মাঘ- ১৩৪২

চতুর্থ বর্ষ, ১ম খণ্ড—১ম সংখ্যা

ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়

—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচ

পূর্ব্বানুবৃত্তি

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমস্যা কি কি, তৎ সম্বন্ধে গত সংখ্যা পর্য্যন্ত যাহা লেখা হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষের দুরবস্থা সংক্ষেপতঃ চারি রকমের, যথা :—

(১) কৃষক, তাঁতী, যুগী, কুম্ভকার এবং কর্ম্মকার প্রভৃতি শ্রমজীবিগণের অন্নাভাব ;

(২) শিক্ষিত যুবক ও শ্রমজীবিগণের বেকারাবস্থা এবং অসন্তুষ্টি ;

(৩) উকিল, ব্যারিষ্টার প্রভৃতি আইন-ব্যবসায়ী, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী এবং বণিকগণের পরমুখাপেক্ষিতা, অর্থকৃচ্ছ্রতা এবং অসন্তুষ্টি ;

(৪) সমস্ত অধিবাসীর স্বাস্থ্যহীনতা, অকালমৃত্যু, অসন্তুষ্টি এবং পরমুখাপেক্ষিতা।

ভারতবাসীর দুরবস্থার কারণ তেরটী, যথা :—

(১) জমীর উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস ;

(২) পণ্যদ্রব্যের মূল্যের সাদৃশ্যের অভাব (want of parity) ;

(৩) কৃষি প্রভৃতি জীবিকার্জ্জনের চারিটী পন্থাতেই যাহাতে ন্যূনকল্পে গরীবানা ভাবে পরিবার প্রতিপালিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থার অভাব ;

(৪) উপরোক্ত চারিটী পন্থাতেই যাহাতে শ্রমজীবিগণের পারিশ্রমিকের সাদৃশ্য থাকে, তাহার ব্যবস্থার অভাব ;

(৫) প্রকৃত বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে কি না তাহার পরীক্ষা দ্বারা যাহাতে শ্রমজীবী (manual workers) ও বিভিন্ন পরিচালকগণের (officers and sub-ordinate officers) পদগৌরবের তারতম্য স্থিরীকৃত হয়, তাহার ব্যবস্থার অভাব ;

(৬) বুদ্ধির উৎকর্ষের তারতম্যানুসারে যাহাতে অ উপার্জ্জনের তারতম্য হয়, তদনুরূপ ব্যব অভাব ;

(৭) জীবিকার্জ্জনের চারিটী পন্থাতেই যাহাতে সবে (maximum) উপার্জ্জন একরূপ হয়, ত ব্যবস্থার অভাব ;

(৮) সম্পূর্ণ ও নির্ভুল শরীরগঠন বিদ্যার (Anatom অভাব ;

(৯) সম্পূর্ণ ও নির্ভুল শরীরবিধান বিদ্যার (Phy. logy) অভাব ;

(১০) সম্পূর্ণ ও নির্ভুল পদার্থবিদ্যার (P অভাব ;

(১১) সম্পূর্ণ ও নির্ভুল রসায়নের (Cl অভাব ;

(১২) জল ও বায়ু যাহাতে অস্বাস্থ্যকর না হয়, ব্যবস্থার অভাব ;

(১৩) শিক্ষাপদ্ধতি যেরূপ হইলে ছাত্র উৎকর্ষ সাধন করিয়া স্বাবলম্বী হইতে পারে, শিক্ষাপদ্ধতির অভাব।

ঐ তেরটী কারণ যাহাতে দূরীভূত হয়, তাহার চেষ্টা ক হইবে। নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি সাধিত হইলে ঐ কারণ দূরীভূত হইতে পারে :—

(১) যাহাতে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি এতাদৃশ প্রাপ্ত হয় যে, প্রত্যেক আট বিঘা জমীর শস্যের দ্বারা অথবা তাহার মূল্যের দ্বারা কৃষির এবং জমীদারের খাজনা ও সেস্ প্রভৃতি নির্ব্ব হইয়া একজন কৃষক, একজন কৃষকপত্নী এবং কৃষক-সন্তান, তাঁহাদের আহার্য্য, পরিধেয়, বা

...ন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য অর্জ্জন করিতে ...রে, তদনুরূপ ব্যবস্থা।

। মাটির বালুকাস্তর পর্য্যন্ত গভীর করিয়া ভারতের নদীগুলির পঙ্কোদ্ধার সাধিত হইলে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব হইতে পারে।

পণ্যদ্রব্যের মূল্যে যাহাতে সাদৃশ্য থাকে তদনুরূপ ব্যবস্থা।

একজন কৃষক যে কয় বিঘা জমী সারা বৎসরে চাষ করিতে পারে, ঐ জমীতে ধান চাষ করিলে যদি কৃষির খরচ, খাজনা, সেস্ প্রভৃতি বাদে গড়ে ৫০ মণ ধান উদ্বৃত্ত হয়, অথবা তুলা চাষ করিলে খরচাদি বাদে যদি গড়ে ৫ মণ তুলা উদ্বৃত্ত হয়, তাহা হইলে ৫০ মণ ধানের মূল্য যাহাতে ৫ মণ তুলার মূল্যের সমান হয়, তদনুরূপ ব্যবস্থা করার নাম পণ্যদ্রব্যের মূল্যের সাদৃশ্য বজায় রাখা। ঐ রূপ খরচাদি বাদে তাঁতী, কুম্ভকার, কর্ম্মকার প্রভৃতি সারা বৎসরে যে যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন করিতে পারে, তাহার পরস্পরের মূল্য যাহাতে ...মান হয়, তদনুরূপ ব্যবস্থাও মূল্যের সাদৃশ্য বজায় রাখিবার ব্যবস্থার অন্তর্গত।

দেশের জনসাধারণের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ যাহাতে স্ব স্ব মজুরী দ্বারা ন্যূনকল্পে গবীবানা ভাবে ...টা স্ত্রীলোক ও তুইটী অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক অথবা ...লিকা প্রতিপালন করিতে পারে, তদনুরূপ মজুরীর ব্যবস্থা।

(৪) পরিশ্রমজাত দ্রব্যের মূল্যের তারতম্যানুসারে যাহাতে পারিশ্রমিকের তারতম্য স্থির করা হয়, তদনুরূপ ব্যবস্থা।

(৫) মস্তিষ্কের পরিশ্রম দ্বারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে যাহা যাহা উৎপন্ন হয়, তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার ব্যবস্থা।

(৬) মূলধনের দ্বারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে যাহা যাহা উৎপন্ন হয়, তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার ব্যবস্থা।

(৭) যাহাতে দেশের প্রত্যেক অপরিণতবয়স্ক বালকের হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় যথাযথ ভাবে সক্ষমতা লাভ করিতে পারে, তদনুরূপ ব্যবস্থা।

(৮) কোন্ কোন্ খাদ্য, পরিচ্ছদ ও বাসস্থান স্বাস্থ্যের উন্নতিকর এবং কোন্‌গুলি অবনতিকর, তাহা যাহাতে দেশের প্রত্যেক অপরিণতবয়স্ক বালক জানিতে পারে, তদনুরূপ ব্যবস্থা।

(৯) স্ত্রী ও পুরুষের কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের পার্থক্য কোথায়, তাহা যাহাতে প্রাপ্তবয়স্ক বালকগণ জানিতে পারে, তদনুরূপ ব্যবস্থা।

(১০) জীবিকার্জ্জনের জন্য দেশের মধ্যে কোথায় কত লোকের উপযোগী কি ব্যবস্থা আছে এবং ঐ ঐ ব্যবস্থানুসারে কি কি শিক্ষা করিলে জীবিকার্জ্জন করা সম্ভব হয়, তাহা যাহাতে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক বালক জানিতে পারে, তদনুরূপ ব্যবস্থা।

(১১) যাহা যাহা শিক্ষা করিলে জীবিকার্জ্জন করা সম্ভব হয়, তাহা যাহাতে প্রাপ্তবয়স্ক বালকগণ ইচ্ছানুরূপ শিক্ষা করিতে পারে, তদনুরূপ ব্যবস্থা।

(১২) যে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক বালক উচ্চশিক্ষা অর্থাৎ বিজ্ঞানশিক্ষার প্রার্থী হইবে, তাহাদের হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় উচ্চশিক্ষার উপযোগী হইয়াছে কি না এবং মন ও বুদ্ধি ভবিষ্যতে তদনুরূপ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিবে কি না, তাহার পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং যাহাতে অনুত্তীর্ণ বালকগণ উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ লাভ না করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা।

(১৩) কোন বস্তুবিষয়ক বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইলে ঐ বস্তুর কত রকম পরীক্ষা কিরূপ ভাবে করিতে হয় এবং নিজেকেই বা কিরূপ ভাবে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা যাহাতে উচ্চশিক্ষার্থী যুবকগণ শিক্ষা করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা।

(১৪) বস্তুর কত রকম পরীক্ষা কিরূপ ভাবে করিতে হয়, অথবা নিজের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি কিরূপ ভাবে গঠিত করিতে হয়, তাহা না শিখিয়া যাহাতে কেহ

উচ্চশিক্ষিত বলিয়া পরিচিত না হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা।

(১৫) উচ্চশিক্ষিত না হইয়া যাহাতে কেহ পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করিতে, অথবা শিক্ষকতা করিতে, অথবা চিকিৎসা ও আইন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে, অথবা ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে, অথবা বিচার ও শাসন-বিভাগে প্রবেশলাভ করিতে না পারেন, তাহার ব্যবস্থা।

(১৬) যাহাতে দেশের জল ও বায়ু কলুষিত হইয়া জনসাধারণের স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে পারে, তাহা যাহাতে বন্ধ হইয়া যায় এবং যাহা করিলে দেশের জল ও বায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ হয়, তাহার ব্যবস্থা।

উপরোক্ত ষোলটী ব্যবস্থা সাধন করিবার উপায়—

(১) কংগ্রেস হইতে যাহাতে ঐ ষোলটী ব্যবস্থার জন্ম গভর্ণমেণ্টের নিকট দাবী উপস্থিত করা হয়, তাহার চেষ্টা করা।

(২) কংগ্রেসের পক্ষ হইতে গভর্ণমেণ্টের নিকট যে ঐ ষোলটী ব্যবস্থার জন্ম দাবী উপস্থাপিত করা হইয়াছে, তাহা যাহাতে দেশের জনসাধারণ জানিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা।

(৩) কংগ্রেসের মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-প্রণয়ন বিভাগের (Central Construction Committee) গঠন করা।

(৪) প্রত্যেক প্রাদেশিক কাউন্সিলে ও ভারতীয় অ্যাসেম্ব্লিতে যাহাতে কংগ্রেস-নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়, তাহার চেষ্টা করা।

ইহাও দেখা গিয়াছে যে, প্রাদেশিক কাউন্সিলে ও ভারতীয় অ্যাসেম্ব্লিতে কংগ্রেস-নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইলে ঐ ঐ কাউন্সিলের মন্ত্রিত্ব কংগ্রেস-নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের লাভ করা সম্ভব হইবে এবং কংগ্রেস-নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ মন্ত্রিত্ব লাভ করিতে পারিলে দেশের শাসন-কার্য্য দেশীয় লোকের লাভ করা সম্ভব হইবে এবং তখন কি করিলে দেশের উপরোক্ত দুরবস্থাগুলি দূরীভূত করা যাইতে পারে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে, দেশীয় মন্ত্রিগণ আবার সোনার ভারতকে স্বর্ণপ্রসবিনী করিয়া তুলিতে পারিবেন।

...সিয়া ... অতী...

মনে রাখিতে হইবে যে, কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত ... গণ কাউন্সিল ও অ্যাসেম্ব্লির মন্ত্রিত্ব লাভ করি... প্রকৃ... দেশের শাসনভার দেশীয় লোকের হস্তে আসিতে ... কিন্তু যদি ঐ মন্ত্রিগণ কি করিয়া দেশের দুরবস্থা ... করিতে হয় তাহার শিক্ষালাভ না করেন, তাহা হইলে ... প্রকৃত দুরবস্থা দূরীভূত হইবে না।

কংগ্রেসের পক্ষ হইতে যদি দেশের মধ্যে হিন্দু মু... প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বাঙ্গালী, বেহারী প্রভৃতি প্রাদেশি... নির্ব্বিশেষে একতা স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে প্রা... কাউন্সিল ও ভারতীয় অ্যাসেম্ব্লিতে কংগ্রেস-নি... প্রতিনিধির সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হওয়া ... হইবে।

ভারতীয় কংগ্রেসের কর্ত্তব্যের অপরা...

পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যায় যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে ... যাইবে যে, ভারতবাসীর বর্ত্তমান দুর্দ্দশা মোচন করিতে ... প্রথমতঃ, কংগ্রেসের মধ্যে যাহাতে দেশীয় সর্ব্বসাধারণের ... স্থাপিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং দ্বিত... যে সমস্ত কংগ্রেস-প্রতিনিধি প্রাদেশিক কাউন্সিল... মন্ত্রিত্বলাভ করিবার সুযোগ পাইবেন, তাঁহারা ... দেশবাসীর প্রকৃত দুরবস্থা কোথায়, ঐ দুরবস্থার ... কতখানি এবং তাহা মোচন করিবার উপায় ... জানিতে ও বুঝিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে হই...

কংগ্রেস * শব্দটীর শব্দগত অর্থ বিবেচনা করিলে ... কংগ্রেস বলিতে বুঝায় সেই স্থান অথবা সেই সংগঠন, ... দেশবাসী সকলের মিলন সম্ভব হইতে পারে। কাযেই ... জাতীয় কংগ্রেস নামক প্রতিষ্ঠানকে কার্য্যতঃ অর্থবান্ ... হইলে, তাহার কর্ম্মোদ্দেশ্য ও কর্ম্মতালিকা এমন হওয়া ... প্রয়োজনীয় যে, দেশবাসী সকলের পক্ষে ঐ জাতীয় ক... যোগদান করা সম্ভব হয় এবং সকলে তাহাতে যো... করেন। যদি দেখা যায় যে, দেশবাসী সকলে ঐ ক... যোগদান করিতে পারিতেছেন না ও করিতেছেন না,

* Congress—(Latin *Con*, together, and *gra*... walk), a meeting together.

...ন যে, তাঁহার কর্ম্মোদ্দেশ্য ও কর্ম্মতালিকায় ...ন ভ্রান্তি উপস্থিত হইয়াছে।

একবার ভারতীয় কংগ্রেসের দিকে লক্ষ্য করিয়া ...ক যে, তাহাতে ভারতবাসী সর্ব্বসাধারণের কত-...ন্ন সম্ভাবিত হইয়াছে।

...রতবাসী সর্ব্বসাধারণ'—এই শব্দের শব্দগত অর্থানুসারে হইবে তাঁহাদিগকে, যাঁহারা ভারতবর্ষে স্থায়ী অথবা ...ভাবে বাস করিয়া থাকেন। যাঁহারা স্থায়ীভাবে ভারত-...স করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের সম্প্রদায়গত নাম—

(১) হিন্দু,
(২) মুসলমান,
(৩) খৃষ্টান,
(৪) জৈন,
(৫) বৌদ্ধ,
(৬) শিখ,
(৭) পার্শী,
(৮) অন্যান্য জাতি।

...পরোক্ত প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার ব্যবসায়গত ...বভাগানুসারে চারিশ্রেণীর লোক আছেন, যথা—

(১) কৃষক,
(২) শিল্পী ও বণিক,
(৩) উকীল, ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক প্রভৃতি ব্যবসায়ী,
(৪) রাজ-কর্ম্মচারী।

প্রত্যেক ব্যবসায়ে আবার তিন শ্রেণীর লোক আছেন,

(১) শ্রমজীবী,
(২) সহকারী কর্ম্মচারী (sub-ordinate),
(৩) কর্ম্মচারী (officer)।

...যেই যাঁহারা স্থায়ীভাবে ভারতবর্ষে বাস করিতেছেন, ...রা সর্ব্বসমেত ৯৬ শ্রেণীর লোক।

যাঁহারা অস্থায়ীভাবে ভারতবর্ষে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের

(১) ইংরাজ,
(২) মার্কিণ, জার্ম্মান, ফরাসী, জাপানী প্রভৃতি অন্যান্য জাতি।

ইহাঁদের মধ্যেও সম্প্রদায়গত, ব্যবসায়গত এবং কার্য্যান্তর-গত শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু আমাদিগের বর্ত্তমান বক্তব্য পরিস্ফুট করিবার জন্য তাঁহাদিগকে কেবলমাত্র উপরোক্ত দুই শ্রেণীর লোক বলিয়া বিবেচনা করিলেই চলিতে পারিবে এবং আমরা তাহাই করিব।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ভারতবাসী সর্ব্বসাধারণ বলিতে বুঝিতে হইবে মোট ৯৮ শ্রেণীর লোক।

গত ১৯৩১ সালের সেন্‌সাস পড়িলে দেখা যাইবে যে, ৯৮ শ্রেণীর লোকের মধ্যে ৩২ শ্রেণীর শ্রমজীবিগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক। লোকসংখ্যার তারতম্যানুসারে ঐ ৯৮ শ্রেণীর লোককে নিম্নলিখিত ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে :—

১।	শ্রমজীবী ...	৩২ শ্রেণী
২।	মুসলমান জমীদার, শিল্পী, বণিক্, ব্যবসায়ী, শিক্ষক ও রাজকর্ম্মচারী,	৮ "
৩।	হিন্দু-মুসলমান ব্যতীত অন্যান্য জাতির জমীদার, শিল্পী, বণিক্, ব্যবসায়ী, শিক্ষক ও রাজকর্ম্মচারী	৪৮ "
৪।	হিন্দু ব্যবসায়ী ও শিক্ষক	২ "
৫।	হিন্দু মধ্যস্বত্বাধিকারী ...	১ "
৬।	হিন্দু রাজকর্ম্মচারী ...	২ "
৭।	ইংরাজ ...	১ "
৮।	হিন্দু শিল্পী ও বণিক্	২ "
৯।	হিন্দু জমীদার ...	১ "
১০।	মার্কিণ, জার্ম্মাণ, ফরাসী, জাপানী প্রভৃতি অন্যান্য জাতি	১ "
	মোট	৯৮ শ্রেণী

ইহার মধ্যে হিন্দু ব্যবসায়ী ও শিক্ষক, মধ্যস্বত্বাধিকারী, শিল্পী ও বণিক্ এবং জমীদারের সংখ্যা ভারতবর্ষের মোট লোকসংখ্যার একশত ভাগের এক ভাগ অপেক্ষাও কম।

উপরোক্ত দশ শ্রেণীর লোকের মধ্যে কে কে ভারতীয় কংগ্রেসের কার্য্যে পরোক্ষভাবে অথবা অপরোক্ষভাবে বর্ত্তমান সময়ে অর্থাৎ এই ১৯৩৬ সালের প্রথম ভাগে সংশ্লিষ্ট আছেন অথবা নাই, তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ৩২ শ্রেণীর শ্রমজীবী, ৮ শ্রেণীর মুসলমান জমীদার প্রভৃতি, ৪৮ শ্রেণীর অন্যান্য জাতির জমীদার প্রভৃতি, ২ শ্রেণীর হিন্দু রাজ-কর্ম্মচারী, ইংরাজ এবং মার্কিণ প্রভৃতি অন্যান্য জাতি কংগ্রেসের কার্য্যে সংশ্লিষ্ট নাই। কেবল মাত্র হিন্দু উকিল, ডাক্তার প্রভৃতি হিন্দু ব্যবসায়ী ও শিক্ষক, মধ্যসত্ত্বাধিকারী, শিল্পী ও বণিক্ এবং জমীদারগণ আংশিক ভাবে ভারতীয় কংগ্রেসের পতাকাতলে মিলিত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের সংখ্যা ভারতবর্ষের মোট লোকসংখ্যার একশত ভাগের এক ভাগ অপেক্ষাও কম।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, ভারতীয় কংগ্রেসে ভারত-বাসী সর্ব্বসাধারণের মিলন উল্লেখযোগ্য ভাবে সম্ভাবিত হয় নাই এবং ভারতীয় কংগ্রেস এই নামটী অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে। ভারতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আরও দেখা যাইবে যে, যে-ইংরাজ আজ পরোক্ষভাবে ভারতীয় কংগ্রেসের অপমৃত্যু কামনা করিয়া থাকেন, সেই ইংরাজ জাতির মধ্যেও বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সহায়তা করিয়াছিলেন এবং ১৯০৪ সাল পর্য্যন্ত মুসলমান প্রভৃতি অপরাপর জাতির মধ্যেও কংগ্রেসের কার্য্যে যোগদান করিবার প্রবৃত্তির সূচনা হইয়াছিল। ১৯০৪ সালের পর হইতে হিন্দু-মুসলমানের অনৈক্য দেখা দিয়াছে এবং ঐ অনৈক্যে তীব্রতাও ছিল। কিন্তু ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত ঐ অনৈক্য এবং উহার তীব্রতা খুব ব্যাপক হয় নাই। ১৯২১ সালে খিলাফত আন্দোলনের সময় আর একবার হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য দেখা দিয়াছিল। কিন্তু ঐ ঐক্য যে খিলাফত আন্দোলনেরই জন্য নহে, তাহা কে বলিতে পারে? ১৯২৩ সালের পর হইতে ঐ অনৈক্য এবং উহার তীব্রতা ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে এবং বর্ত্তমান সময়ে কংগ্রেসের কার্য্যে হিন্দু ব্যতীত অন্যান্য জাতির মধ্যে কেহ কেহ সংশ্লিষ্ট থাকিলেও মোটের উপর অন্যান্য জাতির লোক সম্পূর্ণ ভাবে কংগ্রেসের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং তাঁহারা তাহার বিরোধিতা করিতেছেন, ইহা বলা যাইতে পারে। হিন্দুদিগের মধ্যেও যাঁহারা এক সময়ে কংগ্রেসের কার্য্য [illegible] দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা প্র[illegible] দেশপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া দেশের জন্য সর্ব্বত[illegible] হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে কেহ বা সামাজি[illegible] কেহ বা অর্থনৈতিক কার্য্যে, কেহ বা শারীরি[illegible] উন্নতি সাধনের কার্য্যে, কেহ বা শিক্ষার কার্য্যে যোগদান ক[illegible] পরোক্ষভাবে কংগ্রেসের কার্য্য পরিত্যাগ করিতেছেন। [illegible] কি বর্ত্তমান কংগ্রেসের কর্ণধার মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত কংগ্রে[illegible] কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কুটীর-শিল্পের উন্নতির কার্য্যে [illegible] হরিজন আন্দোলন নামক সামাজিক কার্য্যে যোগ[illegible] করিয়াছেন।

কংগ্রেসের পক্ষ হইতে "রাউণ্ড টেবল কন্ফারেন্[illegible] নিমন্ত্রিত হইয়া লণ্ডন হইতে মহাত্মা জগৎকে শুনাইয়াছি[illegible] যে, তিনি শতকরা ৮০ জন ভারতবাসীর প্রতিনিধি। মহা[illegible] সত্যাগ্রহী, তাঁহার মুখ হইতে অসত্য নিঃসৃত হইতে পারে [illegible] কাযেই তিনি যে, তাঁহার বুদ্ধি ও বিবেচনানুসারে কংগ্রেস শতকরা ৮০ জন ভারতবাসীর মিলন-স্থান মনে করিয়া[illegible] এবং তাহারই জন্য নিজেকে তাহার প্রতিনিধি বলিয়া অভি[illegible] করিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু বাস্তব অ[illegible] পর্য্যালোচনা করিলে, কংগ্রেস যে কখনও সমগ্র ভারতবা[illegible] এক শত ভাগের এক ভাগ লোকেরও মিলন সাধন করি[illegible] পারে নাই, পরন্তু ভারতবাসীর যে মিলনাভাস [illegible] পূর্ব্বে দেখা গিয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে [illegible] সালের পর হইতে তীব্র দ্বন্দ্ব-কলহে পরিণত হইয়াছে, [illegible] স্বীকার করিতেই হইবে।

এক্ষণে প্রশ্ন করিতে হইবে, ভারতীয় কংগ্রেসে ভারতবা[illegible] মিলন ক্রমশঃ বর্দ্ধিত না হইয়া, অ-মিলন বর্দ্ধিত হইল [illegible] এবং দেশবাসীর মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব-কলহের উদ্ভব হইল কেন?

ইহার একমাত্র উত্তর কংগ্রেসের কর্ম্মোদ্দেশ্যে (cree[illegible] এবং কর্ম্মতালিকায় (programme of work) ভ্র[illegible] রহিয়াছে।

দেশীয় মিলন-সভা যদি দেশের স্থায়ী অথবা অস্থ[illegible] অধিবাসিগণের কাহারও স্বার্থ-বিরুদ্ধ কোন কর্ম্মোদ্দেশ্য ল[illegible] কার্য্যে অবতীর্ণ হয়, তাহা হইলে দেশবাসিগণের মধ্যে দলা[illegible] অবশ্যম্ভাবী।

ইংরাজ প্রায়শঃ স্থায়ী ভাবে ভারতবর্ষে বসবাস না করিলেও তাঁহারা যে অস্থায়ী ভাবে ভারতবাসী হইয়া পড়িয়াছেন, ইহা বাস্তব সত্য। ইংরাজের প্রকৃত স্বার্থ যে কোনরূপে ভারতবাসীর প্রকৃত স্বার্থের বিরোধী, তাহা আমি ব্যক্তিগত ভাবে বুঝিতে পারি না এবং স্বীকার করি না। যদি তর্কের খাতিরে স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে, ইংরাজের স্বার্থের সহিত ভারতবাসীর স্বার্থের সংঘর্ষ আছে, তাহা হইলেও ভারতীয় কংগ্রেসের কর্ম্মোদ্দেশ্যে অথবা কর্ম্ম-তালিকায় যাহা ইংরাজের স্বার্থের বিরোধী হইতে পারে, তাহা থাকা উচিত নহে। ভারতবাসীর স্বার্থের বিরুদ্ধে যদি কেহ কিছু করেন, তাহা হইলে যেমন ভারতবাসী তাঁহার ঐ কার্য্যের বিরোধিতা করিয়া থাকেন এবং তজ্জন্য কেহ ভারতবাসীকে যুক্তিসঙ্গত ভাবে অপরাধী করিতে পারে না, সেইরূপ ইংরাজের স্বার্থের বিরুদ্ধে যদি কেহ কিছু করেন, তাহা হইলে ইংরাজের পক্ষে তাহার বিরোধিতা করা স্বাভাবিক এবং তজ্জন্য ইংরাজকে দুষ্ট বলা যায় না।

ভারতবাসীর মধ্যে অথবা ভারতীয় কংগ্রেসে যে দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছে, তজ্জন্য ভারতবাসীর পক্ষ হইতে সাধারণতঃ ইংরাজকে দায়ী সাব্যস্ত করা হইয়া থাকে। অবশ্য ইংরাজগণ তাহা স্বীকার করেন না। ভারতীয় দলাদলির জন্য প্রকৃত পক্ষে ইংরাজ জাতির কোন দোষ আছে কি না, তাহার বিচার না করিয়া যদি তর্কের খাতিরে স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে, ইংরাজই ভারতবাসীর মধ্যে দলাদলির সৃষ্টি করিতেছেন, তাহা হইলেও তাঁহাদিগকে সাধারণ যুক্তি অনুসারে নিন্দা করা যায় না। কেহ তাঁহাদের স্বার্থের বিরোধী কার্য্য করিলে, যাহাতে বিরোধিগণের দল দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহাদের দলের সবলতা লাভ ঘটে, তাহা করিবার অধিকার তাঁহাদের আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

১৯০৪ সাল পর্য্যন্ত ভারতীয় কংগ্রেসের কর্ম্মোদ্দেশ্য ছিল দেশীয় শাসন-কার্য্যের উন্নতি বিধান করা। তাহাতে ইংরাজ-গণের স্বার্থের কোন বিরোধিতা ছিল না এবং ইংরাজগণও কংগ্রেসের কোন উল্লেখযোগ্য বিরোধিতা করেন নাই।

১৯০৪ সাল হইতে ১৯০৬ সাল পর্য্যন্ত কংগ্রেসের কর্ম্মো-দ্দেশ্য অপরিবর্ত্তিত ছিল বটে, কিন্তু কর্ম্মতালিকায় বঙ্গবিভাগ (Bengal Partition) নাকচ করিবার জন্য যে সকল পন্থা অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ইংরাজের স্বার্থের বিরোধী যে অনেক কিছু ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। এই সময়ে মুসলমানের সহিত হিন্দুর তীব্র দলাদলির প্রথম সূচনা হয়।

১৯০৬ সালে "স্বরাজ" লাভ করা হয় কংগ্রেসের কর্ম্মোদ্দেশ্য। স্বরাজ-লাভের মধ্যে যে ইংরাজের স্থানে ভারত-বাসীর সম্পূর্ণ ভাবে শাসন-ভার গ্রহণ করিবার চেষ্টা ছিল এবং তাহাতে যে ইরাজের স্বার্থের বিরোধী তীব্রতা ছিল, ইহা অস্বীকার করা যায় না। তাৎকালিক কাউন্সিলে যাহাতে পৃথক্ ভাবে হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধির স্থান হয়, তাহার প্রথম ব্যবস্থা হইয়াছিল ১৯০৯ সালে। ইহার আগে কাউন্-সিলে সভ্য ছিল বটে, কিন্তু হিন্দু সভ্য অথবা মুসলমান সভ্য বলিয়া কোন সাম্প্রদায়িক বিভাগ ছিল না।

কাযেই দেখা যাইতেছে যে, এই সময়ে সাম্প্রদায়িকতা স্থায়ী ভাবে সরকারী কার্য্যে স্থান পাইয়াছিল।

১৯২৩ সালের পর হইতে কংগ্রেসের কর্ম্মতালিকায় গভর্ণমেণ্টের সহিত অসহযোগ এবং আইন-অমান্য স্থান পাইয়া আসিতেছে। এই দুইটী জিনিষই ইংরাজের স্বার্থ-বিরোধী এবং বিরক্তিকর। এই সময়েই দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে দলাদলির প্রকটতা বাড়িয়া গিয়াছে। এই সময়ে দেশের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী যে তীব্র আন্দোলন চালাইয়াছিলেন, তাহাতে যাঁহারা কংগ্রেসের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে দেশের জন্য তাঁহাদের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে বসিয়া-ছিলেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মোট কংগ্রেস-কর্ম্মীর সংখ্যা যে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। মহাত্মার খিলাফত আন্দোলনের সময় মুসলমানগণের মধ্যেও অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া-ছিলেন বটে, কিন্তু সমস্ত দিকে নজর রাখিয়া মডারেটগণের এবং মুসলমান প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়ের পরবর্ত্তী চালকগণের কার্য্য বিচার করিলে, এই সময়েই যে উৎকট দলাদলির উদ্ভব হইয়াছে এবং কংগ্রেস-কর্ম্মীর সংখ্যা এই সময় হইতেই যে ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে, তাহা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য।

ইহার পর কংগ্রেসের কর্ম্মোদ্দেশ্যে আসিয়াছে "পূর্ণ-স্বাধীনতা লাভ"। অবশ্য কি কার্য্য করিলে পূর্ণ-স্বাধীনতা

লাভ হইতে পারে, তাহা অদ্যাবধি স্থির করা হয় নাই এবং তদুদ্দেশ্যে কংগ্রেসের কর্ম্মতালিকা কি, তাহা আজ পর্য্যন্ত দেশবাসী জানিতে পারে নাই। যাঁহারা পূর্ণ-স্বাধীনতা লাভ করা কংগ্রেসের কর্ম্মোদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্য দেখিলে মনে করা যাইতে পারে যে, তাঁহাদের মতে 'কংগ্রেসের কর্ম্মোদ্দেশ্য—পূর্ণ-স্বাধীনতা লাভ', এই প্রস্তাব কংগ্রেসের অধিবেশনে তীব্রভাষায় পাশ হইয়া গেলেই দেশের স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব হইতে পারে।

"পূর্ণ-স্বাধীনতা" দ্রব্যটী যে অত্যন্তভাবে ইংরাজের স্বার্থের বিরোধী, তাহা বলাই বাহুল্য। "পূর্ণ-স্বাধীনতা"র প্রস্তাবটী পাশ হওয়া অবধি কংগ্রেসের কর্ম্মিগণকে অধিকতর সংখ্যায় কারাগারে নিবদ্ধ হইতে হইয়াছে এবং কংগ্রেস কার্য্যতঃ নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে।

দেশের স্থায়ী অথবা অস্থায়ী অধিবাসিগণের কাহারও স্বার্থ-বিরুদ্ধ কোন কার্য্য কংগ্রেসের কর্ম্মোদ্দেশ্য হইলে কংগ্রেসকে যে নির্জ্জীব হইতে হয়, তাহাতে কংগ্রেসের কর্ম্মী-সংখ্যা যে কমিয়া যায়, এবং দেশের মধ্যে যে উৎকট দলাদলির উদ্ভব হয়, তাহা কংগ্রেসের ইতিহাসের উপরোক্ত মোটা কথাগুলি পর্য্যালোচনা করিলে পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে পারা যায়।

কাযেই বলিতে হইবে যে, ভারতবাসীর বর্ত্তমান দুরবস্থা দূর করিতে হইলে এবং ভারতীয় কংগ্রেস যাহাতে সমগ্র ভারতবাসীর মিলন-ক্ষেত্র হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে, অথবা সমগ্র ভারতবাসীর একতা সাধন করিতে হইলে, "পূর্ণ-স্বাধীনতালাভ" নামক যে বাক্যটী ভারতীয় কংগ্রেসের কর্ম্মোদ্দেশ্য বলিয়া ঔজ্জ্বল্য লাভ করিয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে।

শ্রমিক আন্দোলন-কারিগণের কর্ম্মতালিকা (Socialist Programme) নামক যে একটী কার্য্যতালিকার কথা বর্ত্তমান সময়ে শোনা যাইতেছে, তাহা কংগ্রেসের দ্বারা গৃহীত হইলেও দেশীয় সর্ব্বসাধারণের একতা সাধিত করিবে না এবং সর্ব্বসাধারণের পক্ষে কংগ্রেসে যোগদান করা সম্ভব হইবে না। কারণ, ঐ কার্য্যতালিকায় ধনিকগণের সহিত বিরোধ রহিয়াছে। ধনিকগণও দেশবাসী।

অনেকে হয়ত নজির দেখাইবেন যে, রুসিয়ায়, জার্ম্মেণীতে, অথবা ইটালীতে এই জাতীয় কার্য্যতালিকা গৃহীত হইয়াছে। তাঁহাদের যুক্তিমতে সুসভ্য রুসিয়া, জার্ম্মেণী ও ইটালীতে যখন ঐ জাতীয় কার্য্যতালিকা গৃহীত হইয়া তখন ভারতবর্ষেও উহা গৃহীত হওয়া উচিত। তাঁহাদে[র] কথার উত্তরে আমরা প্রথমতঃ বলিব যে, রুসিয়া, জা[র্ম্মেণী] ইটালী এবং ভারতবর্ষের আবহাওয়ার মধ্যে অনেক পার্থক[্য] রহিয়াছে। কাজেই যে পদ্ধতি রুসিয়া ও জার্ম্মেণী প্রভৃ[তি] দেশে সফল হইতে পারে, তাহা যে ভারতবর্ষে সফল হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। দ্বিতীয়তঃ বলিব যে, রুসিয়া, জার্ম্মে[ণী] প্রভৃতি দেশে আজ পর্য্যন্ত কোন কর্ম্মপদ্ধতি তাঁহাদের দেশ[-]বাসীর দুরবস্থা উল্লেখযোগ্য ভাবে দূরীভূত করিতে পারে নাই দূর হইতে মনে হয় বটে যে, রাসিয়ান, জার্ম্মান, ইটালিয়া[ন] মার্কিন, জাপানী, ইংরাজ প্রভৃতি জাতিগুলি ভারতবা[সী] অপেক্ষা ভাল আছে। কিন্তু, তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ অব[স্থা] বিশ্লেষণ করিয়া চিন্তা করিলে প্রত্যেকেই বলিতে বাধ্য হইবে যে, উঁহাদের মধ্যে কোন জাতিই অর্থনৈতিক দুরবস্থার হা[ত] হইতে বিন্দুমাত্রও অব্যাহতি পান নাই। পরন্তু হেন[্রি] জর্জ্জ, টলষ্টয় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদিগের লেখা পড়ি[লে] জানা যাইবে যে, প্রত্যেক দেশেই দারিদ্র্যের তীব্র[তা] (intensity) এবং [দ]রিদ্রের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃ[দ্ধি] পাইতেছে। তাঁহারা কেহ দুরবস্থার হাত হইতে পরিত্রা[ণ] পান নাই বলিয়াই তাঁহাদিগকে পেটের জন্য স্ব স্ব দেশ ছাড়িয়া দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়।

এক্ষণে প্রশ্ন হইবে যে, কংগ্রেসের কর্ম্মোদ্দেশ্য ও কর্ম্ম[-]তালিকা কি হইলে স্থায়ী ও অস্থায়ী সমগ্র ভারতবাসীর মিল[ন] সম্ভব হইতে পারে।

আমরা তাহার উত্তরে বলিব যে, যদি "সমগ্র ভারতবাসী ও মনুষ্য-সমাজের আর্থিক দুরবস্থা দূর করা" কংগ্রেসে[র] কর্ম্মোদ্দেশ্য হয় এবং নিম্নলিখিত ষোলটী ব্যবস্থা করিবার চে[ষ্টা] তাহার কার্য্যতালিকাভুক্ত হয়, তাহা হইলে অতি অনায়াসে কংগ্রেস সমগ্র ভারতবাসীর মিলন-ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইবে এই ষোলটী ব্যবস্থার নাম :—

(১) যাহাতে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি এতাদৃশ বৃ[দ্ধি] প্রাপ্ত হয় যে, প্রত্যেক আট বিঘা জমীর উৎ[পন্ন] শস্যের দ্বারা অথবা তাহার মূল্যের দ্বারা কৃষির খ[রচ] এবং জমীদারের খাজনা ও সেস্ প্রভৃতি নির্ব্বাহি[ত] হইয়া একজন কৃষক, একজন কৃষক-পত্নী এবং দুই কৃষক-সন্তান, তাঁহাদের আহার্য্য, পরিধেয়, বাসস্থ[ান]

প্রভৃতি একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য অর্জ্জন করিতে পারেন,—তদনুরূপ ব্যবস্থা।

[মাটীর বালুকাস্তর পর্য্যন্ত গভীর করিয়া ভারতের নদীগুলির পঙ্কোদ্ধার সাধিত হইলে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব হইতে পারে।]

(২) পণ্যদ্রব্যের মূল্যে যাহাতে সাদৃশ্য থাকে তদনুরূপ ব্যবস্থা।

একজন কৃষক যে কয় বিঘা জমী সারা বৎসরে চাষ করিতে পারে, ঐ জমীতে ধান চাষ করিলে যদি কৃষির খরচ, খাজনা, সেস্ প্রভৃতি বাদে গড়ে ৫০ মণ ধান উদ্বৃত্ত হয়, অথবা তূলা চাষ করিলে খরচাদি বাদে যদি গড়ে ৫ মণ তূলা উদ্বৃত্ত হয়, তাহা হইলে ৫০ মণ ধানের মূল্য যাহাতে ৫ মণ তূলার মূল্যের সমান হয়, তদনুরূপ ব্যবস্থা করার নাম পণ্যদ্রব্যের মূল্যের সাদৃশ্য বজায় রাখা। ঐ রূপ খরচাদি বাদে তাঁতী, কুম্ভকার, কর্ম্মকার প্রভৃতি সারা বৎসরে যে যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন করিতে পারে, তাহার পরস্পরের মূল্য যাহাতে সমান হয়, তদনুরূপ ব্যবস্থাও মূল্যের সাদৃশ্য বজায় রাখিবার ব্যবস্থার অন্তর্গত।

(৩) দেশের জনসাধারণের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ যাহাতে স্ব স্ব মজুরী দ্বারা ন্যূনকল্পে, গরীবানা ভাবে, একটী স্ত্রীলোক ও দুইটী অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক অথবা বালিকা প্রতিপালন করিতে পারে, তদনুরূপ মজুরীর ব্যবস্থা।

(৪) পরিশ্রমজাত দ্রব্যের মূল্যের তারতম্যানুসারে যাহাতে পারিশ্রমিকের তারতম্য স্থির করা হয়, তদনুরূপ ব্যবস্থা।

(৫) মস্তিষ্কের পরিশ্রম দ্বারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে যাহা যাহা উৎপন্ন হয়, তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার ব্যবস্থা।

(৬) মূলধনের দ্বারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে যাহা যাহা উৎপন্ন হয়, তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার ব্যবস্থা।

(৭) যাহাতে দেশের প্রত্যেক অপরিণতবয়স্ক বালকের হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় যথাযথ ভাবে সক্ষমতা লাভ করিতে পারে, তদনুরূপ ব্যবস্থা।

(৮) কোন্ কোন্ খাদ্য, পরিচ্ছদ ও বাসস্থান স্বাস্থ্যের উন্নতিকর এবং কোন্গুলি অবনতিকর, তাহা যাহাতে দেশের প্রত্যেক অপরিণতবয়স্ক বালক জানিতে পারে, তদনুরূপ ব্যবস্থা।

(৯) স্ত্রী ও পুরুষের কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের পার্থক্য কোথায়, তাহা যাহাতে প্রাপ্তবয়স্ক বালকগণ জানিতে পারে, তদনুরূপ ব্যবস্থা।

(১০) জীবিকার্জ্জনের জন্য দেশের মধ্যে কোথায় কত লোকের উপযোগী কি ব্যবস্থা আছে এবং ঐ ঐ ব্যবস্থানুসারে কি কি শিক্ষা করিলে জীবিকার্জ্জন করা সম্ভব হয়, তাহা যাহাতে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক বালক জানিতে পারে, তদনুরূপ ব্যবস্থা।

(১১) যাহা যাহা শিক্ষা করিলে জীবিকার্জ্জন করা সম্ভব হয়, তাহা যাহাতে প্রাপ্তবয়স্ক বালকগণ ইচ্ছানুরূপ শিক্ষা করিতে পারে, তদনুরূপ ব্যবস্থা।

(১২) যে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক বালক উচ্চশিক্ষা অর্থাৎ বিজ্ঞানশিক্ষার প্রার্থী হইবে, তাহাদের হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় উচ্চশিক্ষার উপযোগী হইয়াছে কি না এবং মন ও বুদ্ধি ভবিষ্যতে তদনুরূপ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিবে কি না, তাহার পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং যাহাতে অনুত্তীর্ণ বালকগণ উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ লাভ না করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা।

(১৩) কোন বস্তুবিষয়ক বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইলে ঐ বস্তুর কত রকম পরীক্ষা কিরূপ ভাবে করিতে হয় এবং নিজেকেই বা কিরূপ ভাবে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা যাহাতে উচ্চশিক্ষার্থী যুবকগণ শিক্ষা করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা।

(১৪) বস্তুর কত রকম পরীক্ষা কিরূপ ভাবে করিতে হয়, অথবা নিজের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি কিরূপ ভাবে গঠিত করিতে হয়, তাহা না শিখিয়া যাহাতে কেহ

উচ্চশিক্ষিত বলিয়া পরিচিত না হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা।

(১৫) উচ্চশিক্ষিত না হইয়া যাহাতে কেহ পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করিতে, অথবা শিক্ষকতা করিতে, অথবা চিকিৎসা ও আইন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে, অথবা ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে, অথবা বিচার ও শাসন-বিভাগে প্রবেশলাভ করিতে না পারেন, তাহার ব্যবস্থা।

(১৬) যাহাতে দেশের জল ও বায়ু কলুষিত হইয়া জনসাধারণের স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে পারে, তাহা যাহাতে বন্ধ হইয়া যায় এবং যাহা করিলে দেশের জল ও বায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ হয়, তাহার ব্যবস্থা।

এই ষোলটী ব্যবস্থার কথা একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, যে-কোন দেশে তাহা সাধিত হইলে সেই দেশের বর্ত্তমান আর্থিক দুরবস্থার কারণগুলি দূরীভূত হইতে পারে এবং ঐ সব দেশের সমগ্র অধিবাসী তাঁহাদের বর্ত্তমান ভীষণ আর্থিক দুরবস্থার হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারেন।

ইংলণ্ড, মার্কিন, রুশিয়া, জার্ম্মানী, ইটালী, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের সর্ব্বত্রই শ্রমজীবিগণের অন্নাভাব ও বেকার অবস্থা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে, সর্ব্বত্রই শিক্ষিত যুবকগণ ক্রমশঃই অধিকতর সংখ্যায় বেকার হইয়া পড়িতেছে, সর্ব্বত্রই আইন ও চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ও বণিকগণ ক্রমশঃ অধিকতর পরমুখাপেক্ষিতা, অর্থকৃচ্ছ্রতা এবং অসন্তুষ্টি অনুভব করিতেছেন। জগতে এখন আর এমন দেশ নাই—যেখানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক মানুষ অকালে স্বাস্থ্য হারায় না, অথবা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয় না, অথবা কোন না কোন কারণে সর্ব্বদা অসন্তুষ্টি অনুভব করে না। অথচ কোন দেশেই মানুষের এই দুরবস্থা দূর করিবার উপায় কি, তাহা স্থির করিতে পারা ত দূরের কথা, কোন্ কোন্ কারণে ঐ দুরবস্থাগুলির উদ্ভব হইয়াছে, তাহা পর্য্যন্ত কেহ সঠিকভাবে স্থির করিতে পারেন নাই।

কাযেই ভারতীয় কংগ্রেসের কার্য্যতালিকায় উপরোক্ত ষোলটী ব্যবস্থার কথা স্থান পাইলে তাহা সমগ্র জগতের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা অলীক হইবে না।

অন্য দিকে কংগ্রেসের কর্ম্মোদ্দেশ্যে যে পূর্ণ-স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার কথা আছে, তাহা অপসারিত হইয়া সমগ্র ভারতের ও জগতের আর্থিক দুরবস্থার মোচন করা তাহার কর্ম্মোদ্দেশ্য হইলে, ভারতবর্ষের প্রত্যেকের পক্ষে কংগ্রেসে যোগদান করা সম্ভব হইবে এবং কংগ্রেস-কর্ম্মীর সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইবে, ইহা আশা করা যায়।

এক্ষণে প্রশ্ন হইবে যে, কংগ্রেসের কর্ম্মোদ্দেশ্য হইতে "পূর্ণ-স্বাধীনতা লাভ" শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন কর্ম্মোদ্দেশ্যের কথা উত্থাপন করিবেন কে?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে প্রথমতঃ চিন্তা করিতে হইবে যে, কেন কংগ্রেসে "পূর্ণ-স্বরাজ অথবা পূর্ণ-স্বাধীনতা প্রাপ্তি", এই কর্ম্মোদ্দেশ্য বর্ত্তমান সময়ে গৃহীত হইয়াছে। প্রচলিত ভাষায় "পূর্ণ-স্বাধীনতা" বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা ইংরাজদিগকে ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য হইতে অপসারিত করিতে না পারিলে পাইবার উপায় নাই। বর্ত্তমান অবস্থায় যাহা দেখা যাইতেছে, তাহাতে খুব শীঘ্র যে, ইংরাজ রাজপুরুষগণ তাঁহাদের স্ব স্ব চাকুরীতে ইস্তফা দিবেন, তাহার কোন চিহ্ন নাই। কংগ্রেসও স্বাধীনতা লাভ করিবার উপযোগী কোন কর্ম্মতালিকা দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারেন নাই। পরন্তু যেদিন হইতে স্বাধীনতা লাভ করা কংগ্রেসের কর্ম্মোদ্দেশ্য হইয়াছে, সেই দিন হইতেই তাহার কর্ম্মিগণকে প্রায়শঃ কারাগারে নিবদ্ধ হইতে হইয়াছে। কারাগারের অন্তরাল হইতে কোন কর্ম্মতালিকা কখনও কার্য্যপ্রসূ করা যায় না, তাহা বলাই বাহুল্য। যে স্বাধীনতার প্রস্তাব আসিবামাত্রই এতখানি দুর্দ্দৈব ঘটিতে পারিয়াছে, সেই স্বাধীনতার প্রস্তাব কেন কংগ্রেসে আসিল, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, সাধারণতঃ প্রত্যেক দেশের কেন উত্থান ও পতন হয়, তাহা চিন্তা করিতে হয়।

কোন দেশের কেন উত্থান ও পতন হয়, তাহা চিন্তা করিতে হইলে সেই দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস জানিবার প্রয়োজন হয়।

আমি আমার পাঠকদিগকে ইটালী, স্পেন, পর্ত্তুগাল এবং ইংলণ্ডের ইতিহাস এবং তৎসঙ্গে নিম্নলিখিত রাজনীতির ইতিহাসগুলি পড়িতে অনুরোধ করি

(১) English Political Philosophy from Hobbes to Maine by W. Graham.
(২) Political Science—by I. S. Wolsley.
(৩) Lectures on Principles of Political Obligation—by I. H. Green.
(৪) Political Theories of Middle Ages—English Translation by F. W. Maitland.
(৫) History of Politics by E. Jenks.
(৬) Legislative Methods and Forms—by C. P. Ilbert.
(৭) A History of Political Theories, Ancient and Medieval—by W. N. Danning.
(৮) A History of Political Theories, Luther to Montesquieu—by W. N. Danning.

উপরোক্ত পুস্তকগুলিতে সাধারণতঃ কোন্ রাজনীতি পরিবর্ত্তিত হইয়া কোন্ রাজনীতির প্রবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা লিখিত আছে। পুস্তকগুলি যে ভাবে লিখিত হইয়াছে, ঠিক ঠিক সেই ভাবে পড়িলে আমার বক্তব্য বুঝিবার সহায়তা হইবে না। সাধারণ ইতিহাসগুলির সহিত মিলাইয়া রাজনীতির ইতিহাস পড়িলে দেশের কোন্ রকম আর্থিক অবস্থায় কোন্ শ্রেণীর রাজনীতির অথবা অর্থনীতির প্রবর্ত্তন হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কোন্ রকম আর্থিক অবস্থায় কোন্ শ্রেণীর রাজনীতির অথবা অর্থনীতির প্রবর্ত্তন হয় এবং কোন্ শ্রেণীর রাজনীতিব অথবা অর্থনীতির প্রবর্ত্তন হইলে, কি রকম আর্থিক অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহা বুঝিতে পারিলে, কেন কোন্ দেশের উত্থান ও পতন হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

আমার বুদ্ধিতে আমি যাহা বুঝিয়াছি, তদনুসারে বলিতে পারি যে, গত উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত রাজনীতি এবং অর্থনীতি বলিয়া যাহা যাহা চলিতেছে, তাহার কোনটাই খুব গভীর অথবা আমূল চিন্তাপ্রসূত নহে।

বর্ত্তমান কালে খুব গভীর অথবা আমূল চিন্তাপ্রসূত রাজনীতি এবং অর্থনীতি নাই বলিয়াই জগতের সর্ব্বত্র মানুষ ক্রমশঃ বিপর্য্যস্ত ও বিপন্ন হইয়া পড়িতেছে। মানুষের চিন্তাশক্তি এত কমিয়া গিয়াছে যে, মানুষ যে কতখানি বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা পর্য্যন্ত সাধারণতঃ তাহাদের অবোধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন যে মানুষের জীবন ৪০।৫০ বৎসরের মধ্যেই প্রায়শঃ শেষ হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং এতাদৃশ অকালমৃত্যু যে কত বিপজ্জনক, তাহা পর্য্যন্ত এখন আর মানুষ তাহার মত্ততার জন্য বুঝিতে পারে না এবং বুঝিতে চাহে না।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত জগতের রাজনীতি ও অর্থনীতি বর্ত্তমান কালের রাজনীতি ও অর্থনীতি হইতে বিভিন্ন ছিল। উপরোক্ত দুইশত বৎসরের রাজনীতি ও অর্থনীতিগুলিকে গতানুগতিক বলা যাইতে পারে। ঐ রাজনীতি ও অর্থনীতিগুলিতে মূলতঃ গ্রীকগণের সময়বর্ত্তী রাজনীতি ও অর্থনীতির সাদৃশ্য দেখা যায়।

কাযেই সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত জগতে যে রাজনীতি ও অর্থনীতি প্রচলিত ছিল, তাহা সম্পূর্ণ ভাবে বুঝিতে হইলে, গ্রীকগণের রাজনীতি ও অর্থনীতি বুঝিবার প্রয়োজন হয়। আগেই বলিয়াছি যে, কোন দেশের কোন সময়ের রাজনীতি এবং অর্থনীতি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে ঐ দেশের ঐ সময়বর্ত্তী ইতিহাস জানিবার প্রয়োজন হয়। কাজেই গ্রীকগণের রাজনীতি ও অর্থনীতি বুঝিতে হইলে তাঁহাদের সাধারণ ইতিহাসও জানিতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বর্ত্তমানকালে গ্রীকগণের ইতিহাস বলিয়া যাহা চলিতেছে, তাহা কার্য্যকারণ-ভাব বিচার করিয়া পড়িলে তাহার অনেক স্থানে অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। কাযেই আমার চোখে আধুনিক কালের রচিত প্রাচীন গ্রীক ইতিহাস অনেক স্থলে অবিশ্বাসযোগ্য।

মোটের উপর, আমি গ্রীকগণের রাজনীতি ও অর্থনীতি চিন্তা করিয়া যাহা বুঝিতে পারিয়াছি, তদনুসারে গ্রীকগণের রাজনীতি ও অর্থনীতিগুলিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। ঐগুলির মধ্যে যেগুলি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম, তাহাদের সহিত ভারতীয় ঋষিদিগের রাজনীতি ও অর্থনীতির সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। আর যেগুলি পরবর্ত্তী, তাহাদিগের সহিত মুসলমানদিগের রাজনীতি এবং অর্থনীতির সাদৃশ্য আছে। কাযেই গ্রীকগণের অর্থনীতি ও রাজনীতি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, ভারতীয় ঋষিগণের

ও মুসলমানগণের রাজনীতি এবং অর্থনীতি জানিবার প্রয়োজন হয়।

দুর্ভাগ্যক্রমে আজ ভারতীয় ঋষিগণের ইতিহাস সম্পূর্ণ বিলুপ্ত এবং মুসলমানদিগের ইতিহাস বহুলাংশে বিপর্য্যস্ত। এই দুইটী জাতির ইতিহাস পুনরুদ্ধার করিতে হইলে স্থান ও কাল সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু কেহ যে কাল ও স্থান সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জন করিয়া ভারতীয় ঋষিগণের অথবা মুসলমানগণের ইতিহাস উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহার সংবাদ আমার জানা নাই।

ভারতীয় ঋষিগণের ও মুসলমানগণের ইতিহাস, রাজনীতি এবং অর্থনীতি কি ছিল, তাহা অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকায় সাধারণ পাঠকের পক্ষে বর্ত্তমান সময়ে রাজনীতি ও অর্থনীতির ধারাবাহিক শৃঙ্খলাবদ্ধ ইতিহাস পরিজ্ঞাত হওয়া একরূপ অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

যদি কখনও ঐ ইতিহাস রচনা করিবার সৌভাগ্য আমার হয়, তাহা হইলে আমি প্রতিপন্ন করিতে পারিব যে, ভারতীয় ঋষিগণের আমূল ভাবে চিন্তিত রাজনীতি এবং অর্থনীতি ছিল। তাঁহাদের রাজনীতি এবং অর্থনীতি অতি উচ্চাঙ্গের ছিল বলিয়াই তাঁহাদের সমসাময়িক জগতে সর্ব্বত্রই মানুষের মধ্যে অর্থাভাব, অস্বাস্থ্য অথবা অকাল-মৃত্যু পরিলক্ষিত হইত না। মুসলমানগণের রাজনীতি ও অর্থনীতি ঋষিগণের রাজনীতি ও অর্থনীতির মত অভ্রান্ত না হইলেও অতীব উচ্চাঙ্গের এবং মুসলমানগণ উহা জ্ঞান-বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে হিন্দুদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মধ্য-এসিয়ায় এবং ইউরোপে মুসলমানগণের দান খুব বিস্তৃত। ইয়োরোপে যে রাজনীতি ও অর্থনীতি মধ্যযুগে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা প্রায়শঃ গ্রীকগণ ও রোমানগণ মুসলমানগণের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে ইয়োরোপীয়গণের না বুঝিবার ফলে ঐ রাজনীতি এবং অর্থনীতি কলুষিত হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানে মানুষের চিরন্তন স্বাস্থ্য ও পরমায়ু এবং অর্থের স্বচ্ছলতা সম্ভব হইতে পারে, সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে।

ভারতীয় ঋষিগণের রাজনীতি অনুসারে স্বাধীনতা প্রত্যেক দেশের মানুষের কাম্য। মানুষ সাধারণতঃ কিসের জন্ম কি হইতেছে, অথবা কোন্ কারণ হইতে কি কার্য্য হইতেছে এবং কোন্ কার্য্যের কি ফল, তাহা বুঝিতে পারে না।

সংস্কৃত ভাষানুসারে কোন দেশের কোন জাতির স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় সেই অবস্থা, যে অবস্থায় দেশের সাধারণ মানুষ কার্য্য-কারণ-ভাব বুঝিতে পারে এবং পরমুখাপেক্ষী না হইয়া স্ব স্ব অর্থ-স্বচ্ছলতা, সন্তুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু সাধন করিতে পারে। ঋষিগণের কথানুসারে মানুষের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইলে, প্রথমতঃ, শিক্ষার দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভ করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, স্বীয় প্রয়োজনীয় বস্তু অর্জ্জন করিবার জন্ম ব্যক্তিগত ভাবে যে যে কার্য্য করা দরকার, তাহা অভ্যাস করিতে হয় এবং তৃতীয়তঃ, সমাজের অথবা জাতির অংশরূপে যাহা করা দরকার তাহা করিতে হয়। তাঁহাদের কথানুসারে মানুষের স্বীয় ইষ্ট সাধন করিতে হইলে যেরূপ ব্যক্তিগত ভাবে তাহার কার্য্য করিবার প্রয়োজন, সেইরূপ সঙ্ঘবদ্ধ ভাবেও তাহার কার্য্য করিতে হয়। মানুষের স্বীয় ইষ্ট সাধন করিবার জন্ম সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কার্য্য করার প্রয়োজন হয় বলিয়াই ব্যাসদেব বলিয়াছেন যে, প্রসাদ লাভ করিবার অন্যতম উপায় দ্বেষ-বিযুক্ত হওয়া।

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥

গীতা, ২য় অধ্যায়, ৬৪ শ্লোক।

পরস্পরের মধ্যে দ্বেষ থাকিলে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া যায় না এব একতাও সাধিত হয় না। কাযেই ব্যাসদেবের মতে একতা-সাধনই মানুষের স্বীয় ইষ্ট লাভ করিবার অন্যতম উপায়।

"রাজনীতি" বলিতে বুঝায় সেই নীতি, যদ্দ্বারা জীবের রক্ষা ও প্রসার সাধিত হইতে পারে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ঋষিদিগের কথানুসারে "স্বাধীনতা" অথবা যাহাতে সাধারণ (প্রচলিত ভাষায় নিম্ন-স্তরের) মানুষ পরমুখাপেক্ষী না হইয়া স্ব স্ব অর্থস্বচ্ছলতা সন্তুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু সাধন করিতে পারে, তাহাই হওয়া উচিত মানুষের কাম্য। তাহার উপায় "রাজনীতি" এবং ঐ রাজনীতির প্রাথমিক কার্য্য "জাতির একতা-সাধন"। ঋষিদিগের চিন্তার ধারায় ইহাও দেখা যায় যে, কোন দেশে কোন জাতি উপরোক্ত ভাবে স্বাধীনতা লাভ করিবার প্রয়াসী হইলে, যাহাতে

জগতে অন্য কোন দেশে কোন মনুষ্যজাতির অর্থাভাব না ঘটে, তাহার চেষ্টা করিতে হয়, কারণ কোন দেশে কোন জাতির অর্থাভাব ঘটিলে ঐ জাতি স্বীয় অভাব পূরণ করিবার জন্য অসৎ উপায়ে স্বচ্ছল জাতির অর্থ আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিয়া তাহাকে বিব্রত করিতে বাধ্য হয়।

ভারতীয় ঋষিদিগের বর্ণাশ্রম কি ছিল, তাহা যথাযথ ভাবে জানিতে পারিলে বুঝা যায় যে, এই বর্ণাশ্রমই ছিল জাতির একতা-সাধনের উপায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চারিটী বর্ণের কার্য্যে সমাজের যাবতীয় কার্য্যের পূর্ণতা সাধিত হয়। এই চারিটী বর্ণের কোন বর্ণের লোকই অপর বর্ণের লোকের অস্পৃশ্য ছিলেন না এবং কোন বর্ণের লোক আপনাকে অপর বর্ণের লোক হইতে ছোট অথবা বড় মনে করিতেন না। পরন্তু কেহ আপনাকে বড় মনে করিলে প্রায়শ্চিত্তার্হ অথবা শাস্তির যোগ্য হইতেন। সমাজ-নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রত্যেক বর্ণের লোকই কায়মনোবাক্যে অপর বর্ণের লোকের সমান ভাবে প্রয়োজন, ইহা স্বীকার করিতেন। কিন্তু আমাদের ভাগ্যদোষে এখন আর সে অবস্থা নাই। বর্ত্তমান পণ্ডিতগণের (?) বর্ণাশ্রমানুসারে এক্ষণে ব্রাহ্মণ সর্ব্বাপেক্ষা বড়, ক্ষত্রিয় মধ্যম, বৈশ্য তৃতীয়, শূদ্র ছোট এবং অস্পৃশ্য ও বর্ণাশ্রমের ব্যাখ্যার এই বিকৃতির ফলে আমাদের অবস্থার যে বিকৃতি ঘটিয়াছে, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি।

বর্ত্তমান পাশ্চাত্ত্য জগতের রাজনীতিও মূলতঃ ঋষিদিগের রাজনীতির অনুরূপ, কিন্তু স্বাধীনতার অর্থ বিকৃত হওয়ায় এই রাজনীতি কার্য্যতঃ সম্পূর্ণ ভাবে পৃথক্ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

রাজনীতি শব্দের ইংরাজী প্রতিশব্দ politics. উহার উদ্ভব হইয়াছে গ্রীক politia শব্দটী হইতে। শব্দগত অর্থানুসারে politics বলিতে বুঝায় এমন কার্য্য, যদ্দ্বারা সমাজের প্রত্যেক মানুষের সুখ, সমৃদ্ধি এবং নৈতিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে। সমাজের প্রত্যেক মানুষের সুখ, সমৃদ্ধি এবং নৈতিক উন্নতি সাধিত হইলে তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া পরিচালিত করিতে হয়। কাযেই পরবর্ত্তী কালে politics শব্দের অর্থ হইয়াছে সেই শাস্ত্র অথবা সেই নিপুণতা, যদ্দ্বারা শাসনকার্য্য পরিচালিত হয়।

The State and the Individual-এর ইংরাজ গ্রন্থকার W. S. Machechnie বলিয়াছেন যে—"The two pillars on which organized society is erected are described sometimes as permanence and progress, sometimes as authority and liberty."

অর্থাৎ, যে দুইটী স্তম্ভের উপর শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজ গঠিত হয়, সময় সময় তাহার একটীর নাম স্থায়িত্ব (অথবা রক্ষা) এবং আর একটীর নাম "উন্নতি" (অথবা বৃদ্ধি), আবার সময় সময় তাহার একটীকে বলা হয় "বিধিসঙ্গত ক্ষমতা" এবং অপরটীকে বলা হয় "স্বাধীনতা"।

কাযেই দেখা যাইতেছে, বর্ত্তমান রাজনীতির মূলেও রহিয়াছে সেই চিন্তা, যাহাতে মানুষের সুখ, সমৃদ্ধি এবং নৈতিক উন্নতি সাধিত হয় এবং সঙ্ঘবদ্ধ করা অথবা মানুষের একতা সাধিত করা তাহার উপায় বলিয়া পরিগণিত হইত। সংস্কৃত ভাষায় যে রূপ "রাজনীতি" বলিতে বুঝায় সেই নীতি, যদ্দ্বারা জীবের রক্ষা ও প্রসার সাধিত হইতে পারে, সেইরূপ ইংরাজ গ্রন্থকারও বলিতেছেন যে, যে দুইটী স্তম্ভের উপর শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজ গঠিত হয়, সময় সময় তাহার একটীর নাম permanence অথবা রক্ষা এবং আর একটীর নাম progress অথবা উন্নতি, অথবা বৃদ্ধি।

ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহাও দেখা যাইবে যে, সমাজের permanence অথবা রক্ষার চিন্তা হইতেই ইংরাজের রাজনীতিতে conservative partyর উদ্ভব হইয়াছিল এবং তাহার progress অথবা বৃদ্ধির চিন্তা হইতেই liberal partyর উদ্ভব হইয়াছিল। প্রাথমিক অবস্থায় দুইটী দলের উদ্ভব হইলেও জাতীয় একতা যাহাতে রক্ষিত হয়, তদ্বিষয়ক ব্যবস্থার দিকে যে ইংরাজ রাজনৈতিকগণের যথেষ্ট লক্ষ্য ছিল, তাহার পরিচয় ইংরাজী রাজনীতিতে আছে। তখনও party politics-এর তীব্রতা ইংরাজী রাজনীতিতে স্থান পায় নাই। সমাজ অথবা রাষ্ট্র-গঠনের মূল উদ্দেশ্য যে প্রত্যেক মানুষের সুখ, সমৃদ্ধি এবং নৈতিক উন্নতি সাধন করা, তাহা মুখ্যতঃ ভুলিয়া গিয়া যেদিন ইংরাজ জাতি authority এবং libertyকে স্থান দিয়াছেন, সেই দিন হইতেই তাঁহাদের রাজনীতিতে party politics-এর তীব্রতা স্থান পাইয়াছে।

C. Burns তাঁহার Political Ideals নামক গ্রন্থে এবং Walter Bagehot তাঁহার English Constitution নামক গ্রন্থে যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মন্তব্যগুলি গ্রহণ না করিয়া তাঁহারা যে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিচার করিয়া পড়িলে ইংরাজ জাতি যে তাঁহাদের party politics অথবা দলাদলির রাজনীতির তীব্রতার জন্য কতখানি বিব্রত হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে বলিতে হয় যে, ইংরাজ জাতি বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের আর্থিক অবস্থার জন্য অত্যন্ত বিপন্ন এবং এই বিপত্তির প্রধান কারণ, তাঁহাদের party politics এবং authority, অর্থাৎ বিধিসঙ্গত ক্ষমতা এবং liberty অর্থাৎ স্বাধীনতা।

যতদিন মানুষের সুখ, সমৃদ্ধি এবং নৈতিক উন্নতি সাধন করা তাঁহাদের রাজনীতির উদ্দেশ্য ছিল এবং পরস্পরের মিলনই তাহার মুখ্য উপায় বলিয়া পরিগণিত হইত, ততদিন ইংরাজ সাম্রাজ্যের প্রসার সাধিত হইয়াছিল এবং তাহারই ফলে ইংরাজ জাতি জগতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু যেদিন হইতে তাঁহাদের রাজনীতিতে দলাদলির তীব্রতা স্থান পাইয়াছে এবং বিধিসঙ্গত ক্ষমতা ও স্বাধীনতার লোলুপতা বাড়িয়াছে, সেই দিন হইতে তাঁহাদের অবস্থার জটিলতা বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

বস্তুতপক্ষে authority (বিধিসঙ্গত ক্ষমতা) এবং liberty (স্বাধীনতা), এই দুইটী কথায় যে মনোভাব প্রকাশ পায়, তাহার তত্ত্ব কি অর্থাৎ তাহাতে বাস্তবতার সহিত কোন সামঞ্জস্য আছে কি না, তাহার বিষয় কোন ইংরাজ গ্রন্থকারের কোন গ্রন্থে আমি খুঁজিয়া পাই নাই। কাযেই ঐ দুইটী কথাকে দুইটী অর্থহীন শব্দ অথবা মাকাল ফল বলা যাইতে পারে।

রাজনীতি সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, মানুষ সাধারণতঃ স্ব স্ব অর্থস্বচ্ছলতা, সন্তুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু সাধন করিবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া থাকে এবং যতদিন পর্য্যন্ত কোন সমাজ তাহার একতা রক্ষা করিতে পারে, ততদিন পর্য্যন্ত সেই সমাজের মানুষের অর্থ-স্বচ্ছলতা, সন্তুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু অটুট থাকে। কিন্তু যখনই কোন জাতি সমাজ-গঠনের মূল উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া তাহার রাজনীতিতে অথবা সমাজনীতিতে বিধিসঙ্গত ক্ষমতা (authority) এবং স্বাধীনতা (liberty) প্রভৃতি অভিমানাত্মক, অর্থহীন শব্দের অথবা ভাবের স্থান দেয়, তখনই তাহার একতা নষ্ট হইয়া দলাদলির উদ্ভব হয় এবং পতন আরম্ভ হয়।

এক্ষণে প্রশ্ন হইবে যে, মানুষের অভিমানের উদ্ভব হয় কেন এবং তাহার রাজনীতিতেই বা উপরোক্ত বিকৃতি স্থান পায় কেন?

ইহার উত্তরে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, সাধারণতঃ আর্থিক দুরবস্থা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইলে মানুষ পরিবর্ত্তন-প্রয়াসী হইয়া থাকে। নতুবা মানুষ গতানুগতিক ভাবে চলাফেরা করে। আর্থিক দুরবস্থার বৃদ্ধিবশতঃ মানুষ যখন নানারকম ক্লেশ ভোগ করিতে আরম্ভ করে, তখন স্বভাবই মানুষকে প্রকৃত জ্ঞানী করিয়া তুলে এবং যে পন্থা অবলম্বন করিলে দুর্দ্দশার হাত হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়, মানুষ সেই পন্থার সন্ধান পায়। প্রাণের দায়ে মানুষ তখন অনেক অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে এবং দ্বেষ-হিংসা ভুলিয়া গিয়া আপন কার্য্যে অভিনিবিষ্ট হয় এবং সমাজের মধ্যে একতা স্থাপিত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় মানুষের নানা ঐশ্বর্য্য লাভ করাও সম্ভব হইয়া থাকে। কিন্তু এই মা[illegible] গুলির সন্তান-সন্ততিগণের সেই অভিজ্ঞতা লাভ করিব[illegible] সুযোগ ঘটে না এবং তাঁহারা জন্মাবধি নিজদিগকে অপ[illegible] তুলনায় জ্ঞানী ও উচ্চতর মনে করিয়া থাকেন। ফ[illegible] তাঁহাদের মুখ হইতে অনেক অর্থহীন, অভিমানাত্মক ক[illegible] নিঃসৃত হইতে আরম্ভ হয় এবং সমাজের মধ্যে দ্বেষ-হিংস[illegible] উদ্ভব হইয়া থাকে।

আমার মনে হয়, উপরোক্ত কারণে ইংরাজ জাতির ম[illegible] যখন সর্ব্বত্রই দারিদ্র্য দেখা দিয়াছিল, তখন তাঁহাদের মধ্যে [illegible] সংখ্যক বুদ্ধিমান্ লোক যে মাত্রায় বুদ্ধিমত্তা লইয়া জন্ম পরিগ্র[illegible] করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী কালে তাহার হ্রাস ঘটিয়াছে। এখ[illegible] ইংরাজের রাজনীতি এবং অর্থনীতি-ক্ষেত্রে যাঁহারা পদ[illegible] তাঁহারা প্রায়শঃ ধনবান্ লোকের সন্তান এবং দারিদ্র্য যে [illegible] জিনিষ ও তাহার ভ্রূকুটি যে কত রকমের, তাহার অভিজ্ঞ[illegible] লাভ করিবার সুযোগ ঐ ধনী-সন্তানগণের হয় না। কাযে[illegible] তাঁহারা নিজদিগকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ মনে করিলেও বা[illegible] পক্ষে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রায়শঃ আংশিক হই[illegible] থাকে। ফলে তাঁহাদের চিন্তায় অর্থহীন ভাবের এব[illegible] মুখ হইতে অর্থহীন শব্দের পরিচয় পাওয়া যায়।

আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ হইয়াছে[illegible] বর্ত্তমানে যে কয়জন মনীষী কংগ্রেসের কর্ণধার রহিয়াছেন[illegible] তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ধনবান্ লোকের সন্তান। দারিদ্র[illegible] যে কি জিনিষ এবং তাহার ভ্রূকুটী যে কি ভীষণ, তাহা তাঁহাদে[illegible] জানিবার সুযোগ হয় নাই। অন্নাভাবে দেশের শতকরা ৯৮ জ[illegible] লোকের উদর যে কিরূপ ক্ষুধায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে, অর্থাভাবে[illegible] প্রিয়তম পুত্র ও দুহিতার রোগশয্যায় চিকিৎসার ব্যবস্থা[illegible] করিতে পারিলে এবং তাহাদের কাহারও অকালমৃত্যু দেখিতে[illegible] হইলে প্রাণে যে কি যাতনা উপস্থিত হয়, পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি[illegible] বিসর্জ্জন দিয়া যে পুত্রকে শিক্ষিত করান হইয়াছে, সেই পু[illegible] উপার্জ্জনক্ষম না হইতে পারিলে মনের যে কি অবস্থা হয়, তাহ[illegible] তাঁহারা অনুমান করিতে পারেন না। তাই তাঁহারা কো[illegible] উপায়ে মানুষের অর্থাভাব, অসন্তুষ্টি, অস্বাস্থ্য এবং অকালমৃত্যু দূর হইবে, তাহার কথা চিন্তা না করিয়া অথবা দেশের জন[illegible] সাধারণ যাহাতে তজ্জন্য কার্য্যে ব্রতী হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া অর্থহীন, অভিমানাত্মক "স্বাধীনতা অর্জ্জন করা[illegible] কংগ্রেসের কর্ম্মোদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

কংগ্রেসের বর্ত্তমান কর্ম্মোদ্দেশ্যের পরিবর্ত্তন সাধন ক[illegible] নূতন কর্ম্মোদ্দেশ্যের কথা উত্থাপন করিবার অধিকারী কে, ত[illegible] সম্বন্ধে আগামী বারে আলোচনা করিব। [ক্রমশ[illegible]

কর্ণেল জাঁতিল

—শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্ণেল শোভালিয়ে জাঁ বাপতিস্ত জোসেফ জাঁতিল (Gentil) প্রথম যুগের একজন খ্যাতনামা ফারাসী ভাগ্যান্বেষী সৈনিক। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে প্যারী নগরে তাঁহার আত্মচরিত প্রকাশিত হইয়াছিল। তথাপি আশ্চর্য্যের কথা এই যে, ভাগ্যান্বেষীদিগের সম্বন্ধে বিরচিত কোন ইতিহাসে তাঁহার নাম পর্য্যন্ত দেখা যায় না। মেজর লুই স্মিথ, ম্যালিসন, কম্টন, গ্রীর্ন কেহই তাঁহার নামোল্লেখ করেন নাই। ১৭২৬ খৃষ্টাব্দের ২৫ শে জুন তারিখে ফ্রান্সের অন্তর্গত লাঙ্গুয়েদোক প্রদেশের ব্যাগনোল নগরে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার বাল্যজীবন সম্বন্ধে কোন কথা জানা যায় না। আত্মচরিতেও তিনি এ বিষয়ে কিছু বলেন নাই।* তাঁহার ভারতবর্ষে আগমনের কারণ তিনি এইভাবে প্রদান করিয়াছেন :—"মোগলসাম্রাজ্যের ঐশ্বর্যসমৃদ্ধি সম্বন্ধে আমি যে সকল কাহিনী শুনিয়াছিলাম, তাহা হইতে ঐ দেশ দেখিবার তীব্র বাসনা এবং আমি পিতার তৃতীয় পুত্র বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে আমার উত্তরাধিকার-সূত্রে বিশেষ কিছু পাইবার সম্ভাবনা না থাকায় জীবনে উন্নতি-লাভের আকাঙ্ক্ষা—এই উভয়বিধ কারণে আমি প্রাচ্যদেশে গমনোদ্যত এক সৈন্যদলে যোগ দিয়াছিলাম।"

১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে L'Orient বন্দর হইতে যাত্রা করিয়া দীর্ঘ পাঁচ মাস কাল পরে ১৩ই জুলাই তারিখে জাঁতিলের রেজিমেণ্ট পন্দিচেরীতে আসিয়া পৌছিল। তখন দক্ষিণভারতে ইংরাজ ও ফরাসীতে তুমুল যুদ্ধ চলিতেছিল। মাত্র কয়েক দিন পূর্ব্বে (৩।৬।১৭৫২) ত্রিচিনপল্লীতে ফরাসী সেনানায়ক জ্যাক ফ্রাঁসোয়াল এবং চাঁদসাহেব শত্রুকরে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ফরাসীদিগের আশ্রিত নিজাম সালাবৎ জঙ্গকে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, নিজাম-উল-মুলকের জ্যেষ্ঠপুত্র, দিল্লীর উজীর গাজিউদ্দিন হাইদর বিতাড়িত করিয়া স্বয়ং সিংহাসনলাভের অভিপ্রায়ে মারাঠাদিগের সাহায্যে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইহাতে উৎকণ্ঠিত হইয়া বুসী পন্দিচেরীতে সাহায্যের জন্য লিখিলে দুপ্লে নবাগত সৈন্যগণকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। জাঁতিল বলেন, "আমরা যে জনপদের মধ্য দিয়া গিয়াছিলাম তথাকার অধিবাসীরা ইতিপূর্ব্বে একসঙ্গে এতগুলি সশস্ত্র ইউরোপীয় কখনও দেখে নাই ; সেজন্য আমাদের আগমন সংবাদে সকলে মহাভয়ে গ্রাম ছাড়িয়া দূরে পলাইয়াছিল।" ২৩শে আগষ্ট ফরাসীরা হায়দ্রাবাদে আসিয়া উপনীত হইল। কিন্তু গাজিউদ্দিনকে লইয়া বুসীকে বিশেষ বিব্রত হইতে হয় নাই। আওরঙ্গাবাদ নগরে আসিয়া পৌছিয়া তিনি বিমাতা সালাবৎ-জননী†-প্রদত্ত বিষাক্ত খাদ্যদ্রব্য ভোজন করিয়া লোকান্তরে গমন করিলে মারাঠারা নিজামের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া নিজেদের দেশে ফিরিয়া গিয়াছিল। ভবিষ্যতে নিরাপদ হইবার জন্য সালাবৎ জঙ্গ তাঁহার অপরাপর ভ্রাতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার জাঁতিলের প্রতি অর্পিত হইয়াছিল।

অতঃপর বুসী মহীশূর রাজ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। সেখান হইতে নয় বৎসরেরও অধিক কাল যাবৎ রাজস্ব বাবদ নিজাম সরকারে এক কপর্দ্দকও প্রেরিত হয় নাই। "কিন্তু গুলবর্গ পর্য্যন্ত গিয়া নবাবের অশ্বারোহী সেনা বেতনাভাবে বিদ্রোহোন্মুখ হইয়া উঠিল, জানাইল যে, বক্রী অর্থ না পাইলে তাহারা আর অগ্রসর হইবে না। একমাস কাল এখানে বৃথা অপব্যয় করিয়া আগামী বৎসরের জন্য অভিযান স্থগিত হইল এবং সৈন্যদল উদগিরে ফিরিয়া আসিল। কঠোর পরিশ্রমে বুসীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি গুপিল-নামা সহকারীর হস্তে সৈন্যদলের ভারার্পণপূর্ব্বক কিছু দিনের মত বিশ্রামসুখ উপভোগের জন্য মসলিপত্তনে বায়ু-পরিবর্ত্তনে গিয়াছিলেন। উদগির হইতে সৈন্যদল গোদাবরী নদী পার হইয়া মাহুরে আসিয়াছিল। এখান হইতে নিজাম

* ১২৮৮ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক দাক্ষিণাত্য বিজয় হইতে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে নিজাম-উল-মুলকের দেহান্ত পর্য্যন্ত দক্ষিণে ভারতবর্ষের ইতিহাস লইয়া তাঁহার মোগল সাম্রাজ্যের স্মৃতি আরম্ভ। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বন্ধনী-চিহ্ন মধ্যে প্রদত্ত অংশ উক্ত গ্রন্থ হইতে পরিগৃহীত বুঝিতে হইবে।

† গ্রাণ্ট ডফের মতে নিজাম আলির জননী।

আওরঙ্গাবাদে গমন করেন। ১১ই জুন ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি মহাসমারোহে নগর প্রবেশ করিয়াছিলেন।" তদুপলক্ষ্যে সংঘটিত উৎসবাদির দীর্ঘ বিবরণ জাঁতিলের গ্রন্থ মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। নিজামের দেহরক্ষী ২০০ ফরাসী সৈনিক-দলের তিনি অন্যতম ছিলেন। অবশিষ্ট পঞ্চ শত সৈন্য সহ ...পিল রাজধানীতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। ২১শে তারিখে নিজাম অদূরবর্ত্তী রোজা নামক স্থানে অবস্থিত তাঁহার পিতা নিজাম উল-মূলকের সমাধি-সৌধ পরিদর্শনে গমন করিলে জাঁতিলও তাঁহার রক্ষীদলের অধিনায়করূপে সহগামী হইয়াছিলেন। কাপ্তেন ডমলুই নরোনহা নামক জনৈক পর্ত্তুগীজ ভাগ্যান্বেষী সৈনিক কর্ত্তৃক পরিচালিত ৬০ জন উক্ত জাতীয় সৈনিক, ৪০ জন ফরাসী অশ্বারোহী এবং এক শত দেশীয় সিপাহী এই দলে ছিল।

বুসীর অবর্ত্তমানে নিজামরাজ্যে উজীর রুকন উদ্দৌলা বা লস্কর খাঁর প্ররোচনায় ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে এক বিষম চক্রান্তের সৃষ্টি হইয়াছিল। সংবাদ পাইয়া তিনি শীঘ্র হায়দ্রাবাদে ফিরিয়া আসিলেন এবং অনতিকাল মধ্যে সকল ষড়যন্ত্রজাল ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। নিজাম তাঁহার আদেশে মন্ত্রী মহাশয়কে পদচ্যুত করিতে বাধ্য হইলেন। "তাঁহার পতনের সহিত আমারও সকল আশা ভরসা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়াছিল। অতঃপর নবাবের নিকট হইতে যাহা কিছু অনুকম্পা, সবই বুসীর অদৃষ্টে ঘটিতে লাগিল।" সম্ভবতঃ জাঁতিল লস্কর খাঁর নিকট হইতে কিছু পুরস্কার-প্রাপ্তির আশা পাইয়াছিলেন। সৈন্যদলের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ নিজাম এই সময় উত্তর-সরকার প্রদেশ বুসীকে জায়গীর দিয়াছিলেন। "তথা হইতে নবাবের বিশেষ কোন আয় ছিল না, কিন্তু নিয়মিত ভাবে আদায় হইলে বার্ষিক ২৫ লক্ষ টাকা আয়ের সম্ভাবনা ছিল। আর সুশাসিত হইলে সর্ব্বপ্রকার খরচ বাদে উক্ত জনপদ হইতে বাৎসরিক ৬০ লক্ষ টাকা লাভের সম্ভাবনা ছিল।"

অতঃপর বুসী নাগপুরের রঘুজী ভোঁসলার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। "খারাপ রাস্তা, নদী এবং পার্ব্বত্য ভূমি সত্ত্বেও আমরা দ্রুতগতি অগ্রসর হইয়াছিলাম। ... পার হইয়া দেখা গেল, সমগ্র জনপদ অগ্নি ও অসিসহযোগে উৎসন্ন করা হইয়াছে। ভস্মীকৃত এক পল্লীসমীপে আমরা শিবির স্থাপন করিয়াছিলাম। চারিদিক মনুষ্য ও গবাদি পশুর দগ্ধীভূত দেহাবশেষে সমাচ্ছন্ন ছিল। সে নৈরাশ্যব্যঞ্জক দৃশ্যের সম্যক্ বর্ণন অসম্ভব।" ১লা এপ্রিল ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা নাগপুর হইতে ১৬ ক্রোশ দূরবর্ত্তী পৌনি নামক স্থানে আসিয়া উপনীত হইল। পর দিবস যুদ্ধে বিজয়লাভ করিয়া তাহারা গ্রামটী সম্পূর্ণরূপে ... করিল; জাঁতিলের ভাষায় "কাজটী খুবই সহজ ছিল, কারণ স্ত্রীলোকগণ নিজেরাই অগ্রসর হইয়া আসিয়া মহা ভয়ে তাহাদের স্বর্ণরৌপ্যাদি অলঙ্কার এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি

কর্ণেল জাঁতিল।

আমাদের দিয়াছিল।" রঘুজীর দূত এইখানে আসিয়া বুসীর সহিত দেখা করিল। অষ্টাহকাল ব্যাপী আলোচনার পর উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল। ভোঁসলা যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন, বকেয়া রাজস্ব প্রদান এবং সাহায্যের মূল্য স্বরূপ মৃত নাসির জঙ্গ কর্ত্তৃক তাঁহাকে প্রদত্ত জায়গীরগুলি প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত হইলেন।

এদিকে উত্তর-সরকার প্রদেশে গোলযোগ বাধার সংবাদ আসিয়া পৌছিয়াছিল। ১৩ই জুন বুসী হায়দ্রাবাদ ত্যাগ করিয়া উক্ত জনপদাভিমুখে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। "২৬শে তারিখে আমরা পুর্ত্তিয়ালে আসিয়া পৌছিলাম

এখানে হীরার খনি আছে, এখন আর তাহাতে কাজ হয় না।" ২৪শে জুলাই তারিখে উহারা রাজমহেন্দ্রীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। ২১শে আগষ্ট তারিখে বুসী মহাসমারোহে নগর প্রবেশ করিলেন। তদুপলক্ষ্যে সংঘটিত নৃত্যগীত-বাদ্যাদির দীর্ঘ বিবরণ জাঁতিল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পেশাদার নর্ত্তকীগণের নৃত্য তাঁহার ভাল লাগে নাই। উৎসব পরিসমাপ্তির পর বুসী রাজস্ব ব্যাপারে মনোনিবেশ করিলেন। বিজয়নগরাধিপতি বিজয়রাম গজপতিরাজ ফরাসীদিগের প্রতি অনুকূল ভাবাপন্ন ছিলেন না। "তিনি ভিন্ন অপর সকলেই ফরাসীদিগের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। মুসলমানেরা ইতিপূর্ব্বে কখনও তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারে নাই। তাঁহাকে দরবারে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। বহু বিলম্বে তিনি সৈন্যদল সহ আসিয়া দেখা দিয়াছিলেন এবং আমাদের শিবির হইতে এক ক্রোশ দূরে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। তিন দিন অতিবাহিত হইলে পরে তাঁহাকে নজর প্রদানের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। যেদিন তিনি বুসীর সহিত দেখা করিতে আসিলেন, সেদিন আমাদের সমগ্র বাহিনী সশস্ত্র অবস্থায় সজ্জিত রহিল; উভয় পার্শ্বে সঙ্গীনধারী সৈনিকশ্রেণীর মধ্য দিয়া তিনি সেনাপতির শিবিরে নীত হইয়াছিলেন। শক্তিমত্তার এই দৃশ্যে তাঁহার প্রাণে প্রথমে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু বুসীর সহিত কথোপকথনের ফলে তাহা অপনোদিত হইয়াছিল। উড়িষ্যা অঞ্চলের তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। এক ছড়া মুক্তার মালা, হীরার শিরপেঁচ, একটী হস্তী, দুইটী অশ্ব এবং মুদ্রা-পরিপূর্ণ দুইটী তোড়া তিনি বুসীকে নজর দিয়াছিলেন। তোড়া দুইটীর মধ্যে কি ছিল তাহা আমার অজানা। অষ্টাহকাল পরে তিনি বিদায় হইলেন। যাত্রাকালে বুসী তাঁহাকে কুড়ি হাজার টাকা দামের জিনিস উপঢৌকন দিয়াছিলেন। রাজমহেন্দ্রী এবং চিকাকোল সরকার দুইটীর দেওয়ানী অর্থাৎ রাজস্ব সংগ্রহের ভারও তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল।"

১৭৫৪ খৃষ্টাব্দের শেষে বুসী হায়দ্রাবাদে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে রাজমহেন্দ্রী হইতে জাঁতিলকে পন্দিচেরীতে নবাগত গভর্ণর চার্লস রবার্ট গদেহুর নিকট বিশেষ কোন কাজে পাঠাইয়াছিলেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারী জাঁতিল পন্দিচেরীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তাহার তিন দিন পরে গদেহু ইংরাজদিগের সহিত ফরাসীদিগের পক্ষে একান্ত অগৌরবজনক ও অসুবিধাকর সর্ত্তে যুদ্ধনিবৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। "তখন আমরা এদেশ হইতে শত্রুপক্ষকে বিতাড়িতপ্রায় করিয়া তুলিয়াছিলাম।"*

বিগত সমরে তাঁহার কৃতিত্বের পুরস্কার স্বরূপ জাঁতিল এই সময় লেফটেনাণ্ট পদে উন্নীত হন। ইহার পর তিনি কিছুকাল পন্দিচেরীতে অবস্থান করেন। ইতোমধ্যে নিজাম রাজ্যে বুসী ও তাঁহার ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইংরাজদিগের চক্রান্তে স্বয়ং সালাবৎ জঙ্গও যোগ দিয়াছিলেন। হায়দ্রাবাদ হইতে ফরাসীদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য সকলে চেষ্টা করিতে লাগিল। বুসী ইহাতে অনুমাত্র ভীত হইলেন না। সমগ্র নিজামী ফৌজ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াও তিনি স্বীয় মুষ্টিমেয় অনুচরবৃন্দ সহ অসম সাহসে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিপদের কথা জানিয়া পন্দিচেরী হইতে নূতন গভর্ণর দেলেরিট পূর্ব্বোক্ত জ্যাক ফ্রাঁসোয়ালের নেতৃত্বে একদল সৈন্য তাঁহার সাহায্যের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য জাঁতিলও এই দলে ছিলেন। দীর্ঘ পথ যথাসম্ভব ক্ষিপ্র গতিতে অতিক্রম করিয়া হায়দ্রাবাদে আসিয়া (আগষ্ট ১৭৫৬) বুসীর সহিত যোগ দিলেন। তাঁহার আগমনে শত্রু সেনা হতাশ হইয়া পলায়ন আরম্ভ করিল। বুসী ও ল তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া উপর্য্যুপরি কয়েকবার তাহাদিগকে পরাজিত করিলেন। তখন ভীত নিজাম দরবারে আবার বুসীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং নিজ আচরণের জন্য তাঁহার নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা করিয়া আবার পূর্ব্বসম্বন্ধ স্থাপন করিলেন।

হায়দ্রাবাদে নিজ ক্ষমতা পুনঃ সম্বদ্ধ করিয়া বুসী অতঃপর তাঁহার বিখ্যাত উত্তর-সরকার প্রদেশ অভিযানে গমন করেন। তাহার সর্ব্বপ্রধান ঘটনা ববিলি দুর্গ আক্রমণের কথা ইতিপূর্ব্বে "ক্লদ মার্টিন" প্রসঙ্গে বলিয়াছি। অনন্তর বুসী বিশাখাপত্তন অধিকারে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। "উড়িষ্যার উপকূলে উহাই তখন ইংরাজদিগের একমাত্র অধিকৃত স্থান

* এ সকল কথা ইতিপূর্ব্বে "ক্লদ মার্টিন" প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে; পুনরুক্তি অনাবশ্যক। (বিচিত্রা, শ্রাবণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৪১)।

ছিল। প্রচণ্ড গ্রীষ্ম ও ভীষণ বৃষ্টি সত্ত্বেও ১৫ই জুন তারিখে বুসী তথা হইতে মাত্র দুই ক্রোশ দূরে আসিয়া উপস্থিত হইয়া ইংরাজ গভর্ণর উইলিয়ম পার্সিভালকে আত্মসমর্পণ করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি আমাদিগকে বাধা দিবার কোন চেষ্টা না করিয়া সর্ত্ত জানিতে চাহিলেন। ২৬শে জুন তারিখে সর্ত্ত নিরূপিত হইলে পরে ইংরাজরা অস্ত্র ত্যাগ করিল। তাহার কয়েক দিন পরে ইংলণ্ডীয় রণপোত "মারলবরো" হইতে উক্ত ২৬শে তারিখে লিখিত মিসেস ক্লাইভের এক চিঠি বুসী পাইয়াছিলেন। ঐ জাহাজের পাঁচ জন নাবিক স্থলে অবতরণ করিয়া আমাদের হস্তে বন্দী হইয়াছিল। উহাদের মুক্তি কামনা করিয়া তিনি জানাইয়াছিলেন যে, প্রতিদানে তিনি বঙ্গদেশে পৌঁছিয়া তাঁহার স্বামীকে বলিয়া সমসংখ্যক চন্দননগরের ফরাসী বন্দীকে মুক্তি দেওয়াইবেন।

"স্বীয় আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ থাকিলে এবং কর্ত্তব্যচ্যুতির সম্ভাবনা না থাকিলে ফরাসী ভদ্রলোকেরা কখনও মহিলাকৃত অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন না। বুসী তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। আমি কিন্তু বলিতে পারি, কোন ইংরাজ অনুরূপ অবস্থায় কখনই ঐ কার্য্য করিত না।"

১৭৫৮-৫৯ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত কর্ণাটিক সমরের বিবরণ জাঁতিলের আত্মচরিতে প্রদত্ত হইয়াছে। সে ইতিহাস ইতিপূর্ব্বে অন্যত্র বলা হইয়াছে, পুনরুক্তি অনাবশ্যক। * ৮ই এপ্রিল ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে মসলিপত্তনে মার্কুইস দি কঁফ্লাঁর অধীনে যে ফরাসী সৈন্যদল শত্রুকরে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, জাঁতিলও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

ইহার পর কিছুকাল আর জাঁতিল সম্বন্ধে কোন কথা জানা যায় না। পুনরায় যখন তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তখন তিনি বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন নবাব মীরকাসিমের অন্যতম সেনানায়ক। কখন এবং কি সূত্রে তিনি বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন অথবা নবাবের কর্ম্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে কি ভাবে জীবন-যাপন করিতেন, সে সম্বন্ধে কোন কথা জানা যায় না। তিনি নিজে তাঁহার স্মৃতিকথায় নাদির সাহের ভারত আক্রমণ, ময়ূর-তখতের বিবরণ, বঙ্গদেশে ইংরাজাধিপত্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ইত্যাদি অনেক কথা লিখিলেও এ বিষয়ে কোন কথার উল্লেখ করেন নাই। কথিত আছে যে, স্বদেশ প্রত্যাব[র্ত্তন] কালে পাটনার কুঠিয়াল ম্যাগুয়ার সাহেব নবাবের সৈন্যাধ্য[ক্ষ] গুর্গিন খাঁর নিকটে জাঁতিলকে বিশেষভাবে সুপারিস করি[য়া]ছিলেন এবং তাঁহার অনুরোধে গুর্গিন তাঁহাকে কর্ম্মদা[ন] করেন। কালক্রমে গুর্গিনের সহিত জাঁতিলের প্রগাঢ় বন্ধু[ত্ব] জন্মিয়াছিল। হেষ্টিংস ও ভান্সিটার্টের শান্তির প্রচেষ্[টা], মীরকাসিমের মন্ত্রিগণের ও জগৎশেঠদিগের বিশ্বাসঘাতক[তা] এবং উভয় পক্ষে সমর আরম্ভ ইত্যাদি সমসাময়িক স[কল] কথার উল্লেখ জাঁতিল করিয়াছেন।

রাজপদে সমাসীন হইয়া মীরকাসিম খুব ভালভাবেই কা[র্য্য] আরম্ভ করিয়াছিলেন। রাজ্যদাতা ইংরাজগণ প্রথমট[া] তাঁহার প্রতি নিতান্ত সুপ্রসন্ন ছিলেন। তথাপি কি কারণে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি এবং তা[হা] হইতে যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, তাহা ভাল করিয়া বুঝি[তে]

সমরু।

হইলে মীরকাসিমের ইতিহাস কিঞ্চিৎ সবিস্তারে আলোচন[া] করা আবশ্যক। অর্থের অস্বচ্ছলতাই যে পূর্ব্বতন নবাবের প্রধান অসুবিধা-স্থল ছিল এবং সেই কারণে তাঁহার রাজ্য গিয়াছিল, তাহা মীরকাসিম বুঝিতেন। একারণ মসনদে উপবেশন করিয়াই তিনি অর্থসংগ্রহকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং বৃথা অপব্যয় নিবারণ, অবাধ্য জমিদারবৃন্দকে দেয় রাজস্ব প্রদানে বাধ্য করা, মীরজাফরের অনুগৃহীত অপদার্থ স্তাবক ও মোসাহেবের দলকে দরবার হইতে বিতাড়ন ও তাহাদের কবল হইতে অন্যায়লব্ধ ধনসম্পত্তির পুনরুদ্ধারকরণ প্রভৃতি নানাবিধ উপায়ে কিয়ৎকাল মধ্যে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া তিনি তদ্দ্বারা বিদ্রোহোন্মুখ সৈনিকগণের বক্রী বেতন কতকাংশে পরিশোধ করিয়া সাময়িক ভাবে তাহাদের

* "জেনারেল ক্লদ্ মার্টিন"—বিচিত্রা, শ্রাবণ— অগ্রহায়ণ, ১৩৪১।

সন্তোষ নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার দত্ত অর্থসাহায্যে এই সময় দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ইংরাজগণের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছিল। শাসন বিভাগেও তিনি বহুবিধ সংস্কারকার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। ফলতঃ মীরকাসিমের রাজত্বের প্রথম চই বৎসর কাল রাজকোষের অর্থ প্রজাপুঞ্জের কল্যাণকল্পে যে প্রকার অকাতরে ব্যয় হইত এবং ন্যায়ধর্ম্মানুসারে যে ভাবে বিচারকার্য্য নিষ্পন্ন হইত, জগতের ইতিহাসে সেরূপ খুব অল্পই দেখা গিয়া থাকে। * "মুৎক্ষিরণ"-কার সৈয়দ গোলাম হোসেন যে স্বজাতির কলঙ্ক-ক্ষালনার্থ লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন এমন কথা কেহ বলেন না। তিনি মীরকাসিমের বহু নিন্দাবাদ করিয়া পরিশেষে বলিয়াছিলেন:—"সত্য কথা বলিতে ঐতিহাসিক বাধ্য। আমি মীরকাসিমের অনেক অপকীর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছি, সুতরাং তাঁহার ভাল কাজগুলির উল্লেখ করাও আমার কর্ত্তব্য। সেনাপতি ও সৈনিকগণের প্রভুভক্তিতে তিনি বিশ্বাস করিতেন না বলিয়া অনেক সময় সামান্য কারণে তিনি অনেকের প্রাণদণ্ডবিধান করিতেন না বটে, কিন্তু দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারকার্য্যে অথবা সৈন্যদল-সম্পর্কিত কোন বিষয়ে কিম্বা বিদ্বজ্জনের মর্য্যাদারক্ষায় মীরকাসিম যে প্রকার নিরপেক্ষ ন্যায়বিচারের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে তদীয় যুগের আদর্শ নৃপতি বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। তাঁহার রাজত্বকালে কোন রাজকর্ম্মচারীর পক্ষে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া "তাঁ'কে "না" করা সম্ভব ছিল না। জমিদারগণের অত্যাচার হইতে দরিদ্র কৃষককুলকে রক্ষা করা তাঁহার সবিশেষ প্রিয় কার্য্য ছিল।" †

কিন্তু এ সুদিন দীর্ঘস্থায়ী হইল না। মীরকাসিম প্রথম হইতেই জানিতেন যে, একদিন ইংরাজগণের সহিত তাঁহার প্রকাশ্য বলপরীক্ষার দিন সমাগত হইবে। তিনি শ্বশুরের মত সুখী ও বিলাসপ্রিয় ছিলেন না; অথবা তাঁহার মত প্রকৃতিবর্গের সুখদুঃখে উদাসীন. বিদেশী বণিকের ক্রীড়াপুত্তল ও নামসর্ব্বস্ব নবাব হইতে তাঁহার বিন্দুমাত্র অভিরুচি ছিল না। তিনি সত্যকার রাজা হইতে চাহিয়াছিলেন। ফলতঃ তাঁহার সকল কার্য্যের মূলে এই আকাঙ্ক্ষার অনুপ্রেরণা দেখা যায়। তখনকার দিনে বাঙ্গালীর বাহুবলের অভাব ছিল না। অভাব ছিল শুধু সমর-বিদ্যা-নিপুণ উপযুক্ত সেনানায়কের। ভারতীয় সৈন্য বহুবার সংখ্যালঘিষ্ঠ ইউরোপীয় বা পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে পরিচালিত স্বজাতীয় সিপাহীর হস্তে পরাজিত হইলেও, কখনও শৌর্য্যবীর্য্যের হীনতার জন্য পরাস্ত হয় নাই। তাহাদের শিক্ষাপ্রণালীর দোষই তাহাদের পরাজয়ের কারণ। সৈন্যগণের যথোপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র বা সামরিক পরিচ্ছদ ছিল না; তাহারা যথাকালে বেতন পাইত না; তাহাদের মধ্যে সাময়িক বশ্যতা বা শৃঙ্খলার কোন নিদর্শন দেখা যাইত না; রণস্থলে তাহাদের পরিচালন করিবার জন্য সমরবিদ্যানিপুণ সেনানায়কের একান্ত অভাব ছিল। দরবারে প্রভাব-প্রতিপত্তি অনুসারে মনসবদারগণ নিযুক্ত হইতেন,--তাঁহাদের সামরিক জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা বলিয়া কোন জিনিষ ছিল না। দেশের রাজায় ও সৈনিকগণে সাক্ষাৎভাবে কোন সম্বন্ধ ছিল না। সেনাপতিরাই সিপাহীদিগকে বেতন দিতেন এবং তজ্জন্য রাজার নিকট হইতে জায়গীর পাইতেন। তখনকার দিনে এখনকার মত রাজভক্তি বা স্বদেশপ্রেমের কোন ধারণা ছিল না। আর স্বদেশই বা তাহাদের কোথায়? সুতরাং যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতির পতন হইলে বা তিনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলে, সে যুদ্ধে তাঁহার সৈন্যগণের আর কোন আকর্ষণ থাকিত না। তাঁহার শূন্যস্থান অধিকার করিয়া সৈন্যদল পরিচালনের যোগ্য অপর কেহ না থাকায় সেনাপতির পতন বা অন্তর্দ্ধানের সহিত যুদ্ধেরও সকল মীমাংসা হইয়া যাইত। দেশীয় সেনার এ সকল গলদের কথা মীরকাসিম জানিতেন। ইংরাজদের সামরিক উৎকর্ষ যে তাহাদের প্রতিষ্ঠার কারণ, তাহা তিনি বুঝিতেন। উপযুক্তরূপে শিক্ষিত ও সুপরিচালিত ভারতীয় সিপাহী যে অত্যল্পকালের মধ্যে ইউরোপীয় সৈনিকের সমকক্ষ হইয়া উঠিতে পারে, তাহার বহু নিদর্শন তিনি দেখিয়াছিলেন। উপযুক্ত পরিচালক ও সমরসম্ভার পাইলে তাঁহার সৈন্যদল বাহুবলে ইংরাজকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন। শিক্ষকের অভাব হইল না, তখনকার দিনে এদেশে অর্থ-বিনিময়ে তরবারী-বিক্রয়েচ্ছু ইউরোপীয় সৈনিকের অভাব ছিল না। আর্ম্মাণী, পর্ত্তুগীজ, ফরাসী, জর্ম্মণ, ইংরাজ অনেক সৈনিক মীরকাসিমের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া

* Hunter—"Warren Hastings", p. 27.

† Vol, II. p. 411.

তাঁহার সেনাদল সংগঠনের ভার লইল। পদাতিক এবং গোলন্দাজবাহিনী পাশ্চাত্য সমরপদ্ধতিতে গঠিত হইয়াছিল, শুধু অশ্বারোহী সেনাদল পূর্ব্ববৎ দেশীয় সেনানায়কগণ পরিচালন করিতে লাগিলেন। পরবর্ত্তী যুগে সকলেই, এমন কি প্রখ্যাতনামা মহাদজী সিন্ধিয়াও, এই প্রথার অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন। শুনা যায়, মীরকাসিমের সেনাদলে দুই শতেরও অধিক ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় সৈনিক ছিল; আর্ম্মাণীদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক শত। কালক্রমে ইঁহাদের অধিকাংশের নাম অজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছে। শুধু অল্প কয়েকজনের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়। মীরকাসিমের বিদেশী সেনানায়কগণের মধ্যে আরাটুন, গ্রেগরী বা গুর্গিন খাঁ, মার্কার, জাঁতিল ও সমরু, এই কয়জনের নামই সমধিক উল্লেখযোগ্য।

গ্রেগরী ও মার্কার দু'জনেই জাতিতে আর্ম্মানী ছিলেন। তখনকার দিনে এ দেশে ব্যবসা বাণিজ্য ও রাজকার্য্য, উভয়বিধ কারণে অনেক আর্ম্মাণী সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কলিকাতা সহরে খোজাপিদ্রু নামে একজন বণিক ছিলেন। ইংরাজ সরকার এবং নবাব দরবার উভয় স্থানেই তাঁহার তুল্যরূপ প্রতিষ্ঠা ছিল। গুর্গিন খাঁ ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। প্রথম জীবনে তিনি হুগলী নগরে একজন বস্ত্র-ব্যবসায়ী ছিলেন। সেনাপতি অবস্থায় মীরকাসিমের ইঁহাদের দুই জনের সহিত সাতিশয় সম্প্রীতি ঘটিয়াছিল এবং তাঁহার রাজ্যলাভকার্য্যে গুর্গিন তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহার পুরস্কার স্বরূপ তিনি মসনদে উপবেশন করিয়া গুর্গিনকে নিজ সেনাবিভাগের কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হইয়া গুর্গিন সর্ব্ব বিষয়ে নিজ যোগ্যতা অতি সত্বরই সুচারুরূপে দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিন বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে তিনি কোম্পানীর সেনাদলের আদর্শে ২৫০০০ পদাতিক ও ১৫০০০ অশ্বারোহী সৈন্যসমেত এক বিশাল বাহিনী গঠন করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষিত গোলন্দাজ সেনা কোম্পানীর সৈন্য হইতে কোন অংশে অপকৃষ্ট ছিল না। তাঁহার মুঙ্গেরের কারখানায় যে সকল কামান ও বন্দুক নির্ম্মিত, হইত তাহা সত্য সত্যই উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। আজও মুঙ্গেরের গাদা-বন্দুকের খ্যাতি বিলুপ্ত হয় নাই। মীরকাসিমকে আলিবর্দ্দী অপেক্ষা পরাক্রান্ত নৃপতিতে পরিণত করিতে শুধু কয়েক বৎসর অক্ষুন্ন শান্তি ভিন্ন আর কিছুরই অভাব ছিল না।

অদৃষ্টচক্র কিন্তু সে অভাব পূরণ করিতে দিল না। শীঘ্রই ইংরাজদিগের সহিত নবাবের অপরিহার্য্য বলপরীক্ষার দিন সমাগত হইল। কোম্পানীর কর্ম্মচারীবৃন্দের দাম্ভিকতা অর্থগৃধ্নুতাই তাহার কারণ। কোম্পানী-প্রদত্ত যৎসামান্য বেতনে তাহাদের কাহারও অভাবমোচনের সম্ভাবনা ছিল না সুতরাং নানা অবৈধ উপায়ে তাহারা অর্থার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইত

মীর কাসিম।

এদেশে সমাগত ইংরাজেরা স্পষ্টই বলিত যে, ভারতবর্ষ ইউরোপ নহে, সুতরাং সভ্য ইউরোপীয় নীতিধর্ম্মের এদেশে অনুশীলন অনাবশ্যক। "যেন তেন প্রকারেণ" রাতারাতি বড়লোক হইয়া দেশে ফেরাই তাহাদের লক্ষ্য ছিল এবং তজ্জন্য বিবেকের প্রেরণার প্রতি দৃষ্টিপাত করার কাহারও অবকাশ ছিল না। চার্টার অনুসারে ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে পণ্যদ্রব্য প্রেরণের অধিকার কোম্পানীর একচেটিয়া ছিল। সুতরাং কর্ম্মচারিগণের পক্ষে ইংলণ্ডীয় বাণিজ্যে লিপ্ত হওয়া সম্ভব ছিল না। তাহারা এ দেশেই জলপথে ও স্থলপথে অবাধে বাণি

করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মোগল বাদসাহগণ প্রদত্ত সনন্দবলে বঙ্গদেশে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার শুধু কোম্পানীকে দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহাদের কর্ম্মচারীদিগের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের জন্য ঐ সুযোগ দেওয়া হয় নাই। গভর্ণরের স্বাক্ষরযুক্ত দস্তক যা পাশের বলে দেশের সর্ব্বত্র কোম্পানীর মাল অবাধে প্রেরিত হইতে পারিত, কোথাও কোনরূপ চুঙ্গি বা শুল্ক লাগিত না। কোম্পানীর নামে কর্ম্মচারিগণ বা তাহাদের অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিগণ ঐ সুযোগ ভোগ করিতে থাকিলে, তাহাকে দস্তকের ঘোর অপব্যবহার ব্যতীত অপর কিছু আখ্যায় অভিহিত করা চলে না। উহার ফলে শুধু যে নবাব সরকারের রাজস্বের ক্ষতি হইত তাহা নহে, দেশীয় বণিকগণকে বিদেশীর নিকট অন্যায় প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইয়া বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত।* তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল ছিল সমস্ত দেশের সর্ব্বনাশ। মীরকাসিমের ন্যায় সমদর্শী, স্বাধীনচেতা, প্রজাবৎসল নরপতির পক্ষে এ অন্যায়ের প্রতিকার চেষ্টা না করিয়া উদাসীন থাকা সম্ভব ছিল না।

নবাবের অসন্তোষের আরও অনেক কারণ ছিল। সে যুগের ইংরাজরা লোভে অন্ধপ্রায় হইয়া এই দেশ যে তখন পর্য্যন্ত তাঁহাদের হয় নাই, সে কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের উৎপীড়নে জর্জ্জরিত দেশের অধিবাসিগণের নীরবে রোদন ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। স্বয়ং মীরকাসিম গভর্ণর ভান্সিটার্টের নিকট এ সম্বন্ধে অভিযোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, "ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের গোমস্তা, কর্ম্মচারী এবং দালালগণ প্রত্যেক জেলাতে ফৌজদার এবং দেওয়ানের মত আচরণ করিতেছে এবং কোম্পানীর পতাকার অন্তরালে আমার কর্ম্মচারীদিগের হস্ত হইতে ক্রমশঃ দেশের শাসনভার কাড়িয়া লইতেছে। উহারা প্রত্যেক জেলাতে, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক বাজারে তৈল, মাছ, বাঁশ, ধান, সুপারী ও অন্যান্য জিনিসের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে। প্রত্যেকেই কোম্পানীর এক এক দস্তক হাতে লইয়া নিজেকে কোম্পানী হইতে কোন মতে হীন বিবেচনা করিতেছে না।" † স্বার্থান্ধ ঐ সকল কেরাণী-বণিক নিজেদের নির্দ্দিষ্ট দরে সকলকে তাহাদের নিকট মাল কেনা-বেচা করিতে বাধ্য করিত। যাহারা আপত্তি করিত, তাহাদের প্রতি বযাঘাতের ব্যবস্থা হইত। দেশের প্রচলিত আইন-আদালতের প্রতি বিন্দু মাত্র লক্ষ্য না করিয়া উহারা নিজেদের কার্য্যের নিজেরাই বিচার করিত। যে মহাপ্রাণ প্রজাপালক নরপতি স্বদেশীয় জমিদারকুলের অত্যাচার হইতে দরিদ্র প্রজাবৃন্দকে রক্ষা করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহার পক্ষে বিদেশী বণিকের হস্তে তাহাদের নিগ্রহ এবং দেশের সর্ব্বনাশ নির্ব্বিকার চিত্তে প্রত্যক্ষ করা আদৌ সম্ভব ছিল না। ইহাই হইল তাঁহার পতনের কারণ।

ভান্সিটার্ট এবং ওয়ারেন হেষ্টিংস ভিন্ন কাউন্সিলের অপর সকল সদস্য কর্ম্মচারিগণের অবাধ বাণিজ্যের পোষক ছিলেন। উহাতে সকলকারই লাভের সম্ভাবনা ছিল। ইংলণ্ড হইতে কর্ত্তৃপক্ষ বারম্বার নিষেধ করিয়াও উহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারেন নাই। মীরকাসিম দেশের রাজা, তিনি স্বহস্তে দুষ্কৃতগণের দণ্ড বিধান করিলেও কাহারও কিছু বলিবার ছিল না। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি শান্ত ভাবে ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রতিকারকামী হইয়াছিলেন। নবাবের অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার ভার ভান্সিটার্ট হেষ্টিংসকে দিয়াছিলেন। তাঁহাকে পাঠানোর মধ্যে গভর্ণরের আরও একটী উদ্দেশ্য ছিল। দুর্দান্ত, দাম্ভিক, কোপণস্বভাব ও নীতিজ্ঞানবিরহিত এলিসের মত লোককে পাটনার কুঠিয়ালের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করা যে কর্ত্তৃপক্ষের উচিত হয় নাই, তাহা সমসাময়িক এবং আধুনিক সকল লেখকই একবাক্যে বলিয়া থাকেন। তাঁহার হঠকারিতার জন্য নবাবের সহিত যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইতেছিল, তাহা বিদূরিত করা ভান্সিটার্টের অভিপ্রায় ছিল। এলিস কারণে অকারণে নবাবের কর্ম্মচারিগণের সহিত বিবাদ বাধাইতে অপার আনন্দ অনুভব করিতেন। কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য হে সাহেবের চালানী আফিং বিনা শুল্কে ছাড়িয়া না দিয়া আটক করা অপরাধে তিনি মনসারাম নামক নবাব সরকারের জনৈক কর্ম্মচারীকে বন্দী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং খোজা আরাটুন নামক অপর এক ব্যক্তিকে কোম্পানীর বিনানুমতিতে বিহার হইতে সোরা ক্রয় করিবার জন্য ধৃত করিয়া শৃঙ্খলিত অবস্থায় বিচারার্থে

* নিতান্ত অধস্তন ইংরাজ কর্ম্মচারীরাও দেশীয় গোমস্তাদিগকে শুধু জাল দস্তক বিক্রয় করিয়া মাসে দুই তিন হাজার টাকা উপার্জ্জন করিত বলিয়া শুনা যায়।

† Mill's History of British India, Bk. IV, Ch V.

কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন। ইহার পর তিনি আবার দুইজন পলাতক ইংরাজ সৈনিকের সন্ধানে মীরকাসিমের রাজধানী মুঙ্গেরে একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিল্লাদার তাহাদিগকে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে না দিলেও সেনাধ্যক্ষ মহাশয়কে যথেষ্ট সৌজন্য সহকারে জ্ঞাপন করিলেন যে, দুইজন অফিসর আসিয়া যদি তাহার সহিত দুর্গের ভিতর অনুসন্ধান করিয়া দেখেন তাহাতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই। ইহাতে এলিসের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিল, তিনি সৈন্যদলকে দুর্গ অবরোধ করিবার আদেশ দিলেন। নবাব কিন্তু ইহাতেও বিচলিত হইলেন না। স্বহস্তে এলিসের শাস্তিবিধানের ভার গ্রহণ না করিয়া তিনি কলিকাতা কাউন্সিলকে সকল কথা জানাইলেন। এলিসও নবাব সম্বন্ধে যথেষ্ট কটুকাটব্য করিয়া তাহার দিক হইতে ব্যাপারটী কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়াছিলেন। এই সকল কারণে উভয় পক্ষে মনোবাদ নিরসনের জন্য ভান্সিটার্ট হেষ্টিংসকে পাঠাইলেন। ৯ই এপ্রিল ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস পাটনা হইতে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। নৌকাযোগে গঙ্গা বক্ষ দিয়া যাইবার কালে তিনি পথে দেখিলেন, নদীতে যত নৌকা আছে, সকলগুলি হইতেই কোম্পানীর পতাকা উড্ডীন রহিয়াছে, তীরে হাট, গ্রাম, গুদাম সর্ব্বত্রই কোম্পানীর নিশান বায়ুভরে বিকম্পিত হইতেছে,—সকল গ্রামে দোকান পসার সব বন্ধ; ইংরাজ বণিকের অত্যাচারভয়ে অধিবাসীরা সকলে গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়াছে। পরিদর্শন-লব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে হেষ্টিংস বুঝিলেন যে, তাঁহার স্বজাতীয়গণের কার্য্য কলাপ "নবাবের রাজস্ব, দেশের শান্তি অথবা আমাদের জাতীয় সুনাম এ সকলই বিনষ্ট করিতেছে।"

(ক্রমশঃ

বন্দিনী

— শ্রীশশাঙ্ককুমার পাত্র

সকলেই বলে, বন্দিনী তুমি সংসার-'কারা' মাঝে,
　প্রতি নিমেষের দুঃসহতম কাজে;
　চারিদিক্‌কার কঠোর শাসন মানি,
ধীর-নত মুখে চলিয়াছ না কি রথের চক্র টানি',—
　সেই চক্রের পাকে,
প্রতি পলে পলে পিষ্ট করিছ নিজের জীবনটাকে!
　আপন বলিতে কিছু নাই তব বাকী,
তবু না কি তা'র পাওনি নিশানা, এমনি বিরাট ফাঁকি!

তারা বলে, কভু প্রশান্ত হলে করুণ দৃষ্টি খানি,
অমনি ভাসিয়া ওঠে চারিদিকে কঠোর শাসন-বাণী;
　হাসি' বিদ্রূপ হাসি
পাকে পাকে তা'র জড়ায় তোমারে যেন কত ভালবাসি'
　সংসার-'কারা'-মাঝে,
আবার তোমার বাঁধা বসন্ত প্রহরে প্রহরে বাজে;
　প্রতি পলে অনুপলে,
নিত্য এমনি ডুবিতেছ না কি মরণ-সাগর-তলে!

তোমার জগতে এতটুকু আলো, এতটুকু বায়ু বয়,
আঙিনার ফাঁকে একটু' আকাশ সৌর-কিরণ-ময়,
নিদাঘ-দুপুর যক্ষ্মারোগীর সে না কি করুণ শ্বাস!
রাতে শশী-তারা; গৃহ-নারায়ণে অবিচল বিশ্বাস;
　আর গুটিকয় প্রাণী,
এই ল'য়ে না কি সারা জনমের জানাজানি-কানাকানি!
　তোমার সাধা-সাধা,
এদেরি সঙ্গে প্রতি পাকে পাকে ওতপ্রোত ভাবে বাঁধা!
আপনার তব ভাবিবার কিছু, করিবার কিছু নাই,
এদেরি শাসন-খড়োতে না কি হানিছ' জীবনটাই!

আমি জানি, ঐ 'কারা'র বাহিরে পাষাণ-প্রাচীর নাই,
　সে যে স্বর্গের ঠাঁই;
　আমি দীন-হীন কবি,
তব বেদনায় রচিতেছি এই মুক্তির ভৈরবী!
এই সঙ্গীতে যদি পাও তুমি সে সুরের ঝঙ্কার!
　বুঝিবে 'কারা'-প্রাকার,—
বন্দী তোমারে করে নাই, শুধু করিয়াছে মহারাণী,
তব সীমন্ত-সিন্দুরে শোভে রাণীর তিলকখানি।

কংগ্রেস

—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

মানুষকে আশীর্ব্বাদ করা হয়, "শতায়ু হও।" যে প্রতিষ্ঠান জাতির আশার কেন্দ্র, কামনার প্রতীক, তাহার সম্বন্ধে আশীর্ব্বাদ—"চিরঞ্জীব"—চিরজীবী হও। আজ যখন কংগ্রেসের বয়স অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ণ হইল, তখন ভারতের দিকে দিকে সেই আশীর্ব্বাদ ধ্বনিত—প্রতিধ্বনিত হইতেছে—"চিরঞ্জীব"। কংগ্রেস চিরজীবী হউক—ইহাই ভারতবাসীর কামনা। যাঁহারা মনে করেন, প্রস্তাবিত নূতন শাসন-পদ্ধতিতে না হইলেও পরবর্ত্তী কোন শাসন-সংস্কারে এ দেশের ব্যবস্থাপক সভা প্রকৃত প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠানে পরিণতি লাভ করিবে, তাঁহারা যেন কংগ্রেস-গঠন সম্বন্ধে লর্ড ডাফরিণের পরামর্শ স্মরণ করেন—যে প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠানকে পৃথিবীর নানা দেশের প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠানের জননী বলা হয়, সেই বৃটিশ পার্লামেণ্টে দুইটি দল থাকে—এক দল যখন মন্ত্রিত্ব করেন, অপর দল তখন সমালোচনা করিয়া থাকেন—সে দলকে তখন opposition বলা হয়, এ দেশে বিদেশী শাসনে এই শেষোক্ত দলের অভাব, কিন্তু তাহার প্রয়োজন আছে। যখন ব্যবস্থাপক সভা প্রকৃত প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠানে পরিণতি লাভ করিবে, তখন কংগ্রেস ও সে সভা অভিন্ন হইয়া যাইবে।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে যখন বোম্বাই নগরে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়, তখন—তাহার সেই দুর্ব্বল প্রারম্ভকালেও—দেশে সেইরূপ প্রতিষ্ঠানের অভাব বিশেষরূপ অনুভূত হইতেছিল। এই অনুভূতি সর্ব্বাগ্রে প্রবলভাবে বাঙ্গালায় অনুভূত হইয়াছিল। তাহার কারণ, বাঙ্গালা সর্ব্বাগ্রে ইংরাজী শিক্ষা লাভ করে ও ইংরাজী সাহিত্য হইতে লোকের জন্মগত রাজনীতিক অধিকারের আদর্শ গ্রহণ করে। এই আদর্শ গ্রহণের ফলেই ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইবার ৬০ বৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব্বে এ দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-সঙ্কোচক ব্যবস্থার বিপক্ষে ৬ জন বাঙ্গালী সুপ্রিম কোর্টে দরখাস্ত দাখিল করিয়াছিলেন—

চন্দ্রকুমার ঠাকুর,
দ্বারকানাথ ঠাকুর,
রামমোহন রায়,
হরচন্দ্র ঘোষ,
গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,
প্রসন্নকুমার ঠাকুর।

এই আদর্শ গ্রহণের ফলেই বিলাতে যাইয়া দ্বারকানাথ ঠাকুর মিষ্টার জর্জ টমসনকে এ দেশে আনয়ন করেন এবং রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি রাজনীতিক আন্দোলনে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন ও বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আদর্শ গ্রহণের ফলেই রামগোপাল ঘোষ বিচার বিষয়ে সম্প্রদায়ভেদে ব্যবস্থাভেদের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সংবাদপত্রে দুর্ব্বলের পক্ষাবলম্বন করেন—অনাচারের উপর খড়্গহস্ত হন।

আর এই আদর্শ বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল—বাঙ্গালা সাহিত্যে। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার বহুদিন পূর্ব্বেই বাঙ্গালা সাহিত্য যেন দেশাত্মবোধের বাহন হইয়াছিল—তাহার সাহায্যে এই ভাব সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের, হেমচন্দ্রের, নবীনচন্দ্রের, রঙ্গলালের রচনায় যেমন—রাজনারায়ণ বসুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির রচনায়ও তেমনই এই জাতীয় ভাব সর্ব্বত্র সপ্রকাশ। বাঙ্গালী কবি বাঙ্গালার বাহিরে যাইয়াও এই ভাব প্রচার করিয়াছেন।

এই বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়—তখন প্রাদেশিকভাব অন্যান্য প্রদেশে যত প্রবলই কেন থাকিয়া থাকুক না, বাঙ্গালা তখন সমগ্র ভারতবর্ষকে এক করিবার কল্পনা করিয়াছে। তাই "হিন্দু মেলায়" সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত যে গান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সপ্তদশ বৎসর পূর্ব্বে গীত হইয়াছিল, সেই—

"মিলে সব ভারত-সন্তান,
একতান মনঃপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান"।

গীতটি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বঙ্গদর্শনে’ লিখিত হইয়াছিল :—

"এই মহাগীত ভারতের সর্ব্বত্র গীত হউক : হিমালয়-কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক ; গঙ্গা-যমুনা-সিন্ধু-নর্ম্মদা-গোদাবরীতটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্ম্মরিত হউক : পূর্ব্ব-পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জ্জনে মন্দ্রীভূত হউক। এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়-যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক।"

“চৈত্র মেলা”য় (পরে হিন্দু মেলা) যে অধিবেশনে এই গীত গীত হইয়াছিল, তাহাতেই বক্তৃতায় মনোমোহন বসু বলিয়াছিলেন :—

‘স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে এই বোধ হয়, আজ আমরা একটি অভিনব আনন্দ বাজারে উপনীত হইয়াছি। সারল্য আর নিশ্চিৎসরতা আমাদের মূলধন, তদ্বিনিময়ে ঐক্যনামা মহাবীজ ক্রয় করিতে আসিয়াছি। এই বীজ স্বদেশক্ষেত্রে রোপিত হইয়া সমুচিত সত্ত্ববারি এবং উপযুক্ত উৎসাহতাপ প্রাপ্ত হইলেই একটি মনোহর বৃক্ষ উৎপন্ন করিবেক। মনোহর হইবে যে, যখন জাতি-গৌরবরূপ তাহার নব পত্রাবলীর মধ্যে অতি শুভ্র সৌভাগ্যপুষ্প বিকশিত হইবে, তখন তাহার শোভা ও সৌরভে ভারতভূমি আমোদিত হইতে থাকিবে। তাহার ফলের নাম করিতে এক্ষণে সাহস হয় না : অপর দেশের লোকেরা তাহাকে ‘স্বাধীনতা’ নাম দিয়া তাহার অমৃতাস্বাদ ভোগ করিয়া থাকে। আমরা সে ফল কখন দেখি নাই ; কেবল জনশ্রুতিতে তাহার অনুপমেয় কথামাত্র শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু আমাদিগের অবিচলিত অধ্যবসায় থাকিলে অন্ততঃ ‘স্বাবলম্বন’ নামা মধুর ফলের আস্বাদনেও বঞ্চিত হইব না। ফলতঃ ঐক্যই সেই শিক্ষাসাধনের একমাত্র উপায় এবং অদ্যকার এই সমাবেশরূপ অনুষ্ঠান যে সেই ঐক্যস্থাপনের অদ্বিতীয় সাধন, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই।"

মনে রাখিতে হইবে ইহা ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কংগ্রেসের মঞ্চ হইতে উক্ত হয় নাই—স্বরাজ বা উপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনই ভারতবাসীর কাম্য।

কংগ্রেস সংস্থাপিত হইবার কয় বৎসর পূর্ব্বে যখন লর্ড লিটনের সরকার দেশীয় ভাষায় পরিচালিত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করেন, তখনও তাহার বিরুদ্ধে বাঙ্গালায় যেরূপ প্রবল আন্দোলন হইয়াছিল, অন্য কোন প্রদেশে সেরূপ আন্দোলন হয় নাই। ইহার পর কংগ্রেসের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী যে আন্দোলনের উল্লেখ করিতে হয়, সে "ইলবার্ট বিলের" জন্য। ভারতীয় রাজকর্ম্মচারী যত উচ্চপদস্থই কেন হউন না, য়ুরোপীয় অভিযুক্ত মফঃস্বলে তাঁহার বিচারাধীন হইতে অস্বীকার করিতে পারে। ইহা যে কেবল ভারতবাসীকে উদ্ধত ভাবে অপমান করা, তাহাই নহে ; পরন্তু ইহার ফলে বিচার-বিভ্রাটও বড় অল্প হয় নাই। সার হেনরী কটন বলেন :—কোন ইংরাজ যদি ভারতবাসীকে হত্যা করার অপরাধে অভিযুক্ত হয়, তবে তাহার স্বজাতীয় বিচারকের যে বিচার হয়, তাহা—"In the majority of cases it could only be described as a judicial scandal." ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হইবার পূর্ব্বে এলাহাবাদে দায়রায় হত্যাপরাধে অভিযুক্ত একটা গোরা সৈনিক জুরীর মতে নিরপরাধ বিবেচিত হইতে ‘পাইওনীয়ার’ লিখিয়াছিলেন :—

"It is disgusting to find a jury, consisting almost entirely of Europeans, giving colour, by such a discreditable mis-performance of their duty, to the widespread feeling in this country that in cases where Europeans and Natives are concerned, our Courts do not deal out even-handed justice."

তথাপি যখন এ দেশে য়ুরোপীয়রা এই অব্যবস্থার বিলোপ-সাধনের প্রস্তাবে এত উত্তেজিত হইয়া উঠেন যে, লর্ড রিপনের সরকার প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন বর্জ্জন করিতে বাধ্য হন, তখন সমগ্র ভারতে ভারতবাসীর আহত আত্মাভিমান-জ্ঞান তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া অধিকার-লাভে সচেষ্ট করায়।

এই সময় মাদ্রাজে থিয়জফিষ্টদিগের এক সম্মেলন হয় এবং তাহার পূর্ব্বে কলিকাতায় আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনীর সুযোগে ভারত-সভা যেমন এক জাতীয় সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই সম্মিলনে তেমনই জাতীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার বিষয় আলোচিত হয়। সেই আলোচনাফলে মিষ্টার হিউম সামাজিক প্রশ্নের আলোচনাকল্পে বার্ষিক সম্মিলনের যে প্রস্তাব করেন, তাহাই পরিবর্ত্তিত হইয়া কংগ্রেসে পরিণত হয়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহরে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। সে বার সভাপতি—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহার পরবর্ত্তী অধিবেশনসমূহের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বৎসর	স্থান	সভাপতি
১৮৮৬	কলিকাতা	দাদাভাই নৌরজী
১৮৮৭	মাদ্রাজ	বদরুদ্দীন তায়াবজী
১৮৮৮	এলাহাবাদ	জর্জ্জ ইউল
১৮৮৯	বোম্বাই	উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ

১৮৯০	কলিকাতা	ফিরোজশা মেটা
১৮৯১	নাগপুর	আনন্দ চালু
১৮৯২	এলাহাবাদ	উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৯৩	লাহোর	দাদাভাই নৌরজী
১৮৯৪	মাদ্রাজ	আলফ্রেড ওয়েব
১৮৯৫	পুণা	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৯৬	কলিকাতা	রহিমতুল্লা সিয়ানী
১৮৯৭	অমরাবতী	শঙ্করণ নায়ার
১৮৯৮	মাদ্রাজ	আনন্দমোহন বসু
১৮৯৯	লক্ষ্ণৌ	রমেশচন্দ্র দত্ত
১৯০০	লাহোর	নারায়ণ চন্দ্রবরকার
১৯০১	কলিকাতা	দীনশা ইদালজী ওয়াচা
১৯০২	আমেদাবাদ	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯০৩	মাদ্রাজ	লালমোহন ঘোষ
১৯০৪	বোম্বাই	হেনরী কটন
১৯০৫	বারাণসী	গোপালকৃষ্ণ গোখলে
১৯০৬	কলিকাতা	দাদাভাই নৌরজী
১৯০৭	সুরাট }	রাসবিহারী ঘোষ
১৯০৮	মাদ্রাজ }	
১৯০৯	লাহোর	মদনমোহন মালবিয়া
১৯১০	এলাহাবাদ	উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ
১৯১১	কলিকাতা	বিষণনারায়ণ দর
১৯১২	বাঁকিপুর	আর. এন. মুধলকার
১৯১৩	করাচী	সৈয়দ মামুদ
১৯১৪	মাদ্রাজ	ভুপেন্দ্রনাথ বসু
১৯১৫	বোম্বাই	সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ
১৯১৬	লক্ষ্ণৌ	অম্বিকাচরণ মজুমদার
১৯১৭	কলিকাতা	মিসেস বেসান্ট
১৯১৮	দিল্লী	মদনমোহন মালবিয়া
১৯১৯	অমৃতসর	মতিলাল নেহরু
১৯২০	নাগপুর	বিজয় রাঘবচারিয়া
১৯২১	আমেদাবাদ	আজমল খাঁ
১৯২২	গয়া	চিত্তরঞ্জন দাশ
১৯২৩	কোকনদ	মহম্মদ আলী
১৯২৪	বেলগাঁও	মোহনদাস করমচাঁদ গন্ধী
১৯২৫	কানপুর	শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু
১৯২৬	গৌহাটী	শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার
১৯২৭	মাদ্রাজ	ডাক্তার আনসারী
১৯২৮	কলিকাতা	মতিলাল নেহরু
১৯২৯	লাহোর	জওহরলাল নেহরু
১৯৩১	করাচী	বল্লভভাই পেটেল
১৯৩২	দিল্লী	রণছোড়লাল
১৯৩৩	কলিকাতা	মিসেস নেলী সেনগুপ্তা
১৯৩৪	বোম্বাই	রাজেন্দ্রপ্রসাদ

ইহা ব্যতীত কংগ্রেসের ৩টি অতিরিক্ত অধিবেশন হইয়াছে—

বৎসর	স্থান	সভাপতি
১৯১৮	বোম্বাই	হাসান ইমাম
১৯২০	কলিকাতা	লালা লজপত রায়
১৯২৩	দিল্লী	আবুল কালাম আজাদ

এই সব অধিবেশনে স্তর-বিভাগ করা যায়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম অধিবেশন অবশ্য প্রথম স্তর; তাহাতে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য যেমন অত্যুচ্চ নহে, আকাঙ্ক্ষাও তেমনই অল্প।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দ্বিতীয় স্তর। কলিকাতায় ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের যে রূপ প্রদত্ত হয়, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাহাই অক্ষুণ্ন ছিল। তবে ইহার মধ্যে কংগ্রেস বলবান ও লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের তৃতীয় স্তরের আরম্ভ। যেন নদীতে বন্যার জল প্রবেশ করিল। যে ভাবের জলরাশি তখন নদীতে প্রবেশ করে, তাহার উৎপত্তি-স্থান—বাঙ্গালা। বাঙ্গালায় তখন জাতীয়ভাব নূতন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ করিয়া যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা কেবল বিলাতী লবণ, চিনি ও কাপড় বর্জ্জনের আন্দোলন নহে, পরন্তু তাহা বিরাট জাতীয় ভাবের বিকাশ। তাহা বণিকের আন্দোলন নহে—তাহা দেশবৎসল ভাবুকের আন্দোলন। তাহা যদি কেবল পণ্য-বর্জ্জনের দ্বারা ইংরাজকে বিব্রত করিবার উদ্দেশ্যে প্রবর্ত্তিত হইত, তবে তাহা কেবল স্বদেশী আন্দোলন হইত—মুক্তির জন্য প্রচেষ্টা হইত না। বাঙ্গালা তখন বুঝিয়াছে—ম্যাট্‌সিনীর কথা সত্য—

"Do not be led away by the idea of improving material conditions without first solving the National question".

বাঙ্গালার এই ভাব কংগ্রেসে প্রভাব সংস্থাপন করে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে বলিয়াছিলেন, এই আন্দোলনের প্রবর্ত্তক বাঙ্গালার উপর ভারতের সম্ভ্রমরক্ষার ভার রহিয়াছে ; এই আন্দোলনে যদি কোন কোন স্থানে উচ্ছৃঙ্খলা লক্ষিত হইয়া থাকে, তবে তাহাতে বিস্মিত বা বিচলিত হইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। লালা লজপত রায় সেই অধিবেশনে ত্যাগের ও লাঞ্ছনার জন্য বাঙ্গালাকে অভিনন্দিত করেন। পর বৎসর কলিকাতায় নবভাব আরও সপ্রকাশ হয়। এই অধিবেশনে সভাপতি ঘোষণা করেন—

স্বরাজ বা উপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনই ভারতবাসীর কাম্য।

পর বৎসর পূর্ব্বমতে ও এই মতে সংঘর্ষে সুরাটে কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া যায়।

চতুর্থ স্তরে কংগ্রেস মডারেটদিগের দ্বারা পরিচালিত—শঙ্কাকম্পিত। সে স্তরের বিস্তার ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই কংগ্রেসের দৌর্ব্বল্য সপ্রকাশ হয় এবং যাঁহারা কংগ্রেস হস্তগত করিয়াছিলেন, তাঁহারাও বুঝিতে পারেন, কংগ্রেসকে আর জাতির প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠান বলা যায় না। তখন এক দিকে রাজপুরুষরা কংগ্রেসকে আদর দিতেছেন, আর এক দিকে মুসলমানরা তাহার দৌর্ব্বল্যের সুযোগ লইয়া স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করিয়া সাম্প্রদায়িকতার প্রসার বৃদ্ধি করিতে চাহিতেছেন। সেই অনুভূতির ফলে পরবর্ত্তী অধিবেশনে (১৯১৬ খৃষ্টাব্দে) —

(১) কংগ্রেসের মুক্তবেণী আবার যুক্ত হয়।

(২) মুসলমানদিগের তুষ্ট করিবার মৃগতৃষ্ণিকা নেতৃগণকে বিভ্রান্ত করে—ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদিগের সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনকেন্দ্র ও মুসলমানদিগের সংখ্যানির্দ্দেশে সম্মতি প্রদা[illegible] করা হয়।

পুনর্মি[illegible] পর হইতেই পঞ্চম স্তরের আরম্ভ। সেই স্তর দ্রুত পুষ্ট [illegible] কারণও ঘটিয়াছিল। সে সব কারণের মধ্যে পঞ্জা[illegible]নাচার ও শাসন-সংস্কার প্রস্তাবই সর্ব্বপ্রধান। শাসন-সং[illegible]াব বিলম্বে প্রস্তাবিত হয় এবং তাহা ভারতের জাতীয় দলের আশা ও আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ হয় নাই। পঞ্জাবে অনাচারে সমগ্র জাতির আত্মসম্মান আহত হয়। এ কথা আমাদিগের নহে ; তৎকালীন ভারত-সচিব সরকারী বিবৃতিতেই এই কথা লিখিয়াছেন :—

"The instances cited by the (Inquiry) Committee gave justifiable ground for the assertion that the administration of martial law in the Punjab was marred by a spirit which prompted not generally, but unfortunately not uncommonly, the enforcement of punishments and orders calculated, if not intended, to humiliate Indians as a race, to cause unwarranted inconvenience amounting on occasions to injustice, and to flout the standards of propriety and humanity, which the inhabitants not only of India in particular but of the civilised world in general have a right to demand of those set in authority over them."

পঞ্জাবে এই সব অনাচার-প্রসঙ্গে ছোটলাট ওডয়ার যে মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন, বিলাতের 'টাইমস' পত্রই তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অনাচারের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ হইতে অনেক বিলম্ব ঘটে ; কিন্তু তাহার আভাস পাইয়াই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার উপাধি বর্জ্জন করিয়া বড়লাটকে যে পত্র লিখেন, নিম্নে তাহার (তাঁহারই কৃত) অনুবাদ প্রদত্ত হইল :—

"কয়েকটি স্থানীয় হাঙ্গামা শান্ত করিবার উপলক্ষে পঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট যে সব উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার প্রচণ্ডতায় আজ আমাদের মন কঠি[illegible] আঘাত পাইয়া ভারতীয় প্রজাবৃন্দের নিরুপায় অবস্থার কথা স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছে। হতভাগ্য পঞ্জাবীদিগকে যে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে, তাহার অপরিমিত কঠোরতা ও সেই দণ্ডপ্রয়োগবিধিবিশেষত্ব, আমাদের মতে কয়েকটি আধুনিক ও পূর্ব্বতন দৃষ্টান্ত বাদে সকল সভ্য শাসনতন্ত্রের ইতিহাসে তুলনাহীন। যে প্রজাদের প্রতি এইরূপ বিধান করা হইয়াছে, যখন চিন্তা করিয়া দেখা যায়, তাহারা কিরূপ নিরস্ত্র ও নিঃসম্বল, এবং যাঁহারা এইরূপ বিধান করিয়াছেন, তাঁহাদের লোকহননব্যবস্থা কিরূপ নিদারুণ নৈপুণ্যশালী তখন এ কথা আমাদিগকে জোর করিয়াই বলিতে হইবে যে, এরূপ বিধান পোলিটিকাল প্রয়োজন বা ধর্ম্মবিচারের দোহাই দিয়া নিজের সাফা[illegible] করিতে পারে না। পঞ্জাবী নেতারা যে অপমান ও দুঃখ ভোগ করিয়াছেন নিষেধরুদ্ধ কঠোর বাধা ভেদ করিয়াও তাহার বিষয় ভারতবর্ষের দূরদূরান্তে ব্যাপ্ত হইয়াছে। তদুপলক্ষে সর্ব্বত্র জনসাধারণের মনে যে বেদনাপূর্ণ ধিক্কার জাগ্রত হইল, আমাদের কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছেন, এবং সম্ভবত এই কল্পনা করিয়া তাঁহারা আত্মশ্লাঘা বোধ করিতেছেন যে, ইহাতে আমাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হইল। এখানকার ইংরাজচালিত অধিকাংশ সংবাদপত্র এই নির্ম্মমতার প্রশংসা করিয়াছে এবং কোনও কোনও কাগজে পাশ[illegible]

মনুষ্যের সহিত আমাদের দুঃখভোগ লইয়া পরিহাস করা হইয়াছে, অথচ আমাদের যে সকল শাসনকর্ত্তা পীড়িতপক্ষের সংবাদপত্রে ব্যথিতের আর্ত্তধ্বনি বা শাসননীতির ঔচিত্য আলোচনা বলপূর্ব্বক অবরুদ্ধ করিবার জন্য নিদারুণ তৎপরতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারাই উক্ত ইংরাজচালিত সংবাদপত্রের কোন চাঞ্চল্যকে কিছুমাত্র নিবারণ করেন নাই। যখন জানিলাম যে, আমাদের সকল দরবার ব্যর্থ হইল, যখন দেখা গেল, প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তিতে আমাদের গভর্ণমেণ্টের মতের রাজধর্ম্মকে অন্ধ করিয়াছে, অথচ যখন নিশ্চয় জানি, নিজের প্রভূত বাহুবল ও চিরাগত ধর্ম্মনিয়মের অনুযায়িক মহদাশয়তা অবলম্বন করা এই গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কত সহজ কর্ম্ম ছিল, তখন স্বদেশের কল্যাণকামনায় আমি এইটুকুমাত্র করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি যে আমাদের বহু কোটি যে ভারতীয় প্রজা অদ্য আকস্মিক আতঙ্কে নির্ব্বাক হইয়াছে, তাহাদের আপত্তিকে বাণীদান করিবার সমস্ত দায়িত্ব এই পত্রযোগে আমি নিজে গ্রহণ করিব। অদ্যকার দিনে আমাদের ব্যক্তিগত সম্মানের পদবীগুলি চতুর্দ্দিকবর্ত্তী জাতিগত অবমাননার অসামঞ্জস্যের মধ্যে নিজের লজ্জাকেই স্পষ্টতর করিয়া প্রকাশ করিতেছে। অন্ততঃ আমি নিজের সম্বন্ধে এই কথা বলিতে পারি যে, আমার যে সকল স্বদেশবাসী তাহাদের অকিঞ্চিৎকরতার লাঞ্ছনায় মনুষ্যের অযোগ্য অসম্মান সহ্য করিবার অধিকারী বলিয়া গণ্য হয় নিজের সমস্ত বিশেষ সম্মানচিহ্ন বর্জ্জন করিয়া আমি তাহাদেরই পার্শ্বে নামিয়া দাঁড়াইতে ইচ্ছা করি। রাজাধিরাজ ভারতেশ্বর আমাকে 'নাইট' উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, সেই উপাধি পূর্ব্বতন যে রাজপ্রতিনিধির হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাঁহার উদারচিত্ততার প্রতি চিরদিন আমার পরম শ্রদ্ধা আছে। উপরে বিবৃত কারণ বশতঃ বড় দুঃখেই আমি যথোচিত বিনয়ের সহিত শ্রীল শ্রীযুক্তের নিকট অদ্য এই উপরোধ উপস্থাপিত করিতে বাধ্য হইতেছি যে, এই 'নাইট' পদবী হইতে আমাকে নিষ্কৃতি দান করিবার ব্যবস্থা করা হয়।"

এই অত্যাচার দেশবাসীকে অসহযোগ নীতি অবলম্বনে আগ্রহশীল করে এবং কলিকাতায় কংগ্রেসের অতিরিক্ত অধিবেশনে অসহযোগনীতিগ্রহণের পক্ষে ১৮৫২ জন ও বিপক্ষে মাত্র ৮৮৩ জন প্রতিনিধি মত ব্যক্ত করায় সেই নীতি গৃহীত হয়।

নাগপুরের অধিবেশনে সেই প্রস্তাবই পুনরায় গৃহীত হয় এবং তদনুসারে কংগ্রেস-কর্ম্মীরা কেহই শাসন-সংস্কারে গঠিত ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইলেন না। গয়ার অধিবেশনে সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশ ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন-প্রস্তাব বর্জ্জনের চেষ্টায় ব্যর্থকাম হইয়া স্বরাজ্য দল গঠিত করেন এবং দিল্লীর অতিরিক্ত অধিবেশনে ব্যবস্থাপক সভা-প্রবেশ কংগ্রেস-কর্ম্মীর ইচ্ছা-সাপেক্ষ করা হয়।

এই পঞ্চম স্তরেই কংগ্রেস হইতে আইন-অমান্য আন্দোলন পর্য্যন্ত পরিগ্রহণের চেষ্টা হইয়াছে এবং কলিকাতায় ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র বসু যে আদর্শ কংগ্রেসকে গ্রহণ করাইবার চেষ্টা করেন, পরবৎসর লাহোরে সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল সেই আদর্শেরই প্রশংসা কীর্ত্তন করেন। "স্বরাজ" তখন সম্রাটের ঘোষণায় ভারতবাসীর দাবী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে; পণ্ডিত জওহরলাল বলেন—স্বাধীনতাই ভারতবাসীর একমাত্র কাম্য—তবে তিনি তাহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই।

কংগ্রেসের অধিবেশন সরকার কর্ত্তৃক নিষিদ্ধও হইয়াছিল এবং সেই জন্য ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে ও ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় অধিবেশন সম্পূর্ণ হইতে পায় নাই। আইন-অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের পর সরকার কংগ্রেসের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়াছেন।

বাঙ্গালাই যে প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব সম্ভব করিয়াছিল এবং বাঙ্গালা যাহাকে লোকমতের অনুবর্ত্তী করিয়াছে—আজ সেই বাঙ্গালাই কংগ্রেসের পরিচালন-সঙ্ঘ হইতে স্থানচ্যুত হইয়াছে। ইহা যে বাঙ্গালার পক্ষে বিশেষ দুঃখের ও লজ্জার কারণ, তাহা বলা বাহুল্য। এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, বাঙ্গালা ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া জাতীয় এই আন্দোলনের জন্য যত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, তত আর কোন প্রদেশ করে নাই। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের সভাপতি বাঙ্গালী। বাঙ্গালায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনেই তাহার রাজনীতিক রূপ সপ্রকাশ হয় এবং তাহা প্রকৃত প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। বাঙ্গালাই ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ইহাকে জাতির আকাঙ্ক্ষার উপযোগী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে—স্বাবলম্বনের দীক্ষায় দীক্ষিত করিয়া ভিক্ষানীতি ত্যাগ করাইবার প্রয়াস করে এবং সেই প্রয়াসের-প্রাবল্যে দুই বৎসর পরে কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া যায়। সেই সময় কেবল মহারাষ্ট্র বাঙ্গালার সঙ্গী ছিল। বাঙ্গালা হইতে একই সময়ে ৯ জন বাঙ্গালীকে বিনা বিচারে নির্ব্বাসিত করা হয়—অশ্বিনীকুমার দত্ত, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, কৃষ্ণকুমার মিত্র এই ৯ জনের মধ্যে ৫ জন। সুরাটে কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া যাইবার পর বাঙ্গালার মডারেটরাই কংগ্রেসের দৌর্ব্বল্য লক্ষ্য করিয়া লক্ষ্মৌ সহরের অধিবেশনে বাঙ্গালী সভাপতির সভাপতিত্বে উভয় দলে মিলনের ব্যবস্থা করেন। গান্ধীজী-

শাসিত কংগ্রেসে বাঙ্গালী চিত্তরঞ্জন দাশই বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া জয়ী হন। বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে যে আন্দোলন হয়, বাঙ্গালীর সেই আন্দোলনই জাতীয় আন্দোলনে নূতন প্রভাব প্রবর্ত্তিত করে। সেই সময় মহারাষ্ট্রীয় রাজনীতিক গোপাল-কৃষ্ণ গোখলে বাঙ্গালীর কৃতিত্বের ও বৈশিষ্ট্যের প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। যদি এ কথা স্বীকার করিতে হয় যে, ভাবই মানুষকে কার্য্যে পরিচালিত করে, তবে এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, বাঙ্গালার ভাবপ্রবণতার অভাবে জাতীয় আন্দোলনের সাফল্য বিলম্বিত হওয়া অনিবার্য্য—অবশ্যম্ভাবী। বাঙ্গালাই ভারতবাসীকে জাতীয়তার মহামন্ত্র প্রদান করিয়াছে, মা'র ধ্যান শিখাইয়াছে। সেই বাঙ্গালী কি কংগ্রেসে তাহার স্থান ত্যাগ করিয়া সে স্থান অন্য প্রদেশের লোককে প্রদান করিবে? সে কি ঈর্ষ্যাপরবশ অন্য প্রদেশকে স্বেচ্ছায় প্রাধান্য দিয়া আপনি অবজ্ঞাত রহিবে?

এই কল্পনাও বাঙ্গালীর পক্ষে অপমানজনক—লজ্জার কারণ।

আজ যখন কংগ্রেস অর্দ্ধ-শতাব্দী শেষ করিয়া অগ্রসর হইতেছে তখন জাতির জয়যাত্রায় যে বাঙ্গালা প্রথম পথিপ্রদর্শক, সে বাঙ্গালাকে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি ভাবিয়া দেখিতে হইবে। আ তাহাকে যেমন স্বার্থপ্রণোদিত দলাদলি বর্জ্জন করিয়া অগ্রস হইতে হইবে, অন্যান্য প্রদেশকে তেমনই মনে রাখিতে হইবে বাঙ্গালাকে বাদ দিলে তাহা "Dropping the Pilot ব্যতীত আর কিছুই হইবে না।

আজ যখন কংগ্রেসের জয়ধ্বনি ভারতবর্ষের আকাশ বাতাস পূর্ণ করিতেছে, যখন এই উৎসবে আমরা নূতন শক্তি সঞ্চয় করিয়া নূতন উৎসাহে ও নূতন আগ্রহে অগ্রসর হইব— তখন যেন আমরা দেশকে প্রদেশ অপেক্ষা, জাতিকে সম্প্রদা অপেক্ষা সম্মানের স্থানে অধিষ্ঠিত করিতে পারি, যেন সমগ্র ভারতের লোক ভক্তিভরে যুক্তকরে মাতৃনাম গান করিতে পারি—

বন্দে মাতরম্।

সিনেমা ও আমরা

—শ্রীদীনেশচন্দ্র দাশ

দীনতার দিনগুলি মনে হয় শতাব্দীর ঘন বিভীষিকা,
ভদ্রবেশী সভ্যতার মহারণ্যে যেন হিংস্র শ্বাপদের মত
নিরীহের কুটীরেতে হানা দেয়। অভাবের রুক্ষ কশাঘাতে
আমাদের অন্তরাত্মা পঙ্গু হয়। তবু মোরা ত্রস্তপদ ছুটি সিনেমায়,
সিনেমায় ছুটে চলি উন্মাদের মত, কেন? কিসের মোহেতে?
সেথা আছে প্রণয়ীর লীলায়িত দেহভঙ্গী, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিবাণ,
চুম্বনের অগ্নিবৃষ্টি, আলিঙ্গন, উন্মাদনা, পৈশাচিক লীলা,
যুবতীর অর্দ্ধনগ্ন মূর্ত্তি সব ইন্দ্রিয়ের তীব্র লোভনীয়,
আমাদের মত্ত করে। রসসৃষ্টি পুষ্ট হয়, যদি থাকে সেথা
জন্তুদের দাপাদাপি—আফ্রিকার জঙ্গলের অতিকায় জীব;
ভাল চলে এই সব মুখরিত চিত্রগুলি—এর অর্থ এই,
মানুষের পশুত্বের রূপ চাই, মানবতা যাতে লজ্জা পায়,
নয় চাই সত্যকার প্রাণীদের পাশবিক বীভৎস ভঙ্গীমা,
তাই ভাবি, মানুষ কি ক্রমশঃই পশুদের গোত্রভুক্ত হ'ল!

অনন্ত

(কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুজ কবি ঈশানচন্দ্রের অপ্রকাশিতপূর্ব্ব কাব্য ;
কবি নবীনচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক সম্পাদিত ।) *

প্রথম সর্গ

বিরাট তরঙ্গে দাঁড়ায়ে হিমাদ্রি তুষারে ধবল কায়,
রজতের সিন্ধু ভুবন উজলি, অনন্তে মিশিয়া যায় ।
উর্দ্ধতম তার শিখরের চূড়ে আকাশের অভ্যন্তরে,
যোগাসনে বসি তাপস অনন্ত হিমমাখা কলেবরে ।
দীর্ঘ জটাজাল রজত প্রবাহে, পড়িয়াছে পৃষ্ঠে তাঁর,
জানু বিলম্বিত শ্বেত শ্মশ্রুরাশি, গ্রথিত হিমানী হার ।
শান্ত, দীপ্ত জ্যোতিঃ ভাতিছে বদনে. নয়ন নিমেষহীন,
মনঃ, প্রাণ, জ্ঞান, ব্যোমগর্ভে যেন, হইয়া র'য়েছে লীন ।
ধরণী অদৃশ্য অভ্র আবরণে, শূন্য খোলা চারিধার,
নাহি জীব-চিহ্ন, নাহি রব কোন— শুব্ধ শূন্য পারাবার ।
কত শত বর্ষ কত শত যুগ, প্রলয় কতই বার,
সেই যোগাসনে বসিয়া তাপস, লুপ্ত বাহ্যজ্ঞান তাঁর ।
সহসা তাঁহার নয়নের পথে, ব্যোমগর্ভ ভেদ করি,
ফুটিয়া উঠিল অপূর্ব্ব কিরণ, কাঞ্চন বরণ ধরি ।
হিরণ্য কিরণে অনন্ত ভরিল জগৎ সুবর্ণময়,
পলক কাঁপিল ঋষির নয়নে, হইল চৈতন্যোদয় ।
ব্যোমগর্ভ হ'তে, হেমময় পথে, ধীরে, ধীরে, ধীরে, আসি,
ঋষির সম্মুখে, উদিল প্রতিমা অতুলা রূপের রাশি ।
তড়িতের তনু যৌবনে জড়িত, অপূর্ব্ব রমণী ছবি,
রূপের ছটায় অনন্ত বিভোর, অদৃশ্য বিশ্বের রবি ।
নমি পদপ্রান্তে সম্ভ্রমে তাপস দাঁড়াইল আগে তাঁর,
ঝরিতে লাগিল তুষারের ধারা, অঙ্গ হ'তে চারি ধার ।
দেবীর কিরণে রঞ্জিত তাপস, কাঞ্চনবরণ দেহ,
যেন স্বর্গপথে, কমলার সাথে, সুবর্ণের প্রাণী কেহ ।
জানু পাতি শূন্যে কর যুড়ি, ঋষি দেবী মুখপানে চায় ;
সজল নয়ান, গদগদ স্বরে, কাতরে কহেন তাঁয় :—
"প্রসন্ন দাসেরে, যদি দয়াময়ি ! মহাশক্তি কর দান
সৃজন করিব নবীন অবনী, ঢালিয়া তৃষিত প্রাণ ।
পাপে পরিপূর্ণ এই বসুন্ধরা, প্রাণী হেথা জ্ঞানহীন ;
অন্ধের জীবন করিয়া ধারণ, হাসে কাঁদে চিরদিন ।
জানে না, ভাবে না ভাবের মহিমা, জগত জড়িত যায় ;
অমৃত আস্বাদ ভুলিয়া, জননি ! নিয়ত গরল খায় !
সর্ব্বসৃষ্টি সার মানব তোমার কালে হইয়াছে ক্ষয় ;
প্রেতমূর্ত্তি তার, ভ্রমে চারিধার, এখন অবনীময় !
ঊর্ণনাভ মত, আপন গরলে রচিছে ধর্ম্মের জাল ;
কতই রচিছে, কতই ভাঙ্গিছে, অপূর্ণ সে চিরকাল !
জটিল সে তন্তু লতাতন্তু সম, তাহে সুখ অন্বেষণে,
জড়ায়ে আপনি, হতাশ জীবনে, ত্যজে প্রাণ উদ্বন্ধনে

* একদিন যাঁহার সুমধুর গীতি-কবিতাসমূহ ভূদেবের "এডুকেশন গেজেট", সঞ্জীবচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন", কালীপ্রসন্নের "বান্ধব", যোগেন্দ্রনাথের "আর্য্য দর্শন" প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠাগুলি অলঙ্কৃত করিত, যাঁহার বিবিধ কাব্যগ্রন্থ, বিশেষতঃ অনবদ্য "যোগেশ" কাব্যখানি বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যে হৈম-যুগে পাঠকসমাজে অপূর্ব্ব সমাদর লাভ করিয়াছিল, কবিবর হেমচন্দ্রের অনুজ সেই সুকবি ঈশানচন্দ্রের নাম বোধ হয়, আধুনিক পাঠকগণের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত । তাঁহার শোচনীয় অকালবিয়োগের পরে তাঁহার অপ্রকাশিত কাব্যগুলি প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আমার শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একবার উদ্যোগী হইয়াছিলেন, এবং কবির অভিন্নহৃদয় সুহৃদ্ কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় উহা স্বরচিত ভূমিকাসহ সম্পাদিত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন । কোন অনিবার্য্য কারণবশতঃ এই সংকল্প সিদ্ধ হয় নাই । এক্ষণে আমরা 'বঙ্গশ্রী'র সুধী পাঠকগণকে ঈশানচন্দ্রের "অনন্ত" নামক নয় সর্গে সমাপ্ত অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব কাব্যখানি উপহার দিতে আনন্দ ও গৌরব অনুভব করিতেছি । কবি জীবিত থাকিলে অনেক স্থলেই হয়ত উহার সংস্কার সাধন করিতেন, কারণ পাণ্ডুলিপির স্থানে স্থানে সংশোধনের চিহ্ন আছে । কবিবর নবীনচন্দ্রও স্থানে স্থানে শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন । ঈশানচন্দ্র নবম সর্গের শেষ অংশটি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই, তাঁহার সংকল্প অনুসারে নবীনচন্দ্র উহা সমাপ্ত করেন । সুবিজ্ঞ পাঠকগণ শেষ অংশ পাঠকালে নবীনচন্দ্রের সেই অননুকরণীয় রচনাভঙ্গী সহজেই লক্ষ্য করিবেন ।

কাব্যখানি পাঠ করিলে ঈশানচন্দ্রের অকালমৃত্যুতে বঙ্গ সাহিত্য কত দূর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল এবং তাঁহার তিরোধানে কত সম্ভাবনা বিলুপ্ত হইয়াছিল তাহার আভাস পাওয়া যায় ।

অদূরভবিষ্যতে ঈশানচন্দ্রের জীবন ও কাব্যের আলোচনা করিবার আমাদের বাসনা আছে, সেই জন্য এক্ষণে দীর্ঘ ভূমিকা অনাবশ্যক বোধ করিতেছি ।

বদ্ধ গ্রীবা কত নরনারী দেহ লম্বিত ধর্ম্মের ফাঁদে ;
হেরিলে সে দৃশ্য, শিহরে শরীর, আকুল পরাণ কাঁদে।
প্রতি পদে বাজে ভীম ব্যথা বুকে অধীনের কারাগার,
এ প্রাণ ধরিয়া সে প্রেত ভবনে রহিতে না পারি আর
তুষ্ট যদি দাসে শক্তিময়ি ! তব শক্তি-কণা কর দান,
এই শূন্য মাঝে, নূতন করিয়া, সৃজিব জীবের স্থান।
সৃজিব নবীন ধরম তথায়, নবীন আচার তার,
ধরার যাতনা, যেন, সে ভুবনে ভুঞ্জিতে না হয় আর।"
দেবী কন তাঁয়, হায়রে অনন্ত ! সৃজিলে নবীন স্থান,
মিটিবে কি তব সাধের বাসনা— জুড়াবে নরের প্রাণ ?
নাহি জান তুমি জীবের হৃদয় বৈকুণ্ঠে রাখিলে তুলি,
তথাপি তাহারা কামনার জ্বালা, ক্ষণেক না রবে ভুলি।
সুখ, দুখ, নর ! মনের বিকার, জীবনে উভয়ই ব্যাধি
সুখ সুখ-হীন দুখ দুখ-হীন একের অভাবে যদি —
এ ব্যাধির মূল কামনা কেবলি ; নহিলে তাহার নাশ,
কিবা সে স্বরগ, কিবা সে নরক, উভয় দুখের বাস।"
ঋষি কহে, "যদি কামনা এমতি, নিয়ত জড়িত দুখে ;
কে রচিল তায়, কে রাখিল হায় ! ধরার মানব বুকে ?
কিম্বা লক্ষ্য আর আছে বিধাতার, কাঁদায়ে ধরার প্রাণী ?
কাঁদে না কি দেবি ! দেবতার প্রাণ বাজে না করুণ বাণী ?
অথবা শ্মশান অমরা এখন, নাহি কোন দেব আর
আছে যদি দেব, দানব প্রকৃতি এবে কি হইল তার ?
কিম্বা দৈব জ্ঞান অলীক কল্পনা তুমিও প্রসূত তার,
পিশাচের রাজ্য এ বিশ্ব সংসার, ভূত নাচে চারিধার॥"
দেবী কন ধীরে, "হায় রে অনন্ত, মানব হৃদয়ে তব,
জীবের সন্তাপে দেবের কি ব্যথা, করিবে না অনুভব।
জীবের কামনা জীবেরি রচনা, নাহি রচে বিধাতায়
সুখ সুখ করি ছুটিছে মানব, সুখ না খুঁজিয়া পায়।
মৃগ মদ গন্ধে কুরঙ্গ যেমতি বনে বনে লয়ে ঘ্রাণ,
ছুটিয়া বেড়ায়, কানন মাঝারে, গন্ধে আকুলিত প্রাণ,
তেমতি মানব, সুখের আকর হৃদয়ে ধরিয়া তার,
সংসার কাননে, সুখ অন্বেষণে, ভ্রমিতেছে অনিবার।
পদে পদে বাধা, তবু অন্ধ প্রাণী ছোটে মত্ত কামনায়,
হায়, কোথা সুখ ! কে পেয়েছে কবে, ভব-মৃগ-তৃষ্ণিকায় !
নিজ ভাগ্য প্রাণী রচিছে আপনি, ভোগের কামনা করি ;
নাহি মুক্তি তার, যতদিন বুকে রহিবে কামনা অরি।
কামনার ফল ভুঞ্জিতে মানব জনমিবে বার বার ;
সম্মুখে তাহার ধরিলে অমরা, নাহি পরশিবে দ্বার।
জীব হৃদয়ের যাতনা নিরখি, যদি রে ব্যথিত প্রাণ,
ঢালি পুণ্য স্রোত পতিত ধরায়, কেন নাহি কর ত্রাণ ?"

উথলিল অশ্রু অনন্তের চক্ষে, কহিল কাতর স্বরে,
"পুণ্য প্রবাহিণী ঢালিল যে মা গো ! অজস্র ধারায় নরে
কত রামকৃষ্ণ কত বুদ্ধ খৃষ্ট চৈতন্য কতই আর,
কল্পে, কল্পে, কল্পে উদিল ধরায় ঘুচিল কি পাপ তার ?
কত ধর্ম্ম শাস্ত্র হইল রচিত, কে করে নির্ণয় তার ?
সুপথ, কুপথ করিল প্রচার কত কত অবতার।
ঘুচিল কি তায় অবনীর পাপ— ঘুচিল কি জীব গ্লানি ?
দুঃখেরি নিবাস ধরণী হেথায় জন্মমাত্র কাঁদে প্রাণী।
যেই পাপ স্রোত অনন্ত প্রবাহে বহিতেছে বসুধায়,
ধর্ম্মের বন্ধনে সে প্রবাহ কভু হয়েছে কি রুদ্ধ হায় !

কবি ঈশানচন্দ্র।

প্রবাহের মুখে যথা বাঁধি শিলা, স্রোত মন্দ তথা তার,
অদূরে দেখিবে উথলি প্রবাহ ছুটিয়াছে চারিধার।
দুই চারি জন কখন কখন হেরি সে প্রবাহে সুখে
ভাসায়ে তরণী চলেছে উজানে প্রীতি-বিকশিত মুখে !
কয়জন তারা — তুলনায় মা গো ! হেরি যবে চারি ধার ?
মজ্জমান পাপে কোটী কোটী বৃন্দ প্রাণী করে হাহাকার !
এত ধর্ম্ম ভেদ, এত কর্ম্ম ভেদ— এত জ্ঞান ভেদ যথা,
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিনী অভেদ মহিমা, দুর্বোধ সতত তথা।
এ বৈষম্য যেন, জীবের ধরায়, গাঁথা তার চিত্ত সনে ;
নর ইতিহাস হেরি যত দূর, হেরি উহা জ্বলযনে।

তাই সে বাসনা, এই শূন্য মাঝে, নব উপাদান আনি,
রচিয়া ভুবন, রাখিব তথায় ধরার তাপিত প্রাণী।"
কহিলেন দেবী, তুমিও ভুলিলে, কামনার সুখে তব,
হের কত দূর পুরে আকিঞ্চন, সৃজিয়া ধরণী নব।
নবীন অবনী সৃজিতে, তোমায় করিব শকতি দান,
কিন্তু নিয়তির করুণা ব্যতীত,— হবে না জীবের প্রাণ।
নূতন ভুবনে রাখিবে প্রাণীরে, ভাগ্য তার রবে কোথা ?
জনমে জনমে, কামনার ফল ললাটে রহিবে গাঁথা।
নিজ ভাগ্য ত্যজি, রহিতে যদি সে পারিত মুহূর্ত, ও রে!
নবীন বৈকুণ্ঠ সৃজিতে, শকতি এখনি দিতাম তোরে।
সে সাধ্য জীবের নাহি রে মানব ভাগ্য লিপি তুলিবার
নাহি হেন দেব, যে পারে খণ্ডিতে ঈষৎ রেখাটি তার।
বিধির তনয়া, নিয়তি আপনি, অদৃষ্ট ভুবনে বসি,
মানবের ভাগ্য করিছে রচনা, নিবিড় আঁধারে পশি।
তুষ্ট করি তাঁরে লয়ে এস বর যতদিন তুমি রবে,
ততদিন যেন, অদৃষ্ট ভুঞ্জিতে, মানব না আসে ভবে।
বাঞ্ছিত ভুবন সৃজিতে, তখন, করিব শকতি দান,
সৃজিবে নবীন মানব মানবী, ঢালিয়া সাধের প্রাণ।"
বলিতে বলিতে দেবীর প্রতিমা অদৃশ্য নয়ন তটে,—
নিদ্রা অবসানে, সুখের স্বপন, যেমন হৃদয় পটে।
দেখিতে দেখিতে, সুবর্ণ কিরণ মিশিল গগন গায়;
বিস্মিত বদনে, আকুল নয়নে, অনন্ত নেহারে তায়।

ইতি "অনন্তের যোগশেষে শক্তির সহিত সাক্ষাৎ"
নামক প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গ

দুগ্ধ-ফেননিভ, শুভ্র ছায়াপথ শোভিছে আকাশ মাঝে,
দুধারে তাহার স্নিগ্ধালোক ধরি তারকার হার সাজে।
পথের দুধারে, বিজলীর লতা, নবীন নীরদ পাতা,
রক্তবরণ কিরণের ফুল বৃন্তে, বৃন্তে গাঁথা!
মাঝে মাঝে তরু নীরদ বরণ, শূন্যপটে যেন আঁকা;
ধূসর বরণ, নবীন পল্লব আকাশে প্রসারি শাখা।
শাখা পথ কত, বিচিত্র সারিতে চলিয়াছে আসে পাশে
সোপান আকারে নীহারিকা স্তর কৌমুদী কিরণে ভাসে।
বিজলী লতিকা বিবশা হইয়ে, উঠিয়াছে তরু গায়,
দ্বিসহস্র বাহু করি প্রসারিত জড়ায়ে ধরেছে তায়।
সহস্র বদন চাপি অঙ্গে অঙ্গে তরুরে চুম্বন করে;
আবেশে তাহার সহস্র মস্তক রাখে তরু হৃদি পরে!
দ্বিসহস্র তার অতৃপ্ত নয়নে চেয়ে দেখে তরুপানে,
দেখিতে দেখিতে, সৃজি নব বাহু, তরুরে জড়ায় প্রাণে।

একাকী অনন্ত চলেছে সে পথে, ব্রহ্মাণ্ড বিজয়ী বেশ,—
দৃঢ় পদক্ষেপে হয় অগ্রসর নাহিক শঙ্কার লেশ।
চারি ধারে তার অসংখ্য জগৎ ভাসিছে গগন গায়;
শ্বেত পীত নীল বিবিধ কিরণ ফুটিয়া পড়েছে তায়।
চলেছে অনন্ত দেখিতে দেখিতে কোটী বিশ্ব ভ্রাম্যমাণ
কতকাল ধরি, চলে কতদূর,— নাহি অবসাদ জ্ঞান।
সহসা নেহারে আঁধার আকাশ যেন মসী পারাবার;
কিরণ হিল্লোলে কাঁপিছে নিয়ত, দূর অভ্যন্তর তার।
দ্রুতগতি ঋষি ধায় সন্নিকটে; ক্রমে যত অগ্রসর,
আঁধার ভুবন নয়নে তাহার দৃশ্যমান স্পষ্টতর।
তড়িত কিরণে, হেরে সে আঁধার— কেবলি কঙ্কাল ছায়া,
নিবিড় শ্রেণীতে, আছে দাঁড়াইয়া, আবরি ভুবন কায়া।
চন্দ্র, সূর্য্য, তারা রয় অগোচর, নাহি অন্য দৃশ্য আর;
অস্ফুট কল্লোল, মহাশূন্য ভরি, উথলিছে চারিধার।
পবনের গতি শুনিতে যেমতি, বসি গিরি গহ্বরে,
সাগর কল্লোল যেমতি শ্রবণে, বসি গৃহ-অভ্যন্তরে;
তেমতি অস্ফুট, ঔদাস্য পূরিত, হু হু রব অনিবার
শুনিল অনন্ত, স্তম্ভিত মূরতি, চরণ না চলে আর।
চিন্তাকুল মনে হয় অগ্রসর— পশিতে অন্তরে তার,
ভ্রমে বহুদূর, তথাপি না পায়, খুঁজিয়া প্রবেশ দ্বার।
কঙ্কাল আকৃতি ঘনশ্রেণী দিয়া, উঠিয়াছে স্তরে স্তরে;
প্রাচীরের মত হেরে সেই শ্রেণী ভুবন বেষ্টন করে।
শক্তিরে স্মরণ করিল তখন, সহসা সুড়ঙ্গ মত,
সে শ্রেণী ভেদিয়া হইল প্রকাশ প্রদীপ্ত সরল পথ।
অনন্ত সে পথে করিল প্রবেশ, হেরে যতদূর তার,—
নিরখে কেবলি কঙ্কাল আকৃতি বিচলিত চারিধার।
মাংস চর্ম্ম হীন, নয়ন কোটর, মসীপূর্ণ গর্ত্ত তার;
হয় অগ্রসর নীরব গতিতে একে একে বাঁধি সার।
চলে যত দূর, হেরে এই দৃশ্য; সুড়ঙ্গ হইলে শেষ,—
নেহারে নিবিড়, জলদ প্রাচীর আবরিয়া শূন্য দেশ।
গাঢ় মসী ঢালা প্রাচীর বরণ উঠেছে আকাশ গায়;
একমাত্র দ্বার, একে, একে, একে, কঙ্কাল প্রবেশে তায়।
হেরিল ভিতরে দীপ্ত মহাকাশ, মাঝে এক সিংহাসন;
রমণী প্রতিমা বসি সে আসনে স্বপ্নে যেন নিমগন।
ধবল বরণ, স্বচ্ছ অবয়ব স্ফটিক কিরণ মাখা,
সুঠাম আকৃতি— পূর্ণ যৌবনে, নীলাভ্রে সুতনু ঢাকা।
অনিন্দ্য বদনে নাহি ভাবলেশ, পাষাণ প্রতিমা প্রায়;
আয়ত লোচনে, নিস্পন্দ পলক বিজলী চমকে তায়!
বাম করতলে ললাট স্থাপিত; নিবিড় কুন্তল চয়,
দক্ষিণ অংশেতে পড়েছে ছড়ায়ে, আবরি উরজ দ্বয়।

সম্মুখে বিস্তৃত বিশাল পুস্তক মসীময় পত্র তার :
বজ্র লেখনীতে, লেখে দেবী শুধু, বহ্নি ছোটে চারিধার।
একে একে যেই কঙ্কাল মুরতি দেবীর সম্মুখে যায় :
হেরে দেবী তার ললাটের পানে,— দৃষ্টি তড়িতের প্রায়,—
সে দৃষ্টি পরশে, ললাট ভরিয়া ফুটিছে প্রদীপ্ত রেখা—
অদৃশ্য তখনি সে ছায়া আকৃতি— অন্য ছায়া দেয় দেখা।
তাহারো ললাটে পড়ে ভাগ্য রেখা, সেও পুনঃ অদর্শন :
নিমেষে নিমেষে কোটী কোটী ছায়া আসে যায় অনুক্ষণ।
কর-যুড়ি ঋষি, কহিল বিষাদে প্রণমিয়া দেবী পায়,
"হের মা অপাঙ্গে অধম কিঙ্কর কাতরে করুণা চায়।"
থামিল লেখনী, বদন তুলিয়া দেবী ঋষি পানে চায় ;
অগ্রসরি ধীরে সজল নয়নে অনন্ত কহেন তাঁয়।—
"এ বজ্র লেখনী রাখ মা বারেক, বিষম ইহার লেখা !
জান না, জননি ! জীবের ললাটে কি দারুণ এই রেখা।
লিখিবে সে যদি, লিখ হেন লিপি— দুখ না জনমে যায় ;
নতুবা বারেক, আইস, জননি ! দেখিবে সে বসুধায়।
দেখাইব চিরি নরনারী বুক, কি করে তাদের প্রাণ ;
কত দুঃখ দেও জীবেরে, জননি ! তখন হইবে জ্ঞান।
ইচ্ছা করে মাতঃ ! ওই বজ্র লয়ে জীবের সন্তাপ যত,
তোমার ললাটে, লিখি একবার : দেখ সে যাতনা কত !
ক্ষান্ত হও, মাতঃ ! জীবের পীড়নে লিখিও না ভাগ্য আর :
পাপে তাপে, ধরা ভীষণ আকৃতি ধরিয়াছে চারিধার।"
দেবীর নয়নে ঝরে দীপ্ত নীর : কহেন করুণ স্বরে,—
"জান না, মানব, জীবের সন্তাপ কত বাজে এ অন্তরে !
আজন্ম পাষাণী নহিরে, মানব ! ছিল প্রাণ এই বুকে : –
জীবের ললাটে লিখিতাম ভাগ্য, নিরত পরম সুখে।
জানিত না প্রাণী নিয়তির নাম, ভ্রমেও সে একবার,—
ভাবিত না কভু, ইহ পরকাল কি বন্ধনে বাঁধা তার।
স্বপ্ন সুখে ভোর ছিল জীব কুল,— ছিল ধরা স্বর্গ সম ;
তাপিতের শাপে এ মরম জ্বালা ছিলনা কখন মম।
কুক্ষণে মানব, ভুলি বিধি সেবা, আপন সেবায় রত,
ভুলি জীবাত্মায়— করিল ইন্দ্রিয়ে আত্মসুখে পরিণত !
ইন্দ্রিয়ের সেবা শিখিলে মানব, অতৃপ্তি উদিল তার ;
নিত্য নব সুখে হইল বাসনা,— তাহে জন্ম কামনার।
যত বাধা পায়, তত লিপ্সা তার সুখের কল্পনা তত :
অভীষ্ট সুখের ক্ষণিক আস্বাদে, তৃপ্তি পুন অপগত।
ঘৃত আস্বাদনে বহ্নি শিখা যথা, উন্মাদিনী কামনায়,
সুখের আস্বাদে, মানবের প্রাণ মত্ত তথা পিপাসায়।
ক্রমে মত্ত জীব তীব্র কামনায় হইল অস্থির প্রাণ :
নব সুখ সাধে ভুলিল তাহারা পরম-আনন্দ জ্ঞান !
অভেদ ভাবনা জীব-চিত্ত হ'তে ক্রমে হয় অন্তর্হিত ;—
ভুবন ব্যাপিনী মহাপ্রাণ হতে বিচ্ছিন্ন হইল চিত।
প্রেমময় বুকে হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, আসি কৈল অধিকার ;
শান্তিময় রাজ্যে অশান্তির জ্বালা, প্রজ্বলিত চারিধার।
পাষাণ শিহরে যে পাপ পরশে,— সুখ সাধ করি তার,
পুরাইতে আশা, কাতর অন্তরে, ডাকে প্রাণী বিধাতায়।
নিরন্তর সেই পাপের চিৎকারে, ক্লিষ্ট শ্রুতি বিধাতায় ;
করিলা আদেশ, "জীবের কামনা অপূর্ণ না রাখ আর।"
তদবধি, তার অদৃষ্ট লিখন, হইল রে দুখময় :—
কামনার ফল ভুঞ্জে জীব কুল,— নিয়তি পাষাণী নয়।"
ঋষি কহে, মাতঃ, অপূর্ণ কামনা যদি গো না রাখ ভবে !
কৃপা করি মোরে, পূর্ণ কর সাধ, জননী আমার তবে !
হয়েছে বাসনা, জননী, আমার,— সৃজিব নবীন স্থান :
বসতি করিয়া, জীব কুল তথা, জুড়াবে তাপিত প্রাণ।
আত্মাশক্তি তাঁর সৃজন শকতি করিবেন মোরে দান ;
তাঁহার আশ্বাস লভিয়া, জননি ! এসেছি তোমার স্থান।
তোমার চরণে, এই ভিক্ষা, মাতঃ ! যতদিন রব আমি ;—
জীবের অদৃষ্ট লিখিতে, জননি ! বিরত রহিবে তুমি।
কর্ম্মফল যার রহিবে অপূর্ণ : লিখিবে ললাটে হেন,—
নবীন ভুবনে, সে ফল তাহার, না হয় ভুগিতে যেন !
অলঙ্ঘ্য লেখনী, জননি ! তোমার, অবশ্য সফল হবে ;—
পরমায়ু গত, হইলে আবার, তাহারা ফিরিবে ভবে।"
লেখনী রাখিয়া, কহিলা নিয়তি, "ধন্য আশা তব, নর,
পূর্ণ মনস্কাম হইবে তোমার, দিলাম তোমারে বর।
প্রণমি দেবীরে চলিল অনন্ত ডাকিয়া কহেন দেবী,
"নাহি কি অনন্ত জানিতে বাসনা আপন অদৃষ্ট লিপি ?"
অনন্ত কহিলা "কিবা ফল তায়, ভবিতব্য দুর্নিবার !
যে জ্ঞান উপজে— যাতনা কেবলি— মূর্খে বাঞ্ছা করে তার।"
নিয়তি কহিলা, "জ্ঞানের মহিমা ভুলিলে যে এইবার ;
জীবের অসাধ্য কি আছে জগতে, রহিলে সে জ্ঞান তার।
ভবিতব্য যদি দুর্নিবার ভবে, বিধি চিন্তা অকারণ ;
অসাধ্য সাধনে, অক্ষম যে বিধি— কিবা তাঁর প্রয়োজন !
জীবের দুর্গতি হেরিয়া, বিধাতা প্রচারিলা জ্ঞান ভবে,
জ্ঞানের অর্জ্জনে, ভবিতব্য হ'তে জীবকুল মুক্ত হবে।"
জিজ্ঞাসিলা ঋষি, "তবে কেন ভবে, সহে দুখ জ্ঞানবান ?"
দেবী কন তাঁয় "জ্ঞাতব্য জগতে কেবলি সে ভগবান।
সে জ্ঞান যাহার আছে এ জগতে, দুখলেশ নাহি তার ;
আশা, অভিলাষ, সুখ দুখ আদি তাহাতে না রহে আর।"
ঋষি কহে, "মাগো ! আশালুব্ধ আমি, সে জ্ঞান আমার নাই ;
দেহ হেন বর জীব দুঃখ আমি যেন গো ঘুচাতে পাই !"

এই বলি ঋষি, প্রণমি দেবীরে, বিদায় লইয়া যায়,
স্নেহ বিগলিত, সুস্নিগ্ধ নয়নে, দেবী তাঁর পানে চায়।

ইতি "অনন্তের ভাগ্যলোকে নিয়তির নিকট গমন" নামক
দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত

তৃতীয় সর্গ

বসিয়া জলদস্তরে, কণ্ঠে শুভ্র বদ্ধ করে, ঊর্দ্ধ দৃষ্টে কুমারী বালিকা :
ঊর্দ্ধ পলকের কোলে, অর্দ্ধ নেত্র ভাসে জলে, বদন পরমানন্দে লিখা
বালিকার চারি পাশে মধুর আলোক হাসে—মহাশূন্য যেন হাসিময় :
সে এক বালিকা ভিন্ন, নাহি প্রাণী অন্য কোন,
অনন্ত সম্বোধি তারে কয়।
কহ দেবি! কৃপা করি, এ আকাশ কোন পুরী?—
ব্রহ্মলোক কত দূরে আর?
ঘুরিয়া এ শূন্য দেশ, পেয়েছি বিস্তর ক্লেশ,— অবসন্ন শরীর আমার।"
বালিকা শিহরি চায় যেন বিস্মিতের প্রায়—অনন্তেরে করি নিরীক্ষণ :
কহিল করুণ বাণী, "আহা বুঝি অন্ধ প্রাণী, নেত্রে তব নাহি দরশন।"
অনন্ত কহিল পুনঃ, "অন্ধ নহে এ নয়ন, আমি দেবি, মানব ধরার।"
বিস্ময়ে বালিকা কয়, "ধরার মানব চয় দেখা নাহি পায় বিধাতার।"
শুনি সে অপূর্ব্ব বাণী ; অনন্ত বিস্ময় মানি, কহে, দেবি তুমি কোনজন?"
বালিকা না শুনে তায়, জিজ্ঞাসিল পুনরায়, "কহ নর, ধরা সে কেমন?
সত্য কি মানব হায় নাহি হেরে বিধাতায়, কিবা তবে করে দরশন?
মানব নিরখে যাহা, কিরূপ দেখিতে তাহা,—
বিধি-হীন সে দৃশ্য কেমন?"
অনন্ত বিমুগ্ধ প্রাণে, চারিদিকে শূন্য পানে, চেয়ে দেখে আকুল নয়নে,
নাহি হেরি বিধাতায়, বালিকার পানে চায়, কহে তায় বিনীত বচনে,
"মানব নয়নে দেবি! অবনীতে স্থূল সবি, নিরাকার তার অগোচর।
জড় দৃশ্যে অনুক্ষণ দৃষ্টি করে আবরণ ; জড়ের পিঞ্জরে বাঁধা নর।
জড়ের বিকাশ যাহা, ধরার জীবন তাহা, বিনাশ তাহার জড় সনে :
অনিত্য সকলি যথা, মানব কেমনে তথা নিত্যরূপ হেরিবে নয়নে?"
বালিকা বিস্মিত প্রায়, অনন্তের পানে চায়, পুনরায় জিজ্ঞাসে তখন,
"শুধু জড় দৃশ্য হেরে, ধরায় কেমন করে, করে নর জীবন ধারণ?
নাহি কি হৃদয় তার? আছে যদি কি প্রকার আকুলতা করে নিবারণ?
কোন ধর্ম্মে রহে রত, কিসে দিন করে গত,—
জীবনের উদ্দেশ্য কেমন?"
অনন্ত কহিল দুখে, "হায় মানবের বুকে, আকুলতা নাহি পায় স্থান,
সচ্ছন্দতা মোহ ঘোর, অবিদ্যার বাঁধে ডোর, সঙ্কীর্ণ করিছে তার প্রাণ;
রচিছে সাধের ঘর, সৃজিছে আপন পর, সুখ দুখ নিরমিছে তায় :
দিবানিশি সেই ধ্যান,—কূপবদ্ধ যেন প্রাণ : নয়ন তুলিয়া নাহি চায়।
প্রেম, মায়া, দয়া, নরে চুরি করে পরস্পরে, মন তার পরিপূর্ণ জ্ঞান
এমন জীবন যার, খুঁজিলে হৃদয় তার, বুঝি আর মিলে কিনা প্রাণ।"
শুনিয়া মলিন মুখে, বালিকা কহিল দুখে, "আহা জ্ঞান নাহি কি ধরায়?
নাহি জানে কিবা সুখ, দিবানিশি সহে দুখ—হায়, কেবা বুঝাইবে তায়?
আইস মানব তুমি, দেখাইয়া দিব আমি, বিধাতার রূপ নিরাকার,
ভুলিবে সকল দুখ, আনন্দে ভরিবে বুক,— এত সুখ নাহি জীব আর।"
বালিকা দাঁড়ায় উঠে ; অগ্রসরি করপুটে, অনন্ত বিনয়ে কহে তায়,
"বালিকা বয়সে হেন, তুমি দেবি, কোন জন—
একাকিনী আকাশের গায়?"
বালিকা হাসিয়া কয়, "সবে মোরে ভক্তি কয়—
একাকিনী নহি আমি নর!
করি সঙ্গী দরশন, ভরি মম দু' নয়ন, অপরূপ রূপ নিরন্তর।
সরাইতে নারি আঁখি, এইরূপে ডুবে থাকি, এইরূপ জীবন আমার ;
শেষ নাহি খুঁজে পাই—যত দূর ভেসে যাই হেরি এইরূপ চারিধার।
আহা নাহি হের তুমি? দেখাইয়া দিব আমি"
বলি ভক্তি ধরে কর তার :
শিহরি অনন্ত হেরে, ভাসিতেছে তারে ঘেরে কিরণের মহাপারাবার
নিমেষে নিমেষে তায় সলিল শীকর প্রায়, ভাসে ডোবে বিশ্ব অগণিত
সে হিল্লোল ধরি বুকে, শান্ত প্রভা হাসি সুখে,
প্রেমে যেন সে হাসি জড়িত
অনন্ত স্তম্ভিত কায়, ভক্তির বদনে চায়, কহে তায় অস্ফুট বচন,
"বুঝিতে নারিনু হায়! আমি, দেবি! বিধাতায়,
কর মোর ভ্রান্তি বিমোচন
জল বুদ্বুদের মত, বিশ্ব যদি অবিরত, কিবা সৃষ্টি প্রয়োজন তার,—
সৃষ্টি করি এত দুঃখ, বিধাতার কিবা সুখ? শক্তি মম নাহি বুঝিবার।"
ভক্তি ম্লান-মুখে কয়, "সৃষ্টি বিধাতার নয়, সৃষ্টি, নর, তোমার স্বপন :
দ্রষ্টা দৃশ্য অস্তমিত, চিদ্রূপে বিভাসিত,— ব্রহ্মরূপ কর দরশন।"
অনন্ত বিষাদে কহে, "নেত্র ভরি দৃশ্য রহে, কিসে তাহা করি নিবারণ?
ভক্তি আসি কাছে তার, করতলে আপনার অনন্তের ঢাকে দুনয়ন।
অনন্ত ভাবিল তায়, দেহ যেন নাহি আর,— শুধু প্রাণে গঠন তাহার,
ক্রমে প্রাণ প্রসারিত—ক্রমে তাহে অনুমিত জীবকুল সকলি ধরায়।
আকুল অনন্ত প্রাণ, করে ক্রমে অনুমান দেশ মহাদেশ প্রাণে তারি
ধরণী ছাড়িয়া প্রাণ—ক্রমে ঊর্দ্ধে ধাবমান, বিশ্বসীমা নিখিল বিদারি।
আকুল উদ্বেগ উঠি গ্রহময় ব্যোম টুটি প্রাণ যেন উছলিতে চায়,—
জ্যোতির্ম্ময় পারাবার—ব্রহ্মরূপ নিরাকার—অমনি ফুটিয়া উঠে তায়।
সৃষ্টি নাহি যায় দেখা, চিন্ময় প্রবাহ-রেখা কেবলি সে আনন্দ অপার,—
অনন্ত সে সুখে হারা, নেত্রে বহে অশ্রুধারা,
শক্তি আসি ধরে করে তার
অমনি শিহরি চায়, হেরি শক্তি প্রতিমায়, ব্রহ্মরূপ এবে অদর্শন ;
"কর সৃষ্টি মন সুখে", কহি শক্তি হাস্য মুখে, ক্রোড়ে তায় করিল ধারণ
মিশাইল দেহ মাঝে সে আকার দিব্য সাজে,—দীপ্ত যেন অভ্যন্তর ভা'
অনন্ত-বিদ্যুৎ গতি, মহা শূন্য যেন মথি, প্রবেশিল সহ অনুরাগ।

ইতি "অনন্তের ব্রহ্মলোকে ভক্তির সহিত সাক্ষাৎ" নামক
তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

যবদ্বীপের আগ্নেয়গিরি 'ব্রোমো'

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রবার্ট মুর প্রাকৃতিক দৃশ্যের ভক্ত, নিজে একজন ভাল আর্টিষ্ট। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সন্ধানে তিনি পৃথিবীর নানা দেশে ভ্রমণ করেছেন। তাঁ'র জাভা-ভ্রমণের কাহিনী হতে কিছু উদ্ধৃত হ'ল।

আমি সম্প্রতি ক্যামেরাতে রঙীন দৃশ্যের ফটো নিয়ে বেড়াই। সানফ্রান্সিসকোর সমুদ্রতটে, বিখ্যাত জ্যাসপার ন্যাশনাল পার্কে, অষ্ট্রেলিয়ার জঙ্গলের নানা স্থান বেড়িয়ে অনেক ফটো নিয়েছি। কিন্তু জাভায় এসে আমার মনে হ'ল এখানে যে বর্ণ-বৈচিত্র্য দেখছি, পৃথিবীর অন্য কোথাও এর তুলনা নেই। যতদূর চোখ যায়, সবুজ আখের ক্ষেত, নয়তো পাহাড়ের উপত্যকার এবং আগ্নেয় পর্ব্বতগুলির সানুদেশে থাকে-থাকে ধানের ক্ষেত। ঢেউ-খেলান ধান-ক্ষেতের পাড় রচনা করেছে মাইলের পর মাইলব্যাপী সিন্‌কোনা বাগান। ডাচ গবর্ণমেণ্ট আজকাল কুইনাইন প্রস্তুতের কাজে অনেক পয়সা খরচ করছেন ও সিনকোনা গাছের উন্নতিকল্পে ইউরোপ থেকে বহু বিশেষজ্ঞ আমদানী করা হয়েছে।

জাভা: পুতুল-নাচ; সম্মুখের পর্দ্দার উপরে ছায়া ফেলিয়া দর্শকদিগকে মুগ্ধ করা হইতেছে।

জাভাকে একটা রঙীন ফিল্মের মত মনে হয়। অসংখ্য রঙীন দৃশ্যের দ্রুত যাতায়াত, একটার পরে আর একটা। পুরানো হিন্দু মন্দির, জীবন্ত ও নিবন্ত আগ্নেয় পর্ব্বত, রেশমী 'বাটিক'-এর শিল্পীদল, রঙীন পোষাকপরা নর্ত্তকীদল, 'গ্যামেলান' বাদকদল; যোজনব্যাপী রবার ও কফির বাগান—যেদিকে চোখ যায়, সেদিকেই শ্যামল ক্ষেত্র ও নীল পর্ব্বতমালা।

নক্ষত্রভরা স্তব্ধ রাত্রি; এক পশলা বৃষ্টি পড়ে বাতাস যেন প্রেয়সীর করস্পর্শের মত মধুর ও মৃদু হয়ে উঠেছে—সে সময় সিঙ্গাপুরের বন্দরের বাইরের সমুদ্রে আমাদের জাহাজ নঙর ফেললে। আমাদের জাহাজ ও দূরবর্ত্তী বন্দরের ক্ষীণ আলোকমালার মধ্যে নানা দেশের জাহাজ নঙর করে আছে,

লণ্ডন থেকে সাংহাই লাইনের আলোকোজ্জ্বল ষ্টীমারখানা তো আমরা বেশ চিনতে পারলাম। নিউ ইয়র্কের ষ্টীমার আছে, সারা পৃথিবী ঘুরতে বেরিয়েছে; কোবে, আমষ্টার্ডম এবং নেপলস্ থেকে কত জাহাজ এসেছে; এ ছাড়া শত শত চীনা সাম্পান ও জাঙ্ক মিটমিটে নারিকেল তৈলের আলোয় ভূতের মত দেখাচ্ছে।

আমরা বেশীক্ষণ সেখানে ছিলাম না—সে রাত্রেই আমরা নঙর উঠিয়ে অন্ধকারে সিঙ্গাপুরকে পেছনে ফেলে বাটাভিয়ার দিকে রওনা হই এবং বিষুবরেখা পার হয়ে, অয়স্কান্ত মণির মত নীল, শান্ত সমুদ্র পার হয়ে, বাটাভিয়া থেকে মোটরযোগে কুড়ি মিনিটের রাস্তা তান্‌জোন প্রিয়োক বন্দরে পরদিন নঙর ফেলি।

জাভা: জাতীয় ঐক্যতান গ্যামেলান-বাদকদল।

বেলা তখন প্রায় আর নেই, রাত্রে কোথায় যাব, অপরিচিত স্থান। জাহাজের কাপ্তেনকে জিজ্ঞাসা করলাম, কাল সকালে তো জিনিসপত্র নিয়ে জাহাজে আসতেই হবে, রাত্রে আমরা জাহাজে থাকতে পারব কি না।

কাপ্তেন বললেন—আমাদের নিয়ম নেই। বন্দরে জাহাজ থামলে যাত্রীকে তীরেই যেতে হবে।

বড় মুস্কিল। হঠাৎ এমন বৃষ্টি সুরু হয়েছে যে নামতে গেলেই কাপড়-চোপড় ভিজে যাবে।

কাপ্তেন আমাদের অবস্থা বুঝে বললেন—আচ্ছা, জাহাজে থাকার ব্যবস্থা আমি করতে পারি, কিন্তু যা খাওয়াব তাই খেতে হবে, আর মশা যদি রাত্রে লাগে, তবে কিছু বলতে পারবে না। মশারি আমি দিতে পারব না।

আমরা বললাম—মশা খুব বেশী লাগবে না কি?

—রাত্রে কেবিনের দোর বন্ধ করে রেখ এবং আলো নিবিও না।

মশার কথা বলব না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি বলেই সে সম্বন্ধে বেশী কিছু বললাম না। এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, সে রাত্রে ঘুম আদৌ হয় নি। এর চেয়ে বৃষ্টিতে ভিজে তীরে নেমে কোন ভাল হোটেলের মশারিঘেরা শয্যায় আশ্রয় নেওয়াই আমাদের পক্ষে ভাল ছিল।

মশার উপদ্রবের কাহিনী বাটাভিয়ার ডাচ ঔপনিবেশিক ইতিহাসের একটি বিখ্যাত অধ্যায়। ডাচেরা যখন প্রথম এদেশে এল,—তখন স্বদেশের খাড়িগুলির স্মৃতি তাদের মনে সমুজ্জ্বল রয়েছে। বড় বড় বাড়ী ও কফিক্ষেত্র তৈরী হ'ল এখানকার খাল ও জলাভূমির ধারে। কিছুদিন পরে হাজারে হাজারে লোক মরতে সুরু করলে ম্যালেরিয়ায়। তখন সকলে বুঝলে, ইউরোপে নেদারল্যাণ্ডসে খালের ধারে বাস করা চলে, কিন্তু জাভায় নয়।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন কুক্ দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে ভ্রমণ শেষ করে দেশে ফিরবার পথে বাটাভিয়ায় তাঁর জাহাজ মেরামত করবার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন এবং

এখানেই তাঁর টাহিটী দ্বীপের দোভাষী বন্ধু টুপিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা পড়েন।

এর পরে বাটাভিয়ার লোকে নিকটবর্ত্তী উচ্চস্থানে তাদের সহর নির্ম্মাণ করে। এই সহরের জল-হাওয়া স্বাস্থ্যকর, এখানে বড় বড় চওড়া রাজপথ ও সুসজ্জিত পার্ক আছে, বাটাভিয়ার সহরের এই অংশের নাম "ভেলটীভ্রিডেন"। পুরানো বাটাভিয়া সহরে ব্যবসা-বাণিজ্যের অফিস ও গুদামগুলি আছে বটে কিন্তু নূতন বাড়ী, ব্যাঙ্ক-অফিস ও ধনী লোকের বসতি এই অংশে। পুরানো বাটাভিয়া সহরে বড় বড় পাথরের ব্যাঙ্ক ও অফিসের বাড়ীগুলির পাশে চীনাপল্লী। প্রশস্ত রাজপথে আমেরিকান মটরগাড়ীগুলি ছুটাছুটি করে এবং জর্জ্জ ষ্টিফেনসনের প্রাচীন ঐতিহাসিক এঞ্জিন "রকেট"-এর অনুরূপ একখানি ষ্টীমট্রাম প্রাচীন ও নবীন সহরদুটীকে সংযুক্ত করছে।

সমস্ত দুনিয়ার সঙ্গে বাটাভিয়ার কারবার, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দুপুর বেলা কোন কাজকর্ম্ম হয় না, বড় বড় অফিস ও ব্যাঙ্কগুলি নিস্তব্ধ ও নীরব, কারণ বাটাভিয়ার লোকে এই সময় দিবানিদ্রা উপভোগ করে থাকে।

বাটাভিয়া থেকে জাহাজ ছেড়ে আমরা চীনের উত্তর উপকূল বেয়ে সুরাবায়া যাত্রা করলাম, পথে জন কয়েক আরোহী নামিয়ে দেবার জন্য সামারাং বন্দরে একটু দাঁড়াতে হল। সামারাং বড় সহর হলেও সামুদ্রিক বাণিজ্যে ও লোকসংখ্যায় বাটাভিয়ার তুলনায় কিছুই নয়। সামারাং বাজারের বর্ণ-বৈচিত্র্য আমাকে এত মুগ্ধ করলে যে, আমি ক্রয়-বিক্রয়রত শ্যামাঙ্গিনী বালিকাদের ও কয়েকটা লোলচর্ম্ম বৃদ্ধার ফটো নেবার চেষ্টা করলাম। ফলে কিন্তু কিছুই উঠল না, কারণ মেয়েরা সবাই এদিকে ওদিকে পালিয়ে গেল, কিম্বা দুহাত দিয়ে মুখ ঢাকল।

সুরাবায়া বন্দরে আসবার কিছু পূর্ব্বে প্রভাতের উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে আমরা দূরে নীলবর্ণ টেন্‌গার পর্ব্বতশ্রেণী এবং দক্ষিণ দিকে কুয়াসাচ্ছন্ন আরডেনো আগ্নেয়গিরি দেখতে পেলাম। সুরাবায়া জাহাজ মেরামতের একটা বড় আড্ডা, সিঙ্গাপুর ছাড়া ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজের মধ্যে এত বড় জাহাজ নির্ম্মাণের স্থান আর নেই, কিন্তু আমি যে জন্য গিয়েছিলাম, সে উদ্দেশ্য সফল হ'ল না। আধুনিক সুরবায়া সহর একটী ছোট খাটো আমেরিকান সহরের অনুরূপ। সর্ব্বত্র সেই ধরণেরই চওড়া রাস্তা, রেডিও ও মটর গাড়ীর দোকান, প্রাসাদোপম বড় বড় বাড়ী, রাস্তার মাঝে ফোয়ারা ও বিখ্যাত নাগরিকদের প্রস্তরমূর্ত্তি। এখানে আমরা আমাদের হোটেলের বারান্দায় বসে একদিন আলোচনা করছিলাম যে, আমরা অগ্নিবর্ষী ব্রোমো পর্ব্বত দেখতে যাব কি না।

জনৈক মার্কিন ব্যবসায়ী বললেন, আমি সেখানে কখন যাইনি বটে, কিন্তু সেখানে দেখার উপযুক্ত কিছু পাব কি না বুঝতে পাচ্ছিনে।

আমি বললাম, কিন্তু ব্রোমো পর্ব্বত দেখবার পরামর্শ সকলে দিয়েছে।

সে বললে, এ দেশের লোকের কথায় বিশ্বাস নেই। একবার একজন ডাচম্যান আমাকে সারা দুপুর হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়েছিল মাত্র দশ ফিট উঁচু একটা জলপ্রপাত দেখবার জন্য।

তা সত্ত্বেও আমরা গেলাম। ট্রেনে এক ঘণ্টার পথ পাসাংগ্রান, সেখান থেকে মটরে চব্বিশ মাইল, দু'হাজার ফুট উঁচু পর্ব্বতগাত্রে আঁকা বাঁকা দুর্গম ও বিপজ্জনক পথ বেয়ে দীর্ঘ দীর্ঘ ঝাউগাছের জঙ্গল ভেদ করে আমরা মেঘ ও কুয়াসাবৃত তোসারী নামক ক্ষুদ্র শৈল নগরীতে এসে পৌছলাম।

বিকেল কেটে গেল, কুয়াসা থেকে বৃষ্টি ঝরতে সুরু করলে। মোটা কোট গায়ে থাকা সত্ত্বেও আমি হি হি করে কাঁপতে সুরু করলাম। একটা ছোট হোটেলে আশ্রয় নেওয়া গিয়েছিল। রাত তিনটার সময় দুরন্ত ব্রোমো আগ্নেয় পর্ব্বতের উপর সূর্য্যোদয় দেখবার আশায় শয্যাত্যাগ করে উঠে দেখি যে, ঘন কুয়াসায় দিগদিগন্ত আচ্ছন্ন হয়েছে। দু'টী চোদ্দ বছরের ছেলে আমার পথ-প্রদর্শক রূপে অপেক্ষা করছিল, তারা ভারী কম্বলে কচ্ছপের মত আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ব্রোমো আগ্নেয়গিরি দেখতে যাবার পথ যেমন দুর্গম, তেমনি সুদীর্ঘ। পথও শেষ হয় না, পথের কিছু দেখাও যায় না। মাঝে মাঝে পাহাড়ের উচ্চস্থান পার হবার সময় কুয়াসামিশ্রিত শীতের বাতাসে যেন শরীরের রক্ত জমে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে আমাদের পথের পাশে সুউচ্চ প্রস্তরস্তূপ যেন প্রাচীর রচনা করেছে—তার ওপাশে রজনীর ঘন অন্ধকার। কখনো কখনো দূরে কোন গ্রামের ক্ষীণ আলোক-রেখা।

আমাদের ঘোড়ার পা ক্রমাগত পিছলে যাচ্ছিল, পথপ্রদর্শক ছোকরা দুটো তো ওদের লেজ ধরে ঝুলছে—আমরা কোন রকমে চোখ বুজে চলেছি দৈবের উপর নির্ভর করে। এ পথ থেকে বেঁচে ফিরতে যদি পারি তবে তো পুনর্জ্জন্ম।

অনেক দূর গিয়ে আমরা গিরিবর্ত্মে পৌঁছলাম—সেখান থেকে রাস্তা হঠাৎ হাজার ফুট নেমে নীচেকার বালুকাময় সমতল ভূমিতে গিয়ে মিশেছে। এই বালুময় সমতল ভূমিকে এখানে 'বালির সমুদ্র' বলে। এটা একটা দেখবার জিনিষ বলে ভ্রমণকারী মাত্রেই নীচের সমতল ভূমিতে একবার নামে। ওখান থেকে চারিপাশের পর্ব্বতমালা ও দূরে ধূমায়মান ব্রোমো পর্ব্বতের দৃশ্য অতি সুন্দর—অন্ততঃ টমাস কুকের গাইড-বইতে তাই লেখে।

জাভা: নিসর্গ দৃশ্য; পর্ব্বত, অরণ্যানী এবং সম্মুখে জলময় ধান্যক্ষেত্র।

কুকের গাইড-বইয়ের উপর যত নির্ভর করি আর না করি, এতদূর যখন এসেছি, তখন না নেমে তো ফিরব না। কিন্তু সেই হাজার ফুট নামতে আমাদের যত কষ্ট হ'ল, এতটা পথ চলে আসতে তত কষ্ট হয় নি। কিন্তু আমাদের পরিশ্রম সার্থক হ'ল সূর্য্যোদয়ের অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখে—হঠাৎ সূর্য্যের আলোয় রাত্রির কুয়াসা অপসারিত হয়ে যে দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ল, তাতে আমাদের মনে হ'ল আমরা চন্দ্রলোকের কোন উপত্যকায় এসে পৌঁছেছি।

এক সময়ে এই বালির সমুদ্র কোন আগ্নেয়গিরির অগ্নিকটাহ ছিল। সমতল ভূমির পূর্ব্বপ্রান্তে বাটক পর্ব্বতের মোচার মত চূড়া সূর্য্যের আলোতে একটা ব্রহ্মদেশের প্যাগোডার চূড়ার মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সমগ্র বিরাট পূর্ব্ব-ভারতীয় উপদ্বীপের মধ্যে একমাত্র সেফ্‌টীভাল্‌ভ ব্রোমো আগ্নেয়গিরির মৃদু গুরু গুরু শব্দ সকালের কন্‌কনে শীতল বাতাসে ভেসে আসছে। এমন জায়গায় আর কখনও আসিনি। ডাচ গবর্ণমেণ্ট ব্রোমো পর্ব্বতের লাভার দেওয়াল কেটে পর্ব্বতচূড়ায় উঠবার প্রায় সাড়ে তিনশো ধাপ এক সিঁড়ি তৈরী করে দেওয়ায় পর্ব্বতে ওঠা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছে। এই সোপানশ্রেণী বেয়ে আমরা উপরে উঠলাম এবং ব্রোমোর বিশাল অগ্নিকটাহের দিকে চেয়ে রইলাম, যেখানে পৃথিবীর গভীর গহ্বর থেকে মাঝে মাঝে গন্ধকের ধূম ও অগ্নিশিখা বার হচ্ছে।

সেখানে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস নেওয়া এক কঠিন ব্যাপার—ঘন গন্ধকের বাষ্পে বাতাস ভারী, মাঝে মাঝে ক্রেটার থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে গন্ধকবাষ্প ও ধোঁয়া অনেক উপরে উঠে প্রভাতের আলোয় সোনালী পাড় দেওয়া মেঘের মত দেখাচ্ছে।

এ অঞ্চলের লোকে ব্রোমো পর্ব্বতকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে। ডাচ অধিকার স্থাপিত হবার পূর্ব্বে তারা প্রতি বৎসর একটী অবিবাহিতা কুমারীকে অগ্নিকটাহের প্রজ্বলন্ত শিখার মধ্যে নিক্ষেপ ক'রে অগ্নি দেবতাকে সন্তুষ্ট রাখত, কিন্তু আজকাল নরবলির পরিবর্তে মুরগী ও শস্য দিয়ে দেবতার রোষ প্রশমিত করা হয়—অনেকে আবার অগ্নিকটাহের মধ্যে নেমে উৎসর্গীকৃত দ্রব্যাদি নিজেদের জন্যে সংগ্রহ করে আনে।

আমি ক্রেটারের অত্যন্ত ধারে দাঁড়িয়ে ক্যামেরা খাড়া করে ফটো নেবার চেষ্টা করছি, এমন সময় আমার সঙ্গী লক্ষ করলে, ক্যামেরার তেপায়ার চারিপাশের গন্ধকের ছাই ক্রমশ সরে যাচ্ছে—এবং আমাকে সতর্ক করে দিলে যে, এইবার বোধ হয় বলির পালা আমার। পথ-প্রদর্শক ছোকরা দুটী বললে—সাহেব, কিছু পয়সা ফেলে দাও না ওর মধ্যে?

আমার সাথী বললেন—যদি ফেলে দিই, তোমরা কি ওর মধ্যে গিয়ে তা কুড়িয়ে আনবে ?

তারা হেসে বললে—নিশ্চয়ই। একবার ফেলে দেখই না ?

আমরা পয়সা ফেলবার পূর্ব্বেই ওরা তাড়াতাড়ি ক্রেটারের গা বেয়ে ভিতরে নামবার উপক্রম করলে। আমরা তাদের ধমক দিয়ে প্রতিনিবৃত্ত করলাম। অপরের প্রাণের জন্যে আমরা দায়ী হ'তে প্রস্তুত নই বেড়াতে এসে।

এখন সূর্য্যের আলো আরও ফুটেছে। প্রভাতের বাতাস একটু গরম মনে হচ্ছে রৌদ্র ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে। এখানে সমস্ত পর্ব্বতগুলোর গায়ে ধাপ-কাটা শস্যক্ষেত্র। আগ্নেয় পর্ব্বতের ছাই উড়ে পড়ে জাভার ক্ষেত্র সকল অত্যন্ত উর্ব্বরা করেছে, জাভার কৃষকদের অবস্থা এজন্য খুব ভাল।

টোসারি ছেড়ে আমরা আবার সুরাবায়া সহরে এলাম। সুরাবায়া সহরে এক ডাচ ভদ্রলোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হয়ে আমরা সর্ব্বপ্রথম এদেশের 'রিজ টাফেল' বা ভাতের ভোজ আস্বাদ করলাম। এই ভোজে ভাত এবং তার আনুষঙ্গিক মাংস ও ব্যঞ্জন এত প্রচুর পরিমাণে খাওয়ায় যে, 'রিজ টাফেল'-এ নিমন্ত্রিত হওয়া বৈদেশিক লোকের পক্ষে একটা ভয়ের ব্যাপার। খাওয়ার টেবিলে দুজন ভৃত্য ঠেলাগাড়ী করে ভাত-তরকারী পরিবেশন করলে। ভাত ও বিশ ত্রিশ রকমের মাংস ও ব্যঞ্জন দুপুরে খেয়ে যে, এখানকার লোকে দিবানিদ্রায় অভ্যস্ত হবে, এতে আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নেই।

বুরোবদর: প্রস্তরোৎকীর্ণ দৃশ্য।

সুরাবায়া থেকে রওনা হয়ে সমতল ভূমির উপর দিয়ে আমরা পশ্চিম দিকে যেতে যেতে লক্ষ্য করলাম, এদিকে আখের চাষ খুব বেশী। প্রায় চার লক্ষ একর জমিতে আখের চাষ আছে এবং এই আখ কাজে লাগাবার জন্যে এ অঞ্চলে ১৮০টা চিনির কল আছে। ডাচ ইষ্ট-ইণ্ডিজ থেকে যত বাণিজ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হয়, তার শতকরা বিশ ভাগ চিনি। চিনির রপ্তানী-বাণিজ্যের হিসাবে পৃথিবীতে কিউবার নীচেই জাভার নাম করা যেতে পারে।

এত জায়গায় গেলাম জাভার, কিন্তু এখানকার গ্রাম একটাও চোখে পড়ল না—অথচ শুনেছিলাম, জাভায় লোক-সংখ্যা প্রতি বর্গ মাইলে ৭২৭ জন। কেবল তো দেখছি বন, পাহাড় আর ফসলের ক্ষেত। কিন্তু জাভায় এত পাখীর খাঁচা কেন, বার বার এ প্রশ্ন আমার মনে উদয় হয়েছে। যেখানে বড় বড় বাঁশ গাছ কি সুপারি গাছ—প্রত্যেক গাছের আগায় সেখানে দশটা বিশটা পাখীর খাঁচা।
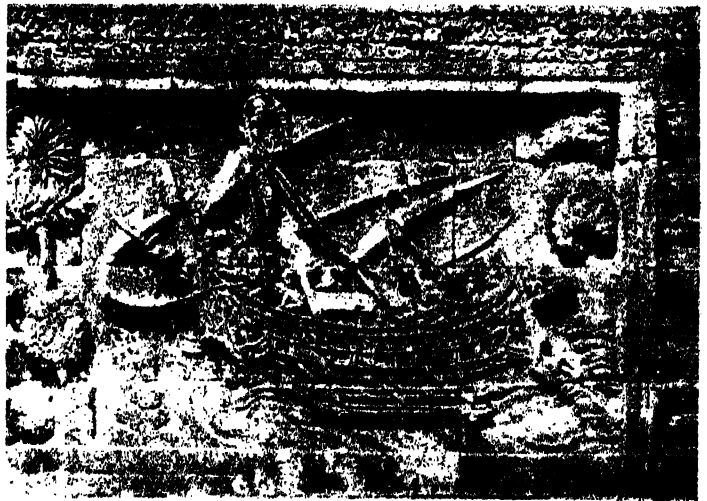
একজন ডাচ রাজকর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করলাম—এত পাখী পোষে কারা ? এদেশের গ্রাম কোথায় ?

ভদ্রলোক হেসে বললেন—এদেশের গ্রাম ঐ সব বাঁশবন ও সুপারিবনের আড়ালে। বাহির থেকে দেখা যাবে না। গ্রামের লোকেই পাখী পোষে।

—অত উঁচুতে সারাদিন পাখীর খাঁচা ঝুলিয়ে রাখার তাৎপর্য্য কি ?

—হাওয়া খাওয়াচ্ছে। সন্ধ্যার পরেই সব নামিয়ে নেবে। এই এ দেশের নিয়ম।

এদের বাড়ী তৈরী করতে কোনও হাঙ্গামা নেই। বাঁশের জাফ্‌রীর বেড়া আর গোলপাতার ছাউনি প্রায় সব ঘরেই। এত অল্পে সন্তুষ্ট জাতি আর দেখেছি কি না সন্দেহ। এক

ক দুখানা গোলপাতার ঘর, এক জোড়া মহিষ, সামান্য কিছু ানের জমি, এদের সকল পার্থিব সম্পদ, এতেই এরা মহা খুসি, এর বেশী যদি কিছু চাইবার থাকে, তবে একটী স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্ম্ম-নিপুণা স্ত্রী ও দু' একটী ছেলেমেয়ে।

জাভায় প্রায় সকলেই মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। পূর্ব্ব-জাভায় কিন্তু হিন্দু ধর্ম্ম প্রচলিত আছে। জাভার নিকটবর্ত্তী বলীদ্বীপে শতকরা আশীজন হিন্দু।

একদিন আমরা সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধকীর্ত্তি বুরোবদর দেখতে গেলাম। মোটরযোগে ছাব্বিশ মাইল রাস্তা। সবুজ আম ও ধানের ক্ষেতের রাস্তা দিয়ে আমরা তালীবনশ্রেণীর আড়ালে অবস্থিত একটা ছোট পাহাড় দূর থেকে দেখলাম এবং শুনলাম, ওই পাহাড়ে খোদাই করে বুরোবদরের মন্দির তৈরী। যত কাছে গেলাম, বুরোবদর ততই বিশাল বলে মনে হতে লাগল এবং একেবারে পাহাড়ের নীচে গিয়ে পৌছেছি, এই প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপের বিশালতা, কারুকার্য্য ও মহিমায় আমরা বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে পড়লাম। কিন্তু বুরোবদরের সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা হয়েছে, তা ছাড়া আমি বৌদ্ধ স্থাপত্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সমালোচক নই—সুতরাং এখানেই এ কথা শেষ করি।

কোথায় চলেছি নেমে ?

—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

কোথায় চলেছি নেমে ?—
পঙ্কিল আবর্ত্তমাঝে মৃত্তিকার গভীর নিতলে
অসংখ্য বুদ্‌বুদ্ যেথা ফুটে উঠে' মুহূর্ত্তে মিলায়।
আলো নাই, বায়ু নাই, বিষ-বাষ্প কুণ্ডলী পাকায়ে
মন্থর গতিতে চলে চতুর্দ্দিক্ সংক্রামিত করি'।
অবরুদ্ধ অন্ধকার শ্বসিয়া উঠিছে ক্ষণে ক্ষণে
বায়ুর অভাবে আয়ু স্তিমিত বিকল কম্পমান।

আমি সেথা চলিয়াছি—
ক্লেদ-কিন্ন অন্ধকারে দুর্গন্ধ গহ্বরপথ ধরি'—
লালসার পশু যেথা লোল জিহ্বা করিছে লেহন,
বুকে হাঁটি' চলি সেথা সন্তর্পণে, অতীব গোপনে।
দিনে দিনে পুঞ্জীভূত আমার অতৃপ্ত যত ক্ষুধা
শিরায় শিরায় আনে আত্মঘাতী বিহ্বল কামনা;
দেহের উদগ্র জ্বালা মিটাইতে প্রতপ্ত পল্বলে
নিত্য আসি, ফিরে যাই শতগুণ জ্বালা ল'য়ে বুকে।

কেন সেথা চলিয়াছি ?—
উপবাসী দেহ-মন—চিরতৃষ্ণা বিশুষ্ক জিহ্বায়
নয়নের বহ্নিজ্বালা—ক্ষুব্ধ দেবতার অভিশাপ;
নখরে নখরে মোর সমুদ্যত হিংস্র কামনা,
অধর সীমায় কাঁদে যুগান্তের অতৃপ্ত আস্বাদ,
কোথায় সমাপ্তি এর ?—চরিতার্থ অবসাদ কোথা
নিস্তব্ধ হইয়া আছে ?—হোক্-না সে পাতালপুরীতে
বহ্নিমান গিরিগুহা-নির্গলিত লাভার প্রবাহে,
হয়ত দুর্দ্দম বেগে দিবে মোরে অশেষ যন্ত্রণা;
তবু মোরে টানিতেছে ক্লেদপঙ্কে অতল পাতালে,
কামনার বহ্নিশিখা অবিরাম চুম্বক"সমান।

মীরা

—শ্রীসুরুচিবালা রায়

[২৪]

সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, মায়ের পূজার ঘরে প্রদীপ জ্বালাইয়া, শাঁখ বাজাইয়া চারুলতা লক্ষ্মী-নারায়ণের পিতলের ছোট মূর্ত্তিখানির পদতলে গভীর ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। এক পাশে চন্দন কাঠের একটী ধূপদানী হইতে মৃদু মৃদু ধোঁয়া উঠিয়া, ঘরখানির ভিতরে কেমন যেন অস্পষ্ট একটা স্বপ্নের জাল বুনিয়া চলিয়াছিল; আরও কিছু ধুনা ধূপদানীটীতে তুলিয়া দিয়া চারু ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। মা এখনি স্নান সারিয়া আসিয়া পূজায় বসিবেন। রান্নাঘরে উনুনে ভাত ফুটিতেছে, চারু সেইদিকে চলিল। মনটী ভারাক্রান্ত, বিশ্রী, পড়ায় মন বসে না, কাজেও না,—কি করিয়া যে সম্মুখের এই অফুরন্ত দিনগুলি কাটিবে, কে জানে!

ভাত নামাইয়া চারুলতা পূজার ঘরের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া বসিল। দাদা যখনই বাড়ী ফিরুক, স্নানের পরে ভাত খাইবার আগে, এক পেয়ালা চা তার চাই-ই; কেটলীতে করিয়া উনুনে চায়ের জল চড়াইয়া চারু আসিয়াছে। রাত্রিতে মায়ের খাওয়ার কোন হাঙ্গামা নাই, পূজার পরে কত রাত অবধি গীতা পড়িয়া, তারপরে সামান্য একটু প্রসাদ মাত্র মুখে দিয়া মা শুইতে যান। তিনজনের রান্না, ঠাকুর-চাকরের গোলমাল কিছু নাই, ওবেলা মা, এবেলা চারুই রান্নার কাজ সারিয়া নেয়। বড়লোক না হোক, গরীবও তেমন কিছু নয়, ব্যাঙ্কে কিছু টাকা জমা আছে, তাহারই সুদে কোনমতে দিনগুলি কাটিয়া যায়। সুশীলের পড়া এখনও সাঙ্গ হয় নাই, কবে হইবে, কবে তার একটী চাকুরী হইবে, মা সেই আশায় দিন গুণেন। আরও কিছু খরচ করিয়া, ছেলেমেয়েগুলি তখন আরও একটু সুখে থাকিবে, মা সেই আশাতেই দিন কাটান, এখন ঘরের টাকা বেশী খরচ করিতে সাহস তাঁহার হয় না।

পূজা সাঙ্গ করিয়া মা কতক্ষণ ধরিয়া লক্ষ্মী-নারায়ণের পদপ্রান্তে লুটাইয়া রহিলেন। চারুও উঠিয়া দূর হইতেই প্রণাম করিয়া, ধূপদানীতে আরও কিছু ধূপ দিয়া, বাহির হইয়া আসিল। ছোট উঠানটী ঘিরিয়া চারুরই যত্নপালিত দুই চারিটী ফুলগাছ, কৃপণের ধনের মত চারু এগুলিকে ভালবাসে; মাটি খুঁড়িয়া, জল ঢালিয়া, আগাছা বাছিয়া পরিষ্কার করে, গোলাপগুলি ফোটে, আবার শুকাইয়া ঝরিয়া যায়; চারু মাটি হইতে কুড়াইয়া সযত্নে পাঁপড়ীগুলি তুলিয়া, তাহার কোন প্রিয় বহির পাতায় পাতায় ঢুকাইয়া রাখে; রাত্রির অন্ধকারে চারিদিক যখন নীরব হইয়া আসে, একলা একলা এই রজনীগন্ধার পাশে পাশে, গোলাপের কাছে কাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আপন মনে কত স্বপ্নই চারু দেখে।

ধীরে ধীরে চারুলতা দোতলায় গিয়া উঠিল। খানিকক্ষণ বারাণ্ডায় একটা থামের আড়ালে রাস্তার আলো হইতে নিজেকে গোপন করিয়া, রাস্তার মোড়ে যেখানে কতদূরের ও কতদিকের জনতা আসিয়া একই স্রোতে মিশিয়া যাইতেছে, সেই দিকে চারু তাকাইয়া রহিল। এই জনতার মাঝে ব্যাকুল চক্ষুদুটি চারুর কাহাকে যে খুঁজিয়া ফিরে, সে কথা স্বীকার করিতে নিজের মনেই চারু লজ্জায় মরিয়া যায়। যাহা না ভাবাই উচিত, কেন সে ভাবনা দিনরাত!

বারাণ্ডা ত্যাগ করিয়া চারু ঘরে আসিয়া ঢুকিল, দেয়ালের গায়ে কলেজের সাপ্তাহিক রুটিন (routine) লেখা রহিয়াছে, সেদিকে একবার চোখ বুলাইয়া কালকের পড়ার বহিগুলি ঠিক করিয়া নিল। তারপর চেয়ারে বসিয়া বহির পাতাগুলি খানিকক্ষণ উল্টাইয়া আবার গুছাইয়া রাখিয়া দিল। ভাল লাগে না—কিছু ভাল লাগে না চারুর। চোখে চারুর জল আসিতে চায়, বিনা কারণেই কাঁদিতে ইচ্ছা করে। আবার বারাণ্ডায় একটু ঘুরিয়া, খানিকক্ষণ একটু দাঁড়াইয়া, ঘরে আসিয়া চারু অর্গানের সম্মুখে বসিয়া গান ধরিল। অতি মৃদু স্বরে, অতি ধীরে ধীরে চারু গাহিতে লাগিল,

"আমার সকল দুঃখের প্রদীপ
জ্বেলে, দিবস গেলে করব নিবেদন
আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন,—"

সহসা পিছন হইতে আসিয়া কে চোখ টিপিল।

তৎক্ষণাৎ সচকিত ভাবে হাত সরাইয়া দিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

—আঃ, চারু তুই কাঁদছিস ?

—কে, ইন্দু ? দূর, কাঁদব কেন! রবিবাবুর এই প্যাটার্ণের গানগুলো গাইতে বসলে আপনা হতেই চোখে কেমন জল এসে পড়ে, তুই একবার দেখ না গেয়ে।

সন্দেহের চোখে খানিকক্ষণ চারুর পানে তাকাইয়া থাকিয়া ঘাড় নাড়িয়া ইন্দু কহিল—উহুঁ—তা নয়, আর কিছু আছে এর ভিতর।

—নাঃ তা নয়! ভারী উনি দৈবজ্ঞ এসেছেন, যাঃ দূর হ', আমার পড়া আছে, তোর সঙ্গে গল্প করতে পারব না এখন।

ঘাড় নাড়িতে নাড়িতেই ইন্দু কহিল,—সন্দেহ বাড়িয়ে তুলছিস ভাই, একটা কথা মনে হ'ত মাঝে মাঝে, আজ সত্যি বলেই মনে হচ্ছে, বলব না কি খুলে ?

—দেখ ইন্দু, এই সারা বিকেল বসে গল্প করে গেলি, আবার কেন এসেছিস, কাজ নেই তোর ?

—কাজ আবার কি, বাপের বাড়ী এসে আবার কাজ কি ?

—কাজ না থাকে, বরকে বসে বসে চিঠি লেখ গিয়ে, আমার কাজ আছে, কলেজ আছে, পড়া আছে,—

সকৌতুকে অতি মৃদু হাসিতে হাসিতে ইন্দু কহিল,—কেবল বরটাই নেই, না ?

অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া চারু কহিল, দেখ ইন্দু, এসব কথায় বরাবর আমি রাগ করি, জানিস তা'—তবু ঐসব কথাই তোর মুখে। নিজে বিয়ে করে বসে আছিস বলে, ভাবিস, সবারই ঐ রকম মন, তা নয়, সবার জীবনের লক্ষ্য একরকম নয়, তোর চিন্তার ধারা এক রকম, আমার আর এক রকম, ও সব কথা আর তুলিস না কখনো, বুঝলি ?

—বুঝেছি ভাই, ব্যাপারটা যে বেশ গুরুতর হয়েই উঠছে, তা বেশ বুঝতে পাচ্ছি। মনের ব্যাপার যখন গুরুতর হয়, মুখেও তখন গুরু গুরু কথাই বেরোয়, মশাই তাতেই গুরু-মশাই সেজে হিতোপদেশ দিতে সুরু করে দিয়েছেন। তা যথাই যাবে এর পর, এক মাঘে শীত পালায় না তা জানিস ত? আমিও মরব না শীগ্‌গির, তা আর একটা কথা বলে যাই, নীচে কে এসেছেন, জানিস ? নামটা কাণে কাণেই বলি, এটা হয়ত মিষ্টি লাগবে খুব,—শোন,—

চারুর কাণের কাছে মুখ নিয়া ইন্দু হাসিতে হাসিতে কি বলিল, তাহার পর মুখ ফিরাইয়া ফিরাইয়া, চারুর পানে বার বার তাকাইতে তাকাইতে হাসিতে হাসিতে ইন্দু নীচে নামিয়া গেল।

ইন্দু চারুদেরই প্রতিবেশী-কন্যা। বৎসর কয়েক আগে কোথা হইতে আসিয়া যখন এই পাড়াতেই ইন্দুর বাবা বাসা বাঁধিলেন, তখন হইতেই কিশোরী ইন্দুর সঙ্গে কিশোরী চারুলতার অন্তরঙ্গতা জন্মিয়াছিল, ইহার পর ইন্দুর বিবাহ হইয়া গিয়াছে, মাঝে মাঝে ইন্দু শ্বশুরবাড়ীও গিয়াছে, কিন্তু দুই সখীর ভিতরের সেই মধুর ভালবাসাটুকুর কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই।

ইন্দু চলিয়া গেলে, চারু পা টিপিয়া টিপিয়া কয়েক সিঁড়ি নীচে নামিয়া, নীচের বারাণ্ডার পানে তাকাইয়া দেখিল,—মা গীতাপাঠ সাঙ্গ করিয়া দ্বারের সম্মুখে আসিয়া বসিয়াছেন এবং তাঁহারই অনতিদূরে একটী মোড়ার উপর বসিয়া আছে পান্নালাল। পাছে শ্বাসপতনের শব্দও কেহ শুনিতে পায়, এই ভয়ে চারুলতা রুদ্ধশ্বাসে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নীচ হইতে মায়ের আহ্বান আসিল, চারু,—

চারু পা টিপিয়া টিপিয়া, আবার দ্রুত উপরে উঠিয়া ঘরে গিয়া টেবিলের পাশে বসিল।—সর্ব্বনাশ! সিঁড়ি হইতে উত্তর দিয়া ফেলিলে কি বিপদই হইত, মার কাছে চারু ধরা পড়িয়া যাইত!

মায়ের গলা আবার শোনা গেল, চারু।

চারু যথাসম্ভব নিজেকে সংযত করিয়া নিয়া ধীর শান্ত ভাবে উত্তর দিল, যাই মা।

বুকের ভিতর একটা অতি মধুর ব্যথা, সেতারের ঝঙ্কারের মত রিণি রিণি করিয়া অনুক্ষণ যে ঝঙ্কার তুলিতেছে, বাহিরে তাহার কোন প্রকাশ হইবে না ত ?

কম্পিত পদ সংযত করিতে ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া চারু নীচে নামিতে লাগিল। হাত দুইটী ইহারই মধ্যে বরফের মত হইয়া গিয়াছে।

নীচে নামিয়া মায়ের নির্দ্দেশমত চারু একখানি কাঁসার রেকাবীতে লক্ষ্মী-নারায়ণের প্রসাদ ও এক গেলাস জল

আনিয়া পান্নুর সম্মুখে রাখিয়া একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল, মা কহিলেন,—ঠাকুরের প্রসাদ বাবা, মাথায় ছুঁইয়ে খাও।

পান্নু হাসিয়া হাত ধুইয়া রেকাবীখানি তুলিয়া কহিল,— প্রসাদে এত জিনিষ কেন মা? এত রসগোল্লা সন্দেশ, প্রসাদ ত খালি আলোচাল কলাতেই হয় জানি, ও গুলো বুঝি যারা পূজো করে, তাদের রুচি দিয়ে? কি বল চারু?

মা হাসিয়া কহিলেন, তা নয় বাবা, আজ বেস্পতিবারে লক্ষ্মীপূজো ছিল, তাই রোজকার চেয়ে একটু বেশী আয়োজন করেছিলুম।

—অন্য দেবতাদের চেয়ে লক্ষ্মীঠাকরুণের খিদেই বুঝি বেশি, একটু সৌখীনও বোধ হয়, কি বল চারু, তাই নয়? চাল-কলার চেয়ে রসগোল্লা সন্দেশ ভালবাসেন, আর এক পেয়ালা চা'ও ভালবাসেন, না চারু?

চারু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

মা'ও হাসিয়াই কহিলেন, নিজের মুখে কি তিনি আর কিছু চান বাবা? আমরা যা ভাল বলে মনে করি তাই ত তাঁদের দিই, আর যা দিই একটু পায়ে ছুঁয়ে, তাঁরা তোমাদের জন্যেই ত প্রসাদ করে রেখে দেন, নিজের মুখে কি তাঁরা খান কিছু? আমাদের ভক্তিতেই তাঁরা সন্তুষ্ট, ভক্তি করে চা বল, আর যাই বল, তাই নিয়ে তাঁর পায়ে রেখে দিলে তাই তাঁদের প্রসাদ হয়ে যায়।

এইবারে চারু হাসি মুখে স্বাভাবিক কণ্ঠেই কহিল, একটু চা প্রসাদও আনব না কি?

—না না, কিছু দরকার নেই, তামাসা করছিলুম খালি, আজ এখনো যে পড়তে বসলে না চারু? তোমরা সব ভাল ভাল মেয়ে, আমাদের মত সময় নষ্ট করা রোগ ত তোমাদের নেই।

—পড়তে ভাল লাগছিল না আজ।

—ভাল লাগছিল না? পূজো করছিলে বুঝি। লক্ষ্মী পূজো,—

—পূজো ত মা করলেন, মা'ই রোজ করেন, আমরা শুধু প্রণাম করি, তাইতেই আমাদের পূজো হয়ে যায়।

—প্রণাম করে কি বর চাও ঠাকুরের কাছে? অনেক অনেক বিয়ে হোক, টাকা হোক, আরও সব অনেক অনেক হোক, এই ত?

—হ্যাঁ, তা আবার চায় না কি কেউ ঠাকুরের কাছে?

—তাই ত চায় সবাই, আচ্ছা চারু আমার জন্য একটা বর চেয়ো ত কাল তোমার ঠাকুরের কাছে।

—কি বর? এক্ষুণি যে টাকার কথা বললেন, সেই টাকার বর?

—উহুঁ, টাকা চাই না, কি বর চাইব বল ত? আচ্ছা বল আমায় ভাল ছেলে করে দিতে, কেমন? ঘুসটুস কিছু দিতে হবে না কি? তা না-হয় রাত্তিরে এসে একটি প্রণাম করে যাব'খন, কি বল?

—ঠাকুর দেবতার নামে ওরকম করে বলতে নেই জানেন?

—বলতে নেই? আচ্ছা আর বলব না।

মা অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিলেন,—কহিলেন, দোষ নেই তোমাদের বাবা, মেসে-টেসে থাকলে কলেজে পড়বার সময় এই রকমই হয়, আবার যখন ঘরসংসার করে সংসারী হয়ে বসবে, তখন সবই হবে, ঠাকুর দেবতাও চিনবে, তখন ভক্তিও আসবে বাবা।

কথার সুরে তাঁহার কি রকম একটা করুণ কোমল ভাব ছিল, আগের মত আর হাল্কা ভাবে রহস্য করা পান্নালালের চলিল না, রেকাবীখানি চারুর হাতে দিয়া হাত ধুইয়া রুমালে মুখ মুছিয়া স্থির হইয়া বসিল—কিন্তু কে বলিবে, মীরার সঙ্গে কথা কহে যে পান্নু, চারুর সঙ্গে কথা কহিতেছে এই পান্নালাল একই মানুষ।

[২৫]

সেদিন পান্নুর দরজার বাহিরে গিয়া চাদরে চোখ মুছাটি মায়ের চোখে এড়ায় নাই। পান্নুকে দেখিবার জন্যই তিনি জানালার পাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, কতটা গভীর বেদনায় যে পুরুষমানুষের চোখে জল আসে ভাবিয়া তিনি স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

সন্ধ্যার পর সেদিন স্বামীকে একান্তে পাইয়া তিনি কহিলেন, দেখ, ছেলেবেলায় যখন ওটাকে মানুষ করতুম, তখন মনে একটা অন্য রকম আশা জেগেছিল, তারপর অভাগা ছেলেটা মানুষ ত হলই না, লেখাপড়া যেটুকু করছিল, হুজুগে পড়ে সেটুকুও গেছে। এখন কি যে ওর হবে! এমন কি

একটা টানের দরকার ওর, যেটায় ওকে ওসব থেকে টেনে এনে বাঁচাতে পারবে।

বিনয়বাবু কহিলেন, বেশত, দেখ না, সমস্ত গোলমাল টোলমাল ছেড়ে দিয়ে যদি ভালভাবে এসে থাকতে পারে, ত থাকুক না এখানে।

—আজকাল কি রকম চেহারা হয়েছে, দেখেছ? চোখ আর ফেরানো যায় না, দিন দিন কি সুন্দরই হচ্ছে! আমার মনে মনে কি একটা সাধ ছিল, জান? কোন রকমে যদি ওকে আপনার করে নিতে পারতাম!

আশ্চর্য্য হইয়া বিনয়বাবু কহিলেন, কি করে আর আপনার করে নেবে? তাহার পর কিছুক্ষণ থামিয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন, তুমি যা বলতে চাইছ, আমি তা বুঝিনি মনে ক'র না, কিন্তু, পাগলি তুমি! যা সম্ভব নয়, তা কেন মনে করে কষ্ট পাওয়া? কিসে আর কিসে! দেখতে ত মাকাল ফল খুব সুন্দর, তাই বলে কি আর সেটার কোন দাম আছে?

করুণ সুরে পত্নী কহিলেন, লেখাপড়া শেখা ত চাকুরীর জন্যেই, ওর ত চাকুরী করবার কোন দরকার নেই, নাই বা শিখলে লেখাপড়া, দু'চারটে বি-এ, এম-এ পাশ ত ওরই জমিদারীতে চাকুরী করে খাচ্চে, বেশি কিছু পাশটাস করে কি লাভই ওর আর বেশি হবে?

অসহিষ্ণু হইয়া স্বামী কহিলেন—পাগল তুমি! খালি জমিদারী থাকলেই হ'ল? তারপর আর নেই কিছু? যতগুলো সম্বন্ধ এসেছে, ফিরিয়েও দিয়েছ যতগুলো, এ রকম কোনও একটা এসেছে কি? এ রকম সম্বন্ধের কথা কেউ আলাপই করতে সাহস পাবে না কোনদিন। আই এ টাও যে পাশ করতে পারলে না, তার সম্বন্ধে আবার একটা কথা! মেয়ে তোমার এম-এ পড়ছে সে হিসাব রাখ? একটা কথা জিজ্ঞেস করলে যে জবাব দিতে পারবে না, তার সম্বন্ধে এ যে কল্পনাতেই আসে না। সাবধান, একথা ওদের কাণে না ওঠে কখনও।

সজোর পদক্ষেপে বিনয়বাবু ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন। আর তাঁহার পত্নী একাকী ঘরে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, রুগ্ন শয্যা হইতে উঠিয়া মনের বলও বোধহয় তাঁহার কমিয়া আসিয়াছিল, তাই চোখের কোণে তাঁহার অজ্ঞাতেই ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া জল জমিয়া উঠিতে লাগিল।

দিন কয়েক পরে একদিন রাত্রিবেলা মাতাকে দেখিয়া ফিরিবার সময় পানু মৃদু হাসিয়া মীরাকে কহিল, মার কাছে একটা কথা শুনলাম, শুধু শুনলাম নয়, তোমার মত জিজ্ঞেস করতে হবে, এই তাঁর আমার উপর হুকুম।

আশ্চর্য্য হইয়া মীরা কহিল, অর্থাৎ?

—অর্থাৎ, মা বললেন, মেয়ে বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে, এখন ধরে বেঁধে যেখানে সেখানে তাকে ফেলে দেওয়া ত চলে না; তার একটা মত জানা এখন দরকার, তবে আমরা ত আর জিজ্ঞেস করতে পারিনে, পানুকেই এ কাজটা করতে হবে।

—ওঃ সেই কথা? তা ভাল করে এই চেয়ারটায় বস, পানু দা, তুমিও বেশ ধীরে ধীরে ভাল করে কথাগুলো বল, আমিও ধীরে ধীরে ভাল করে সেগুলো ভাবতে থাকি।

—না, বসবার আমার সময় তত নেই, দাঁড়িয়েই আমি কথা ক'টা বলে যাই, তুমি আজ সারারাত বা যতদিন ইচ্ছা ভাব, তারপর যখন ভেবে পাবে তখন আমায় বা মাকেই তা ব'লো, যেদিন তোমার খুসী। তবে একটা কথা আছে, এই ফাল্গুনটা পেরিয়ে না যায়, মার এই ইচ্ছে; কাজেই ভাবনার কাজটা একটু শীগ্‌গির করে করতে পারলেই ভাল হয়।

—ওঃ, মার গলা দিয়ে বুঝি ভাত আর গলছে না, তাই এত তাড়া!

—ততটা না হলেও মেয়ে বড় হলে, ভাবনা একটা আছে বৈকি!

—তাই না কি? তা বেশ; তারপর বলে যাও, শুনি।

পানু মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ হইয়া, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া, আরম্ভ করিল,—শরৎবাবুর ছেলে সুধীরদাকে মনে আছে ত?

ওঃ সেই সুধীর বোস, মুন্সেফ, সেই ত?

হ্যাঁ, সুধীরদা নিজেই তোমায় বিয়ে করবার জন্যে খবর পাঠিয়েছেন, তাঁর বাবার মত হবে না, তা তিনি বাপমায়ের অমতে করতেও প্রস্তুত আছেন।

—সৎসাহস!

—এদিক থেকেও এঁদের আপত্তির বিশেষ কিছু নেই, কেন না চাকরীও মন্দ নয়, এবং চেহারাটীও খুবই সুন্দর।

—হাঁ, স্থালুলয়েডের ডলের মত আলমারীতে সাজিয়ে রাখা চলতে পারে!

—দ্বিতীয়তঃ বিমলবাবু এবারে ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরে এসেছেন।

—দাঁড়াও পানু দা' আঙ্গুল গুণতে থাকি, ভুলে যাব শেষকালে।'

মীরা বুড়া আঙ্গুল কড়ে আঙ্গুলে রাখিয়া কহিল, হ্যাঁ বলে যাও এই বারে—

—বিমলবাবুকে ত এই সেদিনও তোমাদের এখানে একটা পার্টিতে দেখলে, তোমাকে একটা ফুলের তোড়া প্রেজেন্ট করলেন, নিশ্চয় তোমার মনে আছে। একটা বিষয়ে কেবল এখানে এঁদের আপত্তি, ভদ্রলোক বড্ড রোগা বলে।

—তা পারিবারিক একজন ডাক্তার রাখলেই চলবে।

—তৃতীয়তঃ খগেন রায়, তোমাদের রেখার দাদা, তিনিও বিলিতি ডাক্তার হয়ে ফিরলেন মাসকয়েক আগে, তাঁকেও তুমি ভাল করেই চেন, মার মনটা একটু খুঁৎ খুঁৎ করছে, ভদ্রলোকের রংটা তেমন ফর্সা নয় বলে,—

—হ্যাঁ, অন্ধকারে হঠাৎ দেখলে, চমকে উঠতে পারি। তারপর থামলে কেন? আর নেই?

আরও যথেষ্ট রয়েছে, এগুলো ঠিক না হয়, তখন আবার বলা যাবে, এখন তবে তুমি ভেবে রেখো, আমি চললুম, কিন্তু ফাল্গুন না পেরিয়ে যায়, এই হচ্ছে কথা।

—পানুদা—

প্রস্থানোদ্যত পানু ফিরিয়া কহিল, কি?

—আমি কি ভাবব, বল দিকিন?

—কেন?

—আমার যে সবাইকেই ইচ্ছে করছে,—

হাসিয়া ফেলিয়া পানু কহিল, বেশত, মাকে তাই জানিও।

পানু চলিয়া গেল।

কিন্তু ফাল্গুন প্রায় আসিয়া পড়িল এবং বরপক্ষীয়েরাও যখন ক্রমে ক্রমেই ঔৎসুক্য তাঁহাদের বাড়াইয়া তুলিতে লাগিলেন, মীরার মা তখন আবার ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। সেই রাত্রির পর পানু দুইচারি মিনিটের জন্য আসিয়া মাকে দেখিয়াই আবার তৎক্ষণাৎ চলিয়া যায়, তাহাকে দিয়া কোন বিশেষ সুবিধার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, মা অগত্যা মীরার বন্ধু বিভার শরণাপন্ন হইলেন।

দিন দুই চার পরে, বিভা একদিন বেড়াইতে আসিয়া মীরার মায়ের অনুরোধে দুই তিন দিনের জন্য এখানেই রহিয়া গেল। মীরা বন্ধুকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া উঠিল এবং হাসিয়া রহস্য করিয়া, গান গাহিয়া, বাড়ীখানি মুখরিত করিয়া তুলিল।

দুই বন্ধু গল্প করিতে বসিলে বিভা কহিল,—এই, তুই বুড়ো খুকী হয়ে আর কতকাল থাকবি, মাসীমার ইচ্ছে এইবার তোর বিয়ে দেন, মা বাপের মনের একটা সাধ আহ্লাদ আছে ত? এইবারে বিয়ে কর।

—বেশ ত, আমার কি অনিচ্ছা?

বিভা খুসী হইয়া কহিল, ওমা তাই না কি? লক্ষ্মী মেয়েটী ত! তা, মাসীমার ইচ্ছে যে এই ফাল্গুনেই হয়, বর ত অনেকগুলো হাজির আছে, এখন মাসীমারা পছন্দ করে কোনও একটীর সঙ্গে ঠিক করে ফেলুন, কি বলিস? না কি তোর আবার মতামত আছে?

—আছে বই কি! বিয়ে করব বলে কি যাকে তোর তাকেই? পছন্দ অপছন্দ আছে না? অনেকগুলো হাজির রয়েছে তুই বলেছিস, আমিও তা জানি, কিন্তু এদের মধ্যে পছন্দ করবার মত লোক কোথায়?

বিভা গালে হাত দিয়া কহিল,—অবাক করলি মীরা, এতগুলো সব চমৎকার ছেলে রয়েছে, অন্য যে কোন মেয়েরা যাদের পেলে ভাগ্য বলে মানবে, এদের মধ্যে তোর যোগ্য কেউ নেই? নিজেকে এত দামী মনে করিস্‌নি ভাই, না হয় এম-এ'ই পড়ছিস!

মীরা হাসিয়া কহিল—সত্যিই ভাই, মিছে বলছি না, আমার পছন্দ একেবারেই হচ্ছে না কাউকে। কি করি!

—না হয় তুই পছন্দটা বিয়ের পরেই করিস বাপু, এখন মাসীমার মতেই মত দিয়ে দে।'

—পরে পছন্দ করা, তার মানে তখন না যাবে ফেলা, না যাবে গেলা, এই ত? না ভাই, তেমন কাঁচা কাজ আমি করি নে?

—আচ্ছা, এদের পছন্দ না হয়, আমার একটা কথা শোন দেখি, আমার এক মামাতো দেওর এই মাস তুই হ'ল বিলেত থেকে এসেছে, চমৎকার ছেলে, যেমন দেখতে তেমনি স্বভাবে, তুই যদি আলাপ করতে চাস মাসীমাকে বলে আলাপ করিয়ে দেব, তাকেই তুই বিয়ে কর।

মীরা হাসিতে হাসিতে বলিল,—রাগ করিস নে ভাই বিভা, বিলাত-ফেরতাদের আমি মোটেই বিশ্বাস করি না।

বিভা দুঃখিত হইয়া চুপ করিল।

মীরা উঠিয়া আয়ার কোল হইতে বিভার মেয়েটাকে কোলে নিয়া তাহাকে নাচাইয়া, হাসাইয়া, কাঁদাইয়া অস্থির করিয়া তুলিল, বাগান হইতে ফুল তুলিয়া তাহার ছোট দুটি হাত ভর্ত্তি করিয়া দিল, তারপর কাছে আসিয়া বিভার গলা জড়াইয়া কহিল, রাগ করেছিস্ বিভা? ভাই আমি তোর দেওরকে কিছু বলিনি, আমার কথা বলার মানেটা হচ্ছে, বিলাত-ফেরত লোকদের আমার ভাই একটুও পছন্দ হয় না, কাগজে কত কি খবর বেরোয়, তুই নিজেও ত সব পড়িস ভাই!

বিভা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল,—আমার ঠাকুরপোকে না করিস, পৃথিবীতে কি তোর যোগ্য কেউ নেই? খুঁজে পেতে এনে দিই আমরা, তুই পছন্দ করে কর বিয়ে। মাসীমা মেসোমশায়ের মনে তা নইলে কত দুঃখ, বল্ দেখি?

—বেশ ত, বিয়ে করতে কি আমারই অসাধ? কিন্তু বড় হয়েছি, ভাল না লাগলে জোর করে কি কারুকে ভালবাসতে পারব? তুই-ই বল। পছন্দমত আমার, দে না তোরা খুঁজে এনে বিয়ে তখন নিশ্চয়ই করব। তা মা কেনই বা এত দুঃখ করেন, এখন ত' তবু তাঁদের কাছে রয়েছি, তারপর কার সঙ্গে বিয়ে হবে, কে কোন্ মুল্লুকে টেনে নিয়ে পালাবে, সেইটেই কি খুব সুখের হবে তাঁদের? আর এখন দুঃখ করেন, দিলেন না কেন ছোট বেলায় বিয়ে, সব হিন্দু মেয়েরই যেমন হয়ে থাকে, তা হলে ত তখন আর কথাটিও কইতুম না! কেন এত লেখাপড়া শেখালেন, এখন নিজের বুঝবার ক্ষমতা হয়েছে, সবাইকে মনে ধরে না, কি করব বল?

—কিন্তু এত লোকের মধ্যে কারুকেই যে তোর মনে ধরল না, এইটেই আমার অবাক লাগে মীরা।

—আচ্ছা, তুই-ই বল দেখি, এত লোক ত তোর বেলায়ও ছিল, তোরই বা কারুককে মনে ধরল না কেন, ঐ একটি জন ছাড়া?

—ঐ একজনের সঙ্গে আমার হবে, ভগবানের এই বিধান ছিল বলে,—

—তা হলে ত' সহজেই বুঝতে পারছিস, এই এতজনের কারুর সঙ্গেই আমার হবে, ভগবানের এ বিধান নয়, তা' হলে হ'য়ে যেত।

—কিন্তু লোকও ত কিছু কম দেখা হ'ল না, আমার বেলায় ত এত দেখতে হয় নি।

—লোক তোরা অনেক দেখেছিস সত্যি, কিন্তু সত্যি সত্যি যার সঙ্গে আমার ভগবানের বিধান, সেইটিকে তোরা দেখতে পাচ্ছিস নে, কি করে হবে বল।

—সেইটিকে আমরা কোথায় পাব আর! বোধ হয় ভাই বিয়ে তোর কপালেই লেখা নেই।

হাসিয়া মীরা কহিল—এতক্ষণেই ঠিক বুঝেছিস, মাকেও এই কথাটিই বুঝিয়ে দিয়ে চুপ করে থাকতে বল।— ভগবান যদি সত্যিই ইচ্ছা করেন, তা হলে একদিন হবেই। কেন মিছে ভেবে ভেবে আর দুঃখ করে' করে' শরীর ও মন খারাপ করা?

সন্ধ্যা বেলা চা-পানের পর বিভার মেয়েকে কোলে নিয়া মীরা ছাতে গেল এবং সেই অবসরে বিভা মীরার মাকে মীরার সঙ্গে কথোপকথনের কথা বলিল, শুনিয়া তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

রাত্রিবেলা একশয্যায় শুইয়া, দুই বন্ধুতে নানা কথার পর হঠাৎ বিভা কহিল, আচ্ছা তোর পানুদা কোথায় মীরা, অনেককাল তাকে দেখি নি ত।

—কি করে দেখবি, আজকাল ত আমাদের এখানে থাকে না, মাঝে মাঝে আসে। মার অসুখের সময়টা এখানে ছিল।

—বিয়ে করেছে?

—না।

—কেন ভাই, বয়স ত বেশ হয়েছে।

—বিয়েয় মন নেই বোধ হয়, তা ছাড়া মেয়ে দেবে কে ওকে?

—কেন, স্বভাব খারাপ না কি ?

—দূর,—তা' নয়, তবে আই-এ টাও দিলে না, লোকে নে করে মূর্খ চাষা ! তা ছাড়া, দেশ দেশ করেই পাগল ! এখন দেশের চাষা-ভূষো, নাপিত-মুচী নিয়েই সে আছে, তাদের কি করে' বড় করবে, জমির উর্ব্বরাশক্তি কি রে বাড়বে, কি করলে দেশের সব লোক খেতে পাবে, চাকরী পেলেও লোকের অন্নের অভাব হবে না, কি লেখাপড়া শখালে সহজেই লোকের অন্নের সংস্থান হবে, কি ক'রে তাদের সই অকল্পিত লেখাপড়া শেখাবে, সমস্ত মানুষকে মানুষের মত রে তুলবে, এই নিয়েই সে ব্যস্ত, এইখানেই তার মন, সব ভালবাসা।—বিয়ের কথা সে মনেও করে না বোধ হয় কখনো।

বিভা হাসিয়া কহিল, ও রকম লোকের ভাই বিয়ে না হওয়াই ভাল, কবে কি হবে, না হবে, জেল খাটবে কি ফাঁসীতেই উঠবে, বউটার তখন হবে কি ?—

মীরা চুপ করিয়া রহিল, মিনিট দুই কাটিয়া গেল, বিভা ডাকিল,—মীরা ঘুমুলি না কি ?

—ঘুম পাচ্ছে ভাই।

পাশ ফিরিয়া মীরা আপাদমস্তক চাদরে আবৃত করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। [ক্রমশঃ

ব্যর্থ-সাধনা

—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

আজি এ পুণ্য পঞ্চমী তিথি, পঞ্চম সুরে বাজে না বীণ,
মানস-সরের স্বচ্ছসলিলে শ্বেতশতদল পাপড়িহীন।
মুক্ত মনের মুক্তা মালিকা যুক্ত নহে গো তোমারি সনে,
রাগ-রাগিণীর অঞ্জলি নাহি চরণে তোমার এ শুভ খনে।
আমের মউল আঙিনায় ঝরে, মৌমাছিদের শিহরে প্রাণ,
অকাল-মেঘের নিবিড় আঁধারে কেঁপে ওঠে নীল আকাশখান।

শুভ্রবরণা জননী আমার, ভগ্নবেদীর উপরে রহ,
কপট-সাধক দাম্ভিক যারা তাদের পূজাই ওকিবহ।
ভাবের ঘরেতে চুরি করি তারা সমাজের কাছে শ্রদ্ধা পায়,
মনীষী তাদের বলি মা কেমনে ? পূর্ণ তাহারা অজ্ঞতায়।
শুধু তাদের যত পণ্ডিতি - সত্য কি তারা সাধনা করে ?
আপনার জয়-ঢক্কানিনাদে দেশ ও দশের চিত্ত হরে।

স্বার্থপূজারী মন্দিরে হেরি ভক্তি-বিহীন পূজায় রত,
কাঁদিছে তোমার প্রাণের মরাল হৃদয়ে তাহার গভীর ক্ষত।
জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প-কলার পূজা অর্চ্চনা জানে না তব,
অভ্যুদয়ের অরুণ আলোক তাইত হেথায় জাগে না নব।
মন্ত্র তোমার গিয়াছে হারায়ে, জীর্ণ পুঁথির উড়িছে পাতা,
নাহিক নিখিল দিক্-মুখরিত ঋষি-কণ্ঠের স্তোত্র-গাথা।

আজ বসন্ত মৌন নীরব দেউলে পুষ্প-অর্ঘ্য নিয়া,
বড় বেদনায় দখিনা বাতাস ফিরে গেছে তব দুয়ার দিয়া।
নিভে গেছে দীপ, শিখাটি তাহার উঠিতেছে ধীরে ধূম্ররাগে,
মঙ্গল-ঘট ভেঙে গেছে হেথা, পুড়িয়াছে ধূপ পূজার আগে।
হৃদি-চন্দন মিশেছে ধূলায় অর্ঘ্য-কুসুমে নহে সে মাখা,
পূজা-উপচার কিছু নাই মা গো, বৃথা আল্পনা রয়েছে আঁকা।

মূক-বধির

হাবা

—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ধোপার ছেলে, তাতে আবার কালা-বোবা, কাজেই নামকরণ তার কিছুই হয় নি। যে কথা বলতে পারে না, সাধারণ চোখে বোকা ছাড়া ত সে কিছুই হতে পারে না। ধোপার ছেলের বুদ্ধি যদিও অনেক কাণে-শোনা কথা-কওয়া ছেলের থেকে বেশী ছিল, তবুও সকলের দেওয়া নাম হল তার হাবা।

ধোপা আর ধোপানী সারাদিন খাটে, ছেলের খোঁজ বেশী নিতে পারে না। হাবা সারাদিন মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়ায়। দুপুরে বাড়ীতে এসে দু'মুঠো ভাত খেয়ে আবার বেরোয় টো টো করতে। সন্ধ্যার পর যখন

যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
(কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম অধ্যক্ষ)।

আবার বাড়ীতে আসে, তখন মা-বাবার কাছে একটু আদর পায়, একটু পরেই মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়ে।

সমবয়সী ছেলেরা কেউ ওর সঙ্গে খেলে না,—একে ধোপা, তাতে আবার হাবা। লুকোচুরি খেলায় 'টু' দিলে কাণে শোনে না, এত বড় গাধাটাকে নিয়ে কি খেলা চলে! গ্রামের যত গরু, কুকুর, তারা হ'ল হাবার খেলার সাথী। বোবা জীব বোবা ছেলের ব্যথা বোঝে!

এমনি ভাবে কেটে গেল তার জীবনের আটটা বছর। তারপরে একদিন একটা মস্ত বিপদ হয়ে গেল। গ্রামে ওলাউঠার মড়ক লাগল। অনেকেই খেয়া পাড়ি দিল। তাঁদের সঙ্গে ধোপা-ধোপানীও গেল চলে। প্রথমে হাবা কিছুই বোঝে নি। কিন্তু যখন বাবা-মাকে বেঁধে নিয়ে লোকেরা চলে গেল, তখন সে বুক-ফাটা কান্না কাঁদল। নিয়তি,—বোবা শিশুর কান্নাও ভগবানের দরবারে পৌঁছল না।

তারপর দু'বছর কেটে গিয়েছে। ধোপার কুঁড়েখানা রেহেন্ ছিল গ্রামের মহাজন ঘোষাল মহাশয়ের কাছে। দু'বেলা ঘণ্টাখানেক আহ্নিক না করে তিনি জলস্পর্শ করতেন না। কিন্তু টাকা আর ধর্ম্ম এক জিনিষ নয় টাকা কিছুতেই মারা যেতে পারে না। তিনি ধোপার কুঁড়েখানি ক্রোক করে নিলেন। হাবা কোথায় মাথা গুঁজবে, তা দেখবার কথা রেহেনী-খতে লেখা ছিল না।

হাবা মাঠে-ঘাটেই ঘুরে বেড়াত। যদি কেউ দয়া করে দু'মুঠো খেতে দিত, খেত। না দিলে, আঁস্তাকুড় চুকিয়ে পেটের আগুণ নিবোবার চেষ্টা করত। অনেক সময় তাও কপালে জুটত না। কুকুরগুলো আগে এসে সব শেষ করে দিত। শুত সে গাছতলায়।

দিন সকলের কেটে যায়, হাবারও কেটে যেত। সে দেখত, যাদে[র] থাকবার ঘর আছে, খাবার ভাত আছে, তারা ঠাকুরবাড়ীতে পূজো দেয়। [সে] ভাবলে, তাই বোধ হয় ভগবানের দয়া তাদের উপরে,—থাকবার ঘর খাবার ভাত তাদের। সে ঠিক করলে পূজো দেবে। কিন্তু ঠাকুর-ঘ[রে] তাকে যে ঢুকতে দেয় না! ঠিক করলে রাত্রে যখন কেউ থাকবে না, তখ[ন] সে পূজো দেবে।

সেই দিনই ফুল জোগাড় করলে, বাগান থেকে কলা চুরি করলে রাত্রে আরতির পর ঠাকুরমশায় মন্দিরের দরজা বন্ধ করে চলে গেলেন হাবা লুকিয়ে এসে বন্ধ দরজার সামনে কলা রাখলে, ফুল রাখলে, চোখে জলে ঠাকুরের চরণে নিজের কষ্টের কথা জানালে।

কি একটা দরকারে ফিরে এলেন পুরোহিত মন্দিরে। মানুষ দেখে বললেন, "কে রে ওখানে?"

হাবা, একে কাণে শোনে না, তায় পূজায় সে তন্ময়, নড়ল না।

"উত্তর দেয় না, কে তুই?—হাবা! তুই বেটা এখানে কেন রে বেরো, বেরো,—ছুঁয়ে ফেললে আবার নাইতে হবে।—আরে, নড়েও না চড়েও না।"

পূজারীর হয়ে গেল রাগ। ব্রাহ্মণের রাগ,—অগ্নিশিখা। পায়ের খড়[ম] খুলে থাই করে মারলেন ছুঁড়ে। হাবা ঠিকরে সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়া[তে]

পড়ল নীচে। পড়ে উঠলও না, শব্দও করল না কিছু। ব্রাহ্মণের দরকার মনে হ'ল না নীচে নেমে দেখা।

গরীবের ঠাকুর কিন্তু হাবার আকুল প্রার্থনা শুনেছিলেন। সে আর জাগল না।

'জবরুল'

'জবরুল' চুরি করার জন্য অভিযুক্ত হয়েছিল। সে অতি সামান্য কাণে শুনতে পেত। কিছু জিজ্ঞাসা করলে, সে জিভ নেড়ে কতকগুলি আবোল-তাবোল শব্দ করত। নাম জিজ্ঞাসা করায় সে যে আবোল-তাবল শব্দ করেছিল, তা' ইন্সপেক্টার বাবুর কাণে 'জবরুল'র মত শুনিয়েছিল। কাজেই তার নাম হয়ে গেল 'জবরুল'।

শমন পেয়ে কোর্টে গেলুম interpret করতে। ইন্সপেক্টার বাবু থানার কর্ত্তা, তিনি জানেন না এমন কিছুই পৃথিবীতে থাকতে পারে না। তিনি বললেন, "ব্যাটা, সব শোনে, বদমায়সি করছে। দেখুন না, নাম জিজ্ঞাসা করলে, নাম বলছে 'জবরুল'।"

আমি বললুম, "আজ্ঞে হাঁ, ও সবই শুনছে। তবে অমন শোনা আপনি শুনলে, আপনাকে আজ থানার কর্ত্তা হবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতে হত।"

'জবরুলে'র অতি সামান্য শ্রবণশক্তি ছিল,—এত সামান্য যে, তা দিয়ে তার কোন কাজই হত না।

সাক্ষীরা বললে, সে চুরি করেছিল, তারা দেখে হাতে-নাতে ধরে। 'জবরুল'কে জিজ্ঞাসা করা হল, তার কিছু বলবার আছে কি না। সে বললে, "খেতে পাই না, তাই চুরি করি।"

ইন্সপেক্টার বাবু বললেন, "ব্যাটা পাজির পা-ঝাড়া। হুজুরের যাতে একটু দয়া হয়, তার চেষ্টা। এর আগে দু'বার ব্যাটা ধরা পড়েছিল, warning দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।"

চুরি যখন করেছে, আর আগে যখন দু'বার warning দিয়ে শুধরোবার সুবিধে দেওয়া হয়েছে, তখন লোকটা নিশ্চয়ই পাকা চোর। কাজেই ছ' মাস জেল। মানুষের বিচার, যে বিচার-পদ্ধতি তৈরী করা হয়েছে বিশেষ একটি গণ্ডির স্বার্থের সংরক্ষণের জন্য, দরিদ্রের মুখ চেয়ে নয়,—সে বিচারে এর থেকে ভাল কি আশা করতে পারা যায়!

'জবরুল' ইসারা করে আমাকে বললে, 'যাক, ছ' মাসের জন্য পেটের চিন্তার হাত থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।"

'তোমার ছল ছল চোখ সইতে পারি না, তাই পালিয়ে যাই।"

এক ভাই, দুই বোন—তিন জনই বধির। তারা সকলেই কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ে পড়ে। আমার দীর্ঘ বারো বছর কাজের মধ্যে আমি এদের মত তীক্ষ্ণ ও গভীর ধীশক্তিসম্পন্ন ছেলেমেয়ে দেখি নি। Genius বলতে যা বুঝায়, এরা ঠিক তাই। আমাদের বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারি না, ভগবান এদের কাণ নিয়ে কি মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করেছেন। কাণে শুনতে পেলে, এরা ভাই বোনে প্রত্যেকেই তাদের কর্ম্মজীবনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করত, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ছেলেটি একদিন আমাকে ও আমার স্ত্রীকে তাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করলে। তার ভয়ানক ইচ্ছা, সে তার মার সঙ্গে তার মাসীমার (আমার স্ত্রীর) আলাপ করিয়ে দেবে। আমরা সানন্দে তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলুম।

যেদিন আমাদের নিমন্ত্রণ, সেদিন ভাইবোনে কেউ স্কুলে এল না। তাদের বাড়ীতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম তারা স্কুলে আসে নি কেন। তাদের বাবা বললেন, "স্কুলে যাবে কি? খোকা নিজে বাজারে গিয়ে তার পছন্দমত জিনিস কিনেছে। বড়খুকী কি রান্না হবে, তাই নিয়ে মার সঙ্গে ব্যস্ত।"

"খোকার আগ্রহে আপনাদের যথেষ্ট কষ্ট পেতে হ'ল।"

"মোটেই না। খোকা আপনাকে খুব ভালবাসে, সর্ব্বদাই নাম করে। কয়েকদিন ধরেই বলছিল, আপনাদের নিমন্ত্রণ করে আমার স্ত্রীকে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে। তার ক্লাশের বন্ধুদের মায়েদের নিমন্ত্রণ করে এর আগেই তার মায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। আমার যে কি আনন্দ হয় তা কথায় বলতে পারব না। বোবা ছেলে কথা বলছে দশজনের সঙ্গে সমান ভাবে মিশছে, সামাজিক আদান-প্রদান করছে।"

দুই বোনে সামনে বসে' খাওয়ালে। কত অনুযোগ,—"এটা খাও, তুমি মোটেই খাচ্ছ না, এটা আমি নিজে রেঁধেছি, আর একটু খাও।" জীবনে এত আনন্দ আর কখনও পাইনি।

বাড়ী ফিরবার সময় আমার স্ত্রীকে অত্যন্ত গম্ভীর দেখে' কারণ জিজ্ঞাসা করলুম।

তিনি বললেন, "আজ আমি যত আনন্দ পেয়েছি, তত আঘাতও পেয়েছি। মানুষের কপালে এত কষ্টও ভগবান্ লেখেন! এমন সোনার টুকরো ছেলেমেয়ে, কী মিষ্টি ব্যবহার, সকলেই কাণে শোনে না! আমি বললুম খোকার মা'কে,—আপনার ত' বড় কষ্ট।"

"তিনি বললেন,—সব কষ্ট সহ্য হয় দিদি, কিন্তু যদি কোন আত্মীয় বাড়ীতে আসেন, তখন সহ্য হয় না। ছেলেমেয়েরা লুকিয়ে বেড়ায়, অতিথির সামনে আসে না। পরে যখন জিজ্ঞাসা করি, পালিয়ে বেড়াস কেন, তখন ভাইবোনে আমার গলা জড়িয়ে বলে, মা, আমরা যে সবাই একরকম। ও'রা যখন সহানুভূতি দেখান, তোমার চোখ ছল ছল করে। তোমার ছল ছল চোখ আমরা সইতে পারি না, তাই পালিয়ে যাই!"

তিন চার বছরের কথা। কিন্তু এখনও যখন রোজ স্কুলে ছেলেটিকে মেয়ে দু'টিকে দেখি, বুকের ভিতর খোঁচা দিয়ে যায়,—"মা, তোমার ছল ছল চোখ আমরা সইতে পারি না, তাই পালিয়ে যাই!"

ছটু

বাবার গর্ব করবার মত ছেলে,—স্বাস্থ্যবান্ ; খেলায়, লেখাপড়ায়, কাজে, সব বিষয়েই ভাল, মধুর ব্যবহার। ছটুকে সকলেই ভালবাসে।

ক্লাসে পড়া হচ্ছিল,

"পাখীর গান মহিমা তব
করিছে প্রচার।"

বোঝাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু ভিতরে খোঁচা দিতে লাগল,—কী নিষ্ঠুর!

হঠাৎ ছটু বলে উঠল, "ভগবান নিষ্ঠুর! গান যদি এত মধুর, আমরা ছোট, কি অপরাধ করেছি যে, তিনি আমাদের কালা করে' পাঠিয়েছেন?"

বললুম, "ও কথা বলতে নেই, বাবা। পৃথিবীতে সব মানুষ ত সমান নয়। তিনি কখন কাকে কি অবস্থায় রাখেন তা' শুধু তিনিই জানেন। তাঁর দেওয়া দুঃখকে দান বলে' নেবে, মনে শান্তি পাবে।"

মনের ভিতরে কিন্তু ঘুরে ফিরে আসতে লাগল,—এ সব ফাঁকা উপদেশ, দাম নেই এক কড়াও। যে বধির, যে অন্ধ, শুধু সেই জানে তার কি ব্যথা!

কে বড়?

শিবু কলিকাতা মূক-বধির বিত্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্র। সে সহরের উপকণ্ঠে কোন কারখানায় ফিটারের কাজ করে, বেশ ভাল মাহিনা পায়। আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি, তার কাজে, ব্যবহারে ও চরিত্রে তার কর্তৃপক্ষ খুব সন্তুষ্ট।

কাজের ভিড়ের জন্ত সে সব সময় স্কুলে বেড়াতে আসতে পারে না। কখনও স্কুলের পর্ব্ব উপলক্ষে এলে আমরা বড় সন্তুষ্ট হই। একদিন জিজ্ঞাসা করলুম, "তুমি বিয়ে করেছ, শিবু?"

"না।"

"কেন?"

"দাদারা আলাদা হয়ে গেছে। মাকে কেউ দেখে না। কিন্তু আমি ত তাঁকে ফেলতে পারি না। তাঁর বয়েস হয়েছে ; যতদিন তিনি বেঁচে আছেন, ততদিন তাঁর সেবা করা ছাড়া অন্ত চিন্তা আমার মনে আসতে পারে না।"

কে বড়,—কালা শিবু, না তার কাণে শোনা দাদারা?

আমরা একই সুতোয় গাঁথা

আমেরিকায় কোন মূক-বধির বিত্যালয় পরিদর্শন করছিলাম। গ্রেট পাল সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্রী, আমাদের স্কুলের কথা, ছেলেমেয়েদের কথা জানতে চাইলে।

পরে সে বললে, "আমার ইচ্ছে করে একবার ভারতবর্ষে যাই আপনাদের স্কুলে আমার ভাই-বোনদের খুব ভালবাসব।"

আমি বললুম, "এখন বলছ বটে, কিন্তু ভারতবর্ষে গেলে সব উল্টে যাবে।"

"কেন?"

"Asiaticদের উপর তোমাদের যে ভয়ানক ঘৃণা! নিউ ইয়র্কে নামবার সময় শুধু Asiatic বলে' যে অপমান আমাদের সইতে হ নিতান্ত পরাধীন জাতির গণ্ডারের চামড়া গায়ে, তাই সহ্য করতে পারি অথচ, এই প্রায় বছর খানেক "God's best country"তে বাস ক বুঝতে পারলুম না, তারা আমাদের থেকে বড় কোন জায়গায়। তুমি ত সে "God's best country'র মেয়ে!"

ব্যথিত ভাবে সে উত্তর দিলে, 'আপনার কথাতে হিংসা, ঘৃণা ফুটে উঠছে তবে আপনাকে আমি দোষ দিই না, কারণ আপনারা শুধু আঘাতই পে আসছেন। কিন্তু একটা কথা আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে, আমরা ও আপনাদের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা, আমরা সকলেই বধির, একই সুতোয় গাঁথা। আমাদের মধ্যে জাতিগত পার্থক্য কিছুই নেই, আমরা একই জাতি, আমরা শুধু বধির চায়নার চিফু স্কুলের খরচা চলে না। তারা প্রত্যেক বছরেই আমেরিকা টাকা চেয়ে আবেদন জানায়। কে টাকা দেয় জানেন? Fifth Avenue এর ধনকুবেররা দেয় না। আমরা, আমেরিকার বধিররা, হাত-খরচ টাকা থেকে, সামান্ত রোজগার থেকে, বাঁচিয়ে চিফু স্কুলের খরচ চালাব টাকা পাঠাই। আমাদের মনেই আসে না যে, সেখানে পড়ে কতকগুলি চী ছেলে-মেয়ে, যাদের Asiatics বলে দমিয়ে রাখবার চেষ্টা ইউরোপ আমেরিকা প্রতিমুহূর্ত্তেই করছে।"

আমি বললুম, 'আমি বড়ই দুঃখিত তোমাকে আঘাত করে'। আজ য পৃথিবীর সব লোক বধির বা অন্ধ হ'য়ে যেত, তা' হলে পৃথিবী থেকে হিংসা ঘৃণা, ছোট-বড় সম্পর্ক, দূর হ'য়ে যেত, পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি আসত।"

শিক্ষার নীতি

...কি জাতীয় শিক্ষা হইলে তদ্দ্বারা বেকার-সমস্যার সমাধান হইতে পারে, তদ্বিষয়ে ইংরাজগণ এখনও পর্য্যন্ত কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই এ তাঁহাদের প্রচলিত শিক্ষানীতিও যে সাফল্যলাভ করে নাই, তাহার প্রমাণ ইংরাজ জাতির শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা এবং ইংরাজ জাতির পরমুখাপেক্ষিতা।...

বাণ-বেঁধা পাখী

—শ্রীআশালতা দেবী

মাটী দিয়া নিকানো তক্‌তকে দাওয়া।

আঙ্গিনার এক ধারে তুলসী-মঞ্চ, তাহারই এক পাশে সারি সারি দোপাটী ফুলের চারা, মাচার উপর লক্‌লকে লাউ-ডগাগুলি বর্ষার জল পাইয়া সজীব ও সরস্ হইয়া উঠিয়াছে।

বিকালের দিকে এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, ভিজা মাটীর সোঁদা গন্ধে বাতাস যেন ভারী হইয়া উঠিয়াছে।

পরনের কাপড়খানি হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত তুলিয়া সন্তর্পণে পা ফেলিয়া ক্ষমা ঠাকরুণ উঠানের উপর হইতেই হাঁকিলেন, কই গো বউ, বেলা পড়ে গেছে, এখনও ঘুমোচ্ছিস না কি?

ঘরের ভিতর হইতে ক্ষীণতর একটা শব্দ উত্থিত হইল: না পিসি, ঘুমোইনি—বড্ড অসুখ আমার, উঠতে পাচ্ছি না!

ক্ষমা ঠাকরুণ উঁকি মারিয়া বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া কহিলেন, ও মা, আবার মরেছিস বুঝি—ক'দিন হ'ল?

বধূ ক্ষীণকণ্ঠেই জবাব দিল: আজ নিয়ে বাইশ দিন হ'ল পিসি···শরীর এবার একেবারে ভেঙ্গে গেছে, আর বোধ হয় বাঁচব না।

ক্ষমা ঠাকরুণ দাওয়ার উপর হইতে নামিয়া ঠোঁট বাঁকাইয়া কহিলেন, বললুম তো তোকে, এবার একটা ঠাকুর-দেবতার দোর ধর, আমাদের কথা তো শুনবি না। এই নিয়ে ছ'টা হ'ল, একটাকেও কোলে পেলি না··কোঁকে আসে আর চলে যায়! যেমন তোর পোড়া কপাল! ছিপতি কোথায়?

বধূর চোখে জল আসিয়াছিল। সিক্ত কণ্ঠে সে কহিল, সেই সকালে দু'টো ভিজে ভাত মুখে দিয়ে বেরিয়েছে; বোধ হয় আখড়ায় গেছে, কিছু দরকার আছে পিসি?

ক্ষমা ঠাকরুণ ওষ্ঠ উল্টাইয়া কহিলেন, নাঃ, ওকে আবার কি দরকার, এমনিই শুধাচ্ছিলুম···তা আখড়ায় যাবে বই কি, বেটাছেলে দিনরাত রুগী নিয়ে কি থাকতে পারে? তুমি এখন আছো চার পাঁচ মাস অন্তর বিছানায় পড়বে। তবু ছিপতির বলে কোন্ দোষ নেই। অন্য পুরুষ হ'লে—মরুক গে···তোর বোন্‌কে না হয় নিয়ে আয় না বউ?

বধূ একথার কোনও উত্তর দিল না।···তাহার কান যেন পুড়িয়া গেল।

এ অপরাধ কি তাহার একার? গর্ভে তাহার সন্তান আসিয়াও প্রাণান্তকর যন্ত্রণায়, অপরিপুষ্ট দেহে, পৃথিবীর আলো-বাতাস স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে মুকুলেই বৃন্তচ্যুত হইয়া ধরিত্রীর তলদেশে আত্মগোপন করিতে চাহে—বিধাতা তাহাকে বার বার চরমতম পরিহাস করেন!

এ অপরাধও যেন তাহার! তাই শুভানুধ্যায়িনীরা আসিয়া সমবেদনা জ্ঞাপনের ছলে তাহাকে বেশ মিষ্টি করিয়া দুই কথা শুনাইয়া দিয়া যান।

রান্নাঘরটা খোলাই পড়িয়া রহিয়াছে, একটা শৃগাল আচম্‌কা ঢুকিয়া কি যেন মুখে করিয়া ছুটিয়া পলাইল। ক্ষমা ঠাকরুণ শিহরিয়া সেই দিকে চাহিয়া কহিলেন, মা, মা·· দূর দূর···এতে কি আর ঘরে লক্ষ্মী থাকে? ও বউ, রান্নাঘরে যে শেয়াল্ কুকুর ঢুকছে। আমি যাই, ছিপতি এলে আমাদের ওখানে একবার যেতে বলিস।

বধূ করুণ কণ্ঠে কহিল, একটু ব'সো না পিসি, সেই সকাল থেকে একলা পড়ে রয়েছি, কেউ কাছে নেই যে এক ফোঁটা মুখে জল দেয়; দুটো কথা বলি।···

কোটরগত চোখ ছাপাইয়া জল ঝরিল। ক্ষমা ঠাকরুণ মুখ বাঁকাইয়া কহিলেন, কি যে বলিস বউ ঠিক নেই, আমার ছিষ্টি সংসার বলে পড়ে রয়েছে, আমার কি কোথায়ও বসে থাকলে চলে? তা এক কাজ কর না কেন···তোর সেই বিধবা বোন্‌টাকে এখানে নিয়ে আয় না—বোন্ ত' বটে, আর ছিপতিও দুটো রাঁধা ভাত পায়, তোরও সেবা-শুশ্রূষা করে। বেশ কচি কচি লাউডগাগুলি হয়েছে বউ, আমি খানিকটা কেটে নেব?···

বধূ শীর্ণ হাতে চোখের জল মুছিয়া কহিল, নাও না পিসি, ও আর কেই বা রাঁধছে, আমি যে কদ্দিনে সেরে উঠব তার ঠিক নেই।

ক্ষমা ঠাকরুণ হাত বাড়াইয়া মাচার উপর হইতে লাউ-ডগাগুলি মুচড়াইয়া, ভাঙ্গিয়া যাহা পাইলেন, কোঁচড়ে করিয়া লইয়া মুখ বাড়াইয়া কহিলেন, আমি তা হ'লে চলনুম বউ, আস্তে আস্তে উঠে, পারিস তো দরজাটা ভেজিয়ে দে—

ক্ষমা ঠাকরুণ চলিয়া গেলেন। বধূ উঠিবার জন্য কোন চেষ্টাই করিল না, নিঃশব্দে পাশ ফিরিয়া শুইল।

তাহার বুকের ভিতর হৃদ্‌পিণ্ড তখন ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। একটী সন্তান, তাহার নারী-জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা—রক্তমাংসে গড়া একটি ক্ষুদ্র জীব, সজীব, প্রাণময়—তাহারই জন্য তাহার সমস্ত অন্তর উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে।

তবু ঈশ্বর কি নিষ্করুণ। সেই সন্তানকে একটি বারও দুই বাহু দিয়া ক্ষুধিত বুকের উপর চাপিয়া ধরিতে পারিল না, পাঁচ বার সে আসিল! গর্ভে তাহার মৃদু স্পন্দন সর্ব্বাঙ্গ দিয়া সে অনুভব করিল, তবু সে পরিপূর্ণ দেহে একটিবারও তাহার অতৃপ্ত শূন্য ক্রোড়ের উপর আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল না।

যে-শিশুটি আসিবে বলিয়া অপরিসীম আনন্দে প্রত্যেক বারই মধুমালা উল্লসিত হইয়া উঠিত, সে-আনন্দ নিঃশেষে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে ঠিক এমনি করিয়াই,—ব্যর্থতার গভীর-তম কন্দরে।

প্রথম যৌবনে যে নারী স্বামীর অজস্র সোহাগে পৃথিবীকে ভাবিয়াছিল সুধার সমুদ্র, এখন সেই সমুদ্র মন্থন করিয়া কেবলই উঠিতেছে সুতীব্র গরল।

মধুভাণ্ড বিষভাণ্ডে পরিণত হইয়াছে।

ঘরে ঘরে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালা হইয়া গিয়াছে, দূরে বুড়া-শিবের মন্দিরে বুঝি সন্ধ্যা-আরতি আরম্ভ হইয়াছে, শঙ্খ ও ঘণ্টার সুগম্ভীর ও সুমিষ্ট ধ্বনি হাওয়ায় ভর করিয়া ভাসিয়া আসিতেছে।

অন্ধকারে শ্রীপতি আসিতে আসিতে হোঁচট খাইল। ক্ষণপরে শ্রীপতির বিরক্তিসূচক কণ্ঠ শোনা গেল, আলোটাও কি উঠে জ্বালতে পারনি! বাড়ী ত নয়, যেন শ্মশানপুরী··· দেশলাই কোথায়?

মধুমালা জাগিয়াই ছিল, অতিকষ্টে কথা কহিল, কুলুঙ্গীতে আছে বোধ হয়।

শ্রীপতি অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া দেশলাই খুঁজিয়া বাহির করিল, তাহার পর লণ্ঠন জ্বালাইয়া তক্তা-পোষের একধারে বসিয়া পড়িল। স্ত্রীর জীর্ণ, কঙ্কালাবশেষ দেহের পানে চাহিতে তাহার বিরক্তি নিমেষমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গভীর সহানুভূতির উদ্রেক হইল, আস্তে আস্তে কহিল, এ বেলা কেমন আছ মধু?

স্বামীর এই সস্নেহ সম্বোধনে মধুমালার বুকের ক্ষোভ যেন উথলাইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে হাত বাড়াইয়া শ্রীপতির এক-খানি হাত চাপিয়া ধরিয়া সে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। পরাজয়ের বেদনা ও গ্লানিতে তার মুখের বাণীও যেন চিরতরে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। শ্রীপতি সরিয়া গিয়া মধুমালার মুখের দিকে চাহিয়া ব্যথিত কণ্ঠে কহিল, কেঁদে আর কি করবে মধু, আমাদের অদৃষ্টে সন্তান নেই। তুমি এবার সেরে ওঠ, তোমাকে আমি ক'লকাতায় নিয়ে যাব; সেখানে মেয়েদের হাঁসপাতালে তোমাকে ভর্ত্তি করে দোব; ক'লকাতায় না কি এসব চিকিচ্ছে খুব ভাল রকমেই হয়, অনেক বড় বড় ডাক্তার আছে, আমাদের আখড়ার হীরু খুড়ো বলেছিলেন।

মধুমালা আস্তে আস্তে সরিয়া গিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, ছেলের জন্যে আমি মোটেই দুঃখু করছি না গো; তোমার কি দশা হয়েছে বল ত? সময়ে দুটো ভাত জল পাও না, এমনি করে তোমার শরীর কদিন টিকবে?

শ্রীপতি ঝুঁকিয়া পড়িয়া একটু হাসিল, তা হলে তোমার ছেলের জন্যে সত্যিই দুঃখু হয় না মধু? আমার কিন্তু হয়, আমাদের ঘরে বেশী না হোক একটা এসেও যদি বাঁচত, তা হলে কেমন সুখের সংসার হত বল দেখি। অদৃষ্ট···

মধুমালা শ্রীপতির কোলের উপর মুখ গুজিয়া উচ্ছ্বসিয়া উঠিল, আর তুমি মনে করিয়ে দিও না, আমি ভুলে যেতে চাই; ওরা আমাদের ঘরে আসবে, এমন কি পুণ্য আমরা করেছি। কিন্তু তোমার জন্যে আমার যে বড় ভাবনা হয়। এমন করে কদিন বাঁচবে তুমি! বলিতে বলিতে সে আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

পত্নীর রুক্ষ শ্রীহীন মুখের দিকে চাহিয়া শ্রীপতি আদরের স্বরে কহিল, কি করতে চাও মধু?

মধুমালা অনেকক্ষণ কথা কহিল না। যে কথা সে স্বামীকে বলিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল, সে কথা বলিবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে তাহার প্রাণ অকস্মাৎ অজানিত শঙ্কায় শিহরিয়া উঠিল।

স্বামীর হৃদয়ের সবটুকু প্রেম সে এতদিন নিজেই সর্ব্বময়ী হইয়া উপভোগ করিতেছিল, আজ সে স্বেচ্ছায় সপত্নী আনিয়া যেন এতদিনকার সমস্ত বিঘ্ন, সমস্ত দুর্ভাবনাকে নিঃশেষে লুপ্ত করিয়া দিতে প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে।

যে সন্তান তাহার গর্ভে আসিয়া অকালে প্রাণ হারাইতেছে, হয়তো সপত্নীর গর্ভে সেই সন্তানই ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিবে, তাহার স্বামীর বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, তাহারও শ্বশুর-কুল প্রেত-লোকে এতটুকু পিণ্ডদান হইতে বঞ্চিত থাকিবে না। তাহার উপর সর্ব্বাগ্রে এই সংসারটি চলিবে সুশৃঙ্খলে—নির্ব্বিবাদে।

মধুমালা নিঃশব্দে অনুভব করিতে লাগিল—তাহার নিজের হাতে-পোঁতা করবী গাছের গোড়াটীতে বসিয়া যে নধর-দেহ শিশুটী খেলা করিতেছে, সে তাহার সপত্নী পুত্র নহে, তাহারই বহুদিনের তপস্যার ফল তাহার স্বামীর ঔরসজাত সন্তান···

মনের মধ্যে যে সুক্ষ্মতম ভয়টুকু মাথা তুলিয়া জাগিয়াছিল, আন্তরিক উল্লাসের তরঙ্গাঘাতে তাহা কোথায় নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গেল।···

মধুমালা শ্রীপতির মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আবদারের ভঙ্গীতে কহিল, আমাকে একটী সতীন এনে দেবে?

কথাটা শুনিয়া শ্রীপতি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বিবর্ণ, পাণ্ডুর মুখে এতটুকু হাসি ফুটাইয়া মধুমালা কহিল, না, সত্যি বলছি, হেস না তুমি। দেখতে পাচ্ছ তো আমার শরীরের অবস্থা, ভাল আমি আর হব না, আমার নিজ-হাতে-গড়া সংসারটীকে একজনের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে মরতে ইচ্ছে যায়। আর তা'ছাড়া, হয় তো সে এলে যা আমরা চাইছি তাই পাব; তার কোলে হয় তো আসবে ছেলে। ওগো লক্ষ্মীটী তুমি রাজী হও···আমার এই একটা সাধ মেটাও।

মধুমালার কণ্ঠস্বর আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ—মৃত্যুর তীরে দাঁড়াইয়াও তাহার সন্তানের ক্ষুধা মেটে নাই। চোখের জলে শ্রীপতির বাহুমূল সিক্ত হইয়া উঠিল।

শ্রীপতি মধুমালার দুটি চোখ মুছাইয়া সস্নেহে কহিল, এমন কথা তুমি মুখে আনতে পারলে মধু···আমি কি তাই চেয়েছি কোন দিন?

—না না, তুমি চাওনি,—আমি, আমি চাইছি। তোমার দুটী পায়ে পড়ি, এনে দাও তাকে, যে আমাকে কোলে ছেলে তুলে দিতে পারবে···

মধুমালা হাঁফাইয়া উঠিল। এক সঙ্গে এতগুলি কথা বলিয়া তাহার দারুণ শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইল। শ্রীপতি মূঢ়ের মত দুর্ভাগিনী পত্নীর রুক্ষ চুলগুলিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, অত অস্থির হ'য়ো না মধু; ভেবে দেখ। এর জন্যে সারাজীবন তোমাকে হয়তো অনুতাপ করতে হবে; যে সতীনের ভয়ে মেয়েরা শিউরে ওঠে—সেই সতীনকে সাধ করে তুমি ঘরে আনতে চাইছ। এর পরে তাকে সইতে পারবে তো?

মাথা নাড়িয়া মধুমালা মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, খুব পারব, তা ছাড়া আমি যদি তাকে হিংসে না করি, তা হ'লে সে কি নিয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে বল তো? আর, আমি আর ক'দিনই বা বাঁচব? আমার গণা দিন ফুরিয়ে এসেছে।

*

দিবারাত্র একই অনুরোধ উপরোধের জ্বালায় শ্রীপতি যেন অস্থির হইয়া পড়িল।

ইদানীং মধুমালার জ্বরটা সারিয়া গিয়াছে। তবে বড় দুর্ব্বল, দুইখানি শীর্ণ হাতে এটা ওটা গুছাইয়া রাখে, পাড়ার মেয়েরা মুখ টিপিয়া হাসে—বলে: মধু বোয়ের ঢং দেখে বাঁচি না, সতীনের জন্যে ঘর সাজাচ্ছেন, এলে যে তোরই কপালে তেঁতুল গুলবে লো!

মধু বউ মুখ তুলিয়া মৃদু হাসিয়া বলে, সেই জন্যেই তো আনছি তাকে। আচ্ছা ছোট খুড়ী, ন'পাড়ার বোসেদের একটী ডাগর মেয়ে আছে না? দেখতে শুনতেও নাকি মন্দ নয়, একটু চেষ্টা করে দেখ না খুড়ী, আর আমার সেজ মামীতো ওই বোসেদেরই ঘরেরই মেয়ে···

প্রতিবেশিনীরা বিস্ময়ে প্রায় নির্ব্বাক হইয়া যায়।

রাত্রে স্বামীর পার্শ্বে শয়ন করিয়া সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি চলে। কখনো শ্রীপতি বিরক্ত হইয়া উঠে, কখনো বা তন্দ্রার ঘোরে বলিয়া উঠে—আচ্ছা আচ্ছা হবে'খন, তুমি মেয়ে দেখো।

মুহূর্ত্তে মধুমালার বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠে।

দুই হাতে শ্রীপতির কণ্ঠ জড়াইয়া তাহার বুকে মুখ লুকায়। এই আশ্রয় সে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতে উদ্যত

হইয়াছে···কাহার প্রীত্যর্থে···নিজের অন্তরের, না স্বামীর, না প্রেতলোকের অধিবাসী মৃত পূর্ব্বপুরুষগণের?

মধুমালা ভাবিয়া পায় না, তথাপি তাহার অন্তর একটা ক্ষুব্ধ কামনায় সাগরের মত উদ্বেল হইয়া উঠে···দীর্ঘ রাত্রি তাহার নিদ্রাবিহীন অবস্থাতেই কাটিয়া যায়।

কাঁদিয়া কাটিয়া মধুমালা অবশেষে সপত্নীকে বরণ করিয়া গৃহে তুলিল। মেয়েটী সেই ন'পাড়ারই বোসেদের ঘরের মেয়ে! গায়ের রংটাই তাহার যা ময়লা, তা না হইলে এদিকে মেয়েটী দৈহিক সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়া, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য, নিটোল দেহ···তদুপরি উচ্ছ্বলিত যৌবন-রসে তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন টলমল করিতেছে।

পূর্ণাবয়বা নারী···দেহের কোনখানে যেন বিধাতা খুঁত রাখেন নাই। তবে এই অল্প বয়সেই মালতী যেন সকল বিষয়ে পাকিয়া গিয়াছে।

মধুমালা তাহাকে বরণ করিতে করিতে অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া দেখিল। দেখিয়া দেখিয়া তাহার চোখে যেন পলক আর পড়ে না।

শ্রীপতি আর মালতীকে মানাইয়াছে নাকি চমৎকার! তাহার পাশে নিজেকে কল্পনা করিতে গিয়া মধুমালা অকস্মাৎ নিজের অজ্ঞানেই একটী নিঃশ্বাস ফেলিল।

বরণ করিতে গিয়া হাত আর উঠে না, পা দুইখানা থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে, কণ্ঠ শুকাইয়া আসে।

কিন্তু যে মহাযজ্ঞের অগ্নিতে সে নিজেকে স্বহস্তে আহুতি দিয়াছে- সে যজ্ঞের ফল যে চাই। যে আসিয়াছে, সে যে তাহারই ঐকান্তিক ইচ্ছায়···এখন আর তাহাকে ফিরাইয়া দিবার কোন উপায়ই নাই।

দু'দিনেই মালতী নিজের সংসার বুঝিয়া লইল। মধুমালার হাত হইতে সমস্ত কাজ কাড়িয়া লইয়া আঁচলে চাবীর রিং বাঁধিয়া এধারে ওধারে ঘুরিয়া বেড়ায়। শ্রীপতির গলার সাড়া পাইলেই তটস্থ হইয়া ছুটিয়া যায়···

ভিজা গামছাটা, জলের গাড়ুটা, বসিবার জলচৌকী নিজের হাতেই পাতিয়া দেয়; ঘোমটার ফাঁকে তাহার উজ্জ্বল নয়ন দুইটী শ্রীপতির মুখের দিকে খঞ্জনের মত নাচিয়া বেড়ায়···

শ্রীপতি কুণ্ঠিত হয়; মধুমালার কাছে [illegible] অপরাধীর মত কিছুক্ষণ বসে, মধুমালা এসব দেখিয়াও দেখে না···ইহা ত হইবেই···শ্রীপতির অপরাধ কি? মধুমালা হাসিয়া বলে, রান্না বোধহয় হয়ে গেছে, যাও খেয়ে এসগে।

শ্রীপতির উঠিবার ইচ্ছাটা ষোল আনা থাকিলেও মুখে তাহা প্রকাশ পায় না, বলে, গলার স্বরকে খুব নীচু করিয়াই বলে: ছোট বউকে দিনকতক বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিলে হয় না? তোমার একা শুতে ভয় করে না মধু?

—পাগল হয়েছ? মধুমালা স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলে, কেন, ও তোমার কি করেছে বল তো। না না, মালতী আমায় খুব ভালবাসে গো, তুমি কিছু ভয় ক'রো না। আমার কিছু কষ্ট হয় না···

রাত্রে নিঃসঙ্গ শয্যায় শুইয়া কিন্তু মধুমালার চোখে ঘুম আসে না। পাশের ঘরে সপত্নীর কলহাস্য শোনা যায়—তাহাদের মিলনের উল্লাস-কূজনের মাঝে তার সমস্ত তৃষ্ণার্ত্ত আত্মা যেন চৈতন্য হারাইয়া বসে।

একটা সুগভীর শূন্যতায় তার অন্তঃস্থল যেন হাহাকার করিতে থাকে।···সেই অপরিপুষ্ট সন্তানগুলির বিদেহী আত্মা যেন সজীব হইয়া আশে পাশে শয্যার চারিধারে শুইয়া বসিয়া থাকে; মধুমালার দুই চোখ বিস্ফারিত হইয়া উঠে; কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়।

রাত্রিশেষে পাশের ঘরে যখন গুঞ্জনধ্বনি থামিয়া যায়, তখন মধুমালা কাশিতে কাশিতে খানিকটা রক্ত বমন করিয়া নির্জীবের মত মেঝের উপর লুটাইয়া পড়ে।

সুদীর্ঘকাল প্রতীক্ষার পর মালতী যেদিন সত্য সত্যই সন্তান-সম্ভাবিতা হইবার সংবাদটা চুপি চুপি শ্রীপতির কাছে প্রকাশ করিল, সেদিন মধুমালার আনন্দের আর সীমা রহিল না।

এ আনন্দ সে দুর্ব্বল শরীরে বহন করিবে কি করিয়া, কাল যে তাহার পূর্ণ হইয়া আসিতেছে···সেই চাঁদ মুখ সে কি মরিবার পূর্ব্বে দেখিতে পাইবে?

সংবাদটা রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হইল না।

পাড়ার মেয়েরা আসিয়া মালতীকে চুপি চুপি বলে, সতীনের কাছ থেকে একটু দূরে থাকিস বউ। জানিস তো মড়ুঞ্চে পোয়াতী···কত রকম মন্দ করতে পারে।

মালতী ভাল মন্দ কিছুই উত্তর দেয় না - কিন্তু সপত্নীকে ঔষধ পথ্য দিতে গিয়া তাহার অন্তঃকরণ দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে থাকে।

মধুমালা শীর্ণ হাত বাড়াইয়া মালতীকে কাছে টানিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলে, যার জন্যে তোকে আনা—সেই সাত রাজার ধন মাণিক আমাদের ঘরে আসছে মালতী - ছেলে হলে তাকে আমার কোলে একটীবার দিবি তো বোন? একটী বার কোলে নেব; তার মুখে চুমো দেব—তারপর তোর ছেলে তোকে ফিরিয়ে দোব। বল্ আমাকে একবার দেবি?

মালতী সবিস্ময়ে মধুমালার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে, কেমন একটা অজানা শঙ্কায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া যায়; কথার জবাব দিতে পারে না।

দিন, মাস পূর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মালতীর মাতা আসিয়া উপস্থিত। জামাতাকে আড়ালে ডাকিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলেন, এ অবস্থায় ওকে এখানে রাখা উচিত হয় না বাবাজী—সহরে তো হাসপাতালের অভাব নেই—সেখানে ওকে রেখে এস—নইলে কোন দিন কি হয়ে বসবে, তাতে আমার বাছার অমঙ্গল হবে!

শ্রীপতি কাঠের পুতুলের মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে। নিরপরাধিনী সরলা পত্নী মধুমালার মুখখানি চোখের উপর ভাসিয়া উঠে। শ্রীপতি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সহসা শিশুর মতই উচ্ছ্বসিয়া কাঁদিয়া ফেলে।

উঠানের এক পাশে করবী ফুলের গাছটা ফুলে ফুলে ছাইয়া গিয়াছে। গত রাত্রে মালতী একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে। মধুমালা উঠিতে পারে না, শুইয়া শুইয়াই সে মালতীর মাকে করুণ কণ্ঠে মিনতি করিয়া বলিতেছিল! আপনার দুটি পায়ে পড়ি মা, একবার ওকে এনে আমাকে দেখান। আমার বড় সাধ, মালতীর ছেলে হলে কোলে নেব। আমি ছোঁব না, শুধু দূর থেকে একবার দেখব।

মালতীর মা ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া সরিয়া গিয়া রুক্ষ কণ্ঠে খর খর কহিয়া ওঠেন; আবদার ত ভাল বাছা। নিজের সব কটাকে পেটে পুরেও নিশ্চিন্ত হন্ নি—আমার বাছার মন্দ করতে পারলেই মনস্কামনা পূর্ণ হয়। বলে, ডাইনের কোলে পো সমর্পণ। দিলুম আর কি ওর কোলে ছেলে! মরতে যাচ্ছে তবু মাগীর বজ্জাতিটুকু যায় না—

মধুমালার কর্ণে সে শব্দ কয়টা ছিটকাইয়া প্রবেশ করে। মাথার মধ্যে রক্ত যেন চন্ চন্ করিয়া উঠে—সে তো শব্দ নয়, বিষাক্ত বাণ; হৃদয়ের অভ্যন্তরে বিঁধিয়া তাহার কোমল বুক-খানিকে রক্তাক্ত করিয়া তুলিয়াছে।

মধুমালার দুই চোখ সহসা রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তার দেহের সমস্ত স্নায়ু অসহ্য বেদনায় ঝন্ ঝন্ করিতে লাগিল।

হৃদয়ের একান্ত আগ্রহে যে সন্তানের মুখ দেখিবার জন্য তাহার অন্তরাত্মা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল—অকস্মাৎ এই নিদারুণ অপমানে সে যেন লুকাইবার জন্য বিবর খুঁজিতে লাগিল।

কতক্ষণ পরে শ্রীপতি ফিরিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল - দেখিল, মধুমালা শয্যা ছাড়িয়া মাটীর উপর দুই হাতে বুক চাপিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

শ্রীপতি ছুটিয়া গিয়া তাহার লুণ্ঠিত মস্তক সযত্নে কোলের উপর তুলিয়া লইয়া ডাকিল, মধু, মধুমালা—চেয়ে দেখ, আমি এসেছি—

কিন্তু মধুমালা সে চিরাকাঙ্ক্ষিত স্বামীর আহ্বান শুনিতে পায় না—দুইটি স্নিগ্ধ দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়াও দেখে না।—

শিক্ষার উৎকর্ষ

…যদি দেখা যাইত যে পাশ্চাত্ত্যগণ তাঁহাদের জ্ঞান ও বিজ্ঞান দ্বারা তাঁহাদের সর্ব্বসাধারণের দুঃখ দূর করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহাদের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অথবা শিক্ষার উৎকর্ষ স্বীকার করিতে কোন আপত্তি হইতে পারিত না। কিন্তু যখন পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, তাঁহাদের জ্ঞান ও বিজ্ঞান দ্বারা তাঁহাদের নিজেদের দুঃখই দূরীভূত হইতেছে না, তখন যুক্তিসঙ্গত ভাবে ঐ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ কিছুতেই স্বীকার করা যায় না।…

বার্লিনে ছয় মাস

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

হ্যাম্বুর্গ বড় 'বেতো' জায়গা। প্রতি তৃতীয় লোকেরই কোন না কোন রকমের একটা বাতজাতীয় বেদনা থাকে। একটা বিশিষ্ট রকমের কাঁধের ব্যথার জন্য হামবুর্গ প্রসিদ্ধ। মিঃ গুপ্ত লাম্বেগোয় কষ্ট পাইতেছেন, মিঃ মল্লিক রাত্রে পা লেপের বাহির হইয়া যাওয়ায় কয়দিন বেদনায় ভুগিলেন। জায়গা অতি স্যাঁৎসেতে, কপালজোরে দুদিন যদি রোদ হইল, তবে তৃতীয় দিন "ধারাসারৈর্মহতী বৃষ্টির্বভূব।" লণ্ডনের মত সদাবৃষ্টিস্থানবাসী একটি ইংরেজের সঙ্গে একটা নাচের পার্টিতে আলাপ হইয়াছিল, পথে দেখা হইলে কথাপ্রসঙ্গে প্রকাশ হইল, তাঁহারও একটা বাতের বেদনা আরম্ভ হইয়াছে। দেশে থাকিতে একটা সায়াটিকার মত ব্যথায় ভুগিতাম, এখানে আসিয়া তাহা হুহু করিয়া বাড়িয়া সারাপিঠ, ছাইয়া ফেলিল। দিন কতক ডাক্তার স্যাণ্ড-বাথ, মাসাজ প্রভৃতি ব্যবস্থা করিলেন। এই স্যাণ্ড-বাথ বা বালুকা-স্নানট বেশ মজার জিনিষ। বিভিন্ন রকমের স্নানের জন্য একটা সরকারী ইন্‌ষ্টিটিউট আছে। মস্ত বাড়ী, বাহিরে প্রবল শীতে বরফে রাস্তা ঢাকিয়া গিয়াছে, কিন্তু এই বাড়ীর হলে ঢুকিলেই বৈশাখ মাসের গরম। টিকিট দেখাইলেই লোক আসিয়া হল হইতে একটি ছোট ক্যাবিনের মত কামরায় ঢুকায়, কামরায় একটা বিছানা, একখানা চেয়ার ও আয়না আছে। দু'মিনিটের মধ্যেই লোক আসিয়া একজোড়া কাঠের খড়ম ও একখানা প্রকাণ্ড তোয়ালে ঘরে রাখিয়া দরজা বন্ধ করিয়া টিকিটটি দরজায় আঁটিয়া দিয়া যায়। এই ক্যাবিনে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হইতে হয়। খানিক বাদে লোক আসিয়া খবর দিলেই খড়ম পায়ে দিয়া তোয়ালে ঘাড়ে ফেলিয়া স্নানের হলে যাইতে হয়। বাহিরের শীত হইতে আসিয়া সম্পূর্ণ নগ্ন দেহে এই ঘরের তাপ লাগাইতে বড়ই আরাম লাগে। হলে আসিয়া চাকাওয়ালা লম্বা একটা কাঠের চারকোণা টবে বসিতে হয়। টবে খানিকটা গরম বালি থাকে, তাহার উপর পা ছড়াইয়া ইজিচেয়ারের মত অর্দ্ধশয়নে বসিতে হয়। লোক আসিয়া বালি কোথাও উঁচু কোথাও নীচু করিয়া সরাইয়া বেশ আরামে বসাইবার ব্যবস্থা করে, তারপর টবটি ঠেলিয়া একটা প্রকাণ্ড ফানেলের নীচে লইয়া যায়। একটা হাতল ঠেলিলেই এই ফানেল হইতে ঝুর ঝুর করিয়া গরম বালি পড়িতে থাকে, এত গরম যে প্রথমটা একটু কষ্টই বোধ হয়। পরিচারক এই বালি সরাইয়া সরাইয়া বুক ও মাথা বাদে সারা শরীর ঢাকিয়া দেয়, ছয় ইঞ্চি পুরু বালির কবরে শরীর সমাহিত হয়। তারপর দুখানি কম্বলে টবটি বেশ আঁটিয়া ঢাকিয়া টবটি ঠেলিয়া হলের একপাশে লইয়া যায়। এখানে এই ভাবে কুড়ি মিনিট বালিচাপা অবস্থায় পড়িয়া থাকুন, পাশে অবশ্য আরও টবে অন্য লোক থাকে। গরমে কপালে দর দর ধারে ঘাম ছুটিতে থাকে, মধ্যে মধ্যে লোক আসিয়া ঝাড়ন দিয়া ঘাম মুছাইয়া দেয়। কুড়ি মিনিট পরে উঠিয়া তোয়ালে ও ঝাড়নের সাহায্যে শরীরের বালি ঝাড়িয়া ফেলিয়া একট গরম শাওয়ার বাথের নীচে দাঁড়াইয়া শরীরের ক্লেদ ধুইতে হইবে। তারপর একটা কবোষ্ণ জলের টবে আবার কুড়িমিনিট ডুবিয়া পড়িয়া থাকিতে হয়। এখান হইতে উঠিয়া গা মুছিয়া একটা গদিওয়ালা টেবিলের উপর গিয়া শুইলে, হাতে ভেসিলিন মাখিয়া একটা জোয়ান লোক আপাদমস্তক কুড়িমিনিট ডলাই-মলাই করে। মাসাজের পর ক্যাবিনে ফিরিয়া ডবল কম্বল জড়াইয়া আধ ঘণ্টাটেক পড়িয়া থাকিয়া কাপড়-চোপড় পরিয়া বাড়ী ফিরিতে হয় প্রত্যেক দিনের এই প্রক্রিয়ার খরচ চার মার্ক।

বাতে ভুগিয়া ঠিক করিলাম, এ শীতে আর হাম্বুর্গে থাকা ঠিক নয়। প্রোফেসার শ্টিং অপেক্ষাকৃত কম ঠাণ্ডা রাইনল্যাণ্ডে বা দক্ষিণ জার্ম্মাণীর সীমান্তে ফ্রাইবুর্গ ইউনিভার্সিটিতে যাইবার পরামর্শ দিলেন। আমি ঠিক করিলাম বার্লিন যাইব, ঠাণ্ডা বেশী হইলেও বার্লিন শুক্‌নো জায়গা। জার্ম্মান বন্ধুসমাজ বার্লিনের কথা শুনিয়া বিশেষ প্রসন্ন হইলেন না। কারণ, বার্লিন-হাম্বুর্গে বড় রেষারেষি। রাজনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি বিষয়ে বার্লিন বড় হইলেও বাণিজ্যলব্ধ টাকার জোরে হাম্বুর্গ সব বিষয়ে বার্লিনের সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলে। দুই

সহরের লোক পরস্পরকে দেখিতে পারে না, হাম্বুর্গওয়ালা বলে, বার্লিনের লোকের মন বড় ছোট ; বার্লিনওয়ালা বলে, হাম্বুর্গ বড় "ষ্টিফ্" জায়গা, লোকগুলা ভারী দেমাকী !

বার্লিনের ডয়েট্শে আকাডেমিকে বাসা ঠিক করিতে লিখিলে তাঁহারা একটা ঠিকানা পাঠাইলেন। শূব্রিং এখানে অধ্যাপক-পদ পাওয়ার আগে বার্লিনের ষ্টাট্‌-বিব্‌লিওটেকের Stantbibliothek, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় লাইব্রেরি) ওরিয়েণ্টাল বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহাকে ঠিকানাটা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, বার্লিনের কোন্ ষ্টেশনে নামিলে স্থানটা কাছে হইবে। শূব্রিং রাস্তাটা চিনিতে পারিলেন না, বলিলেন, 'আমার স্ত্রী বার্লিনের একটা কলা-ভবনে ছবি আঁকা শিখিতেন, রোজ বাসা হইতে অনেকটা দূরে বাসে করিয়া যাইতেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব।" পরদিন অধ্যাপক বলিলেন, রাস্তাটা ফ্রাউ-প্রোফেসরেরও অপরিচিত ; এবং পুরানো পুঁথির মত সযত্নে রক্ষিত তাঁহার ছাত্রাবস্থায় ব্যবহৃত প্রায় ত্রিশ বৎসরের পুরাতন একটি বার্লিনের ম্যাপ ব্যাগ হইতে বাহির করিয়া অতি সন্তর্পণে ছেঁড়া ভাঁজগুলি টেবিলে বিছাইয়া বার্লিনের প্রধান প্রধান স্থানগুলি ব্যাখ্যা করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ম্যাপটি এত প্রাচীন যে, আমার রাস্তাটা দূরে থাকুক, সে পাড়াটারও নামগন্ধ ম্যাপে পাওয়া গেল না।

পয়লা অক্টোবর বার্লিনে আসিলাম। হাম্বুর্গ হইতে এক্সপ্রেস ট্রেনে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার পথ। বার্লিনে ডাঃ সুধীর সেন ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল বিশ্বাস মহাশয়দ্বয় ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে মালপত্র "হিন্দুস্থান হাউসে" রাখিয়া ডাঃ সেনের বাসায় চা খাইলাম ও পরে বিশ্বাস মহাশয়ের সঙ্গে বার্লিনের প্রায় বাহিরে, সহরতলিতে "আণ্ডারগ্রাউণ্ডে" (জার্মান নাম উন্‌টেরগ্রুণ্ট্-বান Untergrund-bahn, সংক্ষেপে উ-বান্ U-bahn বলে) করিয়া গিয়া তিন দিন তাঁহার বাসায় থাকিয়া পরে বার্লিনের শার্লটেনবুর্গ পাড়ায় ঘর লইলাম। বিশ্বাস মহাশয়ও আমার বাসায় উঠিয়া আসিলেন। বিশ্বাস মহাশয় কলিকাতার অ্যানথ্রপলজির এম-এ, এখন বার্লিনে ডক্টরেটের জন্য পড়িতেছেন। ডাঃ সুধীর সেন লণ্ডনের বি-এস্‌সি ও জার্মানীর বন্-ইউনিভার্সিটিতে অর্থশাস্ত্রে ডক্টরেট লইয়াছেন।

যে পরিবারে ঘর লইলাম, তাঁহাদের নাম শ্মিট্ Schmidt। কর্তাটি ইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক। নিতান্ত দৈবাৎ ইঁহাদের কাছে ঘর লইতে গিয়াছিলাম। গিয়া শুনিলাম, অনেক ভারতীয় ইঁহাদের বাসায় থাকিয়া গিয়াছেন, এমন কি অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা পর্য্যন্ত। গৃহিণী গল্প করিলেন যে, বার্লিনের ভারতীয় ছাত্রমহলে এক সময়ে তাঁহাদের বাড়ী এত সুপরিচিত ছিল যে, কোন খবর না দিয়া লণ্ডন প্রভৃতি দূর দূর জায়গা হইতে ভারতীয় ছাত্রেরা রাত দুপুরে লটবহর লইয়া উপস্থিত হইত।

বৃহদায়তন এই বার্লিন সহর। সমগ্র ইউরোপের মধ্যে লোকসংখ্যায় লণ্ডনের পরই বার্লিনের স্থান। লণ্ডনের তুলনায় কিন্তু এখানকার রাস্তাঘাট খুব চওড়া ও পরিষ্কার। সহরের জার্মান নাম "বেরলীন"। দ্রষ্টব্য জিনিষ এখানে অনেক আছে। নানাবিষয়ক বৃহৎ বৃহৎ মিউজিয়াম, কাইজারের
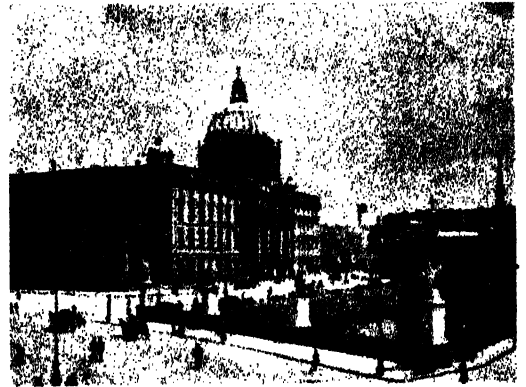
বার্লিনের রাজপ্রাসাদ।

রাজপ্রাসাদ, রাইশটাগ (Reichtag) বা পার্লামেণ্ট-গৃহ, টিয়ারগার্টেন (Tiergarten) নামক দুই মাইল লম্বা পার্ক, প্রভৃতি। এই পার্কের একপ্রান্ত হইতে আরম্ভ হইয়া মাইলখানেক লম্বা একটা সুপ্রশস্ত রাস্তা কাইজারের প্রাসাদ পর্য্যন্ত গিয়াছে, ইহার নাম উণ্টের ডেন্ লিণ্ডেন (Unter den Linden)। এটি বার্লিনের "রাজপথ"। বড় বড় রাজনৈতিক প্রোসেশন বা মিলিটারি মার্চ্চ প্রভৃতি সব এ রাস্তায় হয়। কাইজার এ রাস্তার শোভা নষ্ট হইবে বলিয়া ইহার উপর ট্রামের লাইন বসাইতে দেন নাই। আশেপাশের রাস্তাগুলিতে ট্রাম চলে, উন্টার-ডেন-লিণ্ডেনে শুধু বাস যায়। এক জায়গায় এই রাস্তার উপর দিয়া মাত্র আড়াআড়িভাবে ট্রামের লাইন যাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু কাইজারের

হুকুমে রাস্তার উপর দিয়া না গিয়া, নীচে দিয়া সুড়ঙ্গ বানাইয়া ট্রামের লাইনকে রাস্তা পার হইতে হইয়াছে। এই রাস্তার দুই পাশে বড় বড় দোকান, টমাস কুক, অ্যামেরিকান এক্স্প্রেস প্রভৃতি ভ্রমণ-এজেন্সির বিদেশীয় অ্যাম্বাসাডরদের আপিস প্রভৃতি। এই রাস্তার পাশেই ভিল্‌হেল্‌ম্‌ষ্ট্রাসে (**Wilhelmstrasse**), এখানকার ডাউনিং ষ্ট্রীট,—প্রেসিডেন্টের বাড়ী, চ্যান্সেলরের অপিস, ফরেন অফিস প্রভৃতি। এ রাস্তার অপর প্রান্তে কাইজারের প্রাসাদ। অতিবৃহৎ বহু আঙ্গিনাযুক্ত এই প্রাসাদের এক অংশ ঠিক আগের

বার্লিনের রাইশটাগ বা পার্লামেণ্ট-গৃহের প্রবেশদ্বার।

কাইজারি আমলের মত সজ্জিত রাখা হইয়াছে। বাদশাহী জাঁকের অভাব নাই, ভোজনশালাটি পুরানো আমলের ষ্টেট-ডিনারের কায়দায় সাজান রহিয়াছে। বৃহৎ লম্বা টেবিলের চারিপাশে মখমলের লাল গদিআঁটা চেয়ার, সামনে রূপার তৈজসপত্র ঝকঝক করিতেছে। কাইজারের বসিবার ঘর, লিখিবার ঘর, লাইব্রেরী প্রভৃতি ঘরগুলি সাবেকি ভাবেই রাখা হইয়াছে। যে টেবিলে বসিয়া তিনি বিগত মহাযুদ্ধের হুকুমনামা সহি করিয়াছিলেন, তাহাতে উক্ত মর্ম্মে একটি তাম্রফলক আঁটা আছে। এ রাস্তার পাশে একটি ছোট বাড়ীতে ওয়ার-মেমোরিয়াল ; অষ্টপ্রহর বন্দুকধারী শান্ত্রী পাহারা দিতেছে, রোজ বেলা এগারটার সময় লণ্ডনের হর্স-গার্ড-প্যারেডের অনুকরণে এখানে শান্ত্রীবদল হয়, রোজ জার্ম্মান মিলিটারির goose-step অভিনয় দেখা যায়। জার্ম্মান goose-stepকে কেহ যেন আমাদের কাব্যের ললিত "রাজহংস-গতি"র অনুরূপ কিছু মনে করিবেন না, আসলে ইহা অতি রৌদ্ররস-প্রধান ব্যাপার। ইউনিভার্সিটি ও ষ্টাট-বিবলিওটেকও (Staat-bibliothek, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় লাইব্রেরী) উণ্টার-ডেন-লিণ্ডেনের পাশে। ষ্টাট-বিবলিওটেক জগৎ-প্রসিদ্ধ লাইব্রেরী, এত বড় যে, বইএর ক্যাটালগ রাখিতেই দুখানা হলের প্রয়োজন হইয়াছে। এখানকার গোলাকার রীডিংরুমে প্রত্যেক চেয়ারের সামনে একটা লম্বা টেবিল, প্রত্যেক টেবিলের উপর একটা সুদৃশ্য নীল-ডোমওয়ালা বাতি। হলটি এত বড় যে, রাত্রে প্রত্যেক টেবিলের উপর যখন বাতি জ্বলিয়া উঠে, তখন মনে হয় যেন একটা মেলায় আসিয়াছি বড় রীডিংরুম ছাড়া লাইব্রেরীটি বহু বিভাগে বিভক্ত। বড় রীডিংরুমে খোলা আলমারিতে বহু রেফারেন্স্ বই, বিশিষ্ট বিভাগগুলিতে খোলা আলমারিতে সাধারণ প্রয়োজনের বই, ভিতরে সেই বিষয়সংযুক্ত বিশিষ্ট বই। যে কোনও বিভাগে বসিয়া ইচ্ছামত সব বই নিজের টেবিলে আনাইয়া লওয়া যায়। কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে বই আনাইতে প্রায় আধঘণ্টা এক ঘণ্টা দেরি করিতে হয়, এখানে কিন্তু নিজ বিভাগীয় পুঁথি প্রভৃতি বিশিষ্ট জিনিষ না হইলে শ্লিপ লিখিয়া বই আনিতে অন্ততঃ চব্বিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হয়! লাইব্রেরিতে বসিয়া কাজকর্ম্মের খুব সুবিধা, বাড়ীর ভিতরেই ছোট ও শস্তা রেস্তরাঁয় বসিয়া খাওয়াদাওয়া সারিয়া সারাদিন কাজ করা যায়। গোলমাল, গল্প, আড্ডা একেবারেই নাই, এজন্য শাসকেরও প্রয়োজন হয় না। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরীর অবিশ্রান্ত গণ্ডগোল ও ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর নিদ্রাসেবীদের কথা মনে পড়িল। কর্ত্তৃপক্ষ এখানে অতি বিনীত, সদা সাহায্যদানে প্রস্তুত। আমার একটি জার্নালে একটি প্রবন্ধ দেখিবার প্রয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু প্রবন্ধটি ঠিক কোন্ সংখ্যায় বাহির হইয়াছিল তাহা জানিতাম না। বিভাগীয় ডিরেক্টারকে বলায় তিনি সহকারীকে সঙ্গে দিয়া আমাকে উপরে পাঠাইলেন, সহকারী

পনের বৎসরের জার্নাল ঘাঁটিয়া প্রবন্ধটি বাহির করিয়া দিলেন ও পরে লাইডেন-ইউনিভার্সিটি হইতে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত সেই প্রবন্ধসংক্রান্ত অন্য একটি বইও নিজেই দিয়া গেলেন। ওরিয়েন্টাল বিভাগের সাময়িক পত্রিকার আলমারিতে ভারতীয় পত্রিকার মধ্যে মান্দ্রাজের ইণ্ডিয়ান রিভিউ ও কলিকাতার মডার্ণ রিভিউ ও ইণ্ডিয়ান হিসটরিক্যাল কোয়ার্টারলি দেখিলাম। শেষোক্ত কাগজখানির এদেশে পণ্ডিতমহলে সুনাম হইয়াছে।

বার্লিন ইউনিভার্সিটিও অতি বৃহৎ ব্যাপার। ইউরোপে এত বড় ইউনিভার্সিটি আর নাই। সারা জার্ম্মানীর পণ্ডিতাগ্রগণ্যেরা এখানকার অধ্যাপক-পদ লাভ করেন। ল্যুডার্স (Luders) এখানকার ভারত-তত্ত্বের অধ্যাপক। সাধারণতঃ অন্য ইউনিভার্সিটীর খ্যাতনামা বর্ষীয়ান্ অধ্যাপকেরা বার্লিনের প্রোফেসার হইয়া আসেন, কিন্তু ল্যুডার্স অল্প বয়সেই প্রতিভাবলে অন্য ইউনিভার্সিটির লেক্‌চারার পদ হইতে একেবারে বার্লিনের আসন পান এবং নিজ পাণ্ডিত্যে ইনি যে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাতে সকলেই বলেন যে, তাঁহার নিয়োগ সার্থক হইয়াছে। ভারততত্ত্ব-গবেষকদের মধ্যে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ল্যুডার্সের মহাখ্যাতি। ইঁহার বয়স পঁয়ষট্টি পার হইয়াছে, গত যুগের ভারত-তাত্ত্বিক জার্ম্মান মহারথীদের মধ্যে ইনিই শেষ ব্যক্তি এখনও জীবিত আছেন। দেখা করিবার জন্য টেলিফোন বই খুলিয়া দেখিলাম আমার রাস্তারই অল্পদূরে ল্যুডার্সের বাড়ী। সে কথা আর বলিলাম না, অধ্যাপক প্রাশিয়ান অ্যাকাডেমিতে দেখা করিতে বলিলেন। প্রাশিয়ান অ্যাকাডেমি বিলাতি "রয়েল সোসাইটি"র সমতুল্য জার্ম্মান প্রতিষ্ঠান, ল্যুডার্স ইহার অন্যতম স্থায়ী সেক্রেটারি। রবীন্দ্রনাথ গতবার যখন জার্ম্মানীতে আসেন, তখন বার্লিন-ইউনিভার্সিটির পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভ্যর্থনার জন্য যে সভাধিবেশন হয়, সেই সভায় ল্যুডার্স সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ইনি জার্ম্মান গবর্ণমেণ্টের কাছে সম্মানসূচক "গেহাইম্‌রাট্" (Geheimrat) উপাধিও লাভ করিয়াছেন। অন্য প্রোফেসাররা এদেশে "হের্ প্রোফেসর" বলিয়া অভিহিত হন, কিন্তু ল্যুডার্সকে "হের্ গেহাইম্‌রাট" বলিয়া সম্বোধন করিতে হয়। বার্লিনের প্রোফেসর, প্রাশিয়ান অ্যাকাডেমির সেক্রেটারি, বিশ্ববিখ্যাত দুর্দ্ধর্ষ পণ্ডিত, গবর্ণমেণ্টের গেহাইম্‌রাট-উপাধি প্রভৃতি কারণে ল্যুডার্সের এদেশে খুব উচ্চপদ। ল্যুডার্স যখন শান্তিনিকেতনে গিয়াছিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে যেরূপ সম্ভ্রম দেখাইয়াছিলেন, তাহা লাট-বেলাটের ভাগ্যেও ঘটে না।

ল্যুডার্স এ সেমেষ্টার ঋগ্বেদ ও "কাব্যাদর্শ" পড়াইলেন এ দেশে অধ্যাপকদের পড়ানকে "পড়া" ও ছাত্রদের পড়াকে "শুনা" বলে। "পড়াইব" না বলিয়া অধ্যাপকেরা নোটিশ দেন "আমি এ সেমেষ্টার অমুক অমুক বিষয় পড়িব", "পড়িতেছি" না বলিয়া ছাত্রেরা বলে "এ সেমেষ্টার আমি অমুক প্রফেসারের কাছে বা অমুক বিষয় শুনিতেছি।" আমার জন্য ল্যুডার্স বিশেষ করিয়া গুপ্ত-যুগের অনুশাসন-লিপিগুলিও "পড়িবার" ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। জার্ম্মান পণ্ডিতদের মেথড বা পদ্ধতি
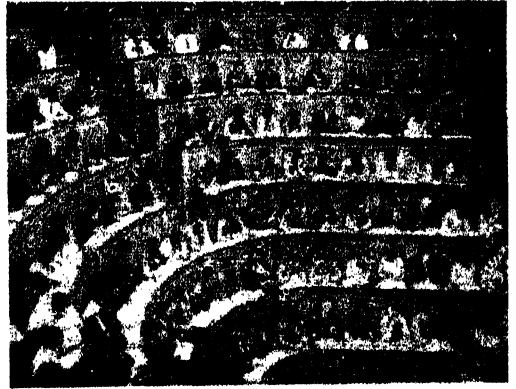
বার্লিন-ইউনিভার্সিটির একটি লেকচার-থিয়েটার।

বিখ্যাত, তাহার উপর ল্যুডার্সের পড়াইবার মেথড বা পদ্ধতি এত বিশিষ্ট যে, ভারত-তত্ত্ব-গবেষক জার্ম্মান ইউনিভার্সিটির ছাত্রেরা ল্যুডার্সের কাছে কিছুদিন পড়িতে পারিলে বিশেষ গৌরব বোধ করে। ঋগ্বেদের কয়েকটি অতি দুরূহ অংশ এবারকার পাঠ্য ছিল। আচার্য্য সায়ণের ভাষ্য পড়িয়া থাকিল, গেল্‌ট্‌নার প্রভৃতি বড় বড় জার্ম্মান বৈদিক পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা কোথায় উড়িয়া গেল, ল্যুডার্সের নিজ প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যে কত দেশের ভাষাতত্ত্ব, কত দেশের পুরাবৃত্তের সাহায্যে প্রাচীন ঋষিদের অধুনা দুর্ব্বোধ্য বাণী যেন কতকটা বোধগম্য হইল। সায়ণের ভাষ্য অনেক স্থলে যে কাল্পনিক বা পোষাকী পরম্পরাগত ব্যাখ্যা, তাহা অবশ্য পণ্ডিত সমাজে সর্ব্ববাদিসম্মত। ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া বিচার করিলে সায়ণের অনেক ব্যাখ্যা, এমন

কি সম্পূর্ণই ভুল বলিতে হইবে। সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে কি কি অর্থে কোন শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, ব্রাহ্মণ-উপনিষৎ যুগের মধ্য দিয়া পরবর্ত্তী সংস্কৃত-প্রাকৃত-পালি সাহিত্যেই বা তাহার কি পরিণতি হইয়াছে, অন্য দেশের ভাষায় বা ভাবে তাহার কি ছায়া আছে—এই সব লইয়াই ল্যুডার্সের মেথড। ল্যুডার্সের ঋগ্বেদের অতি দুর্ব্বোধ্য অংশগুলির ব্যাখ্যা আমাদের কাছে সন্তোষজনক হইলেও ল্যুডার্স বলিলেন যে, মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহার ব্যাখ্যা একটা প্রস্তাব মাত্র, কারণ প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া এ যুগের পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ঋগ্বৈদিক গবেষণা সত্ত্বেও খোলাখুলি স্বীকার করিতে হইবে যে, এসব জটিল স্থানের ব্যাখ্যা সায়ণাচার্য্যের যুগে যেমন, এখনও তেমনি অন্ধকারাবৃত আছে। এক তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের নিয়মাবলী আবিষ্কার ছাড়া এ বিষয়ে আমরা সায়ণের চেয়ে একপাও বেশী আগাইতে পারি নাই। ল্যুডার্স "কাব্যাদর্শ" এমন ভাবে আলোচনা করিলেন যে, তাহাতে বস্তুতপক্ষে প্রায় সারা কাব্যসাহিত্য ও অলঙ্কারশাস্ত্র পড়া হইয়া গেল। এ দেশের এই তুলনামূলক আলোচনা-প্রণালী আমাদের দেশের কলেজি শিক্ষায় এখনও তেমন প্রসারলাভ করে নাই। আমরা যখন শেক্স্‌পীয়ার পড়ি, তখন যে বইটা পড়ি, শুধু সেইটারই নোট মুখস্থ করিয়া মরি। আর এরা যখন "রঘুবংশ" পড়ে, তখন পড়ানর কায়দায় সমগ্র কালিদাস-গ্রন্থাবলী, এমন কি মোটামুটিভাবে সারা সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় হইয়া যায়। গুপ্ত-ইন্‌স্ক্রিপশন পড়িতেও ল্যুডার্সের তুলনা-শক্তির চমৎকার পরিচয় পাইলাম। যে সব শব্দের অপ্রচলিত অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে, সেগুলির ব্যাখ্যা করিতে কত না লিপি কত না গ্রন্থের উল্লেখ হইল। পাথরে বা তাম্রফলকে উৎকীর্ণ সেকেলে অক্ষর অন্য পণ্ডিতেরা যেভাবে পড়িয়া শব্দ-বিশেষের অর্থভেদ করিতে পারেন নাই বা কদর্থ করিয়াছেন, ল্যুডার্স তাঁহার প্রাচীন ভারতীয় লিপিভেদের অদ্ভুত জ্ঞানে সেই অক্ষর বা চিহ্নের স্থানে অন্য শব্দ পড়িয়া (যদিও তাঁহার একটি চক্ষু অন্ধ) শব্দের সুন্দর সরল ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন। প্রস্তর বা তাম্রলিপির অনেক স্থান একেবারে অস্পষ্ট হইয়া যাওয়ায়, সেখানে শুধু ছন্দের মাত্রা ধরিয়া পণ্ডিতদের সম্পূর্ণ আন্দাজি শব্দ বা শব্দাবলী অনুমান করিতে হইয়াছে। এসব স্থানেও ল্যুডার্স-প্রস্তাবিত শব্দাবলী পৌর্ব্বাপর্য্যবিচারে এমন সহজ ও স্বাভাবিক হইল যে, তাহার সঙ্গে তুলনায় ইংরেজ পণ্ডিত ফ্লীট সাহেবের অনুমান ছেলেমানুষি বোধ হইল। ল্যুডার্সের সংগঠন-কল্পনা বড়ই সুন্দর। গোয়ালিয়রের কাছে পাওয়া অনুশাসনে "গোপালিপুর" গ্রামের নাম পাইয়া এবং গয়ার কাছে "বরাবর"-পাহাড়ের গায়ের মন্দিরস্থ দেবমূর্ত্তির পাদদেশে উৎকীর্ণ প্রশস্তিতে "প্রবরগিরিগুহা-সংশ্রিতং বিশ্বমেতৎ" এই পদ পাইয়া গোপালিপুর7গোয়ালিয়ুর7 গোয়ালিয়র এবং প্রবর7পরবর7বরবর7বরাবর—এই যে ইঙ্গিত তিনি আবিষ্কার করিলেন, তাহা অতি সুস্পষ্ট ও যুক্তি-যুক্ত মনে হইল, হয়ত ইহা সকলের মাথায় আসিত না।

ল্যুডার্স-পত্নীও "ডাক্তার"-উপাধি ধারিণী ভারত-তত্ত্ববিৎ। তিনিও এমন গবেষণাপূর্ণ লেখা প্রকাশ করিয়াছেন যে, আচার্য্যাণী আচার্য্যাও হইতে পারিতেন। ল্যুডার্স মাস কয়েকের মধ্যেই অবসর গ্রহণ করিবেন, তাঁহার জায়গায় কে বার্লিনের সংস্কৃতাধ্যাপক হইবেন, তাহা লইয়া খুব জল্পনা চলিতেছে। দীর্ঘপ্রস্থদেহ, স্থূলোদর, কর্কশকণ্ঠ এই মহামেধাবী "টিপিক্যাল" জার্ম্মানপণ্ডিত পাণ্ডিত্যরণক্ষেত্রে অতিদুর্দ্ধর্ষ, কিন্তু অন্যত্র কত বিনয়ী। সন্ধ্যার সময় ৬টা হইতে ৮টা ইনি ক্লাস করিতেন, কিন্তু অন্য প্রফেসারদের ১৫ মিনিটের জায়গায় ইনি বরাবর ২০ মিনিট দেরি করিয়া ক্লাসে আসিতেন। একদিন আমরা প্রস্তাব করিলাম, তাঁহার সঙ্গে ফটো তুলিব, ঠিক হইল অমুক দিন কাইজারের প্রাসাদের আঙ্গিনায় বেলা ১১টায় ছবি তোলা হইবে। সেদিন বেলা দশটায় তাঁহাকে ফোন করিয়া আবার মনে করাইয়া দিলাম। তিনি বলিলেন, ঠিক সময়ে আসিবেন। আমরা জানুয়ারীর বরফের মধ্যে প্রাসাদের সামনে দাঁড়াইয়া ছটফট করিতে লাগিলাম, কিন্তু এমনিই অধ্যাপকি অভ্যাস যে ল্যুডার্স যখন আসিলেন, তখন ঠিক ১১টা ২০ মিনিট। এখানকার "প্রাচ্য-সমিতি"র আয়োজনে ল্যুডার্স একদিন ভারত সম্বন্ধে একটি পাবলিক বক্তৃতা দিলেন। ইউনিভার্সিটিতে দেওয়া কোন পাবলিক-বক্তৃতায় এত ভীড় দেখি নাই। ভারত সম্বন্ধে যেদিক দিয়াই যার এতটুকু অনুসন্ধিৎসা বা আগ্রহ আছে, এমন শ্রোতায় হল ভরিয়া গিয়াছিল, বৃদ্ধ প্রফেসাররা বা তরুণ যুবকরা সবাই ল্যুডার্স কি বলেন শুনিতে ব্যগ্র।

আজকাল কোন ইউনিভার্সিটিতেই সংস্কৃত পড়িবার ছাত্র বেশী হয় না। লুডার্স বলিলেন, আগে সব ইউনিভার্সিটিতেই সংস্কৃত বা ভাষাতত্ত্ব পড়াইবার জন্য সংস্কৃতবিদের দরকার হইত, এখন সব জায়গা ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে, চাকরীর বাজার মন্দা বলিয়া ছাত্র আর তত হয় না। এ সেমেষ্টার লুডার্সের সাত জন ছাত্র ছিল। তা ছাড়া আরও দুজন মধ্যে মধ্যে আসিতেন, একজন ভাষাতত্ত্ব বিভাগের 'ডাক্তার' উপাধিধারিণী একটি পাগলাটে মধ্যবয়সী মহিলা, অন্যজন হাম্বুর্গে সংস্কৃতে 'ডাক্তারি' লইয়া ভারত বেড়াইয়া আসিয়াছেন, এখন বার্লিনে সহকারি অধ্যাপকের চাকরির চেষ্টায় আছেন। সাতজন পুরা ছাত্রের মধ্যে দুটি মহিলা ছিলেন। একটি যুবতী, বেসলার্ড হইতে সংস্কৃতে 'ডাক্তারি' লইয়া এখন এখানে পড়িতেছেন, ইনি ভারতীয়দের জার্ম্মানও পড়ান। ভাষাতত্ত্ব বিভাগের পাগলাটে প্রৌঢ়াটি এই যুবতীকে দুচক্ষে দেখিতে পারিতেন না। যুবতীর সকল গতিবিধি কার্য্যকলাপের উপর কড়া নজর রাখিতেন, যুবতী কাহারও সঙ্গে কথা বলিলে আড়ালে দাঁড়াইয়া খানিকক্ষণ শুনিয়া হঠাৎ একটা অছিলা করিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া গল্পে বাধা দিতেন। অপর ছাত্রীটি তরুণী সাজিয়া থাকিতেন। একদিন ইনি আমাদের ইণ্ডো-গেরমানিশেস্ (Indo-Germanisches) সেমিনারে টেবিলে আমার সামনে বসিয়া ইউনিভার্সিটি সংক্রান্ত একটা ফর্ম ভর্ত্তি করিতেছিলেন। ফর্মে একজায়গায় জন্মসাল লিখিবার প্রয়োজন হইলে যুবতী লিখিলেন ১৯০১, লিখিয়াই মনে পড়িল সালটা তো নেহাৎ সেদিনের কথা নয়, পাছে প্রকাশ হইয়া যায়, এজন্য সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বক্রকটাক্ষপাতে দেখিলেন, আমি দেখিতেছি কি না। আমি অন্যত্র মনঃসংযোগ করিয়া না দেখিবার ভাণ করিলেও স্ত্রীবুদ্ধিতে যুবতী বুঝিলেন, রহস্য ফাঁক হইয়া গিয়াছে, চট করিয়া কাগজ উল্টাইয়া ফেলিয়া স্থান ত্যাগ করিলেন। বাকি পাঁচজন ছাত্রের মধ্যে আমরা দুজন ভারতীয় ছিলাম। অপর ভারতীয়টি দক্ষিণ ভারতীয় যুবক, টোলে পড়া পণ্ডিত, ইংরেজী ও জার্ম্মান মোটামুটি জানেন, কিন্তু সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্য কণ্ঠস্থ। ইঁহার পুরা নাম "মহোপাধ্যায়" "শাস্ত্রাচার্য্য" কোডাভুরু (এটি গ্রামের নাম) অনন্তরাম ভট্ট-ভারদ্বাজ। ভরদ্বাজটি গোত্রনাম, সংক্ষেপে ইনি ভট্ট-নামেই পরিচিত, জার্ম্মানরা বলিত হের ভাটা। অনর্গল সংস্কৃত বলিতে পারেন, অসাধারণ বাচাল নিরন্তর সকলের সঙ্গে তর্কে লাগিয়া আছেন. এমন কি লুডার্সের কোন মন্তব্য ইঁহার সনাতন সংস্কারে মনঃপূত না হইলে সম্ভব অসম্ভব নানা রকম প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া তর্কে লাগিয়া যাইতেন। আমি অনেক ইসারা করিয়া নিষেধ না করা পর্য্যন্ত ইনি লুডার্সের কাছে বাগ মানিতেন না, শেষে যখন বুঝিলেন ক্লাশে তর্ক করা অশোভন, তখন চুপ করিয়া থাকিতেন বটে, মনের দুঃখ রোধ করিতে পারিতেন না, আমার কাছে গোপনে শ্লিপ চালান করিতেন "এরা সায়ণকে হত্যা করিল!" "বেদ লইয়া এরা ছেলে-খেলা করিতেছে!" ইত্যাদি। ভট্ট-পণ্ডিত আসলে ট্যুবিংগেন-ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক হাউয়ারের ছাত্র
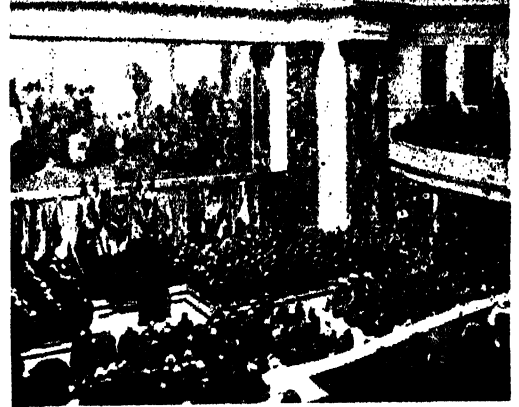
বার্লিন ইউনিভার্সিটির রেকটর-পরিবর্ত্তন উৎসব।

মাত্র, এ সেমেষ্টারে লুডার্সের হাওয়া লাগাইতে আসিয়াছেন অধ্যাপক হাউয়ার প্রথম জীবনে মিশনারী হইয়া ভারতে গিয়াছিলেন, সেখানে গিয়া সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় সভ্যতার পরিচয় পান। ফলে মিশনারী-জীবন ছাড়িয়া দিয়া সংস্কৃতের চর্চ্চায় জীবন কাটাইলেন এবং এখন নব্য জার্ম্মাণীর ধর্ম্মসংস্কার-আন্দোলনের ইনি একজন প্রধান পাণ্ডা, খৃষ্টধর্ম্ম-বিরোধীদের মধ্যে একজন অতি অগ্রগণ্য। তৃতীয় ছাত্রটি পর্ত্তুগীজ, বোম্বাই অঞ্চলে যুবা রোমান-ক্যাথলিক মিশনারী। লোকটি খুব উৎসাহী, সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়া সংস্কৃত পড়িতেছেন, "হনুমান-নাটক"-এর উপর থীসিস লিখিয়া বার্লিনের ডাক্তার হইবার চেষ্টায় আছেন। একদিন ক্লাসে ইনি একটা জায়গার অনুবাদ করিয়াছিলেন, অনুবাদ লুডার্সের মনোনীত হইল না,

ইনি যে অর্থ ধরিতে চাহিয়াছিলেন সেখানে লুডার্স অন্য অর্থ ধরিলেন। পাদ্রী খানিকক্ষণ তর্ক করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। খানিক পরে আবার একটা পদের ব্যাখ্যায় আসিয়া পাদ্রীর ধরা অর্থই যেন কল্পিত হইয়াছে এরূপ মনে হইল, পাদ্রী উত্তেজিত হইয়া চক্ষু কপালে তুলিয়া লুডার্সের সামনে তর্জ্জনী খাড়া করিয়া উষ্ণ ভাবে সাবেগে বলিলেন, "দেখছেন! দেখছেন হের্ গেহাইম্রাট!" গেহাইম্রাট একটু দ্বিধায় পড়িলেন, মাথা নীচু করিয়া আধ মিনিট ভাবিলেন, ধীরকণ্ঠে পাটার্সবুর্গ ডিকশনারি নামাইতে বলিলেন, অবশেষে সাব্যস্ত হইল যে, পাদ্রীর অর্থ অসঙ্গত নহে। চতুর্থ ও পঞ্চম ছাত্রদ্বয় জার্ম্মান ছোকরা। ইহাদের একজন অত্যন্ত চঞ্চলস্বভাব ও অস্থির প্রকৃতি, ছেলেমানুষী অনেক রকম, তর্কপ্রবণতা প্রায় ভট্টাচার্য্যের কাছাকাছি। এদেশে প্রোফেসাররা দেখি নিকট-ছাত্রদের মতিগতি ভাবভঙ্গীর পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর রাখেন। বকাবকি করিবার অবশ্য এদেশে কখনই কোথায়ও প্রয়োজন হয় না, কারণ কাণ্ডজ্ঞানটা কোনলোকেরই আমাদের দেশের মত ঢিলা নয়, বিশেষতঃ যাহার সহিত যে বিষয়ে যতদূর যাওয়া উচিত, তাহার মাত্রা কেহ অতিক্রম করে না। কাজেই ঘোড়ার নিজের সুবুদ্ধি আছে বলিয়া চাবুকের ব্যবহার না করিয়াও চালক হালকা লাগামেই দুষ্ট ঘোড়াকে বশ করিতে পারে। লুডার্স এ তরুণ ছাত্রটিকে লইয়া মধ্যে মধ্যে গুরুগম্ভীর রহস্য করিতেন, একটু আধটু উস্কাইয়া দিয়া ক্লাসকে হাসাইতেন। একদিন ইনস্ক্রিপশনে পড়া গেল যে, সভাকবি রাজার বীরত্বের বর্ণনায় বলিতেছেন "যাঁহার অতি-আকৃষ্ট ধনুর টঙ্কারে কুরর পাখীর নাদধ্বনি শুনা যাইত—অত্যাকৃষ্টাৎ কুরর-বিরুত-স্পর্দ্ধিনঃ শার্ঙ্গযন্ত্রাৎ, বেগাবিদ্ধাৎ" ইত্যাদি। এই ছাত্রটি তর্ক আরম্ভ করিলেন যে "শার্ঙ্গযন্ত্র" শব্দে শুধু "ধনু" কেন বুঝিব? যখন "যন্ত্র" শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে, তখন তীর ছুঁড়িবার একটা বিশিষ্ট রকমের জটিল যন্ত্র ছিল নিশ্চয় বুঝিতে হইবে, ইত্যাদি। সেমিনারের প্রোফেসারের সঙ্গে এত তর্ক করা এদেশের রীতি নয়, তবু যে সকলের এত তর্কপরায়ণতা দেখা যাইত, তাহার কারণ লুডার্সের নামডাক। সকলেরই মনে মনে লুডার্সের মত পণ্ডিতের কাছে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছাটা বলবতী ছিল।

এখানে ওরিয়েন্টালিশেস সেমিনারে দু'জন ভারতীয় লেকচারার আছেন, ডাঃ ব্যানার্জি ও পণ্ডিত তারাচাঁদ রায়। ডাঃ ব্যানার্জি ভারতীয় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সমস্যা সম্বন্ধে এবার "পড়িতেছেন"; পণ্ডিত তারাচাঁদ ইউ-পির লোক, হিন্দি পড়ান। তা ছাড়া বাংলার শিক্ষক আছেন ডাঃ ভাগনার (Wagner)। ইনি জার্ম্মান, বাংলার বেশ চর্চ্চা করিয়াছেন। ইঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণে গেলে নীচের সদর দরজা ঘণ্টা টিপিয়া খুলিয়া * তেতালায় উঠিলেই দেখিতাম, ইনি ফ্ল্যাটের দরজা ঘণ্টা টিপিবার আগেই খুলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, দৃষ্টিগোচর হইলেই বাংলায় বলিতেন, "আসুন মশায়, নমস্কার।" পণ্ডিত তারাচাঁদ ভারতীয় ছাত্রদের যথাসম্ভব সাহায্য করেন। ডাঃ ব্যানার্জিকে "ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন" রেজলিউশন পাশ করিয়া বয়কট করিয়াছেন। ইহার কারণ ছাত্রেরা বলিলেন, তিনি উহাদের অনেকের নামে জার্ম্মান গবর্ণমেন্টের কাছে কমিউনিষ্ট বলিয়া মিথ্যা গুপ্ত রিপোর্ট দেওয়ায় তাহারা জার্ম্মানি হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। ডাক্তার ব্যানার্জি বলিলেন, গভর্ণমেণ্ট পুলিশের রিপোর্ট ইউনিভার্সিটিতে পাঠাইয়া ঐ ছাত্রদের সম্বন্ধে কে কি পড়ে, কোথাকার লোক, কোথায় থাকে ইত্যাদি প্রশ্ন করেন, ইউনিভার্সিটি ডাঃ ব্যানার্জিকে এ কাজের ভার দেন; কাজেই তিন ইউনি-ভার্সিটির খাতাপত্র হইতে ঐ সব খবর একত্র করিয়া গবর্ণ-মেণ্টকে পাঠান। ডাঃ ব্যানার্জি বলেন, ইউনিভার্সিটি তাঁহাকে কোন কাজের ভার দিলে খাতাপত্রমাফিক তাহা করিতে তিনি আইনতঃ বাধ্য, কারণ তিনি ইউনিভার্সিটির বেতনভোগী, তাহার ফলে বা সহায়তায় কেহ কমিউনিষ্ট অপবাদে বিতাড়িত হইলে তাহার জন্য কি তিনি দায়ী?

[মী সংখ্যায় সমাপ্য

* নিজস্ব প্রাইভেট বাড়ীতে সদর দরজার ঘণ্টা টিপিলে দাসী আসিয়া দরজা খুলিয়া দেয়, আর ফ্ল্যাটওয়ালা বড় বাড়ীগুলিতে ঘণ্টা টিপিলে পোর্টার (দরোয়ান, জার্ম্মান "ফোর্টনার" (Pfortner) বা ফ্ল্যাটস্বামী উত্তরে নিজ জায়গায় বসিয়া একটা 'বৈদ্যুতিক বোতাম' টেপে, তাহাতে সদর দরজার তালাতে খট্ বা ঘরর্ করিয়া শব্দ হয়, সেই সময় ঠেলিলেই দরজা খুলিয়া যায়। লোক ভিতরে ঢুকিলেই আবার নিজেই বন্ধ হইয়া যায়। এ সব ব্যবস্থা ইংলণ্ডে নাই।

অপবাদ

—শ্রীশিবেশ্বর দাশ গুপ্ত

সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের সংসার। সে তল্লাটে 'বড়-বাড়ী' বলিয়াই পরিচিত ও সম্মানিত।

সহরের বাসিন্দা না হইলেও চালচলন ও কথাবার্ত্তায় পাড়াগেঁয়ে আড়ষ্ট ভাব নাই; অথচ গ্রামের শ্যামলতা ও সজীবতার ছাপ যেন সকলের মুখে লাগিয়া আছে। বাড়ীর চতুর্দিকে আম, কাঁঠাল গাছের বাহুল্য নাই। সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গন, সেখানটা ছেলেমেয়েদের যত্নে ফুলগাছ ও শাক-সব্জীতে ভরিয়া উঠিয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপে প্রত্যহ ছোট ছোট মেয়েদের স্কুল বসে, অবসর মত বাড়ীর মেয়েরাও সেখানে শিক্ষকতা করেন। এই স্কুলের লেখাপড়ার মধ্যে বাহুল্য একেবারেই নাই। সামান্য একটু অক্ষর ও গার্হস্থ্য শিক্ষা দান করাই স্কুলের উদ্দেশ্য। সুপরিচ্ছন্ন সৌন্দর্য্য ও সচ্ছল প্রাচুর্য্যের মধ্যে লক্ষ্মীশ্রীকে চিনিয়া লইতে বিলম্ব হয় না।

বাড়ীর কর্ত্তা তিন বছর হইল স্বর্গীয় হইয়াছেন। প্রথম পক্ষের তিন পুত্র—নিশীথ, নীরেন ও নীরোদ। তিনজনই উপযুক্ত ও উপার্জ্জনক্ষম। জ্যেষ্ঠ নিশীথ বাড়ীতে থাকিয়া বিষয়-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করে। দ্বিতীয় নীরেন, হায়দ্রাবাদ রাজ-সরকারের চাকরী করে, কনিষ্ঠ নীরোদ ইন্জিনিয়ারীং পাশ করিয়া সম্প্রতি কলিকাতার ব্যবসা সুরু করিয়াছে! দ্বিতীয় পক্ষের অপ্রাপ্তবয়স্ক এক পুত্র ও দুই কন্যা। তাহাদের মাতা বর্ত্তমান। কর্ত্তা নিজেই বড় দুই ছেলের বিবাহ দিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি নীরোদের বিবাহ হইয়াছে। সেই উপলক্ষে নীরেন ছুটি লইয়া কর্ম্মস্থান হইতে সপরিবারে দেশে আসিয়াছিল। শীঘ্রই ফিরিয়া যাইবে।

বিমাতার সংসার, তবু কোথায়ও অশান্তির বাষ্প মাত্র নাই। যেন নিস্তরঙ্গ নদীবক্ষে অনুকূল স্রোতে সংসার-তরী ভাসিয়া চলিয়াছে। বধূরা অনুগত ও মিষ্টভাষী, বিশেষ করিয়া মেজবধূ তরলার স্বভাবটি এমনি চমৎকার যে, পরকে আপন করিয়া লইতে তাহার কিছু মাত্র বিলম্ব হয় না, তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘিরিয়া সর্ব্বক্ষণ এমনি একটা মধুর চঞ্চলতা বিরাজ করে যে, অবাক হইয়া দু'দণ্ড মুখের পানে চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। অফুরন্ত ফোয়ারার মত হাসিগল্প ও কৌতুক-পরিহাসের স্বচ্ছ ধারায় সকলকে অভিসিঞ্চিত ও পরিতুষ্ট করিয়া সে যখন কাজে অকাজে বাড়ীর সর্ব্বত্র ঘুরিত ফিরিত, তখন এই সদাহাস্যময়ী কৌতুকপরায়ণা চঞ্চলা বধূটির পানে চাহিয়া তাহার অন্তরের অপরিসীম ঐশ্বর্য্য যেন চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিত। শুধু হাসি ও প্রসন্নতা দিয়া যে অল্পসংখ্যক লোক পৃথিবীতে সকল দুঃখ জয় করিতে পারে, সেও যেন তাহাদেরই একজন। সূর্য্যরশ্মির মত ইঁহাদের প্রাণের প্রদীপ্ত শিখা সকলকে ছুঁইয়া যায়। ছোট-বড়, ধনী-নির্ধনের বিচার করে না।

শনিবার। দ্বিপ্রহরে দ্বিতলের ঘরে বধূরা অবসর যাপন করিতেছে। ছোটবউ শান্তি বাঙ্গালা খবরের কাগজ পড়িয়া সকলকে শুনাইতেছে। সে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া আই-এ ক্লাশেও কিছুদিন পড়িয়াছিল। সুতরাং এ কাজের ভার রোজ তাহার উপরই পড়িত।

বড়বউ সেকেলে ধরণের লোক, তদুপরি সংসারের বারো আনা ঝক্কি ছিল তাহার উপর। দেশ-বিদেশের খবর জানা অপেক্ষা দুপুরে একটু ঘুমাইয়া লইতে পারিলে সে বেশী খুসী হইত। কিন্তু চোখ বুজিলেই হয়ত তরলা এমনি সব ঠাট্টা সুরু করিয়া দিবে যে, ঘর ছাড়িয়া পালান ব্যতীত আর উপায় থাকিবে না। তবু রৌদ্রতপ্ত মধ্যাহ্নে ঠাণ্ডা পাটির উপর শুইয়া কতক্ষণ আর চোখের পাতা মেলিয়া রাখা চলে!

তাহাকে ঘুমাইতে দেখিয়া তরলা ঠেলা দিয়া কহিল, ওকি দিদি, ঘুমাচ্ছ যে? ওঠ, তোমাকে তাস খেলা শিখিয়ে দিই।

বড়বউ চোখ মেলিয়া কহিল—শিখে আর কি হবে মেজ বউ, তুই ত চলেই যাচ্ছিস।

—যাচ্ছি তা হয়েছে কি? ওঠ, তোমাকে শিখতেই হবে।

বড়বউ মুহূর্ত্তে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল—তোর পায় পড়ি মেজবউ, দু'দণ্ড সুস্থির হয়ে ব'স, এমন করে জ্বালাসনে।

তরলা উঠিয়া বড়বউর পায় হাত দিয়া প্রণাম করিয়া কহিল—ছিঃ 'দিদি, তুমি বড় যা তা বল। আচ্ছা, আর বিরক্ত করব না, তুমি ঘুমাও।—বলিয়া পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল।

বড়বউ নিশ্চিন্ত হইয়া শুইয়া কহিল—এ আবার কি রঙ্গ মেজবউ ?

—কিছু না দিদি, তুমি ঘুমাও। বলিয়া ছোটবউয়ের দিকে চাহিয়া দেখিল, সে তাহারই পানে চাহিয়া মিটি মিটি হাসিতেছে। হটিবার পাত্র সে নয়। তৎক্ষণাৎ কহিল—ওলো ছোটবউ, আজ শনিবার, ঠাকুরপোর আসবার দিন, মনে আছে ত? যা তুইও ঘুমা গে, নইলে—বলিয়া দুষ্ট হাসি হাসিল।

শান্তি সহজ কণ্ঠে কহিল—তুমি আর কি অপরাধ করলে মেজ দি, তুমিও চল না ?

তরলা হাসিয়া কি উত্তর দিতেছিল, দরজার কাছে ডাক আসিল—বড়দি।

মেজবউ চাহিয়া দেখিল, একটি ষোল সতের বৎসরের শ্যামবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি ছেলে দরজার চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আহ্বান শুনিয়া বড়বউও উঠিয়া বসিয়াছিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—ছেলেটি কে দিদি ?

—ওকে ভুলে গেছিস মেজবউ? ও যে আমাদের কানু রে—মিস্তিরদের ছেলে।

কানু অগ্রসর হইয়া বড়বধূ ও মেজবধূকে প্রণাম করিল। মেজবউ আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল—কানু, কত বড়টি হয়েছ ভাই তুমি ?

শান্তিকে দেখিয়া কানু জিজ্ঞাসা করিল—ও কে মেজদি ?—ছোটদি বুঝি ? বলিয়া তাহাকেও প্রণাম করিতে গেল।

শান্তি কিছুতেই পায়ে হাত দিতে দিবে না। কানু বিরক্ত হইয়া কহিল, দেখুন ত মেজদি, ছোটদি প্রণাম নিচ্ছেন না।

মেজবউ হাসিয়া কহিল—তবে ওর ভাগটাও আমাকে দে ভাই, আমি তোকে ডবল আশীর্ব্বাদ করছি।

কানু কোনমতে প্রণাম করিয়া আসিয়া বসিলে বড়-বউ জিজ্ঞাসা করিল—হাঁরে কানু, এতদিন কোথায় ছিলি ? ছোট ঠাকুরপোর বিয়েতে এত করে আসতে বললাম, এলি না কেন ?

—আসব কি করে বড়দি ? মামারা এই দু' মাস খাওয়ালেন পরালেন, সুদশুদ্ধ তাঁদের পাওনা গণ্ডা চুকিয়ে দিয়ে তবে তো ছুটি পাব ?

—তাঁরা খুব খারাপ ব্যবহার করেন বুঝি ?

—খারাপ কেন হবে দিদি ? একটা বাপ-মা-মরা হতভাগা ছেলেকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, এই ঢের, তার উপর—

মেজবউ যখন তিন বৎসর পূর্ব্বে দেশে আসিয়াছিল, তখন কানুর মা জীবিতা ছিলেন। বিস্মিত হইয়া সে প্রশ্ন করিল—ওর মা মারা গেলেন কবে দিদি ?

—গত কার্ত্তিকে। কানু এমন করে মার সেবা করলে যে, আজকাল তেমনটি আর দেখা যায় না। কাণাকড়ির সম্বল নেই, ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা দূরের কথা, কাল কি খাবে, ঘরে এমন সংস্থান পর্য্যন্ত নাই। আত্মীয়-স্বজনরা একবার চেয়ে পর্য্যন্ত দেখল না। কানু প্রতিজ্ঞা করল, পরের অনুগ্রহের একটি কাণাকড়িও নেবে না, নিজে রোজগার করে মার চিকিৎসা করবে। ঐ অতটুকু ছেলে ষ্টেশনে গিয়ে মোট বইতে সুরু করলে, আমাদের কারও নিষেধ শুনলে না। সেই পয়সা দিয়ে মার চিকিৎসা করালে, ওষুধপথ্যের ব্যবস্থা করলে, গঙ্গায় গিয়ে শেষকাজ পর্য্যন্ত করে এল। এমন শুনেছিস মেজবউ ?

তরলার দুই চোখে অশ্রু টল টল করিতে লাগিল। শান্তিও অনেকক্ষণ ধরিয়া সম্মুখে উপবিষ্ট ছেলেটির শীর্ণ মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মেজবউ কহিল—কানু এমন করে আমাদের পর ভাবতে হয় ভাই ?

—পর ভাবব কেন দিদি ? নিজের খুড়ো জ্যেঠারা যখন ফিরেও তাকালেন না, তখন তোমাদের কাছে এসে দাঁড়াতেও আমার লজ্জা হ'ল। তাই ত—বলিয়া ক্ষণকাল থামিয়া পুন-

রায় কহিল—চাইলে তোমরা বিমুখ করতে না জানি, কিন্তু মাথার ঘাম পায় ফেলে উপার্জ্জন করার মধ্যেও যে কতখানি আনন্দ আছে, তার ত সন্ধান পেতাম না।—বলিয়া কাপড়ের খুঁট দিয়া চোখ মুছিল।

তাহার মুখের পানে ভাল করিয়া চাহিয়া মেজবউ যেন সহসা চকিত হইয়া কহিল—ওকি কানু, তোমার মুখ অমন শুকনো কেন? খাওয়া হয়নি বুঝি?

—খেয়েই এসেছি দিদি। রোদে অনেকটা পথ আসতে হয়েছে, তাই বোধহয় শুকনো দেখাচ্ছে।

—তা হোক, আমি এখুনি আসছি ভাই, তুমি যেয়ো না কিন্তু—বলিয়া তরলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল।

*

আজ মেজবধূর যাইবার দিন। প্রতিবেশীদের নিকট সে বিদায় লইয়া আসিয়াছে। ঐ হাস্যমুখী বধূটিকে পুনরায় দূর প্রবাসে পাঠাইতে সকলেরই দীর্ঘনিশ্বাস পড়িয়াছে। সমবয়স্কা সঙ্গিনীরা কেহ কেহ দুই এক ফোটা চোখের জলও ফেলিয়াছে। কিন্তু তরলার মুখের মিষ্টি হাসিটুকু মিলায় নাই। সকলকে যথাযোগ্য প্রণাম, সম্ভাষণ ও আশীর্ব্বাদ জানাইয়া সে হাসিমুখেই বিদায় লইয়া আসিয়াছে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই যাত্রা করিতে হইবে। বেলা পড়িয়া আসিতে বড়বউ আসিয়া কহিল—আয় মেজ বউ, তোর চুল বেঁধে দিই।

তরলা জানালা দিয়া রাস্তার পানে চাহিয়া কাহার যেন প্রতীক্ষা করিতেছিল। মুখ ফিরাইয়া কহিল—কই দিদি, কানু ত কই এল না?

তিন দিন পূর্ব্বে সে আসিয়াছিল এবং মেজদিদি যাইবার দিন অবশ্য দেখা করিবে, একথা বারংবার বলিয়া গিয়াছিল। যাত্রার সময় যতই আসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল, ততই এই পিতৃমাতৃহীন অনাথ ছেলেটির সঙ্গে দেখা হইল না ভাবিয়া তরলার বুকের ভিতরটা ব্যথায় টন্‌টন করিতে লাগিল।

বড়বউ তাহার মুখের প্রানে চাহিয়া কহিল—কি জানি মেজবউ, সে এল না কেন? নিশ্চয়ই কোন জায়গায় আটকে পড়েছে, নইলে কথা দিয়ে ভুলে থাকবার ছেলে সে নয়। বলিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় কহিল—শুনছি মুচিপাড়ায় মা শীতলার কৃপা হয়েছে, হয়ত সেখানেই—

তরলা সভয়ে কহিল—ঐ অতটুকু ছেলে, ওর ভয় করে না দিদি, ও সবের মধ্যে যেতে?

—ভয়-ডর ওর কোনদিনই নেই মেজবউ। ছোটকাল থেকে ওর অভ্যেস যেখানে ছোটজাত বলে ঘৃণায় কেউ যেতে চায় না, সেখানে ও হাসিমুখে সকলের আগে গিয়ে দাঁড়ায়। বারণ করলে হেসে বলে, দিদি আমি ভিখিরী মানুষ, গরীবদের মধ্যেই আমাকে মানায় ভাল, ওদেরই আমি বুক দিয়ে ভালবাসতে পারি।

বিদায়ক্ষণে শান্তি কাঁদিয়া কহিল—তুমি চলে গেলে এ বাড়ীতে কেমন করে থাকব মেজদি?

তরলা তাহাকে কাছে টানিয়া কহিল—ছিঃ বোন, যাবার সময় চোখের জল ফেলতে নেই। সুখ যিনি দিয়েছেন, দুঃখও তাঁরই হাতের দান, একথা মনে রেখ, কোন ব্যথাই দুঃসহ বলে মনে হবে না। বলিয়া আঁচল হইতে দুইটী টাকা বাহির করিয়া কহিল—কানু এল না, যাবার দিনও ভাইটির সঙ্গে দেখা হল না। ও দু'টি টাকা চেয়েছিল—কেন জানি না, নিশ্চয়ই কোন বিশেষ দরকার ছিল, নইলে যেচে হাত পেতে কিছু নিতে ও কোন দিনই জানে না। ওকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ে টাকা দুটি দিস শান্তি, আর যদি পারিস ওর একটু যত্ন নিস, এমন ছেলে হাজারে একটি হয় না। বলিয়া আঁচল দিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দিল। দরজার কাছে গিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া শান্তিকে একেবারে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া চুপি চুপি কহিল—ছোট, আবার যখন আসব, তোর কোলজুড়ে যেন টুকটুকে খোকা দেখতে পাই,—বলিয়া চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া বিদায় লইল।

*

পরদিন ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া শান্তির মনে হইল, বাড়ীর চেহারাখানা যেন একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। একটিমাত্র মানুষের সঙ্গে গৃহের সকল আনন্দ যে এমন করিয়া বিদায় লইতে পারে, তাহা ইতিপূর্ব্বে সে আর কখনও এমন করিয়া অনুভব করে নাই, অত্যন্ত সাধারণ ঘরের একটি নগণ্যা বধূ, স্কুলের গণ্ডী পার না হইতেই যাহার শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছিল, দূর প্রবাসে নানা বিপরীত অবস্থায় যাহাকে স্বামীপুত্র লইয়া সংসার করিতে হয়, তাহার অন্তর-বাহির যে কেমন করিয়া এমন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তাহা ভাবিতে গিয়া

তাহার বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রহিল না। তাহার মুখের সেই সুমধুর হাসি, বুকের অত্যন্ত সহজ প্রসন্নতা, জীবনের সকল দুঃখ ও সমস্যা যাহার কাছে অবলীলায় পরাজয় মানিয়া দূরে সরিয়া গিয়াছে, তাহাই বা সে সংসারের এই ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ থাকিয়া কোথা হইতে সঞ্চয় করিল? সারা সকাল ভরিয়া শান্তি কেবল এই কথাই ভাবিতে লাগিল। কিন্তু কোন যুক্তিতর্ক দিয়াই এ প্রশ্ন সমাধানের পথ খুঁজিয়া পাইল না। শুধু বারংবার মনে মনে এই আনন্দস্বরূপিণী গৃহকল্যাণীর পদতলে নমস্কার জানাইয়া নবজীবনের প্রারম্ভে তাহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতে লাগিল।

বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েদের খাওয়াইয়া সে পান সাজিতে বসিয়াছিল, এমন সময় বাহিরে কানুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া সচকিত হইয়া উঠিল। অল্পক্ষণ পরে কানু নিকটে আসিয়া ডাকিল—ছোটদি।

শান্তি চাহিয়া দেখিল, একখানা অত্যন্ত মলিন মুখের উপর একজোড়া ডাগর চোখ ছলছল করিতেছে। এই কয়দিনের পরিচয়েই কানুকে সে ভাইয়ের মত ভাল বাসিয়াছিল। তাই তাহার কণ্ঠস্বরে ব্যথা অনুভব করিয়া কহিল—কাল এলে না কেন ভাই? মেজদি তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল না বলে কত দুঃখ করছিলেন।

—আমিও তাঁর চেয়ে কম দুঃখ পাচ্ছি না, ছোটদি। আবার কবে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে জানি না, এখান থেকেই তাঁর পায়ে নমস্কার জানিয়ে বলছি, তিনি যেন তাঁর এই অবোধ অকৃতজ্ঞ ভাইটিকে ক্ষমা করেন।

—তিনি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করে গেছেন কানু, আর তোমাকে দেবার জন্ম দু'টি টাকা রেখে গেছেন। এই নাও। বলিয়া আঁচল হইতে টাকা দু'টি খুলিয়া তাহার হাতে দিল।

কানু টাকা দু'টি মাথায় ঠেকাইয়া করুণ হাসি হাসিয়া কহিল—টাকার কথাও তিনি ভোলেননি দেখছি। কিন্তু যার জন্ম চেয়েছিলাম আজ তাকে শ্মশানে রেখে এলাম ছোটদি। বলিয়া একটু থামিয়া কথার সূত্র ধরিয়া নিজেই বলিতে লাগিল—বুড়ীর ঐ একটি মাত্র ছেলে। দু'দিন আগেও বুঝতে পারিনি, অসুখ এমন সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে। কাল ডাক্তার দেখাব বলে মেজদির কাছে টাকা চেয়েছিলাম, কিন্তু সময়ে কুলোল না। তারপর সারাদিন সারারাত যমে-মানুষে টানাটানি চলল, শেষে ভোরবেলায় যমরাজারই জয় হ'ল, আমাদেরও ছুটি মিলল।

শেষের দিকে তাহার কথাগুলি যেন বিধাতার সুবিচারের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর শ্লেষের মত শুনাইল। শান্তি প্রবোধ দিয়া কহিল—তার পরমায়ু ফুরিয়েছিল ভাই, তাই তাকে রাখতে পারলে না, সে জন্ম দুঃখ করে লাভ কি?

—দুঃখ আমি কোনদিনই করি না ছোটদি, তা নইলে আর সবাই যখন পিছিয়ে গেল, তখন মার কোল থেকে ছেলেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে শ্মশানে যেতে পারতাম না। তবে মাঝে মাঝে—থাক্ দিদি, সে কথা আজ নয়। বলিয়া সে যেন হঠাৎ আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া মুহূর্ত্তে নিভিয়া গেল। তাহার চোখের সে বিদ্যুদ্দীপ্তি শান্তির চোখ এড়াইল না। ক্ষণকাল আশ্চর্য্য হইয়া মুখের পানে চাহিয়া রহিল, কিন্তু কিছু বলিবার পূর্ব্বেই কানু নীচে নামিয়া গেল।

মিনিট দশেক পরে রান্নাঘরে আসিয়া শান্তি দেখিল, কানু খাইতে বসিয়াছে এবং বড়দিদি কাছে বসিয়া খাওয়াইতেছেন তাহাকে আসিতে দেখিয়া বড়বউ কহিল—এখানে একটু ব'স শান্তি, আমি নিরামিষ দিকটা দেখে আসি।

কানুর খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে সেও উঠিয়া দাঁড়াইল, দেখিয়া, শান্তি ব্যস্ত হইয়া কহিল—ওকি কানু, উঠছ যে, মাছ-তরকারী সবই ত পড়ে রইল।

—আর খেতে পারছি না ছোটদি, পেট ভরে গেছে। বলিয়া মুখ ধুইতে পুকুরের দিকে অগ্রসর হইল।

পান লইতে আসিয়া কানু কহিল, কম খেলাম বলে দুঃখ করছিলে ছোটদি, কিন্তু কেন খেতে পারলাম না, সে কথাটাও তোমাকে জানিয়ে না গেলে অপরাধী হয়ে থাকব। যাদের মধ্যে আমার দিন কাটে, তাদের খাওয়া রোজই আমি দেখি। নুনভাত, শাকভাত, কচিৎ কোনদিন বা একটু ডাল, তরকারী। নিজে যখন খেতে বসি, তাদের খাওয়া আমার চোখের সামনে ভাসতে থাকে, তাই কোন ভাল জিনিষ মুখে তুলতে পারি না। মনে হয় তা হলে ওদের থেকে আমি অনেক দূরে সরে যাব, তেমন করে আর বুক দিয়ে ভালবাসতে পারব না। বলিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় কহিল—কথাটা

শুনে অনেকে পরিহাস করবে। কিন্তু তুমি হয়ত বিশ্বাস করবে, করবে না ছোটদি?

শান্তি স্নিগ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিল—করব বৈকি ভাই! তুমি মিথ্যা বলতে যাবে কিসের জন্যে?

কানু শ্রদ্ধায় বিগলিত হইয়া কহিল—সে আমি জানি দিদি, তাই তোমাকে অসঙ্কোচে বলতে পেরেছিলাম। আজ মেজদি বহুদূরে, কিন্তু সে জন্য আর আমার দুঃখ নেই। তোমার মধ্যে তাঁকে আবার আমি পেয়েছি।

শান্তি মৃদু হাসিয়া কহিল—এ যে সোনা আর পিতলে তুলনা হ'ল ভাই!

কানু মাথা নাড়িয়া বলিল,—তা হবে কেন দিদি? আমি আর কিছু না পারি, ভালবাসার মধ্যে কোন্‌টা মেকি কোন্‌টা খাঁটি তা নির্ভুল করেই চিনতে পারি। তুমি আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে কেন? এখন আসি ছোটদি। দু'দিন যেতে পারিনি, আজ মুচিপাড়ার খবরটা নিতেই হবে। বলিয়া সে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

শান্তির পিসশাশুড়ী সেখান দিয়া যাইতেছিলেন, কানুকে যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ছেলেটা কে বউমা?

শান্তি মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল—মিস্তিরদের ছেলে, কানু।

—মিস্তিরদের ছেলে? সেই লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়াটা? শুনছি ওর চালচলন ভাল নয়, সে জন্য ওর মামারা ওকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। বউমা, তুমি নতুন মানুষ, গাঁয়ের ভালমন্দ লোক চেন না, যার তার সঙ্গে এমন করে মেলা-মেশা করতে নেই, ওতে দশজনে নিন্দা করে। বলিয়া তিনি নিজের কাজে চলিয়া গেলেন।

শান্তি বিস্ময়াপন্ন হইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

•

তারপর তিনদিন গত হইয়াছে, কানু আর আসে নাই। মুচিপাড়ায় বসন্তরোগ প্রচণ্ডভাবে দেখা দিয়াছে এবং ইতিমধ্যে দুই তিন জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিয়াছে। শুনিয়া অবধি শান্তির মন অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। শুধু ব্যাধির সংক্রামক প্রকৃতির কথা চিন্তা করিয়া নয়, এই পরদুঃখকাতর আত্মভোলা ছেলেটি যখন নির্ভয়ে সকল বিপদের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইবে, চিকিৎসা-পথ্যের সাধ্যমত সুরূপ ব্যবস্থা করিবে, বিনিদ্র চোখে পীড়িতের শয্যাপ্রান্তে জাগিয়া বসিয়া থাকিবে, তখন নিজের বিশ্রামের দিকে হয়ত ভ্রূক্ষেপমাত্র করিবে না, এমন কি আহারের প্রয়োজনীয়তাও ভুলিয়া যাইবে। ভগ্নীর কোমল অন্তঃকরণের স্নেহসিক্ত অনুভূতি দিয়া বারংবার এই কথা ভাবিয়া শান্তি ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

নিয়মমত শনিবার নীরোদ বাড়ী আসিল। রাত্রিতে স্বামীর পাশে শুইয়া অনেক কথার পর কথাচ্ছলে শান্তি জিজ্ঞাসা করিল, মিস্তিরদের কানুকে তুমি চেন?

—চিনি বৈ কি।

—সে কেমন?

—ভাল বলেই ত জানি। লেখাপড়া না শিখুক, স্বভাব-চরিত্র নির্দ্দোষ এবং খুব পরোপকারী। এমন ছেলেকে মন্দ বলতে পারি না।

শান্তি স্বামীর বুকের কাছে আরও ঘেঁষিয়া কহিল,—তবু ভাল, তার স্বপক্ষে একজন আছে।

—কেন, তোমরা সবাই তার বিপক্ষে না কি?

—না, সবাই নয়।

—কিন্তু কথাটা হঠাৎ আজ তোমার মনে হ'ল কেন?

—আর একদিন শুনো।

—আজই বল না?

ঘরের ঘড়িতে দুইটা বাজিল। শান্তি কহিল,—না আজ নয়। দু'টো বেজে গেল, এবার ঘুমাতে দাও, নইলে উঠতে দেরী হবে। বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইল।

সোমবার দুপুরে কানু নিঃশব্দে শান্তির ঘরের দুয়ারে আসিয়া ডাকিল—ছোটদি!

শান্তি শুইয়া একখানা বই পড়িতেছিল, উঠিয়া আসিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া চমকিয়া কহিল—একি চেহারা হয়েছে ভাই?

—ও কিছু নয় দিদি, দু'দিন পরেই সেরে যাবে। বলিয়া মুহূর্ত্ত পরে কহিল—পাঁচটা টাকা দিতে পার ছোটদি?

—টাকা নিয়ে কি হবে কানু?

মুচিপাড়াটা যে একেবারে উচ্ছন্নে গেল, ছোটদি! তিনজন মরেছে এবং আরও পাঁচ ছ' জনের অবস্থা এখন-তখন। সবাই বলে, মার কোপ হয়েছে, ভাল করে পূজো না দিলে, শান্ত হবে না। নন্দীগাঁয়ে মার পীঠস্থান আছে।

ভাবছি সেখানে গিয়ে মার পুজো দিয়ে আসব, কিন্তু খরচটা কোনমতেই জোগাড় হচ্ছে না ছোটদি!

তাহার অত্যন্ত মলিন মুখের অব্যক্ত কাতরতা শান্তির মর্ম্মে বাজিল। উচিত অনুচিত ভালমন্দের কথা একবারও তাহার মনে হইল না। বাক্স খুঁজিয়া পাঁচটি টাকা আনিয়া তাহার হাতে দিয়া কহিল—এই নাও ভাই টাকা। কেউ জিজ্ঞাসা করলে আমার নাম ক'র না কিন্তু।

কানু উৎফুল্ল হইয়া উত্তর দিল,—নাম শুধু তাঁর কাছেই করব দিদি, যিনি উপর থেকে সব দেখছেন, সব শুনছেন। আর দেরী করতে পারছি না ছোটদি, এখন আসি। বলিয়া সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

পরদিন অপরাহ্নে কানু পুনরায় আসিয়া হাজির হইল। মুখের চেহারা বিষণ্ণ, চোখ দু'টি হইতে হতাশার বেদনা যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। শান্তিকে খুঁজিয়া লইয়া কহিল—হ'ল না, ছোটদি।

—কি হ'ল না ভাই?

—পুজো।

—কেন?

—ঠাকুর মশায় বললেন ষোড়শোপচারে পূজা কুড়ি টাকার কমে হবে না। হাতে পায়ে ধরে অনেক করে বলে দশ টাকায় নামিয়েছি, কিন্তু বাকী পাঁচ টাকা যে কোথাও পাচ্ছি না ছোটদি।

শান্তি খৈ বাছিতেছিল, মুখ তুলিয়া কহিল,—আমার কাছে ত আর টাকা নেই ভাই।

—বড়দির কাছে যাব?

—যাও।

মিনিট পাঁচেক পরে ফিরিয়া আসিয়া কানু কহিল, বড়দির কাছেও নেই। তবে কি হবে ছোটদি! আজও যে দু'জন মারা গেছে। বলিতে বলিতে তাহার চোখ হইতে দু'ফোঁটা জল টপ টপ করিয়া মেজের উপর পড়িল।

সেদিকে চাহিয়া শান্তির দুই চোখও ছল ছল করিয়া উঠিল। দরিদ্রের বেদনা যে এই কোমলচিত্ত ছেলেটির বুকে কত গভীর হইয়া বাজিয়াছে এবং তাহাদের যে সে কি অকপটে ভালবাসিতে পারিয়াছে, তাহা যেন অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া সেই মুহূর্ত্তে তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। কিন্তু কি করিয়া যে ইহার প্রতীকার করিবে তাহার পথও খুঁজিয়া পাইল না।

কানু চোখ মুছিতে মুছিতে কহিল—দিদি, দুঃখীর দুঃখ দেখে বুক ফেটে যায়, কিন্তু সে দুঃখ নিবারণ করতে পারি না, এর চেয়ে বড় শাস্তি বোধ হয় আর নেই।

তাহার মুখের পানে চাহিয়া শান্তি ক্ষণকাল কি ভাবিল, তারপর কহিল—একটা কাজ করতে পারবে ভাই?

—কি ছোটদি?

—কিন্তু খুব চুপি-চুপি, কেউ যেন জানতে না পারে।

—কেউ জানবে না দিদি, তুমি বল।

তাহাকে নিজের ঘরে লইয়া বাক্স হইতে একটি আংটি বাহির করিয়া শান্তি কহিল—এটা নিয়ে যাও ভাই, বাঁধা দিয়ে টাকা যোগাড় করগে, আবার রবিবার টাকা শোধ দিয়ে খালাস করে নিয়ে এস।

আংটি দেখিয়া কানু একবার ইতস্ততঃ করিল, তারপর হাত পাতিয়া কহিল—দাও।

আংটি দিয়া শান্তি পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিল—দেখ ভাই জানাজানি যেন না হয়, তা হলে কিন্তু বড় মুস্কিল হবে।

—ভাবনা ক'র না দিদি, সে ভার আমার, বলিয়া কানু অপেক্ষাকৃত হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিল।

*

শান্তির ভয় ছিল, হয়ত কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। সকলের কৌতুহল-প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া সে যখন সত্য কথাটা খুলিয়া বলিবে তখন হয়ত করুণার এই অযাচিত আতিশয্যকে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপে অতিরঞ্জিত করিয়া সমস্ত ব্যাপারটাকে বিকৃত করিয়া তুলিতে অনেকেই লেশমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করিবে না। অথচ কোন্ ছলে কি করিয়া যে সত্য গোপন করিবে তাহাও সে ভাবিয়া পাইল না।

কিন্তু পরদিন সকালে কানু আসিয়া যখন কয়েকটি প্রসাদী ফুল, বেলপাতা ও বাতাসা তাহার হাতে দিয়া জানাইল যে, গত রাত্রিতে মায়ের পূজা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, তখন যেন সে কতকটা নিশ্চিন্ত হইল। আংটির কথা জিজ্ঞাসা করিতে কানু বলিল—খুব বিশ্বাসী লোকের কাছে রেখে টাকা নিয়েছি দিদি; তুমি ভয় ক'র না। রবিবার টাকা দিলেই ফিরিয়ে আনতে পারব।

তবুও শান্তি যাহা ভয় করিয়াছিল তাহাই হইল; কথাটা গোপন রহিল না। কানু যাহার কাছে আংটি বাঁধা রাখিয়াছিল তিনি গ্রামের সর্ব্বজনমান্য ঠাকুর্দ্দা। জীবনের অধিকাংশ সময় বিদেশে প্রবাসে কাটাইয়া শেষ বয়সে তিনি পৈতৃক ভিটায় আসিয়া ধর্ম্মকর্ম্মে মন দিয়াছেন। লোকের রটনা, চাকরীতে তিনি বিস্তর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন এবং সমস্তই তাঁহার খাটের নীচে মাটিতে পোঁতা আছে। একদিন কানু আসিয়া কহিল—এই আংটিটা রেখে পাঁচটা টাকা দাও ঠাকুর্দ্দা—শীগ্‌গির।

তাহার ব্যস্ততা দেখিয়া ঠাকুর্দ্দা আংটি চোখের সম্মুখে লইয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে দেখিতে কহিলেন—কার আংটি রে?

কানু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল—আমার।

—টাকা দিয়ে কি হবে?

—দরকার আছে, আর একদিন শুনো।

ঠাকুর্দ্দা একবার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিলেন, কিন্তু সেই শীর্ণ সুকুমার মুখে কলঙ্কের রেখা পর্য্যন্ত চোখে পড়িল না। ধীরে ধীরে উঠিয়া তিনি পাঁচটা টাকা আনিয়া তাহার হাতে দিলেন।

কানু যাইতে যাইতে বলিয়া গেল, রবিবার সকালে টাকা দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

ঠাকুর্দ্দা মাথা নাড়িয়া কহিলেন—আচ্ছা।

পরদিন সকালে কি জানি কেন তাঁহার মনে খটকা লাগিল। ছেলেটা তাঁহাকে ঠকাইয়া গেল না ত? পাশেই মধু স্যাকরার দোকান। আংটিটা তাহার কাছে লইয়া গিয়া কহিলেন—দেখত মধু, জিনিষটা খাঁটী না মেকী?

মধু আংটি হাতে লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া কহিল—এ যে বড়বাড়ীর জিনিষ, ছোটবাবুর বিয়ের সময় গড়িয়ে দিয়েছিলেম। এ আপনি কোথায় পেলেন ঠাকুর্দ্দা?

ঠাকুর্দ্দা চমকাইয়া উঠিয়া কহিলেন—সে কি? তবে যে ছোঁড়া বললে তার নিজের আংটি।

—ছোঁড়াটা কে?

—মিস্তিরদের কানু।

—কানু? সেই বখাটে ছেলেটা? কর্ত্তাদের অন্দরে ওর যাতায়াত আছে। ব্যাপারটা ভাল বুঝছি না ঠাকুর্দ্দা, আপনি ছোঁড়ার সন্ধান করুন।

ঠাকুর্দ্দা সন্ত্রস্ত হইয়া কহিলেন—এঁ্যা বল কি? ছোঁড়া শেষকালে আমাকে শুদ্ধ ফ্যাসাদে জড়াবে নাকি? বলিতে বলিতে তিনি আংটি লইয়া দ্রুতপদে কানুর সন্ধানে বাহির হইলেন।

অপরাহ্নে কানুকে টানিতে টানিতে ঠাকুর্দ্দা বড়বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বর্গীয় কর্ত্তার তিনি সহপাঠী ছিলেন এবং তাঁহাকে দাদা বলিয়া ডাকিতেন। সেই সুবাদে অন্দর-মহলেও তাঁহার অবাধ গতি ছিল। গৃহিণীকে ডাকিয়া লইয়া আংটি দেখাইয়া কহিলেন--দেখুন ত বউ-ঠাকুরুণ এ জিনিষ আপনার বাড়ীর কি না।

গৃহিণী আংটি লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া কহিলেন—এ যে ছোটবৌমার বিয়ের আশীর্ব্বাদী আংটি।

ঠাকুর্দ্দা একটা অগ্নিদৃষ্টি কানুর দিকে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন—তবে বউমাকেও একবার জিজ্ঞেস করে আসুন, তিনি সনাক্ত করলেই নিঃসন্দেহ হয়ে ছোঁড়াকে পুলিশের হাতে দেওয়া যায়।

শান্তি ঘরের ভিতরেই ছিল এবং সমস্তই শুনিতে পাইয়াছিল। যে কথা গোপন রাখিবার জন্য তাহার আগ্রহের অবধি ছিল না, তাহাই যে কেমন করিয়া এমন অকস্মাৎ রূঢ় ভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িল, তাহা ভাবিতে গিয়া তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। হয়ত ইতিমধ্যে কানুর উপর দিয়া তিরস্কারের ঝড় বহিয়া গেছে এবং তাহারই নির্দ্দেশে নিঃসন্দেহ হইয়া লাঞ্ছনা এবার উগ্র হইয়া দেখা দিবে—চুরির অপরাধে পুলিশে দেওয়াও অসম্ভব নয়। ভাবিতে গিয়া শান্তি শিহরিয়া উঠিল এবং জানালার ফাঁক দিয়া কানুর শীর্ণ মলিন মুখের পানে চাহিয়া তাহার চোখের জল যেন আর মানিতে চাহিল না।

শাশুড়ী ঘরের ভিতর আসিয়া কহিলেন—ছেলেটাকে ভাল বলেই জানতাম, এমন চুরির অভ্যাস আছে জানলে বাড়ীতে ঢুকতে দিতাম না। গয়নাগাটি সাবধানে রাখতে হয় বউমা। ভাগ্যিস ঠাকুরপোর হাতে পড়েছিল, নইলে—

শান্তি বাধা দিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল—ও চুরি করেনি মা।

—চুরি করে নি, তবে কোথায় পেলে?

—আমি দিয়েছি।

—তুমি দিয়েছ, কেন ?

শান্তি একবার ইতস্ততঃ করিল, তারপর সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিল, শান্তির পিসশাশুড়ী সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, শুনিয়া মুখ বাঁকাইয়া কহিলেন—এমন আদিখ্যেতাও ত দেখিনি বৌদি ! বিয়ের আশীর্ব্বাদী জিনিষ এমন করে যাকে তাকে বিলিয়ে দেওয়া কেন ! হাড়ি মুচির জন্য বৌমার যদি এতই দয়া তবে বাপের বাড়ী থেকে টাকা এনে—

গৃহিণী বাধা দিয়া কহিলেন, থাম ঠাকুরঝি, বউমা নূতন মানুষ ওর দোষ কি। ঐ ছোঁড়াটাই হয়ত মিথ্যা করে দশটা ভুজুং দিয়ে ওকে ঠকিয়ে নিয়ে গেছে।

পিসশাশুড়ী তবু ফোড়ন দিতে ছাড়িলেন না, কিন্তু তোমার তো পাশ-করা বউ বৌদি, এত বোকা হবার ত কথা নয়।

*

সপ্তাহকাল অতীত হইয়াছে, কানুর কোন সংবাদ শান্তি রাখিতে পারে নাই। চুরির অপরাধে অভিযুক্ত না হইলেও তিরস্কার-গঞ্জনা তাহাকে কম সহিতে হয় নাই এবং বিশেষ করিয়া বড়বাড়ীর অন্দরমহলে তাহার অবাধ গতি নিষিদ্ধ হইয়াছে। এ সমস্তই শান্তির কানে আসিয়াছে। জন্মাবধি সে সহরে মানুষ হইয়াছে। পল্লীজীবনের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি সম্বন্ধে যে সামান্য অভিজ্ঞতা সে সঞ্চয় করিয়াছিল, সমস্তই বই পড়িয়া। কুশিক্ষা এবং কুসংস্কারের আগাছায় ইহার সত্যকার রূপ যে বহুদিন পূর্ব্বে ঢাকা পড়িয়াছে, তাহা এই স্বল্পকাল মধ্যেই সে বুঝিতে পারিয়াছিল। নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিয়া ইহা বিসদৃশ বলিয়া মনে হয় নাই, কিন্তু বিনা অপরাধে একটি পরদুঃখকাতর ছেলেকে এমন করিয়া শাস্তি পাইতে দেখিয়া তাহার নিঃশঙ্ক তরুণীচিত্ত ক্ষোভে ও দুঃখে উদ্বেল হইয়া উঠিতে লাগিল।

মাঝে মাঝে তাহার মনে হইত, সে যদি পুরুষ হইয়া জন্মিতে পারিত ! যদি শুদ্ধান্তঃপুরের অপরিসীম পরিবেষ্টনকে অতিক্রম করিয়া বিশাল বহির্জ্জগতের সুবিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র তাহার হইত। তবে শুধু দীর্ঘনিশ্বাসে তাহার অন্তরের ব্যথা ও ব্যাকুলতা পর্য্যবসিত হইত না,—প্রতিকারেরও পথ খোলা থাকিত, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মেজদির কথা মনে পড়িল। তিনিও ত অন্তঃপুরিকা, সামাজিক [illegible] তাহারও ত গতি প্রতিহত, ক্ষমতা খণ্ডিত, তবু যে কয় মাস তিনি এ বাড়ীতে ছিলেন, অন্যায় ও অবিচার মুখ বুজিয়া সহিতে শান্তি কোন দিন তাঁহাকে দেখে নাই। কেবল মুখের মিষ্টি কথা ও বুকের অজস্র প্রসন্নতা দিয়া তিনি সমস্ত বিরুদ্ধতা জয় করিয়াছেন, সকলকে আপন করিতে পারিয়াছেন। সেই সহজ অথচ সর্ব্বজয়ী শক্তি কোথা হইতে কিরূপে সঞ্চয় করা যায়, সকল কাজের মধ্যে শান্তি সেই কথাটাই বার বার ভাবিতে লাগিল।

পরদিন আত্মীয়পুত্রের উপনয়ন উপলক্ষে সকলের পাশের গ্রামে যাইবার কথা। যথাসময়ে গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। প্রস্তুত হইবার জন্য শান্তিকে বলিতে আসিয়া বড়বউ দেখিল, সে বিছানায় শুইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিল,—অসময়ে শুয়ে কেন ছোট ?

শান্তি উঠিয়া বসিয়া কহিল, শরীরটা ভাল নেই বড়দি, বোধ হয় জ্বর আসবে।

বড়বউ নিকটে আসিয়া তাহার কপালে ও পিঠে হাত দিয়া কহিল—আসবে কিলো ? এ যে বেশ জ্বর হয়েছে। চুপ করে শুয়ে থাক। আমি মাকে বলে আসছি।

কিছুক্ষণ পরে গৃহিণী আসিয়া শরীরের উত্তাপ অনুভব করিয়া উদ্বিগ্নকণ্ঠে কহিলেন—গাঁয়ের ম্যালেরিয়া ধরল না ত বউমা ? তুমি সহরের মেয়ে পাড়াগাঁয়ের জলবাতাস সহ্য হলে বাঁচি। আজ আর কোথায়ও গিয়ে কাজ নেই, চুপটি করে শুয়ে থাক। আমি গোপালের মাকে বলে যাচ্ছি তোমার কাছে বসবে এখন। বলিয়া তিনি গোপালের মাকে ডাকিয়া যথাযোগ্য উপদেশ দিয়া সকলকে লইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলেন।

নিরালা ঘরের মধ্যে শান্তির সময় যেন আর কাটিতে চাহে না। মাথার ভিতর ঝিম ঝিম করিতেছে, কিছুতেই ঘুম আসে না। কিছুক্ষণ নির্জ্জীবের মত পড়িয়া থাকিয়া সে একখানা বই টানিয়া লইয়া পড়িতে লাগিল।

গোপালের মা বাড়ীর ঝি। সে আসিয়া কহিল, বউদি আমি ভাঁড়ার-ঘরে চাল ঝাড়ছি, দরকার হলে ডেক।

আচ্ছা, বলিয়া শান্তি পাশ ফিরিয়া শুইল। তারপর কতক্ষণ কাটিল সে হুঁস তাহার ছিল না। হয় ত সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। একটা অস্ফুট কাতর আহ্বান কানে আসিতে

আর তন্দ্রাঘোর কাটিয়া গেল। শান্তির মনে হইল, কে যেন তাহাকে 'ছোটদি' বলিয়া ডাকিতেছে।

অপ্রত্যাশিত সম্ভাবনায় তাহার বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল। কিন্তু সে নির্দ্দয় লাঞ্ছনার পর কানু যে কোনদিন বাড়ীতে আসিতে পারে, তাহা সে ভাবিতে পারিল না। কিন্তু পরক্ষণেই আর এক সকাতর আহ্বান তাহাকে যেন ধাক্কা দিয়া বিছানা হইতে তুলিয়া দিল। বাহিরে আসিয়া দেখিল, বারান্দার এক কোণে দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া দেয়ালে ঠেস দিয়া কানু বসিয়া আছে। তাহার সারা শরীর ক্ষণে ক্ষণে কাঁপিয়া উঠিতেছে।

কাছে আসিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে শান্তি জিজ্ঞাসা করিল,—কানু, কি হয়েছে ভাই ?

উত্তরে কানু দুই রক্ত চক্ষু তুলিয়া কহিল—বড় জ্বর ছোটদি, সমস্ত শরীরে ব্যথা আর বসতে পারছি না। বলিয়া সেই অনাবৃত মেজের উপর শুইয়া পড়িল।

—ওকি ভাই ওখানে কেন ? ঘরের ভিতর এস। বলিয়া তাহাকে সযত্নে ধরিয়া তুলিয়া নিজের বিছানায় আনিয়া শোয়াইয়া দিল।

সে কোমল শয্যায় হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া কানু একটা আরামের আঃ শব্দ করিয়া চোখ বুজিল। কিছুক্ষণ পরে শান্তির মুখের পানে চাহিয়া কহিল—বড় তেষ্টা ছোটদি. জল দাও।

জল খাইয়া কানু আবার চোখ বুজিল, শান্তি শিয়রে বসিয়া তাহার জ্বরতপ্ত ললাটে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। হঠাৎ কানু যেন সচকিত হইয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল—আমি যাই ছোটদি, তাঁরা দেখলে হয় ত তোমাকে মন্দ বলবেন।

তাহার ক্লিষ্ট বিশীর্ণ মুখের পানে চাহিয়া শান্তি মুহূর্ত্তের জন্য কি ভাবিল। তারপর দৃঢ় কণ্ঠে বলিল—না, বলবেন না, তুমি শোও।

—ঠিক জান ছোটদি ?

—জানি, বোনের কাছে ভাই আসবে তাতে ভাল-মন্দ নিন্দা অখ্যাতির কথা উঠবে কেন ভাই ? তুমি চুপটি করে শুয়ে থাক।

তার সারা মুখে অকৃত্রিম ভগ্নিপ্রীতির যে আর্দ্র কোমলতা ফুটিয়া উঠিল, তাহার পানে চাহিয়া কানু ধীরে ধীরে আবার শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে ডাকিল—ছোটদি !

—কানু, ভাই।

—আজ তোমার কাছে কেন এসেছিলাম জান ?

—কেন ?

—সকাল থেকে কেন যেন মনে হচ্ছিল, আমি আর বাচব না। হয় ত আজকের দিন পার হয়ে গেলে তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না।—তাই—

—ষাট্, অমন অলক্ষণে কথা মুখে আনতে নেই। তোমার মত ছেলে না বাঁচলে দীন-দুঃখীর দুঃখ দূর করবে কে ভাই ? তাই ভগবান নিজের গরজেই তোমাদের বাঁচিয়ে রাখবেন, বলিয়া অঞ্চলপ্রান্ত দিয়া সজল চক্ষু মুছিয়া কানুর মাথা নিজের কোলের উপর টানিয়া লইল।

এই ভাবে কতক্ষণ কাটিল, সে হুঁস কাহারও ছিল না, শুধু দুইটি স্নেহসিক্ত অন্তর পরস্পরকে চিনিয়া অত্যন্ত নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ কঠিন কণ্ঠের তীক্ষ্ণ আহ্বানে শান্তি চমকিয়া উঠিল।

—বউ মা।

শান্তি দেখিল তাহার পিসশাশুড়ী দুয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

—বউমা এটা ভদ্র গেরস্থের বাড়ী, সহুরে বেহায়াপানা এখানে চলবে না।

তাহার আচরণে কি নির্লজ্জতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা বুঝিতে না পারিয়া শান্তি নির্ব্বোধের মত চাহিয়া রহিল।

পিসি আবার কটু কণ্ঠে কহিলেন—জ্বরের দোহাই দিয়ে কুটুম্ব-বাড়ী যেতে পারলে না, কিন্তু একটা হতভাগা ছোঁড়াকে কোলের উপর শুইয়ে সোহাগ করতে পারছ, এ তোমার কেমন প্রবৃত্তি বউমা ? যে বংশে কোনদিন একটু কলঙ্কের দাগ পর্য্যন্ত পড়ে নি, তার নাম এমন করে ডোবাতে তোমার লজ্জা হ'ল না ?

এই নিষ্ঠুর অপবাদের কি উত্তর দিবে তাহা শান্তি বুঝিতে পারিল না। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল এবং একটা কঠিন প্রত্যুত্তর জিহ্বাগ্রে অসংযত হইয়া আসিল।

কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই কানু যেন বন্দুকের গুলি খাইয়া ছিটকাইয়া পড়িল। কোন মতে দুয়ারের কাছে গিয়া পিসিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—ছোটদিকে বকবেন না পিসিমা, আমিই ইচ্ছা করে এসেছিলাম, দোষ আমারই। বলিয়া টলিতে টলিতে সে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

*

সে রাত্রে বহুক্ষণ শান্তির জাগিয়া কাটিল। পরদিন যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন প্রভাতের সূর্য্যকিরণ ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। জ্বর ছাড়িয়াছে, শারীরিক গ্লানিরও উপশম হইয়াছে, তবু যেন গোপন ব্যথার অনুভূতিতে মনের অবসাদ ঘুচিতেছে না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া কানুর মুখখানা শান্তির মনে পড়িল। অন্তরের কি অপরিসীম ব্যাকুলতায় যে, সে তাহার কাছে আসিয়াছিল, তাহা শুধু শান্তিই জানিতে পারিয়াছিল। দীন-দরিদ্রের রোগ-শোক-আপদ বিপদে যে নির্ভয়চিত্ত বালক নিজকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াছে, তাহার কঠিন পীড়ায় সেবাযত্ন পরের কথা, হয় ত মাথা রাখিবার একটু আচ্ছাদনও মিলিবে না, একথা স্মরণ করিয়া শান্তির ব্যথা যেন চতুর্গুণ হইয়া উঠিল। অথচ তাঁহার পিসশাশুড়ীর মত এমন লোকও আছে, যাহারা তাহাদের ভাই-বোনের নির্ম্মল সম্পর্ককে কটু আলোচনার বিষয়ীভূত করিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিতে দ্বিধা বোধ করে না। ইহাই হয়ত পল্লী-সমাজের নৈতিক জীবনের মাপকাঠি। বিশেষ বয়সের দুইটি স্ত্রী-পুরুষকে নিরালায় একত্র দেখিলে একটা কুৎসিত ধারণা পোষণ করা ইহাদের মজ্জাগত সংস্কার। ভাবিতে গিয়া শান্তির শিক্ষিত মার্জ্জিত অন্তর শিহরিয়া উঠিল এবং এক অজানিত ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া আসিতে লাগিল।

কিন্তু নিন্দুকের রসনা যে কিরূপ নির্ম্মম নিঃসঙ্কোচে মিথ্যাকে প্রচার করিতে পারে, পুকুর-ঘাটে কাপড় ধুইতে আসিয়া শান্তি নিজের কাণেই তাহা শুনিতে পাইল।

বড়বউ রান্নাঘরের বারান্দায় বসিয়া তরকারী কুটিতেছিল, সেখানে গিয়া শান্তি অবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—এসব কি শুনছি বড়দি?

পিসীর প্লাবিত কাহিনীর কিছু কিছু বড়বধূর কাণেও গিয়াছিল। দীর্ঘকাল এই বাড়ীর বধূপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া এই পূজনীয়া শাশুড়ীটিকে চিনিতে তাঁহার বাকী ছি[illegible] পরছিদ্রান্বেষণ ও মিথ্যা অপবাদ রটনা যে তাঁহার স্বভা[illegible] তাহাও সে জানিত। তাই কথাটা কাণে আসিলেও প্রবেশ করিতে পারে নাই।

শান্তির অশ্রুরুদ্ধ স্বরে সচকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার মুখের শেষ রক্তবিন্দু কে যেন শুষিয়া লইয়াছে, এমনি বিবর্ণ পাণ্ডুরতায় তাহা আচ্ছন্ন। এই নিষ্ঠুর আঘাত সে কোথা হইতে পাইল, তাহাও অনুমান করিতে বিলম্ব হইল না। সমবেদনাস্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, ওসব কাণে তুলিস না শান্তি, পিসিমার ঐ স্বভাব, মিথ্যা করে দশ কথা বানিয়ে বলেন। তোর দুধ ঢেকে রেখেছি, দেরী না করে খেয়ে ফেল। বলিয়া তিনি নিজেই উঠিয়া গিয়া দুধের বাটী আনিয়া শান্তির মুখে ধরিলেন।

শান্তি কয়েক মুহূর্ত্ত শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে দুধের বাটিতে মুখ দিল। এক চুমুক খাইতেই জ্বরতপ্ত একখানা শীর্ণ মলিন মুখ তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে তাহার বুকের ভিতরটা প্রচণ্ড বেগে দুলিয়া উঠিল এবং প্রবল বিতৃষ্ণায় পেটের ভিতরের সমস্ত কিছুই যেন বাহির হইয়া আসিতে চাহিল। তাড়াতাড়ি বাটি নামাইয়া সে অঞ্চলে মুখ আবৃত করিল।

বড়বউ দেখিয়া কহিলেন—কি হ'ল ছোটবউ?

শান্তি ভাল করিয়া চোখ মুছিয়া ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিল—বমি আসছে বড়দি, এখন আর খেতে পারব না। বলিয়া উঠিয়া নিজের ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল।

পীড়িত অন্তরের অব্যক্ত ব্যথা লইয়া শান্তি সারাদিন ঘরের ভিতরে কাটাইল। আজ শনিবার, স্বামীর আসিবার দিন। অন্যান্যবার একটা অসহিষ্ণু ও সলজ্জ প্রতীক্ষা লইয়া শান্তির এই দিনটি কাটে। সারা সকাল দুপুর তাহার মন যেন বসন্ত-বাতাসে উড়িয়া বেড়ায়। অপরাহ্নে ঘন ঘন ঘড়ির কাঁটার দিকে নজর পড়ে এবং শয্যা পাতিতে আসিয়া হঠাৎ এক সময়ে মুকুরে নিজের বেশ-প্রসাধনের বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া সরমে রাঙ্গা হইয়া উঠে। আজ কিন্তু সে ব্যাকুলতার চিহ্নমাত্র নাই; যেন তাহার পরিচিত জগৎ হইতে কে তাহাকে নির্ব্বাসনে পাঠাইয়াছে। জীবনের আশা, আকাঙ্ক্ষা, উদ্দেশ্য,

আদর্শ সমস্তই নিষ্করুণ নিষ্ফলতায় কাঁদিয়া মরিতেছে, গন্ধে বর্ণে বিচিত্র এই পৃথিবী তাহার নিকট লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ভাবিতে ভাবিতে তাহার বক্ষ মথিত করিয়া যেন বেদনার ঝড় বহিতে লাগিল এবং নিরুদ্ধ অশ্রুপ্রবাহে চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া উঠিল। বহুক্ষণ পরে যখন চিন্তাবেগ সম্বরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন দিনান্তের শেষ সূর্য্যরশ্মি পশ্চিমের জানালা দিয়া ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। দরজার কাছে আসিতে তাহার বড় জায়ের ছেলে অপূর্ব্ব আসিয়া কহিল— একটা কথা শুনবে ছোট কাকী?

—কি?

অপূর্ব্ব ঘরের ভিতর আসিয়া আস্তে আস্তে কহিল—কানুমামা আর বাঁচবে না, ছোটকাকী।

শান্তি কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—কে বললে?

—নিতাই কবিরাজ। খালের ধারে যে ভাঙ্গা স্কুলঘরটা আছে, তাতেই সে শুয়ে আছে। আমরাও সেখানে খেলা করছিলাম, আমাকে দেখে কানুমামা কি বললে জান?

—কি?

—আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললে, তোর ছোটকাকীর একটু পায়ের ধুলো এনে আমার মাথায় দিতে পারিস অপু? তা হলে হয় ত আমি সেরে উঠব। আচ্ছা, ছোটকাকী, বলিয়া তাহার মুখের পানে চাহিতে সে যেন ভয়ে থামিয়া গেল।

শান্তি অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল—যাও অপু, তুমি খেলা করগে—বলিয়া পুনরায় শয্যাপ্রান্তে আসিয়া বসিল।

সেই মুহূর্ত্তে তাহার অন্তররাজ্যে যেন একটা বিপ্লবের বন্যা বহিয়া গেল। যে নিষ্পাপ, নিঃস্বার্থ, পরোপকারী বালক তাহার অসংখ্য সেবাব্রতের পুরস্কার নিজের মৃত্যু দিয়া এমন করিয়া গ্রহণ করিতে বসিয়াছে, তাহার অন্তিম শয্যাপ্রান্তে বসিয়া কেহ একবিন্দু অশ্রু ফেলিবে না, এক ফোঁটা তৃষ্ণার জল পর্য্যন্ত মুখে তুলিয়া দিবে না! এই অকৃতজ্ঞ নির্ম্মমতার সমগ্র বেদনা যেন এক সঙ্গে সহস্র শক্তিশেলের মত তাহার বুকে আসিয়া আঘাত করিল। মনে হইল, যে দুর্ব্বলতার অন্ধকার তাহার মনের কোণে বাসা বাঁধিয়া ছিল, তাহার চিহ্নমাত্র কোথায়ও নাই! স্বচ্ছ আলোকে সম্মুখের পথ অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছে, ভয়-ভাবনা, নিন্দা-অখ্যাতি, লজ্জা-সঙ্কোচের অনুভূতিও কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। সন্ধ্যার পর স্বামী আসিবেন, তাহাকে না দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, একটা অপ্রিয় ঘটনায় তাহার শান্তচিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে, হয়ত এ বাড়ীর সম্মানের আসন সে চিরতরে হারাইবে। তবু সে যাইবে, শেষ নিঃশ্বাস ফেলিবার আগে তাহাকে একবার দেখিয়া আসিবে!

আসন্ন সন্ধ্যার স্তিমিতালোকে শান্তি রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। আকাশে মেঘ জমিয়াছে। পথ জনবিরল। দুই চার জন যাহারা ছিল, সকলেই ঝড়বৃষ্টির আগে বাড়ী ফিরিতে ব্যস্ত, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া দেখিবার মত অবসর কাহারও ছিল না। অপু যে ভাঙ্গা স্কুলঘরটার কথা বলিয়াছে, রেল-ষ্টেশনের পথ তাহার কাছ দিয়াই গিয়াছে। পিত্রালয় হইতে শ্বশুরবাড়ী যাতায়াতের সময় কাপড়ের পর্দ্দার ফাঁক দিয়া পল্লীর অচেনা শ্যামলশ্রী সে দুই চোখ ভরিয়া দেখিতে দেখিতে গিয়াছে। কালী-মন্দিরের কাছে বাঁয়ের পথ ছাড়িয়া যে ডান দিকে যাইতে হইবে, তাহাও তাহার বেশ মনে ছিল। সুতরাং পথ চিনিয়া যাইতে কষ্ট হইল না।

অনভ্যস্ত ক্ষিপ্রতায় মাঝখানের পথ অতিক্রম করিয়া সে যখন স্কুলঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন গাঢ় অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। একাকিনী অপরিচিত গৃহের দুয়ারে দাঁড়াইয়া শান্তির বুক কাঁপিয়া উঠিল, ভিতরে প্রবেশ করিতে পা সরিল না। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ কাণে আসিতে তাহার সমস্ত ভয়-ভাবনা এক নিমিষে অন্তর্হিত হইল। অব্যক্ত আকুলতায় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দুয়ার ঠেলিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিল, কিন্তু সূচীভেদ্য অন্ধকারে কিছুই চোখে পড়িল না। উদ্বিগ্ন অনিশ্চয়তায় কয়েক মুহূর্ত্ত কাটিল, তারপর তীব্র বিদ্যুতালোকে ঘরের এক কোণে দৃষ্টি পড়িতে শান্তি চমকিয়া উঠিল।

কম্পিতপদে কানুর ভূমিশয্যার কাছে গিয়া ডাকিল—কানু!

কোন সাড়া আসিল না, শান্তি মাথার কাছে বসিয়া কপালে হাত রাখিয়া আবার ডাকিল—কানু, ভাই!

কানু একটু নড়িয়া উঠিল, তারপর অতি কষ্টে নিঃশ্বাস লইয়া দুর্ব্বল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—ছোটদি?

—হাঁ ভাই, আমি।

কানু অস্ফুট স্বরে কহিল—বড় তেষ্টা ছোটদি, বুক ফেটে গেল।

শান্তি তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল। অন্ধকারে পথ চিনিয়া খাল হইতে অঞ্জলি ভরিয়া জল আনিয়া কহিল,—কানু, জল এনেছি ভাই, খাও।

জল খাইয়া আবার অতিকষ্টে নিশ্বাস লইয়া কানু কহিল,—তোমার একটু পায়ের ধুলো আমার মাথায় দাও, ছোটদি, আমাকে আশীর্ব্বাদ কর। বলিয়া সে নিজেই শান্তির পা খুঁজিয়া লইয়া ধীরে ধীরে হাত কপালে ঠেকাইল।

শান্তি অঞ্চলে চোখ মুছিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিল,—ভয় নেই কানু, তুমি ভাল হয়ে উঠবে।

কানু কি বলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু একটা অস্ফুট শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না। তাহার মাথা সযত্নে কোলে তুলিয়া লইয়া শান্তি অপরিসীম স্নেহে মাথায় ও কপালে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

বাহিরে বৃষ্টি ও বাতাসে মাতামাতি সুরু হইল, ঝড়ের দোলায় জীর্ণ ঘর নড়িতে লাগিল, জলের ঝাপটায় ঘরের ভিতর বিন্দুমাত্র স্থান শুষ্ক রহিল না। দূরে নিকটে জনপ্রাণীর অস্ফুট সাড়া পর্য্যন্ত নাই, যেন এই প্রলয়ঙ্করী রজনীর রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া শঙ্কায় ও ত্রাসে সকলে মূক হইয়া গিয়াছে। শিশু মাতৃঅঙ্কে আশ্রয় লইয়াছে, ভাই বোনকে জড়াইয়া ধরিয়াছে, স্বামীর বাহুবন্ধনের মাঝে স্ত্রী নিরাপদ স্থান খুঁজিয়াছে। শুধু পরিত্যক্ত ভগ্ন গৃহে একাকিনী এক মমতাময়ী তরুণী তাহার সোদরোপম স্নেহাস্পদের মৃত্তিকা-শয্যার কাছে তপস্বিনীর মত বসিয়া রহিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ জলে ভিজিয়া গেছে, রাত্রি গভীর হইয়া অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছে, মাথার উপরের জীর্ণ আচ্ছাদন কখন ভাঙ্গিয়া পড়িবে তাহার স্থিরতা নাই। তবু নিঃশঙ্ক অবিচলতায় সে তেমনি করিয়া বসিয়া রহিল, একবার নড়িল না, একটু সরিয়া পর্য্যন্ত বসিল না।

হঠাৎ এক সময়ে শান্তি সচকিত হইয়া উঠিল, ঝড় বৃষ্টি থামিয়াছে। বাহিরে পাখীর কাকলী শোনা যাইতেছে, একটু যেন আলো ফুটিয়াছে, অন্ধকার স্বচ্ছ হইয়াছে, একপাশে দৃষ্টি পড়িতে শান্তি সবিস্ময়ে দেখিল, স্বামীর সঙ্গে শাশুড়ী আসিয়া ঘরের ভিতর দাঁড়াইয়াছেন।

শাশুড়ী সস্নেহ তিরস্কারের সুরে কহিলেন, বউমা এ তোমার কেমন ছেলেমানুষী মা! আমাকে জানালে কি কানুকে আমি বাড়ী নিয়ে যেতে পারতাম না? তোমাকে খুঁজে না পেয়ে এতক্ষণ আমাদের কি ভাবে কেটেছে, তা শুধু ভগবান জানেন, আর দেরী ক'র না, এবার বাড়ী চল। বাবা নীরোদ, তুমি কানুকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী এস।

নীরোদ কানুর ভূমিশয্যার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। হাতের আলোকে তাহার মুখের পানে চাহিয়া ভীত কম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—মা!

প্রকৃত ইতিহাস

কোন্ মানুষের কি রকম উন্নতি অথবা অবনতি হইলে তাহার রচনা ও কার্য্যাবলী কিরূপ হয়, সমাজের কোন্ অবস্থায় কিরূপ গ্রন্থকারের উদ্ভব হয়, এবম্বিধ তথ্যগুলি জানা থাকিলে, যে কোন দেশের ইতিহাস ঐ দেশের এবং ঐ সময়ের রচিত গ্রন্থাবলী হইতে বুঝিতে পারা সম্ভব হয়। মানুষ মিথ্যা কথা বলিতে পারে বটে, কিন্তু যিনি মিথ্যা কথা বলেন, তাঁহার ভাবভঙ্গীতে অথবা রচনায় যে অস্বাভাবিকতার উদ্ভব হয়, তাহা প্রকৃত বুদ্ধিমানের দৃষ্টি হইতে লুক্কায়িত রাখা যায় না। কাযেই প্রকৃত ইতিহাসের প্রধান উপকরণ তিনটী—যথা (১) যে সময়ের ইতিহাস জানিতে হইবে, সেই সময়ের বিভিন্ন রচনাবলী, (২) বুদ্ধিমান্ পাঠক, (৩) রচনাবলী হইতে গ্রন্থকারের চরিত্র এবং তাঁহার সমসাময়িক সমাজ-চিত্র প্রভৃতি কিরূপে বুঝিতে হয়, তাহার তত্ত্ব।

বুকের একটি ব্যাধি

—শ্রীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়

আমার গত প্রবন্ধে স্যানাটোরিয়াম-জীবন সম্বন্ধে যেটুকু শেষ করতে পারি নি, এই প্রবন্ধে সেটুকু বলব।

রোগী স্যানাটোরিয়ামে আসবার পরে তাকে স্যানাটোরিয়ামের কি কি নিয়ম-কানুন মানতে হবে এবং কখন কি ভাবে চলতে হবে, তার একখানা ছাপানো কাগজ অথবা ছোট্ট বই তাকে দেবার ব্যবস্থা অনেক স্যানাটোরিয়ামে আছে, অনেক স্যানাটোরিয়ামে নেই। যেখানে এই কাগজ দেওয়া হয়, সে ত ভালই, যেখানে দেওয়া হয় না সেখানে নবাগত রোগী পুরানো রোগীদের কাছ থেকে সব শুনে নিতে পারবেন। তবে যে করেই হ'ক সব নিয়ম-কানুন জানবার পরে রোগী প্রত্যেকটি নিয়ম পালন করে চলবেন—আন্তরিকতার সাথে। রোগী নিজেকে নিজে এই প্রশ্নটি করবেন—"কিছুদিন একটু কষ্ট সহ্য করে নিজেকে সারিয়ে তুলে আবার ফিরে যাব আমার সেই স্বাধীন, কর্ম্মময়, আনন্দময় জীবনে—সেইটা আমি চাই, না কি বর্ত্তমানের কতকগুলি অতি ছোট-খাটো তৃপ্তির মোহের বশবর্ত্তী হয়ে, অতি ছোট-খাটো কতকগুলি দুর্ব্বলতা প্রকাশ করবার লোভ সম্বরণ করতে না পেরে, নিজেকে ক্রমাগত ভুগিয়ে ভুগিয়ে চলব মাসের পর মাস—বছরের পর বছর—সেইটা আমি চাই?" প্রকৃতপক্ষে আরোগ্যলাভের পথে যক্ষ্মারোগীকে বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, বহু ক্ষুদ্র প্রলোভনের প্রতি উদাসীন হতে হবে, জয় করতে হবে প্রতিপদে বহু হৃদয়-দৌর্ব্বল্য, নিজেকে পরিণত করতে হবে এক নিষ্ঠুর সাধকে। আমার মনে হয় তারাই এই ব্যাধি থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে, যাদের আছে Stalin-এর ন্যায় লোকের মত "grim determination and unshakable will to win." নবাগত রোগী স্যানাটোরিয়ামে হয়ত অনেক এমন রোগী দেখতে পাবেন, যারা করবে বিশ্রামের অবহেলা, অমান্য করে চলবে স্যানাটোরিয়ামের নিয়ম-কানুন; কিন্তু ডাক্তারের সাড়া পাওয়া মাত্র সাজবে একেবারে ভিজে বেড়াল, সটান বিছানায় এসে এমন মড়ার মত পড়ে থাকবে যে, দেখলে মনে হবে, যেন তারা সেই আদমের যুগ থেকে এমনি করে বিশ্রাম নিচ্ছে—একটু এপাশ ওপাশ করেনি! কিন্তু এই সব রোগীর, মহাত্মাজী তাঁর Autobiography (vol. II)তে যে সুন্দর কথাটি বলেছেন এটি জেনে রাখা ভাল—"Ultimately a deceiver only decieves himself." ডাক্তারকে ফাঁকি দিলে তাঁর হবে না একটুও, ঠকতে হবে নিজেরই। এই ব্যারাম নিয়ে ছেলেখেলা নয়, কাজেই মনের সমস্ত বিদ্রোহকে শান্ত করে রাখতে চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ—অবশ্য সারাবার মতলব থাকলে।

স্যানাটোরিয়ামে থাকাকালীন নিজের ব্যাধি সম্বন্ধে এবং চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন, অনেক ভয়, অনেক সংশয় রোগীর মনে জাগে। মনে যা শঙ্কা আসে, রোগী ডাক্তারকে খুলে জিজ্ঞেস করবেন—নিজের সম্বন্ধে কোন ভুল ধারণা নিজের ভিতরে না থাকে। স্যানাটোরিয়ামের বাইরে এসব জানবার বা শিখবার সুবিধা সব সময়ে পাওয়া মুস্কিল।

স্যানাটোরিয়াম-হাসপাতালে যে অনেক সময় অনেক অসুবিধা সহ্য করতে হয়, একথা আমি স্বীকার করি। অনেক সময়ে অনেক ব্যাপারে ডাক্তারদের অনেক রকম মন্তব্য আমাদের পীড়িত করে, নার্স বা ওয়ার্ড-অ্যাসিস্ট্যান্টদের অনেক দুর্ব্যবহার, আমাদের প্রতি অনেক অবহেলা, অনেক ঔদাসীন্য মনকে তিক্ত করে তোলে—এ-ও আমি স্বীকার করি। বিশেষ করে আর একটি কথা, স্যানাটোরিয়ামের একঘেয়ে রান্নাটা অনেকেই তেমন রুচির সাথে খেতে পারে না এবং খাওয়া নিয়ে অভিযোগ যে লেগে থাকে প্রায়ই, তাও আমি জানি। তা ছাড়া আরও হয়ত ছোটখাটো অসুবিধা আছে, ছোট-খাটো আরামের অভাব আছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও স্যানাটোরিয়াম সম্বন্ধে চট করে কোনো বিরুদ্ধ কথা বলতে আমি একটু কুণ্ঠিত হই, কারণ আমি এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন যে আমাদের দরিদ্র দেশে শতকরা নব্বই জন লোকের পক্ষেই বাইরে স্যানাটোরিয়ামের মত ব্যবস্থা করে নিজেদের চিকিৎসা চালানো কি ভয়ানক রকম অসম্ভব। স্যানাটোরিয়ামের বাইরে তাদের বিড়ম্বনা লক্ষগুণে বেশী, যদি এর উপরে আরও না হয়। এক ধরণের লোক আছে, যাদের খুঁত ধরা এবং অভিযোগ করাই স্বভাব, কিন্তু তারা যদি একটু ধীর ভাবে চিন্তা করে তবে বুঝতে পারবে যে, এসব ধরণের পাবলিক ইনসটিটিউশান যেখানে বহু রকম লোকের ভীড়, বহু রকম কাজ এবং বহু রকম ব্যবস্থার প্রয়োজন এবং ভাল ফাণ্ডের অভাবও যেখানে যথেষ্ট আছে, সেখানে সকলের মনস্তুষ্টি করে সব সময়ে চলা কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব হয় না। অবিশ্যি একথা আমি সর্ব্বদাই স্বীকার করব যে, রোগীদের প্রতি কারুরই কোনরকম দুর্ব্যবহার, কোনরকম অমনোযোগিতা, কোনরকম কর্ত্তব্যে শিথিলতা কিছুতেই ক্ষমার্হ নয় এবং স্বীকার করব যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ স্যানাটোরিয়াম-হাসপাতাল এখনও যথেষ্ট সংস্কারের অপেক্ষা রাখে, তবুও আমাদের দেশের জনসাধারণের বহুবিধ দুরবস্থার কথা কল্পনা করে আমি এটা বলতে চাই যে এসব স্থানে এসে সব সময়েই একটা বিরুদ্ধ মনোভাব না পোষণ করাই ভাল এবং মক্ষিকাবৃত্তি যথাসম্ভব ত্যাগ করে মধুকরবৃত্তি অবলম্বন করাই সঙ্গত।

যাঁরা সঙ্গতিসম্পন্ন, তাঁরা স্যানাটোরিয়ামে প্রচুর বিলাসিতা করতে পারেন। দু' একজন আত্মীয়-বন্ধুও সঙ্গে নিতে পারেন, নিজেরা নিজেদের চাকর-বাকর রাখতে পারেন, নিজেদের খাওয়ার বন্দোবস্ত নিজেরা করতে পারেন, সময় কাটাবার জন্যে নিজেদের গ্রামোফোন, নিজেদের রেডিও বা অন্য কিছু রাখতে পারেন। অধিকাংশ, অধিকাংশ কেন, বলতে গেলে

প্রায় সব স্যানাটোরিয়ামেই নানা রকম শ্রেণীবিভাগ আছে, যিনি যে ক্লাশে যত ইচ্ছা খরচা করে থাকতে পারেন।

এখানে আর একটু বলে এই প্রসঙ্গটা শেষ করে দিই। এমন রোগী অনেক সময়ে দেখতে পাওয়া যায়, যারা ডাক্তারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্যানাটোরিয়াম থেকে চলে যেতে সচেষ্ট হন। অবিশ্যি দীর্ঘকালের ভিতরেও যদি কোন রকম উন্নতি না হয়, তবে রোগী অন্য চেষ্টা ইচ্ছে হলে করতে পারেন, কিন্তু উন্নতি যদি সুস্পষ্ট হয়, তবে মাঝ-পথে স্যানাটোরিয়াম ত্যাগ করা কখনই সঙ্গত নয়; বরং ডাক্তারকে একটু ধরে একটু বেশী দিন থাকতে চেষ্টা করা দরকার। যক্ষ্মারোগীর জীবনে বহুবার সাময়িক উন্নতি আসে, বহুবার সে উন্নতি চলে যায়। দুদিন জ্বরটা একটু কম থাকল, অথবা কাসিটা একটু কম থাকল, অথবা দু'সপ্তাহ ওজন একটু বাড়ল, এইতেই যক্ষ্মারোগী নিজের সম্বন্ধে কোন রঙীন কল্পনা যেন গড়ে না তোলেন। চিকিৎসা সম্পূর্ণ শেষ না করে স্যানাটোরিয়াম ছেড়ে চলে আসবার জন্যে ব্যস্ত হওয়া মানে কিছু দিনের ভিতরেই পুনরায় সেখানে ফিরে যাবার পথ পরিস্কার করে রাখা।

যক্ষ্মা-রোগীর জীবনে সাময়িক উন্নতিও যেমন অনেকবার আসে, সাময়িক অবনতিও ঠিক তেমনিই আসে এবং এর জন্যে রোগীর কিছুমাত্র হতাশ হয়ে পড়া ঠিক নয়। বেশ হয়ত দিন চলেছে, হঠাৎ জ্বর বেড়ে পড়ল, কাসি বেড়ে গেল, খুব গয়ের উঠতে থাকল, ওজনও তর তর করে গেল খানিক কমে; কিন্তু রোগী একটু ধৈর্য্য ধরে লক্ষ্মী হয়ে থাকলেই এসব অবস্থা ধীরে ধীরে উঠতে পারবেন কাটিয়ে। অনেক সময়েই এমন দেখা গিয়েছে যে, কিছু দিন এই সব উপদ্রবের পরে রোগীর সহসা একেবারে আশ্চর্য্যজনক ভাবে উন্নতি সুরু হয়েছে। রক্ত ওঠাকে ডাক্তারী ভাষায় বলে "Haemoptysis." এই "হিমপ্‌টিসিস" কথাটা রোগী স্যানাটোরিয়ামে অহরহ শুনতে পাবেন। এই রক্ত ওঠাটাকে অনেকে অতিরিক্ত ভয় পান এবং মনে করেন রক্ত ওঠা মানেই বুঝি অসুখ ভীষণ বেড়ে যাওয়া এবং অবস্থা খুব খারাপ হলেই বুঝি অমন রক্ত ওঠে। এক কথায় বলে রাখি, এ তাঁদের ভুল ধারণা। অসুখের যে কোনও অবস্থায় যে কোনও সময়ে রক্ত উঠতে পারে এবং রক্ত ওঠা নিয়ে মাথা ঘামানোর একেবারেই কিছু নেই। কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়মের ভিতর দিয়ে এ অসুখ অগ্রসর হতে থাকে এবং এমন দেখা গিয়েছে যে, কতকগুলি নিয়ম সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত সারবার দিকে অসুখ সহজে মুখ ফিরাতে চায় না; কখনও চাপা থাকে, আবার কখনও ওঠে একটু মাথা চাড়া দিয়ে। কিন্তু চিকিৎসা চলবার সাথে সাথে ক্রমে ক্রমে অসুখ ধীরে ধীরে শান্ত ভাব ধারণ করে এবং রোগীর চোখের সামনে অথচ দূরে আরোগ্য-নক্ষত্র আশার আলো বিকীর্ণ করতে করতে হাসতে থাকে।

ভারতবর্ষে কোথায় কোথায় কি রকমের কোন টি. বি. স্যানাটোরিয়াম আছে, এর খোঁজ অনেক সময়ে রোগীর পক্ষে পাওয়া মুস্কিল হয়ে পড়ে। এটা উপলব্ধি ক'রেই বর্ত্তমান প্রবন্ধে যতগুলি স্যানাটোরিয়ামের খোঁজ আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি তার একটা ফিরিস্তি দিয়ে গেলাম। কেউ সাধারণ চেঞ্জের জন্যে অথবা ডিস্‌পেপসিয়া, কালাজ্বর, "ম্যালেরিয়া" সারাবার জন্যে যেন এসব জায়গায় যাবার উপক্রম না করেন; এগুলি শুধুই টিউবারকুলোসিসের চিকিৎসা-স্থান।

১। Union Mission Tuberculosis Sanatorium, P.O. Arogyavaram, (near Madanapalla), Dt, Chittoor, South India. এই জায়গাটি সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ২৫০০ ফিট উঁচু, আবহাওয়া বেশ শুকনো, ছোট ছোট পাহাড়ে ঘেরা এবং মদনপল্লী রোড নামক রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে চার মাইল দূরে। এই স্যানাটোরিয়ামে ২৫০টি বেড আছে এবং এই রোগের সর্ব্ববিধ আধুনিক চিকিৎসা এখানে করা হয়ে থাকে। এটা একটা মিশনারী-স্যানাটোরিয়াম, কিন্তু যে' কোন স্থানের যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী রোগীকেই গ্রহণ করা হয়। তবে এখানকার জেনেরাল ওয়ার্ডে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর এবং যে সমস্ত মিশনারী-সোসাইটি এই স্যানাটোরিয়ামকে সাহায্য করেন, তাঁদের প্রেরিত লোক ছাড়া নেওয়া হয় না। বিশেষ রকম ধরাধরি করতে পারলে অবিশ্যি জেনেরাল ওয়ার্ডে স্থান পাওয়া অন্য প্রদেশের রোগীর পক্ষে সম্ভব হলেও হ'তে পারে। এখানে দু'রকমের ওয়ার্ড আছে—জেনেরাল এবং স্পেশ্যাল। জেনেরাল ওয়ার্ডের ভাড়া ১৮৲ টাকা। এই টাকার ভিতরেই খাওয়া, থাকা, চিকিৎসা চলবে। এই টাকাও যাঁরা দিতে পারবেন না, তাঁরা কন্‌সেসান্ অথবা ফ্রীর জন্যে চেষ্টা করতে পারেন। স্পেশ্যাল ওয়ার্ডের ভাড়া ৫০৲ টাকা থেকে ১৫০৲ টাকা। এই ভাড়াটা কেবল ঘরের বাবদ। স্পেশ্যাল ওয়ার্ডের রোগীর নিজের খাবার বন্দোবস্ত নিজে করতে হবে এবং কোন রকম দামী ইঞ্জেক্‌শান, x-ray ইত্যাদির চার্জ্জ পৃথক দিতে হবে। স্পেশ্যাল ওয়ার্ডের রোগীকে নিজের লোক সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। রান্নাঘরের বন্দোবস্ত আছে। স্ত্রী, পুরুষ দুই শ্রেণীর রোগীকেই ভর্ত্তি করা হয়।

২। Dr. Muthu's Sanatorium, Pallawaram at Thambaran. (Madras). মান্দ্রাজ সহর থেকে ১২।১৩ মাইল দূরে। এই স্যানাটোরিয়াম সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর আমি নিতে পারিনি।

৩। Visranthipuram Tuberculosis Sanatorium, Rajahmundry, East Godavari District (South India). —এখানে দুই রকম ওয়ার্ড—জেনেরাল এবং স্পেশ্যাল। জেনেরাল ওয়ার্ডের খরচ ১৫৲ (থাকা, খাওয়া এবং চিকিৎসা)। স্পেশ্যাল ওয়ার্ডের ভাড়া ৩০৲ টাকা থেকে ৬০৲ টাকা পর্য্যন্ত। মেয়ে, পুরুষ দু'রকম রোগীই নেওয়া হয়—মোট ৩০টি বেড আছে।

৪। Edward VII Tuberculosis Hospital, Temple Gardens, P.O. Royapattah, Madras.—এই হাসপাতালটি মান্দ্রাজ সহরের উপরে অবস্থিত। মেয়ে, পুরুষ দু'রকম রোগীই থাকতে পারে। আশীটি বেড আছে। চার্জ্জ হচ্ছে—(গভর্ণমেণ্ট সার্জেণ্টদের জন্যে)—যাঁদের আয় ৫০৲ টাকার নীচে, তাঁরা ফ্রী। ৫০৲ টাকা থেকে ১০০৲ টাকা যাঁদের আয়, তাঁদের দৈনিক চার আনা হিসাবে। ১০০৲ টাকা থেকে ১৫০৲ টাকা যাঁদের আয় তাঁদের দিতে হবে দৈনিক আট আনা হিসাবে। যাঁদের আয় ১৫০৲ টাকা থেকে ২০০৲ টাকা, তাঁদের দৈনিক বার আনা

হিসাবে ; এবং যাঁদের আয় ২০০৲ টাকার উপরে তাঁদের দৈনিক পাঁচসিকে হিসাবে। আর যাঁরা গভর্ণমেণ্টের চাকর নন, তাঁদের এর ঠিক ডবল চার্জ্জ দিতে হবে। রোগী যদি ছাত্র হন, তবে তাঁর অভিভাবকের আয় অনুযায়ী চার্জ্জ করা হবে। আধুনিক সমস্ত প্রকার চিকিৎসা করা হয়ে থাকে।

৫। Princess Krishna Rajammanni Tuberculsis Sanatorium, P. O. Vontikoppal, Mysore. এটা মহীশূর ষ্টেট-স্যানাটোরিয়াম ; ধরাধরি করবার সুবিধা না থাকলে, ভিন্ন দেশীয় লোক এই স্যানাটোরিয়ামে স্থান পাবেন কি না ঠিক বলতে পারি না। জেনেরাল ওয়ার্ড বোধ হয় ফ্রী ; স্পেশ্যাল ওয়ার্ডের ভাড়া কত থেকে কত ঠিক বলতে পারব না। মেয়ে পুরুষ দু'শ্রেণীর রোগীকেই গ্রহণ করা হয়। মহীশূর সহর থেকে একটু দূরে বেশ মনোরম স্থানে না কি স্যানাটোরিয়ামটি অবস্থিত।

৬। Turner Sanatorium, Bhoiwada, Parel, Bombay. এটি বম্বে সহরের উপরে। ৩২টি বেড আছে ; ১৮টি পুরুষ এবং ১৪টি মেয়ে। এখানে সমস্ত রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয়। স্যানাটোরিয়ামটি বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে।

৭। Dr. Bahadurjee Memorial Sanatorium, Deolali, Bombay. এখানেও চিকিৎসা, থাকা, খাওয়া ইত্যাদির জন্যে রোগীদের টাকা দিতে হয় না। সব শুদ্ধ ২৮টি বেড। (বর্ত্তমানে আরও বাড়ান হয়েছে কি না জানি না)। ১৭টি বেড শুধু দরিদ্র পার্শী রোগীদের জন্যে। রোগীদের দেখাশোনা তাদের আত্মীয়স্বজনদের করতে হয়। দেখাশোনা করবার লোকেদের জন্যে ভিন্ন ঘরের ব্যবস্থা স্যানাটোরিয়ামে আছে।

৮। Hindu Sanatorium, Karla, Dt. Poona (Bombay). সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ২০১২৫ ফিট উঁচুতে এবং সুপরিচিত হিল্ ষ্টেশন "লোনাভালা"র অত্যন্ত কাছে এই স্যানাটোরিয়ামটি স্থাপিত। বোম্বাই এবং পুণার মাঝখানে "Malavali" নামক রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে স্যানাটোরিয়ামের দূরত্ব ১॥০ মাইল। এই স্যানাটোরিয়ামটি কেবল মাত্র হিন্দুদের জন্যে। বছরের ১লা অক্টোবর থেকে ৩০শে জুন অবধি খোলা থাকে এবং মাঝের তিন মাস বন্ধ থাকে। সব সমেত চল্লিশটি বেড আছে। রোগীদের দুই ভাগে ভাগ করা হয়—"Paying" এবং "Non-Paying", যারা "Paying"—তাদের কটেজ-ভাড়া বাবদ ২০৲ টাকা করে দিতে হয়। খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ নিজেদের। আর "Non Paying" রোগীদেরও নিজেদের খাওয়ার বন্দোবস্ত নিজেদেরই করতে হবে। থাকার খরচ কিছু লাগবে না এবং স্যানাটোরিয়াম থেকে তাদের ১০৲ টাকা ক'রে মাসে সাহায্য করা হবে।

৯। Sir Wanless Tuberculosis Santorium, Miraj S. M. C. (Bombay). এখানে খুব সম্ভবতঃ বর্ত্তমানে ৭০।৭৫টি রোগীকে রাখবার ব্যবস্থা আছে। থাকবার বন্দোবস্ত চার রকম ; "A" class, "B" class, Semi-Private এবং General Ward. এ ক্লাশের ভাড়া ৬৫৲ টাকা ; বি-ক্লাশের ৫৫৲ টাকা। সেমি-প্রাইভেটের ৩৫৲ টাকা এবং জেনারেল ওয়ার্ডের ২৫৲ টাকা। এ-ক্লাশ, বি-ক্লাশ এবং সেমি-প্রাইভেট ওয়ার্ডের রোগীদের খাওয়ার ব্যবস্থা নিজেদের করতে হবে। জেনেরাল ওয়ার্ডের রোগীরা স্যানাটোরিয়াম থেকেই খাবার পাবেন। Artificial Pneumothorax যাদের করা হবে মাসে তাদের কাছ থেকে ১০৲ টাকা অতিরিক্ত নেওয়া হয়। X-rayর চার্জ্জও আলাদা।

১০। "Bel-Air" Sanatorium, "Dalkeith," Panchgani (Bombay). এই স্যানাটোরিয়ামটি পুণা থেকে ৬৩ মাইল দূরে, সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে চার হাজার দুশো ফিট উঁচুতে স্থাপিত। পাঞ্চগণি বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ভিতরে বেশ স্বাস্থ্যকর একটি হিল-ষ্টেশন। পুণা থেকেও এই স্যানাটোরিয়ামে যাওয়া যায়, আবার M. & S. M. Railwayর "Wathar" নামক ষ্টেশন থেকেও যাওয়া যায়। ওয়াদার থেকে স্যানাটোরিয়ামের দূরত্ব ৩০ মাইল। পুণা এবং ওয়াদার—দু' জায়গা থেকেই পাঞ্চগণি অবধি নিয়মিত মোটর সার্ভিস আছে। এই স্যানাটোরিয়াম সম্বন্ধে কয়েক বছর আগেকার খবর হচ্ছে—সব সমেত ৫০টি বেড আছে। জেনেরাল ওয়ার্ডের ভাড়া (থাকা, খাওয়া, চিকিৎসা) ১৫০৲ টাকা এবং স্পেশাল ওয়ার্ডের ভাড়া ২০০৲ টাকা ও তদূর্দ্ধ (থাকা, খাওয়া, চিকিৎসা)। অবিশ্যি দামী ওষুধপত্রের জন্যে আলাদা চার্জ্জ করা হবে ; তা' ছাড়া Artificial Pneumothraxএর জন্যে মাসিক ৩০৲ টাকা আলাদা দিতে হবে। সম্প্রতি একজনের মুখে জানতে পারলাম, বর্ত্তমানে এই স্যানাটোরিয়ামে ৭০।৭৫টি রোগীর স্থান করা হয়েছে এবং চার্জ্জও না কি নানা দিক থেকে অনেক কমান হয়েছে। Thoracoplasty জাতীয় বড় অপারেশান থেকে আধুনিক আর প্রায় সব রকম চিকিৎসার ব্যবস্থাই এখানে আছে। রোগীর বন্ধু-বান্ধব অথবা আত্মীয়স্বজন যদি রোগীকে দেখতে যান, তবে স্যানাটোরিয়ামের "গেষ্ট হাউসে" তাঁরা থাকতে পারেন—স্যানাটোরিয়াম থেকেই তাঁদের খাওয়ার বন্দোবস্ত হয়। চার্জ্জ—দৈনিক চার টাকা। রোগীদের জন্যে আমোদ-প্রমোদের বেশ ব্যবস্থা আছে।

১১। Hillside Sanatorium, P. O. Vengurla, Dt. Ratnagiri (Bombay). এই স্যানাটোরিয়াম বোম্বারের দক্ষিণে ২০০ (শত) মাইল দূরে সমুদ্রতীরে অবস্থিত। বোম্বাই দিয়ে ষ্টীমারেও এখানে যাওয়া যায়, অথবা M. & S. M. Railwayর "Belgaum" নামক ষ্টেশন থেকে মোটরে যাওয়া যায়। বেলগাঁও থেকে ভেনগুড়লা—৭ মাইল। এখানে জেনেরাল ওয়ার্ডে থাকার ভাড়া হচ্ছে—ফ্রী থেকে সুরু করে ১০৲ অবধি। প্রাইভেট ওয়ার্ডের একটি বেডের জন্যে দিতে হয় মাসিক ২৫৲ টাকা এবং দুটো বেড এক সঙ্গে—৩৫৲ টাকা। প্রাইভেট কক্ষ আছে—সাথে একটা করে রান্না-ঘর ; মাসে ১২৲ টাকা দিতে হয়। দামী ইঞ্জেকশান এবং অপারেশান ছাড়া, ঔষধ-পত্র বিনামূল্যে দেওয়া হয় অথবা দৈনিক চার আনা পর্য্যন্ত চার্জ্জ করা হয়। খাওয়ার ব্যবস্থা আছে চার রকমের—পয়লা নম্বর খাবারের জন্যে চার্জ্জ হচ্ছে মাসে ৭৫৲ টাকা ; দ্বিতীয় নম্বর—মাসে ৫০৲ টাকা ; তৃতীয় নম্বর—মাসে ১৫৲ টাকা এবং চতু

নম্বর—ফ্রী। সব রকম মেডিক্যাল এবং সার্জিক্যাল চিকিৎসার বন্দোবস্ত আছে।

১২। King Edward Sanatorium, P.O. Dharampur, Simla Hills, Punjab. সিমলা পাহাড়ে সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ৫,০০০ হাজার ফুট উঁচুতে পাইন বনের ভিতরে এই স্যানাটোরিয়াম স্থাপিত। প্রায় ১০০ বেড আছে। গ্রীষ্মকালে ৭০ ডিগ্রী থেকে ৯০ ডিগ্রী, বর্ষায় ৬৫ ডিগ্রী থেকে ৭০ ডিগ্রী এবং শীতে ৪০ ডিগ্রী থেকে ৬০ ডিগ্রী—এখানকার টেম্পারেচার থাকে। জায়গাটি কাল্কা-সিমলা রেলওয়েতে। ট্রেণে বা মোটরে যাওয়া যায়; আগে থেকে সংবাদ দিলে, স্যানাটোরিয়ামের মোটর কাল্কায় পাঠান হয়। কাল্কা থেকে ধরমপুর ট্রেণে ২১ মাইল এবং মোটরে ১৬ মাইল। চার রকম থাকার বন্দোবস্ত আছে—A. B. C এবং D. A-class এর ভাড়া মাসে ৯০৲ টাকা। B-class এর ভাড়া মাসে ৬০৲ টাকা এবং ৭৫৲ টাকা। C-class এর মাসে ৪৫৲ টাকা। D-class এ থাকবার ভাড়া লাগে না। মাঝে মাঝে বেশী ভীড়ের সময়ে তাঁবু খাটিয়েও রোগী রাখা হয়—তাঁবুর ভাড়া মাসে ৪৫৲ টাকা। এ ছাড়া খাওয়ার খরচ সম্পূর্ণ আলাদা। নিরামিষাশীদের "অর্ডিনারি" খাবার খরচ হচ্ছে মাসে ৪২৷৷০ টাকা এবং "স্পেশাল" হচ্ছে মাসে—৬২৷৷০ টাকা করে। আমিষাশীদের "অর্ডিনারী" খাবার খরচ হচ্ছে মাসে ৫৫৲ টাকা (ভারতীয়দের জন্যে), মাসে ৭৫৲ টাকা (ইয়োরোপীয়ান এবং পার্শীদের জন্যে), এবং "স্পেশাল" খাবার হচ্ছে মাসিক ১০০৲ টাকা,—(সব সম্প্রদায়ের জন্যে)। কেউ নিজের জন্যে আলাদা চাকরের বন্দোবস্ত করে নিতে পারেন—স্থানীয় লোক পাওয়া যায়। ধরমপুর স্যানাটোরিয়াম থেকে ১ মাইলের কিছু কম দূরে "Arcadia" বলে একটা জায়গা আছে, এখানে অনেকগুলি টি. বি. রোগীর থাকবার বন্দোবস্ত আছে—কিন্তু কোন ডাক্তার নেই। স্যানাটোরিয়ামের ডাক্তারদের ফী দিয়ে ডাকলে তাঁরা এসে দেখে যান এবং চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেন। স্যানাটোরিয়ামের কাছে "হাডিঞ্জ হস্পিট্যাল" বলে পাতিয়ালা গভর্ণমেণ্টের একটা হাসপাতাল আছে, সেখানেও কতকগুলি রোগীর চিকিৎসা করা হয়। এ ছাড়া, ধরমপুর স্যানাটোরিয়ামের ভূতপূর্ব্ব সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট Dr. Nanavati, ধরমপুর থেকে কয়েক মাইল দূরে নিজে একটা স্যানাটোরিয়াম খুলেছেন—বোধ হয় ৪০।৫০টি বেড আছে। আমি এই স্যানাটোরিয়ামের ঠিকানা ঠিক জানি না। ধরমপুর স্যানাটোরিয়ামের একখানা পুরানো Annual Reportএ দেখলাম, একটা Sanatoriumএর নাম—"Rana Durga Singh Sanatorium, Mando Hills, near Kasauli." জানি না এইটিই ডাঃ নানাভাতির স্যানাটোরিয়াম কি না। খুব সম্ভবতঃ ধরমপুর স্যানাটোরিয়ামে চিঠি লিখলে এই স্যানাটোরিয়ামটির খোঁজ মিলবে।

১৩। Mary Wilson Sanatorium, Tilaunia, (via Kishengarh) near Ajmere (Rajputana). তিলাউনিয়ার এই স্যানাটোরিয়ামটি সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ১৫০০ ফিট উচ্চ। এটি কেবলমাত্র স্ত্রীলোক এবং শিশুদের জন্যে। স্যানাটোরিয়ামটি Methodist Episcopal Mission কর্তৃক পরিচালিত, কিন্তু সব রকম ধর্ম্মাবলম্বী রোগীদেরই নেওয়া হয়। দুজন লোক নিয়ে রোগী থাকতে পারেন, বাথরুম, ষ্টোররুম, রান্নাঘর ইত্যাদি আছে—এ রকম ঘরের ভাড়া মাসে চল্লিশ টাকা। সাধারণ চিকিৎসা এই টাকার ভিতরেই করা হবে। আর এক রকম ঘর আছে; সঙ্গে একজন লোক থাকলে মাসে ১৫৲ টাকা এবং সঙ্গে কোন লোক না নিলে মাসে ১০৲ টাকা দিতে হবে। এঁরা স্যানাটোরিয়ামের খাবার পাবেন—ভারতীয় খাবার—১০৲ টাকা এবং ইয়োরোপীয় খাবার ৫০৲ টাকা। এ ছাড়া আর এক রকম খোলা ওয়ার্ড আছে। স্যানাটোরিয়ামে একটি Nursery আছে—যে অসুস্থা মাতার শিশুকে ছেড়ে যাবার উপায় নেই, সেই শিশুকে (অরুগ্ন) এই Nurseryতে রাখা হয়—মাসিক চার্জ্জ ৬৲ টাকা। (এক জনের কাছে শুনলাম, এই Sanatoriumটি না কি কিছুকাল হ'ল উঠে গেছে। তবে এ খবর ঠিক কি না, খোঁজ নিই নি।)

১৪। Madar Tuberculosis Sanatorium, Ajmere, (Rajputana). এই স্যানাটোরিয়াম সম্বন্ধে ভালমত কিছু আমি জানি না।

১৫। Tuberculosis Sanatorium, Rao, Indore.—সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ২০০০ ফিট উচ্চে। বিশেষ খবর জানি না।

১৬। Tuberculosis Sanatorium, Pendra Road, C. P.—জায়গাটি সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ২৩৮০ ফিট উচ্চে। বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের বিলাসপুর-কাট্নী বিভাগের পেণ্ড্রারোড রেল-ষ্টেশন থেকে স্যানাটোরিয়ামের দূরত্ব আড়াই মাইল। এখানে জেনারেল ওয়ার্ডের ভাড়া মাসিক ১৮৲ টাকা—(থাকা, খাওয়া এবং চিকিৎসা।) প্রাইভেট কটেজের ভাড়া ২৭৲ টাকা এবং তদুর্দ্ধে। খাওয়ার বন্দোবস্ত আলাদা করতে হবে।

১৭। King Edward VII Sanatorium, Bhowali, Dt. Nainital, (U. P.) রোহিলখণ্ড-কুমায়ুন রেলওয়ের কাঠগুদাম ষ্টেশন থেকে মোটরে ২১ মাইল পথ অতিক্রম করে এই স্যানাটোরিয়াম। সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ৬০০০ ফিট উচ্চে। মার্চের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি অবধি খোলা থাকেএবং শীতকালে বন্ধ থাকে। একশোটি (কিছু বেশীও হতে পারে) বেড আছে। থাকবার ব্যবস্থা চার রকম—A, B, C, D. A-classএর ভাড়া (পুরুষ বা স্ত্রীলোকদের জন্যে)—U. P.-র লোকদের মাসে ৮০৲ টাকা, এবং অন্য প্রদেশের লোকদের ১২০৲ টাকা। খাওয়ার বন্দোবস্ত নিজেদের করতে হবে। পুরুষ বা মেয়ে দুইজন নিজের লোক রোগী সঙ্গে রাখতে পারেন। B-classএর ভাড়া (পুরুষ বা স্ত্রী-লোকদের জন্যে)—U. P.-র লোকদের জন্যে মাসে ৪০৲ টাকা এবং অন্য প্রদেশের লোকদের ৬০৲ টাকা। খাওয়ার বন্দোবস্ত নিজেদের স্বতন্ত্রভাবে করতে হবে। রোগী একজন নিজের লোক—পুরুষ বা মেয়ে—সাথে রাখতে পারেন। C-class (পুরুষদের)—U. P.-র লোকদের দিতে হবে মাসিক ২০৲ টাকা এবং অন্য প্রদেশের লোকদের দিতে হবে ৩০৲ টাকা। খাওয়ার ব্যবস্থা আলাদা নিজেদের করতে হবে। রোগী সাথে নিজের লোক

একজন রাখতে পারেন, শুধু পুরুষ। C-classএ মেয়েদের থাকবার খরচ দিতে হয় না। খাওয়ার ব্যবস্থা নিজেদের করতে হবে, সাথে একজন নিজের লোক রোগীণী রাখতে পারবেন—পুরুষ হ'ক মেয়ে হ'ক। D-classএ শুধু U. P.-র লোক নেওয়া হয়, অন্য প্রদেশের লোক নেওয়া হয় না। D-classএর রোগীদের খাওয়ার ব্যবস্থা স্যানাটোরিয়াম থেকেই করা হয়; যে যা' দিতে পারে তার কাছ থেকে তাই নেওয়া হয়, অনেককে ফ্রী-ও রাখা হয়। এতদ্ভিন্ন যাঁরা ইয়োরোপীয়ান ষ্টাইলে থাকেন এবং খাঁটি ইয়োরোপীয়ান খাদ্য গ্রহণ করেন, তাঁদের জন্যে একটা "special section" আছে। তিন রকম শ্রেণী আছে—প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়। চার্জ্জ যথাক্রমে—১৫০৲, ১০০৲, ৬০৲ টাকা। স্যানাটোরিয়াম থেকে খাবার দেওয়া হয়।

১৮। Hill Crest Sanatorium, Gethia, near Nainital, Kumaon Hills, (U. P.) কাঠগুদাম থেকে ১৫ মাইল মোটরে যেতে হয়। সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ৫০০০ হাজার ফিট উঁচু। সারা বছরই খোলা থাকে। এখানকার চার্জ্জ হচ্ছে—A-class ৮০৲ টাকা -খাওয়া বাদে। খাওয়ার ব্যবস্থা নিজেরাও করতে পারেন, স্যানাটোরিয়ান থেকেও নিতে পারেন। স্যানাটোরিয়ান থেকে খাওয়া নিলে, দিতে হবে মাসে ১৪০৲ টাকা। B-class - ৪৫৲—খাওয়া বাদে এবং ৯ ৲ টাকা (স্যানাটোরিয়ান থেকে খাওয়া নিলে)। C-class (স্যানাটোরিয়ামের খাবার সহ) ৬০৲ টাকা।

১৯। The Tuberculosis Sanatorium, Almora, (U.P.) এই স্যানাটোরিয়াম কেবলমাত্র স্ত্রীলোক এবং শিশুদের জন্যে। কাঠগুদাম থেকে আলমোড়া অবধি মোটরে আশী মাইল। যেখানে মোটর থামে, সেখানে কুলি এবং ডাণ্ডী পাওয়া যায়; স্যানাটোরিয়ামের দূরত্ব সেখান থেকে আরও আড়াই মাইল। সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে স্যানাটোরিয়ামের উচ্চতা ৫,৬০০ ফিট। এখানে জেনেরাল ওয়ার্ডের খরচ মাসে ২২৲ টাকা (খাওয়া, থাকা, চিকিৎসা)। বিশেষ ক্ষেত্রে কনসেসানও দেওয়া হয়। প্রাইভেট ওয়ার্ডের A-class-এর ভাড়া মাসে ৪০৲ টাকা, (রোগী সঙ্গে নিজের লোক রাখতে পারেন দু'জন); B-class-এর ভাড়া মাসে ৩০৲ টাকা (একজন নিজের লোক রোগী রাখতে পারেন) এবং C-class এর ভাড়া মাসে ৩০৲ টাকা। তবে এক ঘরে যদি দু'জন রোগী থাকে তাহলে এক একজনের ১৫৲ করে দিতে হবে। C-classটা শুধু ইয়োরোপীয়ান এবং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের জন্য। প্রাইভেট ওয়ার্ডের রোগীদের খাওয়ার ব্যবস্থা নিজেদেরই সাধারণতঃ করবার নিয়ম।

২০। Pant's Home for Consumptives, Almora, (U. P.) আলমোড়া সহর থেকে এই স্যানাটোরিয়ামের দূরত্ব দুই মাইল এবং সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ৫,৭০০ ফিট। মাসিক চার্জ্জ ৪৫৲ টাকা; খাওয়ার বন্দোবস্ত নিজেদের স্বতন্ত্র ভাবে করতে হবে। রোগী সঙ্গে নিজের লোক নিতে পারবেন। দামী ওষুধপত্রের খরচ আলাদা দিতে হবে।

২১। Delhi Tuberculosis Sanatorium, Mohroli (Qutub), Delhi—দিল্লীর এই স্যানাটোরিয়ামটির মাসিক চার্জ্জ ৫০৲ টাকা। রোগীদের খাওয়ার বন্দোবস্ত নিজেদের করার নিয়ম, তবে অতিরিক্ত খরচ দিলে স্যানাটোরিয়াম থেকেও করা হ'য়ে থাকে। রোগী সঙ্গে ২।১ জন নিজের লোক নিতে পারেন। স্যানাটোরিয়ামের ভিতর পর্য্যন্ত মোটর আসে এবং স্যানাটোরিয়াম থেকে কুতুব-মিনার এবং দিল্লীর পুরাতন ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষের দৃশ্য উপভোগ করা যায়। কাছেই বাজার আছে। (দিল্লীর এই স্যানাটোরিয়ামটি সম্প্রতি উঠে গিয়েছে কি না জানি না। এটি একজন ডাক্তারের private enterprise ছিল। তবে দিল্লীতে নতুন আর একটি স্যানাটোরিয়াম খোলা হয়েছে—এর তত্ত্বাবধানের ভার খুব সম্ভবতঃ মিউনিসিপালিটির হাতে। ঐ স্যানাটোরিয়ামটিই Municipal Sanatoriumএ পরিণত হয়েছে কি না অথবা একটি উঠে গিয়েছে, অথবা দুটিই আছে—এ খোঁজ শীগগীর নেব।)

২২। Tuberculosis Sanatorium, P.O. Itki, Dt. Ranchi রাঁচি সহরের ১৬ মাইল পশ্চিমে পুরুলিয়া-রাঁচি-লোহারডাগা রেলওয়ের ইটকী নামক ষ্টেশন থেকে ইটকী স্যানাটোরিয়াম মাত্র ১০ মিনিটের পথ। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ২৩৫০ ফিট। এই স্যানাটোরিয়ামটি শুধু বিহারী এবং যারা অন্য প্রদেশের লোক হ'লেও বিহারে "ডোমিসাইলড"—শুধু তাঁদেরি জন্যে। এখানে তিন ভাগে রোগীদের রাখা হয়; প্রথম—ইয়োরোপীয়ান অথবা ইয়োরোপীয়ান ষ্টাইলের ভারতীয়দের ব্লক। মাসিক খরচ—খাওয়া, থাকা এবং চিকিৎসা—৮২॥০ সাড়ে বিরাশী টাকা। দ্বিতীয় হচ্ছে—A ক্লাশ। A ক্লাশের খরচ খাওয়া, থাকা এবং চিকিৎসা বাবদ ৫১॥০ সাড়ে একান্ন টাকা। তবে রোগী নিজের খাওয়ার ব্যবস্থা নিজে করলে ২১॥০ সাড়ে একুশ টাকা দিতে হবে। আর এক রকম হচ্ছে B class. খাওয়া, থাকা এবং চিকিৎসা বাবদ বি ক্লাশের খরচা মাসিক ৩৫॥০ সাড়ে পঁয়ত্রিশ টাকা। এই স্যানাটোরিয়ামে ছিল ৫২টি বেড; কিন্তু ইটকী গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে আরও ১০০টি বেড বাড়ানোর সঙ্কল্প করেছেন—স্যানাটোরিয়ামে বেডপ্রার্থী রোগীদের ভীড় ক্রমেই অতিমাত্রায় বেড়ে চলেছে দেখে।

২৩। Lowis Jubilee Sanatorium, Darjeeling. এটি টি. বি. স্যানাটোরিয়াম নয়, তবে একটি স্বতন্ত্র ওয়ার্ড আছে—সেখানে ৮ জন রোগী থাকবার ব্যবস্থা আছে। থাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা ভাল, কিন্তু চিকিৎসার কোনও প্রকার ব্যবস্থাই নাই। যাঁরা অন্য হাসপাতালে থেকে বেশ সুস্থ হয়ে গেছেন, তাঁরা "চেঞ্জ" হিসাবে অথবা দারজিলিঙ বেড়াতে গেলে এখানে থাকতে পারেন। থাকা এবং খাওয়ার ভাড়া—A-class মাসিক ৯০৲ টাকা এবং B-class মাসিক ৬০৲ টাকা।

২৪। The Jadabpur Tuberculosis Hospital, P. O. Dhakuria, Dt. 24 Parganas—কলকাতার ৬ মাইল দক্ষিণে ডায়মণ্ড হারবার লাইনে যাদবপুর নামক স্থানে এই টি. বি. হাসপাতাল অবস্থিত। সাউথ শিয়ালদা ষ্টেশনে গাড়ীতে চড়তে হয়, থার্ড ক্লাশের ভাড়া

ছয় পয়সা, ইণ্টার ক্লাশের ভাড়া দশ পয়সা, সেকেণ্ড ক্লাশ সোয়া ছ' আনা এবং ফার্ষ্ট ক্লাশ দশ আনা। রিটার্ণ টিকেটে যথাক্রমে লাগে দশ পয়সা, সোয়া তিন আনা, সাড়ে ন আনা এবং পনের আনা। ষ্টেশন থেকে স্যানাটোরিয়াম ৭।৮ মিনিটের রাস্তা। জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক প্রদেশের স্ত্রী বা পুরুষ-রোগীকে ভর্ত্তি করা হয়—চার্জ্জ সকলের পক্ষেই সমান। থাকা, খাওয়া এবং চিকিৎসা বাবদ মাসিক চার্জ্জ ৬০৲ টাকা; ছয়টি বড় ক্যাবিন আছে—প্রত্যেকটিতে দুইটি রোগী রাখা হয়। এই ক্যাবিন একলা নিলে মাসিক ১৫০৲ টাকা করে দিতে হবে। বর্ত্তমানে স্যানাটোরিয়ামে বেডের সংখ্যা একশ'র কিছু বেশী, এর ভিতরে ২০টি বেড স্ত্রী-রোগীদের জন্য। ফ্রী

হাসপাতাল বা স্যানাটোরিয়ামগুলির অন্যতম। অর্থের যথেষ্ট অভাব আছে, অসুবিধাও যথেষ্ট আছে; তারি ভিতরে যাঁদের আপ্রাণ চেষ্টায় বিপুল স্বার্থ-ত্যাগে এমন প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে, তাঁরা সমস্ত বাঙ্গালীর নমস্য। বাঙ্গালা দেশে বর্ত্তমানে এই-ই একমাত্র যক্ষ্মা-হাসপাতাল—যার জন্য সমস্ত বাঙ্গালী আজকে গৌরব অনুভব করতে পারে। কলকাতায় যাঁরা থাকেন, তাঁরা অনায়াসে এই হাসপাতাল দেখে যেতে পারেন—বিকেলের দিকে কয়েক ঘণ্টা বেড়ানোর আনন্দ পাবেন। পরেশনাথের মন্দির যদি দেখবার জিনিষ হয়, চিড়িয়াখানা, যাদুঘর যদি দেখবার জিনিষ হয়, হাবড়ার পুল, বোটানিক্যাল গার্ডেন, হগ সাহেবের বাজার যদি দেখবার জিনিষ হয়, বেলুড় মঠ, দক্ষিণেশ্বর

যাদবপুর হাসপাতালের একটি দৃশ্য।

অথবা হাফ-ফ্রী করেও অনেক রোগীকে নেওয়া হয় X-ray চার্জ্জ ১৬৲ টাকা এবং ১০৲ টাকা, তা ছাড়া দামী ওষুধের টাকা রোগীর নিজের বহন করতে হয়। এখন ভর্ত্তি হবার জন্য দরখাস্ত পাঠানোর নিয়ম এই হাসপাতালের অনরারী সেক্রেটারী এবং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায়ের কাছে তাঁর অফিসের ঠিকানায়—6-A, Surendra Nath Banerjee Road, Calcutta.

১৯২৩ সালে ছোট একটি গৃহে মাত্র চার জন রোগী নিয়ে এই হাসপাতালের আরম্ভ হয়; আর এই সামান্য কয়েক বছরের ভিতরে সেই নগণ্য, অতি ক্ষুদ্র হাসপাতালটি এখন ভারতবর্ষের সর্ব্ববৃহৎ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টি. বি.

কালিঘাট যদি দেখবার জায়গা হয়, তবে তার চেয়ে যাদবপুর কোন অংশে কম দেখবার জায়গা নয়। শত শত নরনারী অসুস্থ দেহ, অসুস্থ মন নিয়ে আসে, তাদের অন্তরে আশার আভাস ফুটিয়ে, কণ্ঠে আনন্দ-কোলাহল জাগিয়ে, সমস্ত জীর্ণতার উপরে স্নিগ্ধ প্রলেপ বুলিয়ে তাদেরকে আবার জীবনের প্রাচুর্য্যে পূর্ণ করে তুলবার প্রয়াসে যাদবপুর তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। কলকাতা থেকে এই হাসপাতালে আসবার চমৎকার মোটর-রোডও আছে।

যাদবপুর হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষ কার্সিয়াং-এ একটি স্যানাটোরিয়াম খুলবার চেষ্টায় আছেন। সবই ঠিক-ঠাক, খুব সম্ভবতঃ শীঘ্রই খোলা সম্ভব হবে। এ ছাড়া কলকাতার এক ধনী মাড়োয়ারী বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টে

হাতে তিন লক্ষ টাকা দান করেছেন একটা স্যানাটোরিয়াম খুলবার জন্যে। এই টি. বি. স্যানাটোরিয়ামটা খুলবার চেষ্টা হচ্ছে কালিম্পং-এ। কাশ্মীর এবং নেপালেও দুটি টি. বি. স্যানাটোরিয়াম খোলা হয়েছে।

আমি যে স্যানাটোরিয়াম-হাসপাতালগুলির নাম করলাম, এ ছাড়া আরও দু চার পাঁচটা ক্ষুদ্র যক্ষ্মা-চিকিৎসালয় হয় ত ভারতে থাকতে পারে; কিন্তু সর্ব্বসাধারণের জন্যে শ্রেষ্ঠ যক্ষ্মানিবাসগুলি আমার তালিকা থেকে বাদ পড়ে নি বলেই বিশ্বাস। এই তালিকার ভিতরে মদনপল্লী, টেম্পল্ গার্ডেনস্, মিরাজ, পাঞ্চগণী, জেন্‌গুড়লা, ধরমপুর, ভাওয়ালী, ইট্‌কী, যাদবপুর —এই সব স্যানাটোরিয়ামই সমধিক প্রসিদ্ধ। প্রথমে রোগীর এই সবের কোন একটাতে যাবার চেষ্টাই করা উচিত। কলকাতা সহরের উপরে মেডিক্যাল কলেজ, কারমাইকেল, ক্যাম্বেল, ন্যাশনাল ইনফারমারি প্রভৃতি স্থানে কতকগুলি ক'রে টি. বি. রোগীর চিকিৎসার বন্দোবস্ত আছে। এগুলির ভিতরে মেডিক্যাল কলেজের ব্যবস্থাই সব চেয়ে ভাল, তারপর কারমাইকেলের। পাটনা, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানের মেডিক্যাল কলেজেও টি. বি. ওয়ার্ড আছে।

স্যানাটোরিয়ামে যাওয়ার কল্পনা যাঁরা করবেন, তাঁরা যেন একটি বিষয় স্মরণ রাখেন—ভর্ত্তির দরখাস্ত করে উত্তর না আসা অবধি অথবা রওনা হবার অনুমতি-পত্র না আসা পর্য্যন্ত কেউ যেন রওনা না হন। প্রত্যেক স্যানাটোরিয়ামে সর্ব্বদা শত শত রোগীর দরখাস্ত এসে জমে থাকে, স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসার যারা উপযুক্ত, বেছে বেছে পর পর তাদের গ্রহণ করা হয়। কোন খবর-বার্ত্তা না দিয়ে হুট করে কোন স্যানাটোরিয়ামে গিয়ে হাজির হ'লে সেখানে বেশ কিছু মুস্কিলে পড়তে হবে। স্যানাটোরিয়াম-গুলিকে কেউ যেন হোটেল না ভাবেন।

স্যানাটোরিয়ামে রোগীদের সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয়। 1st Stageএর রোগী বলা হয় তাদের, যাদের রোগ অল্প দূর এগিয়েছে। তাদের বলা হয় 2nd stage—যাদের রোগ এগিয়েছে একটু বেশী দূর; এবং যাদের রোগ খুব বেশীদূর এগিয়েছে, তাদের ফেলা হয় 3rd stageএর। মদনপল্লী স্যানাটোরিয়ামের ১৯৩৩ সালের Annual Report থেকে আমি একটা হিসাব দিচ্ছি, এ থেকে সকলে বুঝতে পারবেন যে, রোগ অল্প থাকতে থাকতে স্যানাটোরিয়ামে যাওয়া কত দরকার। আলোচ্য বৎসরে ওখানে ২৯৮ জন রোগীর চিকিৎসা হয়েছে। এই ২৯৮ জনের ভিতরে ৪২ জন 1st stageএর, ৫০ জন 2nd stageএর এবং ২০৬ জন 3rd stageএর রোগী। 1st stageএর ৪২ জনের ভিতরে ৩৫ জনের রোগ "Arrested" হয়েছে অর্থাৎ সেরে গেছে (পাঠক পাঠিকারা আপাততঃ 'সেরে গেছে' কথাটাই জেনে রাখুন; আমার পরের প্রবন্ধে "সেরে গেছে" কথাটা সম্বন্ধে কিছু বলবার রইল), ৫ জনের অবস্থার বিশেষ রকম উন্নতি হয়েছে। 2nd stageএর ৫০ জন রোগীর ভিতরে ১০ জনের রোগ 'Arrested' হয়েছে, ৩২ জনের বিশেষ রকম উন্নতি হয়েছে, ৫ জনের সাধারণ উন্নতি হয়েছে, ২ জনের কোন উন্নতি হয় নাই এবং ১ জন মারা গেছে। আর যারা না কি এসেছিল 3rd stage নিয়ে, ২০৬ জনের ভেতরে "Arrested" হয়েছে মাত্র ১ জনের রোগ, বিশেষ রকম উন্নতি হয়েছে ৭৬ জনের, সাধারণ উন্নতি হয়েছে ৪৬ জনের, কোনও উন্নতি হয় নাই ৩৮ জনের, আরো খারাপ হয়েছে ২৫ জনের এবং মৃত্যু ঘটেছে ২০ জনের। প্রত্যেক স্যানাটোরিয়ামেই চিকিৎসার ফলাফল কম বেশী এই রকমই, আরও দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রবন্ধের কলেবর বাড়িয়ে লাভ নেই। এই তালিকা থেকে অসুখ অল্প থাকতে থাকতেই স্যানাটোরিয়ামে যাবার প্রয়োজনীয়তা যে সকল উপলব্ধি করতে পারবেন শুধু তাই নয়, এটা উপলব্ধি ক'রে সকলে বিস্মিত হবেন যে, অধিকাংশ লোকেই রোগের প্রথম অবস্থাটাকে কি রকম উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেন এবং অধিকাংশ লোকেই বুকের কত খারাপ অবস্থা নিয়ে অবশেষে যান স্যানাটোরিয়ামে—যখন না কি তাঁদের সুস্থ ক'রে তোলা চিকিৎসকের প্রায় সাধ্যাতীত হ'য়ে পড়ে। অধিকাংশ স্যানাটোরিয়ামে যে 3rd stageএর রোগী দ্বারাই ভর্ত্তি, এ থেকেই ব্যাধি সম্বন্ধে দেশবাসীর অজ্ঞতা যে কত বেশী তা সম্যকরূপে বুঝা যাবে। এর ভিতরে মেয়েদের অবস্থা তো আরও শোচনীয়। বাড়াবাড়ি না হলে পরিবারে খুব কম মেয়েরই চিকিৎসার বন্দোবস্ত আগে ভাল ভাবে হয়—তা' যে কোন ব্যাধিতেই তারা আক্রান্ত হ'ক না কেন। এই ব্যাধির ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই। শরীরের প্রতি নিদারুণ অবহেলা—কখনও অজ্ঞতায় কখনও স্বেচ্ছায়, কখনও অবস্থা-বিপর্য্যয়ে; তাইতে পুরুষদের চেয়ে মেয়েরা এই ব্যাধি দ্বারা বেশী আক্রান্ত হয় এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা যথাসময়ে অথবা কোন সময়েই না হওয়াতে তাদের ভিতরে মৃত্যুর হারও বহু গুণে বেশী। আমার প্রথম প্রবন্ধে এর উল্লেখ করেছি।

এবারে আমি যক্ষ্মা-চিকিৎসায় "climate" সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলে এই প্রবন্ধ শেষ ক'রব। জনসাধারণের ভিতরে শতকরা নিরেনব্বই জন লোকের মনেই এই ধারণা আছে যে, টি. বি. হ'লেই "চেঞ্জে" চলে যেতে হবে। অধিকাংশ ডাক্তারও বুক-পরীক্ষা করে দোষ দেখবামাত্র ফট্ ক'রে এই কথাই ব'লে বসেন—যান্ চলে মশাই দেওঘর, মধুপুর, সিমলে, অথবা পুরী। যেন যক্ষ্মারোগীর পক্ষে সবচেয়ে এইটাই আগে কর্ত্তব্য—আর সমস্ত কিছু বাদ দিয়ে; এবং সচরাচর এই ই দেখা যায় যে, জমিজিরাত বিক্রী করে, গয়না বন্ধক দিয়ে অথবা বিভিন্ন বীভৎস উপায়ে টাকা ধার করতে হলেও তাই ক'রে রোগী চলে যান্ দেওঘর, মধুপুর, সিমলে অথবা পুরী। প্রকৃতপক্ষে টি. বি.-র চিকিৎসায় "climate"এর প্রয়োজন শতকরা পাঁচ থেকে বড় জোর দশ ভাগের বেশী নয়। এই রোগের চিকিৎসায় কতকগুলি জিনিষকে বলা হয়েছে "absolutly essential" এবং কতকগুলি জিনিষকে বলা হয়েছে—"not essential." এই "essential" জিনিষগুলির ভিতরে পড়ে—সম্পূর্ণ বিশ্রাম, পুষ্টিকর খাদ্য, আরাম, মনের শান্তি ইত্যাদি। এ ছাড়া—উপযুক্ত চিকিৎসকের সাথে সর্ব্ববিধ সহযোগিতা চাই। "Climate"টাকে বলা হয়েছে "not essential." এ যাবৎ কাল টি. বি.-র চিকিৎসায় "climate" সম্বন্ধে কতজনে যে কতভাবে আলোচনা ক'রেছেন তার অন্ত নেই। সে

উল্লেখ এখানে বিশদ ভাবে না ক'রে বর্ত্তমান কালের বিশেষজ্ঞগণের মতামতই আমি সাধারণকে জানাতে চাই।

বস্তুতঃ যে কোন "climate"এ এই রোগীর উন্নতি হ'তে পারে যদি না কি অন্যান্য অবশ্য-পালনীয় নিয়মগুলির প্রতি সে কখনো অবহেলা প্রদর্শন না করে। রোগী পাহাড়ে থাক, সমতল প্রদেশে থাক, আর যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাক, আসল চিকিৎসা কোথাও তার ঠেকে থাকবে না। সমুদ্রের ধারে থাকা বিশেষ উপকারী—হাওয়ায় প্রচুর "ozone" থাকবার দরুণ,—সকলের মনে আছে এই ধারণা। কিন্তু "ozone"এর টি. বি. সারাবার আদপেই কোন ক্ষমতা নাই। বুকের অবস্থা খুব বেশী রকম খারাপ হ'লে সমুদ্রবায়ু রোগীর উন্নতির পক্ষে সম্পূর্ণ প্রতিকূল অনেক চিকিৎসক মন্তব্য করেছেন। কেউ আবার অতিরিক্ত শুকনো, খট্‌খটে আবহাওয়ার খোঁজে পাগল হয়ে ফেরেন। কিন্তু আমেরিকার "Adirondacks"-এর স্যানাটোরিয়াম থেকে ডাক্তারদের এই ধারণা জন্মেছে যে, সেখানকার মেঘলা, কুয়াসাচ্ছন্ন, বরফ এবং বৃষ্টিভরা, অতিরিক্ত ঠাণ্ডা আবহাওয়াতে রোগীদের উন্নতি অন্য কোন স্যানাটোরিয়ামের রোগীদের চেয়ে কম নয়। এই আবহাওয়াতে রোগী সুস্থ হতে পারে আর এই আবহাওয়াতে পারে না এটা কখনই কেউ নির্দ্দেশ করে দিতে পারেন না। যে কোন আবহাওয়াতে রোগীর উন্নতি এবং অবনতি—দুই-ই ঘটতে পারে। অন্য সমস্ত যদি সম্পূর্ণরূপে অনুকূল হয়, তবে রোগী সব চেয়ে খারাপ "climate"এও সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন এবং অন্য বিষয়গুলি যদি সম্পূর্ণরূপে প্রতিকূল হয়, তবে সর্ব্বোত্তম "climate"এও রোগীর সুস্থ হ'বার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। রোগী যখনই "change"এ যাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠবেন, অথবা যখনই একজন ডাক্তার তাঁকে "change"এ যাবার "অ্যাডভাইস্" দেবেন, তখনই রোগী এই বিষয়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভেবে দেখবেন: দু' বছর বা এক বছর "change"এ থাকবার টাকা তাঁর অনায়াসে সংগ্রহ করা সম্ভব কি না; যেখানে তিনি যেতে চান, সেখানে পুষ্টিকর, বিশুদ্ধ এবং রকমারি খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের পক্ষে কোন অসুবিধা হতে পারে কি না; সেখানে তাঁর পরিচর্য্যার কোন প্রকার ত্রুটি হওয়া সম্ভব কি না; এই ব্যাধি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সন্ধান—যাঁর অধীনে তিনি নিজেকে নিরাপদে রাখতে পারেন - সেখানে মিলবে কি না; নিজের স্থান এবং নিজের লোকদের থেকে দূরে থেকে সাংসারিক কোন দুশ্চিন্তায় অথবা প্রিয়জনদের বিরহে অথবা অন্য কোন ভাবে সর্ব্বদা তাঁকে কাতর থাকতে অথবা মনের বহু রকম অশান্তি নিয়ে থাকতে হবে কি না। যদি রোগী মনে করেন যে, এগুলির উত্তর তিনি সন্তোষজনক ভাবে পাচ্ছেন না, তা হলে তিনি "চেঞ্জে" যাবার সঙ্কল্প ত্যাগ করে বাড়ীতে নিশ্চিন্ত মনে চিকিৎসা চালাতে পারেন—বাড়ীতেই তিনি ভাল হবেন। অবিশ্যি যাঁরা প্রচুর অর্থব্যয় করতে সক্ষম এবং যাঁদের পক্ষে চেঞ্জে গিয়ে নিজেদের সর্ব্ববিধ আরামের ভিতরে রাখা সম্ভব—তাঁরা চেঞ্জে যেতে পারেন, আপত্তি নেই। স্থান-পরিবর্ত্তনের যে একেবারেই কোন মূল্য নেই, একথা স্বীকার করেন না কেউই। নতুন জায়গায় নতুন দৃশ্য, নতুন পারিপার্শ্বিক অবস্থা মনের উপরে অনেক সময়ে যথেষ্ট অনুকূল ক্রিয়া করে। পাহাড়ে জায়গায় রক্তের উৎকর্ষ সাধিত হয়; তা ছাড়া সমতল প্রদেশের অনেক স্থান ধূলি, ধোঁয়া দ্বারা দূষিত—কিন্তু পাহাড়ে প্রচুর বিশুদ্ধ বায়ু পাওয়া সম্ভব; অন্যান্য অনেক কারণে গরম জায়গা থেকে ঠাণ্ডা জায়গায় শরীর থাকে ভাল। রোগী যদি আদৌ চেঞ্জে যান, যেখানে তাঁর মন ভাল থাকবে, কোন ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে সেখানেই তিনি যেতে পারেন। কেউ পাহাড় ভাল বাসেন—যেমন সিমলা, দার্জিলিং, শিলং ইত্যাদি। কেউ হাজারিবাগ, দেওঘর, গিরিডি, মধুপুর ধরণের জায়গা হয়তো পছন্দ করবেন। কারুর বা পুরী, ওয়াল্টেয়ার লাগবে ভাল। কিন্তু আমি এই প্রশ্ন করতে চাই—এসব জায়গায় গিয়ে কেবল "হাওয়া" খেলে তো চলবে না! চিকিৎসার যে আরও অসংখ্য অঙ্গ আছে। সব জায়গায় এমন চিকিৎসক রোগী কোথায় পাবেন—"who understands Tuberculosis"? খালি দেশ-বিদেশের হাওয়া খেলেই বুক ভাল হবে না—যে সব কারণে বুক খারাপ হয়েছে, তা উত্তম রূপে জানবার প্রয়োজন, তার জন্য নানা রকম ব্যবস্থারও প্রয়োজন। একটি সাধিত হ'ল, অপর দশটিতে থেকে গেল ত্রুটি—তা' হলে ত চলবে না। প্রতি পদে পদে প্রয়োজন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শের! ধুলো ধোঁয়া নেই, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধির অতিরিক্ত প্রকোপ নেই—এমন যে কোন জায়গায় রোগী থাকতে পারেন এবং এই ধরণের জায়গায় যে সব টি বি. স্যানাটোরিয়াম স্থাপিত, সেখানে ইতস্ততঃ না করে চলে যেতে পারেন। ভাল একটা "climate"এ যাওয়া মাত্র রোগী সুস্থ হবেন—এ রকম ম্যাজিক টি. বি.তে ঘটে না। Climate সম্বন্ধে শুধু একথাই বলা যায় যে হলে ভাল, না হ'লে ক্ষতি নেই। কিন্তু চিকিৎসার অপর অঙ্গগুলি সম্পূর্ণরূপে অপরিহার্য্য।

তবে ডাক্তারেরা সাধারণ ভাবে যে উপদেশ সচরাচর দিয়ে থাকেন, তার একটু উল্লেখ করতে পারি—অপেক্ষাকৃত শুকনো জায়গাই যক্ষ্মারোগীর পক্ষে ভাল। কেউ কেউ এমন মত প্রকাশ করছেন যে, রোগীর যে "climate"এ সর্ব্বদা অথবা অধিকাংশ সময়ে ভবিষ্যতে থাকতে হবে, তাঁর চিকিৎসা এবং আরোগ্য লাভ ঐ "climate"এই হওয়া উচিত। কেউ বা বলছেন, যে রকম "climate"এ থেকে রোগী সুস্থ হলেন, রোগীর উচিত সেই রকম "climate"এই পরে থাকতে চেষ্টা করা। এতে আরোগ্যটা অধিকতর স্থায়ী হবে। যাই হোক, শুধুই "climate"এর মোহে রোগী যেন স্থান হতে স্থানান্তরে কখনই ছুটোছুটি না করে বেড়ান। গ্রীষ্মকালে রোগীর বিশ্রাম নেবার বড়ই কষ্ট হয়। পাল্‌স্, টেম্পারেচার যায় বেড়ে, রাত্তিরে হয় না ঘুম, দিনরাত করতে হয় ছট্‌ফট্। ওজনও এই সময়ে বাড়তে চায় না। সাধারণতঃ শীত কালেই রোগীর উন্নতি হয় সব চেয়ে বেশী। কিন্তু এক উঁচু পাহাড় ছাড়া আমাদের দেশে সব স্বাস্থ্যকর জায়গাগুলিতেই বড় বেশী গরম—গ্রীষ্ম কালে। আর, নতুন কোন আবহাওয়ায় গিয়ে প্রথম কিছুকাল রোগীর বেশ সতর্কভাবে থাকা উচিত - যতদিন পর্য্যন্ত তিনি বেশ "acclimatized" না হতে পারেন। অন্ততঃ প্রথম দুটি সপ্তাহকাল সম্পূর্ণ বিশ্রামের ত্রুটি করা কোন ভাবেই ঠিক নয়—বুকের অবস্থা বেশ ভাল হলেও। পাহাড়ে হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যাবার ভয় বড় বেশী; গায়ে যেন সর্ব্বদা বেশ গরম জামা থাকে। তাই বলে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দরোজা জানালা বন্ধ করে 'আরামে" ঘুমুবার দুর্ব্বুদ্ধি রোগীর যেন না হয়।

সমুদ্রতীরে সব সময়েই প্রায় ঝড়ের মত হাওয়া বইতে থাকে। এই ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপ্‌টা সোজা এসে রোগীর গায়ে না লাগে সে বিষয়ে সতর্কতা প্রয়োজন। যাঁদের হার্টের দোষ আছে, পাহাড়ে খুব বেশী high altitudeএ যাওয়া তাঁদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত কি না এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মত নিতে হবে। আমাদের দেশের সাঁওতাল পরগণা ধরণের জায়গাগুলিই অধিকাংশ টি. বি. রোগীর স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল হবে বলে মনে হয়। যে সব জায়গার জলে পেট ভাল থাকে এবং ক্ষুধা বাড়ে, সে সব জায়গা নির্ব্বাচিত করাও রোগীর পক্ষে মন্দ নয়।

প্লাবন
দ্বিতীয় খণ্ড

—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

প্রথম পরিচ্ছেদ

দুঃখের দিন দীর্ঘ। যাহার দুঃখ যত বড়, তাহার দিনও তত দীর্ঘ। তবু, দিন কাটে। কাটিবে না জানে, তবু দিন কাটে। ছায়ার দিনও কাটিল। একটি একটি করিয়া ছয়টি মাস উত্তীর্ণ হইল।

ছয় মাস পরে হুগলী-জেলের সম্মুখে পরেশকে সঙ্গে লইয়া ছায়া সারাদিন দাঁড়াইয়া ছিল। কত উৎসুক নয়ন নীরব কত প্রশ্নবাণ হানিয়া গিয়াছে, কত পরদুঃখকাতরাত্মা কত আত্মীয়তা জ্ঞাপন করিয়া হতাশ হইয়া চলিয়া গিয়াছে, প্রকাণ্ড পাঁচীলের নীচে মাথার উপর প্রচণ্ড রৌদ্র ও আশে পাশে কৌতূহলী লোক-সমাগম সহ্য করিয়াও পরেশকে কোলের কাছে চাপিয়া ধরিয়া ছায়া সারাদিন দাঁড়াইয়া রহিল। জেলের দরজা কত বার খুলিল, কত বার বন্ধ হইল, কত লোক আসিল, কত লোক গেল, ইমামবাড়ীর ঘড়িতে ঘণ্টা, আধঘণ্টা, কোয়ার্টার বাজিয়া চলিল, সন্ধ্যাও আসন্নপ্রায়, কিন্তু যাহার প্রতীক্ষায় তাহারা দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে দেখা গেল না।

পরেশ বলিল, বৌদি আজ আর ওরা তোমার দাদাকে ছাড়বে না বোধ হয়।

ছায়াও তাহাই ভাবিতেছিল, কিন্তু মন তাহার তাহাতে সাড়া দিল না। কোন কথার উত্তর না দিয়া ছায়া জেলের ফটকটির পানে চাহিয়া যেমন ছিল, তেমনই রহিল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল, পাখীর কলস্বর থামিয়া গেল; আদালত-ফেরত গাড়ী ও রাহীর সংখ্যাও হ্রাস পাইল। আর দাঁড়াইয়া থাকা নিরাপদ নহে ভাবিয়া ছায়া সম্মুখে বিস্তৃত পথের পানে চাহিল।

আবার এক বার বিকট শব্দ করিয়া ফটক খুলিয়া গেল। তিন চারজন লোক বাহির হইয়া আসিল। একজনের দীর্ঘ, উন্নত দেহ দেখিয়াই ছায়া পরেশকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, ঠাকুরপো উনিই আমার বিমলদা। তুমি ওঁকে ডেকে আনতে পারবে ত?

পরেশ সভয়ে কহিল, ওরা যে অনেক লোক বৌদি।

—হলই বা অনেক; তুমি শুধু ওঁকে ডাকবে।

—কি বলে ডাকব?

যাহারা বাহির হইয়াছিল, তাহারা চলিতে চলিতে প্রায় অদৃশ্য হইয়া যায় দেখিয়া, ছায়া পরেশকে ছাড়িয়া দিয়া নিজেই অগ্রসর হইল। কিন্তু, যদি ঐ লোকটি বিমল না হয়!

পরেশ ছায়ার হাত ধরিয়া বাধা দিয়া বলিল, তুমি দাঁড়াও বৌদি, আমি যাচ্ছি। কি বলে ডাকব সেইটে শুধু বলে দাও।

—বলবে বিমল দাদা।

পরেশ চলিয়া গেল। সেই বিলীয়মান আলোকেও দেখা গেল, সেই চিহ্নিত ব্যক্তির সঙ্গে সে কথা বলিল। লোকটি দাঁড়াইল এবং বার দুই এদিকে চাহিয়া সঙ্গীদের সঙ্গে কথা বলিয়া, পরেশের সঙ্গে আসিতে লাগিল।

বিমল কাছে আসিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল, কোন এক মনীষি যে বলিয়াছিলেন, পৃথিবীতে অসম্ভব বলিয়া কোন শব্দ নাই, তাহা ঠিক।

ছায়া ভূতলে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিয়া, বিমলের পায়ের ধূলা লইতে উদ্যত হইলে বিমল সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, ছায়া, তুমি কোথা থেকে, কেমন করে এখানে এলে?

ছায়া আঁচলে মুখ ঢাকিয়াছিল, কথার উত্তর দিল না।

বিমল বলিল, কোথা থেকে এলে তুমি?

ছায়া বলিল, রামপুর থেকে।

বিমল আরও কি প্রশ্ন করিতে উদ্যত হইয়াছিল, ছায়া বলিল, রাত হয়ে গেল যে, এখানে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব।

—কোথায় যাবে?

—বাড়ী যাব। চলুন দাদা, পাশের ঘাটে আমাদের নৌকো আছে।

বিমল সাশ্চর্য্যে কহিল, আমি কোথায় যাব!

ছায়া বলিল, কেন আমাদের সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে।

—পাগল!

—পাগলামি কি দেখলেন দাদা?

—কলকাতায় যেতে হবে, মা আছেন যে!

—তিনি কলকাতায় নেই।

—আমার মা? কলকাতায় নেই?

—না।

বিমলের পা দুটা কাঁপিয়া উঠিল।

ছায়া বলিল, চলুন দাদা নৌকোয়, সব বলছি।

বিমল নড়িল না, বলিল, আমার মা—

—তিনি কাশীতে আছেন।

—কাশীতে! আমার মা!

—হ্যাঁ, দাদা।

—কাশীতে? আমার মা! কে তাঁকে কাশী পাঠাবে!

—বলছি ত নৌকোয় চলুন, সব বলব।

—তুমি ঠিক জান ছায়া? মা আমার বেঁচে আছেন ত?

—আমি কি মিথ্যে বলছি? তিনি কাশীতে আছেন।

জেলখানার পাশের ঘাটে নৌকা বাঁধা ছিল। জোয়ারের জলে নদী কূলে কূলে ভরা, বায়ু অনুকূল। মাঝিরা পাল তুলিয়া দিয়া বসিয়া রহিল।

বিমল বলিল, মার কথা কি বলছিলে? কে তাঁকে কাশী পাঠালে?

ছায়া বলিল, শুনতেই হবে? নাই বা শুনলে?

বিমল কঠিন স্বরে কহিল, তুমি জান?

ছায়া বলিল, যিনি তোমায় জেলে দিয়েছেন, তিনিই মাকে কাশী পাঠিয়েছেন।

— প্রণয় বাবু?

— হ্যাঁ।

বিমল চুপ করিয়া রহিল। তাহার বিচার-দিবসের দৃশ্যটি চোখের উপরে ভাসিয়া উঠিল। প্রণয়কুমার বিচারক, এজলাসে বসিয়া, বিচারের সময় নানাভাবে বিমলকে মুক্তি-গ্রহণের সুযোগ দিতে তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন। বারবার তাহাকে আশ্বাসও দিয়াছিলেন, একটু এদিক ওদিক করিয়া কথা বলিলেই তিনি যে তাহাকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে প্রস্তুত ছিলেন, তাহাও জানাইয়া দিয়াছিলেন। কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াও, দণ্ডকালে যাহাতে তাহাকে কোনরূপ কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে না হয়, তাহার ব্যবস্থাও লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। বিমলের সঙ্গে একই অপরাধে যাহারা কারাদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হয়, তাহাদের কাহারও সম্বন্ধে বিচারক তদ্রূপ দয়া প্রকাশ করেন নাই। কারাগারে বিমল সেই দয়া-দাক্ষিণ্যের সুযোগ গ্রহণ না করিয়া অন্য সকলের সঙ্গে কারাকষ্ট হাসি-মুখেই বরণ করিয়া লইয়াছিল। তাহার মনে হইয়াছিল, প্রণয়কুমারের দয়াদত্ত কোন অনুগ্রহ লইবার পূর্ব্বে কারাগারের কষ্টে প্রাণবিয়োগ হইলেও তাহার দুঃখ হইবে না। প্রণয় যে বিচারকের আসনে বসিয়া দণ্ডদানের সময়ে কতকটা অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, বিমলের তাহা অজ্ঞাত ছিল না। সহকর্ম্মিদিগের অনেকেরই উপর তাহার চেয়ে দীর্ঘকালের কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, একমাত্র তাহাকেই লঘু দণ্ড দেওয়া হইয়াছে, ইহাতেও বিমলের বিতৃষ্ণা জাগিয়াছিল, কিন্তু দণ্ড দীর্ঘ করিবার ক্ষমতা অথবা দণ্ডকাল উত্তীর্ণ হইলে কারাগারে অবস্থানের অধিকার তাহার ছিল না বলিয়াই সে নীরবে সেই অনুগ্রহ স্বীকার করিয়াছিল; তদতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি তাহার ছিল না।

ছায়া নীরবেই বসিয়া ছিল; কিন্তু নীরবতা তাহার ভাল লাগিতেছিল না, বলিল, দাদা জেলে বুঝি সবাই রোগা হয়?

বিমল বলিল, কেন? আমি ত মোটা হইছি, ছায়া!

—মোটা ত কত! কি রকম শুকিয়ে গেছেন।

—শুকিয়ে গেছি? না, না। আচ্ছা ছায়া—

—বলুন।

—প্রণয় বাবু মাকে কাশী পাঠিয়েছেন তুমি জানলে কেমন করে?

—প্রণয় মামাই বললেন!

—তোমার সঙ্গে তাঁর কোথায় দেখা হল?

ছায়া সন্তর্পণে জবাব দিল, একদিন এসেছিলেন।

নৌকার ভিতরে মসীলিপ্ত কাচের আধারে একটি ক্ষুদ্র আলোক মিটি মিটি জ্বলিতেছিল। সে আলোকে কাহারও মুখ স্পষ্টভাবে দেখা যায় না। তবুও, ছায়ার মনে হইল, বিমলের দুটি চোখে অজস্র কৌতূহল ও আকুলতা ফুটিয়া

উঠিয়াছে। কিন্তু কি জানি যদি বাথা লাগে, তাই কৌতূহল নিবারণের কোন চেষ্টাই করিল না।

বিমল নিজের মনেই বলিল, বোধ হয় তাঁর স্ত্রীর পরামর্শেই তিনি আমার মাকে কাশী পাঠিয়ে দিয়েছেন।—

বিমল একটা নিঃশ্বাস দমন করিয়া ফেলিল।

নারী তাহা বুঝিল। বিমল যে ইন্দুর নামোচ্চারণ না করিয়া অন্য ভাষায় তাহার উল্লেখ করিল, এটুকু বুঝিতেও নারীর বিলম্ব হইল না। কিন্তু বিমলের অনুমান যে সত্য নহে, প্রণয়কুমার যে ইন্দুর অজ্ঞাতেই সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং ইন্দু ছায়ার সঙ্গে এক সঙ্গেই খবরটা জানিয়াছিল, এ সকল কথা বিমলকে এখনই বলা উচিত কি না, ভাবিতে ভাবিতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই, বিমল অন্য কথা পাড়িল।

—অশোকবাবু ফেরেন নি! সে আমি তোমায় দেখেই বুঝতে পারছি। কিন্তু কোন খবরও কি পাও নি ছায়া?

ছায়া নীরবে ঘাড় নাড়িল।

বিমল চুপ করিয়া রহিল। নিঃশব্দ ঐ মাথা নাড়ার মধ্য দিয়া অভিশপ্ত নারী-হৃদয়ের কত বড় মর্ম্মান্তিক বেদনা ঝরিয়া পড়িল, তাহা বুঝিয়া তাহার পুরুষ-হৃদয়ও আলোড়িত হইয়া উঠিল। নিরাভরণা দুঃখ-প্রতিমাখানির পানে চোখ তুলিয়া চাহিতেও তাহার চক্ষু যেন আড়ষ্ট হইয়া আসিতেছিল। বিমল অন্ধকারাচ্ছন্ন কাল জলের পানে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

একটু পরে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার শাশুড়ী কেমন আছেন ছায়া?

—প্রাণটা এখনও আছে।—বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ সজল হইয়া আসিল। এক মুহূর্ত্ত থামিয়া পুনরায় বলিল, সে কষ্ট চোখে দেখা যায় না। মনে হয়, তার চেয়ে মরণ হলেই যেন ভাল ছিল।

বিমল হঠাৎ বলিয়া উঠিল, ছায়া, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি এইখানেই নেমে পড়ি।

ছায়া সবিস্ময়ে কহিল, এখানে নেমে কোথায় যাবেন দাদা?

—তা জানি নে, যেখানে হ'ক যাব; তোমাদের বাড়ী ছাড়া।

—আমাদের বাড়ী কি দোষ করল?

কথাগুলার ভিতর দিয়া আহত হৃদয়ের বেদনার ধ্বনিটি বিমলের কাণে অতীব করুণ হইয়া বাজিল; বিমল মৃদুকণ্ঠে কতকটা যেন ক্ষমাপ্রার্থনার ভাবে কহিল, দুঃখের ছবিই সারাজীবন দেখে আসছি দিদি, আর পারি নে। তোমার ঘরেও ত সেই ছবি ভাই।

ছায়া চুপ করিয়া রহিল।

বিমল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, কিছু ভাল লাগে না ছায়া, কিছু ভাল লাগে না। জেল থেকে না বেরুতে দিত যদি, সারা জীবন যদি সেখানেই রেখে দিত, আমার কোন দুঃখ ছিল না। —সে একটু থামিল; একটু পরে আবার বলিল, এই পৃথিবীটাকে আমার একটুও ভাল লাগে না ছায়া। এখানে ভালবাসার দাম নেই, কি বিশ্রী এই পৃথিবী।

ধরণী নিস্তব্ধ, ভাগীরথীর বিশাল বারিবক্ষও নিস্তব্ধ, পালভরে নৌকা ছুটিতেছে, নৌকার দুই পাশে জল কাটার মৃদু শব্দ—কান পাতিলে শুনা যায়, নতুবা বিশ্বপ্রকৃতি নিস্তব্ধ। নিস্তব্ধ পৃথিবীর বুকের উপর নিক্ষিপ্ত কথাগুলা যেন অনেকক্ষণ ধরিয়া থম্ থম্ করিতে লাগিল। পরেশ বৌদির কোলের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া ছিল, কখন্ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, ছায়া তাহার গায়ের চাদরখানি দিয়া দেহটি আবৃত করিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল, এই পৃথিবীর নিন্দা করিবার বহু কারণ বিমলের আছে।

বিমল বলিল, যে পৃথিবীতে স্বামী সর্ব্বস্বত্যাগিনী স্ত্রীর ত্যাগের মর্য্যাদা বুঝে না, সে পৃথিবীর উপর আমার এতটুকু দরদ নেই ছায়া।

ছায়া বলিল, ও কথা থাক দাদা।

—থাকবে, বেশ থাক্! হিন্দুর দেশে জন্মে কোন্ স্ত্রী স্বামী-নিন্দা সহ্য করতে পারে? সেই নিন্দা সইতে না পেরে তোমাদেরই একজন দেহত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু আমি ত নিন্দা করি নি ছায়া। আমি শুধু বলছিলুম—

—দাদা, দুঃখের কথায় কাজ কি?

বিমল সন্তুষ্ট চিত্তে, প্রসন্ন হাস্যে কহিল, ঠিক বলেছ দিদি।

আকাশের এক প্রান্তে বনানীর উপরে ধীরে ধীরে চন্দ্রোদয় হইতেছিল, নদীর কাল জল চক্ চক্ করিতেছিল।

নিস্তরঙ্গ বারিবক্ষে চন্দ্রকিরণচ্ছটা রূপার মত ঝলসিতেছিল। দুইজনেই সেই দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

একটু পরে বিমল বলিল, বাবা মা'র খবর ভাল?

—জানি না।

—জান না?

—না। তাঁরা বিদেশে গিয়েছিলেন খবর পেয়েছিলুম, তারপর কোন খবরই আর পাই নি।

—তোমার মা'র রাগ তা হ'লে এখনও পড়ে নি?

ছায়া চুপ করিয়া রহিল।

মাঝিরা নৌকার পাল খুলিয়া ফেলিল। নৌকা নদী ছাড়িয়া খালে প্রবেশ করিল। একজন দাঁড়ি লগি ঠেলিয়া নৌকা বাহিয়া চলিল। আকাশের চাঁদ তখন বনানী ভেদ করিয়া আকাশে উঠিয়াছে, চারিদিক জ্যোৎস্নায় হাসিয়া উঠিয়াছে; স্বল্পপরিসর খালের জলটি জ্যোৎস্নার আলো বুকে ধরিয়া টল টল করিতেছে। নৌকার ছইয়ের ভিতরও চাঁদের আলো পড়িয়াছে। পরেশের ঘুমন্ত মুখের উপরে সুপ্ত চন্দ্রালোকের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে দেখিতে বিমল মোহাবিষ্টের মত বলিয়া উঠিল, এ পৃথিবীতে বোধ হয় ঐ ছেলেটিই সুখী। বাঙলাদেশের নদীর স্নিগ্ধ জ'লো হাওয়া, মধুর চাঁদের আলো, স্নেহময়ী বৌদিদির কোল—এসব যে পায়, তার নিদ্রা সুখ-নিদ্রাই হয়!

ছায়া বাম হাতে নিদ্রিত বালকের দেহখানি টানিয়া, যেন নিবিড় করিয়া ধরিল।

বিমল বলিল, ছায়া আজ রাতটা তোমার আতিথ্য স্বীকার করলুম ভাই; কাল কিন্তু সকালেই আমাকে ছেড়ে দিও।

ছায়া প্রবল আপত্তি জানাইয়া কহিল, কালই ছাড়তে পারব না। দিন কতক থেকে শরীরটা একটু সারিয়ে তবে যেতে পারবেন।

—শরীর ঠিক আছে দিদি। কাল সকালেই যেতে হবে।

—কোথায় যাবেন শুনি?

—কাশী। তীর্থ করতে দিদি, তীর্থ করতে। একবার যদি ঐ ছেলেটার মত মার কোলে শুয়ে ঘুমুতে পারি, ছ'মাসের জাগার শোধ উঠে যাবে।

—দাদা কি ছ' মাস ঘুমোন্ নি?

—না ভাই।

—কি করতেন? ভাবতেন?

—তাই হবে বোধ হয়, মনে নেই।

তাহার স্বরে হতাশা কল্পনা করিয়া ছায়া বলিল, দাদা, ইন্দুর কথা ত একবারও বললেন না।

বিমল হাসিল, বলিল, তার আর কথা কি আছে দিদি। ভাল ঘরে বরে বিয়ে হয়েছে, ভাল মেয়ে, নিশ্চয়ই সুখী হয়েছে।

ছায়া ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, তুমি তাকে ভুলে গেছ না কি?

—দূর পাগলি! তা কি ভোলা যায়! নৌকো লাগল যে!

—এই আমাদের ঘাট! ও ঠাকুরপো, ঠাকুরপো, ওঠ ভাই, বাড়ী এসে পড়েছি।

পরেশ ধড়কড় করিয়া উঠিয়া বসিল। নৌকা হইতে নামিয়া পথ চলিতে চলিতে বিমল প্রশ্ন করিল, তুমি কোন খবর জান?

ছায়া বলিল, কিসের খবর?

—ওদের।

ছায়া মনে মনে হাসিয়া বলিল, কাদের দাদা?

বিমল পূর্ববৎ অনাসক্তের মত কহিল, প্রণয়কুমার আর তাঁর স্ত্রীর?

ছায়া বলিল, জানি।—সে আর কিছু বলিল না।

বিমল কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া আবার বলিল, ভাল আছেন?

—হ্যাঁ।

কিন্তু বিমলের ক্ষুধা ইহাতেও মিটিল না, অথচ ইহার পরে কোন্ প্রশ্ন করা যায়, তাহাও যেন সে ভাবিয়া-পাইতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল, ছায়া আপনা হইতে যদি আরও কিছু বলে, তবে ভাল হয়।

ছায়া সবই বুঝিতেছিল। এইটুকু তাহার কাছে কত মিষ্ট, কত মধুর যে লাগিতেছিল, তাঁহা তাহার অন্তরই জানে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের সঙ্গে বিমলের মুখের কমনীয়তা যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছিল, আবার অতৃপ্ত-উত্তরে অতৃপ্তি ও হতাশা রূপ ধরিয়া মুখখানিকে বিমর্ষ করিয়া দিতেছিল। বিমল বার বার ছায়ার পানে চাহিয়া কথা খুঁজিতেছিল,

াকুলতার তাহার অন্ত নাই। বুঝিয়া ছায়া বলিল, অনেক থা আছে দাদা, বলব'খন।

বিমল দাঁড়াইয়া পড়িল; উদ্বিগ্ন স্বরে কহিল, এখনই ল।

—সে যে অনেক কথা।

—তা হ'ক্‌।

ছায়া পরেশকে আগে যাইতে বলিয়া, বিমলের পাশে াশে চলিতে চলিতে বলিল, তোমাকে যে আজ হুগলী জেল থকে ছাড়বে, সে খবর ইন্দুই আমাকে চিঠি লিখে জানায়। আমি যাতে জেলের দরজায় থাকি, সে কথাও চিঠিতে সে লিখেছিল।

বিমল নীরব। এই মুহূর্ত্তে তাহার মনে হইল পৃথিবীটা ত শূন্য, তত জঘন্য নহে।

ছায়া বলিল, সে নিজে আসবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছিল, সঙ্গে আসবার লোক না পেয়ে আসতে পারলে না। কত দুঃখ করে আমায় চিঠি লিখেছে।

—তাঁরা এখন কোথায়?

—কুমিল্লায়। তোমার জেল হবার পরই ইন্দু জোর করে প্রণয় মামাকে বদলী করিয়ে নিয়ে চলে যায়।

আকাশ হইতে চন্দ্র সুধা বৃষ্টি করিতেছিল, পল্লীর স্নিগ্ধ শ্যামলতা তাহাতে স্বপ্নের জাল বুনিতেছিল। নৈশ ধরিত্রী কি অপরূপ সুন্দরী!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রত্যুষে, ছায়া বিমলকে চা করিয়া দিয়া বলিল, দাদা, মুড়ী খাবে? এদেশে তোমাকে বিস্কুট, টোষ্ট, কিছুই ত দিতে পারব না।

গত রাত্রে খাইতে বসিয়া তাহাদের মধ্যে একটা আপোষ হইয়া গিয়াছিল। তাহার ফলে দাদাকে ছায়া আপনি ছাড়িয়া তুমি বলিতে সুরু করিয়াছে।

—আমি চায়ের আশাও করি নি ছায়া। এ দুর্ল্লভ সামগ্রী তুমি পেলে কোথায় তাই ভাবছি। তুমি খাও বুঝি?

—না, এখানে এসেই ছেড়েছি।

—ছাড়বারই কথা। এই অকৃত্রিম প্রাকৃতিক আবেষ্টনের মধ্যে চা'টা নিতান্তই কৃত্রিম বলে মনে হয়। মুড়ী তা চেয়ে অনেক ভাল। না, না, এত সকালে নয়, খানিক পরে দিও।

—সেই ভাল। স্নান ক'রে এসে আমি মুড়ী ভাজব, তুমি গরম গরম খেও। কাঁচা লঙ্কা চাও, আমার বাগানে তাও আছে—বলিয়া ছায়া অঙ্গুলিসঙ্কেতে প্রাঙ্গনের ক্ষুদ্র বাগানটি দেখাইয়া দিল। নানা রকমের গাছপালা-লতায় উঠানখানি সবুজ হইয়া আছে।

—তোমার দেওরটি গেল কোথায়? সকাল থেকে তাকে দেখছি নে যে!

ছায়া হাসিয়া বলিল, খালধারে মাছের চেষ্টায় গেছে। রাত্রে নদীতে মাছ ধরে জেলেরা খুব সকালেই ফেরে, সেই সময় তাদের না ধরতে পারলে মাছ পাওয়া যায় না।

—আমার জন্যে এত হাঙ্গাম না করলেই পারতে!

—শুধু তোমার জন্যেই নয়। আজ একাদশী, এ দিনটায় মাছের লোভ ছাড়তে পারি নে।—বলিতে বলিতে তাহার মুখটি ম্লান হইয়া আসিল।

এ বিমর্ষতার কারণ বিমল বুঝিল, প্রসঙ্গ-পরিবর্ত্তনমানসে কহিল, ছায়া তুমি কখনও কাশী গিয়েছ? আমি কখনও যাই নি।

—গেছি দাদা।

—খুব বড় জায়গা না?

—উঃ, মস্ত বড় দাদা।

বিমল চিন্তিত ভাবে বসিল, তাইত! মা'র ঠিকানাটা ত জানা নেই। খুঁজে বার করব কি ক'রে বল ত?

ছায়া বলিল, তুমি দু' চার দিন থাক না, আমি তাঁর ঠিকানা আনিয়ে দোব।

—তুমি কি করে পাবে আমার মার ঠিকানা?

—পাব।

—কেউ চেনা লোক আছে বুঝি সেখানে? তা থাকলেই বা, তিনি আমার মা'কে চিনবেন কেমন করে?

—তা নয়।

—তবে?

ছায়া সে কথার কোন উত্তর না দিয়া হঠাৎ উল্লাসভরে কহিল, আরও এক উপায় আছে দাদা। কাশীর দশাশ্বমেধ

ঘাটে বিকেলে বসলে যাকে দরকার, তাকেই পাওয়া যায়।

বিমল সাশ্চর্য্যে কহিল, কি রকম ?

—দশাশ্বমেধ ঘাটে বিকেলে আসেন না, এমন বাঙালী কাশীতে থাকেন না। সেবার আমরা ক'দিন ছিলাম কাশীতে, রোজ বিকেলে দশাশ্বমেধে আসতুম। রোজই কত চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হ'ত। কেউ গান শুনতে আসে, কেউ কীর্ত্তন শুনতে আসে, কেউ ভিড় দেখতে আসে, কেউ নৌকো বেড়াতে আসে, কেউ তপ-জপ করতে আসে, কেউ শুধু বসে থাকতেই আসে। রোজ বিকেলে দশাশ্বমেধে যেন রথ-দোলের মেলা বসে যায়। আর বুড়ো-বুড়ীর ভিড়ই বেশী।

—আর কোন বেড়াবার যায়গা বুঝি নেই কাশীতে ?

—ওমা! তা আবার নেই! কত—শত—জায়গা আছে। তবু যে দশাশ্বমেধে এত ভিড় হয় তার কারণ হচ্ছে, বাঙালীদের সঙ্গে দেখা এখানে হবেই, তাই সবাই যায়। আর সে ভিড় কি সাধারণ ভিড়! ভিড় ঠেলে যেতে গায়ের চামড়া উঠে যায়।

বিমল দুঃখিত ভাবে বলিল, সে ভিড়ে আমার মা আসবেন না, তাঁকে ত আমি জানি। তুমি যে অন্য কি রকমে তাঁর ঠিকানা জোগাড় ক'রে দেবে বলছিলে ?

ছায়া বলিল, সে ত পারিই। ক'দিন সময় লাগবে। তা লাগুক না সময়, সে ক'দিন তুমি এখানেই থাকবে, সে বেশ হবে। আমার মনে হবে, আমি সেই কলকাতাতেই আছি। কেমন ?

—কিন্তু তোমার শাশুড়ীর কথা মনে হলে একদণ্ড এখানে থাকতে ভাল লাগে না। আমার ত সমস্ত রাত ঘুম হয় নি কি-না, সমস্ত রাতই শুনেছি—কেঁদেছেন।

—আর আমি আজ ছ' মাসেরও বেশী দিনরাত ঐ দৃশ্য দেখছি।—বলিতে বলিতে ছায়ার কণ্ঠ সজল হইয়া উঠিল। তখনই সচকিত হইয়া কহিল, যত ভাবি দুঃখের কথাগুলো তোমার সামনে টেনে আনব না, ততই কি ছাই সেগুলো এসে পড়ে। তুমি বস দাদা, আমি স্নান করে আসি ; এসে মুড়ী ভেজে তোমায় দোব।—বলিয়া অভুক্ত চায়ের বাটীটি তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। বিমল দাওয়াতে বসিয়া শ্যামলতার উপর রৌদ্ররশ্মির খেলা দেখিতে লাগিল।

ইত্যবসরে পরেশ কচুপাতার এক মস্ত ঠোঙ্গা লইয়া অঙ্গনে দেখা দিল। বিমল দাওয়া হইতে নামিতে নামিতে জিজ্ঞাসা করিল, কি মাছ আনলে পরেশ ?

—আজ খুব ভাল ভাল মাছ পেয়েছি,—বলিয়াই সে থত-মত খাইয়া গেল।

বিমল তাহা বুঝিয়া হাসিল, বলিল, তোমার বিরাট ঠোঙ্গাটি খুলে ফেল না ভাই দেখি, তোমাদের দেশের মাছ কেমন ?

পরেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সাগ্রহে কহিল, দেখবেন দাদা, দেখবেন। এই দেখুন!—বলিয়া সে মাটীতে রাখিয়া ঠোঙ্গাটি খুলিল। নদীর টাট্‌কা মাছ, সদ্য পালিশ করা রূপার পাতের মত ঝক্ ঝক্ করিতেছে। পরেশ আঙ্গুল দিয়া কতকগুলা মাছ সরাইতে সরাইতে কহিল, চিংড়ীগুলো এখনও জ্যান্ত রয়েছে। আপনি খান চিংড়ী মাছ ?

—খাই বই কি পরেশ।

—বৌদি'কে মাছগুলো দিয়ে আসি, বলিয়া ঠোঙ্গাটি সযত্নে গুছাইয়া লইয়া পরেশ চলিয়া গেল।

পল্লীগ্রামের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় যাহাদের নাই, পল্লীগ্রাম তাহাদের সম্মুখে অনন্ত সৌন্দর্য্য ও অফুরন্ত বিস্ময় সৃজন করে। পল্লীর সর্ব্বত্রবিস্তৃত শ্যামলতা যেমন নয়ন-মনকে অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ দেয়, পল্লীবাসীর অনাসক্ত অলস প্রাণহীন কর্ম্মপ্রচেষ্টা তেমনই বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। একটি মধ্যবয়স্ক লোককে পথের ধারে দুই কৃশকায় গাভীকে ঘাস-খাইতে দিয়া তাহাদেরই নিকটে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, বিমল ভাবিতেছিল, মানুষ এমন নিষ্কর্ম্মা ও অলস হইতে পারে কেমন করিয়া? আর একটি লোক, সম্ভবতঃ জাতিতে ব্রাহ্মণ, গলায় পৈতার গোছা গোলাকারে জড়ান, একহাতে একটি চকচকে গাড়ু লইয়া অন্য হাতে দাঁতন ঘসিতে ঘসিতে গো-চারণরত লোকটির পাশে বসিয়া ঘণ্টাখানেক কেমন কাটাইয়া দিলেন, দাওয়ায় বসিয়া বসিয়া বিমল তাহাই ভাবিতে লাগিল।

ছায়া আসিয়া তাহার চিন্তাধারা ছিন্ন না করিলে সে হয়ত সেই দৃশ্যেই ডুবিয়া থাকিত। একখানি সরায় মুড়ী আনিয়া ছায়া ডাকিল, দাদা। বিমলের তন্ময়তা ভাঙ্গিয়া গেল। হাসিয়া বলিল, তোমার দেশের লোক [illegible] কি কুড়ে ভাই!

ঐ দেখ-না, দু' দু'টো মদ্দ মিন্‌সে কাজ নেই কর্ম্ম নেই, বসে বসে গল্পের জাবরই কাটছে।

ছায়া হাসিয়া বলিল, এ তোমাদের সহর নয় দাদা যে নাকে মুখে গুজে সকাল হতে না হতে আপিস ছুটতে হবে—দেরী হলে সাহেব রাগ করবে। আমাদের পাড়াগাঁয়ের লোক অমনি বসে দাঁড়িয়ে থিতিয়ে জিরিয়েই চলে। সারা দিন গল্প করে, তাস পাশা খেলে, যাত্রা গান করে, বসে বসে পরনিন্দা পরচর্চ্চা করে। চাষে যা ধান পায়, তাইতেই সারা বছরের মোটা ভাত কাপড়টা হয়ে যায়, বেড়ার ধারে শাক-সব্জী দু'টো লাগিয়ে রেখে দেয়, তরকারীর কাজ তাইতেই চলে যায়, নুন তেলের দু'চারটে পয়সা জুটেই যায়। কেন ওরা বসে বসে গল্প করবে না বল?

বিমল বলিল, তা যা বলেছ ছায়া! ওদের মত স্বল্পে সন্তুষ্ট হলে দৌড়ঝাপ না করলেও চলে। আমরা ত অভাব তৈরী করে দুঃখ ডেকে আনি বৈ ত না!

ছায়া বলিল, ঐ যে বামুনটি দেখছ, উনি আমাদের নিবারণ কাকা, গ্রাম-সম্পর্কে। সামান্য গেরস্থ, ক'বিঘে জমিতে ধান-পান আছে, তাইতেই উনি ফি বছর দুর্গা পূজা করেন।

পরেশও এক সরা মুড়ী লইয়া আসিয়া তাহার পার্শ্বে বসিয়া চিবাইতে লাগিল। ছায়া বলিল, তুমি ঠাকুরপোকে ভাই বলে ডেকেছ, ওর আনন্দ আর ধরে না।

পরেশ লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া উঠিল।

বিমল বলিল, চিঠিখানা লিখতে ভুল না দিদি।

ছায়া হাসিয়া বলিল, বললে আমি টেলিগ্রামে ঠিকানা জানিয়ে দিতে পারি।

বিমল মুড়ীর সরা সরাইয়া রাখিয়া সাগ্রহে বলিল, টেলিগ্রামে? সে কি করে হবে?

—হবে। দাঁড়াও, তোমার কাছে আর লুকোব না।—বলিয়া সে ভিতরে চলিয়া গেল। এক মিনিট পরে ডাকের একখানা খাম লইয়া ফিরিয়া আসিল। খামখানা বিমলের পানে অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল, পড়ে দেখ।

বিমল জিজ্ঞাসিল, কার চিঠি?

—আমার। দেখই না!

বিমল হাত বাড়াইয়া খাম লইয়া ইংরাজীতে লেখা শিরোনামা পড়িল, ছায়ার নাম। হাতের লেখাটা যেন বড় পরিচিত। বলিল, কে লিখেছে?

ছায়া রাগতভাবে বলিল, পড়ে দেখতে দোষ কি!

—অন্যের চিঠি—

—সেই অন্যেই যখন পড়তে দিচ্ছে।

চিঠি খুলিয়া বিমল পড়িল।

ভাই ছায়া......দিন তাঁহাকে হুগলীর জেল হইতে ছাড়িবে। তুমি অতি অবশ্য জেলখানার সামনে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইও। কিছুদিন তোমার কাছে রাখিয়া সেবা যত্ন করিও। আমার সে সৌভাগ্য হইল না। আমার মত দুর্ভাগিনী কেহ আছে কি?

হুগলীতে যে পুল আছে, সেই পুলের পাশেই জেল। তোমাদের রামপুর হইতে হুগলী ত বেশী দূর নয়। নৌকা বা গরুর গাড়ীতে যাওয়া যায়।

আমি যাইতাম, অন্ততঃ একটি দিনের জন্যও যাইতাম, কিন্তু উনি ছুটি পাইলেন না। অন্য লোক সঙ্গে যাইবারও কেহ নাই।

তাঁহার মা'র জন্য তাঁহাকে চিন্তিত হইতে বারণ করিও। আমি প্রতি মাসে পঞ্চাশটি টাকা হাত-খরচ পাই, সেই টাকা কাশীতে পাঠাই। মা' যে আমাকে কত ভালবাসিতেন, তা শুধু আমিই জানি। ভাই, তিনি যে আমারও মা।

তুমি সমস্ত সংবাদ আমাকে লিখিও। জেলখানা হইতে আসিয়া শরীর বোধ হয় খুব খারাপ হইয়াছে। তুমি তাঁহাকে যত্ন করিও। ভাই ছায়া, আর লিখিতে পারিলাম না।

তোমার ইন্দু।

বিমল চিঠিখানা ভাঁজ করিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল, সত্যই ছায়া, মা তাকে বড় ভালবাসতেন!

কথাগুলার ভিতর দিয়া বেদনার যে সুর ঝঙ্কৃত হইতেছিল, তাহাতে ছায়ার মনটা বায়ুতাড়িত পত্রের মত কাঁপিতেছিল।

বিমল বলিল, যাক্, কাশী যাওয়ার আর তাড়া নেই। ইন্দু যা করেছে, তার চেয়ে বেশী আমি আর কি করতে পারতুম বল?—বলিয়া সে ছায়ার পানে চাহিল। ছায়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিমল বলিল, ভালই হ'ল ভাই। নিশ্চিন্ত মনে এইবার সুন্দরবনে গিয়ে লাঙ্গল ধরি।

—লাঙ্গল ধরবে দাদা?

—তা ছাড়া আর উপায় নেই দিদি! চাকরী জোটে না, ব্যবসা করবার পয়সাও নেই, ভেবে-চিন্তে তাই—চাষ-বাসই করব ঠিক করেছি। সে বুঝি তোমায় বলি নি?

—না। কিন্তু লাঙ্গলই যদি ধরতে হয়, সুন্দরবনে কেন? এদেশ কি দোষ করেছে দাদা?

বিমল হাসিল।

ছায়া বলিল, হাসি নয় দাদা। ঠাকুরপোকেও আমি স্কুল ছাড়িয়ে দিয়েছি, তাকেও চাষ করতে লাগাব। দাঁড়াও, ভাতটা চড়িয়ে, মা'কে একটু জল খাইয়ে এসে বসছি।

[ক্রমশঃ

পল্লী ও নগরী

—শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

সে কি ভুলিবার ?
হ'তে পার তুমি বিলাসী নাগরী, নগরী চমৎকার ;
হ'তে পারে তব কাঞ্চন-ভূষা, ইন্দ্র-ভবন-ছটা ;
লোক-লোচনের বিস্ময়কর রত্ন-মণির ঘটা,
দেশে দেশে আর দিশে দিশে তব লুব্ধ মোহের স্তুতি
দিকে দিকে চল গর্ব্বে ছড়ায়ে রূপ-সজ্জার দ্যুতি ;
উদ্ধত-লোভ-উদ্গত কত বৃথা বিলাসের ছল,
লাল নীল কত রঙীন ফানুস, স্তাবক মানুষ দল—
গুণ-কীর্ত্তনে যশোগানে আজ তব মহা-সভাতলে,
বিজয় তোমার ঘোষিছে সুদূর স্বর্গের নীলাচলে ;
হ'তে পারে তুমি তাই,
হ'তে পারে তুমি চির-অতুলনা, শোভার তুলনা নাই ;
নিখিলের রূপকার,
হয়ত তোমারে চিত্রিত করি' লভেছে পুরস্কার ;
—তবু সে কি ভুলিবার ?

নারী নহ, তুমি নাগরিকা,
রজনী-জাগর চক্ষে তোমার জ্বলে কামনার শিখা,
ভোগ-লালসার পঙ্ক অতল রয়েছে তোমার বুকে,
বিলাস-নিশার উগ্র মদিরা-গন্ধ তোমার মুখে,
তৃপ্তি-বিহীন লীলা নিকেতন খুলেছ তোমার গেহে,
কামলোভাতুর তৃষ্ণা-বিধুর যৌবন তব দেহে,
গন্ধ-দীপের আলোকেতে আজ, ছন্দ-বিধুরা সাকী,
কামনার চিতা জ্বলিয়াছ মনে, কি আর রেখেছ বাকি !
হ'তে পারে তুমি নয়ন-মোহিনী, ভুবন-তোষিণী প্রিয়া,
নিখিল-বিশ্ব তুষিছ তোমার রূপের প্রসাদ দিয়া ;
তবু মনে মনে, যেই বাঁশী বাজে, অজানা অপরিচিতার—
কভু সে কি ভুলিবার ?

সে যে অনাদৃতা,
কাছে নাহি আসে, বিদূরিতা, যেন সীতা ;
কানে কানে ডাকে দূর হ'তে তার বাঁশীর কাতর সুরে,
বিলাস-প্রাসাদ নাই তার হায়,—দু'খানি পাতার কুঁড়ে,
মণি-মরকত-হীন ভাণ্ডার, আছে গো ক্ষুধার ক্ষুদ,
লাল সিরাজীর পেয়ালা নাহিক, রেখেছে বুকের দুধ,

সে দুধের স্বাদ, অমৃত-প্রসাদ, অমর জীবন-ধারা—
যে পেয়েছে, সে কি কোন কালে আর তোমাতে হয়েছে হারা ?
সে যে কল্যাণী, চির-শুভা, স্মিতা, অনাড়ম্বরা প্রিয়া,
বিশ্ব-নিখিল তুষিছে তাহার প্রেমের মাধুরী দিয়া,
চক্ষে তাহার জল,
বক্ষে তাহার রয়েছে ফুটিয়া মমতার শতদল ;
মুখে আছে তার শোভা,
দরিদ্রা, তবু আভরণহীনা অধিক সে মনোলোভা।

সে যে কুটিরাঙ্গন ধারে
লাজ-কম্পিতা, বেদনা-পীড়িতা, বেদনার গুরুভারে,
সন্ধ্যাবেলায় ছিন্ন তাহার আঁচল জড়ায়ে গলে,
করজোড়ে মাগে তনয়ের শুভ অবাধ অশ্রুজলে ;
তুলসীর মূলে সঁপে দেয় তার যা কিছু বুকের আশা,
দেবের দেউলে বুকের সলিতা জ্বালায়ে বাঁধে সে বাসা ;
সন্ধ্যা তাহারে রাঙায় তাহার লালিমা-লাবণি ছানি'
নিশীথিনী আসি' পরায় তাহারে তারকার হারখানি ;
সরোবর পারে বেতস-গুল্ম-চারিণী ময়না পাখী
কতবার তার গৃহদ্বারে আসি' লীলাভরে যায় ডাকি',
ফুলে, শতদলে, আকাশে, আলোকে, ভরা-ফসলের ক্ষেতে,
নিখিল সে প্রিয়া কাটায় রজনী ঘুমের আঁচল পেতে।

প্রভাতে ওঠে সে জেগে,
নবারুণ-রেখা ফুটে ওঠে তার সোনার চরণ লেগে,
হয়ত তোমার আরো বেশী রূপ, উগ্র গন্ধী জ্বালা,
তার ঐ রূপ, গুগ্‌গুল্ ধূপ, স্নিগ্ধ-গন্ধ ঢালা,
তুমি উজ্জ্বল,—চিতালোক,
আপাত-মোহন ধ্বংস কেবল দুঃখ, বেদনা, শোক ;
সে যে বীতশোকা, চন্দন-ঘন শান্তি-নিবিড় কায়া,
তুমি মরুভূমি, সে হয় শান্ত পঞ্চবটীর ছায়া..
তুমি হলাহল, উগ্র গরল, সে যে অমৃত-মধু,

তফাৎ আছে গো বঁধু !
—তুমি নটী, সে যে কুল-বধূ ॥

আমেরিকার আদিম জাতির মহাপুরুষ

ঃ অক্ষরের আধারে ভাষাকে অমরত্ব দান

—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

আমরা যখন অনায়াসে বই, কাগজের লেখা পড়ি, অতি সহজে যখন আমরা নিজেদের মনের কথা লিখে প্রকাশ করি, তখন আমাদের সত্যিই মনে থাকে না যে, আজকে ব্যাপারটা নিতান্ত জলের মত সোজা ও সূর্য্য ওঠার মত স্বাভাবিক হলেও, এর পিছনে অনেক জটীলতা আছে। অনেক অসাধারণ লোকের অপরূপ সুদীর্ঘ সাধনার ফলেই ব্যাপারটা যে এমন অনায়াস-সাধ্য হয়ে উঠেছে, এই সুবিধা-টুকুর জন্যে আমরা যে বহু অখ্যাত, অজ্ঞাত প্রতিভাবানের কাছে ঋণী, তা আমরা স্বভাবতই ভুলে থাকি। ঋণের কথা ভাবতে বসলেও আমাদের প্রথমে বোধ হয় মুদ্রাযন্ত্র, কাগজ প্রভৃতি যাঁরা উদ্ভাবন করেছেন, তাঁদের কথাই স্মরণ হয়। উদ্ভাবন হিসাবে এগুলি যে অত্যন্ত মূল্যবান, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু এগুলি মুখ্য নয়, গৌণ। আসল যে জিনিসটি না হ'লে এসব উদ্ভাবন ব্যর্থ নয়, একেবারে অসম্ভবই হ'ত, সে হ'ল ভাষার অক্ষর—মানুষের কথার শব্দকে যা নিঃশব্দে ধরে রাখে। অক্ষর ব্যবহারটা আমাদের কাছে এতই স্বাভাবিক যে, কোন দিন সুদূর অতীতে অসামান্য বুদ্ধিবলে মানুষ তা সৃষ্টি করেছিল, একথা বিশ্বাস করতেই প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু সত্যই অক্ষর কৃত্রিম চিহ্ন ছাড়া আর কিছু ত নয়। আমরা কথাবার্ত্তা বলতে কণ্ঠস্বর থেকে যে সব শব্দ বার করি, তাকে অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে, অনেক ধৈর্য্যসহকারে ভাগ ভাগ করে, আলাদা করে তাদের জন্য এই পৃথক পৃথক চিহ্ন রচনা করতে হয়েছে। কল্পনাতীত সুদূর অতীতে আমাদের ভাষার অক্ষর কে রচনা করেছিল, তা জানবার উপায় নেই; কিন্তু তাঁর প্রতিভা যে অলোকসামান্য তা আমরা মানতে বাধ্য। সংস্কৃত থেকেই আমাদের বাঙলা অক্ষর লওয়া হয়েছে। এই সংস্কৃত অক্ষরের মত এমন নিখুঁত, এমন সম্পূর্ণ শব্দ-বিশ্লেষণ পৃথিবীর আর কোন ভাষায় নেই। অন্যান্য সমস্ত ভাষার অক্ষর অগোছালো, কোন শৃঙ্খলা তাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। কোন কোন ভাষার অক্ষর এখনও তার শৈশবাবস্থাই পার হতে পারেনি। অক্ষর সেখানে স্পষ্ট স্বতন্ত্র শব্দ নয়, দু'তিনটি শব্দের সমষ্টিগত বাক্যকে প্রকাশ করে। চীনা ভাষার দোষই এই। তাদের অক্ষর অগুণ্তি। এবং সেই অক্ষর দিয়েও ঠিক সম্পূর্ণভাবে কোন কথাকে প্রকাশ করা যায় না।

নিখুঁত না হলেও অন্যান্য ভাষার বর্ণমালা যাঁরা সৃষ্টি করেছেন, তাঁরাও নিজেদের জাতির নমস্য। সাঙ্কেতিক চিহ্নের দ্বারা মানুষের কথাকে সর্ব্ব কালের জন্য ধরে রাখবার এ উপায় উদ্ভাবিত না হলে কোন দেশের সভ্যতা অগ্রসর হতে পারত না। সামনা-সামনি যে কথা বলার সুযোগ নেই, সে কথাকে অক্ষরের মধ্যে বন্দী করে মানুষ যেখানে খুশী নিশ্চিন্ত ভাবে পাঠিয়ে দিতে পারে। শুধু তাই নয়, মানুষের মূল্যবান কথা তার আয়ু ফুরোবার সঙ্গে সঙ্গেই হারিয়ে যায় না, কালকে উপেক্ষা করে, অক্ষর তাকে সুদূর ভবিষ্যতে বহন করে নিয়ে যায়।

পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষার অক্ষরই সৃষ্টি হয়েছে অনেক আগে। তাদের প্রথম উদ্ভাবনের ইতিহাস কেউ জানে না, স্রষ্টার নাম ও তার অসাধারণ সাধনার সঙ্গে পরিচিত হবার আমাদের কোন উপায় নেই।

আজ কিন্তু এমন একজনের কথা বলব, যাঁর এই বিষয়ে তপস্যার কাহিনী বিলুপ্ত নয়। তিনি একটি মুমূর্ষু জাতির ভাষাকে বর্ণমালায় বাঁধবার ব্যবস্থা করে, শুধু সেই ভাষাকে নয়, সে জাতিকেও বিলুপ্তি থেকে বাঁচিয়েছেন। সভ্য মানুষের চোখের উপরে মাত্র সেদিন এ ব্যাপার ঘটেছে বলে

তাঁর অপূর্ব্ব ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও একাগ্রতার ইতিহাস এখানে বর্ণনা করা সম্ভব হচ্ছে।

সুসভ্য আধুনিক যুগে জন্মলাভ করলেও, এই অসামান্য মানুষটিকে অন্যান্য ভাষার অক্ষর-প্রণেতাদের মতই অজ্ঞানতার গভীর আঁধার ভেদ করে, দুর্লঙ্ঘ্য সমস্ত বাধা ঠেলে, একাকী অগ্রসর হতে হয়েছে। তাঁর কীর্ত্তি প্রাচীনকালের সেই অজ্ঞাত মনীষীদের মতই বিস্ময়কর।

আমেরিকা যখন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে, তখন আমেরিকার সুদূর আরণ্য প্রদেশে সেখানকার আদিম, অসভ্য, চিরোকী বলে এক জাতির মাঝে একটি ছেলে জন্মেছিল। ছেলেটি জন্মাবার কিছু দিন আগেই তার বাপ মারা গেছে। একে অসভ্য জাতির মধ্যে জন্ম, তার উপর পিতৃহীন; সুতরাং ছেলেটির শৈশব সুখে যে কাটেনি, তা অনায়াসেই অনুমান করা যায়। চিরোকীদের ধরণে গায়ে মোষের চামড়া জড়িয়ে, কাঠের তক্তায় বেঁধে মা তাকে বয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে, একটু বড় হ'লে অসভ্য জাতের ছেলেদের যা শেখা দরকার, তা স্ত্রীলোক হয়ে যত দূর সাধ্য শিখিয়েছে। ছেলেটির মধ্যে সেদিন অসাধারণত্বের কোন পরিচয় তার মাও নিশ্চয় দেখেনি, চিরোকীদের আর সকলের মত ছেলে বড় হয়ে ভাল শিকারী হবে, এই পর্য্যন্ত বোধ হয় ছিল মায়ের আশার দৌড়। কিন্তু তবু ছেলের নামকরণ মা করেছিল একটু আশ্চর্য্য রকম। আমেরিকায় এক রকম গাছ আছে, পৃথিবীর সমস্ত গাছের যা রাজা। দুনিয়ার আর সমস্ত গাছ তার কাছে আকারে বামন। চির সবুজ সে গাছের পাতা, আর তার চূড়া পাহাড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মেঘলোক ছাড়িয়ে যেন সূর্য্যের কাছে পৌঁছাতে চায়। সেই গাছের সঙ্গে মিলিয়ে মা ছেলের নাম রেখেছিল 'সিকুইওয়া'। তার ছেলে যে সবাইকে একদিন ছাড়িয়ে যাবে, তা যেন সে নিজের অজ্ঞাতে জানতে পেরেছিল।

ছেলেবেলা থেকে যৌবন পর্য্যন্ত 'সিকুইওয়া' তেমন কিছু অসাধারণ প্রতিভার কিন্তু পরিচয় দেয়নি। যে জাতের মধ্যে তার জন্ম, আমেরিকার সেই আদিম অধিবাসীরা ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের অত্যাচারে আর নিজেদের দোষে তখন প্রায় নির্ম্মূল হতে বসেছে। যে দেশের তারাই ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধীশ্বর, সে দেশের অধিকাংশই তখন তাদের হাত থেকে সরে গেছে। আমেরিকাবাসী শ্বেতাঙ্গের গুলিতে যারা মরেনি, তারা তাদের আমদানি-করা সুরার নেশায় নিজেদের সর্ব্বনাশ করছে। মুমূর্ষু, অসহায় এই অসভ্য জাতির মধ্যে সিকুইওয়ার জীবনের পঁইত্রিশ বছর এক রকম সাধারণ ভাবেই কেটে গেছল। তাঁর জাতের লোকেরা তাঁকে অবশ্য বিজ্ঞ বলে একটু মান্য করত, দরকারে অদরকারে তাঁর পরামর্শও আসত নিতে, কিন্তু তার বেশী কোন শক্তির পরিচয় তাঁর ভিতর সেদিন কেউ দেখেনি, সিকুইওয়া নিজেও নয়।

কিন্তু এই পরামর্শ নিতে আসা থেকেই একদিন সিকুই-ওয়ার জীবনে অদ্ভুত এক পরিবর্ত্তন ঘটে গেল। চিরোকীদের সঙ্গে কয়েক দিন আগে শ্বেতাঙ্গদের ছোটখাট একটা যুদ্ধ হয়েছিল, সে যুদ্ধে চিরোকীরা একজন শত্রুকে নিয়ে এসেছিল বন্দী করে। সেই বন্দীর জামার পকেটে ছিল অদ্ভুত একটি জিনিষ, যার মানে জানবার জন্যে চিরোকীদের একদিন এসে সিকুইওয়ার শরণ নিতে হ'ল।

সিকুইওয়া সেই আশ্চর্য্য জিনিষটি হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করে বললেন—এ আর কিছু নয়, 'কথা-কওয়া-পাতা'।

'কথা-কওয়া-পাতা'! চিরোকীরা শুনেই ত অবাক! পাতায় আবার কথা বলে না কি!

সিকুইওয়া তাদের বুঝিয়ে দিলেন যে, শাদা মানুষেরা এই পাতায় তাদের কথা যাদু করে ধরে রাখে। এর রহস্য যে জানে, তার কাছে এ পাতা চুপি চুপি সে কথা বলে দেয়।

বুঝুক আর নাই বুঝুক, বিশ্বাস করুক আর নাই করুক, চিরোকীরা তারপর চলে গেল, কিন্তু সিকুইওয়ার সেদিন থেকে জীবন সুরু হ'ল নতুন করে।

নিজের কুঁড়ের ধারে বসে বসে তিনি ভাবেন আর ভাবেন, কেমন করে সেই পাতার যাদু আয়ত্ত করা যায়। পারলে কত সুবিধা যে হয়, তাও তিনি অনেক দিক দিয়ে ভেবে দেখেছেন। চিরোকীরা যে যা জানে, তা দু এক জনকে বলে যেতে পারে মাত্র, কিন্তু সকলের জন্যে সঞ্চয় করে রাখতে পাবে না। তাদের সব জ্ঞান, বিদ্যা, তাই শেষ পর্য্যন্ত হারিয়ে যায় বিস্মৃতিতে। শুধু যদি কোন রকমে 'কথা-কওয়া পাতা'র যাদু শিখে, সে সব বিদ্যাকে ধরে রাখা যেত।

বুনো জানোয়ারকে যেমন করে ধরে বন্দী করে রাখা যায়, তেমনি করে শব্দকে ধরে চিহ্নের মধ্যে যে আটক করতে হবে, সিকুইওয়া তা বুঝেন, কিন্তু অকূল অন্ধকারে কোন দিশা পান না খুঁজে।

কিছুদিন এই চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে হয়ত সিকুইওয়া এ সব চিন্তা শেষ পর্য্যন্ত ছেড়ে দিতেন, কিন্তু বিপদের ছদ্মবেশে ভাগ্য তাকে সাহায্য করে গেল।

শীকার করতে গিয়ে সিকুইওয়া একদিন দারুণ জখম হয়ে ফিরে এলেন। সে আঘাত থেকে সেরে উঠতে তাঁর বহুদিন লাগল। শুয়ে শুয়ে তাঁকে তখন দিন কাটাতে হয়, নড়বার চড়বার বেশী ক্ষমতা নেই। সিকুইওয়ার দেহ যখন অচল, তখন মন কিন্তু তাঁর অত্যন্ত অস্থির ভাবে সেই এক সমস্যারই উত্তর খুঁজে বেড়ায়।

শুয়ে শুয়ে সিকুইওয়া শোনেন, বনের গাছে গাছে হাজার রকমের পাখী হাজার রকমের ডাক দিচ্ছে। হঠাৎ তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে যায়। তখুনি ছেলেদের তিনি পাঠান গাছের ছাল জোগাড় করে আনতে, মেয়েদের পাঠান জড়িবুটি সংগ্রহ করতে। গাছের ছাল হবে তাঁর কাগজ, জড়িবুটি সিদ্ধ করে তৈরী হবে লেখবার কালি। অসংখ্য পশুপাখীর গলায় অসংখ্য আওয়াজ। চিরোকীদের ভাষার সঙ্গে যে আওয়াজ মিলবে, সেই আওয়াজ যার গলা থেকে বেরোয়, তার ছবি তিনি এঁকে ফেলবেন। সে ছবি হবে সেই আওয়াজের চিহ্ন।

দিনের পর দিন সিকুইওয়া এমনি করে ছবি এঁকে যেতে লাগলেন, শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে। তাঁর উৎসাহে ছেলে মেয়েরা এমন কি তাঁর স্ত্রী পর্য্যন্ত মেতে উঠলেন এই নতুন মজার খেলায়। কিন্তু সে বেশী দিনের জন্যে নয়। সিকুই-ওয়ার ক্ষ্যাপামিকে প্রশ্রয় দিলে ত খিদে মিটাবার ব্যবস্থা হয় না। সিকুইওয়ার স্ত্রী অকর্ম্মণ্য স্বামীর খেয়ালে ক্রমশঃ বিরক্ত হয়ে উঠলেন। ঘরে অশান্তি ক্রমশঃ বেড়ে উঠতে লাগল। কিন্তু তবু সিকুইওয়া সমস্ত দুঃখ, অভাব, অশান্তি উপেক্ষা করে একনিষ্ঠ হয়ে রইলেন নিজের সাধনায় ছবির পর ছবিতে গাছের ছাল ভরে উঠল, গাছের ছাল ঘরে স্তূপা-কার হতে লাগল।

শেষকালে সিকুইওয়া নিজেই একদিন নিরস্ত হলেন। এ কাজের ঝোঁক তাঁর কেটে গেছল বলে নয়, শব্দ ধরবার এ কৌশল ঠিক সুবিধার নয় বুঝে। চীনা ভাষা চার হাজার বছরে যা পারে নি, সিকুইওয়া নিজের জীবনে কয়েক বৎসরের মধ্যে অক্ষরের সে শৈশবাবস্থা পার হয়ে গেলেন।

কিন্তু সামনে সমস্ত পথই যে তখনও বাকী; সিকুইওয়া প্রৌঢ়ত্বে এসে পৌচেছেন, পিছনে সুদীর্ঘ কাল ধরে যা সংগ্রহ করে এলেন, নির্ম্মম ভাবে সে সমস্ত ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে কাজ সুরু করতে হবে। অতি বড় কঠিন প্রতিজ্ঞা করে যে বেরিয়েছে, তারও বুঝি এ সময়ে ক্লান্তি আসে, হতাশ

পরিব্রাজক সিকিইওয়া।

হয়ে যায় মন। কিন্তু সিকুইওয়া যে অন্য জাতের মানুষ। মেঘলোক ছাড়িয়ে চিরসবুজ পাতা সূর্য্যের আলোকে মেলে ধরবার জন্যে যে গাছ হাজার হাজার বছর ধরে সাধনা করে, তারই নাম তিনি সার্থক ভাবে গ্রহণ করেছেন।

সিকুইওয়া আবার নতুন করে লাগলেন। পরামর্শ কর-বার কেউ নেই, উৎসাহ দেবার বদলে সবাই ক্ষ্যাপা বলে করে অবজ্ঞা, সংসারে স্ত্রী রাতদিন করেন অভিযোগ, তবু সিকুইওয়ার তপস্যা টলে না। চিরোকী জাতের ভাষা ধীরে ধীরে স্পষ্ট আলাদা আলাদা শব্দে তিনি ভাগ করে চলেন,

সেই ভাগ-করা শব্দকে পরিয়ে দেন নিজের পছন্দ মত অক্ষরের বেড়ি। নতুন শব্দ খুঁজে বার করেন, আবার সংশোধন করেন প্রয়োজন মত। এমনি করে সুদীর্ঘ ২৩ বছরের তপস্যার পর সিকুইওয়া একদিন তাঁর বর্ণমালা সম্পূর্ণ করলেন। সুবশুদ্ধ ৮২টি চিহ্নে তিনি তাঁদের ভাষার সমস্ত কথা তখন প্রকাশ করতে পারেন।

কিন্তু এই এতদিনের চেষ্টাও বুঝি ব্যর্থ হয়ে যায়। তন্ময় হয়ে এতদিন তিনি শুধু অক্ষরের চিন্তাই করেছেন, কয়েক বছর ধরে এক রকম ঘরের বারই হন নি। ইতিমধ্যে তাঁর জাতের লোকে তাঁকে পাগল ভেবে হিসাব থেকে যে বাদ দিয়েছে, তা তিনি কেমন করে জানবেন।

সিকুইওয়া তাঁর আশ্চর্য্য উদ্ভাবনের কথা উচ্ছ্বাসভরে দলের লোকের কাছে বলতে গিয়ে দারুণ ঘা খেলেন। তাঁকে কেউ বিশ্বাস করতে চায় না, পাগল বলে সবাই হেসে তাঁর কথা উড়িয়ে দেয়। চিরোকী জাতের কথা আবার না কি পাতায় যাদু করে রাখা যায়!

সিকুইওয়া এবারে বুঝি সত্যি হতাশ হয়ে পড়লেন। মিছেই তিনি আজীবন সব কিছু বিসর্জ্জন দিয়ে এই এক লক্ষ্য অনুসরণ করেছেন। তাঁর এত দুঃখের সাধনালব্ধ বিদ্যা বুঝি তাঁর সঙ্গেই লুপ্ত হয়ে যাবে!

কিন্তু এখানেও ভাগ্য অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁকে একদিন সাহায্য করে গেল। চিরোকীদের ছোট বড় কজন সর্দ্দার সিকুইওয়াকে নিয়ে তামাসা করবার জন্যেই তার ঘরে এসে সেদিন বুঝি জড় হয়েছে। সিকুইওয়া তাঁর লেখা বুঝাবার চেষ্টায় হয়রাণ হয়ে যাচ্ছেন, হঠাৎ তাঁর ছোট মেয়ে সে ঘরে এসে ঢুকল।

একজন সর্দ্দার ঠাট্টা করে গাছের ছালের লেখা তার হাতে গুঁজে দিয়ে বললে,—"যাদু-করা গাছের ছাল তোমার মেয়ের কাছে চুপি চুপি কি বলে শুনি!"

এই নির্ব্বোধ পরিহাসে সিকুইওয়ার চোখে বোধ হয় জল এসে পড়েছিল, কিন্তু হঠাৎ সকলকে স্তম্ভিত করে দিয়ে মেয়েটি বলে উঠল—"চুপি চুপি কি বলে শুনবে?—"

সিকুইওয়া সবিস্ময়ে শুনলেন তাঁর মেয়ে নির্ভুল ভাবে গাছের ছালের লেখা পড়ে গেল। তাঁর পাশে বসে বসে মেয়েটি অনেকদিন মার বকুনি সত্ত্বেও তাঁর কাজ লক্ষ্য করেছে, তাঁকে নানা প্রশ্ন করে নিবিষ্ট হ'য়ে শুনেছে তিনি জানেন, কিন্তু সে যে অক্ষরগুলি সত্যি এমন ভাবে আয়ত্ত করেছে, তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি।

এর পর চিরোকীদের তাঁর উদ্ভাবিত অক্ষরের ক্ষমতা বুঝানো সিকুইওয়ার পক্ষে কঠিন হ'ল না। মেয়েটিকে যতদূরে খুশী সরিয়ে রাখতে বলে তিনি সর্দ্দারদের প্রত্যেকের এক একটি কথা এক জায়গায় লিখে রাখলেন। তাঁর মেয়েকে সেগুলি দেখাবা মাত্র সে অনায়াসে তা পড়ে তাদের শুনিয়ে দিলে।

এবার রাতারাতি সিকুইওয়ার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে চিরোকীদের ছেলেরা তাঁর বর্ণমালা শিখতে সুরু করলে। সমস্ত জাতের ভিতর অসাধারণ উৎসাহের জোয়ার এই অক্ষর-পরিচয়ের চেষ্টার সূত্র ধরেই যেন এতদিনে দেখা দিল।

চিরোকী জাতি আরও অন্যান্য রেড ইণ্ডিয়ান জাতির শাখার মত বিলুপ্তির একেবারে প্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু এই উৎসাহের জোয়ারে ভেসে তারা সে বিপদ পার হয়ে গেছে।

সিকুইওয়াকে শুধু স্বজাতিরা নয়, ইউরোপীয়রাও এখন থেকে সম্মান ও সমাদর করতে ত্রুটী করলে না। ১৮২৮ সালে সমগ্র চিরোকী জাতির প্রতিনিধি হয়ে তিনি ওয়াশিংটন শহরে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে সন্ধির নানা সর্ত্ত ঠিক করতে যান। যুক্তরাষ্ট্রের রাজকোষ থেকে তাঁকে এক সঙ্গে ৩০০ ডলার পুরস্কার ও বার্ষিক ৬০ ডলার করে বৃত্তি দেবার ব্যবস্থাও হয়।

নিজের জাতির এত বড় কল্যাণ সাধন করবার পর, ইচ্ছা করলে সিকুইওয়া শান্তিতে জীবনের বাকী কয়েকটা দিন সকলের সশ্রদ্ধ সেবা নিয়ে কাটাতে পারতেন। কিন্তু শান্তি ও সুখ বলতে সবাই এক জিনিস বুঝে না। ৭১ বৎসর বয়সে সিকুইওয়া একদিন হঠাৎ পথে বেরিয়ে পড়লেন। চিরোকীদের এক শাখা কবে কোন্ সুদূর অজানা দেশের উদ্দেশে দল ছেড়ে বেড়িয়ে গেছল। কোথায় পৃথিবীর কোন দুর্গম কোণে তাদের রাজ্য হয়ত লুকিয়ে আছে! সেই রাজ্য সিকুইওয়া খুঁজে বার করবেন, সমগ্র চিরোকী জাতিকে বাঁধবেন আবার এক ঐক্যসূত্রে, তাদের অতুলনীয় করে গড়ে তুলবেন!

বৃদ্ধ, পঙ্গু সিকুইওয়া সে সন্ধান থেকে আর ফেরেন নি। যে দুর্গম পথ অনন্ত কাল অজানার সন্ধানে দিকচক্রবাল উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, তারই পাশে তাঁর শেষ-বিশ্রামের শয্যা তিনি পেতেছেন।

আমেরিকায় ওয়াশিংটনের কীর্ত্তি-মন্দিরে লিঙ্কলনের মূর্ত্তির পাশেই একটি রেড ইণ্ডিয়ানকে দেখা যাবে। তিনি আর কেউ নন—'সিকুইওয়া'। আমেরিকার শ্রেষ্ঠ পুরুষসিংহ লিঙ্কলনের পাশে স্থান দিয়ে মার্কিন শ্বেতাঙ্গরা এই আদিম জাতির মহাপুরুষকে যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়েছেন।

ডাইনী

—শ্রীভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এইবার মহুয়া পড়িতে আরম্ভ হইবে। প্রতি গাছের তলায় আগুন ধরাইয়া ঘাস ও শুষ্ক পাতা পোড়ান হইয়াছে। যতদূর পর্য্যন্ত ফল পড়িবার সম্ভাবনা, ঘসিয়া মাজিয়া একেবারে সান-বাঁধান মেঝের মত "ঝক্ ঝক্" করা হইয়াছে। দরিদ্র অসভ্য কোল মুণ্ডা ও উরাঁওদের মহুয়া বড় আদরের। প্রতি বৎসর এই মহুয়া হইতে তাহারা দু' পয়সার মুখ দেখিতে পায়, তাহাদের সামান্য অভাব পূরণের মহুয়া একটি প্রধান সহায়।

বিশিয়া জঙ্গলের ধারে একটি মহুয়া-তলা পরিষ্কার করিতে করিতে কাঁদিয়া সারা হইতেছিল। তার সেই বুকফাটা কান্না ও গভীর, আর্ত্ত দীর্ঘশ্বাস যেন তার বৃদ্ধ, শীর্ণ দেহের পাঁজরা কয়খানা এখনই চূর্ণ করিবে। পাশের গাছতলা হইতে লখিয়া আসিয়া সমবেদনার সুরে বলিল, "কেঁদে আর কি করবি? থাম বিশিয়া, তোর কান্নায় তোর নাতিটার যে অকল্যাণ হবে।" নাতির অকল্যাণ আশঙ্কায় বিশিয়া প্রাণপণে কান্না রোধ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু যে তীক্ষ্ণ, মর্ম্মঘাতী শেল আজ তার বক্ষকে দীর্ণ করিয়াছে, সে যাতনা সহ্যের ক্ষমতার অতীত; বিশিয়া ফুলিতে লাগিল, হায় রে জগৎ! সামান্য একটি মুখের কথায় হৃদয় ভাঙ্গিয়া দিবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করিবে, মনের দিকে চাহিবে না, তার প্রয়োগে যাতনার সিন্ধু মথিত করিয়া কি হলাহলের সৃষ্টি হইবে ভাবিয়া দেখিবে না; মানুষকে কষ্ট দিয়া মানুষের এত আনন্দ হয় কেন?

আজ তার সব পুরাতন স্মৃতি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। মনে হয়, এই ত সেদিনের কথা, গ্রামের "খুঁটকাটিদারের" পুত্রবধূরূপে সে আসিয়াছিল। অটুট স্বাস্থ্য, অসীম কর্ম্মপটুতা, শ্বশুরের আদর, স্বামীর সোহাগ কিছুরই তাহার অভাব ছিল না। এত সুখভোগ বোধ হয় ক্রূর নিয়তির সহ্য হইল না। তিন দিনের জ্বরে (blackwater fever) শ্বশুর অকালে মারা গেল। অল্প বয়সে "গাঁয়ের মোড়ল" হইয়া স্বামীর মাথা বিগড়াইল, কুঅভ্যাসের সঙ্গীর অভাব হইল না; কাজকর্ম্মে মন নাই, সর্ব্বদাই "পচাই"-এ (মদ বিশেষ) ডুবিয়া থাকে। বিশিয়ার আদরসোহাগ এখন নিয়মিত লাঞ্ছনা ও প্রহারে পর্য্যবসিত হইল। অনেকে পরামর্শ দেয়, "ওকে ছাড়ি দে, দুসরা সাগাই (বিবাহ) কর, তোর ভাবনা কি?" বিশিয়া কথা কয় না, কিন্তু মনে মনে শিহরিয়া ওঠে, "আরে এরা বলে কি! হামার করমার বাপ, তাকে ছাড়িয়ে দেবে!" এক মাত্র পুত্র তাহার করমা, তাহার বয়স তখন মাত্র ৫ বৎসর।

তারপর সেই কাল দিন, পানোন্মত্ত বন্ধুদের সহিত স্বামীর বচসা লাঠালাঠিতে পরিণত হওয়ার ফলে যখন রক্তাক্ত মুমূর্ষু স্বামীকে বহিয়া আনিয়া অঙ্গনে নামাইয়া দিল, তখনও বিশিয়া মরে নাই। স্বামীর শেষ আদেশ সে প্রাণপণে পালন করিয়াছে, "করমাকে দেখিস্।"। পুলিস আসিল, আদালতে সাক্ষ্য দিতে হইল, হত্যাকারীদের কঠোর দণ্ড হইল, কিন্তু করমার বাপ ত আর ফিরিল না। কত ঝড়, কত তুফান বিশিয়ার মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, কত প্রলোভন তাহাকে টলাইতে না পারিয়া ফিরিয়া গিয়াছে; এখন আর তাহা ভাল করিয়া মনেও আসে না। এখন সে বৃদ্ধা, বড় নিঃসঙ্গ, বড় শ্রান্ত, শুধু বিশ্রাম চায়। তার বেটা করমা এখন দশের মধ্যে একজন হইয়াছে, তাহার পুত্রবধূ কর্ম্মঠ, নিপুণা গৃহিণী, সংসার আর বিশিয়াকে চায় না। কিন্তু করমার বেটা লালুয়ার জন্য যে মরিতেও বাধে! কি বাঁধনে সে যে তাহাকে আবদ্ধ করিয়াছে তাহা সে নিজেই ভাল বুঝে না; লালুয়াকে ছাড়িয়া বুঝি স্বর্গেও সুখ নাই।

তারপর আসিল লালুয়ার পীড়া; ছেলেটা শুকাইয়া যাইতেছে, তাহাকে আরোগ্য করিবার জন্য কত চেষ্টাই না বিশিয়া করিয়াছে। পাহনের (গ্রাম্য রোজা বিশেষ) পায়ে ধরিয়া কত কাঁদিয়াছে; কত গুণিন আনাইয়া "ঝাঁড় ফুঁক" করাইয়াছে; নিজে মহকুমায় গিয়া ডাক্তারবাবুর নিকট হইতে ভাল ঔষধ আনিয়াছে, ফল হয় নাই, আর তাহারই পুত্রবধূ, তাহার মুখের উপর বলিল যে, বিশিয়া ডাইন, তারই চোখের

বিষের সংস্পর্শে লালু মরণোন্মুখ, সে যেন লালুর ত্রিসীমানায় না আসে। বড় আশায় সে পুত্রের নিকট পুত্রবধূর বিরুদ্ধে কাঁদিয়া নালিশ জানাইল, "করমা তোর বহুরী হামায় ডাইন বলে।" পুত্র কিন্তু মৌন থাকিয়া স্ত্রীকেই সমর্থন করিল, মাতার স্বপক্ষে একটি কথাও বলিল না। বুক তাহার ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া গেছে। হায় রে সংসার! লালুর জন্ম সে যে নিজের বুক চিরিয়া সেই রক্তে তাহাকে স্নান করাইতে পারে, যদি তাহাতেও তাহার উপকার হয়। নিজের সুখের প্রতি কখনও দেখে নাই, ইহাদের ভালর জন্ম প্রাণপাতের এই প্রতিদান!

গরীবের মা-বাপ, দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা সাহেব (মহকুমা-হাকিম) গ্রামে আসিলেন। বড় আশায় বিশিয়া পুত্রবধূর বিরুদ্ধে "আরজু" করিল যে, মিথ্যা ডাইনী আখ্যা দিয়া তাহাকে লালুর নিকট হইতে অপসারিত করা হইয়াছে, "সাহেব তুই দেও (দেবতা), তোকে ফাঁকি চলে না, ইন্সাফ কর।" এখনও কোল এলাকায় (Kolhan area) মাত্র "কিরিয়া" (ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপর দাঁড়াইয়া শপথ করা) ও "গোপুছ" (গোপুচ্ছ ধারণ করিয়া শপথ) এর উপর মামলা-মকর্দ্দমার "ডিগ্রি ডিসমিস" হইয়া থাকে ; লোকের ধ্রুব বিশ্বাস এই যে, মিথ্যা কিরিয়ায় ব্যাঘ্রহস্তে বংশনাশ ও গোপুচ্ছধারীর শূন্য গোহাল অনিবার্য্য। দুঃখের বিষয় সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে আর সে সহজ দৃঢ় সত্যবাদিতা দেখা যায় না ; উন্নতি না অবনতি তাহা কে বলিবে!

সাহেব একটু বিপদে পড়িলেন, "মাহাতো"কে (গাঁয়ের মোড়ল) জিজ্ঞাসা করিলেন, মাথা চুলকাইয়া সে বলিল, "বিশিয়া ডাইন তা বিশ্বাস হয় না, তবে এরা যখন বলছে করমা 'কিরিয়া' করুক।" তাহাই হইল, ব্যাঘ্রচর্ম্ম সাহেবের সঙ্গেই থাকে, কিরিয়া দেওয়া হইল। করমা আম্‌তা আম্‌তা করিয়া, সভয়ে স্ত্রীর দিকে চাহিতে চাহিতে বলিল, সে তার মাকে একদিন লালুয়াকে নদীতে ডুবাইবার চেষ্টা করিতে দেখিয়াছে এবং সেই অবধি তার বিশ্বাস, তাঁর মা ডাইন।

হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদে বৃদ্ধা আছড়াইয়া পড়িল, "হায় রে বেটা! ই কি করলি? সাহেব হামি মানছি হামি ডাইন, হামে জেহেল দে।" এত বড় অনাচারে এখনই পৃথিবী চূর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া তার প্রাণের করমা ও লালুর অস্তিত্ব মুছিয়া দিবে, এই ভয়ে বৃদ্ধা কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্চ্ছা গেল। সাহেব ব্যাপার বুঝিলেন, কিন্তু উপায় নাই। বিশিয়ার গ্রামে বাস অসম্ভব। কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীরা যুক্তি বুঝিবে না, ইহার পর হয়ত বৃদ্ধাকে পুড়াইয়া হত্যা করিবে। সাহেব মাহাতোর সহিত পরামর্শ করিয়া গ্রামের বাহিরে সামান্য কুঁড়েতে তাহার বাসের ব্যবস্থা করিলেন, তার গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় মাত্র ঐ মহুয়া গাছ, যাহার তলায় বসিয়া তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়াছি। গ্রামে তার প্রবেশ নিষেধ। বিশিয়া ডাইন তাহার নাতিকে গুণ করিয়াছে।

ঐ অঞ্চলে অনেক সময় নরখাদক ব্যাঘ্রের উপদ্রব হয়। সরকার নরহত্যার অনুপাতে পুরস্কার ঘোষণা করেন, এবং তাহার ফলে অচিরেই ব্যাঘ্রের দানবীয় লীলার অবসান হইয়া থাকে। ঐরূপ একটি নরখাদক সে সময় উপদ্রব করিতে-ছিল। এক শিকারীর গুলিতে সামান্য আহত হইয়া সে পলায়ন করে, তারপর কিছুকাল সব চুপচাপ, সকলে মনে করিল, আহত ব্যাঘ্র নিরালায় মরিয়াছে, আর ভয়ের কারণ নাই। ভ্রান্তি ঘুচিল, একমাস পরে যখন দিবাভাগে প্রকাশ্য রাজপথে এক খোঁড়া বাঘের কবলে এক সঙ্গে তিনজন মানুষ খুন হইল। ব্যাঘ্র মানুষ মারিল মাত্র, খাইল না।

সেই প্রথম "সয়তানের" আবির্ভাব। তিন মাসের মধ্যে প্রায় চারিশত ব্যক্তিকে সে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিল। সে যেন মানুষের উপর প্রতিহিংসা ব্রত গ্রহণ করিয়াছে ; মানুষ-বধেই তার আনন্দ। এত চতুর যে শিকারীরা, তার নাগাল পাওয়া ত দূরের কথা চোখেও দেখিতে পাইত না। বন্দুকের অস্তিত্ব সে যেন যাদুবলে বুঝিতে পারিত এবং সেদিকে মোটেই ঘেঁসিত না। প্রথমেই যতটুকু ইচ্ছা ভক্ষণের পর কখনও তাহাকে লাসের কাছে ফিরিয়া আসিতে দেখা যায় নাই।

"সয়তান" বধের জন্ম সরকার ১০০০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিলেন। কত খ্যাত ও অখ্যাত শিকারী সেই অঞ্চলে কায়েমী ভাবে "ডেরা" করিলেন। জেলার কর্তৃপক্ষ অসাধ্য সাধন করিতে লাগিলেন। হাজার হাজার লোক সংগ্রহ করিয়া জঙ্গল-পাহাড় তোলপাড় করা হইল।

এমন ভাবে ঘিরিয়া দিনের পর দিন তাড়ান (drive) চলিল যে, একটি মূষিকেরও ফাঁকি দিয়া পলাইবার উপায়

ছিল না। কত যে ব্যাঘ্র সেই "ড্রাইভে" মরিল, তার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু খোঁড়া "সয়তান" যেন যাদু জানে, কোন ফাঁদেই তাহাকে ফেলা গেল না।

মিষ্টার কেয়ার মস্ত শিকারী এবং মহকুমার দায়িত্বভার তাঁহারই উপর ন্যস্ত, তিনি সহৃদয়, প্রজারা তাঁহাকে বাপ-মায়ের মত ভক্তি করে। আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম, সরকারী কাজ সব ছাড়িয়া তিনি পাগলের মত দিবারাত্র সয়তানের সয়তানী লীলার অবসানে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ঘুরিতে লাগিলেন, তিন মাস যাবৎ সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল।

মানুষের ক্ষুদ্রতা ও শক্তিকে উপহাস করিবার জন্যই যেন একদা দ্বিপ্রহরে শত শত লোকের জনতার মধ্যে প্রকাশ্য হাটে প্রবেশ করিয়া সয়তান বার জনকে বধ করিয়া ত্রয়োদশ ব্যক্তিকে মুখে ধরিয়া যখন হাট হইতে বাহির হইয়া গেল, তখন যে আতঙ্ক ও বিভীষিকা সমস্ত কোলেবিরায় ব্যাপ্ত হইল, তাহার বর্ণনা করা যায় না। মিষ্টার কেয়ার আসিলেন, "just too late", রাগে দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়িতে লাগিলেন। একটা সামান্য বাঘ আজ মানুষের সব বলবুদ্ধি বিজ্ঞানকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। সয়তানের সয়তানী অক্ষুণ্ণ ভাবেই চলিতেছে।

এদিকে ডাইনী বিশিয়ার দিন আর কাটে না, লালুর অদর্শনে জগতে আর আলো নাই, সব অন্ধকার। বালক লালুয়াকে বিধিমতে তার আয়ীর ডাইনীত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে ও হইতেছে, তবু সে আয়ীর জন্য কাঁদিয়া আকুল এবং মাঝে মাঝে পলাইয়া তাহার কাছে যাইতে চেষ্টা করে। মাতার শ্যেনদৃষ্টি এড়ান দুষ্কর, কত প্রহার, কত লাঞ্ছনা তাহাকে ভোগ করিতে হইয়াছে তবু সে আয়ীকে দেখিবার আশা ছাড়ে নাই, কুসংস্কারের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরে বদ্ধ দুটি স্নেহপিপাসী বুভুক্ষু প্রাণ গুমরিয়া মরিতে লাগিল।

সুন্দর প্রভাত, নির্ম্মল সূর্য্যকিরণে জগৎ হাসিতেছে, গাছ হইতে টুপ টুপ করিয়া মহুয়া পড়িতেছে, কাজকর্ম্মের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বিশিয়ার কিছুই ভাল লাগে না, তবু পোড়া পেটের জন্য মহুয়া-তলায় গিয়া একটি ঝুড়িতে ফল কুড়াইতেছে, কোন ব্যাপারি আসিয়া "ডোরী" (মহুয়াবীজ) লইয়া যাবে, যে মূল্য পাইবে তাহাই তাহার অন্নসংস্থানের একমাত্র উপায়। হায় হায়! এ জগতে তাহার আপন বলিতে কেউ নাই, সে স্বজন-পরিত্যক্তা, সমাজ হইতে বিতাড়িতা ডাইনী।

একটা আওয়াজ কানে পৌছিল। বৃদ্ধা হইলেও বিশিয়া "কোলহিন্" (কোল রমণী)। সয়তানের ক্রিয়াকলাপ তাহার অবিদিত নহে। তিন লম্ফে সে তাহার গাছের সু-উচ্চ ডালে চড়িয়া বসিয়া দেখিল, লখিয়াও গাছে উঠিয়াছে। তার-পর খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে সয়তান আসিল। শিকার নাগালের বাহিরে দেখিয়া তার সে কি নিষ্ফল আক্রোশ! বিশিয়া ও লখিয়া প্রাণ ভরিয়া চীৎকার করিয়া সয়তানকে গালি দিতে আরম্ভ করিল। সয়তান যেন গালি উপভোগের জন্যই বিশিয়ার বৃক্ষতলে চাপিয়া বসিল।

হঠাৎ লখিয়া হায় হায় করিয়া উঠিল, "দেখ রে বিশিয়া কয়মার ঝুট (মিথ্যা) কিরিয়ার ফল হাতে হাতে ফলিল।" উচ্চ ডাল হইতে বিশিয়া দেখিল সত্যই ত। "আয়ি, আয়ি", বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে লালু ছুটিয়া আসিতেছে ও তাহার পিছনে কিছু দূরে আসিতেছে করমা ও তাহার বধূ, ডাইনীর কবল হইতে পুত্রকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইতে, আর এদিকে গাছের নীচে বসিয়া আছে সাক্ষাৎ কাল। উঃ ভগবান!

বিশিয়ার অভিশপ্ত জীবনে যন্ত্রণার কি শেষ নাই?

মুহূর্ত্ত মাত্র বিশিয়া ভাবিল, তারপর চীৎকার করিয়া বলিল, "ঝুট নহি রে লখিয়া, সচ, হাম ডাইন (মিথ্যা নয় রে লখিয়া সত্যই আমি ডাইনী)" এই বলিয়া হাসিমুখে লাফাইয়া পড়িল সেই দুরন্ত নরখাদকের ঘাড়ে, ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুকে সাদরে আলিঙ্গন দিতে। তার পর সে নিদারুণ নিষ্ঠুর দৃশ্যের উপর যবনিকা টানিয়া দেওয়া ছাড়া উপায় নাই। সয়তান বৃদ্ধার রক্তাক্ত মৃতদেহ টানিয়া লইয়া অদৃশ্য হইল, আর তাহা দাঁড়াইয়া দেখিল করমা, তাহার স্ত্রী ও লালুয়া এবং গাছ হইতে দেখিল লখিয়া। ডাইনীর কর্ম্মক্লান্ত জীবনের কি মহান অথচ শোচনীয় পরিসমাপ্তি।

এই গল্প বলিতে বলিতে সামান্যা কোল-রমণীর জন্য, মহকুমার ভাগ্যবিধাতা সিভিলিয়ানের চক্ষে বালকের মত অশ্রুধারা দেখিলাম। দরদীই দরদ দেখাইতে জানে।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম, শীঘ্র বলুন ব্যাঘ্রের কি হইল? ধীরে আমার স্কন্ধে হাত রাখিয়া মিষ্টার কেয়ার বলিলেন, "বাঘ মরিল, বিশিয়ার আত্মাহুতি বৃথায় যায় নাই, তাহা হইলে বোধ হয় ভগবানের অস্তিত্বে সন্দেহ আনিত, না? যখন তাহার লাস পাওয়া গেল তখন কয়েক টুকরা হাড় ও রক্তাক্ত এক খণ্ড মাংস মাত্র অবশিষ্ট আছে। চতুর সয়তান আর সেখানে আসিবে সে আশা নাই তবুও গাছে উঠিয়া বসিলাম,

মাচা বাঁধিবার হাঙ্গামা করা বাহুল্য। সঙ্কের লোকজন চলিয়া গেল, ১৫ মিনিটের মধ্যে এমন ধূর্ত্ত নরখাদক, মন্ত্রমুগ্ধের মত, চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, সেই মত বিশিয়ার হাড় ক'খানির লোভে ফিরিয়া আসিয়া নিশ্চিত মৃত্যুকে বরণ করিল। এক মুহূর্ত্তে বিশিয়া ও চারিশত নরহত্যার প্রতিশোধ লওয়া' হইয়া গেল। "কোলেবিরা"র বিভীষিকা সয়তান বিশিয়ার মৃত দেহের উপর মরিল; আবার শান্তি ফিরিয়া আসিল। কিন্তু সেইদিন হইতে বড় প্রিয়, বড় আদরের কি যেন হারাইয়াছি, আর খুঁজিয়া পাইতেছি না।" সাহেব রুমালে চোখ মুছিলেন, সত্যই দরদী!

কোলেবিরার নিকটস্থ এক শান্তশ্রীমণ্ডিত গ্রামের প্রান্তে, যেখানে বনানীর স্নিগ্ধ, শ্যামল শোভা প্রাণ কাড়িয়া লয়, এক বিপুল মহুয়াবৃক্ষের তলে সদ্যোনির্ম্মিত প্রস্তরবেদী দেখা যায়, মহামতি মিষ্টার কেয়ারের শ্রদ্ধার নিদর্শন। বহু দূর দূরান্তর হইতে নরনারী পুষ্প ও অর্ঘ্য লইয়া সেই "দেবীস্থানে" তাহাদের ভক্তি-অঞ্জলি প্রদান করিতে আসে। এইখানে অসভ্য কোল রমণী বিশিয়া, কলির দধিচী, আত্মাহুতি দিয়া শুধু নিজের পুত্র পৌত্র নহে, অনেকের পুত্র পৌত্রকে রক্ষা করিয়া গিয়াছে. মরিয়া অমর হইয়া আছে। ডাইনী বিশিয়া আজ দেবী। আর আজ তাহার কাহিনী লিখিয়া আমার এ সামান্য লেখনীও ধন্য হইল। বিশিয়া জীবনে বড় কষ্ট, বড় যন্ত্রণা পাইয়াছিল। পাঠক পাঠিকা, এক ফোঁটা করুণার অশ্রু তার উদ্দেশে উৎসর্গ করিতে কার্পণ্য করিবেন না, তাহার আত্মার তৃপ্তি হইবে। কবির ভাষায় বলিতে হয়, "Many a gem of purest ray serene" ইত্যাদি। *

* সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

মাতৃস্তোত্র

—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

মা-গো আমার পুণ্যময়ি
তুমিই আমার জগন্মাতা,
জনম-জনম পেলাম তোমার
এই করুণা, এই মমতা।

গুল্ম হয়ে বসুন্ধরে
স্তন্য তোমার টেনেছি-গো,
তারা হয়ে নীলিমা তোর
বুকের দরদ জেনেছি-গো।

দোলনাতে মা জনম-জনম
তুমি আমায় দোল দিয়েছ,
আমি যখন কুসুম-কোরক
লতা হয়ে কোল দিয়েছ।

বৎস হয়ে শ্যামলী তোর
সাথে সাথে ছুটেছি-গো,
হরিণ-শিশু তোমার সাথে
কোথায় তৃণ খুঁটেছি-গো।

তুমি ভীমা ভয়ঙ্করী
তুমি আমার ডাকিনী-মা,
উগ্রতা এই রক্তে দিলে
দুগ্ধ তোমার বাঘিনী-মা।

দুখিনী-মা আমায় নিয়ে
ভিক্ মাগিয়া কেঁদেছ-গো,
শবরী-মা আঁচল দিয়ে
বুকে আমায় বেঁধেছ-গো।

পক্ষিণী-মা বুঝতে পারি
এই বুকেতে 'তা' দিয়েছ,
এক ঠাঁয়ে আজ সব পেয়েছি
জনম-জনম যা' দিয়েছ।

তোমার ডাকে চাঁদ আমারে
টিপ্ দিয়ে যায় বরণ করি',
সাঁজের প্রদীপ লয় মা আমার
আলাই-বালাই হরণ করি'।

পান্না ঝরে কান্নাতে মোর
মাণিক ঝরে হাস্যেতে-গো।
লুকাচুরি খেলেন গোপাল
কোমল কচি আস্যেতে-গো।

জনম-জনম মা হয়েছ
জনম-জনম হবেও—মা,
ডাক্‌বে আমায় স্তন্য তোমার
তোমার কাজল, তোমার চুমা।*

* কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে রচিত।

কারিকুলাম

—শ্রীকাঞ্চনমালিকা দেবী

কারিকুলাম-মধ্যে আর একটি বিষয় প্রবিষ্ট করা উচিত বলিয়া আমার মনে হইয়াছে। সন্তান-পালন শিক্ষা না পাইলে মেয়েদের শিক্ষা সম্পূর্ণই হইবে না। ইহা শিক্ষা দেওয়া সহজ নয়। সহজ নয় বলিয়াই ইহা শিক্ষা দিতে হইবে। সহজ হইলে সকলেই আপনা-আপনি শিখিয়া লইয়া কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিত, সহজ নয় বলিয়াই আমাদের সময়কার মেয়েরা তাহা জানে না।

সন্তান-পালন-শিক্ষা ইস্কুলে দেওয়া সম্ভব কি না তাহা বিবেচনা করিতে হয়। সাধারণতঃ মেয়ে-ইস্কুলে শিক্ষয়িত্রীরা নিজেরা অবিবাহিতা, তাঁহারা ঐ বিষয়ে শিক্ষা দিতে সমর্থ হইবেন কিরূপে? আজকালকার বাড়ীতেও ঐ শিক্ষা পাওয়া যাইবে না। কেন না, আজকালকার বাড়ীতে আমাদের মতই সব কর্ত্রী; সেকেলে গৃহিণী সব ঘরেই কম আছেন; আমাদের যা বিদ্যা তাহাতে নিজেরাই আলোক দেখি না, অন্যকে আলো দিব কিরূপে?

আমাদের বৈঠকে যখন এই সব কথা আমরা আলোচনা করিতে বসি, তখন আমাদের মধ্যে অনেকেই এইরূপ বলেন, জ্বালাস নে লো! ঐ সব আবার লোকের কাছে শিখতে যেতে হবে? ঘেন্নায় মরি, ঘেন্নায় মরি। তাঁহাদের এই মত যে, অবস্থায় পড়িলে তখন ব্যবস্থা করিয়া লওয়া যাইবে।

আমার কিন্তু এই মত নয়। বরং আমার মত ঠিক উল্টা। অবস্থা যখন আসিয়া পড়িবে, আমরা তখন ব্যবস্থা করিব কি প্রকারে? আমরা যে একেবারে অজ্ঞতার অন্ধকারে পড়িয়া আছি। অবস্থার উদ্ভব হইলে ব্যবস্থা করিতে পারে সে, যাহার জ্ঞান আছে। যাহার জ্ঞান নাই, সে পারিবে কি প্রকারে? তুফানে নৌকা সামলাইতে কি উপায়ে হয়, যে মাঝি দক্ষ, সে তাহা জানে। না জানিয়া যে মাঝি হাল ধরে, তুফানে পড়িলে হাল ছাড়িয়া জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টাই সে করিবে, নৌকা বাঁচুক বা ডুবুক। জলে নামিয়া সাঁতার শিখিতে হয় মানি; কিন্তু ইহাও মানি যে, সাঁতার না শিখিয়া অগাধ জলে পড়িয়া সাঁতার শিখিয়া লইব, ইহা ভাবিলে বিপদ অনিবার্য্য। সন্তানের মা হইলেই সন্তান-পালন করিতে পারা যায় না। ইহা শিক্ষণীয়।

কি উপায়ে তাহা শিক্ষা করা যায়, তাহা আগে বলিয়াছি। ঘরে শিক্ষার উপায় নাই, কেন না শিক্ষা দিতে পারেন, সেখানে তেমন লোক নাই। ইস্কুলে তাহা শিক্ষা করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রচলিত ইস্কুলে সে ব্যবস্থা নাই। সেই ব্যবস্থা ইস্কুলে সম্ভব কি না, ইহা বিবেচনা করিবার সময় আসিয়াছে।

এক গৃহস্থের ক্ষুদ্র গৃহকোণ হইতে যে কথা আমি বলিতেছি, সেই কথা আমাদের মধ্যে যাঁহারা বরণীয়া ও নেত্রীস্থানীয়া, তাঁহারাও অনেকে সভা-সমিতিতে বলিয়াছেন। অনেক খবরের কাগজে অনেক সময়ে তাহা আমি পড়িয়াছি। বাঙ্গালা দেশের এক মহাপুরুষের এক বর্ষিয়সী কন্যা কিছুদিন পূর্ব্বে এক নারী-সভায় সেই কথা বলিয়াছিলেন, তাহাও খবরের কাগজে বাহির হইয়াছিল। তবু কাজ কিছুই যে হইতেছে না, ইহাতে আমার আশ্চর্য্য লাগে। এই মাত্র আমি যাঁহার কথা বলিলাম, তিনি একজন মহারাণী। তাঁহার অর্থ আছে, লোকজনও থাকা সম্ভব, তারপর তাঁহার প্রতিপত্তিও সমাজের উপর আছে। যাহা বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন, কাজে যাহাতে তাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা তিনি করিতে পারেন না কি?

বালক-বালিকার পক্ষে আশ্রম-জীবন যাপন করা দেহের ও মনের স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর। এই বিবেচনায় আমাদের দেশের দুইজন মহাপুরুষ তাদৃশ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া বালক-বালিকাদের শিক্ষায়তন প্রস্তুত করিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে পরিণত হইয়া আশ্রম-জীবনের সহিত বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্ররূপে দেশমধ্যে সবিশেষ যশঃ অর্জ্জন করিয়াছে। নানারূপ শিক্ষার সঙ্গে স্বাবলম্বী হইবার, কষ্টসহিষ্ণু হইবার, বিনয়ী ও সদাচারী হইবার শিক্ষা তথায় প্রদত্ত হইয়া থাকে। পুণ্যাত্মা, দানবীর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীও রাঁচীতে ঐরূপ একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচর্য্য-শিক্ষা দেওয়া এই বিদ্যালয়েরও প্রধান উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে প্রচলিত শিক্ষাদান-ব্যবস্থাও চলিত আছে।

এমনি মেয়েদের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের জন্য স্বতন্ত্র ইস্কুল যদি করা সম্ভব হয়, তবে যে কারিকুলাম তাহাদের পক্ষে উপযুক্ত, যাহার দ্বারা তাহাদের জীবন গঠিত হইয়া তাহাদের এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততির জীবন গঠিত হইবে, তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে সব দিকে ভাল হইবে।

সন্তান-পালন সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে অধিক লোকেরই কোনরূপ স্পষ্ট ধারণা নাই। এই ধারণা নাই, সেই জন্য সন্তানগুলি যে ভাবে পালিত হইতেছে, তাহাতে আমরাই সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছি না। সন্তান মাতার নিকট হইতে যাহা পায়, তাহা যত আদরে এবং আগ্রহে লইয়া থাকে, অন্যের দেওয়া কিছুই তেমন ভাবে লইতে পারে না, লইতে চায়ও না। মাতৃদুগ্ধের মত মাতার উপদেশ, মাতার আদর্শ তাহার মনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে, এমন আর কিছুই নয়।

যে কোন বড়লোকের জীবনী পাঠ করিলে ইহাই আমরা দেখিয়া থাকি যে, মাতার আদর্শে ছেলে গড়িয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাসাগরের জীবনী ইহার সাক্ষ্য; গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী ইহার সাক্ষ্য; এমন অনেক লোকের নাম আমি করিতে পারি, কিন্তু তাহা বাহুল্য হইবে। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীতেও ইহার প্রমাণ আছে; তাঁহার বাণীতেও আমরা তাহা পাই। তিনি বলিয়াছিলেন, নারীদের সম্মুখে আদর্শ ধর দময়ন্তীর, গার্গীর ও সীতার। তাহাদের জীবনে ঐরূপ উচ্চ আদর্শ থাক্।

সেই উচ্চ আদর্শ ধরিবে কে? প্রথমে মা, পরে আর সবাই। কিন্তু মা যদি প্রথমেই উচ্চ আদর্শ ধরিতে না পারেন, তাহা হইলে উদ্দেশ্য বিফল হইবে।

কাজে কাজেই যে মা সন্তান ধারণ করিবেন, সেই মাকে সন্তান পালন করিবার শিক্ষা সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করিতে হইবে। শুধু দুধ খাওয়াইলে, জামা জুতা দিয়া সাজাইয়া, বই-শ্লেট হাতে দিয়া ইস্কুলে পাঠাইলে সন্তানপালনের সকল কর্ত্তব্য সাধন করা যায় না।

ভগ্নীরা সকলে মানিবেন কিম্বা মানিবেন না, তাহা আমি বলিতে পারিব না, তবে তাঁহারা চেষ্টা করিলে লক্ষ্য করিতে পারিবেন যে, ছেলেকে দুধ খাওয়ানোরও একটি শিক্ষা আছে। ছেলেবেলায় আমরা দেখিয়াছি, মায়েরা কত বিচার করিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া, সময়ের মাপজোক করিয়া তবে শিশুকে দুধ খাওয়াইতেন। আমার একটু একটু মনে আছে, কোন ছেলের একটু সামান্য অসুখ হইলে, মায়েরা সকলের আগে কোন্ দুধ ও কখন্ অর্থাৎ কোন্ সময়ে দেওয়া হইয়াছে, সেই দুধ কেমন গরম ছিল, অথবা তাহাতে কতখানি জল মিশান ছিল, তাহারই তদন্ত করিতেন। আরও মনে আছে, দুগ্ধদানের পূর্ব্বে শিশু কাঁদিয়াছিল কি না, তাহার পেট পড়িয়া ছিল কি উঠাই ছিল, এমনই কত কথাই না জিজ্ঞাসা করিতেন। এই সব কথা জানা হইয়া গেলে, শিশুর অসুখের কারণনির্দ্দেশ ও তাহার প্রতীকারের উপায় নির্ণীত হইত। সেই উপায়ও আবার ডাক্তার ডাকিয়া নয়, নানা রকম মুষ্টিযোগ ও টোটকা তাঁহাদেরই জানা থাকিত, তাঁহারা তাহাদেরই একটি লাগাইয়া দিতেন, শিশু সুস্থ হইত।

এখন কোন বাড়ীতে এইরূপ হয় কি? আমি দেখি না ত। যদি কোথায়ও হয়, তবে খুব ভাল বলিতে হয়। কিন্তু সাধারণ ভাবে আমি দেখি, কোন ছোট অসুখেও ডাক্তার ডাকিয়া বা ডাক্তারের ঔষধ আনিয়া গিলাইতে না পারিলে মায়েরা নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন হইতে পারেন না। আমার পিতামহীর পেটরায় প্রকাণ্ড একটি 'আলুইয়ের ফর্দ্দ' ছিল, সেটি আজও আমাদের বাড়ীতে আছে। ছোটদের জন্য কত অসুখের টোট্‌কা কত রকমের যে ছিল, তাহা দেখিতে বসিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

ছোটদের পোষাক-আষাক সম্বন্ধেও আমরা কতটুকু জানি? দোকান হইতে ফ্যাসানমাফিক জামা, ইজার এই সব আসে, আমরা তাহা পরাইয়া শুধু দেখি, ছেলে মেয়েকে আমাদের সুন্দর দেখাইতেছে কি না। তাহা যদি দেখায়, তবে আর কিছু আমরা দেখি না। এখন ছোটদের আলগা গায়ে, খালি পায়ে থাকিতে দিতে মায়েরা বড্ড অনিচ্ছা দেখান। আর আমার বেশ মনে আছে, আমাদের পিতামহীরা সর্ব্বক্ষণ ছোটদের গায়ে জামাজোড়া দেখিলে অত্যন্ত বকা-ঝকা করিতেন। আমাদের মার-ধোর করিতেন, মায়েদেরও লাঞ্ছনা হইত। শুধু ইহাই নয়। ছোটরা ধূলা-কাদা না মাখিলে তখনকার কর্ত্রীরা অসন্তুষ্ট হইতেন; এখন তাহার উল্টা। তখনকার দিনের কর্ত্রীরা ভাবিতেন, ধূলা-কাদা না মাখিলে তাহারা (ছোটরা) শক্ত হইবে না। আর শক্ত না হইলে তাহাদেরই পরে কষ্ট হইবে। এখন মায়েরা মনে করেন, ছেলে-মেয়ে ধূলাকাদা মাখিলে অসভ্য, কুৎসিত, জংলী, ছোটলোক হইয়া যাইবে। ছোটরা এখন 'ছোটলোক' হইতেছে না সত্য, কিন্তু মানুষ হইতেছে কি? তা যদি হইত, আক্ষেপ করিবার কিছু থাকিত না। আসলে যে তা'ও হইতেছে না।

রবি বাবুর কবিতার সেই—

সাত কোটী সন্তানেরে
হে মুগ্ধা জননী, রেখেছ বাঙালী করি
মানুষ করনি।

উক্তিই যেন মনে পড়ে।

একটু রোদ লাগিলেই ছেলেদের মাথা ধরিয়া উঠে; একটু খানি বৃষ্টিতে ভিজিলে পরে তাহাদের সর্দ্দিকাসি হয়; একটুও হিম সয় না; একটুও কষ্ট সয় না। এই ত ছেলেদের স্বাস্থ্য। ইহা বাঙালীর পরিচয় হইলেও মানুষের পরিচয় নয়। এর চেয়ে ছেলেরা অসভ্য হোক, জংলী ও 'ছোটলোক' হোক, তবু তারা মানুষ হইবে। মানুষের মত শ্রম, মানুষের মত কষ্ট করিতে পারিবে।

আমি ছেলেদের সম্বন্ধে যে কথা বলিলাম, মেয়েদের সম্বন্ধেও আমি সেই কথা বলিতেছি। আমাদের ঘরের মেয়েদের স্বাস্থ্যের ছবি ছেলেদেরই মত। তাহারা পরের ঘরে গিয়া (নিজের ঘর অর্থাৎ বাপের ঘর, পরের ঘর মানে স্বামীর ঘর সে পরের ঘর বলে না, বাপ-মা আত্মীয়-স্বজনরা শ্বশুর-বাড়ীকে পরের ঘর বলেন) একটু পরিশ্রম করিয়াই ক্লান্ত হয়, একটু কষ্ট স্বীকার করিতে হইলে তাহারা অসহিষ্ণু হইয়া যায়। তাহাদের দোষ কি দিব? তাহাদিগকে যে সংসার ঘাড়ে করিতে হইবে, সংসারের সমস্ত গুরুতর দায়-বহন তাহাদেরই করিতে হইবে, এই কথা ভাবিয়া সেই মত তৈরী তাহাদের করা হয় নাই। করা হয় নাই, সেই দোষ তাহাদের কখনই নয়।

যে দিন চলিয়াছে, তাহাতে ছেলেরা যেমন, মেয়েরাও তেমন বাহিরের দিকেই লক্ষ্য বেশী রাখিয়াছে। ছেলেরা আই-এ, বি-এ, এম-এ পাশ আগেও করিয়াছে, এখনও করিতেছে, দেখাদেখি মেয়েরাও ঐ সব পাশ করিতেছে। ছেলেরা চাকরী-বাকরী করিবে, অর্থ রোজগার করিবে, পাশ তাহাদিগকে করিতে হইবেই; কিন্তু মেয়েরা কেন মনে করিবেন, পাশ না করিলে তাঁহারা নগণ্য হইবেন? আমাদের রাজ্যে আমাদের যে অধিকার ভোগ করি, যে কর্ত্তৃত্ব আমাদের প্রত্যেকের আছে তাহা কিসে কম? আসল কথা, আমার মনে হয়, আমাদের গৃহস্থালীর শিক্ষা আমরা সম্পূর্ণ পাই না বলিয়া আমাদের ঐ ভুল থাকিয়া যাইতেছে এবং আমরা মনে করিতেছি, ঘরের ভিতরে থাকিয়া থাকিয়া আমরা পুরুষদের চেয়ে খাট হইয়া পড়িতেছি। তাই ছুটিতেছি আমরা পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিতে। আশ্চর্য্য এই, পুরুষরা আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া গৃহস্থালীতে ঢুকিতে আসিতেছে না। আসিবার কথাও নয়, তাঁহারা আমাদের 'আফিসে' অনধিকার প্রবেশ করিতে আসেন, ইহা আমরা চাই না। তবুও, আসিলে, আমরা এমন লঙ্কা-ফোড়ন দিয়া দিব যে, হাঁচিতে হাঁচিতে হায়রান হইয়া পড়িবেন তাঁহারা।

কিন্তু সে কথা নয়, গৃহস্থালী শিক্ষাদানের কথা চলিতেছিল, সেই কথাই চলুক। ঘর-গৃহস্থালীর শিক্ষা যদি আবার সব মেয়েকে দেওয়া হইতে থাকে, গৃহস্থালীতে তাঁহাদের সম্মান ও গৌরবের স্থানের সম্পূর্ণ পরিচয় যদি জানাইয়া দেওয়া হয় তাঁহাদের, তবে তাঁহারা হয়ত বাহিরে যাইবার জন্য ছুটাছুটি না করিতেও পারেন। বাড়ীর গৃহিণী যে প্রকৃতপক্ষে ঘরণী, ঘরের প্রধানা কর্ত্রী, এই ধারণা মেয়েদের মনে না জাগাইলে, তাঁহারা স্বীয় আসনের মর্য্যাদা

কখনই বুঝিতে পারিবেন না। সেইটি কিরূপে বুঝাইয়া দেওয়া যায় ?

বুঝাইয়া দেওয়ার এই কঠিন কাজ ইস্কুলে বা কলেজে হইবে না, এই কাজ পারিবেন বাড়ীর গৃহিণীরাই। তাঁহারাই মেয়েদের শিখাইবেন, কেমন করিয়া বাল্যকালে পিতামাতার সেবা করিতে হয় ; ভাই-ভগিনীদের যত্ন করিতে হয় ; আত্মীয়-অতিথিকে কি ভাবে আদর-আপ্যায়ন করিতে হয় ; যৌবন-কালে শ্বশুরবাড়ীতে শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করা, তাঁহাদের পরিচর্য্যা করা, স্বামীর সেবা করা, তাঁহার দেহের ও মনের তত্ত্বাবধান করা, এই সমস্ত কাজই তাঁহাদিগকে শিখাইতে হয়। কেবল মুখের কথায় বা উপদেশ দিয়া এই সমস্ত সূক্ষ্ম বা প্রয়োজনীয় কারুকার্য্য যদি শিখান যাইত, তবে ইস্কুলে, কলেজে তাহা হয় ত হইত, কিন্তু তাহা হয় না। কথার চেয়ে কাজ অধিক কাজ করে। মাকে সংসার করিতে দেখিয়া মেয়ের মনে সংসার করিবার প্রবৃত্তি জাগে ; মায়ের আদর্শে মেয়ে স্বামীসেবা, শ্বশুর-শাশুড়ীর পরিচর্য্যা শিখিয়া লয়।

যে মা সন্তান পালন করিতে জানেন, তাঁহার সন্ততি তাঁহার আদর্শে তাহা শিখিতে পারে, কিন্তু অজ্ঞ জননীর নিকট কন্যা শিখিবে কি ? আজকাল সেইজন্য কোন মেয়েই কিছু জানে না।

একখানি ইংরাজি বই (An Aid to Young Mothers) আমি পড়িয়াছি। বইখানি একটি ইংরাজ মহিলা লিখিয়াছেন। তাঁহারই দেশের কথাই তিনি বইতে লিখিয়াছেন। সে সবের সঙ্গে আমাদের দেশের কথা খাটে নাও বটে, আবার কতকটা খাটেও বটে।

তিনি বলিয়াছেন, মায়েরা নিজেদের বেশ-প্রসাধন, অঙ্গ-প্রসাধন ইত্যাদি লইয়া ব্যস্ত ; বাজার করিতে যাওয়া, মিউজিক হল, সিনেমা হাউস, থিয়েটার হল, ভ্যারাইটি শো—এই সব তাতে যোগ দিয়া মায়েরা একটুও সময় পান না। ছেলেরা কি করে, মেয়েরা কি করে তাহা তাঁহারা কখন্ দেখিবেন ? ছেলেরা ইস্কুলে থাকে (বলিয়া রাখি, ইংরেজের দেশের বেশীর ভাগ ছেলে রোজ বাড়ীতে না আসিয়া ইস্কুলেই থাকে, ইস্কুলগুলি ছাত্রদের পড়িবার ও থাকিবার স্থান বলিয়া গণিত) মেয়েরাও তাই। ছুটিতে ছুটিতে বাড়ী আসে যখন, ছেলেরা করে বাপকে অনুসরণ, আর মাকে অনুসরণ করিয়া মেয়েরা ছুটি কাটায়। বাপ নাচে গেল, ছেলেও গেল ; মা নাচে গেল, মেয়েও গেল। বাপ-মা যদি এক থিয়েটারে গেল, ছেলে তাহার বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে, মেয়ে তাহার বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে অন্য থিয়েটারে বায়স্কোপে গেল। ঘর-সংসারের কথা বাপ ভাবে না, মা ভাবে না, তাই ছেলেমেয়েরাও ভাবে না।

এই বইয়ের লেখিকা ইহার নিন্দা করিয়াছেন।

আমি দেখিতেছি, আমাদের দেশের গরীব ও মধ্যবিত্তদের ঘরে ঐ ভাব আসিয়া প্রবেশ করে নাই, কিন্তু ধনী ও পদস্থ ব্যক্তিরা ঐ ভাবের ভাবুক হইয়াছেন। তাঁহারা বোধ করি মনে করেন, বয়, বেয়ারা, আর্দ্দালী, আয়া দিয়া যখন চলিতেছে, তখন কায়িক কষ্ট স্বীকার করিবেন কেন ?

তাঁহারাও ছেলেদের মেয়েদের হিল্-ইস্কুলে পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা এই দেশে ইংলণ্ড-গঠনের চেষ্টা করিতেছেন। আমি ক্ষমা চাহিতেছি, এই সকল উক্তি করিবার অধিকার কাহারও থাকিতে পারে না।

সন্তান-পালন-শিক্ষা ইস্কুলে সম্পূর্ণ হইতে পারে না। তবে একেবারেই হয় না, ইহাও ঠিক নয়। যদি মেয়েদের ইস্কুলে পড়াইতে হয়, তাহা হইলে তাহাদের জীবনযাত্রার পক্ষে সর্ব্বাধিক প্রয়োজনীয় বিষয়টি পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা নিশ্চয়ই সমীচীন। সন্তান-পালন-শিক্ষাকে দুইভাগে ভাগ করা যাইবে। একভাগে সন্তানজন্মের পর হইতে যতদিন লালন করিতে হয়, ততদিন পর্য্যন্ত যাহা করণীয় কর্ত্তব্য তাহা ; দ্বিতীয় ভাগে তাহার পর হইতে যে সময় পর্য্যন্ত না সন্তান বড় হইয়া নিজে প্রতিষ্ঠিত হয়, ততদিন পর্য্যন্ত যাহা কর্ত্তব্য এবং করণীয় তাহা। প্রথম ভাগ মেয়েরা ইস্কুলে শিখিতে পারে ; দ্বিতীয় ভাগ গৃহে স্ব স্ব মাতা বা খুড়ী-জ্যেঠীর কাছে শিখিবে।

যে ইস্কুলে শিক্ষা দেওয়া হইবে, সে ইস্কুল সন্তান-পালন বিষয়ে দক্ষা ও শিক্ষিতা ধাত্রী রাখিয়া মেয়েদের শিক্ষা দিবে ইহা আশা করা যায়। এই শিক্ষায় শিক্ষিতা মেয়েরা তাহাদের সন্তানদের নিজেরা শিক্ষা দিতে পারিবেন। শিক্ষার ধারা একবার প্রচলিত হইলে তখন আর কেহ গতি বন্ধ করিতে পারিবে না।

আলো ও অন্ধকার

—শ্রীপুষ্পরাণী ঘোষ

রাণীগঞ্জের কাছে একটি কয়লাকুঠী; সাঁওতাল পরগণার মধ্যেও বলা যায়, বাঙ্গালাদেশের মধ্যেও বলা যায়; অর্থাৎ বাঙ্গালা ও বিহারের সীমানায় অবস্থিত। বাঙ্গালার শ্যামলতার আভাসও পাওয়া যায়, আবার বিহারের রুক্ষতারও অভাব নাই।

খাদমোহনার সামনেই কিছু দূরে খাদের অ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজারের বাঙলো। তারই খানিকটা পরে খাদের বাঁদিক দিয়ে সারি সারি কুলী ধাওড়া। ম্যানেজার সারাদিনের কর্ম্ম-শেষে বাঙলোর হাতার মধ্যেকার ফুলবাগানে ইজিচেয়ারে শুয়ে একটী বাঙ্গালা মাসিক পত্র পড়ছিলেন। হঠাৎ ধাওড়ার দিকে একটু বেশী রকম গোলমাল শুনে তাঁর মনোযোগ সেই দিকে আকৃষ্ট হ'ল। একটু পরেই একদল লোককে গোলমাল করতে করতে তাঁর বাঙলোর দিকেই আসতে দেখে, ব্যাপারটা কি জানবার জন্য তিনি একটু এগিয়ে গেলেন। তাঁকে দেখে সবাই এক সঙ্গে চেঁচামেচি করে উঠল ও দলের মধ্য থেকে ক্রন্দনরতা একটি কুলী-রমণী তাঁর সামনে এসে খুব চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল আর হাউ হাউ করে কি সব বলতে লাগল। তার কান্নাটা একটু থামলে ব্যাপারটা জানা গেল—ঐ কুলী-রমণীটির নাম মুনিয়া—সে তিন নম্বর "পিটে" ডিপোতে কাজ করে; তার স্বামী রতনাও ঐ তিন নম্বরেরই হলেজ-খালাসী। সে আজ মদ খেয়ে এসে তাকে খুব মারধোর করছিল; এমনি সময় ধাওড়ার অন্য কুলী-কামিনরা তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাঁর কাছে নিয়ে এসেছে।

ম্যানেজার তরুণ বাঙ্গালী যুবক, তাঁর ছাত্র-জীবন বেশী দিন শেষ হয়নি, অল্প দিন মাত্র তিনি কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করেছেন। বর্ব্বর-স্বামী স্ত্রীর গায়ে হাত তুলেছে শুনে, তাঁর ধমনীর তরুণ রক্ত অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং তিনি তখনই রতনাকে ডাকিয়ে এনে' চাপরাশীকে হুকুম করলেন তাকে গুণে একশ' চাবুক লাগাতে। যা কতক বেত পড়তেই হঠাৎ মুনিয়া এসে ম্যানেজারের পা জড়িয়ে ধ'রে রতনাকে আর না মারবার জন্য মিনতি করতে লাগল। ম্যানেজার আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন, কিন্তু নারীর অঙ্গে যে বর্ব্বর হাত তোলে, তার সাজা অত অল্পে সম্পূর্ণ হয় না ব'লে তিনি পা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা ক'রলেন। মুনিয়াকে ধমকালেন, যারা তাকে প্রতিবিধানার্থ তাঁর কাছে এনেছিল, অসময়ে তাঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত করবার জন্য তাদেরও তিরস্কার করলেন, কিন্তু মুনিয়ার সে সবের প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই—সে সাহেবের পা চেপে ধরে বসে আছে। অগত্যা সাহেব মুনিয়ার আন্তরিকতা দেখে চাপরাশীকে নিরস্ত হতে আদেশ দিলেন। তারপর কুলীকামিনরাও ধাওড়া চলে গেল, তিনিও নারীচরিত্রের রহস্য ভাবতে ভাবতে শেষ পর্য্যন্ত প্রচলিত প্রবাদবাক্য "দেবাঃ ন জানন্তি"র আশ্রয় নিয়ে বাড়ী ফিরে গেলেন। কিন্তু তিনি যদি পূর্ব্বকার সব ইতিহাস জানতেন, তা হলে হয়ত এত আশ্চর্য্য [illegible] না। মুনিয়া রতনাকে সত্যাই প্রাণভরে ভালবাসত। [illegible] শ্রেণীর লোকদের মধ্যে যথেষ্ট প্রচলিত থাকলেও এবং [illegible] সময়ে তাকে অনেক দুঃখ কষ্ট সইতে হলেও, সে রতনাকে ত্যাগ করে দ্বিতীয়বার বিবাহের কথা ভাবতেও পারে নি। অন্যান্য কুলী-রমণীরা, তাদের স্বামীরা তাদের মারলে বা অন্য কোন রকম অত্যাচার করলে প্রতীকারের আশায় কয়লাকুঠীর কর্ম্ম-চারীদের কাছে নালিশ করে তাদের শাস্তিবিধান করিয়েছে, কিন্তু মুনিয়া তা কখনও পারে নি। আজ মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় ও পাঁচ জনের প্ররোচনায় এসেছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রতনার লাঞ্ছনা সহ্য করতে পারে নি।

রতনা ও মুনিয়ার জীবনটা ছিল একটু নতুন ধরণের। রতনা ছিল ডোম, আর মুনিয়া ছিল সাঁওতাল—কাজেই তাদের মধ্যে বিয়ে হওয়া এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। কয়লা কুঠীতে সাধারণতঃ যারা কাজ করে—সাঁওতাল, কোল বাউরী, ডোম, ধাঙ্গড় প্রভৃতি; তাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, পুনর্ব্বিবাহ প্রভৃতি প্রচলিত থাকলেও অসবর্ণ বিবাহ এক রকম নেই বললেই চলে; বিশেষ করে রতনা আর মুনিয়ার বিয়ের মত বিয়ে ত নাই-ই, কারণ সাঁওতালরা

অত্যন্ত রক্ষণশীল ও গোঁড়া জাত। তারা নিজেদের সব সময় অন্য জাত থেকে তফাতে রেখে চলে—এমন কি ভিন জাতের ছোঁয়া জলটুকুও খায় না। অবশ্য যারা কয়লাকুঠীতে কাজ করে নানাজাতির সংস্পর্শে এসে ও পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর ফলে তাদের আর আগেকার মত সেই সহজ সারল্যও নেই, ততটা রক্ষণশীলতাও নেই। কিন্তু তা হলেও এরকম একটি ঘটনা তাদের মধ্যে কখনও হয় না—তবুও এখনকার দিন বলেই—নয়ত আগেকার দিনে হলে তারা রত্না ও মুনিয়া দুইজনকেই খুন করে ফেলত। ওরা অবশ্য ওদের আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে পালিয়ে এসে লুকিয়ে বিয়ে করে—কিন্তু কথাটা গোপন নেই, এ কুঠীরও সবাই জানে এবং সকলের কাছেই ওরা লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও উপেক্ষা ভোগ করে—ওদের কোথাও স্থান নেই—সাঁওতাল-সমাজেও না, ডোম-সমাজেও না।

রত্না আর মুনিয়া অতি শিশুকাল হতে মানুষ হয়ে ছিল বরাকরের কাছাকাছি একটা কয়লাকুঠীতে—ওদের উভয়েরই মা, বাবা, সেই কুঠিতে কাজ করতো এবং একই ধাওড়ার বিভিন্ন ঘরে বাস করত। রত্না আর মুনিয়া যখন একটু বড় হল, তখন তাদের সমবয়সী অন্য ছেলে মেয়েদের সঙ্গে তাদেরও লাগিয়ে দেওয়া হল বাগালী (গরুর রাখালী) কাজে। রৌদ্রতপ্ত শীতের বেলায় তারা মাঠে গরু ছেড়ে দিয়ে, তাদের চেয়ে তিন গুণ বড় "ঠ্যাঙ্গা" নিয়ে—চার গুণ বড় মহিষের পিঠের উপর শুয়ে ঘুরে বেড়াত, বর্ষায় তারা ধানের ক্ষেতে কাঁকড়া ও গড়ই মাছ ধরত; আর গ্রীষ্মের সময় কোন ছায়াশীতল গাছ তলায় নানা রকম খেলা করে বেড়াত। এমনি করে তাদের স্বপ্নময় শৈশব কেটে গেল। ক্রমে তারা আরও বড় হয়ে উঠল। বাল্যের সীমারেখা ছাড়িয়ে তারা কৈশোরে উপনীত হ'ল। মুনিয়া যেন একখানি কাল পাথরে খোদাই করা প্রতিমা, সুন্দর তার গঠন, সুন্দর তার চোখ মুখের ছাঁদ—স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। এই পার্বতী বালিকাকে কৈশোরের মোহন তুলির স্পর্শ মাধুর্য্যময়ী করে তুলল। রত্নার চেহারাও হয়ে উঠল বলদৃপ্ত, দৃঢ়, অনমনীয়। সমস্ত কয়লাকুঠীর মধ্যে তার মত বলশালী তরুণ কিশোর আর কেউ ছিল না। এইবার তারা দু'জনেই খাদে কাজ করতে আরম্ভ করল।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি এই দুটি কিশোর-কিশোরী বরাকর নদীর তীরের ছোট ছোট টিলাগুলিতে ছুটাছুটি করে নির্জ্জন বনভূমিকে মুখরিত করে রাখত। গ্রীষ্মের ক্ষীণতোয়া বরাকর পেরিয়ে তারা দূরের বনে চলে যেত। সেখানে কোন পলাশ গাছের তলায় বসে রত্না তার প্রিয় বাঁশের বাঁশীটি বার করে বাজাত। মহুয়ার গাঢ় মদির-গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত, আর মুনিয়া ঘুরে ঘুরে শিরীষ ফুল, পলাশ ফুল, মহুয়া ফুল, কুড়িয়ে এনে কানে গুঁজে দিত, খোঁপায় পরত, রত্নাকে পরিয়ে দিত, নিজে পরত। কোন দিন বা রত্না তীর ধনুক ও গুলতি নিয়ে শীকার করতে বেরুত—কোন রঙ্গীন পাখীর পালক পেলে সে মুনিয়ার চুলে গুঁজে দিত, আর যদি কোন খরগোস বা পাখী পাওয়া যেত তা হলে তারা তাই পুড়িয়ে ঝলসিয়ে বনভোজন করত। কখনও বা রত্না অনেক খুঁজে, কোন ছোট্ট সুন্দর পাখী ধরে আনত মুনিয়া পুষবে বলে। দূরে, কাছে, যেখানে যে কোনও মেলাই হ'ক না কেন, কোনটাতে যেতেই রত্নার ভুল হত না—মেলা থেকে সে মুনিয়ার জন্যে কাঁচের চুড়ী, রঙ্গীন চুলের ফিতা, বেলকুঁড়ি, কাঁটা—এই সব কিনে আনত। ছুটীর দিনে বা উৎসব উপলক্ষে, যখন কুঠীর অন্য সব তরুণ-তরুণীরা চাঁদের আলোয়, মুক্ত প্রান্তরে নাচ গান করত—তারা অনেক সময় দলছাড়া হয়ে খানিকটা দূরে হাত ধরাধরি করে বসে নাচগান দেখত, একটা অজানা আনন্দের পুলকে তাদের হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠত। বর্ষায় যখন দুকূল ভেঙ্গে বরাকরে প্রবল বান আসত—তার এত দিনকার ক্ষীণ, শান্ত মূর্ত্তি ত্যাগ করে সে যখন প্রচণ্ড তেজে রুদ্ররূপী সংহারমূর্ত্তি ধারণ করত, তখন কয়লাকুঠীর আর সকলের সঙ্গে তারাও সেই বান দেখতে আসত—সেই প্রচণ্ড সংহার-লীলা দেখে তাদের সরল কিশোর মন কি যেন আশঙ্কায় ভরে উঠত—তাড়াতাড়ি তারা নিবিড় ভাবে পরস্পরের হাত চেপে ধরত।

এমনি করে সুখে, দুঃখে, উৎসবে, আনন্দে, বিপদে, আপদে তারা সব সময়েই পরস্পরের পাশে থাকত—এমনি করেই একটী সুমিষ্ট একটানা সুরের মত তাদের মধুর কৈশোর জীবন কাটতে লাগল। এর মধ্যে মুনিয়া ও রত্নার মা বাবারা তাদের বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। মুনিয়া ও রত্নার নিবিড় বন্ধুত্বের কথা সবাই জানত—কিন্তু তাদের

ধ্যে যে বিয়ে হতে পারে, এ অসম্ভাব্য কল্পনা কেউ করেনি ; ত্‌না ও মুনিয়ার মা-বাবাও না, কয়লাকুঠীর আর কেউও না। য়লাকুঠীর ধাওড়াতে সাঁওতাল, বাউড়ী, ডোম, ধাঙ্গড় সবাই াশাপাশি থাকে—তাদের ছেলেমেয়েরাও এক সঙ্গে ভাই োনের মত বেড়ে ওঠে—হয়ত তাদের মধ্যে কারুর সঙ্গে কারুর বেশী ভাব থাকে, কিন্তু তাই বলে যে তাদের মধ্যে িয়ে হতে হবে, এ তারা ভাবতে পারেনি—এমন কথা াদের মনে জাগেইনি। রত্‌না ও মুনিয়ার মনেও এ পর্য্যন্ত কথা কখনও জাগেনি, কিন্তু যখন তারা শুনল যে, তাদের য়ের প্রায় ঠিক হয়ে গেছে—শুধু তখনই তারা জিনিষটার রুত্ব বুঝতে পারল—বুঝতে পারল যে, কোন কারণেই াদের পক্ষে অন্য কাউকে বিয়ে করা সম্ভব নয়। তাদের পরিণত সরল বুদ্ধি দিয়েও যে তারা এই অসামাজিক বাহের দুঃখপূর্ণ পরিণামের কথা চিন্তা করেনি তা নয়, ন্তু যতই তারা চিন্তা করেছে—অন্য সব কথা ছাপিয়ে াদের পক্ষে যে, কোন মতেই আর কাউকে বিয়ে করা সম্ভব য়—এই কথাটাই বেশী করে জেগে উঠেছে। অবশেষে কদিন কৃষ্ণপক্ষের এক গভীর অন্ধকার রাত্রিতে তারা াদের একান্ত আপনার মা, বাবা, ভাই, বোন, আবাল্য রিচিত জন্মস্থান, অতি পরিচিত বন্ধুবান্ধব সবাইকে ছেড়ে দ পরস্পরকে সম্বল করে পরস্পরের হাত ধরে নিরুদ্দিষ্টের থে যাত্রা করল।

দুদিন ধরে হেঁটে হেঁটে তারা একটী কয়লাকুঠীতে এসে পস্থিত হল এবং সেখানে তাদের বিয়ে হ'ল। সপ্তাহ নেক বাদে তারা সে কুঠী ছেড়ে আরও দূরে আর একটী ঠীতে এল। সেখানে তারা কাজ খুঁজে নিল এবং সেখানেই স করতে লাগল। সেখানেও অবশ্য তাদের কথা বেশী ন গোপন রইল না। আবার অপমান ও লাঞ্ছনা! এবং ই কয়লাকুঠীর জনসমাজেও এক রকম একঘরে হয়ে ল। কিন্তু রত্‌না ও মুনিয়ার তাতে তখন বিশেষ ক্ষতি আপত্তি ছিল না। তখন তারা পরস্পরের মধ্যেই এত য়েছিল যে, তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গের কোন প্রয়োজন তাদের না। ভোর বেলা পাখীর ডাকের সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠে ভাত রাঁধত,—তারপর খেয়ে নিয়ে দুজনেই এক সঙ্গে কাজে বেরিয়ে যেত,—আবার সন্ধ্যায় এক সঙ্গে ফিরে আসত। সন্ধ্যার খাওয়া শেষ হয়ে গেলে কোন কোন দিন রত্‌না বাঁশী বাজাত, কোন দিন বা মুনিয়া গান করত, আবার কোন দিন বা দুজনে মিলে তাদের ছেলেবেলার গল্প করত। এমনি করে তারা তাদের চারিদিকে একটী অবিচ্ছিন্ন আনন্দের জাল বুনে রেখেছিল এবং প্রতিদিন প্রভাত হতে রাত্রি পর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষণ তাদের দেহ-মন মধুর পুলক রসে ভরে থাকত।

এমনি করে বহুদিন কেটে গেল। কয়লাকুঠীর অন্যান্য কুলী-মজুরেরা এখন আর তাদের তত দূরে দূরে রাখে না। কিন্তু তা হলেও তাদের মনে সেই আনন্দের প্রবাহ, সেই পুলকের জোয়ারের আর কণামাত্রও যেন অবশিষ্ট নাই। পরস্পরের মধ্যেই পরিপূর্ণ হয়ে থাকবার সেই প্রথম যৌবন প্রথম প্রেমের দিন এখন শেষ হয়ে গেছে,—এখন সামান্য অবহেলা, উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্যও মনে বড় বেশী লাগে। তাছাড়া তাদের ছেলেমেয়েদের যে কেমন করে বিয়ে হবে, সেও এক সমস্যার বিষয়। এখন প্রায় সব সময়ই তাদের মধ্যে খিটিমিটি, ঝগড়াঝাঁটি চলে। রত্‌না এখন খুব মদ খায়, কোন কোন দিন মদ খেয়ে হয়ত মুনিয়াকে মারেও। মুনিয়াও মাঝে মাঝে তাকে খুব গালাগালি দেয়—ছেলে-মেয়েদের অনর্থক মারে। এমনি করে অশান্তি ও কলহ-বিবাদের মধ্যে এখন তাদের দিন কাটে।

তবুও এখনও দুঃখ-বেদনার পরম বিরক্তিপূর্ণ মুহূর্ত্তেও রত্‌না ও মুনিয়া একথা ক্ষণিকের জন্যও ভাবে না, যে তাদের বিয়ে না হলেই ভাল হত।

কোন দিন হয়ত চাঁদের আলোয় সুপ্ত মুনিয়ার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে রত্‌নার মনে তার প্রথম যৌবনের প্রিয়তমার কথা জেগে ওঠে ও সমস্ত দুর্ব্যবহারের জন্য অনুতাপে ক্লিষ্ট মনে সে ধীরে মুনিয়াকে জাগিয়ে তুলে মাপ চায়,—সেই নির্জ্জন নিশীথে, জ্যোৎস্না রাত্রিতে চোখের জলে তাদের মিলন হয়। আবার হয়ত কোন দিন গভীর রাত্রিতে রত্‌নার উদাস বাঁশীর সুরে হঠাৎ জেগে উঠে মুনিয়া তার কৈশোর সাথীকে স্বপ্নের মত ফিরে পায়—ও ক্রমে যেন তার অজ্ঞাতেই তার মনের এতদিনকার জমে ওঠা গ্লানির স্তূপ ধীরে ধীরে বাঁশীর সুরের মতই নিঃশেষ হয়ে মিলিয়ে যায়।

ক্রিকেট

—শ্রীবিনয় রায় চৌধুরী

পাতিয়ালা মহারাজার অষ্ট্রেলিয়ান দল
বনাম
নিখিল ভারতীয় দল

বোম্বের প্রথম "টেষ্ট ম্যাচে" মাত্র তিন দিনে নিখিল ভারতীয় দল অষ্ট্রেলিয়ান দলের কাছে ৮ উইকেটে পরাজয় স্বীকার করে। এই অভাবনীয় পরাজয়ের পর অনেকে আশা করেছিল যে, কলিকাতা ইডেন উদ্যানে ভারতীয় দল তার কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে কুণ্ঠিত হবে না। কিন্তু ভগবান বাধ সাধলেন। প্রথম "টেষ্ট ম্যাচে" খেলোয়াড় নির্ব্বাচন ক্রিকেট মহলে এক বিশেষ আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এবারও ভারতীয় টীম তেমন সুনির্ব্বাচিত হয় নি। অমর সিংহ কলিকাতায় এসেও টীমে যোগ না দেওয়াতে বোলিং একটু দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। জয়ের পরিবর্ত্তে কে. বসু খেলবার সুযোগ নষ্ট করলেন—পূর্ব্বদিন খেলবার সময় হাতে আঘাত পেয়ে। লাল সিং, এস. ব্যানার্জ্জির ন্যায় দুইজন অলরাউণ্ডার টীমে স্থান না পাওয়ায় অনেকেই দুঃখিত হয়েছে। পূর্ব্বের টেষ্টে হাভলে, অমর সিংহ, পালিয়া, মোবারক আলি, আমীর ইলাহী, লাল সিংহের পরিবর্ত্তে এবার আবদুল আজীজ, মুস্তাক আলী, সি. এস. নাইডু, মহম্মদ হোসেন, সাহাবুদ্দিন, বাকা জিলানী খেলেন। দ্বিতীয় টেষ্ট খেলার আগের দিন বৃষ্টিতে মাঠ ভিজে যায়, সুতরাং ক্যাপ্টেন রাইডার টস জিতে ফিল্ডিং করতে প্রস্তুত হলেন। অগণিত দর্শকের বিপুল উৎসাহ নিয়ে খেলা আরম্ভ হল। লেদার ও ন্যাগেলের বিরুদ্ধে উজির আলী ও মুস্তাক্ আলি ব্যাট করতে নামলেন। খেলা আরম্ভ হবার মাত্র দেড় ঘণ্টার মধ্যে এক দুর্ঘটনা ঘটল। এই দুর্ঘটনার জের চলল খেলার শেষ পর্য্যন্ত, তাকে রোধ করতে কেউ সক্ষম হয় নি। খারাপ মাঠ আর যাদুকর ম্যাককার্টনির ও অক্সেনহামের প্রবল আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের কোন নামজাদা খেলোয়াড় টিঁকে থাকতে পারলেন না। পর পর খেলোয়াড়রা ম্লানমুখে তাঁবুতে ফিরে এলেন। ভারতীয় দলের প্রথম উইকেট পড়ে ৩০ রাণে।

ক্রিকেট (দ্বিতীয় টেষ্ট) : অষ্ট্রেলিয়ান দল (ফিল্ডিংএ)।

…তার পর ৪০ রাণ না হতেই প্রায় ৭ জন আউট হয়ে গেলেন। …জির আলী ৪৮ মিনিট খেলে মাত্র ২০ রাণ করেন। এই দর্শকদের অসন্তোষ, বিস্ময় ও বিরক্তিতে সারা মাঠ ভরে গেল। অতি ধৈর্য্যের সহিত প্রত্যেক বলটী খেলে টীমের

ক্রিকেট (দ্বিতীয় টেষ্ট): ভারতীয় দল (ফিল্ডিং এ)।

…ড়ি রাণই হল সেদিনকার ভারতীয় দলের সর্ব্বোচ্চ রাণ। …র ১৩ রাণ তার পরই। ম্যাককার্টনির বলে অমর-… অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। অমরনাথ আউট হতে কাপ্তেন নাইডু ভারতীয় দলকে কিছুক্ষণ বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু অতি অল্পক্ষণ মধ্যে নাইডুর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিলেন বোলার অক্সেনহাম। বাকা জিলানী ও আজীজ মারাত্মক

বোলিংএর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কোন মতে স্কোর তুললেন ৪৮। বাকী নিসার ও সাহাবুদ্দিন অক্সেনহামের বলে আউট হতে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসে মোট স্কোর হল ৪৮। জল-যোগের পর অষ্ট্রেলিয়ার ওয়েণ্ডেল বিল ও ব্রায়াণ্ট প্রথম ইনিংস আরম্ভ করলেন। ২২ রাণের মাথায় অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম উইকেট গেল। ওয়েণ্ডেল বিল আউট হলেন। সারা মাঠে প্রবল গর্জ্জন শোনা গেল। মরিসবি ৬ রাণে বিদায় নিলেন।

তখন কাপ্তেন রাইডার এসে টীমের সত্যিকার গোড়া পত্তন করলেন। দুই উইকেটে ভারতীয় মোট স্কোরকে ছাড়িয়ে রাণ উঠল ৫৯। তার পরই ভারতীয় দলের ন্যায় এক ভাগ্য-বিপর্য্যয় সুরু হল। অসামান্য ক্রীড়াকৌশলের পরিচয় দিয়ে ক্যাচ ধরে রাইডারকে নাইডু আউট করলেন। চা-পানের পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়ার স্কোর হল ৪ উইকেটে ৭২ রাণ। হেন ড্রি বিদায় নিতে সকলেই মনে মনে ভাবল, আর এক ঘণ্টা বাকি, অষ্ট্রেলিয়ার সব খেলোয়াড়রা আউট হবে না কি? ৮০ রাণের মাথায় ন্যাগেল আউট হলেন। সকলেই উৎসুক হয়ে ম্যাক-কার্টনির খেলা দেখবার জন্য বসে। কিন্তু ম্যাককার্টনি অল্প-ক্ষণই বেঁচে ছিলেন। অক্সেন-হাম ও এলিস্ জুটী হলেন। রাণের সংখ্যা ৮৭। অবশিষ্ট দুটি উইকেট আউট হতেই সারা মাঠে এক ভীষণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হল। দর্শকদের "হিরো" নিসারের অসা-মান্য ক্রীড়ানৈপুণ্যের ফলে অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে মোট স্কোর হল ৯৯। সেদিনকার খেলার জয়মাল্য কুড়িয়েছেন বোলারগণ—ম্যাককার্টনি, অক্সেন হাম, নিসার ও বাকা জিলানী ভারতের মাটীতে টেষ্ট ম্যাচে এত অল্প সংখ্যক রাণ এই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম। প্রথম ইনিংসে অষ্ট্রেলিয়া দল ৫১ রাণে এগিয়ে রইল, কিন্তু সেটা এমন কি মারাত্মক ছিল না।

দ্বিতীয় টেষ্ট: ওয়াজির আলি ও আজিজ।

দ্বিতীয় দিনে মাঠের অবস্থা মন্দ ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতীয় দল এমন কিছুই রাণ তুলতে সক্ষম হন্ নি এবং সেটা পূরণ করতে অষ্ট্রেলিয়ান দলের মাত্র দুঘণ্টা সময় লেগেছিল। সেটাও সম্ভব হয়েছিল শুধু খেলোয়াড়দের রাশ্রু-জনক ব্যাটিংয়ের ফলে। নিরুৎসাহ মন নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে উজীর আলী ও আজীজ খেলা আরম্ভ করলেন। ত্র ২ রাণ হতে উজীর আলীর 'মৃত্যু' হল। কলিকাতা টেষ্টে' উজীর আলীর খেলা তেমন উল্লেখযোগ্য হয় নি। দলের আশা ইনি খেলার দোষে ভেঙ্গে চুরমার করেছেন। তিয়ালার যুবরাজ ও অমরনাথ যোগ দিলেন। এই দুই বীর লায় নতুন প্রাণ এনে দিলেন। মরনাথ হঠাৎ আহত হন এবং নই জন্যে হাসপাতালে যেতে । জনতার প্রশংসাধ্বনির ধ্যে যুবরাজ-পাতিয়ালা অতি ছন্দে অষ্ট্রেলিয়ার আক্রমণ বার র ব্যর্থ করলেন। টীমের দীন অবস্থায় ক্যাপ্টেন নাইডু াগ দিলেন। চমৎকার খেলা ত্ত্বেও নাইডু মাত্র ৫ রাণ রেন। সি. এস. নাইডু বেশীক্ষণ কে থাকতে পারলেন না, হঠাৎ র্য্য ও সাহস হারিয়ে ফেলতে াসেনও নাইডুর পথ অনুসরণ রলেন। তারপরই সত্যিকার লা আরম্ভ হল। যুবরাজ-পাতিয়ালা ও অমরনাথের চমৎকার লা নিস্তেজ দর্শকদের প্রাণে এক উৎসাহ এনে দিলে। ভূর মাককার্টনি ও অক্সেনহাম হতাশ হলেন। অল্পক্ষণের ধ্যে ৩২ রাণ তুলে ভারতীয় শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটারদের মধ্যে স্থান লেন। অসুস্থ মুস্তাক্ আলি এলেন। টীমের সমস্ত িত্ব অমরনাথ নিজের ঘাড়ে নিলেন। অন্যদিকে াকের পর বাকা জিলানী ভগ্নমনে তাঁবুতে ফিরে গেলেন। খন ইণ্ডিয়ার মোট রাণ ৮ উইকেটে ৯৪। বিপুল হর্ষধ্বনির র অমরনাথের সর্ব্বোচ্চ রাণ ৩৯ হল। অমরনাথের উট হবার পর নিসার ও সাহাবুদ্দিন অতি অল্পক্ষণ 'বেঁচে' ছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় দলের মোট স্কোর হল ১২৭। এবার লেদার বোলিংএ বিশেষ কৃতিত্ব দেখান—৫ উইকেটে মাত্র ২৯ রাণ নেন। ৭৭ রাণ তুললেই অষ্ট্রেলিয়া জয়ী হবে। সুতরাং জয় যে অনিবার্য্য তা সকলেই জানত। বেলা তিনটার সময় অষ্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলেন। পুনঃ পুনঃ খেলার পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও ওয়েণ্ডেল বিল ও ব্রায়াণ্ট রাণ তুলতে লাগলেন। চা-পান পর্য্যন্ত রাণ উঠল ২৭। ভারতীয় আক্রমণ ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে পড়ছিল। ব্রায়াণ্ট ১২ ও মরিসবি ১ রাণে আউট হতে সামান্য একটু চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়েছিল। রাইডার ও ওয়েণ্ডেল বিল আর কোন উইকেট না দিয়ে ৮০ রাণ দিলেন। ৮ উইকেটে অষ্ট্রেলিয়া দল জয়ী হল। অনেকেই আশা করেছিলেন যে বুধবারের খেলায় ভারতীয় খেলোয়াড়রা নিজেদের সম্মান প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেন এবং উভয় দলের মধ্যে এক ভীষণ প্রতিযোগিতা হবে। ভারতীয় দল এমন নিদারুণ পরাজয় স্বীকার করবে কেউ আশা করেনি। খারাপ মাঠ, বোলারদের অদ্ভুত কৃতিত্ব ও নামজাদা ব্যাটস্‌ম্যানদের নিকৃষ্ট খেলা—এই ত্র্যহস্পর্শই ভারতীয় দলের পরাজয়ের হেতু
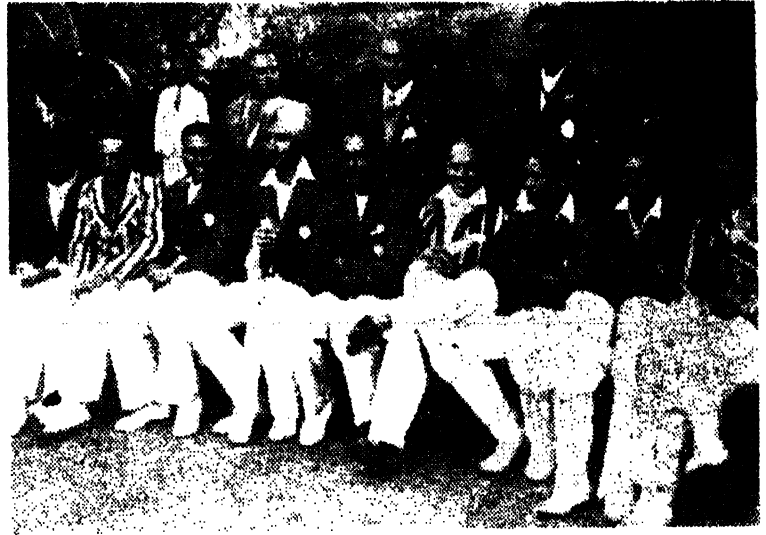
ক্রিকেট (দ্বিতীয় টেষ্ট): ভারতীয় দল।

নিখিল ভারতীয় দল

প্রথম ইনিংস

ওয়াজির আলী	(কট) এলিস, (বো) ম্যাককার্টনি	২০
মুস্তাক আলী	(ষ্ট্যাম্পড) এলিস, (বো) ম্যাককার্টনি	১৩
অমরনাথ	(কট) রাইডার, (বো) ম্যাককার্টনি	০
সি, কে, নাইডু (ক্যাপ্তেন)	(কট) ম্যাককার্টনি, (বো) অক্সেনহাম	৫
... হোসেন	(ষ্ট্যাম্পড) এলিস, (বো) ম্যাককার্টনি	০
পাতিয়ালার যুবরাজ	(কট) মেয়ার, (বো) ম্যাককার্টনি	১
সি, এস নাইডু	(কট) হেনড্রি, (বো) অক্সেনহাম	০
এ, আজিজ	নট আউট	০
মহম্মদ নিসার	(কট) ও (বো) অক্সেনহাম	০
সাহাবুদ্দিন	(কট) রাইডার, (বো) অক্সেনহাম	০
	অতিরিক্ত	৬
	মোট	৪৮

দ্বিতীয় ইনিংস

(কট) ওয়েণ্ডেল বিল, (বো) লেদার ২
(এল বি,) (বো) লেদার ৬
(বো) লেদার ৩৯
(এল বি,) (বো) অক্সেনহাম ৫
(বো) অক্সেনহাম ১০
(কট) মেয়ার, (বো) ম্যাককার্টনি ৩২
(বো) ম্যাককার্টনি ১২
(বো) লেদার
নট আউট
অতিরিক্ত ১১
মোট ১২৭

দ্বিতীয় টেষ্ট : ব্রায়ান্ট ও ওয়েণ্ডেল বিল।

(নিখিল ভারতীয় দল — দ্বিতীয় ইনিংস, পূর্বোক্ত তালিকার পাশে:)

সি, কে, নাইডু (ক্যাপ্তেন)	নট আউট
... হোসেন	(কট) নিসার, (বো) সি নাইডু
পাতিয়ালার যুবরাজ	(কট) আজিজ, (বো) নিসার

মহারাজা পাতিয়ালা অষ্ট্রেলিয়া দল

প্রথম ইনিংস

ওয়েণ্ডেল বিল	(বো) নিসার	১৬
ব্রায়ান্ট	(কট) আজিজ, (বো) নিসার	২৯
মরিসবি	(কট) সি এস নাইডু, (বো) বাঁকাজিলানী	
রাইডার	(কট) সি, কে, নাইডু (বো) নিসার	
হেনড্রি	(বো) নিসার	
ম্যাককার্টনি	(কট) সি এস নাইডু, (বো) বাঁকাজিলানী	১১
হ্যাগেল	রাণ আউট	০
অক্সেনহাম	(বো) নিসার	২
এলিস	নট আউট	৯
মায়ার	(এল-বি,) (বো) বাঁকাজিলানী	৬
লেদার	(বো) নিসার	০
	অতিরিক্ত	১৫
	মোট	

দ্বিতীয় ইনিংস

নট আউট ১০
অতিরিক্ত ১২
মোট (২ উইকেট) ৪০

ভার্সিটি অকেশনাল বনাম ভাইসরয় টীম

ভার্সিটি বনাম ভাইসরয় টীমের তিন দিন ব্যাপী ক্রিকেট উৎসবে বিখ্যাত খেলোয়াড়রা বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ভার্সিটি দলের ক্যাপ্টেন ছিলেন এ. হোসো এবং অন্য পক্ষে মেজর জোনস্। প্রথম ইনিংসে ভার্সিটি অকেশনাল দল ৪ উইকেটে ৪১৯ রাণ করে ডিক্লেয়ার্ড করেন। ওয়াজির আলি বিপক্ষ দলের সমস্ত আক্রমণ ব্যর্থ করে ২৬৮ রাণ করে এক নতুন কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ইডেন উদ্যানে ম্যাক-বিডি ও টেরাণ্ট ছাড়া এত বেশী রাণ করতে কেউ সক্ষম হন নি। ওয়াজের আলি এই নতুন রেকর্ড করে খেলোয়াড়-মহলে এক চাঞ্চল্য উপস্থিত করেন। বিপক্ষ দলের প্রথম ইনিংসে ২৬৪ রাণের পর অকেশনাল টীমকে 'ফলো' করতে হয়। অদ্বিতীয় অমরনাথ দ্বিতীয় ইনিংসে টিমটীকে বাঁচান। অমরনাথ ১৪৯ রাণে নট-আউট হয়ে থাকেন। খেলার ফলাফল অমীমাংসিত থাকে।

ক্রিকেট (দ্বিতীয় টেষ্ট) : অষ্ট্রেলিয়ান দল।

এলাহাবাদে ইউ-পি দলের বিরুদ্ধে অষ্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে মাত্র ৮৯ রাণ করেন। ভারতের মাটীতে এত অল্প রাণ অষ্ট্রেলিয়ারএই প্রথম। ইউ-পি করেন ১৩৭ রাণ। খেলা ড্র হয়।

কলিকাতায় ইডেন উদ্যানে অষ্ট্রেলিয়ান দল ৯ উইকেটে বাঙ্গলা ও আসাম দলকে পরাজিত করেছেন।

টেনিশ

ইষ্ট ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়ানশিপ

এবার প্রায় ২০০ শত প্রতিযোগী এই বিখ্যাত টুর্ণামেণ্টে যোগ দিয়েছিলেন। একমাত্র মহম্মদ স্লিম ছাড়া ভারতের সব নামজাদা খেলোয়াড়দের সাউথ ক্লাবের উডবার্ণ কোর্টে দেখা গিয়েছিল। সেণ্ট্রাল ইউরোপীয় টীম ও অষ্ট্রীয়ান দলের কাছে দেশের নবীন খেলোয়াড়রা বশ্যতা স্বীকার করলেও নিজেদের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছিল। ৩।৪ বছরের ভিতরই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষিত হয়ে ভারতীয় দল অতি শীঘ্রই ডেভিস কাপ ও ইউরোপীয় অন্য অন্য টুর্ণামেণ্টে ওদেশের যথার্থ প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে গণ্য হবে সন্দেহ নাই। এবার এই প্রতিযোগিতায় প্রথম তিন রাউণ্ড খেলা তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও শেষের দিকে খেলার খুব উঁচু ষ্টাণ্ডার্ড চোখে পড়েছিল। মেঞ্জল, হেক্ট, মেটেক্সা, বরোস্কী প্রভৃতি যোগ দিয়ে টেনিস খেলার এক অপূর্ব্ব ক্রীড়াকৌশল পরিচয় দিয়েছিলেন। কাম্বি জ-রু মদনমোহন, বরোস্কীকে হারিয়ে এক চাঞ্চল্য উপস্থিত করেন, কিন্তু অবশিষ্ট খেলোড়াররা তত উৎসাহ সৃষ্টি করে নি। পর পর পরাজয় স্বীকার করে ভারতের অবশিষ্ট খেলোয়াড়রা বিষণ্ণ মনে বিদায় নিলেন। শেষ পর্য্যন্ত বব ও হেক্টের কাছে পরাজয় স্বীকার করেন। অন্য দিকে মেঞ্জেও প্রতিদ্বন্দ্বী মেটেক্সাকে সেমিফাইনেলে সাক্ষাৎ করেন। সেদিন মেটেক্সা চমৎকার খেলা সত্ত্বেও ভাগ্যদোষে ৬—৩, ৩—৬, ৬—৪, গেমে হেরে যান। মেটেক্সা শেষের দিকে ক্লান্ত ও অধীর না হয়ে পড়লে জয়ী হবার খুব সম্ভাবনা ছিল। ফাইনাল গেমে সেণ্ট্রাল ইউরোপীয় টীমের দুই বীর, মেঞ্জেল ও হেক্টের সাক্ষাৎ হল। অসংখ্য দর্শকের সামনে খেলা

আরম্ভ হয়। দুই ঘণ্টা অবিরাম যুদ্ধের পর হেক্ট (২নং জেকোশ্লোভেকিয়া) অদ্বিতীয় মেঞ্জেলকে (১নং জেকোশ্লোভেকিয়া) ৩—৬, ২—৬, ৬—৩, ৬—১, ৭—৫ গেমে হারিয়ে সকলকে মুগ্ধ করলেও ধীর, সাহসী, উন্নত, নবীন হেক্টের কাছে নিজের দুর্ব্বলতা ধরা দেন। প্রথম ২টী সেট মেঞ্জেল অতি সহজে নেন। মেঞ্জেলের ক্যানন বল সার্ভিস ও ব্যাক-

প্রথম চ্যাম্পিয়ান হলেন। তার আগে ক্যালকাটা চ্যাম্পিয়ান ছিলেন বিখ্যাত কোসে, অষ্টিন কুজিমুরা, ডি. ষ্টিফানি, পালাডা প্রভৃতি খেলোয়াড়রা। মেঞ্জেল নানা প্রকার ক্রীড়ানৈপুণ্য হ্যাণ্ড ড্রাইভকে প্রতিরোধ করতে প্রথমে হেক্ট অসমর্থ হচ্ছিলেন; তৃতীয় সেটের খেলার ফলাফলের উপর তখন দুজনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। মেঞ্জেল অধীর ও চঞ্চল হয়ে উঠলেন, কিন্তু

প্রতিদ্বন্দ্বী হেক্ট তখনও ধীর ও অটল। মনে অপূর্ব্ব সাহস এনে প্রত্যেক বলটি অতি সুন্দর ভাবে খেলে হেক্ট তৃতীয় সেটটি নিলেন। চতুর্থ সেটে মেঞ্জেল যেন ক্রীড়ানৈপুণ্য সব হারিয়ে ফেললেন। পঞ্চম সেটে মেঞ্জেলের চৈতন্য ফিরে এল। নানা রকম ক্রীড়া-পারদর্শিতার পরিচয় দিয়ে মেঞ্জেলের বিপুল চেষ্টা সেদিন হেক্ট ভেঙ্গে চুরে দেন। প্রথম ২টা সেট জিতে অধীর ও ক্লান্ত হয়ে না পড়লেও চ্যাম্পিয়ান পদে মেঞ্জেলকে সে দিন কে আটকায়!

লেডিস সিঙ্গল্‌স ফাইনালে মিসেস বোলাণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বী মিস ওয়েবকে সাক্ষাৎ করেন। কিছুদিন আগে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ানশিপে এই দুই প্রতিযোগিনীর দেখা হয়েছিল। সেবার মিস ওয়েব চ্যাম্পিয়ান হন। এত বড় নিদারুণ পরাজয় মিসেস বোলাণ্ডের জীবনে খুব অল্পই ঘটেছে। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেডি-খেলোয়াড় মিসেস বোলাণ্ড সেই পরাজয়ের এবার প্রতিশোধ নিলেন। মিস ওয়েবকে ৬-১, ৪—৬, ৬—৩ গেমে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হন। প্রথম সেটে মিস ওয়েব একেবারে দাঁড়াতে পারেন নি। দ্বিতীয় সেটে মিসেস বোলাণ্ড ৪—১ গেমে জয়ী হয়েও ক্রমান্বয়ে চমৎকার খেলে মিস ওয়েব উক্ত সেটটি নেন। তৃতীয় সেটে মিসেস বোলাণ্ড আশ্চর্য্যকর ক্রীড়াশক্তির পরিচয় দিয়ে মিস ওয়েবকে একেবারে কাবু করে দেন। এই টুর্ণামেন্টে একটি আশ্চর্য্য ঘটনা যে একমাত্র সিনোরিণা ভেলেরিওর নিকট পরাজয়ের পর আজ পর্য্যন্ত মিসেস বোলাণ্ড চ্যাম্পিয়ান পদে অলঙ্কৃত হয়ে আছেন। এ কম গৌরবের বিষয় নয়। লেডিস্ ডাবলস্ ফাইনালে মিস ওয়েব মিসেস গ্রেহাম ৬—৩, ৩—৬, ৬—৪, গেমে মিসেস বোলাণ্ড ও মিসেস ম্যাকিনাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হন। মিক্সড ডবলস্ প্রতিযোগিতায় ফাইনালে কৃষ্ণস্বামী ও মিসেস বোলাণ্ড অতি সহজে মিস ওয়েব ও ম্যাক ইনিসকে পরাজিত করেন। পুরুষ ডাবলস্ প্রতিযোগিতায় মেঞ্জেল ও হেক্ট ৮-৬, ৪-৬, ৬-৮, ৬-৬, ৬-৮ গেমে মেটেস্কা ও বরোস্কীকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন।

টেনিস্ ইণ্টারন্যাশন্যাল ম্যাচ

এবার ইণ্টারন্যাশন্যাল ম্যাচে ভারতীয় সম্মান রক্ষিত হয়েছে। সর্ব্বশুদ্ধ ৬টী গেম খেলা হয়। গত বৎসর ৫টী গেমেই জুকোশ্লোভেকিয়ার কাছে ভারতীয় অক্ষমতা প্রকাশ হয়। এবার প্রথম ম্যাচে মেটেস্কা ৬—১, ৬—৪ গেমে জে, কাউলকে হারিয়ে দেন। উক্ত খেলাটী তত প্রতিযোগিতা-

টেনিস (মিক্সড ডাবলস্): কৃষ্ণস্বামী, বোলাণ্ড, ওয়েব ও ম্যাক্ ইনিস্।

মূলক হয় নি। দ্বিতীয় ম্যাচ ডি. এন. কাপুর বনাম বরোস্কির খেলা বেশ উৎসাহ সঞ্চার করেছিল। ডি. এন. কাপুর ৩—৬, ৬—৪, ৬—৩ গেমে জয়লাভ করেন। সুখের বিষয় ভারতীয় দল দুইটী ডবলস খেলায় জয়ী হয়েছেন। মদনমোহন মেঞ্জেলের কাছে ১০—৮, ৬—৩ গেমে হার স্বীকার করলেও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, কিন্তু সোহন লাল বনাম হেক্টের খেলা তত চমকপ্রদ হয় নি। সোহন লাল একদিন ভারতের ১নম্বর খেলোয়াড় ছিলেন। আজ সেই উৎকৃষ্ট খেলার মাধুর্য্য সব হারিয়ে বসেছেন। অতি সহজেই হেক্ট

৬—২, ৬—৩ গেমে জয়লাভ করেন। ডবলস্ গেমে ভারতীয় দল সত্যিকার পরিচয় দিলেন। এইচ. সোনী ও মিচেল মোর ১—৬, ৬—২, ৬—৩ গেমে কাউণ্ট বরোস্কী ও মেটেস্কাকে হারিয়ে দেন। দ্বিতীয় ম্যাচে সোহনী ও কৃষ্ণস্বামী বনাম মেঙ্গেল ও হেক্টের খেলা বিশেষ উৎসাহ সৃষ্টি করেছিল। মেঙ্গেল ও হেক্ট বেস্ লাইন হতে খেলার প্রলোভন ত্যাগ না করাতে সোহনী ও কৃষ্ণস্বামী ৬-২, ৩-৬, ৬—২ গেমে হারিয়ে পরাজয়ের গ্লানিতে ভরিয়ে দেন। খেলার শেষে গভর্ণর স্যার জন এণ্ডারসন পারিতোষিক বিতরণ করেন।

উত্তরপাড়া রোইং লীগ

গত ২৪শে ডিসেম্বর বেঙ্গল রোইং এসোসিয়েশনের উদ্যোগে উক্ত লীগের শেষ নৌকার বাইচ প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। চাতরা রোইং ক্লাব (শ্রীরামপুর) হাফ লেংথে লক্ষ্মীনারায়ণ রোইং ক্লাবকে (উত্তরপাড়া) পরাজিত করে লীগ চ্যাম্পিয়ান হলেন। এই লীগ প্রতিযোগিতায় চাতরা রোইং ক্লাব কারও নিকট পরাজিত হননি এবং তাঁদের টাইম রেকর্ড (২ মিনিট ৩২ সেঃ) সকলের অপেক্ষা উত্তম। লীগের শেষ খেলা দেখবার জন্য হুগলী নদীর উভয় তীরে প্রায় ৩।৪ হাজার দর্শকের সমাগম হয়েছিল।

লীগের ফলাফল

দল	খেলা	জয়	পরাঃ	পয়েণ্ট
চাতরা (শ্রীরামপুর)	৬	৬	০	১২
উত্তর পাড়া	৬	৫	১	১০
বরাহনগর	৬	৪	২	৮
বেণিয়াটোলা	৬	৩	৩	৬
এড়িয়াদহ	৬	২	৪	৪
বালী	৬	১	৫	২
আগড়পাড়া	৬	০	৬	০

১০ মাইল ভ্রমণ-প্রতিযোগিতা

শিশিরকুমার ইনষ্টিটিউটের উদ্যোগে উক্ত ক্লাবের চতুর্থ বার্ষিক ১০ মাইল ভ্রমণ প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। প্রায় ৩৪ জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিলেন। অলিম্পিকের অধিকাংশ সদস্য এই প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন। মিঃ শচীন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি ষ্টার্টারের কার্য্য করেন।

প্রতিযোগিতার কয়েকটী ফল

১ম—কানাইলাল নাথ (গরিফা গোবিন্দ ক্লাব)
সময় এক ঘণ্টা ২৩ মিনিট

২য়—নীলরতন মুখোপাধ্যায় (কপিবাগান ক্লাব)

৩য়—হিরণ্ময় ভট্টাচার্য্য (প্যারাগণ ক্লাব)

৩০ মাইল ভ্রমণ-প্রতিযোগিতা

গত ২৯শে ডিসেম্বর টেমার্স লেন টুরিষ্ট ক্লাবের উদ্যোগে ৭ম বাৎসরিক ভ্রমণ প্রতিযোগিতা সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হয়েছে। মোট ২৪ জন প্রতিযোগী ভোর ৬টা ৪৯ মিনিটের সময় হুগলী হতে রওনা হন। শ্রীমান ভোলানাথ পাল ১২টা ৩ মিনিটে পৌছান।

অত বড় দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে শ্রীমান ভোলানাথ কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ করেন নি। ২৪ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ১৮ জন ৬ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট ১৫ সেকেণ্ডে ৩০ মাইল হেঁটে আসতে সক্ষম হন। ১৫ বছর বয়স্ক ভোলানাথ উক্ত দূর পথটি মাত্র ৫ ঘণ্টা ১৪ মিনিটে অতিক্রম করেছিলেন।

প্রতিযোগিতার কয়েকটি ফলাফল

১ম—ভোলানাথ পাল
সময়—৫ ঘণ্টা ১৪ মিনিট

২য়—পি, এল, চিত্রকর
সময়—৫ ঘণ্টা ২৮ মিনিট

৩য়—এন, কে, চাটার্জ্জি
সময়—৫ ঘণ্টা ৩২ মিনিট

ক্রীড়াজগতের খবর

নবাব পাটুয়াণ্ডি ভারতীয় ক্রিকেট দলের ক্যাপ্তেন নিযুক্ত হয়েছিলেন। ইনি এখনও অসুস্থ। সেই জন্যে বেঙ্গল এসোসিয়েসন তাঁর পরিবর্ত্তে বিলেতে খেলবার জন্যে ভারতীয় দলে যথার্থ উপযুক্ত অন্য একজন খেলোয়াড় নির্ব্বাচিত করবার উদ্দেশ্যে ক্রিকেট বোর্ডের নিকট এক প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন। আশা করি, ক্যাপ্তেন নাইডু উক্ত পদে নির্ব্বাচিত হবেন।*

* ব্লকগুলি অমৃতবাজার পত্রিকা ও এড্ভান্সের সৌজন্যে প্রাপ্ত।—লেখক।
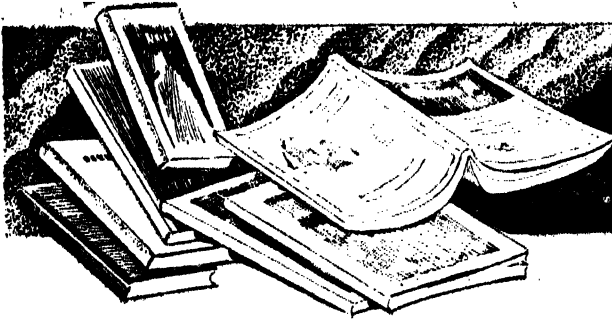
"এটিকেট্ বা শিষ্টাচার"—শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ কাব্য সাংখ্যতীর্থ প্রণীত। মূল্য চারি আনা। ৮৩।এ দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অধুনা যুবকদিগের মধ্যে শিষ্টাচার রক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট ঔদাসীন্য দেখা যায় সুতরাং এরূপ পুস্তকের আবশ্যকতা যে নাই এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু শিষ্টাচার সম্বন্ধে শিক্ষা লোকে সাধারণতঃ পুস্তক হইতে গ্রহণ করে না। এবম্বিধ বিষয়ের পুস্তক অধ্যয়ন করিলেও কার্য্যকালে তাহা ফলোৎপাদক হয় না। এ সম্বন্ধে শিক্ষা বাল্যকাল হইতে প্রদত্ত না হইলে উহা মনোমধ্যে উপযুক্ত স্থান পায় না। এই জন্য মনে হয় এই পুস্তক পিতামাতা বা অভিভাবকদের পক্ষে পাঠ করা আবশ্যক এবং শৈশব হইতে সন্তান-সন্ততি বা পোষ্যবর্গকে এ সম্বন্ধে শিক্ষাদান করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। অধুনা যুবজন-সমাজে যে উচ্ছৃঙ্খলতার লক্ষণসমূহ প্রকটিত হইতেছে, তাহার একমাত্র কারণ সন্তানের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের (পিতামাতা বা অভিভাবক বর্গের) ঔদাসীন্য। গ্রন্থকার এই বিষয়ে অনেক উপদেশ দিয়াছেন। সমস্ত যথাক্রমে পালিত হইলে আমাদের সামাজিক জীবন যথেষ্ট সংযত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়া সম্ভব, কিন্তু ঐ সমস্ত পালিত হওয়া সম্বন্ধে আমরা একেবারে নিঃসন্দেহ নহি। যাহা হউক, এই পুস্তকপাঠে আমাদের সমাজ কথঞ্চিৎ উপকৃত হইলে আমরা পরম সন্তোষলাভ করিব। গ্রন্থকারের লিখনভঙ্গী চিত্তাকর্ষক নহে। ভাষাও পণ্ডিতজনোচিত নহে, কারণ বহুস্থলে শুদ্ধ ও কথ্য ভাষার অবাধ সংমিশ্রণ দেখা যায়। এবং গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়গুলিকে তিনি সম্পূর্ণরূপে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া পরম্পরাক্রমে সুসজ্জিত করিতে পারেন নাই। তথাপি আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

হোমানল—উপন্যাস। শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় মূল্য ১৲ টাকা, প্রকাশক ফাইন আর্ট পাব্লিশিং হাউস, ৬০নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পল্লীগ্রামের একটি সাধারণ ঘটনা অবলম্বনে বিরচিত। উপন্যাসখানি সুখপাঠ্য। শৈলজাবাবুর ভাষা বেশ পরিষ্কার ও ছন্দ সাবলীল, সুতরাং সাধারণ পাঠকের পক্ষে উহা আদরণীয় হইবে। তবে চরিত্রচিত্রণ বা মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া ইহার বিশিষ্টতা কিছু নাই। গ্রন্থের আকার হিসাবে মূল্য অধিক বলিয়া বোধ হয়।

বিয়োগান্ত—ছোট গল্পের বহি। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা। ফাইন আর্ট পাব্লিশিং হাউস, ৬০ নং বিডন ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

নয়টী ছোট গল্পের সমাবেশে পুস্তকখানি গ্রথিত। কয়েকটী গল্প বিদেশী গল্প অবলম্বনে বিরচিত। অমরেন্দ্র বাবুর ছোট গল্পের হাত ভাল, ভাষাও অতি-আধুনিকতা দোষে ভারাক্রান্ত নহে, মোটের উপর সুপাঠ্য বলা চলে। কিন্তু বাঙ্গলা দেশের পাঠকদিগের পকেটের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পুস্তকের মূল্য নির্দ্ধারণ না করিলে এ শ্রেণীর পুস্তকের বিক্রয়-সম্ভাবনা সুদূরপরাহত বলিয়াই মনে হয়। প্রকাশকগণের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য।

তুষার-তীর্থ (অমরনাথ)—সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী—শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

ভ্রমণ-কাহিনীতে আজ বঙ্গ-সাহিত্য পরিপ্লাবিত বলিলেও চলে, কিন্তু প্রায় সবগুলিই একই ছাঁদে গড়া। বৈচিত্র্য বা নূতনত্ব বড়ই অল্প। সুতরাং এই একঘেয়েমীর দিনে ভ্রমণ ব্যাপারে লেখক যেটুকু নূতনত্ব আনিতে পারিয়াছেন, তাহাই লাভ মনে করি। ভ্রমণ-কাহিনীর মূল্য তন্মধ্যে সংগৃহীত তথ্যাবলীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে এবং তথ্যহীন কাহিনীগুলি সুখপাঠ্য হইলেও একান্ত মূল্যহীন বলিয়া বিবেচিত হইবে। নিত্যনারায়ণ বাবু স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে এমন সব অভিনব তথ্য ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, যাহা ভবিষ্যতের যাত্রিগণকে যথার্থ সাহায্যদানে সক্ষম হইবে।

নিত্যনারায়ণ বাবুর ভাষা সবল ও গতিশীল; বর্ণনাভঙ্গী সাবলীল এবং সর্ব্বত্রই একটা স্বচ্ছন্দতা বিরাজিত। ছবিগুলি মামুলী Picture post card-এর reprint নহে। লেখক কর্ত্তৃক গৃহীত বলিয়াই মনে হয়। প্রচ্ছদপটখানিও সুন্দর। আমাদের মনে হয়, তিনি আর একটু শ্রম স্বীকার করিলে ভ্রমণ-সাহিত্যের আরও উন্নতিবিধানে সমর্থ হইবেন। তাঁহার ন্যায় তরুণ উৎসাহী লেখকের নিকট আমরা আরও অনেক কিছু আশা করি।

সাত সাগরের পারে—মূল্য দুই টাকা। লেখিকা কুমারী অমলা নন্দী।

বার বছর বয়সের একটী বাঙ্গালী বালিকা সমগ্র ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া আসিয়া এই বইখানি লিখিয়াছেন। লেখিকা অন্য ক্ষেত্রে অল্প বয়সে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাই তাঁহার সাহিত্য-প্রচেষ্টার ফল এই গ্রন্থখানি আমরা আগ্রহের সহিত পাঠ করিতে আরম্ভ করি। বইখানি একনিঃশ্বাসে পাঠ করিয়াছি এবং প্রীতিলাভ করিয়াছি। মেয়েটি কোথাও বিদ্যা ফলাইবার চেষ্টা করেন নাই এবং যে কিশোরীর মনে, কিশোর চোখে পৃথিবী দেখিয়াছেন, সেইরূপ কিশোর-সরল ভাবেই তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার এই অনাড়ম্বর ভাষাটি আমাদিগকে আনন্দ দিয়াছে; ভাষাটি ঝরঝরে, শব্দ-বিন্যাসে দক্ষতাও প্রশংসনীয়। বইখানি বাঙ্গালী মেয়েদের নিকট সমাদর লাভ করিবেই, তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই এবং আমাদের বিশ্বাস শুধু মেয়েরা নয়, পুরুষরাও বইখানি পড়িয়া খুসী হইবেন। লেখিকাকে আমরা আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতেছি, তাঁহার সাহিত্য-সাধনা জয়যুক্ত হইবে।

—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

[সম্পাদকদ্বয়ের সম্মতিক্রমে শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক লিখিত]

জনসংখ্যা, জন্মনিরোধ ও মানুষের অবস্থা

(ম্যালথাসের Essay on Population নামক গ্রন্থের মূল বক্তব্যের প্রতিবাদ)

অধুনা জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই একদিকে মানুষের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে এবং অন্যদিকে মানুষের আর্থিক অবস্থাও ক্রমশঃ খারাপ হইয়া পড়িতেছে। যুগপৎ এই দুইটী ঘটনা ঘটিতেছে বলিয়া অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ প্রতিপন্ন করেন যে, লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হওয়ায় মানুষের আর্থিক দুরবস্থা ঘটিতেছে এবং তাহার অপনোদন করিবার উপায়—লোকসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ। কি করিয়া লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে বটে, কিন্তু লোকসংখ্যা যাহাতে বাড়িয়া না যায়, তাহার দিকে যে চেষ্টা করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই।

আমাদের এই প্রবন্ধের বিচার্য্য বিষয় চারিটী, যথা :—

(১) লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেই মানুষের দুরবস্থার উদ্ভব হয় কি না?

(২) লোকসংখ্যা কমাইতে পারিলেই মানুষের দুরবস্থার অপনোদন হয় কি না?

(৩) লোকসংখ্যার বৃদ্ধির জন্য যদি দুরবস্থার উদ্ভব না হয়, তাহা হইলে কি কি কারণে মানুষ দুরবস্থাপন্ন হইয়া থাকে?

(৪) কি করিলে মানুষের দুরবস্থা দূর হইতে পারে?

উপরোক্ত বিষয় কয়টী বিচার করিবার জন্য আমরা আমাদিগের পাঠকদিগকে স্ব স্ব সংসারের অবস্থা এবং তাঁহাদের আত্মীয় ও বন্ধুবর্গের সংসারের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে অনুরোধ করি।

যাঁহাদের অবস্থা সম্যক্ ভাবে আমাদের জানা আছে, তাঁহাদের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে—যে সংসারে উপার্জ্জকের সংখ্যার তুলনায় নির্ভরশীল পোষ্যবর্গের সংখ্যা যত কম এবং মোট উপার্জ্জনের পরিমাণ যত বেশী, সেই সংসারের আর্থিক অবস্থা তত ভাল।

উপরোক্ত সত্যটি বিশ্লেষণ করিলে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন সংসারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইলে, প্রথমতঃ, সংসারে উপার্জ্জকের সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহার ব্যবস্থা, দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক উপার্জ্জকের উপার্জ্জনের পরিমাণ এবং মোট উপার্জ্জনের পরিমাণ যাহাতে বাড়িয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা এবং তৃতীয়তঃ, নির্ভরশীল পোষ্যবর্গের সংখ্যা যাহাতে কমিয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ হইতেই প্রতিপন্ন হয় যে, সংসারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইলে নির্ভরশীল পোষ্যবর্গের সংখ্যা যাহাতে কমিয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু সমস্ত শ্রেণীর লোকের সংখ্যা হ্রাস হইলে সংসারের আর্থিক উন্নতি হয় না, কারণ উপার্জ্জকের সংখ্যা এবং উপার্জ্জনের পরিমাণের বৃদ্ধি সংসারের আর্থিক উন্নতির জন্য একান্ত আবশ্যক।

ইহার পর যদি আবার বিচার করা যায় যে, সংসারের মধ্যে কে কে নির্ভরশীল পোষ্য হইয়া থাকেন, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, নির্ভরশীল পোষ্যের সংখ্যা কমিয়া গেলেও সংসারের উন্নতির সম্ভাবনা কমিয়া যায়।

সংসারে সাধারণতঃ নির্ভরশীল পোষ্য হইয়া থাকে তিন শ্রেণীর, যথা :—

(১) অল্পবয়স্ক শিশুগণ ;
(২) কার্য্যক্ষমতাবিহীন যুবকগণ ;
(৩) রুগ্ন, পঙ্গু এবং কার্য্যক্ষমতাবিহীন জরাগ্রস্ত বৃদ্ধগণ।

যাহাতে মনুষ্যের কার্য্যক্ষমতা রক্ষিত হয় এবং ক্রমশঃ তাহার উন্নতি হয়, তদ্বিষয়ক ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে ঐ তিন শ্রেণীর নির্ভরশীল পোষ্যগণও উপার্জ্জকরূপে পরিণত হইতে পারেন।

অল্পবয়স্ক শিশুগণই কালে উপার্জ্জক হইয়া থাকে। কার্য্যক্ষমতাবিহীন যুবকগণকে কার্য্যক্ষম করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে তাহারাও উপার্জ্জক হয়। যাঁহারা রুগ্ন এবং পঙ্গু তাঁহারা যাহাতে রুগ্ন এবং পঙ্গু না হন, অথবা কেহ রুগ্ন এবং পঙ্গু হইয়া গেলে যাহাতে তাঁহাদের রোগ এবং পঙ্গুতা আরোগ্য লাভ করে, তাহার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিলে রুগ্ন এবং পঙ্গুগণও উপার্জ্জক হইতে পারেন। বৃদ্ধ হইলেও যাহাতে কার্য্যক্ষমতা নষ্ট না হইয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে বৃদ্ধগণের দ্বারাও উপার্জ্জন সম্ভব হইতে পারে।

কাযেই দেখা যাইতেছে যে, কোন সংসারে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি পাইলেই আর্থিক দুরবস্থার উদ্ভব হয় না এবং লোকসংখ্যা কমিয়া গেলে আর্থিক দুরবস্থার অপনোদন হওয়া ত দূরের কথা, তাহা বৃদ্ধি পাইবারই সম্ভাবনা ঘটে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, কোন সংসারে শিশুর সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইলে সেই সংসারের আর্থিক দুরবস্থা অনিবার্য্য। কিন্তু ইহাও সত্য নহে। বাস্তব জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, যাঁহারা হস্তপদাদির শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, অথবা যাঁহারা শ্রমজীবী, তাঁহাদের জননশক্তি অপেক্ষাকৃত কম এবং তাঁহাদের সন্তানের সংখ্যাও প্রায়শঃ অপেক্ষাকৃত কম হইয়া থাকে। যাহারা হস্তপদাদির শারীরিক শ্রমের উপর নির্ভর না করিয়া মস্তিষ্কের শ্রমের দ্বারা অথবা মূলধনের সুদের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, অথবা আলস্যে সময়াতিবাহিত করেন, তাঁহাদের জননশক্তি অপেক্ষাকৃত বেশী এবং তাঁহাদের সন্তানের সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়া থাকে। কোন্ কোন্ কারণে শ্রমজীবীদিগের জননশক্তি কম হয় এবং মস্তিষ্কজীবীদিগের জননশক্তি বাড়িয়া যায়, তাহা শরীরবিধান বিদ্যার (Physiology) অন্তর্গত। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য শরীরবিধান বিদ্যা অতীব অসম্পূর্ণ এবং ভ্রমাত্মক এবং তাহাতে ঐ কারণগুলি লেখা নাই বটে, কিন্তু শ্রমজীবিগণের জননশক্তি যে কম এবং মস্তিষ্কজীবিগণের জননশক্তি যে বেশী, তাহা বাস্তব সত্য এবং বাস্তব অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে ঐ সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায়। কোন কোন পাশ্চাত্য গ্রন্থকার এই সত্যের বিরুদ্ধে কথা কহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের কথায় অবিচারিতভাবে বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া স্ব স্ব পরিচিত বিভিন্ন লোকের সন্তানসংখ্যা পর্য্যালোচনা করিলে আমার কথার সত্যতা উপলব্ধ হইবে। যে স্থানে এই নিয়মের ব্যতিচার দেখা যাইবে, সেইস্থানে অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, হয় কৃত্রিম জন্ম-নিরোধের পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে, নতুবা জনন-শক্তি-হানিকর অনাচার ঘটিয়াছে। ভারতীয় ঋষিগণ এই সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু যে ভাষায় ঐ আলোচনাগুলি লিখিত আছে, তাহা বর্ত্তমানে পণ্ডিতগণের অপরিজ্ঞাত বলিয়া ঐ তথ্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

শ্রমজীবিগণের উপার্জ্জন যেরূপ সীমাবদ্ধ, প্রকৃত বুদ্ধিজীবিগণের উপার্জ্জন সেইরূপ সীমাবদ্ধ হইতে পারে না। কাযেই শ্রমজীবিগণের অত্যধিক সংখ্যায় সন্তান হইলে তাহাদের বিপন্ন হইতে হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত বুদ্ধিজীবীদিগের সন্তানের সংখ্যা বেশী হইলেও তাঁহাদের বিপন্ন হইতে হয় না। প্রকৃতভাবে বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিলে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত কার্য্যক্ষমতার উন্নতি সাধিত হইতে পারে এবং উপার্জ্জনের পরিমাণের বৃদ্ধিও সম্ভব হয়। কাযেই যাঁহারা প্রকৃত ভাবে বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিয়া মস্তিষ্কজীবী হইতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও তাঁহাদিগকে বিপন্ন হইতে হয় না। যাঁহারা প্রকৃতভাবে বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন না করিয়া ভাগ্যক্রমে বুদ্ধিজীবী হইয়া পড়েন, তাঁহাদের সন্তানের সংখ্যা বেশী হইলে বিপন্ন হওয়া অনিবার্য্য। কাযেই বলা যাইতে পারে যে, প্রাকৃতিক নিয়মে যে-বুদ্ধিজীবীদিগের সন্তানের সংখ্যা বেশী হইয়া থাকে, সেই বুদ্ধিজীবীদিগের সংসারে শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেই যে বিপন্ন হইতে হয়, তাহা নহে; পরন্তু প্রকৃতভাবে বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন না করিয়া বুদ্ধিজীবী হইলে অথবা আলস্যে সময় কাটাইলে এবং সন্তানের সংখ্যা বেশী হইলে বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা ঘটে।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহাতে দেখা যায় যে, সংসারে আর্থিক দুরবস্থার উদ্ভব হইবার সাধারণ কারণ ছয়টী, যথা :—

(১) নির্ভরশীল পোষ্যের সংখ্যার বৃদ্ধি ;
(২) পোষ্যবর্গের প্রকৃত কার্য্যক্ষমতার অভাব ;
(৩) পরিজনবর্গের অস্বাস্থ্য ;

(৪) পরিজনবর্গের অকালবার্দ্ধক্য এবং তজ্জনিত কর্ম্মক্ষমতার হ্রাস ;

(৫) প্রকৃত ভাবে বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন না করিয়া মস্তিষ্কজীবী হওয়া এবং আলস্য ;

(৬) কার্য্যক্ষম ব্যক্তিগণের কর্ম্মস্থলের অভাব।

প্রকৃত কার্য্যক্ষমতা বলিতে কি বুঝায়, তাহা আমরা এই প্রবন্ধের শেষ ভাগে আলোচনা করিব।

যাহা এক একটী সংসারের পক্ষে সত্য, তাহা সারা দেশের পক্ষেও সত্য, কারণ কতকগুলি সংসারের সমষ্টিকে দেশ বলা হইয়া থাকে।

কাযেই বলা যাইতে পারে যে, কোন দেশে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি পাইলেই সেই দেশে মানুষের দুরবস্থার উদ্ভব হয় না এবং লোকসংখ্যা কমিয়া গেলেই দুরবস্থা দূর হয় না। পরন্তু লোকসংখ্যার বৃদ্ধিসাধন দেশের দুরবস্থা অপনোদন করিবার অন্যতম পন্থা। যে যে কারণে দুরবস্থার উদ্ভব হয়, তাহাও পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে।

দেশের দুরবস্থা দূর করিবার উপায় পনেরটী ; যথা—

(১) যাহাতে ১৮ বৎসরের মধ্যে বালকগণের দশটী ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি কার্য্যক্ষম হয় এবং ঐ বয়সে যাহাতে তাহারা উপার্জ্জনক্ষম হয়, তদনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা ;

(২) কোন্ খাদ্য, পানীয়, বায়ু, বাসস্থান এবং ব্যবহার্য্য বস্তু স্বাস্থ্যপ্রদ অথবা অস্বাস্থ্যপ্রদ, তাহা যাহাতে বালকগণ ১৮ বৎসরের মধ্যে পরিজ্ঞাত হইতে পারে এবং যাহাতে তাহাদের পরমায়ুবৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য থাকে, তদনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা ;

(৩) বালকগণের যাহাতে ১৮ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে বিবাহ হয়, তাহার ব্যবস্থা ;

(৪) প্রকৃত ভাবে বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন যাঁহারা না করিতে পারেন, তাঁহারা যাহাতে হস্তপদাদির শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা অথবা শ্রমজীবী হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তাহার ব্যবস্থা ;

(৫) প্রকৃত ভাবে বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন যাঁহারা না করিতে পারেন, তাঁহারা যাহাতে মস্তিষ্কজীবী না হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা ;

(৬) কোন প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোক যাহাতে স্বামী ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের সহিত অথবা কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ যাহাতে স্বীয় স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীলোকের সহিত অবাধে মেলামেশা না করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা ;

(৭) প্রত্যেক স্ত্রীলোক যাহাতে সংসারের কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং কোন উপার্জ্জনের কার্য্যে প্রবৃত্ত না হন, তাহার ব্যবস্থা ;

(৮) শ্রমজীবিগণ যাহাতে ১৮ বৎসর বয়সে উপার্জ্জন করিবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা ;

(৯) দেশের জল ও বায়ু যাহাতে কোনরূপ বিকৃত না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ;

(১০) দেশের মধ্যে যাহাতে মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৩০ জনের বেশী শিল্প, বাণিজ্য, ওকালতী, ডাক্তারী প্রভৃতি ব্যবসায়, শিক্ষকতা ও সরকারী চাকুরীর উপর নির্ভরশীল না হয়, তাহার ব্যবস্থা এবং যাহাতে কৃষি লাভবান্ হয়, তাহার ব্যবস্থা ;

(১১) জমীর স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া যাহাতে কোনরূপ সার ব্যবহার না করিলেও প্রতি বিঘা জমী হইতে অন্ততঃ ১২ মণ ধান অথবা গম অথবা তন্মূল্যের অপর কোন শস্যের উৎপাদন হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ;

(১২) যে জমীর স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তি প্রতি বিঘায় ৪ মণ ধান অথবা গম অথবা তন্মূল্যেরও কম, সেই জমী যাহাতে কোন কৃষক চাষ না করেন এবং তাহার উৎপাদিকা-শক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তদনুরূপ ব্যবস্থা ;

(১৩) নদীগুলি যাহাতে এত গভীর হয় যে, বর্ষাকালে বৃষ্টির পরিমাণ যতই বেশী হউক না কেন, তাহার দুই পার প্লাবিত হইবার কোন সম্ভাবনা যাহাতে না থাকে, তাহার ব্যবস্থা ;

(১৪) বিভিন্ন খাদ্যশস্য, শিল্পজাত ব্যবহার্য্য জিনিষ এবং গৃহনির্ম্মাণের উপকরণের বিভিন্ন মূল্যের মধ্যে যাহাতে সাদৃশ্য (parity) থাকে, তাহার ব্যবস্থা ;

(১৫) সাংসারিক জীবিকানির্ব্বাহের খরচ ও পারিশ্রমিকের মধ্যে যাহাতে সাদৃশ্য (parity) থাকে, তাহার ব্যবস্থা।

কোন দেশের গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিলে উপরোক্ত পনেরটী ব্যবস্থার কোনটীই অসাধ্য নহে। একাদশ দফায় জমীর স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা আপাতদৃষ্টিতে অসাধ্য বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু পাঠকগণ গত অগ্রহায়ণ (১৩৪২) 'সংখ্যার বঙ্গশ্রীতে প্রকাশিত "ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহার পূরণের উপায়" শীর্ষক প্রবন্ধে জমীর উৎপাদিকা শক্তি কাহাকে বলে এবং তৎসম্বন্ধে প্রকৃতির নিয়ম কি, তাহা পড়িলে জানিতে পারিবেন যে, উহাও অসাধ্য নহে। যদি প্রতিপন্ন হয় যে, এই পনেরটী ব্যবস্থার দ্বারাই যে কোন দেশের দুরবস্থা অপনোদন করা সম্ভব, তাহা হইলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি যে, কোন দেশের দুরবস্থার কারণ, তাহা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত ভাবে বলা চলে না।

যে কোন দেশের দুরবস্থা যে উপরোক্ত পনেরটী ব্যবস্থার দ্বারা অপনোদিত হইতে পারে, আমরা এক্ষণে তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিব।

কি কারণে সংসারে দুরবস্থার উদ্ভব হয়, তৎপ্রসঙ্গে আমরা দেখাইয়াছি যে, সাংসারিক দুরবস্থার কারণ ছয়টী। যে ব্যবস্থা করিলে সাংসারিক দুরবস্থার ঐ ছয়টী কারণ দূরীভূত হইতে পারে, সেই ব্যবস্থাগুলিকে সংসারের দুরবস্থা অপনোদন করিবার ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে।

ঐ ছয়টী কারণের মধ্যে প্রথম চারিটীর নাম :—

(১) নির্ভরশীল পোষ্যের সংখ্যার বৃদ্ধি;

(২) পোষ্যবর্গের প্রকৃত কার্য্যক্ষমতার অভাব;

(৩) পরিজনবর্গের অস্বাস্থ্য;

(৪) পরিজনবর্গের অকালবার্দ্ধক্য এবং তজ্জনিত কর্ম্মক্ষমতার হ্রাস।

যাহাতে নির্ভরশীল পোষ্যবর্গ যথাসম্ভব কম বয়সে প্রকৃত কার্য্যক্ষম ও উপার্জ্জনক্ষম হইতে পারেন এবং দীর্ঘ বয়স পর্য্যন্ত স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে ঐ চারিটী কারণ অপনোদন করা সম্ভব হইতে পারে।

কাযেই আমাদিগকে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে, প্রকৃত কার্য্যক্ষমতা কাহাকে বলে, কোন্ সর্ব্বনিম্ন বয়সে উপার্জ্জনক্ষম হওয়া সম্ভব এবং কি করিলে উত্তরোত্তর তাহার বৃদ্ধি সম্ভাবিত হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে যে, কি কারণে মানুষের স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া অকালবার্দ্ধক্যের উদ্ভব হয় এবং কি করিলে দীর্ঘ বয়স পর্য্যন্ত স্বাস্থ্য বজায় রাখা সম্ভব হইতে পারে।

প্রকৃত কার্য্যক্ষমতা কাহাকে বলে এবং কি করিলে সর্ব্বনিম্ন বয়সে কার্য্যক্ষম হওয়া সম্ভব, তাহার বিশ্লেষণ করিতে হইলে মনুষ্যপ্রকৃতি সম্বন্ধে দুই একটী কথা জানিতে হইবে।

মনুষ্য-প্রকৃতির মূল অঙ্গ যে মানুষের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি, তাহা আমরা আমাদিগের নিজেদের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারি। যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সমান ভাবে কার্য্যক্ষম থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা সবল, সুস্থ ও জীবিত। তাহার একটীরও কার্য্যক্ষমতা আংশিক ভাবে হারাইলে আমরা অসুস্থ, আর যখন সমস্ত কয়টী কার্য্যক্ষমতা হারায়, তখন আমরা নিস্পন্দ, অসাড় এবং মৃত।

কাজেই মানুষের "কার্য্যক্ষমতা" বলিতে বুঝায় তাহার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির কার্য্যক্ষমতা। ইন্দ্রিয়ের কার্য্যক্ষমতা না হইলে মনের কার্য্যক্ষমতা হয় না এবং ইন্দ্রিয় ও মন উভয়ের কার্য্যক্ষমতা না হইলে বুদ্ধির কার্য্যক্ষমতা হয় না। যাঁহার ইন্দ্রিয় ও মন যত কার্য্যপটু, তিনি ততই বুদ্ধিমান্ এবং যিনি যত বুদ্ধিমান, তিনি তত কার্য্যক্ষম।

মানুষের স্বীয় প্রকৃতি হইতেই ইন্দ্রিয় ও মনের কথঞ্চিৎ বিকাশ সাধিত হইয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয় ও মনের বিকাশ হইলেই বুদ্ধিরও কথঞ্চিৎ বিকাশ হয়। প্রকৃতিবশে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির কথঞ্চিৎ বিকাশ হয় বটে, কিন্তু "প্রযত্ন" না করিলে মানুষের ইন্দ্রিয়, মন, ও বুদ্ধি সম্যক্ বিকশিত হয় না। মনুষ্য-প্রকৃতির দিকে নজর করিলে আরও দেখা যাইবে যে, প্রযত্ন করিলে মানুষের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির উন্নতি অপেক্ষাকৃত ভাবে সাধন করা সম্ভব বটে, কিন্তু প্রকৃতিবশে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির যথোপযুক্ত বিকাশ সাধিত না হইলে কেবল মাত্র প্রযত্ন দ্বারা তাহার সম্যক্ বিকাশ সাধন করা সম্ভব হয় না।

কাযেই মানুষের কার্য্যক্ষম হইতে হইলে প্রথমতঃ প্রয়োজন হয় দুইটী বস্তু, যথা :—

(১) প্রকৃতিবশতঃ যাহাতে মানুষের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি যথোপযুক্ত ভাবে ও পরিমাণে বিকশিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ;

(২) মানুষের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির প্রাকৃতিক বিকাশ কথঞ্চিৎ পরিমাণে সাধিত হইলে যে "প্রযত্নে"র দ্বারা তাহার সম্যক্ বিকাশ সাধন করা সম্ভব, মানুষ যাহাতে সেই "প্রযত্ন" অভ্যাস করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা।

মানুষ যে বায়ু ও জল গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করে, সেই বায়ু ও জল যাহাতে বিকৃত না হইয়া বিশুদ্ধ থাকে, তাহার ব্যবস্থার দিকে নজর করিলে, মানুষের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির প্রাকৃতিক বিকাশের সহায়তা করা হয়। বায়ু ও জল কোন রূপে বিকৃত হইলে মানুষের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির যথোপযুক্ত প্রাকৃতিক বিকাশ সম্ভব হয় না এবং তাহার যথোপযুক্ত প্রাকৃতিক বিকাশ সাধিত না হইলে মানুষের আয়ত্তাধীন এমন কোন উপায় নাই, যদ্দারা ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সম্যক্ বিকাশ সাধন করা সম্ভব হইতে পারে।

যে প্রযত্নের দ্বারা মানুষের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সম্যক্ বিকাশ সাধন করা সম্ভব হয়, তাহাকে আমাদের বর্ত্তমান প্রচলিত ভাষায় "শিক্ষা" বলা যাইতে পারে।*

দেশের জল ও বায়ু বিশুদ্ধ রাখিতে পারিলে মানুষের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির স্বাভাবিক বিকাশের সহায়তা করা হয় এবং যথোপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলেও তাহার সম্যক্ বিকাশও সম্ভব হইতে পারে বটে, কিন্তু শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই তাহার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির যথোপযুক্ত পরিমাণে বিকাশ হওয়া সম্ভব হয় না।

মানুষের শৈশব, কৈশোর এবং যৌবন-প্রকৃতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, যতই চেষ্টা করা যাক না কেন, বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি এবং চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি সাধারণতঃ আঠার বৎসর বয়সের আগে বিশ্বাসযোগ্য ভাবে কার্য্যক্ষম হইবার উপযোগী বিকাশ লাভ করে না এবং যতই বয়সের বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির কার্য্যক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং যিনি যত বেশী বয়স পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারেন, তিনি তত বেশী তাঁহার কার্য্যক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন।

যত বেশী বয়স পর্য্যন্ত মানুষ জীবিত থাকিতে পারে, সাধারণতঃ তত বেশী কার্য্যক্ষমতা লাভ করিবার সুযোগ তাহার হয় বটে, কিন্তু কি করিয়া কার্য্যক্ষমতা বজায় রাখিতে হয়, তাহার শিক্ষা ও অভ্যাস জানা না থাকিলে এবং তাহার ব্যভিচার করিলে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যক্ষমতা নষ্ট হইতে পারে।

কাযেই দেখা যাইতেছে যে, মানুষের কার্য্যক্ষম হইতে হইলে এবং উপার্জ্জনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে, প্রথমতঃ, বিশুদ্ধ জল ও বায়ু এবং যথোপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন এবং দ্বিতীয়তঃ, মানুষ যাহাতে স্বাস্থ্য বজায় রাখিবার পদ্ধতিগুলি পরিজ্ঞাত হয় এবং তাহার ব্যভিচার না করে, তদনুরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন। ইহাও দেখা যাইতেছে যে, সাধারণতঃ আঠার বৎসর বয়সে পদার্পণ করিবার আগে তাহার বিশ্বাসযোগ্য কার্য্য-ক্ষমতার উদ্ভব হয় না।

যাহাতে কোনরূপ স্বাস্থ্যের হানি হইতে পারে, তাহা করিবার প্রবৃত্তি যাহাতে মানুষের না হয়, তাহা করিতে হইলে বালকগণের প্রাপ্তবয়স্ক হইবামাত্র বিবাহ দেওয়া এবং স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মিলন যাহাতে না হয়, তাহা করা একান্ত প্রয়োজনীয়। শুক্রহানি যে স্বাস্থ্যনষ্টের এবং অকাল-বার্দ্ধক্যের সর্ব্বাপেক্ষা বড় কারণ এবং ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির জন্য যে উপায় সমাজানুমোদিত, তাহা অবলম্বন করিলে যে পরিমাণ শুক্রক্ষয় হয়, তদপেক্ষা অনেক গুণ বেশী শুক্রক্ষয় যে সমাজ-বিরুদ্ধ উপায়ে হইয়া থাকে, তাহা কেহ যুক্তিসঙ্গত ভাবে অস্বীকার করিতে পারেন না।

* "শিক্ষা" অথবা "এডুকেশন", এই শব্দগুলি আজকাল যেরূপ ব্যাপক অর্থে অথবা অর্থহীন ভাবে ব্যবহৃত হয়, ভারতীয় ঋষিগণ তাহা ঐরূপ অর্থে অথবা অর্থহীন ভাবে ব্যবহার করেন নাই। তাঁহাদের ভাষানুসারে "প্রযত্ন" শব্দটী ব্যাপক। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সম্যক্ বিকাশ সাধন করিবার জন্য তাঁহারা পাঁচটী পদ্ধতি অবলম্বন করিবার উপদেশ দিয়াছেন। "শিক্ষা" ঐ পাঁচটী পদ্ধতির অন্যতম। তাঁহাদের ভাষানুযায়ী "শিক্ষা" বলিতে বুঝায় সর্ব্বপ্রকৃতিসম্পন্ন হইয়া বর্ণ, পদ এবং বাক্যের এমন ভাবে উচ্চারণ করিতে অভ্যাস করা, যাহাতে ঐ ঐ উচ্চারণে শরীরের কোন্ কোন্ অঙ্গ স্পৃষ্ট হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় এবং উচ্চারিত বর্ণ, পদ এবং বাক্যের অর্থ উপলব্ধ হয়।

অতএব নির্ভরশীল পোষ্যবর্গের সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি না পায়, তাঁহারা যাহাতে প্রকৃতপক্ষে কার্য্যক্ষম হইয়া উত্তরোত্তর উপার্জ্জনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারেন, অস্বাস্থ্য এবং অকাল-মৃত্যু তাঁহাদিগকে যাহাতে আক্রমণ করিতে না পারে, তাহা করিতে হইলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থার প্রয়োজন, ইহা বলা যাইতে পারে :—

(১) যাহাতে ১৮ বৎসরের মধ্যে বালকগণের দশটী ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি কার্য্যক্ষম হয় এবং ঐ বয়সে যাহাতে তাহারা উপার্জ্জনক্ষম হয়, তদনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা ;

(২) কোন্ খাদ্য, পানীয়, বায়ু, বাসস্থান এবং ব্যবহার্য্য বস্তু স্বাস্থ্যপ্রদ, অথবা অস্বাস্থ্যপ্রদ তাহা যাহাতে বালকগণ ১৮ বৎসরের মধ্যে পরিজ্ঞাত হইতে পারে এবং যাহাতে তাহাদের পরমায়ুবৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য থাকে, তদনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা ;

(৩) বালকগণের যাহাতে ১৮ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে বিবাহ হয়, তাহার ব্যবস্থা ;

(৪) প্রকৃত ভাবে বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন যাঁহারা না করিতে পারেন, তাঁহারা যাহাতে হস্তপদাদির শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা অথবা শ্রমজীবী হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তাহার ব্যবস্থা ;

(৫) প্রকৃত ভাবে বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন যাঁহারা না করিতে পারেন, তাঁহারা যাহাতে মস্তিষ্কজীবী না হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা ;

(৬) কোন প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোক যাহাতে স্বামী ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের সহিত অথবা কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ যাহাতে স্বীয় স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীলোকের সহিত অবাধে মেলামেশা না করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা ;

(৭) প্রত্যেক স্ত্রীলোক যাহাতে সংসারের কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং কোন উপার্জ্জনের কার্য্যে প্রবৃত্ত না হন, তাহার ব্যবস্থা ;

(৮) শ্রমজীবিগণ যাহাতে ১৮ বৎসর বয়সে উপার্জ্জন করিবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা ;

(৯) দেশের জল ও বায়ু যাহাতে কোনরূপ বিকৃত না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা।

ইহাও বলা যাইতে পারে যে উপরোক্ত নয়টী ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলেই মানুষের কার্য্যক্ষম হওয়া এবং কার্য্যক্ষমতা বজায় রাখা সম্ভব হইতে পারে এবং ইহার পর উপার্জ্জনক্ষম হইতে পারিলে মানুষের স্বীয় উদরান্নের জন্য অথবা নির্ভরশীল পোষ্যবর্গের জন্য বিব্রত হইতে হয় না।

সাধারণতঃ মানুষ কার্য্যক্ষম হইলেই তাহার উপার্জ্জন করিবার সামর্থ্য হয় বটে, কিন্তু উপার্জ্জন করিবার সামর্থ্য হইলেই যে কার্য্যতঃ সে উপার্জ্জন করিতে পারে, তাহা নহে। যাহাতে সকল কার্য্যক্ষম মানুষের কর্ম্মনিয়োগ হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করা সম্ভব হইতে পারে, দেশের মধ্যে এমন ব্যবস্থা থাকা চাই। দেশের মধ্যে কি জাতীয় ব্যবস্থা হইলে সকল কার্য্যক্ষম মানুষের কর্ম্মনিয়োগ হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করা সম্ভব হইতে পারে, তাহা স্থির করিতে হইলে, প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে, সাধারণতঃ মানুষ কোন্ কোন্ পেশা অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে যে, কোন্ পেশায় কত সংখ্যক মানুষের জীবিকা নির্ব্বাহ করা সম্ভব হইতে পারে।

মানুষের পেশা সাধারণতঃ চারিটী, যথা : –

(১) কৃষিকার্য্য ;

(২) শিল্প ও বাণিজ্য ;

(৩) ওকালতী, ডাক্তারী প্রভৃতি ব্যবসায় (profession) ও শিক্ষকতা ;

(৪) সরকারী চাকুরী (সৈনিক সমেত)।

শিল্প ও বাণিজ্যের দ্বারা দেশের কত লোকের জীবিকা নির্ব্বাহ করা সম্ভব হইতে পারে, তাহার বিচার করিতে হইলে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে, কি পরিমাণ শিল্পজাত পদার্থ উৎপন্ন করিলে এবং কি পরিমাণ শিল্পজাত ও কৃষিজাত দ্রব্যের বাণিজ্য করিলে শিল্প ও বাণিজ্য লাভজনক হওয়া সম্ভব।

মনে রাখিতে হইবে যে, শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপত্তি এবং শিল্পজাত ও কৃষিজাত দ্রব্যের বাণিজ্য চাহিদানুযায়ী না হইয়া তদপেক্ষা বেশী হইলে শিল্প ও বাণিজ্যে লাভবান্ হওয়া যায়

না। কাযেই কি পরিমাণ শিল্পজাত পদার্থের উৎপত্তি হইলে এবং কি পরিমাণ শিল্পজাত ও কৃষিজাত দ্রব্যের বাণিজ্য হইলে, তদ্দ্বারা শিল্পীর ও বণিকের জীবনধারণ করা সম্ভব, তাহা স্থির করিতে হইলে, মনুষ্য-সমাজে ঐ ঐ বস্তুর চাহিদা কতখানি হইতে পারে, তাহা স্থির করিতে হয়। মানুষ সাধারণতঃ যাহা যাহা ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহারই চাহিদা হয় এবং মানুষ যে যে বস্তু ব্যবহার করে, তাহার প্রয়োজনের পরিমাণ সীমাবদ্ধ। কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন যে, প্রয়োজনীয় বস্তুর পরিমাণ অসীমভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু এই ধারণা যে অলীক কল্পনা মাত্র, তাহা পাশ্চাত্য ও মার্কিণ দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়। প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পরিমাণ যে সীমাবদ্ধ, তাহা না বুঝিবার ফলে প্রায় প্রত্যেক পাশ্চাত্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি বিক্রয়ের অযোগ্য পরিমাণে দ্রব্যের উৎপত্তি সাধন করিয়া বিপন্ন হইতেছেন। কাযেই বলিতে হইবে যে, শিল্প ও বাণিজ্যের দ্বারা যে সংখ্যক মানুষের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে, তাহা সীমাবদ্ধ।

ওকালতী, ডাক্তারী প্রভৃতি ব্যবসায়ের দ্বারা অথবা শিক্ষকতা দ্বারা অথবা সরকারী চাকুরীতে যে সংখ্যক মানুষের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে, তাহাও যে অতীব সীমাবদ্ধ, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়।

মানুষের কি পরিমাণ শিল্পজাত দ্রব্যের প্রয়োজন, কি পরিমাণ শিল্পজাত ও কৃষিজাত দ্রব্যের লাভজনক বাণিজ্য করা সম্ভব, মানুষের প্রয়োজনে কয়জন চিকিৎসক, আইন-ব্যবসায়ী এবং শিক্ষক লাগিতে পারে এবং সুশৃঙ্খলভাবে রাজ্য-পরিচালনা করিতে হইলে কয়জন সরকারী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হয়, ইত্যাদি হিসাব করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতি তিনটী পেশায় সর্ব্বসমেত দেশের শতকরা ৩০ জনের বেশী নির্ভরশীল হইলে ঐ তিনটী পেশা প্রয়োজনাতিরিক্ত জনতায় পরিপূর্ণ হয় এবং তাহাতে ঐ ঐ পেশাবলম্বী সকলের পক্ষেই জীবিকানির্ব্বাহে ক্লেশভোগ করিতে হয়।

কাযেই বলিতে হইবে যে, শিল্প ও বাণিজ্যে, ওকালতী ও ডাক্তারী প্রভৃতি ব্যবসায়ে, শিক্ষকতায় এবং সরকারী চাকুরীতে দেশের শতকরা ৩০ জন [illegible] মানুষের জীবিকা নির্ব্বাহ করা সম্ভব হইতে পারে এবং ঐ ঐ পেশায়, কার্য্যক্ষম ব্যক্তির শতকরা ৩০ জনের বেশী নির্ভরশীল হইলে মানুষের বিপন্ন হইতে হয়।

এক্ষণে প্রশ্ন হইবে যে, বাকী ৭০ জন যায় কোথায়?

এক একটী মানুষের জীবন ধারণ করিতে হইলে ন্যূনপক্ষে যে যে পরিমাণে যে যে দ্রব্যের ব্যবহার করিতে হয়, তাহার কিয়দংশ কৃষিজাত এবং কিয়দংশ শিল্পজাত। মানুষের সাধারণভাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে সারা বছরে যে যে দ্রব্য যে যে পরিমাণে ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা কয়জন মানুষের পরিশ্রমজাত, ইহা হিসাব করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, এক একটী মানুষ সারা বছরে ⅟ মানুষের সাম্বাৎসরিক পরিশ্রমজাত দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকে এবং তাহার প্রায় চৌদ্দ আনা কৃষিজাত এবং প্রায় দুই আনা শিল্পজাত। ইহাও দেখা যাইবে যে, ১০০ জন মানুষের শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের সাম্বাৎসারিক প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিতে হইলে প্রায় ১১ জন লোকের শিল্পের উপর এবং ৭০ জন লোকের কৃষির উপর নির্ভরশীল হওয়া চলিতে পারে।

কাযেই বলা যাইতে পারে যে, কৃষি লাভবান্ হইলে, তদ্দ্বারা দেশের শতকরা ৭০জন লোক অনায়াসেই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে।

কৃষি লাভবান্ করিতে হইলে কৃষক সারা বৎসর যে পরিমাণ জমী কর্ষণ করিতে পারে, তাহা হইতে যাহাতে কৃষির ও তাহার সাংসারিক খরচ এবং জমীদারের খাজনা প্রভৃতি নির্ব্বাহ হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজনীয়।

একজন কৃষক সাধারণতঃ চাষের সময় ১০ বিঘার বেশী জমী একাকী কর্ষণ করিতে পারে না।

একজন বিবাহিত কৃষকের দুইটী নির্ভরশীল সন্তান থাকিলে তাহার সংসারে খাদ্যের জন্য বৎসরে প্রায় ২০ মণ চাউলের-অথবা আটার প্রয়োজন হয়। চাষের খরচ, জমীদারদের খাজনা ইত্যাদিতে প্রায় উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ খরচ হইয়া যায়। ইহার পর বাকী থাকে তাহার বস্ত্র, গৃহ, আসবাব প্রভৃতির খরচ।

কাযেই বলিতে হইবে যে, যদি ১০ বিঘা জমী হইতে ৬০ মণ চাউল অথবা ১২০ মণ ধান, কিম্বা গম কিম্বা তম্মূল্য উৎপন্ন হয় এবং যাহাতে ২০ মণ চাউল অথবা গম, অথবা উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশের দ্বারা তাহার অপর প্রয়োজনীয়

জিনিষ ক্রয় করা সম্ভব হইতে পারে, তদনুরূপ ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে কৃষি লাভবান্ হইতে পারে।

জমীর এতাদৃশ উর্ব্বরতা সাধন করিয়া কৃষিকে লাভবান্ করিতে হইলে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যাহাতে রক্ষিত হয় এবং বৃদ্ধি পায়, তাহার ব্যবস্থার প্রয়োজন। কারণ কৃত্রিম সার দ্বারা জমীর উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিলে তাহাতে যে খরচ হয়, তাহা নির্ব্বাহ করিয়া কৃষিকার্য্য লাভবান্ করা সম্ভব নহে।

যে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি প্রতি বিঘায় ৪ মণেরও কম, সেই জমী কৃষকের দ্বারা কর্ষিত হইলে কৃষকের বিপন্ন হইতে হয়। কারণ কৃষকের বাৎসরিক কর্ষণশক্তি সীমাবদ্ধ। অত্যন্ত নিম্ন উর্ব্বরাশক্তিসম্পন্ন জমী চাষ করিতে হইলে তাহার সময় অতিবাহিত হয়, অথচ সংসার-নির্ব্বাহোপযোগী ফসল পাইবার আশা থাকে না।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, দেশের সমস্ত লোকের কার্য্যক্ষম হইয়া উপার্জ্জনক্ষম হইতে হইলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলির প্রয়োজন :—

(১০) দেশের মধ্যে যাহাতে মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৩০ জনের বেশী শিল্প, বাণিজ্য, ওকালতী, ডাক্তারী প্রভৃতি ব্যবসায়, শিক্ষকতা ও সরকারী চাকুরীর উপর নির্ভরশীল না হয়, তাহার ব্যবস্থা এবং যাহাতে কৃষি লাভবান্ হয়, তাহার ব্যবস্থা ;

(১১) জমীর স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া যাহাতে কোনরূপ সার ব্যবহার না করিলেও প্রতি বিঘা জমী হইতে অন্ততঃ ১২ মণ ধান অথবা গম অথবা তন্মূল্যের অপর কোন শস্যের উৎপাদন হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ;

(১২) যে জমীর স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তিতে প্রতি বিঘায় ৪ মণ ধান অথবা গম অথবা তন্মূল্যেরও কম শস্য উৎপন্ন হয়, সেই জমী যাহাতে কোন কৃষক চাষ না করেন এবং তাহার উৎপাদিকা শক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তদনুরূপ ব্যবস্থা ;

(১৩) নদীগুলি যাহাতে এত গভীর হয় যে, বর্ষাকালে বৃষ্টির পরিমাণ যতই বেশী হউক না কেন, তাহার দুই তীর প্লাবিত হইবার কোন সম্ভাবনা যাহাতে না থাকে, তাহার ব্যবস্থা ;

(১৪) বিভিন্ন খাদ্যশস্য, শিল্পজাত ব্যবহার্য্য জিনিষ এবং গৃহনির্ম্মাণের উপকরণের বিভিন্ন মূল্যের মধ্যে যাহাতে সাদৃশ্য (parity) থাকে, তাহার ব্যবস্থা ;

(১৫) সাংসারিক জীবিকানির্ব্বাহের খরচ ও পারিশ্রমিকের মধ্যে যাহাতে সাদৃশ্য (parity) থাকে, তাহার ব্যবস্থা।

উপরোক্ত আলোচনাটী চিন্তা করিলে, জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে মানুষের দুরবস্থার যে কোন সম্পর্ক নাই, তাহা বুঝা যায় না কি ?

দেশের অবস্থা ও তৎসম্বন্ধে আনন্দবাজার পত্রিকা এবং ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়

জনসংখ্যার বৃদ্ধি হইলে যে দেশে দুরবস্থার উদ্ভব হয় না, পরন্তু দেশের উন্নতিসাধন করিতে হইলে যে উপার্জ্জক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকের সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা আমরা উপরিলিখিত "জনসংখ্যা, জন্মনিরোধ ও মানুষের অবস্থা শীর্ষক" আলোচনায় দেখাইয়াছি। কেন দেশে দুরবস্থার উদ্ভব হয় এবং কি করিলে তাহার অপনোদন করা সম্ভব হইতে পারে, তাহাও ঐ আলোচনায় দেখান হইয়াছে।

নিম্নলিখিত চারিটী বিষয়ের আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য :—

(১) দেশের উন্নতির জন্য জনসংখ্যার বৃদ্ধির প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও বর্ত্তমান জগতে জনসংখ্যার হ্রাস করিবার কথা উত্থিত হইল কেন ?

(২) দেশে জনসংখ্যা হ্রাস করিবার কথা উত্থিত হইলে বুদ্ধিমান্ নেতৃবর্গের কর্ত্তব্য কি ?

(৩) ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় জাতীয় বিশেষজ্ঞগণ কোন্ শ্রেণীর অর্থনৈতিক ?

(৪) আনন্দবাজার পত্রিকার পরিচালকগণ কোন্ শ্রেণীর নেতা ?

দেশের উন্নতির জন্য জনসংখ্যার বৃদ্ধির প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও বর্ত্তমান জগতে জনসংখ্যার হ্রাস করিবার কথা কেন উত্থিত হইল, তাহা স্থির করিতে হইলে, জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিতে হয়।

কার্য্য-কারণের ভাব চিন্তা করিলে জগতের প্রাচীন ইতিহাস বলিয়া এখন যাহা প্রচলিত আছে, তাহাতে বহু অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইবে।

প্রচলিত ধারণানুসারে জগতের ইতিহাসে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য :—

(১) মনুষ্যজাতির ভিতর এখন যাঁহারা উন্নত এবং সভ্য, তাঁহারা সকলেই এক সময়ে মধ্য-এসিয়ায় বাস করিতেন। মধ্য-এসিয়ার এই সভ্য মানুষগুলি 'পরবর্ত্তী কালে ভারতবাসী, গ্রীক, রোমান, জার্ম্মাণ, ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি নামে পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহাদের সাধারণ নাম 'আর্য্য' ;

(২) মধ্য-এসিয়া ব্যতীত অন্যান্য স্থানের যাঁহারা আদিম অধিবাসী, তাঁহারা অসভ্য ছিলেন। তাঁহাদিগকে "অনার্য্য" বলা হইয়া থাকে ;

(৩) এক সময়ে জগৎ অত্যন্ত অসভ্য ছিল এবং ক্রমশঃ উন্নত হইয়া বর্ত্তমানে উন্নতির শীর্ষস্থানের সমীপবর্ত্তী হইতেছে ;

(৪) মানুষের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে এবং তাহা অপরিহার্য্য। এই মৌলিক পার্থক্যানুসারেই মানুষের সভ্যতার তারতম্য হইয়া থাকে।

একটু চিন্তা করিয়া বাস্তব জগতে কি ঘটিয়া থাকে, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে যে, এই চারিটী কথার কোনটীরই বাস্তবতার সহিত সাদৃশ্য নাই, কাযেই উহা অবিশ্বাস্য।

এ জগতের ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে কি না, মানুষের সভ্যতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে কি না, তাহা বিচার করিতে হইলে, প্রথমতঃ 'উন্নতি' এবং 'সভ্যতা', এই দুইটী শব্দের কি অর্থ, অর্থাৎ তাহাতে কি বুঝায়, তাহা স্থির করিতে হয়। এই দুইটী শব্দের অর্থ লইয়া অনেক মতভেদ আছে। উহাদের অর্থ লইয়া যতই মতভেদ থাক্ না কেন, সমস্ত মানুষের যাহা যাহা প্রয়োজন, মানুষ যখন তাহা সংগ্রহ করিতে পারে না, তখন যে তাহার অবনতি হইতেছে, ইহা বলিতেই হইবে। অন্যদিকে সমস্ত মানুষের যাহা যাহা আকাঙ্ক্ষিত, মানুষ তাহা যখন অনায়াসে পাইতে থাকে, তখন যে তাহার উন্নতি হইতেছে, ইহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা সমস্ত মানুষের সাধারণ (common) আকাঙ্ক্ষিত বস্তুগুলির কথা বলিতেছি এবং কোন বিশেষ মানুষের বিশেষ আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর কথা বলিতেছি না। মানুষের সাধারণ আকাঙ্ক্ষিত বস্তুগুলির নাম—জীবন-ধারণোপযোগী আহার্য্য, পানীয়, বস্ত্র, বাসগৃহ, তৈজসপত্র, সন্তুষ্টি, স্বাবলম্বন, শান্তি, স্বাস্থ্য অর্থাৎ দীর্ঘ যৌবন, পরমায়ু অর্থাৎ দীর্ঘ জীবন। একটু নজর করিলেই দেখা যাইবে যে, ঐ সাধারণ আকাঙ্ক্ষিত বস্তুগুলির প্রত্যেকটীর অভাব অধুনা যেরূপ মানুষ ভোগ করিতেছে, ত্রিশ বৎসর আগেও তাহাদের সেইরূপ অভাব ছিল না। লিখিত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আরও দেখা যাইবে যে, যত অতীতের দিকে পিছাইয়া যাওয়া যায়, ততই ঐ সমস্ত বস্তুর অভাব তাহার কম ছিল, আর যতই বর্ত্তমানের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই জগতের প্রত্যেক দেশে মানুষের মধ্যে দারিদ্র্যের তীব্রতা এবং দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। কাযেই মানুষের উন্নতি যে কোন দেশে হইতেছে না, পরন্তু ক্রমশঃ অবনতি ঘটিতেছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। যাহাতে মানুষের মধ্যে অস্বস্তি অথবা দারিদ্র্যের তীব্রতা এবং দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাহার নাম যদি সভ্যতা হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান কালে মানুষ ক্রমশঃ সভ্য হইতেছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে, নতুবা বলিতে হইবে যে, বর্ত্তমান জগতে মানুষ ক্রমেই অসভ্য হইয়া পড়িতেছে।

মধ্য-এসিয়া ব্যতীত অন্যান্য স্থানের আদিম অধিবাসিগণ সকলেই অসভ্য ছিলেন, ইহাও স্বীকার করা যায় না। হইতে পারে, তাঁহাদের বসবাস-প্রণালী, খাদ্যাদির নির্ব্বাচন ও গ্রহণ-পদ্ধতি প্রভৃতি বর্ত্তমান কালের তুলনায় পৃথক্ ছিল এবং হয়ত কোন জাতির চক্ষুতে বিসদৃশ ছিল, কিন্তু যখন পরিষ্কার দেখা যায় যে, তাঁহারাও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া জীবনধারণোপযোগী সমস্ত বস্তু অর্জ্জন করিতে পারিতেন এবং সন্তুষ্ট চিত্তে, স্বাবলম্বনে, শান্তিতে স্বাস্থ্য ও পরমায়ু উপভোগ করিতে পারিতেন, তখন তাঁহারাও যে উন্নত এবং সভ্য ছিলেন, ইহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। কাহার কি জ্ঞান-বিজ্ঞান ছিল অথবা ছিল না, তাহা বর্ত্তমান কালে জানা নাই বলিয়া আদিম অধিবাসী-দিগের জ্ঞান-বিজ্ঞান ছিল না, ইহা বলা সঙ্গত নয় ; পরন্তু যখন দেখা যায় যে, তাঁহারা মারামারি-কাটাকাটি না করিয়াও সঙ্ঘ-বদ্ধ হইতে পারিতেন এবং সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতেন, তখন তাঁহাদের ভিতরও এক সময়ে কোন না কোন জ্ঞান-বিজ্ঞান ছিল, ইহা অনুমান না করা সঙ্গত নহে।

বর্ত্তমান ভারতবাসী, গ্রীক, রোমান, জার্ম্মান, ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি জাতিগণ এক সময়ে মধ্য-এসিয়ায় বসবাস করিতেন, এইরূপ মনে করাও স্বভাবসম্মত নহে। একে ত মধ্য-এসিয়া যে কখনও অপর কোন দেশের তুলনায় বিশেষ ভাবে মনোরম ছিল, তাহা মনে করিবার কারণ পাওয়া যায় না ; তাহার পর আবার ভারতীয় ও গ্রীকদিগের অভ্যুদয়-কালের ব্যবধান যে সহস্র সহস্র বৎসরের, তাহাও সহজেই অনুমান করা যায়।

"আর্য্য" শব্দটী যে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। পরবর্ত্তী কালে উহা জাতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু ঋষিদিগের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে উহা জাতিবাচক অর্থে কুত্রাপি ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া পরিলক্ষিত হয় না।

অর্থপ্রবৃত্তিতত্ত্বানাং শব্দা এব নিবন্ধনম্।
তত্ত্বাববোধঃ শব্দানাং নাস্তি ব্যাকরণাদৃতে।"

বাক্যপদীয়. ১ম কাণ্ড, শ্লোক ১৩।

—এই রীতি অনুসারে, শব্দ অর্থাৎ অক্ষর এবং বর্ণের সহায়তায় "আর্য্য" শব্দটীর কি অর্থ হয়, তাহা বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, উহা গুণ অর্থাৎ কর্ম্মক্ষমতা এবং পেশাবাচক। কাযেই ভারতীয় হইলেই "আর্য্য" হইবেন, অথবা "গ্রীক" হইলেই "আর্য্য" হইবেন, ইহা সংস্কৃত ভাষার অর্থবোধ করিবার পদ্ধতি অনুসারে বলা যায় না।

মানুষের ভিতর মৌলিক পার্থক্য আছে, ইহাও একেবারেই সত্য নহে। খুব সম্ভব বর্ত্তমান কালের ডাক্তারগণ পর্য্যন্ত স্বীকার করিবেন যে, অসভ্য নিগ্রো ও সুসভ্য ইংরাজগণের মধ্যেও শরীর-গঠনে (anatomical) ও শরীর-বিধানে (physiological) কোন মৌলিক পার্থক্য পাওয়া যায় না। তাহার পর যখন পরিষ্কার দেখা যায় যে, নিগ্রোগণও যথোপযুক্ত শিক্ষা পাইবার সুযোগ পাইলে জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জ্জন করিয়া অপর সমস্ত জাতির সমকক্ষ হইতে পারেন, তখন কোন মৌলিক পার্থক্যের তারতম্যের জন্য কাহারও সভ্যতার তারতম্য হইয়া থাকে, ইহা যুক্তিসঙ্গত ভাবে বলা যায় না। পরন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে, মানুষের ভিতর কোন মৌলিক পার্থক্য নাই। আপাতদৃষ্টিতে যে পার্থক্য দেখা যায়, তাহার কারণ তিনটী, যথা—(১) শিক্ষা, (২) স্থান, (৩) কাল।

প্রাচীন ইতিহাস বলিয়া যাহা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে লিখিত হইতেছে, তাহার প্রায় প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য কথা যে যুক্তিবিরুদ্ধ, তাহা উপরোক্ত পদ্ধতিতে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে।

কাযেই জগতের ইতিহাস বলিয়া আমরা যাহা বর্ণনা করিব, তাহা প্রায়শঃ বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণের সংস্কারবিরুদ্ধ হইলেও আমরা পাঠকদিগকে আমাদিগের বর্ণনার আদ্যোপান্ত পড়িয়া বিচার করিতে অনুরোধ করি। আমরা যাহা যাহা বলিব, তাহা বর্ত্তমান সংস্কারের বিরুদ্ধ হইতে পারে বটে, কিন্তু এমন একটী কথাও বলিব না, যাহা বাস্তবতার সহিত সাদৃশ্যসম্পন্ন নহে এবং যাহা প্রতিপন্ন করা যায় না।

ভারতবর্ষ রাজনীতিক্ষেত্রে পরাধীন, অথচ জগতের মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষেরই আর্থিক স্বাধীনতা ছিল। অনন্যসাধারণ আর্থিক স্বাধীনতা যে একটা অনন্যসাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিচয়, তাহা বলাই বাহুল্য। অথচ প্রচলিত কোন ইতিহাসে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না। আমাদের বর্ণনায় তাহা পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

"ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়" শীর্ষক প্রবন্ধের যে অংশ বর্ত্তমান সংখ্যা বঙ্গশ্রীতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পড়িলে দেখা যাইবে যে, এখনও জগতের মানুষ ভারতীয় ঋষিগণের ও মুসলমানদিগের প্রাচীন ইতিহাস সম্পূর্ণ ও নির্ভুলভাবে জানিতে পারে নাই। যদি কখনও ঐ ইতিহাস আবার উদ্ভাসিত হয়, তাহা হইলে মানুষ জানিতে পারিবে যে, —যে পনেরটী ব্যবস্থা হইলে, মানুষের দুরবস্থা দূরীভূত হয় বলিয়া আমরা "জনসংখ্যা, জন্মনিরোধ ও মানুষের অবস্থা" শীর্ষক আলোচনায় প্রতিপন্ন করিয়াছি, সেই পনেরটী ব্যবস্থা এক সময় জগতের সর্ব্বত্র বিদ্যমান ছিল এবং সকল দেশেই সমস্ত স্তরের মানুষের আর্থিক দুরবস্থাও দূরীভূত হইয়াছিল।

সমস্ত স্তরের মানুষের আর্থিক দুরবস্থা দূরীভূত করিবার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইবার পর সমাজ-নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্ব্বত্রই মানুষকে চারি শ্রেণীর কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল এবং সমস্ত দেশেই মানুষ কার্য্যতঃ চারি শ্রেণীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক শ্রেণীর মানুষের কার্য্য হইয়াছিল—জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা, শিক্ষার পরিচালনা, আইন প্রণয়ন ও আইনের ব্যবহার। ইহাঁদিগকে ইয়োরোপে "পুরোহিত" (Priest or Clergyman) এবং ভারতবর্ষে "ব্রাহ্মণ" বলা হইত। আর এক শ্রেণীর মানুষের কার্য্য হইয়াছিল অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর হাত হইতে দেশরক্ষা ও ব্রাহ্মণ অথবা পুরোহিত-প্রণীত আইনানুসারে দেশের শাসন। ইহাঁদিগকে ইয়োরোপে "যোদ্ধা" এবং ভারতবর্ষে "ক্ষত্রিয়" বলা হইত। তৃতীয় শ্রেণীর মানুষের কার্য্য হইয়াছিল—শ্রমজীবীদিগকে শিক্ষিত করা

এবং অর্থ দ্বারা তাহাদের কার্য্যের সহায়তা করা এবং তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য যাহাতে ক্রয়-বিক্রয় করিবার সুবিধা হয়, তাহার ব্যবস্থা করা। ইহাঁদিগকে ইয়োরোপে "ব্যবসায়ী" বলা হইত এবং ভারতবর্ষে ইহাঁদের নাম হইয়াছিল "বৈশ্য"। চতুর্থ শ্রেণীর মানুষের কর্ত্তব্য ছিল হস্তপদাদির কার্য্য দ্বারা "বৈশ্য" অথবা "ব্যবসায়ি"গণের নির্দ্দেশানুসারে খাদ্য-শস্যাদি উৎপাদন করা, জমীজাত দ্রব্যকে মানুষের ব্যবহারযোগ্য করা অর্থাৎ শিল্পকার্য্য করা, পশুপালন করা এবং অপর তিন শ্রেণীর লোকের গৃহকার্য্যাদি যাবতীয় কার্য্যে সহায়তা করা। ইহাঁদিগকে ইয়োরোপে "শ্রমজীবী" ও ভারতবর্ষে "শূদ্র" বলা হইত। প্রথমোক্ত তিন শ্রেণীর লোক "প্রযত্নে"র দ্বারা ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির অত্যন্ত উৎকর্ষ সাধন করিতেন, শব্দতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতেন এবং তত্ত্বাবধানের কার্য্য করিতেন বলিয়া ঐ তিন শ্রেণীর লোককে "আর্য্য"* বলা হইত।

এইরূপে আর্য্য ও শূদ্রগণ মিলিত হইয়া জগতের সর্ব্বত্র মানুষের যাহাতে দুরবস্থা দূর হয় এবং সমস্ত জীব যাহাতে সুখে কালাতিবাহিত করিয়া দীর্ঘ যৌবন ও দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সকলেরই এক ধর্ম্ম এবং একরূপ জীবনযাপন-প্রণালী ছিল। সমস্ত দেশেই অধিকাংশ লোক শ্রমজীবী অথবা "শূদ্র" ছিলেন। কিরূপ ভাবে খাদ্য শস্যাদি উৎপাদন করিতে হয়, কিরূপে তাহা মানুষের ব্যবহারযোগ্য করিতে হয়, কি করিলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ভাল থাকে, ইত্যাদি শিক্ষা প্রথমতঃ "শূদ্র" অথবা "শ্রমজীবি"গণ "বৈশ্য"গণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে শূদ্রগণ নিজেরাই শিক্ষিত হইতে পারিয়াছিলেন এবং তখন আর তাঁহাদের জীবনযাপনের সুবিধার জন্য ব্রাহ্মণাদি অপর তিন শ্রেণীর লোকের সহায়তার প্রয়োজন হইত না। এই শিক্ষায় 'অক্ষরতা' (literacy) ছিল না বটে, কিন্তু জীবনকে কি করিয়া সুখমণ্ডিত করিতে হয় এবং কি করিলে জীবন দুঃখময় হয়, তাহা এই শিক্ষায় মানুষ জানিতে পারিত।

এই সময় ভারতবর্ষের প্রকৃত সংস্কৃত ভাষার রূপ, সম্পূর্ণ বেদের, মীমাংসার, বেদাঙ্গের এবং পুরাণের, দর্শনের এবং প্রাচীন স্মৃতির প্রকৃত অর্থ মানুষ জানিতে পারিয়াছিলেন। মানুষের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এক কথায় জগৎ ধনবলে ও জনবলে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

যখন শূদ্রগণ পর্য্যন্ত শিক্ষিত হইয়া দেশের ঐশ্বর্য্য এবং শান্তি কি করিয়া রক্ষা করিতে হয়, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছিলেন, তখন আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের বিশেষ কোন কার্য্য করিবার প্রয়োজন হয় নাই। অথচ সমাজ-বন্ধনের নিয়মানুসারে কেহ বা গুরু-পুরোহিত রূপে, কেহ বা রাজা রূপে, কেহ বা জমীদার রূপে, কেহ বা উত্তমর্ণ রূপে স্ব স্ব জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগী প্রচুর অর্থ শূদ্রগণের নিকট হইতে অর্জ্জন করিতে পারিতেন। ফলে ঐ তিন শ্রেণীর লোক অর্থাৎ আর্য্যগণ কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়া পড়েন এবং সমস্ত দেশ হইতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা অন্তর্হিত হয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা অন্তর্হিত হওয়ার ফলে বেদ, মীমাংসা, বেদাঙ্গ, পুরাণ, দর্শন এবং প্রাচীন স্মৃতির প্রকৃত অর্থ এই সময় আবার মানুষ ভুলিয়া গিয়াছিল, এমন কি প্রকৃত সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ পর্য্যন্ত মানুষ বিস্মৃত হইয়াছিল।

এদিকে কালের নিয়ম অপরিহার্য্য। কালের মূল কারণ পৃথিবীর সহিত সূর্য্যের দূরত্ব। কালের মূল কারণ যে, পৃথিবীর সহিত সূর্য্যের দূরত্ব, তাহা উষাকাল, প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল, সন্ধ্যাকাল এবং রাত্রিকালের পার্থক্য এবং বৈশিষ্ট্য পর্য্যালোচনা করিলেই মোটামুটি ভাবে বুঝিতে পারা যায়। এই দূরত্ব প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কখনও কমিয়া যায়, আবার কখনও বাড়িয়া যায়। পৃথিবীর সহিত সূর্য্যের দূরত্ব যখন সর্ব্বাপেক্ষা কম হয়, তখন পৃথিবীর উৎপাদিকা-শক্তি, জীবের স্বাস্থ্য এবং স্বভাব যেরূপ থাকে, পৃথিবীর সহিত সূর্য্যের দূরত্ব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইলে পৃথিবীর উৎপাদিকা-শক্তি, জীবের স্বাস্থ্য এবং স্বভাব সেইরূপ থাকে না। পৃথিবীর সহিত সূর্য্যের দূরত্বের তারতম্যানুসারে পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তির এবং জীবের স্বাস্থ্য, স্বভাব ও সামর্থ্যের তারতম্য হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ কালের পরিবর্ত্তনে জগতে জমীর উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হইতে আরম্ভ হয় এবং মানুষের যৌবনের ও জীবনের দৈর্ঘ্য কমিয়া যাইতে আরম্ভ করে, এমন কি মানুষের সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে থাকে। ক্রমশঃ মনুষ্য-

* "আর্য্য" শব্দের বর্ণগত অর্থ—যাঁহারা শব্দতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া শরীর তত্ত্ব সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত হইতে পারেন এবং ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিয়া তত্ত্বাবধানের কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

সমাজের মধ্যে আবার বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয়। এই সময় জমীর উৎপাদিকা শক্তি এবং মানুষের জীবনের ও যৌবনের দৈর্ঘ্য পূর্ব্ববর্ত্তী কালের তুলনায় কমিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও বর্ত্তমান সময়ের তুলনায় ঐ উৎপাদিকা শক্তি এবং মানুষের অবস্থা অনেক ভাল ছিল

এই সময় মানুষের অবস্থায় যে অসুবিধার উদ্ভব হয়, তাহার প্রতিকার শূদ্রগণ স্ব স্ব বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা করিতে পারেন নাই এবং তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তিন বর্ণের 'সহায়তা-প্রার্থী হইতে হইয়াছিল; কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা ছাড়িয়া দেওয়ায় তৎকালে জমীর উর্ব্বরাশক্তি কি করিয়া বৃদ্ধি করা সম্ভব এবং মানুষের যৌবন ও জীবনের দৈর্ঘ্য কি করিয়া অটুট রাখা সম্ভব, তাহা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তিন বর্ণ আর প্রকৃত ভাবে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারেন নাই। ফলে ঐ আর্য্য (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ত্রি-বর্ণের) ও শূদ্রগণের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়; তাহারই ফলে শূদ্রগণ আর্য্যগণের অস্পৃশ্য এই মতবাদ প্রচারিত হয়। এই সময়েই বর্ত্তমান বর্ণাশ্রমযুক্ত বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের উদ্ভব হয় এবং ক্রমশঃ বৈদিক আচারে নানারূপ বিকৃতি স্থান পাইতে আরম্ভ করে। বেদ যখন প্রকৃত অর্থে জাগ্রত ছিল, তখন মনুষ্য-সমাজে যে শৃঙ্খলা, সুখ এবং শান্তি দেদীপ্যমান হইয়াছিল, তাহা এই সময় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু তখনও মানুষের উদরান্নের জন্য বর্ত্তমান সময়ের মত ক্লেশের উদ্ভব হয় নাই। কারণ তখনও বর্ত্তমান সময়ের তুলনায় জমীর উৎপাদিকা শক্তি অনেক বেশী ছিল। এই সময়ে মোট মনুষ্যসংখ্যাও ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছিল।

মানুষের দুরবস্থা যখন চরমে উপনীত হয়, তখন এক এক-জন মহাপুরুষের অথবা অতিমানুষের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই সময়ে ভারতবর্ষে দুই মহাত্মা জন্ম পরিগ্রহ করিয়া-ছিলেন। একজনের নাম বুদ্ধদেব এবং অপর জনের নাম মহাবীর। দুইজনেই প্রকৃত সংস্কৃত ভাষার পুনরুদ্ধার করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু যে পদ্ধতি অথবা যে শব্দতত্ত্ব জানা থাকিলে বেদাদির ভাষা মাতৃভাষার মত সুবোধ্য হ[illegible] পদ্ধতির পুনরুদ্ধার করা তখনও সম্ভ[illegible] বাইবে :— [illegible]ীন গ্রন্থের মর্ম্ম তখনও জগৎ [illegible]র যে সমস্ত উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা বহুলাংশে বেদসম্মত এবং তদ্দ্বারা মানুষের জীবন ও যৌবন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত রক্ষা করা সম্ভব। দুঃখকষ্টে বিধ্বস্ত হইয়া মনুষ্য সমাজ পরিবর্ত্তনা-কাঙ্ক্ষী হইয়াছিল এবং এসিয়াখণ্ডের অনেক লোক বুদ্ধদেবের মতাবলম্বী হইয়াছিলেন। মানুষ যাহাতে সর্ব্বতোভাবে আর্থিক দারিদ্র্যাদি হইতে রক্ষা পাইতে পারে, তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ উপায় বুদ্ধদেবের উপদেশে ছিল না। ফলে তখনও মানুষের দুঃখ-কষ্ট অপ্রতিহত গতিতে বাড়িয়া চলিতে থাকে।

বুদ্ধদেবের জন্মের পাঁচশত বৎসর পরে খৃষ্টদেব জন্ম পরিগ্রহ করেন। খৃষ্টদেবের সময়েও ভাষার সংস্কার সাধন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তখনও প্রকৃত সংস্কৃত ভাষার শব্দতত্ত্ব মানুষ জানিতে পারে নাই।

মানুষের দুঃখ-কষ্ট ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছিল বলিয়া মানুষ পরিবর্ত্তন-প্রয়াসী হইয়াছিল এবং জগতের অনেক লোক খৃষ্টদেবের মতাবলম্বী হইয়াছিলেন। মানুষ যাহাতে সর্ব্বতো-ভাবে আর্থিক দারিদ্র্যাদি হইতে রক্ষা পাইতে পারে, তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ উপায় Old Testamentএও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ফলে তখনও মানুষের দুঃখকষ্ট অপ্রতিহত-গতিতে বাড়িয়া চলিতে থাকে।

খৃষ্টদেবের জন্মিবার পাঁচশত বৎসর পরে নবী মহম্মদ জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁহার সময়ও ভাষার সংস্কার সাধন করি-বার চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। আরবী ভাষার বর্ণমালায় শব্দতত্ত্বের যে বিজ্ঞান পরিলক্ষিত হয়, তাহা সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃত বর্ণমালার অনুরূপ না হইলেও মহান্। বর্ত্তমান মুসলমানগণ তাঁহাদের বর্ণমালার বৈজ্ঞা-নিকতা কোথায়, তাহা পরিজ্ঞাত নহেন বলিয়া আমার সন্দেহ হয়। নবী মহম্মদের উপদেশ অতীব সারবান্। যদি মানুষ তাহা সর্ব্বতোভাবে মানিয়া চলিতে পারিত, তাহা হইলে হয়ত মানুষের দুঃখকষ্ট অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইত। কিন্তু মানুষ তাহা মানিয়া চলিতে পারে নাই। এমন কি তাঁহার পরবর্ত্তী অনুচরগণ পর্য্যন্ত মুসলমান ধর্ম্মের মুখ্য কথা যে সহন-শীলতা (tolerance), তাহা বিস্মৃত হইয়া উত্তেজনাপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। মুসলমান ধর্ম্মে মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করিবার অতি সারবান্ কথা আছে বলিয়াই মহম্মদের মৃত্যুর পরে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইহা অত্যন্ত প্রসার লাভ

করিয়াছিল, কিন্তু খুব সম্ভব পরবর্ত্তী ধর্ম্মযাজকগণের ভ্রান্তিবশতঃ প্রকৃত মূল্যবান্ কথাগুলি বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং মুসলমান ধর্ম্মের যে প্রসার হওয়া উচিত ছিল, তাহা হয় নাই।

মোটের উপর ভগবৎসদৃশ তিনটী অতিমানুষ—বুদ্ধ, খৃষ্ট এবং মহম্মদ নামে জন্ম পরিগ্রহ করা সত্ত্বেও কার্য্যতঃ লোকের আর্থিক অবস্থার আর কোন উন্নতি হয় নাই এবং যে মনুষ্য-সমাজ এক সময়ে এক ধর্ম্মে এবং এক জীবনযাত্রাপ্রণালীতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, সেই মনুষ্য-সমাজ দুঃখ-কষ্টে ক্রমশঃ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছিল।

তখন মানুষ নিজেদের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারে নাই বলিয়াই যখন যিনি তাহাদিগের দুঃখ-কষ্ট দূর করিবার নূতন পন্থা দেখাইবেন বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তখনই সেই নূতন কথা শুনিবার জন্য লোক আগ্রহান্বিত হইয়াছে। কিন্তু কোন নূতন কথায় মানুষের দুঃখ-কষ্ট সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার প্রকৃত পন্থার অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই বলিয়াই পরবর্ত্তী নূতন কথা জগতে স্থান পাইয়াছে। এইরূপে ক্রমশঃই মনুষ্য-সমাজ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া নূতন নূতন দল ও সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। দুঃখ-কষ্টে মানুষের পরমায়ু ক্রমেই হ্রাস পাইতেছিল এবং মানুষের সংখ্যাও ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছিল। কিন্তু তখনও প্রাচীন সংগঠনের প্রভাবে জগতের কোথাও মানুষ সম্পূর্ণভাবে নিরন্ন হয় নাই। জমীর উৎপাদিকা শক্তি তখনও যাহা অবশিষ্ট ছিল, তদ্দ্বারা জগতের সর্ব্বত্রই মানুষের বিদেশে না যাইয়া নিজ নিজ দেশে বসবাস করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করা সম্ভব হইত।

নবম শতাব্দীতে প্রথমতঃ ইয়োরোপে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। ইয়োরোপের জমীর উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পাইতে পাইতে নবম শতাব্দীতে এতাদৃশ অবস্থায় উপস্থিত হয় যে, তখন আর ইয়োরোপীয়গণের সকলের স্বদেশে বসবাস করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা সম্ভব হয় নাই। তাই তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দেশ ছাড়িয়া বিদেশে আসিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। ইয়োরোপীয় ইতিহাসে একাদশ শতাব্দীতে এই ব্যস্ততার প্রকটতা দেখা যায়।

তখনও এশিয়াখণ্ডে জমীর যে উৎপাদিকা শক্তি অবশিষ্ট ছিল, তাহাতে যাহা যাহা উৎপন্ন হইত, তদ্দ্বারা এশিয়াবাসিগণ নিজ নিজ ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া কিছু কিছু উদ্বৃত্ত করিতে পারিতেন। কাযেই ইয়োরোপীয়গণ এশিয়াখণ্ডে অবাধে যাতায়াত করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তখনও তাঁহাদের অভাবের তাড়না সম্পূর্ণভাবে ভোগ করিতে হয় নাই। কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নাই। এশিয়াখণ্ডেও জমীর উৎপাদিকা শক্তি অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। জগতের সর্ব্বত্রই এখন ক্রমশঃই দারিদ্র্যের ভীষণতা (intensity) এবং দরিদ্রের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে।

আমাদের উপরোক্ত ইতিহাস যে বিশ্বাসযোগ্য এবং তদ্বিরুদ্ধ ইতিহাসে যে কার্য্যকারণের সামঞ্জস্য নাই অতএব অবিশ্বাস্য, তাহা আমরা বঙ্গশ্রীর "ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়" শীর্ষক প্রবন্ধে গত জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, এবং ভাদ্র মাসে দেখাইয়াছি।

উপরোক্ত ইতিহাসে জগতে যে নিম্নলিখিত অবস্থা কয়টী ঘটিয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে :—

(১) কি রূপ ব্যবস্থা করিলে সমস্ত স্তরের মানুষের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর হইতে পারে, তাহা এক সময়ে মানুষ জানিতে পারিয়াছিল, সারা জগতে এই ব্যবস্থা সাধিত হইয়াছিল এবং সারা জগতের সমস্ত মানুষ আর্থিক দুর্দ্দশার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল।

(২) এক সময়ে মানুষের পরমায়ু অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী ছিল। তখন মানুষ প্রায়শঃ দীর্ঘজীবন লাভ করিত বলিয়া প্রত্যেক দেশেই মোট জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী ছিল।

(৩) জমীর প্রকৃতি কি, কি করিলে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব, তাহাও মানুষ এই সময়ে জানিতে পারিয়াছিল এবং যে ব্যবস্থা করিলে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বাড়িয়া যায়, সেই ব্যবস্থা মানুষ কার্য্যতঃ অবলম্বন করিয়াছিল এবং তখন প্রতি বিঘা জমীর উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বর্ত্তমান সময়ের তুলনায় অনেক বেশী ছিল।

(৪) তখন মানুষ জানিতে পারিয়াছিল যে, প্রকৃত শরীর-গঠন তত্ত্ব ও শরীর-বিধান তত্ত্ব জানিতে পারিলে মানুষের মস্তিষ্কের প্রকৃত কার্য্যক্ষম[illegible] হা [illegible] থাকে। ক্রমশঃ

জানিতে পারা যায় এবং তাহা জানা থাকিলে মানুষ আপনাকে **অসীম ভাবে** কার্য্যক্ষম ও উপার্জ্জনক্ষম করিয়া তুলিতে পারে।

(৫) তখন মানুষ জানিত যে, কালের প্রভাবে যখন মানুষের জননশক্তি বৃদ্ধি পায়, তখন জমীরও উৎপাদিকা শক্তি বাড়িয়া যায়। আবার যখন মানুষের জননশক্তি কমিয়া যায়, তখন জমীরও উৎপাদিকা শক্তি কমিয়া যায়। কাজেই মানুষের জননশক্তি বৃদ্ধি পাইবার জন্য যে-জনসংখ্যা বাড়িয়া যায়, তাহার অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা প্রকৃতির দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে।

(৬) তখন মানুষ ইহাও জানিত যে, মানুষের অন্নাভাব হয় তখন, যখন কালের প্রভাবে মানুষের জনন-শক্তি ও জমীর উৎপাদিকা শক্তি বাড়িয়া যায়, অথচ প্রযত্নের দ্বারা কি করিয়া দীর্ঘযৌবন, দীর্ঘ জীবন, এবং কার্য্যক্ষমতা লাভ করিতে হয় ও জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি রক্ষা করিতে হয়, তাহা মানুষ ভুলিয়া যায়।

(৭) পরবর্ত্তী কালে মানুষের পরমায়ু কমিয়া গিয়াছিল এবং সারা জগতে মোট মানুষের সংখ্যাও অত্যন্ত হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

(৮) পরবর্ত্তী কালে পরিণতবয়স্ক মানুষের সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া যাওয়ায় গভীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনাও কমিয়া গিয়াছিল এবং জগৎ হইতে প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান একরূপ লুপ্ত হইয়াছিল।

ষোড়শ শতাব্দী হইতে কালের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে, অর্থাৎ সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে ব্যবধান কমিয়া আসিতেছে। তাহাতে আবার মানুষের ও পৃথিবীর উৎপা-দিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে বটে, কিন্তু যে জ্ঞান লাভ করিলে কার্য্যতঃ মানুষ ও পৃথিবীর বাস্তব উৎপা-দিকা শক্তি বাড়িতে পারে, সেই জ্ঞান মানুষ লাভ করিতে পারে নাই। বর্ত্তমান জগতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে বলিয়া সাধারণের ধারণা। কিন্তু মানুষ যে প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী হয় নাই, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনাগুলিতে বুঝা যাইবে :—

(১) আমরা সাধারণতঃ মনে করিয়া থাকি যে, জগতের সর্ব্বত্র মনুষ্যসংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। মোট মনুষ্যসংখ্যা সর্ব্বত্রই বাড়িয়া যাইতেছে তাহা সত্য, কিন্তু সেন্‌সস্ রিপোর্টগুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, অধিকাংশ দেশেই চল্লিশ বৎসরের নিম্ন-বয়স্ক লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, অথচ তদূর্দ্ধ-বয়স্ক লোকের সংখ্যা ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে। ইহা হইতে কি বুঝিতে হয় না যে, প্রকৃতির সহায়তা বশতঃ মানুষের জননশক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে, অথচ মানুষ এমন কিছু ভুল করিতেছে, যাহার ফলে তাহার স্বাস্থ্য বজায় রাখিতে পারিতেছে না এবং অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে?

(২) আজকাল অনেকেই মনে করেন যে, মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়াই আমাদের দুঃখ-দারিদ্র্যের উদ্ভব হইয়াছে, অথচ কেহ চিন্তা করেন না যে, দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে উপার্জ্জকের সংখ্যার বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজনীয় এবং পরিণতবয়স্ক স্বাস্থ্য-বান্ ব্যক্তিগণের যে পরিমাণ কার্য্যক্ষমতা ও উপার্জ্জন হওয়া সম্ভব, অপরিণতবয়স্ক যুবকগণের তাহা হওয়া সম্ভব নহে।

(৩) সংসারের দুরবস্থা দূর করিতে হইলে নির্ভরশীল পোষ্যবর্গের সংখ্যা যাহাতে কমিয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা যে একান্ত প্রয়োজনীয়, ইহা সাধারণ বুদ্ধি-গম্য। অথচ লেখাপড়ার নামে অধিক বয়স পর্য্যন্ত অভিভাবকগণের উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা জগতের সর্ব্বত্রই বাড়িয়া যাইতেছে।

(৪) ছেলেদিগকে লেখাপড়া শিখিতে পাঠান হয় উপার্জ্জনক্ষম হইবার জন্য এবং উপার্জ্জন করিতে হইলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের এবং মন ও বুদ্ধির উৎকর্ষ একান্ত প্রয়োজনীয়। অথচ জগতের সর্ব্বত্রই বালকগণ এমন লেখাপড়াই শিক্ষা করিয়া থাকে যে, তাহাদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অপটুতাই প্রায়শঃ বাড়িয়া যায় এবং বাস্তবতা-নিরীক্ষণে তাহারা যে মন ও বুদ্ধির পরিচয় দেয়, তাহাতে তাহাদের মন ও বুদ্ধির হ্রস্বতার চিহ্নই অধিকাংশ স্থলে পরিলক্ষিত

হয়। তথাপি তাহারা শিক্ষিত বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

(৫) যে খাদ্য খাইলে তাহার পর মুহূর্ত্তেই অসুস্থতা অনুভব করিতে হয়, সেই খাদ্যই প্রায়শঃ বর্ত্তমান জগতে আদর লাভ করিয়া থাকে।

(৬) পরিণতবয়স্ক হইলেই যুবক ও যুবতীগণের যৌনাকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হইয়া থাকে এবং তখন তাহার পূরণ না হইলে তাহাদিগকে স্বভাবতঃ ভগ্নস্বাস্থ্য হইতে হয় এবং তাহাতে ক্রমশঃ তাহাদিগের মস্তিষ্কশক্তি ও উপার্জ্জনশক্তি কমিয়া যায়, অথচ বেশী বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ না দেওয়াই আজকালকার বৈজ্ঞানিক পন্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(৭) স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা থাকিলে যে কামপ্রবৃত্তির উদ্রেক হয় এবং তাহাতে যে অপেক্ষাকৃত অধিকতর শুক্রহানির সম্ভাবনা ঘটে, ইহা বাস্তব সত্য। শুক্রহানি ঘটিলে যে স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া যায় এবং তাহাতে যে উপার্জ্জন-ক্ষমতা কমিয়া গিয়া অপরের গলগ্রহ হইবার ও অকালমৃত্যু ঘটিবার আশঙ্কা উপস্থিত হয়, ইহাও সহজেই বোধগম্য। একদিন ছিল, যখন জগতের সর্ব্বত্রই স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হইত। অথচ এখন সর্ব্বত্রই যাহাতে স্ত্রী-পুরুষ অবাধে মিলিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে।

(৮) মানুষ যাহা ব্যবহার করে, তাহার অধিকাংশই কৃষিজাত। শিল্পজাত দ্রব্য যাহা যাহা মানুষের প্রয়োজন হয়, তাহার পরিমাণ কৃষিজাত দ্রব্যের পরিমাণের তুলনায় অত্যন্ত কম। মনুষ্য-সমাজে যতখানি কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা হইতে পারে, ততখানি শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা হইতে পারে না। কাযেই কৃষিতে যত মানুষের জীবিকা নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভব, শিল্পের দ্বারা তত মানুষের জীবিকা নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভব নহে। অথচ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বর্ত্তমান কালের মানুষ কৃষিকে উপেক্ষা করিয়া শিল্পের উন্নতির চেষ্টা করিয়া আসিতেছে এবং এখনও সারা জগতে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য যে চেষ্টা চলিতেছে, তাহার অৰ্দ্ধেক চেষ্টাও কৃষির উন্নতির জন্য পরিলক্ষিত হয় না।

(৯) জন্ম নিরোধ করিবার যে সমস্ত কৃত্রিম উপায়গুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার কোনটী কার্য্যতঃ যিনি ব্যবহার করিবেন, তাঁহারই স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য অনিবার্য্য হইয়া পড়ে এবং মস্তিষ্কের কার্য্যক্ষমতা কমিয়া যায়। বর্ত্তমানে বাস্তব জগতেও দেখা যায় যে, ঐ কৃত্রিম উপায়গুলির ব্যবহারের ফলে সমস্ত দেশেই তথাকথিত মস্তিষ্কজীবিগণের সন্তানের সংখ্যা অনেক স্থলে কমিয়া আসিতেছে, এমন কি মোট মস্তিষ্কজীবীর সংখ্যা যে পরিমাণে ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে, শ্রমজীবীর সংখ্যা তাদৃশ পরিমাণে কমিয়া আসিতেছে না এবং মস্তিষ্কজীবির সংখ্যা যে কমিয়া আসিতেছে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের নজরেও পড়িয়াছে, অথচ তাঁহারাই আবার জন্মনিরোধ করিবার উপদেশ দিতেছেন।

এইরূপে বর্ত্তমান কালের বিভিন্ন বিষয়ের তথাকথিত বৈজ্ঞানিকগণের কার্য্যকলাপ আমূল লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্যে মানুষের দুরবস্থা দূর হওয়া ত দূরের কথা, তাহার বৃদ্ধিই সাধিত হইতেছে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইবে যে, বৈজ্ঞানিকগণের এইরূপ ভুল হয় কেন এবং যাহা প্রকৃতপক্ষে কুজ্ঞান, তাহা বিজ্ঞান নামে চলে কিরূপে?

ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে, যাহা প্রকৃতপক্ষে কুজ্ঞান, তাহা যে বিজ্ঞান নামে বর্ত্তমান জগতে চলিতে পারিতেছে, তাহার একমাত্র কারণ এসিয়াবাসিগণের আলস্য ও মোহনিদ্রা।

কোন বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতে হইলে যে, তদ্বিষয়ে একটা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন এবং তাহাতে যে, ব্যক্তিগত অথবা জাতীয় জীবনের একটা দীর্ঘ বয়ঃক্রম প্রয়োজন, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমানকালে যাঁহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা কেহই সম্পূর্ণ সুস্থ শরীর ও মন লইয়া দীর্ঘ

বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারিতেছেন না, তাহাও প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। ৮০ অথবা ৯০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিলেও জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনার পক্ষে দীর্ঘজীবন লাভ করা হইল, ইহা বলা যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক-গণের অনেকে সত্তর বৎসরের অপেক্ষা অধিক পরমায়ু লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে অনেকেরই পরমায়ু পূর্ব্ববর্ত্তীকালের তুলনায়ও কমিয়া যাই-তেছে, ইহা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকগণের জীবনী পর্য্যালোচনা করিলেই দেখা যাইবে। এখন আর প্রায়শঃ এমন কাহাকেও দেখা যায় না, যিনি ৩০।৪০ বৎসর হইতেই চোখের অথবা মস্তিষ্কের অথবা মূত্রের অথবা উদরের একটা না একটা রোগে ভুগিতে আরম্ভ করেন না। বৈজ্ঞানিকগণ এখন এমনই বৈজ্ঞানিক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন যে, যদিও তাঁহাদের মুখ্য কার্য্য সমস্ত মানবজাতির দুঃখ কি করিয়া দূর হইবে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করা, তথাপি তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের শরীরের ও মনের দুঃখ কি করিয়া দূর করিতে হয়, তাহা পর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনায় যে জাতিকে তরুণ বলা যাইতে পারে, সেই জাতি বর্ত্তমান বিজ্ঞানের আলোচনার ভার লইয়াছেন এবং যে সমস্ত জাতিকে ঐ আলোচনায় অভিজ্ঞ বলা যাইতে পারে, তাঁহারা ইহা ছাড়িয়া দিয়াছেন বলিয়াই বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকের ও বিজ্ঞানের এই জাতীয় দুর্দ্দশা হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে।

ভারতবর্ষের তুলনায় জগতের অপরাপর প্রত্যেক জাতি যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনায় অপেক্ষাকৃত অনেক তরুণ, তাহা বিভিন্ন প্রাচীন জাতির প্রাচীন গ্রন্থগুলির বয়স দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

জগতে বর্ত্তমানে যে গ্রন্থগুলি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া পরিচিত—তাহার মধ্যে বেদের নাম, বাইবেলের নাম এবং কোরাণের নাম সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। খৃষ্টদেবের জন্মের পর বাইবেল্ প্রণীত হইয়াছে। কাজেই বাইবেলের বয়স দুই হাজার বৎসরের অনধিক বলিতে হইবে। কোরাণ প্রণীত হইয়াছে নবী মহম্মদের জন্মের পর। হইতে পারে, তাহার উপদেশগুলি অনেক আগেই বিদ্যমান ছিল, কিন্তু গ্রন্থখানি যে, গ্রন্থকারের জন্মের পর প্রণীত হইয়াছে, তাহা যুক্তিসঙ্গত ভাবে অস্বীকার করা যায় না। কাজেই কোরাণকেও দেড় হাজার বৎসরের অনধিক কালের বলিতে হইবে। বেদ যে কত দিনের, তাহা কেহ আজ পর্য্যন্ত সঠিকভাবে নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই। বেদে, বেদাঙ্গে, পাণিনিতে, মীমাংসায়, দর্শনে, পুরাণে এবং প্রাচীন স্মৃতিতে কি আছে, তাহা যখন মানুষ **ধারাবাহিক রূপে** আংশিকভাবেও জানিতে পারিবে, তখন বেদ যে ৩৬০০০ বৎসরেরও অধিক কালের, তাহা বলিতে বাধ্য হইবে। আধুনিক কালের যাঁহারা বেদ ও অন্যান্য ভারতীয় জ্ঞানের বিবিধ গ্রন্থের মূলভাগ নিবিষ্ট চিত্তে না পড়িয়াই বেদের বয়ঃক্রম নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারাও কেহ বেদ যে চারি হাজার বৎসরের অনধিক বয়স্ক, তাহা বলিতে পারেন নাই।

মানুষ হিসাবে ইয়োরোপীয়গণ, বিশেষতঃ ইংরাজগণ বর্ত্তমান কালের অন্যান্য জাতির তুলনায় যে অনেক ভাল এবং সম্পূর্ণ (thorough), তাহা যাঁহারা তাঁহাদিগের কাহারও সহিত অন্তরঙ্গভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ইয়োরোপীয়গণ অথবা ইংরাজগণ মানুষ হিসাবে বর্ত্তমান কালের অপরাপরের তুলনায় ভাল এবং সম্পূর্ণ হইলেও তাঁহাদের জাতি যে, বয়সে অনেকের তুলনায় তরুণ, তাহা বাস্তব সত্য।

ভারতের মানুষগুলি অমানুষ হইয়া পড়ায় এবং ইংরাজগণ মানুষ হিসাবে ভারতীয়গণের তুলনায় ভাল ও সম্পূর্ণ (thorough) হওয়ায় ভারতবর্ষের রাজত্ব ভগবান্ ইংরাজের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন। ভারতের রাজত্ব ইংরাজের হস্তে ন্যস্ত হওয়া অবধি ইংরাজ জাতি হিসাবে জগতের সকলের চক্ষুতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মাননীয় হইয়াছেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অথবা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, ভারতবর্ষের জমীর যে স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি ছিল এবং তাহা হইতে যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইত, তদ্দ্বারা ভারতবাসীর প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া অনেক পরিমাণ শস্য উদ্বৃত্ত হইত। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঐ শস্যে বাণিজ্য করিয়া ইংরাজগণের পক্ষে ধনবান্ হওয়াও সম্ভব হইয়াছিল। ইংরাজগণের মধ্যে কেহ কেহ উপরোক্ত ঐতিহাসিক সত্যগুলি না বুঝিতে পারিয়া মনে করিয়া থাকেন

।, তাঁহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করিতে পারিয়া-
ছলেন বলিয়া জগতের মধ্যে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া-
ছেন এবং ধনবান্ হইতে পারিয়াছেন। যে সমস্ত ইংরাজ
জদিগকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা
কৃত সত্য আদৌ বুঝিতে পারেন না। ভারতবর্ষের জমী
নই স্বর্ণ প্রসব করিতে পারিত যে, ভারতীয় জমীদার-
ন্তানগণ এককালে বংশপরম্পরায় কোনরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞান
র্জ্জন না করিয়া, পরন্তু কুৎসিত আনন্দে সময় ক্ষেপ করিয়াও
তিষ্ঠাবান্ ও ধনবান্ হইতে পারিতেন।

ভারতের রাজত্ব লাভ করিবার পর ইংরাজ হইয়াছিলেন
রতীয় জমীদারের জমীদার। কাজেই তাঁহাদের পক্ষে
তিষ্ঠাবান্ ও ধনবান্ হইবার জন্য জ্ঞানবান্ হইবার কোন
য়োজন হয় নাই। তাঁহারা যদি বিন্দুমাত্রও জ্ঞানবান্
তেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সমাজে অবাধে কামোদ্দীপক
শভূষা, চালচলন এবং জুয়া চলিতে পারিত না এবং তাহার
দর হইত না। তাঁহাদের জ্ঞান যদি প্রাথমিক জ্ঞানের সীমা
ন্তও পৌঁছিতে পারিত, তাহা হইলে তাঁহারা দেখিতে
ইতেন যে, প্রকৃতি দেবী সমস্ত জীবের আহারের সংস্থান
রিয়া রাখিয়াছেন, আশী বৎসরের মধ্যেই মানুষের অকাল-
ত্যু সাক্ষাৎ ভাবে প্রকৃতির নিয়মানুগ নহে এবং তাহা মানু-
। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভাব ও বিকৃতির ফলে ঘটিয়া থাকে।
হাদের জ্ঞান যদি একটুও মার্জ্জিত হইত, তাহা হইলে
হারা বুঝিতে পারিতেন যে, যিনি জীবন দিয়াছেন, তিনিই
ষের জীবনধারণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং তাঁহারা
তে পারিতেন না যে, জগতে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি
তেছে বলিয়াই মানুষের জীবনধারণ অসম্ভব হইয়া
তেছে এবং মানুষের জন্ম নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রয়োজন
ছ। তাঁহাদের জ্ঞান যদি পরিমার্জ্জনার কোন স্তরে
ছিতে পারিত, তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন যে,
তি দেবীর প্রয়োজনীয় আয়োজন ও ব্যবস্থা সত্বেও মানুষ
জীবনধারণে ক্লেশভোগ করিয়া থাকে, তাহার একমাত্র
। যথোপযুক্ত শিক্ষার অভাব। তাঁহাদের জ্ঞান যদি কোন
স্তরে পৌঁছিতে পারিত, তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতে
তেন যে মানুষের সুখে স্বচ্ছন্দে [illegible]ন ধারণ করিতে হইলে
স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি কাহাকে বলে এবং কি করিয়া
তাহার রক্ষা করিতে হয়, তাহা জানা এবং তদনুরূপ ব্যবস্থা
করা মানুষের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য এবং তাহা যদি তাঁহারা
জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন যে, মানুষের
সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে হইলে দ্রুতগামী যানবাহনের
প্রয়োজনীয়তা অতি সামান্য এবং এই দ্রুতগামী যানবাহনের
পদ্ধতি সুচিন্তিত না হইলে, মানুষের উপকার অপেক্ষা অধিক-
তর অপকারই সাধন করিয়া থাকে এবং তাঁহারা দ্রুতগামী
যানবাহনের আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন বলিয়া গৌরবানু-
ভব করিতে পারিতেন না।

প্রকৃত পক্ষে যাহাকে মানুষের হিতকর জ্ঞান-বিজ্ঞান বলা
যাইতে পারে, তাহা ইংরাজ জাতি আদৌ অর্জ্জন করিতে পারেন
নাই এবং তাহারই জন্য তাঁহারা ভারতবর্ষের জমীর স্বাভাবিক
উর্ব্বরাশক্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। ভারতবর্ষের জমীর
স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়াই আজ
সারা জগৎ বিপন্ন, তাই আজ জগতের প্রায় প্রত্যেক দেশ
বারুদস্তূপের উপরে বসিতে বাধ্য হইয়াছে। জগতের প্রায়
সর্ব্বত্র যে শ্রমজীবিগণের ভীষণ বিদ্রোহের আশঙ্কা উপস্থিত
হইয়াছে, তাহা যাঁহারা চক্ষু ও কর্ণ মেলিয়া বাস্তব ঘটনা লক্ষ্য
করিতে পারেন, তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। শ্রম-
জীবিগণের ভীষণ বিদ্রোহের আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে
বলিয়াই জগৎ বারুদস্তূপের উপর বসিয়া রহিয়াছে, ইহা বলা
যাইতে পারে।

বর্ত্তমান লেখার নিমিত্ত হয়ত অনেকে আমাকে উপহাস
করিবেন, আমি তাঁহাদিগকে দশ বৎসর অপেক্ষা করিতে
বলি। আগামী দশ বৎসরের মধ্যে যাহা যাহা ঘটিবে, তাহা
উপরোক্ত কথাগুলির সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের চারিটী শাখা আছে। প্রথমতঃ, দুনিয়ায়
যাহা বাস্তবিক পক্ষে ঘটিয়া থাকে এবং যাহা চর্ম্মচক্ষু দ্বারা
দেখিতে পাওয়া যায়, কর্ণের দ্বারা শুনিতে পাওয়া যায়, নাসিকা
দ্বারা যাহার গন্ধ লওয়া যায়, তাহার পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়।
এই জাতীয় জ্ঞানার্জ্জন করাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রথম শাখা।
ইহাকে প্রাচীন কালে "লৌকিক জ্ঞান" বলা হইত।

দ্বিতীয়তঃ, লোকতঃ যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহা কোন্ কোন্
অব্যক্ত কারণবশতঃ ঘটিতেছে, তাহার পর্য্যবেক্ষণ করিতে ও
অনুভব করিতে হয়। অব্যক্ত কারণের জ্ঞানার্জ্জন করাই

জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বিতীয় শাখা। ইহাকে প্রাচীনকালে "সাংখ্য জ্ঞান" বলা হইত।

তৃতীয়তঃ, যে যে অব্যক্ত কারণে লৌকিক কার্য্য হইয়া থাকে, তাহা শরীরমধ্যস্থ কোন্ উপাদানবশতঃ ঘটিতেছে, তাহার পর্য্যবেক্ষণ ও অনুভব করিতে হয়। ইহাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের তৃতীয় শাখা এবং ইহাকে প্রাচীনকালে "ব্রহ্মতত্ত্ব" বলা হইত।

চতুর্থতঃ, শরীরাভ্যন্তরস্থ যে উপাদান বশতঃ অব্যক্ত-কারণের ও লৌকিক কার্য্যের উদ্ভব হইয়া থাকে, তাহা কোথা হইতে, কি উপায়ে শরীরাভ্যন্তরে উৎপন্ন হইতেছে, তাহার পর্য্যবেক্ষণ ও অনুভব করিতে হয়। ইহাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চতুর্থ শাখা এবং ইহাকে প্রাচীনকালে "শিবতত্ত্ব" বলা হইত।

মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পূর্ণ করিতে হইলে যে, উপরোক্ত চারিটী শাখার কার্য্যের প্রয়োজন হয়, তাহা একটু ভাবুকতার সহিত চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাস্তব জগতে যাহা ঘটিতেছে, তাহা নিপুণতার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কোন্ অব্যক্ত কারণে তাহা ঘটিতেছে, জীবের অভ্যন্তরের কোন্ উপাদান বশতঃ ঐ অব্যক্ত কারণের উদ্ভব হইতেছে এবং যে উপাদান বশতঃ জীবের অভ্যন্তরে ঐ অব্যক্ত কারণের উদ্ভব হইতেছে, সেই উপাদান জীব কোথা হইতে, কি পদ্ধতিতে সংগ্রহ করিতেছে, তাহা সম্পূর্ণভাবে ধারাবাহিক রূপে জানা না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন বিশ্বাসযোগ্য জ্ঞান অর্জ্জিত হয় নাই, ইহা বলা যাইতে পারে।

পাশ্চাত্য জগতে যে ঐ জাতীয় সম্পূর্ণ ধারাবাহিক জ্ঞানের কোন পরিচয় নাই, তাহা যাঁহারা পাশ্চাত্য গ্রন্থগুলি ঘাঁটিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা কোন ক্রমেই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যাঁহারা তদ্বিরুদ্ধ কথা কহিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রায়শঃ পাশ্চাত্য জগতে কি কি গ্রন্থ আছে এবং পাশ্চাত্য জগৎ এখন পর্য্যন্ত কোন্ বিষয়ের কতখানি পর্য্যন্ত আলোচনা করিতে পারিয়াছেন, তাহাও পরিজ্ঞাত হন না। বস্তুতঃ, প্রায়শঃ কেহ তাহা পরিজ্ঞাত হইবার সুযোগ পর্য্যন্ত পান না। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে শিক্ষার যে ধারা চলিয়াছে, তাহাতে কয়েকটী বিষয়ের সামান্য কয়েকখানি পুস্তক মাত্র পড়িলেই এবং তাহা হইতে সংলগ্ন অথবা অসংলগ্নভাবে কোন কোন গ্রন্থকারের কতকগুলি বচন উদ্ধৃত করিয়া এক একটী প্রবন্ধ রচনা করিতে পারিলেই পি-এইচ্-ডি, ডি-এস্-সি এবং ডি-লিট্ প্রভৃতি উপাধি অর্জ্জন করিতে পারা যায় এবং যিনি ঐ জাতীয় কোন উপাধি অর্জ্জন করিতে পারেন, বর্ত্তমান পদ্ধতি অনুসারে তাঁহাকে সমাজ শিক্ষিত অথবা জ্ঞানী বলিতে বাধ্য হয়।

অথচ এম্-এ পর্য্যন্ত পাশ করিবার জন্য ছাত্রগণ যে সমস্ত পুস্তক পড়িয়া থাকেন, তাহা পাশ্চাত্য জাতিগণের সমগ্র গ্রন্থরাশির অতি সামান্য ভগ্নাংশমাত্র। যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখিবার জন্য ছাত্রদিগকে পি-এইচ্-ডি, ডি-এস্-সি, এবং ডি-লিট্ উপাধি দেওয়া হয়, তাহা যদি কোন বাস্তবতা-পর্য্যবেক্ষণে সমর্থ ব্যক্তি পাঠ করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, সেই প্রবন্ধগুলি প্রায়শঃ অসংলগ্ন কথায় পরিপূর্ণ এবং তাহাতে রচনাকারীর বাস্তবতা পর্য্যবেক্ষণ করিবার সামর্থ্যের অভাবের পরিচয় থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পণ্ডিতগণের মধ্যে হয়ত কেহ কেহ মনে করেন যে, পাশ্চাত্য জাতিগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু উপরোক্ত কারণে তাঁহাদিগকে অবিশ্বাস্য মনে করিতে হইবে।

জাতীয় জীবনের যে বয়ঃক্রম হইলে প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হইতে পারে, সেই বয়স একমাত্র চীন ও ভারতবর্ষে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই দুইটী জাতিই মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন রহিয়াছেন।

ভারতবাসীর মোহনিদ্রা অপরিসীম। তাঁহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানে কি আছে এবং সংস্কৃত ভাষায় কয়খানি গ্রন্থই বা আছে, তাহা পর্য্যন্ত প্রায়শঃ কেহ সম্যক্ ভাবে পরিজ্ঞাত হইবার চেষ্টা করেন না।

ভারতীয় ঋষির জ্ঞান-বিজ্ঞানে কি আছে এবং সংস্কৃত ভাষায় প্রাচীন গ্রন্থই বা কয়খানি, তাহা যে প্রায়শঃ কেহ জানেন না, তাহার পরিচয় প্রাচীন ভারতের প্রচলিত ইতিহাস এবং বেদাদি গ্রন্থের প্রচলিত ব্যাখ্যা।

ভারতীয় ঋষির জ্ঞান-বিজ্ঞানে কি আছে এবং সংস্কৃত ভাষায় প্রাচীন গ্রন্থই বা কয়খানি এবং তাহার কোন্ খানির মধ্যে কি আছে, তাহার অধিকাংশ যদি কেহ আংশিক ভাবেও জানিতেন, অথবা ঐগুলি জানিবার চেষ্টা করিয়া ইতিহাস

াতেন, তাহা হইলে বর্ত্তমানে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস াা যাহা চলিতেছে, তাহা চলিতে পারিত না এবং বেদাদি র প্রচলিত ব্যাখ্যাও নাকচ হইয়া জনসাধারণের প্রয়ো- য় ব্যাখ্যায় পরিণত হইত।

ভারতবাসীর মোহনিদ্রা যে অপরিসীম, তাহা প্রতিপন্ন তে হইলে পণ্ডিতসমাজের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতেই ব। হয়ত কেহ কেহ তাহাতে তীব্রতার সন্ধান বেন। মনের কোন্ বেদনা লইয়া রচনাকারী ঐ জাতীয় া করিতে বাধ্য হইতেছেন, তাহা অনুমান করিবার চেষ্টা য়া, আশা করি পাঠকবর্গ আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

ভারতবর্ষ বর্ত্তমানে প্রধানতঃ দুইটী সম্প্রদায়ে বিভক্ত। টীর নাম মুসলমান এবং অপরটীর নাম হিন্দু।

মুসলমানগণ বস্তুতঃ ভারতবাসী হইলেও তাঁহাদের াচলনে তাঁহারা যে ভারতবাসী, তাহা বুঝিয়া উঠা শক্ত। ন-বিজ্ঞানক্ষেত্রে যে হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি কথা থাকিতে ের না, মুসলমানগণের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক প্রাচীন ই যে তাৎকালিক হিন্দুদিগের সাহচর্য্যে সংস্কৃত গ্রন্থাবলম্বনে ত, তাহা তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে করিবার রণ আছে। আধুনিক মুসলমানগণ প্রায়শঃ সংস্কৃত গ্রন্থ- লকে পরের জিনিষ এবং অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করিয়া কন।

হিন্দুদিগের মধ্যে যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং হারা ডি-লিট্, পি-এইচ্-ডি, ডি-এস্-সি, এম্-এ প্রভৃতি াধিলাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন যে, জগতের সমগ্র গ্রন্থসংখ্যার কয়খানি তাঁহারা পড়িয়া কেন এবং সম্পূর্ণ জ্ঞানভাণ্ডারের কতটুকু তাঁহারা অর্জ্জন রিতে পারেন, অথচ তাঁহারা স্ব স্ব বিদ্যায় মত্ত হইয়া অপরকে া মনে করিতে একটুও কুণ্ঠানুভব করেন না। এইরূপে দ্যার মত্ততার ফলে তাঁহারা স্ব স্ব অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে প্রায়শঃ জ্ঞান থাকেন এবং কোথায় কি রহিয়াছে, তাহা জানিবার যোগ তাঁহাদের হয় না। অপরন্তু, বর্ত্তমান কালে প্রকৃত জ্ঞান- জ্ঞান লাভ না করিয়াও আত্ম-বিজ্ঞাপনের ও দলাদলি গঠনের পুণতা অর্জ্জন করিতে পারিলেই গভর্ণমেণ্টের ও জন- ধারণের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া স্যার, সি-আই-ই ভৃতি উপাধিতে ভূষিত হওয়া [illegible] তাহার ফলে উচ্চ উপাধিধারিগণ প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হইয়া আত্ম-বিজ্ঞাপনের কার্য্যে এবং "এসোসিয়েসন" গঠনে অধিকতর মনোযোগী হইয়া থাকেন।

হিন্দুদিগের মধ্যে যাঁহারা পুরুষ-পরম্পরায় সংস্কৃত গ্রন্থগুলি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন বলিয়া অভিমান পোষণ করিয়া থাকেন, সেই ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের বুদ্ধি প্রায়শঃ অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। দারিদ্র্য তাঁহাদের নিত্যসঙ্গী হইয়াছে, দারিদ্র্যের জন্য তাঁহারা যাতনাও অনুভব করিয়া থাকেন, অথচ তাঁহাদের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে, দারিদ্র্য-যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারাই পরকালে স্বর্গ লাভ করিবার প্রকৃষ্ট পন্থা। ইঁহারা "পরকাল", "স্বর্গ" প্রভৃতি শব্দের অর্থ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারেন না, অথচ "পরকাল", "স্বর্গ" প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করিয়া অথবা বক্তৃতা প্রদান করিয়া নিজদিগকে "পণ্ডিত" মনে করিয়া থাকেন। এইরূপে তাঁহারা সর্ব্বদা আত্ম-প্রতারণার কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। ইঁহারা জানেন না যে, প্রকৃত সংস্কৃত ব্যাকরণের নির্দ্দেশানুসারে সংস্কৃত ভাষা বুঝিতে হইলে প্রত্যেক শব্দের যে অর্থ, তাহা প্রত্যক্ষ (১) করিবার সামর্থ্য অর্জ্জন করিতে হয় এবং প্রত্যক্ষের অযোগ্য কোন অর্থ যদি শব্দের অর্থ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে ঐ শব্দ বুঝা হয় নাই বলিয়া ধরিয়া লইতে হয় (২)।

মুখ্যতঃ ইঁহাদেরই কার্য্যকলাপের ফলে প্রকৃত সংস্কৃত ভাষাটী নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ঋষিদিগের অমূল্য জ্ঞান ভাণ্ডার বিলুপ্ত হইয়া রহিয়াছে এবং জগৎ বর্ত্তমান দশায় উপনীত হইয়াছে।

বর্ত্তমান কালে কোন একখানি গ্রন্থ বুঝিতে হইলে, আমরা সাধারণতঃ ঐ গ্রন্থের পূর্ব্ববর্ত্তী ও কোন সমসাময়িক ব্যাকরণের অথবা অভিধানের সহায়তা লইয়া থাকি। ঐ গ্রন্থে যে সমস্ত শব্দ ও বাক্য ব্যবহৃত হয়, তাহা যদি পূর্ব্ববর্ত্তী অথবা সম- সাময়িক কোন অভিধান অথবা ব্যাকরণের দ্বারা বুঝা না

(১) সত্যা বিশুদ্ধিস্তত্রোক্তা বিদ্যৈবৈকপদাগমা।
যুক্তা প্রণবরূপেণ সর্ব্ববাদাবিরোধিনী॥
বাক্যপদীয়, ১ম কাণ্ড, ৯ম শ্লোক।

(২) তত্ত্বার্থবাদরূপাণি নিশ্রিতাঃ সবিকল্পজাঃ।
একত্বিনাং দ্বৈতিনাং চ প্রবাদা বহুধা মতাঃ॥
বাক্যপদীয়, ১ম কাণ্ড, ৮ম শ্লোক।

যায়, তাহা হইলে আমরা ঐ গ্রন্থখানিকে ভ্রমপূর্ণ বলিয়া থাকি। কোন গ্রন্থ যে অর্থে প্রচলিত থাকে, তাহার ঐ অর্থ যে সঠিক, তাহা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অথবা সমসাময়িক ব্যাকরণ ও অভিধানের দ্বারা নিষ্পন্ন করিতে হয়। যদি কোন গ্রন্থের কোন অর্থ তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অথবা সমসাময়িক ব্যাকরণ, অথবা অভিধানের দ্বারা নিষ্পন্ন না করা যায়, তাহা হইলে আমরা বুঝিয়া থাকি যে, ঐ গ্রন্থের ঐ অর্থ ভ্রমাত্মক। যদি দেখা যায় যে, কোন ভাষায় কোন গ্রন্থের অর্থই কেহ তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অথবা সমসাময়িক ব্যাকরণ অথবা অভিধানের দ্বারা নিষ্পন্ন করিতে পারিতেছেন না, তাহা হইলে বুঝিতে হয় যে, ঐ ভাষা মানুষ বিস্মৃত হইয়াছে।

একমাত্র "পাণিনি" ও "নিরুক্ত" বেদাদি গ্রন্থের সমসাময়িক অথবা পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাকরণ ও অভিধান। বর্ত্তমানের আর সমস্ত অভিধান ও ব্যাকরণ "পাণিনি" ও "নিরুক্তে"র পরবর্ত্তী, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। বর্ত্তমান কালে বেদাদি গ্রন্থ যে অর্থে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা "পাণিনি" ও "নিরুক্ত" দ্বারা নিষ্পন্ন করা যায় না। মনে রাখিতে হইবে যে, মূল অষ্টাধ্যায়ী পাণিনিতে কোন ধাতুপাঠ অথবা গণপাঠ নাই। কাযেই বেদাদি বর্ত্তমানে যে অর্থে প্রচলিত রহিয়াছে, সেই অর্থকে ভ্রমাত্মক বলিতে হইবে। পরন্তু "পাণিনি" ও "নিরুক্ত"কে যে অর্থে এখন পণ্ডিতেরা বুঝিয়া থাকেন, তদ্দারা কেহ পরবর্ত্তী অন্য কোন অভিধান, গণ ও ধাতুপাঠের সহায়তা ব্যতীত বেদাদির ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। অতএব এখন আর কেহ বেদ, বেদাঙ্গ, মীমাংসা, পাণিনি, দর্শন, পুরাণ ও প্রাচীন স্মৃতির ভাষা বুঝিতে পারেন না, তাহা যুক্তিসঙ্গত ভাবে বলা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান কালে যেরূপ অন্যান্য ভাষার শব্দের অর্থ বুঝিতে হইলে অভিধানের প্রয়োজন হয় এবং আভিধানিক বিভিন্ন অর্থ লইয়া মতদ্বৈধের সৃষ্টি হয়, ঋষিগণ সংস্কৃত ভাষায় সেইরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করেন নাই। তাঁহারা পদের অর্থ বুঝিবার জন্য শব্দের অর্থাৎ অক্ষরের (১) এবং বর্ণের (২) অর্থ ব্যবহার করিতেন।

কাযেই ভাষা বুঝিবার জন্য তাঁহাদের পদ্ধতি অনুসারে অক্ষরের এবং বর্ণের অর্থ কি করিয়া বুঝিতে হয়, তাহা প্রথমতঃ জানিবার প্রয়োজন হইত। তাঁহারা যে ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে অক্ষরের এবং বর্ণের অর্থ কি করিয়া বুঝিতে হয়, তাহার পদ্ধতি সন্নিবিষ্ট আছে (৩)। যদি তাঁহাদের ভাষা বুঝিতে ব্যাকরণ ছাড়া আর কিছুর সহায়তা লইতে হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাঁহাদের ব্যাকরণ যথাযথ ভাবে বুঝা হয় নাই এবং তাঁহাদের ভাষাশিক্ষাও হয় নাই।

তাঁহাদের পদ্ধতি অনুসারে সংস্কৃত ভাষা বুঝিবার দ্বিতীয় সোপান—বর্ণের অর্থ দ্বারা পদের অর্থ কি উপায়ে নিষ্পন্ন করিতে হয়, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া। পদের যে অর্থ বর্ণের অর্থের সহিত সমঞ্জস নহে এবং যে অর্থ বাক্য দেখিয়া অনুমান করা হয়, সেই অর্থ তাঁহাদের মতে ভ্রমাত্মক*।

অথচ পণ্ডিতগণ আজকাল যে পদ্ধতিতে বেদাদি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থগুলির বাক্যের অর্থ করিয়া থাকেন, তাহাতে সাধারণতঃ "বাক্য" হইতে "পদের" অর্থ অনুমান করা হয় এবং প্রায়শঃ কোন পদেরই অর্থের সংস্কৃত অক্ষরের এবং বর্ণের অর্থের সহিত সামঞ্জস্য থাকে না। বাক্যপদীয়, শাব্দনির্ণয় এবং পাণিনিতে যে অক্ষর ও বর্ণের অর্থোপলব্ধি করিবার এবং অক্ষর ও বর্ণ হইতে পদের অর্থবোধ করিবার পদ্ধতি অতি সুস্পষ্ট ভাবে লিখিত আছে, তাহা পর্য্যন্ত তাঁহারা জানেন না।

আমি ঐ পদ্ধতি অনুসারে বেদাদি প্রাচীন কয়েকখানি গ্রন্থ আংশিক ভাবে পড়িয়া যাহা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে

(১) Sound as it is *sounded* is called শব্দ অথবা অক্ষর।

(২) Sound as it is *written* is called বর্ণ।

(৩) অর্থপ্রবৃত্তিতত্ত্বানাং শব্দা এব নিবন্ধনম্।
তত্ত্বাববোধঃ শব্দানাং নাস্তি ব্যাকরণাদৃতে॥
বাক্যপদীয়, ১ম কাণ্ড, ১৩শ শ্লোক।

* বর্ণাতিরিক্তশব্দাদ্ বা বর্ণবিজ্ঞানসংস্কৃতৈঃ।
স্মারকৈর্বাতিরিক্তৈর্বা বর্ণেভ্যো বার্থধীর্ভবেৎ॥
শাব্দনির্ণয়—১১শ শ্লোক।

* বর্ণাঃ স্বজ্ঞানসংস্কারৈঃ সংভূয়স্মৃতিকারিভিঃ।
ক্রমেণৈকস্মৃতৌ বুদ্ধা বোধয়ন্ত্যর্থমঞ্জসা॥
শাব্দনির্ণয়—১২শ শ্লোক।

* পদে ভেদেঽপি বর্ণানামেকত্বং ন নিবর্ত্ততে।
বাক্যেষু পদমেকং চ ভিন্নেষ্বপ্যুপলভ্যতে॥
বাক্যপদীয়, ১ম কাণ্ড, ৭১ শ্লোক।

* তত্ত্বর্ণব্যতিরেকেণ পদমন্যন্ন বিদ্যতে।
বাক্যং বর্ণপদাভ্যাং চ ব্যতিরিক্তং ন কিঞ্চন॥
বাক্যপদীয়, ১ম কাণ্ড, ৭২ শ্লোক।

* পদে ন বর্ণা বিদ্যন্তে বর্ণেষ্ববয়বা ইব।
বাক্যাৎ পদানামত্যন্তং প্রবিবেকো ন কশ্চন॥
বাক্যপদীয়, ১ম কাণ্ড, ৭৩ শ্লোক।

বলিতে হয় যে, ঐ সমস্ত গ্রন্থ বর্ত্তমানকালে যাহাকে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, প্রাণিতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করা হয়, সেই সকল বৈজ্ঞানিক কথায় পরিপূর্ণ। সেই কথাগুলি যে কত অমূল্য এবং অভ্রান্ত এবং কতখানি বুদ্ধি, পর্য্যবেক্ষণ ও বিচারশক্তি হইতে উদ্ভূত, তাহা ঐ গ্রন্থগুলি লইয়া মাতোয়ারা না হইলে বুঝা যায় না। ঐ গ্রন্থগুলির ভাষা এত সুন্দর এবং সুনিপুণ যে, বর্ত্তমান কালের ভাষার সাহায্যে যে সমস্ত বক্তব্য লিখিতে বঙ্গশ্রীর ১০ পৃষ্ঠা লাগিতে পারে, তাহা ২১০টী পদে এক লাইনে প্রকাশিত হইয়াছে আমার এখনও পুরাণ ও সাংখ্যায়ন সমস্ত মোটামুটি ভাবেও সম্পূর্ণ পড়া হয় নাই। কাজেই ঋষিদিগের জ্ঞানভাণ্ডার বর্ত্তমান কালের কোন ভাষায় পরিবর্ত্তিত করিলে তাহার সম্পূর্ণ কলেবর কতখানি হইতে পারে, তাহা আমি সঠিক বলিতে পারি না। তবে আমার অনুমান হয় যে, ঐ জ্ঞানভাণ্ডার বর্ত্তমান কোন ভাষায় পরিবর্ত্তিত হইলে, উহার কলেবর কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সমস্ত পুস্তক একসঙ্গে যোগ করিলে যে কলেবর হয়, তদপেক্ষা হ্রস্ব হইবে না। ঘটনাচক্রে সংস্কৃত ভাষার উপরোক্ত রহস্য উপলব্ধি হওয়া অবধি আমি কতিপয় প্রখ্যাতনামা পণ্ডিতকে বাক্যপদীয়, শাব্দনির্ণয় ও পাণিনি-কথিত অক্ষর, বর্ণ, শব্দ ও বাক্যের অর্থোপলব্ধি করিবার পদ্ধতি বাঙ্গালা ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি এবং তাহাতে বুঝিয়াছি যে, দারিদ্র্যে এবং অর্দ্ধাশনে তাঁহাদের বুঝিবার সামর্থ্য অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে।

অথচ এই পণ্ডিতগণ তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের মত্ততায় উন্মত্ত। আমাদের সমাজও বুঝে না যে, ভারতীয় ঋষির জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা অটুট থাকিলে তদনুসারে কার্য্য করা সাধারণ মানুষের পক্ষেও অসম্ভব হইত না এবং সাধারণ মানুষ তদনুসারে কার্য্য করিলে ভারতবর্ষে অথবা জগতে অনশন অথবা অর্দ্ধাশন আসিতে পারিত না। ঐ পণ্ডিতগণ ভাষা ভুলিয়া গিয়া ঐ প্রাচীন গ্রন্থগুলির জ্ঞান-বিজ্ঞান বিকৃতার্থে ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছেন বলিয়াই এখন আর সাধারণ মানুষের উপযোগী চালচলনের কোন ব্যবস্থা অথবা সাধারণ মানুষকে কি করিয়া উন্নত করিতে হয় এবং কি উপায়ে তাহাদের অন্নসংস্থান করিতে হয়, তাহার কোন ব্যবস্থা ভারতীয় ঋষির গ্রন্থে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ঐ পণ্ডিতগণের কার্য্যফলে ভারতীয় ঋষিগণের জ্ঞানভাণ্ডারের প্রকৃত অর্থ লুপ্ত হওয়ায় এবং তাহা বিকৃতার্থে প্রচারিত হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে দ্বেষ হিংসা উপস্থিত হইয়াছিল এবং আত্মকলহের উদ্ভব হইয়াছিল।

ঐ আত্মকলহের সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়াই জগতে বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে এবং তাহারই জন্য আজ ভারতে স্বায়ত্তশাসন নাই বলিয়া দৈন্যানুভব করিতে হয়। ভারতের ঋষিগণের উপদেশানুসারে সকল মানুষকে নিজের মত করিয়া দেখিতে হয়*, অথচ এই পণ্ডিতগণের কার্য্যফলে হিন্দু-সমাজের ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ত্রিবর্ণ অন্নদাতা হিন্দু ও মুসলমান কৃষকগণের প্রতি কার্য্যতঃ কুকুর ও বিড়াল অপেক্ষা ঘৃণ্যের মত ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

ঐ পণ্ডিতগণ বস্তুতঃ ঋষিদিগের কোন কথাই নির্ভুল ভাবে জানেন না এবং এখনও তাঁহাদের স্ব স্ব ভ্রম বুঝিতে পারেন না, অথচ হিন্দু-সমাজে এখনও এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা তাঁহাদিগকে প্রকৃত পণ্ডিত বলিয়া মনে করেন। এমন কি গভর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত ইঁহাদিগকে মহামহোপাধ্যায় প্রভৃতি সম্মানজনক উপাধিতে বিভূষিত করিয়া থাকেন।

উপরে যে চিত্র অঙ্কিত করা হইল, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলে নিম্নলিখিত সত্যগুলি বুঝা যাইবে—

(১) এক সময়ে সারা জগতে মানুষের ভিতর দ্বেষ হিংসা ছিল না এবং সমস্ত মানুষ আর্থিক দুঃখ-দুর্দ্দশার হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।

(২) তখন মানুষের ভিতর বৌদ্ধ, খৃষ্টান এবং মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মের উদ্ভব হয় নাই এবং জগতের সমস্ত মানুষ এক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং তাঁহাদের জীবনযাপন-প্রণালী প্রায়শঃ এক রকমের ছিল।•

(৩) যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ফলে সারা জগতের মানুষ দ্বেষহিংসা ভুলিয়া গিয়া মনুষ্য-সমাজে একতা ও সখ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, সেই জ্ঞানবিজ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছিল ভারতবর্ষ হইতে এবং

* আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥
গীতা, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৩২ শ্লোক।

• সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
গীতা, ৯ম অধ্যায়, ২৯ শ্লোক।

তাহা ভারতীয় বেদাদি প্রাচীন গ্রন্থে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত আছে।

(৪) তখন প্রায় সমস্ত মানুষই শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য লইয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতেন এবং জন্মের হারও অপেক্ষাকৃত বেশী ছিল। কাযেই তখন প্রত্যেক দেশেই মোট জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী ছিল।

(৫) তখন প্রত্যেক দেশের মনুষ্যসমাজে "জনসংখ্যা, জন্মনিরোধ ও মানুষের অবস্থা" শীর্ষক আলোচনায় কথিত পনেরটি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল।

(৬) ইহার পর কালের প্রভাবে মানুষের স্বাভাবিক জননশক্তি ও জমীর স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি কমিয়া গিয়াছিল এবং তাহাতে মানুষের সংখ্যা এবং উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ক্রমশঃই কমিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু তখনও এসিয়াখণ্ডের উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বর্ত্তমান কালের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী ছিল।

(৭) যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ফলে সর্ব্বসাধারণের আর্থিক দুর্দ্দশা অপনোদন করা সম্ভব হইয়াছিল, তাহা মানুষ ক্রমশঃ বিস্মৃত হইয়াছিল এবং এই জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া বিকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ঐ জ্ঞান-বিজ্ঞানের নামে চালাইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

(৮) তখন হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত মানুষ আর প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সন্ধান পায় নাই। বর্ত্তমান কালে যাহা জ্ঞান-বিজ্ঞান বলিয়া পরিচিত, তাহা বস্তুতঃ কুজ্ঞান, কারণ তাহা মানুষের দারিদ্র্য বৃদ্ধি করিতেছে।

(৯) প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা যে ভারতবাসিগণ বুঝিতে পারেন না, ইহা তাঁহাদের মোহনিদ্রার ফল। প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা এবং ভারতীয় ঋষিগণের জ্ঞান-বিজ্ঞান পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা না করিয়া তাঁহারা যে বিকৃত ভারতীয় জ্ঞানকে ঋষিদিগের প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান বলিয়া মনে করেন এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে হিতকারী বলিয়া গ্রহণ করেন, ইহাও ভারতবাসিগণের মোহনিদ্রার অন্যতম পরিচয়।

(১০) ষোড়শ শতাব্দী হইতে কালের প্রভাব বশতঃ আবার মানুষের জননশক্তি ও জমীর উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু মানুষের কুজ্ঞানের ফলে মানুষ স্বাস্থ্যবান্ হইয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারিতেছে না। ফলে সর্ব্বত্রই ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ক লোকের সংখ্যা এবং মোট জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে বটে, কিন্তু ৪০ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক লোকের সংখ্যা প্রায়শঃ উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি লাভ করিতেছে না, পরন্তু বহু দেশেই কমিয়া যাইতেছে। জমীরও স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি প্রায় সর্ব্বত্রই বৃদ্ধি পাইতেছে বটে, কিন্তু মানুষের কুজ্ঞানের ফলে তাহা রক্ষিত হইতেছে না। প্রায় সর্ব্বত্রই নদীগুলির গভীরতা কমিয়া যাওয়ায় এবং খনিজ পদার্থ উত্তোলিত হওয়ায় জমী শুষ্ক হইয়া পড়িতেছে।

ফলে যে সমস্ত দেশের কৃষিকার্য্য জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরা-শক্তির উপর নির্ভর করে, সেই সমস্ত দেশে প্রতি বিঘায় উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ প্রতি বৎসর কমিয়া আসিতেছে। যে সমস্ত দেশের কৃষিকার্য্য কৃত্রিম সারের (manure) উপর নির্ভর করে, সেই সমস্ত দেশে প্রতি বিঘায় উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ কিছু বেশী বটে, কিন্তু তাহা কৃষকের পক্ষে লাভজনক নহে, কারণ কৃত্রিম সারের জন্য যে অতিরিক্ত খরচ হয়, তাহার পরিমাণ অধিকতর উৎপন্ন শস্যের জন্য যে লাভ হয়, তদপেক্ষা বেশী। পরন্তু নদীগুলির গভীরতা কমিয়া যাওয়ায় প্রায় সর্ব্বত্রই বন্যা ও প্লাবনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং প্রায় প্রতি বৎসরেই বহু পরিমাণ উৎপন্ন শস্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এক কথায় জগতের সর্ব্বত্রই লাভজনক কৃষিকার্য্য অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। লাভজনক কৃষিকার্য্য অসম্ভব হইয়া পড়িলে কালে মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা করা যে অসম্ভব হইতে পারে, তাহা বলাই বাহুল্য।

এই অবস্থার প্রতিবিধানের একমাত্র উপায় আমাদের পূর্ব্বকথিত পনেরটি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা এবং সর্ব্বপ্রথমে নদীগুলির পঙ্কোদ্ধার করা।

দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান জগতের অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ উপরোক্ত সত্যগুলি বুঝিতে পারেন না। যে শক্তিবলে মানুষের জন্মহার বাড়িয়া যায়, সেই শক্তিবলেই যে জমীর উৎপাদিকা শক্তিও বৃদ্ধি পায়, তাহা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন না।

পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে বলিয়া তাঁহারা আতঙ্কিত হইয়াছেন এবং যাহাতে জন্মসংখ্যা কমিয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন। চল্লিশ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক লোকসংখ্যা যে কোথায়ও উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়িতেছে না, পরন্তু অনেক দেশেই বৃদ্ধ ও প্রবীণ লোকের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে, তাহা তাঁহারা লক্ষ্য করিতেছেন না। শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতি সমস্ত জীবিকার পন্থার মূল যে কৃষি এবং জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি, তাহা তাঁহারা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছেন না।

জীবনের উন্নতি সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইলে মানুষ যেমন দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া আত্মহত্যা করে, সেইরূপ সমাজে জীবিকার উপায়ের পন্থা রুদ্ধ হইলে স্বভাবতঃই মানুষ সন্তানের সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি না পায়, তাহার চেষ্টা করে। সামান্য চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, জন্মনিরোধ আত্মহত্যারই অপর নাম। সাধারণ মানুষ যখন সমস্ত তথ্য না বুঝিতে পারিয়া দুঃখদৈন্যে বিব্রত হইয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হয়, তখন নেতৃবর্গের কর্ত্তব্য তাহা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া এবং যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে দেশের জনসাধারণের দুঃখদারিদ্র্য দূর হয়, সেই ব্যবস্থা যাহাতে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার চেষ্টা করা।

এমন ব্যবস্থা যে থাকিতে পারে, যদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব, তাহা ইয়োরোপীয়গণ তাঁহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অল্পতা হেতু পরিজ্ঞাত নহেন। তাহারই জন্য ইয়োরোপীয় নেতৃবর্গ প্রায়শঃ কোন্ কারণে কি অবস্থার উদ্ভব হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারেন নাই এবং মোট জনসংখ্যার বৃদ্ধি দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়াছেন ও পরোক্ষভাবে জনসাধারণের জন্ম-নিয়ন্ত্রণের সহায়তা করিতেছেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা যদি ভারতীয় নেতৃবর্গের বিন্দুমাত্র জানা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদিগের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার চিহ্ন পরিলক্ষিত হইত এবং তাঁহাদের বক্তৃতায় অথবা প্রবন্ধে অন্য কথার প্রচার হইত, কিন্তু ভারতবাসী পণ্ডিতগণের ভারতবাসিত্ব প্রায় লোপ পাইয়াছে এবং তাঁহারা টীয়াপাখীর মত হইয়া পড়িয়াছেন।

সম্প্রতি আনন্দবাজার পত্রিকায় অধ্যাপক ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় "লোকবৃদ্ধি ও জন্মনিয়ন্ত্রণ" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ভারতবর্ষে জন্ম নিয়ন্ত্রিত না হইলে ভারতবাসীর আর বাঁচিবার উপায় নাই, ইহাই হইল ঐ প্রবন্ধের মূল বক্তব্য। আমরা ডাঃ মুখোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করি যে, জন্মনিরোধ ছাড়া যদি ভারতবাসীকে রক্ষা করিবার আর কোন উপায় না-ই থাকে, তাহা হইলে যে-জনসংখ্যা অতিরিক্ত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার মনে হইতেছে, সেই জনসংখ্যাকে গুলী করিয়া হত্যা করিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিবার চেষ্টা তিনি করেন না কেন?

আনন্দবাজার পত্রিকা বরাবর এই মতবাদের সমর্থন করিয়া আসিতেছেন। আমরা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, তাঁহারা যখন ইংরাজদিগের ভ্রমাত্মক বুলি আওড়াইতে কুণ্ঠাবোধ করেন না, তখন এত জোর গলায় তাঁহাদের স্বাধীনতার বুলি উচ্চারণ করিতে লজ্জাবোধ হয় না কেন?

ভারতীয় অর্থনীতিক সম্মেলনের উনবিংশ অধিবেশন ও অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞগণের কর্ত্তব্যনির্দ্দেশ

গত ২রা জানুয়ারী হইতে ঢাকা সহরে ভারতীয় অর্থনীতিক সম্মেলনের উনবিংশ অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছিল। এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন লাহোরের মিঃ মনোহর লাল, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন মিঃ এ. এফ. রহমান, আর ঐ সম্মেলনের উদ্বোধন করিয়াছিলেন বাঙ্গালার শিক্ষামন্ত্রী খান বাহাদুর আজিজুল হক। এই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল "অর্থনীতিকগণের কর্ত্তব্যনির্দ্দেশ"। সভাপতিগণ ও উদ্বোধক ব্যতীত যাঁহারা ইহাতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়জনের নাম উল্লেখযোগ্য।

(১) অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার,

(২) মিঃ পি. এস. লোকনাথম্,
(৩) " এ. ভি. আয়ার,
(৪) " বি. এম্. গাঙ্গুলী,
(৫) " এস্. কে. মুনিস্বামী,
(৬) ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায়,
(৭) " এইচ্. এল্. দে,
(৮) " কে. বি. সাহা।

এই অধিবেশনে যতগুলি বক্তৃতার যে যে অংশ দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলির মধ্যে খান বাহাদুর আজিজুল হক এবং মিঃ এ. এফ. রহমানের বক্তৃতা ছাড়া আর সব কয়টী বক্তৃতা প্রচলিত রীতি অনুসারে উচ্ছ্বসিত প্রশংসার যোগ্য; কারণ তাহার সব কয়টীর প্রধান প্রধান বক্তব্য অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকে অথবা পাশ্চাত্য অর্থনৈতিক বিশারদগণের প্রবন্ধে খুঁজিয়া পাওয়া যায় এবং কোনটীতেই প্রকৃত চিন্তার কোন খাদ্য নাই। দেশের লোক না খাইয়া মরে, মরুক, তাহাতে তাঁহাদের কিছু আসে যায় না, তাঁহাদের অন্নোপচার ঠিকই হইতেছে এবং তাঁহাদের পাণ্ডিত্য ঠিকই বজায় রহিয়াছে। অধিবেশনের মূল উদ্দেশ্য যাহা ছিল বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে, সেই অর্থনৈতিকগণের কর্ত্তব্যনির্দ্দেশ সম্বন্ধে ধারাবাহিক, শৃঙ্খলিত কোন কথা কোন বক্তৃতাতেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বক্তাগণের নিকট হইতে মিঃ আজিজুল হক তাঁহার উদ্বোধন বক্তৃতায় কয়েকটী অতি প্রয়োজনীয় বিষয় জানিবার জন্য অতি বিনয় সহকারে ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বক্তাগণ যে যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে মিঃ আজিজুল হক সন্তুষ্ট হইতে পারিয়াছেন কি না তাহা আমরা জানি না। তবে কোন বক্তার বক্তৃতায় মিঃ হকের প্রশ্নগুলির জবাব আমরা খুঁজিয়া পাই নাই।

তাঁহার প্রশ্নগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বারটী, যথা—

(১) খাদ্য-সরবরাহের অনুপাতে ভারত জনবহুল হইয়াছে কি না—
(২) আইন-প্রণয়নে পল্লীর ঋণভার কমাইবার সহজ ও সরল পন্থা কি হইতে পারে—
(৩) বিদেশে উপনিবেশ-স্থাপনে জনসংখ্যা কমাইবার সুচিন্তিত পদ্ধতি কি হইতে পারে—
(৪) দেশ হইতে গভর্ণমেণ্ট কি উপায়ে নিরক্ষরতা সত্বর দূর করিতে পারেন—
(৫) পুষ্টিকারিতার অভাবের সহিত সাধারণের শারীরিক দুর্ব্বলতার ও স্বাস্থ্যহীনতার কি সম্বন্ধ—
(৬) এত বড় দেশের সর্ব্বসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য গভর্ণমেণ্টের পক্ষে অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে—
(৭) যে সকল প্রদেশে রাজস্বের ঘাটতি বরাবর চলিয়া আসিতেছে, সেই সকল প্রদেশের ঘাটতি কিরূপে নিবারিত হইতে পারে—
(৮) কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের মধ্যে আয়করের কিরূপ ভাগ-বাঁটোয়ারা হওয়া উচিত—
(৯) পাট উৎপন্নকারী প্রদেশসমূহকে পাট-রপ্তানীর শুল্ক কি ভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে—
(১০) অন্যান্য ষ্টেট ফেডারেল গভর্ণমেণ্টকে কি পরিমাণ রাজস্ব সরবরাহ করিবেন—
(১১) ভূমির স্বামিত্ব সরকারী, ব্যক্তিগত অথবা যুগ্ম অধিকারমূলক হওয়া আবশ্যক এবং উৎপন্ন শস্যে ও জমী-জমায় জমীদারের ও প্রজার মধ্যে কিরূপ বিভাগ থাকা কর্ত্তব্য—
(১২) এদেশে ভূমিরাজস্ব-বন্দোবস্ত স্থায়ী অথবা সাময়িক হওয়া উচিত—

প্রশ্ন কয়েকটী ছাড়া কয়েকটী মন্তব্যও মিঃ হকের বক্তৃতায় প্রকাশ পাইয়াছে। ঐ মন্তব্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য চারিটী, যথা—

(১) এ দেশে স্থায়ী ও উন্নততর জীবিকানির্ব্বাহের উপায় কোন ক্রমেই নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না, কারণ চাষীর ক্রয়শক্তি যেমন একটু বাড়িতেছে, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে।
(২) পল্লীর সংস্কার ও সংগঠনমূলক যে কোনও উপায়ই উদ্ভাবিত হউক, তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে দেশের নিরক্ষরতা প্রধান অন্তরায়।
(৩) কয়েক বৎসর হইতে আমাদের অর্থসঙ্কট চলিয়াছে। কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যহ্রাস হওয়ায় যে নূতন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, অর্থসঙ্কটের সহিত তাহা

মিলিত হওয়ায় আমাদের অর্থনৈতিক জীবন-সংগঠনে নানা অন্তরায়ের সৃষ্টি করিতেছে।

(৪) নূতনের নানা সুবিধা, কিন্তু পুরাতনের তাহা নাই।

ভারতবর্ষের গ্রামগুলির এবং সমাজের প্রাচীন অবস্থা কি ছিল, তাহাতে মানুষের অন্নাভাব ছিল কি না, এখন কি অবস্থা হইয়াছে, কেন সমস্ত স্তরের মানুষের মধ্যে দারিদ্র্যের মাত্রা ও দরিদ্রের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে, এবংবিধ প্রশ্নগুলি বাস্তবতার দিকে লক্ষ্য করিয়া চিন্তা করিতে বসিলে, মিঃ হকের উপরোক্ত চারিটী মন্তব্য সমর্থন করা যায় না বটে, কিন্তু তাঁহার বারটী প্রশ্ন যে, কি উপায়ে দেশের মধ্যে শৃঙ্খলা ও শান্তি বজায় রাখা যায়, তৎচিন্তাপ্রসূত, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। যখন সার্ জন্‌ এণ্ডারসন বাঙ্গালার গভর্ণর হইয়া আসিয়াছিলেন, তখন প্রথম প্রথম তাঁহার কথায় ঐ জাতীয় চিন্তার পরিচয় পাওয়া যাইত। তাহার পর আর আমরা বহুদিন কাহারও মুখ হইতে দেশের প্রকৃত দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য এতখানি চিন্তার পরিচয় পাই নাই। এমন কি, এখন আর সার্ জন এণ্ডারসনের কার্য্যকলাপেও বাঙ্গালা দেশের দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য পূর্ব্বের ন্যায় চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় না। কাজেই আমরা মিঃ আজিজুল হককে আমাদের অভিবাদন জানাইতেছি।

কেন সারা জগতে ক্রমশঃই দারিদ্র্যের মাত্রা ও দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং কি উপায়ে তাহার অপনোদন হইতে পারে, তাহা আমরা বঙ্গশ্রীর এই সংখ্যায় "জনসংখ্যা, জন্ম-নিরোধ ও দেশের অবস্থা"; "দেশের অবস্থা ও তৎসম্বন্ধে আনন্দবাজার পত্রিকা ও ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়" এবং "ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়" শীর্ষক তিনটী আলোচনায় দেখাইয়াছি। ঐ আলোচনা তিনটী মিঃ হককে আমরা পড়িতে অনুরোধ করি।

"জনসংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে বলিয়া এ দেশের স্থায়ী ও উন্নততর জীবিকানির্ব্বাহের উপায় কোন ক্রমেই নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না এবং তাহার জন্য জন্মনিরোধের প্রয়োজন"—ইহা পাশ্চাত্য অর্থনৈতিকগণের অভিমত। মিঃ হকও ঐ মত পোষণ করেন কি না, তাহা তাঁহার বক্তৃতায় স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় নাই। ঐ মতবাদ যে ভ্রমাত্মক, তাহা আমরা "জনসংখ্যা, জন্ম-নিরোধ এবং দেশের অবস্থা" শীর্ষক আলোচনায় প্রতিপন্ন করিয়াছি।

পাশ্চাত্য জাতিগণ প্রধানতঃ তাঁহাদের দুইটী ভ্রমের জন্য জগতের অন্নসমস্যাকে ঘোরাল করিয়া তুলিয়াছেন।

কি করিয়া কৃষিকার্য্যকে লাভবান্ করিতে হয়, তাহা তাঁহারা জানেন না, অথচ তাঁহারা তাঁহাদের কৃষিবিজ্ঞানকে বিশ্বাস করিয়া থাকেন এবং ঐ বিজ্ঞান জগতের সর্ব্বত্র চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহা তাঁহাদের প্রথম ভ্রম। অনেকে মনে করেন, ফ্রান্স, স্পেন, মার্কিণ ও রাশিয়া প্রভৃতি দেশে কৃষি লাভবান্ হইয়াছে, কিন্তু ঐ ঐ দেশের কৃষির অবস্থা গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ দেশগুলির কোনটিতেই কৃষিকার্য্য ব্যাপকভাবে লাভজনক হয় নাই।

পাশ্চাত্য জাতিগণের বিশ্বাস যে, শিল্প ও বাণিজ্য দ্বারা যত লোকের জীবিকা নির্ব্বাহ করা সম্ভব, কৃষি দ্বারা তত লোকের জীবিকা নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভব নহে। ইহা তাঁহাদের দ্বিতীয় ভ্রম।

বস্তুতঃ, কৃষি লাভজনক হইলে কৃষি দ্বারা যত লোকের জীবিকানির্ব্বাহ হওয়া সম্ভব, শিল্প ও বাণিজ্য দ্বারা তত লোকের জীবিকানির্ব্বাহ হওয়া সম্ভব নহে।

মোট জনসংখ্যার জন্য যে পরিমাণ শিল্পজাত দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, সেই পরিমাণ শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা হইয়া থাকে এবং সেই পরিমাণ শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপত্তি ও বাণিজ্য লাভজনক হইতে পারে। চাহিদার অতিরিক্ত শিল্পজাত দ্রব্য উৎপন্ন করিলে শিল্প ও বাণিজ্য লোকসানজনক হইয়া পড়ে। মানুষ যে যে দ্রব্য ব্যবহার করে, তাহার মাত্র দুই আনা শিল্পজাত এবং চৌদ্দ আনা কৃষিজাত। প্রত্যেক মানুষের জীবন ধারণ করিবার জন্য ন্যূনকল্পে যে যে কৃষিজাত দ্রব্য ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা কৃষিবিভাগের কয়জন শ্রমজীবীর কয়দিনের শ্রমজাত এবং তাহার যে যে শিল্পজাত দ্রব্য ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হয়, তাহাই বা শিল্পবিভাগের কয়জন শ্রমজীবীর কয়দিনের শ্রমজাত, ইহা হিসাব করিয়া দেখিলে মানুষ যে মাত্র দুই আনা শিল্পজাত এবং চৌদ্দ আনা কৃষিজাত দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা প্রতিপন্ন হইবে। কাযেই শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং তদ্দ্বারা মোট জনসংখ্যার শতকরা অতি অল্পসংখ্যক মানুষের জীবিকানির্ব্বাহ

করা সম্ভব হইতে পারে। মোট জনসংখ্যার বৃদ্ধি হইলে প্রয়োজনীয় শিল্পজাত ও কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের দ্বারা যে-সংখ্যক মানুষের জীবিকানির্ব্বাহ করা সম্ভব, তাহার হার (ratio) সর্ব্ব সময়েই সমান থাকে। পাশ্চাত্য অর্থনৈতিকগণ এই সত্যটী না বুঝিতে পারিয়া সর্ব্বত্র শিল্পের উন্নতিসাধনের উপদেশে কার্য্যতঃ চাহিদার অতিরিক্ত শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপত্তি সাধন করিবার পরামর্শ দিতেছেন এবং সারা জগৎ বিপন্ন হইয়া পড়িতেছে। তাঁহারা মনে করেন, জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরা-শক্তি সীমাবদ্ধ এবং কৃত্রিম সার ব্যবহার না করিলে জমীর উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব নহে। ঐ ধারণার বশে তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, জনসংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইলে মানুষের অন্নাভাব হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

তাঁহারা জানেন না যে, যে-স্বাভাবিক শক্তিবলে মানুষের জননশক্তি বৃদ্ধি পায়, সেই স্বাভাবিক শক্তিবলেই জমীরও উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কাযেই যখন মানুষের জননশক্তি অর্থাৎ জন্মহার বৃদ্ধি পায়, তখন জমীরও স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যখন মানুষ ও জমীর জননশক্তি বৃদ্ধি পায়, তখন মানুষের জননশক্তি কি করিয়া রক্ষা করিতে হয়, তাহা জানা না থাকিলে, মানুষের অকালমৃত্যু বৃদ্ধি পাইতে থাকে, আর জমীর স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি কি করিয়া রক্ষা করিতে হয়, তাহা জানা না থাকিলে জমী ক্রমশঃই অনুর্ব্বর হইয়া পড়ে। ইহা স্বভাবের নিয়ম।

বর্ত্তমান সময়ে মানুষের ও জমীর উভয়েরই জননশক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে, অথচ পাশ্চাত্য জাতিগণ কি করিয়া তাহা রক্ষা করিতে হয়, তাহা জানেন না বলিয়া প্রত্যেক দেশেই মানুষের অকালমৃত্যু বাড়িয়া যাইতেছে এবং জমীরও স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি কমিয়া আসিতেছে।

মানুষের অকালমৃত্যু যে বাড়িয়া যাইতেছে, তাহা যে-কোন দেশের গত ত্রিশ বৎসরের লোকগণনার বিবরণী পাঠ করিলে পরিষ্কার বুঝা যাইবে। প্রত্যেক দেশেই মোট জনসংখ্যা এবং বাৎসরিক জন্মহার বাড়িয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু কোন দেশেই স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং পরমায়ুর বৃদ্ধি সাধিত হইতেছে না। সেন্‌সাসের রিপোর্টে সর্ব্বত্রই দেখা যাইবে, যে, ৪০ বৎসরের অনূর্দ্ধবয়স্ক লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে বটে, কিন্তু যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, সেই হারে ৪০ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক লোকের সংখ্যা কুত্রাপি বৃদ্ধি পাইতেছে না। পরন্তু বহু দেশে ৪০ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক লোকের মোট সংখ্যাও কমিয়া যাইতেছে। কোন দেশে পরমায়ু যে বাড়িতেছে না, সেন্‌সাসের ঐ বিবরণী তাহার পরিচয়। প্রতি বিঘায় উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ যে সর্ব্বত্রই প্রত্যেক বৎসর কমিয়া যাইতেছে, তাহাও যে কোন দেশের কৃষিবিবরণী পাঠ করিলে বুঝা যাইবে।

প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক সমাজেই পাশ্চাত্য কুজ্ঞান প্রবেশ লাভ করিবার ফলে অবাধে কাম ও প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির উদ্দীপক খাদ্যাদি ও আচার-ব্যবহার চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ফলে যুবক ও যুবতীগণের অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প বয়সেই জীবনীশক্তির হ্রাস আরম্ভ হইয়াছে। তাহার ফলে প্রকৃতির সহায়তায় জন্মের হার বৃদ্ধি পাইলেও মানুষ অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প বয়সে স্বাস্থ্য হারাইয়া অকাল-বার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যু বরণ করিতে বাধ্য হইতেছে। অধিকন্তু পাশ্চাত্য কুজ্ঞানের ফলে শিল্পের উন্নতি এবং সভ্যতার নামে যে সমস্ত পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে বায়ু দূষিত বাষ্পে (carbon dioxide প্রভৃতি) পরিপূর্ণ হইয়া মানুষের জীবন নাশ করিবার সহায়তা করিতেছে। অধিক বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ না হওয়ায় স্বাভাবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য যুবকযুবতীগণ প্রায়শঃ সমাজবিরুদ্ধ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে এবং কৃত্রিম জন্মনিরোধ পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেছেন। তাহাতে তিল তিল করিয়া তাঁহাদের স্নায়বিক শক্তি কমিয়া যাইতেছে এবং ক্রমশঃ বুদ্ধিমান্ মানুষের সংখ্যা জগৎ হইতে অন্তর্দ্ধান পাইতেছে। এমন কি শ্রমজীবীর সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাইতেছে, সেই হারে মস্তিষ্কজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে না। কি উপায়ে মানুষের পরমায়ু বৃদ্ধি পাইতে পারে এবং কি উপায়ে তাহার মস্তিষ্কশক্তি ও কার্য্যক্ষমতার উন্নতি হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করা যে-চিকিৎসকগণের কর্ত্তব্য, সেই চিকিৎসকগণই অল্পবুদ্ধি হইয়া মানুষের অকাল-বার্দ্ধক্য, অকালমৃত্যু, মস্তিষ্কশক্তি ও কার্য্যশক্তির হ্রাসের সহায়তা করিতেছেন।

প্রকৃতির সহায়তাসত্ত্বেও যে, জমীর প্রতি বিঘায় উৎপন্ন শস্যের হার কমিয়া যাইতেছে, তাহার কারণ প্রত্যেক দেশের

নদীগুলির গভীরতা ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে। দেশের মধ্যে নদী যেখানেই থাক না কেন, জমীর বালুকাস্তর পর্য্যন্ত গভীর থাকিলে সারা দেশের সমস্ত জমীর রস পাওয়া সম্ভব হয় এবং দেশে বন্যা-প্লাবনের আশঙ্কা কমিয়া যায়। ঐ রস জমীর সর্ব্বনিম্ন স্তরস্থ খনিজ পদার্থের তেজের সহিত মিশ্রিত হইতে পারিলে স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ উপরোক্ত সত্যটী বুঝিতে পারেন না এবং তাহা না বুঝিবার ফলে মানুষের জীবনের নিদান খনিজ পদার্থগুলি জমী হইতে তুলিয়া লইয়া পরোক্ষভাবে মানুষের বিনাশ সাধন করিতেছেন। তাঁহারা নদীগুলির যে জমীর বালুকাস্তর পর্য্যন্ত গভীরতার প্রয়োজন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাহাদের প্রবাহ (draining of the river) নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, অথচ নদীর গভীরতা সাধন করিবার কোন প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না। তাহাতে প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টের অল্পাধিক ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু কুত্রাপি জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে না এবং বন্যা-প্লাবনের মাত্রা সর্ব্বত্রই বাড়িয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান কালের প্রত্যেক বিভাগের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক-গণের কার্য্য এবং তাঁহাদের বিজ্ঞানের উপদেশ বিশ্লেষণ করিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, তাহার প্রায় প্রত্যেকটী মূলতঃ ভ্রমে পরিপূর্ণ এবং তাহাই মানুষের আর্থিক দুর্দ্দশার উদ্ভব করিতেছে। পাশ্চাত্য জাতিগণ প্রচুর মারণ-যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়া এবং কূটনীতির প্রবর্ত্তন করিয়া জগতের সর্ব্বত্র তাঁহাদের আধিপত্য অটুট রাখিতে পারিবেন বটে, কিন্তু যে পরিমাণ অস্বাস্থ্যের বৃদ্ধি এবং জমীর উর্ব্বরা-শক্তির হ্রাস আরম্ভ হইয়াছে, তাহার প্রতিরোধ অনতিবিলম্বে সাধন না করিতে পারিলে তাঁহাদের নিজেদের অথবা যাঁহাদের উপর তাঁহারা আধিপত্য করিবেন, তাঁহাদের অস্তিত্ব যে আর খুব বেশী দিন বজায় থাকিবে, তাহা যুক্তিসঙ্গত ভাবে মনে করা যায় না। এতগুলি ভ্রম যাঁহাদের আছে, তাঁহাদের মুখেই "যিনি জীবন দিয়াছেন তিনি আহারের ব্যবস্থা করেন নাই" অথবা "মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষের অন্নাভাব অনিবার্য্য" ইত্যাদি উক্তি শোভা পায়। বস্তুতঃ ঐ মতবাদ অসার এবং নিরর্থক।

মিঃ হকের দ্বিতীয় মন্তব্য :—

"পল্লীর সংস্কার ও সংগঠনমূলক যে কোন উপায়ই উদ্ভাবিত হউক তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে দেশের নিরক্ষরতা প্রধান অন্তরায়।" এই মতবাদটীও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের মস্তিষ্কপ্রসূত। দেশে 'অক্ষরতা'র বিস্তার সাধন করিতে পারিলেই যদি অন্নাভাব দূরীভূত হয়, তাহা হইলে ইয়োরোপে এবং মার্কিন দেশে দিন দিন 'অক্ষরতা'র প্রসার সত্ত্বেও অন্নাভাব বাড়িয়া যাইতেছে কেন? মিঃ হক যদি বলিতেন যে, দেশে 'শিক্ষা'র বিস্তার না হইলে পল্লীর সংস্কার ও সংগঠনমূলক কার্য্য সফল করা যায় না, আমরা তাহা হইলে তাঁহার উক্তি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতাম। 'অক্ষরতা' এবং 'শিক্ষা' যে সর্ব্বতোভাবে এক নহে, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে; 'অক্ষরতা' থাকিলেই যে মানুষ 'শিক্ষিত' হয় তাহা বলা যায় না, আবার 'অক্ষরতা' না থাকিলেই যে মানুষ 'অশিক্ষিত' হইবে, তাহাও বলা যায় না।

ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে 'অক্ষরতা' ছিল না তাহা সত্য বটে, কিন্তু তাঁহারা কি বাস্তবিক পক্ষে অশিক্ষিত ছিলেন? তাঁহাদের অন্নাভাব ছিল কি? আমরা মিঃ হককে ভারতের কৃষকদিগের ও পল্লীসমূহের ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে অনুরোধ করি। কেন আমাদের অন্নদাতাগণের নিজেদেরই অন্নাভাব হইল, তাহা যুক্তিসঙ্গত ভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমান তথাকথিত শিক্ষা অথবা 'অক্ষরতা'র প্রসারই তাঁহাদের উত্তরোত্তর অন্নাভাব ও অস্বাস্থ্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

মিঃ হকের তৃতীয় মন্তব্যানুসারে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, কয়েক বৎসর হইতে আমাদের অর্থসঙ্কট চলিতেছে এবং কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস হওয়ায় আমাদের নূতন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে এবং ঐ অর্থসঙ্কট ঐ নূতন সমস্যার সহিত মিলিত হওয়ায় আমাদের অর্থনৈতিক জীবন-সংগঠনে নানা অন্তরায়ের সৃষ্টি করিতেছে। এই মতবাদটীও মিঃ হকের নিজস্ব নহে এবং খুব সম্ভব তিনি নিজে ভারতবাসী রূপে ইহার সমর্থন করিতে পারেন না। উহাও মুখ্যতঃ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের মতবাদ।

দেশের "অর্থ" অথবা "ধন" বলিতে যদি প্রতি বিঘা জমীর উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বুঝিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের

অর্থসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক "অর্থ" অথবা "ধন" বলিতে প্রতি বিঘা জমীর উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বুঝেন না। তাঁহাদের মতে "অর্থ" অথবা "ধন" বলিতে বুঝায় সোনারূপা প্রভৃতি ধাতুর মুদ্রা এবং বিশেষভাবে ছাপান কাগজের (currency note) মুদ্রা। পাশ্চাত্য জাতিগণ যাহাকে অর্থ বলেন, সেই সোনারূপা প্রভৃতি ধাতুর অথবা বিশেষ ভাবে ছাপান কাগজের (currency note) মুদ্রার অভাব এখনও উপস্থিত হয় নাই এবং বর্ত্তমান অবস্থায় হইতে পারে না, কারণ জমীর তলায় এখনও সর্ব্বত্রই প্রচুর পরিমাণে সোনা-রূপা প্রভৃতি ধাতু রহিয়াছে এবং পাশ্চাত্য জাতিগণ তাহা কি করিয়া উত্তোলন করিতে হয়, তাহা অতি সুন্দর ভাবেই শিক্ষা করিয়াছেন এবং প্রতি বৎসরই উত্তোলন করিতেছেন। কারেন্‌সি নোটের মুদ্রার সংখ্যাও বৃদ্ধি করা ছাপাখানার কার্য্য এবং তাহাও খুব কষ্টসাধ্য নহে। বস্তুতঃ দশ বৎসর আগেও জগতে যে পরিমাণ সোনারূপা প্রভৃতি ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রার প্রচলন ছিল, প্রতি বৎসরেই তাহার মোট পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং প্রচলিত কাগজের মুদ্রার পরি-মাণও সমস্ত দেশেই বাড়িয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক যাহাকে অর্থ বলেন, যখন দেখা যায় যে, তাহার পরিমাণ সমস্ত দেশেই ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে, তখন অর্থ-সঙ্কটের কথা তাঁহাদিগের মুখ হইতে নির্গত হইলে বুঝিতে হইবে যে, ঐ সঙ্কট অর্থজাত নহে, পরন্তু উহা অর্থের ব্যবহারের বুদ্ধির বৈকল্যজাত।

কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যের হ্রাস হইলে যে কৃষকদিগের মধ্যে কোন সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে, ইহাও বাস্তবতার দিকে নিরীক্ষণ করিলে স্বীকার করা যায় না। এমন কি ষাট বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী দ্রব্যের মূল্যসম্বন্ধীয় সরকারী কাগজ-পত্র পরীক্ষা করিলেও দেখা যাইবে যে, তখনও বিবিধ কৃষি-জাত দ্রব্যের মূল্য যাহা ছিল, তাহা ঐ ঐ দ্রব্যের আধুনিক মূল্যের তুলনায় অনেক কম, কিন্তু তখনও ভারতের কৃষক-দিগের মধ্যে কোন জটিল সমস্যার উদ্ভব হয় নাই। ভারত-বর্ষে দ্রব্যের মূল্যসম্বন্ধীয় ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আরও দেখা যাইবে যে, আমাদের কৃষকগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঋণ-গ্রস্ত হইয়াছে তখন, যখন পাটের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য দ্রব্যের মূল্যও অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। শুধু ভারতবর্ষে কেন, সমস্ত দেশেই দেখা যাইবে যে, যখন যে যে দেশে দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়াছে, সেই সেই দেশে তখনই দারিদ্র্যের মাত্রা ও দরিদ্রের সংখ্যা বাড়িয়াছে; আবার যখন দ্রব্যের মূল্য কমিয়াছে, তখনই দারিদ্র্যের মাত্রা ও দরিদ্রের সংখ্যা কমিয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বটে যে, দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইলে জন-সাধারণের অধিকতর অর্থাগম হইবার সম্ভাবনা হয়, কিন্তু মানুষের স্বীয় বিক্রয়োপযোগী দ্রব্যের বৃদ্ধি পাইলে তাহার ক্রয়োপযোগী দ্রব্যের মূল্যও বৃদ্ধি পায়। ফলে তাহার বিক্রয়োপযোগী দ্রব্য বিক্রয় করিয়া কিছু অধিকতর অর্থাগম হয় বটে, কিন্তু ক্রয়োপযোগী দ্রব্য কিনিতে অধিকতর অর্থের প্রয়োজন হয়। কাজেই দ্রব্যের মূল্য বাড়িলে মানুষ দরিদ্র হইয়া পড়িতে বাধ্য হয়। বর্ত্তমান অর্থনৈতিকগণ অবস্থার বিবরণী (statistics) যথাযথ ভাবে রক্ষা করিতে অথবা পড়িতে জানেন না এবং তন্নিবন্ধন এই সত্যটুকু না বুঝিয়া মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছেন। কাষেই মিঃ হুকের ঐ মন্তব্যটীরও সমর্থন করা যায় না। কিসের জন্য বিবিধ সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে এবং কি করিলে তাহার অপনোদন হওয়া সম্ভব, তাহা আমরা আগেই দেখাইয়াছি।

মিঃ হুকের চতুর্থ মন্তব্যানুসারে "নূতনের নানা সুবিধা কিন্তু পুরাতনের তাহা নাই"। এই মন্তব্যও স্বভাবসম্মত নহে।

নির্ভরশীল শিশু উপার্জ্জক যুবকের তুলনায় নূতন, অঙ্কুরিত চারা-বৃক্ষ ফলপ্রসূ পরিণত বৃক্ষের তুলনায় নূতন। বস্তুতঃ যে পরিমাণ পুরাতন চাউল হইতে যে পরিমাণ ভাত উৎপন্ন করা সম্ভব, সেই পরিমাণ নূতন চাউল হইতে সেই পরিমাণ ভাত উৎপন্ন করা সম্ভব নহে। নূতন দ্রব্যে অনভ্যাসবশতঃ তাহাকে সুখদ করা অভ্যাস ও সময়সাপেক্ষ। কাষেই, যিনি কেবল নূতনের জন্য মাতোয়ারা হন, তাঁহার নূতনে অভ্যস্ত হইতেই সময় কাটিয়া যায় এবং সুখোপভোগ করা আর সম্ভব হয় না। এই বাস্তব সত্য সত্ত্বেও যে মানুষ নূতনের জন্য মত্ত হয়, তাহার একমাত্র কারণ কুশিক্ষা ও মোহ। পুরাতন যেরূপ প্রকৃত পক্ষে সুখদ, মোহের ইন্ধন জোগাইতে পারিলেও নূতন যে, সেইরূপ বাস্তব সুখের ও সুবিধার উপাদান হয়,

না, তাহা বোধ হয়, যাঁহারা দ্বিতীয় বার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায়শঃ স্বীকার করিবেন।

মিঃ হকের প্রথম প্রশ্ন :—

খাদ্য-সরবরাহের অনুপাতে ভারত জনবহুল হইয়াছে কি না।

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে মোট খাদ্য-শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে কি না তাহা প্রথমতঃ পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে এবং দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে, বাৎসরিক মোট জনসংখ্যার মধ্যে বাৎসরিক মোট খাদ্য-শস্য সমানভাবে ভাগ করিয়া দিলে প্রতি মানুষের ভাগে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য পড়ে, তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে কি না।

কৃষি-বিবরণী ও সেন্সাস-রিপোর্টগুলি পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতবর্ষে যেরূপ মোট জনসংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে, সেইরূপ মোট কৃষিযোগ্য জমীর পরিমাণ ও মোট উৎপন্ন শস্যের পরিমাণও অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পাইতেছে বটে, কিন্তু উপার্জ্জনক্ষম, প্রাপ্তবয়স্ক কৃষকের সংখ্যা এবং প্রতি বিঘায় উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে। প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্তবয়স্ক মোট জনসংখ্যার প্রত্যেকের অংশের খাদ্য-শস্যের পরিমাণও উত্তরোত্তর কমিয়া আসিতেছে। কিন্তু ৪।৫ বৎসর আগেও প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্তবয়স্ক মোট জনসংখ্যার প্রত্যেকের অংশে যে পরিমাণ খাদ্য-শস্য পড়িত, তাহাতে প্রত্যেকের অংশে দৈনিক অর্দ্ধ সের চাউল অথবা গম জুটিতে পারিত। ১৯৩৪ সালেও মোট খাদ্য-শস্যের পরিমাণ ও মোট জনসংখ্যার পরিমাণ যাহা দাঁড়াইয়াছে বলিয়া দেখা যায়, তাহাতে ভারতের প্রত্যেক মানুষটীকে দৈনিক অর্দ্ধ সের পরিমাণের চাউল অথবা গম সরবরাহ করিতে হইলে মোট ৭,৫৪, ৬৭৯ টন কম পড়ে। এই ৭,৫৪,৬৭৯ টন ভারতে মোট যে পরিমাণ খাদ্য-শস্য এখনও উৎপন্ন হইতেছে, তাহার শতকরা ১'৩ অংশ মাত্র। কাযেই এখন পর্য্যন্ত মোট যে-পরিমাণ খাদ্যশস্যের ঘাটতি পড়িতেছে, তাহা উপেক্ষাযোগ্য এবং তজ্জন্য দেশে কাহারও অন্নাভাব উপস্থিত হইয়াছে, ইহা বলা যায় না। পরন্তু যে-পরিমাণ শস্যের ঘাটতি পড়িতেছে, তাহা এখনও পর্য্যন্ত বাহির হইতে আমদানী হইতে পারিতেছে। কাযেই এখনও খাদ্য-সরবরাহের অনুপাতে ভারত জনবহুল হইয়াছে, ইহা মনে করা যায় না। অবশ্য উত্তরোত্তর জনপ্রতি খাদ্য-শস্যের পরিমাণ যেরূপ কমিয়া আসিতেছে, তাহাতে মোট খাদ্য-শস্যের পরিমাণের আরও অধিকতর বৃদ্ধি সাধন না করিতে পারিলে ভারতের প্রত্যেকেরই টাকা থাকিলেও অন্নাভাব হইবার আশঙ্কা আছে, ইহা বলিতে হইবে।

এখনও পর্য্যন্ত মোট খাদ্য-শস্যের পরিমাণ কম না হওয়া সত্ত্বেও যে কৃষকগণের মধ্যে অন্নাভাব উপস্থিত হইয়াছে এবং দেশের শিল্পজীবী ও বাণিজ্যজীবী ও ব্যবসায়জীবিগণ যে অর্থকৃচ্ছ্রতা অনুভব করিতেছেন, তাহার প্রধান কারণ দুইটী, যথা, উপার্জ্জনযোগ্য কৃষকের সংখ্যার হ্রাস এবং প্রত্যেক বিঘায় জমীর উৎপন্ন শস্যের পরিমাণের হ্রাস।

প্রত্যেক পরিবারে উপার্জ্জনযোগ্য কৃষকের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে এবং প্রত্যেক পরিবারেই শারীরিক অক্ষমতা বাড়িয়া যাইতেছে বলিয়া প্রত্যেক কৃষক-পরিবারের মোট জমী কর্ষণ করিবার পরিমাণ কমিয়া যাইতেছে এবং তৎসঙ্গে প্রত্যেক বিঘায় উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ কমিয়া যাইতেছে বলিয়া প্রত্যেক কৃষক-পরিবারের উপার্জ্জন কমিয়া যাইতেছে এবং তাঁহারা অন্নাভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহারাই দেশের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎসংখ্যক। তাঁহারা অন্নাভাবগ্রস্ত হওয়ায় দেশের শিল্পজাত দ্রব্যের যথোপযুক্ত বিতরণ অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে এবং বাণিজ্যের পরিমাণ ও ব্যবসায়ীর কার্য্যের পরিমাণ কমিয়া যাইতেছে। কাযেই দেশের দুর্দ্দশা মোচন করিতে হইলে এবং ইংরাজকে ইংলণ্ডের শিল্পের পক্ষে ভারতাধিকারের প্রয়োজনীয়তা সফল করিতে হইলে, প্রথমতঃ ভারতীয় কৃষকের দুর্দ্দশা মোচন করিতে হইবে। ভারতের কৃষকদিগকে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ অথবা চা-পান, অথবা অক্ষর-পরিচয় প্রদান করিলে তাহাদের দুর্দ্দশা দূর হওয়া ত দূরের কথা, তাহা ক্রমশঃ বাড়িয়াই যাইবে এবং অনতিবিলম্বে ইংরাজ দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহাদের মারণ-যন্ত্র ও কূটনীতিগুলি দ্বারা ভারতবর্ষের আধিপত্য বজায় থাকিলেও ভারতবর্ষের আধিপত্য তাঁহাদের প্রকৃত স্বার্থ-সংরক্ষণের যোগ্য নহে। ভারতের কৃষকদিগের দুর্দ্দশা মোচন করিতে হইলে, প্রথমতঃ যাহাতে উপার্জ্জনক্ষম কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং দ্বিতীয়তঃ যাহাতে প্রত্যেক বিঘা জমীর উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির দ্বারা বৃদ্ধি পাইতে পারে, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

মিঃ হকের দ্বিতীয় প্রশ্ন :—

"আইন-প্রণয়নে পল্লীর ঋণভার কমাইবার সহজ ও সরল পন্থা কি হইতে পারে।"

যাহাতে ঋণী তাহার ঋণ শোধ না করিয়া উত্তমর্ণকে প্রবঞ্চিত করিতে পারে, তাহা করা কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে। ঐরূপ করিলে আপাতদৃষ্টিতে ঋণীকে কিয়ৎপরিমাণে অসুবিধা হইতে মুক্তি দেওয়া হয় বটে, কিন্তু ঋণী ও উত্তমর্ণের মধ্যে যে মনোভাবের উদ্ভব হইবে, তাহাতে ভবিষ্যতে ঋণীকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে এবং গভর্ণমেণ্টকে ঋণী ও উত্তমর্ণ এই উভয়েরই অপ্রিয় হইতে হইবে, কাযেই গভর্ণমেণ্টের ঋণবিষয়ক বর্ত্তমান নীতি অদূরদর্শিতার পরিচয়, ইহা বলিতেই হইবে।

বর্ত্তমানে কৃষকের যে অবস্থা, তাহাতে উত্তমর্ণগণ এখনই যাহাতে কৃষকদিগকে দেনার জন্য ব্যতিব্যস্ত না করিতে পারেন, তদ্বিষয়ক শিক্ষা বিতরণ করিবার প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু যাহাতে উত্তমর্ণগণ মনে করিতে পারেন যে, গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে তাঁহাদের ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, সেইরূপ আইন বিধিবদ্ধ হওয়া কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে।

কৃষকদিগের ঋণভার লাঘব করিবার প্রকৃষ্ট পন্থা—তাঁহারা যাহাতে অধিকতর উপার্জ্জনক্ষম হন, তাহার ব্যবস্থা করা। ইহা কি বুঝা এতই কঠিন?

মিঃ হকের তৃতীয় প্রশ্ন :—

"বিদেশে উপনিবেশ-স্থাপনে জনসংখ্যা কমাইবার সুচিন্তিত পদ্ধতি কি হইতে পারে।"

একে ত দেশের লোকসংখ্যা কমাইয়া কখনও দেশের উন্নতিসাধন সম্ভব হয় না, তাহার পর আবার এখন আর জগতে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে দারিদ্র্যের মাত্রা এবং দরিদ্রের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় নাই। কাযেই এখন আর কোথায়ও কোনও উপনিবেশ-স্থাপনের কথা অথবা তাহার চেষ্টা দূরদর্শিতার পরিচায়ক হইতে পারে না। দেশের জনসংখ্যা কমাইবার অথবা দেশের জনগণ দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেলে কখনও কোন দেশের যে উন্নতি সাধন করা সম্ভব নহে, তাহা ১৯০১ সাল হইতে ১৯১২ সাল পর্য্যন্ত ইটালীতে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা এবং বর্ত্তমান ইটালীর ইতিহাস আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে।

মিঃ হকের চতুর্থ প্রশ্ন :—

"দেশ হইতে গভর্ণমেণ্ট কি উপায়ে নিরক্ষরতা সত্বর দূর করিতে পারেন।"

দেশের কৃষকগণের মধ্যে যাহাতে প্রকৃত 'শিক্ষা'র বিস্তার হয়, তাহা যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং তাহা যে বর্ত্তমান 'অক্ষরতা'-বিস্তারের দ্বারা সাধিত হয় না, তাহা আমরা আগেই দেখাইয়াছি। মানুষ যাহাতে স্বাবলম্বনে, সন্তুষ্ট চিত্তে অন্নাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য উপার্জ্জন করিতে পারে এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন হইয়া দীর্ঘজীবন লাভ করে, তাহার উপায় অভ্যাস করাই প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য। ভারতীয় কৃষকগণ ৫০ বৎসর আগেও কোন চাকুরীর উপর নির্ভর না করিয়া স্বাবলম্বনে, সন্তুষ্টির সহিত স্ব স্ব পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন, তাঁহাদের মধ্যে শান্তি, স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু প্রায়শঃই দেখা যাইত। কাযেই শিক্ষার উদ্দেশ্য কি এবং কোথায় তাহা সফল হইয়াছে, ইহা বিচার করিয়া ভারতীয় কৃষকগণ শিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত, ইহা স্থির করিতে হইলে, তাঁহাদিগকে যুক্তিসঙ্গত ভাবে শিক্ষিত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়। জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি রক্ষিত না হওয়ায় এবং দেশের জলবায়ু বর্ত্তমান বিজ্ঞানের বিভিন্ন পদ্ধতিতে দূষিত হওয়ায়, তাঁহাদের মধ্যে অন্নাভাব, অস্বাস্থ্য এবং অকালমৃত্যু দেখা দিয়াছে। ঐ কারণগুলি দূরীভূত করিতে পারিলে ভারতীয় কৃষকগণ যে কতখানি শিক্ষিত, তাহা মানুষ সহজেই বুঝিতে পারিবেন। কাযেই তাঁহাদের হিতৈষী হইলে তাঁহাদের তথাকথিত নিরক্ষরতা দূর করিবার চেষ্টা না করাই সঙ্গত।

পরন্তু, তথাকথিত আক্ষরিকগণ যাহাতে একটু 'শিক্ষিত' হইয়া পরমুখাপেক্ষী অর্থাৎ চাকুরীর প্রার্থী না হইয়া স্ব স্ব পরিবারের জীবিকার্জ্জন করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা হওয়াই অধিকতর প্রয়োজনীয়।

মিঃ হকের পঞ্চম প্রশ্ন :—

"পুষ্টিকারিতার অভাবের সহিত সাধারণের শারীরিক দুর্ব্বলতা ও স্বাস্থ্যহীনতার কি সম্বন্ধ।"

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে মানুষ কি করিয়া তাহার পুষ্টি রক্ষা করে, তাহা প্রথমতঃ চিন্তা করিতে হইবে। মানুষের

পুষ্টি অর্জ্জন ও রক্ষা করিবার সাধারণ উপায় তিনটী, যথা—

(১) যাহাতে মানুষের গ্রহণযোগ্য বায়ু ও জল বিকৃত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা ;

(২) যাহাতে মানুষ কোনরূপ অপুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করিতে বাধ্য না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা ;

(৩) যাহাতে মানুষ কোন স্বাস্থ্যহানিকর ব্যভিচারে প্রবৃত্ত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা।

বায়ু ও জল বিশুদ্ধ থাকিলে যেরূপ মানুষের স্বাভাবিক পুষ্টি হওয়া সম্ভব, সেইরূপ জমীজাত দ্রব্যেরও স্বাভাবিক পুষ্টি হওয়া সম্ভব। বায়ু ও জল বিকৃত হইলে মানুষ যেমন রুগ্ন হইয়া পড়ে, সেইরূপ জমীজাত শস্যাদিও রুগ্ন হইয়া পড়ে। ঐ রুগ্ন শস্যাদি খাদ্যরূপে গ্রহণ করিতে হইলে মানুষের অস্বাস্থ্য অথবা পুষ্টির অভাব ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বর্ত্তমান সময়ে বৈজ্ঞানিকদিগের খেলায় বায়ু ও জল বিকৃত হওয়ায় মানুষের অস্বাস্থ্য যেরূপ বাড়িয়া যাইতেছে, সেইরূপ শস্যাদির অস্বাস্থ্যও বাড়িয়া যাইতেছে ; এবং ঐ শস্যাদি খাদ্যরূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হওয়ায় মানুষের অস্বাস্থ্য ও দৌর্ব্বল্য অধিকতর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে।

কতকগুলি দাতব্য হাসপাতাল রচিত হইলে রুগ্ন মানুষের রোগের আংশিক ভাবে সাময়িক উপশম সম্ভব হইতে পারে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা মানুষের অস্বাস্থ্য এবং দৌর্ব্বল্য স্থায়ী ভাবে দূর করা সম্ভব হইতে পারে না। এতাদৃশ অবস্থায় মানুষের অস্বাস্থ্য এবং দৌর্ব্বল্য স্থায়ী ভাবে দূর করিতে হইলে তথাকথিত বৈজ্ঞানিকগণ যাহাতে তাঁহাদের কোন খেলার দ্বারা বায়ুকে বিকৃত বাষ্পময় না করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজনীয়।

মিঃ হকের ষষ্ঠ প্রশ্ন :—

"এত বড় দেশের সর্ব্বসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য গভর্ণমেণ্টের পক্ষে অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে।"

পুষ্টিকারিতার সহিত সাধারণের শারীরিক দুর্ব্বলতা ও স্বাস্থ্যহীনতার সম্বন্ধ কি, তৎসম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইবে যে, সর্ব্বসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে বায়ু ও জল যাহাতে দূষিত না হয়, গবর্ণমেণ্টকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সাধারণ কয়েকটী আইন প্রণীত হইলেই ঐ ব্যবস্থা সাধিত হইতে পারে। কাযেই তাহা করা খুব অতিরিক্ত ব্যয়সাপেক্ষ নহে। সাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতির ব্যবস্থা করিতে হইলে, হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ও বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকের পয়ঃপ্রণালী এবং মল-নিষ্কাশন-ব্যবস্থার প্রয়োজন, ইহা ধরিয়া লইলে, অনেক অতিরিক্ত টাকার প্রয়োজন হয় বটে ; কিন্তু তাহাও সংগ্রহ করা বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের অসাধ্য হইতে পারে না। কারণ, টাকা বলিতে স্বর্ণরৌপ্য প্রভৃতি ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রা ও কাগজ-নির্ম্মিত নোট বুঝিতে হয়। আপাতদৃষ্টিতে কাগজনির্ম্মিত মুদ্রা ছাপাইতে হইলে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ রক্ষা করিবার প্রয়োজন হয়। একে ত' জগতের কোন গবর্ণমেণ্টই ঐ নিয়ম অপরিলঙ্ঘিত রাখেন নাই, তাহার পর আবার ঐ নিয়ম রক্ষা করাও খুব কষ্টসাধ্য নহে, কারণ ভারতবর্ষের স্বর্ণখনিগুলি এখনও নিঃশেষিত হইয়া যায় নাই। কাযেই দেখা যাইতেছে, যে-কোন কার্য্যের জন্যই হউক, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে টাকা সংগ্রহ করা একেবারেই কষ্টসাধ্য নহে।

মিঃ হকের সপ্তম প্রশ্ন :—

"যে সকল প্রদেশে রাজস্বের ঘাটতি বরাবর চলিয়া আসিতেছে, সেই সকল প্রদেশের ঘাটতি কিরূপে নিবারিত হইতে পারে।"

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, প্রথমতঃ চিন্তা করিতে হইবে, রাজস্বের ঘাটতি পড়ে কেন। গবর্ণমেণ্ট রাজস্বের দ্বারা তাঁহার আয় সাধন করিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্টের ব্যয় তাঁহার আয় অপেক্ষা বেশী হইলে রাজস্বের ঘাটতি পড়িয়াছে, ইহা বলা হইয়া থাকে। কাযেই, রাজস্বের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, গবর্ণমেণ্টের ব্যয় তদপেক্ষা কম হইলে, কিছুতেই রাজস্বের ঘাটতি পড়িতে পারে না। গবর্ণমেণ্টের যত কিছু ব্যয় আছে, তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, সর্ব্ববিধ ব্যয়ের সম্পূর্ণ পরিমাণের মূলে রহিয়াছে কর্ম্মচারিগণের ও অন্যান্য জনসাধারণের পারিশ্রমিক। ৫০ বৎসর আগেও গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের ও দেশের জনসাধারণের পারি-শ্রমিকের হার যাহা ছিল, বর্ত্তমান কালে তদপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে, অথচ জনসাধারণের ও গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারি-গণের অন্নকষ্ট কিছুমাত্রও কমিয়া যাওয়া ত' দূরের কথা,

ক্রমশঃই তাহা বাড়িয়া যাইতেছে পারিশ্রমিকের হারের বৃদ্ধি সত্বেও কেন জনসাধারণের অন্নকষ্ট বাড়িয়া যাইতেছে, তাহা চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ রূপ হইবার কারণ দুইটী :—

(১) মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য-হারের বৃদ্ধি ; এবং

(২) বিবিধ পণ্যদ্রব্যের মূল্যহারের সাদৃশ্যের অভাব (want of parity)।

কাযেই দেখা যাইতেছে, যাহাতে মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যের বৃদ্ধি না হইতে পারে এবং বিবিধ পণ্যদ্রব্যের মূল্যের সাদৃশ্য থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণকে এবং তৎসংশ্লিষ্ট জনসাধারণকে অপেক্ষাকৃত কম পারিশ্রমিক প্রদান করিলেও তাঁহাদের অন্নাভাবের আশঙ্কা কমিয়া যাইতে পারে। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ও তৎসংশ্লিষ্ট জনসাধারণের পারিশ্রমিক কমিয়া গেলে গবর্ণমেণ্টের খরচ কমিয়া যাওয়া অবশ্যম্ভাবী এবং তখন রাজস্বের পরিমাণ যতই কম হউক, উহার ঘাটতির আশঙ্কা অসম্ভব হইবে।

মিঃ হকের অষ্টম প্রশ্ন : –

"কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের মধ্যে আয়করের কিরূপ ভাগ বাঁটোয়ারা হওয়া উচিত।"

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, প্রথমতঃ চিন্তা করিতে হইবে, গবর্ণমেণ্ট যে জনসাধারণের আয়ের উপর কর স্থাপন করিয়াছেন, তাহার যৌক্তিকতা কোথায়। বস্তুতঃ বিশ্লেষণ করিয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, কোন গবর্ণমেণ্টের জনসাধারণের আয়ের উপর কর স্থাপন করার কোনরূপ যৌক্তিকতা থাকিতে পারে না। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির রাজস্বের উদ্বৃত্তি সাধন করিতে পারিলে, ঐ উদ্বৃত্তি হইতেই কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যয় সঙ্কুলান করা সম্ভব হইতে পারে এবং পণ্যদ্রব্যের মূল্যের হ্রাস সাধিত করিয়া কর্ম্মচারিগণের পারিশ্রমিকের হার কমাইতে পারিলে, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির রাজস্বের উদ্বৃত্তি সম্ভব হইতে পারে। কাযেই বলিতে হইবে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের মধ্যে আয়করের ভাগ-বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে আলোচনার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণই থাকিতে পারে না।

মিঃ হকের নবম প্রশ্ন :—

"পাট-উৎপন্নকারী প্রদেশসমূহকে পাট-রপ্তানীর শুল্ক কি ভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।"

এই প্রশ্নের উত্তরদানকালে মনে রাখিতে হইবে, দেশীয় রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য যত কমিয়া যায়, ততই রপ্তানীর পরিমাণ বাড়িয়া যায় এবং ততই উৎপন্নকারীর লাভবান্ হইবার সম্ভাবনা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অন্যপক্ষে আবার রপ্তানী-দ্রব্যের মূল্যের হার যত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ততই রপ্তানী-দ্রব্যের পরিমাণের হ্রস্বতার আশঙ্কা ঘটে এবং উৎপন্নকারীর লোকসান হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। কোনও দ্রব্যের রপ্তানীর উপর কোন শুল্ক থাকিলে যে, তাহার মূল্য বৃদ্ধি করা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে, তাহা বলাই বাহুল্য। কাযেই প্রজার হিতকামী প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, যাহাতে আমদানী ও রপ্তানীর উপর শুল্ক ধার্য্য না করিয়া গবর্ণমেণ্ট পরিচালনা করা সম্ভব হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা। বর্ত্তমান কালের গবর্ণমেণ্টগুলির ব্যয়াধিক্যবশতঃ এবং বৈজ্ঞানিকগণের কুজ্ঞানবশতঃ তাহা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে ; কিন্তু পণ্যদ্রব্যের মূল্যের হ্রাস ও সাদৃশ্য সাধন করিয়া জনসাধারণের জীবিকানির্ব্বাহে যাহাতে ব্যয়াধিক্য না ঘটে, তাহার ব্যবস্থা সাধন করিতে পারিলে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগকে অপেক্ষাকৃত অনেক কম বেতনদানে, আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের উপর কোন শুল্ক ধার্য্য না করিয়াও রাজ্য-পরিচালনা সম্ভব হইতে পারে। কাযেই পাট-রপ্তানীর শুল্কের ভাগ-বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজনীয়।

মিঃ হকের দশম প্রশ্ন :—

"অন্যান্য ষ্টেট ফেডারেল-গবর্ণমেণ্টকে কি পরিমাণ রাজস্ব সরবরাহ করিবেন।"

যতক্ষণ পর্য্যন্ত ফেডারেল গবর্ণমেণ্টের সংগঠন কিরূপ হইবে এবং ফেডারেল গবর্ণমেণ্টের দ্বারা অন্যান্য ষ্টেটগুলি কোন্ কোন্ জাতীয় সহায়তা লাভ করিবেন, তাহার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অন্যান্য ষ্টেটগুলি তাহাকে কি পরিমাণ রাজস্ব সরবরাহ করিবেন অথবা যুক্তিসঙ্গত ভাবে তাহাদের কি পরিমাণে রাজস্ব সরবরাহ করা উচিত, তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলা যায় না এবং জনসাধারণের বলাও উচিত নহে। উপরোক্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হইবার আগে রাজস্বের

আদান-প্রদান সম্বন্ধে কথা কওয়া জনসাধারণের মধ্যে বিদ্বেষের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে পারে।

মিঃ হকের একাদশ প্রশ্ন :—

"ভূমির স্বামিত্ব সরকারী, ব্যক্তিগত অথবা যুগ্ম অধিকারমূলক হওয়া আবশ্যক এবং উৎপন্ন শস্যে ও জমীজমায়, জমীদারের ও প্রজার মধ্যে কিরূপ বিভাগ হওয়া কর্ত্তব্য।"

এবং তাঁহার দ্বাদশ প্রশ্ন :—

"এদেশের ভূমিরাজস্ব-বন্দোবস্ত স্থায়ী অথবা সাময়িক হওয়া উচিত।"

এই দুই প্রশ্নই অতি বৃহৎ। ইহার যথাযথ উত্তর দিতে হইলে প্রথমতঃ আলোচনা করিতে হইবে, সরকার অথবা গভর্ণমেণ্ট বলিতে কি বুঝায় এবং তাহার প্রয়োজনীয়তা কি এবং দ্বিতীয়তঃ বুঝিতে হইবে, গভর্ণমেণ্ট, জমীদার ও প্রজা, এই তিনের মধ্যে কাহার সহিত জমীর এবং তাহার উৎপন্ন শস্যের কি স্বাভাবিক সম্বন্ধ।

মানুষের জীবনের অনেকগুলি উদ্দেশ্য থাকে। তাহার মধ্যে তাহার প্রথম উদ্দেশ্য, যাহা করিলে তাহার জীবন ধারণ করা সম্ভব, তাহা শিক্ষা করা এবং তদনুরূপ কার্য্য করা। কি করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তাহা শিক্ষা করা এবং তদনুরূপ কার্য্য করাই যে স্বভাবতঃ মানুষের জীবনের প্রথম উদ্দেশ্য, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে, কারণ বাঁচিয়া থাকিতে না পারিলে জীবনের অপর কোন উদ্দেশ্যই সফল হয় না।

যে যে কার্য্য করিলে এক একটী মানুষের বাঁচিয়া থাকা সম্ভব, তাহার কোনটী সম্পূর্ণভাবে কোন মানুষ একাকী সম্পাদন করিতে পারে না। কাযেই মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন হয়। স্ব স্ব জীবনধারণ করিবার জন্য মানুষ যে সঙ্ঘ স্থাপন করে, সেই সঙ্ঘকেই সমাজ, সরকার অথবা গভর্ণমেণ্ট বলা হইয়া থাকে।

যাঁহারা মনে করেন, গভর্ণমেণ্ট না হইলেও মানুষের চলিতে পারে, অথবা যাঁহারা মনে করেন যে, সমাজ ও গভর্ণমেণ্ট দুইটী পৃথক্ জিনিষ, তাঁহারা মানুষের সঙ্ঘতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক্ চিন্তা করেন না এবং প্রকৃতিবিরুদ্ধ কথা কহিয়া থাকেন।

মানুষের বাঁচিয়া থাকিতে হইলে যে, কৃষিকার্য্য একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা আমরা আগেই দেখাইয়াছি। কৃষি সফল করিতে হইলে ত্রিবিধ কার্য্যের প্রয়োজন, যথা—

(১) জমী কর্ষণ করা, বীজ বপন করা, নিড়ান এবং শস্য আহরণ করা ;

(২) যাহা করিলে কৃষকের স্বাস্থ্য ভাল থাকিতে পারে, জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বর্দ্ধিত ও রক্ষিত হইতে পারে, কোন্ জমীতে কোন্ শস্যের বীজ বপন করিলে ঐ জমী সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক হইতে পারে, কিরূপ ভাবে শস্যের আদান-প্রদান করিলে কৃষিকার্য্য লাভজনক হইতে পারে ইত্যাদি নির্দ্ধারিত এবং কার্য্যপ্রসূ হয়, তাহার ব্যবস্থা করা ;

(৩) যাহা যাহা করিলে স্ব স্ব এলাকায় কৃষকের স্বাস্থ্য ভাল থাকে, জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি সংরক্ষিত হয়, জমী ও কৃষিকার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক হয়, তাহা কার্য্যপ্রসূ করিবার ব্যবস্থা করা।

এই তিনটী কার্য্য সমগ্রভাবে কেহ একাকী সম্পাদন করিতে পারে না। কাযেই দেশের কৃষিকার্য্য সফল করিতে হইলে তিন শ্রেণীর লোকের প্রয়োজন হয়। ঐ তিন শ্রেণীর কার্য্যের প্রথমোক্ত কার্য্যগুলি যাঁহারা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে "শ্রমজীবী কৃষক", দ্বিতীয়োক্ত কার্য্যগুলি যাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাঁহাকে "সরকার" অথবা "গভর্ণমেণ্ট" এবং তৃতীয়োক্ত কার্য্যগুলি যাঁহারা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে "জমীদার" বলা হইয়া থাকে।

এই তিন শ্রেণীর কার্য্য অথবা তিন শ্রেণীর লোকের মিলন না হইলে দেশের কৃষিকার্য্য সফল করা সম্ভব হয় না। কাযেই জমী হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাতে ঐ তিন শ্রেণীর লোকেরই অংশ থাকা স্বভাবসম্মত। যাহাতে প্রত্যেক শ্রেণীর লোক স্ব স্ব কার্য্য দ্বারা সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে সংসার-নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয়, কারণ এই তিন শ্রেণীর যে কোন এক শ্রেণীর লোক বিপন্ন হইলে দেশের সমগ্র কৃষিকার্য্য বিপন্ন হইতে পারে। শ্রমজীবী-কৃষকের পক্ষে যতখানি জমী লইয়া কার্য্য করা সম্ভব, তদপেক্ষা অনেক বেশী জমীর তত্ত্বাবধান জমীদারের দ্বারা হইতে পারে এবং গভর্ণমেণ্ট অথবা সরকারের পক্ষে সমগ্র দেশের সমগ্র জমীর তত্ত্বাবধান হইয়া থাকে। কাযেই শ্রমজীবী কৃষকের

পক্ষে যতখানি জমী লইয়া কার্য্য করা সম্ভব, তদ্দ্বারা তাহার সংসারযাত্রা সুনির্ব্বাহ করা সম্ভবপর করিতে হইলে, ঐ জমীর লভ্যাংশের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাগ যাহাতে শ্রমজীবী কৃষকের প্রাপ্য হয়, তাহার ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয়। এই-রূপ ভাবে দেখিলে দেখা যাইবে যে, ন্যায়তঃ জমীর উৎপন্ন শস্যের তিন ভাগের দুইভাগ কৃষকের প্রাপ্য এবং অপর ভাগ জমীদারের প্রাপ্য এবং জমীদার যাহা পাইবেন, তাহার তিন ভাগের দুই ভাগ জমীদারের প্রাপ্য এবং এক ভাগ গভর্ণমেণ্টের প্রাপ্য। অর্থাৎ কে কোন্ দায়িত্ব নির্ব্বাহ করিতেছেন, কাহার কর্ত্তব্যে কি ফলোদয় হইতে পারে, কোন্ ব্যবস্থায় প্রত্যেকের ব্যয় সুনির্ব্বাহ হইতে পারে, এবংবিধ চিন্তার দ্বারা জমীর লভ্যাংশের বণ্টন করিতে হইলে জমী যখন সুফলা থাকে, তখন ন্যায়তঃ তাহার উৎপন্ন শস্যের নয় ভাগের এক ভাগ গভর্ণমেণ্টের প্রাপ্য, দুই ভাগ জমীদারের প্রাপ্য এবং ছয় ভাগ শ্রমজীবী কৃষক অথবা প্রজার প্রাপ্য। যখন দেখা যাইতেছে যে জমীর কার্য্য সরকার, জমীদার এবং প্রজা, এই তিন শ্রেণীর কোন শ্রেণীর লোক ব্যতীত সুসম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে, তখন স্বভাবতঃ জমীর স্বামিত্ব এই তিন শ্রেণীর লোকেরই আছে তাহা বলিতে হইবে। অবশ্য যখন যিনি জমী সম্বন্ধে তাঁহার স্বীয় কর্ত্তব্য যথোচিত ভাবে সম্পাদন না করেন, তখন জনসাধারণের হিতকল্পে যাহাতে তাঁহার স্বামিত্বের বিচ্যুতি ঘটে, তাহার ব্যবস্থা হওয়া বিধেয়, ইহাও মানিয়া লইতে হইবে।

যখন প্রত্যেকেই স্ব স্ব কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করেন, তখন লভ্যাংশ-বণ্টনের হার (ratio) স্থায়ী রাখা একান্ত যুক্তি-সঙ্গত; কিন্তু বণ্টনের হার স্থায়ী থাকিলেও লভ্যাংশের পরিমাণ কখনও স্থায়ী থাকিতে পারে না, কারণ লভ্যাংশ পরিবর্ত্তনশীল হইয়া থাকে। যদি সরকার অথবা জমীদারের কর্ত্তব্যলঙ্ঘনের জন্য মোট লভ্যাংশ কমিয়া যায়, তাহা হইলে যাঁহার কর্ত্তব্যলঙ্ঘনের জন্য মোট লভ্যাংশ কমিয়া গিয়াছে বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, তাঁহার স্বীয় লভ্যাংশের হার অপেক্ষাকৃত কম হওয়া উচিত।

প্রাচীন ইতিহাস চিন্তাশীলতার সহিত অধ্যয়ন করিলে দেখা যাইবে যে, জমীর স্বামিত্ব ও লভ্যাংশ-বণ্টন সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল, তাহাই সারা জগৎ একদিন গ্রহণ করিয়া-ছিল তখন মানুষের ধর্ম্ম ছিল "মানব-ধর্ম্ম"। তখন হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি শব্দের অথবা বিভিন্ন ধর্ম্মের উদ্ভব হয় নাই। তখন সারা জগতের প্রত্যেক মানুষ আর্থিক অভাবের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন এবং সকলেই এক ধর্ম্ম এবং একরূপ জীবনযাপন-প্রণালী অবলম্বন করিয়া-ছিলেন। জমী সম্বন্ধে উপরোক্ত ব্যবস্থায় জনসাধারণের আর্থিক অভাব দূর করা সম্ভব হইয়াছিল বলিয়াই মানুষের মধ্যে এক ধর্ম্মের ও একতার প্রতিষ্ঠা স্থাপন করা সম্ভব হইয়া-ছিল। পরবর্ত্তী কালে সমাজের পরিচালকগণ (অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট এবং জমীদার) স্ব স্ব কর্ত্তব্য অবহেলা করায় জমীর মোট লভ্যাংশ কমিয়া গিয়াছিল। অথচ অতি অসঙ্গত ভাবে তাঁহারা তাঁহাদিগের স্ব স্ব লভ্যাংশ সমান ভাবে দাবী-দাওয়া করিতেন। তাহার ফলে জনসাধারণের মধ্যে দারিদ্র্য, দ্বেষ,হিংসা এবং অনৈক্যের উদ্ভব হইয়াছিল এবং ক্রমশঃ মনুষ্য-সমাজ খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া পড়িয়াছে এবং হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। বৌদ্ধ ও খৃষ্টানগণ জমীসম্বন্ধীয় উপরোক্ত তত্ত্ব আংশিক ভাবেও আর পুনরুদ্ধার করিতে পারেন নাই। মুসলানগণ ঐ তত্ত্ব প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা বহুলাংশে উহার পুনরুদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই অতি অল্প সময়ের মধ্যে মুসলমান রাজত্ব অত্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল এবং তাঁহাদের প্রাধান্যকালে জগতে আবার সমৃদ্ধি দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছিল; কিন্তু পরবর্ত্তী মুসলমান ধর্ম্মযাজকগণ তাঁহাদের মূল জ্ঞান-বিজ্ঞান অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন নাই এবং তাহারই ফলে মুসলমানগণের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যে সহনশীলতা মুসলমান ধর্ম্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, তাহা যে কার্য্যতঃ বর্ত্তমান মুসলমান-দিগের অনেকের মধ্যে প্রায়শঃ হ্রাস পাইয়াছে, তাহা বাস্তব জগৎ নিরীক্ষণ করিলে অস্বীকার করা যায় না।

মুসলমান রাজত্বের পতনের পর আর কেহ জমী সম্বন্ধীয় ঐ তত্ত্ব অথবা কোন যুক্তিসঙ্গত তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই এবং ক্রমশঃই বিশৃঙ্খলার পর বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হইয়াছে এবং সমস্ত দেশেই দারিদ্র্যের মাত্রা ও দরিদ্রের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। এইরূপ ভাবে আর কিছু দিন চলিলে মানুষের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত রক্ষা করা ক্লেশকর হইয়া দাঁড়াইবে. ইহা

আশঙ্কা করা যাইতে পারে। ইতিপূর্ব্বে এই সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে পরিষ্কার বুঝা যাইবে যে, কোন গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী এই অবস্থার জন্য দায়ী নহে। ইহার দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভাবে বর্ত্তমান তথাকথিত সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর আরোপিত হইতে পারে। বর্ত্তমানে প্রত্যেক দেশের, তথা ভারতবর্ষের জমী ও তৎসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে একদিনেই প্রকৃতিসম্মত উপরোক্ত তত্ত্বানুগ ব্যবস্থায় উপনীত হওয়া সম্ভব হইবে না এবং তাহার চেষ্টা করাও সঙ্গত নহে। ঐ তত্ত্বানুগ ব্যবস্থাকে সম্মুখে রাখিয়া, যাহাতে বর্ত্তমান অবস্থা হইতে, ক্রমশঃ একটু একটু পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া, লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব হইতে পারে, তদনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

আমাদের কথাগুলি গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিবে কি ?

আমরা আজ "মা-টী"র কথা কহিয়াছি, কাযেই একবার "মা, মা" উচ্চারণ করিয়া "গণপতি"কে স্মরণ করিতে করিতে বিদায় লইব।

বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞগণ ও নেতৃবর্গ কবে তাঁহাদের মত্ততা ও দাম্ভিকতা ছাড়িয়া দিয়া আমাদের "মা"-কে যথাযথ ভাবে চিনিবার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিবেন—ইহাই আমাদের আজিকার প্রশ্ন।

"অসুর" কাহাকে বলে এবং তৎসম্বন্ধে জনসাধারণের কি কর্ত্তব্য

আমাদের মতে আজকাল মনুষ্য-সমাজে অতি ভীষণ ভাবে অসুরের খেলা চলিতেছে এবং তাহারই জন্য সারা জগতের মানুষ নানারূপে বিধ্বস্ত হইয়া পড়িতেছে। আমরা বৈদিক ধর্ম্মানুসারে যাহাকে "অসুর" বলিয়া থাকি, মুসলমান ও খৃষ্টানেরা তাহাকেই "সয়তান" বলিয়া থাকেন। মুসলমান এবং খ্রীষ্টানেরাও স্বীকার করিয়া থাকেন যে, সয়তানের খেলা ভীষণ ভাবে না চলিলে মনুষ্য-সমাজে আপামর দুর্দ্দশার উদ্ভব হয় না। কাযেই মানুষের দুর্দ্দশা দূর করিতে হইলে, যাহাতে অসুর অথবা সয়তানের খেলার ভীষণতা কমিয়া যায়, তদনুরূপ ব্যবস্থা যে একান্ত প্রয়োজনীয়—ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। কোন্ ব্যবস্থা করিলে অসুর অথবা সয়তানের খেলার ভীষণতা কমিতে পারে, তাহা স্থির করিতে হইলে, প্রথমতঃ "অসুর" বলিতে কি বুঝায় এবং তাহার খেলা কি কি, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইবে।

"অসুর" শব্দের প্রচলিত অর্থ "অমঙ্গল"। অতএব যাহা ব্যক্তিগত অথবা সামাজিক অমঙ্গল সাধন করে, তাহাকেই অসুর বলা যাইতে পারে। কোন্ বস্তু আমাদিগের ব্যক্তিগত ভাবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অমঙ্গল সাধন করিতেছে, তাহা আমাদের বাস্তব জীবন হইতে স্থির করিতে হইলে দেখা যাইবে যে, "অভিমান"ই সর্ব্বাপেক্ষা আমাদিগের অধিক অনিষ্ট সাধন করিতেছে। আমি নিজে বাস্তবিক পক্ষে যে কার্য্য-শক্তিসম্পন্ন অথবা গুণের অধিকারী, তদপেক্ষা নিজেকে অধিক কার্য্যশক্তিসম্পন্ন অথবা গুণের অধিকারী বলিয়া মনে করার নাম "অভিমান পোষণ করা"। আমাদের সংসারযাত্রায় যে যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, তাহার মূলে যে "অভিমান" থাকে, তাহা বাস্তবতার দিকে নিরীক্ষণ করিলে বুঝিতে মোটেই কষ্ট পাইতে হয় না।

কি করিয়া কোন্ কার্য্য করিতে হয়, তাহা জানা থাকিলে কোন কার্য্যেই সাধারণতঃ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় না এবং আমার কি জানা আছে অথবা জানা নাই, তাহার ধারণা থাকিলে সহজেই বিবিধ কার্য্যপদ্ধতি শিক্ষা করিবার সম্ভাবনা হয়; কিন্তু বস্তুতঃ আমার যাহা জানা নাই, তাহা আমার জানা আছে বলিয়া যদি মনে করি, তাহা হইলে আমার অজ্ঞাত জিনিষগুলি পরিজ্ঞাত হইবার সম্ভাবনা অপসারিত হইয়া যায়।

কাযেই ব্যক্তিগত জীবনের অসুর কাহাকে বলে, তাহার উত্তর দিতে হইলে বলিতে হইবে যে, "আত্মাভিমান" ব্যক্তিগত জীবনের অসুর এবং ব্যক্তিগত জীবনে অসুরের খেলা হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, আত্মাভিমান পরিত্যাগ করিতে হইবে, অর্থাৎ নিজের যে যে গুণ অথবা কর্ম্মক্ষমতা নাই, তৎসম্বন্ধে যাহাতে সর্ব্বদা সজাগ থাকি, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

এইরূপ ভাবে কে সামাজিক জীবনের "অসুর" এবং তাহার খেলাই বা কি, তাহার উত্তর দিতে হইলে বলিতে হইবে যে, যাঁহারা সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা যদি আত্মাভিমানী হন, তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারাই সমাজের অসুরের অথবা অমঙ্গলের কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। উচ্চপদের জন্য তাঁহারা সাধারণতঃ জনসাধারণের বিশ্বাসযোগ্য হইয়া থাকেন এবং তাঁহারা যাহা জানেন না, তাহা তাঁহারা জানেন বলিয়া প্রচার করিলে, জনসাধারণ তাঁহাদের কথা বিশ্বাস করিয়া বসে এবং বিভ্রান্ত হয়। ফলে জনসাধারণকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হয়। কাযেই গণ্যমান্য ব্যক্তি অভিমানী অথবা দাম্ভিক হইলে তাঁহাদিগকে "সামাজিক অসুর" বলা যাইতে পারে।

সামাজিক এই অসুরদিগের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে কোন্ কোন্ উচ্চপদস্থ ব্যক্তি বাস্তবিকপক্ষে আত্মাভিমানী অথবা দাম্ভিক, অর্থাৎ কোন বিষয় যথাযথভাবে না জানিয়া অথবা যথাযথভাবে জানিবার চেষ্টা না করিয়া ঐ বিষয় জানেন বলিয়া সমাজে প্রচার এবং আত্ম-বিস্তার গৌরব করিয়া থাকেন, তাহা যাহাতে জনসাধারণ জানিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়।

"অসুর" শব্দের প্রচলিত অর্থের সহায়তায় ব্যক্তিগত জীবনের ও সমাজের "অসুর" কাহাকে বলে এবং কি উপায়ে তাহার খেলা হইতে অব্যাহতি পাইতে হয়, তৎসম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা "অসুর" শব্দের বর্ণগত অর্থের দ্বারা এবং প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে "দেবাসুরের" যুদ্ধসম্বন্ধে যে-সমস্ত বর্ণনা রহিয়াছে, তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতে পারে।

বর্ত্তমান সংখ্যায় স্থানাভাববশতঃ আমরা উহার বিস্তৃত আলোচনা করিব না।

যাঁহারা মনে করেন যে, "অসুর" বলিয়া মানুষের মধ্যে পুরাকালে একটি জাতি ছিল, তাঁহারা সাধারণতঃ ভাষ্যকারদিগের দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়াছেন। ঐ সমস্ত ভাষ্যকার যে অমূল্য গ্রন্থগুলির বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও সহজেই প্রতিপন্ন করা যায়।

মোটের উপর আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, সামাজিক অসুর বলিতে প্রধানতঃ দাম্ভিক পণ্ডিতগণকে বুঝিতে হইবে এবং তথাকথিত পণ্ডিতগণ যাহাতে তাঁহাদের স্ব স্ব দাম্ভিকতা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তাহা যাঁহারা সমাজের হিতকামী, তাঁহাদিগকে মনে প্রাণে চেষ্টা করিতে হইবে। নতুবা অসুরের খেলায় মানুষের দুর্দ্দশা ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইবে। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, পণ্ডিত বলিয়া আখ্যাত হইলেই যে তিনি অসুর হইবেন তাহা নহে। পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা আত্মাভিমানী অথবা দাম্ভিক, তাঁহারাই সমাজের অসুর এবং তাঁহারা যাহাতে সাধারণের শ্রদ্ধা না পাইতে পারেন, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলন

গত বড়দিনের বন্ধে নাগপুরে নিখিল ভারত শিক্ষা-সম্মেলনের অধিবেশনে শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্যামাপ্রসাদ বাবুর বক্তৃতার সমস্ত কথা সমালোচনা করিবার স্থান আমাদের এই সংখ্যায় নাই। কাযেই তাহা আমরা করিতে পারিলাম না। এই সভায় তিনি যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার অনেক কথাতেই অপেক্ষাকৃত ধীর চিন্তার পরিচয় আছে। তিনি যদি আরও চিন্তাশীল হন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন যে, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষা ভারতবর্ষের কোন উপকার করে নাই। এমন কি ইহা ইয়োরোপেরও কোন উন্নতি সাধন করিতে পারে নাই।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় আমাদের কি কি উন্নতি হইয়াছে, তাহা দেখাইতে গিয়া শ্যামাপ্রসাদ বাবু প্রধানতঃ দুইটী কথা উত্থাপিত করিয়াছেন, যথা—(১) ইহা ভারতবর্ষে জাতীয়তার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে, এবং (২) ইহার ফলে আমাদের জাতীয় আত্মসম্মান-বোধ জাগ্রত হইয়াছে।

এই দুইটী কথার একটী কথাও ঠিক নহে। জাতীয়তার ভিত্তিস্থাপনে একতা একান্ত প্রয়োজনীয়। যখন দেখা যায় যে, ভারতীয় গ্রামগুলিতে চল্লিশ বৎসর আগেও হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের যে ভ্রাতৃত্ব এবং সখ্য ছিল, তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং সর্ব্বত্রই দলাদলি ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে, তখন পাশ্চাত্য শিক্ষায় আমাদের জাতীয় ভিত্তি নষ্ট হইয়াছে, ইহা না বলিয়া তাহা স্থাপিত হইয়াছে, ইহা যুক্তিসঙ্গত ভাবে কি করিয়া বলা যায়?

ভারতের বর্ত্তমান জাতীয় আত্মসম্মানের কথা বিচার করিতে হইলে আত্মসম্মান-বোধ ও আত্মসম্মানের ভিতর কি পার্থক্য, তাহা স্মরণ রাখিতে হয়। যে দেশের যুবকবৃন্দের অন্ন-সংস্থান কি করিয়া করিতে হইবে ইত্যাদি সমস্ত কার্য্যের জন্যই পরমুখাপেক্ষী হইতে হয়, সেই দেশের লোকের কোন বাস্তব আত্মসম্মান থাকিতে পারে কি? যেখানে বাস্তব আত্ম-সম্মান নাই,সেখানে নিজেকে সম্মানী মনে করা কি অভিমানের পরিচয় নহে? তাহাতে কখনও কি কোন মঙ্গল হয়?

শ্যামাপ্রসাদ বাবু গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে শিক্ষার সংস্কারের জন্ত এক ক্রোর টাকা চাহিয়াছেন। কোন্ জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইলে দেশীয় যুবকবৃন্দের পক্ষে শিক্ষা লাভ করিয়া অন্নসংস্থান করা সম্ভব হইবে, তাহা যত দিন স্থির না হইতেছে, ততদিন কেবলমাত্র টাকা পাইলে কি ফল হইবে? শ্যামাপ্রসাদ বাবুর পিতৃদেব ত' দেশের লোকের নিকট হইতে অনেক টাকা পাইয়াছিলেন, কিন্তু ঐ টাকার দ্বারা যে সমস্ত মন্দির গঠিত হইয়াছে, সেগুলি ছেলেদের জীবিকা উপার্জ্জন পক্ষে কোন সহায়তা করিতে পারিয়াছে কি?

ভারতীয় ধর্ম্ম

গত ২রা জানুয়ারী, ১৯৩৬ আগ্রায় থিওজফিক্যাল সোসাইটীর অধিবেশনে স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ভারতীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দিয়াছেন।

তিনি যে ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাকে যদি ভারতীয় ঋষিগণের ধর্ম্ম না বলিয়া বর্ত্তমান কালের একটা কিছু বলা হয়, তাহা হইলে তাঁহার সহিত আমাদের কোন মতদ্বৈধ নাই। কেহ যদি মনে করেন যে, তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত ঋষিগণ যাহাকে "ধর্ম্ম" বলিয়াছেন, তাহার কোন সাদৃশ্য আছে, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে বৈশেষিক দর্শন ও পূর্ব্বমীমাংসা পুনরায় পড়িতে অনুরোধ করিব।

স্যার রাধাকৃষ্ণন ঈশ্বর সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহা কোন ভারতীয় ঋষির প্রাচীন গ্রন্থে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ"।

"...নিরতিশয়সর্ব্বজ্ঞবীজম্।"

পাতঞ্জলের এই তিনটী সূত্র আমূলভাবে চিন্তা করা থাকিলে স্যার রাধাকৃষ্ণনের মত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এতাদৃশ দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিতে পারিতেন না। আমরা আগামীবারে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

রোমান হরপে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত অক্ষর

মহীশূর নিখিল ভারত প্রাচ্য সম্মেলনের "আধুনিক ভারতীয় আর্য্যভাষা" বিভাগে শ্রীযুত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া ভারতীয় আর্য্যভাষা সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়াছেন।

"সমস্ত ভারতীয় ভাষাই রোমান বর্ণমালায় লেখা উচিত", অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার বাঁধা বা সাধা বুলি এখানেও আওড়াইয়াছেন। সংস্কৃত অক্ষরগুলি যেরূপভাবে উচ্চারিত হয়, তাহার সহিত তাহার লিখন-প্রণালীর যে সমবায়-সম্বন্ধ আছে, তাহা আমরা বঙ্গশ্রীর কার্ত্তিক (১৩৪২) সংখ্যায় দেখাইয়াছি। বাক্যপদীয়ের ১ম কাণ্ডের ১৯, ২০ এবং ২১ শ্লোক পড়িয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে সংস্কৃত অক্ষরের সহিত সংস্কৃত বর্ণের কি সম্বন্ধ আছে, তাহা পরিষ্কার বুঝা যায়। বস্তুতঃ ঋক্, সাম এবং যজুর অর্থ বোধ করিবার অন্যতম উপায় সংস্কৃত বর্ণ। এই বর্ণের কোন পরিবর্ত্তন হইলে ঐ তিনটী বেদের আসল বক্তব্য অনেক স্থলে বুঝা কঠিন হয়। খুব সম্ভব ডাঃ চাটুয্যের মূল বেদ বুঝিবার চেষ্টার জন্য কোন বালাই নাই। যাঁহারা 'বোধোদয়' পড়েন, তাঁহারা অনেক সময়ে তাঁহাদিগকে যাহা মন্দ বলিয়া করিবার জন্য নিষেধ করা হয়, তাহাই অধিকতর আগ্রহের সহিত করিতে আরম্ভ করেন। 'বোধোদয়' পড়িবার মত বয়স ডাঃ চাটুয্যের আর নাই, তাহা আমরা জানি; অথচ তাঁহার চালচলনে ঐ শ্রেণীর ভাব কেন দেখা যায়, তাহা কেহ আমাদিগকে বলিয়া দিতে পারেন?

ডাঃ চাটুয্যে তাঁহার বক্তৃতার একস্থানে বলিতেছেন— "আর্য্যভাষাসমূহের ইতিহাস আবিষ্কারই এই গবেষণার উদ্দেশ্য"। সংস্কৃত ভাষায় 'আর্য্য' শব্দের যে অর্থ, তাহাতে আর্য্যভাষা একটী মাত্রই হইয়া থাকে এবং তদনুসারে "আর্য্যভাষাসমূহ" এবংবিধ পদ হইতে পারে না। অবশ্য ডাঃ চাটুয্যে পাশ্চাত্যশিক্ষিত পণ্ডিত এবং ইংরাজী ভাষানুসারে

"আর্য্য" শব্দের অর্থ বিভিন্ন এবং তদনুসারে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলা যায়।

আমাদিগকে কি বুঝিতে হইবে যে, সংস্কৃত ভাষার কোন প্রকৃত ধারণা অর্জ্জন না করিয়া অথবা তৎসম্বন্ধে একটা কাল্পনিক ধারণামাত্র অবলম্বন করিয়া আজকালকার দিনে 'Linguist' অথবা ভাষাবিদ হওয়া যায়?

ধর্ম্মের স্বরূপ

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বরোদায় "ধর্ম্মের স্বরূপ" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দিয়াছেন।

দাশগুপ্ত মহাশয় ধর্ম্মের যে স্বরূপ দেখিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমাদের বলিবার অনেক কথা রহিয়াছে, "বঙ্গশ্রী"র কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় এবার আমাদিগকে নিরস্ত থাকিতে হইল।

ডাঃ দাশগুপ্ত বলিয়াছেন যে, "ধর্ম্মের" ইংরাজী প্রতিশব্দ "রিলিজন" (Religion)। এই ধারণা যে কতদূর অসঙ্গত এবং তাঁহার বক্তৃতা যে কতকগুলি কাল্পনিক কথায় পরিপূর্ণ এবং তিনি যাহা বৈদিক ধর্ম্মের কথা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাহা যে প্রকৃতপক্ষে বৈদিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধ কথা, তাহা আমরা আগামীবারে দেখাইব।

সংবাদ ও মন্তব্য

বড়লাটের বক্তৃতা

গত ১৬ই ও ১৭ই ডিসেম্বর কলিকাতা এসোসিয়েটেড চেম্বার্স অফ কমার্সের বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধনপ্রসঙ্গে বড়লাট লর্ড উইলিংডন বলিয়াছেন—ভারতবর্ষের আর্থিক উন্নতির সূচনা দেখিয়া আমি আশান্বিত হইতেছি। পণ্যাদির মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে; কৃষিজাত ও শিল্পজাত বস্তুসমূহের মূল্যের অধিকতর সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে; আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য বর্দ্ধিত হইয়াছে; সুদের হার কমিয়াছে।

যখন বড়লাট বলিয়াছেন যে, আমাদের অবস্থা ভাল হইয়াছে, তখন তাহা স্বীকার করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই, কিন্তু পেট মানে কই? ভারতবর্ষের কোন্ শিল্প ও বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানটী অধিকতর লাভ করিতে পারিয়াছে, অথবা ব্যক্তিগত ভাবে অবস্থা ক্রমিক খারাপ না হইয়া কয়জন লোক পেট ভরিয়া খাইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার সন্ধান আমাদিগকে কেহ দিতে পারেন কি?

ভারতীয় দর্শন মহাসভা

গত ১৯শে, ২০শে ও ২১শে ডিসেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হাউসে ভারতীয় দর্শন মহাসভায় একাদশ অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে মাদ্রাজ খৃষ্টান কলেজের অধ্যক্ষ রেভাঃ ডক্টর এ. জি. হগ বলিয়াছেন—গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার নামে জনসাধারণ বাস্তবক্ষেত্রে যাহা পায়, তাহা যে অন্তঃসারশূন্য, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

পাদ্রী হগ সাহেব ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই বলিয়া ফেলিলেন; কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রের পানে চক্ষু মুদিয়া, গায়ের জোরেই যাঁহারা বলেন, উপায় আছে, তাঁহাদিগকে বুঝান যায় কিরূপে?

প্রচলিত দর্শন

কলিকাতা স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর ডবলু. এস. আরকুহার্ট বলিয়াছেন—আর্থিক দুরবস্থা দূর করিতে হইলে প্রচলিত দর্শন আলোচনায় চলিবে না, পরন্তু দার্শনিকের চিন্তাধারার আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

বেশ! কিন্তু করিবে কে? বিশ্ববিদ্যালয় যাঁহাদিগকে ডক্টর অফ্ ফিলজফি প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের সংস্কার ও অভিমান ঘুচাইবে কে?

ভারতীয় দর্শন

কলিকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী চীফ জষ্টিস স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন—আমাদের দেশে দর্শনশাস্ত্র কোন দিনই কেবল মাত্র শাস্ত্রালোচনায় পর্য্যবসিত হয় নাই; পরন্তু দৈনন্দিন জীবনযাপনে দিগ্দর্শনের কার্য্য করিত।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তি চিন্তার যোগ্য বটে। কিন্তু তাঁহাকে আমরা সবিনয়ে একটি প্রশ্ন করিব। আজকাল বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ প্রভৃতি যে ভাষায় ও যে ব্যাখ্যায় প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার দ্বারা মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কোন নির্দ্দেশ পাওয়া যায় কি? তাহা যদি না পাওয়া যায়,—তাহা হইলে—?

সন্তান-সন্ততি হত্যা

শ্রীহট্টের বানিয়াচঙ-নিবাসী কালীকুমার ধর ছয় বৎসর বয়স্কা কন্যা ও সাত বৎসরের পুত্রহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া জেলা-জজের সম্মুখে স্বীকারোক্তি করিয়া বলিয়াছে—অনাহারে তিলে তিলে মরিতে না দিয়া সে তাহার পুত্রকন্যাকে হত্যা করিয়াছে।

জগতের বৈজ্ঞানিক বলুন, জগতের উন্নতি হইতেছে; অর্থনীতিকগণ ঘোষণা করুন, আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইতেছে; সেই সঙ্গে এই মর্ম্মন্তুদ ঘটনাটির কথাও তাঁহারা চিন্তা করুন। উন্নত জগতের উন্নত মানুষ উদরের তাড়নায় স্বহস্তে যখন সন্তান হনন করে, তখন তাহাকে উন্নতির কোন্ স্তর বলা যায়?

দোষ না গুণ?

গত ১৮ই ডিসেম্বর লণ্ডনের হাউস অফ কমন্সের এক বৈঠকে মিষ্টার হ্যানা নামক জনৈক রক্ষণশীল সদস্য আলোচনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, উপনিবেশসমূহের অন্যান্য দেশবাসীর সহিত এসিয়াবাসীর একটি বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। এসিয়াবাসীদের অভাব অত্যল্প, তাহারা অল্পে সন্তুষ্ট। এই জন্যই, তাঁহার মতে, অন্যান্য উপনিবেশবাসিগণের সহিত তাহাদের বনিবনাও হইতে পারে না।

হায় রে অদৃষ্ট!

'গুণ হৈয়া দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়।'

নারীপ্রগতি

মাদ্রাজের কালিকটের এক সংবাদে প্রকাশ, মিসেস মীর আমীরুদ্দিন এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন—নারীরা যে বিশ্ব-সভ্যতার আসরে অবতরণ করিয়াছেন, আধুনিক সভ্যতার ইহাই উৎকৃষ্ট পরিচয়।

উৎকৃষ্ট পরিচয়ই বটে! এই উৎকৃষ্ট পরিচয় নারীদের যতদিন ছিল না, ততদিন ছিল সংসারের শ্রী, সমাজের শান্তি; নারী যেদিন হইতে বিশ্বসভ্যতার বৈঠকে নামিয়াছেন, সেই দিন হইতে সংসারের শ্রী বিনষ্ট, সমাজের শান্তি বিপর্য্যস্ত হইতেছে—এই পরিচয়কে উৎকৃষ্ট পরিচয় বলিয়া স্বীকার না করিলে আমরা যে সেকেলেও অসভ্য বিবেচিত হইব!

বুদ্ধিমত্তার চরমোৎকর্ষ

নিউ ইয়র্ক সহরের বেলভিউ হাসপাতালের মনস্তত্ত্ববিদ্ মিঃ ওয়েসলার বলিয়াছেন যে, পনের বৎসর বয়সেই মানুষের বুদ্ধিমত্তা চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় এবং পঁচিশ বৎসর হইতে তাহার পতন সূচিত হয়।

যে সভ্যতায় মানুষের বুদ্ধিমত্তা পঞ্চদশবর্ষ বয়সেই চরমোৎকর্ষ লাভ করে এবং তাহার পতন আরম্ভ হয় ২৫ বৎসরে—সেই সভ্যতার মোট পরমায়ু কত বৎসরের হইতে পারে, তাহা কেহ হিসাব করিয়া দেখিবেন কি?

আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা

কর্ণেল ভোলানাথ মাদ্রাজে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেও যে অবস্থায় ছিল, বর্ত্তমানেও সেই অবস্থাতেই আছে। ইহার শরীর-গঠন ও শরীর-বিধান—দুই বিদ্যাই আদিম অবস্থায় রহিয়াছে। ইহার ঔষধাবলী নিতান্ত অনুন্নত।

তর্কের খাতিরে কর্ণেল সাহেবের কথা মানিয়া লইলাম। কিন্তু যদি বলি, তাঁহাদের এলোপ্যাথি-চিকিৎসা-বিদ্যার পূর্ণতা কতখানি, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে সম্পূর্ণভাবে 'আলোকিত' করিতে পারিবেন কি? তাঁহাদের এলোপ্যাথি-চিকিৎসা-বিদ্যা যদি ক্রমশঃ উন্নতি-ই লাভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে মানুষের অস্বাস্থ্য এবং অকালমৃত্যু বাড়িয়া যাইতেছে কেন?

পল্লী-সংস্কার

২৬শে ডিসেম্বরের এক সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত সরকারের নিকট হইতে ১৬ লক্ষ টাকা বঙ্গীয় সরকার বঙ্গদেশের পল্লী উন্নয়ন কার্য্যের জন্য পাইয়াছেন। কোন্ জেলায় কত টাকা প্রদত্ত হইবে, তাহার তালিকা বাহির হইয়াছে। বর্দ্ধমান ২০১০০্, বীরভূম ১৭০০০্, বাঁকুড়া ১০৯০০্, মেদিনীপুর ১৪৮০০্, হুগলী ৮৯০০্, হাওড়া ৯৩০০্, ২৪ পরগণা ৭৭০০্, নদীয়া ৬২০০্, মুর্শিদাবাদ ৫৬০০্, যশোহর ৪১০০্, খুলনা ৫৬০০্, ঢাকা ১৬৮০০্, মৈমনসিংহ ৪৭৩০০্, ফরিদপুর ৯৯০০্, বাখরগঞ্জ ১৪৮০০্, চাটগাঁ ১৩৮০০্, ত্রিপুরা ১৪৮০০্, নোয়াখালি ১০৯০০্, রাজসাহী ১৩৮০০্, দিনাজপুর ২৪২০০্, জলপাইগুড়ী ১৯৭০০্, রংপুর ১৮৭০০্, বগুড়া ৬৯০০্, পাবনা ১৬৮০০্, মালদহ ৯১০০্।

পল্লী-সংস্কারের চেষ্টায় সরকারের খরচের ত্রুটি নাই, তাহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিলে পল্লীর প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে, সরকারের অধীন বিশেষজ্ঞগণ তাহা যে প্রকৃত পক্ষে পরিজ্ঞাত আছেন, তাহার পরিচয় কোথায়?

ভারত হিন্দুর

নিখিল ভারতীয় শুদ্ধি অধিবেশনে ডক্টর কুর্ত্তাকোতি বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ কেবলমাত্র হিন্দুদেরই ছিল এবং হিন্দুদেরই আছে। অন্যান্য

সম্প্রদায় ভারতবর্ষে অতিথি মাত্র, অতিথিদের সেইরূপ ব্যবহার করাই সমীচীন।

কার্য্যকারণ ভাব বিচার করিয়া ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিবার নিদর্শন বটে!

কংগ্রেসের কর্ম্মপদ্ধতি

মাদ্রাজের বেঙ্গওয়াদার এক সংবাদে প্রকাশ, তথাকার এক সভায় দোর্নাকালের বিশপ বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, অতীতকালে কোন কোন খৃষ্টান কংগ্রেসে সভাপতিত্বও করিয়াছেন এবং তাঁহাদের নেতৃত্বে ভারতীয় জনমত নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে ইহাও বলা যায়। বর্ত্তমানে কংগ্রেসের অনুসৃত কার্য্যপদ্ধতি সঙ্কীর্ণ হওয়ায় ভারতের সেবা করিবার ইচ্ছা থাকিলেও অনেকে কংগ্রেসে যোগদান করিতে পারেন না। ভবিষ্যতে যদি কংগ্রেস কর্ম্মপদ্ধতি পরিবর্ত্তিত করেন, তবে জাতিবর্ণধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল ভারতবাসী উহাতে যোগদান করিতে পারিবেন।

বিশপ যাহা বলিয়াছেন, যুক্তিসঙ্গত ভাবে তাহা অস্বীকার করা যায় না। কংগ্রেসের কর্ম্মপদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত এবং কি হইলে সকলে মায় সরকারী কর্ম্মচারিগণও কংগ্রেসে যোগদান করিয়া কংগ্রেস, তথা ভারতের সেবা করিতে পারেন, তাহা "বঙ্গশ্রী"তে প্রকাশিত "ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়" শীর্ষক প্রথম প্রবন্ধের গত ও বর্ত্তমান সংখ্যায় বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

জমীর উর্ব্বরাশক্তি

মধ্য-ভারতের ইন্দোরে ভারতীয় বিজ্ঞান-মহাসভার ত্রয়োবিংশ অধিবেশনে ইন্দোরের মহারাজা উদ্বোধন-বক্তৃতায় বৈজ্ঞানিকগণের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন যে, বৈজ্ঞানিকগণ জমীর উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধির জন্য অবহিত হউন।

মহারাজার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। কিন্তু বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণের বিদ্যার যেরূপ বহর, তাহাতে অরণ্যে রোদনই বা হয়।

ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থা

ভারত সরকারের কন্ট্রোলার অফ কারেন্সির ১৯৩৪-৩৫ সালের বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ যে, ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থা ক্রমোন্নতির পথে চলিয়াছে।

যে বৎসরের বিবরণীতে ইহা প্রকাশ পাইয়াছে, সেই বৎসরে ভারত সরকারকে কত বার এবং কত কোটী টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তাহাও জনসাধারণকে জানাইয়া দেওয়া সঙ্গত। সাধারণ লোক সাধারণ বুদ্ধিতে ইহাই বুঝে যে, যখন কর্জ্জ করিয়া সংসার চালাইতে হয় না, তখনই সংসারের অবস্থা স্বচ্ছল হয়। ঋণভারে জর্জ্জরিত লোকের অবস্থা কি শোভনীয়?

নব শিক্ষা-পরিকল্পনা

সম্প্রতি লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ যে, লেডী এষ্টরের নেতৃত্বে ৩৫ জন শিক্ষাবিষয়ক বিশেষজ্ঞ একটি দশবৎসরের শিক্ষা-পরিকল্পনা করিয়াছেন। ইহাতে বলা হইয়াছে, স্কুলবাড়ীগুলি হয় ভাঙ্গিয়া, না-হয় বদলাইয়া, না-হয় নূতন করিয়া তৈরী না করিলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে না।

প্রবাদ, নাচিতে না জানিলে উঠানের দোষ হয়!

রূপ-প্রসাধন

ইংলণ্ডের রূপসিগণ প্রসাধন-দ্রব্যের জন্য একবৎসর ৬০ কোটী পাউণ্ড অর্থ ব্যয় করিয়াছেন।

ইংলণ্ড নিশ্চয়ই নন্দন-কাননে পরিণত হইয়াছে।

লর্ড রীডিং

ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড রীডিংএর মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার আত্মা সদ্গতি লাভ করুক।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন

গত বড়দিনের ছুটির সময় নয়া-দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ত্রয়োদশ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অধিবেশনের মূল সভাপতি হইয়াছিলেন অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। সাহিত্য, দর্শন, ললিত কলা, বৃহত্তর বঙ্গ, সঙ্গীত, মহিলা শাখাগুলির সভাপতি যথাক্রমে শ্রীযুত হৃষিকেশ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত বীরেশ্বর সেন, শ্রীযুত শান্তমোহন কর, শ্রীযুত ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরাণী।

এই অধিবেশনের সভাপতিগণের বক্তৃতা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা আমাদের আছে। এবার স্থানাভাব, বারান্তরে করিব।

রমণীর মুখ

কমলিনী মলিনা দিবসাত্যয়ে। শশীকলা বিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে ॥
ইতি বিধি বিদধে রমণীমুখম্। ভবতি বিক্লতমঃ ক্রমশোজনঃ ॥

কালিদাসের রচিত রমণীমুখের কাহিনী সংস্কৃত কাব্যের একটি অপরূপ রূপক। কালিদাস লিখেছেন যে বিধাতা সৃষ্টি করতে গিয়ে প্রথমে রচনা করেন কমল। কিন্তু কমল দিনের শেষে যায় মুদ্রিত হয়ে। বিধাতা সেই জন্যে চন্দ্র সৃষ্টি করলেন, কিন্তু চন্দ্রও যায় দিনের বেলা নিষ্প্রভ হয়ে। বিধাতা এমন রূপ সৃষ্টি করতে চান, দিনে রাতে সর্ব্বক্ষণ যাতে চোখ জুড়িয়ে যাবে। তাই সব শেষে তিনি সৃষ্টি করলেন রমণীর মুখ— কমলের মত রাত্রে যা মুদিত হবে না, চন্দ্রের মত দিনের বেলা যাবে না ম্লান হয়ে।

সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে তাই দেখতে পাই রমণীরূপ পুরুষের আনন্দের চিরন্তন উৎস হয়ে আছে। শিল্পীর কাছে নারীর রূপই পরম সৌন্দর্য্যের আদর্শ করিয়া তার সৌন্দর্য্যকেই গদ্যে ও ছন্দে অমর করেছেন।

যা কিছু শোভন, যা কিছু সুন্দর, তা যেন তাই আপনা থেকেই নারীর অধিকারভুক্ত হয়েছে। যে কাজ সে নিজস্ব মধুর ভঙ্গিতে পুরুষের চেয়ে অনেক ভালোভাবেই করতে পারে, সে কাজের ভার তার ওপরই ছেড়ে দিয়ে পুরুষ নিশ্চিন্ত।

এই মত চায়ের অনুষ্ঠানে, পৃথিবীর সকল দেশে সকল ঘরে নারীই বিশেষ কর্ত্তৃত্বের অধিকার। নারীরই চা প্রস্তুত করে, চা তৈয়ারীর সমস্ত খুঁটিনাটির প্রতি তাহারই সজাগ দৃষ্টি থাকে। চা পানের নিত্যকার অনুষ্ঠানের তদারক সেই করে। তার এ অনুষ্ঠানের কর্তৃত্ব করবার অধিকার নিয়ে কোন তর্ক ওঠে না। সত্য কথা বলতে কি, নারীর হাতের স্পর্শ বিনা, চায়ের আকর্ষণ অনেক খানিই কমে যায়।

এই তাড়াহুড়োর যুগে আমরা কখন কখন চায়ের দোকানে চা খেতে যাই বটে, তবু চা-পানের উপযুক্ত স্থান যে নিজের ঘর এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। চা-পানের যথোচিত আবহাওয়াটি ঘরেই শুধু পাওয়া যায়। চা-পানের সামাজিক অনুষ্ঠানে নারী তাই এমন অপরিহার্য্য।

এদেশে বাড়ীর চাকর-বাকরের উপর চা তৈরী করবার ভার দেওয়া হয় দেখে দুঃখ হয়। চাকর-বাকরেরা আনাড়ির মত কি বিচ্ছিরি ভাবেই না চা পরিবেশন করে—পেয়ালা থেকে চামচটা হয়ত বেরিয়ে আছে, পেয়ালার চা উপছে পড়েছে ডিসে। সময় সময় সে চা তো খাওয়াই যায় না। আবার বাড়ীর গৃহিণী স্বয়ং চা তৈরী করে পরিবেশন করলে কিন্তু-আকাশ পাতাল তফাৎ হয়ে যায়।

ব্রাউনিং বলেছেন,—"একটুখানি বেশী হ'লে কতখানি আর একটু কম হলে কত রাজ্যের তফাৎ।" চায়ের নিত্যকার অনুষ্ঠান সার্থক বা পণ্ড করার পক্ষে একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। চা তৈরী করার সঠিক প্রণালীতে একটু মনোযোগ দিলেই আমাদের এই পানীয়টী একেবারে অন্যরকম হয়ে দাঁড়ায়। চা-পান যখন আজকাল আমাদের দৈনিক জীবনের প্রয়োজন হয়ে উঠেছে, তখন ভারতের প্রতি ঘরে মেয়েদের চা প্রস্তুত ও পরিবেশনের ভার নেওয়া উচিত। সংসার সত্যিই তাহলে আরো সুখের হয়ে উঠবে।

পুনর্লাভ

পুণ্যশ্লোক রাজা নলের দেহে কলি কি ভাবে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, তাহা আমরা সকলেই জানি: কিন্তু কুন্দকুসুমের মত অপাপবিদ্ধা বালিকা রেণু যে শিশুকাল হইতেই আধি-ব্যাধিতে পঙ্গু ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল কিরূপে, তাহার কোন কারণই কেহ সন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারিল না। বোস্ দম্পতির অর্থের ও প্রতিপত্তির অভাব ছিল না। ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠাপন্ন এমন কোন বৈদ্য, এমন ডাক্তার, এমন হাকিম তৎকালে কেহ ছিল না, রেণুর চিকিৎসার ভার যাহার উপর ন্যস্ত না হইয়াছে! চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যন্ত রেণুর চিকিৎসা হইয়াছে, কিন্তু কোন ফলই ফলে নাই।

বাঙ্গালা দেশের মেয়ে, ধনীর আদরের দুলালী, যে বয়সে পূর্ণিমার চন্দ্রের মত, ভাদ্রের ভরা নদীর মত, বসন্তের ফুল-কাননের মত শোভা পাইবার কথা, রূপ-লাবণ্যের গৌরবে স্ফীতা হইবার কথা, সেই বয়সে রেণুকে দেখিলে শুধু পিতামাতাই নয়, সকলেরই দুঃখ হয়।

অসুখটা যে কি তাহা সঠিক নির্ণীত হইল না। একটা বেদনা তাহার দেহে লাগিয়াই আছে। যত রকমের পরীক্ষা, বিশ্লেষণ সম্ভব, সকলই হইয়াছে, কিন্তু বেদনার কোন কারণই নির্ণীত হয় নাই। বাত হইতে পারে, অন্ত্রের পীড়াজনিত বেদনাও হইতে পারে, নানা মুনি নানামত প্রকাশ করিয়াছেন।

সেবার হাইকোর্টের পূজাবকাশে বোস্ দম্পতী একমাত্র কন্যাকে লইয়া ইউরোপ যাত্রা করিলেন। সমুদ্রের হাওয়ায়, দৃশ্যের মনোহারিত্বে এবং বৈচিত্র্যে রেণুর স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি দেখা গেল বটে, কিন্তু যে বেদনা আরব্য রজনীর সিন্ধুবাদের মত তাহাকে আশ্রয় করিয়াছিল, তাহার অবসান হইল না। লণ্ডন হইতে ইটালী, ইটালী হইতে ফ্রান্স, যেখানে যত বিশেষজ্ঞ ছিলেন সকলের স্মরণ লওয়া হইল, কিন্তু বেদনার কারণ যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গেল।

অবশেষে সুইট্জারল্যাণ্ড! সুইট্জারল্যাণ্ড যেন বাঙ্গালা দেশের তারকেশ্বর। তারকনাথের অনুগ্রহ হইলে, মুমূর্ষু রোগীও যেমন স্বপ্নাদেশে ঔষধ লইয়া নিরাময় হইয়া যায়, রেণুরও তাহাই হইল। এক বিশেষজ্ঞ পরীক্ষা করিয়াই বলিলেন—ডিস্মেনোরিয়া!

বিশ্বাস করা কঠিন বটে, কিন্তু রোগ বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে ঔষধ প্রয়োগ-মাত্র রেণুর অর্দ্ধেক অসুখ তখনই সারিয়া গেল। যে পেটেণ্টে উচ্চশিক্ষিত বোস্ সাহেবের আদৌ আস্থা ছিল না, রচির পেটেণ্ট "সেরিডন্" অসাধ্য সাধন করিয়া তাহাকে বিস্মিত করিয়া দিল। হফ্ম্যান-লা-রচির "সেরিডন্" বাতে, গাঁটের বেদনায়, শিরঃ-পীড়ায়, ঋতু কষ্টে অদ্ভুত কার্য্য করে।

রেণু আজকাল সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইয়াছে, আজ সে ষোড়শী তরুণী, রূপের আভায় শোভায়, দিব্য বিভায় আজ বোস্ দম্পতীর গৃহ সমুজ্জ্বল। শীঘ্রই আরও একটী ঘরের শোভা বৃদ্ধি পাইবে, তাহারই উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে।

—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

শ্রীশিবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস লিমিটেড, ৫৬ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

For every Indian to know—

How **METROPOLITAN INSURANCE CO., LTD.** has in the last four years of its existence served this society and what it stands for. In this respect we are placing below the Actuary's report and the opinions which count.

Actuary's Report

To

The Directors,

THE METROPOLITAN INSURANCE CO., LTD.,
CALCUTTA.

Gentlemen,

In accordance with your instructions I have completed the Valuation of the liabilities of your Company under its policy-contracts as at 31st March, 1935 and now have pleasure in submitting my report thereon.

The Company was incorporated on 1st May, 1930 and commenced work in July of the same year and it is a matter of congratulation that during the short period of $4\frac{1}{2}$ years it has secured an unprecedented amount of business. The rapid increase of the business of the Company can be judged from the premium collections during each year of the period under review.

1931	...	1,46,018/-
1932	...	1,66,996/-
1933	...	2,91,040/-
1934-35	...	5,76,184/-

The amount of business in force on the date of valuation is Rs. 1,17,29,499/- under 7299 policies with a premium income of Rs. 5,86,845/-. The ratio of expenses of management including commission to renewal premium income on the basis that 90 per cent. of the premiums of new business are spent in its procuration, is gradually diminishing each year as shown hereunder.

1932	...	79.7 per cent
1933	...	63.1 per cent
1934-35	...	47.6 per cent

The Valuation has been made on a stringent basis, namely :

Mortality—$O^{m(5)}$ Table with five years addition to age.

Interest—4 per cent.

Loading—Reserve for with profit policies ··· 20 p.c.
Reserve for without profit policies ··· 12.9 p.c.

The result of the valuation shows a surplus of Rs. 52,904/- of which Rs. 14,189/- has been carried forward unappropriated and the balance of Rs. 38,715/- has been divided amongst 2886 policies which were in force for more than one complete year. The bonus has been allowed as a Simple Reversionary Bonus at the rate of 1.5 per cent per annum on the sums assured among policy-holders for the Whole Term of Life and 1.1 per cent. per annum among Endowment Assurance policy-holders. There is no provision in the Articles of Association for apportionment of the surplus among the share-holders and the policy-holders and the Directors have the right to determine the amount of profit to be divided amongst them. I am given to understand that the share-holders will be glad to forego their portions of the surplus if substantial bonus be given to policy-holders which it is hoped will better further their interest than taking a small dividend at this stage of the Company. On this understanding I advise you, Gentlemen, not to declare any dividend to share-holders.

Gentlemen, you ought to be proud with the progress of the Company and if this be maintained it may be anticipated that the Company will hold a unique position at the next valuation.

Considering the sound way in which your business is conducted, prospective assurers need have no hesitation in joining your Company.

I am, Gentlemen,

Your most obedient servant,
(Sd.) Jogesh Ch. Sen,
Actuary.

38, Sitaram Ghose St.,
Calcutta,
11th September, 1935.

"STATESMAN" says:—

Dated 11-9-35.

METROPOLITAN RESULTS

There are very few new Indian life offices that can point to such a rapid advance as the Metropolitan Insurance Company has made after only four year of existence. The new business obtained last year consisted of Rs. 93,15,000 in proposals received and Rs 68,97,000 in sums assured under policies actually issued, comparing with Rs. 44,33,000 in the previous year. The Company has made a feature of efficient organization and with premiums framed on a very moderate scale has succeeded in attracting an exceptional degree of popularity inspite of the intensive competition in the field today. The life fund has increased during the year from Rs. 1,16,855 to Rs. 2,77,152; premiums less reassurances amounted to Rs. 5,76,184, while expenses, including commission, totalled Rs. 3,77,889 or about 65 per cent of the premiums as against more than 72 per cent in 1933. The net interest revenue of Rs. 10,733 shows a return of 5·6 per cent on the mean life fund. The

total of the assets side of the balance sheet is Rs. 4,33,689, of which Rs. 1,06,958 is invested in Government securities and an almost equal amount in industrial concerns against securities and with the personal guarantee of two of the directors.

An actuarial valuation has been made of the company's affairs covering the first four years' working and reveals a substantial surplus. A meeting of the directors is about to be held with the view of sanctioning the declaratian of the rates of bonus recommended by the actuary—viz. Rs. 15 per Rs. 1000 per annum on whole life policies and Rs. 11 per Rs. 1000 on endowment assurances.

AMRITABAZAR PATRIKA says :—

We have received a copy of the Audited Balance Sheet and Account for the company for its fourth year ending on the 31st March and directors' Report relating thereto.

The "Metropolitan" was eastablished in the latter part of the year 1930 at a time of the greatest national awakening of the recent times, and organised under very highly influential auspices of some of the most distinguished industrialists and insurance men of Bengal, it fell to the happy lot of this concern to take the pride of place among the young life offices that are contributing to the phenomenal growth of India's Life Assurance.

Reviewing its progress for the last four years we find that the Metropolitain, despite the world ecnomic crisis, has in the first four years done exceptionally well and has attained an enviable position among the Indian Insurande Companies. In the very first year of its working its operations resulted in policies being issued for nearly 40 lacs, which is claimed to be record for the opening year of an Indian Life Office. The second year showed a satisfactory progress and the business completed was 42½ lacs with an expense ratio of 81%, lapse ratio of 20%, a premium income of Rs. 1,66,995/- and a life fund of Rs. 62,353/-. The third year's working disclosed a bright career of this prodigious Indian Life Office, the new business completed being Rs. 44,33,375 with the expense ratio of 72.8 p.c., lapse ratio of 19.6 p.c. premium income of Rs. 2,91,040 and Life Fund of Rs. 1,16,855/-.

The fourth year has shewn a brilliant achievement of this young Life Office. During this period business amounting to Rs. 93,15,225 was placed with the company, out of which proposals of the value of Rs. 68,96,725 resulted in policies. The ratio of expense has come down to 63 p.c. the lapse ratio has been 19.8 p.c. The premium income has gone up to Rs. 5,76,184 and Life Fund to Rs. 2 77,152. Claims to the value of Rs. 47,600/- were paid within the year.

The investments of the Company are made in Government Securities and also in sound industrial concerns at an interest of 6%. In the opinion of the Directors, the Company has adopted such a policy of investment in the best interests of its policy-holders.

The Company has embodied in itself all the highly redeeming features in modern life practice, including revival of lapsed policies without payment of accumulated arrear premia, permanent disability benefits, joint-life assurance, children's higher and foreign education policies, automatic extension plan after payment for two years, loan and surrenders after two years and 2½% rebate on annual payments.

On the top of the above, this young company has made an actuarial valuation of its first four years' work and declared a bonus of Rs. 15/- for Whole Life Policies and that of Rs. 11/- for its Endowment Policies per thousand per year. And the Company claims thereby to have achieved another success among the Indian Life Office of the same age.

The Metropolitan Insurance Co., Ltd.—28, Pollock Street, Calcutta.

This unparalled success of the "Metropolitan" is attributable to the public confidence that the Directorate and management have been able to earn and also to the most attractive and beneficial terms for both policy-holders and agents.

We congratulate the company on its rapid progress and wish it a steady and successful career.

"A D V A N C E" says :—

Dated 15-9-35.

It was only four years back that the Metropolitan Insurance Co. Ltd., of Calcutta was started and the Reports and accounts for the fourth year ended 31st March last reveals a striking advance,

The new business obtained last year consisted of Rs. 93,15,000 in proposals received and Rs. 68,97,000 in sums assured under policies actually issued, comparing with Rs. 44,33,000 in the previous year. The company has made a feature of efficient organization and with premiums framed on a very moderate scale has succeeded in attracting an exceptional degree of popularity in spite of the intensive competition in the field today.

The life fund has increased during the year from Rs. 1,16,855 to Rs. 2,77,152; premiums less reassurances amounted to Rs. 5,76,184, while expenses including commission, totalled Rs. 3,77,889 or about 65 per cent of the premiums, as against more than 72 per cent in 1933. The net interest revenue of Rs. 10,733 shows a return of 5·6 per cent on the mean life fund.

The total of the assets side of the balance sheet is Rs. 4,33,689 of which Rs. 1,06,958 is invested in Government securities and an almost equal amount in industrial concerns against securities and with personal guarantee of two of the directors.

An actuarial valuation has been made of the company's affairs covering the first four years' working and reveals a substantial surplus. The declaration of the rates of bonus recommended by the actuary viz. Rs. 15 per Rs. 1,000 per annum on whole life policies and Rs. 11 per Rs. 1,000 on endowment assurance has been sanctioned by the share-holders' meeting.

"THE INDIAN INSURANCE JOURNAL," says :—

The history of Life Assurance in India has produced few more remarkable phenomena than the origin and growth of the Metropolitan Insurance Company, Limited of Calcutta which, though started only in 1930, has already come to be ranked as a strong and popular Life Office in the country.

The Board of Directors of the Company consist of some of the most influential and distinguished industrialists and Insurance men in Bengal and the progress of the Company during the first four years is indicated by the following figures :—

	New business.	Life Fund at the end of the year.
	Rs.	Rs.
1st year	... 40,00.000	... 37,116
2nd year	... 42,50.000	... 62,353
3rd year	... 44,33,000	... 1,16,858
4th year	... 68,96,725	... 2,77,152

The Metropolitan Insurance Co., Ltd.— 28, Pollock Street, Calcutta.

The success of the Metropolitan is due not merely to the power of organisation of the men who conduct its affairs but also to the excellent contract that the Company offers—a contract the liberality of which has never been surpassed by any other Company in India before.

Coming now to the Directors' Report and accounts of the Company for the year ended 31st March 1935, we find that during this period the Company received proposals for Assurance amounting to Rs. 93,15,225, out of which proposals for the value of Rs. 68,96,725 resulted in policies. The income from premiums amounted to Rs. 5,76,184 and from interests and other sources amounted to Rs. 23,170. Claims by death and disability amounted to Rs. 54786 and the expenses of management including commission to Agents were Rs 3,77,889. As a result of the year's working the Life Assurance Fund increased from Rs. 1,16,854 at the beginning of the year to Rs. 2,77,151 at the end of it. The total assets of the Company at the end of the year under review amounted to Rs. 4,33,688 out of which Rs. 1,06,958 is invested in gilt-edged securities and sum of Rs. 1,05,500 has been advanced to industrial concerns. A gratifying feature of the Company is that inspite of more than 50 per cent increase in new business the expense ratio has come down from 72.8 per cent in the previous year to 63 per cent in the year under review.

An actuarial valuation of the liabilities under policy contracts of the Company has been made as at 31st March 1935 and the valuation has disclosed a surplus which will enable the Directors to allot a bonus per thousand per year of Rs. 15 - on whole-life policies and Rs. 11/- on endowment assurances.

This is undoubtedly an occasion when congratulations may be extended to the Metropolitan's Staff, not only at the Head office but in the many branches throughout the country. The Company is in a powerful position and its field force can now offer policies which will compare favourably with those of any competitor. The combination of substantial financial resources, excellent organisation and the right policies, will send the Company ahead from strength to strength and we confidently anticipate that it will outstrip all past records during the next and the following years.

"THE INSURANCE & FINANCE REVIEW", says :—

The Metropolitan, a purely Indian institution having its head office in Calcutta, was ushered into existence in the year 1830, and has been doing exceedingly well since then. It succeeded in writing a new business of about 40 lacs of rupees in the very first year which, so far as we are aware was a record breaking achievement in India and gave unmistakable proof of the popular regard in which the Company—its Directors and its management—are held. The year that followed showed a steady upward movement and fully justified the hopes that were raised by this initial achievement. The following figures will illustrate the substantial progress it has made from year to year :

	New Business.	Life Fund.
First year	... 40 lacs	Rs. 37,000
Second year	... 42½ „	„ 92,000
Third year	... 45 „	„ 1,17,000
Fourth year	... 69 „	„ 2,77,000

With the permission of the Actuary to the Government of India, the last working period of the Company was closed after fifteen months on the 31st of March, 1935. This period was a fitting sequel to the years that went before.

Business :—During the above period business amounting to Rs. 93,15,225 was placed with the Company, out of which proposals of the value of Rs. 68,96,725 resulted in policies and the rest were either rejected or postponed or are awaiting completion. That the Company's progress is very satisfactory and most encouraging is evident from the increase in the volume of business.

Expense :—The expense-ratio of the year under review has been 63% as against 72.9 per cent of the last year.

Lapses :—The lapse-ratio has been 19.8 per cent.

Claim :—During the period under report claims to the extent of Rs. 54,086-11 arose out of death and Rs. 700 out of Permanent Disablement. Outstanding claim as at 31st December, 1933 amounted to Rs. 20,655. Of the total claims of Rs. 75,442-7 claims to the value of Rs. 46,600-8 only were paid within the year.

Life Assurance Fund :—The Life Assurance Fund as at 31st March, 1935, has come up to Rs. 2,77,151-13-7, as compared to Rs. 1,16,854-12-2 of the previous year.

Rarely has a Company done so splendidly on the initial years, and the Metropolitan can justly be proud of its achievements.

The first actuarial valuation of the Company was made as at March 31, 1935, i.e. after a little over four years' working, and inspite of the stringent methods employed, it has enabled the Company to declare a simple reversionary bonus of Rs. 15 per thousand per annum on its participating whole life policies, and of Rs. 11 per thousand per annum on participating endowment policies.

The Company's total business in force as at March 31, 1935 amounted to Rs. 1,17,30,000 and its total assets as at that date were valued at Rs. 4,34,000.

THE INSURANCE REVIEW Says :—

23rd December 1935.

It gives us great pleasure to review the latest Balance Sheet and Valuation Report of the Metropolitan Insurance Co. Ltd., Calcutta for the period ending 31st March 1935. The accounts submitted are for 15 months.

During the period under review the Company received proposals for assuring a sum of Rs. 93, 15,225, out of which proposals to the value of Rs. 6896725 resulted into policies recording an increase of nearly Rs. 25 lacs over the last year's figures.

The Total Premium Income amounted to Rs. 5,76,184 and the Total Income to. Rs. 5,99, 335. The expenses of management absorbed Rs. 3,77,889 giving a highly satisfactory ratio of 65·5% to the Total Premium income as compared with 75·9% during the last year.

During the period under report claims to the extent of Rs 54,086 arose out of death and Rs. 700 out of Permanent Disablement. Outstanding claims as at 31st December 1933 amounted to Rs. 20,655. Of the total claim of Rs, 75,442 claims to the value of Rs. 41,600 were paid within the year leaving a balance of Rs. 27,841 only as outstanding of which Rs. 8,266 have since been paid before the publication of the balance sheet and the balance could not be paid partly because complete claim papers were not yet received and partly because the claim in some cases were still under enquiry.

The lapse ratio is reported to be only 19·8% which is very creditable in view of the large business completed every year. The claims are also being paid very promptly. The Life Fund amounted to Rs. 2,77,152 as compared with Rs. 1,16,855 during the last year recording an increase of over cent per cent over 1933 figures.

The valuation for four years ending 31st March 1935 has been made on the following basis: –

Table of Mortality used OM (5) with five years addition to age.

Rate of Interest assumed 4%.

Premium reserved for future expenses 20% for 'with profit' and 12.9% for 'without profit' policies.

The amount of business in force on the date of valuation was Rs. 1,17,29,499 under 7299 policies with premium income of Rs. 5,86,245. The ratio of expenses of management including commission to renewal premium income on the basis that 90 per cent of the premiums of new business are spent in its procuration, is gradually diminishing each year as shown hereunder.

1932	79.7 per cent.
1933	63.1 per cent.
1934-35	47.6 per cent.

The result of the valuation on sufficiently stringent basis above shows a surplus of Rs. 52,904 of which Rs. 38715 has been allocated to 2886 policies which were in force for more than one year. The balance of Rs. 14189 has been carried forward unappropriated. The sacrifice of the policyholders has enabled the actuary to recommend a simple reversionary bonus of Rs. 15 per thousand per annum on Whole Life and Rs. 11 - on Endowment Assurances and the management deserves every credit for these results. The other notable feature of the valuation is that the shareholders have agreed to forego their share of the surplus and thus strengthen the position of the company to a great extent. This sacrifice of theirs will, we are confident, bear fruit in the future valuation and compensate them suitably by way of better dividend. The Chairman made the following remarks while presenting the report to the Board of Directors :

"The satisfactory features of the Company during the period under review i. e. from its inception to 31-3-35 are :

(1) the progress of the premium income from year to year, and

(2) the gradual diminution of the ratio of expenses.

Genltemen, I am at one with the Actuary when he observes that you should be proud of the progress of the Metropolitan Insurance Co. Ltd. This progress indicates that the Company has found favour with the public, and I think that the low rate of preimum with which the Metropolitan has offered maximum benefits to its policyholders is one of the many reasons behind this public appreciation.

In this connection, I must add that the present cry of protecting the Indian Insurace Companies against the competition of the foreign Companies, so far as it may help the Indian Companies to sell their policies at a higher rate of premium will find disfavour with the insuring public and will thus harm the Companies themselves. The problem before us is to see how we may make our policies cheaper and thereby be able to serve a bigger and bigger majority. It is curious that we as policyholders seek the lowest rates in the market but as Manager of Insurance Companies like to sell our policies at a higher rate. In thus attempting to raise our premium rates we naturally recede from the zone of popular availability and thereby defeat the end of an Insurance Company.

There are of-course, difficulties in keeping the rate of premium, sufficiently low, and I must attract your attention, Gentlemen, to the principle cause of these difficulties as it is not only alarming to Insurance business but is also eating into the very life of the nation. It is the daily growing death rate among our countrymen.

Following is a table showing death rates among Indians at ages between 30 and 55 :—

	Percentages of death at ages.		
Years	30-40	40-50	50-55
1901-11	26.2%	35.6%	32.7%
1911-21	31.9%	37.7%	35.0%
1921 31	30.6%	40.7%	54.0%

The above table shows that the death rate of Indians aged 30 and above is on the increase. This increase in mortality will very soon affect the Insurance Companies seriously and if sufficient attempts for checking this tendency are not immediately made the Insurance Companies will very soon have many black tales to tell. In my opinion, the cardinal interest of all Insurance Companies is to see how our people may easily earn their livelihood and may thereby retain their youth for a longer time and enjoy a longer life, and to this end every Indian Company should endeavour.

Gentlemen, without detaining you further, I now beg to move that the Consulting Actuary's Report on the Assets and Liabilities of the Company as at 31st March 1933 be adopted and that this meeting decides that the bonous to policy-holders as recommended by the Actuary be declared".

A few Claim Testimonials

"Re :—Claim against the policy No. 45 on the life of Surendra Nath Das (deceased) for Rs. 2,000/-.

I feel great pleasure in acknowledging the receipt of the amount of the above claim which has been paid to me to-day by Mr. B. B. Mozumdar B.A., LL.B., the Company's Secretary, who has been deputed to shillong for the purpose. My husband the late Surendra Nath Das insured with the Metropolitan Insurance Co., Ltd., for Rs. 2,000/- for which he had *paid only Rs. 26/- as the first quarterly premium.* After his death the Company very promptly sent the necessary claim papers and its chief-agent Mr. Bhubaneshwar Chakravarty helped me enormously in completing the necessary formalities.

Thanks very much to the extraordinary courtesy and sympathy of all the officers of the Company that as soon as the necessary papers duly completed were received by them, arrangements were made to pay the claim with the greatest promptitude. I cherish the best opinion for the Metropolitan Insurance Co., Ltd. and wish this Company all prosperity. Insurance is a real boon to a bereaved family like that of ours and I would recommend the public to insure their lives and represent this first class and respectable Life Insurance Co."

Dated 8th May, 1931,
Shillong.

Sd/. Chaki Baniani.

Dear Sir,

"Re :—Claim for Rs. 2,000/- under Policy No. 1308 on the life of Mrs. Anupama Debi (deceased).

I have great pleasure in acknowledging the receipt of Rs. 2,000/- being the claim amount on the above policy on the life of my late wife Mrs. Anupama Debi. My wife insured with your company for the above amount on 22-12-31 and *paid only the first premium* on 16-3-32 and died on 27-7-32. I thank you for the great promptness with which your Company has paid me the full amount of the claim. Your dealings in this connection have been most sympathetic and highly satisfactory. I recommend every Indian to insure his life with your purely Indian and most progressive Life Assurance Company and I wish you all success."

Dated 20-10-32

Thanjhora, T. E. P.O. Khoribari, Dist. Darjeeling. Sd/- Sudhir Chandra Bhattacherjee.

Dear Sir,

"Re : —Claim for Rs. 1000/- against the Policy No. 421 on the life of Amrita Lal Chowdhury (decd.)

I feel greatly obliged for the very sympathetic and prompt handling of my claim on your policy No. 121 on the life of my late husband Amritalal Choudhuri. Myself and the rest of the family have been left in such destitute conditions after the sad and untimely death of my husband that your help has come as God-send. The prompt manner in which the claim has been settled speaks very well of your company. Kindly permit me to record my hearty appreciation of your work. May God give you greater and greater prosperity so that destitute widows like myself may find some solace at least in their distress."

Dated 3rd April, 1933.
Kotwalipara, Faridpur. Sm. Sarbamangala Debi.

Dear Sir,

"Re :—Claim for Rs. 1,000/- against the Policy No. 867 on the life of Nagendra Nath Roy (deceased)

I am very much thankful for the prompt settlement of my claim on policy No. 867 on the life of my late father Babu Nagendra Nath Roy. The sympathetic treatment of your office and the readiness to supply me with all necessary informations in this connection have endeared your company to me and my friends. We shall always pray for your prosperity and shall introduce you to our acquaintances."

Dated 8-4-33.
Garhbetta, Midnapore. Sd/- Bhabadeb Roy.

Dear Sir,

"Re :—Claim for Rs. 2,000/- against the policy No. 1013 on the life of Bijoy K. Das Sinha (deceased)

I do not know how to thank you for the care, sympathy and attention with which you have settled my claim on your policy No. 1013 on the life of my son Mr. Bijoy K. Das Sinha. The promptness with which you have gone into the matter and have come to a decision speaks very highly of this progressive Swadeshi Life Office. May you prosper and render increasing services to our society and our country."

Dated 16-4-33.
Calcutta. Sd/- Sm. Priyambada Dassi.

Dear Sir,

"Re :—Claim for Rs. 1,500/- against the policy No. 1038, on the life of Mr. Sachindra Nath Mukherjee (deceased)

I do not know how to express my pleasure and gratitude for the settlement of the above claim with the greatest promptitude possible. The monetary help that the Company has rendered to me in this destitude condition of a bereaved widow and her family has come as god-send. The Company's sympathetic treatment, extraordinary courtesy and readiness to supply me with all sorts of informations required have endeared it to me so much so that I may conscientiously recommend this Company to the public for insuring their lives with it without any hesitation. I wish prosperity of the Metropolitan Insurance Company Limited—a Swadeshi Life office of highest order,"

Dated 24-8-33.
Calcutta.

Sd/- Sm. Taru Bala Devi.

Dear Sir,

"Re :—Claim for Rs. 2000/- against the Policy No. 4749 on the life of Boota Changar (deceased).

I beg to thank you from the core of my heart for the sum of Rs. 2000/- which your Punjab Branch Secretary, has today paid to me on behalf of the minor sons of my brother Boota Changar who died after paying only Rs. 52/6/-. Your treatment all along has been very generous and sympathetic and you have shown utmost promptness in settling this claim which is really praisworthy and all the more so when illiterate and ignorant villager like myselves were the claimants.

I wish your Company every success and prosperity and pray to the Almighty for its success from day to day.

Dated 21-7-34.

Yours faithfully,
Left thumb impression of
Alla Rakha Changar.

Dear Sir,

"Re :—Claim for Rs. 2000/- against the Policy No. 2803 on the life of Bhai Mohan Singh (deceased).

Your Company paid the amount with the least possible delay with the result that the family of the deceased had not to undergo any financial worry...........The promptness with which the claim was paid is really admirable.

Dated 12-12-33.
Punjab.

Sd/- Sardar Gurbaksh Singh,
B.A., LL.B.
Addl. Sub-judge, Sialkot.

Dear Sir,

"Re :—Claim for Rs. 1000/- against the Policy No. 4399 on the life of Kamini Kumar Mozumdar.

Please take my sincerest thanks and best appreciation of the Company for the quick payment of the claim on Policy No. 4399 on the life of my deceased husband Mr. Kamini Kumar Mozumdar.

Yours faithfully,

Dated at Calcutta,
14th March, 1934.

Sd/- (In Bengali)
Kamala Sundari Mozumdar.

Claim under Permanent Disablemen Benefit Clause.

Old Thargupet,
Bangalore City, 13-8-35.

My brother Mr. Singam Thimmaih of Old Tharagupet, Bangalore city, insured his life for Rs. 3,000/- in the Metropolitan Insurance Co., Ltd., Calcutta, under their Policy No. 2451 and after paying 3 years' premiums my brother suddenly fell victim to an attack of paralysis and has been laid down in bed since then. I am extremely glad to state that as soon as the proof of my brother's disability was furnished, the Metropolitan Insurance Co., paid to me the first year's claim amount under their permanent disablement benefit clause without the least delay. I very greatly appreciate the prompt manner in which the matter has been settled and I have no hesitation in recommending my countrymen to insure their lives in large numbers in this national concern particulary because of the unique privileges that the company offers under its permanent disability Benefit.

Sd/- Singam Rangasamappa

Witness ;—
Sd. B. Chicka Byappa
C/o. Singam Thimmiah & Co.,
Old Tharagupet, Bangalore City.
B. M. Nanjundaih,
Kaval, Byrasundra, Hebbal P. O.
Bangalore City.

Claim under Permanent Disablement Benefit Clause.

From

Dr. G. C. Chakravarty, D.Sc., P.R.S.,
Eden Hostel, 8/9, Harrison Road,
CALCUTTA.

To

The Managing Agents,
The Metropolitan Insurance Co., Ltd.
28, Pollock Street, Calcutta.

Dear Sirs,

Re : Claim on Policies 3153 & 3154.

Please accept my great appreciation and greatful thanks for the most favourable consideration that you have given to my permanent disability claim. I am already in receipt of the first instalment of the annual advance payment. It is indeed very creditable for a young company like yours to take such prompt action and to settle claims without giving the least trouble to policy-holders. I wish the company a most prosperous and successful career.

Thanking you,

Yours faithfully,

Dated, Calcutta,
The 23rd Nov. 34.

Sd/- G. C. Chakravarti.

Specialities of the Company :

1. Each Metropolitan policy, under all ordinary plans and most of the special plans, covers not only the risk of life but of permanent disablement as well, caused either by accident or by disease. This is done without any extra charge of premium being imposed.

2. Our Policies are world-wide and free from all restrictions as to travels and residence'

3. Our company entertains proposals on the lives of respectable ladies with a small extra charge only.

4. We accept premiums by instalments of half-yearly or quarterly amounts in all cases and monthly in respect of policies valued Rs. 5000/- and upwards *without* any extra charge.

5. We offer a *rebate* of 2½ per cent if premiums are paid annually.

6. We allow liberal surrender value after a policy has been *only* two years in force.

7. Loans are allowed up-to 95% of the cash surrender value, after *two* years only at a small rate of interest.

8. Our Policies are non-forfeitable and are kept alive under the automatic extension plan.

9. Revival of lapsed policies without payment of arrear premia is provided for.

10. Paid-up Policies are granted after the Policies have been *only* two years in force.

11. Our Policies are indisputable from the date of their issue.

12. Premium rates are most favourable and Policy conditions simple and attractive.

13. The Company entertains joint life proposals.

14. Our company is Indian in every respect—**capital, management and investments,**

We have Branch Offices at

BOMBAY, MADRAS, DELHI and LAHORE

AND

Sub-Offices at

DACCA, BANGALORE AND RANGOON.

Bhattacherjee Chaudhuri & Co.

Managing Agents.

৪র্থ বর্ষ, ১ম খণ্ড—২য় সংখ্যা]

বিষয়-সূচী

[ফাল্গুন—১৩৪২

13/61

চতুর্থ বর্ষ, ১ম খণ্ড—২য় সংখ্যা

ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়

—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

পূর্ব্বাবৃত্তি

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমস্যা কি কি, তৎসম্বন্ধে গত সংখ্যা পর্য্যন্ত যাহা যাহা বলা হইয়াছে, তাহা পুনরায় আবৃত্তি করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতবর্ষের দুরবস্থা সংক্ষেপতঃ চারি রকমের, যথা :—

(১) কৃষক, তাঁতী, যুগী, কুম্ভকার এবং কর্ম্মকার প্রভৃতি শ্রমজীবিগণের অন্নাভাব ;

(২) শিক্ষিত যুবক ও শ্রমজীবিগণের বেকারাবস্থা এবং অসন্তুষ্টি ;

(৩) উকিল, ব্যারিষ্টার প্রভৃতি আইন-ব্যবসায়ী, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী এবং বণিক্‌গণের পরমুখাপেক্ষিতা, অর্থকৃচ্ছ্রতা এবং অসন্তুষ্টি ;

(৪) সমস্ত অধিবাসীর স্বাস্থ্যহীনতা, অকালমৃত্যু, অসন্তুষ্টি এবং পরমুখাপেক্ষিতা।

এই দুরবস্থার কারণ তেরটী :—

(১) জমীর উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস ;

(২) পণ্যদ্রব্যের মূল্যের সাদৃশ্যের অভাব (want of parity) ;

(৩) কৃষি প্রভৃতি জীবিকার্জ্জনের চারিটী পন্থাতেই যাহাতে ন্যূনকল্পে গরীবানাভাবে পরিবার প্রতিপালিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থার অভাব ;

(৪) উপরোক্ত চারিটী পন্থাতেই যাহাতে শ্রমজীবিগণের পারিশ্রমিকের সাদৃশ্য থাকে, তাহার ব্যবস্থার অভাব ;

(৫) প্রকৃত বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে কি না তাহার পরীক্ষাদ্বারা যাহাতে শ্রমজীবী (manual workers) ও বিভিন্ন পরিচালকগণের (officers and subordinate officers) পদগৌরবের তারতম্য স্থিরীকৃত হয়, তাহার ব্যবস্থার অভাব ;

(৬) বুদ্ধির উৎকর্ষের তারতম্যানুসারে যাহাতে মানুষের উপার্জ্জনের তারতম্য হয়, তদনুরূপ ব্যবস্থার অভাব ;

(৭) জীবিকার্জ্জনের চারিটী পন্থাতেই যাহাতে সর্ব্বোচ্চ (maximum) উপার্জ্জন একরূপ হয়, তাহার ব্যবস্থার অভাব ;

(৮) সম্পূর্ণ ও নির্ভুল শরীরগঠন-বিদ্যার (Anatomy) অভাব ;

(৯) সম্পূর্ণ ও নির্ভুল শরীরবিধান-বিদ্যার (Physiology) অভাব ;

(১০) সম্পূর্ণ ও নির্ভুল পদার্থবিদ্যার (Physics) অভাব ;

(১১) সম্পূর্ণ ও নির্ভুল রসায়নের (Chemistry) অভাব ;

(১২) জল ও বায়ু যাহাতে অস্বাস্থ্যকর না হয়, তদনুরূপ ব্যবস্থার অভাব ;

(১৩) শিক্ষাপদ্ধতি যেরূপ হইলে ছাত্রগণ স্ব স্ব বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিয়া স্বাবলম্বী হইতে পারে, সেই শিক্ষাপদ্ধতির অভাব।

কি করিলে ভারতবাসীর দুরবস্থার অপনোদন হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আমরা আমাদের বক্তব্য এই প্রবন্ধ ব্যতীত 'বঙ্গশ্রী'র গত সংখ্যায় প্রকাশিত "জনসংখ্যা, জন্মনিরোধ ও মানুষের অবস্থা" নামক প্রবন্ধেও আলোচনা করিয়াছি। ঐ দুইটী প্রবন্ধে যাহা যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে বর্ণনার পার্থক্য আছে বটে, কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই।

মোটের উপর ভারতবাসীর দুরবস্থার অপনোদন করিতে হইলে নিম্নলিখিত বাইশটী ব্যবস্থা যাহাতে দেশের মধ্যে অবলম্বিত হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

(১) জমীর স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া যাহাতে কোনরূপ সার ব্যবহার না করিলেও প্রতি বিঘা জমী হইতে অন্ততঃ ১২ মণ ধান অথবা গম অথবা তন্মূল্যের অপর কোন শস্যের উৎপাদন হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা;

(২) যে জমীর স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তি প্রতি বিঘায় ৪ মণ ধান অথবা গম অথবা তন্মূল্যেরও কম, সেই জমী যাহাতে কোন কৃষক চাষ না করেন এবং তাহার উৎপাদিকা-শক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তদনুরূপ ব্যবস্থা;

(৩) নদীগুলি যাহাতে এত গভীর হয় যে, বর্ষাকালে বৃষ্টির পরিমাণ যতই বেশী হউক না কেন, তাহার দুই পাড় প্লাবিত হইবার কোন সম্ভাবনা যাহাতে না থাকে, তাহার ব্যবস্থা;

(৪) বিভিন্ন খাদ্যশস্য, শিল্পজাত ব্যবহার্য্য জিনিষ এবং গৃহনির্ম্মাণের উপকরণের বিভিন্ন মূল্যের মধ্যে যাহাতে সাদৃশ্য (parity) থাকে, তাহার ব্যবস্থা;

(৫) সাংসারিক জীবিকানির্ব্বাহের খরচ ও পারিশ্রমিকের মধ্যে যাহাতে সাদৃশ্য (parity) থাকে, তাহার ব্যবস্থা;

(৬) পরিশ্রমজাত দ্রব্যের মূল্যের তারতম্যানুসারে যাহাতে পারিশ্রমিকের তারতম্য স্থির করা হয়, তদনুরূপ ব্যবস্থা;

(৭) যাহাতে ১৮ বৎসরের মধ্যে বালকগণের দশটী ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি কার্য্যক্ষম হয় এবং ঐ বয়সে যাহাতে তাহারা উপার্জ্জনক্ষম হয়, তদনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা;

(৮) কোন্ খাদ্য, পানীয়, বায়ু, বাসস্থান এবং ব্যবহার্য্য বস্তু স্বাস্থ্যপ্রদ অথবা অস্বাস্থ্যপ্রদ, তাহা যাহাতে বালকগণ ১৮ বৎসরের মধ্যে পরিজ্ঞাত হইতে পারে এবং যাহাতে তাহাদের পরমায়ুবৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য থাকে, তদনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা;

(৯) জীবিকার্জ্জনের জন্য দেশের মধ্যে কোথায় কত লোকের উপযোগী কি ব্যবস্থা আছে এবং ঐ ঐ ব্যবস্থানুসারে কি কি শিক্ষা করিলে জীবিকার্জ্জন করা সম্ভব হয়, তাহা যাহাতে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক বালক জানিতে পারে, তদনুরূপ ব্যবস্থা;

(১০) যাহা যাহা শিক্ষা করিলে জীবিকার্জ্জন করা সম্ভব হয়, তাহা যাহাতে প্রাপ্তবয়স্ক বালকগণ ইচ্ছানুরূপ শিক্ষা করিতে পারে, তদনুরূপ ব্যবস্থা;

(১১) যে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক বালক উচ্চশিক্ষা অর্থাৎ বিজ্ঞানশিক্ষার প্রার্থী হইবে, তাহাদের হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় উচ্চশিক্ষার উপযোগী হইয়াছে কি না এবং মন ও বুদ্ধি ভবিষ্যতে তদনুরূপ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিবে কি না, তাহার পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং যাহাতে অনুত্তীর্ণ বালকগণ উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ লাভ না করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা;

(১২) কোন বস্তুবিষয়ক বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইলে ঐ বস্তুর কত রকম পরীক্ষা কিরূপ ভাবে করিতে হয় এবং নিজেকেই বা কিরূপ ভাবে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা যাহাতে উচ্চশিক্ষার্থী যুবকগণ শিক্ষা করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা;

(১৩) বস্তুর কত রকম পরীক্ষা কিরূপ ভাবে করিতে হয়, অথবা নিজের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি কিরূপ ভাবে গঠিত করিতে হয়, তাহা না শিখিয়া যাহাতে কেহ উচ্চশিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হইতে না পারেন তাহার ব্যবস্থা;

(১৪) উচ্চশিক্ষিত না হইয়া যাহাতে কেহ পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করিতে, অথবা শিক্ষকতা করিতে, অথবা চিকিৎসা ও আইন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে, অথবা ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে অথবা বিচার ও শাসন-বিভাগে প্রবেশ লাভ করিতে না পারেন, তাহার ব্যবস্থা;

(১৫) দেশের জলবায়ু যাহাতে কোনরূপে বিকৃত না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা;

(১৬) শ্রমজীবিগণ যাহাতে ১৮ বৎসর বয়সে উপার্জ্জন করিবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা ;

(১৭) দেশের মধ্যে যাহাতে মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৩০ জনের বেশী শিল্প, বাণিজ্য, ওকালতী, ডাক্তারী প্রভৃতি ব্যবসায়, শিক্ষকতা ও সরকারী চাকুরীর উপর নির্ভরশীল না হয়, তাহার ব্যবস্থা এবং যাহাতে কৃষি লাভবান্ হয়, তাহার ব্যবস্থা ;

(১৮) বালকগণের যাহাতে ১৮ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে বিবাহ হয়, তাহার ব্যবস্থা ;

(১৯) প্রকৃত ভাবে বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন যাঁহারা না করিতে পারেন, তাঁহারা যাহাতে হস্তপদাদির শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা অথবা শ্রমজীবী হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তাহার ব্যবস্থা ;

(২০) প্রকৃত ভাবে বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন যাঁহারা না করিতে পারেন, তাঁহারা যাহাতে মস্তিষ্কজীবী না হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা ;

(২১) কোন প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোক যাহাতে স্বামী ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের সহিত অথবা কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ যাহাতে স্বীয় স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীলোকের সহিত অবাধে মেলামেশা না করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা ;

(২২) প্রত্যেক স্ত্রীলোক যাহাতে সংসারের কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং কোন উপার্জ্জনের কার্য্যে প্রবৃত্ত না হন, তাহার ব্যবস্থা।

এই বাইশটী ব্যবস্থার মধ্যে কোন কোনটী কৃষি-সম্বন্ধীয়, কোন কোনটী বাণিজ্য-সম্বন্ধীয়, কোন কোনটী শিল্প-সম্বন্ধীয়, কোন কোনটী স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয়, কোন কোনটী শিক্ষা-সম্বন্ধীয় এবং কোন কোনটী সমাজ-বন্ধন-সম্বন্ধীয়। কোন দেশের গভর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিলে ঐ ব্যবস্থা কয়টীর কোনটীই কার্য্যে পরিণত করা যে কষ্ট-সাধ্য নহে, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে।

জগতের প্রত্যেক দেশে যে দারিদ্র্যের তীব্রতা ও দরিদ্রের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে, তাহা বিভিন্ন দেশের আধুনিক ভাবুক গ্রন্থকারদিগের বিভিন্ন গ্রন্থ পড়িলে অনুধাবন করা যায়। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন গভর্ণমেণ্টও তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন। কি করিলে এতাদৃশ সার্ব্বজনীন দুরবস্থার অপনোদন হইতে পারে, তৎসম্বন্ধেও অনেক শ্রেণীর চিন্তা প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু, ঐ ঐ উপায়ে যে সার্ব্বজনীন দুঃখ অপসারিত হইতে পারে, তাহা কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই। উপরোক্ত ভাবুকগণের চিন্তানুসারে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন গভর্ণমেণ্ট স্ব স্ব পরিচালনা-বিধির অল্পাধিক পরিবর্ত্তনও সাধন করিয়াছেন। কিছু দিন হইতে কোন কোন দেশের কোন কোন গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের দেশের অবস্থার উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেক দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বর্ত্তমানে যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, সেই অবস্থার দিকে, অথবা ঐ ঐ বিষয়ক প্রতিষ্ঠানগুলির লাভ-লোকসানের দিকে, অথবা স্ব স্ব পরিচিত বন্ধুবান্ধবদিগের আর্থিক ও স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় অবস্থার দিকে নজর করিলে, কার্য্যতঃ কোন দেশের যে কোন উন্নতি এতাবৎ সাধিত হইয়াছে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। কাযেই বর্ত্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহায়তায় যে যে উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বসাধারণের দুরবস্থা দূর করিবার কোন সহায়তা করে নাই, ইহা বলা যাইতে পারে।

ভারতীয় ঋষিগণের চিন্তার ধারা অবলম্বন করিলে উপরোক্ত বাইশটী ব্যবস্থা সর্ব্বসাধারণের দুরবস্থা দূর করিবার উপায় বলিয়া প্রতিভাত হয়। তদ্দ্বারা যে বস্তুতঃ সফল হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা আমরা যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছি।

অনেকে মনে করেন যে, আমাদের কথিত ব্যবস্থাগুলি কয়েকটী মন্তব্যমাত্র এবং আমাদের ঐ মন্তব্যের সহিত স্থানে স্থানে একমত হওয়া যায় এবং স্থানে স্থানে ইচ্ছা করিলে বিরুদ্ধ মতাবলম্বন করাও সম্ভব। যাঁহারা মনে করেন যে, আমাদের কথিত ব্যবস্থাগুলি কয়েকটী মন্তব্যমাত্র, তাঁহারা যে আমাদের প্রবন্ধ আদ্যোপান্ত চিন্তা করিয়া পড়েন নাই, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। আমাদের প্রবন্ধ আদ্যোপান্ত পড়িলে দেখা যাইবে যে, আমরা কুত্রাপি কোন মন্তব্য প্রকাশ করি নাই। বাস্তব জগতে যাহা ঘটিতেছে অথবা যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহা কার্য্যকারণ মিলাইবার পদ্ধতি অনুসারে সজ্জিত করিয়া, যে যুক্তি অনুসারে যে যে উপসংহার পাওয়া যায়, আমরা সেই সেই উপসংহারে

উপনীত হইয়াছি। আমাদের যুক্তিতে কোন ভ্রম আছে কি না, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নির্দ্ধারিত না করিতে পারিলে মাত্র মন্তব্যদ্বারা বিরুদ্ধ মতাবলম্বন করা অসারতার পরিচয় মাত্র।

ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণের স্বাস্থ্যের ও অর্থের দুরবস্থা দূর হইতে পারে, এমন পন্থা যদি আর কেহ নির্দ্ধারিত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে যুক্তিযুক্ত ভাবে আমাদের বক্তব্যের বিরোধিতা করা সম্ভব হইত। কিন্তু, যখন পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, সর্ব্ব-সাধারণের দুরবস্থার অপনোদনকর আর কোন পন্থা কোন দেশে কেহ নির্দ্ধারিত করিতে পারেন নাই, তখন আমাদের কথিত পন্থাগুলি যে অনন্যসাধারণ, তাহা যাঁহাদের যুক্তির ও বাস্তবতার উপর শ্রদ্ধা আছে, তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। অবশ্য যে মুহূর্ত্তে কেহ যুক্তি দ্বারা আমাদের কোন কথার অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন, সেই মুহূর্ত্তে আমাদিগকে অবনতমস্তকে তাঁহার বিরোধিতার সারবত্তা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

কেহ কেহ মনে করেন যে, বর্ত্তমানে প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জনসমাজে যেরূপ বিরুদ্ধ চিন্তার স্রোত চলিতেছে, তাহাতে আমাদের কথিত ব্যবস্থাগুলি কোন জনসমাজে কার্য্যতঃ গৃহীত হইবে না। আপাততঃ আমাদের কথিত ব্যবস্থাগুলি যে, কোন জনসমাজে সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হইবে না, তাহা সত্য। কিন্তু, আমাদের কথিত ব্যবস্থাগুলির কোনটীই যে গৃহীত হইবে না, তাহা সত্য নহে। প্রকৃতিদেবীর কার্য্য-কলাপ কিরূপ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়, তাহা যদি কাহারও জানা থাকে, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে, অতি দ্রুতগতিতে বর্ত্তমানে চরাচর জীবের পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে। মানুষ তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিতেছে না বলিয়া মানুষের অবস্থায় ক্রমশঃই অধিকতর জটিলতার উদ্ভব হইতেছে। অনশন ও অর্দ্ধাশনগ্রস্ত লোকের সংখ্যা ক্রমশঃই প্রত্যেক দেশে যেরূপ ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে অনতি-বিলম্বে জনসমাজে সুচিন্তিত কর্ম্ম-পদ্ধতি অবলম্বিত না হইলে, অদূর-ভবিষ্যতে মানুষে মানুষে ভীষণ সংঘর্ষের সম্ভাবনা অপরি-হার্য্য। মানুষে মানুষে এই সংঘর্ষের ফলে মানুষের যে পরিমাণ রক্ত-পাতের ও দুরবস্থার আশঙ্কা আছে, তাহা চিন্তা করিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। যদি এখনও মানুষ সর্ব্বসাধারণের দুরবস্থা দূর করিবার ঐ ব্যবস্থা কয়টী অবলম্বন না করে, তাহা হইলে পরস্পরের সংঘর্ষের ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হইবে, সেই অবস্থায় যে ঐ ব্যবস্থাগুলি সম্পূর্ণভাবে অবলম্বিত হইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এখন ঐ ব্যবস্থাগুলি একমাত্র ভারতবর্ষেও অবলম্বিত হইলে জগতের মানুষের পরস্পরের সংঘর্ষ ও রক্তপাতের সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইতে পারিত।

আমরা ভারতীয় ঋষির বিভিন্ন গ্রন্থ আংশিক ভাবে পড়িয়া যাহা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে বলিতে হয় যে, এই ভারতীয় ঋষির জ্ঞান, বিজ্ঞান ও উপদেশ একদিন জগতের সর্ব্বত্র জনসাধারণের অন্ন, বাসস্থান, সন্তুষ্টি, স্বাবলম্বন, দীর্ঘ যৌবন ও দীর্ঘ পরমায়ুর সংস্থান করিতে পারিয়াছিল। সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বসাধারণের সুখশান্তি বিধান করিবার উপায় মাত্র একটী এবং তাহা জানিতে পারা যায় একমাত্র ভারতীয় ঋষির জ্ঞান, বিজ্ঞান ও উপদেশ হইতে এবং উহা অবলম্বন করিয়াই আমাদের উপরোক্ত বাইশটী ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। একদিন ঐ ব্যবস্থাগুলি যে, মূলতঃ জগতের সর্ব্বত্র অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহা আমরা 'বঙ্গশ্রী'র গত সংখ্যায় প্রকাশিত "দেশের অবস্থা ও তৎসম্বন্ধে আনন্দবাজার পত্রিকা এবং ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। যেদিন হইতে মানুষ ভারতীয় ঋষির জ্ঞান, বিজ্ঞান ও উপদেশ ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই দিন হইতে মনুষ্যসমাজে জনসাধারণের অবস্থায় জটিলতার উদ্ভব হইয়াছে। ঐ জ্ঞান, বিজ্ঞান ও উপদেশ মানুষ যত বেশী পরিমাণে ভুলিয়াছে, মনুষ্য-সমাজে জনসাধারণের অবস্থায় তত বেশী জটিলতার উদ্ভব দেখা গিয়াছে। বর্ত্তমানে মানুষ ঐ জ্ঞান, বিজ্ঞান ও উপদেশ সম্পূর্ণভাবে ভুলিয়াছে বলিয়া মনুষ্যসমাজে জনসাধারণের অবস্থায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর জটিলতা উপস্থিত হইয়াছে।

মানুষের অবস্থা ও বুদ্ধি যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আপাততঃ আমাদের পক্ষে কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ না করা সম্ভব হইলেও হইতে পারে, তাহা সত্য বটে, কিন্তু এক-দিন অবস্থার তাড়নায় বাধ্য হইয়া যে আমাদের কথাগুলি অনেকেরই প্রণিধানযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

কি করিলে ঐ বাইশটী ব্যবস্থা ভারতবর্ষে অনতি-বিলম্বে অবলম্বিত হইতে পারে, তাহার আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে, আমাদের বর্ত্তমান "ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেস" সাধারণের প্রকৃত সম্মিলিত কংগ্রেস হইতে পারিলে এবং তাহার চেষ্টায় উদ্ভব হইলে উহা কার্য্যতঃ গৃহীত হইবার সম্ভাবনা হয়। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, আমাদের বর্ত্তমান "ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেস" নামে "কংগ্রেস" বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ উহাকে "কংগ্রেস" বলা যায় না, কারণ ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার শতকরা এমন কি একজন পর্য্যন্তও ঐ কংগ্রেসের সহিত ঐকান্তিকভাবে যোগদান করেন নাই। কেন অধিকাংশ লোকেরই ঐ কংগ্রেসের সহিত ঐকান্তিক সংস্রব নাই, তাহার আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে, অধিকাংশ জনসংখ্যার কংগ্রেস হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবার প্রধান কারণ দুইটী, যথা—(১) কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে "পূর্ণ স্বরাজ" অথবা স্বাধীনতার্জ্জন এই বাক্যের বিদ্যমানতা, এবং (২) কংগ্রেসের নেতৃবর্গের যথোপযুক্ত অভিজ্ঞতার অভাব।

কি করিলে প্রকৃত "জাতীয় কংগ্রেসে"র উদ্ভব হইতে পারে, আমরা বর্ত্তমান সংখ্যায় তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব।

প্রকৃত "জাতীয় কংগ্রেস" প্রতিষ্ঠা করিবার উপায়

প্রকৃত "জাতীয় কংগ্রেস" বলিতে বুঝিতে হইবে এমন একটী সম্মেলন, যাহাতে দেশের প্রত্যেকের মিলন সম্ভব হইতে পারে। দেশের সমস্ত জনসাধারণের সুশিক্ষা সাধিত না হইলে তাঁহাদের প্রত্যেকের স্ব স্ব জীবিকা নির্ব্বাহের জন্যই যে একটী জাতীয় কংগ্রেসের অথবা সম্মেলনের প্রয়োজন, ইহা সকলের পক্ষে বুঝা সম্ভব হয় না তাহা সত্য এবং বুদ্ধির অল্পতা হেতু হয়ত কেহ কেহ জাতীয় কংগ্রেস যেরূপ সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দরই হউক না কেন, তাহাতে যোগদান করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না তাহাও সত্য, কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে অথবা কর্ম্মপদ্ধতিতে এমন কিছু থাকা কিছুতেই সঙ্গত নহে, যাহার বিদ্যমানতা-হেতু দেশের এমন কি একজন লোকের পক্ষেও স্বীয় ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহাতে যোগদান করা অসম্ভব হইতে পারে।

বিদেশীয় রাজপুরুষগণকে বিতাড়িত করিয়া অথবা ঐ রাজপুরুষগণের স্ব স্ব কর্ত্তব্যনির্ব্বাহের উপযুক্ততা (efficiency) সত্ত্বেও তাঁহাদের ক্ষমতার খর্ব্বতা সাধন করিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জন করা কোন কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হইলে তাহাতে কোন রাজকর্ম্মচারী অথবা গভর্ণমেণ্টসংশ্লিষ্ট জনসাধারণের পক্ষে ঐকান্তিকভাবে যোগদান করা কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না। কাযেই যুক্তিসঙ্গতভাবে "পূর্ণ-স্বরাজ অথবা স্বাধীনতা লাভ" প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। আরও মনে রাখিতে হইবে যে, জনসাধারণের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য সময় সময় রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতায় জনসাধারণের দুঃখ-দারিদ্র্য অপসারিত হয় না, সেই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অথবা 'স্বাধীনতার জন্য স্বাধীনতা' কোন কোন ধনীপুত্রের অভিমান-পরিতৃপ্তির সহায়তা করিতে পারিলেও তদ্দ্বারা জনসাধারণের কোন হিত সাধিত হয় না।

আমাদের বর্ত্তমান তথাকথিত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেস যে-স্বাধীনতার উপাসক হইয়াছেন, তাহার ধারণা যে পাশ্চাত্ত্য জগৎ হইতে ধার করিয়া আনা হইয়াছে, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। স্বাধীনতার ঐ ধারণায় যে, পাশ্চাত্ত্য জগতের কোন উপকার হয় নাই, পরন্তু অপকারই সাধিত হইয়াছে, তাহা তাঁহারা এখন না বুঝিতে পারিলেও অদূরভবিষ্যতে বুঝিতে পারিবেন বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। পাশ্চাত্ত্য জগতের বর্ত্তমান স্বাধীনতার ধারণায় যদি তাঁহাদের কোন উপকারই হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রত্যেক দেশে দারিদ্র্যের তীব্রতা ও দরিদ্রের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে কেন?

আমরা গত সংখ্যায় দেখাইয়াছি যে, ইংলণ্ডেও এমন এক দিন ছিল, যখন বর্ত্তমান স্বাধীনতার ধারণা ব্রিটিশ রাজনীতিতে তীব্রভাবে স্থান পায় নাই এবং তখনই ইংরাজ জাতি জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। ঐ সংখ্যায় আরও দেখাইয়াছি যে, যে দিন হইতে বর্ত্তমান স্বাধীনতার মত্ততা ইংরাজ জাতিকে অধিকার করিয়াছে, সেই দিন হইতে তাঁহাদের মধ্যে দরিদ্রের সংখ্যা ও দারিদ্র্যের তীব্রতা বাড়িয়া চলিতেছে এবং তাঁহাদের দেশ অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছে।

কাযেই দেখা যাইতেছে যে, একে ত এই শ্রেণীর স্বাধীনতা লাভ করা কোন সম্মেলনের উদ্দেশ্য হইলে ঐ সম্মেলন কার্য্যতঃ কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত হইতে পারে না, অধিকন্তু ঐ শ্রেণীর স্বাধীনতার উপাসনায় কোন দেশের জনসাধারণের দুঃখ-দারিদ্র্য অপনোদিত হয় না।

কোন সম্মেলনের কার্য্যপদ্ধতিতে দেশের মধ্যে কাহারও সহিত অসহযোগের অথবা আইন-অমান্যের নীতি থাকিলে ঐ সম্মেলন কার্য্যতঃ কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। গভর্ণমেণ্টের সহিত অসহযোগের অথবা আইন-অমান্যের নীতি প্রবর্ত্তিত হইলে দেশের জনসাধারণের মধ্যে যে দলাদলি অনিবার্য্য হইয়া পড়ে, তাহাও আমরা ইহার পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। কাহারও সহিত অসহযোগ করিয়া তাহাকে অচল অথবা কোণঠেসা করিতে গেলে সেও যে প্রতিদানে তাহার দল পুষ্ট করিবার চেষ্টা করিবে, ইহা স্বভাবের নিয়ম। কাযেই গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে অসহযোগের ফলে যে দেশের মধ্যে দলাদলির বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

গভর্ণমেণ্টের আইন অমান্য করা কোন সম্মেলনের নীতি হইলে, তাহাতে দেশের সকলের যোগদান করা সম্ভব হইতে পারে না, কারণ যাঁহারা গভর্ণমেণ্টের বেতনভুক্ এবং যাঁহারা বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী, তাঁহাদের পক্ষে গভর্ণমেণ্টের আইন অমান্য করা অনায়াসসাধ্য নহে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, অসহযোগ অহিংস হইলে এবং আইন-অমান্য ভদ্রনীতিসম্মত (অর্থাৎ civil) হইলে, হয়ত দেশের সমস্ত জনসাধারণের তাহাতে যোগদান করা সম্ভব হইলেও হইতে পারে, কিন্তু "হিংসা" ও "অমান্য" বলিতে মূলতঃ কি বুঝায়, তাহা যথাযথভাবে জানা থাকিলে দেখা যাইবে যে, "অসহযোগ" কথনও সম্পূর্ণ ভাবে "অহিংস" হইতে পারে না এবং "অমান্যের কার্য্য"ও সম্পূর্ণভাবে "ভদ্রনীতিসম্মত" হয় না। "অহিংস অসহযোগ" এবং "ভদ্রনীতিসম্মত আইন-অমান্য" এই শ্রেণীর শব্দকে সংস্কৃত ভাষায় 'দুষ্ট-শব্দ' বলা হইয়া থাকে। যাহার নাম 'দুষ্ট-শব্দ' তাহারই নাম "সোনার পাথরের বাটী" অথবা "মাকাল ফল"। কার্য্যতঃ অসহযোগ যে অহিংস হয় না এবং আইন-অমান্য যে ভদ্রনীতিসম্মত হইতে পারে না, তাহা তথাকথিত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল (?) কংগ্রেসের গত কয়েক বৎসরের ইতিহাস বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে।

মহাত্মা গান্ধী বর্ত্তমান জগতের অনেকের দৃষ্টিতে সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি। তাঁহার কার্য্যের বিরুদ্ধ প্রতিবাদ করিতে হইতেছে বলিয়া আমরা দুঃখিত, কিন্তু দেশের অবস্থা আমূল ভাবে চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে যুক্তি অনুসারে যাহা প্রতীয়মান হয়, তাহা কর্ত্তব্যের খাতিরে প্রকাশ করিতে মানুষ বাধ্য হয়। যাহা হউক, আমরা "মহাত্মা"র ভক্তবৃন্দের নিকট ক্ষমা চাহিতেছি।

উপরোক্ত যুক্তি অনুসরণ করিলে দেখা যাইবে যে, দেশের মধ্যে ও আমাদের বর্ত্তমান ইণ্ডিয়ান্ ন্যাসন্যাল (?) কংগ্রেসের মধ্যে যে এত দলাদলি, তাহার প্রধান কারণ তিনটী, যথা—(১)কংগ্রেসের উদ্দেশ্য পূর্ণ স্বরাজ অথবা স্বাধীনতার্জ্জন এই বাক্যের বিদ্যমানতা (২) অসহযোগ-নীতি এবং (৩) আইন-অমান্য-নীতি।

যে সম্মেলনের কার্য্যের ফলে দেশব্যাপী এত দলাদলির উদ্ভব হইয়াছে এবং যাহাতে দেশের অধিকাংশ লোকের যোগদান করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে যুক্তিসঙ্গত ভাবে দেশের কোন প্রকৃত জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলা যাইতে পারে না। কাযেই সত্যের প্রতি কোন শ্রদ্ধা পোষণ করিলে বর্ত্তমান "ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেস"কে আমাদের সমগ্র জাতির কোন প্রতিষ্ঠান বলা যায় না। পরন্তু ইহাকে "তথাকথিত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল (?) কংগ্রেস" বলিতে হইবে।

এক্ষণে প্রশ্ন, কি উপায় অবলম্বন করিলে প্রকৃত "ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেসে"র উদ্ভব হইতে পারে।

কোন সম্মেলন স্থাপন করিতে হইলে প্রথমে দেখিতে হইবে, তাহার উদ্দেশ্য কি কি হওয়া উচিত; দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে তাহার কর্ম্মপদ্ধতি কি কি হইলে ঐ সম্মেলনের উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে; তৃতীয়তঃ দেখিতে হইবে ঐ সম্মেলন কোন্ কোন্ মন্ত্রণা ও কার্য্যনির্ব্বাহক সভার দ্বারা গঠিত হইলে তাহার কর্ম্মপদ্ধতি ও উদ্দেশ্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে; চতুর্থতঃ দেখিতে হইবে কোন্ কোন্ মন্ত্রণা ও কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় কি কি বিদ্যা ও অভিজ্ঞতাযুক্ত সভ্য থাকিলে ঐ ঐ মন্ত্রণা ও কার্য্যনির্ব্বাহক সভার দায়িত্ব সুচারুভাবে সম্পন্ন

হইতে পারে ; পঞ্চমতঃ দেখিতে হইবে ঐ সম্মেলনের প্রধান কর্ম্ম-কর্ত্তা হইতে হইলে কোন্ কোন্ বিদ্যা ও অভিজ্ঞতা একান্ত প্রয়োজনীয়।

আমরা আগেই বলিয়াছি যে, "প্রকৃত জাতীয় কংগ্রেস" অথবা "প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেস" বলিতে বুঝিতে হইবে এমন একটী সম্মেলন, যাহাতে দেশের প্রত্যেকের মিলন সম্ভব হইতে পারে। কোন "জাতীয় প্রতিষ্ঠানে" দেশের প্রত্যেকের মিলন সম্ভবপর করিতে হইলে, তাহার উদ্দেশ্য (অথবা Creed) এমন কোন স্বার্থমূলক হওয়া উচিত, যে-স্বার্থ জাতির প্রত্যেকের স্ব স্ব স্বার্থের অনুকূল। কোন দেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ঐ দেশের স্থায়ী অথবা অস্থায়ী অধিবাসীর কাহারও স্বার্থের কথঞ্চিৎ প্রতিকূল হইলে, তাহাতে অল্লাধিক সংঘর্ষ অনিবার্য্য এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত জাতীয়ত্ব-হানি হইবার সম্ভাবনাও অবশ্যম্ভাবী। অন্য দিকে যদ্যপি ঐ প্রতিষ্ঠান এমন কোন উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত হয়, যাহাতে দেশের শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, নির্ধন, জাতি ও ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রত্যেকে মনে করিতে পারেন যে, ঐ উদ্দেশ্য সফল হইলেই তাঁহাদের স্ব স্ব স্বার্থ অনতিবিলম্বে সিদ্ধ হইবে, তাহা হইলে যে ঐ প্রতিষ্ঠান প্রকৃত জাতীয় সম্পদরূপে পরিগণিত হইতে পারে, তাহা বলাই বাহুল্য।

আর্থিক সচ্ছলতা, সন্তুষ্টি, স্বাবলম্বন, শান্তি, স্বাস্থ্যপূর্ণ দীর্ঘ যৌবন এবং স্বাস্থ্যপূর্ণ দীর্ঘায়ু প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকের কাম্য। এই ছয়টী জিনিষ উপার্জ্জন করিতে হইলে দেশে যাহাতে শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও গভর্ণমেণ্ট পরিচালনের ব্যবস্থা সুচিন্তিত হয়, তাহা করা একান্ত প্রয়োজনীয়। যখন দেশে জনসাধারণের মধ্যে আর্থিক অসচ্ছলতা, অসন্তুষ্টি, পরমুখাপেক্ষিতা, অশান্তি, অস্বাস্থ্য এবং অল্লায়ুর বিস্তৃতিলাভ ঘটিতে থাকে, তখন বুঝিতে হয় যে, শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও গভর্ণমেণ্টের পরিচালনের ব্যবস্থায় বিকৃতি ঘটিয়াছে। শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও গভর্ণমেণ্ট এই পাঁচটী বস্তুর প্রত্যেকটীর ব্যবস্থায় অল্লাধিক বিকৃতি না ঘটিলে উহার কোনটীতেই বিকৃতি ঘটিতে পারে না এবং দেশেও জনসাধারণের মধ্যে আর্থিক অসচ্ছলতা প্রভৃতির বিস্তৃতি সম্ভবপর হয় না। যদি কেহ মনে করেন যে, উহার একটী, দুইটী, তিনটী অথবা চারিটীর ব্যবস্থা ভাল থাকিলেও অপর একটী, দুইটী, তিনটী অথবা চারিটীর ব্যবস্থায় বিকৃতি ঘটিতে পারে এবং তাহার জন্যই দেশের জনসাধারণের মধ্যে আর্থিক অসচ্ছলতা প্রভৃতির উদ্ভব হইতে পারে, তাঁহারা চিন্তা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, তাহা হয় না। ভারতবর্ষের শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও গভর্ণমেণ্ট—এই পাঁচটী বস্তুর প্রত্যেকটীর পরিচালনায় অল্লাধিক অব্যবস্থা প্রবেশ লাভ করিয়াছে এবং তাহারই জন্য সোণার ভারতের পঁয়ত্রিশ কোটী নিরীহ ও মূক জনসাধারণ আজ আর্ত্ত, অনশন ও অর্দ্ধাশনগ্রস্ত, অসন্তুষ্ট, পরমুখাপেক্ষী, রুগ্ন এবং অল্লায়ু।

কাযেই যাহাতে ভারতবর্ষের শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও গভর্ণমেণ্ট পরিচালনার সুব্যবস্থা হয়, তাহা করাই যদি কোন সম্মেলনের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে ঐ সম্মেলনে প্রত্যেক ভারতবাসীর যোগদান করা সম্ভব হইতে পারে এবং ঐ সম্মেলন প্রকৃত জাতীয় প্রতিষ্ঠান অথবা প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেস রূপে পরিগণিত হইতে পারে। ইহা ছাড়া আরও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যাহাতে ভারতবর্ষের শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও গভর্ণমেণ্ট পরিচালনার সুব্যবস্থা হয়, তাহার উদ্দেশ্যে "প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেসে"র প্রতিষ্ঠা হইলে প্রত্যেক স্থায়ী ভারতবাসীর তাহাতে যোগদান করা সম্ভবপর বটে, কিন্তু যাঁহারা বিদেশী অথচ অস্থায়ীভাবে ভারতবর্ষে কার্য্যোপলক্ষে বসবাস করিতেছেন, তাঁহাদের স্বার্থের অনুকূল কিছু না থাকিলে,তাঁহাদের পক্ষে ঐ প্রতিষ্ঠানে ঐকান্তিকচিত্তে যোগদান করা সম্ভবপর হইবে না এবং প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেস অঙ্গহীন থাকিয়া যাইবে। ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠানে যাহাতে তাহার অস্থায়ী অধিবাসীবৃন্দের ঐকান্তিকচিত্তে যোগদান করা সম্ভব হয়, তাহা সাধন করিতে হইলে অন্ততঃ তাহার উদ্দেশ্যে যাহাতে ইংলণ্ডের শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও গভর্ণমেণ্ট পরিচালনার প্রকৃত বিঘ্নকর কিছু স্থান না পায়, অপরন্তু ইংলণ্ডের ঐ ঐ ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হয়, তদ্বিষয়ে সাধ্যানুসারে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

আমাদের দেশের এবং এমন কি ইংরাজদিগের মধ্যেও এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা ইংলণ্ডের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে কোন চিন্তার ধার ধারেন না, তাঁহারা মনে করেন যে, ইংলণ্ড অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী দেশ এবং ইংলণ্ডের প্রত্যেক ব্যবস্থা আদর্শ জ্ঞানমূলক। ইংরাজদিগের মধ্যে এমন আর এক

শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা জানিয়া শুনিয়া ভারতবাসী প্রজাগণের মধ্যে স্বীয় দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্ম তাঁহাদের সমৃদ্ধি ও আদর্শ জ্ঞানের কথা প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্তু, বস্তুতঃ তাহা সত্য নহে। ইংলণ্ড যে অত্যন্ত বিপন্ন এবং তাহার প্রায় প্রত্যেক ব্যবস্থায় যে গুরুতর ক্রটী পরিলক্ষিত হইতে পারে, তাহা ইংলণ্ডের প্রায় প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি তাঁহাদের গ্রন্থে ও বক্তৃতায় স্বীকার করিয়া আসিতেছেন।

ইংলণ্ডসম্বন্ধীয় সমস্ত বাস্তব কথা আমূল চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, ইংলণ্ড ভারতবর্ষ অপেক্ষাও বিপন্ন এবং স্বর্ণপ্রসূ ভারতের রাজ্যাধিকার পাইলেও তাহার সমৃদ্ধি সাধিত হয় নাই।

ইংলণ্ডের শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও গভর্ণমেণ্ট পরিচালনায় গুরুতর ক্রটী আছে বলিয়াই তাহার জনসাধারণের মধ্যে দারিদ্র্যের তীব্রতা এবং দরিদ্রের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে।

তাহার শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও গভর্ণমেণ্ট পরিচালনা-ব্যবস্থার সংস্কারও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এমন ব্যবস্থাও দুঃসাধ্য নহে, যদ্দারা ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ড এই উভয় দেশেরই যুগপৎ উন্নতিসাধন সম্ভব হইতে পারে।

অতএব যাহাতে ভারতবর্ষের ও ইংলণ্ডের শিক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য ও গভর্ণমেণ্টের পরিচালনার সুব্যবস্থা হয়, তাহা করা যদি কোন সম্মেলনের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে ঐ সম্মেলনে প্রত্যেক ভারতবাসীর ও ইংরাজের যোগদান করা সম্ভবপর হইতে পারে এবং ঐ সম্মেলন সর্ব্বাঙ্গীণ প্রকৃত জাতীয় প্রতিষ্ঠান অথবা প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেস রূপে পরিগণিত হইতে পারে।

এই প্রবন্ধের প্রথম ভাগে যে বাইশটী ব্যবস্থার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, ঐ ব্যবস্থাগুলি দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইলে যে, দেশের জনসাধারণের আর্থিক অসচ্ছলতা, অসন্তুষ্টি, পরমুখাপেক্ষিতা, অস্বাস্থ্য এবং অল্পায়ু অপনোদিত হইতে পারে, তাহা প্রবন্ধান্তরে দেখান হইয়াছে। কাজেই যে-কর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বন করিলে ঐ বাইশটী ব্যবস্থা দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, তাহাকে প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সফল করিবার কর্ম্মপদ্ধতি বলিতে হইবে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইবে যে, কি কর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বন করিলে ঐ বাইশটী ব্যবস্থা দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে।

কেহ ব্যক্তিগত ভাবে কোন ব্যবস্থা দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন না এবং তাহা দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে সম্মিলিত শক্তির প্রয়োজন, ইহা বলাই বাহুল্য।

সাধারণতঃ প্রত্যেক দেশে ঐ দেশের গভর্ণমেণ্ট এই সম্মিলিত শক্তির কার্য্য করিয়া থাকেন এবং গভর্ণমেণ্টের চেষ্টায় দেশে নূতন নূতন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হয়। ভারতবর্ষেও গভর্ণমেণ্ট আছে এবং আমাদের গভর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিলে কোন নূতন ব্যবস্থা দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন। কিন্তু ভারতবর্ষের গভর্ণমেণ্ট দুইটী বিভিন্ন দেশের দুইটী বিভিন্ন ভাবাপন্ন জাতির দ্বারা পরিচালিত। তাহার ফলে সর্ব্বদা গভর্ণমেণ্টের সংগঠন কিরূপ হইবে, কেবল তাহা লইয়া ইংলণ্ডীয় ও ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে একটা বাদানুবাদ ও সংঘর্ষ চলিতেছে এবং আসল যে ব্যবস্থায় জনসাধারণের মধ্যে দারিদ্র্যের তীব্রতা ও দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি না পাইতে পারে, তাহার যথোপযুক্ত চিন্তা একরূপ লুপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

আসল ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের এই ঔদাসীন্য দূরীভূত করিতে হইলে আপাতদৃষ্টিতে হয় ইংরাজ জনসাধারণের নতুবা ভারতীয় জনসাধারণের দৃঢ়তার সহিত সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। গভর্ণমেণ্টের সংগঠন (constitution) কিরূপ হইবে, কেবল তাহা লইয়াই যে-সকল ভারতীয় জনসাধারণ দেশের মধ্যে হৈ-চৈ উত্থাপিত করিয়াছেন, তাহাদের হৈ-চৈয়ের প্রতি বিন্দুমাত্র দৃক্‌পাত না করিয়া, কি ব্যবস্থা করিলে ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে দারিদ্র্যের তীব্রতা ও দরিদ্রের সংখ্যা হ্রাস পাইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবন যদি প্রবীণ ইংরাজগণ অনন্যমনে করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আসল ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্যের চিহ্ন বিলুপ্ত হইতে পারিত। কিন্তু, প্রবীণ ইংরাজগণের কার্য্যে নানারকমের প্রবীণতার ও সাধুতার চিহ্ন পরিলক্ষিত হইলেও তাঁহাদের বুদ্ধিতে যে ঐ জাতীয় উপায় উদ্ভাবন করিবার সক্ষমতা নাই, তাহা বাস্তব অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে যুক্তিসঙ্গত ভাবে অস্বীকার করা যায় না। তাঁহাদের বুদ্ধি অনুসারে ইংলণ্ডে জনসাধারণের

হিতার্থে প্রবীণ ইংরাজগণ যে যে পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, ভারতবর্ষেও জনসাধারণের হিতার্থে প্রায় ঠিক সেই সেই পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ঐ ঐ পদ্ধতিতে ইংলণ্ডের জনসাধারণের মধ্যে দারিদ্র্যের তীব্রতা ও দরিদ্রের সংখ্যা হ্রাস পাওয়া ত দূরের কথা, বরং ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং ভারতবর্ষের জনসাধারণের মধ্যেও অনুরূপ অবস্থারই উদ্ভব হইতেছে। কাযেই আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হয় যে, প্রবীণ ইংরাজগণ দৃঢ়তার সহিত সতর্কতা অবলম্বন করিলে ভারতবর্ষের জনসাধারণের মধ্যে দরিদ্রের সংখ্যা ও দারিদ্র্যের তীব্রতা যাহাতে বৃদ্ধি না পায় তদনুরূপ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের জ্ঞানের ও অভিজ্ঞতার অভাব বশতঃ তাহা হওয়া সম্ভব নহে এবং কার্য্যতঃও তাহা হইতেছে না।

ভারতবাসিগণের মধ্যে যাঁহারা বয়স ও অভিজ্ঞতায় প্রবীণ, তাঁহারা যদি ঐকান্তিকতার সহিত,—যাহাতে ইংরাজ জনসাধারণের প্রকৃত স্বার্থবিরোধী কিছু না ঘটে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাদের সহযোগে গভর্ণমেণ্টের দ্বারা উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার চেষ্টা করেন, —তাহা হইলে সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

যাহাতে ইংরাজ জনসাধারণের প্রকৃত স্বার্থবিরোধী কিছু না ঘটে এবং ভারতবাসী জনসাধারণের প্রত্যেকের আর্থিক অসচ্ছলতা, অসন্তুষ্টি, পরমুখাপেক্ষিতা, অশান্তি, অস্বাস্থ্য এবং অকালমৃত্যু অপনোদিত হইতে পারে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিলে প্রকৃত সম্মিলিত ভারতীয় জনসাধারণের প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। প্রকৃতভাবে সম্মিলিত ভারতীয় জনসাধারণের প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইলে গভর্ণমেণ্টের প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিলগুলি তাহার নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ দ্বারা পরিপূর্ণ হইতে পারে। গভর্ণমেণ্টের প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিলগুলি প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ দ্বারা পরিপূর্ণ হইলে এবং যাহাতে ইংরাজ জনসাধারণের প্রকৃত স্বার্থবিরোধী কোন কথা অথবা কার্য্য কাউন্সিলগুলিতে না হয়, তদ্বিষয়ে ঐ প্রতিনিধিগণের ঐকান্তিক লক্ষ্য থাকিলে, তাঁহারাই প্রত্যেক প্রদেশের প্রত্যেক বিভাগের মন্ত্রিত্ব লাভ করিতে পারিবেন এবং তখন তাঁহাদের পক্ষে অনায়াসেই দেশের মধ্যে ইচ্ছানুরূপ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিবার সম্ভাবনা ঘটিবে।• এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, যাহাতে ইংরাজ জনসাধারণের প্রকৃত স্বার্থবিরোধী কোন চিন্তা ও কার্য্য জাতীয় সম্মেলনে প্রবেশ লাভ না করিতে পারে এবং ঐ সম্মেলনে ভারতীয় জনসাধারণের প্রত্যেকের আর্থিক সচ্ছলতা, সন্তুষ্টি, স্বাবলম্বন, শান্তি, স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু-সাধক চিন্তা ও কার্য্য সর্ব্বদা স্থান পায়, তাহার চেষ্টা ঐকান্তিক ভাবে করিতে হইবে। তাহা কেবল বচনের দ্বারা সাধন করিলে "প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেসের" প্রতিষ্ঠা সম্ভব-হইবে না। ঐকান্তিক-চিত্তে ইংরাজের প্রকৃত স্বার্থবিরোধী কার্য্য ও চিন্তা পরিত্যাগ না করিয়া কেবল বাচনিকভাবে তাহা পরিত্যাগ করিলে স্বভাবের নিয়মানুসারে ইংরাজ জাতি তাহা বুঝিতে পারিবেন এবং ঐ স্বভাবের নিয়মানুসারেই ভারতবর্ষে যাহাতে সম্মিলিত শক্তির উদ্ভব না হয়, তাহার চেষ্টা তাঁহারা করিবেন। অন্যদিকে ভারতের জনসাধারণের প্রত্যেকের হিতকর কার্য্যের দিকে ঐকান্তিক লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল বাচনিক লক্ষ্য রাখিলে স্বভাবের নিয়মানুসারে জনসাধারণের মধ্যে সম্মিলিত শক্তির প্রতি ঔদাসীন্য অনিবার্য্য। উভয়তঃই প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার আশা সুদূর-পরাহত।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা সাধন করিতে হইলে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত দুইটী বস্তুর একান্ত প্রয়োজন, যথা :—

(১) যাহাতে ভারতীয় জনসাধারণের প্রত্যেকের আর্থিক অসচ্ছলতা, অসন্তুষ্টি, পরমুখাপেক্ষিতা, অশান্তি, অস্বাস্থ্য এবং অকালমৃত্যুর সম্ভাবনা কমিয়া যায় তদনুরূপ কর্ম্মপদ্ধতির উদ্ভাবন। (এই প্রবন্ধের প্রথমভাগে কথিত বাইশটী ব্যবস্থার তালিকা ঐ কর্ম্মপদ্ধতি।)

(২) যাহাতে ইংরাজ জনসাধারণের প্রকৃত স্বার্থের কোন অনিষ্ট ঘটিতে পারে, তাহার কার্য্য, চিন্তা ও বাক্যের ঐকান্তিক বর্জ্জন। (এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, ইংরাজগণের মধ্যেও বড় বড় উপাধিধারী এবং বড় বড় পদগৌরবান্বিত এমন লাট-বেলাট অনেকে আছেন, যাঁহারা না বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের জনসাধারণের আপাত স্বার্থ-সংরক্ষণ করিতে গিয়া তাঁহাদের প্রকৃত স্বার্থের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নির্ব্বুদ্ধিতামূলক কার্য্য, চিন্তা ও বাক্যের বিরুদ্ধ সমালোচনা অথবা বাধা প্রদান করিলে ইংরাজ জনসাধারণের প্রকৃত স্বার্থের কোন অনিষ্ট সাধন করা হয় না।)

আরও দেখা গিয়াছে যে, প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা সাধন করিতে পারিলে, তাহারই নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের পক্ষে গভর্ণমেণ্টের সমস্ত প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের প্রত্যেক মন্ত্রিত্ব লাভ করা সম্ভব হইতে পারে এবং তখন অনায়াসেই পূর্ব্বকথিত বাইশটী ব্যবস্থা দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে।

সামান্ত চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, ইহারই নাম স্বায়ত্ত-শাসন এবং ইহা লাভ করিতে পারিলে আমাদের দুঃখ-দারিদ্র্য অপনোদিত হইতে পারে।

আমাদের মতে বর্ত্তমান তথাকথিত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল (?) কংগ্রেস যে আমাদের জনসাধারণের পক্ষে অসার, তাহার প্রধান কারণ, তাহাতে নেতৃবর্গ দেশের জনসাধারণের প্রত্যেকের দুঃখ-দারিদ্র্য কি করিয়া দূর হইতে পারে, তাহার কোন চিন্তা না করিয়া, কি করিয়া হিন্দু-চাকুরীয়ার সংখ্যা অথবা মুসলমান-চাকুরীয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে পারে, কার্য্যতঃ তাহারই চেষ্টা করিতেছেন এবং নিজদিগকে দেশীয় যুবক-বৃন্দের নিকট 'শ্রুতিমধুর' করিবার জন্য অন্য দেশের নিকট হইতে ধার-করা "স্বাধীনতা", "সমাজতান্ত্রিকতা" প্রভৃতি কথার ব্যবহার করিয়া নিজেদের আসল কার্য্যকলাপ প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন।

ইংরাজের উপর বিদ্বেষ পোষণ না করিয়া দেশের জন-সাধারণ যাহাতে এই নেতৃবর্গের প্রকৃত স্বরূপ চিনিতে পারেন এবং এই নেতৃবর্গ দেশের প্রকৃত হিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হন, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

এইখানে আমরা একবার বাঙ্গালীকে তাহার কিঞ্চিদধিক শত বৎসরের চিত্র স্মরণ করিতে অনুরোধ করিব।

মানসনেত্রে ঐ চিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে প্রথম যে মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইবে তাহা রাজা রামমোহনের। সে মূর্ত্তিতে কাহারও উপর কোন বিদ্বেষের কোন চিহ্নের প্রকটতা নাই। আছে কেবল কি করিয়া ভারতবাসী জনসাধারণের উন্নতি হইবে তাহার চিন্তার চিহ্ন। তাঁহারই সাধনার ফলে ভারত-বাসী লাভও করিয়াছিল একটী জাগরণ।

দ্বিতীয়তঃ যে মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইবে, তাহা যে কতখানি পুণ্যময় ও পবিত্র, তাহা বাঙ্গালী এখনও সম্পূর্ণ ভাবে বুঝিতে পারে নাই। অতীন্দ্রিয়ের সাধনার দ্বারা যে চিন্তাশক্তি বঙ্কিমচন্দ্র লাভ করিয়াছিলেন এবং যাহা তাঁহার রচনার ছত্রে ছত্রে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা অভিমানগ্রস্ত সাধারণ লোকের পক্ষে বুঝিয়া উঠা সম্ভবপর নহে।

তাই তাঁহার 'আনন্দমঠ'কে ও 'দেবী চৌধুরাণী'কে বাঙ্গালী ভুল বুঝিয়াছে। আনন্দমঠের নায়ক জিতেন্দ্রিয়, শক্তিসম্পন্ন পুরুষ আর দেবী চৌধুরাণীর নায়িকা জিতেন্দ্রিয়, শক্তিসম্পন্ন নারী। পুরুষ অথবা নারী জিতেন্দ্রিয় হইলে প্রকৃত সন্ন্যাসী* হইতে পারে। যাহাতে মানুষ কোন নিন্দনীয় কিছু না করে, তাহার চেষ্টা প্রকৃত সন্ন্যাসীর কার্য্যে পরিলক্ষিত হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত সন্ন্যাসীর মধ্যে কখনও কাহারও প্রতি বিদ্বেষের ভাব থাকিতে পারে না। যাঁহারা অপরের উপর বিদ্বেষের বিষ বিতরণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা নামে ভগবৎ-সদৃশ সন্ন্যাসীর খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারিলেও প্রকৃত সন্ন্যাসী নহেন। বঙ্কিমচন্দ্র কাহারও বিরুদ্ধে বিদ্বেষের ভাব প্রচার করেন নাই। সুজলা, সুফলা ভারতমাতা যে শুষ্কা ও শীর্ণা হইয়া আসিতেছিলেন, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রেরই সর্ব্বপ্রথমে লক্ষ্যে পতিত হইয়াছিল। তাই তিনি আকুল হইয়া ভারতবাসী যে কিরূপ কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে, তাহা তাঁহার বিভিন্ন রচনায় দেখাইবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কাহারও উপর বিদ্বেষের ভাব ছিল না, অথচ দেশপ্রাণতা ছিল বলিয়াই তাঁহার সময়েও আমরা ভারতবর্ষে বর্ত্তমান কালের মত দুর্দ্দশার চিহ্ন খুঁজিয়া পাই নাই। পরন্তু তখনও দেশে প্রকৃত স্থায়ী জাগরণই পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

ঐ চিত্রপটে বঙ্কিমচন্দ্রের পর বহুদূর পর্য্যন্ত আর কোন সমুদ্ভাসিত উজ্জ্বলমূর্ত্তি দেখা যায় না। এক একটী অস্পষ্ট মূর্ত্তিতে প্রতিভার চিহ্ন আছে বটে, কিন্তু তাহার প্রত্যেকটী কাহারও না কাহারও উপর বিদ্বেষের বহ্নিতে ক্ষণেকের জন্য প্রকটিত হইয়া পরক্ষণেই নির্ব্বাপিত হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্বেষ-পূর্ণ প্রতিভার ইহাই পরিণতি। ক্ষণেকের তরে সে জাগিয়া উঠিয়া মানুষকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে মানুষ কেবলমাত্র ক্ষিপ্তই হইয়া থাকে। তাহাতে মানুষের প্রকৃত কোন লাভ ঘটে না। এই সময়ে ভারতবাসীর যে জাগরণ তাহাও জলবুদ্বুদের মত কখনও ভাসিয়া উঠিয়াছে এবং পরক্ষণেই নিশ্চিহ্ন হইয়াছে।

সর্ব্বশেষে যে উজ্জ্বলমূর্ত্তি প্রদীপ্ত রহিয়াছে, তাহা খুব সম্ভব ভারতবাসী এখনও ভুলিতে পারেন নাই। উহা আমাদের চিত্তরঞ্জনের। সে মূর্ত্তিতেও বিদ্বেষের প্রকটতা নাই। তাহাতে আছে কেবল দেশের দরিদ্র ও মূক জনসাধারণের জন্য জ্বালার চিহ্ন। সে জ্বালা অবর্ণনীয়। দারিদ্র্যকে গ্রাহ্য নাই, আদরের অভ্যাসগুলির প্রতি কোন লক্ষ্য নাই, সদসৎ চিন্তার প্রতি কোন সতর্কতার ব্যাকুলতা নাই—তাহাতে আছে কেবল "মন্ত্রের সাধন অথবা শরীরপতন", এই মন্ত্রের পুরশ্চরণের প্রবল আকাঙ্ক্ষার চিহ্ন। চারিদিকে দৈত্যদানবে ঘেরা সেই মূর্ত্তির বাস্তবতা অকালে শুকাইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার দীপ্তি এখনও ঐ চিত্রপটে আকর্ষণযোগ্য ঔজ্জ্বল্য লাভ করিবার সামর্থ্য রক্ষা করিতেছে। মনে হয় যেন উহা ক্রমশঃই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া পড়িবে। বিদ্বেষহীনতা ও দেশপ্রাণতার জন্যই তাহার ঐ ঔজ্জ্বল্য।

চিত্তরঞ্জনের বিদ্বেষহীনতা ও দেশপ্রাণতা ছিল বলিয়াই অতি অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে সারা ভারতবর্ষে যে-জাগরণ দেখা গিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে আর কখনও দেখা যায় নাই। ঐ জাগরণে যে আমাদের কোন প্রকৃত ফল হয় নাই, তাহার

* জ্ঞেয়: স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥
গীতা, ৫ম অধ্যায়, ৩য় শ্লোক।

জন্য দায়ী চিত্তরঞ্জন নহেন, পরন্ত আর যে সমস্ত বিদ্বেষ ও অভিমানগ্রস্ত নেতৃবর্গ এখনও জীবিত রহিয়াছেন, তাঁহারাই ঐ অসাফল্যের জন্য দায়ী। এই বাস্তব ঐতিহাসিক চিত্রপট দেখিয়াও কি ভারতবাসী নিজদিগকে বিদ্বেষবহ্নি হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবেন না ?

প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য যে কার্য্যতালিকা গৃহীত হইবে, তাহা সুচারুভাবে নির্ব্বাহ করিবার জন্য কোন্ কোন্ মন্ত্রণা ও কার্য্যনির্ব্বাহক সভার প্রয়োজন হইতে পারে, কংগ্রেসের ঐ ঐ মন্ত্রণা ও কার্য্যনির্ব্বাহক সভার বিশেষ বিশেষ সভ্যগণের কি কি বিদ্যা ও অভিজ্ঞতা থাকার প্রয়োজন এবং প্রধান কর্ম্মকর্ত্তারই বা কি কি বিদ্যা ও অভিজ্ঞতা থাকার প্রয়োজন, তাহা নির্দ্ধারণ করা অতীব বিস্তৃত কার্য্য। এই প্রবন্ধে তাহা সম্যক্ ভাবে বর্ণনা করা সম্ভব নহে। কাযেই যথাসম্ভব সংক্ষেপে এই স্থানে উহা প্রকাশ করিব।

কর্ত্তব্যের সুচারু নির্ব্বাহের জন্য প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেসের সংগঠন (constitution) কিরূপ হওয়া উচিত তাহা চিন্তা করিবার সময় নিম্নলিখিত সত্য স্মরণ রাখিতে হইবে :—

(১) কংগ্রেসের সংগঠন যাহাতে গ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে প্রত্যেক গ্রামে, ইউনিয়ন বোর্ডে, মহকুমায় এবং জেলায় কংগ্রেসের শাখা স্থাপন করিবার প্রয়োজন হইবে।

(২) কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও কর্ম্মতালিকা সফল করিবার জন্য যাহা যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহার দায়িত্বভার যাহাতে স্থানে স্থানে এক এক জন যথোপযুক্ত বিদ্যা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির উপর অর্পিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) যাহাতে কর্ম্মকারের কার্য্য কুম্ভকারের হস্তে, অথবা কুম্ভকারের কার্য্য কর্ম্মকারের হস্তে অর্পিত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) নির্লোভ ও সত্যপরায়ণ লোক যাহাতে কংগ্রেসের দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মভার প্রাপ্ত হন, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে, যাঁহারা স্ব স্ব পরিবারের জীবিকার্জ্জনের জন্য বৃত্তিহীন অথবা যাঁহারা স্ব স্ব বৃত্তিদ্বারা নিজ পরিবারের ভরণপোষণোপযোগী যথেষ্ট উপার্জ্জনে অক্ষম, তাঁহারা যাহাতে কংগ্রেসের কোন দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার প্রাপ্ত না হন, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে। যাঁহারা নিজ পরিবারের ভরণ-পোষণে অক্ষম, তাঁহাদের হাতে জনসাধারণের কার্য্য অর্পিত হইলে অনাচার প্রবিষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকিবে।

(৫) যাঁহারা নিজ পরিবারের ভরণপোষণে অক্ষম, তাঁহাদের হাতে কংগ্রেসের কোন কার্য্যভার অর্পণ করিতে হইলে, তাঁহারা যাহাতে নিজ পরিবারের ভরণপোষণ করিবার উপযোগী বেতন পাইতে পারেন, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইতে হইবে।

গ্রাম্য শাখাসমূহে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কর্ত্তব্যভার অর্পণ করিবার প্রয়োজন হইবে :—

(১) গ্রামের প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষ যাহাতে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও কর্ম্মতালিকা সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন এবং ঐ উদ্দেশ্যে কর্ম্মতালিকায় যাহাতে জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রত্যেকের আস্থা স্থাপিত হয়, তাহার কর্ম্মভার ;

(২) গ্রামের অধিবাসিগণের মধ্যে যাহাতে গভর্ণমেণ্টের উপর, ইংরাজ জাতির উপর অথবা তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে জাতিধর্ম্মবশতঃ কোন বিদ্বেষ না থাকে, তাহার কর্ম্মভার ;

(৩) গ্রামে চৌকীদারগণ অথবা পুলিশ কর্ম্মচারিগণ অথবা কোন সরকারী কর্ম্মচারী কোন গ্রামবাসীর নিকট হইতে কোন উৎকোচাদি গ্রহণ করিলে তাহার সংবাদ যাহাতে উপরিতন কংগ্রেসকর্ম্মীর নিকট পৌঁছিয়া ক্রমশঃ প্রাদেশিক সরকারী মন্ত্রীর কর্ণে পৌঁছিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ;

(৪) কৃষকের কৃষিকার্য্যে, ব্যবসায়ীর ব্যবসায়কার্য্যে, শিল্পীর শিল্পকার্য্যে, বণিকের বাণিজ্যকার্য্যে, শিক্ষকের শিক্ষকতাকার্য্যে যে যে অসুবিধা উপস্থিত হয়, তাহা যাহাতে কংগ্রেসের গ্রাম্য শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মী জানিতে পারেন এবং ক্রমশঃ প্রাদেশিক

সরকারী মন্ত্রী তদ্বিষয়ে পরিজ্ঞাত হন, তাহার ব্যবস্থা ;

(৫) জীবিকানির্ব্বাহের জন্ম ন্যূনকল্পে যে যে বস্তুর প্রয়োজন, তাহার অভাবের তাড়না যে যে গ্রামবাসী সহ্য করিতে বাধ্য হইতেছেন বলিয়া পরিলক্ষিত হইবে, তাঁহাদের নাম সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা :

(৬) যে যে গ্রামে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইবে, সেই সেই গ্রামের পুষ্করিণী ও খাল কখন্ কখন্ জলহীন হইয়া কর্দ্দমময় হইয়া পড়ে, তাহা যাহাতে উপরিতন কংগ্রেসকর্ম্মীর দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার ব্যবস্থা ;

(৭) অনশনে অথবা কোনরূপ নির্য্যাতনে কেহ আত্ম-হত্যা করিলে তাহার নাম যাহাতে উপরিতন কংগ্রেসকর্ম্মীর দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার চেষ্টার ব্যবস্থা ;

(৮) সমাজবিরুদ্ধ অথবা গভর্ণমেণ্টের আইনবিরুদ্ধ যে সমস্ত ঘটনা গ্রামের মধ্যে ঘটিয়া থাকে, তাহা যাহাতে উপরিতন কংগ্রেসকর্ম্মীর দৃষ্টিগোচর হয় এবং ঐ সমস্ত ঘটনা যাহাতে না ঘটিতে পারে, তাহার চেষ্টার ব্যবস্থা ;

(৯) প্রচলিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের শতকরা চারি টাকার অতিরিক্ত সুদে যাহাতে গ্রামবাসিগণকে কেহ কোনরূপ ঋণ প্রদান করিতে না পারেন, তাহার চেষ্টার ব্যবস্থা ;

(১০) ন্যায্য সুদে যাঁহারা গ্রামবাসিগণকে ঋণ প্রদান করিবেন, তাঁহাদের টাকা পরিশোধ করিবার প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য যাহাতে গ্রামবাসিগণের থাকে, তাহার চেষ্টার ব্যবস্থা ;

(১১) যাহাতে কংগ্রেসের গ্রাম্যশাখাগুলি ক্রমশঃ গ্রাম্য মিউনিসিপ্যালিটীগুলির কার্য্যভার লাভ করিতে পারে, তাহার চেষ্টার ব্যবস্থা ;

(১২) গ্রাম হইতে যে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহার বিক্রয়-মূল্যের সহিত যাহাতে অন্যান্য স্থানের উৎপন্ন যে যে দ্রব্য গ্রামবাসিগণের ক্রয় করিতে হয়, তাহার ক্রয়-মূল্যের সমতা থাকে, তাহার চেষ্টার ব্যবস্থা ;

(১৩) গ্রামে অপর যে যে সাধারণ হিতকর প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব দেখা যাইবে, তাহা যাহাতে কংগ্রেসের সহিত মিলিত হইয়া যায়, তাহার চেষ্টার ব্যবস্থা।

গ্রাম্য শাখাসমূহের উপরোক্ত দায়িত্বগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, উহা সাধারণতঃ ছয়টী বিভাগের কার্য্য, যথা—(১) কংগ্রেস-সংগঠন-বিভাগীয়, (২) সাধারণ পরিচালনা-বিভাগীয়, (৩) শিক্ষা-বিভাগীয়, (৪) কৃষি-বিভাগীয়, (৫) শিল্প-বিভাগীয় এবং (৬) বাণিজ্য-বিভাগীয়।

গ্রামের অধিবাসিগণের মধ্যে যাঁহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল এবং যাঁহারা বিভিন্ন-বিভাগীয় অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিবার সুযোগ পাইয়াছেন ও সাধারণের সেবার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্তিযুক্ত, তাঁহারা যাহাতে ঐ ঐ কার্য্যভার অবৈতনিকভাবে গ্রহণ করেন, তাহার চেষ্টা করিলে কংগ্রেসের গ্রাম্য শাখাসমূহের সাফল্য লাভ করিবার সম্ভাবনা হইবে।

প্রত্যেক গ্রাম্য শাখায় এক জন সভাপতি এবং পাঁচ জন বিভাগীয় সহকারী নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন হইবে।

ঐ পাঁচ জন সহকারী ও সভাপতি নিযুক্ত করিবার জন্ম প্রত্যেক গ্রাম্য শাখায় একটী করিয়া "সাধারণ সভা" ও "কার্য্যনির্ব্বাহক সভা" স্থাপন করিতে হইবে। "সাধারণ সভা" ছয়টী বিভাগের কার্য্যের জন্ম বিভিন্ন-বিভাগীয় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ছয় জন কর্ম্মী নিযুক্ত করিবেন এবং ঐ ছয় জন কর্ম্মী মিলিত হইয়া "কার্য্যনির্ব্বাহক সভা" গঠন করিবেন এবং তাঁহাদের মধ্যে যিনি সর্ব্ববাদিসম্মতভাবে বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য-দক্ষতা-সম্পন্ন, তাঁহাকে সভাপতি নিযুক্ত করিবেন।

গ্রামের প্রত্যেকে যাহাতে কংগ্রেসের সভ্য হন, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে এবং যিনি কংগ্রেসের সভ্য হইবেন, তিনি গ্রাম্য শাখাসমূহের সাধারণ সভারও সভ্য হইবেন। কংগ্রেসের সভ্য হইতে হইলে কোন চাঁদা দিবার বাধ্যবাধকতা থাকিবে না। অবস্থানুসারে যাঁহার যাহা দিবার সামর্থ্য ও প্রবৃত্তি থাকে, তাহা দিলেই চলিতে পারিবে।

ইউনিয়ন-বোর্ডের শাখাসমূহের কর্ত্তব্য থাকিবে গ্রাম্য শাখাগুলির পরিদর্শন ও পরামর্শ-প্রদানমূলক। তাহাতেও উপরোক্ত ছয়টী বিভাগ এবং দুইটী সভা থাকিবে।

গ্রাম্য শাখাগুলির কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ মিলিত হইয়া ইউনিয়ন-বোর্ড শাখাগুলির সাধারণ সভা গঠন করিবেন। এই সাধারণ সভা হইতে তাঁহাদের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ছয় জন কর্ম্মী নির্ব্বাচিত হইবেন।

আমরা আগামী বারে বাকী শাখাগুলির সংগঠন ও আয়-ব্যয়-নির্ব্বাহ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। [ক্রমশঃ

আমরা কি সামরিক জাতি ?

—শ্রীকাঞ্চনমালিকা দেবী

আমরা কি সামরিক জাতি ?

আমরা জানি, আমরা সামরিক জাতি নই। আর, যদি আমাদিগকে সামরিক জাতি বলিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের সমরক্ষেত্র আমাদিগের সংসার; আর আমাদিগের অস্ত্র ঝাঁটা (প্রথমেই ঝাঁটার নাম করিলাম বলিয়া কেহ যেন রাগ না করেন) হাতা, বেড়ী, হাঁড়ী, সরা, কড়া, দুধের বাটী, আর খুন্তী বা খোন্তা; এই অস্ত্রগুলি ছাড়া অপর কোন অস্ত্র আমাদিগের আছে কি? আমিও জানি, নাই, তবে আমাদের শিক্ষিতা ভগ্নীগণ যদি বলেন, আছে, তবে আছে। তাঁহারা আমার সেই অজানা অস্ত্রগুলির নাম বলিয়া দিবেন কি?

আমাদের মধ্যে যাঁহারা স্বর্গীয় নাট্যকার রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের "জামাই বারিক" নাটক পড়িয়াছেন, তাঁহারা বগী-বিন্দীকে সামরিক নারী বলিয়া অভিহিত করিলে বোধ হয় খুব অন্যায় হইবে না। আমিও স্বীকার করিতেছি, বগী বিন্দী military সামরিক নারী। কিন্তু তাহারা সামরিক হইলেও তাহাদের সমরাঙ্গন ছিল তাহাদেরই সংসার এবং —অস্ত্রশস্ত্র? আমি উপরে যে নাম গুলি করিয়াছি তাহাই তাহাদেরই অস্ত্র শস্ত্র ছিল। আর কীলটা, চড়টা, চাপড়টা ত হাতেরই সামগ্রী, গালাগালির জন্য স্বতন্ত্র অস্ত্রের কোন দরকার হয় না।

আর একটি অস্ত্র আমাদের আছে। আজকাল আমরা নিজেরা সেটা আর ব্যবহার করি না। আগে সেটি বাড়ীর গিন্নী বা বধূরা ব্যবহার করিতে গর্ব্ব বোধ করিতেন। সে অস্ত্রটি সকল সংসারে সমান আদর লাভ করিত। সেটির নাম বঁটী। বঁটী দুই শ্রেণীর। তরকারীর বঁটী আর আঁশ বঁটী। বাড়ীর গিন্নীরা ও বধূরা তরকারী কুটিতেন, মাছও কুটিতেন; বিধবা গিন্নীরা মাছ ছুঁইতেন না, কিন্তু সধবা স্ত্রীলোক আঁশবঁটীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রাখিয়া পতিদেবতার আয়ুবৃদ্ধির কামনা করিতেন। এই অস্ত্র সংসারে অতি প্রয়োজনীয় হইলেও সংসারের বাহিরে তাহার কাজ ছিল না। কাজেই এই অস্ত্রও আমাদিগের সামরিকতার পরিচয় দিতেছে না।

আমি যে এই দীর্ঘ ভূমিকা করিতেছি, তাহার বিশেষ কারণ রহিয়াছে। আগেই আমি বলিয়াছি, আমরা সামরিক জাতি নই। আমাদের অর্থাৎ বাঙ্গলা দেশের পুরুষরা একদিন হয়ত বা সামরিক জাতি ছিলেন, যুদ্ধ করিতেন, লড়াই করিতেন; লাঠি খেলিতেন, লাঠালাঠি, মাথা ফাটাফাটিও করিতেন, কিন্তু আমরা অর্থাৎ অন্তঃপুরিকারা কোন কালে কোনরূপ সমরসজ্জা করিয়াছি এমন শুনি নাই। বগী বিন্দীর মত সমর আগেও হইয়াছে, এখনও যে একেবারে হয় না তাও বলিতে পারি না, তবে আগের চেয়ে অনেক কমিয়াছে। তবে যে পুরুষ সখ করিয়া বা অন্য কারণে একই আকাশে চন্দ্র ও সূর্য্যের উদয় ঘটাইয়া থাকেন, তাঁহাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয় ত সর্ব্বদাই থাকিতে হয়। তাঁহাদের সংখ্যা নিশ্চয়ই এখন খুব কম।

সেদিন প্রভাতে হঠাৎ কলিকাতার রাস্তায় মেয়েদের কুচকাওয়াজ করিতে দেখিয়া মনে হইল ইংরাজ বুঝি রাতারাতি ভারত ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে; আমাদের দেশের স্ত্রী-পুরুষ সকলে মিলিয়া দেশরক্ষা ও আত্মরক্ষা করিবার জন্য হঠাৎ সামরিক শিক্ষা লইতে সুরু করিতেছেন। ইংরাজ যদি হঠাৎ কাহাকেও কিছু না বলিয়া রাতারাতি এই দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের খুবই বিপদে পড়িতে হয়, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? তখন দেশের সকলে স্ত্রী ও পুরুষ মিলিটারী শিক্ষা লইয়া সামরিক না হইলে বহিশ্‌ত্রুদের আক্রমণ আমরা রোধ করিতে পারিব কিরূপে?

আমাদের বাড়ীতে একখানা ইংরাজী ও একখানা বা

সংবাদপত্র আসে। ইংরাজীখানি বাহিরের ঘরের সম্পত্তি, অন্য খানির অধিকার আমাদের। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর আমরা সেখানিকে লইয়া বসি, গড়াই, শুই। রাস্তায় মেয়েদের প্যারেড দেখিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিলাম আমি বাঙ্গালা খবরের কাগজখানার খোঁজে, ইংরাজ চলিয়া গেল কি না তাই দেখিতে। ইংরাজ চলিয়া গেলে খবরের কাগজে খুব বড় অক্ষরে তাহা ছাপা থাকিবেই। কিন্তু সে রকম কোন খবর দেখিতে পাইলাম না। ভাত চড়াইয়া রান্নাঘরের ভিতরে আসিয়া কাগজখানি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িলাম, ঐ অতি-বড় সু-খবর কোথাও নাই।

প্যারেডের খবর পাইলাম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-উৎসব উপলক্ষ্যে ঐ সামরিক আয়োজন। গত বৎসরও উৎসব ঐরূপ সমারোহ সহকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, মন্দভাগ্য আমার! সেই সময় কলিকাতায় ছিলাম না তাই দেখিতে পাই নাই। এ বৎসর আর কয়দিন আগে উৎসব হইবার কথা ছিল, ভারত-সম্রাট রাজা পঞ্চম জর্জ্জের মৃত্যু হওয়ায় কয়দিন পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। রাজার মৃত্যুতে সমস্ত দেশ শোকে অভিভূত, সেই সময় কোনরূপ উৎসব করা উচিত নয়। কোনরূপ উৎসব করিতে বা উৎসবে যোগ দিতে কাহারও প্রবৃত্তিই হয় না। রাজা যে! এই রাজার পিতামহী মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে এই দেশের লোক খুব ভক্তি করিতেন, অনেকে তাঁহাকে মাতৃস্বরূপিণী মনে করিতেন। রাজা পঞ্চম জর্জ্জকেও আমরা ভক্তি করিতাম। গত জার্ম্মান যুদ্ধের সময় রাজা রাজ-পরিবারের খরচ কমাইয়া যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে অনেক অমিতব্যয়ীরও আক্কেল-চক্ষু খুলিয়া গিয়াছিল। আমাদের একটু একটু মনে আছে, যতদিন সেই মহাযুদ্ধ চলিয়াছিল রাজা নূতন পোষাক একটিও তৈরী করান নাই। মহারাণী মেরী স্বহস্তে রাজার পোষাকে রিপু-কর্ম্ম করিয়া দিতেন, ঠিক মনে নাই, এইরূপ একটি ছবি ছোট বেলায় আমরা যেন দেখিয়াছি, অথবা গল্পে শুনিয়াছি। সে যাই হোক রাজার মৃত্যু উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মতিথি উৎসব বন্ধ ছিল, একেবারে বন্ধ নয়, কয়দিন স্থগিত ছিল।

কলিকাতার বেথুন কলেজ, বিদ্যাসাগর কলেজ, আশুতোষ কলেজ, ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউসন প্রভৃতি যে সব কলেজ মেয়েদের অথবা যে সব কলেজে সহ-শিক্ষা চলিত আছে, সেই সব কলেজের মেয়েরা দল বাঁধিয়া কলেজের নাম লেখা পতাকা বহিয়া কলিকাতার বিশাল রাজপথে মার্চ্চ করিয়া চলিয়াছে—এই দৃশ্য দেখিতে ভাল কি মন্দ সে কথা আমি বলিব না। তবে ইহা দেখিবার জন্য কলিকাতার কোন কোন রাস্তায় যে বিরাট লোকসমাগম হইয়াছিল, আর সেই জনতার বেশীর ভাগ প্রায় সবই পুরুষ দর্শক, তাহা আমি আমাদের জানালা দিয়াই দেখিয়াছি। আর-আর যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাও ইহাই বলিবেন আমার এই বিশ্বাস।

কলেজের ছেলেরাও মার্চ্চ ও প্যারেড করিয়াছেন, তাহাও দেখিয়াছি। তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন কথাই আমি বলিব না; বলা উচিত নয় আমার, তাই বলিব না। আমি কলেজের মেয়েদের কথা বলিতেছিলাম, সেই কথাই বলিব।

মেয়েদের দিয়া এই মার্চ্চ বা প্যারেড করান কেন? ইহার উত্তর কেহ দিবেন কি? মেয়েরা লেখাপড়া শিখিতেছে, যখন হাওয়া চলিয়াছে, তাহার গতিরোধ করা যাইবে না জানি; লেখাপড়া শিখিতেছে শিখুক, কিন্তু কুচকাওয়াজ করিয়া তাহারা কি উপকার পাইবে? এই কুচকাওয়াজ তাহাদের কোন্ কাজে লাগিবে, অনুগ্রহ করিয়া সে কথা কেহ বলিবেন কি?

মেয়েরা যদি বি-এ, এম-এ পাশই করে, তাহা হইলেও মার্চ্চ ও প্যারেড করিয়া তাহাদের কি উপকার হইবে, আমি ত কিছুতেই তাহা বুঝিতে পারি না। তর্কের খাতিরে যদি ধরি যে তাহারা আফিসে চাকরী করিবে 'অফিসারেস' হইবে, তবুও মার্চ্চ-প্যারেড কাজে কি ভাবে লাগিবে তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। মেয়েদের লজ্জা ভাঙ্গিবার জন্য কি এই আয়োজন? তাই যদি হয়, আমি বলিব, তাহার কোন দরকার ছিল না। লজ্জা, ঘৃণা, ভয় থাকিতে কেহ ঘরের বাহির হয় না। ঐ তিনটি 'দোষ' যাহাদের আছে, সেই মেয়েদের অভিভাবকরা কখনও তাহাদিগকে বাসে, ট্রামে চড়িয়া পুরুষদের কলেজে পড়িতে যাইতে দিবেন না। সেই লজ্জাবনতামুখীরাও পুরুষদের সঙ্গে এক ক্লাসে বসিয়া পাঠ দিতে ও পাঠ লইতেও পারিবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়

মেয়েদের দিয়া যে মার্চ্চ ও প্যারেড করাইলেন, তাহাতে লজ্জাও লজ্জায় মরিবে।

মেয়েদের নির্ভীকা করাই কি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই মার্চ্চ ও প্যারেডের উদ্দেশ্য? তাই যদি হয়, তবে এই মার্চ্চ ও প্যারেড কি একান্তই নিরর্থক নহে? মেয়েদের মার্চ্চ ও প্যারেড করিলে ভয় ঘুচিবে, এমন কথা কে বলিবে?

তবে কি তাহাদিগকে স্বাস্থ্য দান করিবার জন্য এই আয়োজন? তাই যদি হয় ত খুবই ভাল কথা। কিন্তু এইরূপ আয়োজন করিয়া তাহা, অর্থাৎ স্বাস্থ্যবতী কিরূপে করা যাইবে, ইহাও ভাবিয়া দেখিতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-উৎসব বৎসরে একটি দিনই হইবে, সেই একটি দিনই মেয়েরা মার্চ্চ ও প্যারেড করিবে। সেই একটি দিনের মার্চ্চ ও প্যারেডই কি তাহাদিগকে শ্রমশীলা, কষ্টসহিষ্ণু ও স্বাস্থ্যবতী করিতে পারিবে? লোকে বলে যে, পাকা হরিতকী একদিন একটিমাত্র খাইলে সারা বছর ক্ষুধার তাড়না হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, খাদ্যদ্রব্য আর না খাইলেও চলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মার্চ্চ ও প্যারেডও কি সেইরূপ, এক দিন করিলেই সারা বছর দেহ স্বাস্থ্য-সম্পন্ন থাকে! তাই যদি হয়, তবে বাঙ্গালাদেশের সব বাপ এবং সব মা আর সব স্বামী স্ব স্ব 'ওয়ার্ড'দিগকে মার্চ্চ ও প্যারেডে পাঠাইতে খুব রাজী।

নব্যা ভগ্নীরা হয়ত ভাবিতেছেন আমি সমস্ত আধুনিকতার বিপক্ষে। তা আমি নই। আমার লেখা যাঁরা পড়িয়াছেন, তাঁরাও কি আমার এই কথা সমর্থন করিবেন না?

যে মেয়েরা সেদিন কুচকাওয়াজ করিয়া গড়ের মাঠে (গড় জয় করিতে নয়!) গিয়াছিলেন, তাঁরা সবাই যে বি-এ, এম-এ পড়িতেছেন, তাহা আমি না জানি তা নয়। তাঁহারা ঐ সব পাস করিয়া যে আমাদের আর সবাইএর মত রান্না-ঘরের ধোঁয়ায় নাকের জলে চোখের জলে হইবেন না, তাহা আমি মানি। ঐ সব পাস করিয়া তাঁহারা ঘরে ঝাড়ু দিবেন বা বসিয়া বসিয়া তরকারী কুটিবেন না, তাহাও আমি মানি। তাঁহারা সবাই আই. সি. এস, ব্যারিষ্টার, ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ, নিদেন পক্ষে ডেপুটীর ঘরণী হইবেন, তাঁহাদিগকে হাত-পা নাড়িয়া সংসারের কোন কাজই করিতে হইবে না, ইহাও আমি ধরিয়া লইতেছি। তাঁহারা তাঁহাদের আই. সি. এস, ব্যারিষ্টার, ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ, নিদেন পক্ষে ডেপুটি স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া মোটরে বেড়াইবেন, সভায় যাইবেন, ডিনার খাইবেন, সিনেমা-শো দেখিবেন, আমি ইহাও ধরিয়া লইলাম। কিন্তু যখন শুনি যে আই. সি. এস-এর সংখ্যা অগণিত নয়, নব্য ব্যারিষ্টারদের অনেকেরই ট্রামের খরচ জোটে না, জজ মুষ্টিমেয় লোকই হয়, ম্যাজিষ্ট্রেট এক শতটি মাত্র, ডেপুটি হাজারের বেশী নয়, তখন কি করিয়া মনে করি যে, আমাদের মেয়ে, বোন, ভাইঝি, বোনঝি, দেবরকন্যা ভাসুরপুত্রীরা বি-এ, এম-এ পাশ করিলেই সংসার করার যে গুরু দায়, গুরু দায়িত্ব, কঠিন পরিশ্রম, কঠোর সাধনা সে সকল হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে?

আর যদি আমাদের মেয়েদের জীবনের লক্ষ্য এই হয় যে, তাঁহারা পায়ে 'শৃঙ্খল' পরিবেন না, বিবাহ করিবেন না, মাষ্টারণী হইয়া, না হয় সেলাই-কল বেচিয়া এই নারী-জীবনগুলি ধন্য করিবেন, মাত্র তাহা হইলেই মার্চ্চ ও প্যারেডের সাথে সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারিবে।

ইউরোপের মেয়েরা মার্চ্চ-প্যারেড করে, কাগজে পড়ি, ছবিও দেখি। আমরাও যেমন দেখি, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তা যাঁহারা, তাঁহারাও দেখেন, তাই দেখিয়া দেখিয়া তাঁহাদেরও এই সখ বা সাধ জাগিয়া উঠিয়াছে বোধ করি। ইউরোপের মেয়েরা যা যা করে, আমাদের মেয়েরা সেই সব করিলে আমাদের মুখোজ্জ্বল হইবে ত? কেন তাঁহারা সে কথা একটিবারও ভাবিয়া দেখেন না, আমরা তাই কেবল ভাবি। ইউরোপের মেয়েদের মধ্যে অনেকে বৎসরে বৎসরে স্বামী বদল করে, এই দেশের মেয়েরা যদি তাই করিতে সুরু করেন, এই দেশের স্বামীরা সুখী হইবেন কি? না, তাঁহারাও ইউরোপের পুরুষদের মত মিনিটে মিনিটে নূতন নূতন স্ত্রী গ্রহণ করিবেন? ইউরোপের মেয়েরা—সব মেয়ে নয়—আর আর যত নোংরা কাজ করে, এই দেশের মেয়েরা তাহাই করেন, আমাদের দেশের প্রধান ব্যক্তিগণ কি তাহাই চাহিতেছেন?

ইহা বুঝিতেই হইবে যে, তাঁহারা তাহাই চাহিতেছেন। নহিলে এইসব ব্যাপার করিবেন কেন? স্ত্রীশিক্ষা ভাল, মেয়েরা শিক্ষা পান ইহা সবাই চায়; কিন্তু সে কোন্ জাতীয় শিক্ষা, যাহা মেয়েরা লইবে? যে শিক্ষা ভারতবর্ষীয় 'সফরেজিষ্ট' তৈরী

করিবে, সেই শিক্ষা ? যে শিক্ষা তরুণীর হাতে নর-হত্যার জন্য রিভলভার তুলিয়া দিবে, সেই শিক্ষা ?

কিন্তু শিক্ষার স্রোত যখন বহিয়াছে, তখন তাহাকে বাধা দেবার চেষ্টা করা বৃথা। যে বাধা দিবে, ঐরাবত যেমন স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল, সেও তেমনই ভাসিয়া যাইবে। তাই মনে ইচ্ছা থাকিলেও মুখ ফুটিয়া বলিবার সাহস অনেকের হয় না।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাক্ষেত্রের সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্বন্ধে যে আদর্শ চালাইবেন, তাহাই চলিবে। যদি বিশ্ববিদ্যালয় নারীদের জন্য স্বতন্ত্র রূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন, তাহাই চলিত, তাহা হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয় ছেলেদের সঙ্গে এক রকম শিক্ষাই মেয়েদের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাই চলিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় মার্চ্চ ও প্যারেড চালাইলেন তাই চলিবে। এর পর হয় ত মফঃস্বলের স্কুল-কলেজও মেয়েদের মার্চ্চ ও প্যারেড করাইয়া মফঃস্বলবাসীকে চমকাইয়া দিবে। মফঃস্বলে যাঁহারা বসতি করেন ও কলিকাতার নিত্য নূতন মজা দর্শন করিতে না পাইয়া যাঁহাদের মনস্তাপের শেষ থাকে না, তাঁহারা সেই আগত শুভদিনের প্রতীক্ষায় থাকুন।

"বঙ্গশ্রী" পত্রিকা ত পুরাতনের উচ্চ আদর্শ, পুরাতনের শিক্ষা, পুরাতনের সমাজ সংগঠন বিষয়ে ধারাবাহিক ভাবে প্রবন্ধ লিখিতেছেন, পাণ্ডিত্যে, গভীর গবেষণায় তাহা খুবই উচ্চাঙ্গের হইতেছে তাহা ত আমরাও জানিতেছি, কিন্তু তাহাতে কি ফল ফলিতেছে ?

কলেজের মেয়েদের মার্চ্চ-প্যারেডের খুব সুখ্যাতি হইয়াছে শুনিতে পাইতেছি। চারিদিকে ধন্য ধন্য ধ্বনি উঠিয়াছে তাহাও শুনিতেছি। যুবাপুরুষদের মুখে গত কয় দিন অন্য কোন কথাই আর নাই। বয়স্ক পুরুষরা কি বলেন জানিবার কৌতূহল হয়। "বঙ্গশ্রীর" সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতির তীব্র সমালোচনা বাহির হয়। মার্চ্চ ও প্যারেড সম্বন্ধে "বঙ্গশ্রী"র মত জানিবার কৌতূহল আমার অদম্য রহিল।

শিক্ষা-সপ্তাহের সঙ্গেও ঐ রূপ মেয়ে মার্চ্চ-প্যারেড হইতেছে শুনা যাইতেছে। সংক্রামক ব্যাধি এক বার দেখা দিলে তাহার শেষ শীঘ্র হয় না। কলেরা, বসন্ত, মহামারী, প্লেগ, ইনফ্লুয়েঞ্জা এক বার আরম্ভ হইলে কাহার সাধ্য আছে তাহাদের গতিরোধ করে ?

যে হাওয়া আসিয়াছে, তাহার গতি বন্ধ করিতেও কেহ পারিবে না। একশটা প্রবন্ধ লিখিয়া হইবে না। এক হাজারটা বক্তৃতাতেও হইবে না।

আমাদের জাতীয় কংগ্রেস

... ... বর্ত্তমানে যে কয়জন মনীষী কংগ্রেসের কর্ণধার রহিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ধনবান্ লোকের সন্তান। দারিদ্র্য যে কি জিনিষ এবং তাহার ভ্রূকুটী যে কি ভীষণ, তাহা তাঁহাদের জানিবার সুযোগ হয় নাই। অন্নাভাবে দেশের শতকরা ৯৮ জন লোকের উদর যে কিরূপ ক্ষুধায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে, অর্থাভাবে প্রিয়তম পুত্র ও দুহিতার রোগশয্যায় চিকিৎসার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে এবং তাহাদের কাহারও অকালমৃত্যু দেখিতে হইলে প্রাণে যে কি যাতনা উপস্থিত হয়, পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি বিসর্জ্জন দিয়া যে পুত্রকে শিক্ষিত করান হইয়াছে, সেই পুত্র উপার্জ্জনক্ষম না হইতে পারিলে মনের যে কি অবস্থা হয়, তাহা তাঁহারা অনুমান করিতে পারেন না। তাই তাঁহারা কোন্ উপায়ে মানুষের অর্থাভাব, অসন্তুষ্টি, অস্বাস্থ্য এবং অকালমৃত্যু দূর হইবে, তাহার কথা চিন্তা না করিয়া অথবা দেশের জনসাধারণ যাহাতে তজ্জন্য কার্য্যে ব্রতী হয়, তাহার ব্যবস্থা না করিয়া অর্থহীন, অভিমানাত্মক "স্বাধীনতা অর্জ্জন করা" কংগ্রেসের কর্ম্মোদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ... ...

পরলোকগত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ।
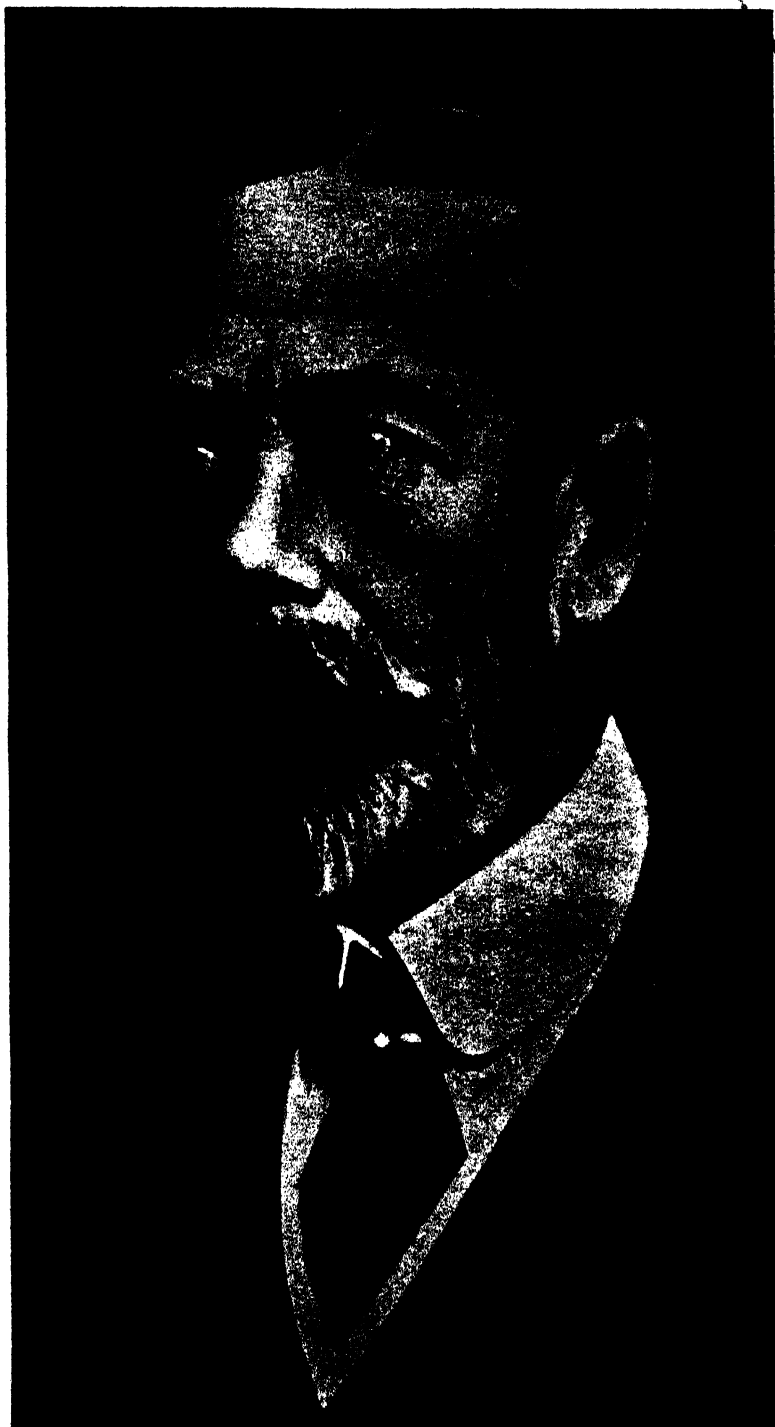
রাজা

"*The King is dead. Long live the King.*"

বিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্যে এই কথা ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। রাজা পঞ্চম জর্জ্জের মৃত্যু হইয়াছে। তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র অষ্টম এডওয়ার্ড নাম ধারণ করিয়া সিংহাসন গ্রহণ করিয়াছেন—তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করুন।

, গত ২০এ জানুয়ারী সোমবার, বিলাতের সময় রাত্রি ১১.৫৫ মিনিটের সময়, একাত্তর বৎসর বয়সে, স্যাণ্ড্রিংহাম রাজপ্রাসাদে পরিজন-পরিবেষ্টিত অবস্থায় রাজা পঞ্চম জর্জ্জ পরলোক গমন করিয়াছেন। যাঁহারা শেষ শয্যায় রাজার চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিয়াছেন, রাজার জীবন-প্রদীপ অতি শান্তভাবে নির্ব্বাপিত হইয়াছে—রাজার প্রাণ শান্তভাবে বাহির হইয়া অনন্তে মিশিয়া গিয়াছে।

রাজা হইলেও তিনি মানুষ। বিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজাধিরাজ সম্রাট হইলেও তিনি জরামরণশীল মানব। নশ্বর পৃথিবীতে মানুষ যাহা কামনা করে, পঞ্চম জর্জ্জের সে সকলের অভাব ছিল না; মৃত্যুকালে স্বদেশে, স্বগৃহে, পরিণত বয়সে, স্ত্রী-পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্রী, পরিজন পরিবেষ্টিত হইয়া শান্তভাবে পৃথিবী হইতে চিরবিদায় লওয়া ভাগ্যবান্ ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। রাজার মৃত্যু সুখ-মৃত্যু বলিয়াই বিবেচিত।

রাজা পঞ্চম জর্জ্জের রাজত্বকালে স্মরণীয় অনেক ঘটনাই ঘটিয়াছে এবং সকলগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজা পঞ্চম জর্জ্জের সংস্রব ছিল। এদেশে তাঁহার প্রথম এবং উল্লেখ-যোগ্য কীর্ত্তি, বঙ্গভঙ্গ রদ। বড়লাট লর্ড কার্জ্জন বঙ্গদেশকে দুইখণ্ডে বিভক্ত করিয়া বাঙ্গালীদিগের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার এই কার্য্যের বিরুদ্ধে বাঙ্গালায় যে সুতীব্র আন্দোলন হইয়াছিল, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন নামে তাহা সুপরিচিত। ১৯১১ সালে পঞ্চম জর্জ্জ রাজা হইয়া বিক্ষুব্ধ বাঙ্গালীর মনোভাব বুঝিয়া খণ্ডিত বঙ্গকে অখণ্ড করিয়া বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের রাজ্যকালেই মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হয়। এ দেশের শাসন-পদ্ধতিতে গণতান্ত্রিক নীতি এই সময়েই সূচিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে যে নূতন শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইবার জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে, তাহাতে সেই গণতান্ত্রিক নীতি প্রসার লাভ করিবে বলিয়াই মনে হয়। ১৯১৭ সালে যেমন, ১৯৩১ সালেও তেমন, রাজা পঞ্চম জর্জ্জের ব্যক্তিত্বের ও তাঁহার ভারতীয় প্রজাবর্গের উপর উদার মনোভাবের পরিচয়, ঐ দুইটি শাসন-সংস্কারে পরিস্ফুট হইয়াছে, এ কথাও বলা যাইতে পারে।

পঞ্চম জর্জ্জ তাঁহার মধুর ভদ্র ব্যবহার, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও সজ্জনতার জন্য অতিশয় জনপ্রিয় ছিলেন। যাঁহারা রাজ-কার্য্যে তাঁহার নিকটে যাইতেন, অতি অল্প কথায় ও অল্প সময় মধ্যে কার্য্য শেষ করিতে দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইতেন। একবারের একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একজন মন্ত্রী একদিন মধ্যাহ্নে কোন একটি গুরুতর কার্য্যের সুবিস্তৃত বিবরণ রাজার নিকটে পাঠান। সেইদিন অপরাহ্নে কোন এক পার্টিতে মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে রাজা সেই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, মন্ত্রী বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, আমি আজই মধ্যাহ্নে সেই বিরাট 'ফাইল' আপনার সকাশে প্রেরণ করিয়াছি। রাজা হাসিয়া বলেন, আমি অপরাহ্নের পূর্ব্বেই তাহা আমূল পাঠ করিয়া ফেলিয়াছি।

রাজা পঞ্চম জর্জ্জ অতিশয় শান্তিকামী ছিলেন। ১৯১৪ সালে ইয়োরোপে মহাযুদ্ধের আশঙ্কা ঘনীভূত হইলে, তিনি স্বয়ং ব্যক্তিগতভাবে রাসিয়ার জার ও জার্ম্মেনীর কাইজারকে যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সে আন্তরিক চেষ্টা ব্যর্থ হয়, দম্ভোদ্ধত রাজন্যদ্বয় তাঁহার অনুরোধ অবহেলা করিয়া মহাযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ফল কি হইয়াছে তাহা ইতিহাসেই লিখিত আছে। ইয়োরোপের মানচিত্রে কত রদ্ বদল যে হইয়াছে তাহা বলা যায় না। আজ সে জারই বা কোথায়, কাইজারই বা কোথায়? তাঁহাদের সিংহাসনগুলিই বা কোথায়?

ইংলণ্ডে কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই, সমগ্র ইয়োরোপে প্রলয় ঘটিলেও ইংলণ্ডের রাজ-সিংহাসন পূর্ব্বের মতই অচল অটল; নিয়মতান্ত্রিক প্রজার উপর নিয়মানুগ ও সহৃদয় রাজার ব্যক্তিগত প্রভাব যে তাহার অন্যতম কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অষ্টম এডওয়ার্ড সিংহাসন গ্রহণ করিয়াছেন। পঁচিশ বৎসর কাল যুবরাজ থাকিয়া তিনি কর্ত্তব্য শিক্ষা ও সাম্রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। তিনি যে তাঁহার পিতা ও প্রপিতামহীর মত ভারতবাসীর চিত্ত জয় করিতে পারিবেন এমন আশা অবশ্যই করা যাইতে পারে।

নবীন রাজা অবিবাহিত, কুমার। ইতঃপূর্ব্বে ইংলণ্ডের সিংহাসনে কুমারী রাণী হইলেও কোন কুমার-রাজা সিংহাসনা-রোহণ করেন নাই। তাঁহার বয়স ৪১ বৎসর মাত্র। তিনি সুদর্শন, কান্তিমান্, জনপ্রিয় ও উদারহৃদয়।

আমরা আশা করি, নবীন সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড বিলাতের রাজ-পরিবারের পদ্ধতি ও মনোভাব রক্ষা করিবেন এবং যে ভারতবর্ষে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠা করাই ইংরাজ শাসনের উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়া থাকে, সেই স্বায়ত্ত-শাসন তাঁহার রাজত্ব-কালে ভারতবর্ষে প্রতি[illegible]য়া তিনি ভারতবাসীর শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি লাভ [illegible] পারিবেন।

প্রদর্শনী

[গত বড়দিনের বন্ধে ইণ্ডিয়ান একাডেমী অব ফাইন আর্টসের উদ্যোগে কলিকাতা মিউজিয়ামে যে শিল্প-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়—তাহার কয়েকটি চিত্র নিম্নে মুদ্রিত হইল।]

অন্ধ জননী। [শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। [শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

সমস্যা। [শ্রীহরিধন দত্ত

গিরি নদী। [মিঃ এম. ড্রেপার

সুধা। [শ্রীগোবর্দ্ধন আস

মা। [শ্রীযামিনী রায়

বিশ্রাম। [মিঃ জি. এস. হালদাঙ্কার

টাইগার হিল। [শ্রীজ্যোৎস্না চন্দ

মা
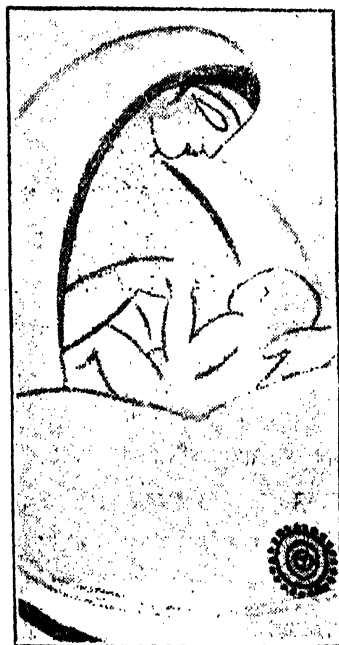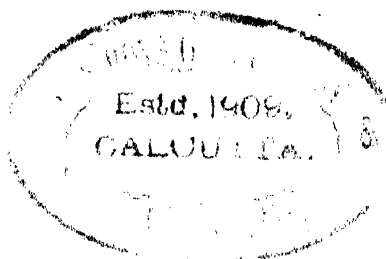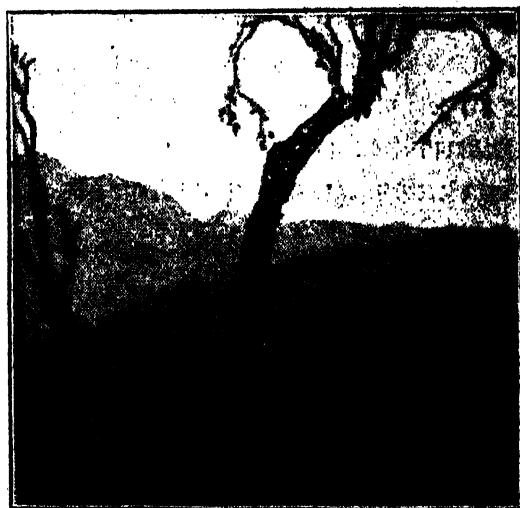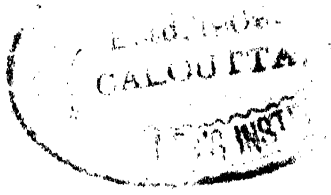
—শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়

কিরণকে কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় থাকিতে হয়। আজকালকার চাকুরীর তুলনায় কিরণের চাকুরীটি ভাল। কিরণ বিবাহিত, পুত্রকন্যাও আছে, তাদের বাড়ী পশ্চিমের কোন এক বড় সহরে—বেহারে। অল্পদিন হইল তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। বেহারের বিরাট ভূমিকম্পে তাহাদের গঙ্গাতীরস্থ বাটী বিধ্বস্ত হইলেও মাতৃদেবীর বিশেষ চেষ্টাতে তাহা পুনরায় বাসযোগ্য হইয়াছে। কিরণের মাতা সেই-খানেই থাকেন। কিরণ অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু মা কলিকাতা আসিতে চাহেন না। মা বলেন যে, তিনি না থাকিলে বাড়ী রক্ষা হইবে না। তিনি তাহাদের ভবিষ্যৎ অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া স্বেচ্ছায় বনবাস লইয়াছেন। মার এ কথার মধ্যে যুক্তি থাকিলেও কিরণের হৃদয়কে তাহা স্পর্শ করে না।

কিরণ মাকে ছাড়িয়া কলিকাতায় থাকিতে ব্যথা পায়—অকারণ অনেক সময়ে মার জন্য ব্যস্ত হয়। মা যখন কলি-কাতায় আসিবেন না, তখন কিরণকে প্রায়ই বাধ্য হইয়া মার কাছে ছুটিতে হয়।

সে বছর কলিকাতায় ভীষণ গরম পড়িয়াছে, সহরটা সারা দিন যেন অগ্নিকুণ্ডের আকার ধারণ করিয়া থাকে। সাহেবরা এবং বাঙ্গালীদের মধ্যেও অনেকে কলিকাতা ছাড়িয়া শৈল-বিহারে গমন করিয়াছেন। রোজ খবরের কাগজে খবর বাহির হইতেছে, সহরের রাস্তায় প্রায়ই অগ্নিদাহে (heat-stroke) লোক মারা পড়িতেছে।

কিরণ এই সময় কয়েকদিনের ছুটী লইয়া বেহারে নিজের বাড়ীতে চলিয়া গেল। গরম সেখানেও কম নয়, কিন্তু সেখানে দিনে যত গরমই হোক, নিশীথিনীর স্নিগ্ধ প্রলেপে দেহ-মন জুড়াইয়া যায়। একটু বেশী রাত্রে যখন পাহাড়ের পাথর ঠাণ্ডা হয়, তখন ভাগীরথী-উত্থিত সমীরণ যে শীতলতা আনিয়া দেয়, তাহাতে সারাদিনের উত্তাপের কথা মনেও থাকে না। কিরণ দেশে আসিয়া বাঁচিয়া গেল। সে একাই আসিয়াছিল, তাহার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, লটবহর লইয়া পুনঃ পুনঃ স্থান হইতে স্থানান্তরে যাওয়া-আসা পছন্দ করিতেন না, আর যাওয়া-আসার যে ব্যয় তাহা অপব্যয় বিবেচনায় তিনি ছেলেপুলে লইয়া কলিকাতায় থাকাই সঙ্গত মনে করিতেন। কিরণ ছুটী লইয়া আসিয়াছে শুনিয়া মার আনন্দ ধরে না। কিন্তু বৌমা ও নাতি-নাতনীদের না আনায় একটু দুঃখও তাঁহার হইল। দুঃখটা তিনি যখন তখন প্রকাশ করিতেন। যে দিন ভাল কিছু রান্না হইত, সেইদিন তাঁহার দুঃখের অবধি থাকিত না। যেদিন পাড়ার কোন গৃহিণী তাঁহার নাতি-নাতনীদের লইয়া বেড়াইতে আসেন, কিরণের মার মনটা হু হু করিয়া উঠিত। পাড়ায় সেদিন কিসের একটা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, নাতি-নাতনীদের জন্য সেদিন তাঁহার চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িয়াছিল। কিরণ সব বুঝিত, সে শুধু হাসিত।

কিরণ দুইবেলা গঙ্গাস্নান করে। নির্ম্মল ভাগীরথীবক্ষে সাঁতার কাটিয়া, অপরাহ্নে তটভূমিতে বিচরণ করিয়া বিস্মৃত-প্রায় শৈশব, বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের অনাবিল আনন্দ উপভোগ করে। তাহার মনে হয়, অতীত তাহার সমুদয় মাধুর্য্য, সমুদয় সৌন্দর্য্য, সমুদয় পবিত্রতা, সমুদয় নিশ্চিন্ততা লইয়া তাহার কাছে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

সারাদিন, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ফিরিয়া রাত্রে বাড়ী আসিয়া কিরণ তাহার পিতার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিত।

পিতা যে খাটে শুইতেন, তাহা আজও সেইখানেই আছে—বইয়ের তাকগুলি ঠিক সেই স্থানেই আছে। তাঁর পায়ের জুতা, গেরুয়া খদ্দরের কাপড়, জামা, ফতুয়া, ছাতা, লাঠি সবই আল্‌নাতে পূর্ব্বের ন্যায়ই রক্ষিত আছে।

শয়নগৃহের পশ্চিম দিকের দেওয়ালে তাহার পিতার চিত্র টাঙ্গানো রহিয়াছে—সেইস্থানে গিয়া ল্যাম্পের আলো বাড়াইয়া দিয়া কিরণ সেই চিত্রের দিকে তাকাইয়া থাকিল। আর একটি ছবি তাহার পার্শ্বেই ছিল—সেই চিত্রটি দেখিতে লাগিল—তাহার মাতা বসিয়া আছেন—কিরণ কনভোকেশনের গাউন পরিয়া তাহার পিতার সহিত দণ্ডায়মান। কিরণ সেই চিত্রের দিকে অনেকক্ষণ তাকাইয়া রহিল।

পিতার মৃত্যুতে কিরণ বড়ই আঘাত পাইয়াছিল। সে বাটীতে আসিয়া তাহার পিতার পুস্তকের রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইত। পিতার মৃত্যুতে সে যে আঘাত পাইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা সে পিতার পুস্তকাবলীর দাগের মধ্যে, মার্জ্জিনাল নোটের মধ্যে পাইত—এই সব চিহ্ন যেন তার কাছে ছিল এক একটি ক্ষুদ্র পথ, যাহা ধরিয়া সে পিতার সান্নিধ্যে পৌঁছিত। সেই ঘরে টেবিলের উপরে তাহার পিতার দাগ-দেওয়া বই Carlyleএর Sartor Resartus ছিল। সেই পুস্তকখানি লইয়া পাতা উল্টাইতে এক স্থানে তিনটে R R R লেখা দেখিয়া সেই স্থানটি পাঠ করিল—

"The fraction of life can be increased in value not so much by increasing your Numerator as by lessening your Denominator, nay, unless my Algebra decieve me—Unity itself divided by Zero will give Infinity—Make thy claims of wages a zero, then thou hast the world at thy feet."

তাহার পিতা মার্জ্জিনে লিখিয়াছেন C. F. my dear wife। কিরণ ভাবিল, কি সত্য কথাই তাহার পিতা লিখিয়াছেন। তাহার মাতা জীবনে কখনও কিছু আশা করেন নাই, কিছু পুরস্কার যে তাঁহার প্রাপ্য তাহাও কোন দিন চিন্তা করেন নাই—স্বামীপুত্রকে লইয়া আনন্দে দিন কাটাইয়াছেন।

কিরণের পিতৃকুল মাতৃকুল উভয়ই শিক্ষিত। মাতামহ পিতামহ উভয়েই সেই বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের গ্রাজুয়েট। তাহারা তিন পুরুষে গ্রাজুয়েট—মাতাও সুন্দর লিখিতে পারিতেন—কিরণের মাতুল দেশপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ, তাহার মাতৃদেবীও ভ্রাতার নিকটে গান খুব ভালই শিখিয়াছিলেন। অবশ্য বি-এ, এম্-এ পাশ না করিলেও তাঁহার প্রকৃত শিক্ষার অভাব ছিল না। কিরণের পিতা ইংরাজী অনেক বিখ্যাত লেখকের পুস্তক তাহার মাতাকে বাংলায় তর্জ্জমা করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। তাহার মাতাও অনেক সময় তাহার পিতাকে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ পাঠ করিয়া শুনাইতেন ও বুঝাইয়া লইতেন। ইহা তাঁহাদের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনার মধ্যে ছিল।

কিরণ তাহার মাতাকে মাসে পঁচিশ টাকা পাঠায়—মা তাহার পিতার যে টাকা ব্যাঙ্কে জমা ছিল, তাহারই সুদে কোন প্রকারে নিজের ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। লোহার সিন্দুকের মধ্যে একটি বড় খামে "কিরণের টাকা" বলিয়া লিখিত আছে। সেই খামের মধ্যে কিরণের মাতা টাকা রাখেন। তাহা পোষ্টাল ক্যাস-সার্টিফিকেটে পরিবর্ত্তিত হইয়া কিরণের বড়মেয়ের বিবাহের জন্য সঞ্চিত হইতেছে। কিরণ এসব কিছুই জানে না—তবে সে মাকে প্রায়ই বলিয়া থাকে যে, মার এত কষ্ট সে দেখিতে পারে না। কিরণের মাতা হাসিয়া বলিতেন, "খোকা, সময় কাল বড় খারাপ হয়ে পড়েছে রে। কত সোনার চাঁদ ছেলে বি-এ, এম্-এ পাশ করে হা-অন্ন হা-অন্ন করে দেশময় ঘুরে বেড়াচ্ছে, বাবা, অন্নপূর্ণার দেশে অন্নের হাহাকার—এই সময়ে বাবুয়ানী, বাজে খরচ বা কতকগুলো চাকর-বাকর রেখে পয়সা নষ্ট করবার উপায় আছে কি? যতটুকু পারবি জমাবি।"

কিরণ মার কথায় হাসিত ও বলিত, "মা যারা টাকা জমাতে পারে, তারা ছেলেবেলা থেকে সে প্রবৃত্তি নিয়েই বড় হতে থাকে, তারপর সেইটে অভ্যাস করে জীবনে, কিন্তু যার সে প্রবৃত্তি নেই, যার সে অভ্যাস হয় নি, সে বাজে খরচ করবেই, তার জন্য কষ্টও পাবে—যখন কষ্ট পাবে, তখন প্রতিজ্ঞা করবে যে এবারে সে হিসাবী হবে, কিন্তু তার সে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ হবে যখন আবার সে টাকা হাতে পাবে।"

কিরণ জানিত যে, তাহার অর্থকষ্ট জীবনে কখনও ঘুচিবে না। সে অর্থকষ্টকে একটা কষ্ট বলিয়া মনে করিত না। সে লেখা, সঙ্গীত ও অধ্যয়নে যে আনন্দ পাইত, তাহাতেই সে বিভোর হইয়া থাকিত। তাহার স্ত্রী কমলা স্বামীর এই প্রকার মনের অবস্থা দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেন।

মা রোজই একবার জিজ্ঞাসা করিতেন, হাঁ রে খোকা, বৌমার চিঠি পেয়েছিস?

কিরণ হাসিয়া বলিত, কদিন এসেছি, এরই মধ্যে চিঠির কি দরকার মা?

মা বলিতেন, সে কি বাবা, কমল, কনক, কানন, বৌমা সব কেমন আছে খবরটা ত পাওয়া চাই।—কমল, কনক কিরণের পুত্র, কানন তাহার কন্যা।

—নিশ্চয় সব ভাল আছে মা। নইলে নিশ্চয়ই খবর আসত!

মা বুঝিলেন, কথাটা ঠিক। বলিলেন, তাই থাক, বাবা, ভালই থাক সব। তা তুই তাদের চিঠি দিইছিস ত?

কিরণ বলিল, এ তোমার বড় অন্যায় মা, তারা দেবে না, আর আমি দেব? কেন দেব?

মা হাসিলেন। কিরণের যুক্তির বিপক্ষে অনেক কথাই বলা যাইত, কিন্তু তাহা তিনি বলিলেন না।

কিরণ বলিল, মা, কদিন ছুটী পেয়ে মার আদর পেতে এসেছি, এ সময় তার ভাগ আর কেউ পাবে না, কাউকে আমি তার ভাগ দেব না।

দুইদিন পরে মা আবার সেই প্রশ্ন করিলেন, হ্যাঁ রে, কলকাতার চিঠিপত্তর এল?

কিরণ পড়ায় ব্যস্ত ছিল, বলিল, না।

মা বলিলেন, তুই কেন একখানা লিখলিনে বাছা?

কিরণ বলিল, সে কথা ত একদিন হয়ে গেছে মা! তারা যদি না দেয় আমিই বা কেন দেব?

—পাগল ছেলে কোথাকার!—কণ্ঠে অজস্র মধু বর্ষণ করিয়া মা কাজে চলিয়া গেলেন। মার কত কাজ! ছেলে একাকী আসিয়াছে বটে, কিন্তু সেই একটি ছেলেকে খাওয়াইয়া আদর-যত্ন করিয়াই ত তাঁহার মাতৃত্বের পূর্ণ পরিতৃপ্তি! সুতরাং তাঁহার অবসর কোথায়? ছেলের সমস্ত কাজ নিজের হাতে না করিলে মার মন কি তৃপ্তি পায়?

কিরণ বাড়ীতে আসিয়া মাতাকে একাই গৃহকার্য্য ও সেবা করিতে দেখিয়া মনে ব্যথা পায়। তাহার কলিকাতার বাসাতে ঠাকুর আছে, ঝি আছে, চাকর আছে, অথচ তাহার মাতার একটী ঠিকা ঝি ব্যতীত আর কেহই নাই। আর ইহাও সত্য যে, তাহার মাতামহের ঐ সহরে আটটী বড় বড় বাড়ী আছে, কিরণের মাতুলরা তাহাতে বাস করেন। কিরণের মাতামহ সেই ১৮৭০ সালে মাসিক কয়েক শত টাকা মাহিনার চাকুরী করিতেন। কিরণের পিতাও উকীল ছিলেন, তাঁহারও বেশ পসার ছিল, প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া গঙ্গার তীরে এই নীড় বাঁধিয়াছিলেন, পুস্তকও হাজার পনের টাকার ক্রয় করিয়াছিলেন।

কিরণ এই সব কথা চিন্তা করিয়া—তাহার মাতাকে কলিকাতায় লইয়া যাইতে চাহে, অথচ মাতা তাঁহার স্বামীর স্মৃতির তীর্থ হইতে কিছুতেই কলিকাতায় যাইবেন না।

কিরণ একবার ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় গিয়া গঙ্গা ও আকাশের দিকে দেখিল। দূরে কালবৈশাখীর কালো মেঘ বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে, নদীর প্রশস্ত বক্ষ বালুরাশিতে অন্ধকার হইয়া গিয়াছে—চতুর্দ্দিকে প্রলয়ের পূর্ব্বাভাস, সে এই দৃশ্য দেখিতেছিল। কিরণের মা নীচ হইতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপরে আসিয়া বলিলেন, "খোকা, খোকা, শীগ্‌গির নেবে আয়, নেবে আয় বলছি।"

কিরণ কারণ জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু মাতা কথার অবসর না দিয়াই পুত্রের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে নীচে লইয়া আসিলেন। পরে বুঝা গিয়াছিল, মাতা প্রলয়ের আশঙ্কা করিতেছিলেন। বিগত ভূমিকম্পের পর বেহারের প্রত্যেক মানুষেরই মন এইরূপ অল্পেই আতঙ্কিত হয়।

[২]

কিরণের ছুটী ফুরাইয়া আসিয়াছে—আজ সে রাত্রি আটটার ট্রেণে কলিকাতা রওনা হইবে। কলিকাতায় সে বড় গঙ্গাস্নান করিবার সুযোগ পায় না। আজ সে গঙ্গাস্নান করিতে যাইবে—কিরণের মাতা তেলের শিশি লইয়া পুত্রের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, ছেলেকে তেল মাখাইবেন। কিরণ বলিতেছে, "না মা আমি নিজেই তেল মাখি।" কিরণের মাতা সে কথা শুনিলেন না, নিজেই পুত্রকে তেল মাখাইলেন—মাতার বিশ্বাস যে, তাঁহার খোকার যত্ন কলিকাতায় ঠিক হয় না। এ বিশ্বাস যে শুধু কিরণের মার তাহা নহে, এদেশের প্রত্যেক জননীরই।

কিরণের মাতা রন্ধনকার্য্যে বিশেষ নিপুণা ছিলেন। মা বিধবা বলিয়া কিরণ মাতার নিকটে আসিলে মাছ খাইতে আপত্তি করায় মাছ আসে নাই। তাহার মাতার হস্তে ঘি-ভাত খুব ভাল হইত, সেই ঘি-ভাত হইয়াছে—ঘি-ভাতের সহিত ছানার ডালনা, ক্ষীরের মালপো, বাড়ীর সন্দেশ, ঘন দুধ, আম ইত্যাদি সব বনিয়াদী রাজভোগ সাজাইয়া মাতা বসিয়া আছেন। পুত্র আহারে বসিল—মাতা পুত্রকে হাওয়া করিতে হাতপাখা লইয়া আসিলেন।

মাতা বলিলেন, "আচ্ছা কি হ'ল বল ত—বৌমা, ছেলেপিলেদের হল কি—প্রায় কুড়ি দিন হল, তুই এসেছিস, কোন চিঠিপত্র নেই!"

কিরণ হাসিয়া বলিল, "কিছু ভেব না মা--তারা সব ভালই আছে।"

কিরণের মা বলিলেন, "তুই বাবা পৌছে তারা সব কি রকম আছে অবিশ্যি জানাস।"

কিরণ হাসিয়া বলিল, "মা, তোমার আসলের চেয়ে সুদের দিকেই টান বেশী।"

মা বলিলেন, "তাই হয় বাবা।"

কিরণ আহার করিতে করিতে মার সহিত গল্প করিতেছে। মা তাহার হাসি ও কথার সঙ্গে সঙ্গে দুই তিনবার চমকিয়া উঠিয়াছেন। কিরণ প্রথমে তাহা লক্ষ্য করে নাই। একবার লক্ষ্য করিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "মা তুমি চমকে উঠলে কেন?" মা বলিলেন, "ও রে একেবারে ওঁর মতন কথা বলা, হাসা, চশমার মধ্য দিয়ে সেই রকম করে তাকানো"—এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চোখ সজল হইয়া আসিল; কিরণও অভিভূত হইয়া পড়িল। মাতা যে তাহার কথা শুনিয়া চমকাইতেছিলেন, সেই কথাই তাহার মনে হইতেছিল। তাহার মনে হইল, যখন তাহার বাবা সভা-সমিতির কার্য্য সম্পাদন করিয়া বা ক্লাবে তর্ক-বিতর্ক করিয়া বেহারের ঐ প্রবল শীতে ডিসেম্বর মাসে রাত্রি দশটার সময় বাড়ী ফিরিতেন, তাহার মা সমানে ঠাণ্ডায় হিমে বারান্দায় লণ্ঠনের আলোটা কমাইয়া স্বামীর আগমনের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতেন। কিরণ যখন এম্-এ পড়ে, তখন তাহার বিবাহ হয়। সেও ছুটীতে বাটী গিয়া অনেক সময়ে বন্ধু-বান্ধবের সহিত গান-গল্প করিয়া রাত্রি দশটায় অনেক দিনই বাটী ফিরিয়াছে বটে, কলিকাতাতেও রাত্রে ঐরূপ সময়ে বাটীতে ফিরিয়া আসে, কিন্তু কোনদিন তাহার স্ত্রীকে ঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখে নাই বা দরজার আড়ালে চুড়ীর শব্দ পায় নাই, বরং ঘরে প্রবেশ করিতে এক শব্দ পাইয়াছে—সেটা তাহার প্রিয়ার ঘোর নাসিকাগর্জ্জনের। সে এই সব কথা ভাবিতেছিল, এমন সময় মা আসিয়া বলিলেন, "খোকা পাঁচটা বাজল, ওঠ—চা খাবার এনেছি।"

চা, জল-খাবার খাইয়া সে ভ্রমণে বাহির হইল। মা এদিকে পুত্রের জন্য ট্রেণের খাবার তৈয়ারী করিলেন। তাহার পুস্তকের ব্যাগে সব পুস্তক বন্ধ করিয়া তালা দিলেন। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরে গাড়ী আসিল। মাকে প্রণাম করিয়া কিরণ গাড়ীতে উঠিল। চাঁদের আলোতে কিরণ দেখিল, মা করুণ দৃষ্টিতে গাড়ীর দিকে তাকাইয়া আছেন। বাড়ীর কম্পাউণ্ডের ঝাউগাছের শোঁ শোঁ শব্দ যেন এক করুণ রাগিণীর স্বর বহিয়া আনিতেছিল কিরণের হৃদয়ে।

[৩]

পরের দিন প্রাতে হাওড়া ষ্টেশনে পৌছিয়া সে একটী বাসে উঠিল। শীঘ্রই তাহার ফ্ল্যাটরূপ "কবুতরখানার" নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। কুলীর মাথায় মালপত্র দিয়া সে যখন রাস্তা দিয়া আসে, দেখিল, তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র মহানন্দে রাস্তায় পাড়ার ছেলেদের সহিত মার্ব্বেল খেলিতেছে।

কনিষ্ঠ পুত্র ডাইং-ক্লিনিং-এর দোকানে একটা টুলে বসিয়া সজোরে এক সেপো-বাঁশীতে ফুঁ দিতেছে। উপরে গিয়া দেখে, ঠাকুর ফ্ল্যাটের বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, চাকর মাদুরের উপর গায়ের আড়ামোড়া ভাঙ্গিতেছে—স্ত্রী ষ্টোভ ঠিক করিতেছেন—বড় কন্যা টেবিল-হারমনিয়ামে গান ধরিয়াছেন, "কে আবার বাজায় বাঁশী এ ভাঙ্গা কুঞ্জবনে।" কিরণের একটী বিলাতী কুকুর ছিল। কিরণকে দেখিয়াই সে ছুটিয়া আসিল। কিরণ তাহাকে আদর করিয়া চাপড়াইল।

কিরণ আসিতেই পুত্রকন্যা স্ত্রী সব আসিলেন। কিরণ বলিল—"যাক্ সব বেঁচে আছ দেখছি, কুড়ি দিনের মধ্যে কেউ একটা চিঠি লিখতেও পার নি।"

স্ত্রী গম্ভীর ভাবে হাসিয়া বলিলেন, "এই ক'দিনের জন্যে গিয়েছ, তাতে আবার চিঠির দরকার কি?"

কিরণ কিছু বলিল না। কেবল "হুঁ" বলিয়াই একটী পোষ্টকার্ড লইয়া মাকে পত্র লিখিল, "মা এরা সব ভাল ছিল অথচ কেউ একটা চিঠি দেয় নি—কি ভয়ানক লোক এরা।" হাত-মুখ ধুইয়া ঘরে আসিতেই স্ত্রী চা-জল-খাবার লইয়া আসিলেন, বলিলেন, "তুমি তোমার এই কুকুরটাকে যেখানে যাবে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।" কিরণ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?" স্ত্রী বলিলেন, "তুমি চলে

যাওয়ার পর দিন তিন চার সমস্ত রাত্তির ধরে চীৎকার করেছে, বাড়ীর কাউকে ঘুমোতে দেয় নি।” কিরণ বলিল, “যাহোক, সে তো তবুও আমায় মনে করে চেঁচিয়েছে।” স্ত্রী এই কথা শুনিয়া একটু রাগিয়াই বলিলেন, “তোমার ঐ রকমই কথা!”

[৩]

কিরণ আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। আজ আর ভ্রমণে বাহির হয় নাই, একটা কি বই পড়িতে বসিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে তাহার ফ্ল্যাটের বারান্দায় পায়চারী করিতে করিতে দূরে চাঁদের দিকে তাকাইয়া তাহার মনে পড়িল, কাল মাতার সেই গাড়ীর নিকটে দাঁড়াইয়া সেই করুণ ভাবে তাকান—মার সেই করুণ মুখচ্ছবি ভাসিয়া উঠিল তাহার মানসমন্দিরে। সেই সময়ে রেডিওতে চন্দ্রগুপ্তের অভিনয় হইতেছিল। তখন চাণক্য বলিতেছিল, “মা, যার অপার শুভ্র করুণা মানব-জীবনে প্রভাত-সূর্য্যরশ্মির মত কিরণ দেয়, বিতরণে কার্পণ্য করে না, বিচার করে না, প্রতিদান চায় না—উন্মুক্ত উদ্যত আগ্রহে দুহাতে আপনাকে বিলোতে চায়—এ সেই মা।”

কিরণ এক মনে বারান্দায় দাঁড়াইয়া তাহার বাটীর কথা ভাবিতেছে—সেই গঙ্গার কলকল্লোল, কালবৈশাখীর সেই রুদ্র তাণ্ডব, সেই সবই আজ তাহার মনকে বিক্ষিপ্ত করিতেছে। সে যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে চলিয়া গিয়াছে, যেখানে ঝঙ্কৃত হইতেছে তাহার মধুর বাল্যকাল।

রাত্রি এগারোটা বাজে, ঠাকুর আসিয়া জানাইল, খাবার ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে। কিরণ উঠিল।

স্ত্রী শয়নকক্ষে ছিলেন, সাড়া পাইয়া কিরণের কাছে আসিয়া বসিলেন। এ-কথা সে-কথার পর বলিলেন, তুমি না থাকলে ছেলেমেয়েরা আমায় যে কি রকম জ্বালাতন করে, তার ঠিক নেই।

একটু থামিয়া তিনি আবার বলিলেন, মা’র কাছে ওরা বেশ চুপচাপ থাকে, তা দেখেছ ত?

কিরণ নিঃশব্দে আহার করিতে লাগিল।

কিরণের স্ত্রী বলিলেন, হ্যাঁ গা, মা’কে আনতে পারলে না? মা এলে ওরাও বেশ থাকে, তাঁর হাতে সব দিয়ে থুয়ে আমিও বাঁচি।

কিরণ সাগ্রহে স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তিনি আবার বলিলেন, সত্যি বলছি, মা এলে বেশ হয়!

কিরণ এতক্ষণে কথা কহিল, বলিল, তা ত হয়, কিন্তু মা আসেন কই? বলিয়া সে চুপ করিল। বিগত কয়দিনের সুখস্মৃতি তাহার আহার্য্যবস্তুতে দ্বিগুণিত রুচি আনিয়া দিল। সে খাইতে আরম্ভ করিল।

তখনই হাত নামাইয়া বলিল, কিন্তু মা সব পারেন, আর তুমি কিছুই পার না কেন!

কিরণের স্ত্রী বলিলেন, মা’র সঙ্গে কার কথা! তোমার যেমন! মা’র ক’ড়ে আঙ্গুলের যোগ্যতাও আমার থাকলে আমি বর্ত্তে যেতুম।

কিরণ হাসিয়া পরমানন্দে স্ত্রীকে বামহস্তে কাছে টানিয়া লইল।

ইউরোপের অবস্থা

…রুশিয়া, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশে আজ পর্য্যন্ত কোন কর্ম্মপদ্ধতি দেশবাসীর দুরবস্থা উল্লেখযোগ্য ভাবে দূরীভূত করিতে পারে নাই। দূর হইতে মনে হয় বটে যে, রাশিয়ান, জার্ম্মান, ইটালিয়ান, মার্কিণ, জাপানী, ইংরেজ প্রভৃতি জাতিগুলি ভারতবাসী অপেক্ষা ভাল আছে। কিন্তু তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া চিন্তা করিলে প্রত্যেকেই বলিতে বাধ্য হইবেন যে, উহাদের মধ্যে কোন জাতিই অর্থনৈতিক দুরবস্থা হইতে কিছুমাত্রও অব্যাহতি পান নাই।…

বুকের একটি ব্যাধি

-শ্রীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়

গত প্রবন্ধে স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসার কথা শেষ করেছি।

রোগের উপশমান্তে রোগী যেদিন স্যানাটোরিয়াম বা হাঁসপাতাল ত্যাগ করেন, সেটি তাঁর পক্ষে শুভদিন। যখন তিনি প্রথম এসেছিলেন, দেহ ছিল তাঁর জীর্ণ—ব্যাধির সহস্র গ্লানি দ্বারা জর্জ্জরিত। কিন্তু যেদিন তিনি স্যানাটোরিয়াম থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন—তখন আর তাঁর সে অবস্থা নেই; পরিপুষ্ট, উজ্জ্বল দেহে তাঁর জেগে উঠেছে নতুন রক্তের লাবণ্য, গতির ভিতরে আবার এসেছে স্বাচ্ছন্দ্য, ব্যাধির দীর্ঘকালের যত কুৎসিত উপদ্রব কোথায় করেছে আত্মগোপন—তার ঠিকানা নেই।

একদিক দিয়ে এটি রোগীর পক্ষে যেমন সুদিন, অপর দিক দিয়ে এটি আবার দুর্দ্দিনও বটে। আমি আমার আগেকার প্রবন্ধে "Arrested" কথাটার বাংলা "সেরে যাওয়া" ক'রে এই "সেরে যাওয়া" কথাটাকে খেয়াল রাখতে পাঠক-পাঠিকাকে বলেছিলাম। প্রকৃতপক্ষে টি. বি. রোগীকে "সেরে যাওয়া" কথাটা বলা শক্ত ব্যাপার। সাধারণতঃ টি. বি. রোগী স্যানাটোরিয়াম থেকে যে অবস্থায় বিদায় গ্রহণ করেন, সেটা অধিকাংশ সময়েই "Arrested" নয়। এই অবস্থাটা অর্থাৎ জ্বর, কাসি ইত্যাদি নেই, থুতু জীবাণু-মুক্ত হয়েছে, ওজন বেশ ভাল, খানিকটা হাঁটাফেরা করতে পারছেন—একে বলা হয় "Quiscent stage." অন্ততঃ তিন বছর খুব ভাল ভাবে এই "Quiscent" অবস্থায় কাটাতে পারলে তখন রোগ "Arrested" হয়েছে বলা চলতে পারে। এবং রোগ "Arrested" হবার পরেও রোগীর দীর্ঘকাল অবধি অত্যন্ত সাবধানে থাকবার দরকার হয়। আর যাঁদের রোগ একটু বেশী ছিল, তাঁদের দীর্ঘকাল কেন, চিরকালই অতিরিক্ত সাবধানতার সাথে থাকতে হবে। অনিয়ম, অত্যাচার করবা মাত্র রোগ পুনরায় আত্মপ্রকাশ করবে। স্যানাটোরিয়ামে যে ভয়ানক রকম কড়াকড়ির ভিতর দিয়ে রোগী সুস্থ হয়ে ওঠেন, স্যানাটোরিয়াম থেকে বেরোন মাত্র অনেক রোগী অবস্থাবিপর্য্যয়ে এবং অনেক রোগী নিজের সংযমের অভাবে সেই কড়াকড়িগুলির প্রতি উদাসীন হতে সুরু করেন—যা না কি তাঁর কঠোর ভাবে মেনে চলবার দরকার, স্যানাটোরিয়াম থেকে বেরোবার পরে বহুকাল অবধি।

এই অসুখ থেকে সত্যিই "সারা" যায় কি না, এ সম্বন্ধে বহু কারণে আমি নিজে এখনও নিশ্চিত ভাবে নিজের মনে কোন ধারণা গঠন করতে পারিনি। কি কি বয়সে, বুকের ব্যাধি কতটুকু অগ্রসর হলে, কি কি ভাবে চিকিৎসা চললে, চিকিৎসা অন্তে কি কি ভাবে কতদিন কোথায় থাকতে পারলে এই ব্যাধি থেকে মুক্তিলাভ করা যেতে পারে, তার এমনই একটা লম্বা ফিরিস্তি চিকিৎসকেরা দিয়ে থাকেন যে, শেষ পর্য্যন্ত সত্যিকার "সারা" কম সংখ্যক [illegible] হয়। তবে বহু গবেষণার ফলে মনীষীরা যে সুর অত প্রচার করেছেন, আমাদের তা খানিকটা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। Mt. St. Rose Sanatorium নামক যক্ষ্মানিবাসের চিকিৎসক Louis C. Boisliniere, M. D. তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন—

"Tuberculosis is essentially a very curable disease, as proven by the fact that practically 100 percent of all early cases recover, who persist long enough under intelligent and expert medical direction, no matter in what climate the case may occur. * * * * The same can be said of typhoid fever, diphtheria and many other diseases which are perfectly amenable to treatment when detected early and properly handled but woefully fatal when they are not. The high mortality in tuberculosis, as in diphtheria, typhoid etc., is not essentially inherent to or in the disease, but tuberculosis being usually insidious in its inception and progress, its detection, diagnosis and the institution of proper remedial methods, are delayed too long. In nearly every case of chronic active tuberculosis that ends fatally there was undoubtedly a time when the patient could have recovered."

ডাঃ এডওয়ার্ড লিভিংষ্টোন ট্রুডো।

শুধু ইনি ব'লে নন, অধুনা সমস্ত বিশেষজ্ঞগণের মতই কম বেশী এই ধরণের। আগেকার দিনে এটা ছিল "শিবের অসাধ্য ব্যাধি" বলে খ্যাত।

এবং বর্ত্তমানেও বহু লোকের ধারণা এর চাইতে অন্য রকম নয়। মনে হয় উপযুক্ত সময়ে ধরাও পড়ত না এবং ধরা পড়লেও চিকিৎসা সুষ্ঠুরূপে হ'ত না, এবং ফলে মৃত্যু ছিল অনিবার্য্য; তাইতেই লোকের মনে গড়ে উঠেছিল ঐ ধারণা। যাই হ'ক এটা যে একটা কঠিন ব্যাধি, তা কেউই অস্বীকার করেন না, কিন্তু হলেই যে অমনি হাত-পা ছেড়ে দিয়ে রাম নাম জপতে হবে—এটাও অধুনা কেউ মানতে রাজী নন। আমি নিজে দীর্ঘদিন ভুগছি—আমার নিজের একটা মত জানতে হয়তো অনেকের কৌতূহল হতে পারে। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, আমার অসুস্থ জীবনের আগাগোড়া এমন অসংখ্য প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়ে চলতে হচ্ছে যে, নিজে আদৌ ভালভাবে সুস্থ হতে আর পারব কি না সে বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ আছে। ডাক্তারের উপদেশ যথাযথভাবে মেনে চলতে পারলে কি অবস্থায় দাঁড়াতুম—সেটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে যথা-নিয়মে থেকে যে অনেকে বেশ ভাল হয়ে গেছেন, ভাল আছেন এবং কাজকর্ম্মও করছেন—এমন কতক কতককে আমি ব্যক্তিগত ভাবে জানি, অন্যের মুখেও অনেকের কথাই শুনেছি, বইতেও অনেকের কথা পড়েছি। আমার নিজের দিক থেকে চিকিৎসকদের এবং এঁদের কথার প্রতিধ্বনি করা ছাড়া উপায় নেই, তবে আমার নানা রকম অভিজ্ঞতা থেকে এটা আমি বিশ্বাস করি যে, স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসার পরে যদি খুব নিয়ম মেনে এবং বেশ মনের শান্তি নিয়ে রোগী থাকতে পারেন, তবে দীর্ঘকাল তাঁর পক্ষে বাঁচতে পারা নিশ্চয়ই সম্ভব।

একটি স্যানাটোরিয়ামের Annual Reportএ প্রকাশিত এই কয়টি লাইন রোগীর জেনে রাখা ভাল—

"The analysis of the after histories shows that the patients who die of tuberculosis after discharge usually die within first two years, while only very few of those who are well five years after leaving the Sanatorium die of tuberculosis later in life."

তা'হলে দেখা যাচ্ছে যে, স্যানাটোরিয়াম থেকে বেরুনোর পরে প্রথম দুটি বছর একেবারেই স্যানাটোরিয়ামের নিয়মে চলবার দরকার এবং অন্ততঃ পাঁচ বছর অবধি সাবধানতার কোন প্রকার ত্রুটি করলে চলবে না। কিন্তু এ-ও সব নয়। বুকের জখম বেশী থাকলে এই সময়কে আরও দীর্ঘ করে দিতে হবে।

স্যানাটোরিয়াম থেকে বেরুনোর দিনটি শুভদিন হ'লেও ঠিক এই কারণেই দুর্দ্দিনও বটে যে, বাইরের সমাজে রোগীকে মিশতে হবে, প্রতি পদে পদে নিজের সম্বন্ধে একটা আশঙ্কা নিয়ে, পরাজিত ব্যাধি রোগীর কোন্ অবস্থা-বিপর্য্যয়ে কোন্ দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে পুনরায় করে নিজ মূর্ত্তি ধারণ! এই সময় থেকে রোগীর দায়িত্ব আরও অনেক বেড়ে গেল। এতদিন তিনি যে রকম আবহাওয়ার ভিতরে ছিলেন, বাইরের আবহাওয়া সে রকম নয়। হাঁসপাতালে ছিল শুধু তাঁকে সারিয়ে তুলবার আয়োজন এবং তাঁর নিজের সমস্ত চিন্তাও ছিল প্রধানতঃ সেই দিকেই নিবদ্ধ; কিন্তু হাঁসপাতাল থেকে বেরুনোর পরে তাঁর নিজের সম্বন্ধে, পরিবারের সম্বন্ধে অথবা আরও দশটি বিষয়ে সহস্র চিন্তা তাঁকে ক'রে তুলবে উদ্ভ্রান্ত, হয়তো প্রধানতঃ আর্থিক কারণেই চিকিৎসকের উপদেশ যথাযথ ভাবে মেনে চলা হবে না তাঁর পক্ষে সম্ভব। ফলে শরীর তাঁর আবার ভাঙবে। এতদিনকার চিকিৎসা, এতদিনকার তপস্যা, এতদিনকার বিপুল কৃচ্ছ্র সাধন—সব যাবে ব্যর্থ হয়ে। রোগী যেন স্বপ্নেও না মনে করেন যে, হাঁসপাতাল বা স্যানাটোরিয়াম থেকে বেরুবার সাথে সাথেই তাঁর চিকিৎসা অথবা আরোগ্যলাভ সমাপ্ত হ'ল। স্যানাটোরিয়াম কেবল মাত্র তাঁকে একটা "State of equilibrium"এ এনে দাঁড় করিয়ে দেয় এবং ডাক্তার J. Wattএর ভাষায়—

"The figures showing ultimate result express not the capacity of the Sanatorium to restore health and arrest tuberculosis disease, but the capacity of the ordinary conditions under which patients live and work after discharge, to break down the resistance or state of equilibrium restored by the Sanatorium treatment."

প্রকৃতপক্ষে এত দীর্ঘকাল পরেও এই অসুখকে একবার সেরে আবার আত্মপ্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে রোগীর দেহে যে, আমার একটি টি. বি. বন্ধুর ভাষায়, সত্যই "না মরা পর্য্যন্ত বুঝবারই উপায় নেই যে সারলাম কি না সারলাম এই ব্যাধি থেকে।" একবার ভালভাবে সেরে অনেক দিন পরে আবার অসুস্থতা ঘটলে সব সময়ে যে আগেকার অসুখই বেড়ে পড়ল, তা নাও হতে পারে; অনেক সময়ে পুনরাক্রমণও (re-infection) ঘটে থাকে। তবে এ সম্ভাবনা খুব কম।

স্যানাটোরিয়াম থেকে বেরুনোর পরে রোগীর সর্ব্বদা ডাক্তারের সংস্পর্শে থাকবার প্রয়োজন। মাস খানেক বা মাস দুই পরে পরে নিয়মিত বুক পরীক্ষা করাতে হবে। কখনো গয়ের উঠতে থাকলে সেটা পরীক্ষা করা দরকার—যক্ষ্মাজীবাণু আছে কি না দেখবার জন্য। মাস ছয়েক থেকে বছরখানেকের ভিতরে বুকের আবার এক্স-রে ফটো নেওয়া উচিত। স্যানাটোরিয়ামে রোগী যে ভাবে ছিলেন, ভবিষ্যতেও তাঁকে ঠিক সেই ভাবেই থাকতে হবে—সর্ব্বদা মুক্ত এবং বিশুদ্ধ বায়ুতে অবস্থান দিনে এবং রাত্রে, শীতে এবং গ্রীষ্মে; সর্ব্বদা পুষ্টিকর আহার্য্যগ্রহণ প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে; আহারের আগে এবং পরে বিশ্রাম—ইত্যাদি, ইত্যাদি। ধূলিধোঁয়াধূমরিক্ত এবং জনাকীর্ণ স্থান রোগী সর্ব্বদা এড়িয়ে চলবেন। থিয়েটার, সিনেমা সভা-সমিতিতে যাওয়া চলবে না। রাত্রে বেশ শীগগির করে শুতে হবে এবং প্রথমে ঘণ্টা দশেক ও তার পরে ঘণ্টা আটেক অন্ততঃ ঘুমুতে হবে। অন্য কোনো ব্যাধি—যথা ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্ত না হ'তে হয়—সেদিকে রোগীর খুব হুঁশিয়ার থাকতে হবে। একেই এই রোগ, তারপরে আবার আর একটি এসে জুটলে আর বাঁচতে হবে না। রোগীর নিজের জন্য একখানা ঘর থাকবে এবং তিনি একাকী এক শয্যায় শয়ন করবেন। মশার উপদ্রব থাকলে কখনই রোগী মশারি ছাড়া যেন না শোন

এবং মশারিটা যেন সর্ব্বদা নেটের মশারি হয়—সাধারণ কাপড়ের যেন কদাচ না হয়। নেটের মশারির ভিতর দিয়ে মুক্ত বাতাস চলাচলের বাধা কম ঘটবে।

নিজেকে অতিরিক্ত পরিশ্রান্ত করে তোলাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগীর অসুখ পুনরায় বেড়ে পড়বার কারণ। বহু লোকের মনেই এই ভুল ধারণা আছে যে, ভাল "Climate" থেকে খারাপ "Climate"এ ফিরে আসবার দরুণই রোগী আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁরা বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে রোগীকে উপদেশ দেন—বাপু হে, বাংলা দেশে আর তোমার পোষাবে না, ওই পশ্চিম-টশ্চিমের ওদিকেই তোমাকে বাকি জীবন কাটাতে হবে। তাঁরা খালি শিখে রেখেছেন "পশ্চিম" আর "চেঞ্জ"—রোগী আর কি করছে না করছে অথবা কি ভাবে তাকে থাকতে হচ্ছে না হচ্ছে, সেদিকে চোখ একেবারে বন্ধ করে রেখে। রোগীকে নিতান্তই এক ভাগাড়ে গিয়ে পড়ে থাকতে নিশ্চয়ই কেউ উপদেশ দেবেন না; কিন্তু যেখানে পারিপার্শ্বিক তাঁর পক্ষে সর্ব্ববিষয়ে অনুকূল, শুধু "Climate" টাই অপেক্ষাকৃত যা কিছু একটু খারাপ—সেখানেই রোগী নিশ্চিন্ত মনে থাকতে পারেন। ("Climate" সংক্রান্ত আলোচনা গত প্রবন্ধে করেছি।) রোগী বিশ্বাস করতে পারেন তাঁর অসুখবৃদ্ধির জন্য "Climate" কদাচিৎই দায়ী হবে। অবিশ্যি তিনি একটা ভাল স্বাস্থ্যকর জায়গায় গিয়ে যদি থাকতে পারেন, তাতে কেউই আপত্তি কিছুই করবে না, বরং তাঁকে সে কাজে উৎসাহই দেবে; কিন্তু দেখতে হবে সব দিকগুলি বজায় থাকছে কি না।

রকম অত্যাচারই খাটবে না তাঁর। তাঁকে মনে রাখতে হবে—

"In considering the relative value of rest and exercise, it is better to err on the side of taking more rest than in taking more exercise."

কখনো যদি সর্দ্দিটর্দ্দি করে বসে অথবা কাসির উপদ্রব সুরু হয়, তবে সেটা সম্পূর্ণ চলে না যাওয়া পর্য্যন্ত রোগী যেন বিশ্রামের ত্রুটি না করেন। বাইরে বেড়াতে বেরিয়ে হঠাৎ কখনো বৃষ্টি এলে রোগী যেন ভুলেও কখনো দৌড় না মারেন—ভিজতে হয় ভিজবেন। চলন্ত ট্রাম থেকে লাফিয়ে পড়তে গিয়ে, কোন সিঁড়ি বেয়ে দ্রুতবেগে ওঠানামা করতে গিয়ে, অথবা প্ল্যাটফরমের উপর দিয়ে ছুটে ট্রেণ ধরতে গিয়ে বহু রোগী দীর্ঘ দিনের উপকার এক মুহূর্ত্তে নষ্ট করে ফেলেছেন। কলকাতায় ট্রাম বাস থেকে ওঠা নামা

কাজের ভিতরে রোগীদের আনন্দ আসে।

বলছিলাম, রোগীর নিজেকে পরিশ্রান্ত করবার কথা। বাস্তবিক, শুধু এই কারণটিতে যত সহজে এবং যত শীগগির রোগ আবার বেড়ে পড়ে এমন আর কোনো কারণেই পড়ে না—পুষ্টিকর খাদ্যের কথঞ্চিৎ অথবা সাময়িক অভাব ঘটলে নয়, অপেক্ষাকৃত খারাপ "Climate"এ নয়, অপেক্ষাকৃত দূষিত বায়ুতে অবস্থানের ফলে নয়, অথবা অন্য কিছুতে নয়। রোগী যা-ই কিছু করুন না কেন, সে কাজকর্ম্মই হ'ক, কথা-বার্ত্তা গল্প-গুজব হাসি-আড্ডাই হ'ক অথবা অন্য কোনো রকম আমোদ-প্রমোদই হ'ক, যেন তিনি সর্ব্বদা খেয়াল রাখেন যে, নিজেকে তিনি খুব ক্লান্ত এবং অবসন্ন করে তুলছেন কি না। নিজেকে খুব বেশী পরিশ্রান্ত করতে থাকলে কিছু দিনের ভিতরেই শরীর আবার ভেঙ্গে পড়বে। কোনো কিছু করার পরে ক্লান্তি বা অবসাদের ভাব আসে এটা লক্ষ্য করবার সাথে সাথে সে সব কাজের মাত্রা কমিয়ে দিতে হবে এবং নিয়মিত বিশ্রাম নিতে হবে। মাত্রা ছাড়িয়ে রোগীর কোনো কাজই চলবে না; শরীর বা মনের উপর কোনো

সম্বন্ধে কোনো সুস্থ টি. বি. রোগীর প্রচুর সতর্কতা অবলম্বনের দরকার না থাকলে ছুটোছুটি করে উঠবার বা নামবার চেষ্টা করা একেবারে মারাত্মক। রাস্তায় বেরুবার সময়ে রোদ থাকলে ছাতা নিতে কখনো ভোলা উচিত নয়। রোদে ঘোরা রোগীর পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসার পরে অনেক সময় রোগীর চেহারা এত ভাল হয় এবং তিনি শরীরটা এত ভাল বোধ করেন যে, সে রকম হয়তো আগে তাঁর জীবনে কখনো ঘটেনি। কিন্তু শরীরটা তাঁর যতখানি ভাল 'লাগে', আসলে তা ঠিক ততখানি 'ভাল' নয়। এবং রোগী যেন সর্ব্বদা স্মরণ রাখেন যে, যে পরিশ্রম অথবা 'ছোটখাটো' যে সব অসুখ-বিসুখ একজন সুস্থ লোকের পক্ষে কিছুই নয়, তা বহু সময়েই তাঁর পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। একজন সুস্থ লোকের চেয়ে শরীর সম্বন্ধে অন্ততঃ একশো গুণ বেশী সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে তাঁকে।

রোগ আবার বেড়ে পড়াটাকে "relapse" বলা হয়ে থাকে। রোগী

যদি সুস্থ হয়ে যাবার পরে পুনরায় এই সব লক্ষণ কখনও প্রকাশ পায়: ভোর বেলার দিকে গয়েরহীন অথবা যুক্ত কাসি, প্লুরিসি, থুতুর সাথে রক্তের ছিট, ওজন কমতে থাকা—ক্রমাগত, শরীর অনবরত দুর্ব্বল বোধ করা, রাত্রে ঘাম, রক্তহীনতা অথবা ক্রমাগত পেটের গোলমাল, বুকে পিঠে বেদনা, ঘাড়ের গ্রন্থিস্ফীতি, স্বরভঙ্গ, ৯৯° ডিগ্রির উপরে ক্রমাগত জ্বর চলতে থাকা—তবে রোগী আর কালবিলম্ব না ক'রে ডাক্তারকে দিয়ে বুক পরীক্ষা করাবেন এবং বেশী বাড়াবাড়ি কিছু হলে পুনরায় কোন স্যানাটোরিয়ামে ভর্ত্তি হতে চেষ্টা করবেন। তরুণ দেহে একমাসেরও উপরে ক্রমাগত অল্প জ্বর, খুশ খুশ কাসি—অধিকাংশ সময়ে নিশ্চিত ভাবেই বুকের দোষ সূচিত করে। এবং অনেক সময়ে সে বুকের দোষ ষ্টেথোস্কোপ, এক্স-রে কিছুতেই ধরা পড়ে না একেবারে প্রথম অবস্থায়। কিন্তু বিজ্ঞ চিকিৎসকের কর্ত্তব্য তখন থেকেই রোগীকে সর্ব্বপ্রকার সাবধানতা অবলম্বন করতে বলা। "Replase"টাও অনেক সময়ে এই ভাবে সুরু হয়—অল্পেতে সন্দেহ আসে না, অনেক সময়ে অনেক ডাক্তার ধরতেও পারেন না। কিন্তু যে লক্ষণগুলির উল্লেখ করলাম এগুলি আবির্ভাবের সাথে সাথে রোগীকে সতর্ক হতেই হবে—নতুবা তিনি অবিলম্বে নিজের গুরুতর ক্ষতি করবেন। কাসি এবং তার সাথে গয়ের উঠতে সুরু করা, সামান্য পরিশ্রমে অত্যন্ত হাঁপাতে থাকা, সব সময়ে ক্লান্তির ভাব ৯৯° ডিগ্রীর উপরে প্রতিদিন টেম্পারেচার ওঠা—এ সব লক্ষণ সুরু হবা মাত্র রোগী ধ'রে নিতে পারেন যে, তাঁর ব্যাধি পুনরায় সক্রিয় হ'য়ে উঠেছে। বারে বারে "relapse" ঘটনাটাকে রোগী যেন বেশী "মজা" বলে ধরে না নেন। দীর্ঘ দিন অসুখে ভুগবার ব্যবস্থা করলে কপালে যে শেষে কত দুঃখ জমে থাকবে—তা' রোগী প্রথমটা বুঝতেই পারবেন না। নিজের অর্থ শেষ হবে, ধৈর্য্য শেষ হবে, আত্মীয়স্বজনের সমস্ত সহানুভূতি শেষ হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধিরও ক্রমবিস্তৃতির ফলে সুস্থ হবার সম্ভাবনা ক্রমেই যাবে দূরে সরে। প্রথম বার সুস্থ হবার পরেই রোগীর একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত, আপ্রাণ চেষ্টায় কি ক'রে সেই সুস্থতাকে বজায় রাখা যায়। প্রথমটা কড়া-কড়ির ভিতরে কাটিয়ে শেষে রোগী ভাল ভাবে একটু শক্ত হতে পারলে অনেক কাজই করতে পারবেন জীবনে—ভবিষ্যতের জন্য [illegible] তাকে তৈরি হতে হবে ধীরে ধীরে। জীবনের কতখানি অংশ একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল বলে রোগীর মনে বেদনা আসা স্বাভাবিক—

> But how crave way i' the life that lies before,
> If bent on groaning ever for the past?
> —(Browning)

স্যানাটোরিয়াম থেকে বেরুবার পরে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং অন্যান্য বাইরের লোকের মাঝে রোগীকে কি রকম একটা আবহাওয়ার ভিতরে পড়তে হয়, এখানে তার উল্লেখ করতে চাই। প্রধানতঃ দুটি শ্রেণীর লোকের দ্বারাই রোগীর জীবন ওঠে শোচনীয় ভাবে বিড়ম্বিত হয়ে। এক শ্রেণীর হচ্ছেন যারা রোগীর বাইরের চেহারা দেখে নিশ্চিত ভাবে ধরে নেন যে, তার অসুখ একেবারে ভাল হয়ে গেছে। তাঁরা তখন চান যে, সে এখন লাফালাফি করুক ঝাঁপাঝাঁপি করুক, সকলের সাথে মিশে দল বেঁধে হল্লা করুক, আড্ডা দিক, প্রাণ হয়ে যাক একেবারে গড়ের মাঠ। তাঁরা চান—কাজকর্ম্ম সে সুরু করে দিক পুরুদমে, পালন করুক সর্ব্ববিধ সংসারধর্ম্ম, সমাজে বাস করে সকলের সাথে রক্ষা করুক বিভিন্ন সামাজিকতা। সে যখন চট করে এগুলিতে রাজী হয় না, সে যখন সুস্থ লোকেদের নানা প্রকার প্রচণ্ড অস্থিরতাকে যথাসাধ্য চেষ্টা করে এড়িয়ে চলতে চায়, তখন কেউই তাকে দেখে না ক্ষমার চোখে। সে হয় তো একটা ভারি জিনিস তুলতে বা নামাতে অস্বীকার করে, সে হয় তো দুপুরবেলাকার বিশ্রামের অবহেলা করে কারুর সাথে তাস খেলতে রাজি হতে চায় না, সে হয় তো তার একটি আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব'সে গ্রামোফোনে দম লাগাতে প্রচুর ইতস্তত করে, সে হয় তো তার একটি বৌদিকে অথবা বান্ধবীকে নিয়ে প্রতিদিন থিয়েটার অথবা সিনেমায় যেতে আপত্তি তোলে, খানিকক্ষণ বেড়িয়ে টেড়িয়ে এসে অথবা অন্য কোন পরিশ্রমের কাজ করবার পরে সে হয় তো ঘণ্টা খানেক বা আধ ঘণ্টা বিশ্রাম না নিয়ে খেতে চায় না, এক একদিন সে বিকেলের দিকে থার্ম্মোমিটারটা মুখে গোঁজে বা পাল্‌স্‌টা হয় তো একটু টেপে, সর্দ্দি বা কাসির ভাব হলে সে হয় তো দু চার দিন একেবারেই বিছানা থেকে উঠতে চায় না—এগুলি তাঁদের মনে প্রচণ্ড বিরক্তির করে উদ্রেক। তাঁরা বিদ্রূপের সুরে বলেন—ও সব ম্যানিয়া, আর কিছু নয়। কখনও হয় তো করেন আরও কঠোর মন্তব্য; এমন একটা সুস্থ জোয়ান লোক, এ রকম নড়তে চড়তে চায় না, সব সময়ে কেমন কেমন করে—এটা তাঁদের মনে জাগিয়ে তোলে ঘৃণার ভাবও। কেউ মন্তব্য করেন—ও সব মনের ব্যাধি। কেউ বা বলেন ও সব প্রেমের ব্যাধি। এই রকম আবহাওয়ার ভিতরে রোগীকে যে কি সতর্ক ভাবে চলবার দরকার হয়, মনে যে কতখানি জোর রেখে কতখানি সাহসের সাথে এদের মাঝখানে বিচরণ করতে হয় তা আর কত বলব। নিজের ভাগ্য, নিজের অবস্থা উপলব্ধি করতে পেরে কোন এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে তাঁর নিজের প্রতি সহসা জাগে যদি অশ্রদ্ধার ভাব, সহসা জাগে যদি ধিক্কার—তা' হলে সেই মুহূর্ত্তে তার সব পণ্ড হয়ে যাবে। তার নিজের মনে যে মুহূর্ত্তে জাগবে একটা উচ্ছৃঙ্খলতা অথবা বিদ্রোহের ভাব, সেই মুহূর্ত্তে সে নিজেকে বিপথে চালিত করতে গিয়ে এতদিনকার সাধনার ফল দেবে নিমেষে ব্যর্থ করে। বাইরের লোকে এমন কি অনেক অজ্ঞ চিকিৎসকও এই ব্যাধির সূচনা থেকে আগাগোড়া এটাকে "মানসিক" আখ্যা দিয়ে রোগীর অবস্থা যে কি রকম নিদারুণ ভাবে শোচনীয় করে তুলতে পারেন, তা' "Outdoor Life Journal" এ A. M. P বলে একজন রোগী নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা "From the frying pan T. B. into the fire of neurasthenia" নামক প্রবন্ধে এমন ভাবে বর্ণনা করেছেন যে, পড়লে শিউরে উঠতে হয়।

স্যানাটোরিয়াম-প্রত্যাগত রোগী আর এক শ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে আসবে যাঁরা না কি তাকে শেয়াল-কুকুর চাইতেও বেশী হীন দেখবেন এবং তাকে এড়ানোর জন্য তাঁরা কোন রকম চেষ্টারই ত্রুটি করবেন না। কত আত্মীয়স্বজনের দ্বার যে এই রোগীর কাছে চিরতরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তা' বলবার নয়। এঁরা শুধু একটা কথা জানেন যে, এই ব্যাধিটা ভীষণ রকমের

ছোঁয়াচে ব্যাধি এবং হয় তো বা এই রোগীর চোখে চোখ পড়বা মাত্রই এই ব্যাধি এসে দেহে আশ্রয় নেয়। রোগীর প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, শিক্ষা, বুকের বর্ত্তমান অবস্থা...যাই হ'ক না কেন, এঁরা সে সব কিছুই দেখবেন না, শুনবেন না, এমন কি বুঝতেও চেষ্টা করবেন না। স্যানাটোরিয়ামে যারা যায় নি তারা বরঞ্চ ভাল ; কিন্তু স্যানাটোরিয়াম-ফেরতা রোগী মানে একেবারে "দাগী" রোগী ("দাগী" চোর বলে না ? সেই রকম) - এবং সে রোগীকে ঘরে ঢুকতে দেওয়া কিছুতেই সঙ্গত নয়, তাকে আদর-আপ্যায়ন করা তো দূরে থাক। স্যানাটোরিয়াম-ফেরতাকে যে তাঁরা কি ভীষণ সংশয়ের চোখে দেখেন, তার সংস্পর্শে আসতে যে তাঁরা কি ভীষণ সঙ্কুচিত হয়ে উঠেন, তার একটি দুটি নয় বহু দৃষ্টান্ত আছে। রোগী কতজনকে তাঁর অবস্থা বোঝাবেন ? একলা জনে জনের কাছে বকে বকে কতজনকে তিনি আলোকিত করতে পারবেন ? বহু সময়ে তাঁকে এই দেখে বিস্মিত হতে হবে যে, তাঁর সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মনে যে কত অদ্ভুত এবং বীভৎস ধারণা আছে, অথচ তারা তাদের অজ্ঞতা চায় না স্বীকার করতে। কত ভাবে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে, কিন্তু নিজের দিকে চেয়ে তাঁকে সংযত হতেই হবে—উত্তেজিত হলে চলবে না। নিজের অবস্থা বোঝানোর চেষ্টায় তাঁর অহরহ যে বিড়ম্বনা ঘটবে, তাতে মুষড়ে না পড়বার মত সৎ সাহস তাঁর অন্তরে রাখতেই হবে।

বস্তুতঃ টি. বি. হাসপাতাল এবং টি. বি. হাসপাতালের রোগীদের সম্বন্ধে বাইরের লোকের মনে যে অজ্ঞতা আছে, সেই হিমালয়ের মত বিপুল অজ্ঞতার জট ধরে টান মারবার প্রয়োজন আজ বিশেষ ভাবে ঘটেছে। সর্ব্বসাধারণের এটা জানবার দরকার যে, যে সব যক্ষ্মা-রোগীর থুতুতে যক্ষ্মাজীবাণু থাকে এবং তারা যখন যেখানে সেখানে গয়ের নিক্ষেপ করে এবং সর্ব্বদা অত্যন্ত অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে, তারাই হয় এই ব্যাধি-বিস্তারের জন্য দায়ী। কিন্তু যে সব রোগী বিশেষ কোন পাত্রে থুতু ফেলে, সেই থুতু সাবধানে নষ্ট করে ফেলে এবং সব সময়ে অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে—তাদের থেকে বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা নেই কিছুমাত্র। উনুন থেকে রান্নাঘরে আগুন লাগবার সম্ভাবনা যতখানি, একজন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বুদ্ধিমান্ রোগীর থেকে একজন সুস্থ লোকের যক্ষ্মাক্রান্ত হবার সম্ভাবনাও ততখানিই। নিতান্ত অসতর্ক না হলে উনুনের আগুনে কখনই রান্নাঘর পোড়ে না ; ঠিক সেই রকম থুতু সম্বন্ধে নিতান্ত অসতর্ক না হলে কোন রোগী দ্বারা অপরের ভিতরে কখনই ব্যাধিবিস্তার ঘটে না। স্যানাটোরিয়াম-প্রত্যাগত রোগী এই কারণেই সর্ব্বদা নিরাপদ যে, তারা এই ব্যাধিসংক্রান্ত নানা বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেছে, থুতু সম্বন্ধে যে যে সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন—তা' তারা উত্তম রূপে আয়ত্ত করেছে এবং স্যানাটোরিয়াম-জীবন তাদের ভিতরে জন্মিয়ে দিয়েছে একটি গুরুতর রকমের দায়িত্ববোধ। তারা তাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব অথবা সমাজের কোন লোকের যে, ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে—তা' তারা কল্পনাও করতে পারে না। তা' ছাড়া স্যানাটোরিয়ামে থাকবার ফলে তাঁদের অভ্যাসটাই এমন অনেক সময় দাঁড়িয়ে যায় যে, যেখানে সেখানে থুতু ফেলতে অথবা নিজেরা কোন রকম নোংরা হয়ে থাকতে সর্ব্বদাই তারা কুণ্ঠিত হয়। অবিশ্যি একথা আমি কিছুতেই বলতে চাই না যে, স্যানাটোরিয়াম হাসপাতালের সব রোগীই এক ধাঁচের, সব রোগীই উপযুক্ত বিবেচনাশক্তি এবং দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ; কিন্তু তাদের অধিকাংশই স্যানা-টোরিয়ামে থাকবার ফলে এগুলি বাইরের যে কোন রোগীর চাইতে বহু পরিমাণে বেশী অর্জ্জন করে থাকে।

কোন স্থানে একটি যক্ষ্মানিবাস স্থাপনের কথা হ'লে স্থানীয় লোকেরা তার বিরুদ্ধে যে কি রকম উঠে পড়ে লেগে যায়, তার দৃষ্টান্ত সম্প্রতি বড় বেশী রকম পাওয়া যাচ্ছে। তাঁরা একটি যক্ষ্মানিবাসকে "menance to the welfare of the locality", "nuisance', "public danger"—ইত্যাদি বিশেষণে অভিহিত করে থাকেন। কোন স্থানে যক্ষ্মানিবাস স্থাপনের

একটু পড়াশোনা নিয়েও ভাল থাকা যায়।

জন্য উৎসাহী ব্যক্তিগণের ভিতরে সর্ব্বদাই একাধিক যক্ষ্মাবিশেষজ্ঞ চিকিৎসক থাকেন এবং এ সম্পর্কে বিবিধ বিষয়ে বিশিষ্ট চিকিৎসকগণের পরামর্শ গ্রহণ করা হয় সর্ব্বদাই। একটি যক্ষ্মানিবাস যে কোনো ভাবেই nuisance এবং public danger নয়, একথা তারা বুঝাতে চেষ্টা করেন নানা ভাবে ; কিন্তু তবুও মিউনিসিপ্যালিটির সদস্যেরা এবং স্থানীয় অন্যান্য লোকেরা এমনই বেঁকে বসেন যে, সেখানে যক্ষ্মানিবাস স্থাপন করবার সঙ্কল্প একেবারে ত্যাগ করতে হয়। যাদবপুর হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায় এক তারিখে একটি দৈনিক কাগজে এই রকম মত প্রকাশ করেছিলেন যে, এ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা উচিত। ডাক্তার রায়ের এই মত সর্ব্বপ্রকারে সমর্থনযোগ্য। যেখানে সাধারণের অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অন্যায় জেদ এবং দায়িত্বহীনতা এত বেশী এবং যেখানে না কি সামান্য চিন্তাশীলতা দ্বারা সত্যকে জানবার চেষ্টায়ও এত অনিচ্ছা এবং উদাসীনতা, সেখানে

কতকগুলি সামান্য লোকের স্বার্থকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত ক'রে বৃহত্তর জাতীয় সমস্যার সমাধানকল্পে জ্ঞানী এবং কর্ম্মী ব্যক্তিগণের পক্ষে যে কোন উপায় অবলম্বন করাই বিধেয়।

একটি যক্ষ্মা-হাসপাতালের নামে সাধারণ লোকের মনে এত ভয় —অথচ তাঁরা জানেন না যে, একটি সহরের থিয়েটার, সিনেমা, স্কুল, কলেজ জনসভা, হোটেল, রেস্টুরেণ্ট, ট্রেণের কামরা প্রভৃতি যে কোনো জায়গা থেকে এই সব হাঁসপাতাল কত বেশী নিরাপদ। তাঁরা জানেন না যে, টন্‌সিলাইটিস্, ফ্যারিনজাইটিস্, ব্রঙ্কাইটিস্, অ্যাজমা, কালা-আজার, ম্যালেরিয়া সর্দ্দি, মাথাধরা, ইনফ্লুয়েঞ্জা -ইত্যাদি নামে কত সহস্র সহস্র লোক প্রকৃত পক্ষে ভুগছে যক্ষ্মাব্যাধিতে এবং তারা যেথানে সেথানে গয়ের নিক্ষেপ ক'রে এবং খাওয়া, শোয়া, ওঠা, বসা, চলাফেরা ইত্যাদি বিষয়ে অহরহ সুস্থ লোকেদের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে মিশে তাদের কি সর্ব্বনাশ আনছে ডেকে

হাল্‌কা কাজ ক'রে সময় কাটানো।

—নিজেরা তো মরছেই। এসব লোক সমাজে অবাধভাবে বিচরণ করছে, কারুর গৃহের দরোজাই তাদের কাছে বন্ধ নয়। কিন্তু একজন স্যানাটোরিয়াম-ফেরতা রোগী—যার বুকের অবস্থা যথেষ্ট ভাল, গয়ের কদাচিৎ ওঠে—উঠলেও খুব বেশী ক্ষেত্রেই যা যক্ষ্মাজীবাণুশূন্য এবং যে না কি সুস্থ লোকেদের সাথে মেশা সম্পর্কে সর্ব্ববিষয়ে সতর্ক—তাকেই রাখা হয় "Outcast" ক'রে। যে কোনো সুস্থ লোককে আমি এই কথা বলতে চাই—তিনিই আপনার প্রকৃত শত্রু যিনি না কি আপনার অন্দরমহলে প্রবেশ ক'রে তাঁর ব্যাধির পরিচয় দেন "সর্দ্দি" এবং "কাসি" এবং "শরীরটা সুবিধের নয়" ব'লে এবং ওই অবস্থায় যিনি না কি বাড়ীর সকলের সাথে, ছোট ছেলেপিলেদের সাথে, বড় বেশী রকম মাথামাথি করেন অথবা এখানে ওখানে থুতু ফেলা সম্বন্ধে যাঁর মনে কোন রকমই ইতস্ততের ভাব নেই। অন্য পক্ষে তিনি আপনার প্রকৃত বন্ধু এবং তাঁর থেকে আপনার এক তিলও বিপদ ঘটবে না—যিনি না কি সাহসের সাথে আপনার মুখের উপরে নিজেকে পরিচিত করেন যক্ষ্মারোগী বলে, যিনি কোন টি. বি. হাঁসপাতাল অথবা স্যানাটোরিয়াম ঘুরে এসেছেন এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে যাঁর নজর অত্যন্ত বেশী।

অনেকে কোন যক্ষ্মা-হাসপাতালের ত্রিসীমানাও মাড়াতে চান না, অথবা এ রকম কোন হাঁসপাতালের কাছাকাছি কোথাও বাস করবার কল্পনাতেও ওঠেন শিউরে। কিন্তু তাঁরা যদি একটু কষ্ট করে একটি টি. বি. হাঁসপাতালের ভিতরে ঘুরে বেড়িয়ে যান, তা হলে তাঁরা দেখতে পাবেন কত অসংখ্য সুস্থলোক—নার্স, ওয়ার্ড অ্যাসিস্টেণ্ট, কুলী, মেথর, ধোপা, নাপিত, পাচক, ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, আয়া, ষ্টুয়ার্ড, কেরাণী- হাঁসপাতালের ভিতরে কি সহজ ভাবে বিচরণ করছে! তাঁরা দেখতে পাবেন—এই লোকগুলির অধিকাংশেরই থাকবার কোয়ার্টার্স হাঁসপাতালের কম্পাউণ্ডের ভিতরেই এবং অনেকেই সপরিবারেই করছেন বাস! এই লোকগুলি বহুকাল যক্ষ্মা-হাঁসপাতালে এই ভাবে কাজ করেও যক্ষ্মাক্রান্ত হয়েছে, এমন কথা তাঁরা কখনই শুনতে পাবেন না। বস্তুতঃ বহু টি. বি. হাঁসপাতালের বহু বৎসরের ইতিহাস অনুসন্ধান করে এটা স্থির ভাবে জানা গিয়েছে যে, এসব স্থানে কাজ করবার ফলে কেউ কদাচিৎ এই রোগাক্রান্ত হয়েছে। যদি সে রকম কোন ঘটনা ঘটেও, তবুও আগে থেকেই এই ব্যাধি তার ভিতরে গুপ্ত অবস্থায় ছিল কি না, অথবা তার নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি অতিরিক্ত কোন অবহেলা সে নিজে করেছে কি না কিংবা তার দেহে রোগ-সংক্রামক বাইরের অপর কোন সূত্র থেকে ঘটেছে কি না—এসব সঠিকভাবে নির্দ্ধারিত না হওয়া পর্য্যন্ত টি. বি. হাঁসপাতালে কাজ করবার জন্যই ওই লোকটি ব্যাধিগ্রস্ত হয়েছে, এমন কথা কখনই বলা চলবে না। এই সব হাঁসপাতাল থেকে ব্যাধি হবার ভয় একেবারেই নেই ঠিক এই কারণেই যে, এই সব হাঁসপাতালগুলিতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কিছুমাত্র ত্রুটি নেই এবং রোগীদের থুতু অত্যন্ত সাবধানতার সাথে নষ্ট করে ফেলা হয়।

আমেরিকায় National Tuberculosis Association-এর প্রথম সভাপতি Dr. Livingstone Trudeau সর্ব্বসাধারণের ভিতরে এসব সম্বন্ধে বিপুল অজ্ঞতা উপলব্ধি করে ১৯০৫ সালে তাঁর "Presidential Address"-এ বলেন—

"The first and greatest need is education; education of the people, and through them education of the State. Education should begin by teaching in the public schools the main facts relating to the transmission of tuberculosis, insisting in such teachings on the value of hygienic measures of prevention and dwelling as little as possible on the details of the bacteriology of the disease, which [illegible] tend to pro-

duce in imaginative young minds exaggerated and fantastic impressions of the danger of infection.

এখানে এই প্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করা যাক।

স্যানাটোরিয়াম-প্রত্যাগত রোগীর নানা প্রকার ভাবনার ভিতরে অন্যতম প্রধান ভাবনা যে-বিষয়ে এসে জোটে, সেটি হচ্ছে তার কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে। যার অর্থের কোনই অপ্রতুলতা নেই এবং খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ, নভেল-নাটক নিয়ে কাল কাটানোর যার কোন অসুবিধা নেই, তার কথা আপাততঃ এখানে আমি বাদ দিচ্ছি। কিন্তু যার অবস্থা সে রকম নয়, স্যানাটোরিয়াম থেকে বেরিয়ে কাজ না করলে যাকে উপবাস করে মরতে হবে—সেই রকম রোগীই সমস্যাস্থল এবং অবস্থাক্রমে সেই রকম রোগীর সংখ্যাই দেশে পূর্ব্বোক্তদের চাইতে বহু গুণে বেশী। কোন্ রোগী যে কি কাজের এবং কতখানি কাজের উপযুক্ত হবেন, তা তাঁর বুকের অবস্থাই যে সর্ব্বদা নির্দ্দেশ করে দেবে—একথা যেন ভুল না হয়। রোগীকে নিজের জন্য এমন কোন কাজ বেছে নিতে হবে, যাতে না কি পরিশ্রম কম এবং যে কাজের পরে তিনি বেশ বিশ্রাম নেবার প্রচুর সুযোগ পাবেন। যক্ষ্মারোগী কি কি কাজের উপযুক্ত—তার লম্বা তালিকা আমি দু' একখানা বইতে দেখেছি। সেই তালিকা আর এখানে দেবার প্রয়োজন আমি বিশেষ অনুভব করছি না এইজন্য যে, নিতান্ত হাতুড়িপেটা-টেটা জাতীয় দু'চারটা অথবা মুটেগিরি-টিরি জাতীয় দু'চারটা কাজ বাদে সুস্থ লোকেরা যে সব কাজ করতে পারে, এই রোগীর জন্যেও তার প্রায় অধিকাংশ কাজের উল্লেখই ঐ তালিকায় আছে। কিন্তু কাজে ঢুকবার পরে রোগীকে যে কত সতর্ক হয়ে চলবার দরকার হয়, তা বলবার নয়। কিছুকাল কাজ করবার পরেই শরীর আবার খারাপ হতে সুরু করেছে, অথবা কমে যাওয়া রোগ আবার বেশ ভাল মত বেড়ে পড়েছে—এমন ঘটনা অহরহই ঘটছে। কিন্তু Lawrason Brown এ সম্বন্ধে বলছেন যে—

"It is usually not the work but the play after the end of the day's work that brings about relapse."

Lawrason Brown-এর এই কথাটি প্রত্যেক রোগীর বিশেষ ভাবে মনে রাখবার দরকার। যে সব রোগী কাজকর্ম্ম সুরু করবেন, তাঁরা শুধু কাজকর্ম্মের সময়টুকু বাদে দিনের অন্য অংশ সম্পূর্ণ বিশ্রামে অতিবাহিত করবার পক্ষে কোনও বিঘ্ন না ঘটে, সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবেন। রবিবার অথবা এ রকম অন্য কোন ছুটির দিনের সদ্ব্যবহার সর্ব্বদাই সম্পূর্ণ বিশ্রাম দ্বারা করতে হবে। রোগী কিছুতেই না ভোলেন যে—

"A recovered patient is able either to wo k or play but not to do both."

অসুস্থ হবার আগে যাঁরা কেরাণীগিরি অথবা ঐ ধরণের লেখাসংক্রান্ত কাজ করতেন, স্যানাটোরিয়ামে থাকতে থাকতেই স্যানাটোরিয়াম থেকে ছুটি পাবার কিছুদিন আগে থেকে তাঁদের অল্পে অল্পে খানিকটা করে লেখা অভ্যাস করা উচিত। অসুস্থ হয়ে যাঁরা ছুটি নিয়ে হাসপাতালে এসেছিলেন, ব্যাধির চিকিৎসার জন্য এবং হাসপাতাল ছাড়বার ঠিক পরেই যাঁদের কাজে গিয়ে ভর্ত্তি হতে হবে, তাঁদের পক্ষে ত এটা করা খুবই উচিত। স্যানাটোরিয়ামে

সূর্য্যের আলোর সাহায্যে এবং নানারকম কাজ দিয়ে রোগীদের চিকিৎসা : (লেজাঁ—সুইট্জারল্যাণ্ড)।

সাধারণতঃ "walking exercise"ই দেওয়া হয়। হয়তো রোগী দু' আড়াই মাইল হাঁটতে কোনই অসুবিধা বোধ করেন না এবং শরীরও তাঁর বেশ ভালই থাকে; কিন্তু অপিসে গিয়ে যখন পাঁচ, ছয় বা সাত ঘণ্টা তাঁকে লেখার কাজ করতে হবে, তখন শরীরটা চট করে খারাপ হতে সুরু করবে। হাঁটা, চলা এবং লেখাপড়া এ দুটো এক ধরণের পরিশ্রম নয়। যে ধরণের কাজ রোগীকে ভবিষ্যতে করতে হবে, স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসাধারা ক্রমে সুস্থ হবার সাথে সাথে প্রথমে দশ পনের মিনিট থেকে সুরু করে ক্রমে সময় বাড়িয়ে সেই কাজটা খানিকটা অভ্যাস করে গেলে শেষে অতটা বেগ পেতে হয় না। রোগী যদি অফিস্ পোষ্টাপিসের পিওন হন, তবে হাঁটার দিক দিয়ে যত তিনি বাড়াতে পারবেন ততই তাঁর ভাল।

অনেক রোগী দীর্ঘকাল বিশ্রাম নেবার ফলে এবং নিষ্কর্ম্মা হয়ে থাকবার ফলে খানিকটা কর্ম্মপরাঙ্মুখ হয়ে ওঠেন—এমন কি অনেক সময়ে দস্তুরমত

কুড়ে হয়ে যান। আবার কেউ কেউ বা অসুখের প্রকৃতি বুঝতে পেরে অথবা দীর্ঘকাল নানা রকম বাধানিষেধের ডোরে বাঁধা থাকার ফলে হয়ে ওঠেন খানিকটা ভীতু। মনে যেন থাকে যে, উচ্ছৃঙ্খলতা ও কর্ম্মানুরক্তি এক জিনিষ নয় এবং সতর্কতা ও ভীরুতাও এক জিনিষ নয়। রোগীকে কাজ করতে হবে,কিন্তু কোন রকম মাত্রা ছাড়ানো বাড়াবাড়ি নিষেধ; রোগীকে নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সর্ব্ববিধ যত্ন নিতে হবে, কিন্তু তাই বলে সত্যকারের "ম্যানিয়াতে" সেটা গিয়ে না দাঁড়ায়—তা খেয়াল রাখতে হবে। "বিশ্রামে"র সঙ্গে যেন "কুড়েমি"র কেউ খিচুড়ী না করে ফেলেন। রোগী পূর্ব্বে যে কাজ করতেন, তা যদি অতিরিক্ত শ্রমসাধ্য হয় এবং যে পারিপার্শ্বিকের ভিতরে কাজ করতেন, তা যদি তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে কোন ভাবেই অনুকূল না হয়, অথবা যে কাজের জন্য তাঁকে হয়তো এই ব্যাধিগ্রস্ত হতে হয়েছিল, সে কাজে আর তাঁর ফিরে যাওয়া সঙ্গত নয়। অর্থ উপার্জ্জন কিছু কম হয় সেও ভাল, তবুও এমন কাজ নিজের জন্যে বেছে নিতে হবে, যাতে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ আর কোন মতেই না ঘটতে পারে।

অনেক ডাক্তারের মতে সুস্থ হয়ে উঠবার সাথে সাথে রোগীর একটা কিছু কাজ নিয়ে থাকা খুবই উচিত, যাদের সঙ্গতি আছে তাঁদেরও। নিষ্কর্ম্মা অবস্থায় থাকবার ফলে মনে আসে নানারকম খামখেয়ালী ভাব "idle brain"টা ক্রমে পরিণত হয় "devil's workshop"এ। এবং নিজেকে সুস্থ করে তুলবার পথে সে অবস্থাটা খুব অনুকূল নয়। কোন ডাক্তার টি. বি. রোগীদের (যাঁরা কর্ম্মক্ষম) সম্বন্ধে এমন কথাই বলেছেন যে,

"It is b.tter to work without pay than not to wo)k at all."

T. B. সংক্রান্ত একখানি বইতে একজন ডাক্তার লিখেছেন যে, তাঁর স্যানাটোরিয়ামের একজন রোগিণী যাকে না কি অত্যন্ত দীর্ঘকাল যাবৎ সম্পূর্ণ বিশ্রামের অবস্থায় রাখতে হয়েছিল—ক্রমে ক্রমে পড়েছিল বড় বেশী রকমের মনমরা হয়ে। দিনরাত কী সব দুশ্চিন্তা করত, নানারকম মানসিক বিপর্য্যয়ও এসে দিয়েছিল দেখা। এই অবস্থায় ডাক্তার তাকে একটু একটু করে এটা-ওটা-সেটা হালকা কাজ করবার অনুমতি দিলেন। ক্রমে ক্রমে কাজে সে এমনি রস পেয়ে গেল, আর অল্পদিনের ভিতরেই তার শরীর-মনের এত উন্নতি সাধিত হল যে, সবাই আশ্চর্য্য বোধ না করে পারেনি। সুবিখ্যাত Dr. A. Rollierও বলেছেন :

"The tuberculosis patient is no exception to the general law that the physical activity deteriorates without regular occupation. Patients who persue a methodical course of manual work soon become conscious of a progressive recovery of strength, accompanied by the pleasant sensation inseparable from the carrying out of regular functioning and the adaptation of the human mechanism to a daily task. Such daily tasks have an undeniably beneficent moral or mental effect."

একেবারে ঠিক এই প্রসঙ্গে নয়, এমনিই সাধারণ ভাবে সকলে জেনে বোধ হয় আমোদ পাবেন—পৃথিবীর বহু বড়লোক, বহু বিখ্যাত লোক, বহু কর্ম্মী লোক যক্ষ্মাগ্রস্ত ছিলেন। যক্ষ্মারোগীরা সাধারণতঃ একটু বেশী "sensitive", "emotional" এবং "intellectual" হয় বলে অনেকে বলেছেন এবং যক্ষ্মারোগের সাথে প্রতিভার নিকট সম্পর্ক দেখিয়েছেন।

"The following list of names, chosen from the field of literature alone will show the close relationship of this disease with creative effort and accomplishment.

"Milton, Pope, Shelly, Hood, Keats, Elizabeth Barret Browning, Francis Thompson, Goethe, Schiller, Moliere, Channings, Merimee, Thoreau, Descartes, Locke, Kant, Spinoza, Beaumont, Samuel Johnson, Sterne, De-Quincey, Scott, Jane Austen, Charlotte, Emily and Ann Bronte, Stevenson, Balzac, Voltaire, Rousseau, Washington Irving, Hawthorne, Gibson, Kingsley, Ruskin, Emerson, Cardinal Manning, Lanier, Marie Bashkirtseff, Robert Southey, West Cott, Georges de Guein, David Gray, Ammiel, John. R. Green, Robert Pollok, Hannah More, James Ryder Randall, N. P. Willis, John Addington Symonds, Stephen Crane, Katherine Mansfield, Paul Lawrence Dunber and Eugene O' Neill.

Cicero, Demosthenes, Galen and Marcus Aurelius might be added to the above list." *

এই প্রকাণ্ড তালিকা থেকেও এডগার এলান পো, শেকভ, ম্যাক্সিম গর্কী, ডস্টয়েভ্স্কী ইত্যাদি বাদ গিয়েছেন।

একটি প্রবন্ধে এমন কথাই পড়েছিলাম যে—

"Edgar Allen Poe and Robert Lowis Stevenson might never have written their famous books, had they not suffered from tuberculosis, which is believed by medical men to stimulate the mind."

যক্ষ্মাক্রান্তদের ভিতরে বহু বড় বড় চিকিৎসকও আছেন—ফিরিস্তি দাখিল করবার আর প্রয়োজন দেখি না। এঁদের সকলের জীবনই কর্ম্মময়। এঁদের ভিতরে পরলোকগত ডাক্তার লিভিংস্টোন ট্রুডো (আমেরিকায় স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসার প্রবর্ত্তক এবং ন্যাশনাল টিউবারকুলোসিস অ্যাসোসিয়েসানের সর্ব্ব প্রথম সভাপতি) অমর এবং চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত "Autobiography"তে এমন কথা লিখেছেন :

"The struggle with Tuberculosis has brought me experiences and left me recollections which I never could have known otherwise, and which I would not exchange for the wealth of the Indies !"

ডাক্তার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র বসু তাঁর "ক্ষয়রোগের আক্রমণ ও আরোগ্যের উপায়" নামক গ্রন্থে "যক্ষ্মাজয়ী" শীর্ষক একটি অধ্যায় লিখেছেন। এই অধ্যায়ে তিনি এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং, ডস্টয়েভস্কি, জন ফ্রেডারিক শিলার, জন কীট্‌স্ এবং এডওয়ার্ড লিভিংষ্টোন ট্রুডোর জীবনী দিয়েছেন। ডাক্তার বসু এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে ভারতবাসীর বিপুল অজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে এই কথা বলছেন : "যক্ষ্মা মাত্রেই যে জীবকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে তাহা সত্য নহে। পৃথিবীর বহু লোক যক্ষ্মাগ্রস্ত হইয়া গুরুকার্য্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন ; তাহাদের কয় জনের মাত্র সংবাদ রাখা হয় ?" তার কিছু পরে ডাক্তার বসু পুনরায় বলছেন : "তাঁহারা কেবলমাত্র রোগ জয় করেন নাই, রোগের সহিত মরণকে জয় করিয়া গিয়াছেন।"

কিন্তু দুঃখের সাথে আমি বলতে চাই যে মুষ্টিমেয় যে কয়েকটি যক্ষ্মারোগী এত কাজ করে গেছেন এবং জগদ্বরেণ্য হয়ে গেছেন,তাঁদের তুলনায় শোচনীয় ভাবে অক্ষম, অসহায় এবং নিরুপায় হয়ে ও চির ব্যর্থতার বোঝা মাথায় নিয়ে যে সব যক্ষ্মারোগী অকালে শুকিয়ে ঝরে গেছে, তাদের সংখ্যা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ গুণ বেশী। অতি মুষ্টিমেয় জন কত লোকের দিকে তাকিয়ে আমাদের কিছুমাত্র সান্ত্বনা পাবার নেই। এ ছাড়া, যে কয়জনের উল্লেখ ডাঃ বসু করেছেন, এঁরা কেউই যক্ষ্মা থেকে নিষ্কৃতি পাননি—চিরজীবনই ব্যাধির সাথে যুদ্ধ করে গেছেন এবং বহু জ্বালা ভোগ করে গেছেন। ডাক্তার বসুও তা স্বীকার করেছেন। এঁদের আমি "মরণজয়ী" বলতে পারি, কিন্তু "যক্ষ্মাজয়ী" বলতে পারি না কোনো মতেই। (ক্রমশঃ)

* T. B. and Genius, by Lewis J. Moorman M. D., Outdoor Journal, May 1934.

কর্ণেল জাঁতিল

—শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২রা মে হেষ্টিংস পাটনায় আসিয়া পৌছিলেন। তাহার পূর্ব্বেই এলিস পাটনা হইতে ১৫ মাইল দূরে সিংহিয়া নামক স্থানে অবস্থিত তাঁহার উদ্যান-বাটিকায় চলিয়া গিয়াছিলেন। হেষ্টিংসের সহিত দেখা হয় ইহা তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, সেজন্য যে কয়দিন হেষ্টিংস পাটনায় ছিলেন, এলিস তথায় আসিলেন না। তখন বাধ্য হইয়া হেষ্টিংস নবাবের সহিত দেখা করিবার জন্য সাসারামে গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আলোচনার পর উভয় পক্ষের অধিকার সঠিক ভাবে নির্দ্ধারিত করিবার জন্য তিনি যে সকল প্রস্তাব করিয়াছিলেন, নবাব তাহাতে সম্মত হইলেও হেষ্টিংসের সহকর্ম্মী কাউন্সিলের অপরাপর সদস্যগণ কিছুতে তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। এই ব্যর্থতার জন্য হেষ্টিংসকে অথবা ভান্সিটার্টকে কোন মতে দায়ী করা চলে না। কাউন্সিলের তখন স্পষ্টতঃই সমর-পিপাসা আরম্ভ হইয়াছিল। সদস্যগণের মধ্যে অনেকেই গভর্ণরের ঘোর বিরোধী ছিলেন। সকল বিষয়ে তাঁহাকে বাধা দেওয়া ও এলিসের সকল কার্য্যের সমর্থন করাই তখন কাউন্সিলের মূলনীতি দাঁড়াইয়াছিল।*

নভেম্বর মাসে আরও একবার শান্তির প্রচেষ্টায় ভান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস মুঙ্গেরে গিয়াছিলেন। তাঁহারা নবাবের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, কোম্পানী ভিন্ন অপর কাহারও বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার থাকিবে না; যাহাতে জাল দস্তক অথবা একই দস্তক পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইতে না পারে, সে জন্য ইংরাজদের গোমস্তা এবং নবাবের স্বাক্ষরযুক্ত ভিন্ন কোন দস্তক গৃহীত হইবে না; ইংরাজ বণিকগণ মাল খরিদের স্থানে শতকরা ৯৲ টাকা হারে শুল্ক দিবেন। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, কাউন্সিল এই সামান্য ত্যাগস্বীকারে অসম্মত হইবেন না এবং কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাঁহারা নবাবকে সে কথা বলিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু কাউন্সিলরগণ কিছুতেই ঐ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন না, তাঁহারা স্পষ্টই বলিলেন যে, তাঁহাদের অনুমোদন ব্যতীত নবাবকে কোন প্রকার সর্ত্তপ্রদানের অধিকার গভর্ণরের নাই। যাহা হউক, শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারা দয়া করিয়া নবাবকে শুধু সুপারীর উপর শতকরা ২৷৷০ টাকা হারে শুল্ক দিতে রাজি হইয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, উহা শুধু তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দিতেছেন, নতুবা ন্যায়তঃ ইহাতে তাঁহার কোন অধিকার নাই। ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া ভান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস তাঁহার নিকট যে সর্ত্ত নিরূপণ করিয়া আসিলেন, তাহা যে তাঁহাদের সহকর্ম্মিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবে, তাহা মীরকাসিম মনে ভাবেন নাই। এ কারণ উহাঁদের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি রাজ্যের সর্ব্বত্র গভর্ণরের পত্রের নকল পাঠাইয়া দিয়া আদেশ দিয়াছিলেন, যে-ইংরাজ গোমস্তা প্রস্তাবিত হারে শুল্ক প্রদান করিতে চাহিবে না, তাহাকে তৎক্ষণাৎ দেশ হইতে যেন বহিষ্কৃত করা হয়। নবাব সরকারের কর্ম্মচারিগণ আদেশপালনে তৎপর হইলে উভয় পক্ষে বিরোধ বাধিল। কলিকাতা কাউন্সিল তাঁহাদের অধস্তন কর্ম্মচারিবৃন্দকে যথাসাধ্য বাধাদান করিতে আদেশ দিলেন। সেজন্য কুঠিয়ালগণের নিকট অস্ত্রশস্ত্র ও সাহায্য প্রেরিত হইতে লাগিল। এলিসের জন্য পাটনাতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গোলযোগ ও রক্তপাত ঘটিয়াছিল।

তখন মীরকাসিম দেশীয় বাণিজ্যরক্ষার্থ সকল প্রকার প্রভেদ তুলিয়া দিয়া আপাততঃ দুই বৎসরের জন্য সকল শুল্ক রহিত করিয়া দিলেন। তাঁহার এই বিখ্যাত ঘোষণাপত্র ৫ই মার্চ্চ ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত হইয়াছিল। যে অন্যায় বাণিজ্যনীতি সকল প্রকার অনাচারের প্রশ্রয় দিত ও নবাবকে তাঁহার প্রাপ্য রাজস্ব হইতে বঞ্চিত করিত এবং স্বার্থান্ধ অর্থগৃধ্নু একদল বিদেশী বণিকের লাভের জন্য দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছিল, দেশের রাজা যখন তাহার প্রতিবিধানে সমুদ্যত হইলেন, তখন ইংরাজ মহলে তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্রতর হইয়া উঠিল। বৃথাই ভান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস তাহাদিগকে তাহাদের দাবীর অযৌক্তিকতা বুঝাইতে চেষ্টা করি-

* Vansittart—Narrative of Transctions in Bengal, Vol. II. p. 61

লেন। কাউন্সিল নবাবকে তাঁহার অদৃষ্টদেবতাগণের বিরোধাচরণ করার জন্য শাস্তিপ্রদানে সমুদ্যত হইলেন। আমিয়ট এবং হে নামক দুইজন সদস্য নবাবকে তাঁহার ঘোষণাপত্র প্রত্যাহার করিবার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে মুঙ্গের যাত্রা করিলেন। যুদ্ধের আয়োজনও সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল। সকলেই আসন্ন সমরের জন্য প্রস্তুত হইতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। কোন্ সৈন্যদল কোথায় সমবেত হইবে, কে কোন্ পথে যুদ্ধযাত্রা করিবেন, এ সকল ব্যবস্থাও এই সময়ে অর্থাৎ হে-আমিয়টের দৌত্যকর্ম্ম সমাধা হইবার পূর্ব্বেই স্থির হইয়া গেল।

মীরকাসিম যদি দেশের সর্ব্বনাশে উদাসীন হইয়া নিজ মসনদ রক্ষার জন্য ব্যাকুল হইতেন, তাহা হইলে তিনি ইংরাজদিগের সহিত বিবাদে লিপ্ত না হইয়া এ সময়েও তাহাদের আপত্তিকর ঘোষণাপত্র প্রত্যাহার করিতেন। কিন্তু তিনি মীরজাফর ছিলেন না। তিনি দেশের প্রকৃত মঙ্গল চাহিতেন। রাজ-কর্ত্তব্যচ্যুত হইয়া তিনি সিংহাসন বাঁচাইতে সমুৎসুক হইলেন না। এলিসের ঔদ্ধত্য দিন দিন মাত্রা অতিক্রম করিতেছিল। তাঁহাতেও তিনি বিচলিত হইলেন না। দুর্দ্দান্ত কুঠিয়ালকে নিজে শাস্তি না দিয়া তিনি তাঁহার উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রতিকারপ্রার্থী হইলেন। বাস্তবিক ইংরাজদিগের সহিত ব্যবহারে মীরকাসিম যে স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রেমের পরিচয় দিয়াছিলেন, যে রাজোচিত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা দেখাইয়াছিলেন, জগতে তাহার তুলনা অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। নিরপেক্ষভাবে ইতিহাস লিখিতে বসিয়া ইংরাজ লেখকগণও একবাক্যে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, উভয় পক্ষে মনোমালিন্য এবং যুদ্ধের জন্য নবাবের কোন দোষ ছিল না, তজ্জন্য ইংরাজরাই প্রধানতঃ দায়ী এবং এলিসের হঠকারিতার জন্যই যুদ্ধ বাধিয়া উঠিয়াছিল।

পাটনায় তখন নবাবী ফৌজের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল। অবস্থা বুঝিয়া মীরকাসিম মার্কারকে নিজ সৈন্যদলসহ তথায় গমনের আদেশ দিলেন। তিনি আসিয়া পৌছিলে পাটনা অধিকার করা সম্ভব হইবে না বুঝিয়া এলিস তৎপূর্ব্বে যুদ্ধ বাধাইলেন। ২৪শে জুন রজনীর অন্ধকারে ইংরাজরা অতর্কিতে নগর আক্রমণ করিল। অপ্রস্তুত নবাবী সেনা বাধা দিতে পারিল না। ইংরাজরা নগর অধিকার ও লুণ্ঠন করিতে সমর্থ হইলেও তাহাদের দুর্গ অধিকারের চেষ্টা সফল হইল না। নবাবী ফৌজের অধিনায়ক লালসিংহ বীরবিক্রমে আত্মরক্ষা করিয়া তাহাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিলেন। এমন সময় মার্কার অদূরে আসিয়া দেখা দিলেন। তাঁহার সৈন্যদল নগর পুনরধিকার করিয়া ইংরাজ কুঠি অবরোধ করিল। ২৯শে জুন নৈশান্ধকারে আত্মগোপন করিয়া অনেক ইংরাজ গঙ্গাপার হইয়া পলায়ন করিল; অবশিষ্টগণ শত্রুকরে বন্দী হইল। পলাতকদিগের অনুসরণে মার্কার ওয়াল্টার রাঁণহার্ড বা সমরুকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ১লা জুলাই ছাপরার অদূরে মাঁঝি নামক স্থানে সামান্য যুদ্ধের পর তিনি উহাদিগকে ধৃত করিতে সমর্থ হইলেন। তখন সমস্ত বন্দিগণ নবাবের আদেশে মুঙ্গেরে আনীত হইল।

অতঃপর সমরানল ভীষণ ভাবে জ্বলিয়া উঠিল। সে আগুনে মীরকাসিমের পতন, সিরাজউদ্দৌলার মতই বিশ্বাসঘাতকগণের চক্রান্তে ঘটিয়াছিল। ১৭ই জুলাই অজয়তীরে এবং দুই দিন পরে আবার কাটোয়ায় তাঁহার সৈন্যগণ ইংরাজ হস্তে পরাজিত হইল। পলাশীতে মীরমদনের মত কাটোয়াতে নবাবের প্রভুভক্ত সুদক্ষ সেনানায়ক মহম্মদ তকী খাঁ গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ যুদ্ধের প্রাক্কালেই প্রাণ হারাইয়াছিলেন। অধিনায়কের পতনে যুদ্ধনিরত সৈন্যগণ হতাশ্বাস হইয়া পলায়নতৎপর হইয়াছিল। অতঃপর আবার গিরিয়ায় যুদ্ধ হইল। এ যুদ্ধে (২।৮।১৭৬৩) নবাবের মুসলমান সেনানায়কবর্গ যেরূপ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, মার্কার ও সমরু তদনুরূপ কিছুই করিতে পারেন নাই। আসাদউদ্দৌলা, বদরুদ্দিন মীরনসির প্রমুখ মোগল বীরগণ যখন মহাবিক্রমে ইংরাজসেনাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তখন উহাঁরা দুইজনে রণস্থলের অপরপ্রান্তে তাঁহাদের সম্মুখীন শত্রুপক্ষকে প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করিলে যুদ্ধের ফলাফল অন্যভাবে লিখিবার আবশ্যক হইত, সে কথা অনেকেই বলিয়া থাকেন।

তাহার পর উধুয়ানালায় যুদ্ধ (৫।৯।১৭৬৩)। জাঁতিল বলেন যে, এই যুদ্ধে শুধু মাদেকের দলের সাহস ও বীরত্বের জন্য ইংরাজরা বিজয়লাভ করিয়াছিল। "ফরাসী সৈনিকদিগের বীরত্বের জন্য ইংরাজরা বঙ্গদেশের আধিপত্যলাভে সমর্থ হইয়াছে। তাহাদের এই অধিকার নিষ্ঠুরতম অবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। বন্দী ফরাসীদিগের দুর্ভাগ্যের সুযোগ

লইয়া তাহাদের পরিশ্রমের সদ্ব্যবহার করা আন্তর্জ্জাতিক বিধি এবং মর্য্যাদাজ্ঞান উভয় দিক হইতেই তুল্যরূপ নিন্দনীয়।" ফরাসীদিগের বীরত্বের জন্য কি না বলা যায় না, তবে নবাবের দলভুক্ত একজন ইংরাজ সৈনিকের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই যে, মেজর এডাম্‌স উধুয়ানালাতে বিজয়গৌরবের অধিকারী হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ঐ ব্যক্তি কোম্পানীর সেনাদল হইতে পলায়ন করিয়া নবাবের কর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অবরোধকালে সে এডাম্‌সকে জলাভূমির মধ্য দিয়া গুপ্ত পথের সন্ধান দেওয়াতে তাঁহার পক্ষে অতর্কিত আক্রমণে দুর্গজয় সম্ভব হইয়াছিল। ঐ পথে বিপদের আশঙ্কা না করিয়া নবাবীসেনা নিশ্চিন্ত ছিল। অকস্মাৎ উভয়প্রান্ত হইতে আক্রান্ত হইয়া তাহারা আর আত্মরক্ষার অবকাশ পাইল না। এই অতর্কিত আক্রমণে মাদেকের দল বীরত্ব দেখাইয়াছিল বলিয়া মনে হয়, কারণ ফরাসীদিগের গুপ্তপথে আক্রমণের কথা ইংরাজী ইতিহাসেও স্বীকৃত হইয়াছে। *

গুর্গিণ এবং মার্কার নবাবের বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন এবং স্বেচ্ছায় কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া তাঁহার পরাজয় ঘটাইয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। মেজর এডাম্‌স গুর্গিণকে তাঁহার ভ্রাতা ইংরাজদিগের পরম শুভানুধ্যায়ী খোজা পিদ্রুর সাহায্যে হস্তগত করিয়াছিলেন এবং সেই জন্য তিনি নবাবের প্রধান সেনাপতি হইয়াও সে বিশ্বাসের মর্য্যাদা রক্ষা করেন নাই, একথা সমসাময়িক এবং আধুনিক অনেক লেখকই বলিয়া থাকেন। গুর্গিণের দেহান্তের পর পিদ্রু নিজেই স্বীকার করিয়াছিলেন যে, উধুয়ানালার যুদ্ধের পূর্ব্বে মেজর এডাম্‌সের আদেশে তিনি তাঁহার শিবির হইতে গুর্গিণকে ও মার্কারকে দুইখানি স্বতন্ত্র পত্র লিখিয়াছিলেন। "উক্ত পত্রে পিদ্রু ভ্রাতাকে নবাবের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে ও সুযোগ পাইলে তাঁহাকে বন্দী করিতে লিখিয়াছিলেন। নবাবের চরাধ্যক্ষ ঐ কথা জানিতে পারে এবং গোপনে প্রভুকে সকল কথা জানায়। তাহার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সে যুগের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি গুর্গিণ খাঁ শবমধ্যে পরিণত হইয়াছিলেন।" †

গুর্গিণের মৃত্যুসংবাদ দিয়া স্বয়ং এডাম্‌স কর্ত্তৃপক্ষকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, ইংরাজদের প্রতি সৌহার্দ্দ্যসম্পন্ন বলিয়া নবাবের আদেশে তিনি নিহত হইয়াছেন। জাঁতিলের মত সৈয়দ গোলাম হোসেনও তাঁহার হত্যাকাণ্ডের অন্যতম প্রত্যক্ষদ্রষ্টা ছিলেন। গুর্গিণের প্রতি তাঁহার বিশেষ আক্রোশ ছিল, নিজ গ্রন্থে অকারণে তিনি তাঁহার প্রতি বহু কটুকাটব্য বর্ষণ করিয়াছেন। গুর্গিণকে তিনি স্পষ্টভাবেই বিশ্বাসঘাতক বলিয়াছেন। তাঁহার শোচনীয় পরিণামদর্শনে গোলাম হোসেনের উল্লাসের অবধি

কর্ণেল মাদেক।

ছিল না এবং উক্ত ঘটনার দীর্ঘ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার কালে তিনি মনের আনন্দ গোপন করিবার কোনই চেষ্টা করেন নাই।

কিন্তু জাঁতিল এবং সে যুগের আরও অনেকের মতে গুর্গিণ আদৌ বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না। নবাব শুধু অলীক সন্দেহের বশে তাঁহার প্রাণদণ্ড বিধান করিয়াছিলেন। পিদ্রু তাঁহাকে প্রভুদ্রোহ করিতে বলিলেও তিনি সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই। জাঁতিলের আত্মচরিত হইতে এবার জগৎ শেঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের ও গুর্গিণের হত্যাকাণ্ডের বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

---

* Forrest—Life of Lord Clive, Vol. II, p. 239

† Marshman—History of India

বলা বাহুল্য, জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর লিখিত বলিয়া তাঁহার এই বিবরণ ঐতিহাসিকের নিকট সাতিশয় মূল্যবান্। মহারাজ স্বরূপচাঁদ এবং মহতাব রায় নামক জনৈক শেঠভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত প্রথমে মীরকাসিমের বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল। কিন্তু ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার বিরোধ বাধিলে উহাঁরা দুইজনে তাহাদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন।* সে কথা জানিতে পারিয়া নবাব তাঁহাদিগকে সপরিবারে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। তখনও উভয় পক্ষে প্রকাশ্য বলপরীক্ষা আরম্ভ হয় নাই। শেঠদিগের মুক্তির জন্য ইংরাজেরা নবাবের নিকট বহু তর্জ্জনগর্জ্জন, অনুনয় বিনয় করিলেও কোন ফল হইল না। নবাবের আদেশে অপরাপর বন্দিগণের সহিত তাঁহারাও মুঙ্গেরে প্রেরিত হইলেন। সেখানে আনীত হইবার পর তাঁহারা নবাবকে জানাইয়াছিলেন যে, এবারকার মত তাঁহাদের অপরাধ মার্জ্জনা করিলে তাঁহারা তাঁহাকে ২৫ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড দিবেন। উক্ত প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়া বিষম ক্রুদ্ধ নবাব উহাঁদিগকে লৌহনিগড়ে আবদ্ধ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন।

উধুয়ানালার পরাজয়ের পর মীরকাসিম মুঙ্গের দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। মেজর এডাম্‌সও রাজমহল অধিকার করিয়া মুঙ্গের অভিমুখে যাত্রা করিলে নবাব তাঁহাকে জানাইলেন যে, তিনি আর অধিক অগ্রসর হইলে তিনি তাঁহার হস্তে বন্দীকৃত ইংরাজগণের প্রাণবধ করিবেন। ইংরাজ সেনাপতি কিন্তু ইহাতে অগ্রগমনে নিরস্ত হইলেন না। তাঁহার আগমন-সংবাদে নবাব যাবতীয় ধনসম্পত্তি ও বন্দিগণসহ মুঙ্গের পরিত্যাগ করিলেন। "মুঙ্গের হইতে পাটনা যাইবার পথে শেঠরা তাঁহাদের হইয়া গুর্গিণকে বলিবার জন্য পুনরায় আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু গুর্গিণ আমাকে উহাদের হইয়া ওকালতী করা হইতে নিরস্ত থাকিবার প্রতিজ্ঞা করিতে বাধ্য করিলেন। উহাতে সাফল্যের আশা বিন্দুমাত্র ছিল না, বরং উহাদের পতনের সহিত নিজেরও বিজড়িত হইবার আশঙ্কা ছিল। গুর্গিণের শত্রুরা নবাবকে ছিলেন যে, তিনিও তাঁহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছেন। সেই মুহূর্ত্তে নবাব প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি উক্ত বিশ্বাসী কর্ম্মচারীকে (মিথ্যাপবাদ যাহাকে কৃতঘ্ন প্রভুদ্রোহী বলিয়া তাঁহার নিকট চিত্রিত করিয়াছিল) বিনাশ না করিয়া নিবৃত্ত হইবেন না। গুর্গিণ যে এ সকল কথা বুঝিতেন না এমন নহে। আমি সর্ব্বদা তাঁহার শিবিরপার্শ্বে নিজ শিবির সন্নিবেশ করিতাম এবং উভয়ে একত্রে ভোজনাদি করিতাম। একদিন তাঁহার অনুপস্থিতিতে আমি নবাবের রন্ধনশালা হইতে প্রেরিত আহার্য্যগুলির একা একা আস্বাদগ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এমন সময়ে গুর্গিণ খাঁ শিবিরে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং আমাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'এ তুমি কি কি করিতেছ? তুমি কি জান না ঐ সকল জিনিষে বিষ থাকিতে পারে? আমার এবং আমার ভ্রাতার সম্বন্ধে যে সকল কথা হইতেছে সব শুনিয়াও তুমি এরূপ অবিবেচনার কার্য্য করিতেছিলে কেন? আমার শত্রুর অভাব নাই। সব দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিও।' অতঃপর নিজ পাকশালা হইতে ভক্ষ্যাদি আনয়নের তিনি আদেশ দিয়াছিলেন।

"মুঙ্গের ও পাটনার মধ্যে গুর্গিণ খাঁকে হত্যা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। দারুণ গরমের জন্য রাত্রে আমি তাঁহার শিবিরের সম্মুখে মুক্ত আকাশতলে আমার শয্যা পাতিয়াছিলাম। ইহাতে ঘাতকেরা মনে ভাবিল বুঝি বা তাহাদের অভিসন্ধি প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা তখনকার মত কার্য্য স্থগিত রাখিল। পরদিন খারাপ রাস্তার জন্য আমাদের পথিমধ্যে বড় বিলম্ব হইয়াছিল। শিবির স্থাপনের অব্যবহিত পরে গুর্গিণ খাঁ ভোজনকার্য্য সমাধা করিয়া লইলেন। তাহার পর গ্রীষ্মাধিক্য বোধ হওয়াতে আমাকে বলিলেন, 'চল, বক্সীর তাঁবুতে যাই, সেখানে কিছু কিছু ঠাণ্ডা হইতেও পারে।' কিন্তু দেখা গেল, সেখানকার অবস্থাও কিছুমাত্র সুখকর নহে। তখন তিনি পুনরায় নিজ শিবিরে ফিরিয়া চলিলেন। মোগল অশ্বারোহী সেনার ছাউনীর মধ্য দিয়া তিনি ফিরিতেছিলেন, এমন সময় একজন সওয়ার অগ্রসর হইয়া আসিয়া, তাঁহার নিকট টাকা চাহিল ও জানাইল যে, আহার্য্যদ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতাবশতঃ বেতন পাওয়া সত্ত্বেও গ্রাসাচ্ছাদনের পক্ষে তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। ইহাতে গুর্গিণ খাঁ বিরক্ত হইয়া তাঁহার জনৈক পার্শ্বচরকে উচ্চৈঃস্বরে

* এলিসের কাগজপত্রমধ্যে শেঠদিগের চক্রান্তে লিপ্ত থাকার সুস্পষ্ট প্রমাণ নবাব পাইয়াছিলেন। উহাঁরা যুদ্ধের যাবতীয় ব্যয়ভারবহনে সম্মতি জানাইয়াছিলেন। কোম্পানী পরে মহতাব রায়ের পুত্র খুশালচাঁদকে এতদুপলক্ষ্যে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন।

আহ্বান করিলেন। তখন সৈনিক সরিয়া গেল। রৌদ্রের তাপে কষ্ট হইতে থাকায় আমি ছায়ায় যাইবার অভিপ্রায়ে তাঁহার নিকট হইতে কতকটা পথ অগ্রসর হইয়াছিলাম। বোধ হয় মাত্র ত্রিশপদ গিয়াছি, সহসা তাঁহার সহিত যে তিন-জন লোক ছিল, তাহাদের সাহায্যপ্রার্থনাসূচক চীৎকারধ্বনি শ্রবণগোচর হইল। ফিরিয়া দেখিলাম, উক্ত মোগল সৈনিক গুর্গিণকে তরবারি দ্বারা আঘাত করিতেছে। তাঁহার নিজের অথবা অনুচরত্রয়ের কাহারও নিকট অস্ত্র ছিল না। কোন সাহায্য করা সম্ভব হইল না, মুহূর্ত্তমধ্যে গুর্গিণ দেহের তিন স্থানে বিষম আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন। প্রথম আঘাতে কণ্ঠদেশ দেহ হইতে বিচ্ছিন্নপ্রায় হইল। দ্বিতীয় আঘাতে স্কন্ধাস্থি ভাঙ্গিয়া গেল। তৃতীয়টি কুক্ষিদেশ বিদীর্ণ করিল। তিনি দৌড়িয়া প্রায় পঞ্চাশপদ দূরবর্ত্তী নিজ শিবিরে আশ্রয় লইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু অধিক দূর যাইবার পূর্ব্বেই সওয়ারদিগের অশ্বসমূহের পশ্চাতের পায়ে বাঁধা সুদীর্ঘ রজ্জুতে পা বাধিয়া পড়িয়া গেলেন। আততায়ীও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখের উপর পুনরায় আঘাত করিল। গুর্গিণের পরিধানে সূক্ষ্ম মসলিন ভিন্ন আর কিছু ছিল না। সুতরাং তরবারির আঘাতের গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। আমি ছুটিয়া তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম, তাঁহাকে শিবিকায় তুলিয়া শিবিরে আনিতে সাহায্য করিয়াছিলাম। তিনি জলপানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, জল দেওয়া হইল। কিন্তু তিনি আর তাহা পান করিতে পারিলেন না; সব জল ঘাড়ের ছিদ্রপথে বাহির হইয়া গেল। আমাকে শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখিয়া তিনি একদৃষ্টে আমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন, তখন তাঁহার বাক্‌-শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল। তিনি হস্তেঙ্গিতে আমাকে নিকটে আহ্বান করিলেন এবং নিজ উরুদেশে তিনবার চপেটাঘাত করিয়া জানাইলেন যে, চক্রান্তকারিগণের মিথ্যাপবাদে তাঁহার এ দশা সমুপস্থিত হইয়াছে; আমি যেন বিশেষ সাবধানতার সহিত চলি।

"সেনাপতির বন্ধু ও পরিচারকগণ যখন সযত্নে তাঁহার শুশ্রূষানিরত ছিল, তখন পূর্ব্বোক্ত মোগল সৈনিক ও তাহার সঙ্গিগণ গুর্গিণ যাঁর কর্ম্মে নিযুক্ত আর্ম্মানীদিগকে বধ করিবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। মুমূর্ষু বন্ধুর বাহুপাশ হইতে আমাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহার মুন্সি এই নূতন বিপদের সম্ভাবনা আমাকে জানাইলে আমি আর্ম্মানীয় সৈনিকগণকে শিবিরের চতুর্দ্দিকে যথেষ্ট প্রহরীর বন্দোবস্ত করিতে বলিলাম। ক্ষণপরে মোগলরা শিবির লক্ষ্য করিয়া একটি কামান বসাইল। আর্ম্মানীরা আমাকে সংবাদ দিলে আমি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে কামানে অগ্নিসংযোগোদ্যত গোলন্দাজকে গুলি করিয়া বধ করিতে আদেশ দিলাম। গোলন্দাজকে নিহত হইতে দেখিয়া তাহার সহচরগণ আর কিছু না করিয়া তথা হইতে পলায়ন করিল। আমার প্রিয় সুহৃদের অন্তিম নিশ্বাসপাতের সহিত আমি দ্রুত অশ্বধাবনে নবাবের শিবিরে গমন করিয়াছিলাম। সেখানে তখন বিষম গোলযোগ,—সকলেই সশস্ত্র—সেনাপতিগণ নিজ নিজ দলসহ বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া সমবেত হইতেছিলেন। শত্রুসেনা অকস্মাৎ শিবির আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া রব উঠিল। সৈন্যগণ আতঙ্কগ্রস্তচিত্তে শৃঙ্খলাশূন্য অবস্থায় আসিতেছিল। চারি-দিকে একটা ত্রস্ত, ভীত ভাব। এমন সময় হস্তিপৃষ্ঠে কাসিম আলি তথায় আসিয়া দেখা দিলেন। আমাকে দেখিবামাত্র তিনি নিকটে আহ্বান করিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন কি হইয়াছে। যে শোচনীয় বিয়োগান্ত দৃশ্য আমি সেইমাত্র দেখিয়া আসিয়াছিলাম, যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে আমি তাহার বিবরণ দিলাম। নবাবের ভাবে বোধ হইল, তিনি খুব দুঃখিত হইয়াছেন; বলিলেন, 'আমি অনেকবার তাঁহাকে একা কোথাও যাইতে নিষেধ করিয়াছিলাম।' তাহার পর নিকটবর্ত্তী আমীরদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'তোমরা সব শুনিলে ত? এখন সকলে নিজ নিজ শিবিরে ফিরিয়া যাও। খয়ের সুলাহ্—(যাহা হউক, শান্তি হইল)।' এই শেষোক্ত কথা দুইটি যে প্রকার পরিতৃপ্তির সহিত কথিত হইয়াছিল, তাহাতে সঙ্গে সঙ্গে গুর্গিণের আশঙ্কার কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। ঈর্ষা, মিথ্যাপবাদ ও শত্রুপক্ষের চক্রান্ত তাঁহার জন্য যে ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করিতেছিল, তাহার আভাস ত ইতিপূর্ব্বেই তিনি আমাকে দিয়াছিলেন! যে নিষ্ঠুর আঘাত আমার প্রিয় সুহৃদকে হরণ ও আমার সকল আশা বিনষ্ট করিয়াছিল, তাহার ভারে মুহ্যমান্ হইয়া আমি শিবিরে ফিরিয়া আসিলাম।

"আমার অবস্থা তখন সহজেই অনুমেয়। আমার প্রিয় বন্ধু, প্রথম পরিচয়ের দিন হইতে যাঁহাকে আমি একমাত্র

ছাড়িয়া থাকি নাই, আজ তাঁহাকে আমি চক্ষুর সম্মুখে নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হইতে দেখিলাম; তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য আমি কিছুই করিতে পারিলাম না। জানি না কেমন করিয়া আমি নিজে হত্যাকারিগণের হস্ত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছিলাম। ঘোর মর্ম্মপীড়ায় অভিভূত হইয়া আমি এক মোগল বন্ধুর শিবিরে গিয়াছিলাম। ইহাঁর নাম সৈতুল্লা খাঁ, পাটনার গভর্ণর মেহেন্দি আলি খাঁ ইহার ভ্রাতা। তাঁহাকে আমি সকল কথাই বলিলাম, মৃত সৈন্যাধ্যক্ষের প্রতি আমার সহানুভূতি ও তাঁহার শোচনীয় হত্যাকাণ্ডে আমার রাগ-বিরক্তি কিছুই গোপন করিলাম না। তিনি বলিলেন, 'আমাদের প্রিয় বন্ধু গুর্গিণের শত্রুরা তাঁহার চরিত্র যে প্রকার মসীলিপ্ত করিয়াছিল, তাহাতে ঐ সকল কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া নবাব এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন।' এ সম্বন্ধে কোন কথা স্থিরনিশ্চয় করিয়া বলিতে আমি চাহি না। তবে সকল কথা শুনিয়া উহাই আমার সম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে। ইংরাজদিগের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া তিনি নবাবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছিলেন এবং ঐ জন্যই ইংরাজরা তাঁহার ভাই খোজা পিদ্রুকে তাহাদের শিবিরে রাখিয়াছে ইত্যাদি কত রকমের কথাই শুনা গিয়াছিল। আমি বলিলাম, কিন্তু ঐ সব কথার কোন ভিত্তি নাই। গুর্গিণের গোপনতম কার্য্যাবলীও আমার নিকট অজানা ছিল না। তাঁহার মধ্যে কৃতঘ্নতার লেশমাত্র ছিল না। একথা আমি জোর করিয়াই বলিতে পারি। ইংরাজরা তাঁহার কাছে নবাবের পক্ষ পরিত্যাগ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল বটে; তাঁহাকে উহারা জানাইয়াছিল যে, ঐ কার্য্যের দ্বারা তিনি উহাদের শিবিরে বন্দীভাবে রক্ষিত নিজ ভ্রাতার প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। তদুত্তরে গুর্গিণ কি বলিয়াছেন, জানেন? তিনি বলিয়াছিলেন, 'কাসিম আলি খাঁর নিকট আমি সত্যে আবদ্ধ। প্রাণ থাকিতে আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আমার ভ্রাতার দুরদৃষ্ট জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তন জন্য কোন হীন কার্য্য করিতে আমি অসমর্থ, ইংরাজরা যেমন আমার ভাইয়ের ভাগ্যাধিপতি, তেমনই নবাব কাসিম আলি খাঁ আমার ভাগ্যাধীশ। তাঁহার স্বার্থের প্রতিকূল কোন কার্য্য করিতে আমি অপারগ। জগদীশ্বরের হস্তে আমি সব সমর্পণ করিলাম। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে।'

"এরূপ ঘোর মিথ্যাপবাদের সৃষ্টি এবং তজ্জনিত শোচনীয় ফল বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই। মানুষের চিত্তবৃত্তি যখন ঈর্ষ্যাবিষে উত্তেজিত হইয়া তাহাদিগকে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য অন্ধ করিয়া ফেলে তখন তাহারা প্রকৃতই ঘোর কৃপার পাত্র। গুর্গিণের সত্যই এরূপ শোচনীয় পরিণাম হওয়া উচিত ছিল না।" গুর্গিণের সুখ্যাতি জাঁতিল শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই এবং পরিশেষে এই বলিয়া প্রসঙ্গের অবসান করিয়াছেন যে, "আমি যত কিছুই বলি না কেন, গুর্গিণের গুণগ্রাম বুঝাইতে তাহা পর্য্যাপ্ত হইবে না।"

টমাস খোজামল নামক একদল সমসাময়িক আর্ম্মানী লেখকও গুর্গিণ খাঁর বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। ইংরাজরা যখন তাঁহার নিকট নবাবকে বন্দী করিয়া তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিবার প্রস্তাব করে এবং তজ্জন্য তাঁহাকে প্রচুর অর্থ দিবে জানায়, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি সামান্য ব্যক্তি ছিলাম। কাসিম আলি খাঁ আমাকে বিশ্বাস করিয়া সম্মানের এই উচ্চপদে উত্তোলন করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি বিশ্বাসহন্তা হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নহে। আর্ম্মানীদের জাতীয় বিশেষত্ব এই যে, তাহারা কখন প্রভুদ্রোহ করে না; বরং বিশ্বস্ত ভাবে তাঁহাদের পরিচর্য্যা করে এবং চিরকাল অনুগত থাকে। সুতরাং আপনাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইতে আমি অসমর্থ।" "মুৎক্ষরিণে"র অনুবাদক হাজি মুস্তাফা নামধারী রেমণ্ড নামক ফরাসী পণ্ডিত গুর্গিণকে ব্যক্তিগত ভাবে জানিতেন। তিনিও গুর্গিণের রাজদ্রোহের কথায় বিশ্বাস করিতেন না। *

মার্কার সম্বন্ধে কিছু বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মার্কারের পূর্ব্বজীবন সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা জানা যায় না। তিনি ইউরোপের কোন সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং নেদারলাণ্ডের যুদ্ধে নিযুক্ত থাকিয়া সামরিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। কি সূত্রে এবং কখন তিনি এদেশে আগমন করেন, অথবা কোন্

* মুৎক্ষরিণ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৯ ফুটনোট। গুর্গিণ খাঁর দেহান্তের পর (১১।৮।১৭৬৩) বড়হি গ্রামে, যেখানে সমরুর সেনাদল শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিল, সেইখানে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। ঐ বড়হি গ্রাম মোকামার অদূরে অবস্থিত।

সময় মীরকাসিমের কর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে সকল কথা অজ্ঞাত। এলিসের হস্ত হইতে পাটনা পুনরুদ্ধারে তিনি যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজদিগের সহিত সংগ্রামে, বিশেষতঃ গিরিয়া এবং উধুয়ানালার যুদ্ধে, তাদৃশ কোন কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। অনেকে মনে করেন যে, খোজা পিক্রণ সাহায্যে ইংরাজরা তাঁহাকেও হস্তগত করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কথা সত্য বলিয়া মনে করিবার পক্ষে সর্ব্বপ্রধান বাধা এই যে, সে অবস্থায় ইংরাজ কোম্পানী নিশ্চয়ই তাহার জন্য সুপ্রচুর বৃত্তি বা পরিতোষিকের ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু সেরূপ কিছু করা হয় নাই, কারণ রেনও তাঁহার গ্রন্থের একস্থানে পাদটীকায় লিখিয়াছিলেন (১৭৮৪ খৃঃ):—"মার্কার এখন কলিকাতায় তাঁহার স্বজাতীয়গণের দয়াদাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছেন। তিনি সুন্দর, সুগঠিত ও বলিষ্ঠকায় পুরুষ।"

এবার শেঠদিগের হত্যার কথা বলা যাইতেছে। "রাত্রে দরবারকক্ষে আসিয়া দেখিলাম, নবাব একাকী বসিয়া আছেন এবং আরজীবেগী উক্ত হতভাগ্যদ্বয়ের পক্ষ হইতে তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছে, যেন চার ক্রোর টাকা অর্থদণ্ড লইয়া এবারকার মত নবাব তাহাদিগকে মার্জ্জনা করেন। নবাব আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, 'শুনিলে ত উহাদের কথা? আমার আমীররা একথা শুনিলে এখনই উহাদের ছাড়িয়া দিয়া আমাকেই ধরিয়া উহাদের হাতে তুলিয়া দিবে।' তিনি সমারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। প্রায় পনের মিনিট পরে সমার আসিলে তিনি তাহাকে শেঠদিগের প্রার্থনা জানাইয়া অবিলম্বে উহাদের বধ করিতে বলিলেন। সমার ফিরিয়া আসিয়া কার্য্য সমাধা হওয়ার সংবাদ না দেওয়া পর্য্যন্ত তিনি আমাদের সকলকে শিবির পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিলেন। শেঠভ্রাতৃদ্বয় সমারকে তাহাদের মস্তক ছেদন করিয়া বধ করিবার জন্য বহু অনুনয় করা সত্ত্বেও সে স্বহস্তে পিস্তলের গুলিতে উহাদের প্রাণবিনাশ করিয়াছিল। বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম সকলকে দেখাইবার জন্য মৃতদেহ দুইটি এক প্রকাশ্য স্থানে রাখা হইয়াছিল এবং যাহাতে কেহ চুরি করিয়া দাহকার্য্য সম্পন্ন করিতে না পারে সে জন্য প্রহরী সেনার বন্দোবস্ত করা হইল।"

পাটনার হত্যাকাণ্ড মীরকাসিমের জীবনের ঘোর কলঙ্ক। কিন্তু কি অবস্থায় তিনি ঐ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা এ প্রসঙ্গে বিচার করা প্রয়োজন। চারিদিকে বিশ্বাসঘাতকতা দেখিয়া মর্ম্মাহত,—বিশ্বাসঘাতকগণের জন্য রণস্থলে বারংবার পরাজিত, ব্যথিত ও ক্ষিপ্তপ্রায় নবাব নিজ বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী ও সভাসদ্‌বর্গকে বিনাশ করিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে বন্দী ইংরাজদিগের হত্যার আদেশ দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এলিসের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা তাঁহাকে ঐ কার্য্যে অনেকটাই প্ররোচিত করিয়াছিল। ইংরাজ সেনাপতি মেজর এডাম্‌স তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও উহাদের উদ্ধারসাধনমানসে অগ্রসর হইতেছিলেন; ইহাতে তাঁহার ক্রোধ হওয়াও স্বাভাবিক। বন্দিগণের মধ্যে কেহ জীবিত নাই, এ সংবাদে তিনি অগ্রগমনে নিরস্ত হইবেন, একথাও মীরকাসিম সম্ভবতঃ মনে ভাবিয়াছিলেন। তিনি যে যুগের লোক, তখনকার দিনে ঐরূপ মনে করা এবং ঐ প্রকার আদেশ দেওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন, আমরা তাঁহার আচরণের সমর্থন করিতেছি।

পাটনার হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে জঁাতিলের লিখিত বিবরণ এখানে দেওয়া যাইতেছে। অপরাপর সূত্র হইতে পরিজ্ঞাত তথ্য সমরুপ্রসঙ্গে অন্যত্র প্রদত্ত হইবে।* "একদিন নবাব

* পাটনার হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে সকল কথা সঠিক জানা যায় না। প্রত্যক্ষদর্শীদিগের মধ্যে কেহই লেখনী ধারণ করেন নাই। বন্দিগণের মধ্যে একমাত্র যিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন, সেই ডাঃ ফুলারটনের কথা এ বিষয়ে কতকটা নির্ভরযোগ্য; কিন্তু তাহা অবিকৃত পাওয়া যায় না। পাটনা সিটিতে প্রতিষ্ঠিত স্মারক-স্তম্ভগাত্রে বহু অপ্রকৃত কথা স্থান পাইয়াছে। সর্ব্বসমেত কত লোক এই ব্যাপারে প্রাণ হারাইয়াছিল, তাহা নির্দ্ধারণের উপায় নাই। বন্দিগণ সকলে এককালে নিহত হয় নাই। ৫ই অক্টোবর হইতে ১১ই অক্টোবর পর্য্যন্ত অষ্টাহকালের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দলে উহাদিগকে হত্যা করা হইয়াছিল। ফুলারটন, পিটার ক্যাম্বেল এবং অপর একজন ডাক্তারের রোজনামচা ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বিশপ কার্মিঙ্গার কর্তৃক "The Diaries of three Surgeons of Patna" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। ৮ই আগষ্ট তারিখে উহারা ডায়ারীতে লিখিয়াছিলেন,—"আমাদের মুঙ্গেরে আসার সংবাদে আমাদের সেনাদল হইতে পলাতক এবং এক্ষণে নবাবের কর্ম্মাধীন একটা নোংরা হতভাগা জার্ম্মাণ (dirty scoundrel of a German) কৌতূহলপরবশ হইয়া আমাদের দেখিতে আসিয়াছিল।" ইউরোপীয় হইয়াও যে ব্যক্তি নেটিভদের সহিত মিশিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহাকে ইহা ছাড়া আর কি বলা হইতে পারে?

আমাকে তাঁহার শিবিরে আহ্বান করিয়াছিলেন। আমি উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে নিজ মসনদের সন্নিকটে রক্ষিত একটি আসনে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন; বলিলেন, 'মেজর এডাম্‌সকে আমি কোরাণের নামে শপথ করিয়া জানাইয়াছিলাম যে, তিনি রাজমহল ছাড়াইয়া মুঙ্গের অভিমুখে অগ্রসর হইবা মাত্র আমি আমার হস্তে বন্দীকৃত ইংরাজগণের প্রাণ বিনাশ করিব। সে কথায় কর্ণপাত করা তিনি আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। তাহার পর তিনি মুঙ্গের অধিকার করিয়াছেন এবং আরও অগ্রসর হইয়াছেন। আমার প্রতিজ্ঞা কি আমি রাখিব না? উহারা যদি আমাকে ধরিতে পারে, তবে নিশ্চয়ই আমার প্রাণবধ করিবে। সুতরাং তাহার পূর্ব্বেই আমি এ কাজ করিব। তুমি কি বল? তুমি কি আমার সহিত একমত নহ?'" জাঁতিল নবাবের কথার কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। উক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তাঁহার যে সুগভীর বিরাগের সঞ্চার হইতেছিল, বাক্য দ্বারা তাহা প্রকাশ করা অপেক্ষা নীরব থাকিলে তাহা অধিকতর পরিস্ফুট হইবে বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু মীরকাসিম তাঁহাকে নির্ভয়ে মনোভাব ব্যক্ত করিতে বলিলে তিনি যে সুদীর্ঘ বক্তৃতাটি দিয়াছিলেন তাহার সারমর্ম্ম হইল এই যে, এতাদৃশ লোমহর্ষণ ব্যাপারের অনুষ্ঠান ইতিপূর্ব্বে হিন্দু বা মুসলমান কোনও আমলেই সংঘটিত হয় নাই। "নবাব বলিলেন, 'কিন্তু আমি যদি উহাদের হাতে ধরা পড়ি তাহা হইলে উহারা ত আমার প্রাণ রাখিবে না।' 'তা কেন? উহারা আপনাকে রাজ্যচ্যুত করিলেও আপনার শ্বশুর মহাশয়ের মত আপনাকেও সম্ভ্রমে রাখিবে।'"

[ক্রমশঃ

ধরিত্রী

—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

বিচিত্র রূপ পৃথ্বী তোমার, শ্যামল ভূতল সুনীল নভ,
রূপার সোনার টানা-পোড়েন, শোভার কথা কি আর কব!
নিম্নে হীরক মুক্তা মাণিক, ঊর্দ্ধে তারার ঝালর ঝোলে,
লক্ষ ফুলের পরশ যে পাই, সমীরণের এ হিল্লোলে।
খাদ্য জোগাও স্বচ্ছ স্বাদু—ধান্য গোধূম অনুপম,
সাগর-ঘেরা বসুন্ধরা চরণপরশ আমার ক্ষম।

২

বসত করে তোমার ঘরে এক সাথে নর-নারায়ণে,
গৃহ-দীপ আর পঙ্ক-প্রদীপ রয় পরস্পর আকর্ষণে।
ভোগের ত্যাগের নিবিড় মিলন, সত্য ভ্রমে স্বপন সাথে,
অগৃহী আর গৃহীর সনে পথেই মিলন দিবস-রাতে।
ভূলোক এবং গোলোক তুমি, নাই ত্রিলোকে তোমার সম।
সাগর-ঘেরা বসুন্ধরা চরণপরশ আমার ক্ষম।

৩

দেবতা-গড়া তোমার মাটী, চক্রতীর্থ প্রেমের তুমি,
তুমি ভূমার রত্নবেদী মণিকোঠা বিহারভূমি।
আধেক সুধা, আধেক সলিল, সত্তা আধেক, আধেক স্মৃতি,
সুদক্ষিণা সবিতৃকে প্রদক্ষিণ হায় করছ নিতি।
হেমবরণী হৈমবতীর পাষাণী মা তোমায় নমঃ,
সাগর-ঘেরা বসুন্ধরা চরণপরশ আমার ক্ষম।

স্বখাত সলিল

—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

যৌবনের দৃঢ় অসন্দিগ্ধ চিত্তবল অল্প বয়সে দেখা যায় না। সে বয়সে সমগ্র বস্তুকে হয়ত আমরা সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাই না, কিন্তু যেটুকু দেখি খুব স্পষ্টভাবে দেখি। তাই, চল্লিশ পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখে যখন 'চাল্‌শে' ধরে, মনও তখন স্পষ্ট দেখার নিঃসংশয় দৃঢ়তা হারাইয়া ফেলে। হয়ত দৃষ্টি ধোঁয়াটে হওয়ার সঙ্গে দৃষ্টির ক্ষেত্র কিছু বিস্তৃত হয়; কিন্তু মোটের উপর একরোখা ভাবে নিজেকেই নির্ভুল মনে করিবার অকুণ্ঠিত সাহস আর থাকে না।

দেবব্রতের কথা যখন মনে পড়িত, তখন ভাবিতাম তাহার বয়সও ত চল্লিশ পার হইয়া গেল; যৌবনের অদম্য দুঃসাহসিকতায় একদিন সে যাহা করিয়াছিল, আজ কি সেজন্য তাহার অনুশোচনা হয় না? বিদ্রোহীর রক্ত-রাঙা ঝাণ্ডা কি এখনও সে তেমনি খাড়া রাখিতে পারিয়াছে?

কারণ, যে দুর্গম পথে সে একাকী যাত্রা সুরু করিয়াছিল, আদর্শের বৈজয়ন্তী কাঁধে লইয়া সে পথে চলা যে কত কঠিন, তাহা ত আর কাহারও অবিদিত নাই। পদে পদে নূতন সমস্যার সৃষ্টি হয়, অথচ তাহাদের জট ছাড়াইবার সময় যৌবনের কল্পনা-উদ্ভূত আদর্শ কোনও কাজেই লাগে না।

তারপর দেবব্রতের সঙ্গে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হইয়া গেল। ব্যবসায় উপলক্ষে মধ্য-প্রদেশের এক অখ্যাতনামা ক্ষুদ্র সহরে গিয়াছিলাম। সেখানে যে বাঙ্গালী কেহ থাকিতে পারে, এ সম্ভাবনা আদৌ মনে আসে নাই; ইচ্ছা ছিল ধর্ম্মশালায় দুদিন থাকিয়া কাজ শেষ করিয়া ফিরিব।

ষ্টেশনে নামিয়া গাড়ীর খোঁজ করিতে গিয়া দেখি, দেবব্রত একখানা চক্‌চকে আট সিলিণ্ডার মোটর হইতে নামিতেছে।

ক্ষণকালের জন্য নির্ব্বাক্ হইয়া গেলাম। তারপর বলিয়া উঠিলাম,—'দেবব্রত! তুমি এখানে?'

দেবব্রত আমাকে দেখিতে পাইয়াছিল, সে এক লাফে আসিয়া আমাকে দুহাতে জড়াইয়া ধরিল,—'মন্মথ! তুমি হঠাৎ এখানে?—উঃ—কতদিন পরে দেখা!' বলিতে বলিতে তাহার গলাটা ভারী হইয়া আসিল।

দেখিলাম তাহার চেহারা বিশেষ বদ্‌লায় নাই। একটু মোটা হইয়াছে; কিন্তু মুখের সেই ধারালো তীক্ষ্ণতা এখনও তেমনি অম্লান আছে। মাথার ছোট-করিয়া-ছাঁটা কোঁকড়া চুল রগের কাছে পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে।

দেবব্রত আমাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল,—'কাজে এসেছ নিশ্চয়। কি-কাজ পরে শুনব, এখন ক'দিন আছ?'

—'দুদিন। কাল সন্ধ্যের গাড়িতে চলে যেতে হবে।'

—'থাকবার কোন আস্তানা নেই ত?'

—'ধর্ম্মশালায় থাকব ঠিক আছে।'

—'ওসব চালাকি চলবে না, আমার বাড়ীতে থাকতে হবে।'

আমার স্যুটকেসটা হাত হইতে কাড়িয়া মোটরে রাখিয়া আসিল; তারপর সপ্রশ্ননেত্রে আমার পানে তাকাইল।

আমি বলিলাম,—'কিন্তু—'

—'কিন্তু কি? আপত্তি আছে?'

মনটাকে একটা ঝাকানি দিয়া বলিলাম,—'না—চল।'

দেবব্রত আমার হাতটা চাপিয়া প্রায় গুঁড়া করিয়া দিবার উপক্রম করিল, তারপর বলিল,—'তুমি গাড়ীতে বস। আমি পার্শেল অফিসে একবার খোঁজ নিয়ে আসি—একটা পার্শেল আসবার কথা আছে।'

গাড়ীতে গিয়া বসিলাম। দেবব্রতের মনের ভিতর অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; আগে তাহার একটা স্বাতন্ত্র্যের ভাব ছিল—যেন নিজেকে দূরে দূরে রাখিত - এখন সেটা নাই। বোধ হয় বয়সের গুণ। ভাবিতে লাগিলাম, বয়সের গুণে আমারও কি এমনি অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে! হয়ত হইয়াছে, নচেৎ এত সহজে তাহার আতিথ্য স্বীকার করিলাম কি করিয়া? আর এক দিনের কথা মনে পড়িল, যেদিন তাহার সহিত এক ট্যাক্সিতে যাইতেই সম্মত হই নাই।

মিনিট পাঁচ-ছয় পরে দেবব্রত ফিরিয়া আসিল। তাহার সঙ্গে একজন কুলী একটা মাঝারি গোছের বাস্কেট মাথায় করিয়া আনিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিল।

দেবব্রত নিজেই গাড়ী চালাইয়া আসিয়াছিল, কুলীকে বিদায় করিয়া গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল।

বেলা তখন সাড়ে দশটা। ক্ষুদ্র গলিবহুল সহরের ভিতর দিয়া দেবব্রত সাবধানে গাড়ী চালাইয়া লইয়া চলিল। আমি কি সম্ভাষণ করিব কিছুই ভাবিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

সহরের ঘিঞ্জি অংশ পার হইয়া দেবব্রত জোরে মোটর চালাইয়া আমার দিকে চাহিয়া হাসিল। মনে হইল, আমাকে পাইয়া সে অকৃত্রিম ভাবে খুশী হইয়াছে। হাসিতে এই আনন্দের প্রতিবিম্ব পড়িল।

কি বলিব কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া শেষে বাজে প্রশ্ন করিলাম,—'বাস্কেটে কি আছে ?'

—'গল্‌দা চিংড়ি। মাঝে মাঝে কলকাতা থেকে আনাই। ভালই হল, ঠিক সময়ে এসে পৌছেছে।' বলিয়া আবার স্নিগ্ধচোখে আমার পানে চাহিয়া হাসিল।

আমি বলিলাম,—'তুমি এইখানেই স্থায়ীভাবে বাস করছ তা হলে ?'

—'হ্যাঁ। সহর থেকে একটু দূরে ফাঁকা জায়গায় একখানা বাড়ী কিনে আছি।'

—'কলকাতার বাস তুলে দিলে ?'

—'হ্যাঁ।'

—'কতদিন এখানে আছ ?'

—'বার বছর। কেয়ার বয়স।'

চমকিয়া তাহার দিকে চাহিলাম।

সে সহজভাবে বলিল,—'কেয়া আমার বড় মেয়ে—তার বয়স এই বার চলছে।'

বাহিরের দিকে চোখ ফিরাইয়া রহিলাম। বড় মেয়ের বয়স বার। হয়ত আরও সন্তানাদি হইয়াছে। তাহার স্ত্রী—অনেকগুলা প্রশ্ন মনের মধ্যে গজ গজ করিতে লাগিল, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না।

দেবব্রতের বাড়ীতে আসিয়া পৌছিলাম। পাঁচিল-ঘেরা বিস্তৃত বাগানের মাঝখানে ভিলা-জাতীয় বাড়ী; আশেপাশেও ঐ রকম বাগানযুক্ত বাড়ী রহিয়াছে। বুঝিলাম, এটি সৌখীন ধনী ব্যক্তিদের পাড়া।

দেবব্রত আমাকে একটা সুসজ্জিত ঘরে বসাইয়া ভিতরে প্রস্থান করিল; কিয়ৎকাল পরে আবার ফিরিয়া আসিয়া বসিল, বলিল,—'তোমার কাজ কি খুব জরুরী? এখনই বেরুতে হবে ?'

আমি বলিলাম,—'হ্যাঁ। খেয়ে দেয়ে বেলা বারটা নাগাদ বেরুলেই চলবে।'

পর্দ্দা সরাইয়া একটি স্ত্রীলোক ঘরে প্রবেশ করিল। চমকিয়া মুখ তুলিয়াই চিনিতে পারিলাম; ষোল বছর আগে একবার মাত্র রাস্তার গ্যাসের আলোয় দেখিয়াছিলাম, তবু চিনিতে কষ্ট হইল না। পরিধানে সাধারণ শাড়ী শেমিজ, সিঁথিতে সিন্দুর জ্বল জ্বল করিতেছে। যে বয়সে গৃহিণী, সচিব, সখী, প্রিয় শিষ্যা ও জননীর একই দেহে সম্মিলন হয়, এ সেই বয়স, যৌবনের উদ্দাম বর্ষা আর নাই, নির্ম্মল শারদ স্বচ্ছতার ভিতর দিয়া তল পর্য্যন্ত দেখা যায়।

সে আমার সম্মুখে অবিচলিত থাকিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তবু ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার মুখখানা রাঙা হইয়া উঠিল। এই লজ্জাকর লজ্জা ঢাকিবার জন্যই যেন সে তাড়াতাড়ি নত হইয়া আমাকে একটা প্রণাম করিল। আমি বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিলাম,—'থাক—থাক—'

সে উঠিয়া দাঁড়াইল, জোর করিয়া আমার চোখের উপর চোখ রাখিয়া বলিল,—'ভাল আছেন ?' এই কথা দুইটা কণ্ঠ হইতে বাহির করিতে তাহাকে যে কতখানি ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিতে হইল, তাহা তাহার স্বর শুনিয়া বুঝিলাম।

কুণ্ঠিত অপরাধীর মত একটা 'হ্যাঁ' বলিয়া আমি আর কিছু বলিতে পারিলাম না। দেবব্রতের উপর রাগ হইতে লাগিল। আমার সম্মুখে এমন ভাবে স্ত্রীকে টানিয়া আনিবার কি দরকার ছিল? আমি কে? দু'দিনের অতিথি বৈ ত নয়। কিন্তু তবু ভাবিয়া দেখিতে গেলে দেবব্রতের পক্ষে ইহাই একান্ত স্বাভাবিক, সে যে কোন অবস্থাতেই পর্দ্দাপ্রথা মানিবে, তাহা কল্পনা করাও দুষ্কর।

দেবব্রত এতক্ষণ জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া ছিল, এবার ফিরিয়া স্ত্রীকে বলিল,—মন্মথ, খেয়ে দেয়ে কাজে বেরুবে—ওর জন্যে—'

বাড়ীর গৃহিণী যেন এতক্ষণে নিজ অধিকারের গণ্ডীর মধ্যে ফিরিয়া আসিল; তাহার গলার স্বর শুনিয়া বুঝিলাম মিথ্যা কুণ্ঠার কুয়াশা কাটিয়া গিয়াছে। সে বলিল,—'রান্না তৈরী আছে। উনি নেয়ে নিন।—তুমিও নেয়ে নাও না, এক সঙ্গে বসে খাবে।' বলিয়া ক্ষিপ্রচরণে আহারের ব্যবস্থা করিতে চলিয়া গেল।

স্নানাদি সারিয়া এক সঙ্গে আহারে বসিলাম। পাচক ব্রাহ্মণ পরিবেশন করিল, দেবব্রতের স্ত্রী দাঁড়াইয়া আমাদের খাওয়াইল। দেবব্রত হাসিয়া গল্প করিতে লাগিল, স্ত্রীকে আমার জন্য এটা-ওটা আনিয়া জোর করিয়া খাওয়াইবার উপদেশ দিল। তাহাদের কথায় আচরণে কোথাও একটু কুণ্ঠার চিহ্ন প্রকাশ পাইল না। তবু আমি নিঃসঙ্কোচে তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারিলাম না। মনের ভিতরটা আড়ষ্ট ও অস্বচ্ছন্দ হইয়া রহিল।

কাজ সারিয়া ফিরিতে বেলা সাড়ে চারটে বাজিয়া গেল।

বারান্দার উপর দেবব্রত দাঁড়াইয়া আছে; তাহার পাশে তাহার একটা হাত জড়াইয়া ধরিয়া একটি মেয়ে।

দেবব্রত বলিল,—'আমার মেয়ে কেয়া।—কেয়া, এঁকে প্রণাম কর।"

বাপের উগ্র সৌন্দর্য্যের সহিত মায়ের কোমল লাবণ্য মিশিয়া কেয়ার রূপ হইয়াছে অপরূপ। এখনও যৌবন বহু দূরে, তবু মুখের একটি অচপল শান্তশ্রী মনকে মুগ্ধ করে।

কেয়া আমাকে প্রণাম করিল; আমি বলিলাম, 'তোমাকে আজ সকালে দেখিনি কেন?'

হাস্যোজ্জ্বল চোখে কেয়া বলিল,—'আমরা ইস্কুলে গিয়েছিলুম।'

তারপর ঘরে বসিয়া চা পান করিতে করিতে দেখিলাম, একটি ছয় সাত বছরের ছেলে ভীরু মৃগশিশুর মত দূর হইতে আমাকে দেখিতেছে। সারঙ্গচক্ষুর মত বিস্ফারিত কালো চোখ দুটিতে অসীম কৌতূহল; কিন্তু সে কাছে আসিতেছে না, একবার এ দরজা একবার ও দরজা হইতে উঁকি মারিতেছে।

আমি তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিলাম, সে ছুটিয়া পালাইয়া গেল।

কেয়া বাপের চেয়ারের পাশে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, কহিল,—'মণ্টুর বড্ড লজ্জা, নতুন মানুষ দেখলে ও কিছুতেই কাছে আসে না। না বাবা?'

মণ্টুর চেহারায় মায়ের ছাপ বসান, কাজেই পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে হইল না। দেবব্রত 'মণ্টু এদিকে আয়' বলিয়া দু'বার ডাকিল, কিন্তু মণ্টুর সাড়া পাওয়া গেল না।

ঘরের তৈয়ারী রসগোল্লায় কামড় দিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমার ক'টি ছেলে মেয়ে?' কথাটা এ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

দেবব্রত বলিল,—'এই দুটি।'

নীরবে জলযোগ শেষ করিলাম।

রুমালে মুখ মুছিতেছি, শুনিতে পাইলাম কেয়া তাহার বাপের কানে কানে বলিতেছে,—'বাবা, ইনি আমাদের কে হন?'

দেবব্রত বলিল,—'উনি তোমাদের বাবার বন্ধু হন।'

কেয়া একটু নিরাশ হইল। ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল,—'ওঁকে আমি কি বলে ডাকব?'

দেবব্রত স্নিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—'কি বলে ডাকতে তুমি চাও?'

কেয়া একবার চকিতে আমার দিকে তাকাইয়া বাপের গলা জড়াইয়া কানে কানে কি বলিল, শুনিতে পাইলাম না; কিন্তু দেবব্রতের মুখের যে পরিবর্ত্তন হইল তাহা দেখিতে পাইলাম। সে একবার মাথা নাড়িয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, আমাকে বলিল, 'তুমি বিশ্রাম কর, আমি একবার বাজারটা ঘুরে আসি। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরব।' বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তাহার এই হঠাৎ উঠিয়া চলিয়া যাওয়ার মধ্যে এমন কিছু ছিল যে কেয়া একটু আহত ও অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। আমিও তাহার [illegible] চুপি কথাবার্ত্তায় কেমন অস্বস্তি বোধ

করিতেছিলাম, কেয়াকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—'তুমি ইস্কুলে কি পড় ?'

কেয়া বলিল,—'বাংলা আর সংস্কৃত।'

বিস্মিত হইয়া বলিলাম,—'ইংরিজি পড় না ?'

'না—মা ইংরিজি পড়া ভালবাসেন না।'

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম, শেষে বলিলাম,—'সংস্কৃত কি পড় ?'

'ব্যাকরণ আর কাব্য।'

'কোন্ কাব্য ?'

'কুমারসম্ভব।'

অবাক হইয়া বলিলাম,—'কুমারসম্ভব বুঝতে পার ?'

কেয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—'হ্যাঁ। যেখানে বুঝতে পারি না, পণ্ডিতজী বুঝিয়ে দেন।'

জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কুমারসম্ভব কোন্ সর্গ সব চেয়ে ভাল লাগে ?'

কেয়া উৎসাহে দুই করতল যুক্ত করিয়া উজ্জ্বল চোখে বলিল,—'সপ্তম সর্গ—যেখানে উমার সঙ্গে মহাদেবের বিয়ে হল।'

'আর, পার্ব্বতীর তপস্যা ভাল লাগে না ?'

'হ্যাঁ, তাও খুব ভাল লাগে।' তারপর আমার চেয়ারের হাতলে বসিয়া আমার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল,—'আচ্ছা, মহাদেব পার্ব্বতীকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন কেন, বলুন ত ?" বিশুদ্ধ সাহিত্যের এমন একটি মহিমা আছে, যে মুহূর্ত্তে বয়সের ব্যবধান ঘুচাইয়া দিয়া দুই রসগ্রাহীর মধ্যে নিবিড় মনের ঐক্য জন্মাইয়া দিতে পারে।

আমি একটু চিন্তা করিয়া বলিলাম,—'বোধহয় পার্ব্বতীকে কষ্ট দেবার লোভ মহাদেব সামলাতে পারেন নি।'

খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কেয়া বলিল,—'ধাঃ—তা কেন হবে।'

'তবে ?'

মুখ গম্ভীর করিয়া সে বলিল,—'কষ্ট না পেলে মহাদেবের মত বর পাওয়া যায় না তাই।'

কেয়ার মত মেয়ে [illegible] দেখি নাই। বার বছর বয়স, কিন্তু মনটি তপোবন-[illegible] মত। তাহার কোঁকড়া নরম চুলে হাত বুলাইয়া ব[illegible] 'ও—তাই [illegible] বোধ হয়।'

হঠাৎ কেয়া বলিল,—'আচ্ছা, আপনি এতদিন আসেন নি কেন ?'

কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না, শেষে বলিলাম,—'তোমাকে ত জানতুম না, তাই আসিনি।'

'বাবাকে, মাকে ত জানতেন, তবে আসেননি কেন ?'

কঠিন প্রশ্ন, এড়াইয়া গেলাম। বলিলাম,—'আমি এসেছি বলে তুমি খুশী হয়েছ ?'

মাথাটি হেলাইয়া সে বলিল,—'হ্যাঁ খুব খুব খুশী হয়েছি। আমাদের বাড়ীতে কক্‌খনো কেউ আসেন না, আমরাও কোথাও যেতে পাই না। আমার ইস্কুলের বন্ধু রূপকুমারী ছুটি হলে মামার বাড়ী যায়,'—কেয়ার কণ্ঠ ম্রিয়মাণ হইয়া আসিল—'মা বলছিলেন কালই আপনি চলে যাবেন। আবার কবে আসবেন ?'

আমি সহসা কেয়ার মুখ কাছে টানিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কেয়া, তখন তোমার বাবার কাণে কাণে কি বলছিলে ? আমাকে কি বলে তুমি ডাকতে চাও ?'

কেয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বলিল,—'সে—সে কিছু না', তারপর মুখ তুলিয়া বলিল,—'ঐ মণ্টু উঁকি মারছে! ওকে ধরে নিয়ে আসি—দাঁড়ান। একবার ভাব হয়ে গেলে ওর আর লজ্জা থাকে না।'

কেয়া মণ্টুর পিছনে ছুটিয়া গেল। আমি অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম কিন্তু তাহারা ফিরিয়া আসিল না। বোধ হয় কেয়া মণ্টুকে ধরিতে পারে নাই।

রাত্রে আমি শয্যা আশ্রয় করিলে দেবব্রত খাটের পাশে একটা ইজি-চেয়ার টানিয়া বসিল। আলোটা ঘরের কোণে আবছায়া ভাবে জ্বলিতেছিল; এই প্রায়ান্ধকারের মধ্যে আমরা অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলাম।

শেষে দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল,—'কালকেই যাওয়া ঠিক তা হলে ? আর দু'দিন থাকতে পারবে না ?'

বলিলাম,—'না, অনেক কাজ ফেলে এসেছি, গিন্নীরও শরীরটা ভাল নয়।—কেন বল দেখি ?'

'তোমাকে পেয়ে কেয়া আর মণ্টু ভারি উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তুমি ছাড়া ওদের মুখে অন্য কথা নেই। ওদের জীবনে এ একটা নূতন অভিজ্ঞতা কি না।'

আবার দীর্ঘকাল দু'জনে নীরব রহিলাম।

তারপর আমি বলিলাম,—'দেবব্রত, তোমার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে।'

সে বলিল,—'হ্যাঁ, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই হয়। তোমারও হয়েছে।'

'আমার? কি জানি—'

কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলাম,—'তুমি কলিকাতার বাস তুলে দিলে কেন? এখানে ত বাঙালীর মুখ দেখতে পাও না।'

'কেন—বুঝতে পারছ না?'

'ছেলে মেয়ের জন্যে?'

'হ্যাঁ। ওদের দোষ কি? ওরা কেন শাস্তি পাবে?'

'কিন্তু এখানে লুকিয়ে থেকে কি ওদের বাঁচাতে পারবে? সমাজ বড় কঠোর, বড় ছিদ্রান্বেষী।'

'তা জানি বলেই ত এই স্বজাতিহীন বিদেশে লুকিয়ে থেকে সমাজকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করছি। সমাজ আমাদের প্রতি অন্যায় পীড়ন করতে চায়, আমি তা করতে দেব না।'

'সমাজ অন্যায় পীড়ন করতে চায় একথা তুমি কি করে বল?'

'পুরোনো তর্কে দরকার নেই। কিন্তু বাপমায়ের কল্পিত অপরাধ সন্তানের ঘাড়ে চাপানোটাও সুবিচার নয়।'

আমি প্রশ্ন করিলাম,—'তোমার ছেলেবেলার মতগুলো এখনো বদলায় নি?'

'কিছু বদলেছে, সব বদলায় নি।'

'বিবাহ সম্বন্ধে?'

'বিশেষ বদলায়নি। বিবাহের একটা লৌকিক উপকারিতা আছে। কিন্তু তবু বলব, বিবাহ কৃত্রিম বন্ধন। যেখানে প্রেম আছে সেখানে বিবাহ নিষ্প্রয়োজন, যেখানে তা নেই, সেখানে বিবাহ একটা বীভৎস পাশবিকতা।'

একবার ইচ্ছা হইল, জিজ্ঞাসা করি সে নিজে কেন বিবাহ করিয়াছিল। প্রশ্ন অরুচিকর হইলেও সে সোজা উত্তর দিবে জানিতাম, কারণ দেবব্রতের মনে কোথাও ফাঁকি ছিল না। কিন্তু তাহাকে আঘাত করিতে সঙ্কোচ-বোধ হইল।

বলিলাম,—'ঘুম পাচ্ছে। এবার শোও গে।'

দেবব্রত উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমার অনুচ্চারিত প্রশ্নের জবাব দিল,—'দ্বিজু রায়ের একটা হাসির গান আছে—'তারেই বলে প্রেম'। গানটা হাসির নয়, অত্যন্ত করুণ। কিন্তু একথাও ঠিক যে মানুষ একলা থাকতে পারে না; তাই সমাজ যত অবিচারই করুক, তাকে নিয়ে কারবার করতে হয়। আমি যে সমাজকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করছি তার জন্য আমার মনে বিন্দুমাত্র গ্লানি নেই, আমি আজ পর্য্যন্ত জেনে বুঝে কোনও অন্যায় কাজ করিনি; আর কাউকে করতেও বলিনি। নিজের কাছে আমি খাঁটি আছি। এখন কথা হচ্ছে, যাদের আমি বন্ধু বলে মনে করি তারা আমায় সাহায্য করবে কি না।'

শেষ কথাটার মধ্যে যে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন ছিল তাহা আমার কানে বাজিল। কিন্তু উত্তর দিতে পারিলাম না। দেবব্রত কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, বোধ হয় একটা কিছু উত্তর প্রত্যাশা করিয়াছিল। তারপর 'ঘুমোও' বলিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

ইহার পর অনেকক্ষণ ঘুম আসিল না; দেবব্রতের কথাগুলা মনের মধ্যে ওলট-পালট করিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে কেয়ার শিশু-মুখ ও মণ্টুর হরিণ-চোখ দৃষ্টিপটের উপর ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

হঠাৎ মনে হইল, দেবব্রতের স্ত্রী যে গৃহত্যাগিনী একথা আমি ছাড়া প্রত্যক্ষভাবে আর কে জানে?

সকাল বেলা মণ্টু নিজে আসিয়া ভাব করিয়া ফেলিল। তখনও শয্যাত্যাগ করি নাই, সে মুখখানি অতিশয় করুণ করিয়া নিজের একটি আঙুল দেখাইয়া বলিল,—'কেটে গেছে।'

আমি উঠিয়া বসিয়া আঙুল পরীক্ষা করিলাম, কিন্তু ক্ষতচিহ্ন এতই আণুবীক্ষণিক যে চোখে দেখা গেল না। বলিলাম, 'তাইত বড্ড লেগেছে। এস, জলপটি বেঁধে দিই।'

পটি বাঁধা হইলে মণ্টু বলিল,—'আমার একটা কোকিল আছে।'

বিস্মিতভাবে বলিলাম,—'তাই না কি! কৈ আমাকে দেখালে না?'

মণ্টু জানালার বাহিরে একটা গাছের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিল,—'ঐ গাছে বসে রোজ ডাকে, আবার উড়ে যায়। ওটা আমার কোকিল। দিদির কোকিল নেই।'

বনের পাখীর উপর এমন স্বত্বাধিকার প্রচার করিতে দেখিয়া আমি থতমত খাইয়া গেলাম, বলিলাম,—'তোমার আর কি আছে ?'

অত্যন্ত রহস্যপূর্ণভাবে মণ্টু পকেট হইতে একটি ফলা ভাঙা ছুরি বাহির করিয়া দেখাইল, প্রশ্ন করিল,—'তোমার ছুরি আছে ?'

বিষণ্ণ ভাবে বলিলাম,—'না। তোমার ছুরিটা আমায় দেবে ?'

দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়িয়া মণ্টু বলিল,—'না। তোমাকে একটা লাট্টু দেব।'

'কিন্তু আমি যে লাট্টু ঘোরাতে জানি না।'

'আমি শিখিয়ে দেব।'

এইরূপ আলাপ আলোচনার মধ্যে সে ধীরে ধীরে আমার কোলের কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল, এখন আমার জানুর উপর উপবেশন করিয়া এক প্রচণ্ড প্রশ্ন করিয়া বসিল,— 'তুমি আমার, না দিদির ?'

কোকিলের মত আমাকেও নিশ্চয় মণ্টু ইতিমধ্যে নিজের খাস-সম্পত্তি করিয়া লইয়াছে, মহা দ্বিধায় পড়িয়া গিয়া বলিলাম,—'তাইত, একথা ত ভেবে দেখিনি। দু' জনেরই হওয়া কি চলে না ?'

এমন সময় মণ্টুর দিদি আসিয়া প্রবেশ করিল। মণ্টু লাফাইয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—'না তুমি আমার, দিদির নয়—দিদির নয়—'

দিদিও ছাড়িবার পাত্রী নয়, পিছন হইতে আমাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—'কক্‌খনো না। তুই কাল কেন আসিস নি, উনি আমার।'

এ বিবাদের মীমাংসা সহজে হইত না, কিন্তু এই সময় তাহাদের মা দরজার পরদা সরাইয়া এই দৃশ্য দেখিয়া বলিয়া উঠিল,—'ও কি হচ্ছে! ছেড়ে দে—ওঁকে জ্বালাতন করিস নি। আপনি চা খাবেন আসুন।'

হৃদয়ের মধ্যে অদ্ভুত পূর্ণতা লইয়া চা খাইতে গেলাম।

তারপর যতক্ষণ বাড়ীতে রহিলাম, মণ্টু ও কেয়া আমার সঙ্গ ছাড়িল না; আমাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া স্কুলেও গেল না। আমাকে লইয়া তাহাদের শিশুচিত্তের এই অপূর্ব্ব আনন্দ-সমারোহ যেন আমারও মনে নেশা জাগাইয়া তুলিল।

কাজে বাহির হইতে বেলা একটা বাজিল। তিনটার সময় ফিরিয়া আসিলাম। কাজ শেষ হইল না; কিন্তু সে যাক্।

সন্ধ্যার ট্রেণে যাইব। তার আগে যতটুকু সময় পাইলাম কেয়া ও মণ্টুর সঙ্গেই কাটাইলাম। দেবব্রত আমার ইচ্ছা বুঝিয়া আলগোছে রহিল।

ক্রমে যাত্রার সময় উপস্থিত হইল। আমি উঠিয়া দেবব্রতকে বলিলাম,—'আমি একবার অনিমার সঙ্গে দেখা করে আসি। তুমি বস।' দেবব্রত চকিতভাবে আমার দিকে তাকাইয়া ঘাড় নাড়িল।

পাঁচ মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া মোটরে উঠিলাম। কেয়া ও মণ্টু আগে হইতেই গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছিল; দেবব্রত নিজে গাড়ী চালাইয়া লইয়া চলিল। আমার গলাটা এমন বুজিয়া গিয়াছিল যে, প্রথম খানিকক্ষণ কথা কহিতে পারিলাম না। একটি কৃতজ্ঞ নতজানু নারীর অশ্রুপ্লাবিত মুখ বারবার মনে আসিতে লাগিল।

মণ্টু ও কেয়া আমার পাশ ঘেঁষিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। ষ্টেশনে পৌঁছিতে যখন আর দেরী নাই, তখন কেয়া চুপিচুপি আমার পকেটে হাত দিয়া কি রাখিয়া দিল। জিনিষটি বাহির করিয়া দেখিলাম, একটি ছোট্ট রুমাল, কোণে লাল রেশমী সূতায় কেয়ার নাম লেখা। আমি কেয়ার মাথা টানিয়া আনিয়া কপালে চুম্বন করিলাম।

মণ্টু ম্লানমুখে একটি রং-চটা প্রাচীন লাট্টু আমার হাতে গুঁজিয়া দিল। আমি তাহাদের দু'জনের মুখ কাছে আনিয়া বলিলাম,—'আমি তোমাদের কে জান? আমি তোমাদের মামা।'

একটু অবিশ্বাস ও অনেকখানি আনন্দ চোখে ভরিয়া দু'জনে আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

আমি বলিলাম,—'সত্যি, তোমাদের মা জানেন। বাড়ী গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রো। আর, এবার ছুটি হলে তোমরাও রূপকুমারীর মত মামার বাড়ী যাবে।'

ট্রেণ ছাড়িলে জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেবব্রতকে বলিলাম,—'মাসখানেকের মধ্যে আবার আসছি। কাজটা শেষ হ'ল না।'

দেবব্রত বুঝিল। বাষ্পোজ্জ্বল চোখে একবার ঘাড় নাড়িল।

বার্লিনে ছয় মাস

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

হিন্দুস্থান-হাউস এখানকার ভারতীয়দের আড্ডা। এটি একটি রেস্তরাঁ ও হোটেল, ইহার পরিচালক মিঃ নলিনী গুপ্ত। মিঃ গুপ্ত না কি আগে রেভলিউশনারি দলে ছিলেন, এখন একটি জার্ম্মান মেয়েকে বিবাহ করিয়াছেন ও "হিন্দুস্থান-হাউস"-এর ব্যবসা করিতেছেন। হিন্দুস্থান-হাউস এক রকম মন্দ চলে না, বাহিরে থাকিতে ইহার বেবন্দোবস্ত সম্বন্ধে যেরূপ অপবাদ শুনিয়াছিলাম, আসলে দেখিলাম ইহা তত মন্দ নয়। মিঃ গুপ্ত যথাসাধ্য ভাল ব্যবস্থার চেষ্টাই করেন, তবে রান্নার কথাটা স্বতন্ত্র। আমার তো মনে হইল, মিঃ গুপ্ত বা তাঁহার সহায়কদের কাহারও রান্নার জ্ঞানটা তেমন প্রখর নয়। মিঃ গুপ্তের ব্যবসাটা সম্পূর্ণ এখানকার ভারতীয়দের পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভর করে। অপর পক্ষে এখানকার ও লণ্ডনের চীনা রেস্তরাঁগুলিতে ও লণ্ডনের ভারতীয় রেস্তরাঁগুলিতে অভারতীয় খদ্দের যথেষ্ট হয়। বার্লিনে বহু জার্ম্মানকে সখ করিয়া বিভিন্ন বিদেশীয় রেস্তরাঁয় খাইতে দেখিয়াছি। বুলগেরিয়ান, হাঙ্গেরিয়ান, রাশিয়ান, চীনা, সব রেস্তরাঁতেই দেখিলাম, বিদেশীরা সখ করিয়া ও খুসী হইয়া খাইতে আসে। হিন্দুস্থান-হাউসে লোক না আসিবার কারণ প্রোপাগাণ্ডা ও ব্যবসা-বুদ্ধির অভাব। জার্ম্মানীতে লোকের সব রকম বিদেশী জিনিষের উপর বেজায় ঝোঁক, নাটসি-সরকার হাজার প্রোপাগাণ্ডা করিয়াও ইহা বদলাইতে পারিবেন না। তাহার উপর ওরিয়েণ্টাল, তাহাতে ভারতীয় নামের আকর্ষণ খুব। রেস্তরাঁটি যদি উপযুক্তভাবে সাজাইয়া গুজাইয়া ভালভাবে পরিচালিত হয়, তবে আমার মনে হয়, এখানে অনেক বাহিরের খদ্দের বাড়িতে পারে। সত্যই হ'ক মিথ্যাই হ'ক, বার্লিনবাসী অনেক ভারতীয় সাধারণ্যে কমিউনিষ্ট নামে পরিচিত ছিলেন এবং ইঁহাদের আড্ডা বলিয়া হিন্দুস্থান-হাউসের কমিউনিষ্ট-কেন্দ্র নাম ছিল। এ জন্য নাট্‌সি দলের জয় হইয়া যখন কমিউনিষ্ট ধর্ষণ আরম্ভ হইয়াছিল, তখন নাট্‌সিরাও পুলিশ চড়াও হইয়া এখানকার আড্ডাধারীদের উত্তম-মধ্যম প্রদান ও আসবাবপত্র ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, বহু কারণে হিন্দুস্থান-হাউসের এখানকার ভদ্রসমাজে সুনাম নাই, ভারত সম্বন্ধে আগ্রহ থাকিলেও বিশিষ্ট জার্ম্মান ভদ্রলোকরা এখানে পদার্পণ করিতে চায় না, ভারতীয়দের মধ্যেও অনেকে এ জায়গাটিকে এড়াইয়া চলিতে চায়। বার্লিনে ভারতীয় ইউনিভার্সিটির ছাত্র বেশী নাই, সেজন্য এখানকার তরুণদের ষ্ট্যাণ্ডার্ডটাও তেমন উঁচু নয়।

আর একটি আলোচনাতে হিন্দুস্থান-হাউসকে মুখর থাকিতে দেখা যায়—"অ্যাসোসিয়েশন" লইয়া অহোরাত্র বিবাদ। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা মহাশয়ের উদ্যোগে এখানে "হিন্দুস্থান অ্যাসোসিয়েশন" নামে একটা সমিতি স্থাপিত হয়। কিছুদিন চলিবার পরই এই সমিতির মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ আরম্ভ হইল। স্বদেশ হইতে ছ'হাজার মাইল দূরে মাত্র গুনকতক লোক—তাঁহাদের মধ্যেও "অতীত্য হি গুণান্ সর্ব্বান্ স্বভাবো মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে" প্রকাশ পাইল। সমিতি দুই দলে ভাগ হইয়া পড়িলেন, দুই দলই প্রাধান্য চাহিলেন, উভয়েই সমান নাছোড়বান্দা। ব্যাপার আদালতে গড়াইল, দুই দলের লোকই বলিলেন, আমরা প্রেসিডেণ্ট, আমরা সেক্রেটারি! জার্ম্মান বিচারপতি হাসিয়া খুন, বলিলেন—"তোমরা মাত্র গুটিকত ইয়ংম্যান এত দূরদেশে আসিয়া স্বদেশীয় সমিতি স্থাপন করিয়াছ, আর তাহার কে প্রেসিডেণ্ট, কে সেক্রেটারি, তাহাও সঠিক ধার্য্য হয় নাই!" যাহা হউক, মামলা খারিজ হইয়া সমিতি ভাঙ্গিয়া গেল। তারপর বাজে লোককে বাদ দিয়া শুধু ছাত্ররা মিলিয়া "ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্টস্ অ্যাসোসিয়েশন" স্থাপন করিলেন, কন্‌ষ্টিটিউশন ইত্যাদিও বানান হইল, কিন্তু "অঙ্গারঃ শতধৌতেনাপি মলিনত্বং ন মুঞ্চতি"; প্রায়ই শুনি একজিকুটিভ কমিটি ভাঙ্গিয়া গেল, নূতন সেক্রেটারি নিযুক্ত হইয়া খুব আড়ম্বরে নোটিশাদি জারি করিতেছেন, দুদিন পরেই দেখি আবার মহা গণ্ডগোল, হিসাবের ঠিক নাই, কাজকর্ম্মের খবর নাই, আবার সব ভাঙ্গিয়া পণ্ড হইয়া গেল। লণ্ডনে ও বার্লিনে বঙ্গদেশের বিদেশী ছাত্রদের নিজ

নিজ সমিতি আছে, ঝগড়া-বিবাদও সবের মধ্যেই আছে, কিন্তু বেশীর ভাগ ঝগড়া প্রাচ্যদেশীয় ছাত্রদের সমিতিগুলিতে; কিন্তু তা সত্ত্বেও কাজ সবারই চলে, একা আমরাই আসল লক্ষ্য ও কাজ ভুলিয়া ঝগড়াটাকে প্রধান করিয়া উহা লইয়াই সমস্ত শক্তি ক্ষয় করিয়া ফেলি। স্বগৃহচরিত স্মরণ করিতে করিতে অতঃপর দারুভূত স্থানুবৎ নিশ্চল নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়া থাকা ছাড়া অন্য উপায় আর নাই।

সঙ্গে মিশিতে পারে, কিন্তু নিজেদের বৈশিষ্ট্য হারায় না। উপরন্তু ইহারা একটা উদ্দেশ্য লইয়া এদেশে আসে। সে উদ্দেশ্যটা দেশে ফিরিয়া সাহেব হইয়া স্বদেশীয়দের উপর চা'ল দিয়া জব্দ করা নয়; এদের প্রত্যেকের মন ও ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিটা থাকে নিজের দেশ ও সমাজের উন্নতির দিকে। এরা জানে যে, জাপান ও ইউরোপ বিভিন্ন, ইউরোপ যে বিজ্ঞান বা যে বিদ্যা লইয়া নিজের গর্ব্ব বা অধিকার বিস্তার করে, সেটা

বার্লিন: সাঁ সুসসীর একটি উদ্যান; পশ্চাতে প্রাচীন মিল দেখা যাইতেছে

পৃথিবীর প্রায় সব দেশের ছাত্রদের এদেশে দেখিলাম। কাজ বা স্ফূর্ত্তি বা উভয়ই করে, সব রকমই দেখিলাম। পাশ্চাত্য দেশবাসী অর্থাৎ ইউরোপ-আমেরিকানদের কথা ছাড়িয়া দিয়া প্রাচ্যদেশীয়দের মধ্যে উল্লেখ্য জাপানি ছাত্রেরা। ইহাদের প্রায় প্রত্যেকেই স্বল্পভাষী ও অতি চতুর, বুদ্ধিমান্। অতি-স্মার্ট বা ভ্যাবাগঙ্গারাম প্রায়ই চোখে পড়িল না। ইউরোপীয় সমাজের গতিবিধি আদব-কায়দার প্রতি পুঙ্খানুপুঙ্খের খবর ইহারা রাখে ও সাহেব-সমাজে সম্পূর্ণ সমানভাবে লোকের

আয়ত্ত করিয়া লইয়া গিয়া নিজের দেশের লোকের উন্নতিতে লাগানই তাহাদের কাজ। সুতীক্ষ্ণ ধীমত্তার সঙ্গে এই দ্বৈতবোধের নিদিধ্যাসন ও অতঃপর নিজদেশের উন্নতিরূপ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে তাহার প্রয়োগ হইতেছে জাপানীদের সাধন-মার্গ। সব সাধনারই ফল আছে, আজ তাহার ফলেই সারা শ্বেত-জগতে এত পীতাতঙ্ক। আরও দেখিলাম যে, জাপান হইতে খুব বাছাই করিয়া এদেশে ছাত্র পাঠান হয়। জার্ম্মানী হইতেও ইউরোপ-আমেরিকার অনেক দেশের সঙ্গে "ছাত্র-

বদল" (Student Exchange) করিয়া ছাত্র পাঠান হয়; তাহাতে বিধিমত চেষ্টা করা হয় যে, শুধু সর্ব্বোত্তম চরিত্রের ও যোগ্যতার ছাত্ররাই যাহাতে বিদেশে যাইতে পারে, বিদেশে যাইবার সুযোগ যেন অপদার্থদের হাতে নষ্ট না হয়। বিদেশে যাইবার আগে ছাত্র সে দেশের আগে যে ছাত্রেরা গিয়াছিল, তাহাদের কাছে কিছুদিন শিক্ষানবীশ থাকিয়া সব রকম হাল-চালের খবর যাহাতে পায়, সেজন্যও বন্দোবস্ত আছে। আরও দ্রষ্টব্য যে, সব বিদেশী ছাত্রেরা হাজার দলাদলি, মত ও প্রকৃতি-বৈষম্য সত্ত্বেও নিজেদের মধ্যে সংহতি রাখিবার চেষ্টা করে, কেবল ভারতীয়েরাই নিজেদের একটি ছোট্ট দল বা আড্ডায় নিজেদের সম্পূর্ণ মনে করে, অন্য ভারতীয়দের গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না, দেখা বা পরিচয় করিতে যেন লজ্জা বোধ করে। এ সবের মূল ক্ষুদ্রতা, দুষ্টামি ও ঈর্ষা।

বার্লিনের আর একটি প্রসিদ্ধ রাস্তার নাম কুরফুর্ষ্টেনডাম Kurfurstendamm। এটি বার্লিনের ফ্যাশনেবল পাড়া। রূপ-যৌবন, পোষাক-পরিচ্ছদ, মোটরগাড়ী প্রভৃতি যাহার যাহা কিছু দেখাইবার আছে, তাহা এখানে না দেখাইতে পারিলে লোকের জীবন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কাফে, ক্যাবারে প্রভৃতিও এখানে প্রচুর, সর্ব্বত্রই বিলাসিনীরা বহুতর সংখ্যায় বিরাজমানা, সন্ধ্যা হইতে রাতভোর পর্য্যন্ত পণ্যস্ত্রীরা রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়।

বার্লিন হইতে ইলেকট্রিক সহর-রেলে (ষ্টাট্‌বান্ Stadtbahn সংক্ষেপে 'এস'-বান S-Bahn বলা হয়) প্রায় ঘণ্টাখানেকের পথ পট্‌সডাম Potsdam। এটি একটি ছোট সহর, মিলিটারি ঘাঁটি। আসলে ইহার খ্যাতি কাইজারদের প্রাসাদগুলির জন্য। প্রাসাদগুলি পুরা সাবেকি চালেই রাখা হইয়াছে এবং এখানে দর্শকদের সর্ব্বত্র অবাধ গতি। রাজপ্রাসাদের আসবাবপত্র, ছবি, বই প্রভৃতি আগের অবস্থাতেই দেখা যায়। সরকারি গাইড প্রত্যেক দর্শক দলের সঙ্গে ঘরে ঘরে গিয়া নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় দ্রষ্টব্য ও জ্ঞাতব্য সবই দেখাইয়া বুঝাইয়া দেয়। মার্ব্বেল বা কাঠের সুচিত্রিত মেঝে দর্শকদের জুতার দৈনন্দিন ঘর্ষণে যাহাতে নষ্ট না হয়, সে জন্য প্রত্যেককে জুতার উপর একজোড়া লম্বা পুরু ফেল্টের চটি পরিয়া লইতে হয়। এই চটি পরিয়া পা তুলিয়া হাঁটা যায় না, পা ঘষিয়া ঘষিয়া চলিতে হয়; একদল লোকের সঙ্গে নীরবে ধীরে ধীরে এইরূপ পা ঘষিয়া ঘষিয়া চলিতে মনে হয় যেন একটা অলৌকিক ব্যাপারের মধ্যে আসিয়াছি। গোটা চারেক প্রাসাদের মধ্যে দুটা দেখিলাম। বাকি দুটার এখন প্রাসাদত্ব লোপ পাইয়া অন্য সরকারি বা পাবলিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইতেছে, ইহাদের মধ্যে একটি বিনা প্রয়োজনে লোককে দেখাইবার জন্য বানান হইয়াছিল। "সাত বছরের যুদ্ধে"র (১৭৫৬-১৭৬৩) পর বাহিরের লোকের ধারণা হইয়াছিল যে, এত বিপদের পর নিশ্চয় রাজকোষ শূন্য হইয়া গিয়াছে; ইহাদের মুখ বন্ধ ও জব্দ করিবার জন্য রাজা বড় ফ্রেডারিক (Frederic the Great, জার্মানরা ইঁহাকে আদর করিয়া "বুড়া ফ্রিটস্" der alte Fritz নাম দিয়াছে) রাজকোষের অরিক্ততা দেখাইবার জন্য জাঁক করিয়া এই প্রাসাদটি বানাইয়াছিলেন। সবচেয়ে পুরাতন প্রাসাদটির প্রাচীরের বাহিরে একটা গাছ দেখা যায়, রাজা যে ঘরে বসিয়া কাজ করিতেন সেখান হইতে এই গাছটি দেখা যাইত। রাজদর্শনাকাঙ্ক্ষী সাধারণ লোকে এই গাছের তলায় অপেক্ষা করিত, শেষে বড় ফ্রেডারিক হুকুম দিয়াছিলেন যে, এই গাছের তলায় যে দাঁড়াইবে, তাহাকে নিশ্চয় যেন রাজসমীপে আনা হয়। দরিদ্র বা সাধারণ লোকে কোন কারণে রাজ-সকাশে কিছু আবেদন বা দরবার করিতে হইলে নির্ভয়ে এই গাছের তলায় আসিয়া দাঁড়াইত।

প্রাসাদগুলির মধ্যে সবচেয়ে নূতন ও উল্লেখযোগ্য "সাঁ সুস্‌সী Sans Souci" বা "বীতদুঃখ" প্রাসাদ। একটি অতি বৃহৎ পার্কের মধ্যে একটা পাহাড়ের মাথায় এই প্রাসাদ স্থাপিত; পাহাড়ের গায়ে থাকে-থাকে বাগান। এই প্রাসাদের ভিতরের সাজসজ্জা ও প্রাসাদ হইতে বাহিরের চারিদিকের দৃশ্য অতি মনোরম। প্রাসাদের পিছন দিকে পার্কের শেষ প্রান্তে একটি উইণ্ডমিল (windmill) দেখা যায়। ইহার সম্বন্ধে গল্প আছে যে, বহু অর্থব্যয়ে এই "বীতশোক" প্রাসাদ বানাইয়াও বড় ফ্রেডারিক দেখিলেন যে, বাস্তবিক সব দুঃখ তিনি এড়াইতে পারেন নাই, কারণ ঐ উইণ্ডমিলটির আওয়াজ তাঁহার নিস্তব্ধ শান্তি ভঙ্গ করিত। তিনি মিলওয়ালাকে ডাকাইয়া মিলটি কিনিয়া লইতে চাহিলেন, কিন্তু মিলওয়ালা পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রয় করিতে সম্মত হইল না। রাজা তখন মিলওয়ালাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, তিনি রাজা এবং

মিলওয়ালা বিক্রয় করিতে রাজী না হইলে তিনি জোর করিয়া উহা লইতে পারেন। মিলওয়ালা উত্তর দিল যে, রাজাও যেন না ভুলেন যে, দেশে বিচার এবং বিচারালয় আছে, রাজা জোর করিয়া লইলে সে আদালতে যাইবে। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার বিরুদ্ধে মামলা করিলে কোন হাকিম সে আর্জি গ্রহণ করিবেন বলিয়া তোমার মনে হয়?" মিলওয়ালা বলিল, তাহার বিশ্বাস যে হাকিম শুধু আর্জি গ্রহণই নয়, পূর্ণ সুবিচার করিয়া তাহাকে তাহার মিল ফিরাইয়াও দিবেন! দেশের সুবিচারের উপর দরিদ্রের এই সরল বিশ্বাসের সম্মান রাজা রাখিয়াছিলেন, মিল এখনও স্বস্থানে দণ্ডায়মান আছে।

বার্লিন: সাঁ সুসী (উপবনের মধ্যে)।

বার্লিনের আন্তর্জাতিক মোটর-প্রদর্শনী দেখিলাম। সঙ্গী ছিলেন একটি ইঞ্জিনিয়ার জার্মান বন্ধু, যন্ত্রপাতির বহু ঘোর-প্যাঁচ ব্যাখ্যা করিলেন, খুব যে বুঝিলাম তা নয়। দ্রষ্টব্যের মধ্যে ভাল লাগিল নানা রকমের বৃহদাকার রেল-মোটর ও মোটর-বাসগুলি। দুই হইতে ছয় সীটার গাড়ী অনেক দেশের অনেক রকম দেখা গেল। সস্তার মধ্যে দেখিলাম বিখ্যাত DKW কোম্পানীর মোটর বাইক, দাম মাত্র ৩১৬ টাকা। কোম্পানীর লোকের কাছে ইঞ্জিনের খবরাদি লইয়া বন্ধুটি জানাইলেন যে, এই বাইক সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য, অতিবেগে অর্থাৎ ঘণ্টায় ৩০।৪০ মাইলের বেশী দৌড়িতে পারে না, তা ছাড়া অন্য সব গুণ আছে। জার্মানীতে ইদানীং দেশব্যাপী সুপ্রশস্ত পাকা সিমেণ্টের মত মোটর-রাস্তা বানান হইতেছে। মিলিটারি প্রয়োজনই ইহার প্রধান কারণ, উপরন্তু বহু বেকার লোক ইহাতে খাটিতে পারিয়াছে এবং বিদেশী ভ্রমণ-বিলাসীদেরও আকর্ষণ করিয়া দেশের অর্থার্জ্জনের একটা পথ করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের হুকুমে বড় বড় কোম্পানি মিলিয়া সাধারণ লোকের জন্য নির্ভরযোগ্য, স্থায়ী অথচ হাজার টাকা দামের মধ্যে পাওয়া যায়, এমন চার সীটার মোটরগাড়ী প্রস্তুতের আয়োজনে ব্যাপৃত আছেন।

জার্ম্মানীতে বড় বড় সহরগুলিতে সদাই একটা না একটা প্রদর্শনী লাগিয়া আছে। সে দিন হামবুর্গে কৃষি-প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে সারাদেশ হইতে চাষীরা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল; রাস্তা-ঘাট, রেস্তর্াঁ, কাফেতে তিলার্দ্ধ জায়গা ছিল না। ইটালির দেখাদেখি জার্ম্মান গভর্ণমেণ্টও এই সব প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে রেল-ভাড়া অর্দ্ধেকেরও বেশী কমাইয়া দেন। আর একটা নূতন জিনিষ জার্ম্মান গবর্ণমেণ্ট আরম্ভ করিয়াছেন, "আনন্দের মধ্য দিয়া শক্তি" ক্রোফট্ ডুর্খ ফ্রয়ডে, Kroft durch Freude, ইংরেজিতে Strength through Joy। ইহাতে জনসাধারণের জন্য অতি সস্তায় নানা রকম আমোদ-প্রমোদ, গান-বাজনা, রেলে ষ্টিমারে বাসে ভ্রমণ প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ক্যাপিটালিষ্টিক সমাজে সব জিনিসের জন্যই দাম দিতে হয়, উপরন্তু দামের মাত্রা এমন যে, শুধু ধনীর পক্ষেই তাহা দেওয়া সম্ভব; লোকের আনন্দ বা উপকার বা শিক্ষাটা গৌণ জিনিষ, ক্যাপিটালিষ্টরা সর্ব্বত্র আধিপত্য করিয়া নিজেদের লাভটাকেই মুখ্য করিয়াছে। ইহার পরিবর্ত্তে সোসালিষ্টিক ব্যবস্থায় লাভের মাত্রা অল্প রাখিয়া জনসাধারণের কল্যাণকেই মুখ্য করার চেষ্টা হয়। ভ্রমণটা এদেশে দরিদ্রের বা সাধারণ অবস্থার লোকের পক্ষে দুষ্কর ছিল, এখন মধ্যে মধ্যে নামমাত্র ভাড়ায় স্পেশাল ট্রেনে দলে দলে লোক ভ্রমণের দ্বারা আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করে।

একটি জার্ম্মান উকিল বন্ধুর সঙ্গে বার্লিনের হাইকোর্টে

একজন কমিউনিষ্ট আসামীর বিচার দেখিলাম। জজের সঙ্গে ছয়জন জুরী বসিয়া ছিলেন, ইঁহারাও জজের মত গাউন পরিয়া জজের দু'পাশে সম আসনে আসীন ছিলেন। বিলাতী প্রথায় কিন্তু জুরীদের সংখ্যা অযুগ্ম হয়, তাঁহারা গাউন পরিতে পারেন না এবং বসেনও স্বতন্ত্র জায়গায়। এখানে সরকারি উকিল জজের সামনে বাঁ'দিকে বসেন ও আসামীর উকিল জজের সামনে ডানদিকে আসামীর কাঠগড়া ঘেঁসিয়া বসেন, এ ব্যবস্থাও বিলাতের চেয়ে বিভিন্ন। বিলাতী তথা ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের সঙ্গে জার্ম্মান (ও ফরাসী) আইনের একটা মৌলিক পার্থক্য এই যে, বিলাতী আইনের চক্ষে আসামীকে নিরপরাধ ধরিয়া লইয়া বিচার আরম্ভ হয় এবং অপরাধ প্রমাণের সম্পূর্ণ ভার সরকার বা বাদীর উপর থাকে; আসামী সম্পূর্ণ নির্ব্বাক্ থাকিয়া নিজের নির্দ্দোষিতার কোন প্রমাণ না দিয়া শুধু বাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণের অসম্পূর্ণতা বা অযৌক্তিকতা দেখাইয়া বেকসুর খালাস পাইতে পারে। বিচারকও বাদীর সাক্ষ্য নিঃসন্দেহে সপ্রমাণ না হইলে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করেন না। জার্ম্মান-ফরাসী আইনে কিন্তু আসামীকে প্রথম হইতে আইনের চক্ষে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া লওয়া হয় এবং আসামীকে নিজ সাক্ষ্য-প্রমাণ দিয়া নিজের নির্দ্দোষত্ব প্রমাণ করিতে হয়। মোটের উপর ফল একই দাঁড়ায়, অর্থাৎ অপরাধীর অব্যাহতি বা নিরপরাধের শাস্তি উভয়ই সচরাচর ঘটে না, ক্রিয়াবিধি বা procedure-এ বিভিন্নতাটা বেশ স্পষ্ট হয়। বিলাতী আইনে আসামী উপযাচক হইয়া কিছু না বলিলে সে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নহে, কন্টিনেন্টে কিন্তু জজেরা আসামীকে ক্রমাগত বাদীর সাক্ষ্যের উপর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন।

একদিন ইউনিভার্সিটির লাউট্‌ফোরশুং ইনষ্টিটুট (Lautforschung Institut বা ধ্বনিতত্ত্বানুশীলন বিভাগ) হইতে একটি মহিলা-ছাত্রী চিঠি লিখিলেন যে, তিনি ভারতীয় বর্ণমালার কয়েকটি অক্ষরের শুদ্ধ উচ্চারণ শুনিতে চান। ঘ, ধ, ঝ, ভ, ঢ প্রভৃতি কয়েকটি অক্ষরের উচ্চারণ শুনাইলাম। পরে মহিলা বলিলেন যে, বিভাগীয় প্রোফেসার আমাকে ডাকিয়াছেন, আমি যদি যাই তবে তাঁহারা উপকৃত হইবেন। প্রোফেসারের সঙ্গে ল্যাবরেটরিতে দেখা করিলাম। প্রোফেসার আমার গলায় কণ্ঠনালীর কাছে একটা যন্ত্র লাগাইয়া ঐ অক্ষরগুলি উচ্চারণ করিতে বলিলেন, যন্ত্রের অপর প্রান্তে একটা সিলিণ্ডার ঘুরিতে ছিল, উচ্চারণের সময়ের কণ্ঠনালীর কম্পন যন্ত্রযোগে বাহিত হইয়া সিলিণ্ডার-সংযুক্ত একটি নীড্‌ল্‌কে কাঁপাইয়া ঘূর্ণ্যমান সিলিণ্ডারের গায়ে অতি সূক্ষ্ম রেখাপাত করিতেছিল। ম্যাগ্‌নিফাইং কাঁচে এই রেখা পরীক্ষা করিয়া বোর্ডে হিজিবিজি আঁকিয়া প্রোফেসার ছাত্রদের কাছে অনেক ধ্বনিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলেন। হামবুর্গের দক্ষিণ-আফ্রিকান্ ভাষানিচয়ের অধ্যাপকও একবার ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সেবার বর্ণমালার উচ্চারণ, এক-দুই-তিন গোণা, কুমারসম্ভবের প্রথম শ্লোক ও রবীন্দ্রনাথের এক ছত্র ক্লাসকে শুনাইতে হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি ছাত্রেরা ফোনেটিক সঙ্কেতে লিখিয়া লইয়া সঙ্গে সঙ্গে পুনরাবৃত্তি করিয়াছিল এবং তাহাদের উচ্চারণ প্রায় বাঙ্গালীর মতই হইয়াছিল। অতঃপর বার্লিনের প্রোফেসার প্রস্তাব করিলেন যে, আমার মুখ হইতে ঐ অক্ষরগুলি সংযুক্ত কয়েকটি শব্দের ও কথিত বাংলার তাঁহারা গ্রামোফোন-রেকর্ড বানাইবেন এবং আমাকে সেজন্য পারিশ্রমিকও দেওয়া হইবে। ল্যাবরেটরির আর একটি ঘরে গিয়া মাইক্রোফোনের সামনে কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ ও ঢেংকানালের জঙ্গলে জ্যান্ত বাঘ দেখার একটা বৃত্তান্ত বাংলায় বলিলাম। সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘরে একটা দুপিঠ রেকর্ড বানান হইয়া গেল। সেই রেকর্ড তন্মুহূর্ত্তেই আবার গ্রামোফোনে চড়াইয়া লাউড-স্পীকারের সাহায্যে আমাকে শুনান হইল। শ্রোতারা বলিলেন, বেশ স্পষ্ট রেকর্ড হইয়াছে, আমার কিন্তু নিজের কানে উচ্চস্বরে নিজের গলার আওয়াজ শুনিতে অতি অদ্ভুত ও অপরিচিত বোধ হইল। ইনষ্টিটুটের অফিস-ঘরে দেওয়ালে দেখিলাম, মাইক্রোফোনের সামনে রবীন্দ্রনাথের ফটো রহিয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলে রেকর্ড-নির্ম্মাতা বুড়া ল্যাবরেটরি-অ্যাসিষ্টান্ট সোৎসাহে জানাইলেন, তিনি রবীন্দ্রনাথের গলার রেকর্ডও বানাইয়া-

বার্লিন : বিস্‌মার্ক মূর্ত্তি ও বিজয়-স্তম্ভ।

ছেন। মহিলা-ছাত্রীটি বলিলেন, রবীন্দ্রনাথ যখন ইউনিভার-সিটিতে বক্তৃতা করিতে আসেন, তখন তিনি উৎসাহের উত্তেজনায় রবীন্দ্রনাথের মোটরের পাদানিতে চড়িয়া অনেক দূর চেঁচাইতে চেঁচাইতে গিয়াছিলেন।

নাদ-ধ্বনি-ঘটিত আর একটা ব্যাপারে জড়িত হইতে হইয়াছিল। ডাঃ ব্যানার্জি একদিন বলিলেন International Himalayan Expedition-এর কর্ত্তারা যে ফিল্‌ম্ তুলিয়াছিলেন, তাহাতে এখানে বাক্‌-সংযোগ করা হইতেছে। সুইস্ প্রোফেসার ডুারেনফুর্ট Dyhrenfurth এই এক্‌স্‌পিডিশনের নেতা ছিলেন, তাঁর স্ত্রীও সঙ্গে ছিলেন। ইংরেজ, ইটালিয়ান, আমেরিকান, জার্ম্মান, সুইস্ প্রভৃতি অনেকে ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন। ফিল্‌ম্ তৈরির জন্য পেশাদার অ্যাকটারও কয়েকজন সঙ্গে লওয়া হইয়াছিল। প্রোফেসার ডুারেনফুর্ট নিজে ফিল্‌মে প্লে করিয়াছেন ও তাঁহার স্ত্রীর পার্ট প্লে করিয়াছিলেন একজন আমেরিকান পেশাদারিণী। প্রধান পার্টটি প্লে করিয়াছিলেন ডিসেল Diessel নামক একজন নামজাদা জার্ম্মান পেশাদার। ফিল্‌ম ভারতেই তোলা হইয়াছিল, এখানে শুধু স্বরসংযোগ হইতেছে। ডাঃ ব্যানার্জ্জি বলিলেন, ষ্টুডিওতে ফিল্‌মটি দেখিয়া মতামত জানাইবার জন্য প্রোফেসার ডুারেনফুর্ট নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। দেখিয়া মনে হইল, মন্দ হয় নাই। পরে প্রোফেসার ও তাঁহার পত্নী তাঁহাদের হোটেলে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রস্তাব করিলেন, বাক্‌সংযোগে কিছু সাহায্য করিতে পারি কি না। এ সম্পর্কে যাহা বলিবার তাহার পর প্রস্তাব হইল, বাস্তবিকই কিছু গলার আওয়াজ দিতে পারি কি না। ডাঃ ব্যানার্জি, ভট্ট-ভারদ্বাজ, স্বামী বন* ও আমি ভাগাভাগি করিয়া দোভাষী, তিব্বতী লামা, পাহাড়ী কুলি, দোকানদার প্রভৃতির পার্টগুলিতে আওয়াজ দান করিলাম। বার্লিন সহরের প্রায় কুড়ি মাইল দূরে ষ্টুডিও, প্রকাণ্ড কারখানা, সঙ্গে হোটেলও আছে। কোম্পানির মোটরে যাতায়াত করিতাম, সারাদিন সেখানে কাটাইতে হইত, খাওয়া-দাওয়া, চা-কফি-ওয়াইন-সিগারেট সব কোম্পানীর খরচায়, উপরন্তু বেশ মোটা দৈনিক পারিশ্রমিক! ষ্টুডিওর একটি ঘরে ছবি দেখান হইত ও সেখানে মাইক্রোফোন ছিল, পাশের ঘরে নানারূপ যন্ত্রপাতি কানে লাগাইয়া লোক টোন-মেশিনের সামনে বসিয়া থাকিত। আমাদের ছবিটা বার বার দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে ডিরেকটারের নির্দ্দেশমত কথা বলিতে হইত, এটা সম্পূর্ণ দোরস্ত হইলে তবে মাইক্রোফোনের সামনে আবার আবৃত্তি করিতে হইত, কোন জায়গায় একটু বেশ-কম হইলেই যন্ত্রঘর হইতে ডিরেক্টার ছুটিয়া আসিয়া আবার নির্দ্দেশ দিতেন, আবার আওড়াইতে হইত, বহুবার এরূপ করিবার পর শেষে অব্যাহতি পাইতাম। টোন-টেক্‌নিকের অনেক মজাও দেখিলাম। ছবি তোলা ব্যাপারে যেমন ক্যামেরা ও ষ্টুডিওর সাহায্যে অনেক নকলকে আসল বলিয়া চালান হয়, শব্দ-ব্যাপারেও তেমনি অনেক জুয়াচুরি চলে। এক্‌স্‌পিডিশনের লোক জাহাজে ভারত অভিমুখে চলিয়াছেন, জাহাজের ডেকের আড্ডা গল্প, নাচগান প্রভৃতির ছবি দেখান হইল; সেই সঙ্গে চলন্ত জাহাজের শব্দ দেওয়া হইল এই ভাবে—একজন লোক কাঠের ভারি হাতুড়িতে ন্যাকড়া জড়াইয়া মাইক্রোফোনের কাছে একটা প্রকাণ্ড পিতলের ঘণ্টার গায়ে দ্রুত মৃদু আঘাত করিয়া লঘু 'রিন্‌ন্' রকমের একটা আওয়াজ করিয়া যাইতে লাগিলেন, আর একজন একটা কাঠের বাক্‌সে ন্যাকড়া-জড়ান হাতুড়ি মারিয়া অবিরাম ধপ-ধপ-ধপ আওয়াজ করিয়া যাইতে লাগিলেন, দুইএ মিলিয়া পরে ফিল্‌মে চমৎকার ইঞ্জিন চলিবার আওয়াজ প্রস্তুত হইল। বরফের উপর বুট জুতা পায়ে লোক চলিতেছে ছবিতে আছে, তাহার আওয়াজ দিতে হইবে। একজন হাতে একটা আলুর ময়দা ভরা ছোট কাপড়ের থলি মাইক্রোফোনের একেবারে মুখের কাছে ধরিয়া ছবির চলন্ত লোকটির প্রতি পদক্ষেপে থলি টিপিয়া কচ্ কচ্ আওয়াজ করিয়া যাইতে লাগিলেন, ফলে ফিল্‌মে যে আওয়াজ শুনা গেল, তা আমরা শীতকালে এদেশে পথে চলিতে প্রত্যহই শুনি। আমেরিকান অভিনেত্রীটি বিবাহিতা, কিন্তু যেখানেই বসুন, বসিতেন অবিবাহিত জার্ম্মান অভিনেতা ডিসেলের গলা জড়াইয়া ধরিয়া। আর একটি অভিনেত্রী ক্যান্‌টিনে ঢুকিয়াই পুরুষ অভিনেতাদের কাছে আগাইয়া আসিতেন শরীরটি নানারূপ আঁকাইয়া বাঁকাইয়া ও মুখে ছাগলের মত ব্যা ব্যা শব্দ করিতে করিতে। এইরূপ "হলিউড"-জীবনের রকম-সকম অনেক দেখা গেল দিন কয়েক।

* ইনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একজন যুবক সন্ন্যাসী ধর্ম্মপ্রচারক। ইঁহারা এদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের আয়োজনে আছেন। ইঁহার নামের অর্থ কি জানি না, লেখেন Swami Bon, (ইহা কি 'বনমালী'র সংক্ষিপ্ত রূপ?)

নিশি-মালঞ্চ

—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশের তারার মত মালঞ্চে মোর
ফুটল যারা সন্ধ্যা-তিমির ভ'রে —
ভোর না হ'তেই পড়বে ঝরে' ঝরে'।
ওদিকে ওই শিউলী ফুলের ঝাড়
চিক্‌মিকিয়ে জ্বালল আলো তার,
যূথাবনের শ্যামল অন্ধকার
ফুল-তারকার আলোয় গেল সরে'—
একটু খানি তরল হ'ল ও রে।

ফুটেছে কামিনী ফুল মালঞ্চে মোর
হাস্‌নুহানা আর রজনীগন্ধা,
সাগর-পারের ক্যাক্টাস্ কাকবন্ধ্যা।
সন্ধ্যামণির পাপড়ি খুলে যায়
সাঁঝের পিদিম সেই বুঝি দেখায়,
মল্লিকা ফুল মুখটি তুলে চায়
আকাশে তার কৈ নিরমল চন্দা!
আজকে কি গো অমানিশির সন্ধ্যা?

রজনী ঘনিয়ে আসে মালঞ্চে মোর
বাসর জাগে রাত-জাগুনি বেলি,
কুমুদ করে একলা জলকেলি।
ভোমরা ঘুমায় কমলিনীর বুকে
মৌমাছিরা বেড়ায় না ফুল শুঁকে
প্রজাপতি ওড়ে না কৌতুকে
রামধনু-রং হাল্‌কা পাখা মেলি;
রসিক বঁধু সবাই গেছে ফেলি'।

নিশুতি নিশীথ রাতি, মালঞ্চে মোর
ফুল-বধূরা করছে কানাকানি—
কি কথা কয় কেমন ক'রে জানি!
নিশি-পবন চোরের মত আসে
ঘুরে বেড়ায় তাদের আশে পাশে—
জানতে যেন চায়—কারা ঐ হাসে
ঠোঁটের 'পরে রেখে আঙুলখানি,
শুনবে যেন তাদের গুণ্‌গুণানি।

আঁধারে মুখ লুকায়ে মালঞ্চে মোর
মুখচোরা সব লাজুক ফুলের দল
ঘোমটা-আড়ে চায় দিঠি-চঞ্চল।
সরম-ভীরু মরম খুলে তারা
জানে না যে রসালাপের ধারা,
অন্ধকারে গোপনে হয় হারা
প্রাণের মধু হাসির পরিমল
সরমভরা নরম আঁখির ছল!

জোনাকির চোখের আলো মালঞ্চে মোর
যখের মত পাহারা দেয় খালি—
ক্ষণেক তরে মুছায় অমা-কালি।
সেই জানে গো সেই জানে সব কথা
আমার ফুলের নিবিড় যত ব্যথা
শঙ্কা-ঢাকা প্রাণের ব্যাকুলতা
সেই জেনেছে প্রাণের শিখা জ্বালি'
অমানিশির অরূপ সে-দীপালি।

প্রভাতের আলো যখন মালঞ্চে মোর
পড়বে এসে নবীন রবিকরে—
ফুলগুলি মোর পড়বে ঝরে' ঝরে'।
সূর্য্যমুখী নয় যে তারা নয়
নয় রে চাঁপা নয় রে কুবলয়;
আলোয় তারা নয়ন মুদে রয়
কিংবা করুণ পাতার মর-মরে
তরুমূলে লুটায় থরে থরে।

একটি মনোরম তীর্থ

—শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

অনেক দিন ধরিয়া অনেক দেশেই ঘুরিয়াছি। অনেক অনেক গিরি-অধিত্যকায়, অনেক ঝর্ণাতলার নির্জ্জনতায়, আমার জীবনের অনেক প্রভাত, অনেক সন্ধ্যা, আনন্দেই কাটিয়াছে। দেশ হতে দেশে, গ্রাম হতে গ্রামে ঘুরিতে ঘুরিতে অকস্মাৎ একদিন আসিয়া পড়ি বরাকরের তটভূমিতে, অরুণোদয়ের পূর্ব্বক্ষণে। পশ্চিমের নদী সেখানে দক্ষিণবাহিনী, পাহাড়ের পর পাহাড় দুই তীরে চলিয়া গেছে, ঘন শালতরুশ্রেণী আরণ্যশোভায় রমণীয়, দূরে দেখা গেল, হেমন্তের অপসরয়মাণ কুজ্ঝটিকার অন্তরালে শুভ্র এক মন্দির-চূড়া, শোনা গেল উপলপথে অদৃশ্য নির্ঝরকলধ্বনি।

বঙ্কিমের অনন্যুকরণীয় উপন্যাসপাঠের অনুভূতি লইয়া সেই প্রথম আমি ৺কল্যাণেশ্বরীর পীঠভূমি দেখি। বনচ্ছায়ায় চাল্‌নানদীর উচ্ছ্বসিত কল্লোলের মৃদু সঙ্গীতমুখরিত পাষাণ-ভিত্তি সেই দেউলের শীর্ষে কাঞ্চনের লাবণ্য—দূরে তরঙ্গিত উষরভূমি,—আরো দূরে, বরাকরব্রীজের পরপারে, হেমপ্রভ বালুকিনারায়, রূপালি নদীর বক্রগতি,—আরো দূরে, অসংখ্য কোলিয়ারীর চিমনি ও মানভূম ও সাঁওতালপরগণার দিগঞ্চল, আধুনিক বাঙলার সীমারেখায় বসিয়া দেখিতে দেখিতে সোনার বরণ রৌদ্র উঠিল, কিন্তু ছবি মুছিল না,……

…অনুভূতির দশ বৎসর পরে আপনাদের উপহার দিলাম।

ভাল লাগিল,—এমনি ভাল লাগিল যে, এই রমণীয় তীর্থক্ষেত্রের কাছাকাছি কোথাও একটা আস্তানা বাঁধিবার বাসনা মনে জাগিল। ৺মাকে জানাইলাম,—রাজা বল্লাল সেন যাঁর অর্চ্চনা করিয়া গিয়াছেন, একদা-স্বাধীন পঞ্চকোটের রাজন্যগণ আবহমানকাল যাঁর সেবায়েৎ, দরিদ্রের অভিপ্রায়ে তাঁহাকে আহ্বান করিবার প্রয়োজন ছিল, কারণ কাছাকাছি জমি সংগ্রহ করিয়া বাস করা, ইচ্ছা থাকিলেই হয় না, কত রকম যে বাধাবিপত্তি উঠিতে পারে, একদিন গল্পচ্ছলে সে কথা প্রকাশ করিব, কারণ তা কথিকার মতই বিচিত্র, ঘটনা-পরম্পরায় প্রচার করিয়া দিলে বহুজনের মানহানির সম্ভাবনা আছে, সকলের খেসারৎ দিয়া উঠিতে [illegible]রিব না।

মাইল চারেক দূরে শালানপুরে "শুধু বিঘা দুই হ'ল মোর ভুঁই।"

অসংখ্য বিঘ্ন আসিল এবং দূর হইয়া গেল যাঁহার প্রসাদে, তাঁহারই নাম স্মরণ করিয়া বাঙলায় বাড়ীর নাম রাখিলাম —"কল্যাণকুটির"।

দেবীদর্শনে আর অসুবিধা রহিল না।

যখনই শালানপুরে যাই, উপবাস করিয়া পূজা দিতে, বন্ধুদের লইয়া বেড়াইয়া আসিতে, আত্মীয়দের লইয়া পিক্‌নিক করিতে, ৺কল্যাণেশ্বরীতে গিয়াছি অসংখ্যবার। স্থানীয় লোকে বলে, 'মায়ের থান'! মায়ের থানের নাম শুনিলে ভক্তিতে গদ্‌গদ হয় না, এমন থানও আমার চোখে পড়ে নাই।

কখনও গিয়াছি, মেলা বসিয়াছে, কুলটি, কুমারডুবি হইতে অসংখ্য দোকানী আসিয়া দোকান খুলিয়াছে, জাপানী খেলনার, দেশী রঙীন চুড়ীর, বোম্বায়ের শস্তা রঙীন শাড়ীর। ম্যাজিকের সাদা তাঁবু পড়িয়াছে, নাগরদোলা ঘুরিতেছে, তেলেভাজার-গন্ধে চারিদিক ভরপুর। খোঁপায় ফুল গুঁজিয়া সাঁওতালী মেয়েরা আসিয়াছে, আসিয়াছে বিলাসপুরীয়া নীলচক্ষু ও কটা চামড়ার সৌন্দর্য্যে। স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্ত্তি, সিংভূমের লোক আসিয়াছে বাঁশী কিনিতে, কোলিয়ারীর বাবুরা আসিয়াছে, মাৎলামি করিয়া অপরিসর পথে তরুণীর ঘাড়ে পড়িতে। বাস চলিয়াছে বুনোলোকের ভিড় ঠেলিয়া, ট্যাক্সি আসিয়াছে আসানসোল, ধানবাদ, এগারকুণ্ড, চিরকুণ্ডা, বাঁশ-জোড়া হইতে,গরুর গাড়ীতে আসিয়াছে যাত্রীদল, দূর দূর গ্রাম হইতে। মাত্র এক বেলার জন্য, পার্ব্বত্য বনভূমি সচকিত করিতে মেলা বসে, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হইবার আগে, বাঘের ভয়ে, অস্থায়ী নগরী তার শোভাসম্পদ লইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

কখনও গিয়াছি, দেখি অগণিত পূজার্থীর অসংখ্য ছাগ-শিশু বাঁধা, বলির অপেক্ষায়। কাহাদের কবেকার মানৎ করা ছিল। বলি দেখি নাই, শুনি নাই অসহায় জীবের

আর্ত্তনাদ। তার চেয়ে ভাল লাগিয়াছে, চাল্‌নার ওপারে ঘন অরণ্যসমাকীর্ণ পাহাড়টির বিকালের আলোয় শ্যামগম্ভীর ছবি।

কখনও,—কেহ নাই, কিছু নাই। একটি পূজারী এবং একটি পূজারিণী। বনফুলে মৃদুগন্ধ, কাননের করুণ মায়া।

মোটরের গতিবেগে পনর মিনিটের মধ্যে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া কখনও গিয়াছি। আবার কখনও গিয়াছি, ছাউনী-ঢাকা গরুর গাড়ীর শ্লথ অভিযানে, প্রতি কুটিরের আঙিনাটি দেখিতে দেখিতে, পথের পাশের প্রতি তরু-তলচ্ছায়া সেবন করিয়া, প্রতি উপল-খণ্ড, প্রতি বনকুসুমের স্নিগ্ধ স্মৃতি লইয়া। মেঘ ও রৌদ্রে শস্যসম্ভারের উপর যে বর্ণ-বৈচিত্র্যের খেলা চলিয়াছে, পথিক-বধূর গতিভঙ্গিমায় যে লাবণ্য ঝলসিয়া উঠিয়াছে, গিরিমালার তরঙ্গায়িত মিলনে যে বিরাটের ছবি জাগিয়াছে, অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া বসিয়া উপভোগ করিয়া ক্লান্ত বেলা-শেষে পথপ্রান্তে পৌঁছিয়াছি। 'ডবলডেকারের' দেশের লোক আমরা, গোযানের জন্য স্বভাবতঃই মন কাঙাল হইয়া ওঠে। একথা কিন্তু ও অঞ্চলের লোক বিশ্বাস করিতেই চায় না। বলে পয়সা বাঁচাইবার কৈফিয়ৎ, নহিলে গরুর গাড়ী আবার কারুর ভাল লাগে! কেহ কখনও শুনিয়াছে সে কথা!

শালানপুর: বিভিন্ন দৃশ্য।

কাহিনী আছে, মা একদিন এখানে শাঁখারীকে ডাকিয়া শাঁখা পরিতে চাহিয়াছিলেন, দাম লইতে বলিয়াছিলেন, শবনপুর গ্রামের এক দেওঘরিয়ার কাছে। দেওঘরিয়া শাঁখারীর কথা বিশ্বাস করে নাই, বিজন অরণ্যে কোন্ কুমারী তাহাকে পিতৃ-পরিচয়ে অভিহিত করিয়া শাঁখারীকে শাঁখার দাম দিতে বলিবে! বনের মাঝে গিয়া শাঁখারী মেয়েটিকে খুঁজিয়া না পাইয়া মুস্কিলে পড়িল। ভক্ত-বৎসল মাতৃহৃদয় আর গোপন রহিল না, শাঁখাপরা দুখানি অনিন্দ্যসুন্দর করপদ্ম চাল্‌নার জলে ভাসিয়া উঠিতে দেখা গেল। এই মন্দিরনির্ম্মাণের মূলকথা। এমনি অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে, তুমি অহিন্দু কিংবা নাস্তিক, বিশ্বাস করিতে না পার, ক্ষতি নাই, কিন্তু আমি হিন্দু-সন্তান, সমস্ত সংস্কার আমার কাছে সুসংস্কার, এ সমস্ত বিশ্বাস করিয়া আমি আনন্দ পাই, গায়ে আমার কাঁটা দিয়া ওঠে।

৺মায়ের মূর্ত্তি আছে গালা-ঢাকা। এক সন্ন্যাসী ভাঙিয়া দেখিতে গিয়া সর্পদংশনে মারা যায়। তারও সমাধি আছে অঙ্গনের একধারে। মর্ম্মরপ্রস্তরের আঙিনাটি, দুর্গের মত কঠিন প্রস্তর-প্রাচীরে ঘেরা, ফুলদল ও ধূপসুরভিতে সমাচ্ছন্ন। পূজা সুরু হইতে বেলা একটা বাজে। রাত্রে জনমানব কেহ

থাকে না। নদীর দিকে দীর্ঘ সোপানশ্রেণী পার হইয়া কাকচক্ষু জলপ্রান্তে পৌঁছানো যায়, দেবী সেখানে কবে তাঁর ভক্তবাঞ্ছিত পদযুগল রাখিয়াছিলেন, শিল্পী তা-ই পৃথক্ এক মন্দিরবেদীতে শ্রদ্ধায় স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

বর্ষায় নদী কূলে কূলে উছলিয়া ওঠে, ক্রমনিম্ন প্রস্তরের স্তরে স্তরে প্রতিহত স্রোতোবেগ ফেণপুঞ্জ ও জলকণা ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করে, দুই তীরের অরণ্যমর্ম্মরে আর্দ্র পূবালী হাওয়ার আছাড় খাওয়ার শব্দ শোনা যায়, ঝটিকাবিক্ষুব্ধ অন্ধকার দিবসেও কল্যাণেশ্বরীর পূজা বন্ধ যায় না।

যেদিন শ্রীমতী রুচিরা দেবী—আমার সুগৃহিণী সঙ্গে থাকেন, সেদিন ষোড়শোপচারে খাওয়ার আয়োজন চলে, তাঁহার কবিতা (নিজের কবিখ্যাতি নষ্ট হইবার ভয়ে যা আমি প্রকাশ করিতে নারাজ) সঙ্কীর্ণ অরণ্যপথের বনজ্যোৎস্নায় গুঞ্জরিত হয়, সেদিন আরো দূরে যাইতে হয়, গ্রাম পার হইয়া, শস্যক্ষেত্র পার হইয়া, পাহাড়ের কোল ঘেঁসিয়া, নিভৃত নির্জ্জন সাধুর আশ্রমে। সাধু থাকেন না, গভীরতর বনের মধ্যে চলিয়া যান, ছোট ঘরখানি তালা বন্ধ থাকে, কমণ্ডলু ও চিম্‌টা বাহিরে পড়িয়া থাকে, জানালা দিয়া দেখা যায় বার্লীর ও চায়ের কৌটা, হারিকেন লণ্ঠন, ষ্টোভ। বাঁধানো কূপের জলে মিষ্টতার অবধি নাই, ফুলের বাগানে ফুল ও লঙ্কাগাছে গুচ্ছগুচ্ছ লঙ্কা থাকে। আর একটা শুঁড়িপথ গহন বনের দিকে চলিয়া গেছে, সেখানে তান্ত্রিকের আসন আছে, সাপের মত বাঁকানো নিমগাছতলায়! দেয়ালে দেবীর ছবি বাঁধানো, ধূপদানী, কোশাকুশি, পঞ্চপ্রদীপ। দরজা খোলাই থাকে। ডাকিলেও কাহাকে পাওয়া যায় না। সামনের গভীর জঙ্গলময় পাহাড় হইতে বাঘের ডাক শুনিতে পাওয়া আশ্চর্য্য নয়, কোন দিন বা লতাগুল্ম ঠেলিয়া হঠাৎ সাধু আসেন এবং সন্তানের শ্রদ্ধায় মুখের দিকে চাহিয়া কুশলপ্রশ্ন করেন। তাঁহার বহু শিষ্য আছে, কিন্তু এমনই অমায়িক এমনই বিনীত—যে, সে রকম সাধু হৃষীকেশে, কামাখ্যায়ও দেখি নাই।

আর দেবীর স্থানের এমনি মাহাত্ম্য যে, জামা কাপড়, টাকাকড়ি চারিদিকে ছড়াইয়া রাখিয়াছি, পিকনিক পার্টির হুল্লোড়ে গাড়ীতে উঠিবার আগে মনে পড়ে নাই, কিন্তু কখনও কোন জিনিস হারায় নাই। কত লোক আসিয়াছে, গিয়াছে, দেয়ালের কাছে লোকচক্ষুর সামনে আমার প্রায় কুড়ি টাকা ভরা মনিব্যাগ ছিল, কেহ স্পর্শও করে নাই। জামা যেখানে ফেলিয়া আসিয়াছিলাম, সে এক মহানির্জ্জন জায়গা, রাখাল গরুর পাল লইয়া চলিয়া গেছে, জেলেরা মাছ ধরিয়া ফিরিয়াছে, দেখিয়াছে নিশ্চয়ই, কিন্তু কেহই লয় নাই। গ্রাম্য লোক, তীর্থ স্থানে চুরী করে না, করে সহুরে চোর।

বরাকর ষ্টেশনে ট্যাক্সি পাওয়া যায়, সেই দিক দিয়াই বেশী লোক আসে; মিহিজাম, রূপনারায়ণপুর শালানপুর, সীতারামপুর হইতেও আসিবার ব্যবস্থা আছে, বাসে গরুর গাড়ীতে অথবা মোটরে। এমন মনোরম কবিজনসুলভ পুণ্যপীঠ দেখিবার বাসনা হয়ত পাঠকেরও একদিন হইবে। ভাষায়, ফটো তুলিয়া, অথবা ছবি আঁকিয়া সেখানকার পারিপার্শ্বিক দৃশ্য আমি ফুটাইতে পারি না। যতটুকু চেষ্টা করিলাম, এর বেশী আর সম্ভব নয়।

কিন্তু এবারে এক কাণ্ড ঘটিল। আমার তখন বিরহযন্ত্রণা চলিতেছে। শালানপুরের আকাশ-বাতাসের সমস্ত মাধুর্য্য বিলুপ্ত হইয়া গেছে। আমার ঘরের বাতায়ন দিয়া উত্তরের বিস্তীর্ণ প্রান্তর, যা শালানপুর কোলিয়ারী হইতে সিকদাসপুর ও বনবিড়ি অবধি অবারিত, কতদিন দুজনে দেখিয়াছি, কত না ভাল লাগিত! একাকী দেখিয়া মনে হইল, কি বিশ্রী। কাঁটাসায়রের একশো বিঘা জলকর, যেখানে দাঁড়াইলে লালবাজার ও ভিক্টোরিয়া কোলিয়ারী দেখা যায়, সেখানে কতদিন ভূর্জ্জপত্রের গাছ ও হিংএর গাছ দেখিবারজন্য দুজনে গিয়াছি। গভীর রাত্রে যখন আপ-শিয়ালদাএক্সপ্রেস ও ডাউন-পাঞ্জাব মেল ও পার্শেল-এক্সপ্রেস ভীষণগর্জ্জনে প্রায় আমার বাগানের ধার দিয়া চলিয়া যাইত, তখন সেই কাঁটাসায়র, যেখানে অতীত কালে ডাকাতের হাতে কত না মানুষ খুন হইয়াছে, সেইখান হইতে এক শ্মশানচারী পাখীর অট্টহাস্যের মত হা-হা ধ্বনি নিশীথ অন্ধকার রণিত করিয়া কাঁপিয়া উঠিত। ভয় হইত শ্রীমতীর, আমার নয়। শূন্য শয়নে সেই কথা মনে পড়িতে থাকে।

নিদ্রাবিহীন রাত্রি-শেষে প্লাটফর্মে গিয়া দাঁড়াইলাম, ভোরের প্যাসেঞ্জারটা দেখিয়া মনটা হাল্কা করিব। প্লাটফর্ম নামক বস্তু এককালে ছিল, আজ নাই। এখন লাইনই দু ইঞ্চি উঁচু হইয়া গেছে। ওঠা ও নামা শুধু অসুবিধাজনক নয়,

বিপজ্জনক। সংবাদ-পত্রিকাতে চিঠি লিখিয়া, কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া কোন প্রতিকার হয় নাই, জবাব আসিয়াছে, অর্থাভাব। কিন্তু এখানকার ধনী লোকেরা, যাঁরা দলবল লইয়া কলিকাতায় যাওয়া-আসা করেন উচ্চশ্রেণীতে, তাঁহারা যদি আসানসোলে ওঠা-নামা না করিয়া এই ছোট ষ্টেশনটিতে আসিতেন, তবে হয়ত রেল কোম্পানী একটু খাতির করিতেও পারিত, কারণ উচ্চশ্রেণীর সুবিধা-অসুবিধার প্রতি কর্তাদের তীক্ষ্ণ নজর চিরদিনই।

যাই হোক, ট্রেণও আসিয়া পড়িল, উর্দ্ধমুখে দেখিতেছি পরিচিত কেহ যায় কি না। সহসা বিকট আওয়াজ করিয়া কুলীর ডাক পড়িল।

এ ষ্টেশনে কুলী পাওয়া যায় না, বাবুদের জানা ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয় থাকিলে হয় ত সুটকেশগুলা কলিকাতার বাবুদের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া কিছু শিক্ষা দিতেন। তাঁহার অভাবে মাদৃশ ক্ষুদ্র ভক্তকেই অগ্রসর হইতে হইল। দেখিলাম, তাঁহারা ইতিমধ্যে এক 'নাতি' সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন, তাঁহারই মারফৎ গাড়ীশুদ্ধ লোককে খাটাইয়া ভদ্রলোকেরা মাল নামাইলেন। প্রভাতের কুয়াসায় দেখিলাম, ভদ্রলোকেরা আর কেহই নহেন, আমার বহু পুরাতন সুহৃৎ শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার ও শিশিরকুমার মিত্র, 'বাসন্তী' ও 'শিশিরে'র যুগে যাঁহাদের সঙ্গে একত্র অনেকদিন কাটিয়াছে। না আমি, না তাঁহারা, কোন পক্ষই আশা করি নাই, পরস্পরের দেখা এখানে এমন ভাবে হইবে।

টানিয়া লইয়া গেলাম আমার বাড়ীতে, সঙ্গে আর একজন ছিলেন, তাঁহাকে (ভদ্রলোক কিছু মনে করিবেন না) তাঁহাদের সরকার মনে করিয়াছিলাম। পরে জানিলাম, তিনি কলিকাতার বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী, শ্রীযুক্ত অশ্বিনী বর্ম্মণ। অত ভোরে এক কাপ চায়ের বেশী কিছু দিতে পারিলাম না। স্বল্পে সন্তুষ্ট বন্ধুবর্গ তাহাতেই প্রভূত বিনয় প্রকাশ করিলেন। আমার বংশরক্ষার শুভ কামনা করিয়াছিলেন কি না জানি না।

কিন্তু তাঁহারা বিদায় লইলে আমার হইল লজ্জা। যদি অপ্রত্যাশিত ভাবে পুরাণো-বন্ধুদের কুটিরেই পাওয়া গেল যথোচিত অভ্যর্থনা হইল কই! কাজেই আর একদিন সন্ধ্যা চায়ের আসরে তাঁহাদের আসিতে লিখিয়া, সুদুর আসানসোল হইতে জিনিসপত্র আনাইয়া সাধ্যমত আয়োজন করিলাম সন্ধ্যা হইয়া গেল, কাহারও দেখা নাই, অবশেষে বন্ধুবর শিশিরকুমার আসিলেন একলা, অপর দুই মূর্ত্তি না কি মৎস্য-হননে এমন মসগুল যে, ভদ্রতা রক্ষা বলিয়া একটা জিনিস আছে, সেটাও ভুলিতে বসিয়াছেন। রাগের চেয়ে দুঃখই হইল বেশী এবং সেই শুষ্ক প্রান্তরে আমার আয়োজন যে নিন্দনীয় হয় নাই, একজন অতিথি অন্ততঃ তার সাক্ষ্য দিবেন তা'ছাড়া খাওয়াটাই বড় কথা নয়, প্রাণের আবেগটাই বড় মাছ ধরা কি তাহার চেয়েও বড়? মাছ জীবনে অনেক ধরিবেন, কিন্তু এমন যোগাযোগ কি আর সহজে হইবে?

ইহার পরেও অভদ্রতার কথা আপনারা শুনিতে পাইবেন, যদি বিজয়রত্নবাবু সে অংশ কাটিয়া দিয়া দয়া না করেন। পর-দিন প্রভাতে তিন মূর্ত্তি নিঃশব্দে ষ্টেশনে আসিয়া পলায়নের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় আমি গিয়া পড়িলাম। সম্পাদক সাহিত্যিক মানুষ, মুখও চলে, কলমও চলে, কৈফিয়ৎ সুন্দর করিয়া মধুর করিয়া বলিতে বাধিল না, কিন্তু 'অকাট্য' করা গেল না। আমি তখন এমনি দুর্ব্বাক্য সুরু করিলাম, যেন নিমন্ত্রণ করিয়া মাথা কয়টি কিনিয়া রাখিয়াছি। এবং আমার চা পান করিলে জীবনের ক্ষুধা মিটিয়া যাইত। ভদ্রলোকেরা রাগ করেন নাই, তার প্রমাণ তাঁহাদের কুকীর্ত্তির কথা তাঁহারাই ছাপার অক্ষরে ছাপিতেছেন, তাই ৺কল্যাণে-শ্বরীর পবিত্র কাহিনীর সহিত সেই অপবিত্র কথা আজ লিপিবদ্ধ করিয়া দিলাম। আশা করি পাঠকের সহানুভূতি লেখকের উপরেই আসিবে, যদি অবশ্য পাদটীকায় আক্রান্ত না হয়।১

তবে দিনের গাড়ীতে পশ্চিমে যাইবার সময় শালানপুর ষ্টেশনের দক্ষিণে আপনারা আমার কবিকুঞ্জটি দেখিয়া যাইবেন, আর, আরও খানিকটা আগে গিয়া বামে যে পর্ব্বতমালা নজরে পড়িবে, তাই ৺কল্যাণেশ্বরী।
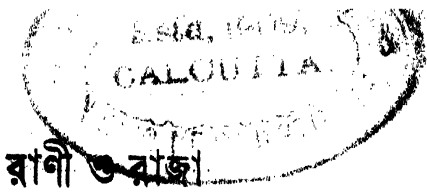
রাণী ও রাজা

—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ

[১]

পাটলীপুত্রের রাজপ্রসাদসংলগ্ন উদ্যান; উদ্যানে পুষ্পিত একটি বৃক্ষকুঞ্জের মধ্যে মর্ম্মর-বেদী; একটি যুবতী সেই বেদীর উপরে বসিয়া বীণাবাদন করিতেছেন। অঙ্গে বসন-ভূষণের পরিপাট্য বিশেষ কিছু নাই; সুন্দর মুখখানিও যেন কেমন একটি বেদনার ম্লানিমায় মলিন; বীণাতেও একটি কেমন উদাস বিষাদের সুর কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। আর একটি যুবতী পশ্চাতের দিকে একটি বৃক্ষের পাশে নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইল; দাঁড়াইয়া সেই বীণাবাদন শুনিতে লাগিল। উদাস সেই বিষাদের সুরঝঙ্কার তাহারও প্রাণে গিয়া করুণ বিষাদের একটা স্পর্শ দিল। হাস্যচটুল মুখখানি ভরিয়া ধীরে ধীরে একটি ম্লান ছায়া আসিয়া পড়িল।

বীণা থামিল; দ্বিতীয়া যুবতী কয়েক পা অগ্রসর হইয়া ডাকিল, "মহারাণী!"

শিথিল হস্ত হইতে বীণাটি স্খলিত হইয়া আসনের গায়ে হেলিয়া পড়িল, চমকিত হইয়া বীণাবাদিনী প্রথমা যুবতী ফিরিয়া কহিলেন, "কে, সুজাতা? এসেছ সখী?"

একটু নতশির হইয়া সুজাতা উত্তর করিল, "হাঁ মহারাণী! রাণীর অভিবাদন গ্রহণ করুন।"

"সুজাতা!" বড় ব্যথিত দৃষ্টিতে সুজাতার দিকে চাহিয়া রাণী কহিলেন, "সুজাতা, ধিক! তুমিও অভাগীকে ত্যাগ করলে?"

"ত্যাগ করলাম! অভাগী! এ কি কথা মহারাণী? ত্যাগই যদি করব, তবে আদেশ পেয়েই তখনি পিতার গৃহ থেকে মহারাণীর চরণে ছুটে আসব কেন?"

"না, তোমাদের মহারাণীকে ত্যাগ করেছ এমন কথা বলতে পারি না। কিন্তু তোমার বাল্যসঙ্গিনী, সোদর ভগ্নীর ন্যায় সস্নেহ প্রীতির অধিকারিণী, সতীর্থা সেই সখী কুমারদেবীকে ত্যাগ করেছ।"

একটু হাসিয়া সুজাতা উত্তর করিল, "আমার বাল্যসঙ্গিনী সোদর ভগ্নীর ন্যায় সস্নেহ প্রীতির অধিকারিণী সতীর্থা সেই সখী কুমারদেবীই যে আজ আমার রাণী। রাণীকে যদি ত্যাগ না করে থাকি, সখীকেই বা ত্যাগ করলাম কি করে?"

কুমারদেবী কহিলেন, "প্রজার মত সম্ভ্রমে এসে তোমাদের রাণীকে অভিবাদন করলে। কিন্তু কই, তোমার সেই সখীকে একটি বার প্রীতি-সম্ভাষণ ত করলে না সুজাতা?"

"এই কথা? তা বাল্যের সখী বলে প্রজা আমি আজ কি রাণীর অমর্য্যাদা করতে পারি?"

গভীর একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কুমারদেবী কহিলেন, "সুজাতা, তোমার এক একটি কথা আজ বড় নিষ্ঠুর বিদ্রূপের মতই আমার প্রাণে গিয়ে লাগছে। আর কেন ভাই, এস! ভুলে যাও, দুর্ভাগ্যক্রমে লিচ্ছবি-নায়কগণ তাঁদের রাণী নাম আমাকে দিয়েছেন। সখী ছিলে, আবার সখী হয়ে সখীর প্রীতি, সখীর স্নেহ নিয়ে আমার বুকে এস। সুজাতা, সখী আমার!"

বলিতে বলিতে উঠিয়া কুমারদেবী উচ্ছ্বসিত প্রীতির আবেগভরে সাশ্রনয়নে সুজাতাকে আলিঙ্গন করিলেন।

"সখী! রাজকুমারী! কুমারদেবী!" সুজাতাও স্নেহ-প্রীতিময় প্রেমালিঙ্গনে কুমারদেবীকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিল।

কিছুক্ষণ উভয়ে উভয়ের আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া রহিলেন। পরে আত্মসংবরণ করিয়া স্নেহে সুজাতার হাতখানি ধরিয়া কুমারদেবী পাশাপাশি তাহাকে লইয়া আসনে গিয়া বসিলেন।

তখন খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভ-কাল। মগধের উত্তর-ভাগে সহস্রাধিক বৎসর লিচ্ছবি জাতি বাস করিতেছিলেন। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হয়। তাহার পূর্ব্ব হইতেই লিচ্ছবি জাতির একটা প্রাধান্য এই অঞ্চলে ছিল। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক মগধের শিশুনাগবংশীয় রাজা অজাতশত্রু এক লিচ্ছবি-রাজকন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তারপর নন্দ, মৌর্য্য, কণ্ব প্রভৃতি বহু রাজবংশের অভ্যুদয় ও পতন হয়। সকলেই পাটলীপুত্রে আসিয়া চক্রবর্ত্তী-সম্রাট রূপে আর্য্যাবর্ত্তের বিপুল সাম্রাজ্য শাসন করেন। একে একে তাঁহাদের সকলের পতনের পর পাটলীপুত্র লিচ্ছবিদের

হস্তগত হয়। আর্য্যাবর্ত্ত তখন বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। রাজধানী পাটলীপুত্রের অধিকারী লিচ্ছবি জাতিই মগধে আধিপত্য করিতেন। মগধ বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্র স্বরূপ ছিল। লিচ্ছবিরাও বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন। সম্প্রতি লিচ্ছবি-রাজ শীলভদ্রদেব * অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে লিচ্ছবি-নায়কগণ তাঁহার একমাত্র কন্যাসন্তান কুমারদেবীকে আপনাদের আধিপত্যে বরণ করিলেন। সুজাতা কোনও লিচ্ছবি-নায়কের কন্যা, কুমারদেবীর বাল্যসহচরী। রাজার মৃত্যুকালে সুজাতা দূরে তাহার পিতৃগৃহে ছিল। রাজপদে অধিষ্ঠিতা হইয়াই কুমারদেবী সুজাতাকে আসিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্র পাইয়া সুজাতা আজ আসিয়া পৌছিয়াছে।

আসনে আপন পাশে বসাইয়া সুজাতার হাতখানি ধরিয়া কুমারদেবী কহিলেন, "সুজাতা! কতদিন ধরে তোমার আসবার পথ চেয়ে আছি। আজ আমি বড় একা—সবাই আমাকে ত্যাগ করেছে—এই অবস্থাটা সইতে আর পারছি না। সবাই ত্যাগ করেছে, যদি এসেছ ভাই, তুমি আমায় ত্যাগ ক'র না। যদি কর, একা এ জীবনভার বইতে আমি পারব না।"

একটু হাসিয়া সুজাতা কহিল, "একা! ত্যাগ করেছে! এসব কি হেঁয়ালী তুমি বলছ? মহারাজ শীলভদ্রদেব নির্ব্বাণ-লাভ করেছেন; তাঁর একমাত্র সন্তান তুমি আজ মগধেশ্বরী—লিচ্ছবি-কুলের রাণী! তোমায় ত্যাগ করবে কে? ত্যাগ করতে পারে কে? রাজার মেয়ে হলেও ছোট মেয়েটি যখন ছিলে, সবাই স্নেহ করত, আদর করত। আজ রাণী বলে তোমাকে তারা মাথায় তুলে নিয়েছে, একটু অনুগ্রহদৃষ্টির জন্য সম্ভ্রমে তোমার পানে চেয়ে রয়েছে।"

"তাই ত বলছি, সবাই আমায় ত্যাগ করেছে—বড় একা আজ আমি সুজাতা। যারা স্নেহ করত, কেউ নেই, সমান, আপন জনের মত নিঃসঙ্কোচ প্রীতিতে যার পাশে এসে কেউ দাঁড়ায় না, দূর থেকে সম্ভ্রমেই শুধু অভিবাদন করে,—নির্ভয়ে মন খুলে বন্ধুর ন্যায় দুটি কথা যাকে কেউ বলে না, রাগ হলে দুটো গাল দিতে সাহস পায় না, নতশির হয়ে তুষ্টিকামনায় কেবল মিষ্ট কথাই কয়,—যার সমান কেউ হয় না, সমান হয়ে যে কারও সঙ্গে মন খুলে দুটো মনের কথা বলতে পারে না, তার মত বান্ধবহীন, সকলের পরিত্যক্ত আর কে? সুজাতা! রাজপদ কেন লোকে কামনা করে জানি না। রাজার মত বান্ধবহীন, সখ্যের আনন্দে বঞ্চিত, একাকী—এমন অভাগা পৃথিবীতে আর কে আছে?"

একটু হাসিয়া সুজাতা উত্তর করিল, "সমান হলেই সমান সমান দিতে হয়। দিতে লোকে বড় কেউ চায় না, পেতেই কেবল চায়। যার সমান কেউ নেই, সকলের বড় যে সে পায়ই শুধু, দিতে তাকে বড় কিছু হয় না,—দেয় যা সব প্রসাদ। তাই না সবাই এমন বড়ই হ'তে চায়। সকলের বড় রাজার পদ, তাই না লোকে এই পার্থিব জীবনের সব চেয়ে বড় সৌভাগ্য, বড় গৌরব ব'লেই মনে করে।"

"ভুল—ভুল—সুজাতা! বড় ভুল!—এর চাইতে ভুল আর কি হ'তে পারে জানি না। প্রসাদ বই কাউকে যে কিছু দেয় না, দিতে যার হয় না, কেবলই পায়—ধিক তাকে! জীবনে তার কি সুখ? সমান পাঁচজনের সঙ্গে সমান ভাবে দেওয়া-নেওয়া, এতে যে তার কর্ম্মফলে বঞ্চিত, মানবসমাজে থেকেও সে ত নির্ব্বাসিত। সুজাতা, রাজপদ লোকে কামনা করে, সকলের হতে দূরে—অনেক উপরে—একা থাকতে চায়। কেন চায়, কি সুখ তারা পায়, তারাই জানে। আমি বুঝতেই পারি না। পিতার সব আমাত্য, বিশ্বস্ত সব সেবক, তাঁদের ছোট মেয়েটির মত আমাকে স্নেহ ক'রতেন, আদর ক'রতেন, তিনি গেলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেরও সেই স্নেহ, সেই আদর—কোথায় চলে গেল! সবাই দূরে থেকে এখন আমার অভিবাদন করেন। স্নেহে কোনও আদেশ কেউ করেন না,—কেবল আদেশই চান।"

"তা বেশ ত, কারও মন চেয়ে তোমাকে চলতে হয় না, তোমার মন চেয়েই সকলে চলে, মন্দই বা কি এমন? আগে সবাইকে ভয় করে চলতে, এখন ভয় সকলে তোমাকে করে। অনেকের মুখ চেয়ে আগে চ'লতে হ'ত, আদেশ অনেকের মানতে হ'ত। এখন আর ওসব জ্বালা কি নেই,—যা খুসী তাই ক'রতে পার।"

"সেটা বরং আগেই অনেকটা পারতাম, এখন একেবারে পারি না। পায়ে পায়ে আমার বিধির বেড়ী, ইচ্ছামত এতটু চ'লব, সাধ্য কি? একেবারে বিধির ক্রীতদাসী এখন আমি

* কল্পিত নাম ব্যবহৃত হইল

এঁরা আদেশ করেন না, আদেশ চান। কিন্তু সে কেমন চাওয়া জান? যেন বিধির দূত এঁরা—বিধির দাসীর সম্মুখে বিধির নির্ম্মম সব নির্দ্দেশ নিয়ে এসে দাঁড়ান, ভঙ্গীতে তাই পালন করতে আমাকে বাধ্য করেন। যদি এঁরা এসে সহজ স্নেহে ব'লতেন, কুমারদেবী, এইটি তোমার করা উচিত,—আনন্দে হাসিমুখেই আমি তাঁদের আদেশ বা উপদেশ মেনে চলতে পারতাম। কিন্তু যখন সম্ভ্রমে অভিবাদন ক'রে এঁরা বলেন, 'মহারাণী ইহাই বিধি, তখন ব'লব কি সুজাতা—মনে হয় এ কি অভিশাপের ফল শিরে আমি বহন করতে বাধ্য হচ্ছি। যদি দীন কুটীরে সহস্র অভাবের মধ্যেও স্নেহময় কারও সেবার অধিকার আমি পেতাম, তাও যে এই রাজপদের চেয়ে অনেক বেশী বরণীয় আমার হ'ত।"

"জানি না—রাজপদের অধিকারিণী হ'য়ে বিধি মানতে এ ভাবে আদিষ্ট বা উপদিষ্ট ত কখনও হই নি। তবে এই যে বিধি—বিধি কার? রাজার নয় কি?"

"না, বিধি ধর্ম্মের। রাজাকে তা রক্ষা করতে, পালন করতে হবে।"

সুজাতা কহিল, "বিধি যদি ধর্ম্মেরই হয়, সবাইকেই ত তা মেনে চলতে হবে।"

কুমারদেবী উত্তর করিলেন, "অন্যের পক্ষে বিধির ব্যবস্থা এই, যার যতটুকু প্রয়োজন তাকে ততটুকুই মেনে চলতে হবে। তার বাইরে সে স্বাধীন। কিন্তু রাজা তার জীবনে সম্পূর্ণ বিধির দাস,—বিধির বাইরে এতটুকুও তার আপন ব'লে কিছু নেই।"

একটু হাসিয়া সুজাতা তখন কহিল, "এই ত আপন মনে ব'সে বীণা বাজাচ্ছিলে—"

"বিধিই এই সময়টা আমার চিত্ত-বিনোদনের জন্য নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিয়েছে। তাই বীণাটি নিয়ে বসেছিলাম। বীণার তানে না কেঁদে শয্যায় শুয়ে নীরবেও এখন অশ্রুপাত করতে পারতাম। এইটুকু যা স্বাধীনতা এই সময়ে আমার আছে।"

"তাই ত! রাজ্যের আধিপত্য যে জীবনে এমনই একটা অভিশাপ তা ত জানতাম না। কিন্তু রাজারা যে সবাই এমন অভিশপ্ত জীবন বহন করেন, এমন ত মনে হয় না।"

"কত রাজা তুমি দেখেছ সুজাতা?"

"না, এক তোমার পিতাকে ছাড়া রাজা, কই—আর কাউকে দেখিনি। কিন্তু পুস্তকে ত রাজাদের কথা অনেক পড়ে থাকি, প্রাচীন কাহিনীতেও শুনে থাকি। তাতে—"

"তাতে রাজাদের বহির্জ্জীবনের গৌরব বর্ণিত আছে, অন্তর্জ্জীবনের বেদনার কথা কিছু নেই।"

সুজাতা কহিল, "এই বেদনার জন্য কোন রাজা প্রাপ্ত রাজপদ ত্যাগ ক'রতে উৎসুক কি রাজপদ পেতে অনিচ্ছুক, এমন কোন লক্ষণও ত ইতিহাসে কোনও রাজার কাহিনীতে দেখা যায় না। বরং কি যুদ্ধে, কি রাজ্যশাসনে, শক্তিমান্ রাজা মাত্রকেই অতি উৎসাহী আর আনন্দিত ব'লেই মনে হয়। অন্তরে তোমার মত এমন দারুণ বেদনা থাকলে বাইরে এত বড় আনন্দ উৎসাহ কারও পক্ষে সম্ভব হয় কি?"

কি ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে কুমারদেবী উত্তর করিলেন, "কে জানে, পুরুষ হয় ত এমন স্নেহের কাঙ্গাল, সখ্যের কাঙ্গাল হয় না—শুধু প্রভুত্বেই জীবনে তৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু আমি নারী। নারী স্নেহ চায়, স্নেহাধীন হয়ে সেবায় নারীর জীবন কৃতার্থ হয়। নারীর প্রভুত্ব স্নেহেরই প্রভুত্ব। কঠোর শাসনের প্রভুত্ব নারীকে সুখী করতে পারে না। নারীতে শোভাও তা পায় না। নারীর প্রকৃতিও বুঝি তার বিরোধী।"

"কিন্তু নারীকে যদি তোমার মত রাজ্যশাসনের কর্ত্রী হতে হয়—"

"তবে বলতে হবে সে নারী বড় মন্দভাগিনী!"

"সেই মন্দ ভাগ্য যদি অনিবার্য্যই হয়, তবে ধীর চিত্তে তা বহন করাই ধর্ম্ম নয় কি?"

"বহন ত আমি করছিই। কিন্তু অনিবার্য্য কোনও মন্দ ভাগ্য বহন করে চলা এক কথা, আর জীবনে সুখ শান্তি লাভ করা আর এক কথা।"

একটি নিশ্বাস চাপিয়া ঈষৎ স্মিত মুখেই সুজাতা কহিল, "মনের এই দীনতা দূর কর সখী। এই রাজগৌরব তখন সুখেরই হবে।"

কুমারদেবী উত্তর করিলেন, "দীনতা যে নারীর প্রাণে নেই, সে অভাগী নারীর ধর্ম্মে বঞ্চিতা। ভগবান তথা-

গতের* ধর্ম্মেরও মূল নীতি দীনতা, পুরুষ তা ত্যাগ করেছে। নারী আমরাও যদি তাই করি, তবে ত তাঁর ধর্ম্মরাজ্য থেকে তিনি একেবারেই নির্ব্বাসিত হলেন।"

সুজাতা কহিল, "রাজাকে যদি রাজ্যশাসন করতে হয়, দীনতার ধর্ম্ম তাঁর চলে না। পুরুষ না হও, রাজার দায়িত্ব তোমার শিরে পড়েছে। এরূপ দীনতাকে আশ্রয় করলে রাজধর্ম্ম তোমার ব্যাহত হবে।"

একটু হাসিয়া কুমারদেবী কহিলেন, "সুজাতা! কোনও ধর্ম্ম যাতে ব্যাহত না হয়, প্রাণপণ চেষ্টা তার জন্ম করছি। প্রাণে নারী থেকে বাইরে রাজধর্ম্মই আমাকে পালন করতে হবে, করছিও বটে। পদে পদে নারীত্বে তাই আঘাত পাচ্ছি, নারীচিত্তের আকাঙ্ক্ষা সব ব্যর্থ হচ্ছে,—কিন্তু উপায় নাই। ব্যর্থ, আহত প্রাণে এই বেদনা বয়েই রাজধর্ম্ম আমাকে পালন করতে হবে। রাজধর্ম্মপালনে আমি কুণ্ঠিত, একথা ত কখনও বলিনি। আমি যে বড় একা, বড় অসুখী, এই রাজপদে নারীত্ব আমার ব্যর্থ হচ্ছে, হবে, তাই তোমাকে বলছিলাম। আর বলছিলাম, সবাই যদি অভাগীকে একা রেখে দূরে সরে গেল, তোমাকে যেন কাছে পাই,—তোমার স্নেহে, তোমার প্রীতিতে যেন বঞ্চিত না হই। যেমন সখীটি আমার ছিলে, তেম্‌নি থেক। থাকবে সুজাতা?"

সুজাতার দুটি হাত ধরিয়া বড় আকুল দৃষ্টিতে কুমারদেবী তার দিকে চাহিলেন। একেবারে গায়ে ঘেঁসিয়া ছলছল নয়নে ঈষৎস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া সুজাতা কহিল, "কুমারদেবী! রাজকুমারী! সখী! সুজাতা তোমারই।"

বাহিরে বাদ্যধ্বনি এবং বন্দিগণের গীত মন্ত্রণাসভার সময় ঘোষিত করিল। প্রতিহারী আসিয়া অভিবাদন করিয়া জানাইল, আমাত্যগণ মন্ত্রণাগৃহে আগমন করিয়াছেন।

কুমারদেবী কহিলেন, "সুজাতা! চল, মন্ত্রণাগৃহে যাই।"

"আমি! আমি কোথায় যাব? মন্ত্রণাগৃহে আমি কে?"

হাসিয়া কুমারদেবী কহিলেন, "এস, ভয় কি? না হয় একটুকাল আমার চামরধারিণী হয়েই দাঁড়াবে। এস।"

সুজাতার হাত ধরিয়া কুমারদেবী কুঞ্জ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

* ভগবান বুদ্ধদেবকে এই নামেই বৌদ্ধেরা সাধারণতঃ উল্লেখ করিয়া থাকেন। 'তথা' অর্থাৎ পুনরাবৃত্তি বা পুনর্জ্জন্ম হইবে না, এই অর্থে 'গত', নামটির মৌলিক অর্থ এই।

[২]

মগধের দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রান্তে একটি রাজ্য ছিল, কুশজাঙ্গল*। লিচ্ছবিগণ কুশজাঙ্গলকে আপনাদের অধীন রাজ্য এবং কুশজাঙ্গলের অধিপতিগণকে আপনাদের সামন্ত বলিয়া দাবী করিতেন। কুশজাঙ্গলের অধিপতিরাও আপনাদিগকে লিচ্ছবিরাজ্যের সামন্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া রাজ্যশাসন সম্বন্ধে একরূপ স্বাধীন ভাবেই চলিতেন। লিচ্ছবিরাজ কুমারদেবীর পিতা শীলভদ্রদেবের রাজত্বের প্রারম্ভে গুপ্ত নামধারী কুশজাঙ্গলরাজ আপনাকে একেবারে স্বাধীন বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু লিচ্ছবিদের বাহুবলে পরাভূত হইয়া আবার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। সেই অবধি কুশজাঙ্গলে আপনাদের প্রভুত্ব যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, এসম্বন্ধে লিচ্ছবিগণ বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া চলিতেন। রাজা গুপ্তের পুত্র ঘটোৎকচ কখনও কোনও রূপ বিদ্রোহ ভাব দেখান নাই। ঘটোৎকচের পুত্র যুবক চন্দ্রগুপ্ত এখন কুশজাঙ্গলের রাজা। ইহার বিরুদ্ধে গুরু এক বিদ্রোহাত্মক আচরণের অভিযোগ শীলভদ্রদেবের নিকটে উপস্থিত হয়। শীলভদ্রদেব তখন অন্তিম-শয্যায়। সুতরাং কোনও প্রতিবিধানের প্রয়াস তিনি করিতে পারেন নাই। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের অপরাধকে উপেক্ষা করিলে মগধে বৌদ্ধ লিচ্ছবিদের প্রভুত্ব রক্ষা করা কঠিন হইবে - এ সম্বন্ধে শীলভদ্রদেব জীবিত থাকিলে কি করিতেন, অধুনা তাঁহাদেরই বা কি কর্ত্তব্য, আমাত্যগণ তাহা একরূপে স্থিরই করিয়াছেন। এখন তাহাতে মহারাণীর অনুমোদন আবশ্যক।

কুমারদেবী মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ করিলেন, আমাত্যগণ সম্ভ্রমে উঠিয়া গম্ভীরভাবে রাণীকে অভিবাদন করিলেন। কুমারদেবীও প্রত্যভিবাদন জানাইয়া নিজের আসনে বসিলেন। আমাত্যগণ তখন নিজ নিজ আসন গ্রহণ করিলেন। সুজাতা রাণীর নিকটে পৃথক্ এক আসনে বসিল। প্রধান আমাত্য সুমিত্র চন্দ্রগুপ্তের কথা উত্থাপন করিলেন। কুমারদেবী কহিলেন, "চন্দ্রগুপ্তের কি অপরাধ হয়েছে আর্য্য সুমিত্র?"

"তিনি জীবহিংসা করেছেন।"

"জীবহিংসা! জীবহিংসা করেছেন কিসে? কি ভাবে?"

* কল্পিত নাম ব্যবহার করা হইল।

"যজ্ঞে পশুবলি দিয়েছেন।"

"যজ্ঞে পশুবলি দিয়েছেন ; কেন চন্দ্রগুপ্ত কি তবে বৈদিক ব্রহ্মণ্য ধর্ম্ম পালন করেন ?"

"হাঁ, মহারাণী।"

কুমারদেবী কহিলেন, "শুনেছি বৈদিক ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মে পশুবলির বিধি আছে। সুতরাং তার অনুষ্ঠান যে পালন করে, জীবহিংসায় সে কি ভাবে বিরত থাকতে পারে ? বৌদ্ধ লিচ্ছবি রাজ্যের অধীন কাউকে যদি বৈদিক ব্রহ্মণ্য অনুষ্ঠান সম্পাদনে অনুমোদন করা হয়, তবে সেই অনুষ্ঠানের অঙ্গীয় জীববলিই বা নিষিদ্ধ হয় কিরূপে ?"

সুমিত্র উত্তর করিলেন, "মহারাণী, অহিংসা বৌদ্ধের পরম ধর্ম্ম। বৌদ্ধ রাজা কেউ জীবহিংসার অনুমোদন করতে পারেন না। ভিন্ন ধর্ম্মে বিশ্বাসী প্রজাকে বলপ্রয়োগে রাজার ধর্ম্মমতে আনবার চেষ্টা সাধু কি সমীচীন নীতি নয়, তাই বৈদিক ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম পালন করতে চায়, এরূপ প্রজাদের সম্বন্ধে প্রাচীন বৌদ্ধ রাজগণ সকলেই এই নিয়ম অনুসারে চলেছেন, বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূল অহিংসানীতির বিরোধী না হয় এমন ভাবে তারা নিজ নিজ ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন করবে।"

"ভাল, বৌদ্ধ রাজ্যের বৈদিক ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বী প্রজারা সকলেই কি অবিদ্রোহে এই নিয়ম মেনে চলেছেন ?"

"সাধারণতঃ মেনেই সকলে চলেছেন। তবে মধ্যে মধ্যে অতি দুষ্ট কেউ নিয়ম লঙ্ঘন করে নাই, এমন কথা বলতে পারি না মহারাণী।"

কুমারদেবী কহিলেন, "রাজবিধি যে লঙ্ঘন করে, সে দণ্ডার্হ। বৌদ্ধ রাজগণ এদের কি দণ্ডবিধান করেছেন ?"

"সময়ে সময়ে অতি কঠোর দণ্ডেই রাজবিধির এরূপ বিদ্রোহ দমন করতে হয়। অপরাধী কেউ কেউ প্রাণদণ্ডেও দণ্ডিত হয়েছে।"*

একটু হাসি তখন কুমারদেবীর মুখে ফুটিল ; কহিলেন, "আর্য্য সুমিত্র ! আমাকে মার্জ্জনা করবেন। কিন্তু মানুষ কি জীব নয় ? মানুষের বধ কি জীবহিংসা না ?"

"রাজবিধির দণ্ডকে পাপ হিংসা নাম দেওয়া যেতে পারে না।"

"ধর্ম্মবিধির বলিকেই বা পাপ হিংসা নাম তবে কি প্রকারে দেওয়া যায় ?"

সুমিত্র একটু ভ্রূকুটি করিলেন, শেষে কহিলেন, "সদ্ধর্ম্মের* বিরোধী যে বিধি, তাকে সাধু বিধি ব'লে স্বীকার করতে আমরা প্রস্তুত হ'তে পারি না মহারাণী।"

"কিন্তু সদ্ধর্ম্মী আপনিও ত' প্রাণদণ্ডকে সাধু বিধি ব'লে গ্রহণ করতে প্রস্তুত দেখতে পাচ্ছি ?"

সুমিত্র উত্তর করিলেন, "ঠিক সাধু বিধি না হ'ক, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে অপরিহার্য্য বটে।"

"সে যাই হ'ক আর্য্য, প্রাণদণ্ড হিংসাই বটে। হীন পশু অপেক্ষা মানব শ্রেষ্ঠ জীবও বটে। পশুহিংসা নিবারণের বাসনায় মানবহিংসা অপরিহার্য্য কি না জানি না, তবে যুক্তিসঙ্গত ব'লে মনে ক'রে নেওয়া কঠিন বটে।"

সুমিত্র কহিলেন, "মহারাণী ! অবোধ পশু নিরীহ নিষ্পাপ ; মানুষ বুদ্ধির অধিকারী হ'য়ে পাপবুদ্ধিতেই পাপ করে। কে শ্রেষ্ঠ, কে নিকৃষ্ট তা নির্ণয় করা সহজ নয়। নিরীহ পশুর হিংসা মানুষ করে নিজের কোনও বাসনার চরিতার্থতার জন্য। সুতরাং সে হিংসার পক্ষে বলবার কিছুই নাই। তারপর মানুষ যখন পাপবুদ্ধির বশেই পাপ করে, বিধিনিষেধ সব ভেঙে ধর্ম্মের বিদ্রোহ করে, তখন সেই পাপবুদ্ধি দমনের জন্য, ধর্ম্মের মর্য্যাদারক্ষার জন্য তার প্রাণদণ্ডের প্রয়োজনও হ'তে পারে, যদিও সদ্ধর্ম্মী মাত্রই দারুণ মনোবেদনা তাতে অনুভব করবেন।"

কুমারদেবী কহিলেন, "ভাল, সে যে ধর্ম্মবিদ্রোহই করল, তার বিচার হবে কিসের প্রমাণে ?"

"ধর্ম্মবিধিরই প্রমাণে।"

"কিন্তু সমস্ত জগতের সকল লোক একই ধর্ম্মবিধি গ্রহণ করেনি। শ্রমণের ধর্ম্মবিধির দ্বারা আপনারা ব্রাহ্মণের বিচার কি প্রকারে করবেন ? বিশেষ এই স্থলে দেখতে পাচ্ছি, শ্রমণ বলছেন জীবহিংসা পাপ, ব্রাহ্মণ বলছেন যজ্ঞে পশুবলিতে পুণ্য লাভ হয়।"

সুমিত্র কহিলেন, "মহারাণী, আমরা শ্রমণ ধর্ম্মের শিষ্য। আমাদের রাজশক্তি শ্রমণ ধর্ম্মেরই অধীন। আমাদের প্রজার বিচার শ্রমণ ধর্ম্মের বিধি অনুসারেই হবে।"

"তবে বলুন, যুক্তিসঙ্গতি কিছু থাক্ আর নাই থাক্,

* Early History of India, Vincent A. Smith (2nd dition, 1908) Chap. II, p. 170 এবং Oxford History of ndia, p. 101—এই দুই স্থলেই ইহার প্রমাণ কেহ চাহিলে পাইবেন।

* বৌদ্ধেরা আপনাদের ধর্ম্মকে সাধারণতঃ সদ্ধর্ম্ম বলিতেন।

রাজশক্তি আপন প্রভুত্বের বিধিবলে যা কিছু নির্দ্দেশ করবে, সকল প্রজাকে তারই অধীন হয়ে চলতে হবে। সে যাই হ'ক, এই বিধির উপরে আমার কিছু প্রভুত্ব আছে কি? এইরূপ কোনও বিধির সংস্কার আমার অধিকারের মধ্যে কি?"

সকলেই কিয়ৎকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। প্রবীণ শ্রমণ উপানন্দ আমাত্য-সভার অন্যতম সদস্য। গম্ভীরভাবে তিনি শেষে উত্তর করিলেন, "মহারাণী! ধর্ম্মবিধির উপরে রাজার কোন প্রভুত্ব নাই। রাজাও ধর্ম্মবিধির অধীন।"

সুমিত্র কহিলেন, "মহারাণী! বিধির অবজ্ঞা রাজার পক্ষে সম্ভব হতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক রাজার এই কথাটাও স্মরণ রাখা উচিত যে, রাজ্যের উপরে প্রজার উপরে তাঁর প্রভুত্ব, রাজায় প্রজায় সকল সম্বন্ধ—এই বিধির ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। বলগর্ব্বে যদি কোনও রাজা বিধি অবজ্ঞা করে চলেন, আপনার প্রভুত্বেরই মূল ভিত্তি ক্রমে তা থেকে শিথিল হয়ে পড়বে।"

কুমারদেবী কহিলেন, "তবে কি বিধি অচল, অপরিবর্ত্তনীয়? কোনও সংস্কার তার সম্ভব নয়? কোনও সংস্কার কোনও বিধির কখনও হয় নাই?"

উপানন্দ কহিলেন, "ধর্ম্মের মূলনীতির অবিরোধী সংস্কার মাঝে মাঝে সকল বিধির পক্ষেই আবশ্যক হয়; হয়েছে, আরও হবে। কিন্তু সে সংস্কারের অধিকারী রাজা নহেন, ধর্ম্মসংঘ।"

সুমিত্র কহিলেন, "কিন্তু রাজা আর রাজ্যের নায়কবর্গের স্থানও এই ধর্ম্মসংঘে আছে।"

উপানন্দ উত্তর করিলেন, "থাকলেও তা শ্রমণের উপরে নয়।"

কুমারদেবী কহিলেন, "তা হ'লে দেখতে পাচ্ছি এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধও কিছু আছে। যাই হ'ক, এখনই এর কোনও সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়। তবে চন্দ্রগুপ্তের সম্বন্ধে আজই একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়াও আমাদের পক্ষে আবশ্যক বটে। আপনারা বলছেন চন্দ্রগুপ্ত জীবহিংসা করে লিচ্ছবি ধর্ম্মবিধি লঙ্ঘন করেছেন, সুতরাং তিনি দণ্ডার্হ। কিন্তু এই চন্দ্রগুপ্ত কি লিচ্ছবি রাজশক্তির অধীন প্রজা?"

সুমিত্র কহিলেন, "সাধারণ প্রজা না হন, লিচ্ছবি রাজ্যের একজন সামন্ত তিনি।"

"সামন্তকেও কি সাধারণ প্রজার ন্যায় লিচ্ছবি রাজশক্তির এই ধর্ম্মবিধি মেনে চলতে হবে?"

সুমিত্র উত্তর করিলেন, "বৌদ্ধ রাজশক্তির সঙ্গে কোনও রূপ অধীনতার সম্বন্ধ যার আছে, তাকে অন্ততঃ এই অহিংসার বিধি মেনে চলতেই হবে।"

কুমারদেবী কহিলেন, "চন্দ্রগুপ্ত নামে সামন্ত হলেও কার্য্যতঃ প্রায় স্বাধীন রাজা। তিনি অজ্ঞ নন, বৌদ্ধ রাজশক্তির বিধি এই জেনেও তা লঙ্ঘন করেছেন। আপনারা কি দণ্ড তাঁকে দিতে চান? আপনাদের বিহিত কোনও দণ্ড তিনি গ্রহণ করবেন কি?"

সুমিত্র উত্তর করিলেন, "অবশ্য সাধারণ প্রজার ন্যায় কোনও দণ্ড তাঁকে দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা চাই, যে অপরাধ তিনি করেছেন, তার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট একটা কাল ভিক্ষুকব্রত তিনি গ্রহণ করবেন,—আর এ জাতীয় কোনও অপরাধ কখনও করবেন না, এইরূপ একটা প্রতিশ্রুতিও দেবেন।"

"যদি তিনি তাতে সম্মত না হন?"

উপানন্দ কহিলেন, "বলপূর্ব্বক তাঁকে বাধ্য করতে হবে।"

"অর্থাৎ তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে?"

"হাঁ।"

"জীবহিংসা পাপ নিবারণের উৎকৃষ্ট উপায় বটে! ভাল, বিধি ব'লে কি এও অনুমোদন আমাকে করতে হবে?"

সুমিত্র কহিলেন, "মহারাণী নিজে যদি বিধিদ্রোহিণী হতে না চান, তবে তাই করতে হবে বটে।"

কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া কুমারদেবী শেষে কহিলেন, "বিধিদ্রোহিণী হব, এরূপ অভিপ্রায় কি শক্তি কিছুই আমার নাই। কিন্তু আজ আমার মনে হচ্ছে, ভগবান তথাগতের উপদিষ্ট সেই শান্তির ধর্ম্ম, দীনতার ধর্ম্ম, তিতিক্ষার ধর্ম্ম—তার সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্বন্ধ থাকতে পারে না। রাজনীতি সর্ব্বদাই সেই ধর্ম্মের বিরোধী। রাজাকে যদি ধর্ম্ম পালন করে রাজ্যশাসন করতে হয়; তবে—তবে বুঝি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মই রাজার ঠিক ধর্ম্ম। সে ধর্ম্মে যতদূর জানি—মানব-জীবনের সকল বৃত্তির, সকল কর্ম্মের, সকল কর্ত্তব্যেরই স্থান আছে।"

উপানন্দ কহিলেন, "লিচ্ছবি-রাণীর মুখে একথা শোভা পায় না।"

সুমিত্র কহিলেন, "সে যাই হ'ক, মহারাণীর এখন কি আদেশ?"

কুমারদেবী উত্তর করিলেন, "বিধির দাসী আমি,—বিধির যা নির্দ্দেশ তা ছাড়া আর কি আদেশ আমার হতে পারে? বিধি অনুসারে আপনাদের মতে যা স্থির হয় তাই করুন।"

"কি বিধি এবং এস্থলে বিধি অনুসারে কর্ত্তব্য কি, পূর্ব্বেই তা মহারাণীকে নিবেদন করা হয়েছে।"

"তাই তবে হ'ক!" বলিয়া একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কুমারদেবী আবার কহিলেন, "নিজের বুদ্ধিতে যুক্তিসঙ্গত কি সুনীতিসঙ্গত বলে যা মনে হচ্ছে না, সে কাজেও আদেশ আমাকে দিতে হয়, রাজপদের অধিকারিণী বলেই হয়। কিন্তু এই রাজপদ যদি স্বেচ্ছায় আমি ত্যাগ করতে চাই, তাতেও কি বিধির কোনও বাধা আছে?"

চমকিয়া সকলে চাহিলেন; বিস্মিত স্তব্ধভাবে চাহিয়াই রহিলেন। সুমিত্র শেষে কহিলেন, "মহারাণী! সহসা আপনার এই প্রশ্নে সকলেই আমরা বড় ব্যথিত হলাম।"

"কিন্তু উত্তর কি দিতে পারেন আর্য্য?"

"এরূপ একটা প্রশ্ন কখনও আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই। হতে পারে, এ কথাও কেউ কখনও ভাবিনি। তবে এই মাত্র বলতে পারি, রাজা কেউ স্বেচ্ছায় রাজপদ ত্যাগ করতে চাইলে, কোনও বিধি তাকে সেই পদে বাধা করে বসিয়ে রাখতে পারে না। কিন্তু একটা কথা মহারাণী অবশ্য বিবেচনা করবেন। সত্যই যদি মহারাণীর এরূপ কোনও অভিপ্রায় হয়ে থাকে, তবে রাজবংশীয় অন্যান্য নায়কগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজ্যে একটা বিপ্লবের সৃষ্টি হবে। লিচ্ছবি রাজ্যই তার ফলে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। কোনও বিধির সংস্কার যদি আবশ্যক বলে মহারাণী মনে করেন, বিধিসঙ্গত উপায়েই তার চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু যত দিন না হয়, নিজ বুদ্ধির যতই বিরোধী হ'ক, রাজ্যের মঙ্গলে বিধি পালন করে চলাই মহারাণীর পক্ষে কর্ত্তব্য মনে করি। বিধিমাত্রই পুরুষপরম্পরাক্রমে বহু বিজ্ঞ লোকেরই বুদ্ধিপ্রসূত। নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধিকে লোকপরম্পরাগত ব্যাপক বুদ্ধির অধীন করে রাখতে পারা সুবুদ্ধির কেবল নয়, মহত্ত্বেরও পরিচায়ক বটে।"

ম্লান মুখে একটু হাসিয়া কুমারদেবী কহিলেন, "একটি প্রশ্নই কেবল উপস্থিত করেছি আর্য্য। নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধিকে লোকপরম্পরাগত এই ব্যাপক বুদ্ধির উপরে নিয়ে তুলব, আর তার প্রভাবে এই যে গুরু দায়িত্ব আমার মাথায় আজ এসে পড়েছে, তাই ত্যাগ করব, এমন কোনও অভিপ্রায় এখনই আমার নাই।"

"সাধু! সাধু!"

অতি আনন্দে সকলে তখন এই ধ্বনি করিলেন।

সুমিত্র কহিলেন, "মহারাণী নারী, সহজেই কোমলচিত্তা। বয়সে এখনও বালিকা মাত্র। রাজপদেও অতি অল্পদিন হল অভিষিক্তা হয়েছেন। সুতরাং রাজবিধির অপরিহার্য্য কঠোরতা সহজেই আপনাকে কিছু আকুল করে তুলতে পারে। তবে ভরসা করি বয়োবৃদ্ধি আর অভিজ্ঞতার সঙ্গে এ জাতীয় দুর্ব্বলতা থেকে ক্রমে মহারাণী মুক্ত হতে পারবেন।"

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কুমারদেবী কহিলেন, "থাক, ওসব কথা এখন। রাজকার্য্য আজ আর কিছু আছে?"

সুমিত্র কহিলেন, "সামান্য যা আছে, তার জন্য মহারাণীকে এখন আর ক্লেশ দেওয়া প্রয়োজন হবে না। আদেশপত্র প্রস্তুত হ'লে স্বাক্ষরের জন্য মহারাণীর নিকটে প্রেরিত হবে।"

"তা হলে এখন আমি বিদায় গ্রহণ করতে পারি?"

"মহারাণীর যেরূপ অভিরুচি।"

কুমারদেবী তখন উঠিলেন। আমাত্যগণও সম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। প্রত্যভিবাদন জানাইয়া সুজাতার হাত ধরিয়া গৃহ হইতে কুমারদেবী নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সুজাতা চাহিয়া দেখিল, চক্ষুদুটি তাঁহার অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

[৩]

"সুজাতা! কতদিন আর একা নারী আমি কঠোর এই রাজধর্ম্মের ভার বহন করতে পারব?"

"একা নারী যতদিন থাকবে, এ ভার এমনি বহন করতেই হবে।" বলিয়া সুজাতা একটু হাসিল।

তেমনই একটু হাসিয়া কুমারদেবী উত্তরে কহিলেন, "একা নারী থাকব না, এমন দোসর কোথায় পাব, যে আমার এ ভারের ভাগ নেবে?"

"সকল নারীই এ দোসর পায়, আর রাণী তুমি পাবে না?"

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কুমারদেবী কহিলেন, "সাধারণ একজন নারী হলে সহজেই হয়ত পেতাম। কিন্তু রাণী বলেই পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে।"

"কিসে?"

"আমাত্যরা কেউ কেউ বলেন, যাঁকেই আমি পতিত্বে বরণ করি, তিনি গৃহেই কেবল আমার পতি হয়ে থাকতে পারেন, রাজ্যশাসনে তাঁর কোনও প্রভুত্বই চলতে পারে না।"

"রাজ্যে তবে তোমার সঙ্গে তাঁর কি সম্বন্ধ হতে পারে?"

"প্রজার সম্বন্ধ—তাই ত শুনছি।"

সুজাতা কহিল, "ভারতের রাজা ত কেউ ননই, কোন্ রাজপুত্রই বা তবে তোমাকে বিবাহ করবেন, আর তাই করে মগধে এসে তোমার প্রজা হয়ে থাকবেন? যদি কেউ থাকে, সে পুরুষ নয়! পুরুষত্বহীন যে, কোনও নারী কি তাকে স্বামী বলে শ্রদ্ধা করতে পারে?"

গভীর একটি নিশ্বাসে কুমারদেবীর বুক ভরিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে কহিলেন, "এঁরা বলেন, বাইরের কোনও রাজা কি রাজপুত্র মগধে এসে আমার প্রজা হয়ে থাকতে চাইবেন না। এরূপ কাউকে যদি পতিত্বে বরণ করি, মগধে তিনি আপন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতেই চেষ্টা করবেন। তেজস্বী লিচ্ছবিরা বিদেশী কোনও রাজার আধিপত্য স্বীকার করবে না। সুতরাং এঁর সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ অনিবার্য্য হয়ে উঠবে।"

"তবে কাকে বিবাহ করতে এঁরা বলেন?"

"লিচ্ছবি কুলের কোন যোগ্য নায়ককে।"

"কিসের যোগ্য?"

"আমার পতিত্বের, আর কিসের?"

"প্রজা কি কখনও রাণীর পতিত্বের যোগ্য হতে পারে? রাণী বলে সম্ভ্রমে যে তোমার সামনে নতশির হয়ে দাঁড়াবে, রাণী বলে যার শাসন ও দণ্ডের কর্ত্রী তুমি, গৃহেই বা কোন্ সাহসে তোমার উপরে স্বামীর প্রভুত্ব সে করবে? আর রাণী কেবল রাজসভায়ই রাণী নয়, গৃহেও অনেক খানি রাণী, সেই গৃহেই বা তার প্রজার দায়িত্ব আর স্বামীর অধিকারের মধ্যে সীমানির্দ্দেশ করে দেবে কে? আর সেই সীমা কিছু মেনে চলা মানুষের পক্ষে সম্ভব কখনও হয় কি? তুমিও পারবে না, সেও পারবে না। যেমন বাইরে, তেমন ঘরেও সমান ভাবে সে তোমার প্রজাই থাকবে। আর সে ঘরও তোমার, তার নয়। স্বামী যদি স্বামীই না হল, তোমার উপরে কর্ত্তা কিছুতে না হয়ে তোমার কর্তৃত্বাধীন—তোমারই মুখাপেক্ষী আর কৃপাভিখারী হয়ে তোমারই ঘরে রইল, তবে—তবে—শুনতে কটু শোনাবে সখী—সে নারী-জীবনের দেবতা, পূজ্য স্বামী নয়,—ঐশ্বর্য্যস্বামিনীর ভোগ্য দাস মাত্র।"

কুমারদেবী কহিলেন, "সত্য কথাই বলেছ সুজাতা! আমার বর্ত্তমান এই জীবনের আর একটি বড় দুর্ভাগ্য হল এই। নারী হয়ে জন্মেছি, কিন্তু পতির আশ্রয়ে নারীজীবনের যে তৃপ্তি, সে তৃপ্তি বুঝি এ জীবনে ভাগ্যে আমার নাই। যিনি আমারই প্রজা, আমার শাসনাধীন, বাইরের কর্ম্মক্ষেত্রে নিয়ত যাঁকে আমারই আদেশপালনে প্রস্তুত থাকতে হবে, স্বামী যেমন আপন প্রভুত্বের আশ্রয়ে স্নেহে স্ত্রীকে রক্ষা করেন, তেমন একটা সম্ভাবনার কথাও কি মনে কখনও তিনি আনতে পারবেন? পুরুষত্বের এই আশ্রয়ই এ সংসারে নারীর স্বর্গ। হায় মহাপাপিনী আমি—এ জীবনে সে স্বর্গের দ্বার আমার রুদ্ধ হয়েই রইল।"

বলিতে বলিতে উত্তরীয়াঞ্চলে কুমারদেবী অশ্রু মার্জ্জনা করিলেন।

স্নেহে তাঁহার হাত দুখানি নামাইয়া নিজের হাতে ধরিয়া স্নেহকরুণ স্বরে সুজাতা কহিল, "কি তবে করবে সখী?"

"বিবাহ বোধ হয় ক'রব না। স্বামীই যদি না পেলাম, তবে বিবাহের খেলাই বা কেন করব? ভোগ্য একটা দাসে মাত্র কোনও লিপ্সা আমার নাই।"

"লিচ্ছবি রাজবংশ যে লুপ্ত হবে।"

"পিতা অপুত্রক অবস্থায় যেদিন নির্ব্বাণ লাভ করেছেন, সেই দিনই তা হয়েছে। জামাতার বংশ কি কারও নিজের বংশ হয়?"

একটু হাসি তখন সুজাতার মুখে ফুটিল; কহিল, "মনে পড়ে কি সখী এক জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত কোষ্ঠী গণনা করে ব'লেছিলেন, দিগ্বিজয়ী বীর রাজাধিরাজের জননী তুমি হবে।"

"বাতুলের প্রলাপ! স্ত্রীর আজ্ঞাধীন পৌরুষবিহীন কোনও পিতার সন্তান দিগ্বিজয়ী বীর রাজাধিরাজ কখনও হয়?"

"এমন কোনও হীন স্বামীর পত্নীত্ব তোমার স্বীকার করতেই হবে, এমন কথাই বা কে আজ বলতে পারে ?"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কুমারদেবী কহিলেন, "যদি বিবাহই হয়, অনুরূপ সম্ভাবনা ত কিছু দেখতে পাচ্ছি না।"

সুজাতা কহিল,"তেজস্বিনী জননীর সন্তানও তেজোবীর্য্যের অধিকারী হতে পারে। ঘরে আমার কাছে যতই কাঁদ আর হা হুতাশ কর, রাজসভায় রাজকীয় মর্য্যাদায় তোমার হীনতা কিছু লক্ষ্য করি নাই।"

প্রতিহারী আসিয়া সংবাদ দিল, আমাত্যপ্রধান আর্য্য সুমিত্র সাক্ষাৎকারের প্রার্থনায় অপেক্ষা করিতেছেন।

"তাঁকে আসতে বল।"

আদেশ পাইয়া সুমিত্র গৃহে প্রবেশ করিলেন। কুমারদেবী উঠিয়া অভিবাদন করিয়া প্রবীণ অমাত্যকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ আর্য্য ?"

সুমিত্র কহিলেন, "সংবাদ বোধ হয় মহারাণীর প্রীতিকর হবে না।"

"কি ? চন্দ্রগুপ্ত আমাদের আদেশ অবজ্ঞা করেছেন ?"

"হাঁ, মহারাণী !"

"তবে এখন যুদ্ধের অভিযানেই বিদ্রোহীকে দমনের চেষ্টা করতে হবে !"

"হাঁ, মহারাণী। মহারাণী এখন যথাযোগ্য আদেশ দিলেই সেনাপতি প্রস্তুত হতে পারেন।"

"আদেশ,—আমার কি আদেশ আর্য্য ? বলুন বিধির আদেশ, ইচ্ছায় হ'ক, অনিচ্ছায় হ'ক, আমাকে তা পালন করতেই হবে।"

সুমিত্র উত্তর করিলেন, "মহারাণী নারী। যুদ্ধের আদেশ দিতে স্বভাবতঃই তাঁর কোমল চিত্ত ব্যথিত হবে। কিন্তু যুদ্ধ এ অবস্থায় অপরিহার্য্য।"

"আমিও তাই বলছি। ভাল, যুদ্ধ যদি অপরিহার্য্যই হয়, তারই ব্যবস্থা তবে করুন। সেনাপতিকে প্রস্তুত হতে বলুন।"

"যে আজ্ঞা।"

"কিন্তু আমার একটি কথা আছে।"

"কি মহারাণী ?"

"আমি নিজে এই যুদ্ধে যাব।"

সুমিত্র শিহরিয়া উঠিলেন। বালিকা কি উন্মাদরোগ-গ্রস্তা হইল ? ধীরে ধীরে শেষে কহিলেন, "মহারাণী এখনও বালিকা।"

"বালিকা হলেও মহারাণী ত বটে। যে যুদ্ধের আদেশ আমাকে দিতে হ'ল সে যুদ্ধে নিজে উপস্থিত থাকব, এ অধিকারটুকু বোধ হয় আমার আছে ?"

"অবশ্য আছে। কিন্তু যুদ্ধে সৈন্যচালনায় ত মহারাণী অভ্যস্তা নন।"

"রাজকার্য্যেও অভ্যস্তা নই। তবু রাজসভায় উপস্থিত থাকি, আপনাদের উপদেশ মতই রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করি। যুদ্ধক্ষেত্রেও তেমনই উপস্থিত থাকব, সেনানায়কদের উপদেশ না হয় আদেশ মতই যুদ্ধ পরিচালনা করব।"

"ভাল, মহারাণীর যেরূপ ইচ্ছা, তাই হবে।"

[৪]

যুদ্ধ আরম্ভ হইল। একদিন উভয় পক্ষে বড় ভীষণ একটি সংঘর্ষ বাধিল ; চন্দ্রগুপ্তের সেনার পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড আক্রমণে লিচ্ছবিরা পশ্চাতে হটিল। কুমারদেবী স্বয়ং শত্রুহস্তে পতিত হইলেন। সহচরিগণসহ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কিছু দূরে সুরক্ষিত এক শিবিরে তিনি নীত হইলেন।

সুজাতা কহিল, "এ কি হ'ল সখী ?"

একটু হাসিয়া কুমারদেবী কহিলেন, "বড় একজন বীরের হাতে বন্দী হলাম, এমন মন্দই বা কি হ'ল ?"

"রাণী তুমি বন্দী হলে, এর চাইতে মন্দ কি আর হতে পারে ?"

"রাণীর পদে এমন সুখ ত কিছু পাচ্ছিলাম না, দেখি নূতন এই বন্দীর জীবনই বা কেমন ?"

"শত্রুর হাতে বন্দিনী তুমি ; শত্রু যদি কোনও অমর্য্যাদা তোমার করে ?"

"আর্য্যনারী আমি আর্য্যবীরের হাতে কোনও অমার্য্যাদার ভয় করি না। আর যদি চন্দ্রগুপ্ত এমন মনুষ্যত্ববিহীনই হন, তাঁর হাতে কোনও অমর্য্যাদা হীন কীটদংশনের মতই অবজ্ঞা আমি করতে পারব।"

সুজাতা কহিল, "না, অমর্যাদা বোধ হয় কিছু করবেন না। তাঁর মত অমন একজন সৌম্যদর্শন বীরপুরুষ—হাঁ। সখী চন্দ্রগুপ্তকে দেখেছ ত?"

ঈষৎ একটু হাসিয়া কুমারদেবী কহিলেন, "হাঁ, দেখেছি বই কি?"

"কেমন দেখলে?"

কুমারদেবী মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন; হাসিমুখেই উত্তর করিলেন, "তোমার চক্ষে তিনি সৌম্যদর্শন বীরপুরুষ। আমি অন্যরকম কিছু বললে কি তা বিশ্বাস করবে?"

"তুমি কি অন্য রকমই কিছু তাঁকে দেখেছ?"

কুমারদেবী কহিলেন, "সুজাতা! চন্দ্রগুপ্তের রূপের আলোচনা এ অবস্থায় আমাদের শোভা পায় না। তবে এ ভরসা অন্ততঃ করি, তাঁর হাতে বন্দিনী বলে কোনও অমর্যাদা তিনি আমাদের করবেন না।"

সুজাতা কহিল, "তা বটে, তবে ভাবছি, রাণী তুমি শত্রুর হাতে পড়লে, লিচ্ছবিদের গতি এখন কি হবে?"

হাসিয়া কুমারদেবী কহিলেন, "সহস্রাধিক বছর লিচ্ছবিরা এই মগধে বাস করছে। শতাধিক বছর প্রাধান্যও এখানে তারা করছে। আমি একটি নারী মাত্র আজ শত্রুর হাতে বন্দিনী হয়েছি। এতেই যদি তারা গতিহীন হয়, তবে এ পৃথিবীতে তাদের থাকবারই কোনও প্রয়োজন দেখতে পাচ্ছি না।"

"কিন্তু এই নারীই যে আজ তাদের রাণী।"

"রাজা কি রাণী একজন কোথাও কেউ অক্ষয় অমর হয়ে থাকে না। আমাকে যদি উদ্ধার তারা নাই করতে পারে, আমি মলে যা করত, তাই এখন করবে।"

"কাকে তারা এখন রাজা করবে?"

"আজ যদি পাটলীপুত্রের রাজগৃহে রোগে আমার মৃত্যু হত, তবে কি মগধ তারা চন্দ্রগুপ্তের হাতে অমনি সঁপে দিত?"

"তা কেন দেবে? তবে তাদের রাণী তুমি আজ শত্রুর হাতে বন্দিনী—এ অমর্যাদা কি তারা অমনি নীরবে সহ্য করতে পারে?"

"সে হ'ল পৃথক্ কথা। জাতীয় অমর্যাদা কোনও জাতিরই সহ্য করা উচিত নয়। যদি যুদ্ধে তারা চন্দ্রগুপ্তকে পরাভূত ক'রে আমায় উদ্ধার করতে পারে ভাল, নইলে—"

"নইলে—কি সখী?"

"যদি কোনও পণে আমার মুক্তির প্রয়োজন হয়, আর যে পণে এর চাইতেও কোনও অমর্যাদা লিচ্ছবি জাতির হয়, তবে সে মুক্তির প্রার্থিনী আমি নই।"

সুজাতা কহিল, "তোমার যোগ্য কথাই তুমি বললে। কিন্তু লিচ্ছবিরাই বা কোন্ মুখে শত্রুর হাতে তোমাকে ফেলে রাখবে?"

"জাতীয় মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে যদি তারা আমাকে উদ্ধার করতে না পারে, তবে রাখতেই হবে। রাণী ব'লে আমার নিজের মর্য্যাদা যে লিচ্ছবিদের জাতীয় মর্য্যাদার উপরে, এরূপ আমি মনে করি না, এরূপ কোনও প্রস্তাবেও আমি সম্মত হতে পারি না। নিজের হাতে মরণকে বরণ করব, তবু লিচ্ছবি জাতির, লিচ্ছবি রাজশক্তির কোনও অমর্য্যাদার নিমিত্তের ভাগী আমি হব না।"

"ধন্য মহারাণী কুমারদেবী! ধন্য লিচ্ছবি জাতি—এমন মহাপ্রাণা মহিমময়ী অধীশ্বরী যাঁদের!"

বলিতে বলিতে সহসা দীপ্ত বীরশ্রীমণ্ডিত সুদর্শন দীর্ঘকায় এক পুরুষ পার্শ্বের এক দ্বার সরাইয়া শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

চমকিয়া কুমারদেবী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সুজাতার হাত ধরিয়া কয়েক পা এক পাশের দিকে সরিয়া গেলেন। আগন্তুক এই পুরুষের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, "কে! কুশজাঙ্গলরাজ চন্দ্রগুপ্ত?"

"আজ্ঞা হাঁ মহারাণী, আমিই আপনার সামন্ত চন্দ্রগুপ্ত, যদিও দুর্ভাগ্যক্রমে আজ বিদ্রোহী হতে হয়েছে।"

"চন্দ্রগুপ্ত!"

"মহারাণী!"

"আমি আজ আপনার বন্দিনী বটে, কিন্তু বন্দিনী হলেও আমি নারী, আমি রাণী। আমাকে এরূপ অবমাননা করা আপনার পক্ষে পুরুষোচিত কি রাজোচিত ব্যবহার হয়েছে কি?"

"সে কি মহারাণী! আপনার অবমাননা! বুঝতে পারছি না মহারাণী—আপনার অবমাননা আমি কিসে করলাম।

অবশ্য আমার দুর্ভাগ্যক্রমে যুদ্ধে আমার সৈন্যের হস্তে আপনি পতিত হ'য়েছেন—"

তেমনই গর্ব্বিত ভাবে কুমারদেবী কহিলেন, "যুদ্ধে এলে শত্রুর হস্তে বন্দী হবার আশঙ্কা সকলেরই আছে। তাতে আমার কোনও অবমাননা হয়েছে, এরূপ আমি মনে করি না। কিন্তু এখানে নিঃসঙ্কোচে নারী আমি সখীর সঙ্গে কথা ব'লছিলাম, আপনি আড়ালে থেকে আমাদের কথাবার্ত্তা শুনেছেন, আমার অনুমোদনের অপেক্ষা না ক'রে এই শিবিরে আপনি প্রবেশ করেছেন। আপনিই বিচার করুন, এটা আপনার পক্ষে ভদ্রোচিত ব্যবহার হয়েছে কি না।"

লজ্জিত চন্দ্রগুপ্ত নতজানু হইয়া করজোড়ে কহিলেন—"অধীনকে মার্জ্জনা করুন মহারাণী। আপনার কোনও রূপ অমর্য্যাদা করব, এ অভিপ্রায় আমার ছিল না। তবে কৌতূহল বশতঃ হীনবুদ্ধি আমি অন্তরালে থেকে আপনাদের কথাবার্ত্তা শুনছিলাম বটে। চিত্তের আবেগে সহসা আত্মবিস্মৃত হ'য়ে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে পড়েছি। আচরণ আমার অভদ্রোচিতই হ'য়েছে; দয়া করে দাসকে মার্জ্জনা করুন।"

কুমারদেবী কহিলেন, "উঠুন কুশজাঙ্গলরাজ, বন্দিনীর সম্মুখে নতজানু হয়ে থাকা বিজয়ী বীরের শোভা পায় না।"

তেমনই বিনয়ে চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন, "রাণীর সম্মুখে অপরাধী সামন্ত আমি নতজানু হয়ে আছি, আমার অবমাননায় বিক্ষুব্ধা নারীর সম্মুখে পুরুষ আমি নতজানু হ'য়ে আছি। মার্জ্জনা পেলেই উঠতে পারি।"

কুমারদেবীর মুখখানি ভরিয়া বড় মধুর একটি রক্তিম আভা ফুটিয়া উঠিল। ঈষৎ অবনত মুখে কহিলেন,"কুশজাঙ্গল রাজ! নারী আমি যে অবমাননা এই মাত্র অনুভব ক'রে-ছিলাম, আপনার সৌজন্যে তার কোনও বেদনা আমার চিত্তে আর নাই। কিন্তু বিদ্রোহী সামন্তের হস্তে আজ আমি বন্দিনী শক্তিহীনা রাণী। এস্থলে ক্ষমার অধিকার আমার কিছুই থাকতে পারে না। যাই হ'ক, উঠে এখন আপনি আসন গ্রহণ করলেই সুখী হব।"

উঠিয়া চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন, "মহারাণী! যে অধিকার-ভোগ ব্যতীত মানুষের মনুষ্যত্বই থাকতে পারে না, সেই অধিকার রক্ষার জন্যই অধীনকে বিদ্রোহী হতে হয়েছে। মহারাণী বুদ্ধিমতী, উদারচিত্তা, মহাপ্রাণা। এতে কি বিশেষ অপরাধী ব'লে আমাকে মনে করতে পারেন?"

কুমারদেবী উত্তর করিলেন, "চন্দ্রগুপ্ত! নিজে আমি আপনার এই বিদ্রোহকে অন্যায় বিদ্রোহ ব'লে মনে করতে পারি না। কিন্তু লিচ্ছবিরাজ্যের রাণী আমি; রাজ্যশাসন আমাকে লিচ্ছবিদের রাজবিধি অনুসারেই করতে হবে।"

"যে ধর্ম্মের যে শাস্ত্র প্রজা মানে সেই শাস্ত্রের বিধান অনুসারে সে তার ধর্ম্মানুষ্ঠান করতে পারবে না, এই রাজবিধি কি অসঙ্গত নয় মহারাণী?"

"হাঁ, নিজে আমি তাই মনে করি বটে, কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি, রাজবিধি লঙ্ঘন ক'রবার অধিকার আমার নাই।"

"আপনি রাণী, কোনও বিধি অন্যায় কি অসঙ্গত হ'লে তার প্রতিকারেও কি আপনার অধিকার নাই?"

কুমারদেবী কহিলেন, "বাইরের সম্বন্ধে আমাদের সামন্ত হ'লেও আপনার রাজ্যের মধ্যে আপনি রাজাই বটেন। আপনি ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের সেবক, রাজবিধি আপনাদেরও শাস্ত্রের অধীন। কোনও বিধি যদি নিজে অন্যায় ব'লে মনে করেন, তবে কি কেবল আপন ক্ষমতায় তার পরিবর্ত্তন আপনি কিছু করতে পারেন?"

"না, শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণ আর রাজ্যের নায়কগণের অনুমোদন ব্যতীত তা পারি না। তবে যত্ন থাকলে এ অনুমোদন লাভ করা দুঃসাধ্য হয় না।"

কুমারদেবী কহিলেন, "আমার পক্ষেও তাই বটে।"

চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন, "মহারাণী, বাহুবলে বৌদ্ধ লিচ্ছবিগণ ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাদের মনুষ্যত্বের এই অধিকারে বঞ্চিত ক'রে রেখেছেন। বাহুবলে আমাদের এ অধিকার [illegible]কে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এই মনে করেই অস্ত্রধারণ করেছিলাম। আর ভরসাও কিছু আমি করেছিলাম,—মহারাণী বন্দিনী হয়েছেন, এই পরাভবে লিচ্ছবিগণ এই অধিকার আমাদের দান করতে হয়ত বাধ্য হবেন।"

কুমারদেবী উত্তর করিলেন, "আমি বন্দিনী হ'য়েছি বলেই যে লিচ্ছবিগণ পরাভূত হয়েছেন, একথা আমি স্বীকার ক'রে নিতে পারি না চন্দ্রগুপ্ত। আমার মুক্তির পণে বাধ্য হ'য়ে যে তাঁরা তাঁদের রাজবিধি অতিক্রম ক'রবেন, এরূপ ইচ্ছাও আমি করি না।"

চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন, "মহারাণীর যোগ্য কথাই মহারাণী বলেছেন। যাই হ'ক, বিনা পণেই মহারাণীকে মুক্তি দিতে আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু যত দিন এ অধিকার না পাই, অস্ত্র ত্যাগও করব না। ভরসা করি অধীনকে তাতে অপরাধী মনে ক'রবেন না।"

কুমারদেবী উত্তর করিলেন, "মনুষ্যত্বের অধিকারলাভে যে বদ্ধপরিকর, অটলপ্রতিজ্ঞ, সে আমার শ্রদ্ধারই পাত্র।"

চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন, "মহারাণী আপনি মুক্ত, যখন ইচ্ছা আপনার শিবিরে ফিরে যেতে পারেন।"

"কিন্তু যুদ্ধ ত চলবে। আবার যদি বন্দিনী হই ?"

একটু হাসি কুমারদেবীর মুখে ফুটিল। চন্দ্রগুপ্তও একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "বন্দিনী আর হবেনই না মহারাণী! আর অনবধানতায় দৈবাৎ যদি কখনও হন, মুক্তি দিতেই আমি বাধ্য থাকব।"

"সাধু।"

"আপনি এখন মুক্ত মহারাণী। তবে একটি কথা দয়া ক'রে মহারাণী লিচ্ছবি-নায়কদের জানালে কৃতার্থ হব। ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য চন্দ্রগুপ্ত তার শক্তির শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করবে। যুদ্ধে প্রাণ দেবে, তবু আপন ধর্ম্মের কোনও অমর্য্যাদা সে সহ্য করবে না।"

"সাধু চন্দ্রগুপ্ত! লিচ্ছবি-নায়কগণ যাতে সকল ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাকেই এই ন্যায্য অধিকার দান করেন, আর তাই স্বীকার করে আপনার সঙ্গে সন্ধি করেন, তার জন্য চেষ্টা আমি যথাসাধ্য করব। তবে প্রতিশ্রুতি কিছুই এখন দিতে পারছি না। আপনার মহত্বে আমি মুগ্ধা, অনুগ্রহে কৃতার্থা এই নারীর অভিবাদন গ্রহণ করুন।"

প্রত্যভিবাদন করিয়া কিয়ৎকাল চন্দ্রগুপ্ত বিস্মিত, মুগ্ধ নেত্রে কুমারদেবীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে শেষে কহিলেন, "মহারাণী! আপনি এখন মুক্ত। মুক্ত ব'লেই ভরসা ক'রে একটি বলছি - আপনার কোনও রূপ অমর্য্যাদা করলাম মনে করে কষ্ট পাবেন না। লিচ্ছবি জাতি শক্তিমান্, তাদের অধীশ্বরী আপনিও মহিমময়ী দেবী! এ অধীনও হীন নয়। যদি—যদি - আপনার সহযোগী হতে পারতাম, ভারতে আবার মগধ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হ'ত, পাটলীপুত্র আবার ভারতের রাজধানী হ'ত।"

আরক্ত মুখখানি কুমারদেবীর আনত হইয়া পড়িল। রাণীর গৌরবদর্প চিত্ত হইতে দূর হইল; রমণীর প্রাণ পুরুষের সম্মুখে নত হইল, পৌরুষের আশ্রয়লাভের জন্য আকুল হইয়া উঠিল। কোমল বাষ্পকম্পিত স্বরে তিনি কহিলেন, "চন্দ্রগুপ্ত! যদি যুদ্ধ নিবৃত্ত হয় আমি স্বয়ম্বরা হব। যদি আহূত হন, দয়া করে উপস্থিত হবেন।"

আবার নতজানু হইয়া সম্ভ্রমে কুমারদেবীকে অভিবাদন করিয়া কোমল গদ্গদ কণ্ঠে চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন, "দেবী! এ দাস কৃতার্থ হ'ল।"

[৫]

যথা সময়ে কুমারদেবী আপন শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। লিচ্ছবি-নায়কগণ সকল কথাই শুনিলেন। চন্দ্রগুপ্তের মহত্বে সকলেরই মুগ্ধচিত্ত তাঁহার প্রতি অতি শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট হইল। এদিকে এই কয়েক দিনের যুদ্ধেও তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, চন্দ্রগুপ্তের শক্তি নগণ্য নহে। তাঁহাকে দমন করিবার চেষ্টায় শক্তির শেষ পর্য্যন্ত লিচ্ছবিদের যুঝিতে হইবে। তাহাতেও চন্দ্রগুপ্ত পরাভূত হইবেন কি না সন্দেহ। তিনি যাহা চান, তাহাও তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অন্যায় দাবী বলা যায় না। উপানন্দপ্রমুখ কতিপয় শ্রমণ কিছু আপত্তি করিলেও লিচ্ছবি-নায়কগণ সকলেই প্রায় একমত হইয়া চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন। ইহার জন্য রাজবিধির যে সংস্কার আবশ্যক, নায়কগণ ও শ্রমণগণ সম্মিলিত হইয়া সত্বর তাহা সম্পাদন করিবেন, এইরূপ স্থির হইল।

যথা সময়ে সন্ধি হইল। কিছুদিন পরে স্বয়ম্বরা হইবেন, এইরূপ অভিপ্রায় কুমারদেবী প্রকাশ করিবেন। তাঁহাকে তিনি বরণ করিবেন, লিচ্ছবি রাজ্যে তাঁহার স্থান কিরূপ হইবে, আমাত্য-সভায় একদিন ইহার আলোচনা হইল। কুমারদেবী দৃঢ়ভাবে জানাইলেন, রাণী বলিয়া তিনি নারীর ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারিবেন না। স্ত্রীর উপরে স্বামীর যে অধিকার আছে, তাঁহার মনোনীত স্বামী সর্ব্বদা সেই অধিকার ভোগ করিবেন, নতুবা বিবাহই তিনি করিবেন না। আমাত্যগণ ইহাতে আপত্তি কিছু করিতে পারিলেন না। মনে মনে এরূপ বাসনাও তাঁহাদের ছিল কুমারদেবী এমন

কাহাকেও বরণ করিবেন না, যাহা হইতে লিচ্ছবিদের জাতীয় স্বার্থের ও রাজকীয় মর্য্যাদার হানি কিছু হইতে পারে।

স্বয়ম্বর ঘোষিত হইল। অন্যান্য অনেক রাজা, রাজপুত্রদের ন্যায় চন্দ্রগুপ্তও আহূত হইয়া আসিলেন।

আজ স্বয়ম্বর। সুজাতা ও অন্যান্য সহচরীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া যথাযোগ্য বসন-ভূষণে সজ্জিতা কুমারদেবী স্বয়ম্বর-সভায় প্রবেশ করিলেন।

সমবেত রাজা ও রাজপুত্রদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া লিচ্ছবি-নায়কদের সম্বোধন করিয়া কুমারদেবী কহিলেন, "লিচ্ছবি-নায়কগণ, আজ এই সমবেত রাজা ও রাজপুত্রদের সমক্ষে আপনারা আমার এই কথার উত্তর দিন। উপস্থিত এই সব রাজা ও রাজপুত্রদের মধ্যে যাঁকে আমি বরণ করব, লিচ্ছবিরাজশক্তি পরিচালনায় তিনি আমার সহযোগী হবেন, আর স্ত্রীর উপরে স্বামীর যে অধিকার আছে, সর্ব্বথা সেই অধিকারও ভোগ করবেন। আমি আপনাদের রাণী বলে তার অন্যথা কখনও হবে না। বলুন, আপনারা এতে প্রস্তুত আছেন?"

"হাঁ, হাঁ! প্রস্তুত—প্রস্তুত! যাঁকে মনোনীত হয়, মহারাণী বরণ করুন।'

প্রথমে আমাত্যগণ, তারপরে নায়কগণ, সকলেই এই প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন।

প্রধানা সখী সুজাতা যথারীতি একে একে উপস্থিত রাজগণ ও রাজপুত্রগণের পরিচয় উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিল। আরক্ত ও আনত মুখে অগ্রসর হইয়া কুমারদেবী চন্দ্রগুপ্তের কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করিলেন।

লিচ্ছবি-নায়কগণ সকলেই আনন্দে মিলিত কণ্ঠে ধ্বনি করিলেন, "জয় মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত মহারাণী কুমারদেবীর জয়?"

চন্দ্রগুপ্ত তখন আসন হইতে উঠিয়া কুমারদেবীর কম্পিত হাতখানি হাতে ধরিয়া কহিলেন, "বলুন মহারাণী কুমারদেবী মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের জয়! লিচ্ছবি-নায়কগণ! আপনাদের মহারাণী যে স্বেচ্ছায় আজ আমাকে পতিত্বে বরণ করলেন, আপনারাও যে আনন্দে তাঁর স্বয়ম্বৃত পতি আমাকে গ্রহণ করলেন, এতে আমি কৃতকৃতার্থ হলাম। মগধের রাজ গৌরবে কুমারদেবীই প্রধানা থাকবেন, আমি থাকব তাঁর সহযোগী মাত্র। রাজকীয় ঘোষণায় ও লিপিতে কুমারদেবীর নামই আমার আগে থাকবে—মুদ্রায় কুমারদেবীর মূর্ত্তি আমার দক্ষিণে অঙ্কিত হবে। * রাজ্যশাসনে যে প্রভুত্বই আমার হ'ক, আপনারা যে লিচ্ছবিবংশীয়া কুমারদেবী ব্যতীত অপর কাহারও প্রভুত্বের অধীন, এরূপ অনুভব করবারই অবসর কখনও পাবেন না। তাই বলছি, আপনাদের জয়ধ্বনিতে কুমারদেবীর নামই আগে উচ্চারণ করুন। বলুন, মহারাণী কুমারদেবী মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের জয়!"

অতি উল্লাসে সভাস্থ নায়কগণ অত্যুচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, "জয় মহারাণী কুমারদেবী মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের জয়।"

লিচ্ছবিদের এই আনন্দের উন্মাদনা ব্যর্থমনোরথ অন্যান্য রাজা ও রাজপুত্রদেরও প্রাণ স্পর্শ করিল। তাঁহারাও এই জয়কারের প্রতিধ্বনি করিলেন।

* এই সময়ের মুদ্রা যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে কুমারদেবীর মূর্ত্তি চন্দ্রগুপ্তের মূর্ত্তির দক্ষিণে অঙ্কিত আছে।

শীত

—শ্রীঅনুরূপা দেবী

নীরব কোকিল গাহে না গান,
ফুল গন্ধহীনা পুষ্প-বিতান।
শীত-শীর্ণ শাখে. আজি, পাখী না ডাকে,
অকালসন্ধ্যায় ম্লানায়মান।
স্মিত হাস্য ভুলি, সতী-প্রকৃতি আজি,
শিত-শুভ্র বাসে বসে বিধবা সাজি,
তার আঁখিপাতে, শিশিরাশ্রু ভাতে,
দিশি, বিষাদ-স্তম্ভিত নত-বয়ান।

পার্সিপোলিস

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অতীত কালের বহু গুপ্ত রহস্য আবিষ্কৃত হচ্ছে প্রত্ন-তাত্ত্বিকের কোদালের আগায়। ইজিপ্ট, সিরিয়া, ব্যাবিলোনিয়া তাদের প্রাচীন মহিমা গোপন রাখতে পারে নি, এবার পালা পড়েছে পারস্য দেশের······

যীশুখৃষ্ট জন্ম গ্রহণ করবার ৩৩১ বছর পূর্ব্বে আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট যখন পার্সিপোলিস্ সহর লুঠ-তরাজ করে আগুন দিয়ে পুড়িয়েছিলেন, তারপর সর্ব্বপ্রথম আজ (১৯৩৩-৩৫) প্রাচীন পার্সিপোলিসের রহস্যময় কাহিনী লোক-সমাজে প্রচারিত হচ্ছে।

পার্সিপোলিস কথাটার অর্থ 'পারস্যের সহর'। এ রকম নাম হবার মানে এই যে, এই সহরের আসল নামটি যে কি ছিল, তা কারো জানা নেই। প্রাচীন যুগের কুয়াসার আড়ালে তা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে বহুকাল। কেবল এইটুকু জানা আছে যে, ২৫০০ বছর আগে পারস্য-সম্রাট দরায়ুস দ্বারা এই সহর নির্ম্মিত হয়—যাঁর পুত্র জ্যারাক্‌সেস বা খয়হর্ষ এথেন্স নগরীর নিকটবর্ত্তী শৈলচূড়ায় বসে স্যালামিসের যুদ্ধ ও গ্রীক বহর কর্ত্তৃক পারস্য বহরের পরাজয় লক্ষ্য করেছিলেন।

বর্ত্তমান শিরাজ সহরের ৩৮ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব কোণে রৌদ্রদগ্ধ মর্ভদস্ত্ উপত্যকায় এই বিশাল প্রাচীন কালের নগরীকে—তার সমাধি, বিরাটকায় প্রস্তরমূর্ত্তি, রাজপ্রাসাদ, স্নানাগার, হারেম, স্তম্ভাবলী—বহুকাল ধরে মরুভূমির কটা

পার্সিপোলিস: জ্যারাক্সাসের (খয়হর্ষ) প্রাসাদ তোরণ। তোরণ-গাত্রস্থ পক্ষযুক্ত বৃষমূর্ত্তিদ্বয় দ্রষ্টব্য। এই পদ্ধতি এসিরিয়া হইতে পারস্যে আনীত বলিয়া অনুমান করা হয়।

বালুরাশির নীচে কৌতূহলী চক্ষুর দৃষ্টি থেকে গোপন রেখে-ছিল—দরায়ুস্ ও খয়হর্ষের সাধের এই রাজধানীকে এতদিনে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ওরিয়েণ্টাল ইনষ্টিটিউট খনন করে দিনের আলোয় প্রকাশ করবার ভার নিয়েছে।

এর ভারপ্রাপ্ত নেতা প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক চার্লস্ ব্রেষ্টেড। খনন-কার্য্যের পরিচালক ডাঃ আর্ণষ্ট হার্জ্জফিল্ড। এঁরা যে শুধু এখানে রাজপ্রাসাদ ও শিল্পদ্রব্য বার করেছেন তা নয়, পারস্য-সম্রাটদের একটা পুস্তকাগার পর্য্যন্ত এঁরা বার করেছেন, তাতে বিশ হাজার কাদার ইঁটের গায়ে কিউনিফর্ম্ম বা বানমুখো অক্ষরে লিখন আছে।

ব্রেষ্টেড বলেন, এইটাই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ আবিষ্কার। এই ইঁটগুলির পাঠোদ্ধার করলে সুদূর অতীত যুগের কি ছবিই না পাওয়া যাবে!

কি ভাবে দরায়ুসের আমলের নাগরিকেরা দিন কাটাত, দিনে মর্ম্মদন্ত্ মরুভূমির বালুর ঝড়ে ঝাল্‌সাপোড়া হয়ে সান্ধ্য জ্যোৎস্নায় তারা প্রাসাদের বিস্তৃত সোপানাবলীতে বসে বসে চারিধারের দূর পর্ব্বতমালার দিকে চেয়ে কি গল্প করত, কোন্ সে সব হারানো প্রেমের কাহিনী? না বুঝে তাদেরও যে সব প্রিয় হয়ত রাগ করে বসে থাকত নিতান্ত নিষ্ঠুরের মত—ঐ সব ইঁটের গায়ে তীক্ষ্ণধার লেখনীর ফলার মুখে চির-কালের মত খোদাই হয়ে আছে সেই সব অবুঝ প্রিয়ের উদ্দেশে লিখিত কত বেদনা-নম্র নিবেদন।

পারস্য গোলাপ আর বুলবুলের দেশ হলে কি হবে, প্রেমের পথে গোলাপ ফুটে থাকে না, কোনো কালেই বুলবুলও ডাকে না, সে পথ ঐ মর্ম্মদন্ত্ মরুভূমির পথ।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই ইউরোপীয় ভ্রমণকারী ও ও প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুদের কাছে পার্সিপোলিস্ সুপরিচিত। একটা দেওয়ালের গায়ে লেখা আছে, "হেন্‌রী ষ্ট্যান্‌লি, নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড, ১৮৭০"। প্রাচীন নগরীর নানা প্রস্তরময় দেবদেবী ও অজ্ঞাত, ভীষণদর্শন জন্তু জানোয়ারের মূর্ত্তি পুরা-কালের ভ্রমণকারীদের ভয় ও বিস্ময় উৎপাদন করে এসেছে।

এখনও কুসংস্কারগ্রস্ত ব্যাকৃতি্য়ান্ বেদের দল সন্ধ্যার পরে এ পথে হাঁটতে সাহস পায় না, খয়হর্ষের রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে যে দুই বিশালকায় পক্ষযুক্ত বৃষের প্রস্তরমূর্ত্তি আছে, তার সম্বন্ধে অনেক গল্প নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রচলিত।

এই পক্ষযুক্ত বৃষ দুটীর মূর্ত্তি যেন প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতীক, প্রাচীন দিনের সমস্ত রাজ্যকে যেন তারা সদর্পে যুদ্ধে আহ্বান করছে।

প্লুটার্ক তাঁর আলেকজাণ্ডারের জীবনীতে লিখেছেন যে, পার্সিপোলিস্ অগ্নিপাত দ্বারা বিধ্বস্ত হয়। এতকাল পরে তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ডাঃ হার্জ্জফিল্ড প্রাসাদগুলির দেওয়ালের আশে পাশে, ঘরের মেঝেতে, গৃহপ্রাঙ্গনে অনেক পোড়া কয়লা ও ছাইয়ের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন।

প্লুটার্কের বিবরণে পাওয়া যায়, পারস্যদেশ বিজয়ের সময় আলেকজাণ্ডার পশ্চিম-পারস্যের সুসা নগরীর সমস্ত অধিবাসীকে হত্যা করেন এবং পার্সিপোলিস অগ্নি দ্বারা বিধ্বস্ত করেন। এখানে এত মুদ্রা ও অন্যান্য মূল্যবান্ জিনিস-পত্র পাওয়া গিয়েছিল যে, সেগুলো বহন করবার জন্য ১০,০০০ জোড়া অশ্বতর ও ৫০০০ উটের আবশ্যক হয়।

পার্সিপোলিস-জয়ের পরে আলেকজাণ্ডার একদিন শিবিরে সুরাপানে মত্ত অবস্থায় আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত ছিলেন। সে সময়ে একটী মেয়ে সর্ব্বপ্রথম পার্সিপোলিস নগরীতে অগ্নিদানের প্রস্তাব করে। খয়হর্ষের প্রাসাদে প্রথমে আগুন দেওয়া হয়, পরে সারা নগরীতে অগ্নিপাত ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে।

পাথরের স্তম্ভ, দেওয়াল, প্রস্তরমূর্ত্তি ইত্যাদি কিছুই নষ্ট হয় নি আগুনে। প্রাসাদের ছাদ ও কড়িবরগা ছিল কাঠের, সেগুলোর কয়লা ঘরের মেঝেতে পাওয়া গিয়েছে। আলেকজাণ্ডারের প্রস্থানের পরে পার্সিপোলিস পরিত্যক্ত হয়। তারপরও এ পথে বহু লুণ্ঠনকারী এসেছে ও গিয়েছে, তাদের মধ্যেও অনেকে নগরীর ধ্বংসাবশিষ্ট দ্রব্যাদি অপহরণ করতে দ্বিধাবোধ করে নি।

এমন কি প্রাচীন পারস্যসম্রাটদের সমাধিগুলি পর্য্যন্ত তস্করদের হাত থেকে অব্যাহতি পায়নি। পাহাড়ের গায়ে খোদাই মূর্ত্তির অনেকগুলি তারা ভেঙ্গে নষ্ট করে দিয়েছে। মাটীর উপরে যেসব স্তম্ভ বা প্রস্তরমূর্ত্তি ছিল, ধ্বংসকারীদের নিষ্ঠুর হাতের চিহ্ন তার সর্ব্বদেহে।

আলেকজাণ্ডারের অভিযানের হাজার বছর পরে ইরাণের মরুভূমির অশ্বারোহী বেদুইন দস্যুদল পার্সিপোলিসের উপ-

কণ্ঠে অনেকগুলি প্রস্তরমূর্ত্তি নষ্ট করে দেয়।

বুশায়ার বা বন্দর আব্বাস পারস্যের একটী প্রধান বন্দর, পারস্য উপসাগরের তীরে। এখান থেকে শিরাজ ১৯৯ মাইল, ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের উপর দিয়ে রাস্তা। চিরকাল ধরে যারা ভ্রমণ করে এসেছে, তাদের পক্ষেও এই পথে ভ্রমণ একটা বিভীষিকার ব্যাপার। বহু পর্ব্বতমালার মাথার উপর দিয়ে দিয়ে মোটরের পথ শেষে গিয়ে নামে মর্ভদস্ত্ উপত্যকায়। মর্ভদস্ত্ সমতল বটে, কিন্তু বর্ত্তমানে মরুপ্রান্তর মাত্র। এই মর্ভদস্ত্ প্রান্তরের কেন্দ্রস্থলে পার্সিপোলিস অবস্থিত।

পার্সিপোলিস সহরের কয়েক মাইল উত্তর-পশ্চিমে কারুন ভ্যালি তেলের খনি। পারস্যের মধ্যে এটাই বর্ত্তমানে সকলের চেয়ে বড় তেলের খনি।

পার্সিপোলিসের সঙ্গে কিন্তু এসব আধুনিক ব্যাপারের কোন যোগ নেই। মরুবালুর মধ্যে বসে সে তার প্রাচীন গৌরবের স্মৃতিতে ভোর হয়ে আছে। বিংশ শতাব্দীর পারস্যকে পার্সিপোলিস চেনে না।

১৬২১ খৃষ্টাব্দে জনৈক ইটালীয়ান ভ্রমণকারী মর্ভদস্তের এই ধ্বংসস্তূপগুলিকে প্রাচীন পারস্যের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ বলে নির্ণয় করেন। কিন্তু তখনকার সময়ে স্তূপখনন বিষয়ে কারও কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। বর্ত্তমান পারস্য গবর্ণমেণ্ট ১৯৩০ সালে ওরিয়েণ্টাল ইনষ্টিটিউটের হাতে খননকার্য্যের ভার না দিলে আরও কতদিন পার্সিপোলিস অনাবিষ্কৃত থাকত কে জানে!

খননকার্য্যের যিনি ভারপ্রাপ্তকর্ম্মচারী ডাঃ হার্জ্জফিল্ড, তাঁর চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি খুঁজে বার করা যেত না। পারস্যে তিনি ত্রিশ বৎসরের উপরে আছেন এবং এদেশে প্রচলিত সকল রকম ভাষাতেই কথা বলতে পারেন।

বহু বৎসর পূর্ব্বে তিনি পার্সিপোলিসের ধ্বংসস্তূপ পর্য্যবেক্ষণ করে ঠিক করেন যে, দরায়ুস ও খয়হর্ষের হারেম অন্য সব অংশের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভালভাবে আছে। সুতরাং যখন অনেকদিন পরে ওরিয়েণ্টাল ইনষ্টিটিউটের তরফ থেকে পার্সিপোলিসের খননভার তাঁর উপর পড়ল, তখন তিনি প্রাসাদের এই অংশটা প্রথমে উদ্ধার ক'রে ও মেরামত্ ক'রে তাঁর আপিস সেখানে বসাবেন ভাবলেন।

কিন্তু কাজটা বড় সহজ ছিল না। এক একখানা প্রস্তর খণ্ড নতুন করে বসাতে হ'ল, যার ওজন কুড়ি টন। তা ছাড়া মাটীর কাজও অনেক করতে হ'ল। এসব মেরামতের কাজ শেষ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত খনন-কারীর দল তাঁবুতে বাস করত, আর সে তাঁবু পাতা হ'ল দরায়ুসের প্রাসাদের ছাদে—কারণ ছাদ তখন চারিপাশের জমির সঙ্গে সমতলে অবস্থিত।

খনন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ ছোট বড় জিনিস পাওয়া যেতে লাগল—পুঁতির দানা, ছোট ছোট প্রস্তরমূর্ত্তি, মৃৎপাত্র, খেলনা ইত্যাদি।

পার্সিপোলিস: রাজ-অশ্ব; আধুনিক অশ্বারোহীর সকল প্রিয় সজ্জাই ইহার অঙ্গে পাওয়া যাইবে।

প্রাসাদের বিভিন্ন অংশের পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ নির্ণয় ক'রে তারপর ডাঃ হার্জ্জফিল্ড একটা নক্সা তৈরী করলেন। নীচের সমতলভূমি থেকে প্রাসাদের সিংহদ্বার পর্য্যন্ত একসারি পাথরের সোপানাবলী। সোপানাবলী গিয়ে শেষ হয়েছে ঐ বিখ্যাত সিংহদ্বারের সম্মুখে, যার দুপাশে পূর্ব্বোক্ত পক্ষযুক্ত বৃষদ্বয়ের বিরাট মূর্ত্তি অবস্থিত। এই সিংহদ্বার নির্ম্মাণ করেন সম্রাট খয়হর্ষ।

প্রাসাদ একটী নয়, অনেকগুলি—দরায়ুসের প্রাসাদ, দরায়ুসের হারেম, খয়হর্ষের প্রাসাদ ও খয়হর্ষের হারেম। পরবর্ত্তী জনৈক সম্রাট আর্ত্তখয়হর্ষের প্রাসাদ। এই প্রাসাদশ্রেণীর মাঝখানে আর একটা সিংহদ্বার আছে, যার দুদিকে দুটী সুবৃহৎ সভাগৃহ। প্রত্যেক সভাগৃহে একশো প্রস্তরস্তম্ভ—স্তম্ভের অরণ্য বলা যেতে পারে।

এই সব স্তম্ভের মাথায় কড়িকাঠগুলি ছিল সব কাঠের। পার্সিপোলিস নগরী যেদিন দগ্ধ হয়, সেইদিন এই দুই সভাগৃহে কি ভীষণ ভাবেই না অগ্নি পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল! সভাগৃহ দুইটীর মেঝেতে ছাই জমে ছিল ২৬ ফুট উঁচু।

প্রাসাদের অন্তঃপুরের দিক থেকে এই সভাগৃহে আসবার কোনও সোপানশ্রেণী প্রথমে দৃষ্টিগোচর হয় নি। কিন্তু হার্জ্জ-

পার্সিপোলিস: রাজার নিকট প্রজা উপহার সামগ্রী বহন করিয়া চলিতেছে। উপরে সিংহী ও সিংহ-শিশু, নিম্নে অশ্ব দ্রষ্টব্য (বা-রিলিফ)।

ফিল্ড ঠিকই অনুমান করেছিলেন যে, এই সব ভগ্নস্তূপ অপসারিত হ'লে সোপানশ্রেণী পাওয়া যাবেই।

তাঁর নির্দ্দেশমত সেই ২৬ ফুট উঁচু ভস্মস্তূপ সরানো হ'ল এবং ফলে দুই সারি প্রস্তরময় সোপান তাদের বিচিত্র কারুকার্য্যসহ আড়াই হাজার বছর পরে আবার দিনের আলোয় মুখ দেখালে। ওরিয়েণ্টাল ইনষ্টিটিউটের কর্ম্মচারিগণ বিবেচনা করেন, এই দুই সারি সোপানশ্রেণী তাঁদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার।

এতকাল পর্য্যন্ত জগতের বিভিন্ন মিউজিয়মে প্রাচীন পারস্য শিল্প ও ভাস্কর্য্যের যে সব নিদর্শন সংগৃহীত হয়ে ছিল, ঐ দুই সোপানশ্রেণীর আবিষ্কারের ফলে তাদের সংখ্যা হঠাৎ দ্বিগুণ বেড়ে গেল, মাত্র কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে।

সোপানশ্রেণীর বাইরের দিকে কোন প্রাচ্য দরবারের চিত্র খোদাই করা। পারস্য-সম্রাটের শরীররক্ষী ও প্রাসাদ-রক্ষী সৈন্যদল একসারি তাদের দিকে এগিয়ে আসছে পারস্য ও মিডিয়া দেশীয় রাজকর্ম্মচারিগণ ও পারস্য সাম্রাজ্যের অধীন আটাশটী বিজিত জাতির রাজদূত। দূতগণের হাতে মূল্যবান্ উপঢৌকন—সোনা, ইবোনি ও হাতীর দাঁতের তৈরী শিল্পদ্রব্য, দামী পক্ষীপুচ্ছ, মধু, নানা প্রকার ফল, গবাদি পশু, সিংহ ও সিংহের বাচ্চা, উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদপূর্ণ পেটিকা।

পারস্য দেশীয় নববর্ষের দিন তারা সম্রাটকে অভিনন্দন করতে এসেছে, এই হ'ল ছবির বিষয়। ২১শে মার্চ্চ প্রাচীন পারস্য দেশীয় পঞ্জিকার নববর্ষের প্রথম দিন।

এই সব ছবিতে খোদাই মূর্ত্তিগুলির উচ্চতা প্রায় ছ' ফুট এবং যতখানি জমিতে ছবি খোদাই আছে, তার দৈর্ঘ্য প্রায় হাজার ফুটের বেশী। একটি জায়গায় ছবিগুলি জড় করলে সাত হাজার বর্গফুট পরিমিত একখানা বড় প্যানেল হয়।

প্রাসাদের দেওয়াল পতনের সময় উপরের সারির কোন কোন ছবি যদিও একটু একটু নষ্ট হয়েছে, কিন্তু মোটের উপর মূর্ত্তিগুলির ভাব আজও এমন সুন্দর ও তাজা যে, মনে হয় শিল্পী কাল মাত্র তার বাটালীর কাজ শেষ করেছে।

প্রাচীন কিংবদন্তী যে অনেক পরিমাণে সত্য, বর্ত্তমান প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে অনেক ক্ষেত্রেই তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, যেমন ট্রয় নগরীর ধ্বংস সম্বন্ধে যে সব গল্প প্রচলিত আছে, তা সত্য হ'ক না হ'ক, ট্রয় নগরী যে আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়েছিল, তার অনেক চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। পার্সিপোলিস-দাহ সম্বন্ধে কিংবদন্তী বহুকালের, কিন্তু এখন খনন করে দেখা যাচ্ছে, কথাটা খুবই সত্য।

পার্সিপোলিস বহু ব্যবহারের ফলে ক্ষয় হয়ে যায় নি, হঠাৎ পরিত্যক্ত হয়েছিল। একটা ঘরে এমন সব চিহ্ন আছে, যা দেখে মনে হয় বাড়ীর লোক ঘরের মধ্যে আহারে বসেছিল, হঠাৎ কোন বিপদ্পাতের দরুণ খাবারের পাত্র ফেলে উঠে পালিয়েছে। আড়াই হাজার বছর পূর্ব্বে প্রাচীন পার্সিপোলিসের এই বাঁধান গৃহতলে কোন্ বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় হয়ে গিয়েছে, আজ কে তার খবর রাখে?

ছোট রেললাইন পাতা হয়েছে রাবিশ বইবার জন্য। রাবিশের মধ্যে হয়তো মূল্যবান্ দ্রব্য থাকতে পারে সেজন্য

রাবিশ এক জায়গায় জড় করে তা বেছে দেখা হয়, যদি কিছু তার মধ্যে মেলে। এক জায়গায় রাবিশ সরাবার পরে খুব লম্বা নর্দ্দমা বার হয়ে পড়েছে, প্রাসাদের জল নিকাশ হ'ত এই নর্দ্দামা দিয়ে। নর্দ্দামা একটা নয়, অনেকগুলি এবং নানা-দিকে তাদের বহু শাখাপ্রশাখা আছে।

এই সব নর্দ্দামার মোট দৈর্ঘ্য এখনও মাপ হয় নি। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, এই সকল নর্দ্দামার প্রস্তুতপ্রণালী বর্ত্তমান কালেরও যে কোনো স্যানিটারি এঞ্জিনিয়ারের গৌরবের বিষয়। অনুমান করা হয়, প্রাচীন পারসীকগণ আসিরীয়া ও ব্যাবিলোনিয়া থেকে নর্দ্দামার গঠন-প্রণালী শিক্ষা করে। আসিরীয়া রাজ্য ছিল বর্ত্তমানে যা উত্তর-ইরাক এবং দক্ষিণ-ইরাকে ছিল সেকালের ব্যাবি-লোনিয়া। বাগ্‌দাদ সহর থেকে ৫০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে টেল্-আসমার প্রান্তরে ওরিয়েণ্টাল ইন্‌ষ্টিটিউট খৃষ্টপূর্ব্ব ২৬০০ বৎসরের একটা প্রাচীন ব্যাবি-লোনীয় নগরী খুঁড়ে বার করেছেন, তাতে সহরের বড় বড় রাজপথের তলায় এই ধরণের পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মিত দেখা যায়।

পার্সিপোলিস সহর থেকে কিছু দূরে মর্ভদস্ত্ প্রান্তরের বক্ষে ছয় হাজার বৎসরের প্রাচীন একটী প্রস্তরযুগের গ্রামের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। এই গ্রামের একটা ঘরের মেঝেতে কতকগুলো মৃৎপাত্র ছিল, তাদের গায়ে নানা রকম ফুল লতা-পাতা আঁকা। ঘরের দেওয়াল রাঙা গিরিমাটী দিয়ে রং-করা।

আধুনিক ঐতিহাসিকগণের ধারণা—এশিয়ার এই সব অঞ্চলে মানব-সভ্যতা প্রথম জন্মলাভ করে। চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ওরিয়েণ্টাল ইন্‌ষ্টিটিউট বর্ত্তমানে এই সভ্যতার ইতিহাসের উপকরণ খুঁজতে ব্যস্ত। উত্তরে তুরস্ক, দক্ষিণে সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন ও ইজিপ্ট, পূর্ব্বে পারস্য—সব শুদ্ধ জড়িয়ে প্রায় ৪০০০ বর্গ মাইল ব্যাপী স্থান এঁদের কর্ম্মক্ষেত্র। এই সব অঞ্চলের জনহীন মরু-প্রান্তরের মধ্যে কত প্রোথিত প্রাচীন নগরীর অস্তিত্ব আছে, তার ঠিকানা নেই। এঁরা তার একটা তালিকা করছেন। ১৯৩২ সালে ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ কোম্পানীর একটা মনোপ্লেন ভাড়া করে এঁরা কায়রো সহরের হেলিওপোলিস এরোড্রোম থেকে ওড়া সুরু করেন এবং প্যালেষ্টাইন, উত্তর ও দক্ষিণ-ইরাক, পূর্ব্বে পারস্য উপসাগরের তীরবর্ত্তী বন্দর আব্বাস এবং উত্তর-পশ্চিমে শিরাজ, পার্সিপোলিস সমস্ত দেশ উড়ে বেড়িয়ে দেখেন, কোথায় কোন্ প্রাচীন নগরীর চিহ্ন আছে ও আকাশ থেকে তাদের ফটো নেন।
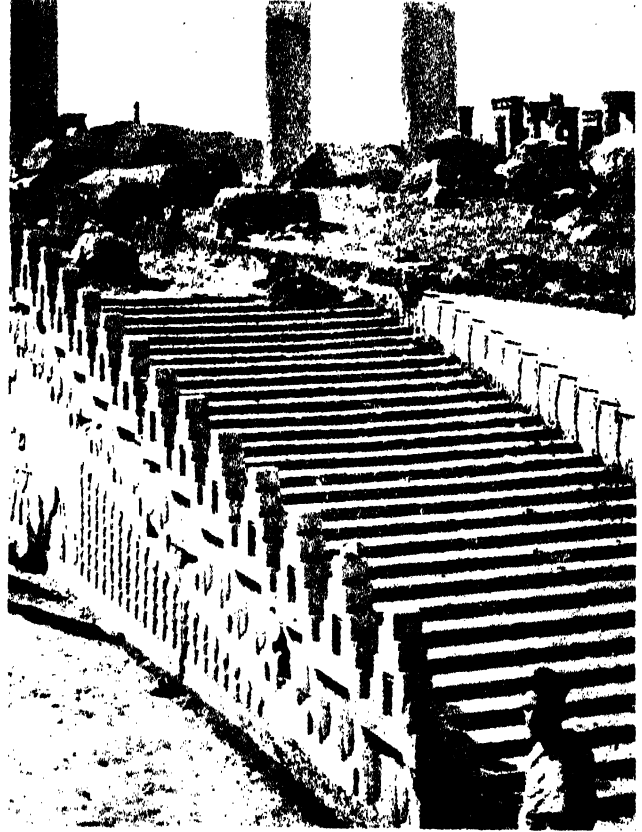
পার্সিপোলিস : রাজ-প্রাসাদের সম্মুখস্থ সোপান-শ্রেণী।

ইরাকের মরুভূমিতে সে সময় ছিল ঝড়ের সময়, কারণ ওঁরা উড়তে সুরু করেন মার্চ্চ মাসে; দিন রাত মরুবালুর ঝড় বইছে, উপরে নীচে অন্ধকার, ইরাকে আবার এই ঝড়ের বালি ১৫০০০ হাজার ফুট উঁচুতে পর্য্যন্ত ঠেলে ওঠে—পাইলট

শুধু বেতারে ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ কোম্পানীর রেডিও-ষ্টেশনগুলি থেকে পথ জেনে নিয়ে চোখ বুঁজে এরোপ্লেন চালালে দিন দুই। তখন সকলে বললে, এতে কোন কাজ হবে না, এত ধুলোতে ফটো নেওয়া যায় কি করে? নাম মাটীতে, ঝড় থামতে দাও।

এরোপ্লেন থেকে পার্সিপোলিস ও বহু প্রাচীন স্থানের সুন্দর ফটোগ্রাফ নেওয়া হয়েছে। এই এরোপ্লেনের চালক ছিলেন বিখ্যাত কাপ্তেন ওলি, যিনি এক সময়ে প্রিন্স অফ ওয়েল্‌সের এরোপ্লেনে পাইলটের কাজ করেছেন। ওরিয়েন্টাল ইনষ্টিটিউটের অন্যতম পরিচালক ডাঃ জেমস্ ব্রেষ্টেড বলেন:—

"মনুষ্যের সভ্যতার উত্থান ও পতনের ইতিহাস একটা গোলোকধাঁধার মত। এর সব খেই খুঁজে পাওয়া ভার। তবুও আমার মনে হয় প্রাচ্যদেশের এই সব অঞ্চলেই এর চাবিকাঠির সন্ধান মিলবে। উত্তর-সিরিয়ায় এলেক্‌জাড্রেট্টা ও আলেপ্পো সহর দুটোর মধ্যে চাটাল হুয়ুক নামে যে প্রাচীন নগরীর ধ্বংসস্তূপ আছে, তার উপর দাঁড়িয়ে আমি দূরবীণ দিয়ে দেখেছি, চারিদিকের প্রান্তরের মধ্যে আরও পঞ্চাশটী প্রাচীন নগরীর স্তূপ বর্ত্তমান। আমরা পশ্চিম-এসিয়ার এই রকম ষোলটা স্তূপ খুঁড়বার ভার নিয়েছি—আমাদের বেশী টাকা নেই। ইউরোপ ও আমেরিকার অন্য অন্য প্রতিষ্ঠান যদি আমাদের মত এদিকে মন দেয়, তবে মানব সভ্যতার একটা অজ্ঞাত অন্ধকার যুগে সত্যের আলোকপাত হবে। হাজার হাজার এরকম প্রাচীন নগরীর ধ্বংসস্তূপ রয়েছে সমস্ত পশ্চিম এসিয়ার মরুভূমিতে ছড়িয়ে।"

উমার বিবাহ-সজ্জা

—৺ইন্দিরা দেবী

শৈলেশবালার কোন প্রিয়তমা সখী
চরণে অলক্ত-রাগ অর্পিতে সজনী,
ঈষৎ হাসিয়া বলে, 'এ-রাঙ্গা চরণতলে,
লুটাবে ভবের শির-চন্দ্র; বিধু-মুখী!'
হাসি'—মালা ছুঁড়ি তারে মারিলা ভবানী।

প্রসাধিকাগণ হেরে মানিয়া বিস্ময়,
উমার নয়ন যুগ্ম ফুল্ল শতদল
কজ্জল রঞ্জিয়া চোখে, তাহে কি সে চাঁদমুখে
অধিক বাড়িল কান্তি? তা তো কভু নয়!
মঙ্গল বলিয়া তাহা দিলেক কেবল।

সুন্দর কুসুম যবে হয় প্রস্ফুটিত
যেমতি সে পুষ্পবৃক্ষ তাহে শোভা পায়,
অসংখ্য তারকাদলে ত্রিযামা যামিনী জ্বলে,
চক্রবাকগণে শোভে জাহ্নবী-সরিত,
ভূষণ তেমতি শোভে পার্ব্বতীর গায়।

মীরা

—শ্রীসুরুচিবালা রায়

[২৬]

জগতের মহাঋষি, মহামানব, বাঙ্গালার দেবর্ষি শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের তিথি, বেলুড় মঠের সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনে মহাসমারোহে রাত্রি শেষ হইতে যে উৎসব সুরু হইয়াছে, বেলাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে সমারোহ ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছে, জাতে অজাতে, ধনীনির্ধনে আজ ভেদাভেদ নাই, সুদূর অতীতের এক শুভক্ষণের স্মরণে নাম নেওয়ার উল্লাসে, কীর্ত্তনের আনন্দে সকলে আজ এক হইয়া গিয়াছে।

কল-কল্লোলিনী ভাগীরথী আজ যাত্রী-যাতায়াতের আঘাতে তরঙ্গচঞ্চলা, বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, কয়েকটী স্বেচ্ছাসেবক ক্লান্ত হইয়া নদীর পাড়ে একটী গাছতলায় আসিয়া বসিল। অদূরে, এখানে ওখানে নানাদলে নানাভাবে কীর্ত্তন চলিয়াছে, সেই দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া একটী ছেলে কহিল—আমি কেবল এই ভেবেই অবাক হয়ে যাই, বিবেকানন্দের মত লোককে যিনি বশ করতে পেরেছিলেন, তাঁর সত্যিই কি আশ্চর্য্য আর অতুলন শক্তি ছিল, এর চেয়ে বড় করে ভাবতে আমি জানি না।

অন্য সকলে চুপ করিয়া রহিল, মনের ভিতর সকলেরই এই কথারই প্রতিধ্বনি উঠিতেছে, মন যখন ভরা থাকে মুখের ভাষায় তখন কতটুকু প্রকাশ পায়!

জাহাজ হইতে নূতন একটী কীর্ত্তনের দল নামিয়া ইহাদের সম্মুখ দিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিয়া গেল। দলটী খানিকটা দূরে চলিয়া গেলে, নিজেদের স্তব্ধ ভাবটা ভাঙ্গিয়া দিয়া একটী ছেলে কহিল—এই সব দেখে শুনে মনে হয়, এর পরও আবার নিজেদের সেই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীগুলির ভিতর গিয়ে ঢুকতে হবে, যেখানে নিত্য অভাব, নিত্য অশান্তি, আর ছোট ছোট কথা নিয়ে নিত্য ঝগড়াঝাঁটি অসহিষ্ণুতা, তখন মনে হয়, সন্ন্যাস-টন্যাস নিয়ে এইখানেই থেকে যাই, বাড়ীতে ফিরে আর কাজ নেই।

ইহাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ যিনি তিনি হাসিয়া কহিলেন, —এ নিতান্তই ছোট মনের কথা হ'ল ভাই, সংসারের ভার সহ্য করতে পারলাম না, মা বাপ ভাইবোনগুলোকে অসহায় ফেলে পালিয়ে এসে, তাই, ধর্ম্মে মন দিলে, ধর্ম্ম কি এত সহজে হয়?

—তা' হলে নরেনদা, কত লোক যে সন্ন্যাসী হয়ে যায়, বেশির ভাগই ত' শুনি সংসার অসহ্য হয়ে উঠল বলেই পালিয়ে এসে সন্ন্যাস নিয়েছে, তাদের কি ধর্ম্ম হচ্ছে না?

—হয়ত হয়, কিন্তু আমার মতে তারা সব নীচুস্তরের সন্ন্যাসী, পৃথিবীর কোনও উপকারেই লাগে না, সংসারের দারিদ্র্য বহন করবার ক্ষমতা, সংসার প্রতিপালন করবার ক্ষমতা নেই বলে পালিয়ে গিয়ে সন্ন্যাসী হওয়া আর নিজেকে শুধু জগতের জন্যই দান করবার জন্য সন্ন্যাসী হওয়া এক রকম নয়! আজ যেখানে এসেছ, তাঁদের বড় বড় সন্ন্যাসীরা সবাই এই রকমের, নিজেকে এরাঁ শুধু নিজের সংসারটীর ভাবেন না, ভাবেন জগতের। যাক, আমাদের কাজের কথা হ'ক।

সকলেই মুখ তুলিয়া বলিল, বলুন।

—আমার কথা ত জানই তোমরা, সংসারে কিছুই দিতে হয় না, রোজগার করি মাষ্টারী ক'রে, বাপ-মার অনুমতি নিয়েই তা যখন যেখানে দরকার মনে করি, দিই, এইবারে এই দিকের পাড়াগাঁওগুলোতে ঘুরে দেখলাম ভীষণ শোচনীয় অবস্থা, ভদ্রলোকের সংখ্যা খুবই কম, যাঁরা আছেন তাঁরা এবং অন্য যারা আছে সবাই দারিদ্র্যে, দুঃখে, রোগে এবং নানারকম কুশিক্ষায় ক্রমে ক্রমে এমন হীন অবস্থায় নেমেছেন, যার চেয়ে অধঃপতন আর হতে পারে না। এখানকার স্বামী শ্রদ্ধানন্দ আমায় কয়েকদিন থেকেই বলছিলেন, ওদিকে দু' একটী আশ্রম করা দরকার এবং আমাকেই তার ভার নিতে বলছেন। আমি রাজী হয়েছি তোমরাও কেউ কেউ আমার সঙ্গে কাজ করতে চেয়েছিলে, তাই তোমাদের বলছি।

—আমাদের কি করতে হবে নরেন দা?

—নূতন আশ্রম গড়ে তুলব, আমি অনেক ভেবে দেখেছি, রামকৃষ্ণ মিশনের দৃষ্টি না পড়লে এই গ্রামগুলোর আর উপায় নেই। ক্ষেতে ফসল নেই, পেটে ভাত নেই, ম্যালেরিয়ায়

ভুগছে, ঔষধ নেই, পথ্য নেই, অভাবে স্বভাব নষ্ট, গ্রামে গ্রামে চোর-ডাকাতের সৃষ্টি হচ্ছে। মাঝে মাঝে এই সব গ্রামে রামকৃষ্ণ মিশনের লোক যায়, ওদের ঔষধ দেয়, পথ্য দেয়, পরবার কাপড় দেয়, যতটা সম্ভব অভাব মাঝে মাঝে ঘুচিয়ে দিয়ে আসে। তাদের ওরা দেবতা বলে মনে করে, দেবতারই মত মানে, তাই ওখানে গিয়ে আশ্রম খুলে যদি বসি আমরা, খুবই উপকার হবে বলে মনে হয়।

—এত টাকা কোথায় পাব আমরা নরেন দা?

—প্রথমে ঘরবাড়ী তৈরী করতে যা দরকার হবে, এখান থেকেই পাব, তারপর দেশের লোকের দয়ার উপর নির্ভর করতে হবে। আশ্রমে হাসপাতাল হবে, স্কুল হবে এবং ক্রমে আরও যা করতে পারা যাবে, সবই হবে। এখন দরকার কাজের লোকের। তোমরা যারা আশ্রমে থাকতে পারবে তারা আশ্রমেই থাকবে,অর্থাৎ যাদের বাড়ীর দিক থেকে কোন বাধা নেই, যেমন প্রতুল, সুরেশ, যোগেন, আমি—এই আশ্রম থেকেও লোক পাব। আর তোমরা সকলে ছুটিতে ছুটিতে মা-বাপের অনুমতি নিয়ে আসবে, দু'চারদিন থাকবে, কাজকর্ম্ম করবে, আবার ফিরে যাবে। ভাল কাজ, সৎকাজ কেবল সংসার ত্যাগ করলেই করা যায় তা ভেব না ভাই, সংসারের ভিতরে থেকেও করা যায়। দূরে দূরে থাকলেও আমরা একই গ্রন্থিতে বাঁধা, তোমাদের দুঃখ করবার কিছু নেই।

—নরেনদা, আমার কথা কি ভুলে গেলেন, আমি কেন আশ্রমে থাকব না?

—কে? পান্নালাল, তুমি? আচ্ছা, সে পরে দেখা যাবে, তোমার বাবা যে অনুমতি দেবেন, সে ত মনে হয় না ভাই।

ক্ষুব্ধ অভিমানমিশ্রিত স্বরে পান্নালাল কহিল,—কিন্তু আমাকে দিয়ে সংসারে আর দরকারও কিছু নেই, সেও ত আপনি জানেন।

হাসিয়া নরেনদা পান্নালালের পিঠে হাত রাখিয়া কহিলেন, —বেশ বেশ, বলেছি ত দেখা যাবে।

দূরে প্রসাদ পাইবার জায়গায় ভিড় ক্রমে বাড়িতেছিল, স্বেচ্ছাসেবকের দল দ্রুত সেইদিকে অগ্রসর হইলেন।

[২৭]

শীতের শেষ বেলা, গাছগুলির উপর দিয়া সূর্য্যদেব দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গেলেন, পাতাগুলির ফাঁকে ফাঁকে গ্রামের পথে আলোছায়ার খেলাও ধীরে ধীরে মিলাইয়া আসিল। সম্মুখে অমাবস্যার ভীষণ অন্ধকার রাত্রি, সন্ধ্যার গোধূলিলগ্নেই পৃথিবী ঘনঘোর অন্ধকারে ছাইয়া গেল।

সঙ্কীর্ণ গ্রাম্যপথে ভয়াবহ নিস্তব্ধতার ভিতর দিয়া একাকী একটি পথিক দ্রুত হাঁটিয়া চলিয়াছে। দুপাশের ঘরগুলিতে আলো, বাতির বা-লোক চলাচলের চিহ্নমাত্র দেখা যায় না—গ্রামে মহামারী লাগিয়াছে, গ্রাম উজাড় করিয়া লোক মরিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে, শেষ পর্য্যন্ত যাহারা কোন মতে বাঁচিয়া গিয়াছিল, তাহারা গ্রাম ত্যাগ করিয়া টিঁকিয়া গিয়াছে।

গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে আসিয়া সতীশচন্দ্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। মহামারী এ গ্রামে আসিয়াও প্রবেশ করিয়াছে সত্য কিন্তু গ্রাম এখনও নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। পথে লোকজন না থাকিলেও কোন গৃহে অতি মৃদু একটী কান্নার শব্দ, কোন রুদ্ধ গৃহের ফাঁক দিয়া একটু ম্লান আলোর রেখা ও অস্পষ্ট কথোপকথনের শব্দ এখনও কাণে ভাসিয়া আসিতেছে, কতক্ষণে এ সবেরও শেষ হইবে—কে জানে! সে গতির বেগ বৃদ্ধি করিল, দূরে নন্দনপুর কাছারীবাড়ীর বড় আলোটী চোখে পড়িতেছে, সতীশচন্দ্রের পথ চলা আজিকার মত ঐখানে গিয়াই শেষ হইবে।

গৃহের সম্মুখে আসিয়া সতীশচন্দ্র বিস্মিত হইল। কাছারীর ম্যানেজার বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় তাহার বিশেষ বন্ধু, মাঝে মাঝে এখানে আসিয়া সে বন্ধুর কাছে দুই চারিদিন থাকিয়া যায়, অন্যবারের মত দ্বারোয়ান চাকরবাকরদের ব্যস্ততা, গ্রামের সম্ভ্রান্ত লোকদের এখানে গানবাজনা বা তাসপাশার মজলিস—কোথায় আজ সব?

প্রায়ই এ কাছারী হইতে অনেক টাকা জমিদারীতে যায় বলিয়া যে দুটী বিশালকায় ভোজপুরী দ্বারোয়ানকে দ্বারপ্রান্তে সর্ব্বদাই বসিয়া থাকিতে দেখা যায়, আজ তাহারাই বা কোথায় গেল? বিস্মিত সতীশ ধীরে ধীরে বারান্দায় আসিয়া এদিকে ওদিকে তাকাইল, বহু দূর হইতে দ্বিতলের বারান্দার যে বড় আলোটী দেখা যাইতেছিল, তেমনি একটী আলো একতলার সদর দরজার সম্মুখেও জ্বলিতেছে, দ্বারোয়ানদের রুদ্ধদ্বারের

ফাঁক দিয়া অতি সূক্ষ্ম একটা আলোর রেখা বাহিরের বাগানে এবং উঠানে আসিয়া ঠিকরিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু লোকজনের কোন চিহ্ন কোথাও নাই।

উপরে দ্বিতলের একটি শয্যায় শায়িত বিশ্বনাথ তখন হোমিওপ্যাথিক ঔষধের একটি ছোট বাক্স ও বই সম্মুখে খুলিয়া রাখিয়া নিজেই নিজের চিকিৎসার বিধান করিতেছে, শ্লথ কম্পিত হস্তে বহিখানির পাতার পর পাতায় সজল চোখের নিষ্প্রভ দৃষ্টি বুলাইয়া যাইতেছে।

সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই রোগের মৃদু আক্রমণ বুঝিতে পারিয়া বিপন্ন বিশ্বনাথ তখন হইতেই সতর্ক হইয়াছিল। কাছারীতে প্রায় ষাট সত্তর হাজার টাকা জমা হইয়াছে, আজই সন্ধ্যার গাড়ীতে একটি দ্বারোয়ান ও ভৃত্যসহ তাহার জমিদারীতে টাকা লইয়া যাবার কথা ছিল, কিন্তু রোগের আকস্মিক আক্রমণে সকল কিছুই ওলটপালট হইয়া গেল, ভৃত্যটীকে জমিদারীতে খবর দিতে পাঠাইয়া দ্বারোয়ানদের পাহারার উপর নির্ভর করিয়া বিশ্বনাথ আসিয়া শয্যাগ্রহণ করিল। কিন্তু অনতিবিলম্বেই যে দ্বারোয়ান এবং অন্যান্য ভৃত্যেরাও যে-যাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, বিশ্বনাথের এখবর জানিতেও বিলম্ব হইল না। সিন্দুকের চাবিটি বালিশের নীচে রাখিয়া এবং ঔষধ, বই এবং জলের গোটা চার পাঁচ কুঁজো শয্যার পাশে হাতের কাছে নিয়া কম্পিত হস্তে দুইখানি পত্র লিখিয়া টেবিলের উপর রাখিল, একখানি তাহার প্রভু জমিদার মহাশয়কে, দ্বিতীয়খানি তাহার দুঃখিনী অভাগিনী পত্নীকে।

রোগের যন্ত্রণাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুদুটিও ক্রমে অস্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছিল। বইখানি ক্লান্তভাবে বালিশের পাশে রাখিয়া, অতি কষ্টে বাক্স হইতে আর এক ডোজ ঔষধ পান করিয়া, বিশ্বনাথ গভীর ভাবে একটী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া, শয্যার উপর ছটফট করিতে লাগিল,—মরণ মানুষের আসে, পৃথিবীর সকলেই একদিন মরে, কিন্তু এমন শূন্য গৃহে, নিজের চিকিৎসা নিজে করিতে করিতে, একাকী মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে করিতে মরা, এ কোন্ পাপের শাস্তি—কে জানে!

ব্যাকুল ভাবে ছটফট করিতে করিতে, বিশ্বনাথের সমস্ত শক্তি যখন ক্রমে ক্ষয় হইয়া আসিতেছিল, তখনই ভীত, বিবর্ণ মুখে সতীশচন্দ্র বন্ধুর শয্যার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার সমস্ত দেহ কাঁপিতেছিল, বহু কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া সে বলিল, তুমি? বিশু তুমি? তোমার এই অবস্থা? হা ভগবান!

অতি কষ্টে চক্ষু দুটি পরিষ্কার করিয়া মেলিয়া, বিশ্বনাথ বন্ধুকে চিনিতে পারিয়া, বন্ধুর দিকে দুইহাত প্রসারিত করিয়া দিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বন্ধু মুহূর্ত্তের জন্য একবার একটু দ্বিধা করিল, তাহার পরই সরিয়া আসিয়া বন্ধুকে জড়াইয়া ধরিল, তাহার পর শুশ্রূষা এবং যথাসম্ভব চিকিৎসাও করিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের মধ্যেই বিশ্বনাথ নির্জ্জীব হইয়া পড়িতে লাগিল। জীবনের আর কোনও আশাই নাই যখন নিজেও তাহা বুঝিতে পারিল, তখন বিশ্বনাথ ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে আরম্ভ করিল, কাঁদিতে কাঁদিতেই বালিশের তলা হইতে চাবীর গোছা তুলিয়া বন্ধুর হাতে দিল। জমিদারীর ষাট সত্তর হাজার টাকা সিন্দুকে জমা আছে, জমিদার বাটী হইতে কালই সকালের মধ্যে লোক আসিয়া পৌছিবে, তাহাদের হাতে সে টাকা তুলিয়া দিয়া, সকল অবস্থা পরিষ্কার করিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া, তবে যেন সতীশ বিদায় গ্রহণ করে,—অন্তিমকালে বন্ধুর কাছে তাহার এই একান্ত মিনতি!

সতীশ চাবীর গোছা হাতে নিয়া সজল চোখে বন্ধুর চোখের জল মুছাইয়া দিল, অন্তিমের জ্যোতিঃহীন পাণ্ডুর চক্ষু দুটিতে দৃষ্টি আর ফুটিতে চাহে না, কিন্তু এত জল তবু কোথা হইতে আসে! গলার স্বর বাহির হইতে চায় না, কত কথা তবু এখনও বলিবার আছে! বাহিরের অঙ্গ যখন নিস্পন্দ হইয়া আসিতেছে, ভিতরের জ্ঞান তখনও, তবু এত সতেজ কেন!

বহু কষ্টে গোঙ্গানীর মত অতি অস্পষ্ট স্বরে বিশ্বনাথ আবার জানাইল, তাহার সারাজীবনের সঞ্চিত অর্থ, এইখানেই সুদে লাগাইয়া যাহা এতদিনে বার হাজার টাকা হইয়াছে, তাহাও ঐ সিন্দুকেই আলাদা রাখা আছে, সতীশ নিজের হাতে যেন তাহার দুঃখিনী পত্নীকে এই টাকা দিয়া আসে, এবং আর যাহা বলিলে সে শান্ত হইতে পারে, তেমনই সান্ত্বনার কথা বলিয়া যেন সে তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করে।

রাত্রিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বনাথের কাতরতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং অবশেষে কাঁদিতে কাঁদিতে সজ্ঞানে স্ত্রীপুত্র-

কন্যারই দুঃখের কথা ভাবিতে ভাবিতে, বন্ধুর হাতে হাত রাখিয়া, মধ্যরাত্রিতে তাহার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইল।

[২৮]

অভিশপ্ত রাত্রি,—অভিশপ্তই বটে! সমস্ত গ্রামখানি, শুধু তাহাই নয়, আশে পাশের তিন চারিখানি গ্রামে যখন মহামারী তাহার মরণ-নাচন নাচিয়া নাচিয়া, গ্রামগুলিকে প্রায় শূন্য করিয়া তুলিয়াছে, ঘরে ঘরে যখন বাহকের অভাবে শবগুলি ফুলিয়া পচিয়া বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে, তখন বহুদূর হইতে এত রাত্রিতে এখানে আসিয়া, তাহার পঁহুছিবার কারণ কি ছিল শুধু একক গৃহে সারারাত্রি বন্ধুর শব আগুলিয়া রাখিবার জন্য?

প্রহরের পর প্রহর অতীত হইতেছে, বন্ধুর শয্যায় বসিয়া, তখনও হাতে হাতখানি ধরিয়া রাখিয়া সতীশ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে। সে হাতে সেই স্পন্দন, সেই কম্পন আর নাই, এই যে খানিকক্ষণ আগেও এত কাঁদিয়া সে আকুল হইতেছিল যাহাদের জন্য, এখন তাহারা সকলে ডাকিয়া ডাকিয়া গলা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেও আর সে সাড়া দিবে না! কোথায় গেল বিশ্বনাথ! এ যে কিছুই দেখা গেল না, বুঝা গেল না, অথচ বিশ্বনাথ চলিয়া গিয়াছে! বিশ্বনাথ চলিয়া গিয়াছে, বিশ্বনাথ আর নাই, এ দেহটা তবে কার!

হঠাৎ সতীশের সমস্ত দেহে মনে একটা ত্রাসের কম্পন অনুভূত হইতে লাগিল, মনে একটু সাহস সঞ্চয়ের আশায় সতীশ উঠিয়া ঘরের এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। আশেপাশে সম্মুখে বা নিকটে লোকজনের চিহ্নমাত্রও কোথাও দেখা যায় না; অমাবস্যার ভীষণ অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া পথে ঘাটে সর্ব্বত্র ভয়াবহরূপে পড়িয়া আছে, তাহারই মাঝে এ বাড়ীর এই উজ্জ্বল আলো সতীশের চোখে যেন অসহনীয় হইয়া উঠিল। বাহিরের যে ভয়ঙ্কর অন্ধকার চতুষ্পার্শ্বের গ্রামগুলির প্রেতাত্মার নিঃশ্বাসে ভারী হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই মাঝে জীবন্ত সতীশের এই মূর্ত্তি যেন অশরীরীদের চোখে স্পষ্টতর হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। সতীশ দ্বারপ্রান্ত হইতে সরিয়া আসিয়া ওপাশের একটা জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, ওদিকের একটা বাড়ী হইতে থাকিয়া থাকিয়া একটা চাপা ক্রন্দন কাণে প্রবেশ করিয়া সহসা সতীশের সর্ব্বদেহ যেন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, দ্রুত সরিয়া আসিয়া সতীশ গৃহের সকল দ্বার-জানালাগুলি দ্রুত বন্ধ করিয়া, শব হইতে খানিকটা দূরে একখানা বিছানা পাতিয়া বসিল। সম্মুখে দেয়ালের গায়ে প্রকাণ্ড একটা লোহার সিন্দুক, তাহার উপর রামায়ণ, মহাভারত, রামকৃষ্ণ পরমহংসের একখানা ফটো এবং খান-কয়েক চিঠিপত্র ও হিসাবের খাতা রহিয়াছে, সময় কাটাইবার জন্য সতীশ বই দুখানি টানিয়া নীচে নামাইল।

বাহিরে উঠানে এবং বারান্দার দ্বারপ্রান্তে মাঝে মাঝে দুই একটা শব্দ শ্রুত হইতেছিল, শেয়াল কুকুর মনে করিয়া সতীশ মনকে অভয় দিতে চেষ্টা করিল,—রাত্রি ক্রমে বাড়িতে লাগিল, বহির পাতা খুলিয়া, সতীশ চেষ্টা সত্ত্বেও অক্ষরগুলিতে বিশেষ মনঃসংযোগ করিতে পারিতেছিল না, বিশ্বনাথের অতৃপ্ত আত্মা আরও কত কথা বলিবার জন্য কেবলই যেন সতীশকে কাছে যাইতে বলিতেছে, শয্যায় বসিয়া সতীশের একটা কম্পন বোধ হইতে লাগিল, সিন্দুকের উপর হইতে রামকৃষ্ণের ফটো-খানি নামাইয়া নিয়া, তাহারই পানে তাকাইয়া তাকাইয়া সতীশ নিজেকে নির্ব্বিকার মনে করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু বাহিরের শব্দটা এইবারে আরও একটু জোরে শ্রুত হইয়া সতীশকে একটু চঞ্চল করিয়া তুলিল,—হয়ত বা বিড়াল, হয়ত বা কুকুর, কিংবা চোর-ডাকাত নয় ত? কাছারীবাড়ীতে সঞ্চিত টাকার কথা গ্রামের এবং ভিন্ন গ্রামেও অনেকেই হয়ত জানে। দ্বার ভাঙ্গিয়া যদি এখনই ঘরে প্রবেশ করিয়া লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়, একাকী সতীশ কি করিবে? তাহার পর কাল প্রভাতে তাহার কথা কে বিশ্বাস করিবে? অপরের গচ্ছিত অর্থের গুরু ভার বহন করিয়া তাহার পর জেল খাটিতে হইবে না কি? প্রেতাত্মার চিন্তা দূর হইয়া গিয়া, সতীশের মনে নূতন ভাবনার উদয় হইল।

রাত্রির অন্ধকার-প্রহর ক্রমে ক্রমে কাটিয়া আসিতেছিল, সতীশের ভাবনার গতিও ক্রমে ক্রমে ভিন্ন দিকে ঘুরিল, দাঁতে অধর পিষ্ট করিয়া, ভ্রূকুঞ্চিত ভাবে অর্দ্ধশায়িতাবস্থা হইতে উঠিয়া বসিয়া সতীশ ভাবিল,—এই মুহূর্ত্তে ডাকাতে নিয়া গেলেও সিন্দুকের এই টাকা আর থাকিবে না, এবং জমিদার বাবুদের খুব বেশি ক্ষতিও তাহাতে কিছু হইবে না, কিন্তু মাঝে

হইতে বিনা দোষে চোর নামের অপবাদ তাহাকে সহিতে হইবে, তাহার চেয়ে,—তাহার চেয়ে—

সতীশ শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া, নতমস্তকে ঘরে পাদচারণা করিতে লাগিল,—পদক্ষেপ ধীর হইতে ক্রমে দ্রুত হইতে লাগিল, মুখের শোকাকুল ব্যথিত বিবর্ণ ভাব ক্রমে কঠিন হইয়া আসিল, হস্তদুটি দৃঢ়বদ্ধ ভাবে বুকে রাখিয়া সতীশ ভাবিতে লাগিল তাহার চেয়ে সত্য সত্যই ডাকাতের পার্টই একবার জীবনে অভিনয় করা যাক, সম্মুখে এত টাকা, আর গৃহ তাহার কানাকড়িশূন্য, একটা ছেলে দারুণ ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া, বিনা চিকিৎসায়, বিনা ঔষধপথ্যে চোখের সম্মুখে মরিল; বড় মেয়েটা বাড়ীশুদ্ধ লোকের চক্ষুর শূল হইয়া ক্ষীণ, শীর্ণ সরল রেখাকারেই কেবল বাড়িয়া উঠিতেছে; জ্ঞাতিরা, সমাজপতিরা মাঝে মাঝে হুঙ্কার ছাড়েন, কিন্তু উপায় বলিয়া দেন না। কচি মেয়েটির দুধের অভাবে তাহার মা তাহাকে ভাতের ফেন খাওয়ায়,—সংসারের তাহার এই অবস্থা, আর তাহারই কাছে গচ্ছিত আজ এত টাকা!

·· কখনও বসিয়া, কখনও দাঁড়াইয়া, কখনও দ্রুত পদে পায়চারী করিয়া সতীশ তাহার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল; ভাবিতে লাগিল,—ক্ষতি কার? বৎসরে যাঁহার বার চৌদ্দ লাখ টাকা আয়, এই যৎসামান্য টাকায় তাঁহার কতটা ক্ষতি হইবে? কিছুই নয়, প্রজার রক্ত শোষণ করিয়াই ত এই টাকা সিন্দুকে উঠিয়াছে,—যে প্রজা অনাহারে, অর্দ্ধাহারে মৃতপ্রায় হইয়া, রুদ্ধদ্বার গৃহে বিনা ঔষধপথ্যে, বিনা চিকিৎসায় মরিতেছে! গ্রামে ডাক্তার নাই, ঔষধ নাই, পথ্য নাই, শুষ্ক জলাশয়গুলিতে জল নাই, কাদার আকারে তরল পদার্থপ্রায় যাহা পড়িয়া আছে, তৃষ্ণার সময় তাহাই আপনি খাইয়া, সন্তানকে খাওয়াইয়া দলে দলে লোক মহামারীতে মরিতেছে,—এসব প্রজার কাছ হইতে টাকা নিবার অধিকার জমিদারের কোন্ নায্য আইন মতে?

······জমীদারের অধিকার নাই, সত্য, কিন্তু তাহারই বা অধিকার কিসের!.:.বদ্ধ মুষ্টিতে সতীশ স্তব্ধ হইয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল—কিসের অধিকার তাহার? দারিদ্র্যের অধিকার। তাহার কিছু নাই, আর একজনের অনেক আছে, তাহার ঘরে ভাত নাই, আর একঘরে থালায় থালায় ভাত অবহেলায় অনাদরে উচ্ছিষ্ট পড়িয়া থাকে—যার অনেক আছে, তাহার আর প্রয়োজন নাই, কিন্তু তাহার কোন প্রয়োজন আজিও জীবনে মেটে নাই,—সেই অধিকার! দারিদ্র্যের অধিকার!

রক্তিম মুখে সতীশের রক্তিম চক্ষু দুটি লালসার আগুনে ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

রাত্রি অতীত হইয়া যাইতেছে, যাহা করিবার এখনই করিতে হইবে, বিলম্বে কার্য্য সিদ্ধি হইবে না এবং হয়ত তাহারই চক্ষুর সম্মুখে অপরে লুঠিয়া লইবে, যাঁহাদের জিনিষ তাঁহাদের ভোগেও আসিবে না।

আস্তে আস্তে অগ্রসর হইয়া আসিয়া সতীশ ধীরে ধীরে কম্পিত হস্তে সিন্দুকের ডালা খুলিল. তাহার পর নত হইয়া ভিতরের দিকে তাকাইল, মুহূর্ত্তের জন্য সতীশ চমকিয়া চক্ষু মুদিল—সর্ব্বনাশ, এত নোটের তোড়া, এত টাকা তাহার চৌদ্দ পুরুষেও ত কেহ কখনো দেখে নাই, বুকের স্পন্দন ক্রমে ক্রমে যেন তাহার বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, কম্পিত হস্তে সিন্দুকের ডালা ফেলিয়া দিয়া সতীশ দুই তিন পা পিছু হটিয়া আসিল, তাহার পর শ্লথ পদে আবার ঘরে পায়চারী করিতে লাগিল। হাত পা শীতল এবং মাথা যেন ক্রমে ক্রমে তাহার গরম হইয়া উঠিতেছিল। ভয়-ভাবনা চিন্তা ক্রমে একেবারে সব দূর হইয়া গেল, চলা স্থগিত রাখিয়া সতীশ আবার আসিয়া ডালা তুলিয়া ধরিল।

—মিনিট পনের কাটিয়া গেল—চাদরটী কোমরে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া মোটা একটী লাঠি হাতে নিয়া, সতীশ একবার আসিয়া বিশ্বনাথের মৃতদেহের পাশে দাঁড়াইল, সর্ব্বাঙ্গ তাহার ভাল করিয়া ঢাকিয়া দিয়া, মৃদু অস্পষ্ট স্বরে কহিল, 'বন্ধু, তোমার স্ত্রীপুত্রকে বঞ্চিত করিব না, তবু যদি অপরাধ হয়, ভগবান আমাকে ক্ষমা করিবেন, তুমিও করিও।'

গৃহের আলোটী উজ্জ্বলতর করিয়া দিয়া, সতীশ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল এবং তাহার পর প্রায় রুদ্ধশ্বাসে দারুণ অন্ধকারের ভিতর দিয়া সতীশ ছুটিয়া চলিল, গ্রাম অতিক্রম করিয়া আসিতে বেশী সময় তাহার লাগিল না,—ডান পার্শ্বে গ্রামের শ্মশান, প্রায় চক্ষু মুদিয়া চলিতে চলিতে সহসা কিসে হোঁচট খাইয়া পড়িতে পড়িতে সতীশ উঠিয়া দাঁড়াইল; শ্মশানের উপর এক পাশে একটা চিতা জ্বলিতেছিল, তাহারই অস্পষ্ট আলোক সতীশ চাহিয়া দেখিল, ভূলুণ্ঠিত

বস্তুটা একটা শব, অদূরে একটা শেয়াল বসিয়া আছে, খুব সম্ভব এটা তাহারই ভক্ষ্য জিনিষ, আগন্তুক দেখিয়া ঝোপের আড়ালে গিয়া অপেক্ষা করিতেছে।

দ্বিতীয় বার আর চাহিবার সাহস সতীশের রহিল না, পথে বিপথে ঝোপে জঙ্গলে সে ছুটিয়া চলিল।

শেষ রাত্রিতে নদীর পাড়ে পাড়ে হাঁটিয়া আসিয়া, যখন সে বাড়ীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন অল্প রাত্রির সেই ভীষণ অন্ধকার ক্রমে হালকা হইয়া আসিয়াছে, সতীশ স্থির ভাবে একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া এদিকে ওদিকে চাহিয়া নদীর জলে পা দুটি ধুইল। বহুদূরে নৌকাপথে কোন এক যাত্রী চলিয়াছে, তাহারই নৌকা হইতে সুমিষ্ট একটী বাঁশীর সুর জলের ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ভাসিয়া আসিতেছে; জলের অপর পারে, বালুর চরের ভিতর গিয়া জল যেখানে মিলাইয়া গিয়াছে, সেখানে আকাশের গায় পুঞ্জীভূত অন্ধকার ভেদ করিয়া একটী মাত্র তারা উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে,—সেই দিকে চাহিয়া শান্ত মনে সতীশ ভাবিল, আমার নূতন গৃহপ্রবেশের শুভ রাত্রে ঐ আমার স্বাতী নক্ষত্র!

ভাঙ্গা ঘরের ভাঙ্গা বেড়ার ফাঁক দিয়া সতীশ চাহিয়া চাহিয়া দেখিল, অতি অস্পষ্ট আলোর সম্মুখে বসিয়া পত্নী সুরমা রুগ্ন সন্তানের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি দেখিতেছে। সতীশ ধীরে ধীরে দাওয়ায় উঠিয়া দ্বারে ধাক্কা দিল।

[২৮]

বহু লক্ষ টাকা যাঁহাদের জমিদারীর আয়, যাট সত্তর হাজার টাকার লোকসানে তাঁহাদের অভাব পরিপূরণের কিছু ন্যূনতা ঘটিলেও, সর্ব্বনাশ কিছু হইল না; কিন্তু মাসিক সামান্য কিছু মাহিনার টাকায় যাহাদের সংসার চলিত, সেই মাহিনার অভাবে সেই সংসার তাহাদের অচল হইয়া দাঁড়াইল, স্বামীর সঞ্চিত সেই বার হাজার টাকার কথাও বিশ্বনাথের পত্নী জানিত, তাই পতিশোকের সঙ্গে সঙ্গে, এই টাকার অভাবটীও তাহাকে জীবন্মৃত করিয়া দিল। ক্ষুধার্ত্ত শিশুগুলির, বয়স্থা কন্যার মুখপানে চাহিয়া, দু'দণ্ড বসিয়া শোক করিবারও অবসর তাহার জুটিল না।—অনেক ভাবিয়া, অবশেষে শ্বশুরের আমলের আশ্রিত এবং অনুগত রতনসিংকে সঙ্গে দিয়া, আট বৎসরের জ্যেষ্ঠ পুত্রটীকে বিশ্বনাথের পত্নী জমিদারবাড়ীতে পাঠাইল। বিশ্বনাথ তাঁহাদের বহু কালের বিশ্বাসী কর্ম্মচারী ছিল, আজ তাহার অভাবে তাঁহার এই দীন দুঃখী অনাথ শিশুগুলিকে অনুগ্রহের দৃষ্টিতে তাঁহারা দেখিতেও বা পারেন!

বালকটীকে সঙ্গে করিয়া, বহু দূরের পথ বহু কষ্টে অতিক্রম করিয়া রতনসিং যখন জমিদারবাটীতে আসিয়া পঁহুছিল, বৈঠকখানার সুপ্রশস্ত মার্ব্বেলমণ্ডিত দালানে একখানি ঢালা বিছানা পাতিয়া তখন কর্ত্তার জ্যেষ্ঠপুত্র 'বড় বাবু' তাঁহার বন্ধুদের সহিত মহোৎসাহে দাবা খেলিতে বসিয়াছেন। পিতা বর্ত্তমানেও বড়বাবুই সংসারের বা জমিদারীর কর্ত্তা, তাঁহারই অনুগ্রহ বা নিগ্রহেই কর্ম্মচারী ও প্রজাদিগের সুখ দুঃখ নিরূপিত হইত।

শ্রান্ত বালকটীকে কোলে করিয়া রতনসিং উঠানের এক-কোণে বসিয়া, বড়বাবুর খেলাশেষের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সহসা দৃষ্টি পড়াতে কে একজন নিম্ন স্বরে কহিলেন, লোকটী দাঁড়িয়ে কে হে?

বক্র দৃষ্টিতে একবার দেখিয়া নিয়া বড় বাবু কহিলেন, —ভিখিরি! আবার কে!

কথাটা রতনসিংএর কাণে প্রবেশ করিল, জোড় হাতে একটী বিনীত নমস্কার করিয়া ঘুমন্ত বালকটীর মুখখানি একটু তুলিয়া ইহার পরিচয় দিতেই, বড়বাবু সহসা জলন্ত বারুদের মত লাফাইয়া উঠিয়া ভীষণ তীব্র দৃষ্টিতে রতনসিংএর পানে তাকাইয়া, বহির্ব্বাটীর দিকে বেগে হাত প্রসারিত করিয়া কহিলেন, বেরোও, এক্ষুনি বেরোও বাড়ী থেকে, ডাকাতি করে সবই ত মেরে নেওয়া হয়েছে আবার সাধুতা দেখাতে ছেলে পাঠিয়ে দিলেন, বেরোও বলছি,—দরোয়ান।

ছেলেটী চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়া ভয়ে কাঁদিবার উপক্রম করিতেই রতনসিং ছেলেটীর মুখখানি বুকে চাপিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। [ক্রমশঃ

অনন্ত

—(কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুজ কবি ঈশানচন্দ্রের অপ্রকাশিত কাব্য ;
কবি নবীনচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক সম্পাদিত)

চতুর্থ সর্গ

মহাকাশ আলোড়িত নীহারিকা ঘূর্ণনে ;
আবরিত ধূমময় ক্ষীণপ্রভ কিরণে,
কোটী কোটী বজ্রনাদ অবিরত ফুটিছে,
বিথারি বিচিত্র জাল. সৌদামিনী ছুটিছে।
তরলিত নীহারিকা, ঘনীভূত ঘূরণে,
ঝরিতেছে নিরন্তর অঙ্গুরীয় গঠনে।
মিশিতেছে তাহা পুন স্তূপাকার আকারে.
অবিরল গ্রহরূপে চারিধারে প্রচারে।
অনন্ত উন্মাদ বেশে ছোটে তার মাঝারে,
বিজড়িত অঙ্গ তার দীপ্যমান নীহারে।
বাছি বাছি নীহারিকা, রাশি রাশি ধরিয়া
আকাশের এক প্রান্ত রাখে পূর্ণ করিয়া।
নিমেষে, নীহার রাশি শূন্য প্রান্ত ছাইল :
আকর্ষণ করি তাহা ঋষি নিম্নে ধাইল।
তারকা জড়িত প্রাণী বুকে বিশ্ব ধরিয়া,
নামিতেছে শূন্য পথে ত্রিভুবন মোহিয়া।
উত্তরিয়া নিম্নে, দুই করে তাহা ধরিয়া
ঘূর্ণন করিল দ্রুত মহাশূন্য মথিয়া।
আবর্ত্তনে খণ্ড স্তূপ দীপ্তাকার ধরিল
নবীন আলোকে এক মহাকাশ পূরিল।
নিমেষে সে মহাখণ্ড নিম্ন ভাগে ঝরিয়া.
ভাসিতে লাগিল শূন্যে, সূর্য্য রূপ ধরিয়া।
অন্য খণ্ড খসি পুন চন্দ্ররূপ ধরিল,—
অদূরে অপর খণ্ড ধরারূপে শোভিল।
ঝরিল কতই খণ্ড ভরিয়া সে গগন ;
ধরিল গঠন কত কত রূপ বরণ
ভাসিয়া উঠিল শূন্য অপরূপ কিরণে,—
রক্ত, নীল, পীত, শ্বেত, শ্যাম. কৃষ্ণ বরণে।
অনন্ত কৌশল করে, করি সবে স্থাপন,
পরস্পর রশ্মিজালে যেন করি বন্ধন
সৌরলোক সৃষ্টি করি, নামি নিম্ন আকাশে,
দাঁড়াইয়া শূন্য দেশে, মনোবাঞ্ছা প্রকাশে।

নিরখে তরঙ্গ তায়, প্রভঞ্জন তাড়নে,
বিথারি সফেন ফণা, ছুটিতেছে সঘনে।
হু হু রবে পূর্ণ শ্রুতি,—দৃশ্য পূর্ণ সাগরে
অনন্ত একাকী ভ্রমে তরঙ্গের উপরে।
দেখিতে দেখিতে দ্বীপ উঠে সিন্ধু মাঝারে,
ক্রমশঃ বিস্তৃত তাহা পৃথিবীর আকারে।
শৈলমালা উঠে তায় ক্রমে নভ পরশে ;
ঝর ঝর রবে কত নির্ঝরিণী বিকাশে।
ক্রমে স্রোত তরঙ্গিণী চারিদিকে ছুটিল ;
ক্রমে তরু বনলতা ধরাময় ফুটিল।
পুলকিত তনু ঋষি, বসে শৈলশিখরে,
মনের বাসনা তার একে একে উচ্চারে।
অনন্ত প্রসন্ন মুখে অবনীতে উত্তরে।
অভিনব শিল্প শালা রচে তার উপরে।
ব্যাপিয়া বিশাল ভূমি দুই-গিরি মাঝারে,
নিরমিল যন্ত্র কত অপরূপ আকারে।
বারি বহ্নি সহযোগে, করে যন্ত্র চালনা,
নিমেষে সে যন্ত্র হ'তে নানা জীব রচনা।
কৌশলে সে যন্ত্র গর্ভে পঞ্চভূত ধরিয়া.
রচিয়া শোণিত শুক্র রাখে পাত্র ভরিয়া।
অন্য যন্ত্র গর্ভে তাহা করি পুনঃ স্থাপন,
অস্থি, চর্ম্ম, মেদ, মাংস করে কত সৃজন।
বিচিত্র কৌশলে শিল্পী রচি নানা আকারে,
শিল্প-শাল পূর্ণ করি রাখে কত প্রকারে।
উপাদান সাবধানে যন্ত্রে করি স্থাপিত
ঈষৎ পরশি তাহা করে দ্রুত চালিত।
নিমেষে সৃজিত পশু নানাবিধ আকার,
অন্য যন্ত্রে পরশিয়া, করে প্রাণ সঞ্চার।
অহিংস্র শ্বাপদকুল, কৃপাপূর্ণ নয়নে,
অনন্তের কাছে আসি, লুটে তার চরণে।
একে একে করি সবে নানাদিকে প্রেরণ,
নানাজাতি বিহঙ্গেরে করে সুখে সৃজন।
বিবিধ আকার পাখী মনোহর বরণে,
দলে দলে যন্ত্র ত্যজি উড়ে যায় গগনে।

ভরিয়া উঠিল শূন্য সুমধুর কূজনে ;
অনন্ত আনন্দে রত মানবের সৃজনে।
অস্থি, মাংস, মেদ, চর্ম্ম, যত্নে করি স্থাপন,
অতি সাবধানে স্নায়ু করে তাহে অর্পণ।
রুধির ঢালিয়া, শিরা রচে হেন কৌশলে—
ঈষৎ পরশে তায়, যেন প্রাণ উছলে।
অতি সাবধানে, করে মস্তিষ্কের সৃজন,—
জীবনের সর্ব্ববৃত্তি করে তাহে স্থাপন।
এমনি কৌশল করি শিরাজাল বিস্তারে,—
কুপ্রবৃত্তি যেন তাহে, কভু নাহি প্রচারে।
শরীরের গুরু যন্ত্র—করি শির সৃজন,
দৃঢ় অস্থি, চর্ম্ম দিয়া, করে তাহা বরণ।
শিরে শিরে দিল কেশ, তরঙ্গিত গঠনে,—
হরিত, বাসন্তী, নীল, ভিন্ন ভিন্ন বরণে।
ললাট রচিল স্বচ্ছ,—যেন কাচে রচনা—
প্রতিভাত তাহে চিন্তা, জ্ঞান, বুদ্ধি, ধারণা।
যতনে রচিল আঁখি অপরূপ গঠন,
বিকশিত তাহে যত আকাঙ্ক্ষার গমন।
হেরিলে বারেক সেই মানবের বদনে,
অন্তরের ভাব ভাসে দর্শকের নয়নে।
না রাখিল অন্তরের কোন ভাব গোপন,—
ক্লেদহীন কলেবর মলহীন মনন।
বাছি, বাছি, রাখি লয়ে, করে হৃদি রচনা,—
স্বচ্ছ আবরণে ভাসে আনন্দ কি বেদনা।
স্নেহ, প্রেম, দয়া বুকে যখনি যা বিকাশে,
তখনি সে হৃদয়ের আবরণে প্রকাশে।
অস্থি, মেদ, মাংস শিরা অদর্শন সতত,
শুধু সুখ, দুখ বুকে প্রতিভাত নিয়ত।
নিবিড় নিটোল অঙ্গ করি শেষ যোজন,
পুরুষ, রমণী, শিশু করে কত গঠন।
ইঙ্গিতে চলিল যন্ত্র, ইরম্মদ গমনে ;—
জন্মে নরনারী শিশু অপরূপ গঠনে।
প্রাণ সঞ্জীবনী যত্নে করি শেষে স্থাপন,
পবিত্র জীবন তাহে করে সুখে অর্পণ।
সুপ্তোত্থিত প্রাণীকুল, আসি তার সকাশে,
বিস্মিত নয়নে তারে কত কথা জিজ্ঞাসে।
স্নেহে তুষ্ট করি সবে, উপদেশ বলিল ;
দলে দলে প্রাণীবৃন্দ নানা দিকে চলিল।
জনকত নরনারী রাখি নিজ সকাশে,
রচিয়া বিবিধ গ্রন্থ, মুদ্রাযন্ত্রে প্রকাশে।

সাহিত্য, বিজ্ঞান, নীতি, ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শন,
সঙ্গীত, স্থপতি শিল্প, অভিনব চিন্তন।
অভিনব ভাষা তার, অভিনব আকার,
বিতরিয়া সবে, কহে করিবারে প্রচার।
গ্রন্থ হাতে, ভিন্ন পথে, করে সবে গমন,
অনন্ত প্রফুল্ল মুখে, করে কবি সৃজন।
ক্ষিপ্রতর সুখপ্রদ শিরা করি স্থাপন,
নিরমি ইন্দ্রিয় পঞ্চ, করে স্নেহ অর্পণ।
জ্ঞান-বুদ্ধি-চিন্তা-প্রীতি-শিরা ঘন প্রমাণে,
মস্তিষ্কের সনে, অতি সাবধানে প্রদানে।
আবেগ-উচ্ছ্বাস-শিরা, হৃদে করি লেপন,
আকুলিত করি প্রাণ, করে কবি সৃজন।
নির্গত হইল কবি—মগ্ন যেন স্বপনে ;
অনন্ত সাদরে তারে আলিঙ্গন প্রদানে।
রচিয়া লেখনী নব, করে করি স্থাপন,
কহিল প্রসন্ন মুখে স্নেহপূর্ণ বচন।
"রচিলাম বিশ্ব—তুমি স্বর্গ কর রচনা ;
জীবের অসাধ্য তাহা—বিনা কবি কল্পনা।"
আলিঙ্গন করি তায় কবি করে গমন ;
সিন্ধুতীরে, গিরিশিরে, করে বাস সৃজন।
অনন্ত হইল রত, ফুল, তরু সৃজনে ;
নিরমিল কতবিধ, কত রূপ বরণে।
সৃজিল পতঙ্গ, কীট, সরীসৃপ বহুল,
হিংসাবৃত্তি সবাকার একেবারে রোধিল।
সৃষ্টি সমাপন করি, উঠে গিরিশিখরে,—
হেরে শূন্যে মনোহর তিন মূর্ত্তি উত্তরে।

(ইতি "অনন্তের নূতন জগৎ নির্ম্মাণ" নামক চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত)

পঞ্চম সর্গ

অনন্ত শিখর হতে, নিরখিল শূন্য পথে,
নামিতেছে প্রাণী তিনজন,
রূপ যৌবনেতে মিশি, উছলিয়া দশদিশি,
করিয়াছে শরীর ধারণ।
যেই যুবা অগ্রসর, পরাগের কলেবর
অঝর সে ঝর ঝর কায়;
বল্লরীজড়িত গায় মুকুল ফুটিছে তায়
কেশপাশ বেষ্টিত মালায়।
নেত্র দুই পদ্মদল ছেদি তার মধ্যস্থল,
নিশা শেষে অলি বাহিরায় ;
ছিদ্রভাগ অগ্রসর, কণ্ঠবদ্ধ সে ভ্রমর
দলসহ যেন উড়ে যায়।

প্রশান্ত ললাটতলে,　　নিবিড় মধুপ দলে
　　করিতেছে পথ অন্বেষণ ;
অমৃত তড়াগ জ্ঞানে,　　বিকশিত ফুলয়নে,
　　চাহে তায় হইতে মগন।
ঝরঝর সে অধরে,　　হাসি থর থর করে
　　উছলিতে পরাগে মিশায়।
সৌরভে গগন ভাসে,　　মধুব্রত চারিপাশে,
　　গুন্ গুন্ রবে শূন্য ছায়।
শোভিছে পল্লব করে　　বসিয়া তাহার পরে,
　　কোকিল পাপিয়া ঢালে তান।
মধুর মলয় বায়,　　আবেশে হিল্লোলে তায়,
　　উছলিত আকাশের প্রাণ।
পৃষ্ঠদেশে সে যুবার,　　নারী এক যুবা আর,
　　অভিনব উভয় গঠন।
পঞ্চদশ কি ষোড়শ　　কিম্বা হবে সপ্তদশ,
　　রমণীর নবীন যৌবন।
লাবণ্য করিয়া ঘন,　　দেহ নিরমিত যেন
　　কোমলতা ঢল ঢল করে।
যৌবন ব্যাকুলতায়　　উছলি পড়িতে চায়,
　　সুথ যেন জড়াইয়া ধরে।
নয়নে লালসা হাসে,　　কপোলে উল্লাস ভাসে
　　রুচি ফোটে ওষ্ঠাধর ভরি।
বিলাস উথলি পড়ে　　হৃদয় চাপিয়া ধরে,
　　নিতম্ব জঘন রাখে ধরি।
সূক্ষ্ম নীল মেঘাম্বর,　　সরমেতে জড় সড়
　　উত্তরীয় মত অঙ্গবাস,
কুসুম ভূষণ গায়,　　যেন আঁকা তুলিকায়,
　　নিতম্বচুম্বিত কেশপাশ।
এক দৃষ্টে ফুলনয়নে　　চাহি তার সঙ্গীপানে
　　পলক না পড়ে একবার,
জগতের কিছু আর　　যেন লক্ষ্য নহে তার
　　সঙ্গী যেন জগতের সার।
দক্ষিণে দোসর তার,　　অপরূপ সে আকার
　　জ্বলে বহ্নি দেহের ভিতরে,
অস্থির সতত কায়,　　কাতরে সখারে চায়,
　　সখী তার কর চাপি ধরে।
চাঁচর চিকুর ঘিরে　　ফুলের কিরীট শিরে
　　কেতু তায় মকর অঙ্কিত ;
নব শাখা ধনুকায়,　　ছিলা পুষ্প মালা তায়,
　　পৃষ্ঠে তূণ পলাশে নির্ম্মিত।

পঞ্চ পুষ্পবাণ ফুটে,　　বহ্নিশিখা যেথে ছুটে,
　　শূন্য যেন উত্তাপে শিহরে ;
এতই বিলাস গায়　　অঙ্গে নাহি চাওয়া যায়,
　　আঁখি যায় বুজে লাজভরে।
এইরূপে তিনজন　　করে শূন্যে আগমন,
　　অনন্ত কুপিত স্বরে কয়,
"তিষ্ঠ শূন্যে, না উত্তর　　আমার অবনী 'পর,
　　কলুষের স্থান ইহা নয়।"
অগ্রগামী হাসি কয়,　　"আমরা কলুষ নয়,
　　দেবতা আমরা তিনজন ;
আমি মধু, ইনি মার　　পাশে প্রিয়া রতি তাঁর
　　ধরণীর আমরা ভূষণ।
যেখানে আমরা নাই　　মরুময় সেই ঠাঁই
　　তথা জীব তিষ্ঠিতে না পারে।
জীবের মঙ্গল আশে,　　ভ্রমি তার আশে পাশে
　　বিলাইয়া সন্তোষ সংসারে।
দুজনার ভিন্ন দেহ　　তুলিয়া তা' হতে স্নেহ
　　মিশাইয়া নিরমি সন্তান ;
একাধারে দুজনার　　বিজড়িত সে আকার
　　হেরে জীব জুড়ায় পরাণ।
স্নেহের নিগড় মত,　　দুই দম্পতীর চিত্ত
　　করে তাহা মধুরে বন্ধন,
শিশু বৃদ্ধি পায় যত,　　দুজনায় মিশে তত
　　চন্দ্রিকার গগনে যেমন।
দুজনার সাধ যত　　সে শিশুতে পরিণত
　　কর্ত্তব্য শিখায় শিশু তায়,
শ্রেষ্ঠ দীক্ষা আত্মদান　　শিখে জীব তার স্থান
　　ধর্ম্মশাস্ত্র সন্তান ধরায়।
বিতরি মঙ্গল হেন,　　করি মোরা বিচরণ
　　না করিও কলুষিত জ্ঞান।
জীবের সংসার ছাড়ি,　　আমরা রহিতে নারি,
　　আকুলিত সদা দেব প্রাণ।
সৃজিয়াছ ধরা নব,　　অভিনব জীব সব
　　রূপে গুণে দেহ প্রাণ ভরি,
আমা ছাড়া বহুক্ষণ　　রহিয়াছে জীবগণ,
　　দেহ পথ, যাই ত্বরা করি।
অনন্ত চিন্তিত মন,　　হস্ত তুলি নিবারণ
　　করি সবে, করে নিরীক্ষণ,
ক্ষণকাল চিন্তা করি,　　ধীরে ধীরে অগ্রসরি:
　　কহে শেষ গম্ভীর বচন ;—

"মধু, তুমি কাছে এস, তোমার পবিত্র বেশ
নাহি তায় কলুষের লেশ,
রতি কাম, ফের ত্বরা, আমার পবিত্র ধরা
পাপ দেহে না কর প্রবেশ।"
বসন্ত হাসিয়া কয়, "তাও কি কখন হয়?
আমরা যে অভেদহৃদয়,
যথা রতি তথা বঁধু, যথা বঁধু তথা মধু,
একে ছাড়ি অন্যে নাহি রয়।
চেতনা কি নাহি তব? বিনা রতি মনোভব
ধরা তব হবে মরুপ্রায়।"
সক্রোধে অনন্ত কয়, "হয় হবে মরু ময়,
রতি কাম না রহিবে তায়।
জীবের অভাব যাহা, আপনি ঘুচাব তাহা
রতি কামে নাহি প্রয়োজন,
এ ধরণী সৃষ্টি যার, জানে সে উপায় তার,
নিরমিব পবিত্র বন্ধন।
রতি কাম, অপসর, কালব্যয় নাহি কর",
বলি, ধরে বসন্তের কর।
অপাঙ্গে ঠারিল রতি, মদন ত্বরিত গতি,
শরাসনে আরোপিল শর।
অনন্ত নিরখি তায় মত্ত গজরাজ প্রায়
নিক্ষেপিল বিশাল প্রস্তর;
পরশি মদনশর পুষ্পসম সে প্রস্তর
ঝরে পড়ে ভূধর উপর।
তখন ব্যাকুল মন, শক্তিরে করি স্মরণ
অনন্ত উরধ নেত্রে চায়,
শূন্য বিভাসিত করি, শক্তি নিজ মূর্ত্তি ধরি
সস্নেহ বচনে কহে তায়।
"অনন্ত! না কর ভয়— দেহ তব শক্তিময়
না পশিবে কন্দর্পের বাণ,
রতি কাম, বাক্য ধর, না উত্তর ধরাপর,
রাখ মম ভক্তের সম্মান।"
নিমেষে গগন গায়, শক্তিমূর্ত্তি মিশে যায়,
হাসিয়া মদন রাখে শর,
স্মর রতি ফিরে যায়, বসন্ত কাতরে চায়,
অনন্ত ত্যজিল তার কর।
অদৃশ্য সে তিনজন, অনন্ত প্রসন্ন মন
করে তার সৃষ্টি দরশন:
নির্ম্মল আকাশ বুকে স্নিগ্ধরবি হাসে সুখে
প্রফুল্লিত করিয়া ভুবন।

সম্মুখে জলধি মাঝে বিশাল ধরণী সাজে
নবীন গঠন সবি তার;
উন্নত বিনত কায় নব তরুলতা তায়
প্রধাবিত শৈল চারিধার।
রচিয়া রজতহার ধরাবুকে চারিধার
প্রবাহিত নিরমল ধারা
অধীর হৃদয় তার ছোটে স্রোত অনিবার
সাগরে কাননে পথহারা।
দেশ মহাদেশ কত আলেখ্যে চিত্রিত মত
জনপদ শত শত তায়;
বিবিধ বরণ ধরে সৌধমালা স্তরে স্তরে
ধরা অঙ্গে অবিরল ছায়।
ঢাকিয়া জলধি'চ্ছ্বাস উঠে প্রাণীকণ্ঠভাষ
সুখ যেন উথলে গগনে,
অনন্ত আনন্দে ভোর শুনি সে উচ্ছ্বাস ঘোর
নয়ন মুদিয়া তাহা শোনে।
শৈল হতে নামি সুখে, চলে জনপদমুখে
জীবের সংসার দরশনে,
অটবী নিরখি তায় সম্ভ্রমে লুটায় পায়
শূন্য ভোর বিহঙ্গ কূজনে।

ইতি "অনন্তের জগতে বসন্ত ও কামরতির প্রবেশ ও দূরীকরণ" নামক পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠ সর্গ

অনন্ত প্রসন্ন মুখে, প্রবেশে সংসার,
যে দিকে নয়ন রাখে, হেরে মূর্ত্তি তার।
অরণ্যে প্রবেশি হেরে পাতায় পাতায়
অঙ্কিত আকৃতি তার, তরু, লতা গায়
বল্কলে, অঙ্কুরে, বৃন্তে, কোরকে, মুকুলে,
স্তবকে স্তবকে ফলে, গুচ্ছে গুচ্ছে ফুলে।
তৃণগুল্ম দূর্ব্বাদল, অঙ্গে সবাকার
নিরখে আকৃতি তার, আকৃতি মাতার।
বিহঙ্গে, মধুর কণ্ঠে, গাহে নাম তার,
পবনে তাহারি নাম ভাসে চারিধার।
নিরখি, সে মহাসিন্ধু আত্মগরিমার,
শিহরে অনন্ত, কায়—স্তম্ভিত আকার।
অবসন্ন দেহে, বসে ধরার উপরে;
নয়নযুগলে তার অশ্রুধারা ঝরে।
ত্যজিয়া সুদীর্ঘ শ্বাস, কহিলা কাতরে,
"রচিনু কি এই বিশ্ব, এত সাধ করে।

যুগ, যুগান্তর ধরি, করিনু সাধন
হেরিতে কেবলি কি রে গৌরব আপন ?
আশৈশব আমার সে বাসনাসঞ্চিত
হইল কি নীচতায় শেষে পরিণত ?
সহে না এ নীচ দৃশ্য নয়নে আমার !"
ছুটিল অনন্ত দ্রুত, উন্মাদ আকার।
অরণ্যের প্রান্তভাগে, হ'য়ে উপনীত
পর্ণের কুটীর হেরে, উদ্যানবেষ্টিত।
শ্লথ গতি সন্নিকটে করিয়া গমন,
অদৃশ্য হইয়া তাহা করে দরশন।
কুটীর প্রাঙ্গণে, ফুল্ল অশোকের মূলে,
জটাশ্মশ্রুধারী ঋষি বসি গ্রন্থ খুলে।
দীর্ঘ দেহ, দীপ্ত দেহ, বলিষ্ঠ গঠন,
উন্নত ললাটতলে আয়ত লোচন।
কেশ উপবীত গলে, বল্কল বসন,
সম্মুখে বসিয়া তার শিষ্য কয় জন।
শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে ঋষি নিবিষ্ট মানসে ;
দৃশ্যমান চিন্তা—স্বচ্ছ ললাট, উরসে।
ললাটে, হৃদয়ে তার, রাখিয়া নয়ন,
অনিমেষে, শিষ্যগণ করিছে শ্রবণ।
ঋষি কহে, "জাতিভেদে আছে প্রয়োজন,
ধর্ম্ম ভাগ করি, জাতি করিবে সৃজন।
ভক্ষ্য, পেয় পূর্ণ ধরা, অনন্ত কৃপায় ;
সুলভ ঐশ্বর্য্য, সুখ, সকলি ইহায়।
ঐশ্বর্য্য সঞ্চয়ে, শ্রম নাহি প্রয়োজন ;
শান্তি উপার্জ্জনে, লক্ষ্য কর সর্ব্বজন।
শান্তি ভিন্ন নাহি সুখ, জানিও ধরায়,
ঐশ্বর্য্যের সুখ বৃদ্ধি করে দুরাশায়।
উৎকট পীড়ার সম, যাতনা দুঃসহ
ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় আশা—দহে অহরহ।
আমরণ সেই ব্যাধি না কর বহন,
নহে সুখ, নহে সঙ্গী, তাহা অকারণ।
বিন্দু মাত্র শান্তি পার করিতে সঞ্চয়,
কোটী কোটী বিত্ত তার সমতুল নয়।
এক বিন্দু শান্তি কর প্রিয়জনে দান,
বিপুল ঐশ্বর্য্য নহে তাহার সমান।
অতএব ত্যজি' সবে ঐশ্বর্য্য বাসনা,
অবহিত চিত্তে, কর শান্তির কামনা।
কঠোর সাধন বিনা, শান্তি নাহি মিলে,
একের মঙ্গল বাঁধা জীবের মঙ্গলে।

একত্রে সমগ্র জীব শান্তি নাহি পায় ;
ক্রমিক উন্নতি তার, নিয়ম ধরায়।
সেই ক্রম পাঁচ ভাগে করিয়া নির্ণয়,
পঞ্চ ভিন্ন জাতি সৃষ্টি কর এ ধরায়।
শান্ত, দাস্য, সখ্য আর বাৎসল্য, মধুর
পঞ্চ ধর্ম্মে জাতি পূর্ণ কর নরপুর।
কুলগামী জাতি মান না কর কখন ;
শিথিল হইবে তাহে জাতির বন্ধন।
কুলগত যশ মান করি দরশন,
ধর্ম্মে বীতরাগ হবে বংশধরগণ।
সাধনার তারতম্যে উর্দ্ধ অধঃ গতি
এক মাত্র ধর্ম্ম কর জাতির উন্নতি।
বিভিন্ন জাতির যেই বিভিন্ন আচার,
উর্দ্ধ তিন জাতি তার করিবে বিচার।
সর্ব্ব শাস্ত্রে সবাকার সম অধিকার,
বিজ্ঞান অবশ্যপাঠ্য হইবে সবার।
সর্ব্বশাস্ত্রসার তাহা, সর্ব্বফলপ্রদ,
বিজ্ঞান বিহনে নর নহে নিরাপদ।
নীতিশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, কাব্যগ্রন্থ আর
বিজ্ঞানে, দর্শন মত, সকলি প্রচার।
সুশিক্ষিত কর তাহে মানব সকল ;
ধর্ম্মের জটিল পথ হইবে সরল।
ভগবান অনন্তের করুণা অপার—
জীবের মঙ্গল হেতু করেন প্রচার।"
'ভগবান' সম্বোধনে, অনন্ত শিহরে,
ত্যজিয়া সে স্থান দ্রুত যায় স্থানান্তরে।
যাইতে যাইতে পথে করে দরশন,
ভূচর, খেচর তারি করিছে কীর্ত্তন।
বহিছে তটিনী ধারা, দুই কূল ভরি,
সুমধুর স্বরে শুধু তারি নাম ধরি।
যা' কিছু নয়নে পড়ে, করে দরশন,—
কেবলি তাহারি নাম করিছে কীর্ত্তন।
নিরখি উত্তুঙ্গ গিরি, আরোহিল তায়,
হেরে ঋষিবৃন্দ তার গুহায়, গুহায়।
প্রবেশি গুহায়, হেরে চারিধারে তার,
সজ্জিত বিশাল যন্ত্র—জটিল আকার।
রাশি রাশি গ্রন্থ পড়ি যন্ত্রের উপরে
কোন ঋষি মগ্ন-চিত্তে অধ্যয়ন করে।
যন্ত্রের চালনা করে ঋষি কোন জন,
যন্ত্র মুখ করিতেছে ধূম উদগীরণ।
প্রবেশে সে ধূমরাশি অন্দরগুহায়,
তরঙ্গ আকারে, তাহে ঘুরিয়া বেড়ায়।
দাঁড়াইয়া মাঝে তার ঋষি একজন
তীব্র দৃষ্টে করে সেই ধূম দরশন।

ঘুরিতে ঘুরিতে ধূম গুহার মাঝার,
ধরিতেছে নানারূপ মেঘের আকার।
কখন, সে মেঘ হ'তে কুয়াশা সঞ্চার,
কখন ধরিছে তাহা হিমানী আকার।
তরঙ্গে তরঙ্গে কভু হইয়া ঘর্ষণ
থেকে থেকে বিদ্যুদ্দাম হ'তেছে স্ফুরণ।
শীতল হইয়া কভু ধূমরাশি তার,
সলিল হইয়া, ঝরে পড়ে চারিধার।
প্রবেশি গহ্বরে অন্ত, করে দরশন—
রচনায় নিমগন ঋষি কোন্ জন।
অবিশ্রান্ত করে ঋষি লেখনী চালনা,
বাহ্য দৃশ্যে, যেন, নাহি তিলেক ধারণা।
শৈলের শিখরে উঠি, করে দরশন—
যন্ত্র লয়ে উপবিষ্ট ঋষি কয় জন।
নিবিষ্ট মানসে, যন্ত্রে রাখিয়া নয়ন,
গগন-মণ্ডল সবে করে নিরীক্ষণ।
দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হয় সমাগত,
অমনি সে ঋষিকুল, হইয়া বিরত,
তার স্বরে অনন্তের করে স্তুতিগান,
শিহরি অনন্ত, দ্রুত করিল প্রস্থান।
এইরূপে নানাস্থান করি পর্য্যটন
অবশেষে, জনপদ করে দরশন।
হেরে সৌধ-সুশোভিত রাজধানী তায়,
অনন্ত অদৃশ্য হ'য়ে প্রবেশে তথায়।
পথে, ঘাটে, হাটে, মাঠে হেরে চারিধার
প্রতিষ্ঠিত হৈমমূর্ত্তি কেবলি তাহার।
গৃহে গৃহে, দেবালয়ে, মন্দিরে মন্দিরে,
নরনারী তারি মূর্ত্তি উপাসনা করে।
প্রাচীন, প্রাচীনা, শিশু, যুবক, যুবতী,
গললগ্ন বাসে তায় করিছে প্রণতি।
শিহরিত কলেবরে ত্যজিয়া মন্দির,
অনন্ত হেরিল কোন দরিদ্র কুটীর।
প্রকাশ হইয়ে তথা ভিক্ষুক আকারে,
প্রবেশিল, ধীরে ধীরে, কুটীরের দ্বারে।
হেরিয়া ভিক্ষুক দ্বারে, নারী একজন,
যুক্ত করে আসি, তায় করে সম্ভাষণ।
অনন্ত জিজ্ঞাসে তার জাতি পরিচয়,
"শান্ত মোরা," কহে নারী, করিয়া বিনয়।
অনন্ত জিজ্ঞাসে পুন জীবিকা তাহার,
নারী কহে "নীচ কার্য্য করি সবাকার।"

জিজ্ঞাসে অনন্ত তায়, কেবা আছে আর,
নারী কহে, "পিতা, মাতা, সখা, পুত্র আর।"
অনন্ত সে রমণীরে জিজ্ঞাসে তখন,—
কি প্রথায় হৈল তার সম্বন্ধ বন্ধন।
নারী কহে, "স্নেহ, মমতা, প্রেম, দয়া ধরি,
আত্ম পরিজন মোরা নির্ব্বাচন করি।"
অনন্ত জিজ্ঞাসে পুন সংসারে তাহার,
পরস্পরে অনুরাগ রহে কি প্রকার।
রমণী তখনি কহে গদগদ স্বরে,
একবার যে যাহারে অনুরাগ করে,—
ভগবান অনন্তের করুণা এমন
সেই অনুরাগ খিন্ন না হয় কখন।"
শিহরি অনন্ত, তায় জিজ্ঞাসে আবার—
কোন্ ধর্ম্মে রত তারা, কি পদ্ধতি তার।
"বিনয় আমার ধর্ম্ম," কহিল রমণী,
"তাহারি সাধনা করি দিবস রজনী।
কিবা কার্য্যস্থানে, কিবা আপনার ঘরে,
বিনয় আমার ব্রত সতত অন্তরে।
সুখ, দুখ, রাগ, দ্বেষ, ত্যজি সমুদয়
সংসার সেবায় করি বিনয় সঞ্চয়।"
প্রসন্ন বদনে, মুষ্টি করিয়া গ্রহণ,
আশীর্ব্বাদ করি, করে অনন্ত গমন।
অদূরে হেরিয়া কোন গৃহস্থ ভবন,
ভিক্ষাছলে, দ্বারদেশে করিল গমন।
ভিক্ষুক হেরিয়া দ্বারী সম্ভ্রমে দাঁড়ায়,
বসায়ে আসনে তারে, সেবা করে তায়।
অনন্ত মধুর ভাষে, চাহে পরিচয়,
সেবিতে সেবিতে দ্বারী সবিনয়ে কয়।
"শান্ত ছিনু, দাস এবে, আশীর্ব্বাদ কর,—
'সখা' জাতি লাভ যেন করি হে সত্বর।"
গৃহস্বামী ভিক্ষুকেরে করি দরশন,
সসম্ভ্রমে ছুটি' তায় করে আলিঙ্গন।
স্বামিনী, তনয়া তার, সন্তান কুমার,
দ্রুতপদে ভিক্ষুকেরে ঘেরে চারিধার।
স্বামিনী আহার্য্য তারে করায় ভোজন,
তনয়া অঞ্চলে যত্নে মুছায় বদন।
শিশু ক্রোড়ে বসি, করে বদন চুম্বন,
অনন্ত আনন্দে ভোর—মুদিল নয়ন।
আশীর্ব্বাদ করি, শেষে, চাহিল বিদায়,
হৃদয়ে ধরিয়া কহে গৃহস্বামী তায়,

"ভগবান অনন্তের থাকে কৃপা পুন—
ভিখারী আবার তব পাব দরশন।"
অনন্ত সে স্থান ত্যজি, যায় ত্বরা করি ;
অদৃশ্য হইয়া শেষ, পশে রাজপুরী।
প্রবেশিয়া সভাগৃহে, করে দরশন—
রতনের সিংহাসনে মুরতি আপন।
হীরক অক্ষরে, রত্ন আসনে ক্ষোদিত—
'অনন্ত দেবাদিদেব—ইহার জাগ্রত।'
সে মূর্ত্তির পাদদেশে বসিয়া রাজন,
অনন্তের নামে, রাজ্য করিছে শাসন।
নাহি পরিচ্ছদ দেহে, নাহি অলঙ্কার—
কটীতে কৌপীন, শিরে দীর্ঘ জটাভার।
চারিধারে, যোড় করে, পারিষদগণ,
প্রজাদের হিতাহিত করে নিবেদন।
বাৎসল্যপূরিত মুখ সতত রাজার,
প্রজার অহিত শুনি, ঝরে নেত্রাসার।
অপরাধী কেহ নীত সম্মুখে যখন,
বিনা দণ্ডে রাজা তার করিছে শাসন।
সজল নয়নে, রাজা বুঝান তাহায়,—
কিবা অপরাধ তার, কি অশুভ তায়।
হেরি সে করুণা তাঁর—শুনি সে বচন,
অনুতাপে, অপরাধী করিছে রোদন।
অনুতপ্ত হেরি তারে, তখন রাজন,
সন্তানের মত, ক্রোড়ে করেন ধারণ।
সাধু উপদেশে তার তুষ্ট করি মন,
ললাট চুম্বিয়া, তারে করেন প্রেরণ।
অনন্ত ত্যজিয়া সভা, অন্তঃপুরে যায়,
শুধু অনুচরবর্গ নেহারে তথায়।
রাজমাতা, রাজরাণী, তনয়া তনয়,
কেহ নাহি অন্তঃপুরে—শূন্য গৃহময়।
প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে পশি' করে দরশন—
রাশি রাশি গ্রন্থ তাহে কেবলি ভূষণ।
অবশেষে শয্যাগৃহে প্রবেশে রাজার,
সজ্জিত তাহায় যন্ত্র বিবিধ আকার।
অনন্ত সে পুরী ত্যজি, সিংহদ্বারে যায়,
ধরিয়া প্রজার বেশ, রক্ষীরে শুধায়,
"রাজ অন্তঃপুরে, কেন, নাহি পরিজন ?"
প্রহরী হাসিয়া কয়, "কিবা প্রয়োজন ?"
সসাগরা বসুন্ধরা, সংসার রাজার—
প্রজাকুল সকলেই পরিজন তাঁর।
আত্মপর ভাব, যদি, রহে রাজ চিতে,
প্রজার মঙ্গল কভু, হয় কি মহীতে ?
ভগবান অনন্তের করুণা অপার—
রাজার এ হেন রীতি, আদেশ তাঁহার!"
অনন্ত ত্বরিত পদে যায় স্থানান্তরে,
নগরে নগরে গ্রামে, পর্য্যটন করে।
প্রভাতে মানবকুল মেলিয়া নয়ন,
সর্ব্বত্র করিছে তার মহিমা কীর্ত্তন।
স্নানান্তে, তাহারি স্তুতি করে সর্ব্বজন,
মন্দিরে মন্দিরে তারি মুরতি অর্চ্চন।
সায়াহ্নে সবাই করে তারি স্তুতিগান,
হেরিয়া বিষাদে দহে আকুল পরাণ।
অনন্ত, সংসার ত্যজি যায় সিন্ধু তীরে ;
দূর হ'তে হেরে কবি—বসি গিরিশিরে।
বড় যত্নে, করেছিল কবির সৃজন ;
হেরিতে তাহায়, গিরি করে আরোহণ।

ইতি 'অনন্তের বিশ্বভ্রমণ' নামক ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত।

ইউরোপীয় জাতি

…জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনায় যে জাতিকে তরুণ বলা যাইতে পারে, সেই জাতি বর্ত্তমান বিজ্ঞানের আলোচনার ভার লইয়াছেন এবং যে সমস্ত জাতিকে ঐ আলোচনায় অভিজ্ঞ বলা যাইতে পারে, তাঁহারা ইহা ছাড়িয়া দিয়াছেন বলিয়াই বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকের ও বিজ্ঞানের এই জাতীয় দুর্দ্দশা হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে।…

…মানুষ হিসাবে ইউরোপীয়গণ, বিশেষতঃ ইংরাজগণ বর্ত্তমান কালের অন্যান্য জাতির তুলনায় যে অনেক ভাল এবং সম্পূর্ণ (thorough), তাহা যাঁহারা তাঁহাদিগের কাহারও সহিত অন্তরঙ্গভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ইয়োরোপীয়গণ অথবা ইংরাজগণ মানুষ হিসাবে বর্ত্তমান কালের অপরাপরের তুলনায় ভাল এবং সম্পূর্ণ হইলেও তাঁহাদের জাতি যে, বয়সে অনেকের তুলনায় তরুণ, তাহা বাস্তব সত্য।…
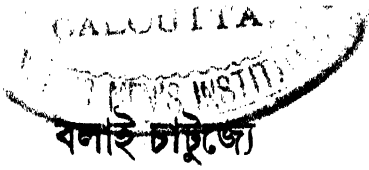
বলাই চাটুজ্যে

—শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পল্লীগ্রামের একটী জমিদারী কাছারী।

প্রকাণ্ড জমিদারী তাই কাছারীও প্রকাণ্ড—প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন কর্ম্মচারী একটী প্রকাণ্ড হলে বসিয়া কলম পেশে। ইহাদের অধিকাংশই দরিদ্র, ছয় টাকা হইতে পনের টাকা বেতন; পরিধানের জামা ও কাপড় অধিকাংশেরই ছিন্ন ও অপরিচ্ছন্ন। যে টাকা বেতন পায়, তাহাতে সংসারের নিত্য খরচ সংকুলান করিয়া জামা-কাপড়, বিলাসিতা ত নয়ই, সাধারণ ভদ্রতা রক্ষাও সকলের সম্ভব হয় না। জমিদারের বেতনে একজন নাপিত সপ্তাহে একদিন, রবিবারে সকলকে কামাইয়া দিয়া যায়, নচেৎ ক্ষৌরকার্য্যটিও অনিয়মিত ভাবেও হইত কি না সন্দেহ।

জমিদার হরকালী বাবুর শুধু জমিদারী নয়, ব্যবসাও আছে। ব্যবসা উপলক্ষে তিনি বৎসরের অধিকাংশ সময়ই থাকেন কলিকাতায়? দেশের জমিদারী পরিচালনা করিতেন এক জন ম্যানেজার; মাসকয়েক পূর্ব্বে তাঁহার উপরওয়ালা হইয়া আসিয়াছে হরকালী বাবুর বড় ছেলে বিলাস। সম্প্রতি সে ওকালতি পাশ করিয়া পিতার বিশাল জমিদারী পরিচালনার ভার লইয়া দেশে আসিয়া বসিয়াছে।

পূর্ব্বে জমিদারের কাছারী বৃদ্ধ ম্যানেজারের আমলে চলিত ঢিমে-তেতালা ভাবে। কাছারীর মধ্যেই কর্ম্মচারীদের হাতে হাতে তামাকের হুঁকাও খোস গল্পের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইত, কাহারও কিছু জিজ্ঞাস্য বা বক্তব্য থাকিলে নিজ নিজ আসন হইতেই উচ্চ চীৎকারে তাহা করা চলিত; কাজে আসা-যাওয়ার ঘড়িধরা নিয়ম কিছু ছিল না; দিনের মধ্যে যে কোন এক সময় আসিলেই চলিত, এখন বিলাসের কর্ত্তৃত্বাধীনে ক্রমশঃ শাসন কঠিন ও কঠোর হইয়া উঠিল। কলিকাতার ব্যবসা-দপ্তরের মত কর্ম্মচারীদিগকে কাজে যোগ দিবার সময় রোজ নিজের নাম ও আসিবার সময় খাতায় লিখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, কাজের সময় তামাক খাওয়া নিষেধ, সমস্ত ব্যাপারে শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থার পরিচয় ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

•

সম্মুখে দণ্ডায়মান বৃদ্ধের দিকে মাথা তুলিয়া বিলাস কহিল, "পাওয়া গেল না খাতাটা?"

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বৃদ্ধ কহিলেন, "আজ্ঞে না, অনেক ত খুঁজলাম। দলীল, নকল-বই অন্য সবগুলোই আছে, খালি ঐটাই পাওয়া যাচ্ছে না।"

রুক্ষকণ্ঠে বিলাস কহিল, "পাওয়া যাচ্ছে না কেন শুনি? খাতাটার ত পাখা হয় নি। যদি বাইরে কোথাও গিয়ে থাকে আপনার ইস্যু-বুকে নিশ্চয়ই লেখা থাকবে।"

মৃদুকণ্ঠে বৃদ্ধ রেকর্ড-কিপার উত্তর দিল "আজ্ঞে ইস্যু বইও খুঁজলাম, কিন্তু পেলাম না।"

ক্রুদ্ধকণ্ঠে বিলাস কহিল, "সেটা ঘোড়ায় চেপে হাওয়া খেতে গেছে, কি বলেন। আপনাদের মত 'ওল্ডফুলের' হাতে রেকর্ডের ভার দেওয়াই ভুল। বাবা বলেন, বিশ্বাসী। শুধু বিশ্বাসী নিয়ে হবে কি, যদি সময় মত দলীলপত্র না দিতে পারেন। অর্দ্ধেক সময় ত আপনি কলম নিয়ে বসে বসে ঢোলেন, তা দলীল, খাতাপত্র এসব গুছিয়ে রাখবেন কখন।"

বৃদ্ধ নীরবে এ অভিযোগ স্বীকার করিল। বিলাস হাঁকিল, "বলাই"।

একটী গৌরকান্তি, পেশীবহুল পুষ্টবপু বছর ছাব্বিশ বয়সের যুবক তড়াক করিয়া আসন ছাড়িয়া কহিল, "ইয়োর অনার সার।"

অন্যান্য কর্ম্মচারীরা ঠোঁট টিপিয়া মৃদু হাসিল, পূর্ব্বেকার আমল হইলে তাহারা প্রাণ খুলিয়া হাসিত। বলাইয়ের কথায়, ভাবে ও ভঙ্গীতে না হাসিয়া থাকা যায় না—আইন ও শৃঙ্খলার কড়াকড়ির মধ্যেও তাহার স্বর, তাহার ভঙ্গী সকলের মনে হাসির একটু মৃদু পরশ বুলাইয়া দিল।

বিলাস কহিল, "১৯২৯ সালের দলীল-নকলের খাতা কে নকল করেছিল বলতে পার?"

বলাইয়ের স্মৃতিশক্তি অসাধারণ।

বলাই কহিল—"১৯১৯? ইয়োর দিস্ অবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট

সার। ১৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ৩রা আমি এষ্টেট হরদয়াল বাবুর বাড়ীতে চাকরীতে ঢুকি, এক যুগ পেরিয়ে গেছে, পেন্সন পাবার সময় হয়েছে সার।"

বিলাস জানিত বলাই একটু বাচাল, তাহার মুখ বন্ধ করা কঠিন, সাধারণ কথাও এমন স্বরে ও ভঙ্গীতে সে বলে যে, না হাসিয়া উপায় নাই, অথচ তাহার মধ্যে দোষের কিছু নাই। বলিল, "খাতাটা বিশেষ দরকার, খুঁজে বার করতে পার?"

ঘাড় বাঁকাইয়া বলাই কহিল, "আই ট্রাই সার। আজ ষোল বৎসর এই এষ্টেটে চাকরী করছি, দশ বৎসর বয়সে পাঠশালা ছাড়তেই কর্ত্তাবাবু বললেন, বলাই তুই আমার এষ্টেটে কাজ কর। বললাম "মেনি ইয়েস" (বহুত আচ্ছা)। তখন কি এই সব দেড়মণ ভাত-গেলা এক গোয়াল লোক ছিল? শুধু তিনটী প্রাণী; বলাই, তারণ ম্যানেজার আর ন'কড়ি হিসেব মুহুরী; তাতে কাজ হত আয়নার মত; আর এখন যত লোক বাড়ছে, তত গোল বাড়ছে, কাছারী ত নয় কল্যাণপুরের হাট।

বাধা দিয়া বিলাস কহিল, "আচ্ছা, বক্তিমেটা পরে হবে, খাতাটা খোঁজ ত দেখি, কেমন তোমার ষোল বছরের সার্ভিস।"

বলাই রেকর্ডে ঢুকিয়া পড়িল। বলাই যে খাতাটায় কাজ করিতেছিল বিলাস সেটা আনাইয়া চোখ বুলাইতে লাগিল। বলাইয়ের উপর বিলাস বিশেষ খুসী ছিল না, তাহার মনে হইত বলাই-ই শৃঙ্খলারক্ষার প্রধান অন্তরায়—তাই সে তাহার কাজের গলদ্ খুঁজিতেছিল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে হাতে মাথায় একরাশ ধূলা মাখিয়া একটী জীর্ণ খাতা লইয়া বলাই বিলাসের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, "পাওয়া গেছে সার, আপনার টেবিলে ফেলব খাতাটা? মাথাটায় রুমাল ঢাকা দিন, নইলে আমার মত চেহারা হবে। আমার ষোল বছরের সার্ভিস, ধুলো খাওয়া হজম হয়, আপনি ত সবে মাস ছয়েক এসেছেন, এ ধুলো বরদাস্ত করতে পারবেন না।" সে মাত্র ছয়মাস কাজ করিতেছে, কাজেই সে জমিদারীর কাজ বোঝে কম, বলাইয়ের কথায় এই ইঙ্গিত পাইয়া বিলাস মনে মনে যথেষ্ট চটিলেও বাহিরে তাহা অপ্রকাশ রাখিয়া কঠিন ভাবে বলিল, "দাও টেবিলেই দাও"।

বলাই দুম করিয়া খাতাটা টেবিলে ফেলিতেই একরাশ ধূলা টেবিলময় ছড়াইয়া পড়িল। খাতাটা না খুলিয়া বলাইয়ের লিখিত অন্য খাতাটায় অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বিলাস কহিল, "এটা কি হয়েছে?"

মনযোগসহকারে নিজের নকলের ভুলটী দেখিয়া বলাই কহিল, "ওটা স্লিপিং মিসটেক সার।"

একটা চাপা হাসির লহর কাছারীময় খেলিয়া গেল। উদ্যত হাসি চাপিয়া বিলাস কহিল, "স্লিপিং মিসটেকটা কি?"

—"আজ্ঞে, লিখতে লিখতে ভুল আর কি! আপনারা ত ঐ-ই বলেন"।

খাতার দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বিলাস পুনরায় কহিল, "ওটা না হয় ভুল, কিন্তু এগুলো কি? গোটা খাতাময়ই ত দেখছি একটাও যুক্ত অক্ষর নাই। যুক্ত অক্ষর কি পণ্ডিত তোমায় শেখায় নাই!"

হাসিয়া বলাই কহিল,"আজ্ঞে, ভাঙ্গা অক্ষরেই ষোল বছর কাটিয়ে দিলাম—আজ এষ্টেট—"

বাধা দিয়া রূঢ়কণ্ঠে বিলাস বলিল, ষোল বছর কাটলেও আর ষোল দিনও কাটবে না, এই লেখায়। ভাল ক'রে নকল করতে পার ত কর, নইলে তোমার কাজের দরকার নাই।"

হাসিয়া লঘুকণ্ঠে বলাই কহিল, "আজ্ঞে দশ বছর বয়সে পাঠশালা ছেড়েছি, পণ্ডিত তখন যুক্ত অক্ষর ভাল করে শেখায় নাই—এখন কি করে লিখব? আর আপনার মত যুক্ত অক্ষর কি ইংরেজী যদি জানব, তবে আপনি এ্যালায়েন্স পান দেড়শো, আর আমি পাই শুকো আটটা টাকা"।

কঠিনস্বরে বিলাস কহিল, "তোমার ফাজলামী শোনবার সময় আমার নেই। ভাল করে কাজ না করতে পারলে কাল থেকে তুমি এস না, তোমাকে জবাব দিলাম।"

অবিচলিতকণ্ঠে বলাই কহিল, "আজ্ঞে কর্ত্তাবাবু বলেছিলেন আমার চাকরী কখনও যাবে না। আমার বাবার কাছে যখন কল্যাণপুরের অংশ সস্তায় কিনে নেন, তখন কর্ত্তাবাবু বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, আমি যতদিন বাঁচব তিনি আমায় পালন করবেন"।

কল্যাণপুরের অংশ সস্তায় লওয়ার কথায় ও পিতার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়ায় বিলাস অসম্ভব চটিয়া

গেল। সে তীব্রকণ্ঠে বলিল, "যিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যাও তাঁর কাছে। তোমাকে দিয়ে আমার কাজ চলবে না। যাও, আজই তুমি মাইনে মিটিয়ে নিয়ে যাও, তোমার মত ফাজিল লোক কাছারীতে না থাকাই ভাল—যাও এখুনি।"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া নমস্কার করিয়া বলাই কাছারীর বাহির হইয়া আসিল। ষোল বছরের যাওয়া-আসা তাহার এক দিনেই শেষ হইল। অন্যান্য কর্ম্মচারীরা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। বলা বাহুল্য, ঘরময় একটা আতঙ্কের বিভীষিকা ছড়াইয়া পড়িল।

* * * *

"দিশীখবর", "বিলিতিখবর"—"নূতন খবর"—বলাই হাঁকিয়া হাঁকিয়া গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় কাগজের বোঝা বগলে লইয়া ফেরে। শুধু একটী নয়, আশে পাশের আট দশখানি গ্রামে সে কাগজ ফেরি করে। বেলা দেড়টার ট্রেনে কাগজ নামে, সেই কাগজ বিলি করিয়া রাত্রি আটটায় সে বাড়ী ফেরে। কাগজের দামটা সঙ্গে সঙ্গে পাঠাইতে হয় না, কাজেই কিছু নগদ পয়সা হাতে থাকেই। সেই পয়সায় বলাই তাহার আঠার বৎসরের ভাইটীকে দিয়া একটা পানবিড়ির দোকান খুলিল। খবরের কাগজ বিলির সময় সে জামার ছিট ও কাপড়ের একটা পোঁটলা ঘাড়ে ফেলিয়া বাহির হইত, সারাদিন ঘুরিয়া যাহা বিক্রী হইত, মহাজনের দোকানে আসিয়া জমা দিয়া নিজের প্রাপ্য কমিশন কাটিয়া লইত। এইভাবে বিনা মূলধনে শারীরিক শ্রমে চাকরী ছাড়াও বলাইয়ের দিন ভালই যাইতে লাগিল। তাহার পূর্ব্ব-কর্ম্মবন্ধুদের কেহ যদি জিজ্ঞাসা করিত, "কেমন আছ বলাই?" হাসিয়া সে উত্তর দিত, "গোলামীর চেয়ে ভালই। শরীর যতদিন আছে, মাসে আট টাকার বেশী রোজগার বলাই চাটুজ্যে করবেই। আরে চাকরী করে কবে কে বড় হয়েছে? বাণিজ্যেই লক্ষ্মী, বুঝলে। এই যে ব্যবসা [illegible]ছি দেথ তো দুবছরে লাল হয়ে উঠছি।" তাহার [illegible] শরীরটার দিকে চাহিয়া লোকে বলিত, "চাকরী ছেড়ে তোমার শরীরটা ভাল হয়েছে হে।"

বাহুর পেশীটায় একটা মোচড় দিয়া বলাই উত্তর দিত, "আয়রণ-বিল্ট বাবা; ভীম ভবানী। এ শরীরে হাজা [illegible]ই—মাস গেলে বারটা টাকা আসবেই, এ একেবারে ঠিকে চুক্তি। এই বলাই চাটুজ্যে বাজী রেখে পাঁচ সের মিষ্টি একসঙ্গে মেরে দিতে পারে, চোঁয়া ঢেকুরটি পর্য্যন্ত উঠবে না।"

লোকে তাহার সুপুষ্ট শরীরের দিকে তাকাইয়া বিশ্বাসের হাসি হাসে। পাড়ার ভোজে কাজে জবর খাইয়ে বলিয়া বলাইয়ের সুনাম আছে।

'আয়রণ' অক্ষয় অটুট নয়, তাই 'আয়রণ-বিল্ট' যে শরীরটা মানুষের, তাও অক্ষয় অটুট নয়। একদিন মাথাটা ভার হইয়া জ্বর আসিল, ক্রমে বুকের দোষ দেখা দিল। ডাক্তারেরা বলিল, নিউমোনিয়া। যথাসাধ্য চিকিৎসা চলিল; ক্রমে রোগ কমিয়া আসিল, কিন্তু একেবারে সারিল না। জ্বর কমিয়া সেই যে একশ' ডিগ্রীতে ঠেকিল, আর নড়িল না। বৈকালের দিকে জ্বরটা বোধ হয় কিছু বেশী উঠিত, শরীরটা সেই সময়েই বেশী ভারী বোধ হয়। বুকের দোষটাও সামান্য একটু রহিয়া গেল; কাসিতে কাসিতে এক আধ টুকরা শ্লেষ্মা উঠিত, কিন্তু যাহাকে শরীরের শ্রমের বিনিময়ে অন্নসংস্থান করিতে হয়, তাহার সামান্য একটু জ্বর বা শ্লেষ্মার জন্য বাড়ীতে বসিয়া থাকিলে চলে না। শয্যাগত অবস্থায় ছোট ভাইটীকে দিয়া কাগজ বিলি করিয়া কোন রকমে সে খরিদ্দারগুলি বজায় রাখিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে পানবিড়ির দোকানটীর ক্ষতি হইয়াছে; এদিকে সামান্য যা' কিছু পুঁজি ছিল, ডাক্তারের ফি ও ঔষধের দাম দিতে তাহা ত গিয়াছেই, কাগজবিক্রীর টাকাও কিছু ভাঙ্গা হইয়া গিয়াছে, কাজেই নিজে বাহির না হইলে আর চলে না।

*

শরীরটা যে হঠাৎ কেমন করিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, বলাই ঠিক যেন বুঝিতে পারে না। দাঁড়কা কল্যাণপুর হইতে চার মাইল পথ—এই পথটা পূর্ব্বে সে অক্লেশে এক ঘণ্টায় অতিক্রম করিত, এখন পথটা বড় দীর্ঘ লাগে, সময়ও লাগে অনেক বেশী। পা গুলায় পূর্ব্বের সে স্ফূর্ত্তি আর নাই, মনটা আগের মত ভবিষ্যতের আশায় নাচিয়া নাচিয়া উঠে না, শরীরে এবং মনে সর্ব্বদাই কেমন একটা অবসাদ জাগে। ডাক্তারকে হাত দেখাইলে তিনি বলেন, "বিশ্রাম নাও বলাই, এ শরীরে এত পরিশ্রম ক'র না, সহ্য হবে না। একটু ভাল খাও দাও।"

ম্লান হাসিয়া বলাই বলে, "বসে বিশ্রাম নিলে খাব কি ডাক্তারবাবু? শুধু খেতে গেলেই বিশ্রাম নেওয়া চলবে না। ভাল খেতে হলে দৌড় ঝাঁপ আরও যে বাড়াতে হবে।"

চলেও না, তাহাকে গ্রামে গ্রামে পূর্ব্বের মত খবরের কাগজ ও কাপড় ফিরি করিয়া ফিরিতে হয়।

সেদিন দ্বিপ্রহরে এক হাতে একটি ছাতা, অন্য হাতে কাগজের তাড়া ও কাঁধে কাপড়ের বুঁচকী বাঁধিয়া বলাই দাঁড়কা অভিমুখে চলিয়াছিল। বৈশাখের খর রৌদ্র, তাহার উপর বৃষ্টির অভাবে পৃথিবীটা জ্বলিয়া পুড়িয়া যেন খাঁক হইয়া গিয়াছে। রাস্তার ধারে ঘাসগুলাও শুকাইয়া নিশ্চিহ্ন, দিগন্তবিস্তৃত মাঠে এক বলাই ছাড়া অন্য জনপ্রাণী কেহ ছিল না, দূরে মাঠের গরুগুলা পর্য্যন্ত আহারের আশা ত্যাগ করিয়া বটগাছের তলায় আশ্রয় লইয়াছে। এই দারুণ রৌদ্রে বলাইয়ের মনে হইল শরীরের তাপটাও যেন বাড়িয়াছে। গলাটা খুশ খুশ করিতেই বলাই যেমন কাসিল, খানিকটা রক্ত মুখ দিয়া উঠিয়া আসিল। মুখ হইতে রক্তটা ফেলিবার সময় ভয়ে বিস্ময়ে আতঙ্কে বলাইয়ের সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। মাটির উপরে ফেলিয়া দেওয়া রক্তটা তখনও নিঃশেষে শুকাইয়া যায় নাই, একদৃষ্টে সেদিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে বলাইয়ের দুই চোখ বাহিয়া টপ টপ করিয়া অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িল। মাথাটা কেমন ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল।

* * *

কথাটা সে প্রকাশ করিল না, নিজেরই তাহার নিজের কাছে এ কথাটা বলিতে কেমন সঙ্কোচ ও শঙ্কা জাগিল। বলাই চাটুজ্যে সে, ভীম ভবানীর মত দেহ তাহার, সেই শরীরে কি দুর্ব্বলের ক্ষয়িষ্ণু ব্যাধি আশ্রয় লইতে পারে? অনেক সময় পিত্তের দোষে অমনি হয়।

কিন্তু রোগকে বলাই পাশ কাটাইয়া চলিলেও রোগ বলাইকে পাশ কাটাইল না। গ্রামের ডাক্তারকে সকল কথা বলিতে হইল, তিনি ঔষধ ও ইন্‌জেক্‌সনের ব্যবস্থা করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে রোগের কথাটা এমুখে ওমুখে সারা গ্রামেও ছড়াইয়া দিলেন।

স্ত্রী কমলা স্নানের ঘাটে কাণাঘুষায় কথাটা শুনিয়া ফেলিল, ভয়ে বেচারীর মুখ এতটুকু হইয়া গেল; তাহাদের যে দু'টি নাবালক দুগ্ধপোষ্য শিশু! বাড়ীতে গিয়া বলাইকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ গো তোমার কি অসুখ করেছে? প্রমথ ডাক্তার না কি ওপাড়ার মণি মুখুজ্যেকে কি সব বলেছে। তোমার না-কি বুকের দোষ?"

মুহূর্ত্তে বলাইয়ের মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। পরক্ষণেই সে কহিল, "আমার? হ্যাঁ—বুকের সর্দ্দিটা এখনও যায় নাই, বুকের দোষটা রয়ে গেছে।"

সভয়ে কমলা কহিল, "তা রোগ পুষে রেখে কি হবে, চিকিৎসে করাও।"

সহসা খিঁচাইয়া উঠিয়া বলাই কহিল, "করাচ্ছি ত দেখতে পাও না, রোজ গেলাস গেলাস ওষুধ গিলছি। রোগ হয়েছে আমার, মরবার ভয়টা তোমার অত কেন? বেশী ভয় হয় ত, না হয় বাপের বাড়ী পালাও।"

কমলা চুপ করিয়া গেল। সহসা উত্তেজনায় বলাই কাসিতে আরম্ভ করিল, কাসিতে কাসিতে হড়হড় করিয়া অনেকটা রক্ত মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল। এই দ্বিতীয় দিন প্রচুর রক্তবমন হইল। পূর্ব্বে কয়েকবার অল্পস্বল্প রক্ত দেখা দিয়াছে মাত্র। দুর্ব্বল দেহটা চালার একটা বাঁশের খুঁটিতে এলাইয়া দিয়া বলাই বসিয়া পড়িল। কমলা ভয়ে কণ্টকিত হইয়া সেই রক্তধারার দিকে চাহিয়া রহিল; মুখ দিয়া তাহার কথা ফুটিল না।

ক্রমশঃ বলাই দুর্ব্বল হইয়া পড়িল; দূর গ্রামে যাওয় আর সম্ভব হইল না। ভাইকে সে খবরের কাগজের ভার দিয়া নিজে দোকানের ভার লইল।

দোকানে সে বসিয়া থাকে, কিন্তু খরিদ্দার কেহ আসে না। রাস্তায় পুরাতন খরিদ্দারদের সঙ্গে দেখা হইলে সে বলে, "কই, ভবেশ বাবু আর ত চা নেন না? এবার ভাল পাতা চা আনিয়েছি; ছ' আনা পাউণ্ড, ভূদেব বেণের ঘরে চা ত আট আনা পাউণ্ডের কম নেই, তাও আমার চেয়ে খারাপ, মিলিয়ে দেখুন না। দেব এক পাউণ্ড?"

পূর্ব্বে গ্রামের সকলে তাহার সঙ্গে সাধিয়া ডাকিয়া আলাপ করিত, তাহার কৌতুকে রঙ্গরসে সকলেই আনন্দ পাইত, আজকাল আর কেহ তাহার সামনে দাঁড়াইয়া কথা কহিতে চায় না। সংক্রামক রোগের মত তাহাকে এড়াইয়া যায়; একথা সে বোঝে কিন্তু বিশ্বাস করিতে চায় না। লোকে

যতই তাহাকে এড়াইয়া দূরে যাইতে চায়, লোকের সঙ্গে মিশিবার ক্ষুধা ততই তাহার বাড়িয়া উঠে।

একদিন গ্রামের চার পাঁচজন লোক পর পর আসিয়া জানাইয়া গেল, আজ খবরের কাগজ পাওয়া যায় নাই। মনে মনে ভাইটা বাড়ী ফিরিলে তাহাকে তিরস্কারের জন্য চোখা চোখা শব্দবাণ সে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল কিন্তু সেদিন রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত ভাই বাড়ী ফিরিল না।

পরদিন জানা গেল সংবাদপত্র বিক্রয়ের টাকাগুলি লইয়া সে বাড়ী ছাড়িয়া কাটোয়া পলাইয়াছে। কাহাকেও কাহাকেও না কি বলিয়া গিয়াছে, যক্ষ্মারোগীর সঙ্গে বাস করিয়া নিজের কাঁচা প্রাণটা খোয়াইতে সে পারিবে না।

বলাই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। মাসশেষে কাগজওয়ালাদিগকে টাকা না পাঠাইলে তাহারা কাগজ বন্ধ করিবে। নিজেরা যতই সাম্যবাদের পক্ষে ও ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে লম্বা লম্বা প্রবন্ধ লিখুক, নিজেদের টাকাটী না পাইলে কাগজ বন্ধ করিতে একদিনও তাহারা বিলম্ব করে না। দোকান ত অচল, সক্ষম ভাইটাও পালাইল, এ দুঃসময়ে বলাই চোখে অন্ধকার দেখিল। অনাহারে তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করা ছাড়া কোনো উপায় রহিল না।

হরকালীবাবু অনেক দিন পর দেশে আসিয়াছেন। তাঁহার আসার খবরটা গ্রামের সকলেই শুনিয়াছে। সেদিন হরকালী বাবু তাঁহার কাছারীতে বসিয়া খাতাপত্র ঘাঁটিতেছেন, এমন সময় শীর্ণ কঙ্কালসার বলাই দরজায় মাথা গলাইল। যাহারা পূর্ব্বে তাহাকে দেখিলেই একটা কিছু হাসির কথার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া থাকিত, আজ তাহাদের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, তাহাদের মুখে বিরক্তির ও শঙ্কার একটা ছায়া স্পষ্ট হইয়া উঠিল। হরকালীবাবুর সামনে যে কর্ম্মচারীটা দাঁড়াইয়া ছিল, সে অস্ফুট কণ্ঠে বলিল, "বলাই এসেছে।"

খাতা হইতে মুখ না তুলিয়াই হরকালীবাবু কহিলেন, "কি হে মিঃ বি. চ্যাটার্জ্জী, শরীর ভাল আছেন ত সার?"

ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলাই গিয়া তাঁহার পদধূলি লইল। পায়ের ধূলা লইয়া যখন বলাই সোজা হইয়া দাঁড়াইল, হরকালী বাবু তাহার দিকে তাকাইয়া বিস্ময়ে ভয়ে নির্ব্বাক হইয়া ক্ষণেক স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তাহার গৌর বর্ণ তামাটে হইয়াছে, উজ্জ্বল চোখ দুইটী কোটরগত, ম্লান; গালের মাংসগুলো একেবারে হাড়ের সঙ্গে লাগিয়া আছে, হাত পা-গুলা শীর্ণ, বুকের পাঁজরগুলা গোণা যায়।

অস্ফুটকণ্ঠে হরকালী বাবু কহিলেন, "বলাই, তুই? এ তোর কি হয়েছে?"

কি জানি কেন বলাইয়ের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল, চোখের কোণে মনের সঞ্চিত বেদনা অশ্রুবিন্দু রূপে দেখা দিল। অতি কষ্টে সে কহিল, "বাবু আমি বাঁচব না। আমার জমিগুলোর খাজনা তামাদি হবে, তাই শুনলাম নালিস হবে, আমার ছেলে দুটো কি না খেয়ে শুকিয়ে মরবে?"

বলাই অসম্ভব হাঁপাইতে লাগিল; বেশী কথা কহিতে ইদানীং তাহার বড় কষ্ট হয়।

বিস্ময়াপ্লুত কণ্ঠে হরকালী বাবু কহিলেন, "তোর হয়েছে কি? জমির খাজনা বাকী ফেললি কেন, মাইনের টাকা গুলো করলি কি?"

এইবার হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলাই কহিল, "চাকরী আমার আজ দেড় বছর নেই কর্ত্তাবাবু, আপনি বলেছিলেন আমায় দেখবেন, কিন্তু তা' হয় নি। আমার ছেলেগুলোকে আপনি দেখবেন বাবু, তা'দিগকে আপনার পায়েই দিয়ে যাব।"

বলাই হরকালী বাবুর পা দুইটী জড়াইয়া ধরিল, প্রবল উত্তেজনায় সে বিষম হাঁপাইতেছিল।

হরকালী বাবু নির্ব্বাক দৃষ্টিতে বিলাসের দিকে তাকাইলেন। নীরব হইলেও সে ভর্ৎসনা শুধু বিলাস নয়, আরো অনেকে বুঝিল।

ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া হরকালী বাবু কহিলেন, "আচ্ছা, তোর জমির নালিশ হবে না, আমি নাখরাজ দলীল করে দোব, নয়ত আমার কোনো জমিতে তোর জমা চুকিয়ে দেব। তুই ভাল করে চিকিৎসা করা; খরচ আমি সব দেব।" বলাইয়ের কোটরগত চোখ দুইটী অকস্মাৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, শীর্ণ কুঞ্চিত কপোলে হাসির একটা সুস্পষ্ট রেখা ফুটিয়া উঠিল; সে রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "আপনি আমার লাইফ লাইকের পেরেন্ট সার।"

হরকালী বাবু হাসিয়া কহিলেন, "আমি যে তোর নেবার-ইন-ল রে হতভাগা।"

বলাই কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু প্রবল কাসিতে তাহার স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল; কাসিতে কাসিতে সে এক ঝলক রক্ত বমন করিল। দু একজন কর্ম্মচারী বলিল, "বাইরে বাইরে।" হরকালী বাবু অঙ্গুলিসঙ্কেতে তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন। বলাই ক্লান্ত ভাবে হাঁপাইতে লাগিল, কিছুক্ষণের মধ্যেই আরো কয়েকবার রক্ত বমন হওয়ায় সে অবশ হইয়া শুইয়া পড়িল। হরকালী বাবু কহিলেন, "বিলাস একটু জল আনিয়ে ওর মুখে দাও।" জল আসিল, কিন্তু দিতে গিয়া দেখা গেল, দুই দিকের কষ বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া হরকালী বাবু চোখ তুলিয় বিলাসের পানে চাহিলেন, তারপর যেন নিজের মনেই বলিলেন, "ছোকরা না খেয়ে ম'ল।"

বিলাসের অনুগত একজন কর্ম্মচারী বলিল, ওর বাবাও ঐ রোগে মরেছিল, হুজুর!

হরকালী সে কথায় কাণ দিলেন না, বলিলেন, "ওর বাড়ীতে খবর দেওয়া আর যা-যা করা সব ভার তোমার উপর রইল"—বলিয়া বিলাসের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া, গম্ভীর ভাবে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

সাঙ্কেতিক বর্ণমালা

—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঠারে কথা বলা অতি প্রাচীন কাল হইতে আমাদিগের দেশে প্রচলিত আছে,—যেমন, বররুচিঠার, কদম্বঠার, ফুলঠার ইত্যাদি।

ইউরোপেও ঠারে কথা বলিবার নানাবিধ পদ্ধতি অতি প্রাচীন কাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। মঠের সন্ন্যাসীরা অনেক সময় মৌনী থাকিতেন। তখন তাঁহারা ইঙ্গিত করিয়া অথবা শূন্যে অঙ্গুলিসঞ্চালন দ্বারা বর্ণ-বিন্যাস করিয়া ভাবের আদান প্রদান করিতেন।

মূক-বধিরদিগের কথিত ভাষা শিক্ষা দিবার পদ্ধতি আবিষ্কারের পূর্ব্বে, তাহাদিগকে ইঙ্গিতের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হইত। ফ্রান্সে মহাপ্রাণ Abbe De l'Epee মূক-বধিরদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য তাহাদিগের স্বাভাবিক ইঙ্গিতের উপর নির্ভর করিয়া, একটি ব্যাবহারিক ইঙ্গিতের ভাষা (conventional sign language) আবিষ্কার করেন। কিন্তু ইহার পদবিন্যাস (syntax) কথিত ও লিখিত বাক্যের পদ-বিন্যাস হইতে অনেক পৃথক্। এই ভাষার সাহায্যে গুণবাচক পদের মধ্যস্থিত সূক্ষ্ম বিশেষত্ব অনেক সময় পরিস্ফুট করিয়া প্রকাশ করা যায় না। এই জন্য মূক-বধিরদিগের শিক্ষকগণ অঙ্গুলি-সঞ্চালন দ্বারা শূন্যে বর্ণ-বিন্যাস করিয়া শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন।

এই অঙ্গুলিসঞ্চালন দ্বারা শূন্যে পাদবিন্যাস করিবার পদ্ধতি তাঁহাদিগের আবিষ্কৃত নয়। তাঁহারা মঠের মৌনী সন্ন্যাসীদিগের নিকট হইতে ইহা গ্রহণ করিয়া মূক-বধিরদিগের সাহায্যকল্পে ব্যবহার করিয়াছিলেন।

কথিত ভাষা শিক্ষা দিবার পদ্ধতির আবিষ্কারের সহিত, শিক্ষাগৃহে এই সাঙ্কেতিক বর্ণমালার ব্যবহারের হ্রাস পাইয়াছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ উঠিয়া যায় নাই। ইহার ব্যবহার সম্পূর্ণ ভাবে কোন দিন উঠিয়া যাইবেও না। সভা-সমিতিতে ইহার ব্যবহার ব্যতীত কোন উপায় নাই। কারণ, সভাগৃহের বিভিন্ন স্থান হইতে বধিরের পক্ষে বক্তার ওষ্ঠ-পাঠ করা অসম্ভব। সাধারণতঃ বক্তার বলিবার সঙ্গে সঙ্গে কেহ সাঙ্কেতিক বর্ণমালার সাহায্যে বক্তার বক্তব্য বিষয় তর্জ্জমা করেন।

ইংলণ্ডে দুই হস্তের দশটি অঙ্গুলির সাহায্যে তদ্দেশে প্রচলিত সাঙ্কেতিক বর্ণমালা বিন্যস্ত করা হয়। আমেরিকায় প্রচলিত বর্ণমালা লিখিতে মাত্র পাঁচটি অঙ্গুলির সাহায্যের প্রয়োজন হয়। আমেরিকায় প্রচলিত বর্ণমালা এই:- ।

× × × × ×

আমেরিকান সাঙ্কেতিক বর্ণমালার প্রণয়নপদ্ধতির উপর নির্ভর করিয়া কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম অধ্যক্ষ আমার স্বর্গগত পিতৃদেব ৺যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (গত সংখ্যায় ইহার ছবি প্রদত্ত হইয়াছে) মহাশয় বাংলা ভাষার জন্য এক সাঙ্কেতিক বর্ণমালার আবিষ্কার করেন। ইহার সাহায্যে সংস্কৃতমূলক সকল ভাষাই লেখা যাইতে পারে।

অনাগত

—শ্রীপ্রমথনাথ কুণ্ডার

অনাগত হে পথিক, জীবনের গোধূলি-বেলায়,
কালের এ বেলা-বালুকায়
পায় পায়,
কাঁদিছে পরাণ মোর ধরণীর তরে।
সুমন্দ স্পন্দন লাগে তরণীর 'পরে।
তবু যেতে হবে—
সকল বন্ধন ছিঁড়ি নিতান্ত নীরবে
অনন্তের ডাকে ;
বিস্মৃতির কালো ছায়া নিত্য যেথা স্মরণেরে ঢাকে।

আবর্ত্ত-লীলায় হেথা নৃত্যভঙ্গে চলে চিরদিন
বসন্ত নবীন,—
শীতদগ্ধ বনানীর অযুত শাখায়
স্বপনের সূক্ষ্ম-সূত্রে কুসুম ফোটায়।
মধুর মাধবী রাতে সুরের বিলাসে
বিরহের বাণী কার ভেসে ভেসে আসে
দক্ষিণের উতরোলে—
মোর ধরণীর এই সুশ্যামল কোলে।

হেথা কবিতার রসে
উচ্ছল আকাশতল আষাঢ়ের প্রথম দিবসে।
আত্মার বিধানে,—
মানুষে মানুষে হেথা মহাসত্য জানে।
জাগিয়া দেবতা তার হৃদয়-প্রাঙ্গণে,
আগে চলে অগ্রদূত,—কুরুক্ষেত্র রণে।
অমৃতের পুত্র সে যে, রহে নাকো মিথ্যায় মগন,
কালিকার দস্যুশ্রেষ্ঠ আজি সে-ই রচে রামায়ণ।
অসীমের তৃষ্ণা লয়ে আসে হেথা সবে
চলে যায় বেলা-শেষে—ব্যথার গৌরবে।

ধরার ধূলায় হেথা সন্ধ্যা আসে নেমে,
থেমে থেমে,
স্তব্ধ করি চারিধার সমাধির মত।
জাগে অবিরত,
সমাপ্তির শেষ প্রশ্ন,—বিরক্তির কথা,
তুচ্ছ করি দিবসের সর্ব্ব চঞ্চলতা।

আমার পৃথিবী এই ; আমি তারে বেসেছিনু ভালো
আমার সকল দিয়া। আরতির আলো
পরাণের দীপদণ্ডে তুলিয়া ধরিয়া
গেয়েছি বন্দনা-গীতি কণ্ঠ মোর ভরিয়া ভরিয়া,
ছন্দে, গানে,—
ধ্যানের সোপানে।

তারপর দূর-দুরান্তরে,
সৃজনের অগোচরে,
বসিয়া একেলা,
কল্পনার সুরলোকে যাপিয়াছি বেলা।
আমার এ সাধনারে,—
নব-প্রভাতের দ্বারে পূর্ণ করিবারে।
ওগো বন্ধু, সেথা আমি মাগিয়া লয়েছি মোর বর,—
মাটির পৃথিবী 'পরে পুনরায় বাঁধিবারে ঘর।

হে অতিথিরাজ,
দূর-পথে দেখি যেন আজ
উড়ে তব বিজয়-পতাকা,
মেঘে যেন বিদ্যুল্লেখা বাঁকা।

আকাশ-ললাট-মাঝে,
নবতর সাজে,
তারায় তারায় তব আগমনী লিখা।

সমুন্নত ভালে তব পরাইতে টীকা
চলে পল্লীবালা
আঁচল আড়ালে তার গন্ধ-দীপ জ্বালা।

পড়িলে করিয়ো মনে
অবসর-ক্ষণে,—
দীনতম কবি এক পল্লীর সন্তান
ধরণীর জয়গানে রচিয়াছে সমাধি-শয়ান।

সেই ধরণীরে মোর দিয়ে গেনু তব করে, হায়,—
দেখো বন্ধু, দেখো তারে,—বিদায় বিদায়।…

প্লাবন

—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চায়ের পেয়ালায় ধোঁয়া উঠিতে সবাই দেখিয়াছে, কিন্তু চায়ের পেয়ালায় ঝড় উঠিতে কেহ দেখিয়াছ কি? আমি দেখিয়াছি। সেই কথাই বলিব।

কুমিল্লা সহরের সাহেবপাড়ার একটি বাঙলো। বর্ষাকাল, সারারাত্রি বৃষ্টি হইয়াছে, ভোরের দিকেও টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল, এই মাত্র বৃষ্টি বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু আকাশের মুখের ভাব যেরূপ গোমড়া রহিয়াছে, তাহাতে এখনই ধারা নামা আশ্চর্য্য নয়। বাঙলোটির সামনে সাজান একটি ফুল-বাগান, ধারাবর্ষণ সত্ত্বেও কত কগুলি গাছ বিবর্ণ ফুলগুলিকে অঙ্গে ধারণ করিয়া সদ্যোবিধবা নারীর মত সন্তান-ক্রোড়ে দাঁড়াইয়া আছে। বাঙলোর পিছন দিয়া খরস্রোতা গোমতী নদী প্রবাহিতা। অন্য সময়ে নদীটির দুই পাড়ে প্রশস্ত সাদা বালির চর পড়িয়া থাকে, বর্ষায় পাড় ভরিয়া, চর ঢাকা পড়িয়া গোমতী কূলে কূলে ভরিয়া উঠে। আজও নদী কূলে কূলে ভরা—বাঙলোখানির বাঁশের রঙীন বেড়ার রঙ ধুইয়া ফুলগাছের গোড়াগুলিতে ফেনা জমাইয়া দিয়া, বহিয়া যাইতেছে।

আজ প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া মুখ ধুইতে যাইবার সময় ইন্দু বাঙলোর বারান্দায় দাঁড়াইয়া অপলক নেত্রে সেই দৃশ্যই দেখিতেছিল। শহরের মেয়ে, শহরে লালিত পালিত, শহরে বর্দ্ধিত, নদীর এমন ভরাট, এমন বিরাট, এমন মহান্, এমন সুন্দর রূপ আর কখনও দেখে নাই, আজ দেখিয়া তাহার আশা মিটিতেছিল না। নদীর জল তর্ তর্ বেগে একদিকে ছুটিয়াছে, কোথাও স্রোত ঘূর্ণাবর্ত্তে ছুটিতেছে,. কোথাও জ্যানিক্ষিপ্ত শরের মত তির্য্যক্ গতিতে ছুটিতেছে, কোথাও একটু সংঘর্ষজনিত তরঙ্গের উদ্ভব হইতেছে। পরপারের জল যেন কতকটা স্বচ্ছ, মধ্যদেশে স্বচ্ছতা কমিয়া আসিয়াছে, এপারে জল অত্যন্ত ময়লা, গিরিমাটির রঙ। স্রোতের সঙ্গে কোথায় ছোটখাট গাছপালা ভাসিয়া চলিয়াছে, বন-বিল ভাসা শ্যাওলা, শাপলাফুল কোথাও ডুবিয়া, কোথাও ভাসিয়া, কোথাও আধডোবা আধভাসা হইয়া ছুটিতেছে, কোথাও খড়-কুটা ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া কিছুক্ষণ ঘুরিতেছে, আবার আবর্ত্তমুক্ত হইয়া স্রোতোবেগে ধাইয়া চলিতেছে। কোথায়ও একটি জনপ্রাণী নাই, যতদূর দৃষ্টি চলে—জল, কেবল জল। নদী-মাঠ সব একাকার হইয়া গিয়াছে। অনেক দূরে, প্রায় দৃষ্টিচক্রের শেষপ্রান্তে একখানি গ্রাম যেন দেখা যায়, হয়ত জল সেই পর্য্যন্ত ছুটিয়াছে।

বেহারা আসিয়া সেলাম করিয়া কহিল, হুজুর, চা টেবলপর্।

ইন্দু ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সাবকো গোসল হো গিয়া?

—জী।

ইন্দু ত্বরিতপদে প্রাতঃকার্য্যাদি সমাপন করিয়া যখন ভোজনকক্ষে উপস্থিত হইল, প্রণয়ের এক প্রস্থ চা পান হইয়া গিয়াছিল।

ইন্দু হাসিমুখে কহিল, শুধু চা খাওয়া হল বুঝি?

প্রণয় বলিলেন, ওটা বেড-টী'রই সামিল।

ইন্দু এগ্-ফিলিপ্ করিয়া, টোষ্ট সাজাইয়া, আবার চা ঢালিয়া দিল, প্রণয়কুমার সুখভোজন করিতে করিতে বলিলেন, আজ যাচ্ছ ত?

ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, কোথায়?

—ওয়েষ্টের ড্যান্স-ডিনারে।

—না।

—না কেন?

—সেদিনই ত বললুম, আমার ভাল লাগে না।

কি ভাল লাগে না, কেন ভাল লাগে না এ সকল প্রশ্ন প্রণয়ের মনেও আসিল না; তিনি বলিলেন, যাওয়া কিন্তু উচিত।

—কেন? ভাল না লাগলেও যেতে হবে?

—নিজের ভাল লাগাটাই যারা বড় ক'রে দেখে, তাদের কথা তাই বটে; কিন্তু অন্যের ভাল লাগাটাও দেখতে হয়।

ইন্দু নিজের কাছে যেন নিজেই কৈফিয়ৎ দিতে বলিল, অন্যেরই বা কি যে ভাল লাগে তা ত জানি নে। সেন সাহেবের বাড়ীর নাচে আমাকে গোড়ার দিকে সবাই টানাটানি করেছিল বটে, তারপর আমি যখন রাজী হলুম না, সবাই ত জোড় বেঁধে বেঁধে বাঁদরামী করতে লাগল। আমার জন্য কেউ ত বসে রইল না।

প্রণয় গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন, তুমি ওকে বাঁদরামী বল ?

—বলিই ত !

—তা হ'লে আমিও বাঁদর ?

ইন্দু তাহার গম্ভীর মুখভাব দেখিয়া ও গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল, বাঁদরেই কেবল বাঁদরামী করে না, কখন কখন মানুষেও করে।

প্রণয় বলিলেন, সমস্ত সভ্য সমাজটাই তা হ'লে বাঁদর সমাজ ?

ইন্দু এই প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়া, চায়ের বাটীতে চামচ ডুবাইয়া আস্তে আস্তে নাড়িতে লাগিল। তাহার অধরে হাসির রেখা স্ফুর্ত্ত ছিল কি ছিল না বলা যায় না, প্রণয় হাস্যরেখা কল্পনা করিয়া মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতে-ছিলেন। যুক্তিতর্কের পথ ছাড়িয়া দিয়া এবার স্পষ্টভাষায় আদেশ জ্ঞাপন করিলেন ; বলিলেন, আজ তোমায় যেতে হবে।

ইন্দু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, উঁহু।

প্রণয় কঠিনকণ্ঠে কহিলেন, আমি কথা দিয়েছি, তুমি যাবে।

—আমায় না জিজ্ঞেস করে তুমি কথা দাও কেন ?

—যাওয়া উচিত, যেতে হবেই, তাই কথা দিয়েছি।

—আমি যাব না। আমার ভাল লাগে না, আমি যাব না, এই শেষ কথা।

প্রণয় ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। এতক্ষণ পর্যান্ত বাহিরে তাহা অপ্রকাশিতই ছিল কিন্তু আর সম্ভব হইল না, কহিলেন, আমারও এমন অনেক কাজ করতে হয়, যা আমার ভাল লাগে না।

কথাগুলা বলিয়া নিজের কাণেই খাপছাড়া ও অসম্পূর্ণ বোধ হইল, তাই সম্পূর্ণ করিবার মানসে কহিলেন, নিজের ভাল লাগে না, তবু অন্যের মুখ চেয়ে অনেক কাজ আমাকেও করতে হয়।

ইন্দু সহাস দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, কর কেন ?

প্রণয় বলিলেন, অন্যের ভাল লাগে বলে।

ইন্দু বলিল, আমি হলে তেমন কাজ কখনও করতুম না। আমার যা ভাল লাগবে না, তা আমি করব না। কারুর মুখ চেয়েও করব না।

প্রণয় ক্ষণকাল কঠোর দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কঠিনতম কণ্ঠে কহিলেন, সেই ভ্যাগাবাণ্ডটার মা'কে কাশীতে টাকা পাঠাতে আমার ভাল লাগে না, তবু—

'ভ্যাগাবাণ্ড' কথাটা ইন্দুর বুকে বিঁধিয়াছিল, কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। আপনাকে সে ক্ষণেকের জন্য হারাইয়া ফেলিয়াছিল, পর মুহূর্ত্তেই সংযম ফিরাইয়া আনিয়া কহিল, সে টাকা ত তুমি দাও না, দিই আমি।

—টাকা আমার।

—যে মুহূর্ত্তে আমায় দাও, সেই মুহূর্ত্ত থেকে সে টাকা তোমার নয়।

—তুমি নষ্ট করছ দেখলে আমি টাকা বন্ধ করতে পারি।

—তা পার।—বলিয়া ইন্দু অভুক্ত চায়ের পেয়ালাটা সরাইয়া দিল। বোধ হয় মন চঞ্চল হইয়াছিল, হাতের গতিতেও চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইয়াছিল। তাহাকেই তাহার ক্রোধ কল্পনা করিয়া প্রণয়কুমার অধিকতর কঠিন হইয়া উঠিলেন। অধিকতর কঠিন আঘাত করিবার জন্য ভাষা খুঁজিতে লাগিলেন। কামরার জানালা দিয়া পরিপূর্ণদেহা নদীটি দেখা যাইতেছিল, ইন্দু সেই দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তাহার এই অসাধারণ নির্লিপ্ততা ও ঔদাসীন্য দর্শনে প্রণয়কুমার আরও জ্বলিয়া উঠিলেন ; বলিলেন, লোফারটার জন্যে তোমার যত দরদ—

ইন্দু ধীরকণ্ঠে কহিল, তুমি তাঁর নাম ত জান ! নাম ধরে কথা বললেই ভাল হয় না কি ?

প্রণয় অধীর ভাবে কহিলেন, না, নাম জানিনে, জানিবার দরকারও নেই।

—আজ দরকার না থাকতে পারে, যখন তাঁর মা'কে কাশী পাঠিয়েছিলে, তখন দরকার ছিল নিশ্চয়। তখন সে দরদ দেখাতে আমি বলি নি। তাঁকে যে খরচ হয়েছিল, তা করতেও আমি বলিনি।

—মনুষ্যত্ব—

ইন্দু হাসি চাপিয়া বলিল, তাই হবে।

প্রণয় চীৎকার করিয়া বলিলেন, তাই হবে! তার মানে?

ইন্দু নীরব।

প্রণয় পুনরায় চীৎকার করিয়া বলিলেন, তার মানে?

—না-ই বা শুনলে?

—না, আমি শুনতেই চাই।

ইন্দু ধীর সংযত কণ্ঠে কহিল, কি হবে শুনে? অপ্রিয় কথার যত কম আলোচনা হয়, ততই ভাল নয় কি?

প্রণয় পূর্ব্ববৎ কহিলেন, ভাল-মন্দর বিচার থাক্, আমি শুনতে চাই।

কথাটা কি তাহা জানি না, তবে ইন্দু কথাটা বলিতে উদ্যত হইয়াছিল, প্রায় যেন বলিয়া ফেলিয়াছিল, কি ভাবিয়া বলিল না, কহিল, থাক্।

প্রণয় চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া জলদগম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, তুমি বলবে কি না, তাই আমি জানতে চাই।

ইন্দু নম্রস্বরে কহিল, চেঁচাচ্ছ কেন? চাকর-বাকরেরা কি ভাবছে বল ত?

—ভাবুক। আমি শুনতে চাই।

—কিন্তু আমি বলতে পারব না।

দুই ঘূর্ণায়মান রক্তচক্ষুতে চাহিয়া প্রণয় বলিলেন, বলতেই হবে, না বললে আমি ছাড়ব না।

ইন্দু একমিনিট কি ভাবিল, তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, বলব, কিন্তু এক সর্ত্তে।

প্রণয় বলিলেন, কি?

ইন্দু বলিল, তুমি কথা দাও, তারপর আর আমার মুখ দর্শন করবে না।

প্রণয়কুমার নির্ব্বাক বিস্ময়ে ইন্দুর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। সাপ যেমন ঈশের মূলের গন্ধ পাইলে স্তব্ধ ভাব ধারণ করে, তাঁহারও সেই অবস্থা ঘটিল।

ইন্দু বলিল, তোমাকে ভয় দেখাবার জন্যে ও কথা আমি বলি নি। কথাটা খুবই তুচ্ছ, দোষেরও হ'ত না, যদি না তুমি আমাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জানা কথাটা বার করতে চাইতে।

প্রণয় বিস্মিতের মত কহিলেন, জানা কথা? কার জানা কথা?

ইন্দু বলিল, তোমারই জানা কথা। তোমার মনে যা আছে, থাকত; আমারও মনে যা আছে, থাকত। এ হলে কথাটা তেমন দোষের হ'ত না; কিন্তু আমায় বলতে হলে কথাটা নোংরা হয়ে দাঁড়াবে।

প্রণয়কে নির্ব্বাক দেখিয়া ইন্দু বলিল, শুনতে চাও?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু এখানে নয়, ঘরে চল। দোর বন্ধ ক'রে ঘর অন্ধকার ক'রে বলব।

—তার মানে?

—তার মানে এই যে, সে কথা বলতে হলে আমার নারীত্বকেও ধিক্কার দিতে হবে। আর সে কথা বলার পরে কোন ভদ্রনারী ভদ্রনারী থাকতে পারে না। চল, বলছি। কিন্তু তুমি আমার সর্ত্তে রাজী?

ইন্দুর অধরকোণে তখনও হাসির রেখা; তাহার খঞ্জন-গঞ্জন নয়ন দু'টি তখনও রহস্যালোকে উজ্জ্বল, চঞ্চল। অঙ্গের ভাবে ভঙ্গীতে, ভাষায় এতটুকু অধীরতা নাই, একটু চাঞ্চল্য নাই, রাগ-দ্বেষের কোন চিহ্ন মাত্র নাই। প্রণয়ের বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

ইন্দু দাঁড়াইয়া উঠিয়া, টেবিলের উপরে রক্ষিত প্যান্ট্রী-ভাঁড়ারের চাবির তাড়াটি তুলিয়া লইয়া দ্বারের দিকে চলিতে চলিতে বলিল, কথাটা বলব কিন্তু বলার পরে—যা হবার হক্ সে ভেবে আর কি হবে! দেখ, আজ তুমি সেই 'লোফার'টার মার কথা তুলে একটা নোংরা ইঙ্গিত করলে, তাই; নইলে যে কথা আমি এখন বলব, সে কথাটা ভাবতে আমার আনন্দই হ'ত, সুখই হ'ত।

কথা বলিতে বলিতে ইন্দু শয়নকক্ষের দ্বারের সম্মুখে আসিয়া একহাতে পর্দ্দাটা সরাইয়া ধরিয়া কহিল, এস।

প্রণয় আপিস-কামরার দিকে চক্ষু রাখিয়া কহিলেন, আমি ডাকটা দেখে আসছি।

—ডাক পরে দেখ, এস।

প্রণয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘরে ঢুকিতে বাধ্য হইলেন। ইন্দু দ্বারটা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল, বস।

নিজে বিছানার প্রান্তে বসিয়া বলিল, 'লোফার'টার উপর দরদ আমি দেখাই, তুমি বলেছ, কথাটা মিথ্যে নয়, সত্যিই তাঁর উপর আমার দরদ আছে। কিন্তু তোমার পয়সা দিয়ে দরদ দেখাবার প্রবৃত্তি আমার হত না, যদি না আমি জানতুম, তাঁদের দুঃস্থ অবস্থার জন্যে তুমিও দুঃখ অনুভব করছ। তাঁকে জেল তুমিই দিয়েছিলে, তিনি তাঁর মা'র একমাত্র সন্তান, সেই সন্তান জেলে গেলে তাঁর মা হয়ত অনাহারে মারা পড়বেন, এই ভেবে তুমি তাঁর মা'কে কাশী পাঠিয়েছিলে খরচপত্র দিয়ে, একথা তুমিই একদিন বলেছিলে। কিন্তু আমার কি মনে হয়েছিল জান? আমার মনে হয়েছিল, সেটুকু আমার মুখ চেয়েই তুমি করেছিলে, তুমি জানতে, তাঁদের আমি ভালবাসি—ইন্দু এক মুহূর্ত্ত থামিয়া আবার বলিল, তাঁরা আমার আপনার লোক, তাঁদের কষ্ট দূর করেছ জানলে আমি সুখী হব, এই ভেবেই তুমি সে কাজ করেছ। এতে একদিকে তোমার উদারতা, অন্যদিকে আমার উপর তোমার শ্রদ্ধা ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছিল, তাতে আমি সুখী হয়েছিলুম। এখন দেখছি—

প্রণয় বলিলেন, থামলে কেন? বল, এখন কি দেখছ সেটাও বল।

—এখন দেখছি, শ্রদ্ধা ভালবাসা কিছুই নয়, পাছে তুমি তাঁকে জেল দিয়েছ বলে আমি বিরূপ হই, উদারতাটুকু শুধু সেই জন্যেই দেখিয়েছিলে।

—তাই যদি সত্যি হয়, দোষটা হয়েছে কি?

—সে শুধু লোভ দেখিয়ে পাখীকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা বই ত নয়!

—তা হলে আমি নিজে থেকেই তোমাকে সব বলতুম। কিন্তু তুমি জান, বিয়ের প্রায় পনের দিন পরে ছায়ার সঙ্গে কথায় বিমলের জেলের কথা বেরিয়ে পড়ে, তাঁর মার কাশী যাওয়ার কথাও বার হয়। আমি ইচ্ছে করে বলি নি।

—বল নি সত্যি! কিন্তু তুমি ভেবেছিলে, তাঁর জেলের খবরটা আমি অন্য দিক থেকে জানতে পারবই; সেই ভেবেই তাঁর মাকে কাশী পাঠিয়ে তুমি সাধু সেজে বসেছিলে!

প্রণয় একটু একটু নরম হইয়া আসিতেছিলেন, এই কথায় শেষে আবার গরম হইয়া উঠিলেন। গরম হইবার [illegible] ইন্দু যে তাঁহার সুকল্পিত অভিসন্ধি ধরিয়া ফেলিয়াছে, ইহা তাঁহাকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়া ফেলিয়াছিল। তাঁহার কাণ মাথা ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল, তিনি কি যে বলিবেন, কি যে করিবেন ভাবিয়া পাইতে-ছিলেন না।

ইন্দু বলিল, আমার দরদ, সে ত আছেই। যতদিন পর্য্যন্ত তিনি উপার্জ্জনক্ষম না হন্ ততদিন পর্য্যন্ত তাঁর মা'র খরচ আমাকে পাঠাতেই হবে। আমার বাবা অক্ষম ন'ন, আমার অনুরোধ হাসিমুখেই তিনি রাখবেন।

প্রণয়কুমার এতক্ষণে সশস্ত্র হইয়া বলিলেন, তবু দরদ দেখাতেই হবে? উঃ!

ইন্দু বলিল, মনুষ্যত্ব কথাটা তুমি ব্যবহার করেছ, তাই সেই নোংরা কথাটা আর আমি বলব না। আমি বলব, কর্ত্তব্যবোধ।

প্রণয়কুমার উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, ফুঃ! কর্ত্তব্যবোধটা কি সমস্ত জেলখাটা লোকের মায়েদের জন্যই জাগে, না শুধু সেই—

ইন্দুর মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, বলিল, ও সম্বন্ধে আর কোন কথাই আমি বলব না। অন্য কথা থাকে, বল।

প্রণয় বলিলেন, ওয়েষ্টের ডিনারে তোমায় যেতে হবে।

—না। কোন ডিনারেই আর না।

—তার মানে?

– মানে কি স্পষ্ট নয়?

এই সময়ে বাহির হইতে দ্বারে কে 'নক্' করিতে লাগিল। প্রণয় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, কোন্ হ্যায়?

—হুজুর, ম্যাজিষ্টর সাব আয়া হ্যায়!

—আতে হেঁ।

মেজাজ ও কণ্ঠস্বর এক মুহূর্ত্তে নিম্ন পর্দ্দায় নামিয়া আসিল: তখনই দ্বার খুলিতে হইল। আপিস-কামরার বারান্দায় দাঁড়াইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট গোমতীর পানে চাহিয়া ছিলেন, প্রণয় আসিতে কহিলেন,—তোমায় বিরক্ত করিলাম; দুঃখিত। কিন্তু ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার অনেকগুলি গ্রাম প্রবল বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে, তোমাকে এই মুহূর্ত্তে রিলিফে যাইতে হইবে।

প্রণয়কুমার নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন, কহিলেন, এখনই যাইতেছি, স্যার।

সাহেব আবশ্যক দুই চারিটা কথা বলিয়া বিদায় লইলেন, প্রণয় শয়নকক্ষে ফিরিলেন। ইন্দু কোণের

টেবিলে বসিয়া চিঠি লিখিতেছিল, প্রণয় পার্শ্বে দাঁড়াইলেন, ইন্দু সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না। প্রণয় চিঠি পড়িলেন—

"শ্রীচরণেষু

বাবা, বিমলদার যতদিন কাজকর্ম্ম না হয়, ততদিন তুমি তাঁর মাকে কাশীতে কিছু কিছু টাকা পাঠাইও। তাঁর কাশীর ঠিকানা নীচে দিলাম। আমি ক'মাস পঞ্চাশ টাকা করিয়া পাঠাইয়াছি, আর আমি পাঠাইতে পারিব না। এই মাস হইতেই তুমি পাঠাইও।

তোমার আদরের ইন্দু।

প্রণয় বলিলেন, আমি মফঃস্বলে যাচ্ছি।

ইন্দু কথা কহিল না।

প্রণয় হাসিয়া বলিলেন, তোমার বড্ড রাগ হয়েছে দেখছি।

ইন্দু কোন কথা কহিল না।

প্রণয় আদরের স্বরে কহিলেন, বিমলকে লোফার বলেছি বলে রাগ করেছ! বলাটা অন্যায় হয়েছে বটে! তুমি তাকে ভালবাস জেনেও কথাটা বলা আমার অন্যায় হয়েছে। কিন্তু ইন্দু, তোমারও অন্যায় আছে।

ইন্দু কথা বলিল না, নিজের অন্যায়টা জানিবার কৌতূহলও প্রকাশ করিল না।

প্রণয় বলিলেন, এখন আর তোমার হৃদয়ে অন্যের স্থান থাকা কি উচিত? তোমার ভালবাসা—

ইন্দু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিবামাত্র প্রণয় নির্ব্বাক্ হইলেন। ক্ষণকাল পরে বলিলেন, তুমি বল তোমার মনে তার স্থান নেই, তা হ'লে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারি।

ইন্দু নির্লিপ্তের মত কহিল, সমুদ্রের তলে কি আছে না আছে কে বলতে পারে সে কথা!

প্রণয় স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, আমি দু'তিন দিন পরে ফিরব।

ইন্দু কোন কথা কহিল না; যেমন নীরবে বসিয়া ছিল, তেমনই বসিয়া রহিল। প্রণয় কক্ষত্যাগে উদ্যত হইলে হঠাৎ উঠিয়া আসিয়া একটা প্রণাম করিয়া আবার স্বস্থানে আসিয়া বসিয়া জানালাটা খুলিয়া দিল।

বাহিরে তখন বৃষ্টি সুরু হইয়াছে। গোমতীর পরপার দেখা যায় না; এপারে গোমতীর বুক যেন আরও ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ছায়া বলিল, আজ ইন্দুর চিঠি আসবে।

বিমল জিজ্ঞাসা করিল, কিসে বুঝলে?

ছায়া বলিল, একটু আগে তার আগের চিঠিটা বার করে তারিখ দেখ্‌ছিলুম, যেদিন ডাকে দেয়, সেই দিন থেকে তিন দিনের দিন চিঠি আসে। তা হ'লে যায়ও তিন দিনের দিন। যেতে তিন দিন, আসতে তিন দিন, এই ছ'দিন লাগবে ত! আজ সেই ছ'দিন।

বিমল বলিল, তুমি বসে বসে এত হিসেব করছ ছায়া!

—আমার যে স্বার্থ রয়েছে দাদা, হিসেব না করে কি পারি?

—তোমার আবার কি স্বার্থ?

—গুরুতর স্বার্থ।

বিমল হাসিয়া বলিল, শুনতে পাই না?

ছায়াও হাসিল, কহিল, তা পেতে পার।—বলিয়া সে একটুখানি চুপ করিয়া রহিল; তারপর বলিল, সে কত ক'রে আমাকে অনুরোধ করলে, আমি যেন জেল থেকে তোমায় নিয়ে এসে আমার কাছে রাখি, যত্ন করি, সেবা করি—যেন ইন্দু না বললে করতুম না! আমার চিঠি পেয়ে সে জানবে তুমি আমার এখানে আছ, তাতে তার কত আনন্দ হবে, কত কথা লিখবে আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে, আমি মনে মনে তার চিঠি পড়তেই পাচ্ছি।

—বল কি!

—সত্যি, পাচ্ছি। চিঠি যখন সে লিখছিল, তখনকার ছবিও আমি মনের চোখ দিয়ে দেখতে পেয়েছি।

বিমল সহাস্যে কহিল, কি দেখলে বল ত ছায়া দিদি, একটু শুনি।

ছায়া বলিল, দেখলুম, দুটি চোখ দিয়ে তার জলের ধারা নামছে; একবার করে লিখছে, আর একবার করে চোখ মুছছে; মাঝে মাঝে চিঠিতেও ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে যাচ্ছে, আঁচলের খুঁট দিয়ে সন্তর্পণে জলের দাগগুলি মুছে ফেলছে, আবার লিখছে, যেখানে যেখানে তোমার কথা লিখছে, সেখানেই হু হু করে তার চোখের জল ঝরে পড়ছে, চিঠি শেষ করতে আর পারছে না।

বিমল বলিল, ছায়া তোমার জাই কবি হওয়া উচিত ছিল।

ছায়া হাসিয়া বলিল, তা বুঝি জান না দাদা! আমি প্রথম প্রথম বিলেতে কবিতায় চিঠি লিখতুম। অনেকগুলো চিঠি কবিতায় লিখেছিলুম, তারপর বেণাবনে মুক্তা ছড়ান ছেড়ে দিলুম।

বিমল ম্লান মুখে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

ছায়া পূর্ব্ববৎ কৌতুকভরে কহিতে লাগিল, একখানা চিঠিও কি ছাই কবিতায় পেলুম! সব চিঠিতেই সেই বাঁধা গদ্য গৎ—তুমি কেমন আছ? আমি ভাল আছি! এতে কি কোন ভদ্রলোকের কবিত্ব থাকে, তুমিই বল? কিছুদিন পরে ত মূলেই হা-ভাত, চিঠিই বন্ধ!

একটু থামিয়া ছায়া আবার রঙ্গভরে কহিল, বেচারী আমার চিঠির চাপে চ্যাপ্টা হয়ে গেছল বোধ হয়, তাই চিঠি-পত্তর আর লিখলে না! আমি রোজ সকালে একখানা, বিকেলে একখানা 'কাব্যি' লিখে রাখতুম, প্রত্যেক মেল্-ডে-তে পুরো চোদ্দখানা রয়েল 'কাব্যি' মেল্ ডাকে দিতুম।

—ছায়া!

—কি?

বিমল বলিল, না থাক্।

ছায়া ছাড়িল না, কহিল, থাকলে হবে না দাদা, বলতে হবে। তুমি যে আমার কৌতূহল জাগিয়ে কথাটা বলবে না, আর অক্ষুধা, অনিদ্রায় আমি ছটফট করে মরব সেটি হবে না।

বিমল বলিল, নারী-চরিত্র কি অদ্ভুত, আমি শুধু তাই ভাবছি ছায়া।

—অদ্ভুত কি দেখলে?

—অদ্ভুত নয়? অশোকের কথা ভাবতে গেলে আমরা আড়ষ্ট হয়ে যাই, আর তুমি তাই নিয়ে রঙ্গ করছ কি করে আমি ত ভেবেই পাই না।

ছায়ার মুখে চোখে উজ্জ্বল হাসির আলো ফুটিয়া উঠিল; বলিল, কেন, আড়ষ্ট হতে যাব কেন? প্রভু এলেও সংসার পাততুম, এলেন না তাতেও সংসার পেতেছি। এর চেয়ে ভালটা কি হ'ত দাদা তুমিই বল!

হায়, সে কথা কি মুখ ফুটিয়া বলিবার, না, বলা যায়! কথায় সে ভাব, সে ঐশ্বর্য্য, সে সুখ, সে সমৃদ্ধি রূপ পাইবে কি করিয়া?

বিমলকে নীরব থাকিতে দেখিয়া ছায়া বলিল, ঐ ছেলে-টাকে যদি মানুষ করতে পারি, আমি আর কিছু ভাবি নে দাদা! ও চাষই করুক, লাঙ্গলই ধরুক, যাই করুক, মানুষ হ'ক এই আমি শুধু চাই। মানুষের মত মানুষ হ'ক, আর কিছু না। চিরকাল ও গরীব চাষী হয়েই থাক্, তাতে আমার দুঃখ নেই, শুধু মানুষ হ'ক।

বিমল ছায়ার মুখের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

ছায়া বলিল, মানুষের মত মানুষ হ'ক। দেশকে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসুক, দেশের মাটী তার কাছে পবিত্র হ'ক্, নিজের মা'কে সে ভালবাসুক, তাঁর চোখ দিয়ে ওর জন্যে যেন কখনও একবিন্দু জল না পড়ে! গরীব হ'ক, দু' বেলা দু' মুঠো খেয়ে থাকতে হয়, তা'ও ভাল, কিন্তু যেন মানুষ হয়—মানুষের মত মানুষ! আত্মসুখ আর আত্মবিলাস নিয়েই যেন তার জীবন না কাটে।

কথাগুলা বলিতে বলিতে ছায়া যেন উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। কথাগুলার সঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে অশোক জড়িত ছিল, বোধ করি তাহার নিষ্ঠুর অমানুষিকতার অনুভূতিবশেই সে উত্তেজিত হইয়াছিল, বিমলের পানে চোখ পড়িতেই লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল; আবার তখনই হাসিয়া ফেলিল। বলিল, লম্বা বক্তৃতা দিয়ে ফেললুম, না দাদা?

বিমল প্রতিবাদে বলিতে যাইতেছিল, না ছায়া, ঠিকই বলিতেছ, ছায়া তৎপূর্ব্বেই পুনরায় কহিল, জানি না পারব কি না, কিন্তু যদি ভগবান বিরূপ না হন্, ঠাকুরপোকে আমি মানুষের মত মানুষই করব। হ'ক মূর্খ, হ'ক চাষা অসভ্য, মানুষ হ'ক, আমি ওকে মানুষ করে ছাড়ব। তোমাদের লেখাপড়া আর সভ্যতা মানুষকে যত অমানুষ করে, এমন আর কিছুতে নয়।

বিমল নিঃশব্দ, বুঝি নিস্পন্দ।

ছায়া বলিতে লাগিল, সভ্যতার আলোক যত বেশী গায়ে লাগে, মানুষ হয় তত অমানুষিক। ছেলে মাকে চেনে না, মা'র কথা মনে থাকে না। মা সন্তানের মুখ চান না, সন্তানের কথা তাঁর মনে থাকে না। এর নাম যদি সভ্যতা হয়, নাই বা পেল সভ্যতা। ঠাকুরপো আমার চিরকাল অসভ্য থাক্, চিরকাল মূর্খ, চাষী থাক্।

হঠাৎ উঠানের দিকে চাহিয়া ছায়া চমকিয়া উঠিয়া বলিল, বেলা যে পড়ে গেল গো ! বস দাদা, আমি পুকুরের কাজগুলো সেরে আসি।

ছায়া প্রস্থানোদ্যত হইয়াছিল, পরেশ ছুটিতে ছুটিতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল, তোমার চিঠি এসেছে বৌদি!

ছায়া সোল্লাসে কহিল, নিশ্চয়ই ইন্দুর চিঠি। হ্যাঁ, এই দেখ—বলিয়া খামখানি বিমলের সম্মুখে ধরিল। বিমল দেখিল মাত্র, পরিচিত হাতের লেখা, চিনিতে বিলম্ব হইল না।

পরেশ বলিল, ডাক-পিওন কি বলছে জান বৌ-দি ? বলছে, এ গাঁয়ে শুধু তোমাদের বাড়ীতেই চিঠি আছে, ছায়া দেবীর নামে, সেই জন্যেই দেড় ক্রোশ দূর থেকে তাকে এখানে আসতে হয়, সে একটা ঝুনো নারকোল চেয়েছে। দোব, বৌদি ?

ছায়া কহিল, দাও গে ভাই, রান্নাঘরের কোণে ঝুনো নারকোল আছে ক'টা।

পরেশ ছুটিয়া চলিয়া গেল।

ছায়া বলিল, আমার হিসাবে ভুল হয় নি, দাদা, দেখলে ত! বলেছিলুম না, ছ'দিনের দিন চিঠি আসবে।

—দেখলুম বৈ কি! তা হ'লে আজ সাতদিন তোমার এখানে বসে আছি।

—তাতে হয়েছে কি ?

—না; হবে আর কি! খাচ্ছিদাচ্ছি ঘুমোচ্ছি, বেশ আছি। সারাজীবন যদি এমনই থাকতে পারতুম!—বিমল একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

পরেশকে আসিতে দেখিয়া, ছায়া বলিল, ঠাকুরপো, দেখ ত ভাই মা উঠেছেন কি-না! যদি উঠে থাকেন, তাঁর কাছে তুমি একটু বসগে, আমি আসছি।

পরেশ চলিয়া গেলে ছায়া বলিল, কে খুলবে চিঠি? তুমি, না, আমি ?

—যার নাম লেখা আছে, সে খুলবে।

—আমি স্বাধিকার ত্যাগ করতে রাজী। তুমিই খোল, ইন্দুর চিঠি, তোমারই খোলা উচিত।

বিমল গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, ছায়া, তার সম্বন্ধে এ রকম কথা বলা আমাদের উচিত হচ্ছে না বলে আমার মনে হয়।

ছায়া সহসা গম্ভীর হইয়া বলিল, জিভকে ফাঁকী দেওয়া সহজ, মনকে নয়। মন কি বলছে অন্যায়, ঠিক ক'রে বল দাদা।—ছায়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, চুপ ক'রে রইলে যে বড়! মন অতল সমুদ্র বিশেষ, তার ভিতরকার কটা কথাই বা আমরা জানি!

ইহারা কেহ জানিল না যে, বহুশত মাইল দূরে আর একটি নারী মনের সম্বন্ধে এইরূপ উপমাই দিয়াছিল।

ছায়া চিঠিখানা বিমলের হাতের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল, খুলে ফেল।

বিমল চিঠি খুলিল। অদ্ভুত চিঠি।

"ছায়া, কাশীর ঠিকানা এই—

১৯ক ভেলুপুরা, বেনারস সিটি।

ইন্দু।"

চিঠি দেখিয়া উভয়েই স্তম্ভিত হইয়া গেল। অনেকক্ষণ কাহারও মুখ দিয়া একটি শব্দও নির্গত হইল না। অবশেষে ছায়া "পুকুরের কাজ সেরে আসি দাদা" বলিয়া ত্বরিতপদে প্রস্থান করিল।

চিঠিখানা সেইখানেই পড়িয়া ছিল। দুইবার, তিনবার, বার বার পড়িয়াও একটি শব্দও বাড়াইতে পারা গেল না। একটি কুশলপ্রশ্ন নাই, একটি সন্তোষের বাণী নাই, একটি সম্ভাষণ পর্যান্ত নাই। ইন্দু জানে, সে এখানে রহিয়াছে, তাহার জন্যই ছায়া মা'র ঠিকানা চাহিয়াছে!

তবুও কেন মনে হয়, ইন্দুর এই পরিচয়ই সম্পূর্ণ ও শেষ নয় ?

(ক্রমশঃ)

আলোচনা

এল্‌-জিজিরের ইস্‌লাম-তীর্থ

'**বঙ্গশ্রী'র** আশ্বিন সংখ্যায় 'এল্‌-জিজিরের ইসলাম তীর্থ' নামে মুস্‌লিম জগতের হজ্জ-ব্রত সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয় একটী প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধটী সুলিখিত ও হজ্জ-ব্রত সম্বন্ধে মোটামুটী তথ্য-পূর্ণ। হজ্জ-ব্রত মুসলমানদের অবশ্য-পালনীয় শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান সমূহের অন্যতম। উক্ত ব্রত উদ্‌যাপনের পিছনে ইসলামের ব্যবহারিক শিক্ষা ও গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। নরেন্দ্র বাবু তাঁর কতকটা পরিস্ফুট করার প্রয়াস পেয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আলোচ্য প্রবন্ধের পঞ্চম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় পরচ্ছেদে 'এহ্‌রাম' সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখেছেন, তাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

'এহ্‌রাম' হজ্জ-ব্রতের অবশ্য-পালনীয় অনুষ্ঠান সমূহের অন্যতম। 'এহ্‌রাম' পালন না করে হজ্জ-ব্রত উদ্‌যাপিতই হ'তে পারে না। ইহাই হজ্জ-ব্রতের বাহ্যতঃ অনুষ্ঠেয় প্রারম্ভিক কর্ত্তব্য।

'এহ্‌রামের' ভাষাগত মানে 'বিশুদ্ধিকরণ'। ধর্ম্মের পথে নিজের দেহ ও মনকে বিশুদ্ধ করার অর্থই 'এহ্‌রাম'। 'এহ্‌রামের' সময় কোনও রূপ প্রাণী-বধ, কুচিন্তা প্রভৃতি নিষিদ্ধ। প্রবন্ধকার 'এহ্‌রামের' বাহ্য রূপ ও অন্তর্নিহিত তত্ত্বের বেশ একটী মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর প্রবন্ধের কথাগুলি পুনরুক্ত করার যোগ্য।

"পুণ্য-ধাম মক্কার পবিত্র গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করবার পূর্ব্বে প্রত্যেক যাত্রীকে বস্ত্র পরিবর্ত্তন ক'রে শ্বেত-শুভ্র নব বস্ত্র ও উত্তরীয় ধারণ করতে হয়। যাত্রীদের মস্তকেও উষ্ণীষ বা টুপী নামিয়ে নগ্নশিরে ও পায়ের পাদুকা খুলে নগ্নপদে সেখানে প্রবেশ করতে হয়। নবাব, বাদশাহ, আমীর ও সুলতান যিনিই হউন না কেন, এখানে আসতে হলে তাঁকে সে সকল পদ-মর্য্যাদা ভুলে ভিখারী ফকীরের সঙ্গে একত্রে একবেশে এক সমান হয়ে আসতে হবে। ভগবানের দ্বারে ছোট বড় কেউ নেই। ইসলাম ধর্ম্মের এই সুন্দর সাম্যবাদ সকল ধর্ম্মের অনুসরণীয়।"

বাস্তবিক, সাম্যবাদ ইস্‌লাম ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতম শিক্ষা ও বৈশিষ্ট্যের অন্যতম। আল্লাহর একত্ব ('তৌহীদ') এবং সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যবাদ ('এখাওৎ') —ইংরেজীতে বলতে গেলে Universal Brotherhood on terms of Absolute Equality under the all-compassing Over-lordship of One and Only One God— এই হচ্ছে ইস্‌লাম ধর্ম্মের মৌলিক ও শাশ্বত শিক্ষা। হজ্জ-ব্রতের ন্যায় ইস্‌লাম ধর্ম্মের যাবতীয় মৌলিক আদেশ এবং অনুষ্ঠানের ভিতরও রয়েছে উক্ত শিক্ষার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ও অভিব্যক্তি। দৃষ্টান্তস্বরূপ মুসলমানের প্রত্যহ পালনীয় 'ওক্তিয়া' নমাজ, সাপ্তাহিক জুমার নমাজ ও বাৎসরিক ঈদের নমাজের কথা উল্লেখযোগ্য। নমাজের সময়ও ধনী-নির্ধন, আমীর-ফকীর, রাজা-প্রজার কোনও তারতম্য থাকে না এবং হ'তে পারে না। সকলেই এক আল্লাহর বান্দা এবং এক আল্লাহর এবাদতের জন্য সমবেত ও মশ্‌গুল। পদ-মর্য্যাদার মদ-মত্ত অহঙ্কার বা বৈশিষ্ট্যের স্থান তাতে হতে পারে না।

উপরোক্ত 'এহ্‌রাম' পর্ব্ব সম্বন্ধে আরও একটা কথা প্রণিধানযোগ্য। প্রবন্ধকার সে কথার উল্লেখ করেন নি। 'এহ্‌রামের' সময় যাত্রীদিগকে যে পোষাক পরিধান করতে হয়, তা মুসলমানগণের কাফণের অনুরূপ। মৃত্যুর পর মুসলমানকে যে কাপড় পরিয়ে সমাহিত করা হয়, তাকেই বলে 'কাফণ'। বস্তুতঃ প্রত্যেক হজ্জ-যাত্রীকে যে সকল দ্রব্য-সামগ্রী সঙ্গে নিতে হয়, কাফণের কাপড় তাদের অন্যতম। এর উদ্দেশ্য কি?

'ইস্‌লাম' মানে ঐহিক ও পারত্রিক শান্তিলাভমানসে আল্লাহ তা'লার দরজায় নিজেকে পূর্ণভাবে আত্ম-সমর্পণ করা। 'এহ্‌রাম' এবং কাফণের পিছনেও রয়েছে এই আত্ম-সমর্পণের অভিব্যক্তি। দুনিয়ার ধান্দাবাজী, কায়-কারবার, কোলাহল-কলরব পরিত্যাগ ক'রে, জীবনে অন্ততঃ একবার আল্লাহর নিকটে নিজেকে পূর্ণভাবে আত্ম সমর্পণ করার জন্যই হজ্জ-ব্রতের আদেশ। পুণ্যধাম মক্কাভিমুখে রওনা হবার সময় তাই 'কাফণ' ও কাফণ তুল্য 'এহ্‌রাম' বস্ত্রের ব্যবস্থা।

গোড়াতেই বলে রাখছি, নরেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধটী পাঠ করে আনন্দিত হয়েছি। একজন অ-মুসলমানের পক্ষে মুস্‌লিম জগতের একটী সুমহান্‌ অনুষ্ঠান নিয়ে এমন আলোচনা খুবই প্রশংসার কথা। আলোচনাটীও হয়েছে সুন্দর এবং সময়োপযোগী।

যে কারণেই হউক, সাম্প্রদায়িক এবং ধর্ম্মসংক্রান্ত বাদ-বিসংবাদ ও কোন্দল-কলহের কলঙ্ক-কালিমায় বাংলার, তথা সমগ্র ভারতের, সামাজিক জীবনের আব-হাওয়া হয়ে পড়েছে বর্ত্তমানে গভীরভাবে কলুষিত। এই অশোভনীয়, অমর্য্যাদাকর ও লজ্জাকর পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন না হ'লে আমাদের জাতীয় জীবনাকাশ যে ঘন তমসায় সমাচ্ছন্ন, সে কথা খুলে বলার দরকার করে না।

ধর্ম্ম প্রাণের জিনিস। স্রষ্টার সহিত সৃষ্টির, তথা মানুষের, আধ্যাত্মিক মিলন-সংঘটন-পটীয়সী পন্থা-নির্দ্দেশই ধর্ম্মের শাশ্বত উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষ ধর্ম্মের দেশ। ধর্ম্মানুরাগ ও ধর্ম্মপরায়ণতা ভারতবাসীর মজ্জাগত। বস্তু-তান্ত্রিক বিশ্ব-সভ্যতার দরবারে আধ্যাত্মিক অনুশীলন ও উৎকর্ষ ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাবী। অথচ এই ভারতবর্ষই বর্ত্তমানে হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ধর্ম্মের ব্যাপারে ঝগড়া-ফসাদের তাণ্ডব লীলাভূমি। অদৃষ্টের নির্ম্মম পরিহাস আর কাকে বলে?

ভারতবর্ষে যত বিভিন্ন জাতি, সমাজ, সম্প্রদায় ও ধর্ম্মের অবস্থান, দুনিয়ার আর কোনও দেশে তেমন নাই। ইহা ঐতিহাসিক সত্য। হাজার হাজার বৎসর ধরে ভারতের বুকে হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-জৈন-শিখ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায় সমূহ বসবাস ক'রে আসছে। অথচ ভারতবাসী আমরা আজও পরস্পর পরস্পরকে তেমন ভাবে চিনতে পারি নি এবং পরস্পর পরস্পরের সামাজিক ও ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানাদির মর্য্যাদা ও মূল তত্ত্ব সম্যক্ রূপে রক্ষা ও হৃদয়ঙ্গম করতে শিখি নি। ইহা গভীর লজ্জা ও পরিতাপের কথা, সন্দেহ নাই।

এই শোচনীয় অবস্থার পরিবর্ত্তন করতে হলে চাই পরস্পরের ভিতর ভাবের অধিকতর আদান-প্রদান ও সত্যিকার অনুভূতি। সাময়িক উত্তেজনা বা রাজনৈতিক কারণ-উদ্ভূত বক্তৃতার তুবড়ী-বাজী কিংবা পাটোয়ারী বুদ্ধি-প্রসূত তথা কথিত প্যাক্ট-ফ্যাক্টের ভিতর দিয়ে সাম্প্রদায়িক শান্তি ও মিলন-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন কতকটা আকাশ-কুসুম। বলতে গেলে উহা এক প্রকার আত্ম-প্রবঞ্চনারই নামান্তর।

সত্যিকার সাম্প্রদায়িক মিল-মিশের ভিত্তি হ'তে হবে অন্তরে। বিভিন্ন সম্প্রদায়-ভুক্ত সর্ব্ব-সাধারণের অন্তর্নিহিত ভাবধারা ও দৃষ্টিকোণের সত্যিকার পরিবর্ত্তন না হ'লে স্থায়ী ভাবে সাম্প্রদায়িক শান্তি-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হতে বাধ্য। সামাজিক ও ধর্ম্মগত আচার-অনুষ্ঠান নিয়েই সাধারণতঃ সাম্প্রদায়িক বিবাদ-বিসংবাদের সূত্রপাত হ'য়ে থাকে। উক্ত ব্যবস্থাদির প্রকৃত মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা, ভ্রান্ত ধারণা, কুসংস্কার ও ধর্ম্মান্ধতার জন্যই মোটামুটী হয়ে থাকে এ সকল কেলেঙ্কারী ও লজ্জাকর অভিনয়।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সামাজিক ও ধর্ম্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি সাধারণের মনে সত্যিকার অনুরাগের ভাব জাগাতে হলে চাই জাতীয় সাহিত্যে এ সকল বিষয় নিয়ে সশ্রদ্ধ আলোচনা। সাহিত্যের ভিতর দিয়েই জাতির ভাবধারা রূপ গ্রহণ করে এবং পরিপুষ্ট ও পরিমার্জ্জিত হয়। জাতির সমষ্টিগত ভাবের অভিব্যক্তিই বলতে গেলে সাহিত্য। সুতরাং আলোচ্য প্রবন্ধের ন্যায় আলোচনা জাতীয় সাহিত্যে যত বেশী হয়, ততই মঙ্গল। এই হিসাবে নরেন্দ্র বাবুকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কিন্তু সত্যের খাতিরে বলতে বাধ্য যে, আলোচ্য প্রবন্ধটী সুলিখিত, সুচিন্তিত এবং তথ্যপূর্ণ হলেও ভুল-প্রমাদ হতে বিমুক্ত নয়। ত্রুটীগুলি অনিচ্ছাকৃত বলেই প্রতীয়মান হয়। তথাপি প্রবন্ধকার ও বঙ্গশ্রীর পাঠক-পাঠিকাগণের দৃষ্টি ভুল-ত্রুটীগুলির প্রতি আকর্ষণ করা সমীচীন মনে করি।

সর্ব্বপ্রথমে, প্রবন্ধটীর শিরোনামার প্রতিই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমার মতে শিরোনামাটী শুদ্ধভাবে লেখা হয় নি।

বাংলা ভাষার দ্বীপ বা উপদ্বীপের আরবী প্রতি-শব্দ 'জজিরা', প্রবন্ধে লিখিত 'জিজিরে' নহে। আরবী 'আল্' 'এল্' নহে—ইংরেজীর definite article "the"র corresponding. আরব উপদ্বীপকে আরবী ভাষায় বলা হয় "আল্-জজিরা", প্রবন্ধে লিখিত "এল্ জিজিরে" নহে।

তারপর 'ইসলাম' ('স'এর নীচে হসন্ত বাদে) লেখার চেয়ে 'ইস্‌লাম' বা 'এস্‌লাম' লিখলেই আরবী শব্দ বাংলা ভাষায় অধিকতর শুদ্ধরূপে অনু-লিখিত হয়।

সুতরাং "এল্-জিজিরের ইসলাম-তীর্থ" না হয়ে "আল্-জজিরার ইস্‌লাম-তীর্থ" হলেই আমার মতে শিরোনামাটী অধিকতর শুদ্ধ ও সুন্দর হত।

তারপর, আলোচ্য প্রবন্ধে যে সকল আরবী শব্দ 'এস্তেমাল' করা হয়েছে, তার অনেকগুলিই শুদ্ধরূপে অনুলিখিত হয় নি। নিম্নোক্ত তালিকা হতে আমার মন্তব্যের সার্থকতা সপ্রমাণ হবে।

প্রবন্ধে যেরূপ লিখিত হয়েছে	বাংলায় যেরূপ লেখা উচিত
'জেম্‌জেম্'	'জম্‌জম্'
'ইশমাইল'	'ইস্‌মাঈল' বা 'এস্‌মাঈল'
'হজ'	'হজ্জ' বা 'হজ্ব'
'তায়ুক'	'তওয়াক্'
'বেইত্ উল্লাহ্'	'বায়তুল্লাহ্' বা 'বয়তুল্লাহ্'
'এল-শাঈ'	'আস্-সাঈ'

উপরোল্লিখিত ভুলগুলি ভাষান্তরে অনুলিখন-জনিত। এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় সঠিক ভাবে লেখা নিতান্ত সহজ নয়। আরবী ও বাংলা ভাষার বেলা এ কথা বিশেষভাবে প্রযুজ্য, কেন না আরবী ভাষার অনেকগুলি উচ্চারণ-কঠিন 'হরফের' সঠিক বাংলা প্রতি-অক্ষর নাই। আরবী ভাষার উচ্চারণও মোটামুটী মুশ্‌কিল। আরবী ভাষার 'জবর', 'জের' এবং 'পেশের' উচ্চারণও বাংলার 'আকার', 'ইকার' এবং 'উকার' দ্বারা পুরোপুরি হয় নাই। সুতরাং উপরোক্ত ভুল-ত্রুটীগুলি নিতান্ত অস্বাভাবিক নয়, এ কথা স্বীকার করতে দ্বিধা নাই।

তথাপি এগুলির উল্লেখ করলুম। কেন, তা একটু খুলে বলা দরকার।

বাংলা ভাষায় বহু আরবী, ফারসী, উর্দ্দু বা মুসলমানী শব্দ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু উহাদের অনেকগুলিই বাংলা ভাষায় অশুদ্ধ ভাবে লিখিত হচ্ছে। বিজ্ঞান-সম্মত অনুলিখনের ধারা নিয়ে ভাষাবিদগণের মধ্যে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু ভাষাগুলি ও শব্দগুলিকে যা তা করে লেখবার আবশ্যকতা বা যৌক্তিকতা কোথায়? দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটী বহু-প্রচলিত শব্দের দুর্দ্দশার কথা উল্লেখ করব। আরও অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারত। বাহুল্য বিবেচনায় গুটিকতক নজিরই পেশ করলুম।

'আহ্‌মদ' কথাটা বহু মুসলমানের নামের একাংশ। উহাকে অনেক পত্রিকা বা বহি-পুস্তকে লেখা হয় 'আমেদ' বা 'আহাম্মদ' রূপে। 'আহ্‌মদ' মানে প্রশংসিত। 'আমেদ' বা 'আহাম্মদের' কোনও মানেই হয় না। যাঁহারা 'আমেদ' বা 'আহাম্মদ' লিখতে পারেন, ইচ্ছা করলে কি তাঁরা 'আহ্‌মদ' লিখতে পারেন না? একটুখানি সাবধান হলেই আর এমন ধারা ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে না। এইরূপে 'আহ্‌মক' হয়ে গেছে 'আহাম্মক'; 'মোহাম্মদ' হয়ে গেছে 'মাহাম্মদ'; 'মোহসেন' হয়ে গেছে 'মহসীন'; 'আক্‌রম' হয়ে গেছে 'আক্রাম'; 'মাহ্‌মুদ' হয়ে গেছে 'মামুদ' ইত্যাদি।

নে রাখা দরকার যে, ভাষান্তরিত শব্দগুলি অবিশুদ্ধভাবে লিখিত হলে অর্থ-বিকৃতির যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। যাক সে কথা। এইবার আলোচ্য প্রবন্ধের কয়েকটী বিষয়ঘটিত ভুল-ক্রটীর উল্লেখ করছি।

প্রবন্ধের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে—"আরবেরা তাদের দেশে কাফেরকে ঢুকতে দেয় না ... ... কারণ পয়গম্বরের আদেশ যে, অবিশ্বাসীরা যেন সেখানে পদার্পণ না করে।"

পয়গম্বরের আদেশ বলে যা উল্লিখিত হয়েছে, তা নিছক ভুল ও ইতিহাসবিরুদ্ধ মন্তব্য। ইস্‌লাম ধর্ম্মের মহাগুরুর প্রতিও তাতে দস্তুরমত অবিচার করা হয়েছে। মক্কা ও মদীনায় বিদেশীদের প্রবেশ নিষেধ বলে হজরতের আদেশ কোথায় রয়েছে, প্রবন্ধকার দয়া করে তা জানালে অনুগৃহীত হব।

উপরোক্ত তথাকথিত আদেশের অন্তরালে বিধর্ম্মীদের প্রতি হজরত মোহাম্মদের (দঃ) অনুদারতাই প্রকাশ পায়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা মোটেই ঠিক নয়। আরবের সমসাময়িক ইতিহাস ও ইস্‌লাম ধর্ম্মের শিক্ষাই তা সমর্থন করে না। বস্তুতঃ হজরতের সময়ে আরবদেশে বহু ইহুদী, খৃষ্টান প্রভৃতি বিধর্ম্মীদের বসবাস ছিল। তাঁদের প্রতি হজরতের ব্যবহার বরাবরই সদয় ও উদার ছিল। ইতিহাস তার জ্বলন্ত সাক্ষী। তারপর "লা একরাহা ফী দ্দীন্"—ধর্ম্মের ব্যাপারে জোরজবরদস্তী নাই ও থাকতে পারে না—ইহা ইস্‌লামের মূল ধর্ম্ম-গ্রন্থ 'আল্লাহর কালাম' কোরআন শরীফের বজ্র-নির্ঘোষ মহাবাণী ও আদেশ।

মক্কাতীর্থের পাণ্ডারা 'মুতোওয়াফ্' নামে অভিহিত বলে প্রবন্ধকার লিখেছেন। উহা ঠিক নয়। মক্কা-তীর্থ-যাত্রীদিগকে যাঁরা সাধারণভাবে পরিচালিত করেন, তাঁরা 'মোয়াল্লিম' নামে পরিচিত। 'মুতোওয়াফ্' শুধু তাঁরা—যাঁরা 'কা-আবা'র চারদিকে হাজীদিগকে 'তওয়াফ্' বা প্রদক্ষিণ করিয়ে আনেন। 'মুতোওয়াফ্' মানেই "তওয়াফ করানে ওয়ালা"। 'মোয়াল্লিম' মানে শিক্ষক বা পরিচালক (guide)।

প্রবন্ধের চতুর্থ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে—"এই তীর্থ দর্শনের শাস্ত্রীয় বিধান হচ্ছে, মোস্‌লেম বর্ষপঞ্জীর শেষ মাসের শেষ দশ দিনের মধ্যে যাত্রীদের পরিক্রমা শেষ করতে হবে।"

উপরোক্ত শেষ দশদিন কথাটা মারাত্মক ভুল। মুস্‌লেম বর্ষপঞ্জীর শেষ মাসের নাম 'জিল হজ্জ'। 'জিল হজ্জ' মাসের দশই তারিখের মধ্যেই হজ্জ-পর্ব্ব উদ্‌যাপন করতে হয়। সুতরাং শেষ দশদিন না বলে প্রথম দশ দিনই বলা উচিত ছিল। 'শেষ' কথাটা ইস্‌লামিক শরীয়তের আসল আদেশের বরখেলাফ।

প্রবন্ধের তৃতীয় পৃষ্ঠার শেষাশেষি বেদুঈনদের সম্বন্ধে লেখা হয়েছে:—"কায়িক পরিশ্রমকে তারা অত্যন্ত ছোট কাজ ভেবে ঘৃণার চক্ষেই দেখে। বেদুঈনদের ঠিক খাঁটি মুসলমান বলা চলে না, কারণ তারা নিয়মিত নমাজ পড়ে না।"

উপরোক্ত মন্তব্যে বেদুঈনদের প্রতি মোটামুটী অবিচার করা হয়েছে। বেদুঈনরা দুর্দ্দান্তপ্রকৃতি মরুচারী, সন্দেহ নাই। হাজীদিগের উপর এক কালে তারা যথেষ্ট অত্যাচার উপদ্রবও করত। হেজাজের বর্ত্তমান সুলতান ইবনে সাউদের কড়া শাসনের কল্যাণে বেদুঈনদের লুঠ-তারাজ আজকাল প্রায় নাই বললেও চলে।

দুরন্ত মরুভূমিতেই বেদুঈনদের বাস। মরুভূমিতে রীতিমত কৃষিকার্য্য, ব্যবসায়-বাণিজ্য বা অন্যবিধ কায়-কারবার করতঃ সুষ্ঠুভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা দুষ্কর ও অসম্ভব। অবশ্য তজ্জন্য দুষ্কর্ম্ম সমর্থন করছি না। তবে বলতে বাধ্য যে, অবস্থাধীনে মজবুর হয়েই বেদুঈনদিগকে লুঠ-তারাজ করে খেতে হ'ত, 'কায়িক পরিশ্রমকে তারা অত্যন্ত ছোট কাজ ভেবে ঘৃণার চোখে দেখে' বলে নয়। বাস্তবিক কায়িক পরিশ্রম বেদুঈনদিগকে যথেষ্ট করতে হয়, দুরন্ত মরু-বক্ষে তাদের স্বাধীন জীবনরক্ষার জন্য। বেদুঈনরা নিয়মিত নমাজ পড়ে না, এ কথাও ঠিক নহে।

প্রবন্ধের চতুর্থ পৃষ্ঠার প্রথম পরিচ্ছেদে কা-আবার মস্‌জিদে নমাজের জন্য সমবেত হাজীদিগের ছবির নীচে এবং প্রবন্ধের অন্যত্র 'নমাজ করছেন' কথাগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। উহা ভুল। 'নমাজ পড়ছেন' বলাই উচিত ছিল। 'নমাজ পড়াই' শুদ্ধ প্রয়োগ। 'নমাজ করা' কথাটা মুসলমানদের কাছে নেহায়েৎ বে-খাপ্পা প্রতীয়মান হয়।

উপসংহারে প্রবন্ধকারকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি—মুস্‌লিম জগতের একটী সুমহান্ অনুষ্ঠান বুঝবার ও বুঝাবার প্রয়াস পেয়েছেন ব'লে।

হজ্জ-ব্রতের বিবিধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও নিগূঢ় তত্ত্ব সম্যক্ রূপে পরিস্ফুট করতে হলে অনেক কথা বলতে হয়। আজকে শুধু এইটুকু বলেই শেষ করব যে, ইস্‌লামের শাশ্বত শিক্ষানুযায়ী মুসলমানদিগকে যে সকল বিধি-ব্যবস্থা পালন করতে হয়, হজ্জ-ব্রত তাদের চরম ও পরম ব্যবস্থা। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ হতে লক্ষ লক্ষ নর-নারী সমবেত হয় মক্কার পুণ্যতীর্থে বিশ্ব-প্রভুর নিকট আত্মসমর্পণ করতে। পূর্ব্বেই বলেছি দেশ-কাল-পাত্র, পদ-মর্য্যাদা প্রভৃতি ভুলে গিয়ে চরম ও পরম শান্তিলাভ-মানসে বিশ্ব-নিয়ন্তা আল্লাহর দরবারে আত্মভোলা আত্ম-সমর্পণকারীই হচ্ছে প্রকৃত 'মুস্‌লিম'। ইস্‌লাম মানেই হচ্ছে আল্লাহর নিকট আত্ম সমর্পণ। ইস্‌লাম ধর্ম্মের যাবতীয় বিধি-ব্যবস্থাই এই আত্ম-সমর্পণের চারিদিকে কেন্দ্রীভূত। হজ্জ-ব্রতও তাই। প্রবন্ধকার হজ্জ-ব্রতের আর একটী দিক্ বেশ সুন্দর ভাবে ফুটাবার প্রয়াস পেয়েছেন নিম্নলিখিত কথায়:—

"তীর্থশ্রেষ্ঠ মক্কা ইস্‌লাম ধর্ম্মের জ্যোতিঃ-কেন্দ্র; প্রত্যেক মুসলমানের ঐহিক ও পারলৌকিক প্রগতির পরম পুণ্যালোক। নমাজ বা উপাসনার সময় জগতের কোটী কোটী ধর্ম্ম-প্রাণ মুসলমানেরা শ্রদ্ধাবনত শির এই পবিত্র ভূমির উদ্দেশ্যে তাঁদের সভক্তি প্রণতিখানি নিবেদন করে দেয়। মৃত মুসলমানের শবদেহ কবরে সমাহিত করবার সময় এই পুণ্যতীর্থের দিকেই তার সহজ গতির লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। ধ্রুবতারা যেমন অকূল সমুদ্রে নাবিকদের লক্ষ্য স্থির রেখে দিঙ্‌নির্ণয়ে সাহায্য করে, পুণ্যভূমি মক্কাও তেমনি ধ্রুবতারার মত প্রত্যেক ধর্ম্ম-বিশ্বাসী ভক্ত মুসলমানকে সুপথ দেখিয়ে সর্ব্বশক্তিমান্ আল্লার চরণে উপনীত করে।"

আলোচ্য প্রবন্ধের ন্যায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিবিধ সামাজিক ও ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানাদির সশ্রদ্ধ ও সমঝদার সাহিত্যিক আলোচনায় আমাদের অন্তর্নিহিত ভাবধারা পরিপুষ্ট ও পরিমার্জ্জিত হোক এবং বাংলার তথা ভারতের আকাশ-বাতাস সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বিষ ও কলঙ্ক-কালিমা হতে বিমুক্ত হোক, ইহাই আন্তরিক কামনা। আমীন।

—মীজানুর রহমান
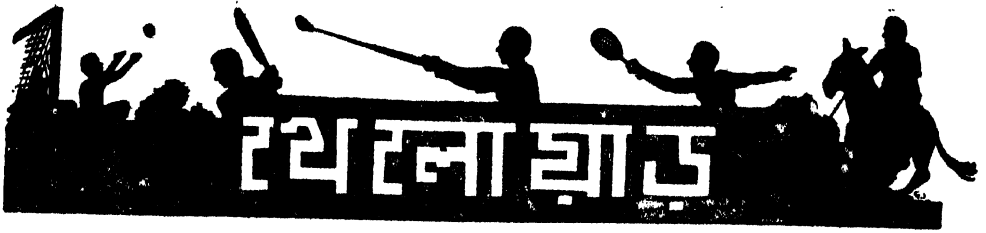
স্পোর্টস্ ঃ

—শ্রীবিনয় রায় চৌধুরী

বেঙ্গল অলিম্পিক স্পোর্টস্

ক্যালকাটা মাঠে বেঙ্গল অলিম্পিক স্পোর্টসের ত্রয়োদশ বার্ষিক অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে। বহু কৃতী প্রতিযোগী যোগদান করেছিলেন। গত বছরের ন্যায় এবারও অলিম্পিকের কর্তৃপক্ষদের নানারূপ দোষ ও ত্রুটি চোখে পড়ে। সত্য বলতে গেলে, কর্তৃপক্ষদের কর্ম্মদক্ষতার অভাব ও অশিষ্ট আচরণ এবারের স্পোর্টসের বিশেষত্ব। তাঁরা প্রেসের রিপোর্টার ও প্রেসের ফটোগ্রাফারদের ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ হতে বের করে দেন। এর ফলে সাংবাদিক-মহলে এক ভীষণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়েছে। অলিম্পিক স্পোর্টস শুধু দেরীতেই শেষ হয় নি; প্রতিযোগিতার প্রোগ্রামগুলি শেষ মুহূর্ত্তে ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন করে প্রতিযোগীদের বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করেন। এই অসুবিধার একটি উদাহরণ ২২০ গজ দৌড়-প্রতিযোগিতায় গ্যাণ্টজার প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি বিশ্রাম না করতেই ৪০০ গজ দৌড়ের ডাক পড়ে। ক্লান্ত গ্যাণ্টজার উক্ত দৌড়ে যোগদান করতে অসমর্থ হন। স্পোর্টসের শেষে প্রেসিডেণ্ট সন্তোষের মহারাজা স্যার এম. এন. চৌধুরী বিজয়ী প্রতিযোগীদের লৌহপদক উপহার দেন। তারপর এ্যাথলেটদের মার্চ্চ-পাষ্ট হয়। ২০টী বোমাধ্বনি এবং অলিম্পিকের দীপগুলি নির্ব্বাণের পর স্পোর্টস শেষ হয়।

বর্দ্ধমানের মহারাজা বেঙ্গল অলিম্পিক স্পোর্টসের উদ্বোধন করিতেছেন।

প্রতিযোগিতার কয়েকটী ফলাফল

১০০ গজ দৌড়

১ম—জেড. এইচ. খাঁ (মেডিকেল)
২য়—ডি. ষ্টুয়ার্ট (সেণ্ট জেভিয়ার্স)
৩য়—আর. বেনেট "

সময়—১১ সেঃ।

হাই জাম্প

১ম—আবু ইউসুফ (আই এ ক্যাম্প)
২য়—বি. বসু (")
৩য়—এস. চৌধুরী (")

উচ্চ—১'৭৪ মিটার।

৪০০ গজ দৌড়

১ম—সি. পিট (ভিক্টোরিয়া, কসিয়াং)
২য়—অরুণ মিত্র (আই এ ক্যাম্প)

৩য়—বি. লুই (সেণ্ট জেভিয়ার্স)

সময়—৫৪ ⅘ সেঃ।

৮৩ মিটার লো হার্ডল্ রেস (মহিলা)

১ম—মিস মার্জ্জরী স্মিথ (ওয়াণ্ডারার্স)

২য়—মিস ডি. প্রিচার্ড (ব্লু' ট্রায়াঙ্গেল)

৩য়—মিসেস এম. জনসন (")

খেলাঘর স্পোর্টস্

খেলাঘরের তৃতীয় বার্ষিক স্পোর্টস্ সম্পন্ন হয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে নানা রকম ব্যায়াম ও স্পোর্টস্ উৎসব

অলিম্পিক্ স্পোর্টের "মার্চ-পাষ্ট"।

প্রতিষ্ঠা করে খেলাঘরের কর্ত্তৃপক্ষরা কলিকাতার মেয়েদের শারীরিক উন্নতির প্রতি যত্নবান্ হয়েছেন। এবার প্রায় দেড়শত প্রতিযোগী যোগদান করেছিলেন। প্রায় সব প্রতিযোগিতাই খুব প্রতিযোগিতামূলক হয়েছিল।

প্রতিযোগিতার কয়েকটী ফলাফল

স্লো সাইকেল

১ম—রমা সেনগুপ্ত ([illegible]

২য়—নীলিমা ঘোষ [illegible]

৩য়—অমিয়া নাগ ([illegible]

থ্রি লেগেড রেস

১ম—শান্তি মুখার্জ্জি এবং ভবানী চাটার্জ্জী (চিলড্রেন ক্লাব)

২য়—কমলা ও প্রতিমা বোস (খেলাঘর)

টাগ অব ওয়ার

বিজয়িনী—আশুতোষ গার্লস স্কুল।

সিটি এথেলিটিক স্পোর্টস

এবারও সিটি এথেলেটিক স্পোর্টসে প্রায় দেড়শত প্রতিযোগী যোগদান করেছিলেন। স্পোর্টসের দীর্ঘ তালিকাগুলির ভিতর ১০০ গজ ও ৪০০ গজ দৌড় খুব প্রতিযোগিতামূলক হয়েছিল। মহিলাদের ১০০ গজ দৌড়ে মিস মার্জ্জরী স্মিথ এক নূতন রেকর্ড করেছেন। এ. ড্রমণ্ড পুরুষ-প্রতিযোগিতায় এবং মিস প্রিচার্ড মহিলা-প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন।

প্রতিযোগিতার কয়েকটী ফলাফল

৮৬ লো হার্ডল (মহিলা) রেস

১ম—মিস এম. স্মিথ (ওয়াণ্ডারার্স)

২য়—মিস প্রিচার্ড (ব্লু' ট্রায়াঙ্গেল)

৩য়—মিস রানা লার্ডিড "

সময়—১৩ ⅘ সেঃ।

৪৪০ গজ দৌড়

১ম—সি. পিট (ভিক্টোরিয়া, কার্সিয়ং)

২য়—এফ. গ্যাণ্টজার (")

৩য়—এন. দাস (আই এ ক্যাম্প)

সময়—৫১⅖ সেঃ।

১২০ গজ হার্ডল রেস

১ম—ডেভিস (ই. বি. আর)

২য়—এস. ঘোষ (সেনট্রাল)

সময়—১৬⅖ সেঃ।

টেনিস

ক্যালকাটা জিমখানা টুর্নামেণ্ট

এবার বহু তরুণ খেলোয়াড় এই টুর্নামেণ্টে যোগদান করেছিলেন। টুর্নামেণ্টটী শেষ পর্য্যন্ত বেশ প্রতিযোগিতা-মূলক হয়েছিল। ফাইনালে ম্যাথিউজ প্রতিদ্বন্দ্বী বিরলাকে সাক্ষাৎ করেন। খেলার প্রথম সেট ম্যাথিয়ুজ জিতেন কিন্তু দ্বিতীয় সেটে বিরলা প্রতিশোধ নেন। তৃতীয় ও চতুর্থ সেট উভয়ই জয়ী হতে খেলার ফলাফল অমীমাংসিতভাবে থাকে। পঞ্চম সেটে বিশেষ উৎসাহ সৃষ্টি হয়। ক্লান্ত ম্যাথিউজকে ৫-৭, ৬-৩, ৩-৬, ৬-০, ৬-২ সেটে হারিয়ে জি. বিরলা সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ান হন। মিস পি. ভিয়ানেষ্ট ও এফ. ভিয়ানেষ্টকে ৬-১, ২-৬, ৬-০ গেমে হারিয়ে মহিলা ডাবলস্ ফাইনালে মিসেস বিসপ ও মিসেস আর ক্রুটিট্ জয়ী হলেন। মহিলা হ্যাণ্ডিকাপ ডাবলস্ ফাইনালে মিসেস জেফ্রিস ও মিসেস ল্যাণ্ডার (—৩০) মিস ই. সেনগুপ্ত ও মিস এম. সুরিটাকে (+৩০) পরাজিত করেন।

অল ইণ্ডিয়া টেনিস টুর্নামেণ্ট

ইষ্ট ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়ানসিপ খেলার পর এলাহাবাদে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের দেখা যায়। এবারকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, অদ্বিতীয় মেঞ্জেল, হেক্ট, মেটেস্কা ও কাউণ্ট বরোস্কি প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড় এই চ্যাম্পিয়ানশিপে খেলেছিলেন। দুঃখের বিষয়, ভারতের প্রথম শ্রেণীর পুরুষ ও মহিলা খেলোয়াড় বব ও মিসেস্ বোলাও যোগদানে অসমর্থ হন। তারপর মণিমোহন, মোহনলাল, মেটা, রণবীর সিংহ, কৃষ্ণস্বামী প্রভৃতির অনুপস্থিতিতে টুর্নামেণ্টের উৎসাহ অনেকখানি নিবে আসে। কোন উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর সাক্ষাৎ অভাবে বিদেশের খেলোয়াড়রা এক মিক্সড্ ডাবলস ছাড়া সব কটী প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেন। টুর্নামেণ্টের সবচেয়ে আশ্চর্য্যকর ঘটনা এই যে সেমি-ফাইনালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়ান হেক্ট মেটেস্কার কাছে হেরে যান। সেদিন মেটেস্কার খেলা হয়েছিল অতি চমৎকার। হেক্ট এত খারাপ খেলবে কেউ আশা করে নি। অন্যদিকে মেঞ্জেল অতি সহজে বোরস্কিকে হারিয়ে ফাইনালে মেটেস্কাকে সাক্ষাৎ করেন। মেটেস্কার খেলা সত্ত্বেও মেঞ্জেল অপূর্ব্ব ক্রীড়া-কৌশলের জোরে মেটেস্কাকে হারান। মেটেস্কার সব আশা ও চেষ্টা সেদিন ব্যর্থ হলেও জয়ী হতে মেঞ্জেলকে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল। ফাইনাল গেমে বেশ উচু ষ্টাণ্ডার্ড লক্ষিত হয়েছিল। মেঞ্জেল ৬-৪ ৬-২, ৮-৬ গেমে মেটেস্কাকে
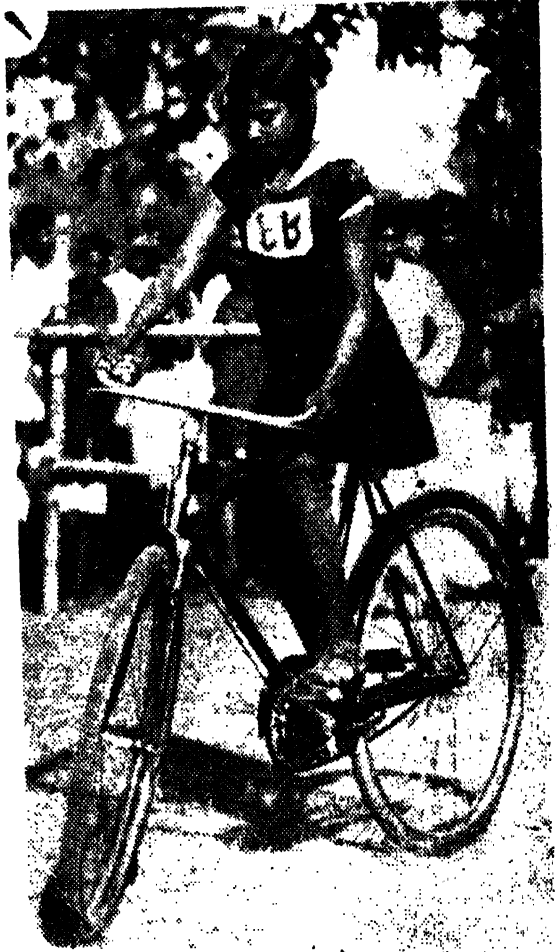
খেলাঘর স্পোর্টস: স্লো সাইকেল, ১ম—রমা সেনগুপ্তা।

হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হন, মিক্সড ডাবলস ফাইনালে বাংলার দুই কৃতী জুড়ী সাক্ষাৎ করেন। বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ান হজেস ও মিস গিবসন ৬-৩, ৬-৪ গেমে আর.কে.দে ও মিস উডকককে পরাজিত করেন। আর. কে. দের খেলার বহু দোষ থাকাতে ফলাফল এমন দাড়ায়। মহিলা ডাবলস ফাইনালে মিস গিবসন ও মিস হার্বে জনসন ৬-৩, ৭-৯, ৬-৪ গেমে মিস উডকক

ও মিসেস ওয়াইল্‌ডকে হারান। ইণ্টারন্যাসনাল ম্যাচে হেক্ট নাম কাউলের খেলা বেশ চিত্তকর্ষক হয়েছিল, প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে কাউল হেক্টের উপযুক্ত না হলেও খেলায় কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। হেক্ট ৬-০, ৮-৬ গেমে জয়লাভ করেন।

খেলাঘর স্পোর্টস: প্রি-লেগেড্‌ রেস। ১ম—শান্তি মুখার্জী ও ভবানী চাটার্জ্জী।

অন্যদিকে বরোস্কিকে ২-৬, ৬-৩, ৬-১ গেমে হারিয়ে বেটী হঠাৎ ক্রীড়ামহলে বিখ্যাত হয়ে পড়েন। বরোস্কি ক্রীড়া দক্ষতার পরিচয় দিলেও তেমন আনন্দ দিতে সক্ষম হন নি। মঙ্গোল ৬-৩, ৩-৬, ৬-১ গেমে ঘুস মহম্মদকে পরাজিত করেন।

ক্রিকেট

তৃতীয় টেষ্ট

সুন্দর আবহাওয়ার মাঝে মাত্র তিন হাজার দর্শকের সামনে লাহোর তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ সুরু হয়। ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন নাইডুর পরিবর্ত্তে ওয়াজীর আলির নেতৃত্ব এবং এস. বানার্জ্জী, মেহের হোমজী, ভায়া, পুরী, সালাউদ্দিন মহম্মদ সইদ প্রভৃতি তরুণ খেলোয়াড়ের সর্ব্বপ্রথম টীমে যোগদান এবারকার খেলার ছিল প্রধান বিশেষত্ব। ভারতীয় শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের অনুপস্থিতিতে দর্শকরা বড় হতাশ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার অভাবনীয় পরাজয়ে যে আনন্দ ও উল্লাস লাহোরে সারা প্রান্তরে ভরে উঠেছিল, ভারতের মাটীতে তেমন খুব অল্পই ঘটেছে। টস জিতে ভারতীয় দলের প্রথম এস. বানার্জ্জী ও মেহের হোমজী ব্যাট করতে নাবেন। লেদার ও হ্যাগেলের বলে দুইজনেই সন্ত্রস্তভাবে খেলা সত্ত্বেও বানার্জ্জী আউট হলেন মাত্র ৫ রাণ করে। সইদ কোন রাণ না করে বিদায় নিলেন। ক্যাপ্টেন ওয়াজীর আলি ও পাতিয়ালার যুবরাজ এসে টীমের সত্যিকার গোড়াপত্তন করলেন। নির্ভীকভাবে প্রত্যেক বলটি মেরে খেলে ওয়াজীর আলি অষ্ট্রেলিয়ার সাংঘাতিক আক্রমণকে ব্যর্থ করলেন। ১৪ রাণের মাথায় যুবরাজের "মৃত্যু" হল। ভায়াও বেশীক্ষণ টিঁকে থাকেন নি। এক ওভারে হ্যাগেল বোকা জিলানী ও আমীর এলাহিকে আউট করেন। তখন ৭ উইকেটে মাত্র ১০০ রাণ। সালাউদ্দিন যোগ দিতে

ওয়াজীর আলির রাণের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে গেল। শেষের দুই উইকেট পুরী ও নিসার খুব অল্পক্ষণেই বেঁচেছিলেন। অতি সুন্দর খেলে ওয়াজীর আলির সর্ব্বোচ্চ রাণ হল ৭৬। প্রথম ইনিংসে মোট স্কোর হল ১৪৯। ম্যাগেল ৪ উইকেটে ৭২ রাণ নেন। ইহার প্রত্যুত্তরে অষ্ট্রেলিয়ার মোট রাণ তেমন সুবিধাজনক হয়নি। মাত্র ১৬৬ রাণে সকলেই আউট হয়ে যান। প্রথম তিন উইকেটের মধ্যে ওয়েণ্ডেলবিল ১৭, ব্রায়াণ্ট ১০ এবং মরিসবি ২৩ রাণ করেন। ভারতীয় ফিল্ডিং ও বোলিং বেশ চমৎকার হচ্ছিল। রাইডার সতর্কভাবে খেলে রাণ তুলতে লাগলেন। ২১ রাণে রাইডার বিদায় নিতে অষ্ট্রেলিয়া দলের এক ভাগ্য-বিপর্য্যয় সুরু হল। লাভ, অক্সেনহাম, ম্যাককার্টনী পর পর তিনটী উইকেট ১০ রাণের ভিতর পড়ে গেল। তখন দর্শকদের উল্লাস প্রবল হয়ে উঠল। ৮ উইকেটে মেয়ার ও লেদার অনেক রাণ তুললেন। ওয়াজীর আলি আউট করবার জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন। কিন্তু ভারতীয় দলের মোট রাণকে ডিঙিয়ে এই দুই বীর অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে মোট রাণ তুলেন ১৬৬।

আমীর এলাহি ৩ উইকেটে ১৫ রাণ নেন। গভীর উত্তেজনার মধ্যে ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ হল। হঠাৎ চঞ্চল হয়ে পড়তে মেহের হোমজী ১৫ রাণে আউট হন। বাকা জিলানী মেহের হোমজীর পথ অনুসরণ করলেন। চারিদিক নিস্তব্ধ। আবার টীমকে বাঁচালেন ক্যাপ্টেন ওয়াজীর আলি। খেলার গতি ফিরে গেল। বোলাররা জব্দ হলেন আর রাণের পর রাণ উঠতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে বোলার পরিবর্ত্তন হল। ম্যাককার্টনীর লেংথ ও স্পিন-বলে অস্থিরতা বোধ করলেও খেলোয়াড়দ্বয় অতি দৃঢ়ভাবে খেলতে লাগলেন। চা-পানের পর ১৩৫ মিনিট অতি চমৎকার খেলে এস. বানার্জ্জী ৭০ রাণে আউট হলেন। তারপর পাতিয়ালার যুবরাজ ১৬ রাণ ও মহম্মদ সইদের ২৪ রাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভায়া ফিল্ডিংএ যেমন নাম কিনেছিলেন, ব্যাটিংএও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখালেন। রাণ করলেন ২৭। আমীর এলাহি ও আলাউদ্দিন পেছিয়ে রইলেন না। মারাত্মক অষ্ট্রেলিয়ার বোলারদের তুচ্ছ করে ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসে রাণের সংখ্যা তুললেন ৩০১। উক্ত দীর্ঘ স্কোরের মধ্যে আলি ৯২ রাণ করেন। দুই ইনিংসে ওয়াজীর আলির অপূর্ব্ব ক্রীড়াদক্ষতা অতি প্রশংসার যোগ্য। দ্বিতীয় ইনিংসে অষ্ট্রেলিয়ার নৈরাশ্যজনক খেলাই হল পরাজয়ের প্রধান কারণ। প্রথম দুই উইকেট ওয়েন্ডেল বিল ও লাভ অল্প রাণে যায়। মরিসবি ও ক্যাপ্টেন রাইডার আবার টীমকে দাঁড় করান। মরিসবি ৩৫ ও রাইডারের ৭০ রাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তারপর বাকা জিলানীর বলে অপূর্ব্ব সাফল্যে অষ্ট্রেলিয়ার ভাগ্যপরিবর্ত্তন সুরু হল। অদ্বিতীয়

ম্যাথুস্ ও বিরলা।

ম্যাককার্টনি মাত্র ৩৬ রাণে বিদায় নিলেন। ব্রাই বেশীক্ষণ টিকে থাকলেন না। গভীর উত্তেজনায় সারা মাঠ ভরে গেছে। পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচাবার আর কোন পথই রইল না। অক্সেনহাম ৩০ রাণ করে কিছুক্ষণ বেঁচে ছিলেন। তখন উইকেটে মাত্র ২০০ রাণ, আরো ৮৪ রাণ হলে জয়ী হবার সম্ভাবনা থাকে। হাতে মাত্র একটি উইকেট। বাকা জিলানীর শেষ বলে লেদার আউট হতে

বিপুল জয়ধ্বনির ভিতর ভারতীয় দল ৬৪ রাণে জয়লাভ করলেন। ভারতের মাটীতে "টেষ্ট ম্যাচে" বিদেশী দলের এই প্রথম পরাজয়।

তৃতীয় টেষ্ট

ভারতীয় দল

প্রথম ইনিংস

মেহের হোমজী (কট) লাভ (ব) হ্যাগেল	২৬
এস. ব্যানার্জ্জি (কট) লাভ (ব) হ্যাগেল	৫

মিসেস্ জেফ্রীস্, মিসেস্ ল্যাণ্ডার, মিস্ ই. সেনগুপ্তা ও মিস্ এম্ গুপ্টা।

মহম্মদ সইদ (কট) হেণ্ডরী (ব) লেদার	০
ওয়াজীর আলি (কট) হেণ্ডরী (ব) মেয়ার	১৬
পাতিয়ালার যুবরাজ (কট) অক্সেনহাম (ব) মেয়ার	১৪
ভায়া (ব) মেয়ার	৭
বাকা জিলানী (ব) হ্যাগেল	৪
আমির এলাহী (ব) হ্যাগেল	০
মামুদ আলাউদ্দিন (ব) লেদার	১২
ডি পুরী (ব) লেদার	০
নিসার (নট আউট)	০
অতিরিক্ত	৫
মোট	১৪৯

দ্বিতীয় ইনিংস

মেহের হোমজী (রাণ আউট)	১২
এস. বানার্জ্জি (ব) লেদার	৭০
মহম্মদ সইদ (ব) মায়ার	২৮
ওয়াজীর আলি (কট) লাভ (ব) লেদার	৯২
পাতিয়ালার যুবরাজ (কট) ও (ব) হ্যাগেল	১৬
ভায়া (রাণ আউট)	২৭
বাকাজিলানী (কট) রাইডার (ব) হ্যাগেল	০
আমির এলাহী (কট) হ্যাগেল (ব) লেদার	২৬
মামুদ আলাউদ্দিন (নট আউট)	২৩
ডি পুরী (ব) লেদার	০
নিসার (কট) লাভ (ব) লেদার	৩
অতিরিক্ত	৩
মোট	৩০১

অষ্ট্রেলিয়া দল

প্রথম ইনিংস

ওয়েন্ডেল বিল এল-বি (ব) বাকা জিলানী	১৭
ব্রায়াণ্ট (কট) ও (ব) পুরী	১০
মরিসবি (কট) মেহের হোমজী (ব) আমীর এলাহি	২৩
রাইডার (কট) সৈয়দ (ব) নিসার	২১
হেনড্রী (ব) আমীর এলাহি	৩
লাভ (ব) বাকা জিলানী	৩
ম্যাককার্টনী এল-বি (ব) নিসার	৩৪
অক্সেনহাম (কট) পুরী (ব) নিসার	৪
হ্যাগেল এল-বি (ব) নিসার	১
মেয়ার (নট আউট)	১৭
লেদার (ব) আমীর এলাহি	২৭
অতিরিক্ত	৬
মোট	১৬৬

দ্বিতীয় ইনিংস

ওয়েণ্ডেল বিল এল-বি (ব) সালাউদ্দিন

ব্রায়ান্ট (কট) মেহের হোমজী (ব) নিসার	৬
মরিসবি (ব) নিসার	৩৫
রাইডার (কট) ওয়াজীর আলি (ব) আমীর এলাহি	১০
হেনড্রী (ব) নিসার	৬
লাভ (ব) বাকাজিলান	১০
ম্যাককার্টনী এল-বি বাকাজিলানী	১৬
অক্সেনহাম (ব) নিসার	৩০
ম্যাগেল (ব) বাকাজিলানী	০
মেয়ার (নট আউট)	১৪
লেদার (কট) বানার্জ্জি (ব) বাকাজিলানী	১১
অতিরিক্ত	১৩
মোট	২১৬

রঞ্জি ট্রফি টুর্নামেণ্ট

গত বছর আন্তপ্রাদেশিক ক্রিকেট-প্রতিযোগিতায় বাংলা ও আসাম দল যোগদান করেন নি। এবার বাংলা ও আসাম দল খেলতে নেবে প্রথমে মধ্যপ্রদেশ ও বেরার দলকে অতি সহজে হারিয়ে মধ্য-ভারতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মধ্য-ভারতের দলের ক্যাপ্টেন নাইডু, সি. এস. নাইডু, মুস্তাক আলি, জগদল ও ভায়ার খেলা দেখতে ইডেন উদ্যান দর্শকে ভরে গিয়েছিল। টস্ জিততে বাংলার দলের প্রথমে কে. বসু ও বেরেণ্ড খেলতে নাবেন। কোন রাণ হবার পূর্ব্বেই কে. বসু আউট হলেন। এস. বানার্জ্জি এলেন এবং ১০ রাণে বিদায় নিলেন। তারপর টীমের ক্যাপ্টেন হোসী ও বেরেণ্ড মধ্য-ভারতের আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হলেন। কিন্তু ৮২ রাণের মাথায় এক ভাগ্য-বিপর্য্যয় সুরু হল। বেরেণ্ড, হোসী ও লংফিল্ড পর পর তিন রাণের মধ্যে আউট হয়ে গেলেন। তখন বাংলার রাণসংখ্যা ৫ উইকেটে মাত্র ৮৪। এই বিপদের সময় ভাণ্ডারগাট ও কে. ভট্টাচার্য্য খেলার গতি ফিরিয়ে আনলেন। নাইডুর চাতুর্য্যপূর্ণ বোলিং জব্দ হল।

কে. ভট্টাচার্য্যের ৪০ রাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জি. বসু বেশ উৎসাহ সহকারে খেলেছিলেন। রাণ করেন ২০। সুশীল বসু আউট হতে ভাণ্ডারগাট অতি সতর্ক হয়ে খেলতে লাগলেন। ৭ রাণ হলেই সেঞ্চুরী হয়। দুর্ভাগ্য বশতঃ নাইডুর বলে ভাণ্ডারগাট শ্লিপে ক্যাচ-আউট হন। চা-পানের পর ১০ উইকেটে আরো ২১ রাণ উঠলে বাংলা ও আসামের প্রথম ইনিংসে মোট রাণ হল ২৮৩। ক্যাপ্টেন নাইডু ৭ উইকেট ৬৩ রাণ নেন। ইহার প্রত্যুত্তরে মধ্য-ভারতের রাণ হল ২০০, এস. ব্যানার্জ্জী ও লংফিল্ডের সুন্দর বল সত্ত্বেও শুধু ফিল্ডিংএর দোষে জগদল ৪০ রাণ করেন। নাইডু খেলতে নাবতেই চারিদিকে হর্ষধ্বনি পড়ে। কিন্তু সে আনন্দধ্বনি খুব অল্পক্ষণই স্থায়ী হয়েছিল। সকলকে নিরাশ করে নাইডু মাত্র ৮ রাণে আউট হন। ইডেন উদ্যানে
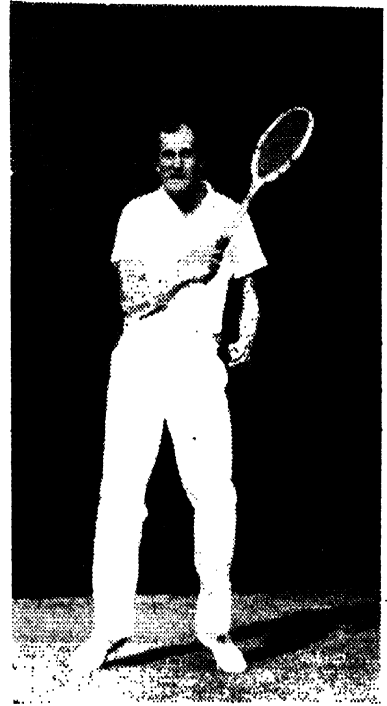
অদ্বিতীয় মেক্লেল্।

নাইডুর কৃতিত্ব খুব অল্পই চোখে পড়েছে। নাইডুর ভ্রাতা সি. এস নাইডু সকলকেই মুগ্ধ করলেন। মুস্তাক বেশ সংযমী হয়ে খেলছিলেন, কিন্তু ২০ রাণের মাথায় নাইডুর দোষে রাণ-আউট হন। ৬১ রাণ পরে চমৎকার খেলা দেখিয়ে সি. এস. নাইডু বিদায় নিলেন।

অবশিষ্ট খেলোয়াড় বসির, টাটারাও, কালেয়ার ও হাজারে অতি নিৰ্জ্জীবের মত খেলতে নেমে দেখতে দেখতে

'মৃত্যু" লাভ করল। মোট স্কোর হল ২০০। প্রথম ইনিংসে বাংলা তখন ৮৩ রাণে এগিয়ে। দ্বিতীয় ইনিংসে সতেজ উৎসাহ

লাহোরে ক্রিকেট ম্যাচ বিজয়ী ভারতীয় দল। মধ্যে ওয়াজির আলি (ক্যাপ্টেন) এবং উপরে দণ্ডায়মান (একেবারে দক্ষিণে) বাঙ্গালার প্রতিনিধি এস. ব্যানার্জ্জী।

নিয়ে বাংলা আবার খেলা শুরু করলেন। কে. বসু চারটী সুন্দর বাউণ্ডারী মারের পর খেলা জমবার মুখে আউট হলেন। কে. বসুর পর বেরেণ্ড ও লংফিল্ড অতি নির্জ্জীবের মত খেলতে বেশীক্ষণ টিকে রইলেন না। দর্শকের নিস্তেজ উৎসাহকে আবার নতুন করে জাগিয়ে দিলেন হোসী। নানা রকম ক্রীড়া-কৌশলের পরিচয় দিয়ে হোসী রাণ করলেন ৫৩, ভ্যাণ্ডারগাট ও ভট্টাচার্য্যের পার্টনারশিপ জমবার মুখে নাইডুর বলে ভট্টাচার্য্য আউট হলেন। জি. বসু ও নাইডু চাতুর্য্যপূর্ণ বলে প্রতারিত হয়ে বিদায় নিলেন। তখন ৮ উইকেটে বাংলার রাণ ২১৭; আবার ভ্যাণ্ডারগাট সর্ব্বোচ্চ রাণ করলেন ৭২। বাংলার দলে একমাত্র ভ্যাণ্ডারগাটের খেলা খুব উপভোগ্য হয়েছিল, অপর পক্ষে ভায়ার ফিল্ডিং দেখবার মত। ২টার সময় বাংলার দ্বিতীয় ইনিংসের ২৪৭ রাণে খেলা শেষ হল।

মাত্র আড়াই ঘণ্টা বাকি এবং ৩৪৩ রাণ উঠলে তবে মধ্য-ভারতের জয়ী হবার সম্ভাবনা। সুতরাং খেলা যে ড্রতে পরিণত হবে, এ সকলেই জানত।

মুস্তাক ও জগদল রাণ তুলবার জন্য খেলতে নাবলেন। বাংলার আক্রমণ তেমন প্রবল না হতে মুস্তাক ২৭ এবং জগদল ৩৪ রাণ করলেন।

ক্যাপ্টেন নাইডু ও সি. এস. নাইডু বোলারদের জব্দ করে অতি চমৎকার খেলে বহু রাণ তুললেন। নাইডু ভ্রাতা-দ্বয়ের খেলা সত্যি চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। কিন্তু সময় অল্পই ছিল। নাইডু রাণ করলেন ৪৭ এবং সি. এস. নাইডু ৫১। ৫ উইকেটে মধ্য-ভারতের ১৯৫ রাণে খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হল।

প্রথম ইংনিসের ফলাফলের জোরে বাংলা ও আসাম সেমি-ফাইনালে মাদ্রাজ দলকে সাক্ষাৎ করেন।

মধ্যভারতীয় দল।

বাংলা ও আসাম দল:—এ. হোসী (ক্যাপ্টেন), টী লং-ফিল্ড, এস. বেরেণ্ড, পি. ভ্যাণ্ডারগার্ট, কে. বসু, জি. বসু, বি. বসু, এস. বসু, এস. ব্যানার্জ্জি, জে. এন. ব্যানার্জ্জি, কে. ভট্টাচার্য্য।

মধ্য-ভারতের দল :—মেজর সি. কে. নাইডু (ক্যাপ্টেন), সি. এস. নাইডু, মুস্তাক আলি, ইস্তাক আলি, জে. এন. ভায়া, এম্. জগদল, ভাণ্ডারকর, পি. টাটারাও, ডি. হাজারে, মহম্মদ বসির ও কালেয়ার।

ক্রীড়া-জগতের খবর

রাজা দেবেন্দ্রনাথ মল্লিকের পৌত্র শ্রীমান চিতন মল্লিক সম্প্রতি পরলোকে গমন করেছেন। শ্রীমান চিতন একজন নামজাদা বিলিয়ার্ড খেলোয়াড় ছিলেন। মৃত্যুর সময় বয়স হয়েছিল মাত্র ২৩ বছর।

বক্সিংএ জো. লুইস এক রেকর্ড করে চলেছেন। এই নিগ্রো বীর ওয়ারল্ড বক্সিংএ তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। ভবিষ্যতে ইনি ওয়ারল্ড-চ্যাম্পিয়ান হবেন অনেকেই আশা করে। সেদিন ১৫ রাউণ্ডের এক বক্সিং যুদ্ধে জার্ম্মান বক্সার রেজ লেফকে হারিয়ে দেন। প্রথম রাউণ্ড যুদ্ধে লুইসের প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী ধরাশায়ী হন। এই নিয়ে লুইস সর্ব্বশুদ্ধ ২৩টী নক-আউট জিতেছেন।

আবিসিনিয়া যুদ্ধের জন্য ইটালী বার্লিন অলিম্পিকে যোগদান করবে না বলে যে সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল, তাহা সম্পূর্ণ ভুল। ইতালী যাতে নিজেদের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে তার জন্য বিশিষ্ট প্রতিযোগীকে নিয়ে এক অলিম্পিক দল গঠিত হয়েছে।

আসানসোল ই. আই. আর কর্ম্মচারীবৃন্দের এথ্‌লেটিক ক্লাবের উদ্যোগে ১২ মাইল দৌড়-প্রতিযোগিতায় শ্রীমান মণ্টু রায় চৌধুরী প্রথম স্থান অধিকার করেন। শ্রীমান মণ্টুর উক্ত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে ১ ঘণ্টা ২৭ মিনিট ১ সেকেণ্ড লেগেছিল।

কেপটাউনে অষ্ট্রেলিয়া বনাম সাউথ আফ্রিকা ক্রিকেট ম্যাচে সি. ডি. গ্রিমেট এক নতুন রেকর্ড স্থাপন করলেন। প্রথম ইনিংসে তিনি ৩২ রাণে ৫ উইকেট এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ১১ রাণে ৫ উইকেট নেন। এই নিয়ে গ্রিমেট বহু টেষ্ট ম্যাচ খেলে মোট ১৯৩ উইকেট নিয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী বার্ণাসের ১৮৯ উইকেট রেকর্ড ভাঙ্গলেন।

পাটনায় একটি একজিবিসন ম্যাচে মেঙ্গেল ৮-৬, ৬-২ গেমে প্রতিদ্বন্দ্বী হেক্টকে হারিয়েছেন। ডাবল্‌স ম্যাচে হেক্ট ও বরোস্কি ৬-২, ৬-৩ গেমে মেঙ্গেল ও মেটাস্কাকে পরাজিত করেন।

অষ্ট্রেলিয়ান্ টেনিস টুর্ণামেণ্টে কুইষ্টের হাতে জগৎ বিখ্যাত ক্রফোর্ডের শোচনীয় পরাজয়ে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। কুইষ্টের বয়স মাত্র ২২ বৎসর। আর ক্রফোর্ডের এখন ২৭। নিউ সাউথ ওয়েলস, ভিক্টোরিয়া ও অষ্ট্রেলিয়া চ্যাম্পিয়ান হয়ে কুইষ্ট অষ্ট্রেলিয়ার টেনিস ইতিহাসে নাম রাখলেন।

এবার বিহার ও উড়িষ্যা অলিম্পিক স্পোর্টসের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা, তিনটী নতুন রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে। পোলভল্টে ৭ ফিট তিন ইঞ্চি লাফায়, এস্ মজুমদার ৪৪০ গজ দৌড়ে, এম. আমেদ ৫৪ সেকেণ্ডে জয়ী হয় এবং ৮৮০ গজ দৌড়ে জে. বিষ্ণু ২ মিনিট ৮ সেকেণ্ডে চ্যাম্পিয়ান হন।

মাদ্রাজ অলিম্পিক স্পোর্টসে এফ. হাণ্টার ২২০ গজ হার্ডলে মাত্র ২৫ $\frac{৬}{১০}$ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে ভারতে একটী নূতন রেকর্ড স্থাপন করলেন।

নিখিল-বঙ্গ কুস্তি-প্রতিযোগিতায় এ. জার্ডিন নায়ক সিংকে হেভী-ওয়েট যুদ্ধে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন।

ইংরাজের রাজনীতি

… … যতদিন মানুষের সুখ, সমৃদ্ধি এবং নৈতিক উন্নতি সাধন করা তাঁহাদের রাজনীতির উদ্দেশ্য ছিল এবং পরস্পরের মিলনই তাহার মুখ্য উপায় বলিয়া পরিগণিত হইত, ততদিন ইংরাজ সাম্রাজ্যের প্রসার সাধিত হইয়াছিল এবং তাহারই ফলে ইংরাজ জাতি জগতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু যেদিন হইতে তাঁহাদের রাজনীতিতে দলাদলির তীব্রতা স্থান পাইয়াছে এবং বিধিসঙ্গত ক্ষমতা ও স্বাধীনতার লোলুপতা বাড়িয়াছে, সেই দিন হইতে তাঁহাদের অবস্থার জটিলতা বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। … …

পৃথিবীর মানচিত্র যারা আঁকে

—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

আজকের দিনে পৃথিবীর মাপ খুলে ধরে আমরা অনায়াসে সমস্ত সুদূর দেশ, অনন্ত অকূল সমুদ্র, অনন্ত অজানা অরণ্য, মরু, পর্ব্বতের খোঁজ পাই। পৃথিবীর কোন কোণ আর আমাদের জানতে বাকি নেই। কোন্ মহাদেশের কত আয়তন, কোন্ সমুদ্রের কোথায় সীমানা আমরা শুধু মানচিত্র থেকেই হিসাব করে বলে দিতে পারি। পৃথিবী সত্যিই এখন আমাদের নখদর্পণে।

কিন্তু কাগজের উপর পৃথিবীর ছবি নির্ভুল করে আঁকতে যুগযুগান্ত ধরে অসংখ্য বীরকে কি দুঃখ-দুর্দ্দশার ভিতর দিয়ে, কি ভয়ানক সব বিপদ্ বরণ করতে হয়েছে তার কাহিনী কতটুকু আমরা জানি! পৃথিবীকে স্পষ্ট করে তো'লবার জন্যে যারা অসীম দুঃসাহসে মৃত্যু তুচ্ছ করে অজানার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছে, তারা সবাই সার্থক হয়ে ঘর ফিরে আসে নি। পৃথিবীর মানচিত্র তাদের কঙ্কাল দিয়েই চিহ্নিত। দুস্তর মরুর মাঝে উত্তপ্ত বালুকার উপর প্রচণ্ড রৌদ্রে তাঁদের কারোর অস্থি এখনো হয়ত শুকোচ্ছে। গভীর সমুদ্রের তলায় ঝিনুক আর শাঁখগুলো আর কারোর অস্থির উপর দিয়ে চলে বেড়াচ্ছে।

খোঁজ না পেলেও তাঁদের অনেকের নাম অমর হয়ে আছে মানচিত্রের উপর। কারো কারো অবশ্য সে সৌভাগ্যও হয় নি।

তিন শত বৎসরেরও বেশী হ'ল দুটি মানুষের খোঁজ পৃথিবীর লোক পায় নি। তারা পিতা ও পুত্র। একটি শোলার খোলার মত নৌকার চারিধারে শাদা বরফের চাঁই ছড়ানো—তুষার-সমুদ্রের দিগন্তে তারা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেছল—আর তাদের সন্ধান পাওয়া যায় নি।

সন্ধান পাওয়া না যাক্, তাদের স্মৃতি আছে অমর হয়ে। আমেরিকার বিরাট একটি উপসাগরের ঢেউএ তাদের নাম কল্লোলিত, সেখানকার বিশাল একটি নদী তাদের নাম অনন্ত ভবিষ্যতের উদ্দেশে বয়ে নিয়ে চলেছে।

হাডসান উপসাগর ও নদীর নাম আমরা সবাই জানি। সেই দুঃসাহসী বীরের নাম গ্রহণ করেই তারা ধন্য হয়েছে।

হাডসানের জীবনের সমাপ্তি যেমন অজানা, তেমনি অজানা তাঁর জীবনের আরম্ভ। মানুষের জন্য খেটে তিনি যেমন রহস্যের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছেন, তেমনি রহস্যের ভিতর থেকে একদিন সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। একটি সদাগরী কোম্পানীর বাণিজ্য-প্রচেষ্টার সূত্রে প্রথম তাঁর নাম শোনা যায়। স্পেনের সঙ্গে ইংলণ্ডের বিখ্যাত জল-যুদ্ধের যুগে তিনি জন্ম নিয়েছিলেন। ইংলণ্ডের গৌরব-সূর্য্য তখন থেকেই উঠতে সুরু করেছে। বাণিজ্য-জাহাজে ইংরাজ সেদিন সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বার জন্যে উৎসুক। কিন্তু পথ অনেক দিকে বন্ধ। অসীম ঐশ্বর্য্যের অপরূপ দেশ ভারতবর্ষের ও চীনের কথা তারা শুনেছে। কিন্তু, ভূমধ্য সাগরের পথ তখনও মুক্ত হয় নি। আফ্রিকা ঘুরে যাওয়াও বিশেষ সুবিধার নয়। উত্তর-মেরু দিয়ে আরও সোজা পথ আছে বলে তখনও অনেকের বিশ্বাস। মস্কোভি ট্রেডিং কোম্পানী নামে একটি প্রতিষ্ঠান হেনরী হাডসানকে এই পথ খুঁজে বার করে মশলার দেশ থেকে মূল্যবান্ বাণিজ্য-সম্ভার আনবার অনুরোধ করলে। অনুরোধটা শুনতে খুব সহজ, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা যমের দক্ষিণ দুয়ার দেখে আসার মত। কিন্তু, হাডসান এ অনুরোধ রাখতে দ্বিধা করেন নি। পৃথিবীর বীরেদের জাতই আলাদা।

আজকের দিনে সুদূর সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া এমন কিছু ভয়ানক ব্যাপার নয়। যন্ত্রপাতি কলকব্জা নিয়ে আধুনিক বড় জাহাজ সমুদ্রের ক্রোধকেও উপেক্ষা করতে সাহস করে। তা'

ছাড়া সমস্ত পথ তার জানা। কিন্তু, সেদিনকার পাল-তোলা ছোট জাহাজে অকূল সমুদ্রে একেবারে কিছুই না জেনে পাড়ি দেওয়া ভিন্ন ব্যাপার ছিল। উত্তর-মেরুর তুষার-সমুদ্রে কত নির্ভীক নাবিক যে প্রাণ দিয়েছে তার লেখাজোখা নেই। সমুদ্র পার হ'য়ে এসিয়ায় পৌছান ত আলাদা কথা, সমুদ্রের সঙ্গে যারা আজীবন পরিচিত, তখনকার সেই দুঃসাহসী ইংরাজ নাবিকেরাও উত্তর-মেরুর সমুদ্র প্রেত-পিশাচের বিচরণ-ক্ষেত্র মনে করত।

কিন্তু হাডসান প্রেত-পিশাচকেও ভয় করতেন না। ভয় যে করতেন না, তার প্রমাণ দশ জন নাবিকের সঙ্গে তিনি তাঁর দশ বৎসর বয়সের পুত্রকেও এই অভিযানের সঙ্গী করেছিলেন। হাডসান যে জাহাজটি পেয়েছিলেন, সেইটিতেই কিছু দিন আগে মার্টিন ফ্রবিশার নামে এক জন গুণী নাবিক উত্তর-মেরুর সন্নিহিত তুষার-সমুদ্র জয় করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছিলেন। জাহাজটির নাম 'হোপফুল'।

মস্কোভি ট্রেডিং কোম্পানী পথের কোন নির্দেশ হাডসানকে দেন নি, শুধু জানিয়ে দিয়েছিলেন দক্ষিণে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে এসিয়ায় যাওয়া তাঁর চলবে না। সোজা উত্তর-মেরুর দিকেই তাঁকে রওনা হতে হবে।

'তথাস্তু' ব'লে ১৬০৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে টেম্স নদী থেকে দশ জন লোক ও বালক পুত্র নিয়ে হাডসান জাহাজ ছাড়লেন। ছয় সপ্তাহ বাদে তাঁকে গ্রীনল্যাণ্ডের উপকূলে দেখা গেল। তার পরেই সুরু হল তাঁর অজানার পাড়ি। দিক্-চিহ্নহীন তুষার-সমুদ্র, মৃত্যুর মত শাদা বরফের পাহাড় চারিদিকে নিষেধের ভ্রুকুটী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যত দূর দৃষ্টি যায়, শুধু সেই জলের পাহাড় ছাড়া আর কিছুই নেই। অগণন সৈনিক যেন মেরুর রহস্যকে পাহারা দেবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। কোন অনধিকার প্রবেশ তারা সইবে না। মানুষের কৌতূহলকে তারা ক্ষমা করবে না। কিন্তু, হাডসানের ক্ষুদ্র জাহাজ তাদের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে সামনেই এগিয়ে চলল। বরফের মসৃণ বিস্তীর্ণ পাহাড়ের মধ্যে যেখানে একটু ফাটল, যেখানে একটু ফাঁক দেখা যায়, হাডসানের জাহাজ তারই ভিতর দিয়ে গলে বেরিয়ে যায়। তবু উত্তর-পশ্চিমের পথ শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল না। হাডসান উত্তর-পূর্ব্ব মুখে জাহাজ ফিরিয়ে তুষারাবৃত উপকূল ধরে স্পিটজবার্জেনে পৌছোলেন।

স্পিটজবার্জেনেই তাঁর শক্তির চরম পরীক্ষা। হিমেল উত্তরে হাওয়া বইছে ঝড়ের বেগে, সাগর-জলে নেই স্রোত। ধীরে ধীরে তবু তিনি শুধু ইচ্ছাশক্তির জোরেই যেন জাহাজ টেনে নিয়ে চললেন। তিন দিন এমনি করে কাটল। তার পর হাডসান বুঝতে পারলেন, মানুষের শক্তির সীমায় তিনি পৌছে গেছেন। তুষার-মেরু তাঁকে আর অগ্রসর হতে দেবে না। আবার হাডসান ফিরলেন—না, ঘরের মুখে নয়, গ্রীনল্যাণ্ডের উত্তর দিয়ে ঘুরে পথ কেটে ডেভিস্ প্রণালীতে বেরিয়ে পড়বার জন্যে।

এই নিরবচ্ছিন্ন বরফের দেশে এত বড় দুঃসাহসিক চেষ্টা কোন মানুষ এর আগে করে নি। হাডসানের জাহাজের নামও সার্থক - সত্যই অদম্য তাঁর আশা।

কিন্তু তবু কিছু হল না। হাডসান পরাস্ত হয়ে ফিরলেও তাঁর অভিযানকে নিষ্ফল বলা চলে না। সভ্য জগতের একটি মনোহর ভ্রান্তি তিনি নিদারুণ অভিজ্ঞতা দিয়ে ভেঙে দিতে সক্ষম হলেন। উত্তর-মেরু দিয়ে কোন সহজ পথ চীনে পৌছায় না।

আর একটি মূল্যবান্ তথ্যও তিনি সংগ্রহ করে নিয়ে এলেন ইংলণ্ডে। উত্তরের বরফ-সমুদ্রে তিমি কিলবিল করছে, তিনি দেখে এসেছিলেন। ইংরাজ তিমি-শীকারিদের তিনি সেখানকার বর্ণনা দিয়ে উৎসাহিত করে তুললেন। তাঁর উৎসাহেই স্পিটজবার্জেনের তিমি-শীকার-কেন্দ্রের সূত্রপাত হ'ল।

হাডসান দেশে ফিরে চুপ করে বসে থাকবার পাত্র নয়। এক বার পরাস্ত হয়েছেন বলে হাল ছেড়ে তিনি দেবেন কেন? সুদূর প্রাচ্য তাঁর কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছে। পথ তিনি খুঁজে বার করবেন-ই। মেরুর উপর দিয়ে না হয় উত্তর-পশ্চিম বা উত্তর-পূর্ব্ব দিয়ে তিনি সেই স্বপ্নের দেশে উত্তীর্ণ হবেন। সাত মাস বাদেই আবার তাঁকে দেখা গেল মেরুর তুষার-সাগরে। উদ্ধত মাস্তুলে সমস্ত প্রতিকূল প্রকৃতিকে উপেক্ষা করে তাঁর জাহাজ চলেছে সুইডেনের উত্তর হয়ে পূর্ব্ব দিকে।

এখনকার মেরু-অভিযানের কথা আমরা জানি। কত দীর্ঘ ও বিশদ তার আয়োজন, কি প্রচুর তার উপকরণ, কত জটিল তার নানা ব্যবস্থা। কিন্তু হাডসান মাত্র ১৩ জন

নাবিক ও তাঁর ছেলেকে নিয়ে দ্বিতীয় বার মেরুর সঙ্গে দ্বন্দ্বে নেমেছিলেন।

৩রা জুন, ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে সুইডেনের উত্তর দিক্ ঘুরে নোভা জেম্বলার শিয়রে যাবার জন্যে তিনি জাহাজের মুখ ফেরালেন। সামনে আবার তুষার-সমুদ্র। সে তুষার-সমুদ্র দেখলে, কেন নাবিকেরা সেকালে প্রেত-পিশাচের অস্তিত্ব সেখানে কল্পনা করত তা' বুঝা কঠিন নয়। সে সমুদ্র স্থির শান্ত নয়, অসংখ্য অদৃশ্য দানব যেন বরফের পাহাড় নিয়ে সেখানে সংগ্রাম করছে। সমুদ্র আলোড়িত, বাতাস তুষার-গিরির সঙ্গে তুষার-গিরির সঙ্ঘর্ষে মুখর। মহাযুদ্ধের সমস্ত কামান এক সঙ্গে ফেলেও সেখান দিয়ে পথ কেটে বার করা যেত না। তিন সপ্তাহ ধরে সেই সমুদ্র জয় করবার ব্যর্থ চেষ্টার পর হাডসান অবার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে কারা-প্রণালী দিয়ে কারা-সাগরে যাবার সঙ্কল্প করলেন। একবার কারা-সাগরে পড়তে পারলেই প্রশান্ত মহাসাগর ও প্রাচ্যদেশ তাঁর করতলগত।

কিন্তু বরফের বাধা অলঙ্ঘ্য। তাঁর জাহাজের মত হাজার খানা জাহাজ অনায়াসে চুরমার করে তারা অতলে ডুবিয়ে দিতে পারে। শুধু বরফের প্রাচীর নয়, তার সঙ্গে এল মেরু-প্রদেশের প্রলয়ের মত ঝড়। জমাট সমুদ্রের সঙ্গেই জাহাজ নোঙর দিয়ে বেঁধে হাডসান সে ঝড়ের মুখে এগিয়ে চললেন। সঙ্গে প্রচুর খাদ্যের অভাব, মেরুর শীত ভয়ঙ্কর ভাবে দেখা দেবারও খুব দেরী নেই। ঝড় থামবার পর আবার হাডসানকে ফিরতে হল। তিনি দুঃসাহসী কিন্তু অপরিণামদর্শী নন। এতগুলি মানুষের জীবনকে অকারণে নষ্ট হতে দিতে তিনি প্রস্তুত নন।

তৃতীয় বার হাডসানকে তুষার-সমুদ্রে দেখা গেল ১৬০৯ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি। দুটি জাহাজ নিয়ে আবার তিনি চলেছেন সুদূর প্রাচ্যের আহ্বানে। এবারে তাঁর অভিযানের খরচ জুগিয়েছে ওলন্দাজ বণিকেরা। একটি জাহাজ ওলন্দাজ নাবিকেরাই চালাচ্ছে। কারা-প্রণালীতে পৌঁছে ওলন্দাজেরা ভয় পেয়ে ফিরে গেল। হাডসান একাই চললেন জাহাজের মুখ ফিরিয়ে তাঁর নিজের লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে।

নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড পৌঁছে ভয়ঙ্কর ঝড়ে হাডসানের জাহাজের মাস্তুল গেল ভেঙে। বাধ্য হয়ে বর্ত্তমান 'মে-ন' নামে একটি জায়গায় তাঁকে কিছুদিন কাটাতে হ'ল। সেখানে আদিম অধিবাসীরা তাঁদের এক দিন অতর্কিতে আক্রমণ করলে। সে বিপদ্ থেকে উদ্ধার পেয়ে অনেক কষ্টে জাহাজ মেরামত করে হাডসান আবার রওনা হলেন। জাহাজের খাতায় তাঁর সে সময়কার লেখা পাওয়া গেছে, "সব পাল তুলে দিতে সাহস পাচ্ছি না, অজানা সমুদ্র—বিপদ্ অজানা।"

হাডসানের অবিস্মরণীয় নিরুদ্দেশ যাত্রা

আজ যেখানে আমেরিকার বড় বড় অভ্রভেদী শহর দাঁড়িয়ে আছে, সেই সমস্ত তটরেখা প্রথম হাডসানই উল্লসিত বিস্ময়ে দেখেছিলেন। নিউইয়র্ক যে উপসাগরের কূলে দাঁড়িয়ে অতলান্তিককে পাহারা দেয়, সে উপসাগরে তিনিই প্রথম প্রবেশ করেন। এই উপসাগর থেকে একটি বিশাল জলপথ নূতন মহাদেশের অভ্যন্তরে চলে গেছে। সেখানকার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে সে জল-পথের রহস্য হাডসান জানবার চেষ্টা করেন। তাদের কথায় তাঁর ধারণা হয় যে, এই জল-পথ দিয়েই তিনি প্রশান্ত মহাসাগরে গিয়ে পড়তে পারবেন। সেই ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হয়েই হাডসান সামনে এগিয়ে যান। কিন্তু দেড় শত মাইল যাবার পর তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারেন। এবারও হাডসানকে ব্যর্থ হয়ে ইংলণ্ডে ফিরতে হয়। কিন্তু এ ব্যর্থতাও অতুলনীয়। বারো বৎসর বাদে ওলন্দাজেরা হাডসানের প্রদর্শিত পথেই গিয়ে নিউইয়র্কে উপনিবেশ স্থাপন করে। হাডসান নদী তাঁরই প্রথম প্রবেশের সাক্ষ্য এখনও দেয়।

বার বার তিন বারের পর অতি বড় দুঃসাহসীও বুঝি হতাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু পরাজয় স্বীকার করা হাডসানের ধাতে নেই। আবার ১৬১০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি বেরিয়ে পড়লেন ৫৫ টনের একটি জাহাজ নিয়ে। সঙ্গে ছ মাসের মত রসদ নিয়ে। অনাবিষ্কৃত প্রাচ্যের পথ এবার তিনি খুঁজে বার করবেন-ই।

সঙ্কল্পের দৃঢ়তা বা উপকরণ ও রসদের অভাবে নয়, সঙ্গী-নির্ব্বাচনের দোষেই তাঁকে যে এবার আর এক নিরুদ্দেশ পথে যাত্রা করতে হবে, তা কে তখন জানত!

হাডসানের জাহাজের এবার ২০ জন মাল্লা, তাঁর পুত্রকেও সঙ্গে নিতে অবশ্য তিনি ভোলেন নি। ২০ জন মাল্লার ভিতর

গ্রীন নামে একটি লোক ছিল। আত্মীয়-স্বজন-পরিত্যক্ত লোক-টির অত্যন্ত দুর্দশার দিনে হাডসান তাকে সাহায্য করেছিলেন, মাল্লাদের মধ্যে তাকে স্থানও দিয়েছিলেন করুণা করে। এত অনুগ্রহের প্রতিদান গ্রীন তাঁকে কেমন ভাবে দিয়েছিল, খানিক পরেই আমরা জানতে পারব।

এ যাত্রায় প্রথম দিনটা সব লক্ষণই ভাল ছিল। অর্কনি দ্বীপপুঞ্জ হয়ে, আইসল্যাণ্ডে জিরিয়ে নিয়ে, গ্রীনল্যাণ্ডকে পাশ কাটিয়ে দুরন্ত ঝড়ের মুখে বরফ-সমুদ্র ঠেলে তিনি একটি অনাবিষ্কৃত প্রণালী পার হয়ে অজানা সমুদ্রে এসে পড়লেন। তাঁর আগেও দু একজন এ সমুদ্রে প্রবেশ করেছিলেন বলে শোনা যায়—কিন্তু এত পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে এ সমুদ্রের পরিচয় আর কেউ গ্রহণ করেন নি। প্রথমে এই উপসাগরটিকেই তিনি প্রশান্ত মহাসাগরের পথ ভেবেছিলেন। তিনমাস ধরে তিনি উপসাগরের সমস্ত উপকূল সন্ধান করে দ্বীপ-অন্তরীপ প্রভৃতির নামকরণ করে ফিরলেন, কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে পড়বার পথ তবু মিলল না। চারিধারে সমুদ্র তখন আসন্ন শীতে জমাট বেঁধে আসছে, বরফের মাঝে বন্দী হয়ে যেতে যেতে আশ্চর্য্যভাবে কয়েকবার জীবন রক্ষা পেল। গ্রীন ইতিমধ্যে মাল্লাদের মধ্যে নিজের মনের বিষ ছড়াতে সুরু করেছে। তারা একদিন বেঁকে দাঁড়াল। তাদের কাছে এ সন্ধান নিরর্থক, তারা আর অগ্রসর হতে চায় না।

হাডসান সমস্ত মাল্লাদের একত্র করে জাহাজের মানচিত্র তাদের সামনে খুলে ধরলেন। এ পর্য্যন্ত কোন দুঃসাহসিক নাবিক তাদের মত এত দূরে সমুদ্রে কখনও পৌছায় নি। তারা আর সকলের কীর্ত্তিকে তিন শত মাইল দূরে ফেলে এসেছে। এতদূর আসার পর তারা কি কাপুরুষের মত ফিরে যেতে চায়!

মাল্লাদের মধ্যে একদল তাঁর কথায় উৎসাহিত হয়ে উঠল; গ্রীনের নেতৃত্বে আর এক দল কিন্তু তখনও তাঁর বিরুদ্ধে। হাডসান তাদের বিরুদ্ধতা গ্রাহ্য না করে সামনে এগিয়ে যাওয়াই স্থির করলেন। দরকার হলে জমাট বরফের সমুদ্রের উপরেই তিনি শীত কাটাবেন। মাঝে মাঝে দু এক জায়গায় কূলে নেমে তাঁরা পশুপক্ষী শীকার করে নিজেদের রসদের অভাব পূর্ণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। এই শীকারের সময় তাঁরা একটি অদ্ভুত ব্যাপার আবিষ্কার করেন। এই তুষারাবৃত প্রদেশেও কোন জাতের মানুষ আগে বাস করে গেছে। পাথরের ছোট ছোট কুঠুরিতে তারা যে সমস্ত শীকার-করা পাখী ছাল ছাড়িয়ে ঝুলিয়ে রেখেছিল, সেগুলি তখনও ঠাণ্ডার দরুণ অবিকৃত। কয়েকজন লোক ভাল খাবারের লোভে এখান থেকে আর নড়তে চায় না। তাদের শাসন করে হাডসান আবার জাহাজ ছেড়ে দিলেন। কোথায় ক্যাথেলের রহস্যময় উপকূল, ভারতবর্ষের স্বপ্নময় তটরেখা?—তাঁর দেরী করবার যে সময় নেই!

কিন্তু মাল্লারা ক্রমশ সবাই বেঁকে দাঁড়াল, তারা এই অসাধারণ মানুষটির স্বপ্ন ত বুঝতে পারে নি, গ্রীন তাদের বশ্যতারও মূল ছেদন করেছে প্রতি দিনের কুটীল চক্রান্তে। তুষার-ঝটিকা আর মৃত্যুর মত শীতল সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ তাদের সাহস নিয়েছে হরণ করে।

একদিন ঘন কুয়াশার মধ্যে জাহাজ আর চালান সম্ভব হল না। চারিধারে সমুদ্র তাকে শীতল আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলেছে। কূলে নেমে কোন রকম একটা আশ্রয় সবাই

হাডসানকে জাহাজ হইতে ফেলিয়া দিতেছে।

মিলে খাড়া করলে। কিন্তু উত্তর-মেরুর ছুরির ফলার মত ধারাল ঝড় তাকে যে কোন মুহূর্ত্তে বুঝি টুকরো করে ফেলবে।

সঙ্গে খাদ্য অত্যন্ত অল্প। বন্য সামুদ্রিক পাখী মেরে কোন রকমে মাল্লাদের দিন চলতে লাগল। শেষ পর্য্যন্ত শ্যাওলা,—ব্যাঙে পর্য্যন্ত তাদের অরুচি রইল না।

দীর্ঘ শীতের পর একটু একটু করে বরফে চিড় ধরতে সুরু করেছে। এমন একদিনে দেখা গেল পাঁচটি পণিরখণ্ড ছাড়া আর কিছু জাহাজের ভাঁড়ারে অবশিষ্ট নেই। গ্রীন সেই দিনই মাল্লাদের উত্তেজিত করে তুললে হাডসানের বিরুদ্ধে। তিনি না কি ঠিকমত সকলকে খাবার ভাগ করে দেন নি। হঠাৎ

এক মুহূর্ত্তে তারা হাডসানকে ধরে বেঁধে ফেললে। তারপর হাডসানের দলে যারা ছিল তাদের অতর্কিতে আক্রমণ করে করলে বন্দী! হাডসানের অনুগত লোকেরা প্রাণপণে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুঝেও কিছু করতে পারলে না। তারা প্রস্তুত ছিল না।

জাহাজের নৌকাটি জলে নামাবার পর বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্য বোঝা গেল। একে একে হাডসান, তাঁর পুত্র ও জাহাজের সমস্ত রুগ্ন লোকেদের তারা হাত-পা বেঁধে নৌকায় নামিয়ে দিলে। একটি লোকের শুধু হাত খোলা রাখা হ'ল আর সকলকে পরে বন্ধনমুক্ত করবার জন্যে। দয়া করে বিদ্রোহীরা নৌকায় একটি বন্দুক ও বারুদ দিয়ে তারপর নৌকাটিকে ঠেলে দিলে অকূল সাগরে।

দিক্‌চিহ্নহীন বিশাল অজানা সাগরে ভাসমান বরফের স্তূপের মাঝে সে নৌকার পাল ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেছে তিন শত বৎসর আগে। দেবতার চেয়ে দুঃসাহসী মানুষের মৃত্যুঞ্জয়ী সঙ্কল্পের সেই চিরন্তন প্রতীক।

লীলামানব

—শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

সুন্দর চেতনের পদ্মের রসদলে সৃষ্টির দোলে লীলাহিন্দোল,
অম্বর ঘিরে ঘিরে সেই রসলীলা থেকে বীণ বাজে
ওঠে নিশিদিন রোল।
নির্গুণ ঝরণার রস ঝরি' রঙ্গীন তিনরূপে হ'ল আদি সৃষ্টি,
চিন্ময় দেহে দেহে নন্দন-গেহে গেহে লীলাময় মেলিলেন দৃষ্টি।
সেই আদি মধুময় প্রভাতের কোল থেকে
প্রাণধারা ঝরল রে ছন্দে,
ছন্দিত তারি শ্লোকে মৃন্ময় নরনারী রূপ নিল আদি দেহানন্দে।
অন্তরে অন্তরে মৃন্ময় বাসনার লীলাতনু নেচে ওঠে ছন্দি,
কায়হীন কামনার ইন্দ্রিয়াতীত রূপ ইন্দ্রিয় দিয়া হ'ল বন্দী।
সুন্দর দিল দোল্ নাচে লীলাহিন্দোল্ লীলায় নাচিল মধুবিশ্ব,
ইন্দ্রিয়-তনু থেকে সুন্দরী জেগে উঠি' দোলাইল জীবনের দৃশ্য।
লীলাতনু সুন্দরসুন্দরী গাহে গান নেচে নেচে মিশি দুটী অঙ্গে,
দুটী আদি মধুবুক নাচে লীলাউন্মুখ জীবনের রসভোগে রঙ্গে।
ভূর্লোক স্বর্লোকে রচি মিলনের শ্লোক লীলানর গাঁথিলেন মাল্য
মৃন্ময়ী ধরণীর ধূলি হ'ল চন্দন প্রেম হ'ল হরিনির্ম্মাল্য।
লীলাসঙ্গিনী সাথে জয়যাত্রার রথে দেহজন্মের পথ ছন্দি,'
সুন্দর শ্রীদুলাল বাঁধি ইহ-পরকাল করল রে নিজ বুকে বন্দী।
রঙ্গীন জীবনের সঙ্গীত ঘিরে ঘিরে ছন্দি' নামিল ঊষা-ভর্গ,
রসে বাঁধা রাসদোল ঝুলনার হিন্দোল্ এক হ'ল ধরা আর স্বর্গ।
অর্দ্ধনারীশ্বর জেগে উঠি' প্রেমভোলা গাহিলেন মিলনের
গান গো,
মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেম সার্থক হ'ল লীলাদম্পতি-বুকে বুক দান গো।
সেই রসরূপায়ন-মধু-উৎসব থেকে সংসার লীলায়িত ছন্দে,
নেমে এল ভাই বোন কোটী লীলাদম্পতি নিখিল ভরিল
গীতে গন্ধে।
বন্ধু গো তোরা সেই লীলামানবের ধারা চেতনার রসফুল
দল গো,
নাহি রে দুঃখতাপ দলি' ধরণীর পাপ জয়যাত্রায় তবে চল্ গো।

হৃদ্‌পদ্মের দলে ওই শোন্ ওই তোর ব্রহ্মার বাজে মহাবীণ রে,
গলে রসঝঙ্কার ঝরে রূপটঙ্কার উদ্দাম ধ্বনি নিশিদিন রে।
ঝঁঝেতে ঝরে বর বন্দি গো লীলানর সঙ্গীত গেয়ে চল যাত্রী,
লীলাজন্মের গান হবে না রে অবসান অসীম এ কোজাগর
রাত্রি।

ফুলফোটা এ নিখিল তোলপাড় করে দিল মিলনের
মধুকলহাস্যে,
সে রসপূর্ণ থালি তোমারি ভোগের ডালি সজ্জিত শ্লোকে
মধুভাষ্যে।
অনাদি সৃষ্টিলীলা উৎসব চিরদিন দোল্ খাবে মহাকাল অঙ্গে,
যুগ যুগ নন্দিয়া তুমি তার রসভোগে সন্তরি' যাবে চির রঙ্গে।
মাঝে রহিবে না খেদ নাহি মৃত্যুর ছেদ তুমি রবে আর রবে
কাল গো,
ছন্দিবে তুমি গান ব্যোম বাজাইবে বীণ্ সঙ্গিনী দিবে
লীলাতাল গো।
নাচে কলাকলরব চলে লীলা-উৎসব শাশ্বত চির অকলঙ্ক,
জয়-যাত্রার পথে তব লীলাছন্দের রথে ওই বাজে জয়শঙ্খ।
সুন্দর চেতনার লীলারস-কেন্দ্রে গো বাজে দেহজন্মের
গান গো,
অম্বুধি-বুক চিরে লীলাজয়যাত্রার বন্ধু গো কর পদ্রদান গো।
পিঠে সত্যের জয় শিব ঢালে বরাভয় সুন্দর পথে চিরসঙ্গী,
বন্ধু গো চল চল মাতায়ে কুঞ্জবন লীলাহোলি উৎসবে রঙ্গি'।
নাহি রে মৃত্যুভয় লীলামানবের জয় ভগবান বাঁধা লীলা সঙ্গে,
ওগো লীলানারীনর চুম্বিয়া বুকে বুক লীলাভোগে যাই
চল্ রঙ্গে।

শাশ্বত হ'ক গান শাশ্বত হিয়া দান শাশ্বত মিলনের রাত্রি,
শাশ্বত বরাভয় লীলামানবের জয় বন্ধু গো চল জয়যাত্রী।
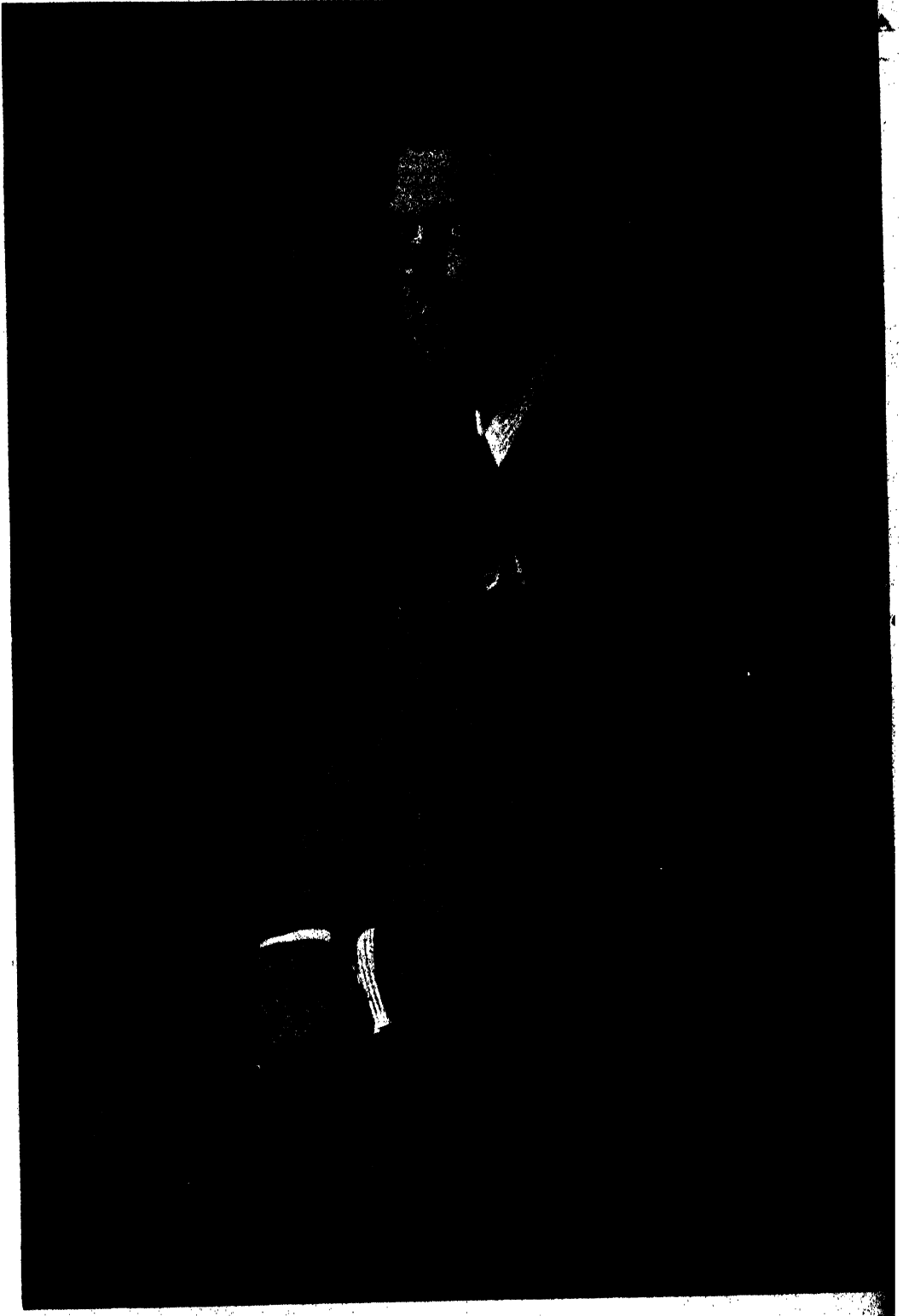
আই য়্যাম্ এ বি. এ.

—শ্রীআরতি ঘোষ

আজকাল বেকার-সমস্যার যুগ। এখন শ্রমের মর্য্যাদার কথা এবং গ্র্যাজুয়েট্ ছেলেদের রিক্‌শ-চালনার কথা অনেক শুনিতে পাই। নিদেন গল্প-উপন্যাসেও মোটর-ড্রাইভার হইয়া একটা চমকপ্রদ রোমান্স্ সৃষ্টি করা যেন বাংলার যুবকদের নেশায় দাঁড়াইয়াছে। বাংলা দেশে হয়ত বাংলার ছেলেরা নিজেদের মর্য্যাদানাশের আশঙ্কা করে না, কিন্তু বাংলার বাইরে, বোম্বাই সহরের এক বাঙ্গালীর ব্যবহারে মর্য্যাদা-নাশের যে মিথ্যা আশঙ্কা দেখিয়াছি, তাহার সহিত বাংলার এই মানসিক পরিবর্ত্তনের কোন সামঞ্জস্য দেখা যায় না।

মিঃ কে. মিত্র বিলাত-প্রত্যাগত বাঙ্গালী। বোম্বাইয়ে উচ্চবেতনে চাকুরী করেন। তিনি এক অফিসের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী; সেই সূত্রে বহু বড় বড় কলওয়ালা এবং ব্যাপারীদের সহিত পরিচিত। অনেকের সহিত তাঁহার হৃদ্যতাও জন্মিয়াছে। একদিন মিঃ মেকডনেল্ড গর্ডন নামক একজন এন্‌জিনিয়ার মিঃ কে. মিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিঃ মিত্র, হোয়াট ইজ এ বি এ?" (What is a B. A.) মিঃ মিত্র নানা কথার মধ্যে হঠাৎ এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হওয়ায় প্রথমে ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি গর্ডনকে প্রশ্ন করিলেন, "কেন, কি হয়েছে?" ইহার ভিতরে যে রহস্য রহিয়াছে, তাহা না জানিয়া সহসা কিছু বলার ইচ্ছা মিঃ মিত্রের হইল না।

মিঃ গর্ডন হাতুড়ী-পেটা লোক—একজন বড় এন্‌জিনিয়ার। কার্য্যদক্ষতায়, কারখানা ও কারবার চালনোতে সুচতুর বলিয়া মোটা মাহিনায় ডানবার কোম্পানীর বেল্‌টিঙের অফিসে ম্যানেজারী করেন। তাঁহার এই প্রশ্নে মিঃ মিত্র যে একটু কৌতুক অনুভব করেন নাই—তাহা নহে। তাই তিনি বলিলেন, "বাংলার সকলকেই বিয়ে করতে হয়। বিয়ে মানে ম্যারেজ (marriage)।". মিঃ গর্ডন বলিলেন—"ও নো, নো, তুমি আমায় ঠাট্টা করছ।"

মিঃ মিত্র—"না না আমি একটুও ঠাট্টা করছি না, বাংলা দেশে বি-এ না হলে বিয়ে করতে পারে না।"

মিঃ গর্ডন—"ইউ মিন এনগেজ্‌ড (you mean engaged), তুমি নিশ্চয় আমাকে ভুল বোঝাচ্ছ।"

মিঃ মিত্র—"তবে তুমি আমাকে সব খুলে বল।"

মিঃ গর্ডন তখন নীচের ঘটনাটি বিবৃত করিলেন।

তাঁহাদের কারখানায় একজন বাঙ্গালী বাবু কাজ করে, সাধারণতঃ হিসাবপত্র রাখে—অর্থাৎ একজন কেরাণী। তার কাজ খুবই কম, সময় সময় বসিয়াই থাকে। গর্ডন সাহেব এজন্য তাহাকে তাঁহার কারখানায় কোন কোন কাজে সাহায্য করিতে ডাকেন। যখনই গর্ডন এইরূপ কাজের জন্য তাহাকে ডাকেন, সে প্রতি বারই উত্তর করে, "বাট্ সার আই অ্যাম এ বি. এ (But, Sir I am a B. A.)" এইরূপ বলিয়া সেই কাজে সে আর হাত লাগায় না। গর্ডনকে অগত্যা কোন মজুর বা এপ্রেন্টিসকে ডাকিতে হয়। মিঃ গর্ডন বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু মিঃ মিত্র, আমি আর একজন বাঙ্গালী বাবু, বোম্‌পাস চাকাবুর্টিকে দেখিয়াছি, তিনি তো কখনও আমাকে এইরূপ বলেন নাই?" এই বলিয়া তিনি বোম্‌পাস চাকাবুর্টির বিষয়ে নিম্নবর্ণিত বৃত্তান্তটি বিবৃত করিলেন।

তিনি ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, গর্ডন সাহেব সুবিধামত তাঁহাকে ডাকেন বোম্‌পাস চাকাবুর্টি। চক্রবর্ত্তীর বিবরণ তিনি যাহা দিলেন তাহা এই। পুণা সহরে জলের কল বসাইবার জন্য একবার তিনি একটা বড় কনট্রাক্ট পান। সেখানে চক্রবর্ত্তী কুলিদের সর্দ্দার ছিলেন। চক্রবর্ত্তী আই. এ পর্য্যন্ত পড়িয়া কলেজ ছাড়িয়া দেন এবং আঠারো টাকা বেতনে কুলিদের কাজ দেখিবার ভার পাইয়াছিলেন। একদিন চক্রবর্ত্তী দেখিলেন যে, একটি মোটা পাইপ চারিটি কুলিতে কিছুতেই লইয়া যাইতে পারিতেছে না। কার্য্য-শিথিলতা তাঁহার অসহ্য লাগিল, কারণ তাঁহার শরীরে যথেষ্ট শক্তি ছিল। তিনি কুলিদের ধমক দিয়া সরাইয়া দিলেন এবং

একা একদিকে ধরিয়া পাইপটা আনিতে সাহায্য করিলেন। গর্ডন সাহেব দূর হইতে ইহা দেখিয়া নিজেই এই কাজে বাঙ্গালী বাবুকে সাহায্য করিতে আসিলেন। উভয়ের সমবেত চেষ্টায় সেদিন কাজ খুব বেশী অগ্রসর হইল। সেইদিন হইতে গর্ডন চক্রবর্ত্তীকে জলের কলের বিষয়ে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন এবং তাঁহার দ্বারা অনেক কাজ করাইয়া লইতে লাগিলেন। চক্রবর্ত্তী কুলী-মজুরের কাজ বলিয়া কোন দিন উপেক্ষা করেন নাই বরং এমন মনোযোগের সহিত তিনি সব কাজ সম্পন্ন করিয়াছেন যে, কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ প্রসন্ন হওয়ায়, তাঁহার অনেক উন্নতি হইয়াছে। চক্রবর্ত্তী এখন মফঃস্বলে কোন জলের কলে মোটা বেতনে কাজ করিতেছেন।

গর্ডন সাহেব বলিলেন, "ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীও তো বাঙ্গালী বাবু, তিনি তো কখনও আই য়্যাম এ বি. এ বলেন নাই!"

গর্ডন বলিলেন, "জান, এই দাশকে যদি বলি বাবু, এই বেল্টটা একটু কলে পরিয়ে দাও, সে অমনি উত্তর করে, But Sir I am a B. A. মিঃ মিত্র এর অর্থ কি?"

মিঃ মিত্র একটু গম্ভীর হইলেন, পরে বলিলেন, "ম্যাট্রি-কুলেসন পাশ করিয়া চার বৎসর কলেজে পড়িয়া পরীক্ষা দিলে, বি. এ পাশ করা যায়। আমার মনে হয়—মিঃ দাশ এ সব কাজে অভ্যস্ত নহেন।"

ইহার প্রায় দুই মাস পর পরে একদিন মিঃ মিত্রের বাড়িতে একটি বাঙ্গালী যুবক ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিষম চিন্তাক্লিষ্ট, বিবর্ণ মুখ। কষ্টের সহিত বলিলেন,"আমাকে রক্ষা করুন। এই বিদেশে আপনি ভিন্ন আমাকে সাহায্য করবার কেহ নাই; আমার চাকুরী গেলে আমার পরিবারবর্গ না খেয়ে মারা যাবে। আমি চাকুরী ছাড়বার নোটীস পেয়েছি, আপনি অনুগ্রহ করে ডানবার কোম্পানীর ম্যানেজার গর্ডন সাহেবকে যদি বলেন, তবেই আমার চাকুরীটী থাকতে পারে।"

ডানবার কোম্পানীর কথায় মিঃ মিত্রের গর্ডনের সকল কথা মনে পড়িল। এই ব্যক্তিই মিঃ দাশ মনে করিয়া মিঃ মিত্র বিমর্ষ হইলেন।

জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কোয়ালিফিকেশন কি?"

"আই য়্যাম এ বি. এ. স্যার।"

মিঃ মিত্র পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডান্‌বার কোম্পানীতে আপনাকে কোন্ কোন্ কাজ করতে হ'ত?"

লোকটি পূর্ব্ববৎ উত্তর করিল, "আই য়্যাম এ বি. এ. স্যার।"

মিঃ মিত্র হাসিলেন, বুঝিলেন, "আই য়্যাম এ বি. এ. স্যার"টি উহার মুদ্রাদোষ মাত্র; কাজ ফাঁকী দিবার গুপ্ত মন্ত্র না হইতেও পারে। বলিলেন, "আচ্ছা, আমি গর্ডনকে আপনার বিষয় বলব। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ আছে।"

লোকটি সাগ্রহে কহিল, "আজ্ঞে, বলুন।"

"'আই য়্যাম্ এ বি. এ.' স্যার বুলিটি আপনাকে ত্যাগ করতেই হবে।"

"কিন্তু স্যার, আমার সার্টিফিকেট আছে, ১৯৩১ সালে আমি ডিগ্রী পেয়েছি।"

"দু' লক্ষ দশ হাজার লোক ঐ ডিগ্রী পেয়েছে, উহাতে বাহাদুরী কিছু নাই। বুলিটি ত্যাগ করতে পারবেন ত?"

"পারব, কিন্তু আই য়্যাম এ বি. এ. স্যার ইউ বিলিভ্ মি!"

"আই ডু বিলিভ! কিন্তু ও বুলি থাকতে গর্ডন আপনাকে চাকুরী দিবে না।"

শিক্ষা

"শিক্ষা" অথবা "এডুকেশন", এই শব্দগুলি আজকাল যেরূপ ব্যাপক অর্থে অথবা অর্থহীন ভাবে ব্যবহৃত হয়, ভারতীয় ঋষিগণ তাহা ঐরূপ অর্থে অথবা অর্থহীন ভাবে ব্যবহার করেন নাই। তাঁহাদের ভাষানুসারে "প্রযত্ন" শব্দটী ব্যাপক। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সম্যক্ বিকাশ সাধন করিবার জন্য তাঁহারা পাঁচটী পদ্ধতি অবলম্বন করিবার উপদেশ দিয়াছেন। "শিক্ষা" ঐ পাঁচটী পদ্ধতির অন্যতম। তাঁহাদের ভাষানুযায়ী "শিক্ষা" বলিতে বুঝায় সত্ত্বপ্রকৃতিসম্পন্ন হইয়া বর্ণ, পদ এবং বাক্যের এমন ভাবে উচ্চারণ করিতে অভ্যাস করা, যাহাতে ঐ ঐ উচ্চারণে শরীরের কোন্ কোন্ অঙ্গ স্পৃষ্ট হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় এবং উচ্চারিত বর্ণ, পদ এবং বাক্যের অর্থ উপলব্ধ হয়।

স্বরলিপি

(সুর ও স্বর-লিপি —শ্রীনরোত্তমদাস ঘোষ) কথা—শ্রীঅনুরূপা দেবী

ফাগুন-রাতে জ্যোছনা জলে ডুব্‌লো ধরা
শীতের হাওয়া আজকে রাতে মর্ম্মে মরা।
ফুটেছে মাধবী ফুল
আমের মুকুল ডালে ডালে

শোন ঐ গাছে কোয়েল
শ্যামা দোয়েল নাচে তার তালে তালে
কোন্ অচিন্ পুরের বাঁশীর সুরে উদাস-করা।

গজল—দাদরা

দ্‌া প্‌া পা I দ্‌া প্‌া রা I সা া া I রা জ্ঞা রা I
০ ০ ফা I গু ন রা I তে ০ ০ I ০ ০ ০ I

সা মা জ্ঞা I রা সা রা I সা ন্‌া সা I রা ন্‌সা া I
জো ছ না I জ লে ০ I ডু ব লো I ধ রা০ ০ I

া া ন্‌া I সা রা জ্ঞা I রসা া া I া
০ ০ শী I তে র হাও I য়া ০ ০ I ০

সসা রগা I সরা মপা মা I জ্ঞা রা
০০ ০০ I ০০ ০০ শী I তে র

জ্ঞা I রসা া া I া া া I সা পা পা I
হাও I য়া০ ০ ০ I ০ ০ ০ I আ জ কে I

মা পধা প I ম জ্ঞা রা I জ্ঞা রসা া I
রা ০০ তে I ম র্ মে I ম রা০ ০ I

সা সা সা I গা গা া I মা মা া I মা মা পা I
০ ০ ফু I টে ছে ০ I মা ধ ০ I বী ফু ল I

গা গা পা I মা মা পা I গা রা গা I মা গা া I
আ মে র I মু কু ল I ডা ০ লে I ডা লে ০ I

া া প্‌া I ন্‌া ন্‌া ন্‌া I ন্‌া সা া I
০ ০ শো I ন ও ই I গা ছে ০ I

ন্‌া সা সা I সা রা জ্ঞা I
কো য়ে ল I শ্যা মা ০ I

রা জ্ঞা রসা I ন্‌া স সা I পা পা পা I
দো য়ে ল I ০ ০ না I চে তা র I

মা জ্ঞা রা I জ্ঞা রসা া I া া া I া
তা ০ লে I তা লে০ ০ I ০ ০ ০ I ০

সা সা I সা পা পা I মা ধা পা I
কো ন্ I অ চি ন I পু রে র I

পা মা জ্ঞা I রা জ্ঞা পা I সা মা জ্ঞা I রা ন্‌সা া II
বাঁ শী র I সু রে ০০ I উ দা স I ক রা০ ০ II

হিজলী টাইড্যাল ও উড়িষ্যা কোষ্ট ক্যানাল

—জি. বি. নন্দী

[আমরা এই প্রবন্ধটী বাঙ্গালা সরকারের প্রচার-অধ্যক্ষের নিকট হইতে পাইয়াছি। বাঙ্গালা সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মচারিগণ দেশের জনসাধারণের আর্থিক সচ্ছলতা, সন্তুষ্টি, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্পাদনের জন্য তাঁহাদের জ্ঞানবুদ্ধিমত যে কিরূপ প্রযত্ন করিয়া থাকেন, তাহার একটী চিত্র এই প্রবন্ধে আছে। অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রায় সর্ব্বত্রই বহুদিন হইতে লোকের সংসারযাত্রানির্ব্বাহে আর্থিক সচ্ছলতা অথবা স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়া ত' দূরের কথা, তাহা ক্রমশঃই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। কাযেই বলিতে হইবে যে, গবর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারিগণের যদিও প্রযত্নের কোন ত্রুটী নাই, তথাপি তাঁহাদের জ্ঞানগম্যের অভাববশতঃ দেশের জনসাধারণের কোন বিষয়ে উন্নতি না হইয়া অবনতি সাধিত হইতেছে। এই ক্ষেত্রে আরও বুঝিতে হইবে যে, দেশীয় জনসাধারণের গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের সহিত অসহযোগ না করিয়া, যাহাতে তাঁহাদের সহিত সহযোগ করিয়া তাঁহাদের প্রকৃত জ্ঞানগম্যের উন্নতি সাধিত হয়, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। —বঃ সঃ]

মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ ভাগ—অর্থাৎ উত্তরে কালিঘাই ও হলদি নদী, দক্ষিণে ও পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে সুবর্ণরেখার মুখ হইতে আমর্শি পরগণার পশ্চিম সীমানা পর্য্যন্ত—এই জায়গাটাকে পূর্ব্বে হিজলী বলা হইত। সানাদা ও রসুলপুর নদীর উত্তরভাগকে উত্তর-হিজলী আর দক্ষিণ ভাগকে দক্ষিণ-হিজলী বলা হইত। এক কথায় এখন যেটা কাঁথি মহকুমা, তাহার সমস্তটা এবং তমলুক মহকুমার হলদী নদীর দক্ষিণ দিকটাই সে সময়ের হিজলী। কি জন্য যে এ অঞ্চলের নাম হিজলী হইল, তাহা আমি জানি না। তবে আমার মনে হয়, তখনকার দিনে বোধ হয় এদিকে অনেক হিজল গাছ ছিল। সেই জন্য ইহার নাম হিজলী। আর ঐ খালটী এই দেশের ভিতর দিয়া গিয়াছে বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে হিজলী ক্যানাল। ইহার আবার দুইটী ভাগ আছে। প্রথম ভাগের নাম হিজলী টাইড্যাল ক্যানাল রেঞ্জ ওয়ান, আর দ্বিতীয় ভাগটীর নাম, হিজলী টাইড্যাল ক্যানাল রেঞ্জ টু। রূপনারায়ণ নদী গেঁওখালির কাছে হুগলী নদীতে মিশিয়াছে। হিজলী খালের প্রথম ভাগটা আরম্ভ হইয়াছে এই গেঁওখালির নিকট হইতে, আর শেষ হইয়াছে হলদী নদীর উত্তর পার্শ্বে ইটামগরার কাছে। ইহা এগার মাইল লম্বা। আর দ্বিতীয় ভাগ হলদী নদীর দক্ষিণ পার্শ্বে ইটামগরা হইতে এক মাইল পূর্ব্বে তেরোপেকে বাজারের নিকট হইতে আরম্ভ হইয়া রসুলপুর নদীর উত্তরে কালীনগরে শেষ হইয়াছে। ইহা লম্বায় সতের মাইল। পূর্ব্বে প্রথম ভাগের মুখটা গেঁওখালি হইতে চার মাইল উপরে বাঁকার নিকটে ছিল। কিন্তু সেখানে হুগলী নদীর উজান-বাঁধনে নৌকায় যাইতে অসুবিধা হইত ও সময় বেশী লাগিত। ইহা ছাড়া আরও অন্য অসুবিধা ছিল বলিয়া, পরে গেঁওখালির নিকট আনা হইয়াছে। হুগলী, রূপনারায়ণ, হলদী ও রসুলপুর —এই চারিটী নদীই টাইড্যাল, অর্থাৎ এই চারিটী নদীর প্রত্যেকটাতেই জোয়ার-ভাঁটা খেলে বলিয়া খালটীর নাম টাইড্যাল ক্যানাল রাখা হইয়াছে। অনেকেই হয়তো মনে করিবেন যে, খালের ভিতর জোয়ার-ভাঁটা খেলে, কিন্তু আসলে তাহা নয়। টাইড্যাল নদীগুলির সঙ্গে যোগ আছে বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে টাইড্যাল ক্যানাল। নৌকা-চলাচলের জন্য খালে যথেষ্ট জল আটকাইয়া রাখার প্রয়োজন, সেই জন্য খালের প্রথম ও শেষ মুখে একটা করিয়া লক্‌গেট বা কপাট আছে।

আজ প্রায় ৬৭ বৎসর হইল ইংরাজি ১৮৬৮ সালে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ইরিগেসন ও ক্যানাল কোম্পানী এই খালের কার্য্য আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহারা ঠিক মত কার্য্য করিতে না পারায়, ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রজার মঙ্গলের জন্য এই কার্য্যের ভার নিজের হস্তে লইলেন এবং ১৮৭৩ সালে কাজ শেষ করিলেন। ইহাতে সরকারের খরচ হইয়াছিল প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা। ইহা ছাড়া কালী-নগর লকের উন্নতির জন্য পরে আরও ৮ লক্ষ টাকা খরচ হয়। এ পর্য্যন্ত সরকারের মোট খরচ হইয়াছে ২৬,১৪,৩১৮ টাকা। ইহা ছাড়াও মেরামত ও লোকজনের মাহিনা বাবদ গড়ে বৎসরে ৪০ হাজার টাকা খরচ হয়। এই খাল হইবার পূর্ব্বে কলিকাতা বা অন্যান্য স্থানে মালপত্র লইয়া যাওয়া বড়ই কষ্টকর ছিল। তখন রাস্তাঘাট বা রেলপথ কিছুই ছিল না। অনেক ঘুরিয়া এবং অনেক বিপদ-আপদ মাথায় করিয়া নদী দিয়া যাইতে হইত, ঝড়-তুফানে অনেক নৌকা ডুবিয়া যাইত, জিনিষ-পত্র সব মারা যাইত, নৌকার মাঝি-মাল্লারাও অনেকে প্রাণ হারাইত। কিন্তু খাল হইবার পর হইতে সে সব অসুবিধা দূর হইয়াছে, পথ অনেক কমিয়া গিয়াছে, বিপদের ভয় একেবারে নাই বলিলেই হয়। ফলে আমদানী-রপ্তানীর পরিমাণ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। যে বৎসর প্রথম খাল খোলা হয়, সে বৎসর বিহারে খুব দুর্ভিক্ষ। কাজেই হাজার হাজার নৌকা এ দেশের ধান লইয়া কলিকাতায় চালান গেল। সেই ধান বিহারে গিয়ে অনেকের প্রাণ বাঁচায়। এদিকে এ দেশের লোকেরও খুব পয়সা হইল। খাল না থাকিলে ঐ ধান ঘরে মজুত পড়িয়া

থাকিত। যেমন শিক্ষার আদান-প্রদানে জ্ঞান বাড়িয়া যায়, তেমনি উপজাত দ্রব্যের আদান-প্রদানে দেশের সম্পদ বাড়িয়া যায়।

সরকারী কাগজ-পত্র হইতে জানা যায় যে, এ পর্য্যন্ত এই খাল দিয়া গড়ে বছরে প্রায় কুড়ি হাজার টন জিনিষ আমদানী এবং পঁয়তাল্লিশ হাজার টন জিনিষ রপ্তানী হইয়াছে। আর সেই জিনিষের দাম প্রায় বাষট্টি লক্ষ টাকা। মোটামুটি হিসাবে এই স্থান দিয়া এ পর্য্যন্ত ছত্রিশ কোটী টাকার মাল আমদানী ও রপ্তানী হইয়াছে। আমদানী জিনিষের মধ্যে কেরোসিন তেল, কয়লা, কাপড়-চোপড় ও গৃহনির্ম্মাণের মাল-মসলা ইত্যাদি এবং রপ্তানী জিনিষের মধ্যে ধান, পাট, বাঁশ ইত্যাদিই প্রধান।

পূর্ব্বে এই হিজলী অঞ্চল প্রায়ই ভাসিয়া যাইত। কখনও বা সমুদ্রের তুফান আসিয়া, কখনও বা অতিবৃষ্টির জন্য, কখনও কখনও সুবর্ণরেখা ও কালিঘাইয়ের বন্যায় ফসল একেবারে নষ্ট হইয়া যাইত। আর তখন খাল ছিল না, কাজেই অন্য স্থান হইতে ধান-চাল আসার সম্ভাবনা কম ছিল। রাস্তা-ঘাটও ছিল না, ফলে অনেককে অসময়ে প্রাণ হারাইতে হইত। সমুদ্রের ঢেউ আসিয়া এতদঞ্চলের যে কি পরিমাণ ক্ষতি করিত, তাহার একটা ক্ষুদ্র বিবরণ সংক্ষেপে দিতেছি। ১৮৬৪ সালে যে তুফান হয়, তাহাতে হিজলীর সমস্তটাই জলমগ্ন হয়। মেদিনীপুরের ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর হ্যারিসন সাহেবের 'এমব্যাঙ্কমেণ্ট ম্যানুয়ালে' লিখিত আছে যে, এই তুফানে ৪৭ হাজার লোকের এবং এক লক্ষ ছত্রিশ হাজার গরুবাছুরের প্রাণ বিনষ্ট হয়; এক কোটী টাকার বাণিজ্য-দ্রব্য এবং সাড়ে আট লক্ষ টাকার সরকারী সম্পত্তি নষ্ট হয়। প্রজার সম্পত্তির যে কত ক্ষতি হইয়াছিল, তাহার সঠিক হিসাব করা যায় নাই।

এই ত গেল এক বছরের কথা। কত বছর যে এই রকম ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। অত্যধিক বৃষ্টিতে এবং সুবর্ণরেখা ও কালীঘাইয়ের বন্যায় দেশের প্রভূত ক্ষতি হইত।

১৭৬০ সালে মেদিনীপুর জেলা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত হয়। তদবধি যাহাতে সমুদ্রের তুফান আসিয়া দেশ ভাসাইয়া দিতে না পারে, তাহার জন্য সরকার যথেষ্ট পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াছেন। অনেক বার চেষ্টা করিয়া শেষে ৭৫ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া সরকার সমুদ্রের ও হুগলী নদীর মোহানার পাশে উচ্চ বাঁধ করিয়া দিয়াছেন। খালগুলির ভিতর দিয়া তুফান আসিয়া দেশ ডুবাইয়া দিত বলিয়া সেগুলির মুখে অজস্র অর্থব্যয় করিয়া কপাট করিয়া দিয়াছেন। একদিকে জোকি-বাঁধের সুব্যবস্থা হওয়ায় সুবর্ণরেখার বন্যায় ভাসিবার সম্ভাবনা অনেক কমিয়া গিয়াছে। আমর্শি-বাঁধ নির্ম্মিত হওয়ায় কালীঘাইয়ের বন্যা-ভয়েরও অনেক লাঘব হইয়াছে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অধিকারের পূর্ব্বে এদেশের বাঁধের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। জমিদারেরা বাঁধ ভাল রূপে মেরামত করিতেন না। কাজেই প্রায় প্রত্যেক বৎসরই বাঁধ ভাঙ্গিয়া লোকের প্রভূত ক্ষতি হইত। গভর্ণমেণ্ট অনেক চেষ্টা করিয়া এবং অনেক পয়সা খরচ করিয়া এখন এই অঞ্চল অনেকটা নিরাপদ করিয়াছেন।

এদেশে তিন রকম বাঁধ আছে। যথা, (১) পাহাড়ের জল নদী দিয়া আসিতে আসিতে যাহাতে নদীর পাড় ছাপাইয়া দেশ ভাসাইয়া না দিতে পারে, তজ্জন্য নদীর পাশে বাঁধ দেওয়া হয়। কাঁসাই ও শিলাই নদীতে এ... বাঁধ আছে। (২) যাহাতে জোয়ারের নোনাজল মাঠে গিয়া শস্য নষ্ট না করিতে পারে, তাহার জন্য নদীর পাশে বাঁধ আছে। রূপনারায়ণ, হলদী ও রসুলপুর নদীতে এই রকম বাঁধ আছে। (৩) যাহাতে সমুদ্রের ঢেউয়ে ও তুফানে দেশ ভাসিয়া না যায়, তজ্জন্য সমুদ্রের উপকূলে উচ্চ বাঁধ আছে। হিজলী টাইডাল ক্যানাল দিয়া জল-নিকাশেরও সুব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা দ্বারা মাঠের জল এই খালে আসিয়া পড়ে এবং শেষে লক-গেট দিয়া নদীতে বাহির হইয়া যায়। জল-নিকাশ যাহাতে তাড়াতাড়ি হয়, তজ্জন্য সরকার বাহাদুর অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া খালের তলা নীচু করিয়া দিয়াছেন। যখন বন্যায় দেশ ভাসিয়া যায়, তখন যাহাতে তাড়াতাড়ি জল নিকাশ হয়, তাহার জন্য খালের বাঁধ কাটাইয়া দেন এবং লক খুলিয়া দিয়া জল বাহির করিয়া দেন। যখনই খালে পলি পড়িয়া তলা উঁচু হইয়া যায়, তখনই সরকার বাহাদুর অনেক টাকা ব্যয় করিয়া পলি কাটাইয়া দেন। যাহাতে জল-নিকাশ আরও ভাল রকম হয়, তজ্জন্য প্রায় ৪০ হাজার টাকা খরচ করিয়া কালীনগরে একটা প্রকাণ্ড স্লুইস-গেট করিয়াছেন।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হিজলী খালের দুই ভাগ কালীনগরের নিকট রসুলপুরে মিশিয়াছে। এই কালীনগরের প্রায় অপর দিকে রসুলপুরের উপরে ভাইটগড়া। উড়িষ্যা কোষ্ট ক্যানাল এই ভাইটগড়া হইতে আরম্ভ হইয়া ওদিকে উড়িষ্যার মধ্যে বালেশ্বর ও ভদ্রক পর্য্যন্ত গিয়াছে। ইংরাজী ১৮৮০ সালে এই খালের কাজ আরম্ভ হয় এবং ১৮৮৬ সালে শেষ হয়। এই খাল খনন করিতে সরকার বাহাদুরের খরচ হয় প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা। ইংরাজী ১৯১২ সালের পূর্ব্বে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা এক প্রদেশই ছিল। ১৯১২ সালে বিহার ও উড়িষ্যা বাঙ্গালা হইতে পৃথক্ হয়। এখন ভাইটগড়া হইতে সিরগোদা পর্য্যন্ত ২৬ মাইল বাঙ্গালার মধ্যে। এই হিজলী টাইড্যাল ও উড়িষ্যা কোষ্ট ক্যানাল হওয়ায় উড়িষ্যার সঙ্গে কলিকাতার যোগ খুব সহজ হইয়া পড়িয়াছে। তখনকার দিনে লোকজনের যাতায়াতের জন্য ও জিনিষ-পত্রের আমদানী-রপ্তানীর জন্য সমুদ্রের উপর দিয়া জাহাজ ভিন্ন কিংবা জগন্নাথের রাস্তা দিয়া গরুর গাড়ী করিয়া যাওয়া ছাড়া উড়িষ্যা হইতে কলিকাতা যাইবার অন্য কোন পথ ছিল না। ইণ্ডিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর জাহাজ চাঁদপলী ফল্‌স-পয়েণ্ট বন্দর হইতে ছাড়িত, তাহাতে অসুবিধা ছিল বিস্তর। প্রথম, গ্রাম হইতে সেখানে পৌছানই ছিল এক দায়। তাহার উপর সমুদ্রের ঝড়-ঝটিকায় অনেক সময় অনেক জাহাজ-ডুবি হইত। জিনিষের মাশুলও অপেক্ষাকৃত বেশী ছিল। সমুদ্র-পীড়াতে লোকে বড় কষ্ট পাইত, অনেকে আবার জাহাজে খাওয়া-দাওয় করাটা ধর্ম্মবিরুদ্ধ মনে করিত, সে জন্য সে কয় দিন অনাহারে কাটাইতে হইত। আর জগন্নাথের যে রাস্তার কথা বলিলাম, সে রাস্তা দিয়া গরুর গাড়ী যাইতে অনেক সময় লাগিত। আর তাহা ছাড়া রাস্তায় বিপদ ছিল অনেক। চারিদিকে বন-জঙ্গল, বাঘ-ভালুকের ভয়, তাহার উপর চোর-ডাকাতের উপদ্রব। তখনকার দিনে পুলিশ-পাহারার বন্দোবস্ত আজ কালকার দিনের মত ছিল না। তখন পথ চলা ছিল বড়ই বিপদ্জনক।

যাঁহারা জগন্নাথ যাইতেন, তাঁহারা অনেকে মিলিয়া দলবদ্ধ হইয়া রাস্তায় বাহির হইলেও চোর-ডাকাত বা বাঘ-ভাল্লুকের হাত হইতে অনেক সময় পরিত্রাণ পাইতেন না।

শোনা যায় যে, পূর্ব্বে জগন্নাথ-যাত্রীরা বাড়ী হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে পাছে আর ফিরিতে না পারেন, সেই জন্য টাকা-পয়সা, জমি-জমা, উইল-পত্র করিয়া বাহির হইতেন। এই সব অসুবিধা দূর করিবার জন্য এই খাল খনন করা হয়। খাল খোলার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার লোক গ্রাম হইতে ধান-চাল লইয়া কলিকাতায় যাইতে লাগিল। এবং ফিরিবার পথে কলিকাতা হইতে কেরোসিন তৈল, কাপড় ইত্যাদি লইয়া আসিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে লোকের অবস্থা ফিরিয়া গেল।

দেশের অবস্থা অন্য রকম হইল। মেটো-ঘরের স্থানে টিনের বাড়ী, পাকা বাড়ী দেখা দিল। জ্ঞানের আলো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল ও দুভিক্ষের হাত হইতে লোক রক্ষা পাইল। পুরাতন কাগজপত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, চাঁদপলী হইতে কলিকাতা যাইতে লোকপিছু প্রায় তিন টাকা পড়িত। নৌকা করিয়া খাল দিয়া যাইতে তিন টাকার যায়গায় দেড় টাকা পড়িতে লাগিল। জিনিষপত্রের মাশুল কম হইয়া গেল। আমদানী-রপ্তানী বিস্তর বাড়িয়া গেল, আগে আগে এই খাল দিয়া কোন কোন বছর প্রায় ৫০ হাজার টন জিনিষ আমদানী ও ৯০ হাজার টন জিনিষ রপ্তানী হইয়াছে। আর তাহার দাম প্রায় এক কোটী টাকা। এখন অবশ্য চার দিকে অর্থসমস্যা। কাজেই আমদানী-রপ্তানী কমিয়া গেছে। এ পর্য্যন্ত গড়ে বছরে ৩৩ হাজার টন জিনিষ রপ্তানী হইয়াছে, আর তাহার দাম প্রায় ৪৩ লক্ষ টাকা। মোটামুটি এ পর্য্যন্ত প্রায় ২১ কোটী টাকার জিনিষ এই খাল দিয়া আমদানী-রপ্তানী হইয়াছে। এই ত গেল ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা—তাহা ছাড়া এই খালে আরও অনেক উপকার হইয়াছে। এদিকে বর্ষাকালে যখন চারিদিক ডুবিয়া যায়, তখন লোকের চলাচলের একমাত্র রাস্তা এই খালের বাঁধ। যখন বেশী বন্যা হয়, তখন গরুবাছুরের, এমন কি মানুষের থাকিবার জায়গা থাকে না। এই খাল দিয়া আবার জলনিকাশের সুন্দর ব্যবস্থা করা আছে। এই খালের সঙ্গে ছোট ছোট খাল কাটিয়া দিয়া মাঠের সঙ্গে যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্ষাকালে বেশী বৃষ্টি হইলে মাঠ হইয়া ঐ ছোট ছোট খাল দিয়া জল আসিয়া এই বড় খালে পড়ে। এবং সেখান হইতে স্লুইস্ দিয়া নদীতে বাহির হইয়া যায়। বহু অর্থব্যয়ে ১২ মাইল ব্যাপী স্থানে জল আসার ও যাওয়ার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। যে বছর বেশী বন্যা হয়, সে বছর খালের বাঁধ কাটিয়া দেওয়া হয়। এবং ভাইটগড়ার লক খুলিয়া দিয়া জলনিকাশের ব্যবস্থা করা হয়। বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, এই অর্থসঙ্কটের সময়ও অর্দ্ধ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গভর্ণমেণ্ট ভাইটগড়ায় একটি সুবৃহৎ স্লুইস্ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

শেষ লিপি

—শ্রীপ্রতিভা ঘোষ

তুমি এসেছিলে পাশে নহে প্রিয়, ভুল মোর,
অলীক স্বপনও সে তো নয়!
সেদিনের স্মৃতি আজো মোর বুকে অমলিন,
মোর কাছে সে যে মধুময়!

একা আমি পাশে তব, তোমার মুঠিতে হাত,
আঁখি থির্ চেয়ে তোমা' পানে।
নীরব ভাষার ডালি দিয়াছিনু উপহার,
খুশী তোমা' করেছি সে দানে॥

সেদিন আসন পাতি' দিয়াছিল শ্যাম তৃণ
দোঁহা লাগি' মিলন-সভায়।
জানি না সে কোন্ দূতী কহেছিল সে বারতা
সাঁঝের প্রথম তারকায়॥

ক্রমে তা' আকাশ-পথে হয়েছিল কানাকানি
সব তারা একে একে এসে—
দেখেছিল সে মিলন, এসেছিল ফুল-রেণু
উজানী সমীর-স্রোতে ভেসে॥

নাম-না-জানা কি পাখী সহসা গভীর রাতে
ভেঙেছিল সমাধি দোঁহার!
তুমি যেতে চেয়েছিলে, আমি করেছিনু মানা
—"যেও না গো—" ব'লে বারে বার!

আমার মিনতি প্রিয়, তোমার চলার পথে
তুলেছিল বাধা গ'লে গ'লে!
সারাটী রজনী তাই নিদ্হারা ছিলে ব'সে
সোহাগে এ-মাথা ল'য়ে কোলে।

তোমার আঙুলগুলি খেলিয়াছে লুকোচুরি
আমারি এ-অলকের মাঝে।
তোমার ওষ্ঠ দু'টী ভীরু কপোতীর মত
নেমেছে এ-কপোলে সে সাঁঝে॥

—"বহু দূরদেশে গিয়া বাঁধিব দু'জনে নীড়,
প্রেম র'বে চির-অবিনাশী,
বিটপী জোগাবে ফল, নদী পিপাসায় জল,
ব'সে র'ব মোরা পাশাপাশি—"

তোমারি সে কথা আর স্মৃতির দুয়ারে তব
ভিড় ক'রে দাঁড়াবে না জানি,—
তবু বহু দুরাশায় ঠাঁই দেছি ব'লে বুকে
পাঠাইনু শেষ লিপিখানি॥

[সম্পাদকদ্বয়ের সম্মতিক্রমে শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক লিখিত]

ভারতবর্ষের অবস্থা ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পণ্ডিত জওহরলালের মতবাদ

কিছুদিন পূর্ব্বে পণ্ডিত জওহরলাল লণ্ডন সহরে কোন সংবাদপত্রের প্রতিনিধির সহিত কথাবার্ত্তায় নিম্নলিখিত মতবাদ কয়টী প্রকাশ করিয়াছেন।

(১) ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা যে, ভারতসচিব পর্য্যন্ত ভারতের প্রকৃত ইতিহাস জানেন না।

(২) পুরাতন রকমের ভারতীয় শিল্পের বিলোপ এবং বাহির হইতে আনীত নূতন শিল্প প্রবর্ত্তনের ফলেই এই বেকার-সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে।

(৩) নূতন শাসনতন্ত্রের আমলে আমরা এই বেকার-সমস্যা, জমিসংক্রান্ত সমস্যা, জমির বিলি-বন্দোবস্ত এবং শিল্পগুলির উন্নতিবিধান সম্পর্কে একটী অঙ্গুলী সঞ্চালনও করিতে পারিব না।

(৪) কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এই শাসনতন্ত্র অনুসারে কাজ করা যাইবে না এবং করিয়াও কোন ফল হইবে না।

(৫) নূতন ভারতশাসন আইনের দ্বারা কতিপয় কায়েমী স্বার্থের (vested interests) নিকট ভারতবর্ষকে বন্ধক দেওয়া হইয়াছে।

(৬) মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে কে অধিকসংখ্যক চাকুরী পাইবে, তাহা লইয়া বিরোধিতাই সাম্প্রদায়িক সমস্যার প্রকৃত রূপ।

(৭) ভূমিসংক্রান্ত যে সমস্যা, তাহা একমাত্র যৌথ চাষ-বাসের ব্যবস্থা দ্বারাই সমাধান হইতে পারে।

(৮) ভারতের বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান করিতে হইলে বিরাট ও ব্যাপক ভাবে কলকারখানার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা আবশ্যক।

(৯) ভারতীয় ভাষাসমূহের ঐক্যের জন্য এক বর্ণমালা ব্যবহারের প্রয়োজন।

পণ্ডিত জওহরলালের উপরোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় কথানুসারে বুঝিতে হয় যে, ভারতবর্ষে প্রাচীন কালে একটা বিরাট শিল্প ও বহির্বাণিজ্য ছিল এবং ভারতবর্ষের ঐ শিল্প ও বহির্বাণিজ্য নষ্ট হইয়া যাওয়ায় এবং বাহির হইতে নূতন শিল্পের ও বাণিজ্যের আমদানী হওয়ায়, আমাদের বেকার-সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। তাঁহার কথায় আরও বুঝিতে হয় যে, তিনি ও অন্যান্য কয়েকজন ভারতবাসী ভারতবর্ষের যথাযথ প্রাচীন ইতিহাস জানেন এবং ইংরাজগণের মধ্যে কেহ তাহা জানেন না।

আমাদের মতে ভারতের প্রকৃত প্রাচীন ইতিহাস বর্ত্তমানে প্রায়শঃ বিস্মৃতির গর্ভে লুক্কায়িত রহিয়াছে এবং তৎসম্বন্ধে জওহরলালজীর অথবা আধুনিক ঐতিহাসিকগণের বিশেষ কোন জ্ঞান লাভ করিবার সুযোগ হয় নাই।

প্রাচীন ভারতবর্ষে যে একটা বিরাট শিল্পের অস্তিত্ব ছিল এবং ভারতবাসিগণ যে তাঁহাদের ব্যবহার্য্য শিল্পজাত দ্রব্য সম্পূর্ণ ভাবে নিজেরাই প্রস্তুত করিতে জানিতেন এবং করিতেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় বটে, কিন্তু ভারতবাসীর যে কোন বিস্তৃত বহির্বাণিজ্য ছিল, তাহার কোন প্রমাণ ঋষিদিগের কোন প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। পরন্তু মনুসংহিতা পড়িলে দেখা যাইবে যে, ঋষিদিগের অভ্যুত্থান-

কালে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল এবং যাহাতে জগতের প্রত্যেক দেশের লোক ভিন্ন দেশে না যাইয়া, স্ব স্ব দেশে নিজ প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপাদন করিতে পারেন, তাহার প্রবৃত্তি জাগ্রত হইয়াছিল। সমুদ্রযাত্রা যে কেন নিষিদ্ধ হওয়া উচিত, তাহা বায়বীয় আকারের ক্ষিত্যাদি পঞ্চ-মহাভূত হইতে কি করিয়া জীবের ও সমুদ্রের উদ্ভব হয়, তাহার আলোচনা অবগত হইলে বুঝিতে পারা যায়। চারিটী বেদ, যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি, কয়েকখানি পুরাণ এবং মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়, ঐ সমস্ত আলোচনায় অল্পাধিক পরিপূর্ণ। সমুদ্র-যাত্রা যাহাতে নিষিদ্ধ হয়, তাহার ব্যবস্থা যে ভারতীয় ঋষিগণ করিয়াছিলেন, তাহা আজকাল পণ্ডিতগণের মধ্যেও অনেকে স্বীকার করিয়া থাকেন। আধুনিক ইতিহাসেও ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগে কোন উল্লেখযোগ্য সমুদ্রযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায় না। আধুনিক ইতিহাসানুসারে ভারতবর্ষের বাহিরে যাইতে হইলে, তখন "খাইবার পাশে"র মধ্য দিয়া যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না এবং ঐ "খাইবার পাশ" বৎসরের অধিকাংশ সময়ই দুর্গম থাকে। সমুদ্রযানের অস্তিত্ব যদি না দেখা যায় এবং স্থলপথেও যদি দুর্গমতার বিদ্যমানতা উপলব্ধি করা যায়, তাহা হইলে তখন যে দেশের কোন বিরাট বহির্বাণিজ্য ছিল না—ইহা কি যুক্তি-সঙ্গতভাবে বলা যায় না ?

যে সমস্ত বড় বড় পণ্ডিত ঋগ্বেদ হইতে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে বহির্বাণিজ্য ছিল, তাঁহারা যে ঋগ্বেদের বক্তব্য ও ভাষা পর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত নহেন, তাহা অতি সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে। যুক্তিসঙ্গতভাবে তাঁহাদের কথা বিশ্বাস করিবার অযোগ্য।

ভারতের প্রকৃত উন্নতির যুগ ছিল ভারতীয় ঋষিদিগের সময়ে। কেন ও কাহার কর্ত্তব্যবিমুখতায় ভারতের অবনতি ঘটিয়াছে, তাহা আমরা গত সংখ্যায় "দেশের অবস্থা ও তৎসম্বন্ধে আনন্দবাজার পত্রিকা" ইত্যাদি-শীর্ষ প্রবন্ধে দেখাইয়াছি।

ভারতীয় ঋষিদিগের সময়ে ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্য ছিল না বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া যেন কেহ মনে করেন না যে, তাঁহারা বাণিজ্য-বিস্তার সম্বন্ধে কোন চিন্তা করেন নাই, অথবা তাঁহাদের কোন অক্ষমতার জন্যই বাণিজ্য বিস্তার করা সম্ভাবিত হয় নাই, অথবা দ্রুতগামী যান-বাহন তাঁহারা প্রস্তুত করিতে জানিতেন না। মানবধর্ম্মের প্রকৃষ্ট জ্ঞান বশতঃ তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বহির্বাণিজ্য বিস্তার করিবার চেষ্টা করিলে, মানবজাতির অকল্যাণ সাধিত হইতে পারে এবং সেই জন্য তাঁহারা তাহা করেন নাই। দ্রুতগামী যানবাহন তাঁহারা যে প্রস্তুত করিতে জানিতেন এবং করিতেন, তাহারও যথেষ্ট পরিচয় তাঁহাদের বৈশেষিক-দর্শনাদি বিভিন্ন গ্রন্থে আছে। বাহুল্যভয়ে আমরা ঐ সমস্ত গ্রন্থের আলোচনা এখানে করিব না।

দেশীয় প্রয়োজন সরবরাহ করিবার উপযোগী বিস্তৃতরূপে শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা সমস্তই কুটীর-শিল্প। ইহা দ্বারা এমন বুঝিতে হইবে না যে, যন্ত্রের ব্যবহার তাঁহারা জানিতেন না, অথবা যন্ত্র-শিল্পের প্রচলন কোন দিন ভারতবর্ষে ছিল না। আধুনিক যন্ত্র-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা পরিজ্ঞাত হইয়া বৈশেষিক দর্শন এবং পরমসিদ্ধান্ত নামক গ্রন্থ দুইখানি অধ্যয়ন করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, আধুনিক যন্ত্র-বিজ্ঞানে বস্তুর গতি সম্বন্ধে যে যে আলোচনা আছে, তাহা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্তিপূর্ণ; আর ঋষিগণ গতি (motion) সম্বন্ধে অতিবিস্তৃত এবং ভ্রান্তিহীন আলোচনা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। যদি তাঁহাদের গতিবিজ্ঞান (science of motion or mechanics) সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাই না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা ঐ সম্বন্ধে আমূল আলোচনা করিতে পারিতেন কি ?

ঋষিদিগের গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায় যে, যন্ত্র-বিজ্ঞানের অত্যধিক প্রচলন হইলে দেশের হাওয়া বিকৃত হইয়া যায়, এবং মানুষের অস্বাস্থ্য বৃদ্ধি পাইতে পারে এবং তাহার অকালমৃত্যু ঘটিবার আশঙ্কা হয়। যান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান অত্যধিক সংখ্যায় প্রচলিত হইলে যে, দেশের জলহাওয়া খারাপ হইয়া যায় এবং তাহাতে যে মানুষের অস্বাস্থ্য এবং অকালমৃত্যু বৃদ্ধি পাইতে পারে, তাহা বর্ত্তমান কালের কলগুলির দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেও বুঝিতে পারা যায়। কলগুলির চিম্‌নী হইতে যে ধূম নির্গত হইতেছে, তাহা বিষাক্ত বাষ্পে (carbon dioxide) পরিপূর্ণ। ঐ বিষাক্ত বাষ্প সর্ব্বদা বায়ুর সহিত

মিশ্রিত হইতেছে এবং তাহা আমরা নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছি। ঐ বিষাক্ত বাষ্প (carbon dioxide) অবিমিশ্র ভাবে গ্রহণ করিলে মানুষের যে মৃত্যু ঘটিতে পারে, তাহা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণও স্বীকার করিয়া থাকেন। উহা অবিমিশ্র ভাবে গ্রহণ করিলে যদি মানুষের মৃত্যু ঘটিতে পারে, তাহা হইলে বায়ুর সহিত মিশ্রিত অবস্থায় গ্রহণ করিলেও যে, মানুষের মৃত্যুর কারণ হইতে পারে, তাহা বুঝিতে কোন কষ্ট হয় কি ?

কোন দেশে লাভজনক কৃষি এবং কুটীর-শিল্প যুগপৎ বিদ্যমান থাকিলে, সেই দেশের শিল্পের সহিত কোন যান্ত্রিক শিল্প প্রতিযোগিতায় দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম হয় না।

যান্ত্রিক শিল্পজাত দ্রব্যের তুলনায় যে কুটীর-শিল্পজাত দ্রব্য অধিক টেঁকসই এবং দেখিতে অপেক্ষাকৃত সুন্দর হয়, তাহা আমাদের দেশের তাঁতের কাপড়গুলিকে বিলাতী কলের কাপড়ের সহিত তুলনা করিলে বুঝিতে পারা যায়।

আমাদের দেশের তাঁতের কাপড় যে কলের কাপড়ের সহিত বর্ত্তমান কালে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিতেছে না, তাহার একমাত্র কারণ মূল্যাধিক্য। কিন্তু, কৃষিকার্য্য যদি যথেষ্ট পরিমাণে লাভজনক থাকিত, তাহা হইলে তাঁতের কাপড়ের এই মূল্যাধিক্য থাকিতে পারিত না।

একখানি কাপড় প্রস্তুত করিতে যাহা যাহা লইয়া তাহার পড়্‌তা (cost), তাহাদের নাম—(১) তুলা প্রভৃতি কাঁচা মালের খরচা, (২) মজুরী, (৩) পর্য্যবেক্ষণ (supervision)।

কুটীর-শিল্পে তাঁতের কাপড় প্রস্তুত করিতে যে তুলা লাগে, তাহার মূল্য সাধারণতঃ কলে কাপড় প্রস্তুত করিতে যে তুলা লাগে, তদপেক্ষা কম। কারণ, কলে তুলার যে লোকসান (wastage) হয় এবং তাহাতে যেরূপ শক্তিসম্পন্ন আঁশের (strong fibres) প্রয়োজন, কুটীর-শিল্পে তুলার লোকসান তদপেক্ষা কম এবং তাহাতে অপেক্ষাকৃত কম জোরের আঁশ হইলেও চলিতে পারে।

পর্য্যবেক্ষণের খরচাও কুটীর-শিল্পে অপেক্ষাকৃত কম।

তুলা এবং পর্য্যবেক্ষণের খরচে সুবিধা থাকা সত্ত্বেও যে, যান্ত্রিক শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় কুটীর-শিল্প বর্ত্তমান কালে সাফল্য লাভ করিতে পারিতেছে না, তাহার একমাত্র কারণ মজুরীর খরচাধিক্য।

যদি জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বজায় থাকিত এবং জমীজাত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ে কোন অনাচার না ঘটিত, তাহা হইলে কৃষকগণ বৎসরের মধ্যে ছয় সাত মাস পরিশ্রম করিয়া একমাত্র কৃষি-কার্য্যের দ্বারাই তাঁহাদের সংসারের ভরণপোষণ করিতে পারিতেন এবং তখন বৎসরের বাকী পাঁচ ছয় মাস কিছু উপার্জ্জন না করিলেও তাঁহাদের সংসার-যাত্রায় কোনরূপ ক্লেশের আশঙ্কা ঘটিত না। এই অবসর সময়ে তাঁহারা যদি বস্ত্র-বয়ন প্রভৃতি কুটীর-শিল্পে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে কাপড়ের পড়তায় (cost) মজুরীর কোন খরচ না ধরিলেও তাঁহাদের কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইত না। কাযেই তখন কুটীর-শিল্পে যন্ত্রশিল্পের তুলনায় মূল্যাধিক্য থাকিতে পারিত না এবং যন্ত্রশিল্পের পক্ষে কুটীর-শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করা সম্ভব হইত না।

ঋষিগণের অভ্যুত্থানকালে কৃষিকার্য্য এই রূপে লাভজনক হইয়াছিল বলিয়াই কুটীর-শিল্পও সাফল্য লাভ করিয়াছিল এবং ভারতবর্ষে প্রকৃত অনন্যসাধারণ আর্থিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান কালে লাভজনক কৃষিকার্য্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়াই ভারতবর্ষের কুটীর-শিল্পও সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে বসিয়াছে। আমাদের ঐ কুটীর-শিল্পের ধ্বংসের জন্য বিদেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানীকে যুক্তিসঙ্গত ভাবে দায়ী করা যায় না, কারণ লাভজনক কৃষি বিদ্যমান থাকিলে কুটীরশিল্পজাত দ্রব্যের যে পড়তা পড়িত, তাহার সহিত যন্ত্রজাত শিল্পদ্রব্য প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম হইত না এবং বিদেশীয় ঐ যন্ত্রজাত শিল্পদ্রব্যের আমদানী হওয়াই অসম্ভব হইত। ভারতের কৃষিকার্য্য যে এখন আর লাভজনক নাই, তাহার জন্যও ইংরাজগণ দায়ী নহেন, কারণ ভারতীয় ঋষিদিগের যে যে গ্রন্থ হইতে জমী এবং জীবতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা ইংরাজদিগের পক্ষে বুঝা সম্ভব নহে। যুক্তিসঙ্গতভাবে উহার জন্য কাহারও উপর দায়িত্ব আরোপ করিতে হইলে আমাদের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে ধিক্কার দিতে হয়। তাঁহাদের অসারতার জন্যই প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং প্রকৃত জমী এবং জীবতত্ত্ব ভারতীয় ঋষিগণ যে যে গ্রন্থে যে যে স্থানে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমানকালে আজগুবি

'পরকালে'র, 'স্বর্গে'র ও 'আধ্যাত্মিকতা'র গল্পে পরিণত হইয়াছে।

আমাদের কৃষক ও শিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে যে এত বেকারের উদ্ভব হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহারও কারণ, ঐ জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস এবং লাভজনক কৃষি-কার্য্যের বিলোপ। ইহা আমরা "ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রমাণ করিয়াছি।

মিঃ জওহরলাল বলিতেছেন যে, অত্যধিক বিদেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানীর জন্য আমাদের দেশে বেকারের উদ্ভব হইতেছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, যদি বিদেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানী সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলেই কি আমাদের বেকার-সমস্যার সমাধান হইবে? বিদেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানী সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিলে যে, কোন দেশের বেকার-সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হয় না, তাহার দৃষ্টান্ত ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্। জওহরলালজী অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন যে, ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সে গত কয়েক বৎসর হইতে বিদেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানী একরূপ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তথাপি তথাকার বেকার-সমস্যার কোন সমাধান হয় নাই।

জওহরলালজীর তৃতীয় ও চতুর্থ কথানুসারে বুঝিতে হয় যে, ভারতবর্ষের নূতন শাসনতন্ত্রের আমলে ভারতের জনসাধারণের পক্ষে তাহাদের আর্থিক উন্নতিবিধানকল্পে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব নহে।

তাঁহার এই দুইটী কথাও অসার এবং অদূরদর্শিতার পরিচায়ক।

আমরা বঙ্গশ্রীর এই সংখ্যায় "ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, কোন্ কোন্ কারণে ভারতে আর্থিক দুরবস্থার উদ্ভব হইয়াছে এবং কি কি করিলে ঐ আর্থিক দুরবস্থার অপনোদন হইতে পারে, তাহা সুচিন্তিত হইয়া উদ্ভাবিত হইলে এবং ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেস ইংরাজবিদ্বেষ ও পূর্ণ স্বাধীনতালাভের হৈ-চৈ পরিত্যাগ করিয়া, যদি সর্ব্বসাধারণের দুরবস্থার অপনোদনকর ঐ কার্য্যতালিকা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে দেশের মধ্যে প্রকৃত একতা স্থাপিত হইয়া প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেসের উদ্ভব হইতে পারে। তখন ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণের পক্ষে সমস্ত প্রদেশের সমস্ত মন্ত্রিত্ব লাভ করা সম্ভব হইবে এবং দেশের মধ্যে ইচ্ছানুরূপ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করাও কষ্টসাধ্য হইবে না।

জওহরলালজীর পঞ্চম কথানুসারে নূতন ভারতশাসন আইনের দ্বারা কতিপয় কায়েমী স্বার্থের (vested interests) নিকট ভারতবর্ষকে বন্ধক দেওয়া হইয়াছে।

আমরা তাঁহার তৃতীয় ও চতুর্থ কথার আলোচনায় দেখাইয়াছি যে, ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেসে প্রকৃত একতা স্থাপিত হইলে এবং ইংরাজ-বিদ্বেষ দূরীভূত হইলে ভারতবাসীর স্বায়ত্তশাসন লাভ করা সম্ভব হইতে পারে। যদি কোনক্রমে ভারতবাসীর স্বায়ত্তশাসন লাভ করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষকে কাহারও নিকট বন্ধক দেওয়া হইয়াছে, তাহাও যুক্তিসঙ্গতভাবে বলা যায় না। কাযেই জওহরলালজীর পঞ্চম কথাটীতেও সুচিন্তার পরিচয়ের অভাব আছে, ইহা বলিতে হইবে।

জওহরলালজীর ষষ্ঠ কথাটী খুব যুক্তিসঙ্গত। প্রধানতঃ সরকারী চাকুরীর ভাগবাটোয়ারা লইয়াই যে হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া প্রকট হইয়া পড়ে, তাহা যাঁহারা দেশের অবস্থা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও চিন্তা করেন, তাঁহারা যুক্তিসঙ্গতভাবে অস্বীকার করিতে পারেন না। আমাদের শুধু জিজ্ঞাস্য এই যে, আমাদের কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষগণ যে এই কথা বাস্তবিক পক্ষে বুঝিতে পারেন, তাহার পরিচয় তাঁহাদের কোন কার্য্যে পাওয়া যায় কি?

জওহরলালজীর সপ্তম কথানুসারে বুঝিতে হয় যে, দেশের মধ্যে যৌথ চাষবাসের ব্যবস্থা হইলে দেশের কৃষিসমস্যার সমাধান হইতে পারে।

তাঁহার এই কথা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নহে। একে ত স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির বৃদ্ধি এবং কৃষিজাত দ্রব্যের আদান-প্রদানের সুব্যবস্থা না হইলে প্রকৃত কৃষিসমস্যার সমাধান করা সম্ভব নহে, তাহার পর আবার যদি দেশে যৌথ চাষবাসের ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে যাঁহারা কৃষকভাবে কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া এতাবৎকাল জীবনযাপন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের সকলেরই যৌথ চাষবাসের প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট চাকুরীপ্রার্থী হইতে হইবে এবং যে-স্বাবলম্বন প্রত্যেক মানুষের প্রার্থনীয় এবং যাহা প্রত্যেক ভারতীয় কৃষক এতাবৎ উপভোগ

করিয়া আসিতেছিলেন, সেই স্বাবলম্বন দেশ হইতে অন্তর্দ্ধান করিবে। আমাদের কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান আমেরিকার কৃষির অবস্থা।

আমরা মিঃ জওহরলালকে জিজ্ঞাসা করি যে, যদি যৌথ চাষবাসের প্রবর্ত্তন করিলেই কৃষিসমস্যার সমাধান হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান আমেরিকার কৃষি লাভজনক হইতেছে না কেন এবং সেখানে দারিদ্র্যের তীব্রতা ও দরিদ্রের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে কেন?

যৌথ চাষবাসের প্রবর্ত্তন করিলেই কৃষিকার্য্যাদি যে ধনিকের হাতে চলিয়া যায়, তাহা কি জওহরলালজী বুঝিতে পারেন না? সমাজতান্ত্রিকভাবে তিনি ধনিকের বিরুদ্ধবাদী বলিয়া সকলে তাঁহাকে জানে।

যে কার্য্য চিরদিন শ্রমিকের একচেটিয়া ছিল, তাহা যাহাতে ধনিকের হাতে চলিয়া যাইতে পারে, তাহার প্রস্তাবের সহিত সমাজতন্ত্রবাদের সুসামঞ্জস্য কোথায়, ইহা জওহরলালজী জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিবেন কি?

জওহরলালজীর অষ্টম কথানুসারে ভারতের বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান করিতে হইলে বিরাট ও ব্যাপকভাবে কলকারখানার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা আবশ্যক।

বিরাট ও ব্যাপকভাবে কলকারখানার প্রতিষ্ঠা হইলেই যদি দেশের আর্থিক অথবা বেকার-সমস্যার সমাধান হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে আর্থিক ও বেকার-সমস্যা দেখা যায় কেন, ইহা জওহরলালজী জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিবেন কি?

আমাদের ভারতবর্ষেও ত্রিশ বৎসর আগে যতগুলি কলকারখানা ছিল, তাহার তুলনায় বর্ত্তমানে অনেক বেশী কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছে, অথচ ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের কোন হ্রাস হওয়া ত দূরের কথা, আর্থিক দুরবস্থা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিতেছে। কলকারখানার বিস্তৃতি সাধন করিলেই যদি দেশের আর্থিক দুরবস্থার অপনোদন সম্ভব হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষেরই বা আর্থিক দুরবস্থা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে কেন? সমাজতান্ত্রিক জওহরলালজীর সমাজতন্ত্রবাদের সহিত কলকারখানা-স্থাপনবাদের সুসামঞ্জস্য কোথায়?

মিঃ জওহরলালের নবম কথা তাঁহার অনধিকারচর্চ্চা। সংস্কৃত, হিন্দী, ইংরাজী এবং বাঙ্গালা বর্ণমালার লিখনপ্রণালী যে, তাহাদের উচ্চারণের প্রতিলিপি অথবা ফটোগ্রাফ-মাত্র এবং উহা যে যথেচ্ছ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না, তাহা খুব সম্ভব জওহরলালজী বুঝিতে পারিবেন না। ঐ সম্বন্ধে সংস্কারকার্য্য চালাইবার জন্য নবীন ভারতের ভাষা-সম্রাট্ ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বর্ত্তমান রহিয়াছেন। আমাদের বক্তব্য তাঁহার ক্রিয়াকলাপ সমালোচনাপ্রসঙ্গে পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন করিব।

যে পণ্ডিত জওহরলালজী দুই দুইবার কংগ্রেসের সভাপতি হইতে চলিয়াছেন, তিনি যে কত দূরদর্শী রাজনৈতিক এবং তাঁহার কথাগুলি যে কিরূপ সুসমঞ্জস, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার ভার আমাদের পাঠকবর্গের উপর রহিল। চারিদিকে যে হাহাকার উঠিয়াছে, তাহার পরিণতি যে কত ভীষণ, সেই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে যখন কংগ্রেসের এতাদৃশ নেতৃবর্গের দিকে নজর পড়ে, তখন বুক শুষ্ক হইবার কারণ উপস্থিত হয় না কি?

আমাদিগের সমাজতান্ত্রিক যুবকবৃন্দকে শুধু এই কথা বলিতে ইচ্ছা করে যে, হে ভাইগণ, তোমাদের এই নেতাগণকে চিনিতে আরম্ভ কর এবং এখনও একবার নিজেদের কর্ত্তব্য খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা কর।

কৃষকদিগের অবস্থা এবং তৎসম্বন্ধে আনন্দবাজারের মন্তব্য

কৃষকদিগের অবস্থা যে অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহা যে আমাদের নেতৃবর্গের বোধগম্য হইতে আরম্ভ করিয়াছে, আজকাল অনেকেরই কথায় ও কার্য্যকলাপে ইহা প্রতীয়মান হয়। মোটামুটী ভাবে অনেকেই কৃষকদিগের অবস্থা যে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার অনেক পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কেন যে তাহাদের এ দুরবস্থার উদ্ভব হইয়াছে এবং কি করিলে তাহার প্রকৃত উন্নতিসাধন সম্ভব, তাহা যে কেহ সর্ব্বাঙ্গীণ ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহার কোন পরিচয় কাহারও কথায় এবং কার্য্যকলাপে পাওয়া যায় না।

সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গের নেতৃত্বে কৃষকদলের পক্ষ হইতে একটী আবেদন পেষ করা হইয়াছে। ঐ আবেদনের মূল কথা সংক্ষেপতঃ এই—

(১) ভূমির রাজস্ব-নীতির পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে।

(২) জমিদারী প্রথার পুনরালোচনা করিতে হইবে।

(৩) রাস্তাঘাটের সংস্কার করিতে হইবে।

(৪) সুদের হারের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

(৫) দেউলিয়া আইন কৃষকদিগের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া কৃষক-সন্তানদিগকে পৈতৃক ঋণ হইতে মুক্তি দিতে হইবে।

(৬) ঋণের দায়ে কৃষক যাহাতে আটক অথবা গ্রেপ্তার না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৭) কৃষকের ঋণের দায়ে যাহাতে তাহার সম্পত্তি ক্রোক না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৮) সমবায়-ঋণদানের ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে।

(৯) গভর্ণমেণ্ট যাহাতে ধনিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিকদিগকে এবং মহাজনদিগকে অর্থসাহায্য না করেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১০) কৃষকদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা সাধন করিতে হইবে।

(১১) কৃষক-সঙ্ঘ গঠন করিতে হইবে।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ আনন্দবাজার পত্রিকা, অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গের উপরোক্ত আবেদনের সমালোচনাপ্রসঙ্গে যাহা যাহা বলিতেছেন, তাহা সংক্ষেপতঃ এই—

(১) ভারতবর্ষের মোট অধিবাসী ৩৫ কোটী। তাহার মধ্যে ১৫ কোটী ৪৩ লক্ষ পরিণতবয়স্ক ও কার্য্যক্ষম এবং ঐ ১৫ কোটী ৪৩ লক্ষ কার্য্যক্ষম জনসমূহের মধ্যে ১০ কোটী ৩৭ লক্ষ কৃষক। কাযেই মোট অধিবাসীর শতকরা ২৯.৪ জন কৃষক।

(২) হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ধনী ব্যক্তিদের দ্বারাই কৃষকসমাজ নিপীড়িত।

(৩) একমাত্র অসাম্প্রদায়িক আন্দোলন দ্বারাই কৃষকের প্রকৃত উপকার হইতে পারে।

(৪) বস্তুতঃ দেশের কৃষকদিগের দুঃখ-দুর্দ্দশার জন্য দেশের জমীদার ও মহাজনের দায়িত্ব কতটুকু, তাহা আজ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই।

(৫) যাঁহারা কৃষকদিগের এই ন্যায়সঙ্গত দাবী ও জন্মগত অধিকার স্বীকার করেন না, তাঁহারা নিশ্চয়ই কৃষকের মিত্র নহেন।

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ যে যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা কোন বিশেষজ্ঞগণের সভার অথবা পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের অনুমোদিত কি না, তাহা আমরা জানি না। পাঠকদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যাহা বিশেষজ্ঞগণের অথবা নেতৃবর্গের মুখনিঃসৃত, তাহা বাস্তবতার সহিত সাদৃশ্যসম্পন্ন অথবা প্রমাণযোগ্য না হইলেও, অথবা তদ্দারা দেশের লোক জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়া গেলেও, তদ্বিরুদ্ধে কাহারও কথা কহিবার অধিকার নাই, কারণ তাহা বিশেষজ্ঞ ও নেতৃবর্গের বিজ্ঞানসম্মত কথা। আমরা দুর্ম্মুখ। কাযেই দুই চারি কথা না বলিয়া পারিব না।

অধ্যাপক রঙ্গ বলিতেছেন যে, ভূমির রাজস্ব-নীতির পরিবর্ত্তন সাধন করিলে কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে। আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, যাহাতে প্রজাদিগকে এক কপর্দ্দকও খাজনা না দিতে হয়, যদি তদনুরূপ আইন প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলেও কি প্রজাদিগের দুঃখ দূর হইবে? মিঃ রঙ্গ অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন যে, ভারতবর্ষে এমন অনেক বেবন্দোবস্তি যৌথ মালিকের "মহাল" আছে, যেখানে মালিকদিগের স্ব স্ব কলহের জন্য বৎসরের পর বৎসর কোন খাজনা আদায় হয় না এবং তাহা তামাদি হইয়া যায়। ঐ ঐ স্থানে প্রজাগণ খাজনা দিবার হাত হইতে কার্য্যতঃ রক্ষা পাইয়া থাকে, অথচ দেখা যায় যে, তাহারা অনশন-ক্লেশ সমান ভাবেই সহ্য করিয়া থাকে। খাজনা না দিতে হইলেই অথবা খাজনা কমিয়া গেলেই যদি প্রজার দুর্দ্দশা মোচন হইবার সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে উপরোক্ত প্রজাগণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয় কেন?

মিঃ রঙ্গের দ্বিতীয় কথানুসারে জমিদারী প্রথাই প্রজাগণের দুর্দ্দশার একটী বড় কারণ। এই কথানুসারে বুঝিতে হয় যে, খাসমহালের প্রজাগণের দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হয় না।

কিন্তু, বস্তুতঃ খাসমহালের প্রজাগণের দুঃখের ও দুর্দ্দশার মাত্রা কি অন্য কোন প্রজার অপেক্ষা কোন অংশে কম ?

অধ্যাপক রঙ্গের তৃতীয় কথানুসারে রাস্তাঘাটের সংস্কার সাধন করিলে প্রজার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে।

রাস্তাবিষয়ক সরকারী রিপোর্টগুলি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিলে দেখা যাইবে যে, গত ত্রিশ বৎসরে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটী, পাবলিক ওয়ার্কস্ এবং রোড-বোর্ডের উদ্যোগে সারা ভারতবর্ষে নূতন নূতন বহু রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে এবং তাহার অনেক রকম উন্নতিও সাধিত হইয়াছে। কিন্তু প্রজাদিগের দুর্দ্দশার বৃদ্ধি ছাড়া হ্রাসপ্রাপ্তি কোথায়ও ঘটিয়াছে কি ?

অধ্যাপক রঙ্গের চতুর্থ কথানুসারে সুদের হার কমাইয়া দিলে প্রজার দুঃখ দূর হইতে পারে।

অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, আজকাল অনেক প্রজা মহাজনদিগকে সুদ দেওয়া ত' দূরের কথা, "আসল" পর্য্যন্ত দিতে পারিতেছে না কিংবা দিতেছে না, এমন কি মহাজনগণ পর্য্যন্ত অনেক স্থলে সম্পূর্ণ সুদ বাদ দিয়া আসল হইতেও কিছু কম আদায় করিতে পারিলে সন্তুষ্টি অনুভব করিয়া থাকেন ; কিন্তু তাহাতে প্রজার কোন শ্রীহীনতার লাঘব হইয়াছে কি ?

অধ্যাপক রঙ্গের পঞ্চম কথানুসারে কৃষক-সন্তানগণ যদি পৈতৃক ঋণ হইতে মুক্তি পায়, তাহা হইলে তাহাদের দুর্দ্দশার মোচন সম্ভব হয়।

প্রজাদিগের মধ্যে অনেকে ওয়াকফ, দেবোত্তর প্রভৃতি নানা রকম দানপত্রে স্ব স্ব বিষয়সম্পত্তি বেনামা করিয়া তাহাদের পুত্রদিগকে স্বীয় দেনা পরিশোধ করিবার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কিন্তু, ঐ কৃষক-পুত্রগণ তাহাদের স্ব স্ব অবস্থার কোন উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হয় না। কাযেই পৈতৃক ঋণ হইতে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত হইলেও আর্থিক অবস্থার কোন উন্নতি সাধিত হয় না—ইহা বলা যায় না কি ?

মিঃ রঙ্গের ষষ্ঠ এবং সপ্তম কথানুসারে প্রজাগণকে ঋণ শোধ করিবার জন্য যদি গুরুতর চাপ দেওয়া না হয়, তাহা হইলে তাহাদের অবস্থার উন্নতি সাধিত হইবে। যখন প্রজারা বস্তুতঃ তাহাদের ফসলের ন্যূনতার জন্য দেনা পরিশোধ করিতে অসমর্থ এবং ঐ ফসল কম হওয়ার দায়িত্ব দেশের সকলেরই উপর অল্পাধিক আরোপ করা যায়, তখন তাহাদিগকে দেনা পরিশোধ করিবার জন্য চাপ দেওয়া যে নৃশংসতার কার্য্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সকল অবস্থাতেই তাহাদিগকে দেনা পরিশোধ করিবার জন্য চাপ না দিলে তাহারা ঋণ পরিশোধ করিতে অনভ্যস্ত হইয়া পড়ে এবং সমাজে ক্রমশঃ অসাধুতা প্রবিষ্ট হয়। কাযেই তাহাদিগকে সর্ব্বাবস্থায় ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য চাপ না দেওয়ায় সমাজের অমঙ্গল ঘটিতে পারে। তাহা যুক্তিসঙ্গত কি ?

মিঃ রঙ্গের অষ্টম ও নবম কথানুসারে প্রজাদিগকে ঋণ-দানের সুব্যবস্থা করিলে এবং মহাজনগণ যাহাতে অল্প সুদে ঋণ না পান, তাহার ব্যবস্থা হইলে প্রজাদিগের উপর সমবেদনার পরিচয় দেওয়া হয়।

জমীর ফসল যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিলে প্রজাদিগের কোন ঋণ করিবার প্রয়োজন হয় না। কার্য্যতঃ দেখা যায় যে, যদি ফসল যথেষ্ট হয়, তাহা হইলে প্রজাগণ কোন অবস্থাতেই বিব্রত হয় না। অন্যপক্ষে যদি জমীর ফসল কমিয়া যায়, তাহা হইলে ঋণ যত সুদেই তাহাদিগকে দেওয়া যাক না কেন, তাহা তাহারা পরিশোধ করিতে সক্ষম হয় না। কাযেই অধ্যাপক রঙ্গের প্রস্তাবানুসারে জমীর ফসল বৃদ্ধি করিবার উপায় উদ্ভাবন না করিয়া, ঋণদানের সুব্যবস্থা করিতে পারিলে কোন ফলোদয় হইবে কি ?

মহাজনগণ অল্প সুদে যাহাতে টাকা সংগ্রহ না করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা হইলে, কৃষকদিগের যে, কি লাভের সম্ভাবনা হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। মহাজন ও ব্যবসায়িগণের সহিত টাকার আদান-প্রদান না রাখিলে, দেশের মধ্যে কোন ব্যাঙ্ক পরিচালিত হইতে পারে কি ?

অধ্যাপক রঙ্গের দশম কথানুসারে প্রজাদিগকে বর্ত্তমান কালের শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে পারিলে তাহাদের অবস্থার উন্নতি সম্ভব।

বর্ত্তমান কালে অনেক কৃষক-সন্তান ম্যাট্রিকুলেশন হইতে আরম্ভ করিয়া এম. এ পর্য্যন্ত পাশ করিতে পারিতেছেন। তাঁহাদের কাহারও আর্থিক ও শারীরিক অবস্থা স্ব স্ব পিতা ও পিতামহের তুলনায় কোনরূপে উন্নত হইতে পারিয়াছে কি ?

যদি তাহা না পারিয়া থাকে, তাহা হইলে কৃষকদিগকে বর্ত্তমান শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে পারিলে তাহাদের উন্নতি বিধান করা যায়, ইহা যুক্তিসঙ্গত ভাবে বলা যায় কি ?

অধ্যাপক রঙ্গের একাদশ কথানুসারে কৃষকগণ যাহাতে জমীদার ও মহাজনদিগের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিলে, তাহাদের অবস্থার উন্নতির সহায়তা সাধিত হইতে পারে।

প্রজারা জমীদারের বিরুদ্ধে অনেক সময়ে ও অনেক স্থানে ঘোট পাকাইয়া থাকে। কাযাতঃ তাহাতে কখনও কোন প্রজার অথবা দেশের কোন প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয় কি ? পরন্তু উভয়েরই তাহাতে অনিষ্ট ঘটে না কি ?

একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, যাহাতে কোনরূপ সারের (manure) অতিরিক্ত খরচ ব্যতীত স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির ফলেই জমীর ফসল যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং ফসল বিক্রয় করিয়া প্রজা যাহা পায়, তদ্দ্বারা যাহাতে তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সাধিত করিতে পারিলে, অনায়াসেই প্রজার দুরবস্থা দূরীভূত হইতে পারে এবং তাহার কোন ঋণ গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয় না। অন্যপক্ষে জমী হইতে যদি যথেষ্ট ফসলের উৎপত্তি না হয় এবং যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা বিক্রয় করিয়া প্রজা যতই অধিক মূল্য পাক না কেন, সেই মূল্য যদি তাহার ক্রয়োপযোগী অন্যান্য দ্রব্যের মূল্যের সমতুল্য না হয়, তাহা হইলে অন্য কোন ব্যবস্থার দ্বারাই প্রজার কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। মিঃ রঙ্গ যাহা যাহা বলিয়াছেন। তদ্দ্বারা জমীদার, মহাজন ও প্রজার মধ্যে বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্বলিত করিবার সুবিধা হয় বটে এবং তাহাতে দেশের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড হৈ-চৈ জাগ্রত হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রজার কোন প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইবে না। পরন্তু জমীদার ও মহাজনদিগের সহিত প্রজার অসখ্য উপস্থিত হইলে তাহাদিগের অধিকতর বিব্রত হইবার সম্ভাবনা ঘটিবে এবং তাহাতে দেশের সকল শ্রেণীর লোকের অধিকতর অশান্তি ভোগ করিবার আশঙ্কা আছে।

কাযেই মিঃ রঙ্গের কোন প্রস্তাব যুক্তিযুক্তভাবে সমর্থন করা যায় না। অথচ "আনন্দবাজারে"র সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত হইয়াছে যে, যাঁহারা কৃষকদিগের এই ন্যায়সঙ্গত দাবী ও জন্মগত অধিকার স্বীকার করেন না, তাহারা নিশ্চয়ই কৃষকের মিত্র নহেন!

আনন্দবাজারের সম্পাদক ও পরিচালকগণ কৃষকদিগের কোন্ শ্রেণীর মিত্র ও তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে কিরূপ দূরদর্শী, তাহা আমরা এক্ষণে পাঠকবর্গকে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি।

আনন্দবাজারে আরও বলা হইয়াছে যে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ধনী ব্যক্তি দ্বারাই কৃষক-সমাজ নিপীড়িত এবং এই নিপীড়নে কাহার দায়িত্ব কতটুকু, তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। ইহা দ্বারা কি আমাদিগের বুঝিতে হইবে যে, হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে যিনি ধনী হইবেন, তাঁহার দ্বারাই কৃষকদিগের নিপীড়ন সম্ভাবিত হইতে পারে এবং ধনী হওয়াই একটা গুরুতর পাপ এবং ধনিক ও শ্রমিকদিগের মধ্যে একটা বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্বলিত করিতে পারিলেই দেশের মঙ্গল সাধিত হয়, ইহাই আনন্দ-বাজারের মত ?

আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, যদি আনন্দবাজারের মতে ধনী হওয়াই একটা গুরুতর পাপ হয়, তাহা হইলে তাহার পরিচালক আনন্দবাজার পত্রিকাকে লাভবান্ করিয়া ধনী হইবার চেষ্টা করেন কোন্ যুক্তি অনুসারে ?

আনন্দবাজার একাধারে ধনিক ও শ্রমিকের দ্বন্দ্ব যাহাতে প্রজ্বলিত হয়, তাহার কথা বলিতেছেন, আবার ইহাও বলিতেছেন যে, একমাত্র অসাম্প্রদায়িক আন্দোলন দ্বারাই কৃষকদিগের প্রকৃত উপকার হইতে পারে।

ধনিক ও শ্রমিকের বিরোধিতা কি এক শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক বিরোধিতা নহে ? যাঁহাদের এই সামান্য সামঞ্জস্য-জ্ঞানের অভাব, তাঁহাদের পক্ষে দায়িত্বপূর্ণ সংবাদ-পত্রের সম্পাদনার ভার লইতে লজ্জা হয় না কেন ?

আনন্দবাজারের মতে ভারতবাসীর মোট অধিবাসীর শতকরা ২৯'৪ জন কৃষক। তাঁহাদের যুক্তি—৩৫ কোটী মোট লোকসংখ্যার মধ্যে ১৫ কোটী ৪৩ লক্ষ কার্য্যক্ষম এবং তাহার মধ্যে ১০ কোটী ৩৭ লক্ষ কৃষক।

৩৫ কোটী মোট লোকসংখ্যা হইতে ১৫ কোটী ৪৩ লক্ষ কার্য্যক্ষম লোকের সংখ্যা বিয়োগ করিলে বাকী যে ১৯ কোটী ৫৭ লক্ষ লোকসংখ্যা থাকে, তাহার মধ্যেও যে কৃষক-সন্তান

ও কৃষকরমণী আছে এবং তাহাদিগকেও যে কৃষক বলা যাইতে পারে, তাহা আনন্দবাজারের পণ্ডিতগণ চক্ষু মেলিয়া দেখিবেন কি? ঐ বক্রী ১৯ কোটী ৫৭ লক্ষ লোকের মধ্যে কৃষকশ্রেণীর লোক থাকিলে মোট লোকসংখ্যার শতকরা মাত্র ২৯'৪ জন কৃষক—ইহা বলিলে ভুল হয়।

পরন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষে ১৫ কোটী ৪৩ লক্ষ কার্য্যক্ষম লোকের মধ্যে ১০ কোটী ৩৭ লক্ষ কার্য্যক্ষম কৃষক, তখন বলিতে হয় যে, ভারতবর্ষের কৃষকের হার শতকরা ৬৭'২ জন। ইহা আনন্দবাজারের সম্পাদকগণ বুঝিতে পারিবেন কি?

যাঁহাদিগের অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে এতখানি জ্ঞানের অভাব, তাঁহারা দেশীয় সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়গুলির বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে লজ্জাবোধ করেন না কেন?

আনন্দবাজারের পরিচালকগণের দায়িত্বজ্ঞান ও বিচার-শক্তি কতটুকু, তাহা আমরা আমাদিগের পাঠকদিগকে নির্ণয় করিতে অনুরোধ করি।

লক্ষ্ণৌয়ে ভারতীয় জন-সংখ্যা সম্মেলন ও বিশেষজ্ঞগণের কীর্ত্তি এবং তৎসম্বন্ধে আনন্দবাজার পত্রিকার মতবাদ

সম্প্রতি লক্ষ্ণৌয়ে ভারতীয় জনসংখ্যা সম্মেলনের প্রথম-বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনে যাঁহারা যাঁহারা বক্তৃতা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ভাইস্-চ্যান্সেলার ডাঃ আর. পি. পরাঞ্জপে, আইন-সচিব মিঃ জে. এম. ক্লে এবং অধ্যাপক ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ-যোগ্য।

ঐ তিনজনের প্রত্যেকের বক্তৃতা হইতেই বুঝিতে হয় যে, ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা যেরূপ ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে শীঘ্রই ভারতে ৪৪ কোটী নরনারী দেখা যাইবে এবং ভারতের যে অবস্থা, তাহাতে ৪৪ কোটী নরনারীর অন্ন-সংস্থান করা কিছুতেই সম্ভব নহে। অতএব তাঁহাদের মতে ভারত-বাসীকে রক্ষা করিতে হইলে, যাহাতে ভারতের জন্মসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা করা একান্ত প্রয়োজনীয় এবং তাহার ব্যবস্থা না হইলে ভারতবাসীর রক্ষার আর কোন উপায় নাই। এই তিনজন বিশেষজ্ঞের মধ্যে একজন একটী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার, আর একজন একটী প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের আইন-সচিব এবং তৃতীয়জন একজন ডক্টর (অবশ্য পি. এইচ. ডি, অথবা ডি-লিট্ অথবা ডি. এস. সি—এই তিনটী উপাধির মধ্যে কোন্‌টী ইনি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা আমাদের জানা নাই) এবং ছাত্রদিগের অধ্যাপক। ইহাঁদের মুখ-নিঃসৃত কথা যে আমাদের যুবকবৃন্দের কাছে বেদবাক্যের মত প্রতীয়মান হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

এই বিশেষজ্ঞগণের কথানুসারে, হয় এখনই মাতৃজাতিকে বধ করিতে উদ্যত হইতে হয়, নতুবা যাহাতে শিশুহত্যা এবং ভ্রূণহত্যার ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, তাহার আয়োজন করিতে হয়।

অন্যদিকে জনসাধারণ একে অন্নাভাবে ক্লিষ্ট, তাহার পর বিভিন্ন রোগের ও অশান্তির যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত। যুবক, কৃষক প্রভৃতি যাহার মুখের দিকেই চাওয়া যাক না কেন, সর্ব্বত্রই একটা নির্জ্জীবতার চিহ্ন প্রকট হইয়া পড়িতেছে। তাহারা নিজেরাই জীবনযুদ্ধে বিফলমনোরথ হইয়া পরোক্ষ ভাবে মাতৃহত্যা, শিশুহত্যা ও ভ্রূণহত্যারূপ তিনটী বধের কার্য্য অপ্রতিহত গতিতে চালাইতেছে। এতদবস্থায় প্রাণের সাড়া পাইবার চেষ্টা করিলে যাহাতে পরোক্ষ ভাবে হত্যাকার্য্যে লিপ্ত হইতে হয়, তাহার পরামর্শ যে মানুষ কি করিয়া দিতে পারে এবং জনসাধারণই বা যে কি করিয়া এই মানুষগুলিকে এক একটী প্রকাণ্ড ব্যক্তি বলিয়া মনে করে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

বস্তুতঃ ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৪৪ কোটীতে পরিণত হইলে কোন আতঙ্কের কারণ আছে কি না, আমরা এক্ষণে তাহার বিচার করিব।

১৯৩১-৩২ সালের গভর্ণমেণ্ট-রিপোর্ট অনুসারে ভারত-বর্ষের মোট কৃষিযোগ্য জমীর পরিমাণ ৬৬ কোটী ৮৮ লক্ষ ৬৯ হাজার ৪ শত ১৯ একর, অথবা প্রায় ২০০ কোটী

৬৬ লক্ষ ৮ হাজার ২ শত ৫৭ বিঘা। ইহার মধ্যে বর্ত্তমানে যে জমি কর্ষিত হইতেছে, তাহার পরিমাণ ২২ কোটী ৮৮ লক্ষ ৩৫ হাজার ৯ শত ২৪ একর, অথবা প্রায় ৬৮ কোটী ৬৫ লক্ষ ৭ হাজার ৭ শত ৭২ বিঘা।

ত্রিশ বৎসর আগেকার সরকারী রিপোর্ট অনুসারে ভারতবর্ষের জমীর প্রতি বিঘায় উৎপন্ন শস্যের হার ছিল গড়ে কিঞ্চিদধিক ৭ মণ শস্য। সম্রাট্ আকবরের সময় প্রতি বিঘায় যে শস্য উৎপন্ন হইত, তাহার পরিমাণ ২০ মণেরও অধিক ছিল। বন্যার প্রকোপ ও শস্যের বিবিধ রোগের জন্য বর্ত্তমানে গড়ে প্রতি বিঘায় উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ৩ মণে আসিয়া পৌছিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও কোন কোন জমীতে কোন কোন বৎসর ১৬।১৭ মণ অপেক্ষাও বেশী শস্য হইয়া থাকে। নদীগুলি, উৎপত্তি-স্থান হইতে সাগর-সঙ্গম পর্য্যন্ত জমীর বালুকাস্তর অবধি গভীর করিয়া কাটিয়া দিলে অনায়াসেই প্রতি বিঘায় ন্যূনপক্ষে গড়ে ১২ মণ হারে শস্য পাওয়া কোন ক্রমেই কষ্টসাধ্য নহে। কাযেই আমরা ভারতে মোট কত শস্য হইতে পারে, তাহা হিসাব করিবার জন্য প্রতি বিঘায় উৎপন্ন শস্যের হার ১২ মণ বলিয়া ধরিয়া লইব।

ভারতের বৃদ্ধ, যুবক, বালক ও বালিকা গড়ে প্রতিদিন অর্দ্ধসের চাউল অথবা আটা পাইলে জীবন ধারণ করিতে পারে। প্রতিদিন অর্দ্ধ সের চাউলের প্রয়োজন হইলে ৩৬৫ দিনে অথবা সম্বৎসরে কিঞ্চিদধিক ৪৷৷০ মণ চাউল অথবা আটার প্রয়োজন হয়। মানুষের বাঁচিয়া থাকিতে হইলে চাউল অথবা আটা ছাড়া কিছু ডাল, কিছু তুলা, কিছু সর্ষপ প্রভৃতিরও প্রয়োজন হইয়া থাকে। বিবিধ দ্রব্যের বিভিন্ন হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, তজ্জন্য প্রতি মানুষের সম্বৎসরে ১৷৷০ মণের অধিক ব্যবহার্য্য শস্যের প্রয়োজন হয় না। কাজেই এক একটী মানুষের জীবন ধারণ করিতে হইলে প্রতি বৎসরে সর্ব্বসমেত ৬ মণ ব্যবহার্য্য শস্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ৬ মণ ব্যবহার্য্য শস্য অনায়াসেই ১২ মণ কাঁচা শস্য হইতে উৎপন্ন হইতে পারে। কাযেই প্রতি বিঘা জমীতে গড়ে ১২ মণ কাঁচা শস্য উৎপন্ন হইলে, এক এক বিঘা জমীর উৎপন্ন দ্রব্য দ্বারা এক একটী মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

অতএব এখনও ভারতবর্ষে যে জমী কর্ষিত হইতেছে, তাহার উৎপন্ন শস্যের হার গড়ে ১২ মণ হইলে, তদ্দ্বারা প্রায় ৬৯ কোটী মানুষ জীবন ধারণ করিতে পারে এবং ভারতের যে পরিমাণ জমী কর্ষণযোগ্য, তাহার সমস্ত চাষ-আবাদ করিতে পারিলে তদ্দ্বারা প্রায় ২০১ কোটী লোকের জীবন-ধারণ করা সম্ভব হইতে পারে।

ইহা দেখিয়াও কি বলা যায় যে, ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৪৪ কোটীতে পরিণত হইলে ভারতবাসীর আতঙ্কের কারণ আছে?

অত্যন্ত ভ্রান্ত ও দাম্ভিক না হইলে যিনি জীবন দিয়াছেন, তিনি আহারের ব্যবস্থা করেন নাই, ইহা বলা যায় না।

উপরোক্ত হিসাবের দিকে নজর করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতবর্ষের জমীর যে উর্ব্বরাশক্তি ছিল, তাহা নষ্ট না হইলে এবং প্রতি বিঘায় মাত্র ১২ মণ শস্যের উৎপত্তি হইলে এক ভারতবর্ষের জমীর দ্বারা ২০১ কোটী লোকের অথবা সারা জগতের* অন্নসংস্থান হইতে পারে।

ভারতের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া যুক্তিসঙ্গত ভাবে কোন আতঙ্কের কারণ থাকা ত দূরের কথা, পরন্তু ভারতের সমস্ত কৃষিযোগ্য জমীর চাষ-আবাদ করিতে হইলে যে-কার্য্যক্ষম লোকসংখ্যার প্রয়োজন, তাহাও বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে নাই।

২০০ কোটী বিঘা জমী চাষ করিতে হইলে অন্ততঃ ২০ কোটী কার্য্যক্ষম পরিণতবয়স্ক কৃষকের প্রয়োজন। বর্ত্তমান ভারতে মোট কার্য্যক্ষম পরিণতবয়স্ক লোকের সংখ্যা ১৩ কোটীরও কম। কাযেই ভারতে এখনও কিঞ্চিদধিক ৭ কোটী কার্য্যক্ষম পরিণতবয়স্ক লোকের অভাব আছে। ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বোধ হয় খবর রাখেন না যে, বাংলা দেশেই বহুস্থানে আজকাল বহু জমী, লোকের অভাবের জন্যই চাষবাস হয় না।

যাঁহারা সব দিক্ না দেখিয়া, না শুনিয়া মন্তব্য পাশ করিয়া ও বিশেষজ্ঞ বলিয়া নিজদিগকে প্রচার করেন, তাঁহাদিগকে যে সমস্ত বিশেষণে বিভূষিত করিতে হয়, তাহা প্রকাশ করিতে গেলে আমাদের ভাষা কর্কশ হইয়া দাঁড়াইবে। কাযেই ঐ ভার পাঠকবর্গের উপর রহিল।

যে শিক্ষিত যুবকগণ আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পদ্, তাহারা

* গত লোক-গণনার হিসাবানুসারে সারা জগতের লোকসংখ্যা ২০২ কোটী।

না খাইতে পাইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষুকের মত ঘুরিয়া বেড়াইবে, যে কৃষকগণের শক্তিকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত জাতীয় শক্তি জাগ্রত হইয়া থাকে, সেই কৃষকগণ না খাইতে পাইয়া দিন দিন শীর্ণ হইয়া যাইবে, আর তথাকথিত বিশেষজ্ঞগণ আবোল-তাবোল বকিয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিবেন, ইহা বাস্তবিকপক্ষে হৃদয়বিদারক নহে কি?

এই প্রসঙ্গে "আনন্দবাজার পত্রিকা" যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা খুব স্পষ্ট ভাবে বুঝা না গেলেও তাহার ভিতর জমীর উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি করিবার দিকে যাহাতে জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তাহার পরামর্শ আছে। আর কোন পত্রিকায় ঐ জাতীয় পরামর্শ আমাদের নজরে পড়ে নাই। কাযেই আমরা আনন্দবাজার পত্রিকার পরিচালকবর্গকে এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

বর্ত্তমানে আমাদের যে দুর্দ্দৈব, তাহার কারণ বহু এবং তন্মধ্যে প্রধান—জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস। বর্ত্তমান কৃষিবিজ্ঞানে যে বিস্তৃত চাষবাসের (intensive cultivation) এবং জলসেচন-প্রণালীর (irrigation) কথা আছে, তাহা ইয়োরোপ ও আমেরিকাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের দেশেও যেখানে যেখানে ইহা আংশিকভাবে গৃহীত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে কোন সুফল ফলে নাই। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মোহে উহা অবিচারিত চিত্তে গৃহীত হইতেছে এবং উহার কুফল কাহারও নজরে পড়িতেছে না।

জমীর অবস্থার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে, যখন দেশের নদীগুলির জলাধার অতলস্পর্শী ছিল, তখন সারা দেশ শস্য-সম্ভারে পূর্ণ এবং স্বাস্থ্যপূর্ণ ছিল। নদী যত শুষ্ক হইয়া আসিতেছে এবং দেশের খনিজ পদার্থ যত উত্তোলিত হইতেছে, ততই জমীর উর্ব্বরাশক্তি কমিয়া আসিতেছে এবং দেশে নানাবিধ রোগের উদ্ভব হইতেছে। এই নদীগুলি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে এবং খনিজ পদার্থ উত্তোলিত হইয়াছে বলিয়াই সারা জগতে অভূতপূর্ব্ব ভাবে এই ভূমিকম্প দেখা দিয়াছে এবং সর্ব্বত্রই অন্নাভাব ও বেকার-সমস্যা জাগিয়া উঠিয়াছে। যদি এখনও নদীগুলির সংস্কার না হয় এবং সমান ভাবেই খনিজ পদার্থ উত্তোলিত হইতে থাকে, তাহা হইলে সারা জগতে ভূমিকম্পের মাত্রা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে—এমন কি আগ্নেয় গিরির উদ্ভব পর্য্যন্ত দেখা দিবে।

আমাদের এই কথার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমরা প্রবন্ধান্তরে করিব। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক হয় ত আমাদের কথায় উপহাস করিবেন, কিন্তু যে বিজ্ঞানে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভাবে মানুষের সংহারের যন্ত্রই আবিষ্কৃত হইতেছে, সেই বিজ্ঞানকে কুজ্ঞান না বলিয়া কেন যে মানুষ তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরে, তাহা বুঝিয়া উঠা শক্ত। ঐ তথাকথিত বিজ্ঞান এত আদর লাভ করিয়াছে বলিয়াই জগতের মনুষ্যসমাজে আজ এত দুর্দ্দৈব।

জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিবার এবং দেশ হইতে ম্যালেরিয়া, বেরীবেরী, রক্তের চাপ প্রভৃতি রোগগুলিকে সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত করিবার প্রধান উপায়, দেশের সমস্ত নদীগুলির সংস্কার সাধন করা। তাহা না করিয়া জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে দোষ দিলে কি ফলোদয় হইবে? উহা করিতে হইলে ইংরাজ-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগ করা একান্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের কংগ্রেসের পাণ্ডাগণ তাহা কবে বুঝিবেন?

ভারতীয় দর্শন-মহাসভার একাদশ সম্মেলন ও মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী..

গত ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা সহরে ভারতীয় দর্শন-মহাসভার (Indian Philosophical Congress) একাদশ সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনের ভারতীয় দর্শন-শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী। তিনি সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের আশুতোষ চেয়ারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

বাঙ্গালা দেশে সংস্কৃত-শিক্ষার রক্ষণ ও বিস্তারের জন্য যে যে সংগঠন আছে, তাহার কার্য্যভার দুইটী পদে ন্যস্ত রহিয়াছে।

একটী, কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং আর একটী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ চেয়ার। এই দুইটী পদের কার্য্যভার যাঁহারা গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সংস্কৃত গ্রন্থগুলির বিদ্যায় ও অভিজ্ঞতায় মারাত্মক ত্রুটী থাকিলে যুক্তিসঙ্গত ভাবে বুঝিতে হয় যে, গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যাঁহাদের হস্তে সংস্কৃত শিক্ষার রক্ষণ ও বিস্তারের ভার অর্পিত হইয়াছে, তাঁহারা দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং তাঁহাদের দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতার জন্যই ভারতীয় ঋষির যে জ্ঞান বিস্মৃতির অতল তলে নিমজ্জিত রহিয়াছে এবং যে-জ্ঞানের পুনরুদ্ধার হইলে মনুষ্যজাতি অতি সহজে স্ব স্ব আর্থিক অসচ্ছলতা হইতে রক্ষা পাইতে পারে, সেই বিদ্যা ও জ্ঞান পুনরুদ্ধার করিবার যথোপযুক্ত চেষ্টা হইতেছে না।

ঐ দুইটী পদের মধ্যে কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত আছেন ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান যে কিরূপ অবিশ্বাসযোগ্য, তাহা আমরা ইতঃপূর্ব্বে আমাদের পাঠকবর্গের গোচরার্থ নিবেদন করিয়াছি। কিন্তু, সংস্কৃত শাস্ত্র সম্বন্ধে ডক্টর দাশগুপ্তের বিদ্যা ও অভিজ্ঞতা যতই অকিঞ্চিৎকর হউক, তিনি আমাদের মতে সম্পূর্ণভাবে ঐ পদের অনুপযুক্ত নহেন। তাঁহার লেখা ও বক্তৃতা পড়িলে তিনি যে ঋষিদিগের সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হন নাই, তাহা বুঝিতে পারা যায় বটে, কিন্তু তথাপি তিনি যে ঐ শাস্ত্রে প্রবেশ লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বলিতে বাধ্য হইতে হয়। ঐ শাস্ত্রে প্রবেশ করিবার জন্য যে চেষ্টা ও পরিশ্রম তাঁহার লেখায় ও বক্তৃতায় পরিলক্ষিত হয়, সেই চেষ্টার চিহ্ন আমরা বাঙ্গালা দেশের আর কোন পণ্ডিতের মধ্যে খুঁজিয়া পাই নাই। আমাদের মনে হয়, ডক্টর দাশগুপ্ত যদি স্বীয় বিদ্যার অভিমান ও আত্ম-প্রচারের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া, ঋষিদিগের শাস্ত্রে প্রকৃতপক্ষে প্রবেশ করিবার জন্য অধিকতর যত্নশীল হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার দায়িত্বভার সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ চেয়ারের বর্ত্তমান অধিকারী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় উপরোক্ত ভারতীয় মহাসভার একাদশ সম্মেলনে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহা পড়িলে অত্যন্ত হতাশ্বাস হইতে হয়।

তাঁহার বক্তৃতাটী ইংরাজীতে লিখিত হইয়াছে এবং তাহা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে; তাহার ইংরাজী নাম করণ হইয়াছে, Art of Indian Philosophy, অর্থাৎ 'ভারতীয় দর্শনের শিল্প', অথবা 'ভারতীয় দর্শনের শিল্প-দক্ষতা'। দর্শনের শিল্প অথবা শিল্প-দক্ষতা বলিতে যে কি বুঝায়, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। যাঁহারা সংস্কৃত শব্দ-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, দর্শন বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা হইতে 'আগম'-বিদ্যার ও তাহার দক্ষতার উদ্ভব হইতে পারে বটে, এবং ঐ আগম-বিদ্যা ও দক্ষতা হইতে যে-কোন শিল্প সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব বটে, কিন্তু কেবল দর্শনের সক্ষমতা হইতে কোন শিল্পের অথবা শিল্প-দক্ষতার উদ্ভব হয় না।

আমাদের উপরোক্ত কথা কয়টী প্রকৃত সংস্কৃত শব্দবিদের পক্ষে বুঝা কষ্টকর হওয়া উচিত নহে। কিন্তু উহা সাধারণ পাঠককে বুঝাইতে হইলে যতখানি লিখিতে হইবে, সম্পূর্ণভাবে ততখানি লেখা এ প্রবন্ধে সম্ভব নহে।

সংস্কৃত ভাষানুসারে 'চক্ষুর কলা' অথবা 'শিল্প' এইরূপ পদ হইতে পারে বটে, কিন্তু 'দর্শনের শিল্প' অথবা 'কলা' এইরূপ পদ হইতে পারে না এবং তাহা "দুষ্ট শব্দ" হইয়া পড়ে। সংস্কৃত শাস্ত্রে "কলা" অথবা "শিল্প" বলিতে বুঝায় সেই ব্যক্ত এবং মনোমুগ্ধকর নিপুণতা, যাহা স্কন্ধদেশের নিম্নস্থিত অঙ্গের সাহায্যে সাধিত হইয়া থাকে। কাযেই কোন কার্য্যকে "কলা" অথবা "শিল্প" বলিতে হইলে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, তাহা লোকচক্ষুর গোচর হইয়াছে কি না, দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে, তাহা দর্শকের মনোমুগ্ধকর হইয়াছে কি না এবং তৃতীয়তঃ দেখিতে হইবে, তাহা হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় নিষ্পন্ন হইতেছে কি না। চক্ষুর দৃষ্টি অর্থাৎ "চাহনি" কলা অথবা শিল্প পদবাচ্য হইতে পারে, কারণ চক্ষু ঘুরাইতে ফিরাইতে হইলে, যে যে শিরা এবং ধমনীর কার্য্য হয়, তাহা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে হস্তপদাদির শিরা এবং ধমনীর সহিত সংশ্লিষ্ট এবং তাহা লোকচক্ষুর গোচর ও মনোমুগ্ধকর হয়। দর্শনের "কলা" অথবা "শিল্প" হয় না, কারণ, "দর্শন" বলিতে যে "কার্য্য" বুঝায়, তাহা সময় সময় লোক-চক্ষুর অন্তরালে এবং সম্পূর্ণভাবে হস্তপদাদির বিনা সহায়-তায় সম্পাদিত হইতে পারে। যাঁহারা ভারতীয় ঋষির মূল

দর্শনশাস্ত্রে কি আছে, তাহা পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে, ভারতীয় কোন দর্শনের মূল গ্রন্থে শিল্প অথবা কলা-সম্বন্ধীয় কোন কথা নাই। সংস্কৃত ভাষায় "দুষ্ট শব্দ" এবং "অপ-শব্দ" কাহাকে বলে, তৎসম্বন্ধে যাঁহাদের বিন্দু-মাত্রও জ্ঞান আছে, তাঁহারা কখনও "দর্শনের শিল্প" অথবা "দর্শনের শিল্পদক্ষতা" এইরূপ শব্দ ব্যবহার করিতে পারেন না। যিনি ঐরূপ শব্দ ব্যবহার করেন, তিনি যে "দর্শন" এবং "কলা" অথবা "শিল্প", এই তিনটী সংস্কৃত শব্দের কোনটীরও অর্থ বুঝেন না, তাহা প্রতীত হয়। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে কোন দায়িত্বভার গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা যদি সংস্কৃত শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তাহা মার্জ্জনীয় হইতে পারে বটে, কিন্তু ঐরূপ ভাবে শব্দের ব্যবহার যাঁহারা করেন, তাঁহাদিগকে সংস্কৃত ভাষা-সম্বন্ধীয় কোন দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করা যায় কি?

শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার বক্তৃতার প্রথম ভাগে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বুঝিতে হয় যে, ম্লেচ্ছ অর্থাৎ গ্রীক এবং আরবদিগের নিকট হইতে ভারতীয়গণ জ্যোতিষের বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

"Take, for example, the case of Astronomy that was accepted from the "Mlecchas", both Greek and Arab." (পৃষ্ঠা ৩, প্যারাগ্রাফ ৩)।

তাঁহার এই কথা আদৌ সত্য নহে এবং উহা ইতিহাস, জ্যোতিষ ও অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে অত্যন্ত অজ্ঞতাপ্রসূত এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক।

যাঁহারা বিন্দুমাত্রও চিন্তার সহিত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, ভারতীয় ঋষিগণের পক্ষে গ্রীক ও আরবদিগের নিকট হইতে কোন জ্ঞানলাভ সম্ভবপর নহে। ভারতীয় ঋষিদিগের অভ্যুদয়ের অনেক পরে গ্রীক ও আরবদিগের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। ভারতীয় ঋষিদিগের অভ্যুদয় যে কত সহস্র বৎসর আগে ঘটিয়াছিল, তাহা এখনও পর্য্যন্ত কেহ সঠিক ভাবে নির্ণয় করিতে পারেন নাই। পরন্তু, গ্রীক ও আরবদিগের অভ্যুদয়কালে ভারত-বর্ষের দস্তুরমত অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল এবং ভারতীয় ঋষির জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভেজালের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। গ্রীক ও আরবদিগের নিকট হইতে কোন জ্ঞান ও বিজ্ঞান ধার করিয়া লওয়া ত দূরের কথা, যখন ভারতীয় ঋষিদিগের অভ্যুদয়, তখন গ্রীক ও আরবদিগের নাম পর্য্যন্ত জগতে প্রসিদ্ধিলাভ করে নাই—ইহা ঐতিহাসিক সত্য। ভারতীয় প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রে কি আছে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে এই কথা আরও পরিস্ফুট হয়। জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে অল্পাধিক কথা চারিটী বেদের প্রত্যেকটিতেই পাওয়া যায়। বেদে জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে যে যে কথা আছে, তাহা সাধারণতঃ কি করিয়া জ্যোতিষশাস্ত্রের জ্ঞানলাভ করিতে হয় এবং গ্রহ-নক্ষত্র-পরিশোভিত বিশ্বের সহিত মানুষের অব্যক্ত অঙ্গের অবস্থানের ও কার্য্যের যে সাদৃশ্য আছে, তাহা কি করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়, তদ্বিষয়ক। যাঁহারা গীতার বিশ্বরূপ-দর্শনাধ্যায়ের মর্ম্ম যথাযথভাবে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, ঐ তথ্য কত দুরূহ। উহা সাধারণ লোকের বুদ্ধিগম্য নহে।

বেদ ছাড়া জ্যোতিষ ও অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে আর যে যে প্রাচীন গ্রন্থ আমাদের নজরে পড়িয়াছে, তাহার মধ্যে "জ্যোতিষসিদ্ধান্তসংগ্রহ," "পঞ্চসিদ্ধান্তিকা", "বৃহৎসংহিতা" এবং "পরমসিদ্ধান্ত", এই চারিখানির নাম উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত "ভৃগুসূত্র" প্রভৃতি কয়েকখানি সূত্র-গ্রন্থও আছে। এই কয়খানি গ্রন্থ যে অতি প্রাচীন, তাহা তাহাদের ভাষা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। যদি কেহ বর্ত্তমান পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষ এবং ভারতের ঐ প্রাচীন গ্রন্থগুলি মনোযোগ সহকারে পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রের উৎকর্ষ কোথায়। গ্রহ ও নক্ষত্রগণের দূরত্ব কি করিয়া সঠিকভাবে পরিমাপ করিতে হয়, কোন্ সময়ে গ্রহণ হইবে, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য যে সারণী (table) আছে, তাহা কি করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়, কেন চন্দ্র কলায় কলায় বিলুপ্ত হয়, আবার কেন কলায় কলায় তাহার অভ্যুদয় হয়, মানুষের মনে কেন সংখ্যার কথা উদয় হয়, দ্বৈরাশিক সংখ্যার (binomial theorem) কেন উদ্ভব হইল, এবংবিধ বহু বহু তথ্য অদ্যাবধি পাশ্চাত্ত্য জ্যোতির্ব্বিদগণ স্থির করিতে পারেন নাই। অথচ তাহার সমস্ত কথাই "পরমসিদ্ধান্ত" ভাল করিয়া পড়িতে পারিলে বুঝিতে পারা যায়। প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা নষ্ট হইয়া গিয়াছে

বলিয়া এ সমস্ত তথ্যই বর্ত্তমানে বিস্মৃতির অতল তলে লুক্কায়িত।

এই তথ্যগুলি সম্পূর্ণভাবে না জানা থাকিলেও আমরা কাহাকেও নিন্দা করিতে পারি না, কারণ বিশেষ সাধনার দ্বারা সর্ব্বনিয়ন্তার কৃপার পাত্র না হইতে পারিলে, কাহারও পক্ষে ঋষিদিগের সমগ্র আগম ও শাস্ত্র পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব নহে। শাস্ত্রী মহাশয় জ্যোতিষ অথবা অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে দায়ী করিতে পারি না, কিন্তু ঐ ঐ শাস্ত্র সম্বন্ধে ইংরাজিতে কি আছে এবং ভারতীয় ঋষিগণই বা কোন্ কোন্ গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা সমগ্রভাবে পরিজ্ঞাত হইবার চেষ্টা না করিয়া তৎসম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রচার করা কি দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় নহে? ঋষিদিগের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যিনি এত অজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধাহীনতার পরিচয় দিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে আশুতোষ চেয়ারের দায়িত্ব গ্রহণ করা সমীচীন কি?

পাশ্চাত্ত্য দর্শন ও পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকের প্রতি অসীম শ্রদ্ধার পরিচয় শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতায় পরিস্ফুট হইয়াছে। আমাদের মতে ইহা হইতে বুঝিতে হয় যে, শাস্ত্রী মহাশয় পাশ্চাত্ত্য দর্শনে কি আছে, তাহা যেমন যথাযথভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই, তেমনই ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের প্রকৃত রসও তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

কোন গ্রন্থকারের দর্শন-সম্বন্ধীয় কোন কথা প্রকৃতপক্ষে গ্রহণযোগ্য কি না, তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় তখন, যখন ঐ গ্রন্থকারের দর্শনের সিদ্ধান্তানুসারে রাজ্যের অথবা সমাজের পরিচালনা আরম্ভ হয়। ভারতীয় ঋষিদিগের দর্শন ও তাঁহাদের স্মৃতির সংহিতাগুলি যদি শাস্ত্রী মহাশয়ের জানা থাকে, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে, প্রাচীন স্মৃতির প্রত্যেক অনুশাসন ভারতীয় ঋষির দর্শনের তথ্যের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পরবর্ত্তী যে যে ভারতীয় পণ্ডিতগণ ঐ দর্শন না জানিয়া স্মৃতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহারা ভারতীয় সমাজকে বিভ্রান্ত করিয়া গিয়াছেন এবং তাহারই ফলে ঋষির ভারত যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা ভাবিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। ভারতীয় ঋষির দর্শনের তথ্যের সহিত সামাজিক ও রাজ্য-পরিচালনা সম্বন্ধীয় অনুশাসনের যে সমবায়-সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং যাহার ফলে ভারতে অনন্ত-সাধারণ আর্থিক স্বাধীনতা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ভারতীয় ঋষির দর্শন যে সফল হইয়াছিল এবং তাহার যথাযথ জ্ঞান লাভ করা যে প্রত্যেকের কাম্য হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায়। ক্যাণ্ট, হেগেল, ক্রোচে, বার্গসঁ প্রভৃতি যে সমস্ত পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকের নাম শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতায় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার কোন্ দার্শনিকের কতখানি জ্ঞান পাশ্চাত্ত্য রাজ্য ও সমাজসংগঠনে কতখানি স্থান পাইয়াছে, তাহা শাস্ত্রী মহাশয় অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন কি? যদি দেখা যায় যে, পাশ্চাত্ত্য রাজ্য ও সমাজসংগঠনে পাশ্চাত্ত্য কোন দার্শনিকের জ্ঞান প্রয়োগ করা হয় নাই, তাহা হইলে কি বলিতে হয় না যে, যাঁহারা বর্ত্তমান পাশ্চাত্ত্য জাতীয়তা ও সামাজিকতা গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাঁহারাও পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকের জ্ঞানকে কোন উল্লেখযোগ্য স্থান দেন নাই? ইয়োরোপীয় প্রত্যেক দেশের সংগঠনের (Constitution) ইতিহাস অথবা বিবরণগুলি মনোযোগসহকারে পড়িলে দেখা যাইবে যে, তাহাতে কোন পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকের কোন কথা কোন উল্লেখযোগ্য স্থান পায় নাই। ইয়োরোপীয়গণ নিজেরাই যখন তাঁহাদের চালচলনের পদ্ধতিতে দার্শনিকগণকে কার্য্যতঃ কোন উল্লেখযোগ্য স্থান দেন নাই, তখন তাহা আমাদের ভারতীয় সমাজে প্রচার করিবার জন্য শাস্ত্রী মহাশয়ের এত আগ্রহ কেন? ইহা কি তাঁহার অপরিণামদর্শিতা অথবা কপটতার পরিচয় নহে?

প্রকৃত পক্ষে আশুতোষ চেয়ারের উপযুক্ত হইতে হইলে ইহা কি অশোভনীয় নহে?

ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের Positive Sceinces of the Ancient Hindus নামক গ্রন্থে শাস্ত্রী মহাশয় অনুকরণীয় বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাইয়াছেন বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

ঐ গ্রন্থখানি সম্পূর্ণভাবে পড়িয়া এবং বুঝিতে পারিয়া শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার মন্তব্য প্রচার করিয়াছেন কি না, তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ হয়। ডক্টর শীল আমাদের ছাত্র-সমাজের শিরোমণি এবং জীবনের সায়াহ্নে উপনীত হইয়াছেন। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাকে কোনরূপে আক্রমণ করিতে আমাদের কুণ্ঠানুভব করা উচিত এবং তিনি যে বয়সে উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার দ্বারা আর আমাদের সমাজের কোন হিতাহিত সংঘটিত হওয়া সম্ভব নহে। যদি আমাদের

যুবকবৃন্দ আবার কখনও তাঁহাদের দুঃখ-সমুদ্র সন্তরণ করিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাহা হইলে কেন তাঁহারা দুঃখ-সাগরে পতিত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা নিজেরাই বুঝিতে পারিবেন এবং এই সমস্ত 'সুধীবৃন্দে'র ইতিহাস তাঁহাদের দ্বারাই রচিত হইবে।

আমরা অকুণ্ঠিতভাবে স্বীকার করিতেছি যে, ডক্টর শীলের ঐ গ্রন্থ আমরা চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পারি নাই এবং আমাদের মতে ভারতীয় ঋষির জ্ঞানের অপব্যবহারের পরিচয় ঐ গ্রন্থে আছে। ঐ গ্রন্থে কোন্ কোন্ বিদ্যাবত্তার পরিচয় আছে এবং তাহার কোন্ কোন্ কথা পণ্ডিতসমাজের চালচলনের প্রয়োগযোগ্য, তাহার ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণ সমক্ষে প্রচারিত করিলে, অন্ততঃ আমাদের একটি ভ্রম-সংশোধন করিবার সহায়তা করা হইবে এবং তজ্জন্য আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা অনুভব করিব। শাস্ত্রী মহাশয় তাহা পারিবেন কি? যদি না পারেন, তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে না যে, তিনি কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তিবৃন্দের প্রিয় হইবার জন্যই কোন কোন কার্য্য করিয়া থাকেন? তাহা কি আশুতোষ চেয়ারের দায়িত্ব সুচারু ভাবে নির্ব্বাহের পক্ষে বিঘ্নকর নহে?

শাস্ত্রী মহাশয় চীনা ও তিব্বতীয় ভাষাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহা আরও অদ্ভুত। আমাদের মতে তাহাতে বুঝায় যে, তিনি যেমন ঋষিদিগের গ্রন্থে প্রবিষ্ট হইতে পারেন নাই, তেমনই আবার চীনা ও তিব্বতীয় ভাষায় যে সমস্ত গ্রন্থ লিখিত রহিয়াছে, তাহাও ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই।

ভারতীয় ঋষির গ্রন্থে নাই, এমন কোন্ তথ্য তিনি কোন্ চীনা ও তিব্বতীয় গ্রন্থে পাইয়াছেন, তাহা তিনি জনসমাজে প্রকাশ করিবেন কি? প্রকৃত সংস্কৃত ভাষার বৈজ্ঞানিকতার তুলনায় চীনা ও তিব্বতীয় ভাষায় কি প্রকৃষ্টতর বৈজ্ঞানিকতা আছে, যাহাতে লোকসমাজ তাহা বুঝিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা তিনি করিবেন কি?

আমরা যত দূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে বলিতে হয় যে, চীনা ও তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত কোন গ্রন্থে এমন কোন তথ্য নাই, যাহা ভারতীয় ঋষির গ্রন্থে পাওয়া যায় না। পরন্তু, ভারতীয় ঋষিগণ যে যে তথ্য নিঃসন্দিগ্ধ ও সম্পূর্ণভাবে বুঝিবার উপযোগী করিয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাহার অনেক তথ্য চীনা ও তিব্বতীয়গণ বিভ্রান্তিকর ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঋষিদিগের ঐ সংস্কৃত গ্রন্থগুলি না পড়িয়া এবং সম্যক্‌ভাবে বুঝিতে না পারিয়া কোন চীনা ও তিব্বতীয় গ্রন্থের আলোচনা করিলে মানুষের ভ্রান্তি উপস্থিত হইবার আশঙ্কা ঘটে। চীনা ও তিব্বতীয় ভাষা যে—এমন কি প্রাচীন হিব্রু ও প্রাচীন আরবীর তুলনাতেও অবৈজ্ঞানিক, তাহা ঐ দুইটী ভাষার বর্ণমালা পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

নিষ্প্রয়োজনীয় ও বিভ্রান্তিকর তথ্যের জ্ঞান লাভ করিলে অভিমানের পরিতৃপ্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা অবস্থা বিশেষে মানুষের প্রকৃত উপকার হওয়া ত দূরের কথা, কার্য্যতঃ অপকারই হইয়া থাকে। আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সর্ব্বোচ্চ শিক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়া যাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তাঁহাদিগের স্বভাব ও কার্য্যকলাপের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহারা প্রায়শঃ স্বাভাবিক প্রতিভামণ্ডিত। অথচ কোনরূপ চাকুরী না পাইলে তাঁহাদের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে স্ব স্ব বুদ্ধিপরিচালিত হইয়া জীবিকার্জ্জন করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। কি কারণে তাঁহাদের এতাদৃশ অবস্থা হয়, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, কতকগুলি নিষ্প্রয়োজনীয়, ভ্রমপূর্ণ, অভিমানাত্মক তথ্যের ধারণাই তাঁহাদিগের ঐ অবস্থার উদ্ভব করিতেছে।

শাস্ত্রী মহাশয়ের মত যাঁহারা অপরিণামদর্শী, তাঁহারাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে এইরূপভাবে বিভ্রান্ত করিতেছেন এবং আমাদের ঔজ্জ্বল্যমণ্ডিত যুবকবৃন্দের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া তাহাদিগকে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তাহা বুঝিতে পারিবেন কি?

ভারতীয় দর্শনের উদ্দেশ্য কি, তৎসম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিতে বসিয়া শাস্ত্রী মহাশয় যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন এবং যে যে গ্রন্থের নাম করিয়াছেন, তাহাতে কেবল মাত্র কোন মূল ভারতীয় দর্শনের কোন প্রকৃত কথা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের গ্রন্থের বিভ্রান্তিকর অনেক কথা পাওয়া যায়

যাঁহারা ঋষির কথার প্রতি বিন্দুমাত্রও শ্রদ্ধাশীল এবং যাঁহারা তাঁহাদের মূলকথার কথঞ্চিৎ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিয়া আংশিক ভাবেও মাতোয়ারা হইতে পারিয়াছেন,

তাঁহাদের পক্ষে ঐ সমস্ত কথা অত্যন্ত বিরক্তিকর। শাস্ত্রী মহাশয় ভারতীয় দর্শনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা ধৈর্য্যসহকারে অনুধাবন করিলে বুঝিতে হয় যে, তিনি ভারতীয় মূল দর্শনগুলির কোন্ খানির কি উদ্দেশ্য, তাহা বিন্দুমাত্রও পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই, অধিকন্তু ভারতীয় ঋষির জ্ঞান-বিজ্ঞানে কি কি বিষয় আছে, ঐ ঐ বিষয়গুলি প্রধানতঃ কোন্ কোন্ শ্রেণীতে বিভক্ত, কোন্ কোন্ গ্রন্থে কোন্ কোন্ বিষয় কিরূপ ভাবে আলোচিত হইয়াছে, তাহা পর্য্যন্ত তাঁহার জানিবার সুযোগ হয় নাই।

শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, "অবিদ্যা হইতে মোক্ষলাভ করা" ভারতীয় দর্শনের উদ্দেশ্য। অথচ ভারতীয় দর্শনের উদ্দেশ্য যে অবিদ্যা হইতে মোক্ষলাভ করা, তাহা কোন্ দর্শনের কোন্ সূত্রে পাওয়া যায়, সেই সূত্রের নাম করা ত দূরের কথা, তিনি কোন দর্শনের নাম পর্য্যন্ত তাঁহার সমগ্র বক্তৃতায় প্রকাশ করেন নাই। দর্শনের কথা বলিতে বসিয়া তিনি বিভিন্ন উপনিষদের কথা, বিভিন্ন নাটকের, বিভিন্ন পুরাণের এবং বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রন্থের বিভিন্ন অপব্যাখ্যা করিয়াছেন, অথচ সমগ্র বক্তৃতার কোথায়ও একখানি মূল দর্শনের একটীও মূল কথার কোনরূপ আলোচনা করেন নাই। ইহারই নাম "ধরি নাছ না ছুঁই পানি"। যাঁহারা ভারতীয় ঋষির শাস্ত্রের প্রকৃত উপাসক, তাঁহারা কখনও এই পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন না।

যাঁহারা পাণ্ডিত্যাভিমান প্রচ্ছন্ন অথবা অপ্রচ্ছন্নভাবে পোষণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে ভারতীয় ঋষির জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রবেশ করা আদৌ সম্ভব নহে। আমাদের এই কথা যে সত্য, তাহা ভারতীয় ঋষির জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রথম পুস্তক অধ্যয়ন করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ঋষির জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রবিষ্ট হইতে হইলে অভিমান যথাসাধ্য সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার চেষ্টা করিতে করিতে স্বীয় দৈনন্দিন জীবন যথাযথ ভাবে গঠিত করিবার ব্যাকুলতা সহকারে ঋষির গ্রন্থে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। অভিমানের অপর নাম আত্ম-প্রতারণা। তাহা ইচ্ছা করিলেই সর্ব্বতোভাবে চূর্ণ করা যায় না। যাঁহাদের প্রাণে অভিমান চূর্ণ করিবার ইচ্ছার উদয় হয়, তাঁহারা যদি ঋষির জ্ঞান-বিজ্ঞানের আশ্রয়প্রার্থী হন, তাহা হইলে হাবু-ডুবু খাইতে খাইতে তাঁহাদিগের পক্ষে ঐ অভিমান সম্পূর্ণ ভাবে চূর্ণ করিবার সম্ভাবনা হইতে পারে। যাঁহারা এতাদৃশ ভাবে অভিমান বিসর্জ্জন দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া স্বীয় দৈনন্দিন জীবনযাপনপ্রণালী কিরূপ ভাবে গঠিত করিলে জীবনযাত্রা সুখময় হইতে পারে,তাহা পরিজ্ঞাত হইবার উদ্দেশ্যে ব্যাকুলতা লইয়া ভারতীয় ঋষির অমূল্য গ্রন্থরাশি আলোচনা করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই জানিতে পারিয়াছেন যে, কি করিয়া প্রত্যেক মানুষ জীবনের প্রত্যেক দিন সর্ব্বতোভাবে সুখে অতিবাহিত করিতে পারে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করাই ঐ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য।

মানুষের সুখের সর্ব্বাঙ্গীণ উপায় কি কি, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে যে, প্রথমতঃ মানুষের শরীরের গঠন কিরূপ, অর্থাৎ মানুষের শরীর-গঠন তত্ত্ব (Anatomy), দ্বিতীয়তঃ, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গগুলি কেন কিরূপভাবে কার্য্য করে, অর্থাৎ শরীর-বিধান তত্ত্ব (Physiology) এবং তৃতীয়তঃ, মানুষের দৈনিক জীবনযাত্রায় যে যে বস্তুর সংস্রবে আসিতে হয়, তাহা কত রকমের হইয়া থাকে ও কোন্ স্বভাবের বস্তুর সংস্রবে কোন্ বস্তুর কিরূপ স্বভাবের উদয় হয়, তাহা জানিবার প্রয়োজন, ইহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। মানুষের শরীর-গঠন তত্ত্ব (Anatomy) ও শরীর-বিধান তত্ত্ব (Physiology) যথাযথ ভাবে জানিতে হইলে মানুষের শরীরের মধ্যে কোন্ কোন্ ধমনী প্রভৃতি অঙ্গগুলি কি অবস্থায় কিরূপ ভাবে কার্য্য করে, তাহা তাহার জীবিতাবস্থায় উপলব্ধি করিতে হয়। কারণ, মৃত ব্যক্তির শরীরের গঠনের ও তাহার কার্য্যকলাপের সঙ্গে জীবিত ব্যক্তির শরীরের গঠনের ও তাহার কার্য্য-কলাপের অনেকখানি পার্থক্য। জীবিত অবস্থায় শরীরের যে যে অঙ্গ উষ্ণ এবং তরল (liquid), মৃত অবস্থায় তাহা শীতল এবং কঠিন (solid) হইয়া পড়ে। অধিকন্তু জীবিত ব্যক্তির শরীরের মধ্যে যে যে অসংখ্য কার্য্যকলাপ রহিয়াছে, তাহা মৃত ব্যক্তির শরীর হইতে লুপ্ত হইয়া যায়। কাযেই শবের শরীর-গঠন দেখিয়া জীবিত মানুষের শরীর-গঠন তত্ত্ব (Anatomy) এবং শরীর-বিধান তত্ত্ব (Physiology) উপলব্ধি করা যায় না। শরীরাভ্যন্তরস্থ অব্যক্ত অঙ্গগুলির ঐ উপলব্ধি লাভ করিতে হইলে বাচনিক কোন কার্য্যের দ্বারা

তাহা সম্ভব হয় না পরন্তু তাহার জন্ম কতকগুলি অভ্যাসের প্রয়োজন।

ভারতীয় ঋষিদিগের গ্রন্থ-সমূহ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর নাম আগম-গ্রন্থ এবং অপর শ্রেণীর নাম শাস্ত্র।

যে অভ্যাসগুলির প্রযত্ন করিলে জীবিতাবস্থায় শরীর-গঠন বিদ্যা (Anatomy) ও শরীর-বিধান বিদ্যা (Physiology) অর্থাৎ মানুষের ধর্ম(১) ও ধর্ম্ম(২) জানিতে পারা যায়, সেই অভ্যাসগুলির নির্দ্দেশ যে যে পুস্তকে আছে, সেই গুলিকে আগম-গ্রন্থ বলা হইয়া থাকে।

চারিটী বেদ, সমগ্র তন্ত্র-শাস্ত্র, ব্যাকরণ এবং শিক্ষাবিষয়ক পুস্তকগুলিকে আগম-গ্রন্থ বলা হইয়া থাকে।

আগম-গ্রন্থগুলি সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর নাম মন্ত্রভাগ, দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম উপনিষদ, তৃতীয় শ্রেণীর নাম আরণ্যক এবং চতুর্থ শ্রেণীর নাম ব্রাহ্মণ।

যে শব্দগুলি বিশেষ ভাবে অভ্যাস করিলে শরীর-গঠন তত্ত্ব ও শরীর-বিধানতত্ত্ব, মানুষের বিভিন্ন ধর্ম এবং এক ধর্ম্ম জানিতে পারা যায়, তাহার নাম মন্ত্রভাগ।

ঐ শব্দগুলি কিরূপ ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে এবং শরীরের কোন্ অবস্থায় কি ধর্মের উদয় হয়, তাহা যাহাতে লিখিত আছে, তাহার নাম উপনিষদ্‌ভাগ। ভাষ্যকারগণ উপনিষদের মধ্যে যে সমস্ত অবাস্তব গল্প আছে বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন, তাহা ভাষাবিস্মৃতির ফল।

শরীরের মধ্যে অত্যধিক তেজের অথবা রসের উদ্ভব হইলে মন্ত্রভাগোক্ত শব্দগুলির যথাযথ অভ্যাস করা সম্ভব হয় না। কাযেই যাহাতে শরীরের মধ্যে অত্যধিক রসের অথবা তেজের উদ্ভব না হইতে পারে, অথবা অত্যধিক তেজের অথবা রসের উদ্ভব হইলে কি করা বিধেয়, তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়। ঐ ঐ সম্বন্ধীয় উপদেশ যে যে গ্রন্থে আছে, তাহাদের নাম আরণ্যক।

মন্ত্রভাগে বিশিষ্ট ভাবে অভ্যস্ত হইলে পদাঙ্গুলি হইতে মুখের মধ্যস্থিত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী (টাক্‌রা অথবা mucous membrane) পর্য্যন্ত কোন্ অঙ্গ কোথায় কি ভাবে আছে এবং কাহার কি ধর্ম ও ধর্ম্ম, তাহা জানিতে পারা যায় এবং ব্রহ্ম কি পদার্থ তাহাও বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তখনও টাক্‌রার উপরিভাগে মস্তিষ্কের মধ্যে কি কি আছে, অর্থাৎ "ঈশ্বর" এবং "পরম পুরুষ"* কি কি বস্তু, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। মস্তিষ্কের মধ্যে কি কি পদার্থ আছে অর্থাৎ ঈশ্বর এবং পরম পুরুষ বুঝিবার মন্ত্রগুলি কিরূপ ভাবে অভ্যাস করিতে হয়, তাহা যে গ্রন্থগুলিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার নাম আগমের ব্রাহ্মণভাগ।

আগমোক্ত প্রযত্নগুলিতে অভ্যস্ত হইয়া স্বীয় শরীর-গঠন ও শরীর-বিধান তত্ত্ব সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে প্রথমতঃ ঐ পরিজ্ঞানগুলি বাস্তব জগতে যাহা দেখা যায়, তাহার সহিত সম্যক্ সামঞ্জস্যবিশিষ্ট কি না, দ্বিতীয়তঃ মানুষ যে যে বস্তুর সংশ্লিষ্ট হয়, তাহার স্বভাব কি কি এবং তৃতীয়তঃ বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সংসারক্ষেত্রে চলিতে হইলে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন কর্ত্তব্য কি কি, তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়। এই তিনটী জ্ঞান যে যে গ্রন্থে আছে তাহাদের নাম শাস্ত্র।

আগম-গ্রন্থোক্ত অভ্যাসের ফলে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা বাস্তব জগতে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহার সহিত সুসমঞ্জস কি না, তাহা যে গ্রন্থগুলি হইতে জানা যায়, তাহাদের নাম "দর্শন শাস্ত্র"।

সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিতে হইলে মানুষের যে যে বিভিন্ন বস্তু ও অবস্থার সংস্রবে আসিতে হয়, ঐ ঐ বস্তুর ও অবস্থার স্বভাব কি কি, তাহা যে যে গ্রন্থ হইতে জানা যায়, তাহাদের নাম "পুরাণ শাস্ত্র"।

পুরাণের মধ্যে যে অবাস্তব গল্প আছে বলিয়া প্রচারিত হইতেছে, তাহাও প্রকৃত সংস্কৃত ভাষাবিস্মৃতির পরিণতি

(১) ধর্ম— শব্দের অর্থ জীব ভিন্ন অবস্থায় যাহা যাহা করিয়া থাকে, যথা চোরের ধর্ম, সাধুর ধর্ম ইত্যাদি মানবর ধর্ম বহু।

(২) "ধর্ম্ম"—কি হইলে মানুষের অস্বাস্থ্য ও অকালমৃত্যু না ঘটিয়া মানুষ চিরসুখী হইতে পারে, তাহা জানিয়া তদনুসারে মানুষ যে যে কার্য্য করে, তাহার নাম মানুষের ধর্ম্ম। মানুষের ধর্ম্ম মাত্র একটি। সাধারণতঃ পণ্ডিতগণ এই দুইটি বানানের যে, দুইটি বিভিন্ন অর্থ আছে, তাহা পরিজ্ঞাত নহেন। আমরা এই সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

* পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্॥
(গীতা, ৮।২২)

বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সংসারক্ষেত্রে চলিতে হইলে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন কর্ত্তব্য কি কি, তাহা যে সমস্ত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, তাহাদের নাম "স্মৃতি শাস্ত্র"।

ভাষার বিস্মৃতির ফলে "স্মৃতি শাস্ত্রে"র অমূল্য গ্রন্থগুলি কদর্থে ব্যাখ্যাত হইতেছে।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা প্রয়োজন হইলে আমরা বিভিন্ন বিষয়ক গ্রন্থের মূলভাগ হইতে প্রতিপন্ন করিতে প্রস্তুত আছি।

উহা হইতে উপনিষদের অথবা পুরাণের কি প্রতিপাদ্য তাহা বুঝা যাইবে এবং দেখা যাইবে যে, ভারতীয় দর্শনের বক্তব্য কি, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে বসিয়া, যাঁহারা মূলতঃ উপনিষদের অথবা পুরাণের কথা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালীতে অসারতার পরিচয় আছে।

শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় গীতার বক্তব্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, 'উহা একটি বিহ্বল বীরের এবং তাঁহার বন্ধুর কথোপকথন।'

[Bhagabatgita—a dialogue between a bewildered hero and his friend and teacher. ১১ পৃষ্ঠা]

যাঁহারা মহাভারতের সমগ্র অষ্টাদশ পর্ব্ব অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, প্রথমতঃ কি করিয়া মানুষ অসংযত বাক্য ও কার্য্যসম্পন্ন হয় ও তাহাদের পরিণামই বা কি বিষময় হইয়া পড়ে এবং দ্বিতীয়তঃ মানুষ যখন বুদ্ধিমান্ হয়, তখনও তাহাদের পরমোন্নতি লাভ করা কত কষ্টসাধ্য, কি করিলে বুদ্ধিমান্ মানুষ সংসারক্ষেত্রে যোগী পর্য্যন্ত হইতে পারে এবং প্রকৃত যোগী হইলে মানুষের পক্ষে কত অসাধ্য সাধন করা সম্ভব হয়, মহাভারতে তাহা বুঝান হইয়াছে।

মহাভারতের দুইজন নায়ক, একজনের নাম দুর্য্যোধন এবং অপরের নাম অর্জ্জুন। "দুর্য্যোধন" শব্দে বুঝায় সেই মানুষ, যাহার বাক্ ও কার্য্য অসংযত। আর "অর্জ্জুন" শব্দে বুঝায় সেই মানুষ, যিনি নিজেকে সংযত করিতে পারিয়াছেন, অথচ ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও পুরুষ কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

ভাষার বিস্মৃতির ফলে আমাদের মহাভারতও আজ অনেক অবাস্তব গল্পে পরিপূর্ণ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতেছে। আমরা আহার জন্য কাহাকেও দায়ী করি না।

গীতা মহাভারতের অন্তর্গত। কাযেই গীতায় বক্তব্য কি, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, সমগ্র মহাভারতের সমগ্র উপাখ্যান চিন্তা না করিয়া একটি মন্তব্য প্রকাশ করিলে কি একদেশদর্শিতার পরিচয় দেওয়া হয় না? এই জাতীয় দায়িত্বজ্ঞানহীনতা কি আশুতোষ চেয়ারের অধিকারীর পক্ষে অশোভনীয় নহে?

চণ্ডী ও ছান্দোগ্য উপনিষদের বক্তব্য সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে এমন কি বর্ত্তমান সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধেও তাঁহার অজ্ঞতার পরিচয় আছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যে-কোন অভিমানহীন বুদ্ধিমান্ পণ্ডিত তাহা বুঝিতে পারিবেন।

ভারতীয় ঋষির শাস্ত্র সম্বন্ধে যে জ্ঞান ও দায়িত্ববোধের পরিচয় শাস্ত্রী মহাশয়ের এই বক্তৃতায় পাওয়া যায়, তদপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান ও দায়িত্বজ্ঞানযুক্ত পণ্ডিত বর্ত্তমান সময়েও বিরল নহে। আমরা ব্যক্তিগত ভাবে মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থকে গীতায় পণ্ডিতের যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, সেই শ্রেণীভুক্ত পণ্ডিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতে পারি না; তথাপি তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থে যে প্রতিভার পরিচয় আছে, তাহা দেখিলে বলিতে হয় যে, তাঁহার দ্বারা সংস্কৃত ভাষার ও ঋষিদিগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের যতটুকু সম্মান রক্ষিত হইবার আশা করা যায়, তাহা যুক্তিসঙ্গতভাবে মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে আশা করিতে পারা যায় কি না, ইহা প্রশ্নযোগ্য।

ভারতীয় ঋষিদিগের জ্ঞান-বিজ্ঞান যে আজ ইয়োরোপীয় সমাজে বিকৃত ভাবে প্রচারিত, তাহা আধুনিক ও তথাকথিত পণ্ডিতগণের কৃতকর্ম্মের ফল।

যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের সৃষ্টি করা হইয়াছিল, তখন স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ দেশবাসীকে যাহা শুনাইয়াছিলেন, তাহাতে আশা হইয়াছিল যে, ভারতবাসী আবার তাহার প্রকৃত প্রাচীন ইতিহাস খুঁজিয়া পাইবে এবং যে যে বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিলে যুবকগণ স্বাবলম্বী হইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবিত হইবে। উপরোক্ত কোন আশাই যে বিন্দুমাত্রও সফল হয় নাই, তাহা কেহ যুক্তিযুক্তভাবে অস্বীকার করিতে পারেন না। আমরা বলিতে চাই

যে, কতকগুলি দায়িত্বজ্ঞানহীন অধ্যাপককে দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অসাফল্যের প্রধান কারণ।

ভারতের প্রত্যেক সংসারে যে অর্থকৃচ্ছ্রতার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা আর কিছুদিন চলিলে ভারতীয় সমাজ অচল হইয়া পড়িবে, ইহা আশঙ্কা করা যাইতে পারে।

একটা এত বড় প্রাচীন সমাজ একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে, ইহা সর্ব্বনিয়ন্তার নিয়মসঙ্গত হইতে পারে না। কাযেই অদূর ভবিষ্যতে যে একটা পরিবর্ত্তন আসিবেই, তাহা আশা করা যাইতে পারে। যখনই পরিবর্ত্তন আসিবে, তখনই ভারতীয়গণের প্রথমে নজরে পড়িবে তাহাদের ঋষিগণের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনাচার। কাযেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে আমরা এখনও সতর্ক হইতে অনুরোধ করি। আমাদের কথা তাঁহাদের কর্ণে পৌছিবে কি?

রাষ্ট্রভাষা ও শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্‌-এ, ডি-লিট্‌

'নূতন পত্রিকা' নামক নূতন সাপ্তাহিক পত্রখানিতে রাষ্ট্র-ভাষা সম্বন্ধে ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

মানুষের কোন্ কোন্ অঙ্গের কি কি কার্য্যফলে তাহার বিভিন্ন শব্দ উদ্গত হইয়া থাকে, তাহা যে তত্ত্বে জানা যায়, তাহার নাম ভাষা-তত্ত্ব। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষা-তত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা যে কতখানি বিকৃত ও অসার, তাহা তাঁহার এই প্রবন্ধে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। মানুষের কোন্ কোন্ অঙ্গের কোন্ কোন্ কার্য্যফলে তাহার বিভিন্ন শব্দের উদ্গম হয়, তাহা বুঝিতে হইলে মানুষের শরীর-গঠন তত্ত্বের (Anatomy) ও শরীর-বিধান তত্ত্বের (Physiology) অন্ততঃ মোটামুটি একটা ধারণা থাকা চাই। মানুষের শরীরের দিকে নজর করিলে সাধারণতঃ দেখা যাইবে যে, উহা বিভিন্ন প্রকারের কয়েকখানি অস্থি, বিভিন্ন রকমের কিছু মাংস এবং বিভিন্ন রকমের কয়েকটী ধমনীর সমষ্টিমাত্র। আরও দেখা যাইবে যে, পা এবং হাত ছাড়া স্কন্ধদেশের নিম্নভাগে শরীরের যে কোন অংশ দ্বিখণ্ডিত না করিয়া যত গভীর করিয়াই কাটা যাক না কেন, মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। পা এবং হাত দ্বিখণ্ডিত করিয়া কাটিয়া ফেলিলেও মানুষ জীবিত থাকিতে পারে। কেবল কণ্ঠদেশের পশ্চাৎ ভাগে এমন স্থান আছে, যাহা একটী সূচিবিদ্ধ হইলেও মানুষকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। ইহা হইতে বুঝিতে হয় যে, মানুষের জীবনী শক্তির মূল উৎস তাহার কণ্ঠদেশের উপরিভাগে, এবং তাহা কণ্ঠদেশ হইতে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইতেছে। পা এবং হাতে জীবনী শক্তির প্রবাহ আছে বটে এবং তাহার বিচ্ছেদ ঘটিলে মানুষের কর্ম্মশক্তির হ্রাস হয় বটে, কিন্তু ঐ বিচ্ছেদে মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। ইহার পর আর একটু অনুভব করিলে দেখা যাইবে যে, মানুষের টাকরার (mucous membrane) বিভিন্ন স্থানে কতকগুলি বিভিন্ন ধমনী রহিয়াছে এবং ঐ ধমনীগুলি কণ্ঠের পশ্চাদ্দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া গ্রীবাবন্ধনীর (collar bone) উদ্ভব সাধন করিতেছে। ঐ গ্রীবাবন্ধনী হইতে মেরুদণ্ড, হাত এবং পায়ের জীবনীপ্রবাহ সাধিত হইতেছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, মানুষের অস্থি অতীব কঠিন, কিন্তু তাহা যে অতীব কঠিন নহে, পরন্তু যথেষ্ট স্থিতিস্থাপকতাসম্পন্ন elastic), তাহা মানুষের জীবদ্দশায় তাহার বিভিন্ন অস্থির ঘুরান-ফিরান লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

মানুষের টাকরার বিভিন্ন স্থানে যে বিভিন্ন কতকগুলি ধমনী আছে, তাহা জিহ্বা দ্বারা টাকরা স্পর্শ করিলেই বুঝিতে পারা যায় বটে, কিন্তু সর্ব্বসমেত কয়টী ধমনী কিরূপ ভাবে টাকরার কোন্ কোন্ স্থানে অবস্থিত আছে, তাহা সহজে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। কয়টী ধমনী কিরূপ ভাবে টাকরার কোন্ কোন্ স্থানে অবস্থিত আছে, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে টাকরা যাহাতে উত্তপ্ত হয় এবং তাহার বিভিন্ন ধমনীগুলির বিস্তৃতি (expansion) সাধিত হয়, তদনুরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিবার প্রয়োজন। এই প্রক্রিয়া শিক্ষা করিতে হইলে জিহ্বাকে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করিতে হয় এবং যাহাতে শরীরের কোন অনিষ্ট না

করিয়া শরীরের মধ্যে তেজের উদ্ভব সাধন করা যাইতে পারে, তাহা অভ্যাস করিতে হয়। জিহ্বাকে কিরূপভাবে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহার উপদেশ আছে ঋগ্বেদে; শরীরের অনিষ্ট সাধন না করিয়া কি করিয়া শরীরের মধ্যে অতিরিক্ত তেজের উদ্ভব হইতে পারে, তাহার নির্দ্দেশ আছে সামবেদে ও ছান্দোগ্য উপনিষদে। ঐ তেজ শরীরের বিভিন্ন স্থানে ও টাকরায় কি করিয়া সঞ্চারিত করিতে হয়, তাহার উপদেশ আছে যজুর্ব্বেদে এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে।

এখন প্রায়শঃ কেহ মূল বেদ অথবা মূল উপনিষদ পড়েন না এবং উহার ভাষার বিস্মৃতির ফলে চেষ্টা করিলেও তাহা বুঝিতে পারেন না। যাঁহারা বেদের অথবা উপনিষদের পণ্ডিত বলিয়া জনসমাজে প্রচারিত, তাঁহারা প্রায়শঃ ঐ ঐ পুস্তকের ভাষ্যকারগণের কথা মুখস্থ করিয়া থাকেন। ঐ তথ্য বুঝিতে হইলে চারিটী বেদের মন্ত্রভাগ, উপনিষদ, আরণ্যক ও ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করিতে ও অভ্যাস করিতে হয়। বর্ত্তমানে যাঁহারা বেদের ও উপনিষদের পণ্ডিত বলিয়া প্রচারিত, তাঁহাদের মধ্যে কেহ যে ঐ ঐ গ্রন্থ সম্পূর্ণভাবে অধ্যয়ন ও অভ্যাস করিয়াছেন, তাহার পরিচয় পাওয়া ত দূরের কথা, ভাষ্যকারগণের মধ্যেও যে কেহ ঐগুলি সমগ্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহার পরিচয় নাই। সায়ণাচার্য্য যে বেদের মন্ত্রভাগ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় আছে বটে, কিন্তু তিনি যে তাহা অভ্যাস করিয়াছিলেন অথবা উপনিষদ, আরণ্যক এবং ব্রাহ্মণ সম্পূর্ণভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার কোন চিহ্ন নাই। শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে বলিতে হয় যে, তিনি কয়েকখানি উপনিষদ পাঠ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি যে সমগ্র বেদ অধ্যয়ন অথবা অভ্যাস করিয়াছিলেন, তাহার কোন পরিচয় তাঁহার লিখিত কোন ভাষ্যে অথবা গ্রন্থে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

বৈদিক ও তান্ত্রিক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেও যে এখন আর কেহ সমগ্র বেদ সম্পূর্ণভাবে আলোচনা করেন, তাহার পরিচয় নাই। তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ দেখিলে মনে করিতে হয়, বেদের যে অভ্যাসগুলি এক সময়ে ভারতের সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারিত ছিল, তাহা অতি সামান্যাংশে কথঞ্চিৎ বিকৃত ভাবে তাঁহারা রক্ষা করিতেছেন। বেদের অভ্যাসগুলি তাঁহারা কথঞ্চিৎ রক্ষা করিতেছেন বলিয়াই তাঁহাদের কাহারও কাহারও একটী দুইটী বিভূতির উদ্ভব হয়, কিন্তু তাহা বিকৃত হইয়াছে বলিয়াই তাঁহাদের ঐ বিভূতিই সময় সময় তাঁহাদের মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। তাঁহারা কেহ সমগ্র বেদ সম্পূর্ণ ভাবে পরিজ্ঞাত হন না বলিয়াই তাঁহারা যে অভ্যাসগুলি করিয়া বিভূতিসম্পন্ন হইয়া থাকেন, তাহার কোন বৈজ্ঞানিক কার্য্য-কারণ ভাব ব্যাখ্যা করিতে পারেন না।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, চারিটী বেদের সমগ্র মন্ত্রভাগ, উপনিষদ, আরণ্যক ও ব্রাহ্মণ একজন মানুষের পক্ষে এক জীবনে পড়িয়া উঠা এবং তাহার অভ্যাস করা সম্ভব নহে। কিন্তু যদি কখনও প্রকৃত সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ মানুষের স্মৃতিপথে আবার উদয় হয়, তখন সংস্কৃত ভাষা মাতৃভাষার ন্যায় হইয়া দাঁড়াইবে এবং মানুষ তখন দেখিতে পাইবে যে, কোন তথ্য অন্যান্য ভাষায় লিখিত হইলে তাহা পরিজ্ঞাত হইতে যে সময় লাগে, তাহার শতাংশের একাংশ সময়ে সংস্কৃতভাষায় লিখিত তথ্যগুলি বুঝা সম্ভব হয় এবং সমগ্র বেদ অধ্যয়ন ও অভ্যাস করিতে সমগ্র জীবনকালের প্রয়োজন হয় না।

এখন সমগ্র বেদের সম্পূর্ণভাবে অধ্যয়ন এবং অভ্যাস বিলুপ্ত রহিয়াছে বলিয়াই টাকরায় মোট কয়টী ধমনী কিরূপভাবে তাহাদের প্রবাহকার্য্য সমাধান করিতেছে এবং জিহ্বা ঐ ধমনীপ্রবাহের সহায়তায় কি কি করিতেছে, তাহার জ্ঞান বিস্মৃতির অতলজলে নিমজ্জিত রহিয়াছে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে যে বহু ধমনীর সংযোগ রহিয়াছে, তাহা বর্ত্তমান পাশ্চাত্য শরীর-গঠন তত্ত্ব এবং শরীর-বিধান তত্ত্বেও স্বীকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ স্থানে মোট কয়টী ধমনী আছে, অথবা তাহাদের প্রত্যেকের কি কার্য্য অথবা কেন তাহাদের বিভিন্ন কার্য্যের উদ্ভব হয়, তাহা বর্ত্তমান শরীর-বিধান তত্ত্বেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

বেদোক্ত উপায়ে জিহ্বাকে প্রস্তুত করিতে পারিলে এবং শরীরের মধ্যে অতিরিক্ত তেজের উদ্ভব ও সঞ্চার করিবার সক্ষমতা অর্জ্জন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, মানুষের টাকরার নিম্নদেশে মোট চব্বিশটী বৃহৎ ধমনী আছে এবং ঐ টাকরার উপরিভাগে—অর্থাৎ মস্তিষ্কের মধ্যে—কার্য্যক্ষমতা, কার্য্যপ্রবৃত্তি ও তেজসম্পন্ন একটী প্রবাহের কার্য্য সর্ব্বদা চলিতেছে। টাকরার উপরিভাগে যে প্রবাহ চলিতেছে,

তাহারই সাহায্যে তাহার নিম্নতলস্থ চব্বিশটী ধমনী মানুষের সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সর্ব্বদাই চালু রাখিয়াছে। টাকরার উপরিভাগে মস্তিষ্কের মধ্যে যে প্রবাহ রহিয়াছে, তাহার সাহায্যে মানুষ 'অ, ই, উ' প্রভৃতি স্বরবর্ণ অতর্কিতভাবে উচ্চারণ করিয়া থাকে, আর ঐ প্রবাহ যখন মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া গুহ্যদ্বার ও লিঙ্গমূল স্পর্শ করিতে আরম্ভ করে, তখন শরীরের মধ্যে তেজের ও রসের উদ্ভব হয়। শরীরের মধ্যস্থিত রসের গতি নিম্ন দিকে এবং তেজের গতি উপরের দিকে। উপরের দিকে গতিসম্পন্ন তেজ যখন কণ্ঠমূলে পুঞ্জীভূত হইতে আরম্ভ করে, তখন "হ, য, ব, র, ল" এই পাঁচটী অন্তঃস্থ অক্ষরের উচ্চারণ আরম্ভ হয়। ঐ উপরের দিকে গতিসম্পন্ন তেজের প্রভূত সঞ্চয় যখন কণ্ঠমূলে সাধিত হয়, তখন জিহ্বার ঘুরিবার ফিরিবার সামর্থ্যের উদ্ভব হয় এবং তখন জিহ্বা হইতে টাকরার বিনা সাহায্যে "ক" শব্দ উচ্চারিত হইতে আরম্ভ করে এবং তাহার পর টাকরার চব্বিশটী ধমনীর সহায়তায় পরবর্ত্তী চব্বিশটী ব্যঞ্জনবর্ণের উদ্ভব হয়। সর্ব্বশেষে টাকরার তলদেশে যে শ্বেতবর্ণের অনুলেপন আছে, তাহার সাহায্যে "শ" "ষ" এবং "স"এর উচ্চারণ হইয়া থাকে।

উপরোক্ত তথ্য হইতে শিশুদিগের কেন যে জন্ম হইবা মাত্র সমস্ত অক্ষরের উচ্চারণ করা সম্ভব হয় না, তাহা বুঝা যাইবে।

সমস্ত অক্ষরের উচ্চারণ করিবার সামর্থ্য হইবার পর অক্ষরের মিশ্রণ অর্থাৎ পদের উচ্চারণ এবং তাহার পর পদের মিশ্রণ অর্থাৎ বাক্যের উচ্চারণ হইতে আরম্ভ করে।

মোটের উপর, মানুষের যে—ভাষার সৃষ্টি হয়, তাহার মূলে রহিয়াছে টাকরার উপর জিহ্বার কার্য্য। ঐ টাকরায় চব্বিশটী ধমনী আছে। ঐ চব্বিশটী ধমনী সর্ব্বশরীরে পরিব্যাপ্ত।

কাযেই মানুষের ভাষার মূলে একই সত্য নিহিত রহিয়াছে। মানুষ কথা কহিবার জন্য ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দী, পার্শী, গ্রীক অথবা যে কোন ভাষাই ব্যবহার করুক না কেন, মূলতঃ অকারাদি অক্ষরমালা ব্যবহার না করিয়া পারে না। জিহ্বা যখন এক একটী ধমনী স্পর্শ করে, তখন এক একটী অক্ষরের উচ্চারণ হয় এবং সেই উচ্চারণের ফলে নিকটবর্ত্তী অন্যান্য কয়েকটী ধমনীরও কম্পন আরম্ভ হইয়া থাকে। বিভিন্ন অক্ষরের উচ্চারণভেদে নিকটবর্ত্তী অন্যান্য ধমনীর সহিত বিভিন্ন সংস্রবের সৃষ্টি হইয়া থাকে। যে ধমনীর সাক্ষাৎস্পর্শে যে অক্ষরের উচ্চারণ হয়, উচ্চারণ-সময়ে সেই ধমনীর, জিহ্বার এবং সংশ্লিষ্ট অপর ধমনীর তাৎকালিক মিলন যে আকৃতি ধারণ করিয়া থাকে, তাহারই প্রতিকৃতি ঐ অক্ষরের বর্ণ অথবা লিখন-প্রণালী (script)। কাযেই অক্ষরের লিখন-প্রণালী বস্তুতঃ শব্দের প্রতিকৃতি অথবা ফটোগ্রাফ ও মূলতঃ এক এবং তাহার যথেচ্ছ পরিবর্ত্তন সাধন করিবার চেষ্টা করা ভাষা-তত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচয় মাত্র।

যদিও মূলতঃ সমস্ত মানুষের ভাষার তত্ত্ব এক এবং উচ্চারিত অক্ষরসমূহের লিখন-প্রণালীও এক, তথাপি কার্য্যতঃ ব্যবহারে উহা বহুবিধ হইয়া থাকে। তাহার কারণ—কাল, স্থান এবং শিক্ষার ভেদ। কাল, স্থান এবং শিক্ষা-ভেদে মানুষের শরীরের অবস্থা বিভিন্ন হইয়া থাকে এবং শরীরের অবস্থার বিভিন্নতা অনুসারে শরীরস্থ চব্বিশটী ধমনীর প্রবাহের গতি বিভিন্ন হইয়া থাকে এবং জিহ্বার শক্তিতেই পার্থক্যের উদয় হয়। এই পার্থক্যের জন্যই একই মানুষ তাহার নিজ জীবনের বাল্যে যে ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং তাঁহার হস্তাক্ষর বাল্যে যেরূপ থাকে, যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে ঐ ভাষার এবং হস্তাক্ষরের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এমন কি, প্রত্যেক মানুষ প্রতিদিন অতর্কিতভাবে তাঁহার নিজ নিজ ভাষার ও হস্তাক্ষরের বিভিন্ন পরিবর্ত্তন সাধন করিতেছেন। ব্যাঙ্ক হইতে সময়ে সময়ে স্বাক্ষরের বিভিন্নতার জন্য (Signature differs) যে চেক্‌গুলি ফেরত আসে, তাহা একই মানুষের হস্তাক্ষরের বিভিন্নতার নিদর্শন। কাযেই যদিও সমস্ত মানুষের ভাষায় এবং বর্ণের লিখন-প্রণালীতে একতা নিহিত রহিয়াছে, তথাপি ব্যবহারে তাহার সম্পূর্ণ ঐক্য মানুষের প্রকৃতিসম্মত নহে—ইহা বলা যাইতে পারে।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে আরও বুঝা যাইবে যে, যদিও ব্যবহারে মানুষের ভাষায় এবং বর্ণের লিখন-প্রণালীতে বৈষম্য অপরিহার্য্য, তথাপি প্রকৃত ভাষাতত্ত্ব জানিতে পারিলে সমস্ত জীবের প্রাকৃতিক ভাষা ও লিখন-প্রণালী বুঝা সম্ভব হইতে পারে। যে ভাষা ও লিখন-প্রণালী প্রকৃত ভাষাতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, অথবা যাহা তথাকথিত শিক্ষার দ্বারা পরিমার্জ্জিত হয় নাই, অথবা যে ভাষার অর্থ কতকগুলি

সম্মিলিত আভিধানিক অর্থের দ্বারা (conventional meanings) নিষ্পন্ন হয় না, তাহার নাম প্রাকৃতিক ভাষা। প্রাচীন হিব্রু এবং প্রাচীন আরবীকে প্রাকৃতিক ভাষা বলা যাইতে পারে। যাঁহারা প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা পরিজ্ঞাত আছেন, অর্থাৎ কি করিয়া বর্ণের অর্থ স্থির করিতে হয় এবং কি উপায়ে বর্ণের অর্থ হইতে পদের অর্থ স্থির করিতে হয়, তাহা জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রাচীন আরবী এবং প্রাচীন হিব্রু ভাষা বুঝা সহজসাধ্য। যাঁহারা প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে যে-কোন দেশের, যে-কোন অশিক্ষিত লোকের ভাষা বুঝা কষ্টসাধ্য নহে, কারণ সর্ব্বদেশেই অশিক্ষিত লোক প্রাকৃতিক ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। মনে রাখিতে হইবে যে, জগতে অশিক্ষিত লোকই শতকরা ৯৮ জন। কাযেই দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃত ভাষাতত্ত্বের জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারিলে, যে-কোন দেশের প্রাকৃতিক ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলি এবং জগতের মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৯৮ জনের ভাষা বুঝা সম্ভব হইতে পারে।

ভাষা-তত্ত্বের আর একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার সহায়তায় বক্তা কোন্ অর্থে তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করিতেছেন, তাহা ঠিক ঠিক ভাবে বুঝিতে পারা যায়। পরন্তু যে সমস্ত গ্রন্থ ভাষা-তত্ত্বের সাহায্যে লিখিত হয় না, তাহাদের বিভিন্ন অর্থ করা সম্ভব হয় এবং এই অর্থের বৈপরীত্যের জন্য পাঠকদিগের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ হয়। ভাষা-তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ভাষায় ও লিখন-প্রণালীতে যে সমস্ত গ্রন্থ লিখিত হইয়া থাকে, তাহা ভাষা-তত্ত্বের বিস্মৃতির ফলে কখনও কখনও মানুষের অবোধ্য হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা কখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইতে পারে না। তাহার পরিচয় মূল বেদ, মূল ওল্ড টেষ্টামেণ্ট এবং মূল কোরাণ। অন্য পক্ষে যে সমস্ত গ্রন্থ অপ্রাকৃতিক ভাষায় অথবা অপ্রাকৃতিক লিখন-প্রণালীতে লিখিত হইয়া থাকে, তাহা জলবুদ্বুদের মত ভাসিয়া উঠে এবং আবার ডুবিয়া যায়। তাহার পরিচয় গ্রীক ও রোমান এবং ইংরাজ প্রভৃতি ইয়োরোপীয়গণের লিখিত গ্রন্থ। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, গ্রীক ও রোমানগণের সময় যে সমস্ত গ্রন্থ গ্রীক ও রোমান ভাষায় লিখিত হইয়াছিল, তাহা প্রায়শঃ এখন আর পাওয়া যায় না এবং ঐ দুইটী জাতির যে যে গ্রন্থ এখন প্রচলিত আছে, তাহা প্রায়শঃ প্রাচীন গ্রীক ও প্রাচীন রোমান নামক ভাষায় লিখিত এবং ঐ দুইটী ভাষাই যথাযথ ভাবে প্রাকৃতিক না হইলেও অনেকটা প্রাকৃতিক ভাষার সহিত সাদৃশ্যসম্পন্ন। ইংরাজী ভাষার যে সমস্ত গ্রন্থ দেড় শত বৎসর আগেও লিখিত হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশ এখন আর পাওয়া যায় না এবং যাহাও বা পাওয়া যায়, তাহার অর্থ লইয়া বিভিন্ন মতবাদের অস্তিত্ব দেখা যায়।

অতএব, ভাষার "রাষ্ট্রত্ব" সাধন করিতে হইলে, যাহাতে মানুষ প্রকৃত ভাষাতত্ত্ব জানিতে পারে, তাহার চেষ্টা করাই একমাত্র কর্ত্তব্য, ইহা বলা যাইতে পারে।

এক্ষণে দেখা যাউক, ভাষার রাষ্ট্রত্বসাধন সম্বন্ধে ভাষা-সম্রাট ডক্টর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কি বলিতেছেন—

লিখন-প্রণালী ও ভাষা এক না করিতে পারিলে মানুষের একতা সাধিত হইবে না এবং একতা না হইলে মানুষের উন্নতি হইবে না এবং ইয়োরোপে ঐ একতা আছে বলিয়াই ইয়োরোপীয়গণের উন্নতি হইতেছে—এবংবিধ কথা যে ডক্টর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রায়শঃ বলিয়া থাকেন, তাহা সর্ব্বজন-বিদিত।

একতা না হইলে যে মানুষের কোন উন্নতি হয় না, তাহাতে কাহারও মতভেদ থাকিতে পারে না। কিন্তু ইয়োরোপীয়গণ কি সেই একতা সাধন করিতে পারিয়াছেন? ইহাই প্রথম প্রশ্ন। যদি তাঁহাদের একতাই সাধিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে এত মহা মহা যুদ্ধের উদ্ভব হয় কেন?

তাহার পর দ্বিতীয় প্রশ্ন, ইয়োরোপীয়গণ কি তাঁহাদের স্ব স্ব কোন প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছেন? যদি প্রকৃত উন্নতি তাঁহাদের হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা স্ব স্ব জীবিকার জন্য অন্য দেশের মুখাপেক্ষী হইতে বাধ্য হন কেন? আর তাঁহাদের মধ্যে এত বেকারের সংখ্যা, রোগীর সংখ্যা এবং অকালমৃতের সংখ্যাই বা বাড়িয়া যাইতেছে কেন?

তৃতীয় প্রশ্ন—কোন দেশের মধ্যে একটী ভাষা ও একটী লিখন-প্রণালী কার্য্যতঃ প্রচলন করা সম্ভব কি? তাহা যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে অতি অল্প পরিধিবিশিষ্ট "ইউনাইটেড কিংডমে"র মধ্যে ওয়েলস্-ভাষাভাষিগণ ইংরাজের ভাষা ও

স্কচম্যানের ভাষা এবং ইংরাজী-ভাষাভাষিগণ ওয়েল্‌স্‌ ও স্কটল্যাণ্ডবাসিগণের ভাষা বুঝিতে পারেন না কেন?

ডক্টর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার নিজের ভাষা ও লিখন-প্রণালী সর্ব্ব সময়ে এবং সর্ব্ব অবস্থায় একরূপ রাখিতে পারেন কি? বাল্যে তাঁহার যে ভাষা ও হস্তাক্ষর ছিল, যৌবনে যদি তাহার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে এবং এখনও তাহার পরিবর্ত্তন প্রতিনিয়ত সাধিত হইতেছে, ইহা যদি দেখা যায় এবং তাহা যদি তিনি অপরিবর্ত্তিত রাখিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে তিনি সকলের ভাষা ও লিখন-প্রণালী এক করিয়া দিবেন, ইহা আশা করিতে পারেন কোন্‌ যুক্তিবলে?

ডক্টর সাহেবের বিভিন্ন গ্রন্থে ও বক্তৃতায় যে বিশ্বার প্রকাশ আছে, তাহা দেখিলে দৃঢ়তার সহিত বলা যায় যে, তাঁহার মস্তিষ্কে আমাদের কোন কথা প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে না এবং উপরোক্ত কোন প্রশ্নের জবাব তিনি দিতে পারিবেন না এবং তাঁহার কোন কথার কোন যুক্তি তিনি দেখাইতে পারিবেন না। যুক্তির মধ্যে তাঁহার সম্বল আছে যে, তিনি ডি-লিট, তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাধ্যাপক, অমুক অমুক সাহেব তাঁহার কথায় সায় দিয়াছেন, গান্ধীজী, জওহরলালজী তাঁহার কথায় হুঁ দিয়াছেন, তাঁহার, অমুক অমুক ছাত্র তাঁহার মতবাদ প্রচার করিয়াছেন ইত্যাদি।

ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের যে প্রবন্ধের সমালোচনা আমরা করিতে বসিয়াছি, সেই প্রবন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বুঝিতে হয়, হিন্দী ভাষা ভারতের একরূপ রাষ্ট্রভাষা হিসাবে পরিণত হইয়াছে, কারণ ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে কথা কহিয়া সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরিয়া বেড়ান যায়।

ডক্টর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে জানিতে হইবে যে, সমগ্র ভারতবাসী বলিতে তিনি এবং যাঁহাদের সঙ্গে তিনি চলাফেরা করেন, কেবল তাঁহাদিগকে বুঝায় না এবং কেবল তাঁহাদিগকে লইয়াই ভারতের 'রাষ্ট্রত্বে'র কোন কথার সমাধান হয় না। তিনি যে শ্রেণীর লোকের সঙ্গে চলাফেরা করিয়া থাকেন, সেই শ্রেণীর লোকের সংখ্যাও সমগ্র ভারতবাসীর শতাংশের একাংশ অপেক্ষাও কম।

অনুসন্ধান করিলে তিনি জানিতে পারিবেন যে, বাঙ্গালার অথবা আসামের অথবা পাঞ্জাবের অথবা মাদ্রাজের অথবা বোম্বায়ের কৃষকদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকই হিন্দী ভাষার এক বর্ণও বুঝিতে পারে না। বিভিন্ন প্রদেশের কৃষকবর্গ হিন্দী-ভাষা বুঝিতে পারে না, ইহা যদি প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, দেশের বার আনা লোকই হিন্দী ভাষা বুঝিতে পারে না। দেশের বার আনা লোক যে-ভাষা বুঝিতে পারে না এবং যাহা বুঝিবার তাহাদের কোন উপায় নাই, তাহা রাষ্ট্র-ভাষা হইয়া গিয়াছে, ইহা বলিলে দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতার পরিচয় দেওয়া হয় না কি?

এই দায়িত্বজ্ঞানহীন পণ্ডিতটী যে সমস্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা কত ভ্রান্তিপূর্ণ এবং ছাত্রদিগের কত অনিষ্টসাধক, তাহা আমরা সময়ান্তরে পাঠকবর্গকে জানাইব।

খুব সম্ভব, এই পণ্ডিতটীর স্কন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বিশেষ কোন দায়িত্বভার অর্পণ করেন নাই। মানুষের স্কন্ধে কোন দায়িত্বভার থাকিলে প্রকৃতিবিরুদ্ধ কথা লইয়া তাঁহার আলোচনা করিবার অবসর হওয়া সম্ভব নহে।

এই দুঃসময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কি দেশবাসীকে এই পণ্ডিতটীর অস্বাভাবিক হৈ-চৈ হইতে রক্ষা করিতে পারেন না?

শিক্ষা ও রবীন্দ্রনাথ

বঙ্গীয় শিক্ষা-সপ্তাহ সম্পর্কিত অনুষ্ঠানে কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক সুদীর্ঘ বক্তৃতাপ্রসঙ্গে অনেক কথা বলিয়াছেন। 'আমাদের দেশের আর্থিক দারিদ্র্য দুঃখের বিষয়, লজ্জার বিষয় আমাদের দেশের শিক্ষার অকিঞ্চিৎকরত্ব। এই অকিঞ্চিৎকরত্বের মূলে আছে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অস্বাভাবিকতা। দেশের মাটীর সঙ্গে এই ব্যবস্থার বিচ্ছেদ' ইত্যাদি নানা শ্রুতিমধুর কথায় তাঁহার বক্তৃতাটি পরিপূর্ণ। কিন্তু কবিবর রবীন্দ্রনাথের এই বক্তৃতায় যে কোন্‌ কার্য্যের নির্দ্দেশ আছে, তাহা আমরা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি নাই। আমরা যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে বলিতে হয় যে সমগ্র বক্তৃতাটী কতকগুলি অসংলগ্ন কথার "মার প্যাঁচ" মাত্র এবং তাহাতে কোন কার্য্যের কোন সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ নাই। রবীন্দ্রনাথের যে বয়স, তাহা চিন্তা করিলে আমরা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করিতে বাধ্য। কাযেই সরাসরি তাঁহার

কোন কথার বিরুদ্ধে সমালোচনা করিতে আমরা সঙ্কোচ অনুভব করি।

দেশের জনসাধারণের মধ্যে অনেকে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহার কথা আগ্রহের সহিত শুনিয়া থাকেন। এতাদৃশ অবস্থায় তিনি যদি চিন্তা না করিয়া কোন কথা কহিতে থাকেন, তাহা হইলে লোকের বিভ্রান্তির উদ্ভব হইবার আশঙ্কা আছে। দেশের আপামর জনসাধারণের এক্ষণে যেরূপ দুরবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে আর নূতন রকমের কোন বিভ্রান্তির উদ্ভব হইলে মানুষের বাঁচিয়া থাকা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে। কাযেই আমরা অতি সশ্রদ্ধ ভাবে তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি যে, হয় তিনি চিন্তা করিয়া লোকে বুঝিতে পারে এমন ভাবে কথা কহিতে প্রবৃত্ত হউন, নতুবা জীবনের সায়াহ্নে আর কোন কথা না কহিয়া বিশ্রামসুখ উপভোগ করুন। তাঁহার কথায় যদি দেশের লোকের দুঃখসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিত অথবা থাকে, তাহা হইলে আজীবন তিনি যে সমস্ত কথা কহিয়াছেন, তাহাতেই ফলোদয় হইত কিংবা হইবে।

"শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ", "Education Naturalised" প্রভৃতি যে সমস্ত শব্দ তিনি তাঁহার বক্তৃতায় ব্যবহার করিয়াছেন,তাহা কোন্ বিজ্ঞান, দর্শন অথবা ব্যাকরণানুমোদিত অথবা তাহাদের কি অর্থ, তাহা ঐ সমস্ত শব্দ বিশ্লেষণ করিয়া, যাঁহারা অনুসন্ধিৎসু তাঁহাদিগকে তিনি বুঝাইয়া দিতে পারেন কি? যে সমস্ত শব্দ বিজ্ঞান, দর্শন অথবা ব্যাকরণানুমোদিত নহে, সেই সমস্ত শব্দ যে সকল গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়, সেই সমস্ত গ্রন্থ পড়িলে যে, মানুষ আত্ম-প্রতারক হইয়া পড়ে, ইহা রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করিতে পারিবেন কি? বর্ত্তমান কালে যে, মানুষ এই শ্রেণীর গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া আত্মপ্রতারক হইয়া পড়িতেছে এবং তাহার ফলে মানুষের অস্তিত্ব বজায় রাখা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িতেছে, তাহা রবীন্দ্রনাথ চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি?

স্যার জন এণ্ডার্সন ও বঙ্গীয় শিক্ষা-সপ্তাহ

গত ৩১শে জানুয়ারী হইতে ৬ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কলিকাতার সিনেট হলে "বঙ্গীয় শিক্ষা সপ্তাহ" অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই শিক্ষা-সপ্তাহের অনুষ্ঠান কাহার কল্পনাপ্রসূত, তাহা আমরা জানি না। এবং ইহা হইতে দেশে কি সুফল প্রসূত হইতে পারে তাহাও আমরা বুঝিতে পারি না। উহার কল্পনা যাহার দ্বারাই সূচিত হইয়া থাকুক না কেন, "বঙ্গীয় শিক্ষা সপ্তাহ" যে স্যার জন এণ্ডার্সনের অনুমোদিত, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে নতুবা তাহার উদ্বোধন তিনি নিজে সম্পাদন করিতেন না।

বাঙ্গালাদেশে কি করিলে সুশিক্ষার প্রবর্ত্তন হইতে পারে, তৎ সম্বন্ধে যে বর্ত্তমান গভর্ণর সাহেব অনেক চিন্তা করিতেছেন, তাহা তাঁহার কার্য্যকলাপে বুঝিতে পারা যায়। "বঙ্গীয় শিক্ষা-সপ্তাহ" সেই চেষ্টার অন্যতম নিদর্শন। স্যার জন এণ্ডার্সন বাঙ্গালীর সুশিক্ষার জন্য যে অনেক চেষ্টা করিতেছেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না বটে, কিন্তু আমাদের মনে হয়, কার্য্যতঃ বাঙ্গালীর সুশিক্ষার নীতি প্রবর্ত্তন করিতে হইলে, দেশের যে যে অবস্থা সম্বন্ধে যে যে সংবাদ সংগ্রহ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহার সুযোগ এখনও স্যার জন এণ্ডার্সনের হয় নাই। আমরা কেন এই কথা বলিতেছি, তাহা ঐ অনুষ্ঠানের উদ্বোধনপ্রসঙ্গে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার কয়েকটী কথা বিশ্লেষণ করিলেই বুঝা যাইবে।

স্যার জন এণ্ডার্সনের সমগ্র বক্তৃতার মধ্যে নিম্নলিখিত দুইটী কথা বিশেষ ভাবে আলোচনার যোগ্য।

(১) ইংলণ্ড, আমেরিকা বা জার্ম্মানীতে কোন একটী বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতি সাফল্য লাভ করিয়াছে বলিয়াই যে, তাহা ভারতবর্ষেও অনুকরণীয় হইবে, তাহা ঠিক নহে।

(২) ভারতের ঐতিহ্য, পারিবারিক অবস্থা এবং শিক্ষার প্রকৃত অবস্থা অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পূর্ণ পৃথক্।

আমাদের মতে উপরোক্ত দুইটী কথার একটীও সর্ব্বতোভাবে যুক্তিসঙ্গত নহে। বর্ত্তমানে ইংলণ্ড, আমেরিকা বা জার্ম্মানীতে যে শিক্ষা প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা আমাদের ভারতবর্ষের অনুকরণীয় নহে, ইহা খুব সঙ্গত কথা। তাহার কারণ ঐ ঐ দেশের বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি অত্যন্ত দুষ্ট এবং তাহা ঐ ঐ দেশের জনসাধারণকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারে নাই।

ইংলণ্ডের শিক্ষাপদ্ধতি যে সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই, তাহা এমন কি ঐ দেশে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে বিংশতি বৎসরের মধ্যে যে কয়েকটী শিক্ষাবিষয়ক কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহাদের একাধিক সভ্য তাঁহাদের মন্তব্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্বীকার করিয়াছেন। ইয়োরোপ অথবা আমেরিকার সর্ব্বত্রই যে তথাকার মানুষ প্রকৃত লোকহিতকর শিক্ষার পদ্ধতি বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছেন, তাহার পরিচয় তাঁহাদের জনসাধারণের অবস্থা। প্রকৃত লোকহিতকর শিক্ষার পদ্ধতি কি, তাহা যদি তাঁহাদের জানা থাকিত, তাহা হইলে স্ব স্ব দেশের জনসাধারণের অন্নসংস্থানের জন্ম তাঁহাদিগকে অন্যান্য দেশের বাজারের মুখাপেক্ষী হইতে হইত না। প্রকৃত শিক্ষায় যদি তাঁহারা নিজদিগকে মণ্ডিত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে একদিকে একটি মানুষকে হত্যা করিলে ফাঁসি দিবার দণ্ডবিধি প্রচার, আর অন্য দিকে মহা মহা যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করিলে দেশপ্রেমের জন্ম ধন্যবাদের উচ্ছ্বাস—এই দুই বিরুদ্ধ ভাববন্যার স্রোত তাঁহারা প্রবাহিত করিতে পারিতেন না। প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে পারিলে, একসঙ্গে মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বের কথা আর যন্ত্র-শিল্পের দ্বারা বায়ুমণ্ডলকে বিকৃত বাষ্পে পরিপূর্ণ করিয়া পরোক্ষভাবে মানুষের অসুস্থতা এবং অকালমৃত্যুর ব্যবস্থা তাঁহাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হইত না।

আরও চাহিয়া দেখুন, ইয়োরোপের এবং আমেরিকার প্রত্যেক দেশে প্রাকৃতিক কারণ বশতঃ জন্মসংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে, অথচ যে হারে জন্ম-সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে, তাহার একদশমাংশ হারেও চল্লিশ বৎসরোর্দ্ধ বয়স্ক পরিণত লোকের সংখ্যা বাড়িতে পারিতেছে না এবং প্রত্যেক দেশেই রোগীর সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতেছে। যদি প্রকৃত শিক্ষা অথবা প্রকৃত বিজ্ঞান অথবা প্রকৃত দর্শন তাঁহাদের থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদের দেশে এত পরমুখাপেক্ষিতা, এত বেকার, এত অস্বাস্থ্য এবং এত অকালমৃত্যু থাকিতে পারিত না।

কিন্তু ইয়োরোপ এবং আমেরিকার অবস্থা চিরদিন ঐরূপ ছিল না। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগের প্রাচীন ইতিহাস আজ বিস্মৃতির অতল গর্ভে নিমজ্জিত এবং ঐ আদিম অধিবাসিগণ আজ জগতের সমক্ষে বর্ব্বর নামে পরিচিত। যদি কখনও আবার ভারতীয় ঋষির শিক্ষা ও সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার সম্ভব হয় এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ভাসিত হয়, তাহা হইলে মানুষ জানিতে পারিবে যে, এমন সময় ছিল, যখন আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণকেও বর্ব্বর বলা যাইত না। তাহারাও পরমুখাপেক্ষী না হইয়া, নিজেদের ভিতর মারামারি কাটাকাটি না করিয়া, স্বাস্থ্য ও কার্য্যক্ষমতার সহিত দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে বসবাস করিতে জানিত। তাহারাও এক সময়ে জগতের মধ্যে একটী সুসভ্য জাতি নামে পরিচিত ছিল।

ইয়োরোপের সর্ব্বত্রও নবম শতাব্দীর আগে মানুষ ছিল। এবং তখন ইয়োরোপীয়গণেরও স্ত্রী পুত্র ও জন্মভূমি ছাড়িয়া জীবিকার জন্য সারা জীবন দেশে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত না। তাঁহারাও পরমুখাপেক্ষী না হইয়া, নিজেদের ভিতর মারামারি কাটাকাটি না করিয়া, স্বাস্থ্য ও কার্য্যক্ষমতার সহিত দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারিতেন এবং সন্তুষ্টচিত্তে স্ব স্ব পরিবারের মধ্যে স্ব স্ব জন্মভূমিতে সারা জীবন অতিবাহিত করিতেন। স্থান ও কালের পার্থক্যের জন্য তখনও সারাজগতের শিক্ষাপদ্ধতিতে অল্পাধিক প্রভেদ বর্ত্তমান ছিল বটে, কিন্তু উহার মূলে সর্ব্বত্রই ঐক্য পরিলক্ষিত হইত।

যে শিক্ষাপদ্ধতি সুচিন্তিত, তাহা সর্ব্বত্রই গৃহীত হইতে পারে; কারণ যে শিক্ষা একটী মানুষেরও জীবনযাত্রা কি করিয়া সর্ব্বতোভাবে সুখমণ্ডিত হইতে পারে তাহার অনুসন্ধান দিতে সক্ষম, সেই শিক্ষা সমস্ত মানুষেরই গ্রহণযোগ্য। মানুষের বয়স ও ইন্দ্রিয়-সামর্থ্যানুসারে শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু মানুষের সারাজীবনে সমগ্র শিক্ষাপদ্ধতি একাধিক নহে, তাহা একটী মাত্র।

কাযেই যে শিক্ষায় ইয়োরোপ অথবা আমেরিকার জনসাধারণের প্রকৃত হিতসাধিত হইতে পারে, তদ্দ্বারা বাঙ্গালার উপকার সাধিত হইতে পারে না এই কথা যুক্তিসঙ্গত নহে।

যদি স্যার জন এণ্ডার্সন মুক্তকণ্ঠে বলিতেন, বর্ত্তমানে যে শিক্ষা ইংলণ্ড অথবা জার্ম্মানীতে অথবা আমেরিকায় প্রচলিত আছে, তাহা ঐ ঐ দেশের জনসাধারণের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার কোন তৃপ্তি সাধন করিতে পারে নাই এবং বাঙ্গালা দেশেও তাহা পারিবে না এবং কোন্ শিক্ষা সর্ব্বজনহিতকর তাহা বাঙ্গালীকে চিন্তা করিয়া বাহির করিতে হইবে,

তাহা হইলে আমরা তাহা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে পারিতাম এবং তাহা তাঁহার অসামান্য রাজনৈতিকতার (Statesmanship) সুসমঞ্জস হইত।

সারা জগতের মানুষ যে কি ভীষণ অবস্থার সম্মুখীন হইতেছে, তাহা চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারিলে, এখন আর যাহাতে মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য ভাবের অথবা বিদ্বেষের উদ্ভব হয়, এমন কোন কথা কাহারও মুখ হইতে নির্গত হইলে ব্যথিত হইতে হয়।

এতদিন পর্য্যন্ত জগতে সমস্ত সমস্যা কেবলমাত্র ধনিক ও মধ্যবিত্তদিগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ধনিক ও মধ্যবিত্তগণ জগতের সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা ২ জন মাত্র। অর্থাৎ ধনিক ও মধ্যবিত্তের সংখ্যা মোট লোকসংখ্যার পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। আর বাকী ৪৯ ভাগ কৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবী।

নবম শতাব্দী হইতে জগতের যেখানে যে কোন রাজ্যের পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তাহাতে প্রায়শঃ ধনিক ও মধ্যবিত্তগণের সংস্রব মাত্র রহিয়াছে ইহা দেখা যাইবে। আরও দেখা যাইবে যে, সর্ব্বত্রই কৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবীগণ তাঁহাদের নিজ নিজ কার্য্য লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছেন এবং তাঁহারা প্রায়শঃই রাজ্যের মধ্যে কি ঘটিতেছে তৎসম্বন্ধে উদাসীন। মধ্যবিত্ত ও ধনিকগণের মধ্যে অন্নাভাব ও বুভুক্ষাও পরিলক্ষিত হইত বটে, কিন্তু কৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবিগণের প্রায়শঃ প্রকৃত অন্নাভাব ছিল না।

কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নাই। জগতের সর্ব্বত্রই কৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবিগণের মধ্যে অন্নাভাব দেখা দিয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত ঐতিহাসিকগণ যে সমস্ত অন্তর্বিদ্রোহ ও মহাযুদ্ধের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাদের নায়ক যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা সমগ্র লোকসংখ্যার পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ মাত্র এবং তাঁহাদের মারামারির কারণ ছিল প্রায়শঃ কাল্পনিক অভাব। আর ভবিষ্যতে জগতে যে মারামারির আশঙ্কার উদ্ভব হইতেছে, তাহাতে লিপ্ত হইবেন সমগ্র মনুষ্যজাতি এবং তাহার কারণ হইবে প্রকৃত ক্ষুধার জ্বালা।

প্রকৃত ক্ষুধার জ্বালা যে কি ভীষণ এবং তাহাতে যদি আবার অসহায়তার ভাব মিশ্রিত থাকে, তাহা হইলে তাহা যে কত ভীষণতর হয়, তাহা কি আমাদের অত বড় লাট সাহেব অনুমান করিতে পারিবেন ?

আমরা এখনও বলি যে, বাঙ্গালা জগতের গোলাঘর। চেষ্টা করিলে এই বাঙ্গালার সহায়তায় জগতকে তাহার আগত ভীষণ দুর্দ্দৈব হইতে রক্ষা করা সম্ভব হইতে পারে। আমাদের এই কথা কি লাট সাহেবের হৃদয়ে স্থান পাইবে ?

সংবাদ ও মন্তব্য

শিক্ষা সপ্তাহ

ভারত সরকারের শিক্ষাসচিব স্যার জর্জ এণ্ডার্সন বলিয়াছেন, আমাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য যে কত অল্প সময়ের মধ্যে এদেশের লোকের অক্ষরজ্ঞান সাধিত হইতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করা। আমার বিশ্বাস যে, শিক্ষা ব্যপদেশে বহু অর্থই অপব্যয়িত হইতেছে এবং ঐ টাকার অধিকাংশভাগ কার্য্যকরী শিক্ষায় ব্যয় করা যাইতে পারে।

কোন কার্য্যকরী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে তাহার আগে যাহাতে কার্য্যকরী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া কর্ম্মস্থলের অভাবে যুবকগণের বেকার অবস্থায় না থাকিতে হয়, তদনুরূপ কর্ম্মস্থানের ব্যবস্থার আয়োজন করা সঙ্গত নহে কি ?

ডাইরেক্টর অফ পাবলিক ইনষ্ট্রাকসান ডক্টর ডবলু. এ. জেনকিন্স বলিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে পরীক্ষায় পাশ করাই শিক্ষার মস্ত উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উচ্চশিক্ষা জীবনের উন্নতিস্বরূপ না হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশের পন্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কাহার ত্রুটী ? যুবকগণের ? না, যাঁহারা শিক্ষা ও পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন, তাঁহাদের ?

দেওয়ান বাহাদুর রামস্বামী মুদালিয়র বলিয়াছেন, স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও মনের প্রসারতা প্রকৃত শিক্ষার ফল। যে মানুষের মন স্বাধীন এবং যে ব্যক্তি গতানুগতিকতার বশবর্ত্তী না হইয়া বিচারবুদ্ধিপ্রয়োগে কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারে, তাহাকেই প্রকৃত শিক্ষিত বলিতে পারা যায়।

গতানুগতিকতার বশবর্ত্তী না হইয়া বিচারবুদ্ধিপ্রয়োগে কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য শিক্ষা লাভ করিতে হইলে পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান ও জ্যোতিষশিক্ষার কোন ব্যবস্থা কোন শিক্ষামন্দিরে রক্ষা করা চলে কি ?

শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, ভারতের অসংখ্য দুর্ব্বল ও স্নায়ুরোগগ্রস্ত ব্যক্তি জীবনসংগ্রামের কঠোরতা ও জটিলতার মধ্যে নিজেদের সামলাইতে না পারিয়া সমাজে বিরুদ্ধাচরণ

করিতে ও পাপকার্য্যে রত হয়। এ বিষয়ে জনসাধারণের ঔদাসীন্য আইন-প্রয়োগে দূরীভূত করাই সমীচীন।

এই মুখোপাধ্যায় মহাশয় লোকটী কে এবং কি অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতায় যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে তাঁহার যে চিন্তাশক্তির বিশেষ অভাব আছে, তাহা বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। ক্ষুধার জ্বালা থাকিলে মানুষের বিভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী। তখন যাহাতে ক্ষুধার জ্বালার নিবৃত্তি হয়, তাহার চেষ্টা না করিয়া মাত্র আইন প্রণয়ন দ্বারা নানা রকম বন্ধনে মানুষের বিভ্রান্তিকর কার্য্য বন্ধ করিবার চেষ্টা করিলে, সুফল অপেক্ষা অধিকতর কুফলের উদয় হয় না কি? আমাদের কি বুঝিতে হইবে যে, বিশ্ববিদ্যালয়মহলে চিন্তাশীল লোকের অভাব এতই হইয়াছে যে, দেশের এই সমস্ত অপরিণামদর্শী লোকের বক্তৃতা শোনান ছাড়া কর্ত্তৃপক্ষের গত্যন্তর নাই?

শিক্ষামন্ত্রী খাঁ বাহাদুর আজিজুল হক্ বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, যে-দেশের যুবকবৃন্দ দীর্ঘকাল যাবৎ শিক্ষালাভ করিয়া কঠিন বাস্তব জগতে জীবনসংগ্রামে বিপর্য্যস্ত হন, সে দেশের ধ্বংস অনিবার্য্য।

যে শিক্ষা লাভ করিয়া মানুষের জীবন সংগ্রামে বিপর্য্যস্ত হইতে হয়, সে শিক্ষা মূলতঃ কোন না কোন ভাবে দুষ্ট, তাহাই বুঝিতে হয় না কি? ঐ শিক্ষার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইলে যাঁহারা ঐ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া অভিমান পোষণ করেন, তাঁহারা যাহাতে স্ব স্ব অভিমান বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হন, তাহার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে করা কর্ত্তব্য নহে কি? যে সর্ষপ প্রয়োগে ভূতপ্রেতের অত্যাচার নিবৃত্ত করিতে হইবে, তাহা যদি দুষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে যুক্তিসঙ্গতভাবে কোন হিতকর পরিবর্ত্তনে সাফল্য লাভ করিবার আশা থাকে কি?

কংগ্রেস ও উদারনৈতিক দলের মিলন

নিখিল ভারত রাষ্ট্রমহাসভার সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, উদারনৈতিক দলের সহিত কংগ্রেসের মিলন ও সহযোগিতা সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন—

মিলনের অন্তরায় চারিটি। (১) কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতা সংক্রান্ত মুখ্য উদ্দেশ্য পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। (২) কংগ্রেসের কার্য্যতালিকা হইতে আইন-অমান্য নীতি পরিহার করিতে হইবে। (৩) কায়িক পরিশ্রমমূলক কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক বিধি বর্জ্জন করিতে হইবে। (৪) খদ্দর-পরিধানের মূল সর্ত্ত ত্যাগ করিতে হইবে।

বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের মতে, (১) পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্কল্প ত্যাগের জন্য গবর্ণমেণ্টও জেদ করেন নাই। (২) কংগ্রেসের আইন-অমান্য নীতি বর্জ্জন-প্রস্তাব কংগ্রেসের কার্য্য-পদ্ধতির পথে অলঙ্ঘনীয় বাধা-বিপত্তি উপস্থিত করে। (৩) কায়িক পরিশ্রমমূলক নীতি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উঠিলে কোন মধ্যপন্থা অবলম্বন করা একেবারে অসম্ভব নহে। (৪) খদ্দর সম্বন্ধে গম্ভীরভাবে আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ আরও বলেন যে, বিরোধের বিষয়গুলির মধ্য হইতে একতামূলক বিষয়গুলি বাছিয়া বাহির করিয়া মিলিয়া মিশিয়া কাজ করা একেবারে অসম্ভব নহে।

আমাদের মতে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব কংগ্রেসে গৃহীত হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট মুখে হয়ত আপত্তি জ্ঞাপন করেন নাই, কিন্তু ঐ প্রস্তাব যে গবর্ণমেণ্ট প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন করেন না, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় কি? পূর্ণ স্বাধীনতা ও আইন অমান্য প্রস্তাব দুইটী কংগ্রেসের মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত হওয়াতেই যে কংগ্রেসে ভাঙন ধরিয়াছে ও দেশে দলাদলির তীব্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। আমাদের বর্ত্তমান সংখ্যার "ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়" শীর্ষক প্রবন্ধে এই কথাগুলি বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

পূর্ণ স্বাধীনতা ও আইন-অমান্য প্রস্তাব কংগ্রেসের কার্য্য-নীতি হইতে পরিত্যক্ত না হইলে, মিলিয়া মিশিয়া কাজ করার কথা মুখের কথাই থাকিয়া যাইবে।

বাঙ্গালার গভর্ণরের সফর

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী দিনাজপুরে এক সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বাঙ্গালার লাট স্যার জন এণ্ডার্সন বলিয়াছেন, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সম্প্রতি যে বঙ্গীয় কৃষি-ঋণ-বিধায়ক আইন পাশ হইয়াছে, তদ্দ্বারা কৃষকদের অবস্থার উন্নতি সাধিত হইবে।

কৃষকদের যে "সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা, তার প্রলেপ দিবে কোথা?" যাহাতে পাওনাদারের ন্যায্য প্রাপ্য যথাসময়ে পরিশোধ না করিয়া তাহাকে বিব্রত করা যায়, তাহার ব্যবস্থা হইলেই যদি লোকের দুর্দ্দশার মোচন হইতে পারে, তাহা হইলে Jurisprudence অথবা Civil Procedure Code-এর কি সার্থকতা থাকে, তাহা স্যার জন্ জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিবেন কি?

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী মালদহে এক সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে লাট সাহেব বলিয়াছেন, দেশের রেশম শিল্পের উন্নতির জন্য ভারত ও বাঙ্গালা সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। লাক্ষা-শিল্পের উন্নতিমূলক ব্যবস্থা সরকার কর্তৃক বিবেচিত হইতেছে।

চেষ্টার ত্রুটী সরকার করিতেছেন না, কিন্তু কাজের কাজ কি হইয়াছে?

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-দিবস

গত ৩০শে জানুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে বাঙ্গালার গবর্ণর স্যার জন এণ্ডার্সন বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন যে, আজ যাহারা এখানে সমবেত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই অবস্থার বিপাকে পড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে জীবিকানির্ব্বাহের পন্থা বলিয়া ভাবিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তোমাদিগকে তাহারও বেশী কিছু দিতে চায়। জীবন-সংগ্রামে যখন তোমরা বিপর্য্যস্ত হইবে, যখন সাফল্য ও অসাফল্য তোমাদের জীবনে গভীর ভাবে রেখাপাত করিতে থাকিবে, তখন— বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাধীন অবস্থায় তোমরা তোমাদের দেশবাসী ও মানব-সমাজের সেবাব্রতের যে মন্ত্রটি শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছ, তাহাই তোমাদিগকে মুক্তির পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবে।

বাঙ্গালা দেশে একটা প্রবাদ আছে, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। দেশের যুবকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা সেরা ছাপ পাইয়াও যদি অন্নের সংস্থান করিতে ও স্ব স্ব সংসার প্রতিপালনে অক্ষম হয় এবং অকালে অস্বাস্থ্যকবলিত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হয়, তবে দেশবাসী ও মানবসমাজের হিতকর মন্ত্র কাজে লাগাইবার ফুরসৎ তাহারা পাইবে কখন? ইহারই নাম কি ভিত্তিহীন সৌধনির্ম্মাণ নহে?

গত ৩০শে জানুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, অনমনীয় দৃঢ়তা তোমাদের সকল কার্য্যের মূলমন্ত্র হৌক। আমি জানি, ঐ ভাব জাগ্রত হইয়াছে; কিন্তু যদি দৃঢ়তাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে যত্ন করিতে হইবে। আজ বাঙ্গালা দেশ অগ্রণী হইয়া এক দল অভিযানকারীকে এভারেষ্ট অভিযানে প্রেরণ করিবে না কেন, আমি তাহাই ভাবিয়া আশ্চর্য্য হই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকদের চরিত্রে অনমনীয় দৃঢ়তা পরিলক্ষিত হইলে প্রশংসার কথা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে পর্ব্বতলঙ্ঘন বা তদনুরূপ দুর্দ্ধর্ষ কার্য্য করিলে কি শুভ ফলোদয় হইবে, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র-বুদ্ধিতে আমরা বুঝিতে পারি না! কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি প্রকৃত বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি শিক্ষার বন্দোবস্ত হয় এবং তদ্দ্বারা যদি দেশের যুবকগণের নৈতিক চরিত্র সুগঠিত হয় এবং তাহারা স্বাবলম্বী ও স্বাস্থ্যের অধিকারী হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে জীবিকার্জ্জন করিতে পারে, তাহা হইলে কৈলাসশৃঙ্গে কুঠারাঘাত না করিলেও বাঙ্গালী কাহারও পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে না, আমাদের এইরূপ ধারণা।

গ্রন্থাগার সম্মেলন

গত ১২ই জানুয়ারী কলিকাতা গ্রন্থাগার সম্মেলন উদ্বোধনপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বক্তৃতায় বলেন, প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে গ্রন্থাগার অজ্ঞাত বস্তু ছিল না; কিন্তু গ্রন্থাগার সম্পর্কে আধুনিক যে সমস্ত উন্নতিমূলক কার্য্য সাধিত হইয়াছে, তাহার জন্য ভারতবাসীকে প্রতীচ্যের মুখাপেক্ষী হইতেই হইবে। প্রাথমিক ও প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা-বিস্তারও গ্রন্থাগার দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে; কিন্তু পুস্তক-নির্ব্বাচনে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। সমবায়-পদ্ধতিতেই গ্রন্থাগার-গুলি গঠিত হওয়া বিধেয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বরেণ্য ভাইস-চ্যান্সেলারের মতে প্রতীচ্যের মুখাপেক্ষী না হইলে আমাদের কোন কাযই হইতে পারে না! এক দিকে "পরমুখাপেক্ষিতা" আর অন্য দিকে "স্বাধীনতা"—এই দুইটীর সমবায় দেখিবার জিনিষ বটে!

কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী সম্মেলন

গত ১৯ ও ২০শে জানুয়ারী নিখিল ভারত কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অভ্যর্থনা-সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী সত্যবতী তাঁহার অভিভাষণে বলেন, নূতন শাসনতন্ত্রে কংগ্রেস যদি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে, তাহা হইলে সমগ্র দেশের রাজনৈতিক অবনতি ঘটিবে। কৃষক ও শ্রমিকদের সহযোগিতা লাভ করিতে হইলে কংগ্রেসকে শ্রেণী-সংগ্রাম এবং শ্রেণীবিরোধ মানিতে হইবে।

কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলে রাজনৈতিক অবনতি ঘটিবে কি না বলিতে পারি না, তবে কায যে কিছু হইবে না, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেই কায হয় না, কায করিবার পথ ও পদ্ধতি জানিবার প্রয়োজন হয় সর্ব্বাগ্রে। কৃষক ও শ্রমিকদিগের সহযোগিতালাভ তখনই সম্ভব হইবে যখন তাহাদের আর্থিক দুরবস্থা দূর করিবার প্রচেষ্টাই নেতৃবর্গ অন্তরের সহিত গ্রহণ করিবেন।

মীরাটে অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত-কংগ্রেস-সমাজতন্ত্রী সম্মেলনে অন্যান্য বহু প্রস্তাবের সঙ্গে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলিও গৃহীত হইয়াছে।

(১) শ্রীযুক্ত সম্পূর্ণানন্দ নূতন শাসন সংস্কার সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া জনসাধারণের পক্ষ হইতে দাবী জ্ঞাপন করেন যে, যাঁহারা আইনসভায় প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ভূমিরাজস্ব সম্পর্কীয় ব্যবস্থা বাতিল করিয়া তাহার স্থলে বার্ষিক পাঁচ শত টাকার অধিক কৃষিজাত আয়ের উপর আয়কর প্রবর্ত্তন, জমিদারী প্রথা এবং রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যবর্ত্তী অপর সম্প্রদায়ের উচ্ছেদসাধন, সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা কার্য্যের জন্য অন্যূন ত্রিশ টাকা পারিশ্রমিক, বক্তৃতায় স্বাধীনতা, সংবাদপত্র সংগঠন, বকেয়া ঋণ ও রাজস্ব বাতিল, রাষ্ট্র কর্ত্তৃক ঋণ দান ব্যবস্থা ইত্যাদি।

(২) মিঃ ইউসুফ আলি প্রস্তাব করেন, আইন-সভায় ভোটে জয়লাভ করাই কংগ্রেস সদস্যগণের লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে।

(৩) সভানেত্রী শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন যে, ভারত ও ভারতের বাহিরে কৃষকপ্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি সম্ভাষণ ও তাঁহাদের সংগ্রামে দলের সংহতি ঘোষিত হউক।

(৪) কংগ্রেসে যাহাতে কৃষক ও শ্রমিক প্রভৃতি সম্প্রদায়সমূহের যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি থাকিতে পারে, কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র সেই ভাবে সংগঠিত হোক, শ্রীযুক্ত সম্পূর্ণানন্দ এই প্রস্তাব করেন। পূর্ণ স্বাধীনতাই কংগ্রেসের আদর্শ হওয়া উচিত।

(৫) শ্রীযুক্ত রাজারাম শাস্ত্রী প্রস্তাব করেন, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বেকার-গণকে কলকারখানা ও ক্ষেতের উপর সমাজতন্ত্রগত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কৃষক ও শ্রমিকদিগের সহিত যোগদান আন্দোলন আরম্ভ করিতে প্রবৃত্ত করা হোক।

আমরা কংগ্রেসও বুঝি, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রও বুঝি, আর এই সব প্রস্তাবও বুঝি; বুঝি না কেবল, এত আয়োজন-গর্জ্জন-সমারোহ সত্ত্বেও দেশের লোকের পেটের ভাত জোগাড় হয় না কেন!

ভারত সরকারের বার্ষিক বিবরণী

১৯৩৩-৩৪ সালের ভারত সরকারের বার্ষিক বিবরণীতে কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট ও বিপ্লবী আন্দোলনের সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, কংগ্রেস্ প্রতিষ্ঠানগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ফলে কংগ্রেস-পন্থী এবং মডারেটগণ সকলেই মহাত্মা গান্ধীর কার্য্যের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন। ব্যক্তিগত ভাবে আইন-অমান্য আন্দোলন অবলম্বিত হওয়ায় অনেকেই বিরক্ত হইয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত হরিজন আন্দোলন সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, কোন কোন সমালোচক যদি ইহার মূলে অপর কোন উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত পাইয়া থাকেন, তাহাকে অস্বাভাবিক বলা যায় না।

বিপ্লববাদ সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, বিভিন্ন সভাসমিতিতে বিপ্লব-বাদের বিরুদ্ধে বাঙ্গালার জনমত যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু ইহা দমনের জন্য যে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, উহা একটু ঢিলা পড়িলেই আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত হইবার সম্ভাবনা আছে।

সময়বিশেষে তিক্ত ঔষধও গিলিতে হয়। সরকারী বিবরণীর সত্যতা সম্বন্ধে সর্ব্বথা সন্দেহ প্রকাশ করা যায় না।

হিন্দু সংগঠন

এলাহাবাদ কুম্ভমেলার মাঠে হিন্দু মহাসভার এক অধিবেশনে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছেন—তরবারির ঝনঝনার সঙ্গে ইয়োরোপীয় এবং অন্যান্য জাতিসমূহ সজ্যবদ্ধ হইবার চেষ্টা করিতেছে। এই অবস্থায় হিন্দুগণ যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইবার চেষ্টা না করেন, তাহা হইলে স্বগৃহেই তাঁহাদের বিপদ উপস্থিত হইবে—অপরকে নির্য্যাতন সংগঠনের উদ্দেশ্য নহে; ইহার উদ্দেশ্য আত্মপক্ষ সমর্থন।

অনুন্নত সম্প্রদায় সম্পর্কে মালব্যজী বলেন, তাহাদের প্রত্যেক বালক-বালিকার শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত; কিন্তু অর্থের ও সরকারী সাহায্যের অভাব বশতঃ তাহা সম্ভব হইতেছে না।

হিন্দুগণ যে দিন হইতে 'আত্মপক্ষসমর্থনে' অতিমাত্রায় আগ্রহশীল হইয়াছেন, সেই দিন হইতে মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে এবং অনুন্নতগণও হিন্দু সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহিতেছেন। সংগঠন কি এইরূপেই সংসাধিত হইবে? অনুন্নত সম্প্রদায়ের বালক-বালিকারা শিক্ষা লাভ করিয়া কি করিবে তাহাও আমরা বুঝি না; উন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছে বলিয়া যদি ধরা যায়, তাহা হইলে উন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকার, অন্নহীনের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহাও কি স্বীকার করিতে হয় না?

বিজ্ঞান ও কৃষি

বঙ্গীয় শিক্ষা-সপ্তাহ সম্পর্কে কলিকাতা সেনেট হলে ডক্টর মেঘনাথ সাহা বক্তৃতায় বলিয়াছেন—বাঙ্গালার বেকার-সমস্যার সমাধানকল্পে বাঙ্গালায় কইম্বাটুর ও পুসা কৃষি-গবেষণাগারের মত প্রথম শ্রেণীর একটি কৃষি-কলেজের প্রয়োজন।

ডক্টর সাহার এই বক্তৃতা হইতে বুঝিতে হয় যে, প্রচলিত কৃষিবিজ্ঞান দ্বারা কৃষির উন্নতিসাধন সম্ভব এবং পুসা ও কইম্বা-টুরের কৃষি-গবেষণা দেশের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছে।

আমরা কিন্তু দেশের বাস্তব অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিতে বাধ্য যে, আধুনিক বিজ্ঞান দেশ ও দেশবাসীর কোন উপকারই করে নাই, পরন্তু অপকার করিয়াছে। বৈজ্ঞানিকের সঙ্কীর্ণ ল্যাবরেটরি হইতে বাহির হইয়া দেশের লোকের সত্যকার অবস্থা নিরীক্ষণ করিলে, ডক্টর সাহাও এই মত সমর্থন করিবেন। বহুকাল হইতে দেশের প্রকৃত অবস্থার সহিত বৈজ্ঞানিকগণ বিচ্ছিন্ন, ফলে তাঁহাদের গবেষণা দেশের কোন কাজেই লাগে না। ভিত্তিহীন শিক্ষার প্রাচীরবদ্ধ মন্দিরে কয়েকটী ভক্ত ছাত্রের নিকট 'বাহবা' আদায় করিয়াই বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণা আজ লয়প্রাপ্ত হইতেছে—অপ্রিয় হইলেও এই সত্য আজ বৈজ্ঞানিকগণকে উপলব্ধি করিতেই হইবে।

কোন্নগর পাঠ-চক্র

বাঙলা সাহিত্যের বীরবল শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় হঠাৎ অসুস্থতার জন্ত আসিতে না পারায় অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম এ মহাশয়ের সভাপতিত্বে শিবচন্দ্র স্মৃতি উৎসব ও চক্রের সপ্তবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠান ৬ই পৌষ, রবিবার, কোন্নগর বিদ্যালয় গৃহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শিবচন্দ্র দেবের তৈলচিত্র নানা প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্যে ভূষিত হওয়ার পর শিবচন্দ্র সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং একটি কবিতা পঠিত হয়। পাঠচক্র-সম্পাদক চক্রের সাম্বৎসরিক কার্য্য-বিবরণী পাঠ করার পর কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় এবং প্রফুল্লকুমার সরকার যথাক্রমে "স্বর্গের ঠিকানা" ও "বাঙ্গালা সাহিত্যের অভাব অভিযোগ" শীর্ষক দুইটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন।

কুমারী মঞ্জুলিকা ভাদুড়ীর নৃত্য, কুমারী গীতা মিত্র, বাণী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গীত এবং শ্রীযুক্ত সারদামোহন গুপ্তের হাসির গানে সকলে বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করেন।

মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরী

খিদিরপুর মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরীর উদ্যোগে এবং কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী মহাশয়ের সভাপতিত্বে গত ২৮ শে জানুয়ারী মঙ্গলবার, বাংলা ১৩ই মাঘ চারি ঘটিকার সময় যে অষ্টাদশ বার্ষিক মধু-মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হইবার আয়োজন হইয়াছিল, তাহা মহামান্য সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের মহাপ্রয়াণের নিমিত্ত এ বৎসরের মত বন্ধ রাখা হইল।

শোক-সংবাদ

সুপ্রসিদ্ধ ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ ডাঃ নরেন্দ্রনাথ বসু গত ১৩ই পৌষ ৬৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। চিকিৎসা-শাস্ত্রে বিশেষ সম্মানের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কিয়ৎকাল উচ্চ সরকারী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু তাহা ত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে চিকিৎসকের কার্য্যে ব্রতী হন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলা দেশের একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

পরলোকগত প্রাতঃস্মরণীয় ডাঃ আর. জি করের সহিত তিনি কারমাইকেল মেডিকাল কলেজের ভিত্তি-স্থাপনা হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কলেজের উন্নতি ও অধ্যাপনায় ব্যাপৃত ছিলেন এবং কিছুদিন ইহার অধ্যক্ষরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। ভগবান্ তাঁহাকে প্রভূত অর্থের অধিকারী করিয়াছিলেন এবং তিনি কখনও চিকিৎসকের আদর্শ হইতে বিচ্যুত হন নাই। তাঁহার চিকিৎসার মূল মন্ত্র ছিল আর্ত্ত ও বিপন্নের রক্ষা।

সৌজন্য স্বীকার

এই সংখ্যায় প্রকাশিত পরলোকগত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও বর্ত্তমান সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ডের প্রতিকৃতি দুইখানির ব্লক কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সৌজন্যে প্রাপ্ত। 'খেলোয়াড়' শীর্ষে কয়েকখানি ব্লক অ্যাডভান্স পত্রিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত।

ভারতীয় ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের স্বরূপ

স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের "ভারতীয় ধর্ম্ম" ও ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের "ধর্ম্মের স্বরূপ" সম্পর্কে বক্তৃতা বর্ত্তমান সংখ্যায় আলোচিত হইবে বলিয়া গত সংখ্যায় বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। স্থানাভাবে ঐ আলোচনা বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইল না। বারান্তরে উহা মুদ্রিত হইবে।

মাতার কর্ত্তব্য

আমাদের দেশে সাধারণতঃ মেয়েদের কৈশোর উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই বিবাহ হয়। নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মেয়েদের সম্পূর্ণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা জন্মিবার পূর্ব্বেই তাহাদের ঘাড়ে মস্ত দায়িত্ব আসিয়া পড়ে "মাতৃত্ব"। নিজের শারীরিক সুস্থতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান না জন্মাইতেই তাহাদের শিশুপালন করিবার দায়িত্ব আসিয়া পড়ে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ এই সব জননীরা যে কি প্রকারে সন্তান পালন করেন, তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন। এদেশের মেয়েরা যখন প্রথম সন্তানের জননী হন, তখন তাহাদের শিশুপালন সম্বন্ধে কোনই জ্ঞান থাকে না।

এদেশে সাধারণ সূতিকা-গৃহ যে ভাবে তৈরী হয়, তাহাতে এই শীত ঋতুতে সদ্যোজাত শিশু অতি সহজে সর্দ্দিকাশিতে আক্রান্ত হয়। শিশু-পালনে অনভিজ্ঞা কিশোরী মাতা এই শিশুর উপযুক্ত যত্ন করিতে পারে না। কি ভাবে শিশুকে রাখিলে শিশু সুস্থ থাকিবে, তাহা সম্যকরূপে না বুঝিতে পারিয়া মায়েরা শিশুর অসুস্থতার কারণ হইয়া পড়েন। জন্মের পর হইতে অতি সহজে সর্দ্দিকাশিতে আক্রান্ত হইবার অভ্যাস একবার দাঁড়াইয়া গেলে শীঘ্র প্রকৃতি এ অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারে না এবং ক্রমে ক্রমে শ্বাসযন্ত্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি ভয়াবহ রোগ আসিয়া আক্রমণ করে। ফুসফুস একবার দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে তাহা সবল করিতে বহু কষ্ট পাইতে হয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথমাবস্থায় সামান্য সর্দ্দিকাশিকে অবহেলা করিবার ফলে ফুসফুস দুর্ব্বল হইয়া অদূরভবিষ্যতে ইহা দুরারোগ্য ভীষণ ক্ষয়রোগের আবাসস্থল হইয়া পড়ে, ইহা দেখা যায়। কাজেই জননীর প্রধান কর্ত্তব্য সন্তানকে অতি সতর্কভাবে পালন করা; যাহাতে সন্তান সর্দ্দিকাশিতে আক্রান্ত না হয়। ঠাণ্ডা পড়িলেই গরম জামাকাপড়ে শিশুর শরীর আচ্ছাদিত করা এবং সর্দ্দিকাশিতে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা দেখিলেই উপযুক্ত ঔষধ খাওয়ান কর্ত্তব্য। সর্দ্দিকাশি এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগে সুইজারল্যাণ্ডের "রচি" কোম্পানীর "সিরোলীন" অব্যর্থ ঔষধ। রোগ নিবারণ করিতে হইলে, শীতকালে সামান্য সর্দ্দিকাশি হইবামাত্র শিশুগণকে প্রতিদিন নিয়মিত "সিরোলীন" খাওয়াইলে ফুসফুস সবল হয় ও রোগবীজাণু ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং ফুসফুস সম্বন্ধীয় ব্যাধির আক্রমণ হইতেও রক্ষা পাওয়া যায়।

অপর পক্ষে মাতার কোন প্রকার শ্বাসপীড়া থাকিলে সন্তানের শরীরে রোগের বীজাণু প্রবেশ করিবার বিশেষ সম্ভাবনা। এ প্রকারে অনেক নিরীহ শিশু ইনফ্লুয়েঞ্জা, যক্ষ্মা প্রভৃতি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়।

"সিরোলীন" খাইতে মিষ্ট এবং সুস্বাদু বলিয়া শিশুগণ স্বেচ্ছায় ইহা খাইতে চাহিবে। ইউরোপের প্রত্যেক দেশে পাকা গৃহিণীগণ তাঁহাদের সন্তানসন্ততিদিগকে সর্দ্দিকাশির হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য এক বোতল "সিরোলীন" গৃহে রাখেন। বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ "রচি" কোম্পানীর প্রস্তুত "সিরোলীনে"র সর্ব্বতোভাবে প্রশংসা করেন।

—ডাঃ এস. এন. ঘোষ, এম-বি

চৌষট্টি শিল্পকলার একটি

ভালোভাবে চা তৈরী করাকে চৌষট্টি শিল্পকলার একটী বলা যায়। কিন্তু সত্যিকার ভালো চা কদাচিৎ খেতে পাওয়া যায়। অনেক বাড়ীতে চায়ের জল ত একরকম সারাদিনই ফোটে। তবু খুব কম বাড়ীতেই চা খেয়ে সুখ হয়। একটু যত্ন নিয়ে ঠিক প্রণালীটি অনুসরণ করলেই চা অতি সহজে তৈরী হয়। চা খারাপ হয় শুধু বাড়ীর গৃহিণীদের অবহেলায় ও অপটু চাকর-বাকরদের দোষে। তাদের নিজের দোষে চায়ের অকারণে নিন্দে হয়, এ সত্যিই বড় দুঃখের কথা।

চা-পানের নিয়ম-কানুন জটিল নয়। সে গুলি আয়ত্ত করাও কঠিন নয়। মোদ্দা কথা, ঠিকমত সে-নিয়মগুলি লোককে দিয়ে পালন করানই শক্ত। ভালো চা তৈরীর জন্য কোন যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না, শুধু দুটী হাত আর সেগুলি পরিচালনায় একটু মনোযোগ দিলেই হ'ল। চা তৈরীতে একটু মনোযোগ বিশেষভাবে দরকার। অনেক সময় দেখা যায় তৈরীতে নিপুণ হলেও মনোযোগের অভাবে চা ঠিকমত হয় না।

ভালো চা তৈরীর আসল রহস্য রয়েছে তার জলে। জল টাট্‌কা হওয়া দরকার এবং তা ঠিকমত ফোটানও প্রয়োজন। জল বেশী ফোটালে, আগেকার ফোটান হ'লে বা কম ফুটলে, চা বেতার ও বিস্বাদ হবে। চায়ের পাতা ভেজানর কৌশল তার পরে জানা দরকার; পাঁচ মিনিট ভেজবার আগেই চা যদি পেয়ালায় ঢালা যায়, তা হলে স্বাদ ও গন্ধ ঠিকমত হবে না, এ ক্রটীর জন্য চা'কে দোষী করা যায় না। সংক্ষেপে চায়ের পেয়ালা উপভোগ্য করতে হলে প্রস্তুত করার জন্য উপযুক্ত সময় দিতে হবে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের এদিক ওদিক হ'লে চলবে না।

চা প্রস্তুতের ব্যাপারে এই দুইটী প্রয়োজনীয় কথা মনে রেখে সেই পুরাণ নিয়মটি অনুসরণ করতে হ'বে ;"লোকপিছু এক চামচ করে আর পাত্রের নামে আর এক চামচ বেশী"। ঠিক ধরণের পাত্রটিও দরকার। পাত্রটী মাটির হ'লেই ভালো হয়। ব্যবহারের আগে সব সময়ে যেন পাত্রটী পরিষ্কার ও শুকনো হয়। এদেশে গরম জলে পাত্র ভর্ত্তি করে তার পর চায়ের পাতা দেওয়ার রীতি বড় বেশী প্রচলিত বলে মনে হয়। এ যেন ঘোড়ার সামনে গাড়ী জোতা, পাত্রটী গরম জলে ধুয়ে নিয়ে তার ভেতর চায়ের পাতার উপর টাট্‌কা ফোটান জল ঢালাই হ'ল ঠিক পদ্ধতি।

সুপেয় চা তৈরী করবার জন্যে এর চেয়ে বেশী আর কিছু জানবার দরকার নেই। এতেই বোঝা যায় যে চা-তৈয়ারীর বিদ্যা আয়ত্ত করা অত্যন্ত সহজ। চা-রসিকের কাছে তার নিজস্ব মূল্য যা আছে তা ছাড়াও চা-কে জীবনের অন্যতম আনন্দ বলা যায়।

শ্রীশিবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস লিমিটেড, ৯০ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বিলাস।

শিল্পী—শ্রীঅরুণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

চতুর্থ বর্ষ, ১ম খণ্ড—৩য় সংখ্যা

ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়

—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

পূর্ব্বানুবৃত্তি

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের সমস্যা কি কি এবং কি করিলে ঐ সমস্যাগুলির পূরণ হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে এতাবৎ এই প্রবন্ধে যাহা যাহা লেখা হইয়াছে, তাহাতে সমস্যার রূপ, কারণ ও প্রতিষেধক কি কি তাহা দেখান হইয়াছে। এক্ষণে কি করিলে ঐ প্রতিষেধকগুলি কার্য্যপ্রসূ হইতে পারে, তাহার আলোচনা করা হইতেছে।

যাহা লইয়া ভারতবর্ষের বর্ত্তমান দুরবস্থা, তাহারই নাম আমাদের সমস্যার রূপ।

আমাদের দুরবস্থা সংক্ষেপতঃ চারি রকমের, যথা :—

(১) কৃষক, তাঁতী, যুগী, কুম্ভকার এবং কর্ম্মকার প্রভৃতি শ্রমজীবিগণের অন্নাভাব ;

(২) শিক্ষিত যুবক ও শ্রমজীবিগণের বেকারাবস্থা এবং অসন্তুষ্টি ;

(৩) উকিল, ব্যারিষ্টার প্রভৃতি আইন-ব্যবসায়ী, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী এবং বণিকগণের পরমুখাপেক্ষিতা, অর্থকৃচ্ছ্রতা এবং অসন্তুষ্টি ;

(৪) সমস্ত অধিবাসীর স্বাস্থ্যহীনতা, অকালমৃত্যু, অসন্তুষ্টি এবং পরমুখাপেক্ষিতা।

এই দুরবস্থার কারণ তেরটী : –

(১) জমীর উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস ;

(২) পণ্যদ্রব্যের মূল্যের সাদৃশ্যের অভাব (want of parity) ;

(৩) কৃষি প্রভৃতি জীবিকার্জ্জনের চারিটী পন্থাতেই যাহাতে ন্যূনকল্পে গরীবানাভাবে পরিবার প্রতিপালিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থার অভাব ;

(৪) উপরোক্ত চারিটী পন্থাতেই যাহাতে শ্রমজীবিগণের পারিশ্রমিকের সাদৃশ্য থাকে, তাহার ব্যবস্থার অভাব ;

(৫) প্রকৃত বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে কি না তাহার পরীক্ষাদ্বারা যাহাতে শ্রমজীবী (manual workers) ও বিভিন্ন পরিচালকগণের (officers and subordinate officers) পদগৌরবের তারতম্য স্থিরীকৃত হয়, তাহার ব্যবস্থার অভাব ;

(৬) বুদ্ধির উৎকর্ষের তারতম্যানুসারে যাহাতে মানুষের উপার্জ্জনের তারতম্য হয়, তদনুরূপ ব্যবস্থার অভাব ;

(৭) জীবিকার্জ্জনের চারিটী পন্থাতেই যাহাতে সর্ব্বোচ্চ (maximum) উপার্জ্জন একরূপ হয়, তাহার ব্যবস্থার অভাব ;

(৮) সম্পূর্ণ ও নির্ভুল শরীরগঠন-বিদ্যার (Anatomy) অভাব ;

(৯) সম্পূর্ণ ও নির্ভুল শরীরবিধান-বিদ্যার (Physiology) অভাব ;

(১০) সম্পূর্ণ ও নির্ভুল পদার্থবিদ্যার (Physics) অভাব ;

(১১) সম্পূর্ণ ও নির্ভুল রসায়নের (Chemistry) অভাব ;

(১২) জল ও বায়ু যাহাতে অস্বাস্থ্যকর না হয়, তদনুরূপ ব্যবস্থার অভাব ;

(১৩) শিক্ষাপদ্ধতি যেরূপ হইলে ছাত্রগণ স্ব স্ব বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিয়া স্বাবলম্বী হইতে পারেন, সেই শিক্ষাপদ্ধতির অভাব।

আমাদের দুরবস্থার অপনোদন করিতে হইলে নিম্নলিখিত দ্বাবিংশতি ব্যবস্থা যাহাতে দেশের মধ্যে অবলম্বিত হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

(১) জমীর স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া যাহাতে কোনরূপ সার ব্যবহার না করিলেও প্রতি বিঘা জমী হইতে অন্ততঃ ১২ মণ ধান অথবা গম অথবা তন্মূল্যের অপর কোন শস্যের উৎপাদন হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ;

(২) যে জমীর স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তি প্রতি বিঘায় ৪ মণ ধান অথবা গম অথবা তন্মূল্যেরও কম, সেই জমী যাহাতে কোন কৃষক চাষ না করেন এবং তাহার উৎপাদিকা-শক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তদনুরূপ ব্যবস্থা ;

(৩) নদীগুলি যাহাতে এত গভীর হয় যে, বর্ষাকালে বৃষ্টির পরিমাণ যতই বেশী হউক না কেন, তাহার দুই পাড় প্লাবিত হইবার কোন সম্ভাবনা যাহাতে না থাকে, তাহার ব্যবস্থা ;

(৪) বিভিন্ন খাদ্যশস্য, শিল্পজাত ব্যবহার্য্য জিনিষ এবং গৃহনির্ম্মাণের উপকরণের বিভিন্ন মূল্যের মধ্যে যাহাতে সাদৃশ্য (parity) থাকে, তাহার ব্যবস্থা ;

(৫) সাংসারিক জীবিকানির্ব্বাহের খরচ ও পারিশ্রমিকের মধ্যে যাহাতে সাদৃশ্য (parity) থাকে, তাহার ব্যবস্থা ;

(৬) পরিশ্রমজাত দ্রব্যের মূল্যের তারতম্যানুসারে যাহাতে পারিশ্রমিকের তারতম্য স্থির করা হয়, তদনুরূপ ব্যবস্থা ;

(৭) যাহাতে ১৮ বৎসরের মধ্যে বালকগণের দশটী ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি কার্য্যক্ষম হয় এবং ঐ বয়সে যাহাতে তাহারা উপার্জ্জনক্ষম হয়, তদনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা ;

(৮) কোন্ খাদ্য, পানীয়, বায়ু, বাসস্থান এবং ব্যবহার্য্য বস্তু স্বাস্থ্যপ্রদ অথবা অস্বাস্থ্যপ্রদ, তাহা যাহাতে বালকগণ ১৮ বৎসরের মধ্যে পরিজ্ঞাত হইতে পারে এবং যাহাতে তাহাদের পরমায়ুবৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য থাকে, তদনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা ;

(৯) জীবিকার্জ্জনের জন্য দেশের মধ্যে কোথায় কত লোকের উপযোগী কি ব্যবস্থা আছে এবং ঐ ঐ ব্যবস্থানুসারে কি কি শিক্ষা করিলে জীবিকার্জ্জন করা সম্ভব হয়, তাহা যাহাতে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক বালক জানিতে পারে, তদনুরূপ ব্যবস্থা ;

(১০) যাহা যাহা শিক্ষা করিলে জীবিকার্জ্জন করা সম্ভব হয়, তাহা যাহাতে প্রাপ্তবয়স্ক বালকগণ ইচ্ছানুরূপ শিক্ষা করিতে পারে, তদনুরূপ ব্যবস্থা ;

(১১) যে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক বালক উচ্চশিক্ষা অর্থাৎ বিজ্ঞানশিক্ষাপ্রার্থী হইবে, তাহাদের হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় উচ্চশিক্ষার উপযোগী হইয়াছে কি না এবং মন ও বুদ্ধি ভবিষ্যতে তদনুরূপ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিবে কি না, তাহার পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং যাহাতে অনুত্তীর্ণ বালকগণ উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ লাভ না করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ;

(১২) কোন বস্তুবিষয়ক বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইলে ঐ বস্তুর কত রকম পরীক্ষা কিরূপ ভাবে করিতে হয় এবং নিজেকেই বা কিরূপ ভাবে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা যাহাতে উচ্চশিক্ষার্থী যুবকগণ শিক্ষা করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ;

(১৩) বস্তুর কত রকম পরীক্ষা কিরূপ ভাবে করিতে হয়, অথবা নিজের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি কিরূপ ভাবে গঠিত করিতে হয়, তাহা না শিখিয়া যাহাতে কেহ উচ্চশিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হইতে না পারেন, তাহার ব্যবস্থা ;

(১৪) উচ্চশিক্ষিত না হইয়া যাহাতে কেহ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিতে, অথবা শিক্ষকতা করিতে, অথবা চিকিৎসা ও আইন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে, অথবা ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে অথবা বিচার ও শাসন-বিভাগে প্রবেশ লাভ করিতে না পারেন, তাহার ব্যবস্থা ;

(১৫) দেশের জলবায়ু যাহাতে কোনরূপে বিকৃত না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ;

(১৬) শ্রমজীবিগণ যাহাতে ১৮ বৎসর বয়সে উপার্জ্জন করিবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা ;

(১৭) দেশের মধ্যে যাহাতে মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৩০ জনের বেশী শিল্প, বাণিজ্য, ওকালতী, ডাক্তারী প্রভৃতি ব্যবসায়, শিক্ষকতা ও সরকারী চাকুরীর

উপর নির্ভরশীল না হয়, তাহার ব্যবস্থা এবং যাহাতে কৃষি লাভবান্ হয়, তাহার ব্যবস্থা ;

(১৮) বালকগণের যাহাতে ১৮ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে বিবাহ হয়, তাহার ব্যবস্থা ;

(১৯) প্রকৃত ভাবে বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন যাঁহারা না করিতে পারেন, তাঁহারা যাহাতে হস্তপদাদির শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা অথবা শ্রমজীবী হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তাহার ব্যবস্থা ;

(২০) প্রকৃত ভাবে বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন যাঁহারা না করিতে পারেন, তাঁহারা যাহাতে মস্তিষ্কজীবী না হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা ;

(২১) কোন প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোক যাহাতে স্বামী ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের সহিত অথবা কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ যাহাতে স্বীয় স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীলোকের সহিত অবাধে মেলামেশা না করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা ;

(২২) প্রত্যেক স্ত্রীলোক যাহাতে সংসারের কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং কোন উপার্জ্জনের কার্য্যে প্রবৃত্ত না হন, তাহার ব্যবস্থা।

জমীর বালুকান্তর পর্য্যন্ত নদী ও খালগুলির পঙ্কোদ্ধার সাধন করিতে পারিলে জমীর উর্ব্বরাশক্তির উন্নতি সাধিত হইবে এবং বর্ষাকালে বন্যা-প্লাবনের আশঙ্কাও কমিয়া যাইবে। দেশস্থ সমস্ত নদী ও খাল সারা বৎসর জলে পরিপূর্ণ থাকিলে সর্ব্বত্রই স্রোত প্রবাহিত থাকিবে এবং তাহা হইলে দেশের ম্যালেরিয়া, বেরীবেরী, রক্তের চাপ প্রভৃতি রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা তিরোহিত হইবে। নদী ও খালগুলি জলে পরিপূর্ণ থাকিলে ভূমিকম্পের আশঙ্কাও দূরীভূত হইবে।

আমাদের উপরোক্ত মন্তব্য বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ জানিতে হইবে, জমীর উৎপাদিকা-শক্তি কাহাকে বলে। তেজ ও রসের দ্বারা জমীর উৎপাদিকা-শক্তি সাধিত হইয়া থাকে। রৌদ্র ও বৃষ্টি দ্বারা জমীতে তেজ ও রসের কার্য্য সম্পাদিত হয় বটে, কিন্তু জমীর অভ্যন্তরে স্বাভাবিক তেজ ও রস সঞ্চিত না থাকিলে কেবল রৌদ্র ও বৃষ্টি দ্বারা অথবা অন্য কোন কৃত্রিম উপায়ে তাহার কার্য্য যথাযথ ভাবে সাধিত হওয়া সম্ভবপর নহে। যদি কেবল রৌদ্র অথবা বৃষ্টির দ্বারাই জমীর উর্ব্বরাশক্তি বজায় রাখা সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে যে সমস্ত জমী কর্দ্দমময় অথবা মরুভূমির মত বালুকা-পরিপূর্ণ, তাহাতেও ফসল হইতে পারিত, কারণ এমন বহু কর্দ্দমময় জমী দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে রৌদ্রের অভাব হয় না এবং মরুভূমিতেও বৃষ্টি বর্ষিত হইয়া থাকে।

কিন্তু যে সমস্ত জমী অতিরিক্ত কর্দ্দমময়, সেই সমস্ত জমীতে এবং মরুভূমিতে কখনও স্বাস্থ্যপ্রদ ফসল উৎপন্ন করা সম্ভব হয় না। কৃত্রিম উপায়ে অতিরিক্ত তাপের সঞ্চারণ দ্বারা অতিরিক্ত কর্দ্দমময় জমীতে এবং কৃত্রিম সারের দ্বারা মরুভূমির জমীতে কখন কখন কিছু কিছু ফসল উৎপন্ন হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু ঐ ফসল কখন মানুষের সম্পূর্ণ শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষার সহায়ক হয় না এবং অতিরিক্ত ব্যয়-নিবন্ধন ঐ সমস্ত কৃত্রিম উপায়ের কৃষিকার্য্য দ্বারা মানুষ লাভবান্ হইতে পারে না। কৃত্রিম তাপ অথবা সারের দ্বারা যে সমস্ত ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা যে পূর্ণভাবে মানুষের স্বাস্থ্য বজায় রাখিতে সক্ষম নহে, ঐ সমস্ত ফসল ব্যবহার করিলে শরীরের কি অবস্থা হয়, তাহা একটু সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক জলসেচন-প্রণালী (Irrigation) দ্বারাও জমীর উৎপাদিকা-শক্তির উন্নতি সাধন করা সম্ভবপর নহে, কারণ তাহাতে কেবল জমীর উপরিভাগে জল-সিঞ্চনের ব্যবস্থা সাধিত হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা জমীর অভ্যন্তরে রস-সঞ্চয়ের কোন ব্যবস্থা সাধিত হয় না। পরন্তু বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক জলসেচন-প্রণালীতে দ্রুতগামী স্রোত-প্রবাহের কোন বন্দোবস্ত না থাকায় জমীর মধ্যে বিষাক্ত বাষ্পের সঞ্চয় হইয়া থাকে এবং তাহাতে মশকাদি অতিরিক্ত কীট-পতঙ্গের উদ্ভব হইয়া দেশের মধ্যে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মানুষ বহু সহস্র বৎসর হইতে প্রকৃত কৃষিবিজ্ঞান বিস্মৃত হইয়াছে বলিয়া বহু সহস্র বৎসর হইতে জমীর উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য জগতের কুত্রাপি কেহ নদীগুলির পঙ্কোদ্ধার সাধন করেন নাই। ফলে জগতের সর্ব্বত্রই প্রায়শঃ নদীগুলি অপ্রসর এবং অগভীর হইয়া আসিতেছে এবং সর্ব্বত্রই জমীর উর্ব্বরাশক্তিও হ্রাস পাইয়া আসিতেছে। কৃত্রিম সারের সাহায্য ব্যতীত

কোন এক বিঘা জমী হইতে প্রত্যেক পাঁচ বৎসরে গড়ে প্রতি বৎসর কত ফসল হয়,তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যে ক্রমশঃই হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে, তৎসম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায়। জগতের যেখানে যেখানে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক জলসেচন প্রণালী (Irrigation) ব্যবহৃত হইতেছে, সেই সেই স্থানের প্রতি পাঁচ বৎসরে গড়ে প্রতি বিঘায় কত পরিমাণের শস্য উৎপন্ন হইতেছে, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে যে, প্রায়শঃ ঐ বৈজ্ঞানিক জলসেচন-প্রণালীর প্রবর্ত্তনাবধি প্রারম্ভের কয়েক বৎসরে ঐ ঐ স্থানে প্রতি বিঘার বাৎসরিক উৎপন্ন শস্যের পরিমাণে উপরোক্ত ক্রমিক হ্রাস সংঘটিত হয় না বটে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য ভাবে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণের কোন বৃদ্ধিও সংঘটিত হয় না। অন্যত্র প্রতি পাঁচ বৎসরের উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ যেরূপ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে বলিয়া পরিলক্ষিত হয়, তাহা ঐ ঐ স্থানে প্রারম্ভের কয়েক বৎসরে দেখা যায় না বটে, কিন্তু কিছুদিন পরে আবার পূর্ব্ববৎ উৎপাদিকা-শক্তির ক্ষয় আরম্ভ হইয়া থাকে। অধিকন্তু জমীর অভ্যন্তরে বিষাক্ত বাষ্পের সঞ্চয় বশতঃ ঐ ঐ স্থানে অতিরিক্ত ভাবে মশকাদি কীট-পতঙ্গের উদ্ভব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে এবং তাহাতে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব ও বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া দেখা যায়। মশকাদির জন্য ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে, ইহা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণও স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু কেন যে অতিরিক্ত মশকের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে, তৎসম্বন্ধে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ প্রায়শঃ নির্ব্বাক।

আমাদের দেশের ম্যালেরিয়ার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এদেশে এমন একদিন ছিল, যখন লোকে ম্যালেরিয়ার নাম পর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত ছিল না এবং যে দিন হইতে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক জলসিঞ্চন-প্রণালীর প্রবর্ত্তন হইয়াছে, সেই দিন হইতে ম্যালেরিয়াও দেখা দিয়াছে এবং দেশের নদীগুলির গভীরতা ও প্রসার যত কমিয়া আসিতেছে, বিবিধ রোগের প্রকোপও তত বাড়িয়া যাইতেছে।

ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির উদ্ভব কেন হয়, তৎসম্বন্ধে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক কোন বিশ্বাসযোগ্য তথ্য এখনও আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

তাঁহাদের মতে পৃথিবীর বহিরাবরণে যে কঠিন ভাগ (crust) আছে, তাহার উপাদানের দৌর্ব্বল্যবশতঃ যে যে স্থান অত্যন্ত খাড়া (steep), সেই সেই স্থানে ভূমিকম্পের উদ্ভব হয়। আগ্নেয়গিরির উদ্ভব তাঁহাদের মতে পৃথিবীর ঐ বহিরাবরণের ছিদ্রবশতঃ ঘটিয়া থাকে। পৃথিবীর বহিরাবরণের দৌর্ব্বল্য ও ছিদ্রবশতঃ ভূমিকম্পের ও আগ্নেয়-গিরির উদ্ভব হইয়া থাকে, ইহা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কেন যে ঐ বহিরাবরণের দৌর্ব্বল্য ও ছিদ্র হইয়া থাকে, তৎসম্বন্ধে কোন কথা তাঁহারা বলেন নাই। একে ত পৃথিবীর বহিরাবরণ (crust) বলিতে কি বুঝায়, তাহা যথাযথ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর কি না, ইহা চিন্তার যোগ্য। তাহার পর কেন ঐ বহিরাবরণের দৌর্ব্বল্য অথবা ছিদ্র ঘটিয়া থাকে, তাহা যদি স্থির করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে ভূমিকম্প অথবা আগ্নেয়গিরি সম্বন্ধে কোন বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা যুক্তিসঙ্গত ভাবে বলা যায় না।

ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির উদ্ভব কেন হয়, তাহা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যথাযথ ভাবে ঠিক করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু ভারতীয় ঋষিগণ বহু সহস্র বৎসর আগে উহার কারণ নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছিলেন।

সর্ব্বত্রই জমীর সর্ব্বনিম্ন স্তরে যে খনিজ পদার্থ রহিয়াছে, তাহার দাহমানতাবশতঃ উহা হইতে প্রতিনিয়ত উষ্ণ বাষ্পো-দ্গম হইতেছে। নদীগুলি জমীর বালুকান্তর পর্য্যন্ত গভীর থাকিলে জমী সর্ব্বদা রসাল থাকে এবং তখন নিম্নস্তরের খনিজ পদার্থ হইতে উত্থিত উষ্ণ বাষ্প জমীর দ্বিতীয় স্তরস্থিত রসের সহিত মিলিত হইয়া জমীর উর্ব্বরাশক্তি সাধিত করিয়া থাকে। কিন্তু নদীগুলি জমীর বালুকান্তর পর্য্যন্ত গভীর না থাকিলে জমী ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া যায় এবং তখন সর্ব্বনিম্নস্তরস্থিত খনিজ পদার্থের বাষ্প ক্রমশঃই উষ্ণ হইতে উষ্ণতর হইতে থাকে এবং জমীর মধ্যে চলচ্ছক্তির উদ্ভব হইয়া জমীকে ক্রমশঃ কম্পিত করিয়া তোলে এবং পরিশেষে ঐ খনিজ পদার্থসমূহ আগ্নেয়গিরিরূপে উদ্ভূত হইতে থাকে।

এই সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষিগণ কোথায় কি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা জানিবার জন্য যাঁহারা উৎসুক, তাঁহা-দিগকে আমরা 'নিরুক্তে'র মধ্যে 'পর্জ্জন্য' সম্বন্ধে যে স্থানে আলোচনা করা হইয়াছে, সেই স্থান অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ

করি। ঐ আলোচনা অতি বিস্তৃত এবং উহাতে আরও দেখা যাইবে যে, চারিটী বেদে ঐ সম্বন্ধীয় তথ্য আরও অধিকতর বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। প্রকৃত সংস্কৃত ভাষাবিস্মৃতির ফলে এক্ষণে হয় ত পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকেই উহা যথাযথ ভাবে বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা না জানিয়াও নিজদিগকে ঋষিদিগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বুঝিতে পারেন না বলিয়া ঋষিদিগের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অসম্পূর্ণ মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

কাযেই দেখা যাইতেছে যে, জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিবার একমাত্র উপায় সমস্ত নদী ও খালের পঙ্কোদ্ধার করিয়া যাহাতে সারা বৎসর ঐ নদী ও খালে সর্ব্বত্র স্রোত প্রবাহিত থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা এবং উহাই দেশ হইতে সংক্রামক রোগের কীটাণু তিরোহিত করিবার প্রধান পন্থা।

নদী ও খালগুলির পঙ্কোদ্ধার সাধন করা প্রচুর ব্যয়-সাপেক্ষ বটে, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট ও দেশের লোকের ঐকান্তিক সহযোগ থাকিলে ঐ অর্থ সংগ্রহ করা একেবারেই কষ্টসাধ্য নহে।

বর্ত্তমান সময়ে টাকা বলিতে বুঝায় ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রা ও কাগজের নোট। আন্তর্জ্জাতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টের সাধারণতঃ একটী পদ্ধতি অনুসারে নোট মুদ্রিত করিতে হয়। কিন্তু যদি কোন গভর্ণমেণ্ট দেশস্থ লোকের জীবন রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া ঐ আন্তর্জ্জাতিক শৃঙ্খলা উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে যথেচ্ছ নোট-মুদ্রণে কোন বাধা থাকিতে পারে না। ভারতবর্ষে যেরূপ ইংরাজ-বিদ্বেষের বন্যা প্রবাহিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে, তাহাতে বর্ত্তমান অবস্থায় ইংরাজের পক্ষে আন্তর্জ্জাতিক শৃঙ্খলা উপেক্ষা করা সম্ভব নহে। তাহার কারণ, ইংরাজ জাতির স্বীয় দেশের যে অবস্থা, তাহাতে তাঁহাদের পক্ষে অন্য কোন দেশের সহায়তা ব্যতীত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু সম্মিলিত ভারতবাসীর নিকট হইতে যদি ইংরাজ প্রতিশ্রুতি পান যে, অন্য কোন জাতির সহিত তাঁহার সখ্য নষ্ট হইলেও ভারতবর্ষ তাঁহার সহায়তা করিবে এবং যদি দেখান যায় যে, একমাত্র ভারতবর্ষের দ্বারা সমগ্র ইংরাজ জাতির ও ভারতবাসীর সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা সম্ভব, তা[হা] হইলে ইচ্ছানুরূপ পরিমাণে নোট-মুদ্রণে ইংরাজের যে যুক্তিসঙ্গত প্রতিবন্ধক থাকিতে পারে না।

দেশস্থ জমীর স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি করিব[ার] ব্যবস্থা হইলে দেশের মধ্যে যথেষ্ট খাদ্য-পরিধেয় ও অন্যা[ন্য] ব্যবহার্য্য জিনিষ প্রস্তুত করিবার উপযোগী প্রচুর শস্যোৎপা[দন] করা সম্ভব হয় বটে এবং দেশের সমৃদ্ধিও বৃদ্ধি পাইতে পা[রে] বটে, কিন্তু বিবিধ শস্য যাহাতে দেশের সমস্ত লোক প্র[চুর] পরিমাণে পাইতে পারেন, তদনুরূপ ক্রয়-বিক্রয়ের বন্দোব[স্ত] না হইলে দেশের সকলের পক্ষে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযা[ত্রা] নির্ব্বাহ করা কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে। জীবনযাত্রা নির্ব্ব[াহ] করিতে হইলে প্রত্যেকেরই একাধিক জমীজাত ও শিল্পজ দ্রব্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে। অথচ কেহই একা প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য উৎপন্ন করিতে সক্ষম হন ন[া]। কেহ বা ধান্য উৎপাদন করেন, কেহ বা ধান্য হইতে চা[উল] প্রস্তুত করিয়া থাকেন, কেহ বা তুলা উৎপাদন করে[ন], কেহ বা তুলা হইতে সূতা ও কাপড় উৎপন্ন করিয়া থাকে[ন], কেহ বা সর্ষপ, কেহ বা ডা'ল ইত্যাদি উৎপন্ন করি[য়া] থাকেন। যিনি ধান্য উৎপাদন করেন, তিনি তাঁহার উদ্ব[ৃত্ত] ধান্য বিক্রয় করিয়া মূল্য বাবদ যাহা পাইয়া থাকেন, তদ্দ্ব[ারা] বস্ত্র ও ডা'ল প্রভৃতি ক্রয় করিয়া থাকেন। যিনি ব[স্ত্র] উৎপাদন করেন, তাহার মূল্য যতই অধিক হউক না কেন, ত[াহা] যদি অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিবার পক্ষে প্রচুর না [হয়], তাহা হইলে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ যতই প্রচুর হউক [না] কেন, উৎপন্নকারীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব থাকিয়া যাইে[ব]। অন্যদিকে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য যতই কম হউক না কেন, ত[াহা] যদি অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিবার পক্ষে যথেষ্ট [হয়], তাহা হইলে উৎপন্নকারীর কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অ[ভাব] থাকিতে পারে না। কাযেই দেখা যাইতেছে যে, দ্রব্যের [পরিমাণ] বেশী হউক অথবা কম হউক, তাহাতে মানুষের বিশেষ [কোন] ক্ষতিবৃদ্ধি নাই এবং যাহাতে বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্যের সাদৃশ্য (parity) থাকে, তাহার ব্যবস্থা হইলেই মানু[ষের] দুরবস্থা দুরীভূত হইতে পারে।

যাহাতে বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্যের মধ্যে সা[দৃশ্য]

তদনুরূপ আইন যদি কোন গভর্ণমেণ্ট প্রণয়ন করেন, তাহা হইলে ঐ ব্যবস্থা সাধন করা কোন ক্রমেই কষ্টসাধ্য নহে।

দেশের মধ্যে যাহাতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয় এবং তাহার আদান-প্রদানে যাহাতে সাদৃশ্য থাকে, তাহার ব্যবস্থা হইলে দেশের সমগ্র জনসাধারণের দুরবস্থা দূর হওয়া সম্ভবপর হয় বটে, কিন্তু কোন্ শস্য মানুষের স্বাস্থ্যপ্রদ, কি উপায়ে তাহা উৎপাদন করিতে হয়, কি করিয়া তাহাকে ব্যবহারোপযোগী করিতে হয় এবং তাহার আদান-প্রদানেরই বা পদ্ধতি কি, তাহা জানা না থাকিলে কার্য্যতঃ মানুষের পক্ষে স্ব স্ব প্রয়োজনীয় দ্রব্য উপার্জ্জন করা অথবা নীরোগ হওয়া সম্ভবপর হয় না। কাযেই মানুষের যথাবিহিত শিক্ষার প্রয়োজন হইয়া থাকে। কোন্ দ্রব্য হিতকর অথবা অহিতকর, কোন্ কার্য্য হিতকর অথবা অহিতকর, কোন্ গুণ হিতকর অথবা অহিতকর, কি উপায়ে হিতকর দ্রব্য ও গুণ অর্জ্জন করিতে হয়, কি অভ্যাসে হিতকর কার্য্যে সক্ষমতা লাভ করিতে পারা যায়, তৎসম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করা শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। এবংবিধ জ্ঞানলাভের দ্বারা বালকগণ যাহাতে উপার্জ্জনক্ষম হইতে পারে, তাহার আয়োজন করিতে হইলে তাহাদের দশটী ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি যাহাতে যথাসম্ভব অল্প বয়সের মধ্যে কার্য্যক্ষম হয়, তাহার ব্যবস্থা হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। ঐ ব্যবস্থা সাধন করিতে হইলে উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষকের প্রয়োজন হইয়া থাকে। বর্ত্তমান কালে যে শিক্ষা প্রচলিত আছে, তাহাতে যথাসম্ভব অল্পবয়সে বালকগণের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির পরিপক্কতাসাধনের কোন ব্যবস্থা নাই। ফলে যাহারা শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন, তাঁহারা অধিক বয়স পর্য্যন্ত পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি অভিভাবকদিগের গলগ্রহ হইয়া পড়েন এবং ইন্দ্রিয়াদির পরিপক্কতা লাভ করা ত দূরের কথা, তাঁহাদের শিক্ষা-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে একাধিক ইন্দ্রিয় অক্ষম ও অপটু হইয়া পড়ে।

দেশীয় জনসাধারণের অথবা কোন গভর্ণমেণ্টের ঐকান্তিক চেষ্টার উদ্ভব হইলে আইন প্রণয়ন দ্বারা যথাবিহিত শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা বিন্দুমাত্রও কষ্টসাধ্য নহে।

যাহাতে প্রচুর শস্যের উৎপাদন হয় এবং তাহার আদান-প্রদানে যাহাতে সাদৃশ্য থাকে এবং দেশের মধ্যে যাহাতে যথাবিহিত শিক্ষার প্রবর্ত্তন হয়, তাহার ব্যবস্থা হইলে মানুষের উপার্জ্জনক্ষম হইয়া প্রাচুর্য্যের সহিত নীরোগ জীবন যাপন করা সম্ভবপর হয় বটে, কিন্তু দেশের জলবায়ু যাহাতে অস্বাস্থ্যকর না হয়, তাহার ব্যবস্থা না থাকিলে মানুষের অহরহঃ রুগ্ন হইবার আশঙ্কা থাকিয়া যায়। কাযেই দেশের জলবায়ু যাহাতে কেহ বিকৃত এবং অস্বাস্থ্যকর না করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করাও একান্ত প্রয়োজনীয়। ইহাও আইন প্রণয়নের দ্বারা সাধিত হইতে পারে।

এইরূপে প্রচুর শস্যের উৎপাদন, তাহার আদান-প্রদানে সাদৃশ্যের রক্ষণ, যথাবিধি শিক্ষার প্রবর্ত্তন এবং বায়ুর অবিকৃতি সাধন করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে দেশের জনসাধারণের সর্ব্বতোভাবে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করিবার আশা হয় বটে, কিন্তু তখনও মানুষ যাহাতে তাহার স্বাভাবিক কামপ্রবৃত্তি বিধিবদ্ধ ও সংযতভাবে চরিতার্থ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা না হইলে মানুষের অসংযত, উচ্ছৃঙ্খল এবং রুগ্ন হইবার আশঙ্কা থাকিয়া যায়। স্ত্রী ও পুরুষের স্বাভাবিক কামোদ্রেক আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বিবাহের ব্যবস্থা এবং স্ত্রী-পুরুষ যাহাতে অবাধে মেলামেশা না করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে মানুষের অসংযত, উচ্ছৃঙ্খল এবং রুগ্ন হইবার আশঙ্কা কমিয়া যায়। ইহাও আইন প্রণয়নের দ্বারা সম্ভাবিত হইতে পারে।

কাযেই দেখা যাইতেছে যে, উপরোক্ত দ্বাবিংশতি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে আমাদের জনসাধারণের দুরবস্থা সম্পূর্ণভাবে উপশমিত হইতে পারে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ মিলিত হইয়া চেষ্টা করিলে ঐ দ্বাবিংশতি ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা খুবই সহজসাধ্য।

আমাদের শ্রমজীবিগণ ও শিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে বেকার-সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। তাহার পূরণও নদী এবং খালসমূহের পঙ্কোদ্ধারকার্য্য আরম্ভ হইবামাত্র সম্ভব হইতে পারে, কারণ নদীর পঙ্কোদ্ধারকার্য্যে অসংখ্য শ্রমজীবীর এবং তত্ত্বাবধায়কের প্রয়োজন হইবে।

গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের মিলিত হইতে হইলে আগে যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে ঐক্য সম্ভব হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে অর্থাৎ যাহাতে একটী সর্ব্বাঙ্গীণ জাতীয় সম্মেলন গড়িয়া উঠিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ইংরাজের সহিত অথবা গভর্ণমেণ্টের সহিত অসহযোগ-নীতি অথবা আইন-অমান্যের নীতি অথবা স্বাধীনতা অর্জ্জনের উদ্দেশ্য কোন ভারতীয় সম্মেলনে রক্ষিত হইলে সেই সম্মেলনে সমগ্র ভারতবাসীর যোগদান করা সম্ভব হইবে না এবং তাহা কখনও প্রকৃত জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

যাহাতে ভারতবর্ষের ও ইংলণ্ডের শিক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য ও গভর্ণমেণ্টের পরিচালনের সুব্যবস্থা হয়, তাহা করা যদি কোন সম্মেলনের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে ঐ সম্মেলনে প্রত্যেক ভারতবাসীর ও ইংরাজের যোগদান করা সম্ভব হইতে পারে এবং ঐ সম্মেলন সর্ব্বাঙ্গীণ প্রকৃত জাতীয় প্রতিষ্ঠান অথবা প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেস রূপে পরিগণিত হইতে পারে।

যে কর্ম্ম-পদ্ধতি অবলম্বন করিলে উপরোক্ত বাইশটী ব্যবস্থা দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, তাহাকে প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সফল করিবার কর্ম্ম-পদ্ধতি বলিতে হইবে।

প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে নিম্নলিখিত দুইটী ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন, যথা :—

(১) যাহাতে ভারতীয় জনসাধারণের প্রত্যেকের আর্থিক অসচ্ছলতা, অসন্তুষ্টি, পরমুখাপেক্ষিতা, অশান্তি, অস্বাস্থ্য এবং অকালমৃত্যুর সম্ভাবনা কমিয়া যায়, তদনুরূপ কর্ম্ম-পদ্ধতির উদ্ভাবন। (এই প্রবন্ধের প্রথমভাগে কথিত বাইশটী ব্যবস্থার তালিকা ঐ কর্ম্মপদ্ধতি)।

(২) যাহাতে ইংরাজ জনসাধারণের প্রকৃত স্বার্থের কোন অনিষ্ট ঘটিতে পারে, তাহার কার্য্য, চিন্তা ও বাক্যের ঐকান্তিক বর্জ্জন। (এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, ইংরাজগণের মধ্যেও বড় বড় উপাধিধারী এবং বড় বড় পদগৌরবান্বিত এমন লাট-বেলাট অনেকে আছেন, যাঁহারা না বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের জনসাধারণের আপাত স্বার্থ-সংরক্ষণ করিতে গিয়া তাঁহাদের প্রকৃত স্বার্থের মূলে কুঠারা-ঘাত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নির্ব্বুদ্ধিতামূলক কার্য্য, চিন্তা ও বাক্যের বিরুদ্ধ সমালোচনা অথবা বাধা প্রদান করিলে ইংরাজ জনসাধারণের প্রকৃত স্বার্থের কোন অনিষ্ট করা হয় না)।

কর্ত্তব্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহের জন্য প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাস-ন্যাল কংগ্রেসের সংগঠন (constitution) কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা চিন্তা করিবার সময় নিম্নলিখিত সত্য স্মরণ রাখি[তে] হইবে :—

(১) কংগ্রেসের সংগঠন যাহাতে গ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে প্রত্যেক গ্রামে, ইউনিয়ন-বোর্ডে, মহকুমায় এ[বং] জেলায় কংগ্রেসের শাখা স্থাপন করিবার প্রয়োজ[ন] হইবে;

(২) কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও কর্ম্মতালিকা সফল করিবা[র] জন্য যাহা যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহার দায়িত্বভার যাহাতে স্থানে স্থানে এক এ[ক] জন যথোপযুক্ত বিদ্যা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি[র] উপর অর্পিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে;

(৩) যাহাতে কর্ম্মকারের কার্য্য কুম্ভকারের হস্তে, অথব[া] কুম্ভকারের কার্য্য কর্ম্মকারের হস্তে অর্পিত না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে;

(৪) নির্লোভ ও সত্যপরায়ণ লোক যাহাতে কংগ্রেসে[র] দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মভার প্রাপ্ত হন, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে, যাঁহারা স্ব স্ব পরি-বারের জীবিকার্জ্জনের জন্য বৃত্তিহীন অথবা যাঁ[হারা] স্ব স্ব বৃত্তিদ্বারা নিজ পরিবারের ভরণপোষণোপযো[গী] যথেষ্ট উপার্জ্জনে অক্ষম, তাঁহারা যাহাতে কংগ্রেসে[র] কোন দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার প্রাপ্ত না হ[ন] তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে। যাঁহারা নিজ পরি-বারের ভরণ-পোষণে অক্ষম, তাঁহাদের হাতে জন-সাধারণের কার্য্য অর্পিত হইলে অনাচার প্রবি[ষ্ট] হইবার আশঙ্কা থাকিবে;

(৫) যাঁহারা নিজ পরিবারের ভরণপোষণে অক্ষম, তাঁহ[া]দের হাতে কংগ্রেসের কোন কার্য্যভার [অর্পণ] করিতে হইলে, তাঁহারা যাহাতে নিজ পরিবারে[র] ভরণপোষণ করিবার উপযোগী বেতন পাইতে পারেন, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইতে হইবে।

উপরোক্ত সমস্ত কথাই আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যায় বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছি। ইহার পর প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেসের সংগঠন কিরূপ হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। ঐ আলোচনা অতি সংক্ষেপে গত মাসের বঙ্গশ্রীতে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সংখ্যায় উহা আরও বিশদ ভাবে পর্য্যালোচনা করা হইবে।

প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেসের সংগঠন কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা বিশদভাবে আলোচনা করিবার আগে আমরা একবার দেশবাসীকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, তাঁহারা ইংরাজের সহিত ঝগড়া চালাইয়া দেশের জনসাধারণের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থার আশা যাহাতে সুদূরপরাহত হয়, তাহা পছন্দ করিবেন—অথবা ইংরাজের ও গবর্ণমেণ্টের সহিত মিলিয়া মিশিয়া যাহাতে অনতিবিলম্বে দেশের জনসাধারণের প্রত্যেকের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হয়, তাহার চেষ্টা করা পরামর্শযোগ্য বিবেচনা করিবেন।

যাঁহারা ইংরাজ ও গভর্ণমেণ্টের সহিত ঝগড়া চালাইয়া দেশের স্বাধীনতা লাভ করার চেষ্টা করা দেশবাসীর কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগকে আমরা আমাদিগের এই প্রবন্ধের কংগ্রেসের সংগঠনবিষয়ক অংশ পড়িতে নিষেধ করি। যাহারা ফাঁকা স্বাধীনতার বুলি উচ্চারণ করিয়া নিজদিগকে দেশপ্রেমিক বলিয়া মনে করেন এবং যাঁহারা দেশবাসীর নিকট হইতে ছলে বলে কৌশলে অর্থসংগ্রহ করিয়া দেশের মধ্যে হিংসামূলক বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্জলিত করিয়া তুলিয়াছেন, অথচ নিজদিগকে অহিংস মনে করেন, যাঁহারা প্রকৃত দেশপ্রেমিক যুবকবৃন্দের জীবন লইয়া খেলা করেন, অথচ তাঁহাদের মুক্তির ও জীবনযাত্রানির্ব্বাহের ব্যবস্থা না করিয়া নিজেদের মুক্তির ব্যবস্থা করিতে এবং কংগ্রেস হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে লজ্জা বোধ করেন না, আমরা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যদি আগামী কল্য ইংরাজ ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া যান এবং ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়, তাহা হইলে যে-ব্যবস্থায় প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্নাভাব, অসন্তুষ্টি, অশান্তি, অস্বাস্থ্য এবং অকালমৃত্যু দূরীভূত হইতে পারে, সেই ব্যবস্থার উদ্ভাবন তাঁহারা করিতে পারিবেন কি?

যদি তাঁহারা মনে করেন যে, ঐ ব্যবস্থা উদ্ভাবন করিবার সামর্থ্য তাঁহাদের আছে, তাহা হইলে উহা তাঁহারা দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করিবেন কি?

দেশের প্রত্যেকের অন্নাভাব, অসন্তুষ্টি, অশান্তি, অস্বাস্থ্য এবং অকালমৃত্যু কি করিয়া অপনোদিত হইতে পারে, ইহা যদি তাঁহাদের না জানা থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা কোন্ যুক্তিবলে দেশের যুবকবৃন্দের জীবন ও ভবিষ্যৎ লইয়া খেলা করেন, তাহা তাঁহারা দেশবাসীকে বুঝাইয়া দিবেন কি? তাঁহারা কি বলিতে চান যে, স্বাধীনতা পাইলেই দেশের সমস্ত মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর হইতে পারে? যদি স্বাধীন হইলেই দেশের সমস্ত মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর হয়, তাহা হইলে ইংরাজ, মার্কিণ ও জার্ম্মাণ প্রভৃতি স্বাধীন জাতিগুলির দুঃখ দারিদ্র্য দূর না হইয়া ক্রমশঃ তাহাদের মধ্যে অন্নাভাব ও বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে কেন?

আমরা বলিতে চাই যে, যাঁহারা ভারতবর্ষে "স্বাধীনতা" "স্বাধীনতা" বলিয়া হৈ চৈ তুলিয়াছেন, তাঁহারা কি করিলে দেশের প্রত্যেকের অন্নাভাব, অসন্তুষ্টি, অশান্তি, অস্বাস্থ্য এবং অকালমৃত্যু দূর হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে চিন্তা করেন নাই। কেবল পাশ্চাত্ত্য দেশের অন্ধ অনুকরণে এই স্বাধীনতার বুলি এই দেশে আসিয়াছে। এই স্বাধীনতার বুলি পাশ্চাত্ত্য দেশের প্রত্যেক জাতিকে অন্ধ করিয়া তুলিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য দেশের কেহই স্ব স্ব দেশে কি করিয়া পরমুখাপেক্ষী না হইয়া অন্নসংস্থান করিতে হয়, তাহা পরিজ্ঞাত নহেন এবং প্রায় প্রত্যেক দেশেই অন্নাভাব ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে। এতদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা কখনও কখনও পাশবিক বলের সহায়তায় অন্য দেশ জয় করিয়া, কখনও কখনও ছল-চাতুরী দ্বারা অন্য দেশের বাজার (market) অর্জ্জন করিয়া তাঁহাদের অন্নসংস্থান করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু এখন আর জগতে এমন কোন দেশ নাই, যে-দেশে সেই দেশবাসীর নিজেদেরই অন্নাভাব হয় না। তাহার পর আবার পাশবিক বলের সহায়তায় কোন দেশ জয় করিতে হইলে নিজেদেশের লোকের জীবন-নাশ হইয়া থাকে। এখন যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে কোন দেশের জনসাধারণ আর দেশপ্রেমের নামে তত আগ্রহের সহিত প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত নহে। ফলে পাশবিক বলের সহায়তায় অন্য দেশ জয় করাও এখন অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য হইয়াছে।

এইরূপে যাঁহারা স্বাধীনতা-মন্ত্রের উপাসক, তাঁহারা ক্রমশঃ নিজেদের জীবন ধারণ করার পন্থা অবরুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন।

ভারতবর্ষেও যাঁহারা ঐ মন্ত্রের উপাসক, তাঁহারা যে অদূরদর্শী, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে।

কি করিলে দেশের প্রত্যেকের অন্নাভাব, অসন্তুষ্টি, অশান্তি, অস্বাস্থ্য এবং অকালমৃত্যু দূর হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে যাঁহারা চিন্তা করিতে পারিবেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, বর্ত্তমান অবস্থায় ইংরাজ ও গভর্ণমেণ্টের ঐকান্তিক সহযোগ ব্যতীত ভারতবর্ষের অথবা ইংলণ্ডের সমস্যা পূরণের কোন পন্থা আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব নহে। যাঁহারা মনে করেন যে, অন্য উপায় আছে, তাঁহারা তাঁহাদের সেই উপায়টীকে দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিলে তাঁহাদের ভ্রমাত্মকতা আমরা দেখাইয়া দিতে পারিব। তাহা তাঁহারা করিবেন কি?

প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেস সংগঠনের মূলনীতি

প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেসের সংগঠন কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা চিন্তা করিবার সময় ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জাতীয় সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য সমগ্র দেশবাসীর অন্নাভাব, অসন্তুষ্টি, পরমুখাপেক্ষিতা, অশান্তি, অস্বাস্থ্য এবং অকালমৃত্যু দূর করা এবং তাহার জন্যই উপরোক্ত দ্বাবিংশতি কর্ম্মের তালিকা। গভর্ণমেণ্ট ব্যতীত আর কেহ এই কর্ম্ম-তালিকা সম্পূর্ণ ভাবে কার্য্যে গ্রহণ করিতে সক্ষম নহেন। কাযেই গভর্ণমেণ্ট যাহাতে ঐ কর্ম্মতালিকা সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করেন, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্যই দেশবাসীর সম্পূর্ণ ঐক্য একান্ত প্রয়োজনীয়। কেন প্রত্যেক দেশে এক একটী গভর্ণমেণ্টের প্রয়োজন হয়, এই প্রশ্নের উত্তরদান-কালে বর্ত্তমান জগতের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টও স্বীকার করিয়া থাকেন যে, জনসাধারণের দুঃখ মোচন করিবার জন্যই গভর্ণমেণ্টের প্রয়োজনীয়তা এবং তাহার অস্তিত্ব। প্রত্যেক দেশেই গভর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারিগণ ঐ ঐ দেশের জনসাধারণের দুঃখ-মোচনার্থ বিবিধ কার্য্যও করিয়া থাকেন, অথচ প্রত্যেক দেশেই জনসাধারণের অন্নাভাব, অসন্তুষ্টি, পরমুখাপেক্ষিতা, অশান্তি, অস্বাস্থ্য এবং অকালমৃত্যু ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতেছে। কাযেই বুঝিতে হইবে যে, গভর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারিগণের শুভ ইচ্ছার ও চেষ্টার কোন অভাব নাই। তাঁহাদের শুভ ইচ্ছা ও চেষ্টা সত্ত্বেও যে, জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার কারণ গভর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারিগণের মধ্যে প্রকৃত বুদ্ধি ও জ্ঞানের অভাব। যে শিক্ষা পাইয়া মানুষ গভর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারী হয়, সেই শিক্ষা-পদ্ধতিতে অথবা পাঠ্য পুস্তকে এমন কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যদ্দ্বারা মানুষের যুগপৎ অন্নের প্রাচুর্য্য, সন্তুষ্টি, স্বাবলম্বন, শান্তি, স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ জীবন বিধান করা যাইতে পারে। পরন্তু বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে ও পাঠ্য পুস্তকে তাহার বিপরীত কথা দেখিতে পাওয়া যায়।

শিল্প ও বাণিজ্য দ্বারা অন্নের সংস্থান হয়, ইহা বর্ত্তমান জগতের শিক্ষা। অথচ জীবিকার জন্য কোন যান্ত্রিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ লাভ করিলে মানুষের স্বাস্থ্য অচিরে নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহার অন্নের প্রাচুর্য্য ও সন্তুষ্টি হওয়া ত দূরের কথা, প্রায়শঃ চিকিৎসার খরচের জন্য পর্য্যন্ত তাহাকে বিব্রত হইতে হয়। চাকুরীতে মানুষের জীবন কিরূপ স্বাবলম্বী ও শান্তিপ্রদ হয়, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। কলের চাকুরীয়াদিগের পরমায়ু সাধারণতঃ কত হ্রস্ব, তাহা একটু চক্ষু মেলিয়া চাহিলেই দেখিতে পাওয়া যায়।

মানুষ কি করিয়া সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারে, তাহার উত্তরে বর্ত্তমান জগতের শিক্ষকগণ বলিবেন যে, সিনেমা দেখ, খেলাধূলা কর, অল্প মাত্রায় নিয়মিত রূপে একটু আধটু হুইস্কি অথবা ব্রাণ্ডী পান কর ইত্যাদি। অথচ সিনেমা দেখিলে যে চক্ষুর জ্যোতি নষ্ট হইয়া যায়, ফুটবল, ক্রিকেট খেলায় যে তিল তিল করিয়া মস্তিষ্কশক্তি অপহৃত হয়, নিয়মিত মাত্রায় ব্রাণ্ডী ও হুইস্কি পান করিতে করিতে যে অপরিমিত মাত্রায় পানদোষ আরম্ভ হয় এবং ক্রমশঃ অস্বাস্থ্যের ও অকালমৃত্যুর উদ্ভব হয়, তাহা কেহ দেখিয়াও দেখেন না।

বর্ত্তমান জগতের প্রত্যেক দেশেই যে গভর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারি-গণের মধ্যে লোকহিতকর বুদ্ধি ও জ্ঞানের যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে, তাহা উপরোক্ত যুক্তিদ্বারা প্রমাণিত হয় বটে, কিন্তু কোন দেশেই গভর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারিগণ প্রায়শঃ তাঁহাদের পদ-গৌরবের কথা স্মরণ রাখিয়া দেশবাসীর সম্মুখে তাঁহাদের অক্ষমতার কথা স্বীকার করেন না এবং যাঁহারা গভর্ণমেণ্ট-

কর্ম্মচারী নহেন, তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ না হইয়া একক কোন কথা কহিলে গভর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারিগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সক্ষম হন না।

কাযেই আগত দুর্দ্দৈব হইতে রক্ষা পাইতে হইলে জন-সাধারণের মিলনের ব্যবস্থা অপরিহার্য্য।

মনে রাখিতে হইবে যে, জনসাধারণের দুঃখ দূর করিবার জন্যই এই মিলন এবং ঐ মিলিত শক্তি যাহাতে গভর্ণমেণ্টের কোন অনিষ্ট সাধন না করে, তদ্বিষয়ে সতর্ক হইয়া যাহাতে উহা গভর্ণমেণ্টের সুপরিচালনার সহায়ক হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। জনসাধারণের মধ্যে কোথায় কাহার কোন্ শ্রেণীর দুরবস্থার উদ্ভব হইতেছে, তৎসম্বন্ধে ঐ মিলিত শক্তির পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু উহার প্রতিবিধানার্থ যে সমস্ত পদ্ধতি ও কার্য্য অবলম্বন করিতে হইবে, তজ্জন্য গভর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে, নতুবা গভর্ণমেণ্টের সহিত সংঘর্ষ অনিবার্য্য এবং তাহাতে উদ্দেশ্য বিফল হইবার আশঙ্কা আছে।

জনসাধারণের মধ্যে কোথায়, কাহার, কোন্ শ্রেণীর দুরবস্থার উদ্ভব হইতেছে, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ সংগ্রহ করিতে হইলে প্রত্যেক গ্রামে যাহাতে ঐ সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা থাকে, তদনুরূপ সংগঠনের প্রয়োজন হয়, কারণ জন-সাধারণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোক গ্রামে বস-বাস করিয়া থাকেন। ঐ সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানকে গভর্ণমেণ্টের সুপরিচালনার সহায়ক করিতে হইলে কোন্ গ্রামে কাহার কি অভাব আছে, তাহা যেমন জানিবার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ যাহাতে গভর্ণমেণ্টের দ্বারা দেশবাসীর অভাব-অভিযোগের আশু প্রতিবিধান হয়, তাহার ব্যবস্থারও প্রয়োজন হয়। গভর্ণমেণ্টের পরিচালনায় যে সমস্ত বিভাগীয় কার্য্য থাকে, তাহা সাধারণতঃ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, চাকুরী, বিচার, শান্তিরক্ষা, অর্থনীতি-পরিচালনা এবং সেনাবিভাগীয়। কাযেই সারা দেশের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, চাকুরী, বিচার, শান্তিরক্ষা, অর্থনীতি-পরিচালনা এবং সেনা-বিভাগীয় কার্য্যে প্রকৃতপক্ষে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, তাঁহারা মিলিত হইয়া একটী কেন্দ্রীয় সভা এবং প্রত্যেক প্রদেশে এক একটী প্রাদেশিক সভা গঠন করিলে, ঐ সভাসমূহের দ্বারা গভর্ণ-মেণ্টের সুপরিচালনায় সহায়তা হইতে পারে এবং দেশের জনসাধারণের অভাব এবং অভিযোগের প্রতিবিধান সাধিত হইতে পারে।

এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, কোন একটী বিষয়ে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় ডিগ্রী অথবা সার্টিফিকেট পাইলেই সেই বিষয়ের প্রকৃত অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে, ইহা বলা যায় না। কোন বিষয়ের যথাযথ অভিজ্ঞতার পরিচয় সেই বিভাগীয় বাস্তব কার্য্য অথবা তৎসম্বন্ধীয় চিন্তাশীল রচনা।

গ্রাম্য শাখা, কেন্দ্রীয় সভা (Central Committee) এবং প্রাদেশিক সভাসমূহ গঠিত হইলে দেশীয় জনসাধারণের অভাব-অভিযোগের সংবাদ সংগৃহীত হইতে পারে এবং তাহার প্রতিবিধান হইতে পারে বটে, কিন্তু একমাত্র গ্রাম্য শাখা ও কেন্দ্রীয় সভা ও প্রাদেশিক সভাসমূহের দ্বারা জাতীয় সম্মেলনের কার্য্য পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিলে, গ্রাম্য শাখাগুলিতে অনাচার প্রবিষ্ট হইতে পারে এবং কেন্দ্রীয় সভা ও প্রাদেশিক সভাসমূহ দেশের দুরবস্থা অপনোদন করিবার জন্য দেশবাসীর কর্ত্তব্য বলিয়া যাহা যাহা স্থির করিবেন, তাহা দেশবাসীকে বুঝান সম্ভব হইবে না। কাযেই গ্রাম্য শাখায় যাহাতে কোন অনাচার প্রবেশ লাভ না করে এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সভাসমূহ হইতে যাহা যাহা দেশবাসীর কর্ত্তব্য বলিয়া সিদ্ধান্ত হইবে, তাহা যাহাতে দেশবাসী জানিতে পারেন এবং তদনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তজ্জন্য প্রত্যেক ইউনিয়ন-বোর্ডে, মহকুমায় এবং জেলায় জাতীয় মহাসম্মেলনের শাখার প্রয়োজন হইবে।

প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেসের গ্রাম্য শাখাসমূহের সংগঠন ও দায়িত্ব

জনসাধারণের মধ্যে কোথায়, কাহার, কোন্ শ্রেণীর দুরবস্থার উদ্ভব হইতেছে, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ সংগ্রহ করা হইবে গ্রাম্য শাখাসমূহের প্রধান দায়িত্ব, ইহা আগেই বলা হইয়াছে। যাহাতে প্রকৃত অভিজ্ঞ এবং দেশপ্রেমিক লোকের হস্তে ঐ দায়িত্ব-ভার অর্পিত হয় এবং তাঁহারা যাহাতে জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে প্রাদেশিক ও রাষ্ট্রীয় কাউন্-সিলের সভ্যরূপে মনোনীত হইতে পারেন, তদ্বিষয়ক ব্যবস্থা করা গ্রাম্য শাখাগুলির অপর দায়িত্ব। প্রত্যেক গ্রাম্য শাখায় একটি সাধারণ বিভাগ ও একটি কার্য্যনির্ব্বাহক

।ভাগ রক্ষা করিবার ব্যবস্থা হইলে ঐ দুইটী কর্ত্তব্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করা সম্ভব হইতে পারে।

কোন্ কর্ম্মতালিকা অনুসরণ করিলে, গ্রাম্য শাখাসমূহের ।ক্ষে ঐ গ্রামের জনসাধারণের মধ্যে কোথায় কাহার কোন্ শ্রেণীর দুরবস্থার উদ্ভব হইতেছে, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ ।ংগ্রহ করিবার কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে—তাহা আমরা বঙ্গশ্রী'র পূর্ব্ব সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছি।

ঐ কর্ম্মতালিকায় নিম্নলিখিত কার্য্যসমূহের কথা বলা ।ইয়াছে :—

(১) গ্রামের প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষ যাহাতে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও কর্ম্মতালিকা সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন এবং ঐ উদ্দেশ্যে কর্ম্মতালিকায় যাহাতে জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রত্যেকের আস্থা স্থাপিত হয়, তাহার কর্ম্মভার ;

(২) গ্রামের অধিবাসিগণের মধ্যে যাহাতে গভর্ণমেণ্টের উপর, ইংরাজ জাতির উপর অথবা তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে জাতিধর্ম্মবশতঃ কোন বিদ্বেষ না থাকে, তাহার কর্ম্মভার ;

(৩) গ্রামের চৌকীদারগণ অথবা পুলিশ-কর্ম্মচারিগণ অথবা কোন সরকারী কর্ম্মচারী কোন গ্রামবাসীর নিকট হইতে কোন উৎকোচাদি গ্রহণ করিলে তাহার সংবাদ যাহাতে উপরিতন কংগ্রেসকর্ম্মীর নিকট পৌছিয়া ক্রমশঃ প্রাদেশিক সরকারী মন্ত্রীর কর্ণে পৌছিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ;

(৪) কৃষকের কৃষিকার্য্যে, ব্যবসায়ীর ব্যবসায়কার্য্যে, শিল্পীর শিল্পকার্য্যে, বণিকের বাণিজ্যকার্য্যে, শিক্ষকের শিক্ষকতাকার্য্যে যে যে অসুবিধা উপস্থিত হয়, তাহা যাহাতে কংগ্রেসের গ্রাম্য শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মী জানিতে পারেন এবং ক্রমশঃ প্রাদেশিক সরকারী মন্ত্রী তদ্বিষয়ে পরিজ্ঞাত হন, তাহার ব্যবস্থা ;

(৫) জীবিকানির্ব্বাহের জন্য ন্যূনকল্পে যে যে বস্তুর প্রয়োজন, তাহার অভাবের তাড়না যে যে গ্রামবাসী সহ্য করিতে বাধ্য হইতেছেন বলিয়া পরিলক্ষিত হইবে, তাঁহাদের নাম সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা ;

(৬) যে যে গ্রামে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইবে, সেই সেই গ্রামের পুষ্করিণী ও খাল কখন কখন জলহীন হইয়া কর্দ্দমময় হইয়া পড়ে, তাহা যাহাতে উপরিতন কংগ্রেসকর্ম্মীর দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার ব্যবস্থা ;

(৭) অনশনে অথবা কোনরূপ নির্য্যাতনে কেহ আত্ম-হত্যা করিলে তাহার নাম যাহাতে উপরিতন কংগ্রেসকর্ম্মীর দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার চেষ্টার ব্যবস্থা ;

(৮) সমাজবিরুদ্ধ অথবা গভর্ণমেণ্টের আইনবিরুদ্ধ যে সমস্ত ঘটনা গ্রামের মধ্যে ঘটিয়া থাকে, তাহা যাহাতে উপরিতন কংগ্রেসকর্ম্মীর দৃষ্টিগোচর হয় এবং ঐ সমস্ত ঘটনা যাহাতে না ঘটিতে পারে, তাহার চেষ্টার ব্যবস্থা ;

(৯) প্রচলিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের শতকরা চারি টাকার অতিরিক্ত সুদে যাহাতে গ্রামবাসিগণকে কেহ কোনরূপ ঋণ প্রদান করিতে না পারেন, তাহার চেষ্টার ব্যবস্থা ;

(১০) ন্যায্য সুদে যাঁহারা গ্রামবাসিগণকে ঋণ প্রদান করিবেন, তাঁহাদের টাকা পরিশোধ করিবার প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য যাহাতে গ্রামবাসিগণের থাকে, তাহার চেষ্টার ব্যবস্থা ;

(১১) যাহাতে কংগ্রেসের গ্রাম্য শাখাগুলি ক্রমশঃ গ্রাম্য মিউনিসিপ্যালিটীগুলির কার্য্যভার লাভ করিতে পারে, তাহার চেষ্টার ব্যবস্থা ;

(১২) গ্রাম হইতে যে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহার বিক্রয়-মূল্যের সহিত যাহাতে অন্যান্য স্থানের উৎপন্ন যে যে দ্রব্য গ্রামবাসিগণের ক্রয় করিতে হয়, তাহার ক্রয়-মূল্যের সমতা থাকে, তাহার চেষ্টার ব্যবস্থা ;

(১৩) গ্রামে অপর যে যে সাধারণ হিতকর প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব দেখা যাইবে, তাহা যাহাতে কংগ্রেসের সহিত মিলিত হইয়া যায়, তাহার চেষ্টার ব্যবস্থা।

উপরোক্ত কর্ম্মতালিকা অনুসরণ করিলে গ্রামের মধ্যে কোথায়, কাহার, কোন্ শ্রেণীর দুরবস্থার উদ্ভব হইতেছে, তাহার সংবাদ সংগৃহীত হইবে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা দুরবস্থার

কোন প্রতীকারের সম্ভাবনা হইবে না। দুরবস্থার সংবাদ সংগ্রহ করা যত সহজ, তাহার প্রতীকার করা তত সহজ নহে। যে জাতীয় কর্ম্মক্ষমতা ও ব্যবস্থার দ্বারা দুরবস্থার সংবাদ সংগ্রহ করা যায়, তাহার প্রতীকার করিতে হইলে তদপেক্ষা অনেক বেশী কর্ম্মদক্ষতা ও অধিকতর সুচিন্তিত ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। গ্রাম্য দুরবস্থার আমূল প্রতীকার সাধন করিতে হইলে যে জাতীয় কর্ম্মদক্ষতার প্রয়োজন, সেই জাতীয় কর্ম্মদক্ষতাসম্পন্ন মানুষের পক্ষে বর্ত্তমানকালে গ্রামে বসবাস করিয়া সন্তুষ্ট থাকা সম্ভব নহে। বাস্তব অবস্থার দিকে তাকাইলেও দেখা যাইবে যে, আজকাল যাদৃশ কর্ম্মদক্ষ মানুষ সহরে পাওয়া যায়, তাদৃশ কর্ম্মদক্ষ লোক গ্রামে পাওয়া যায় না। কাযেই গ্রাম্য দুরবস্থার সংবাদগুলি যাহাতে প্রাদেশিক সভাসমূহের সভ্যগণের গোচর হয়, তাহার ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয়। এই উদ্দেশ্যে যাঁহারা গ্রাম্য শাখাসমূহের কার্য্য-ভার প্রাপ্ত হইবেন, তাহাদের অন্যতম কর্ত্তব্য থাকিবে—গ্রাম-বাসিগণের দুরবস্থার সংবাদ ইউনিয়ন-বোর্ড শাখাগুলির কার্য্য-ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মিগণের গোচরার্থ আনয়ন করিবার ব্যবস্থা করা।

গ্রাম্য শাখার সাধারণ বিভাগের কর্ত্তব্য থাকিবে কেবল কার্য্যনির্ব্বাহক বিভাগের কর্ম্মিগণের মনোনয়ন করা এবং তাঁহারা তাহাদের কর্ত্তব্য যথাযথভাবে পালন করিতেছেন কি না তাহার পরীক্ষা করা। আর কার্য্যনির্ব্বাহক বিভাগের কর্ত্তব্য থাকিবে চারিটী, যথা :—

(১) গ্রাম্য লোকের দুরবস্থার সংবাদ সংগ্রহ করা ;

(২) ঐ সংবাদ যাহাতে স্ব স্ব ইউনিয়ন-বোর্ডের শাখা-গুলির কর্ম্মাধ্যক্ষগণ নিয়মিতভাবে জানিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা ;

(৩) গ্রাম্য লোকের প্রত্যেকটী দুরবস্থা অপনোদন করিবার জন্য জাতীয় মহাসম্মেলনের প্রাদেশিক, কেন্দ্রীয় সভা ও গভর্ণমেণ্ট দ্বারা কি কি চেষ্টা হইতেছে, তাহা ইউনিয়ন-বোর্ডের শাখাগুলির কর্ম্মাধ্যক্ষগণের নিকট পরিজ্ঞাত হওয়া এবং ঐ ঐ চেষ্টার কথা গ্রামবাসী জনসাধারণকে জানাইয়া দেওয়া ;

(৪) গ্রাম্য শাখার কর্ম্মাধ্যক্ষগণের মতে ঐ ঐ গ্রামের কে কে গভর্ণমেণ্টের প্রাদেশিক কাউন্সিলের সভ্য হওয়ার উপযুক্ত তাহা ইউনিয়ন-বোর্ডের শাখাগুলির কর্ম্মাধ্যক্ষগণকে জানাইয়া দেওয়া।

উপরোক্ত তেরটী কর্ম্মতালিকা ও চারিটী কর্ত্তব্য প্রতি-পালিত হইলে সারা ভারতবর্ষের গ্রামবাসিগণের মধ্যে যে একটী জাগরণের ও সৌখ্যের উদ্ভব হইতে পারে, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ভারতবর্ষের মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৯৭জন এখনও পল্লীগ্রামবাসী। দারিদ্র্যে, অস্বাস্থ্যে এবং নানারূপ মানসিক অশান্তিবশতঃ পল্লীগ্রাম-বাসিগণ সর্ব্বত্রই নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছেন।

সাধারণতঃ আমাদের মনে হয় যে, ভারতবর্ষে একটা জাগরণ আসিয়াছে। তথাকথিত শিক্ষিত লোকদিগে: টীয়াপাখীর মত ধার-করা স্বাধীনতার বুলি ও হৈ চৈ শুনিয়া সারা ভারতবর্ষ জাগ্রত হইয়াছে, ইহা মনে করা হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ টীয়াপাখীর দল যে সমগ্র ভারতবর্ষের মোট লোকসংখ্যার এমন কি শতকরা একজন অপেক্ষাও কম, তাহা বিস্মৃত হওয়া সমীচীন নহে। আত্মপ্রতারণা-পরায়ণ কোন জাতির পক্ষে স্বাধীনতা লাভ করা ত দূরের কথা, কোন প্রকৃত জাগরণ লাভ করাও সম্ভব নহে। বাস্তব অবস্থার পর্য্যালোচনা করিলেও দেখা যাইবে যে, ভারতবর্ষে কোন প্রকৃত জাগরণ আসা ত দূরের কথা, ভারতবাসী ক্রমশঃই নির্জ্জীব হইয়া পড়িতেছে।

যে পল্লীগ্রামে সমগ্র ভারতবাসীর শতকরা ৯৭জন এখনও বস-বাস করিয়া থাকেন, সেই পল্লীগ্রামে ত্রিশ বৎসর আগেও যে সজীবতা ও স্বাবলম্বনের চিহ্ন দেখা যাইত, অথবা যে আনন্দের কোলাহল শোনা যাইত, এখন আর তাহা দেখা যায় না এবং শোনা যায় না। যাঁহারা শিক্ষাভিমানী এবং ঐ অভিমানে ভারতে জাগরণ আসিয়াছে বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তাঁহারা এমনই শিক্ষা পাইয়াছেন যে, চক্ষু থাকিতেও তাঁহারা অন্ধ এবং কর্ণ থাকিতেও বধির।

জাতীয় মহাসম্মেলনের গ্রাম্য শাখার উপরোক্ত তেরটী কর্ম্মের তালিকা অনুসৃত ও চারিটী কর্ত্তব্য প্রতিপালিত হইলে সমগ্র ভারতবাসীর সর্ব্বতোভাবে মিলিত হওয়া সম্ভব হইবে।

বর্ত্তমান কালে হিন্দু কেবল মাত্র হিন্দুর দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা বলিতেছেন, আর মুসলমানগণ কেবলমাত্র মুসলমানের দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা লইয়াই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। ফলে এক ভারতবর্ষের মধ্যেই দুইটী খণ্ড পরস্পর বিরুদ্ধভাব লইয়া সর্ব্বদা দ্বন্দ্ব-কলহে মত্ত হইয়াছে এবং একটী ভারতীয় জাতির গঠন হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। ইহা ছাড়া কেহ কেহ শিক্ষার উন্নতিকর কার্য্যের জন্য বিভিন্ন দল গঠন করিতেছেন, কেহ কেহ বা সামাজিক উন্নতিকর কার্য্যের জন্য বিভিন্ন দল গঠন করিতেছেন, কেহ কেহ বা ধর্ম্মের উন্নতিকর কার্য্যের জন্য বিভিন্ন দল গঠন করিতেছেন, কেহ কেহ বা স্বাস্থ্যের উন্নতিকর কার্য্যের জন্য বিভিন্ন দল গঠন করিতেছেন। ইঁহারা সকলেই মুখে বলিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের কাহারও অপর কাহারও সহিত কোন বিরোধ নাই। কিন্তু বাস্তব অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, এই সমস্ত বিভিন্ন দলের লোকহিতকর কর্ম্মীর কার্য্যের ফলে প্রকৃতপক্ষে সারা দেশটী অসংখ্য দলে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে এবং যে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র একদিন এক জাতীয় শিক্ষা, একই সামাজিক নিয়ম, একই মানব ধর্ম্ম*, একই স্বাস্থ্যের নিয়ম পরিলক্ষিত হইত, সেই ভারতবর্ষ ক্রমশঃ অসংখ্য দলে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। ইহার জন্য কাহাকেও যুক্তিযুক্তভাবে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। একই জাতির এইরূপ ভাবে অসংখ্য খণ্ডে বিভক্ত হওয়ার একমাত্র কারণ—যে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রত্যেকের অন্নসমস্যা, দারিদ্র্য-সমস্যা, শিক্ষাসমস্যা, স্বাস্থ্যসমস্যা, সামাজিক সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে—সেই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অভাব। যে কর্ম্মতালিকা ও কর্ত্তব্যভার আমরা জাতীয় মহাসম্মেলনের গ্রাম্য শাখায় অনুসৃত ও প্রতিপালিত হইবার প্রস্তাব করিতেছি, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, তাহাতে মানুষের জীবনযাত্রায় যত কিছু সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে, তাহার প্রত্যেকটী যাহাতে সুমীমাংসিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রহিয়াছে। কাযেই ঐ কর্ম্ম-তালিকা ও কর্ত্তব্যভার গ্রামবাসিগণের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইলে আর অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের প্রয়োজন হইবে না এবং জাতির খণ্ডিত ও বিখণ্ডিত হইবার আশঙ্কা দূরীভূত হইবে।

পল্লীগ্রামের যে কেহ কংগ্রেসের সভ্য হইবেন, তিনিই গ্রাম্যশাখার সাধারণ সভার সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন, ইহা আমরা আগেই বলিয়াছি।

গ্রাম্য শাখার সাধারণ সভার কর্ত্তব্য প্রতিপালনার্থ প্রতি তিন মাসে যাহাতে তাহার একটী অধিবেশন হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা পূর্ণ কর্ম্ম-তালিকার এবং কর্ত্তব্যভারের কোন্ কোন্ অংশের কি কি কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করা প্রত্যেক ত্রৈমাসিক অধিবেশনের উদ্দেশ্য থাকিবে, আর বাৎসরিক অধিবেশনের উদ্দেশ্য থাকিবে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য মনোনয়ন করা।

আমরা গত সংখ্যায় বলিয়াছিলাম যে, কার্য্যনির্ব্বাহক বিভাগের ছয়টী বিভিন্ন বিষয়ক ছয়টী বিভিন্ন কার্য্যের জন্য ছয় জন বিভিন্ন সদস্যের মনোনয়ন করা সাধারণ বিভাগের কর্ত্তব্য হইবে এবং ঐ ছয় জন সদস্য তাঁহাদের আপনাদের মধ্য হইতে এক জনকে সভাপতিপদে বরণ করিবেন। কিন্তু আমাদের বন্ধুবর্গের মধ্যে কেহ কেহ যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ঐরূপ মনোনয়নে আত্মকলহের সম্ভাবনা থাকিবে। তাঁহাদের মতে সাধারণ বিভাগ কেবল এক জন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সভাপতি মনোনয়ন করিলে এবং ঐ সভাপতির দ্বারা অপর পাঁচ জনের মনোনয়ন হইলে আত্ম-কলহের আশঙ্কা অপেক্ষাকৃত কমিয়া যাইবে। আমাদের মনে হয়, পরবর্ত্তী প্রস্তাব অপেক্ষাকৃত অধিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক এবং তাহাই আমাদের গ্রহণযোগ্য। যিনি সাধারণ বিভাগের সভাপতি হইবেন, তিনি কার্য্যনির্ব্বাহক বিভাগেরও সভাপতি হইবেন।

যাঁহাকে একবার কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভাপতিরূপে বরণ করা হইবে, তাঁহার কার্য্যে কোন অসাফল্য না ঘটিলে অথবা তিনি স্বয়ং কার্য্য পরিত্যাগ না করিলে তাঁহাকে পরিবর্ত্তিত না করাই সঙ্গত। প্রতিনিয়ত সভাপতির নির্ব্বাচন-সম্ভাবনা থাকিলে তাঁহার পক্ষে স্বাধীনভাবে কার্য্য করা

---

* ভারতীয় সামাজিক নিয়ম অথবা ধর্ম্ম যে সংহিতায় বর্ণিত আছে, তাহার নাম 'মনুসংহিতা'। ঐ সংহিতার প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে সমগ্র মানবধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। উহার কুত্রাপি মানুষের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান, ম্লেচ্ছ অথবা কাফের প্রভৃতি অবজ্ঞেয় ভাবের কোন্ পরিচয় নাই।

সম্ভব নহে, কারণ তাঁহার সর্ব্বদা নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। কোন কার্য্যনির্ব্বাহক বিভাগের সভাপতির পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয় কি না, তাহা বিবেচিত হইবে সাধারণ বিভাগের ত্রৈমাসিক অধিবেশনে। ঐ অধিবেশনের অধিকাংশ সভ্যের মতে সভাপতির বিফলতা নির্দ্ধারিত হইলে তাঁহার পরিবর্ত্তন-সাধনের প্রয়োজন হইয়াছে, ইহা বিবেচিত হইবে।

এই সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা সম্পূর্ণভাবে এই প্রবন্ধে আলোচিত হওয়া সম্ভব নহে। প্রয়োজন হইলে যথাসময়ে তাহার আলোচনা করিব।

প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেসের ইউনিয়ন-বোর্ড শাখাসমূহের সংগঠন ও দায়িত্ব

গ্রাম্য শাখায় যাহাতে কোন অনাচার প্রবেশ লাভ না করে এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সভাসমূহ হইতে যাহা যাহা পল্লীগ্রামবাসীর কর্ত্তব্য বলিয়া সিদ্ধান্ত হইবে, তাহা যাহাতে জনসাধারণ জানিতে পারেন এবং তদনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তজ্জন্য ইউনিয়ন-বোর্ড শাখাসমূহের প্রয়োজন—ইহা আমরা আগেই বলিয়াছি। গ্রাম্য শাখাসমূহে যাহাতে কোন অনাচার প্রবেশ লাভ করিতে না পারে, তাহার চেষ্টা করিতে হইলে প্রতিনিয়ত গ্রাম্য শাখাসমূহের পরিদর্শন করিবার প্রয়োজন হয়। ঐ পরিদর্শনে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, গ্রাম্য শাখাসমূহের কার্য্যনির্ব্বাহক বিভাগের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ তাঁহাদের কর্ম্মতালিকানুযায়ী কর্ত্তব্য যথাযথ পালন করিতেছেন কি না; দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে, "গ্রামবাসী জনসাধারণের কর্ত্তব্য" বলিয়া সময় সময় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সভা হইতে যে যে উপদেশ দেওয়া হইতেছে, তাহা তাঁহাদের মধ্যে প্রচারিত হইতেছে কি না; তৃতীয়তঃ দেখিতে হইবে, ঐ উপদেশসমূহ জনসাধারণের দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে কি না; চতুর্থতঃ দেখিতে হইবে, পল্লীগ্রামবাসী জনসাধারণের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষের মাত্রা হ্রাস পাইতেছে কি না; পঞ্চমতঃ দেখিতে হইবে, ইংরাজবিদ্বেষ কমিতেছে কি না, ষষ্ঠতঃ দেখিতে হইবে কংগ্রেস ও গভর্ণমেণ্টের উপর জনসাধারণের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইতেছে কি না; সপ্তমতঃ দেখিতে হইবে, কংগ্রেস ছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে, তাহার সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে কি না। এই সাতটী বিষয় সম্বন্ধে সতর্ক হইলে গ্রাম্য শাখাসমূহে অনাচার প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা প্রারম্ভে কমিয়া যাইবে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের আর্থিক ও স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় দুরবস্থা হ্রাস করিবার ব্যবস্থা না হইলে জনসাধারণের পক্ষে কংগ্রেসের কর্ম্মিগণের উপর স্থায়ীভাবে শ্রদ্ধা রক্ষা করা সম্ভবপর হইবে না। পল্লীগ্রামবাসী জনসাধারণ যাহাতে স্থায়ীভাবে কংগ্রেস-কর্ম্মিগণের উপর শ্রদ্ধা বজায় রাখিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে, প্রথমতঃ যাহাতে পল্লীগ্রামবাসিগণের বিবিধ দুরবস্থার কথা মহকুমা-শাখাগুলির কর্ম্মাধ্যক্ষগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ যে যে ব্যবস্থা দ্বারা মহকুমা শাখাগুলির কর্ম্মাধ্যক্ষগণের পক্ষে জিলা-শাখা ও প্রাদেশিক শাখাসমূহের মারফৎ পল্লীগ্রামবাসী জনসাধারণের দুরবস্থা অপনোদন করা সম্ভব হইবে, তাহার প্রস্তাব উপস্থিত করিতে হইবে; তৃতীয়তঃ ঐ ঐ প্রস্তাব যাহাতে মহকুমা-শাখাগুলির কর্ম্মাধ্যক্ষগণ জিলা ও প্রাদেশিক শাখাসমূহের দৃষ্টিগোচর করেন, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে; চতুর্থতঃ জনসাধারণের দুরবস্থার অপনোদনকর প্রস্তাবসমূহ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাখাসমূহ হইতে যে যে ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত হয়, তাহা যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়, তৎসম্বন্ধে আয়োজন করিতে হইবে।

কাযেই ইউনিয়ন-বোর্ড শাখাসমূহের ত্রিবিধ কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে, যথা:—

(১) গ্রাম্য শাখাসমূহের পরিদর্শন;

(২) কি করিলে পল্লীগ্রামবাসিগণের বিবিধ দুরবস্থার অপনয়ন করা সম্ভবপর হইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবন;

(৩) পল্লীগ্রামবাসিগণের দুরবস্থা দূর করিবার জন্য কংগ্রেস ও গভর্ণমেণ্ট কি করিতেছেন, তাহার প্রচার।

উপরোক্ত কর্ত্তব্য পালন করিবার জন্য ইউনিয়ন-বোর্ড শাখাসমূহের প্রত্যেকটীতে দুইটী বিভাগের প্রয়োজন হইবে। একটী সাধারণ বিভাগ এবং অপরটী কার্য্যনির্ব্বাহক বিভাগ।

গ্রাম্য শাখার সাধারণ বিভাগের ন্যায় ইউনিয়ন-বোর্ড শাখাসমূহের সাধারণ বিভাগেরও কর্ত্তব্য থাকিবে দুইটী; যথা:—

(১) কার্য্যনির্ব্বাহক বিভাগের কর্ম্মিগণের মনোনয়ন করা;

(২) কার্য্যনির্ব্বাহক বিভাগের ঐ কর্ম্মিগণ তাঁহাদের কর্ত্তব্য যথাযথ পালন করিতেছেন কি না, তাহার পরীক্ষা করা।

কার্য্যনির্ব্বাহক বিভাগের কর্ত্তব্য থাকিবে উপরোক্ত গ্রাম্য শাখাসমূহের পরিদর্শন প্রভৃতি ত্রিবিধ।

প্রত্যেক ইউনিয়ন-বোর্ডের অন্তর্গত যে কয়টী গ্রাম্য শাখা থাকিবে, সেই গ্রাম্য শাখাগুলির কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ মিলিত হইয়া ইউনিয়ন-বোর্ড শাখার সাধারণ বিভাগ গঠন করিবেন এবং তাঁহারা তাঁহাদিগের সভাপতি নির্ব্বাচন করিবেন। যাঁহারা সভাপতির পদপ্রার্থী হইবেন, তাঁহাদের সঙ্ঘগঠন ও পরিচালনার, শিক্ষা-বিজ্ঞানের, কৃষি-বিজ্ঞানের, শিল্প-বিজ্ঞানের এবং বাণিজ্য-বিজ্ঞানের বিদ্যা আছে কি না, তাহা সর্ব্বপ্রথমে আলোচনা করিতে হইবে। দেশের কার্য্য করিতে হইলে ঐ ছয়টী বিদ্যার একান্ত প্রয়োজন, কারণ ঐ ছয়টী বিদ্যা লইয়াই যে দেশের কার্য্য, তাহা আমরা পূর্ব্ব সংখ্যায় দেখাইয়াছি। যে বিষয় পরিচালনার জন্য যে যে চিন্তার প্রয়োজন হয়, তাহা যদি পরিচালকের না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা কখনও কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করা সম্ভব হয় না। বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশে যাঁহারা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলির বিভিন্ন মন্ত্রিপদে মনোনীত হন, তাঁহারা যে প্রায়শঃ তাঁহাদের স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করিতে সক্ষম হন না, তৎসম্বন্ধে বোধ হয় আমাদিগের পাঠকবর্গের মধ্যে মত-পার্থক্য ঘটিবে না। এই মন্ত্রিগণ দেশবাসীর সমক্ষে অনেক সময়ে প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, তাঁহারা গভর্ণমেণ্টের অর্থের অভাবের জন্য অথবা সময় সময় লাটসাহেবের বিরোধিতার জন্য তাঁহাদের দায়িত্ব নির্ব্বাহ করিতে অক্ষম হন। কিন্তু মন্ত্রিগণের কার্য্যকলাপ একটু চিন্তাসহকারে পর্য্যালোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, তাঁহাদের ঐ কথা আদৌ সত্য নহে। তাঁহারা যে, প্রায়শঃ স্ব স্ব দায়িত্ব নির্ব্বাহ করিতে অক্ষম হইয়া থাকেন, তাহার প্রধান কারণ ঐ দায়িত্ব নির্ব্বাহ করিতে হইলে যে যে বিদ্যার প্রয়োজন, তাঁহাদের ঐ ঐ বিদ্যার অভাব। এইরূপ ভাবে প্রয়োজনীয় বিদ্যা ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন না করিয়া যে মন্ত্রিত্ব-পদ লাভ করা সম্ভব হয়, তাহার জন্য অবশ্য মন্ত্রিগণ দায়ী নহেন; তাহার জন্য দায়ী বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের নির্ব্বাচন-নীতি। বর্ত্তমান নির্ব্বাচন-নীতি অনুসারে কোন বিদ্যা অর্জ্জন না করিয়াও যে কাউন্সিল-গুলির সভ্য হওয়া ও মন্ত্রিত্ব লাভ করা সম্ভব, তাহা ঐ নির্ব্বাচন-নীতি অধ্যয়ন করিলেই জানা যায়।

যাঁহারা সভাপতির পদপ্রার্থী হইবেন, তাঁহাদের উপরোক্ত ছয়টী বিদ্যা আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া যাঁহাদের ঐ ছয়টী বিদ্যা নাই, তাঁহারা সভাপতির পদ লাভ করিতে পারিবেন না—এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইলে অনুপযুক্ত লোকের পক্ষে সভাপতির পদ পাওয়া সম্ভব হইবে না এবং জাতীয় সম্মেলনের কার্য্য যথাযথ ভাবে পরিচালিত হইবার আশা করা যাইবে।

বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষা যেরূপ দুষ্ট, তাহাতে প্রথম প্রথম হয় ত এমন একজনও পাওয়া যাইবে না, যিনি উপরোক্ত ছয়টী বিদ্যার একটীও যথাযথ ভাবে অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। প্রথম প্রথম উপযুক্ত লোক পাওয়া অসম্ভব হইলে হইতে পারে বটে, কিন্তু যাহাতে মানুষ যথাযথ সক্ষমতাসম্পন্ন হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিলে ক্রমশঃই দেশের মধ্যে সক্ষম লোকের সংখ্যা ও সক্ষমতার মাত্রা বৃদ্ধি পাইবে, ইহা আশা করা যাইতে পারে। অন্যদিকে অনুপযুক্ত লোকের পক্ষে উচ্চপদের দ্বার অবারিত থাকিলে কখনও দেশের মধ্যে প্রকৃত সক্ষম লোকের সংখ্যা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবার আশা করা যাইতে পারে না।

কার্য্যনির্ব্বাহক বিভাগে উপরোক্ত ছয়টী বিদ্যায় অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ছয় জন সদস্য থাকিবেন।

সাধারণ বিভাগের সভাপতি কার্য্যনির্ব্বাহক বিভাগেরও সভাপতি হইবেন এবং তিনি অপর ছয় জন সদস্যের নির্ব্বাচন করিবেন।

পল্লীশাখার সভাপতির মত ইউনিয়ন-বোর্ড শাখার সভাপতিরূপে যাঁহাকে একবার বরণ করা হইবে, তাঁহার কোন কার্য্যে অসাফল্য না ঘটিলে অথবা তিনি স্বয়ং কার্য্য

পরিত্যাগ না করিলে তাঁহাকে পরিবর্ত্তন করা নিয়মবিরুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

বর্ত্তমানে গভর্ণমেণ্ট-পরিচালনার জন্য যে সমস্ত সভা রহিয়াছে, তাহাতে প্রায়শঃ এক একটা সময়ের জন্য এক এক জনকে সভাপতি-রূপে নির্ব্বাচন করা হইয়া থাকে। ঐ সময় অতিক্রান্ত হইলে পুনরায় নূতন সভাপতির নির্ব্বাচনের কার্য্য উপস্থিত হয়। এই পদ্ধতিতে কোন পরিচালনা চলিতে থাকিলে, সভাপতিগণকে বাধ্য হইয়া যাহাতে তাঁহারা প্রত্যেক নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচিত হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সতর্ক থাকিতে হয়। ফলে তাঁহাদের পক্ষে তাঁহাদের কর্ত্তব্য কিরূপে নিরপেক্ষ ভাবে সাধিত হইবে, তাহা চিন্তা করিবার সুযোগ হয় না। পরন্তু কাহাকে সন্তুষ্ট রাখিলে পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে তাঁহাদের পুনরায় সভাপতি হওয়ার সম্ভাবনা অটুট থাকিবে, তাহাই তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা চিন্তা করিতে হয়। এই রূপে গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে পক্ষপাতিত্ব প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে এবং প্রজাগণের মধ্যে অসন্তুষ্টি উপস্থিত হইয়া থাকে।

অধিকন্তু প্রায়শঃ নূতন নূতন কর্ম্মকর্ত্তার নিয়োগ হওয়ায় কোন কর্ম্মকর্ত্তাই কোন কার্য্যে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সক্ষম হন না।

অন্য পক্ষে যদি সভাপতির জানা থাকে যে, তাঁহার কার্য্যে অসাফল্য না আসিলে অর্থাৎ তাঁহার কর্ত্তব্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইলে তাঁহার কর্ম্মচ্যুতি হইবার কোন আশঙ্কা নাই, তাহা হইলে তিনি যে কাহারও সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির উপর ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য যথাযথভাবে পালন করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিবেন এবং সকলের সন্তুষ্টি উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবেন, তাহা স্বতঃসিদ্ধ।

যাহাতে এক একটী বিদ্যায় দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সদস্য হন, তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা বিধেয়। কার্য্যদক্ষতা অর্জ্জন না করিলে যদি কেবল অর্থের সহায়তায় লোক বাধ্য করিয়া গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে প্রবেশ লাভ করিবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্টের কার্য্য যে সম্পূর্ণভাবে সুপরিচালিত হইতে পারে না, তাহা আমরা আগেই দেখাইয়াছি।

কংগ্রেসের বিভিন্ন শাখার সংগঠন সম্বন্ধে এখনও অনেক কথা বলা বাকী রহিয়াছে। আগামী সংখ্যায় আবার তাহা আলোচিত হইবে।

আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে হয়ত অনেকে মনে করিতেছেন যে, আমরা যে জাতীয় সংগঠনের প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতেছি, তাহা কার্য্যতঃ প্রয়োগযোগ্য নহে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, আমাদের প্রস্তাবমত কংগ্রেসের শাখাগুলি সংগঠিত করিতে হইলে যে-শ্রেণীর লোকের প্রয়োজন হইবে, তাহা দেশে পাওয়া যাইবে না। সাধারণের কার্য্য করিবার উপযুক্ত লোকের সংখ্যা বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে খুব বেশী নাই তাহা সত্য। কিন্তু আমাদের প্রস্তাবিত সংগঠনে দেশের কার্য্যের উপযুক্ত লোক যাহাতে প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার চিন্তা আছে। আমরা যথাস্থানে তাহা পাঠকবর্গকে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। যে কার্য্যবিধি প্রয়োগযোগ্য নহে, অথবা যাহা মানুষ শুনিবামাত্র প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে গ্রহণ করিতে বিমুখ হইতে পারে, তাহা আমাদের মতে কোন কার্য্যের বিধি নহে এবং সেই জাতীয় কোন সংগঠনের কথা যে আমরা পাঠকবর্গকে শুনাইতেছি না, তাহা যথাসময়ে পরিস্ফুট হইবে।

কোন সঙ্ঘবদ্ধ কার্য্য করিতে হইলে প্রথমতঃ মানুষ যাহাতে একক ভাবে প্রয়োজনীয় চিন্তা করিতে আরম্ভ করে, তাহার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হয়, কারণ দেশের এক একটী মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে কোন ব্যাপার সম্বন্ধে বুঝিতে আরম্ভ না করিলে তাঁহাদের দ্বারা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ঐ ব্যাপারবিষয়ক কার্য্য করা সম্ভব হয় না। মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত চিন্তার উদ্ভব হইতে অত্যধিক বিলম্ব হইতে পারে বটে, কিন্তু যাহা বাস্তব তাহাকে কেহ প্রতিরুদ্ধ করিতে পারে না।

আগত দুর্দ্দৈব হইতে রক্ষা পাইতে হইলে ভারতবাসীকে যাহা যাহা করিতে হইবে, তাহার মধ্যে প্রধান গভর্ণমেণ্ট ও ইংরাজ-বিদ্বেষ বর্জ্জন।

জনসাধারণের পক্ষে ঐ বিদ্বেষ অচিরে বর্জ্জন করা সম্ভব না হইলে কোন কার্য্য করা যাইবে কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে।

[ক্রমশঃ

চিত্রিত সন্ন্যাসী

—শ্রীহিমাংশু গুপ্ত

সাধারণতঃ পথে ঘাটে আমরা যে সব সাধু-সন্ন্যাসী দেখিতে পাই, তাঁহাদের অনেককে নানারূপ বসন-ভূষণে সজ্জিত ও নানা রকম ফোঁটা-তিলকে অঙ্গ চিত্রিত করিতে দেখা যায়। প্রথমে ভস্মের দ্বারা গাত্রচর্ম্ম আচ্ছাদিত করিয়া, তদুপরি শ্বেত ও রক্তচন্দনে ললাটে, নাসিকায়, কণ্ঠে, বাহুদ্বয়ে, বক্ষে নানারূপ চিত্রাঙ্কন-কার্য্য সাধু-সন্ন্যাসীরা করিয়া থাকেন। অধিকাংশের মস্তকে জটাজুট, মুখে সুবৃহৎ শ্মশ্রু-গুম্ফ থাকে। সাধারণতঃ সন্ন্যাসীদের আমরা এইরূপই দেখি।

চীনদেশে এক শ্রেণীর সন্ন্যাসী আছেন, যাঁহাদের বেশ-ভূষা ও অঙ্গচিত্রের কথা এই প্রবন্ধে বলিব।

চীনদেশের একটি মন্দির বা মঠ। তখনও রাত্রির অন্ধকার রহিয়াছে। মঠের সম্মুখে অন্ধকারের মধ্যে সত্তর জন লোক বসিয়া আছে—তাহারা বৌদ্ধ পুরোহিতগণের নিকট হইতে দীক্ষা লইবে।

দীক্ষা-দান উৎসব আরম্ভ হইবে ভোর চারটায়। এই সত্তরটি মুণ্ডিতমস্তক ব্যক্তিকে মন্ত্রদানের সঙ্গে মাথার খুলিতে উত্তপ্ত শলাকা দ্বারা চিহ্নিত করা হইবে।

ইহার পূর্ব্বে এই সত্তরজন লোক তাঁহাদের অতীত জীবনের সব কথা মন্দিরের পুরোহিতের নিকট অকপটে ব্যক্ত করিয়াছেন; তাঁহারা বিশুদ্ধ জলে স্নান করিয়া লইয়াছেন এবং বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন। সকালের দিকে বিশেষ কোন উৎসব হয় না; উৎসব আরম্ভ হয় অপরাহ্নে সাড়ে তিনটার সময়। এই বার-চৌদ্দ ঘণ্টা তাঁহারা একভাবে, হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া থাকিয়া ইহাই প্রমাণিত করেন যে, তাঁহারা উত্তরকালে পরের জন্য সর্ব্ববিধ দুঃখ-কষ্ট সহিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

মুণ্ডিত মস্তকের উপরে সাধারণতঃ ১২টি দাগ দেওয়া হয়, তিনটি সারিতে চারটি করিয়া থাকে সেই পোড়া দাগ। বৌদ্ধ প্রচারকগণের উহাই চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত হয়।

সাঙহাই হইতে বার মাইল দূরে লাঙ্গোয়া মন্দিরমধ্যে দীক্ষা-দান উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

এক বন্ধুর নিকট হইতে উৎসবের সংবাদ পাইয়া, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ভোর রাত্রের অন্ধকারে বাহির হইয়া পড়িলাম। চীন দেশের শ্যাম-নীল আকাশে তখন সোনালী নক্ষত্র
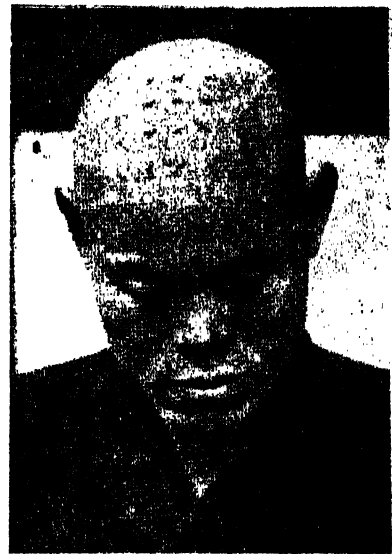
চিত্রিত সন্ন্যাসী।

চিক্ চিক্ করিতেছে; আকাশের একপ্রান্তে অস্তাচলমুখী চন্দ্রমা করুণ নয়নে আলোক বিতরণ করিয়া পথিককে অন্ধকারে পথনির্দ্দেশ করিতেছে। আমরা চলিলাম।

আমরা একখানি ট্যাক্সি লইয়াছিলাম। মঠ হইতে প্রায় আধ মাইল দূরে ট্যাক্সি ছাড়িতে হইল; কারণ সেখান হইতে মঠ পর্য্যন্ত যে অপরিসর রাস্তাটি গিয়াছে, তাহা যেমন এবড়ো-

খেবড়ো, তেমনই আঁকা-বাঁকা। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে পায়ে আলগা পাথরের টোকর লাগিতেছিল, তবুও আমরা চলিলাম।

অবশেষে মঠের প্রকাণ্ড দ্বারসম্মুখে উপস্থিত হওয়া গেল। বিরাট দরজা, কাষ্ঠনির্ম্মিত। আমার সহযাত্রী বন্ধুটি সেই বিশাল দ্বারে ক্রমাগত করাঘাত করিতে লাগিলেন। নিস্তব্ধ নিশীথে আঘাতগুলির শব্দ ও প্রতিশব্দ খুব মোলায়েম বোধ হইতেছিল না। কিন্তু অতি শীঘ্রই আঘাতের সুফল ফলিল, সশব্দে দ্বার খুলিয়া গেল এবং আপাদমস্তক কৃষ্ণবস্ত্রাচ্ছাদিত এক দীর্ঘদেহ মানব আমাদের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। লোকটির চেহারা যেমন প্রকাণ্ড, তাহার কণ্ঠস্বর তদ্রূপ ভীষণ।

দীক্ষার্থিগণ সারারাত্রি এই ভাবে বসিয়া আছে।

বাজখেঁয়ে গলায় লোকটি বলিল, এই অসময়ে তোমরা কে এখানে? কি চাও?

আমার কণ্ঠস্বর বোধ হয় লোপ পাইয়াছিল; ভয়ে দেহের ভিতরে কম্পন অনুভূত হইতেছিল। আমার বন্ধুটি চৈনিক ভাষা বুঝিতেন, তিনিও নির্ব্বাক হইয়া আমার পাশে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমাদের অবস্থাটা কিরূপ হইয়াছিল জানেন? আমরা যেন অতর্কিতে ও অজ্ঞাতসারে দস্যুদলের আড্ডায় আসিয়া পড়িয়াছি।

ক্রমে সাহস ফিরিয়া আসিল, ভয় দূর হইল। কণ্ঠে শক্তি সঞ্চয় করিয়া কহিলাম, আমরা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দীক্ষা-উৎসব দেখিতে আসিয়াছি।

লোকটি পূর্ব্ববৎ বাজখেঁয়ে সুরে বলিল, প্রবেশ নিষেধ; সম্পূর্ণ অসম্ভব।

পকেট হইতে আমার একখানি কার্ড বাহির করিতে করিতে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমরা কি একবার প্রধান পুরোহিত মহাশয়ের দর্শন পাইতে পারি? বলিয়া কার্ডখানি তাহার হাতের উপর রাখিয়া দিলাম।

লোকটা একটি কথা বলিল না; হাঁ-না কিছু না বলিয়া, ভদ্রতাসূচক কোন ইঙ্গিত পর্য্যন্ত না করিয়া অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইল।

আমরা দুইটি জড়পুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া কিংকর্ত্তব্য ভাবিতে লাগিলাম। ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে সুরু করিয়াছিল, সে ঠাণ্ডা আবার এমন ঠাণ্ডা নয়, মোটা পোষাকের ভিতরেও আমরা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিলাম; আমাদের দাঁতে দাঁত লাগিয়া যাইতেছিল। এক মিনিট, দুই মিনিট করিয়া আধ-ঘণ্টা কাটিয়া গেল।

কোন আশা নাই ভাবিয়া যখন আমরা ফিরিতে উদ্যত, সেই সময়ে অন্ধকারে ভূতের মত দুইটি মূর্ত্তিকে ধীরে ধীরে আমাদের দিকে অগ্রসর হইতে দেখা গেল। কাছে আসিতে বুঝা গেল, তাহারা মানুষ। একজনের খুব লম্বা দাড়ী আছে। এই লোকটির হাতে একটি জ্বলন্ত মশাল ছিল।

মশালের আলো আমার মুখের উপর ফেলিয়া সেই দাড়ীওলা ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, কে তোমরা? কোথা হইতে আসিয়াছ?

বলিলাম, আমরাও বুদ্ধদেবের দেশের লোক, সিংহলবাসী। সিংহল বৌদ্ধমন্ত্রে দীক্ষিত; আর আমি একজন সংবাদপত্র-লেখক।

আমি জানিতাম, চীনারা সিংহল দেশকে শ্রদ্ধা করে; সেই জন্যই ঐ টিপ্ ছাড়িলাম। তাহাতে কাজ হইল।

দাড়ীওলা লোকটি এইবার আমাদিগকে পরম আদরে অভ্যর্থনা করিল। পরে জানিয়াছি, এই লোকটিই মঠের প্রধান পুরোহিত।

প্রধান পুরোহিত আমাদিগকে অনুসরণ করিতে বলিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমরা একেবারে মঠের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলাম। উৎসব সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। ঘড়িতে তখন চারটা বাজিল।

প্রকাণ্ড এক হলঘর—মৃদু আলোকিত। নিস্তব্ধ কক্ষে যাহারা আছে, তাহারাও যেন নিঃশ্বাস ফেলা বন্ধ করিয়াছে। বৌদ্ধ মন্দিরাদিতে যেরূপ গোলমাল হইয়া থাকে, এখানে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দৃশ্য।

প্রধান পুরোহিত আমাকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া এমন একস্থানে দাঁড় করাইয়া দিলেন, যেস্থান হইতে খুঁটিনাটি সমস্ত দৃশ্যই সম্পূর্ণভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর অনেক দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচলন আছে, উৎসবাদিও হইয়া থাকে, কিন্তু এখানে যে দৃশ্য দেখা গেল, তাহা আর কোন দেশে হয় বলিয়া শুনা যায় না।

এই হলঘরটির দুইদিকে সারি সারি বুদ্ধ-শিষ্যগণের স্বুবর্ণ-নির্ম্মিত মূর্ত্তি রক্ষিত। হলের মধ্যস্থলে শাক্যমুনির এক বিশাল স্বর্ণময় মূর্ত্তি! মূর্ত্তিটির পাশে একখানি টেবিল, তাহার তিন দিকে তিনজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তিনখানি বই হাতে বসিয়া আছেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহারা মিষ্টস্বুর করিয়া কখনও একক, কখনও একসঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন। তাঁহারা যে মুহূর্ত্তে থামিতেছেন, কাষ্ঠনির্ম্মিত দামামাগুলি ভীষণ শব্দে বাজিয়া উঠিতেছে।

হলঘরের শেষপ্রান্তে সত্তর জন দীক্ষার্থী হরিদ্রাবর্ণের পোষাক পরিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আছে। তাহাদের মুণ্ডিত-মস্তকের নিম্নে পাণ্ডুর মুখগুলি সেই স্বল্পালোকে মৃতের রক্তহীন মুখ বলিয়া মনে হইতেছিল।

বুদ্ধের বিরাট মূর্ত্তির সম্মুখে স্থাপিত টেবিলের পাশে ছোট ছোট মাদুরের আসন পাতা, আর একপাশে তিনখানি বেঞ্চ। বেঞ্চগুলির উপরে তিন রকম দ্রব্য রহিয়াছে।

ছোট ছোট রেকাবীতে মোম আর খণ্ড খণ্ড কাঠ-কয়লা রাখা হইয়াছে।

দীক্ষার্থীরা আসিয়া সেই মাদুরের আসনে বসিল, তাহাদের বাহুগুলি বেঞ্চের উপরে রাখিয়া পুরোহিতগণ আসিয়া কাঠিগুলি কালিতে ডুবাইয়া দীক্ষার্থীদিগের মুণ্ডিত মস্তকের উপর বারটি করিয়া চিহ্ন অঙ্কিত করিলেন। সত্তর জনের মাথায় অনুরূপ চিহ্ন অঙ্কিত হইলে, পুরোহিতগণ দীক্ষার্থীদিগের মস্তকগুলি খুব শক্ত করিয়া ধরেন; বেঞ্চগুলির ধারে ধারে অন্যান্য পুরোহিতগণ প্রজ্জলিত মোমবাতি ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন।

বাজনা বাজিতে আরম্ভ করে এবং সকলেই সমস্বরে গাহে—হে ভগবান, আমি তোমাকেই আশ্রয় করিলাম।

এই গানের সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিতগণ দীক্ষার্থীদের মাথার সেই বারটি দাগের উপর কাঠকয়লা ধরিয়া তাহার উপরে জলন্ত মোমবাতিগুলি ধরেন। উত্তাপে কয়লা ও মোম মিশ্রিত হইয়া মাথার খালের উপর গভীর চিরস্থায়ী রেখা অঙ্কিত করিয়া দেয়। পুরোহিত ও দীক্ষার্থী সকলেই সমস্বরে তখনও গাহিতেছে—হে ভগবান, আমি তোমাকেই আশ্রয় করিলাম।

মাত্র দুইটি মিনিট—কয়লা ও মোমবাতি পুড়িতে দুইটি মিনিটের বেশী সময় লাগে না; কিন্তু আমার বোধ হইতেছিল যেন দুই যুগ।

তারপর দগ্ধ স্থানের উপর প্রলেপ বসাইয়া দেওয়া হয়—পার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলিকে শীতল রাখিবার জন্য।

দীক্ষার্থীরা নিস্পন্দ, নিথর—যেন এক একটি শববিশেষ। তাহাদের যন্ত্রণা আমরা অনুভব করিতে পারি; কিন্তু

মঠাভ্যন্তরে।

তাহাদের কাহারও একটি ঠোঁট নড়ে না, মুখে একটি রেখা-পাতও হয় না, ইহা কম আশ্চর্য্যের কথা নহে।

চিত্রিত হইয়া গেলে, দীক্ষাপ্রাপ্ত সন্ন্যাসিগণ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া মঠ-সংলগ্ন উদ্যানে চলিয়া গেল। মঠের দ্বারে তাহাদিগের হস্তে অনেকগুলি করিয়া কমলালেবু দেওয়া হইল। মঠের লোকের বিশ্বাস, এ সময়ে একমাত্র উপকারী খাদ্য ঐ কমলালেবু।

সন্ন্যাসিগণ চিরকালের জন্য চিত্রিত হইয়া গেল।

তখন সূর্য্যোদয় হইয়াছে। এখন লক্ষ্য করিলে কাহার কাহার মুখে বেদনার ছায়া-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়; চামড়া-পোড়ার গন্ধে সেখানে তখন তিষ্ঠান দায়।

প্রদর্শনী

হিন্দুস্থান আকাডেমি শিল্প-প্রদর্শনী (শিবপুর)

'বঙ্গশ্রী'র পৃষ্ঠায় ইতিপূর্ব্বে আমরা যে সকল প্রদর্শনীর পরিচয় প্রকাশিত করিয়াছি, সেগুলি সমস্তই রাজধানীতে অনুষ্ঠিত। এখানে আমরা আজ যে প্রদর্শনী হইতে সংগৃহীত দুইটী মুখের প্রতিকৃতি ছাপিলাম, সে প্রদর্শনী রাজধানীর নিকট হইলেও বাহিরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। চারুকলা শিল্প মূলতঃ রাজধানীর বস্তু, রাজধানীর অভিজাতবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় ইহার প্রতিষ্ঠা ও প্রাণ। কেন না চারুকলা মানুষের অবসরের সামগ্রী, অবসরের সহিত বিলাসের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক; মানুষের বিলাসবোধ হইতে চারুকলার জন্ম। প্রাক্-সভ্যতা যুগের যে আদিম শিল্পের পরিচয় পর্ব্বতগুহার মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে,—উহাকে অবশ্য চারুশিল্প বলিব না। ধর্ম্মানুষ্ঠানের কিংবা

প্রাচান। শ্রীগোবর্দ্ধন আস।

ফকির। শ্রীগোবর্দ্ধন আস।

জাতীয় জীবনের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে-শিল্প, উহা চারুকলা নহে। উহাকে লোক-শিল্প বলিব, উহা উন্নতিশীল জাতির অভ্যুত্থানের পদচিহ্ন। চারুকলা পতিত যুগের দান। প্রাচীন চারুকলাও অবনত ভারতের প্রতীক—মদন ও রতির প্রকৃত পরিকল্পনা তখন নষ্ট হইয়াছে। আজ আমরা প্রাচীন ভারতীয় বলিয়া যে-শিল্পের গর্ব্ব করি, তাহাতে গর্ব্বিত হইবার কিছু নাই, পরন্তু লজ্জার কারণ আছে।

এই প্রসঙ্গে ইহার আলোচনা করিলাম এই জন্য যে, রাজধানীর বাহিরে থাকিয়া যাঁহারা শিল্পচর্চ্চা করেন, তাঁহারা এই বক্তব্যের মর্ম্ম বুঝিলেও বুঝিতে পারেন।

বঙ্কিমচন্দ্র
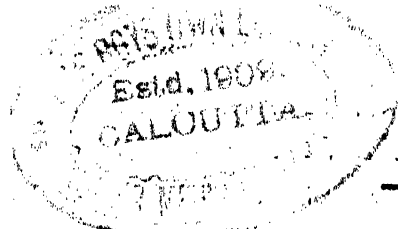
—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

দ্বিচত্বারিংশ বৎসর অতীত হইতে চলিল, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন। কিন্তু প্রতিভার সেই বরপুত্রের অনন্যসাধারণ প্রভাব কি সর্ব্বজয়ী কাল এতটুকুও ক্ষুণ্ণ করিতে পারিয়াছে? তিনি তাঁহার অপূর্ব্ব যাদুকরী ক্ষমতা-বলে যে অভিনব রসোজ্জ্বলা ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই অমৃতময়ী ভাষার "চল সৌন্দর্য্য, লীলা-চাতুর্য্য, আবেগ, উচ্ছ্বাস ও সজীবতা" কি এখনও লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীর মন হরণ করিতেছে না? তিনি তাঁহার যে সুদূরগামিনী কল্পনার সাহায্যে বঙ্গবাসীর মানসলোকে এক বৈচিত্র্যময় নবীন জগতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই কল্পনার অপূর্ব্ব লীলা সন্দর্শন করিয়া এখনও কি তাঁহার লক্ষ লক্ষ অনুরাগী তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে নীরবে শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছে না? তাঁহার সেই অননুকরণীয় রসোজ্জ্বলা বর্ণনা, উদ্দীপনাময়ী প্রাণোন্মাদিনী বাণী আজিও কি বঙ্গভাষা-ভাষীর হৃদয়ে প্রতিদিন অভিনব ভাবের তরঙ্গ তুলিতেছে না? প্রাচীন কালের সত্যদ্রষ্টা ঋষি-গণের ন্যায় তিনি যে মহামন্ত্র আবিষ্কার করিয়া উদাত্ত স্বরে অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে উদ্গীরিত করিয়াছিলেন, আজও কি সেই মন্ত্র আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষকে নববলে বলীয়ান্, আত্মত্যাগে স্পৃহাবান্, নবোৎসাহে প্রোৎসাহিত, ও নব আশায় আশান্বিত করিতেছে না?

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (পরিণত বয়সে)।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা অতি শোচনীয়। অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙ্গালী ইংরাজ-আনীত প্রতীচ্য সাহিত্যের অপূর্ব্ব ভাণ্ডার উন্মুক্ত পাইয়া তাহার সহিত পরিচয়-সংস্থাপনে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। মাতৃ-ভাষা তখন অনাদৃতা। তখন বাঙ্গালী জাতির সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় লেখক ছিলেন, 'সংবাদ প্রভাকর'-সম্পাদক কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার একটি ইংরাজী প্রবন্ধে ইঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই :—

"তিনি অল্পজ্ঞ ও অশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁহার মাতৃভাষা ভিন্ন আর কোনও ভাষা জানিতেন না, এবং তাঁহার মতও অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও কুসংস্কারপূর্ণ ছিল; তথাপি

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হস্তাক্ষর।

বিংশতি বৎসরের অধিক কাল ব্যাপিয়া তিনিই বাঙ্গালী জাতির সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় লেখক ছিলেন, ব্যঙ্গ ও রহস্যপূর্ণ কবিতার রচনায় তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, এবং এই গুণেই তিনি কি কবি, কি সম্পাদক, উভয় রূপেই সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আর কোন উল্লেখযোগ্য গুণ ছিল না; এবং তাঁহার রচনা অত্যন্ত গ্রাম্য ও অসংস্কৃত ছিল। তাঁহার রচনাদি অধিকাংশ স্থলে জঘন্য অশ্লীলতায় কলঙ্কিত। অফুরন্ত অনুপ্রাস এবং অপূর্ব্ব শব্দালঙ্কারের ছটাই তাঁহার লোকরঞ্জক হইবার প্রধান কারণ। যে যুগে ঈশ্বর গুপ্তের ন্যায় নিকৃষ্ট কবিও লোকনয়নে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া প্রতিভাত

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

হইতেন, সে যুগের লোকের সাহিত্য-বিষয়ক রুচি ও বিচার-বুদ্ধি যে কিরূপ ছিল, তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই আমরা এই স্থলে তাঁহার কবিতার আলোচনা করিলাম। তিনি যে তাঁহার সমসাময়িক বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, একথা অস্বীকার করাও যায় না; কারণ তাঁহার কিছু প্রতিভা ছিল, অপর লেখকদিগের কিছুই ছিল না।"

ঈশ্বর গুপ্তের রচনা আজিকালিকার পাঠকগণের নিকট কিরূপ সমাদৃত হইতেছে বলিতে পারি না, কিন্তু একটি কারণে তিনি বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। তাঁহার শক্তি যতই সীমাবদ্ধ হউক না কেন, মাতৃসমা মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ তাঁহার অসীম ছিল, এবং এই অনুরাগের অগ্নিশিখা তিনি বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল প্রভৃতি তরুণগণের হৃদয়ে এরূপ ভাবে প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছিলেন, অনুক্ষণ উৎসাহবারি সেচন দ্বারা তরুণ লেখকগণের প্রতিভা-মুকুল বিকশিত করিতে এরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা প্রতীচ্য সাহিত্য সেবার মোহময় আকর্ষণ হইতে আপনাদিগকে বিমুক্ত রাখিয়া মাতৃভাষার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, এবং মাতৃভাষাকে অপূর্ব্ব ভাবসম্পদে সমৃদ্ধিশালিনী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

'সংবাদ প্রভাকরে' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম 'হাতে খড়ি' হয় এবং তাঁহার কৈশোর বয়সের রচনাগুলি কবিবর ঈশ্বরচন্দ্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত। ঈশ্বরচন্দ্রের গদ্য অনেক স্থলে গ্রাম্য ভাষায় লিখিত, আবার অনেক স্থলে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি পণ্ডিতগণের সংস্কৃতানুসারিণী ভাষার আদর্শে লিখিত—শব্দালঙ্কারের আতিশয্যে ভারাক্রান্ত। যথা,—

"কেন না তুমি এই কালে নব নব নয়ন-বল্লভ-পল্লব-মঞ্জরী-মণ্ডল-মণ্ডিত নব নব সুচারু সুন্দর সুরভি ফুল্লফুলদল সুশোভিত মৃদু মৃদু মলয়ানিল সেবিত মধুপান মত্ত মধুকরনিকরগুঞ্জিত কোকিলকুলকলকুঞ্জিত কমনীয় কুঞ্জকাননে কুটিলকুন্তলা কুরঙ্গাক্ষী কুলকামিনীকুল করসঞ্চারণ পুরঃসর বিহারসুখে সুখী হইতে ইচ্ছা কর।"

কিছুকাল পূর্ব্বে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের কতকগুলি বাল্য-রচনা উদ্ধার করিয়াছিলাম এবং তাহাতেও ঈশ্বর গুপ্তের রচনা-পদ্ধতির দোষ গুণ উভয়ই সমান ভাবে ও সমান পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।

শ্রুতিকঠোর সংস্কৃত শব্দতরঙ্গের অবিশ্রান্ত গর্জ্জনে যখন বঙ্গীয় পাঠকগণের কর্ণকুহর প্রপীড়িত, তখন বাঙ্গালা গদ্যের একজন প্রতিভাশালী সংস্কারকের আবির্ভাব হইল। সংস্কৃতানুসারিণী ভাষার সেবকগণের "এই অসহনীয় পাণ্ডিত্যগর্ব্ব," (বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন), "'আলালের ঘরের দুলাল'-প্রণেতা টেকচাঁদ ঠাকুর কর্ত্তৃকই সর্ব্বপ্রথমে প্রতিহত হয় এবং এই জন্য তিনি আমাদের নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসার পাত্র। উচ্চশিক্ষা এবং স্বাভাবিক বুদ্ধির বলে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, এরূপ বিশুদ্ধ সংস্কৃতানুসারিণী ভাষার সেবা করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি যে ভাবে 'আলালের ঘরের দুলাল' লিখিতে আরম্ভ

করিলেন, তাহা দেখিয়া সংস্কৃতজ্ঞগণ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, এবং এরূপ ভাষার প্রচলন বাঞ্ছনীয় নহে, এই অভিমত প্রকাশ করিলেন। রচনা-পদ্ধতির চিরানুসৃত পথ পরিহারপূর্ব্বক সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থা অবলম্বন করিয়া টেকচাঁদ তাঁহার রচনা-বলীতে দৃঢ়প্রযত্নে পাণ্ডিত্যসূচক বাক্যবিন্যাস যথাসম্ভব পরিবর্জ্জিত করিলেন। সংস্কৃত শব্দের এইরূপ পরিবর্জ্জনে তাঁহার রচনায় কিছু সৌন্দর্য্যহানি ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু ভাষার এই সংস্কার অতি উপযুক্ত সময়েই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তিনি পূর্ব্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষ আবর্জ্জনার ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি সাধনোচিত সাফল্য ও সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র অন্যত্র টেকচাঁদ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—"তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে; তাহার জন্য ইংরাজী বা সংস্কৃতের নিকট ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি 'আলালের ঘরের দুলাল'।"

বলা বাহুল্য প্যারীচাঁদের এই সংস্কার-চেষ্টা সংস্কৃতানুসারিণী ভাষার সেবকগণ কর্ত্তৃক তীব্রভাবে সমালোচিত হইয়াছিল। কিন্তু অনেকে উহার সমর্থনও করিয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে মহাভারত-অনুবাদক মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ সর্ব্বপ্রধান। তিনি তাঁহার 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় আলালী ভাষা ব্যবহার করিলেন। সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছেন, "বিশুদ্ধ সহজ বাঙ্গালায় সুন্দর গদ্য হয়, প্যারীচাঁদ হইতে ইহা শিখিয়াছিলাম। সঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহের নাম করিতে হইবে। আমরা যখন নিতান্ত বালক তখন 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' প্রকাশিত হইল। তাহার ভাষার রচনার রঙ্গেতে একেবারে মোহিত হইয়াছিলাম। তখন হইতে বুঝিয়াছি, আমাদের মাতৃভাষায় বাজী খেলান যায়, তুবড়ী ফুটান যায়, ফুল কাটান যায়, ফুয়ারা ছোটান যায়। আমাদের মাতৃভাষা সর্ব্বাঙ্গে রঙ্গময়ী।"

টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র)। ['আলালের ঘরের দুলাল' রচনাকালের ফটো হইতে]

প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্নের সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাবের

পর বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিতে পারিলেন, শব্দালঙ্কারই সাহিত্যের সর্ব্বস্ব নহে, সাহিত্যে চাই ভাব ও রস। সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা ও আলালী ভাষা উভয়েরই দোষগুণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি নিজ প্রতিভাবলে যে নূতন ভাষার সৃষ্টি করিলেন, তাহাতে এক দিকে যেমন ভাষার আড়ষ্ট ভাব বিদূরিত হইয়া গেল, অপর দিকে তাহা গ্রাম্য ভাষার স্তরে অবনত হইল না। তিনি যে

কালীপ্রসন্ন সিংহ।

অপূর্ব্ব শব্দৈশ্বর্য্যময়ী ভাবালঙ্কারভূষিতা ভাষার সৃষ্টি করিলেন, সেই সর্ব্বভাবপ্রকাশক্ষম ভাষা কখনও সুখে উচ্ছ্বসিত, দুঃখে ম্রিয়মাণ, করুণায় বিগলিত, গর্ব্বে উদ্বেলিত, দৈন্যে সঙ্কুচিত, প্রেমে আত্মহারা, ক্রোধে উদ্দীপিত হইতে লাগিল। সঙ্কীর্ণতার রুদ্ধ-বাতায়ন কক্ষে হৃতস্বাস্থ্য বালিকা বঙ্গভাষাকে সংস্কৃতানুসারিণী ভাষার সেবকগণ মাতামহীর বহুমূল্য আভরণাদিতে ভারাক্রান্ত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাকে সবল, সতেজ ও প্রাণময়ী করিতে পারেন নাই। টেকচাঁদ ও হুতোম বালিকা বঙ্গভাষাকে আভরণ-বিমুক্ত করিয়া স্বাভাবিক বেশে মুক্ত আলোকে ও বাতাসে আনিয়া তাহাকে স্বাস্থ্যময়ী, লাবণ্যময়ী ও প্রাণময়ী করিয়া তুলিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেই লীলাময়ী ভাষার প্রথম যৌবনকালে তাহাকে অপূর্ব্ব রত্নালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া ভুবনমনোমোহিনীরূপে জগতের সমক্ষে আনিয়া ধরিলেন। তখন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়-বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই সব বালকভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য!"

তখন বঙ্গভাষার "যৌবনজলতরঙ্গ রোধিবে কে?"

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস-গ্রন্থ 'দুর্গেশনন্দিনী' হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি নূতন যুগের আরম্ভ হইল। বলা বাহুল্য, 'দুর্গেশনন্দিনী' পণ্ডিতগণ কর্তৃক কঠোর ভাবে সমালোচিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা, তাঁহার রচনা-পদ্ধতি, তাঁহার কল্পনাশক্তি, তাঁহার বিষয়-বিন্যাস, তাঁহার প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আদর্শের প্রতি সম-পক্ষপাতিত্ব সমস্তই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ কর্তৃক নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হইল। কিন্তু যেমন উত্তাল তরঙ্গমালা উত্তুঙ্গ পর্ব্বতগাত্রে আঘাত করিয়া তাহাকে খর্ব্ব করিতে পারে না, প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যায়, কঠোর সমালোচনা ও নিন্দা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার অবদানের মূল্য হ্রাস করিতে পারিল না, এবং প্রকাশকালের পর সত্তর বৎসর অতীত হইয়া গেল, এখনও দুর্গেশনন্দিনী বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠগ্রন্থ বলিয়া সম্মানিত হইয়া আসিতেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'কপালকুণ্ডলা' একেবারে নূতন ধরণের গ্রন্থ। উহা উপন্যাস নহে, উহা গদ্য-কাব্য। জগতের সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা, সেক্সপীয়রের মিরাণ্ডা ও কালিদাসের শকুন্তলার ন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীনা। তাহার পর 'মৃণালিনী' প্রকাশ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ব্ব যশঃ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা এক অসাধ্য সাধন করিল। এই বৎসর তিনি "বঙ্গদর্শন" নামক বঙ্গবিশ্রুত মাসিক পত্রের প্রবর্ত্তন করিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহাদের মনোভাব প্রকাশ করিতে প্রেরণা দান করেন। 'বঙ্গদর্শনে'র পত্রসূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন :

"যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের বিশেষ দুরদৃষ্ট। তাঁহারা যত যত্ন করুন না কেন, দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায় প্রায়ই তাঁহাদিগের রচনাপাঠে বিমুখ। ইংরাজপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থির জ্ঞান আছে যে, তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাঁহাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা ভাষার লেখক মাত্রেই হয় ত বিদ্যাবুদ্ধি-হীন, লিপি-কৌশল-শূন্য; নয় ত ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদক। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, যাহা কিছু বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয় অপাঠ্য, নয়ত কোন ইংরাজি গ্রন্থের ছায়ামাত্র; ইংরাজিতে যাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গালায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি? সহজে কালো চামড়ার অপরাধে ধরা পড়িয়া আমরা নানারূপ সাফাইয়ের চেষ্টায় বেড়াইতেছি, বাঙ্গালা পড়িয়া কবুল-জবাব কেন দিব?

ইংরাজিভক্তদিগের এইরূপ। সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডিত্যাভিমানীদিগের 'ভাষায়' যেরূপ শ্রদ্ধা, তদ্বিষয় লিপিবাহুল্যের আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা 'বিষয়ীলোক' তাঁহাদিগের পক্ষে সকল ভাষাই সমান। কোন ভাষার বহি পড়িবার তাঁহাদের অবকাশ নাই। ছেলে স্কুলে দিয়াছেন, বহি পড়া আর নিমন্ত্রণ রাখার ভার ছেলের উপর; সুতরাং বাঙ্গালা গ্রন্থাদি এক্ষণে কেবল নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্র, গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, অপ্রাপ্তবয়ঃ পৌর-কন্যা এবং কোন কোন নিষ্কর্ম্মা রসিকতা-ব্যবসায়ী পুরুষের কাছেই আদর পায়। কদাচিৎ দুই একজন কৃতবিদ্য সদাশয় মহাত্মা বাঙ্গলা গ্রন্থের বিজ্ঞাপন বা ভূমিকা পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া বিদ্যোৎসাহী বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন।

লেখাপড়ার কথা দূরে থাক, এখন নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরাজিতে। সাধারণের কার্য্য, মিটিং, লেক্‌চর, এড্রেস, প্রোসিডিংস্, সমুদয় ইংরাজিতে। যদি উভয়পক্ষ ইংরাজি জানেন, তবে কথোপকথন ইংরাজিতেই হয়, কখন ষোল আনা, কখন বার আনা ইংরাজি। কথোপকথন যাহাই হউক, পত্র লেখা কখনই বাঙ্গালায় হয়

রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সি-আই-ই (তরুণ বয়সে)।

না। আমরা কখন দেখি নাই যে, যেখানে উভয়পক্ষ ইংরাজির কিছু জানেন, সেখানে বাঙ্গালায় পত্র লেখা হইয়াছে। আমাদিগের এমনও ভরসা আছে যে, অগৌণে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদি ইংরাজিতে পঠিত হইবে।

ইহাতে কিছুই বিস্ময়ের বিষয় নাই। ইংরাজি একে রাজভাষা, অর্থোপার্জ্জনের ভাষা, তাহা আবার বহুবিদ্যার আধার, এক্ষণে আমাদের জ্ঞানোপার্জ্জনের একমাত্র সোপান; এবং বাঙ্গালীরা তাহার আশৈশব অনুশীলন করিয়া দ্বিতীয় মাতৃভাষার স্থলভুক্ত করিয়াছেন। বিশেষ ইংরাজিতে না

বলিলে ইংরাজে বুঝে না; ইংরাজে না বুঝিলে ইংরাজের নিকট মান মর্য্যাদা হয় না; ইংরাজের কাছে মান মর্য্যাদা না থাকিলে কোথাও থাকে না, অথবা থাকা না থাকা সমান। ইংরাজ যাহা না শুনিল সে অরণ্যে রোদন, ইংরাজ যাহা না দেখিল তাহা ভস্মে ঘৃত।

আমরা ইংরাজি বা ইংরাজের দ্বেষক নহি। ইহা বলিতে পারি যে, ইংরাজ হইতে এদেশের লোকের যত উপকার হইয়াছে, ইংরাজি শিক্ষাই তাহার মধ্যে প্রধান। অনন্ত-রত্ন-প্রসূতী ইংরাজি ভাষার যত অনুশীলন হয়, ততই ভাল। আরও বলি, সমাজের মঙ্গলের জন্য কতকগুলি সামাজিক কার্য্য রাজপুরুষদিগের ভাষাতেই সম্পন্ন হওয়াও আবশ্যক। আমাদিগের এমন অনেকগুলি কথা আছে যাহা রাজপুরুষদিগকে বুঝাইতে হইবে। সে সকল কথা ইংরাজিতেই বক্তব্য। এমন অনেক কথা আছে যে, তাহা কেবল বাঙ্গালীর জন্য নহে, সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার শ্রোতা হওয়া উচিত। সে সকল কথা ইংরাজিতে না বলিলে, সমগ্র ভারতবর্ষ বুঝিবে কেন? ভারতবর্ষীয় নানা জাতি একমত, একপরামর্শী, একোদ্যোগী না হইলে ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই মতৈক্য, একপরামর্শিত্ব, একোদ্যম, কেবল ইংরাজির দ্বারা সাধনীয়, কেন না এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, পঞ্জাবী ইহাদিগের সাধারণ মিলনভূমি ইংরাজি ভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে। অতএব যতদূর ইংরাজি চলা আবশ্যক, ততদূর চলুক। কিন্তু একেবারে ইংরাজ হইয়া বসিলে চলিবে না। বাঙ্গালী কখন ইংরাজ হইতে পারিবে না। বাঙ্গালী অপেক্ষা ইংরাজ অনেক গুণে গুণবান্ এবং অনেক সুখে সুখী; যদি এই তিন কোটি বাঙ্গালী হঠাৎ তিন কোটি ইংরাজ হইতে পারিত, তবে সে মন্দ ছিল না। কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা নাই; আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্ম্ম স্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময় ধরা পড়িব। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কোটি সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে না। গিলটি পিতল হইতে খাঁটি রূপা ভাল। প্রস্তরময়ী সুন্দরী মূর্ত্তি অপেক্ষা কুৎসিতা বন্যা নারী জীবনযাত্রার সুসহায়। নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালী স্পৃহনীয়। ইংরাজি লেখক ইংরাজি বাচক সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখন খাঁটি বাঙ্গালির সমুদ্ভবের সম্ভাবনা নাই। যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।

এ কথা কৃতবিদ্য বাঙ্গালীরা কেন যে বুঝেন না তাহা বলিতে পারি না। যে উক্তি ইংরাজিতে হয়, তাহা কয়জন বাঙ্গালীর হৃদয়ঙ্গম হয়? সেই উক্তি বাঙ্গালায় হইলে কে তাহা হৃদয়ঙ্গম না করিতে পারে? যদি কেহ এমত মনে করেন যে, সুশিক্ষিতদিগের উক্তি কেবল সুশিক্ষিতদিগেরই বুঝা প্রয়োজন সকলের জন্য সে সকল কথা নয়, তবে তাঁহারা বিশেষ ভ্রান্ত। সমগ্র বাঙ্গালীর উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই, সমস্ত দেশের লোক ইংরাজি বুঝে না; কস্মিন্‌কালে বুঝিবে এমতও প্রত্যাশা করা যায় না। কস্মিন্‌কালে কোন বিদেশীয় রাজা দেশীয় ভাষার পরিবর্ত্তে আপন ভাষাকে সাধারণের বাচ্যভাষা করিতে পারেন নাই, সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে তাহা তিন কোটি বাঙ্গালী কখন বুঝিবে না বা শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোন কালেও শুনিবে না। যে কথা দেশের সকল লোকে বুঝে না, বা শুনে না, সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।"

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বার্ত্তাবহ করিয়া তাহার সাহায্যে বঙ্গ মধ্যে জ্ঞানের প্রচারকল্পে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গ দর্শন' প্রচার করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দীপনাময়ী আহ্বানবাণী ব্যর্থ হয় নাই। তাঁহার পতাকাতলে স্বনামধন্য দীনবন্ধু, প্রত্নতাত্ত্বিক রামদাস সেন, ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও ভাষাতত্ত্ববিদ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সঙ্গীত-বিজ্ঞানবিদ্ জগদীশনাথ রায়, সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক অক্ষয়চন্দ্র সরকার, সমালোচকশ্রেষ্ঠ চন্দ্রনাথ বসু, পণ্ডিত-প্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ভারত-সঙ্গীতের মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অবকাশরঞ্জিনী'র কবি নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতি বাঙ্গালার চিরস্মরণীয় মনীষিগণ সমবেত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের আকাঙ্ক্ষা সফল করিয়াছিলেন। ভাবের অপূর্ব্ব রসধারায় বঙ্গসাহিত্য অভিসিঞ্চিত হইল ও নবীন আকার ধারণ করিল। দীনা বঙ্গভাষা তখন রাজরাজেশ্বরী রূপে প্রতিভাত হইলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর', 'কৃষ্ণকান্তের

উইল'—যাহাতে তিনি বুঝাইলেন চিত্ত-সংযম প্রবৃত্তি ব্যতিরেকে প্রকৃত সুখ সম্ভবপর নহে,—'আনন্দমঠ' ও 'কমলাকান্ত'—যাহাতে তিনি বঙ্গবাসীকে দেশজননীর প্রকৃত মূর্ত্তি দেখাইলেন,—দেখাইলেন মা কি ছিলেন ও কি হইয়াছেন,—'রাজসিংহ' – যাহাতে তিনি হিন্দুর পূর্ব্ব গৌরবকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া বুঝাইলেন—

'যাদের মহিমাময় এ অতীত তাদের কখনও হবে না ধ্বংস।'

'দেবী চৌধুরাণী'—যাহাতে তিনি গীতার নিষ্কাম কর্ম্মের আদর্শ বুঝাইলেন—এই সকল অমূল্য রত্নই তিনি 'বঙ্গদর্শনে'র মধ্য দিয়া বঙ্গবাসীকে উপহার দিয়াছিলেন। যে অলৌকিক প্রতিভার সাহায্যে তিনি বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাসের মূল সূত্রগুলির ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, তাহার নিকট পরবর্ত্তী প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ঋণী। বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ, মহেঞ্জোদাড়োর আবিষ্কারক, আমাদের স্বর্গগত বন্ধু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একবার বলিয়াছিলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি হইতে তাঁহার অমূল্য ঐতিহাসিক গবেষণার অনেক মূলসূত্র তিনি পাইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সমালোচনায় বাঙ্গালার সাহিত্যিক রুচি সংগঠিত হইয়াছিল এবং বঙ্গবাণীর পবিত্র মন্দিরে অপবিত্রতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করিতে পারে নাই। কয়েক বৎসরের মধ্যে 'বঙ্গদর্শন' অসাধ্য সাধন করিয়াছিল,—

"বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে
কার সাধ্য রোধে তার গতি?"

বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার সহযোগিগণ বঙ্গসাহিত্যে যে অজস্র ভাবস্রোত প্লাবিত করিয়াছিলেন তাহার গতি রুদ্ধ হয় নাই, তাহা অপূর্ব্ব রঙ্গে বিশ্বের অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্রে মিলিত হইয়াছিল।

শেষ জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র এক নূতন মূর্ত্তিতে দেখা দিলেন। হিন্দু ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্মব্যাখ্যা, কৃষ্ণ-চরিত্রের যথার্থ বিশ্লেষণ, বৈদিক সাহিত্যের চিত্তাকর্ষিণী সমালোচনা, বাঙ্গালী পাঠকের সম্মুখে এক নূতন জগৎ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিল। 'প্রচার', 'নবজীবন' ও Calcutta University Magazineএ এই সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 'প্রচারে'ই তাঁহার শেষ উপন্যাস 'সীতারাম' প্রকাশিত হয়। ইহার একটি বাক্য আজ বিশেষ ভাবে স্মরণযোগ্য :—

"হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?"

বঙ্কিমচন্দ্রের এই শেষ উপদেশ—আমাদিগকে নির্ভর-পরায়ণ হইতে হইবে, নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে, ধ্বংসোন্মুখ জাতিকে রক্ষা করিতে "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" বঙ্কিমচন্দ্রের এই মহাবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া আমরা যেন জীবনপথে অগ্রসর হইতে পারি, তাহা হইলেই স্বজাতিবৎসল বঙ্কিমচন্দ্রের স্বর্গগত আত্মা পরিতৃপ্ত ও চরিতার্থ হইবে।

সনাতন ধর্ম্ম

তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতন ধর্ম্ম নহে, সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম্ম; তাহার প্রভাবে প্রকৃত সনাতন ধর্ম্ম—ম্লেচ্ছেরা যাহাকে হিন্দু ধর্ম্ম বলে—তাহা লোপ পাইয়াছে। প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক—কর্ম্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার—বহির্ব্বিষয়ক ও অন্তর্ব্বিষয়ক। অন্তর্ব্বিষয়ক যে জ্ঞান, সেই সনাতন ধর্ম্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্ব্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি, তাহা না জানিলে, সূক্ষ্ম কি, তাহা জানা যায় না। এখন এদেশে অনেক দিন হইতে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কাজেই প্রকৃত সনাতন ধর্ম্মও লোপ পাইয়াছে। সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে, আগে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক।...

আনন্দমঠ—বঙ্কিমচন্দ্র

চৈতালী

—শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

বৎসর পরে ভুবনে আবার
এসেছে চৈত্র-সন্ধ্যা ;
মঞ্জুল বায়, শিহরিত-কায়
বিহরে উতল-ছন্দা !
দিকে দিকে আজ খোলে বাতায়ন
ভুবনে ভুবনে ওঠে আবাহন,
ফুলতরুশাখে জাগায়ে কাঁপন
ফোটায়ে যোজন-গন্ধা,
ঘাসে ঘাসে ফেলি' চপল চরণ
এসেছে চৈত্র-সন্ধ্যা।

ফাল্গুন ফুল বিতানে বিতানে
লেগেছে কিসের বর্ণ ;
পল্লবে আজ কী রঙ মেখেছে
—রক্ত, হরিৎ, স্বর্ণ !
ছোঁয়া লেগে তার, দোল লেগে হায়,
দিগ্‌বধূদের তন্দ্রা ঘনায়,
নিখিল নাচের ছন্দ দোলায়
নৃত্য-পাগল পর্ণ ;—
কাননে কাননে জাগে সমারোহ
—নব রামধনু বর্ণ !

সুখ-অভিসারে ফিরিছে অনিল
মত্ত মাধবীকুঞ্জে ;
অঙ্গে বহিয়া এনেছে গোপন
অনঙ্গ শর-তূণ যে !
গাছে গাছে আর দোদুল শাখায়
নাচে অভিনব চঞ্চল বায়
অঙ্গনাদের অঞ্চল ছায়
শিহরণসুখ ভুঞ্জে।
—গন্ধলোকের নন্দন বনে
কলাপী কোকিল গুঞ্জে !

হিম-জর্জ্জর ক্লিষ্টা ধরণী
তরুলতা ছিল বন্ধ্যা,
শুখায়ে আছিল অশোকের বুকে
রূপের অলকানন্দা ;—
কত না যামিনী পোহাল বিফলে
কত চন্দ্রিমা ফিরে গেল চ'লে
আসিল না তার অঙ্গন-তলে
অন্তরলোক-বন্দ্যা !
ঘন তুহিনের বাষ্পে সকলি
ঘিরেছিল শীতসন্ধ্যা।

বহু দিন পরে আজিকে আবার
হাসিয়া উঠিল সৃষ্টি
শুষ্ক মরুর বক্ষে ঝরিল
অপরূপ রস বৃষ্টি !
ফুল ফোটানোর মোহন মায়ায়
নাচে মনোহর রৌদ্র ছায়ায়
লাগিয়াছে তার সকল কায়ায়
অরূপের রূপ দৃষ্টি ;—
হিল্লোলি' ওঠে বিশ্ব-নিখিল
হর্ষে ভরিল সৃষ্টি।

চম্পকবাসে উদ্বেল নিশি
অন্তরভরা রঙ্গ
মদালসা আঁখি, চেয়ে আছে যেন
পেয়েছে স্বপন-সঙ্গ।
সৃষ্টি-সায়রে শোভা ঢল ঢল্
লীলা-সুন্দর ও রূপকমল
হেরি ভূলোকের চিত চঞ্চল
দ্যুলোকের তপোভঙ্গ—
সপ্ত ভুবন মুগ্ধ নেহারি'
চৈতালী রসরঙ্গ !

একূল ওকূল

-শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

[১]

চল্লিশ বৎসর বয়সে সাধুচরণ যেদিন হঠাৎ কাহাকেও কিছু না বলিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া গেলেন, সেদিন গাঁয়ের সকলে একবাক্যে বলিল, ইহা যে ঘটিবে তাহা কাহারও অবিদিত ছিল না, বরং সাধুচরণ প্রাণের মধ্যে এতখানি বৈরাগ্য পুষিয়া এতদিন সংসার করিল কি করিয়া, ইহাই আশ্চর্য্য। কিন্তু সাধুচরণের স্ত্রী সৌদামিনী চারিদিক্ অন্ধকার দেখিলেন।

সৌদামিনীর বয়স তখন আটাশ। বড় ছেলে নিমাই সবে চৌদ্দ বছরে পা দিয়াছে; এখনও পাঠশালা ছাড়ে নাই। তাহার নীচে তিনটি বোন। জমিজমা সামান্য যাহা আছে, তাহাতে সাধুচরণের বৈরাগ্যলিপ্ত চিত্ত কোন ক্রমে গ্রাসাচ্ছাদন যোগাড় করিয়া চলিতেছিল। কিন্তু এখন তাহাও ঘুরিয়া গেল। কারণ সংসারের একমাত্র সমর্থ পুরুষ যদি বিনা বাক্যব্যয়ে গৃহত্যাগ করে, তবে সংসার চলে কি করিয়া?

পাঁচ বৎসর সৌদামিনীর চোখের জল শুকাইল না।

কিন্তু সংসারের একটা অলঙ্ঘনীয় নিয়ম আছে, দিন কাটিয়া যায়। চাকা-ভাঙ্গা পারিবারিক যন্ত্রণা—যাহা আর কোনদিন চলিবে না বলিয়া মনে হইয়াছিল—আবার নড়িতে আরম্ভ করিল। দেখা গেল, সাধুচরণের অভাবে সেটা গুরুতর রকম জখম হইয়াছিল বটে, কিন্তু একেবারে অচল হয় নাই।

ক্রমে সৌদামিনীর চোখের জলও শুকাইল। জমিদার ভাল লোক, সৌদামিনীর অবস্থা বুঝিয়া তিনি আর কয়েক বিঘা জমি তাঁহাকে দিয়াছিলেন, খাজনাও কমাইয়া নামমাত্র রাখিয়াছিলেন। পাড়াগাঁ হইলেও নিঃস্বার্থ লোক দু' এক জন ছিল; তাহারা ক্ষেতখামার দেখিয়া দিত, যাহাতে চাষারা অসহায়া স্ত্রীলোকের যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়া লইতে না পারে। মাথায় গুরুভার পড়িলে দেখা যায়, ভারটা যত দুর্ব্বহ মনে করা গিয়াছিল, ততটা নয়। সৌদামিনীরও তাহাই হইল। ক্রমে তিনি নিজেই কাজ চালাইয়া লইতে শিখিলেন। এদিকে নিমাইও বড় হইয়া উঠিতে লাগিল।

ধীরে ধীরে সাধুচরণের সংসারে তাঁহার শূন্য স্থানটা ভরাট হইয়া আসিতে লাগিল। তাঁহার প্রথমা কন্যা সাবিত্রীর বিবাহ যেদিন স্থির হইয়া গেল, সেদিন সৌদামিনী আবার সেই প্রথম দিনের মত কাঁদিলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ কাঁদিবার অবসর কৈ? চোখ মুছিয়া তাঁহাকে আবার মেয়ের বিবাহের কাজে লাগিতে হইল।

সামান্য ঘরে সামান্য বরে বিবাহ। তবু প্রথম মেয়ের বিবাহ; আয়োজন যথাসাধ্য ভাল করিতে হইল। পাড়ার মোড়ল হারু মুখুজ্যে দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন,—'হ্যাঁ—একলা মেয়েমানুষ, কিন্তু বুকের পাটা আছে বলতে হবে।' বলিয়া গাঁয়ের অন্যান্য প্রবীণ ব্যক্তিদের সঙ্গে গোপনে এই প্রশ্নটাই আলোচনা করিতে চলিলেন যে, সাধুচরণের বৌ নিতান্ত অসহায় হইয়াও এত আয়োজন করিতে সমর্থ হইল কিরূপে।

বিবাহের দিন প্রাতঃকালে সমস্যা উঠিল, বর ও বরযাত্রীদের বসিবার ব্যবস্থা হইবে কোথায়। চণ্ডীমণ্ডপের ঘরটা সাধুচরণের অন্তর্দ্ধানের পর হইতে এ কয় বৎসর সৌদামিনী তালা লাগাইয়া রাখিয়াছিলেন, কাহাকেও ব্যবহার করিতে দেন নাই। তাঁহার মনে হয় ত আশা ছিল, সাধুচরণ যদি কখনও ফিরিয়া আসেন, তবে ঐ ঘর আবার ব্যবহার করিবেন। এখন সৌদামিনী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সেই ঘরের চাবি বাহির করিয়া দিলেন। বলিলেন,—'ঐ ঘরেই আসর কর্ নিমাই। তাঁর নিজের ঘর ছিল, সব সময় বসে শাস্তর-পুঁথি পড়তেন; ঐ ঘরেই জামাই এসে বসুক। মেয়ে-জামায়ের কল্যাণ হবে।' বলিয়া ঘন ঘন চোখের জল মুছিতে লাগিলেন।

যা' হোক, মেয়ের বিবাহ হইয়া গেল। সাধুচরণের সাবেক ঘরে কিন্তু আর তালা পড়িল না। নিমাই বড় হইয়াছিল, আঠার উনিশ বছর বয়স। ঘরটা সে ব্যবহার করিতে

লাগিল। স[illegible]র দু'চার জন বন্ধু আসিত, তাহাদের সহিত গল্প-গুজব, [illegible]াইয়া দু' একটা বিড়ি খাওয়া চলিতে লাগিল।

নিমাই আগে ঘোষেদের বাড়ীতে আড্ডা দিতে যাইত; এখন নিজের চণ্ডীমণ্ডপে বসিতে লাগিল দেখিয়া সৌদামিনী চাবি লাগাইবার কথা আর বলিতে পারিলেন না। হাজার হোক, নিমাই এখন বাড়ীর কর্ত্তা, বাহিরে একটা ঘর না হইলে তাহার অসুবিধা হয়। তা' ছাড়া এখন জামাই হইয়াছে, মেয়ের শ্বশুরবাড়ী হইতে সর্ব্বদা লোকজন আসিতেছে; বাহিরে একটা ঘর না হইলে চলিবে কেন?

সুতরাং বাহিরের যে ঘরটা এতদিন সাধুচরণের শোক-স্মৃতির তাজমহল হইয়া বিরাজ করিতেছিল, তাহা আবার নিত্যব্যবহার্য্য সাধারণ বৈঠক হইয়া পড়িল।

নিমাই ছেলেটি বেশ বুদ্ধিমান্। কুড়ি বছর বয়স হইতেই সে নিজের দায়িত্ব বুঝিয়া চলিল। শুধু তাই নয়, নানা বুদ্ধি খাটাইয়া সে জমিজমা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। একুশ বছর বয়সে সৌদামিনী তাহার বিবাহ দিলেন।

নিমায়ের বিবাহের দিনেও সৌদামিনী আবার চোখের জল ফেলিলেন। কিন্তু বেশী চোখের জল ফেলিতেও সাহস হইল না, ছেলের অকল্যাণ হইতে পারে। নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিলেন,—'কপাল! যার ঘর যার সংসার, সে ই ভোগ করতে পেলে না—!'

ছেলের বিবাহের পর সৌদামিনী ধর্ম্ম-কর্ম্মের দিকে অধিক মন দিলেন; গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। সাধুচরণ চলিয়া যাইবার পর তিনি শাঁখাসিঁদুর রাখিয়া দিলেন বটে, কিন্তু হবিষ্য আহার করিতেন এবং অন্যান্য বিষয়েও ব্রহ্মচারিণীর কঠোর নিয়ম পালন করিতেন। এখন বধূর হাতে সংসারের অধিকাংশ কাজ তুলিয়া দিয়া তিনি জপতপের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। ছেলে কোনদিন পর হইয়া যাইবে এ ভাবনা তাঁহার ছিল না, তাই বধূর হাতে সংসার ছাড়িয়া দিতে তিনি দ্বিধা করিলেন না।

তারপর আরও দু' তিন বছর গেল।

সাধুচরণের সন্ন্যাসগ্রহণের পর এগার বছর গেল। দ্বাদশ বৎসর স্বামী নিরুদ্দেশ থাকিলে কুশপুত্তলি দাহ করিয়া রীতিমত বৈধব্য আচার গ্রহণ করিতে হয়; পুরোহিত মহাশয়ের সঙ্গে এই সব বিধিবিধান সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময় হঠাৎ একদিন সাধুচরণ নিজের গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

[২]

কার্ত্তিক মাসের প্রভাত। তখনও ঘাসে ও গাছের পাতায় শিশির শুকায় নাই; পুঁটু সদর দরজায় জলছড়া দিতেছিল, এমন সময় এক সন্ন্যাসী আসিয়া দাঁড়াইলেন। পুঁটুর মুখখানি ভাল করিয়া দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন,—'পুঁটু না?'

পুঁটু চমকিয়া মুখ তুলিল। সন্ন্যাসীর গায়ে একটা ময়লা ছেঁড়া আলখাল্লা, মাথায় রুক্ষ চুল, কাঁচাপাকা গোঁফ-দাড়ি, মুখে একটু করুণ হাসি। তাঁহাকে দেখিয়া পুঁটু হাতের ঘটি নামাইয়া থতমত ভাবে বলিল,—'আপনি কে?'

সন্ন্যাসী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—'আমি তোমার বাবা।'

সাধুচরণ যখন বিরাগী হইয়া যান, তখন পুঁটুর বয়স ছিল দেড় বছর; কিন্তু সে মায়ের কাছে গল্প শুনিয়া সব কথা জানিত। কিছুক্ষণ বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া সে চীৎকার করিতে করিতে ভিতরের দিকে ছুটিল,—'ওমা—ও মেজদি—কে এসেছে ত্যাখ,—বাবা—বাবা এসেছেন—ওমা—'

মুহূর্ত্তমধ্যে বাড়ীতে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সৌদামিনী ছুটিতে ছুটিতে বাহিরে আসিয়া স্বামীকে দেখিয়া একেবারে তাঁহার পা জড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন,—'ও গো, এতদিন পরে তুমি ফিরে এলে—'

সাধুচরণের চোখেও জল গড়াইয়া পড়িল, তিনি বলিলেন,—'হাঁ লক্ষ্মী, আমি এসেছি। ওঠ।'

সৌদামিনী পা জড়াইয়া থাকিয়াই বলিলেন,—'আর চলে যাবে না, বল।'

সাধুচরণ বলিলেন,—'না আর যাব না। সংসার ছেড়ে যাওয়াই আমার ভুল হয়েছিল, লক্ষ্মী। যা খুঁজতে বেরিয়েছিলুম তা' ত পেলুম না। এখন ঘরেই থাকব।'

দেখিতে দেখিতে গ্রামের লোক জড় হইয়া গেল। প্রবীণ ব্যক্তিরা সাধুচরণকে আশীর্ব্বাদ ও প্রীতিজ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। হারু মুখুজ্যে বলিলেন,—'সাধুচরণ, তুমি যে

ফিরে এসেছ বাবা, এ শুধু তোমার সহধর্ম্মিণী আর ছেলে-মেয়ের পুণ্যে। সন্ন্যাসী হওয়া কি চাট্টিখানি কথা, বাবা, বাপ-পিতামো'র পুণ্যের জোর চাই। এই ত্থাখ না, আমার তিন কুড়ি আট বয়স হল এখনো সংসারে জড়িয়ে আছি। চেষ্টা করলে কি আমি বৈরাগী হতে পারতুম না? এই ত সেবার জমিদারবাবুকে বলেছিলাম, রাধা-গোবিন্দ মন্দিরের সেবায়েৎ করে দিন, দেখুন সংসার ত্যাগ করতে পারি কি না—ঘরে তৃতীয় পক্ষ আছে ত কি হয়েছে। তা' সে যা' হোক, এখন ফিরে এসেছ, ছেলেপুলে নিয়ে মনের সাধে ঘর-সংসার কর, আমরা দেখে চোখ জুড়োই।' উপস্থিত ছেলেবুড়ো সকলেই মুখুজ্যের এই সদিচ্ছার সমর্থন করিল।

নিমাই ক্ষেতখামার পরিদর্শন করিতে প্রত্যুষেই বাহির হইয়া গিয়াছিল, মাঠে পিতার আগমন-সংবাদ শুনিতে পাইয়া ছুটিতে ছুটিতে ফিরিয়া আসিল। জটাজুটধারী বাপকে দেখিয়া সে ক্ষণেক থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, তার পর সঙ্কুচিত ভাবে প্রণাম করিল। সাধুচরণ তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

তার পর কয়েকদিন ধরিয়া সাধুচরণের গৃহে যেন উৎসব লাগিয়া গেল। তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন-বার্ত্তা চারিদিকে রটিয়া যাইবার পর, আশেপাশের গ্রাম হইতেও পরিচিত-অপরিচিত নানা লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। সাধুচরণ এই এগারো বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের নানাদেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন; সাধু, যোগী, অলৌকিক ব্যাপারও বোধ করি অনেক প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন; তাঁহার গল্প সকলে চমৎকৃত হইয়া শুনিতে লাগিল। চণ্ডীমণ্ডপে লোক ধরে না। দিবারাত্রির অধিকাংশ সময়ই সাধুচরণ বহুজনপরিবৃত হইয়া তাঁহার সন্ন্যাসী-জীবনের কাহিনী শুনাইতেছেন। বাড়ীর ভিতরেও আনন্দের সীমা নাই। দলে দলে গাঁয়ের মেয়েরা আসিতেছে; সৌদামিনীর চোখে কখনও জল, কখনও হাসি—জপতপও এক প্রকার বন্ধ আছে। বিবাহিতা মেয়ে সাবিত্রী সংবাদ পাইয়া বাপকে দেখিতে আসিয়াছে। দুই অনূঢ়া মেয়ে, কালী ও পুঁটু মুহুর্মুহু বাহিরে গিয়া বাপকে দেখিয়া আসিতেছে। বিশেষতঃ পুঁটু ত আহ্লাদে ও গর্ব্বে আটখানা, কারণ সে-ই প্রথমে পিতাকে আবিষ্কার করিয়াছে।

মোটের উপর একটা কল্পনাতীত উত্তেজনা ও বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া এই পরিবারের জীবনের সাতটা দিন কাটিয়া গেল।

তার পর ধীরে ধীরে নূতনত্বের জৌলষ যখন কাটিয়া আসিল, তখন আবার স্বাভাবিক ভাবে জীবনযাত্রা চালাইবার চেষ্টা হইল। সাধুচরণ বাহিরের ঘরটাই অধিকার করিয়া রহিলেন; বাড়ীর অন্দরের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইল না। দীর্ঘকাল গৃহহীন পরিব্রাজকের জীবন যাপন করিয়া তাঁহার নূতন অভ্যাস যাহা কিছু জন্মিয়াছিল, তাহা তিনি নিজের মধ্যেই রাখিলেন। সন্ন্যাসীর জীবনে আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছু হোক না হোক, একটা স্বাবলম্বনের ভাব-ও বিলাসবিমুখতা জন্মে। সাধুচরণেরও তাহা জন্মিয়াছিল। তাই তাঁহার আগমনে পরিবারের এক জন লোক বাড়িল বটে, কিন্তু দায়িত্ব বা অসুবিধা কিছু বৃদ্ধি হইল না।

এই ভাবে কার্ত্তিক মাসটা কাটিয়া গেল।

অগ্রহায়ণ মাসের গোড়ায়, একদিন সন্ধ্যার পর তুলসীমঞ্চে প্রদীপ দেখাইয়া সৌদামিনী ছোট মেয়েকে বলিলেন,—'পুঁটু, বাইরে দেখে আয় ত কেউ আছে কি না।'

পুঁটু এইমাত্র দেখিয়া আসিয়াছিল, বলিল,—'না মা, কেউ নেই। বাবা একলা বসে আছেন।'

সৌদামিনী তুলসীমূলে প্রদীপ রাখিয়া, বধূকে রান্না চড়াইবার আদেশ দিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে গেলেন। সাধুচরণের সঙ্গে তাঁহার নিভৃতে সাক্ষাৎ ঘটিবার সুযোগ বড় একটা হয় না, সন্ধ্যাকালে দু' এক জন বাহিরের লোক সর্ব্বদাই তাঁহার কাছে আসিয়া বসে। আজ নিরিবিলি পাইয়া সৌদামিনী স্বামীর ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘরে রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বালা হইয়াছিল, সাধুচরণ একটা রুক্ষ কম্বল দুই কাঁধের উপর তুলিয়া দিয়া স্থির হইয়া বসিয়া ছিলেন; স্ত্রী প্রবেশ করিলে একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া বলিলেন,—'এস, লক্ষ্মী।'

সৌদামিনী মাদুরের একটা কোণে বসিয়া বলিলেন,—'নিশ্চিন্দি হয়ে তোমার কাছে দু'দণ্ড যে বসব তা' আর হয় না। এখনি হয় ত কে এসে পড়বে।'

সাধুচরণ বিমনা ভাবে বাহিরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—'না, এখন আর কে আসবে! নিমাইকে সন্ধ্যেবেলা দেখি না, সে কোথাও যায় না কি?'

সৌদামিনী কহিলেন,—'সারাদিন খেটে খুটে সন্ধ্যের পর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দুটো গল্পগুজব করতে যায়। আগে ত এই ঘরেই বসত'—বলিয়া সৌদামিনী থামিয়া গেলেন।

সাধুচরণ অল্প হাসিয়া বলিলেন,—'আমি এসে ওর বসবার যায়গাটা কেড়ে নিয়েছি—না?'

জিভ কাটিয়া সৌদামিনী বলিলেন,—'সে কি কথা!' তার পর তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন,—'নিমুকে কি কোনো দরকার আছে?'

'না, দরকার এমন কিছু নয়। তবে সন্ধোবেলা আমার কাছে এসে বসত, দুটো ধর্ম্মকথা শুনত—এই আর কি।'

পুত্র পিতার কাছে বসিয়া ধর্ম্মোপদেশ শুনিবে, ইহার চেয়ে আনন্দের কথা আর কি থাকিতে পারে! তবু সৌদামিনীর বুকের ভিতর ছাঁৎ করিয়া উঠিল। তিনি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—'ও ছেলেমানুষ, ওর এখন আমোদ আহ্লাদের বয়স, আর ধর্ম্মকথার ও বুঝবেই বা কি!—তার চেয়ে আমাকেই দুটো ধর্ম্মকথা শোনাও না গো! দেশশুদ্ধ লোক শুনলে, কেবল আমিই শুনতে পেলুম না।'

সাধুচরণ প্রসন্নস্বরে বলিলেন,—'বেশ। কি শুনতে চাও বল।'

সৌদামিনী বিশেষ কিছুই শোনেন নাই, তিনি গোড়া হইতে সব কথা শুনিতে চাহিলেন। তখন সাধুচরণ ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন। গৃহত্যাগ করিবার পর হইতে কোথায় কোথায় গিয়াছেন, বনে জঙ্গলে পর্ব্বতে কোথায় কোন্ মহাপুরুষের দর্শন লাভ করিয়াছেন, কবে কোন্ তীর্থে স্নান করিয়াছেন ইত্যাদি অনেক গল্প বলিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতাও কেমন করিয়া অল্পে অল্পে কমিয়া আসিল, তাহাও গোপন করিলেন না একবার অসুখে পড়িয়া তাঁহার কিরূপ দুরবস্থা হইয়াছিল, তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া শেষে বলিলেন,—'বুঝতে পারলুম ঘর ছেড়ে এসে ভুল করেছি। সদ্‌গুরুর দর্শন পেলুম না; তা' ছাড়া জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত নিঃসম্বল ভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়াবার মত বৈরাগ্যের জোরও আমার নেই। তাই শেষ পর্য্যন্ত তোমাদের কাছেই ফিরে এলুম, লক্ষ্মী। ভাবলুম, সাধন ভজন যা' করবার ঘরে বসেই করব।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সৌদামিনী বলিলেন,—'ভগবানের অসীম দয়া।'

কিছুক্ষণ উভয়ে চুপ করিয়া রহিলেন। তার পর সৌদামিনী আস্তে আস্তে বলিলেন,—'আমি বলছিলুম কি, ভগবানের দয়ায় যখন ঘরে ফিরে এলে, তখন ওই কম্বল-টম্বল ছেড়ে আবার আগেকার মতন'

মাথা নাড়িয়া সাধুচরণ বলিলেন,—'না লক্ষ্মী, ওই কথাটি ব'ল না। এতদিন পরে আর তা' পারব না, অভ্যাস ছেড়ে গেছে।' ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন,—'আমি এই বাইরের ঘরটিতে পড়ে থাকব আর দুটি করে খাব। আমাকে আর সংসারে টেন না—মনে ক'রো তোমাদের বাড়ীতে এক জন অতিথ এসেছে।' বলিয়া একটু হাসিলেন।

সৌদামিনী বলিয়া উঠিলেন,—'ও আবার কি কথা! তুমিই ত সব। তবে তুমি যদি আবার আগেকার মত হয়ে বসতে পারতে, তা' হলে ছেলের বুকে সাহস হত। হাজার হোক, ছেলে মানুষ বৈ ত নয়।'

'না লক্ষ্মী, এ বয়সে নতুন করে বিষয়-আশয় দেখা আর পেরে উঠব না, তাতে কাজ নেই। তুমি ত জান, চিরদিনই আমি খোলাভোলা লোক। তার চেয়ে নিমাই যেমন করছে করুক, ওর দ্বারাই হবে। দেখেছি, কাজে কর্ম্মে ওর খুব মন আছে।

তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া সৌদামিনী বলিলেন,—'তা' আছে। ও-ই ত ক' বছর ধরে সব করছে। এরই মধ্যে ও—'

এই সময় বাহিরে পদশব্দ শুনা গেল। সৌদামিনী গলা বাড়াইয়া দেখিলেন—হারাণ দত্ত। হারাণ লোকটা নিষ্কর্ম্মা, পরের বৈঠকে আড্ডা দিয়া বেড়ানোই তাহার পেশা। সৌদামিনী বিরক্ত হইলেন, গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন,—'খাবার এতক্ষণে তৈরী হ'ল, পুঁটুকে দিয়ে খবর পাঠাব। দেরী ক'রো না যেন।'

'আচ্ছা।—কে, হারাণ না কি? এস হারাণ।'

'আজ্ঞে কর্ত্তা। জমিদার-বাড়ী গিয়েছিলুম, সেখানে শুনে এলুম—'

শুনিতে শুনিতে সৌদামিনী অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

[৩]

শনিবারে নিমাই সহরে গিয়াছিল।

বেলা একটার সময় ফিরিয়া আসিয়া স্নানাদির পর আহারে বসিলে সৌদামিনী তাহার সম্মুখে বসিয়া বলিলেন,—'কি হল ?'

নিমাই অন্নের গ্রাস মুখে তুলিয়া বলিল,—'কাল তা'রা মেয়ে দেখতে আসবে।'

সৌদামিনী উৎসুক স্বরে বলিলেন,—'তার পর, ছেলেটিকে কেমন দেখলি ? কালীর সঙ্গে মানাবে ত ?'

'বেশ মানাবে। একটু রোগা কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না।'

'বয়স কত হবে ?'

'হবে উনিশ কুড়ি। এই সবে চাকরিতে ঢুকেছে, এখনো পাকা হয়নি। তার ভগ্নীপতি ডেপুটি পোষ্টমাষ্টার কি না, তিনিই চেষ্টা করে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। শুনলুম, শীগ্‌গিরই চাকরিতে পাকা হবে।'

সৌদামিনী খুশী হইয়া বলিলেন,—'হ্যাঁ রে, ছেলের বাপ নেই বুঝি ?'

'না, বাপ নেই মা আছে। বড় দুই ভাই আছে, তা'রা কাটা কাপড়ের দোকান করে। তিন ভাই একান্নবর্ত্তী, অবস্থা বেশ ভাল। এই ছেলেটি বংশের মধ্যে বিদ্বান্, এণ্ট্রেন্স্ পাশ করেছে।'

সৌদামিনী তৃপ্ত হইয়া বলিলেন,—'বেশ হবে। একটা মেয়ে যদি চাকুরের ঘরে পড়ে ত, মন্দ কি ? সহরে একজন আপনার লোক রইল। তা হ্যাঁ রে, কি বুঝলি ? টাকার কামড় খুব বেশী হবে না কি ?'

'এখনও ত দেনা-পাওনার কোনও কথাই হয় নি। দেখা যাক, কি চায়।'

'হ্যাঁ, সে পরের কথা পরে, আগে মেয়ে দেখে পছন্দ ত করুক। কালী অবিশ্যি অপছন্দর মেয়ে নয়—।'

অন্যান্য আরও অনেক সাংসারিক কথার পর, আহার শেষ করিয়া উঠিবার সময় নিমাই বলিল,—'মা, একটা খারাপ খবর আছে।'

শঙ্কিত ভাবে সৌদামিনী বলিলেন,—'কি রে ?'

নিমাই গলা খাটো করিয়া বলিল,—'রাধাগোবিন্দ মন্দিরের জন্য জমিদার বাবু একজন ভাল সেবায়েৎ খুঁজ-ছিলেন ; বাবার কথা তাঁকে বলেছিলুম। একরকম ঠিকও হয়ে গিয়েছিল ; কিন্তু মাঝে থেকে একজন গিয়ে তাঁর কাছে চুকলি খেয়েছে।'

সৌদামিনী কিছু জানিতেন না ; নিমাই কথাটা যথাসম্ভব গোপন করিয়াছিল, মাকে পর্য্যন্ত বলে নাই। কিন্তু তিনি নিমেষ মধ্যে সমস্ত বুঝিয়া লইয়া বলিলেন,—'তার পর ?'

'তার পর আর কি—ফস্‌কে গেল।—কে চুকলি কেটেছে জান ? ঐ হিংসুটে বুড়ো হারু মুখুজ্যে ! ওর নিজের লোভ ছিল কি না।' বলিয়া নিমাই সক্রোধে মুখখানা বিকৃত করিল।

সৌদামিনী ঠোঁটে ঠোঁটে চাপিয়া কয়েক বার ঘাড় নাড়ি-লেন। পাড়াগাঁয়ে কে কিরূপ চরিত্রের লোক সকলেই জানে, অথচ পরস্পরকে দাদা খুড়ো জ্যেঠা বলিয়া মৌখিক আত্মীয়-তায় জীবন কাটাইয়া দেয়, ইহাতে নিজেদের কপটতার কথা ভাবিয়া তিল মাত্র লজ্জিত হয় না। সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি লাগিয়েছে মুখুজ্যে খুড়ো ?'

আসন ছাড়িয়া উঠিয়া নিমাই বলিল,—'সে আর শুনে কি হবে। কুচুটে বুড়ো রাজ্যির মিথ্যে কথা গিয়ে লাগিয়েছে।'

'তবু কি বলেছে শুনি না।'

'শুনবে ?—বলেছে বাবা গাঁজাখোর।'

সৌদামিনী উঠিয়া দাঁড়াইয়া তীব্র স্বরে বলিলেন,—'কি বলেছে ?'

'বাবা না কি রোজ রাত্তিরে হারাণ দত্তর সঙ্গে বসে গাঁজা খান। আরো কত কি বলেছে কে জানে। এত বড় মিথ্যে-বাদী ঐ বুড়ো—'

আরক্ত মুখে সৌদামিনী বলিলেন,—'যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। মুখুজ্যে খুড়ো নিজের বুকে হাত দিয়ে কথা বলে না ? ওর নাতনীকে ভাতারে নেয় না কেন ? কেউ জানে না বুঝি !—' বলিয়া তিনি ছেলের কাছে ঘেঁষিয়া আসিয়া ক্রুদ্ধ চাপা গলায় মুখুজ্যের নাতনীর অতি গুহ্য জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে লাগিলেন। নিমাই এঁটো হাতে দাঁড়াইয়া এই পরম রুচিকর কাহিনী শুনিল, তার পর বলিল,—'হুঁ।—ও বুড়োকে আমি ছাড়ব না, মা। কিন্তু এখন গোলমাল করে কাজ নেই, কালীর বিয়েটা আগে ভালয় ভালয় হ'য়ে যাক। তুমি দেখ

না, একদিন না একদিন ও-বুড়ো আমার হাতে এসে পড়বেই—তখন—' বলিয়া নিমাই দাওয়ার পাশে মুখ ধুইতে বসিল। পিতাকে গাঁজাখোর বলায় তাহার যত না রাগ হইয়াছিল, এই সূত্রে অমন লাভের চাকরী ফস্‌কাইয়া যাওয়ায় সে আরও আগুন হইয়া উঠিয়াছিল।

পর দিন দ্বিপ্রহরে সহর হইতে কালীকে দেখিতে আসিল—পাত্র ও তাহার দুই জন বন্ধু। মেয়ে দেখানো হইল। কালী চলনসই মেয়ে; পনের বছর বয়স, বাড়ন্ত গড়ন। মেয়ে দেখা হইলে পাত্র তাহার এক বন্ধুর কাণে কাণে কি বলিল। বন্ধু হাসিমুখে জানাইল, মেয়ে বেশ ভাল, তাহাদের পছন্দ হইয়াছে।

সাধুচরণ সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন; তিনি পাত্রটিকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দুই চারিটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পাত্র বন্ধুদের পানে একবার তাকাইয়া মুচ্‌কি হাসিয়া উত্তর দিল। এই সাধুটি যে তাহার সঙ্কল্পিত শ্বশুর, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই।

জলযোগ শেষ করিয়া পাত্রের দল পুনশ্চ কন্যা সম্বন্ধে তাহাদের পরিতোষ জ্ঞাপন করিয়া প্রস্থান করিল। বাড়ীতে সকলেই হৃষ্ট: সৌদামিনী আড়াল হইতে পাত্রকে দেখিয়াছিলেন; তাঁহার বেশ পছন্দ হইয়াছিল। ছেলেটি একটু রোগা বটে, কিন্তু বেশ চটপটে। সহরের ছেলে কি না—কথায় বার্ত্তায় দিব্যি চোস্ত।

সন্ধ্যার সময় সাধুচরণ নিমাইকে নিজের ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পিতাপুত্রে কিয়ৎকাল কথা হইল; তার পর নিমাই ক্ষুব্ধ মুখে বাড়ীর ভিতর গিয়া সৌদামিনীকে বলিল,—'মা, বাবার ছেলে পছন্দ হয় নি, সম্বন্ধ ভেঙে দিতে বললেন।'

সৌদামিনী তরকারী কুটিতেছিলেন, বঁটি ফেলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন, বলিলেন,—'সে কি রে!'

'হ্যাঁ—ছেলে না কি ট্যারা।'

'ট্যারা! কৈ, আমি ত কিছু দেখি নি।'

নিমাই বলিল,—'একটু চোখের দোষ আছে হয়ত, তাকে ট্যারা বলা চলে না। আর, অত দেখতে গেলে ত ঠক বাছতে গাঁ উজোড় হ'য়ে যাবে। ময়ূরছাড়া কার্ত্তিক এখন কোথায় পাওয়া যায়, বল।' বলিয়া হতাশ ভাবে হাত উল্টাইয়া প্রস্থান করিল।

সাধুচরণের প্রত্যাবর্ত্তনের পর হইতে যে জিনিষটি তলে তলে এই পরিবারের মধ্যে সৃষ্টি হইতেছিল, তাহা বুদ্ধিমতী সৌদামিনী এতদিন জোর করিয়াই চোখের সম্মুখ হইতে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন। যে-মানুষ চলিয়া যাওয়ায় একদিন সংসার ছন্নছাড়া হইয়া গিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিলে যে আবার একটা নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইবে, তাহা কেহ ভাবিতে পারে নাই। কিন্তু যখন তিল তিল করিয়া তাহাই দেখা দিতে আরম্ভ করিল, তখন সৌদামিনী অন্তরে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এখন তাঁহার এক সুরে বাঁধা সংসারের অবিচ্ছেদ্য ঐক্য নষ্ট হইয়া যায় দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। হাত ধুইয়া তিনি স্বামীর ঘরের অভিমুখে চলিলেন।

ঘরে প্রবেশ করিয়া সৌদামিনী শান্ত স্বরেই বলিলেন,—'হ্যাঁ গা, ছেলে পছন্দ হ'ল না?'

সাধুচরণ কম্বলের উপর অৰ্দ্ধশয়ান অবস্থায় ছিলেন, ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন,—'তোমার কি রকম মনে হ'ল?'

সৌদামিনী নিজের মতামত প্রকাশ করিতে আসেন নাই, ঈষৎ অধীর কণ্ঠে বলিলেন,—'আমার কি মনে হ'ল না-হ'ল তাতে ত কিছু আসে যায় না, আমি মেয়ে-মানুষ। কিন্তু তোমার অপছন্দ হ'ল কেন?'

সাধুচরণ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—'আর ত কিছু নয়, ছোকরা একটু ট্যারা।'

সৌদামিনী বলিলেন,—'কি জানি বাপু, আমি ত কিছু দেখিনি। আর, তা যদি একটু হয়ই তাতে দোষ কি? আর সব দিক্ দিয়ে ত ভাল।'

সাধুচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কালীর অমত হবে না?'

'ও আবার কি কথা! কালী গেরস্তর মেয়ে, যে বরে আমরা তা'কে দেব, সেই বর নিয়েই ঘর করতে হবে। আর অপছন্দই বা হবে কেন? ভাল ঘর, লেখাপড়া-জানা ছেলে,—একটু চোখের দোষ যদি থাকেই। কাণা-খোঁড়া ত আর নয়।'

অল্প হাসিয়া সাধুচরণ বলিলেন,—'খোঁড়া বা নুলো হ'লে বরং ভাল ছিল লক্ষ্মী। কিন্তু এ পাত্রের হাতে মেয়ে দিতে আমার মন সরছে না।'

'কেন?' সৌদামিনীর কণ্ঠে একটা অনিচ্ছাকৃত তীব্রতা আসিয়া পড়িল।

সাধুচরণ আবার কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন; বোধ হয় নিজের আপত্তিটাকে ভাষায় রূপ দিবার চেষ্টা করিলেন। শেষে বলিলেন,—'যোগসাধনের কথা তোমাকে ত বোঝাতে পারব না, কিন্তু যে-ছেলে ট্যারা—জন্মধ্যে যার দৃষ্টি স্থির হবার উপায় নেই—তাকে যে ভগবান্ মেরেছেন। সে যে কোন কালেই ধর্ম্মকর্ম্ম করতে পারবে না।'

সৌদামিনী স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। সাধুচরণের আপত্তির মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না বলিয়া নয়, হঠাৎ তাঁহার একটা বিভ্রম জন্মিল। মনে হইল, তাঁহার এই স্বামী তাঁহার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত, কোথাও তাঁহাদের মনের সাদৃশ্য পর্য্যন্ত নাই; এবং একদিন যে এই লোকটির সঙ্গে নিবিড় দাম্পত্য-বন্ধনের ভিতর দিয়া জীবন যাপন করিয়াছেন, তাহাও অসম্ভব বলিয়া মনে হইল। অজ্ঞাতসারে তাঁহার একটা হাত মাথার কাপড়ের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল।

সাধুচরণ বলিলেন,—'ধর্ম্মের অধিকার থেকে স্বয়ং ভগবান্ যাকে বঞ্চিত করেছেন, জ্ঞানতঃ হোক অজ্ঞানতঃ হোক, সে যে মহা পাষণ্ড। জেনেশুনে তাকে জামাই করি কি করে? বুঝছ না?'

সৌদামিনী বুঝিলেন না, বুঝিবার বৃথা চেষ্টাও করিলেন না। তিনি স্বামীকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিবাণে বিদ্ধ করিয়া বলিলেন,—'না, বুঝতে পারলুম না। আমি মুখ্যু মেয়েমানুষ, কিন্তু ট্যারা হলেই যে পাষণ্ড হয় এমন কথা বাপের জন্মে শুনিনি। তা' হলে ওখানে মেয়ের বিয়ে দেবে না? অমন পাত্র হাতছাড়া হয়ে যাবে?'

সাধুচরণ বলিলেন,—'তা আর উপায় কি, বল।'

সৌদামিনী ফিরিয়া দ্বারের দিকে যাইতে যাইতে বলিলেন,—'বেশ, যা' ভাল হয় কর। সাবিত্রীর বিয়ের সময় কিন্তু এসব হাঙ্গাম হয়নি।'

সৌদামিনী দ্বার অতিক্রম করিয়া যাইবার পর সাধুচরণ তাঁহাকে ফিরিয়া ডাকিলেন। সৌদামিনী মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—'কি বলবে বল, আমার ছিষ্টির কাজ পড়ে রয়েছে।'

সাধুচরণ একটু বিষণ্ণ ভাবে বলিলেন,—'আমি সন্ন্যাসী মানুষ, সংসারের বড় কিছু বুঝি না; আমার যা' মনে হল বললুম। তোমরা যদি মনে কর ওখানে বিয়ে দিলেই ভাল হবে, তাই দাও। এ সব বিষয়ে তুমি আর নিমাই আমার চেয়ে ভাল বোঝ, তোমাদের কাজে আমি ঝগড়া বাধিয়ে উৎপাত করতে চাই না।' বলিয়া চক্ষু বুজিয়া আবার কম্বলের উপর দেহ প্রসারিত করিলেন।

সৌদামিনী কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর নীরস স্বরে বলিলেন, -'তা' আর কি করে হবে। তুমি হলে বাড়ীর কর্ত্তা, ভাল হোক মন্দ হোক, তোমার হুকুমই মেনে চলতে হবে।' বলিয়া অসন্তোষপূর্ণ মেঘাচ্ছন্ন মুখে প্রস্থান করিলেন।

[৪]

কয়েক দিন কাটিয়া গেল। কালীর বিবাহের কথাটা আপাততঃ ধামাচাপা পড়িয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু নানা খুঁটিনাটির ভিতর দিয়া সংসারে অসন্তোষ ও চিত্তক্ষোভ ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছিল। সাধুচরণের সেবাযত্ন লইয়াও একটু আধটু ত্রুটি হইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

বাড়ীর একমাত্র পুঁটু তাহার বাবার প্রতি ভালবাসা ও অনুরাগ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিল। সে ছেলেমানুষ, সাংসারিক ভালমন্দের জ্ঞান তাহাকে আক্রমণ করে নাই বলিয়াই বোধ করি সে নিরপেক্ষ রহিয়া গিয়াছিল।

বেলা এগারোটার সময় পুঁটু বাহির হইতে আসিয়া বলিল,—'মা, বাবার চান হয়ে গেছে, ভাত বাড়ো।' বলিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় একটা আসন পাতিতে প্রবৃত্ত হইল।

সৌদামিনী বলিলেন,—'আসন তুলে রাখ পুঁটু, এখন ভাত নামেনি।'

'ভাত নামেনি!' পুঁটু সোজা হইয়া বলিল,—'বা রে! বাবা চান করে বসে থাকবেন! কখন তোমাদের বলে গেছি—'

সৌদামিনী ধমক দিয়া বলিলেন,—'তুই থাম। যা' বলছি কর, ভাঁড়ার থেকে দুটো বাতাসা আর এক ঘটি জল এখন দিয়ে আয়। ভাত নামতে দেরী হবে।'

পুঁটু রাগিয়া বলিল,—'কেন দেরী হবে! বাবার জন্যে একটু আগে ভাত চড়াতে পার না?'

'পুঁটি!'

'বুঝেছি গো বুঝেছি। দাদার মাঠ থেকে ফিরতে হয় তাই বেলা করে ভাত চড়ানো। দাদাই সব আর কেউ নয়।' পুঁটুর ক্রুদ্ধ দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

কথাটা সত্য। ধান কাটা চলিতেছিল, তাই প্রত্যহ নিমাইয়ের ফিরিতে দেরী হইত। সে খাটিয়া খুটিয়া আসিয়া ঠাণ্ডা ভাত খাইবে, এই বিবেচনায় সৌদামিনী বিলম্বে রান্না চড়াইতেছিলেন। পুঁটির সত্য কথায় তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু কোনো কথা বলিবার পূর্ব্বেই পুঁটি দুপ দুপ্ করিয়া পা ফেলিয়া প্রস্থান করিল। সৌদামিনী অন্ধকার মুখ করিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিলেন।

ইহার কিছুক্ষণ পরেই বাহিরে একটা হৈ চৈ ও কান্নার শব্দ উঠিল।

বাড়ীশুদ্ধ লোক ছুটিয়া বাহিরে গিয়া দেখিল কৈবর্ত্ত বিধু হাজরা সাধুচরণের পা দুটা ধরিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতেছে এবং সেই সঙ্গে চীৎকার করিয়া যাহা বলিতেছে, তাহার একবর্ণও বুঝিতে না পারিয়া সাধুচরণ পা দুটির আশা ছাড়িয়া দিয়া হতভম্ব হইয়া বসিয়া আছেন। গণেশ বাড়ীর একমাত্র ভৃত্য; সে সাধুচরণের বিপদ্ দেখিয়া তাড়াতাড়ি বিধু হাজরাকে সরাইয়া আনিয়া বলিল, 'কাঁদছ কেন বিধু, কি বলবে কর্ত্তাবাবুকে পষ্ট করে বল না।'

বিধু হাজরার ক্রন্দন কিন্তু বন্ধ হইল না, তাহার কাঁচা-পাকা দাড়ি বহিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তবু অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার স্বরে সে বলিল,—'গরীবের মুখের গেরাস কর্ত্তা! ঐ দেড় বিঘে জমির ওপরেই সারা বছরের ভরসা। আপনি সাধু সন্নিসি লোক তাই আপনার পায়েই ছুটে এলুম; আপনি না রক্ষে করলে গরীবকে আর কেউ রক্ষে করতে পারবে না।'

সাধুচরণ বিপন্নভাবে চারিদিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'কি হয়েছে, আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না।'

তখন অনেক যত্নে অনেক সওয়াল করিয়া কথাটা বিধু হাজরার নিকট হইতে উদ্ধার হইল। নিমাইয়ের জমির আলে বিধু হাজরার জমি; বিধু অন্যান্য বারের মত এবার জমি চাষ-আবাদ করিয়াছে। কিন্তু ধান কাটিতে গিয়া দেখিল নিমাই বাবু তাহার ধান কাটিয়া লইতেছেন। বিধু ওজোড় করায় নিমাই বাবু বলিয়াছেন যে, জমি তাঁহার, তিনি নীলামে উহা খরিদ করিয়াছেন। বিধুর জমি অবশ্য কানাই মণ্ডলের কাছে বন্ধক ছিল; কিন্তু কবে যে কানাই মণ্ডল মোকদ্দমা করিয়াছে এবং তার পর আদালতের ডিক্রির জোরে জমি হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছে, বিধু কিছুই জানে না। সে নিশ্চিন্ত মনে জমি চাষ করিয়াছে, কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে ধান রোপাই হইবার বহু পূর্ব্বে জমি নিমাই বাবুর দখলে চলিয়া গিয়াছিল। এখন ধান পাকিয়াছে দেখিয়া তিনি জোর করিয়া ধান কাটিয়া লইতেছেন।

ব্যাপারটা আগাগোড়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া সাধুচরণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। পাড়াগাঁয়ে এরূপ ঘটনা বিরল নয়। গরীব মূর্খ চাষা মহাজনের নিকট জমি বাঁধা দিয়া টাকা ধার করে। তারপর কয়েক বৎসর নিরুপদ্রবে কাটিয়া যায়। হঠাৎ একদিন চাষা দেখে আদালতের ডিক্রী জারি হইয়াছে, এমন কি আর একজন আসিয়া দখল লইয়া বসিয়া আছে—অথচ সে কিছুই জানে না। সে যখন জানিতে পারে তখন হাহাকার করা ছাড়া আর কোনও উপায়ই থাকে না।

বিধু আবার সাধুচরণের পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া বলিল,—'মরে যাব কর্ত্তা, সগুষ্ঠি না খেতে পেয়ে মরে যাব। ঐ দেড় বিঘেই ভরসা, আর কোথাও এককাঠা জমি নেই—গাঁ শুদ্ধ লোককে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন। আপনি আমার বাপতুল্যি, নিমাই দাদা আমার বাপের ঠাকুর—আপনারা গরীবকে মাথায় পা দিয়ে ডুবিয়ে দেবেন না।'

এই সময় নিমাই মাঠ হইতে ফিরিল। চণ্ডীমণ্ডপের দিকে একবার তাকাইয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিতেছিল, সাধুচরণ তাহাকে ডাকিলেন। নিমাই মুখ কালো করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

সাধুচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'বিধু যা বলছে তা সত্যি? তুমি ওর জমি নীলামে খরিদ করে নিয়েছ?'

সংক্ষেপে নিমাই বলিল,—'হ্যাঁ।'

সাধুচরণ একটু চুপ করিয়া বলিলেন,—'কাজটা ওকে জানিয়ে করলেই ভাল হত না কি?'

নিমাই বলিল,—'যার জমি মহাজনের কাছে বন্ধক আছে সে নিজে খোঁজ রাখে না কেন? আমি ত লুকিয়ে কিনি নি, সদর নীলেমে কিনেছি।'

সাধুচরণ ব্যথিত স্বরে বলিলেন,—'সে কথা ঠিক, নিমাই। কিন্তু জমি যখন তুমি দখল করলে তখনও কি ওকে জানান তোমার উচিত ছিল না? ও গরীব মানুষ, খরচপত্র করে পরিশ্রম করে ধান উবজেছে, সেই ধান তুমি কেটে নিচ্ছ—'

অবরুদ্ধ ক্রোধের স্বরে নিমাই বলিয়া উঠিল,—'কে বলে ও ধান উবজেছে! আসুক দেখি একজন সাক্ষী।' বলিয়া আরক্ত চক্ষে চারিদিকে চাহিল। সকলেই জানিত কে ধান উৎপন্ন করিয়াছে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিবার সাহস কাহারও হইল না।

হতাশ স্বরে সাধুচরণ বলিলেন,—'সাক্ষীসাবুদ হয়ত বিধু আনতে পারবে না, কিন্তু সত্যি ও-ই ত জমি চাষ করেছে। জমি যদি তোমারই হয়, তবু বিধু যখন চাষ করেছে তখন অন্ততঃ অর্দ্ধেক ধান ত ওর প্রাপ্য—'

'আমি পারব না। জমি আমার, আমি চাষ করেছি। বিধুর ক্ষমতা থাকে আদালত থেকে ধান আদায় করে নিক্।' বলিয়া নিমাই আর বাগ্‌বিতণ্ডা করিবার জন্য দাঁড়াইল না, ক্রোধবিকৃত মুখে দ্রুতপদে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

* * *

রেলের ইঞ্জিনের মত ধীরে ধীরে গতি সঞ্চয় করিয়া এতদিনে এই পরিবারের ঘটনাবলী হঠাৎ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে আরম্ভ করিল। যেদিন মধ্যাহ্নে এই ব্যাপার ঘটিল, তাহার পরদিন হাটবার। গণেশ ও ভৃত্য বাড়ীর কাজ সারিয়া হাটে যাইবার জন্য সৌদামিনীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; গ্রাম হইতে প্রায় ক্রোশ তিনেক দূরে হাট বসে, সপ্তাহে একবার করিয়া সেখান হইতে সংসারের বাজার-হাট, প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনিয়া আনা হয়।

সৌদামিনী বাজারের পয়সা গণেশকে বুঝাইয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, গণেশ কুণ্ঠিত স্বরে বলিল,—'মা—'

'কি রে'—বলিয়া সৌদামিনী ফিরিলেন।

গণেশ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—'মা, আর চার আনা পয়সা চাই।'

সৌদামিনী আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন,—'আর চার আনা পয়সা। কি হবে?'

লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিয়া গণেশ আস্তে আস্তে বলিল,—'বড়বাবু বললেন, হাট থেকে চার আনার গাঁজা কিনে আনতে।'

সৌদামিনী যেন পাথর হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ তাঁহার বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। তারপর সভয়ে একবার চারিদিকে তাকাইয়া আঁচল হইতে চার আনা পয়সা গণেশের হাতে ফেলিয়া দিয়া তিনি দ্রুতপদে নিজের শয়নঘরে প্রবেশ করিলেন; গণেশের মুখের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিলেন না। লজ্জায় ও ধিক্কারে তাঁহার সমস্ত অন্তর ছি ছি করিতে লাগিল।

সেদিন সৌদামিনী আর ঘর হইতে বাহির হইলেন না, শরীর অসুস্থ বলিয়া মেঝের একটা কম্বলের উপর পড়িয়া রহিলেন। রাত্রেও জলস্পর্শ করিলেন না। কালী ও পুঁটু তাঁহার সহিত একশয্যায় শয়ন করিত; তাহারা ঘুমাইয়া পড়িলে, রাত্রি প্রায় এগারটার সময় তিনি শয্যা ছাড়িয়া উঠিলেন। নিঃশব্দে দরজা খুলিয়া বাহিরে স্বামীর ঘরে গেলেন।

সাধুচরণ তখন কম্বলের উপর যোগাসনে বসিয়া ছিলেন; রক্তনেত্র মেলিয়া চাহিলেন।

দ্বার ভেজাইয়া দিয়া সৌদামিনী একবার ঘরের চারিদিকে চাহিলেন, ঘরে কেহ নাই। তখন তিনি দুইবার নিশ্বাস টানিয়া তিক্ত চাপা স্বরে বলিলেন,—'মুখুজ্যে খুড়ো তা' হলে মিথ্যে বলেনি!'

সাধুচরণের মৌতাত তখন জমাট বাঁধিয়াছে, তিনি গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—'কি বলেছে মুখুজ্যে খুড়ো?'

'যা বলেছে তা সত্যি। বলেছে তুমি গাঁজা খাও।'

মাথাটি দুলাইতে দুলাইতে সাধুচরণ বলিলেন,—'হ্যাঁ, খাই। গাঁজা খেলে সাধনমার্গের সুবিধে হয়।' বলিয়া ফিক করিয়া হাসিলেন।

সৌদামিনী জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন,—'পোড়া কপাল তোমার সাধন মার্গের। ও কথা মুখে আনতে লজ্জা করে না! আর, সাধন করতে যদি চাও তবে ঘরে ফিরে এলে কেন?—উঃ—আমার সোনার সংসার দু' দিনে উচ্ছন্ন গেল!'

সাধুচরণ ঈষৎ গরম হইয়া বলিলেন,—'উচ্ছন্ন গেল কেন?'

'কেন! তুমি এই কথা জিজ্ঞেস করছ! মেয়ের অমন চমৎকার সম্বন্ধ তুমি ভেঙে দিলে। ছেলে ঠাকুরমন্দিরে চাকরি যোগাড় করে দিলে, তাও তোমার গাঁজা খাওয়ার জন্তে ভেস্তে গেল। তার পর আবার জমিজমা নিয়ে ছেলের পেছনে লেগেছ, কোথাকার কে বিধু হাজরা, তার হয়ে ছেলের সঙ্গে

লড়াই করছ। এখন আবার চাকরবাকরকে দিয়ে গাঁজা আনিয়ে সদরে গাঁজা খাওয়া আরম্ভ করলে! উচ্ছন্ন যাওয়া আর কাকে বলে শুনি!'

সাধুচরণ হঠাৎ সপ্তমে চড়িয়া গেলেন, চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'বেশ করি গাঁজা খাই, আমার খুসী আমি খাব।—এ সংসার কার? জমিজমা ঘরবাড়ী কার? আমার! আমি যা' ইচ্ছে করব।'

সৌদামিনীর দুই চক্ষে আগুন ছুটিতে লাগিল, তীব্র অনুচ্চকণ্ঠে বলিলেন,—'চেঁচিও না অত—সবাই ঘুমুচ্ছে। জমিজমা ঘরবাড়ী একদিন তোমার ছিল বটে, কিন্তু এখন আর নেই। জমিদারী শেরেস্তায় খোঁজ নিলেই জানতে পারবে। এখন নিমাই মালিক, সে-ই এ বাড়ীর কর্ত্তা; তোমার উৎপাত করবার কোনো অধিকার নেই—বুঝলে?'

ক্রমধ্যে অকস্মাৎ হাতুড়ির ঘা খাইয়া যেন সাধুচরণের নেশা ছুটিয়া গেল। সৌদামিনীর এ রকম চেহারা তিনি পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই; তিনি ক্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিলেন। তারপর মূঢ়ের মত বলিলেন, —'আমার কোনো অধিকার নেই!'

'না, নেই। এই কথাটা ভাল করে বুঝে নাও। তোমার ঐ সব লক্ষীছাড়া বৃত্তি এ বাড়ীতে চলবে না। এই আমি শেষ কথা বলে গেলুম।' বলিয়া জলন্ত মশালের মত সৌদামিনী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

* * *

অল্পমাত্র ভোর হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তখনও কাক-কোকিল ডাকে নাই, এমন সময় সৌদামিনীর ঘরের দরজায় মৃদু টোকা পড়িল। সৌদামিনীর চোখে নিদ্রা ছিল না, তিনি শুষ্ক চক্ষু অন্ধকারে মেলিয়া শুইয়া ছিলেন, উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিলেন সাধুচরণ দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার গায়ে সেই প্রথম দিনের আলখাল্লা, কাঁধে কম্বল, বগলে সেই পুরাতন ঝুলি।

সৌদামিনীকে হাতের ইসারায় একটু দূরে লইয়া গিয়া মৃদুকণ্ঠে সাধুচরণ বলিলেন,—'লক্ষী, আমি যাচ্ছি।'

সৌদামিনীর কণ্ঠ কে যেন চাপিয়া ধরিল, তিনি রুদ্ধশ্বাসে বলিলেন,—'যাচ্ছ।'

'হ্যাঁ লক্ষী, সংসারে আর আমার মন টিকছে না।'

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া সৌদামিনী অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন,—'আমার কথায় রাগ করে কি তুমি চলে যাচ্ছ?'

মাথা নাড়িয়া সাধুচরণ বলিলেন,—'না, সে জন্যে নয়। কিন্তু তোমার কথা সত্যি। সংসারে আমার অধিকার নেই।' একটু থামিয়া বলিলেন,—'প্রথম যেদিন সংসার ছেড়ে গিয়েছিলুম সেদিন ভুল করেছিলুম; আবার যেদিন ফিরে এলুম সেদিন তার চেয়ে বড় ভুল করলুম। ভুলে ভুলেই জীবনটা কেটে গেল, সত্যিকার পথ চিনে নিতে পারলুম না।—ললাট-লিখন।'

সৌদামিনীর নিকট হইতে কোনও জবাব আসিল না। সাধুচরণ তখন ঈষৎ হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন,—'তোমাদের একটা কম্বল নিয়েছি, বোধ হয় সেজন্যে কোনও অসুবিধা হবে না। আচ্ছা, তা' হলে চললুম লক্ষী, আর দেরী করব না। অন্ধকার থাকতে থাকতে গ্রাম পেরিয়ে যেতে চাই।'

সাধুচরণ তবু একটু ইতস্ততঃ করিলেন, হয়ত সৌদামিনীর নিকট হইতে একটা মৌখিক বাধানিষেধও প্রত্যাশা করিলেন। তার পর উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া নিরাশ্রয় আত্মীয়হীন পৃথিবীর পথে পা বাড়াইলেন। যাইবার সময় খোলা দরজা দিয়া পুঁটুর ঘুমন্ত মুখখানি সতৃষ্ণ নয়নে দেখিয়া লইলেন।

সৌদামিনী কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার চোখ দিয়া নিঃশব্দে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল বটে, কিন্তু একটা 'না' বলিয়াও তিনি স্বামীর গতিরোধ করিতে পারিলেন না।

তখন রোদ উঠিয়াছে। শয়ন-ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া সৌদামিনী ভারী গলায় সদ্যোত্থিতা বধূকে বলিলেন, 'বৌমা, পুকুরে একটা ডুব দিয়ে এসে তাড়াতাড়ি রান্না চড়িয়ে দাও, নিমু আজ সহরে যাবে।' বধূর চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি দেখিয়া বলিলেন, 'কালীর জন্যে যে পাত্রটি দেখা হয়েছিল তা'দের সঙ্গে কথাবার্ত্তা পাকা করতে হবে ত। সামনেই আবার পৌষ মাস।'
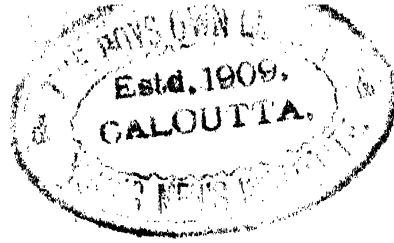
রাজা রামমোহন রায় সংগৃহীত যিশুপ্রণীত হিতোপদেশ

—শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু-শতবার্ষিকী উপলক্ষে রামমোহন রায় সম্বন্ধে অনেকেই অল্পবিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার সমগ্র বাঙ্গালা ও ইংরাজী গ্রন্থাবলীর সঠিক সংস্করণ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এবং সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে বিশিষ্ট সম্পাদকবর্গের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদিত প্রথমখণ্ড প্রকাশিতও হইয়াছে; ইহা আনন্দের কথা, সন্দেহ নাই।

রামমোহন The Precepts of Jesus নামক একখানি গ্রন্থ ইংরাজীতে সঙ্কলন করেন। ইহা Baptist Mission Press হইতে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে প্রথম মুদ্রিত হয়। আলোচ্য পুস্তকের আখ্যাপত্র হইতে জানা যায়, ইহার সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা অনুবাদও তিনি করিয়াছিলেন*। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, রামমোহনের জীবিতকালে অথবা তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার বাঙ্গালা গ্রন্থাবলীর যে সব সংস্করণ দেশে কি বিদেশে হইয়া গিয়াছে, তাহার কোথাও The Precepts of Jesus-এর বাঙ্গালা বা সংস্কৃত অনুবাদ স্থান পায় নাই। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত ইংরাজী পুস্তকখানি দেখিবার আমার সুযোগ হইয়াছে। এই পুস্তক রামমোহনের ইংরাজী সকল গ্রন্থাবলীতেই স্থান পাইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকের বাঙ্গালা অথবা সংস্কৃত সংস্করণ পুস্তকাকারে কি বাঙ্গালা গ্রন্থাবলীতে কোথাও না থাকায় এই পুস্তকের বাঙ্গালা কি সংস্কৃত সংস্করণ আদৌ মুদ্রিত হইয়াছিল কি না সন্দেহ হয়। এমনও হইতে পারে, ইংরাজী সঙ্কলন মুদ্রণকালে ইহার বাঙ্গালা ও সংস্কৃত অনুবাদ দেওয়ারই রামমোহনের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পরে কারণবশতঃ দেন নাই; অন্ততঃ যতদিন পর্য্যন্ত আলোচ্য পুস্তকের বাঙ্গালা বা সংস্কৃত অনুবাদ আবিষ্কৃত না হইয়াছে, ততদিন ইহার সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অনুবাদ মুদ্রণ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া চলে না।

রামমোহন-কৃত The Precepts of Jesus-এর বঙ্গানুবাদ না পাওয়া গেলেও, অপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনূদিত The Precepts of Jesus পাওয়া গিয়াছে। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে রাখালদাস হালদার ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে যে কয়েকজন সাহিত্যসেবীকে পাইতেছি, রাখালদাস হালদার তাঁহাদের অন্যতম। হালদার মহাশয় "যিশুপ্রণীত হিতোপদেশের" অনুবাদ ব্যতীত শ্রীরামচরিত্র ১৭৭৬ শকাব্দ [১৮৫৪ খৃঃ] ও ব্রহ্মস্তোত্র, ১৭৭৮ শকাব্দ [১৮৫৬ খৃঃ] প্রভৃতি আরও কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন।

রাখালদাস হালদার অনূদিত The Precepts of Jesus-এর আখ্যাপত্র দেওয়া হইল।

রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত / যিশু-প্রণীত / হিতোপদেশ, / The Precepts of Jesus / The / Guide to Peace and happiness ; / compiled by / The Late Rajah Ram Mohun Roy, from the four gospels. / Translated into Bengali, and annotated / by / Rakhaldas Haldar. / "To sects and parties his large Soul / Disdains to be confined ; / He loves the good of every name / and prays for all mankind." / Calcutta / Printed by Sudharam Nyayaratna, Sudharnab Press. / MDCCLIX. / To be had, 4, Chowringhee Road, Calcutta, of the / Rev. C. H. A. Dall / Price 8 Annas.

সুখ শান্তির উপায় / স্বরূপ / যিশু-প্রণীত / হিতোপদেশ : / রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত। / শ্রীরাখালদাস হালদার কর্ত্তৃক /

* The Precepts of Jesus-এর আখ্যাপত্র :—

[বিভিন্ন পংক্তি বুঝাইবার জন্য পংক্তিদ্বয়ের মধ্যে "/" চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে।]

"The / Precepts of Jesus / The / Guide to Peace and happiness ; / Extracted from / The books of the new Testament, / ascribed to the four Evangelists / with / Translations into Sungscrit and Bengalee / Calcutta / Printed at the Baptist Mission Press, Circular Road 1820."

ইংরেজী ভাষা হইতে / অনুবাদিত। / শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত / স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। / তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্ত সাধু / ভবতি হীয়তেহর্থাৎ য উ প্রেয়োবৃণীতি। / শ্রুতিঃ। / কলিকাতা / মেজাপুর ১০।২ ভবনে সুধার্ণব যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। / শকাব্দাঃ ১৭৮১। / পৃ ।৵০ + ১৭৪।

হালদার মহাশয় যে অনুবাদকের বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, রামমোহন-কৃত The Precepts of Jesus গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় রেভারেণ্ড চার্লস্ ডাল তাহা পুনর্মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন। অনুবাদক রেভারেণ্ড ডাল মুদ্রিত গ্রন্থ অবলম্বনেই অনুবাদ করিয়াছেন এবং ডালের প্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনার্থ উক্ত পুস্তক তাঁহার নামে উৎসর্গ করেন*। রামমোহন রায়ের ইংরাজী মূল গ্রন্থে কোন টীকা ছিল না, কিন্তু সাধারণ পাঠকদের বোধসৌকর্য্যার্থে অনুবাদক ইহার সহিত টীকা সংযোগ করিয়াছেন। রামমোহন তাঁহার সঙ্কলিত গ্রন্থে যে ভূমিকা দিয়াছিলেন—হালদার মহাশয় তাহারও অনুবাদ করিয়াছেন। "অনুবাদকের বিজ্ঞাপন" এবং অনূদিত ভূমিকাটি নিম্নে যথাযথ উদ্ধৃত হইল।

অনুবাদকের বিজ্ঞাপন

রাজা রামমোহন রায়, মহাত্মা যিশুখৃষ্টের উপদেশ সকলকে মহোপকারী বিবেচনা করিয়া ইংরেজী, সংস্কৃত এবং বাঙ্গলা ভাষায় প্রচার করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় যাহাকে প্রয়োজনীয় বোধ করেন, তাহাকে অপরাপর লোকের একবার সাবধানে পরীক্ষা করা উচিত। কিন্তু অস্মদ্দেশীয় লোকের মহদ্বিষয়ে এতাদৃশী উপেক্ষা যে, কোন ব্যক্তি তাহার প্রচারিত গ্রন্থের উপযুক্ত সমাদর করিয়াছিলেন, এমত বোধ হয় না; কারণ এক্ষণে সেই পুস্তকের এক খণ্ড প্রাপ্ত হওয়াও দুর্ঘট হইয়াছে; তিনি যথার্থতঃ দুর্ব্বাক্ষেত্রে মুক্তা বিকীর্ণ করিয়াছিলেন। অল্পকাল পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত চার্লস্ ডাল মহোদয়ের যত্নে খৃষ্টের উপদেশ পুস্তকের ইংরেজী মূল পুনর্মুদ্রিত হইয়া সুলভ হইয়াছে; আমি তাহাকেই বাঙ্গলা পরিচ্ছদে প্রকাশ করিতেছি।

বিচক্ষণ পাঠকেরা দেখিবেন যে বর্ত্তমান অনুবাদ দোষশূন্য হয় নাই; বলিতে কি, তদ্দ্বারা আমি নিজেই সর্ব্বতোভাবে তুষ্ট হই নাই। কিন্তু আত্মপ্রতি ন্যায়বিচারার্থ ইহা বক্তব্য যে যদি দীর্ঘসূত্র কঠিন পীড়ায় পীড়িত না হইতাম, তবে বোধ করি, এই পুস্তক কিছু উৎকৃষ্টতর পরিচ্ছদে প্রকাশিত হইতে পারিত। পরমেশ্বরের কৃপায় যদি জীবিত থাকি এবং ইহার পুনর্মুদ্রাঙ্কনের প্রয়োজন হয়, তবে অভিলাষানুরূপ শ্রীবৃদ্ধি করা যাইবে।

মূল গ্রন্থে টীকা ছিল না; কিন্তু ঈদৃশ পুস্তক টীকা ব্যতিরেকেও বোধসুকর হয় না; অতএব এই অনুবাদে টীকা সংযোজন করা গিয়াছে। এ বিষয়ে নর্টন্, লিবরমোর এবং বর্কিট প্রণীত ইংরেজী ভাষ্য হইতে কতক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। যে যে স্থলের অর্থ ব্যাখ্যানে আমার অসাধ্য ছিল কিংবা যে যে স্থলের অর্থ ব্যাখ্যানে আমি ইংরেজী ভাষ্য-কর্ত্তৃদের সহিত সর্ব্বতোভাবে ঐকমত্য হইতে পারি নাই, তত্তৎ স্থলের টীকায় ইংরেজী ভাষ্যকারদের নাম লিখিয়া দিয়াছি। টীকা সংযোজনে আমার মূলের অর্থ ব্যাখ্যান মাত্র উদ্দেশ্য ছিল; এই জন্য মূলের দোষগুণ বিচারে প্রবৃত্ত হই নাই।

আমি এমত আশা করি না যে এই গ্রন্থ আশু সর্ব্বত্রে সমাদৃত হইবে; পৃথিবীর ভাব ক্রমশঃ যথেষ্ট রূপে দেখা গিয়াছে। পশ্চাদুক্ত—উপদেশ সকল যে মহাত্মার বদননিঃসৃত হয়, তিনিই বলিয়া গিয়াছেন যে ধর্ম্মবীজ বিকীর্ণ করিয়া সর্ব্বত্রে সমান ফলের প্রত্যাশা করা যায় না। যাহা হউক, যদি অনতিবিলম্বে অতি অল্পস্থলেও শতগুণ, ষষ্টিগুণ বা ত্রিশগুণ ফল জন্মে, তবেই কৃতার্থ হইব।

উত্তরপাড়া।
২০এ ফাল্গুন ১৭৮০ শক

রাখালদাস হালদার

* * * যদিও এই পুস্তক প্রস্তুত হইবার প্রায় নয় মাস পরে ইহা প্রচারিত হইতেছে, তথাপি অন্যান্য কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকা প্রযুক্ত ইহাকে উচিত মত সংশোধন করিবার অবকাশ পাওয়া যায় নাই; অতএব, প্রথমত যেরূপ ছিল প্রায় সেই অবস্থাতে ইহা মুদ্রিত হইল। সহৃদয় পাঠকেরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক মুদ্রাকরের কৃত কয়েকটি ভ্রম মার্জ্জনা করিবেন। ১০ই অগ্রহায়ণ ১৭৮১ শক.

ভূমিকা

পরমেশ্বরের স্বরূপ এবং গুণ সকল মনের অতীত, এতাদৃশ মানসিক সংস্কার এবং জীবাত্মার সারভূত পদার্থ বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে কেবল আমারদের পরিচ্ছিন্ন ক্ষমতা জন্য যে সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইতে হয়, এমত নহে, কিন্তু মনুষ্যাশ্রিত ভাবদ্বিষয়ের প্রতিই অশ্রদ্ধা জন্মিয়া যায়; যেহেতু তদ্দ্বারা অভিহিত অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে কোন জ্ঞানই লব্ধ হয় না। প্রত্যুত, এই সর্ব্বসামঞ্জস্য সম্পন্ন জগতের কর্ত্তা এবং পালয়িতা যে পরম পুরুষ, যিনি সৃজন করিয়া অশেষবিধ দিব্য ও পার্থিব পদার্থকে যথাস্থানে নিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহার সত্তায় বিশ্বাস, এবং "সকলের

* উৎসর্গপত্র :—

To / The Revd. Charles H. A. Dall, A. M.; / The bare mention of whose name / is sufficient to awaken Sentiments of Love and respect / In the minds of those who intimately know him; / This volume is inscribed / as a token of Gratitude / of / The Translator.

প্রতি আত্মবৎ ব্যবহার কর" এই ব্যবস্থায় ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা থাকিলে আর মানব প্রকৃতির প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া যায় না ; বরঞ্চ আমারদের জীবন আপনারদের পক্ষে সুখকর, ও অপর মনুষ্যদের পক্ষে উপকার জনক হইয়া উঠে। সন্তোষের প্রথমোক্ত হেতুটি অর্থাৎ পরমেশ্বরের সত্তায় বিশ্বাস প্রায় সর্ব্বত্রেই উপদেশ দেখা যায় ; ইহা হয় শ্রুতি এবং পারম্পর্য্য দ্বারা, নয় জগতের কার্য্যে যে অদ্ভুত কৌশল এবং নিয়ম প্রতীত হয়, তাহা নিরীক্ষণ দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে। শেষোক্ত হেতুটি যদিও আমার অভিজ্ঞাত তাবৎ প্রকার ধর্ম্মে আংশিক রূপে আদিষ্ট হইয়াছে, তথাপি খৃষ্টান ধর্ম্মেতেই মুখ্য রূপে অনুজ্ঞাত দেখা যায়।

খৃষ্টীয় ধর্ম্মের এই যে বিশেষ ভাব, তাহা বহুদিনাবধি আমি স্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করিতে পারি নাই ; যে হেতু খৃষ্টান গ্রন্থকারদের গ্রন্থে এবং আমার পরিচিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মোপদেশকদের সহিত কথোপকথনে আমি নানা প্রকার মত বিদিত হইয়াছিলাম। এই সকল মতের মধ্যে এইটিকেই প্রবলতম বোধ হয় যে যে ব্যক্তি সমস্ত সৃষ্ট জীবের পিতা স্বরূপ পরমেশ্বরের ঐশীত্বের সহিত খৃষ্ট এবং পরমাত্মার * ঐশীত্ব স্বীকার না করে, সে খৃষ্টান উপাধির যোগ্য নয়। অপিচ, অনেকে খৃষ্টান শব্দের এক বিস্তীর্ণতর অর্থ গ্রহণ করেন, এবং যে কেহ বাইবেল গ্রন্থকে পরমেশ্বরের প্রস্ফুট অভিপ্রায় পূরিত বলিয়া বিশ্বাস করে, (শাস্ত্রের বিশেষ বিশেষ স্থানের অর্থ অন্যান্য সম্প্রদায়ের অভিমত অর্থ হইতে যত পৃথক্‌রূপে ব্যাখ্যান করুক না কেন,) তাহাকেই খৃষ্টান বলিয়া অঙ্গীকার করেন, যে ব্যক্তি স্বয়ং খৃষ্টানের উপদেশকে শিরোধার্য্য করে, অথচ এই বিবেচনায় তাঁহার শিষ্যদের মতে সম্পূর্ণ নির্ভর করে না যে তাঁহারা প্রত্যাদেশের অবস্থা ব্যতীত অপর সময় অন্যান্য লোকের ন্যায় ভ্রম প্রমাদের অধীন ছিলেন। প্রেরিতদের ক্রিয়াপুস্তক এবং পত্র সকলের মধ্যে প্রেরিতদের মত বিষয়ে যে পরস্পর পার্থক্য দেখা যায়, তাহাই ইহার দেদীপ্যমান প্রমাণ †।

বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের পণ্ডিতেরা আপনারদের বিশেষ মতের সমীচীনতা, সামঞ্জস্য, যুক্তিসিদ্ধতা এবং প্রাচীনত্ব প্রতিপাদনার্থ যাবতীয় বহুল গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে এত বিবিধ তর্ক উত্থাপিত হইয়াছে যে, আমি এই স্থলে কোন অভিনব এবং বলবৎ যুক্তির আবির্ভাব করিয়া পাঠকবর্গের চিত্তাকর্ষণ করিবার ভরসা রাখি না। বিশেষতঃ ধর্ম্ম বিষয়ে মনুষ্যেরা একবার কোন বিশেষ মতকে শ্রদ্ধেয় জানিয়া এবম্প্রকার কুসংস্কার-পরতন্ত্র হয় যে, তাহাদের কোন বিরুদ্ধ মত যত সুযৌক্তিক হউক না কেন, তাহাতে প্রণিধান করে না, এবং যে মত প্রাকৃতিক নিয়মের বিলক্ষণ অনুকূল, এবং মানবিক যুক্তি এবং পরমেশ্বরের অভিপ্রায় সম্মত, তাহা শ্রবণ করিতেও তাহারা বধির হয়। পরন্তু যাঁহারা কুসংস্কারপরবশ নহেন, এবং যাঁহারা পরমেশ্বরের কৃপায় সত্য প্রতীতি মাত্র গ্রহণে প্রস্তুত হন, তাঁহাদের হস্তে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন মতের বিবরণ মাত্র প্রদান করিলে তাঁহারা তন্মধ্যে কোন্ মত শ্রুতিসম্মত এবং সাধারণ বুদ্ধির গ্রাহ্য, তাহা অনায়াসে নিরূপণ করিতে পারেন। অধুনা আমি সেই সকল বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি না ; কেবল খৃষ্টের বাক্যগুলীন ইংরেজী হইতে সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ পূর্ব্বক ভ্রাতৃবৃন্দের উপকারার্থ প্রচার করিতেছি।

আমার বোধ হয়, ধর্ম্ম পুস্তকের নূতন নিয়ম ভাষিত অপরাপর বিষয় হইতে ধর্ম্মনীতি বিষয়ক উপদেশ গুলীন পৃথক্ করাতে আমারদের বাঞ্ছনীয় ফল উৎপন্ন হইবে, অর্থাৎ তদ্দ্বারা নানা মতাবলম্বী এবং নানা প্রকার বুদ্ধিশালী ব্যক্তির মন এবং অন্তঃকরণের উন্নতি সাধন হইবে। ঐতিহাসিক বিবরণ ও অন্যান্য বিষয় সকল তার্কিক ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতিকূল লোকের দ্বারা সন্দেহিত ও বিতর্কিত হইতে পারে ; বিশেষতঃ অলৌকিক কার্য্যাদির বর্ণনা সকল আশিয়ার লোকের বিশ্বাসবর্দ্ধিনী হইবে না, কারণ অধিকতর অদ্ভুত কার্য্যের কল্পিত গল্প সকল পরম্পরা ক্রমে তাহারদের মধ্যে প্রচলিত আছে। প্রত্যুত, ধর্ম্মনীতি বিষয়ক উপদেশ, যদ্দ্বারা স্পষ্টতঃই মনুষ্য কুলের মধ্যে শান্তি ও পরস্পর প্রীতি রক্ষিত হয়, তাহা ব্যর্থ তর্ক বিতর্কের আয়ত্ত নহে এবং পণ্ডিত অপণ্ডিত সকলেরই বুদ্ধিগম্য, সন্দেহ নাই। যে এক পরমেশ্বর বর্ণ, পদ বা বিভবের সম্ভ্রম না রাখিয়া সকল জীবকে সমানরূপে পরিবর্ত্তন, নিরাশ, দুঃখ এবং মৃত্যুর অধীন করিয়া ও তাঁহার এই বিশ্বব্যাপ্ত করুণামৃত পানে সকলকেই অধিকারী করিয়াছেন, তাঁহার বিষয়ে এই ধর্ম্মনীতি বিষয়ক গ্রন্থ খানি লোকের মনে এমত উৎকৃষ্ট ও উচ্চভাব উৎপাদনে সমর্থ এবং মনুষ্যগণের স্রষ্টার প্রতি, আত্মপ্রতি এবং লোকসমাজের প্রতি যাবতীয় কর্ত্তব্য আছে, তাহা নিয়ত করণার্থ ঈদৃশ উপযুক্ত, যে বর্ত্তমান আকারে ইহাকে প্রচার করিয়া আমি অত্যুৎকৃষ্ট ফলোৎপাদনের আশা করিতেছি।

(পৃঃ ১-৫) [রামমোহন রায়]

ইংরাজী হইতে বঙ্গানুবাদের ক্ষেত্রে ডাঃ কেরী, মার্শমেন প্রভৃতি অগ্রণী। বাঙ্গালী কর্ত্তৃক ইংরাজীর বঙ্গানুবাদের নিদর্শন ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত রামচন্দ্রের বাঙ্গালা ভাষায় ইংরাজী ব্যাকরণে পাই*। রামমোহন ১৮২০ খৃষ্টাব্দে The Precepts of Jesus প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের বঙ্গানুবাদ আবিষ্কৃত হইলে তাহা বাঙ্গালী কর্ত্তৃক ইংরাজী হইতে অনুবাদের অন্যতম প্রাচীন নিদর্শন রূপেই গৃহীত হইবে। নিম্নে কেরীর বাইবেলের অনুবাদ ও রাখালদাস হালদারের

---

* Holy Ghost.

† প্রেরিতদের ক্রিয়া ১১শ অধ্যায় ২, ৩ শ্লোক ; ১৫শ অধ্যায় ২ অবধি ৭ শ্লোক ; ১ম করিন্থীয় ১ম অ, ১২ শ্লোক ; গালাতীয় ২য় অধ্যায় ১১ অবধি ১৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

* "বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম ইংরাজী ব্যাকরণ", বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৯ বাং ৪র্থ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

"যিশুপ্রণীত হিতোপদেশের" অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইল। বাঙ্গালা অনুবাদের ক্ষেত্রে এই ৫৯ বৎসরে কি সামান্য পরিবর্তন হইয়াছিল তাহা নিম্নোক্ত অনুবাদদ্বয় হইতে বুঝা যাইবে।

প্রথমে ঈশ্বর সৃজন করিলেন স্বর্গ ও পৃথিবী। পৃথিবী শূন্য ও অস্থিরাকার হইল এবং গভীরের উপরে অন্ধকার ও ঈশ্বরের আত্মা দোলায়মান হইলেন জলের উপর। পরে ঈশ্বর বলিলেন দীপ্তি হউক তাহাতে দীপ্তি হইল তখন ঈশ্বর সে দীপ্তি বিলক্ষণ দেখিলেন। তৎপরে ঈশ্বর দীপ্তি অন্ধকার বিভিন্ন করিলেন। ঈশ্বর ও দীপ্তির নাম রাখিলেন দিবস এবং অন্ধকারের নাম রাত্রি। সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে হইল প্রথম দিবস।

ঈশ্বর বলিলেন আকাশ হউক জলের মধ্যস্থলে ও সে জল এ জল পৃথক্ করুক। অতএব ঈশ্বর সৃজন করিলেন আকাশ ও পৃথক্ করিলেন আকাশের উপরের জল ও নীচের জল হইতে। তাহাতে সে মত হইল। ঈশ্বর সে আকাশের নাম রাখিলেন স্বর্গ সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে হইল দ্বিতীয় দিবস।

["আদি পুস্তক যাহা মোশা রচিত প্রথম পর্ব্ব" - হইতে উদ্ধৃত, শ্রীরামপুরে মুদ্রিত, ১৮০১ ইংরাজী।]

"মথি ৬ষ্ঠ অ।

তোমারদের কৃতকার্য্য সকল সাধারণ লোকের দৃশ্য হইবে, এ জন্য উৎসুক হইও না; হইলে পরম পিতা হইতে পুরস্কার পাইবার অযোগ্য হইবে। ভণ্ডতাপসেরা সুখ্যাতি লাভ নিমিত্ত দেবালয় বা পথিমধ্যে তূরীবাদন পূর্ব্বক যেমন দান ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তোমরা সেরূপ করিও না। আমি যথার্থ বলিতেছি, তাহারা আপনারদের উপযুক্ত পুরস্কার পাইবে। কিন্তু তোমারদের দান করিবার সময় তোমার দক্ষিণ হস্তের কার্য্য যেন বাম হস্ত জানিতে না পারে; গোপনে দান করিবে বটে, কিন্তু তোমারদের সর্ব্বান্তর্য্যামী পিতা প্রকাশ্যরূপে পুরস্কার দিবেন।"

[যিশুপ্রণীত হিতোপদেশ, পৃঃ ১৭-১৮। শক ১৭৮১]

জীবনের নববর্ষ

—শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

চৈত্র-দিবসের শেষে অতীতের স্মৃতিটুকু
হয়ে গেল ম্লান,
জীবনের একবর্ষ ধীরে ধীরে অস্তাচলে
করিল প্রয়াণ।

প্রকৃতির প্রাণ পেল নবীনের সাড়া আজি
নবীন চেতনা,
জীবনের আরো কাছে ঘনায়ে আসিল তীব্র
মরণ-বেদনা।

শ্যাম ধরণীর বুকে আজ নব-জীবনের
নবীন উৎসব,
কুসুমিত উপবনে নব কচি কিশলয়,
বিতরে সৌরভ।

সুমধুর সমীরণ ধীরে ধীরে বলে যায়
জীবনের কানে,
নব-বরষের বাণী পশিবে কি আজি তোর
জরাজীর্ণ প্রাণে?

অতীত বিদায় দিয়ে নূতনেরে ডেকে তোর
বৃথাই উল্লাস,
ওই দূরে শোনা যায় মরণের মহাডাক
করিবারে গ্রাস।

পুরাতন চলে যায় পুলকে বরষ নব
করে আগমন,
জীবনের নববর্ষে পুলক পশ্চাতে কাঁদে
ঘনায় মরণ।

মীরা

—শ্রীসুরুচিবালা রায়

মানুষের আশার অন্ত নাই, তাই এত অপমানের পরেও কম্পমান্ ভীত বালকটীকে বুকে জড়াইয়া রতন সিং বহির্বাটির শেষ প্রান্তে কর্ত্তাবাবুর বৈঠকখানার সিঁড়ির নীচে গিয়া বসিল। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর অনাথ শিশুটীর মুখের পানে চাহিয়া নিজের অপমান রতন ভুলিয়া গেল। বড় বাবুর কাছে নিরাশ হইলেও কর্ত্তাবাবুর হয়ত দয়া হইতেও পারে, এ রকম একটী ধারণা রতনের মনে জাগিয়াছিল। কঠোর জমীদার-জীবনের ফাঁকে ফাঁকে দুই চারিটা দয়ার কাজও কর্ত্তাবাবু করিয়াছেন, এই ছেলেটীর করুণ মুখখানির পানে ভাল করিয়া একবার চাহিয়া দেখিলে হয়ত তাঁহার দয়া হইতেও পারে।

বেলা দ্বিপ্রহর প্রায় অতীত হইতে চলিয়াছে। ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর ক্ষুদ্র বালকটী রতনের কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। তাহার শুষ্ক মুখখানির পানে চাহিয়া রতন চিন্তাকুল হইয়া উঠিল। পিপাসায় তাহারও ছাতি ফাটিতেছে, কিন্তু সে চাষা মানুষ, ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করিতে করিতেই জীবন তাহাদের গড়িয়া উঠে। তাহার না হো'ক, এই শিশুটীর জন্যও আজ কিছু জুটিবে কি না কে জানে,—রতন চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল। এমন সময় চারিদিকে আগমন-বার্ত্তা জানাইয়া, জমিদার বাবুর চটিজুতার শব্দ অন্দরমহল হইতে ক্রমে বাহিরে আসিতে লাগিল।

দ্বিপ্রহরের নিদ্রাসুখ উপভোগের পর গোটা দুই সন্দেশ ও এক গেলাস ঠাণ্ডা সরবতে দেহ ঠাণ্ডা করিয়া বৃদ্ধ জমিদার বাহিরে আসিয়া বসিলেন, মাথার উপরে তাঁহার টানা-পাখা চলিতে লাগিল।

বৈঠকখানার ফরাসে বসিয়া চাকরের হাত হইতে আল্‌-বোলার নল টানিয়া জমিদার মুখে দিলেন। নিকটে দুই একটী ভৃত্য ব্যতীত অপর কেহ ছিল না। তাঁহার সমবয়সী তাঁহার বন্ধু-বান্ধবের দল তখনও আসিয়া উপস্থিত হন নাই। দিবা-নিদ্রার পর একে একে সকলে আসিয়া সভা আলো করিয়া বসিলে, প্রত্যেকেরই নিজের নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি মত বেদ, গীতা, উপনিষদ্ সকল কিছুরই আলোচনা এখানে হয়।

এখনো কেহ আসিয়া উপস্থিত হন নাই, জমিদার মহাশয় উৎসুক নেত্রে দ্বারপ্রান্তে তাকাইয়া আছেন, এমন সময় চাকরদের ইঙ্গিতে রতন শিশুটীকে লইয়া, তাঁহার সম্মুখে মেঝের উপর সাষ্টাঙ্গে লুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। একটু লক্ষ্য করিয়া এবং চিনিতে না পারিয়া, পাশের ভৃত্যের পানে তাকাইয়া জমিদার বাবু প্রশ্ন করিলেন, কে রে? চিনলুম না ত?

পরম বিনয়ের সহিত শঙ্কামিশ্রিত স্বরে রতন কহিল, আজ্ঞে ইনি আপনাদের নায়েব বিশ্বনাথ বাবুর ছেলে।

—ওঃ, বিশ্বনাথের ছেলে!

মুণ্ডিত মস্তক, ক্ষীণ দেহ ছেলেটীর পানে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া জমিদার মহাশয় রতনকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন,—তা বিশ্বনাথের শ্রাদ্ধ হয়ে গিয়েছে ত? ছেলে-পিলে ক'টি তার?

একে একে সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া রতন তাহার আসি-বার কারণ এবং ছেলেটির সারাদিন উপবাসের কথা জানাই-তেই বৃদ্ধ জমিদার ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, আঃ, কি রকম লোক হে তুমি! একটা ক্ষুদে ছেলে আমার বাড়ী সারাটা দিন উপোস করে কাটালো, একটা চাকরকে দিয়েও ত তুমি একে ভেতরে পাঠিয়ে দিতে পারতে। কি রকমের কাজ এটা হোল, বল দিকি! ওরে ও রামধন, ভেতরে গিয়ে নন্দার মাকে একবার পাঠিয়ে দে দিকি, নিয়ে যাক্ এসে ছেলেটাকে, আর একে নিয়েও বামুন ঠাকুরকে বলে বেশ করে খাইয়ে দি' গে যা।

নন্দার-মা ঝি আসিল, কিন্তু গম্ভীরপ্রকৃতি ছেলেটী আরও গম্ভীর হইয়া রতনের কোল ঘেসিয়া দাঁড়াইয়া, জমিদার বাবুর বিপুল দেহের পানে অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিল। সস্নেহে ছেলেটাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া রতন কহিল, আমিই নিয়ে যাচ্ছি।

পরিতৃপ্ত ভাবে আহার করিয়া আসিয়া, রতন করুণ অনুনয়ের সহিত বিশ্বনাথের পরিবারের অসহায় অবস্থার কথা জানাইয়া জমিদার বাবুর দয়া ভিক্ষা করিল। তিনি আল-বোলার নল মুখে রাখিয়াই গম্ভীর ভাবে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, তাহার পর মুখ হইতে নলটি চাকরের হাতে তুলিয়া দিয়া কহিলেন,—বাপু হে, এ রকম দুঃখী পরিবারের বাঙ্গালা দেশে কি অভাব আছে? তাই বলে আমরা কি সবাইকে প্রতিপালন করবার ক্ষমতা রাখি? বাইরের লোকে আমার আয়টাই কেবল দেখে, ব্যয়ের দিকটা ত তাকিয়ে দেখে না কেউ। কিন্তু বিশ্বনাথ অতগুলো টাকা করল কি? কাছারীর টাকাগুলো ত, লোকে বলে, ইদানীং অবস্থা খারাপ হয়ে পড়াতে, রাতারাতিই সে সরিয়ে ফেলেছিল। একটা জমিদারীর আদায় প্রায় লাখখানেক টাকা, সে টাকা কি করলো বিশ্বনাথের বউ?

রতন স্তম্ভিত হইয়া রহিল, ইঁহাদের মনে এই বিশ্বাস? ইহারই জন্য বড় বাবু তাহার উপরে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিয়াছিলেন!

মুহূর্ত্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া রতন সবিনয়ে প্রতিবাদ করিয়া জানাইল,—আজ্ঞে তিনি কেন সরাবেন? আর যদি তিনি পারতেনই কিছু সরাতে, তা হলে আপনাদের 'নাক' টাকা না হয় ছেড়েই দিন, নিজের সারাজীবনের জমানো বার বারটা হাজার টাকা কোথায় গেল কর্ত্তা? যা পেলে এদের আজ এমন গাছতলায় দাঁড়াতে হোত না। আপনি ত তাঁকে জানেন কর্ত্তাবাবু? তিনি কি চোর ছিলেন? আপনাদের কাছারীতে সারাজীবন চাকরী করে গেছেন, একটি পয়সার হিসাবের গোলমাল কোনদিন কি তিনি করেছেন? সারা-জীবন আপনাদের কাযই করে গেছেন, কিসে জমিদারীর ভাল হবে, কিসে জমিদারের আয় বাড়বে, এই ভাবনাই করে গেছেন তিনি, আপনাদের কাজ ফেলে রেখে বাড়ীতে গিয়ে বসে' দু'টি দিন বিশ্রাম করতেও পারেন নি কোনদিন, আপনি ত সবই জানেন কর্ত্তা। টাকাকড়ি যা কিছু জমিয়েছিলেন, তাই নিয়ে গিয়ে আগেই যদি বাড়ীতে বসতেন, তাঁর সংসারের আজ কি এই দুরবস্থা হ'ত? আজ যে এই ছেলেপিলেরা এক মুঠো খেতে পাচ্ছে না, এমন অবস্থাটাই হত? আপনারা যদি দয়া না করেন কর্ত্তা, তা হলে সব মারা পড়বে।

রতন দুই হাতে জমিদার বাবুর দু'টি পা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া সেই খানেই লুটাইয়া পড়িল।

[২৯]

বিশ্বের এক প্রান্তে অবস্থিত, অতি তুচ্ছ অবহেলিত ক্ষুদ্র গোটা কয়েক পল্লীগ্রাম। বর্ষের পর বর্ষ অজন্মার শূন্য ভাণ্ড লইয়া এখানে আসিয়া দেখা দেয়, আকাশের বৃষ্টি নাই, শীর্ণ খাল বিলগুলিতে জল নাই, শ্যামশ্রী প্রকৃতির স্নিগ্ধরূপখানি কোথায় লুকাইয়া গিয়া চারিদিকে কেবল বিষণ্ণতার কঠোর রুদ্র ছাপ।

ইহারই মধ্যে জন্মিয়া, জীবনের গোণা কয়টা দিন ভীষণ সংগ্রাম করিতে করিতে যে আকর্ষণহীন আরামহীন বুভুক্ষিত জীবনগুলি এইখানেই শেষ হইয়া যায়, পৃথিবীর সেই অব-হেলিত জীবনগুলির উপর রামকৃষ্ণ মিশনের দৃষ্টি পড়িল। দেখিতে দেখিতে শীর্ণদেহ প্রায় শুষ্ক একটী খালের পাড়ে গোটা কয়েক ঘর উঠিয়া একটী আশ্রম গড়িয়া উঠিল, প্রথম প্রথম গ্রামবাসীরা আপনাদের অপূর্ব্ব স্বভাবের গুণে ইহাদের কাজের তীক্ষ্ণ সমালোচনা এবং আড়ালে আবডালে উপহাস বিদ্রূপ করিল, তাহার পর কিছুদিন আশ্চর্য্য হইয়া ইহাদের সহিষ্ণুতা ও কার্য্যদক্ষতার পানে চুপচাপ চাহিয়া রহিল এবং তাহার পর কোন্ এক ফাঁকে ইহাদের সহিত মিলিত হইয়া, একযোগে কাজ করিতে লাগিল। আশ্রমে স্কুল বসিল, ছোট একটী হাসপাতাল তৈরী হইল, নানাবিধ বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক উপায়ে ক্ষেত কর্ষণ এবং চাষ আরম্ভ হইল, আশা-হীন উৎসাহহীন যে জীবনগুলি শুধু রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া মরিবার জন্যই সৃষ্ট হইত, বাঁচিবার আগ্রহে, মানুষ হইবার উপায়ের সন্ধান তাহারাই খুঁজিতে লাগিল।

নরেনদার অধিনায়কত্বে যে কয়টী তরুণ ব্রহ্মচারী এখানে কাজ করিতে লাগিল, বাপ মা'য়ে খেদানো, কলেজ-পালানো বদ ও বয়াটে ছেলে বলিয়া আত্মীয়-পরিজনের কাছে ইহাদের বদনাম হইলেও জীবনের একটা নূতনত্ব ইহারা ভোগ করিতে লাগিল, সেই পাসকরা এবং চাকরীর সন্ধান করার যে এক-ঘেয়ে সহুরে জীবন,—তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়া, জীবনের ভিতরের অনন্ত মাধুর্য্যের স্বাদ ইহারা পাইল। ইহারা কাজ করে এবং করায়, শেখে ও শেখায়, ইহারা হাসে

গল্প করে, গান গাহে, ডন কুস্তি করিয়া দেহটাকে নানারকম পীড়া হইতে বাঁচাইয়া রাখে, চাষ করে, শুশ্রূষা করে এবং ভিক্ষার ঝুলি লইয়া বাহির হয়। ধর্ম্মাচার্য্যরা নানারকম কঠোর বিধান দিয়া আসল ধর্ম্মটাকেই যে খোলসের ভিতর পুরিয়া রাখিয়াছেন, ইহারা সেই খোলসের বাহিরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভিড় করে না, ইহারা বেদ, গীতা, উপনিষদ, কোরাণ এবং বাইবেল সকল কিছুই পড়ে এবং সত্যকেই একমাত্র ধর্ম্ম জানিয়া ভোরে জাগে এবং গভীর রাত্রে ঘুমায়। হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদের যে কঠিন সমস্যা বিশ্বের সর্ব্বত্র মাথা উঁচু করিয়া ভয়াবহ হইয়া আছে, সে সব সমস্যা ইহাদের এখানে নাই, মানুষকে মানুষ বলিয়াই জানা এবং তাহারই সম্মান তাহাকে দিয়া সহজেই ইহারা তৃপ্তি লাভ করে।

এই দলের ভিতর ঢুকিয়া পান্নু বাঁচিয়া গেল। জীবনে যে ব্যর্থতার বেদনা তাহাকে অহর্নিশ বিদ্ধ করিয়া চলিতে-ছিল, এখানে আসিয়া সে বেদনা তাহার কোথায় চলিয়া গেল। মানুষ হইবার যে একটাই পথ নহে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে—ইয়ুরোপে, আমেরিকায়, যে বিভিন্ন পথে চলিয়া লোকে জীবনকে গড়িয়া তোলে, গতানুগতিক ভাবে বি-এর পর এম-এ পাস না করিলেই যে জীবনটা তুচ্ছ হইয়া গেল, এরকম ধারণা যে সে সব দেশে নাই, একথা ভাবিয়া মনে তাহার বল আসিল। পুরুষোচিত সুন্দর দেহে উৎসাহ এবং বলের অভাব তাহার কোন কালেই ছিল না, এখন মনেও তাহার জোর আসিয়া কর্ম্মক্ষেত্র তাহার সুপ্রশস্ত করিয়া দিল।

সমস্ত কার্য্যের অবসানে গভীর রাত্রে তবু পান্নুর মনে একটা বেদনা জাগিতেই থাকে, সে হয়ত তুচ্ছ নহে, ক্ষুদ্র নহে সত্য, কিন্তু যোগ্যতা অযোগ্যতার বিচার সকলের কাছে ত এক নহে—পান্নুর এ বেদনা এ জীবন হইতে কখনও ঘুচিবার নহে, পান্নু তাহা কখনও ভুলিতেও চাহে না, কিন্তু যাহা গোপনের ধন, চিরকাল তাহা অতি গোপনে তাহার মনের কপাটের ভিতরই রুদ্ধ থাক, এ জীবনে তাহা প্রকাশ হইবে না, কোন দিন না, কাহারও কাছে না।

দিনশেষে বাহিরের কাজের ভিড় কমিয়া আসিলে ধীরে ধীরে সকলে আশ্রমে ফিরিয়া আসিতে লাগিল, খালের ওপারে ছোট গ্রামখানির নারিকেল গাছগুলির ফাঁকে ফাঁকে সূর্য্য অস্ত যাইতে লাগিল, এপারে ছোট আশ্রমখানি আঁধারে ঢাকিয়া সন্ধ্যা নামিয়া আসিল। আশ্রমের একটি বড় ঘরে বসিয়া নরেন দা তিন চারিখানি গ্রামের মেয়েদের চরকার সুতা পরীক্ষা করিতেছিলেন। আশ্রমে দুটি তাঁত বসিয়াছে, সুতা এখনও যথেষ্ট পাওয়া যায় না, তথাপি প্রতি ঘরে ঘরেই প্রতিযোগিতার উৎসাহ দেখা দিয়াছে, নিজের কাটা সুতার কাপড়খানি যখন ঘরে যায়, মনে তখন আনন্দের সঞ্চার হয় না, এমন লোক কে আছে সংসারে? মেয়েরা সুতা কাটে এবং আশ্রমের লোক গিয়া সেই সুতা আশ্রমে লইয়া আসে। কাপড় বোনা হইয়া গেলে যাহার সুতা তাহার নিকটে পাঠাইয়া দেয়।

বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন দলের ছেলেরা আশ্রমে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। শুধু ব্রহ্মচারীরা নহে, স্কুলের বয়োজ্যেষ্ঠ ছেলেরাও ইহাদের সঙ্গে যোগ দেয়, সকালে যাহারা ক্লাশে পড়াশুনা করে, বিকালে তাহারা অন্য কাজে যায়। বিকালে যাহাদের পড়ার ক্লাশ, সকালে তাহাদের অন্য কাজ। ইহাদের আশ্রমের কাছাকাছি এই পাঁচ ছয়টি গ্রামে কোথাও পচা ডোবা পানা, পুকুর প্রায় আর নাই, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের মুখের পানে চাহিয়া তাহাদের সাহায্যের প্রত্যাশায় দিনের পর দিন ঘরে বসিয়া মরার চেয়ে নিজেরা দেহের শক্তি ব্যয় করিয়া যেরূপ গ্রামের সর্ব্ববিধ সংস্কার করিয়া চলিয়াছে, তাহাতে উৎসাহ এবং আনন্দের প্রাচুর্য্যে গ্রামবাসীদের সকল কিছুরই সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে জীবনীশক্তিও বাড়িয়া চলিয়াছে। গ্রামের হিন্দু মুসলমান সকলেই এই দলে আছে।

আজ যাহারা ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিল, সোনার একছড়া হার ও ক'গাছা চুড়ি আনিয়া নরেন দার হাতে দিয়া তাহারা পরম উৎসাহে ভিক্ষার বর্ণনা করিতে বসিল। ও পাড়ার সতীশবাবু, লোকে বলে তিনি যক্ষের ধন পাইয়া বড়লোক হইয়াছেন এবং এই যক্ষের ধন পাহারা দিতে দিতেই দিনরাত তাঁহার কাটে, জীবনও কাটিয়া যাইবে কিন্তু ভোগ করা হইবে না। আজ তাঁহারই কাছে ভিক্ষা চাহিতে গিয়া ইহাদের কেবল মার খাইতে বাকী রহিয়াছে। দুঃখিত মনে যখন ইহারা ফিরিয়া আসিতেছিল, তখন খিড়কির দ্বার খুলিয়া, দাসীকে দিয়া ডাকাইয়া সতীশবাবুর স্ত্রী ইহাদের হাতে এই জিনিষ-

গুলি দিয়েছেন। ইহারা প্রথমে কিছুতেই লইতে চাহে নাই, কিন্তু তাঁহার করুণ অনুনয়ে জিনিষগুলি গ্রহণ না করা সম্ভব হইল না।

নরেন দা সবিস্ময়ে জিনিষগুলি হাতে লইয়া দেখিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামিবার সঙ্গে সঙ্গেই পড়ার ক্লাশ শেষ হইয়া গিয়াছিল; আশ্রমের ভিড় এবং গোলমাল কমিয়া গেলে আহারাদি সমাপ্ত করিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া ব্রহ্মচারীরা পুঁথি পড়িতে বসিল

সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর নরেন দা একাকী খালের ধারে বেড়াইতেছিলেন। ছেলেদের কর্ম্মদক্ষতায় ক্ষীণদেহ ক্ষুদ্র খালটির কতক কতক অংশের কাদামাটি প্রায় পরিষ্কার হইয়া নদীর জল ঢুকিয়া খালটিকে জলপূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহারই নিস্তরঙ্গ জলে ফুটফুটে জ্যোৎস্না স্থির হইয়া আছে। সারাদিনের কর্ম্মকোলাহলে ব্যস্ত গ্রাম খানি ঘুমের কোলে ক্লান্তি ন্যস্ত করিয়া দিয়া নীরব নিঝুম সমস্ত দিনের রাজ্যের ভাবনা এবং অক্লান্ত কাজের শেষে এই শান্ত রাত্রির মৃদু শীতল পরশটি উদার স্নেহধারার মত দেহ ও মনকে স্নিগ্ধ করিয়া দেয়।

দুই তিনটি ছেলের সঙ্গে পান্নু আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়া কহিল, আজ দক্ষিণপাড়ায় গেছলুম নরেনদা, বিশ্বনাথ বাবুর বাড়ী।

—কেমন দেখে এলে? জমিদার সাহায্য করেছেন কিছু?

—অতি সামান্য, মাসে পাঁচ টাকা করে দেবেন বলেছেন, কিন্তু তাতে ওদের চলবে কেমন করে নরেন দা!

নরেন দা স্তব্ধ হইয়া জলের পানে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, পৃথিবী যত সুন্দরী আর যত স্নেহময়ীই হৌক, বুভুক্ষু পীড়িত গরীবের সে কেহ নয়! উদরের খাদ্যের অভাবে চক্ষু যাহার অন্ধকার হইয়া আসিতেছে, তাহার চোখে পৃথিবীর অসীম সৌন্দর্য্য ধরা দেয় না; স্নেহময়ী ধরিত্রীর স্নেহের স্পর্শও সে পায় না। পৃথিবীতে সে নানা বিভীষিকাই কেবল দেখে।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নরেনদাই নীরবতা ভাঙ্গিয়া কহিলেন,—বিশ্বনাথ বাবুর স্ত্রী জানেন কি না জানি না, কিন্তু তোমরা ত জান, গেল বছর [illegible] বড় ছেলেটা গ্রামে ডাক্তারের অভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা গেল, তখন বিশ্বনাথ বাবু হাসপাতালের সাহায্যের জন্য আমাদের পাঁচশ টাকা দিয়েছিলেন। ওঁদের যখন এত দুঃখ তখন ঐ টাকাটা ফিরিয়ে দেওয়াই আমাদের উচিত। আমাদের ত একরকম চলেই যাচ্ছে সব।

—কিন্তু বিশ্বনাথ বাবুর স্ত্রী কি নেবেন সেটা? দান করা টাকা ফিরে কি কেউ নিতে চায়?

—জেনে নেবেন না, গোপনে দিতে হবে, কিন্তু সেই গোপনতাটাই বা কি করে সম্ভব হবে, তা ভেবে পাচ্ছি না

একটু চুপ করিয়া ভাবিয়া পান্নু কহিল, নরেন দা আমি পারব—টাকাটা যদি দিতেই হয় আমায় দেবেন, আমি পৌঁছে দেব।

—কিন্তু কোন জানাজানি হবে না ত ভাই?

—কিছু না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন নরেন দা।

নরেন দা পরম স্নেহভরে পান্নালালের পিঠে হাত রাখিয়া কহিলেন, সে আমি জানি। তোমার শক্তির উপর আমার বিশ্বাস আছে পান্নালাল। ভালই হল, ওদের জন্য ভারী দুর্ভাবনা হয়েছিল ভাই। এমন উদারপ্রাণ ছিলেন বিশ্বনাথবাবু, তাঁর পরিবারের আজ এই অবস্থা!

[৩০]

—এসেছ পান্নু দা? এস, ডুমুরের ফুলটি হয়েছ আজকাল। কতদিন পরে এলে বল দেখি?

—মাত্র পনের দিন, অনেক দিন হয়েছে না কি?

নীরা সে কথার উত্তর না দিয়া কহিল, মা ঐ বারান্দায় বসে' পায়েস রাঁধছেন, একটু আগেই তোমার কথা বলছিলেন।

—মা ওরকম করে' টেনে আনেন বলেই ত' আসি, যেখানেই থাকি মার ঐ টানটা সমস্তক্ষণ অনুভব করি।

—তোমার কঠোর সন্ন্যাস ধর্ম্মের ব্যাঘাত হয় না তাতে?

—আগে মা, তারপর সন্ন্যাস।

নীরার চক্ষু দুটি সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কি বলিতে গিয়া মুহূর্ত্তে নিজেকে সম্বরণ করিয়া কহিল, যাও বস গে মার কাছে।

—তুমি বুঝি খুব ব্যস্ত আজ ? উপরে খুব হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছি, বন্ধুসমাগম হয়েছে বুঝি ? মায়ের খাটুনী সেই জন্যেই বেড়েছে বোধ হয় ?

বাহিরের বারান্দা অতিক্রম করিয়া অন্দরের দিকে আসিয়া দাঁড়াইতেই মীরার সঙ্গে পানুর সাক্ষাৎ, মীরা উপর হইতে নীচে নামিবার সময় সিঁড়ি হইতেই পানুকে দেখিতে পাইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, পানু মার কাছে চলিয়া গেলে, মীরা চুপ করিয়া খানিকক্ষণ সিঁড়ির নীচেই দাঁড়াইয়া থাকিয়া আবার উপরে উঠিয়া গেল।

মিনিট পনের পরে মীরা আবার সিঁড়ি দিয়া দ্রুত নামিয়া আসিল, পানু ধীরে ধীরে অন্দরের রাস্তা অতিক্রম করিয়া বাহিরে চলিয়াছে, মীরা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

—এ কি পানু দা, মা অত করে বলছেন, তবু একটু খেয়ে যাবার ফুরসৎ তোমার হচ্ছে না! এত কি রাজ-কাজে ব্যস্ত তুমি, শুনি ?

পানু দাঁড়াইয়া, মুখ তুলিয়া চাহিয়া কহিল, ব্যস্ত সত্যিই, রাজ-কাজে না হোক, বিশেষ একটা কাজে আজ যাচ্ছি, খাবার সময় নেই।

—ইস্ বড্ড কাজের লোক! কোথায় যাবার এত তাড়া শুনতে পাই ?

—কি করবে শুনে ? কত জায়গায় যেতে হয়, কত কি করতে হয় আমাদের, চাগাভুষো লোক আমরা, সে সব শুনে কি হবে তোমাদের ? তোমার বন্ধুরা তোমার অপেক্ষা করছেন, তুমি যাও।

—ইস্ আজকাল বড্ড যে কথা শিখেছ দেখতে পাচ্ছি পানু দা।

—চিরদিন কি একভাবে কাটে ?—কিন্তু ঐ দেখ ঘড়ি, আর পনের মিনিটের মধ্যে গাড়ী ছেড়ে যাবে, তার আগে আমার পৌছন চাই-ই ষ্টেশনে।

—কোথা যাচ্ছ সেইটে বলে তারপর যাও

—শুনে তুমি খুসী হবে না।

—শুনে আমি খুসী হব না ? সব কাজেই কি তুমি আমাকে খুসী কর পানু দা ? বল তবু।

—ডাকাতের সন্ধানে।

—ডাকাতের সন্ধানে ? সর্ব্বনাশ পানু দা, তার মানে ? হেঁয়ালী ছেড়ে পরিষ্কার করে বল, ডাকাতের সন্ধানে মানে কি ? ডাকাতি করতে যাচ্ছ ? চুরি ? ডাকাতি ?

—চুরি, ডাকাতি ঠিক বলা চলে না, তবে ডাকাতের কাছ থেকে কেড়ে নিতে যাচ্ছি বটে!

—কি বলছ ? কি সব বলছ পানু দা, আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না, চুরি, ডাকাতি, কেড়ে নেওয়া এ সব কি বলছ ?

—আগেই ত বলেছিলুম মীরু, খুসী হবে না শুনে।

—পানু দা, তবে কি তুমি—

বিবর্ণ মুখে মীরার গলার স্বর কাঁপিতে কাঁপিতে অস্পষ্ট হইয়া গেল। ধীরে ধীরে একটা থামে হেলান দিয়া মীরা দেহের ভার রক্ষা করিয়া শঙ্কিত পাণ্ডুর ছুটি চক্ষুর দৃষ্টি তুলিয়া পানুর মুখের পানে তাকাইয়া রহিল; দৃঢ় শক্ত হাতে পানু মীরার হাত ছুটি চাপিয়া ধরিল, তাহার পর গাঢ় স্বরে কহিল, মীরু, যাও, ওঠ, উপরে যাও, সবাই বসে রয়েছে, নেমে আসতে পারে।

মীরা নড়িল না।

—যাও, ওঠ, তুমি উঠলে তবে আমি যাব।

মীরা অত্যন্ত মৃদুস্বরে কহিল—কিন্তু পানু দা, আমি যে কিছুই বুঝতে পারলুম না, আমার যে বড্ড ভয় করছে।

একটা পুলকমিশ্রিত বেদনা ধীরে ধীরে ধীরে পানুর সমস্ত অঙ্গে সঞ্চারিত হইতে লাগিল, কৃপণের ধনের মত মীরার এই ব্যাকুলতাটুকু সমস্ত মন দিয়া পানু উপভোগ করিতে লাগিল; তাহার পর কোমল কণ্ঠে কহিল, ভয় কিসের মীরু, ভয়ের কি আছে ? এক বড় লোকের বাড়ীতে ডাকাত পড়বে আজ, সে খবর আমরা পেয়েছি, গ্রামে থানা নেই, অনেকটা দূরে থানায় খবর দিতে গিয়ে দেখলুম, দারোগা তাঁর ফৌজ নিয়ে অন্য কাজে চলে গেছে, থানার ভার নিয়ে যে আছে, তাকে জানিয়ে এসেছি, কিন্তু সময় মত গিয়ে যে সে পৌছুতে পারবে সে ভরসা আমাদের নেই। হয়ত গ্রামের লোকের সাহায্য যদি পাই এবং নাও যদি পাই, পুলিস এসে পৌছুবার আগে আমাদেরই বাধা দেবার জন্যে তৈরী হয়ে যেতে হবে। সেই জন্যেই আশ্রমে গিয়ে আমার এক্ষুনি পৌছোন দরকার।

—কি করে তোমরা খবর পেলে ?

—কতকগুলো পাঞ্জাবী শিখ খান দুই মোটর নিয়ে আজ দু'তিন দিন থেকে গ্রামের কাছাকাছি ঘুরে বেড়াচ্ছে, চেহারা দেখলেই মনে হয় এরা ভাল লোক নয়, আজ এমন কতকগুলো প্রমাণ পাওয়া গেল, যাতে মনে হচ্ছিল ঐ বাড়ীটার উপরে নজর রেখেই তারা ঘুরছে, সঙ্গে ফিরি করবার মত কতকগুলো গরম কাপড় চোপড়, হিং, জাফরাণ সবই আছে, সেগুলো যে লোকের চোখে ধূলো দেবার জন্তে তা পরিষ্কারই বুঝা যাচ্ছে। ভদ্রলোকের বাড়ীতে একটা চাকর বা দরোয়ান কিছু নেই, সত্যিই বিপদ হলে বাধা দেবার কোন উপায় নেই,—কিন্তু মীরু, আমার সময় হয়ে গেল।

মীরা ব্যাকুলভাবে পান্নুর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, —তুমি যেয়ো না।

—তা হয় না মীরু, অন্তের বিপদ দেখে নিজে কি করে পিছিয়ে থাকব ? যাও তুমি ওপরে।

—পান্নু দা, তোমাদের অস্ত্র নেই, কিছুই নেই, ওরা তোমাদের মেরে ফেলবে।

—পাগল, মারা কি এত সোজা ?—আর যদি মরেই যাই তাতেই বা দুঃখ কি !

মীরা শুষ্ক মুখে শুষ্ক চোখে নীরবে শুধু তাকাইয়া রহিল, —পান্নু দৃঢ় মুষ্টিতে মীরার হাতখানি একবার চাপিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে হাত তুলিয়া লইয়া সম্মুখে একটু অগ্রসর হইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—অবিশ্বাস ক'রো না মীরা, চেয়ে দেখ এই তোমার আংটি। এ আংটি যতদিন এ হাতে থাকবে, কোন রকম ছোট কাজ, অন্যায় কাজ এ হাত দিয়ে ততদিন হবে না।

পান্নু দ্রুতগতিতে বাহির হইয়া গেল। [ক্রমশঃ

হে মোর আত্মা জাগো

—শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

রাতের তারকা কেঁদে মরে আজ চোখ ভরা তার জল ;
ভরা চাঁদ কাঁদে, রাতের বাতাসে ভাসে তার হাহাকার,
সকল গাছেরি মৃত্যু-লগন সব পাতা গেলো ঝরে ;—
আঘাতের পরে বাতাস আঘাত হানে।
আরো কাঁদে নীচে সবুজ ঘাসেরা, ধরার দুলালী মেয়ে,
কাঁদে চৈত্রের রৌদ্র-আগুন লেগে।
বহুদূরে শোন সূর্য্য কাঁদিছে মেঘতলে ঢাকি মুখ,
মেঘ-বজ্রেতে সেই ব্যথা ওঠে ধ্বনি'।
পাথরে পাথরে বাজে নিঠুর ঝরণা-মরণ গাথা ;
মহাসাগরের ক্রন্দন শোন বাজে তরঙ্গরোলে। ··· ···

মেসিন-গানের গর্জ্জন আসে জীবন-আকাশ ঘিরে,
কেঁদে কেঁপে তারা নিঃশেষ হয়ে যায় ;
হাহাকার করে করুণ ব্যথায় গোলা বারুদের দল,
মুহূর্ত্তেকের দম্ভ তাদের শূন্যে মিলায়ে যায়।
মানুষ কাঁদিয়া নিঃশেষ হলো মানুষের পদতলে,
সভ্যতা তারি লভিল সমাধি তারি হিংসার তলে।
জীবন-দেবতা আঁধারে ডুবিল আর্ত্ত অত্যাচারে,
পিশাচের হাসি—সেও ক্রন্দন—শ্মশানে নাচিয়া ফিরে।
স্থলে জলে আর আকাশে বাতাসে শুধু ক্রন্দনধ্বনি ;
দিকে দিকে বাজে হিংসা-কুটিল শিব-সমাধির গান।

এরি মাঝে আজ হে মোর আত্মা, উৎসব তব জাগো,
জাগো জাগো আজ নব বলে বলীয়ান্,
শ্মশানের বুকে মানব-শিবের মন্দির তুলিবারে
ক্রন্দনমাঝে আনো আনন্দ-বাণ।
দিকে দিকে হানো সত্যপ্রাণের ভাস্বর আলোরেখা,
আকাশে মাটীতে তোলো মানুষের স্তব,
প্রাণ-সঙ্গীতে ঢেকে দাও যত ক্রন্দন হাহাকার।
নব-মানবের গাও আবাহন-গান।
মেসিনগানেরা হিংসা-আগুনে কেঁদে কেপে মরে যাক্ ;
মানব-শিবের দীপ্ত পূজারী জাগো শাশ্বত প্রাণ। ··· ···

বুকের একটি ব্যাধি

—শ্রীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়

এই ব্যাধিসংক্রান্ত নতুন বিষয় এই প্রবন্ধে লিখতে চেষ্টা করবার প্রারম্ভে এই কথা মনে আসছে যে, অনেকে এই প্রশ্ন করতে পারেন—এই রোগের স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসাই একমাত্র চিকিৎসা কি না—যা' নিয়ে কয়েক প্রবন্ধে এতখানি আমি লিখলাম।

এই রোগের স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসাই "একমাত্র চিকিৎসা" হয় তো নাও হ'তে পারে। কতজনের কথা কানে আসে—কেউ সেরেছে কবিরাজীতে, কেউ হোমিওপ্যাথীতে, কেউ কোন এক ভৈরবী ঠাকরুণের টোটকায়, কেউ দৈনিক অথবা মাসিকের কোন এক পাতার সচিত্র, সাড়ম্বর বিজ্ঞাপনের এক আদি এবং অকৃত্রিম টনিকে, কেউ স্বপ্নাদ্য মাদুলী ধারণ ক'রে, কেউ বাবা তারকনাথের সামনে হত্যে দিয়ে, কেউ বা তর্কপঞ্চানন অথবা বিদ্যাবাগীশ মশায় কৃত উনপঞ্চাশ টাকা সওয়া পাঁচ আনা খরচের এক বিপুল শান্তি-স্বস্ত্যয়নের জোরে। তবে ব্যক্তিগত ভাবে আমি আমার নিজের কথা বলি—অন্য সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসার চেয়ে স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসায় এবং অন্য সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসকদের চেয়ে স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের উপরে আমার শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস অনেক বেশী। আমার দীর্ঘদিনকার অসুস্থতার ভিতরে আমার উপর দিয়ে বহু রকম পরীক্ষাই হয়ে গেছে, কিন্তু আমার মতের কোন পরিবর্ত্তন অন্ততঃ এখনও হয়নি—জানি না পরে কোন ঘটনাচক্রে হতে পারে কি না। অবিশ্যি একথা খুবই সত্যি যে, খুব সহজে স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসকগণ এই রোগীকে একেবারে নির্দ্দোষ ভাবে সরিয়ে পূর্ব্বের স্বাভাবিক অবস্থায় তাকে ফিরিয়ে আনতে কখনই সক্ষম হন না এবং একজন রোগীর সারবার ভিতরে প্রকৃত পক্ষে এত ত্রুটি থেকে যায় যে, স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসাকে এখনও সম্পূর্ণ সন্তোষজনক কোন মতেই বলা চলে না। কিন্তু একথা বলতে আমি একটুও ইতস্তত করব না যে, সব চেয়ে বেশী সংখ্যক লোকের সবচেয়ে বেশী উপকার (Greatest good to the greatest number) একমাত্র স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসার দ্বারাই সাধিত হ'য়েছে, এবং আমার এই প্রতীতি দৃঢ় ভাবে জন্মেছে যে, অন্য 'সব রকম' চিকিৎসকদের চেয়ে স্যানাটোরিয়াম-পন্থী চিকিৎসকগণ অনেক অধিক দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন। রোগনির্ণয়ের দিক্ দিয়ে হোক, চিকিৎসার দিক্ দিয়ে হোক, আরোগ্যলাভের দিক্ দিয়ে হোক—এ'দের মতামতের উপর যতটা নির্ভর করা চলে, এতখানি অপর কারুর মতামতেরই উপরে নির্ভর করা চলে না এবং এ'দের মতামত যতখানি সুযুক্তিপূর্ণ, এতখানি অপর কারুরই নয়। বস্তুতঃ অ্যালোপ্যাথিক লাইনের সুধী চিকিৎসকগণ এই ব্যাধিসংক্রান্ত অসংখ্য বিষয়ে যত গভীর গবেষণা করেছেন এবং যত অসংখ্য বিষয় আবিষ্কার এবং উদ্ভাবন করেছেন—এত আর অন্য কোন লাইনের চিকিৎসকেরাই করতে পারেন নি।

যা'ই হোক, কোন রকম চিকিৎসা-প্রণালীর উপরে বিদ্রূপের কটাক্ষপাত করা আমার উদ্দেশ্য নয় এবং যিনি যেদিক্ দিয়ে ভাল হতে পারেন সেই-ই ভাল। আমি নিজেও তো এই অসুখেই কষ্ট পাচ্ছি এবং প্রবন্ধগুলিও

কিং এডোয়ার্ড স্যানাটোরিয়াম, ধরমপুর (সিমলা)।

লিখলাম এক হাসপাতালেই শুয়ে শুয়ে—ডাক্তারের উপদেশের কিছু বিরুদ্ধেই, কারণ এখনও বেশী পরিশ্রম করবার অবস্থা আমার নয়। আমি যে আমার অসুস্থতা নিয়ে খুব সুখী তাও নই এবং আমিও সম্পূর্ণরূপে সেরে উঠতেই ত চাই! আমি যখন কোন T. B. রোগীর সম্বন্ধে জানতে পাই যে, তিনি একেবারে ভাল ভাবে সেরে গিয়েছেন, তখন তাঁর সেই "সারা"টার উপরেই মূল্য দিই বেশী—সারবার "উপায়"টা তাঁর যা'ই হয়ে থাকুক না কেন। অ্যালোপ্যাথী, হোমিয়োপ্যাথী, হাইড্রোপ্যাথী, কবচ, তাবিজ, তেল-পড়া, জল-পড়া, ধূপমন্ত্র, অবধৌতিক—যিনি যেদিক্ দিয়ে পারুন, সেরে উঠুন, এবং যাঁর যে-দিকে শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস আছে, তিনি সেইটাই গ্রহণ করুন। এই অসুখ থেকে সুস্থ হবার কেউ যদি একটা Short Cut খুঁজে পান, অথবা একেবারে radically নিরাময় হতে পারেন, তবে তাঁকে অকারণ স্যানাটোরিয়ামের ঘোল খাওয়ানোর কিছুমাত্র দরকার আমার নেই। কিন্তু রোগী

নিজের জন্য যে পথই বেছে নিন না কেন, তাঁকে শুধু আমার একটি কথা বলবার আছে। তিনি যেন কখনই আত্মপ্রতারণা না করেন। তিনি যে ধরণের চিকিৎসকের কাছেই যান না কেন, তাঁর মতামতকে তাঁর কঠোর ভাবে নিতে হবে যাচাই করে। রোগনির্ণয় সঠিক ভাবে হ'ল কি না, চিকিৎসা-প্রণালীর ভিতরে সব দিকে বেশ সঙ্গতি থাকছে কি না, বুকের উন্নতি যথেষ্ট সুস্পষ্ট কি না, এগুলির প্রতি বুদ্ধিমান্ রোগীর তীব্র ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। নিজের অসুস্থ জীবনে যে সময়েই তাঁর যে খটকা উপস্থিত হবে, তা পরিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই যেন তিনি সন্তুষ্ট না থাকেন এবং যে-সে লোকের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে এবং নিশ্চিন্ত মনে একটি গুরুতর ব্যাধি নিয়ে ছেলেখেলা করতে গিয়ে নিজের বিপদ্ না ডেকে আনেন।

মাসিক বা দৈনিকের পাতা খুললেই আজকাল যক্ষ্মারোগের অসংখ্য অব্যর্থ মহৌষধের বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। আমি যে কোন রোগীকে এবং রোগীর আত্মীয়-স্বজনকে এই সব মহৌষধ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে হুঁশিয়ার করে দিতে চাই। যে ওষুধের গ্যারান্টির জোর যত বেশী, রোগী যেন মনে রাখেন যে, সেই ওষুধ ঠিক ততখানিই বাজে এবং সে সব ওষুধ ব্যবহার ক'রে শুধু যে কিছুমাত্র ফল হবে না তাই নয়, অনেক সময়ে গুরুতর অনিষ্টেরই কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এই ধরণের বিজ্ঞাপনের ওষুধ সম্বন্ধে ১৩৪১ সালের মাঘ মাসের "শনিবারের চিঠি"তে প্রকাশিত কতকগুলি চিন্তাশীল মন্তব্য থেকে এই লাইন ক'টি এখানে আমি তুলে দিচ্ছি: "শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই জানেন, যাঁহারা বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা করেন, তাঁহারা কোন ব্যাধিমুক্তি সম্বন্ধেই গ্যারান্টি দিতে পারেন না। এরূপ গ্যারান্টির কোন মূল্য থাকিলে পৃথিবী হইতে ব্যাধি নির্ম্মূল হইয়া যাইত। কিন্তু তাহা হয় নাই, এবং শীঘ্র হইবে বলিয়াও কোন সম্ভাবনা নাই। যাহাদের দায়িত্বজ্ঞান কম, তাহারাই অসুখ সারাইতে গ্যারান্টি দিবার স্পর্দ্ধা রাখে। শিক্ষিত চিকিৎসক এরূপ করিতে পারেন না।"

যক্ষ্মারোগী তার অনেক হিতাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়স্বজনের মুখে মেলাই "দৈব" এবং পেটেণ্ট ওষুধের খবর পাবেন অনেক সময়ে; এবং সে সব ব্যবহার করবার জন্যে উপদ্রুত হবেন। বহু শিক্ষিত এবং scientific minded লোককেও অনেক সময় এই সব তথাকথিত "দৈব" এবং অসার পেটেণ্ট ওষুধের মোহে পড়তে এবং অযথা সময়ক্ষেপ করতে হয়। এ সব সম্বন্ধে বিস্তারিত কোন মন্তব্য করতে আমি ইচ্ছুক নই; কিন্তু স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসাটা আগে করে নিয়ে তারপরে ফলাফল দেখে যেন রোগী অপর যা হয় করেন। অবিশ্যি আমি একটু আগেই বলেছি যে, সারাটাই হ'ল আসল—যিনি যে ভাবে পারেন আপত্তি নেই। কিন্তু রোগী নিজের গুরু দায়িত্ব সম্বন্ধে যেন সর্ব্বদা সচেতন থাকেন এবং সব দিক্ বুঝে এবং বিচার ক'রে অগ্রসর হন, এই আমার অনুরোধ।

স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসাটা অ্যালোপ্যাথিক লাইনে হ'লেও এর একটা সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে এবং যে কোন অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার এই লাইনের চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। এই রোগে স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসার যত দোষত্রুটিই থাক এবং এখনও তার অবস্থা যত অপরিণতই হোক্—আমি আমার কথার পুনরাবৃত্তি ক'রে বলব যে, এই চিকিৎসাই বর্ত্তমানে নিঃসন্দেহরূপে করছে "Greatest good to the greatest number" এবং বিশেষ ভাবে আশা করা যায় যে, সুদূর ভবিষ্যতেও সে তাই-ই করবে—এই ক্ষেত্রের মনীষিগণের অশ্রান্ত গবেষণা এবং একাগ্র চেষ্টার ফলে।

এখন আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাই, এ নিয়ে এ যাবৎকাল যে কত রকম মতেরই সৃষ্টি হয়েছে তার অন্ত নেই। বিষয়টি হচ্ছে—যক্ষ্মাপীড়িতের পক্ষে বিবাহ করা কত দূর সমীচীন। আমি বলেছি যে, যুবক-যুবতীদের ভিতরেই এই রোগের প্রসার সব চেয়ে বেশী। এখন, এই সব যুবক-যুবতীদের ভিতরে হয়তো অধিকাংশই অবিবাহিত এবং যক্ষ্মাক্রান্ত হবার পরে বিবাহের কল্পনা নিশ্চয়ই অধিকাংশের মনেই একটি বিচিত্র সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এ সম্বন্ধে কি কি কথা বলতে পারা যায় দেখা যাক।

বস্তুতঃ রোগ যখন সক্রিয় অবস্থায় থাকে অথবা শরীর যখন অতিরিক্ত দুর্ব্বল থাকে এবং রোগী যখন নিয়মিত চিকিৎসাধীন থাকে, তখন বিবাহের কথা ওঠেই না। কিন্তু ক্রমান্বয়ে শরীর সুস্থ এবং সবল হয়ে উঠবার সাথে সাথে রোগীর মস্তিষ্কে যখন জাগতে থাকে এই সব কল্পনা, তখন দুটি জিনিষের বিষয় রোগীর প্রথমেই চিন্তা করতে হবে:—(১) বুকের অবস্থা কি রকম। আমি বলেছি যে, অনেক সময়ে রোগীর সাময়িক উন্নতি হয়; অথবা বুকের একটু উন্নতি হবার সাথে সাথেই রোগীর বাইরের চেহারা অনেক সময়েই বেশ ভাল হয় এবং তিনি শরীরটাকে বেশই "ভাল" বোধ করতে থাকেন—যদিও বুকের দোষ তখনো কাটে না। কাজেই এসবের উপরে নির্ভর না করে আসল ফুসফুসটির অবস্থা কি রকম, সে সম্বন্ধে ডাক্তারের মতামত বিশেষ ভাবে নিতে হবে এক্স-রে ফটো তোলা, থুতু এবং রক্ত পরীক্ষা, ষ্টেথোস্কোপ লাগানো—ইত্যাদির পরে। স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসার পরে একটা বা দুটি বছর বাদ দেওয়া ভাল। এই সময়টা যদি রোগী খুব ভাল ভাবে থাকেন, কোন রকম উপসর্গ আর না আসে, তখন ডাক্তারকে দিয়ে বুকটা আবার নানাভাবে পরীক্ষা ক'রে রোগী বিবাহ করতে পারেন। রোগীর দ্বিতীয় চিন্তার বিষয় হচ্ছে—তাঁর আর্থিক অবস্থা। আমাদের নানারকম অশান্তি, নানা মানসিক দুশ্চিন্তা, নানা দুঃখ ইত্যাদির মূলে রয়েছে গুরুতর আর্থিক অসচ্ছলতা। রোগীর আর্থিক অবস্থা যদি শোচনীয় হয়, তবে তাঁর বিবাহিত জীবন যে বিড়ম্বিত হয়ে উঠবে, তাতে সন্দেহ নেই। অর্থের দিক্ দিয়ে যদি রোগীর বিশেষ কোন ভাবনা না থাকে, তবে তাঁর বিবাহ না করবার পক্ষে কোন যুক্তি থাকতে পারে না।

এখন এই সব কথা সচরাচরই উঠে থাকে:

(১) যৌন সংসর্গ হেতু পুরুষ এবং নারী উভয়েরই শরীর দুর্ব্বল হয় এবং রোগ তাতে পুনরায় শক্তি লাভ করতে পারে।

(২) যক্ষ্মাগ্রস্তা নারীর ক্ষেত্রে বিপদ্ আরও অধিক। গর্ভ-

ধারণের ফলে সমস্ত শরীর দুর্ব্বল হয় এবং বহুক্ষেত্রে ওই সময়ে বা প্রসবের পরে তার দেহে পুনরায় ঐ ব্যাধি অথবা অন্যান্য নানা প্রকার ব্যাধি আত্মপ্রকাশ করে।

(৩) যক্ষ্মাগ্রস্ত পিতামাতার সন্তানেরও ঐ রোগপ্রবণতা থাকে, ঐই সব দুর্ব্বল সন্তান-সন্ততি সমাজ-শরীরকে দুর্ব্বল করে।

(৪) বিবাহিত জীবনে সর্ব্বদাই আসে নানারকম সাংসারিক ঝঞ্ঝাট। অর্থ থাকলেও সব সময়ে অশান্তি, দুশ্চিন্তার হাত থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যায় না—যা না কি স্বাস্থ্যের পক্ষে নিতান্ত ক্ষতিকর।

(৫) এই অসুখের যা রীতি, তাতে মনে সর্ব্বদাই থাকে একটা ভয়; কখন কোন কারণে কি আবার হয়ে পড়ে কিছুই বলা যায় না। বিয়ে করে মিছিমিছি আর একজনের জীবনটা নষ্ট করা কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নয়। এত বেশী risk নেওয়া কোন মতেই চলে না। এ ছাড়া আরো একটা ভয় আছে—একজনের দেহ থেকে আর একজনের দেহে রোগসংক্রমণের।

আমি এসব পয়েন্টগুলির গুরুত্ব বুঝে, এগুলি নিয়ে একটু খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করতে চাই; আশা করি কেউ গবেষণা করে এর ভিতর থেকে "অশ্লীল" কিছু টেনে আনবেন না।

(১) যৌন সংসর্গ হেতু পুরুষ এবং নারী উভয়েরই শরীর দুর্ব্বল হয়, একথা কোন শরীর-তত্ত্ববিদ্ অথবা মনস্তত্ত্ববিদ্ই স্বীকার করবেন না—বরং তাঁরা ঠিক উল্টোটাই বলবেন—যৌন সংসর্গের প্রয়োজনীয়তা যে কোন স্বাভাবিক লোকের স্বাস্থ্য-রক্ষার পক্ষে স্বীকার্য্য। এ সম্বন্ধে শরীরাবস্থিত কতকগুলি gland এবং তাদের ক্রিয়াসংক্রান্ত আলোচনা একটু বিশদভাবে এখানে করতে পারলে হয়তো ভাল হতো; কিন্তু প্রবন্ধের কলেবরবৃদ্ধির ভয়ে আপাততঃ তা থেকে বিরত হ'লাম। প্রকৃতপক্ষে যৌন সংসর্গ শরীরের ক্ষতিবিধান করে তখনই—যখন না কি তা' ক্রমাগত যেতে থাকে মাত্রা ছাড়িয়ে এবং একজন যক্ষ্মারোগীর ভয় থাকা উচিত ঠিক সেইখানেই। যে কোন কাজেই যেমন তার নিজের সীমা সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে, তেমনি এ কাজেও। যে কোন কাজে উচ্ছৃঙ্খলতা দ্বারা সে যেমন নিজের বিপদ্ ডেকে আনতে পারে, ঠিক তেমনি এ কাজেও। যে কোনো কাজে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়বার দরুণ সে যেমন নিজের বুককে জখম করতে পারে, তেমনি এ কাজেও। কাজেই সর্ব্বপ্রকার "বাড়াবাড়ি" সম্বন্ধেই রোগীকে থাকতে হবে সতর্ক। তবে "বাড়াবাড়ি" কথাটার কোনো নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই এবং প্রত্যেকের পক্ষে একই নিয়ম খাটবে না। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার শারীরিক অবস্থানুযায়ী এ কথাটার বিশেষ বিশেষ বিচার হবে। নইলে কেবলমাত্র "যৌন সংসর্গ"ই শরীরকে ধ্বংস করে একথা ভাবা ভুল। আর, অনেকে হয়তো একথাটা জানেনও না যে, কোনো কোনো Psycho-analyst-এর মতে অতিরিক্ত যৌন-সংযম অথবা অতৃপ্ত যৌনাকাঙ্ক্ষা কতকগুলি অবস্থার ভিতর দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে T. B. রোগের কারণ স্বরূপ।

(২) যক্ষ্মাগ্রস্তা নারীর পক্ষে গর্ভধারণ যে অধিকাংশ সময়েই বিপদযুক্ত, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নাই। কিন্তু সে বিপদটা গর্ভধারণকালে নয়, প্রসবের সময়ে এবং প্রসবের পরে। সেই সময়েই এই বিপদ্ সচরাচর গুরুতর আকার ধারণ করে। বরং গর্ভ যতদিন থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত অনেক যক্ষ্মাগ্রস্তা নারীর স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতিই পরিলক্ষিত হয়েছে: কিন্তু প্রসবের পরেই তাদের শরীর ভেঙ্গে পড়ে; মোটের উপর বুকে যদি সামান্য দোষ থাকে, সেই দোষ বেশ ভাল ভাবে সেরে যাবার পরে যদি নারী গর্ভিণী হয়ে থাকে, এবং তার স্বাস্থ্যের সাধারণ অবস্থা যদি বরাবর ভাল থেকে থাকে, তবে সন্তান-প্রসবের ফলে সে হয়তো বেশী কাতর হয়ে না-ও পড়তে পারে; কিন্তু পুনঃ পুনঃ গর্ভধারণ এবং সন্তানপ্রসবকে একেবারেই নিরাপদ বলা চলে না।
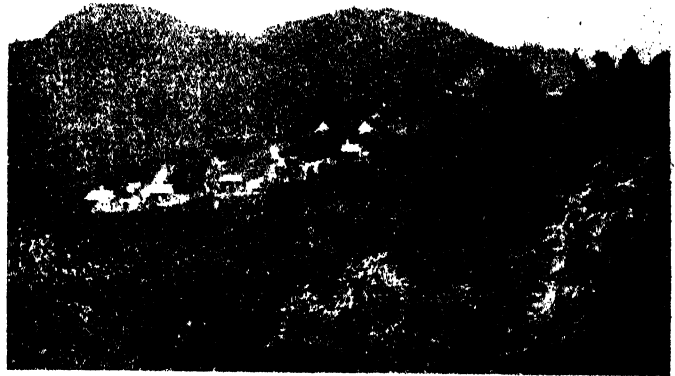
ভাওয়ালী স্যানাটোরিয়াম।

যাই হোক, এ সমস্যার একমাত্র সমাধান হচ্ছে—Birth Control অর্থাৎ জন্ম-নিয়ন্ত্রণ। কৃত্রিম এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে সন্তান-জন্ম-রোধ করার প্রক্রিয়াগুলি উত্তমরূপে জানবার জন্যে এই বিষয়ে স্বতন্ত্র বই স্বামী-স্ত্রী পড়ে নেবেন। এ সব ক্ষেত্রে যাঁরা Birth Control-এর সাহায্য না নেবেন, তাঁদের আমি সম্পূর্ণরূপে অশিক্ষিত, কুরুচিসম্পন্ন এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন আখ্যায় অভিহিত করব। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা- সর্ব্বক্ষেত্রেই T. B. রোগীকে অবলম্বন করতে হবে।

(৩) যক্ষ্মাগ্রস্ত পিতামাতার সন্তানের এই রোগপ্রবণতা আদৌ থাকে কি না, অথবা তাদের লালন-পালন সম্বন্ধে কি সব সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার, সে আলোচনা প্রথম প্রবন্ধে আমি করেছি। সেই প্রবন্ধেই এর উত্তর পাওয়া যাবে। এই পয়েন্ট দ্বারা বিবাহকে সমর্থন না করবার কোনো হেতু নাই।

(৪) বিবাহিত জীবনে সর্ব্বদাই কি কেবল নানারকম ঝঞ্ঝাটই আসে? অশান্তি এবং দুশ্চিন্তাই কি বিবাহিত জীবনের সবটুকু? আমি বলেছি যে, অধিকাংশ সময়ে অর্থাভাবই আমাদের বহু অশান্তি এবং দুশ্চিন্তার মূল কারণ। কিন্তু রোগীর নিজের যদি আর্থিক সচ্ছলতা থাকে, অথবা সম্পূর্ণ বেকার না থেকে তিনি যদি এমন একটি কাজের সুবিধা করতে পারেন, যার দ্বারা তাঁর অর্থাগম হবে, তবে বলতে পারি, বিবাহিত জীবন যে তাঁর শুধু সুখের হবে তাই নয়, সুস্থ থাকবার পক্ষে তা তাঁর সম্পূর্ণরূপে সহায়ক হবে। আমার পরিচিত অসংখ্য রোগীর ভিতরে অবিবাহিতদের চাইতে বিবাহিতরাই এই রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম মোটের উপর বেশী সন্তোষজনক ভাবে করছেন বলেই আমার বিশ্বাস। বিবাহিত রোগীদের সাধনার ভিতরে বেশী আন্তরিকতা দেখতে পাই—কারণ তারা তাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন। তাদের ভিতরে উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব কদাচিৎ আসে, সর্ব্ববিষয়ে কর্ত্তব্যপরায়ণতা থাকে তাদের অক্ষুণ্ণ।

এখানে Dr. Muthu র কয়েকটি সুন্দর লাইন আমি না তুলে দিয়ে পারলাম না:

"Marriage stirs up all the tender emotions of sympathy, affection and love, joy and happiness, gives the patient an object in life and something to live for—all of which tend to open up the vital reserves and energies which make for health. Love is a dynamic force which enriches life and uplifts man in every trial and emergency."

যক্ষ্মারোগীর বিবাহ, পিতৃত্ব, মাতৃত্ব সম্বন্ধে এই চমৎকার কথা কয়েকটি বলে ডাঃ মুথু তাঁর একখানি গ্রন্থ শেষ করেছেন:

"Worldly prudence and expediency may think them a folly in tuberculosis persons. But love will give the consumptive courage, endurance, and wisdom to act rightly in every human relation, and will rather sacrifice itself in the cause of its dear ones than bring suffering to them. For it knows that the corn of wheat falls to the ground and perishes only to live again, and death is swallowed up in a larger life and victory."

(৫) যক্ষ্মারোগীকে প্রতি পদেই risk নিয়ে চলতে হবে। যে কোন কাজে খানিকটা risk নেবার সাহস যদি না থাকে, তা হলে—যক্ষ্মারোগী ত দূরের কথা—সুস্থ লোকেরই কখন চলে কি? সুখ, দুঃখ, বিপদ, আপদ, উন্নতি, অবনতি—কার জীবনে কখন কি রকম আসবে বলা চলে না। যক্ষ্মারোগীর নিজেকে নিয়ে একটা নিরর্থক কোন fuss সৃষ্টি করবার বিশেষ কারণ থাকতে পারে না। শরীরের যথাসম্ভব যত্ন নিয়ে জীবনকে যথাসম্ভব সার্থক করে তুলবার চেষ্টা তাঁকে করতে হবে। সম্পূর্ণ সুস্থ লোকই হোন আর একজন সুস্থ যক্ষ্মারোগীই হোন, কারুর ক্ষেত্রেই, risk না নিলেই জিততে হবে এবং risk নিলেই ঠকতে হবে, একথা সত্য নয়। জীবনের যে কোন পথে চলতে যক্ষ্মারোগীর অলস, অপদার্থ, ভীরু অথবা অকর্ম্মণ্য হবার কোন মানে হয় না।

স্বামী অথবা স্ত্রী—যিনিই যক্ষ্মাক্রান্ত হোন না কেন, একে অপরকে infect করতে পারে একত্র থাকবার ফলে—এ ভয়টাও একটু বাড়াবাড়ি ছাড়া কিছু নয়। বুকের অবস্থা ভাল হ'য়ে গেলে অধিকাংশ সময়েই আর থুতু আসে না, এবং অধিকাংশ সময়েই থুতুতে যক্ষ্মাজীবাণু থাকে না। কখন থুতু সম্বন্ধে কোন সন্দেহ এলে স্বামী-স্ত্রী যদি বেশ বুদ্ধিমান্ এবং সাবধানী হন তা' হলে infection-এর এমন কিছুই ভয় থাকতে পারে না। একথা অবিশ্যি অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, স্বাভাবিক স্বাস্থ্য বজায় থাকলে স্বামী-স্ত্রীর কাছে তাঁদের বিবাহিত জীবন যতখানি উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে, এমন অবস্থায় ঠিক অতটা হয় তো নিশ্চয়ই সম্ভব নয়, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর ভিতরে প্রীতি, অনুরাগের শিথিলতা যদি না ঘটে এবং সহযোগিতার ভাব অক্ষুণ্ণ থাকে, তবে পরস্পরের কাছে পরস্পর নিরাপদে থাকতে পারা অসম্ভব হবে না। বাৎস্যায়নের মত আমিও বলতে চাই—এতগুলি প্রবন্ধ ত সকলে পড়লেন, এখন কখন কোন্ বিষয়ে কি রকম সাবধানতা অবলম্বন করবার দরকার, বুদ্ধিমান্ রোগী অথবা রোগিণী মাথা খাটিয়ে খাটিয়ে বের করতে থাকুন।...Good luck !...

এবারে রোগীর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকে কয়েকটি বিষয় আমার বলবার আছে।

এটা বোধ হয় আর বেশী কথা বলে বুঝাতে হবে না কাউকে যে, একজন টি. বি. রোগীর জীবন আগাগোড়া নানাদিক্ থেকে কতখানি বেদনায় পূর্ণ। এই বেদনা তার আরও সহস্র গুণ তীব্র হয়ে ওঠে, যখন সে কোন ভাবে উপলব্ধি করতে পারে—তার আপন জন, তার প্রিয়জন তার প্রতি বিমুখ হয়েছে, অথবা কোন প্রকারে তার সম্বন্ধে অমনোযোগী হয়ে উঠেছে। শারীরিক এবং মানসিক নানা যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট, দীর্ঘ ব্যাধি-জীবনে তার সমস্ত অন্তর একান্তভাবে ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে সবার স্নেহ, মমতা, সহানুভূতি পাবার জন্য; তার সমস্ত মন একান্ত ভাবে উন্মুখ হয়ে ওঠে সকলের কাছ থেকে আশা, উৎসাহ, শক্তি পাবার জন্য; সকলের মাঝখানে সে কাতরভাবে খোঁজে একটু শান্তি, একটু সান্ত্বনা। খোঁজে একটি কোমল, সকরুণ চোখের দৃষ্টি, তপ্ত ললাটে একটি করুণ, সুগভীর স্নেহ-সিক্ত করস্পর্শ। এসব থেকে যদি সে বঞ্চিত হয়, তবে তার জীবন যে কতখানি দুর্ব্বিষহ হয়ে ওঠে, এই দুরন্ত ব্যাধির সাথে সংগ্রাম করা তার পক্ষে যে কতখানি দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে, তা' প্রকাশ করে বলতে আমি অক্ষম। Dr. MacDougall King তাঁর The Battle with Tuberculosis and how to win it নামক গ্রন্থে সুস্পষ্ট আন্তরিকতার সাথে এই কথা কয়েকটি লিখেছেন:

"Possibly at no time in the life of a mother, a wife, a sister, or a friend is the opportunity for service and devotion so great as during the long, weary hours of the conflict, and in none of life's crises is devotion of

the practical kind so helpful to the patient and so much appreciated by him."

বঙ্গশ্রী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার মহাশয় কলিকাতার উপকণ্ঠাবস্থিত যাদবপুর যক্ষ্মা-হাসপাতাল দেখে এসে ঐ হাসপাতাল সম্বন্ধে ১৩৩৯ সালের ফাল্গুন মাসের "ভারতবর্ষ" মাসিক পত্রে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধটির এক জায়গা ছিল : "আমরা (আমি ও কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ সান্যাল) যেদিন যাদবপুর দেখিতে গিয়াছিলাম, সেদিন দেখিলাম রোগীদের মধ্যে কেহ সংবাদপত্র পাঠ করিতেছেন, কেহ চিঠিপত্র লিখিতেছেন কেহ গ্রামোফোন বাজাইতেছেন। কাহাকেও বিমর্ষ বা চিন্তাক্লিষ্ট দেখিলাম না। যে রোগ 'শিবের অসাধ্য' (শিব একজন বড় দরের চিকিৎসক, একথা বোধ করি আমার হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী পাঠক-পাঠিকার অজ্ঞাত নাই) বলিয়া কথিত, যে রোগের নাম শুনিলেই শোণিত জল হইয়া যায়, সেই রোগে আক্রান্ত হইয়াও যে রোগী প্রফুল্লমুখে বসিয়া গল্পগুজোব করে, আরোগ্য চিন্তা করে, ইহা দেখিয়াও সুখ! শুনিয়াও সুখ! "কেমন আছেন? শরীর ভাল বোধ করিতেছেন কি?" মাত্র এই দুটি প্রশ্নেই তাঁহাদের কত আনন্দ! "আমরা আপনাদের দেখিতে আসিয়াছি" শুনিয়া সকলেরই মুখ অম্লান হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। * * * আত্মীয়ের কথা বলি না, অনাত্মীয়ের ব্যবহারে আত্মীয়তার কণামাত্র অনুভব করিলে, এই রোগের তাপ অনেকখানি হ্রাস পায় বলিয়াই কথাটা এখানে বলিলাম।

"একটি সুন্দরী নারী শয্যাপ্রান্তে বসিয়া সীবন করিতেছিলেন—শিল্পকার্য্যটি দেখিবার মত, বোধ হইল, একখানি রেশমী টেবল ক্লথ। আমরা নিকটে যাইতেই শিল্পকার্য্য রাখিয়া দিয়া যুক্তকরে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইলেন। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন আছেন?" উত্তর হইল "অনেক ভাল। বাড়ীর লোক রোজ আসে কি না, বসিয়া গল্পগুজব করে কি না, জিজ্ঞাসা করায় মেয়েটি বঙ্গললনাসুলভ ব্রীড়ানম্রমুখে ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, আসে; ভাইয়েরা আসে, দেবর আসে। অর্থাৎ মনে হইল, 'একজন' ছাড়া সবাই আসে। বাহিরে আসিয়া যাহা শুনিলাম, তাহা যেমন মর্ম্মন্তুদ, তেমনই করুণ! সেকথা প্রকাশ করিয়া লাভ নাই, বরং ক্ষতির সম্ভাবনা সমধিক।"

অনাত্মীয়ের ব্যবহারে আত্মীয়তার কণামাত্র অনুভব করিলে যদি এই রোগের তাপ অনেকখানি হ্রাস পায়, তা হলে আত্মীয়ের ব্যবহারে অনাত্মীয়তার কণামাত্র অনুভব করলে ঠিক সেই পরিমাণেই কি এই রোগের তাপ বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক নয়? অভাব প্রিয়জনদের সঙ্গলাভের জন্যে এই রোগী যে কি রকম আকুল হয়ে উঠতে পারে, এখানে তার আর একটু উল্লেখ আমি করছি। শ্রীবকুলরাণী দেবী নাম্নী একটি মহিলা অমৃতবাজার পত্রিকায় একটি চিঠি লেখেন—"T. B. Sanatorium : Its immediate necessity in Bengal" এই শিরোনামা দিয়ে—মাদ্রাজের মদনাপল্লী স্যানাটোরিয়াম থেকে। ইনি একজন T. B. পেসেন্ট এবং আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখা কালীন ইনি উক্ত স্যানাটোরিয়ামে চিকিৎসাধীন আছেন। বাংলার বাইরে কোন স্যানাটোরিয়ামে সিট পাওয়া নিয়ে, খাওয়া নিয়ে, ভাষা নিয়ে বাঙ্গালীদের যে কত রকম অসুবিধার ভিতরে অনেক সময়ে পড়তে হয়, এই মহিলাটি তাঁর চিঠিতে সে সব উল্লেখ করে এক জায়গায় লিখছেন :

"Apart from all these difficulties they are deported from their health and home thousands of miles away, which makes it impossible for near and dear ones to have interviews occasionally. Lying helpless in sick bed, and groaning, when we find the occasional visits given by husbands, brothers, parents to other patients and see the faces of the patients beaming with joy, our heart aches."

মদনপল্লী স্যানাটোরিয়াম : একটি দিকের দৃশ্য।

এ সব থেকে সহজেই বুঝতে পারা যাবে রোগীর প্রতি আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবের কোন রকম উদাসীনতা তার প্রতি অমানুষিক নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর কিছুই নয়; এবং তাকে শীগ্‌গির করে সুস্থ করে তুলতে হলে তাকে সবরকম স্নেহ-মমতা, সহানুভূতি দিয়ে সর্ব্বদা এমনভাবে রাখতে হবে আচ্ছন্ন করে, যাতে করে না কি নিজের ব্যথা-বেদনা নিয়ে একটুকু ম্রিয়মাণ হয়ে থাকবার সুযোগ সে কখনো না পায়। কাছে না থেকে সে যদি দূরে থাকে, একলা কোন এক ভিন্ন দেশের হাসপাতালে পড়ে, তবে তাকে এমন চিঠিপত্র লিখতে হবে যা না কি তার প্রতি অসীম স্নেহ, আশা, সান্ত্বনা, উৎসাহের বাণীতে পূর্ণ। এক জন টি. বি. রোগী যে কতখানি sensitive হতে পারে এবং তাদের সাথে যে কত সাবধানে এবং কত বুঝে চলতে হয়, আমার কাছে আমার এক টি. বি. বান্ধবীর লেখা কয়েকটি পত্রাংশ থেকে সকলে তা উপলব্ধি করতে পারবেন। কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজে পড়তে পড়তে তাঁর অসুস্থতা ঘটে। তাঁর একখানা পত্রাংশ :

"* * * এবারে আমার এখানে আসবার কথা লিখি। অসম্ভ

হয়ে অন্যের কাছ থেকে টাকা নিয়ে জীবন কাটাচ্ছি, এইটাই যেন মনকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। ভাবছিলাম কি করে নিজের ভরণপোষণ চালাই। আপনার লোকের কাছ থেকে টাকা নিতে সুস্থ লোকের হয়তো মনে কোন ভাবান্তর হয় না, কারণ সে জানে একদিন সে নিজের পায়ে দাঁড়াবে, কিম্বা হয়ত যা নিচ্ছে তা একদিন ফিরিয়ে দিতে পারবে। আমার সে আশা নেই—কাজেই যদিও দিদি আমার সব অভাব পূরণ করে, আমি তা নিতে কুণ্ঠিত হই। লোকে বলে কুণ্ঠিত হবার কোন কারণ নেই, কারণ যে দিচ্ছে সে সন্তুষ্ট মনে দিচ্ছে। আমার মন তাতে সান্ত্বনা পায় না—আমি ভাবি আমার এত নেবার অধিকার নেই। মনে যখন এই সব নিয়ে অত্যন্ত অশান্তি আরম্ভ হ'লো—একদিন এখানকার ডাক্তারকে একটা চিঠি লিখলাম আমায় এরা ল্যাবরেটারীতে কাজ দিতে পারে কি না; কারণ এর আগে একবার এখানকার ডাক্তার আমায় কাজ করবার জন্যে ডেকেছিলেন। * * এখানকার ডাক্তার আমায় আসতে লিখলেন। * * এরা মিশনারী, টি. বি, পেসেন্টদের জন্যে এদের দয়ামায়া আছে। শরীর খারাপ হলেই বিশ্রাম করতে দেবে। আমি স্বাস্থ্য ফিরে পাবার আশায় এখানে আসি নি, একটু যদি স্বাবলম্বী হতে পারি, এই আশায় এসেছি। বুঝেছি ডাকলে মরণ আসে না, যতক্ষণ না তার নিজের খেয়াল হবে। কবে তার খেয়াল হবে সেই আশায় কতদিন বসে থাকব? এতদিনও ঠিক বুঝতে পারি নি, কিন্তু ক্রমেই বুঝতে পারছি এখন কেবল দেহের ঠাট বজায় রেখে বেঁচে থাকা, সামর্থ্য একবিন্দু নেই। এই রকম জায়গা ছাড়া এ অবস্থায় আর কোথাও আমার কাজ করা অসম্ভব। নেবেও না কেউ। তা না হলে আর এই সামান্য কটা টাকার উপর নির্ভর করে এতদূর আসি? ভাগ্যের পরিহাস দেখেছ? হাসি পায় না? এতদূরে আসবার আর একটা কারণ, পাঁচ মাস অনবরত বাড়ীতে থেকে বুঝতে পেরেছি, যে রকম mentality হয়েছে সুস্থলোকের সঙ্গে (সে আপনার লোকই হোক, পরই হোক) মানিয়ে চলা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমিও তাদের বুঝতে পারব না, আর তারাও আমার temper সহ্য করতে পারবে না। আমারই মত যারা হতভাগ্য তাদের মধ্যেই আমার বাকি জীবনটা কাটাতে হবে * *"

অপর একখানি পত্রাংশ:

"* * জানো, আমি যত দূর দেখলাম এ জীবনে তো অনেক T. B. Patient ই দেখলাম—more or less সকলেরই (with average intelligence) মনের অবস্থা একই। প্রথম একটি কিম্বা বড় জোর দুটি বছর তাদের মনে আশা থাকে যে হয়ত ভাল হব, কিন্তু তার পরই এই ভাব। কেউ যদি T. B. Patientদের মনস্তত্ত্ব লিখতে বসে, তা হলে আলাদা আলাদা করে একশটার কিম্বা হাজারটার মন বিশ্লেষণ করতে হবে না—গোটা চার পাঁচ দেখলেই কার্য্যসিদ্ধি হবে। তবে তাদের মধ্যে এই একটু তফাৎ যে কেউ বা খুব keenly feel করে আর কেউ বা বেপরোয়া। * * বাড়ীতে থাকতে যে তোমার আর একবিন্দু ইচ্ছে করছে না এ আমি খুব বুঝতে পারছি। * * ঐ তুমি যা বলেছো— আমাদের বোঝবার চেষ্টা কেউ করে না, আর বোঝবার চেষ্টা করে না বলেই আমাদের মনের বিদ্রোহভাবটা আরও জোরের সঙ্গে জাগিয়ে তোলে। বাড়ীতে দিদির কাছে যখন ছিলাম সামান্য বিষয় নিয়ে ভাই বোনদের সঙ্গে খুটোখুটি বাধতো। ওরাও আমার ওপর অসন্তুষ্ট হতো আমারও মন ভয়ানক খিঁচড়ে যেতো। আমায় তো দিদি একদিন স্পষ্টই বলে দিল "নিমু, তোর মনটা বড় নীচ হয়ে গেছে।" ওরা বলেই খালাস, কিন্তু ঐ কথাটাই যে আমাদের মনকে কতখানি আঘাত দিতে পারে, সেটা ওরা কল্পনায়ও আনতে পারে না। দিন রাত মনের সঙ্গে আমাদের যে কতখানি যুদ্ধ করতে হয়, জয়ী হওয়া যে কত কঠিন—মাঝে মাঝে দুর্ব্বলতা যে কথার মধ্যে প্রকাশ পাবেই এ কথা তারা বোঝে না। তারা আমাদের এই দুর্ব্বলতার ওপরে advantage নেয়। এবারে আমি সত্যই মনে মনে ঠিক করেছি যে ভাগ্য আমায় আবার আত্মীয়দের মধ্যে নিয়ে না গেলে নিজে যাবার চেষ্টা আর করবো না। তোমার জন্যে আমার বড় কষ্ট হয়, কতখানি অশান্তির মধ্য দিয়ে যে তোমার দিন কাটে তা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করতে পারি। আমাদের মনের বোঝা কারুর কাছে নামাবার নয়। তুমি লিখেছ পথ খুঁজে নেবার চেষ্টায় আছ—কি চেষ্টা করছ আমায় জানাবে কি? * * *"

আর একখানি পত্রাংশ:

"* * তোমার মনের অবস্থা আমি আমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করতে পারছি। এতবড় আঘাতটা সহ্য করতে যে তোমার কতখানি আত্মবলি দিতে হচ্ছে সে যে আমি বুঝতে পারছি with every fibre of my life. আমি মেয়েমানুষ, ভগবান্ হয়তো সহ্য করবার শক্তি আমায় অনেক বেশী দিয়েছেন। প্রথমে আমারও সমস্ত মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল, কিন্তু সময়ের দীর্ঘতা আমার সমস্ত বিদ্রোহী feelingsকে যেন একেবারে dull করে দিয়েছে। আমার মনে হয় আমি যেন সময়ের স্রোতে ভেসে চলেছি। না আছে আমার কোন আকাঙ্ক্ষা, না আছে আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার মত উৎসাহ বা শক্তি। কখনও কখনও মানুষের নিষ্ঠুরতা সুপ্ত feelings গুলোকে জাগিয়ে দেবার চেষ্টা করে; কিন্তু ভাই, যুদ্ধ করবার ক্ষমতা তার একেবারে গেছে। তুমি এখনও নিজের অবস্থা মেনে নিতে পারছো না, যতই তুমি বুঝতে পারছ তুমি নাচার—ততই তোমার মন অক্ষমতার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়ে উঠছে। অমিয় লক্ষ্মীটি, আমাদের উপরে যে মহাশক্তি আছে তার বিপক্ষে যুদ্ধ করবার ক্ষমতা আমাদের কতটুকু? সে শক্তির ত এতটুকু হ্রাস হবে না কেবল তুমিই ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠবে। Surrender ত একদিন করতে হবেই, ভাই। নিজের ভাগ্যের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেওয়া কি সব চেয়ে ভাল নয়? অবশ্য এটা যে কত কঠিন তা আমি খুব ভাল করেই জানি, আমার নিজেরও যে খুব বড় রকমের অভিজ্ঞতা * * *"

চিঠিগুলির এই সব অংশ নিয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এখানে ছোট্ট একটি সংবাদ দিয়ে রাখতে পারি, যিনি আমাকে এই চিঠিগুলি লিখেছিলেন, দীর্ঘ দশটি বছর বহু বিরুদ্ধ অবস্থার ভিতর দিয়ে এই দুরন্ত

ব্যাধির সাথে আপ্রাণ সংগ্রামের পরে কিছুকাল হল তাঁর ব্যর্থ জীবনের সমস্ত ব্যথা, বেদনা, অভিযোগ, অভিমানের চির-অবসান ঘটেছে।

আমেরিকার ন্যাশনাল টিউবারকুলোসিস অ্যাসোসিয়েসনের অষ্টাবিংশ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি Dr. Alfred Henry তাঁর অভিভাষণে বলেছিলেন যে, এক জন লোককে যখন বলা হয় যে তার টি. বি. হয়েছে এবং তাকে যখন বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে কর্মজগৎ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন করে এখন তাকে কি ভাবে নিজের চিকিৎসা চালাতে হবে, তখন সেটা তার পক্ষে হয় "more of a shock than the sentence given a criminal." এই রোগের চিকিৎসাসংক্রান্ত অন্য কথা বলে তিনি আফশোষ করেছেন, "Another phase of a treatment is sadly neglected. The proper mental attitude of the patient is referred to treat the patient as well as the disease. A disease has seized upon one, and of all ills this is the one he always dreaded. Almost immediately depression, instability, and in many cases neurasthenia become controlling factors. An applicant for a Sanatorium Superintendency was asked what he considered the most important thing in conducting the affairs of the institution and he replied, "Keep the patients satisfied and happy." He was hired and made good. The physician who successfully treats tuberculous patients is keeping up a morale, establishing a wholesome philosophy of life, and seeing to it that the human side is always uppermost. Worry, fear and anxiety have no place in a favourable response, but hope, poise, and emotional control have ringside seats."

Dr. Alfred Henry-র এই উক্তি থেকে বুঝা যায় যে শুধু আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের নয়, রোগীর চিকিৎসকেরও একটি বড় কর্তব্য রোগীর মনকে সব সময়ে হালকা এবং সুখী রাখতে চেষ্টা করা। রোগীকে যাদের উপরে সর্বদা নির্ভর করতে হবে—এমন যে কোন বন্ধু, আত্মীয় বা চিকিৎসকের প্রতিমুহূর্তে লক্ষ্য রাখা উচিত যে তাঁদের কোন প্রকার কথায় বা ব্যবহারে তাকে এতটুকু ক্ষুণ্ণ অথবা আহত না হতে হয়, যার না কি নিজের ব্যাধি নিয়ে এমনিই নানা ভাবে লজ্জা এবং সঙ্কোচের অন্ত নাই।

এক জন যক্ষ্মারোগীর প্রতি সর্ব্ব রকম অবহেলা প্রদর্শন করতে হবে এবং তাকে সর্ব্বপ্রকারে এড়িয়ে চলতে হবে, এই মনোবৃত্তিটা অধিকাংশ লোকের ভিতরে এত বেশী প্রবল যে, কেউ যদি প্রকৃত আন্তরিকতা নিয়ে একজন টি. বি. রোগীর পাশে এগিয়ে যায়, তার একটু সত্যিকার কাজ করবার চেষ্টা সুরু করে, তার সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশতে চায়, তা' হলে বহু সময়ই তার পক্ষে নানা রকম মন্তব্যের পাত্র হওয়া আশ্চর্য্য নয়। অপর দশ জনের কুশিক্ষা এবং কুসংস্কারের প্রভাব নিজের উপরে খানিকটা বিস্তার লাভ করবার ফলে এবং "পাছে লোকে কিছু বলে" এই কারণে একজন রোগীকে সত্যি করে ভালবাসলেও তার প্রতি সে ভালবাসা প্রকাশ করতে যদি কারুর কোন প্রকার জড়তা এবং সঙ্কোচ আসে, তাঁকে আমি Moor House-এর এই লাইনটি বলে দেব—The strength of a character is measured by its resistance to the contagion of accepted ideas.—এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন চিন্তাধারা নিজের পথে চলতে তাঁকে অনুরোধ ক'রে প্রাচীন পাশ্চাত্ত্য কবির ভাষায় তাঁকে বলব—

"...Give every man thy ear, but few
thy voice;
Take each man's censure but reserve
thy judgment."

এবারে অন্য প্রসঙ্গে আসা যাক।

আমি আমেরিকার ন্যাশনাল টিউবারকুলোসিস অ্যাসোসিয়েসনের উল্লেখ অনেকবার আমার প্রবন্ধে করেছি। ওদেশে এ লাইনে যে কি রকম কাজ হচ্ছে তা জেনে সকলে হয়ত চমৎকৃত হবেন। উয়োরোপ, আমেরিকার সমস্ত প্রদেশেই যক্ষ্মারোগ-নিবারণকল্পে আশ্চর্য্যকর কাজ চলেছে। শুধু য়ুনাইটেড স্টেটস্-এর ন্যাশনাল টিউবারকুলোসিস্ অ্যাসোসিয়েসনের কাজের একটু নমুনা দিলেই পাঠক-পাঠিকার মোটামুটি একটা ধারণা জন্মাবে যে, কি কাজটাই ওরা করছে।

পাঁচগণী স্যানাটোরিয়াম : মেন ফিমেল ওয়ার্ড।

ঐ অ্যাসোসিয়েসনের উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ (১) শুধু নিজেদের সমিতি নিয়ে ব্যস্ত থাকা নয়, দেশের সমস্ত স্বাস্থ্য-সমিতিগুলির সাথে এবং চিকিৎসক সমাজের সাথে যোগ রেখে পরস্পরের মধ্যে সাহায্য আদানপ্রদান। (২) দেশের বয়স্কদের ভিতরে টি. বি. সংক্রান্ত সব রকম শিক্ষা প্রচার। (৩) শিশুদের স্বাস্থ্যের খবর করা এবং বিশেষ ভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এ সম্বন্ধে শিক্ষিত করে তোলা। (৪) টিউবারকুলোসিস্ সংক্রান্ত কাজের জন্যে Christmas seal sale ইত্যাদির দ্বারা এবং অন্যান্য নানা উপায়ে

অর্থসংগ্রহ। ["কৃস্‌মাস্ সিল" বিক্রীর ব্যাপারটা হচ্ছে এই রকম: ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ডেনমার্ক দেশীয় একজন পোষ্টাপিসের কেরাণী,Einar Holboell-এর মাথায় খেলে যে, কৃস্‌মাসের সময়ে এক রকম টিকিট সবাইকে পাঠাতে হবে, শুধু সকলের প্রতি শুভেচ্ছাজ্ঞাপক। পোষ্টাল ষ্টাম্পের সাথে এর কোন সম্পর্ক থাকবে না। এই টিকিট পাঠিয়ে যে চাঁদা আদায় করা গিয়েছিল, তা দিয়ে তখন শিশুদের জন্যে একটা স্যানাটোরিয়াম খোলা হয়েছিল। এর পরে ১৯০৭ সালে Miss Emily P. Bissel এই ধরণের আর একটি টিকিট বের করে কিছু টাকা তুলে একটা ছোট স্যানাটোরিয়ামকে সাহায্য করলেন। তার পরে এই "সিল"টা এল অ্যামেরিকান রেডক্রস্ সোসাইটির হাতে; ক্রমে "সিল"-বিক্রীর সম্পূর্ণ অধিকার এল ন্যাশনাল টি. বি. অ্যাসোসিয়েসনের হাতে।] (৫) টিউবারকুলোসিস সংক্রান্ত নানা রকম পত্রিকা, বই, বিজ্ঞাপন প্রকাশ। (৬) টিউবারকুলোসিসের চিকিৎসা এবং এই ব্যাধির সর্ব্বপ্রকার সমস্যা সম্বন্ধীয় নানা প্রকার গবেষণা এবং অনুসন্ধান। (৭) টিউবারকুলোসিস্ অ্যাসোসিয়েসনের কাজের জন্যে কতকগুলি উপযুক্ত কর্ম্মী তৈরি করা। (৮) কাজ করবার জন্য নার্স ৭,১১৫; ১৯০৪ সালে অ্যাসোসিয়েসনের সভ্যের সংখ্যা যেখানে ছিল ১৫৬, ডিরেক্টারের সংখ্যা ৩০ এবং ষ্টাফের সংখ্যা ১ সেখানে ১৯২৯ সালে সভ্যের সংখ্যা হয়েছে ২,৫৭১, ডিরেক্টারের সংখ্যা ৯৮ এবং ষ্টাফের সংখ্যা ৫১; ১৯০৭ সালে যেখানে "কৃস্‌মাস্ সিল্" বিক্রী করে পাওয়া গিয়েছিল ৩,০০০ ডলার, ১৯২৮ সালে সেখানে "সিল্" বিক্রী করে পাওয়া গিয়েছে ৫,৪০৬,২৪১ ডলার; ১৯১৫ সালে শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার যেখানে কোনই ব্যবস্থা ছিল না, ১৯২৮ সালে সেখানে ২০০০,০০০ শিশুর হয়েছে স্বাস্থ্যপরীক্ষা। এবং এই রকম ভাবে কাজ চলবার ফলে ১৯০৪ সালে যেখানে এক লক্ষ লোকের ভিতরে ২০০ জন লোকের মৃত্যু ঘটত যক্ষ্মারোগে, সেখানে এক লক্ষ লোকের ভিতরে ১৯২৭ সালে যক্ষ্মারোগে মৃত্যুসংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ৮১ তে। সকলে যেন মনে রাখেন আমি যে হিসাবগুলি দিলাম, এগুলি কয়েক বছর আগেকার পুরোণো। এ কয়েক বছরে এই সমস্ত কাজ আরও অনেক বেড়ে গিয়েছে। ইংলণ্ডের ন্যাশনাল টিউবারকুলোসিস্ অ্যাসোসিয়েসনের কথাও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এদের কাজও ওই একই ধরণেরই প্রায়। ১৮৯৮ সালে সপ্তম এডওয়ার্ড কর্ত্তৃক হয় এই সমিতির উদ্বোধন। ঐ সালে গ্রেট ব্রিটেনেই যক্ষ্মারোগে মৃত্যুসংখ্যা ছিল ৭০,২৭৯ এবং ১৯২৩ সালে সেই সংখ্যা

কয়েকটি 'কৃস্‌মাস্ সিল':—সর্ব্ববামে প্রথম 'কৃস্‌মাস্ সিল' (হেল্‌বেল কৃত)। (২) তৎপরে আমেরিকার ন্যাশনাল টি. বি. অ্যাসোসিয়েসনের প্রথম 'কৃস্‌মাস্ সিল'।

নেমে দাঁড়িয়েছে ৪৬,৫৭৮ এ; বর্ত্তমানে যে এ সংখ্যা আরো অনেক কমে গেছে এ কথা বলাই বাহুল্য। ফিল্‌ম্, ম্যাজিক লণ্ঠন দেখিয়ে, পুস্তিকা, বিজ্ঞাপন বিলি করে, সভা-সমিতি করে বক্তৃতা দিয়ে কি বিপুল উদ্যমে যে এরা এই রোগের পিছনে উঠে পড়ে লেগেছে, তা বলবার নয়। এবং যে পরিমাণ এদের অধ্যবসায়, আন্তরিকতা ও চেষ্টা, এরা ঠিক সেই পরিমাণে কৃতকার্য্যও হচ্ছে। জার্ম্মানী, ফ্রান্সেও একই ব্যাপার চলেছে।

সমস্ত রকম যক্ষ্মা-প্রতিষ্ঠান গুলির যে সব নানারকম জিনিষের প্রয়োজন হয়, সেগুলি প্রস্তুত এবং সরবরাহ করা।

ন্যাশনাল টিউবারকুলোসিস্ অ্যাসোসিয়েসন স্থাপিত হয় ১৯০৪ সালে। এই সমিতির কাজ কি ভাবে এগিয়েছে, দেখুন।

১৯০৪ সালে সমিতির সংখ্যা যেখানে ছিল ২০, ১৯২৮ সালে সেখানে হয়েছে ১৪৩৪; ১৯০৫ সালে যেখানে বুলেটিনের সংখ্যা ছিল ১, সেখানে ১৯২৮ সালে টি. বি. সম্বন্ধীয় পত্রিকা, বুলেটিনের সংখ্যা হয়েছে ৪০০; টি. বি. সংক্রান্ত কাজে বিশেষ শিক্ষালাভের জন্যে ছাত্রসংখ্যা ১৯১৬ সালে যেখানে ছিল ২১, ১৯২৮ সালে সেখানে ৭১৭; ১৯০৪ সালে স্যানাটোরিয়ামের সংখ্যা যেখানে ছিল ১১৫, স্যানাটোরিয়াম বেডের সংখ্যা যেখানে ছিল ৯১০৭, প্রিভেনটোরিয়াম যেখানে একটিও ছিল না, ডিস্পেন্সারি যেখানে ছিল ১৯ এবং টি. বি.র কাজ করবার জন্যে নার্স যেখানে ছিল ১০, ১৯২৮ সালে সেখানে স্যানাটোরিয়ামের সংখ্যা হয়েছে ৬১৮, স্যানাটোরিয়াম বেডের সংখ্যা ৭৬,৬৯৫, প্রিভেন্টোরিয়াম ৮৩, প্রিভেন্টোরিয়াম বেডের সংখ্যা ৫,০০১, ডিস্পেনসারি ৬,৬৭১ এবং টি. বি.র

যক্ষ্মা-নিবারণের প্রচেষ্টা এবং যক্ষ্মাগ্রস্তদের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা ইত্যাদি ইত্যাদি ছাড়া যক্ষ্মাসংক্রান্ত কাজের এদের আর একটি দিক্ হচ্ছে—সুস্থ যক্ষ্মারোগীদের জন্য এমন কিছু ব্যবস্থা করা যাতে না কি তারা তাদের সুস্থতাটাকে বজায় রাখতে পারে—মুক্ত এবং বিশুদ্ধ বায়ুতে বাস করে, অপেক্ষাকৃত হালকা কাজ করে এবং চিকিৎসকদের সংস্পর্শে থাকে। প্রত্যেক দেশের ন্যাশনাল টিউবারকুলোসিস্ অ্যাসোসিয়েসন এ বিষয় নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাচ্ছে। মাথা-ঘামানোর প্রয়োজন এই জন্যই যে এক জন যক্ষ্মারোগী তার আগেকার কার্য্য-ক্ষমতা যখন ফিরে পায় না, তাকে যখন নিজের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বহু সাবধানতা অবলম্বন করে এবং বহু

নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়, তখন সুস্থ লোকের মত যে কোন কাজের উপযুক্ত হওয়া, তার পক্ষে কখনই সম্ভব হয় না। অথচ তাকে আপন জীবিকা অর্জ্জন করতেই হবে। অনেক সময়ে তার পক্ষে তার পূর্ব্বের কাজে ফিরে যাওয়া সম্ভব হয় না এবং যে কাজের সে উপযুক্ত, অনেক সময়েই তেমন একটি কাজ নিজের জন্য সংগ্রহ করা অতি কঠিন হয়ে পড়ে তার পক্ষে। নানা দুশ্চিন্তা এবং অবস্থাগতিকে নানা অনিয়মের ভিতর দিয়ে শরীরের উপর নানা অত্যাচারের ফলে আবার তার শরীর ভেঙে পড়ে এবং রোগ আবার করে আত্মপ্রকাশ। এই সব সমস্যার সমাধান করবার জন্য ওরা উদ্যোগী হয়ে উঠেছে—কোন্ কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় তা ভাবছে। সমস্ত যক্ষ্মা-প্রতিষ্ঠানের ষ্টাফের ভিতরে সুস্থ রোগীদের ঢোকান হচ্ছে, গড়ে তোলা হচ্ছে "After-care Colony"—উপযুক্ত অবস্থার ভিতরে রেখে সেখানে নানা রকম কাজের ব্যবস্থা করবার চেষ্টা চলেছে—সুস্থ রোগীদের জন্য।

শুধু পুরুষরা নয়, মেয়েরাও এসে দলে দলে যোগ দিচ্ছে এ কাজে। আমি নিউইয়র্কে ন্যাশনাল টিউবারকুলোসিস্ অ্যাসোসিয়েসনের Publications and Extension-এর ডিরেক্টার Dr. Philip P. Jacobsএর কাছে দীর্ঘ একখানা চিঠি লিখে যে দীর্ঘ জবাব পাই, তার একটি অংশ আমি আমার পাঠক-পাঠিকা বন্ধুদের জ্ঞাতার্থে তুলে দিচ্ছি :—

"With regard to your inquiryc oncerning the work of women in the tuberculosis movement of this country, I am very pleased to say that ever since the beginning of the movement, women's groups, both organized and unorganized have been our most valuable allies. In many parts of the United States much of the organizing activities for the control of tuberculosis has been carried on by women's groups of various kinds."

Sanatorium ত্যাগ করবার সময়ে এরা রোগীকে এই কথা বলে দেয়—"The Sanatorium has done its best for you and will do the same for many more patients. It is only fair to speak good of it wherever you go. Remember that the doctors and nurses in these institutions are fighting against enormous difficulties. Do not add to their labours by repeating thoughtless criticisms which you may hear."

ইংলণ্ডে মোন্‌ডি হিল্‌স্ নামক স্যানাটোরিয়ামে চিকিৎসার পরে যক্ষ্মাক্রান্ত মাতাদের সন্তান। মা এবং ছেলেরা সবাই সুস্থ আছে।

এর পরের প্রবন্ধটিই হবে খুব সম্ভবতঃ আমার শেষ প্রবন্ধ—টি. বি. বিষয়ে। আমার এতগুলি প্রবন্ধ লিখবার সার্থকতা কি কিছু হবে? কতজনে এই প্রবন্ধগুলি মনোযোগ দিয়ে পড়ল এবং অন্তর দিয়ে সব অনুভব করল? সেই কথা ভাবছি।

প্রকৃত জাতীয় কংগ্রেস

প্রকৃত "জাতীয় কংগ্রেস" বলিতে বুঝিতে হইবে এমন একটী সম্মেলন, যাহাতে দেশের প্রত্যেকের মিলন সম্ভব হইতে পারে। দেশের সমস্ত জনসাধারণের সুশিক্ষা সাধিত না হইলে তাঁহাদের প্রত্যেকের স্ব স্ব জীবিকা নির্ব্বাহের জন্যই যে একটী জাতীয় কংগ্রেসের অথবা সম্মেলনের প্রয়োজন, ইহা সকলের পক্ষে বুঝা সম্ভব হয় না তাহা সত্য এবং বুদ্ধির অল্পতা হেতু হয়ত কেহ কেহ জাতীয় কংগ্রেস যেরূপ সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দরই হউক না কেন, তাহাতে যোগদান করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারিবে না তাহাও সত্য, কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য অথবা কর্ম্মপদ্ধতিতে এমন কিছু থাকা কিছুতেই সঙ্গত নহে, যাহার বিদ্যমানতা-হেতু দেশের এমন কি একজন লোকের পক্ষেও তাঁর ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহাতে যোগদান করা অসম্ভব হইতে পারে।...

হ্যাণ্ড-শেক

—স্বামী ভূমানন্দ

পঞ্চাশ কি ষাট বৎসর পূর্ব্বে বিদেশীয় পোষাক-পরিচ্ছদ, হাব- ভাব, কথাবার্ত্তা, আচার ব্যবহার অনুকরণ করা একটা গুণের মধ্যে পরিগণিত ছিল। "I speak English, think in English and dream in English"—**বলাটাও তখন** একটা গৌরবের বিষয় ছিল। **এই সময় হ্যাণ্ডশেক** (hand-shake) অর্থাৎ কর-মর্দ্দন প্রথাটারও খুব বেশি প্রসার হইয়াছিল। স্কুলে, কলেজে, আফিসে, কাছারীতে, ঘাটে, মাঠে সর্ব্বত্র দেখা হইলেই হ্যাণ্ডশেক চলিত এবং ওটা না করা সাধারণ ভদ্রতার বিরুদ্ধ বলিয়া অনেকের ধারণা ছিল। কালের কুটিল (কি সু-টিল জানি না) গতিতে ক্রমে লোকের মত বদলাইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে হ্যাণ্ডশেকটা বৈদেশিক বলিয়া বর্জ্জিত হইল ও একটা অদ্ভুত রকমের নমস্কার তাহার স্থান অধিকার করিয়া সহর হইতে ক্রমে সুদূর পল্লীপ্রান্তের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল—"নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি"।

বাস্তবিকই হ্যাণ্ডশেকটা আমাদের দেশে য়ুরোপ হইতে আমদানী হইয়াছে কি না, তাহা বিবেচনা ও বিচারের বিষয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের আচার-ব্যবহারের প্রতি একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, এই হ্যাণ্ডশেক ব্যাপারটা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন আকারে ও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মুসলমান ও মাড়োয়ারীদিগের মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ কালে হ্যাণ্ডশেক করার প্রথা পূর্ব্বেও ছিল, এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে; তবে বৈদেশিক হ্যাণ্ডশেকের মত ঝাঁকাঝাঁকি নাই। ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে দেখা যায়, কোন দ্রব্য সরবরাহ বা তাহার মূল্যের পাকা চুক্তির (final contract) সময় একে অপরের করতলে করতল ন্যস্ত করে। বিবাহটাও ত একটা চুক্তি (contract) বিশেষ; তাই দেখি, কন্যাসম্প্রদান-কালে বরের হাতে কন্যার হাত দিয়া বরকে কন্যা-গ্রহণ-মন্ত্র পাঠ করান হয়। "বিবাহ" অর্থে, শাস্ত্রাদিতে এবং অন্যান্য প্রাচীন পুস্তকেও "কর-গ্রহণ", "পাণিপীড়ন", "পাণি-গ্রহণ" প্রভৃতি শব্দের বহু প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। হাত ধরিয়া অনুরোধ করার প্রথাটাও বহু পুরাতন এবং এখনও মেয়েদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়—"তাকে হাতে ধ'রে বলে এলাম, ছেলেটাকে দেখিস্।" কাজেই দেখা যায়, বিদেশীয় আচার-ব্যবহার আমদানীর বহু পূর্ব্ব হইতে এদেশে হ্যাণ্ডশেক (hand-shake) প্রথাটা অন্য আকারে চলিয়া আসিতেছে!

রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি প্রাচীন গ্রন্থ পাঠ করিলেও দেখা যায়, প্রথম দর্শনে, বিদায়কালে, বন্ধুত্ব-স্থাপনে, অনুরোধে, অনুমোদন ও প্রীতি-জ্ঞাপনে কর-গ্রহণের বা কর-স্পর্শের প্রথা সে যুগেও ছিল। রামায়ণে দেখি, পঞ্চবটী বনে উপস্থিত হইয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

> "আশ্রমঃ কতরস্মিংস্তু দেশে চ তব সম্মতঃ।
> রমেত যত্র বৈদেহী ত্বমহঞ্চৈব লক্ষ্মণ॥"
>
> রামায়ণ (অরণ্য কাণ্ড—২১।৪)

"হে লক্ষ্মণ, এই পঞ্চবটী প্রদেশের কোন্ স্থানে আশ্রম নির্ম্মাণ করা তোমার অভিপ্রেত? এমন একটী স্থান তুমি নির্ব্বাচন কর যেখানে সীতা, তুমি ও আমি আনন্দে কাল যাপন করিতে পারি।"

উত্তরে লক্ষ্মণ বলিলেন -

> "পরবানস্মি কাকুৎস্থ ত্বয়ি বর্ষাযুতং স্থিতে।
> স্বয়মেব রুচির্দ্দেশে ক্রিয়তাং যত্র রোচতে"॥
>
> রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড—২১।৭

"হে কাকুৎস্থ, আপনি অযুত বৎসর জীবিত থাকিলেও আমি আপনারই অধীন থাকিব। অতএব, যেখানে আপনার মনস্তুষ্টি হইতে পারে এমন স্থান আপনি স্বয়ংই মনোনীত করুন।"

লক্ষ্মণের এই উত্তরে নিরতিশয় প্রীত হইয়া রামচন্দ্র হস্তদ্বারা লক্ষ্মণের হস্ত গ্রহণ করিলেন এবং আশ্রম-নির্ম্মাণার্থ স্বচ্ছসলিল একটী স্থানের বিষয় বলিতে লাগিলেন—

> "স তং রুচিরপানীয়ং দেশমাশ্রমকর্ম্মণি।
> প্রগৃহ্য হস্তং হস্তেন রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ॥"
>
> রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড—২১।৮

রাবণ কর্ত্তৃক সীতা অপহৃত হইলে, রামচন্দ্র আকুলহৃদয়ে বন হইতে বনান্তরে সীতার অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে করিতে এক কবন্ধের সাক্ষাৎ পান। কবন্ধ রামচন্দ্রকে বলেন, "জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালী কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া বানররাজ সুগ্রীব ঋষ্যমূক পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছেন। আপনি তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করুন; তিনিই সীতার সন্ধান দিবেন ও তাঁহার সহায়তাতেই আপনি সীতার উদ্ধারে সক্ষম হইবেন।" কবন্ধের বাক্যানুসারে রাম ও লক্ষ্মণ ঋষ্যমূক পর্ব্বতে গমন করেন, কিন্তু সুগ্রীব দূর হইতে তাঁহাদিগকে দেখিয়া বালীর চর মনে করিয়া ভয়ে ঋষ্যমূক পরিত্যাগ করিয়া মলয় পর্ব্বতের এক শৃঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদিগের পরিচয় ও প্রয়োজন জানিবার জন্য হনুমানকে প্রেরণ করেন। হনুমান, রাম ও লক্ষ্মণের সহিত আলাপ করিয়া ও তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া, তাঁহাদিগকে পৃষ্ঠে করিয়া লইয়া সুগ্রীবের সম্মুখে আনয়ন করেন। সুগ্রীব রামের সহিত কথোপকথন করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলেন—"যদি আমার ন্যায় বানরের সহিত আপনি মিত্রতা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি এই বাহু প্রসারিত করিতেছি, আপনি স্বহস্তে আমার হস্ত গ্রহণ করিয়া সখ্য স্থাপন করুন।" রামচন্দ্র সুগ্রীবের এই বাক্যে আনন্দিত হইয়া নিজ হস্তে সুগ্রীবের কর-মর্দ্দন করিলেন এবং সুগ্রীবও স্বহস্তে রামের হস্ত গ্রহণ করিয়া অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্য অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন—

> "যদি তে রোচতে সখ্যং বাহুরেষ প্রসারিতঃ।
> গৃহ্যতাং পাণিনা পাণির্ম্মর্য্যাদা বধ্যতাং স্থিরা॥
> এতত্তু বচনং শ্রুত্বা রামঃ সুগ্রীবভাষিতম্।
> সংপ্রহৃষ্টমনা হস্তং পীড়য়ামাস পাণিনা॥
> ততো রামস্য সুগ্রীবঃ পাণিং জগ্রাহ পাণিনা।
> হার্দ্দং সৌহৃদমালম্ব্য পরিষজ্য চ পীড়িতম্॥"

রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড—৪।১৩-১৫

মহাভারতে দেখা যায়, কুরু ও পাণ্ডব উভয় পক্ষই যখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, সেই সময় একদিন বলদেব বিরাট-রাজ্যে আগমন করতঃ পাণ্ডবদিগের বাস-ভবনে প্রবেশ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র আসন হইতে উত্থিত হইলেন ও কর দ্বারা তাঁহার কর গ্রহণ করিলেন। পরে বাসুদেবপ্রমুখ অন্যান্য সকলে বলদেবকে অভিবাদন করিলে পর, তিনি বৃদ্ধ রাজা বিরাট ও দ্রুপদকে নমস্কার করিয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত উপবিষ্ট হইলেন—

> "ততস্তং পাণ্ডবো রাজা করে পস্পর্শ পাণিনা।
> বাসুদেবপুরোগাস্তং সর্ব্ব এবাভ্যবাদয়ন্॥
> বিরাটদ্রুপদৌ বৃদ্ধাবভিবাদ্য হলায়ুধঃ।
> যুধিষ্ঠিরেণ সহিত উপাবিশদরিন্দমঃ॥"

মহাভারত, উদ্যোগ পর্ব্ব—১৫৬।২২-২৩

শরশয্যাশায়ী ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রতিগ্রহ-দোষ বর্ণনাকালে, সপ্তর্ষি-বৃষাদর্ভি সংবাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করেন। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, সপ্তর্ষিগণ বৃষাদর্ভি রাজার সুবর্ণদান অস্বীকার করায়, রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ যজ্ঞোত্থিত যাতুধানী রাক্ষসীকে ঋষিদিগের বিনাশের জন্য প্রেরণ করেন। যে সময় যাতুধানী ঋষিদিগের নিকট আগমন করে, সেই সময় হঠাৎ একজন স্থূলাঙ্গ সন্ন্যাসী একটী পীবরতনু কুক্কুর লইয়া ঋষিদিগের অভিমুখে আগমন করিতে থাকেন। ঋষিগণ দূর হইতে ঐ সন্ন্যাসী ও কুকুরটীকে দেখিয়া তাহা-দিগের স্থূলত্ব সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে সন্ন্যাসী তাঁহার কুকুরটী লইয়া ঋষিদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন ও যথানিয়মে তাঁহাদিগের প্রত্যেকের করস্পর্শ করেন—

> "অথ দৃষ্ট্বা পরিব্রাট্ স তানহর্ষীন্ শুনা সহ।
> অভিগম্য যথান্যায়ং পাণিস্পর্শমথাচরৎ॥"

মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব—৯৩।৭২

ভীষ্মদেব উঞ্ছবৃত্তি ব্রতের প্রশংসা করিতে করিতে যুধি-ষ্ঠিরকে একটী উপাখ্যান বলিয়াছিলেন। তাহাতে দেখি, নাগ বলিতেছেন—"একদা মধ্যাহ্নকালে দিবাকর কিরণজাল বিস্তার পূর্ব্বক লোকসকলকে সন্তপ্ত করিতেছেন, এমন সময় আদি-ত্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর এক পুরুষ আমাদিগের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলেন। ঐ পুরুষ তেজঃপ্রভাবে লোকসকলকে উদ্ভাসনপূর্ব্বক যেন গগনতল বিদীর্ণ করিয়াই সূর্য্যাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই পুরুষ উপস্থিত হইবামাত্র সূর্য্য তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত হস্তদ্বয় প্রসারিত করিলেন এবং তিনিও দিনকরের সম্মানরক্ষার্থ স্বীয় দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিলেন"—

"তস্মাভিগমনপ্রাপ্তো হস্তো দত্তো বিবস্বতা।
তেনাপি দক্ষিণো হস্তো দত্তঃ প্রত্যর্চিতার্থিনা"॥
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব—৩৬২।১৫

শ্রীমদ্ভাগবতেও অনেক স্থলে করস্পর্শের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ শেষ হইলে যুধিষ্ঠিরকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি গ্রহণ করতঃ দ্বারকায় প্রস্থান করেন। দ্বারকায় উপস্থিত হইবামাত্র বসুদেব, অক্রুর, উগ্রসেন প্রভৃতি ও অন্যান্য দ্বারকাবাসিগণ কৃষ্ণদর্শনলালসায় ব্যাকুল হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করিতে লাগিলেন। নট অভিনয়, নর্ত্তক নৃত্য, গায়ক মনোহর গান, পৌরাণিক পুরাণপাঠ, মাগধবংশকীর্ত্তন এবং বন্দিগণ পুণ্যযশা বসুদেবতনয়ের অদ্ভুত চরিত্র ও যশোগান করিতে লাগিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে পুরবাসী, বন্ধু ও অনুজীবীদিগকে আসিতে দেখিয়া সম্ভাষণপূর্ব্বক প্রত্যেকের যথোচিত সম্মাননা করিলেন। কাহাকেও মস্তক অবনতি পূর্ব্বক নমস্কার, কাহাকেও বা বাক্যদ্বারা বন্দনা, কাহাকেও আলিঙ্গনে, কাহারও করস্পর্শ, কাহারও প্রতি সহাস্য কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া অশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক চণ্ডাল অবধি পূজনীয় ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেরই যথাযোগ্য সম্মান রক্ষা করিলেন—

"ভগবাংস্তত্র বন্ধূনাং পৌরাণামনুবর্ত্তিনাম্।
যথাবিধ্যুপসঙ্গম্য সর্ব্বেষাং মানমাদধে॥
প্রহ্বাভিবাদনাশ্লেষ-করস্পর্শস্মিতেক্ষণৈঃ।
আশ্বাস্য চ শ্বপাকেভ্যো বরৈশ্চাভিমতৈর্বিভুঃ॥"
শ্রীমদ্ভাগবত – ১।১১।২২-২৩

আদিদেব ব্রহ্মা আপনার অবলম্বন-স্থান পদ্মে উপবেশন করিয়া সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত তপস্যায় নিরত হইলেন। ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মার তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বৈকুণ্ঠ নামক নিজধাম দেখান। বৈকুণ্ঠধাম ও ভগবানের রূপ দর্শন করিয়া ব্রহ্মার অন্তঃকরণ আনন্দে প্লাবিত হইল; তাঁহার অঙ্গে লোমাঞ্চ ও নয়নযুগল হইতে প্রেমাশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল এবং তিনি ভগবানের চরণকমলে নমস্কার করিলেন। ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মার উপর প্রসন্ন হইয়া তাঁহার করস্পর্শ করিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—

"তং প্রীয়মাণং সমুপস্থিতং কবিং
প্রজাবিসর্গে নিজশাসনার্হণম্।
বভাষ ঈষৎস্মিতরোচিষা গিরা
প্রিয়ঃ প্রিয়ং প্রীতমনাঃ করে স্পৃশন্"॥
শ্রীমদ্ভাগবত—২।৯।১৮

একদিন দেবর্ষি নারদ কংসের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন,"হে অসুররাজ, তুমি যাহাকে দেবকীর অষ্টমগর্ভজাতা কন্যা বলিয়া স্থির করিয়াছ, সে প্রকৃতপক্ষে যশোদার কন্যা। স্বরূপতঃ কৃষ্ণ দেবকীর ও বলরাম রোহিণীর তনয়। দেবকী ও বসুদেব তোমার ভয়ে ভীত হইয়া স্বকীয় মিত্র নন্দের নিকটে কৃষ্ণ ও বলরামকে গোপনে রক্ষা করিয়াছে, এই দুই ভ্রাতাই ব্রজে প্রেরিত তোমার চরদিগকে ধ্বংস করিতেছে।" নারদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কংস কৃষ্ণ ও বলরামকে হত্যা করিবার নিমিত্ত নানাবিধ বন্দোবস্ত করিলেন ও বালকদ্বয়কে নন্দগৃহ হইতে মথুরায় আনাইবার জন্য যদুশ্রেষ্ঠ অক্রুরকে আহ্বান করিয়া তাঁহার হস্ত গ্রহণ করতঃ সাগ্রহে তাঁহাকে ব্রজে গিয়া কৃষ্ণ ও বলরামকে সঙ্গে করিয়া মথুরায় আনিবার জন্য অনুরোধ করিলেন—

"ইত্যাজ্ঞাপ্যার্থতত্ত্বজ্ঞ আহূয় যদুপুঙ্গবম্।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিস্ততোঽক্রুরমুবাচ হ॥"
শ্রীমদ্ভাগবত—১০।৩৬।২৭

কংসকে বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ উগ্রসেনকে মথুরার রাজসিংহাসনে স্থাপন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা সাক্ষাৎ বৃহস্পতির শিষ্য,বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ উদ্ধব বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মান্য মন্ত্রী ছিলেন। শরণাগতের দুঃখহারী ভগবান্ কেশব একদিন একান্ত অনুরক্ত প্রিয়তম সেই উদ্ধবের হস্তে হস্ত স্থাপন করিয়া কহিলেন, "হে সৌম্য উদ্ধব, তুমি শীঘ্র ব্রজে গমন করিয়া আমাদিগের পিতামাতার আনন্দ উৎপাদন কর এবং আমার বিরহে গোপীদিগের যে মনস্তাপ জন্মিয়াছে, আমার সংবাদ দ্বারা তাহা নাশ করিয়া আইস"—

"বৃষ্ণীনাং প্রবরো মন্ত্রী কৃষ্ণস্য দয়িতঃ সখা।
শিষ্যো বৃহস্পতেঃ সাক্ষাদুদ্ধবো বুদ্ধিসত্তমঃ॥
তমাহ ভগবান্ প্রেষ্ঠং ভক্তমেকান্তিনং কচিৎ।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং প্রপন্নার্ত্তিহরো হরিঃ॥
গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্য পিত্রোর্নৌ প্রীতিমাবহ।
গোপীনাং মদ্বিয়োগাধিং মৎসন্দেশৈর্বিমোচয়॥"
শ্রীমদ্ভাগবত—১০।৪৬।১-৩

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণেও করগ্রহণের উল্লেখ পাওয়া যায়। বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রের নিকট ব্রহ্মার সঙ্কল্পপ্রভাবে স্বীয় জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে করিতে বলিতেছেন, "হে অনঘ, কমলযোনি ব্রহ্মা মনে মনে এইপ্রকার চিন্তা করিয়া সঙ্কল্পবলে

আমাকে সমুৎপাদিত করিলেন। আমি তৎকালে তদীয় অনির্ব্বচনীয় মায়াপ্রভাবে সমুৎপন্ন হইয়া জলতরঙ্গসমীপে জলতরঙ্গের ন্যায় সত্বর পিতৃসন্নিধানে সমুপস্থিত হইলাম। আমার হস্ত অক্ষমালা ও কমণ্ডলু দ্বারা মণ্ডিত ছিল। আমি তদবস্থায় উপস্থিত হইয়া কমণ্ডলুধারী অক্ষমালাবান্ ভগবান্ পিতৃদেব ব্রহ্মার পাদপদ্মপ্রান্তে বিনীতভাবে অভিবাদন করিলাম। তখন তিনি মৎকর্ত্তৃক অভিবাদিত হইয়া "এস পুত্র" এই মাত্র বলিয়া মদীয় হস্তগ্রহণপূর্ব্বক নির্ম্মল নীরদমণ্ডলে নিশাকরের ন্যায় আমাকে আপন আসন-পদ্মের উত্তর দলে উপবেশন করাইলেন—"

"এহি পুত্রেতি মামুক্ত্বা স স্বাব্জস্যোত্তরে দলে।
শুক্লাভ্র ইব শীতাংশুং যোজয়ামাস পাণিনা ॥"

যোগবাশিষ্ঠ, মুমুক্ষুপ্রকরণ—১০।২৭

মহর্ষি ভৃগু দেবপরিমিত সহস্র বৎসর পরে পরমাত্মার সাক্ষাৎকারক সমাধি হইতে বিরত হইলেন, কিন্তু তাঁহার বিনয়াবনত পুত্র শুক্রকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন না। তিনি দেখিলেন, তাঁহার সমক্ষে পুত্রের কঙ্কালমাত্র পড়িয়া রহিয়াছে। পুত্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে ভাবিয়া ভৃগু কালের প্রতি কুপিত হইলেন ও কালকে অভিশাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। কাল নিরাকৃতি হইলেও দেহ ধারণ করিয়া ভৃগুর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও তাঁহাকে বহু উপদেশ দিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, জীবমাত্রই স্বকীয় কর্ম্মবশেই জন্মগ্রহণ করে ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, ইহাতে কালের কোনও কর্তৃত্ব নাই। তিনি আরও বলিলেন, মহর্ষি ভৃগুর সমাধিকালমধ্যে শুক্র বহু জন্ম গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমানে বিপ্রকুমার বাসুদেব নামে পরিচিত ও সমঙ্গা নদীতীরে তপস্যায় নিরত আছেন। কালের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভৃগু প্রকৃতিস্থ হইলেন ও ধ্যানমগ্ন হইয়া জ্ঞাননেত্রে পুত্রের পূর্ব্বাপর অবস্থা প্রত্যক্ষ করিলেন এবং কালের প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ করিলেন। কালও সহাস্যমুখে স্বীয় করদ্বারা ভৃগুর কর ধারণ করিলেন—

"ইত্যুক্তা ভগবান্ কালো হসন্নিব জগন্মতিম্।
হস্তাভ্যস্তেন জগ্রাহ ভৃগুমিন্দুমিবাংশুমান্ ॥"

যোগবাশিষ্ঠ, স্থিতিপ্রকরণ—১৩।১৭

মনে হয় যেন কাল 'ফরগিভ্ অ্যাণ্ড ফরগেট' (forgive and forget) বলিয়া ভৃগুর সহিত হ্যাণ্ডশেক (hand-shake) করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ একদিন ইন্দ্রসভায় শাতাতপ নামে এক মুনির নিকট চিরজীবী ভুশুণ্ডের পরিচয় পান। বশিষ্ঠ ভুশুণ্ডকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় আকাশ-পথে সুমেরু গিরিতে গমন করেন ও ভুশুণ্ডের আবাস কল্পবৃক্ষ সমীপে উপস্থিত হন। ভুশুণ্ড কি উপায়ে এইরূপ দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছেন প্রশ্ন করায় তিনি মহর্ষিকে প্রাণনিরোধ যোগের বিষয় আদ্যোপান্ত বর্ণনা করেন। মহর্ষি প্রীত হইয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে ভুশুণ্ড ভক্তির সহিত অর্ঘ্য, পাদ্য ও পুষ্পপ্রদান পূর্ব্বক মহর্ষির অর্চ্চনা করিলেন ও আকাশ-পথে মহর্ষির অনুগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহর্ষি ভুশুণ্ডের হস্তগ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে অনুগমন হইতে নিরস্ত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ করতঃ আকাশমার্গে অদৃশ্য হইয়া গেলেন—

"যোঽস্মি যোজনমাত্রস্থ মদনুব্রজায়াগতঃ।
করং করেণাশ্লিষ্যভ্য বলাৎ সংরোধিতঃ খগঃ ॥
ময়ি যাতে ক্ষণেনৈব গগনাধ্বন্যদৃশ্যতাম্।
নিবৃত্তোঽসৌ বিহঙ্গেন্দ্রো দুষ্প্রাপ্যা সঙ্গতিঃ সতাম্ ॥"

যোগবাশিষ্ঠ, নির্ব্বাণপ্রকরণ, পূর্ব্বভাগ—২৭।১৪-১৫

এখানে একটী অবান্তর প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, ভুশুণ্ড ত কাকবিশেষ, তাঁহার হাত হইল কেমন করিয়া। ভুশুণ্ড আত্মজ্ঞানী মহাযোগী ছিলেন। তিনি স্বকীয় সত্য সঙ্কল্প-প্রভাবেই বশিষ্ঠের সহিত প্রথম দর্শনকালে মানবের ন্যায় হস্ত সৃষ্টি করিয়া সেই হস্তে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া বশিষ্ঠ দেবকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন এবং বিদায়কালেও বশিষ্ঠ ভুশুণ্ডের সেই হস্তই গ্রহণ করিয়াছিলেন—

"সঙ্কল্পমাত্রজাতাভ্যাং করাভ্যাং কুসুমাঞ্জলিম্।
স মমাশু তদেবাদাদম্ভোদো হৈমমিবোৎকরম্ ॥"

যোগবাশিষ্ঠ, নির্ব্বাণপ্রকরণ, পূর্ব্বভাগ—১৬।১৫

এই বিষয়ে আর অধিক লেখা বা প্রমাণ প্রয়োগ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করি। প্রাচীন গ্রন্থাদি পাঠ করিলেই দেখা যায় হ্যাণ্ডশেক (hand-shake) ব্যাপারটা পুরাকাল হইতেই আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, উহাকে বৈদেশিক বলিয়া ঘৃণা করিবার কোনও কারণ নাই; বরং নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে উহা 'খাঁটি স্বদেশী'।

বিপত্তি

—শ্রীপুষ্পরাণী ঘোষ

ছোট দোকানটাতে লাভ হয় না। একটু একটু করে ব্যাপারটা উইনস্লোর বোধগম্য হ'ল। ভেবে চিন্তে, ঠিকঠাক করে অঙ্ক কষে দেখবার মত মাথা উইনস্লোর কোনদিনই ছিল না। হঠাৎ কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতেও সে পারত না। কিন্তু যখন ক্রমে ক্রমে একটু একটু করে ব্যাপারটা সে বুঝতে পারল, তখন তার মনে হল, সে যেন বরাবর এই কথাই ভেবে আসছে। অনেকগুলো ঘটনা একে একে তার মানসপটে উদিত হতে লাগল, যার ফলে তার এই বর্ত্তমান সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর রইল না। তার দোকানের জিনিসপত্র, সার্ট-কোট প্রভৃতির ছিট ও অন্যান্য কাপড়-চোপড় সব যেমনকার, তেমনি পড়ে আছে,—বিক্রী হবার এমন কোনই সম্ভাবনা নেই, কারণ অন্য কয়েকজন দোকানদার সেই সব জিনিস অনেক কম দামে বিক্রী করছে। তা করুক—কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তারা ছাড়া অন্য দোকানদারদেরও যে বেঁচে থাকতে হবে, একথাটা তাদের মাথায় আসে না।

তার পর গৃহস্থ-বাড়ীর চাকর-বাকরদের জন্য যে সব তৈরী জিনিষের কতকটা কাটতি ছিল, সেগুলোও একদম ফুরিয়ে গেছে। কিছু না আনলে আর মোটেই চলছে না—কিন্তু এই জিনিষ আনবার কথা মনে হতেই তার মনে পড়ে গেল, "হেটুলার হেটলার এ্যাণ্ড গ্র্যাব কোম্পানী"র কথা—যাদের কাছ থেকে সে পাইকারী দরে জিনিষপত্র কেনে। তাদের পাওনাগণ্ডা মেটান যায় কি করে?

তাকের ওপর সাজানো একটা সবুজ রংয়ের খোলা বাক্সের সামনে দাঁড়িয়ে উইনস্লো এই সব কথা ভাবছিল। তার মুখ চোখ অত্যন্ত মলিন, বিবর্ণ; অত্যন্ত বিমনা ভাবে অর্থহীন দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে, সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এমন সময়, দোকানঘর ও শোবার ঘরের মাঝের সাদা খড়খড়ি দেওয়া ও কাঁচবসান জানলাওয়ালা দরজাটা খুলে মিসেস উইনস্লো ঘরে ঢুকে বলল, "এস, চা হয়ে গেছে।"

"যাচ্ছি, একটু অপেক্ষা কর" এই বলে উইনস্লো ডেস্কটা খুলতে আরম্ভ করল।

ইত্যবসরে একজন তিরিক্ষে মেজাজের বুড়োলোক, একটা প্রকাণ্ড ফারকোট গায়ে দিয়ে, মুখচোখ লাল করে, হন্তদন্ত হয়ে এসে দোকানঘরে ঢুকলেন। মিসেস উইনস্লো ভিতরে চলে গেল। বুড়ো লোকটি এসেই বললেন, "দাও হে দাও, পকেটে রাখবার রুমাল দাও—কই—বের কর।"

"এই যে," উইনস্লো বলল, "কি রকম দামের চান?"

"দাও, দাও, পকেটে রাখবার রুমাল হে—তাড়াতাড়ি দাও।"

উইনস্লো অত্যন্ত ব্যস্ত ও উত্তেজিত হয়ে তাড়াতাড়ি ছুটো বাক্স বের করে বলল, "এই যে মশাই, নিন না।"

রুমালের খস্‌খসে কাপড়টা দুই হাত দিয়ে ঘসতে ঘসতে বুড়ো লোকটি চেঁচিয়ে উঠলেন, "আরে মুস্কিল—আমি রুমাল দিয়ে নাক ঝাড়ব আর ঘাম মুছব হে—তাকে সাজিয়ে রাখব না—বুঝলে?"

"ওঃ, আপনি সুতির জিনিষ চান—এই যে নিন।"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ—হয়েছে—দাম কত?"

"সাত পেন্স—আর কিছু চাই না? টাই কি ব্রেস কি অন্য কিছু...... "

"না, বাপু না", এই বলে ভদ্রলোকটি জামার পকেট হাতড়ে হাতড়ে একটা হাফক্রাউন বের করে উইনস্লোর হাতে দিলেন।

উইনস্লো তার ক্যাসমেমোর বইটা খুঁজতে লাগল, কোন সময়েই সেটাকে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট জায়গাতে রাখা হত না, যখন যেখানে সুবিধা হত, তখন সেখানেই ফেলে রাখত। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ বুড়োলোকটির দিকে উইনস্লোর চোখ পড়ে গেল— তখন সে আর দ্বিধামাত্র না করে, দোকানঘরের সমস্ত নিয়ম ও শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সোজা ডেস্কের কাছে গিয়ে ভাঙানি পয়সা নিয়ে এল।

সাধারণতঃ কোন খরিদ্দার এলেই উইনস্লো একটু আধটু উত্তেজিত হয়ে উঠত—কিন্তু আজ খোলা ডেস্কটার দিকে তাকাতেই তার আবার সেই আসন্ন বিপদের কথা মনে পড়ে গেল। সেইখানে, সেই খোলা ডেস্কের সামনেই, সে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল। জানালার কাচের উপর আঙুল দিয়ে টোকা মারবার একটা মৃদু শব্দ শুনে সে খড়খড়ির মধ্য দিয়ে দেখল, মিনি দাঁড়িয়ে আছে। সে আস্তে আস্তে ডেস্কটা বন্ধ করে চা-পান করবার জন্যে ভিতরে চলে গেল।

কিন্তু তার মনে তখন অনেক ভাবনা ভিড় করে ছিল। আর মোটে তিন সপ্তাহ একটি দিন বাকী। সে খুব বড় বড় গ্রাসে রুটি ও মাখন খেতে লাগল ও কঠোর দৃষ্টিতে জ্যামের পাত্রটীর দিকে চেয়ে রইল। অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে সে মিনির কথাবার্ত্তার উত্তর দিতে লাগল। তার মনে হচ্ছিল, সে যেন উত্তম পালিশ-করা টেবিলের উপরে "হেটলার স্কেটলার এ্যাণ্ড গ্রাব কোম্পানী"র ছায়া দেখতে পাচ্ছে। ব্যবসায়ক্ষেত্রে সে যে সফল হয় নি, এই প্রথম সেই কথাটা বুঝবার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে চিন্তার বিভিন্ন প্রকার ঘাতপ্রতিঘাত লাগছিল। কিছুদিন ধরে একটা অস্বাচ্ছন্দ্য তাকে পীড়ন করছিল সেইটাই যেন আজ রূপ ও আকার ধারণ করে এই ব্যর্থতার মূর্ত্তিতে এসে দেখা দিল। বর্ত্তমানে আর কোন সংশয় নেই—এটা অত্যন্ত স্থূল ও সহজ সত্য যে, ব্যাঙ্কে মোটে উনচল্লিশটি পাউণ্ড মাত্র আছে এবং আজ থেকে ঠিক তিন সপ্তাহ পরে নব্য যুবকদের পরিচ্ছদ-প্রস্তুতকারী সেই বিখ্যাত "হেটলার স্কেটলার এ্যাণ্ড গ্রাব কোম্পানী" তার কাছ থেকে আশী পাউণ্ড দাবী করবে।

দু' একজন খরিদ্দার এল, কেউ কিছু মসলিন, কেউ খানিক ফিতে, কেউ বা একজোড়া মোজা, এমনি সব অল্প-স্বল্প জিনিষ তারা কিনল। ক্রমে বেলা বাড়তে লাগল—গোধূলির আলোর সঙ্গে সঙ্গে "চিন্তা নাম গরীয়সী" তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। সে তার দোকানঘরের মধ্যে বেশ ভাল করে আস্তানা গাড়বার চেষ্টা করছে, সে কথাটা বুঝতে পেরে উইনস্লো খুব সকাল সকাল তার দোকানঘরের তিনটে আলোই জেলে দিল ও খুব উৎসাহের সঙ্গে দোকানে জামাকাপড়ের যত ছিট ছিল, সব নামিয়ে নিয়ে খুলে খুলে আবার নতুন করে ভাঁজ করতে লাগল। হাত-পা নেড়ে

একটু শারীরিক পরিশ্রম করবার ও　　উইনস্লো নাটকীয়
সর্ব্বপ্রকার জটিলতা দূর করবার এ　　হয়েছে? শুনতে
আর কোন উপায় তার মাথায়　　প্রাণপণ চেষ্টার
পুরাণ পোষাক সেলাই করছিল,　　জান? যদি আজ
ছায়া পড়েছিল--উইনস্লো দেখ　　র স্কেটলার এ্যাণ্ড গ্রাব
ভোজনের পর উইনস্লো একটু　　রি, আমাদের যথাসর্ব্বস্ব
থেকে বের হল। সে ওয়াই. এম.　　য়ে যাবে--বুঝলে মিনি,
একটু গল্পগুজব করতে পারে,
পেল না। তখনি বাড়ী ফিরে　　করল; কিন্তু উইনস্লো তার
শুয়ে পড়েছিল। শুয়েও বি　　র দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে
সেখানেও "গরীয়সী চিন্তা"　　ন হল তার দুঃখের অন্ততঃ
ফলে তাকে মাঝরাত পর্য্যন্ত　　।
পড়ে থাকতে হল।　　পরিষ্কার বাক্সগুলোকে পেড়ে

কিছু দিন হতে মা　　করল এবং সজ্জিত জিনিষগুলো
কবলিত অবস্থায় কাট　　াগল। সে অত্যন্ত মানসিক
শোচনীয় অবস্থা আ　　তার মনে হচ্ছিল, সে যেন নিষ্ঠুর
মনে পড়ল--"হেটল　　টি ক্রীড়নক মাত্র।
পাওনা আশী পা　　রিশ্রম না করে অলসতায় মগ্ন থাকবার
মোটে ১৭০ পাউ　　হতে পারে নি, এ অপবাদ অন্ততঃ কেউ
বলতে হবে।　　। সে কতদিন ধরে কত কি ভেবে রেখে-
শিবির সন্নিবেশ　　সংগ্রহ করে এনেছিল—আর কি রকমভাবে
বিপদ থেকে　　হল—শেষ কালে তার কি না এই পরিণাম?
অন্বেষণে　　ের সন্দেহের উদ্ভব হল, দৈব আর "ব্যাণ্ডারস্ন্যাচ
হাঁতড়াতে　　। বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই লড়াই করা যায় না। হঠাৎ
করে দেয়　　ল, এও ত হতে পারে যে, ঈশ্বর তাকে পরীক্ষা
লাগল　　ে এই কথা মনে হতেই তার মনে একটা নতুন
আশ্চর্য্যর　　রথাপাত হল, একটু আশার সঞ্চার হল। তার
দামে　　ি সত্য ও ন্যায়ের জন্য যে সব লোক সর্ব্বপ্রকার দুঃখকষ্ট
কথা　　েন, সেও তাদের মত দৈবের হাতে নিপীড়ন ভোগ
ন্যাচ　　ি মাত্র। সারা সকাল তার মনে এই ভাবেরই বন্যা
তারা লাগল।

সঙ্গে ডিনারের সময় খেতে খেতে হঠাৎ মিনির দিকে তাকিয়ে তা　　স্লো দেখল যে, সে একদৃষ্টে তার দিকেই চেয়ে আছে। মনে　　ক কেমন যেন বিবর্ণ দেখাচ্ছিল—তার চোখের কোণটাও পা　　টা য়ে উঠেছিল। উইনস্লোর মনে হল, কি যেন খানিকটা।

ন কি জিনিষ তার আছে? থাকবার মধ্যে কতকগুলো হলদে ও কালো রংয়ের কাপড়, খানিকটা ছিট—যা কেউ পছন্দ করে না, ...র কাপড়-বাজে দরজীর তৈরী কতক- -এই সব বাজে জিনিষ। আর এই না যাচ্ছিল "ব্যাণ্ডারস্ন্যাচ লিমিটেড", ও গ্র্যাব"—এক কথায় সমস্ত নির্দ্দয় ...া করতে? তার মাথা কি খারাপ ...পেরেছিল কোন লোকে এসব ...ই বা অন্য সব ভাল ভাল জিনিষ ...যছিল কিসের জন্য? "হেটলার ...নিক বস্ত্রবিক্রেতার প্রতি তার সঞ্চার হল। ...নি উপস্থিত হল। টাকাকড়ি ...নেকগুলো টাকা খরচ করে ...ন? আর আলোগুলো? ...র হঠাৎ প্রায় শারীরিক মনে পড়ল বাড়ী- ...টা চীৎকার করে ...ছা আবছা অন্ধ- ...চ্ছে—সেইদিকে ...র গেল। সে ...ঃ মিনির এক ...ার দুশ্চিন্তায় ...ুর মত বেশ ...টাবার পর তিক্ততার রস ভাবে ...নর দিকে যে, এই উপস্থিত ...শেষ। ...চন্তে, বোধ তুলে

বিপত্তি

ছোট দোকানটা ব্যাপারটা উইনগ্লোর বো... করে অঙ্ক কষে দেখবা... ছিল না। হঠাৎ কোন ... না। কিন্তু যখন ক্রমে ক্র... সে বুঝতে পারল, তখন তা... কথাই ভেবে আসছে। অনে... মানসপটে উদিত হতে লাগল ... সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ছাড়া অ... দোকানের জিনিসপত্র, সার্ট-কোট কাপড়-চোপড় সব যেমনকার, তে... হবার এখন কোনই সম্ভাবনা নেই, দোকানদার সেই সব জিনিস অনেক কম ... করুক—কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই ... দোকানদারদেরও যে বেঁচে থাকতে হবে ... মাথায় আসে না।

তার পর গৃহস্থ-বাড়ীর চাকর-বাকরদের জন্য ... জিনিষের কতকটা কাটতি ছিল, সেগুলোও ... গেছে। কিছু না আনলে আর মোটেই চলবে ... এই জিনিষ আনবার কথা মনে হতেই তার মনে ... "হেটলার হেটলার এ্যাণ্ড গ্র্যাব কোম্পানী"র ক... কাছ থেকে সে পাইকারী দরে জিনিষপত্র কেনে। পাওনাগণ্ডা মেটান যায় কি করে?

তাকের ওপর সাজানো একটা সবুজ রংয়ের খোল ... সামনে দাঁড়িয়ে উইনগ্লো এই সব কথা ভাবছিল। ত... চোখ অত্যন্ত মলিন, বিবর্ণ; অত্যন্ত বিমনা ভাবে ... দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে, সে চুপ করে দাঁড়িয়ে র... এমন সময়, দোকানঘর ও শোবার ঘরের মাঝের সাদা খ... দেওয়া ও কাঁচবসান জানলাওয়ালা দরজাটা খুলে ... উইনগ্লো ঘরে ঢুকে বলল, "এস, চা হয়ে গেছে।"

দিয়ে বলে যে, তাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে—তারা সর্ব্বস্বান্ত হতে বসেছে, তাকে আবার তার মামার কাছে ফিরে যেতে হবে। মিনির মামা আবার উইনগ্লোকে কোনকালেই দুচক্ষু দিয়ে দেখতে পারেন না। নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উইনগ্লোর মনে তখনও কোন স্থিরতা ছিল না। কোন দোকানের সহকারী যদি নিজেই দোকান খুলে বসে তো তার পক্ষে পরে কোন দোকানে আবার কাজ পাওয়া নেহাৎ সোজা নয়।

উইনগ্লো কল্পনা করতে লাগল সে যেন আবার এখানে, ওখানে, এ রাস্তা, সে রাস্তায়—সব জায়গায়, পাইকারী বিক্রীর দোকানে দোকানে কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছে ও ক্রমাগত বসে বসে অসংখ্য আবেদনপত্র লিখছে। "মহাশয় অমুক খবরের কাগজে আপনাদের বিজ্ঞাপন দেখিয়া..." এই রকম চিঠি লিখতে যে তার কি বিতৃষ্ণাই আসে! যতই সে ভাবতে লাগল, ততই তার মন অস্বাচ্ছন্দ্য ও গভীর হতাশায় ভরে উঠতে লাগল।

বিছানা ছেড়ে উইনগ্লো উঠে দাঁড়াল ও হাই তুলতে তুলতে পোষাক পরল, তার পর দোকানঘর খুলতে চলে গেল। দিনের কাজ আরম্ভ করবার আগেই সে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করছিল।

খড়খড়িগুলো খুলতে খুলতে সে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করতে লাগল—যে এত ভেবে ভেবে কি লাভ হচ্ছে—সে ভাবুক আর না ভাবুক, যা হবার তাতো হবেই।—জানালার মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল সূর্য্যালোক ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছিল। সেই আলোতে দেখা গেল, ঘরের মেঝেটা কিরকম পুরাণ, খসখসে আর চটা-ওঠা; পুরাণ দোকান থেকে কেনা টাকা-কড়ি বাজিয়ে নেবার প্রস্তরখণ্ডটা কি জঘন্য! এক কথায় নির্ভর করে আঁকড়ে ধরবার মত কোন কিছুই নেই—সমস্ত ব্যাপারটাই যেন আগাগোড়া একটা নিরর্থক বোকামি মাত্র। গত ছয় মাস ধরে সে ভাবছিল যে, সে একটী সুন্দর সুসজ্জিত দোকান খুলবে—দোকান থেকে বেশ লাভ হবে, আর সে ও মিনি বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবে। কিন্তু নিষ্ঠুর বাস্তব সহসা তার সে সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে দিল। যে বুরুনীটী দিয়ে উইনগ্লোর কালো রংয়ের সুদৃশ্য ও শোভন কোটটা আটকানো থাকত—সেইটে অল্প একটু আলগা হয়ে গিয়েছিল, সেটা এখন হঠাৎ দোকানের দরজায় বেঁধে ছিঁড়ে গেল—

এতেই হঠাৎ তার ভীষণ রাগ হয়ে গেল। সে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাগে ফুলতে লাগল—তার পর আক্রোশভরে বুনুনীটাকে জোরে টেনে আরও আলগা করে দিল ও সেইটা নিয়ে মিনির কাছে গিয়ে অত্যন্ত বিরক্তি-পূর্ণ স্বরে বলল, "এই দেখ কি হয়েছে? জিনিষপত্রগুলোর দিকে একটু একটু নজর রাখলেও তো পার।"

মিনি বলল, "ওটা যে ছিঁড়ে গেছে আমি ত দেখি নি।"

মিনির প্রতি অত্যন্ত অবিচার করে, একান্ত অন্যায়ভাবে উইনস্লো বলল, "যখন জিনিসপত্রগুলো একেবারে নষ্ট হয়ে যায়—করবার আর কিছু থাকে না—তার আগে তুমি কোন দিন কিছু দেখ না।"

মিনি তার মুখের দিকে তাকিয়ে খানিক ক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তার পর আস্তে আস্তে বলল, "তুমি যদি চাও ত বল—আমি এখনই সেলাই করে দিচ্ছি।"

"না না—চল আগে ব্রেকফাষ্ট খেয়ে নেওয়া যাক্—আর এবার থেকে যখনকার যা তখন তা-ই করতে শেখ।"

খাবার সময়ও উইনস্লোকে খুব চিন্তান্বিত দেখাচ্ছিল—মিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে তাকে লক্ষ্য করছিল, সে চুপচাপ খেয়ে যেতে লাগল—কোন কথাবার্ত্তা বলল না—একবার খালি বলল যে, ডিমটা খারাপ। আসলে কিন্তু তা নয়, ডিমটা বেশ ভালই ছিল—বেশ সুস্বাদু ডিন, শিলিংয়ে পনরটা করে। উইনস্লো ডিমটা সরিয়ে দিল, কিন্তু এক শ্লাইস মাত্র রুটি-মাখন খেয়ে নিজেই নিজের ভুল প্রমাণ করে অন্যমনস্কভাবে আবার ডিমটা নিয়ে খেতে লাগল। খাওয়া শেষ হলে সে যখন দোকানে ফিরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল, মিনি বলল, "সিড, তোমার শরীরটা কি ভাল নেই?"

"না আমি খুবই ভাল আছি" এই বলে সে মিনির দিকে এমন করে তাকাল, যেন সে মিনিকে সত্যসত্যই ঘৃণা করে।

"তা হলে আর কিছু হয়েছে বল—কোটের বুনুনীটা ছিঁড়ে যাওয়ার জন্য তুমি নিশ্চয়ই আমার ওপর রাগ কর নি, তা-ই না? কি হয়েছে বল—আমায় বলবে না? কাল চা খাবার সময়ও তোমাকে এই রকম দেখেছিলাম—রাত্রে খাবার সময়েও—তখন ত আর বুনুনীটার জন্য কিছু হয় নি—"

"হ্যাঁ—আমি এখন থেকে এই রকমই থাকব।"

মিনি কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "বল কি হয়েছে?"

না—এমন সুযোগ নষ্ট করা উচিত নয়, উইনস্লো নাটকীয় ভঙ্গীতে দুঃসংবাদটা প্রকাশ করল, "কি হয়েছে? শুনতে চাও?…শোন তবে—আমি আমার প্রাণপণ চেষ্টার কোন ত্রুটি করি নি, কিন্তু ফল কি হয়েছে জান? যদি আজ থেকে তিন সপ্তাহ পরে আমি "হেটলার স্কেটলার এ্যাণ্ড গ্রাব কোম্পানী"কে ৮০ পাউণ্ড না দিতে পারি, আমাদের যথাসর্ব্বস্ব বিক্রী হয়ে যাবে—সব কিছু বিক্রী হয়ে যাবে—বুঝলে মিনি, সমস্ত বিক্রী হয়ে যাবে।"

"সিড"—মিনি বলতে আরম্ভ করল; কিন্তু উইনস্লো তার কথা শেষ না হতেই ঝনাৎ করে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বাইরে চলে গেল। তার মনে হল তার দুঃখের অন্ততঃ অর্দ্ধেকটা ভার যেন কমে গেছে।

বাইরে গিয়ে উইনস্লো পরিষ্কার বাক্সগুলোকে পেড়ে আবার ঝাড়তে আরম্ভ করল এবং সজ্জিত জিনিষগুলো নতুন করে সাজাতে লাগল। সে অত্যন্ত মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছিল। তার মনে হচ্ছিল, সে যেন নিষ্ঠুর অদৃষ্টের হাতে ক্ষুদ্র একটি ক্রীড়নক মাত্র।

যাই হোক—পরিশ্রম না করে অলসতায় মগ্ন থাকবার জন্যই যে সে সফল হতে পারে নি, এ অপবাদ অন্ততঃ কেউ দিতে পারবে না। সে কতদিন ধরে কত কি ভেবে রেখেছিল—কত কিছু সংগ্রহ করে এনেছিল—আর কি রকমভাবে পরিশ্রম করছিল—শেষ কালে তার কি না এই পরিণাম! তার মনে ঘোর সন্দেহের উদ্ভব হল, দৈব আর "ব্যাণ্ডারম্যান লিমিটেডে"র বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই লড়াই করা যায় না। হঠাৎ তার মনে হল, এও ত হতে পারে যে, ঈশ্বর তাকে পরীক্ষা করছেন? এই কথা মনে হতেই তার মনে একটা নতুন আলোর রেখাপাত হল, একটু আশার সঞ্চার হল। তার মনে হল, সত্য ও ন্যায়ের জন্য যে সব লোক সর্ব্বপ্রকার দুঃখকষ্ট সহ্য করে, সেও তাদের মত দৈবের হাতে নিপীড়ন ভোগ করছে মাত্র। সারা সকাল তার মনে এই ভাবেরই বন্যা হইতে লাগল।

ডিনারের সময় খেতে খেতে হঠাৎ মিনির দিকে তাকিয়ে উইনস্লো দেখল যে, সে একদৃষ্টে তার দিকেই চেয়ে আছে। মিনিকে কেমন যেন বিবর্ণ দেখাচ্ছিল—তার চোখের কোণটাও লাল হয়ে উঠেছিল। উইনস্লোর মনে হল, কি যেন খানিকটা

এসে তার কণ্ঠ রোধ করে দিচ্ছে। তার সমস্ত চিন্তাধারা এক মুহূর্ত্তের মধ্যে গতি পরিবর্ত্তন করে অন্য পথে ধাবিত হল। খাবারের থালাটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সে খানিকক্ষণ অর্থহীন দৃষ্টিতে মিনির দিকে তাকিয়ে রইল, তার পর উঠে এসে টেবিলের ধারে মিনির পাশে দাঁড়াল—মিনি তখনও তার পানে চেয়েছিল। কোন কথা না বলে সে হাঁটু গেড়ে মিনির পাশে বসে পড়ল, তার পর একবার মাত্র আস্তে আস্তে "মিনি" বলে ডাকল; মিনি বুঝতে পারল, আর তাদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। উইন্‌শ্লো হঠাৎ কাঁদতে আরম্ভ করে দিল, মিনি নিঃশব্দে তার কাঁধের উপর নিজের হাত দুটো রাখল।

মিনির কাঁধের উপর মাথা রেখে উইন্‌শ্লো ছেলেমানুষের মত কাঁদতে লাগল ও আক্ষেপ করতে লাগল। বলল যে মিনিকে বিয়ে করে শেষ পর্য্যন্ত এই রকম অবস্থায় নিয়ে আসা তার অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে, সে কোন কাজের লোক নয়, এক কানাকড়ি পয়সাও সে ঠিকমত খরচ করতে জানে না, যা কিছু ঘটেছে, সে সবই তার দোষ, কিন্তু সে কত কি আশা করেছিল—ইত্যাদি ইত্যাদি। মিনিও নীরবে কাঁদতে কাঁদতে উইন্‌শ্লোর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল ও তাকে চুপ করতে বলছিল। এমনি করে ক্রমশঃ সে তাকে শান্ত করে তুলল। এর মধ্যে হঠাৎ দোকানঘরের ঘণ্টা বেজে উঠল ও উইন্‌শ্লোকে এক লাফ দিয়ে উঠে কাজে যেতে হল।

এই ঘটনার পর প্রাতরাশের সময়, নৈশ ভোজনের সময়, শয়নকক্ষে যখনই তারা একটু অবসর পাচ্ছিল, তখনই অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে ও বিরস বদনে সামনের টেবিলের দিকে তাকিয়ে এই কথারই আলোচনা করছিল। যদিও কেউ কারুর দিকে তাকাচ্ছিল না তবুও দু'জনেই মনে মনে খানিকটা শান্তি পাচ্ছিল। এই সব আলোচনার সময় উইন্‌শ্লোর প্রধান কথা ছিল, "কি যে করব কি জানি, কিছুই ভেবে পাচ্ছি না, কি যে হবে শেষ পর্য্যন্ত," মিনি কিন্তু অত হতাশ হয়ে পড়ত না। সে সব সময়ই সব জিনিষের ভালদিক্‌টাই দেখত। তার মামা হয়ত তাদের এই দুঃসময়ে কিছু সাহায্য করতে পারেন—সব সময় অত ভাবিত হলে ত আর চলে না, তা ছাড়া মিনির স্বভাবই এমনি ছিল যে, সে সব সময়েই ভাবত যে "হয়ত এর মধ্যে একটা কিছু হতেও পারে।"

আশা করবার মত একটা বিষয় এই ছিল যে, দোকানে যদি হঠাৎ খদ্দেরের ভিড় খুব বেড়ে যায়! মিনি বলল, "তা হলে হয়ত তুমি ৫০ পাউণ্ড জোগাড় করতে পারবে আর তারা তোমাকে এতদিন ধরে জানে—বাকী টাকাটার জন্য কি আর বিশ্বাস করে কিছুদিন অপেক্ষা করতে রাজী হবে না?"

এই নিয়ে তারা খানিক ক্ষণ আলোচনা করল—এক একবার মনে হল যে, "হেটলার স্কেটলার এ্যাণ্ড গ্র্যাব কোম্পানী"র পক্ষে আর কিছুদিনের জন্য সময় দিতে রাজী হওয়া খুবই সম্ভব—তখন তারা কত টাকা ধার দিতে রাজী হতে পারে, এই কথা নিয়ে আলোচনা চলতে লাগল। এই বিপত্তিটা আবিষ্কার করবার দুদিন পরে চা পান করবার সময় এই সব আলোচনা করার ফলে প্রায় আধঘণ্টাটাক ধরে তারা বেশ সানন্দচিত্তে কাটাল—এমন কি তারা যে অত বেশী ভয় পেয়েছিল, এই মনে করে খুব খানিকটা হাসল। কিন্তু হঠাৎ এক সময় আবার "হেটলার স্কেটলার এ্যাণ্ড গ্র্যাব" যে ধার দিতে রাজী হবে, এ কথাটা একান্ত অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব মনে হতে লাগল এবং উইনশ্লো আবার চিন্তার গভীর কূপে নিমগ্ন হয়ে গেল। উইনশ্লো আসবাবপত্রগুলির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল, সেগুলো বিক্রী করলে কত পাওয়া যেতে পারে;—কাপড়-চোপড় সাজিয়ে রাখবার আলমারীটা মোটের উপর মন্দ নয়, আর মিনির মার দেওয়া প্লেটগুলোও অবশ্য আছে। বিপদ্ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য সে উন্মত্তের মত অসম্ভব অসম্ভব উপায়ের কল্পনা করতে লাগল। তার মনে পড়ল, সে যেন কোথায় বিক্রয়পত্রের কথা শুনেছিল—ঐ ভাবটা তার কাণে সত্যকার আশার বাণী শোনাতে লাগল। তা' ছাড়া সে মহাজনদের কাছ থেকেও ত টাকা ধার নিতে পারে!

বৃহস্পতিবার বিকালে তবু একটা শুভ লক্ষণ দেখা গেল। একটি ছোট মেয়ে এক টুক্‌রা ছিটের নমুনা নিয়ে এল—আর সুখের বিষয় এই যে, উইনশ্লোর ঠিক সেই রকমের ছিট ছিল। এর আগে সে কখনও তার ক্ষুদ্র পুঁজি থেকে নমুনা মিলিয়ে কোন ছিট কাউকে বিক্রী করতে সমর্থ হয় নি। বাড়ীর ভিতর গিয়ে কথাটা সে মিনিকে জানিয়ে এল। ব্যাপারটার এই জন্য উল্লেখ করা হল যে, না হলে হয়ত পাঠক মনে করতে

পারেন যে, উইনস্লোর মনে একেবারেই পরিপূর্ণ হতাশা বিরাজ করছিল।

বিপত্তিটা আবিষ্কার করবার পর দু'দিন ধরে উইনস্লো দেরী করে দোকান খুলছিল। তার যখন আর কোন আশা ভরসাই নেই এবং তাকে যখন প্রায় সারারাতই জেগে থাকতে হয়, তখন আর রোজ রোজ নিয়মমত ঠিক সময় উঠে লাভ কি? কিন্তু শুক্রবার দিন সকালে উঠে সে যেই অন্ধকার দোকানঘরটাতে ঢুকল, দেখতে পেল যে কোণের দিকে একটা কি যেন পড়ে রয়েছে। দরজাটা ঠিকমত না বসানর জন্য তার পাশে যে ফাঁক ছিল, সেই ফাঁকের মধ্য দিয়ে এক টুক্‌রা আলো এসে ঘরের কোণে পড়ছিল—সেই আলোতে দেখা গেল চৌকো কি একটা কালোমত জিনিষ পড়ে রয়েছে। নীচু হয়ে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে উইনস্লো দেখতে পেল যে সেটা মোটা কৃষ্ণরেখাঙ্কিত একটা শোক-প্রকাশক পত্র—তার স্ত্রীর নামে। বোঝাই যাচ্ছে, মিনির আত্মীয়দের মধ্যে কেউ মারা গেছেন, খুব সম্ভব তার মামা। উইনস্লো মিনির মামাকে খুব ভাল করেই জানত—তাঁর কাছ থেকে কিছু আশাও সে করে নি। উপরন্তু তার মনে পড়ল যে শোকপ্রকাশের জন্য উপযুক্ত পরিচ্ছদ চাই এবং অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময় উপস্থিত থাকা চাই। মানুষের মৃত্যুটাও যেন একটা নিষ্ঠুর অত্যাচারবিশেষ। উইনস্লোর চিন্তাধারা সব সময়েই তার চোখের সামনে ছবির মত ভেসে উঠত—সে দেখতে পেল কালো ট্রাউজার চাই, কালো ক্রেপ, কালো দস্তানা, অথচ এ সব কিছুই তার ঘরে নেই, সবই কিনতে হবে—তা' ছাড়া রেলের ভাড়া আছে, আর পুরো একটি দিনের জন্য দোকান বন্ধ রাখতে হবে, তাতেও লোকসান।

উইনস্লো মিনির কাছে এসে বলল, "মন শক্ত কর মিনি—দুঃসংবাদ আছে।"

মিনি তখন সকাল বেলাকার সাদাসিধা পোষাকে গৃহস্থালীর কাজ করছিল। সে তখন উনুনের ধারে বসে বাতাস দিয়ে উনুন ধরাচ্ছিল, ফিরে তাকিয়ে চিঠিটা দেখে একটা অস্ফুট চীৎকারধ্বনি করে উঠল, তার পর রক্তহীন ওষ্ঠদ্বয় একত্রে চেপে ধরল। চিঠিটা হাতে নিয়ে সে বলল, "আমার মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই মামা", তার পর উইনস্লোর দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "হাতের লেখাটা তো অচেনা।"

উইনস্লো বলল, "হাল পোষ্ট অফিসের ছাপ রয়েছে।"

মিনি বলল, "হ্যাঁ—'হাল'-ই পোষ্ট অফিস বটে।"

মিনি ধীরে ধীরে খামটা ছিঁড়ে চিঠিটা বের করে নিল—একটু ইতস্ততঃ করল—তার পর চিঠিটা উল্টে স্বাক্ষরের জায়গাটা দেখে নিয়ে বলল, "মিঃ স্পাইট লিখেছেন, দেখছি।"

"কি লিখেছেন তিনি?" উইনস্লো জিজ্ঞাসা করল।

মিনি চিঠিটা পড়তে আরম্ভ করল—পড়া হয়ে গেলে সে কাতর কণ্ঠে একটা আর্ত্তনাদ করে চিঠিটা ফেলে দিল ও দু'হাতে চোখ ঢেকে এক কোণে ধপ করে বসে পড়ল। উইনস্লো তাড়াতাড়ি চিঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে পড়তে লাগল। "অকস্মাৎ একটা ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে গেছে—মেলকয়াব-এর চিমনীটা গতকল্য আপনার মামার বাড়ীর ছাদের উপর ভেঙ্গে পড়েছে, তার ফলে বাড়ীশুদ্ধ সবাই—

"আপনার মামা, মামাতো ভাইবোনেরা—মেরী, উইল, নেড, ছোটখুকী সবাই মারা গেছে। আপনি যাতে কাগজে পড়বার আগেই ঘটনাটা শুনতে পান, সেই জন্য আমি এই চিঠিটা লিখছি"--উইনস্লোর হাত থেকে চিঠিটা স্খলিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল—নিজেকে সামলে নেবার জন্য সে দেয়ালটায় ভর দিয়ে দাঁড়াল।—কেউ নেই, সবাই মারা গেছে! উঃ ভীষণ!......

খানিক ক্ষণ পরে ক্রমে ক্রমে উইনস্লোর মানসচক্ষে ভেসে উঠল সপ্তাহে ৭ শিলিং ভাড়ায় ৭ খানা ছোট ছোট বাড়ী, একটা কাঠের গুদাম, দুটো বাগানবাড়ী আর বসতবাটীটার ভগ্নাবশেষ। উইনস্লো খুব দুঃখ ও অভাব অনুভব করবার চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু কিছুতেই পারল না।

...ওসব নিশ্চয়ই মিনির মামীমা পাবেন—কিন্তু না—লিখছে ত যে সকলেই মৃত।... উইনস্লোর মন কখন তার অজ্ঞাতেই অন্যমনস্কভাবে অঙ্ক কষতে আরম্ভ করেছিল—৭ × ৭ × ৫২ ÷ ২০ কিন্তু মানসিক অঙ্কে সে কোনদিনই পটু ছিল না, আর এখন তো অঙ্কগুলো কিছুতেই ঠিকমত মাথায় আসছিল না—একবার হচ্ছিল দু'শো পাউণ্ডের কাছাকাছি, আবার একবার হচ্ছিল একশো পাউণ্ড। কিছুক্ষণ পরে উইনস্লো চিঠিটা ফের কুড়িয়ে নিল ও সবটা পড়ে ফেলল। মিঃ স্পাইট লিখেছেন, "যেহেতু আপনিই নিকটতম আত্মীয়..."

অনেক ক্ষণ পরে মিনি মুখ তুলল এবং অত্যন্ত শঙ্কাহত-কণ্ঠে, মৃদুস্বরে বলল, "ওঃ কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার!"

উইনশ্লো তার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়ল।

উইনশ্লো খুব বেশী বুদ্ধিমান্ ছিল না, কিন্তু এটী সে বুঝতে পারল যে, যদিও তখন তার মাথায় হাজার রকমের চিন্তা ঘুরে বেড়াচ্ছিল—তার মধ্যে সময়োপযোগী বলবার মত কোন কথাই ছিল না। অবশেষে সে আস্তে আস্তে বলল, "সকলই ঈশ্বরের হাত।"

মিনি বলল, "কিন্তু কি ভীষণ, এ্যাঁ—আমার স্নেহময়ী মামীমা—বেচারী ছোট্ট নেড, স্নেহশীল মামা—কেউ নেই—কেউ নেই!"

"সবই ঈশ্বরের হাত মিনি—কি আর করবে বল" গভীর সহানুভূতির স্বরে উইনশ্লো বলল। তার পর অনেক ক্ষণ ধরে দুজনেই চুপ করে বসে রইল।

উনুনের আগুন তখন নিভে গিয়েছিল—সেই নির্ব্বাণোন্মুখ আগুনের দিকে চেয়ে চিন্তিতভাবে মিনি ধীরে ধীরে বলল, "হ্যাঁ—তা-ই হয়তো হবে, ভগবানেরই হাত।"

তারা দু'জনে গম্ভীরভাবে পরস্পরের দিকে তাকাল। এই সময়ে দু'জনের মধ্যে যে এক জনও যদি ঘরবাড়ী, বিষয়ের কথা উল্লেখ করত—অপরে তা হলে অত্যন্ত আহত হত। মিনি আস্তে আস্তে নিবন্ত উনুনটার কাছে ফিরে গেল ও একটা পুরাণ খবরের কাগজ ছিঁড়ে সেটা আবার জ্বালাতে চেষ্টা করতে লাগল—"আমাদের যতই ক্ষতি হোক—যতই দুঃখকষ্ট আসুক—যতই আঘাত ও ব্যথা আমরা পাই না কেন—সংসার যেমন চলে তেমনি চলবেই আর আমাদেরও নিত্য-নৈমিত্তিক কাজকর্ম্ম সব করে যেতেই হবে।"

একটু বাদে উইনশ্লোও একটী গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে মৃদুপদক্ষেপে দোকানঘর খোলবার জন্য চলে গেল। সে যেই দরজাটা খুলল, একঝলক রোদ এসে ঘরটীকে আলোকিত করে দিল। উদীয়মান সূর্য্যের আলোয় অপস্রিয়মাণ কুয়াসার মত তার মন থেকেও তখন চিন্তার জঞ্জাল সব দূর হয়ে গিয়েছিল।

একটু পরে উইনশ্লো জানালার খড়খড়িগুলো খুলে দিচ্ছিল—রান্নাঘরে মিনির উনুনও বেশ ধরে উঠেছিল। উনুনে একটা সসপ্যান চড়ানো ছিল—তাতে দুটো ডিম সিদ্ধ হচ্ছিল,—আজ মিনি নিজের জন্যও একটা ডিম নিয়েছে। তার পর মহা আড়ম্বরের সঙ্গে টেবিলে খাবার সাজাতে সাজাতে মিনিই প্রথম কথা বলল—বিপদটা অত্যন্ত সহসা ঘটেছে এবং অতিশয় ভয়াবহও বটে, কিন্তু এই দুঃখক্লেশ-সমাচ্ছন্ন ও সংগ্রামবহুল জগতে সবই আমাদের ধীরের মত সহ্য করতে শেখা উচিত।

......যখন তারা দু'জনেই বাড়ীগুলোর কথা আলোচনা করছিল, তখন বেলা রীতিমত দুপুর হয়ে গিয়েছিল।*

* H. G. Wells-এর The Catastrophe নামক গল্প হইতে।

জাতীয় সম্মেলনের কর্ম্মপদ্ধতি

...যাহাতে ভারতবর্ষের শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও গভর্ণমেণ্টের পরিচালনার সুব্যবস্থা হয়, তাহা করাই যদি কোন সম্মেলনের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে ঐ সম্মেলনে প্রত্যেক ভারতবাসীর যোগদান করা সম্ভব হইতে পারে এবং ঐ সম্মেলন প্রকৃত জাতীয় প্রতিষ্ঠান অথবা প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেস রূপে পরিগণিত হইতে পারে। ইহা ছাড়া আরও স্মরণ রাখিতে হইবে যে যাহাতে ভারতবর্ষের শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও গভর্ণমেণ্ট পরিচালনার সুব্যবস্থা হয়, তাহার উদ্দেশ্যে "প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেসে"র প্রতিষ্ঠা হইলে প্রত্যেক স্থায়ী ভারতবাসীর তাহাতে যোগদান করা সম্ভবপর বটে, কিন্তু যাঁহারা বিদেশী অথচ অস্থায়ীভাবে ভারতবর্ষে কার্য্যোপলক্ষে বসবাস করিতেছেন, তাঁহাদের স্বার্থের অনুকূল কিছু না থাকিলে, তাঁহাদের পক্ষে ঐ প্রতিষ্ঠানে ঐকান্তিকচিত্তে যোগদান করা সম্ভবপর হইবে না এবং প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেস অঙ্গহীন থাকিয়া যাইবে। ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠানে যাহাতে তাহার অস্থায়ী অধিবাসীবৃন্দের ঐকান্তিকচিত্তে যোগদান করা সম্ভব হয়, তাহা সাধন করিতে হইলে, অন্ততঃ তাহার উদ্দেশ্য যাহাতে ইংলণ্ডের শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও গভর্ণমেণ্ট পরিচালনার প্রকৃত বিঘ্নকর কিছু স্থান না পায়, অপরন্তু ইংলণ্ডের ঐ ঐ ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হয়, তদ্বিষয়ে সাধ্যানুসারে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।...

খেলোয়াড়

স্পোর্ট্‌স্

—শ্রীবিনয় রায় চৌধুরী

আনন্দ মেলার স্পোর্ট্‌স

মার্কাস স্কোয়ারে আনন্দ মেলার দ্বিতীয় বার্ষিক স্পোর্টস শেষ হয়েছে। এই স্পোর্টসে শুধু মেয়েরা যোগ দিতে পারে। কলিকাতা ও সহরতলীর বিভিন্ন স্কুল হ'তে প্রায় ১৫০ শত প্রতিযোগিণী এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলেন। জুইস্ গার্লস্ স্কুল সিনিয়ার চ্যাম্পিয়ান, কমলা গার্লস্ স্কুল ইন্টারমিডিয়েট এবং বেথুন স্কুল জুনিয়ার চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন।

অলিম্পিক্ হেভী ওয়েট্ চ্যাম্পিয়ন: গোলাম নবী (পাঞ্জাব) ও ডি. লড়্কী (বরোদা)

প্রতিযোগিতার কয়েকটী ফলাফল

১০০ গজ দৌড় (সিনিয়ার)

১ম —রামালা'ডড (জুইস গার্লস্)
২য়—এইচ. বোস (রামকৃষ্ণ মিশন)
৩—সিলভিয়া ইসাক (জুইস গার্লস্)

সময়—১৪½ সেঃ।

৭৫ মিটার ব্যালান্স রেস (সিনিয়ার)

১ম—আশা চাটার্জ্জী (বেথুন)
২য়—উমা ব্যানার্জ্জী (ব্রাহ্ম)
৩য়—বাসন্তী কর (ব্রাহ্ম)

৫০ গজ ত্রিপ্তাল রেস (ইন্টার)

১ম—শান্তি মিত্র (মেট্রো)
২য়—ঊষা চাটার্জ্জী (কমলা গার্লস্)
৩য়—মিলি মুখার্জ্জী (মডেল)

৫০ গজ স্যাক রেস (ইন্টার)

১ম—প্রভা হালদার (রামকৃষ্ণ মিশন)

২য়—চিন্ময়ী দাস গুপ্ত (ভিক্টোরিয়া)
৩য়—শান্তি মিত্র (মেট্রো)

৫০ গজ স্কিপিং রেস (জুনিয়ার)
১ম—শান্তি মুখার্জ্জী (ভারত স্ত্রী বিদ্যালয়)
২য়—শোভনা দাস (নিবেদিতা)
৩য়—আরতি সরকার (বেথুন)

অল ইণ্ডিয়া অলিম্পিক স্পোর্টস

লাহোরে অলিম্পিক স্পোর্টসের সপ্তম বার্ষিক অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে। দেশের সব নামজাদা এ্যাথলেটরা যোগদান করে-

অলিম্পিক জুভেনাইল্ চ্যাম্পিয়ন।

ছিলেন। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও পাঞ্জাব ৯২ পয়েণ্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন। এই অপূর্ব্ব কৃতিত্বের ফলে পাঞ্জাব স্যার ডোরাব টাটা ট্রফি লাভ করলেন। এই নিয়ে পাঞ্জাব আট বার চ্যাম্পিয়ান হলেন। এই তুলনায় বাংলা, বোম্বে, মাদ্রাজ, সি. পি, ইউ. পি প্রভৃতির ক্রীড়া-ফল অতি যৎ-সামান্য। বাংলা ২৩ পয়েণ্ট, বোম্বে ১৯, মাদ্রাজ ১৩, সি. পি ১০, মহীশূর ৭, ইউ. পি ৭, আর্ম্মি ৬ এবং পাতিয়ালা ৩ পয়েণ্ট পেয়েছেন।

মহিলা-প্রতিযোগিতায় বাংলার মান রক্ষা করেছেন মিস্ স্মিথ ও ডি. প্রিচার্ড। সব কটি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান জিতে মহিলা চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন। নামজাদা পুরুষ প্রতি-যোগিতার ভিতর পাঞ্জাবের হার্ট অশেষ কীর্ত্তি অর্জ্জন করেছেন। প্রায় ১৯টী প্রতিযোগিতা ফাইনালে পাঞ্জাব ১০টী প্রথম স্থান এবং ৭টী দ্বিতীয় স্থান এবং বাংলা ৪টী প্রথম স্থান ও ৬টী দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন। এ ছাড়া বাস্কেট বল, ভলি বল গেমে পাঞ্জাবের কাছে মহীশূর ও বাংলার অভাবনীয় পরাজয়ে সকলে বিস্মিত হয়েছে। ভলি বলে পাঞ্জাব ১৫-৮, ১৫-৪, ১৫-২, গেমে দুর্ব্বল বাংলার দলকে হারায়। বাস্কেট বল গেমে মহীশূর ৩৭-১৮ পয়েণ্টে পাঞ্জাবের কাছে পরাজয় স্বীকার করে। অলিম্পিক স্পোর্টসের উদ্বোধন-দিনে পাঞ্জাবের মেহের চাঁদ শপথ গ্রহণ করেন। তারপর এ্যাথলেটদের "মার্চ্চ-পাষ্ট" হয়।

প্রতিযোগিতার কয়েকটি ফলাফল

১০০ মিটার দৌড়
১ম—জে. হার্ট (পাঞ্জাব)
২য়—হোয়াইট সাইড (পাঞ্জাব)
৩য়—হামিদ (ইউ. পি)
সময় - ১০'৯ সেঃ।

হফ ষ্টেপ এণ্ড জাম্প
১ম—মেহের চাঁদ (পাঞ্জাব)
২য়—কুঞ্জিভেরাম (মাদ্রাজ)
৩য়—জে. ষ্টীল (বেঙ্গল)
দূরত্ব—৪৬ মিঃ ১$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

৪৪০ গজ দৌড়
১ম—এফ. গ্যাণ্টজার (বেঙ্গল)
২য়—সি. পিট (বেঙ্গল)
৩য়—কে. চেনগাপ্পা (মহীশূর)
সময়—৫০'২ সেঃ।

৫০ গজ দৌড় (মহিলা)
১ম—মিস মার্জ্জরী স্মিথ (বেঙ্গল)
২য়—মিস ডি. প্রিচার্ড (বেঙ্গল)
৩য়—মিস ডি. ফরেষ্ট (পাঞ্জাব)
সময়—৬'৮ সেঃ।

৫০০০ মিটার দৌড়

১ম—রাওনক সিংহ (পাঞ্জাব)
২য়—অমর সিংহ (পাঞ্জাব)
৩য়—ডেনিয়েল (আর্মি)
সময়—১৫ মিনিট ... সেঃ।

৮০ গজ লো হার্ডল রেস (মহিলা)

১ম—মিস ডি. প্রিচার্ড (বেঙ্গল)
২য়—মিস ফরেষ্ট (বেঙ্গল)
৩য়—মিস প্রিসলে (মহীশূর)
সময়—১৫·৫ সেঃ।

ব্যানটাম ওয়েট চ্যাম্পিয়ান—১ম—চামন সিং (পাঞ্জাব)
২য়—থোরাট (বরোদা)

লাইট ওয়েট ১ম—চামন (পাঞ্জাব)
২য়—এস. বসু (বেঙ্গল)

হেভী ওয়েট—১ম—গুলাম নবি (পাঞ্জাব)
২য়—ডি. লড়্‌কি (বরোদা)

ক্যালকাটা অ্যাথ্‌লেটিক্ স্পোর্টস্ঃ পোলভল্ট্ চ্যাম্পিয়ন্ ডি. চৌধুরী।

ক্রিকেট

চতুর্থ টেষ্ট

মাদ্রাজে শেষ "টেষ্ট" খেলায় বিপুল জয়ধ্বনির ভিতর ভারতীয় দল ৩৩ রাণে জয়লাভ করলেন। এবারও চার দিনের খেলা, মাত্র তিন দিনে শেষ হয়। দুই টীমেই খেলোয়াড়ের পরিবর্ত্তন দেখা গিয়েছিল। বাংলার কার্ত্তিক বসু এই প্রথম নিখিল ভারতীয় দলে খেলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় ক্রীড়া-নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে সক্ষম হন নি। অষ্ট্রেলিয়া দল বোম্বে ও কলিকাতা এবং ভারতীয় দল লাহোর ও মাদ্রাজ টেষ্টে জয়লাভে ফলাফল সমান হল। প্রথম দিনে সুন্দর উইকেট, পরিষ্কার আকাশ এবং ১২ হাজার দর্শকের উৎসাহ নিয়ে ভারতীয় দল ব্যাট করতে নাবেন। লাঞ্চের পর খেলায় ভাগ্য-বিপর্য্যয় সুরু হতে চা-পানের সময় ভারতীয় প্রথম ইনিংসের খেলা ১৮৯ রাণে শেষ হল। মুস্তাক আলি ৪৩, অমর সিং ৪৫, অমরনাথের ৩২ রাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ম্যাককার্টনী ৩ উইকেটে ৫২ রাণ নেন।

দ্বিতীয় দিনে বৃষ্টি হওয়ায়, ১২টার পর খেলা আরম্ভ হয়। খারাপ মাঠে অষ্ট্রেলিয়ার মোট রাণ হল ১৬২। মায়ার ৪২, ব্রায়াণ্ট ২৬, রাইডার ২০। অমর সিংহ ৫ উইকেটে ৫৪ এবং নিসার ৫ উইকেটে ৩১ রাণ নেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় দল মাত্র ১১৩ রাণে আউট হয়ে যায়। অমরনাথ ১৮, ওয়াজির আলি ১৬ ও হার্ডি নট আউট ১৯। ম্যাককার্টনী

৬ উইকেটে ৪১ রাণ নেন। তখন মাত্র ১৪১ রাণ হলে অষ্ট্রেলিয়া দলের জয়লাভ হয়। কিন্তু ভাগ্যদেবী ভারতীয় দলকে সাহায্য করতে ফলাফল অন্য রকম দাঁড়াল। ১০৭ রাণে অষ্ট্রেলিয়া দলের নামজাদা খেলোয়াড়রা আউট হয়ে ম্লান মুখে তাঁবুতে ফিরে গেলেন। চারিদিকের গভীর উল্লাসের ভিতর ভারতীয় দল জয়লাভ করলেন।

ক্যালকাটা অ্যাথ্‌লেটিক্‌ হার্ডল্‌ রেস।
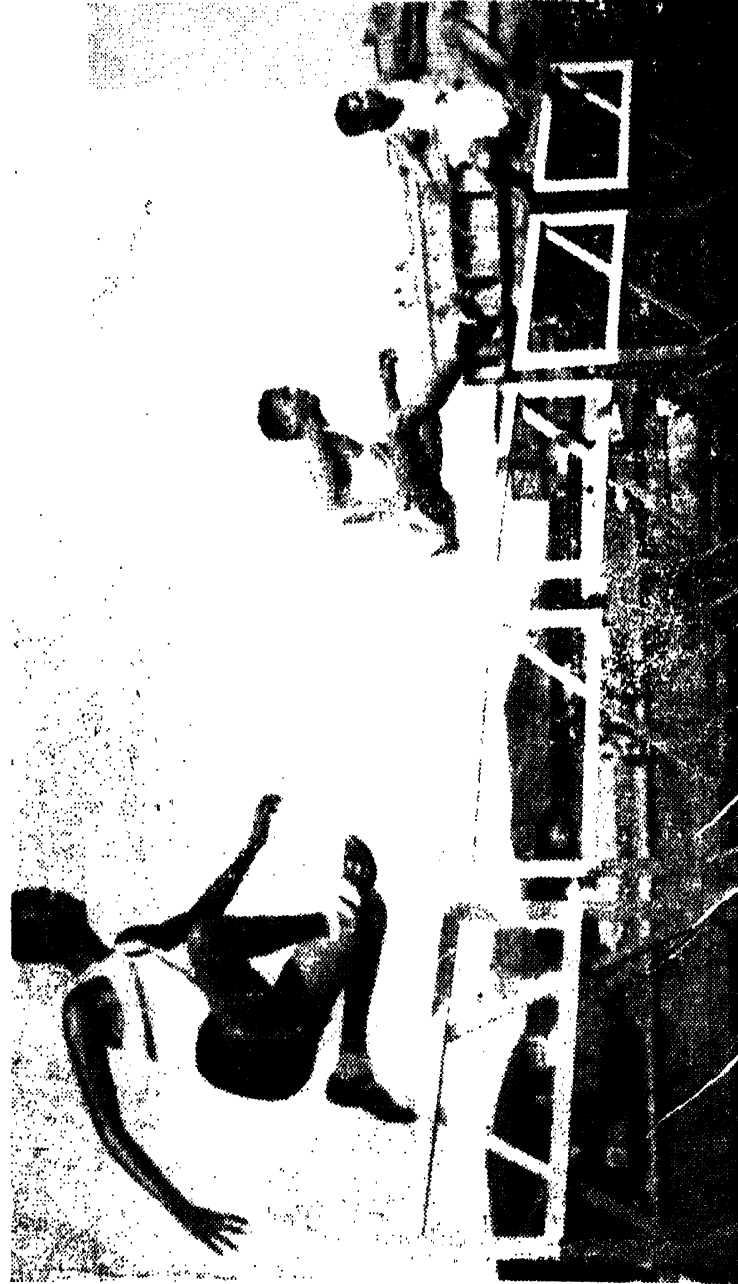
ভারতীয় দল—কে. বসু, মুস্তাক আলি, অমরনাথ, ওয়াজির আলি, এন. নাইডু, রাম সিং, এস. হার্ডি, এম. আলাউদ্দিন, এস. নিসার, এম. টিরু ভেনকাটাচারি ও অমর সিংহ।

অষ্ট্রেলিয়া—ব্রায়াণ্ট, লাভ, মরিসবি, রাইডার, হেনড্রি, ম্যাককার্টনী, এলিস, মেয়ার, লেডার, ডেভিস ও আলেকজাণ্ডার।

অষ্ট্রেলিয়া দল

সিংহল ও ভারতের মাটীতে প্রায় সাড়ে তিন মাস মুগ্ধকর খেলার পর অষ্ট্রেলিয়া দল দেশের মুখে রওনা হয়েছেন। অতি অল্প দিনের মধ্যে সম্মিলিত ভারতীয় দল বিলাতে খেলতে যাচ্ছেন। অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলার ফলাফল বিবেচনা করলে ক্রিকেটে আমাদের ন্যায্য গৌরব প্রতিষ্ঠা করেছি, সন্দেহ নাই। এ দেশে ২৩টী ম্যাচে অষ্ট্রেলিয়া ১১টীতে জয়লাভ, ৯টীতে ড্র এবং তিনটীতে পরাজয় স্বীকার করেন। সেকেন্দ্রাবাদে নবাব মইনুদ্দৌলা টীমের কাছে এক ইনিংস ও ১১৫ রাণে অষ্ট্রেলিয়ার সব চেয়ে বড়

পরাজয়। ১৯২৬-২৭ সালে গিলিগান টীমের এক আশ্চর্য্যকর রেকর্ড ছিল। ৩৪টী গেমের ভিতর একটী গেমেও পরাজয় স্বীকার করেন নি। এ কম কৃতিত্বের কথা নয়। সর্ব্বশুদ্ধ ১১টী জয়লাভ এবং ২১টী ড্র করেন। বিখ্যাত টেট, এষ্টীল, স্যাণ্ডহাম, উক্ত টীমে খেলেছিলেন।

১৯৩৩-৩৪ সালে জার্দ্দিন টীমের ইংলণ্ডের বাছা বাছা খেলোয়াড় সত্ত্বেও ৩৪টী গেমে, ১১টী গেম জিতেন, ১৭টী ড্র করেন এবং বেনারসে মহারাজকুমার ভিজিয়ানাগ্রাম টীমের রাণ করেছেন ১০১১। এবং এর যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়েছেন ভারতীয় দল ৩৫০ উইকেটে ৬৩০১ রাণ। গিলিগান দল ৩২৭ উইকেটে ১২,১৪১ এবং জার্দ্দিন দল ৩৫১ উইকেটে ১১,২১৫ রাণ করেন। অষ্ট্রেলিয়া দলের ২৩টী ম্যাচের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

অষ্ট্রেলিয়া ৩৩৪ রাণ ও অল সিংহল ৬৩ ও ১১১ রাণ করেন। এক ইনিংস ও ১২৭ রাণে অল সিংহল পরাজিত হন।

গ্র্যাসহপার দল।

কাছে পরাজয় স্বীকার করেন। অষ্ট্রেলিয়া দল সর্ব্বশুদ্ধ ১১টী সেঞ্চুরী রাণ করেছেন। গিলিগান টীম ১৯টি এবং জার্দ্দিন টীম ১৮টী সেঞ্চুরী করেন। রাইডার ও মরিসবি এক হাজারের অধিক রাণ করেছেন। তারপর ওয়েণ্ডেল বিল ৭৬৫, ব্রায়াণ্ট ৭৫৪ ও ম্যাককার্টনীর ৫৪৮ রাণ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। অক্সেনহাম বোলার হিসাবে এক নতুন কীর্ত্তি রেখে গেলেন। কলিকাতা টেষ্ট ম্যাচে ৫ উইকেট ৭ রাণ। সিন্ধু টীমের বিরুদ্ধে ৫ উইকেটে ৭ রাণ অক্সেনহামের সুদক্ষ বোলিং-এর পরিচয়। এম. সি. সি. দলের টেট ও ভেরিটী এক শতের অধিক উইকেট নিয়েছিলেন। ২৭১ উইকেটে অষ্ট্রেলিয়া

অষ্ট্রেলিয়া—১৯৭ ও ৪ উইকেটে ৫৪ রাণ। ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ষ্টেট—১৫৪ ও ৯৫ রাণ। ৬ উইকেটে জয়লাভ করেন।

গুজরাট দলের ১২১ ও ৯৩ রাণের বিরুদ্ধে অষ্ট্রেলিয়া ৪ উইকেটে ৩০০ রাণে এক ইনিংস ও ৮৬ রাণে জয়লাভ করেন।

জামনগরের বিরুদ্ধে ৯ উইকেটে অষ্ট্রেলিয়া ৩১৫ রাণে ডিক্লেয়ার্ড করেন। জামনগরের ১৫৪ ও ৬ উইকেটে ১২৮ রাণ হয়। ড্র হয়।

অষ্ট্রেলিয়া—১৪৯ ও ৩ উইকেট ১০০ রাণ। রাজপুতনা ও মধ্য ভারত ১৩১ ও ১১৮ রাণ। ৭ উইকেটে জয়লাভ করেন

সিন্ধুর ৭৯ ও ১২৫ রাণের বিরুদ্ধে অষ্ট্রেলিয়া ২৯৪ রাণ করে। এক ইনিংস ও ৯০ রাণে জয়লাভ করেন।

মহারাষ্ট্রের ২০৫ ও ১ উইকেটে ৪২ রাণের বিরুদ্ধে অষ্ট্রেলিয়া ৪ উইকেটে ৩৪২ রাণ করেন। ড্র হয়।

বোম্বে ২৪১ ও ৭ উইকেটে ১৭১ রাণ করেন। ৮ উইকেটে অষ্ট্রেলিয়ার রাণ হয় ৪৬৪। ড্র হয়।

প্রথম টেষ্ট ম্যাচে অষ্ট্রেলিয়ার ২৬৪ ও এক উইকেটে ৫৯

কলিকাতায় দ্বিতীয় টেষ্টে নিখিল ভারতীয় দলের রাণ হয় মাত্র ৪৮ ও ১২৭। অষ্ট্রেলিয়া ৯৯ ও দুই উইকেটে ৮০ রাণ করে ৮ উইকেটে পরাজিত করেন।

পাঞ্জাবের ১৬৩ ও ১১৫ রাণের বিরুদ্ধে অষ্ট্রেলিয়া রাণ করেন ৩৪০। এক ইনিংস ও ৬২ রাণে জয়লাভ করেন।

লাহোর তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচে অষ্ট্রেলিয়ার ১৬৬ ও ২১৬ রাণ হয়। নিখিল ভারতীয় দলের মোট রাণ হয় ১৪৯ ও ৩০১।
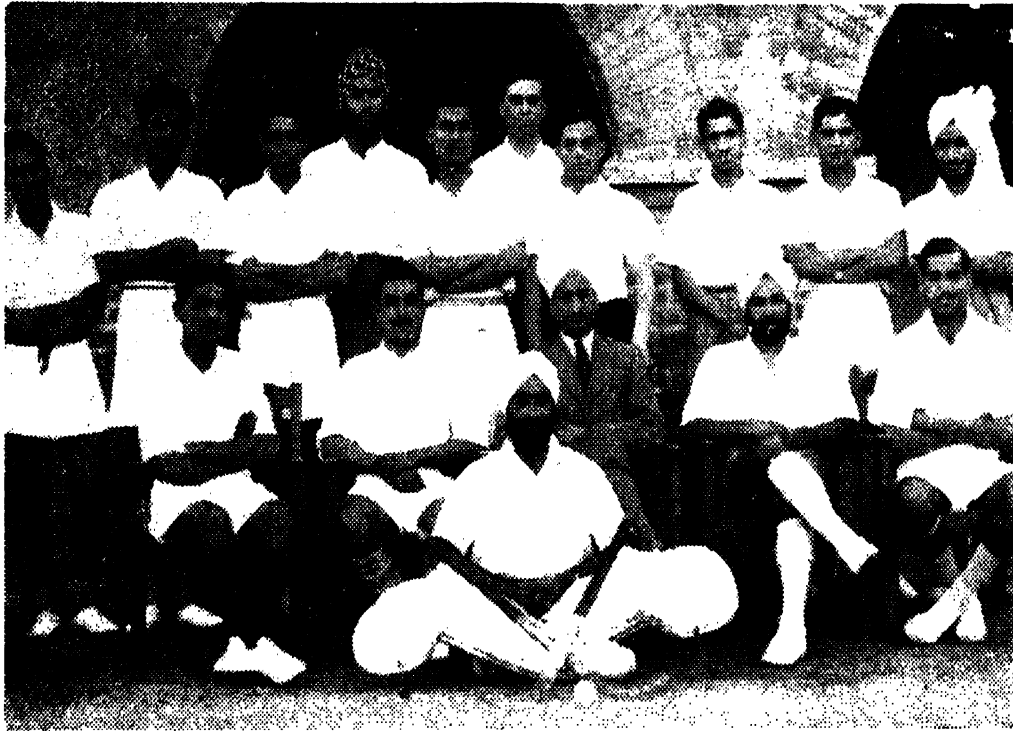
পাঞ্জাব দল।

রাণ হয়। ভারতীয় দলের মোট স্কোর হয় ১৬৩ ও ১৬৩। অষ্ট্রেলিয়া ৯ উইকেটে জয়লাভ করেন।

অষ্ট্রেলিয়া—৪৯ ও ইউ. পি—১৩৭। ড্র হয়।

অষ্ট্রেলিয়ার ৩৫১ ও সি. পি ও বেরারের ১২১ ও ১২৩ হতে অষ্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ১০৭ রাণে জয়লাভ করেন।

কুচবিহার টীম দুই উইকেটে ১০১ রাণ করেন। অষ্ট্রেলিয়া করেন ৫ উইকেটে ২১১ রাণ। ড্র হয়।

অষ্ট্রেলিয়ার ৩০০ রাণ ও এক উইকেটে ১৩ রাণ। বাংলা ও আসাম দলের ১৩৬ ও ১৮৪ রাণ। ৯ উইকেটে অষ্ট্রেলিয়া জয়লাভ করেন।

এই সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় দল বিদেশী দলকে টেষ্ট-ম্যাচে পরাজিত করলেন।

পাতিয়ালার ৩৫২ ও তিন উইকেট ৭৭ রাণের বিরুদ্ধে অষ্ট্রেলিয়া ৪৮৪ রাণ করেন। ড্র হয়।

অষ্ট্রেলিয়ার ২৬৪ রাণ হয়। ক্রিকেট-ক্লাব অফ ইণ্ডিয়া ১৬৭ ও ৬ উইকেট ৪১ রাণ করেন। ড্র হয়।

নবাব মইনুদ্দোলা টীম ৫ উইকেট ৪১৩ রাণে ডিক্লেয়ার্ড করেন। অষ্ট্রেলিয়ার রাণ হয় ১৪৪ ও ১৫৪। এক ইনিংস ও ১১৫ রাণে পরাজিত হন।

মাদ্রাজ দলের ১৪২ ও ১৬৫ রাণ হয়। অষ্ট্রেলিয়া ৪৭ ও ৯ উইকেট ২৬২ রাণে এক উইকেটে জয়লাভ করেন। মাদ্রাজে চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচে অষ্ট্রেলিয়া ১৬২ ও ১০৭ করেন। ভারতীয় দল ১৪৭ ও ১১৩ রাণ করে। মাত্র ৩৩ রাণে ভারতীয় দল জয়লাভ করেন।

মহীশূর ২১৬ ও তিন উইকেটে ১২৭ রাণের বিরুদ্ধে অষ্ট্রেলিয়া ৩৯২ রাণ করেন। ড্র হয়।

সেঞ্চুরী রাণ অষ্ট্রেলিয়ান দলের পক্ষে

ওয়েণ্ডেল বিল ১০১ বনাম অল সিংহল।
ম্যাককার্টনী ১০৬ „ জামনগর।
রাইডার ১৩৯ নট আউট বনাম গুজরাট।
রাইডার ১০১ নট আউট বনাম মহারাষ্ট্র।
ওয়েণ্ডেল বিল ১০৭ বনাম বোম্বে।
ব্রায়াণ্ট ১৫৫ " বোম্বে।
রাইডার ১০৪ " অল ইণ্ডিয়া।
মরিসবি ১১৯ " সি. পি ও বেরার।
রাইডরা ১১৫ বনাম পাঞ্জাব।
ওয়েণ্ডেল বিল ১১৮ " পাতিয়ালা।
মরিসবি ১৪৫ " পাতিয়ালা।

অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেঞ্চুরী রাণ

এম. নাইডু	(মহারাষ্ট্র)	১২৪
এল. জয়	(বোম্বে)	১১৫
এ. ভায়া	(মধ্যভারত)	১০৬
এম. ওয়াজির আলি.'	(পাতিয়ালা)	১৩২
অমরনাথ	(মইনুদ্দৌলা)	১৪৪

হকি

হকি লীগ খেলার আরম্ভ হবার সাথে সহরে বহু গুজব শেষ হল। গত বছর লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান হওয়াতে হকি খেলার প্রতি বাঙ্গালী দর্শকের উৎসাহ একটু বেড়ে গেছে। এখন মোহনবাগানের খেলা হলেই মাঠে ভীড় জমে যায়। এইচ. মিত্র ও এ. দেবকে হারিয়ে মোহনবাগান দল একটু দুর্ব্বল হয়ে গেছে। মানাভাদার নামজাদা সুলতানীকে পেয়েও মোহনবাগান পর পর কয়েকটী গেম ড্র করাতে সকলেই দুঃখিত হয়েছে। কাষ্টমস কিংবা রেঞ্জার্সে'র ভাগ্যবিপর্য্যয় না হলে মোহনবাগানের লীগ চ্যাম্পিয়ান হবার আশা আর নেই বললেই চলে। রিবেলোকে

মিসেস্ বোলাণ্ড ও হারভে জনসন্।

পরে কাষ্টমস্ প্রতিদ্বন্দ্বী টীমদের গোলের পর গোল দিয়ে চলেছে। মনে হয় এবার অপরাজেয় হয়ে কাষ্টমস্ লীগ-চ্যাম্পিয়ান হবে। কাষ্টমস্‌দের হাত থেকে লীগ-চ্যাম্পিয়ানসিপ কেড়ে নিতে একমাত্র রেঞ্জার্স ও মোহনবাগানের সাহস ছিল, কিন্তু এবার দুই দলই এর মধ্যে কয়েকটী মূল্যবান্ পয়েণ্ট নষ্ট করেছেন। আগেকার চেয়ে রেঞ্জার্স দল তত উন্নত ও দৃঢ় নয়। সেণ্ট জেভিয়ার্স ও সেণ্ট জোসেফ শুধু তরুণ খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত। লীগে ভালই খেলছে এবং ভাল স্থান অধিকার করবে। ই. বি. আর, কলিকাতা ও পুলিশ কয়েকটী আপসেট করেছে, ঝাল্লি দলের কয়েকটী খেলোয়াড় নিয়ে ভবানীপুর লীগে অনেক দলের উপর থাকবে। মিলিটারি মেডিকেল মাঝে মাঝে সুন্দর খেলে সকলকে চমকিয়ে দেয়। নতুন টীম আর্মেনিয়ান ও ডালহাউসির লীগে স্থান এবারে থাকবে কি না সন্দেহ।

অলইণ্ডিয়া ভার-উত্তোলন প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন : জি. হিউ। (মধ্যে)।

লেডী টেগার্ট কাপ

এবার ফাইনালে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী টীম ওয়াণ্ডারার্স ও ব্লু গ্রাসহপার সাক্ষাৎ করেছিল। খেলার প্রথম ভাগে ওয়াণ্ডারার্স অতি সুন্দর খেলে বার বার আক্রমণে বিপক্ষ দলকে চেপে রাখে। সাত মিনিটের মধ্যে মিস স্থাণ্ডলে একটি গোল দেয়।

তারপর মিস মারসিলিন আরেকটী গোল দিতে গ্রাসহপারের চৈতন্য হয়। দ্বিতীয় হাফে মিস স্থাণ্ডলে চমৎকার খেলে নিজেই আর একটী গোল স্কোর করেন। খেলার শেষের দিকে মিস ওয়াটসন গ্রাসহপার হয়ে একটী গোল শোধ করেন। ৩-১ গোলে ওয়াণ্ডারার্স বিজয়ী হন।

টেনিস

পাঞ্জাব টুর্ণামেণ্ট

নামজাদা খেলোয়াড়রা যোগদান না করায় পাঞ্জাব টুর্ণামেণ্টে ততখানি উৎসাহ দেখা যায় নি। তরুণ সোয়ানী ফাইনাল গেমে পরভাসকে ৬-২, ৬-৩, ৬-১ গেমে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হন। এইবার নিয়ে সোয়ানী তিনবার সিঙ্গল্‌স বিজয়ী হলেন। লেডিস ডাবল্‌স ফাইনালে মিস গিবসন ও মিসেস এলেন ১১-৯, ৬-৩ গেমে মিসেস ফয় ও মিসেস রকিকে হারান।

পুরুষ ডবল্‌স্ ফাইনালে সোয়ানী ও কৃষ্ণস্বামী প্রতিদ্বন্দ্বী ফিশার ও আহাদ হোসেনকে ৬-২, ৬-১, ৬-২এ পরাজিত করেন।

ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া টুর্ণামেণ্ট

এবার ফাইনালে সিঙ্গলস ম্যাচে সাক্ষাৎ করেন মেজেল ও হেক্ট। কলিকাতা সাউথ ক্লাবে হেক্টের কাছে মেজেলের অভাবনীয় পরাজয়ে সকলেই বিস্মিত হয়েছিল। তার পর মেজেল বহু বার হেক্টকে টেনিস যুদ্ধে পরাজিত করে পূর্ব্বের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। বোম্বে টুর্ণামেণ্টে অতি নিখুঁত খেলে, নানা রকম ক্রীড়া-দক্ষতার পরিচয় দিয়ে মেজেল ৬-১, ৬-১ গেমে অতি সহজেই হেক্টকে পরাজিত করলেন। পুরুষ ডাবল্‌স ফাইনালে হেণ্ডারসন, ব্রুক ও ব্লেক, মেজেল ও হেক্টের কাছে দাঁড়াতে পারেন নি। ৬-২, ৬-৩ গেমে মেজেল ও হেক্ট জয়ী হন। লেডিস সিঙ্গল্‌স ফাইনালে বাঙ্গলার মিসেস বোলাণ্ড ও মিস হার্ভে জনসন সাক্ষাৎ করেন।

অদ্বিতীয়া মিসেস বোলাণ্ডের কাছে মিস হার্ভে জনসন হার স্বীকার করবে সকলেই জানত। মিস হার্ভে জনসনকে ৬-৩, ৬-৩ গেমে হারিয়ে মিসেস বোলাণ্ড আবার মহিলা চ্যাম্পিয়ান হলেন। লেডিস ডাবল্‌স ফাইনালে মিসেস জে. টিউ ও মিস হিককে ৬-৩ ১৫-১৩ গেমে মিসেস বোলাণ্ড ও মিস হার্ভে জনসন পরাজিত করেন। মিক্সড ডাবল্‌স ফাইনালে ই. বি ও মিসেস বোলাণ্ড ৬-২, ৮-৬ গেমে মিসেস টিউ ও জে. টিউকে হারান। এবারকার টুর্ণামেণ্টের প্রধান বিশেষত্ব মিসেস বোলাণ্ড তিনটী প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করলেন।

ইণ্টারন্যাসানাল ম্যাচ

সেণ্ট্রাল ইউরোপিয়ান দল বনাম ভারতীয় দলের খেলায় ভারতীয় দল সম্পূর্ণ অযোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। হেক্ট ৬-৪ ৬-৪ গেমে শোহনলালকে হারায়। এই খেলাটী খুব চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। তারপর ব্লেককে ৬-২, ৬-১ গেমে হারাতে মেজেলের কিছুমাত্র বেগ পেতে হয়নি। ডবল্‌স ম্যাচে মেটেস্কা ও মেজেলের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হেণ্ডারসন ব্রুক ও চিরঞ্জীবের চমৎকার খেলা সত্ত্বেও ৬-৪, ৬-৪ গেমে হেরে যায়।

ক্রীড়া-জগতের খবর

এবারও অল ইণ্ডিয়া বিলিয়ার্ড ফাইনাল গেমে গত বছরের বিজয়ী প্রত্যুষ দেব ও বিজিত এস. বেগ সাক্ষাৎ করেছিলেন। প্রত্যুষ ৭৭৩ পয়েণ্ট করে ও বেগ করে ৭১৯ পয়েণ্ট। ৭৪ পয়েণ্টে প্রত্যুষ জয়ী হন। এই টুর্ণামেণ্টে বেগের সর্ব্বোচ্চ ব্রেক হয়েছিল ১১৯ পয়েণ্ট।

লীলাধর শর্ম্মা ৯১ ঘণ্টা অবিরাম হেঁটে জগতে এক নতুন রেকর্ড করেছেন। উক্ত দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি প্রায় ১৯১½ মাইল হেঁটেছিলেন।

সেণ্ট জেভিয়ার্স দল ওয়াই. এম. সি. রিঙ্গ হকি টুর্ণামেণ্টে চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন।

হকি লীগের খেলায় সেণ্ট জেভিয়ার্স শেষ পর্য্যন্ত অপরাজেয় ছিলেন।

অল ইণ্ডিয়া প্রফেসনাল বিলিয়ার্ড টুর্ণামেণ্টে ইরিক মঙ্ক রাজাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন। মঙ্কের স্কোর হয়েছিল ৯৪৫ আর রাজার ৮৭৯ পয়েণ্ট।

সাউথ ক্লাব জুনিয়ার টুর্ণামেণ্টে দীলিপ বসু ৬ ৩, ৬-২ গেমে এইচ ডেমিট্রিয়াসকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন।

১০ রাউণ্ড বক্সিং যুদ্ধে লেন বারে ৭ রাউণ্ড যুদ্ধে গানবোট্ জ্যাকের কাছে প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে যান। দুঃখের বিষয় হাসপাতালে তিনি মারা গেছেন।

সেফিল্ড সিল্ড ম্যাচে সাউথ অষ্ট্রেলিয়া দল এক ইনিংস ও ১৯০ রাণে ভিক্টোরিয়া দলকে পরাজিত করেছেন। এই নিয়ে সাউথ অষ্ট্রেলিয়া পাঁচবার জয়ী হলেন।

দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, নাইডু বিলেতে খেলবার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন।

এখন মিস্ সোনিয়া হেনী বার্লিন অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় স্পোর্টিং চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন।

আড়ি ও ভাব

—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

[১]

অস্মদ্দেশে প্রবাদ আছে, লোক কুকুর মারে, হাঁড়ী ফেলে না। কথাটা মিথ্যা নয়। হিমাদ্রি যে বাড়ীর কাহারও সহিত পরামর্শ না করিয়াই বি-এ ক্লাশে পড়া এক 'তালবৃক্ষ'সদৃশ নারীকে বিবাহ করিল, তাহার দোষটা এবং দোষজনিত ক্রোধটা তাহার উপরে না পড়িয়া সেই তালবৃক্ষের উপর পড়িল।

হিমাদ্রি বিবাহ করিবে না, ইহাই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। সে বিদেশে থাকে, বিদেশে চাকরী, বৎসরে একবার বাঙ্গালা দেশে আসে। তাহার পিতামাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা সেই সময়ে খুব তোড়জোড় করিয়া ক'নে খুঁজিতে ও দেখিতে আরম্ভ করেন। পিতার অনুরোধ, মাতার আঁখিজল, ভ্রাতৃজায়াদের পরিহাস, এই ত্রিবিধ বাণে বিদ্ধ হইয়া কখন কখন সে'ও ক'নে দেখিতে যায়, ফিরিয়া আসিয়া মাথা নাড়ে, মেয়ে পছন্দ হয় না। বাইশ বৎসর বয়স হইতে পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পাত্রী খুঁজিয়া ও দেখিয়া সকলেই হয়রাণ হইয়াছিল। হিমাদ্রির বিবাহের আশা-ভরসা লোপ পাইতে দেখিয়াও কেহই বিস্মিত হইল না। হিমাদ্রির ছোট ভাই নীলাদ্রি ইতোমধ্যে বি-এ পাশ এবং বিয়ে দুই-ই করিয়া ফেলিল। আত্মীয়-স্বজন নিশ্চিত বুঝিলেন, হিমাদ্রি বিবাহ করিবে না।

কিন্তু হিমাদ্রি বিবাহ করিল।

সেবার ছুটিতে বাড়ী আসিতেছে, বোম্বাই মেলের ইন্টার-মিডিয়েট ক্লাশে এক বাঙ্গালী পরিবারের সহিত হইয়া গেল আলাপ। আলাপটা হইল দৈবাৎ। সুযোগ দৈবাৎ—অর্থাৎ দেব-অনুগ্রহেই ঘটিয়া থাকে। হিমাদ্রির সহিত সেই পরিবারটির আলাপ দেব-অনুকম্পাতেই ঘটিল। কিন্তু না ঘটিয়াও উপায় ছিল না; কারণ দুইটি:

একটি কারণ এই যে আলাপ না ঘটিলে আমার গল্প লেখা হইত না; কাজেই ইহা অবশ্যম্ভাবী।

অপর কারণ এই যে, সেই কথাই এখন বলিতেছি। সেই পরিবারে একটি শিশু, একটি অনূঢ়া যুবতী ও একটি বৃদ্ধা ছিলেন। তাঁহারা কোথা হইতে আসিতেছিলেন সে সংবাদ অনাবশ্যক। নাগপুরে হিমাদ্রি গাড়ীতে উঠিয়া তাঁহাদের দেখিল এবং ডোঙ্গারগড়ে এক অভাবনীয় পরিস্থিতির ফলে আলাপ ও আত্মীয়তা হইয়া গেল। ডোঙ্গারগড়ে ডাকগাড়ী থামিলে টিকিট-পরিদর্শক টিকিট দেখিতে আসিয়াছিল। বৃদ্ধা মহিলা ও যুবতী উভয়ে মিলিয়া বাক্স-পেঁটরা, সুটকেস, এটাচি কেস, পোঁটলা-পুঁটলী, তৈজসপত্র, হাঁড়ী-বালতী তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়াও টিকিট পাইলেন না। বলা নিশ্চয়ই বাহুল্য, তাঁহাদের মাথার উপরে বাজ ভাঙ্গিয়া পড়িল। মা মেয়ের পানে, মেয়ে মায়ের পানে শুষ্কমুখে চাহিয়া, বোধ হয় নীরবে বিপদের গুরুত্বের একবার মাপ-পরিমাপ করিয়া লইলেন।

টিকিট-পরীক্ষক দয়া করিয়া দশ মিনিট সময় দিয়াছিল, তৎপরে পকেট হইতে খাতা-পেন্সিল ইত্যাদি বাহির করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা কোত্থেকে আসছেন?

বৃদ্ধা কাতরকণ্ঠে কহিলেন, আমাদের টিকিট আছে বাবা।

—কই দেখান, বলিয়া লোকটি ছোট টাইম ও ফেয়ার টেবল খুলিয়া ভাড়া কসিতে আরম্ভ করিল।

—কোথা যাবেন?

—মেদিনীপুর। আমরা টিকিট করেছি বাবা।

লোকটি এইবার একটু গরম হইয়া বলিল, করেছি বললেই ত হবে না, টিকিট দেখাতে হবে।

মেয়েটি এই অবসরে ছোটখাট পোঁটলা-পুঁটলীগুলি, পানের বাটা, দোক্তার কৌটা প্রভৃতিও খুলিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু টিকিট পাওয়া গেল না।

লোকটি হিসাব করিয়া বলিল, লাষ্ট চেকিং ষ্টেশন নাগপুর। নাগপুর টু মেদিনীপুর ভায়া খড়্গপুর ৬৩৯ মাইল, ভাড়া ১৯৸৵৯, এক্সেস দু'খানায় পড়বে আপনাদের তিন টাকা, মোট ৪৫৷৶৬ লাগবে। দিন্।

বৃদ্ধা মাথায় হাত দিয়া বেঞ্চে বসিয়া পড়িলেন; সকাতরে কহিলেন, আমরা টিকিট করেছি বাবা, তুমি আমার ছেলে,

—তা হোক।

—আরও এক কথা আছে। মা যদি দেরী করিয়ে দেন?

নীলিমা কহিল, মা ত আর অবুঝ নন যে দেরী করিয়ে দেবেন।

এ কথার শেষ এই খানেই। কিন্তু নীলিমার জেদের একটা বিশেষ কারণ ছিল। তাহার আশঙ্কা ছিল, গত বারে বাড়ীতে—অর্থাৎ শ্বশুরালয়ে সে যেরূপ আদর ও সম্বর্দ্ধনা পাইয়াছে, যদি এবারও তাহার অদৃষ্টে তাহাই জোটে, তাহা হইলে ফিরিবার পথে মেদিনীপুরে মায়ের কাছে ক'দিন থাকিয়া দুঃখ কতকাংশে লাঘব করিয়া আসিতে পারিবে, সেই জন্যই এত জেদ ধরিয়াছিল।

যে সন্তান বিদেশে বাস করে, মাতাপিতার মন তাহার কাছেই পড়িয়া থাকে। তাহার আসিবার দিন সন্নিকট হইলে তাঁহারা দিন গণিতে থাকেন। হিমাদ্রির পিতামাতাও দিন গণিতেছিলেন। ধার্য্য দিনে, ট্রেন বিলম্বিত হওয়ায় পিতা ঘর-বাহির করিয়া, ঘড়ি দেখিয়া, সম্ভব অসম্ভব চিন্তা করিয়া, মুহুর্মুহু সকলকে নানাবিধ প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে-ছিলেন। রান্নাঘরে হিমাদ্রির জননী সুক্তুনীতে আদা-বাটার পরিবর্ত্তে লঙ্কা-বাটা গুলিয়া দিয়া বাড়ীসুদ্ধ লোককে সেদিন নাকের জলে চোখের জলে করিয়াছিলেন।

হিমাদ্রি আসিতে মহা সমারোহ পড়িয়া গেল। বড় ভায়েদের ছেলেমেয়েরা কেউ ছবির বহি, পুতুল, লজেঞ্জস, বল, খেলনা পাইল; যাহারা বয়সে একটু বড় হইয়াছে, তাহারা মারাঠি শাড়ী বা মান্দ্রাজী ধুতি, চাদর বা চটি পাইল।

শ্বশ্রূ বধূর চিবুক ধরিয়া মাথায় হাত রাখিয়া, তাহাকে বুকে টানিয়া অনেক আদর করিলেন। এত আদর করিবার কারণ আছে। হিমাদ্রির চেহারাটি দেখিয়া তাঁহার বড় আনন্দ হইয়াছে। তাহার কণ্ঠার হাড় ঢাকিয়াছে, বুকের সে জিরজিরে পাঁজরাগুলা দেখা যায় না। যে বধূর কৃতিত্বে এই অসাধ্য সাধিত হইয়াছে, তাহার প্রতি শ্বশ্রূ সন্তুষ্ট না হইয়া পারেন কিরূপে?

জায়েরা হাসিমুখে প্রণাম লইলেন, আশীর্ব্বাদ করিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ দেবরগণ হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন এবং প্রথানুযায়ী কুশল প্রশ্নও করিলেন। বয়োকনিষ্ঠ দেবরগণ পায়ে হাত দিয়া নমস্কার করিল। এই পর্য্যন্ত—দেখিতে বেশ, শুনিতে বেশ, বলিতেও বেশ।

তাহার পর কে যে কোথায় সরিয়া পড়িল, কে জানে! বাড়ীটা মস্ত, তিন মহাল, চকমিলান বাড়ী, কে কোথায় আছে খুঁজিয়া পাওয়া দায়।

বাড়ীর যে ঘরটা হিমাদ্রির, দূরসম্পর্কীয় এক পিসেমহাশয় চিকিৎসার্থ সহরে আসিয়া সেই ঘরটায় বাসা বাঁধিয়াছেন। আহারাদির পর শ্বশ্রূ বধূমাতাকে একরকম জোর করিয়াই একটু গড়াইতে পাঠাইয়া দিলেন। নীলিমা নির্দ্দিষ্ট কক্ষে উপস্থিত হইয়া, বিভ্রাট দেখিয়া নীচে নামিতে উদ্যত হইয়াছে, একটি ভাসুরপুত্র আসিয়া বলিল, কাকীমা, দাদুর লাইব্রেরী-ঘর তোমার হয়েছে।

—সেটা কোথায় অনু?

—এস না, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি—বলিয়া বালক অগ্রসর হইয়া চলিল।

ঘরটি বড়, তার চারিদিকে, কড়িকাঠ পর্য্যন্ত আলমারি, তাক এবং তাহাদের আকণ্ঠ নানা রূপ ও নানা আয়তনের পুস্তকে সমাকীর্ণ। মধ্যস্থলে একখানি খাট, তদুপরি শুভ্র শয্যা বিস্তৃত। সুইচ টিপিয়া পাখাটা চালাইয়া দিয়া বালক বলিল, এ ঘর তোমার কেন হয়েছে জান কাকীমা?

—না বাবা।

—জান না?

—না।

কাকীমার অজ্ঞতায় বালক অনু অপরিসীম কৌতুক বোধ করিতেছিল, হাসিতে হাসিতে বলিল, সত্যি জান না?

—না অনু, সত্যি জানি না। তুমি জান?

—জানি।

নীলিমা ভয়ে ভয়ে ছেলেটিকে কোলের কাছে টানিয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি জন্যে বল ত অনু?

অনু একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, তুমি খুব বিদ্বান কি-না, তাই!

নীলিমা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এক মুহূর্ত্তে এক বৎসরের পুরাতন কাহিনী তাহার মনে পড়িয়া গেল। বিবাহের পর, মেদিনীপুর হইতে আসিবার সময় নিদারুণ মমতা বশতঃ কলেজের বহিগুলা সে আনিয়াছিল এবং

প্রথম দুই একদিন অতীত স্মৃতির টানেই সেগুলা লইয়া নাড়াচাড়াও করিয়াছিল। কেহ দেখিয়াছিল কি না তাহা মনে নাই বটে, তবে তাহার পর হইতেই জা ও দেবরের দল তাহাকে যেন এড়াইয়া চলিতে সুরু করিয়াছিল।

অনু সসম্ভ্রম কৌতুহলপূর্ণ দৃষ্টিতে কাকীমার পানে চাহিয়া চাহিয়া প্রশ্ন করিল, কাকীমা, ঐ-ই সব বই তুমি পড়তে পার?

—ছাই পারি।

—না, তুমি পার। কাকাবাবুরা বললে, মা'রা বললে, সবাই বললে; আর তুমি বলছ ছাই পারি। আমি সব জানি।

নীলিমা সুন্দর শিশুটির চিবুক ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি জান বল ত?

অনু বলিল, তুমি পাস করেছ, খুব ইংরিজি জান। হাঁ কাকীমা, আমি কবে তোমার মত ইংরিজি শিখব?

নীলিমা বালককে কোলে তুলিয়া তাহার মুখের উপর আস্তে আস্তে মুখ ঘসিতে ঘসিতে বলিল, তুমি ঢের ইংরিজি শিখবে অনু, তুমি খুব বিদ্বান হবে।

—তুমি আমায় পড়াবে কাকীমা! আমি তা হলে ছোড়দার মাষ্টারের কাছে পড়ব না। মাষ্টার বড্ড মারে।

—আমি তোমায় ইংরিজি পড়াতে ত পারব না অনু, বাঙ্গালা পড়াতে পারব।

—আমি তাই পড়ব। বলিয়া বালক আর ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। ছোড়দার সর্ব্বদাবেত্র-হস্ত মাষ্টারের হাত হইতে তাহার মুক্তি মিলিয়াছে, এই শুভ সংবাদটি ছোড়দার পাইতে বিলম্ব হইলে যে চলে না।

শরীরটা খুবই ক্লান্ত ছিল, বিছানায় পড়িতেই নীলিমা অঘোরে ঘুমাইল।

[৫]

পরদিন সকালে খাবার খাইতে আসিয়া বাড়ীশুদ্ধ লোক আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, সেই সকাল বেলাতেই চিঁড়েভাজা, মোহনভোগ প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে এবং নীলিমাই প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র পাত্রে খাবার বণ্টন করিয়া বেড়াইতেছে। এই কাজটা চাকরদেরই হাতে ছিল। তাহারা, পাঁউরুটী সেঁকিয়া মাখম লাগাইয়া দুধ বা চায়ের সঙ্গে দিত, প্রাতর্ভোজনের এই ব্যাবস্থাই ছিল। আজিকার নূতন ব্যবস্থায় সকলেই সন্তোষ লাভ করিয়াছিল।

তাহাদের ভাগ্যে অধিকতর বিস্ময় পুঞ্জীভূত ছিল, মধ্যাহ্নে তাহা প্রকাশ পাইল। কিন্তু সে কথা বলার পূর্ব্বে অন্য কথাও একটু বলিতে হইতেছে। এই বাড়ীতে স্বজাতীয় একটি দরিদ্র বিধবা রান্নাঘরের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। বাড়ীর গৃহিণী ও বধূরা তাঁহাকে সাহায্য করিতেন বটে, কিন্তু দায়িত্ব ছিল তাঁহারই। এ বাড়ীর নিয়ম ছিল ছেলেবুড়ো সকলে এক সঙ্গে আহারে বসিত; এবং তাঁহাদের পর মেয়েরা ছোটবড় সব একসঙ্গে বসিতেন।

এদিন বাড়ীর পুরুষেরা আহারে বসিয়া লক্ষ্য করিলেন, সব-কিছুতেই নূতনত্বের ছাপ। তরকারী নূতন ধরণের, ডালে নূতনত্ব, অম্বল, পায়স প্রভৃতিও পুরাতনপন্থী নহে। রান্নাও অতীব চমৎকার হইয়াছে। কর্ত্তা প্রশ্ন করিলেন, আজ রান্না কার গা?

গৃহিণী গাওয়া ঘিয়ের পাত্রহস্তে সম্মুখেই দাঁড়াইয়া ছিলেন, বলিলেন, বল না কার?

কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন, রান্নাঘরে নতুন অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান হয়েছে, তা বেশ বুঝতে পারছি। তিনি কে? ন' বৌমা কি?

বোধ করি বিশ জোড়া চক্ষু এক সঙ্গে গৃহিণীর মুখের উপর স্থাপিত হইল। গৃহিণী হাসিমুখে বলিলেন, আজ সকাল থেকে সেই ত সব করছে। কেমন রেঁধেছে?

—চমৎকার। বলিয়া কর্ত্তা খাইতে লাগিলেন। তিনি অতীব অল্পাহারী, কিন্তু আজিকার খাওয়া দেখিলে তাহা মনে হইত না। উঠিয়া যাইবার সময় গৃহিণীর কাছে আসিয়া যেন খুব গোপনে (অথচ সকলেই শুনিতে পাইতেছে) জিজ্ঞাসা করিলেন, বৌমাকে জিগ্যেস্ কর তার মা বুঝি পাঞ্জাল দেশের মেয়ে!

বৌয়েরা ও মেয়েরা খাইতে বসিলে নীলিমাও তাহাদের সঙ্গে বসিল। গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, নতুন বৌমা কেমন রেঁধেছে গো, তোমরা কেউ বলছ না কেন?

—ভাল, মা।

ইহার বেশী কেহ কিছু বলিলেন না। ন' বৌ যে একদিন রাঁধিয়া ডবল প্রোমোসন আদায় করিতে উদ্যত হইয়াছে, ইহা তাঁহাদের ভাল লাগিতেছিল না; তাই তাঁহারা মন খুলিয়া চমৎকার বলিতেও পারিলেন না,—মুখ খুলিয়া নিন্দা করিতেও চাহিলেন না। তাঁহাদের ভাবটা ঔদাসীন্যের ভাব।

কিন্তু একদিন নয়, দেখা গেল, প্রতি মধ্যাহ্ন এবং প্রতি রাত্রেই ন' বধূ স্বহস্তে নূতন নূতন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া সকলকে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইতে লাগিল।

ফলে, শ্বশুর-শাশুড়ীর কথা ছাড়িয়াই দিই, অন্যান্য সকলে নায় চাকর-বাকরও ন' বৌয়ের গুণগানে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাহার কুফলও যে ফলিতেছিল না, এমন

কথা বলা যায় না। তবে সে কথা বিশদভাবে বলিয়া পর-নিন্দায় পঞ্চমুখ হইবার বাসনা আমার নাই।

নীলিমা বধূদের সঙ্গে ভাব করিবার সুযোগ খুঁজিয়া ফিরিতেছিল, কিন্তু তাঁহারা বোধ হয় সুযোগ দিবেন না ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, কোন মতেই সে তাঁহাদের সান্নিধ্যে আসিতে পারিতেছিল না। তাঁহারা নিজেরা বিশেষ কোন ভাবই প্রকাশ করিতেন না,ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মুখ দিয়া তাঁহাদের ভাব ও ভাষা কখন কখন প্রকাশ হইয়া পড়িত।

পূর্ব্বপরিচিত অনুই একদিন বলিল, কাকীমা, বি-এ এম-এ পাস করলে খুব ভাল রান্না করা যায় ? না ?

নীলিমা সবই বুঝিল, বলিল, তা যায়।

পরদিন প্রশ্ন হইল, কাকীমা তুমি যখন কলেজে পড়তে, তখন মুসলমান বাবুর্চ্চি তোমায় রেঁধে দিত বুঝি ?

হায় রে! কি কুক্ষণেই সে সেবার সেই পাপ বাবুর্চ্চিগুলা আনিয়াছিল !

একদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর বড়বধূর ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিল, সেখানে দু' সেট তাস পড়িয়াছে। একদল ব্রীজ, অপর দল টোয়েন্টি নাইন খেলিতে বসিয়াছেন। আর একদল একটি লোকের অভাবে অভাবে-স্বভাব-নষ্ট হিসাবে তাস লইয়া পেটাপেটি করিতেছেন—ইহাদেরই একজন কতক আগ্রহে কতক বিদ্রূপ ভরে কহিলেন, ন' বৌদি ত কুড়ে খেলা খেল না, না ?

নীলিমা হাসিয়া বলিল, কেন খেলব না ভাই!—বলিয়াই তাহাদের কাছে বসিয়া পড়িল।

যখন কথা উঠিল, কোন্ খেলা হইবে, নীলিমার উপর ভার অর্পিত হইল, প্রস্তাব করিবার। পাশের দল টোয়েন্টি নাইন খেলিতেছিল, নীলিমা নাম জানিত না, বলিল, এঁরা যা খেলছেন।

—টোয়েন্টি নাইন! বেশ, বেশ!

অপর দল মুখ ভার করিয়া বলিল, কি ছেলেমানষী খেলা ভাই! তার চেয়ে গ্রাবু ভাল।

পূর্ব্ব দল অমনই বলিল, গ্রাবু আবার খেলা? না ভাই ন'বৌদি, টোয়েন্টি নাইনই ভাল। বেশ ডাক ওঠে। কি বল ?

নীলিমার পক্ষে সবই সমান। বলিল, যা হক খেললেই হল।

টোয়েন্টি নাইনই আরম্ভ হইল এবং মিনিট দুই মধ্যেই সে যে কত বড় আনাড়ি তাহা প্রতিপন্ন হইয়া গেল, কিন্তু আরও দশ মিনিট পরে দেখা গেল, যাহার শিখিবার ইচ্ছা আছে, যে-কোন শিক্ষা লইতে তাহার বিলম্ব হয় না। দিন তিনেকের মধ্যে সকল দলেই তাহার সমান আদর হইল। ন' বধূ খেলে ভাল, তাহার কথাগুলি বড় মিষ্ট, ব্যবহার চমৎকার।

ইহার পরে আর কোন বৈঠকে তাহাকে না হইলে চলে না। যাহারা তাহাকে তাস খেলা শিখাইলেন, বিনিময়ে তাহার নিকট হইতে পেঁয়াজের পায়স রান্না শিখিয়া লইলেন।

হিমাদ্রির ছুটি ফুরাইয়া আসিল। আর কিছুদিন ছুটি বাড়ান চলে কি-না তাহারই পরামর্শ চলিতে লাগিল। তাহা সম্ভব নয় জানিয়া একটি বৌদিদি প্রস্তাব করিলেন, ন' ঠাকুরপো, নীলিমা এখন থাক, মাস দুই পরে ছোট ঠাকুরপো ওকে রেখে আসবে।

হিমাদ্রি শুষ্ক মুখে বলিল, রোগিণী কি বলে ?

—সে আর কি বলবে! পতিই পরম গুরু!

—ওঃ নীলিমার কি বুদ্ধি!

—কেন? বুদ্ধিটা আবার কি বেশী দেখলে ?

—বুদ্ধি বেশী নয় আবার! জানে, আমি কিছুতেই ছেড়ে যাব না, ছেড়ে গেলে পাগল হয়েই বা যাই। তাই তোমাদের কাছে ভালমানুষটি সেজে বলেছে, উনি যা বলবেন, তাই হবে। অর্থাৎ দোষটা সব আমারই ঘাড়ে পড়বে।

বৌদি রঙ্গ করিয়া বলিলেন, এরই মধ্যে এ্যাতো!

হিমাদ্রি বলিল, সেটা দোষের স্বীকার করি। কিন্তু তুমি একটা কাজ করবে?

বৌদি সাগ্রহে কহিলেন, কি?

হিমাদ্রি বলিল, নীলিমাকে ছেড়ে থাকতে তোমার খুব কষ্ট হবে?

—ওমা, তা আবার হবে না। সমস্তক্ষণ ও ত আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। পায়ে পায়ে ফেরে।

—তবে এক কাজ কর, তুমি ওর সঙ্গে চল। মাস দুই পরে আমি তোমায় রেখে যাব।

বৌদি বলিলেন, তা—তা…

হিমাদ্রি বলিল, এই ত বৌদি হেরে গেলে! বলতে হয়, তোমার দাদাকে জিজ্ঞাসা করি। তা হলে আমারও মুখ বন্ধ হত, তোমারও ঠাট নষ্ট হত না।

যাইবার দিন নীলিমা বড়জাকে বলিল, বড়দি, এবার এলে কিন্তু লাইব্রেরী ঘরে শুতে দেবেন না।

বড়-জা আদর করিয়া বলিলেন, এবার থেকে রান্নাঘরে শুস্!

বলিয়া আদর করিয়া তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, আসছে বছর একটি সোনার চাঁদ না আনলে আড়ি হবে কিন্তু।

হিমাদ্রি বোধ হয় আড়াল হইতে কথাটা শুনিতে পাইয়াছিল, অদৃশ্য হইতে দৃশ্য হইয়া কহিল, [illegible]র কিছু [illegible] আড়ি করতে আমি দিচ্ছি নে। [illegible] করা সম্ভব হত না।

—

জ্যোৎস্না রাত বড় সুন্দর।

পৃথিবীর বিশালতম অরণ্যের পথে

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাজন নদীর উৎপত্তি-স্থানের জঙ্গলময় অঞ্চল দক্ষিণ-আমেরিকার মধ্যে এখনও অনেকাংশে অজ্ঞাত দেশ। দক্ষিণ-পশ্চিম ব্রেজিলের পারিমা নদী আজ পর্যান্ত অনেক শ্বেতকায় সভ্য মানুষ দেখে নাই। ১৯২৫ সালে এলেকজাণ্ডার রাইস্ ও তাঁর দল এরোপ্লেনে এই নদীর উৎপত্তি-স্থান আবিষ্কার

রিয়ো নিগ্রো : দূরে হাইড্রোপ্লেন, সম্মুখে তীরবর্ত্তী তরীর সাহায্যে অভিযাত্রী দল হাইড্রোপ্লেনে যাতায়াত করিতেন।

করিতে যাত্রা করেন। আকাশ হইতে তাঁরা নিম্নের আরণ্য ভূভাগের অনেকগুলি অতি সুন্দর ফটো লইয়াছিলেন।

জলপথে এই নদী বাহিয়া আসিবার চেষ্টা যে না হইয়াছিল তাহা নয়, কিন্তু তীরের অজ্ঞাত জঙ্গল ও বনবাসী অসভ্য হিংস্রস্বভাব ইণ্ডিয়ানদের জন্য পূর্ব্বের চেষ্টা প্রায়ই দুর্ঘটনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু ইণ্ডিয়ানদের বিষাক্ত তীর ৫০০০ ফুট উঁচুতে পৌঁছাইতে পারে না বলিয়া এবং আরও তাঁদের ভাগ্যে তাহা প্রকাশ পাইল। কিন্তু রাইস আকাশপথে এই অঞ্চল একটু বলিতে হইতেছে। এই ব. আমরা ডাঃ রাইসের সেক্রে-টারী কাপ্তেন ষ্টিভেন্সের লিখিত বিবরণ হইতে নিম্নোক্ত অংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

আমাদের যাত্রা যেদিন আরম্ভ হবে, তার আগের রাত্রে মানাওস্ সহরে একটা ছোটখাট বিদ্রোহ হয়ে গেল। একথা কে না জানে যে, দক্ষিণ-আমেরিকার রাজ্যগুলোতে বিদ্রোহ বার মাস লেগেই আছে, কিন্তু আমাদের রওনা হবার পূর্ব্ব রাত্রেই একটা বিদ্রোহ ঘটবে, এটা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

হোটেলের দরজা জানালা দুমদাম শব্দে চারিদিকে বন্ধ হতে লাগল। বাইরে যেন মনে হল বাজি পোড়ানো উৎসব চলছে। প্রথমটা আমরা তাই ভেবেছিলাম বটে, কিন্তু বন্দুকের গুলির শন্ শন্ আওয়াজ তো ভুল হবার নয়, জানালার কাছে যাব এমন সময় একজন হোটেলের ভৃত্য ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকে জানালা বন্ধ করতে গেল।

আমরা বললাম, এই রাখ, জানালা খোলা থাক্।

সে এমন কথা কখনও শোনে নি, তার চোখ কপালে উঠল। জানালা খোলা থাকবে কি! বাইরে যে বিদ্রোহ সুরু হয়েছে, গুলি চলছে!

দক্ষিণ-আমেরিকার ছোটখাট রাজ্যগুলির বিদ্রোহের কথা খবরের কাগজে চিরকাল পড়ে আসছি, এই প্রথম আমাদের সে বিদ্রোহ দর্শনের সুযোগ এসেছে। এ আমরা দেখবই। হোটেলের ভৃত্যকে বুঝিয়ে দিলাম।

লোকটা দুর্বোধ্য পর্টুগিজ ভাষায় হাত-পা নেড়ে কি বলতে বলতে বাইরে চলে গেল। জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখলাম। কলেরার মড়কের সময়ে সহরের রাস্তা-ঘাট যেমন জনশূন্য দেখা যায়, সহরের হয়েছে ঠিক সেই চেহারা।

হঠাৎ দেখি একটা লোক রাস্তা দিয়ে পাগলের মত দিশাহারা ভাবে ছুটছে। দেখে মনে হ'ল সে কোথাও লুকাবার জায়গা খুঁজছে—কারণ আমাদের জানালার আলো দেখে সে দৌড়ে আমাদের জানালার নীচে এসে দাঁড়াল। কিন্তু আমাদের জানালাটা তার হাতের নাগালের বাইরে। বুল্ ও আমি ঝুঁকে পড়ে তাকে লাফাতে বললাম। সে প্রাণপণে উঁচুদিকে একটা লাফ দিলে, আমরা দুজনে তাকে টেনে তুললাম। ঘরের মেঝেতে লোকটা শুয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।

সন্ধ্যার কিছু পরে বাজী পোড়ানো বন্ধ হ'ল, আমরা স্থির করলাম, সহরের অবস্থাটা একবার দেখেই আসা যাক। রাস্তা-ঘাট তখনও জনশূন্য, একটা রাস্তার মোড়ে একজন সৈনিক পাহারা দিচ্ছে।

আমরা তাকে বললাম—গুলিটা বেশীর ভাগ চলেছে কোথায়?

সে বললে—বড় স্কোয়ারে। স্কোয়ারের সামনের পুলিশ-ব্যারাক বন্দুকের গুলিতে ঝাঁঝরা করে ফেলেছে।

স্কোয়ারে হতাহতের সংখ্যা বহু। পুলিশ-ব্যারাক খালি, পুলিশের দল অনেক আগেই পালিয়েছে। দেখে শুনে হোটেলে প্রত্যাবর্ত্তন যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হ'ল, কারণ, গুলি আবার যে কোন মুহূর্ত্তে চলতে পারে।

পরদিন আমাদের ষ্টীমার ও হাইড্রোপ্লেন রিও-নিগ্রোর পথে রওনা হ'ল এবং তারপর ন'মাস ধরে আমরা পৃথিবীর বিশালতম অরণ্যের মধ্যে ভ্রমণ করেছি। সকালের ঠাণ্ডা হাওয়ার সুযোগ নেবার জন্য আমি ও হিণ্টন খুব ভোরেই আকাশে উঠলাম ও নদীর উপরে একশো মাইল পর্য্যন্ত উড়ে ফটোগ্রাফ ইত্যাদি নিলাম।

নদীটার নাম নিগ্রো দেওয়া ঠিকই হয়েছে বটে। নদীর জলের বর্ণ ঘনকৃষ্ণ। মানাওস সহর থেকে দুশো মাইল পর্য্যন্ত আমরা চললাম, সেখানে রিও ব্র্যাঙ্কা এসে মিশেছে রিও নিগ্রোর সঙ্গে। পূর্ব্বোক্ত নদীর জল দুধের মত শাদা, আমাদের মনে হ'ল কাল কফির পেয়ালায় যেন দুধ ঢালা হচ্ছে।

এইখানে হিণ্টন লক্ষ্য করলে, আমাদের হাইড্রোপ্লেনের অবস্থা ভাল নয়, মেরামত করতে হবে। শিরীষের আঠা, চট, মেহগনির তক্তা ও পেরেক আমাদের সঙ্গেই ছিল। হাইড্রোপ্লেন জলে নামিয়ে আমরা তাকে নদীর ধারের কর্দ্দ-

রিয়ো নিগ্রো ও আমাজন নদীর মিলন-স্থল: আকাশ-যান হইতে ফোটো তোলা হইয়াছে। নিগ্রো নদীর কৃষ্ণ-জল ও আমাজনের গৈরিক-জল গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের সৃষ্টি করিয়াছে।
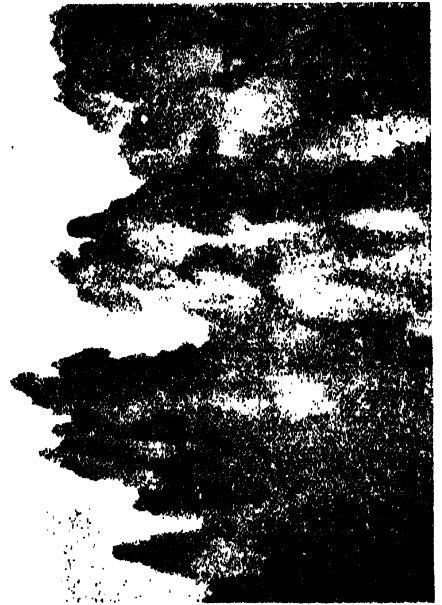
মাবৃত তীরে ঠেলে তুলে মেরামতের কাজে নিযুক্ত হ'লাম।

কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে কাজ করে কার সাধ্য? ব্রেজিলের জঙ্গলের যত মশা এসে আমাদের ছেঁকে ধরল। উপায় কি? দু'দিন কঠিন পরিশ্রম ও দুঃসহ কষ্টের মধ্য দিয়ে কোনক্রমে কাটল। যেদিন আমরা আবার আকাশে উড়লাম, সেদিনটা বড় মেঘলা। কিন্তু উষ্ণমণ্ডলের অসহ্য রৌদ্রতাপ মেঘে ঢেকে রেখে আমাদের উপকার ছাড়া অপকার কিছু করে নি। নতুবা জুলাই আগষ্ট মাসের গরম সহ্য করা সম্ভব হত না।

রাত্রিগুলি—বিশেষ করে জ্যোৎস্না রাত বড় সুন্দর।

মাথার উপরে নক্ষত্ররাশি বিজলী বাতির মত উজ্জ্বল। বৎসরের এই সময় ছায়াপথ ও 'সাদার্ণ ক্রশ' বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় আমাজন নদীর তীরবর্ত্তী অরণ্য সীমাহীন বিশাল পরীরাজ্যে পরিণত হতে দেখেছি, জগতের কোথাও অত সৌন্দর্য্য এক জায়গায় জড় হয় বলে আমার বিশ্বাস নেই।

নদীর কুলুকুলু শব্দ, অরণ্যের সুগন্ধ, বনমধ্যে বানরদলের উচ্চ চীৎকারশব্দ—সবটা মিলিয়ে বনের সৌন্দর্য্যকে বাড়িয়েছে।

আদিম মায়নগঙ্ (Mayongong) ইণ্ডিয়ান: বিশাল তীর-ধনু রামায়ণ-মহাভারতের যুগের কথা স্মরণে আনে।

এই গভীর জঙ্গলের মাঝে মাঝে যে আবার গ্রাম আছে, এবং সেখানে লোক বাস করে তা কে জানত? ঐ সব গ্রামের লোক খবর পেয়েছে যে, আমাদের দলের অধ্যক্ষ একজন ডাক্তার। দলে দলে লোক আসতে লাগল, তার মধ্যে ইণ্ডিয়ানই বেশী, পর্টুগিজও আছে। কারো চোখের অসুখ, কারো বা দাঁতের, কারো কাণের, কারো জ্বর—আরও অনেক রকমের।

এ জঙ্গলের মধ্যে ডাক্তার কোথায় যে, এই সব দরিদ্র লোক তার সাহায্য পাবে! দুশো মাইল দূরে মানওস্ সহরে ক'জন গিয়ে চিকিৎসা করাতে পারে? কিন্তু আমরা সঙ্গে বেশী ঔষধপত্র আনি নি, কারণ জঙ্গলের মধ্যে হাঁসপাতাল খুলবার উদ্দেশ্য গোড়ায় আমাদের ছিল না অনেক রোগীকেই নিরাশ হয়ে ফিরতে হ'ল।

খাবার জিনিস বহন করে নিয়ে যাওয়ার ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচবার জন্য আমরা যে স্থান দিয়ে যেতাম, সেখান থেকে খাবার সংগ্রহ করতাম। ওদেশের লোকের সাধারণতঃ খাদ্য—ময়দা, মাংস ও মাছ। নদীর ধারের জঙ্গলে কমলা লেবু, আনারস ও কলা বন্য অবস্থায় পাওয়া যায়; লোকালয়ে চাষ করলে ফল যেমন মিষ্ট হয়, প্রায় তেমনি খেতে লাগে।

নানা জাতীয় মাছ নদীতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে এক ধরণের মাছ আছে, তারা মানুষের মাংস খায়। এদের জন্য নদীতে সাঁতার দেওয়া বড়ই বিপজ্জনক। মানুষের গায়ের গন্ধ পেলেই তারা ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসবে, এদের দাঁত ক্ষুরের মত ধারালো, অল্পক্ষণের মধ্যে মাংস কেটে হাড় বের করে ফেলবে, এমনি এদের দাঁতের জোর। অনেক সময়ে নৌকা থেকে জলে হাত বাড়ানো মুস্কিল, কুট করে আঙুলটী কেটে নিয়ে যাবে।

শীঘ্রই বিপদ এল রোগের মূর্ত্তি ধরে।

ট্রপিক্যাল জঙ্গলে যাওয়ার বিপদ আমরা জানতাম; খুব ভাল মশারি, দৈনিক ৫ গ্রেণ কুইনিন্ ব্যবহার করা সত্ত্বেও সকলেই ম্যালেরিয়ায় পড়লাম। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে আমাদের দলের অন্যতম নেতা ডাঃ কক্-গ্রুন্‌বার্গ দশ দিনের জ্বরে মারা গেলেন।

তাঁবুতে তখন সকলের জ্বর, এরোপ্লেনের পাইলট্, বেতার-চালক, দুই সার্ভেয়ার, রাঁধুনী ও দুজন চাকর জ্বরে বেহুঁস। ষ্টীমারের এঞ্জিনিয়ার ও মিস্ত্রিও ক্রমে পড়ল জ্বরে। কেউ আর ওঠে না, আমরা জন দুই কেবল ভাল আছি, সেই জঙ্গলের মধ্যে কোথা থেকে বা অত ঔষধ পাই, রোগীর পথ্যই বা আসে কোথা থেকে? আমি নিজে অনেক দিন পর্য্যন্ত ভাল ছিলাম, অক্টোবর মাসে আমারও জ্বর হ'ল।

জ্বরকে দূর করে দিলাম, মরিয়া হয়ে ১৫০ গ্রেণ কুইনিন্ তিন দিনের মধ্যে খেয়ে ফেলে।

হিণ্টন্ যদি বা সেরে উঠল, তার শরীর এমন দুর্ব্বল ও জ্বরপ্রবণ হয়ে পড়ল যে, এরোপ্লেনে হাজার চারেক ফুট উপরে উঠলেই ওর জ্বর আসবে, যদিও সেখানে ঠাণ্ডা মোটে ৫৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট্। তাকে দিয়ে এরোপ্লেন চালান অসম্ভব হয়ে উঠল, অনেক সময় এরোপ্লেন চালাতে চালাতেই তার জ্বর আসে।

অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি আমরা বোয়া ভিষ্টা বলে একটা ছোট সহরে পৌছুলাম। সহরটায় লোকসংখ্যা চার পাঁচশ'র বেশী নয়, তবে উঁচু জায়গায় অবস্থিত বলে ম্যালেরিয়া জ্বর নেই। সহরের পিছনেই একটা দীর্ঘ শৈল-মালার সুরু, আমাজন ও নিগ্রো নদীর একঘেয়ে সমতল ভূমির জঙ্গলের দৃশ্যে ক্লান্ত চোখ এই শৈলশ্রেণীর প্রথম সন্দর্শনে যেন জুড়িয়ে গেল।

বোয়া ভিষ্টা সহরে আমরা কিছুদিন বিশ্রাম করে জ্বরের পরে বল সঞ্চয় করলাম এবং হাইড্রোপ্লেনটাও মেরামত করে নিলাম।

ওই সহরে পাঁচ জন মিশনারী নিজের হাতে হাঁসপাতাল গড়ছে। এরা সকলেই এসেছে ইউনাইটেড ষ্টেট্স্ থেকে। বোয়া ভিষ্টা সহরের এই প্রথম হাঁসপাতাল।

তিন মাস আমরা এই ছোট সহরকে কেন্দ্র করে বহু দূর উড়ে বেড়ালাম ও বোয়া এস্পারান্সা থেকে ইউরারিসোরা পর্য্যন্ত সমস্ত জঙ্গলটার ফটো নিলাম। বোয়া এস্পারান্সা আর একটা ছোট সহর, বোয়া ভিষ্টা থেকে ১৭০ মাইল দূরে। এর পরে জঙ্গল আরও ঘন, ওপথে সভ্য লোকে বেশী যাতায়াত করেনি, মোটরের তেল ও পেট্রল পাবার কোন উপায় নেই এক বোয়া এস্পারান্সা ছাড়া।

একদিন সকালে সাড়ে ছটার সময়ে বোয়া এস্পারান্সা ছেড়ে আমরা জঙ্গলের দিকে উড়লাম—কি ভীষণ জঙ্গল সুরু হয়েছে এর পরে! জঙ্গল আরও ভয়ানক বলে বোধ হতে লাগল এই জন্য যে, নীচের দিকে চেয়ে দেখি, বিপদে পড়লে হাইড্রোপ্লেন নদীর জলে নামানো যাবে না, নদীর জল ক্রমাগত উপর থেকে নীচের দিকে নামছে—এত প্রখর স্রোতে হাইড্রোপ্লেন এক দণ্ডও টিক্‌বে না। নব্বই মাইল ধরে নদী কেবল ধাপে ধাপে নেমে চলেছে, স্থির জল কোথাও চোখে পড়ে না।

আমাদের নীচে সবুজের সমুদ্র, কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু, আকাশের মত উপর থেকে সত্যই সমুদ্রের মত মনে হয়—বহুদূরে একটা নীলকৃষ্ণ পর্ব্বতমালার অস্পষ্ট উপকূল।

পারিমা নদীর তীরে আদিম অধিবাসীদিগের কুটির। বহু কষ্টে ঘন অরণ্যমধ্যে এই কুটিরের সন্ধান মিলিয়াছিল। আকাশ-যান ব্যতীত ইহার সন্ধান পাওয়া সম্ভব ছিল না।

জঙ্গলের মধ্যে তালজাতীয় গাছগুলোর মাথা যেন জলের মধ্যে সন্তরণশীল তারামাছের (starfish) মত দেখাচ্ছিল। নদীর নানা শাখা ও খাড়ি জঙ্গলের এদিকে ওদিকে চলে গিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়েছে, লক্ষ্য করে দেখা গেল, এই সব খাড়ির ধারেই তালগাছ বেশী।

এক জায়গায় জঙ্গলের মধ্যে নদী দুভাগে ভাগ হয়ে আবার সামনে এসে মিলেছে, নদীর দুই ধারার মধ্যবর্ত্তী দ্বীপটীতে জঙ্গল অত্যন্ত ঘন, দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে নদীর দুই ধারা আবার জুড়ে এক হয়ে গিয়েছে ও পরবর্ত্তী কয়েক মাইলের মধ্যে তিনবার নেমে গিয়েছে। সব শুদ্ধ এই তিন জায়গায় নেমেছে ৮০ ফুট। এ থেকেই বোঝা যাবে নদীর চেহারা

এখানে কি ভীষণ। যেমন স্রোত, তেমনি আবর্ত্ত।

আমরা তো হাইড্রোপ্লেনে ত্রিশ মিনিটের মধ্যে এর উপর দিয়ে উড়ে গেলাম, আমাদের খাদ্যসম্ভার নিয়ে আসছিল যে দুখানা নৌকা বোয়া ভিষ্টা থেকে—এই জায়গাটুকু পার হতে তাদের লাগল পাঁচ দিন, মারাকা দ্বীপ এবং ঐ তিনটে 'র‍্যাপিড' (rapid) পার হয়ে নদীর চেহারা সমানই ভয়ঙ্কর। মাঝে মাঝে ছোটখাট প্রস্তরময় দ্বীপ, তাদের মধ্যে খরস্রোতা নদী ভীম মূর্ত্তি ধরে ঘোর আবর্ত্ত সৃষ্টি করে বইছে। সে নদীতে নৌকা চালানো মানে মৃত্যুকে বরণ করা। এমন কি স্থানীয় অসভ্য ইণ্ডিয়ানরা পর্য্যন্ত এই সব জায়গায় ভেলা চালায় না—স্বেচ্ছায় কে এই মৃত্যুর ফাঁদে পা দেবে ?

তিন ঘণ্টা কুড়ি মিনিট ধরে অনবরত আকাশপথে উড়ে বেড়ালাম, নীচে কোথাও একটা মানুষ চোখে পড়ল না। আমরা বোয়াভিষ্টা সহরে ফিরে আসতে বাধ্য হলাম, কারণ গ্যাসোলিন ও খাবারের ভাণ্ডার ফুরিয়ে এসেছে, তা ছাড়া নদীর যা দৃশ্য দেখেছি, তাতে আকাশপথে উড়ে ও পথে যাওয়াও যে খুব নিরাপদ, তা নয়। যদি এঞ্জিন অচল হয়, তবেই সর্ব্বনাশ! সেই ফেনোচ্ছল আবর্ত্তের মধ্যে হাইড্রোপ্লেন নামালে চোখের নিমেষে সেটা ঘূরপাক খেতে খেতে খানচাল হয়ে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, ওর একটুকরো কাঠের সন্ধানও পাওয়া যাবে না।

জানুয়ারী মাসে ইউরারিসোরা নদীর ওপার দিয়ে আমরা দক্ষিণ-পূর্ব্ব মুখে হাইড্রোপ্লেন চালাই। বড় বিপদে পড়তে হয়েছিল এবার। ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে আমরা পূর্ব্বেই ব্যবস্থা করেছিলাম, কুলিকুলিনা বলে একটা ছোট দ্বীপে নেমে সেখানকার একটা অদ্ভুতদর্শন পাহাড়ের ফটো নেব। হিন্টন হাইড্রোপ্লেনটা নামিয়ে দিলেও ভাল, তার পর সেটাকে জলের উপর দিয়ে দ্বীপের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, হঠাৎ মচ্ করে কি একটা শব্দ হল। তখন হাইড্রোপ্লেন বাঁ কাতে মাতালের মত ঝুঁকে পড়ল।

হিন্টন্ বলে উঠল—গেল!

আমি বললাম কি হ'ল, দেখ আগে।

সে ভীষণ স্রোতের মধ্যে দেখার কোন উপায় ছিল না, কিন্তু মুখের বিরাম, হাইড্রোপ্লেন নিজেকে নিজে একটু সামলে নিতেই হিন্টন এঞ্জিন বন্ধ করে দিলে।

একটা মগ্ন শৈলে এসে ঠেকেছে আমাদের যন্ত্রটা।

হিন্টন বললে—হাইড্রোপ্লেনের তলা চিরে জল উঠছে, এ অবস্থায় যদি ওকে ডাঙ্গায় নিয়ে যাই, এই নির্জ্জন জঙ্গলের মধ্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে কয়েক সপ্তাহ। এখানে প্লেন সারান একরকম অসম্ভব। চল এই অবস্থায় উড়ে বোয়া এস্পারানসাতে যাওয়া যাক্।

তখনই আমরা জল ছেড়ে আকাশপথে উঠলাম। কিন্তু ভাঙা হাইড্রোপ্লেনে দেড় শো মাইল দূরবর্ত্তী বোয়া এস্পারানসা পর্য্যন্ত আমরা নিরাপদে পৌছুতে পারব কি না তা গুরুতর সন্দেহের বিষয়। এদিকে বিকেল হয়ে এসেছে, সূর্য্যাস্তের বিলম্ব নেই বেশী, বেলা থাকতে গন্তব্য স্থানে পৌছান দরকার, নতুবা পথে বিপদ আছে।

যা ভয় করা গিয়েছিল, ঘটলও তাই।

মারাকা দ্বীপের উপর দিয়ে যখন আমরা যাচ্ছি, তখন সূর্য্য অস্ত গেল, নদীর উত্তর খাড়ির পথ ধরে হিন্টন পুরোবেগে প্লেন চালালে, কিন্তু এসব দেশে সূর্য্যাস্তের পরেই অন্ধকার নামে। আমরা শীঘ্রই বুঝলাম, অবিলম্বে প্লেন নীচে না নামালে সম্মুখের কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির অন্ধকারে অজানা জঙ্গলের উপর দিয়ে ওড়া যাবে না, কোথায় যেতে কোথায় গিয়ে পড়ব।

নীচে তিনটী দ্বীপ দেখা গেল। মাঝের দ্বীপটাতে একটা বালির চড়া। আমরা ঠিক করলাম প্লেন নামাবার পক্ষে এর চেয়ে নিরাপদ স্থান আর মিলবে না। হিন্টন সুকৌশলে ঠিক সেই বালির চড়ার সঙ্গে নদীর জলে প্লেন নামালে। তারপর তাকে চড়ার কাছে নিয়ে আসা গেল।

সেই নির্জ্জন দ্বীপের মধ্যে আমাদের এগার দিন কেটে গেল।

দ্বীপটা ঘন জঙ্গলে ভরা ও সম্পূর্ণ জনহীন। মাইল খানেক লম্বা ও সিকি মাইল চওড়া হবে। একটা জায়গা বেছে নিয়ে সেখানে দুটো গাছের মধ্যে একটা দড়ি টাঙিয়ে তার উপর একটুকরা চট বিছিয়ে তাঁবু খাটান হল। তারই নীচে আমাদের দোলনার মত ঝোলান দড়ির শয্যা টাঙিয়ে নিলাম। এসব জঙ্গলে সকলেই এই দোলনার মত শয্যা করে, মাটীতে কেউ শোয় না।

এ জঙ্গলে মাটীতে শোবার বিপদ যে কত ধরণের, তার সংখ্যা হয় না। উই, জোঁক, মশা, ডাঁশ তো আছে, তা

বাদে আছে হরেক রকমের সাপ—বিষাক্ত ও নির্ব্বিষ, ছোট ও বড় গাছ থেকে সাপ পড়তে পারে, এ জন্য ঝোলান শয্যার উপরে একটা আচ্ছাদন থাকা নিরাপদ।

একদিন একটা ডোঙায় চারজন ইণ্ডিয়ান নদী বেয়ে যেতে যেতে আমাদের তাঁবুর ধোঁয়া দেখে সেখানে এল। তারা সকলেই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ব্যবহারও বেশ নম্র। আমরা লক্ষ্য করলাম, তাদের কাছে কোন ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্য নেই; জঙ্গলজাত দ্রব্যে তাদের সকল অভাব পূর্ণ করেছে।

আমাদের হাইড্রোপ্লেন দেখে তারা খুব বেশী আশ্চর্য্য হল না। আমরা অসভ্য জাতিদের মধ্যে বহুদিন ভ্রমণের অভিজ্ঞতার ফলে এটা বুঝতে পেরেছি যে, বিস্ময় জিনিষটা অপরিণত মনের পক্ষে সুলভ নয়। ওরা ভাবলে আমাদের মত শ্বেতকায় মানুষে যে আকাশপথে উড়ে বেড়াবে, এটা আর বেশী কথা কি? যাদের গায়ের চামড়া শাদা, তাদের পক্ষে সবই সম্ভব।

আমরা দেখলাম ওদের গায়ে ডাঁশ বা মশা কামড়াবার দাগ নেই, বোধ হয় চিনি বা লবণ ব্যবহার না করার দরুণ ওদের রক্ত এমন ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়েছে যে, মশামাছির তা স্বাদু বলে মনে হয় না।

একদিন হিণ্টন তার সার্টটা দড়ির উপর ঝুলিয়ে রেখে ছিল। সকালে উঠে সার্ট গায়ে দেবার জন্যে দড়ি থেকে যেমন তুলতে গিয়েছে, অমনি টুকরা টুকরা হয়ে খসে পড়ে গেল। রাতারাতি উইয়ে সেটাকে শেষ করে রেখেছে। ব্রেজিলের জঙ্গলের মত এত পোকামাকড়ের দৌরাত্ম্য কোথাও দেখিনি।

পিঁপড়ে আর উই যে কত রকমের তার সংখ্যা হয় না। কালো পিঁপড়ে, লাল পিঁপড়ে, ছোট ছোট পিঁপড়ে, বড় বড় পিঁপড়ে। তাদের সর্ব্বত্র অবাধ গতি এবং সব জিনিস তারা খেয়ে ফেলবে। জঙ্গলের হিংস্র জানোয়ারের চেয়েও তারা মানুষের বেশী শত্রু। উইও নানা জাতীয়, আমাদের হাইড্রোপ্লেনের মেহগনি কাঠের অংশটুকু কোন্ কালে তারা খেয়ে সাবাড় করে ফেলত, কিন্তু ওর উপর রং করা ছিল বলেই শুধু পারে নি।

এগার দিন পরে হাইড্রোপ্লেন মেরামত করে আমরা বোয়া এস্‌পারানসা অভিমুখে উড়লাম। শেষের তিন চার দিন আমাদের তাঁবুতে খাদ্যদ্রব্য ফুরিয়ে গিয়েছিল, চিনি ছিল না, নুন ছিল না। আমি ও হিণ্টন নদীতে মাছ ধরতাম ও তাই পুড়িয়ে, কি সিদ্ধ করে বিনা লবণে খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হ'ত।

পথে যেতে যেতে নীচের দিকে চেয়ে দেখি, আমাদের বিপদ অনুমান করে বোয়া এস্‌পারানসা থেকে একটা দল ডোঙায় ও নৌকাতে আমাদের সন্ধানে নদী বেয়ে চলেছে। সহরে পৌঁছেই আমি ওদের খবর দিতে রওনা হই ডোঙায় চেপে, কারণ ওরা আমাদের দেখতে পেয়েছে কি না বোঝা গেল না। একটু পরে হাইড্রোপ্লেনের মোটরের আওয়াজ শুনে চেয়ে দেখি, হিণ্টন আবার কোথায় চলেছে। হিণ্টন আমাদের দেখে টিনের কৌটার মধ্যে আমাদের কি খবর পাঠালে, সে কৌটা জলে পড়ে খরস্রোতে কোথায় ভেসে

আদিম ইণ্ডিয়ানের শিশু: পারিমা তীরে।

গেল, আমি ও আমার ইণ্ডিয়ান কুলীরা খুঁজে বার করতে পারলাম না। পরে শুনলাম, উইলিয়ামসন বলে আমাদের দলের একজন ছোকরা আর্টিষ্টকে সঙ্গে নিয়ে হিণ্টন একটু বেড়াতে বার হয়েছিল। সেই বেড়ানোর জের মিটল এক মাস পরে। হাইড্রোপ্লেনের এঞ্জিন খারাপ হয়ে কোথায় কোন্ জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে অচল হয়ে পড়ল। হিণ্টন ও উইলিয়ামসনের কোন পাত্তাই নেই। অনেক কষ্টে তাদের খুঁজে বার করা হল। হাইড্রোপ্লেন সেই জঙ্গলে মেরামত করা হল। তবে এক মাস পরে ওরা ভ্রমণ শেষ করে তাঁবুতে ফেরে।

কর্ণেল জাঁতিল

—শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

"এই বলিয়া আমি তাঁহাকে ইংরাজ সেনাপতির নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া বন্দীদিগের মধ্য হইতে দুইজন ব্যক্তিকে পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিলাম। এমন সময়ে সমার আসিয়া উপস্থিত হইল। নবাব তাহাকে নিকটে বসিতে বলিয়া আমাকে কক্ষত্যাগ করিবার আদেশ দিলেন এবং বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে জানাইলেন যে, সায়ংকালীন দরবারে আমার উপস্থিতির আর প্রয়োজন নাই। শিবির হইতে আমি বাহির হইবার অল্প পরে সমারও উঠিল এবং বন্দীদিগকে হত্যা করিবার আয়োজনার্থ বাহিরে গেল।" মীরকাসিমের সেনাদলে শাতো (Chateau) নামক একজন ফরাসী সার্জেন্ট ছিল। সমরু তাহাকে উক্ত কার্য্যের ভার দিতে চাহিলেও ঐ ব্যক্তি অসম্মত হইল, কহিল, "ফরাসী হিসাবে আমি ইংরাজদিগের শত্রু বটে, কিন্তু আমি তাহাদের জল্লাদ হইতে চাহি না।" তাহাকে বন্দী করিয়া সমরু নিজেই সকল আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল। পরে সমরু-প্রসঙ্গে হত্যাকাণ্ডের বিবরণ প্রদত্ত হইবে। জাঁতিলের মতে এলিসের ঔদ্ধত্য এবং তৎকৃত অপমান নবাব কখনও বিস্মৃত হন নাই এবং তৎপ্রতি ঘৃণাই তাঁহাকে ঐ নিষ্ঠুর কার্য্য করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল। নবাব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আমার রাজ্য গেল বটে, কিন্তু আমার পতনে আমার শত্রুরা আর আনন্দ করিতে পারিবে না; কারণ তৎপূর্ব্বেই আমি তাহাদিগকে ইহলোক হইতে বিদায় লওয়াইব।" জাঁতিল এই বলিয়া নিজের মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, বন্দিগণের হত্যাব্যাপারে তাঁহার কোন হাত ছিল না এবং উহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বসমেত পাঁচজন ইংরাজ ও একজন জর্ম্মান বন্দীর প্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন। উহাদের মধ্যে তিনজন নবাবের মুঙ্গের পরিত্যাগের পূর্ব্বে ও অপর তিনজন পাটনা গমনকালে পথিমধ্যে ধৃত হইয়াছিল। জাঁতিল উহাদের সকলকে ফরাসী বলিয়া পরিচয় দিয়া নবাবের নিকট তাহাদের মুক্তি ভিক্ষা করিয়াছিলেন। সভাসদগণের মধ্যে কেহ কেহ ঐ কথায় সন্দেহ প্রকাশ করিলে নবাব জাঁতিলের মুখের কথাই যথেষ্ট, অপর স্বতন্ত্র প্রমাণ অনাবশ্যক বলিয়া তাহাদের মুক্তি দিয়াছিলেন।

অতঃপর মীরকাসিম পাটনা পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমে অযোধ্যারাজ্যাভিমুখে পলায়ন করিলেন। তিনি হতাশ হইয়া দেশ ত্যাগ করেন নাই। বাদসাহ ও নবাব-উজীরের সাহায্য লইয়া পুনরায় প্রতিপক্ষের সহিত বলপরীক্ষা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। নিজ রাজ্যমধ্যে দাঁড়াইবার স্থান থাকিলে তিনি কখনই বাহিরে যাইতেন না। সাহ তাঁহার পক্ষ লইয়া ইংরাজদিগের সহিত বিরোধে লিপ্ত হইতে একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। সে বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু অযোধ্যাধিপতির জন্য তাঁহাকে ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল। ইংরাজরা সুজাউদ্দৌলাকে মীরকাসিমকে সাহায্য করিতে নিষেধ করিলেও তিনি তাহাতে কর্ণপাৎ করিলেন না, বরং পলাতক নবাবকে তৎক্ষণাৎ তাঁহার রাজ্যমধ্যে আশ্রয় লইবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। তখন কর্ম্মনাশা নদী উত্তীর্ণ হইয়া মীরকাসিম অযোধ্যাধিপতির অন্যতম প্রধান সামন্ত-নরপতি কাশীরাজ বলবন্তসিংহের রাজ্যমধ্যে আশ্রয় লইলেন। প্রভুর আদেশে তিনি রাজ-অতিথিকে পরম সমাদর প্রদর্শন করিলেন। বারাণসী হইতে মীরকাসিম সাহ আলম ও সুজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে এলাহাবাদ গমন করিয়াছিলেন। প্রকাশ্য দরবারে তিন মুসলমান নরপতির মিলনসংবাদে ইংরাজেরা প্রমাদ গণিলেন। এই সময়ে মীরজাফর স্বীয় সুপরিজ্ঞাত ষড়যন্ত্রবিদ্যার সাহায্যে সুহৃদ্‌গণের উপকারসাধনের জন্য মিত্রভেদকার্য্যে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। সুজাউদ্দৌলা প্রধান মন্ত্রী বেণী বাহাদুরের সহিত পরামর্শ না করিয়াই মীরকাসিমের পক্ষাবলম্বন করায় মন্ত্রিমহাশয়ের তাঁহার প্রতি জাতক্রোধ হইয়াছিল। ইংরাজদিগের পরম অনুগত রাজা সিতাব রায় এই সময় অযোধ্যা-দরবারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, আমাত্যবরের তিনি দক্ষিণহস্ত স্থানীয় ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার সাহায্যে

মীরজাফর ও ইংরাজরা সাহ আলমকে নিজেদের পক্ষে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এদিকে মীরকাসিমও বাদসাহ, নবাব-উজীর এবং তাঁহাদের পাত্রমিত্রগণকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত মুক্তহস্তে অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করিলেন না। অনুপস্থিত প্রতিপক্ষের আশ্বাস অপেক্ষা অর্থের মোহিনী শক্তিই অধিকতর কার্য্যকরী হইল। দরবারে তাঁহার দলই প্রবল হইল। তদ্ভিন্ন বুন্দেলখণ্ডে বিদ্রোহ-দমনভার স্বহস্তে লইয়া স্বল্পকালমধ্যে তাহাতে সাফল্য লাভ করার ফলে তাঁহার প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি পাইল। এবার আর বাদসাহ ও উজীরের কিছু বলিবার ছিল না। মহা-সমারোহে নৃপতিত্রয় যুদ্ধযাত্রা করিলেন। সৈন্যদলের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ মীরকাসিম সুজাকে প্রতিমাসে ১১ লক্ষ টাকা দিবেন স্থির হইল। ক্রমে গঙ্গা ও কর্ম্মনাশা নদী অতিক্রম করিয়া নবাবীফৌজ বিহার প্রদেশে প্রবেশ করিল। রসদ অভাবে ইংরাজসেনার তখন শোচনীয় অবস্থা। মেজর কার্ণাক প্রবল শত্রুসেনার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহস না করিয়া পশ্চাদ্‌পদ হইলেন। মহোৎসাহে নবাবীসেনা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিল; আবার সমগ্র পশ্চিম-বিহার মীরকাসিমের করায়ত্ত হইল। তাঁহারা অতঃপর পাটনা অবরোধে প্রবৃত্ত হইলেন। একমাস কাল অবরোধের পর তেসরা মে ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে সুজা দুর্গ আক্রমণ করিয়া অধিকারের চেষ্টা করিলেন। কথিত আছে, সমরু এই যুদ্ধে আক্রমণকারী সেনাদল পরিচালন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হইল না। স্বয়ং সুজা যুদ্ধে আহত হইয়াছিলেন। ইংরাজ পক্ষে গোরাদের অপেক্ষা সিপাহীরাই সমধিক সাহস ও পরাক্রম দেখাইয়াছিল। ফলতঃ তাহারাই এযুদ্ধে কোম্পানীর মান ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। জাঁতিল বলেন যে, ঈর্ষ্যা-পরায়ণ কুচক্রী বেণী বাহাদুর গোপনে নবাবের একজন সেনানায়ককে পাটনা অধিকারে তৎপর হইতে নিষেধ করার জন্যই ইংরাজসেনা আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিল।

অতঃপর সম্মিলিত সৈন্যদল বক্সারে ফিরিয়া গিয়া বর্ষাবাস করিল। সমরনিবৃত্তিজাত অবসরকালে শিবির মধ্যে গোল-যোগ বিশৃঙ্খলার অবসর রহিল না। তিনজন নরপতির সমাবেশ সুখের হইবার কথা নহে; সকলকারই পাত্রমিত্র অনুচর ছিল;—ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ, ষড়যন্ত্র, মিথ্যানিন্দা, মনো-মালিন্যের অবধি ছিল না। মীরকাসিমের অধঃপতন ইতি পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছিল; এক্ষণে অদৃষ্টচক্রের দ্রুত আবর্ত্তনে কোন বাধা রহিল না। তাঁহার অনুচরবৃন্দ একে একে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া নূতন প্রভুর—মীরজাফর ও সুজাউদ্দৌলার মনোরঞ্জনে যত্নবান্ হইল। কোষাধ্যক্ষ মীর-সোলেমান রাজকোষসহ উজীরের আশ্রয় লইলেন। ইহার জন্য মীরকাসিম সুজার নিকট প্রতিকারকামী হইলে তিনি তাঁহাকেই দেয় অর্থের জন্য পীড়ন আরম্ভ করিলেন। অর্থাভাবে মীরকাসিম নিজ হাতে গড়া সৈন্যদলকে বিদায় দিতে বাধ্য হই-লেন। জাঁতিল ও সমরু উভয়েই এই সময় তাঁহাকে পরিত্যাগ

বেগম সমরু।

করিয়া অযোধ্যাপতির কর্ম্মে প্রবেশ করেন। ভাগ্য-পরীক্ষার নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে গমন করিলেও জাঁতিল কিন্তু পুরাতন সুহৃদ্ ও সহকর্ম্মিগণকে বিস্মৃত হন নাই; বরং আপদকালে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে "মুৎ-ক্ষরিণ"কার গোলাম হোসেন বলিয়াছেন— "সমরু সসৈন্যে সুজার আশ্রয় লইবার অল্প পরে রজনীর অন্ধ-কারে গোপনে মুশীর জেন্টিল মীরকাসিমের প্রধান মন্ত্রী আলি ইব্রাহিম খাঁর নিকটে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে এবম্প্রকার পরামর্শ দিয়াছিলেন। এই ফরাসী ভদ্রলোক ইতিপূর্ব্বে মীরকাসিমের কর্ম্ম হইতে বরখাস্ত হইয়া এ যাবৎ উজীরের নিকট থাকিলেও আলি ইব্রাহিম খাঁর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ়

শ্রদ্ধা ছিল। তিনি বলিলেন, কাল উজীরের সৈন্যেরা মীরকাসিমকে বন্দী করিতে আসিবে। তখন নিঃসন্দেহে একটা ভয়ানক গোলযোগ হইবে। আপনাদের অদৃষ্টে যে কি আছে তাহা ভগবানই জানেন। এই ছয়জন ফরাসী সৈনিককে আপনার কাছে রাখুন। উহাদের দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে, ততক্ষণ কোন দেশীয় ব্যক্তি আপনাদের স্পর্শও যে করিতে পারিবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। তাঁহার এই আদর্শস্থানীয় বন্ধুত্ব ও ভদ্রতার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া আলি ইব্রাহিম খাঁ প্রস্তাবিত সাহায্য লইতে নিজ অক্ষমতা জানাইলেন, বলিলেন, যেখানে তাঁহার প্রভুর বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে, সেখানে বন্ধুদের আশ্রয়ের অন্তরালে নিজে নিরাপদ থাকা তাঁহার পক্ষে সঙ্গত হইবে না। পরদিবস প্রাতঃকালে নয় ঘটিকার সময় উজীরের শিবির হইতে একদল সৈন্য অশ্বারোহণ করিয়া মীরকাসিমের পটমণ্ডপ অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল। তাহাদের আগমনের পূর্ব্বেই মুশীর জেন্টিলও নিজ তেলিঙ্গাদল হইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কতকগুলি সৈনিক ছিল এবং তিনি পূর্ব্বরাত্রির প্রার্থনা পুনরাবৃত্ত করিয়াছিলেন। আলি ইব্রাহিম খাঁও পূর্ব্ববৎ প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন। ইহাতে উক্ত ফরাসী সৈনিক অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে নিজ অনুচরগণ সহ প্রস্থান করিয়াছিলেন। সেই মুহূর্ত্তে উজীরের সৈন্যেরা আসিয়া পৌঁছিল এবং মীরকাসিমের শিবির পরিবেষ্টন করিয়া তাহারা জেনানা মহল এবং দফতরখানার সর্ব্বত্র প্রহরী স্থাপন করিল। তাহাদের অধিনায়ক মীরকাসিমের শিবিরে গিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ঐ উদ্দেশ্যে আনীত একটি হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া স্বয়ং তাঁহার পশ্চাতে হাওদায় আসন পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সওয়ারদিগকে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিবার আদেশ দিয়া তিনি নবাবকে বন্দী করিয়া উজীরের শিবিরে লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে তাঁহাকে আটক করিয়া রাখা হইয়াছিল। পর দিবস আলি ইব্রাহিম খাঁকে উজীরের দরবার-গৃহে আনা হইয়াছিল। সেখানে তখন বেণী বাহাদুর, সুজাকুলি খাঁ, মুশীর জেন্টিল এবং ইয়াকুব খাঁ মণ্ডলাকারে উপবিষ্ট ছিলেন। মুশীর জেন্টিল তাঁহাকে দেখিবা মাত্র সম্মান দেখাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। একজন বিদেশীর নিকট ভদ্রতাজ্ঞানে পরাস্ত হইয়া অপর সকলে লজ্জিত হইয়াছিলেন। তাঁহারাও উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং খাঁ সাহেবকে সসম্মানে নিজেদের মধ্যে বসাইয়াছিলেন।" *

বর্ষাপগমে ইংরাজ সেনাপতি মেজর হেক্টর মনরো যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। ২৩শে অক্টোবর ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে বক্সারে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হইল। এই যুদ্ধে সমরু ও মাদেক সুজার বাহিনীর দক্ষিণ প্রান্ত পরিচালনা করেন এবং জাঁতিল তাঁহার এডিকংরূপে রণভূমে উপস্থিত ছিলেন। বিজয়লক্ষ্মী প্রথমটায় সুজাকেই বরণ করিবেন বলিয়াই মনে হইয়াছিল। তাঁহার সুদক্ষ সেনানায়ক ঈশা খাঁর বীরত্বে শত্রুসেনা বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। পরে সমরু ও মাদেক-প্রসঙ্গে বক্সার-যুদ্ধের উল্লেখ আবার করিতে হইবে, সে কারণ এখানে সকল কথা সবিস্তারে বলিবার প্রয়োজন নাই; শুধু জাঁতিলের আত্মকাহিনী হইতে একাংশ উদ্ধৃত করা গেল :—"ভীষণ লোকক্ষয়কর যুদ্ধের পর ইংরাজ সেনা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছিল। তাহাদের গোলাবারুদ, রসদাদি, টাকার বাক্স সবই হাতছাড়া হইয়া গিয়াছিল। হতাশ হইয়া মনরো তাঁহার নৌকাগুলিকে যুদ্ধক্ষেত্রের যতখানি সম্ভব নিকটে আনিবার আদেশ দিয়াছিলেন, কারণ জলপথ ভিন্ন ইংরাজ-সেনার পলায়নের অন্য উপায় ছিল না। যখন এই সকল আদেশমত ব্যবস্থা হইতেছিল, তখন মোগল সৈন্যদল বিপক্ষের শিবিরলুণ্ঠনে ব্যাপৃত ছিল। এমন সময় মনরো একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবার উদ্দেশ্যে বেণী বাহাদুরের দলের উপর নিপতিত হইয়াছিলেন। উহারা তৎক্ষণাৎ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল, লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া মোগল সেনার একাংশ উহাদের সহিত পলাইল।" এমন সময়ে সুজার দুরদৃষ্টক্রমে ঈশা খাঁও নিহত হইয়া ধরাশায়ী হইলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিরকাল যাহা ঘটিয়াছে এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। সেনাপতির পতনে হতাশ্বাস সৈনিকবর্গ পলায়নে তৎপর হইল। তখন নববলে বলীয়ান্ শত্রুসেনা প্রবল আক্রমণে উহাদের ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল। "এইরূপে মনরো কিঞ্চিন্মাত্রপূর্ব্বেও তিনি যথা হইতে পলায়নে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, সেই সংগ্রামভূমির আধিপত্য লাভ করিলেন। মহাবীর সুজাকুলি খাঁ পরাজয়ের কালিমা বহন করিয়া জীবিত থাকিতে অনিচ্ছুক হইয়া তাঁহারই মত সাহসী

* Vol. II, pp 545—48

চারি কোম্পানী সিপাহীসহ শত্রুসেনাকে মহাবিক্রমে আক্রমণ করিয়া সদলে বীরের গতি লাভ করিয়াছিলেন।”

সাধারণতঃ ইতিহাসে লিখিত হইয়া থাকে যে, বক্সার-যুদ্ধে মেজর মন্‌রো সাহ আলম, সুজাউদ্দৌলা এবং মীরকাসিমের সম্মিলিত সৈন্যদলকে পরাজিত করিয়াছিলেন। একথা কিন্তু সত্য নহে। যুদ্ধটা হইয়াছিল শুধু সুজার সৈন্যগণের সহিত। যুদ্ধের পূর্ব্বদিন তিনি হৃতসর্ব্বস্ব মীরকাসিমকে একটি অন্ধপঙ্গু হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া বিদায় দিয়াছিলেন। ধীরমন্থর গতিতে এলাহাবাদ যাইবার পথে তিনি বক্সার-যুদ্ধের বার্ত্তা শুনিয়াছিলেন। * সাহ আলমও যুদ্ধে কোন অংশ না লইয়া উদাসীন দর্শকবৎ অদূরে অবস্থিত ছিলেন। ইংরাজেরা বিজয়-লাভ করিবামাত্র তিনি তাহাদের আশ্রয়ে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। পরাজিত সুজা প্রথমে কাশী ও তথা হইতে এলাহাবাদ গমন করিয়াছিলেন। এখানে তিন মাস কাল থাকিয়া তিনি পুনর্ব্বার বলপরীক্ষার্থ নূতন সৈন্যসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এদিকে ইংরাজসেনা অযোধ্যারাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। এ সংবাদে সুজা তাহাদের বাধাদানে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাঁহার সৈনিকগণের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে সন্ধিস্থাপন করিতে পরামর্শ দিল। তিনি সে কথায় কর্ণপাৎ না করায় “মোগলেরা তাঁহাকে ইংরাজহস্তে ধরিয়া দিবার ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিল।” ইহাতে তিনি ভীত হইয়া লক্ষ্ণৌ ও সেখান হইতে রোহিলাসর্দ্দার হাফিজ রহমৎ খাঁর অধীন বেরিলি গমন করিলেন। তথায় সনরুর তত্ত্বাবধানে স্বীয় পরিজনবৃন্দকে রাখিয়া সুজা অনন্তর গড়মুক্তেশ্বরে গিয়াছিলেন। সেখানে মলহররাও হোলকার প্রমুখ মারাঠা নেতৃবর্গের সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া তিনি অপরাপর রোহিলা ও পাঠান সর্দ্দারগণের নিকট হইতে সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় অতঃপর ফরুখাবাদে আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল; ইংরাজের বিপক্ষে উহারা কেহই তাঁহার পক্ষাবলম্বনে সম্মত হইল না।

এদিকে ইংরাজ সেনা অযোধ্যারাজ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার অনেকাংশ অধিকার করিয়া লইয়াছিল। রোহিলা-দিগের নিকট হইতে সাহায্যপ্রাপ্তি বিষয়ে নিরাশ হইয়া ও তাঁহার নিজ রাজ্যের কতকাংশ শত্রুর কবলজাত হইল দেখিয়া সুজাউদ্দৌলা সন্ধির কামনায় জঁাতিল এবং মীর্জ্জা নজফ খাঁকে † ইংরাজ সেনাপতি মেজর কার্ণাকের নিকট দৌত্য-

* জঁাতিলের আলি ইব্রাহিম খাঁর প্রতি যথেষ্ট সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া গেলেও তাঁহার পূর্ব্বতন প্রভুর দুরদৃষ্টে সহানুভূতির কোন নিদর্শন দেখা যায় না। তাঁহার গ্রন্থমধ্যে মীরকাসিমের আর নামোল্লেখ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় না। মীরকাসিমের পরবর্ত্তী জীবন সম্বন্ধে “Proceedings of Indian Historical Records Commission;” পত্রে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত এবং “Calcutta Review,” (মে ১৯৩৫) পত্রে শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† উত্তর কালে নজফ খাঁ বাদসাহ আলমের উজীর এবং মোগল সাম্রাজ্যের শেষ রক্ষাকর্ত্তারূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী প্রবন্ধ সমূহে তাঁহার উল্লেখ প্রায়ই করিতে হইবে, সেজন্য এখানে তাঁহার প্রথম জীবন সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। মীরজাফর পারস্যের সাফাভী রাজবংশের সন্তান ছিলেন। নাদির সাহ যখন সিংহাসন অধিকার করিয়া পুরাতন রাজবংশজাত সকলকেই বন্দী করিয়া রাখিতেছিলেন, তখন তিনি এবং তাঁহার এক ভগিনীও কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। বাদসাহ মহম্মদ সাহ একবার মীর্জ্জামহসিনকে (সুজাউদ্দৌলার পিতা তাঁহার উজীর সফদর জঙ্গের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) দৌত্যকার্য্যে পারস্য দেশে পাঠাইয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে নাদির ভ্রাতাভগিনীকে মুক্তি দিয়াছিলেন। মহসিন অতঃপর মহিলাটিকে বিবাহ করেন। উঁহারা হিন্দুস্থানে ফিরিয়া আসিলে নজফ খাঁও উঁহাদের সহিত এদেশে আসিয়াছিলেন। মহসিনের দেহান্তের পর তাঁহার পুত্র এলাহাবাদ সুবার শাসনভার লাভ করেন। জ্যেষ্ঠ-তাত-পুত্র সুজাউদ্দৌলার সহিত দ্বন্দ্বে তিনি অচিরেই বিনষ্ট হন এবং এলাহাবাদ প্রদেশ সুজার হস্তগত হয়। তখন আশ্রয়চ্যুত নজফ খাঁ ভাগ্যান্বেষণে বঙ্গদেশে আগমন করিয়া মীরকাসিমের সেনাদলে প্রবেশ করেন। ইংরাজদিগের সহিত সংগ্রামে, বিশেষতঃ উধুয়ানালার যুদ্ধে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। পরাজিত মীরকাসিম অযোধ্যাধিপতির আশ্রয় লইলে নজফ খাঁ পূর্ব্বকথা স্মরণে তাঁহার নিকট না গিয়া বুন্দেলখণ্ডের এক সর্দ্দারের নিকট গমন করেন। বক্সার-যুদ্ধের পর তিনি ইংরাজদিগের নিকট আগমন করেন এবং তাঁহাদিগকে বলেন যে, তিনিই এলাহাবাদ প্রদেশের প্রকৃত অধিকারী। সে কথা বিশ্বাস করিয়া তাঁহারা উঁহাকে উক্ত জনপদের একাংশ কোড়ার আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার অল্প পরেই সুজার মিত্র মলহররাও হোলকারের সহিত যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও বন্দী হইয়াছিলেন। ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার সম্প্রীতি থাকার জন্য নবাব দৌত্যকার্য্যে জঁাতিলকে পাঠাইবার সময় তাঁহাকেও সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। কোম্পানীর দেওয়ানী লাভকালে নূতন ব্যবস্থায় বঙ্গদেশের রাজস্ব হইতে মীর্জ্জা নজফ খাঁর জন্য বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা হইয়াছিল। এলাহাবাদ প্রদেশের উপর তাঁহার প্রকৃত কোন দাবী নাই জানা গিয়াছিল বলিয়া এবার আর কোড়ার আধিপত্য তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই। অতঃপর নজফ খাঁ মোগল

কার্য্যে পাঠাইয়াছিলেন। "কার্ণাকের সহিত সাক্ষাতের পর আমি নবাবকে সকল কথা জানাইবার জন্য দুইজন পত্রবাহক পাঠাইয়াছিলাম। পত্রপ্রাপ্তিমাত্রে নবাব তাহার প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন; এবং সেই সঙ্গে আমাকেও 'রফিউদ্দৌলা, নাজিম জঙ্গবাহাদুর, তদ্‌বির-উল-মুলক' উপাধিত্রয় প্রদান করিয়াছিলেন। পত্রবাহকদ্বয় ফিরিয়া আসিবামাত্র মেজর কার্ণাকের এডিকং কাপ্তেন স্যুইণ্টন উহাদের ধৃত করিয়া সঙ্গে প্রাপ্ত কাগজপত্রাদিসহ তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন: জানাইয়াছিলেন, আমি ইংরাজ শিবিরে বসিয়া নবাবের সহিত পত্র ব্যবহার করিতেছিলাম; আমি কি লিখিতেছিলাম তাহা দেখা আবশ্যক। কিন্তু কার্ণাক আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া চিঠিগুলি না খুলিয়াই ফেরৎ দিয়াছিলেন।" সন্ধির চেষ্টা কিন্তু সফল হইল না। সুজা মীরকাসিমকে ও সমরুকে কোন মতে শত্রুকরে সমর্পণ করিতে সম্মত হইলেন না। ইংরাজরা উহাঁদের না পাইলে কিছুতেই সন্ধি করিতে স্বীকৃত হইলেন না। সমরুর নিজস্ব সৈন্যদল আছে, তাহাকে করায়ত্ত করা তাঁহার সাধ্যের বাহিরে; ইংরাজরা যদি সমরুকে চিনে এরূপ দুই তিনজন ব্যক্তিকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন, তাহা হইলে তিনি উহাকে তাঁহাদের সম্মুখে আহ্বান করিবেন, তখন তাহাকে বন্দী করার ভার তাঁহাদের,—শেষ পর্য্যন্ত নবাব না কি ইংরাজদিগের নিকট এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

তখন আবার সংগ্রাম বাধিল। ফরুখাবাদ হইতে সুজা মারাঠাদিগের সহিত গঙ্গাতীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। এলাহাবাদ হইতে ইংরাজরাও যুদ্ধযাত্রা করিলেন। খাজামৌয়ের তুমুল যুদ্ধে সুজা আবার পরাভূত হইলেন। মারাঠারাও কাল্পীর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। উপায়ান্তরবিহীন সুজা তখন ইংরাজদিগের শরণ লওয়াই স্থির করিলেন। একদিন মাত্র কয়েকজন অনুচর লইয়া তিনি ইংরাজ সেনাপতির সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার আগমনসংবাদে কার্ণাক ও সিতাব রায় মহাব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ছুটিলেন। মধ্যপথে উভয় পক্ষে সাক্ষাৎকার হইল। রাজ-অতিথিকে পরম মহাদরে আপ্যায়িত করিয়া তাঁহারা সসম্মানে শিবিরে লইয়া আসিলেন।

সন্ধির চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও জাঁতিল এ যাবৎ ইংরাজ শিবিরে বাস করিতেছিলেন। তিনি আর নবাবসকাশে ফিরিয়া যান নাই। এই সময়ের ঘটনাবলীর বিবরণ তিনি কতকটা অন্যভাবে প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার কথা ইংরাজদিগের পক্ষে নিতান্ত অগৌরবকর এবং প্রচলিত ইতিহাসের বিরোধী; সত্য বলিয়া মনে করা উচিত নয়। তিনি বলেন, "আকবরপুরে ইংরাজ বাহিনীর পশ্চাদ্দেশ মারাঠাদিগের কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। উহারা তাহাদের রসদাদি যাবতীয় দ্রব্য হস্তগত করিয়াছিল, কিন্তু নজফ খাঁ তথায় দৌড়িয়া আসিয়া ঐগুলি পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। এই ব্যর্থতা সত্ত্বেও মারাঠারা শত্রুসৈন্যকে এরূপ বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল যে, অচিরেই উহাদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল।" মহাভয়ে ভীত কার্ণাককে জাঁতিলই বুঝাইয়াছিলেন, এ অবস্থায় নবাবের সহিত যতশীঘ্র সম্ভব সন্ধিস্থাপন করা তাঁহার পক্ষে কল্যাণকর এবং তাঁহার পরামর্শে সেনাপতি মহাশয় নবাবকে নিজ শিবিরে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

অনন্তর উভয়পক্ষে সন্ধি প্রতিষ্ঠিত হইল। যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ কোম্পানীকে অর্দ্ধ ক্রোর টাকা, রাজকরের পরিবর্ত্তে বাদসাহকে এলাহাবাদ ও কোরাপ্রদেশ এবং স্বয়ং ইংরাজ সেনাপতি মেজর কার্ণাককে আট লক্ষ টাকা প্রদান করিয়া সুজা নিজ রাজ্য ফিরিয়া পাইলেন। সাহ আলম ইতিপূর্ব্বে একবার সুবে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী ইংরাজদিগকে দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তখন তাহা লইতে তাঁহাদের সাহস হয় নাই। এক্ষণে ক্লাইভ ইংলণ্ড হইতে গভর্ণর নিযুক্ত হইয়া আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে কোম্পানীর নামে দেওয়ানি গ্রহণ করিলেন (১৬।৮।১৭৬৫)। স্থির হইল, বঙ্গদেশের রাজস্ব হইতে ইংরাজরা সম্রাটকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিবেন। বাদসাহের আনন্দের অবধি রহিল না। আলিবর্দ্দীর সময় হইতে বাঙ্গালার রাজকর আর মোগলদরবারে প্রেরিত হয় নাই। "এইরূপে একটি গর্দ্দভ বিক্রয় করিতে যে সময় লাগে, তদপেক্ষাও অল্প সময়ের মধ্যে তিনকোটি মনুষ্য অধ্যুষিত এবং বার্ষিক চারি কোটি টাকা রাজস্বপ্রসূ এক

সম্রাটের অনুচরবৃন্দমধ্যে পরিগণিত হইয়া অনতিকালমধ্যে নিজ কর্ম্মকুশলতায় তাঁহার প্রধান মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়া সকলকার পরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্র হইয়াছিলেন।

সমৃদ্ধ দেশের আধিপত্য ইংরাজ কোম্পানীর হস্তগত হইল।" তদ্ভিন্ন অযোধ্যাপতিগণও এই সময় হইতে স্বাধীনতা হারাইয়া তাঁহাদের আশ্রিতমধ্যে পরিণত হইয়াছিলেন।

"ইংরাজদিগের সহিত সন্ধিস্থাপনে আমি যে প্রভূত আয়াস স্বীকার করিয়াছিলাম,তাহার ফলে সুজাউদ্দৌলা ইতি-পূর্ব্বে ফরাসীজাতি সম্বন্ধে যে প্রতিকূল ধারণা পোষণ করিতেন, তাহা পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমি হিন্দুস্থানী ভাষায় এরূপ অনর্গল কথোপকথন করিতে পারিতাম যে, আমাদের আলাপকালে দোভাষী আবশ্যক হইত না, নবাব সরাসরিভাবে আমার কথা বুঝিতে পারিতেন। তাঁহার মাতৃভাষায় বাক্যালাপপটু একজন ফরাসীকে দরবারে পাইয়া তিনি সবিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন এবং সে কথা আমাকে জানাইতে গিয়া যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহা হইতে আমি বুঝিয়াছিলাম যে, চারিশত ফরাসী সৈনিককে নিজ কর্ম্মে গ্রহণ করিতে তিনি ইচ্ছুক আছেন। কিন্তু তখন অত-গুলি ফরাসীকে একত্র পাওয়া সম্ভব ছিল না বলিয়া সে ইচ্ছা আর কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কিন্তু আমার সৌভাগ্যক্রমে আমি দুইশত স্বদেশীয়ের সাহায্য করিতে পারিয়াছিলাম। অদৃষ্টের ফেরে উহারা ইংরাজের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মীর-কাশিমের পতন ঘটাইতে সাহায্য করিতে বাধ্য হইয়াছিল। পাটনার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর মেহেন্দি আলি খাঁর নিকট আমি একদিন শুনিলাম যে, এলাহাবাদে গঙ্গার অপর পারে একদল ইউরোপীয় সৈনিক আসিয়া দেখা দিয়াছে। এ সংবাদে আমি তৎক্ষণাৎ সেখানে গমন করিলাম; দেখিলাম, উহারা ইংরাজ বাহিনী হইতে পলাতক ফরাসী সৈনিক। উহাদের নেতা সার্জ্জেণ্ট-মেজর মাদেকের সহিত বাক্যালাপ করিয়া আমি জানিলাম, তাহারা অযোধ্যাপতির কর্ম্মগ্রহণে ইচ্ছুক। মেহেন্দি আলিকে সকল কথা বলিয়া আমি তাঁহাকে উহাদের অযোধ্যারাজ্যে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিতে বলিলাম। দরবারে মাদেককে নবাবের নিকট পরিচিত করিয়া দেওয়া হইল। তিনি সানন্দে তৎক্ষণাৎ উহাদিগকে স্বীয় কর্ম্মে গ্রহণ করিলেন। উহাদের মাসিক বেতন কুড়ি হাজার টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।"

সমসাময়িক বহু ঘটনার উল্লেখ জঁতিল করিয়াছেন। ইংরাজদিগের সহিত কৃত সন্ধিপত্র এবং বাদসাহী ফর্ম্মাণ এই দুইয়েরই অনুবাদ তিনি নিজগ্রন্থে প্রদান করিয়াছেন। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে সাহ আলম এলাহাবাদে ইংরাজ আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া মারাঠাদিগের সহিত দিল্লী গমন করিয়াছিলেন। জঁতিলের মতে ইংরাজ সেনাপতি ব্রিগেডিয়ার রিচার্ড স্মিথ কর্ত্তৃক তাঁহার অবমাননাই সম্রাটের উক্ত কার্য্যের অন্যতম কারণ।* পর বৎসর নির্ব্বাসিত মীরকাসিম পুনরায় ইংরাজের বিরুদ্ধে সুজার সাহায্যলাভ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য তাঁহার কর্ম্মাধীন ওয়েষ্ট নামক জনৈক ইংরাজ জাতীয় সৈনিককে তাঁহার নিকট দৌত্যকার্য্যে পাঠাইয়াছিলেন।† ইংরাজ হইয়াও কেন যে ঐ ব্যক্তি মীরকাসিমের নিকট শেষ পর্য্যন্ত ছিল বুঝা যায় না। উহার বর্ণসঙ্কর ইউরেসীয় হওয়াই সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

জঁতিল "রোহিলা যুদ্ধের" উল্লেখও করিয়াছেন। ইতি-হাসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই হেষ্টিংসের এই অপকীর্ত্তির কথা পরিজ্ঞাত আছেন। নবাব-উজীরের নিকট হইতে ৪০ লক্ষ টাকা নগদ লইয়া তিনি রোহিলাজাতির স্বাধীনতাহরণে তাঁহাকে এক ব্রিগেড ইংরাজ সৈন্য দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। রোহিলাদিগের সহিত ইংরাজদিগের কোন বিরোধ ছিল না; তাঁহারা উহাদের মহাবন্ধু ও পরম মিত্র ছিলেন। তথাপি অর্থের লোভে হেষ্টিংসের উহাদের সর্ব্বনাশ করিতে বাধিল না। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রেল মিরাণপুর-কাটরার যুদ্ধে রোহিলারা পরাজিত হইল। বিখ্যাত রোহিলা-সর্দ্দার হাফিজ রহমৎ খাঁ নিহত হইয়াছিলেন। এই অন্যায় যুদ্ধে কৃত অত্যাচারের সুন্দর বর্ণনা বার্কের বক্তৃতায় এবং মেকলের রচনায় আছে। এখানে মিলের ইতিহাস ও জঁতিলের আত্মচরিত হইতে যুদ্ধের বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। "১৭ই এপ্রিল তারিখে সম্মিলিত বাহিনী রোহিলা জনপদে প্রবেশ করিয়াছিল। ১৯শে তারিখে ইংরাজ সেনানায়ক কর্ণেল চ্যাম্পিয়ন কর্ত্তৃপক্ষকে লিখিয়াছিলেন যে, 'রোহিলা সর্দ্দা-

---

* একথা আরও অনেকে বলিয়াছেন। স্মিথের প্রতি সম্রাটের রক্ষণ বেক্ষণের ভার অর্পিত হইয়াছিল। তিনি সম্রাটের সহিত নিতান্ত অসদ্ব্যবহার করিতেন ও প্রতি পদে তাঁহাকে অপমান করিয়া চলিতেন। নিজে ঘুমনিদ্রার ব্যাঘাত হইত বলিয়া তিনি সম্রাটের মহিমাব্যঞ্জক নহবৎ বাজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

† Select Committee Proceedings, 15|11772 : p. 12|

পত্রযোগে উজীরের নিকট সন্ধিস্থাপনে তাঁহার একান্ত আগ্রহ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু নবাব দুই ক্রোর মুদ্রা দাবী করিয়াছিলেন।' এই অযৌক্তিক দাবীর পর রোহিলারা শেষ পর্য্যন্ত দৃঢ়ভাবে তাহাদের অধিকৃত স্থান রক্ষা করিবার সঙ্কল্প লইয়া বাবুল নালার পার্শ্বে স্থান অধিকার করিয়া অবস্থান করিয়াছিল। ২৩শে প্রত্যুষে ইংরাজ সেনাদল আক্রমণে অগ্রসর হইল। হাফিজ রহমৎ খাঁ এবং তাঁহার সৈন্যদল, সংখ্যায় প্রায় ৪০০০০ সৈনিক যথেষ্ট সাহস ও দৃঢ়তা দেখাইয়াছিল এবং তাহাদের তোপখানা হইতে গোলা ও রকেট বর্ষণ করিয়া আমাদিগকে নিতান্ত বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল।" ইংরাজ সেনাপতি উহাদের সাহস, বীরত্ব ও সামরিক কৃতিত্বের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে পরাজিত হইতে হইল। শত্রুপক্ষে প্রায় ২০০০ সৈনিক বিনষ্ট হইয়াছিল, তন্মধ্যে অনেক সর্দ্দারও ছিলেন। কিন্তু যে কারণে এই বিজয়লাভকে চূড়ান্ত আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে তাহা এই যে, অসীম বীরত্বের সহিত স্বীয় অনুচরবৃন্দকে সমবেত করিবার কালে হাফিজ রহমৎ স্বয়ং নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে একজন নিহত ও একজন বন্দী হইয়াছিলেন, অপর একজন পলায়ন হইতে আজ ফিরিয়া আসিয়া সুজাউদ্দৌলার হস্তে আত্মসমর্পন করিয়াছে।"*

"২২শে এপ্রিল ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে বিলগ্রাম নামক স্থানে ইংরাজ সেনাদল নবাবের সৈন্যগণের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। রোহিলাদিগের শিবির হইতে পাচক্রোশ দূরে ক্ষুদ্র একটি স্রোতস্বিনীর তীরে তাহারা শিবিরস্থাপন করিয়াছিল। ইংরাজ সেনাপতির সহিত সকল ব্যবস্থা করিয়া নবাব পরদিন শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিবেন স্থির করিলেন। প্রত্যুষে তিন ঘটিকার সময় ইংরাজ সৈন্যদল যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। বসন্ত, লেতাসৎ এবং সৈয়দ আলির ব্যাটালিয়নগুলিও তাহাদের সহিত ছিল। নবাবের অশ্বারোহীসেনা দুই দলে বিভক্ত হইয়া দক্ষিণে ও বামে অবস্থান করিতেছিল।...একজন স্পানিয়ার্ড কর্তৃক পরিচালিত রোহিলাদিগের তোপখানা ইংরাজদিগের উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। এবং তাহাদিগকে বিষম উৎপীড়িত করিয়া তুলিল। হাফিজ রহমৎ উন্মুক্ত কৃপাণহস্তে অশ্বপৃষ্ঠে তাহার রোহিলাগণের পুরোভাগে ইংরাজ সেনাকে চার্জ্জ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন; সহসা একটি গুলি কিসে প্রতিহত হইয়া আসিয়া তাঁহার উদরদেশে বিদ্ধ হইল। তাঁহার পরিচারকগণ বহু আয়াসে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে তাঁহাকে নামাইয়া ভূমিতে শয়ন করাইয়া দিল। শীঘ্রই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল...ইংরাজরা এই যুদ্ধকে সেণ্ট জর্জ্জের যুদ্ধ নাম দিলেও উহা কাটরা গ্রামের সন্নিকটে বীরপুর ও পিলিভিটের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষে প্রায় দুই শত লোক ক্ষয় হইয়াছিল। নবাবের সেনাদলে ৩৬ জন লোক প্রাণ হারাইয়াছিল। নবাব দুইদিন উক্ত তটিনীতীরে শিবিরে অবস্থান করিয়াছিলেন। হাফিজ রহমতের এক পুত্র ২৬শে এপ্রিল তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল এবং তাঁহার ভ্রাতা এনায়েৎ খাঁর পরিবারবর্গ ২৪শে তারিখে তথায় আসিয়াছিল।"* জাঁতিলের লেখা হইতে তিনি নিজেও যে এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন তাহা বেশ বোঝা যায়।

অযোধ্যা-দরবারে ফরাসী ভাগ্যান্বেষিগণের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। জাঁতিলের আত্মচরিতে উক্ত হইয়াছে যে, ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে সুজাউদ্দৌলার সেনাদলে সাত শতেরও অধিক ফরাসী জাতীয় সৈনিক ছিল। উহাদিগকে কিন্তু আর অধিক কাল তথায় থাকিতে হয় নাই। সুজাউদ্দৌলার ফরাসী প্রীতি ইংরাজদিগের পছন্দকর ছিল না। † জাঁতিল এবং তাঁহার সহকর্ম্মিগণ নবাবদরবারে তাঁহাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন। এ বিষয়ে জাঁতিল স্বীয় গ্রন্থে জনৈক ইংরাজ লেখকের লেখা হইতে একাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন,—"সুজাউদ্দৌলার সৈন্যদলে যে সকল ফরাসী সৈনিক কার্য্যনিরত ছিল, তাহারা ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নবাবের মনে যে বিরাগের ভাব ছিল, তাহা পরিপোষণ ও পরিবর্দ্ধন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিত। উহারা তাঁহাকে একথাও বুঝাইয়াছিল যে, ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা যে তাঁহাকে সুধু উহাদের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্তির উপায়

* Mill—"History of Br. India", vol. III, p. 573.

* pp. 283--87

† ১৯শে মে ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কাউন্সিলের সিলেক্ট কমিটির অধিবেশনে নবাব উজীরের "predilection for Frenchmen" আলোচ্য বস্তু ছিল।

হইবে এমন নহে; পরন্তু যে সকল দেশ জয়ের পরিকল্পনা তিনি মনোমধ্যে পোষণ করেন, তাহাও কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হইবে। উজীর এ সকল প্রস্তাব পরম আগ্রহের সহিত শুনিতেন এবং প্রস্তাবিত সন্ধির জন্য আবশ্যকীয় আলোচনা আরম্ভ করিতে উদ্‌গ্রীবও ছিলেন। কিন্তু কার্য্যকালে তাঁহাকে যে সকল বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইত, প্রথম উৎসাহের মুখে তিনি আর সেগুলি সবিশেষ ভাবিবার অবকাশ পান নাই। অযোধ্যায় সমাগত ফরাসী কমিশনারগণ তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছিল যে, কাম্বে উপকূলে একদল ফরাসী সৈন্য অবতরণ করিবে এবং উপদ্বীপের অধিকাংশ অতিক্রম করিয়া অযোধ্যারাজ্যের পশ্চিম প্রান্তে প্রবেশ করিবে। উজীর যদি এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে তিনি স্পষ্টই দেখিতে পাইতেন যে, উহা একেবারেই সম্ভবপর ছিল না; ফরাসী ভাগ্যান্বেষীদিগের কৃত প্রস্তাবগুলি যে আকাশ-কুসুমবৎ অলীক ভিন্ন আর কিছু ছিল না, তাহাও তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন। একথাও মনে করা যাইতে পারে যে, ফরাসী মন্ত্রীমণ্ডলী কখনই উহা অনুমোদন করিতেন না।"

ইহার উত্তরে জাঁতিল লিখিয়াছেন যে, উক্ত কল্পনা মোটেই অসম্ভব বা অলীক ছিল না। "১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে সুজাউদ্দৌলার কর্ম্মাধীনে সাত শতেরও অধিক ফরাসী সৈনিক ছিল। সে সময় কেবল উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না; তিনি নিজ সন্নিধানে দশ সহস্র ফরাসী সৈনিকের একটি দল লাভ করিতে সমুৎসুক ছিলেন। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বেই উহাদের উপস্থিতি তাঁহার সমস্ত প্লান ফাঁস করিয়া দিত এবং তাঁহার শত্রুপক্ষকে সতর্ক হইবার অবসর দিত। যুদ্ধ বাধিলে পরে সুজা তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈন্য ও তদুচিত তোপখানা লইয়া যোগ দিতেন এবং উক্ত দুই সমৃদ্ধ প্রদেশে ইংরাজ শক্তি বিধ্বস্ত করিবার উদ্দেশ্যে বঙ্গ ও বিহার আক্রমণ করিতেন। এ সুযোগ ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে দেখা দিয়াছিল। সে সময়ের ঘটনাবলী হইতে সুজার শত্রুগণও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল যে, পরিকল্পনাটি মোটেই আকাশ-কুসুম ছিল না; বরং ঠিক যে সময়টিতে উড়িষ্যা ও করমণ্ডল উপকূলে হায়দার আলির সাফল্য এবং সাফ্রাঁর (Suffrein) নৌ-বিজয় ইংরাজাধিকার বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতেছিল, সেই সময় বঙ্গদেশেও ইংরাজশক্তি চূর্ণ করিতে উহা নিশ্চয়ই যথেষ্ট সাহায্য করিত। ব্যবস্থামত ফয়জাবাদে ফরাসীরাজের রেসিডেণ্ট কর্ণেল জাঁতিলের নবাবী ফৌজের পরিচালন-ভার লইবার কথা ছিল। উক্ত অফিসার এবং চন্দননগরের ফরাসী সেনাধ্যক্ষ মসিয় শ্যেভালিয়ের মধ্যস্থতায় প্রস্তাবিত সন্ধির আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল; কিন্তু নবাবের মৃত্যুর জন্য তাহা আর কার্য্যে পরিণত হয় নাই।"

কিন্তু উক্ত ঘটনার অনতিকাল পরেই জাঁতিল ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ অযোধ্যা-দরবার হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। দেশীয় রাজ্যে ফরাসীদিগের প্রভাব ইংরাজদিগের পছন্দসই ছিল না। তাঁহারা হিন্দুস্থানে সকল মিত্ররাজ্য হইতে ফরাসীদিগকে বহিষ্কৃত করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। অযোধ্যা দরবারেও জাঁতিল এবং তাঁহার সহযোগিগণের কর্ম্মচ্যুতি দাবী করা হইয়াছিল। প্রথমে সুজা সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই। নানা অজুহাতে তিনি দীর্ঘকাল কাটাইয়া দিতে সমর্থ হইলেও তদীয় উত্তরাধিকারী ফরাসীদিগকে বিদায় দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে কোম্পানী ও অযোধ্যা-দরবারের মধ্যে যে পত্র বিনিময় হইয়াছিল, তজ্জন্য ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত "Calendar of Persian Correspondence," চতুর্থ খণ্ড (৩০, ৫৪, ৯৮২, ১০৭৩ এবং ১১২৫ সংখ্যক পত্র) দ্রষ্টব্য। প্রথম তিনখানি চিঠিই যথাক্রমে ১৩।৫।১৭৭২, ১৪।৭।১৭৭২ এবং ২৩।৪।১৭৭৪ তারিখে গভর্ণর জেনারেল কর্ত্তৃক নবাবকে লিখিত হইয়াছিল, পত্রগুলির বক্তব্য একই; —কোম্পানী মহামান্য নবাব বাহাদুরের পরম বন্ধু এবং সতত তাঁহার শত্রুকে নিজেদের পরিজ্ঞান করিয়া থাকেন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, নবাব বাহাদুরও সেরূপ ... করিয়া তাঁহাদের চিরশত্রু ফরাসীদিগকে নিজ রাজ্যে আশ্রয় দিয়াছেন, ইহা উচিত হয় নাই ইত্যাদি। শেষ চিঠিখানির সুজা যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন তাহা (১০৭৩ নং পত্র) এইরূপ:—গভর্ণর বাহাদুরের অনুরোধে তিনি মুশীর মাদে ও জাঁতিলকে বরখাস্ত করিতেছেন। প্রথম ব্যক্তিকে তিনি বুন্দেলখণ্ড প্রদেশের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। জাঁতিল তাঁহার নিকট বিগত আট নয় বৎসরকাল যাবৎ রহিয়াছেন। তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে নবাবের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা

ছিল না। কিন্তু গভর্ণর বাহাদুরের অভিরুচির অন্যথাচরণ তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে বলিয়া তিনি তাঁহাকেও কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন।" এই পত্রের সহিত নবাব ১৪ই মে তারিখে জঁতিলকে পদচ্যুতির যে পরওয়ানা দেওয়া হইয়াছিল তাহার নকলও পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। উহা এইরূপ—"নবাব উজীর মুলীর জঁাতিলকে আর নিজ কর্ম্মে রাখিতে অসমর্থ, কারণ ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ তাহাতে অসম্মত। অতএব তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করা হইল; অতঃপর তিনি যথাইচ্ছা যাইতে পারেন। তাঁহার এক মাসের প্রাপ্য বেতন তাঁহাকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।"

জঁাতিল কিন্তু তাঁহার কর্ম্মচ্যুতির বিবরণ কতকটা অন্য ভাবে প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, পূর্ব্বোক্ত ব্রিগেডিয়ার স্মিথের ষড়যন্ত্রই তাঁহার পতনের কারণ। সুজার সহিত তাঁহার সম্প্রীতি স্মিথের প্রীতিকর হয় নাই, তিনি অনবরত জঁাতিলের বিরুদ্ধে কলিকাতায় লিখিতে থাকেন।* তখন জঁাতিলও তাঁহার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ সমূহ যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, তাহাই ইংরাজ সেনাবিভাগে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত নিজ জনৈক সুহৃদকে লিখেন। অনন্তর গভর্ণর ভেরেলেষ্ট রাসেল ও কার্টিয়ার নামক কাউন্সিলের তুইজন সদস্যকে তদন্তে পাঠাইয়াছিলেন। তখন স্মিথের সকল কথা যে সর্ব্বৈব মিথ্যা তাহা প্রমাণ হইল। এই তদন্তের ফলে তাঁহার এদেশে ভাগ্যার্জ্জনের পথ চিরতরে রুদ্ধ হইল দেখিয়া স্মিথ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমার শত্রুতাসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় কোর্ট অব ডিরেক্টরস আমাকে অযোধ্যা-দরবার হইতে অপসারিত করিতে উদ্যোগী হইলেন এবং সে জন্য যেন তেন প্রকারেণ আমাকে নবাবের কর্ম্ম হইতে বিতাড়িত করিবার আদেশ বঙ্গদেশের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। প্রথমে নবাব প্রত্যেক বারই তাহাদের প্রার্থনা কোন উপায়ে কাটাইয়া দিতেন। পরিশেষে তাহাদের বারম্বার অনুরোধ উপরোধে বিরক্ত হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "জঁাতিলের নিকট আমি পরম উপকৃত। তিনি না থাকিলে ইংরাজদিগের সহিত আমার পরিচয় সংঘটিত হইত না অথবা তাহাদের সহিত সন্ধিও হইত না। তিনি আমার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত, তাঁহাকে ছাড়িতে বাধ্য হইলে আমি ঘোর দুঃখিত হইব। তাঁহার স্বদেশীয়গণকে সাহায্য না করিলে তিনি যদি আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যান, এই আশঙ্কায় আমি ফরাসীদিগকে কর্ম্মদান করিয়া থাকি। বরং আমি ইংরাজদিগের সহিত আবার যুদ্ধে লিপ্ত হইতে সম্মত আছি, তথাপি জঁাতিলকে বিদায় দিতে পারিব না।" জঁাতিল আরও বলেন যে, ইংরাজদিগের হুমকীতে ভয় পাইয়া তাঁহাকে বিতাড়িত করার পরিবর্ত্তে নবাব তাঁহার বেতন বার্ষিক ২৫০০০৲ টাকা হইতে ৩০০০০৲ টাকায় বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং সুজার মৃত্যুকালেও তিনি তাঁহার কর্ম্মনিরত ছিলেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সুজা সাতিশয় পীড়িতাবস্থায় বেরেলী হইতে ফয়জাবাদে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। বহু সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের পর জঁাতিল তাহাকে ভিসাজ নামক জনৈক ফরাসী ভিষক কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইতে সম্মত করাইয়াছিলেন। "তিনি নিশ্চয়ই নবাবকে নিরাময় করিতেন। কিন্তু তাঁহার পরিজনবর্গ ও বেগমমণ্ডলী তাঁহাকে আবার বিদেশী চিকিৎসকের ঔষধ সেবনের পরিবর্ত্তে দেশীয় হাকিমগণের হস্তে চিকিৎসাভার সমর্পণে রাজী করাইলেন। ফলে পক্ষকালের মধ্যে (২৫।১।১৭৭৫) নবাব মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।" তাহার তিনদিন পরে জঁাতিল তাঁহার পুত্র নবীন ভূপতি আসফউদ্দৌলার সহিত দেখা করেন। তিনি তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন যে, বরং তিনি ইংরাজদিগকে নগদ দশলক্ষ টাকা দিবেন, তথাপি কোন মতে তাঁহাকে ছাড়িবেন না। কিন্তু অষ্টাহকালমধ্যে নবাবের সকল সাহস বিলুপ্ত হইল। তিনি মন্ত্রী মারফৎ জঁাতিলকে জানাইলেন যে, অতঃপর আর তাঁহার পক্ষে ফরাসীদিগকে আশ্রয়দান করা সম্ভব নহে, কারণ হেষ্টিংস তাঁহাকে জানাইয়াছেন যে, উহাদিগকে বিতাড়িত করিতে সম্মত না হইলে তিনি তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্য হইতে অপর কাহাকেও সিংহাসন দান করিবেন। জঁাতিলের একথা সত্য বলিয়াই মনে হয় কারণ নবীন নৃপতির সহিত কোম্পানীর যে নূতন ব্যবস্থা হইয়াছিল, তদনুসারে আসফউদ্দৌলা ফরাসী সৈনিকগণকে কর্ম্মচ্যুত করিতে ও বারাণসীরাজ্য ইংরাজকরে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। তদ্ভিন্ন কোম্পানীকে দেয় তাঁহার রাজকরও

* জঁাতিল কতকটা বাড়াইয়া লিখিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সুজার পক্ষে [illegible] ঐভাবে চিঠি লেখা সম্ভব ছিল কি? হয়ত জঁাতিলকে তিনি [illegible] স্তোকবাক্য দিয়াছিলেন।

যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হইল। ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের এ কথা অজানা নহে যে, বঙ্গদেশে নূতন নবাব-নাজিমগণের এবং অযোধ্যায় নবাব-উজীরগণের সিংহাসনারোহণকালে প্রত্যেক বারই কোম্পানীর সহিত এই ধরণের নূতন বন্দোবস্ত হইত।

১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে কর্ম্মচ্যুতি-পত্র জাঁতিলের হস্তগত হইল। তাহার দশ দিন পরে তিনি নিজ পত্নী ও পরিজনবর্গ সহ ফয়জাবাদ পরিত্যাগ করিয়া চন্দননগর যাত্রা করিলেন। জাঁতিলের স্ত্রীর নাম ছিল টেরেসা ভেল্‌হো; ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ফয়জাবাদ নগরে তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিদায়কালে এক বৎসরের বেতন বাবদ নবাব সরকার হইতে তাঁহার আশী হাজার ফ্রাঙ্ক পাওনা হইয়াছিল। ঐ টাকা তিনি আর পান নাই। হেষ্টিংস তাঁহাকে টাকাটা পাওয়াইয়া দিবেন, এ আশ্বাস দিলেও কার্য্যতঃ কিছু করেন নাই। পাটনায় আসিয়া উপনীত হইবার পর জাঁতিল সাহ আলমের নিকট হইতে বার্ষিক ৪০০০০৲ টাকা বেতনে তাঁহার কর্ম্মপ্রবেশের এক আমন্ত্রণ পাইয়াছিলেন। কিন্তু স্বদেশে ফিরিবার জন্য তখন তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়াছিল বলিয়া তিনি ঐ আহ্বান প্রত্যাখান করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে থাকিতেই ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে জাঁতিল ফরাসী রাজের নিকট হইতে Chevalier de la Ordre Royale et Militaire de St. Louis নামক উচ্চ রাজ-সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। ফ্রান্সে ফিরিয়া যাইবার পর ষোড়শ লুই তাঁহাকে কর্ণেল পদে উন্নীত করিয়া তাঁহার জন্য বিশেষ একটি পেন্সনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে মহীশূর-শার্দ্দুল টিপু সুলতান প্রেরিত তিন-জন ফ্রান্সে আসিয়াছিল। ১০ই আগষ্ট ভারসেঈ রাজপ্রাসাদে মহাড়ম্বরের মধ্যে লুই তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। অসভ্য ভারতবর্ষীয়গণকে নিজ ঐশ্বর্য্যের ছটায় বিস্ময়বিমূঢ় করাই সম্ভবতঃ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। এই উৎসবে জাঁতিলও উপস্থিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার আত্মকাহিনীর একম অধ্যায় শুধু ইহারই বিবরণে পূর্ণ। দৌত্যকর্ম্ম কিন্তু কোন ফলপ্রসূ হইল না। ফরাসীরাজ দূতগণকে একপ্রকার অবমাননা করিয়াই বিতাড়িত করিলেন। মহীশূর-নৃপতির সহিত ইংরাজগণের বিরুদ্ধে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইতে তাঁহার কোন স্পৃহা ছিল না। তাঁহার কর্ম্মচারীবৃন্দের ব্যর্থতায় বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া টিপু সুলতান আকবর আলি ও মহম্মদ ওসমান নামক দূতদ্বয়ের স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তনের পর প্রাণদণ্ড বিধান করিয়াছিলেন।

পর বৎসর ফ্রান্সে রাষ্ট্রবিপ্লব বাধিল। সে অনলে রাজা গেল, রাণী গেল, অভিজাতকুল গেল,—ফরাসীদেশে রক্তের স্রোত বহিল। রাজ-সরকার হইতে জাঁতিলের সামান্য পেন্সনটীও বন্ধ হইল। উহাই ছিল তাঁহার একমাত্র জীবিকা। স্বোপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশই বার্ষিক ৪০০০০৲ টাকা আয়ের সম্পত্তি তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগকালে দুঃস্থ স্বদেশীয়গণের সাহায্যকল্পে দিয়া আসিয়াছিলেন। হিন্দুস্থানে থাকাকালে তিনি নিজ নাম গোপন করিয়া পাদ্রি টাইফেন থেলারের হাত দিয়া বহু অর্থ দরিদ্র খৃষ্টানদিগের সাহায্য জন্য ব্যয় করিতেন। ফলে অন্যান্য ভাগ্যান্বেষীদিগের মত সুপ্রচুর ধনরত্ন দূরে থাক, তিনি বিশেষ কিছুই লইয়া দেশে ফিরেন নাই। সুতরাং শেষ জীবনে তাঁহাকে বিষম অর্থকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। একরূপ নিঃসম্বল অবস্থায় ঘোর অনটনের মধ্যে ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে জন্মভূমি বাগনোল নগরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

সাধারণ ভাগ্যান্বেষী সৈনিকগণ হইতে জাঁতিল শিক্ষা-দীক্ষায় অনেকটা উন্নত ও মার্জ্জিত রুচিসম্পন্ন ছিলেন। লেখাপড়ায় তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। নিজ আত্মকাহিনী ভিন্ন তিনি আরও কয়েকটী গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ঐগুলি কিন্তু মুদ্রিত হয় নাই। বর্ত্তমানে উহাদের পাণ্ডুলিপিগুলি পারী নগরীর জাতীয় গ্রন্থশালায় রক্ষিত আছে। জাঁতিলের আত্মকাহিনী "Memoires sur l'Indoustan ou Empire Mougol" নামে তাঁহার পুত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া ১৮২২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি ভারত-বর্ষের একখানি ইতিহাসও লিখিয়াছিলেন। গ্রন্থখানির তিনি নাম দিয়াছিলেন,—"Abrege Historique des Souverains de l' Indoustan, ou Empire Mougol" অর্থাৎ হিন্দুস্থানের বা মোগল সাম্রাজ্যের অধিপতিগণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ফরাসীতে মোগল বাদসাহগণের যে সকল ইতিহাস আছে, তাহাদের, প্রধানতঃ ফেরিস্তা ও মুন্সী সজ্জন রায়ের গ্রন্থের, নিজ ফারসী ভাষাবিদ মুন্সীর সাহায্যে সার সঙ্কলন করিয়া এই গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল। পুস্তকখানি

জাঁতিল ষোড়শ লুইকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে তিনি ফরাসী-রাজ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হইবার কালে পাণ্ডুলিপিটী তাঁহাকে দিয়াছিলেন। উৎসর্গ-পত্রে অন্যান্য নানা কথার মধ্যে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের রাজন্যবৃন্দ এবং জনসাধারণ সকলে ইংরাজদের ঘৃণ্য অধীনতা-পাশ হইতে ত্রাণকর্ত্তা রূপে ফরাসী-রাজের শুভাগমনের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে। অযোধ্যা-দরবারে অবস্থানকালে জাঁতিল যে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। * তখনকার দিনে ফরাসী ইংরাজের চিরশত্রু ছিল। সুতরাং জাঁতিলের পক্ষে ইংরাজদিগের শত্রুতাচরণ করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। এ বিষয়ে ইংরাজ লেখকগণ তাঁহাকে অপকর্ম্মের ভাগী বলিলেও অপরের পক্ষে তাহা সমর্থন করা সম্ভব নহে। "Histoire des radjahs de l'Indoustan, depuis Barht jusqua Petaurah" নামে তিনি আর একখানি ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন। নাম হইতেই প্রকাশ, ইহাতে ভরত হইতে পৃথ্বীরাজ পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানের রাজন্যবর্গের ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। Histoire Numismatique de l'Inde" নামে ভারতবর্ষীয় মুদ্রাতত্ত্ব সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ এবং এদেশের একটি ভৌগোলিক বিবরণও তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রথমটিতে তৎকালে প্রচলিত যাবতীয় স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। এই তিনখানি পাণ্ডুলিপি ও এবং তদ্ভিন্ন বহুসংখ্যক সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, হিন্দী, উর্দ্দু, বাঙ্গালা, তামিল, তেলেগু পুঁথি তিনি লুইকে উপহার দিয়াছিলেন। জাঁতিলের চিত্রসংগ্রহেরও সখ ছিল। ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের চিত্র সংগ্রহ করিয়া এবং সেগুলি নিজ গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে সন্নিবেশ করিয়া তিনি পুস্তকটিকে সচিত্র করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া বেতন দিয়া তিন জন শিল্পীকে রাখিয়া তিনি বহুসংখ্যক ছবি অঙ্কন করাইয়া লইয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের অবনত মোগল চিত্রকলার ঐগুলি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। জাঁতিলের সংগৃহীত পুঁথি ও চিত্রসমূহ বর্ত্তমানে পারী নগরীর জাতীয় গ্রন্থশালায় সংরক্ষিত আছে। বিখ্যাত শিল্প-সমালোচক E. Blochet বিরচিত "Les enluminures des manuscripts orientanse, arabes, persanes, et tures, de la Bibiliotheque Nationale" নামক গ্রন্থে চিত্রগুলির বিবরণ এবং কয়েকটির প্রতিলিপিও প্রদত্ত হইয়াছে।*

অযোধ্যা-দরবারে থাকাকালে জাঁতিল নিজেকে ফরাসী কোম্পানীর রেসিডেন্ট বলিতেন। কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি ছিলেন সকল বিষয়ে নবাবের পরামর্শদাতা। ইংরাজদিগের দ্বারা বহিষ্কৃত না হইলে তিনি স্বীয় কর্ম্মকুশলতা, রাজনৈতিক জ্ঞান এবং সামরিক অভিজ্ঞতার বলে অযোধ্যারাজ্যের আয়ুষ্কাল হয়ত অনেকটাই বর্দ্ধিত করিয়া যাইতে পারিতেন। হেষ্টিংস কর্ত্তৃক উৎপীড়িত ও কর্ম্মচ্যুত হইলেও জাঁতিল তাঁহার সম্বন্ধে মনে কোন বিরুদ্ধভাব পোষণ করেন নাই। পরন্তু হেষ্টিংসের ঘোর দুর্দ্দিনে, পার্লামেণ্টে তাঁহার বিচারকালে, জাঁতিল তাঁহার সাহায্যকল্পে আগুয়ান হইয়াছিলেন এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রে তাঁহার স্বপক্ষে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

* Sir Even Cotton :—"Indian Historical Records Commission Procedings", vol. X, p. 28—29.

* তাঁহার সংগৃহীত পুঁথি, মুদ্রা, চিত্রাদির জন্য ইংরাজ কোম্পানী তাঁহাকে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা দিতে চাহিলেও জাঁতিল সেগুলি হস্তান্তর করেন নাই।

ভারতবাসী ও ইংরাজ

... ... যাহাতে ভারতবর্ষের ও ইংলণ্ডের শিক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য ও গভর্ণমেণ্টের পরিচালনার সুব্যবস্থা হয়, তাহা করা যদি কোন সম্মেলনের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে ঐ সম্মেলনে প্রত্যেক ভারতবাসীর ও ইংরাজের যোগদান করা সম্ভবপর হইতে পারে এবং ঐ সম্মেলন সর্ব্বাঙ্গীণ প্রকৃত জাতীয় প্রতিষ্ঠান অথবা প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস রূপে পরিগণিত হইতে পারে। ... ...

অনন্ত

—(কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুজ কবি ঈশানচন্দ্রের অপ্রকাশিত কাব্য ;
কবি নবীনচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক সম্পাদিত)

সপ্তম সর্গ

[১]

ধরণী ঘেরিয়া, মহাপারাবার,
বিরাট সঙ্গীত গাহে চারিধার
সে গম্ভীর তান, গভীর ঝঙ্কার
শুনিছে জগত, হইয়া ভোর।

[২]

সে মহাসঙ্গীতে, হইয়া মগন,
গিরিশিরে, কবি হেরিছে স্বপন,
অঙ্কেতে মাধুরী, করিয়া শয়ন—
দু'নয়নে তার সুখের ঘোর।

[৩]

লাবণ্যকিরণে, শূন্য আলোকিত,
মুগ্ধ বিশ্ব-ছায়া তাহায় জড়িত ;
খেলিছে মধুর বায় সুরভিত ;
আকাশ ভাসায়ে পাপিয়া গায়।

[৪]

চারিদিক হ'তে ঝরিছে প্রসূন,
ভ্রমর গুঞ্জনে পুরিছে শ্রবণ,
শার্দ্দূল, কেশরী, মুগ্ধ নয়ন,
পদতলে পড়ি বিস্ময়ে চায়।

[৫]

শুনিতে শুনিতে সাগরের গান,
উথলি উঠিছে কবির পরাণ,
ফুটিয়া পড়িছে নয়নে তুফান,—
হেরিয়া মাধুরী পুলক কায়।

[৬]

সাগর হইতে, সরাইয়া আঁখি,
মাধুরী ললাটে দু'নয়ন রাখি,
মুগ্ধ দৃষ্টে কবি, ক্ষণকাল থাকি,
চুম্বিয়া নয়ন কহিছে তায়।

[৭]

"উঠেছে হৃদয়ে বিষম তুফান,
বুকেতে আমার নাহি হয় স্থান,—
কোথায় ঢালিব এ আকুল প্রাণ ?
কেমনে হৃদয় শীতল করি ?"

[৮]

"এই যে হৃদয়ে মাধুরী তোমার,
ঢাল প্রাণেশ্বর ! হৃদয়েতে তার ;
অকূল হৃদয়—আকুল তাহার
ধরিতে তোমারে পরাণ ভরি।"

[৯]

ঢালিব, মাধুরী, ভাষা কই তার ?
কই ভাষা পায় জলধি উহার ?
হুহু করে, শুধু ক্ষোভে অনিবার ;
ভাঙ্গিয়া পড়িছে হৃদয় তার।"

[১০]

মাধুরী কহিছে, "ধরণীর মত,
হৃদয়ে তোমায় ধরিব সতত,
বলিতে হবে না, বুঝিব নিয়ত—
তুফান হইতে ভাষা কি আর !'

[১১]

"বুঝিবি ?" বলিয়া, কবি ধরে কর :
"বল, কি বুঝিলি,—কি চায় অন্তর ?
কেন বহে, হেন, প্রলয়ের ঝড় ?
কেমনে বা তায় শীতল করি ?"

[১২]

মাধুরী কহিছে, চুম্বিয়া তাহায়,
"হৃদয় তোমার উথলিয়ে চায়—
বাসনা জগতে মিশাইয়া যায় ,"
শুনে, কবি কহে, বদনে পড়ি।

[১৩]

'দু'দিকে, দু'সিন্ধু নাচিছে আমার,
সমুখে সাগর পশ্চাতে সংসার,
তুই মোর ভেলা, মাঝারে তাহার—
পারিবি ত মোরে লইতে তীরে ?

[১৪]

"পারিব", বলিয়া কবি-কণ্ঠ ধরি,
চুম্বিল তাহার অধর মাধুরী,
মুগ্ধ কবি, তার নয়ন উপরি,
গদ গদ স্বরে কহিছে ধীরে।

[১৫]

"কেমনে পারিবি ? মাধুরী, আমার,
সংসার-জলধি ভীষণ আকার,
গরল-তুফান তার চারিধার—
সরল হৃদয় সহিবে তোর ?"

[১৬]

হাসিয়া মাধুরী কহে, "প্রাণেশ্বর !
তুমি যদি থাক বুকের উপর,
ভাসিব তাহায়, যুগ যুগান্তর—
গরল-তুফানে কি ভয় মোর ?"

[১৭]
"কেমনে পারিবি? বল্ খুলে বল্",
বলি, কবি, তার সরায়ে কুন্তল,
নয়নে রাখিয়ে নয়ন যুগল
চুম্বিল চটুল, বিমল ভাল।
[১৮]
"কেন পারিব না", কহিছে মাধুরী,
"ভাসাইব নাথ, হৃদয়ের তরী,
তুমি রবে বসি প্রেম হাল ধরি,
তুলিব আপনি ভকতি পাল।
[১৯]
স্নেহ, দয়া, এই দুই করে ঠেলে,
সংসার-তরঙ্গ সরাইব ঠেলে,
পরাণ ভরিয়া দিব গান ঢেলে,
তরঙ্গে, তরঙ্গে সংসার গায়।
[২০]
পরশে তাহার গরল-তুফান
হইবে হে নাথ, পীযূষ সমান!
সংসার তাহার জুড়াবে পরাণ!
ঘুমাবে শান্তি, আনন্দে তায়!"
[২১]
ত্যজি' দীর্ঘশ্বাস, কবি কহে তায়,
"সরলা রে ভক্তি পাইবি কোথায়?
জ্ঞানের কুয়াশা কেবলি ধরায়!
ভকতি এখানে না যায় দেখা!
[২২]
সৃজিলা অনন্ত সকলি এখানে—
সৃজিল সকলি প্রচুর প্রমাণে,
বিপুল আলোক রচিল বিজ্ঞানে,—
ভক্তি বিনা, সবি কুয়াশা ঢাকা!
[২৩]
আলোক-আঁধারে, হারায়ে নয়ন,
শান্তি-পথ প্রাণী করে অন্বেষণ,
শেষে, দুরাশায় আকুল জীবন,
সতত, তুফানে ভরিয়া রহে।
[২৪]
মাধুরী রে, শুধু তুমি আমি নয়,
কিবা জীব, কিবা জড়ের হৃদয়,
এ ভীম যাতনা বসুন্ধরাময়,—
সেই দুখে মোর পরাণ দহে।"
[২৫]
বিস্ময়ে, মাধুরী পতিপানে চায়,
বদনে লাবণ্য সহসা শুখায়,
নয়নে তরাস জড়াইয়া যায়,
কহে, ধীরে ধীরে, কাতর স্বরে।

[২৬]
"যা কহিলে, নাথ, নাহি কহ আর,—
অনন্ত দেবের করুণা অপার,—
নয়ন তুলিয়া, হের চারিধার,—
পূজে বিশ্ব তাঁর ভকতি ভরে।"
[২৭]
"ছি, ছি, ছি, মাধুরী, না কহ এমন,
না কর ভক্তিরে কলঙ্কে লেপন,
অযথা কীর্ত্তন না কর কখন,
সত্য অপলাপ, কভু না কর।
[২৮]
এত ক্ষুদ্র নহে অনন্তের চিত,
নহেন প্রয়াসী যশ অনুচিত,
ধরণী তাঁহার ভকতি বর্জ্জিত,
সরল হৃদয়ে বুঝিতে নার।
[২৯]
হের যে উচ্ছ্বাস তব চারিধার,—
ওযে কৃতজ্ঞতা এই বসুধার,—
ওযে প্রতিদান কেবলি দয়ার,—
কামনা উহায় জড়ায়ে রয়।
[৩০]
ও নহে রে ভক্তি, মাধুরী, আমার!
ভক্তি সুধাময় প্রেম পারাবার!—
ডুবিলে তাহায় প্রাণ একবার,
কামনার জ্বালা হৃদে না রয়।"
[৩১]
উঠিয়া মাধুরী, বসি অঙ্কোপরে,
কবি-কণ্ঠ প্রেমে জড়াইয়া ধরে,
কহে মিশাইয়া অধর অধরে,
"তুমি ত সে ভক্তি রচিতে পার!"
[৩২]
"ধর, প্রাণেশ্বর, লেখনী তোমার!"
বলি, তুলে দেয় লেখনী তাহার,
"ঢেলে দাও ভক্তি হৃদয়ে আমার"
বলি, তুলে ধরে হৃদয়-হার।
[৩৩]
"তাপিত সংসারে চল, নাথ, যাই;
দ্বারে দ্বারে ভ্রমি', ভকতি বিলাই;
মনের মালিন্য তোমায় ঘুচাই,
শান্তিপূর্ণ করি জীবের বুক।
[৩৪]
অন্ধ প্রাণী যদি, পাই দরশন,
হৃদয়ে তাহার করিব ধারণ,
ঢেলে দিব ভক্তি, ভরিয়া শ্রবণ,
ঘুচাইয়া তার মনের দুখ।

[৩৫]
হেরি, যদি, নাথ, খঞ্জ কোন জন,
অঙ্কে তুলি তায়, করিব বহন
নিয়ত ভকতি করিয়া লেপন,
ঘুচাব দেহের বেদনা তার।

[৩৬]
অনাথ, দরিদ্র, হেরিব যে জন,
মুছাইব অঙ্গ, করিয়া যতন,
ভক্তি-সুধা নিত্য করাব সেবন—
উদরের ক্ষুধা না রহে আর।

[৩৭]
পাপী, যদি, কোন পাই দরশন,
জড়াইয়া কণ্ঠ, করিব রোদন ;
পাপের কলঙ্ক করি প্রক্ষালন,
ভক্তি মন্ত্র তায় করিব দান।

[৩৮]
রোগ-শোক-তপ্ত হেরিব যাহায়,
তনয়ার মত, সেবিব তাহায় ;
ভক্তি-গীতি নিত্য শুনাইয়া তায়,
শীতল করিব তাহার প্রাণ।

[৩৯]
পশু, পক্ষী, কীট, তরুলতা, তৃণ,
গ্রহ, উপগ্রহ, গগন অসীম,
ভূধর, সাগর, হ্রদ, নদী, বন.
ভক্তি-গীতি, নাথ, শিখাব সবে।

[৪০]
সে সঙ্গীতে তুমি হইবে মগন,
অঙ্কে তব আমি করিব শয়ন,
রহিবে জগত করিয়া বেষ্টন,
এ আক্ষেপ, নাথ, ঘুচিবে তবে।"

[৪১]
প্রেমভরে, কবি, চুমে আঁখি তার,
পাপিয়া গাহিয়া উঠে চারিধার,
উছলিয়া উঠে, কোকিল-ঝঙ্কার,
অবিরল ধারে, কুসুম ঝরে।

[৪২]
শার্দ্দুল, কেশরী, পুলকিত কায়,
মাধুরীর পায় মস্তক লুটায় ;
মাধুরী তাদের জড়ায়ে গলায়,
স্নেহ-ভরে অঙ্কে টানিয়া ধরে।

[৪৩]
অদৃশ্য, অনন্ত, করে দরশন,
আনন্দাশ্রু ঝরে, ভরিয়া নয়ন,
সম্মুখে প্রকাশি, কহিল তখন,
"ধন্য, রে মাধুরী, হৃদয় তোর।"

[৪৪]
"ধন্য, ধন্য কবি, জীবন তোমায়!
তাই এ মাধুরী, তব কণ্ঠ-হার।
সৃজন করিয়া জীবন তোমার,
শত ধন্য মানি জীবন মোর।

[৪৫]
সত্য কহিয়াছ ধরণী আমার
জ্ঞান-কুয়াশায় ঢাকা চারিধার,
অদূর অশান্তি পরিণাম তার—
তোমার হৃদয়ে নিরখি, কবি।

[৪৬]
পারি নাই ভক্তি করিতে সৃজন,
বুঝি পারিব না সৃজিতে কখন ;
কবি রে, আমার চির আকিঞ্চন
বুঝি বা, বিফল হইল সবি।

[৪৭]
সান্ত্বনা কেবলি, তুমি রে আমার!
পতিত উদ্ধারে সৃজন তোমার ;
মাধুরীরে লয়ে, প্রবেশ সংসার—
জ্ঞানান্ধ জীবেরে উদ্ধার কর।

[৪৮]
কবি হৃদয়ের নাহি পুরস্কার,
বিরাজে জগত হৃদয়ে তাহার—
কর সে জগতে শান্তির প্রচার—
অনন্তের এই আশীষ ধর।

[৪৯]
আমি চলিলাম,—ভক্তি অন্বেষণে,
খুঁজিয়া বেড়াব, ভুবনে ভুবনে,—
খুঁজিয়া বেড়াব গগনে গগনে,
যাবৎ জীবন খুঁজিব তাঁয়।

[৫০]
পেয়েছিনু দেখা, একদিন, তাঁর,
জ্ঞানে মত্ত মন, তখন, আমার—
হৃদয় ভরিয়া ছিল অহঙ্কার—
অবহেলে তাঁয় হারানু হায়?

[৫১]
সে ক্ষণিক দেখা—তড়িতের মত,
স্মরিলে, এখনো প্রাণ বিভাসিত,
বুঝি, সে আনন্দ তুলনারহিত,—
চরণের রেণু জগত তাঁয়।

[৫২]
এবে যদি তাঁয় পাই দরশন,
হৃদয় ভরিয়া, করিব ধারণ,
ছাড়িব না আর থাকিতে জীবন,
রাখিব করিয়া কণ্ঠের হার।

[৫৩]

হৃদয়ে করিয়া আনিব ধরায়,
জনে জনে ধরি, দেখাইব তাঁয়,
মন্দিরে মন্দিরে ভাঙি আপনায়,
প্রতিষ্ঠা করিব জগতে তাঁয়।

[৫৪]

বলিতে বলিতে, চাহিয়া গগনে
চলিল অনন্ত মলিন বদনে,
উথলে অশ্রু কবির নয়নে ;
মাধুরীর আঁখি ভাসিয়া যায়।

ইতি "কবি গান" নামক সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টম সর্গ

অনন্তের নেত্রাসার, ঝরে পড়ে গণ্ডে তার, উঠে শূন্যে, ভক্তি-অন্বেষণে।
জলধি-উচ্ছ্বাস মত, স্তুতিগান অবিরত, প্রবেশিছে তাহার শ্রবণে।
ত্বরিতে, উরধে ধায়, তথাপি শুনিতে পায়— পূর্ণ ব্যোম স্তুতিগীতে তার!
আকুল হৃদয়ে, হেন, উঠে শূন্যে, কতক্ষণ, উত্তরিল তার সৃষ্টি পার।
নিরখে, সে প্রান্তদেশে, দাঁড়ায়ে বীভৎস বেশে, ভীমকায় মূর্ত্তি একজন।
দুই দিকে দুপ্রকার, বিভক্ত আকৃতি তার, শূন্য ব্যাপি' দেহ আয়তন।
একভাগ দেহে তার, নানা ব্যাধি চারিধার, হেরিলে শিহরি উঠে কায়।
শুক্র বর্ণ অৰ্দ্ধকেশ, অধর ললাট শেষ, কুষ্ঠময়, ভ্রমে কীট তায়।
... ...
অন্য দেহ ভাগ তার মনোহর, চারিধার সঙ্গ যেন তাহার গঠন।
কোমল মাধুর্য্যময় অঙ্গ, তাহে সমুদয় শরতের শশীর বরণ।
দেখিতে দেখিতে তায়, শিহরে অনন্ত কায়, পরিচয় জিজ্ঞাসে তখন।
হাসিয়া বিকট হাস, কহিয়া বিরাট ভাস, কহে মূর্ত্তি ভীষণ বচনে।
"আমি, কাল, রুদ্রচয়, ভ্রমি আমি নিরন্তর, ছড়াইয়া ধ্বংস বিশ্বময়।
কিবা ক্ষুদ্র—কি মহৎ কি সুন্দর—কি অসৎ আমাতে জড়িত সমুদয়।
দ্রুম, গুল্ম, লতা, তৃণ, অঙ্কুরিত যেই ক্ষণ, পশি আমি দেহেতে তাহার।
দেহ বৃদ্ধি পায় যত, মিশি আমি তাহে তত, তিল, তিল করিয়ে সংহার।
নব প্রস্ফুটিত ফুলে, যে গৌরব ধরে তুলে, কে ভাবে বিনাশ মাখা তায়?
আমি, কিন্তু, অহরহ, রূপ, রস, গন্ধ, সহ ধ্বংস করি অজ্ঞাতে তাহায়।
বাল্য মূর্ত্তি সুকুমার— জগত সৌন্দর্য্য সার— মূর্ত্ত যায় সারল্য বিকাশে।
প্রবেশিয়া দেহে তার, জড়াইয়া বারম্বার— দিবানিশি ফিরি পাশে পাশে।
নবীন যুবক-কায়, আকুল জীবন যায়, সঙ্গে সঙ্গে উথলিয়া পড়ে ;
মূর্ত্তি হেরি হয় জ্ঞান, যেন, সে অস্থির প্রাণ স্বর্গ কোন রচিবার তরে।
দেহ অভ্যন্তরে তার, ব্যাপ্ত থাকি অনিবার, জাগ্রতে, নিদ্রায়, অনুক্ষণ।
তাহার জীবনস্রোত, নিয়ত জলৌকা মত, পান করি আনন্দে মগন।
যুবতীর যে আকারে, বিশ্বশোভা ফুটে পড়ে স্বপনময় সুষমায় গড়া,
নয়ন রাখিয়া যায়, মানব না ফিরে চায় কিবা স্বর্গ কিবা বসুন্ধরা।
আমি সে রমণী অঙ্গে, রূপের লহরী সঙ্গে, নিরন্তর করি বিচরণ।
শোণিত প্রবাহ সহ, ঢালি বিষ, অহরহ, ধ্বংস করি সে শোভা-কিরণ।
কিবা প্রৌঢ়, বৃদ্ধ আর, লিপ্ত অঙ্গে সবাকার, সংহারে নিরত অবিরাম।
সবলে না করি ভয় দুর্ব্বলে সদয় নয় এ হৃদয় নহে স্নেহধাম।
রত্নের আবরণ, নাহি করে নিবারণ, গতি মম শরীরে রাজার।
বীর অঙ্গে লৌহ বর্ম্ম, সাধু অঙ্গে মৃগ চর্ম্ম, নাহি রোধে প্রবেশ আমার।
বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, মান, নাহি করি বিঘ্ন জ্ঞান নিমেষের মাঝে করি ক্ষয়।
দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রেম, সুখ-সেব্য ভক্ষ্য সম, দিবানিশি কবলে মিশায়।
গ্রামে গ্রামে পুণ্য পাপ, গ্রামে গ্রামে সুখ তাপ, রাশি রাশি নিত্য পান করি।
নেহার এ রসনায়, মুহূর্ত্তে মিশায়ে যায়, কত প্রাণী কত বেশ ধরি।
ক্ষিতি, কাষ্ঠ, শিলা, পয়, গ্রহ উপগ্রহ-চয়, শূন্য, শব্দ, বায়ু, জ্যোতিঃ, তম
অভ্যন্তরে সে সবার, ব্যাপ্ত আমি চারিধার, বিস্তারিয়া ধ্বংস ক্রম ক্রম।
ওই বিশ্ব, অভিনব বুঝি সে সৃজন তব, প্রবেশিব উহায় এবার।
জড়, অজড়ের অঙ্গে, মিশাইয়া নানা রঙ্গে, ধীরে ধীরে, করিব সংহার।"
অনন্ত শিহরি উঠে, নেত্রযুগে বহ্নি ছুটে, কহে দৃপ্ত কঠোর বচন—
"কি সাধ্য, রে কাল তোর! পশিবি এ বিশ্ব মোর অনন্তের থাকিতে জীবন।"
শুনি, কাল হাস্য করে, বিকট হি হি হি স্বরে, শীর্ণকর করে প্রসারণ।
রক্ত পুঁজ ঝরে তায়, শিহরে অনন্ত কায়, ত্রাসে, করে শক্তিরে স্মরণ।
দৈববাণী শূন্যে ভাসে, "দুর্জ্জয় কালের গ্রাসে, এ জগতে, মুক্ত কেহ নয়।
সৃষ্টি সহ বিশ্লেষণ শঙ্করের নিবন্ধন চিরকাল, ত্রিভুবনময়।
তুষ্ট করি পশুপতি, নিবার কালের গতি অজেয় সে মহেশের বরে।"
নীরবিল দৈববাণী, যুড়িয়া যুগল পাণি, কহে কালে, অনন্ত, কাতরে
"কৃপা কর, হে বীরেশ, বিশ্বে মম না প্রবেশ, প্রত্যাগত নহি যতক্ষণ।
বিপুল সাধনা করি, অশেষ কামনা করি, করিয়াছি ইহার সৃজন।
তিল তিল, ঢালি প্রাণ, করিয়াছি নিরমাণ, এ নবীন জগত আমার ;
রচিয়াছি সযতনে, সৃষ্ট বস্তু, জনে জনে, নিরমল করিয়া আকার।
স্নেহ, মায়া, দয়া, দিয়া, সৃজন করেছি হিয়া, নাহি তাহে মালিন্যের স্থান,
কি দরিদ্র, কিবা ধনী, ব্যবসায়ী কিবা জ্ঞানী, সবারই শিশুর মত প্রাণ।
অজর, অমর হয়ে, রবে সদানন্দ লয়ে, প্রাণীবৃন্দ নিয়ত ইহার
যুগ, যুগান্তর ধরি, দুষ্কর সাধনা করি পুরাইব এ সাধ আমার।
আমার সাধের পুরী, আদর্শ জগত করি, রাখিব এ আকাশের গায়।
অপর ধরণী হতে, আসি প্রাণী, এ জগতে, দেখে যাবে পবিত্রতা, তায়।
হায়! কাল, তব চিত সত্য কি কঠোর এত? নিত্য কর কেমনে সংহার?
সুষমা কি সরলতা, স্নেহ, দয়া, পবিত্রতা, বাজে না কি হৃদয়ে তোমার?
পাষাণ আঘাত হ'তে ও ব্যথা যে বাজে চিতে, কিসে তাহা কর সম্বরণ?
যুগ যুগান্তর ধরি, নিরন্তর ধ্বংস করি, তবু হিংসা নহে নিবারণ?
চেয়ে দেখ, একবার ওই বিশ্বে চারিধার, সুধার পুত্তলী সমুদয়।
ক্ষিতি, তরু, শৈল, বারি, পশু, পক্ষী, নর, নারী অঙ্গে অঙ্গে সবি সুধাময়।
কাল, হাস্য করি, কয়, "বৃথা বাক্য কর ব্যয়, এ হৃদয় নহে জ্ঞান-হীন।
আপন কর্ত্তব্য যাহা, পালন কারব তাহা, করুণায় করিয়া বিলীন।
জননী হৃদয় ছিঁড়ি, সন্তানে যখন হরি, না ভাবিহ, শিহরে না জ্ঞান।
নারী-হৃদি চূর্ণ করি, যবে প্রাণপতি হরি কাঁপে না কি তখনো এ প্রাণ?

যে ভাবনা হৃদে জাগে, এ ভুবনে কব কা'কে, নিজ ধর্ম্ম বুঝে কোন জন ?
জীবন অধিক জ্ঞানে কর্ত্তব্যে যে জন জানে, সে বুঝিবে কালের জীবন।
ধর্ম্মচ্যুতি যত ভয়, হিংসা তত সুখ নয়, কর্ত্তব্য সে তাই প্রিয় হেন।
নতুবা, মানব-হৃদে, কি বুঝিবে, কাল-চিতে, আকুলিত কি অকূল প্রাণ ?
তুষ্ট করি মহেশ্বর, লহ মনোমত বর আক্ষেপ আমার নাহি, তায়।
রুদ্রলোকে যাও দ্রুত, যত দিন অনাগত, রহিলাম, তব অপেক্ষায়।"
অনন্ত পুলক-কায়, দ্রুতগতি উর্দ্ধে ধায় শূন্য গর্ভ করিয়া বিদার।
কাল এক দৃষ্টে হেরে উর্দ্ধগতি অনন্তেরে, ধন্যবাদ ঝরে মুখে তার।

(ইতি "অনন্তের কালের সহিত সাক্ষাৎ" নামক অষ্টম সর্গ সমাপ্ত)

নবম সর্গ

মহাকাশ ধূমাকার, আলোড়িত গর্ভ তার, নিরন্তর, প্রলয় পবনে।
কোটী বজ্র গরজন, হইতেছে অনুক্ষণ, চমকিছে চিকুর সঘনে।
উর্দ্ধ দৃষ্টি মধ্যে তায়, রুদ্রমূর্ত্তি ভীমকায় ত্রিনয়নে জ্বলিছে অনল।
পলকে, পলকে তাঁর উর্দ্ধ হ'তে চারিধার, ভস্মরাশি ঝরিছে কেবল।
কোটী কোটী গ্রহতারা, যেন, উল্কাপথ হারা ছুটে আসে, উর্দ্ধে চারিধার,
রুদ্র-দৃষ্টি পরশনে চূর্ণ হয়, সেই ক্ষণে, ঝরে পড়ে ভস্মের আকার।
শত শত ভূমণ্ডল, পশি তাহে, অবিরল, ছিন্ন ভিন্ন হইছে আকার
সাগর ভূধর তার, তটিনী, তড়াগ আর, খসিয়া পড়িছে চারিধার।
খসে তরু, লতা, তৃণ, অট্টালিকা অগণন, পর্ণশালা ছাইয়া গগন,
পশু, পক্ষী, নারী, নর, শিশু, যুবা, বৃদ্ধাকার ধারা সম, হইছে পতন।
হেরে রুদ্র, ত্রিনয়নে ভস্মীভূত সেইক্ষণে সে বিবিধ স্খলিত আকার।
কি কোমল, কি কঠিন, কি সুন্দর, কিবা হীন, পলকে হইছে ধূলিসার।
ব্যোমগর্ভ পূর্ণ করি, ভস্মধারা পড়ে ঝরি, দাঁড়াইয়া রুদ্র মাঝে তার,
কুঞ্চিত বিশাল ভাল, ত্রিনয়নে ঘোর জ্বাল মহাচিন্তা বদনে প্রচার,
সভয়, বিস্মিত আঁখি, দীর্ঘকাল শুব্ধ থাকি শিহরিল অনন্তের কায়,
আঁধার আবর্ত্ত, যেন, করে তায় আকর্ষণ শূন্যবক্ষে যেন পড়ি যায়।
সংহারের গরজন করে শ্রুতি বিদারণ, বিভীষিকা প্রবেশে নয়নে।
জগত সংহারময়, অনন্তের জ্ঞান হয়, স্মরে শক্তি, আকুল জীবনে।
সে আঁধার ব্যোম হ'তে, তড়িতের আকৃতিতে, প্রকাশিল শকতি আপনা,
মূর্চ্ছাগত অনন্তেরে দ্রুতগতি আসি ধরে, করুণায় যেন সে মগনা।
শক্তিরে পরশ করি, দেহে নব বল ধরি, স্থির পদে অনন্ত দাঁড়ায়,
ভীষণ সে রুদ্র পুরে, সে সংহার ভেদ করে, প্রবেশিবে কেমনে, সুধায়।
অঙ্কে করি শক্তি তারে, প্রবেশিল অন্ধকারে, রুদ্রপদে করিল স্থাপন।
অনন্ত নিরখে হর, বিচলিত কলেবর, নিমীলিত তাঁর ত্রিনয়ন।
"কোথা তুমি, মহেশ্বরী ! ব্রহ্মাণ্ড যে শূন্য হেরি", করে হর ঘন উচ্চারণ।
শক্তি কহে, "মহেশ্বর ! নয়ন মেলিয়া হের, শক্তি তব হৃদয়ে মগন।"
অনন্ত বিস্ময়ে হেরে, অন্ধকার পূর্ণ করে, মিলাইল শক্তির আকার,
শঙ্কর পুলক কায়, ত্রিনয়নে পুন চায়, বিশ্বচূর্ণ ঝরে চারিধার।

অনন্ত, কাতর স্বরে, করযুগ বদ্ধ করে, শঙ্করেরে করে নিবেদন,
"রক্ষ, রক্ষ, মহেশ্বর ! নিবার তোমার চর ধ্বংস করে আমার ভুবন।
বহু আরাধনা করি, রচিয়াছি নব পুরী, ঢালিয়া এ জীবন আমার।
এখনো অপূর্ণ তাহা আমার বাসনা যাহা, কিঞ্চিতো সফল নহে তার।
সুপবিত্র করি প্রাণ, করিয়াছি নিরমাণ, জীবজন্তু সকলি তাহার;
আদর্শ করিয়া তায়, রাখিয়া ব্রহ্মাণ্ড গায় চিরসাধ, শঙ্কর আমার।
শঙ্কর কহেন হাসি "আদর্শ ধরাভিলাষি ! দেখ চেয়ে বিশ্বে একবার।"
অনন্ত ফিরিয়া চায় ওকি দেখা যায়, হায়, শুনা যায় ওকি হাহাকার!
নাহি কাম, নাহি রতি, অবশ চিত্তের গতি, কামনা-বিহীন জীবগণ,
কারো নাহি কর্ম্মে মতি, উৎসাহ, সুখের রতি, অবসন্ন জড়ের জীবন।
জ্ঞানের চর্চ্চায় ঋষি, আছে মগ্ন দিবানিশি, একভাবে কতই বৎসর,
এ চর্চ্চা কামনা হীন, একি ভাবে দিন দিন, অবসন্ন এবে কলেবর।
কামনা-বিহীন হায় ! রাজা অবসন্নপ্রায়, রাজকার্য্যে নাহি প্রীতি আর,
যেন মৃত পঙ্গপাল, কামনা অভাবে, কাল কাটে, কর্ম্মহীন প্রজা তাঁর।
কামনা অভাবে কবি, হইয়াছে যেন ছবি, নিবিয়াছে প্রাণের উচ্ছ্বাস,
কবিতায় প্রীতি নাহি, পড়ে আছে শূন্যে চাহি, জড়বৎ নিরাশ উদাস।
শান্ত, দাস্য, সখ্য আদি, বাৎসল্য মধুর জাতি বন্ধন বিচ্ছিন্ন কামাভাবে;
পরস্পর প্রীতি আর কামনা ত নাহি কার কে কাহার স্নেহ প্রেম চা'বে?
সবারি মলিন মুখ, দুঃখের অভাবে সুখ, পাপাভাবে পুণ্য অর্থহীন,
বুঝিবে কি সাধ্য কার, না থাকিলে অন্ধকার, সূর্য্যালোক-জ্যোতিঃপ্রভা-বিন,
জীবন বৈচিত্র্যহীন, সৃষ্টির প্রথম দিন, যে ভাবে যে ছিল অতঃপর
রহিয়াছে সেই মত, সৃষ্টি যেন চিত্রার্পিত, হ্রাস বৃদ্ধি নাহি রূপান্তর।
নাহি মৃত্যু, নাহি জন্ম, শৈশব কি লোলচর্ম্ম, যুবক যুবতী চিরদিন;
দেহে মনে নাহি গতি, উন্নতি কি অবনতি, শৈলমূর্ত্তি যেন লক্ষ্যহীন।
জগতে বৈচিত্র্য নাই, জীবনে বৈচিত্র্য নাই, পড়ে আছে জড়বৎ সব,
নাহি পাপ, নাহি পুণ্য আনন্দ বেদনাশূন্য, নাহি কোন কৌতুক উৎসব।
কাম নাই, রুচি নাই, মুখে উঠিতেছে হাই, কাতরে কহিছে উচ্চরায়—
"এই জীবনের ভার বহিতে পারি না আর, হা অনন্ত ! কি করিলে, হায়!"
কাঁদিয়া অনন্ত কহে, "প্রভো ! প্রাণে নাহি সহে, আমার সে সুন্দর জগৎ,
আমার আনন্দ ধাম, তার এই পরিণাম ? নাহি মৃত্যু—তবু মৃতবৎ!"
হাসিয়া ভুবনেশ্বর, কহেন করুণ স্বর,— "ভ্রান্ত তুমি শক্তির মায়ায়,
মনে করিয়াছ স্থির, যত দুঃখ অবনীর সমুদ্ভূত এই কামনায়।
কি যে ঘোর কামনার নিজে তুমি দাস তার, নাহি জ্ঞান মোহেতে মায়ায়,
নহ বিশ্ব তুলনায় ধূলির শতাংশ হায় ! কর সমালোচনা স্রষ্টার ?
এ অনন্ত সৃষ্টি যাঁর, কি অনন্ত জ্ঞান তাঁর, ক্ষুদ্র নর বুঝিবে কেমনে,
তুমি মাত্র দেখ পাপ, দেখ মাত্র পরিতাপ, দগ্ধ জীব কামনা-তাড়নে।
তাই এই সৃষ্টি তব করিয়াছ অভিনব, কামনা করিবে অধিকার?
স্রষ্টার উপরে স্থান ! হায় ! নর ক্ষুদ্রপ্রাণ, ঈশ্বরত্ব কামনা তোমার?
হাস্যকর কামনায়, উন্মত্ত পতঙ্গপ্রায়, সৃজিয়াছ নিষ্কাম সংসার।—
নাহি কাম নাহি রতি, দেখ তার কিবা গতি, ধ্বংসশীল পরিণত তার।

ক বলিল মূর্খ নর, কামনা দুঃখ-আকর ? ঈশ্বরত্ব কামনা যাহার
স কেন না পাবে দুঃখ, কেন অশান্তিতে বুক, হইবে না শ্মশান তাহার ?
ায় ! অন্ধ মূঢ়মতি ! বারেক ধরার প্রতি, চেয়ে দেখ বৃক্ষে কামনার
লিয়াছে কত সুখ ! কি আনন্দে পূর্ণ মুখ, দেখ চেয়ে শ্যামা বসুধার !
কি আনন্দ বৃক্ষে ফলে, কত শোভা পুষ্পে, জলে, কি মধুর হাসে জ্যোৎস্নায় ?
কি সুন্দর শিশু-হাসি, দেখ কি আনন্দ রাশি, সোহাগ-ভাষার প্রতীক্ষায় ?
মায়ের কামনা-ফল, কত সুখকর বল ! পতিপত্নী প্রেমকামনায়
কি সুখ প্রবাহ বয় ! সংসার কি সুখময় ! কত সুখ উছলে ধরায় !
পুণ্যের কামনা কর, পাবে তুমি সুখ নর, হবে দুঃখ পাপ-কামনায়।
রোপ যদি বৃক্ষ বিষ, কেমনে ফলিবে আম্র, গোলাপ ফুটিবে বাবলায় ?
মানবের দুঃখ হেন ? কুকর্ম্মে কামনা কেন ? সৃষ্টির এ তত্ত্ব, ক্ষুদ্র নর !
কেমনে বুঝিবে বল, মহান্ এ বিশ্বতল, মায়াময় রহস্য আকর।
কামনার স্বাধীনতা, মানবের মানবতা, না থাকিলে মানব কেমন
[illegible]ড়ে পরিণত, অবসন্ন মৃত মত, তব সৃষ্টি তার নিদর্শন।
কামনার কর্ম্মে রত হয় জীব অবিরত, কেন্দ্র-শক্তি কামনা সৃষ্টির,
কামনা অভাব আনে, যে অভাব দুঃখ জ্ঞানে, হয় নর কাতর অস্থির।
কিন্তু সে অভাব বৎস ! জীবের উন্নতি-উৎস ; করিতে সে অভাব পূরণ
অনন্ত চেষ্টায় নর, পশু হ'তে উর্দ্ধতর উঠিতেছে দেখ অনুক্ষণ।
এখনও ঋষিবর ! অর্দ্ধপশু অর্দ্ধ নর— মানব যে দেখিতেছ তুমি,
প[illegible] প্রবৃত্তিচয় এখনো হৃদয়ে বয়, তামস ভাবের ক্রীড়াভূমি।
সেই দুঃখমোচনের হয় লক্ষ্য মানবের, চেষ্টায় নিরত অতঃপর
ত্যজিয়া সে পশুভাব, ক্রমশঃ করিবে লাভ পূর্ণ মানবত্ব, ঋষিবর !
ত্যজি এই নরলোক, অজ্ঞানতা, মোহ শোক, যাবে ক্রমে লোকে উচ্চতর :
পাবে সুখ শ্রেষ্ঠতর, এ উন্নতি নিরন্তর, কি অনন্ত সুখের আকর !
এ উন্নতি সুখ-গীতি, চিরন্তন পুণ্য গীতি, জগতের সর্ব্বত্র সমান ;
দুঃখ-সুখাভাব, ঋষি ! দিবাভাবে যথা নিশি ; সুখ—ঋষি দুঃখের নির্ব্বাণ,
সুখ নিত্য, দুঃখানিত্য, দুঃখে অভিভূত চিত্ত, তাই জীব না হয় কখন,
শত দুঃখে জর্জ্জরিত যেই জন, কদাচিত সেও তবু না চাহে মরণ।
মানব-উন্নতি নিত্য তাই সুখ পুণ্যে ধৃত, দুঃখ পাপ ব্যতিক্রম তার।
মেঘাবৃত চন্দ্র যথা, সুখ দুঃখাবৃত তথা, ভ্রান্তি তব কর পরিহার।
[illegible] জনক কাম, কে বলিল ? পুণ্যবান্ ! দুঃখের বাসনা নহে রতি,
আপনি যে বিশ্বপতি, তাঁর কাম, কর্ম্ম, রতি—দেখ সৃষ্টি, স্থিতি, লয় গতি।
কি কামনা অবিশ্রাম ! যত্ন, আশা অবিরাম, এ সাধনা জগত-মঙ্গল !
তাঁহার শক্তির লীলা, সিন্ধুর লহরী খেলা, এই বিশ্বে অনন্ত চঞ্চল।
সিন্ধু যবে কর্ম্মে রত, জীব জলবিম্ব মত রবে কিসে কর্ম্ম-রতি-হীন ?
কামনা জগত-হিত, সাধনায় অবহিত, কর লক্ষ্য—দুঃখ হবে লীন।
মনুষ্যত্বে শ্রেষ্ঠতর হবে ক্রমে অগ্রসর, দেবত্ব ইহার পরিণাম,
মৃত্যুতে হবে না ভয়, মৃত্যু যে মঙ্গলময়, মৃত্যু হয় মুক্তির সোপান !

জগত-মঙ্গল-কাম, তুমিও হে পুণ্যধাম ! কিন্তু মুগ্ধ অলীক মায়ায়,
একটিও ধূলি নব সৃজিবে কি সাধ্য তব ! তুমি মত্ত সৃষ্টি-কামনায় !
তোমার যে ক্ষুদ্র শক্তি, ভগবানে রাখি ভক্তি, জীবহিতে হও সদা রত।
সৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্ব, বুঝিতেও নাহি শক্ত, তুমি ক্ষুদ্র পতঙ্গের মত,—
কি বুঝিবে সেই তত্ত্ব, ভ্রান্তিতে হয়েছ মত্ত, সেই ভ্রান্তি কর পরিহার।
দুর্ব্বল মানব, তব শক্তি করি অনুভব, নিয়তির কর অনুসার।"
প্রভাতে পূরবাকাশে, যথা শান্ত রবি হাসে, ধীরে ধীরে আলোক প্রকাশি'
অনন্ত হৃদয়ে জ্ঞান করিল আলোক দান, ধীরে ধীরে মোহ ভ্রান্তি নাশি'।

অনন্ত কাতরে কয়—"তুমি শিব দয়াময় ! যে জগত সৃজিয়াছি হায় !
নাহি দুঃখ, নাহি সুখ, শ্রান্ত অবসন্ন বুক, ইহাদের কি হবে উপায় ?"
বিশ্বনাথ হাস্য হানি, কহেন করুণ বাণী, ভ্রান্ত তুমি শক্তির মায়ায়,
তোমার যে সৃষ্টি নব, মস্তিষ্কের ভ্রম সব, জলদৃশ্য মৃগ তৃষ্ণিকায় !

তোমার তপস্যা পূর্ণ হইয়াছে, মোহশূন্য, জ্ঞানালোকে চিত্ত বিভাসিত,
সেই সৃষ্টি কু-আশার তুমি দেখিবে না আর, কুয়াসার সম অন্তর্হিত !
অনন্ত ফিরিয়া চায়, কিছু নাহি দেখা যায়, সে পুরীর চিহ্ন নাহি আর।
দেখে আর দিব্য জ্ঞানে, পুলকপূরিত প্রাণে, চিদানন্দ মহা পারাবার।

যে প্রবাহ মাত্র সৎ, জলে জলবিম্ববৎ, সৃষ্টি স্থিতি লয় অবিরল
হতেছে জগত কত, মহাসূর্য্য শত শত, লয়ে গ্রহ তারকামণ্ডল।
কি অচিন্ত্য আয়তন, কি অনন্ত আবর্ত্তন, অপরূপ গতি বিঘূর্ণন !
ওম্ ওম্ বম্ বম্— করি পরিপূর্ণ ব্যোম, অপূর্ব্ব গভীর গরজন !
জলে জলবিম্ব মত, বিলুপ্ত জগত কত, হইতেছে পলকে পলকে !
জলে বুদ্বুদের প্রায়, সৃষ্টি ফুটি ডুবে যায়, চিত্র যেন চিত্রের ফলকে।
অনন্ত গ্রহের বল, অসংখ্য জীবের দল, করমের সূত্রে নিয়ন্ত্রিত
উর্দ্ধতর, অধঃতর, কর্ম্মফলে নিরন্তর, হইতেছে উত্থিত, পতিত।
জ্ঞানের আলোকে নর, হয় যত অগ্রসর, তত সুখ, উচ্চ লোকে স্থান ;
যত হয় অধোগতি, তত দুঃখ অবনতি, পশুত্ব জড়ত্ব পরিণাম।
এই চিদানন্দ জ্ঞানে, নির্ম্মল পবিত্র প্রাণে, অনন্ত হইল উদ্বেলিত।
পূর্ণ তপস্যার ফলে, শিবের চরণতলে, পড়িল হইয়া মূরছিত।
অনন্ত মেলিয়া নেত্র, দেখে মহা হিমক্ষেত্র, বসি যোগ-শৃঙ্গে আপনার।
চারিদিকে হিমালয় শৈল সিন্ধু উর্ম্মিময়, হিমাবৃত অনন্ত বিস্তার।
এ কি স্বপ্ন ?—স্বপ্ন কেন, জ্ঞানপূর্ণ হবে হেন, বুঝিলেন যোগলীলা সব।
হয়ে যোগে অভিভূত, দেখিলেন এ অদ্ভুত, মহাস্বপ্ন—যোগীর দুর্লভ।
বুঝিলেন জীবগতি, বুঝিলেন কাম রতি, সুখ দুখ-তত্ত্ব নিরমল।
পূর্ণানন্দে জ্ঞানোদয় ফলিয়াছে সুধাময় সাধনার বৃক্ষে সিদ্ধি ফল

ইতি "অনন্তের রুদ্রলোকে গমন' নামক নবম সর্গ সমাপ্ত।)

[গ্রন্থ সমাপ্ত]
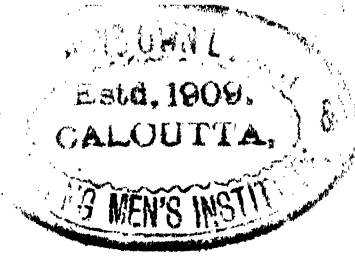
প্লাবন

—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিমল সেই রাত্রেই চলিয়া গেল। ছায়া অনেক করিয়া বলিয়াছিল, দাদা রাতটা থাক, কাল সকালে যেও। বিমল রাজী হইল না। ছায়া অনুরোধ করিয়াছিল, দাদা, কয়েকটা টাকা সঙ্গে রাখ। কাশীই যদি যাও, হেঁটে ত যাওয়া চলবে না, গাড়ীভাড়ার টাকাটা অন্ততঃ রাখ। তাহাতেও বিমল সম্মত হয় নাই, বলেছিল, কাশী যাব না বোন্।

ছায়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কোথায় যাবে তা হলে?

বিমল বলিয়াছিল, কিছু ঠিক নেই দিদি। তবে যেখানেই যাই, আর যেখানেই থাকি, তোমার এ আদর-যত্ন ভুলব না বোন, খবর দোব।

ছায়া এদিকে ওদিকে চাহিয়া, অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, দাদা একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

—অত কিন্তু কেন ছায়া?

—যদি অন্যায় হয়, ক্ষমা করবে বল?

—আমি রাগ করব না, ছায়া, কাজেই ক্ষমা করার কথা উঠতেই পারে না।

কথাটা তবুও ছায়ার মুখ দিয়া বাহির হইল না; অধিকতর দ্বিধার সহিত বলিল, তবু বল, ক্ষমা করবে।

বিমল ম্লানহাস্যে কহিল, বেশ, তাই বলছি। কিন্তু তুমি কি জিজ্ঞাসা করবে তা আমি বুঝতে পেরেছি ছায়া!

ছায়া বলিল, কি বল ত?

বিমল বলিল, আমি কুমিল্লা যাব কি-না?

ছায়া একথার কোন উত্তর দিল না, নতচক্ষুতে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিমল ম্লানমুখে মৃদু হাসিয়া বলিল, না বোন, যাব না। যেতে পারি না, যাওয়া উচিত নয়।—একটু থামিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, কোন দিন তার সঙ্গে দেখা যাতে না হয়, সেই চেষ্টাই করব ছায়া। দুঃখে হোক্, কষ্টে হোক্, সুখে হোক্, স্বেচ্ছায় হোক্ বা সংস্কারের বলেই হোক্, মনকে যদি সে বাঁধতেই পেরে থাকে, আমি কেন তার সে তপস্যায় বিঘ্ন জন্মাই ভাই?

ছায়া সাহস করিয়া বলিল, দাদা, তা কি সম্ভব?

—কি সম্ভব ছায়া?

—মন বাঁধা কি সম্ভব?

—জানি না।

ছায়া বলিল, মন বাঁধা মানে ত অতীত বিস্মৃত হওয়া? অসম্ভব। পুরুষেই পারে না, তা মেয়েরা!

বিমল হাসিয়া বলিল, তুমি ত অভিজ্ঞান শকুন্তলা পড়েছিলে, ছায়া? মনে আছে, দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে একেবারে ভুলে গেছলেন।

ছায়া অবজ্ঞাভরে কহিল, একেবারে আজগবী গল্প। হয় রাজা শকুন্তলাকে ভালবাসেন নি, না-হয় কালিদাস গাঁজাখুরী গল্প লিখেছেন।

—ঠিক বলেছ ছায়া! সত্যিকার ভালবাসা হলে কখনও ভোলা সম্ভব নয়। কালিদাস রাজা দুষ্মন্তকে অমানুষ গড়েছেন। পরীক্ষার ফলে শকুন্তলার নিষ্ঠা উজ্জ্বল হয়েছে সত্যি, দুষ্মন্ত মানুষ হন্ নি, অমানুষ হয়েছেন। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে এল ছায়া, আমি আসি ভাই।

ছায়া জিজ্ঞাসা করিল, আবার আসবে ত?

—ইচ্ছে নেই এই কথা বলতে পারলে ভাল হত বটে; কিন্তু সেটা হত মিথ্যে কথা। মিথ্যে বলব না ছায়া, বোনের অভাব মানুষের জীবনে যে কত বড় অভাব তা আগে কখনও বুঝি নি, আজ যাবার সময় তা বুঝতে পারছি। এই শূন্য জীবন মাঝে মাঝে পূর্ণ ক'রে নিতে তোমার কাছ ছাড়া আর কোথায় যাব ভাই? তোমাদের ঐ নারকেল গাছটা কি দুষ্টু, দেখলে? টুপ্ করে সূর্য্যিটিকে ঢেকে দিয়ে আমায় বলে দিলে—আর দেরী নয়। পরেশটার সঙ্গে দেখা হল না, একরকম ভালই—দেখা হলে তাকে বোঝাতে আরও আধ ঘণ্টা লাগত। তোমার শাশুড়ীকে আমি এই খান থেকেই প্রণাম করি ভাই, আমার খোঁজ করলে তুমি ব'লে দিও।

ছায়া ভূতলে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিলে, বিমল হাসিয়া বলিল, এসব তুমি শিখলে কোথায় ছায়া? আমি ত দেখেছি — বলিতে বলিতে থামিয়া গিয়া, আবার বলিল, তুমি একটি আশ্চর্য্য সৃষ্টি ছায়া! ঘোষ সাহেবের বাড়ীর ছায়া আর আজকের ছায়ায় এতটুকু মিলও নেই। আশ্চর্য্য!

—মানুষ অবস্থার দাস, দাদা।

— ঠিক বলেছ, ছায়া।

ছায়া বলিল, সেই জন্যেই ইন্দুর ঐ দু'লাইনের চিঠি দেখেও আমি আশ্চর্য্য হই নি।

বিমল বলিল, আমিও না, ছায়া, আমিও না। চললুম ভাই। আবার আসব, কবে তা জানিনে, কিন্তু জানি, আসব। তবে এর মধ্যে যদি মিঃ অশোক বোস ফিরে আসেন, আমাকে খবর দিও, আগেই চলে আসব।

ছায়া কহিল, আমি সে আশা বড় করিনে দাদা।

—কিন্তু আমি করি। আশা করি, কায়মনে কামনাও করি। এত বড় একটা মহৎ জীবন বিফলে যেতে পারে না ছায়া! ভক্তের প্রাণের নিবেদন, ভগবান গ্রহণ না ক'রে পারেন না।

ভক্তের প্রাণের নিবেদন, ভগবান কি সত্য সত্যই গ্রহণ না করিয়া পারেন না? কই, পৃথিবীতে তাহার সাক্ষ্য প্রমাণ দেখা যায় কই! মুমূর্ষু পুত্রের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কোন্ পিতা বা কোন্ মাতা ভগবানের উদ্দেশে আবেদন-নিবেদন না করে? কয়জনের আবেদন তিনি কাণে শোনেন? কাহার নিবেদন তিনি গ্রহণ করেন? ভক্ত প্রহ্লাদের নিবেদন তিনি শুনিয়াছিলেন; ধ্রুবের আবেদনও তাঁহার কাণে গিয়াছিল; কিন্তু পুরাণের বাহিরে কোন্ ভক্তের কোন্ আবেদন, কোন্ নিবেদন তিনি গ্রাহ্য করিয়াছেন? তা যদি করিতেন, সংসারের এই লক্ষ্মীশ্রী রূপ কি থাকিতে পারিত?

কিন্তু কাহার পুণ্যে জানি না, কাহার ভক্তির জোরে তাহাও বলিতে পারি না, ছায়ার নিবেদন তিনি গ্রাহ্য করিলেন। বিমলের কথাটা যে একটি দিনের মধ্যেই সত্য হইয়া উঠিবে, বোধ হয় ঘটনাটা যিনি ঘটাইলেন, তিনি ছাড়া কেহই জানিতেন না।

পরেশ বাগানপাড়ায় বীজ-ধানের সন্ধানে গিয়াছিল, ফিরিয়া শুনিল, বিমল চলিয়া গিয়াছে। শুনিয়া সে কচি ছেলের মত পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল। তাহার কান্না দেখিয়া, ছায়া হাসিবে কি কাঁদিবে ভাবিয়াই পাইল না।

ঘরের ভিতরে জীর্ণ শয্যায় শুইয়া যে কঙ্কালসার-দেহ স্ত্রীলোকটি প্রতিমুহূর্ত্তে যমদূতের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, পরেশের কান্না শুনিয়া বিচলিতকণ্ঠে ডাকিলেন, বৌমা, বৌমা!

ছায়া আসিলে বলিলেন, পরেশের কি হয়েছে বৌমা? অসুখ-বিসুখ করেছে বুঝি? আমি জানি, এ পোড়া বরাতে ও গুঁড়োটুকুও থাকবে না। ভয় নেই বৌমা, আমি মরব না, তুমি বল, কি হয়েছে তার।

ছায়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া, তাঁহার পায়ের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, না মা, না, অসুখ-বিসুখ কিছু নয়। দাদা চলে গেছেন, ওর সঙ্গে দেখা করে যান্ নি, তাইতে বাবুর পা ছড়িয়ে বসে কান্না হচ্ছে।

শাশুড়ী বলিলেন, তোমার দাদা গেলেন? কই, যাবার সময় আমার সঙ্গে দেখা ক'রে গেলেন না যে!

ছায়া বলিল, আপনার অসুখ···

—দেখা ক'রে যেতে হয়। গরীবই হই, বুড়োই হই, আমি ত অশোক-পরেশের মা। বলিতে বলিতে অশ্রুভারে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

একটু পরে তিনি আবার বলিলেন, ভালই হয়েছে গেছেন; নইলে আমাকেই যেতে বলতে হ'ত।

ছায়া বিস্ময়ে হতবাক, হতবুদ্ধি হইয়া গেল। যেন শুনিতে পায় নাই, এই ভাবে কহিল—মা!

—হাঁ বাছা, বলতে হ'ত বৈ কি! এটা ত তোমাদের কলকাতা শহর নয়, এ যে পল্লীগ্রাম।- পল্লীগ্রামে পল্লীগ্রামের মতই থাকতে হয় বাছা।

তাঁহার কথাগুলা ছায়ার কাছে হেঁয়ালীর মত ঠেকিতেছিল। কিছুই না বুঝিতে পারিয়া আকুলিত বিস্ময়ে শাশুড়ীর মুখের পানে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। প্রদীপের আলো এত মৃদু, এত মলিন যে পার্শ্বে বসিয়াও স্পষ্ট ভাবে কিছু দেখা যায় না। শাশুড়ী কি বলিলেন তাহার অর্থবোধ করাও যেমন দুঃসাধ্য, তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝিয়া লওয়াও তদ্রূপ দুঃসাধ্য।

কিছুক্ষণ নীরবতার মধ্যে অতিবাহিত হইলে, ছায়ার শাশুড়ী বলিলেন, দাদা বল এই বই ত নয়, সম্পর্ক ত আর সত্যিই কিছু নেই, পাঁচজন পাঁচ রকম কথা বলতে পারে বৈ কি!

সম্ভব অসম্ভব অনেক কথাই ছায়া কল্পনায় আনিয়া ভাঙ্গা গড়া করিতেছিল, কিন্তু এই জঘন্য কথাটা সুদূর কল্পনাতেও সে আনিতে পারে নাই। মুখে বলা ত দূরের কথা, একথা যে মনের কোণেও কোন লোক ঠাঁই দিতে পারে, তাহাও তাহার কল্পনার অতীত ছিল। ঐ কথাগুলা যে দুইটা কাণের মধ্য দিয়া গিয়াছিল, কিছুক্ষণের জন্য সে দু'টা যেন সমস্ত শক্তি হারাইয়া ফেলিয়া পাষাণ হইয়া গিয়াছিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার কাণের কোনরূপ শব্দানুভূতিও ছিল না। যখন শ্রবণশক্তি ফিরিয়া আসিল, তখন শুনিল, শাশুড়ী বলিতেছেন, পল্লীগ্রাম বড় বিষম ঠাঁই বাছা। এখানে পাণ থেকে চূণ খসলেই সর্ব্বনাশ। বুড়ো নরু চক্কোত্তী আশী বছর বয়স, বার্ম্মা মুলুক থেকে বিধবা বৌটাকে নিয়ে এসে বাড়ীতে রাখলে, লোকে তাকেই বড় রেয়াৎ করলে, তা এ ত তোমার পাতান সম্পর্ক বাছা।

ছায়ার কাণ মাথা তখনও ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল, প্রদীপের ক্ষীণ আলোকটুকুও তাহার চোখে নিবিয়া গিয়াছিল। যে মাদুরটায় বসিয়া ছিল, তাহারই একটা ছিন্ন অংশের মধ্যে কয়টা আঙ্গুল পুরিয়া দিয়া সে পাথর হইয়া গিয়াছিল।

শাশুড়ী বলিতে লাগিলেন, পল্লীগ্রাম বড় সর্ব্বনেশে জায়গা বাছা, এখানকার লোকে না পারে হেন কাজ নেই। এরা জ্যান্ত মাছে পোকা পড়ায়।

ধীরে ধীরে ছায়ার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিতেছিল।

শাশুড়ী বলিলেন, সেদিন হালদার বৌমা এসে বললেন; তারপর দিন পদ্ম নাগের মা'ও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিমলের কথাই বলতে লাগলেন; কাল মুখুজ্জে-গিন্নী ত পষ্টই বললেন, ও লোকটি নড়তে চায় না কেন গা পরেশের মা? আমি সবাইকে যা বলি, মুখুজ্জে-গিন্নীকেও তাই বললুম।

তিনি কি বলিয়াছেন জানিবার কৌতূহল যে ছায়ার মনে জাগে নাই, তাহা নহে; জাগিয়াছিল, এবং বেশী করিয়াই জাগিয়াছিল; কিন্তু ঐ জঘন্য নোংরা কথাটাকে নাড়াচাড়া করিতে হইবে বলিয়া প্রশ্ন করিয়া কৌতূহল নিবৃত্তি করিবার প্রবৃত্তি তাহার হইল না।

তাহার প্রয়োজনও ছিল না, শাশুড়ী নিজের মনেই বলিয়া চলিলেন, বললুম, ছ'মাস জেলে পাথর ভেঙ্গে এসে শরীর ভেঙ্গে গেছে, মা কাশীবাস করছেন, আত্মীয়-স্বজন আর ত কেউ নেই, বৌমা দাদার মতন দেখে, তাই দিনকতক আছে। শুনে, মুখুজ্জে-গিন্নী নাক সিঁটকে বললেন, তোমার বৌমা দাদা বলেন বই ত নয়, সত্যিকার দাদা ত আর নয়।

ছায়ার পক্ষে আর সহ্য করা দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছিল, বলিল, মা, এদেশে মানুষ থাকে?

শাশুড়ী ত্বরিত উত্তর দিলেন, এরা কি মানুষ নয় বাছা?

—কি জানি মা, আমার ত সন্দেহ হয়।

শাশুড়ী বোধ হয় বিরক্ত হইয়াছিলেন, বোধ হয় কেন, তাঁহার কথায় বিরক্তি সুস্পষ্ট হইয়াই প্রকাশ পাইল। বলিলেন, তোমায় ত বললুম বাছা, এ তোমাদের কলকাতা শহর নয়, এ পল্লীগ্রাম। শহরে কেউ কারও খোঁজ রাখে না, কে কি করছে কোন খবর রাখে না, পল্লীগ্রামে ত তা নয় বাছা। এখানে সকলে সকলের খোঁজ রাখে; কে কি করছে না করছে সব খবর সবাই জানে।

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ছায়া যে প্রশ্নটা করিয়াছিল, সেই প্রশ্নটাই পুনরায় তাহার জিভ দিয়া বাহির হইয়া আসিল, বলিল, মা এদেশে কি মানুষ বাস করে?

শাশুড়ী বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিলেন, তোমারই বা কি দরকার ছিল বাছা, ওকে আজ আট দশ দিন আটকে রেখে আদিখ্যাতা করবার!

এই কথা কয়টা শুনিয়া ছায়া দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়া ফেলিল। এক মুহূর্ত্তে পৃথিবীর রূপ যেন বদলাইয়া গেল। পল্লীগ্রামের যে পরিচয় অল্পক্ষণ পূর্ব্বে সে পাইয়াছে, তাহা শাশুড়ীকেও সেই পল্লীগ্রামের একজন ভাবিতে তাহার মন যেন ছিঁড়িয়া যাইতেছিল।

শাশুড়ী বধূর মনের ভাব বুঝিবার কোন চেষ্টাই করিলেন না, প্রবৃত্তির ঝোঁক যেমন বাড়িয়াই চলে, তাঁহারও ঝোঁক তেমনই বাড়িতেছিল, আমার শোকতাপের শরীর বাছা ঐ এক ফোঁটা একটা ছোঁড়াকে নিয়ে দুঃখে কষ্টে এক কোণে পড়ে ছিলুম, কারুর কথার তোয়াক্কা ছিল না বাছা—এ

পর্যন্ত বলিয়া তিনি থামিলেন। বোধ হয় বধূর প্রতি ঈষৎ করুণার সঞ্চার হইল।

একটু পরে বলিলেন, যাক্, সে যখন গেছে, তখন দু'দিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

ছায়া কঠিনকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কি ঠিক হয়ে যাবে?

তাহার কঠিনকণ্ঠের কঠোর প্রশ্ন শুনিয়া শাশুড়ী যেন থতমত খাইয়া গেলেন; তারপর জড়িতকণ্ঠে কতকগুলা কি বলিলেন, তাহার একটি বর্ণও বুঝা গেল না। কথার ধরণ ধারণে শেষের দিকটায় যেন ইহাই বুঝাইল যে, পরেশের বিয়ের আগে এবাড়ীতে যখন কাহারও পাতা পাতিবার সম্ভাবনা নাই, ততদিনে এই একটু-আধটু ভুলচুকের কথা লোকের মনে চাপা পড়িয়াই যাইবে। পরেশ ত ঐ একরত্তি ছেলে, আগে বাঁচিয়াই থাক, তারপরে তাহার বিবাহ—ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু ছায়ার মত তেজস্বিনী মেয়ে ইহাতে সান্ত্বনা পায় না। বলিল, তারা আমার নামে মিথ্যে অপবাদ দেবে?

— যা বলবার তা ত তারা বলেইছে বাছা।

—আমরা তাই সহ্য করব!—রাগে তাহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল।

—সহ্য করা ছাড়া—

ছায়া শাশুড়ীর মুখের পানে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, তাদের কথা চুলোয় যাক্‌গে। আপনার কথা কি, তাই বলুন।

শাশুড়ী হতাশভাবে কহিলেন, আমার আবার কিসের কথা বাছা। থুতু ছুঁড়লে নিজেরই গায়ে পড়বে।

ছায়া অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল, সোজা কথা বলুন আপনি—

— ক'জন লোকের মুখে সরা চাপা দেবে বাছা?

—সরা চাপা একজনের মুখেও আমি দিতে বলছি নে মা; আমি তা চাই-ও না। আমি শুধু জানতে চাই, লোকের মত আপনিও কি—কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না। কথাটা কোন নারী নিজের মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতে পারে কি-না সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এমনই একটা সঙ্কটময় মুহূর্তে জনকদুহিতা সীতা অগ্নিপ্রবেশ করিয়া পরীক্ষার জ্বালা এড়াইয়াছিলেন।

শাশুড়ী চুপ করিয়া ছিলেন, ছায়া কণ্ঠে বল সঞ্চয় করিয়া কহিল, বলুন মা!

শাশুড়ী তথাপি স্পষ্ট করিয়া কথা বলিতে পারিলেন না, যেন উত্তর না দিলে না, এমন ভাবে কহিলেন, একটু সাবধান হলে ত কোন কথাই উঠত না বাছা। জেল থেকে বেরিয়ে এসেছিল, এসেছিল, বেশ ত, দুদিন থেকে চলে গেলে ত আর কোন কথাই উঠত না।

ছায়া বসিয়া ছিল, আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, আপনার মনে কি আছে আপনিই জানেন, আমি তা জানিনে; কিন্তু আমার কথা আপনাকে আমি বলছি শুনুন।

শাশুড়ী ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি কহিলেন, তুমি রাগ করছ কেন বাছা? আমি ত বলেছি তোমায়, ওসব কথা লোকে বেশী দিন মনে ক'রে রাখে না।

—বেশী দিনের দরকার নেই, একটা দিন একটি বার মনে করলেই যথেষ্ট।

—সে আর কি ক'রবে বাছা!

—কিছুই করব না মা। তবে আমার মনে যদি কোন পাপ থাকে, তা হ'লে আমি যেন তার সাজা পাই; আর আমার মনে যদি বিন্দুমাত্র পাপ না থাকে, তা হ'লে—

একটা কঠিন শপথের আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া বৃদ্ধা বলিয়া উঠিলেন, তুমি হয় ত কিছু বুঝতে পার নি বৌমা। সেই লোকটির—

ছায়া বলিল, না, না, না। তাঁরও মনে কোন পাপ নেই।

—কলকাতার ছেলে, বাছা, চেনা দায়।

—পল্লীগ্রামের লোকের পক্ষে চেনা দায় হতে পারে, কলকাতার মেয়েদের পক্ষে দায় নয়। বিমল দা'র মত নিষ্কলঙ্ক চরিত্র লোক কলকাতাতেও বেশী নেই মা।

শাশুড়ী বলিলেন, ভাল হলেই ভাল বাছা।

ছায়া কথাটা শেষ করিবার উদ্দেশে কহিল, শুনুন মা, আমাদের দু'জনের কারও মনে যদি কোন পাপ স্পর্শ করে থাকে, তা হ'লে ভগবানের কাছে আমার এই অনুরোধ, সারা-জীবন যেন আমার এমন কষ্টেই কাটে। আর যদি আমরা নির্দোষ হই—থাক্, এটা কলিকাল।

কিন্তু এটা কলিকাল যে নয়, অচিরেই তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল।

বাহিরে আসিয়া ছায়া দেখিল, পরেশ বাঁশের একটা খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে। পাশে বসিয়া, তাহার গায়ে হাত রাখিতেই পরেশ চমকিয়া উঠিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে কহিল, তুমি তাঁকে যেতে দিলে কেন?

হায় রে! এ বালকও ত পল্লীগ্রামের। তবে এই অস্ফুট-কুসুমে আজও পাপ-পুণ্য প্রবেশ করে নাই, এই যা!

বৌদিদিকে নীরব দেখিয়া পরেশ আবার বলিল, তুমি বললেই পারতে, পরেশ আসুক, পরেশের সঙ্গে দেখা করে তবে যেও। তোমার কথা তিনি ঠেলতে পারতেন না।

ছায়া নিজের মনেই বলিল, তা পারতেন না। কিন্তু পল্লীগ্রামে এই কথাটা যে কত দোষের, কত নিন্দার, তাহা মনে করিতেও মন অশুচিতে ভরিয়া উঠিল।

পরেশ বলিতে লাগিল, আমি কোথায় তিনখানা গাঁয়ে খবর দিয়ে এসেছি, বৌদি'র দাদা এসেছেন, তিনি কত পাস্ করেছেন, কত বিদ্বান। তাদের সবাইকে আসতে বলে এসেছি—

এত দুঃখের মধ্যেও ছায়ার হাসি আসিল, বলিল, কি বলে এসেছিলে ঠাকুরপো, বৌদিদির দাদাকে দেখাবে? বৌদিদির দাদা কি বাঘ না ভাল্লুক যে দেখে যাবার নেমন্তন্ন ক'রে এলে?

পরেশ লজ্জিত ভাবে কহিল, বা রে! তা কেন? দাদা সেদিন বলছিলেন না, আমাদের ঐ খালটা যদি খুব গভীর করে কাটা যায়, সমস্ত বছর যদি ওতে অনেক জল থাকে, তা হ'লে খালের ধারের জমিতে দু'নো ফসল হবে। বলছিলেন না?

—তা হবে। আমি শুনি নি ভাই।

—তুমি তখন ছিলে না; ঠিক, ঠিক! রাত্রে শুয়ে শুয়ে আমাকে বলছিলেন। সুন্দরবনে এক সাহেব আছে, তার কাছে উনি সব শিখেছেন। আমি সবাইকে সে কথা বলতেই তারা বললে, বেশ ত, আমরা খাল কাটব—

ছায়া হাসিয়া বলিল, তা ত কাটবে; কিন্তু যদি কুমীর আসে?

পরেশ সাশ্চর্য্যে কহিল, কুমীর আসবে কেন?

ছায়া বলিল, খাল কাটলেই কুমীর আসে। জান না, সেই জন্যই লোকে বলে, খাল কেটে কুমীর এন না।

পরেশ হাসিয়া উঠিল, বলিল, সেই কথা! ও সব বাজে কথা বৌদি।

ছায়া বলিল, কিন্তু রাত্রে কি খাবে বল ত ভাই?

পরেশ রাগ করিয়া বলিল, আমি খাব না। কেন তুমি দাদাকে চলে যেতে দিলে?

—ঘাট হয়েছে, মাপ কর ভাই। সত্যি বল, কি খাবে? ফলার করবে?

—কেন, ভাত?—বলিয়াই শিশু যেন মনে-মনে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল; পর মুহূর্ত্তেই বলিল, চাল বাড়ন্ত বুঝি?

ছায়া শিহরিয়া উঠিল, বলিল, বালাই!

ছায়া যাহাই বলুক, বালকের পক্ষে চাল বাড়ন্ত হওয়ার সংবাদ আদৌ নূতন নহে; বরং সে তাহাতে বিশেষ অভ্যস্ত ছিল। তাহার মা'ও প্রথম প্রথম তাহাকে গোপন করিতেই চেষ্টা করিত; কিন্তু ক'দিন গোপনতা থাকিত?

পরেশ ছলছল মুখে কহিল, তুমি কি খাবে বৌদি?

—আমি আজ খাব না ঠাকুরপো।

পরেশ বলিল, আমিও খাব না।

—তুমি খাবে না কেন?

—তুমিই বা খাবে না কেন?

—আমার আজ খিদে নেই।

—আমারও।

বস্তুতঃ এমন অক্ষুধায় এই বালক অনভ্যস্ত ছিল না। মায়ের কাঁদ-কাঁদ মুখ দেখিলেই অক্ষুধার ওজর করিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া যাইত এবং পাড়াগাঁয়ের বনে, বাগানে ঘুরিয়া কখনও পাকা গাব, কখনও জাম, কখনও বৈঁচি, খেজুর, তালশাঁস, কখনও বা খালের জলে উদর পূর্ণ করিয়া ফিরিয়া আসিত। যেদিন বেশী পাইত, ছিন্ন বস্ত্রের খুঁটে বাঁধিয়া মাতার জন্যও কিছু কিছু আনিত। ছায়া এই গৃহে আসা অবধি বালকের কোন দুঃখই ছিল না। উদরের ক্ষুধা অনুভব করিবার পূর্ব্বেই খাদ্য তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইত। আজ পুরাতন দিনের কথা মনে করিয়া পরেশ সপ্রতিভ ভাবে আবার বলিল, আমার আজ একটুও খিদে নেই।

ছায়া হাসিয়া তাহার পেটে হাত দিয়া বলিল, খিদে নেই, পেট বলে কোথায় ঢুকে গেছে, খিদে নেই, দুষ্টু ছেলে কোথাকার।

—সত্যি বলছি, এই দেখ-না। বলিয়া সে নিঃশ্বাস টানিয়া পেটটা ফুলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ছায়া বলিল, থাক্ থাক্, শেষকালে পেটটি দুম্ ফট্ হয়ে যাবে! আর ফুলিয়ে কাজ নেই।

পরেশ হাসিয়া ফেলিল; সে কিছু বলিতে যাইতেছিল, ছায়া বলিল, শরীরটা আজ ভাল নেই ঠাকুরপো, তাই তোমায় জিজ্ঞাসা করছিলুম, যদি তুমি ফলার খেতে পার, তা হ'লে আজ আর রাঁধিনে। দুধ আছে, গুড় আছে, হাট থেকে কাল কলা এসেছিল, কলা আছে, চিঁড়ে-মুড়কী আছে—খাবে?

পরেশ বলিল, তুমিও খাবে?

ছায়া কহিল, বললুম না, আমার শরীরটে আজ ভাল নেই।

—দু'টিখানি খেও। কেমন?

—আচ্ছা, তাই হবে।

পরেশকে পরিপাটি করিয়া ফলাহার ভোজন করাইয়া, তাহারই পীড়াপীড়িতে ছায়াও সামান্য কিছু খাইয়া, শাশুড়ীর জন্য দুধ-মিষ্টান্ন বাহির করিয়া, পরেশের হাত দিয়াই পাঠাইতে উদ্যত হইয়াছিল; কি ভাবিয়া তাহার হাত হইতে লইয়া নিজেই ঘরপানে চলিল।

শাশুড়ীর সম্মুখীন হইতে সত্যই আজ তাহার পা'ও উঠিতেছিল না, মনও উঠিতেছিল না। নোংরা পথে পা দিতে মানুষের যেমন মনটা সঙ্কুচিত হয়, পা দ্বিধা করে, তাহারও সেই অবস্থা।

শাশুড়ীর শয্যাপার্শ্বে গঙ্গাজল ছড়া দিয়া, খাদ্য নামাইয়া নিব-নিব প্রদীপটাকে উস্কাইয়া দিয়া, ছায়া ডাকিল, আপনার খাবার এনেছি।

অন্যদিন ছায়া তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইয়া বসিত; এবং যতক্ষণ না খাওয়া হইত, তাঁহার গায়ে পিঠে হাতে পায়ে হাত বুলাইয়া দিত। আজ কিছুই পারিল না। প্রদীপটার দিকে [illegible] করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শাশুড়ী এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন কি না বলা যায় না, উঠিয়া বসিয়া আহার করিলেন এবং হাত-মুখ ধুইয়া শুইয়া পড়িলেন। কেহই কোন কথা কহিলেন না।

ছায়া নিঃশব্দে বাহিরে আসিয়া, দাওয়ায় মাদুর বিছাইল। অন্যদিন সে ঘরে শাশুড়ীর কাছে শুইত, পরেশ ও বিমল এই দাওয়াটায় শুইত। আজ কোন মতেই ঘরের ভিতরে শুইবার কথাটা তাহার মনে স্থান পাইল না। যতবারই কথাটা মনে আসিয়াছে, সবলে মন হইতে কথাটাকে সে দূর করিয়া দিয়াছে। যখন বিমল আসে নাই, পরেশকে লইয়া সে ঘরের ভিতরেই শুইত। গরমে বদ্ধ ঘরে থাকিতে প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম করিয়াছে, দম বন্ধ হইতে গিয়াছে, তবুও শাশুড়ীকে ফেলিয়া আসিতে পারে নাই। আজ সে কথা যখনই মনে হইয়াছে, তখনই ভাবিয়াছে, সে সকলের এই পুরস্কার!

যাহার চোখে ঘুম নাই, তাহার রাত্রি কাটিতে চায় না। ছায়ার রাত্রিও কাটে না। প্রহরে প্রহরে পাখী ডাকিতেছে, এখানে সেখানে কুক্কুরের দল কলহ করিতেছে, দূরে নিকটে শিবা-রব উত্থিত হইতেছে, আকাশে তারারা বর্ণ পরিবর্ত্তন করিতেছে, স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে, অন্ধকার আকাশ কখনও আলোকে ভরিয়া যাইতেছে, কখনও বা গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে, রাত্রি যেন আর শেষ হইতে চায় না।

এই পল্লীগ্রাম, এই তাহার স্বামী-গৃহ! এর অঙ্গে এত সৌন্দর্য্য, এত বীভৎসতা এক সঙ্গে কেমন করিয়া জড়াইয়া রহিয়াছে, ভাবিতে ভাবিতে তাহার দু'চোখে অজস্র ধারা ছুটিল।

এই তীর্থের উদ্দেশে যেদিন নিঃসহায়া নারী পিতার গৃহ ত্যাগ করিয়া হাসিমুখে স্বেচ্ছায় সকল দুঃখ-কষ্ট বরণ করিতে আসিয়াছিল, সেদিনের কথা মনে করিতে অশ্রুর উৎস রোধ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল।

সেই দিন হইতে, প্রত্যেকটি দিনের ছোট-বড় ঘটনাগুলি আলোচনা করিতে কত সুখ, কত আনন্দই না হইত, কিন্তু আজ! আজ মনে হইল, তাহার সমস্ত ত্যাগ, কষ্টস্বীকার, দুঃখবরণ সকলই ব্যর্থ হইয়াছে। এ পৃথিবীতে সে সকলের কোন মূল্য নাই, সে সকলের কোন মর্য্যাদা কেহ দেয় না। এই সুশ্রী সুন্দর আবরণের মধ্যে কুৎসিত পৃথিবী কেবল কুৎসাই দেখিয়া থাকে, কদর্য্যতাই তাহার চোখে লাগে। সে

মানুষের উচ্চতা দেখে না, হৃদয়ের সন্ধান করে না, অন্তরের মর্য্যাদা বুঝে না। দুই আর দুইয়ে চার হয়, এই সংস্কারই তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে—সেই সংস্কারের মাপ-কাঠিতে সে পৃথিবীর পরিমাপ করে। একটা বিশেষ বয়সের নরনারীর সম্বন্ধে একটি মাত্র ধারণাই ইহার আছে—অন্য কোন ধারণা করিতেও সে যেন জানে না। এই পৃথিবীর সঙ্গে বোঝাপড়া ও সামঞ্জস্য বিধান করিয়া বাস করিতে হইবে ভাবিয়া ছায়ার মনটা তিক্ততায় ভরিয়া গেল। জীবনে এমন বিতৃষ্ণা আর কোনদিন সে অনুভব করে নাই।

অকস্মাৎ একটি কাক ডাকিয়া উঠিল। একটির পর আর একটি, তারপরে আর একটি, এমনই করিয়া অনেকগুলি কাক কলরব করিয়া উঠিল। তাহাদের কলরব থামিতে না থামিতে মধুরস্বরে অন্য পাখীও ডাকিল। তাহারাও একটির পর একটি করিয়া অসংখ্য কণ্ঠে কাকলী তুলিল। পূর্ব্বাকাশ পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করিতেছে দেখিয়া ছায়ার বক্ষের ভার দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল। এই মুখখানা কেমন করিয়া সে ঐ গৃহশায়িতা নারীর সম্মুখে বাহির করিবে ভাবিয়া তাহার মন পক্ষাঘাত-গ্রস্ত হইয়া যেন বসিয়া পড়িতেছিল।

পরেশ ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, বৌদি ঘাটে যাই?

সুকুমার বালকটিকে চাপিয়া ধরিয়া ছায়া বলিল, না।

পরেশ বলিল, আজ যে বড়-জলা বেঁধেছে বৌদি। মাছ আনব না?

ছায়া সংক্ষেপে কহিল, না।

পরেশ ক্ষুব্ধভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বলিল, তোমার হাতে পয়সা না থাকে, মাছ না-ই বা আনলুম, দেখে আসি-না বৌদি! যে কোটালে বড়-জলা বাঁধা হয়, উঃ, কত বড় বড় মাছ যে পড়ে বৌদি। তুমি দেখনি, তাই জান না, এই এত বড় বড় রুই, কাৎলা, মৃগেল, কালবোস্, ভেট্‌কী। আমি দেখে আসি বৌদি। যাব?

ছায়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া ছিল। একহাতে বস্ত্রাঞ্চল টানিয়া চক্ষু মুছিয়া, উঠিয়া বসিতে বসিতে বলিল, শুধু দেখেই আসবে ঠাকুরপো—

পরেশ সোৎসাহে কহিল, মাছ আনতে বল যদি, কিন্তু তোমার হাতে যে—

ছায়া বলিল, পয়সার কথা বলছ? পয়সা আছে ভাই।

পরেশ দাঁড়াইয়া উঠিল, বলিল, আমি মুখ হাত ধুয়ে আসি, তুমি পয়সা বার কর।—বলিয়া বালক ছুটিয়া চলিয়া গেল।

কথায় বলে, মানুষের adaptibility. যে অবস্থাতেই পড়ুক, মানুষ যেমন মানাইয়া লইতে পারে, এমনটি আর কোন জীব পারে না। কাল রাত্রে সে ভাবিয়াছিল, এই গৃহে আর একটি দিনও সে বাস করিতে পারিবে না, এই গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া একটি অন্নকণাও সে মুখে তুলিতে পারিবে না। অথচ এই গৃহ ছাড়া আর যে আশ্রয় নাই, যাইবার স্থান নাই, তাহাও সে জানিত; তবুও তাহার মন মানে নাই। দুঃখরজনীর অনন্ত দুঃখের মধ্যে এই দুঃখটাই দুর্দ্দমনীয় হইয়াছিল যে, শাশুড়ীর মুখের ঐ কথার পরেও এই গৃহেই তাহাকে রজনী অতিবাহিত করিতে হইতেছে

পরেশ ফিরিয়া আসিয়া বলিল, ওকি, তুমি যে এখনও বসে আছ? পয়সা বার করবে না?

—পয়সা আমার আঁচলেই আছে ভাই।—বলিয়া আঁচলটা খুলিবার ছলে আর একবার চোখ মুছিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি মাছ আনবে ঠাকুরপো?

পরেশ নিরীহ শিশুর মত বলিল, তুমি যা বলবে।

ছায়া বলিল, তুমি ত রুই মাছের মুড়ো খেতে ভালবাস, তাই একটা এনো।

পরেশ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, দুর! চারা-রুইয়ের মুড়ো বুঝি খেতে ভাল হয়?

ছায়া বলিল, চারা কেন, বড় রুই আনবে।

পরেশ বলিল, বড়? বড় মাছ কে খাবে বৌদি! খেতে ত আমি আর তুমি!

একটু থামিয়া আবার বলিল, আজ কিন্তু বিমল দা' থাকলে বেশ হত। না বৌদি?

ছায়ার মনও তাহাই বলিতেছিল। কিন্তু এই পবিত্রতার আভরণে সজ্জিত পল্লীগ্রামে মনের কথা প্রকাশ পাইলে সমূহ বিপদ, তাই চুপ করিয়া রহিল।

পরেশ রাগত ভাবে কহিল, তুমি যদি কাল তাঁকে না যেতে দিতে…

ছায়া হাসিয়া বলিল, তুমি কি আমায় স্বপ্ন দেখেছিলে যে কাল বড়-জলার মাছ উঠবে?

পরেশ এক গাল হাসিয়া, পরমুহূর্ত্তেই মুখখানি করুণ করিয়া ফেলিল, তা বলিনি বটে! ঐ যাঃ, সূর্য্য উঠে পড়ল, দাও, আজ।

ছায়া আঁচল খুলিতে খুলিতে বলিল, কত দেব ঠাকুরপো?

—বড় রুই ত! চার পাঁচ আনা দাও না।

পয়সা লইয়া পরেশ ছুটিয়া চলিয়া গেল।

রজনী প্রভাত হইলে শয্যা ত্যাগ করিতে হয় এবং গৃহকর্ম্মে মনও দিতে হয়। মনের সঙ্গে দেহের কি নিবিড় সম্পর্ক, একের অনিচ্ছায় অন্যেরও গতিরুদ্ধ হয়। মনে তাহার পক্ষাঘাত হইয়াছিল, কিন্তু দেহও যে এমন বেদনাভারে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে, আগে সে বুঝিতে পারে নাই। উঠিয়া দাঁড়াইতে গিয়া বুঝিল; মনে হইল, এখনই পড়িয়া যাইবে। একটা খুঁটি ধরিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর মাদুরখানি, বালিশ দুইটি তুলিয়া ঘরের মধ্যে রাখিতে গিয়াছে—পরিচিত প্রিয়কণ্ঠে কে ডাকিল, ছায়া!

মানুষের দেহের মধ্যে কি আছে না আছে জানি না, তবে ঐ ডাক শুনিয়া ছায়ার মনে হইল, রক্ত-সমুদ্রে তুফান উঠিয়াছে। তাহার হাত হইতে মাদুর-বালিশ পড়িয়া গেল। ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, বেড়ার ধারে দাঁড়াইয়া পিতা! সৌম্য মূর্ত্তি, হাস্যানন, প্রশান্ত নয়নে স্নেহের আহ্বান, ছায়া ছুটিয়া গিয়া বেড়া খুলিয়া দুই হাতে গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার বুকের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

—বাবা।

—[illegible]।

—এতদিন কোথায় ছিলে বাবা? একটিবারও কি ছায়া বলে খোঁজ নিতে হয় না?

কন্যার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে মিঃ ঘোষ বলিলেন, খবর নিতুম না বুঝি? দিন-রাত আমার ছায়ার কথাই ভাবতুম।

ছায়ার দু'নয়নে সহস্র ধারা। বলিল, কিন্তু খোঁজ তো নাও নি। ছায়া বাঁচল কি মল?

আদরে পিঠের উপর গোটা দুই চাপড় মারিয়া পিতা বলিলেন, পাগলি! তোর শাশুড়ী আছেন ত রে?

—আছেন। এতদিন কোথায় ছিলে বাবা?

—তোর জন্যে একটি জিনিষ আনতে গেছলুম। দেখবি, আয়, গাড়ীতে আছে। চল্।

—গাড়ী কতদূরে রেখে এসেছ বাবা? কেন, এখান পর্য্যন্ত গাড়ী ত আসে।

—বড় গাড়ী কি-না, এর মধ্যে ঢুকল না। তুই আয় না।

মোড়ের উপরে গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল, দূর হইতেই দেখা যাইতেছিল। ছায়া জিজ্ঞাসা করিল, এ গাড়ী কবে কিনলে বাবা?

—নতুন কিনেছি রে। কেমন, ভাল নয়?

—সুন্দর গাড়ী।

—জিনিষ আরও সুন্দর। দেখবি চল না।

গাড়ীর কাছে অনেক লোক জমা হইয়াছিল। সেই অনেক লোকের মধ্যেও একটি লোককে চিনিতে ছায়ার বিলম্ব হইল না। তাহার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য সারা দেহ উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু এ-যে পল্লীগ্রাম! অজ্ঞাতে মাথায় আঁচল উঠিয়া পড়িল, সারা দেহে লজ্জার বান ডাকিয়া গেল, ছায়া পিতার হাত ছাড়াইয়া যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে ফিরিয়া গেল।

—পাগলি! মিঃ ঘোষ হাসিলেন, বলিলেন, এস অশোক! বলিয়া তিনি জামাতার হাত ধরিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আমার কলিকাতার পাঠক-পাঠিকা! চার আনা মূল্য দিয়া পরেশচন্দ্র যে সুবৃহৎ রোহিত মৎস্যটি ক্রয় করিয়াছে, আপনাদের কলিকাতায় হইলে তাহার মূল্য অন্ততঃ তিনটি মুদ্রার কম হইত না। আমি হুগলী জেলার লোক, একদিন ছিল, যখন আমরা চার আনার মাছ কিনিয়া বহিয়া আনিতে গলদঘর্ম্ম হইতাম; টাকায় ত্রিশ সের চাল, বার আনায় উপাদেয় গব্য ঘৃত আমরাই কিনিয়াছি, ত্রিশ বত্রিশ সের দুধ আমরা খাইয়াছি। আজ এই দুর্ম্মূল্যের দিনেও আমরা যে সুবিধা ও সম্ভোগ করিয়া থাকি, আপনাদের তাহা নাই। আমাদের পল্লীগ্রামে অর্থ নাই, স্বাস্থ্য নাই, শিক্ষা নাই, সহবৎ নাই, ঔজ্জ্বল্য নাই, চাকচিক্য নাই, স্বীকার করি।

কিন্তু এই দুর্দ্দিনেও দু'বেলা দু'মুঠো খাদ্য আমরা পাই, যে খাদ্যে ভেজাল নাই।

পরেশচন্দ্র মাছটার কান্‌কোয় দড়ি বাঁধিয়া ঘাড়ে ফেলিয়া আসিতেছিল, বাড়ীর কাছে গলিটার মোড়ে মোটর দেখিয়া, মাছ নামাইয়া গাড়ীর চালকের শরণ লইল। চালক পরম গম্ভীর প্রকৃতির লোক, তারপর গাড়ীর-রাজা রোলস্ তাহার হাতে, পাড়াগাঁয়ের ভুষুণ্ডিদের সহিত বাক্যালাপ করিতেই তাহার সম্ভ্রমে বাধে। দুই ধমক দিয়া সকলকে হাঁকাইয়া দিলেও পরেশকে কিছু বলিল না। বরং তাহার পানে চাহিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—এ খোঁকা, মছলি কাঁহা মিলা?

পরেশ মাছটাকে নামাইয়া রাখিয়া, এক লাফে পা-দানে উঠিয়া পড়িয়া বলিল, কিনে আনা হ্যায়। রুই মাছ জান ত?

চালক পৃষ্ঠপোষকতার স্বরে কহিল, হাঁ হাঁ ও ত জানতা হ্যায়। লেকিন্ কেৎনা মে লিয়া?

পরেশ লেকিন বুঝিল না, কেৎ না মে'ও বুঝিল না, ভাবিল, মাছটা কাতলা কি না এ ব্যক্তি তাহাই জানিতে চাহিতেছে; বলিল—কাতলা নয়, রুই। লাল দেখতে পারতা নেই?

চালক বিজ্ঞের মত বলিল, ও ত ঠিক হ্যায়, লেকিন (আবার লেকিন?) কেত্তা দাম?

লেকিনে যে গণ্ডগোল বাধিয়াছিল, দামে তাহার নিরসন হইয়া গেল, পরেশ বলিল, চার আনা।

চালক তাহার দাড়ী এবং গোঁফ ফুলাইয়া বলিয়া উঠিল, চার আনামে এত্তা বড়িয়া মাছলি! এ কিয়া তাজ্জব!

পরেশ এবার সাহসভরে জিজ্ঞাসা করিল, গাড়ীতে কোন্ এসেছে হ্যায়?

—জজ সাব আয়া হ্যায়।

পরেশের বৌদিদির পিতা যে জজ সাহেব তাহা সে জানিত। উল্লসিত হইয়া গলিটা দেখাইয়া পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল, এই দিকমে গেছেন হ্যায়।

—হাঁ হাঁ, উধার গিয়া।

পরেশ আর দাঁড়াইতে পারিল না, মাছটাকে ঘাড়ে তোলাও আর হইল না। সেটাকে হিঁচড়াইয়া লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। ছায়া উঠানে দাঁড়াইয়া যাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছিল, অনুমানে তাঁহাকেই জজ সাহেব বুঝিয়া লইয়া পরেশ বেড়ার ধারেই দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। ছায়া দেখিতে পাইয়া ডাকিল, ওখানে দাঁড়ালে কেন ঠাকুরপো। বাবা, এইটি আমার ঠাকুরপো। মাছ পাওনি বুঝি?

মাছটাকে দুইহাতে প্রাণপণ শক্তিতে তুলিয়া ধরিয়া পরেশ মৃদু হাসিল। ছায়া ছুটিয়া গিয়া মাছটা লইয়া কানে কানে বলিল, প্রণাম করগে ভাই, আমার বাবা।

পরেশ জড়সড় ভাবে অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিতে, জজ সাহেব বলিলেন, মাছটি কি আমাদের জন্যে এনেছ বাবা?

জজ সাহেব! পরেশ সবিনয়ে বলিল, আজ্ঞে হাঁ।

—বেশ বেশ, তোমার নামটি কি বাবা?

পরেশ নাম বলিল।

ছায়া বলিল, কত হ'ল ঠাকুরপো?

—চার আনা। পাঁচ আনা চাচ্ছিল—

জজ সাহেব বলিলেন—তোরা বলিস কি ছায়া! চার পাঁচ আনায় এত বড় মাছ? নাঃ, এখন থেকে তোদের দেশেই এসে থাকতে হবে দেখছি!

পরেশ ছায়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, আজ কত মাছ যে পড়েছে বৌদি! লোক নেই, বিক্রী হ'ল না। বোষ্টমী জেলে কি বলছে জান?

—কি বলছে ঠাকুরপো?

—বলছে খদ্দের নেই, বড়-জলায় মাছ আর ধরবে না।

জজ সাহেব বলিলেন, এখান থেকে মাছ চালান যায় না?

পরেশের জড়সড় ভাবটা কাটিয়া গিয়াছিল, বলিল, আমাদের যে রেল নেই। রেল হবার কথা হচ্ছে, আসছে বছর রেল হবে।—রেল হবার সম্ভাবনায় বালকের মুখে চোখে আহ্লাদের যে দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল, তাহা দেখিয়া জজ সাহেব বলিলেন, হচ্ছে ত! বাস্, চার আনায় আর রুইমাছ কিনে আনতে হবে না। রুই মাছের আঁস কিনতে হবে।

পরেশ কথাগুলার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া ক্যাল্ ক্যাল করিয়া চাহিতে লাগিল দেখিয়া, ছায়া বলিল, রেল হলে দেশের সব জিনিষ সহরে চালান যায় কি-না, তখন দেশে আর কোন জিনিষ পাওয়া যায় না, বাবা সেই কথা বলছেন, বুঝলে?

পরেশ যাহা বলিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহা সেই বয়সের সব ছেলেই বলে এবং সকলেই তাহা জানে। ছায়া তাহা বুঝিয়াই হাসিয়া বলিল, তুমি ঘরে যাও ঠাকুরপো।

পরেশ সচকিত হইয়া উঠিল, বলিল, মা ডাকছেন?

ছায়া সলজ্জ হাস্যে কহিল, দেখই না গিয়ে।

পরেশ বিনা বাক্যব্যয়ে ঘরে ঢুকিল।

—তুই অত বড় মাছ কাটতে পারবি না কি রে?

—কি যে বল বাবা! কেন পারব না? তোমার চা-টা আগে করে দিই, দিয়ে মাছ কুটে স্নান সেরে রান্না চড়িয়ে দেব।

—চা আছে তোর ঘরে?

—ঘর করতে সব জিনিষই রাখতে হয়। ক'দিন বিমল দা এসেছিলেন—তাহার গলাটা একটু কাঁপিয়া গেল।

—তাই বললে। কাল রাত্রে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আজ ভোরের জাহাজে সুন্দরবনে যাবার কথা। তোমার মা, আমি, কত বললুম, কলকাতায় থেকে কাজ-কর্ম্মের চেষ্টা করবার জন্যে। রাজী হল না, বললে, চাকরী করবে না, চাষ করবে। এম্-এ বি-এল পাস করে যাবে চাষ করতে! চাষের তুই জানিস্ কি বাপু?—

তিনি আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, ছায়া বলিল, মাথায় ঐ ঢুকেছে—

জজ সাহেব বলিলেন, ওদের দোষই বা কি! এম্-এ, বি-এল পাস ক'রেও কাজ ত কেউ জোটাতে পারছে না, যা' হক ক'রে পেটের ভাত জোগাড় করতে হবে ত!

তার পর তিনি নিজের মনেই বলিতে লাগিলেন, তাই ত বলি, লেখাপড়া শিখিয়ে হবে কি! লোকে যদি রোজগার করতেই না পারল, পেটের ভাতই না পেল, সে লেখাপড়ার দরকার কি!

দাওয়ার উপরের মাদুরটা দেখাইয়া দিয়া ছায়া বলিল, তুমি উঠে বস বাবা, আমি চা ক'রে আনি। চায়ের সঙ্গে নারকোলের নাড়ু, খাবে ত বাবা? তুমি আগে নাড়ু বড্ড ভাল-বাসতে।

—এখনও বাসি। কিন্তু—

ছায়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কিছু বলছিলে?

জজ সাহেব বলিল, বলছিলুম। তুই অশোকের সঙ্গে দেখা করলি নে যে এখনও!

—সে ত হবেই, বলিয়া লজ্জারুণ হাসিমুখে অদৃশ্য হইয়া গেল।

অশোক বোধ হয় এই সুযোগটুকুর প্রতীক্ষায় ছিল। ছায়া চলিয়া যাইতেই বাহিরে আসিয়া সবিনয়ে কহিল, একবার আসবেন, মা আপনাকে ডাকছেন?

—আসছি, বাবা, আসছি—বলিয়া তিনি দাওয়ার উপরে উঠিয়া, জুতার ফিতা খুলিতে উদ্যত হইলেন। অশোক বলিল, জুতো পায়ে দিয়েই আসুন-না।

—না বাবা, রোগা মানুষের কাছে জুতোটুতো পায়ে যেতে নেই। কত কি নোংরাটোংরা আছে, তার ঠিক কি!

জুতা খুলিয়া ঘোষ সাহেব ঘরে ঢুকিলেন। অশোক বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আজ কতকাল পরে, অশোক ভাবিতেছিল, আজ কতকাল পরে আজন্ম পরিচিত আবাল্য-প্রিয় জন্মভূমির পরে আসিয়া দাঁড়াইল! কতকাল পরে! কোথায় রহিল তাহার বিলাতী শিক্ষা-দীক্ষা, কোথায় রহিল তাহার সাহেবিয়ানা! দাওয়ার ধূলার উপরে বসিয়া পড়িয়া সে ভাবিতেছিল, কাহার পুণ্যে সে আবার মাতার মুখ দেখিতে পাইল, তাঁহার চরণ বন্দনা করিতে পাইল! তাহার এমন কোন পুণ্য নাই, বরং—অশোক লাফাইয়া উঠিল।

ওদিকের চালাঘরটার দরজায় দাঁড়াইয়া অঙ্গুলি-সঙ্কেতে ছায়া তাহাকে ডাকিতেছিল। ছায়াকে দেখিয়া তাহার চক্ষু জুড়াইয়া গেল। কিন্তু ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতেও পারিতে-ছিল না, কেমন একটা দ্বিধা, একটা সঙ্কোচ চোখের উপরে দৌরাত্ম্য করিতেছিল। কোন মতে বলিল, আমায় ডাকছ?

ছায়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

বাঙ্গালীর মেয়েকে যে বেশে সুন্দরী-শিরোমণি দেখায়, সেই চওড়া লালপাড় একখানি শাড়ী ছায়ার পরিধানে, সীমন্তে সিন্দুর-রেখা, ললাটে সিন্দুরবিন্দু বেশ বড় করিয়া পরা, দু'হাতে দু'গাছি করিয়া চারগাছা চুড়ী—তাহাতেই রূপ যেন ফাটিয়া পড়িতেছে, শোভা যেন ছড়াইয়া পড়িতেছে। শরতের পদ্মবনে এত শোভা নাই, বসন্তের ফুলকাননে এত সৌন্দর্য্য নাই, শ্বেতদ্বীপেও এমন শান্ত শ্রী তাহার চোখে পড়ে নাই।

অশোক কাছে আসিলে, ছায়া বলিল, ভেতরে এস।

তখনি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে বলিল, জুতো খোল, খোল, এটা যে রান্নাঘর, সব ভুলে গেছ বুঝি?

অশোক বাহিরে জুতা রাখিয়া আসিতে ছায়া নত হইয়া প্রণাম করিয়া, বস্ত্রাঞ্চলে অশোকের দু'টি পা মুছাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, তোমার চা এখানেই দিই, কেমন ?

অশোক বলিল, বাবার ?

—তাঁকে আর পরেশকে ওঘরে দিয়ে আসছি, তুমি এই-খানে বোস ; কেমন ?

অশোক মনে মনে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। 'না' শব্দটা তাহার মনে ছিল না। বলিল, তাই বসি।

ছায়া নিঃশব্দে চা প্রস্তুত করিয়া ও-ঘরে পিতাকে দিয়া আসিয়া বলিল, তোমাকে নাড়ু দিয়ে চা দেব না ; দু'খানা লুচি ভেজে দিই, কেমন ?

—দাও।

ছায়া লুচি ভাজিয়া দিতে লাগিল, অশোক খাইতে লাগিল। খাওয়া শেষ হইলে অশোক বলিল, তুমি চা খাও না ?

—খাইনে, কিন্তু আজ খাব।

বলিয়া অশোকের ভুক্ত পেয়ালাটা টানিয়া লইয়া চা ঢালিতে উদ্যত হইল। অশোক বাটীটা সরাইয়া লইয়া বলিল, অন্য বাটী নেই ?

—আছে, কেন ?

—সেই বাটীতে নাও ; না-হয় এটা ধুয়ে নাও।

ছায়া হাসিয়া বলিল, খুব হয়েছে, দাও।

অশোক দিল না, বলিল, লক্ষীটি, এ বাটীতে খেও না। আমার—

ছায়া বলিল, সোণা অপবিত্র হয় না, জান ? বলিয়া এক রকম জোর করিয়াই বাটীটা মুক্ত করিয়া লইল। একটু জোর করিতে হইল, একটু যে টানাটানি করিতে হইল, কে-জানে কেন, ছায়ার মনে হইল তাহার মৃত নারীত্বটি অমৃতস্পর্শে পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিল। রাজ্যের লজ্জা, বিশ্বের আদর সোহাগ, জগৎজোড়া ভালবাসার গান সব একে একে দেহে জাগিয়া উঠিতে লাগিল।

ছায়া পাশে বসিয়া বলিল, মা'কে আনতে পারলে না তোমরা ?

অশোক বলিল, তুমি না বললে মা আসবেন না। আমরা তাই পরামর্শ করেছি, কাল তোমাতে আমাতে গিয়ে তাঁকে নিয়ে আসব। বাবার ত এখনও দশ দিন ছুটী আছে, এখানেই ওঁরা থাকবেন। অবিশ্যি কষ্ট খুবই হবে।

ছায়া বলিল, বাবার কিছু কষ্ট হবে না, তবে মার—আর —বলিয়া সে একটু হাসিল, বলিল, তোমারও হয় ত—

পরেশ আসিয়া পড়িল, তাই, নইলে, অশোক যেভাবে হাত বাড়াইয়াছিল, উনুনের অগ্নি সাক্ষ্য করিয়া পুনর্মিলনটা এখনই হইয়া যাইত।

—বৌদি, মাছ কুটবে না ?

—চল না ভাই, যাই। [ক্রমশঃ

ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেস ও স্বাধীনতা

……আমাদের বর্ত্তমান তথাকথিত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেস যে-স্বাধীনতার উপাসক হইয়াছেন, তাহার ধারণা যে পাশ্চাত্ত্য জগৎ হইতে ধার করিয়া আনা হইয়াছে, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। স্বাধীনতার ঐ ধারণায় যে, পাশ্চাত্ত্য জগতের কোন উপকার হয় নাই, পরন্তু অপকারই সাধিত হইয়াছে, তাহা তাঁহারা এখন না বুঝিতে পারিলেও অদূরভবিষ্যতে বুঝিতে পারিবেন বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। পাশ্চাত্ত্য জগতের বর্ত্তমান স্বাধীনতার ধারণায় যদি তাঁহাদের কোন উপকারই হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রত্যেক দেশে দারিদ্র্যের তীব্রতা ও দরিদ্রের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে কেন ?……
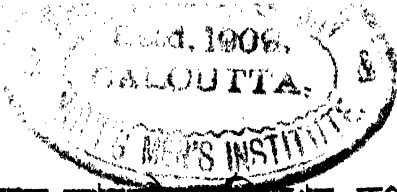
"ধর্ম্ম" সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষিগণের কথা এবং তৎসম্বন্ধে স্যার রাধাকৃষ্ণন্ ও ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের পাণ্ডিত্য

—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

গত জানুয়ারী মাসে থিওসফিক্যাল সোসাইটীর উদ্যোগে মান্দ্রাজ সহরে একটী ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ঐ অধিবেশনে স্যার রাধাকৃষ্ণন্ হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন। অধিবেশনে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই স্যার রাধাকৃষ্ণনের বক্তৃতা শুনিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। স্যার রাধাকৃষ্ণন্ তাঁহার বক্তৃতায় অনেক কথা বলিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত কথার অর্থ এবং পরস্পরের মধ্যে কি সম্বন্ধ, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই এবং এই প্রবন্ধে তাঁহার সম্পূর্ণ বক্তৃতা আমাদের মুখ্য আলোচ্য নহে।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বরোদায় "ধর্ম্মের স্বরূপ" এবং গোয়ালিয়রে "হিন্দুজাতি গঠনে সংস্কৃত ভাষার স্থান" সম্বন্ধে দুইটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। এই দুইটী বক্তৃতায়ও অনেক কথা আছে। ইহাও সম্পূর্ণভাবে আলোচনা করা আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

ভারতীয় ঋষিগণ জীবের "ধর্ম্ম" সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহা কত পরিষ্কার ও মানুষের পক্ষে তাহা কত প্রয়োজনীয় এবং বর্ত্তমান কালে ভারতীয় ঋষিগণের ভাষা বিস্মৃত হওয়ার ফলে পণ্ডিতগণ ঐ সমস্ত কথা কত অপরিষ্কার করিয়া তুলিয়াছেন এবং তাহাতে ঐ প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি কত নিষ্প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়, তাহা দেখানই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কাযেই আমাদিগের প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে, ঐ দুইটী পণ্ডিত "ধর্ম্ম" সম্বন্ধে কি বলিতেছেন।

স্যার রাধাকৃষ্ণনের বক্তৃতার নিম্নলিখিত কথাগুলি উল্লেখযোগ্য :—

(১) হিন্দুধর্ম্ম ৪।৫ হাজার বৎসর ব্যাপী একটী যান্ত্রিক পরিপুষ্টি ;

(Hinduism was an organic growth spread over forty or fifty centuries)

(২) ইহা উৎপত্তি-প্রার্থী এবং ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানে সন্নিবেশপ্রয়াসী একটী কল্পনার বিকাশ মাত্র ;

(It was the expression of an idea struggling to be born and endeavouring to embody itself in historic institutions)

(৩) যদিও প্রত্যেক অবস্থাতেই ঐ কল্পনাটীকে বিকশিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তথাপি উহা কোন সময়েই সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই ;

(At no stage had the idea been perfectly expressed though at every stage, there was the struggle for expression)

(৪) উহার একটা অনিশ্চিত অনুভূতি মাত্র পাওয়া যায় এবং কুত্রাপি তাহা একত্র সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না ;

(They could have only a vague feeling and they could never see it expressed in one perfect embodiment)

(৫) ধর্ম্ম যে একটি না একটি বিশেষ মতের অনুবর্ত্তিতা অথবা বিশেষ কোন অনুষ্ঠানের সাধনা, তাহা হিন্দুধর্ম্মের মত নহে ;

(Hinduism does not believe that religion is either the acceptance of one creed or another, or the practice of particular rituals)

(৬) আমাদের জীবনকে একটি বিভিন্ন রকমের স্বভাবে উন্নীত করিবার জন্য অভিজ্ঞতা বিশেষের নাম ধর্ম্ম—ইহা হিন্দু ধর্ম্মের মত ;

(It believes that it is a kind of experience to raise our lives to a very different kind of temper)

(৭) সর্ব্বোচ্চ সত্যের যান্ত্রিক অনুভূতির নাম ধর্ম্ম, ইহাই ধর্ম্মের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংজ্ঞা ;

(Religion can best be defined as the organic realisation of the highest truth)

(৮) হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে যে কেবলমাত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানেরই পরিচয় আছে তাহা নহে, তাহাতে যথেচ্ছ কল্পনাও আছে এবং এমন বহু কথা আছে যাহা যুক্তিসঙ্গত নহে ;

(The Scriptures contained not only the products of ripest wisdom, but also wayward fancies, and there were so many things which would not stand the test of reason)

(৯) সর্ব্বোচ্চ সত্য কি তৎসম্বন্ধে বিজ্ঞ ভাবুকগণ কোন কথা বলেন নাই ;

(The wisest thinkers have adopted a tone of reticence in defining the supreme reality)

(১০) তাঁহাদের মতে সর্ব্বোচ্চ সত্য কি তাহা চিন্তা করিয়া বাহির করিতে হইবে ;

(They have stated that it is something which a man has to discover for himself)

(১১) ভগবান্ আমাদের ক্রটি ও বিচ্যুতি পরিজ্ঞাত আছেন ;

(God knows our deficiencies and defects)

(১২) আমরা ভগবান্‌কে জানি না বটে, কিন্তু ভগবান্ আমাদিগকে জানেন না, ইহা মনে করা সঙ্গত নহে ;

(We may not know God, but it is wrong on our part to think that God does not know us)

(১৩) আমরা যাহা যাহা করিতেছি, তাহা ঐকান্তিক কি না এবং যাহা যাহা করিবার চেষ্টা করিতেছি, তাহা সৎ কিনা, তাহা ঈশ্বর বিচার করিতেছেন এবং যথাসময়ে তিনি আমাদের ক্রটিগুলি সংশোধিত করিবার চেষ্টা করিবেন এবং যাহাতে আমরা ঈশ্বরকে আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারি, তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

(He is judging the sincerity of our pursuits and the honesty of our endeavours and in time, will try to correct the deficiencies which we have and bring about a better conception of God Himself)

পাঠকগণ, আপনারা লক্ষ্য করুন যে, স্যার রাধাকৃষ্ণনের বক্তৃতায় ধর্ম্মের সংজ্ঞা আছে, সর্ব্বোচ্চ সত্য কি করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে তাহার নির্দ্দেশ আছে এবং ঈশ্বর নিজেই যে আমাদিগকে সংশোধিত করিয়া লইবেন, সে আশার বাণীও আছে। কাযেই করতালি প্রদান করুন এবং স্যার রাধাকৃষ্ণন্‌কে ধন্যবাদ দান করুন। আরও দেখুন যে, ধর্ম্মের সংজ্ঞা কি, তাহা বর্ণনা করিতে বসিয়া তিনি বলিয়াছেন, "সর্ব্বোচ্চ সত্যের যান্ত্রিক অনুভূতির নাম ধর্ম্ম।" কাযেই ধর্ম্ম কি তাহা বুঝিতে হইলে "সর্ব্বোচ্চ সত্য" কি এবং "যান্ত্রিক অনুভূতি" (organic realisation) কি তাহা জানিতে হইবে। অবশ্য "যান্ত্রিক অনুভূতি" কি, তৎসম্বন্ধে তিনি নির্ব্বাক বটে কিন্তু সর্ব্বোচ্চ সত্য সম্বন্ধে একটী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য (?) কথা তিনি বলিয়াছেন, যথা—(১০নং) "সর্ব্বোচ্চ সত্য কি তাহা চিন্তা করিয়া বাহির করিতে হইবে।" কাযেই "সর্ব্বোচ্চ সত্য" কি তাহা আপনারা জানিতে পারিয়াছেন এবং তাহার "যান্ত্রিক অনুভূতি"ই বা কি, তাহাও আপনারা ঠিক করিয়া লইতে পারিবেন। অতএব স্যার রাধাকৃষ্ণন্ আপনাদিগের ধর্ম্ম কি তাহা ঠিকই বুঝাইয়াছেন। আপনাদিগের মধ্যে যাঁহারা মনে করিবেন যে, কিছুই বুঝা গেল না, তাঁহাদিগকে স্মরণ করিতে হইতে হইবে যে, বড় বড় পণ্ডিতের কথা সকলের পক্ষে বুঝা সম্ভব নহে এবং তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে যে "উঃ, কি ভীষণ পণ্ডিত! তাঁহার একটি ছত্রেও দন্তস্ফুট করা গেল না।" তাঁহার কথা বুঝা যাউক আর না-ই যাউক, তিনি প্রয়োজনীয় সংবাদ লিপিবদ্ধ করুন আর নাই করুন, তিনি যে বড় পণ্ডিত (a great scholar), এ কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না, কারণ তিনি accepted authority. অবশ্য তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা ভারতীয় ঋষিদিগের চিন্তায় অনেক অযৌক্তিকতা আছে—এই কথা বলিয়াছেন। তথাপি মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি স্যার রাধাকৃষ্ণন্,—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা অধ্যাপক, অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার, সম্প্রতি বিলাতে বিশেষ অধ্যাপনার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার কথায় কোন ভুল হইতে পারে না। কোন মূল ধর্ম্মগ্রন্থের সহিত তাঁহার যে কোন পরিচয় আছে, তাহার কিছুমাত্র চিহ্ন তাঁহার বক্তৃতায় পরিলক্ষিত না হইলেও তাঁহাকে আপনাদিগের মানিয়া লইতে

হইবেই। প্রতিদিন অনশনে, অর্দ্ধাশনে, ব্যাধির প্রকোপে, প্রিয়জনের অকালমৃত্যুতে আপনাদের বুক ফাটিয়া যায় যাউক, তাহাতে ক্ষতি নাই; ভগবান্ নিজেই আপনাদিগকে আরাম দিবেন—এই আশার বাণী আপনারা রাধাকৃষ্ণন্‌জীর নিকট পাইয়াছেন। অবশ্য ভুল করিয়া কেহ রাধাকৃষ্ণন্‌জীকে আঘাত করিতে উদ্যত হইবেন না। তাহা হইলে কিন্তু দেখিবেন যে, ঈশ্বরের প্রতীক্ষায় তিনি বসিয়া নাই, পরন্তু স্বতঃই তাঁহার হস্ত দুইখানি বাধা দিবার জন্য প্রসারিত হইয়াছে।

প্রবন্ধের শেষভাগে এই বক্তৃতার বিস্তৃত সমালোচনা করিব।

অধ্যক্ষ ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কথাগুলি উল্লেখযোগ্য:—

(১) রিলিজিয়ান এবং উহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ ধর্ম্মের সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন;

(২) প্রকৃত ধর্ম্ম মানবীয় অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত;

(৩) ধর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রেও এইরূপ অনুভূতি থাকিতে পারে;

(৪) ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি দিয়া আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপলব্ধিই সুকুমার কলার উদ্দেশ্য:

(৫) কলাবিদ্ রসসৃষ্টিতে এবং কলারসিক সেই রস উপভোগে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে আধ্যাত্মিক-লোকে চলিয়া যান;

(৬) সুকুমার কলা সমগ্র মানবজাতিকে সৌহার্দ্দ্যবন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারে;

(৭) ধর্ম্ম কলারও ঊর্দ্ধে, কারণ ধর্ম্মের সম্পর্ক শুধু ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিরই সহিত নহে, মানুষের সমগ্র সত্তার সহিতই ধর্ম্মের সম্পর্ক;

(৮) যদি বিজ্ঞানের দিক্ হইতে নীতিবোধের বিচার করা যায়, তবে উহাতে বহু দুরতিক্রম্য অসামঞ্জস্য দেখা যায়;

(৯) ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা দ্বারা ব্যক্তিত্ব গঠিত হইলে নীতিবোধ উহার একটি স্বাভাবিক উপফল স্বরূপ হইয়া পড়ে;

(১০) সাধারণ নীতিশাস্ত্র অনুসারে সুনীতিসম্মত আচরণই যথেষ্ট;

(১১) ধর্ম্মজগতের নীতিবোধ অনুসারে মননে এবং চিন্তনেও সুনীতি রক্ষা করিতে হইবে;

(১২) ধর্ম্ম ও কলাজগতে আচার ও প্রথাগুলি অনুষ্ঠান-বিধি মাত্র;

(১৩) মনকে সমগ্র মানবজাতির একাত্মবোধের উপযোগী করিয়া গঠন করাই ধর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করা উচিত;

(১৪) যদি মন আর্দ্র না হয়, যদি মনের কণ্টকসমূহ সমূলে উৎপাটিত না হয়, তবে ঈশ্বর আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হন না;

(১৫) মানুষের মধ্যে ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের মধ্যে মানুষ—ইহাই ধর্ম্মের প্রথম ও শেষ কথা;

(১৬) ইহুদীদের মতে ঈশ্বর একমাত্র তাঁহাদের রক্ষক। তাঁহারা শুধু একটি উপজাতির সমস্ত লোকের ভ্রাতৃসম্পর্কে বিশ্বাসী;

(১৭) মুসলমানেরা সমগ্র মানবজাতির ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী নহেন, তাঁহারা একমাত্র মুসলমানদের ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী;

(১৮) খৃষ্ট ধর্ম্ম সমগ্র মানবজাতির ভ্রাতৃত্ব প্রচার করেন। কিন্তু আদিম যুগে খৃষ্টানদিগের উপর যে নির্য্যাতন হইত, তাহার ফলে তাঁহারা শুধু খ্রীষ্টানদের ভ্রাতৃত্ব প্রচার করিয়া থাকেন;

(১৯) হিন্দু ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম এবং জৈন ধর্ম্ম কেবল সমগ্র মানবজাতির মধ্যে নহে, সমগ্র জীবের মধ্যেই ভ্রাতৃ-সম্পর্ক প্রচার করেন;

(২০) বৌদ্ধ ধর্ম্মের সার শিক্ষা, আত্মসংযম এবং সর্ব্বভূতে সমাত্মবোধ;

(২১) যৌগিক, বৈদান্তিক ও বৈষ্ণব প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন মতবাদেও আত্মসংযম, সর্ব্বভূতে সৌহার্দ্দ্য এবং একাত্মবোধের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে;

(২২) শিক্ষিত সমাজের এবং নেতৃবর্গের ঔদাসীন্য-বশতঃ দেশে ক্রমেই সংস্কৃতচর্চ্চা উঠিয়া যাইতেছে;

(২৩) সংস্কৃত ভাষায় উচ্চতম শিক্ষা লাভ করিতে হইলে বিশেষ প্রতিভা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি অত্যাবশ্যক। কিন্তু তেমন ছাত্রেরা সংস্কৃত শিক্ষা করে না। সুতরাং যাহারা সংস্কৃত শিক্ষা করে তাহারা প্রায়ই গভীর জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারে না;

(২৪) যদি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার অযোগ্য হইয়া থাকে, তবে বলিতে হয়, আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতিও মূল্যহীন, আমাদের কোন ইতিহাস নাই এবং আমরা একটী অপদার্থ জাতি;

(২৫) যদি ভারতবর্ষের সমস্ত হিন্দুর জন্য কোনও ভাষা নির্ব্বাচন করিতে হয়, তবে সংস্কৃত ভাষা অপেক্ষা উপযুক্ত ভাষা আর নাই।

ডাঃ দাশগুপ্তের সমগ্র বক্তৃতা মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিলে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা কোথায়, তাহার উপলব্ধি কি করিয়া করিতে হয় এবং তাহার উদ্দেশ্য কি, এবংবিধ অনেক তথ্য সম্বন্ধে অনেক কথা খুঁজিয়া পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহার কোন সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। তিনি তাঁহার বরোদার বক্তৃতার প্রারম্ভেই বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মের সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন এবং তিনি তাহার চেষ্টাও করেন নাই।

ঋষিদিগের মূল গ্রন্থ অধ্যয়ন করা থাকিলে অথবা প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা জানা থাকিলে ধর্ম্মের সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন, এই কথা বলিতে হইত না, কারণ যে সমস্ত "বর্ণ" লইয়া "ধর্ম্ম" শব্দটী গঠিত হইয়াছে, তাহার অর্থ জানা থাকিলে এবং বর্ণের অর্থ হইতে পদের অর্থ কি করিয়া স্থির করিতে হয়, তাহা পরিজ্ঞাত হইলে, স্বতঃই "ধর্ম্ম" শব্দের অতি পরিষ্কার সংজ্ঞা জানা যায়। অধিকন্তু বেদ, তন্ত্র, উপনিষদ্, দর্শন, পুরাণ, সংহিতা-বিষয়ক ঋষিদিগের রচিত যে সমস্ত মন্ত্র, সূত্র ও শ্লোকের গ্রন্থ রহিয়াছে, তাহার প্রায় প্রত্যেকখানিতে ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বহু তথ্য আলোচিত হইয়াছে এবং তাহা হইতে ধর্ম্মের বিস্তৃত সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব নহে।

ডাঃ দাশগুপ্তের ইটালীর বক্তৃতায় যেরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল, এই দুইটী বক্তৃতায় তাহা দেখা যায় না। পরন্তু তিনি যে তাঁহার শ্রোতৃবর্গকে আর্য্যধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান-বিশ্বাস মত কিছু শুনাইবার জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার পরিচয় আছে। তিনি যে অনেক গ্রন্থের ভাষ্য পড়িয়াছেন, অথচ ঋষিদিগের মূল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার চেষ্টা করেন নাই, তাহার চিহ্নও এই বক্তৃতায় আছে। ঋষিদিগের মূল গ্রন্থে প্রবেশলাভ করিবার চেষ্টা না করিয়া কেবলমাত্র ভাষ্য মুখস্থ করিলে এবং তাহা শ্রোতৃবর্গকে শুনাইলে প্রয়োগযোগ্য কোন ফলোদয় হয় না। তাহার কারণ, ভাষ্যকারগণ ঋষিদিগের কথা না বুঝিতে পারিয়া অসংলগ্ন প্রলাপ বকিয়াছেন।

সংস্কৃত ভাষায় কি করিয়া বর্ণের অর্থ বুঝিতে হয়, বর্ণের অর্থ হইতে কি করিয়া মন্ত্রের অর্থ ও পদের অর্থ নির্দ্ধারণ করিতে হয়, পদের অর্থ হইতে কি করিয়া সূত্রের ও বাক্যের অর্থ নির্দ্ধারণ করিতে হয়, তাহা যদি আবার কেহ কখনও পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি ভাষ্যের বিনা সহায়তায় বেদ, তন্ত্র, দর্শন প্রভৃতি যথাযথভাবে বুঝিতে পারিবেন এবং দেখিতে পাইবেন যে, এমন কি শঙ্করাচার্য্য ও সায়ণাচার্য্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ পর্য্যন্ত মূল সূত্রের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কথা ঋষিদিগের কথা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তাই আজ জগতের আরাধ্য, দেবতাস্বরূপ ঋষিগণের কথা তমসার অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং যাঁহারা প্রকৃত পক্ষে ঘোর মূর্খ, তাঁহারাও পণ্ডিত নামে চলিয়া যাইতেছেন, এমন কি গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে উচ্চ উপাধিগুলি লাভ করিতেছেন। ভাষ্যকারগণ ঋষিদিগের কথা বহুদিন আগে বিকৃত করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়াই আজ নাস্তিক পণ্ডিতগণ [illegible] বলিতে সাহস করেন যে, ঋষিদিগের কথায় অযৌক্তিকতা আছে। দম্ভে পরিপূর্ণ তথাকথিত পণ্ডিতগণ এমন কি [illegible] ভাষ্য পর্য্যন্ত না পড়িয়া হিন্দু-দর্শনজ্ঞ বলিয়া চলিয়া যাইতেছে এবং স্বকপোল-কল্পিত কথা বলিয়া সাহেবদিগের নিকট হই[illegible] বাহবা পাইতেছেন। মানবজাতির ভাগ্যাকাশে যে মেঘে[illegible] হইয়াছে এবং তাহার জীবনযাত্রার ৮।১০ বৎসরের ম[illegible] যে ভীষণ ঝঞ্ঝাবাতের আশঙ্কা ঘটিয়াছে, তাহা হইতে সা[illegible] দিগের কোন জ্ঞান-বিজ্ঞান মানব জাতিকে রক্ষা কর[illegible] পারিবে না। একটু মনোযোগ সহকারে কর্ণপাত কর[illegible] সকলেই শুনিতে পাইবেন যে, আমাদের দেশের টীয়াপা[illegible] গুলি বৃথা কিচিরমিচির করিতেছে। যদি কোন জ্ঞান-বি[illegible] মানবজাতিকে রক্ষা করিতে সক্ষম হয়, তাহা ভারতীয় [illegible] দিগের গ্রন্থে রহিয়াছে। মানবজাতি কি করিয়া অ[illegible]

দুর্দ্দিন হইতে রক্ষা পাইতে পারে, তাহা ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট এবং কোরাণেও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে বটে, কিন্তু যে ভাষায় ঐ দুইখানি গ্রন্থ লিখিত রহিয়াছে, সেই ভাষাও এখন আর কেহ বুঝিতে পারেন না। যদি কখনও আবার প্রাচীন হিব্রু ভাষা ও প্রাচীন আরবী ভাষা মানুষ যথাযথ জানিতে পারে, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, ঐ দুইখানি গ্রন্থের যে অনুবাদ অথবা অর্থ বর্ত্তমান কালে গৃহীত (accepted) হইয়াছে, তাহা ভ্রম-প্রমাদে পরিপূর্ণ এবং ঐ দুইটী ভাষার চাবিকাঠীও এই হতভাগা জাতির বেদের মধ্যে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

যে দেবতাগণ যারা জগতের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের দিনগুলি সর্ব্বতোভাবে সুখ ও শান্তিময় করিবার পন্থা আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা ডাঃ দাশগুপ্ত পরিস্ফুট করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার অপর সহযোগীর মত দেবতাসদৃশ ঋষিদিগের অপমানকর কোন কথা তিনি বলেন নাই। পরন্তু সাধ্যমত দেবোপম ঋষিদিগের চিত্র উদ্দীপ্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কাযেই দূর হইতে আমরা তাঁহাকে আমাদের নমস্কার জানাইতেছি। আমরা এখনও তাঁহাকে বিদ্যাভিমান ত্যাগ করিতে এবং প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ তিনি যে-ব্যাকরণ পড়িয়া নিজেকে সংস্কৃতজ্ঞ মনে করেন, সেই ব্যাকরণ দ্বারা যে ঋষিদিগের লিখিত মূল কোন গ্রন্থের অর্থ যথাযথভাবে উদ্ধার করা যায় না, তাহা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে অনুরোধ করি।

যদি তিনি ঋষিদিগের মূল কথা পরিজ্ঞাত হইতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে এমন কোন কথা পাওয়া যাইত না, যাহা পরস্পরের বিরোধী বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

তিনি একবার বলিতেছেন যে, "যদি মন আর্দ্র না হয়, যদি মনের কণ্টকসমূহ সমূলে উৎপাটিত না হয়, তবে ঈশ্বর আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হন না" (১৪নং)—এই কথা হইতে কি বুঝিতে হয় না যে, মানুষের এমন অবস্থাও আছে, যখন মানুষের মধ্যে ঈশ্বর থাকেন না? অথচ তিনিই আবার বলিতেছেন যে, 'মানুষের মধ্যে ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের মধ্যে মানুষ—ইহাই ধর্ম্মের প্রথম ও শেষ কথা" (১৫ নং) — ইহা হইতে কি বুঝিতে হয় না যে, মানুষের মধ্যে সর্ব্বদাই ঈশ্বর রহিয়াছেন এবং এই দুইটী কথা কি পরস্পর-বিরোধী নহে?

ডক্টর দাশগুপ্তের বক্তৃতাটীতেও ঋষিদিগের প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত বিরোধিতা এবং বাস্তবতার সহিত অসামঞ্জস্য রহিয়াছে। "ধর্ম্ম" কাহাকে বলে এবং তাহা অর্জ্জন করিবার উপায় কি, তৎসম্বন্ধে ভারতীয় ঋষিগণ কি বলিয়াছেন, তাহার আলোচনা আমরা প্রথমে করিব এবং তাহার পর আবার উপরোক্ত বক্তৃতার সমালোচনা করিব।

"ধর্ম্ম" সম্বন্ধে কোন আলোচনা উত্থাপিত করিবার আগে পাঠকদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে,"ধর্ম্ম" এই শব্দটীর দুইটী বানান আছে, যথা—ধর্ম্ম (অর্থাৎ দুইটী "ম"য়ে রেফ) আর ধর্ম (অর্থাৎ একটী "ম"য়ে রেফ)। বর্ত্তমান কালের পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, বিকল্পে "ম"য়ের দ্বিত্ব হইয়া থাকে এবং ধর্ম্ম ও 'ধর্ম', এই দুইটী শব্দ একার্থক। কিন্তু তাঁহাদের এই জাতীয় পদসাধন-প্রণালী অষ্টাধ্যায়ী পাণিনিতে পাওয়া যায় না। অষ্টাধ্যায়ী পাণিনিতে "বিভাষা" বলিয়া একটী পদ আছে। তাহার অর্থ "বিকল্প" এই শব্দটীর অর্থের প্রায় সমতুল্য। যে শব্দ প্রয়োগ করিলে তাহার অর্থে কোন্ পরিদৃশ্যমান বস্তু বুঝায়, তাহা বুঝা যায় না, পাণিনিদেব তাহার নাম দিয়াছেন "বিভাষা"(১)। শরীরের ও মস্তিষ্কের কি অবস্থা হইলে মানুষ এইরূপ "বিভাষা" ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা বুঝিবার উপায় তিনটী বেদে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বিকল্প (২) শব্দটীর অর্থ সর্ব্বতোভাবে "বিভাষা" শব্দের অর্থের তুল্য না হইলেও প্রায় তুল্য। পরবর্ত্তী বৈয়াকরণগণ এটীও হয় এবং অপরটীও হয়, এই অর্থে "বিকল্প" শব্দ ব্যবহার করিয়া

১। বিভাষা"—"ন বেতি বিভাষা" (পাণিনি, ১ম অধ্যায় ১ম পাদ ৪৪ সূত্র) "বে" শব্দের অর্থ "ত্বক্-জ্ঞান" "তি" শব্দে অর্থ "অহংকৃতির কার্য্য"। বাক্যপদীয়, শাব্দনির্ণয়, স্ফোটসিদ্ধিন্যায়বিচার এবং ভোজদেবের তত্ত্বপ্রকাশ নামক গ্রন্থে সূত্রের অর্থ বুঝিবার জন্য সূত্রকে বিশ্লেষণ করিবার যে পদ্ধতি আছে, তাহা অনুসরণ করিলে এই সূত্রটীর অর্থ হয়—বিভাষা বলিতে বুঝিতে হয় সেই বর্ণনাপ্রকাশক ভাষাকে, যে ভাষায় বস্তুটী দেখিতে কিরূপ এবং তাহার কার্য্যশক্তিই বা কিরূপ তাহা বুঝা যায় না।

২। "বিকল্প"—শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ (পাতঞ্জল, ১ম অধ্যায় ৯ সূত্র), বিকল্প বলিতে বুঝায় সেই বর্ণনা-প্রকাশক 'কল্প'কে যাহাতে তাহার শব্দজ্ঞানানুযায়ী বস্তু কি, তাহা বুঝা যায় না।

থাকেন। "বিভাষা" ও "বিকল্প" শব্দের এই অর্থ যে, তাঁহারা কোন্ ঋষির কথা হইতে পাইয়াছেন, তাহার কোন প্রমাণ আমি খুঁজিয়া পাই নাই।

কোন্ কোন্ বর্ণের সহযোগে কোন্ কোন্ বর্ণের কেন দ্বিত্ব হয় এবং দ্বিত্ব হইলে তাহার অর্থের কিরূপ তারতম্য ঘটে, তৎসম্বন্ধে অষ্টাধ্যায়ী পাণিনিতে খুব বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিতে গেলে আমাদের প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। কাযেই এখানে আমরা তাহা করিব না। সারস্বত ব্যাকরণে এই সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে।* তাহা পড়িলে বুঝা যায় যে, কোন শব্দের শেষ বর্ণের দ্বিত্ব হইলে তাহার যে অর্থ হয়, সেই অর্থ একক শেষবর্ণযুক্ত শব্দের অর্থ হইতে পৃথক।

ধর্ম্ম ও ধর্ম, কর্ম্ম ও কর্ম প্রভৃতি শব্দকে একার্থক মনে করিয়া বাঙ্গালা দেশে যে সমস্ত পুস্তক মুদ্রিত হইয়া থাকে, তাহাতে প্রায়শঃ "ধর্ম্ম" "কর্ম্ম" এই জাতীয় (দুইটী ম'এর উপর রেফ) বানান ব্যবহৃত হইয়া থাকে, আর বাঙ্গালার বাহিরে ধর্ম, কর্ম এই জাতীয় (একটী ম'এর উপর রেফ) বানান ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পুরাতন হস্তলিখিত কোন পুঁথিতে যদি দেখা যায় যে, একই পুঁথিতে ধর্ম্ম এবং ধর্ম, এই দুইটী বানান ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা হইলে উহার যে একটা বিশেষ কিছু উদ্দেশ্য আছে এবং দুইটী বানান যে সর্ব্বতোভাবে একার্থক নহে, তৎসম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায়। কাশী "চৌখাম্বা" হইতে যে "বাক্যপদীয়" এবং "পূর্ব্বমীমাংসা" সূত্রপাঠ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইবে যে, একই গ্রন্থে দুইটী বানানই ব্যবহৃত হইয়াছে এবং অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, তাঁহারা ঠিক প্রাচীন পুঁথির অনুরূপ উহা মুদ্রিত করিয়াছেন। "ধর্ম্মের" সংজ্ঞা কি তাহা লিপিবদ্ধ আছে "বৈশেষিক দর্শনে" আর "ধর্ম" কাহাকে বলে, তাহা বুঝান হইয়াছে "পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনে"। কোন কোন ছাপাখানায় মুদ্রিত পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনের প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রে যে "ধর্মে"র কথা আছে, তাহাতে দুইটী ম-এর উপর রেফ অর্থাৎ "ধর্ম্ম" এই রূপ বানান আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ ছাপাখানায়, এমন কি বাঙ্গালা দেশে মুদ্রিত পুস্তকেও একটী ম-এর উপর রেফ অর্থাৎ "ধর্ম" এইরূপ বানান আছে। সেইরূপ আবার কোন কোন ছাপাখানায় মুদ্রিত বৈশেষিক দর্শনের প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রে যে "ধর্ম্মের" কথা আছে, তাহাতে একটী ম-এর উপর রেফ অর্থাৎ "ধর্ম" এইরূপ বানান আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ ছাপাখানায়, এমন কি বাঙ্গালা দেশ ছাড়া অন্যত্র যে সমস্ত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতেও দুইটী ম-এর উপর রেফ অর্থাৎ "ধর্ম্ম" এইরূপ বানান আছে।

কাযেই প্রথমতঃ দেখিতে হইবে "ধর্ম্ম" ও "ধর্ম" এই দুইটী পদের কি অর্থ এবং ঐ দুইটী অর্থের মধ্যে কি পার্থক্য আছে। আগেই বলিয়াছি যে, "ধর্ম্ম" এই শব্দের অর্থ অথবা সংজ্ঞা আছে বৈশেষিক দর্শনে এবং "ধর্ম" শব্দটার ব্যাখ্যা আছে পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনে। আমরা প্রথমতঃ বর্ণ হইতে পদের অর্থ স্থির করিবার এবং পদ হইতে সূত্রের অর্থ স্থির করিবার যে পদ্ধতি আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া "ধর্ম্ম" ও "ধর্ম" সম্বন্ধে বুঝিতে হইলে যাহা যাহা বলা একান্ত প্রয়োজন, তাহা যথাসম্ভব পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থিত করিব। তাহার পর ঐ দুইটী শব্দের বর্ণগত অর্থের সহিত যে বৈশেষিক ও পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনপ্রোক্ত সংজ্ঞার সামঞ্জস্য আছে, তাহা দেখাইব।

বর্ণের অর্থানুসারে "ধর্ম্ম" বলিতে বুঝায় সেই কার্য্য (দ্রব্য অথবা গুণ নহে), অথবা সেই চালচলন, যে কার্য্যে অথবা চালচলনে জীবের উপস্থ, বহ্নি এবং স্পর্শশক্তি অটুট থাকে। অথবা যাহা মানুষের করা উচিত, তাহার নাম ধর্ম্ম, ইহা বলা যাইতে পারে। ধর্ম্ম বলিতে কোন্ উদ্দেশ্যে কোন্ কার্য্য করা উচিত, তাহা এই প্রবন্ধে ক্রমশঃ পরিষ্কার করা হইবে। আর "ধর্ম" বলিতে বুঝায় সেই কার্য্য (দ্রব্য অথবা গুণ নহে), অথবা সেই চালচলন, যাহা জীব তাহার উপস্থ ও তেজ বশতঃ অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহা হইতে বুঝিতে হয় যে, জীব যাহা সাধারণতঃ করিয়া থাকে, তাহাই তাহার ধর্ম, যথা চোরের ধর্ম, সাধুর ধর্ম, পশুর ধর্ম ইত্যাদি।

এই দুইটী পদের সংজ্ঞা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, প্রথমতঃ, উপস্থ কাহাকে বলে, দ্বিতীয়তঃ উপস্থ, বহ্নি এবং

---

* রান্তপো দ্বিঃ এবং স্বরহীনং পরেণ সংযোজ্যম্।
তুম্বিকা তৃণকাষ্ঠং চ তৈলং জলসমাগমে।
ঊর্দ্ধস্থানং সমায়ান্তি রেফাণামীদৃশী গতিঃ।
রেফঃ স্বরপরং বর্ণং দৃষ্ট্বা রোহতি তচ্ছিরঃ॥
পুরঃস্থিতং যথা পঙ্কেহধঃ সংক্রমতে স্বরম্॥

তেজ অটুট রাখিবার প্রয়োজনীয়তা কি, তাহা বুঝিতে হইবে।

"উপস্থ" শব্দে পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ জীবের শিশ্ন বুঝিয়া থাকেন। শিশ্নকে উপস্থ বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষানুসারে উপস্থ শব্দের অর্থ আরও ব্যাপক। ঋষিগণ সাধারণতঃ ব্যাপক অর্থে সংজ্ঞা-শব্দগুলি ব্যবহার করিয়াছেন।

প্রত্যেক শব্দের ঐ ব্যাপক অর্থ বিভিন্ন সমাসে বিভিন্ন রূপে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে। ব্যাকরণের জাতি-সমুদ্দেশ ও উপগ্রহ-সমুদ্দেশ জানা থাকিলে "উপস্থ" বলিতে ঠিক ঠিক কি বুঝায়, তাহা মোটামুটী জানা যায়। আর তাহা ভাল করিয়া জানিতে হইলে শব্দের স্ফোটন-ধর্ম্ম কি তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া জাতি-সমুদ্দেশ, দ্রব্য-সমুদ্দেশ, গুণ-সমুদ্দেশ, দিক-সমুদ্দেশ, সাধন-সমুদ্দেশ, কাল-সমুদ্দেশ, পুরুষ-সমুদ্দেশ, সংখ্যা-সমুদ্দেশ, উপগ্রহ-সমুদ্দেশ, লিঙ্গ-সমুদ্দেশ ও বৃত্তি-সমুদ্দেশ আলোচনা করিতে হয়। স্ফোটন-ধর্ম্মের ও উপরোক্ত সমস্ত সমুদ্দেশের বিস্তৃত আলোচনা পাণিনিতে ও বাক্যপদীয়ে বিবৃত রহিয়াছে। তাহা ছাড়া শাব্দনির্ণয়, তত্ত্বপ্রকাশ, স্ফোটসিদ্ধিন্যায়বিচার নামক তিন খানি গ্রন্থে এবং বিবিধ তন্ত্রের বিবিধ স্থানে উপরোক্ত তথ্যসমূহের সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। পাণিনি ও বাক্যপদীয় ঋষিদিগের গ্রন্থ, আর উপরোক্ত অন্যান্য পুস্তক ঐ দুই খানি গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। পাণিনি যে ঋষিদিগের গ্রন্থ, তাহা আধুনিক পণ্ডিতগণও স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু "বাক্যপদীয়"কে অনেকে মনে করেন যে, উহা ভর্ত্তৃহরি নামক একজন ব্যাকরণের পণ্ডিতের দ্বারা লিখিত। কিন্তু তাহা সত্য নহে। বাক্যপদীয়ের দ্বিতীয় কাণ্ডের ৪৮৪ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া ৪৯০ শ্লোক পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিলে জানা যাইবে যে, ঐ গ্রন্থখানি অতি প্রাচীন। ভর্ত্তৃহরি তাঁহার গ্রন্থের ২য় কাণ্ডের ৪৮৮ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, পতঞ্জলির শিষ্যগণের দ্বারা যে ভ্রষ্ট ব্যাকরণের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা এক সময়ে দাক্ষিণাত্যে গ্রন্থমাত্রে ব্যবস্থিত হইয়াছিল।*

ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, পতঞ্জলির মহাভাষ্যে যদিও অনেক পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে এবং তাহা অধ্যয়ন করিয়া অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য জানা যায় বটে, কিন্তু পাণিনিতে যে ভাষাতত্ত্ব আছে, তাহা বুঝা যায় না; পরন্তু মহাভাষ্যের অনুবর্ত্তিগণ সংস্কৃত ভাষার একটী বিকৃত ধারণা লাভ করিয়া থাকেন। মহাভাষ্যের অনুসরণ করিলে যে প্রকৃত সংস্কৃত ভাষার কোন জ্ঞান লাভ হয় না, পরন্তু একটা বিকৃত দম্ভের উদ্ভব হয়, আর বাক্যপদীয় অনুসরণ করিলে যে প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া বেদাদি অধ্যয়ন করা সম্ভব হয়, তাহা যাঁহারা ঐ দুইখানি গ্রন্থের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু যে ভাবে মানুষ সাধারণতঃ মহাভাষ্য অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, সেই ভাবে বাক্যপদীয় অধ্যয়ন করা যায় না। বর্ত্তমান প্রচলিত ভাষানুসারে যাহাকে "সাধনা" বলা যায়, বাক্যপদীয় পড়িতে হইলে সেই "সাধনা"র প্রয়োজন হয়। সেই সাধনা দুরূহ বটে, কিন্তু তাহা বড়ই আরামপ্রদ; দুরূহত্বের জন্য মানুষের মন বাক্যপদীয়ের সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে চাহে না এবং সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণগুলির আশ্রয় লইয়া থাকে। ঐ সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণগুলির আশ্রয় লইলে ভাষার বিকৃতি সাধিত হইয়া থাকে এবং ঋষিদিগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা মানুষের অপরিজ্ঞাত হইয়া উঠে। যখন প্রথম মহাভাষ্যের রচনা হইয়াছিল, তখন বাক্যপদীয়ের সাধনাই দেশের সর্ব্বত্র গৃহীত ছিল বলিয়া ঐ মহাভাষ্য কার্য্যতঃ গৃহীত হয় নাই এবং উহা গ্রন্থমাত্রে ব্যবস্থিত ছিল। কিন্তু পরে মানুষের অবনতি ঘটায় বাক্যপদীয়ের দুরূহত্বের জন্য তাহার সাধনা লুপ্ত হইয়া পড়ে এবং ভাষ্যের অনুসরণকারিগণের দ্বারা অদ্ভুত রকমের ব্যাকরণ-জ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছিল ও চন্দ্রাচার্য্য প্রভৃতি উহার বহু বিস্তৃতি সংঘটিত করিয়াছিলেন।†

এই সময়ে বাক্যপদীয়ের আলোচনা একরূপ লুপ্ত হইয়াছিল। ইহার পর ভর্ত্তৃহরির গুরু স্বীয় সাধনার দ্বারা তখনকার দুষ্প্রাপ্য বাক্যপদীয়ের তথ্য আবার পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন এবং গুরুর নিকট হইতে সেই তথ্য পরিজ্ঞাত

* যঃ পতঞ্জলিশিষ্যেভ্যো ভ্রষ্টো ব্যাকরণাগমঃ।
কালে স দাক্ষিণাত্যেষু গ্রন্থমাত্রে ব্যবস্থিতঃ॥
বাক্যপদীয়, ২য় কাণ্ড—৪৮৮ শ্লোক।

† পর্ব্বতাদাগমং লব্ধ্বা ভাষ্যবীজানুসারিভিঃ।
স নীতো বহুশাখত্বং চন্দ্রাচার্য্যাদিভিঃ পুনঃ॥
বাক্যপদীয়, ২য় কাণ্ড—৪৮৯ শ্লোক।

হইয়া ভর্ত্তৃহরি ঐ প্রাচীন গ্রন্থের পুনঃ প্রচার সাধন করিয়াছিলেন। * বাক্যপদীয় যে বৈদিককালের গ্রন্থ তাহা তাহার ভাষা এবং ছন্দ দেখিলেও বুঝিতে পারা যায়। বর্ত্তমান কালে আবার বাক্যপদীয় প্রায়শঃ অবোধ্য হইয়া পড়িয়াছে এবং সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণগুলি পণ্ডিতদিগের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। ফলে প্রকৃত সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান আবার লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং বেদাদি গ্রন্থ বিকৃত অর্থে প্রচারিত হইতেছে।

পাণিনি ও বাক্যপদীয়ের পন্থানুসরণ করিলে যাহা "উপ-স্থানে" স্থিত,তাহার নাম "উপস্থ" ইহাই হইবে উপস্থের সংজ্ঞা। কোন্ স্থানকে"উপ-স্থান"বলা যাইতে পারে, তাহা স্থির করিতে হইলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, "অপ-স্থান" ও "উপ-স্থান" নামক দুইটী শব্দ আছে এবং ইহা ছাড়া কোন্ বিধানে আমাদের শরীর পরিচালিত হইতেছে, তৎসম্বন্ধে কিছু কিছু পরিজ্ঞাত হইতে হইবে।

অপ-স্থান হইতে মানুষের উদ্ভব এবং উপ-স্থান হইতে মানুষের বৃদ্ধি† ইহা বেদের কথা।

মানুষের শরীরের যে স্থান না থাকিলে মানুষের পক্ষে স্বাধীন মানুষের মত বাঁচাই সম্ভব নহে, তাহা তাহার "অপ-স্থান", আর যে স্থান না থাকিলেও মানুষ স্বাধীনভাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারে বটে, কিন্তু স্বীয় কোন উন্নতি সাধন করিতে পারে না, তাহা তাহার "উপ-স্থান"। সেইরূপ আবার যে যে বস্তু না থাকিলে মানুষ একেবারেই স্বাধীন মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, সেই সেই বস্তুকে তাহার "অপস্থ" বলা হইয়া থাকে, আর যে যে বস্তু না থাকিলেও সে স্বাধীনভাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারে বটে, কিন্তু তাহার স্বীয় কোন উন্নতি সাধন করা সম্ভব হয় না, সেই সেই বস্তুকে তাহার "উপস্থ" বলা হইয়াছে। কেন এতাদৃশ বস্তু অপ-স্থ এবং উপ-স্থ শব্দে অভিহিত হইবে, তাহা পর্য্যন্ত বেদে আলোচিত হইয়াছে।

মানুষের শরীরের কোন্ কোন্ স্থান "অপ-স্থান" ও "উপ-স্থান"এবং কোন্ কোন্ বস্তু তাহার "অপ-স্থ"ও "উপ-স্থ", তাহা বুঝিতে হইলে পাঠকদিগকে স্ব স্ব শরীর ও কার্য্য পরীক্ষা করিতে হইবে।

মানুষের শরীরের কোন্ স্থান না থাকিলে অথবা কোন্ বস্তু না থাকিলে মানুষের পক্ষে স্বাধীন মানুষের মত বাঁচাই সম্ভব নহে, তাহা বুঝিতে হইলে "স্বাধীন মানুষের মত বাঁচা" কাহাকে বলে, তাহা আগে বুঝিতে হইবে।

স্বাধীন মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, মানুষের দৃষ্টিশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, শ্রবণশক্তি, বাক্‌শক্তি, স্পর্শশক্তি ও চলচ্ছক্তি অপরিহার্য্য। মানুষ ভাল করিয়া দেখিতে পারুক আর নাই পারুক, একেবারে দৃষ্টিশক্তিহীন হইলে আমরা মানুষকে অন্ধ বলিয়া থাকি। অন্ধ হইলেও মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে বটে, কিন্তু স্বাধীনভাবে বাঁচিতে পারে না এবং তাহার বহু কার্য্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে হয়। ঘ্রাণশক্তি সবল অথবা দুর্ব্বল হইলেও মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে বটে, কিন্তু একেবারে না থাকিলে মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কারণ তখন আর মানুষের পক্ষে নিঃশ্বাস গ্রহণ অথবা প্রশ্বাস পরিত্যাগ করা সম্ভব হয় না।

এইরূপভাবে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, মানুষের পক্ষে পরমুখাপেক্ষী না হইয়া স্বাধীনভাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে শ্রবণশক্তি, বাক্‌শক্তি, স্পর্শশক্তি এবং চলচ্ছক্তিও একান্ত প্রয়োজনীয়।

ইহা ছাড়া মানুষের জনন-শক্তি, আস্বাদন-শক্তি, বুদ্ধি-শক্তি, মনন-শক্তি প্রভৃতি আর যে সমস্ত শক্তি আছে, তাহা না থাকিলে তাহার স্বীয় উন্নতি অথবা শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা সম্ভব হয় না বটে, কিন্তু ঐ সমস্ত শক্তি না থাকিলেও মানুষ স্বাধীনভাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, মানুষের এই দৃষ্টিশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, শ্রবণ-শক্তি, বাক্‌শক্তি, স্পর্শশক্তি ও চলচ্ছক্তি তাহার শরীরের কোন্ স্থানে এবং কোন্ কোন্ [illegible] সহায়তায় উদ্ভূত হইতেছে। তাহার শরীরের যে যে স্থানে উপরোক্ত ছয়টি শক্তির উদ্ভব

---

* ন্যায়প্রস্থানমার্গাংস্তানভ্যস্য স্বং চ দর্শনম্।
প্রণীতো গুরুণাঽস্মাকময়মাগম-সংগ্রহঃ॥
বাক্যপদীয়, ২য় কাণ্ড—৪৯০ শ্লোক।

† উদ্বত্যমিতি……উদ্বত্যং জাতবেদসম্। বৈদিক-সন্ধ্যা।
অপোঙ্কার-পদার্থাঃ……বাক্যপদীয় ১ম কাঃ—২৫ শ্লোক
শন্ন অপো ধন্বন্যাঃ—বৈদিক[illegible]। কেহ কেহ 'আপো' উচ্চারণ করিয়া থাকেন, তাহা ঠিক নহে। "আপ" এবং "অপ" একার্থক নহে।

হইতেছে, তাহাই তাহার অপ-স্থান এবং তদ্ব্যতিরিক্ত তাহার শরীরের অন্যান্য অংশ তাহার উপ-স্থান।

যে যে বস্তুর সহায়তায় উপরোক্ত ছয়টি শক্তির উদ্ভব হইতেছে, সেই সেই বস্তু মানুষের "অপস্থ" এবং এতদ্ব্যতিরিক্ত তাহার যাহা কিছু শরীরের মধ্যে আছে, তাহা তাহার "উপস্থ"।

দৃষ্টিশক্তির উদ্ভব হইতেছে দুইটি চক্ষু হইতে; ঘ্রাণশক্তির উদ্ভব হইতেছে দুইটি নাসারন্ধ্র হইতে; শ্রবণশক্তির উদ্ভব হইতেছে দুইটি কর্ণরন্ধ্র হইতে; বাক্‌শক্তির উদ্ভব হইতেছে দুইটি চোয়াল হইতে; স্পর্শশক্তির উদ্ভব হইতেছে দুইটি হস্ত হইতে এবং চলচ্ছক্তির উদ্ভব হইতেছে দুইখানি পা হইতে। কাযেই আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, দুইটি চক্ষু, দুইটি নাসিকারন্ধ্র, দুইটি কর্ণরন্ধ্র, দুইখানি চোয়াল, দুইখানি হস্ত এবং দুইখানি পা মানুষের অপ-স্থান। কিন্তু পর্যাবেক্ষণ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, দুইটি চক্ষু, দুইটি নাসারন্ধ্র, দুইটি কর্ণরন্ধ্র, দুইটি চোয়াল, দুইখানি হাত, দুইখানি পা বলিতে লোকতঃ যাহা বুঝায়, তাহা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হইলেও মানুষের দৃষ্টিশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, শ্রবণশক্তি, বাক্‌শক্তি, স্পর্শশক্তি, ও চলচ্ছক্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হয় না।

কাযেই লোকতঃ যাহাকে চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ, চোয়াল, হস্ত ও পদ বলা হইয়া থাকে, তাহাকে অপ-স্থান বলা যায় না। অথচ একটু অনুসন্ধান করিলেই জানা যাইবে যে, দুই চক্ষুর কোটর নাসিকার পার্শ্বে যে স্থানে মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানের মেদে কোনরূপ ক্ষত হইলে চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি তখনই নষ্ট হইয়া যায়। নাসিকারন্ধ্রের মূলে যে স্থান রহিয়াছে, সেই স্থানের মেদে কোনরূপ ক্ষত হইলে ঘ্রাণশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। দুইখানি চোয়ালের যে দুইখানি হাড়ের উপর দুই পঙক্তি দাঁত সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, সেই দুইখানি চোয়ালকে সমরেখায় বর্দ্ধিত করিলে মস্তিষ্কের পশ্চাদ্‌ভাগে যেখানে তাহাদের মিলন হয়, সেই স্থানের মেদে ক্ষত হইলে বাক্‌শক্তি নির্ব্বাপিত হয়। গলাবন্ধনের হাড় যে স্থানে মেরুদণ্ডে মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানের মেদে কোন ক্ষত হইলে হস্তের স্পর্শশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। পা দুইখানি পৃষ্ঠদেশের সহিত যে স্থানে মিলিত হইয়াছে, সেই দুইটি স্থান পায়ের [illegible] সমরেখায় পরিবর্দ্ধিত করিলে মেরুদণ্ডের উপর যে স্থানে ঐ দুইটি রেখার মিলন হয়, সেই স্থানের মেদে কোন ক্ষত হইলে চলচ্ছক্তি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়া যায়। ব্রহ্মরন্ধ্রে কোনরূপ ক্ষত হইলে শ্রবণশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। কাযেই এই ছয়টি স্থানকে অপ-স্থান বলা যাইতে পারে।

আরো একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, এই ছয়টি স্থানই মুখের হা-কারের উপরিস্থিত মস্তিষ্ক-ভাগে এবং পৃষ্ঠদেশের মেরুদণ্ডপ্রদেশে; কাযেই অপ-স্থান বলিতে মেরুদণ্ড প্রদেশ এবং মস্তিষ্কের উপরিভাগ বুঝিতে হইবে এবং তদ্ব্যতিরিক্ত অন্যান্য স্থান অর্থাৎ সম্মুখভাগ এবং পদদেশ মানুষের উপ-স্থান। অপ-স্থান বলিতে শরীরের যে প্রদেশ বুঝিতে হইবে, তাহার মধ্যেও যে-অংশকে অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত ও চর্ম্ম বলা হয়, সেই অংশ না থাকিলেও মানুষ স্বাধীন ভাবে জীবিত থাকিতে পারে। কাযেই অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত ও চর্ম্মকে সর্ব্বত্রই উপ-স্থান বলিতে হইবে। যে অংশের নাম মেদ, তাহাকে অপ-স্থান বলিতে হইবে।

কোন্ কোন্ বস্তুর সহায়তায় উপরোক্ত ছয়টি শক্তির উদ্ভব হইতেছে, তাহা অনুভব করার চেষ্টা করিলে দেখা যাইবে—শরীরমধ্যস্থিত বায়ু, অম্বু, তেজ এবং মেদের সহায়তায় মানুষ ঐ ছয়টি শক্তি অর্জ্জন করিতেছে। আরও দেখা যাইবে যে, শরীরমধ্যস্থিত বায়ু হইতে অম্বুর এবং অম্বু হইতে তেজের এবং তেজ হইতে মেদের উদ্ভব হইতেছে। কাযেই শরীরমধ্যস্থিত বায়ু, অম্বু, তেজ এবং মেদকে অপ-স্থ বলিতে হইবে। এতদ্ব্যতিরিক্ত মানুষের শরীরের মধ্যে যাহা কিছু আছে, তাহাকেই মানুষের উপ-স্থ বলা যাইতে পারে। এক কথায় শরীরের যাহা কিছু কাটিয়া ফেলিলে মানুষের পরমুখাপেক্ষী না হইয়া স্বাধীন ভাবে দৃষ্টিশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, শ্রবণ-শক্তি, বাক্-শক্তি, স্পর্শ-শক্তি ও চলচ্ছক্তি বজায় থাকিতে পারে, তাহার নাম উপ-স্থ এবং যাহা কাটিলে ঐ ছয়টি শক্তির কোনটি সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়, তাহার নাম অপ-স্থ। মনে রাখিতে হইবে যে শরীরাভ্যন্তরস্থ অপ-স্থানে প্রবাহিত বায়ু, অম্বু ও তেজ তাহার অপ-স্থ বটে, কিন্তু যে বায়ু, অম্বু ও তেজ উপ-স্থানে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা তাহার উপ-স্থ।

স্ব স্ব চালচলনের দিকে লক্ষ্য করিলে আরও দেখা যাইবে যে, আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের সন্নিকটস্থ বায়ুমণ্ডল হইতে আমাদের অপ-স্থানে এবং উপ-স্থানে বায়ু, অম্বু এবং

তেজ গ্রহণ করিতেছি এবং সন্নিকটস্থ বায়ুমণ্ডলের বায়ু, অম্বু এবং তেজ হইতে অপ-স্থানের এবং উপ-স্থানের বায়ু, অম্বু ও তেজ সঞ্চয় করিয়া নিত্য নূতন নূতন মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত এবং চর্ম্মের উদ্ভব সাধন করিতেছি। নিকটবর্ত্তী বায়ুমণ্ডলে যে বায়ু, অম্বু এবং তেজ রহিয়াছে এবং যাহা গ্রহণ করিয়া আমাদের অপ-স্থানের এবং উপ-স্থানের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে, তাহাও আমাদের উপ-স্থ।

বায়ুমণ্ডলের বায়ু, অম্বু ও তেজ ছাড়া যে সমস্ত মানুষ, পশু, পক্ষী, গাছপালা প্রভৃতি চর ও অচর জীবের সংসর্গে আমাদের বস-বাস করিতে হয়, তাহাদের দ্বারাও আমাদের অপ-স্থানের ও উপ-স্থানের পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে। এই সমস্ত চরাচর-জীবকেও উপ-স্থ বলিতে হইবে।

কাযেই দেখা যাইতেছে যে, "অপ-স্থান" ও "উপ-স্থানের" মিলনে জীবের অবয়ব এবং অপ-স্থ বস্তু ও উপ-স্থ বস্তুর প্রক্রিয়াবশতঃ তাহার সত্তা ও বৃদ্ধি। ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইতেছে যে, আমাদের প্রত্যেকের শরীরের প্রত্যেক উপাদান-বস্তু অর্থাৎ বায়ু, অম্বু, বহ্নি, মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত এবং চর্ম্ম ব্যোম হইতে উৎপন্ন হইতেছে।

লক্ষ্য করিলে আরও দেখা যাইবে যে, আমাদের শরীরের অপ-স্থান এবং উপ-স্থানের স্থিতি-স্থাপকতা (elasticity) যত অধিক হয়, আমাদের শরীরও তত অধিক নীরোগ ও কার্য্যক্ষম হইয়া থাকে। যত সহজ চেষ্টায় কোন বস্তুকে ভগ্ন না করিয়া রূপান্তরিত করা যায় এবং রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিলে আবার যত সহজে বস্তুটি পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, ততই তাহার স্থিতি-স্থাপকতা বেশী বুঝিতে হইবে। যদি কোন বস্তুকে রূপান্তরিত করিতে হইলে অত্যধিক চেষ্টার প্রয়োজন হয়, অথবা রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা করিলেই তাহা যদি ভগ্ন হইয়া যায়, অথবা একবার রূপান্তরিত হইলে তাহাকে পূর্ব্বাবস্থায় আনয়ন করা যদি কষ্ট-সাধ্য হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ঐ বস্তুর স্থিতি-স্থাপকতা (elasticity) অত্যন্ত কম।

কাযেই শরীরকে নীরোগ ও কার্য্যক্ষম রাখিতে হইলে তাহার অপ-স্থান এবং উপ-স্থানের স্থিতি-স্থাপকতার দিকে লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু শরীরের উপ-স্থানের দিকে লক্ষ্য রাখা যত সহজ, অপ-স্থানের দিকে লক্ষ্য রাখা তত সহজ নহে, কারণ শরীরের উপ-স্থান তাহার অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত এবং চর্ম্ম লইয়া এবং ঐ কয়টী বস্তুই অপেক্ষাকৃত উপরিভাগে। আর শরীরের অপ-স্থান তাহার মেদ লইয়া এবং তাহা অপেক্ষাকৃত অনেক গভীর-প্রদেশে অবস্থিত থাকে। ইহা ছাড়া উপ-স্থান প্রদেশের স্থিতি-স্থাপকতা রক্ষা করিতে পারিলে অতি সহজেই অপ-স্থান প্রদেশের স্থিতি-স্থাপকতা রক্ষা করাও সম্ভব হয়।

যে যে উপাদান লইয়া এক একটী বস্তু গঠিত হয়, সেই সেই উপাদানের আণবিক (inter-molecular) ব্যবধান যত অধিক হয়, তাহার স্থিতি-স্থাপকতাও তত বেশী হয়, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। কাযেই শরীরের উপ-স্থ বস্তুর আণবিক ব্যবধান যত বেশী পরিমাণে রক্ষা করা যাইবে, ততই তাহার উপ-স্থানের স্থিতি-স্থাপকতা (elasticity) বেশী হইবে এবং শরীরের নীরোগতা ও কার্য্য-ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে। অতএব ইহা বলা যাইতে পারে যে, জীবের উপ-স্থ যাহাতে অটুট থাকে, তদনুযায়ী কার্য্য করিলে জীবের নীরোগতা এবং কার্য্যক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে পারে। ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা স্থির করিতে হইলে, জীবের উপ-স্থ বস্তুগুলির শক্তি অটুট রাখিবার উপযোগী কার্য্য করিলে যে তাহার নীরোগতা এবং কার্য্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, এই সত্যটী আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, কারণ বর্ণগত অর্থানুসারে "ধর্ম্ম" বলিতে বুঝায় সেই কার্য্য অথবা সেই চাল-চলন, যে কার্য্যে অথবা চালচলনে জীবের উপ-স্থ বহ্নি এবং স্পর্শ-শক্তি অটুট থাকে। এক্ষণে দেখিতে হইবে "বহ্নি" অটুট রাখিবার কি প্রয়োজনীয়তা।

মানুষের বহ্নি অটুট রাখিবার কি প্রয়োজনীয়তা তাহা স্থির করিতে হইলে সাধারণতঃ তাহার কি কি প্রবৃত্তির উদয় হয়, কোন্ প্রবৃত্তি হইতে কি ফলোদয় হয় এবং কোন্ উপাদান-বস্তুর জন্য কোন্ প্রবৃত্তির উদয় হইতেছে, তাহার ধারণা করিতে হইবে।

যে কোন সাধারণ মানুষের দিকেই লক্ষ্য করা যা'ক না কেন, প্রায়শঃ দেখা যাইবে, তিনি আটটি প্রবৃত্তি লইয়া সর্ব্বদা চলাফেরা করিতেছেন। উপ-স্থান এবং অপ-স্থানের মিলনে যে তাঁহার শরীর এবং তাহা যে ব্যোম, বায়ু, অম্বু, বহ্নি, মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত এবং চর্ম্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাহা তিনি উপলব্ধি করেন না। এমন কি তাঁহার শরীরস্থ

চর্ম্ম যে রক্ত হইতে পৃথক্‌, রক্ত যে মাংস হইতে পৃথক্‌, মাংস যে বসা হইতে পৃথক্‌, বসা যে মজ্জা হইতে পৃথক্‌, মজ্জা যে অস্থি হইতে পৃথক্‌, অস্থি যে মেদ হইতে পৃথক্‌, মেদ যে বহ্নি হইতে পৃথক্‌, বহ্নি যে অম্বু হইতে পৃথক্‌, অম্বু যে বায়ু হইতে পৃথক্‌, বায়ু যে ব্যোম হইতে পৃথক্‌ এবং ব্যোম হইতে যে সমস্ত উপাদানের উদ্ভব হইতেছে, তাহা পর্য্যন্ত অনুভব করিবার চেষ্টা করেন না।

কোন্‌ কোন্‌ প্রবৃত্তি মানুষকে সর্ব্বদা সংসারক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের অবস্থার মধ্যে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া থাকে, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলে নিম্নলিখিত আটটি প্রবৃত্তির দিকে নজর পড়িবে—

(১) কামক্রোধাদি রিপুজনিত প্রবৃত্তি। সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে "ভূমি"-প্রকৃতি বলা হইয়া থাকে।*

(২) প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছাসম্ভূত প্রবৃত্তি। সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে "আপ"-প্রকৃতি বলা হইয়া থাকে।*

(৩) অতৃপ্তি-সম্ভূত প্রবৃত্তি। সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে "অনল"-প্রকৃতি বলা হইয়া থাকে।*

(৪) অবিচারিত সিদ্ধান্তের উপর আস্থা-সম্ভূত প্রবৃত্তি। সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে "বায়ু"-প্রকৃতি বলা হইয়া থাকে।*

(৫) একটা কিছু শুনিলে তাহা যদি ভাল লাগে, তাহা বিচার না করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি। সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে "খং" অথবা "আকাশ"-প্রকৃতি বলা হইয়া থাকে।*

(৬) যে সমস্ত বস্তু অথবা ব্যক্তির সংসর্গ-বশতঃ উপরোক্ত পাঁচটী প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়, সেই সমস্ত বস্তু অথবা ব্যক্তির সংসর্গ লাভ করিবার ইচ্ছা-সম্ভূত প্রবৃত্তি। সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে "মনঃ"-প্রকৃতি বলা হইয়া থাকে।*

(৭) কেন মানুষের উপরোক্ত ছয়টী প্রবৃত্তির উদ্ভব হইতেছে, তাহা নির্ণয় করিবার সাময়িক (স্থায়ী নহে) ইচ্ছার উদ্ভব হইলে, মানুষ তাহার সংস্কারকে আঁকড়াইয়া ধরিবার* চেষ্টা করে। এই অবস্থায় সংস্কারকেই আঁকড়াইয়া ধরার চেষ্টা-সম্ভূত প্রবৃত্তি। সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে "বুদ্ধি"-প্রকৃতি বলা হইয়া থাকে।*

(৮) মানুষ যাহা যাহা করে, তাহা তাহার কোন্‌ অঙ্গ অথবা উপাদান-বস্তু বশতঃ, ইহা যখন নির্ণয় করিবার ইচ্ছা হয়, অথচ সঠিক ভাবে নির্ণয় করিতে না পারিয়া সেই ভ্রান্ত কারণকেই সঠিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার ইচ্ছাসম্ভূত প্রবৃত্তি। সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে "অহংকার"-প্রকৃতি বলা হইয়া থাকে।*

উপরোক্ত আটটি প্রবৃত্তি বশতঃ সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত চলাফেরা করিতেছে এবং কখনও বা নিজের দৈন্যের কথা ভাবিতে অধীর হইয়া পড়িতেছে, আবার কখনও বা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সে নিজকে সুখময় মনে করিতেছে। তাহার জীবনকালের মধ্যে সে প্রায়শঃ এমন একটী দিনও পায় না, যে দিনটীকে সে সম্পূর্ণ ভাবে সুখের দিন বলিয়া মনে করিতে পারে। তাহার জীবনের প্রত্যেক দিন হাসি ও কান্নায় মিশ্রিত। অথচ কোন মানুষ কখনও এক মুহূর্ত্তের জন্য কান্না চায় না। তাহার প্রাণ চায় সর্ব্বদা হাসিতে। কিন্তু যে হাসি তাহার কাম্য, সে হাসি তাহার ভাগ্যে জুটে না। সে সাধারণতঃ দেখিতে পায় যে, হাসি ও কান্নার মিশ্রণেই জীবন এবং তাই সে মনে করে যে, তাহার স্রষ্টাই বুঝি তাহাকে হাসি ও কান্না উভয়ই দিয়াছেন। কিন্তু বস্তুতঃ আমাদের স্রষ্টা আমাদিগকে কোনরূপে কাঁদিবার জন্য গঠিত করেন নাই। আমরা যাহাতে সর্ব্বদা প্রাণ ভরিয়া আনন্দে বিভোর থাকিতে পারি, আমাদের স্রষ্টা তাহার সমস্ত উপকরণের সৃজন করিয়াছেন। তথাপি আমাদের জীবনে যে এত কান্না ভোগ করিতে হয়, তাহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমাদের নিজেদের। আমাদের সর্ব্বদা প্রাণ ভরিয়া হাসিবার সর্ব্ববিধ উপকরণের সৃজন সত্ত্বেও আমরা যে হাসি-কান্নায় মিশ্রিত জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকি, তাহার দায়িত্ব যে সম্পূর্ণভাবে আমাদের

* ভূমি, আপ, অনল, বায়ু, খং, মনঃ, বুদ্ধি, অহংকার—মানুষের এই আটটি প্রকৃতির যে ব্যাখ্যা করা হইল, উহা যে নির্ভুল, তাহা বর্ণ হইতে পদের অর্থ স্থির করিবার পদ্ধতি পরিজ্ঞাত হইলে এবং "নিরুক্ত" যথাযথভাবে অধ্যয়ন করিতে পারিলে জানা যায়।

নিজেদের এবং অপর কাহারও, অথবা কোন পূর্ব্বজন্মজনিত অদৃষ্টবশতঃ নহে, তাহা আমরা এই প্রবন্ধে ক্রমশঃ প্রতিপন্ন করিব। এই "পূর্ব্বজন্মজনিত অদৃষ্টের" উপর ভর করিয়া বর্ত্তমান হিন্দু তাহার হিন্দুয়ানি ফলাইতেছেন। তাঁহারা জানেন না যে, ইহা আমাদের বেদবিরুদ্ধ কথা। বেদবিরুদ্ধ কথা জগতে স্থান পাইয়াছে বলিয়াই আজ মানবজাতি এত বিপন্ন এবং সোনার ভারত আজ শৃঙ্খলিত এবং ঋষি-রচিত ভারতে তাহার মূক জনসাধারণ ও ভবিষ্যৎ আশার স্থলস্বরূপ দেশের যুবকবৃন্দ অন্নাভাবের হাহাকারে বিধ্বস্ত। পাপ ও পুণ্য বশতঃ আমাদের হাসি ও কান্না ভোগ করিতে হয় এবং তাহার কর্ত্তা আমরা নিজেরা।

আমরা কেবলমাত্র আমাদের স্বকীয় কার্য্যবশতঃই হাসি ও কান্না ভোগ করিয়া থাকি এবং তাহার জন্য আর কেহ দায়ী নহে, ইহা ঋষিগণ সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জগৎকে শুনাইয়াছিলেন যে, স্রষ্টা কাহাকেও পাপ অথবা পুণ্য দেন নাই। জীব স্বীয় অজ্ঞতা-বশতঃই কান্নার ভাগী হইয়া থাকে। * প্রত্যেক ঋষির বিভিন্নবিষয়ক পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থে ঐ একই কথার প্রতিধ্বনি রহিয়াছে। কোন ঋষির কোন গ্রন্থে ইহার বিরুদ্ধ কথা নাই। পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষার প্রকৃত ব্যাকরণ না বুঝিতে পারিয়া এই কথার কদর্থ করিয়া থাকেন। যে যে ভাষ্যকার এই কথার বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই ব্যাখ্যা কোন ঋষিপ্রণীত ব্যাকরণসম্মত বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না। যদি কেহ পারেন, তাহা হইলে আমরা অবনত মস্তকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।

উপরে সাধারণ মানুষের যে আটটি প্রবৃত্তির কথা বলা হইয়াছে এবং যাহার জন্য মানুষ হাসি-কান্না মিশ্রিত জীবন যাপন করিয়া থাকে, তাহার উদ্ভব হয় কেন, তাহা জানিতে পারিলে, মানুষ বুঝিতে পারিবে যে, আমাদের কান্নার জন্য আমরাই দায়ী। কেন মানুষের জীবনে অহরহঃ ঐ আটটি প্রবৃত্তির উদ্ভব হইতেছে, তাহা পাঠকবর্গকে শুনাইবার আগে তাঁহাদের নিজ জীবনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বুঝিতে হইবে যে, ঐ আটটি প্রবৃত্তির প্রথমটি, অর্থাৎ কামক্রোধাদির বেগ যতদিন পর্য্যন্ত অপ্রতিহত থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত মানুষের জীবনের দিনগুলির অধিকাংশ সময়ই কান্নায় কাটিয়া যায়। যদি কখনও কোন মানুষের মনে, উহার বেগ প্রতিহত করিবার ইচ্ছার উদ্ভব হয়, তখনও তিনি ইচ্ছা করিলেই সাফল্য লাভ করিতে পারেন না। উহার বেগ প্রতিহত করিবার ইচ্ছার উদ্ভব হইলে এইটুকু মাত্র পার্থক্য হয় যে, জীবনের এক একটি দিন অপেক্ষাকৃত একটু বেশী সময় হাসিবার সুযোগ উপস্থিত হয়। তখনও হাসি-কান্নামিশ্রিত জীবন থাকিয়া যায় এবং কামক্রোধাদির বেগ প্রতিহত করা সম্ভব হয় না। এইরূপে ঐ আটটি প্রবৃত্তির একটির পর একটি দমন করিবার ইচ্ছার উদ্ভব হইলে অপেক্ষাকৃত একটু একটু বেশী সময় হাসি উপভোগ করিবার সুযোগ হয়।

ঐ আটটি প্রবৃত্তির মধ্যে যত বেশীসংখ্যক প্রবৃত্তি দমন করিবার ইচ্ছার উদ্ভব হয়, তত বেশী সময় হাসি উপভোগ করিবার সুযোগ হয়। উপরোক্ত আটটি প্রবৃত্তির সমস্ত কয়টিই যখন দমন করিবার ইচ্ছার উদ্রেক, হয় তখন অপেক্ষাকৃত সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সময় হাসিতে পারা যায় বটে, কিন্তু তখনও কান্নার প্রাধান্য থাকিয়া যায় এবং তখনও ঐ প্রবৃত্তিগুলি কার্য্যতঃ দমন করা সম্ভব হয় না।

যাহা করিলে ঐ আটটি প্রবৃত্তি দমন করা সম্ভব হইতে পারে, তাহার নাম কর্ম্ম (দুইটি "ম"এর উপর রেফ—একটি "ম"এর উপর রেফ, অর্থাৎ "কর্ম" নহে)। মানুষের সাধারণ আটটি প্রবৃত্তি দমন করিবার উপায় যে "কর্ম্ম", তাহা কোশা-কুশী, ফুল, বিল্বপত্র, নৈবেদ্য লইয়া পূজা করিলে, অথবা খোল-করতাল লইয়া ভজনা করিলে, অথবা নিত্য গঙ্গাস্নান কিম্বা গীতা, চণ্ডী, ভাগবত ও বেদাদি পাঠ করিলে, অথবা তথাকথিত দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করিলে, অথবা অবিবাহিত জীবনে তথাকথিত সেবার কার্য্য কিম্বা প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার সম্মুখে চক্ষু মুদ্রিত করিবার কার্য্য গ্রহণ করিলে, অথবা স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া তথাকথিত সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, অথবা সঙ্ঘবদ্ধ কিম্বা একক ভাবে "ভগবান্, তুমিই সব" এই কথা চিন্তা করিবার চেষ্টা করিলে সিদ্ধ হয় না। উপরোক্ত পূজা প্রভৃতি কার্য্যে যে মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখের মিশ্রণ উদ্ভবকর সাধারণ আটটি প্রবৃত্তি দমিত হয় না, তাহা যাঁহারা ঐ পূজা প্রভৃতি প্রচলিত বিধি অনুযায়ী করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের জীবন লক্ষ্য

* ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥
গীতা, ৫ম অধ্যায়—১৪-১৫ শ্লোক।

ভাষ্যকার পণ্ডিতগণ ইহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা কোন ঋষির ব্যাকরণ-সম্মত নহে। প্রয়োজন হয়, আমরা দেখাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি।

করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ঐ আটটি প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে দমন করিয়া প্রতিনিয়ত অবিমিশ্র সুখ ভোগ করিতেছেন, উহাঁদের মধ্যে এমন কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় কি? প্রতিনিয়ত অবিমিশ্র সুখ ভোগ করিতে পারিলে যে,শারীরিক অসুস্থতা অথবা যখন তখন মৃত্যু আসিতে পারে না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অথচ উপরোক্ত পূজা প্রভৃতি কার্য্যে রক্ত এমন কাহাকেও প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায় না, যিনি কখনও অসুস্থ হন না এবং সাধারণ কার্য্য করিতে করিতে মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে (দুই ঘণ্টা, দুই দিন,দুই মাস অথবা দুই বৎসর পূর্ব্বে নহে) সুস্থ স্বরে বলিতে পারেন যে, 'আমি এখন মরিতে চলিলাম'। সাধারণ মানুষ যে-অস্বাস্থ্য অথবা রোগ অথবা অকালমৃত্যু অথবা ইচ্ছার বিরুদ্ধে মৃত্যু ভোগ করিয়া থাকেন, তথাকথিত বিধিবদ্ধ পূজা প্রভৃতি করিলেও যদি সেই অস্বাস্থ্য অথবা রোগ অথবা অকালমৃত্যু অথবা ইচ্ছার বিরুদ্ধে মৃত্যু ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ তথাকথিত বিধিবদ্ধ পূজা প্রভৃতির সার্থকতা কোথায়? কোশাকুশী, ফুল, বিল্বপত্র ও নৈবেদ্য লইয়া পূজার প্রয়োজন আছে তাহা সত্য, কিন্তু সে "পূজা" যে কি "পূজা", তাহা মানুষের সুখ-দুঃখমিশ্রিত জীবনের ঐ আটটি প্রবৃত্তি দমিত করিতে না পারিলে বুঝিয়া উঠা সম্ভব নহে। ভজনা, ধ্যান ও জপসম্বলিত পূজা কি জিনিষ, তাহা যথাযথভাবে বুঝিয়া উঠা এবং তাহার পূর্ণ প্রয়োগ করা সম্ভব হয় কেবলমাত্র তখন, যখন মানুষ তাহার ঐ আটটি প্রবৃত্তি দমিত করিবার কর্ম্ম আরম্ভ করে এবং একটির পর একটি করিয়া সাফল্য লাভ করে। বর্ত্তমানে হিন্দু, খৃষ্টান ও মুসলমান প্রচারকগণ জনসাধারণকে যে "পূজা" শিখাইয়া থাকেন, তাহা বেদ অথবা ওল্ড টেষ্টামেণ্ট অথবা কোরাণের অনুমোদিত নহে।

প্রকৃত ভাষা-বিজ্ঞান এবং প্রাচীন সংস্কৃত, প্রাচীন হিব্রু এবং প্রাচীন আরবী মানুষ বিস্মৃত হইয়াছে বলিয়া বেদ, ওল্ড টেষ্টামেণ্ট এবং কোরাণের প্রকৃত তথ্য বিকৃত হইয়া এতাদৃশ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। আমাদের কথায় হয়ত আরও কিছুদিন মানুষের অবিশ্বাস হইতে পারে এবং হয়ত তাহাতে কেহ কেহ আমাদের উপর খড়্গহস্ত হইতেও পারেন। যাঁহারা আমাদের উপর খড়্গহস্ত হইবেন, তাঁহারা জানিয়া রাখুন যে, এতাদৃশ কথা বলিবার কি দায়িত্ব, আমরা তাহা পরিজ্ঞাত আছি। আমাদের কথাগুলি সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করা কিছু সময়সাপেক্ষ মাত্র। ঋষিগণের কথার ভাষাবিজ্ঞান যাহাতে মানুষ চেষ্টা করিলে বুঝিতে পারে, আমরা তাহা লোকসমক্ষে উদ্ভাসিত করিবার কার্য্য গ্রহণ করিয়াছি। ঐ ভাষা-বিজ্ঞান পরিজ্ঞাত হইলে মানুষ দেখিতে পাইবে যে, একই নিয়মে প্রাচীন সংস্কৃত, প্রাচীন আরবী এবং প্রাচীন হিব্রু অধ্যয়ন করা যায় এবং ভারতীয় বেদে কিছু অতিরিক্ত কথা আছে বটে, কিন্তু তাহা বাদ দিলে বেদ, ওল্ড টেষ্টামেণ্ট এবং কোরাণে একই কথা সর্ব্বতোভাবে একই পদ্ধতিতে বর্ণিত রহিয়াছে। বেদেও যে মানুষের "ধর্ম্মে"র ও "ধর্মে"র কথা রহিয়াছে, কোরাণ ও ওল্ড টেষ্টামেণ্টেও সেই মানুষের "ধর্ম্মের" ও "ধর্মে"র কথাই রহিয়াছে।

অনেকে মনে করেন যে, বিভিন্ন মুনির বিভিন্ন মত। কিন্তু তাহা সত্য নহে। যাঁহারা জীবসম্বন্ধীয় সমগ্র তথ্য আমূলভাবে জানিতে পারেন, তাঁহাদিগকে সংস্কৃত ভাষায় "মুনি" বলা হইয়া থাকে এবং ঐ ভাষানুসারে তাঁহাদিগকে "ব্যবসায়াত্মিক" বলা হয়। ব্যবসায়াত্মিকগণের বুদ্ধি এক এবং তাঁহাদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য থাকে না।* যাঁহারা কোন তথ্য যথাযথ ভাবে বুঝিতে পারেন না, তাঁহাদের মধ্যেই মতদ্বৈধের উপস্থিত হয় এবং বাদবিসংবাদ স্থান পায়। যে সমস্ত শ্লোক হইতে মুনিদিগের বিভিন্ন মতের কথা উত্থাপিত হয়, সেগুলির ঐরূপ ব্যাখ্যা প্রকৃত সংস্কৃত ভাষার বিস্মৃতিবশতঃ হইয়া থাকে। কোন ঋষি-প্রণীত কোন ব্যাকরণদ্বারা ঐ জাতীয় ব্যাখ্যা প্রতিপন্ন করিতে কেহ সক্ষম হইবেন না।

মানুষ মূর্খ হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া নিজেদের মধ্যে এত বিদ্বেষ ও এত শত্রুতার উদ্ভব হইয়াছে। তাহার মূর্খতা এত বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, সে যে মূর্খ, তাহা পর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত নহে। বর্ত্তমান কালের মানুষ এতখানি মূর্খ যে, যে কুজ্ঞানের ও অসভ্যতার কার্য্যে তাহার অন্নাভাব উদ্ভূত হইয়া অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বজায় রাখা কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই কুজ্ঞানকে সে বিজ্ঞান বলে এবং সেই অসভ্যতাকে সে সভ্যতা বলে। পাঠকগণ, একটু স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখুন যে, উপরোক্ত কোন কথা অতিরঞ্জিত নহে এবং তাহাতে কর্কশতা আছে বটে, কিন্তু প্রাণের খেদ ব্যতীত কাহারও উপর বিদ্বেষের হুতাশন নাই।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে, কোন্ কার্য্যের নাম সেই "কর্ম্ম", যদ্দ্বারা মানুষের সুখ-দুঃখমিশ্রিত জীবনের সাধারণ আটটি প্রবৃত্তি দমিত হইতে পারে এবং কিরূপভাবে তাহা কার্য্যতঃ করা যায় এবং কিরূপভাবে তাহা করিলে মানুষ তাহার আটটি প্রবৃত্তি সম্পূর্ণভাবে দমিত করিয়া প্রকৃত ভজনা, ধ্যান, জপ ও পূজা কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে পারে এবং তাহার পক্ষে জীবনে অবিমিশ্র হাসি উপভোগ করা সম্ভব হইতে পারে। [ক্রমশঃ

* ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥
গীতা—২য় অঃ, ৪১ শ্লোঃ।

[সম্পাদকদ্বয়ের সম্মতিক্রমে শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক লিখিত]

দেশের বর্ত্তমান অবস্থা, সংবাদপত্রের দায়িত্ব ও দৈনিক আনন্দবাজার

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে বাঙ্গালা ভাষায় যে কয়টী সংবাদপত্র আছে, তন্মধ্যে আনন্দবাজার পত্রিকা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচার লাভ করিয়াছে। ইহার পরিচালকগণ বঙ্গদেশের কংগ্রেস শাখার নেতৃত্বও লাভ করিয়াছেন। কাযেই আপাতদৃষ্টিতে তাঁহারাই এখন বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গণ্যমান্য। কেহ কেহ এমন আছেন, যাঁহাদের নিকট আনন্দবাজার পত্রিকায় যাহা প্রচারিত হয়, তাহা উপেক্ষণীয় নহে বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

আমাদের "বঙ্গশ্রী" পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলির অন্যতম লেখক শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আনন্দবাজারের উপহাস-স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ঐ কাগজে তাঁহার নামকরণ করা হইয়াছে, "পূজার সং" এবং "পাগলা মেহেরালী"। আমাদের ঐ লেখকের এতাদৃশ নামকরণ করিলে বাঙ্গালা দেশের শিল্প-বাণিজ্যের কিছু অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে, কারণ আমাদের ঐ লেখক বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্, বঙ্গলক্ষ্মী সোপ ওয়ার্কস্, বঙ্গলক্ষ্মী উলেন মিলস্, মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স্, মেট্রোপলিটান্ প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস, কমারসিয়াল ক্যারীইং, ইণ্ডিয়ান মোটর ষ্টোর্স, বেঙ্গল টেক্স্টাইল এজেন্সি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনার সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন। ঐ প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম প্রধান পরিচালক একটী "সং" অথবা একটী "পাগল", ইহা প্রচারিত হইলে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের খরিদ্দারগণের আস্থা হারাইতে পারে এবং খরিদ্দারগণের আস্থা হারাইলে প্রতিষ্ঠানগুলি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা করা অলীক নহে। উপর্য্যুপরি বাঙ্গালা দেশের কয়েকটী যৌথ প্রতিষ্ঠান নষ্ট হইয়া যাওয়ায় দেশীয় যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলির উপর দেশবাসীর আস্থা একেই হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহার পর যদি আবার আরও কয়েকটী দেশীয় প্রতিষ্ঠান নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে যে, বাঙ্গালার যৌথ শিল্প-বাণিজ্যের ভাগ্যাকাশে অধিকতর কালমেঘের উদয় হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

আনন্দবাজার পত্রিকায় যাহা প্রচারিত হয়, তাহা উপেক্ষণীয় কি না, অর্থাৎ আনন্দবাজার পত্রিকা সংবাদপত্র-হিসাবে বিশ্বাসযোগ্য কি না এবং তাঁহারা যে আমাদের লেখককে "সং" এবং "পাগল" বলেন, তাহা সঙ্গত কি না, ইহা বিচার করাই আমাদের এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ইহার বিচার করিতে হইলে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, সংবাদপত্রের দায়িত্ব কি কি, দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে, দেশের বর্ত্তমান অবস্থাই বা কি এবং তৃতীয়তঃ দেখিতে হইবে, আনন্দবাজারে সংবাদপত্রের দায়িত্ব প্রতিপালিত হয় কি না। আমাদের মতে দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সংবাদ পত্রের দায়িত্ব বহু এবং তাহার মধ্যে নিম্নে যাহা যাহা লিখিত হইল, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

(১) যে যে ঘটনায় জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি অথবা অবনতি ঘটিতে পারে, সেই সেই ঘটনা যথাসম্ভব যথাযথ ভাবে প্রচারিত করা ;

(২) দেশে যাহা যাহা ঘটিতেছে, তাহা জনসাধারণের হিতকর কিংবা অহিতকর, তাহা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া ;

(৩) দেশের মধ্যে জনসাধারণের অহিতকর কিছু ঘটিতেছে, ইহা নজরে পড়িলে তাহার কারণ নির্দ্ধারণ করিয়া, ঐ কারণ জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া ;

(৪) জনসাধারণের অহিতকর যাহা যাহা দেখা যায়, কি করিলে তাহার উপশম হইতে পারে এবং ক্রমশঃ জনসাধারণের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়, তাহা জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া ;

(৫) দেশের জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে বিদ্বেষের অথবা দলাদলির উদ্ভব না হয়, অথচ কে দেশের হিতসাধন করিতেছেন, অথবা কে অহিতসাধন করিতেছেন, তাহা যাহাতে জনসাধারণ জানিতে পারে, তাহার চেষ্টা করা ;

(৬) জনসাধারণের প্রয়োজন সাধনের জন্য যে সমস্ত সমাজ, রাষ্ট্র এবং শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলির মধ্যে কোন অনাচার ঘটিতে থাকিলে, ঐ অনাচার যাহাতে না ঘটিতে পারে, অথচ ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে স্থায়ী হয়, তাহার চেষ্টা করা ;

(৭) বিজ্ঞাপনদাতাগণের বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য যাহাতে সফল হয় এবং তাঁহারা যাহাতে লাভবান্ হন, তাহার চেষ্টা করা।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থা কি এবং তৎসম্বন্ধে দেশীয় সংবাদপত্রগুলির কর্ত্তব্য কি, তাহার বিচার করিতে হইলে, দেশের শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, গভর্ণমেণ্টের রাজ্যপরিচালনা এবং দেশীয় রাষ্ট্রসঙ্ঘগুলি কি অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, মুখ্যতঃ তাহার আলোচনা করিতে হইবে।

কোন্ কার্য্য কি অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, নিঃসন্দিগ্ধভাবে সংক্ষেপতঃ তাহার বিচার করিতে হইলে, ঐ কার্য্যের কি উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং ঐ উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে কি না, তাহার দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে।

শিক্ষার বিবিধ উদ্দেশ্যের মধ্যে চারিটী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ছাত্রগণ যাহাতে কার্য্যক্ষম হইয়া স্ব স্ব জীবিকার্জ্জনের উপযোগী হয় এবং যে-যে-কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়, তাহা যাহাতে তাহার হস্তে সফল হয়, ইহাই শিক্ষার প্রথম [।] পর জীবনে ছাত্রগণের ব্যবহার যাহাতে ভাল হয় অর্থাৎ সংসারক্ষেত্রে তাহারা যাহাতে অধিকাংশ লোকের সহিত ঐকান্তিক সখ্য স্থাপন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, ইহা শিক্ষার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

ছাত্রগণ পূর্ণ বয়স প্রাপ্ত হইলে যাহাতে স্বাস্থ্য ও কার্য্যক্ষমতা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বজায় রাখিতে পারে, তাহা শিক্ষার তৃতীয় উদ্দেশ্য।

পরবর্ত্তী জীবনে কি করিলে ছাত্রগণ অকালমৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে, ইহা শিক্ষার চতুর্থ উদ্দেশ্য।

শিক্ষার অপরাপর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যিনি যাহাই বলুন না কেন, উপরোক্ত চারিটী উদ্দেশ্য যে একান্ত প্রয়োজনীয়, তৎসম্বন্ধে যুক্তিসঙ্গতভাবে কাহারও মতপার্থক্য থাকিতে পারে না।

বাঙ্গালাদেশের শিক্ষিত যুবকগণ স্বাধীনভাবে যে সমস্ত কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করেন, সেগুলি প্রায়শঃ যেরূপ ভাবে নষ্ট হইয়া যায় এবং তাঁহাদের মধ্যে যেরূপ বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিলে এখনকার শিক্ষার প্রথম উদ্দেশ্য যে সফল হয় নাই, তাহা বলিতেই হইবে।

বাঙ্গালীদের মধ্যে বাদবিসম্বাদ ক্রমশঃই যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া শিক্ষার দ্বিতীয় উদ্দেশ্যও যে এখনও সফল হয় নাই, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে।

রুগ্ন যুবকের সংখ্যা এবং চল্লিশ বৎসর হইতে না হইতে মানুষের মৃত্যুর হার যেরূপ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলে শিক্ষার তৃতীয় ও চতুর্থ উদ্দেশ্যও যে বিফল হইতেছে, তাহাও যুক্তিসঙ্গত ভাবে অস্বীকার করা যায় না।

জমী হইতে যে যে শস্য যে যে পরিমাণে উৎপন্ন হইলে কৃষকসম্প্রদায় পরমুখাপেক্ষী না হইয়া সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, যাহাতে সেই সেই শস্য সেই সেই পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করাকে কৃষিকার্য্যের উদ্দেশ্য বলিতে হইবে।

ভারতবর্ষের কৃষক চিরদিন স্বচ্ছন্দে, সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে নিজ নিজ জীবন অতিবাহিত করিয়া আসিতেছিল, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। শুধু তাহাদের নিজ নিজ জীবন কেন, তাহারাই ছিল সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ। কৃষকের সহায়তায় সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের মোটা ভাত এবং মোটা

কাপড়ের সংস্থান হইত। এমন কি বিদেশীয়গণ যে ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্য করিতে লোলুপ হইয়াছিলেন, তাহাও মুখ্যতঃ এই সমৃদ্ধিশালী কৃষকদিগের জন্য। অথচ অধুনা প্রায় সমগ্র কৃষক সম্প্রদায় বাজারের দরের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছে এবং প্রায়শঃ অর্দ্ধাশনে এবং অনশনে ক্লেশ ভোগ করিতেছে।

কাজেই কৃষিকার্য্যের আধুনিক ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ অসাফল্য লাভ করিয়াছে।

দেশের সমগ্র জনসাধারণের ব্যবহারে যে যে শিল্পজাত দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, তাহা যাহাতে দেশীয় শিল্পিগণ যথাসম্ভব অল্প খরচায় প্রস্তুত করিয়া খরিদ্দারগণকে সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন মূল্যে বিক্রয় করিতে পারেন এবং করেন এবং তাঁহারা লাভবান্ হন, তাহার ব্যবস্থা করাই শিল্পকার্য্যের উদ্দেশ্য বলিতে হইবে। শিল্পিগণকে লাভবান্ করিতে হইলে যাহাতে চাহিদার অতিরিক্ত শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপত্তি না হয়, অথচ তাঁহারা যাহাতে অন্যদেশের বণিকগণের প্রতিযোগিতায় বেশী মূল্যে কোন দ্রব্য বিক্রয় না করেন, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়। কাযেই যাহাতে চাহিদার অতিরিক্ত শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত না হয় এবং তাহা অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রয় না হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা শিল্প ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য।

এই ভারতবর্ষেই এমন একদিন ছিল, যখন ভারতবাসীর প্রয়োজনীয় জিনিষ প্রায়শঃ বাহির হইতে আনয়ন করিতে হইত না এবং দেশীয় তাঁতী, জোলা, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, স্বর্ণকার প্রভৃতি শিল্পিগণ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনাতিবাহিত করিতে পারিতেন। শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যও কোন দেশের তুলনায় খুব বেশী ছিল না এবং খরিদ্দারগণের প্রয়োজনীয় জিনিষ ক্রয় করিবার অর্থের জন্য বিব্রত হইতে হইত না। অতি সামান্য খরচায়ই দেশীয় জনসাধারণের প্রায় ঘরে-ঘরে মহাসমারোহে দোল-দুর্গোৎসবাদি বার মাসে তের পার্ব্বণ সাধিত হইত। প্রায় প্রত্যেকের ঘরেই প্রায় প্রতি দিন একাধিক আত্মীয়-কুটুম্ব এবং অতিথির সমাগম দেখা যাইত এবং তাঁহাদের আদর-আপ্যায়নের খরচার জন্য কোন গৃহস্থই বিব্রত অথবা বিরক্ত হইতেন না।

অথচ অধুনা ভারতবাসী যাহা যাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহার প্রায় বার আনা জিনিষ হয় বিদেশ হইতে আমদানী করিবার প্রয়োজন হয়, নতুবা বিদেশজাত উপকরণে প্রস্তুত করিতে হয়। প্রত্যেক শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যও পূর্ব্বের তুলনায় এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, জনসাধারণের মধ্যে অনেকেরই অর্থাভাবে বহু প্রয়োজনীয় জিনিষ হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। দোল-দুর্গোৎসবাদি বার মাসে তের পার্ব্বণ ত দূরের কথা, এখন অনেকেই অর্থাভাবে যথাসময়ে পুত্রকন্যার বিবাহ পর্য্যন্ত দিতে সক্ষম হয় না। আত্মীয়-কুটুম্ব এবং অতিথির আপ্যায়ন করা ত দূরের কথা, নিজের পুত্র এবং সহোদর ভ্রাতাকে স্বোপার্জ্জনে এক সপ্তাহের বেশী দুটী খাইতে দিতে হইলে অনেকেরই কুণ্ঠা বোধ করিতে হয় তাঁতী, জোলা, কর্ম্মকার, কুম্ভকার এবং স্বর্ণকারাদি শিল্পিগণ প্রায়শঃ নিজ নিজ ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া অন্নের জন্য উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন যাঁহারা পাশ্চাত্ত্য ধরণের শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও বেশীর ভাগ লোকই ঋণে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছেন। অনেকেই উৎপন্ন দ্রব্য যথাসময়ে বিক্রয় করিতে পারেন না বলিয়া লোকসান খাইয়া পরিশেষে স্ব স্ব শিল্প-প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইয়া থাকেন।

কাযেই ভারতবর্ষের আধুনিক শিল্পব্যবস্থাও নিষ্ফল হইয়াছে বলিতে হইবে।

দেশের কৃষিযোগ্য জমীর এবং চারণভূমির কোন অনিষ্ট সাধন না করিয়া যাহাতে কৃষিজাত এবং শিল্পজাত দ্রব্যের দেশব্যাপী আদান-প্রদান সাধিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করার নামই বাণিজ্য-ব্যবস্থা।

ভারতবর্ষে এমন একদিন ছিল, যখন নদী ও খালগুলির মধ্য দিয়া সুন্দর সুন্দর নৌকাগুলি পাল তুলিয়া সমগ্র দেশের মধ্যে যাতায়াত করিতে পারিত। এক নৌকার সহায়তাতেই প্রত্যেক গ্রামের বাণিজ্য সাধিত হইত। অশ্বচালিত যান এবং অশ্ব দ্রুত গমনাগমনের সহায়তা করিত। বৈদিক সাহিত্য যথাযথ অর্থে উদ্ভাসিত হইলে আরও দেখা যাইবে যে, ঋষিগণের অভ্যুদয়কালে একদিকে আমেরিকা এবং অন্য দিকে ইয়োরোপ ও আফ্রিকা পর্য্যন্ত প্রায়শঃ নদীপথ বর্ত্তমান ছিল এবং তাহার মধ্য দিয়া জলজাত বাষ্পের সাহায্যে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সুদৃঢ় নৌকাগুলি প্রতি ঘণ্টায় ১৫০ মাইল বেগে প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য স্থানে গমনাগমন

করিত। তখন নদীগুলি সারা বৎসর জলে পরিপূর্ণ থাকিত বলিয়া প্রত্যেক দেশের হাওয়া শীতল থাকিত এবং স্বাস্থ্যও ভাল থাকিত। অধিকন্তু নদী জলে পরিপূর্ণ থাকায় জমীগুলি প্রতিনিয়ত রস সঞ্চয় করিতে পারিত এবং তাহার ফলে সর্ব্বত্র জমীর উর্ব্বরাশক্তি রক্ষিত হইত এবং প্রত্যেক স্থানকেই শস্য-শ্যামলা বলা যাইত। বাণিজ্যের জন্য কোন স্থানের কোন জমী কোনরূপে নষ্ট করিবার প্রয়োজন হইত না।

এখন সারাদেশ রেলওয়ের লৌহবর্ত্মে শৃঙ্খলিত এবং নদীগুলি কোথাও লৌহ কপাটে, কোথায়ও বা লৌহ-নির্ম্মিত সেতুতে, কোথায়ও বা মৃত্তিকানির্ম্মিত বাঁধে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। কত জমী যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। নদীগুলি শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় সারা দেশের সমগ্র জমী শুকাইয়া গিয়াছে এবং প্রায়শঃ উৎপাদিকা-শক্তিবিহীন হইয়া উঠিয়াছে। দেশের মধ্য দিয়া বাষ্পযানাদির গমনাগমন অপ্রতিহত হওয়ায় দেশের বায়ু প্রতিনিয়ত বিকৃত বাষ্পে পরিপূর্ণ হইয়া পড়িতেছে এবং তাহার ফলে সারা দেশ অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিতেছে।

তাহাতে একদিকে যেমন মানুষের স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া পড়িতেছে, অন্যদিকে মানুষ যাহা খাইয়া বাঁচিবে, সেই শস্যাদিও অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়িতেছে। অধিকন্তু ভূমি-খণ্ডের উপর দিয়া লৌহনির্ম্মিত দ্রুতগামী বাষ্পযানের গমনাগমনের ফলে সারা দেশের জমীগুলি অত্যধিক মাত্রায় কম্পিত হইতেছে এবং ক্রমশঃই উর্ব্বরাশক্তি আরও হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে।

কাযেই আধুনিক বাণিজ্য-ব্যবস্থা নিষ্ফলতা লাভ করিয়াছে ইহা বলা যায়

আধুনিক বাণিজ্যের জন্য যে জাতীয় মুদ্রা ও ব্যাঙ্কের প্রবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ করিলেও দেখা যাইবে যে, তাহাতে বাণিজ্যের সুবিধা হওয়া ত দূরের কথা, তদ্দ্বারা যথেষ্ট অসুবিধাই সংঘটিত হইতেছে। প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আমরা এস্থানে তাহার সমালোচনা করিব না। আধুনিক মুদ্রা ও ব্যাঙ্কে যে বাণিজ্যের অসুবিধা হইতেছে, তাহা ইয়োরোপের এবং মার্কিণ দেশের বাণিজ্যের দুরবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই অনুমান করা যাইতে পারে।

যে ব্যবস্থায় দেশের শিক্ষা, কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যের ক্রমিক উন্নতি সাধিত হয়, সেই ব্যবস্থা রাজ্য-পরিচালনার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—ইহা বলিলে কেহ যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রতিবাদ করিতে পারিবেন না।

যখন পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, আমাদের দেশে ঐ কয়েকটী কার্য্যই অসাফল্য লাভ করিয়াছে, তখন আমাদের দেশের রাজ্য-পরিচালনার বর্ত্তমান নীতি সাফল্যপ্রদ হয় নাই, ইহা বলা যাইতে পারে।

যাহাতে দেশের ও জনসাধারণের মধ্যে ঐক্য সাধিত হয়, তাহার চেষ্টা করাই দেশীয় রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—এতদ্বিষয়ে কেহ যুক্তিসঙ্গতভাবে ভিন্নমতাবলম্বী হইতে পারেন না।

মহাত্মা গান্ধী আমাদের ভারতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার আগে দেশে সর্ব্বসমেত চারিটী মাত্র দল ছিল। আর আজ হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে দেশে বড় বড় উনিশটী দলের উদ্ভব হইয়াছে। কাযেই মহাত্মার কংগ্রেস পরিচালনা প্রায় সর্ব্বতোভাবে অসাফল্য লাভ করিয়াছে, ইহা বলিতে পারা যায়।

দেশের অবস্থা যে দিক দিয়াই দেখা যায়, সেই দিকেই কুজ্ঝটিকা-পরিপূর্ণ। এতাদৃশ অবস্থায় যদি কেহ বলেন যে, চারিদিকে ভুলের খেলা চলিতেছে, তাহা হইলে যুক্তি-সঙ্গত ভাবে তাঁহাকে "পাগল" এবং "সং" বলিতে হইবে, না যাঁহারা তাহাকে উপহাস করেন, তাঁহাদিগকে "পাগল" এবং "সং" বলা যাইতে পারে, ইহা নির্দ্ধারণের ভার আমাদের পাঠকবর্গের উপর রহিল।

এতাদৃশ দুঃসময়ে যাঁহারা গম্ভীর ভাবে দেশের অবস্থার কথা না ভাবিয়া উপহাসে সময়ক্ষেপ করিতে পারেন, তাঁহাদের কোন্ বয়সের কি, তাহা আমাদের পাঠকবর্গ নির্ণয় করুন।

আনন্দবাজার পত্রিকায় সাংবাদিক দায়িত্ব কিরূপ ভাবে প্রতিপালিত হয়, আমরা এক্ষণে তাহার বিচার করিব।

যাহাতে দেশের এতাদৃশ অবস্থা একদিনের মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, এমন কিছু করা কোন সংবাদপত্রের পরিচালকের পক্ষে সম্ভব, আমরা তাহা বলি না।

কেন আমাদের দেশের শিক্ষা, কৃষি, শিল্প-বাণিজ্য রাজ্য-পরিচালনা এবং দেশের রাষ্ট্রসঙ্ঘ এতাদৃশ দুষ্ট হইল এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে ঐ ঐ বিষয়ক অবস্থার পরিবর্ত্তন

সাধিত হইতে পারে, তাহা ধীর ভাবে চিন্তা করা এবং যে যে কারণে আমাদের দুরবস্থার উদ্ভব হইয়াছে এবং যাহা করিলে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে পারে, তাহা দেশবাসীকে স্পষ্ট ভাবে জানাইয়া দেওয়া যে দায়িত্বজ্ঞানযুক্ত প্রত্যেক সাংবাদিকের কর্ত্তব্য, কেহ যুক্তিসঙ্গত ভাবে তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অথচ আপনারা চাহিয়া দেখুন, আজ পনের বৎসর আনন্দবাজারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, এই পনের বৎসরের মধ্যে আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় বিবৃতিতে উপরোক্ত বিষয়ক একটীও উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ পাওয়া যাইবে না।

পরন্তু দায়িত্বজ্ঞানযুক্ত সংবাদপত্রের যাহা একান্ত অকর্ত্তব্য, তাহা প্রায় প্রতিদিন আনন্দবাজারে প্রকাশিত হইতেছে।

শিক্ষা যখন দুষ্ট হইয়াছে, তখন যাঁহারা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা-কার্য্যে নিযুক্ত, যাঁহারা অধ্যাপক এবং যাঁহারা পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতা, তাঁহাদের কার্য্যে যে কোন না কোন গলদ আছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। সাংবাদিকের কর্ত্তব্য ব্যক্তিগতভাবে কাহাকেও নিন্দা না করিয়া কে কোথায় কোন্ অন্যায় করিয়াছেন এবং কেন তাঁহার ঐ কার্য্যকে অন্যায় বলা হইতেছে, তাহা দেখাইয়া দেওয়া। অথচ আনন্দবাজার উল্টাইলে দেখা যাইবে যে, হয় কখনও কাহারও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা প্রচারিত হইতেছে, নতুবা কাহাকেও অশ্রদ্ধার পাত্র করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। অথচ যাঁহাকে প্রশংসা অথবা নিন্দা করা হইতেছে, সে কেন প্রশংসা অথবা নিন্দার পাত্র, তাহার কোন কারণ প্রায়ই দেখান হয় না। পরন্তু প্রায়শঃ অযথা ভাবে মানুষকে নিন্দা ও প্রশংসা করিয়া জনসাধারণের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হইতেছে।

দেশের কৃষকের যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে অনতিবিলম্বে কৃষির ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে ভারতবাসীর যে কি অবস্থা হইবে, তাহা ভাবিতেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। কি ব্যবস্থা করিলে যে দেশের কৃষকের অবস্থা উন্নত হইতে পারে, তাহা অবশ্য প্রত্যেক সংবাদপত্রের প্রত্যেক সম্পাদকের পক্ষে স্থির করা সম্ভব নহে। কিন্তু যে ব্যবস্থায় অন্যদেশের কৃষকের অপকার সাধিত হইয়াছে, সেই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের পরামর্শ কোন ক্রমেই কোন দায়িত্বজ্ঞানযুক্ত সম্পাদক দিতে পারেন না। মার্কিন দেশে এবং ইউরোপে বর্ত্তমানে intensive cultivation নামক যে কৃষি-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার ফলে ঐ ঐ দেশের স্বাবলম্বী কৃষকবর্গ প্রায়শঃ পরোক্ষভাবে ধনিকের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের দুরবস্থা ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে। আন্তর্জ্জাতিক সভার (League of Nations) অর্থনৈতিক শাখা (Economic Committee) হইতে ১৯৩১ সালে কৃষির বিপত্তি (Agricultural Crisis) সম্বন্ধে যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মন্তব্যগুলি অবিচারিতভাবে গ্রহণ না করিয়া তাহাতে কৃষকের অবস্থা সম্বন্ধে যে বর্ণনা রহিয়াছে, তাহা নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিলে আমাদের কথার সার্থকতা বুঝিতে পারা যায়। কাযেই বর্ত্তমান intensive cultivation কোন ক্রমেই কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির গ্রহণীয় হইতে পারে না।

অথচ আনন্দবাজারে কৃষি সম্বন্ধে টীয়াপাখীর বুলির মত যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা ঐ intensive cultivation-এর রূপান্তর মাত্র।

বর্ত্তমান শিল্প-প্রণালীতে ইয়োরোপ এবং মার্কিন দেশ যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে ঐ ঐ দেশের বহুদর্শী ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। আমাদের দেশেও গত ২৫ বৎসরে আধুনিক শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। অথচ দেশের জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি হওয়া ত দূরের কথা, ক্রমশঃই খারাপ হইয়া পড়িতেছে। কাযেই আধুনিক শিল্প-প্রণালীর বিস্তার হওয়া পরামর্শসিদ্ধ কি না, তাহা দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেরই চিন্তার যোগ্য হওয়া উচিত।

অথচ আনন্দবাজার খুলিলে দেখা যাইবে যে, যাঁহারা ঐ আধুনিক শিল্প-বিস্তারের পোষকতা করেন, উহাতে তাঁহাদের জয়ঢক্কা বাজান হইয়া থাকে।

দেশীয় বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি আনন্দবাজারের বিচারও অদ্ভুত। কি হইলে কোন্ বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানকে প্রশংসনীয় অথবা নিন্দনীয় বলা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আনন্দবাজারের সম্পাদকবর্গের যে কোন বিচারশক্তি আছে, তাহা তাঁহাদের লেখা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় না। সম্প্রতি সুপ্রতিষ্ঠিত হিন্দুস্থান ইন্‌সিওরেন্‌স্ কোম্পানীর সম্বন্ধে আনন্দবাজার পত্রিকা যে সমস্ত মন্তব্য প্রচার করিয়াছেন, তাহা যে কতদূর দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক, তাহা অন্যান্য সংবাদপত্রে আলোচিত হইয়াছে। আমরা হিন্দুস্থান

ইন্‌সিওরেন্‌স্ কোম্পানীকে সম্পূর্ণ দোষমুক্ত বলিতে পারি না বটে, কিন্তু আনন্দবাজারে তাহাকে যতদূর দুষ্ট বলিয়া প্রচারিত করা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং বিদ্বেষমূলক। পরন্ত উহাতে অযথাভাবে আমাদের বাঙ্গালার জীবনবীমা কোম্পানী-গুলির যথেষ্ট অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে এবং আনন্দবাজারের সম্পাদকবর্গ যে, বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যালান্স শিট্ (balance sheet) পর্য্যন্ত যথাযথ ভাবে বিশ্লেষণ করিতে জানেন না, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। প্রয়োজন হয়, আমরা ভবিষ্যতে আমাদের এই কথার সার্থকতা প্রতিপন্ন করিব।

গভর্ণমেন্টের কার্য্যাবলী যে প্রত্যেক সংবাদপত্রের সমালোচ্য, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের দেশের গভর্ণমেন্টের কার্য্যেও যে দোষ আছে, তাহা আমরা আগেই দেখাইয়াছি। কিন্তু গভর্ণমেন্টের কোন কার্য্যের সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে হইলে তাহার বিরুদ্ধে যে সমস্ত কথা বলিবার থাকে, তাহা যেমন বলিতে হয়, তেমনই আবার তাহার স্বপক্ষের কথাগুলিও বলিবার প্রয়োজন হয়। নতুবা কেবলমাত্র একঘেয়ে তাহার নিন্দাবাদ প্রচার করিলে বিদ্বেষ প্রকাশ পায় এবং দেশের মধ্যে দলাদলির সৃষ্টি হয়। গভর্ণ-মেন্টের প্রজাহিতকর কার্য্যগুলি সাফল্য লাভ করে নাই, তাহা যুক্তিসঙ্গতভাবে বলা যায় বটে, কিন্তু আমাদের গভর্ণমেন্ট আমাদের হিতকর কোন কার্য্য করিবার চেষ্টা করেন না, তাহা বলা যায় না।

অথচ আনন্দবাজার খুলিলে গভর্ণমেন্টের অযৌক্তিক নিন্দাবাদের প্রচারই দেখা যাইবে।

বাঙ্গালাদেশের কংগ্রেসের মধ্যে যে দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার প্রধান নেতা এই আনন্দবাজার পত্রিকা।

কে যে কখন তাহার নিন্দাভাজন হইবেন, তাহার স্থিরতা নাই।

অথচ নিন্দাস্তুতির যে কি কারণ, তাহা কেহ ঐ কাগজে খুঁজিয়া পাইবেন না।

বিজ্ঞাপনদাতাগণের প্রতি তাঁহাদের বিচারও যথেষ্ট। বিজ্ঞাপিত বিষয়ে যাহাতে সাধারণের লক্ষ্য আকৃষ্ট হয়, তাহার জন্যই সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়া থাকে। যে সংবাদপত্র দিনান্তে রক্ষিত হয় না এবং যাহা মাত্র একদিনের জন্য মানুষ পড়িয়া থাকে, তাহাতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বিত না হইলে কোন মানুষের মনোযোগ প্রায়শঃ আকর্ষণ করিতে পারে না। তাহার পর যদি আবার ঐ দৈনিক পত্রিকার কলেবর অত্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞাপনগুলির পক্ষে পাঠকবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার সম্ভাবনা আরও কমিয়া যায়, কারণ কাহারও পক্ষে একদিনে অতগুলি পৃষ্ঠা পড়িয়া উঠা সম্ভব নহে এবং প্রায়শঃ কোন পাঠক বিজ্ঞাপন পড়িবার জন্য কোন সংবাদপত্র রক্ষা করেন না। কাযেই একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, দৈনিক পত্রিকার পৃষ্ঠার সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া বিজ্ঞাপন-দাতাগণের স্বার্থবিরুদ্ধ। অথচ আনন্দবাজার পত্রিকায় কোন চিন্তাযোগ্য কথা থাক আর নাই থাক, তাহার কলেবর ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে।

আমাদের প্রতি আনন্দবাজার পত্রিকা যে ব্যবহার করিতেছেন, তাহাতে আমরা বিন্দুমাত্রও ক্ষুব্ধ হই নাই, তাহা বলিতে পারি না। তবে প্রয়োজন মনে করিলে আমাদের ব্যক্তিগত ক্ষোভের প্রতিবিধান আমরা করিতে পারিব। ব্যক্তিগতভাবে গালাগালি না করিয়া আমরা যাহা লিখিতেছি, তাহাতে অযৌক্তিকতা কোথায় আছে, তাহা দেখাইয়া দিলে আমাদের ক্ষোভের কোন কারণ থাকিবে না। কাহারও অনিষ্ট করা আমাদের কাম্য নহে। আনন্দ-বাজার পত্রিকায় দেশের ও বিজ্ঞাপনদাতাগণের ইষ্ট অথবা অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, আমরা তাহা পাঠকবর্গকে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। আনন্দবাজার যাহাতে সাংবাদিকের দায়িত্ব যথাযথ প্রতিপালন করিতে বাধ্য হন এবং তদনুসারে কার্য্য করিয়া তাহার প্রচার অপ্রতিহত থাকে, তাহার চেষ্টা করা দেশবাসীর কর্ত্তব্য।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইলে একদিকে যেরূপ গভর্ণমেন্টের কার্য্যাবলীর নিরপেক্ষ সমা-লোচনার প্রয়োজন, সেইরূপ আবার ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নেতৃবর্গের কার্য্যাবলীরও নিরপেক্ষ সমা-লোচনার প্রয়োজন আছে। যেহেতু অমুক অমুক-পদস্থ, অতএব তিনি সমালোচনার অতীত, অথবা আমি যখন অমুক দলের, তখন আর অমুকের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা চলিবে না, এইরূপ ভাব যতদিন দেশবাসীর মধ্যে থাকিবে, ততদিন অন্নাভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

সাংবাদিকগণ তাঁহাদের দায়িত্ব যথাযথ প্রতিপালন না করিলে দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তনের আশা সুদূরপরাহত।

নাড়িয়া উত্তর করিল, "না—গুরুদেব ছাড়া আর কারও কাছে আমি মাথা নোয়াইনে—"

স্বামীজী প্রশ্ন করিলেন, "গুরুদেব! কে তোমার গুরুদেব ?"

সদানন্দ বাবু তাচ্ছিল্যের সহিত কহিলেন, "কে এক ষণ্ডানন্দ—"

রমেন বাধা দিয়া কহিল, "শ্রীশ্রীমৎ প্রচণ্ডানন্দ স্বামী।"

সদানন্দ বাবু কহিলেন, "তোমার মস্তকানন্দ, মিথ্যুক—"

জ্ঞানানন্দ বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন, "প্রচণ্ডানন্দ ? কোন্ সম্প্রদায় ? নাম তো শুনিনি ?"

রমেন প্রত্যুত্তর করিল, "আপনার নামও তো আগে আমরা কেউ শুনিনি।"

সদানন্দ বাবু চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িয়া মারমুখো হইয়া কহিলেন, "মুখ সামলে কথা কও বলছি! নইলে—"

জ্ঞানানন্দ স্বামী মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন, "কর কি সদানন্দ বাবু! ধৈর্য্য হারিও না; সূর্য্যকে যদি কেউ আজন্ম দেখিনি বলে, তো তার উপর কি রাগ করা উচিত? না তাকে জন্মান্ধ বলে করুণা করা উচিত ?"

মিনতির পিঠে হাত বুলাইয়া কহিলেন, "বেশ লক্ষ্মী মেয়ে; বুদ্ধি-শুদ্ধি হয়নি—ছেলে মানুষ! বয়স হলেই শুধরে যাবে—" মিনতি সরিয়া দাঁড়াইল। রমেন ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে স্বামীজীর পানে চাহিয়া চলিয়া গেল।

সদানন্দ বাবু চেয়ার গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "কখ্খনও শুধরোবে না।" যোগেন্দ্র বাবু বিস্মিত নয়নে তাঁহার দিকে তাকাইলেন। সদানন্দ বাবু বলিতে লাগিলেন, "কোথাকার একটা অভদ্র লোফারের হাতে মেয়ের শিক্ষার ভার দিয়েছে—শিক্ষা যা হচ্ছে—"

জ্ঞানানন্দ ক্ষমা-স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "না না তা নয়, তবে ছেলেটির সহবৎ-জ্ঞান বেশ হয়নি—আজকালকার ছেলে কি না!" মিনতি মৃদুচরণে স্থান ত্যাগ করিল।

যোগেন্দ্র বাবু কহিলেন, "না, না, ছেলেটী তো বেশ ভদ্র। তা' ছাড়া ভারী ধার্ম্মিক, এই বয়সেই টিকি—"

সদানন্দ বাবু ধমকাইয়া কহিলেন, "টিকি থাকলেই বুঝি ধার্ম্মিক হয়? এই যে আমার টিকি নেই, তবে—?" বলিয়া কটমট করিয়া তাকাইলেন।

জ্ঞানানন্দ স্বামী কহিতে লাগিলেন, "ও সব বাহ্য আড়ম্বর কোন কাজের নয় যোগেন্দ্র বাবু। অন্তরের সম্পদই হ'ল আসল। দেখ না, এই গেরুয়ার (নিজের বুকে হাত দিয়া) অন্তরালেই কত দুষ্ট প্রকৃতি যে আত্মগোপন করে, তার সংখ্যা নেই। জগতে সত্যিকার সাধু প্রকৃতির লোক দুর্লভ যোগেন্দ্র বাবু—"

সদানন্দ বাবু বলিলেন, "ও লোকটাকে তাড়াতেই হবে, যোগেন্দ্র! যাঁকে আমার বাড়ীর বধূ হতে হবে, তাঁকে ও রকম লোকের শিক্ষাধীনে রাখায় আমার মত নেই—"

যোগেন্দ্র বাবু কহিলেন, "তা' হলে মিনতির লেখাপড়া বন্ধ করে দিতে হয়।"

—"তা হোক, আর লেখাপড়ার কি দরকার? যথেষ্ট হয়েছে।"

সকলে কিছুক্ষণ নীরব। তারপর জ্ঞানানন্দ কহিলেন, "যোগেন্দ্র বাবুর শরীর কেমন? প্রাতে ও সন্ধ্যায় যে প্রাণায়াম এবং নাম জপ করতে বলেছিলাম, তা করছেন তো ?"

সমস্ত মুখ কুঞ্চিত করিয়া যোগেন্দ্র বাবু জবাব দিলেন, "আজ্ঞে, ও সব সুবিধে হয়নি। ও সব করতে গেলেই বুক ধড়ফড়ানি বেড়ে যায়।"

জ্ঞানানন্দ ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "উঁহু, তা তো হবার নয়। ঠিকঠিক করা হচ্ছে না বোধ হয়। না হলে দেখ না, আমার এক শিষ্য—ডিষ্ট্রিক্ট জজ—তার ব্লাড-প্রেসার ছিল প্রায় হাজার, চোক কান নাক থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্তের ফোয়ারা ছুটত, তিন দিন প্রাণায়াম আর নাম-জপে ব্লাড-প্রেসার হয়ে গেল কত, বল ত? একেবারে জিরো—দেহ হয়ে গেল এক গাছি দড়ি—"

"ওরে বাব্বা" বলিয়া যোগেন্দ্র বাবু হাঁ করিয়া রহিলেন। সদানন্দ বাবু সমর্থনসূচক মাথা নাড়িতে লাগিলেন।

সদানন্দ বাবু বলিয়া উঠিলেন, "যোগেন্দ্রের যে রকম ব্লাড-প্রেসার চলছে, যে কোন দিন হার্টফেল করতে পারে।"

যোগেন্দ্রের মুখটী শুকাইয়া গেল, কহিলেন, "কি যে বা, তা বল সদানন্দ!"

সদানন্দ বলিলেন, "সত্যি কথা! আমাদের পাড়ার পরাণ মুখুজ্জের ঠিক তোমার মত ব্লাড-প্রেসার ছিল, ছেলে

বসতে যাচ্ছে, হার্টফেল করল ; বসতে আর হ'ল না, ঠিক তেমনি আধবসা দাঁড়িয়ে রৈল।"

—"বল কি হে ? তবে ?"

—"সম্পত্তির সব ব্যবস্থা করে ফেল যোগেন্দ্র ! উইল করে ফেল। মিনতিকে কি পথে বসাবে ? তোমার তো শুনেছি দেশে ভাইপোরা আছে—"

যোগেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া বিষণ্ণ কণ্ঠে জানাইলেন, "আছে ব'লে আছে—বিস্তর আছে—"

সদানন্দ কহিলেন, "সমস্ত সম্পত্তি মিনতির নামে লিখে দাও, ভাইপোরা দাঁত বসাতে আসুক দিকি !—সে আমি দেখে নেব। আর, এই বাড়াটা তো তুমি আশ্রমের জন্যে দেবে বলেছিলে, তা তাও পাকা লেখাপড়া করে দাও। আশ্রম চালাবার জন্যে টাকাকড়ির যা ব্যবস্থা করতে চাও, তা' এখনই করে দেওয়া ভাল। কি বলেন স্বামীজী ?"

স্বামীজী সায় দিয়া কহিলেন, "সত্যি ! যা করতে হবে, কালক্ষয় না করে করাই যুক্তিসঙ্গত। ভাল কাজে পৃথিবীতে অনেক বাধা। শাস্ত্রে আছে—রাবণ কালক্ষয় করেই স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধিয়ে দিয়ে যেতে পারেন নি। না হ'লে কি সুবিধে হত বল দেখি ! টক্ টক্ করে যখন তখন স্বর্গে যাওয়া আসা করা চলত।"

সদানন্দ—"সত্যি ! উঃ।"

যোগেন্দ্র চুপ করিয়া রহিলেন।

স্বামীজী কহিতে লাগিলেন, "তা ছাড়া, ও সব জঞ্জাল চুকিয়ে ফেলাই ভাল যোগেন্দ্র বাবু ! বয়স হয়েছে ; শরীরের অবস্থা খারাপ ; এখন কেবল ভগবানের নাম কর, পরকালের ব্যবস্থা কর।"

যোগেন্দ্র বাবু বিষণ্ণ বদনে চুপ করিয়া রহিলেন।

সদানন্দ বাবু কহিলেন, "তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না, যোগেন্দ্র ! আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।"

স্বামীজী কহিলেন, "হাঁ্যা হাঁ্যা সদানন্দ বাবু রয়েছেন, তোমার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তোমার কোন চিন্তা নেই যোগেন্দ্র বাবু ! বেশ, তা হলে আজ আমরা উঠি। হাঁ্যা, এই পূর্ণিমায় তা' হলে নাম-সঙ্কীর্ত্তনের ব্যবস্থা তোমার এখানেই হবে। সেদিন প্রক্রিয়াগুলো আবার ভাল করে দেখিয়ে শুনিয়ে দেব—"

সেদিন রাত্রি নয়টা। রমেন একতলায় নিজের ঘরে ; ঝি আসিয়া কহিল, "মাষ্টার বাবু ! দিদিমণি আপনাকে ডাকছেন—"

রমেন বিস্মিত হইয়া কহিল, "দিদিমণি ডাকছেন !"

ঝি কহিল, "হাঁ্যা গো—বাবু কেমন করছেন, শীগগির উপরে আসুন—"

রমেন তাড়াতাড়ি উপরে গিয়া দেখিল, যোগেন্দ্র বাবু বিছানায় পড়িয়া হাঁপাইতেছেন, মিনতি পাশে বসিয়া বুকে হাত বুলাইতেছে।

রমেন কাছে যাইতেই যোগেন্দ্র বাবু কহিলেন, "কে ? মাষ্টার ! আর বাঁচব না হে !" বলিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন।

রমেন কহিল, "কি কষ্ট হচ্ছে আপনার ?"

যোগেন্দ্র বাবু বুকে হাত দিয়া কহিলেন, "বুক ধড়ফড় করছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে,"—কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "বড় ভুল করেছি মিনুকে এখানে এনে ; আমি গেলে দেখবার কেউ থাকবে না ; সব লুটপাট করে নেবে—"

রমেন কহিল, "ভয় কি ! আপনার কিছু হবে না—"

যোগেন্দ্র বাবু ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "আমার এমন কখনও হয় নি ; সবাই ভয় দেখিয়ে বাড়িয়ে দিয়ে গেল।"

সহসা রমেনের হাত ধরিয়া কহিলেন, "মাষ্টার ! আমি যদি মরেই যাই, তুমি মিনুকে ফেলে চলে যেও না। ওকে ওর কাকার কাছে পৌঁছে দিও, বুঝলে ?"

রমেন উত্তর দিল, "কেন আপনি ভয় করছেন ? আমি ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসছি, কিছু ভয় নেই।"

মিনতিকে কহিল, "আমি এখনই আসছি"—বলিয়া দ্রুত পদে প্রস্থান করিল।

[৩]

ইহার কয়েক দিন পরে একদিন অপরাহ্ণে রমেন পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর নীরেন বাবুর বসিবার ঘরে হাজির হইল। একটা হিন্দুস্থানী লোক জানাইল যে, বাবু বাড়ীর ভিতরেই আছেন। রমেন একটা চেয়ার টানিয়া বসিল এবং লোকটা বাবুকে খবর দিবার জন্য বাড়ীর ভিতরে গেল।

কক্ষটী আয়তনে বেশী বড় নয়। সজ্জাভরণ স্বল্প, কিন্তু পরিচ্ছন্ন। মধ্যস্থলে একটী ছোট টেবিল, ধপধপে শাদা

টেবিল-ক্লথে ঢাকা; টেবিলক্লথটী গৃহলক্ষ্মীর সুনিপুণ হস্তের কারুকার্য্যে সুন্দর। টেবিলের চারিপাশে চারখানি চেয়ার, বানিশ এখনও ঝক্ ঝক্ করিতেছে। কক্ষের এক কোণে একটী ছোট টেবিলের উপর একটী গ্রামোফোন। চারিটী দেওয়ালে চারিটী বড় ফটো, সুন্দর ফ্রেমে বাঁধান। একটীতে গৃহকর্ত্তা নিজে, আর একটীতে গৃহকর্ত্তা ও কর্ত্রীর যুগলমূর্ত্তি, আর একটীতে ভারত-সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী, এবং বাকীটীতে কদম্ববৃক্ষতলে ত্রিভঙ্গঠামে দণ্ডায়মান মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণ। বসিবার ঘর ও অন্দরের মধ্যে একটী দরজা, তাহাতে সবুজ মোটা পর্দ্দা ঝুলিতেছে।

কিছুক্ষণ পরে পর্দ্দা সরাইয়া নীরেন বাবু প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বয়স প্রায় ত্রিশ; দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, সুগৌর বর্ণ, চোখে চশমা, মুখে বুদ্ধির দীপ্তি। রমেন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিনয়-সূচক হাস্য করিতে লাগিল।

"ব'স, ব'স", বলিয়া নীরেন বাবু একটা চেয়ারে বসিলেন। রমেনও বসিল।

নীরেন বাবু কহিলেন, "তারপর রমেন, কি খবর বল দেখি!"

রমেন কহিল, "বাড়ীতে অসুখ—"

—"কার হে? বৌমার না কি?—"

রমেন হাসিয়া কহিল, "না, দাদা মশায়ের—"

—"কি অসুখ?"

—"ব্লাড-প্রেসার, বুক ধড়ফড়, হাউ হাউ কান্না—"

—"বাঁচবেন, না?"

—"না, সেরে উঠেছেন। তবে খুব সেবা-আত্তি করেছি, রাত জেগে ওষুধ খাইয়েছি, বুড়োর মনটা অনেক নরম হয়েছে বলে মনে হয়—'

—"কি করে জানলে?"

—"একদিন রাত্রে আমি একা বুড়োর পাশে বসে পাখা করছি, এমন সময়ে বুড়ো জেগে উঠে বলে, 'কে, মাষ্টার?' আমি বললুম 'হুঁ'। বুড়ো বলে, 'রাত কত?' আমি বললুম, 'তিনটে'। বুড়ো আশ্চর্য্য হ'ল, বললে,"তুমি একা জেগে আছ মাষ্টার!' কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর আমার হাত ধরে বলল, "তুমিই আমাকে বাঁচিয়ে তুললে গজানন!"

—"তুমি বুঝি সঙ্গে সঙ্গে আর্জ্জি পেশ করে দিলে?"

—"আজ্ঞে না। আমি শুধু বুঝলুম, যে মাটী বেশ নরম হয়েছে, এর পর কিঞ্চিৎ কর্ষণ করে বীজ বপন করলেই ফসল সুনিশ্চিত।"

এমন সময়ে পর্দ্দা ঠেলিয়া একটী বাইশ, তেইশ বৎসর বয়সের সুন্দরী যুবতী কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার দুই হাতে দুই প্লেট খাবার। তাঁহাকে দেখিবামাত্র রমেন উঠিয়া দাঁড়াইয়া হর্ষোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল, "এই যে বৌদিদি!"

মৃদু হাসিয়া যুবতী কহিলেন, "থাক থাক, আর ভালবাসা দেখিয়ে কাজ নেই। মনে যে পড়েছে এই ভাগ্যি।" বলিয়া একটী প্লেট রমেনের সামনে এবং আর একটী নীরেন বাবুর সামনে রাখিলেন। ঝি আসিয়া দুইটী কাচের গ্লাসে জল দিয়া গেল।

রমেন কহিল, "বৌদিদি—আপনি আবার এ সময়ে—"

বৌদিদি কহিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আবার এ সময়ে, বসে পড়, ভদ্রতা করতে হবে না। আমি আসছি"— বলিয়া আবার গৃহের মধ্যে চলিয়া গেলেন। রমেন বসিয়া পড়িল। খাইতে খাইতে রমেন কহিল, "যা' করবার এই পূর্ণিমাতেই করতে হবে দাদা—"

নীরেন বাবু কহিলেন, "কেন বল দেখি?"

—"এই পূর্ণিমাতে নাম-সঙ্কীর্ত্তন হবে, স্বামীজী এবং তাঁর শিষ্যবর্গ জড় হবেন, রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত হৈ হৈ চলবে—"

—"তাই না কি! তা' হলে তো বেশ সুবিধে হয়েছে। আমার প্ল্যান সব ঠিক হয়ে গেছে। তুমি কেবল দরজা-গুলো খুলে রাখবার ব্যবস্থা ক'রো—"

—"বাইরের দরজা আমি খুলে রাখব, শোবার ঘরের দরজা মিনু খুলে দেবে—"

—"কি করে?"

—"মিনুর শোবার ঘর হতে একটা দরজা দিয়ে বুড়োর শোবার ঘরে যাওয়া যায়"—

নীরেন বাবু সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "All right! তা হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি ঠিক সময়ে হাজির হ'য়ো ভায়া, বেশীক্ষণ prolong করা হবে না, দশ মিনিটে শেষ করে দিতে হবে—"

বৌদিদির পুনঃ প্রবেশ, দু' হাতে দু' বাটি চা; কাপ ও প্লেট টেবিলে নামাইয়া একটা চেয়ারে বসিয়া কহিলেন, "কি পরামর্শ হচ্ছে শুনি?"

নীরেন বাবু কহিলেন, "কিছু না, সেই প্ল্যানটার কথা বলছিলুন--"

বৌদিদি হাসিয়া কহিলেন, "মিনতির উপর আমার হিংসে হয় ঠাকুরপো!"

নীরেন ও রমেন দুই জনে এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "কেন, কেন?"

বৌদিদি বলিলেন, "আমাদের বাপ-মাকে কত কষ্ট করে, হাজার হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে আমাদের বরদের আনতে হয়েছিল, আর মিনুর জন্যে ওর বরই কত সাধ্যি-সাধনা করছে—"

নীরেন বাবু হাসিয়া কহিলেন, "মিনুর মত দাদামশাই থাকলে তোমরাও সাধ্যি-সাধনা পেতে গো, বরের ভিড় জমে যেত; ইচ্ছে করলে স্বয়ম্বরাও হতে পারতে—"

বৌদিদি জবাব দিলেন, "তাই না কি! মিনুর উপরে ঠাকুরপোর তা' হলে বিন্দুমাত্র টান নেই, যত কিছু টান তার দাদামশাই-এর টাকার থলের দিকে—"

রমেন কহিল, "দোহাই বৌদিদি, ভুল বুঝবেন না। (বক্তৃতার সুরে) মিনুকে যখন চেয়েছিলুম তখন রঙ্গমঞ্চে দাদামশাই-এর আবির্ভাব ঘটেনি, আজও যদি দাদামশাই তাঁর সমস্ত ব্যাঙ্ক এ্যাকাউণ্ট সমেত অন্তর্হিত হন, তা' হলেও মিনুকে পাবার আকাঙ্ক্ষা আমার বিন্দুমাত্র কমবে না—"

বৌদিদি কহিলেন, "আমি বুঝেছি ভাই, তোমার দাদাকে বোঝাও—"

নীরেনবাবু কহিলেন, "পুলিশে চাকরী করলেও রমেনের sentiment আমিও যে বুঝিনি তা নয়। রমেন হচ্ছেন আমাদের বাংলা দেশের রোমিও, প্রণয়িণীকে লাভ করবার জন্যে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করেছেন। তবে ভাগ্য ভাল, জুলিয়েতকে ইহজীবনেই লাভ করবেন। এখন ওঁকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন আসছে পূর্ণিমাতেই ওঁর মনস্কামনা সিদ্ধ হয়।"

বৌদিদি কহিলেন, "আশীর্ব্বাদ তো আমি অনেক দিন আগেই করেছি, আজও করছি, মিনতি-লাভের পথে যেন বিন্দু মাত্র বিঘ্ন না ঘটে।"

নীরেন—"Amen!"

পূর্ণিমা তিথি, রাত্রি দুইটা; পূর্ণিমার চাঁদ মধ্য-গগন পার হইয়া গিয়াছে; আকাশ যেন শ্বেতদ্বীপবাসিনী রূপসীর হাস্যোজ্জ্বল নীলাভ নয়ন—তার দিকে চাহিয়া চাহিয়া সারা ভুবন যেন মোহাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। সব নিস্তব্ধ, শুধু বাগানের গাছগুলা হইতে মাঝে মাঝে দু' একটা নিশাচর পক্ষী ডাকিয়া উঠিতেছে। এমন সময়ে চারজন যুবক যোগেন্দ্র বাবুর বাড়ীর সামনে হাজির হইল। তাহাদের পরিধানে খাকি-রং-এর হাফ-প্যাণ্ট ও সার্ট, মাথায় মুখের প্রায় আধখানা ঢাকিয়া পাগড়ী। পায়ে রবারের জুতা। বারান্দায় উঠিয়া দরজায় টোকা মারিতেই রমেন দরজা খুলিয়া দিল। তাহারা নির্বিবাদে দোতলার বারান্দায় পৌঁছিল। বারান্দায় লম্বালম্বি একসারি ঘর।

রমেন নিম্নকণ্ঠে কহিল, "Third from the right."

একজন কহিল, "কেন, second?"

রমেন (ব্যস্ত ভাবে) কহিল—"না না—ওটা মিনতির—"

—"তা হ'ক—"

হাসির শব্দ—সঙ্গে সঙ্গে তর্জনধ্বনি—চুপ···

যোগেন্দ্রবাবুর শয়ন-কক্ষের দরজা ঠেলিতেই খুলিয়া গেল। সকলে ভিতরে প্রবেশ করিল।

কক্ষটা আয়তনে বৃহৎ। ভিতর ও বাহিরের বারান্দার দিকে বড় বড় দরজা ও জানালা। অন্য দুই দিকের দেওয়ালে একটা করিয়া দরজা—তাহা দিয়া পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে যাওয়া যায়। কক্ষের মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড পালঙ্কে নেটের মশারির মধ্যে যোগেন্দ্রবাবু নিদ্রিত। মাথার দিকে একটা টিপয়ে একটা জলের কুঁজা, কাঁচের গ্লাস দিয়া মুখটা ঢাকা। মিনতির ঘরে যাইবার দরজাটার এক পাশে একটা ছোট টেবিলের উপর একটা টেবিল-ল্যাম্প—তাহার আলো একটু কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে, আর একপাশে একটা লোহার সিন্দুক। বিপরীত দিকের দরজার এক পাশে একটা বড় আলমারী, এবং আর এক পাশে একটা কম্বলে ভৃত্য রঘুনন্দন নাক ডাকাইয়া নিদ্রা যাইতেছে।

লোকগুলি ভিতরে ঢুকিয়া আলোটা উস্কাইয়া দিল। একজন রঘুনন্দনের পাশে বসিয়া তাহার নাকটা টিপিয়া

উঠল। তার পর এক সঙ্গে চাকুরী-বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে এখানে এসেছি।"

—"তা ভাল করেছেন। কিন্তু কিছু মনে করবেন না মশায়, বন্ধুটী আপনার সোজা লোক নয়।"

—"ওর বিষয়বুদ্ধি একটু বেশী, কম বয়স থেকেই, তবে সাংঘাতিক কিছু ওর সম্বন্ধে শুনিনি—"

—"আপনারা ওসব শুনবেন কি করে? শুনে থাকি আমরা—পুলিশের লোকরা। কার কোথায় গলদ, সব আমাদের নখাগ্রে; কখন যে কাকে ছোবলাতে হবে, তা ত বলা যায় না? ওর সম্বন্ধে আমরা কিছু খোঁজ-খবর রাখি।"

—"ওর উপর আপনাদের অনুগ্রহের হেতু?"

—"আমাদের অনুগ্রহ সকলের পরেই, কারও উপর পক্ষপাত করিনে; তা থাক্ আপনার বন্ধুটী হঠাৎ চাকুরী ছাড়লেন কেন জানেন? বন্ধু-বিচ্ছেদের ভয়ে, না, জেলে যাবার ভয়ে।"

যোগেন্দ্রবাবু বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন, "তার মানে?"

—"তার মানে খুব সোজা। উনি জমিদারের কতকগুলো টাকা 'পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ' ভেবে আত্মসাৎ করেছিলেন। মা-খরচের কায়দাতে সেটা চেপে রেখেছিলেন। কিন্তু বেশীদিন চেপে রাখা সুবিধে হ'ল না; কাজেই শরীর হতে লাগল খারাপ, মাথা আরম্ভ করল ঘুরতে; দেহ আর গুরু-ভার বহন করতে পাচ্ছে না বলে, পুরাণো মনিবের কাছ হতে নিলেন সস্নেহ ও সসম্মান বিদায়।"

—"তার পর?"

—"তার পর হিসেবের গোলমাল ধরা পড়ল, পরে যিনি [illegible]লেন তার চোখে। জমিদার লোক ভাল, পুরাণো চাকর [illegible]লে, শুধু পত্রাঘাত করেই রেহাই দিলেন—"

যোগেন্দ্রবাবু বিস্মিতভাবে কহিলেন, "কই, কিছু শুনিনি [illegible]?"

—"সদানন্দবাবু আত্মপ্রশংসা পছন্দ করেন না কি না, [illegible] চেপে গেছেন।"

দারোগা বাবু এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। তিনি [illegible] হাসিয়া কহিলেন, "আপনি সদানন্দ বাবুর বিষয়বুদ্ধির [illegible]ফ করছিলেন না? সত্যি ওঁর বিষয়বুদ্ধির দু একটা নমুনা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। মনে হয় না উনি মানুষ, কোন শাপভ্রষ্ট—"

নীরেন বাবু কহিলেন, "যমদূত। Thanks যতীন, বেশ মনে পড়িয়ে দিয়েছ। শুনুন যোগেন্দ্র বাবু, আপনার বন্ধুর আর এক কীর্ত্তি-কাহিনী। ওঁর একটি মেয়ে বিধবা, তা বোধ করি জানেন?"

যোগেন্দ্রবাবু দুঃখিতভাবে কহিলেন, "জানি। আহা! ভারী ভাল মেয়ে! কি দোষে যে এই অল্পবয়সে কপাল ভাঙ্গল, ভগবান জানেন!"

—"তা' নিশ্চয়ই জানেন। কিন্তু সদানন্দ বাবুর এতে লাভ ছাড়া ক্ষতি হয়নি।"

—"অর্থাৎ?"

—"অর্থাৎ মেয়ে বিধবা হওয়ায় সদানন্দ বাবু বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন। এক ভদ্রলোকের একমাত্র ছেলের সঙ্গে দিয়েছিলেন মেয়ের বিয়ে। ভদ্রলোক ছেলের বিয়ে দিয়েই বৌমার প'য়ে পরলোকের টিকিট কাটলেন। থাকলেন দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূ। পুত্রও বৎসর খানেকের মধ্যে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন। তখন রঙ্গমঞ্চে দেখা দিলেন, সদানন্দ বাবু। প্রথমেই মেয়েকে দিয়ে সংসারের চাবিগুলি সরিয়ে নিজের কোমরে বাঁধলেন, এবং বেয়ান ঠাকরুণকে দিলেন নোটিশ, নিজের পথ দেখবার জন্যে। তারপর বাড়ীঘর, জমি যায়গা বিক্রী করে যা পেলেন, তা রাখলেন পকেটে, আর সোনা, রূপা, টাকা, গহনা, শাল, আলোয়ান সব বাঁধলেন একটা মোটে। তার পর সেই মোট পিঠে বেঁধে একহাতে মেয়ের হাত ধরে, আর একহাতে নিজের কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বাড়ী ঢুকলেন। সবাই করতে লাগল, হায়! হায়! সদানন্দ বাবু বলতে লাগলেন, হতোস্মি! সেই কলরবে অনাথা, নিরাশ্রয়া বিধবার করুণ আর্ত্তনাদ গেল তলিয়ে।

—"ওঃ ভারী সাংঘাতিক ত—"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু সদানন্দ বাবুর মিশন এখনও শেষ হয়নি। আরও সাংঘাতিক কিছু করবার চেষ্টায় আছেন।

—"তাই না কি! কি ব্যাপার বলুন দেখি?"

—"বলছি। ওর একটী ছেলে বিলেত গেছে জানেন তো?"

—"নিশ্চয় জানি। বিলেতে আই-সি-এস হতে গেছে।"

—"আজ্ঞে হাঁা, ছেলেটা একটি প্রকাণ্ড ass অর্থাৎ গাধা হতে গেছে—যেমন বাপ তেমনি ছেলে তো। খুব মজা লুটছেন সেখানে—"

যোগেন্দ্রবাবুর মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। ভীত কণ্ঠে কহিলেন, "তাই না কি! বড় সাংঘাতিক কথা তো মশায়—"

নীরেন বাবু বলিতে লাগিলেন, "ছেলেটি সেখানে একটী বিলেতী মেয়ের সঙ্গে পড়েছে প্রেমে; এদিকে বাপ করেছে সম্বন্ধ এক বড়লোকের একমাত্র মেয়ের সঙ্গে—অগাধ সম্পত্তি অথচ ওয়ারিশান আর কেউ নেই। এমন দাঁও অন্ততঃ সদানন্দ বাবু ছাড়বার পাত্র নন্।"

—"মহামুস্কিল তো—"

—"মুস্কিল আর আপনার কি মশায়, মুস্কিল মেয়ের বাপের। সদানন্দ বাবু এখনও ধাপ্পা দিয়ে রেখেছে, ছেলেকে লিখেছে আসতে। তিনি আসবেন; এসে বিবাহ করবেন। কথা আছে, বিয়ের সময়ে সমস্ত সম্পত্তি মেয়ের বাপ উইল করে দিয়ে কোন এক স্বামীজীর হেপাজতে আশ্রমবাস করবে। তারপর বিয়ে করে, টাকাকড়ি, গয়নাগাঁটি, মায় নববিবাহিতা পত্নীকে পর্য্যন্ত বাপের হাতে দিয়ে তার বদলে নগদ টাকা নিয়ে ছেলে পাড়ি দিবেন বিলেতে, এখানে মেয়ে খাবে বিষ আর মেয়ের বাপ দেবে গলায় দড়ি—"

যোগেন্দ্রবাবু আর্ত্ত কণ্ঠে কহিলেন, "চুপ করুন, চুপ করুন, অসহ্য হচ্ছে—ওঃ" বলিয়া ইজিচেয়ারে হেলিয়া পড়িয়া হাঁফা-ইতে লাগিলেন।

নীরেন বাবু ভীতকণ্ঠে কহিলেন, "ও কি মশায়, অমন করছেন কেন?"

যোগেন্দ্রবাবু হাতের ইঙ্গিতে নীরেন বাবুকে থামিতে বলিলেন এবং দুই চোখ বন্ধ করিয়া নির্জ্জীবের মত পড়িয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া বসিলে, নীরেন বাবু কহিলেন, "সামলেছেন?"

যোগেন্দ্রবাবু ঘাড় নাড়িলেন।

নীরেন বাবু কহিলেন, "কি ব্যাপার বলুন দেখি? হঠাৎ এরকম করে উঠলেন কেন? যা ভয় পাইয়েছিলেন আপনি—"

—"কোন ভয় পেলে আমার ওরকম হয়," বুকে হাত দিয়া কহিলেন, "বুকের দোষ আছে।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া যোগেন্দ্র বাবু কহিলেন "আপনি আমাকে খুব বাঁচিয়েছেন।"

বিস্মিত কণ্ঠে নীরেন বাবু কহিলেন, "তার মানে?"

—"সদানন্দ বাবুর ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ে নয়, আমার একমাত্র নাতনীর সম্বন্ধ ঠিক হয়েছিল; আমাদের দুজনকে শোচনীয় পরিণাম থেকে আপনি রক্ষা করেছেন—"

—"আপনিই সদানন্দ বাবুর খপ্পরে পড়েছেন? তবে ত বলে ভাল করিনি মশায়, শাপ-মন্যি খেতে হবে।"

—"তা' হ'ক, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী আশীর্ব্বাদ পাবেন আমার কাছ থেকে।" (তার পর নীরেন বাবুর দুইহাত ধরিয়া) "ভগবান আপনাকে পাঠিয়েছেন আমার কাছে, কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব—"

—"ধন্যবাদ দেবার প্রয়োজন নেই। আমার দ্বারা যদি আপনার কোন উপকার হয়ে থাকে, তাতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই। যিনি উপকার করিয়েছেন, তাঁকে ধন্যবাদ দিন।"—বলিয়া নীরেন বাবু স্বীয় বদনমণ্ডলে আধ্যাত্মিক ভাব ফুটাইবার প্রয়াস করিতে লাগিলেন। তারপর কহিলেন, "তা হলে আমরা আজ উঠি; আপনার কোন চিন্তা নেই, এখানে চৌকীদারের ব্যবস্থা করে দেব, নির্ভয়ে থাকুন।" বলিয়া নমস্কার করিয়া উঠিলেন।

যোগেন্দ্র বাবু বিদায় দিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে কতকটা পথ আগাইয়া আসিলেন।

পরদিন সকালে স্বামীজীসহ সদানন্দ বাবু আসিয়া দেখা দিলেন। সদানন্দ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুলিশ এসে-ছিল?"

যোগেন্দ্র বাবু ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, "হাঁা।"

"কি হ'ল? মাষ্টারকে ধরে নিয়ে গেল?"

—"না।"

—"তবে?"

—"বরং প্রশংসা করলে।"

—"প্রশংসা! হেতু?"

—"হেতু, নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে পরের প্রাণ রক্ষা—"

সদানন্দ স্বামীজীর সহিত দৃষ্টি বিনিময় করিলেন। তারপর

কহিলেন, "স্বামীজী বলছেন,—চোর-ডাকাতের যখন নজর পড়েছে, তখন মাঝে মাঝে তাদের পায়ের ধুলো পড়বেই; তোমার গজানন তো চিরদিন অটল হয়ে থাকবেন না? কাজেই স্বামীজীর মতে আশ্রমটা এ বাড়ীতে উঠিয়ে আনাই ভাল। তা' হ'লে ওঁরা সকলেই তোমাদের খবরদারী করতে পারবেন; কি বল?"

যোগেন্দ্র বাবু বিরক্ত ভাবে কহিলেন,—"তা' কি করে হবে? এক পাল অপরিচিত পুরুষের মধ্যে মিনতি থাকতে পারবে না।"

—"এক পাল পুরুষ মানে, স্বামীজী আর ওঁর শিষ্যরা ত? ওঁদের মধ্যে যে-কোন মেয়েমানুষের নির্ভয়ে থাকতে পারা উচিত।"

যোগেন্দ্র বাবু রাগত কণ্ঠে জবাব দিলেন, "উচিত হ'ক, মিনু পারবে না, ব্যস্—"

—"মিনতি আর তুমি ত আমার ওখানে থাকতে পার।"

স্বামীজী সমর্থন-সূচক ঘাড় নাড়িলেন।

যোগেন্দ্র বাবু কহিলেন, "আমরা তোমার ওখানে থাকতে যাব কিসের জন্যে?"

স্বামীজী কহিলেন, "যিনি তোমার পরম বন্ধু এবং দু'দিন পরে যিনি পরম আত্মীয়-পদে উন্নীত হবেন, তাঁর বাড়ীতে থাকা লজ্জার বিষয় নয় যোগেন্দ্র বাবু!"

যোগেন্দ্র বাবু নিরুত্তর রহিলেন।

সদানন্দ বাবু কহিলেন, "বেশ, তুমি না থাকতে চাও, তুমি না হয় স্বামীজীর কাছেই থাক। মিনতির ত' আমার ওখানে থাকায় লজ্জা নেই। বিশেষ যখন দু'দিন পরে থাকতে হবেই—"

যোগেন্দ্র বাবু বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন, "তার মানে?"

—"মানে, মিনু-মা ত' দিন কয়েক পরেই আমার ঘরের লক্ষ্মী হবেন।"

যোগেন্দ্র বাবু সন্দিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "দিন কয়েক পরেই! তোমার ছেলে কি শীগ্‌গির ফিরছে না কি?"

—"তাই ত লিখেছে। শরীরটা বেশ সারে নি, তাই এবারও পরীক্ষা দিতে পারবে না। এদিকে আমার স্ত্রীর শরীর হচ্ছে দিন দিন খারাপ, ছেলের বে দেবার জন্য পাগল হয়ে গেছে। বলে, 'দুটিকে এক সঙ্গে না দেখলে আমি মরেও সুখ পাব না।' তাই লিখে দিয়েছিলুম, যদি এবার পরীক্ষা না দেওয়াই হয়, তবে এসে বিয়েটা সেরেই যাক। তারপর না হয় ফিরে গিয়ে পাশ করে আসবে।"

স্বামীজী কহিলেন, "ঠিক কাজই করেছেন সদানন্দ বাবু। যোগেন্দ্র বাবুরও যে রকম শরীরের অবস্থা, কোন দিন কি হয় বলা যায় না। বিয়েটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাওয়াই ভাল।"

যোগেন্দ্র বাবু প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "আই-সি-এস না হ'লে আমি মিনুর বিয়ে দেব না, কিছুতেই না—"

সদানন্দ বাবু কহিলেন, "যোগেনের ছেলেমানুষী আর গেল না", বলিয়া হাসিয়া আবার কহিলেন, "আরে, আই-সি-এস কি পালিয়ে যাচ্ছে না কি? ছেলেও রইল, আই-সি-এস-ও রইল, যেদিন ইচ্ছে গিয়ে নামের পিছনে গেঁথে নিয়ে এলেই হবে।"

যোগেন্দ্র বাবু কহিলেন, "তা হ'ক, আই-সি-এস না হ'লে মিনুর বিয়ে দেব না, আমার এক কথা—"

সদানন্দ বাবু এবার গম্ভীর হইলেন। বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, "তোমার মতলব কি বল দেখি? ছেলে এত দিন জাহাজে চড়েছে, দু'এক সপ্তাহের মধ্যে এসে পড়বে—এখন তুমি বলছ, বিয়ে দেব না; এ ত ভাল কথা নয়!"

স্বামীজীও ঘাড় নাড়িলেন।

যোগেন্দ্র বাবু কহিলেন, "তা' আমি কি করব? আমার সঙ্গে কি পরামর্শ করে ছেলেকে আসতে লিখেছিলে?"

—"তা' অবশ্য করিনি—তবে তোমার যে অমত হবে তা' ত কখনও ভাবি নি?"

—"সে কি আমার দোষ?"

সদানন্দ বাবু কিছুক্ষণ নীরবে তাকাইয়া থাকিয়া কহিলেন, "আমার ছেলের সঙ্গে এখন বিয়ে দেবার আপত্তি কি? আই-সি-এস ত' দু'দিন পরে হবেই—"

যোগেন্দ্র বাবু নিরুত্তর।

সদানন্দ বাবু কহিলেন, "এখন না বিয়ে দিলে আমাকে অন্যত্র পাত্রীর সন্ধান করতে হবে।"

যোগেন্দ্র বাবু তথাপি নিরুত্তর।

স্বামীজী কহিলেন, "যোগেন্দ্র বাবু বোধ হয় ভাবছেন যে, সদানন্দ বাবু ওঁর সম্পত্তির লোভে ওঁর দৌহিত্রীর সঙ্গে নিজের

পুত্রের বিবাহ দিতে চেষ্টা করছেন ; পৃথিবীতে যথার্থ শুভানুধ্যায়ীকে মানুষ না হারালে চিনতে পারে না—"

যোগেন্দ্র বাবু দুই হাত জোড় করিয়া কহিলেন, "প্রভো ! আমি কিছুই ভাবি নি। আপনারাই আমার হ'য়ে বড় বেশী ভাবছেন।"

সদানন্দ বাবু বলিলেন, "তুমি কি ভাব, এতগুলো টাকা খরচ করে, সাত সমুদ্দুর তের নদী পেরিয়ে ছেলে আমার আসবে, আর শুধু শুধু ফিরে যাবে ? তবু তোমার অন্যায় জেদ্ বজায় রাখতে হবে ?" স্বামীজীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "যোগেন্দ্র যদি আমাদের এমনি ভাবে অপমান করে, তা' হ'লে, আপনি যাই বলুন না স্বামীজী, আমি আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে বাধ্য হব, অন্যত্র ছেলের বিয়ে দেব।"

যোগেন্দ্র বাবু কহিলেন, "স্বামীজী আর কি বলবেন ? তোমার ছেলের তুমি যেখানে ইচ্ছে বিয়ে দিতে পার, আমার আপত্তি নেই।"

সকলে নীরব।

সদানন্দ বাবু কহিলেন, "তুমি তা' হ'লে কোথায় মিনতির বিয়ে দেবে ? গঙ্গার সঙ্গে না কি ?"

যোগেন্দ্র বাবু নিরুত্তর।

সদানন্দ বাবু বলিলেন, "তোমার দুর্ম্মতি হয়েছে যোগেন্দ্র।"

স্বামীজী বলিলেন, "বার্দ্ধক্যজনিত মতিভ্রম—"

যোগেন্দ্র বাবু কড়া গলায় জবাব দিলেন, "তা' হ'ক, তোমাদের সে জন্য ভাবতে হবে না।"

সদানন্দ বাবু কহিলেন, "ভাবতে হবে না ? রীতিমত ভাবতে হবে।"

স্বামীজী বলিলেন, "সদানন্দ বাবু যদি তোমার জন্য না ভাববেন, তবে আর কে ভাববে যোগেন্দ্র বাবু ?"

যোগেন্দ্র বাবু উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "আপনারা দু'জন চুপ করুন, আমার আর ভাল লাগছে না।" বলিয়া ইজি-চেয়ারে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলেন।

সদানন্দ বাবু কহিলেন, "কি হ'ল হে ? মাথা ঘুরছে ? বুক ধড়ফড় করছে ? অ্যাঁ ?"

যোগেন্দ্র বাবু নীরব নিস্পন্দ ;

সদানন্দ বাবু ভীত কণ্ঠে কহিলেন, "এ কি স্বামীজী, হার্ট ফেল করল না কি ?"

স্বামীজী কহিলেন, "তাই ত ! এত শীঘ্র হবে তা' কে জানত ?"

সদানন্দ বাবু যোগেন্দ্র বাবুকে নাড়া দিয়া ডাকিলেন, "যোগেন ! যোগেন !"

যোগেন্দ্র বাবু নীরব।

সদানন্দ বাবু কহিলেন, "তাই ত, স্বামীজী, উইলটার কোন ব্যবস্থা যে হ'ল না !"

স্বামীজী কহিলেন, "তাই ত, সদানন্দ বাবু, আশ্রমটার—"

হঠাৎ যোগেন্দ্র বাবু উঠিয়া বসিলেন।

সদানন্দ বাবু কহিলেন, "এই যে যোগেন ! বেঁচে আছ তা' হ'লে—আমরা ভাবছিলাম, বুঝি—"

যোগেন্দ্র বাবু মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, "পটল তুলেছি। কি শুভাকাঙ্ক্ষী তোমরা—"

স্বামীজী কহিলেন, "ছিঃ যোগেন্দ্র বাবু, ও কথা বলবেন না। আমরা সত্যই বড় ভয় পেয়েছিলাম। আপনার শরীরের যে রকম অবস্থা—"

সদানন্দ—"তাতে পট্ করে কিছু হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।"

স্বামীজী—"অতএব আর দ্বিধা না করে—"

সদানন্দ—"বিয়ে দিয়ে ফেল, উইলটাও—"

স্বামীজী—"তার সঙ্গে আশ্রমটারও—"

যোগেন্দ্র বাবু কহিলেন, "দেখ সদানন্দ, দেখুন স্বামীজী, আমি যা' করবার স্থির করে ফেলেছি—"

উভয়ে এক সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "কি—কি—"

যোগেন্দ্র—"মিনুর বিয়ে সদানন্দের ছেলের সঙ্গে দেব না, আর আশ্রমের জন্যে বাড়ীও দেব না—তোমরা সরে পড়—"

সদানন্দ বলিলেন, "এখন তোমার মতিস্থির নেই, কাল আবার আসব"—বলিয়া দাঁড়াইলেন; স্বামীজীও উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

যোগেন্দ্রবাবু কোন কথা বলিলেন না।

•

সেই দিন অপরাহ্নে নীরেনবাবু দেখা দিলেন। আজ আর পরিধানে খাকী-রং-এর পুলিশের পোষাক নাই,

বেকার সমস্যা এবং তৎসম্বন্ধে স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু এবং আনন্দবাজার পত্রিকা

অধুনা জগতের সর্ব্বত্রই যে বেকার সমস্যা জটিল হইতে জটিলতর হইয়া পড়িতেছে, তাহা বিভিন্ন দেশের সরকারী রিপোর্টগুলি পড়িলে বুঝিতে পারা যায়। সরকারী রিপোর্ট অনুসারে ইউনাইটেড ষ্টেট্সে বেকারের সংখ্যা এক কোটী নব্বই লক্ষ এবং ইংলণ্ডের বিশ লক্ষ। ভারতের বেকারের সংখ্যা কত তাহার কোন সরকারী রিপোর্ট নাই। তবে অনুমানে কেহ কেহ বলেন যে, ভারতে বেকারের সংখ্যা চারি কোটী। মোট লোকসংখ্যার সহিত বেকারের সংখ্যার তুলনা করিলে বলিতে হয় যে, ইউনাইটেড ষ্টেট্সে মোট লোকসংখ্যার শতকরা ১৫½ জন এবং ইংলণ্ডে শতকরা ৪½ জন বেকার। যে-সংখ্যক বেকারদিগকে সরকার হইতে নিয়মিত সাহায্য (dole) দেওয়া হয়, সরকারী রিপোর্টে কেবল তাহাদেরই কথা থাকে। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স এবং ইংলণ্ডেও এমন বহু বেকার আছে, যাহারা সরকার হইতে কোন সহায়তা পায় না এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের সহায়তায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে।

কাযেই অনুমান করিতে হইবে যে, সরকারী রিপোর্টে যাহা বেকারের সংখ্যা বলিয়া প্রচারিত হইতেছে, প্রকৃত বেকারের সংখ্যা তদপেক্ষা অনেক বেশী। আমাদের মতে ইংলণ্ড এবং আমেরিকাতেও কয়েকজন মুষ্টিমেয় সরকারী ও বেসরকারী কর্ম্মচারী বাদে আর সকলেই, হয় বেকার, নতুবা নিজ নিজ ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া শঙ্কাকুল, রুগ্ন এবং অল্লাধিক ঋণগ্রস্ত।

দুইটী দেশের কোন দেশেই সরকারী ও বেসরকারী মোট চাকুরিয়ার সংখ্যা মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৮ জনের বেশী নহে। কাযেই বলিতে হইবে যে, ইংলণ্ড এবং ইউনাইটেড ষ্টেট্সের শতকরা বিরানব্বই জন অন্নসমস্যা এবং জীবনসমস্যা লইয়া প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন।

অনুসন্ধান করিলে আরও জানা যাইবে যে, এই বেকার-সমস্যা, অন্নসমস্যা এবং জীবনসমস্যা যে শুধু ইংলণ্ড এবং ইউনাইটেড ষ্টেট্সকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে, তাহা নহে, জগতে এখন আর এমন কোন দেশ নাই, যেখানে ঐ তিনটী সমস্যা তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে না।

ভারতবর্ষের বেকারের সংখ্যা ৪ কোটী হইলে মোট লোক-সংখ্যার শতকরা ১১ জন বেকার দাঁড়ায় এবং এই সংখ্যা ইউ-নাইটেড ষ্টেট্সের তুলনায় কম। কিন্তু বেকারের সংখ্যা ভারতবর্ষে যাহাই হউক না কেন, নিজ নিজ পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদিগের অবস্থা অনুসন্ধান করিলে এখানেও যে শতকরা বিরানব্বই জন অন্নসমস্যা, ঋণসমস্যা এবং জীবনসমস্যার জন্য শঙ্কাকুল, তদ্বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায়।

এমন সর্ব্বব্যাপী সমস্যার নিরাকরণের জন্য কোন্ দেশে কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে, তাহার অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। গত দশ বৎসরে স্বাধীন দেশগুলির গভর্ণমেণ্ট কারেন্সি-নোটের পরিমাণ কত হইয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক দেশেই প্রতি বৎসর মোট কারেন্সি-নোটের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়িয়া চলি-তেছে। আরও দেখা যাইবে যে, সর্ব্বত্রই পরস্পরের মধ্যে টাকা আদান-প্রদানের হারে নিত্য নূতন চাতুরীর খেলার (dodge with regard to exchange rates) উদ্ভব হইতেছে।

ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, জগতের সর্ব্বত্রই জমীর প্রতি বিঘার উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ অর্থাৎ উর্ব্বরাশক্তি প্রতি বৎসর হ্রাস পাইতেছে।

সুতরাং বলিতে হইবে যে, বর্ত্তমান জগতের সুচতুর অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিকগণের মতে কারেন্সি-নোট ছাপাইবার কারখানাগুলি ব্যস্ত রাখিলে এবং অর্থ-ব্যবহারে নূতন নূতন চাতুরী আবিষ্কার করিতে পারিলেই এই জনসাধারণের বেকারসমস্যা, অন্নসমস্যা এবং জীবনসমস্যার পূরণ হইবে এবং তাঁহাদের মতে জমীর উর্ব্বরাশক্তির বৃদ্ধির কোন বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন নাই। ফলে যাহা হইতেছে, তাহা সকল দেশেই মানুষ অনুভব করিতেছে।

ভারতবর্ষের ষ্টেট্সম্যান এবং পি. আর. এস., পি. এইচ. ডি., ডি.এস. সি., প্রভৃতি বিজ্ঞ পণ্ডিতগণের মস্তিষ্কগুলিও যে এই সমস্যাগুলির জন্য বিশেষ আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তবে এদেশের বিজ্ঞগণ যে সমস্ত কথা কহিয়া থাকেন, সেগুলি প্রায়শঃ পাশ্চাত্ত্য

পণ্ডিতগণের কেতাবে অথবা বক্তৃতাতেই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। অপরের কথা আওড়াইয়া যাওয়া ময়না ও টীয়া-পাখীর ধর্ম এবং ঐ পক্ষীগুলির কথা কখনও পরিষ্কার হয় না। তাহাদের কথা যতই পরিষ্কার হউক, মানুষের কথার মত পরিষ্কার কখনও হয় না। তাঁহাদের ইংরাজী কথাগুলি আমরা ইংরাজীতেই পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিব, কারণ ঐ ইংরাজী কথাগুলির প্রয়োগযোগ্য বাঙ্গালা অর্থ করা আমাদের দ্বারা সম্ভব হইল না। **Maldistribution of wealth, maladjustment of labour wages, fall of purchasing power, cruelty of the Capitalists, maldistribution of lands, heavy charge of rent, selfish manipulation of the credit currency, demonetization of silver** প্রভৃতি কত কথাই যে টীয়া-পাখীর দল আওড়াইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। জনসাধারণ কিন্তু যে তিমিরে ঠিক সেই তিমিরেই আছে এবং ক্রমশঃই তাহাদের নাভিশ্বাসের লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

আমাদের বিজ্ঞবরগণের শেষ সম্বল গভর্ণমেণ্টকে গালাগালি দেওয়া। যদিও তাঁহাদের সকল কথাই টীয়াপাখীর বুলির মত অস্পষ্ট, তথাপি তাঁহারা মনে করেন যে, বেশ এক একটা বড় স্কিম তৈয়ারী করিয়াছেন, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট বিদেশীয় বলিয়াই কিছু করা সম্ভব হয় না। অথচ নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, আমাদের দেশের প্রত্যেক বিজ্ঞের বড় বড় কথাই চর্ব্বিত-চর্ব্বণ মাত্র এবং তাহা প্রায়শঃ বিভিন্ন দেশে পরীক্ষিত হইয়া সুফলপ্রদ হয় নাই। ইঁহাদের সহিত কথায় আঁটিয়া উঠা শক্ত। কাজেই গভর্ণমেণ্টের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে হার মানিতে হয়।

ইঁহাদের কেহ বলিতেছেন, শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার সাধন কর, তাহা হইলেই দেশের বেকার-সমস্যার সমাধান হইবে, অথচ দেখিতেছেন না যে, যে সমস্ত শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান দেশে রহিয়াছে, সেগুলির প্রায় প্রত্যেকটী লোকসান খাইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখা ক্লেশকর হইয়া পড়িয়াছে। কেহ বলিতেছেন, কৃষির প্রসার সাধন কর, অথচ দেখিতেছেন না যে, যে কৃষকগণ এতদিন পর্য্যন্ত কৃষি অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিল, তাঁহারাই এখন কৃষির লভ্যাংশ কমিয়া যাওয়ায় ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং আর কৃষির উপর নির্ভর করিতে পারিতেছে না। কেহ বলিতেছেন, সরকারী চাকুরীর সংখ্যা বৃদ্ধি কর, অথচ তাঁহারা ভাবেন না যে, মিতব্যয়িতার সহিত রাজ্য পরিচালনা করিতে হইলে চাকুরীর সংখ্যা সীমাবদ্ধ করিতে হয় এবং চাকুরী দ্বারা অতি সীমাবদ্ধ সংখ্যক লোকের ভরণপোষণ করা সম্ভব হইতে পারে। কেহ বলিতেছেন যে, ছাত্রগণ যাহাতে নূতন পেষা শিক্ষা করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা কর, অথচ তাঁহারা দেখিতেছেন না যে, যাহারা পেষা শিক্ষা করিয়াছে, তাহাদের মধ্যেই অধিকাংশই বেকার হইয়া পড়িতেছে। এইরূপ ভাবে যিনি যাহা বলিতেছেন, তাহার প্রত্যেকটী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, কাহারও কথায় আমূল কোন চিন্তার পরিচয় নাই। আছে কেবল পদের ও উপাধির অভিমান এবং অসংযত জিহ্বা।

সম্প্রতি যুক্ত প্রদেশের কাউন্সিলে স্যর তেজবাহাদুর সপ্রু বেকার-সমস্যা সমাধানকল্পে উচ্ছ্বসিত বক্তৃতার সহিত এক পরিকল্পনা দাখিল করিয়াছেন এবং আনন্দবাজার পত্রিকা তাহার মহিমা গাহিয়াছেন। স্যর তেজ বাহাদুর বেকার-সমস্যার জন্য যে যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাও মূলতঃ চাকুরী, শিল্পের উন্নতি এবং বৃত্তিশিক্ষা বিষয়ক। চাকুরী, অথবা শিল্পের উন্নতি, অথবা বৃত্তিশিক্ষা দ্বারা যে, কোন দেশের বর্ত্তমান বেকার-সমস্যার আংশিক সমাধান হইতে পারে না এবং হইতেছে না, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। যখন দেখা যাইতেছে যে, যে সমস্ত শিল্প ও বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান এখন বর্ত্তমান আছে, তাহারাই প্রায়শঃ লোকসান খাইতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন আর নূতন কোন শিল্প অথবা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা পরামর্শসিদ্ধ হইতে পারে কি ?

অথচ আনন্দবাজার পত্রিকা স্যর তেজবাহাদুর সপ্রুর জয়ঢাক বাজাইয়াছেন এবং গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধেও এক কলম লিখিয়াছেন। আমাদের বোধ হয়, লজ্জা জিনিষটী পর্য্যন্ত ইঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইতে লজ্জানুভব করে।

যতদিন পর্য্যন্ত লাভবান্ কৃষির পুনরুদ্ধার না হয়, ততদিন শিল্প ও বাণিজ্য কিরূপে সাফল্য লাভ করিতে পারে, তাহা যুক্তিদ্বারা আনন্দবাজারের মহারথিগণ জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিবেন কি ?

কি করিলে জনসাধারণের বিবিধ সমস্যার সমাধান হইতে পারে, তাহা আমরা "ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহার পূরণের উপায়" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। কাযেই এখানে তাহার পুনরুক্তি করিব না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্ত্তন-উৎসবে ভাইস্-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্ত্তন-উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এবারকার এই সভায় এক চ্যান্সেলারের বক্তৃতা ছাড়া আর সমস্তই যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ভাইস-চ্যান্সেলার তাঁহার বক্তৃতায় যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কথা কয়টি উল্লেখযোগ্য :—

(১) মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে ;

(২) বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ বাঙ্গালার বানান সমস্যা সম্পর্কে যত্নবান্ হইয়াছেন ;

(৩) অল্প সময়ের মধ্যে অধিকসংখ্যক শিক্ষকগণকে যাহাতে শিক্ষাদান করা যায়, তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে ;

(৪) নূতন লাইব্রেরি হলের কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে ;

(৫) জীববিজ্ঞান সম্পর্কে ল্যাবরেটরির সংস্কার সাধন করা হইতেছে ;

(৬) সায়ান্স কলেজের কার্য্যাবলী কেবল উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া তাহার কার্য্যকারিতা যাহাতে শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রসারিত হয়, তাহার চেষ্টা হইতেছে ;

(৭) জীবিকার্জ্জনের উপযোগী নূতন শিক্ষার ব্যবস্থা কিছু করা যায় কি না, তাহাও বিবেচনা করা হইতেছে ;

(৮) ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগে কমুনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে ;

(৯) চীনা ও তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষার জন্য চেষ্টা হইতেছে। কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তি বর্ত্তমানে এই গবেষণায় নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের গবেষণার দ্বারা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার অনেক অজ্ঞাত বিষয়ে আলোকসম্পাত হইবে বলিয়া আশা করা যায় ;

(১০) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণের গবেষণা যে কেবল একটী বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, তাহার প্রমাণ গত বৎসর আট জন গ্রাজুয়েটকে ডক্টর উপাধি দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে চারিজন আর্টের, দুইজন বিজ্ঞানের, একজন আইনের এবং একজন মেডিসিনের ;

(১১) অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনকে সম্প্রতি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত করায় পাণ্ডিত্যের যথোচিত মর্য্যাদা দেওয়া হইয়াছে ;

(১২) সিনেট সভা, পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষার্থীদের জন্য একটী চারুকলা প্রদর্শনী ও মিউজিয়াম স্থাপনের পরিকল্পনা সমর্থন করিয়াছেন। ইহাতে আশা করা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে এবং স্বদেশপ্রীতিতে উদ্বুদ্ধ হইবে ;

(১৩) গবর্ণমেণ্ট হইতে যে টাকা সাহায্য বরাদ্দ আছে, গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কোন প্রকারের সর্ত্ত না করিয়া ঐ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে অর্পণ করা ;

(১৪) অত্যধিক সংখ্যক ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিতেছে এবং শিক্ষার ব্যয়বাহুল্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে যে দায়ী করা হয়, তাহার মূলে কোন সত্য আছে কি না, ইহা বিচার্য্য। (এই প্রসঙ্গে ভাইস চ্যান্সেলার মহাশয় যে সমস্ত সংখ্যা উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার প্রাসঙ্গিকতা আমরা সম্পূর্ণ ভাবে বুঝিতে পারি নাই। তিনি বোধ হয় বলিতে চাহেন যে, ভারতের এবং ভারতের বাহিরের যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তাহার এক একটীতে যত গুলি ছাত্রকে পড়ান হয় এবং তজ্জন্য এক একটী বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-পরিমাণ ব্যয় হয় এবং তদনুসারে ছাত্র-প্রতি অন্যান্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যে খরচা হয়, তাহার তুলনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-প্রতি খরচা কম।) অতএব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যয়বাহুল্যের জন্য দায়ী করা যায় না।

(১৫) অন্যান্য দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা অতিরিক্ত হইয়াছে, অথবা তথাকার অধিবাসীদিগের মানসিক অধঃপতন হইয়াছে বলিয়া আমরা কোন কথা শুনিতে পাই না ;

(১৬) শিক্ষার প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধাবশতঃ বিদ্যা অর্জ্জন না করিয়া অধিকাংশ ছাত্র উপার্জ্জনের পন্থা হিসাবে বিদ্যা অর্জ্জন করে—এই অজুহাতে সে সকল দেশে শিক্ষাপদ্ধতিকে এইরূপ পাইকারী ভাবে নিন্দা করা হয় না ;

(১৭) আমার নিশ্চিত ধারণা, বর্ত্তমান অবস্থার প্রতীকার করিতে হইলে অন্য দেশের শিক্ষার অনুরূপ ব্যবস্থা আমাদের স্কুল ও কলেজে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে ;

(১৮) বর্ত্তমানে দোষত্রুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কন্ধে চাপাইবার একটা কুপ্রবৃত্তি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতকার্য্যতা নষ্ট করিবার একটা অপচেষ্টা দেশের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে ;

(১৯) এখন সকল বাদবিসম্বাদ ভুলিয়া সকলের সহযোগিতায় শিক্ষায় এমন একটা পদ্ধতি নির্দ্দেশের সময় আসিয়াছে যে, শিক্ষা-পদ্ধতি দেশের সকলের—অন্ততঃ অনেকের মঙ্গলদায়ক হয় ;

(২০) কোন দেশেই শিক্ষাপদ্ধতি পূর্ণতা লাভ করে নাই ;

(২১) শিক্ষাক্ষেত্রে আদর্শ ও লক্ষ্য লইয়া দ্বন্দ্ব করিলে চলিবে না, আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য কোন খামখেয়ালি কাজ করিলেও চলিবে না। অথবা কায়েমি স্বত্বাধিকারিগণের কোন কর্তৃত্ব চলিবে না।

ভাইস্-চ্যান্সেলার মহোদয়ের সমগ্র বক্তৃতাটীকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা :—

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীত কার্য্যের ফর্দ্দ ;

(২) বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কার্য্যপরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত চিত্র ; এবং

(৩) শ্যামাপ্রসাদ বাবুর উচ্ছ্বাস।

শ্যামাপ্রসাদ বাবুর এই উচ্ছ্বাসের মূল্য কতখানি, আমরা পাঠকবর্গের সমক্ষে প্রথমতঃ তাহাই উপস্থাপিত করিব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কিছু করিবার আন্তরিক ইচ্ছা যে তাঁহার আছে, তাহার নিদর্শন এই বক্তৃতায় আছে বটে, কিন্তু কি করিলে যে, শিক্ষা ছাত্রগণের তথা দেশবাসীর পক্ষে ফলপ্রদ করা যায়, সে অভিজ্ঞতা যে তাঁহার নাই, ইহাও এই বক্তৃতায় অতিমাত্রায় প্রকট হইয়াছে। অবশ্য তাঁহার বয়ঃক্রমের কথা চিন্তা করিলে, আমরা তাঁহাকে এজন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে দোষী সাব্যস্ত করিতে পারি না।

বক্তৃতাটীতে দেখা যায়, তিনি একবার বলিতেছেন যে, বর্ত্তমানে দোষত্রুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কন্ধে চাপাইবার একটা কুপ্রবৃত্তি দেশের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে (১৮নং), আবার পরক্ষণেই বলিতেছেন যে, এমন একটা পদ্ধতি নির্দ্দেশের সময় আসিয়াছে, যাহাতে শিক্ষা-পদ্ধতি দেশের অন্ততঃ অনেকের মঙ্গলদায়ক হয় (১৯নং)। বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি কোন দোষত্রুটিই না থাকে এবং তাহার স্কন্ধে যাহারা দোষ চাপাইতে চাহে, তাহারা কুপ্রবৃত্তিসম্পন্ন, ইহা যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে, আবার নূতন করিয়া মঙ্গলদায়ক শিক্ষাপদ্ধতি অনুসন্ধান করিবার কি প্রয়োজন হইতে পারে ?

আবার দেখুন, তাঁহার উপরোক্ত বক্তৃতার বিংশ দফায় তিনি বলিতেছেন যে, কোন দেশের শিক্ষা-পদ্ধতি পূর্ণতা লাভ করে নাই এবং অনুসন্ধান করিলে ইহাও জানা যাইবে যে, এখনও শিক্ষা শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা পর্য্যন্ত আধুনিক যুগে নির্দ্ধারিত হয় নাই।* অথচ, ভাইস চ্যান্সেলার মহোদয় তাঁহার বক্তৃতার বিংশ দফায় বলিতেছেন যে, শিক্ষাক্ষেত্রে আদর্শ ও লক্ষ্য লইয়া দ্বন্দ্ব করিলে চলিবে না। যদি কোন দেশেই শিক্ষাপদ্ধতি পূর্ণতা লাভ করে নাই, অথবা শিক্ষা শব্দের অর্থ সঠিকভাবে স্থির হয় নাই, ইহা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে কি যুক্তিসঙ্গত ভাবে বলা চলে যে, শিক্ষাক্ষেত্রে আদর্শ ও লক্ষ্য লইয়া দ্বন্দ্ব করিলে চলিবে না ? একই বক্তৃতায় এতখানি অসামঞ্জস্য বর্ত্তমানে কোন কোন দৈনিক পত্রের সম্পাদকের শোভা পাইলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার পক্ষে ইহা নিতান্ত অশোভন।

শ্যামাপ্রসাদ বাবু তাঁহার বক্তৃতার পঞ্চদশ দফায় বলিতেছেন যে, অন্য কোন দেশে শিক্ষিত অধিবাসীদিগের মানসিক অধঃপতন হইয়াছে বলিয়া তিনি কোন কথা শুনেন নাই। তাঁহার শ্রবণ-শক্তির কোন বিকৃতি আছে কি না, আমরা তাহা পরিজ্ঞাত নহি। টলষ্টয়, হেন্‌রি জর্জ প্রভৃতি চিন্তাশীল লেখকগণের রচনা পড়িলে অথবা বর্ত্তমান যে কোন চিন্তাশীল পাশ্চাত্ত্য বহুদর্শী লোকের সহিত এই সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিলে তিনি জানিতে পারিবেন যে, পাশ্চাত্ত্য জাতিগণের মধ্যে চিন্তাশীল লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে বলিয়া তথায় বেশ আশঙ্কাকুলতা দেখা দিয়াছে।

যুদ্ধের পর হইতে যে এই বিষয় লইয়া একটা বিশেষ আন্দোলন চলিতেছে, তাহাও কি শ্যামাপ্রসাদ বাবু অবগত নহেন ?

ষোড়শ দফায় শ্যামাপ্রসাদ বাবু বলিতেছেন, শিক্ষার প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধাবশতঃ বিদ্যা অর্জ্জন না করিয়া অধিকাংশ ছাত্র উপার্জ্জনের পন্থা হিসাবে বিদ্যা অর্জ্জন করে—এই কথা বলিলে শিক্ষাপদ্ধতিকে পাইকারী ভাবে নিন্দা করা হয়।

তিনি তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন কি যে, তাহারা কেন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যা অভ্যাস করিতে আসিয়াছে ? যদি উপার্জ্জনের পন্থা হিসাবেই তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যা অর্জ্জন করিতে না আসিয়া থাকে, তাহা

* অনুসন্ধিৎসু পাঠককে আমরা N. M. Butlerএর Meaning of Education, Stanley Lathesএর What is Education, Weltonএর, What do we mean by Education, Mooreএর What is Education—এই চারিখানি গ্রন্থ পড়িতে অনুরোধ করি।

হইলে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়াই চাকুরীর প্রার্থী হয় কেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর ক্রম হিসাবে বেতনের ক্রম দাবী করা হয় কেন? তথাকথিত "পারমার্থিক ধ্যান" শিখাইবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন্ কোন্ পাঠ্য পুস্তক ও বিস্তার ব্যবস্থা আছে, তাহা শ্যামাপ্রসাদ বাবু জনসাধারণকে জানাইয়া বাধিত করিবেন কি? শ্যামাপ্রসাদ বাবুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতগণ বিদ্যা অথবা knowledge কথাটীর অর্থ কি স্থির করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না; আমরা যত দূর জানি, বিদ্যা শব্দটীর প্রকৃতি (etimology) অনুসারে যাহা জানিলে মানুষ তাহার ইচ্ছার পূরণ করিতে পারে, তাহার নাম বিদ্যা। অন্ন সংস্থান করা পরিণতবয়স্ক মানুষ মাত্রের প্রাথমিক ইচ্ছা, কাযেই যে-বিদ্যায় অন্নের সংস্থান পর্য্যন্ত হয় না, তাহাকে কোন বিদ্যাই বলা যায় না, ইহা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের বুঝিতে এত কষ্ট হয় কেন?

সতেরো দফায় শ্যামাপ্রসাদ বাবু বলিতেছেন যে, বর্ত্তমান অবস্থার প্রতীকার করিতে হইলে, অন্য দেশের শিক্ষার অনুরূপ ব্যবস্থা আমাদের স্কুল ও কলেজে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে, ইহা তাঁহার ধারণা। আমাদের পরামর্শ এই যে, তিনি যদি দেশের প্রকৃত কোন উপকার করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহার ঐ ধারণাটি বিসর্জ্জন দিতে হইবে। অন্যান্য দেশে শিক্ষা দুষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রত্যেক দেশেই বেকার-সমস্যা ও জীবন-সমস্যা লইয়া লোক বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। যে শিক্ষায় অপরে বিপন্ন হইয়াছে, আমরা যদি তাহার অনুকরণ করি, তাহা হইলে আমাদেরও বিপদ অনিবার্য্য। কাযেই মৌলিক ভাবে চিন্তা করিয়া শ্যামাপ্রসাদ বাবুকে কিছু একটা আবিষ্কার করিতে হইবে। বিগত কয় সংখ্যা "বঙ্গশ্রী" পাঠ করিলেও তিনি সে সন্ধান পাইবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্য সম্বন্ধে শ্যামাপ্রসাদ বাবু যাহা যাহা বলিতে চাহিয়াছেন, তাহার বিচারের ভার আমাদের পাঠকদিগের উপরে রহিল। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দেখিলেই তাহা কতক পরিমাণে নির্দ্ধারিত হইতে পারে। আমরা অবশ্য একমাত্র শিক্ষার বিকৃতির জন্যই যে বেকারের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে তাহা বলি না, কারণ উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্রের ব্যবস্থা না হইলে শিক্ষিত হইয়াও জীবিকার্জ্জনের কর্ম্ম সংগ্রহ করা ক্লেশকর হইতে পারে। উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্রের অভাবের জন্যও আংশিকভাবে শিক্ষাপদ্ধতিকে দায়ী করা যায়, কারণ যাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসারের জন্য দায়ী, তাঁহারা যদি যথাযথ ভাবে শিক্ষিত হইতেন, তাহা হইলে যুবকদিগের এতাদৃশ কর্ম্মক্ষেত্রের অভাব উপস্থিত হইতে পারিত না। তাহা ছাড়া, শিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে যাঁহারা বি-এ, এম-এ পাশ করিয়া শিল্প অথবা বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রবিষ্ট হন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যে বিশেষভাবেই দুষ্ট হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। প্রায়শঃ দেখা যায় যে, এই বি-এ ও এম-এ উপাধিধারিগণ স্বাভাবিক প্রতিভামণ্ডিত, অথচ তাঁহাদের মস্তিষ্কের মধ্যে এমন কতকগুলি প্রয়োগের অযোগ্য মন্তব্য প্রবিষ্ট করান হয় যে, তাঁহাদিগের হস্তে প্রায়শঃ যুক্তিযুক্তভাবে কোন দায়িত্ব ন্যস্ত করা যায় না। এমন কি, অনেক সময়, যাঁহারা বি-এ ও এম-এ পাশ করেন নাই, তাঁহারাও অপেক্ষাকৃত অধিক কার্য্যক্ষম বলিয়া প্রমাণিত হন। বি-এ, এম-এর বর্ত্তমান পাঠ্য পুস্তকগুলি বিশ্লেষণ করিলে ইহার কারণ নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে স্থির করিতে পারা যায়। প্রয়োজন হয়, আমরা ভবিষ্যতে তাহা করিব।

ষষ্ঠ দফায় শ্যামাপ্রসাদ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বুঝিতে হয় যে, সায়ান্স কলেজের কার্য্যাবলী যাহাতে শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রসারিত হয়, তাহার চেষ্টা চলিতেছে। আমরা কিন্তু এই কথাটী বিশ্বাস করিতে পারি না। কি করিলে ছাত্রদিগকে শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রের উপযোগী শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, তাহা যাঁহারা কখনও শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে হাতে কলমে কার্য্য করিয়া সাফল্য লাভ করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে নির্দ্ধারণ সম্ভব নহে। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, পাশ্চাত্ত্য জগৎ শিল্প-বাণিজ্যে সাফল্য লাভ করিয়াছে বলিয়া একটা প্রসিদ্ধি আছে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা সত্য নহে। তাঁহারা যদি শিল্প-বাণিজ্যে প্রকৃত সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের দেশের সর্ব্বত্র এত হাহাকার উঠিতে পারিত না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বটে যে, আমাদের দেশে বোম্বাইওয়ালা, মাড়োয়ারী ও ভাটিয়াগণ শিল্প-বাণিজ্যক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য মহাজনগণের নিকট দেনায় কে কত জর্জ্জরিত, তাহা জানিতে পারিলে, তাঁহাদের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। শিল্প-বাণিজ্যে কৃতকার্য্য ব্যক্তির যখন

এত অভাব, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে কি তাহার যথাযথ পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করা সম্ভব ?

সায়ান্স কলেজে এতাবৎ মানুষের কাজে লাগে, এমন কি কি করা হইয়াছে, তাহা শ্যামাপ্রসাদবাবু দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে পারেন কি? আমরা যতদূর জানি, তাহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সায়ান্স কলেজটীতে মানুষের কাজে লাগে এমন কোন বিদ্যার প্রায়শঃ কোন আলোচনা হয় না। এবং তাহা হইতে যে সমস্ত পণ্ডিতের উদ্ভব হয়, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে স্থান পাইবার অনুপযুক্ত। এই সায়ান্স কলেজের প্রধান পাণ্ডাদিগের কাহারও কাহারও মুখ হইতে কিরূপ দায়িত্ব-জ্ঞানহীন উক্তি বাহির হইয়া থাকে, তাহাও আমরা ইতিপূর্ব্বে "বঙ্গশ্রী"তে দেখাইয়াছি।

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার অনেক অজ্ঞাত বিষয়ে আলোক সম্পাত হইবে বলিয়া যে আশার বাণী শ্যামাপ্রসাদ বাবু তাঁহার বক্তৃতার নবম দফায় দেশবাসীকে শুনাইয়াছেন, তাহা অলীক স্বপ্ন মাত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতগণ অতীত ভারতের ইতিহাস যেরূপ কুজ্ঝটিকাপূর্ণ করিয়াছেন, সেরূপ জগতের আর কেহ করে নাই। আমাদের ভারতীয় ঋষিগণ যে অনন্যসাধারণ ছিলেন, তাহা বেদাদি গ্রন্থ না পড়িয়াও একটু সাধারণ বুদ্ধির সহিত দেশের অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়। জগতের মধ্যে একমাত্র ভারতেই এতাবৎ আর্থিক স্বাধীনতা পরিলক্ষিত হইত। জগতের মধ্যে এমন আর একটি দেশ নাই যে-দেশের অধিবাসী পরমুখাপেক্ষী না হইয়া, নিজের দেশে বসবাস করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। ইতিহাসেও ভারতবাসীর কখনও অন্নের জন্য বিদেশে যাইতে হইয়াছে, এমন কোন পরিচয় নাই। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই অনন্যসাধারণ আর্থিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ভারতীয় ঋষি। যাঁহারা একটা সমগ্র দেশে অনন্যসাধারণ আর্থিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, তাঁহারা যে অনন্যসাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বেদাদি গ্রন্থ যথাযথ অর্থে অধ্যয়ন করিলে, তাঁহারা যে কত ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, তাহা আরও পরিস্ফুট হয়।

ইউরোপীয়গণ ১৭৯০ সন হইতে সংস্কৃত চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছেন। ১৭৯০ সন হইতে ১৮২৭ সন পর্য্যন্ত প্রকাশিত বপ্ (Bopp), ফর্ষ্টার (Forster), উইলকিন্স (Wilkins), কেরী (Carey), কোলব্রুক (Colebrooke) প্রভৃতি সংস্কৃতজ্ঞ ইয়োরোপীয়গণের গ্রন্থে ঋষিদিগের কোন নিন্দাবাদ দেখা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও যে সমস্ত ইউরোপীয় ঐতিহাসিক ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রণয়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা ভারতীয় ঋষির প্রতি শ্রদ্ধার ভাবই জ্ঞাপন করিয়াছেন, কিন্তু এই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতগণের মধ্যেই কেহ কেহ সর্ব্বপ্রথম ঋষিগণের নিন্দাবাদ প্রচার করিতে সাহসী হইয়াছেন। এই পণ্ডিতগণের গ্রন্থ পড়িলে পরিষ্কার বুঝা যাইবে যে, তাঁহারা ঋষিদিগের কোন মূল গ্রন্থের সহিত আদৌ পরিচিত ছিলেন না, অথচ নিজদিগকে সংস্কৃতজ্ঞ বলিয়া প্রচারিত করিয়া জগতকে প্রতারণা করিয়াছেন। প্রধানতঃ তাঁহাদের কথার ফলেই এবং তাঁহাদের শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইয়োরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞগণ ভারতীয় বেদকে 'চাষার গান' বলিতে সাহসী হইয়াছেন। এখনও এই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতগণ যে কি উদ্ভট কথাই প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বলিয়া প্রচার করিতেছেন, তাহা অদূরভবিষ্যতে জনসমাজ জানিতে পারিবেন। এই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যের ফলেই লোকে সংস্কৃত না জানিয়াও সংস্কৃতবিদ্ বলিয়া নিজদিগকে প্রচার করিতে সক্ষম হইতেছেন এবং ভারতীয় ঋষিদিগের সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কথা বিলাইতে পারিতেছেন। যে স্যার রাধাকৃষ্ণন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হওয়ায় শ্যামাপ্রসাদ বাবু আহ্লাদে গদ্‌গদ হইয়াছেন, ঐ স্যার রাধাকৃষ্ণনটী ভারতীয় ঋষির ধর্ম্মকে যে কিরূপ অযথা ভাবে গালাগালি করিয়াছেন, তাহা এই সংখ্যায় প্রকাশিত "ধর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধ পড়িলে পাঠকবৃন্দ বুঝিতে পারিবেন। স্যার রাধাকৃষ্ণনের সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় ঋষির মূল গ্রন্থ সম্বন্ধে অজ্ঞতা কিরূপ তাহা আমরা আগামী দুই তিন সংখ্যার মধ্যে দেখাইতে চেষ্টা করিব। অথচ এই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যই এতাদৃশ একটি অজ্ঞ ব্যক্তি পণ্ডিত বলিয়া সমাজে চলিয়া যাইতেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস-সম্বন্ধীয় যে সকল কথা প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে প্রায়শঃ এই স্যার রাধাকৃষ্ণন জাতীয় পণ্ডিতেরই

পরিচয় পাওয়া যায়। কাযেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ভারতের কোন প্রাচীন ইতিহাস উদ্ভাসিত হইবে, বর্ত্তমানে তাহা আশা করা যায় না

চীনা ও তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য শ্যামাপ্রসাদ বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অর্থ ব্যয় করিবেন, তাহাতে কোন ফলোদয় হইবে না। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, চীনা ও তিব্বতীয় ভাষায় যে সমস্ত গ্রন্থ আছে, সেগুলি প্রায়শঃ ভারতীয় ঋষির জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকৃতিকর। যে সমস্ত পণ্ডিত চীনা ও তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থব্যয়ে পরামর্শ দিতেছেন, তাঁহারা কেবল আত্মপ্রচারের নিমিত্তই এইরূপ করিতেছেন।

চতুর্দ্দশ দফায় শ্যামাপ্রসাদ বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মিত-ব্যয়িতার প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহা আমাদের অবোধ্য। অন্যান্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রপ্রতি যে খরচ পড়ে, তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অধিক, ইহা প্রতিপন্ন হইলেই কি এদেশের শিক্ষার মিতব্যয়িতা প্রমাণিত হয়? অন্যান্য দেশের প্রত্যেকের গড়ে আয় কত এই প্রসঙ্গে তাহা দেখিবারও প্রয়োজন হয় না কি? যখন পরীক্ষার ফি ও কলেজের বেতন অপেক্ষাকৃত কম ছিল, তখন ছাত্রগণ যে শিক্ষা পাইত, তাহার তুলনায় বর্ত্তমান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা কি কোনরূপে উন্নত হইয়াছে?

প্রতি বৎসর ডক্টর উপাধিধারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা দেখাইয়া শ্যামাপ্রসাদ বাবু তাঁহার বক্তৃতার দশম দফায় প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিধ বিষয়ের গবেষণা হইয়া থাকে।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যে কোন্ শ্রেণীর গবেষণা হইয়া থাকে, তাহা আমরা এই মাত্র দেখাইয়াছি। এখানকার ডক্টর উপাধিধারিগণ অন্যান্য বিষয়ে যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহাদের উপাধি অর্জ্জন করিয়া থাকেন, ঐ প্রবন্ধসমূহেও প্রায়শঃ সাধারণ জ্ঞানের অভাবের ও প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকৃতির পরিচয় থাকে। প্রয়োজন হইলে আমরা এই উক্তি প্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছি। যে সমস্ত প্রবন্ধের ফলে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে ডক্টর উপাধি দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাতে প্রকৃত পক্ষে ঐ উপাধিটির অবমাননা করা হয়। কাযেই ডক্টর উপাধিধারীর সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে, ইহা মনে করার হেতু নাই

শ্যামাপ্রসাদবাবু তাঁহার বক্তৃতার পঞ্চম দফায় বিশ্ববিদ্যা-লয়ের ছাত্রগণ যাহাতে জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তাহার আয়োজন করিতেছেন, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। শিক্ষার বর্ত্তমান বন্দোবস্তে কোন প্রকৃত জীবতত্ত্বের জ্ঞান লাভ করা কাহারও পক্ষে সম্ভব হইবে কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়। জীবতত্ত্ব অথবা মনুষ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ না করিয়া ঐ সম্বন্ধে একটা বিকৃত জ্ঞানকে প্রকৃত জ্ঞান বলিয়া মনে করিতে শিখিলে মনুষ্য-সমাজের উপকার অপেক্ষা অপকারই অধিক হইয়া থাকে। এই সত্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান পাশ্চাত্ত্য শরীর-গঠন তত্ত্ব (Anatomy) ও শরীর-বিধান তত্ত্ব (Physiology)। বর্ত্তমান পাশ্চাত্ত্য শরীর-গঠন তত্ত্ব ও শরীর-বিধান তত্ত্ব যে বিকৃত ও অসম্পূর্ণ, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। পাশ্চাত্ত্যগণ মৃত দেহের বিশ্লেষণ করিয়া ঐ দুইটি তত্ত্বের জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। জীবের দেহের মধ্যে যে সমস্ত গতি ও চালচলন রহিয়াছে, তাহা মৃতদেহের মধ্যে বিদ্যমান থাকে না এবং জীবিত দেহের শক্তি ও চালচলন মৃতদেহ দেখিয়া স্থির করা যায় না। কাযেই মৃতদেহ দেখিয়া যে শরীর-বিধান তত্ত্ব (Physiology) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা একটি কল্পনা মাত্র এবং তাহা কখনও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। মৃতদেহের গঠনও জীবিত দেহের গঠন হইতে অনেক পৃথক্ হইয়া পড়ে। কাযেই মৃতদেহ দেখিয়া কোন জীবের শরীর-গঠন তত্ত্ব (Anatomy) নির্দ্ধারণ করা যায় না।

পাশ্চাত্ত্য শরীর-বিধান তত্ত্ব ও শরীর-গঠন তত্ত্ব বিকৃত ও অসম্পূর্ণ বলিয়াই প্রতিনিয়ত চিকিৎসা-বিভ্রাট চলিতেছে। অথচ বিজ্ঞ চিকিৎসকগণের মধ্যে অনেকেই তাহা বুঝিতে পারেন না। মৃতদেহের সঙ্গে যে জীবিত দেহের অনেকখানি পার্থক্য, মৃতদেহ হইতে যে প্রকৃত অ্যানাটমী ও ফিজিওলজি নির্দ্ধারণ করা যায় না এবং তাহা যে চিকিৎসকগণ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারেন না, তাহাও বিশ্ববিদ্যালয়ের কুশিক্ষার ফল। প্রকৃত অ্যানাটমী এবং ফিজিওলজীর জ্ঞান উদ্ধার করিতে

হইলে মানুষের জীবিতাবস্থায় তাহার শরীরের মধ্যে কোন্ কোন্ অঙ্গের সাহায্যে কি কি প্রক্রিয়া চলিতেছে, কোন্ কোন্ উপাদানের সহায়তায় মানুষের মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত এবং চর্ম্মের উদ্ভব হইতেছে, কেমন করিয়া মানুষ তাহার ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিচালনা করিতেছে এবং পরিপাক-কার্য্যাদি চালাইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার প্রয়োজন হয়। পাশ্চাত্যগণ অদ্যাবধি তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই। জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞতম চিকিৎসকগণকে জিজ্ঞাসা করিলেও তাঁহারা ঐ তথ্য সম্বন্ধে কোন সন্ধান দিতে পারিবেন না। ডাক্তারগণ জনসাধারণকে প্রতারিত করিতেছেন এবং পরোক্ষভাবে মানুষের বর্ত্তমান অস্বাস্থ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহাদের এই পাপের ফলে তাঁহারা প্রায়শঃ হয় নির্ব্বংশ, নতুবা নির্ধন, নতুবা জনসমাজের ঘৃণিত সন্তান-সন্ততিযুক্ত হইয়া থাকেন। জীবিত অবস্থায় কি করিয়া মানুষের আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াসমূহ প্রত্যক্ষ করিতে হয়, তাহার তথ্য একমাত্র ভারতীয় ঋষির বেদে ও তন্ত্রে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। ওল্ড টেষ্টামেণ্ট এবং কোরাণেও তাহার স্থূলাংশ গুলি পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে প্রাচীন সংস্কৃত, প্রাচীন হিব্রু এবং প্রাচীন আরবী মানুষ সম্পূর্ণ ভাবে ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়াই জীব-শরীরের ঐ তথ্যগুলি বিকৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান কবিরাজ এবং হকিমগণ পর্য্যন্ত উহা জানেন না।

কাযেই প্রাচীন সংস্কৃত, হিব্রু এবং আরবী ভাষার উদ্ধার সাধন করিয়া বেদ, ওল্ড টেষ্টামেণ্ট এবং কোরাণের মর্ম্ম পরিজ্ঞাত না হইতে পারিলে, প্রকৃত কোন জীবতত্ত্বের জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হইবে না। তাহা না করিয়া আর যাহা করা যাইবে, তাহাতে একটা বিকৃত জীবতত্ত্ব প্রকৃত জীবতত্ত্ব নামে প্রচারিত হইবে এবং পরোক্ষ ভাবে জীবধ্বংসের উপায় প্রবর্ত্তিত হইবে। আমাদের মনে হয়, আত্ম-বিজ্ঞাপনপরায়ণ কতকগুলি কুজ্ঞানীর পরামর্শে নিরীহ শ্যামপ্রসাদ বাবু জীবতত্ত্ব উদ্ধারের নামে একটি ভীষণ কুকার্য্যে লিপ্ত হইতেছেন।

আমরা ক্রমশঃ এই "বঙ্গশ্রী"র সহায়তায় দেখাইব যে, দশ হাজার বৎসর আগেকার জগৎ একটিমাত্র রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল এবং তাহার রাজা ছিলেন বাস্তব (শুধু কথার কথা নহে) ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন, তেজস্বী (দাম্ভিক নহে) ভারতীয় ব্রাহ্মণ। এখন যেমন মানুষের ধারণা যে, শরীর থাকিলেই রোগ থাকিবে এবং কোন বিষয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে, মানুষের জীবনে সুখ এবং দুঃখ দুইই থাকিবে, তখন এই অবস্থা ছিল না, তখন মানুষের শরীরে প্রায়শঃ রোগ দেখা যাইত না, প্রায়শঃ কাহারও কোন অভাব ছিল না। মানুষে মানুষে কোন বিদ্বেষ ছিল না, কোন দলাদলি ছিল না, হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মের অস্তিত্ব ছিল না। সারা জগতের মানুষ একমাত্র মানব-ধর্ম্ম পালন করিতেন। ভারতীয় মনুসংহিতায় যে, এই মানব-ধর্ম্মের কথাই আছে, তাহা তাহার প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষাংশ পড়িলে বুঝিতে পারা যায়।

তথাকথিত বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণ প্রথমতঃ ঐ মানবধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ফলে তাঁহাদের পতন হইয়াছিল এবং ক্ষত্রিয়গণের প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়া জগৎ বিভিন্ন রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। তাহার পর জগতের ক্রমিক পতনই চলিতেছে। প্রত্যেক দেশে পতিত ব্রাহ্মণ-সন্তানগণ, পতিত ক্ষত্রিয়-সন্তানগণ এবং পতিত বৈশ্য-সন্তানগণ মিলিত হইয়া বর্ত্তমান মধ্যবিত্ত ও ধনিক সম্প্রদায়ের গঠন সাধন করিয়াছেন।

আমরা আরও দেখাইব যে, মুসলমানগণকে যেরূপ অত্যাচারী বলিয়া জগতের ইতিহাসে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা আদৌ সত্য নহে। তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে মানবের সুখ-শান্তি যাহাতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু উপরোক্ত মধ্যবিত্ত ও ধনিক সম্প্রদায়ের বিরোধিতার ফলেই তাঁহাদের চেষ্টা বিফল হইয়াছে।

ভারতবর্ষে তাঁহারা রাজত্ব করিতে আসেন নাই এবং কোন অত্যাচারও তাঁহারা করেন নাই। ভারতবর্ষে তাঁহারা আসিয়াছিলেন অন্নসংস্থানের জন্য এবং ভারতবর্ষে যে তাঁহাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা ভারতীয় ঐ মধ্যবিত্ত ও ধনিক সম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে দ্বেষ-হিংসার ফলে।

ইংরাজগণও প্রথমতঃ ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতে আসেন নাই। তাঁহারাও আসিয়াছিলেন তাঁহাদের অন্নসংস্থানের জন্য। তাঁহাদেরও ভারতীয় রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ঐ মধ্যবিত্ত ও ধনিক সম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে দ্বেষ-হিংসার ফলে এবং তাহার প্রকৃত বিস্তৃতি [illegible]য়াছে এই কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়েরই দুরদর্শিতার অভাবে। বর্ত্তমান জগতের বিভিন্ন জাতির লোকের সহিত টাকাকড়ির আদান-প্রদান করিয়া যাঁহারা তাঁহাদের সহিত প্রকৃতপক্ষে মিলিত হইবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা প্রায়শঃ বলিতে বাধ্য যে, এই ইংরাজ জাতি জগতের অন্য সমস্ত জাতির তুলনায় ভাল লোক। তাঁহারা কোন দিন চান নাই যে, ভারতীয়গণ তাঁহাদের সামাজিক আচার-ব্যবহার গ্রহণ করেন। বিশ বৎসর আগেও এই দেশে বহু ইংরাজকে দেখা যাইত, যাঁহারা হ্যাটকোটধারী, পাশ্চাত্ত্য 'খানা'প্রয়াসী ভারতীয়গণ অপেক্ষা দেশীয় আচার-ব্যবহার সম্পন্ন ভারতীয়গণকে অধিকতর শ্রদ্ধা করিতেন। এমন কি তাঁহারা নিজেরাও ভারতীয় আচার-ব্যবহার কি, তাহা অনুসন্ধান করিয়া কোন কোন ভারতীয় আচার-ব্যবহার নিজ নিজ দৈনন্দিন জীবনে গ্রহণ করিতেন।

প্রথমতঃ এই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতগণই বিলাত হইতে একবার ঘুরিয়া আসিতে পারিলে অথবা পাশ্চাত্ত্য 'খানা'র আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারিলে নিজদিগকে কুলীন মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহারাই ঐ মনোভাবের বীজ সমাজের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দিয়াছেন এবং intellectual conquest-এর সহায়তা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহারাই পাশ্চাত্ত্য-ভাবে আমাদের ভগ্নী ও কন্যাগণের শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিয়া ইংরাজ রাজত্ব আমাদের অন্দরমহল পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিয়াছেন। ফলে, সমাজের কি অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তাঁহারাই আবার ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে এমন শিক্ষা দিতেছেন যে, ঐ শিক্ষার ফলে তাহারা অযথা রাজ-প্রতিনিধিগণের জীবন হত্যা পর্য্যন্ত করিবার চেষ্টা করিতে কুণ্ঠাবোধ করে না।

দেশীয়গণের মধ্যে যাঁহারা মন্ত্রিত্ব প্রভৃতি গভর্ণমেন্টের বড় বড় পদ লাভ করেন, তাঁহারাও মূলতঃ বিশ্ববিদ্যালয়েরই সৃষ্টি। তাঁহারা যদি প্রকৃত শিক্ষাসম্পন্ন হইতেন, তাহা হইলে কি গভর্ণমেণ্ট অন্যভাবে পরিচালিত হইত না এবং দেশের অবস্থা অন্যরূপ দেখা যাইত না ?

ভারতীয় ঋষিগণের সমগ্র মূল গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করা ত দূরের কথা, এই পণ্ডিতগণ ঐ গ্রন্থগুলির নাম পর্য্যন্ত জানেন না। অথচ সরাসরি রসায়নের ইতিহাস লিখিতে বসিয়া বলিয়া যাইতেছেন যে, ভারতবর্ষে রসায়ন ছিল না; বিজ্ঞানের বক্তৃতা দিতে বসিয়া বলিতেছেন যে, ভারতবর্ষে বিজ্ঞান ছিল না; ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে বসিয়া বলিয়া যাইতেছেন যে, ভারতবর্ষে ধর্ম্ম কি তাহা পরিজ্ঞাত হইবার একটা চেষ্টা চলিয়াছে বটে, কিন্তু ভারতবাসী কোন সময় ধর্ম্ম কি, তাহা সংলগ্নভাবে জানিতে পারে নাই। এই আত্মসম্মান ও দায়িত্বজ্ঞানহীন নরাধমগুলিকে আমরা কখনও অধ্যাপক বলিয়া, কখনও পণ্ডিত বলিয়া, কখনও দেশনেতা বলিয়া মাথায় তুলিয়া নাচিতেছি। ইহাঁরা সকলেই মূলতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই সৃষ্টি।

এই চিত্র দেখিয়াও কি শ্যামাপ্রসাদ বাবু বলিতে চেষ্টা করিবেন যে, তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জনসমাজের কোন সৎকার্য্য সাধিত হইতেছে ?

শ্যামাপ্রসাদ বাবু এবং তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ হয়ত মনে করিবেন যে, আমরা একটা nuisance হইয়াছি। জগতের মনুষ্যসমাজ ও ভারতবাসী কি দুরবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে এবং তাহারা কোথায় চলিয়াছে, তাহা একবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আমরা তাঁহাদিগকে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, কি বেদনায় লেখকের লেখনী চলিতেছে এবং তাহা হইলে তাঁহারা তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতগণ তাঁহাদের নিজ নিজ ভ্রম না বুঝিতে পারিলে আমাদের যে কোন উপায় নাই! তাঁহারাই যে আমাদের ভবিষ্যৎ আশার স্থল রত্নগুলির নির্ম্মাতা! তাহারা তো কোন অপরাধ করে নাই, অথচ অন্নাভাবে দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছে এবং হতাশ্বাস হইয়া আত্মহত্যা পর্য্যন্ত আরম্ভ করিয়াছে!

উপসংহারে বলিতে চাই যে, অধুনা সারা জগতের কুত্রাপি কোন জাতি প্রকৃত শিক্ষার অনুসন্ধান পান নাই। তাঁহারা প্রকৃত শিক্ষার অনুসন্ধান পান নাই বলিয়াই সর্ব্বত্রই মানুষের অবস্থাবিপর্য্যয় ঘটিতেছে। অন্যান্য দেশে যে প্রকৃত শিক্ষার অনুসন্ধান মিলে নাই, তাহা তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়াও অনুমান করা যায়। অন্যান্য দেশ শিক্ষিত ও সুসভ্য হইয়াছে বলিয়া আমরা যে মনে করি, তাহা

আমাদের ভ্রান্তি। অন্য কোন দেশের শিক্ষার অনুকরণ না করিয়া, প্রকৃত শিক্ষা কি, তাহা মৌলিক ভাবে গবেষণা করিলে আমরা তাহার সন্ধান পাইব এবং সারা জগৎ আমাদের অনুকরণ করিবে।

শ্যামাপ্রসাদ বাবু যে সুযোগ পাইয়াছেন, তাহা যাহাতে নষ্ট না হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করি। দেশ যেরূপ বিপন্ন, তাহাতে এই সময়ে প্রকৃত শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে পারিলে অর্থের জন্য তাহা কার্য্যপ্রসূ করা অসম্ভব হইবে না এবং তিনি ইতিহাসে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারিবেন।

কর্পোরেশনের আগামী নির্ব্বাচন ও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু

কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু কর্পোরেশনের আগামী নির্ব্বাচন সম্বন্ধে একটি আবেদন বাহির করিয়াছেন। ভোটদাতাগণ যাহাতে কংগ্রেস-কর্পোরেশন ইলেকসান বোর্ড মনোনীত নির্ব্বাচনপ্রার্থীদিগকে ভোট দেন, তাহার জন্য অনুরোধ করা এই আবেদনের প্রধান উদ্দেশ্য। ভোটদাতাগণ কেন কংগ্রেস-পার্টির মনোনীত প্রার্থীদিগকে ভোট দিবেন, শরৎবাবুর মতে তাহার কারণ তিনটি, যথা—

(১) কংগ্রেস-সেবক সুরেন্দ্রনাথ কর্পোরেশনে স্বরাজ্য স্থাপন করিয়াছেন। অতএব কংগ্রেসের ফতোয়া জনসাধারণের সর্ব্বদা শিরোধার্য্য হওয়া উচিত;

(২) যেহেতু কর্পোরেশনে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা হওয়া অবধি কংগ্রেস-কর্পোরেশন পার্টি অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা, যথেষ্ট পরিমাণ জল সরবরাহ, বিশুদ্ধ দুগ্ধ, বিশুদ্ধ খাদ্য, বিশুদ্ধ মুক্ত বায়ু, সহরের সর্ব্বত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট প্রভৃতি স্বাস্থ্যরক্ষার যথাযোগ্য ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদের মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দেওয়া উচিত;

(৩) যেহেতু কর্পোরেশন কলিকাতা নগরীর শ্বেতাঙ্গ-পরিচালিত অনুরূপ প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা সুবিধাজনক সর্ত্তে প্রকাশ্য বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে ঋণ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, অতএব তাঁহাদের মনোনীত নির্ব্বাচন-প্রার্থীদিগকে ভোট দেওয়া উচিত।

শরৎ বাবু প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার বটে, কিন্তু তিনি কতখানি দেশপ্রাণ, তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। দেশের শতকরা নিরানব্বই জন লোক যখন অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট, দেশের শিক্ষিত যুবকগণ যখন প্রায়শঃ বেকারাবস্থায় দ্বারে দ্বারে চাকুরীর জন্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া হতাশ্বাস হয় এবং আত্মহত্যা করিতে আরম্ভ করে, তখন কোন প্রকৃত দেশপ্রাণ ব্যক্তির পক্ষে ঘটা করিয়া দেশপ্রাণতার অভিনন্দন গ্রহণ করা সম্ভব বলিয়া আমাদের মনে হয় না। কোন প্রকৃত দেশপ্রাণ ব্যক্তির বিরুদ্ধে লোকজনের সহিত ব্যবহারে, আত্ম-প্রচারের লিপ্সার অভিযোগ থাকিতে পারে না বলিয়া আমাদের ধারণা।

সন্ত্রাসবাদীদিগের সহায়ক, এই সন্দেহে গভর্ণমেণ্টের দ্বারা ধৃত এবং আবদ্ধ হইলেই যদি দেশপ্রাণ বলিয়া পরিচিত হওয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের বোধ হয় অনেককেই দেশের নেতৃত্বপদে বরণ করিতে হয়।

যাহা হউক, একজন প্রথিতনামা ব্যারিষ্টার যে সমস্ত সওয়ালজবাব করেন, তাহা জনসাধারণের সব সময়ে বুঝিয়া উঠা সম্ভব নহে। কাষেই শরৎ বাবুর সওয়ালজবাব যদি আমরা না বুঝিয়া থাকি, তাহার জন্য দায়ী তিনি নহেন। সে দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমাদের।

কর্পোরেশনের কি জন্য প্রয়োজন এবং তাহার কাছে নাগরিকগণের কি প্রাপ্য, তৎসম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি।

সংক্ষেপতঃ যে যে পন্থায় সর্ব্বাপেক্ষা অল্প করগ্রহণে সহর-বাসিগণের স্বাস্থ্য এবং সম্পত্তি বজায় রাখা যায়, সেই পন্থা উদ্ভাবন করিয়া কার্য্যপ্রসূ করিবার জন্যই কর্পোরেশনের প্রয়োজন, ইহা বলিলে বোধ হয় কেহ যুক্তিসঙ্গতভাবে আমাদের বিরোধিতা করিতে পারিবেন না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটু স্মরণ রাখা দরকার যে, কোন প্রতিষ্ঠান সুপরিচালিত হইলে তাহা যত পুরাতন হয়, ততই

তাহার মাথাপিছু ব্যয় কম হইতে থাকে, কারণ নূতন অবস্থায় বিবিধ সংগঠনের জন্য যে সমস্ত খরচ থাকে, প্রতিষ্ঠানগুলি পুরাতন হইতে থাকিলে এবং সুপরিচালিত হইলে আর সংগঠনের সেই ব্যয় থাকিতে পারে না। কাযেই যদি কোন প্রতিষ্ঠান পুরাতন হওয়া সত্ত্বেও মাথাপিছু ব্যয়ের হ্রাস সাধন করিতে না পারে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, ঐ প্রতিষ্ঠান সুপরিচালিত হয় নাই।

এক্ষণে আপনারা চাহিয়া দেখুন যে, কর্পোরেশন এতদিন কংগ্রেস-পরিচালনায় চলিতেছে অথচ আমাদের ট্যাক্স্ কমিয়া যাওয়া ত দূরের কথা, প্রতি বৎসর তাহার বাজেটে যেরূপ ঘাট্‌তি পড়িতেছে, তাহাতে যে কোন মুহূর্ত্তে ঐ ট্যাক্স বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা আছে

ইহার পরও কি বলা যায় যে, কর্পোরেশন কংগ্রেস-পার্টির কর্তৃত্বে সুপরিচালিত হইতেছে?

তাহার পর আরও লক্ষ্য করুন, শরৎ বাবু বলিয়াছেন বটে যে, তাঁহাদের পরিচালনায় সহরের স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে, অথচ সারা সহরে যেরূপ বেরী-বেরী, থাইসিস্, টাইফয়েড, কলেরা, বসন্ত (আধুনিকতম ঝিন্‌-ঝিনিয়া পর্য্যন্ত) প্রভৃতি রোগের প্রকোপ বাড়িয়া চলিতেছে, তাহাতে সহর অদূরভবিষ্যতে বাসের একরূপ অযোগ্য হইয়া পড়িতে পারে, এই আশঙ্কা করা অমূলক হইবে না। অধুনা সহরবাসিগণের স্ব স্ব স্বাস্থ্যের জন্য বৎসরের মধ্যে দুই এক বার স্থান বা বায়ু পরিবর্ত্তন করা যেরূপ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে, ১০।১৫ বৎসর আগে যে তদ্রূপ ছিল না, তাহা প্রাচীনগণ সহজেই স্মরণ করিতে পারেন।

ইহাই কি শরৎ বাবুর পার্টির সহরের স্বাস্থ্যোন্নতির পরিচয়?

সর্ব্বশেষে চাহিয়া দেখুন, সহরবাসীর সম্পত্তির মূল্য কিরূপ দ্রুতবেগে কমিয়া যাইতেছে। তাহাতে কি সহরবাসিগণ বিপন্ন হইতেছেন না?

ইহাই কি সুপরিচালনার পরিচয়?

শরৎ বাবুর দলের লোক হয়ত বলিবেন যে, সহরে লোকের সংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে সহরের স্বাস্থ্য ইহা অপেক্ষা ভাল রাখা যায় না, অথবা বলিবেন যে, স্বাস্থ্য ভাল রাখিতে আরও টাকার দরকার। আরও হয়ত বলিবেন যে, বাজার যখন পড়িয়া যাইতেছে, তখন সহরের সম্পত্তি বজায় রাখা সম্ভব নহে। আমরা তাহার উত্তরে বলিব, তাঁহার দল কর্পোরেশনের বর্ত্তমান আয়দ্বারা সহরবাসীর স্বাস্থ্য ও সম্পত্তির মূল্য বজায় রাখিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা সহরের উন্নতি করিতে পারিয়াছেন বলিয়া করতালি পাইতে চাহেন কেন এবং কর্পোরেশনের কর্তৃত্ব কামনাই বা করেন কেন?

সহরবাসিগণের এক একখানি বাড়ীর যাহা মোট মূল্য, তাহা প্রায় প্রতি পোনের অথবা ষোল বৎসরে কর্পোরেশনকে ট্যাক্স স্বরূপ দিতে হইতেছে, অথচ তাঁহাদের স্বাস্থ্য বজায় থাকে না, ডাক্তারের খরচা বাড়িয়া যাইতেছে, বাড়ীর মূল্য ক্রমেই হ্রাস পাওয়ায় সহরবাসিগণ দরিদ্র হইয়া পড়িতেছেন—ইহা কি তাঁহাদের পক্ষে হৃদয়বিদারক নহে?

গভর্ণমেণ্টের নেতৃত্বাধীন কর্পোরেশনকে যে ট্যাক্স্ দিতে হইত, কংগ্রেস-পার্টির কর্তৃত্বাধীন কর্পোরেশনকেও যদি সেই ট্যাক্সই দিতে হয়, অথচ সেই সময়ে স্বাস্থ্য এবং সম্পত্তির মূল্য যেরূপে বজায় থাকিত, এখন যদি তাহা না থাকে, তাহা হইলে সহরবাসীর স্বরাজ লাভ করিবার সার্থকতা কোথায়, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখিবেন কি?

ইহা হইতে কি বুঝিতে হইবে না যে, কংগ্রেস-পার্টিতে এখন যে সমস্ত লোক আছেন এবং যাঁহারা তাঁহাদের নেতা, তাঁহারা কার্য্যক্ষমতাহীন এবং ভোট পাইবার অনুপযুক্ত?

আমরা কর্পোরেশনের বাজেট অধ্যয়ন করিয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে বলিতে হয় যে, কর্পোরেশন সুপরিচালিত হইলে নয় বৎসরের ভিতর প্রতি তিন বৎসরে শতকরা ২ টাকা হারে ট্যাক্স্ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বসমেত শতকরা ছয় টাকা ট্যাক্স্ কমিয়া যাইতে পারে এবং স্বাস্থ্যও বর্ত্তমান সময়ের তুলনায় অনেক উন্নত হইতে পারে। চেষ্টা করিলে সম্পত্তির মূল্যের অবনতিও অবরুদ্ধ করা অসম্ভব নহে। যাঁহারা বর্ত্তমান কংগ্রেস-পার্টির নেতা, তাঁহারা অযথাভাবে কন্ট্রাক্টর, এবং অর্ডার-সাপ্লায়ারদিগের সহায়তা করেন বলিয়া কর্পোরেশনের খরচা বৃদ্ধি পাইতেছে, বাজেটে ঘাট্‌তি পড়িতেছে এবং করদাতাগণের ট্যাক্স্ কমিতে পারিতেছে না। প্রায়শঃ অনুপযুক্ত লোকের হস্তে বিভাগীয় কর্তৃত্ব ন্যস্ত হওয়ায় স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করাও অসম্ভব হইয়া

পড়িয়াছে; এবং কাউন্সিলারগণ প্রায়শঃ অনভিজ্ঞ বলিয়া সম্পত্তির মূল্য বজায় রাখিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিতেছেন না।

আমাদের মতে বর্ত্তমান কংগ্রেস্-পার্টির মনোভাব সম্পূর্ণ ভাবে বিদূরিত না হইলে ইঁহারা ভোট পাইবার অযোগ্য এবং সহরের মঙ্গলের আশা সুদূরপরাহত।

সংবাদ ও মন্তব্য

শিক্ষা-কমিশনারের রিপোর্ট

সংপ্রতি ভারত সরকারের শিক্ষা-কমিশনারের একটা রিপোর্ট সাধারণ্যে বাহির হইয়াছে। তাহাতে প্রকাশ, বিশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যত ছাত্র-ছাত্রী ছিল, আলোচ্য বৎসরে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। শুধু তাহাই নহে, পূর্ব্বে যে সকল প্রদেশ শিক্ষায় পশ্চাৎপদ ছিল, সেই সকল প্রদেশও শিক্ষায় উন্নত প্রদেশগুলির সমকক্ষ হইয়াছে।

খোসখবরের ঝুটাও ভাল; তবে কুশিক্ষা অপেক্ষা অ-শিক্ষাও যে বরং ভাল, শিক্ষা-কমিশনারের সে তত্ত্ব জানা আছে তো?

বাংলা সাহিত্য

কিছুদিন পূর্ব্বে আশুতোষ কলেজ সংশ্লিষ্ট বাংলা সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সেই সম্মেলনে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, "প্রায়ই দেখিতে পাই এই সমস্ত অনুষ্ঠানে আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে খুবই নিন্দাবাদ হয়···আমার বক্তব্য এই যে, এই ধরণের আলোচনা না হওয়াই ভাল। কারণ এই ভাবে লেখা উচিত বা এই ভাবে লেখা উচিত নহে—এ কথা বলিলে বিশেষ কিছু লাভ হয় না। যাহার যে রকম শিক্ষা, যাহার যে রকম শক্তি, যাহার যে রকম রুচি, তিনি তাহারই অনুপাতে সাহিত্য গড়িয়া তুলেন। এই সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে যেগুলি থাকিবার তাহা থাকিবে এবং যাহা না থাকিবার তাহা লোপ পাইবে।

শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় তো সোজা কথায় তাঁহার বক্তব্য শেষ করিয়াছেন—যাহা না থাকিবার তাহা কয়েক দিন পরে লোপ পাইবে। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যিকদিগের অধিকাংশের লেখনী হইতেই যে কুরুচিপূর্ণ ভাব, যে ভাষা ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইতেছে, তাহার ফল যে বহু দূরবিসর্পী, এই কঠোর সত্যটুকু কি শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় উপলব্ধি করিতে পারেন না? যত শীঘ্র এই সকল লেখকের লেখনীর বেগ সংযত করা যায়, ততই দশের ও দেশের মঙ্গল। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়ের নির্দ্ধারণ হিসাবে সাহিত্য-সম্মেলন গুলি কি সে চেষ্টা হইতেও বিরত থাকিবে? তবে এইগুলির সার্থকতা কোথায়?

জন্ম-নিরোধ

ভারতীয় লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্মেলনের অর্থনীতিক শাখার সভাপতি অধ্যাপক মিঃ টমাস তাঁহার অভিভাষণে কয়েকটী কথার অবতারণা করিয়াছেন। তিনি অন্যান্য কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, কোন দেশে লোকসংখ্যাবৃদ্ধিই শুধু আতঙ্কের কারণ নহে। কোন দেশের লোকসংখ্যা কিছুদূর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া তারপর স্বভাবতঃই বৃদ্ধির গতি হ্রাস পাইতে থাকে, সে জন্য প্রত্যেক পরিবারে জন্মশাসনের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয় না। ভারতে যে পরিমাণ লোকসংখ্যা বাড়িতেছে, খাদ্যদ্রব্য বা ভরণ-পোষণের উপায় কি সেই পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে?

ইহা তো কতকটা আমাদের কথারই প্রতিধ্বনি। যাহাতে খাদ্যদ্রব্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন করা সম্ভব হয়, সেদিকে অবহিত হও, তাহা হইলে বহু সমস্যার সমাধান হইবে। কৃত্রিম উপায়ে জন্মশাসনের কোন দিন প্রয়োজন হয়ও নাই—হইবেও না।

চট ও আইন

বাঙ্গালা দেশের চটকলওয়ালা সমিতি ভারত সরকারের নিকট এক আবেদন করিয়াছিলেন যে, চট ব্যবসায়ের যে প্রকার দুরবস্থা, তাহাতে ভবিষ্যতে আর কেহ কোন নূতন চটকল যাহাতে স্থাপন করিতে না পারে, ভারত সরকার যেন তজ্জন্য এক আইন প্রণয়ন করেন। ভারত সরকার সে-আবেদন নামঞ্জুর করিয়াছেন।

আইন-প্রণয়ন দ্বারা যদি এমন ব্যবস্থা করা যায় যে, চটকলওয়ালা, পাটচাষী, চটক্রেতা সকলেরই অবস্থা ভাল হয়—তবেই আইন-প্রণয়নের সার্থকতা থাকে, নহিলে নয়।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের বিলোপ

কিছুদিন পূর্ব্বে কবিরাজ শিরোমণি মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন মহাশয় কলিকাতার বিশ্বনাথ আয়ুর্ব্বেদ মহাবিদ্যালয়ের এক নব-নির্ম্মিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন সম্পর্কে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন, সেই বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, বর্ত্তমানে যে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রচলিত আছে, উহা সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র নহে। প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদের চার ভাগের তিন ভাগ বিলোপ হইয়া গিয়াছে।

আমাদের কিন্তু বাকী এক ভাগের সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে। তথাকথিত ভাষাবিদ্ ও টীকাকারদিগের কল্যাণে ভাষার যে প্রকার দুরবস্থা হইয়াছে, তাহাতে ত ইহাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কবিরাজ মহাশয় মুখ ফুটিয়া যেটুকু স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার বাহাদুরী!

'ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়' সম্পর্কিত পত্রাদি

"ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়" সম্পর্কে কয়েকখানি চিঠি "বঙ্গশ্রী"-কার্য্যালয়ে এবং উক্ত প্রবন্ধ-লেখকের নিকট আসিয়াছে। তাহার মধ্যে দুই একখানি ঠিকানাহীন; সুতরাং সেই সব পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নাই। পত্রলেখকগণ ঠিকানা জানাইলে কিংবা পূর্ব্বাহ্ণে জানাইয়া বঙ্গশ্রী-কার্য্যালয়ে স্বয়ং আসিলে, তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়।

এলেম্বিক কেমিক্যাল ওয়ার্কস্

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান এলেম্বিক কেমিক্যাল ওয়ার্ক-সের আজ আর নূতন পরিচয়ের প্রয়োজন নাই উদ্যোক্তাগণের জীবনব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং কর্ম্মযোগী স্বনামধন্য রাজরত্ন বি, ভি, আমিন, বর্ত্তমান ম্যানেজিং ডিরেক্টর মহোদয়ের অধ্যবসায় ও কার্য্যদর্শিতার গুণে এতদিনের এই শিশু প্রতিষ্ঠানটি আজ গৌরবময় জাতীয় প্রতিষ্ঠানে উন্নীত হইয়াছে। সম্প্রতি এই কোম্পানীর দ্রাক্ষাসব ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। মহামূল্য ভেষজ উপাদানের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক মতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই দ্রাক্ষাসব প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া সকল প্রকার দুর্ব্বলতায় ইহা অব্যর্থ ফলপ্রদ মহৌষধ। দীর্ঘকাল রোগভোগের পর ইহা ব্যবহারে শরীরে নূতন বলের সঞ্চার হয়। ইহা রুগ্ন শিশু এবং প্রসবের পর প্রসূতির পক্ষে শক্তিবর্দ্ধক মহৌষধ। সর্দ্দি, কাশি, ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি রোগেও ইহা চমৎকার কার্য্য করে।

"শত বর্ষ পরে"

একশত বৎসর যে মানুষ বাঁচে তার পরমায়ু অসাধারণ, মানুষের গড়-পড়তা আয়ুর তুলনায় অনেক বেশী। কিন্তু জাতির জীবনে একশত বৎসর কাল-সমুদ্রের বিন্দু মাত্র।

মানুষের জীবন গণনা করা হয় বৎসর ধরে, জাতির জীবন শতাব্দীর হিসাবে। দিনের পর দিন সমুদ্রের ঢেউএর মত মানুষ জীবনরঙ্গমঞ্চ থেকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু জাতির সভ্যতা, বহুশত বা বহুসহস্রবর্ষব্যাপি যুগের শেষে লয় পায়। একটা দেশের প্রগতির পথে একশত বৎসর আর এমন কি দীর্ঘকাল? যেমন, ভারতবর্ষ শতবর্ষ আগে বন্য একটি স্বভাবজাত গাছ থেকে, সামান্য একটি উদ্ভিদতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা থেকে তার চায়ের বিশাল শিল্প ব্যবসায় গড়ে উঠতে দেখেছে। আমরা সবাই এ কীর্ত্তি নিয়ে গর্ব্ব করতে পারি, কিন্তু ভারতের এই বিরাট শিল্প যেদিন উন্নতির চরম শিখরে উঠবে সেদিন আমরা কল্পনা করতে পারি কি? না পারারই কথা, কিন্তু এইটুকু আমরা বুঝতে পারি যে অদূরভবিষ্যতে সমগ্র ভারতবর্ষ যদি চা সম্বন্ধে সজাগ হয়ে ওঠে তাহ'লে পৃথিবীর চায়ের ব্যবসায়ে সে অদ্বিতীয় হয়ে দাঁড়াবে।

চা ভারতেই উৎপন্ন হয় এবং পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণ চা ভারত থেকেই সরবরাহ করা হয়। তবু যে সব দেশে ভারতের চা ছাড়া আর কিছু ব্যবহৃত হয় না, তাহাদের অধিকাংশের চেয়ে মাথা পিছু এখানে চা খরচ হয় অনেক অল্প; সত্যিই এটা ভাববার বিষয়। প্রত্যেক ভারতবাসী বৎসরে আধসের করে চা ব্যবহার করলেও এ শিল্পের উৎপাদনশক্তি চেপে রাখার কোন দরকার হবে না। গত একশত বৎসরে যে বেগে এ শিল্প বেড়েছে তাহলে তার চেয়ে অনেক দ্রুত তাকে প্রসারলাভ করতে হবে। পরবর্ত্তী একশত বৎসর তা হলে ভারতীয় চা ব্যবসায়ের আরো অসাধারণ উন্নতির যুগ বলে গণ্য হবে।

নিজেদের এই জাতীয় শিল্পের উন্নতির যথাসাধ্য চেষ্টা করার চেয়ে প্রশংসনীয় কাজ ভারতবাসীর আর কিছু হতে পারে না। এ শিল্পের ভবিষ্যৎ সত্যিই উজ্জ্বল। এ শিল্প গড়ে তোলার শতাব্দীব্যাপী সাধনার ইতিহাস থেকে আমরা এই শিক্ষাই পাই যে, যারা ভারতীয় চায়ের কদর বুঝতে শিখে, তাকে নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনের অচ্ছেদ্য অঙ্গ করে তুলেছে, তাদের মত আমাদেরও চাকে আপনার করে নেওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীদীনেশচন্দ্র গুহ কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস লিমিটেড, ৯০নং লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতা কর্পোরেশন

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ৩ আইনানুসারে (বঃ ব্যঃ) (পরে সংশোধিত)

পঞ্চম সাধারণ কাউন্সিলার নির্ব্বাচন

নোটীশ

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ৩০ ধারা অনুসারে লোক্যাল গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক প্রণীত নিয়মাবলীর ১৬, ১৯ ও ২০ নিয়মানুসারে, এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, এতৎসঙ্গে লিখিত নির্ব্বাচন কেন্দ্রসমূহ হইতে নির্ব্বাচনের জন্য প্রার্থীদের নামের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল। ঐরূপ প্রত্যেক কেন্দ্র হইতে কয়জন করিয়া কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইবেন, তাহার সংখ্যা এবং কোথায় ভোট গ্রহণ করা হইবে, তাহাও নিম্নে দেওয়া হইল। ইহা বিশেষ দ্রষ্টব্য যে **১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার** দিবস ভোট গ্রহণ করা হইবে। ইহা সকাল ৮টায় আরম্ভ হইবে ও সন্ধ্যা ৬টায় শেষ হইবে। মধ্যে বেলা ১টা হইতে ২টা এক ঘণ্টা কাল অবকাশ থাকিবে।

নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে দেওয়া হইল, (ক) নির্ব্বাচন কেন্দ্রের নাম, (খ) কাউন্সিলারের সংখ্যা, (গ) প্রার্থীদের নাম, (ঘ) ভোট গ্রহণের স্থান—(১) পুরুষদের জন্য, (২) নারীদের জন্য।

সাধারণ নির্ব্বাচন কেন্দ্রসমূহ

(ক) শ্যামপুকুর (১নং ওয়ার্ড), (খ) দুইজন, (গ) ১। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ২। জয়গোপাল মুখার্জ্জি, ৩। ডাঃ কৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য, ৪। মাণিকলাল মল্লিক, ৫। প্রফুল্লকুমার মুখার্জ্জি, ৬। রাজেন্দ্রনারায়ণ ব্যানার্জ্জী, (ঘ) (১) বাগবাজার ষ্ট্রীটের উপর বাগবাজার মেটাল ডিপো, (২) ১২৬নং শ্যামবাজার শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুল।

(ক) বড়তলা (৩নং ওয়ার্ড), (খ) দুইজন ৩। ডাঃ জি সি ঘোষ, ৪। মণীন্দ্রনাথ মৈত্র, ৫। প্রকাশচন্দ্র ভোস, ৬। ডাঃ শশীকুমার সেনগুপ্ত, ৭। সুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, (ঘ) (১) ৭৯নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ ১নং ডিষ্ট্রীক্টের মিউনিসিপ্যাল অফিস বিল্ডিংস, (২) ২৩-১-১, রায় বাগান ষ্ট্রীটে স্কটিশ চার্চ্চেস কলেজিয়েট স্কুল।

(ক) সুকিয়াস ষ্ট্রীট (৪নং ওয়ার্ড), (খ) দুইজন, (মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত অপর আসনটি —সেখ আবদুল রহমান বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হওয়ায় পূরণ হইয়াছে), (গ) ১। এইচ কে মিটার, ২। হৃদয়কৃষ্ণ ঘোষ, ৩। মিস জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী, ৪। এন সি ঘোষ, ৫। নলিনচন্দ্র পাল, ৬। পি সি ভগৎ, (ঘ) (১) ৩ ও ৪নং কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারস্থ স্কটিস চার্চ্চেস কলেজ, (২) ২৬৭নং আপার সারকুলার রোডস্থ রামমোহন লাইব্রেরী।

(ক) জোড়াবাগান (৫নং ওয়ার্ড), (খ) দুইজন, (গ) ১। মোহনলাল মক্কর, ২। রামচন্দ্র শেঠ, ৩। রূপনারায়ণ গগ্গর, ৪। কবিরাজ শিবনাথ সেন, (ঘ) (১) রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীটস্থ তারাসুন্দরী পার্ক, (২) ২০নং পাথুরিয়া ঘাট ষ্ট্রীটস্থ মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশন (বড়বাজার শাখা)।

(ক) জোড়াসাঁকো (৬নং ওয়ার্ড), (খ) দুইজন, (গ) ১। গোষ্ঠবিহারী শেঠ, ২। মদনমোহন বর্ম্মণ, ৩। শৈলেন্দ্রনারায়ণ রায়, ৪। সুধীরকুমার চাটার্জ্জী. (ঘ) (১) গিরীশ পার্ক—চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, (২) ১৪৮নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটস্থ কেশব একাডেমী।
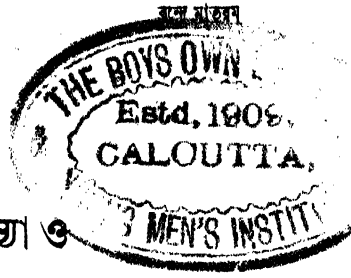
চতুর্থ বর্ষ, ১ম খণ্ড—৪র্থ সংখ্যা

ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়

—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

পূর্ব্বাবৃত্তি

সমগ্র ভারতবাসী যতগুলি সমস্যার জন্য সর্ব্বদা বিব্রত রহিয়াছে, সেগুলিকে সংক্ষেপে চারিটী কথায় বিবৃত করিতে পারা যায়; যথা :—

(১) কৃষক, তাঁতী, যুগী, কুম্ভকার এবং কর্ম্মকার প্রভৃতি শ্রমজীবিগণের অন্নাভাব;

(২) শিক্ষিত যুবক ও শ্রমজীবিগণের বেকারাবস্থা এবং অসন্তুষ্টি;

(৩) উকিল, ব্যারিষ্টার প্রভৃতি আইন-ব্যবসায়ী, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী এবং বণিকগণের পরমুখাপেক্ষিতা, অর্থকৃচ্ছ্রতা এবং অসন্তুষ্টি;

(৪) সমস্ত অধিবাসীর স্বাস্থ্যহীনতা, অকালমৃত্যু, অসন্তুষ্টি এবং পরমুখাপেক্ষিতা।

যে যে কারণে ভারতবাসীর জীবনযাত্রায় উপরোক্ত সমস্যাগুলির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা বহু। সংক্ষেপতঃ ঐ কারণগুলিকে নিম্নলিখিত তেরটী কথায় প্রকাশ করা যাইতে পারে :—

(১) জমীর উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস;

(২) পণ্যদ্রব্যের মূল্যের সাদৃশ্যের অভাব (want of parity);

(৩) কৃষিপ্রভৃতি জীবিকার্জ্জনের চারিটী পন্থাতেই যাহাতে ন্যূনকল্পে গরীবানাভাবে পরিবার প্রতিপালিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থার অভাব;

(৪) উপরোক্ত চারিটী পন্থাতেই যাহাতে শ্রমজীবিগণের পারিশ্রমিকের সাদৃশ্য থাকে, তাহার ব্যবস্থার অভাব।

(৫) প্রকৃত বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে কি না, তাহার পরীক্ষাদ্বারা যাহাতে শ্রমজীবী (manual workers) ও বিভিন্ন পরিচালকগণের (officers and subordinate officers) পদগৌরবের তারতম্য স্থিরীকৃত হয়, তাহার ব্যবস্থার অভাব;

(৬) বুদ্ধির উৎকর্ষের তারতম্যানুসারে যাহাতে মানুষের উপার্জ্জনের তারতম্য হয়, তদনুরূপ ব্যবস্থার অভাব;

(৭) জীবিকার্জ্জনের চারিটী পন্থাতেই যাহাতে সর্ব্বোচ্চ (maximum) উপার্জ্জন একরূপ হয়, তাহার ব্যবস্থার অভাব;

(৮) সম্পূর্ণ ও নির্ভুল শরীরগঠন-বিদ্যার (Anatomy) অভাব;

(৯) সম্পূর্ণ ও নির্ভুল শরীরবিধান-বিদ্যার (Physiology) অভাব;

(১০) সম্পূর্ণ ও নির্ভুল পদার্থবিদ্যার (Physics) অভাব;

(১১) সম্পূর্ণ ও নির্ভুল রসায়নের (Chemistry) অভাব;

(১২) জল ও বায়ু যাহাতে অস্বাস্থ্যকর না হয়, তদনুরূপ ব্যবস্থার অভাব;

(১৩) শিক্ষাপদ্ধতি যেরূপ হইলে ছাত্রগণ স্ব স্ব বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিয়া স্বাবলম্বী হইতে পারেন, সেই শিক্ষাপদ্ধতির অভাব।

সমস্যার কারণগুলিকে দূর করিতে পারিলেই সমস্যার দূরীকরণও সম্ভব হয় এবং প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষেও পুনরায় প্রতিনিয়ত সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে দিনাতিপাত করা সম্ভব হইতে পারে।

সমস্যার ঐ কারণসমূহ দূরীভূত করিতে হইলে প্রত্যেক ভারতবাসীর ব্যক্তিগত ভাবে ও সমষ্টিগত ভাবে কতকগুলি

কার্য্যক্রম ও ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। ব্যক্তিগত ভাবে ও সমষ্টিগত ভাবে যে যে কার্য্যক্রম ও ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে প্রত্যেক ভারতবাসীর আবার সু-সময় লাভ করা সম্ভব হইতে পারে, তাহাদের সংখ্যা বহু। তন্মধ্যে যে যে কার্য্যক্রম ও ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহাদের সংখ্যা দ্বাবিংশতি, যথা :—

(১) জমীর স্বাভাবিক উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি পাইয়া যাহাতে কোনরূপ সার ব্যবহার না করিলেও প্রতি বিঘা জমী হইতে অন্ততঃ ১২ মণ ধান অথবা গম অথবা তন্মূল্যের অপর কোন শস্যের উৎপাদন হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ;

(২) যে জমীর স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তি প্রতি বিঘায় ৪ মণ ধান অথবা গম অথবা তন্মূল্যেরও কম, সেই জমী যাহাতে কোন কৃষক চাষ না করেন এবং তাহার উৎপাদিকা-শক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তদনুরূপ ব্যবস্থা ;

(৩) নদীগুলি যাহাতে এত গভীর হয় যে, বর্ষাকালে বৃষ্টির পরিমাণ যতই বেশী হউক না কেন, তাহার দুই তীর প্লাবিত হইবার কোন সম্ভাবনা যাহাতে না থাকে, তাহার ব্যবস্থা ;

(৪) বিভিন্ন খাদ্যশস্য, শিল্পজাত ব্যবহার্য্য জিনিষ এবং গৃহনির্ম্মাণের উপকরণের বিভিন্ন মূল্যের মধ্যে যাহাতে সাদৃশ্য (parity) থাকে, তাহার ব্যবস্থা ;

(৫) সাংসারিক জীবিকানির্ব্বাহের খরচা ও পারিশ্রমিকের মধ্যে যাহাতে সাদৃশ্য (parity) থাকে, তাহার ব্যবস্থা ;

(৬) পরিশ্রমজাত দ্রব্যের মূল্যের তারতম্যানুসারে যাহাতে পারিশ্রমিকের তারতম্য স্থির করা হয়, তদনুরূপ ব্যবস্থা ;

(৭) যাহাতে ১৮ বৎসরের মধ্যে বালকগণের দশটী ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি কার্য্যক্ষম হয় এবং ঐ বয়সে যাহাতে তাহারা উপার্জ্জনক্ষম হয়, তদনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা ;

(৮) কোন্ খাদ্য, পানীয়, বায়ু, বাসস্থান এবং ব্যবহার্য্য বস্তু স্বাস্থ্যপ্রদ অথবা অস্বাস্থ্যপ্রদ, তাহা যাহাতে বালকগণ ১৮ বৎসরের মধ্যে পরিজ্ঞাত হইতে পারে এবং যাহাতে তাহাদের পরমায়ুবৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য থাকে, তদনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা ;

(৯) জীবিকার্জ্জনের জন্য দেশের মধ্যে কোথায় কত লোকের উপযোগী কি ব্যবস্থা আছে এবং ঐ ঐ ব্যবস্থানুসারে কি কি শিক্ষা করিলে জীবিকার্জ্জন করা সম্ভব হয়, তাহা যাহাতে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক বালক জানিতে পারে, তদনুরূপ ব্যবস্থা ;

(১০) যাহা যাহা শিক্ষা করিলে জীবিকার্জ্জন করা সম্ভব হয়, তাহা যাহাতে প্রাপ্তবয়স্ক বালকগণ ইচ্ছানুরূপ শিক্ষা করিতে পারে, তদনুরূপ ব্যবস্থা ;

(১১) যে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক বালক উচ্চশিক্ষা অর্থাৎ বিজ্ঞানশিক্ষাপ্রার্থী হইবে, তাহাদের হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় উচ্চশিক্ষার উপযোগী হইয়াছে কি না এবং মন ও বুদ্ধি ভবিষ্যতে তদনুরূপ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিবে কি না, তাহার পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং যাহাতে অনুত্তীর্ণ বালকগণ উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ লাভ না করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ;

(১২) কোন বস্তুবিষয়ক বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইলে ঐ বস্তুর কত রকম পরীক্ষা কিরূপ ভাবে করিতে হয় এবং নিজকেই বা কিরূপ ভাবে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা যাহাতে উচ্চশিক্ষার্থী যুবকগণ শিক্ষা করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ;

(১৩) বস্তুর কত রকম পরীক্ষা কিরূপ ভাবে করিতে হয়, অথবা নিজের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি কিরূপ ভাবে গঠিত করিতে হয়, তাহা না শিখিয়া যাহাতে কেহ উচ্চশিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হইতে না পারেন, তাহার ব্যবস্থা ;

(১৪) উচ্চশিক্ষিত না হইয়া যাহাতে কেহ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিতে, অথবা শিক্ষকতা করিতে, অথবা চিকিৎসা ও আইন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে, অথবা ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে অথবা বিচার ও শাসন-বিভাগে প্রবেশ লাভ করিতে না পারেন, তাহার ব্যবস্থা ;

(১৫) দেশের জলবায়ু যাহাতে কোনরূপে বিকৃত না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ;

(১৬) শ্রমজীবিগণ যাহাতে ১৮ বৎসর বয়সে উপার্জ্জন করিবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা ;

(১৭) দেশের মধ্যে যাহাতে মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৩০ জনের বেশী শিল্প, বাণিজ্য, ওকালতী, ডাক্তারী প্রভৃতি ব্যবসায়, শিক্ষকতা ও সরকারী চাকুরীর উপর নির্ভরশীল না হয়, তাহার ব্যবস্থা এবং যাহাতে কৃষি লাভবান্ হয়, তাহার ব্যবস্থা ;

(১৮) বালকগণের যাহাতে ১৮ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে বিবাহ হয়, তাহার ব্যবস্থা ;

(১৯) প্রকৃত ভাবে বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন যাঁহারা না করিতে পারেন, তাঁহারা যাহাতে হস্তপদাদির শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা অথবা শ্রমজীবী হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তাহার ব্যবস্থা ;

(২০) প্রকৃত ভাবে বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন যাঁহারা না করিতে পারেন, তাঁহারা যাহাতে মস্তিষ্কজীবী না হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা ;

(২১) কোন প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোক যাহাতে স্বামী ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের সহিত অথবা কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ যাহাতে স্বীয় স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীলোকের সহিত অবাধে মেলামেশা না করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা ;

(২২) প্রত্যেক স্ত্রীলোক যাহাতে সংসারের কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং কোন উপার্জ্জনের কার্য্যে প্রবৃত্ত না হন, তাহার ব্যবস্থা।

বর্ত্তমানে প্রায় প্রত্যেক ভারতবাসী নিজ নিজ সমস্যায় বিপর্য্যস্ত। অথচ কেন যে তাঁহার জীবনযাত্রায় প্রতিনিয়ত অশান্তিকর অবস্থার উদ্ভব হইতেছে, তাহা প্রায়শঃ কেহ ক্ষণিকের জন্যও দূরদর্শিতার সহিত চিন্তা করেন না। বেশীর ভাগ লোকই স্ব স্ব "পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল" (?) অথবা "অদৃষ্টে"র উপর দোহাই দিয়া যাহাতে ভগবানের দয়া হয়, অথবা পরজন্মে শুভাদৃষ্টের উদয় হয়, সংস্কারানুসারে সময় সময় তদনুরূপ কয়েকটী কথাবার্ত্তার আলোচনা করিয়া ক্ষণিকের জন্য স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহাদের চালচলন পর্য্যবেক্ষণ করিলে মনে করিতে হয় যে, তাঁহাদের মতে ভক্তিমূলক কয়েকটী কথাবার্ত্তার আলোচনা করিলে, অথবা স্ফুট ও অস্ফুট ধ্বনিতে গোটা কয়েক মন্ত্রোচ্চারণ করিলেই জীবনে শান্তি লাভ করা সম্ভব হইতে পারে। অথচ যাঁহারা ঐ ভক্তিমূলক কথাবার্ত্তার আলোচনায় অথবা স্ফুট ও অস্ফুট ধ্বনির মন্ত্রোচ্চারণে সময়াতিবাহিত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা যে প্রায়শঃই নিয়ত বুকের মধ্যে কোন না কোন জ্বালায় প্রতিনিয়ত বিধ্বস্ত হইতেছেন, তাহা কেহ দেখিয়াও দেখেন না। যদি এবংবিধ ভক্তিমূলক কথা-বার্ত্তাদিতে, অথবা স্ফুট ও অস্ফুট ধ্বনির মন্ত্রোচ্চারণেই মানুষের সুখের উদ্ভব হওয়া সম্ভব হইত, তাহা হইলে বাস্তব জগতে ঐ তথাকথিত ভক্ত মানুষগুলির হৃদয়ে কোনরূপ জ্বালার চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতে পারিত কি ?

"পূর্ব্ব জন্ম", "অদৃষ্ট", "ভক্তি" প্রভৃতির কোন বালাই পোষণ করেন না, এমন এক শ্রেণীর লোকও আজকাল ভারতবর্ষে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা মনে করেন যে, ঐ পূর্ব্ব-জন্ম, অদৃষ্ট এবং ভক্তির কথা ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছে বলিয়াই ভারতবাসীর যত দুঃখ এবং ঐ সমস্ত "অসভ্য" ভাবগুলি বিসর্জ্জন দিতে পারিলেই তাঁহাদের দুঃখ-নিশির অবসান হইবে। তাঁহাদের চালচলন দেখিলে মনে করিতে হয় যে, কোনরূপে নিজের ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য এক একটা বড় বড় চাকুরী সংগ্রহ অথবা কোন না কোন রকমের একটা লাভজনক ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারিলেই জীবনযাত্রায় আর কোন দুঃখের উদ্ভব হইতে পারিবে না। অথচ যাঁহারা বড় বড় চাকুরীয়া, ডাক্তার, উকিল এবং কারবারী হইতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের নিজ নিজ বুক এবং সংসার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেও দেখা যাইবে যে, তাঁহাদের কাহারও জ্বালা অপর কাহারও অপেক্ষা বিন্দুমাত্রও কম নহে।

কাযেই যিনি যাহা ভাবিয়াই নিজেকে বুদ্ধিমান্ মনে করুন, তাঁহার সেই ভাবনায় যে কোন না কোন অসঙ্গতি রহিয়াছে, তাহা বলিতেই হইবে।

উপরে যে দ্বাবিংশতি কার্য্য ও ব্যবস্থার কথা বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা যে প্রত্যেক ভারতবাসীর দুরবস্থার অপনোদন করা সম্ভব, তাহা আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় যুক্তি-দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছি।

কি করিলে ঐ দ্বাবিংশতি ব্যবস্থা দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, তাহার আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে, সমগ্র দেশবাসীর মধ্যে ঐক্য স্থাপিত করিতে পারিলে এবং প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইলে, অনায়াসেই দেশবাসীর ইচ্ছানুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে ইহা ব্যতীত আরও দেখা গিয়াছে যে, যাহাতে ভারতীয় জনসাধারণের প্রত্যেকের আর্থিক অসচ্ছলতা, অসন্তুষ্টি, পরমুখাপেক্ষিতা, অশান্তি, অস্বাস্থ্য এবং অকাল-মৃত্যুর সম্ভাবনা কমিয়া যায়, এতাদৃশ কর্ম্মতালিকা বর্ত্তমান কংগ্রেসের দ্বারা গৃহীত হইলে এবং যাহাতে ইংরাজ জনসাধারণের প্রকৃত স্বার্থের কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিতে পারে, তাহার কার্য্য, চিন্তা ও বাক্য ঐকান্তিক ভাবে জনসাধারণের দ্বারা বর্জ্জিত হইলে, দেশবাসীর মধ্যে প্রকৃত ঐক্য স্থাপিত হইতে পারে। এবং তাহা হইলে প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাও সম্ভব হইতে পারে। সমগ্র জনসাধারণের মিলনের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা সাধন করিতে হইলে "স্বাধীনতা", "অসহযোগ" এবং "আইন অমান্য" —এই তিনটী 'বাদ' যাহাতে সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তমান কংগ্রেস দ্বারা পরিবর্জ্জিত হয়, তাহা করিতে হইবে।

এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, এক্ষণে যাঁহারা বর্ত্তমান কংগ্রেসের প্রধান প্রধান পরিচালক, প্রায়শঃ তাঁহাদের উপর নির্ভর করিলে উপরোক্ত পরিবর্ত্তন সাধন সম্ভব হইবে না। তাঁহারা প্রায়শঃই তথাকথিত সুখের ক্রোড়ে লালিত পালিত এবং তাঁহাদের পক্ষে জনসাধারণের প্রকৃত ক্ষত কোথায়, তাহা যথাযথভাবে বুঝিয়া উঠা সম্ভব নহে। যিনি বর্ত্তমান কংগ্রেসের প্রধান হোতা, তাঁহার কোন্ কার্য্যের কি উদ্দেশ্য, তাহা সাধারণতঃ কাহারও বুঝিয়া উঠা সম্ভব নহে। তিনি নিজেও তাহা বুঝিতে পারেন কি না, তদ্বিষয়েও সন্দেহ করিবার কারণ আছে। কোন্ উদ্দেশ্যে কোন্ কার্য্যের অনুমোদন তিনি করিতেছেন, তাহা যদি তাঁহার সঠিকভাবে জানা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার "আভ্যন্তরীণ ডাক"-(inner call)এর অজুহাত দেখাইতে হইত না। তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে প্রায় চল্লিশ হাজার যুবক যেরূপ বেকার হইয়া হৃদয়বিদারক দুর্দ্দশায় উপনীত হইয়াছেন, অথচ তৎসত্ত্বেও তাহাদের অবস্থার উন্নতি সাধন করিবার কোন চেষ্টা না করিয়া তিনি যেরূপ ভাবে দেশীয় কুটীরশিল্পের উন্নতির নামে কংগ্রেস হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা লক্ষ্য করিলে তাঁহার ঐ "আভ্যন্তরীণ ডাক" আত্ম-প্রতারণামূলক বলিয়া মনে হয় না কি? যখন পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, যাহারা বংশপরম্পরায় কুটীরশিল্পের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে, এখন আর তাহারা পর্য্যন্ত কুটীরশিল্পের দ্বারা লাভবান্ হইতে পারিতেছে না এবং বাধ্য হইয়া চাকুরীপ্রার্থী হইতেছে, তখন যাঁহারা দেশের অবস্থার সংস্কার সাধন করিতে বসিয়া মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যুবকদিগকে কুটীরশিল্প অবলম্বন করিতে বলিতেছেন, তাঁহারা যে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানবিবর্জ্জিত, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

দেশে বর্ত্তমান সমাজতন্ত্রবাদ প্রচারিত হইলে ধনিক ও শ্রমজীবীদিগের মধ্যে যে বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বলিত হইবে, তাহার ফলে দেশব্যাপী অশান্তির সৃষ্টি হইতে পারে এবং জাতীয় ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেসের গঠনের আশা সুদূরপরাহত হইবে, ইহাও একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। অথচ বর্ত্তমান কংগ্রেসের প্রধান পাণ্ডাগণের মধ্যে অনেকের মস্তিষ্কেই ঐ সমাজতন্ত্রবাদ জাগ্রত হইয়াছে।

এতাদৃশ অবস্থায় বর্ত্তমান কংগ্রেসের সংস্কার সাধন করিয়া জাতীয় ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেসের গঠন করিতে হইলে দেশের জনসাধারণের এতদুদ্দেশ্যে ঐকান্তিক ভাবে সচেষ্ট হইতে হইবে। দেশবাসীর নিজ নিজ অবস্থা প্রতিদিন কিরূপ ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া পড়িতেছে, তাহা যখন তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবেন, তখন প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব হইবে।

এখন পর্য্যন্ত জনসাধারণের ধারণা যে, দেশে দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, ধনিক, মূর্খ, পণ্ডিত প্রভৃতি অনেক শ্রেণীর লোক আছেন এবং যাঁহারা নিজদিগকে দরিদ্র ও মূর্খ মনে করিয়া থাকেন, তাঁহাদের বিবেচনায় মধ্যবিত্ত, ধনিক এবং পণ্ডিতগণ অপেক্ষাকৃত সুখ ও শান্তিতে জীবন যাপন করিতেছেন। কিন্তু, যখন জনসাধারণের চক্ষু খুলিবে, তখন তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, মানবসমাজের বর্ত্তমান বিপদ্ সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক।

বর্ত্তমান জগতে কাহারও কাহারও ধনিকতার একটা অভিমান আছে বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ধনী বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা প্রায়শঃ এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। জগতে একদিন ছিল, যখন মানুষ সর্ব্বত্র জমীদারীর ও বাণিজ্যের সচ্ছলতা বংশপরম্পরায় উপভোগ করিতে পারিত, কিন্তু এখন আর তাদৃশ জমীদার অথবা বণিক্ কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। এক সঙ্গে তিন-পুরুষ অর্থাৎ পিতা, পুত্র ও পৌত্র ক্রমশঃ সমান সচ্ছলতা উপভোগ করিতেছেন, এতাদৃশ অবস্থা প্রায়শঃই পরিলক্ষিত হয় না। পিতা হয়ত বিপুল সম্পত্তি অর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন, পুত্রের অবস্থা তদপেক্ষা খারাপ হইয়াছে এবং পৌত্রকে পুনরায় চাকুরীর জন্ম দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে, ইহাই সাধারণতঃ দেখা যাইবে। যাঁহারা ধনকুবের বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের অবস্থার সংক্ষেপ বর্ণনা (balance sheet) পর্য্যালোচনা করিলেও প্রায়শঃ দেখা যাইবে যে, তাঁহাদের ধনবত্তা প্রায়শঃ কোন না কোন দ্রব্যভাণ্ডারের (stock) মূল্যের উপর নির্ভরশীল এবং প্রায় সকলেরই যেমন পাওনা থাকে, তেমনই আবার যথেষ্ট দেনাও থাকে। দ্রব্যভাণ্ডারের (stock) মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে যেমন তাঁহাদের অভিভূত হইবার কারণ উপস্থিত হয়, সেইরূপ আবার মহাজন ও পাওনাদার প্রভৃতির প্রাপ্য এককালীন পরিশোধ করিতে হইলে তাঁহারা বিব্রত হইয়া পড়েন। কাযেই ঐ ধনকুবেরগণের ধনবত্তা পাওনাদারদিগের অনুগ্রহ ও বাজার-দরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এবং তাহা সর্ব্বদাই টলটলায়মান। যাঁহারা নিজ নিজ পরিশ্রমশীলতার ফলে ধনার্জ্জন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ প্রাচুর্য্য উপভোগ করিতে সমর্থ হন, তাঁহারাও হয় নিজ অস্বাস্থ্য, নতুবা পারিবারিক অশান্তিতে সর্ব্বদাই বিব্রত থাকেন।

ধন সম্বন্ধে যেরূপ প্রকৃত ধনী না থাকা সত্ত্বেও একটা ধনিকতার অভিমান বর্ত্তমান জগৎকে বিড়ম্বিত করিতেছে, পাণ্ডিত্য সম্বন্ধেও তেমনই অধুনা আর প্রকৃত পণ্ডিত দেখা না গেলেও পাণ্ডিত্য অভিমান যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃত পাণ্ডিত্য বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা যদি জগতে একজন মানুষেরও থাকিত, তাহা হইলে মানবসমাজ এতাদৃশ অবস্থায় উপনীত হইতে পারিত না।

আগত দুর্দ্দৈব হইতে রক্ষা পাইতে হইলে মানবসমাজের উপরোক্ত সার্ব্বজনীন দুরবস্থার বাস্তবতা জনসাধারণকে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে হইবে এবং যাঁহারা সমাজের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান্ অথচ পাণ্ডিত্য এবং ধনবত্তার অভিমান-পরিশূন্য, তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে।

মানব-সমাজের মধ্যে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান্, তাঁহাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাঁহারা তাঁহাদের তথাকথিত পাণ্ডিত্য এবং ধনবত্তার অভিমান বশতঃ জনসাধারণের সহিত সর্ব্বান্তঃকরণে মিলিত হইতে পারিতেছেন না এবং জনসাধারণের সহিত সর্ব্বান্তঃকরণে মিলিত হইতে পারিতেছেন না বলিয়াই মানব-সমাজের প্রত্যেকের অবস্থা দিন দিন ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া পড়িতেছে। তাঁহারা যে অযথাভাবে নিজদিগকে পণ্ডিত ও ধনবান বলিয়া মনে করেন, এই সত্যটুকু যেদিন তাঁহারা আত্মপরীক্ষাদ্বারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন, সেই দিন তাঁহাদের অভিমান দূরে চলিয়া যাইবে এবং দেখিতে পাইবেন যে, যে অগণিত জনসমাজ তাঁহাদের দিকে তাকাইয়া একদিন নিশ্চিন্ত ছিল, আজ তাহারা অনশনে, অর্দ্ধাশনে, অশান্তিতে, অস্বাস্থ্যে এবং অকালমৃত্যুতে কি ভীষণ ভাবে জর্জ্জরিত হইতেছে।

এই বুদ্ধিমান্ শ্রেণীর লোক যদি এখনও স্ব স্ব অভিমান, মানুষের উপর বিদ্বেষ এবং সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের চেষ্টাতেই প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে এবং তাহা হইলে তাঁহাদের প্রাধান্য এখনও বজায় থাকিতে পারে। নতুবা কৃষক প্রভৃতি ঐ অগণিত শ্রমজীবী সম্প্রদায় অনশন, অর্দ্ধাশন, অশান্তি, অস্বাস্থ্য এবং অকালমৃত্যুর তাড়নায় অদূরভবিষ্যতে উচ্ছৃঙ্খলভাবে জাগিয়া উঠিতে বাধ্য হইবে এবং তখন আর এই তথাকথিত বুদ্ধিমানগণের আত্মরক্ষার জন্য লুক্কায়িত হইবার স্থান পর্য্যন্ত মিলিয়া উঠা দুষ্কর হইবে।

পাণ্ডিত্য, ধন ও প্রভুত্ব অভিমানী তথাকথিত বুদ্ধিমান্‌গণ এই সত্যটুকু বুঝিতে পারিবেন কি না, তদ্বিষয়ে অবশ্য আমাদের সন্দেহ আছে।

প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেস সংগঠনের মূল নীতি কি হওয়া উচিত তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা

করিয়াছি। ঐ মূল নীতি সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপতঃ নিম্নলিখিত কথায় বিবৃত হইতে পারে :—

(১) জনসাধারণের বিবিধ বিষয়ক দুরবস্থার সংবাদ সংগ্রহ করা এবং তাহা যাহাতে গভর্ণমেণ্টের বিবেচনাযোগ্য হয়, তাহার চেষ্টা করা ;

(২) জনসাধারণের প্রতি গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের অনাচারের সংবাদ সংগ্রহ করা এবং গভর্ণমেণ্ট যাহাতে তাহার প্রতিবিধান করেন, তাহার চেষ্টা করা ;

(৩) কি কি কারণে জনসাধারণের দুরবস্থার উদ্ভব হইতেছে, তাহার গবেষণা করা এবং ঐ গবেষণামূলক তথ্যগুলির প্রতি গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করা ;

(৪) কি করিলে জনসাধারণের দুরবস্থা আমূলভাবে দূরীভূত হইতে পারে, তাহার গবেষণা করা এবং ঐ তথ্যগুলির প্রতি গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করা ;

(৫) যাহা যাহা করিলে জনসাধারণের দুরবস্থা আমূলভাবে দূরীভূত হইতে পারে, তাহা যতদিন পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্টের দ্বারা পরিগৃহীত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কি করিলে জনসাধারণের দুরবস্থা সাময়িক ভাবে উপশমিত হইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করা এবং তৎসম্বন্ধে জনসাধারণকে উপদেশ দেওয়া ;

(৬) দেশের সর্ব্বসাধারণ যাহাতে নিজ নিজ অবস্থা যথাযথভাবে বুঝিতে পারেন, তদ্বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করা এবং তাহার প্রচার করা ;

(৭) শিক্ষা, সাহিত্য, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও গভর্ণমেণ্টের পরিচালনা কিরূপ হইলে সর্ব্বসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় তাহা প্রকৃত হিতকর হইতে পারে, তাহার গবেষণা করা এবং তদ্বিষয়ক গ্রন্থ প্রচার করা ;

(৮) জনসাধারণের প্রকৃত হিতকর শিক্ষা-বিজ্ঞান, সাহিত্য-বিজ্ঞান, কৃষি-বিজ্ঞান, শিল্প-বিজ্ঞান, বাণিজ্য-বিজ্ঞান, রাষ্ট্রপরিচালনা-বিজ্ঞান প্রভৃতিতে যাহাতে বুদ্ধিমান্ লোক শিক্ষিত হইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করা এবং যাঁহারা ঐ ঐ প্রকৃত লোক-হিতকর বিজ্ঞানে শিক্ষিত হইবেন, তাঁহারা যাহাতে গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রিত্ব প্রভৃতি প্রধান প্রধান দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করা ;

(৯) বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের নির্ব্বাচন-প্রণালীতে মানুষে মানুষে ডিমোক্রেসির নামে যে সমস্ত দ্বন্দ্ব-কলহ এবং বিদ্বেষের উদ্ভব হইতেছে, তাহা যাহাতে না হইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করা এবং তদনুরূপ কার্য্য করা ;

(১০) প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ যাহাতে প্রত্যেক প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সমূহের সভ্যপদ লাভ করিতে পারেন, তাহার উপায় উদ্ভাবন করা এবং তদনুরূপ কার্য্য করা ;

(১১) জনসাধারণের প্রকৃত হিতকর শিক্ষা-বিজ্ঞান, সাহিত্য-বিজ্ঞান, কৃষি-বিজ্ঞান, শিল্প-বিজ্ঞান, বাণিজ্য-বিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রপরিচালনা-বিজ্ঞান প্রভৃতিতে যাঁহারা যথার্থভাবে শিক্ষিত হন নাই, তাঁহারা যাহাতে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সমূহের সভ্য অথবা মন্ত্রী অথবা গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত না হইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করা ;

(১২) প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণের মধ্যে যাঁহারা জনসাধারণের প্রকৃত হিতকর শিক্ষা-বিজ্ঞান প্রভৃতিতে যথার্থভাবে শিক্ষিত, তাঁহারা যাহাতে গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রিত্বলাভ করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করা ;

(১৩) প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সমূহের যাঁহারা সভ্য এবং মন্ত্রী হইবেন, তাঁহারা যাহাতে একযোগে জনসাধারণের দুরবস্থার আন্দোলনকর ব্যবস্থাসমূহ প্রবর্ত্তিত করিবার আয়োজন করেন, তাহার চেষ্টা করা ;

(১৪) প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সমূহের যাঁহারা সভ্য এবং মন্ত্রী হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে অথবা

জনসাধারণের মধ্যে যে সমস্ত আত্ম-বিচ্ছেদকর প্রস্তাবের সম্ভাবনা উত্থিত হইবে, তাহা যাহাতে আপোষে মীমাংসিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা ;

(১৫) যাহাতে ইংরাজ প্রভৃতি বিদেশীয়গণের প্রতি কোন-রূপ বিদ্বেষের উদ্ভবকর মনোবৃত্তি জনসাধারণের মধ্যে উত্থিত না হইতে পারে, অথবা লোকহিতকর ব্যবস্থাগুলি প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, তাহার আয়োজন করা ;

(১৬) যাহাতে ইংরাজ প্রভৃতি বিদেশীয়গণের জীবনযাত্রায় ভারতীয়গণের দ্বারা যথাসম্ভব সহায়তা সাধিত হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা ;

(১৭) যাহাতে গভর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যের সহিত সংঘর্ষের উদ্ভব হইতে পারে, তাহা যথাসম্ভব বর্জ্জন করা ;

(১৮) যথার্থ লোকহিতকর গভর্ণমেণ্টের পরিচালনা করিতে হইলে গভর্ণমেণ্টের পক্ষেই যে এই শ্রেণীর জাতীয় মহাসম্মেলনের একান্ত প্রয়োজন, তাহা ক্রমশঃ গভর্ণমেণ্টের পরিচালকদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া এবং তাঁহারা যাহাতে জাতীয় মহাসম্মেলনের ব্যয়সঙ্কুলনার্থ অর্থসাহায্য করিতে সম্মত হন, তাহার চেষ্টা করা ;

(১৯) দেশের মধ্যে অপরাপর যে সমস্ত সাধারণ হিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহ বিদ্যমান আছে, সেগুলি যাহাতে কংগ্রেসের সহিত মিলিত হয়, তাহার চেষ্টা করা ;

প্রকৃত জাতীয় সম্মেলনের প্রতিষ্ঠা সাধন করিতে হইলে, উপরোক্ত উনবিংশতি মূল নীতি ছাড়া নিম্নলিখিত সত্য সমূহ স্মরণ রাখিতে হইবে।

(১) কংগ্রেসের সংগঠন যাহাতে গ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে প্রত্যেক গ্রামে, ইউনিয়ন-বোর্ডে, মহকুমায় এবং জিলায় কংগ্রেসের শাখা স্থাপন করিবার প্রয়োজন হইবে ;

(২) কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও কর্ম্মতালিকা সফল করিবার জন্য যাহা যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহার দায়িত্বভার যাহাতে স্থানে স্থানে এক এক জন যথোপযুক্ত বিদ্যা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির উপর অর্পিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে ;

(৩) যাহাতে কর্ম্মকারের কার্য্য কুম্ভকারের হস্তে, অথবা কুম্ভকারের কার্য্য কর্ম্মকারের হস্তে অর্পিত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে ;

(৪) নির্লোভ ও সত্যপরায়ণ লোক যাহাতে কংগ্রেসের দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মভার প্রাপ্ত হন, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে, যাঁহারা স্ব স্ব পরিবারের জীবিকার্জ্জনের জন্য বৃত্তিহীন অথবা যাঁহারা স্ব স্ব বৃত্তিদ্বারা নিজ পরিবারের ভরণপোষণোপযোগী যথেষ্ট উপার্জ্জনে অক্ষম, তাঁহারা যাহাতে কংগ্রেসের কোন দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার প্রাপ্ত না হন, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে। যাঁহারা নিজ পরিবারের ভরণপোষণে অক্ষম, তাঁহাদের হাতে জনসাধারণের কার্য্য অর্পিত হইলে অনাচার প্রবিষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকিবে ;

(৫) যাঁহারা নিজ পরিবারের ভরণপোষণে অক্ষম, তাঁহাদের হাতে কংগ্রেসের কোন কার্য্যভার অর্পণ করিতে হইলে, তাঁহারা যাহাতে নিজ পরিবারের ভরণপোষণ করিবার উপযোগী বেতন পাইতে পারেন, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইতে হইবে।

গ্রাম্য শাখাসমূহের সংগঠন ও দায়িত্ব-সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গে যাহা যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, জনসাধারণের দুরবস্থার সংবাদ এবং গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণের অনাচারের সংবাদ সংগ্রহ করিবার দায়িত্ব গ্রাম্য শাখাসমূহের উপর ন্যস্ত হওয়া উচিত।

ইউনিয়ন-বোর্ড শাখাসমূহের সংগঠন ও দায়িত্ব-সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গে যাহা যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, কি কি কারণে জনসাধারণের দুরবস্থার উদ্ভব হইতেছে এবং কি করিলে জনসাধারণের দুরবস্থা আমূলভাবে দূরীভূত হইতে পারে, তাহার গবেষণার ভার ইউনিয়ন-বোর্ডের শাখাসমূহের উপর ন্যস্ত হওয়া উচিত।

অনেকে মনে করেন যে যাঁহারা জন্মাবধি সহরে বাস করেন, তাঁহারা যত সভ্য ও বুদ্ধিমান্, পল্লীগ্রামবাসীদিগের পক্ষে তত সভ্য ও বুদ্ধিমান্ হওয়া সম্ভব নহে।

আমাদের মতে এই কথা সত্য নহে। কি হইলে মানুষকে যথাযথভাবে "সভ্য" অথবা "অসভ্য" বলিয়া আখ্যাত করা যাইতে পারে, তাহা ইতিপূর্ব্বে আমরা প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা করিয়াছি। সেই প্রসঙ্গে দেখান হইয়াছে যে, যে-মানুষ নিজ জীবিকার জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে বাধ্য হন, তাঁহাকে উচ্চ শ্রেণীর সভ্য মানুষ বলিয়া অভিহিত করিলে, "সভ্য" শব্দটীর অপমান করা হয়। যিনি স্বাবলম্বনে নিজ জীবিকার্জ্জন করিতে পারেন না, তাঁহাকে হয় ভিক্ষা, নতুবা দাসত্ব, নতুবা চুরি, নতুবা ডাকাতি, নতুবা প্রবঞ্চনার দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে হয়; ভিক্ষুক, দাস, চোর, ডাকাত এবং প্রবঞ্চকের জীবন কখনও দাতা, প্রভু ও সাধুর জীবন হইতে বরণীয় হইতে পারে না। মানুষের জীবিকার জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহাদের আদান-প্রদান সহরে হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহাদের উৎপত্তি হইয়া থাকে পল্লীগ্রামে এবং তাহা কখনও সহরে উৎপন্ন হয় না। কাযেই পল্লীগ্রামের সঙ্গে যাঁহারা সংশ্লিষ্ট, তাঁহাদের পক্ষে স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব এবং যাঁহারা একান্ত সহরবাসী, তাঁহাদের পক্ষে যথাযথভাবে স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব নহে। এতাদৃশ অবস্থায় কাহাদের পক্ষে প্রকৃত সভ্য হওয়া সম্ভব, তাহা পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখিবেন।

যাঁহারা চিরদিন সহরবাসী, তাঁহাদের পক্ষে জনসাধারণের দুরবস্থার উদ্ভব কেন হইতেছে এবং কি করিলে তাহার অপনয়ন হইতে পারে, তাহাও বুঝিয়া উঠা সম্ভব নহে। কি উপায়ে মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণভাবে না জানা থাকিলে, কেন তাহাদের উৎপত্তি হইতেছে না, তাহা বুঝা যায় না। এই শ্রেণীর বাস্তব সত্যগুলি পল্লীগ্রামবাসিগণের পক্ষে যত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা সম্ভব, সহরবাসিগণের পক্ষে ততটা পরিজ্ঞাত হওয়া কখনও সম্ভব নহে। কাযেই কি কি কারণে জনসাধারণের দুরবস্থার উদ্ভব হইতেছে এবং কি করিলে তাহার অপনয়ন সম্ভব হইতে পারে, তাহা নির্ণয়ের ভার যদি ইউনিয়ন-বোর্ড শাখা-সমূহের কর্ম্মিগণ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে উদ্দেশ্য সফল হইবার আশা করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় জাগরণাবধি সহরবাসিগণ এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আসিতেছেন, অথচ পল্লীবাসিগণ তৎসম্বন্ধে উদাসীন রহিয়াছেন। কর্ম্মকারের কার্য্য কুম্ভকারের হস্তে পড়ায় কতকগুলি কিম্ভূতকিমাকার কথার উদ্ভব হইয়াছে মাত্র, কোন ফলোদয় হয় নাই।

অতঃপর আমরা মহাকুমা-শাখাসমূহের সংগঠন ও দায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

কংগ্রেসের মূল দায়িত্ব-বণ্টনের নীতি

মহকুমা-শাখাসমূহ কিরূপভাবে সংগঠিত হওয়া উচিত এবং কি কি দায়িত্ব তাহাদের স্কন্ধে ন্যস্ত হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে একবার দেখিতে হইবে যে, সর্ব্বসমেত যে যে দায়িত্ব প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেসের নির্ব্বাহ করিতে হইবে, তাহা মহকুমা-শাখা, জিলা-শাখা, প্রাদেশিক শাখা এবং কেন্দ্রীয় সভার মধ্যে কিরূপভাবে বণ্টন করিলে কর্ত্তব্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে।

প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেসের উল্লেখযোগ্য মূল দায়িত্ব ঊনবিংশতি প্রকার, তাহা আমরা আগেই দেখিয়াছি। তাহাদের মধ্যে প্রথম চারিটী অর্থাৎ—(১) জনসাধারণের বিবিধ-বিষয়ক দুরবস্থার সংবাদ সংগ্রহ করার ভার; (২) জনসাধারণের প্রতি গভর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারিগণের অনাচারের সংবাদ সংগ্রহ করার ভার; (৩) কি কি কারণে জনসাধারণের দুরবস্থার উদ্ভব হইতেছে, তাহার গবেষণার ভার, এবং (৪) কি করিলে জনসাধারণের দুরবস্থা আমূলভাবে দূরীভূত হইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণের ভার—গ্রাম্য এবং ইউনিয়ন-বোর্ড শাখাসমূহের উপর অর্পিত হইলে উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে, তাহা দেখান হইয়াছে।

অবশিষ্ট পনরটী দায়িত্ব এবং তৎসহ উপরিলিখিত প্রথম দুইটী অর্থাৎ জনসাধারণের দুরবস্থামূলক সংবাদ সংগ্রহ এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণের অনাচারের সংবাদ গভর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর করিবার দায়িত্ব কোন্ কোন্ শাখার উপর কিরূপভাবে অর্পিত হওয়া উচিত, এক্ষণে তাহা বিবেচনা করিতে হইবে।

নিম্নলিখিত দায়িত্বগুলি কেন্দ্রীয় সভার উপর ন্যস্ত হওয়া উচিত:—

(১) জনসাধারণের বিবিধ-বিষয়ক দুরবস্থার সংবাদ যাহাতে গভর্ণমেণ্টের বিবেচনাযোগ্য হয়, তাহার কার্য্য;

(২) জনসাধারণের প্রতি গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারিগণের অনাচারের প্রতিবিধান যাহাতে গবর্ণমেন্টের দ্বারা পরিগৃহীত হয়, তাহার কার্য্য ;

(৩) জনসাধারণের দুরবস্থার কারণ যাহাতে গবর্ণমেন্টের চিন্তার যোগ্য হয়, তাহার ব্যবস্থা ;

(৪) জনসাধারণের দুরবস্থা দূরীভূত করিবার উপায়গুলি যাহাতে গবর্ণমেন্টের দ্বারা পরিগৃহীত হয়, তাহার ব্যবস্থা ;

(৫) যাহাতে জনসাধারণের দুরবস্থা সাময়িকভাবে উপশমিত হইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করার কার্য্য ;

(৬) দেশের সর্ব্বসাধারণ যাহাতে নিজ নিজ অবস্থা যথাযথভাবে বুঝিতে পারেন, তদ্বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করার কার্য্য ;

(৭) কি হইলে শিক্ষা, সাহিত্য, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য এবং রাষ্ট্র-পরিচালনা বাস্তব ক্ষেত্রে লোকহিতকর হইতে পারে, তাহার গবেষণার কার্য্য ;

(৮) দেশের বুদ্ধিমান্‌গণকে লোকহিতকর শিক্ষা-বিজ্ঞান, সাহিত্য-বিজ্ঞান, কৃষি-বিজ্ঞান, শিল্প-বিজ্ঞান, বাণিজ্য-বিজ্ঞান, রাষ্ট্রপরিচালনা-বিজ্ঞান শিখাইবার কার্য্য ;

(৯) প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সমূহের যাঁহারা সভ্য এবং মন্ত্রী হইবেন, তাঁহারা যাহাতে একযোগে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহার ব্যবস্থা ;

(১০) প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সমূহের যাঁহারা সভ্য এবং মন্ত্রী হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে অথবা জনসাধারণের মধ্যে যে-সমস্ত আত্মবিচ্ছেদকর প্রস্তাবের সম্ভাবনা উপস্থিত হইবে, তাহা যাহাতে আপোষে মীমাংসা হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ;

(১১) যাহাতে ইংরাজ প্রভৃতি বিদেশীয়গণের জীবনযাত্রায় ভারতীয়গণের দ্বারা যথাসম্ভব সহায়তা সাধিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ;

(১২) যাহাতে গবর্ণমেন্টের কোন কার্য্যের সহিত কংগ্রেসের কোন সংঘর্ষ উদ্ভব না হয়, তাহার ব্যবস্থা ;

(১৩) এতাদৃশ কংগ্রেসের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যাহাতে গবর্ণমেন্ট অবহিত হন এবং ইহার ব্যয়নির্ব্বাহের সহায়তা করেন, তাহার চেষ্টা ও ব্যবস্থা।

প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসনাল কংগ্রেসের কেন্দ্রীয়-শাখার যে তেরটী দায়িত্বের কথা উপরে বলা হইল, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রত্যেকটী সমগ্র ভারতবর্ষসম্পর্কিত। ভারতের প্রত্যেক গ্রামে জনসাধারণের যে সকল দুরবস্থার সংবাদ শুনা যাইবে, তাহার প্রতিবিধানকল্পে প্রত্যেক প্রদেশ হইতে যদি একই ভাবের উপায়ের কথা একই প্রণালীতে গবর্ণমেন্টের নিকট উত্থাপিত না হয়, তাহা হইলে প্রাদেশিক বিদ্বেষের সম্ভাবনা থাকিতে পারে। বিভিন্ন রকমের প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে কোন্‌টী ভাল অথবা কোন্‌টী মন্দ, তাহা গবর্ণমেন্টের পক্ষে নির্দ্ধারণ করা জটিল বলিয়া অনুভূত হইতে পারে। একই কেন্দ্র হইতে একই রকমের প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে ঐ দুইটী আশঙ্কা থাকিতে পারে না। সেইরূপ আবার শিক্ষা-বিজ্ঞান, সাহিত্য-বিজ্ঞান, কৃষি-বিজ্ঞান প্রভৃতি কিরূপ ধরণের হইলে লোকহিতকর হইতে পারে, তাহার মীমাংসা একই ধরণের হওয়া সঙ্গত, নতুবা বিভিন্ন প্রদেশের জন্য বিভিন্ন রকমের শিক্ষা-বিজ্ঞান, কৃষি-বিজ্ঞান প্রভৃতি নির্দ্ধারিত হইলে প্রাদেশিক বিদ্বেষের উদ্ভব হইতে পারে এবং গবর্ণমেন্টের পক্ষে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করাও অসুবিধা-জনক হইবার সম্ভাবনা থাকিবে। এইরূপভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ঐ তেরটী দায়িত্বের প্রত্যেকটী কেন্দ্রীয় সভা ব্যতীত আর কোনও শাখা-সভার দ্বারা সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হওয়া সম্ভব নহে।

প্রাদেশিক শাখাগুলির হস্তে নিম্নলিখিত দায়িত্বগুলি ন্যস্ত হওয়া উচিত :—

(১) জনসাধারণের বিবিধ-বিষয়ক দুরবস্থার সংবাদ যাহাতে যথাযথভাবে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহার ব্যবস্থা ;

(২) জনসাধারণের প্রতি গবর্ণমেন্ট-কর্ম্মচারিগণের অনাচারের সংবাদ যাহাতে যথাযথভাবে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহার ব্যবস্থা ;

(৩) জনসাধারণের দুরবস্থার কারণ-সম্বন্ধীয় গবেষণাগুলি

যাহাতে যথাযথভাবে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তাহার ব্যবস্থা ;

(৪) জনসাধারণের দুরবস্থা আমূল ভাবে অপনোদন করিবার উপায়-সম্বন্ধীয় গবেষণাগুলি যাহাতে যথাযথভাবে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তাহার ব্যবস্থা ;

(৫) জনসাধারণের দুরবস্থা সাময়িক ভাবে অপনোদন করিবার উপায়সমূহ যাহাতে তাহাদের মধ্যে প্রচারিত হয়, তাহার ব্যবস্থা ;

(৬) দেশের সর্ব্বসাধারণের নিজ নিজ অবস্থা যথাযথ-ভাবে বুঝিবার উপযোগী গ্রন্থগুলি প্রচার করিবার ব্যবস্থা ;

(৭) প্রকৃত শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, বাণিজ্য ও রাষ্ট্র-পরিচালনা-বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তকগুলি প্রচার করিবার এবং তাহা যাহাতে দেশের বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ শিক্ষা করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা ;

(৮) যাঁহারা প্রকৃত শিক্ষা-বিজ্ঞান প্রভৃতিতে শিক্ষিত হইবেন, তাঁহারা যাহাতে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ও কাউন্সিলের মন্ত্রিত্ব প্রভৃতি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা ;

(৯) প্রাদেশিক কাউন্সিল, মিউনিসিপ্যালিটী, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড প্রভৃতির বর্ত্তমান নির্ব্বাচন-পদ্ধতির ফলে দেশের জনসাধারণের মধ্যে যে সমস্ত দ্বন্দ্ব-কলহ এবং বিদ্বেষের উদ্ভব হইতেছে, তাহা যাহাতে না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ;

(১০) প্রাদেশিক কাউন্সিল প্রভৃতিতে যাহাতে কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ সভ্য হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা ;

(১১) যাঁহারা শিক্ষা-বিজ্ঞান, সাহিত্য-বিজ্ঞান, কৃষি-বিজ্ঞান, শিল্প-বিজ্ঞান, বাণিজ্য-বিজ্ঞান এবং রাষ্ট্র-পরিচালনা-বিজ্ঞান প্রভৃতিতে শিক্ষিত হন নাই, তাঁহারা যাহাতে প্রাদেশিক কাউন্সিল প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠান সমূহের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত না হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা ;

(১২) প্রাদেশিক কাউন্সিল সমূহের যাঁহারা সভ্য এবং মন্ত্রী হইবেন, তাঁহারা যাহাতে একযোগে জন-সাধারণের দুরবস্থার অপনোদনকর ব্যবস্থাসমূহ প্রবর্ত্তিত করিবার আয়োজন করেন, তাহার ব্যবস্থা ;

(১৩) প্রাদেশিক কাউন্সিল সমূহের যাঁহারা সভ্য এবং মন্ত্রী হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে অথবা জনসাধারণের মধ্যে যে সমস্ত আত্মবিচ্ছেদকর প্রস্তাবের সম্ভাবনা উত্থিত হইবে, তাহা যাহাতে আপোষে মীমাংসিত হয়, তাহার ব্যবস্থা ;

(১৪) যাহাতে প্রত্যেক প্রদেশে ইংরাজ প্রভৃতি বিদেশীয়-গণের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষের মনোবৃত্তি জন-সাধারণের মধ্যে উত্থিত না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ;

(১৫) যাহাতে প্রত্যেক প্রদেশে ইংরাজ প্রভৃতি বিদেশীয়-গণের উপার্জ্জনের যথাসম্ভব সহায়তা সম্পাদিত হয়, তাহার ব্যবস্থা ;

(১৬) যাহাতে প্রত্যেক প্রদেশে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের সহিত কংগ্রেসের কার্য্যের কোন সংঘর্ষ উপস্থিত না হয়, তাহার ব্যবস্থা ;

(১৭) যাহাতে প্রাদেশিক গবর্ণর সমূহ কংগ্রেসের প্রয়ো-জনীয়তা বুঝিতে পারেন এবং তাহার আর্থিক সহায়তায় প্রবৃত্ত হন, তাহার ব্যবস্থা ;

(১৮) প্রদেশমধ্যে অপরাপর যে সমস্ত সাধারণ হিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহ বিদ্যমান আছে, তাহা যাহাতে কংগ্রেসের সহিত মিলিত হয়, তাহার ব্যবস্থা ;

উপরোক্ত সমস্ত দায়িত্ব প্রদেশ-সম্বন্ধীয়। কাযেই তাহা যে প্রাদেশিক শাখাসমূহের উপর অর্পণযোগ্য, ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

জিলা-শাখাগুলির হস্তে নিম্নলিখিত দায়িত্বসমূহ ন্যস্ত হওয়া উচিত :—

(১) জনসাধারণের দুরবস্থার সংবাদ যাহাতে গবর্ণ-মেণ্টের জিলা-কর্ত্তৃপক্ষগণের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তাহার চেষ্টা করা ;

(২) জনসাধারণের প্রতি গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের

অনাচারের সংবাদ যাহাতে জিলা-কর্তৃপক্ষগণের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তাহার ব্যবস্থা ;

(৩) কি কি কারণে প্রত্যেক জিলার জনসাধারণের দুরবস্থার উদ্ভব হইতেছে, তাহার গবেষণা করা ;

(৪) কি কি করিলে জনসাধারণের দুরবস্থা আমূলভাবে দূরীভূত হইতে পারে, তাহার গবেষণা করা ;

(৫) যাহা যাহা করিলে প্রত্যেক জিলার জনসাধারণের দুরবস্থা সাময়িক ভাবে উপশমিত হইতে পারে, তাহার উপদেশ দেওয়া ;

(৬) প্রত্যেক জিলার জনসাধারণ যাহাতে নিজ নিজ অবস্থা বুঝিতে পারেন, তাহা যে সমস্ত গ্রন্থে বিবৃত হইবে, তাহার প্রচার করা ;

(৭) প্রকৃত শিক্ষা, সাহিত্য, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য এবং রাষ্ট্র-পরিচালনাবিজ্ঞান প্রত্যেক জিলার বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ যাহাতে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন; তাহার ব্যবস্থা করা ;

(৮) প্রত্যেক জিলার মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত লোকহিতকর বিজ্ঞানাদিতে শিক্ষিত হইবেন, তাঁহারা যাহাতে গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রিত্ব প্রভৃতি প্রধান প্রধান দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করা ;

(৯) প্রত্যেক জিলার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি নির্ব্বাচনের বর্ত্তমান পদ্ধতির ফলে জনসাধারণের মধ্যে যে সমস্ত দ্বন্দ্ব-কলহ এবং বিদ্বেষের উদ্ভব হয়, তাহা যাহাতে না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা ;

(১০) কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ যাহাতে প্রত্যেক প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সমূহের সভ্যপদ লাভ করিতে পারেন ও ঐ জিলাস্থিত, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড প্রভৃতির সভ্যপদ লাভ করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা ;

(১১) প্রত্যেক জিলার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতির যাঁহারা সভ্য হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে এবং জনসাধারণের মধ্যে যে সমস্ত আত্মবিচ্ছেদকর ঘটনার সম্ভাবনা উত্থিত হইবে, তাহা যাহাতে আপোষে মীমাংসিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা ;

(১২) যাহাতে জিলার মধ্যে ইংরাজ প্রভৃতি বিদেশীয়গণের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষকর মনোবৃত্তি জনসাধারণের মধ্যে জাগ্রত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা ;

(১৩) প্রত্যেক জিলার মধ্যে অপরাপর যে-সমস্ত সাধারণের হিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহ বিদ্যমান আছে, সেগুলি যাহাতে কংগ্রেসের সহিত মিলিত হয়, তাহার চেষ্টা করা ;

উপরোক্ত সমস্ত দায়িত্ব জিলা-সম্বন্ধীয়, কাযেই সেগুলি যে জিলা-শাখাসমূহের উপর অর্পণযোগ্য,ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

মহকুমা-শাখাগুলির হস্তে নিম্নলিখিত দায়িত্বসমূহ ন্যস্ত হওয়া উচিত :—

(১) প্রত্যেক মহকুমার জনসাধারণের বিবিধ বিষয়ক দুরবস্থার সংবাদ যাহাতে গবর্ণমেণ্টের মহকুমার কর্তৃপক্ষগণের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তাহার ব্যবস্থা করা ;

(২) প্রত্যেক মহকুমার জনসাধারণের প্রতি গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের অনাচারের সংবাদ যাহাতে মহকুমা-কর্তৃপক্ষগণের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তাহার ব্যবস্থা করা ;

(৩) কি কি কারণে মহকুমার জনসাধারণের দুরবস্থার উদ্ভব হইতেছে, তাহার গবেষণা করা ;

(৪) কি করিলে জনসাধারণের দুরবস্থা আমূলভাবে দূরীভূত হইতে পারে, তাহার গবেষণা করা ;

(৫) যাহা করিলে প্রত্যেক মহকুমার জনসাধারণের দুরবস্থা সাময়িকভাবে উপশমিত হইতে পারে, তাহার উপদেশ দেওয়া ;

(৬) প্রত্যেক মহকুমার জনসাধারণ যাহাতে নিজ নিজ অবস্থা যথাযথভাবে বুঝিতে পারেন, তাহা যে সমস্ত গ্রন্থে বিবৃত হইবে, সেগুলির প্রচার করা ;

(৭) প্রকৃত সাহিত্য, শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য এবং রাষ্ট্র-পরিচালনাবিজ্ঞান প্রত্যেক মহকুমার বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ যাহাতে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা ;

(৮) প্রত্যেক মহকুমার মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত লোক-হিতকর বিজ্ঞানাদিতে শিক্ষিত হইবেন, তাঁহারা যাহাতে গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রিত্ব প্রভৃতি প্রধান প্রধান দায়িত্বপূর্ণ পদ পাইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করা ;

(৯) প্রত্যেক মহকুমার লোক্যাল বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি নির্ব্বাচনের বর্ত্তমান পদ্ধতির ফলে যে সমস্ত দ্বন্দ্ব-কলহ এবং বিদ্বেষের উদ্ভব জনসাধারণের মধ্যে হইতে পারে, তাহা যাহাতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা ;

(১০) প্রত্যেক মহকুমার জনসাধারণের মধ্যে আত্ম-বিচ্ছেদকর যে-সমস্ত ঘটনার উদ্ভব হইবে, তাহা যাহাতে আপোষে মীমাংসিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা ;

(১১) প্রত্যেক মহকুমার জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে ইংরাজ প্রভৃতি বিদেশীয়গণের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষকর মনোবৃত্তি জাগ্রত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা ;

(১২) প্রত্যেক মহকুমার মধ্যে অপরাপর যে-সমস্ত সাধারণ হিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহ বিদ্যমান আছে, সেগুলি যাহাতে কংগ্রেসের সহিত মিলিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা ;

উপরোক্ত সমস্ত দায়িত্ব মহকুমা-সম্বন্ধীয় ; কাযেই তাহা যে মহকুমা-শাখাসমূহের উপর অর্পণযোগ্য, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

মহকুমা-শাখাসমূহের সংগঠন ও দায়িত্বসম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিবার আগে বিবিধ শাখাগুলির মধ্যে উপরোক্ত ভাবে দায়িত্ব বণ্টিত হইলে কি ফলোদয় হইতে পারে, তাহা বিবেচনার যোগ্য।

কংগ্রেসের বিবিধ শাখাসমূহের মধ্যে উপরোক্ত ভাবে দায়িত্ব বণ্টিত হইলে কি ফলোদয় হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করিতে গেলে, মানুষের জীবন ধারণ করিবার পক্ষে কি কি বস্তু একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা একবার ভাবিয়া লইতে হইবে। মানুষের জীবন ধারণ করিবার পক্ষে কি কি বস্তু একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা স্থির করিতে হইলে, প্রত্যেক মানুষ কি কি চায়, তাহা একবার স্মরণ করিতে হইবে।

মনে রাখিতে হইবে, মানুষের মধ্যে সাধু এবং অসাধু, মূর্খ এবং পণ্ডিত, ধনী এবং দরিদ্র প্রভৃতি নানা শ্রেণী বর্ত্তমান আছে। সাধু মানুষ এমন অনেক জিনিষ চাহিয়া থাকেন, যাহা অসাধু মানুষ চাহেন না, আবার অসাধু মানুষ এমন অনেক জিনিষ চাহিয়া থাকেন, যাহা সাধু মানুষ চাহেন না। এইরূপ মূর্খ মানুষ এমন অনেক জিনিষ চাহিয়া থাকেন, যাহা পণ্ডিত মানুষ চাহেন না, আবার পণ্ডিত মানুষ এমন অনেক জিনিষ চাহিয়া থাকেন, যাহা মূর্খ মানুষ চাহেন না। কাযেই সাধু মানুষের এমন অনেক জিনিষ প্রয়োজনীয়, যাহা মূর্খ মানুষের প্রয়োজনীয় নহে, আবার মূর্খ মানুষের এমন অনেক জিনিষ প্রয়োজনীয়, যাহা সাধু মানুষের প্রয়োজনে লাগে না।

প্রত্যেক মানুষ কোন্ কোন্ বস্তু চাহিয়া থাকেন এবং প্রত্যেক মানুষের কোন্ কোন্ বস্তু প্রয়োজনীয়, তাহা স্থির করিতে হইলে সাধু, অসাধু, মূর্খ, পণ্ডিত, ধনী এবং নির্ধন প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ মানুষের যাহা যাহা বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে চলিবে না। কেবল যাহা যাহা প্রত্যেক মানুষের আকাঙ্ক্ষণীয় এবং প্রয়োজনীয়, তাহা বাছিয়া বাহির করিতে হইবে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে অনেকবার বিবিধ প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি যে, প্রত্যেক মানুষ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতি জীবন ধারণের উপকরণ, স্বাবলম্বন, সন্তুষ্টি, শান্তি, স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। প্রত্যেক মানুষ যে—অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতি জীবন-ধারণের উপকরণ, স্বাবলম্বন, সন্তুষ্টি, শান্তি, স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন, তাহা পাঠকগণের প্রত্যেকে নিজকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, উপরোক্ত জীবন-ধারণের উপকরণাদি সংগ্রহ করিতে হইলে মানুষের কি কি প্রয়োজন।

মানুষের জীবন-ধারণের উপকরণ বলিতে কি কি বুঝিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিবেন। কিন্তু, আমরা এখানে কেবল সেই উপকরণসমূহের কথা বলিতেছি, যাহা না হইলে মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।

যাহা যাহা না হইলে মানুষের পক্ষে স্ব স্ব জীবন-ধারণোপযোগী উপকরণ উপার্জ্জন করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়, সংক্ষেপে নিম্নলিখিতভাবে তাহা প্রকাশিত হইতে পারে :—

(১) প্রচুর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তিযুক্ত জমী ;
(২) কৃষি-বিজ্ঞান ও লাভবান্ কৃষি-সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা ;
(৩) শিল্প-বিজ্ঞান ও লাভবান্ শিল্প-সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা ;
(৪) বাণিজ্য-বিজ্ঞান ও লাভবান্ বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা ;
(৫) শিক্ষা-বিজ্ঞান ও লোকহিতকর শিক্ষার ব্যবস্থা ;
(৬) রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ও লোকহিতকর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ;

মানুষের স্ব স্ব জীবনধারণোপযোগী উপকরণ উপার্জ্জন করিতে হইলে যে, উপরোক্ত ছয়টী বস্তু একান্ত প্রয়োজনীয়. তাহাও আমরা ইতিপূর্ব্বে বিবিধ প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি।

এই ছয়টী বস্তু ও ব্যবস্থা যে দেশে থাকে, সেই দেশের লোকের কখনও জীবনধারণের জন্য অন্য দেশের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কাযেই বুঝিতে হইবে যে, যে-দেশের লোক অন্য দেশের মুখাপেক্ষী না হইয়া জীবন ধারণ করিতে পারিত, সেই দেশে ঐ ছয়টী বস্তু ও ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল ; আর যে-দেশের লোক জীবনধারণের জন্য অন্য দেশের মুখাপেক্ষী হইতে বাধ্য হয়, তাহাদের ঐ ছয়টী বস্তু ও ব্যবস্থায় কোন না কোন বিকৃতি আছে।

ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইলে দেখা যাইবে যে, একমাত্র ভারতবাসী চিরদিন কোন দেশের মুখাপেক্ষী না হইয়া নিজেদের দেশে বসবাস করিয়া জীবনধারণ করিয়া আসিতেছেন এবং অন্যান্য দেশের লোকও ভারতবর্ষ হইতে স্ব স্ব জীবিকার্জ্জনের সহায়তা উপভোগ করিয়াছেন। ভারতবাসী ব্যতীত জগতের আর কোন দেশের লোক বহু শত বৎসর হইতে নিজেদের দেশে বসবাস করিয়া অন্য কোন দেশের মুখাপেক্ষী না হইয়া স্ব স্ব জীবিকার্জ্জন করিতে সমর্থ হন নাই এবং এখনও হইতেছেন না।

কাযেই বলিতে হইবে যে, একমাত্র ভারতবর্ষেই প্রচুর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তিযুক্ত জমী, লোকহিতকর কৃষি-বিজ্ঞান, লাভবান্ কৃষি-সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা, লোকহিতকর শিল্প-বিজ্ঞান, লাভবান্ শিল্প-সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা, লোকহিতকর বাণিজ্য-বিজ্ঞান, লাভবান্ বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা, লোকহিতকর শিক্ষা-বিজ্ঞান ও তাহার ব্যবস্থা, লোকহিতকর রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ও তাহার ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল এবং তাহা ভারতবর্ষ ব্যতীত জগতের আর কোন দেশে লিখিত ইতিহাসকালের মধ্যে ছিল না এবং এখনও নাই। জগতের অন্য কোন দেশে যে বর্ত্তমানে প্রচুর উর্ব্বরাশক্তিসম্পন্ন জমী, লোকহিতকর কৃষি-বিজ্ঞান ও কৃষি-সম্বন্ধীয় যথাযথ ব্যবস্থা বিদ্যমান নাই, তাহা ঐ সকল দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা এবং রাষ্ট্রের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়। কোন দিনও যে তাহা ছিল না, তাহাও প্রত্যেক দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থ ও অবস্থা চিন্তা করিলে পরিস্ফুট হয়।

অনেকে মনে করেন যে, গ্রীকগণ প্রাচীন কালে বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানে খুব উন্নত ছিলেন। এতাদৃশ ধারণা যে ভিত্তি-হীন, তাহা গ্রীক গ্রন্থকারগণের গ্রন্থ পড়িলে বুঝিতে পারা যায়। তাঁহাদের সমগ্র গ্রন্থরাশি হইতে কোন সুচিন্তিত কৃষি-বিজ্ঞান, শিল্প-বিজ্ঞান, বাণিজ্য-বিজ্ঞান, শিক্ষা-বিজ্ঞান এবং রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। গ্রীকগণের যদি খুব উন্নত কৃষি-বিজ্ঞান, শিল্প-বিজ্ঞান প্রভৃতি অথবা তৎসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা প্রভৃতি থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারাও অন্য দেশের মুখাপেক্ষী না হইয়া ভারতবাসীর মত চিরদিন নিজ দেশে বসবাস করিয়া জীবনধারণ করিতে পারিতেন, ইহা সাধারণ বুদ্ধি দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে।

অনেকে মনে করেন যে, প্রকৃতিদেবী ভারতবর্ষের উপর পক্ষপাতিত্ব করিয়া এই দেশটীকে প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ করিয়াছেন এবং ভারতবাসীরও কোন উন্নত কৃষি-বিজ্ঞানাদি অথবা তৎসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা ছিল না। এই কথাও সত্য নহে। প্রকৃতির নিয়মের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, প্রকৃতি দেবী যাহা দিয়া থাকেন, তাহা সাধারণতঃ জঙ্গল এবং তাহাতে অনেক সম্পদ্ থাকে বটে, কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ব্যবস্থা দ্বারা তাহার উন্নতি সাধন করিতে না পারিলে মানুষের পক্ষে তাহা ব্যবহারযোগ্য হয় না।

লোকহিতকর কৃষি-বিজ্ঞান, শিল্প-বিজ্ঞান প্রভৃতি ও তাহার ব্যবস্থা প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া যাইবে একমাত্র ভারতীয় ঋষির বেদাদি গ্রন্থে, কোরাণে এবং ওল্ড-টেষ্টামেন্টে। ঐ সমস্ত গ্রন্থ লিখিত রহিয়াছে প্রাচীন সংস্কৃত, প্রাচীন আরবী এবং প্রাচীন হিব্রু ভাষায়। বহু সহস্র বৎসর হইতে মানুষ ঐ তিনটী ভাষা ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়া বহুদিন হইতে কেহ ঐ বেদাদি গ্রন্থ, কোরাণ এবং ওল্ড-টেষ্টামেন্ট যথাযথভাবে বুঝিতে পারেন না এবং তাহার ফলে প্রকৃত লোকহিতকর জ্ঞান-

বিজ্ঞান ও ব্যবস্থা মানুষ বিস্মৃত হইয়াছে এবং মানুষের জীবন ধারণ করা ক্রমশঃই অসাধ্য হইয়া পড়িতেছে।

কতদিন হইতে ভারতবাসীর পতন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা সঠিক ভাবে নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য বটে, কিন্তু গত আট হাজার বৎসর ধরিয়া যে ভারতবাসী ক্রমশঃ পতিত হইয়াছে, তাহা সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে। এই আট হাজার বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে যে-সমস্ত গ্রন্থ ঋষিপ্রণীত গ্রন্থের অনুবাদ অথবা ভাষ্য বলিয়া প্রচারিত হইতেছে, তাহার কোন খানিতেই ঋষিপ্রণীত কোন মূল গ্রন্থের সহিত যথাযথ সাদৃশ্য নাই। আমাদের এই কথা যে সত্য, তাহা আমরা অদূরভবিষ্যতে প্রমাণিত করিব।

এই আট হাজার বৎসরের ভিতর ভারতীয় ঋষির মূল জ্ঞান-বিজ্ঞানের তাৎপর্য্য যথাযথভাবে জানিতে পারিয়াছিলেন একমাত্র বুদ্ধদেব, খৃষ্টদেব এবং নবী মহম্মদ। তাঁহারা ঐ তথ্য জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের আবির্ভাব-কালে জগতে জাগরণের সাড়া পড়িয়াছিল। কিন্তু, পরবর্ত্তী ধর্ম্মযাজকগণের প্রাচীন সংস্কৃত, প্রাচীন আরবী ও প্রাচীন হিব্রু ভাষার অনবগতির জন্য আবার তাহা মানুষ বিস্মৃত হইয়াছে।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, যাহা পাশ্চাত্ত্য কৃষি-বিজ্ঞান, শিল্প-বিজ্ঞান, বাণিজ্য-বিজ্ঞান, শিক্ষা-বিজ্ঞান ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞান বলিয়া চলিতেছে, তাহার অনুকরণ করিলে অথবা তৎপ্রদর্শিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে ভারতবাসীর অন্নসমস্যার সমাধান হইবে না। শুধু ভারতবাসীর কেন, জগতের কোন জাতির জাতীয় সমস্যাই বর্ত্তমান পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের দ্বারা পূরণ করা সম্ভব হইবে না, ইহাও বলা যাইতে পারে।

যাঁহারা লোকহিতকর ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই সত্যটুকু স্মরণ রাখিতে হইবে। তাঁহারা যতদিন এই সত্যটুকু মনে প্রাণে স্বীকার না করিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত মানুষের অবস্থা জটিল হইতে জটিলতর হইতে থাকিবে। আগামী দশ বৎসরের মধ্যে মানুষ যে-অবস্থায় উপনীত হইতে চলিয়াছে, তাহা একটু সজাগতার সহিত লক্ষ্য করিলে আমাদের এই কথার সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে।

সারা জগতের মানুষের অবস্থার পরিবর্ত্তন অনতিবিলম্বে সাধন করিতে হইলে, ভারতবর্ষের জমী যাহাতে অচিরে স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি পুনরায় লাভ করে, প্রথমতঃ তাহার আয়োজন করিতে হইবে। তাহার পর ক্রমে ক্রমে যাহাতে ভারতবর্ষের প্রকৃত কৃষি-বিজ্ঞান, শিল্প-বিজ্ঞান প্রভৃতির গবেষণা পুনরায় মৌলিকভাবে ভারতবাসীর মধ্যে আরম্ভ হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ভারতবর্ষের জমীর উর্ব্বরাশক্তির উন্নতিসাধন করিতে চেষ্টা করিলে যত শীঘ্র সাফল্য লাভ করা সম্ভব, অন্য দেশের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে, কারণ পরীক্ষা করিলে জানা যাইবে যে, এখনও এখানকার জমিতে যে স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি আছে তাহা অন্য কোন দেশের জমীতে নাই এবং এখানে অনায়াস-কৃষিযোগ্য জমীর পরিমাণ যত অধিক তাহা জগতের আর কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হইবে না। একমাত্র ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স ও অষ্ট্রেলিয়া ব্যতীত জগতের সর্ব্বত্রই যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যশস্যের অভাব আরম্ভ হইয়াছে। কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বেও ভারত-বর্ষের জমীর যে স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি ছিল, তাহা ফিরাইয়া আনিতে পারিলে, সারা জগতে যে খাদ্যশস্যের অভাব ঘটিয়াছে, তাহার পূরণ একমাত্র ভারতবর্ষের দ্বারাই সংঘটিত হইতে পারে, ইহাও আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি।

ভারতবর্ষের জমী যাহাতে অচিরে তাহার প্রাচীন স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি ফিরিয়া পায়, তাহা করিতে হইলে ইংরাজদিগকে এবং ভারতবাসীদিগকে মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিতে হইবে এবং রাষ্ট্রীয় পরিচালনা যাহাতে লোকহিতকর রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ভারতবর্ষের জমী যাহাতে অচিরে তাহার প্রাচীন স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি ফিরিয়া পায়, তাহা করিতে হইলে সারা ভারতবর্ষের নদী ও খালসমূহের সংস্কার সাধন করা যে একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা আমরা এই প্রবন্ধে ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি। সারা ভারতবর্ষের নদী ও খালসমূহের সংস্কার সাধন করা যে প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ইংরাজ ও ভারতবাসী মনে প্রাণে মিলিত হইলে কারেন্সি-নোট মুদ্রিত করিয়া ঐ ব্যয় নির্ব্বাহ করা সম্ভব হইতে পারে। ইংরাজ ও ভারতবাসী মনে প্রাণে মিলিত না হইলে উহা যে সম্ভব নহে, তাহাও আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি।

যদ্দ্বারা দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে লোকহিতকর হয়, তাহার নাম রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত লোকহিতকর রাষ্ট্রীয় পরিচালনা (Government for the people)। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে লোকহিতকর করিতে হইলে, একদিকে যেরূপ ঐ ব্যবস্থাগুলি প্রবর্ত্তিত ও চালু করিবার প্রয়োজন হয়, আবার অন্যদিকে সেইরূপ ঐ ব্যবস্থাগুলি প্রকৃতপক্ষে লোকহিতকর হইতেছে কি না, তাহার পরীক্ষা করিতে হয়। কোন্ কোন্ ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে লোকহিতকর, তাহা দেশবাসীর পক্ষে যেরূপ যথাযথভাবে নির্ণয় করা সম্ভব, বিদেশীয়গণের পক্ষে সেইরূপ যথাযথভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নহে। কাযেই লোকহিতকর রাষ্ট্রীয় পরিচালনা সম্ভব করিতে হইলে, দেশবাসী যাহাতে মিলিত হইয়া কোন্ কোন্ ব্যবস্থা তাঁহাদের হিতকর তাহা স্থির করেন, তাহার আয়োজন করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

ইহা ছাড়া জনসাধারণের হিতার্থে যে-সমস্ত ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়, ঐ সমস্ত ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে হিতকর হইতেছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে, যাঁহারা ঐ ব্যবস্থাগুলি প্রবর্ত্তিত ও চালু করিবার ভার পাইবেন, তাঁহারা ব্যতীত অন্য পরীক্ষকের প্রয়োজন হয়। কারণ যাঁহাদের উপর ঐ ব্যবস্থাগুলি প্রবর্ত্তিত ও চালু করিবার দায়িত্ব থাকিবে, তাঁহারাই যদি উহার সাফল্য সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার ভার পান, তাহা হইলে তাঁহারা স্বভাবতঃই নিজ অসাফল্য স্বীকার করিতে পারেন না। যাঁহাদের জন্য ঐ ব্যবস্থাগুলি প্রবর্ত্তিত ও চালু করা হয়, তাঁহাদের উপর যদি উহার সাফল্য ও অসাফল্য পরীক্ষা করিবার ভার দেওয়া হয়, তাহা হইলে প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হইতে পারে।

কাযেই দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃত লোকহিতকর রাষ্ট্রীয় পরিচালনা করিতে হইলে, যাহাতে দেশবাসী মিলিত হইয়া কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা-সম্বন্ধীয় কোন্ কোন্ ব্যবস্থা তাঁহাদের হিতকর, তাহা নির্ণয় করেন এবং ঐ ঐ ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের হিতকর হইতেছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া গবর্ণমেণ্টকে তদীয় সাফল্য ও অসাফল্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত রাখেন, তাহা একান্ত প্রয়োজনীয়।

এক্ষণে আমাদের প্রস্তাবিত কংগ্রেসের ঊনবিংশতি দায়িত্ব বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, তাহাতে মূলতঃ উপরোক্ত চারিটী পরিকল্পনার (যথা—(১) ইংরেজ ও ভারতীয়গণের বিদ্বেষ দূরীকরণ, (২) ভারতীয়গণের মিলন, (৩) কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও শিক্ষা-সম্বন্ধীয় কোন্ কোন্ ব্যবস্থা লোকহিতকর, তাহার নির্দ্ধারণ, (৪) গবর্ণমেণ্ট-প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থাগুলি যথার্থভাবে লোকহিতকর হইতেছে কি না, তাহার পরীক্ষা) কথাই আছে।

অতএব বলা যাইতে পারে, আমাদের প্রস্তাবিত কংগ্রেস সংগঠিত হইলে, প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্নাভাব দূরীভূত হইতে পারে এবং তাহা ভারতবাসী ও ইংরেজ উভয়েরই কল্যাণকর।

ভারতবাসীর অন্নাভাব দূর হইলে এবং তাহাদের মিলন হইলে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য সমস্যার সমাধান করাও সম্ভব হইবে।

ভারতবর্ষে প্রচুর শস্যের উৎপত্তি হইলে এবং ভারতীয় প্রজাগণ সমৃদ্ধিশালী হইলে, ইংরেজগণের পক্ষে ভারতের উদ্বৃত্ত শস্য লইয়া জগতের সর্ব্বত্র বাণিজ্য করা সম্ভব হইবে এবং তাঁহাদের শিল্পজাত দ্রব্যও অধিক পরিমাণে বিক্রয় করা সম্ভব হইতে পারে। তাহাতেও ভারতীয়গণের কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকিবে না।

যে দিক দিয়াই দেখা যাউক, ভারতবর্ষের ও ইংলণ্ডের বর্ত্তমান সমস্যা সমাধান করিতে হইলে, ভারতবাসীর নিজেদের মিলন ও ইংরেজদিগের সহিত তাঁহাদের কায়মনোবাক্যে মিলন একান্ত প্রয়োজনীয়, ইহা বলিতেই হইবে।

এই মিলন যে কেন হইতেছে না, তাহা আমরা প্রবন্ধান্তরে বিশদভাবে আলোচনা করিব।

সংক্ষেপে বলিতে হইলে বলিতে হয় যে, কয়েকটী ইংরাজ ও ভারতীয় তথাকথিত রাজনৈতিকের, বৈজ্ঞানিকের ও পণ্ডিতের অদূরদর্শিতার ফলে অগণিত মনুষ্য-জনসাধারণ আজ অনশনে ও অর্দ্ধাশনে হাবুডুবু খাইতেছে। ভারতবাসী ও ইংরাজ জনসাধারণ ইহা কবে বুঝিবেন?

(ক্রমশঃ)
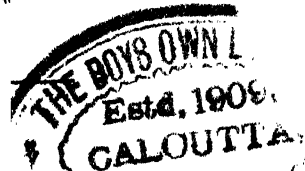
নির্ভীক নববর্ষ

—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

বসন্ত ফুরায়ে গেছে, পুরাতন বরষের হ'ল অবসান,
শেষ চৈত্র-শর্ব্বরীর গেয়ে গেল শুকতারা বেদনার গান ;
বিদায়ের অশ্রুবিন্দু পল্লবে পল্লবে ঝরে শ্যাম দুর্ব্বাদলে,
ঊষার অরুণরাগে অরণ্যের ধূলিপথে স্মৃতিটুকু জ্বলে ;
তারি মাঝে এস তুমি সত্য-শিব-সুন্দরের মহাসিন্ধু তীরে,—
যেথা নিত্য অশিবের কোপানলে জীবধাত্রী রহে অশ্রুনীরে
পাষাণী অহল্যা সাথে। ভারতী-মন্দিরে ভগ্ন পাদ-পীঠে আজি
পিশাচের অট্টহাস্যে সারমেয়-শিবাদল উঠিতেছে নাচি'।

নাহি আর সেই ধর্ম্ম, রয়েছে ধর্ম্মের ভান—কদর্য্য কুটিল,
জীর্ণ পুঁথি পড়ে আছে, ভাষ্যে লিখা অর্থ তার, অবোধ্য, জটিল;
দিকে দিকে পণ্ডিতের হেরি ব্যর্থ আস্ফালন, এ বিশ্ব শিহরে !
এরা কি পণ্ডিত বন্ধু ! মোহমুগ্ধ মূর্খতায় নিয়ত বিহরে।
স্বার্থের সুযোগ নিয়া জীবনের আদর্শেরে ধ্বংস করি' যারা
রচিতে ব্যাকুল আজি বিলাস-প্রাসাদ-কুঞ্জ, সুখস্বপ্ন-তারা
খুঁজিতেছে এ জাতির কৃষ্ণা রজনীর এই গাঢ়ঘন মেঘে,
তাদের মরণ আসে রক্তের কল্লোল তুলি' বিদ্যুতের বেগে।

তুমি এলে অসময়ে। চারি ভিতে রহিয়াছে কঙ্কালের স্তূপ,
নাহি আর অতীতের সৌভাগ্যলক্ষ্মীর সেই জ্যোতির্ম্ময়ী রূপ।
আশ্রমের শ্রম-শিল্প পারিব না দেখাইতে তপোবন মাঝে,
বিজ্ঞানের জ্ঞান-সূর্য্য নির্ব্বাপিত অস্তাচলে। বক্ষে তাই বাজে
হৃদয়ের বীণা হ'তে মোর যত ছিন্নতন্ত্রী সকরুণ সুরে,
কীর্ত্তিকাহিনীর গীতি কেমনে শুনাব বন্ধু ! হারায়েছে দূরে।
যন্ত্রযুগ-দানবের তীব্ররূঢ় কশাঘাতে পল্লী-নারায়ণ
কাঁদিতেছে পথে পথে। লক্ষ্মীহীনা প্রেতপুরী হেরি অগণন।

প্রাচ্যের সাগরতীরে দুরন্ত ঝটিকা উঠে পশ্চিম পবনে,
সমুদ্র-বিহঙ্গ কাঁদে, সমরের উন্মাদনা গগনে গগনে।
ভারতেরে কেন্দ্র করি' কে জানে কখন বন্ধু ! প্রলয়ের গীতি,
গাহিবে ধূর্জ্জটি-সেনা নন্দীভৃঙ্গী সাথে, তাই মনে জাগে ভীতি
অন্তরের অন্তস্তলে। বিধাতার নাহি দোষ, মোদের মরণ
আমরা এনেছি ডাকি' আপনার কর্ম্মগুণে, তাহারে বরণ
করিয়া কত না যাত্রী চলেছে অজানা পথে,ফেলে গেছে কায়া;
আজো যারা মরে নাই তাহাদের মুখে পড়ে করালের ছায়া।

এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা-নাগিণী-ফণা-দংশনজ্বালায়,
প্রপীড়িত নরনারী দুলিতেছে মরণের ঝটিকা-দোলায়।
লক্ষ লক্ষ জ্বলে চিতা। উন্মাদিনী কুলবধূ ভূলুণ্ঠিতা সবে
শ্মশানের ভস্ম মাখি'—জাতির জীবন শুষ্ক আর্ত্তবায়ুরবে ;
সেদিন গিয়াছে বন্ধু, তপস্যার দৃপ্ত তেজে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি
ভগবানে পদাঘাত করেছিল গর্ব্বভরে, তাই দিবানিশি
সানন্দেতে ভর্গদেব ভৃগুপদচিহ্ন বুকে রেখেছে গৌরবে,
ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রভা দেবতার বক্ষে শোভে প্রেমের সৌরভে।

দধীচির মত এই উগ্রতপা বৈশাখের পুণ্য অস্থি দিয়া
রচিবে কি বজ্র তুমি ? জাতিরে বাঁচাতে বন্ধু ! সেই বজ্র নিয়া
মরণের মৃত্যুরূপে দাঁড়াবে কি সিন্ধুতটে বিদ্রোহীর বেশে
হে নির্ভীক নববর্ষ ! বৈদিক যুগের বার্ত্তা শুনাবে কি দেশে ?
ভাঙিবে কি অসত্যের আশ্রম-মন্দির যত ? চাই মানবতা,
লক্ষ মুদ্রা ঢালি' সেথা রচিছে বিগ্রহ সবে, কাঁদিছে দেবতা
দেশে দেশে নগ্ন দেহে ! চূর্ণ কর শিক্ষালয়, নাহি শিক্ষা কিছু;
চূর্ণ ক'র দেবালয়, ধূলায় রয়েছে প্রভু মাথা করে' নীচু।

আকাশপথে হাওয়াই হইতে স্যান্‌ফ্রান্সিস্‌কো

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মিস এমেলিয়া ইয়ারহার্ট একজন তরুণী মার্কিণ মহিলা। সম্প্রতি তিনি প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপ থেকে এরোপ্লেনে একা কালিফোর্নিয়ার স্যান্‌ফ্রান্সিসকো বন্দর পর্য্যন্ত উড়ে গেছেন। তাঁর আকাশ-ভ্রমণের বৃত্তান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হল:—

২২শে ডিসেম্বর আমি লস্ এঞ্জেলস্ থেকে জাহাজে হনোলুলু আসি। আমার এরোপ্লেনখানা আমার সঙ্গে এসেছিল জাহাজের টেনিস-ডেকে প্যাক্ করা অবস্থায়। হনোলুলু এসে আবহাওয়ার অবস্থা খারাপ দেখে মনটা কিছু দমে গেল। দিন কয়েক অপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত মনে হল। আমার এরোপ্লেনের মোটর খুব ভাল অবস্থায় ছিল। সমুদ্রে যে কয়দিন এসেছিলাম, পাছে নোনা জলের হাওয়ায় মোটর খারাপ হয়ে যায়, এই ভয়ে রোজ চালিয়ে দেখে পরীক্ষা করতাম। এরোপ্লেনের রেডিও সেট্‌টাও পরীক্ষা করে দেখে নিতাম ঐ সঙ্গে। স্যান্‌ফ্রান্সিসকো বন্দর থেকে যখন আমরা হাজার মাইল এসেছি, তখন এরোপ্লেনের অনেকগুলি বড় আড্ডার বেতারবার্ত্তা আমার রেডিওর সাহায্যে শোনা গেল।

আবহাওয়ার জন্যে যে ক'দিন হনোলুলুতে ছিলাম, এরোপ্লেনের কলকব্জা প্রত্যহ পরীক্ষা করা হ'ত। অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি যে, কখনও এ বিষয়ে ঔদাসীন্য দেখাতে নেই। এরোপ্লেন যখন উড়ছে না, তখনই কলকব্জা পরীক্ষার সুবিধা, সুতরাং সে অবস্থায় দুবেলা যদি তা করা যায়, খুবই ভাল। মার্কিণ যুক্তরাজ্যের সামরিক উড়ো-জাহাজ-বিভাগের কর্ম্মচারিগণ এ বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন, এজন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

১১ই জানুয়ারী আবহাওয়া-বিভাগের রিপোর্ট যা পাওয়া গেল, তাতে সেইদিনই রওনা হওয়া উচিত মনে হ'ল। ঐদিন বিকাল ২টার সময় ওড়বার ঠিক করেছিলাম, কিন্তু সকাল থেকেই সুরু হল গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। দুপুরের পর রীতিমত ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নামল। বাতাস ঘুরে গিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে বইতে সুরু করল।

এমেলিয়া ইয়ারহার্ট: হনোলুলু হইতে ওকল্যাণ্ড পর্য্যন্ত ২৪০০ মাইল ব্যাপী ১৮ ঘণ্টা বিমান-যাত্রার পর।

মাটী ভিজে নরম হয়ে গিয়েছে বৃষ্টিতে, আমার এরোপ্লেনে বোঝাই অনেক, পাঁচশ' গ্যালন গ্যাসোলিন ত আছেই, তা ছাড়া আরও অনেক জিনিস তাতে চাপান। সুবিধের মধ্যে যেখান থেকে এরোপ্লেন উড়বে, সেই জমিটা ছয় হাজার

সূর্য্য উঠল, আমার পক্ষে সেটা খুব ভালই বলতে হবে, কারণ সোজাসুজি সূর্য্যের কিরণ চোখে পড়লে মোটা কাঁচের পরকলা-ওয়ালা চশমা পরা সত্ত্বেও কষ্ট হ'ত।

এতক্ষণ আমি ৮০০০ ফুটের উপর দিয়ে চলে এসেছি, কারণ আবহাওয়া আফিসে বলে দিয়েছিল, অত উঁচু দিয়ে না গেলে অনুকূল বায়ু পাওয়া যাবে না। সকাল থেকে বেলা সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত কি ভয়ানক কুয়াসা চারিদিকে! যে দিকে চাই আকাশ দেখা যায় না, সমুদ্র দেখা যায় না, আমার এরোপ্লেনের ডানার দূর প্রান্তটা পর্য্যন্ত দেখা যায় না—শুধু আমি, আর ককৃপিট। আর আমার চালানোর যন্ত্রখানিও সামনে।

পনের ঘণ্টা অনবরত চালানোর পরে কুয়াসা একটু একটু কাটতে আরম্ভ করল। ঘন কুয়াসার দেওয়ালের মধ্যে জায়গায় জায়গায় বড় বড় গর্ত্ত দেখা দিল। যে কুয়াসা প্রাচীরে আমার এই পনের ঘণ্টা আবদ্ধ করে রেখেছিল, ওগুলো যেন তার গায়ে ফোটানো জানালা।

সেই মুক্ত বাতায়নপথে আমি চেয়ে দেখলাম নিম্নের নীল সমুদ্র, প্রভাতের সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত অগণিত ঊর্ম্মিমালা।

আমার বাঁ দিকের প্রাচীরগাত্রে একটা বড় জানালা খুলে গেল। সেই দিকে চেয়ে দেখি সমুদ্র-বক্ষে খুব বড় একখানা আমার ভয় কেটে গেল, তা হ'লে কুয়াসায় আমি পথ হারিয়ে ভুল পথে যাই নি, জাহাজ যাতায়াতের পথ ধরেই চলেছি।

আমি নেমে এলাম, মাত্র ১৫০০ ফুট ওপর থেকে জাহাজ খানার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে জাহাজের গতি ও গমনপথের সঙ্গে এরোপ্লেনের গতি মিলিয়ে দেখলাম। সেখানা বিখ্যাত ডলার লাইনের নতুন তৈরী জাহাজ 'প্রেসিডেন্ট পিয়ার্স'। জাহাজ থেকে বেতারে আমায় জানালে স্যানফ্রান্সিসকো বন্দর আর ৩০০ মাইল দূরে। আমি অত উঁচুতে আর না উঠে বাকী পথটুকু ১৫০০ ফুট উপর দিয়ে চললাম।

এরোপ্লেনে কোন জায়গা পৌছবার শেষ দু ঘণ্টা সকলের চেয়ে কষ্টকর। এখানেই দিগ্‌ভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। মেঘে ও দূরবর্ত্তী উপকূলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। কোন্‌টা মেঘ কোন্‌টা বা জমি তা বুঝে নেবার উপায় নেই।

দিক ভুলের সম্ভাবনা যেমন এখানে বেশী, তেমনি এখানেই আবার অর্জ্জিত অভিজ্ঞতার চূড়ান্ত পরীক্ষা-ক্ষেত্র। যন্ত্রপাতি ও কম্পাস যেটা ঠিক দিক বলে নির্দ্দেশ করছে, মানুষের মন বলে সেটা ঠিক দিক নয়। অনভিজ্ঞ লোকে এখানে চোখের বশে চলতে চাইবে, যন্ত্রকে অবিশ্বাস করে। কিন্তু অভিজ্ঞ লোক জানে যে, যখন চোখ ও যন্ত্রের মধ্যে বিবাদ বেধে যাবে, তখন যন্ত্রকে বিশ্বাস করবে, চোখকে নয়।

প্রথম জমি দেখা গেল কালিফোর্ণিয়ায় পিলার পয়েণ্ট। কিন্তু এত ঝাপসা দেখা গেল যে, আমার মনে হ'ল কালি-ফোর্ণিয়ার উপকূলে খুব মেঘ কি কুয়াসা হয়েছে। আমার অনুমান ঠিক—আর একটু এগিয়ে দেখি খুব বৃষ্টি হচ্ছে। ডাইনে একটু ঘুরে গেলাম—একটা উঁচু পাহাড় যেন আমার দিকে ছুটে আসছে—তারপরেই আমার এরোপ্লেনের নীচে জমি দেখা গেল।

হনোলুলু থেকে আমেরিকা মহাদেশে পৌছে গিয়েছি! ঠিক আঠার ঘণ্টা লাগল।

সেবার যখন একা আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হই, তখন নামি গিয়ে আয়ারল্যাণ্ডে এক কৃষকের আলুর ক্ষেতে। এরো-প্লেনের এঞ্জিনের শব্দ শুনে তিনটি আইরিশ কৃষক ব্যাপার কি দেখতে এল। তাদের যখন বললাম আমি আমেরিকা থেকে আসছি, তারা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে চুপ করে রইল। অর্থাৎ মুখের উপর 'মিথ্যাবাদী' বললে না।

এবার ওক্‌ল্যাণ্ড এরোড্রোমে যে হাজার লোক জড় হয়ে-ছিল, তাদের বলবার প্রয়োজন হল না, আমি কোথা থেকে আসছি। আমি ককৃপিট খোলবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ক্যামেরার খুটখাট শব্দ শোনা গেল, মাইক্রোফোন নিয়ে লোক এগিয়ে এল আমি কি কথা বলি তাই বেতারে ধরবার জন্যে।

সমুদ্রে আমার এরোপ্লেন যদি পড়ে যেত, কয়েকদিন জলের উপর ভেসে থাকতে পারি তার ব্যবস্থা করেই হনোলুলু থেকে রওনা হই। এরোপ্লেনের পুচ্ছের দিকে যেখানে পেট্রোল ট্যাঙ্ক বসানো তার পেছনে একটা রবারের ভেলা আটকানো ছিল। কার্ব্বণ ডায়োক্সাইড গ্যাসভরা টিউবের সাহায্যে ভেলাটা এক মিনিটের মধ্যে [illegible] যেত। ভেলার

মধ্যে একটা মুখআঁটা থলির মধ্যে টোমাটোর রস, চকোলেট, জমাট দুধের বড়ি, স্যাণ্ডউইচ ও জল ছিল।

সমুদ্রে পড়লে এরোপ্লেন যদি না ডুবে যেত, এই রবারের ভেলায় চড়ে সমুদ্রে আমায় ভাসতে হ'ত। অন্য এরোপ্লেন বা জাহাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট করবার জন্যে আমার কাছে লাল ও সবুজ হাউই ছিল। এ ছাড়া অনেকগুলো ছোট বেলুনে লাল রেশমের নিশান বাঁধা ছিল, শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে এগুলো অনেক উচুতে উঠিয়ে দিলে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবার সম্ভাবনা।

আমি জানি অকূল সমুদ্রে এসবেও কিছু হয় না। বিপদ যখন আসবার হয়, সহস্র উপকরণেও তাকে এড়ানো যায় না। মানুষ জল না খেয়ে কতদিন বেঁচে থাকতে পারে আর আমার ছোট রবারের ভেলাতে কতটুকু জলই বা ধরে! দু' তিন দিনের মধ্যে কারো মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম না হলে মৃত্যু ছিল অনিবার্য্য।

আকাশপথে এই আঠার ঘণ্টার মধ্যে আমি কি খেয়েছিলাম এ প্রশ্ন আমায় অনেকে করেছেন। এইখানে প্রথমেই একটা কথা বলি। যে কোনও দায়িত্ব-পূর্ণ ও শ্রমসাধ্য কাজ করবার সময় বেশী কিছু খাওয়া উচিত নয়, একথা যদি সত্যি হয়, আকাশপথে বহুদূরে উড়ে যাওয়ার সময় যে খুব কিছু খাওয়া উচিত নয়, এটা আরও বেশী সত্যি।

আমি খেয়েছিলাম সামান্য একটু টোমাটোর রস, একটা ডিমসিদ্ধ এবং থার্ম্মোবোতলে আনীত এক পেয়ালা গরম কোকো। পৃথিবীপৃষ্ঠ হতে ৮০০০ ফুট উর্দ্ধে প্রশান্ত মহাসমুদ্রের ওপর ঘনীভূত মেঘ ও কুয়াসার মধ্যে বসে এক পেয়ালা গরম কোকো খাওয়ার অভিজ্ঞতা আমার কাছে সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত বলে মনে হয়েছে।

এ সব আয়াসসাধ্য কাজের সময় প্রকৃতই খাদ্যের বিশেষ কোন দরকার হয় না। খাওয়ার কথা মনেই থাকে না, মন সম্পূর্ণ অন্য চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে। অতিরিক্ত আহারে এ অবস্থায় চিন্তাশক্তির জড়তা আসে।

আমার এরোপ্লেনখানা তিন বছরের পুরাণো। এর মধ্যে দুজন যাত্রীর বসবার স্থান ছিল, কিন্তু দূর ভ্রমণের জন্যে ঐ যাত্রীদের আসনের বদলে সেখানে পেট্রোলের ট্যাঙ্ক বসিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তিন বছর আগে এই এরোপ্লেনেই আমি আটলাণ্টিক পার হই। কুড়ি ঘণ্টা চলবার উপযুক্ত পেট্রোল ভরে নেওয়ার জায়গা আছে এতে। এই এরোপ্লেনেই এক বার সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করবার ইচ্ছা করেছি, যদিও জানি না সেটা কতদূর সম্ভব হয়ে উঠবে।

নরওয়ে গৃহিণী: রুটি তৈয়ারী হইতেছে।

নরওয়ের পল্লীজীবন

জনৈক মার্কিণ তরুণীর অভিজ্ঞতা

নরওয়ে পাহাড় ও সমুদ্রের দেশ। নরওয়ের দক্ষিণাংশ দেশের অন্য অঞ্চলের অপেক্ষা কিছু সমতল হলেও অন্য দেশের তুলনায় পর্ব্বতময়। আমার অনেক দিনের ইচ্ছা নরওয়ের পল্লীগ্রামে কিছুদিন কাটাই। সেবার সুযোগও ঘটল। আমাদের বাড়ীতে একজন নার্স ছিল আমাদের বাল্যকালে। আমরা বড় হবার পরে সে দেশে ফিরে গিয়ে বিবাহ করে সংসারী হয়েছে। তার নাম রাস্‌না। রাস্‌না হঠাৎ আমাকে পত্র লিখলে সে আমায় দেখতে চায়।

১লা আগষ্ট অসলো বন্দরে নেমেই রাসনাকে পত্র দ্বারা জানালাম শুক্রবারে আমি তার বাড়ীতে যাচ্ছি। নির্দ্দিষ্ট দিনে নেস্‌বিন ষ্টেশনে আমি একখানি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা থেকে নেমে দেখি রাস্‌না তার ভাল পোষাকটী পরে আমার অপেক্ষায় প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে আছে।

গত পনের বছরের মধ্যে রাস্‌না কিছুই বদলায় নি। কিন্তু আমি অনেক বদলে গিয়েছি, তখন আমি ছিলাম দশ বছরের মেয়ে, এখন আমার বয়স পঁচিশ। রাস্‌না কিন্তু আমায় দূর থেকে দেখেই চিনলে ও ছুটে আমার কাছে এল।

ষ্টেশনের ফটকের বাইরে একখানা ১৯০৮ সালের মডেলের ফোর্ড ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল, দুজনে আমরা তাতে গিয়ে উঠলাম। রাসনার বাড়ী ষ্টেশন থেকে তিন মাইল দূরে। সেখানে পৌঁছে আমার জিনিসপত্র গাড়ী থেকে নামানো শেষ হবার পূর্ব্বেই আমায় খেতে দেওয়া হল। সব খাবার জিনিসই বাড়ীতে তৈরী বা ক্ষেত থেকে টাটকা সংগ্রহ করা। দুধ, ফল, লেটুস শাক, রুটী ও আচার! রাস্‌নার স্বামীর নাম গুটর্ম্ম। লম্বা জোয়ান চেহারা, বেশ হাসি মুখ, খোলা উদার মন। গুটর্ম্মের বাবা পিণ্ডারের সঙ্গেও আলাপ হল, তাঁর বয়েস আশী বছর, গায়ে তাঁর স্ত্রীর বোনা মোটা কাপড়ের পোষাক। রাস্‌নার সাত বছরের ছোট মেয়েটী আমায় দেখে লজ্জায় উঠানের খড়ের গাদার আড়ালে লুকিয়ে রইল। গ্রামের পিছনকার পর্ব্বতের শিখরে মেঘ জমেছে। মাঠে আরও খড় রয়েছে, তুলে না আনলে ভিজে যাবে। গুটর্ম্ম, রাস্‌না, গুটর্ম্মের বৃদ্ধ পিতা সবাই খড় তুলতে গেল, আমি বললাম, আমিও সাহায্য করব। আমায় খড় জড় করতে দেখে ঠাকুরদাদা হেসেই খুন, প্রতিবাসীদের ডেকে দেখাতে লাগল, দেখ আমেরিকার মেয়েটী কেমন খড় তুলছে।

আমরা যেমন বাড়ী ফিরে এসেছি, একটী বৃদ্ধা আমাদের সামনে এসে আমায় খুব ভদ্রতার সঙ্গে বললে, দয়া করে সামান্য একটু কফি খাও। এই বৃদ্ধাটীকে এই প্রথম দেখলাম, শুনলাম সে রাস্‌নার স্বামীর খুড়ীমা।

ঘরের বাইরে উঠানে আমরা কফি খেতে বসেছি। ইতিমধ্যে রাস্‌নার ছোট মেয়েটী বন থেকে প্রচুর বন্য বেরি সংগ্রহ করে এনেছে, কফির সঙ্গে তাও খাওয়া গেল। দুজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আমাদের বাড়ীর সম্মুখের পথ দিয়ে কোথায় যাচ্ছে। তারা বললে, ভাল?

এরা উত্তর দিলে, ভাল। তোমাদের সব ভাল?

—খড় তোলা শেষ হয়েছে?

—প্রায়। একটু কফি খাবে না?

—থাক, ধন্যবাদ। সময় নেই, অনেকটা যেতে হবে।

—তা হোক। একটী ফোঁটা কফি খেয়ে যাও।

—আচ্ছা, কিন্তু একটী ফোঁটা মাত্র, মনে থাকে যেন!

এইখানকার পল্লী অঞ্চলের প্রথা—নিতান্ত অপরিচিত যদি না হয়, তবে পথচল্‌তি লোককেও ডেকে খাওয়ান এখানকার গ্রাম্য প্রথা।

কয়েক দিন খুব বৃষ্টি নামল। আমরা খড় গাদা দিতে ব্যস্ত, বৃদ্ধ পিণ্ডার শীতকালের জন্যে কাঠ সংগ্রহ করতে রোজ পাহাড়ের ওপর গিয়ে বার্চ্চ গাছ কাটে। অথচ আশী বছর তার বয়েস। গাছ কেটে গাছের পাতাশুদ্ধ ডাল সে আঁটি বেঁধে আনতে লাগল—শীতকালে পশুখাদ্য হিসেবে তা ব্যবহৃত হবে।

সংসারে এদের যা কিছু খাদ্যদ্রব্য আবশ্যক, সব জমি থেকে উৎপন্ন করা হয়। যব, রাই, ওট্‌ ক্ষেতেই হয়। বাগানে হয় কপি, আলু ও ফরাসী বিন্‌। গ্রামের পেছনে যে পাহাড়, তাতে নানা প্রকার বন্য বেরি জন্মায়, গ্রামের ছেলেমেয়েরা প্রচুর তুলে আনে, পল্লী-গৃহিণীরা তার আচার ও মোরব্বা ইত্যাদি তৈরী করে শীতকালের জন্য রেখে দেন। গ্রামের বাইরে পথের ধারে ঝোপে রাশি রাশি ষ্ট্রবেরি ও র‍্যাম্পবেরি ফলে। বুনো কিউরাণ্ট ফলের মিষ্ট মদ তৈরী হয়। সুপ ও পুডিং তৈরীর জন্যে বন্য চেরি ফলের রস বোতলে পুরে রাখা হয়। পাহাড়ের মাথায় শীতের প্রারম্ভে ক্লাউডবেরি ফলে, তা থেকে অতি উৎকৃষ্ট জ্যাম প্রস্তুত হয়।

একদিন পাশের গ্রামে একটা উৎসব হ'ল। দু-তিন খানা গ্রামের তরুণ-তরুণী, বৃদ্ধ, প্রৌঢ় সবাই জুটে সারা রাত নাচলে। অবিবাহিতা মেয়েরা সুন্দর সেজে এসেছে। একটী মেয়ে খুব লম্বা একটা লাঠির আগায় একটা হ্যাট তুলে ধরে রেখেছে, গানের তালে তালে নাচতে নাচতে যে লাফিয়ে উঠে হ্যাটটা লাঠি থেকে ফেলে দিতে পারবে, সে ছেলেটি ঐ মেয়েটীর সঙ্গে নাচতে পাবে। অনেকগুলি ছেলে চেষ্টা

করলে, হ্যাট কেউ ফেলতে পারে না। অবশেষে খুব সুশ্রী একটী ছেলে এক লাফে ঠেলে উঠে হ্যাট ছুঁড়ে ফেললে। আমার যেন মনে হ'ল ওই ছেলেটী যখন এল, মেয়েটী তখন লাঠিগাছটা একটু নীচু করে ধরেছিল। কিংবা হয়তো আমার চোখের ভুল। যাই হোক, ছেলেটীর সঙ্গে মেয়েটী সারা রাত নাচলে।

নাচ আর গান থামবার নাম নেই। হলের মধ্যে বেজায় গরম। আমি বাইরে এসে দাঁড়ালাম, দুপুর রাত পার হয়ে গিয়েছে, উত্তর দিকের পাহাড়ের আড়ালে তখনও সূর্য্যাস্তের রঙীন আভা মেলায় নি, ঘণ্টা দুই পরেই আবার সূর্য্যোদয় হবে

রাত সাড়ে তিনটার সময় আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। রাস্‌নার স্বামী বললে—চল আমরা সব যাই। আবার সকালে উঠেই মাঠের কাজে বেরুতে হবে।

আমরা যখন পথে বেরিয়েছি, তখন তরুণ তপনের সোণালী আলোয় পর্ব্বতশিখর রঞ্জিত হয়ে উঠছে। ভোরের বাতাসে শিশির ও বনফুলের গন্ধ। আমি বাড়ী ফিরে এসে পালকভরা গদির বিছানায় যখন ক্লান্ত দেহ প্রসারিত করে দিয়েছি, আমার শয়নগৃহের জানালার বাহিরে চেরি গাছে পাখীরা তখন কলধ্বনি করে উঠল।

ঘুম ভেঙে উঠে দেখি রাস্‌না নিজে আমার জন্যে কফি আর কেক্ এনেছে। রোজই এ রকম হয়। হাত-মুখ ধুয়ে পোষাক পরে ব্রেকফাষ্ট খেতে যাই। তখন আরও কফি দেয়, তার সঙ্গে থাকে রুটী, মাখন, মাছ, সসেজ ও ছাগলের দুধের পনির। ব্রেকফাষ্ট খাওয়ার পরে বেলা এগারটা পর্য্যন্ত ক্ষেত-খামার ও ঘর-গৃহস্থালীর কাজ হয়। তারপর আবার ঠিক সকালের মত গুরুভোজন। বেলা দেড়টার সময় মধ্যাহ্ন-ভোজন অন্তে সবাই একটু ঘুমিয়ে নেয়। বিকেলে ঘুম থেকে উঠে আর একবার কফি ও কেক্ খেয়ে যে যার কাজে বেরুবে। রাত আটটা বা নটায় এদের নৈশ ভোজন। সে সময়ে শুধু বড় এক বাটী ভাজা যবসিদ্ধ ছাড়া আর কিছু খাওয়ার নিয়ম নেই।

নরওয়ে কৃষাণ-জীবন: পিতামাতার সহিত শিশুরাও শস্য-ক্ষেত্রে কাজ করে।

নৈশভোজন শেষ করে আমরা সেলাই করি বা বুনি। সংসারে ব্যবহৃত মোজা, দস্তানা, সোয়েটার ইত্যাদি সবই বাড়ীতে বোনা ও রিপু করা হয়। রাস্‌নার মেয়ে টেবিলে বসে দুলে দুলে পড়া মুখস্থ করে। বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা আমাদের কাছে বসে গল্প বলে।

এখানে শীতকালের শোভা অবর্ণনীয়। পর্ব্বতের উপত্যকা-রাজি শুভ্র তুষারে আবৃত হয়, দিনে হরিদ্রাভ সূর্য্যকিরণে তাদের নানারকম রং দেখা যায়। কিন্তু শীতের সুদীর্ঘ রাত্রির জ্যোৎস্নালোকে তুষারমণ্ডিত পর্ব্বত শিখর, উপত্যকা ও নিষ্পত্র বৃক্ষরাজির যে শোভা হয়, তা যেন সম্পূর্ণ অপার্থিব ও অবাস্তব। চোখে না দেখলে তা বুঝাবার উপায় নেই।

বৈশাখ

—শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

চৈত্রের অঙ্গন তলে, ঝটিকার দ্বারপথ হ'তে
বহুদূর শূন্যে, মেঘলোকে,—
মুখানি দেখিনু কার—খররৌদ্রে প্রদীপ্ত, সুন্দর!
অভিনব নর্ত্তকের বেশে মনোহর।
সুবিশাল জটাজালে আচ্ছন্ন আকাশ
বাতাস শ্বসিয়া ওঠে স্ফীত তার নাসারন্ধ্র তলে
উদ্দাম নৃত্যের ছলে,
অকূলের প্রান্ত বাহি উত্তরিল অনন্তের মন্দিরপ্রাঙ্গণে।

বসন্তের ছায়া-কুঞ্জ বনে
পলে পলে একান্ত গোপনে
রসঘন মৃত্তিকার অন্তরের নীচে, সংগুপ্ত কুলায়ে
নিখিলের হৃদয়ে আবরণ-ছায়ে
কে তাহারে দিল রূপ—
জীবন-মৃত্যুর বেশে অতি অপরূপ!
অতুলন রৌদ্র-মেঘ-ছায়ে।
প্রচ্ছন্ন দক্ষিণবায়ে
ভস্মের সৌন্দর্য্য-কলি পলকে পলকে
প্রস্ফুটিল আঁখির অলখে!

জরাজীর্ণ বৃদ্ধত্বের ধ্বংসস্তূপ মাঝে
পরিপূর্ণ জীবনের শোভায় সুন্দর,
মূর্ত্তি তার অতি মনোহর।
অট্টহাস্যে তড়িতের দীপশিখা ধরি
দিবস-শর্ব্বরী,
গর্জ্জমান ক্ষুব্ধ শূন্যতলে
বর্ষণের তীক্ষ্ণ ধারাজলে
অন্ধকারে মত্ত অভিসারে;
কটাক্ষে কম্পিতকায়, উলঙ্গ সে করাল দুর্ব্বার,
নৃত্যে তার স্তব্ধ ধরা, সৃষ্টিতল কাঁপে বার বার
হেরি তারে
চক্রবাল-সীমা-রেখা পারে
ধরিত্রী নীরব যেন অতি শঙ্কাতুর—
উচ্ছৃঙ্খল ক্রন্দনের সুর,
চতুর্দ্দিকে ওঠে তার বাজি'—

এই তার দুরন্ত শিশুর
দুর্নিবার রথচক্রতলে
তৃণসম অবিশ্রাম তারে যেন দলে;
নিঃশঙ্কের চিত্তে লাগে ভয়,
মদক্ষিপ্ত ক্রুদ্ধ তার হয়
শূন্য পথে দুর্দ্দাপটে ছোটে,
অগ্নির স্ফুলিঙ্গ ওঠে তীব্র গতিবেগে,
প্রচণ্ড আঘাত লেগে
কেঁপে ওঠে দিগন্তের বাঁক
আকাশের প্রান্তে প্রান্তে, গুরু গুরু বাজে মেঘ-সংঘাতের শাঁখ।

অতীতের পুরাতন পুরাবৃত্ত যত,
যত তার পুঞ্জীভূত ক্ষত,
যে তার কাহিনী—অবলুপ্ত যে প্রাচীন আশা,
শীর্ণ দেহে নাহি পায় প্রকাশের ভাষা,
হতবাক্ যে তাহার বাণী,
গতমান জীবনের বহি যত গ্লানি—
ল'য়ে তার ঝরা ফুল, নির্ব্বাপিত হাসি
প্রক্ষিপ্ত পত্রের রাশি,
মিলাইয়া যেতে চায় আঁখি-পথ হ'তে
তাহারি অন্তরস্রোতে
যে বাণী অমর,
যাতে আছে ভবিষ্যৎ জীবনের নির্ভরের বর
পরিপূর্ণ আছে যাহে প্রাণ,
মৃত্যুহীন, সীমাহীন,—সৃষ্টি যার ধ্বংসে মহীয়ান,
বৎসরের শেষ চিতালোকে,
নিষ্প্রভ আলোকে,
দুঃখে, শোকে, নাচে যেই অন্তহীন আয়ু
মৃত্যুর অপর প্রান্তে চির-অমিতায়ু,
অলোক-সুন্দর সেই গতায়ুর অন্তস্থল হতে
উৎসারিয়া ওঠে যেই গান,
অনাগত কালের আহ্বান,
ভবিষ্যৎ জীবনের সগৌরব ডাক্
রুদ্রকণ্ঠে মেঘ-মন্দ্র-স্বরে
অসীম অম্বরপরে
শুনিলাম সেই বাণী ঘোষিছে বৈশাখ।
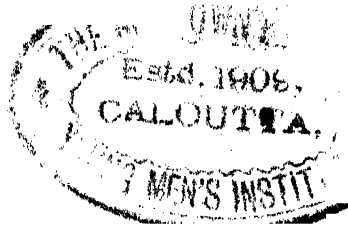
থিল

—শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

বেশী দিনের কথা নয়—গত মাঘ মাসে আমাদের এই সহর কলিকাতার কোনও ভদ্র, শিক্ষিত, বাঙ্গালী হিন্দু-পরিবারের চারিটি অনূঢ়া বয়স্থা কন্যা বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিল, তিনটি অভাগী অকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে, একটি মাত্র সঙ্কল্পচ্যুত হইয়াছে। চারিটিই সহোদরা ভগিনী, বয়স তাহাদের অষ্টাবিংশতি হইতে চতুর্ব্বিংশতি।

বাঙ্গালী হিন্দু-পরিবারের কন্যা এত বয়স পর্য্যন্ত কেন অবিবাহিত ছিল এবং কি হেতু তাহারা মুকুলিত যৌবনে আত্মহত্যারূপ মহাপাপ অনুষ্ঠান করিয়া ইহসংসারের জ্বালা যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতিলাভের উদ্দেশ্যে একযোগে পরামর্শ করিয়া একই সঙ্গে অহিফেন সেবন করিল, তাহা ভাবিয়া দেখিবারও কি সমাজের অধিকার নাই বা সময় হয় নাই?

অতীতে সমাজের যে ভাবে পরিস্থিতি ছিল, অবশ্য সে ভাবের সমাজ বলিয়া কোন জিনিষ এখন আর নাই। সে সমাজপতিও আর নাই, সমাজের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ সে সব মানুষও আর নাই, আর নাই সমাজের সে সব কড়া আইন-কানুন, যম-নিয়ম, শাসন-অনুশাসন। সমাজের প্রত্যেক ঘরের প্রত্যহ হাঁড়ীর খবর রাখেন, সকলের সুখে দুঃখে দরদী সমব্যথী এমন সমাজপতিদেরও যেমন অভাব, তেমনই তাঁহাদের ন্যায়ধর্ম্মানুযায়ী কঠোর শাসন মানিবার মত শ্রদ্ধা-প্রীতিও এখন কাহারও নাই, এখন সবাই স্বাধীন, সবাই প্রধান, আপনার যুক্তি বা রুচি যাহা বলে, রাজার পিনাল-কোড না ভাঙ্গিয়া, তাহাই মানিয়া আমরা সবাই চলিয়া থাকি। কাজেই এখন সমাজের কাহারও কোনরূপ অনিয়ম দেখিলে—কাহাকেও চলিত বিধি-নিষেধ বা আচার-ব্যবহার অমান্য করিতে দেখিলে—কেহ গুরুমহাশয়ের মত বেত লইয়া শাসন করিতে গেলে তাহাকে উপহাসাস্পদ হইতে হইবেই। তবে কি, সমাজের অনিষ্টের আশঙ্কা হইবার কারণ ঘটিতেছে মনে করিলেও মুখ ফুটিয়া কাহারও কিছু বলিবার অধিকার নাই বা কোনও কিছু ভাবনা-চিন্তা করিবারও প্রয়োজন নাই?

মনে ত তাহা হয় না। যে চারিটি অনূঢ়া তরুণীর আত্ম-হত্যার চেষ্টার কথা উল্লেখ করিলাম, তাহাদের সম্পর্কে স্থানীয় সংবাদপত্রসমূহে নানা আলোচনা হইয়াছে। ঐ সম্পর্কে কেহ তরুণীদের বিকৃত শিক্ষার স্কন্ধে দোষের বোঝা চাপাইয়াছেন, কেহ বা হিন্দু সমাজকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়া দায়ে খালাস হইয়াছেন; সুতরাং সমাজে যে এ সম্বন্ধে আলোচনা মোটেই চলে না তাহাও বলা যায় না। এই আলোচনার সম্পর্কে সংবাদপত্রে একটি খবর বাহির হইয়াছে যে, তরুণীদের একটি তরুণ অবিবাহিত ভ্রাতা ইতিপূর্ব্বে একটি বিবাহিতা তরুণীর সহিত ঢাকুরিয়া-হ্রদে নিমজ্জিত হইয়া এক সঙ্গে আত্মহত্যা করিয়াছিল। সেই হৃদয়-ভেদী করুণ কাহিনীর উপরে ভিত্তি করিয়া পূর্ব্বে 'বঙ্গশ্রী' পত্রে আমি 'ফোর্থ ক্লাস ফুল'-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। শুনিয়াছি, বাঙ্গালী সমাজে—বিশেষতঃ আমাদের বাঙ্গালী তরুণ মহলে—উহা আদর পাইয়াছে। সুতরাং সমাজ যে এই শ্রেণীর সামাজিক দুর্ঘটনার ব্যাপারে কাহারও মতামত একেবারে গ্রহণ করে না, তাহাও বলা যায় না। এই ভরসায় আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধটি লিখিতে সাহসী হইলাম।

এখনকার যুগে কেহ যদি বলে, পুত্রের মত কন্যাকে স্কুল কলেজে পাঠাইয়া শিক্ষিত করিবার প্রয়োজন নাই, তাহা হইলে সমাজ তাহাকে নিশ্চিতই রাঁচী পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবে। কন্যাকে পুত্রের মত পালন করিবার ও শিক্ষিত করিবার কথা সত্যযুগ হইতে স্মৃতিকারেরা ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন। বস্তুতঃ আমাদের ঘরের মেয়েরা চেলীর পুঁটুলী বা রেলগাড়ীর লগেজ হইয়া আমাদের পায়ে পায়ে জড়াইয়া থাকে, তাহাদের কোনরূপ শিক্ষা বা স্বতন্ত্র সত্তা থাকিবে না, গরু বাছুর বা ঘটিবাটীর মত তাহাদের লইয়া নাড়াচাড়া করা হইবে,—বোধ হয় এখনকার যুগে কোন বাঙ্গালী গৃহস্থই ইহা অনুমোদন করিবে না। বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে দেশের অবস্থা যাহাই থাকুক, বর্ত্তমানে আমাদের সমাজে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি আগ্রহান্বিত নহেন, এমন

লোক বিরল। বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে নারী-শিক্ষা সম্বন্ধে মানুষের যে ধারণা ছিল এবং তাহার ফলে সমাজে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল, জগতের প্রগতিশীল সভ্য উন্নত দেশসমূহেও কোন না কোন সময়ে সেই অবস্থা বিদ্যমান ছিল। বৃটিশ জাতির ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখা যায় মিড-ভিক্টোরিয়ান (Mid-Victorian) যুগ পর্য্যন্ত সমাজে নারীর স্থান এবং স্ত্রী-শিক্ষার অবস্থা সেখানেও প্রায় প্রাচ্য দেশের তথাকথিত 'অসভ্য ও অনুন্নত' দেশসমূহের মতই ছিল। ডিকেন্সের ডেভিড কপারফিল্ডের (David Copperfield) অ্যাগ্নেস (Agnes) চরিত্রে দেখা যায়, প্রাচ্য দেশেরই মত নারীর মধ্যে একনিষ্ঠ প্রেম-তন্ময়তা তখনকার কালে বৃটেনে আদরণীয় ছিল। বোধ হয় বর্ত্তমান যুগের কর্ত্তিতালক (bobbed hair) আধুনিকারা (modern girl) হকি-ষ্টিক তুলিয়া ঐরূপ প্রকৃতির নারী-চরিত্রের দিকে তাকাইয়া অবজ্ঞা ও বিদ্রূপের হাসি হাসিবেন সন্দেহ নাই। এ পরিবর্ত্তনও কিন্তু অধিক দিনের নহে। জার্ম্মান যুদ্ধের সময়ে যখন রাষ্ট্রসমূহের সমর্থ তরুণ মাত্রেই রণস্থলে গিয়াছিল এবং রাষ্ট্রের কাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে নারীদের বাহিরে ডাক পড়িয়াছিল, পরন্তু যখন হইতে ওয়ার-বেবির (war babies) উদ্ভব হইয়াছিল, তখন হইতেই পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। কেবল নারী কেন, প্রতীচ্যে, বিশেষতঃ বৃটেনে পুরুষদেরও শিক্ষার সংস্কারই বা কবে হইয়াছে? বৃটিশ নারীদের সাফ্রেজিষ্ট (Suffragist) আন্দোলন ত সেদিনের কথা! শ্রীমতী প্যাঙ্কহার্ষ্টের (Mrs. এবং Miss Pankhurst) লীলা-খেলার কথা বোধ হয় অনেকেরই মনে আছে। বিলাতে শ্রমিক আন্দোলনই বা কত দিনের কথা? শ্রমিক দলপতি হার্ডি (Mr. Keir Hardi) বিলাতের রাজবংশে একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে যেদিন অম্লান বদনে বলিয়াছিলেন,—'আর একটি ভিখারীর অন্ন যোগাইতে হইবে জাতিকে', তাহাই বা কত দিনের কথা?

কাজেই সকল দেশের সকল সমাজেই এই ভাবে একটা না একটা কারণে পরিবর্ত্তন আসিয়া থাকে, তবে জাতির বৈশিষ্ট্য বা ভাবধারা কতক পরিমাণে বজায় থাকে। নতুবা পরিবর্ত্তন ও অনুকরণের ফলে সকল জাতির ভাবধারাই এক হইয়া যাইত। আমাদের দেশেও বর্ত্তমানে যে একটা পরিবর্ত্তনের যুগ আসিয়াছে, সেজন্য বিস্মিত বা চকিত হইবার কোন কারণ নাই। তবে ঐ পরিবর্ত্তনটিকে কিরূপে জাতির বৈশিষ্ট্য ও ভাবধারার অনুযায়ী করিয়া ঘরে তুলিয়া লওয়া যায়, তাহাই এখন সমাজের মনীষী চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গকে চিন্তা করিতে হইবে।

সকলেই স্বীকার করিবেন যে, পুরুষের মত নারীরও শিক্ষার প্রয়োজন আছে। কারণ সমাজের এক অঙ্গ অজ্ঞানান্ধকারে পঙ্গু হইয়া থাকিলে অপরাঙ্গ শতধারে জ্ঞান আহরণ করিলেও স্বতঃস্ফূর্ত্ত উন্নত সমাজ গড়িয়া উঠে না। কিন্তু কথা এই যে, আমাদের বাঙ্গালীর ঘরের মা-লক্ষ্মীদের শিক্ষার প্রকৃতি কিরূপ হইবে? ইহাই হইয়াছে মহা সমস্যার কথা। বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরুষদেরই যে শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহাই কাহারও মনঃপূত হইতেছে না। সকলেই তাহা ঢালিয়া সাজাইবার জন্য আন্দোলন করিতেছেন। অনেকের মতে আধুনিক যুগের অর্থকরী বিদ্যা-শিক্ষার সহিত উহার সম্পর্ক যখন কম, তখন উহা অচল, উহার আশু পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। তাহা ছাড়া ধর্ম্মহীন, কেতাবতী শিক্ষা আমাদের ছেলেদের পক্ষেই অনিষ্টকর বলিয়া যখন বিবেচিত হইতেছে, তখন যে-অন্তঃপুরে আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম এখন সীমাবদ্ধ, অন্তঃপুরচারিকাদের পক্ষে যে উহা একেবারেই উপযোগী নহে একথা অনেকেই মুক্তকণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সমাজে সম্প্রতি যে কয়টি উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতার দৃষ্টান্ত দেখা দিয়াছে, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই এই ভাবের মন্তব্য প্রকাশিত হইতেছে।

কথা উঠিয়াছে, আধুনিক প্রগতির যুগে ধর্ম্মহীন শিক্ষা জাতিকে পরানুকরণপ্রিয়, বিজাতীয় ভাবাপন্ন এবং কোনরূপ সামাজিক বা পারিবারিক কর্ত্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছে। ফলে আমাদের ছেলে-মেয়েরা সেই বিকৃত শিক্ষার ফলে স্বদেশ ও স্বজাতির শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি ও ভাবধারা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে এবং তাহার ফলও সমাজের পক্ষে বিষময় ও সর্ব্বনাশকর হইতেছে। এই শিক্ষা আমাদের মা-লক্ষ্মীদের দেওয়া উচিত কি না, তাহাই এখন চিন্তার বিষয়। বিশেষতঃ সহশিক্ষা (co education) প্রসারের জন্য যখন এক শ্রেণীর প্রগতিবাদী দেশবাসী বিশেষ

ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন, তখন বয়স্থা গৃহলক্ষ্মীদের মূলেই বাহিরে শিক্ষিত হইবার জন্ত প্রেরণ করা বাঙ্গালী হিন্দুর পক্ষে কর্ত্তব্য কি না, সে প্রশ্নও অনেকে উত্থাপন করিতেছেন। সুতরাং আমাদের মা-লক্ষ্মীদের কি ভাবে, কোন্ প্রথায় এবং কিরূপ আবেষ্টনীর মধ্যে শিক্ষা দেওয়া সমীচীন, তাহা চিন্তা করিবার অধিকার সমাজের সকলেরই আছে এবং সে সময়ও উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা অসঙ্গত নহে।

আমরা জাতির এক মস্ত বড় জীবন-সন্ধিক্ষণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। নদীতে যখন বন্যা আসে, তখন অনেক আবর্জ্জনা তাহার সহিত ভাসিয়া আসিয়া নদীর জলকে আবিল ও পঙ্কিল করে, দুই কূলও প্লাবিত করে। নদীর জল যখন তাহার পর স্থির হয়, তখন মন্দ ভাগটা সরিয়া যায়, নদীর তট-ভূমিতে পলিমাটী পড়িয়া চাষবাসের সুবিধা করিয়া দেয়। বিদেশের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা,—যাওয়া আসা, মেলামিশা এবং ভাবের আদান-প্রদানের জন্য বর্ত্তমানে খুবই বাড়িয়াছে। এই তথাকথিত বৈজ্ঞানিক যুগে দূর নিকট হওয়ায় এবং লেনদেনের প্রভাব বৃদ্ধি হওয়ায় এই সংস্রবের ও প্রভাবের হাত এড়াইবার কাহারও সাধ্য নাই। তাই সেই সংস্রবে আমাদের নিজস্ব শিক্ষা-দীক্ষা,সংস্কৃতি ও ভাবধারা হইতে বিভিন্ন প্রকৃতির ভাব আমাদের সমাজে নদীর বন্যার মত আসিয়া পড়িয়াছে এবং তাহার প্রভাব কোন কোন স্থলে আমাদের সমাজকে আবিল ও পঙ্কিল করিতেছে। ইহা দেখিয়া অনেকে হতাশ হইয়া পড়িতেছেন। একবারে রুদ্ধ কক্ষের অন্ধকার হইতে আধুনিকতার মুক্ত আলোকে আসিয়া চক্ষু ঝলসিয়া যাইতেছে। পথে-ঘাটে, ট্রামে-বাসে, স্কোয়ারে-লেকে, স্কুলে-কলেজে কোন কোন ক্ষেত্রে তরুণ সমাজের মধ্যে বাধাহীন উচ্ছৃঙ্খলতা এবং বিধিহীন যথেচ্ছাচার দেখিয়া তাঁহারা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছেন। নারী-সম্মেলনে সহ-শিক্ষা, বিবাহ-বিচ্ছেদ, জনন-নিরোধ-প্রমুখ বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হইতে দেখিয়া তাঁহারা সমাজ-ধ্বংসের আশঙ্কা করিতেছেন।

কিন্তু বন্যার জল স্থির হইলে যেমন জল নির্ম্মল ও সুন্দর হয় এবং আবিলতা আবর্জ্জনা হয় স্রোতমুখে বাহিত হইয়া চলিয়া যায়, অথবা নদীভিত্তিতে বিলীন হইয়া যায়, তেমনি সমাজের প্রথম ওলটপালটের অবসান হইলে আবার যখন আমাদের সমাজ আমাদের চিরন্তনী ভাবধারা, শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতির দিকে আকৃষ্ট হইবে, তখন আতঙ্ক, আশঙ্কা অমূলক বলিয়াই মনে হইবে। আমাদের ঘরের মা-লক্ষ্মীরা যেমন ছিলেন, তেমনই থাকিবেন। শিক্ষিতা আধুনিকা হইলেই যে তাঁহারা সমাজছাড়া অদ্ভুত জীবে পরিণত হইবেন, স্বামী-পুত্র, আশ্রিত পোষ্যকে খাওয়াইয়া পরাইয়া সেবা-শুশ্রূষা করিয়া সংসার-মরুর মধ্যে শান্ত শীতল প্রস্রবণ-শোভিত মরুদ্বীপ সাজাইবেন না, তাহা হইতেই পারে না। আমাদের এই ভারতের মাটী—বাঙ্গলার মাটী তেমন নহে।

এইটুকু মানিয়া লইলেই সমস্যা সোজা হইয়া পড়ে। কেহ গুরু মহাশয়ের মত বেত লইয়া সমাজ শাসন করিতে কাহাকেও আহ্বান করিতেছে না। আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া আমাদের মা-লক্ষ্মীদের শিক্ষার ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া সমীচীন, সেই সম্বন্ধে কিছু বলিবার কথা হইতেছে।

বেশী দিনের কথা নহে, গত ফেব্রুয়ারী মাসে "শিক্ষা সপ্তাহে" সরকারের শিক্ষাকর্ত্তা (Education Commissioner) সার জর্জ্জ এণ্ডার্সন আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাদান প্রথা সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছেন। উহাতে অন্যান্য কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—"এখানকার শিক্ষার প্রধান প্রতিবন্ধক দারিদ্র্য। এখানকার সরকার দরিদ্র, জনসাধারণও দরিদ্র। সুতরাং এখানকার দারিদ্র্যক্লিষ্ট পিতা-মাতা যদি তাহাদের সন্তানগণকে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে না পাঠাইয়া যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জনের চেষ্টায় প্রেরণ করেন, তবে তাঁহাদের দোষ দেওয়া যায় না।"

কথাটা নিশ্চিতই সত্য। সুতরাং অন্য সম্পন্ন দেশের অনুকরণে এদেশে যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে এবং উহাতে যে ভাবের শিক্ষা এ যাবৎ দিয়া আসা হইতেছে, তাহা যে এদেশের উপযোগী নহে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ছেলেদের সম্বন্ধে এ কথা যখন প্রযোজ্য, তখন মেয়েদের সম্বন্ধে ত কথাই নাই। তবে এদেশের সরকার দরিদ্র বলিয়া যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। সে তর্ক এখানে তুলিব না। তবে এইটুকু মাত্র বলিব যে, সরকারী রাজস্ব যদি দেশ ও জাতিগঠন কার্য্যে উপযুক্ত রূপে ব্যয়িত হইত, তাহা হইলে আধুনিক কালোপযোগী অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দিবার পথে কোন কণ্টকই থাকিত না।

যাহা হউক, সার জর্জ্জ তাহার পর আর একটি কথা বলিয়াছেন, সেটি বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, "এদেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পাত্রাপাত্রনির্ব্বিচারে কেবল পুঁথিগত বিদ্যালাভের অভিলাষীদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়েছে। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে শিক্ষার বিভিন্ন কতকগুলি স্তর বিভাগ করিয়া ফেলিতে হইবে।" কাজেই যখন শিক্ষা-কমিশনারের মতে ছেলেদের পক্ষেই আধুনিক পুঁথিগত বিদ্যাশিক্ষা-দান প্রথার আমূল পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয়, তখন আমাদের মা-লক্ষ্মীদের পক্ষে যে উহা অধিকতর প্রয়োজনীয়, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। আরও একটা কথা ঐ সঙ্গে বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখা আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য,—আমাদের ঘরের বালিকা, কিশোরী ও তরুণী শিক্ষার্থিনীদের কিরূপ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা সমীচীন। পরন্তু সেই সব প্রতিষ্ঠান কেবল মাত্র ডে-স্কুল ও কলেজ (day school & college) হইবে, অথবা অহোরাত্রের বোর্ডিং স্কুল ও কলেজ হইবে, তাহাও ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

এখনকার কালে আমাদের দেশে যে সব স্কুল, কলেজ অথবা বোর্ডিং স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান হইয়াছে, সে প্রকৃতির শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশের শিক্ষা-দীক্ষা বা ভাবধারার অনুযায়ী নহে, সেগুলির আদর্শ বিদেশী ও বিজাতীয়। সুতরাং যে সকল আদর্শের অনুকরণ করিয়া এই প্রকৃতির স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের আভ্যন্তরীণ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা কিরূপ তাহার একটু আলোচনা করিয়া দেখা আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। যদি সে আদর্শ অনুকরণযোগ্য অর্থাৎ আমাদের সমাজের পক্ষে কল্যাণপ্রদ হয়, তবে আমাদের ঘরের লক্ষ্মীদের জন্য অবশ্যই সেই আদর্শ অনুকরণ করা কর্ত্তব্য। অন্যথা আবাহনেই সেই আবর্জ্জনাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। ইহা সহজ বুদ্ধিতে সকলেই স্বীকার করিবে।

"ফোর্থ ক্লাশ স্কুল" প্রবন্ধে আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জজ বেন লিণ্ডসের (Ben Lindsay) মামলার বিচারের রায় হইতে কতকগুলি অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, সেখানকার স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী বালক-বালিকা ও তরুণ-তরুণীরা কিরূপ বিপদের আবহাওয়ার মধ্যে বসবাস করিয়া থাকে। এখানে আমি তাহার পুনরুল্লেখ করিব না। তাঁহার আর একটি উক্তির ভাবার্থ এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

For recreation or amusement or for thrills the boys and girls of high-school age go to parties, attend dances, ride together in automobiles and do a lot of other things. More than ninety per cent of such youth indulge in hugging and kissing. At least 50 per cent of those who begin in hugging and kissing do not restrict themselves to that, but go further and indulge in other sex liberties which by all the convention are outrageously improper.

ইহার সরলার্থ :—উচ্চ বিদ্যালয়ে যাইবার বয়ঃপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরা অবসর-বিনোদন, আমোদ-প্রমোদ অথবা 'শিহরণ" উপভোগের জন্য ভোজের বা অনুরূপ সভায় যাইয়া থাকে, অথবা নাচের মজলিসে যায়, কিংবা একত্র মোটরে চড়িয়া সখের ভ্রমণ করে এবং আরও অনেক রকম কাজ করে। এই শ্রেণীর তরুণ তরুণীরা পরস্পর আলিঙ্গন-চুম্বনাদি করিয়া থাকে। যাহারা আলিঙ্গন চুম্বন আরম্ভ করে, তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ শতকরা ৫০ জন ইহা হইতে আরও দূরে যায় এবং সমাজের সকল নিয়ম কানুনের ঘোর বিরোধী ও অন্যায় মৈথুন সম্পর্কিত স্বাধীনতা উপভোগ করে।

জজ্ বেন লিণ্ডসে যাহা বলিয়াছেন এবং তাঁহার রায়ের ভাবার্থ হইতে যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা তাঁহার স্বকপোলকল্পিত দায়িত্বজ্ঞানহীন অভিমত নহে, নিজের জীবনে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফল। তিনি ডেন্‌ভার শিশু-আদালতে (Denver Juvenile Court) বিচারে বসিয়া স্কুল-কলেজের তরুণ শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থিনীদের পরস্পর ব্যবহারের সম্বন্ধে যে সব সাক্ষ্য-প্রমাণ পাইয়াছেন, তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া এই ভাবের অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

আর তাঁহার এই সুচিন্তিত অভিমত যে ভিত্তিহীন নহে, তাহাও আমি পরবর্ত্তী একটি বিবরণ হইতে সপ্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইব। এই বিবরণটি যদিও একখানি উপন্যাস হইতে গৃহীত হইয়াছে, তথাপি উহা একটি জীবন্ত শিক্ষার্থিনীর স্কুল-জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে সঞ্চিত। সুতরাং উহা অবিশ্বাস্য নহে।

নভেলখানির নাম The Schoolgirl, (বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থিনী বালিকা)। নভেলখানি লিখিয়াছেন একটি পঞ্চদশী

বালিকা, নাম তাঁহার Miss Carmen Barnes, কুমারী কার্মেন বার্নেস। তিনি তাঁহার 'from her experience' অর্থাৎ স্কুল বোর্ডিংএ অবস্থানকালীন সঞ্চিত অভিজ্ঞতা হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া এই অপূর্ব্ব উপন্যাস লিখিয়াছেন। প্রতীচ্যে (মার্কিণ মুলুকেও) পঞ্চদশী বালিকার না কি যৌন বোধের উন্মেষ হয় না বলিয়াই শুনিয়াছিলাম ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই বালিকাটি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে আমার সে ধারণা দূর হইয়াছে, পরন্তু সে দেশের অল্পবয়স্কা কিশোরীও যে অপূর্ব্ব লিপিচাতুর্য্য প্রদর্শনে সুনিপুণা, তাহাও বিশ্বাস হইয়াছে। এই কিশোরীটী সপ্তদশ বর্ষ বয়সে আর একখানি নভেল লিখিয়াছেন, তাহার নাম 'Beau Lover', অর্থাৎ সৌখিন প্রেমিক। সেই নভেলখানির পরিচয়ও পরে দিতেছি। আপাততঃ তাঁহার 'স্কুল গার্ল'খানির একটু সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতেছি।

প্রথমেই বলিয়া রাখি, কার্মেন বার্নেস উপকথার রাজকন্যা নহেন, তাঁহার পিতা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভাণ্ডারবিল্ট বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একজন নামজাদা অধ্যাপক। তাঁহার গর্ভধারিণী মিসেস Dianthia ডায়েন্থিয়া স্বয়ং কন্যার নভেলের একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। ঐ ভূমিকায় তিনি বলিতেছেন—

"This is written by my daughter with my full consent and approval for publication. She is now aged 16 and she has consulted me in every detail."

অর্থাৎ, আমার পূর্ণ সম্মতি ও অনুমোদন লইয়া উপন্যাস খানি আমার কন্যা লিখিয়াছে। তাহার বয়স এখন ১৬ বৎসর, সে প্রত্যেক খুঁটিনাটিতে আমার সহিত পরামর্শ করিবার পর বই লিখিয়াছে।

বর্ষিয়সী গৃহিণী জননীর পূর্ণ অনুমতি ও অনুমোদনক্রমে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া পঞ্চদশী কন্যা কি অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছে, তাহার পরিচয় দিতেছি। গ্রন্থখানি এত উপাদেয় হইয়াছে যে, উহা যখন ১৯৩০ সনের জানুয়ারী মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন একেবারে ১০ হাজার মুদ্রিত হয় এবং ১৯৩০ সনের জুলাই মাসে আবার উহা পুনর্মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে হয়। তাহার পর আবার ১৯৩২ সনের মার্চ্চ মাসে এবং ১৯৩৪ সনের মে মাসেও উহার পুনর্মুদ্রণ ও প্রচার করিতে হয়!

উপন্যাসের প্রকাশক তাঁহার কৈফিয়তে লিখিয়াছেন,— "মানুষের, বিশেষতঃ বালিকাগণের প্রথম যৌবনাবস্থা অতি ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক (notoriously dangerous age) এই হেতু নাওমির (উপন্যাসের নায়িকা শিক্ষার্থিনী বালিকার) পিতামাতা অন্যান্য পিতামাতার ন্যায় তাঁহাদের কন্যাকে একটি উচ্চাঙ্গের উচ্চ-বিদ্যালয়ের (fashionable finishing school) বোর্ডিংয়ে ভর্তি করিয়া দেন। তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, মেয়ে জীবনের বিপদ-আপদ হইতে—বিশেষতঃ যৌবনের যৌন বিপদ আপদ হইতে দূরে বোর্ডিং স্কুলের মধ্যে প্রাচীরবেষ্টিত (cloistered away) অবস্থায় থাকিয়া নিরাপদ হইবে। বোর্ডিং স্কুল জীবনের এই চমকপ্রদ (amazing) গল্পটি সত্যসত্যই একটি কিশোরী স্কুলের বালিকা লিখিয়াছেন। তিনি যে সকল ভিতরের রহস্য তৎসম্বন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সত্যসত্যই আশ্চর্য্যজনক, চমকপ্রদ। এই উপন্যাসের প্রাণই (spirit) হইতেছে যৌবন—যে যৌবনের মাদকতা একবার মনকে উত্তুঙ্গ পর্ব্বত শৃঙ্গে উত্তোলিত করিয়া পর মুহূর্ত্তেই গভীর খাদে নিমগ্ন করিয়া দেয়—যে যৌবন গোপনে অবৈধ অভিসার করে (stolen rendevous), লুকাইয়া চুম্বন আস্বাদন করে, প্রথম অভিজ্ঞতা ও আবিষ্কারের উন্মাদনার মদিরায় মনকে প্রথম শিহরণ দান করে।" প্রকাশক এই হেতু পাঠকগণকে উপহার দিতেছেন এই ভাবিয়া যে, "ইহা হইতে পাঠক বালিকা-বিদ্যালয়ের বোর্ডিংএর অভ্যন্তরে প্রকৃত জীবন-যাত্রা কিরূপ ভাবে নির্ব্বাহিত হয় তাহা জানিতে পারিবেন।"

কিশোরী লেখিকা মুখবন্ধে স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"একটি বালিকা বোর্ডিংএ স্কুল-জীবনে যে সকল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে, তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া এই নভেল লিখিত, —ইহার কিছুই অতিরঞ্জিত নহে (unexaggerated)। আমি পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে দক্ষিণের একটি উচ্চ বালিকা-বিদ্যালয়ের বোর্ডিংএ শিক্ষাসমাপনের জন্য প্রেরিত হই। এই স্থানেই আমি আমার উপন্যাসের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি। সেখানে যে সকল কাণ্ড হইতে দেখিয়াছি, তাহার কথা আমি পূর্ব্বে কিছুই জানিতাম না বা বুঝিতাম না।"

এইবার উপন্যাসের নায়িকা নাওমির কথা বলিব। গৃহে বাসকালে সে thrills অথবা শিহরণের আস্বাদ যে একবারে পায় নাই তাহা নহে। পাড়ার স্কুলছাত্র এবং তাহার ভ্রাতাদের বন্ধুদের সাহচর্য্যে কিছু কিছু থ্রিল (thrill) পাইয়াছিল; কিন্তু সে সকল তাহার পরবর্ত্তী বোর্ডিং-জীবনের থ্রিলের (thrill) তুলনায় নির্দ্দোষ বলিলেও চলে।

তবে সে একদিন 'বালিকাসুলভ' খেলাধুলার (pranks) ছলে তাহার John 'জন' নামক boy-friend এর (বালক বন্ধুর) সহিত গৃহত্যাগ করিয়াছিল (eloped)। এই হেতু তাহার মাতা তাহাকে বলিলেন যে, তাহার পিতা তাহাকে South Fields Preparatory School Boarding এ দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তখন নাওমির বয়স পঞ্চদশ বর্ষ!

মেয়েটি মায়ের কাতর উত্তরে রাগে পা ঠুকিতে লাগিল এবং অম্লান বদনে বলিল, "আচ্ছা, জনের সহিত পলায়ন করিয়াছি বলিয়া আমার খুব ভয়ঙ্কর কুনাম রটিয়াছে, না?"

বাবা বলিলেন, "আমরা তোমাকে দুই চারিদিন অন্তর গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে দিতে পারি না। এই ব্যবহারে ছেলেগুলার উপর অত্যন্ত অত্যাচার করা হয় (too hard for the boys)." নাওমি একথার পর একটি সিগারেট ধরাইয়া স্বচ্ছন্দে আরামে ধূম উদ্গীরণ করিতে লাগিল।

পিতাপুত্রী এবং মাতাকন্যার মধ্যে কি চমৎকার আলাপ পরিচয়! কি সুন্দর প্রাণখোলা সমান সমান ব্যবহার! এইরূপ আদর্শ ঘরসংসার ওখানে প্রায় সর্ব্বত্র।

অনেক কাকুতি-মিনতির পর একখানি Roadster (মোটরগাড়ী), একটি fur coat এবং একটি leopard coat ঘুষ দিবার প্রলোভন দেখাইয়া মেয়েকে স্কুলে পাঠান হইল। গৃহত্যাগের সময় নাওমি যখন গাড়ীতে উঠিতে যাইবে, তখন তাহার boy-friend টিম হিউজেস (টিম—টিমথি, আদরের ছোট নাম) তাহাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া গেল। এমন boy-friend এখানেই আরও দুই চারি জন ছিল।

বোর্ডিং স্কুলে গিয়া ক্লাসমেট ও রুমমেট অর্থাৎ এক ক্লাসের মেয়েদের এবং এক ঘরে শয়ন ও বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট মেয়ের সহিত নাওমির নানারূপ 'ক্রাশে'র (crushes) অভিজ্ঞতা হইল—সে অপূর্ব্ব! নাওমির মত মেয়েও তাহাতে বিস্মিত ও স্তম্ভিত না হইয়া পারিল না। কিন্তু সে প্রথম দুই চারিদিন। রুম মেটের নাম Janet (আদরের নাম জ্যানি)। সে তাহাকে তাহার স্কুলের বাহিরের স্কুলের ছাত্র বালক-বন্ধুর (boy friend) কথা জানাইল, তাহার নাম নিকি (Nicky, Nicholas এর ছোট আদরের নাম)। আরও নাওমি জানিত যে, তাহার ক্লাসমেট ও রুমমেটদের প্রায় সকলেরই বাহিরে বালক-বন্ধু (boy-friend) আছে। যেমন Marjorys (মার্জ্জি আদরের নাম) Jimmie (জিমি—জেমস, আদরের ডাকনাম জিমি)। জ্যানির আরও একটি boy-friend ছিল, তাহার নাম Jerry (জেরি—Gerald, আদরের নাম জেরি)।

একদিন স্কুলের এক matron এর বা chaperon অর্থাৎ খবরদারনি মিস্ গার্ডনারের সঙ্গে মেয়েরা ভ্রমণে (excursion) বাহির হইল। সময় বাঁধা আছে, তাহার মধ্যে ফিরিতে হইবে। পথে এক মোটরে ছিল Dave (ডেভ-ডেভিড) এবং তাহার বন্ধু জেরি। জ্যানি ও নাওমির সহিত তাহাদের দৃষ্টিবিনিময় ও ইসারা ইঙ্গিত হইল, ডেভ পেন্সিলে কাগজের টুক্‌রা বাঁধিয়া বালিকাদের কাছে ছুঁড়িয়া দিল। তাহাতে appointment এর অর্থাৎ গুপ্ত অভিসারের স্থান ও সময় নির্দ্দেশের জন্য অনুরোধ ছিল। স্কুলের ছেলেদের এই সাহসের কারণ এই যে, ঐ দুটি স্কুলের মেয়ে পথে তাহাদের প্রতি 'made eyes at them and waved hands.'

তাহার পর আসিল অভিসারের রাত্রি—নাওমির লুকাইয়া স্কুল হইতে পলায়ন-এবং লুকাইয়া যথাকালে প্রত্যাবর্ত্তন। অবশ্য একাজে তাহার সহায়ও ছিল জ্যানি। সে অভিসারের সমস্তটা আমি উদ্ধৃত করিব না, আর যতটুকু করিব, তাহার আর বাঙ্গলা তর্জ্জমাও করিয়া দিব না, তাহার রসাস্বাদ সকলেই সহজেই করিতে পারিবেন:—

(1) The beauty of Dave's great strength! Oh! The way she loved his blue eyes and fair hair! His smile and soft voice!

(2) Dave.—How late can you stay out?
Naomi.—Until ten thirty.

(3) In Dave's Roadster theystarted and dropped his sister (a very small girl) at home and then started towards the river. Kissing went on, Dave's kisses bruising Naomi's lips.

(4) Then night. Dave's lips burning into her, bruising her mouth, exulting and thrilling her. The right kind of thrill, ecstatic joy. His lips against the full veins of her throat and neck again and again. The shivery mercurial thrill racing down her spine when his hand sought her body, its rounded curves, when his mouth burrowed into the soft flesh where the bodice of her dress went down in a V, the agony, the excruciating dilation of her heart. Then the fury of his caresses sweep her on and on into a daze as she lay in his arms, overwhelmed by the terrfic violence of his love. His breathing against her ear, the force of his strength, his masculinity, his love crashing through her resistance. The fire of fierce desire had weakened, had made her heedless.

(5) The long drive back the night. Naomi crying softly. "Dave, I am so sorry! What do you think of me?"

Dave,— "Oh! It is all right."

(6) Late at night Naomi thought too it was all right!

নাওমি—পঞ্চদশী নাওমী—স্কুল বোর্ডিংএ কি সুন্দর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিল এবং লেখিকা স্বয়ং বলিয়াছেন যে, স্কুলের বালিকাদের এ অভিজ্ঞতা সর্ব্বব্যাপক! এই পঞ্চদশী লেখিকার আর একখানি কেতাবের নাম "Beau Lover," অর্থাৎ বাবু প্রেমিক। এখানি তাঁহার সপ্তদশ বর্ষ বয়সের লেখা। এ গল্পের নায়িকা স্কুলের 'আউট,' নাম Flora। তাঁহার অনেক লীলাখেলার পর তিনি তাঁহার বালক-বন্ধু অ্যার্ভিদের (boy-friend Arvid) সহিত ধরা পড়েন সন্দেহজনক (compromising) অবস্থায় এক পান্থ-নিবাসে (road hotel); এমন পথের অভিসার-স্থল ওদেশে অনেক থাকে। ফ্লোরার (Flora) এক ভগিনীর নাম গ্লোরি (Glory)। তিনি প্রেমের চুম্বন দেন জিমিকে, জিমিও তাঁহাকে প্রলোভিত করে। তাহার পর Anthony (টোনি, আদরের ছোট নাম)। কিন্তু তাঁহার পর একে একে তাঁহার যতই প্রেমিক দেখা দিক না কেন, কেহই তাঁহার খাঁটি Beau Lover বাবু প্রেমিকের আদর্শের কাছেও যাইতে পারেন নাই বা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই!

আমি পাঠকগণকে লিলিয়ান ডে (Lilian day) নাম্নী আর একটি তরুণীর (বিবাহিতা এবং অপেক্ষাকৃত অধিক-বয়স্কা ও সংসারজ্ঞানাভিজ্ঞা) লেখিকার কিস্ এণ্ড টেল (Kiss and Tell) উপন্যাস খানি পড়িয়া দেখিতে বলি তিনি গ্রন্থারম্ভেই প্রশ্ন তুলিয়াছেন,—"Why I divorced my husband, কেন আমি স্বামীর সহিত বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাইলাম?" তাহার পর তাঁহার জীবনের নানা অভিজ্ঞতার ফল মুক্তার বিন্দুর মত গ্রন্থে সঞ্চিত হইয়াছে।

এমন সব অমূল্য দৃষ্টান্তের পর এ দেশের মা-লক্ষ্মীদের শিক্ষা কি ভাবের, কি প্রকৃতির এবং কি অবস্থায় হওয়া উচিত, তাহা সকলে ভাবিয়া দেখিতে পারেন।

ধর্ম্ম ও ধর্ম

বর্ণের অর্থানুসারে "ধর্ম্ম" বলিতে বুঝায় সেই কার্য্য (দ্রব্য অথবা গুণ নহে), অথবা সেই চালচলন, যে কার্য্যে অথবা চালচলনে জীবের উপস্থ, বক্ষি এবং স্পর্শশক্তি অটুট থাকে। অথবা যাহা মানুষের করা উচিত, তাহার নাম ধর্ম্ম, ইহা বলা যাইতে পারে। আর "ধর্ম" বলিতে বুঝায় সেই কার্য্য (দ্রব্য অথবা গুণ নহে), অথবা সেই চালচলন, যাহা জীব তাহার উপস্থ ও তেজ বশতঃ অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহা হইতে বুঝিতে হয় যে, জীব যাহা সাধারণতঃ করিয়া থাকে, তাহাই তাহার ধর্ম, যথা চোরের ধর্ম, সাধুর ধর্ম, পশুর ধর্ম ইত্যাদি।……

মিনতি-উদ্ধার

—শ্রীঅমলা দেবী

[১]

পাশাপাশি দুইটি বাড়ী—নং ১ ও নং ২; ঠিক এক রকম দেখিতে, যেন একই শিল্প-প্রতিভার দুই যমজ সন্তান। বাড়ীগুলির বয়স বেশী বলিয়া বোধ হয় না, কারণ দেওয়াল-গুলি এখনও ক্ষতবিক্ষত হইয়া উঠে নাই এবং জানালা-দরজা গুলির বর্ণ স্বাভাবিক রহিয়াছে। প্রত্যেক বাড়ীর সামনে এক ফালি রোয়াক, তার পরেই প্রশস্ত বসিবার ঘর। রোয়াকের এক পাশে অন্দরে প্রবেশ করিবার দরজা। ১নং বাড়ীটির বসিবার ঘরে একটি ইজি চেয়ারে সম্প্রতি একজন বৃদ্ধকে অর্দ্ধশায়িত দেখা যাইতেছে। এই দুই বাড়ীর বাসিন্দা-দের মধ্যে নিশ্চয়ই খুব ঘনিষ্ঠতা আছে, কেন না দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, একটি সুদর্শন যুবক ২ নং বাড়ী হইতে ১নং বাড়ীতে অসঙ্কোচে প্রবেশ করিতেছে।

দরজা পার হইয়া একটি অপ্রশস্ত গলি এবং একটু অগ্রসর হইলেই আর একটি দরজা, তার পরেই ডানদিকে দোতলায় যাইবার সিঁড়ি এবং সাম্‌নেই প্রশস্ত উঠান। যুবক সিঁড়ি দিয়া উঠিল না; উঠান দিয়া বরাবর চলিল। সামনেই রান্নাঘরের রোয়াকে বসিয়া একটি যুবতী তরকারী কুটিতে-ছিলেন; যুবকের পদশব্দে মুখ তুলিয়া চাহিয়া মৃদু হাসিলেন এবং যুবক কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই কহিলেন, "কি, আজ সকালেই যে! কলেজ নেই?"

যুবক রোয়াকের উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল, "কাল রাত্রে তোমাদের বাড়ীতে কে এল গো, কাকী?"

যুবক ও যুবতী দুই জনেই প্রায় সমবয়সী। কাজেই দুইজনের মধ্যে একটি অকৃত্রিম বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকা বিচিত্র নয়।

যুবতী হাসিয়া কহিলেন, "কে, শুনলে খুব খুসী হয়ে উঠবে না।"

যুবক কহিল, "তাই না কি? কেন বল দেখি?"

যুবতী কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিলেন, "আচ্ছা রমেন, এখানে আসবার সময় তোমার বাঁ চোখ নাচেনি? কেউ হাঁচেনি? রাস্তায় হোঁচট খাওনি?"

রমেন হাসিয়া ফেলিল, দুই হাত দিয়া নিজের চোখদুটি ঘসিয়া কহিল, "সত্যি কাকী, চোখ দুটোই কদিন ধরে বেজায় নাচছে, তবে কোনটা যে বেশী নাচছে, তা অবিশ্যি হিসেব করিনি। আর হাঁচা? কে হাঁচবে? মা ত' আহ্নিকে বসেছেন, ভজুয়া বাজারে। আর হোঁচট্?" বিশেষ চিন্তিত ভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "হোঁচট্ খেয়েছি বলে ত মনে হচ্ছে না," বলিয়া চটি হইতে দক্ষিণ পদতল মুক্ত করিয়া, বাম হাঁটুর উপর চাপাইয়া, তাহাতে মমতার সহিত হাত বুলাইতে লাগিল।

যুবতী কহিলেন, "তা হলে ত ভারী মুস্কিলে ফেললে দেখছি! এ সব ত তোমার হওয়া উচিত ছিল।" বলিয়া হাসিয়া আবার নতমস্তকে তরকারী কুটিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

রমেন একটু সরিয়া বসিয়া কহিল, "সত্যি কাকী, রসিকতা রাখ। ব্যাপারটা কি বল দেখি? ভদ্রব্যক্তিটি কে? বয়স দেখে মনে হচ্ছে যে তোমরা নিশ্চয়ই মিনুর জন্যে পাত্র আমদানী করনি। অথচ মিনু অতিথি সৎকারে এমনি ব্যস্ত যে তার টিকিটিও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। আচ্ছা সমস্যায় ফেললে দেখছি।" ভুরু কুঁচকাইয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "বিশেষও নেই বাবা! ভেতরে ভেতরে ফাঁকি দিয়ে দাঁওয়ের চেষ্টা করছ না তো?"

মিনু অর্থাৎ মিনতি এই বাড়ীর অধিবাসিনী, সপ্তদশী, সুন্দরী-তরুণী। গৃহস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্রী। এ বৎসর আই-এস-সি পাশ করিয়া বেথুনে বি-এ পড়িতেছে।

যুবতী মুখ তুলিয়া কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিলেন, "কি মনে হয়?"

যুবক কহিল, "মনে যা হচ্ছে তা প্রকাশ করে না বলাই ভাল।" মিনতির সহিত কহিল, "দোহাই কাকী, দয়া করে নীহারিকা-লোক থেকে বাস্তব জগতে নেমে এস। অধমকে আর বৃথা ধোঁকা দিয়ে লাভ কি?"

যুবতী,—"ধোঁকা কাটিয়ে কোন লাভ নেই বৎস। ব্যাপার যা দাঁড়িয়েছে তা বেশ শক্ত। প্রকাশ করে বলি, অবহিত

হয়ে শ্রবণ কর। আর আগে একটুখানি চেপে বস, নচেৎ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বার সম্ভাবনা আছে।"

যুবতী কহিতে লাগিলেন, "বৃদ্ধ মিনুর দাদা মশাই, ছিলেন সাবজজ, রায় লিখতে লিখতে নাতনীর সম্বন্ধে কোন খেয়াল করবার এতদিন অবসর হয়নি। সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন, অতএব খেয়ালও হয়েছে। নিজের বলতে তেমন কেউ নেই অথচ হাতে আছে অনেক টাকা। কাল রাত্রে এসেছেন, মিনুকে নিয়ে যাবেন। কালই ফিরে যেতেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে ফিরে যাবার আর ট্রেণ ছিল না। কাজেই আজ পর্য্যন্ত আছেন। সেখানে এক বন্ধুর পাল্লায় পড়েছেন, তার একটি ছেলে না কি বিলেতে আই-সি-এস হতে গেছে, তার সঙ্গে মিনুর বিয়ের কথাবার্ত্তা স্থির হয়ে গেছে! পাছে শীকার হাত-ছাড়া হয়ে পড়ে সেই জন্যে দরদী বন্ধু একটা পুরাণো বাড়ী নূতনের দরে কিনে দিয়ে বৃদ্ধকে নজরবন্দী করে রেখেছে এবং 'অর্থং অনর্থং' শেখাবার জন্য একজন 'স্বামীজী'কে দিয়েছে বৃদ্ধের স্কন্ধে চাপিয়ে। কারণ হিসেব করে দেখেছে যে, মঠে মোটা চাঁদা দিয়েও যা বাকী থাকবে তার অঙ্কটাও নেহাৎ ফেল্‌না নয়। আজ রাত্রে যাবেন স্থির হয়েছে। মিনুকে আসবার পর থেকে কাছে বসিয়ে রেখেছেন, একটি পা নড়তে দেন নি, পাছে আমরা বিগড়ে দিই। শুনলে? শুনে নিশ্চয়ই পুলকিত হয়ে উঠছ না?"

রমেনের মুখখানি শুকাইয়া গেল। শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিল, "তুমি বুঝি খুব পুলকিত হয়ে উঠেছ?"

যুবতী দুই ভুরু কুঁচকাইয়া কহিলেন, "রীতিমত রোমাঞ্চ হচ্ছে রমেন। আই-সি-এস-এর শাশুড়ী, চাট্টিখানি ব্যাপার না কি? কাল রাত্রে আমাদের ঘুম হয় নি।"

রমেন ম্লান কণ্ঠে কহিল, "সত্যি না কি? তোমাদের কোন শক্রতা করেছি বলে ত মনে হচ্ছে না কাকী!"

যুবতী স্থির দৃষ্টিতে রমেনের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া কহিলেন, "রমেন এ তোমার বিশ্বাস হয়? কাল সত্যি আমরা ঘুমোই নি, পুলকে নয়, চিন্তায়; কি যে করব বুঝতে পারছি নি।"

রমেন কহিল, "কেন? কাকু ত' খোলাখুলি বললেই পারেন যেতে দেবেন না। এতদিন কোন খবর নেয়নি এখন দাদা মশাই সাজতে এসেছে! বেটা—"

"তোমার ভক্তি যে ভারী উগ্র হয়ে উঠছে রমেন! মাথা ঠাণ্ডা করে তোমার কাকুর সঙ্গে পরামর্শ কর গিয়ে। রোগ এখনও সাধ্যের বাইরে যায় নি বোধ হয়, উপায় একটা হতেও পারে।"

লজ্জিতমুখে রমেন কহিল, "কাকু কোথায়?" ঠিক এই সময়ে উপর হইতে ডাক আসিল, "কে রমেন না কি? উপরে এস হে!"

দোতলায় শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া রমেন দেখিল, একটি বড় আয়নাওয়ালা ড্রেসিং-টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া কাকু অর্থাৎ সুরেন্দ্রনাথ ক্ষৌরকর্ম্মে নিযুক্ত। সামনে টেবিলের উপর কামাইবার সরঞ্জাম ও একখানি লাল রংএর গামছা। গালে, চিবুকে ও গলায় এখানে সেখানে কাটিয়া গিয়া বিন্দু বিন্দু রক্ত জমিয়াছে। রমেন ঢুকিতেই সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "এস বাবাজী।"

কাছে আসিয়া রমেন কহিল, "এঃ একেবারে কেটে ফেলেছেন দেখছি।"

সুরেন্দ্রনাথ উত্তর দিল, "আজই নয় বাবাজী! এ নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। এক একদিন রক্তগঙ্গা বয়ে যায়, তোমার কাকীকে কাছে আসতে দিই নে, কেঁদে অনর্থ করে, হেমো-গ্লোবিন খাওয়ায়।"

রমেন বলিল, "সত্যি না কি, ভারী মুস্কিল তো?"

সুরেন্দ্রনাথ তখন ক্ষৌরকর্ম্ম শেষ করিয়া গামছা দিয়া মুখ মুছিতেছেন। কহিলেন, "মুস্কিল? অত্যন্ত এবং অনিবার্য্য। দিন আধ ইঞ্চি বৃদ্ধি; এক দিন না কামালেই জঙ্গল।" গালে হাত বুলাইয়া কহে, "দাড়ী ত নয়, বাবাজী দাড়া।"

সুরেন্দ্রনাথ সেই প্রকৃতির লোক, যার পনের হইতে পঞ্চাশ পর্য্যন্ত যে কোন বয়সের মানুষের সহিত রসিকতা করিতে বাধে না।

কামাইবার সাজ-সরঞ্জাম ধুইয়া মুছিয়া সাফ করিয়া ড্রয়ারের মধ্যে ঢুকাইয়া রাখিয়া, চেয়ারটা ঘুরাইয়া রমেনের মুখোমুখী হইয়া বসিয়া সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "সব ত শুনেছ বাবাজী?"

রমেন নীরবে ঘাড় নাড়িল।

সুরেন্দ্রনাথ কহিতে লাগিলেন, "ভারী মুস্কিল বাবাজী! বুড়ো যে রকম বদমেজাজী, কিছু বলতে সাহস হচ্ছে না।

কাল রাত্রে এসেই বলে, ফিরে যাবার ট্রেণ কখন? আমি বিনীত ভাবে নিবেদন করলাম, ট্রেণ নাই। বুড়ো খ্যাঁক করে উঠল, কামড়ায় আর কি। বলে ট্রেণ নেই, চালাকী না কি? দেখ দিকি কি বিপদ! ট্রেণ নেই ত আমি কি করব রে বাপু?"

রমেন মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করিল; "কখন যাবে?"

উত্তর আসিল, "রাত্রে, দিনেও একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেণ ছিল, তাও বলেছিলুম, পাছে ভাবে গোপন করছে, তা বললে, গাধা-বোট ত? সারাদিন রোদে টাটিয়ে হটর হটর করে যাই, এই তো আপনার ইচ্ছে। আপনার কি! বলে কট-মট করে তাকাতে লাগল। ভাগ্যে বামুনের ব্রহ্মতেজ আর নেই বাবাজী! তা হলে আজ আর আমাকে দেখতে পেতে না, দেখতে একমুঠো ছাই।"

রমেন হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "কাকু যেন কী! কোন জিনিষটা seriously নিতে পারেন না।"

দুই চোখ ডাগর করিয়া সুরেন্দ্রনাথ কহিল, "Serious! এর চেয়ে serious কখনও হইনি বাবাজী।" বলিয়া গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিলেন।

বাধা দিয়া রমেন কহিল, "মিনু কি বলে? যেতে চায়?"

মুখে ক্ষোভসূচক শব্দ করিয়া সুরেন্দ্র কহিলেন, "মিনুকে কি আসতে দিয়েছে না কি! Close vigilance—not নড়ন-চড়ন, not কিচ্ছু। চুপটি করে বসে মিনুকে শুধু ভাবী পতির গুণ বর্ণনা শুনতে হচ্ছে—এই এমন রূপ! এই তেমন বিদ্যে!"

রমেন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল, "তবে মিনুর নিশ্চয়ই ইচ্ছে আছে; কি বলেন?" বলিয়া সুরেন্দ্রের মুখের পানে তাকাইল।

সুরেন্দ্র সঘনে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "পাগল না কি! মিনু আমাদের তেমন মেয়েই নয়। কি করবে? একবার উঠতে দিচ্ছে না। কাল একবার তোমার কথা বুড়োকে বলেছিলুম, বাবাজী! বললুম, 'বৌদিদি একেবারে হাতে হাতে মিলিয়ে দিয়ে গেছেন, শুধু দুটো মন্ত্রপড়া হতে যা বাকী।' বলতেই বুড়ো কড়া সুরে বলল, 'ছেলেটির কি করা হয়?' বললুম, 'প্রফেসার'—বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ মাষ্টার তো? নিজের পেট চলে না, বৌকে খাওয়াবে কি? মাষ্টারের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার চেয়ে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়া ভাল।' আমি বলতে গেলুম 'আজ্ঞে প্রেসিডেন্সী কলেজের'—কথা শেষ করতে দিলে না বাবাজী! বললে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ সব সমান। মাষ্টারের সঙ্গে বিয়ে দেব না, ব্যস্', বলে দুই ঠোঁট চেপে চুপ করল। তারপর থেকে আমার সঙ্গে আর কথা কয়নি।"

রমেন এতক্ষণ কি ভাবিতেছিল; হয়তো সুরেন্দ্রের সব কথা তাহার কানেও যায় নাই। সুরেন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "তুমি ঘাবড়িও না বাবাজী! একটা উপায় করতে হবে।"

রমেন কহিল, "মিনুর সঙ্গে একবার দেখা হয় না?"

সুরেন্দ্র উত্তর দিলেন, "দেখা? সেইটিই তো মুস্কিল বাবাজী! তবে, বুড়ো কাল সারারাত্রি ঘুমোয়নি। নূতন যায়গা, সেই জন্যে বোধকরি ঘুম হয়নি। দুপুরে যদি কোন প্রকারে ঘুম পাড়ান যায় তো, মিনুকে পাঠিয়ে দিতে বলব।"

উৎসাহিত হইয়া রমেন কহিল, "দেখুন কাকু! পাড়াতেই হবে। আচ্ছা, ঘুমের একটা ওষুধ খাইয়ে দিলে হয় না?"

ম্লান হাসিয়া সুরেন্দ্র উত্তর দিলেন, "কে খাওয়াবে বাবাজী! খোকা তো নয়, যে চাম্‌চে করে ঢক্ করে গিলিয়ে দেওয়া যাবে?" রমেন কহিল, "কেন জলে গুলে?" সুরেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিলেন, "পাগল! ও সব কিছু করতে হবে না। দেখা হবার উপায় একটা করা যাবে। কিন্তু তোমা' তো কলেজ"—রমেন কহিল, "কলেজ থেকে চলে আসব দুটো তিনটের সময়, বুঝলেন? তা হলে আমি উঠি এখন, কাকীকেও একবার সব বুঝিয়ে বলে যাই।"

শুব্ধ দ্বিপ্রহর। পুরুষেরা অফিসে, ছেলেরা স্কুলে; মেয়েরা আহারাদি সারিয়া কোলের ছেলেগুলিকে ঘুম পাড়াইয়া, নিজেরাও দিবানিদ্রার ব্যবস্থা করিতেছেন। ছোট্ট রাস্তাটি—লোকচলাচল একেবারে রুদ্ধ। সমস্ত পল্লীটি যেন শীতের মধুর মধ্যাহ্নে পরম আরামে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

এমন সময়ে মিনতি রমেনদের বাড়ীতে প্রবেশ করিল। বসিবার ঘরের বাহিরের দিকের দরজা-জানালা সব বন্ধ। কিন্তু ঘরের ভিতরের দিকের দরজাটি খোলা দেখিয়া, মিনতি সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, অন্ধকার ঘরের মধ্যে টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া রমেন নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া আছে। জাগিয়া আছে না ঘুমাইয়া গেছে, বুঝা যায় না।

মিনতি কিছুক্ষণ স্নিগ্ধ নয়নে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল; তারপর একটা চেয়ার টানিয়া বসিতেই, রমেন তাহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল। মিনতি কহিল, "জেগে আছ না কি? ভাবলুম ঘুমিয়ে পড়েছ।" রমেন শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিল, "ঘুম? মাথায় বলে আগুন জ্বলছে!"

মিনতি দুই চোখ বড় করিয়া কহিল, "আগুন? কই

—"মাথার উপরে নয়, ভিতরে।"

"ওঃ তাই! সেই জন্যে বুঝি কলেজ পালিয়ে এসেছ?" রমেন শুধু ঘাড় নাড়িল। মিনতি কহিল, "আগুন ফাগুন তো ভাল নয়! ডাক্তার ডাকতে হবে, যাই মাকে বলি গিয়ে" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রমেন কড়া গলায় কহিল, "ব'স। দেখ মিনু, এ সময় রসিকতা আমার ভাল লাগছে না।" মিনতি বসিল। কাঁদ-কাঁদ সুরে কহিল, "তুমি আমাকে ধমকাবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছ না কি? ভাবলুম, কত টাকা পাব, আই-সি-এস্ বর হবে, তাই বুঝি congratulate করবার জন্যে ডেকেছ।"

রমেন ঠাট্টার সুরে কহিল, "ওঃ খুব স্ফূর্তি হয়েছে বুঝি? তাই সকালে দেখতে পেয়েও একবারটি কাছে আসতে পারলে না। মেয়েদের বিশ্বেস নেই বাবা!"

মিনতি কহিল, "তুমি তা' আজ জানলে না কি? কেন তোমাদের কবি বলেছেন, 'Frailty! thy name is woman' মনে নেই?"

রমেন কহিল, "হয়েছে মিনতি, আমাকে আর ও সব শোনাতে হবে না। তা' আই-সি-এস-এর উপর এত ভক্তি হ'ল কখন থেকে?"

মিনতি কহিল, "অনে—এ—এ—ক দিন—"

রমেন বিস্মিতকণ্ঠে কহিল, "বল কি মিনতি! তবে আমি যখন এম-এ পাশ করে আই-সি-এস পড়তে চাইলুম, তখন যে খুব স্বদেশীপনা দেখিয়ে নিষেধ করলে, আই-সি-এস ভাল না, ডক্টরেট্‌ই ভাল। আর এখন—"

মিনতি হাসিয়া বলিল, "তাই বলেছিলুম না কি? কিছু মনে নেই।" রমেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "বেশ ভাল। তবে তুমি এখন এস। এই জানতেই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলুম। তোমার যদি মত থাকে, তুমি যদি সুখী হও, তবে আমার কি বলবার আছে?" বলিয়া রমেন মুখ ফিরাইল।

মিনতির যাইবার লক্ষণ দেখা গেল না। বরং চেয়ারটা সরাইয়া, রমেনের ঠিক মুখোমুখী বসিয়া কহিল, "আমার দিকে তাকাও।" রমেন তেমনি বসিয়া রহিল।

"এখনও পরস্ত্রী হইনি গো, এখন তাকালে দোষ হবে না" বলিয়া মিনতি জোর করিয়া রমেনের মুখ ফিরাইয়া দিল। কহিল, "আচ্ছা! আমাকে তুমি কতদিন হতে দেখছ?"

রমেন জবাব দিল, "জন্মাবার পর থেকেই। আমরা তো এক সঙ্গেই মানুষ হয়েছে মিনু। বাবা আর কাকাবাবু একই আফিসে চাকরী করতেন, একই বাড়ীতে থাকতেন। এই তো সেদিন মাত্র আমাদের দুটো বাড়ী এক সঙ্গে তৈরী হ'ল। আমাদের বাবাদের মধ্যে যে পরম প্রীতির বন্ধন ছিল, তা কখনও ক্ষুণ্ণ হয়নি, কারণ আমাদের মা'দের মধ্যেও একটা অকৃত্রিম সখীত্বের বন্ধন গড়ে উঠেছিল।"

মিনতি তাহাকে বাধা দিয়া বলিতে লাগিল, "তাঁরা শুধু সখী ছিলেন না, ছিলেন দুই বোন, না, বোনের চেয়েও বেশী। আমার মনে পড়ে—যদিও তখন আমি খুব ছোট—বাবা যেদিন মারা গেলেন, সেদিন জ্যেঠাইমা মাকে জড়িয়ে ধরে, 'ওরে ছোট কি হ'ল রে' বলে কেঁদে উঠলেন। জ্যাঠামশাই বললেন, 'তুমি শুদ্ধু অবুঝ হ'চ্ছ? বৌমাকে সান্ত্বনা দাও, চুপ করাও। কারও হাত নেই, নইলে, নরেন আমাকে ফেলে চলে গেল', বলে জ্যেঠামশায় নিজেই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন।"

রমেন বলিতে লাগিল, "সে দিন তোমার মনে পড়ে মিনু, আমি খুব কাঁদছিলুম, তখন তুমি কি বলেছিলে? তুমি তোমার কচি হাত দুটি দিয়ে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলেছিলে, ছিঃ রমু দা, কাঁদতে আছে? বাবা স্বর্গে গেছেন।"

দুইজন কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ। তারপর মিনতি কহিল, "আচ্ছা! তোমার মনে পড়ে, একদিন তুমি জ্যাঠাইমার সঙ্গে তোমার মামার বাড়ী বরানগরে গিয়েছিলে, আর আমি এমনি কান্না জুড়েছিলুম যে শেষে কাকুকে গিয়ে আমাকে পৌঁছে দিতে হয়েছিল?" রমেন ম্লান হাসিয়া কহিল, "খুব মনে পড়ে"; একটু চুপ করিয়া থাকিয়া, "আজ তুমিও তো চলে যাবে মিনু

তোমার মামার বাড়ী, আমিও হয়তো, কান্না জুড়ে দেব। কিন্তু আমাকে তোমার কাছে পৌঁছে দেবার কেউ নেই—" মিনতির দুইটি হাত নিজের দুইটি হাতে লইয়া, বলিয়া চলিল, "আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে মিনু? মনে করে দেখ,—আজ পর্য্যন্ত এমন একটি দিনও কি গেছে, যেদিন দুজনে দেখা হয়নি?" রমেন বক্তৃতার সুরে বলিতে লাগিল, "আজ তুমি চলে যাবে, কাল হতে আমার দিন যে কেমন করে কাটবে মিনু! তা' আমিই জানি।" মিনুর দুই হাত নিজের বুকের কাছে টানিয়া বলিল, "হয়তো এ জীবনে দেখা হবে না। দেখা হলেও হয়তো অপরিচিতের মত মুখ ফিরিয়ে দূরে চলে যাবে।" মিনতি সেই সুরেই বলিতে থাকে, "সঙ্গে থাকবে সেই অর্ব্বাচীন আই সি-এস এবং তার অনুচর এক বা একাধিক পাষণ্ড পাঠান; কাজেই পুরান পরিচয় ঝালাবার সুবিধে হবে না, সুড় সুড় করে সরে পড়তে হবে।" রমেন মিনতির হাত ছাড়িয়া দিল। তাহার মেরুদণ্ড হইয়া উঠিল খাড়া সোজা এবং চোখের দৃষ্টি হইল কঠিন। নীরস কণ্ঠে কহিল, "তোমরা অদ্ভুত, মিনতি! যেমন কাকু, তেমনি কাকী, আর তেমনি তুমি! Seriousness বলে কিছুই তোমাদের ধাতে নেই।"

—"অর্থাৎ আমি খুব হাল্কা প্রকৃতির অর্থাৎ আই-সি-এস বর আসবা মাত্র আমি চটপট্ গয়না-গাঁটী, চেলী, টোপর পরে বিয়ের পিঁড়িতে গিয়ে বসব, এই তো? আর তুমি?

—"আমি কি?"

—"আর তুমি হতাশ হয়ে মিস্ কিটি রায়কে বিয়ে করে ফেলবে।"

রমেন চঞ্চল হইয়া উঠিল, কহিল, "কিটি রায় কে?"

মিনতি মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহে, "কিটি রায়কে চেন না? ঐ যে গো, তোমার ছাত্রী, সুন্দরী, তন্বী, সপ্তদশী। ছিপ-ছিপে যাঁর গঠন, এবং চোখে যাঁর চসমা। যাঁকে নিত্যি সন্ধ্যেবেলায় মোটরে চেপে পড়াতে যাও, এবং পড়া সাঙ্গ হলে, লেকের ধারে যাঁর সঙ্গে যুগল মূর্ত্তিতে নৈশভ্রমণ কর; যাঁর জন্যে সেদিন আমার জন্মতিথিতে বাড়ী ফিরতে তোমার রাত্রি দশটা বেজে গিছল?"

রমেন হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "বুঝেছি, ড্রয়ার খুলে আমার চিঠিপত্র পড়া হয়েছে। কিন্তু তুমি ঠকেছ মিনু। যাকে পড়াতে যাই, সে ছাত্রী নয়, ছাত্র; সুন্দরী তন্বী সপ্তদশী নয়; বয়স প্রায় বাইশ, পালোয়ান চেহারা, বুকের উপর ষ্টীম্ রোলার চালায়। নাম কিটি রায় নয়, কে. টি. রায়, ওরফে কৃষ্ণতারণ রায়, কায়দা করে, মেয়েলী ছাঁদে লেখে, কিটি রায়।"

মিনতি হাসিয়া জবাব দেয়, "কি জানি বাপু! তুমিই জান। আজকাল মাষ্টারদের যে রকম ছাত্রী বিয়ে করবার ঝোঁক, তোমাকেই বা বিশ্বাস কি?"

রমেন বলিল, "আমার চিঠি তুমি পড়লে কেন? ড্রয়ারই বা খুললে কেন?"

হাসিতে হাসিতে মিনতির চোখ দুটি ছোট হইয়া আসে; কহিল "তোমার সব কিছু জানবার আমার অধিকার আছে কিনা, তাই।"

—"তাই না কি?"

—"হ্যাঁ তাই, মাকে জিজ্ঞাসা করে দেখ।" তারপর গম্ভীর হইয়া বলিতে থাকে, "তোমার মনে নেই। আর বছর তোমার যখন টাইফয়েড হয়েছিল, তখন একদিন অবস্থা খুব খারাপ হল। ডাক্তার এসে বললে, আজ রাত্রি পার হয় কি না কে জানে! সে রাত্রির কথা মনে হলে আজ গা শিউরে ওঠে। অন্ধকার রাত্রি, বোধ করি অমাবস্যা, কাকা, কাকী তার আগের রাত্রি জেগেছিল, ঘুমিয়ে পড়েছে; তুমি মৃতের মত নিস্পন্দ পড়ে আছ; কোন জ্ঞান নেই; শুধু ধীরে ধীরে নিশ্বাস পড়ছে। তোমার দুই পাশে বসে আছি, মা আর আমি। হঠাৎ তুমি কি রকম ছট্‌ফট্ করতে লাগলে, নিঃশ্বাস হয়ে উঠল ঘন, কি রকম বিশ্রী শব্দ করতে লাগলে। মা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন 'ও মা! সব শেষ হয়ে গেল না কি!' বলে ডুকরে কেঁদে উঠলেন; আমিও কাঁদতে লাগলুম; কাকী ধড়মড় করে উঠে ডাক্তার ডাকতে গেলেন, সমস্ত রাত্রি আমাদের কি করে কাটল ভগবান জানেন। সেই রাত্রে মা তোমার হাত আমার হাতে দিয়ে কি বলে-ছিলেন জান? বলেছিলেন, "আমি অভাগী, আমার ভাগ্যে রমু হয়তো বাঁচবে না মা। তোর জিনিষ তুই পারিস ত বাঁচিয়ে তোল।" মিনতির চোখ দুটি অশ্রুসজল হইয়া আসিয়া-ছিল। চোখ মুছিয়া মুখে হাসি ফুটাইয়া কহিল, "সেইদিন,

হতে তুমি আমার, তোমার সব কিছু আমার : আমার কাছ হতে তোমার কিছুই গোপন থাকতে নেই, বুঝলে ?"

রমেন কহিল, "তবে যে তুমি চলে যাচ্ছ ?"

—"চলে যাচ্ছি ত কি, দুদিন পরে ফিরে আসব।"

—"যদি না আসতে দেয় ?"

—"তুমি গিয়ে জোর করে নিয়ে আসবে। পারবে না ? রামচন্দ্র সীতার জন্য এত কাণ্ড করেছিলেন, আর তুমি আমার জন্যে এইটুকু পারবে না ? আজ কালকার ছেলেরা যেন কি !"

—"পারব মিনু ! যে কোন প্রকারে হ'ক্ তোমাকে নিয়ে আসব। কিন্তু তার আগেই যদি আই-সি-এস-চন্দ্র এসে হাজির হয় ?"

—"হাজির হয় ত বলব, বিয়ে হয়ে গেছে।"

—"যদি বলে প্রমাণ কি ?"

হাসিয়া মিনতি বলিল, "প্রমাণ কি ? দেখাচ্ছি মশাই।" বলিয়া মুখ ফিরাইয়া ঘুরিয়া বসিল এবং হার হইতে একটি চতুষ্কোণ লকেট খুলিয়া আবার ঘুরিয়া বসিয়া কহিল, "দেখ, খোল এই লকেটটা, নীচে স্প্রিং আছে।"

রমেন লকেটের ডালাটি খুলিয়া ফেলিয়া দেখিল, লকেটের মধ্যে তাহার ছোট্ট একখানি ফোটো।

রমেনের মুখখানি হাসিতে ভরিয়া উঠিল ; কহিল, "এটা কখন হ'ল ? দেখিনি ত ?"

—"আমি কি সহরশুদ্ধ সবাইকে দেখিয়ে বেড়াব না কি ? তুমি যেমন সবাইকে দেখিয়ে বেড়াচ্ছ, আমি যাচ্ছি বলে যেন তোমার কতই মন খারাপ হচ্ছে, হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে ; এদিকে হরদম্ টাইম-টেবল দেখছ, কটার সময় যাবার ট্রেণ ; আবাগী একবার বিদেয় হলে বাঁচ। তা হলেই কিটি রায়কে নিয়ে—"

—"আবার দুষ্টুমি হচ্ছে ! বল না এটা কবে করালে ?

—"Convocation-এর দিনে তোমার যে ফোটোটা তুলেছিলাম না, সেইটাই ছোট করে নিয়েছি।"

নিশ্চিন্ততার সুরে রমেন কহিল, "তা হলে তুমি আমায় ভালবাস মিনু ?"

মিনতি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "উঁ হু না, ভালবাসি আমার সেই আই-সি-এস-কে" (সুর করিয়া) "তাঁরে চোখে দেখার আগে, তাঁর স্বপন চোখে লাগে, বেদন জাগে গো, আমি না দেখিতেই ভাল বেসেছি।"

মিনতি উঠিয়া দাঁড়াইলে, রমেনও উঠিয়া দাঁড়াইল। মিনতি কহিল, "ঘাবড়িও না, লক্ষ্মীটি ! আমাকে নিয়ে আসবে বুঝলে ? আমি উপরে মা-এর সঙ্গে দেখা করি গে—' রমেন বাধা দিয়া কহিল, "কিন্তু মিনু তোমার সঙ্গে যদি আর দেখা না হয়, তবে এই শেষ দেখা—"

মিনু কহিল "সম্প্রতি শেষ, আবার দেখা হবে, যখন তুমি আমায় আনতে যাবে।"

রমেন কি একটা বলিতে চাহিতেছিল, বলিতে পারিল না। মিনু বাহির হইয়া বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল। রমেন দরজা পর্য্যন্ত আসিয়া, তাহার অপস্রিয়মাণ মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল।

মিনতি যাইবার দিন পনের পরে। সময়—বেলা দশটা। কলেজ যাইবার পোষাকে রমেন ১নং বাড়ীতে ঢুকিয়া ডাক দিল "কাকী !" কাহারও সাড়া না পাইয়া সটান দোতলায় উঠিয়া সুরেন্দ্রের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

টেবিল-আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া সুরেন্দ্র, তাহার পোষাক পরা হইয়া গিয়াছে ; সামনে দাঁড়াইয়া তাহার স্ত্রী মাধুরী টাই বাঁধিয়া দিতেছে। রমেন প্রবেশ করিতেই দুইজনে চাহিয়া দেখিল। সুরেন্দ্র কহিল, "এস বাবাজী ! আজ প্রথম ঘণ্টাতেই ক্লাস না কি ?"

রমেন কাছে আসিয়া একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া কহিল, "কাকু কি টাই বাঁধতেও জানেন না না কি ?"

সুরেন্দ্র জবাব দিল, "জানতুম বাবাজী, ভুলে গেছি।"

বিস্মিত হইয়া রমেন কহিল "ভুলে গেছেন ?"

ঈষৎ হাসিয়া সুরেন্দ্র কহিল, "বিয়ে হবার পর অনেক জিনিষ ভুলতে হয় বাবাজী ! নইলে স্ত্রীদের পতিসেবা করবার সুবিধে হয় না, ধর না কেন ”

মাধুরী ধমক দিয়া কহিল, "আর ধরতে হবে না। চেয়ারটায় ব'স দিকি চুলটা ঠিক করে দিই।" তারপর রমেনের দিকে তাকাইয়া কহিল, "ছেলের এতদিন দর্শন পাওয়া যায় নি কেন ? আমরা ত ভাবলুম, দেশত্যাগ করেছ ?"

রমেন লজ্জিত মুখে কহিল, "দিন কয়েক ভারী ব্যস্ত ছিলাম কাকী—"

সুরেন মাথা সোজা করিয়া খাড়া বসিয়া আছে, কারণ মাধুরী তাহার চুলে চিরুণী চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে ; একটু নড়িলেই ধমক খাইতে হইবে। মুখ না ফিরাইয়াই সুরেন্দ্র কহিল, "কোথায় হে ?"

রমেন তাহার প্রশ্নের জবাব না দিয়া কহিল, "আপনারা মিনুর কোন খবর পান নি ?"

ক্ষোভসূচক শব্দ করিয়া সুরেন্দ্র কহিল, "আমাদের খবর দেবার মিনুর যো আছে না কি ? তা' হলে আমরা মিনুর মাথাটি বিগড়ে দেব না ?" তারপর জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোন খবর পাওনি, বাবাজী !"

রমেন বলিল, "কাকু যেন কি ! আপনাদের খবর দেওয়া চলে না, আর আমাকে চলে ? আমি তো আপনাদের চেয়ে আরও undesirable element."

সুরেন্দ্রের তখন চুল ঠিক করা হইয়া গেছে। সে ঘুরিয়া রমেনের মুখোমুখী বসিয়া কহিল, "বুড়োর ভারী সন্দেহ আমাদের উপরে। একে তো আমাদের কখনও পছন্দ করে না—বৌদিদি বেঁচে থাকতে একদিনও আমাদের আত্মীয় বলে স্বীকার করে নি—"

রমেন বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "কেন ?"

—"দাদার সঙ্গে বৌদিদির বিয়েতে ওর বিন্দুমাত্র মত ছিল না ; বিয়ে হয়েছিল বৌদিদির ঠাকুর্দ্দার জিদে এবং এই ভদ্রলোকটির অনুপস্থিতিতে। কিন্তু এমনি ওর রাগ যে, যত দিন ওর বাবা বেঁচেছিলেন, ততদিন দেশে যায় নি, বৌদিদির সঙ্গেও কোন সম্পর্ক রাখে নি—"

রমেন ঘাড় তুলিয়া কহিল, "এমনতর ব্যাপার না কি ? আমাকে তো মিনু কিছু বলে নি। তা হ'লে দেখছি বুড়ো মিনুকে এ দিক মাড়াতেই দেবে না।" সুরেন্দ্র শুধু সমর্থন-সূচক ঘাড় নাড়িল।

মাধুরী কহিল, "অতএব তুমি হয় চিরকুমার সভার মেম্বর হও অথবা হৃদয়-বেদনা নিবারণী বটিকা সেবন কর। ও পাশ মাড়াবার চেষ্টা ক'র না, বুড়ো কুকুর লেলিয়ে দেবে। এখন খাঁটি হয়ে ঘরে বসে কবিতা লেখ—"

রমেন হাসিয়া জবাব দিল, "কবিতা লেখা আমার আসে না যে, মিনুর আসে।" মাধুরী কহিল, "মিনুর আসে এবং লিখছেও। তবে যাঁকে উদ্দেশ করে, তাঁর আড্ডা কলকাতায় নয়, সাগরপারে।" সুরেন্দ্র প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "না, না, ও সব বিশ্বেস ক'র না বাবাজী !" মাধুরীকে বলিল, "তুমি ত আচ্ছা লোক ! কোথায় ওকে একটু সাহস দেবে, উৎসাহ দেবে, তা না দমিয়ে দিচ্ছ।" কাকা হাসিতে থাকে। রমেন কহিল,"তা' তুমি যাই বল কাকী, আমি একবার যাব সেখানে, একবার হালচাল দেখে আসব। তার সুবিধেও হয়েছে।"

সুরেন্দ্র ও মাধুরী দুইজন একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "কি, কি ?"

রমেন বলিল, "আমার বন্ধু ধীরেনকে তো আপনি জানেন। আগে তো প্রতিদিনই আমাদের বাড়ী আসত, আজ-কাল কাজের ভিড়ে আসতে পারে না। ও কলকাতা পুলিশে কাজ করছে, কাজেই আমার চেয়ে সব বিষয়ে ওর বুদ্ধি বেশী খেলে। ওকে বলতেই ও বললে, ওর জন্যে তোর চিন্তা কি ? সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আর একটা সুবিধেও হয়েছে—ওর দাদা সম্প্রতি মিনুদের সহরে পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার হয়ে গেছেন। ও তাঁকে সব লিখেছে। তাঁর চিঠি পেলেই আস্‌ছে গুড ফ্রাইডের ছুটিতে গিয়ে হাজির হব।"

সুরেন্দ্র সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল "তার পর ?"

—"তারপর তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে যা করবার করা যাবে।"

—"অর্থাৎ তুমি তা হলে স্বর্গ ও নরক তোলপাড় করবে ঠিক করেছ ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

মাধুরী হাসিতে হাসিতে তাহার ডান হাতখানি তুলিয়া করতল প্রসারিত করিয়া থিয়েটারী ধরণে কহিল—"তোমার জয়যাত্রা শুভ হ'ক বৎস।"

[২]

কলিকাতা হইতে প্রায় দেড়শত মাইল দূরে একটি ছোট সহর, সহরের বাহিরে পাঁচ ছয় বিঘা যায়গা জুড়িয়া হাতার মধ্যে একটি দ্বিতল বাড়ী। বাড়ীটি পুরাতন, কিন্তু সম্প্রতি সংস্কার করা হইয়াছে। বাড়ীটির সম্মুখ দিয়া একটি রাস্তা সহর হইতে পল্লীগ্রামের দিকে গিয়াছে। রাস্তার ওপাশে আর কাহারও বাড়ী নাই, শুধু মাঠের পর মাঠ নহর পর্য্যন্ত

প্রসারিত। বাড়ীটির এক পার্শ্বে কিছু দূরে রেল লাইন এবং অন্য পার্শ্বে প্রায় মাইলখানেক দূরে কতকগুলি নবনির্ম্মিত কুটীরের সমাবেশ; এটি নাকি নবাগত জ্ঞানানন্দ স্বামীর আশ্রম।

এই বাড়ীটির নূতন অধিকারী অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ যোগেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, আমাদের মিনতির দাদা মশায়। এই বাড়ীটি যে তিনি স্বেচ্ছায় কিনিয়াছেন, তাহা নহে; এটি তাঁহাকে তাঁহার এক বন্ধু কিনিয়া দিয়াছেন। বন্ধুর নাম—সদানন্দ ভট্টাচার্য্য; কোন এক ষ্টেটে ম্যানেজারী করিতেন, সম্প্রতি অবসর লইয়া এই সহরে নিজ বাড়ীতে বাস করিতেছেন। এই বাড়ীটি কিনিয়া দিয়া তিনি তাঁহার এক আত্মীয়কে উপকৃত করিয়াছেন এবং আরও উপকৃত করিয়াছেন যোগেন্দ্রবাবুকে। কারণ সহরের কোলাহল হইতে দূরে এবং স্বামীজীর আশ্রমের স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যে এই নির্লিপ্ত নির্জ্জনতা যোগেন্দ্রবাবুর 'আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য' তাঁহার নিজের আগ্রহের চেয়ে তাঁহার বন্ধুর আগ্রহই বেশী। কারণ যোগেন্দ্রবাবুর হাতে অনেক টাকা এবং সেই টাকার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী মিনতি তাঁহার বিলাত-প্রবাসী পুত্রের বাগ্‌দত্তা।

সকাল প্রায় আটটা; এক তলার বারান্দায় একটা ইজি চেয়ারে যোগেন্দ্রবাবু বসিয়া আছেন এবং তাঁহার পাশেই একটি চেয়ারে সদানন্দ বাবু উপবিষ্ট। দুই বন্ধুর মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতেছে!

সদানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামীজী রোজই আসছেন তো?"

যোগেন্দ্রবাবু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "রোজ আসবার কি আবশ্যক? মাঝে মাঝে দু একদিন এলেই যথেষ্ট--"

—"না হে, ধর্ম্মচর্চ্চাটা নিত্যই করা ভাল, না হলে ধাতস্থ হবে না। কখনও তো ওসব করনি। স্বামীজীকে রোজ আসবার জন্যে বলে দেব।"

সজোরে ঘাড় নাড়িয়া যোগেন্দ্রবাবু কহিলেন, "না, না ওঁকে কিছু বলবার প্রয়োজন নাই। দরকার বোধ করলে আমিই বলব। তা ছাড়া ডাক্তার আমাকে দিন কয়েক rest নিতে বলেছে।"

সদানন্দ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "হঠাৎ ডাক্তার ডাকতে গেলে কেন আবার? কি হয়েছে?"

—"ব্লাড প্রেসার বেড়েছে, বুক ধড়ফড় করে।"

—"তাই না কি? তবে তো স্বামীজীর আসা আরও প্রয়োজন। ওঁর মুখে নাম সঙ্কীর্ত্তন শুনলে ব্লাড-প্রেসার চড় চড় করে কমে যাবে, দেখ না—"

দোতালার বারান্দায় একটি চেয়ারে বসিয়া মিনতি; তাহার সামনে একটি ছোট টেবিলে খান কয়েক বই; একখানি বই খোলা পড়িয়া আছে; কিন্তু তাহার মন ঐ খোলা বইএর পৃষ্ঠার উপর নাই, সম্মুখে রেল লাইন পার হইয়া দিগন্তপ্রসারী কঙ্করময় প্রান্তর অতিক্রম করিয়া কোথায় চলিয়া গেছে। হাত দুটি নিশ্চল ভাবে কোলের উপর পড়িয়া আছে, চোখের দৃষ্টি স্থির, ভাব বিহীন; সে যেন ধ্যানরতা তপস্বিনার মূর্ত্তি।

হঠাৎ পিছন হইতে এক বৃদ্ধ বারান্দায় পা দিয়াই ডাকিল "দিদিমণি!" মিনতি চমকিয়া উঠিয়া পিছন দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, তাহার দাদা মশাই-এর বহু পুরাতন ভৃত্য রঘুনন্দন।

মিনতি মুখ ফিরাইয়া বসিল। রঘু কহিল, "একটা চাকর ধরে এনেছি।" কয়েকদিন হইল মিনতিদের চাকরটি পলায়ন করিয়াছে।

রঘু ঘরের ভিতরের দিকে তাকাইয়া ধমক্ দিয়া কহিল, "এ্যাই বেটা, এদিকে আয় না! হাঁ করে দাড়িয়ে আছে—" বলিতেই যে বারান্দায় প্রবেশ করিল, তাহাকে দেখিয়া মিনতির মুখে প্রথমেই ফুটিয়া উঠিল বিস্ময়, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সমস্ত মুখখানি কৌতুক ও হাস্যে ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিল।

লোকটির বয়স চব্বিশ কি পঁচিশ। পরনে অর্দ্ধমলিন কাপড়, গায়ে অর্দ্ধমলিন গেঞ্জি, সমস্ত মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়িতে সমাকীর্ণ। মাথার চুলগুলি ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা। লোকটা রঘুনন্দনের পিছনে দাঁড়াইয়া বোকার মত হাসিতে লাগিল।

মিনতি কহিল, "একে কোথায় পেলে?"

রঘু কহিল, "বেটা রাস্তার ধারে বসে ছিল, বল্‌তেই সুড় সুড় করে চলে এল। এখানে বাড়ী নয়, পাড়াগাঁর দিকে বাড়ী।"

মিনতি লোকটাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি ?"

লোকটা দুই হাত জোড় করিয়া কহিল, "আজ্ঞে হুজুর, আমার নাম বাঞ্ছারাম, ডাকনাম পটল, পিসিমা ডাকে ল্যাড়া।"

রঘু ধমক দিয়া কহিল, "চুপ কর বেটা! ডাকনাম! রাশ নাম! গাঁই গোত্তর!—বেটা যেন বিয়ে করতে এসেছে।"

বাঞ্ছারাম এক গাল হাসিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিল, "হুজুর, বিয়ে হয়ে গেছে।"

মিনতি হাসিয়া কহিল, "কোথায় রে ?"

—"হোই, আমাদের গাঁয়ে—"

—"কত বড় তোর বউ ?"

—"তা বেশ বড় সড় হবেন হুজুর! তা বছর দশেরটি হবেন। দু' কুড়ি দশ গণ্ডা টাকা লিয়েছে হুজুর—"

—"তোদের বিয়েতে টাকা লাগে না কি রে ? এত টাকা কোথায় পেলি ?"

লোকটার মুখখানি ম্লান হইয়া আসিল ; কহিল, "হুজুর, ঘর-বাড়ী, জমি-জায়গা বাঁধা দিয়ে—"

রঘুনন্দন বাধা দিয়া কহিল, "বেটার সঙ্গে বাজে বকে কি হবে দিদিমণি! ওরা ছোট লোক, ওদের ক'নে কিনতে হয়। ওরা কি আমাদের মত ভদ্রলোক যে, বৌএর সঙ্গে এক রাশ টাকা গয়না ঘরে ঢুকবে ?"

রঘুনন্দন জাতিতে নাপিত।

বাঞ্ছারামকে উদ্দেশ করিয়া রঘু কহিল, "এ্যাই, কত নিবি ?"

বাঞ্ছারাম কহিল, "আজ্ঞে দশ টাকা।"

রঘু মুখ ভ্যাংচাইয়া কহিল, "দশ টাকা! কত ভদ্রলোকের ছেলে দশ টাকা মাইনের চাকরীর জন্যে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে! দশ টাকা! তিন টাকা করে পাবি, কাজ করগে যা—"

বাঞ্ছারাম জবাব দিল, "আজ্ঞে না, সাত টাকার কম পারব নাই হুজুর!"

মিনতি হাসিয়া কহিল, "দশ টাকা হতে একেবারে সাত টাকা—"

রঘু তাড়াইয়া মারিতে আসিল, "বেরো বেটা বেরো! তিন টাকার একটি পয়সা বেশী পাবি না।"

বাঞ্ছারামের যাইবার লক্ষণ দেখা গেল না ; সে জোড়হাতে মিনতিকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "হুজুর, তবে পাঁচটি করেই দিবেন। অনেক দেনা হুজুর! ঘর-বাড়ী বাঁধা—"

মিনতি রঘুকে কহিল, "আচ্ছা, তাই হবে। যাও, রঘু-দা, ওকে কাজকর্ম্ম সব দেখিয়ে দাও গে—"

লোকটা রঘুনন্দনের পিছনে পিছনে চলিয়া গেল। তবে যাইবার সময় একবার মিনতির দিকে তাকাইল ; তাহার চোখে বোধ করি দুষ্ট হাসি।

কিছু ক্ষণ পরে। নীচে রান্নাঘরের কাছে মহা গোলমাল! মিনতি দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেখিল, ভৃত্য বাঞ্ছারাম দাঁড়াইয়া মাথা চুলকাইতেছে। তাহার সামনে রান্নাঘরের দাওয়ার উপর এক রাশ বাসন, কড়া, হাঁড়ি ; ঝি নকুড়োর মা রোয়াকে দাঁড়াইয়া কাংস্যবিনিন্দিত কণ্ঠে বাঞ্ছারামকে ভর্ৎসনা করিতেছে, "কোথাকার অলপ্পেয়ে, আকাট মুখ্যু গো! বাসন মেজেছে তো এঁটো ভ্যাট্ ভ্যাট্ করছে, কড়া, হাঁড়িতে যেমন যেমন তেমনি কালি ; ও মা, গতর তো কম নয়, কাজ এমন কেন!"

বাঞ্ছারাম রাগিয়া কহে, "আমার গতর খুঁড়ো না বলছি—পিসি থাকলে দেখা'ত মজা, হুঁ," বলিয়া ঘাড় নাড়িতে লাগিল।

ঝি উচ্চ কণ্ঠে কহিল, "নিয়ে আয় না তোর পিসিকে ডেকে, ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব না পিসির! বিষ নেই, কুলো-পানা চক্কর। গতর খুঁড়বে না তো কি করবে ? চাকর খাটতে এসেছে, বাসন মাজতে জানে না—"

উপর হইতে মিনতি কহিল, "কি হল রে নকুড়োর মা ?"

ঝি থন্ থন্ করিয়া কহিল, "দেখ দিকি দিদিমণি! কোত্থেকে এক আনাড়ী লোককে এনে হাজির করেছে ; বাসন মাজতে জানে না, বাসনে যেমনকার-তেমনি এঁটো ; কুয়ো থেকে জল তুলতে পারে না, দড়ি বাল্‌তি সব দিয়েছে ফেলে ; একে দিয়ে কোন কাজ হবে না বাবু, এক্ষুণি বিদেয় কর।"

মিনতি জিজ্ঞাসা করিল, "রঘু দা কোথায় ?"

ঝি বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "তার কি! একটা জানোয়ারকে জুটিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তি হয়ে বাজারে গেছে।"

মিনতি কহিল, "আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।" কাছে আসিয়া কহিল, "কি বাঞ্ছারাম! তুমি বাসন মাজতে জান না ?"

বাঞ্ছারাম উত্তর দিল, "আজ্ঞে জানি হুজুর! একবার দেখিয়ে দিলেই পারব।"

ঝি মুখ ভ্যাংচাইয়া কহিল, "কচি ছেলে, কুলোয় শুয়ে তুলোয় করে দুধ খাচ্ছেন; ওঁকে সব দেখিয়ে দিতে হবে—"

বাঞ্ছারাম তাহার দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

মিনতি বাঞ্ছারামকে কহিল, "আচ্ছা, এগুলো কুয়োতলায় নিয়ে চল, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।" ঝিকে কহিল, "তুমি ওপরে দাদামশাইয়ের ঘর ঝাঁট দাও গে যাও।"

কুয়ার পাশে বাসনগুলা নামাইয়া বাঞ্ছারাম দাঁড়াইয়া রহিল। দোতালার বারান্দা হইতে নকড়ির মা তাহা দেখিয়া হাঁক দিল, "ঐ দেখ দিদিমণি! খোকনমণি তোমার পিতিক্ষেয় দাঁড়িয়ে আছেন। ওরে এই কুঁড়েরাম! তুই মাজ না; দিদিমণি কি হাতে ধরে শিখিয়ে তোকে দেবে না কি? রঙ্গর যেমন কাণ্ড! কোত্থেকে এক হাড়হাবাতেকে ধরে এনেছে গো!" বলিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেল।

মিনতি কাছে আসিয়া অনেকক্ষণ বাঞ্ছারামের দিকে তাকাইয়া রহিল; তাহার মুখে চোখে হাসি ঝিক্‌মিক্ করিতেছে।

বাঞ্ছারাম কহিল, "কি দেখছ?"

মিনতি কহিল, "বেশ মানিয়েছে। কবে এলে?"

—"দিন দুই।"

—"কোথায় উঠেছ?"

—"ধীরেনের দাদা, নীরেন বাবুর বাড়ী। এখানে পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার।"

—"কি করে বাড়ী চিনলে?"

—"ছোট সহরে বাড়ী চেনা শক্ত নয়। বিশেষ একজন সরকারী চাকরের বাড়ী। দুদিন তোমাদের বাড়ীর কাছে ঘুরঘুর করছি, ঢুকতে সাহস করি নি।"

—"তাই না কি! আমি ত দেখিনি!"

—"আমি তোমাকে দেখেছি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবছিলে—"

মৃদু হাসিয়া মিনতি কহিল, "কি বল দেখি?"

রমেন কহিল, "নিশ্চয় আমার কথা নয়।"

—"ঠিক বলেছ। একটা কবিতা লিখেছি, তার দুটো লাইন শোন—'সাগর পার'য়ে চলে যায় মন সুদূরে, যেথা আছে মোর বিরহবিধুর বঁধুরে।' বুঝতে পেরেছ?"

"রমেন ম্লান মুখে কহিল, "বুঝতে পেরেছি। কাকী ঠিকই বলেছিল।"

মিনতি জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলেছিল?"

রমেন জবাব দিল, "বলেছিল তুমি কবিতা লিখছ, সাগর পারের ঠিকানায় পাঠাচ্ছ। আমি চললুম।"

—"সে কি! চাকরী হয়ে গেল? বাসন মাজতে হবে না? ডেকে দেব নক্‌ড়োর মাকে?"

—"দেখ মিনতি! আসা অবধি একটা খবর পর্য্যন্ত দাও নি। কাকী বলছিল, তুমি আমাদের ভুলে গেছ। সত্যি ভুলেছ কি না, তাই দেখবার জন্যে আমার আসা। যদি আমাকে না চাও, তবে মিথ্যে আর কষ্ট কেন? তুমি তোমার নিজের পথে যাও, আমি আমার নিজের পথে যাই—"

মিনতি জবাব দিল, "অর্থাৎ মিস কিটি রায়কে বিয়ে করি।" কিন্তু পরক্ষণেই মিনতির চোখ দুটি ম্লান হইয়া আসিল, বলিল, "আমি ভুলেছি, তোমার বিশ্বাস হয়? দাদা-মশাই আমাকে চিঠি লিখতে নিষেধ করেছে। আমার যে কি করে দিন কাটছে আমিই জানি।" মিনতির দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল।

দুই হাতে মিনতির হাত দুটি ধরিয়া রমেন কহিল, "আমায় মাপ কর, মিনু! আমি অত্যন্ত নির্ব্বোধ।"

হাত ছাড়াইয়া লইয়া মিনতি কহিল, "হাত ছাড়, ঝিটা দেখতে পাবে। তুমি যে বাঞ্ছারাম, তা ভুলে গেছ বুঝি?"

রমেন তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়া দিয়া একবার দোতলার বারান্দার দিকে তাকাইয়া নির্ভয়ে কহিল, "কেউ নাই।"

তখন দুইজন বাসনগুলার দুই পাশে বসিয়া পরামর্শ করে। মিনতি কহিল, "এতে সুবিধে হবে না। দাদামশাই খবরের কাগজে আমার জন্যে একজন এম-এ পাশ প্রাইভেট টিউটারের জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। তুমি মাষ্টার হয়ে এস, বুঝলে? তা হলে হয় তো দাদামশাইকে কতকটা কায়দা করতে পারবে।"

রমেন কহিল, "তথাস্তু!"

সেই দিন বিকালেই বাঞ্ছারাম সরিয়া পড়িল।

পনের দিন পরে। সকাল ৯টা; যোগেন্দ্রবাবু একতলার বসিবার ঘরে ইজিচেয়ারে বসিয়া আছেন; তাহার পাশে একটা টুলে বসিয়া মিনতি তাঁহাকে খবরের কাগজ পড়িয়া

শুনাইতেছে। এমন সময়ে রঘু আসিয়া সংবাদ দিল যে, একটি বাবু দেখা করিতে আসিয়াছেন।

যোগেন্দ্রবাবু কহিলেন, "বাবুকে আসতে বল।"

মিনতি উঠিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

কয়েক মিনিট পরে, একটি পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর বয়সের যুবক সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। যুবকের গাত্রবর্ণ সুগৌর, মুখশ্রী সুন্দর, গোঁফদাড়ি বিবর্জ্জিত; মাথার চুলগুলি ছোট করিয়া ছাঁটা; মাথার ঠিক মধ্যস্থলে একটি অতি সূক্ষ্ম টিকি অতি ভয়ে ভয়ে উঁকি মারিতেছে। গায়ে একটি খদ্দরের পাঞ্জাবী, পরনে খদ্দরের ধুতি, পায়ে অতি সাধারণ অ্যালবার্ট স্লিপার। যুবক কাছে আসিয়া নমস্কার করিতেই, যোগেন্দ্র বাবু তাহার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাইয়া কহিলেন, "আপনি?"

লজ্জিত ও অপ্রতিভ ভাবে যুবক কহিল, "আজ্ঞে আমি —ঐ যে—আপনার—অমৃতবাজারে—বিজ্ঞাপন—"

যোগেন্দ্রবাবু কহিলেন, "ওঃ বুঝেছি; মাষ্টারীর candidate? আচ্ছা ব'স।" বলিয়া পাশের টুলটি দেখাইয়া দিলেন। যুবক টুলটি একটু দূরে সরাইয়া লইয়া জড়সড় হইয়া বসিল; ভাবে মনে হইল যে, ভাবী অন্নদাতার সামনে খাড়া দাঁড়াইয়া থাকিলেই সে আরাম বোধ করিত।

যোগেন্দ্রবাবু প্রশ্ন করিলেন, "কি নাম?"

যুবক জবাব দিল, "গজানন গাঙ্গুলী।"

যোগেন্দ্রবাবু পুনরায় প্রশ্ন করিল, "এম-এ পাশ?"

যুবক ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"কোন বিষয়ে?"

—"ইকনমিক্‌স্।"

—"ইকনমিক্‌স্? তা' বেশ; মিনতিও ইকনমিক্‌স্ পড়তে চায়। আপনার বয়স কত?"

—"ছাব্বিশ।"

—"ছাব্বিশ? বিয়ে করেছেন?"

—"না।"

—"কেন করেন নি?"

—"বিয়ে করবার ইচ্ছে নেই।"

—"বিয়ে করবার ইচ্ছে নেই ত কি করবার ইচ্ছে? Free love করবার?"

যুবক জিভ বাহির করিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "আজ্ঞে না।"

যোগেন্দ্রবাবু দুই চোখ ডাগর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে?"

—"বিবাহ করা আমার গুরুদেবের নিষেধ।"

যোগেন্দ্রবাবু বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন, "গুরুদেব! সে আবার কে?"

যুবক উত্তর দিল, "শ্রীশ্রীমৎ প্রচণ্ডানন্দ স্বামী।"

—"কি নন্দ?"

—"প্রচণ্ডানন্দ।"

—"বাপ্‌স্, কি নাম! সাংঘাতিক গুরুদেব ত?"

যুবক চুপ করিয়া রহিল।

যোগেন্দ্রবাবু প্রশ্ন করিলেন, "মাসে কত করে প্রণামী লাগে?"

যুবক উত্তর দিল, "কিছুই লাগে না।"

—"বল কি হে? আচ্ছা সুবিধে ত? সত্যি সাধু, না জোচ্চোর?"

যুবক জিভ বাহির করিয়া কহিল, "ছিঃ ছিঃ ও কথা বলবেন না", দুইহাত জোড় করিয়া গুরুদেবের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া কহিল, "তিনি মহাপুরুষ।"

যোগেন্দ্রবাবু কিছুক্ষণ কি ভাবিলেন, তারপর কহিলেন, "গুরুদেবের আদেশে বিয়ে করবে না, বিয়ের উপর বিতৃষ্ণা আছে?"

—"আজ্ঞে, দারুণ বিতৃষ্ণা, নাম শুনলেই গা ঘিন্‌ঘিন্ করে।"

—"খুব ভাল কথা; বিয়ে কখনও ক'র না; তোমাদের মত চালচুলোহীন মনিষ্যিদের বিয়ে করা পাপ।"

—"আজ্ঞে, গরীবের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।"

—"ঠিক বলেছ! বিয়ে করে করেই দেশটা উচ্ছন্ন গেল। নিজেরা পায় না খেতে, আবার কতকগুলোকে টেনে নিয়ে আসে উপোস করবার জন্যে।"

—"আজ্ঞে গুরুদেবও আমাদের তাই বলেন—"

—"বলেন না কি! কি বলেন?"

—"বলেন যে, গরীবরা না বিয়ে করে যদি বড়লোকরা এক একজন চার পাঁচটা বিয়ে করে ত খুব ভাল হয়।"

—"তার মানে?"

—"মানে তা' হলে, বড়লোক আর গরীব লোকের মধ্যে তফাৎটা বেশী দিন থাকে না, সব সমান হয়ে আসে।"

—"বেশ ভাল কথা ত?" বলিয়া কি যেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। তারপর কহিলেন, "এখানে কোথায় উঠেছ?"

যুবক কহিল, "একটা হোটেলে—"

—"তা' বেশ, তুমি কাল তোমার জিনিষপত্তর নিয়ে এখানে এসে পড়।"

যুবক নত মুখে বসিয়া রহিল।

যোগেন্দ্রবাবু অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ভাবিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে যুবকের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "তুমি এখন আসতে পার।"

যুবক বিনীতভাবে নিবেদন করিল, "আজ্ঞে বেতন সম্বন্ধে এখন একটা ঠিক করলে ভাল হয় না?"

যোগেন্দ্রবাবু যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, "ওঃ বেতন! তা' তুমি ত বাবু সাধুর শিষ্য, বে'থা করবে না, তোমার আবার টাকার দরকার কি? বাড়ীর ছেলের মত থাকবে, খাবে, পরবে—"

—"আজ্ঞে বাড়ীতে আত্মীয়স্বজন ও আছে? বাপ মা—"

—"ওঃ আবার সে সব ফ্যাসাদও আছে বুঝি? তা' এস তো আগে, কাজ করতে আরম্ভ কর, যদি পছন্দ হয় তো, মাইনের জন্যে কিছু আটকাবে না, বুঝলে?"

যুবক দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল। যোগেন্দ্রবাবু কহিলেন, "আচ্ছা, কাল সকালেই এস, বুঝলে?"

যুবক প্রস্থান করিল, কিন্তু কিছুদূর যাইতে না যাইতেই যোগেন্দ্র বাবু আবার ডাক দিলেন, "শুনছ হে?"

যুবক ফিরিয়া দাঁড়াইল; যোগেন্দ্র বাবু কহিলেন, "আসবে, না খসে পড়বে?"

যুবক কহিল, "আজ্ঞে আসব বৈ কি, নিশ্চয়ই আসব।"

যোগেন্দ্র বাবু কহিলেন, "হাঁ হাঁ এস, মাইনের জন্যে ভেব না, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

যুবক প্রস্থান করিবার উপক্রম করিতেই, আবার কহিলেন, "আর দেখ, আর কোথাও জুটবার আশা আছে না কি?"

যুবক উত্তর দিল, "আজ্ঞে না, আর কোথাও কিছু আশা নেই; রাখেন তো এইখানেই যাবজ্জীবন থেকে যাব।"

যোগেন্দ্র বাবু সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "বেশ, বেশ।"

দিন কয়েক পরে। যোগেন্দ্রবাবু বসিবার ঘরে বসিয়া আছেন। দোতলায় মিনতির পড়িবার ঘরে মাষ্টার মিনতিকে পড়াইতেছে, তাহার কণ্ঠস্বর নীচে হইতে বেশ শোনা যাইতেছে। মাষ্টারটি যোগেন্দ্রবাবুর বেশ পছন্দসই হইয়াছে। নিরীহ, গোবেচারী ব্যক্তি, আজকালকার ছোকরাদের মত ফোতো বাবু নয়, বেশ সাদাসিধা ধরণের, তা ছাড়া এই বয়স হইতেই কেমন ধর্ম্মে নিষ্ঠা, টিকি পর্য্যন্ত রাখিয়াছে। মাষ্টারটি নীচের ঘরে থাকে, সকালে ও রাত্রে পড়াইতে যাওয়া ছাড়া দোতলার দিকে উঁকিটি পর্য্যন্ত মারে না।

এমন সময় সদানন্দ বাবু আসিয়া হাজির হইলেন। যথা-রীতি শারীরিক ও সাংসারিক কুশল সংবাদ বিনিময়ান্তে একটা চেয়ারে বসিয়া কহিলেন, "ওপরে এত সোরগোল কিসের?"

যোগেন্দ্রবাবু জবাব দিলেন, "মিনুর পড়া হচ্ছে!"

—"পড়া? পুরুষের গলা শোনা যাচ্ছে যেন—"

—হাঁ, মিনুর মাষ্টার—"

—"মাষ্টার! এ্যাঁ! মিনতির মাষ্টার এসে হাজির হয়েছে বুঝি? বয়স কত?"

—"বয়স? ছাব্বিশ—"

সদানন্দবাবু চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "বল কি ও বয়সের লোক রাখা ভাল হয়নি তো! অন্ততঃ আমার ওতে মত নাই—"

—"ছেলেটি ভাল, আমার বেশ পছন্দ হয়েছে।"

—"পছন্দ তো হয়েছে, কিন্তু শাস্ত্রবাক্য মনে আছে ত? 'ঘৃতকুম্ভ সমা নারী, অগ্নিকুণ্ড সমঃ পুমান্', বিশেষতঃ এ বয়সের ছোকরা তো গন্‌গনে আগুন।"

"—এ ছেলেটি গন্‌গনে আগুন নয়, কাচের পুরু পরকলা দেওয়া লণ্ঠন—"

"—তার মানে?"

—"তার মানে ছেলেটি এই বয়সেই বেশ ধর্ম্মনিষ্ঠ, টিকি আছে, কোন এক সাধুর শিষ্য—"

সদানন্দ বাবু বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, "হ্যাঁ, সাধুর শিষ্য! ডাকাতের শিষ্য গাঁটকাটা! পেয়েছে তোমাকে ভাল মানুষ, পেয়ে ধাপ্পা দিয়েছে। ডাক তো তোমার মাষ্টারকে—"

যোগেন্দ্র বাবু ডাক দিলেন, "ওরে রঘু।"

"আজ্ঞে যাই," ভিতর হইতে রঘুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল এবং কয়েক মিনিট পরেই রঘু হাজির হইল।

যোগেন্দ্র বাবু কহিলেন, "মাষ্টারকে নীচে ডেকে দে।"

অল্পক্ষণ পরেই মাষ্টার আসিয়া বিনীতভাবে দাঁড়াইল। সদানন্দবাবু জলন্ত দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইলেন। যোগেন্দ্র বাবু প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কোন্ সাধুর শিষ্য বলেছিলে না? পিণ্ডানন্দ না—"

যুবক নিবেদন করিল "আজ্ঞে শ্রীশ্রীমৎ প্রচণ্ডানন্দ স্বামী।"

সদানন্দ বাবু গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "শ্রীমৎ জোচ্চোরা-নন্দ bogus! ও নামের সাধু বাংলাদেশে নাই।"

যোগেন্দ্র বাবু কহিলেন, "তা তুমি কি করে জানলে? তোমার কাছে সাধুর ক্যাটালগ আছে না কি?"

প্রশ্নের জবাব না দিয়া, সদানন্দ বাবু মাষ্টারকে কহিলেন,

"তুমি এম-এ পাশ করেছ? সার্টিফিকেট আছে? না হেতমপুরী ধর্ম্মদাস বাবাজীর শিষ্য?"

যোগেন্দ্রবাবু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "তিনি আবার কে?"

সদানন্দবাবু জবাব দিলেন, "তিনিও একজন প্রকাণ্ড মহাপুরুষ—"

মাষ্টার উত্তর করিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ডিপ্লোমা আছে।"

সদানন্দ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "সঙ্গে আছে, দেখাতে পার?"

—"সঙ্গে নাই—তবে প্রয়োজন হলে দেখাতে পারি—" বলিয়া মাষ্টার সদানন্দ বাবুর দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া যোগেন্দ্রবাবুকে নম্রকণ্ঠে নিবেদন করিল, "আমি এখন যেতে পারি কি?"

যোগেন্দ্রবাবু কহিলেন, "হ্যাঁ যাও।" তারপরেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ হে, নীচের ঘরে তোমার কোন কষ্ট হচ্ছে না তো? বল তো ওপরের একটা ঘর—"

মাষ্টার কহিল, "আজ্ঞে না, নীচে কোন কষ্ট হচ্ছে না"—বলিয়া প্রস্থান করিল।

সদানন্দ বাবু বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন, "তোমার কি বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পেয়েছে না কি? ছোকরার সম্বন্ধে কিছু জান না, হয় তো কলকাতার কোন বখাটে ছেলে, ভুজুং দিয়ে ঢুকে পড়েছে।"

যোগেন্দ্রবাবু বাধা দিয়া কহিলেন, "না, না, যা তা ছেলে নয়, খুব শিক্ষিত; আমি কথাবার্ত্তা কয়ে দেখেছি—"

—"বেশ স্বীকার করছি, এম-এ পাশ, খুব শিক্ষিত। তবু তার সম্বন্ধে যখন আর কিছু জান না, তখন তার সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠতা করা ভাল নয়। বিশেষ তোমার বাড়ীতে একটি অবিবাহিতা তরুণী আছে, যে অন্যের বাগ্‌দত্তা।"

যোগেন্দ্রবাবু ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "তুমি জান না, ছেলেটি খুব ভাল, যেমন শিক্ষিত, তেমনি ধার্ম্মিক; এই বয়সে এতখানি টিকি" বলিয়া তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা টিকির দৈর্ঘ্য নির্দ্দেশ করিলেন। সদানন্দ বাবু বাধ্য হইয়া কথাবার্ত্তার মোড় ফিরাইলেন। কহিলেন, "সুকুর চিঠি পেয়েছি এই মেলে, লিখেছে এগজামিন দেবে—" সুকু অর্থাৎ সুকুমার, বিলাত-প্রবাসী পুত্রের নাম।

যোগেন্দ্রবাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "এগজামিন দেবে! এখনও দেয়নি? তুমি যে বলেছিলে পরীক্ষা হয়ে গেছে, ফলের জন্য অপেক্ষা করছে?"

সদানন্দ বাবু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "তাই শুনেছিলাম বটে, শুনেছিলাম কেন, এগজামিন তো দিয়েই ছিল, সব পেপার দিতে পারে নি, কলিক্ পেন-এর জন্য উঠে আসতে হয়েছিল।"

দুই চোখ বড় করিয়া যোগেন্দ্রবাবু কহিলেন, "কলিক্ পেন? অর্থাৎ শূল? তোমার ছেলের শূলরোগ আছে না কি হে? সে ত ভাল কথা নয়!"

সদানন্দবাবু থাবড়াইয়া গেলেন। এ আবার কি ফ্যাসাদ হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি কহিলেন, "না, না, শূল নয়। ডাক্তার বলেছে ও কিছু নয়, ordinary pain, সেরে যাবে; বিলেতের খুব নামকরা বড় ডাক্তার, এদেশের হাতুড়ে নয়।"

যোগেন্দ্রবাবু বলিতে লাগিলেন, "তা বলুক, কিন্তু শূলরোগ শিবের অসাধ্যি।

দোতলার বারান্দার সাম্‌নেই মিনতির পড়িবার ঘর। সম্প্রতি মিনতি ঘরে নাই। দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া মাষ্টার গজানন সামনের টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া একটা খাতায় কি লিখিতেছে। বোধ করি মিনতির কোন লেখা সংশোধন করিতেছে। মিনতি আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়াই মুহূর্ত্তের মধ্যে খাতাটা কাড়িয়া লইয়া কহিল, "ও কি হচ্ছে? আমার কবিতার খাতা দেখছ কেন?"

গজানন ওরফে রমেন উত্তর করিল, "দেখবার জন্যেই সাম্‌নে ফেলে রেখে গিয়েছিলে কি না, তাই।"

কৃত্রিম ক্রোধের সহিত মিনতি কহিল, "সাম্‌নে ফেলে রেখে গেছি? কখখন না। আমার আই-সি-এস এর জন্যে লেখা কবিতা টিকিওয়ালা গজানন মাষ্টারের জন্যে ফেলে রেখেছি, কি বুদ্ধি!" পাতা উল্টাইয়া, "আবার এ কি করেছ? কলম চালিয়েছ কেন, এঁ্যা?" বলিয়া রমেনের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাইল, ওষ্ঠে চাপা হাসি—

রমেন কহিল, "মিল ভাল হয়নি কি না, তাই একটু improve করে দিয়েছি। পড়ে দেখ না, আগের চেয়ে পড়তে ভাল লাগবে।"

মিনতি মৃদুকণ্ঠে পড়িতে লাগিল,

"সাগর পারায়ে মন চলি যায় সুদূরে,
যেথা আছে মোর বিরহবিধুর টুঁটুঁরে।"

রমেন কহিল, "শুনতে ভাল লাগছে না? সুদূরে আর বঁধুরে ভাল মিল হয়নি। এখন কেমন মিলেছে বল দেখি?"

খাতাটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া মিনতি কহিল, "ছাই মিলেছে, টুঁটুঁ! কি অলক্ষুণে কথা বল দিকি?" হঠাৎ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "আমার বুকের ভিতরটা কেমন করছে—কলিক পেন—"

রমেন ভীত কণ্ঠে কহিল, "কার? তোমার না কি? সত্যি?"

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য
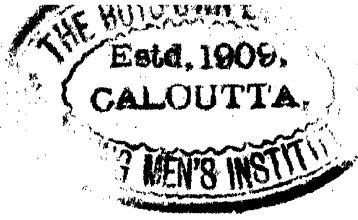
কথা-সাহিত্যের কথা

—শ্রীবিনায়ক সান্যাল

কালেকালে সাহিত্যের কারুরূপের পার্থক্য ঘটিলেও একথা অবিসংবাদিত যে, তাহার একটি অখণ্ড অপরিবর্ত্তনীয় স্বরূপ আছে। মানব-মনের যে প্রাথমিক হৃদয়বৃত্তির দ্যোতনা সাহিত্য, বিভিন্ন যুগের সাহিত্যিকের কারুকলায় তাহা বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইলেও তাহার মূলে একটি শাশ্বত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত আছে। ক্রৌঞ্চের বিরহ-দুঃখে আদিকবি বাল্মীকির চিত্ত-উৎসে যে অনির্ব্বচনীয় কারুণ্য উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল, সেই অপার্থিব বেদনার গানই আজও রস-সাহিত্যের উপজীব্য হইয়া রহিয়াছে। যুগধর্ম্মের প্রভাবে প্রকাশশৈলীর পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু সাহিত্যবস্তুর প্রাণরস যদি সত্যের মধ্যেই নিহিত থাকে, তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সাহিত্যের রস-রূপের বিকার নাই। উহা স্থির ও নিত্য।

বাহিরের বস্তুপুঞ্জের সংস্পর্শে সাহিত্যের বহীরূপের বহুরূপতা ঘটে। বিশেষ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেষ্টনের মধ্যে কারুকলার প্রকাশের প্রকারভেদ হয়। কিন্তু যে মৌলিক রসের অভিব্যঞ্জনা সাহিত্য—তাহা যুগধর্ম্মের প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া ধ্রুবরূপে বিরাজিত থাকে। রসের উৎসভূমি ত মানুষের মন; সেই মন অথবা আরও সূক্ষ্মরূপে আত্মা, সৃষ্টির সত্যস্বরূপকে উপলব্ধি করিবার জন্য চিরদিনই উৎকণ্ঠিত। উপনিষদের ঋষি আত্মদৃষ্টিবলে সেই সত্যের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। ইংরাজ কবি ব্লেক এবং ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সেই একই সত্যের উপলব্ধির জন্য আজীবন সাধনা করিয়া গিয়াছেন। স্থান-কালের কি বিপুল ব্যবধান, অথচ আসল বস্তুটির কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য! যখন ব্লেকের—

> "To see a world in a grain of sand
> And a heaven in a wild flower,
> Hold infinity in the plam of your hand
> And Eternity in an hour."

পাঠ করি, তখন আমাদের মন কি "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্—" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যের উদাত্ত ধ্বনিতে স্পন্দিত হইয়া উঠে না? সুতরাং দেখা যায়, সাহিত্যের জীবনাধার সত্য ব্যতীত কিছুই নহে।

সাহিত্যে বাস্তববাদ, বিস্ময়বাদ, আদর্শবাদ ইত্যাদি বহু 'বাদে'র কথা শুনিতে পাওয়া যায় এবং ইহাদের লইয়া বাদানুবাদেরও অন্ত নাই। কিন্তু বাস্তবিক ইহারা কি সাহিত্যের মৌলিক অনৈক্যের ইঙ্গিত করে? বাস্তববাদ ও বিস্ময়বাদের মধ্যে কি সত্যকার কোন বিরোধ আছে? কখনই না। আধারভেদে একই সত্য বস্তুর আকারভেদ হয় মাত্র। জল যেমন যে-পাত্রে রাখা যায় তাহারই আকার প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ 'নীরাকার' সত্যবস্তু সমাজ-জীবনের নিজস্ব ছাঁচে গড়িয়া উঠে। সমগ্র পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে আজ বাস্তববাদের প্রভাব। বিষয়াতিরিক্ত কল্পপদার্থের কারবার করেন যে সকল ভাবুক শিল্পী, প্রতীচ্যের সারস্বত সভায় তাঁহাদের "প্রবেশ নিষেধ"; যে-গুণের জন্য একযুগে ইঁহারা নিন্দিত হইয়াছিলেন, তাহারই জন্য আজ ইঁহারা নিন্দিত। এই যে দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতা ইহার কারণ পারিপার্শ্বিকের পরিবর্ত্তন। সমাজ ও রাষ্ট্র-নৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য লাভ করিবার জন্য আজ সমগ্র য়ুরোপ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। স্বার্থসংরক্ষণের এই দুর্নিবার আগ্রহ সমগ্র জাতিকে আত্মকেন্দ্র করিয়া তুলিয়াছে। তাই রুষীয় সাহিত্যে 'গোর্কি'র 'মাদার্'এর মধ্যে পাই ধনিকের সহিত শ্রমিকের বিরোধ, রাজশক্তির প্রতি গণমতের মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ, কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না, যে-"বাদীই" হউন, গ্রন্থকার যদি সত্যকার শিল্পী হন, তবে তাঁহার চিত্রিত আলেখ্যের মধ্যে অলক্ষ্যে তাঁহার গভীর অনুভূতির ছাপ পড়িবেই। ক্ষণিক ও ভঙ্গুর যাহা, দেশকালের মধ্যে সীমিত যাহা, তাহারই মধ্যে নিত্যকালের হৃদয়ের সুরটি বিনাকাজেই বাজিয়া উঠিবে। তাই 'মাদার্'এর মধ্যে একদিকে যেমন পাই জীবনব্যাপী একটি বিপ্লব ও দ্বন্দ্বের চিত্র, অপরদিকে পাই নিত্যকালের চিরঈপ্সিত সেই মা'টিকে, যিনি তাঁহার চিত্তের সঞ্চিত সমস্ত মধু নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়া মাটিকে করেন খাঁটি সোনা।

ফল কথা, শুধু টিঁকিয়া থাকিবার প্রশ্নটাই যেখানে সকলের সেরা প্রশ্ন, সেখানে নির্লিপ্ত রসসৃষ্টির অবকাশ অল্প, তথাপি রূপদক্ষ যদি নিখিলের মর্ম্মরক্তে তাঁহার লেখনী রঞ্জিত করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার রচিত চিত্রে মানবমনের অক্ষয় রূপটি কিছু না কিছু ধরা পড়িবেই। সাহিত্যে যদি কোন 'বাদে'র অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হয়, তবে তাহা একমাত্র সত্য বা রসবাদ, অন্য কোন উপাধির স্থান সাহিত্যে নাই।

বাস্তবিক, 'বাস্তববাদ' কাহাকে বলে? চোখে যাহা দেখিতেছি, ইন্দ্রিয় দিয়া যাহা গ্রহণ করিতেছি, তাহাকে অবিকল সেইরূপই অঙ্কিত করার নাম বাস্তববাদ; এ যেন পাশ্চাত্যদর্শনের (positivism) বা প্রত্যক্ষবাদেরই নামান্তর। ইহা একদিকে ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্ম সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে; অপর পক্ষে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহকেই চরম সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়া তাহাদেরই আলেক্ষ্য অঙ্কনে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু যে-কোন যুগেই হউক না, প্রথম শ্রেণীর রূপকার বলিয়া যাঁহারা কীর্ত্তিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজনও কি এমন আছেন, যিনি জীবনের পারম্পর্য্যবিহীন ঘটনাবলীর আলোক-চিত্র তুলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, যাঁহার রচিত আলেখ্যে কল্পনার বর্ণসম্পাত বিন্দুমাত্র হয় নাই? আধুনিক কালের যে সকল কথাশিল্পী চরম বস্তুপন্থী বলিয়া বিবেচিত, তাঁহাদের মধ্যে 'হেনরিক ইবসেনের' নাম একেবারে পুরোভাগে। তাঁহার রচিত নাটকগুলির আলোচনা করিলে আমরা সহজেই দেখিতে পাই, কি প্রগাঢ় ও চিত্রিত বর্ণরাগে তদীয় চিত্রের পটভূমি রঞ্জিত।

সাধারণ ভাবে কল্পনা বলিতে আমরা বুঝি আশ্চর্য্যজনক অথবা চমকপ্রদ কোন চিন্তা। কিন্তু কল্পনার শোভন প্রকাশ অনৈসর্গিককে স্বাভাবিকের আকারে প্রতীয়মান করায় নহে, অথবা যাহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, সম্ভাব্যরূপে তাহাকে প্রকাশ করার মধ্যেও নহে। কল্পনা মানবমনের সেই অনির্ব্বাচ্য শক্তি, যাহার প্রভাবে শিল্পী তাঁহার হৃদয়ের অন্তর্গূঢ় অরূপ ভাবকে অপরূপ রূপ-প্রতিমায় আরোপ করেন। আমাদের প্রতিদিনের যে সাধারণ অভিজ্ঞতা, তাহার বিপরীত চিন্তার নাম কল্পনা নহে। প্রত্যুত: এই জীবনেরই অনুরূপ আর একটি জীবনের সৃষ্টি করেন শিল্পী; পার্থক্য এইটুকু যে সেই কল্পলোকের অধিবাসিগণ সেই অচিন দেশের নূতন নিয়মই মানিয়া চলেন, স্মৃতিসংহিতার ধার তাঁহারা ধারেন অতি অল্পই। তাই বস্তুজগতে যাহাকে পাপ অথবা দুঃখ মনে করিয়া আমরা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি, শিল্পীর সৃষ্ট জগতে হয় ত' তাহা ততখানি আশঙ্কার কারণ না হইতেও পারে। কবির নিয়মে চলে কাব্য; সংসারের বাঁধা-ধরা নিয়ম সেখানে খাটে না।

কল্পনার একটা প্রধান দিক বৈষম্যকে পরিহার করিয়া সৃষ্টির অন্তর্লীন মিলটাকে আবিষ্কার করা, বহুর মধ্যে সেই একের গান গাহিয়া চলা। সেক্সপীয়রের বিয়োগান্ত অনেক নাটকেই, বিশেষতঃ 'লিয়র' নাটকে, দুইটি ব্যভিচারী রসের সমাবেশ ও সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। প্রথমতঃ আমরা মনেই করিতে পারি না সূচনাভাগের লঘু, চটুলগতি উত্তরকাণ্ডের প্রকাণ্ড ট্র্যাজেডিতে পরিণত হইতে পারে। অথচ হইয়াছে তাহাই এবং অতি অনায়াসে।

কোন কোন লোকের বুদ্ধি সমগ্রকে পরিচ্ছিন্ন ও বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখে। যখন যেটি চোখের সামনে আসিয়া পড়ে, তাহারই আলোচনা আরম্ভ হয়, তন্ন-তন্ন করিয়া সেই সম্বন্ধে খুঁটিনাটি তথ্যসংগ্রহের চেষ্টা চলিতে থাকে। এরূপ বিশ্লেষণাত্মক বুদ্ধি শিল্পীর নহে। তাঁহার কার্য্য ক্ষুদ্র ও পরিচ্ছন্ন জীবনকে এক পরিপূর্ণ অখণ্ড জীবনের অংশরূপে উপলব্ধি করা, সৃষ্টির বিরাট পটভূমির উপরে জীবনকে সংহত, সুন্দর ও নবীন করিয়া গড়িয়া তোলা, যে ক্ষুদ্র, অনাদৃত ফুলগুলি পথের দুধারে বনভূমিকে অকারণ আকুল করিয়া ফুটিয়া আছে, নিপুণ করে তাহাদের চয়ন করিয়া মালাকারে বয়ন করা। তাজমহলের নির্ম্মাণের বহু পূর্ব্বেই শিল্পীর চিত্তপটে ইহার মনোময় রূপ অক্ষয় রেখায় অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। ইহারই আলঙ্কারিক নাম 'অলৌকিক বিভাব'। এক কথায়, যে প্রতিভা থাকিলে ভাবুকের মনে কোন অনুভূতি প্রকাশের অব্যবহিত পূর্ব্বে একেবারে রূপের আকারে ফুটিয়া উঠে, তাহারই নাম কল্পনা অথবা অলৌকিক বিভাব।

আলঙ্কারিকেরা স্পষ্টই বলিয়াছেন, লৌকিক ভাবগুলি যে পর্য্যন্ত না অলৌকিকত্ব প্রাপ্ত হয়, সে পর্য্যন্ত তাহারা কাব্যের (সাহিত্যের) বিষয় হইতে পারে না। লৌকিক ও ভাবসত্তা এক বস্তু নহে। কাণ দিয়া শোনা ও মন দিয়া শোনার মধ্যে পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। সাধারণ অবস্থায় আমরা

পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যকেই অভ্রান্ত বলিয়া মনে করি, কিন্তু চোখের ছায়াপটের উপর বাহিরের জগতের যে স্থূল ছবি ফুটিয়া উঠে, তাহা যখন আরও তলাইয়া গিয়া মনের নিভৃত নেপথ্যে উপনীত হয়, তখন সে তাহার বাহিরের সমস্ত খোলস খুলিয়া, লইয়া আসে তাহার সরল, সহজ রূপটি। তাই জীবনের দুঃখ-বেদনার মর্ম্মন্তুদ কাহিনীও সঙ্গীতে রূপায়িত হইয়া আমাদের চিত্তবীণায় আনন্দ রসধারায় ক্ষরিত হয়। লৌকিক লাভ-ক্ষতির মানদণ্ডে এ আনন্দের পরিমাপ হয় না। ইহা লোকোত্তর। প্রয়োজনের অতীত যাহা, তাহাই ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যে মহীয়ান মুক্তির আনন্দে উদ্বেল।

ফল কথা, আমার বক্তব্য, কি কাব্যে,কি নাটক-উপন্যাসে খাঁটি realism বা বাস্তবতা বলিয়া কিছুর অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। কল্পনার কমনীয় কিরণে যখন জগৎকে দেখি, তখন তাহার অপরিচিত নূতন রূপ দেখিয়া মন মুগ্ধ হইয়া যায়। মনে হয়, এতদিন সংসারকে যে চোখে দেখিয়াছিলাম, যেমন করিয়া তাহাকে বুঝিয়াছিলাম, তাহার সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদকে যে রূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম ইহা ত সে রূপ নহে, এমনটি ত আর কখনও দেখি নাই। নিখিলের মর্ম্মকোষে যে এত সুধা সঞ্চিত ছিল, তাহা কে জানিত! সত্যই নিছক 'ফোটোগ্রাফি' অথবা 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং' কখনই চারুকলার অঙ্গীভূত হইতে পারে না। হিম-গিরির ভীমকান্ত রূপ দেখিয়া প্রাণে যে ভাবের তরঙ্গ দুলিয়া উঠে, আলোকযন্ত্র কি সেই গহনতার কণামাত্র আভাসও দিতে পারে? সংস্থান ও আয়তনের দিক হইতে হয়ত আলোকচিত্রটি হয় নিখুঁত কিন্তু ভাব-উদ্দীপনের দিক হইতে হয় সম্পূর্ণ নিরর্থক। সে কার্য্য করিতে পারে একমাত্র শিল্পী। তথ্যের অবিকৃত অনুলিখনের জন্য নহে, ঘটনাবলীর পারম্পর্য্যের অনুসরণের জন্যও নহে, প্রতীক নির্ব্বাচনের কৃতিত্বে। কত সংযোগ-বিয়োগ ঘটিয়া যায়, কত আগের জিনিষ পাছে গিয়া পড়ে, পাছের জিনিষ আগে যায়; কত ছোট বড় হইয়া উঠে, বড় ছোট হয়; কিন্তু এত ওলটপালটের মধ্যেও একটি বস্তু অবিকৃত থাকিয়া যায়, তাহা হইল ইহার আত্মরূপ; শুধু অবিকৃত থাকে বলিলেও সব বলা হয় না, কবির কল্পিত এই নূতন সংস্থানের মধ্যে প্রাণবস্তু অনির্ব্বচনীয় রূপে ফুটিয়া উঠে। শিল্প তথ্যের সত্যে রূপান্তর, বাঙ্ময়ের চিন্ময়ে রূপান্তর; জড়বস্তুর নির্জীব প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয় শিল্পে।

অতএব, সাহিত্য যদি শিল্প বলিয়া দাবী করে, তবে তাহা কখনই প্রাণহীন জড়পিণ্ডমাত্র হইতে পারে না। যাহা সচরাচর ঘটিতেছে, তাহারই হুবহু অনুকরণকে সাহিত্য অভিধা দিলে সাহিত্যের মর্য্যাদাহানি হয়। শিল্পী ত শুধু যাহা ঘটিতেছে, তাহাই লিপিবদ্ধ করিবার জন্য তুলি হাতে বসিয়া নাই—তথ্যের আনুগত্য করিবার জন্যও তিনি দাসখত লিখিয়া দেন নাই। তাঁর কাজ হইল বস্তুর সংস্পর্শভাবের যে রূপ তাঁহার অন্তরে জাগিয়া উঠে, তাহাকে রসের অপরূপতায় মিলাইয়া দেওয়া।

তাই যখন কেহ বলে Zola, Ibsen প্রভৃতি বস্তুপন্থী, তখন সহসা তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না, সাহিত্যিক কখনই যাহা দেখিলাম তাহাই বলে না, বলে যাহা দেখিলাম তাহা কেমন লাগিল। তাই যখন কোন সাহিত্যিক সংস্কারক সম্মার্জ্জনী হস্তে সমাজের জঞ্জাল সাফ করিতে লাগিয়া যান, বস্তুপন্থী আখ্যা পাইলেও আমরা জানি আসলে তিনি ঘোরতর আদর্শবাদী। সমাজ অথবা রাষ্ট্র-জীবনে যখন কোন গ্লানি আসিয়া উপস্থিত হয়, অসুন্দরের অশুভ স্পর্শে যখন সংসারের শ্রী ও হ্রী ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, যখন কোন প্রথাকে চিরাগত বলিয়াই নির্ব্বিচারে মানিয়া লওয়া হয়, তখন সেই অসামঞ্জস্য ও আত্মাবমাননা কবিচিত্তকে নির্ম্মমভাবে পীড়িত করে, তখন তাঁহার রচনায় সমাজের ভাবী চিত্র কল্পনার কমনীয় আলিম্পনে অঙ্কিত হইয়া তাঁহার আদর্শ নিষ্ঠা-রই ইঙ্গিত করে। Ibsen-এর "Pillars of Society", "Doll's House", "Ghosts" প্রভৃতি সকল নাটকেই যৌন-সম্বন্ধের কৃত্রিমতার প্রতি তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করা হই-য়াছে। তাঁহার মতে সমাজের যে অবস্থায় প্রেমের পরম সম্বন্ধ টুটিয়া গেলেও বিবাহের কৃত্রিম বন্ধনকে মানিয়া লওয়া হয়, সে অবস্থা সত্যই ভয়াবহ, তাই তিনি দেখাইয়াছেন, কেমন করিয়া মমতাময়ী সাধ্বী নারী যে স্বামীর কল্যাণ কামনায় সহস্র স্বার্থত্যাগ করিয়াছে, পতির প্রীতির জন্য যে স্বামীর জীবনের কোন দুঃখকেই দুঃখ বলিয়া মানে নাই, স্বামীর অসুস্থতার সময়ে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য জাল সহি পর্য্যন্ত করিয়া যে অর্থ জুটাইয়া দিয়াছে, এক কথায়

।তিদেবতার প্রেমনিষ্ঠায় যাহার নির্ভর ছিল স্থির ও গভীর, একদিন সে সহসা বুঝিল, এতদিন সে জাগিয়া স্বপ্ন দেখিয়াছিল। কোথায় প্রেম, কোথায় নিষ্ঠা? তাহাদের স দাম্পত্যজীবন স্বপ্নমায়ার মত মিথ্যা, মরীচিকার মত অলীক। সমাজের শতকরা নিরানব্বইটি স্থলেই যৌনজীবনের প্রতিষ্ঠা এইরূপ 'চোরাবালি'র উপরে, কখন ধ্বসিয়া যায় কে জানে? মনের দিক দিয়া প্রেমকে তলাইয়া বুঝিবার ইচ্ছা বা বুদ্ধি যাহাদের নাই, তাহারা হয়ত দাম্পত্য জীবনের এই মামুলী নীতিকে বেশ সুসহ বলিয়াই মনে করে, কিন্তু যুক্তির সূক্ষ্ম নিক্তি দিয়া যাহারা সমাজ-ব্যবস্থার গুরুত্বের পরিমাপ করে তাহারা বুঝে, যে-ঘর সাজাইয়া তাহারা বসিয়া আছে, তাহার স্থায়িত্ব একতিলও নাই। কিন্তু বুঝিলেও 'টেক্স' দিবার ভয়ে তাহারা কথা কহে না। কিন্তু যুগে যুগে, দেশে দেশে জনসমুদ্রের মধ্যে পাগলা ঢেউ দু'একটি জাগিয়া উঠে এবং সংসারের জীর্ণ বাঁধা তটে আছাড়িয়া পড়িয়া কূলে কূলে ভাঙ্গন লাগাইয়া দেয়। সেই যে দুই একজন দুর্লভ মনুষ্য, যাঁহারা সত্যকে অন্তরে উপলব্ধি করেন এবং উদাত্ত কণ্ঠে প্রচার করিবার দুঃসাহস রাখেন, তাঁহারা বোধ হয় জীবনে সম্মানের চেয়ে নির্য্যাতনই লাভ করেন অধিক। সাধারণে তাঁহাদের বুঝিতে পারে না, মুষ্টিমেয় যাহারা বুঝিতে পারে তাহারাও না বুঝিবার ভাণ করে। তবেই দেখা গেল, "বাস্তববাদী" নামে যাঁহারা আখ্যাত, তাঁহারাও আমাদের সামনে ধরেন কল্পলোকের সেই মনোজ্ঞ চিত্র, যাহা তাঁহারা রচনা করিয়াছেন "আপন মনের মাধুরী মিশায়ে"।

তাই বলিয়া শিল্পী ও সংস্কারক এক নহেন, ইঁহারা দুই পৃথক্ জগতের জীব। শিল্পী ব্যস্ত থাকেন আনন্দলোক সৃজনে; সংস্কারক চাহেন জাতীয় জীবনের অভ্যুদয়ের পথ মুক্ত করিয়া দিতে। সৃজন-বেদনায় যখন কবিচিত্ত আতুর হইয়া উঠে, তখন সেই ভাবঘন মনে পার্থিব উন্নতি সাধনের কল্পনাও জাগে না। আইরিশ কবি জর্জ রাসেল (এ. ই.) যেমন অক্লান্তকর্ম্মী, তেমনি সত্যসন্ধ, ঋষিকল্প কবি। কিন্তু কাজকে তিনি তাঁহার কাব্যে টানিয়া আনেন নাই—বাণীর রেখ্য মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন ভক্তিপূত ভাবকমলের মঞ্জুল অঞ্জলি লইয়া। তাই বলিয়া কলাবিদের কল্পলেখায় কর্ম্মি-জনের কোন ছাপই পড়িবে না,এরূপ আশা করা দুরাশা মাত্র। শিল্পরচনার কালে প্রেরণার প্রবাহে তাহা কথঞ্চিৎ গৌণ হইয়া যাইবে, এই পর্য্যন্ত। বাঙ্গালা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের এবং শরৎচন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাসের মধ্যে সংস্কারক ও শিল্পীর সমন্বয় দেখা যায়।

পূর্ণাঙ্গ কথা-সাহিত্যের প্রথম স্তরে পাই 'Romance', অথবা নিছক গল্প—রোমাঞ্চকর ঘটনাপুঞ্জের পরম্পরা, যাহা আমাদের বিস্মিত ও চকিত করিয়া সমগ্র দেহ-মনে পুলকের শিহরণ বহাইয়া দেয়। Dumasর 'Three Musketeers,' বঙ্কিমের 'দেবী চৌধুরাণী' প্রভৃতি কতকটা এই জাতীয় গ্রন্থ। ইহাদের মধ্যে আমরা গূঢ় মনস্তত্ত্বের নিপুণ বিশ্লেষণ, অথবা অপূর্ব্ব চরিত্র-চিত্রণ, কিছুই প্রত্যাশা করি না। যে জগৎ বাহিরে নাই, অথচ আমাদের মনে আছে, যে বেপথু ও বিস্ময় জীবনে পাই নাই, অথচ পাইতে ইচ্ছা করে, কবি-মনের মুক্ত বাতায়নে বসিয়া সেই অনাস্বাদিতের সহিত দূর হইতে যখন প্রথম দৃষ্টিবিনিময় হয়, তখন একটা অপূর্ব্ব পরিতৃপ্তিতে সমস্ত চিত্ত ভরিয়া যায়, দেহপিঞ্জরের পোষা পাখীটি বাঁধন কাটিয়া অসীম নীলিমায় মিলাইতে চায়।

কিন্তু চিত্তবৃত্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই অবাস্তবের রসপিপাসা মিটিয়া যায়, মানুষ ক্রমে কতক পরিমাণে বাস্তবের সীমায় নামিয়া আসে। তখনও চোখে ঘোর লাগিয়া আছে; তাই এই যুগের শিল্পসৃষ্টির ভিতরে জগতের যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা বাস্তব ও অবাস্তবের মাঝামাঝি, তাহার মধ্যে আছে পূর্ণাঙ্গ জগতের এক অপরূপ পরিকল্পনা (utopia)। বঙ্কিমের 'চন্দ্রশেখর' ও 'আনন্দমঠ', রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' এইরূপ আদর্শমূলক বাস্তব রচনা। অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে অনৈসর্গিক অথবা অসম্ভাব্য কিছুই নাই—আছে সুসমঞ্জস ও সম্পূর্ণ এক আবেগময় মনোজগতের চিত্র।

ইহার অব্যবহিত পরের যুগেই পাই সেই অনবদ্য কথা-সাহিত্য, মাটীর পৃথিবীর সহিত যাহার নাড়ীর যোগ আরও ব্যাপক ও গভীর, যাহার ভিতর বুদ্ধি ও বিচারের তীব্রধারা আসিয়া মিশিয়াছে মানুষের অন্তরের নিগূঢ় সংবেদনার সহিত। ইহাকে নিছক বস্তুজগতের চিত্র বলিয়া মনে করা ভুল, আর তাহা হইতেও পারে না—তবে একথা ঠিক যে, এ যুগের প্রতীচ্য সাহিত্যে বর্ত্তমান জীবনসমস্যার মূল সুরটি ধ্বনিত হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে এখন রোমান্সের যুগ

কাটিয়া গেলেও "Romanticism"এর যুগ বোধ হয় যায় নাই, তাই বাঙ্গালা কথা-সাহিত্যে লক্ষিত হয় অশান্তি ও অধীরতার আবেগ। 'Realism' বা বাস্তববাদ বলিতে পাশ্চাত্য দেশে যাহা বুঝায়, তাহার অনুরূপ কিছু আজ পর্য্যন্ত আমাদের কথা-সাহিত্যে দেখা যায় নাই। গোর্কি, আইবানেজ, ডেকোব্রা প্রভৃতির সৃষ্ট জগতে প্রকট জগতের যে উৎকট বীভৎসতা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে, বর্ত্তমান বিশ্বের রাষ্ট্র ও সমাজের সমালোচনামূলক যে অভিনব আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে,'নানা আন্দোলনের প্রতি যে সুতীব্র কটাক্ষপাত করা হইয়াছে—এক কথায় মানুষের ধীশক্তির যে বিস্ময়কর লীলা চমক দেখান হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালার কোন শিল্পীর রচনায় কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। "Madonna of the Sleeping Cars" নামধেয় ফরাসী সাহিত্যিক 'ডেকো-ব্রা' লিখিত একখানি উপন্যাস সম্প্রতি আমার হাতে আসে। বইখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইলাম। রুষিয়ায় 'সোভিয়েট' আন্দোলনের নগ্ন মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম; মতের দিক দিয়া সাম্য-নীতির পরিপোষক ও প্রচারক যাহারা, কি ভীষণ তাহাদের ভেদবুদ্ধি—স্বার্থসাধনের সময় এই সোভিয়েট 'কম্‌রেড'গণ কি হৃদয়হীন ও নির্ম্মম! হয়তো সোভিয়েট রুসিয়ার এই মূর্ত্তি অতিরঞ্জিত, হয়ত ইহাদের নৃশংসতার যে বীভৎস চিত্র লেখক আঁকিয়াছেন, তাহার অনেক খানিই তাঁহার মনগড়া, তবুও এই গ্রন্থপাঠে আমরা জানিতে পারি, মানুষ আসলে 'মানুষ'ই, মানুষ-সুলভ দুর্ব্বলতা তাহার থাকিবেই; সে সুখের স্বপ্ন দেখিবে, স্বপনের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিবার চেষ্টা করিবে, লোভের বশীভূত হইবে, হাস্যময়ী রূপসীর বিলোল কটাক্ষে সে বাঁধা পড়িবে, অর্থাৎ মানুষের সেই চিরন্তন রসেরই অভিব্যক্তি এখানেও। বাস্তবের উপকরণ এখানে প্রচুর থাকিলেও কল্পনার স্বপ্ন দিয়া ইহা নির্ম্মিত। আবার বলি, অবিমিশ্র বাস্তবতার উপাদানে কোন সাহিত্য কোন দিন সৃষ্ট হইতে পারে না।

জীবন-সমস্যার প্রকৃত আলোচনা বিশেষ না হইলেও অধুনা একটি নূতন শক্তির ক্রিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যে অনুভূত হইতেছে। জীবনের উত্তাপ ও দুঃখের সহিত একটা নিবিড় সহানুভূতি, দৈনন্দিন জীবনের অন্তরতম বস্তুর সহিত একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ, বাঙ্গালা সাহিত্যকে জীবন্ত ও শক্তিমান্ করিয়া তুলিয়াছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি মানুষের মহৎ ও গর্ব্ব দুঃখের ছায়াপাতে স্নিগ্ধ ও মেদুর। সমাজশক্তির বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড অভিযোগ বিদেশীয় সাহিত্যে অহরহঃ শ্রুত হইতেছে, তাঁহার রচনায়ও সেই ধ্বনি পৌঁছিয়াছে। কিন্তু "তিনি সমাজশক্তিকে আঘাত করিয়াছেন তাহার নীতির দিক দিয়া, অর্থনীতির দিক দিয়া নহে," অর্থাৎ তাঁহার গল্প-উপন্যাসে তিনি সমাজের কোন কঠিন সমস্যার সমাধানে আত্মনিয়োগ করেন নাই—সমাজের জটিল প্রশ্নগুলি তাঁহার সাহিত্যে যে স্থান লাভ করিয়াছে, তাহা নিতান্ত গৌণ। ধনিক ও শ্রমিকের বিরোধ, অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতি গণমনের বিরূপতা, দেশব্যাপী বেকার সমস্যা ইত্যাদি তাঁহার রচনায় কতকটা উপেক্ষিতই হইয়াছে, অথচ প্রতীচ্যের কথা-সাহিত্যে এইগুলিই এখন সর্ব্বপ্রধান আলোচ্য। শরৎচন্দ্রের সহানুভূতি পড়িয়াছে সমাজের ধর্ম্মমূলক কতকগুলি প্রচলিত সংস্কারের উপর।

ফল কথা, সমাজ-ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াই শরৎচন্দ্র ক্ষান্ত হইয়াছেন, সংস্কারকের উচ্চমঞ্চে চড়িয়া তাহাদের আমূল পরিবর্ত্তনের অধিকার দাবী করেন নাই। শিল্পী তিনি, রস-সাহিত্যের রূপকার তিনি, কাজেই তাঁহার সূক্ষ্ম রসবোধ তাঁহাকে সেই দুষ্কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে। তাঁহার উপন্যাসগুলির পত্রে পত্রে নারী-চিত্তের যে অজস্র মধু ঝরিয়া পড়িয়াছে, তাহা পান করিয়া আমরা মুগ্ধ ও চরিতার্থ হইয়াছি, "রামের সুমতি" "বিন্দুর ছেলে" প্রভৃতি গল্পে তিনি নারী-চিত্তের যে অমেয় স্নেহের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা যে কোন দেশের সাহিত্যেই দুর্লভ। নারীর এই দেবীরূপ তো আমরা সহজে দেখিতে পাই না—তিনি দেখাইয়া আমাদের ধন্য করিয়া দিয়াছেন। এখনও কি বলিব, তিনি বাস্তববাদী—এখনও কি মানিব না যে সাহিত্য মাত্রেই আদর্শধর্ম্মী?

বর্ত্তমানে একদল তরুণ সাহিত্যিক বাস্তবতার নামে যৌনবিকারের যে নগ্ন ও নিরাবরণ চিত্র অঙ্কিত করিতেছেন, তাহা পাঠ করিলে এই মনে হয় যে, মানুষ আবার সেই আদিম বর্ব্বরতার যুগে ফিরিয়া গিয়াছে। স্বীকার করি, মানুষের ভিতরের সেই বর্ব্বর জীবটি মাঝে মাঝে তাহার বিচারবুদ্ধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বসে, কিন্তু একথাও কি

অস্বীকার্য্য যে ইন্দ্রিয়জয়েই মানুষের মনুষ্যত্ব,—স্মরণাতীত কাল হইতে মানুষ তাহার অন্তরের এই পশুপ্রকৃতির সহিত নিরন্তর সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে? বিলাতীর অনুকরণে flirtation পর্য্যন্ত না হয় সহ্য হয়, কিন্তু এমন একটা সময় আসে, যখন শক্ত করিয়া দাঁড়ি টানিয়া না দিলে মানুষের কথা-শিল্প পশুত্বের মনোবিজ্ঞানে পরিণত হয়। কবিগুরু কালিদাসের শকুন্তলায় দেখি ইন্দ্রিয়জয়ে অসমর্থ হইয়া এই গ্রন্থের নায়ক-নায়িকা অনুশোচনার কি তীব্র তুষানলে দগ্ধ হইতেছিলেন—কেমন করিয়া তাঁহারা দীর্ঘ দুরূহ তপস্যার অন্তে ইন্দ্রিয়-জয়ের পর—শাশ্বত মিলনের অধিকারী হইলেন। কালিদাসকে 'old fool'এর দলে ফেলিলেও পৃথিবীর যে কোনও শ্রেষ্ঠ কথাগ্রন্থের আলোচনা করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, সাহিত্য পুলিশ আদালতের মামলার তালিকা মাত্র নহে, জীবনের পরম-মুহূর্ত্তে সযত্নে চয়িত ভাবপ্রসূনের মঞ্জুল মালিকা। য়ুরোপীয় সাহিত্যে সমস্যা ও সংস্কার আজ বিপুলাকার ধারণ করিয়াছে; কোথায় গেল শিল্পের জন্য শিল্প, কোথায় গেল আদর্শবাদ! শুধু অন্তহীন আন্দোলনই (endless agitation) রহিয়া গেল, নির্ব্বিকল্প শান্তি (tranquillty) সভয়ে দূরে পলাইল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে য়ুরোপে eroticismই ছিল কথা-সাহিত্যের উপজীব্য; কতকগুলি শক্তিহীন ও রুচিহীন লেখকের কবলে পড়িয়া সাহিত্যের মেধা মন্দির অশুচি ও পূতিগন্ধে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে প্রকৃত মনীষী যাঁহারা, তাঁহারা এই কামবৃত্তির উদ্দামতা দুর্ব্বারতার চিত্র আঁকিয়াছেন সত্য, কিন্তু একটি সহজ ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবোধের দ্বারা প্রেরিত হইয়া তাঁহারা শ্লথরশ্মি কামপশুর মুখের বল্গা টানিয়া ধরিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আনাতলের "থেইস" গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান শতাব্দীতে পাশ্চাত্যে এই কামায়ন-সাহিত্যের প্রচার যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে—জাতির অর্থ ও রাষ্ট্রসমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে সাহিত্যের প্রাণবস্তু,—তদপেক্ষা উচ্চতর কোন চিন্তা যেন সাহিত্যের আসরে আসন পাইবার যোগ্যই নহে। মার্কিণ লেখক Upton Sinclair এর 'Oil', 'Metropolis' প্রভৃতি গ্রন্থ এই শ্রেণীর। ইহাদের মধ্যে জীবনদ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাতের, সমাজের বিচিত্র সমস্যার চিত্র যে পরিমাণে আছে, শুদ্ধ সৌন্দর্য্যসৃষ্টির প্রেরণা ততখানি আছে বলিয়া মনে হয় না। রেমার্কের All Quiet গ্রন্থে বিগত য়ুরোপীয় যুদ্ধের ভয়াবহ চিত্র যেরূপ নগ্ন ভাবে উদ্ঘাটিত করা হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে আমাদের অন্তরাত্মা বেদনায় বিহ্বল হইয়া যায়। আহত, আর্ত্ত সৈনিকটি দেহরক্ষা করিলে ঐ বুট জোড়াটি তাহার হস্তগত হইবে সেই আশায় বন্ধু প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার বন্ধুর মৃত্যু কামনা করিতেছে, এই মর্ম্মান্তিক করুণ কাহিনী যখন পাঠ করি, তখন মনুষ্য-জীবনের প্রতি একটা বিরাট ধিক্কারে কি আমাদের চিত্ত ভরিয়া যায় না? বলা আবশ্যক, ইহাও বাস্তব চিত্র নয়,—সৈনিক-হিসাবে যুদ্ধক্ষেত্রে যে-অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহারই কল্পনানুরঞ্জিত আলেখ্য। কলাবিৎ যখন শিল্পের শাশ্বত আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বস্তুপুঞ্জের বেদীমূলে সৌন্দর্য্য ও সুষমাকে বলি দেন—তথ্য যখন অতিমাত্র স্ফীত হইয়া সত্য-বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, কলাসাহিত্যের ইতিহাসে সে এক ভয়ানক দুর্দ্দিন, আজ আমাদের ব্যাবহারিক জীবনে সমাজ-সমস্যা অত্যন্ত উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিলেও সাহিত্যে তাহার রেখাপাত হইয়াছে অল্পই। পাশ্চাত্য সাহিত্যের হিসাবে এখনও আমরা রহিয়াছি উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে; তাই এখনও এ দেশে 'কামায়ন' সাহিত্যেরই প্রচার ও পুষ্টি হইতেছে প্রচুর। যে-সকল পবিত্র সম্বন্ধ-বন্ধন এতদিন হিন্দুর গৃহাশ্রমকে দেবায়তনের পবিত্রতা দান করিয়াছিল, তাহাদের নিলীয়মান জ্যোতির শেষরশ্মিগুলিও একে একে কোথায় মিলাইয়া গেল! চিরাচরিত রীতির পরিপন্থী বলিয়াই যে ইহাদের নিন্দা করিতেছি তাহা নহে, সমাজ শৃঙ্খলার বিপ্লব সূচনা করিতেছে বলিয়াও ইহাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অনুযোগ নাই; অপবাদ দিতেছি এই বলিয়া যে, কোন বিরাট গঠনকল্পনা এই প্রচেষ্টার পশ্চাতে নাই, আছে কেবল গুরুপাক ফ্রয়েডিয়ান মনোবিজ্ঞানের বিকৃত উদ্গার। 'Libido' 'Œdipus', প্রভৃতি নানা 'complex' ইহাতে আছে সত্য, কিন্তু নাই সেই সহজ প্রাণরস, যাহা নিত্য-কালের মানুষকে যুগপৎ আনন্দ ও বেদনায় বেপমান করিয়া তুলে। সাহিত্যে জীবনকে প্রচুর ও প্রগাঢ় ভাবে ফিরিয়া পাইতে হইলে শুধু যৌবনের অবাধ উদ্দামতার চিত্র অঙ্কিত করিলেই যথেষ্ট হইবে না, জীবন উৎসের মুখগুলি সব খুলিয়া দিয়া জীবনের উর্বরতার উপর দিয়া রসের প্রবাহ বহাইয়া দিতে হইবে, সেখানে প্রেম থাকিবে, পুণ্য থাকিবে, সর্ব্বোপরি থাকিবে কল্পনার সেই অপরূপ বিস্তার, যাহা মর্ত্ত্যকে অমৃতের দিকে লইয়া যায়, ধূলিময়ী ধরণীকে স্বর্গের স্নিগ্ধ সুষমায় মণ্ডিত করিয়া তুলে।

মীরা

—শ্রীসুরুচিবালা রায়

[৩১]

গোধূলি লগ্নের শেষক্ষণ পর্য্যন্ত গৃহসংলগ্ন আমগাছের পাতার আড়ালে বসিয়া ডাকিতে ডাকিতে কাকটা অবশেষে থামিল। রান্না করিতে করিতে বার বার বাহিরে আসিয়া সুরমা কাকটাকে তাড়াইতে বহু ক্ষণ বহুচেষ্টা করিতেছিল, দাওয়ায়, উঠানে, ঘরের চালে সর্ব্বত্র অন্ধকারের ছায়া পড়িতে কাকটা আপনি থামিল। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই থাকিয়া থাকিয়া ঝড়ের মত হাওয়া বহিতেছে, গাছপালার উপরে তাহারই যে একটা সন্ সন্ শব্দ হইতেছে, সুরমার মনটা তাহাতেই মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছে। মাছের ঝোল আলুনি রাখিয়া ডালে দুবার নুন দিয়া নামাইল, টকে ঘি, গরম মশলা দিয়া নামাইয়া রাখিয়া, উনানের আলুর দমের কড়ায় যে কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া ফুলিয়া ফুলিয়া শূন্যে উঠিয়া মিলাইয়া যাইতেছে, তাহারই পানে তাকাইয়া বিষণ্ণ মনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, বড় মেয়ে রাধারাণী সন্ধ্যাবাতি জ্বালাইয়া শাঁখ বাজাইয়া কাছে আসিয়া ডাকিল, "মা, খুকী মণ্টু ঘুমিয়ে পড়ছে, ভাত দেবে?"

মা খানিকক্ষণ মুখ তুলিয়া কন্যার পানে চাহিয়া রহিল, কথাটা কাণে ঢুকিতে যেন দেরী হইতেছে—"ভাত? তা থাক মা, দে না বসিয়ে—"

পুত্রকন্যারা বসিল, মা তবুও নিশ্চেষ্ট ভাবে উনানের ধারে বসিয়াই রহিল।

—ও মা, দাও।

—বসেছিস? রাধু, এক কাজ করত মা, ভাতটাত বেড়ে নিয়ে তোরা সব বস, আমি গিয়ে পূজোটা সেরে আসি, সকালেও ভাল পূজো হয় নি, আজ মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে।

পুকুরের জলে বার কয়েক ডুব দিয়া উঠিয়া পট্টবস্ত্রখানি পরিয়া সুরমা যুক্তকরে গঙ্গার উদ্দেশে নমস্কার করিয়া কহিল, মা গো মা, জন্মে জন্মে কত অপরাধ করেছিলুম, জানি নে, এ জন্মে তাই মনে শান্তি নেই, মা গো জগজ্জননী, তোমার এই শীতল জলে সব অপরাধ ধুয়ে দাও মা!

নিকটবর্ত্তী খালটি গঙ্গারই অংশ বলিয়া লোকের বিশ্বাস। কোন কোন বছর বর্ষার প্লাবনে খালের জল আসিয়া এ পুকুরটিকে কানায় কানায় ভরিয়া তোলে, সুরমার ভাবপ্রবণ মন ইহাকেই তাই গঙ্গা কল্পনা করিয়া শান্তি এবং সান্ত্বনা লাভ করে।

গৃহকর্ত্রীকে পুকুরে স্নান করিতে আসিতে দেখিয়া বৃদ্ধা দাসী হরির মা বারান্দায় আঁচল বিছাইয়া তাহার সন্ধ্যার সুখশয্যা হইতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠিয়া কর্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ফিরিবার পথে সে গল্প আরম্ভ করিয়া দিল,

—শুনেছ মা ওপাড়ার ঈশ্বর ঘোষের কথা?

অন্যমনস্কভাবে সুরমা উত্তর দিল, না, কি হয়েছে ঈশ্বর ঘোষের?

—ও মা, তুমি শোন নি বুঝি? সে কথা গাঁয়ের কে না জানে বল? সেই যে সেবারে ভাজকে ফাঁকী দিয়ে অনেকগুলো টাকা হাত করলে, আর বিধবার চোখের জলে মাটি ভেসে গেল, ধর্ম্ম কি আর তা দেখেন নি মা! তার পরে বছরখানেক পেরুল না, দুটি হাতেই মহাব্যাধি হয়ে হাত ত গেল, তার পর আজ পাঁচদিন হল যা কিছু ছিল চোরে সর্ব্বস্ব এসে নিয়ে গ্যাছে।

সুরমা সচকিত হইয়া কহিল, চোরে? কোথাকার চোরে?

—কে জানে মা, মাসখানেক থেকেই কোন্ এক বর্গীর দল ঘুড়ে বেড়াচ্ছে গাঁয়ে, দিনের বেলা ওষুধ, আরসি, চিরুণী, গরম কাপড়-চোপড়, কম্বল-টম্বল সব বিক্রী করে বেড়ায় মা, আবার চলে যায়—তারাই হয় ত হবে—

—বর্গীর দল, তোকে কে বললে?

—কে জানে মা, বর্গী ত আর চোখে দেখি নি, ঠাকুর্দ্দা ঠাকুমার কাছেই শুনেছি, কি দুষমণের মত চেহারা মা, বর্গী না হয়ে আর কি হবে বল।

গৃহপ্রাঙ্গনে উঠিয়া সুরমা কহিল, কি আঁধারই হয়েছে একবার দেখ। রাজ্যের যত আঁধার এই একটি গাঁয়ের উপরেই পড়েছে না কি বাপু, জানি নে, তেমনি হাওয়াটাও কি ঝড়ের মত বইছে, মন খারাপ করে দেয়।

পা ধুইয়া ঘটিটি হরির মার হাতে দিয়া সুরমা কহিল ভিজে সাড়িখানি দড়িটায় দিয়ে তুই রান্নাঘরে গিয়ে ব'স ত হরির মা, ছেলে মেয়েরা খাচ্ছে, ভয়টয় পাবে আর দেখ বড় লণ্ঠনটা জেলে বাইরের ঐ দোরটার সামনে রেখে দে।

দ্বিতলে উঠিবার পথে বারান্দার একপার্শ্বে একটি উন্মুক্ত-দ্বার গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সুরমা ডাকিল, "গোপাল, ও গোপাল ঘুমিয়ে পড়েছিস না কি, ও গোপাল।"

চমকিয়া, লাফাইয়া উঠিয়া গোপাল কহিল,"কে মাঠাকরুণ না কি, কি হয়েছে?"

—না হয় নি কিছু, বলছি সন্ধ্যারাতেই অত ঘুমিয়ে পড়লি?

—না, ঘুমুই নি ত! এই এমনি একটু—এই একটুখানি গড়িয়ে নিচ্ছিলুন মা ঠাকরুণ।

—তা একটু জেগে জেগে ঘুনোস বাবা, ডাকলে টাকলে সাড়া টাড়া পাই যেন, এক কাজ কর, গোপাল, এখন আর ঘুমোস নি, বারান্দায় এসে ব'স, আমি এসে ভাত দিচ্ছি।

সুরমা দ্বিতলে উঠিয়া গেল।

সিঁড়ির উপর একটা লণ্ঠন জলিতেছে, খুবই কমানো, মিছিমিছি খানিকটা করিয়া তেল না পোড়ে, এ বিষয়ে সতীশের খুবই কড়া দৃষ্টি ছিল। সুরমা আসিয়া আলোটা বাড়াইয়া দিয়া সম্মুখবর্ত্তী গৃহটিতে প্রবেশ করিল, গৃহের এক পাশে একটি সিন্দুকের পাশে বসিয়া গৃহকর্ত্তা সতীশচন্দ্র মাটির পিলসুজ হইতে যে সামান্য আলো বিকীর্ণ হইতেছিল, তাহা-তেই কিসের হিসাব লিখিতে ব্যস্ত।

সুরমা ডাকিল, ও গো শুনছ?

দাঁত মুখ খিচাইয়া বিকৃত স্বরে সতীশ কহিল, "হাঁ, হাঁ শুনছি, কাণ দুটো সঙ্গেই রয়েছে, পালিয়ে যায় নি, যা বলবার বলে ফেল; বলে রেখেছি অত চড়া আলো নিয়ে আমার সুমুখে এস না, আমার চোখের ব্যামো তা কাণে আর সে কথা—

—চোখের ত ব্যামো নয়, ব্যামো তোমার মনের, পাছে আমি কাছে গিয়ে তোমার হিসেব-টিসেব পড়ে ফেলি, পাছে আরও কিছু টাকা পয়সা চেয়ে বসি, এই তোমার ভয়! তা সে তোমার মিছে ভাবনা, কোন মতে সংসার আমার চালিয়ে নিতে পারলেই হল, টাকা নিয়ে কি করব আমি? সে জন্যে আসিনি, বলছি রাত হয়ে যাচ্ছে ওবেলাও মিছামিছি রাগারাগি করে ভাত খেলে না—ভাল করে। এখন ওঠ, বারান্দায় জল রেখে গেছে, হাত-মুখ ধোও, আমি ভাত আনছি—

অত্যন্ত বিরক্তির সহিত সতীশ ভাত খাইতে বসিলে সুরমা অদূরে বসিয়া অন্যমনস্কভাবে ম্লানমুখে স্বামীর থালার পানে চাহিয়া রহিল—নীচের বারান্দায় হরির মা ও গোপাল মহা ঔৎসুক্যের সহিত ঈশ্বর ঘোষের আলোচনাই করিতেছে। ছেলেমেয়েরা খাওয়া ও আচমন শেষ করিয়া কোলাহল করিতে করিতে উপরে উঠিয়া আসিতেছে, সকল কিছুই সুরমার কাণে প্রবেশ করিতেছে, অথচ মনটি যে তাহার কোথায় কোন্ অন্ধকারের অকূল সমুদ্রে ডুব দিয়া আছে কে জানে?

কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে গোপাল হুঁকাটি আনিয়া বারান্দা হইতে মা ঠাকরুণকে ডাকিল, এই ঘরে প্রবেশ তাহাদের নিষেধ, সুরমা হুঁকাটি স্বামীর হাতে দিয়া স্বামীর উচ্ছিষ্টসহ নীচে নামিয়া আসিল। ঝি চাকরকে ভাত দিয়া বহির্ব্বাটী ও ভিতরবাটীর দরজাগুলি নিজের হাতে ভাল করিয়া বন্ধ করিরা সামান্য কিছু খাইয়া সুরমা উপরে উঠিয়া আসিল।

হিসাবের খাতাগুলি পাশে থাকে থাকে সাজাইয়া রাখিয়া সতীশ মুদ্রিত নয়নে বসিয়া তামাক খাইতেছে, পাণের ডিবাটি স্বামীর পাশে রাখিয়া, একটি পাণ মুখে দিয়া সুরমা দ্বারপ্রান্তে বসিল, বহুক্ষণ কাটিয়া গেল, হুঁকার আগুন নিভিয়া যাইতে সতীশ মুখ তুলিয়া সম্মুখে চাহিল।

—কি গো আজ যে এখনো বসে? শুতেটুতে হবে না না কি?

—দোরে তালাচাবি দিয়ে আজ চল তুমি ও ঘরে শোবে—

—ও ঘরে? পাগল না কি? ঘর খালি ফেলে রেখে আমি গিয়ে ও ঘরে শোব?

—তা হলে ছেলে মেয়েদের নিয়ে এসে আমিও আজ এঘরে শুই, আমার মনটা আজ কেমন করছে।

—ও মন কেমন করাকরি তোমাদের রোজই আছে, মিছামিছি অমঙ্গল ডেকে আনা মেয়েমানুষের একটা কাজ। যাও যাও, শোও গে—এ ঘরে কোথায় শোবে!

স্তব্ধ হইয়া সুরমা নীরবে বসিয়া রহিল, বাহিরে আঁধারের বন্যা বহিয়া যাইতেছে, বহুদূরের গ্রামপ্রান্তে চৌকিদারের অস্পষ্ট ডাক আসিয়া কাণে বাজিল। ওপাড়ায় কতকগুলি কুকুর তারস্বরে চীৎকার করিয়া পাড়ার লোকের ঘুম ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিতেছে, সুরমা বসিয়াই রহিল, আরও কতক্ষণ কাটিয়া গেল, ছোট মেয়েটি ঘুমের ঘোরে কাঁদিয়া উঠিতেই সুরমা উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর স্বামীকে দ্বার বন্ধ করিতে বলিয়া ম্লানমুখে পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

মেয়েটিকে ঘুম পাড়াইয়া সুরমা অশান্তচিত্তে বারান্দা ও ঘরে ছটফট করিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং ক্লান্ত দেহে মনে কখন্ এক সময় শয্যায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

মাঝ রাত্রিতে কি একটি দুঃস্বপ্ন দেখিয়া রাধারাণী শয্যায় উঠিয়া বসিল। মা, মন্টু এবং খুকু গভীর নিদ্রায় মগ্ন। রাধারাণীর কেমন একটু ভয় ভয় করিতে লাগিল। জলতৃষ্ণা পাইয়াছিল, মাকে মৃদুস্বরে দুই একবার ডাকিয়া কোন সাড়া পাওয়া গেল না। শয্যার পাশের বাতিটিকে বাড়াইয়া দিয়া রাধারাণী ধীরে ধীরে উঠিয়া কুঁজো হইতে জল ঢালিয়া খাইল, তারপর কি ভাবিয়া দ্বার খুলিয়া ধীরে ধীরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল, বাহিরে অন্ধকার -দারুণ অন্ধকার গভীর রাত্রির এই ভয়াবহ অন্ধকারের ভিতর নিঃসহায় পৃথিবী অঘোরে ঘুমাইয়া আছে। মাঝে মাঝে প্রবল বাতাসের একটা সন সন শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গাছের শুকনো পাতা ঝরার শব্দ। রাধারাণী এদিকে ওদিকে তাকাইয়া একটু দেখিল, বাবার ঘরে অতি মৃদু আলো জ্বলিতেছে। বন্ধ দ্বারের ফাঁক দিয়া তাহারই মৃদু একটা রেখা বারান্দায় আসিয়া পড়িয়াছে —সহসা কোথা হইতে একটা ঢিল পড়িয়া সম্মুখের আম গাছটার কয়েকটা ডাল আলোড়িত করায় ভীত কয়েকটি পাখী শূন্যে উড়িয়া গেল। ভয়ার্ত্ত রাধারাণী মুহূর্ত্তে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল—শয্যায় বসিয়া মাকে দুই একবার একটু ধাক্কা দিয়া মা মা করিয়া মৃদুস্বরে দুই একবার একটু ডাকিল, ঘুমের ঘোরে দুই একবার একটু উঃ আঃ করিয়া মা আবার পাশ ফিরিয়া শুইল—বাবার ঘরের দ্বারের কপাটে কিসের একটা শব্দ যেন শোনা যায়—অতি মৃদু কিন্তু সুস্পষ্ট—রাধারাণীর গলার শব্দ আর বাহির হইল না। বুকের ভিতর প্রবলবেগে একটি কম্পন অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত দেহ ঘামে সিক্ত হইয়া উঠিল। মাকে ডাকিবার শক্তি আর নাই, হাত দুটি নাড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু অবশ হইয়া হাত পাথরের মত শক্ত হইয়া গিয়াছে—দ্বারের উপর কিছু ঘসিবার মত একটা শব্দ মাঝে মাঝে শোনা যাইতেছে। বাবার ঘরে কি ডাকাত পড়িল?—ডাকাত—ও ঘরে বাবা যে একলা!—রাধারাণী আর ভাবিতে পারিল না। অঘোরে নিদ্রিত মায়ের উপর একটা ক্রোধের ভাব জাগিয়া উঠিতেই রাধারাণী অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

সুরমা আর একবার পাশ ফিরিয়া শুইল।

[৩২]

রাত্রি গভীর হইয়াছে, রুদ্ধদ্বারকক্ষে সতীশ এক হাতে আলো ধরিয়া অন্য হাতে সিন্দুকের ডালা খুলিয়া ঈষৎ নত মস্তকে ভিতরের দিকে তাকাইল। বাতির আলো পড়িতেই ভিতরের অসংখ্য জিনিষ চক্ চক্ ঝক্-ঝক্ করিয়া উঠিল, সতীশ ক্রমে ডালাটি ভাল করিয়া খুলিয়া দিয়া আলো হাতে সম্মুখে আরও ঝুঁকিয়া পড়িল, এবং ক্রমে ক্রমে মুখের সে কঠিন ভাব দূর হইয়া গিয়া উজ্জ্বল হাস্যে সতীশের মুখ ভরিয়া উঠিল। কোথাও নোটের তোড়া, কোথাও হীরা মতি মুক্তার জড়োয়া গয়না, কোথাও মোহরের সারি, কোথাও বা রূপার টাকা।—সৌন্দর্য্য দেখিয়া মন কাহার না অভিভূত হয়? কিন্তু এত সৌন্দর্য্য এক সঙ্গে কে কবে দেখিয়াছে?—আনন্দে সতীশ নোটগুলি, মোহরগুলি তুলিয়া তুলিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিতে লাগিল।—সতীশ যে এত হাসিতে পারে, আনন্দের উচ্ছ্বাসে সতীশের চেহারায় কোমলতা যে এমনও ফুটিয়া উঠিতে পারে, সতীশের স্ত্রী-কন্যা তাহা চোখে দেখিলেও হয়ত' বিশ্বাস করিতে পারিত না!—কিন্তু সত্যই ফোটে, নিঝুম রাত্রিতে যখন পাশের ঘরে স্ত্রী-পুত্র

কন্যারও আর সাড়া পাওয়া যায় না, তখনই সিন্দুকের এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাশির সঙ্গে সতীশের গোপন প্রেমলীলার সূচনা হয়—এবং এই মুহূর্ত্তটিরই আশায় এবং অপেক্ষায় সমস্ত দিন সতীশের অতি কষ্টে কাটে, মন খারাপ হইলেই মেজাজও খারাপ হয়, তাই সারাদিনই সতীশের রুক্ষ প্রকৃতি, কঠোর ব্যবহার।

প্রথম যেদিন সতীশ টাকার তোড়া আনিয়া বাড়ীতে ফেলিয়াছিল, সেদিন স্ত্রী-পুত্র-কন্যার দুঃখই তাহার নিকট প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদিগকে ভাল খাওয়াইবে, ভাল পরাইবে, প্রাসাদোপম গৃহ প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে লইয়া তথায় সুখে বাস করিবে, সতীশের মনে এই কামনাই তখন প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল; হইতও তাহাই, এতদিনে তাহাদের জড়োয়া গহনা, রেশমী বেনারসির সাড়িতে গৃহে রংএর ঢেউ খেলিয়া যাইত, কিন্তু কে জানে কখন কি হইল! যে টাকা সতীশ হাতে করিয়া আনিয়া সিন্দুকে তুলিয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে তাহার বুকে এবং মাথায় চাপিয়া বসিতে লাগিল, ক্রমে সতীশের আর নড়িবার ক্ষমতা রহিল না। সতীশের হাসি গেল, আনন্দ গেল, ভ্রমণ নিদ্রা সকল কিছুই ঘুচিল,—সেই টাকা, মোহর এবং জড়োয়া গহনা, সিন্দুক ছাপাইয়া উঠিয়া সতীশের সমস্ত দেহে মনে অচল হইয়া বসিয়া রহিল,—যাহাদের সে বহিয়া আনিয়াছিল, তাহারা মুহূর্ত্তের জন্যও আর সতীশের উপরে তাহাদের দাবী ছাড়িতে চাহিল না। নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত সতীশ এই গৃহ ছাড়িয়া কখনও বাহির হইত না।

বিশ্বনাথের কথা সে কখনও ভোলে নাই। কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়িলে বিপদ অনিবার্য্য, এবং সেই জন্যই বিশ্বনাথের পত্নীকে তাহার প্রাপ্য টাকা তখন সে দিতে পারে নাই। জমিদারের টাকা চুরীর কথা দেশের লোকে যখন ভুলিয়া যাইবে, তখনই একদিন গোপনে গিয়া বিশ্বনাথের পত্নীকে সেই টাকা সে দিয়া আসিবে, এইরূপ ইচ্ছা সতীশের আগে ছিল। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, সেই বার হাজার টাকা অক্টোপাসের মত সহস্র দিকে বাহু প্রসারণ করিয়া, আঁকড়িয়া ধরিল,—এবং অবশেষে যে টাকা পৃথক্ ভাবে সিন্দুকের এক পাশে রক্ষিত ছিল, কখন একদিন তাহা সতীশের অন্য টাকার সঙ্গে আসিয়া মিশিয়া গেল।—সতীশ ধর্ম্ম ভুলিল, বিবেক ভুলিল, মায়া মমতা করুণা—সকল কিছুই ভুলিয়া গিয়া সতীশের জপ-তপ হইয়া উঠিল, টাকা টাকা।

কিন্তু বিশ্বনাথকে সে ভুলিতে পারিল না। কতদিন হইয়া গিয়াছে, এখনও এক একদিন গভীর রাত্রে সিন্দুক খুলিয়া তাকাইলে বিশ্বনাথের মৃত্যু-বিবর্ণ মুখখানি কাতর দৃষ্টি মেলিয়া সতীশের মুখের পানে তাকাইয়া থাকে, শিহরিয়া সতীশ সিন্দুক বন্ধ করিয়া দূরে সরিয়া যায় এবং মনে মনে সেদিন বন্ধুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া টাকা ফিরাইয়া দিবার প্রতিশ্রুতি করে। অবশ্য দিনের বেলা সে সমস্ত কথা সতীশের মনে থাকে না, এবং মনে হইলেও বহু দিনের বদ্ধ সংস্কারে প্রেতাত্মা সম্বন্ধে অবিশ্বাসই আসে।

[৩৩]

গভীর রাত্রি, পল্লীগ্রামের রুদ্ধদ্বার গৃহগুলির বাতি নিবিয়া গিয়াছে। নিশ্চিন্ত আরামে গৃহবাসী আপন আপন গৃহে গভীর সুপ্তিতে মগ্ন। গ্রামের প্রান্তে ভগ্ন শিবমন্দিরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া কয়টি বিদেশী লোক সোজা পথে হাঁটিয়া চলিল। নির্জ্জন পথে মাঝে মাঝে ঝড়ো হাওয়ায় গাছের শুকনো পাতা ঝরার শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ আর কোথাও নাই। সশস্ত্র পথিকের দল নিঃশঙ্কে চলিল, গ্রামের পূর্ব্ব প্রান্তে সতীশের প্রকাণ্ড বাড়ীখানির সম্মুখে আসিয়া ইহারা থামিল। দ্বিতলে আলোর চিহ্ন দেখা যাইতেছে, গৃহবাসীরা ঘুমাইয়াছে কি না ঠিক বুঝা যাইতেছে না। যদিও না ঘুমাইলেও ক্ষতি বিশেষ কিছু নাই, কারণ রক্ষীহীন গৃহে তাহাদিগকে বাধা দিবার ক্ষমতা গৃহকর্ত্তার নাই। ইহা তাহাদের অবিদিত ছিল না।

পূর্ব্বচিহ্নিত পথে ইহারা ভিতরে ঢুকিয়া অনায়াসেই দ্বার খুলিয়া দ্বিতলে উঠিয়া গেল। এরূপ নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া গেল যে গোপালের কুম্ভকর্ণের নিদ্রার তাহাতে কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটিল না। দ্বিতলের বারান্দায় উঠিয়া, তেমনি নিঃশব্দে সতীশের গৃহের দ্বারও ইহারা খুলিয়া ফেলিল, এবং ধীরে ধীরে একজন দুইজন করিয়া মুখোসপরা আগন্তুকের দল ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

আলো হাতে সতীশ সিন্দুকের ভিতরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া নোটের তাড়াগুলি একপাশ হইতে অন্যপাশে সরাইয়া,

রাখিতেছে। বিশ্বনাথের সেই নোটের তাড়া এখনও তেমনি ভাবেই বাঁধা রহিয়াছে। এই বদ্ধ অবস্থাতেই ইহারা অহরহঃ সতীশের মনে সেই পুরাতন স্মৃতি জাগায়। সতীশ নোটবাঁধা সুতাটি খুলিয়া ফেলিবার জন্য নোটের তাড়াটি হাতে তুলিয়া দাঁড়াইল,—নোটগুলির পরতে পরতে রাজার মুখের জায়গায় ও কার ছবি?—বিশ্বনাথের? নোটের উপরে বিশ্বনাথ আপনি ফুটিয়া উঠিয়া এবার কি সকল কিছুর রহস্য ভেদ করিয়া দিবে? সতীশ হাতে চোখ ঢাকিয়া প্রাণপণে চোখ রগড়াইয়া নানা রকম ভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিল - তবু সেই একই ছবি, সেই বিশ্বনাথ, বিশ্বনাথের অন্তিমের সেই করুণ কাতর দৃষ্টি। সতীশের হাত কাঁপিতে কাঁপিতে নোটগুলি সিন্দুকের ভিতর পড়িয়া গেল,—কিন্তু এ কি!—এ কি!—নোটের ভিতর হইতে বাহির হইয়া বিশ্বনাথ এবার তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল না কি?—তারপর? তারপর,—একটি নয়, দুইটি নয়, সমস্ত ঘরে বিভীষিকা জাগাইয়া বিশ্বনাথের প্রেতাত্মা এবারে বহুমূর্ত্তি ধরিয়া সমস্ত ঘর ব্যাপিয়া নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল, চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া একটিবার মাত্র চারিদিকে তাকাইয়া দেখিয়া স্পন্দনহীন, মূর্চ্ছিত সতীশের মাথা সিন্দুকের ভিতর পড়িয়া গেল।—আগন্তুক প্রেতাত্মার দল সেখান হইতে তাহাকে সরাইয়া গৃহের এক কোণে টানিয়া ফেলিয়া রাখিল এবং অবশেষে আলো উজ্জ্বল করিয়া স্তরে স্তরে সাজানো নোটের তাড়া, জড়োয়া গহনা, মোহরের স্তবক ধীরে ধীরে নীচে নামাইয়া রাখিতে লাগিল।—

দূরে সতর্কতার বাঁশী বাজিয়া উঠিল, বুঝি পুলিশ আসিতেছে ভাবিয়া যাহা উঠানো হইয়াছিল দ্রুত হস্তে তাহা ব্যাগে পুরিয়া আগন্তুকের দল দ্রুত নামিয়া বাহির হইয়া গেল,—বাহিরে মশাল জ্বালাইয়া এবং লাঠি লইয়া চীৎকার করিতে করিতে যাহারা দ্রুতপদে ছুটিয়া আসিতেছিল, তাহারা পুলিশ নহে, গ্রামের মুটে-মজুর, কুলী, চাষার দল, এবং তাহাদের অগ্রবর্ত্তী হইয়া যাহারা তাহাদিগকে উৎসাহ দিতে দিতে আসিতেছিল,—তাহারা সেই আশ্রমের ছেলেরা। কিন্তু সশস্ত্র গুণ্ডার দল বন্যার জলের মত তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া গেল।

দূরে শুনা গেল অশ্বের পদধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের দল।

[৩৪]

সন্ধ্যার পর হইতেই টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িয়া অন্ধকার চারিদিকে ঘনাইয়া তুলিতেছিল। কেরোসিনের কুপিটা জ্বালিয়া দ্রুতহস্তে সুধা ঘরের দ্বার জানালাগুলি বন্ধ করিতে লাগিল। সেলাই করিতে করিতে আজ রাত হইয়া পড়িয়াছে, ভাইবোন এখনই ঘুমে ঢুলিয়া সারা হইবে, তাহার আগে ভাত নামাইয়া দিতে হইবে।

অন্ধকার পুকুর হইতে একটা ডুব দিয়া, বারান্দায় আসিয়া গা মুছিতে মুছিতে মা কহিলেন, ভাত কি চড়িয়েছিস সুধা?

—না মা, এই যে যাচ্ছি, জোরে জল আসছে, দোরগুলো বন্ধ করে যাচ্ছি। আজ ঝড়ও আসবে হয়ত।

—চাল নিয়েছিস?

—না মা, কেন?

—আমার চাল আর নিস নি তা' হলে, আজও জ্বর এল আবার,—

বাহির হইয়া আসিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া সুধা কহিল,—আবার জ্বর এল মা? ও বেলাও খেলে না, এ বেলা খাবে বলে; তবে কেন মা রাত করে নাইতে গেলে?

—তাতে কিছু হবে না, জ্বর এসেছে, সেরে যাবে, ভাববার কি আছে। দু' একদিন উপোস দিলেই ঠিক হয়ে যাবে।

জ্বরের জন্যই হ'ক বা অসময়ে স্নানের জন্যই হ'ক্, শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে মা ঘরে ঢুকিলেন, পশ্চাৎ চলিতে চলিতে সুধা কহিল,—বিছানা করেছি মা, তুমি শোও তা হ'লে, লেপটি আমি তোমার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে যাই।

মাতাকে শুইতে দেখিয়া, ছোট পুত্রটি মার পাশে শুইতে চলিল, মা কহিলেন, দেবু শুলেই ত ঘুমিয়ে পড়বে সুধা, তা হলে আর খাওয়া হবে না, তুই ওকে ডেকে নে।

সুধা ডাকিল, উঠে আয় দেবু, ছবি নিবি আয়।

দেবু কহিল, না।

—না? তবে থাক তুমি, আমি টুকুকে গুড় দিচ্ছি, সব গুড় ও খেয়ে নেবে,—

গুড়ের নামে দেবু ছুটিয়া দিদির কাছে আসিল, দিদি হাসিয়া ভাইটিকে কোলে তুলিয়া রান্নাঘরে চলিল। মা কহিলেন, বড্ড রাত হয়ে গেল সুধা, একলাটি আর যাসনি

ওদিকে, এ পাশে দাঁড়িয়ে রতনের বউকে একটু ডাক, ও এসে বসবে'খন। রান্নাবান্না সেরে তাড়াতাড়ি তোরা খেয়ে নে,—

কন্যা চলিয়া গেলে, আপাদমস্তক লেপে ঢাকিয়া, এটা ওটা ভাবিতে ভাবিতে, ক্রমে তিনি ভাবনার স্রোতে ডুবিয়া গেলেন,—ঘরে চাল ক্রমে বাড়ন্ত হইয়া আসিতেছে, জ্বরের ভাণ করিয়া কতদিন আর নিজের আহার্য্যের ভাগ এই অনাথ শিশুগুলির জন্য সঞ্চয় করা চলিবে? পাটবিক্রয়ের টাকা কয়টি মহাজনের কাছ হইতে আজিও পাওয়া যায় নাই, ওটা হাতে আসিলে মাস তিনেকের জন্য তবু কতকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যাইত।

দ্বারের পাশে কেরোসিনের কুপিটা সামনে রাখিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রটি বানান করিয়া করিয়া দ্বিতীয় ভাগ পড়িতেছিল, খানিকক্ষণ তাহার আর সাড়াশব্দ কিছু না পাইয়া মুখ তুলিয়া মা চাহিয়া দেখিলেন, ছেলেটি বহির উপর মাথা রাখিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবে ঢুলিতেছে, ব্যস্ত হইয়া, মা ছেলেটিকে ডাকিয়া দিদির কাছে খাইতে পাঠাইয়া দিলেন।

ক্ষুদ্র সংসারের আহারেরও ক্ষুদ্র আয়োজন সারিতে অধিকক্ষণ লাগিল না। ঘুমন্ত ভাইটিকে মাতার পাশে শোয়াইয়া দিয়া, অন্য ভাই-বোনগুলিকে সযত্নে সুধা কম্বলে চাদরে ঢাকিয়া দিল, তাহার পর আলোটি পাশে রাখিয়া ঠাকুরমার ঝুলির পাতা খুলিয়া, শয্যায় আসিয়া শুইল। কিন্তু অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই চক্ষু দুটি ধীরে ধীরে বন্ধ হইয়া আসিয়া বহিখানি সুধার বুকের উপর পড়িয়া গেল। তন্দ্রাঘোরে গরীবের সংসারের অসংখ্য দারিদ্র্যদুঃখ ভুলিয়া গিয়া মেঘমালা রাজকন্যার অতল পুরীর রত্নপ্রাসাদের ভিতর সুধার সমুদয় মনখানি ডুবিয়া গেল।

রাত কটা তখন, কে জানে—বৃষ্টির টিপি টিপি শব্দের এতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন বিরামই হয় নাই। সুধার মার ভাল ঘুম হইতেছিল না, অর্দ্ধ জাগরিত ভাবে বার বার চমকিয়া উঠিয়া পুত্রকন্যাগুলির গায়ে হাত বুলাইয়া আবার শুইতেছিলেন। মনটা অশান্ত হইয়াই ছিল, সহসা দ্বারে মৃদু আঘাতের শব্দে সভয়ে উঠিয়া বসিলেন। রতনের ঘরখানি বেশি দূরে ছিল না, তাহাকে ডাকিবার জন্য অস্পষ্ট, কম্পিত কণ্ঠে সুধাকে ডাকিলেন। ঘুমের ঘোরে সে মৃদু শব্দ সুধার কাণে প্রবেশ করিল না, সর্ব্বাঙ্গে তাঁহার ঘাম ঝরিতে লাগিল, বাহির হইতে কে অতি মৃদু কণ্ঠে কহিল,—মা কি জেগেছেন? দোরটা খুলুন।

সবিস্ময়ে একটু সরিয়া আসিয়া সুধার মা কহিলেন, কে তুমি?

—আমি মা, চিনতে পাচ্ছেন না? খুলুন দোরটা, জলে ভিজছি,—

—ওঃ তুমি? এত রাত্রে কি রকম? মা আলো হাতে করিয়া আসিয়া দোরটি খুলিয়া দিলেন। সিক্ত বস্ত্রে অতি সুন্দর তরুণ একটি যুবক ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বারটি পুনরায় বন্ধ করিয়া, দ্বারের পাশেই একটি মোড়া টানিয়া বসিয়া পড়িল।

সুধার মা অদূরে শয্যার এক পাশে বসিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিলেন। মৃদু হাসিয়া যুবক কহিল, মাসীর বাড়ী যাচ্ছিলুম মা, পথে হঠাৎ এক রোগীর সঙ্গে দেখা, ঝড়ে জলে গাছতলায় পড়ে আছে, তারই একটু ব্যবস্থা করে দিতে দিতে রাত হয়ে গেল। ভাবলুম, এত রাতে কোথায় আর যাই? মাসীর বাড়ী ত' কাছে নয়। তাই ভাবলুম মার মনে আছে কি না কি জানি, হয়ত' দোর বন্ধ করে ঘুমিয়ে আছেন, তবু একবার যাই।

যুবক হাসিল। মা নিরুৎসাহ ভাবেই কহিলেন তা এসেছ, বেশ করেছ,—তাহার পর অনেক ভাবিয়া, ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করিলেন—তা, কিছু খেয়েছ কি?

—সে সব হয়ে গেছে মা।

পরম নিশ্চিন্ত ভাবে মা মনে মনে ভগবানকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলেন, অবুঝের মত যদি যুবক আহার্য্য কিছু চাহিয়াই বসিত,—কি আছে ঘরে তাঁহার? কি দিয়া ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধা নিবারণ করিতেন!

—তা একখানা কাপড় দিই। ভিজে কাপড়খানা ছেড়ে ফেল।

যুবক প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, কিছু দরকার নেই মা, এই ত শুকিয়ে গেল বলে,—

—তবে একখানি সতরঞ্চি পেতে দিই এখানে, একটু শুয়ে পড় বাবা, বসে থাকবে কি করে?

তাহাতেও বাধা দিয়া যুবক কহিল, মিছামিছি মা, কতটুকু রাতই বা আর আছে? এই ত ভোর হ'ল বলে—আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন।

অগত্যা মা নীরবেই বসিয়া রহিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার অদ্ভুত অতিথি দেয়ালে ভর রাখিয়া চক্ষু মুদিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

মাও বসিয়া বসিয়াই কেমন একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন।

ভোর বেলা সুধার ধাক্কায় চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন—কিন্তু কোথায় তাঁহার অতিথি? ঘরে ত আর কেহ নাই!

ঘরের মেঝে হইতে একখানা মোটা খাম তুলিয়া অবাক হইয়া সুধা মার হাতে দিল, মা বিস্ময়ের সহিত খামখানি খুলিলেন,—কি আছে খামে? আশ্চর্য্য অবাক কাণ্ড, কে দিল এ সব? পাঁচশো টাকার নোট,—কে তাঁকে এসব দিয়া গেল? একখানি ছোট্ট কাগজে লেখা শুধু,—"মা, ভগবান আপনাকে দিলেন।"

মা খামখানি বন্ধ করিয়া মূর্চ্ছিতের মত শয্যার উপর পড়িয়া রহিলেন।

সকাল বেলার সোণালী আলোয় গৃহখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, গত রাত্রের বৃষ্টির কোন চিহ্নই আর নাই।

দীর্ঘরাত্রিব্যাপী বর্ষণের পর অন্ধকার আকাশের প্রান্ত সীমায় নূতন দিনের জন্ম হইতেছে, পৃথিবী এখনো স্নান।

জাগরণের পর আশ্রমে ব্রহ্মচারীদের স্নানের কোলাহল পড়িয়া গিয়াছে। প্রাণের প্রাচুর্য্য ভরা এই ছেলেগুলির সকল কিছুতেই প্রবল উৎসাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, কেহ বা স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে ধুতি-গামছা লইয়া পুকুরপারে চলিয়াছে, স্নান সমাপন করিয়া কেহ আসিয়া দড়িতে ধুতি মেলিতে মধুর সুরে গানে টান দিয়াছে। সকলেই ব্যস্ত। ঘণ্টা দুয়েকের ভিতরই সকলকে নিজের নিজের কাজকর্ম্ম এবং পড়া শেষ করিয়া রাখিতে হইবে, তারপর আরম্ভ হইবে আশ্রমের কাজ এবং অধ্যাপনা।

স্নানান্তে বিবেকানন্দের কি একখানা বহি হাতে লইয়া নরেনদা ধীরে ধীরে খাল পারে আসিয়া দাঁড়াইলেন।—মরা গাঙে জোয়ার আসিয়াছে—সেই ক্ষীণদেহ শুষ্ক খালটিতে জলের তরঙ্গ নাচিয়া চলিয়াছে, নরেন দা পুলকোজ্জ্বল দৃষ্টিতে খালের জলে আলোর খেলার পানে তাকাইয়া রহিলেন।

দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া সূর্য্যোদয় হইল—শুভ্র সতেজ সুন্দর সূর্য্য। যুক্ত করে নরেন দা এই জ্যোতির্ম্ময় মহান্ দেবতার উদ্দেশে নত হইলেন।

মাথা তুলিতেই সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল পানু—নরেন দা সবিস্ময়ে মুহূর্ত্তকালের জন্য স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন, আকাশে এই মাত্র ওই যে দেবতার আবির্ভাব হইল, তাঁহারই মত তরুণ এবং জ্যোতির্ম্ময় আশ্চর্য্য সুন্দর যুবক—পানু কহিল, —দিয়ে এলাম নরেন দা—বিশ্বনাথ বাবুর ছেলেমেয়েদের উপর ভগবানের দৃষ্টি পড়েছে, এবারে ওরা সুখী হবে।

(ক্রমশঃ)

টিয়াপাখীর ধর্ম

এদেশের বিজ্ঞগণ যে সমস্ত কথা কহিয়া থাকেন, সেগুলি প্রায়শঃ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কেতাবে অথবা বক্তৃতাতেই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। অপরের কথা আওড়াইয়া যাওয়া ময়না ও টিয়াপাখীর ধর্ম এবং ঐ পাখীগুলির কথা কখনও পরিষ্কার হয় না। তাহাদের কথা যত পরিষ্কারই হউক, মানুষের কথার মত পরিষ্কার কখনও হয় না।

হেমচন্দ্র

—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

আজ আপনারা আমাদের জাতীয় মহাকবি হেমচন্দ্রের স্মৃতিপূজার এই অনুষ্ঠানে আমাকে পৌরোহিত্যে বরণ করায় আমি আপনাকে যেরূপ ধন্য, সম্মানিত ও গৌরবান্বিত মনে করিতেছি, আমার অযোগ্যতার কথা স্মরণ করিয়া তদধিক লজ্জিত, কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত বোধ করিতেছি। আমার এই কথা চিরাচরিত প্রথানুযায়ী শিষ্টাচারসম্মত বিনয়ভাষণ মাত্র মনে করিবেন না, সত্য সত্যই যে জ্ঞান, যে রসানুভূতি, যে বাগ্মিতা, যে সাহিত্যিক পদমর্য্যাদা প্রভৃতি গুণ থাকিলে এইরূপ সভায় যথাযোগ্যভাবে পৌরোহিত্য করা সম্ভব, দুর্ভাগ্যক্রমে আমি সে সকল গুণের একটিরও বিন্দুমাত্র অধিকারী নহি। বাণী-মন্দিরের এক নিভৃত অংশে আমি এতাবৎকাল নীরবে সামান্য ভারবাহীর কার্য্য করিয়া আসিয়াছি, পুরোভাগে দাঁড়াইবার অধিকার আমার নাই। সাহিত্যরাজ্যের একজন "হরিজন"কে আপনারা আজ পৌরোহিত্যে বরণ করিয়া আপনাদের উদারতা ও মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছেন বটে, কিন্তু আমি যে এই আসন গ্রহণের কতদূর অনুপযুক্ত, তাহা অনুভব করিয়া আমি লজ্জিত হইয়াছি। তথাপি আমি আপনাদের এই সাদর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারি নাই। কারণ, আমার বিশ্বাস যে দেবপূজা সার্থক হয়—পুরোহিতের সুস্পষ্ট মন্ত্রোচ্চারণের গুণে নহে, আরতির উচ্চ ঘণ্টানিনাদেও নহে,—কিন্তু ভক্তগণের আন্তরিক ভক্তি, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠায়। আমার তাই মনে হয়, আজিকার এই স্মৃতিসভায় আমার অক্ষমতা সত্ত্বেও আপনাদের ভক্তি ও নিষ্ঠার গুণে এ পূজা সার্থক হইবে। আমার পক্ষ হইতে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আমার ভাষা আমার মনোভাব সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করিতে অক্ষম হইলেও স্বর্গগত বাণীবরপুত্রের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আপনাদের কাহারও অপেক্ষা আন্তরিকতায় ন্যূন নহে এবং আপনাদের এই পূজায় আমি যোগদান করিতে সুযোগ পাইয়া যথার্থ ই ধন্য হইয়াছি।

আমি কলিকাতাবাসী। দুঃখের সহিত, লজ্জার সহিত স্বীকার করিতেছি, কলিকাতায় বঙ্গ-সাহিত্যের অন্যতম যুগান্তরকারী জাতীয় মহাকবি হেমচন্দ্রের কোনও বিশেষ স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে বলিয়া আমি অবগত নহি। আমাদের বর্ত্তমান নাগরিক জীবনের সহিত ইহার বেশ সামঞ্জস্য আছে। যে হেমচন্দ্রের মধুর, গম্ভীর ও ওজস্বিনী কবিতাবলী মানবহৃদয়কে উচ্চতর, মহত্তর ও পবিত্রতর করিয়া তুলে, আলস্যপরায়ণ, স্বার্থপর, ভূতগৌরববিস্মৃত সুষুপ্ত জাতিকে জাগরিত, উত্থিত ও উদ্বোধিত করিয়া তুলে, পাপের প্রতি বিদ্বেষ, পুণ্যের প্রতি আনুরক্তি, অত্যাচারীর প্রতি ক্রোধ, অত্যাচারিতের প্রতি মমতা, ভণ্ডামীর প্রতি ঘৃণা, সাধুতার প্রতি শ্রদ্ধা উদ্রিক্ত করে, যে সকল কবিতা কোনও ধর্ম্ম-মন্দিরের বেদী হইতে উচ্চারিত হইবার উপযুক্ত, সে সকল কবিতার প্রতি আমাদের নবীনগণ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলে হয়ত প্রকৃতির সহিত সঙ্গতিরক্ষা হইত না। এখন ধর্ম্মমন্দিরের গম্ভীর অর্গ্যানবাদ্য বা সুমধুর কীর্ত্তনধ্বনি আমাদিগকে মোহিত করে না, আমরা সাধারণ বা অ-সাধারণ রঙ্গালয়ে নারীনৃত্যসম্বলিত প্রণয়গীতির ঝঙ্কার শুনিতে ছুটিয়া যাই, আমাদের অতীত গৌরবের মহিমময় চিত্র আর প্রাণকে স্পর্শ করে না, পাশ্চাত্য কামলীলার চিত্র দেখিতে চলচ্চিত্রগৃহে দলে দলে সমবেত হই। এ যুগে আন্তরিকতার মুখোস পরিয়া হেমচন্দ্রের স্মৃতিপূজায় বাগ্মিতার উৎস উন্মুক্ত না করিয়া আমরা ভালই করিয়াছি। ইহা অপেক্ষা আমাদের বর্ত্তমান রুচির প্রশ্রয়দাতা জীবিতগণের জয়ন্তী উৎসব করা স্বভাবসঙ্গত, হয়ত লাভজনক।

কিন্তু জানি না, আজ বাঙ্গালার এই নিভৃত পল্লীতে, এত দিন পরে, কাহার অলক্ষ্য ইঙ্গিতে, এই জাতীয় মহাকবির স্মৃতিপূজার আন্তরিক বাসনা অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। হেম-চন্দ্রের বাণী আজ স্মরণ হইতেছে :-

'আর ঘুমাইও না' বলে কতদিন
কেঁদেছি—কেঁদেছে কত সে আর,
আজি জন্মভূমি, জীবন সার্থক—
তোমার কণ্ঠে এ মিলনহার।

... ...

জীবনের বিন্দু না হেরি কোথায়,
সব শূন্যময়—সকলি খালি,
চারিদিকে যত নরাস্থি কঙ্কাল,
চারিদিকে ধূ ধূ করিছে বালি ॥
উঠ গো জননী, দেখ চক্ষু মেলি,
সেই অস্থিগুলি নড়িছে ধীরে,
মৃদুল হিল্লোলে দেখো কি নিশ্বাস
সে শব-পঞ্জরে বহিছে ফিরে ॥

শবপঞ্জরে আবার কিরূপে প্রাণশক্তি ফিরিয়া আসিতেছে? আমার মনে হয় ইহা তীর্থমাহাত্ম্য। রাজবল্লভহাট—গুলিটা বাঙ্গালীর জাতীয় মহাকবি হেমচন্দ্রের জন্মস্থান ও শৈশবের লীলাভূমি,—বাঙ্গালীর মহাতীর্থ। এই স্থানেই তাঁহার মাতামহ রাজচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর আলয়ে ৯৮ বৎসর পূর্ব্বে ১২৪৫ সালের ৬ই বৈশাখ হেমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই স্থানের মধুর স্মৃতি বার্দ্ধক্যে হিন্দুজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ ৺কাশীধামে অবস্থানকালেও হেমচন্দ্র হৃদিপটে সমুজ্জ্বল রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহার শেষ কাব্যগ্রন্থ 'চিত্তবিকাশে' 'কি সুখের দিন' শীর্ষক কবিতায় অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। উহা আজ এই তীর্থে দাঁড়াইয়া পুনরায় পাঠ করিতে ইচ্ছা হইতেছে:—

"শৈশব সময় বর্ষ বার তের
বয়ঃক্রম বুঝি হইবে তখন,
জন্মিয়া অবধি এক দিন তরে
জানি না কখন দুঃখ যে কেমন।

তখন (ও) পূজার্হ মাতামহ মম,
সুমেরুর মত উন্নত শরীর
মাতা পিতা আদি বন্ধু সর্ব্বজন,
সে গিরি আশ্রয়ে আছেন স্থির।

সুখে হাসি খেলি সুখে আসি যাই,
সুখেতে ভাসিয়া করি ভ্রমণ,
সুখপূর্ণ ধরা, শূন্য সুখে ভরা,
সুখেরই প্রবাহ ভাবি জীবন।

আদরে লালিত আদরে পালিত,
মাতাম'র আর ছিল না কেহ,
অগত্যা তাঁহার আমাদের (ই) প্রতি,
ছিল আশৈশব অধিক স্নেহ।

আশায় নির্ভর করিয়া আহ্লাদে
জানাইলে তাঁয় মনের সাধ,
কখন (ও) অপূর্ণ থাকিত না তাহা,
পুরাতেন তিনি করিয়া আহ্লাদ।

বৎসরে বৎসরে শারদীয়া পূজা,
হইত আলয়ে আনন্দ সহ,
কতই আনন্দ পেয়েছি তখন,
মাসাবধি ধরি করি উৎসাহ।
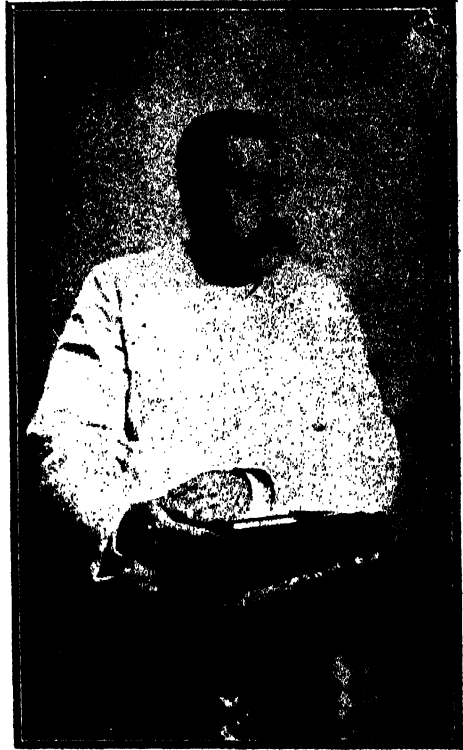
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

আসিত প্রত্যহ প্রতিমা দেখিতে,
কত দুঃখী প্রাণী প্রফুল্ল মুখে,
নববস্ত্রে সবে নিজে নিজে সাজি,
সাজায়ে বালিকা বালকে সুখে।

সে আনন্দ ছবি তাহাদের মুখে
হেরি কতবার সংশয়ে ভাবি,
কার বেশী শোভা, প্রতিমার কিবা
তাদের প্রফুল্ল মুখের ছবি।

আসে যায় হেন কতই দর্শক,
গ্রাম পল্লীবাসী কতই আসে,
ভিক্ষুক যাচক গীতবাদ্যকর,
অতিথ-অভ্যাগত কত কি আশে।

ক্রমে গৃহাগত আত্মীয় স্বজন,
কলরবপূর্ণ সদা আলয়,
প্রিয় সম্ভাষণ, মধুর আলাপ,
গৃহের সর্ব্বত্র ধ্বনিত হয়।

সদা হৃষ্টমতি কুটম্ব জ্ঞোয়াতি,
আমোদে প্রমোদে রত সদাই,
সর্ব্ব পরিজন আনন্দে মগন,
নিরানন্দ ভাব কাহার (ও) নাই।

সে আনন্দমাঝে আমি শিশুমতি,
সদা হেসে খেলে সুখে বেড়াই,
ধনী কি দরিদ্র প্রতিবেশী ঘরে,
আমার প্রবেশ নিষেধ নাই।

সেকালের প্রথা রামায়ণ গান,
অপরাহ্নে শুনি মোহিত হয়ে,
সমুদ্র লঙ্ঘন, পুষ্পকে গমন,
শুনি স্তব্ধ হয়ে বিস্ময়ে ভয়ে।

নিশিতে আবার শুনি যাত্রা গান,
সমস্ত রজনী জাগিয়া থাকি,
শুনি সে আখ্যান না ভুলি কখন,
হৃদয় ফলকে লিখিয়া রাখি।

ষাট বর্ষ আয়ু ফুরাইতে যায়,
সে সুখের দিন কবে গিয়াছে,
আজও সেদিন ভুলেনি হৃদয়,
সে সুখের স্বাদ আজও আছে।

ভদ্র মহোদয়গণ! যখন আমি প্রায় বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে "ভারত সঙ্গীতে"র কবির চরণরেণু অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিলাম, তখন কতবার আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, এই মহাতীর্থের ধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া জীবন ধন্য করি, কিন্তু আমার আশঙ্কা হইয়াছিল, এখানে আসিয়া কি দেখিব? ইংলণ্ডের মহাকবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ Yarrow Unvisited নামক কবিতায় যে ভাব তদীয় অননুকরণীয় ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমার মনেও সেই ভাবের উদয় হইয়াছিল—

"We have a vision of our own,
Ah ! why should we undo it ?"
যে ছবি ভাসিছে মম মানস-নয়নে, হায়,
প্রত্যক্ষ করিলে তাহা যদি চূর্ণ হয়ে যায়!

কিন্তু আজ বিংশতি বৎসর পরে, আপনাদের অনুগ্রহে এই তীর্থসন্দর্শনের সুযোগ পাইয়া আমি ধন্য হইলাম। যে চিত্র আমি কল্পনানয়নে দেখিয়াছি, সে চিত্র স্থূলনয়নেও অবিকৃতই দেখিতেছি। যখন আমি এই পথ দিয়া আসিতেছিলাম, তখন হেমচন্দ্রের মানসসন্তান, অপর একজন দেশভক্ত কবির কথাগুলি মনে পড়িতেছিল,—

"সেই স্থানে আজ কর বিচরণ,
পবিত্র সে দেশ, পুণ্যময় স্থান,
ছিল এ একদা দেবলীলাভূমি
করো না করো না তার অপমান।"

আমরা যদি এই তীর্থরেণু হইতে এতদিন পরে আজিকার এই স্মৃতিপূজার প্রেরণা লাভ করিয়া থাকি, এ প্রেরণা কি কেবল ক্ষণস্থায়ী ফল প্রসব করিবে? আর দুই বৎসর পরে, ৬ই বৈশাখ ১৩৪৫ সালে হেমচন্দ্রের জন্মের শতবার্ষিক উৎসব যথাযোগ্যভাবে অনুষ্ঠিত করিয়া, হেমচন্দ্রের অতীত-গৌরব-বাহিনী, মহাজাতিসংগঠনী বাণী তাঁহার সুষুপ্ত দেশবাসীকে পুনরায় বজ্রনির্ঘোষে শুনাইয়া তাঁহাদিগের মোহনিদ্রা ভাঙ্গাইয়ে বার কি কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে? আজ এই কথাই আমার মনে বারম্বার উদিত হইতেছে এবং এই কথাই আপনাদের নিকট নিবেদন করিতে চাই।

যাঁহারা সাহিত্যের স্রষ্টা জাতীয় জীবনের স্রষ্টা—তাঁহাদের জন্মস্থান সর্ব্বদেশেই দেশবাসীর তীর্থরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশেও ক্রমে ক্রমে, প্রধানতঃ স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের যত্নে ও চেষ্টায় মহাত্মগণের জন্মস্থান সমূহে স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হইতেছে। যদি রাজবল্লভহা অধিবাসিগণ, যাঁহাদের প্রশংসনীয় উদ্যম ও উৎসবের ফলে কয়েক বৎসর হইল এইস্থানে হেমচন্দ্রস্মৃতিপাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে, এ বিষয়ে উদ্যোগী হন, তাহা হইলে বোধ হয় ভারতীর বরপুত্র ক্ষণজন্মা কবি হেমচন্দ্রের জন্মস্থান—বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণের এই মহাতীর্থে, তাঁহার শতবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁহার যোগ্যতর স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠার সূচনা হইতে পারে।

বর্ত্তমান স্মৃতিসভায় কবিবর হেমচন্দ্রের কাব্যের দোষ-গুণ বিশ্লেষণ করিবার স্থান নহে। প্রতিভার বরপুত্র হেমচন্দ্র যে একজন অনন্যসাধারণ কবি ছিলেন, তাহাতে কাহারও কোন সংশয় থাকিতে পারে না। তাঁহার জীবন ও কাব্যের আলোচনা আমি আমার তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ "হেমচন্দ্র" নামক গ্রন্থে যথাসাধ্য করিয়াছি। এক্ষণে নূতন কোনও কথা বলিবার নাই, পুরাতনের পুনরুল্লেখও বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন।

"জ্বালিয়ে ঘৃতের বাতি, প্রখর ভাস্কর ভাতি,
বৃদ্ধি করা দুরাশা কেবল।"

আমি একাধিক স্থানে বলিয়াছি, হেমচন্দ্র "শবদে শবদে বিয়া" দিয়া, শব্দের ঝঙ্কার দ্বারা আমাদিগকে ক্ষণকালের জন্য মুগ্ধ করিতে আসেন নাই, তাঁহার উচ্চতর উদ্দেশ্য ছিল, তাঁহার হৃদয়ে এক অগ্নিময়ী বাণী আত্মপ্রকাশের জন্য সর্ব্বদা উন্মুখ ছিল। তিনি সেই শ্রেণীর কবি ছিলেন, যাঁহারা বলিতে পারেন—

"আমরা জীবন গড়ি,
মরণে মধুর করি,
নিরাশায় দেই আশা।"

অথবা,—

"অপূর্ব্ব অমর গান গাহি,
বিশাল নগর গাঁথি তুলি,
রচি' গল্প যার মূল নাহি,
সাম্রাজ্য-গৌরব-দীপ জ্বালি।

উত্তেজিত মোদের স্বপনে,
কেহ রাজা জিনিবারে ধায় ;
কভু গীতে মত্ত তিন জনে,
সাম্রাজ্য দলিত করে পায়।

যুগে যুগে ফুৎকারে জাগাই
প্রাণবহ্নি জাতির অন্তরে,
সম্ভব যা কেহ ভাবে নাই
স্বপ্নলব্ধ হেন মন্ত্র স্বরে।"

তরুণ বয়সে রচিত 'চিন্তাতরঙ্গিণী'তেই দেখিতে পাই মিথ্যা ও প্রতারণাপূর্ণ জগতের সংস্কারসাধন করিবার জন্য হেমচন্দ্রের অদম্য বাসনা কিরূপ বলবতী। তিনি বলিতেছেন,—

"ধর্ম্মশীল অকুটিল আছে কয় জনা।
কে না মিথ্যা বলে, কে না করে প্রতারণা॥
ইচ্ছা করে একেবারে পৃথিবী জুড়িয়া।
নূতন মানব জাতি আনি হে গড়িয়া॥"

তাঁহার দুঃখ,—

"দেশাচার রাক্ষসীরে বধিতে নারিনু।
স্বদেশের দুঃখভার ঘুচাতে নারিনু॥

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

... ...

মনের বাসনা কই পুরাতে পারিনু।
মানবমণ্ডলী কই পবিত্র করিনু॥
প্রীতিবারি সমাজেতে সেচিলাম কই।
স্বার্থ, দ্বেষ, পরহিংসা, নাশিলাম কই॥"

কিন্তু তিনি দুঃখবাদী নহেন। তিনি আশা ও উদ্দীপনার কবি। তাঁহার বাণী কি পুরুষোচিত ও উৎসাহপূর্ণ!

"কি ছার পাপের ঢেউ দেখি, ভয় কর।
পায়ে করি ঠেলে দেও, নিজ বীর্য্য ধর॥"

"বৃথা চিন্তা কর দূর, রণমাঝে হও শূর,
কি কারণ এত ভয় পাও।
বিপদে যে ভয় পায়, লোকে দেখে হাসে তায়,
পুরুষের প্রতাপ দেখাও॥"

হেমচন্দ্রের বাণী পরে তাঁহার "ভারত-বিলাপ," "ভারত-সঙ্গীত" ও "ভারত-ভিক্ষা" প্রভৃতি অমর সঙ্গীতে আরও স্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। সমগ্র বঙ্গসাহিত্যে, উদ্দীপনায় ও উন্মাদনী শক্তিতে তাঁহার দেশাত্মবোধবিষয়ক বাণীর তুলনা নাই। তাঁহার কাব্যের যে কোনও স্থান পাঠ করিলে ইহা হৃদয়ঙ্গম হইবে :—

চীন ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।
... ...
কিসের লাগিয়া হলি দিশে-হারা,
সেই হিন্দুজাতি, সেই বসুন্ধরা,
জ্ঞান-বুদ্ধি-জ্যোতিঃ, তেমনি প্রখরা,
তবে কেন ভূমে পড়ি লুটাও।
অই দেখ! সেই মাথার উপরে,
রবি শশী তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপ দিক শোভা করে,
ভারত যখন স্বাধীন ছিল;
সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখন(ও) বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যাচল এখন(ও) উন্নত,
সেই ভাগীরথী এখন(ও) ধাবিত,
কেন সে মহত্ত্ব হবে না উজ্জ্বল?
বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে?"

পুনশ্চ,—

এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি পূর্ব্বে যবে
মধুমাখা গীত শুনাইল ভবে,
স্তব্ধ বসুন্ধরা শুনি বেদ-গান
অসাড় শরীরে পাইল পরাণ,
পৃথিবীর লোক বিস্ময়ে পূরিয়া
উৎসাহ-হিল্লোলে সে ধ্বনি শুনিয়া
দেবতা ভাবিয়া স্তম্ভিত রহে।

এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি সে যখন,
উৎসবে মাতিয়া করিত ভ্রমণ,
শিখরে শিখরে, জলধির জলে,
পদাঙ্ক অঙ্কিত করি ভূমণ্ডলে,
জগৎ ব্রহ্মাণ্ড নখর-দর্পণে
খুলিয়া দেখাত মনুজ সন্তানে!
সমর-হুঙ্কারে কাঁপিত অচল,
নক্ষত্র, অর্ণব, আকাশ মণ্ডল—
তখন তাহারা ঘৃণিত নহে;

যখন জৈমিনি, গর্গ, পতঞ্জলি,
মম অঙ্কস্থল শোভায় উজলি,
শুনাইল ধীর নিগূঢ় বচন,
গাইল যখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন,
জগতের দুঃখে শুকপিলবস্তো
শাক্যসিংহ যবে ত্যজিলা গার্হস্থ্যে,—
তখন(ও) তাহারা ঘৃণিত নহে;

তাদেরই রুধিরে জনম এদের,
সে পূর্ব্ব গৌরব সৌরভের ফের
হৃদয়ে জড়ায়ে ধমনী নাচায়,
সেই পূর্ব্ব পানে কভু গর্ব্বে চায়—
এ জাতি কখন জঘন্য নহে;

হে কুমার মনে রেখো এই কথা
যে ভারতে তুমি ভ্রমিতেছ হেথা
পবিত্র সে দেশ, পূত কলেবর—
কোটি কোটি প্রাণী, ঋষি পুণ্যধর,
কোটি কোটি জন শূর বীর নর,
কবি কোটি কোটি মধুর অক্ষর,
রেণুতে তাহার মিশায়ে রহে!

বাস্তবিক এই সকল পংক্তি পড়িলে কাহার হৃদয় ভূত-গৌরবস্মৃতিগর্ব্বে উদ্বেলিত ও স্বদেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে না? হেমচন্দ্রের শিক্ষা জাতীয় জীবনে যে উদ্দীপনার তড়িৎ-তরঙ্গ সঞ্চারিত করিয়াছে তাহার তুলনা কোথায়? আজিও যেন তাঁহার অশরীরী আত্মা বজ্রনির্ঘোষে তাঁহার স্বদেশবাসীকে স্বকীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনে প্রোৎসাহিত করিতেছে :—

যাও সিন্ধুনীরে, ভূধর-শিখরে
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে
বায়ু উল্কাপাত, বজ্রশিখা ধ'রে
স্বকার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হও!

নিরাশ জাতিকে এমন আশার কথাও এমন ভাবে কেহ শুনায় নাই—

আবার উজ্জ্বল হবে,
নব প্রজ্জলিত ভবে,
ভারত উন্নতি-স্রোতে চলিবে রে ভাসিয়া!
জন্মিবে পুরুষগণ,
বীর যোদ্ধা অগণন,
রাখিবে ভারত-নাম ক্ষিতি-পৃষ্ঠে আঁকিয়া।

পুনশ্চ :—

কে বলেছে এই ভাবে
ভারতের দিন যাবে?—
'নিশির প্রভাত নাই'
যে বলে সে জানে নাই,
ভারতের ভাবীবেদ পড়েনি কখন,—
জানে না সে জগতের
কিবা গতি, কিবা ফের,
ফের এ ভারতবাসী
জ্ঞানের তরঙ্গে ভাসি,
হাসিবে অপূর্ব্ব হাসি, লভিয়া জীবন
চলিবে নূতন পথে
সাধিবে নূতন ব্রতে,
ফিরাতে নারিবে তায়
এ তরঙ্গ নাহি যায়
একবার হৃদিতটে খেলিলে কিরণ,—
যাবে আগে যাবে সদা
অন্যথা নহিবে কদা,
চিরদিন এই রীতি, জীবনের এই নীতি,
জাগিলে নাহিক নিদ্রা—চির জাগরণ।

এই আর্য্যভূমে বাঁধিয়া কুন্তল,
ধরিয়া কৃপাণ কামিনী সকল,
প্রফুল্ল স্বাধীন পবিত্র অন্তরে
নিঃশঙ্ক-হৃদয় ছুটিত সমরে,—
খুলে কেশপাশ দিত পরাইয়া
ধনুদণ্ডে ছিলা আনন্দে ভাসিয়া,
সমর-উল্লাসে অধৈর্য্য হয়ে।

কবি হেমচন্দ্র (অন্ধাবস্থায়)।
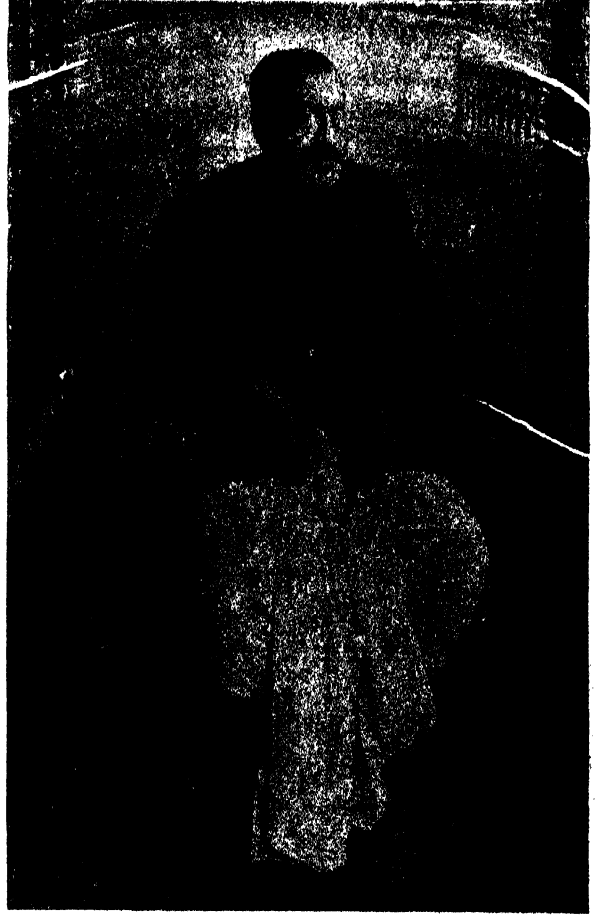
হিন্দু নারীগণকেও তিনি অতীত গৌরবকাহিনী স্মরণ করাইয়া দিতে বিস্মৃত হন নাই :—

এই রঙ্গভূমে করেছিল লীলা,
আত্রেয়ী, জানকী, দ্রৌপদী সুশীলা,
খনা, লীলাবতী প্রাচীন মহিলা,—
সাবিত্রী, ভারত পবিত্র করে।

'বৃত্রসংহার' মহাকাব্যেও কবি কেবল দেবাসুরের লীলা বর্ণনা করেন নাই, উহার মধ্যে আমাদের রাজনীতিক সামাজিক ও নৈতিক কত সমস্যার সমাধানের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, ত্রিভুবন-বিজয়ী বীর বৃত্রের যে আসুরিক শক্তি বিনষ্ট করিতে অমিতপরাক্রম ইন্দ্রাদি দেবগণও অসমর্থ, দধীচির ন্যায় আত্মোৎসর্গপরায়

স্বদেশ-প্রেমিকের অস্থির মধ্যস্থিত বজ্রশক্তি সেই আসুরিক শক্তিকে নিমেষের মধ্যে বিনষ্ট করিতে পারে।

বাস্তবিক 'বৃত্রসংহার' মহাকাব্যখানি মনোযোগসহকারে পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, কেন বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন প্রমুখ মহামনীষিগণ হেমচন্দ্রকে বাঙ্গালার কবিসিংহাসনে শ্রদ্ধার সহিত স্থাপন করিয়াছিলেন। ল্যাণ্ডর একস্থানে বলিয়াছেন :—

"We may write little things well and accumulate one upon another ; but never will any be justly called a great poet unless he has treated a great subject worthily. He may be the poet of the lover and of the idler, he may be the poet of green fields or gay society but whoever is this can be no more. A throne is not built of birds' nests, nor do a thousand reeds make a trumpet."

আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া সুন্দর কবিতার স্তূপ রচনা করিতে পারি, কিন্তু কোনও মহৎ বিষয় লইয়া যথাযোগ্যভাবে কাব্য রচনা না করিলে কেহ যথার্থ মহাকবি নামে অভিহিত হইতে পারেন না। তিনি প্রেমিক বা বিলাসীদিগের কবি হইতে পারেন, তিনি প্রাকৃতিক শোভাবর্ণনে বা আমোদপ্রিয় সমাজের মনোরঞ্জনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন, কিন্তু তদতিরিক্ত কিছুই হইতে পারেন না। পক্ষিনীড়দ্বারা রাজসিংহাসন নির্ম্মিত হইতে পারে না, সহস্র সহস্র বংশীদ্বারাও তূর্য্যধ্বনির সৃষ্টি করা যাইতে পারে না।

বাঙ্গালার কাব্যকুঞ্জে বংশীধ্বনি অনেকেই শুনাইয়াছেন, কিন্তু হেমচন্দ্রের ন্যায় কে এমন প্রাণমন-উন্মত্তকারী ভেরী-নিনাদ শুনাইয়াছেন ?

কেবল সামাজিক ও রাজনীতিক সমস্যার সমাধানে নহে, উচ্চতর জীবন-সমস্যার সমাধানেও কবি আত্মবিশ্বাস অনুসারে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। যে সংশয়বাদীর মনে সংশয় উপস্থিত হইয়া বলে—

"আমি বলি যায়—করিস্ প্রত্যয়,
দেহান্তে মানব কিছুই না হয়,
মাটীর শরীর মাটীতেই রয়,
দেহ মন গড়া একই ছাঁচে।"

তাহাকে তিনি জলন্ত বিশ্বাসের সহিত বলেন,—

"নহে—নহে কদাচন না মানি প্রত্যয়
ব্রহ্মা যদি নিজে বলে সে প্রাণী ওরূপে চলে,
সে আত্মার শেষ এই অন্ধ নিশিময়।
... ...
পরকাল আছে সত্য ; আছে পাপে প্রায়শ্চিত্ত
জগত নিয়ন্তা বিধি অবশ্য করিলা বিধি
যেরূপে উদ্ধার পাবে ভ্রমান্ধ যাহারা।"

যে পাপী পাপের পঙ্কিল হ্রদে নিমজ্জিত হইয়া কাতরকণ্ঠে প্রশ্ন করে,—

আছে কি রে পার সে পাপের হ্রদে,
ডুবে যাহে নর পড়িয়া প্রমাদে
বিষাক্ত জীবন ভোগে রে বিষাদে,
আছে কি পশ্চাতে নিষ্কৃতি তার ?

তাহাকে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে আশ্বাসবাণী শুনান,—

দুষ্কৃতির আছে ক্ষয় সন্তাপ অনন্ত নয়
পরকালে আছে ভোগ, মুক্তি আছে পুনঃ।

যে নৈরাশ্যের অন্ধকূপ হইতে কিছুই দেখিতে পায় না, কোনও তত্ত্বের সন্ধান করিতে পারে না, নানা প্রশ্নে যাহার মন নিয়ত আলোড়িত হইতে থাকে,—

সুখ কি জীবিতমানে ? কিবা অর্থ নির্ব্বাণে ?
কা হতে জনমিল জগতের যাতনা ?
অশুভ সৃজন কার ? নিরমল বিধাতার
মানস হতে কি এ মলিনতা রচনা ?

তাহাকে তিনি আশার সঞ্জীবনী মন্ত্র শুনান,—

না হও নিরাশ * * *
* * *
দুঃখেরি কারণ নহে জীবলীলা
মোচন আছে রে আপদে।
পূর্ণ সুখ ইহ জগত ভাণ্ডারে
দেখিতে পারিবে পশ্চাতে॥
অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা দশ পুরী
ক্রমে জীব পূর্ণ কামনা।
শোক দুঃখ তাপ সকলি দমন
এমনি বিধানে যোজনা॥
পর পর পর ঈশ জগতে
জীবের উন্নতি কেবলি।
অনন্ত অসীম কাল আছে আগে
অনন্ত জীবিত মণ্ডলী॥

হেমচন্দ্র আমাদিগের গন্তব্য পথের নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া, চরম শুভপথ লক্ষ্য করিয়া চলিতে সাহস প্রদান করত মা ভৈঃ মা ভৈঃ রবে বলিয়াছেন, "ভয় কি ? এস, আমাদের জীবন মরণের অধিষ্ঠাত্রী সেই জীবজননীর উপর নির্ভর করিয়া স্বধর্ম্মসাধনে নিরত হই" :—

লক্ষ্য করি তারি পথ, চালা নিজ মনোরথ
জীবজন্মে ভয় কি রে ? জগদম্বা জননী।

একজন সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক যথার্থই বলিয়াছেন, অন্যান্য কবিরা প্রায়ই মানবের জীবন-সমস্যার আলোচনা করিতে গিয়া কোন প্রশ্নাত্মক বা সন্দেহাত্মক বাক্যে উপসংহার করেন, হেমচন্দ্রের ন্যায় মা ভৈঃ মা ভৈঃ রবে প্রসারিত করে আমাদের উদ্বেলিত হৃদয়ের উপকূলে আসিয়া দাঁড়াইতে তাঁহাদের সাহস হয় না।

যে ক্ষণজন্মা কবি এইরূপ মহাবাণী দ্বারা আমাদিগকে নিরন্তর উৎসাহিত, উন্নত ও আশান্বিত করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, তিনি চিরকাল আমাদিগের পূজনীয় ও বরণীয় হইয়া থাকিবেন। কাব্যে কেবল সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিলেই সার্থক হয় না। উহা সার্থক হয় যখন উহা পাঠককে কেবল ক্ষণিক আনন্দ দেয় না, পরন্তু পাঠকের হৃদয়ে উচ্চ, পবিত্র ও মহান স্থায়ী ভাবের তরঙ্গ তুলিয়া তাহাকে উন্নত করিয়া তুলে। হেমচন্দ্রের ন্যায় কয়জন লেখক প্রকৃত কবির এই মহাব্রত পালনে সমর্থ হইয়াছেন ? তাঁহার কাব্যে যে মহাজীবনসঙ্গীত ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল, নব্য বাঙ্গালী কি তাহার মূল্য বুঝিবে ?

"হবে কি সেদিন এ গউড়মাঝে
পুরিবে তোমার আশা ?
বুঝিবে কি ধন দিয়াছ ভাণ্ডারে,
উজ্জ্বল করিয়া ভাষা ?"

আমাদের বিশ্বাস, এরূপ মহজ্জীবন ব্যর্থ হইবার নহে। কুজ্ঝটিকা ক্ষণকালের জন্য প্রভাকরকে আবৃত করিয়া রাখিতে পারে, কিন্তু উহা অপসৃত হইলেই স্বাস্থ্যকর, জীবনপ্রদ সূর্য্য-কিরণ জগতকে প্রতিভাসিত করিবে। পাশ্চাত্ত্য আদর্শে রচিত অস্বাস্থ্যকর সাহিত্য এবং শ্রুতিসুখকর, অথচ প্রাণহীন কাব্যের কুজ্ঝটিকা যে মহান্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছে, একদিন সে অন্ধকার বিদূরিত হইবেই এবং দেশবাসী হেমচন্দ্রের ন্যায় মহাকবির বাণীর উপযুক্ত মর্য্যাদা করিতে শিখিবে। আজ তাই নতজানু হইয়া, বিনম্রহৃদয়ে, সেই বাণীবরপুত্রের অমর আত্মার

সাহিত্য পরিষৎ-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হেমচন্দ্রের মর্ম্মর-মূর্ত্তি।

উদ্দেশে বারম্বার এই প্রার্থনা জানাই, যেন তাঁহার দেশবাসী হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করিতে পারে—

"অক্ষরে অক্ষরে তব হৃদয়-রুধির
কি গৌরবে মহাগন্ধে করিছে আহ্বান।" *

* কবিবর হেমচন্দ্রের জন্মস্থান রাজবল্লভহাটে আহূত স্মৃতি-সভার সভাপতির আসন হইতে বিবৃত। ২১শে চৈত্র ১৩৪২, ৩রা এপ্রিল ১৯৩৬, শুক্রবার।

দেবতার হাসি

—শ্রীকুড়নচন্দ্র সাহা
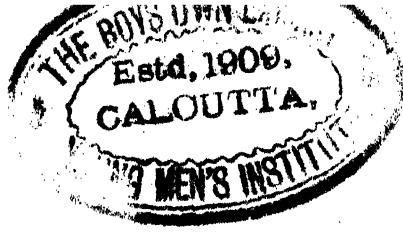
সারারাত্রির হিমে ঠাকুরঘরের খোলা জানালাটা বেশ ভিজিয়া উঠিয়াছে, বোধ হয় মাঝে কখন্ একপশলা বৃষ্টিও হইয়া গিয়াছে। মাঘ মাসের শীত। শেষ রাত্রির দিকে তার প্রকোপটা একটু বেশিই। এমন দুরন্ত শীতেও নীলকান্তর ছেলের ভয়-ডর বলিয়া কিছু নাই; কোমরে কাপড় জড়াইয়া সে সমান উৎসাহে কাঁসর পিটিতেছে।

এই মাত্র নীলকান্ত ঘরের ভিতর ঘিয়ের প্রদীপ জালিয়া দিয়াছে। আলো দেখিয়া কয়েকটা চাম্‌চিকা দালানের ফাটা খিলানের ভিতর হইতে বাহিরের অন্ধকারে উড়িয়া গেল। নীলকান্ত একবার মাত্র পিছনে তাকাইয়া নিজের কাজে মন দিল।

ঘরের মধ্যস্থলে কাষ্ঠনির্ম্মিত ছোট একটি সিংহাসন। গৈরিক রঙের কাপড়ে তার বাহিরের দিকটা ঢাকা। কাপড় সরাইতেই নাড়ুগোপাল হামাগুড়ি দিয়া ডানহাত বাড়াইয়া নীলকান্তর দিকে মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

নীলকান্ত হাসিয়া, আদরের সুরে বলিল, রাত্তেও তোর ঘুম নেই, দিন রাত শুধু হাত পেতেই থাকবি! কি নিবি তুই?

আলোটা একটুখানি উস্কাইয়া দিয়া আবার বলিতে লাগিল,—দিতে কি আমার আপত্তি আছে, যাদু? আমার কৃপণতা কোথায়, বল তুই। দেখতেই ত পাচ্ছিস, কি সুখে আছি!—ভাবে গদগদ কণ্ঠ যেন জলে ভারী হইয়া আসিল।

একপাশে একখানি রূপার রেকাবিতে ভোগের উপকরণ। আয়োজন যৎসামান্য। রেকাবিটা নীলকান্ত সিংহাসনের সম্মুখে স্থাপন করিল। বিগ্রহের প্রসারিত হাতের উপর একটি মিষ্টি দিয়া নীলকান্ত একদৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, তারপর এক সময়ে আপন মনেই গুন্ গুন্ সুরিয়া গা[illegible] লাগিল—

যশোদা নাচাত তোরে···

[illegible]র ছেলে কাঁসরহাতে দালান হইতে উঠিয়া আ[illegible]ছিল। [illegible]লিল, আমি একটা নেব বাবা।

গানের সুর নীলকান্তর হঠাৎ থামিয়া গেল। পুত্রের দিকে রূঢ় দৃষ্টিতে তাকাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, এখানে এলি যে, ভাগ, বেল্লিক, ভাগ।

—কেন, আমি ত কাচা কাপড় পরে এসেছি।

—তবে আর কি, বলি, ও তোকে ডেকেছে যে এসেছিস?

নীলকান্তর ছেলে এবার হাসিয়া উঠিল। পাথরের ঠাকুর আবার ডাকে নাকি কাউকে!

সে ভয়ে ভয়ে বলিল, এতক্ষণ ধরে বাজালাম, একটা মণ্ডা আমি পাব না?

—না না পাবি নে। ঠাকুরের ভোগ হয়েছে না কি যে পাবি? চোখ নেই তোর?—সঙ্গে সঙ্গে আরক্ত দৃষ্টিতে তাকাইয়া নীলকান্ত বলিয়া বসিল,—রোজ রোজ আমার সঙ্গে আসতে বলে কে রে তোকে? কাল থেকে ফের যদি আসবি, তোর গাল আমি চড়িয়ে ভাঙব।

রাগে গম্ গম্ করিতে করিতে নীলকান্তর ছেলে দালানের উপর ফিরিয়া আসিল। কাঁসরে ঘা দিবার আগেই বলিল,—না এলাম তা কি হল আমার! তুমি একাই কাঁসর বাজিও, একাই ঠাকুরের ভোগ দিও।

পঞ্চপ্রদীপ, শাঁখ আর ধূপের ধোঁয়ায় ঠাকুরের মঙ্গল-আরতি শেষ হইয়া গেল। ঘিয়ের দীপটি একটু আগে নিবিয়া গিয়াছে। কিন্তু বাহিরের অনতিস্ফুট আলোর আভা আসিয়া ঘরের অন্ধকার ফিকা করিয়া তুলিয়াছে। নীলকান্ত চাহিয়া দেখিল, বটুর বাম হাতের ঊর্দ্ধে পূজার কাঁসর তখনও ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজিতেছে।

খালি গা, কাপড়ের খুঁটটা পর্য্যন্ত গায়ে নাই।

নীলকান্ত হাসিতে হাসিতে বলিল, হয়েছে রে, আর না, খুব হয়েছে।

কিন্তু বটুর হাতের কাঁসর থামিল না। সে আরও জোরে বাজাইতে লাগিল, ট্যান্‌না ট্যান্‌না ট্যান্ ট্যান্।

নীলকান্ত আগাইয়া আসিয়া ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইল। শালপাতার ঠোঙায় যে এক টুক্‌রা ভাঙা সন্দেশ পড়িয়া ছিল, সেইটুকু তার হাতে দিয়া বলিল, খেয়ে নে। ঠাকুরের ভোগের সন্দেশ, আগে ত আর দিতে নেই।

—কে বলেছে দিতে নেই? ঠাকুরের ভোগ ত কখন হয়ে গিয়েছে।

—চুপ চুপ, ঠাকুর শুনতে পাবে। শুনলে আর মুখে দেবে না বাবা। বলিয়া পূজার একটি ফুল নীলকান্ত ভক্তি-ভরে ছেলের কপালে ছোঁয়াইয়া দিল। তারপর বিড় বিড় করিয়া বলিতে লাগিল—ও ছেলেমানুষ, ওর কথায় তুমি কাণ দিও না ঠাকুর। ওর জ্ঞানবুদ্ধি আর কতটুকু; বড় হলে ও তোমাকে পুজো করবে দেখো।

সন্দেশের টুক্‌রা-টুকু হাতে করিয়া বটু বাহিরে যাইতে-ছিল, হঠাৎ চাতালের উপর চোখ পড়িতেই সে চম্‌কিয়া উঠিল।

নীলকান্ত বলিল, কি হল রে, কি ওখানে?

—দেখে যাও এসে।

চাতালের এককোণে একটি অজগর সাপ কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া আছে। তার ধূসর বর্ণের গাটা একেবারে ফাটা চটা হইয়া উঠিয়াছে।

নীলকান্ত চোখ দুটি বড় করিয়া বলিল, ও যে সোণা খুড়ো রে, সোণা বুড়ো।—তারপর চাতালের উপর নামিয়া আসিয়া সোহাগ করিয়া বলিতে লাগিল, এতদিন কোথায় ছিলি রে সোণা, তোর রূপো কোথায়, অনেকদিন আর দেখি নে বুড়ীকে।

বটু বলিল, আমি ওখান দিয়ে উঠে এসেছি বাবা, ভাগ্যে আমাকে ছোবলায় নি।

—ওর কি বুদ্ধি নেই, যে ছোবলাবে! গোপালজীর চেলা, ঘর আগ্‌লিয়ে পড়ে থাকে। ও বুড়ো, চললি যে রে? ও রে শোন, পেসাদ পেয়ে যা ঠাকুরের।

সোণা কথা শুনিল না। তাহার চিত্তে ভক্তিরসের প্রাবল্য ছিল কি না জানি না, তবে প্রসাদের লোভ যে ছিল না, তাহা বুঝা গেল। চাতালের উত্তর দিকে যে ইটকখানি [illegible] ধরিয়া পড়িয়া আছে, ধীরে ধীরে সে তাহারই ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

সকালের আলোটা এতক্ষণে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ঠাকুরঘরের সম্মুখে নাটমন্দির। চারিদিকে বড় বড় বাড়ী-গুলি পাষাণ-প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। কোনটিরই শ্রী নাই। বড় বড় ফাটলের ভিতর বট-অশ্বত্থের গাছগুলি নির্ভয়ে শিকড় চালাইয়া দিয়াছে।

নাটমন্দিরের চাতালে নীলকান্ত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রত্যহ ভোরে অনন্ত পূজারীকে ছেলেবেলায় সে এইখানে পায়চারি করিতে দেখিয়াছে। অনন্তর কাঁধের উপর ধবধবে শুভ্র পৈতাগাছটা নীলকান্তর আজও মনে পড়ে। তার মাথায় টিকিরই বা কি শোভা! কেশগুচ্ছটি ঠিক চামরের ন্যায় সঞ্চালিত হইত।

এক পা এক পা করিয়া নীলকান্ত কখন দেউড়ি ধরিয়া কাছারি বাড়ীতে আসিয়া দাঁড়াইল।

সিং দরজাটা খাঁ খাঁ করিতেছে। দুইজন ভোজপুরী দারোয়ান লাঠিঘাড়ে অষ্টপ্রহর ঐখানে দাঁড়াইয়া থাকিত। নীলকান্তকে দেখিলে তাদের সে কি কুর্নিশের ঘটা!

স্নানের চৌবাচ্চাটা আজও তেমনি আছে। কেবল কালকিসিন্দি আর আকন্দর ঝোপে উহার বাহিরের দিকটা ঢাকিয়া গিয়াছে। পিতা কৈলাস বাবু প্রতিদিন ঐ চৌবাচ্চার ধারে বেতের মোড়ায় খাড়া হইয়া বসিতেন। আধ ঘণ্টা ধরিয়া ভৃত্য কেশব ঘোষ তাঁর গায়ে মাথায় তেল মাখাইয়া দিত। চৌবাচ্চার স্নিগ্ধ জলে স্নান করিয়া করিয়া বৃদ্ধের আর আশ মিটিত না।

অনেক কিছুই নীলকান্তর চোখের উপর ফুটিয়া উঠে; কিন্তু সবই আজ তার কাছে স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়।

পূব-দেউড়ীর ছোট গলি রাস্তাটা দিয়া চলিতে চলিতে নীলকান্ত সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল। এত ভোরে কে আবার এখানে ঢুকিল? লোকটাকে ভাল করিয়া দেখিবার একটুখানি সরিয়া আসিতেই নীলকান্ত বিস্ময়ে একেবারে কাঠ হইয়া গেল

—তুই কখন এলি রাজীব, তোকে যে আর চিনবার উপায় নেই রে!

—দেশে থাক শুনতে পাই, অথচ বাড়ী ঘরের এই দশা, একেবারে প্রেতপুরী করে রেখেছ। আগে জানলে আসতাম না।

নীলকান্তর সন্দেহ প্রশ্নের এই উত্তর !

নীলকান্তর বড় লজ্জা বোধ করিতে লাগিল। সত্যাই ত নয়, এ একেবারে প্রেতপুরীই।—সে একদৃষ্টে রাজীবের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

গায়ের মূল্যবান র‍্যাপখানা একবার ভাল করিয়া জড়াইয়া লইয়া রাজীব বলিল, এসেছি মাসখানেকের জন্য একটু বেড়াতে, ছেলেমেয়েরা এসেছে। আমার ঘরখানায় গোটাচারেক মিস্ত্রী লাগিয়ে দাও দেখি। ভেতরটা আছে এক রকম। একটু মেজে ঘষে নিলেই চলে যাবে।

নীলকান্ত একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, তা মাসখানেক আমার ওখানে থাকলে কোন অসুবিধে হত না। পশ্চিম দেউড়ির ঘরগুলো সবই ভাল আছে কি না।

—থাক্‌, এই দিকটাই আমার ভাল লাগে। পথের ধারে ঘর, ডাকলে ভুজনকে পাওয়া যাবে। শেষ রাত্রে ঠাকুরের মঙ্গল-আরতি তুমি করছিলে ?

—হ্যাঁ তা ছাড়া আর করবে কে ?

—কেন একজন পূজোরী রেখে দিলেই চুকে যায় ! হাজার হলেও জমিদারের ছেলে ত।

কি উত্তর দিবে নীলকান্ত ! অনেক কথাই তার মনের ভিতর ভাসিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু রাজীবের মুখের দিকে চাহিয়া সে চুপ করিয়া রহিল। রাজীবের কাছে নীলকান্তই আজ অপরাধী।

দুটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে কখন রাজীবের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বয়স তাদের আট হইতে দশের মধ্যে।

নীলকান্ত বলিল, ছেলে মেয়ে দুটি তোমার ?

—হ্যাঁ, ভালোয় ভালোয় এখন ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলে বাঁচি। কাল খুকুটার একটু জ্বর হয়েছিল। বাপ রে, এত মশা তোমাদের এই পাড়া গাঁয়ে,—ইহার পর কি একটা কথা বলিতে গিয়াই রাজীব থামিয়া গেল।

নীলকান্ত দেখিল বটু তাহাদের দিকে ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছে।

—ও বাবা বিমলি এটুকু নিল না। তুমি এসে দিয়ে দাও।

—কেন কাঁদছে না কি ছুঁড়ি ?

—খুব কাঁদছে। বলে আমি নাকি বেশি টুকু খেয়েছি। চল না তুমি—বটু নীলকান্তর হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল।

—আচ্ছা চল্‌। ও রাজীব, আগে থামিয়ে আসি ছুঁড়িটাকে।—নীলকান্ত ছেলের হাত ধরিয়া চলিতে লাগিল।

দীর্ঘ বার বৎসর পর ছোট ভাইএর সহিত নীলকান্তর এই সাক্ষাৎ। বার বৎসর আগে রাজীব সোণায় সংসার মাটি করিয়া গিয়াছে। সিন্দুকের টাকায় ইয়ার-বন্ধু আর অন্যান্য উপসর্গে মৌতাত জমাইয়াছে। কৈলাসবাবুর সম্পত্তিতে একা তা'রই ছিল অধিকার, নীলকান্ত তা'র কেউ নয়।

বার বৎসর পূর্ব্বের একটি দিনের কাহিনী নীলকান্তর সহসা মনে পড়িয়া গেল। বিকাল বেলা। কাছারি-ঘরে বসিয়া নীলকান্ত জমিদারির কাগজপত্র দেখিতেছে, সাজিয়া গুজিয়া রাজীব আসিয়া সামনে দাঁড়াইল। নীলকান্ত বলিল, বড় যে ফিট্‌ফাট্‌ দেখছি। কোথায় আজ, শুনতে পাইনে ?

রাজীবের মুখে কোন কথা নাই, নীলকান্তর দিকে চাহিয়া কেবল মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছে।

নীলকান্ত রুখিয়া উঠিয়া বলিল, বুঝেছি, কিন্তু আর একটি পয়সা আমার কাছে পাবে না। মহাল তুমি উড়িয়ে দিয়েছ, দেনায় মাথা আমার বিক্রী হয়েছে। ফুর্ত্তি করবার সখ থাকে, টাকা তুমি নিজে ধার কর গে।

রাজীব তবু নিরুত্তর। পকেট হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া নীলকান্তর হাতে দিয়া সে তা'র মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

নীলকান্ত সে চিঠি পড়িয়া রাজীবের দিকে চাহিতেই, রাজীব হাসিয়া উঠিল, কেমন, বাজী এবার মাৎ কি না ! শুধু এই···এইটে দাদা, তা' ছাড়া আর কিছু নয়।—ডান হাতের তর্জ্জনীটা কপালে ঠেকাইয়া রাজীব তীরের মত খাড়া হইয়া দাঁড়াইল; নীলকান্তর দিকে তাকাইয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, দেশে আর ফিরছিনে কোন দিন, এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থেক, বলিতে বলিতে নীলকান্তর সম্মুখ হইতে ঝড়ের মত সে কাছারি-ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

নীলকান্ত পিছনে পিছনে আসিয়া দেখিল, সিংহদরজার সামনে চাটুয্যে বাড়ীর পুরাতন ছক্কাকা গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে।

রাজীব গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছে, নীলকান্ত বলিল, তুই নেমে আয় রাজীব, তোর যখন যা দরকার আমি দেব, অমন কাজ করিস্‌ নে ভাই।

—টাকায় আমার দরকার নেই দাদা ; তোমার মহাল আমি উদ্ধার ক'রে দেব একদিন।

নীলকান্ত বলিল, মহাল আমি চাই নে। তুই নেমে আয়, ও সম্পত্তি দুদিন পরে তোরই ত হবে।

—বিশ্বাস কি দাদা ! এখনও শত্তুর আছে। আগে ব্যবস্থা করি গে তা'রপর।

টুন্‌ টুন্‌ করিয়া বলিষ্ঠ দুইটী বলদের গলায় পিতলের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ছোটবাবুর নির্দ্দেশে চাটুয্যেবাড়ীর রমাই গাড়োয়ান ইষ্টিশানের পথে গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

চিঠিতে ছিল শ্যালকের মৃত্যুসংবাদ। শ্বশুরের একমাত্র বংশধরের মৃত্যুতে জামাতা বিপুল সম্পত্তির মালিক হইয়াছে। রাজীব থাকিবে কেন ? হাসিতে হাসিতে নীলকান্তকে পথে বসাইয়া সে চলিয়া গেল।

ইহার পর দীর্ঘ বারটি বৎসর নীলকান্তর মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, রাজীব তা'র পিতৃভিটায় ফিরে নাই। জমিদারি নীলামে উঠিয়াছে। নায়েব-গোমস্তা সুযোগ দেখিয়া ষ্টেটের টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। বাগ-বাগিচাগুলি জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে। ঘর-বাড়ীই বা মেরামত করিবে কে ? যে প্রতাপশালী চাটুয্যেবাড়ীর এখানে সেখানে দিবারাত্রি নানা কণ্ঠের কলরব উঠিত, তাহারই একটি কোণে নীলকান্ত মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। কাহার কাছে সে তা'র মুখ দেখাইবে ? কে তা'র অন্তরের ব্যথা বুঝিয়া দেখিবে ? নীলকান্ত গোপালজীর চরণতল আশ্রয় করিল। চোখের জলে বুক ভাসাইয়া বলিল, আমার সকল দুঃখ দূর ক'রে দে ঠাকুর, তোর চরণতলে আমায় ঠাঁই দে। ধীরে ধীরে নীলকান্তর অশান্তির আগুন নিভিয়া গিয়াছে, ঠাকুর তা'র প্রাণের জ্বালা দূর করিয়াছেন।

পুরাতন চাবির গোছাটা লইতে লইতে রাজীব সেদিন নীলকান্তকে বলিল, খোলার কোন দরকার ছিল না দাদা, কিন্তু দিন রাত ঘরের কোণে বসে থাকতে কি ভাল লাগে ? তা' ছাড়া লোকজনের ত কামাই নেই, দেখে আর আশ মিটছে না ওদের।

নীলকান্ত উচ্ছসিত হইয়া বলিল, খুলে দাও না তুমি। আঁধার ঘরে মাণিক জ্বলুক রাজু। এইক'টা দিন বই ত নয়। হাঁ, একটা কথা কাল থেকে তোমাকে বলব মনে করছি ভাই।

কথাটা কি শুনিবার জন্ম রাজীবের আগ্রহ দেখা দিল।

নীলকান্ত বলিল, গোপালজীর ঘরখানা আর কি। তিরিশ বছরের মধ্যে ওর ত মেরামত বলতে কিছু হয় নি, চূণবালি খসে গিয়েছে। তা'তেও দুঃখ নেই, গোপালজী তা'তেও রাগ করেনি। কিন্তু গেল বারের ভূঁইকম্পে সব কটা থিলেন একেবারে হাঁ হয়ে গিয়েছে। রাতে শুয়ে ঘুম হয় না ; ভাবি, কখন ভেঙ্গে পড়ল বুঝি।

রাজীব হাসিতে হাসিতে বলিল—আর ত কিছু নয়। সারিয়ে দিয়ে যাব, তার আর কি !

কাছারি-ঘরের সুসজ্জিত ফরাশের উপর সেই দিন হইতে গানের জলসা বসিয়া গেল। গানের সুর গৃহের প্রতি অলিন্দে ভাসিয়া বেড়ায়। বিশাল সুপ্ত সৌধ যেন জাগিয়া উঠিয়া চোখ মেলিয়া তাকাইয়াছে।

নীলকান্ত দেখিল, চকমিলান বাড়ীখানায় লোকজন, নায়েব-গোমস্তা আর দাসী-চাকরে গিস গিস করিতেছে ; গোপালজীর ঘরে আকাশ ফাটাইয়া আরতির বাজনা বাজিতে আরম্ভ করিয়াছে, সিংদরজায় ভোজপুরী দরোয়ান, কাছারি-ঘরে কৈলাসবাবু তাকিয়া হেলান দিয়া গুড়গুড়ি টানিতেছেন, আর তাহারা দু' ভাইয়ে পাল্লা দিয়া বৃদ্ধের মাথার পাকা চুলগুলি টানিয়া তুলিতেছে।

নীলকান্ত অতীতের দিনে ফিরিয়া গেল।

প্রসন্নময়ী জিজ্ঞাসা করিল, রাজু এখন থাকবে ত গো ?

—থাকল আর কই, এই মাসের কটা দিন, তা'র পরেই —চোখ দুটি নীলকান্তর ছল ছল্‌ করিয়া উঠিল, শেষ কথাগুলি আর সে উচ্চারণ করিতে পারিল না।

সন্ধ্যা হইতে দেরী নাই। ঠাকুরঘরে নীলকান্ত পঞ্চ-প্রদীপ সাজাইতেছিল, বিমলি ছুটিয়া আসিয়া বলিল—এই দেখ বাবা। নীলকান্ত চোখ ফিরাইয়া দেখিল, বিমলি একটি নীল রঙের ফ্রক পরিয়া তার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মেয়েকে এত খুসি নীলকান্ত কোন দিন দেখে

নাই, এমন একটি রঙীন জামাও কোনদিন সে কিনিয়া দেয় নাই।

নীলকান্ত শুধাইল, জামা কে দিয়েছে রে ?

বিমলি হাসিয়া উঠিয়া বলিল—কে দিয়েছে বল দেখি বাবা ?

নীলকান্ত কি বলিতে উদ্যত হইয়াছে, ছুটিতে ছুটিতে বটু আসিয়া তার চমক লাগাইয়া দিল। বটুর পরণে কোট প্যান্ট ! গম্ভীর ভাবে সে মাথা দুলাইয়া বলিয়া উঠিল, কাকাবাবু দিয়েছে বাবা। বলেছে জুতোও দেবে শীগগির।

বিমলি বলিল—আমাকেও দেবে বাবা।

—দেবে তোকে ছাই, বলিতে বলিতে বিমলির দিকে একবার তাচ্ছিল্যভরে তাকাইয়া ঠাকুরঘরেই বটু সাহেবের ভঙ্গীতে পা ফেলিতে আরম্ভ করিল।

বিমলি চোখ মুখ বিকৃত করিয়া সরোষে বটুর দিকে ধাবিত হইতেছিল, নীলকান্ত তাড়াতাড়ি তাকে কোলে লইয়া বলিল, না মা তোমাকেও দেবে বই কি। আমাকে বলেছে দেবে—জরি দেওয়া জুতো, এই যে, তুমি আবার কি পেলে গো ? নাটমন্দিরের চাতাল পার হইয়া প্রসন্নময়ী ঠাকুরঘরের দিকে আসিতেছিল ; হাসিতে হাসিতে বলিল, কাজ গুছিয়ে এলাম, বটু এখন থেকে কলকাতায় পড়বে, রাজু নিজে পড়াবে।

—কার কাছে শুনলে এ কথা ?

—কেন ? রাজু নিজের মুখে বললে।

কথাটা বলিয়া প্রসন্নময়ী বেশ একটা আনন্দোজ্জ্বল দৃষ্টিতে নীলকান্তর দিকে তাকাইল।

নীলকান্তর মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না, সে কি বলিবে কি করিবে কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, মনের আবেগে ঘরের ভিতর কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

রাজু পড়াইবে বই কি, সে না পড়াইলে বটুকে পড়াইবে কে ! তারা যে সময় মত বটুর মাহিনাটাও দিতে পারে না। কিন্তু একটু আবার মুস্কিল হইতেছে যে ! বটু কলিকাতায় গেলে কে গোপালজীর কাঁসর বাজাইবে ? ভোরে উঠিয়া কেই বা রোজ রোজ ফুল তুলিয়া আনিবে ? এত কথা প্রসন্ন বলিতে গেল কেন ? নীলকান্তর বড় রাগ হইল।

হঠাৎ নীলকান্ত দেখিল, ঘরের ভিতর কখন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। অন্ধকারে গোপালজীকে ভাল করিয়া দেখা যায় না।

হাতড়াইতে হাতড়াইতে ঘিয়ের প্রদীপটা জ্বালিয়া দিয়া নীলকান্ত তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, বটু।

দেখিতে দেখিতে একটি মাস কাটিয়া গেল, নীলকান্ত বেশ একটু অধীর হইয়া উঠিয়াছে। গোপালজীর ভাঙা ঘরে এখনও হাত পড়ে নাই, গোপালজী তাহারই দিকে চাহিয়া আছে।

কথাটা ফের রাজীবের কানে তুলিতেই, নীলকান্ত অপ্রতিভ হইয়া গেল।

রাজীব বলিল—আমাকে না তাড়িয়ে তুমি আর ছাড়লে না দাদা, শরীরটা একটু ভাল হচ্ছে দেখে আর একটা মাস থেকে যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু তোমাদের জন্যে আর হল না। কালই তোমার গোপালজীর ঘরে মিস্ত্রী লাগিয়ে দিচ্ছি।

নীলকান্ত উত্তর দিল—পাগল ! তোমার উপরে আমার অবিশ্বাস, এ কি একটা কথা রাজু। তবে একটু তাড়াতাড়ি করছিলাম কেন জান ? দোলপূর্ণিমার আর একটা মাস বাকী। মেরামতটা যদি হয়ে যেত এরই মধ্যে—সেই জন্যে আর কি। তা' তুমি যখন একটা মাস আছই, তখন আর কি বলব ?

দিন কয়েক পর নীলকান্ত একদিন কাছারীবাড়ীর দিকে আসিতেই অবাক হইয়া গেল। পূব দেউড়ীর দ্বিতল একখানি ঘরের মেরামতি কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ছাদের উপর অনেকগুলি লোক হল্লা করিয়া কাজ করিতেছে।

ছোট বেলায় নীলকান্ত দেখিয়াছে, এ বাড়ীটায় বাহিরের দুই চারিটি অপরিচিত ভদ্রলোক আসিয়া মাঝে মাঝে আস্তানা লইতেন। দুই চারিদিন থাকিয়া খাইয়া দাইয়া আবার স্ব স্ব স্থানে চলিয়া যাইতেন। ইঁহাদের কেহ জমিদার, কেহ সরকারী কর্ম্মচারী।

নীলকান্ত এদিক ওদিক চাহিয়া কাছারী-ঘরের দিকে আগাইতেই রাজীবই ভিতর হইতে উঠিয়া আসিল।

নীলকান্ত বলিল, এ বাড়ীটা এখন শুধু শুধু মেরামত করে লাভ হবে কি রাজু ?

রাজীব উত্তর দিল—মেরামত করছি কে বললে তোমাকে ? একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছি ওখান থেকে। সাপ বাঘের আড্ডা হয়ে উঠেছে। তুমি থাক ওধারে, কিছু ত আর দেখ না।

নীলকান্তর চোখ দুটি ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। রাজীবের দিকে তাকাইয়া ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, কিন্তু অনেক কালের ঘর যে!

—জানি তা, কিন্তু শুধু শুধু খাড়া করে রেখে কোন লাভ নেই। বরং ইটগুলো বিক্রী করে যে দু' চার টাকা পাওয়া যায়, সেই আমাদের দু' জনের লাভ।

নীলকান্ত আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। এমন দুর্বুদ্ধি তাহার মাথায় কি করিয়া উদ্ভব হইল, কে জানে! কে আর তাকে নিরস্ত করিবে?

নীলকান্তর মনে হইল, গোপালজীর ভাঙা ঘরের কথা এই সূত্রে রাজীবকে একবার স্মরণ করাইয়া দেয়, দেখিতে দেখিতে অনেক দিনই ত হইয়া গেল, হয় ত রাজীব কথাটা আজ শুনিবে।

কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল, না, পুনরায় বলিলে রাজীব তাহার উপর চটিয়া যাইবে, হয় ত ভাঙা ঘরের আর উপায়ই হইবে না।

নীলকান্ত প্রস্থানোদ্যত হইয়াছিল, রাজীব ডাকিল, কাছারি-ঘরে একটু এস দেখি, একটা কথা আছে।

নীলকান্ত রাজীবের পিছনে পিছনে কাছারী ঘরে আসিয়া বসিল। কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রাজীব তাকিয়ার তলা হইতে একখানা দলিল বাহির করিয়া নীলকান্তর দিকে আগাইয়া ধরিয়া বলিল,—নামটা সই ক'রে দাও। দাও, কোন ভয় নেই তোমার।

নীলকান্ত বিস্ফারিত নেত্রে একবার রাজীবের দিকে, আর একবার তা'র হাতের দলিলের দিকে তাকাইতে লাগিল।

রাজীব বিরক্তিব্যঞ্জক কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—বোকা তোমাকে আর সাধে বলে লোকে! অত ভাববার কিছুই নেই এতে।

নীলকান্ত ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল, দলিল না দেখে সই দিই কি করে?

—তা দেবে কেন? যাতে দু'পয়সা আসবে, সেদিকে ত তোমার হুঁস নেই। তারপর বাহিরের দিকে তাকাইয়া গম্ভীর গলায় বলিল,—যা দেখতে শুনতে পার না, তা রেখে কোন লাভ নেই, জেনে রেখো।

—কথাটা এখনও বুঝতে পারছিনে রাজু।

—বাগান গো বাগান, তোমার নদীপুরের বাগান। বাগান দেখে ত একেবারে মাথা ঘুরে যায়। দুশো টাকায় বিক্রী কবলা করে দিচ্ছি কেমন, ঠকা হবে আজকের দিনে?

নীলকান্তর আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। আজ সম্বল মাত্র তার এই লাখরাজ স্বত্বটুকু। একে একে সব গিয়াছে নীলকান্তর, বাগান, পুষ্করিণী, মহাল এক এক করিয়া সব গিয়াছে। জীর্ণ গৃহে অর্দ্ধাশনে স্ত্রীপুত্র লইয়া সে বড় কষ্টে দিন কাটায়।

নীলকান্ত অস্ফুট স্বরে উত্তর দিল, ওতে আমার হাত নেই, গোপালজী ওর মালিক।

রাজীব চটিয়া গেল। বলিল, মিছে কথা। দেবোত্তর হ'লে আমার নিজের অংশটা এতদিন বিক্রী করতে পারতাম না, এ আমি জানি।

নীলকান্ত ওষ্ঠপুটে ক্ষীণ হাসি আনিয়া বলিল, তোমার অংশ তুমি বিক্রী করছ, আমার অংশ গোপালজীর আছে, আমার ওতে হাত নেই রাজু। বলিতে বলিতে নীলকান্ত উঠিয়া দাঁড়াইল।

দলিলখানা ফরাসের একদিকে ছুড়িয়া দিয়া রাজীব বলিল, থাক না, আমার কি! আমার এই মাথাব্যথা ত তোমারই জন্যে! তোমার কষ্ট দেখেই এ কাজে নেমে ছিলাম। এতগুলো টাকা এক মতি বাবু ছাড়া আর কেউ দেবে না তোমাকে! ভারি ত বিঘে কয়েকের লাখরাজ! পাড়াগাঁয়ে এর চেয়ে কি বেশী দাম হবে শুনি? তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, ও টাকায় তোমার গোপালজীর ভাঙাঘর মেরামত হয়ে যেত, আমি নিতাম না কখনও।

দেউড়ী দিয়া চলিতে চলিতে নীলকান্ত হাসিতে হাসিতে বলিল, গোপালজী আমার ভাঙা ঘরেই থাক রাজু।

নিশুতি রাত্রি!

গোপালজীর ঘরের ভিতর নীলকান্ত একা। একদিকে টিপ টিপ করিয়া আলো জ্বলিতেছে। গোপালজীকে কোলে করিয়া নীলকান্ত একদৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকাইয়া আছে।

গোপালজীর মাথায় শিখিপুচ্ছ। কপালে অর্দ্ধচন্দ্র ঝিক্-মিক্ করিতেছে। হাতের কঙ্কণ দুইটি পরিচ্ছন্ন ন্যাকড়ায় মুছিয়া নীলকান্ত সযত্নে আবার পরাইয়া দিল। কাণের কুণ্ডল

ছুটিতে একবার দোল দিয়া ধীরে ধীরে গোপালজীকে সিংহাসনের উপর স্থাপন করিল।

কাল গোপালজীর চাঁচর। পরশু এই ক্ষুদ্র সিংহাসনে বসিয়া, আবীর-কুঙ্কুমে রঞ্জিত হইয়া গোপাল মৃদু মৃদু দোল খাইবে।

আনন্দের উত্তেজনায় নীলকান্ত ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

এই নিভৃত কক্ষে গোপালজী কতকাল ধরিয়া অধিষ্ঠিত আছে কে জানে। কৈলাসবাবু তাহাকে এমনিভাবে দেখিয়াছেন। পিতামহ নিত্যশরণ বাবুর সহিত গোপালজীর প্রতি রাত্রে না কি কথা হইত।

সেদিনকার ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধির চিত্র নীলকান্তর চোখের উপর মুহূর্ত্তের জন্য ফুটিয়া উঠিল। কি ছিল, আর কি হইয়াছে আজ। দেবতা আজ ভাঙা ঘরে তা'র নিজের সমাধি ডাকিয়া আনিয়াছে।

—তুই না জাগলে কি করে আমি জাগাই বল্। আমার কি ইচ্ছে তোকে ভাঙা ঘরে রাখি? কিন্তু তুই ত দেখলি সব, শুনলি সব। এ পাপ তোর, না আমার?

কিন্তু দেবতা পাষাণ। নীলকান্তর উদ্দাম কণ্ঠ নৈশবাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ভোর রাত্রির দিকে নীলকান্ত ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ঘুম ভাঙিল বটুর ডাকে।

চোখ মেলিয়া দেখিল, বেলা হইয়া গিয়াছে। নীলকান্ত ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িল। বিছানার একটু দূরে বটু দাঁড়াইয়া ছিল, নীলকান্তকে দেখিয়া সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

—কিরে কি হয়েছে?

—গোপালজী নেই বাবা…

—নেই?

—না! সেই কতক্ষণ ধরে খুঁজছি পেলেম না। এস দেখবে এস।

ছেলের পিছনে নীলকান্ত ঠাকুর-ঘরে আসিয়া দেখিল, সত্যই তাই—গোপালজীর শূন্য সিংহাসন খাঁ খাঁ করিতেছে; গোপালজী নাই।

ভোরের আলো আসিয়া ঠাকুর-ঘরের দালানে পড়িয়াছে। বটু দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়া আশপাশের ঝোপ ঝাড় খুঁজিতে লাগিল।

নীলকান্ত উঠানের একদিকে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে; বলিল, আর খুঁজতে হবে না, তুই বাড়ী যা দেখি। বলিতে বলিতে দেউড়ী দিয়া নীলকান্ত একেবারে কাছারি-বাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে নিত্য প্রথামত রাজীব ধীরে ধীরে পায়চারি করিতেছিল, নীলকান্ত বলিয়া উঠিল, ঠাকুর ফিরিয়ে দাও রাজু।

রাজীব সবিস্ময়ে নীলকান্তের মুখের দিকে তাকাইল।

সহসা তার ডান হাতখানা খপ করিয়া ধরিয়া ফেলিয়া নীলকান্ত বলিয়া উঠিল, দলিলে আমার সইটা ত মাত্র বাকি, তা নিয়ে এস, দিচ্ছি, কিন্তু গোপালজীর কিছু যদি হারিয়ে থাকে রাজু—

—পাগল না কি? ঠাকুরের গয়নায় আমার কি দরকার। তুমি এসে নিজের চোখে দেখে নাও। বলিতে বলিতেই রাজীব হন হন করিয়া কাছারি-ঘরে গিয়া ঢুকিল।

ভাঙা ঘরে সেদিন গোপালজী ফিরিয়া আসিয়াছে। নীলকান্তের ছেলে দালানে দাঁড়াইয়া ঠিক তেমনি সাগ্রহে কাঁসর বাজায়। গোপালজীর পিঠে থাবা দিতে দিতে নীলকান্ত বলে, আবারও যে হাসি রে কিন্তু এবার নিবি কি, তুই বল দেখি?

গোপালজী পাষাণ, শোনে কি না জানি না, কোন কথার উত্তর দেয় না।

রাজীব কোথায়, কেহ জানে না; বাগান বিক্রীর টাকাটা মতিবাবুর সিন্দুক হইতে বাহির ঠিকই হইয়াছিল, কিন্তু কোথায় যে গেল অন্ততঃ নীলকান্ত তাহা জানে না।

বুকের একটি ব্যাধি

—শ্রীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়

আমার টিউবারকুলোসিস সম্বন্ধে শেষ প্রবন্ধের আরম্ভ করতে চাই বাংলা দেশের টিউবারকুলোসিস্ অ্যাসোসিয়েসানের কথা দিয়ে। গত প্রবন্ধের শেষের দিকে য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্স্-এর ন্যাশনাল টি. বি. অ্যাসোসিয়েসানটির কথা সকলের জানবার প্রয়োজন।

প্রথমে ১৯২৯ সালে হয় এই অ্যাসোসিয়েসানের গোড়াপত্তন এবং এণ্টালীর চিত্তরঞ্জন হাঁসপাতালে এই অ্যাসোসিয়েসানের প্রথম ডিসপেনসারি খোলা হয়। এই অ্যাসোসিয়েসান ক্রমান্বয়ে কলকাতায় যে ডিসপেনসারিগুলি খুলেছেন, তার তালিকা এবং ঠিকানা এবং সমাগত রোগীদের এখানে কি ভাবে পরীক্ষা করা হয়, তার কিছু খবর আমি আমার দ্বিতীয় প্রবন্ধে দিয়েছি। এগুলি ছাড়া মফঃস্বলেও দুটি ডিসপেনসারী খোলা হয়েছে—একটি কলকাতা থেকে ১৬ মাইল দূরে চণ্ডীতলা গ্রামে এবং অপরটি কৃষ্ণনগরে।

এই অ্যাসোসিয়েসান প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছে :

(ক) বুক পরীক্ষাদ্বারা রোগনির্ণয় এবং রোগীদের চিকিৎসার্থে নানাস্থানে যক্ষ্মাকেন্দ্র স্থাপিত করা।

(খ) স্বাস্থ্যপরিদর্শকের নিয়োগ দ্বারা জনসাধারণের আবাসস্থান পরীক্ষা করা।

(গ) স্কুল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে এবং অন্যান্য স্থানে এই রোগসংক্রান্ত প্রচারকার্য্য এবং এই ব্যাধির প্রতীকার কি করে হতে পারে, জনসাধারণকে সে বিষয়ে আলোকদান।

(ঘ) যক্ষ্মাসংক্রান্ত কাজের জন্যে নার্স এবং স্বাস্থ্যপরিদর্শক তৈরী করা।।

এঁরা অনেকটা আমেরিকার ন্যাশনাল টি. বি. অ্যাসোসিয়েসানের পদ্ধতিই গ্রহণ করেছেন। বাংলার গভর্ণর হচ্ছেন এই অ্যাসোসিয়েসানের প্রেসিডেন্ট এবং সুযোগ্য ব্যক্তিগণের দ্বারাই এটি পরিচালিত হচ্ছে। যে সব চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যপরিদর্শক এই অ্যাসোসিয়েসানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন, বক্তৃতা দিয়ে, ম্যাজিক লণ্ঠন দেখিয়ে, রেডিওতে কথা বলে সর্ব্বসাধারণের ভিতরে তাঁরা যক্ষ্মাসংক্রান্ত নানা তথ্য প্রচার করছেন। অ্যাসোসিয়েসান থেকে এই ব্যাধি সম্বন্ধে শিক্ষামূলক বিজ্ঞাপন বিলি করবারও ব্যবস্থা আছে। চিত্তরঞ্জন হাঁসপাতালে স্থাপিত প্রথম ডিসপেনসারিতে ১৯২৯ সালে মোট হাজার চুয়েক যক্ষ্মারোগীকে পরীক্ষা করা হয়েছিল। ১৯৩৩ সালে সমিতির ডিসপেনসারিগুলিতে বুক পরীক্ষা করা হয়েছিল ৪১,৯৩৫ জন রোগীর এবং নতুন রোগীর সংখ্যা ছিল ৭৪০১। এ ছাড়া সমিতির স্বাস্থ্যপরিদর্শকেরা ঘুরে ঘুরে সবাইকে যক্ষ্মাসংক্রান্ত উপদেশ দিয়েছিলেন ১৫,৮২১ খানা বাড়ীতে। এই সমিতির কাজ যে ক্রমেই বাড়ছে এবং ক্রমেই অন্যান্য নানাবিধ উন্নতি হচ্ছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুপ্রতিষ্ঠিত এই টি. বি. অ্যাসোসিয়েসান বাংলা দেশের সম্পদ স্বরূপ।

টিউবারকুলোসিস অ্যাসোসিয়েসান সম্বন্ধে আমরা গর্ব্ব বোধ করলেও যক্ষ্মাব্যাধি দেশে যে বিপুল সমস্যার সৃষ্টি করেছে, সে সমস্যার প্রতীকার যথোপযুক্তভাবে করবার ক্ষমতা এই সমিতির নিতান্ত সামান্যই আছে—এবং এর সর্ব্বপ্রধান কারণ হচ্ছে উপযুক্ত ফণ্ডের অভাব। উপযুক্ত ভাবে কাজ চালানোর জন্যে যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, তার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশই

লেখক।

সমিতি সংগ্রহ করতে পারছেন—দেশবাসীর কাছ থেকে, অথবা সরকারের কাছ থেকে।

অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে কাজ যে কত কম হচ্ছে সে কথা বলতে দমে যেতে হয়। বর্ত্তমানে আমাদের টি. বি. অ্যাসোসিয়েসানের যেখানে আছে গোটা আষ্টেক কেন্দ্র, য়ুনাইটেড ষ্টেট্স্-এর ন্যাশনাল টি. বি. অ্যাসোসিয়েসানের সেখানে আছে (কিছু আগের খবর) অন্ততঃ ৩৫০০ কেন্দ্র। মুক্ত বায়ুতে বিদ্যালয় এবং ক্লাশ, শিশুদের জন্যে Summer Camp, যাদের সন্দেহজনক স্বাস্থ্য—তাদের উদ্ধারের জন্যে Preven-

toria যে, কত অসংখ্য স্থাপিত হয়েছে তার অন্ত নেই। বাংলা দেশে হাসপাতালগুলি মিলিয়ে বড় জোর তিনশো থানেক বেড হয়তো যক্ষ্মাগ্রস্তের জন্মে আছে, যেখানে কয়েক লাখ হলেই কেবল কুলোতে পারে। সমস্ত ভারতে বড় জোর হাজার দুয়েকও বেড আছে কি না সন্দেহ—লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনান্ত যেথানে প্রতি বৎসর হচ্ছে এই ব্যাধিতে। অক্লান্ত চেষ্টার ফলে লণ্ডনে যেখানে এই রোগে মৃত্যু ৪৫% হারে কমান সম্ভব হয়েছে, সেখানে কলকাতায় ৭০% হারে এই রোগে মৃত্যু গত ১০।১৫ বছরের ভিতরে বেড়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "রাশিয়ার চিঠি"তে আক্ষেপ করে বলেছেন, "বাংলা দেশে ঘরে ঘরে যক্ষ্মা রোগ ছড়িয়ে পড়েছে—রাশিয়া দেখে অবধি এ প্রশ্ন মন থেকে তাড়াতে পারছি নে যে, বাংলা দেশের এই সব অল্পবিত্ত মুমূর্ষুদের জন্যে কটা আরোগ্যাশ্রম আছে?" দেশের লোকে তাদের বিপদের গুরুত্ব যে কবে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারবে এবং তার প্রতীকারের জন্মে কঠোর সংগ্রাম সুরু করবে তাই ভাবি। এই ব্যাধির কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা সম্বন্ধে, এ ব্যাধি সমাজের কি সর্ব্বনাশ সাধন করছে সে সম্বন্ধে, কি করে এর প্রতীকার হতে পারে সে সম্বন্ধে দেশবাসীর এই পর্ব্বতপ্রমাণ অজ্ঞতা, নিজেদের স্বাস্থ্য বিষয়ে গভীর উদাসীনতা, যাঁরা অর্থশালী—কোন স্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠানে মুক্ত হস্তে দান করতে তাঁদের বিচিত্র কুণ্ঠা, দেশবাসীর স্বাস্থ্যের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের এই অমনোযোগিতা—আমাদের এই অভিশপ্ত দেশেই বিদ্যমান—অন্যত্র নয়।

এই ব্যাধির নিবারণকল্পে কি কি উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে, তার কয়েকটি নির্দ্দেশ ডাক্তার এ. সি. উকীল Indian Medical Journal-এর ১৯৩৫এর জানুয়ারি মাসের Tuberculosis Number-এ করেছেন। সংক্ষেপে সেগুলি এই :

(১) যে কোন চিকিৎসক, যে কোন গৃহস্থ অথবা যে কোন প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষকে তাঁদের চানা যক্ষ্মা রোগীর সংবাদ স্থানীয় স্বাস্থ্য-তত্ত্বাবধায়কের কাছে দিতে হয়।

(২) যাদের থুতুতে যক্ষ্মাজীবাণু পাওয়া গেছে (open cases) তাদের আলাদা ভাগে ভাগ করতে হবে এবং স্বাস্থ্য-বিভাগের পরীক্ষায় তাদের থুতু পর পর কয়েকবার যক্ষ্মা-জীবাণু-মুক্ত না দেখা অবধি তাদের open case বলে ধরতে হবে।

(৩) বুকে যাদের ব্যাধি সক্রিয় অবস্থায় আছে, তাদের সাথে এক ঘরে কেউ শুতে পারবে না—বিশেষ করে যার বয়স ১৫ বছরের নীচে।

(৪) সক্রিয় রোগগ্রস্ত শিক্ষক স্কুলে কাজ করতে পারবে না এবং কোনো সক্রিয় রোগগ্রস্ত বালককে স্কুলে যেতে দেওয়া হবে না।

(৫) কোন সক্রিয় রোগগ্রস্ত লোক মুদীর দোকান, খাবারের দোকান ইত্যাদি চালাতে পারবে না।

(৬) যে কোন প্রকাশ্য স্থানে যে কোন লোকের থুথুর নিক্ষেপ (রাস্তা, আপিস, স্কুল, রেস্টুরেন্ট, গাড়ী ইত্যাদিতে) আইন করে বন্ধ করতে হবে।

(৭) রোগীর ব্যবহৃত কক্ষ উত্তমরূপে শোধন করতে হবে।

(৮) প্রয়োজন বিবেচনা করলে কোন যক্ষ্মা রোগীকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করবার অধিকার স্বাস্থ্যকর্ত্তৃপক্ষের থাকবে।

(৯) হোটেল, রেষ্টুরেন্ট, বোর্ডিং ইত্যাদি স্থানে একই বাসনপত্র সর্ব্ব রকম লোকের দ্বারা ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

(১০) সহরে, বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থানগুলিতে ঘর অথবা বস্তিনির্ম্মাণ বিষয়ে নূতন আইন তৈরি করতে হবে।

(১১) বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য-বীমা (Compulsory Health Insurance) বিষয়ে চিন্তা করতে হবে।

(১২) গ্রামে বাস করে আসছেন এমন সব লোক যখন সহরে আসবেন, তাঁদের যক্ষ্মা-প্রতিষেধক টীকা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।...ইত্যাদি।

বস্তুতঃ এই ভীষণ ব্যাধির নিবারণকল্পে যে কত রকম উপায় অবলম্বন করবার দরকার তার অন্ত নেই। বিশুদ্ধ খাদ্য, বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব এই রোগের সর্ব্বপ্রধান কারণগুলির অন্যতম। সেই দিক থেকে সহরে দূষিত এবং কৃত্রিম খাদ্যদ্রব্যের বিক্রী কঠোর ভাবে বন্ধ করা, বিষাক্ত কয়লার ধোঁয়ার (smoke nuisance) প্রতীকারের জন্মে সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করা, এগুলির দিকে সহরের কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি এবং স্বাস্থ্যকর্ত্তৃপক্ষের নজর দিতে হবে। শিশুদের কি ভাবে লালন পালন করতে হবে, তাদের স্বাস্থ্য কি ভাবে রক্ষা করতে হবে, জনসাধারণের ভিতরে সে শিক্ষার প্রচার স্বাস্থ্য-কর্ত্তৃপক্ষের করতে হবে। যক্ষ্মাজীবাণু শরীরে প্রবেশ করেছে কি না ইত্যাদি দেখবার জন্মে "টিউবারকুলিন-টেষ্ট" প্রভৃতি যা' করবার প্রয়োজন, তাঁরা মনে করেন, শিশু যাতে কোন মতেই এই ব্যাধির কবলে না পড়তে পারে, তার জন্মে কি কি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, এসব বিষয়ে অভিভাবকদের ভিতরে উপযুক্ত শিক্ষার বিস্তার করে তাঁদের সমস্ত পরিবারের, তথা সমস্ত জাতির কল্যাণ-কামনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলবার ভার একান্ত ভাবে নিতে হবে স্বাস্থ্যকর্ত্তৃপক্ষের।

যে ঘরে কোন যক্ষ্মারোগীর মৃত্যু হবে, সেই ঘর সম্বন্ধে এবং তার ব্যবহৃত জিনিষপত্র সম্বন্ধে বাড়ীর লোকে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন :

(১) বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, তোয়ালে ইত্যাদি গরম জলে একেবারে সিদ্ধ করে কেচে ফেলতে হবে। কম্বল গরম জলে প্রচুর সাবান গুলে ভাল করে ধুয়ে রৌদ্রে রেখে দিতে হবে। (যদি এগুলি আদৌ অপর কারুর ব্যবহার করতেই হয়—অবস্থাবিশেষে।)

(২) লেপ, তোষক, বালিশ ইত্যাদি দু তিন দিন কড়া রোদে ফেলে রাখতে হবে। (সূর্য্যালোক যক্ষ্মাজীবাণুর শত্রু সেকথা আগে বলেছি।)

(৩) জামা, কাপড়—রোগী সর্ব্বদা যা ব্যবহার করেছে—এসব একেবারে পুড়িয়ে ফেলে দেওয়াই সব চেয়ে ভাল, না হলে যেগুলো খুব সিদ্ধ করা যাবে সেগুলিকে তাই করতে হবে, আর পশমী জিনিষ অথবা তুলোর জিনিষ—যেগুলি কেবল সাবান দিয়ে ধোয়া চলে অথবা আদৌ ধোয়া চলে না, সেগুলিকে রোদে এবং খোলা বাতাসে দু'তিন দিন রাখতে হবে।

(৪) টেবিল, চেয়ার, খাট ইত্যাদি সমস্ত কিছু গরম জল, সাবান ইত্যাদি দিয়ে ভাল করে ধুয়ে ফেলতে হবে।

(৫) ঘরের মেঝে, দেওয়াল ইত্যাদি ফিনাইল, সাবান জল দিয়ে এবং কোন কড়া লোশান (যথা কম্পাউণ্ড Cresol সলিউসান ১% —জলে) দিয়ে খুব করে ঘষে ধুয়ে ফেলতে হবে এবং কয়েক দিন যাবত ঘরের সমস্ত দরজা জানালা খুলে রেখে ঘরে রোদ হাওয়া লাগাতে হবে। দেয়ালে নতুন চূর্ণকাম করে নিতে পারলে আরো ভাল।

শুধু কোন রোগীর মৃত্যু নয়, কোন অসতর্ক এবং অপরিচ্ছন্ন রোগীকে স্থানান্তরিত করবার পরেও এই সব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

আগেকার প্রবন্ধে আমি বলেছি যে, সব দিক বিবেচনা করে স্যানাটোরিয়ামই এই রোগীর পক্ষে সব চেয়ে উপযুক্ত স্থান। এবং এও বলেছি যে, যে সামান্য ক'টি বেড সব মিলিয়ে দেশে আছে, তাতে দেশের যক্ষ্মা-পীড়িতদের অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশেরই চিকিৎসা স্যানাটোরিয়ামে হতে পারে। যাদবপুর হাসপাতালের ১৯৩৩ সালের বাৎসরিক রিপোর্টে এই আবেদন কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের কাছে করেছেন।

আপনি এই ভাবে স্যানাটোরিয়ামকে সাহায্য করতে পারেন—

(১) আপনার নামে একটি "কটেজ" দান করে।

(২) আপনার নামে একটি "ওয়ার্ড" তৈরি করে।

(৩) আপনার নামে একটি "বেডে"র খরচা দিয়ে।

(৪) অর্থসাহায্য করে।

(৫) বস্ত্রাদি, পুস্তক, আসবাবপত্র, ইত্যাদি দান করে।

(৬) আমাদের সাথে সহযোগিতা করবার জন্যে আপনার বন্ধু-বান্ধবের উপরে প্রভাব বিস্তার করে।

(৭) আমাদের সাথে সহযোগিতা করবার জন্যে আপনার পরিচিত সঙ্ঘ, সমিতি ইত্যাদির উপরে প্রভাব বিস্তার করে।

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণের দেশের এই সমস্যা সম্বন্ধে একটু সচেতন হয়ে উঠতে হবে। কলকাতার উপকণ্ঠে পাতিপুকুরে আয়ুর্বেদীয় মতে পরিচালিত একটি যক্ষ্মা-হাসপাতাল আছে। সিমলা পাহাড়ে এই রকম আর একটি হাসপাতালের সন্ধান (কর্তৃপক্ষ মাড়োয়ারী) জেনেছি।

ভারতবর্ষের সব প্রদেশেই একটু একটু করে এই ব্যাধির প্রতীকারের জন্যে কিছু কিছু কাজ সুরু হয়েছে এবং হচ্ছে। দেশীয় রাজ্যগুলির ভিতরে মহীশূরই সব চেয়ে ভাল কাজ করছে। King George V এর সেবারকার অসুস্থতার পরে যে Thanksgiving Fund এর সৃষ্টি হয়, তা দ্বারা অল্পদিনের ভিতরে দেশের যক্ষ্মাসংক্রান্ত কাজে বেশ সহায়তা হচ্ছে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের সাথে বলতে হচ্ছে, যে রেটে কাজ এগুচ্ছে এবং যতটুকু কাজ হচ্ছে, তা কিছুই নয়; এর চেয়ে হাজার গুণ জোরালো ভাবে যদি অনতিবিলম্বে কাজ সুরু না হয়, তবে এই একটি ব্যাধিতেই দেশ উজাড় হয়ে যাবে।

দেশের শতকরা নিরনব্বই জন লোকের আর্থিক অবস্থা এমন ভীষণ শোচনীয় যে, এই ব্যাধির উপযুক্ত চিকিৎসা চালান খুবই অল্প লোকের পক্ষে সম্ভব। অজ্ঞতা তো আছেই; কিন্তু সেই অজ্ঞতা দূর করলেই বা কি? দুধ খাও, ঘি খাও, ডিম খাও, মাখন খাও; যাও নাইনিতাল, মুশুরী, উটকামণ্ডে চেঞ্জে; কর মাসের পর মাস, বছরের পর বছর শুয়ে শুয়ে আরাম; এ সব উপদেশ আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের কাছে কি অতি জঘন্য বিদ্রূপের মতই শোনাবে না? ডাক্তাররা আক্ষেপ করে বলছেন,—

Physicians are amazed at the short memories of patients in regard to what they have been taught, and also in regard to what they have suffered. The penalty of relapse is great.

টিউবারকুলিন টেস্ট্।

কিন্তু যাঁরা এই কথাগুলি বলছেন, তাঁরা কি একটু অনুসন্ধান করে দেখবেন, যে, রোগীদের এই রকম "short memory" হবার কারণ কি? স্যানাটোরিয়াম থেকে বেরুনোর পরে একজন রোগীকে দীর্ঘকাল, কখন বা সারাজীবন কি ভাবে চলবার দরকার হয়, তা আগে সবিস্তারে বলেছি। একজন স্যানাটোরিয়াম-ফেরতা রোগী বেশ ভাল ভাবেই জানে যে, কি ভাবে সে ভাল থাকতে পারে এবং কি ভাবে সে পুনরায় নিজের ক্ষতি করতে পারে। সুদীর্ঘকাল অসুস্থতা ভোগের পরে স্যানাটোরিয়াম থেকে বেরিয়ে হয়ত প্রত্যেক রোগীরই মন প্রলুব্ধ হয়ে ওঠে বাইরের আনন্দময়, কর্মময় জগতে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে—অন্ততঃ মুহূর্তের তরেও। কিন্তু অধিকাংশ রোগীর মনেই তার পরের মুহূর্তেই যে একথা না জাগে তা নয়—"নিঠুর গরজি! তুই কি মানস মুকুল ভাজবি

আগুনে... ?" সে যে কিছুকাল একটু সাবধানে থাকতে চায়, কিছুকাল একটু ভাল ভাবে থাকতে চায়, একথা হয়ত মিথ্যা নাও হতে পারে। কিন্তু কি করে তার পক্ষে সে সংযম সম্ভব হবে? এতদিন ধরে চিকিৎসা চালাতেই সে হয়তো হয়েছে সর্ব্বস্বান্ত, তারপরে সে এসে দাঁড়াল বাইরের বিপুল, বিচিত্র জীবন-সংগ্রামের একেবারে মুখোমুখি। সহস্র অভাব, সহস্র বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিকের পথ দিয়ে সংসারের কুটিল আবর্ত্ত তাকে আবার জোর করে নিয়ে গেল টেনে—"The penalty of relapse is great" এ সতর্ক-বাণী তার কাছে নিরর্থক হল। বস্তুতঃ এই ব্যাধির প্রতীকারের বিষয় বলতে গিয়ে আমাদের সমাজের কথা, আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় অবস্থার কথা, এত বেশী আলোচনা করবার দরকার হয় যে, তা বলা যায় না। আমাদের দারিদ্র্য, আমাদের অজ্ঞতা, অশিক্ষা এবং কুশিক্ষা এসব দূর করা সম্ভব কি অসম্ভব, এই দুরন্ত ব্যাধিকে বশে আনা যায় কি যায় না, এসব কথা বলতে গেলে অনেক কথাই এসে পড়ে। দেশের সমস্ত আবহাওয়ার ভিতরে যে অসংখ্য গলতি পদে পদে কুৎসিত ভাবে আত্মপ্রকাশ করে, তা উপলব্ধি করে মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠি; কিন্তু বুঝতে পারি না কবে হবে এর অবসান।

এ ব্যাধির সম্পূর্ণ সন্তোষজনক চিকিৎসা যে কতদিনে আবিষ্কৃত হবে সে কথা ভাবি। অসুখ যদি হয়ও, আমরা চাই এক সপ্তাহ, দু সপ্তাহ, বড় জোর এক মাসের ভিতরে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠতে এবং আগেকার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে ফিরে পেতে। এখনও এ রোগের চিকিৎসাপদ্ধতি এবং চিকিৎসার কলাকল্পকে অতিরিক্ত রকম হাস্যকর এবং অসহ্য বলেই মনে করি—একজন সুস্থ লোকের সাথে নিজেদের তুলনা করে। চিন্তাশীল চিকিৎসকও আমাদের পক্ষ নিয়ে এই কথা বলছেন:—

Although we are fifty years from Koch, the proper treatment of the disease is still close to pioneering. There is no hesitancy in going to bed on account of typhoid, in being operated for appendicitis, gall stones, and other surgical diseases, or in taking fourteen painful treatments for rabies, but there is a hesitancy in accepting bedrest as the cure for tuberculosis.

It seems the medical profession is slower in promoting this cure-taking process than in any other medical problem.......Let us hope this pioneering will soon be over.

এবারে বিশেষ ভাবে দেশের ছাত্রসমাজকে আমার কয়েকটি কথা বলবার আছে।

১৯৩৪ সালের Calcutta Municipal Gazette-এর ষষ্ঠ "স্বাস্থ্য সংখ্যায়" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস-চ্যান্সেলার স্যার হাসান সুরাবর্দী "The Tuberculosis menace to our Students" বলে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন,—

It has been found that one out of six cases of diagnosed Tuberculosis occurs amongst students.

তারপরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Students' Welfare Committee"র ১৯৩৪ সালের বার্ষিক বিবরণীতে এই কথা বলা হয়েছে,—

"The increased incidence of malnutrition and of Tuberculosis is a disquieting figure and calls for immediate action. Dietetic adjustments, better atmosphere at home and introduction of some system of compulsory tiffin in schools will help to reduce that extent of malnutrition prevailing among school and college students.

আমার প্রথম প্রবন্ধেও দেখিয়েছি যে, এই ব্যাধির বিষ ছাত্রদের ভিতরে কি ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তাদের স্বাস্থ্যকে কি ভাবে বিপন্ন করে তুলেছে। এখন আমার প্রশ্ন এই, তারা আর কতদিন এই ভাবে তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি অমনোযোগী হয়ে থাকবে? এই ক্লেদ, গ্লানি, এই জীর্ণতা, মলিনতার বিরুদ্ধে তাদের সমস্ত অন্তর কি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে না? তাদের জীবনের এই স্বাস্থ্যহীনতারূপ কলঙ্ককে নিশ্চিহ্ন করে, মুছে ফেলবার কল্পনায় ক্ষণেকের জন্যেও কি তাদের মস্তিষ্ক ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে না? এই জরাজীর্ণ, ব্যাধিক্লিষ্ট দেহের ভার এমন করে বয়ে বয়ে তাদের ধৈর্য্য, সহ্য কি সীমা অতিক্রম করে যায় না? ছাত্রসমাজকে আমি এই কথা বলতে চাই—তাদের এই দৃঢ়পণ আজকে করতে হবে যে, সত্যিকারের বাঁচাই আমরা বাঁচব: বেঁচে মরে থাকব না। তাদের এই পণ করতে হবে, সমাজের সমস্ত জড়তা, সমস্ত সংকীর্ণতা, সমস্ত অজ্ঞতার বুকে হানব আমরা অগ্নিবাণ; তেজে, বীর্য্যে, শক্তিতে, সাহসে, স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্য্যে আমরা প্রদীপ্ত জ্যোতির্ম্ময় হয়ে বেরিয়ে আসব সহস্র হীনতা, দীনতার পুঞ্জীভূত অন্ধকার থেকে। আমরা সমস্বরে, পরিপূর্ণ তীব্রতার সাথে এই দাবী জানাব:—

"অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট........."

স্বাস্থ্যচর্চ্চার জন্যে সর্ব্বতোমুখী উদ্যম, বিশেষ করে এই ব্যাধির সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করবার জন্যে সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টা সমস্ত ছাত্রসম্প্রদায়ের নিজেদের ভিতরে জাগিয়ে তোলবার জন্যে কালক্ষেপ করলে এখন আর চলবে না। অন্য দেশের ছাত্রেরা তাদের বিপদ সম্বন্ধে যে কেমন সচেতন হয়ে উঠেছে, তার একটি দৃষ্টান্ত দিই।—১৯৩২ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখের New York Times-এ ঐ কাগজের সম্পাদককে লিখিত এই চিঠিখানা প্রকাশিত হয়েছিল:—

A group of students here at the University of Missouri recently decided to form a health unit to aid the State and National Tuberculosis Associations in their fight against the disease. On the face of it this is relatively insignificant. But there seem to be reasons why it deserves wider attention.

"It is the first organization of its kind rising out of the voluntary action of the students themselves at

any University. To recognize the need of health education as an important factor in checking the insidious march of this disease is to admit that this step by University students is of more than passing significance. * * * They can only aid organized professional projects, but that is precisely what is needed—an awakened interest in a matter that affects them vitally, and an intelligent effort to face the situation.

এই চিঠিটা New York Times এ দিয়েছিল Missouri বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত Student Tuberculosis Committeeর একজন ছাত্র-সভ্য। শুধু এই একটি দৃষ্টান্ত নয়, ১৯৩১ সালের জুনে প্রকাশিত The Journal of Health and Physical Education নামক একটি পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ (আমেরিকার ন্যাশন্যাল টিউবারকুলোসিস অ্যাসোসিয়েসনের Child Health Educationএর ডিরেক্টার

not merely to pump in so-called knowledge. It must rid itself of the notion that management of the body is the business of the individual alone. No one should be free to sin at the expense of posterity—that is, of the race."

স্বাধীন জাতির প্রধান নেতার মুখে এসব শুধু কথাতেই পর্যবসিত হয়ে যায় না, সেই অনুযায়ী দেশে মানুষও তৈরী হ'য়ে উঠে। দুর্ভাগা আমাদের দেশ ; বলবারও কেউ নেই, কেউ নেই তৈরি হবারও। Lord Beaconsfield বলেছেন, "The nation's health should be the primany concern of every great statesman." কিন্তু "Nation's health" আমাদের দেশের statesmanদের "primary concern" দূরে থাক, কোন "concern"ই নয়।

এবারে সম্পূর্ণ অন্য গল্প বলব আপনাদের কাছে—আমার নিজেরই ব্যাধি-জীবনের কথা। আমি লিখে এসেছি যে আমি নিজেই একজন ভুক্তভোগী। অনেকেরই হয়ত আমার অসুস্থতা সম্বন্ধে খানিকটা জানতে কৌতূহল হবে।

পুষ্টিকর এবং পর্যাপ্ত খাদ্য শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজন।

স্কুলের বালক মুক্ত আলো-হাওয়ায় বসে পড়াশুনা করবে—ডাক্তারের আদেশ অনুযায়ী।

প্রচুর নিদ্রা এবং বিশ্রাম শিশুদিগকে যক্ষ্মার হাত থেকে রক্ষা করে।

Lousis Strachan লিখিত) থেকে জানলাম যে, ওদেশের স্কুল, কলেজ য়ুনিভার্সিটিগুলি ক্রমেই ছাত্রদের ভিতরে যক্ষ্মাসমস্যা সম্বন্ধে বিশেষ রকম সচেতন হয়ে উঠছে এবং তার প্রতীকারের জন্যে বিশেষ ভাবে কলেজগুলির স্বাস্থ্যকর্তৃপক্ষ মনোযোগ প্রদর্শন করতে সুরু করেছেন। আমাদের দেশের ছাত্রদেরও স্থানীয় যক্ষ্মা-নিবারণ সমিতিগুলির সাথে সর্ববিধ সহযোগিতা সাগ্রহে করতে হবে এবং নিজেদের ভিতরেও সমিতির প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

Herr Hitler তাঁর Mein Kampf-(My Struggle)-এ এই ধরণের কথা বলছেন :—

The whole of education should be designed to occupy a boy's free time in profitable cultivation of his body. He has no right during those years to loaf about idly and make disturbances in the streets and picture houses, but after his day's work is done he ought to harden his young body so that life may not find him soft when he enters it. To prepare for this and to carry it out is the function of youthful education, and

তা' ছাড়া আমার কাহিনী থেকে কোন রোগীর অথবা তাঁর আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের বুঝবার, ভাববার এবং শিখবার কিছু থাকতে পারে, এও আশা করি।

এই "Les miserables"এর গোড়াতে একটি কথা ব'লে রাখি। আমার যখন বছর পনের বয়স, আমি আমার এক পিসেমশায়ের সাথে কিছুদিন একত্র শুয়েছিলাম, এবং একটি কক্ষে বাস করেছিলাম। আমার ঐ পিসেমশাই তখন ভীষণ ভাবে যক্ষ্মাগ্রস্ত। অবিশ্যি তা' বোঝা যায় নি তখন। সাধারণ জ্বর এবং কাসিতেই ভুগছেন, মাঝে মাঝে যে রক্তরঞ্জিত থুতু আসে—সেটা কাসির চোটে গলা চিরেই হয়, সবার ধারণা এই রকমই ছিল। পরে অবিশ্যি ডাক্তার বুক এবং থুতু পরীক্ষা করে তাঁর রোগ ধরে দিয়েছিলেন ; কিন্তু তখন তাঁর শেষ অবস্থা। কয়েক মাসের ভিতরেই তিনি যক্ষ্মা-লীলা, তার সঙ্গে জীব-লীলা সংবরণ করেন। আমার আত্মীয়দের ভিতরে অনেকেরই এই রকম বিশ্বাস এবং কারুর কারুর প্রায় দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমার ঐ পিসেমশায়ই আমার দেহে দিয়ে দিয়েছিলেন এই ব্যাধির বিষ। হয়তো

একথা সত্যি হতেও পারে। তবে কত স্থানে কত ভাবে কত রকম লোকের সংস্পর্শে এসেছি—অন্য কোন প্রকারেও হয় তো এ দেহে ব্যাধির সংক্রমণ হয়ে থাকতে পারে; সর্ব্বত্র বিরাজমান টি. বি-ব্রহ্ম এই ভাবেই তো আমাদেরকে কৃপা করছেন। তবে আমাদের নিজেদের পরিবারের কেউ কখনও যক্ষ্মাগ্রস্ত ছিল না।

যা হোক, পরবর্ত্তী কথা এবারে বলি।

কলকাতাতেই পড়াশুনা করছি; জেনারেল লাইনেই পড়ছিলাম। কিছুদিন ধরে খুব খুশ খুশে কাসিতে ভুগছি। মাঝে মাঝে এত বেড়ে পড়ে যে অসম্ভব কষ্ট হয়। পড়াশোনাও ভাল করে করতে পারি না, সব সময়ে শরীরে একটা ক্লান্তি এবং অবসাদের ভাব। বেশ বড় জু একজন ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, টনসিলাইটিস এবং ফ্যারিঞ্জাইটিস। গলায় নানা রকম ওষুধ ব্যবহার করতে লাগলাম; কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। পেটেরও নানা গোলমাল মাঝে মাঝে লেগেই থাকে। একদিন একজন ডাক্তার আমাকে বললেন, কয়েকটা দিন বাইরে থেকে ঘুরে আসতে।

তখন আমার ছোটকাকা গিরিডিতে চেঞ্জে যাচ্ছিলেন, তিনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। গিরিডিতে আমি ছিলাম প্রায় আড়াই মাস—শরীরের বেশ উন্নতি হল। কাসি অনেক কমল, হজমটাও অনেক ভাল হতে লাগল—দিন রাত খুব ছুটোছুটি করতাম। একদিন ডুমকা থেকে আমার একটি বন্ধু এলেন তাঁদের বাড়ীতে আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে। ডুমকাতে বন্ধুর বাড়ী গিয়ে একদিন ত খুব সাইকেলে বেড়িয়ে এসেছি, রাত্তির বেলা ডান দিকের বুকে ভীষণ একটা ব্যথা হল সুরু—নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত নিতে পারি না এমন অবস্থা। হ্যারিকেনে কাপড়ের পুঁটুলি গরম করে বন্ধু ত খুব খানিক সেঁক দিলেন। আর কিই বা তিনি বিশেষ করতেন! যা হোক পরদিন ব্যথাটা কমে গেল।

গিরিডি থেকে ফিরে এসে আবার নিয়মিত কলেজে যাই, আসি। হৈ হৈও করি। হঠাৎ একদিন ডান ধারে বুকে আবার সেই বেদনা—এবং তার তীব্রতা আগের চাইতেও বেশী। দিন তিনেক পরে একদিন সন্ধ্যা বেলা তিনতলার ওপর থেকে (হোষ্টেলের) সিঁড়ি বেয়ে লাফাতে লাফাতে নীচে নেমে আসবা মাত্র এল একটা কাসির বেগ এবং সঙ্গে সঙ্গেই মুখের ভিতর খানিকটা গরম কি যেন উঠে এল। সামনেই কলের পাশে ফেললাম—একেবারে পরিষ্কার রক্ত। তক্ষুণি ডাক্তারকে ডাকান হ'ল। নানা ভাবে তিনি বুক পরীক্ষা ক'রে বিশেষ কিছুই পেলেন না—আমার যে টি. বি. হয় নি এ মত তিনি পরিষ্কার ভাবে দিয়ে গেলেন। পরদিন ভোর বেলা আবার রক্ত উঠল। আমার থুতু নিয়ে যাওয়া হ'ল মেডিকেল কলেজে—থুতুতে টি বি, ব্যাসিলাই পাওয়া গেল না। তখন সকলে দৃঢ় ভাবে এই কথা বলতে লাগলেন যে টি. বি. ফিবি কিছু নয়। যা হোক তবুও আমার বুকের একখানা এক্স-রে ফটো তোলান হ'ল। এই ফটোর রিপোর্টে Lieut. Col. Shorten, যিনি তাঁর বাড়ীতে আমাকে এক্স-রে করেছিলেন, এই কথা লিখে দিলেন যে, আমার টি. বি. হয়েছে। আমার আত্মীয়েরা আমার কাছে সে রিপোর্ট গোপন করলেন এবং আমাকে নিয়ে গেলেন এক কবিরাজের কাছে। আমার বাবা "ডাক্তারি" চিকিৎসার ঘোর বিরুদ্ধে এবং কবিরাজীতে তাঁর অগাধ বিশ্বাস। যে কবিরাজের কাছে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল, তিনি ব্যবস্থাপত্রে আমার ব্যাধি "রক্তপিত্ত" ব'লে উল্লেখ করে লিখে দিলেন অনেকগুলি ওষুধ—যে গুলির জন্যে কয়েক মাস ধরে অনেক টাকা খরচ হয়ে গেল একেবারে জলের মত। কবিরাজের ব্যবস্থা নিয়ে বাবা আমাকে ফরিদপুরে পল্লীগ্রামে নিয়ে রাখলেন। খাওয়া-দাওয়ার অসম্ভব রকম ভাল ব্যবস্থা করলেন। কলকাতায় যে ওজন ছিল, অতি অল্প দিনের ভিতরে তার চেয়ে অনেকখানি গেলাম বেড়ে। সবাই মুচকে হাসল, অসুখকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করা হ'ল।

এই সময়ে আমার বগলে জ্বর উঠত ৯৯·৪° ডিগ্রীর মতন। তার মানে মুখে নিশ্চয়ই ১০০° অথবা তারও বেশী হত। "বিশ্রাম" নেবার কথা কিছুই বুঝি না, কেউ কখনো বলেও নি। দুবেলা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াই, ছেলেদের সাথে আর বৌদি কাকী পিসিদের সাথে আড্ডা দিয়ে,—কেবল ঘণ্টায় ঘণ্টায় বড়ি, মোদক, পাচনগুলোকে এক একবার উদরস্থ করি, এই পর্য্যন্ত। একদিন, আমার কতকগুলো বইএর ভিতরে ঢুকেছে একপাল ইঁদুরের বাচ্চা; সেগুলিকে খুব ছুটোছুটি করে বধ করলাম। তার পরে আর এক বাড়ীতে গেলাম এক দাদার সাথে ক্যারম পিটতে। বেলা বেড়ে উঠতে বাড়ী ফিরে এসে মাথা ধোয়া, খাওয়া ইত্যাদির আয়োজন করছি, ইতিমধ্যে (কাসি আমার ইদানীং সর্ব্বদাই ভীষণ ভাবে লেগে থাকত) কাসতে কাসতে আবার মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল। এই ভাবেই পড়ে থেকে কিছুকাল পরে বাবার সঙ্গে ভীষণ কথা কাটাকাটি সুরু করে দিলাম এই বলে যে, আমি আর কিছুতেই এভাবে থাকতে চাই না—কবরেজী ওষুধও খেতে চাই না, (বাবা তখন কবিরাজীর একেবারে শ্রাদ্ধ করেছেন—কতক নিজের খুশীমত, কতক গ্রামের হাতুড়েদের কথামত, কতক কলকাতার কবিরাজের নির্দ্দেশ মত)—সোজা বললাম, ডাক্তারকে দেখিয়ে "চেঞ্জে" যাব। কারণ, আমার জ্বর লাগল ক্রমেই বাড়তে, সাংঘাতিক কাসি, কাসি আর বুকের সেই ব্যথা এক এক সময় এমন বেড়ে পড়ত যে, যন্ত্রণায় আমি নীল হয়ে যেতাম। অর্থাভাব যথেষ্ট, তার পরে নানা বিষয় নিয়ে অতি বিশ্রী অশান্তির মাঝখানে ত অবশেষে একদিন রওনা হওয়া গেল। কলকাতায় ডাক্তার বুক পরীক্ষা করে বললেন অসুখ আরও বেড়ে গেছে। কডলিভার অয়েল আর ক্যালসিয়ামের ব্যবস্থা নিয়ে এলাম পুরী। পুরীতে রওনা হবার সময়ে হাওড়া ষ্টেশনে আসবার আগে আবার মুখ দিয়ে প্রচুর রক্ত উঠতে লাগল। ঐ অবস্থাতেই মরিয়া হয়ে চলে এলাম। রক্ত অবিশ্যি কয়েকদিনে বন্ধ হ'ল, জ্বর আর কাসি তখন আমার সমানে চলছে। এক একদিন জ্বর ত ১০৩°, ১০৪° ডিগ্রী উঠে যেত। পেটও আমার একটুও ভাল থাকত না। সমুদ্রের ধারে অনেক যক্ষ্মারোগী বেড়িয়ে বেড়াতেন, তাঁদের সাথে বাবার আলাপ হ'ত। বাবার মুখে তাঁদের উপদেশ অনুযায়ী একদিন আমিও সমুদ্রের ধারে বের হলাম বেড়াতে। এর আগেও বাসার বাইরে যে না যেতাম

তা নয়। সেদিন একটু বেশীই হাঁটলাম। অনবরত কাসি ত' আছেই। ফিরে এসে কেবল একটু শুয়েছি, এর ভিতরে আবার রক্ত উঠতে সুরু হল। উঃ, সে যে কি ভীষণ ভাবে, একেবারে নাকের ভিতর দিয়ে পর্য্যন্ত রক্ত ফেনিয়ে ফেনিয়ে আসতে লাগল, তা আর কি বলি। থামতে আর চায় না। বাবাও বেরিয়ে গেছেন; আমার শিয়রে শুধু বসে আছেন আমার বৃদ্ধা ঠাকু'মা—আমার একখানা হাত কোলের উপর টেনে নিয়ে—পাথরের মূর্ত্তির মত নিশ্চল নিস্পন্দ।

সেদিন আমার একটি অভিজ্ঞতা গেছে। আমার চোখের সামনেকার খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের দিগন্তবিস্তৃত নীল জল; সমুদ্রের উপরে তেমনি নীল, সীমাহীন শান্ত নির্ম্মল আকাশ; অবিশ্রান্ত একটা গানের সুরের মত কানে ভেসে আসছে বিক্ষুব্ধ সাগরের সুগম্ভীর কলোচ্ছ্বাস। কিছুক্ষণ ধরে অবিরত মুখ দিয়ে রক্ত উঠবার পরে একটু নিবৃত্তি হয়েছে, সমস্ত মস্তিষ্কের ভিতরে কেমন যেন একটা শূন্যতা, অনেকক্ষণ পরে পরে হৃৎপিণ্ডের এক একটি স্পন্দন হচ্ছে—সে স্পন্দন আমার কানের ভিতরে ধ্বনিত হয়ে উঠছে কেমন অদ্ভুত ভাবে, একবার একটা শ্বাস ত্যাগ করবার পরে আর তা টেনে নেবার উৎসাহ পাচ্ছি না। আসন্ন মৃত্যুর সুস্পষ্ট অভিজ্ঞতা; অথচ সেই মুহূর্ত্তে আমি নিজেকে এমন করে প্রস্তুত করেছিলাম যে, তা বলতে পারি না। সমস্ত মন আমার যেন একটি বিচিত্র গাম্ভীর্য্যে একটি প্রশান্ত সৌন্দর্য্যে উঠেছে পূর্ণ হয়ে, প্রতিদিনকার তুচ্ছ অভিযোগ, অভিমান, প্রতি মুহূর্ত্তের ক্ষুদ্র লাভ, ক্ষতি, টানাটানি, কলহ সংশয়ের অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ-ভাগ এসেছে আমার ভিতরে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে; শেষ নিশ্বাসটির প্রতীক্ষায় আমার যেন ধৈর্য্য আর থাকছে না—সামনের রিক্ত আকাশের নির্ম্মল আলোর স্পর্শ পাবার জন্যে আমার উন্মুখ অন্তর আকুল, অধীর হয়ে উঠেছে।

কিন্তু মৃত্যু আমার হল না; সেই সুদুর্লভ, পরম সুন্দর ক্ষণটি আমার বন্ধ্যা হয়ে গেল। নিজেকে এমন করে তৈরি করে নেবার সেই মুহূর্ত্তটিতে যে আমি মরতে পারিনি, এই ব্যর্থতা আমার হৃদয়ে গভীর ক্ষত রেখে দিয়ে গেছে।

যা হোক, রক্ত উঠবার পরে আমি আর কখনও ঘর থেকে বেরুতে সাহস করতাম না। এই সময়ে আমি টি. বি. সম্বন্ধে ছোট একখানা বই কিনে আনাই—টি. বি. সম্বন্ধে এই-ই আমার প্রথম বই পড়া। সে বইখানার অনেক মতামতের ভিতরে অনেক ভ্রান্তিপূর্ণ কথা ছিল; কিন্তু তবুও মোটামুটি ভাবে এমন দু' একটি বিষয় জানতে পারলাম, যা এতদিন জানবার আমার সুযোগ হয় নি।

কাসি আর জ্বর আমার সমানেই চলেছে। অবশেষে আমাকে মাদ্রাজ পাঠানোর ব্যবস্থা হল।

মাদ্রাজ সহরের উপরে "রয়াপেটা" নামক স্থানে মাদ্রাজের গভর্ণমেণ্ট টিউবারকুলোসিস্ হসপিটালে আমার চিকিৎসা সুরু হল। মাদ্রাজের এই হসপিটালে আমি মাস ছয়েক ছিলাম। যখন ছুটি পেলাম, জ্বর আমার খুব কমে গেছে, কাসি একেবারেই নেই, ওজনেও বেড়েছি এবং (ওয়ার্ডের ভিতরে ঘোরাঘুরি করা ছাড়া) সকাল বিকেল মিলিয়ে সোয়া এক মাইলের মত হাঁটতে পারি। মাদ্রাজে থাকতে রক্তটক্তও আর কিছু ওঠে নি। মাদ্রাজের ডাক্তার আমায় বললেন কিছুদিন এখন ভাল climateএ কোনো একটা স্যানাটোরিয়ামে গিয়ে থাকতে। তখন হয় মহীশূরে না হয় মদনপল্লীতে যাব, এই রকম একটা কথাবার্ত্তা প্রায় ঠিকঠাক করতে করতে একজনের কথামত সি পি.তে পেণ্ড্রা রোডের টি. বি. স্যানাটোরিয়ামে আসা ঠিক করে ফেললাম। অবিশ্যি একটা কারণও ছিল—মহীশূর বা মদনপল্লী স্যানাটোরিয়ামে তখন বেড খালি ছিল না, যেতে হলে অনেক দেরি করতে হয়; অথচ মাদ্রাজ হাসপাতালেও আর আমাকে রাখতে চায় না। পেণ্ড্রা রোডে দরখাস্ত করবার সাথে সাথেই পেয়ে গেলাম সিট।

খোলা জায়গায় শিশুরা খেলাধুলো করবে।

দীর্ঘকাল পরে হাঁসপাতাল থেকে মুক্তি পেয়ে একটু শক্ত হয়ে মাদ্রাজ থেকে আবার ফিরে এলাম কলকাতায়, নামলাম এসে হাওড়া ষ্টেশনে আমার পরিচিত জগতে—

O, the wonder, the spell of the streets !
The stature and strength of the horses,
The rustle and echo of footfalls,
The flat room and rattle of wheels !
A swift tram floats huge on us…
It's a dream ?
The smell of the mud in my nostrills
Blows brave—like a breath of the sea !

...O, younder—
Is it ?—the gleam of a stocking !
Sudden, a spire
Wedged in the mist ! O the houses,
The long line of lofty, grey houses
Cross—hatched with shadow and light !
These are the streets...
.........Free......... !
Dizzy, hysterical, faint,
I sit and the carriage rolls on with me
Into the wonderful world !*

কলকাতায় ৫।৭ দিন থেকে আমি রওনা হ'লাম পেণ্ড্রা রোডে। পথে নানা রকম বিপদ গেল ; সে যা হোক, স্যানাটোরিয়ামে পৌঁছে অনেকগুলি কারণে আমার মন ভীষণ অস্বস্তিতে উঠল ভরে, ওখানে আর এক মিনিটও আমার মন টি'কতে চাইল না। তার পরের দিনই এক টেলিগ্রাম ক'রে দিয়ে রওনা হয়ে চলে এলাম আবার কলকাতায়।

আবার তোড়জোড় সুরু হল। অবশেষে চেঞ্জের জন্যে যেখানে গিয়ে হাজির হলাম—সেটা হচ্ছে হাজারিবাগ রোড। হাজারিবাগ রোডে আমি বেশ অনেক দিনই ছিলাম, কিন্তু এখানেও এমন কতগুলি কারণ ঘটতে লাগল, যার জন্যে আমার মনের অশান্তি অত্যন্ত বেড়ে গেল। যে ভাবে থাকলে আমি ভাল থাকব প্রতি পদে ব্যাঘাত ঘটতে লাগল তার। এই অবস্থায় একদিন পুনরায় মুখ দিয়ে একটু রক্ত উঠল। জ্বর এবং পালস অবিশ্যি তখনও তেমন বিশেষ ছিল না। এই সময়ে আমি আমার মাদ্রাজের চিকিৎসক, টি. বি. হস্‌পিট্যালের সুপারিণ্টেডেণ্ট ডাঃ এম. কেশভ পাই-এর এক দীর্ঘ চিঠি লিখে যে উত্তর পাই, তার বাংলা অনুবাদ এখানে দিয়ে দিলাম। আমার তখন যে অবস্থা ছিল, ওই অবস্থার অনেক রোগীর হয়ত এই চিঠিখান থেকে জানবার অনেক কিছু থাকবে।

রাও বাহাদুর
এম. কেশভ পাই, এম. ডি.

"শ্রী নিবাস"
৪৮, হ্যারিস রোড
পোঃ মাউণ্ট রোড, মাদ্রাজ।
২৫. ১. ৩১.

প্রিয় মিঃ মুখার্জী,

তোমার ২৩শে তারিখের চিঠি পেলাম। তোমার চিঠি থেকে আমার মনে হয়, তোমার বুকের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নতির দিকেই চলেছে। হঠাৎ তোমার যে রক্তটুকু উঠেছে, তা যে তোমার ব্যাধির সক্রিয় অবস্থাই সূচিত করছে ঠিক তা নয়। তুমি যদিও সন্তোষজনক ভাবেই সারবার পথে চলেছ, তবুও তোমার পূর্ব্বের অসুস্থতা ফুসফুসের রক্তকোষকে অনেক দুর্ব্বল করে রেখেছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেক ক্ষেত্রেই এটা দেখা যায় যে, বুকের উন্নতি সুস্পষ্ট হলেও হঠাৎ এক এক সময়ে আবার একটু রক্ত উঠে রোগীকে ঘাবড়ে দেয়। এবং রোগী ভাবতে থাকে যে তার বুকের অবস্থা খুব খারাপ—যদিও আসলে তা নয়। সেদিন তোমার বুকের ভিতরে যে গুড়গুড় করে উঠেছিল, সেটি একটি ক্ষুদ্র কোষের বিদারণ এবং পূর্ব্বেকার কোন দুর্ব্বল ক্ষতস্থানের ভিতর দিয়ে রক্তনিঃসরণের জন্যেই হয়েছিল। তুমি তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে অত বেশী চিন্তা ক'র না। আর সকলের মতই তুমি ভবিষ্যতের কর্ম্মময় জীবন যাপন করতে পারবে বলে আমি আশা করি। এবারে তোমার প্রশ্নগুলির উত্তর একে একে আমি দেব। (আমার কি কি প্রশ্ন ছিল, এই উত্তরগুলি থেকেই পাঠক-পাঠিকা তা বুঝতে পারবেন।)

১। তোমার যেটুকু রক্ত উঠেছে এখন, তাতে রক্তটুকু সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবার পরে এক সপ্তাহের বেশী আর বিশ্রাম নেবার দরকার নেই। তারপরে তুমি হাঁটতে সুরু করতে পার। যদি কোন রকম ক্লান্তি বোধ না হয়, তবে তুমি ধীরে ধীরে দৈনিক পাঁচ মাইল অবধিও হেঁটে বেড়াতে পার। জ্বর, ক্লান্তি ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখেই তুমি হাঁটা-চলাটাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। বিকেলে যদি ৯৯° ডিগ্রীরও উপরে জ্বর যায়, তবে হেঁট না। তবে সকাল বেলার টেম্পারেচার যদি ভাল থাকে এবং বিকেল বেলা যদি ৯৯·২° এর উপরে না যায় এবং নাড়ীর বেগ স্বাভাবিক থাকে, তবে সকাল বেলায় তুমি হাঁটবে। হেঁটে আসবার পরে আধ ঘণ্টার ভিতরে টেম্পারেচার বেশ নর্ম্ম্যাল হয়ে আসে কি না এটা লক্ষ্য রেখ। বিকেল বেলাকার টেম্পারেচার যদি ৯৯·৫° অথবা আরও উপরে উঠে যায়, তবে দিনের ভিতরে কোন সময়েই হাঁটবে না। টেম্পারেচার ৯৮·৪° এবং ৯৮·৮° এর ভিতরে থাকলে হাঁটবার কোন বাধা নেই—এই সীমা ছাড়িয়ে না যায়। আমার মনে হয় তোমার এই টেম্পারেচার একেবারে স্বাভাবিক অবস্থায় অল্পদিনের ভিতরে (বিশেষতঃ গরমের দিনে) না-ও আসতে পারে। তুমি এটুকুর জন্যে একেবারেই মাথা ঘামিয়ো না। অল্প অল্প লেখাপড়া করতে তুমি পার।

২। শরীরের কোন আকস্মিক প্রবল ঝাঁকানি নিশ্চয়ই রক্ত উঠবার কারণ হতে পারে। না, হাঁটার দরুণ তোমার রক্ত উঠবে না।

৩। রক্ত উঠবার দিন-তারিখ কিছু ঠিক নেই। ভাল হয়ে যাবার কয়েক বছর পরেও রক্ত উঠতে দেখা গিয়েছে। তবে ভাল হয়ে যাবার পরে যত বেশীদিন কেটে যাবে, রক্ত উঠবার সম্ভাবনাও ততই কম থাকবে এবং হঠাৎ কখন উঠলেও পরিমাণে খুব কম হবে। স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসায় সুস্থ হবার পরে দুই থেকে পাঁচ বছর অবধি ভাল থাকতে পারলে অবস্থা নিরাপদ বলা চলতে পারে। বেশী অসুখ থাকলে আরো বেশী দিন।

৪। বুকের বেদনা সব সময়েই ব্যাধির সক্রিয় অবস্থা সূচিত করে না। তোমার বুকে বর্ত্তমানে যে ধরণের বেদনা আছে, বক্ষাবরক-ঝিল্লির সাথে আরোগ্যাভিমুখী ফুসফুস এঁটে গিয়ে আকুঞ্চন কালে ঐ ধরণের বেদনা হতে পারে।

৫। বুকের ওই ব্যথার জন্যে বিশেষ কোন দাওয়াইয়ের তোমার প্রয়োজন নেই। ও বেদনা একেবারে যেতে দীর্ঘ সময় নিতে পারে। প্রবল কোন পরিশ্রম ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে তোমার ভয় পাবার প্রয়োজন নেই। তোমার টেম্পারেচার, পাল্‌স যদি ভাল থাকে, তা হলে ওই বুকের বেদনা সত্ত্বেও তুমি নিয়মিত হাঁটবে।

৬। তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকে আশ্বস্ত করতে পার যে, তোমার দ্বারা তাঁরা সংক্রামিত হবেন না।

৭। ক্যালসিয়াম ইঞ্জেকশান আর তোমার নেবার দরকার নেই। কিছুদিন যাবৎ তুমি "কাল্‌জানা" এবং "প্যারাথাইরয়েড" ট্যাবলেট (প্রত্যেকটি ১/১০ গ্রেণ—পার্কডেভিস কম্প্যানির) দৈনিক দুবার করে (দু বেলা ভাত খাবার আধঘণ্টা আগে) খেতে পার। কডলিভার অয়েলও খেতে পার পেট ভাল থাকলে।

৮। অনেক রোগীই, বিশেষ করে প্রথম অবস্থা থেকে, সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়েছে এবং কাজকর্ম্ম করে অনেক দিন বেঁচেছে। প্রকৃত পক্ষে অনেকেই বেশ দীর্ঘজীবী হয়েছে। তুমিও যে তাদেরি একজন হবে না, তার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নেই।

৯। যদি এখনও তোমার ঐ কাসি এবং রক্তটুকু সম্পূর্ণরূপে বন্ধ না হয়ে থাকে, তবে আমি স্বতন্ত্র কাগজে যে প্রেসকৃপশানটি লিখে দিলাম, এই মিক্‌শ্চারটি খেয়ো। তবে ঐ উপদ্রবগুলি ইতিমধ্যে চলে গিয়ে থাকলে আর এটা খাবার দরকার নেই।

১০। স্বাস্থ্যকর স্থানে এখন থাকা তোমার পক্ষে নিশ্চয়ই দরকার এবং যতদিন পাববে, থাকবে। এই ব্যাধি থেকে সারতে মুক্ত এবং বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী। পুষ্টিকর খাদ্যেরও (যথা ডিম, দুধ, মাখন, টাট্‌কা মাছ, মাংস, ভাত, আটা, তরকারি, দই ইত্যাদি) বিশেষ দরকার। তোমার যদি থুতু ওঠে তবে টি. বি. ব্যাসিলাই সম্বন্ধে সন্দেহ ভঞ্জন করে নেবার জন্যে সেটা পরীক্ষা করিয়ে নেওয়াই ভাল। বিশ্রামসম্বন্ধে স্যানাটোরিয়ামের নিয়ম পালন করতে অন্যথা করবে না।

আমি বিশেষ ভাবে আশা করি যে তুমি বেশ ভালভাবেই উন্নতির পথে চলতে থাকবে।

শুভার্থী
(স্বাঃ) এম্‌. কেশভ পাই

রক্ত অবিচ্ছি দু'চার দিনের ভিতরেই বন্ধ হয়ে গেল; কিন্তু ক্রমে গরমের আসবার সাথে সাথে আমার পাল্‌স্‌ এবং টেম্পারেচার যেতে লাগল অত্যন্ত বেড়ে এবং শরীরও নানাভাবে খারাপ হতে থাকল। কাজেই আমি পুনরায় কোন স্যানাটোরিয়ামে যেতে চেষ্টা করলাম এবং মা—আমার সাথে ছিলেন—তাঁকে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে গেলাম চলে পাঞ্জাবে ধরমপুর স্যানাটোরিয়ামে। কয়েক মাস আমি থাকলাম সেখানে এবং পুনরায় বেশ সুস্থ অবস্থায় ফিরে চলে এলাম কলকাতায়।

কলকাতায় নানারকম অশান্তি আমার একেবারে চরমে উঠল। না পারছি বাইরে কোন জায়গায় যাবার সুবিধা করতে, না পারছি এখানে এতটুকু নিয়মমত থাকতে। অর্থের নিদারুণ প্রয়োজন; তারপরে যাদের এড়ানোর জন্যে আমার সমস্ত প্রাণমন অস্থির হয়ে উঠেছে—নিরুপায়ের মত তাদেরই কাছে আত্মসমর্পণ! আমার শরীর এবং মন নিয়ে যেন চলতে লাগল একটা ছিনিমিনি খেলা: যাক, সে সব ব্যক্তিগত ব্যাপার এখানে টেনিয়ে বেশী আর কি লাভ হবে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে নানাভাবে আমার মন এমন তিক্ত এবং বিষাক্ত হয়ে উঠল যে, অবশেষে নিজের জীবনের প্রতি এক বিন্দু মমতা আর আমার রইল না; উঠলাম ভীষণ রকম উচ্ছৃঙ্খল এবং দুর্ব্বিনীত হয়ে। কয়েকটি মাস কি ভাবে কাটল সে সবের হিসাব-নিকাশ এখন তোলা থাক, তবে এঁদবের ফলও ফলল। প্রত্যেক দিন জ্বর হতে লাগল ১০১° মত করে, সাথে সাথে কাসি ত ভীষণ ভাবেই চলল। অনেক খারাপ হয়ে গেল বাইরের চেহারাও।

এই রকম যখন অবস্থা, হঠাৎ একদিন রক্তরঞ্জিত খানিকটা থুতু দিল দেখা এবং প্রায় ক্রমে মুখ দিয়ে ঝ রক্ত উঠতে লাগল—বাপ রে বাপ! এবারকার রক্তটা বেশ অনেক দিন ধরেই উঠল। ইতিমধ্যে দারজিলিঙ যাবার পেয়ে গেলাম একটা সুযোগ। রক্ত বন্ধ হবার মাস খানেক পরে চলে গেলাম দারজিলিঙ। আমার তখন একটা নিয়মিত চিকিৎসাধীনেই থাকা উচিত ছিল, কিন্তু তাও হল না। দারজিলিঙ-এ আমি দুবার যাই এবং বেশ অনেক দিন করেই থাকি। প্রথম বারে এক রকম ভালই কাটালাম, কিন্তু তারপরের বারে গিয়ে আবার আমার বেশ রক্ত উঠল, নেমে চলে আসবার কিছুদিন আগে। এবারে যাদবপুর টি. বি. হাঁসপাতালে সিট্ ঠিক করে রক্ত ওঠবার অবস্থাতেই সম্পূর্ণরূপে ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে দারজিলিঙ থেকে নেমে এলাম চলে যাদবপুর।

এই প্রবন্ধগুলি লিখলাম যাদবপুর হাসপাতালে অবস্থানকালীন। যাদবপুর হাসপাতালে আমার বুকে Artificial Pneumothorax করা হয়েছে। বুকের যে অবস্থা নিয়ে এসেছিলাম, এখন তার চাইতে অনেকটা ভাল। ইদানীং ফার্লং চারেক আমি রোজ সকালে বেড়াতে পারি; তা' ছাড়া ওয়ার্ডের ভিতরে সব সময়েই ঘোরাফেরা করতে পারি। সাধারণতঃ এই ভাবে এখন আমার সময় কাটে—সকালে বেড়ান এবং এই প্রবন্ধ লেখা: দুপুরে খাওয়ার পরে বেলা তিনটা অবধি বিশ্রাম নিতে হয়; তারপরে ঘণ্টা দুয়েক পড়ি। বিকেলে ভিজিটার এলে গল্প-গুজব; পরে খাওয়ার আগে যে সময়টুকু পাই, চিঠিপত্র লিখবার দরকার থাকলে লিখি; খাওয়ার পরে খবরের কাগজ পড়ি, একটু এস্রাজ বাজাই। রাত্রি সাড়ে ন'টার সময়ে আমাদের আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়। খুব সম্ভবতঃ আর দু এক মাসের ভিতরে আমি এই হাসপাতাল থেকে ছুটি পাব—দশ মাস আমার এখানে কাটল। এই প্রবন্ধ ছাপা হতে হতে যে আমি কোথায় থাকব—ফরিদপুর কি ফরাক্কাবাদ, কলকাতা কি কোপেনহেগেন, ইহলোকে কি পরলোকে কিছুই জানি না। এই যে আবার একটু সুস্থ হয়ে উঠেছি, এই সুস্থতা বজায় রাখতে পারব, অথবা এতদিনকার ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হবে, তাও জানি না।

আমার নিজের যাই ঘটুক না কেন, আমি জানি তাতে পৃথিবীর বৃহৎ কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু যাদের জীবনের সত্যিকার মূল্য আছে, চলবার পথে যাদের জীবন সবদিক দিয়ে সার্থকতার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারত, সকলের শ্রদ্ধায়, সকলের ভালবাসায় নিজেদের জীবন যারা গৌরবান্বিত করে তুলতে পারত, এমন লক্ষ লক্ষ সুন্দর প্রাণ যে এমন ভাবে অকালে শুকিয়ে ঝরে যায়, একথা ভেবে আমি বেদনা পাই। এর প্রতীকার কোন্ পথে হতে পারে ভেবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠি; এ সমস্যার সমাধানের জন্যে প্রত্যেক যোগ্য ব্যক্তিকে আমার অন্তরের আবেদন জানাই। একেবারে গোড়া থেকে এ পর্য্যন্ত সব দিক দিয়ে অত্যন্ত favourable case হওয়া সত্ত্বেও আমি নিজে যে সুস্থ হয়ে উঠতে পারছি না, এর পিছনে কত কি আছে, হয়ত বুঝি, হয়ত বুঝি না। এক এক সময়ে ক্ষণিকের ক্লান্তি আসে; নিজের দুর্ব্বলতা আমি উপলব্ধি করতে পারি। গ্রীষ্ম যায়, বর্ষা যায়, শীত যায়, প্রস্ফুটিত বর্ণসম্ভার, বিচিত্র কুজন-গুঞ্জন নিয়ে লীলায়িত বসন্ত যায়, বৎসরের পর বৎসর একে একে ফিরে যায়; দূর থেকে আমার কানে ভেসে আসে বাইরের বৃহত্তর পৃথিবীর উদাত্ত কোলাহল, চোখে আসে ভেসে নগরীর রাজপথের ব্যস্ত বিপুল জনপ্রবাহের ছায়া; একটি শ্রান্ত, ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলে আবার কক্ষকোণে একলা বসে ভাবি—

"আমি তোমার ভুবনমাঝে
লাগি নি নাথ কোন কাজে,
শুধু কেবল সুরে বাজে
অকাজের এই প্রাণ!"

সাইরেন

—শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

সাইরেনদের দ্বীপের কাছাকাছি যখনই তারা এসে পড়ল, তখন সমুদ্রের হাওয়া গেল স্তব্ধ হয়ে আর সমুদ্র ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল। নাবিকেরা জাহাজের পাল দিল নামিয়ে। মার্সি তাকে যে সাবধান হবার উপদেশ দিয়েছিল, ইউলিসিস্ সেই কথা মনে করে বাতির মোম দিয়ে তার সঙ্গী নাবিকদের কান বন্ধ করে দিলেন। আর, নাবিকরা ইউলিসিসের আদেশ মত শক্ত দড়ি দিয়ে নিজেদের দেহ-গুলিকে মাস্তুলের সঙ্গে বেঁধে ফেলল। ফেনিল সমুদ্রের উপর দিয়ে তখন তাদের জাহাজ চলতে লাগল।

সাগর-গুহার অভ্যন্তর থেকে সাইরেনরা জাহাজের দ্রুত অগ্রগতি লক্ষ্য করেছিল। জাহাজের অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের জলকলধ্বনি যেমনি শুনতে পাওয়া গেল, অমনি তারা সমুদ্রতীরে এসে দাঁড়াল এবং তাদের গান আরম্ভ করে দিল।

"এদিকে এস, ও গো সুন্দর পৃথিবীর মানুষ, এদিকে এস। ও গো সুন্দর পৃথিবীর মানুষ, এদিকে এস। কোন নাবিকই আমাদের কণ্ঠস্বর না শুনে যায় নি—আমাদের গানের সুর এমনি। আমাদের গান শোনার পর তারা আনন্দের সঙ্গে ফিরে যায়, পৃথিবীর বহু জিনিষের সম্বন্ধে তারা অনেক কিছু শিখে যায়। পৃথিবীতে যা' কিছু আছে, আমরা তাদের খবর রাখি, আমরা সকলের জন্মদাত্রী।"

এই কথা বলে তারা তাদের সুন্দর বিচিত্রোজ্জ্বল দেহ সমুদ্রের তরঙ্গ-দোলার উপর তুলে ধরল আর তাদের মসৃণ পেলব বাহুভঙ্গীতে নাবিকদের আহ্বান করতে লাগল। কিন্তু সব চেয়ে মায়া ছিল তাদের কণ্ঠস্বরে—সেই কণ্ঠস্বরে ছিল সাগরের বিচিত্র সম্মোহন, শৈবালের গন্ধের মত তা তীব্র, মৃদু অথচ ঈষৎ কর্কশ—যেন তা মূর্ত্ত কামনার কণ্ঠস্বর।

ইউলিসিস্ তাঁর বন্ধনের সঙ্গে করতে লাগলেন যুদ্ধ। কিন্তু তাঁর নাবিকেরা পূর্ব্ব থেকেই সাবধান, কাজেই তারা ভাবে তাঁর উরু এবং বাহু বেঁধে ফেলল।

কিন্তু যত যাই হোক, ইউফোরিয়ন বলে একজন নাবিক আপন মনেই ভাবতে লাগল যে, যে-গানের এত শক্তি যে, ইউলিসিসের মত জ্ঞানবান্ লোকও বিমূঢ় এবং মুগ্ধ হয়ে পড়েন, তার মত সাধারণ মানুষ, সে যদি তার জীবন দিয়েও সে গান শুনতে পায়, তবু তার সে গান শোনা উচিত।

ইউফোরিয়ন্ তার কান থেকে মোম খুলে ফেলে দিয়ে শুনতে লাগল। আর, এমন সব গান সে শুনল যে, সে জাহাজের ডেক থেকে ঝুঁকে পড়ে শুনতে শুনতে অল্প সময়ের মধ্যেই তিক্ত লবণাম্বুর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল।

নাবিকেরা তাদের সঙ্গীকে অতি ভীষণ মৃত্যুর মুখোমুখি ছেড়ে দিতে নিতান্তই কুণ্ঠিত ছিল। কিন্তু ইউলিসিস্ তাদের আদেশ দিলেন—অতি কঠিন ভ্রূভঙ্গী তাঁর মুখে—দ্বীপের পাশ দিয়ে আগে বেরিয়ে চল।

… … …

কামনার মধুর আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে ইউফোরিয়ন যে দিক থেকে সঙ্গীত ভেসে আসছিল, সেই দিকে সাঁতার দিয়ে চলল। রৌদ্রালোকিত সাগরের জলরাশি শীতল স্নিগ্ধ গুহার অন্ধকারের দিকে অগ্রসর হয়ে চলল। গুহার প্রবেশ-দ্বার-পথে সাইরেনরা দল বেঁধে বসে আছে—তাদের সংখ্যা সাত। তাদের দেহের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। তাদের চোখগুলো কাল, চুল সোণালি সবুজ, তাদের তীক্ষ্ণ দন্তাগ্রভাগ কতকটা মুখের মধ্যে জ্বল জ্বল করছে। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো আশ্চর্য্য রকম শিশুসুলভ। তাদের দেহের নিম্নার্দ্ধভাগ মাছের মত। আর, ইউফোরিয়ন তাদের কাছা-কাছি আগিয়ে গিয়ে দেখল, তাদের দেহের নিম্নভাগের অদ্ভুত বর্ণবিচিত্রতা—সাগরজলের সঙ্গে তরঙ্গায়িত এবং লীলায়িত হচ্ছে।

যেমনই ইউফোরিয়ন্ সেখানে পৌছুল, সাইরেনদের গান গেল থেমে। তারা সেই হতভাগ্য লোকটার উপর বিকট চীৎকার করে লাফিয়ে পড়ল এবং মানুষের কঙ্কালে আচ্ছন্ন একটা পাহাড়ের উপর তাকে উলঙ্গ করে ফেলে রাখল। এই অতি সুন্দরী সাইরেনদের স্বভাবই এই যে, তারা ডোবা—

জাহাজের হতভাগ্য নাবিকদের দেহ ছিন্নভিন্ন করে পুষ্পকোমল ওষ্ঠ দিয়ে তাদের রক্ত পান করে থাকে।

এখন, ইউফোরিয়নের মনে হল যে, সাইরেনদের মধ্যে একজন তার অন্য ভগ্নীদের চেয়ে সুন্দরী। আর, তার মুখাকৃতি অন্য সাইরেনদের মত অতটা নিষ্করুণ নয়। ইউফোরিয়ন তার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল—"আমি বড় সুখেই মরব, কারণ, আমি সাগর-কন্যাদের গান শুনতে পেয়েছি। কিন্তু আমার আনন্দ সম্পূর্ণ হবে, যদি শুধু তোমার হাতেই আমার মৃত্যু হয়।"

সাইরেন তার দিকে গভীর বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এর আগে সে শুধু মানুষের মুখে কামনাই দেখেছে, কিন্তু কামনার সঙ্গে সঙ্গে একটা অতি সুদূর নির্লিপ্ত ভাবাবেশ সে কখনো আর কার মুখে দেখেনি। ইউফোরিয়ান আসবার আগে যারা এসেছিল, তাদের মুখাকৃতি এবং অবয়বের মধ্যে আর কিছুই ছিল না, ছিল শুধু ভয়। সাইরেনদের কবল থেকে ক্রমাগত মুক্তি পাবার চেষ্টায় তাদের মুখাবয়ব একেবারে ভাবলেশহীন হয়ে থাকত।

সম্রাজ্ঞীর মত কঠিন আদেশে সে তার ভগ্নীদের দূরে থাকতে বলল। তাদের সে বলল, "এই আগন্তুক আমার।"

অন্য সাইরেনরা দূরে চলে গেল। বোধ হয়, যে সাইরেন ঐ আদেশ করল, অন্য সকলের উপর তার আদেশ করবার ক্ষমতা ছিল। বোধ হয় তাদের মধ্যে এমন একটা বোঝা-পড়ার সঙ্কেত ছিল যে, ভ্রান্ত, সাগরপথভ্রষ্ট হতভাগ্য নাবিক কেউ এলে, সে যে কার ভাগ্যে পড়বে—এটা তারা নিজেরাই ঠিক করে নিত।

এখন সুচতুর গ্রীকের কাছে একাকিনী সাইরেন তার নাম জিজ্ঞাসা করল এবং সেটা জানতে পেরে বলল, "ইউ-ফোরিয়ন, আমি তোমাকে ভালবাসি। আমার মৃত্যু নাই, কিন্তু আমি এই প্রথম আমার ভালবাসার কথা জানালাম। আমি এই প্রথম জানলাম, কাকে প্রেম বলে।"

"আর তুমি?" গ্রীক জিজ্ঞাসা করল, "তোমার নাম কি?"

"লিউকোসিয়া।"

... ...

অন্য সাইরেনরা তাদের পূর্ব প্রতিশ্রুতিমত ইউফোরিয়ন এবং লিউকোসিয়াকে তাদের নিজেদের খেয়ালমত ছেড়ে দিল। ভূভাগের দিকে গুহার মুখটা একটা অদৃশ্য অনাবিষ্কৃত প্রান্তরের উপর—সেখানে একটা নির্মল জলের ফোয়ারা। ইউফোরিয়ন্ এই জলে তার তৃষ্ণা মেটাল। সমুদ্রের ছোট ছোট মাছ খেয়ে ইউফোরিয়ন্ তার ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে লাগল।

লিউকোসিয়া তাকে ছেড়ে কোথাও গেল না। সাগর-তরঙ্গ-ছন্দের সঙ্গে তারা তাদের নিজেদের সুন্দর দেহ লীলায়িত করত এবং যখন সেই তরঙ্গগুলি তাদের উপর আন্দোলিত হত, তখন আর তাদের আনন্দের সীমা থাকত না।

কখন কখন পাহাড়ের চূড়া থেকে সাইরেন তার দেহের নিম্নার্দ্ধভাগ ঋজু এবং কঠিন করে একটি শাণিত তীরের মত সাগর-গর্ভে ঝাঁপ দিয়ে পড়ত। ইউফোরিয়ন তাকে বাহুর আলিঙ্গনের মধ্যে গ্রহণ করে সমুদ্রের অতলে এক নিমেষে অন্তর্হিত হত। তারা রৌদ্রের মধ্যে খেলা করতে ভালবাসত, সাগর-তীরের চূর্ণ ফেনরাশির মধ্যে এবং সাগরজলের চমৎকার ঘূর্ণীর মধ্যে তারা খেলা করে বড় আনন্দ পেত। আবার কখনো বা সমুদ্রের সুন্দর সুন্দর মাছদের সঙ্গে খেলা করে তাদের সময় কাটিত।

যখন রাত্রি আসত, অন্য সাইরেনরা সমুদ্র-তীরের শৈবাল রাশির উপর পাশাপাশি শুয়ে থাকত। কিন্তু ইউফোরিয়ন ও লিউকোসিয়া মাঠের একটি নিভৃত কোণ বেছে নিত—আর সেই নাবিক সেই সাগরকন্যার মধুর সুশীতল আলিঙ্গনের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকত।

তারা খুব অল্পই কথাবার্ত্তা বলত, লিউকোসিয়া ধীরে ধীরে মানুষের ভাষা আয়ত্ত করতে লাগল। সে আকাশের নাম করতে পারত—সমুদ্র, সূর্য্য, চাঁদ, নক্ষত্র, পাহাড়, মাছ এবং শরীরের বিবিধ অংশের নাম করতে পারত।

সে আরও বলতে পারত, "আমি দেখি," "আমি শুনি," "আমি অনুভব করি", "আমি ভালবাসি", "আমি চাই" "আমি আশা করি" এবং "আমি ইচ্ছা করি"। কিন্তু এইখানেই তার কথার পুঁজি শেষ হত।

ইউফোরিয়ন একদিন তাকে বলল, "যখন আমাদের জাহাজ থেকে আমি তোমার গান শুনেছিলাম, তুমি বলেছিলে যে, তোমরা এমন অনেক জিনিষ জান, যা মানুষ জানে না। লিউকোসিয়া, তুমি কি আমাকে সে সব বলবে না?" কিন্তু

লিউকোসিয়া তাকে এই কথা বুঝিয়ে দিল যে, এ বিষয়ে সাইরেনরা তাকে মিথ্যা কথা বলেছে। তাদের সম্বন্ধে নাবিকদের কৌতূহল জাগাবার জন্তেই এই কথা তারা বলেছে।

বস্তুতঃ যে কথাগুলো তারা গানের মধ্য দিয়ে বলেছিল, এবং যে কথাগুলো প্রতিসন্ধ্যায় সে শুনে থাকে, তার মধ্যে বিশেষ কোন অর্থ নেই—তার মধ্যে আছে শুধু প্রভাতের বিচিত্র মহিমা, সূর্য্যাস্তের অসীম বর্ণচ্ছটা এবং সাগরের বিশালতা ও সৌন্দর্য্য। অথবা সেই গানের সুরের মধ্যে আছে একটা ক্লান্তিহীন শক্তির পরিচয়। আর একটা কামনার আবেশ আছে, যা' এই গায়িকাদের কাছে একেবারে দুর্ব্বোধ্য—কিন্তু যা' ইউফোরিয়ন অতি সহজেই বুঝতে পেরেছিল। মানুষের স্মৃতি এবং অভিজ্ঞতাতে এ সুর ধরে নেওয়া নিতান্ত শক্ত নয়।

... ...

লিউকোসিয়া তার সঙ্গীর দুঃখ সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ ছিল। সে তার আবেগময় চুম্বন দিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করত। সমুদ্রে এবং পর্ব্বতগুহার মধ্যে লিউকোসিয়ার শক্তি অত্যন্ত বেশী—সেখানে সে তার সঙ্গীকে প্রত্যেক অবস্থায় রক্ষা করবার চেষ্টা করত। কিন্তু সমুদ্রতীরে এবং নির্জ্জন প্রান্তরে লিউকোসিয়া শক্তিহীন—কেবল হাতে ভর দিয়ে লিউকোসিয়া চলত। তার দেহের নিম্নার্দ্ধভাগ বড় দুর্ব্বল এবং অসহায় অবস্থায় মাটির উপর দিয়ে চলত। তখন লিউকোসিয়া তার সঙ্গীর অতি সুন্দর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রশংসা না করে থাকতে পারত না। সে সময়ে সে ভাবত যে, ইউফোরিয়ন তার চেয়ে অনেক বেশী দেখেছে। আর তার মনের মধ্যে এমন সব চিন্তা এবং কল্পনার সংমিশ্রণ, যার সম্বন্ধে তার কোনো ধারণাই নেই।

সেই জন্তে ইউফোরিয়ন তাকে বহু দূরদেশের সংবাদ এবং মানবজীবন সম্বন্ধে বহু তথ্য ও কাহিনী শেখাবার জন্তে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হ'ল। কিন্তু সে শীঘ্রই দেখল যে, লিউকোসিয়া সে সম্বন্ধে কিছুই জানতে চায় না বা তার জানবার আগ্রহ নেই। কারণ, যে কথাগুলো সে ব্যবহার করত তার মধ্যে এমন কিছুই থাকত না, যা সে শুধু দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারে।

তারপর, লিউফোসিয়ার সঙ্গে এইভাবে জীবন অতিবাহিত করা ইউকোরিয়নের আর ভাল লাগল না। লিউকোসিয়ার মধ্যে আর সেই নূতনত্বের আস্বাদ নেই। লিউকোসিয়া ইউফোরিয়ন থেকে একেবারে সম্পূর্ণ পৃথক; তার আত্মা এখনও প্রাথমিক অবস্থায় অবস্থান করছে। প্রথমে যা তার কাছে অত্যন্ত ভাল লেগেছিল, এখন তা অত্যন্ত ক্লান্তিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। লিউকোসিয়ার অজ্ঞতা এবং তার দেহের অপরিচ্ছন্নতা ও লবণাক্রতা যেন তার স্নায়ুগুলীর মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করেছে।

ইউফোরিয়ন তার অতীত জীবনের কথা ভাবতে লাগল। একটা গভীর দুঃখে তার মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। রাত্রিতে নির্জ্জন প্রান্তরে যখন সেই ক্ষুদ্র সাগর-কন্যা তার পাশে এসে ঘুমোত, তখন তার চিন্তা আর কল্পনা প্রসারিত হত প্রান্তরে, অরণ্যে এবং নদীতে—কোথায় কতদূরে চলেছে গরুর পাল, ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর, লোকালয়ের পণ্যবীথি, দেবতাদের মন্দির, বন্দর-তীরের জাহাজ, হোটেলের সুগন্ধি মন্ড, ক্ষুদ্রায়তনা নৃত্যরতা বালিকা, যুবতী এবং কিশোরী মেয়ের দল—যারা লাল ফুল দেয় তাদের চুলে, যাদের হাতের স্পর্শ উত্তপ্ত এবং যাদের সুগঠিত সুন্দর চরণপদ্ম...

ঠিক এই রকম সময়েই একখানা জাহাজ সাইরেনদের গানে আকৃষ্ট হয়ে একটা পাহাড়ের উপর আছড়ে পড়ল। আর ইউফোরিয়নের ভীত দৃষ্টির সম্মুখে সেই সুন্দরী মেয়েরা তাদের তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে ডোবা-জাহাজের ভয়ার্ত্ত নাবিকদের দেহ ছিন্ন ভিন্ন করে তাদের উষ্ণ রুধির পান করতে লাগল। লিউ-কোসিয়া তার ভগ্নীদের সঙ্গে গান গাইতে এবং তাদের সেই ভীষণ ভোজের অংশ নিতে অস্বীকার করল। ইউকোরিয়ন এজন্তে লিউকোসিয়াকে ধন্যবাদ দিল। কিন্তু সে শীঘ্রই আবিষ্কার করল যে, লিউকোসিয়া যে তার ভগ্নীদের সঙ্গ গ্রহণ করতে চায় না—এ শুধু তাকে সন্তুষ্ট করার জন্তে। আর যদিও সে প্রেমের স্পর্শ অনুভব করেছে—কিন্তু সে ত প্রায় সব প্রাণীরাই অনুভব করে—সে করুণা বা দয়া কাকে বলে তা বড় একটা জানে না। এই করুণা বা দয়া শুধু মানুষেরই থাকে।

সাইরেনরা উভচর—জল এবং স্থল উভয় স্থানেই তারা সমভাবে নিশ্বাস নিতে পারে। লিউকোসিয়ার শিক্ষায় ইউফোরিয়ন জলের মধ্যে বহুক্ষণ নিশ্বাস নিয়ে থাকতে পারত। সে লিউকোসিয়ার সঙ্গে প্রবালদ্বীপের মধ্যে এবং উজ্জ্বল সমুদ্রশৈবালের মধ্যে সাঁতার দিত এবং প্রায়ই আশ্চর্য্য হত এই ভেবে যে, যে সব বস্তু সে স্বচ্ছ জলতলে দেখেছে, সে সব পাথর, ফুল, না পশু!

এই রকমভাবে জলের মধ্যে সাঁতার দিতে দিতে সে একটা জাহাজের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেল। আর সেই জাহাজের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ছিল চিত্রিত মাটির ভাঁড়, বাসন-কোসন, গলার হার, মণিমুক্তা, মালা, রৌপ্যদর্পণ, মনুষ্য-জীবনের বিচিত্র-দৃশ্যাবলী-অঙ্কিত ছবি এবং শেষ পর্য্যন্ত সোণার মোহরে ভরা থলে। লিউকোসিয়ার সাহায্য নিয়ে সে এই সমস্ত রত্ন এবং দ্রব্যসম্ভার শুক্‌নো ডাঙ্গার উপর তুলে আনল। ইউফোরিয়ন লিউকোসিয়ার গলায় একটি হার পরিয়ে দিল। তার হাতে পরিয়ে দিল বালা। তার কোমরে জড়িয়ে দিল একটা সুন্দর মালা। আর তার হাতে দিল একখানি দর্পণ। সে অত্যন্ত খুশী হল এবং দর্পণে তার প্রতিবিম্ব দেখতে পেয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। তারপর সে তাকে অন্যান্য বস্তু-গুলোর ব্যবহার কি তা'ও শিখিয়ে দিল। আর ছবিগুলোর অর্থ তাকে বুঝিয়ে দিল। অবশেষে লিউকোসিয়া তার নিজের জীবন থেকে স্বতন্ত্র একটা জীবন কল্পনা করে দুঃখের সঙ্গে বলল, "সাধ যায় আমি এসব দেখি, কিন্তু আমি ত সাগর-নারী—সমুদ্র ছাড়া বোধ হয় আমি আর কিছুই জানব না।"

এই কথা শুনে ইউফোরিয়ন পৃথিবী সম্বন্ধে তার কৌতুহল আরও জাগাবার চেষ্টা করতে লাগল এবং সাইরনদের দ্বীপ থেকে এই ভাবে পলায়নের চেষ্টা করতে লাগল। যখন বুদ্ধিমত্তায় প্রায় ইউফোরিয়নের কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করতে লাগল, তখনই ইউফোরিয়ন তাকে ত্যাগ করে চলে যাবার চেষ্টা করতে লাগল। ইউফোরিয়ন ক্রমাগত মানুষের জীবনযাত্রার আনন্দের কথা সাইরেনদের কাছে বলতে লাগল।

একদিন সে বলল, "যদি তুমি আমার সঙ্গে একবার আস, তা'হলে আমরা এক সঙ্গে সাঁতরে এথেন্স নগরীতে যেতে পারব—এখান থেকে এথেন্স যেতে তিন দিন লাগবে।"

"কিন্তু আমি যে মাটিতে একটুও হাটতে পারি নে।"

ইউফোরিয়ন উত্তর দিল, "আমি তোমাকে সাহায্য করব। আর যখনই আমরা সহরে পৌছব, ছবিতে তোমাকে যে গাড়ী দেখিয়েছি, ঐ রকম একখানা চমৎকার গাড়ীতে তুমি তোমার ইচ্ছামত যেতে পারবে। আর আমরা আমাদের বাক্সের ধনদৌলত নিয়ে পরমানন্দে কাটাতে পারব।"

ইউফোরিয়নের মনে যা ছিল, তা সে বাইরে প্রকাশ করল না।

...   .

সাইরেনের পক্ষে তিন দিনের সাঁতার কিছুই নয়। সাইরেনের সাহায্যে সাঁতার দিতে দিতে ইউফোরিয়ন নির্ব্বিঘ্নে তীরে এসে পৌছল। তারপর তারা সমুদ্রতীরে একটা নির্জ্জন স্থানে এসে উঠল। বহুদূরে একটা নগরী দেখা যাচ্ছে, সেখানে রাস্তাটা ধূলিময় এবং দীর্ঘ।

ইউফোরিয়ন একটা পত্রাবরণ রচনা করে পরল, যাতে করে সে মনুষ্যসমাজে একটু ভদ্র হতে পারে।

প্রথমে সাইরেন তা'র হাতে ভর দিয়ে বেশ সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু সে পাথরের উপর বড় কঠিন আঘাত পেল। রৌদ্রে প্রায় তার মূর্চ্ছা হবার উপক্রম হল। শীঘ্রই ইউফোরিয়ন তাকে পিছনে ফেলে এল। কিন্তু লিউকোসিয়া তাকে ফিরে ডাকতে লাগল। "মানুষের পৃথিবী বড় কঠিন" —সে বলল, "বন্ধু, আমি তোমাকে বয়ে নিয়ে এসেছি, এই-বার তুমি আমাকে বয়ে নিয়ে চল।"

তার কথা প্রত্যাখ্যান করবার মত হৃদয় তার ছিল না। সে ফিরে এল এবং নত হয়ে তাকে তার পিঠে ভর দেবার জন্যে বলল। সাইরেন হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরল। সে উঠল এবং রাস্তা দিয়ে চলতে লাগল, আর তার দেহের নিম্নার্দ্ধভাগ ধূলোর উপর দিয়ে লোটাতে লোটাতে চলল।

বোঝার ভারে ঘামতে ঘামতে ইউফোরিয়ন বড় কষ্ট পাচ্ছিল। সে ভাবতে লাগল, মানুষের পৃথিবী এই মৎস্য-নারী নিয়ে কি করবে? অবশেষে সে তার গলা থেকে লিউকো-সিয়ার হাত জোর করে সরিয়ে ফেলল, মাটিতে তাকে ফেলে দিল এবং তাড়াতাড়ি সহরের দিকে ছুটতে লাগল।

লিউকোসিয়া চীৎকার করে ডাকতে লাগল, "ইউফোরিয়ন, ইউফোরিয়ন!" সে চীৎকার এত করুণ যে, ইউফোরিয়নের হৃদয় করুণার্দ্র হল এবং সে [illegible] ঘুরে এল। সে বলল,

"ধৈর্য্য ধর, আমি তোমার জন্যে একখানা গাড়ী আনতে যাচ্ছি।"

সে চীৎকার করে বলল, "না, না, তুমি আর ফিরে আসবে না—আমি এটা ভাল রকমই জানি। তুমি আর আমাকে ভালবাস না, কারণ আমি তোমাদের পৃথিবীর নারীর মত নই। কিন্তু আমাকে ধন্যবাদ দাও, কারণ আমিই তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছি। আমি তোমার প্রাণ রক্ষা করলাম, আর তুমিই আজ আমার মৃত্যুর কারণ হতে চলেছ। দেবতারা মানুষকে ভালবাসার জন্য আমার অমরতা হরণ করেছেন।"

সে তার হাত রগড়াতে লাগল, আর তার ক্লান্ত চোখ দিয়ে এই সর্ব্বপ্রথম অশ্রু ঝরে পড়ল। তার দেহের সর্ব্বপ্রকার শ্রী বিনষ্ট হল।

লিউকোসিয়া চীৎকার করে কেঁদে উঠল, "ইউফোরিয়ন, ইউফোরিয়ন, দয়া কর, দয়া কর।"

"দয়া? তুমি ত কৈ আগে সে কথা বল নি?"

"কারণ, আমি কখনও কষ্ট পাই নি," সে বলল, "বন্ধু, শোন, আমি বেশ বুঝতে পারি, আমি সর্ব্বদাই তোমার কষ্টের কারণ—আর, আমি আমার দিক থেকে এই কথাই বলতে পারি যে, যে সব মেয়েদের হেঁটে যাওয়ার পা আছে, তাদের কথা মনে করলে আমার বড় দুশ্চিন্তা আসে। আর, এতদিন ধরে আমি যা তোমার কাছ থেকে জানতে চেয়েছি, তা জেনে আমার মনে শান্তি নেই। এখন আর আমি সমুদ্রে ফিরে যেতেও পারি নে। যদি তুমি আমাকে দয়া করে সমুদ্রতীরে নিয়ে যাও, তা হলে আমি আমার দয়াহীনা ভগ্নীদের কাছে ফিরে যেতে পারি।"

"দয়াহীনা?"—ইউফোরিয়ন চীৎকার করে বলল,—"কৈ, এ কথা ত তোমার কাছে কোন দিন শুনি নি।"

"হায়, আজ তোমার মনে নাই"—সে দুঃখ করে বলল, "তুমিই আমাকে এর অর্থ শিক্ষা দিয়েছ।"

আর কোন কথা না বলে ইউফোরিয়ন তাকে তার নিজের বুকে তুলে নিল, সাইরেনের কেশপাশ তার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সাইরেন তার চোখের জলের মধ্য দিয়ে হাসতে লাগল, আর, তারপর এত করুণ কোমল-কণ্ঠে সে তাকে ডাকতে লাগল যে, ইউফোরিয়নের [illegible] জিজ্ঞা শিথিল হয়ে এল। অবশেষে সে তাকে সমুদ্রতীরে ধীরভাবে শুইয়ে দিল। সমুদ্রের ছোট ছোট তরঙ্গগুলি এসে তীরে আঘাত করতে লাগল।

"বিদায় বন্ধু" সে বলল।

ইউফোরিয়ন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, "হায়, যদি তোমার পা থাকত।"

লিউকোসিয়া বলল, "বন্ধু, আমার পা নাই, আর এই সাগর-জলের মধ্যে আমার সে পায়ের প্রয়োজনও নাই। আমি সমস্তই ভুলে গিয়ে আবার আমার সেই ভগ্নীদের মত হতে চাই। যদি আমাকে সমস্তই মনে রাখতে হয়, তা হলে আমি তোমাকে জানলাম, এবং তোমার কাছ থেকে সমস্তই শিখলাম বলে অত্যন্ত অসুখী হয়ে থাকব। কিন্তু আমি কি ভুলে যেতে পারব? আমার ভয় হয়, সকলেই আমাকে ত্যাগ করেছে।"

এখন ইউফোরিয়ন চীৎকার করে কেঁদে উঠল। সে বলল, "তুমি যাই হও,—আমার দিক থেকে বলতে গেলে আমি তোমাকে ভালবাসি, আমাকে ছাড়া তুমি কোথাও যেতে পাবে না। দেবতাদের যে অভিপ্রায়ই থাক, আমরা দু'জনে আবার মিলব। এস, আমরা সাগরতলে যাই।"

লিউকোসিয়া বোধ হয় এই ভুলই করে বসত, যদি না করুণাময় দেবতা থেটিস সেই দু'জন প্রেমিক-প্রেমিকার কাছে আবির্ভূতা হতেন।

"তোমাদের কথা আমি সর্ব্বদাই ভাবি" দেবতা বললেন, "তোমাদের মঙ্গলের জন্যে আমি সদা-সর্ব্বদা চিন্তিত। তুমি লিউকোসিয়া, আমার পুত্র এচিলিসের সঙ্গে যারা যুদ্ধ করেছিল, তাদের মধ্যে একজনকে সাহায্য করেছিলে। আর, তুমি ইউফোরিয়ন, আমার প্রিয়তমা সাগর-দুহিতাকে ভালবেসেছ; আর তোমরা দু'জনে পরস্পরকে ঊর্দ্ধে তুলেছ—একজনকে জ্ঞানের দিকে আর একজনকে সভ্যতার দিকে। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নানাভাবে পুরস্কৃত করতে পারি। লিউকোসিয়া, তোমাকে একাকিনী সাগর-গৃহে পাঠাবার পূর্ব্বে আমি তোমার কাছ থেকে তোমার সমস্ত পূর্ব্ব-জীবনের স্মৃতি-কথা অপহরণ করে নেব। সে সব কথা মনে না রাখাই ভাল। অপর দিকে, ইউফোরিয়ন, আমি তোমার দেহের নিম্নার্দ্ধভাগ মৎস্যাকৃতি করে দেব। তা হলে তুমি [illegible]

[ল]িউকোসিয়ার সঙ্গে সমুদ্রে বিচরণ করতে পারবে। কিন্তু [আ]মার ইচ্ছা, তোমরা দু'জনে তোমাদের ইচ্ছামত জীবন-[যা]পন করতে পার। লিউকোসিয়া, তুমি কি তোমার অমরতা [প]রিত্যাগ করতে পার? তা যদি পার, তা হলে তুমি ইউ-ফোরিয়নের সঙ্গে মিলিত হতে পারবে।"

সাইরেন বলল, "নিশ্চয়ই, অমরতা উপভোগ করতে গেলে —কোন ভাবনা-চিন্তারই বা কি দরকার?"

থেটিস বললেন, "ধন্যবাদ!"

লিউকোসিয়া উচ্চকণ্ঠে বলল, "আমি আপনার কথা বলছি না। আমি আমারই মত একজন ক্ষুদ্র সাগর-নারীর কথা বলছি।"

"বৎসে, মিথ্যা কথা বলার প্রয়োজন কি? এটা অতি সহজেই বোধগম্য যে, তুমি নর-জীবন যাপন করতে চাও।"

"স্বচ্ছন্দে।"

"তা হলে এই মুহূর্ত্তেই তুমি নারী হও এবং যে মানুষটিকে তুমি ভালবাস, তার অনুসরণ কর।"

এই কথা বলে থেটিস তাঁর স্বর্ণদণ্ড দিয়ে সাইরেনকে স্পর্শ করলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যে রূপান্তর সংঘটিত হয়ে গেল।

দেবী থেটিস বললেন, "এখন কন্যা, ঐ ছোট মন্দিরের পুরোহিত নারীর কাছে যাও, এবং সেখানে তার কাছে একটি পরবার গাউন চেয়ে নাও। তারপর তোমরা দু'জনে নগরে যেতে পার।"

ইউফোরিয়ন এবং লিউকোসিয়া উভয়েই আনন্দে উল্লাসিত হয়ে উঠল। কিন্তু থেটিসের মুখে একটা বিষাদের হাসি ফুটে উঠল। কারণ, তিনি তাদের মানব-জীবনে মিলিত করে সুখী করতে পারবেন এমন বিশ্বাস তাঁর মনে ছিল না।*

* Jules Lemaitre-এর "The Siren" নামক গল্পের অনুবাদ।

নিমিত্ত মাত্র

—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

যাহা করাও তাই ত শুধু করি
আমরা কেবল দাগা বুলাই হরি।
অলক্ষ্য ওই আদরা তোমার ঘিরে,
রঙ ফলিয়ে মরছি ঘুরে ফিরে।
ভাবছি মনে নিজেই বুঝি আঁকি
ধরতে নারি এমন বিরাট ফাঁকি।
ছবি দেখেই জন্মে যে বিস্ময়,
এঁকেছি যা এ ছবি তা নয়।

মৌমাছি হায় যেমন রচে চাক
সেই গড়ে তার মনেই বড় জাঁক।
নক্‌সা করা সেই যে মধুক্রম,
হয় না তাহার একটু ব্যতিক্রম।
তেমনি গড়ি রাজ্য ও রাজধানী,
নিজেই নিজে কর্ত্তা বলে মানি,
কর্ত্তা তুমি, কর্ম্মী যথার্থ
আমরা শুধু নিমিত্ত মাত্র।

কর্ম্ম-ধারার গোমুখীতেই হরি
গঙ্গাসাগর তুমিই রাখ ধরি,
এক সাথেতে গোকুল প্রভাসে
তোমার কাছে রয় পাশে পাশে।
পঞ্চবটী এবং অযোধ্যা
একই তোমার সূত্রেতে বদ্ধা।
আদি ও শেষ তোমার একত্তর,
কৃষ্ণকালী তুমিই হরিহর।

শক্তি তুমিই তুমিই সদাশিব
কৃষ্ণ তুমি উঠাও হে গাণ্ডীব।
সৌর জগৎ তোমার দাগা পথে
চলছে তোমার কপিধ্বজ রথে।
সবই তুমি কিন্তু সবাকার
মাথায় দিলে কি দায়িত্ব ভার।
হে বিশ্বরূপ তুমিই যথার্থ
আমরা শুধু নিমিত্ত মাত্র।

—শ্রীউপানন্দ উপাধ্যায়

আজ যাহাদের সম্বন্ধে বলিব, তাহারা নিজেদের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য এবং আদর্শকে হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া রক্ষা

মৎস্য-শীকার।

করিয়া আসিতেছে। তাহাদের পশ্চাতে বিরাট কীর্ত্তিকাহিনী নাই সত্য, তবু এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহারা আমাদের ন্যায় সভ্যতার সর্ব্বপ্রকার কৃত্রিমতার মধ্যে বদ্ধিত হইয়া আর্ত্তনাদ করে না,বরং শ্যামল প্রাকৃতিক জীবনের নিবিড় শান্তি উপভোগ করিয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে কালাতিপাত করে। যে সভ্যতা মানুষকে অমানুষ করিয়া তোলে, যে শিক্ষা মানুষের অন্তরে শঠতা ও কপটতা আনিয়া দেয়, সে সভ্যতা ও শিক্ষার সহিত তাহারা পরিচিত হয় নাই বলিয়া আধুনিক সভ্য-সমাজ বর্ব্বর আখ্যা দিলেও আমরা তাহাদিগকে আদৌ উপেক্ষা করিতে পারি না। বঙ্গোপসাগরের পথ বাহিয়া পোর্টব্লেয়ার পোতাশ্রয়ে প্রবেশ করিবার সময় বামে স্বচ্ছ-নীল সাগরের ভিতর হইতে রস দ্বীপের পার্ব্বত্যচিত্র এবং দক্ষিণে হেরিয়েট পর্ব্বতের বনানী-বিস্তৃত নয়নানন্দকর ক্রম-নিম্নভূমি। পোর্ট ব্লেয়ার হইতে গবর্ণমেণ্টের ষ্টীমার প্রতি তিন মাস অন্তর নিকোবর দ্বীপপুঞ্জাভিমুখে যাত্রা করে, ; তাহাতে যাইতে হইলে, চীফ কমিশনারের অনুমতি গ্রহণ করিতে হয়। চীনা পোতে যাওয়া অনেক সময় সুবিধাজনক নহে বলিয়া গভর্ণমেণ্ট ষ্টীমারে যাওয়াই শ্রেয়। অপরাহ্নে পোর্টব্লেয়ার হইতে গবর্ণমেণ্টের ষ্টীমার ছাড়ে এবং দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া পরদিন প্রাতঃকালে কার নিকোবার দ্বীপে উপনীত হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌশুমী বায়ু যখন প্রবল হইয়া উঠে, তখন পূর্ব্ব উপকূলবর্ত্তী মাস বা মালাক্কা প্রভৃতি গ্রামগুলির কাছে উহাকে নোঙ্গর ফেলিতে হয়। অন্যান্য সময়ে উপকূল হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে সাধারণতঃ সাউই উপসাগরের ভিতর উহা অবস্থান করে।

উনিশটি দ্বীপ লইয়া নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ গঠিত। মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, দেখা যাইবে, এই উনিশটী দ্বীপ সাড়ে ছয় হইতে সাড়ে নয় ডিগ্রীর

কারনিকোবার উপকূলে।

ভিতর উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত। দূর উত্তরে দেখা যায় কার নিকোবার দ্বীপ। ১৪০ খৃষ্টাব্দে টলেমী দ্বীপপুঞ্জগুলিকে

'সার্কা' আখ্যা দিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে উহারা পর্তুগীজ অধিকারে ছিল এবং মালাক্কার রাজপ্রতিনিধি উহাদের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। উপনিবেশ-স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়া দিনেমারগণ ১৭৬৬ হইতে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কয়েকবার

দাঁড় লইয়া দণ্ডায়মান দ্বীপবাসী।

আক্রমণ করিয়াছিলেন; অবশেষে, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে এই দ্বীপপুঞ্জ ব্রিটিশের অধিকারে আসে।

উনিশটী দ্বীপের মধ্যে বারোটী দ্বীপে লোক বসতি করে। মোট সমতলভূমির পরিমাপ ৬৩৫ বর্গ মাইল। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের লোক গণনায় দেখা যায়, মাত্র নয় হাজার নয় শত আশী জন লোক উক্ত দ্বীপপুঞ্জে বসবাস করে, তন্মধ্যে সাত হাজার চারিশত বিরানব্বই জন লোক থাকে উনপঞ্চাশ বর্গ-মাইলবিশিষ্ট কারনিকোবার দ্বীপে।

নিকোবারের অধিবাসীরা অতি আদিম মানব-জাতির অন্যতম শাখা-বংশধর। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে বর্ম্মা এবং মালয় প্রদেশ হইতে যাহারা এই সব দ্বীপে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল, ইহারাই তাহাদিগের বংশধর। জনসংখ্যা অত্যন্ত অল্প। ইহাদিগের বিশেষ বংশবৃদ্ধি হয় নাই। ক্রমবর্দ্ধিত মানব-সভ্যতার সংবাদ ইহারা রাখে না এবং এখনও বাহিরের কোনরূপ প্রভাব ইহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া শান্তি এবং শৃঙ্খলতার সহিত ইহারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে।

নিকোবার দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীবৃন্দ খাঁটি প্রেত উপাসক, অথচ প্রাণে প্রেতের ভয়ও আছে। ইহারা বাহিরের কোন রূপ সাহায্যের প্রত্যাশা করে না; এজন্য পরামুখাপেক্ষীও নহে। নিজেদেরই যে প্রাকৃতিক বিভব আছে, (অর্থাৎ নারিকেল, শূকর ও কুক্কুট-শাবক, বিভিন্ন প্রকার মৎস্য, চুণ, কদলী প্রভৃতি) তাহার কল্যাণে আত্মনির্ভরশীল। অন্তরের সারল্য, আতিথেয়তা প্রভৃতি সদ্‌গুণ ইহাদের ভিতর দেখা যায়। ইহাদের কার্য্য করিবার স্পৃহা নাই বলিলেই চলে। জল-বায়ুই ইহার একমাত্র কারণ। প্রখর রৌদ্রের উত্তাপ বলিয়াই বোধ হয় ইহারা দিবাভাগে নিদ্রালু হয় এবং রাত্রিতে নিশা-চরের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়, কখন অন্যান্য গ্রামে যায়, কখন বা পাল-পার্ব্বণে অত্যন্ত উৎসব-মত্ত হয়, আবার কখন বা মৎস্য ধরিতে বাহির হইয়া থাকে।

অনেকের ঘরে আলো জ্বালিবার জন্য চকমকি-প্রস্তর আছে। অধুনা বিদেশী বণিকরা এই সব দ্বীপে দিয়াশালাই আমদানী করায় অধিকাংশ গ্রামে ইহার প্রচলন দেখা যাইতেছে। বাহিরে দীপালী করিবার সময় দ্বীপবাসীরা নারিকেলের মালা বা পাতা জ্বালাইয়া থাকে এবং স্ব স্ব কুটীরে নারিকেল তৈল বা শূকরের চর্ব্বি দিয়া প্রদীপের আলো রক্ষা করে। ইহাদের প্রধান পানীয় নারিকেলের জল।

দ্বীপবাসীদিগের নৃত্য।

কারনিকোবার দ্বীপে পরিবারবর্গ লইয়া প্রায় তিনশত ব্যবসায়ী আছেন। ইঁহাদের বেশীর ভাগই ভারতবাসী, কিন্তু

সেখানে বাঙ্গালীকে দেখা যাইবে না। নানকৌউরি, কোমোর্টা, কচাল, তেরেসা এবং বোমপোকা—এই কয়টী

নিকোবার রমণী।

অনুচর সহ নিকোবার পল্লী সর্দ্দার।

দ্বীপ লইয়া যে কেন্দ্রপুঞ্জ গঠিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে একশত কুড়ি জন চৈনিক ব্যবসায়ী বেশ পসার-প্রতিপত্তি করিয়া লইয়াছেন। ইঁহারা সকলেই পেনাঙ হইতে আসিয়াছেন।

সামান্য পরিমাণে চাউল, বস্ত্র, কেরোসিন, রূপার তার, তামাক, দিয়াশালাই, দা, লৌহদ্রব্য, লবণ, শর্করা, জপমালা,

নিকোবার যুবক।

আয়না প্রভৃতি লইয়া ব্যবসায়ীরা দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদিগকে বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে আসিয়া থাকেন। এই দ্বীপপুঞ্জে মুদ্রার

সমুদ্র উপকূলে।

প্রচলন না থাকায় দ্রব্য-বিনিময়ের দ্বারাই ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতে হয়। এক টাকার সমান ৬৮টি নারিকেল। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট এই হিসাব ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন।

যদি এক টিন কেরোসিন তৈল দ্বীপের ভিতর বিক্রয় করা যায়, তাহা হইলে মূল্যস্বরূপ দুই শত নারিকেল পাইবে।

নিকোবার বালকগণ।

একটি শূকর-শাবকের মূল্য ছয় শত হইতে দুই হাজার নারিকেল। প্রত্যেক বিদেশী বণিক বা তাহার ভৃত্যকে বৎসরে দুই টাকা গবর্ণমেণ্ট-ট্যাক্স দিতে হয় এবং রপ্তানী-দ্রব্যের শতকরা দশ ভাগের উপর গবর্ণমেণ্ট শুল্ক আদায় করেন। নারিকেল, নারিকেলের শুষ্ক শাঁস,—ঝিনুক, শুক্তি প্রভৃতি ছোট জাপানী মোটরবোটে বোঝাই দিয়া চালান দেওয়া হয়। এই সব দ্রব্য সিঙ্গাপুরে যায়। সেখানে যে সব বোতাম প্রস্তুতের কারখানা আছে, সেই সব স্থানে ঝিনুক জমা হয়। জাপানী ডুবুরিরা সুদক্ষ এবং কোনরূপ সাহায্য না লইয়া ৫০ ফিট পর্য্যন্ত সমুদ্র-গর্ভে অনায়াসে যাইতে সক্ষম। ইহারাই চোখে চশমা পরিয়া ঝিনুক সংগ্রহ করে।

দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এবং চিত্তাকর্ষক যে কয়টি দ্বীপ আছে, তন্মধ্যে চৌউরা অন্যতম। ইহার আয়তন ক্ষুদ্র এবং অধিবাসীর সংখ্যা ৭২০; অন্যান্য দ্বীপের অধিবাসীদিগের অপেক্ষা এখানকার লোকেরা বলিষ্ঠ বলিয়া সকলেই ইহাদিগকে বড় বলিয়া স্বীকার করে।

নিকোবার দ্বীপবাসীরা ডাকিনী বিদ্যায় পারদর্শী। ইহাদের ধর্ম্মের এরূপ মাহাত্ম্য যে, পিশাচদিগকে ভয় দেখানো বা মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া তুষ্ট করা একমাত্র ইহাদের দ্বারাই সম্ভব। নতুবা ভূতের দৌরাত্ম্যে উহাদিগের বসবাস করা একরূপ অসম্ভবই হইত। ওঝারা প্রেতদিগকে ক্রীতদাসের মত ব্যবহার করে এবং যাহা আদেশ করে, তাহাই প্রেতগণ পালন করে। কোন প্রেত ওঝার আদেশ লঙ্ঘন করিলে, তাহাকে মন্ত্রবলে সমুচিত শাস্তি দেওয়া হয়।

ডাকিনী বিদ্যাচর্চ্চা চৌউরা দ্বীপেই বিশেষভাবে হইয়া থাকে। কারনিকোবার হইতে চৌউরায় সমুদ্রের উপর দিয়া শাল্তি করিয়াই দ্বীপবাসীরা যাতায়াত করে। যাইতে ১৫ হইতে ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে। পূর্ণিমা রজনীতেই ইহারা যাইতে অভ্যস্ত। যখন প্রকৃতি শান্ত থাকে এবং আবহাওয়া অনুকূল হয়, তখন বড় ডিঙ্গায় করিয়া ত্রিশ চল্লিশ জন একত্রে চৌউরাভিমুখে যাত্রা করে। কারনিকোবার হইতে চৌউরা চল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত। যদিও নিকোবারের অধিবাসীরা অলস, তথাপি তাহারা সমুদ্রের জলরাশি ভেদ করিয়া চৌউরা হইতে রন্ধনের পাত্রাদি আনিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। যাইবার সময় টক্ ফল, মুর্গী প্রভৃতি তাহারা লইয়া যায় এবং মাঝে মাঝে ডিঙ্গা হইতে হাঙ্গর অথবা শিশুমার প্রভৃতি জলজন্তুদিগের উদ্দেশে কিছু কিছু ফল, মুর্গী দূরে নিক্ষেপ করে, নতুবা সেই সব জন্তু ডিঙ্গার কাছে আসিবার সুযোগ পাইলে তাহাদিগকে ডুবাইয়া মারিতে পারে।

দ্বীপপুঞ্জের কেন্দ্র হইতে খানিকটা দক্ষিণে নানকৌউরি এবং কোমোর্ত্তার মাঝামাঝি স্থানে সমুদ্রমধ্যে সুন্দর প্রাকৃতিক পোতাশ্রয় রহিয়াছে।

নিকোবার দ্বীপের পল্লী।

বিগত ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে অন্নকণের জন্য জার্ম্মানীর 'এমডেন'
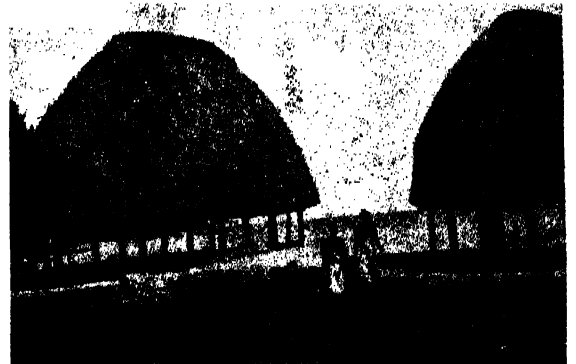
এখানে লুকায়িত ছিল। যদি 'এমডেন' এখানে থাকিবার সুযোগ পাইত, তাহা হইলে ভারতে কামানের গর্জ্জন-ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইত—ইহা অনুমান করা অসম্ভাব্য কিছুই নহে। শ্রীমতী ব্রিজকুমার ইন্দ্রানী সে সময়ে গবর্ণমেণ্টের এজেণ্টরূপে দ্বীপপুঞ্জের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। এই কর্ত্তব্যপরায়ণা এবং সুদক্ষা ভারতমহিলার জন্য জার্ম্মানীরা

এখানে জার্ম্মাণ ক্রুজার 'এমডেন' লুকায়িত ছিল।

বঙ্গোপসাগরে ঘাঁটি করিবার সুযোগ পাইল না। শ্রীমতী ব্রিজকুমার ইন্দ্রানী কর্ত্তৃক 'ইউনিয়ান জ্যাক্' পতাকা উত্তোলিত হইতে দেখিয়া 'এমডেন' দ্রুতবেগে পলায়ন করে।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীমতী ইন্দ্রানী দেহত্যাগ করিলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার জন্য স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া পতাকাধারী কাষ্ঠখণ্ডের ভিতর খোদিত করিয়া দেন :—

IN MEMORY of
SHRIMATI BRIJKUMAR INDRANI
Widow of Lala Ratti Lall
Assistant Government Agent, NanCowry. Who died at NanCowry, 20th January 1919, aged 39.

২৭ বৎসর ধরিয়া এই ভারতীয় রমণী দ্বীপপুঞ্জের প্রত্যেক অধিবাসীর হৃদয় স্নেহ-ভালবাসা দিয়া জয় করিয়াছিলেন। দ্বীপবাসীরা সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে নানকৌউরী দ্বীপে জার্ম্মান ক্রুজার 'এমডেন' আসিলে তিনি যে রাজভক্তি, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং শৌর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে ভারত গবর্ণমেণ্ট মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পারিতোষিক প্রদান করেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে আন্দামান এবং নিকোবার দ্বীপপুঞ্জের চিফ-কমিশনারের আদেশানুসারে শ্রীমতী ইন্দ্রানীর পুণ্য-স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হয়।

১৮৭০ হইতে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নির্ব্বাসিত ভারতবাসীদিগকে কোমোর্ত্তায় রাখা হইত, কিন্তু পোর্ট-ব্লেয়ার হইতে অনেক দূর বলিয়া নানারূপ অসুবিধা হওয়ায় এবং ম্যালেরিয়ার তীব্র প্রাবল্য অনুভূত হওয়ায় উক্ত স্থানটি পরিত্যক্ত হয়। এখানে একটি পাহাড়ের উপর কেশুর বৃক্ষের অন্তরালে মিঃ ডি. রোপষ্টর্ফের সমাধি-বক্ষে একখানি স্মৃতিলিপি মাত্র অতীতের সাক্ষ্য দিতেছে। এতদ্ব্যতীত সেখানে আর কিছুই নাই। মিঃ ডি. রোপষ্টর্ফ পেনাল সেটেলমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষ ছিলেন এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে জনৈক সিপাহীর দ্বারা নিহত হন।

ভারতবর্ষের জাগরণ

যে পল্লীগ্রামে সমগ্র ভারতবাসীর শতকরা ৯৭ জন এখনও বসবাস করিয়া থাকেন, সেই পল্লীগ্রামে ত্রিশ বৎসর আগেও সজীবতা ও স্বাবলম্বনের চিহ্ন দেখা যাইত, অথবা যে আনন্দের কোলাহল শোনা যাইত, এখন আর তাহা দেখা যায় না এবং শোনা যায় না। যাঁহারা শিক্ষাভিমানী এবং ঐ অভিমানে ভারতে জাগরণ আসিয়াছে বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তাঁহারা এমনই শিক্ষা পাইয়াছেন যে, চক্ষু থাকিতে তাঁহারা অন্ধ এবং কর্ণ থাকিতেও বধির।

উদো এবং বুদো

—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

কীর্ত্তিমান কলিকাতায় জ্যাঠার বাড়ীতে থাকিয়া কলেজে পড়ে। আপন জ্যাঠা নয়, জ্ঞাতি—তিন পুরুষের মধ্যে। জ্যাঠা ছোটখাট জমিদার, বাঁকুড়া জেলায় জমিদারী। আয় বেশী না হইলেও, কলিকাতার বাড়ীতে গৃহস্থচালে চলিয়া যায়। জ্যাঠার তৃতীয় পক্ষের তিনটি ছেলে, তিনটিই নাবালক; প্রথম পক্ষের একটি কন্যা, শ্বশুরগৃহে স্বামীপুত্র লইয়া বাস করে; দ্বিতীয়পক্ষ জগতের জনবল বৃদ্ধি করিবার অবসর পান নাই। কীর্ত্তি বাঁকুড়ার কলেজ হইতে আই-এ পাস করিয়া জ্যাঠাকে অনেকগুলি চিঠি লিখিয়া তাঁহার বাড়ীতে থাকিয়া বি-এ পড়িবার অনুমতি পাইয়াছে। কলিকাতায় আসিয়া সে শুনিয়াছে, জ্যাঠাইমার আগ্রহেই এই অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। তাই সে জ্যাঠাইমার প্রতি বিশেষ ভক্তিমান। জ্যাঠাইমার নাবালক তিনটিকে সে বাড়ীতে পড়ায়, জ্যাঠাইমার সংসারের সাশ্রয় হইবে বলিয়া পড়ার ক্ষতি করিয়াও যখন তখন বাজার যায় এবং বাজারের নিখুঁত হিসাব দিতে খুঁত থাকিয়া গেলে তিরস্কৃত হইয়াও মন খারাপ করে না। পাল-পার্ব্বণে জ্যাঠাইমাকে গঙ্গাস্নান করাইয়া আনিতে ক্লেশ অনুভব করিলেও অস্বীকার যেমন করে না, থিয়েটার-বায়োস্কোপে তাহার নিজের নিদারুণ অরুচি থাকা সত্ত্বেও জ্যাঠাইমার প্রীত্যর্থে সেগুলিতে গিয়া সময় নষ্ট করিতে সে আপত্তি করে না।

এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। হঠাৎ একদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া গৃহাভ্যন্তরের ভাবান্তর দেখিয়া কীর্ত্তি স্তব্ধ হইয়া গেল। চাকর-ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়া বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিল না। জ্যেঠতুতো ভাইয়েরাও কিছু বলিতে পারিল না। শুধু এইটুকু জানা গেল, তাহাদের পিতা বিশেষ অসুস্থ, জ্যাঠাইমা সেইখানে আছেন, সে ঘরে যাইতে সকলের মানা।

কীর্ত্তি ভাইদের লইয়া পার্কে চলিয়া গেল এবং সেখানে যথা নিয়মে শরীরচর্চ্চা করিয়া সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিল। ভৃত্য আসিয়া খবর দিল, বাবু ডাকিয়াছেন।

কীর্ত্তি জ্যাঠার ঘরে ঢুকিল। ঢুকিবার সময় বুকটা একটু কাঁপিল, পা দু'টা যেন একটু দ্বিধা করিল। মনে হইল, জ্যাঠা মহাশয় বুঝি বা খুব বেশী অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, তিনি তাকিয়ায় ঠেস দিয়া তামাক টানিতেছেন। ঘরের দ্বার-জানালা বেশীর ভাগই বন্ধ, ধোঁয়ায় ঘর ভরিয়া গিয়াছে; সুগন্ধি তামাকের মিষ্ট গন্ধটি ঘরময় ভর ভর করিতেছে।

জ্যাঠামহাশয় বুড়া হইয়াছেন, অন্ততঃ চুলে বার্দ্ধক্যসন্ধির পতাকা উড্ডীন হইয়াছে, এককালে সুশ্রী সুপুরুষ ছিলেন, চেহারায় এখনও তাহার রেশ আছে, রঙটি কাঁচা সোনার মত ছিল, এখনও চক্‌চকে নূতন পয়সার মত দেখায়; জ্যাঠামহাশয়ের নাম শ্রীযুক্ত নসীরাম সরকার।

নসীরাম বাবু একবার কীর্ত্তিকে দেখিলেন, একবার নলে টান দিলেন, তখনই নলটি নামাইয়া তাকিয়ার পার্শ্বে রাখিয়া দিয়া, ঊর্দ্ধমুখে কি ভাবিয়া লইয়া বলিলেন, কীর্ত্তি, সব শুনেছ?

নসীরাম বাবুর ভাঙা গলা শুনিয়া কীর্ত্তি মনে মনে শঙ্কিত হইয়া বলিল, কিসের কথা বলছেন?

নসীরাম বাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, বলিলেন, শোন নি? বাড়ীতে ছিলে না বুঝি?—স্বরে বিস্ময়ের সঙ্গে বিরক্তি মিশ্রিত।

কীর্ত্তিমান চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

—আমার বিষয়-আসয় সব নীলেম হয়ে গেছে।

—নীলেম!

—হ্যাঁ, এক ছটাক জমিও নেই।

কীর্ত্তি নীরব। এমন অসম্ভাব্য ঘটনা কিরূপে সম্ভব হইতে পারিল, স্তব্ধ ভাবে তাহাই সে চিন্তা করিতেছিল।

নসীরাম বাবুর ভাঙা গলা ক্রমশঃই আরও ভাঙিয়া পড়িতেছিল, বলিলেন, স্ত্রীপুত্র নিয়ে গাছতলায় দাঁড়াতে হল!—একটা বুকভাঙা নিঃশ্বাস বাহির হইয়া যেন ঘরময় হা হা করিয়া ছুটিয়া কোথায় চলিয়া গেল।

কীর্ত্তিমান জিজ্ঞাসা করিল, এ বাড়ীও কি—

নসীরাম বিরক্তভাবে বলিলেন, এ বাড়ী এখনও নীলেম হয় নি বটে, তবে বিক্রী হয়ে যাবে। খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে হলে একে বিক্রী করা ছাড়া আর উপায়ই বা কি!

ইহার পরে কেহ আর কোন কথা বলিলেন না, ঘরের ভিতরটা গুমোট হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কীর্ত্তি চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতে, নসীরাম বাবু বলিলেন, বলতে আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু না বলেও উপায় নেই, তুমি বাবা অন্য কোথায়ও—কথাটা তিনি শেষ করিতে পারিলেন না। তাহার প্রয়োজনও ছিল না।

কীর্ত্তিমান বুঝিল ঐ অসমাপ্ত কথাটির ফলে সে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িল। মাথায় কাহারও আকাশ নামক কোন বস্তু ভাঙিয়া পড়ে কি না জানি না, তাহার মনে হইল, ঐ কড়ি-বরগা, ছাদ সমেত সমস্ত ঘর-বাড়ী, আকাশ, গাছ-পালা সব এক সঙ্গে তাহার মাথার উপরে আসিয়া পড়-পড় হইয়াছে।

নসীরাম বাবু বলিলেন, তোমার ভার খুব বড় ভার নয় তা আমি জানি; কিন্তু আমার এখন যা অবস্থা দাঁড়াল, তাতে স্ত্রী-পুত্রের ভারটাও না নামালে চলবে না। এই বয়েস, চাকরী করতেও পারব না, পারলেই বা দিচ্ছে কে! তাই মনে করছি, তোমার জ্যেঠাইমাকে ছেলেপুলে সঙ্গে মুক্তা-ডাঙ্গায় পাঠিয়ে দোব, আর আমি, যে কটা দিন আছি, কাশীর কোন সত্রে-টত্রে গিয়ে উঠি।

এই চিত্রের কল্পনামাত্রেই কীর্ত্তির চোখে জল আসিয়া পড়িতে চাহিল। সে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

অন্ধকার বারান্দায় কে একজন লোক গুটিসুটি হইয়া বসিয়া ছিল, তাহার গায়ে পা লাগিয়া যাইতে কীর্ত্তি বলিয়া উঠিল, কে রে!

—আমি!

—জ্যাঠাইমা! তুমি!—বলিয়া মনে মনে শতবার জিভ কাটিয়া, পাশে বসিয়া পড়িয়া অনেকবার করিয়া তাঁহার পায়ের ধুলা লইয়া মাথায়, মুখে, বুকে ঠেকাইয়া কীর্ত্তি দাঁড়াইয়া উঠিল।

জ্যেঠাইমা কাঁদিতেছিলেন, যে-হাত দিয়া তিনি চক্ষু মুছিলেন, সেই হাতেই কীর্ত্তির চিবুক স্পর্শ করিলেন, হাত ভিজা। কীর্ত্তি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রাত্রির সঙ্গে অন্ধকার বাড়িয়া চলিল, কলিকাতা সহর ক্রমেই কলরবহীন হইয়া পড়িল, এ বাড়ীর জীবজন্তুগুলি (পালিত বা অপালিত জন্তু কলিকাতার কোন বাড়ীতেই বা নাই?) আজ বহু পূর্ব্বে মূক হইয়া গিয়াছিল।

[২]

সাতাশ দিনের দিন একজন গৃহস্থ কথা বলিল। কীর্ত্তি কলিকাতা শহরের বড় বড় রাস্তা ধরিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া প্রাইভেট টিউসনীর খবর লইয়াছে, সবাই এক উত্তর দিয়াছে, না। এতদতিরিক্ত একটি শব্দ কেহ বলেও নাই, শুনেও নাই। আজ এক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাড়ী কোথা?

—বাঁকুড়া।

—দুর্ভিক্ষের দেশ!

কীর্ত্তিমান আশঙ্কা করিতেছিল, এইবারই চিরপরিচিত শব্দটি উচ্চারিত হইবে। তাহা হইল না। গৃহস্থ বলিলেন, কলেজে পড়েন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কি পড়েন?

—বি-এ।

—ক'টাকা মাইনে চান?

কীর্ত্তি মাথা চুলকাইয়া, সভয়ে, সবিনয়ে, সসঙ্কোচে কহিল, আজ্ঞে, কাকে পড়াতে হবে, কি পড়ে—

লোকটি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আহা, কি মুস্কিল! আপনি কি চান তাই বলুন না।

যদি কথার পিঠে কথা বাড়িতে বাড়িতে সেই ভীতিজনক শব্দটি বাহির হইয়া পড়ে, কীর্ত্তি ভয়ে ভয়ে বলিল, কুড়ি টাকা!

গৃহস্থ চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, কুড়ি টাকায় আপিসের কেরাণী পাওয়া যায়, ১০ টা ৮টা ডিউটী, দশটি ঘণ্টা বুঝেছেন।

—আজ্ঞে আপনি কত দেবেন?

—পাঁচ টাকা। পারেন কাল থেকে আসবেন। বলিয়া তিনি অন্তঃপুরের দিকে মুখ ফিরাইলেন, হাঁকিলেন, ভ্যাবা,

ভ্যাবা, তেলের বাটী দিয়ে যা না বেলা হচ্ছে না? আপিস যেতে হবে না?

কীর্ত্তিমান দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া চটিয়া উঠিলেন, বলিলেন, পাঁচ টাকায় রাজী থাকেন, কাল সকালে আসবেন, নইলে যান মশাই, আমার আর কথা বলবার সময় নেই।

—আজ্ঞে কালই আসব। কিন্তু—

—আবার কিন্তু কিসের! আর একটি কাণাকড়িও পারব না। কই রে, ভ্যাবা! বেটাচ্ছেলের কোন আক্কেল যদি—বোধ হয় আক্কেলহীনকে আক্কেল দিবার জন্য তিনি দ্রুত ধাবিত হইলেন।

পরদিন প্রভাত হইতেই, কীর্ত্তিমান আসিয়া হাজির হইল। বাবুটি রোয়াকে বসিয়া, কোঁচার খুঁট গায়ে বিড়ি ফুঁকিতেছিলেন, কীর্ত্তিকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, এত সকালেই এসে হাজির হয়েছেন, এখনো ত তারা কেউ ওঠেই নি।

কীর্ত্তির মনটা ভয়ে কাঁপিতেছিল, বাবুটির বিরক্তি দেখিয়া সে ভাবিতেছিল, এত সকালে না আসাই উচিত ছিল। কিন্তু আসা যখন হইয়াই গিয়াছে, তখন আর কি করা যাইবে!

বাবুটি কোন কথাই বলেন না; একটির পর আর একটি বিড়ি ধরাইয়া টানিতে লাগিলেন। কীর্ত্তি তাঁহার পানে চাহিয়া সেই সকালবেলাতেও ঘামিতে লাগিল।

বাবুটি বিড়ি নিঃশেষ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং বক্র দৃষ্টিতে একবার কীর্ত্তিকে দেখিয়া লইয়া অন্দরের দিকে যাইতে যাইতে বলিলেন, ওরা কেউ ওঠে নি।—বলিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি থাকিতেও বলিলেন না, যাইতেও আদেশ করিলেন না। এমতাবস্থায় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া কীর্ত্তি রাস্তায় পায়চারী করিতে লাগিল।

আজ কয়দিন কলিকাতার রাস্তার কলের জলের অতিরিক্ত কিছু তাহার পেটে যায় নাই। আজ যদি চাকরীটা হয়, তাহা হইলে কাহারও নিকট হইতে কয়েকটা পয়সা কর্জ্জ করিয়া কোন পাইস-হোটেলে ঢুকিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবে। আর যদি চাকরীটি না হয়, তাহা হইলে? তাহা হইলে সে যে কি করিবে, এখনও সে তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারে নাই। সাতদিন সে খায় নাই বটে, কিন্তু কলেজ কামাই একটি দিনও করে নাই। হাঁটিয়া যাইতে পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ক্লাশে বসিয়া থাকিতে থাকিতে হাতে পায়ে কাণে মাথায় তালা ধরিয়া অসাড় হইয়া গিয়াছে, তবুও ক্লাশ করিয়াছে। কিন্তু আজ যদি চাকরীটি না হয়, পেটে কিছু না যায়, তাহা হইলে আজ কলেজ যাইতে পারিবে কি?

কিছুক্ষণ পরে বাবুটি দুইটি ছেলে ও তিনটি মেয়ে সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। কীর্ত্তি সসম্ভ্রমে সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

বাবুটি বলিলেন, এদের পড়াতে হবে।

কীর্ত্তি একগাল হাসিয়া বলিল, যে আজ্ঞে।—বলিয়াই রোয়াকে উঠিয়া পড়িয়া সব চেয়ে বড় ছেলেটির পিঠে হাত রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, খোকা, তুমি কি পড়?

খোকা বলিল, আমি ক্লাশ টুয়ে পড়ি। নদি ক্লাশ ওয়ানে পড়ে, বলিয়া খোকা তাহার পার্শ্ববর্ত্তী বালককে দেখাইয়া দিল।

কীর্ত্তি বড় মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি পড় খুকী?

ছোট্ট মেয়েটি লাফাইয়া লাফাইয়া বলিল, ও বুঝি খুকী? খুকী ত আমার নাম। ও দিদি, তোকে খুকী বলছে!

তাহার দিদি ছোট বোনের এই অসভ্যতার জন্য দারুণ চটিয়া গিয়াছিল, রাগতভাবে বলিল, তুই থাম্।—মাষ্টারের দিকে ফিরিয়া বলিল, আমি থ্রি ক্লাশে পড়ি, সুধীরা টু ক্লাশে পড়ে; আর ও—

—আমি হাসিখুসী পড়ি!

বাবুটি কখন প্রস্থান করিয়াছিলেন; কীর্ত্তি তাহা দেখে নাই, এখন দেখিল। তাহার ছাত্র-ছাত্রীদের বলিল, তোমরা কোথায় বসে পড়?

ছোট মেয়েটি অর্থাৎ খুকী বলিল, এস না দেখাই, ঐ ঘরে।

ঘরে আসিয়া পড়ান আরম্ভ হইল। বাবুটি কয়েকবার আসিলেন, গেলেন, পড়ান কেমন হইতেছে বোধ হয় তাহাও দেখিয়া গেলেন; শেষে তেলের বাটি লইয়া সেই ঘরের মেঝেতে বাবু হইয়া বসিয়া অঙ্গে তৈলমর্দ্দন করিতে লাগিলেন।

ছোট্ট মেয়েটি হাসিখুসী ফেলিয়া রাখিয়া পিতার কাছে ছুটিল—বাবা, তেল মাখি...

মাখ।

বেলা ৯॥০টা বাজে দেখিয়া পড়ান শেষ করিতে হইল। ছেলেরা বই খাতা রাখিয়া বই খাতার বাক্স হইতে মার্বেল-গুলি, লাটু, ইত্যাদি লইয়া রাস্তার দিকে ধাবমান হইল। কীর্ত্তি চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বাবুটি বলিলেন, দাঁড়িয়ে কেন?

—আজ্ঞে—কিন্তু কথাটা বলা হইল না।

বাবুটি বলিলেন, ৮টার সময় ওরা শোয়; সন্ধ্যে সন্ধ্যেয় পড়া করিয়ে দেবেন।

কীর্ত্তি সানন্দে কহিল, যে আজ্ঞে।

বাবু আবার বলিলেন, আবার দাঁড়িয়ে কেন?

—আজ্ঞে, মাইনের কথাটা?

বাবু বিরক্তভাবে কহিলেন, ওঃ সে কথা ত বলেই দিয়েছি, আগের মাষ্টার যা পেত, তাই পাবেন।

—তিনি—বাক্য অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল।

—পাঁচ টাকা! আগের মাষ্টার পাঁচ টাকা পেত।

ছোট্ট মেয়েটি পিতার ভ্রম সংশোধন করিয়া বলিল, আগের মাষ্টার ছ'টাকা পেত, বাবা।

—না হাবী! পাঁচ টাকা পেত; আপনিও ছ'টাকা, তাই পাবেন।

—আজ্ঞে দু'বেলা—পুনরায় বাক্য অসম্পূর্ণ রহিল।

—তার বেশী হবে না, বলিয়া বাবুটি এক হাতে তেলের বাটি, অন্য হাতে মেয়ের হাত ধরিয়া চলিয়া গেলেন।

অনাহার, পরিশ্রম, রৌদ্র ও নিরাশা সব কয়টি একত্র হইয়া তাহার মাথার মধ্যে আলোড়ন তুলিতেছিল। কিন্তু এই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া লাভ নাই ভাবিয়া কীর্ত্তি পথে আসিয়া পড়িল। সামনের একটা বড়বাড়ীর ফটকের সম্মুখে খঞ্জনী বাজাইয়া বৈষ্ণব ভিক্ষুক বিরহ গাহিতেছিল, তাহার ঝুলিটির পরিপূর্ণতা দেখিয়া কীর্ত্তির চক্ষু ঝলসিয়া উঠিল। এই যদি তাহার নিত্যকার রোজগার হয়, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুকের অবস্থা অনেক গৃহস্থের চেয়ে অনেকাংশে ভাল বলিতে হইবে।

দারোয়ান ফটক-সংলগ্ন ঘর হইতে একটা রেকাবীতে দুই মুষ্টি তণ্ডুল, গোটা দুই আলু আনিয়া ভিক্ষুকের ঝুলিতে ঢালিয়া দিলে, ভিখারী খঞ্জনী বাজাইয়া গুন্ গুন্ করিতে করিতে চলিয়া গেল। কীর্ত্তি ভাবিতেছিল, সে যদি অমনই ভাবে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে পারিত, তাহা হইলে পাঁচটা টাকা মাহিনার চাকরীর জন্য এমন লালায়িত হইতে হইত না। পাঁচ টাকায় পাঁচটি শিশুকে পড়াইতে হইবে, তাও এক বেলা নয়, দুই বেলা! পাঁচ টাকায় গ্রা সাচ্ছাদন চলিবে কি না তাহাতেও সন্দেহ আছে, কলেজের মাহিনা এক মাস বাকী পড়িয়াছে, আর এক মাস বাকী ফেলা চলিতে পারে, তাহার পর, চলে না; তখন কলেজ ত্যাগ করিতেই হইবে।

স্বগ্রামবাসী এক বন্ধুর ভুষোমালের দোকান ছিল। বন্ধুটি যে তক্তপোষে বসিয়া দিনের বেলা খাতা লিখিত, সেই তক্ত-পোষখানাই রাত্রে দুই বন্ধুর দেহাশ্রয় হইত। সে বন্ধুর রোজগারও যৎসামান্য, যাহা হয়, তাহাতে পাইস-হোটেলের ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া যাহা থাকে, তদ্দ্বারা বিড়ি-তামাকের খরচটাই কেবল উঠে। কান্তির সঙ্গে তাহার খুব ভাব, উভয়ে উভয়কে ভালবাসে। গভীর রাত্রে ইন্দুরের দল যখন শব্দ করিয়া ভুষোমালের বস্তা কাটিয়া আহার্য্য আহরণ করে, দুইটি বন্ধু তখন অন্ধকার ঘরে ছিন্ন মাদুরে শুইয়া দুঃখের কথাই কয়। ইহার কাছে চাহিলে যে দু'চার আনা পয়সা কীর্ত্তি পাইত না তাহা নহে; কিন্তু ইহার আর্থিক অবস্থা জানিত বলিয়াই কখনও হাত পাতে নাই। খালি পেট কলের জলে ভরাইয়াছে, তবু বন্ধুর কাছে ধার চাহে নাই। ঋণ পরিশোধ করিবার শক্তি যাহার নাই, ধার করা তাহার পক্ষে পাপ। আজ বন্ধুর কাছে দুই আনা পয়সা চাহিয়া লইল। আজ তাহার বিশ্বাস হইল যে, মাসান্তে মাহিনা পাইলে এই দুই আনা ঋণ শোধ করিতে পারিবে।

বিশ্বের ক্ষুধা যাহার জঠরে অনল প্রজ্জ্বলিত রাখিয়াছে, দুই আনায় তাহার কি হইবে? যিনি ক্ষুধা দেন, আহার দিবার মালিক কি তিনি নন? দুইয়ের নিয়ামক যদি এক, জগতে তবে এমন বৈষম্য কেন? আহারের সংস্থান বুঝিয়া ক্ষুধার পরিমাপ কি করা যায় না?

দু'টি ভাত পেটে পড়িতেই রাজ্যের ঘুম আসিয়া চোখ দুইটিতে চাপিয়া বসিল—কলেজ যাওয়া হইল না। পার্-সেণ্টেজ নাশের ভয় তাহার নাই, মাহিনার যোগাড় না হইলে কলেজই ঘুচিয়া যাইবে, তাই ভাবিতে ভাবিতে অনাহারে জর্জ্জরিত দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল, কীর্ত্তি ঘুমাইয়া পড়িল।

বন্ধু পাশে বসিয়া বেচা-কেনা করিতেছে, কীর্ত্তিকে জাগায়

নাই। যখন ঘুম ভাঙিল, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। মুখে চোখে জল দিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল, ছাত্র-ছাত্রীদের গৃহের উদ্দেশে। পথটা নিতান্ত কম নয়, যাইতে অনেক সময় লাগিল। গিয়া দেখিল, তাহার অপেক্ষা বয়স্ক এক ভদ্রলোক ছেলেমেয়েগুলিকে পড়াইতে বসিয়া গিয়াছেন। তাহাকে দেখিবামাত্র ছোটমেয়েটি বলিল, পুরোণো মাষ্টার মশাই এসেছে। বাবা বলেছে আপনাকে আর আসতে হবে না।

পুরোণো মাষ্টার মশায় চশমার ফাঁক দিয়া আগন্তুককে একটিবার দেখিয়া লইয়া পাঠনে মন নিবেশ করিলেন।

ছোট মেয়েটি উঠিয়া আসিয়া কীর্ত্তির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিল, বুড়ো মাষ্টার মশাই এক টাকা মাইনে বাড়াতে বলেছিল কি না, বাবা বাড়ায় নি বলে চলে গেছল। আজ এসে বললে, পাঁচ টাকাতেই থাকবে। তাই বাবা—

বুড়ো মাষ্টার মশায় হাঁকিলেন, খুকি, পড়বে এস।

খুকী 'যাচ্ছি' বলিয়া তাঁহাকে এক ধমক দিয়া বলিতে লাগিল, তাই বাবা বললে, তবে বুড়ো মানুষটাই থাক।—বক্তব্য শেষ করিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া আসিয়া খুকী আবার বলিল, বুড়ো মাষ্টার বড্ড কান মলে দেয়; আপনি পড়ালে বেশ হত।—বলিয়া খুকী চলিয়া গেল।

কীর্ত্তি বাহিরে আসিয়া বারান্দাটায় দাঁড়াইল। ইচ্ছা করিয়া দাঁড়াইল, অথবা চলচ্ছক্তি হারাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, বলা কঠিন।

সামনে সেই বড়বাড়ীর ফটক, যে ফটকে সকালবেলা পরিপূর্ণ ঝুলিস্কন্ধে ভিক্ষুককে সে দেখিয়াছিল। সে কেন ভিক্ষুক হইল না!

সন্ধ্যার পরই কীর্ত্তি দোকান-ঘরে ফিরিয়া আসিল। দেখিল, তাহার বন্ধু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে। মুখ শুষ্ক, চক্ষুর্দ্বয় কোটরে ঢুকিয়া গিয়াছে, মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছে না। অন্ধকে দেখিয়া অন্ধেরও কষ্ট হয়। জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিল, আসাম অঞ্চলের এক জমিদার-বাড়ীতে সে তিন মাস যাবত ঘোড়ার দানা, গরুর খড়, ভূষি ইত্যাদি জোগাইতেছিল, আজ তাহার দাম পাইবার কথা। গিয়া দেখে, জমিদার গরু-জরু ঘোড়া-মটর লইয়া রাতারাতি উধাও হইয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন কেহ জানে না; তবে কলিকাতায় যে নাই, তাহা সকলেই এক বাক্যে বলিয়াছে। তাহার পুঁজিপাটা গেল, দোকান গেল, সর্ব্বস্ব গেল। কীর্ত্তি বন্ধু তবু লেখাপড়া জানে, দুইটা পাস করিয়াছে, ছেলে পড়াইয়াও খাইতে পাইবে, সে-যে লেখাপড়াও জানে না।

কীর্ত্তি তাহার দুঃখের বারতাও ব্যক্ত করিল।

দুই বন্ধু দুঃখের কাহিনী কহিতে কহিতে রাত কাটাইয়া দিল। প্রভাতে একজন গেল পলাতক জমীদারের সন্ধান করিতে, অপরজন প্রথমতঃ প্রাইভেট টিউসনির খোঁজে বাহির হইল। সন্ধ্যাবেলা দুইজন ক্ষুৎপিপাসায় জীর্ণ হইয়া দোকানে ফিরিল।

দোকানের ভিতর কেরোসিনের ডিবা জ্বালাইয়া, দুই পয়সার মুড়ি আনিয়া দুইজনে ভাগাভাগি করিয়া চিবাইতেছে, তিনজন লোক উঁকিঝুঁকি মারিয়া দোকানে ঢুকিয়া পড়িল। একজন বলিল, আমরা বিদেশী, এই মাত্র সহরে এসে পৌঁছেছি, রাতটার মত একটু আশ্রয় পেতে পারি?

যাহার দোকান সে হতভম্বের মত খানিকক্ষণ লোকগুলির মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, যায়গা কোথায়?

লোকটি বলিল, আমরা ঐ খড়ের গাদাতেই শুয়ে থাকব।

কীর্ত্তির বন্ধু কীর্ত্তির পানে চাহিল, কীর্ত্তি নিম্নকণ্ঠে বলিল, তা থাকে থাক্ না, বলছে বিদেশী।

দোকানী বলিল, তা থাকুন।

লোকগুলি খড়ের গাদার ওপাশে গিয়া বসিল। কেরোসিনের ডিবার অন্ধকার-আলোকে তাহাদের ভাল করিয়া দেখা গেল না তাই, নহিলে তাহাদিগকে আশ্রয় দিতে এই সাদাসিধা লোক দুইটিও আঁৎকাইয়া উঠিত। দুই বন্ধু মুড়ি চিবাইতেছে, আগন্তুকদের একজন ডাকিল, একবার শুনুন!

কীর্ত্তি গেল।

—আমরা বিদেশী লোক, কলকাতায় কখনও আসি নি, পথ-ঘাট চিনি নে, দোকান বাজারও জানি নে। আপনারা আমাদের জন্যে কিছু খাবার-দাবার এনে দেবেন?

কীর্ত্তি বলিল, তা দোব।

—এই পাঁচটা টাকা নিন। আপনাদের খাওয়া হয়ে গেছে?

—না।

—ভালই হয়েছে। আমরা তিন জন, আপনারা দু'জন, পাঁচ জনের মত খাবার আনুন।

—কি কি আনব?

লোকটা হাসিয়া বলিল, সে আপনারা জানেন। এখানে কি পাওয়া যায় না যায়, আমরা তার কি জানি। বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে, পেট ভরে খেতে পেলেই হল। এই নিন, পাঁচ টাকার নোট।

কীর্ত্তি জিজ্ঞাসিল, ক' টাকার খাবার আনব?

লোকটা আবার হাসিল, বলিল, তাই বা আমি বলব কি করে? পেটভরা খাওয়া হয় পাঁচ জনের যাতে, এমন আনবেন।

— আপনারা একজন আসুন না আমার সঙ্গে।

তিনজনই না না করিয়া উঠিল। যে কথা কহিতেছিল, সেই বলিল, আমরা অনেক দূর থেকে আসছি কি-না, পা আর চলছে না। পেটে বেজায় আগুন জ্বলছে, নইলে এখুনি নাক ডাকিয়ে দিতুম। আপনি নিয়ে আসুন। তবে হাঁ, পাঁচ জনের মত আনবেন; আর ভাল জিনিষ যা তাই আনবেন। পাঁচ টাকাই খরচ হয়, হোক্। টাকার জন্যে কিছু আসে যায় না। বুঝলেন?

কীর্ত্তি ঘাড় নাড়িল। কিন্তু অত বড় দুর্বোধ্য কথাটা সে যে বুঝিয়াছিল তাহা বলা বড় কঠিন। টাকার জন্যে কিছু আসে যায় না, এ কথা তাহার কাণে যেমন নূতন, তেমনই অবিশ্বাস্য।

কীর্ত্তি ও তাহার বন্ধু খাবার কিনিতে চলিয়া গেলে আগন্তুকত্রয় বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া সেই প্রায়ান্ধকার ঘরে গুজ-গুজ ফুস্-ফুস শব্দে বাক্যালাপ করিতে লাগিল। তাহাদের কথাবার্ত্তা এত গোপনে ও ঠারে-ঠোরে ইসারা-ইঙ্গিতে চলিতেছিল যে আমরা অন্তর্যামী-শ্রেণীর লোক হইয়াও তাহার একটি বর্ণ উদ্ধার করিতে পারিলাম না।

প্রকাণ্ড দুই চ্যাঙড়ায় করিয়া খাবার আসিল। যাহারা ভাল খাবার এবং বেশী খাবার আনিবার জন্য পুনঃ পুনঃ এবং সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিল, তাহারা ভোক্তা আদৌ ভাল নয়। সামান্য কিছু খাইয়াই হাত গুটাইয়া বসিল এবং তাহাদের আশ্রয়দাতাদের পেট ভরাইয়া খাওয়াইতে লাগিল। সাধ্যের অতিরিক্ত খাইয়া তাহারা হাঁসফাঁস করিতেছে দেখিয়া ইহাদের সে কি হাসি!

এইরূপে অত্যল্প সময়ের মধ্যেই বন্ধুত্ব জমিয়া উঠিল এবং সেই রাত্রিতে নিদ্রামগ্ন হইবার পূর্ব্বেই স্থির হইয়া গেল যে, বিদেশী অতিথিরা ইচ্ছা করিলে যতদিন খুসী এই দোকান-ঘরের মধ্যে থাকিতে পারিবে।

— কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা সব আপনাদের করতে হবে, আমরা টাকা দিয়েই খালাস। কালকের জন্যে এই দশটা টাকা নিয়ে রাখুন।

—কাল নোব'খন।

—না, না, আমরা মশাই বিদেশী লোক, কত বেলায় উঠি, তার ঠিক কি! সমস্ত ভার আপনাদের! বেশী খরচ হয়, সো ভি আচ্ছা। টাকা-পয়সার জন্যে কিছু আসে যায় না। - তাহারা খড়ের গাদায় উঠিল

ইহারা আধভাঙ্গা তক্তপোষের ছেঁড়া চ্যাটাইয়ের উপর শুইয়া ভাবিতে লাগিল, টাকা-পয়সার জন্যে কিছু আসে যায় না। এ কেমন কথা গা!

চাল-ডাল, তরী-তরকারী আনিয়া কীর্ত্তি সকালেই রান্না চাপাইয়া দিল। দোকানপাট আজ বন্ধ, একদিনে এমনই বা কি ক্ষতি হইবে? আট আনা পয়সা বই ত নয়, ইহারা এ[illegible] টাকা হিসাবে ঘর ভাড়া আগাম দিয়াছে।

বিকালের দিকে আগন্তুক তিনটি সহর দেখিতে বাহির হইল। কীর্ত্তি দয়াপরবশ সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিল, কি জানি বিদেশী লোক, জনসমুদ্র-মাঝে যদিই বা হারাইয়া যায়! তাহারা বলিল, বেশী দূর যাব না, এই মোড়টা দেখে শুনেই ফিরে আসব। আপনারা খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় করুন। টাকা-পয়সা আছে ত?

—আছে।

—না, না, লজ্জা করবেন না, টাকা-পয়সার জন্যে আসে যায় না। বরং আর পাঁচটা টাকা রাখুন।

— আজ আর চাই নে।

—আহা, রাখুন না মশাই। মাংস-টাংস করছেন ত ওবেলা! আজ অমাবস্যা, বলির মাংস না খেলে মন ওঠে না।

দোকানী জিজ্ঞাসা করিল, বলির মাংস না হলে আপনারা খান্ না নাকি ?

—বলি হলেই ভাল হয়। অভাবে সবই চলে। বলিয়া তাহারা বাহির হইয়া গেল।

কীর্ত্তির বন্ধু বলিল, আমি বরং কালীঘাটে মা'র বাড়ী যাই, 'প্রসাদ' আনি। কথাটা বলেছে ভাল, অমাবস্যার রাত্রি, বলির মাংস খাওয়া মহাপুণ্য।

কীর্ত্তি বলিল, তাই যাও। আমি দোকান-ঘরে চাবি দিয়ে মাংসর মসলা-টসলাগুলো কিনে টিনে করে আনি।

সন্ধ্যার পরে কীর্ত্তি খড়ের গাদার ওপাশে মাংস চড়াইয়া দিয়া বসিয়া নিজের দুরদৃষ্টের কথা ভাবিতেছিল। তাহার দোকানী বন্ধু 'মার প্রসাদ' আনিয়া দিয়া আবার সেই নিরুদ্দিষ্ট জমিদারের পাত্তা করিতে গিয়াছে; দোকানের কপাট ভেজানই ছিল, হড় মড় করিয়া কপাট খুলিয়া দুইটা লোক দোকানের ভিতরে ঢুকিল। কীর্ত্তি বলিল, কে ?

—আমরা।

তাহারা কপাট বন্ধ করিয়া উনানের কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে, কীর্ত্তি একজনের পানে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল। তাহার জামায় রক্ত, কাপড়ে রক্ত, হাতে মুখেও রক্তের দাগ। কীর্ত্তি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সে লোকটি বলিল, একবার হাঁড়ীটা তুলুন ত !

কীর্ত্তি বিনাবাক্যব্যয়ে হাঁড়ী তুলিয়া ধরিল, লোকটা কি একটা বস্তু উনানের ভিতরে ফেলিয়া দিল। কাঠের উনান হইতে স্ফুলিঙ্গাকারে খানিকটা আগুন, এক রাশ ছাই উড়িয়া ছড়াইয়া পড়িল। লোকটি বলিল, দিন, হাঁড়ী বসিয়ে দিন; কি হচ্ছে ওতে ?

কীর্ত্তি ভয় পাইয়া গিয়াছিল, ভয়ে ভয়ে বলিল, মাংস।

—মাংস!—বলিয়া লোক দুইটি তাড়াতাড়ি গায়ের রক্তাক্ত জামা খুলিয়া ফেলিয়া বলিল, আর একবার হাঁড়ীটা তুলুন ত।

জামা দুটা উনানের ভিতর ফেলিয়া দিয়া একজন বলিল, হোক্, মাংস হোক।

অপরজন চক্ষুর ইঙ্গিতে তাহাকে কি বলিল; লোকটি কীর্ত্তিকে বলিল, এক বালতি জল চাই যে। আছে ?

—না। এনে দোব ?

—তা হ'লে বড় ভাল হয়।

কীর্ত্তি এইবার কতকটা সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, আপনাদের আর একজন ?

দু'জনেই একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, তার কথা আর বলবেন না, মারা গেছে, গাড়ী চাপা পড়ে।

ইহাদের জামার রক্তের কারণ এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়া কীর্ত্তি যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

জল আসিলে লোক দুইটি গা হাত পা ধুইয়া জামা বদলাইয়া খড়ের গাদার ধারে বসিয়া রহিল। কীর্ত্তি মাংস রান্না করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে দোকানী ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল, সহরে আজ বড় গণ্ডগোল। একজন সাহেবকে একটা লোক গুলি করিয়া মারিয়া নিজেও আত্মহত্যা করিয়াছে। পুলিশে সহর ছাইয়া ফেলিয়াছে। আমাদের এই মোড়টাতেও অনেক পুলিস, ঘোড়সওয়ার দাঁড়িয়ে আছে।

কেরোসিনের ডিবার আলোতে কাহারও মুখ দেখা যায় না, তাই, নহিলে দেখা যাইত যে, শ্রোতৃবর্গের মুখের সমস্ত রক্ত নিঃশেষে নামিয়া গিয়াছে। বাড়ার ভাগ, কীর্ত্তির হাত-পাগুলা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে।

দোকানী বলিতে লাগিল, ট্রাম থেকে, বাস থেকে লোককে টেনে টেনে নামিয়ে জামা-কাপড় সব তল্লাস করছে; রাস্তা দিয়ে যত লোক যাচ্ছে, সকলকে থামিয়ে থামিয়ে পরখ করছে; আমাকেও ধরেছিল—

কীর্ত্তির দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল, শব্দ বাহির হইল, অ্যাঁ !

—জিজ্ঞেস করলে, কোথা গেছলে ? কোথায় থাক, বাসায় আর কে থাকে—

আগন্তুকদ্বয়ের একজন বলিল, সাত গোষ্ঠির খবর চায় বলুন ! মেয়ের বিয়ে দেবে না কি ? তারপর, তারপর ?

—আমি বললুম, খড়ের দোকান করি, একলাই থাকি, বাঁকুড়া জেলায় ঘর।

আগন্তুকদ্বয় স্বস্তির হাসি হাসিয়া বলিল, তারপর ?

—বললে, যাও। আমিও চলে এলুম। ও ভাই কীর্ত্তি, তোমার হল ?

কীর্ত্তি বলিল, মাংস নামিয়ে ভাত চড়িয়ে দিয়েছি, হল ব'লে।

আগন্তুকদের একজন বলিল, আপনার বড্ড খিদে পেয়েছে বুঝি ?

দোকানী হাসিয়া বলিল, খিদে পেলেই বা হচ্ছে কি বলুন? আজই না-হয় আপনারা আছেন, অন্যদিন খিদে পেলে কলের জল খেয়েই ত কাটাতে হয়। কি বল কীর্ত্ত ?

—কিছু খাবার আনুন না ততক্ষণ, এই নিন্ টাকা।।

—দরকার নেই। এখুনি ভাত হয়ে যাবে। আপনাদের অন্ত বাবুটি কোথায় গেলেন ?

—তার কথা আর বলবেন না! বলিয়া বিমর্ষমুখে নিঃশ্বাস ফেলিল।

কীর্ত্তি ব্যাপারটা বিবৃত করিল।

বন্ধুবিয়োগবিধুর বন্ধুদ্বয় আহারে বসিল মাত্র, খাইতে পারিল না। হাঁ গা, তাই কি পারা যায়? তিনজনে এক সঙ্গে সহর বেড়াইতে আসিল, সুস্থ মানুষ, অসুখ নয়, বিসুখ নয়, গাড়ী চাপা পড়িয়া টাটকা প্রাণটা বাহির হইয়া গেল, ইহাদের তাহাই চোখে দেখিয়া আসিতে হইয়াছে, ইহাদের মুখে আজ কখন অন্ন রুচে? তিনজনে হাসিমুখে বাড়ী হইতে বাহির হইল, আর দুইজন ফিরিল, একজন জন্মের মত কোথায় চলিয়া গেল!

কীর্ত্তি ও তাহার দোকানী বন্ধু অনেক সমবেদনা জ্ঞাপন করিল, অনেক বুঝাইল, ভগবান যাহা করিবেন, তাহার উপর ত কাহারও হাত নাই, ইত্যাদি বুঝাইয়া রাত্রের মত শয্যা-গ্রহণ করিল।

প্রত্যুষে অনেক লোকের হাঁকাহাঁকি ও চেঁচামেচিতে কীর্ত্তি ও তাহার বন্ধু জাগিয়া উঠিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে শশকের প্রাণ কণ্ঠার কাছে আসিয়া ধুক্ ধুক্ করিতে লাগিল। ছোট দোকানটি লালমুখ ও লালপাগড়ী কালমুখে ভরিয়া গিয়াছে। কীর্ত্তি পুলিশকে বড় ভয় করে। পুলিশ ও অশ্ব দেখিলেই পালাইতে হয়, ইহাই তাহার সংস্কার। সংস্কারবশে তক্তপোষের তলা দিয়া হামাগুড়ি দিয়া সে খড়ের গাদায় উঠিয়া খড়ের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। এই স্থানটিতে যাহারা শুইয়া ছিল, একনজরে দেখিয়া লইল, তাহারা নাই।

পুলিশ খড়ের গাদা, ভূষির বস্তা, দানার ছালা সব তচনচ করিয়া খানাতল্লাস করিতে লাগিল এবং একটা লালমুখ ব্যক্তি খড়ের মধ্য হইতে কীর্ত্তির কাণ ধরিয়া এক টানে মাটিতে ফেলিয়া দিল। নীচে যাহারা ছিল, তাহারা তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহারা নিঃসন্দেহে বুঝিল, এই লোকটা যখন আত্মগোপন করিয়াছিল, তখন এই আসামী। তাহারা তাহাকে লইয়া পড়িল। সে পড়ার বিস্তারিত বিবরণ দিবার ইচ্ছা নাই প্রবৃত্তিও নাই। তবে এইটুকু বলা দরকার যে, চোখের জলে যদি যন্ত্রণার লাঘব হয়, তাহা হইলে কীর্ত্তির যাবতীয় যন্ত্রণা একেবারেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

যাহারা খানাতল্লাস করিতেছিল, তাহারা দরজার ছিদ্র, থলিয়ার বুনন, জুতার হাফ-সোল সমস্তই পরীক্ষা করিতেছিল। পরীক্ষা করিতে করিতে এক জন চীৎকার করিয়া উঠিল, মিল্ গিয়া!

সমস্ত জনতা তাহার ঘাড়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া হাত উচু করিয়া ছাইমাখা একটা পিস্তল দেখাইল। পরমুহূর্ত্তে কীর্ত্তির চোখের জলে বাকী যে যন্ত্রণাটুকু ছিল, তাহারও লাঘব হইতে লাগিল। ভব-যন্ত্রণার লাঘব হইতে যে বেশী দেরী নাই, তাহাও সে বুঝিতেছিল।

দুই বন্ধুকে বাঁধিয়া, মারিয়া, টানিয়া, হিঁচড়াইয়া লইয়া যাওয়া হইল। পাড়ার লোকে কলিকাতার সাহেব খুন ও আততায়ীর আত্মহত্যার সংবাদ শুনিয়াছিল। আততায়ীর সঙ্গী দুইজন ধৃত হওয়ায় জনসাধারণ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল। যাও এখন ফাঁসী কাঠে ওঠ গে।

... ...

মাসখানেক পরে কীর্ত্তির জ্যাঠামহাশয়ের হাত হইতে খবরের কাগজটা টানিয়া লইয়া জ্যাঠাইমা পড়িতে পড়িতে কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিলেন, ছোঁড়ার বরাতে শেষে এই লেখা ছিল গো!

সাবধানী জ্যাঠামশায় কহিলেন, আমার বাড়ী থেকে বিদেয় হয়ে ছিল তাই রক্ষে, নইলে আমাদেরও লটকে দিত।

আসামীদ্বয় প্রথমে যাহা বলিয়াছিল, শেষ মুহূর্ত্তেও তাহাই বলিল, তাহারা নিরপরাধ।

ল যাহা দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহা যে খুবই সত্য, র নিত্যকার কাগজেই দেখিতে পাই। কিন্তু ঐ ঘর-গৃহস্থালীর অবস্থা কিরূপ, তাহা চাক্ষুষ করিয়া কেহ কিছু লেখেন না কেন? যদি লিখিতেন া প্রকৃত অবস্থাটা বুঝিতে পারা যাইত।

স্ত্রীলোক পাঁয়তাল্লিশ বার স্বামী গ্রহণ করিয়াছে, ত্যাগ করিয়াছে, এ খবর কি অলীক? ইউ- লির আদালতে স্বামী-ত্যাগ, স্ত্রী-ত্যাগের

নাড়িয়া আইনের তর্ক করিতেছে, কখন তেছে, ধমকাইতেছে, ভয় দেখাই শিহরিয়া উঠেন, বাঙ্গালা দে বরং তাঁহাদেরই সংখ্যাধিক রাজনীতিক্ষেত্রে যে না সহজাত ভীতিও এই ভীতি আম

—শ্রীকাঞ্চনমালিকা দেবী

ঘর-সংসার

আবার আমাদের ঘর-সংসার... হয়?... ...করিয়া যাইতে হইল। যদিও জানি ঘর-সংসারের কথা যতই বলি, ঘরের শ্রী, সৌন্দর্য্য, শান্তির বিষয়ে যতই লিখি, সংসারের দিকে যতই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি, কেবল ঘর-সংসারে আধুনিকাদের আর মন উঠিতে চাহিতেছে না। ঘরের চেয়ে বাহিরের আকর্ষণ বড় প্রবল। ঘরে তত আলো নাই, বাহিরে যত আছে; ঘরে তত স্বাধীনতা নাই, বাহিরে যত আছে; ঘরে তত মজা নাই, বাহিরে যত আছে; ঘরে তত আনন্দ নাই, বাহিরে যত আছে। দেখিতেছি সকলের মধ্যে এই মনোভাবই প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

যাঁহারা লিখিতে জানেন, বক্তৃতা করিতে জানেন, সভা-সমিতি গঠন করিতে জানেন, সকলেই এক কথা বলিতেছেন, লেখাপড়া শিখিয়া আমাদিগকে স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হইতে হইবে; বিশ্ব-সভায় আমাদের যোগ্য আসন খুঁজিয়া লইতে হইবে; পুরুষরা সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া আমাদিগকে পদানত করিয়া রাখিয়াছিল; তাহাদের দাসী হইয়া আমরা হাজার হাজার বৎসর কাটাইয়াছি; আমাদিগকে তাহারা খাইতে দিয়াছে, খাইয়াছি; পরিতে দিলে পরিয়াছি; তাহারা আমাদিগকে বাহিরের কাহারও সহিত মিশিতে দেয় নাই, মিশি নাই; বাহিরের কোন কাজ করিতে দেয় নাই, করি নাই। রাষ্ট্র-পরিচালনা তাহারা করিয়াছে, সমাজ গঠন তাহারা করিয়াছে, শিক্ষার ব্যবস্থা তাহাদের হাতে, একটি কথায় সমস্ত বিষয়েই তাহারা প্রভুত্ব করিয়াছে, আর আমরা তাহাদিগের আদেশ পালন করিয়া তাহাদিগকে মান্য করিয়া আমাদের সত্তা হারাইয়া অচলায়তন হইয়াছি।

এখন আমাদিগকে জাগিতে হইবে। এখন হইতে আমরা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া, স্বাবলম্বী হইয়া, ভালমন্দ বিচার করিয়া নিজেদের ব্যবস্থা সকল নিজেরাই সম্পন্ন করিব। আমরা কাউন্সিলে আমাদের আসন দাবী করিব, না পাইলে আজিটেসন চালাইব, নূতন নূতন আইন পাশ করাইয়া আমাদিগকে জাতির—নারী-সমাজের উন্নতি বিধান করিব।

এই সকল কাজ করিতে আমাদের অনেক টাকা খরচ করিতে হইবে, ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত আমাদিগকে যাওয়া-আসা করিতে হইবে, ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভগ্নীগণকে একতাসূত্রে বদ্ধ করিতে হইবে। এই সকলই আমরা করিব এবং সকল কাজে পরমুখাপেক্ষিণী না হইয়া অর্থাৎ পুরুষের মুখ চাহিয়া বসিয়া না থাকিয়া নিজেরাই করিয়া লইব। কাহারও দয়া বা অনুগ্রহদত্ত অর্থ বা সহায়তার ভরসা আমরা করিব না।

আমি উপরে যে সব কথা বলিলাম, লক্ষ্য করিয়া দেখিলে আপনারা সকলেই বুঝিবেন, ভারতের সকল প্রদেশেই ঐ এক রব উঠিয়াছে। সকলেই চাহিতেছেন, লেখাপড়া শিখিয়া পাশ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়া স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হইয়া এই সমস্ত কাজ চালাইতে।

কয়েক দিন আগে পাটনায় গিয়াছিলাম। পাটনায় আমার মাসিমারা থাকেন, মেসো-মহাশয়ের কঠিন ও দুরারোগ্য পীড়ার সংবাদ পাইয়া আমাদিগকে সেখানে যাইতে হয়।

যেদিন আমাদের চলিয়া আসিবার কথা ছিল, সেইদিন সকালে কতকগুলি মেয়ে একখানা মোটরে করিয়া আসিয়া একখানি হ্যাণ্ডবিল দিয়া গেলেন। সমস্ত সকালটা তাঁহারা বাড়ী বাড়ী সেই কাগজ বিলি করিয়া বেড়াইতেছেন।

তাহাতে এক নারী-সভার কথা লেখা আছে। এবং সহরের সমস্ত নারীকে সভায় যোগ দিতে খুব করিয়া অনুরোধ করা হইয়াছে।

আমার মেসো-মহাশয় স নামিয়ে ভাত চড়িয়ে দিয়েছি, হল
পেন্সন লইয়া পাটনার পুরা আপনার বড্ড খিদে পেয়েছে
করিতেছেন। তাঁহার বয়স প্রায়
বুড়ো লোক তিনি—তিনি যেমন সে পেলেই বা হচ্ছে কি
তাঁহার বাড়ীতে আধুনিকতা একটুও ঢুকে অন্যদিন খিদে
তাঁহার চার ছেলে, তাহাদের চার বৌ, ছ'টি বল কী
তাহাদের বৌ, ছ'টি বৌ ছ' জায়গা হইতে আসিয়াছে,
রকমের প্রকৃতি লইয়া, কিন্তু এখানে আসিয়া সব এক হইয়া গিয়াছে। অনেকে মনে করেন, বাঙ্গালার বাহিরে কড়া পর্দ্দা নাই; আমার মাসীমার বাড়ী দেখিলে তাঁহাদের ধারণা বদলাইয়া যাইবে। মাসীমার বাড়ী হইতে কেহ নারী-সভায় যাইবেন না তাহা আমি জানিতাম। তবুও সমবয়সী বৌ কজনকে জিজ্ঞাসা করিতে তাহারা আকাশ হইতে পড়িয়া বলিল, বাপ রে! তা হলে রক্ষে আছে!

দেখিলাম, তাহারা যে ইহা পছন্দ করে তা নয় এবং সভায় যাইবার বা বক্তৃতা শুনিবার আগ্রহ তাহাদের আছে তাহাও দেখিলাম না। সভায় যাইবার ও বক্তৃতা শুনিবার ইচ্ছা আমারই যে খুব ছিল, তা নয়, তবে শ্রীমতী ধর্ম্মশীলা লাল এম-এর বক্তৃতার সার মর্ম্ম জানিবার আগ্রহ ছিল।

আমার মাসতুতো সেজভাই ওখানকার এক কলেজের অধ্যাপক। তাঁহার দুইটি ছাত্রী আছেন, তাঁহারা ঐ সভার জন্ম খুব পরিশ্রম করিতেছেন শুনিয়া সেই অধ্যাপক দাদাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়া আসিয়াছিলাম, বক্তৃতাটি যদি ছাপা হয়, তাহার একখানা যেন দাদা আমায় পাঠাইয়া দেন।

দাদা পাঠাইয়া দিয়াছেন।

বক্তৃতার সারমর্ম্ম আমি নিম্নে তুলিয়া দিতেছি। আমার মত স্বল্প শিক্ষায় শিক্ষিত (অশিক্ষিত বলিলেও আমি রাগ করিতে পারিব না) একটি স্ত্রীলোকের পক্ষে এম-এ ও ব্যারিষ্টারী পাস করা একজন খ্যাতনাম্নী মহিলার কথার ভুল ধরিয়া তর্ক করা অত্যন্ত অশোভন হইবে; কিন্তু সকল লোকের নিজস্ব মত থাকা অস্বাভাবিক নয়, আর তাহা প্রকাশ করাও অসঙ্গত বিবেচিত হইতে পারে না বোধে আমি অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত এই কথাগুলি বলিতে যাইতেছি। আশা করিতে পারি কি শ্রীমতী ধর্ম্মশীলা আমার মূঢ়তা মার্জ্জনা করিবেন?

পুলিশ খড়ের গাদা, ভূষির বস্তা, দানার ছালগুলি বিলাত করিয়া খানাতল্লাস করিতে লাগিল এবং একটা লাম্বদ্ধে কথা খড়ের মধ্য হইতে কীর্ত্তির কাণ ধরিয়া এক উঠের সময় ফেলিয়া দিল। নীচে যাহারা ছিল, তাহারা তাআর এখন ফেলিল। তাহারা নিঃসন্দেহে বুঝিল, এই ।গুের জ্ঞান আত্মগোপন করিয়াছিল, তখন এই আ:সেখানে প্রথমে তাহাকে লইয়া পড়িল। সে পড়ার বিস্ময়া সকলে অবাক হইয়া যাইবেন।

আমার কথা, আমাদের দেশের মেয়েরা বাহিরের কোন লোকের অবাক-নির্ব্বাক হওয়ার খোঁজ রাখিতেন না, তাঁহাদের তাহাতে প্রয়োজনই ছিল না।

ইনি বলিয়াছেন আইন, রাজনীতি, চিকিৎসা, বিমান-পোত চালনা, সেবা—সকল ক্ষেত্রেই মহিলাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।

আমি বলি, আমাদের দেশেই বা কম কি! শ্রীমতী ধর্ম্মশীলা নিজেই ব্যারিষ্টার। রাজনীতিতে ভারতীয় মহিলা অনেকগুলিই আছেন। বিমানপোত চালনায় দুইজন বঙ্গনারী প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দুঃখ করিবার কারণ কিছুই নাই। তবে ইংলণ্ডের মত এদেশের ঘর-সংসারে শ্রী বাড়িতেছে, না কমিতেছে ইহাই দেখিবার বিষয়। ঘর সাজান থাকিলেই শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে বলা যায় না। সংসার চলিয়া যাইতেছে বলিয়াই সংসার সুখের আগার, ইহাও বলা যায় না। যে নারীরা আইন চর্চ্চা করেন, রাজনীতি করেন, পোতে চড়িয়া বিমানে উড়েন, তাঁহাদের ঘর-সংসার সুখের আগার হইয়াছে, তাঁহাদের আত্মীয়-পরিজন সুখী হইয়াছেন—এই সংবাদগুলি কেহ দিতে পারিবেন কি?

শ্রীমতী ধর্ম্মশীলা বলিয়াছেন, ইউরোপের প্রত্যেক দেশেই মেয়েরা পুরুষদের ন্যায় বিভিন্ন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকে। আমেরিকাতেও তাই। রাশিয়ার মেয়েরা আরও অনেক দূর গিয়াছে, তাহারা সৈন্যবাহিনীতেও যোগ দিয়াছে। জাপানের মেয়েরা ব্যবসাক্ষেত্রেও বেশ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

আমরা ইউরোপ দেখি নাই সত্য, কিন্তু উপরে যে চিত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার সত্যতায় আমাদের একটুও সন্দেহ নাই। খবরের কাগজ আমাদের এই কথাই শুনায়। শ্রীমতী

ধর্ম্মশীলা লাল যাহা দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহা যে খুবই সত্য, তাহার খবর নিত্যকার কাগজেই দেখিতে পাই। কিন্তু ঐ ঐ দেশের ঘর-গৃহস্থালীর অবস্থা কিরূপ, তাহা চাক্ষুষ করিয়া আসিয়া কেহ কিছু লেখেন না কেন? যদি লিখিতেন তাহা হইলে প্রকৃত অবস্থাটা বুঝিতে পারা যাইত।

একটি স্ত্রীলোক পঁয়তাল্লিশ বার স্বামী গ্রহণ করিয়াছে, চুয়াল্লিশ বার ত্যাগ করিয়াছে, এ খবর কি অলীক? ইউ-রোপের দেশগুলির আদালতে স্বামী-ত্যাগ, স্ত্রী-ত্যাগের মামলা প্রত্যহ কত হাজার করিয়া হয়? ইবসেনের নোরা ইউরোপে কত কোটী আছে তাহা কেহ বলেন না কেন?

শ্রীমতী ধর্ম্মশীলা লাল বলিয়াছেন, বিভিন্ন দেশের মেয়ে-দের এই সকল কার্য্য ইহাই প্রমাণ করে যে, তাহারা বুদ্ধি-বৃত্তির তুলনায় পুরুষদের চেয়ে হীনতর নহে। দুঃখের বিষয়, মেয়েরা বহু দায়িত্বপূর্ণ কাজ দক্ষতার সহিত করা সত্ত্বেও আমাদের দেশের পুরুষেরা তাহাদিগকে তাহাদের অপেক্ষা অপটু মনে করিয়া থাকে এবং কেবল সংসারের নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্যের জন্য উপযুক্ত বলিয়া মনে করে।

শ্রীমতী ধর্ম্মশীলা লাল বিবাহ করিয়াছেন কি না জানিনা, করিয়া থাকিলেও ঘর-সংসার পাতিয়াছেন কি না তাহাও জানা নাই। কিন্তু মনে হইতেছে, তিনি কোনরূপ 'বন্ধনে' আবদ্ধ নহেন, তাই ঐ কথা বলিয়াছেন। ঘর-সংসারের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজের ভার ত পুরুষেরা আমাদের দেয় নাই, আমরা সে কাজের উপযুক্ত অথবা অনুপযুক্ত, সে বিচার-ভারও তাহাদের উপরে কোন দিন ছিল না। সমাজ-গঠনের সঙ্গে সঙ্গে ঘরের কাজ ও বাহিরের কাজ আলাদা হইয়াছিল এবং যাহার যাহা শোভা পায়, সে সেই ভার লইয়াছিল। বি-এ, এম-এ পাস যাঁহারা করিয়াছেন, ইউরোপ যাঁহারা দেখিয়াছেন, ইয়োরোপ-ফেরতদের ঘরে যাঁহারা বাস করেন, পুরুষদের অবিচার কেবল সেই নারীদেরই বিদ্ধ ও উত্যক্ত করিয়াছে। ভারতবর্ষ বড় কথা, সমগ্র ভারতবর্ষের হইয়া কথা কহিবার দুঃসাহস আমার নাই। আমি বাঙ্গালা দেশের কথা বলিতে পারি, বাঙ্গালা দেশে সংসার প্রতিপালন করিয়া, বারব্রত উদ্যাপন করিয়া নারী-জীবন ধন্য করিতে চাহেন যাঁহারা, সেই নারীর সংখ্যা আজও গণনা করিয়া শেষ করিতে পারা যাইবে না। আদালতে শত শত পুরুষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাত-মুখ নাড়িয়া আইনের তর্ক করিতেছে, কখনও হাসিতেছে, রাগি-তেছে, ধমকাইতেছে, ভয় দেখাইতেছে, ইহা মনে করিতেও শিহরিয়া উঠেন, বাঙ্গালা দেশে এমন বঙ্গনারী বিরল নয়—বরং তাঁহাদেরই সংখ্যাধিক্য। সে সংখ্যাও গণনার অতীত। রাজনীতিক্ষেত্রে যে নারীরা বিচরণ করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে সহজাত ভীতিও বাঙ্গালা দেশের অগণিত নারীরই আছে। এই ভীতি কি এবং কিরূপ তাহা আমি বলিতে চাই না, আমার বিশ্বাস আছে বলিবার প্রয়োজনও হইবে না, সকলেই তাহা মনে মনে জানেন।

"বঙ্গশ্রী" মাসিক-পত্রে পড়িয়াছি—

ভারতবাসীর দুরবস্থার অপনোদন করিতে হইলে যে বাইশটী ব্যবস্থা দেশের মধ্যে অবলম্বিত হওয়া বাঞ্ছনীয় তন্মধ্যে একটী উল্লেখযোগ্য :—

প্রত্যেক স্ত্রীলোক যাহাতে সংসারের কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং কোন উপার্জ্জনের কার্য্যে প্রবৃত্ত না হন তাহার ব্যবস্থা।

আমার জানা-শোনা কয়েকটি নারী ইহাতে আপত্তি করিয়া বলিয়াছেন, ইহা করিলে দেশের অবস্থা আরও খারাপ হইবে। তাঁহারা যে দৃষ্টান্ত দেখান, তাহা এইরূপ—

(১) অনেক সংসার আছে, যেখানে স্বামী-স্ত্রী দুইজন উপার্জ্জন করিয়া সংসার চালান। একা স্বামীর রোজগারে সংসার চলে না

(২) অনেক বিধবা স্ত্রীলোক স্কুলে অথবা হাসপাতালে বা অন্য কোন স্থানে কাজ করিয়া যে উপার্জ্জন করেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদের পুত্র-কন্যাদের ভরণপোষণ চলে।

তাঁহাদের কথা উপেক্ষা করা যায় না। অধিকাংশ স্ত্রীলোকের স্বামী যত লেখাপড়াই শিখিয়া থাকুন, রোজগার কাহারও যথেষ্ট নয়। সামান্য রোজগারে সংসার চালান কত কষ্টের আমরা সকলেই তাহা জানি। সে অবস্থায় স্ত্রীরা শিক্ষকতা বা অন্য কোন কাজ করিয়া কিছু উপার্জ্জন করিয়া আনিলে কষ্টের কতকটা লাঘব হইতে পারে।

কিন্তু যাঁহারা ঐ ভাবে রোজগার করিতে যান, তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি উপেক্ষিত ও অবহেলিত হয় না কি? মাতার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্যে অবহেলা কি দারুণ অপরাধ নয়?

সংসারের অভাব প্রতিনিয়ত আমরা যদি বৃদ্ধি না করি-তাম, তবে আমাদের এত কষ্ট হইতে পারিত না। আমরা

অভাব বৃদ্ধি করিব, বিলাসের উপকরণের অভাব হইলে মনে ব্যথা পাইব, ধনীদিগের মত শাড়ী চাহিয়া না পাইলে আমরা মর্ম্মপীড়া বোধ করিব, থিয়েটার-সিনেমা না দেখিতে পাইলে আমাদের মনঃকষ্টের শেষ থাকিবে না। কাজে কাজেই স্বামীর সামান্য উপার্জ্জনে সংসার চালান অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে; স্ত্রীকেও উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে হইতেছে।

পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলার পক্ষে এই ব্যবস্থা কতদূর ক্ষতিকর আমরা কি তাহা বুঝিয়া দেখিতে চেষ্টা করি? আমি একটি চিত্র দিতেছি।

ধরুন একটি ছোট সংসারে স্বামী, স্ত্রী, দুইটি শিশু। স্বামী দশটার সময় আপিস চলিয়া গেলেন, স্ত্রী একটি স্কুলে মাষ্টারি করেন, সাড়ে দশটার সময় তিনিও চলিয়া গেলেন। শিশু দুইটি বাড়ীতে রহিল। হয় একটি নিম্নজাতীয় ভৃত্য অথবা নিম্নজাতীয়া নোংরা একটি দাসী, ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। গৃহিণী সাড়ে চারিটায় বাড়ী আসিলেন, আসিয়া তাহাদের খাইতে দিলেন, মধ্যে সামান্য খাবার ঝি বা চাকরের কাছে রাখা ছিল, তাহা খাইয়াছে। খাওয়ার বিশেষ কষ্ট হইল না একথা যদিই স্বীকার করি; কিন্তু যে সংসর্গে তাহাদের সমস্ত দুপুর কাটিল, সেই সংসর্গের হাওয়া যে তাহাদের পক্ষে স্বাস্থ্য ও হৃদ্য, তাহা স্বীকার করিতে পারি কি? কর্ত্তা ফিরিলেন রাত্রি ৭ টায় বা ৮ টায়। শিশু দুইটি হয় তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, না হয় ঘুমে চক্ষু ঢুলু ঢুলু। মার সঙ্গ সকালে কতটুকুর জন্যই বা তাহারা পায়? রাত্রে পিতার কাছে শোওয়া ছাড়া তাঁহার সঙ্গও তাহারা কতখানি পায়? চরিত্র-গঠনের পক্ষে ইহা কম ক্ষতিকর নয় বলিয়াই আমার মনে হয়।

আবার যখন ভাবি, না করিলেই বা চলে কিরূপে, তখন বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতে হয়। তখন যে দুইটি উপায় মনে আসে, তাহা এই—

এক, পুরুষ উপার্জ্জন করিতে পারে। তাহার উপার্জ্জন যাহাতে বৃদ্ধি পায়, সেই চেষ্টা করাই উচিত।

দুই, অভাবের সৃষ্টি আদৌ না করিয়া যাহাতে মোটা ভাত, মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট থাকা যায়, তদ্রূপ মন তৈরী করাই উচিত।

উপার্জ্জন বাড়ে কি না আমি জানি না; তবে বিজ্ঞেরা বলেন চেষ্টা করিলে বাড়ান যায়।

অভাব বৃদ্ধি না করার হাত আমাদের নিজেদের। ইচ্ছার সঙ্গে খানিকটা ত্যাগ করিতে অভ্যাস করিলে অনায়াসে আমরা অর্দ্ধেকের বেশী অভাব ছাঁটিয়া বাদ দিয়া দিতে পারি। যতদিন পর্য্যন্ত তাহা না করিতে শিখিতেছি, ততদিন আমাদের অভাবও ঘুচিবে না, দুঃখও যাইবে না।

আমরা চোখ খুলিয়া যদি দেখি, তবে দেখিতে পাইব, এখনকার দিনে বড় বড় লোকদেরও নিত্য অভাব, নিত্য দুঃখ জড়াইয়া রহিয়াছে। যাহার যত বেশী উপার্জ্জন, তত অধিক ব্যয়বাহুল্য তাহার। দুই দিক সামঞ্জস্য করা অর্থাৎ আয় ও ব্যয় সঙ্কুলান করিতে কেহই পারিতেছেন না। তাই এই কথা আমার মনে হইয়াছে যে, রোজগারের সঙ্গে বিলাস-বাহুল্য বাড়িয়া যাইতেছে বলিয়াই এমন ধারা হইতেছে।

এখন ত বেশীর ভাগ লোকেরই চাকরীর রোজগার। ব্যবসায় কার্য্য যাঁহারা করেন, তাঁহাদের রোজগার কম বলিয়া শুনা যায়। কৃষি-কর্ম্মে রোজগার কাহারও নাই। কাজেই চাকরী তালপত্রের ছায়া বিবেচনা করিয়া মিতব্যয়ী হওয়া কি সকলের উচিত নয়? অভাব ও রোগ যত বাড়ান যায়, ততই বাড়ে। রোগও নিজেদের দোষে বাড়ে, অভাবও তাই। মনকে সতর্ক প্রহরী নিযুক্ত করিয়া যদি আমরা স্ব স্ব জীবন যাপন করিতে পারি, তাহা হইলে অনেক অংশে ব্যাধিদ্বয়ের কবলমুক্ত হইবার সম্ভাবনা হয়।

কিন্তু হিন্দু ঘরের বালবিধবাদের সম্বন্ধে কি উপায় অবলম্বিত হইলে এই একটি গুরুতর সমস্যার সমাধান হইতে পারে, তাহা আমার মত বুদ্ধিহীনা নারী বুঝিতে পারে না। তবে এই সমস্যা আমাদের ঘরে আগে ছিল না বলিয়াই বোধ হয়। এদেশ যৌথ-পরিবারের দেশ, এই দেশে একজন লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেও পরিবারের শোক-দুঃখ যতই হউক, অন্নকষ্ট হইত না। আর সেই বিধবা এবং যদি তাহার দুই একটি ছেলেমেয়ে থাকে, সকলকে গাছতলায় দাঁড়াইতে হইত না। হিন্দু বিধবারা কখনও কখনও যে গৃহে উপেক্ষিতা হইতেন না, অথবা তাঁহাদিগকে কেহ নির্য্যাতন করিত না তাহা নয়। বরং সেই রকমের দৃষ্টান্তও অনেক শুনা যাইত।

ভগবান যাহাদিগকে চরম দুঃখ দিয়াছেন, তাহার তুলনায় সে সব কিছু নয়। যতদিন বাঁচিয়া থাকিত অন্নকষ্টে পড়িতে হইত না; বার-ব্রত তীর্থ-ধর্ম্মও আটকাইয়া থাকিত না।

এখন আর সে দিন নাই। এখন সব ঘরে অন্নের জন্য হাহাকার, বস্ত্রের জন্য হাহাকার, রোগে, শোকে, অভাবে, সকলেই জর্জ্জরিত। স্বচ্ছন্দমনে এক মুঠা অন্ন দিতেও লোকের যেন গায়ে লাগে। নিজের ভাই যদি বেকার হয়, তাহাকে ভাতের সঙ্গে গাদা গাদা গঞ্জনা দিবার রীতি আজকাল বেশ চলিয়াছে। ছেলে বেকার হইলেও ঐ একই কথা।

আজ যদি মাঠ-ভরা ধান, গোলা-ভরা শস্য আর নীরোগ দেহ থাকিত, তাহা হইলে কোন সমস্যাই কঠিন হইত না। আবার কি সেদিন ফিরিবে না?

প্লাবন

—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বাহিরে যাইতে যাইতে, নিম্নকণ্ঠে ছায়া বলিল, মাছ কুটে আসতে আমার দেরী হবে না। তুমি কোথাও যেও না যেন।

—না, আমি এখানেই আছি।

—না, না, রান্নাঘরে কালি-ঝুলের মধ্যে থাকতে হবে না তা' বলে। কাছে কোথাও থাক-না, আমি ফিরে এসে ডাকব।

—আচ্ছা।

কিন্তু অশোক সেই কালি-ঝুলের মধ্যেই থাকিয়া গেল। মা'র বুকে তাহার চিরঠাঁই আছে ইহা সে জানিত; পরেশ ছেলেমানুষ, ধর্ত্তব্যই নয়। ছায়ার পিতামাতাই তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছেন সত্য, কিন্তু ছায়ার মত এরিষ্টোক্র্যাট ঘরের মেয়ে যে অসঙ্কোচে তাহাকে আদর করিয়া লইবে, ইহা তাহার কল্পনার অতীত ছিল। বহুকাল পূর্ব্বে অধীত একটি গল্পের একটি ভগ্নাংশ তাহার মনে ছিল। বড়লোকের ঘরের এক আদরিণী স্ত্রীর স্বামী জমিদারী দেখিতে গিয়াছেন, সেই সময়ে গ্রামের একটি বিধবা স্ত্রীলোকের নাম তাঁহার নামের সঙ্গে জড়াইয়া গেল। যেদিন স্বামীর গৃহে ফিরিবার কথা, তার আগের দিন স্ত্রী কাঁদাকাটা করিয়া শ্বশুরগৃহ ছাড়িয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছিল, স্বামী-স্ত্রীর মিলন আর হয় নাই। স্ত্রীর মৃত্যুকালে একটি মুহূর্ত্তের জন্য স্বামী তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল। গল্পটা মোটামুটি ভাবে ঐ টুকুর বেশী তাহার মনে ছিল না, কিন্তু স্ত্রীর লেখা চিঠির একটি ছত্র তাহার মনে পাষাণে খোদিত রেখার ন্যায় সুস্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে। স্ত্রী স্বামীকে লিখিয়াছিল, তুমি যতদিন ভক্তির যোগ্য ছিলে, ততদিন ভক্তি করিতাম। এখন আর করি না। তাহার মনে এই আশঙ্কাই ছিল, ছায়া তাহাকে ঐ কথাই বলিবে। বলিলেও, তাহা অন্যায় হইবে না।

সত্য কথা বলিতে কি, সে বিলাত ছাড়িয়া আসিতেই চাহে নাই। অপরাধের পর অপরাধ করিতে করিতে অপরাধী যেমন মরিয়া হইয়া উঠে, অপরাধ সম্পর্কে নির্ব্বিচার হইয়া পড়ে, সে'ও তাহাই হইয়াছিল। অপুত্রক শ্বশুরের বিপুল বিত্ত, সুতরাং কঠোর জীবন-সংগ্রামে বিনাযুদ্ধে জয়—কোন প্রলোভনই তাহাকে ছায়ার সম্মুখীন হইয়া মুখোমুখী দাঁড়াইবার সাহস দেয় নাই, বরং এই কথাটা যখনই মনে হইয়াছে, তখনই তাহার অপরাধ-প্রবণতা মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। মানুষ স্ত্রীর অবজ্ঞাদৃষ্টি সহিতে পারে না। স্ত্রী যে ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিবে, ইহার কল্পনামাত্রে মানুষ বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। অশোক বিলাতে থাকিতে ভাবিত, এ কালামুখ আর দেশের কাহাকেও দেখাইতে পারিবে না। পরে, নানারকমে ব্যস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া বিলাত হইতে পলাইয়া আসিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল, ছায়াকে লিখিয়া পাথেয় সংগ্রহও করিয়াছিল; কিন্তু সে টাকাগুলি পাওনাদারেরাই গ্রাস করিয়া ফেলে; সামান্য যাহা বাকী ছিল, তাহারই সৌরভে আকৃষ্ট আকুল মধুপদের মধু সরবরাহ করিতেই নিঃশেষিত হইয়া গেল। মধু ফুরাইল, কিন্তু মোহের অবসান হইল না। মধুমোহে আবার সে দেশ ভুলিল, আত্মীয়-স্বজনকে ভুলিল; পুরাতন ব্যাধিসমূহ আবার একটির পর একটি দেখা দিতে লাগিল। ছায়ার নিকট দ্বিতীয়বার গুরুতর অপরাধ করিয়া আবার পুরাতন সঙ্গী ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিলিত হইয়া পুরাতন প্রথায় জীবন উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

এই সময় তাহার শ্বশুর-শাশুড়ী বিলাতে আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। লণ্ডন হইতে বহু দূরে এক গ্রামে কিছু দিন থাকিয়া, তাহাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহারা কন্টিনেণ্ট টুর করিলেন। দেশে ফিরিবার কথা উঠিতে অশোক বিগড়াইয়া গেল। কয়েকদিন পর্য্যন্ত কিছুতেই তাহার মত করান গেল না। কিন্তু মিষ্টার ঘোষ যখন তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ছায়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্যই এক রকম তাঁহাদের অমতেই—তাহার মাতার ঘোর অমতে ত বটেই—অশোকদের

সেই অজ পল্লীগ্রামে মেটো-বাড়ীতে বাস করিতেছে, নিজের হাতে রাঁধিতেছে, গৃহকর্ম্ম করিতেছে, সুতরাং তাহার দিক হইতে কুণ্ঠিত হইবার কোনই কারণ থাকিতে পারে না, তখন হইতে অশোকের জেদটা কমিয়া আসিল। মিষ্টার ঘোষ আরও বলিলেন, আমার একটা পুরানো চাপরাসী একদিন কিছু জিনিষপত্তর নিয়ে গেছল, ফিরে এসে সে যা বললে, ওঁদের (দূরে উপবিষ্টা স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া) তা বলিনি ভাই, শুনলে কেঁদে অনর্থ করতেন। সেই যে কি বলে ব্রহ্মচারিণী না কি, ছায়া তাই হয়ে গেছে। তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে অশোক, আমার ওখান থেকে কাপড়-জামা সে বড় কম পায় নি, দশ বিশটা পোর্টম্যাণ্ট বোঝাই করা যেতে পারে; তোমাদের বাড়ী যাবার সময়, সে সবের একখানাও ছায়া নেয় নি, একখানা লালপাড় শাড়ী আর একটা সেমিজ পরে আমার মেয়ে আমার বাড়ী থেকে বিমলের সঙ্গে ট্যাক্সিতে করে চলে গেছল। বাপ মা'র তাতে যে কত কষ্ট হয়েছিল, তা বোধ হয় তুমি বুঝতে পার। উনি অবশ্য খুবই রাগারাগি করেছিলেন, আমি কিন্তু একটিবারও না বলি নি। হলই বা আমার মেয়ে, তোমার স্ত্রী ত! তোমার বাড়ীই ত তার বাড়ী, সে বাড়ী যেমন হোক্ না। তাই যেদিন সকালে একবস্ত্রে ছায়া আমার বাড়ী ছেড়ে চলে গেল, আমার চোখে জল এসে পড়লেও তাকে আমি বাধা দিই নি। ব্রাহ্মই হই, বিলেতই যাই, আসলে বাঙ্গালী ত। বাপ-মা যার হাতে তুলে দেবে, সে ছাড়া মেয়ের যে অন্য গতিই নেই, এ কথাটা ভুলতে পারি কৈ? আমি তোমায় বলছি অশোক, নিজের মেয়ে বলে বলছি, তা নয়; তাকে দেখে তোমার চোখ জুড়িয়ে যাবে।

অশোক আজ সেই কথাগুলা ভাবিতেছিল, আর তাহার দুই চোখ দিয়া শ্রাবণের ধারা বহিয়া যাইতেছিল। অশোক রান্নাঘরের একটা কাঠের পিঁড়িতে নতমুখে বসিয়া ছিল, অশ্রুবিন্দুগুলি টপ টপ করিয়া মাটীতে পড়িয়া মাটী ভিজাইতেছিল, অশোক আঙুল দিয়া সেই জলেরই দাগ কাটিতেছিল। ছায়া ঘরে ঢুকিয়া বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল, তুমি বুঝি এই গরমে আগুনতাতে বসে আছ!

অশোক কোন মতে খুব সাবধানে ও সঙ্গোপনে কাপড়ের খুঁটে চোখে মুছিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল।

ছায়া উনানে ভাতের হাঁড়ী চড়াইয়া দিল; ছোট একটা ধামায় চাল আনিয়া অশোকের পার্শ্বে বসিয়া চালগুলা বাছিতে বাছিতে বলিল, ঘি-ভাত করব, খাবে?

—কর।

—মা'র জন্যে দু'টি ঝোল-ভাত আগে করে তাঁকে খাইয়ে দিই, কেমন? তোমাদের ত বেলা হলেও ক্ষতি নেই, কি বল?

এমন সুশীলা, সেবাপরায়ণা স্ত্রীর পানে অশোক চক্ষু তুলিয়া চাহিতেও পারিতেছিল না, ম্লানহাস্যে কহিল, না, ক্ষতি কিসের!

ছায়া বলিল, আচ্ছা, সেখানে কি খেতে? ভাত নিশ্চয়ই পেতে না!

অশোক বলিল, না। তবে পোলাও এক-একদিন হোত।

—বল কি! পোলাও? কে রাঁধত?

—সে দেশের রাঁধুনীরাই রাঁধত।

ছায়া হাসিয়া বলিল, কেমন রাঁধত, ভাল?

অশোক বলিল, ভাল মন্দ বিচার করবে কে? যা পাওয়া যেত, তাই ভাল।

—সাদা ভাত খাও নি কতদিন?

—কাল খেয়েছি।

—ক'লকাতায়?

—হ্যাঁ।

খুব ভাল লাগে নি?

—তা লেগেছে।

ছায়া বলিল, এখন তা হ'লে মাছের ঝোল ভাতই করি। ওবেলা ঘি-ভাত বা লুচি যা খাও, তাই হবে। কেমন?

অশোক বলিল, বেশ।

এমন করিয়া কথা টানিয়া কথা বাড়ান কতক্ষণ চলে? যে অতি আপন, অতি প্রিয়তম, অথচ মনের পরিচয় যাহার সঙ্গে নাই, তাহার সহিত কথা কওয়া যে কিরূপ বিড়ম্বনা, ছায়া তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিল। কত কথাই ত জমিয়া রহিয়াছে, কহিতে আরম্ভ করিলে শেষ করাই দায়, তবুও যে কত সাবধানে, কত বিচার-বিবেচনা করিয়া কথা কহিতে হইতেছে, কত আত্ম-প্রতারণাই না করিতে হইতেছে, তাহার ঠিকানাই নাই! যে কথা মনে উদয় হইতেছে, তাহাকে

হইতেছে, এ যে কি বিড়ম্বনা, তাহা বলা যায় না অথচ উভয়ে স্বামী-স্ত্রী।

অশোকের সে কষ্ট কষ্ট নয়। সে সমস্ত কথার সত্য উত্তর দিবার জন্য মনকে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার শুধু শঙ্কা হইতেছিল, ছায়ার কথার ভাও শেষ না হয়!

তাহার শঙ্কাই সত্য হইল। ছায়া আর কি বলিবে, কোন্ কথা নির্দ্দোষ ও অতীতের চিহ্ন-লেশশূন্য তাহা ছায়া ভাবিয়াই পাইতেছিল না। অথচ চুপ করিয়াও থাকা যায় না; তাই অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, বাবা ত ঠাকুরপোকে নিয়ে বার হলেন, মাঠ দেখতে, খাল দেখতে, চাষাভূষোদের ঘর-বাড়ী দেখতে। বললেন, ফিরতে দেরী হবে। আমি কত বললুম, রোদ্দুরে হাঁটতে কষ্ট হবে—

—হেঁটে গেলেন না কি?

—হেঁটে ছাড়া আর কিসে যাবেন? মোটর ত এই বড় রাস্তাটাতেই কোন রকমে চলে, তাও আবার বর্ষার আগে পর্য্যন্ত; বর্ষার পরে আর চলে না।

অশোক উঠিতে উঠিতে বলিল, তা হ'লে ত খুবই কষ্ট হবে। দেখি, কোন্ দিকে গেলেন।

ছায়া হাসিয়া বলিল, পাড়াটা অমনি বেড়িয়ে আসাও হবে, বোধ হয়।

অশোক বলিল, না, এখন আর বেড়ান হবে না। বাবার সঙ্গেই যাই, একটু ঘুরিয়ে তাঁকেও ফিরিয়ে আনব।—অশোক চলিয়া গেল। যতদূর দেখা যায়, ছায়া দ্বার-সন্নিধানে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

অশোক আগের চেয়ে দেখিতে সুন্দর হইয়াছে। রং তাহার চিরদিন ফর্সা, এখন তাহাতে লাল আভা পড়িয়া আরও সুন্দর করিয়াছে। আগে তাহার দেহটি একটু অধিকমাত্রায় মাংসল ছিল, তাহাকে মোটা বলাও চলিত; এখন অতিরিক্ত মাংস ঝরিয়া গিয়া দেহটি ঋজু সুঠাম হইয়া কি সুন্দরই দেখাইতেছে! দেখিয়া যেন আশ মিটে না! কত কথাই মনে জাগে, ঐ যে দীর্ঘ ঋজু সুগঠিত সবলদেহ লোকটি, সে তাহার, তাহার, তাহার! একমাত্র তাহার কি-না এই প্রশ্নটা তাহার মনে জাগিতেই ঘরটির যেখানটায় দৃষ্টি পড়ে, মনে হয় অপরূপ রূপ ধারণ করিয়া তাহা যেন হাসিতেছে; সমস্ত তৈজসপত্র আজ ঝক্ ঝক্ তক্ তক্ করিতেছে; সমস্ত জিনিষ আজ যেন নূতন জীবন লাভ করিয়াছে। ছায়ার হাসি পাইতেছিল। তাহার মনের সঙ্গে আজ যে ঘর-সংসারেও এত নূতনত্বের সঞ্চার দেখিতেছে, ইহা মনে করিতেও হাসিতে তাহার মুখ ভরিয়া উঠিতেছিল।

আরও একটা কারণে সে হাসি চাপিতে পারিতেছিল না। আজ কেন প্রতি কাজে প্রতি পদে তাহার এত ভুল হয়! ডালের দরকার, ছায়া মসলার পুঁটলী খুলিয়া বসিয়াছে; ভুল বুঝিয়া হাসিতে হাসিতে মসলার পুটলী তুলিয়া রাখিয়া ডালের হাঁড়ী নামাইয়াছে। কড়ায় মাছ চড়াইয়াছে, মাছ সাঁৎলাইয়া রাখিবার জন্য দরকার একখানা থালার, সে লইয়া আসিল উঠান হইতে আঁসবটীখানা। দুঃখে কষ্টে অন্যমনস্ক থাকিলে ভুল হয় জানা কথা, আনন্দের আতিশয্যেও কি তাহাই হইয়া থাকে?

উঠানের এক কোণে আঁসবটী রাখিয়া ফিরিতেছে, দেখিল কাপড়ের খুঁটটা মাথায় জড়াইয়া অশোক আসিতেছে। ছায়া দাঁড়াইল। অশোক কাছে আসিলে হাসিমুখে [illegible] করিল, এখুনি কি! ফিরলে যে!

—বড্ড রোদ, পারলুম না।

—পেরে দরকার নেই; বসবে এস।

দু'জনে আসিয়া রান্নাঘরে বসিল। ছায়া বলিল, আজ আমার এত ভুল হচ্ছে কেন বলতে পার?

অশোক তাহার মুখের পানে চাহিয়া ঘাড় নাড়িল।

ছায়া হাসিতে হাসিতে বলিল, সত্যি এত ভুল হচ্ছে আজ কি বলব! মায়ের ঝোলে দেব নুন, দিলাম তেঁতুল গুলে, আবার সব ফেলে দিয়ে নতুন করে চড়াই। কাঁচা মাছে নুন-হলুদ মাখায় ত, আমি মাখিয়ে বসলাম জিরে-বাটা।

অশোক হাসিতে লাগিল।

ছায়া বলিল, আজ ত ভুল হবার কথা নয়, তবু কেন এত ভুল—বল ত!

অশোক বলিল, কি জানি!

ছায়া কৃত্রিম কোপের সহিত বলিল, তুমি যেন কি! কিচ্ছু জান না!

অশোক চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ছায়া আপন মনে রান্না করিতেছে, মাঝে মাঝে হাসিমুখটি তুলিয়া অশোকের পানে চাহিতেছে; অশোক হাসিতে হাসি মিলাইবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু সে চেষ্টাকৃত হাসি প্রাণ পাইতেছে না।

অনেকক্ষণ এইভাবে কাটিল। বিজ্ঞজন বলিয়া থাকেন, স্বামী স্ত্রী নির্জ্জনে বসিয়া আছে, অথচ তাহাদের মধ্যে কথা-বার্ত্তা নাই—এ লক্ষণ ভাল নয়। মনে মনে দু'জনেই তাহা বুঝে, দু'জনেই প্রতিকার চায়, কিন্তু প্রতিকার হয় কই!

এক সময়ে অশোক মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, ছায়া!

ছায়ার কাণের ভিতর দিয়া কত মধু যে প্রবেশ করিল তাহা বলা যায় না। তাহার সকল অঙ্গ যেন নৃত্য করিয়া উঠিল। চন্দ্রোদয়ে সাগর-তরঙ্গের মত, দক্ষিণ বায়ে পুষ্প-লতার মত, নবারুণরাগে ধরিত্রীর মত নারীদেহ পলকে পুলকে যেন বিকশিত হইয়া উঠিল। যে কণ্ঠস্বরে পাখী প্রথমে প্রভাতী গাহে, যে কণ্ঠস্বরে নবোঢ়া বধূ ফুলশয্যার রাত্রে কথা বলে, যে কণ্ঠস্বরে লজ্জা মাধুর্য্যের গলবেষ্টন করিয়া থাকে, যে স্বরে অনুরাগ ঝঙ্কার দিয়া উঠে, সেই কণ্ঠস্বরে ছায়া বলিল, বল।

কিন্তু অশোক আর মুখ তুলিতে পারে না।

ছায়া সাগ্রহে কহিল, চুপ করে রইলে যে!

অশোক নতমুখেই কহিল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।

ছায়ার ভিতরটা ভয়ে কাঁপিতেছিল; বাহিরে তাহা যথা-সাধ্য গোপন রাখিয়া হাসিমুখেই কহিল, মোটে একটা!

অশোক বলিল, এখন থাক।

ছায়া সহজ স্বাভাবিক স্বরে কহিল, থাকবে কেন, বল না!

অশোক বলিল, না, রাত্রে বলব!

ছায়া হাসিয়া ফেলিল; বলিল, এখনও যা রাত্রেও ত তাই! এখন বলতেই বা ক্ষতি কি!

ক্ষতি কিছুই নয়, তবু যতটা বিলম্ব হয় ততই ভাল। অশোক তাহাই ভাবিতেছিল।

ছায়া অন্য কথা ভাবিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, কঠিন পরীক্ষা সম্মুখাগত। অধীর ছাত্রের মত যত শীঘ্র পরীক্ষা শেষ হইয়া যায়, সে তাহাই কামনা করিতেছিল। হাসিমুখে বলিল, রাত্রে কোথায় শোবে বল ত?

অশোক উৎকণ্ঠিত ভাবে নীরবে মুখ তুলিল।

ছায়া কতকটা লজ্জা কতকটা রাগভরা কণ্ঠে বলিল, বল না গো কোথায় শোবে?

উত্তর ছিল—এবং সে উত্তরে স্ত্রী মাত্রেই সুখানুভব করিতে পারে—সে উত্তর যে অশোকেরও জানা ছিল না তা নয়; কিন্তু সে উত্তর দিতে মনের যে বলের দরকার, অশোকের তাহা ছিল না এবং কেন ছিল না অশোকের মত অন্যেও তাহা বুঝিত। কিন্তু ছায়া তাহা বুঝিয়াও বুঝিল না, অথবা বুঝিতে চাহিল না, অথবা চিন্তাটাকে সে আমলই দিল না।

ছায়া পুনরায় বলিল, বললে না ত কোথায় শোবে!

একটু থামিয়া আবার বলিল, একটি ত ঘর, মা রোগা মানুষ, মাকে ত নড়ান যাবে না, বাবাই বা কোথায় শোন, তুমি—বলিয়াই সে হাসিয়া ফেলিল, বলিল—তুমি আমিই বা কোথায় শুই বল ত!

অশোক কোন কথা বলিল না, মুখ তুলিয়া চাহিলও না।

ছায়া একটু পরে বলিল, এ পাশে একখানা ঘর না তুললেই নয়। কি বল?

অশোক তথাপি কথা কহে না দেখিয়া ছায়া উদ্বিগ্ন মুখে বলিল, কি হল অমন চুপচাপ যে!

অশোক বার দুই ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, তুমি বিলাতের কথা জানতে চাও না?

ছায়া উৎসুকভাবে কহিল, বিলাতের গল্প?

অশোক নীরবে চাহিল।

ছায়া মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, না।

না! আশ্চর্য্য! অশোক বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল।

ছায়া বলিল, দেশ-বিদেশ দেখতে আমার খুব ভাল লাগে, দেশবিদেশের গল্প শুনতে কিন্তু একটুও ভাল লাগে না।

অশোক যেন বাঁচিয়া গেল। সব কথা বলিবার জন্যই সে নিজেকে প্রস্তুত করিতেছিল, কিন্তু তাহা যে কত কঠিন, তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেও ছায়ার কাছে অকপটে মুক্ত

হৃদয়ে সব কথা বলিবার সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিল। ছায়া সে কাহিনী শুনিতে অস্বীকার করায় একদিকে সে যেমন পরিত্রাণ লাভ করিল, অন্যদিকে মনের ভারটা যেন আরও ভারী হইয়া উঠিতেছিল। সেই ভারী বোঝাটাকে নামাইতে পারিলেই যেন সে সত্যকার মুক্তি পায়।

ছায়া উনানে কি একটা চড়াইয়া এক মনে তাহাতেই খুন্তি চালনা করিতেছিল, অশোক অপলক নেত্রে চাহিয়া তাহাই দেখিতে লাগিল। ছায়ার মুখের একটা দিকই দেখা যাইতেছে, সেই একটা দিকে যাহা দেখা যাইতেছে, তাহা অতীব স্পষ্ট, তাহাতে কোনরূপ ভেজাল নাই। কোমল আননের প্রত্যেকটি কমনীয় রেখা স্বচ্ছ প্রফুল্ল হৃদয়ের প্রতিবিম্ব ধারণ করিয়া রহিয়াছে। দেখিলেই মনে হয়, ইহার কোথাও একটু মেঘ নাই, শরতের সুপ্রভাতের মত সকলই সুনির্মল। অশোক তাহাতেই ভরসা পাইয়া বলিল, আমি কিন্তু সব কথা বলে তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে চাই।

ছায়া খুন্তিটাকে নামাইয়া রাখিয়া, একগাল হাসিয়া বলিল, আমি শুনলে ত!

—তার মানে?

—আহা! মানে আবার বোঝ না!

অশোক বলিল, আমি যে কত বড় পাপিষ্ঠ—

ছায়া হাসিয়া বলিল, ওগো মশাই, এটা আপনার কনভেণ্ট নয়, আপনি অবিবাহিতা কুমারী ন'ন, আমিও তোমার খুড়ি, আপনার পাদ্রী সাহেব নই যে তোমার—ঐ যাঃ, আপনার কনফেসন শুনে ক্ষমা করে আপনাকে স্বর্গের ছাড়পত্তর লিখে দোব। আমার কাছে আপনার অত বক্তৃতা করতে হবে না। বুঝলেন?

অশোককে নীরব দেখিয়া হাসি মুখে আবার বলিল, হ্যাঁগা, আমি কি তোমার জজ সাহেব না ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব!

—কিন্তু তুমি—

—কি আমি?—তখনই উচ্ছ্বসিত হাস্যে প্রায় লুটাইয়া পড়িয়া কহিল, তোমার স্ত্রী! প্রভু নই, বিচারক নই, দাসী নই, বাঁদীও নই, শুধু স্ত্রী! বুঝলে?

—স্ত্রীর ক্ষমা না পেলে—

ছায়া মসলার পাত্র হইতে গোটাকতক লঙ্কা-ফোড়ন হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, শীগগির চুপ কর, নইলে এই ফোড়নগুলো সব কড়ায় ছেড়ে দেব, হাঁচতে হাঁচতে সারা হবে।

—কিন্তু আমি যে না বলে নিশ্চিন্ত হতে পারছি নে!

—কে তোমায় নিশ্চিন্ত হতে বলছে! কাজের অন্ত আছে না কি? ঐ যে ঘরটার কথা বললুম, তার ব্যবস্থা কর না! টাকা আমার কাছে আছে। কিন্তু লোকজন জিনিসপত্তর ঠাকুরপোকে সঙ্গে নিয়ে যোগাড় করে ফেল দেখি!—থামিয়া একটু হাসিয়া বঙ্কিম নয়নে ছোট্ট একটি কটাক্ষ হানিয়া বলিল, আলাদা আলাদা থাকতে কি ভাল লাগে!—বলিয়াই মুখটা ফিরাইয়া লইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া কড়ার তরকারী নাড়িতে মন দিল।

অশোক তখনও বসিয়া ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া ছায়া রাগতভাবে কহিল, প্রথম রাত্রিটি ত বিফলেই গেল—লজ্জায় আড়ষ্ট ও রাঙা হইয়াও কথাটা শেষ করিল, দেখ না গো ঘরটা যাতে আজ-কালের মধ্যে হয়ে যায়।

হঠাৎ বাহিরে অনেকগুলি লোকের কণ্ঠস্বর শুনিয়া রান্নাঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখিয়া লইয়া ছায়া হাসিমুখে বলিল, গাঁয়ের লোক সব তোমাকেই দেখতে এসেছেন। যাও।

অশোক বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলে, ছায়া তাহার পাশে আসিয়া চুপে চুপে বলিল, আমার কথাটা ভুল হয় না যেন—বলিয়া রাঙা মুখে হাসিয়া সরিয়া গেল। আবার কাছে আসিয়া বলিল, ঘরটা, বুঝলে?

বাহিরে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই গ্রামের লোক। অশোক কাহারও চরণ স্পর্শ করিয়া, কাহাকেও শুধু হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া নতমুখে দাঁড়াইল, কুশলপ্রশ্নাদি ও অশোকের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা উঠিয়া পড়িল। অশোক তাঁহাদিগকে দাওয়ায় উঠিয়া বসিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাঁহারা উঠিলেন না; অথচ যে স্থানটিতে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, সেই স্থানটি রৌদ্রে পুড়িয়া যাইতেছিল। তাঁহারা সরিয়া গিয়া কাঁঠাল গাছটার ছায়ায় দাঁড়াইলেন।

তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে যে খুব সঙ্গোপনে একটা আন্দোলন চলিতেছিল, তাহা অশোকও বুঝিতেছিল, কিন্তু সেটা যে কি, তাহা সে অনুমান করিতে পারে নাই।

বয়োবৃদ্ধ একজন অন্য সকলকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, নরু ত আর আমাদের পর নয়। ওর কাছে ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড় করা কেন? খুলে বললেই ত হয়। তোমরা না পার, আমি বলছি।

সকলেই সস্মিত নয়নে তাঁহাকে সমর্থন করিল।

তিনি বলিলেন, বাবা নরু, একটা কথা বলি, এদিকে একটু এস ত!—বলিয়া তিনি অশোককে সঙ্গে লইয়া কাঁঠাল গাছটার ওদিকে যাইতেছিলেন, ইঁহারা আপত্তি করিয়া বলিলেন, বলতে হয় এখানেই বল না, সরকার। ছেলে-মানুষকে আবার রোদে টানা-হেঁচড়া করে নিয়ে যাওয়া কেন!

তখন সেই লোকটি কহিলেন, শোন বাবা নরু। আমাদের সকলেরই ইচ্ছে, তুমি দুটো প্রায়শ্চিত্ত করে ফেল, তা হ'লে তোমার সঙ্গে চলা-ফেরা করতে কারও কোন অমতই আর থাকে না।

অশোক সবিস্ময়ে কহিল, প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে!

—তাতে দোষ কি বাবা!

—একটা নিয়ম আছে, বুঝলে না নরু।

—এমন হাঙ্গামার কাজও সে কিছু নয়।

—গ্রামসুদ্ধ সকলেরই ইচ্ছে, বুঝলে না বাবা নরু।

অশোক বলিল, কিন্তু দুটো কেন?

—একটা হচ্ছে বিলেত যাওয়ার। আর—

—আর একটা!—বক্তা একটু এদিক-ওদিক দেখিয়া লইয়া বলিলেন, পাড়াগাঁয়ে ওটা এখনও চলে নি কি না, বুঝলে না বাবা!

—কি চলে নি?

—ঐ যে কেরাশ্চান মেয়ে বিয়ে!

অশোক বলিল, খৃশ্চান! কে বলেছে আমি খৃশ্চান বিয়ে করেছি?

—বেহ্ম, কেরাশ্চান, মুসলমান—ও তিনই এক।

—বলেন কি পার্ব্বতী কাকা। ব্রাহ্ম আর খৃশ্চান, মুসলমান এক!

—এক বৈ কি বাবা!

—সকলেই বলে—

—আমরাও জানি—

—ওরা তিনই গরু খায়।

—নইলে সনাতন হিন্দু সমাজ ওদের বার করেই বা দেবে কেন, বল!

অশোক বলিল, কিন্তু আপনারা বোধ হয় জানেন না, হাইকোর্টের জজেরা পর্য্যন্ত রায়ে স্বীকার করেছেন, ব্রাহ্মরাও হিন্দু।

—ওদের কথা ছেড়ে দাও না বাবা! আদালত চিরকাল মিথ্যে কথা বলে; ওখানে মিথ্যেরই জয়-জয়কার। যে যত বেশী মিথ্যে বলতে পারবে, তারই জিত, বুঝলে না! আইন-আদালতের কথা ছেড়ে দাও। যে যত ঘুষ খাওয়াতে পারবে, যে যত সত্যকে মিথ্যে করতে পারবে, মিথ্যেকে সত্য করতে পারবে, জজরা তার গোড়েই গোড় দেবে!

হঠাৎ পরেশের সঙ্গে অপরিচিত, দীর্ঘকায় একজন প্রৌঢ়-বয়স্ক সুপুরুষ ব্যক্তিকে বেড়া ডিঙ্গাইতে দেখিয়া বক্তার বক্তৃতা থামিয়া গেল এবং জনতা সাগ্রহে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

আগন্তুক দীর্ঘ এক মিনিট কাল ললাটে যুক্তকর স্থাপন করিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, আপনারা নিশ্চয়ই গ্রামের লোক। আপনাদের গ্রাম বেড়িয়ে এলাম। বেশ গ্রাম!

সমগ্র জনতা নরু'র মুখের পানে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া আগন্তুকের পরিচয় জানিতে চাহিলেন।

অশোক বলিল, আমার শ্বশুর মহাশয়।

জনতা সম্ভ্রমে বিনয়াবনত হইয়া পড়িলেন।

জজ সাহেব বলিলেন, আপনাদের জেলাতেই আমি আসছি ওমাস থেকে।

জনতা এবারে ভূম্যবলুণ্ঠিত হইলেন।

—তা আপনাদের সব কিসের পরামর্শ হচ্ছে, বলুন।

—ও কিছু না, কিছু না। নরুর সঙ্গে দেখা—

অশোক বলিল, ওঁরা বলছেন, আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

সমগ্র জনতা একেবারে ডিঙ্গি মারিয়া উঠিয়া বলিলেন, আরে, ও একটা কথার কথা—

অশোক বাধা দিয়া বলিল, ওঁরা বলছেন, দুটো প্রায়শ্চিত্ত না করলে—

—ছটো। ওঃ। বুঝেছি। তা প্রায়শ্চিত্তটা আধুনিক প্রথায় হবে, না—

—আপনি ধর্ম্মাবতার। আপনি যেমন আদেশ করবেন। পাড়াগাঁ স্থান, বুঝতেই ত পারছেন। তা ছাড়া—

—বাবা!

কোমল নারীকণ্ঠে আহ্বান আসিল, বাবা!

জজ সাহেব বলিলেন, আপনারা একটু দাঁড়ান, আমার মেয়ে কেন ডাকছে, শুনে আসি। কোথা রে ছায়া?

অশোক রান্নাঘর দেখাইয়া দিল।

রান্নাঘরে আসিয়া জজসাহেব যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মনে হইল, ছায়া বোধ হয় এখনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে। তাহার মুখ-চোখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে; কপাল দিয়া দর দর ধারে স্বেদ ঝরিতেছে; দেহটি যেন থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। জজসাহেব ভাবিলেন, রান্নাঘরের উত্তাপে এইরূপ ঘটিয়াছে। অবিলম্বে একটি পাচক বা পাচিকার ব্যবস্থা করিতে হইবে ভাবিয়া লইয়া, বলিলেন, কি বলছিস?

ছায়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, ওঁরা যা বলছেন, তাতে কি তোমার মত নেই?

—না।

ছায়া একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, কিন্তু করাই ভাল।

—কে বললে ভাল? কি দোষ করেছে যে, প্রায়শ্চিত্ত করতে যাবে, গোবর খাবে? কেন, কিসের জন্যে—

—কিন্তু ওঁরা যখন বলছেন—

—দেখ না, আমি ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি। পাড়াগাঁয়ের লোক দম দিয়ে কিছু বার করে নিতে এসেছে বুঝলি নি! এখন শুনেছে আমি এই জেলার জজ হয়ে আসছি, অমনি সুর কোমলে নেমে গেছে দেখছিস না?

ছায়া সকাতরে বলিল, না বাবা, তুমি করতে বল ওকে?

জজ সাহেব অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, তোর এত ভয় কেন বল ত?

—সে আমি তোমায় বলতে পারব না, কিন্তু তুমি অমত ক'র না বাবা, আমার এই কথাটি রেখ। বলিতে বলিতে তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল।

—আচ্ছা, আচ্ছা। সে আমি দেখছি। তুই বাহিরে একটু হাওয়ায় গিয়ে বস গে দিকিন।

—তুমি ওঁদের সঙ্গে তর্ক ক'র না বাবা, ওঁরা যা বলেন, তাইতেই মত কর।

—আচ্ছা, আচ্ছা—বলিয়া জজ সাহেব চলিয়া গেলেন। কন্যার এতখানি ব্যগ্র আকুলতার কোন কারণই তিনি বুঝিলেন না। কাল রাত্রি হইতে যে কথাটা কালভুজঙ্গের মত ফণাবিস্তার করিয়া ছায়ার মনের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে, অন্যে তাহা কিরূপে জানিবে?

জজ সাহেব ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ—তা হলে আমার মতেই আপনাদের মত ত?

—নিশ্চয়, নিশ্চয়, আপনি হুজুর, ধর্ম্মাবতার।

—বেশ, তা হলে শুনুন। অশোক প্রায়শ্চিত্ত করবে কিন্তু ও আধুনিক ছোকরা, আধুনিক মতে প্রায়শ্চিত্ত করলে আপনাদের আপত্তি হবে না ত?

—আপনি যখন বলছেন, কার সাধ্যি আপত্তি করে।

—উত্তম। শুনুন, গ্রামসুদ্ধ সমস্ত লোককে ও খাওয়াবে, আর প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ প্রত্যেককে পাঁচটা করে টাকা দেবে। তার বেশী কিছু ও করবে না। আপনারা রাজী?

—এ ত খুবই সমীচীন প্রস্তাব হুজুর।

—এতে আর আপত্তি করবার আছে কি?

—হুজুর যখন বলছেন—

—তা শুভস্য শীঘ্রম্।

কেবল একজন বলিল, একটু গোময়—

জজ সাহেব বলিলেন, সেটা আপনারা কেউ ওর হয়ে খেয়ে নেবেন। তার জন্যে দশটাকা বেশী। কেমন রাজী?

রাজী কি-না, তাঁহারা যে জবাব দিলেন, তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইবার কথা নহে। আগামী পরশ্ব শুভ-কর্ম্মের দিন স্থির করিয়া তাঁহারা প্রস্থান করিলেন বটে, কিন্তু গোময়-ভক্ষণ-সৌভাগ্য-সমস্যা লইয়া সেই দীপ্ত দ্বিপ্রহরে মাঠের মাঝখানে দাঁড়াইয়া যে কাণ্ড করিতে লাগিলেন, তাহা লিখিতে আমার এই মসী-অঙ্গ লেখনীও লজ্জায় মরিয়া যাইতেছে। আমি সে লজ্জা হইতে তাহাকে অব্যাহতি দিলাম। অতঃপর আপোষে স্থির হইল, কাজটা তিন চার

জনেই করিবেন। জজসাহেব দরাজ-হাত লোক, তাহাতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

জজসাহেব রান্নাঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া বলিলেন, কেমন রে, হয়েছে ত?

মেয়ে বাপের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, ঠিক হয়েছে বাবা।

—কিন্তু কেন বল দেখি তোর এত—

—সে তোমায় অন্য সময়ে বলব বাবা। পাড়াগাঁয়ের লোক যে কি বজ্জাত! কিন্তু অনেক বেলা হয়েছে, চান করবে না বাবা?

—ঐটি বাদ। শেষে কি তোমার শ্বশুরবাড়ী থেকে ম্যালোয়ারি নিয়ে যাব?

—আমার দেশে ম্যালোয়ারি নেই। বেশ চান না কর, না করবে, একটু জিরিয়ে হাত-পা ধোও, রান্না হয়ে গেছে। আমি শাশুড়ীকে দুটো খাইয়ে আসি।

ছায়ার শাশুড়ী নির্জীবের মত পড়িয়াছিলেন। ছায়াকে দেখিয়াই ডুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন: ডাকিলেন—বৌমা!

ছায়ার চোখেও জল আসিয়া পড়িয়াছিল, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, কেন মা?

—বুড়ো মাকে ক্ষমা কর মা, তুমি আমার সতীলক্ষ্মী, তোমার সিঁদুরের জোরেই আমার বাছা ফিরে এসেছে।

ছায়া ভূতলে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, উঠুন মা, ভাত এনেছি।

শাশুড়ী বলিলেন, বল মা, কোন কথা মনে রাখবে না?

ছায়া তাঁহার পায়ে মাথা ঠেকাইয়া বলিল, না মা, না! পুরানো কোন কথা আমার মনে নেই; সব আমি ভুলেছি। আপনি উঠুন। [ক্রমশঃ

জিজ্ঞাসা

—শ্রীপ্রতিভা ঘোষ

একই কথা কতবার শুনাইবে বল'
'ভালবাসি তোমারেই সখি!'
আমারে বাস না ভাল, ভাল তাহা জানি,
মোহ তব এ রূপ নিরখি'।
তুমি ভালবাস মোর চপল নয়ন,
ভালবাস নয়নের ভাষা,
এ-বাহু-লতিকা মোর বেড়ি' থাক্ তোমা'
নিশিদিন জাগে এ পিয়াসা।
গোলাপ-রঙ্গিন্ মোর কপোলের পানে
ভালবাস থাকিবারে চেয়ে,
বাস ভাল চঞ্চলি উঠুক্ অধর
চকিত-পরশ তব পেয়ে।
সিক্ত বসনে যবে চলি' স্নানশেষে
কলসী লইয়া মোর কাঁখে,
পিছু ফিরে দেখিবারে ভালবাস তুমি
থমকি' দাঁড়ায়ে পথ-বাঁকে।
ইসারায় কাছে ডেকে কহি, 'প্রিয়তম,'
ভালবাস শুনিতে সে বাণী,
চাহ এ-আঙুলগুলি মুঠিমাঝে ল'য়ে
ক'বে, 'কি নিঠুরা তুমি রাণি

মুখ ফুটে একবার কহিবে না মোরে
ছোট দু'টি কথা 'ভাল বাসি'?
তোমার কামনা ভাবি' আপনার মনে
বিরলে বসিয়া শুধু হাসি।
আমার এ-দেহ—সে তো নিশার স্বপন,
জাগরণে কিছু নাহি র'বে,
গত হ'লে যৌবন চঞ্চল দিঠি
অক্ষি-কোটরে ঠাঁই ল'বে।
ভুজ-বল্লরী মোর লুটাবে ধূলায়
শ্লথ হ'য়ে ছাড়ি সহকারে,
খুঁজিবে তৃতীয়ে মোর এ-দু'টী চরণ,
চলিতে পড়িব বারে বারে।
কপোলে নামিবে খাদ; মন-জয়ী হাসি
যৌবন ল'য়ে যাবে সাথে,
চিক্কণ কালো কেশ পাণ্ডুর হ'বে
একদিন জরা-পরভাতে।
ক'রো না গোপন, বল, সেদিনের ছবি
আঁখির সমুখে টেনে আনি—
কি আমার ভালবাস? দেহাতীত কিছু?—
—অথবা এ জড় দেহখানি?

পূর্ব্বরাগে ভবভূতি

—শ্রীরামশশী কর্ম্মকার

রাগ, অনুরাগ, পূর্ব্বরাগ প্রভৃতি কথায় বৈষ্ণব কবিগণেরই একচ্ছত্র রাজত্ব হওয়াতেও আমি কেন যে অগ্রে কবি ভবভূতির নামোল্লেখ করিলাম, তাহা ভাবিয়া কেহ কেহ বিস্মিত হইতে পারেন। অচিরে তাঁহাদের সে বিস্ময় বিদূরিত করিবার ইচ্ছা রাখিয়া বর্ত্তমানে ভাবুক কবি ভবভূতির কাব্যে রাগ-রসের অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিতেছি।

সাহিত্যদর্পণকারের বিধান অধুনাতন আলঙ্কারিক সমাজে সর্ব্ববাদিসম্মত। তিনি স্বীকার করিয়াছেন, পুরুষের অনুরাগ অগ্রে উদ্ভূত হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের লেখক কবি বড়ু চণ্ডীদাস এই মতের একান্ত পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন। পুরুষানুরাগ অগ্রে উদ্ভূত হইলেও স্ত্রীর অনুরাগ প্রথমে বর্ণনীয়, কারণ 'এবমধিকং হৃদয়ঙ্গমং ভবতি', এইরূপে কাব্য অধিক মনোরম হয়, সাহিত্যদর্পণকারের এই বিধানকে বড়ু চণ্ডীদাস লক্ষ্যই করেন নাই। না করুন, কিন্তু দর্পণকারের কথাটা অযুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। নারীর প্রেমের গভীরতা উদার হৃদয়ের প্রেমোচ্ছ্বাস যেমন হৃদয় স্পর্শ করে, পুরুষের সহস্র অহঙ্কৃত কল্পিতপ্রায় বাক্য তেমন পারে না, কারণ পুরুষের প্রেমে স্বভাবতই একনিষ্ঠতার অভাব সুবিদিত। অনন্তরত্নরাজির অধিকারীর নিকট রত্নের যে আদর, একটিমাত্র রত্নের অধিকারী তদপেক্ষা সহস্রগুণে সেই রত্নকে আদরযত্ন করে। তাই স্ত্রীর প্রেম, পুরুষের প্রেম অপেক্ষা এত মধুর, দর্শনে, শ্রবণে, কীর্ত্তনে ও অনুভবে। উদয়নের প্রতি সাগরিকার অনুরাগ, দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলার অনুরাগ, কৃষ্ণের প্রতি রাধার অনুরাগ (বিদ্যাপতি), শঙ্করের প্রতি পার্ব্বতীর অনুরাগ, রাজসিংহের প্রতি চঞ্চলকুমারীর অনুরাগ, অর্জ্জুনের প্রতি ভদ্রার অনুরাগ, জগৎসিংহের প্রতি আয়েসার অনুরাগ কে না সানন্দে দর্শন করিয়া থাকেন?

সকল কবিই এই নিয়ম, সুন্দরতর হইলেও, পালন করেন নাই, করিতে পারেন নাই। চণ্ডীদাসের পক্ষে কলঙ্কের গান অত্যধিক গাওয়া সম্ভব হইয়াছিল, বিদ্যাপতির হয় নাই। একপতিত্ব ও একপত্নীকত্বের মহিমা ও মাধুর্য্য খ্যাপন করা তাঁহাদেরই সম্ভব, যাঁহারা উহার মাধুর্য্যাস্বাদে নিজ নিজ জীবন মধুময় করিতে পারিয়াছেন। আর যাঁহারা মাধুকরী বৃত্তিকে জীবনের শ্রেষ্ঠাবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে মৌচয়া রসে পরিতৃপ্ত ব্যক্তির মধু-বর্ণনার ন্যায় পাতিব্রত্য ও একপত্নীকত্বের বর্ণনা অসম্ভব। কাব্য কবির বহুদর্শিতার উপাদানে গঠিত হইলেও, কবির মানসিক বৃত্তির রঙ্ অজ্ঞাতভাবে তাহাতে ধরিয়া যায়। তাই পুস্তকাগারে অধ্যয়নরত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে বলিতে পারে—

> 'Around me I behold
> The mighty minds of old.'

গ্রন্থ পাঠ করিলেই গ্রন্থকর্ত্তার মনের সহিত পরিচিত হওয়া যায়। ভবভূতির কাব্যপাঠেও তদ্রূপ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারা যায়।

মহাকবি ভবভূতিও স্বকাব্যে দর্পণকারের বিধানের ব্যতিক্রম দেখাইয়াছেন। কবি তদীয় প্রসিদ্ধ **'মালতীমাধব'** নাটকে ইঙ্গিতে নায়িকার অনুরাগ সঙ্কেতিত করিয়া নায়কের অনুরাগ পরিপূর্ণ-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাস রাধার পূর্ব্বানুরাগ ত্যাগই করিয়াছেন। লোকের মুখে মালতীর ভাবোদ্রেকের কিঞ্চিৎ সংবাদ পাইলেও মালতীকে অগ্রে বিরহোৎকণ্ঠিতা দেখিতে পাই নাই। কামন্দকীয় বাক্য (অঃ ১, শ্লো ১৮) হইতে জানা গিয়াছিল যে, মদনোদ্যানে পরস্পর দর্শনের পূর্ব্বে বাতায়নগতা মালতী অমাত্য-ভবনাসন্নরথ্যাসঞ্চারী মাধবকে দেখিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হইয়া এবং উৎকণ্ঠা-বিনোদন-জন্য মাধবের আলেখ্য ধারণ করিয়া অনুরাগের উদ্রেক কতক পরিমাণে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিল; কিন্তু কবি মালতীর মদনবিকারাদি সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করেন নাই; বোধ হয়, কবির সে ইচ্ছা ছিল না। মালতী চণ্ডীদাসের রাধার ন্যায় বলে নাই—

> 'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
> কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
> আকুল করিল মোর প্রাণ।'

কিংবা বিদ্যাপতির রাধার মত অধীর-ভাবে বলে নাই—

'তব ধরি অবোধী মুগধ হাম নারী।
কি কহি কি বলি কছু বুঝই না পারি॥'

কিংবা বিদগ্ধ-মাধবের দূরাগত বেণুনাদবিহ্বলা রাধার ন্যায় বলে নাই—

'নাদঃ কদম্ববিটপান্তরতো বিসর্পন্
কো নাম কর্ণপদবীমবিশন্ন জানে।
হা হা কুলীনগৃহিণীগণগর্হণীয়াং
যে নাদ্য কামপি দশাং সখি লম্ভিতাস্মি॥' (বিঃ মাঃ ১।১৪)

ভবভূতি মাধবের প্রতি পক্ষপাত দেখাইয়াছেন। মালতী-সৌন্দর্য্যদর্শনমুগ্ধ মাধব ক্ষণকাল মালতীর অদর্শন সহ্য করিতে পারিতেছে না। চিত্ত-বিনোদনের জন্য 'সৌন্দর্য্যসারসমুদায়-নিকেতন' মালতীর প্রতিমূর্ত্তি নিজ কলাকৌশলে অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু কার্য্য অসম্ভব হইয়া পড়িল।

'বারং বারং তিরয়তি দৃশাবুদ্গতো বাষ্পপূরঃ
তৎসংকল্পোপহিতজড়িমস্তম্ভমভ্যেতি গাত্রম্।
সদ্যঃ স্বিদ্যন্নয়মবিরতোৎকম্প-লোলাঙ্গুলীকঃ
পাণির্লেখাবিধিষু নিতরাং বর্ত্ততে কিং করোমি॥'

(মাঃ মাঃ ১।৩৮)

নিরন্তর অশ্রু নির্গত হইয়া দৃষ্টি রোধ করিতেছে; চিন্তার গুরুত্ব-জন্য জড়তা শরীর আচ্ছন্ন করিতেছে; করাঙ্গুলি অবিরাম ঘর্ম্মাক্ত ও কম্পিত হইয়া লিখন কি অঙ্কন-কার্য্য কোনটাই করিতে দিতেছে না।

মালতীগতপ্রাণ মাধব কখনও বলিতেছে—

উন্মীলন্মুকুলকরালকুন্দকোশ-
প্রচ্যোতদ্ঘনমকরন্দগন্ধবন্ধো।
তামীষৎপ্রচলবিলোচনাং নতাঙ্গীম্
আলিঙ্গন্ পবন মম স্পৃশাঙ্গমঙ্গম্॥

(মাঃ মাঃ ১।৪১) (তুলনীয়ঃ মেঘদূত, উ. ৪৬)

'হে পবন, তুমি কুন্দকে ফুটাইতেছ, তুমি পুষ্প-মকরন্দে ভরপূর। তুমি আমার চঞ্চলাক্ষী, ক্ষীণাঙ্গী প্রিয়াকে আলিঙ্গন করিয়া আমার সকল অঙ্গ স্পর্শ কর'।

মাধব মালতীর অঙ্গসৌরভবাহী বায়ু-স্পর্শে প্রিয়তমার আলিঙ্গনসুখ অনুভব করিতে সদা ইচ্ছুক। প্রিয়তমার দর্শন আশায় কুসুমাকর উদ্যানে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছে। এইরূপ পদে পদে কবি মাধবের উদ্বেগ, কম্প, স্বেদ ও মত্ততা পর্য্যন্ত দেখাইলেন। এমনি, কিংবা ইহা অপেক্ষা অধিক উন্মত্ততা দেখাইয়াছেন স্বীয় নায়কে কবি বিদ্যাপতি। শ্রীকৃষ্ণ রাধার দর্শন আশায় কখনও পথিপার্শ্বে, কখনও স্নানঘাটে, কখনও গোধূলির অন্ধকারে গা ঢাকিয়া গৃহদ্বারে উপনীত হইত। বিদ্যাপতি বাস্তব জগতের চিত্রের একাংশ দেখাইয়াছেন। মহাকবি ভবভূতির কাব্যেও সেই চিত্র দেখিতেছি। কে জানে বিদ্যাপতির কাব্যে ভবভূতির ছায়া পড়িয়াছে কি না। বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকে অস্বাভাবিক ভাবে 'মহাদানী', নাবিক, ভারবাহী ও ছত্রধারী করিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। এ সকল বর্ণনায় বড়ু কবি যথেষ্ট দক্ষতা প্রদর্শন করিলেও ঘটনাবলীর সমাবেশ ঠিক সম্ভবমত নয় বলিয়া পাঠককে সময়ে সময়ে বিমনা হইতে হয়। কেহ কেহ বলিবেন, চক্রধারীর পক্ষে কোন চক্রই অসম্ভব নয়।

ভবভূতি মাধবের কামদশা অতি দ্রুত অগ্রসর করাইয়া দিলেন। প্রিয়তমাধ্যাননিরত মাধব ইতিমধ্যে (প্রথমাঙ্কেই) চারিদিকে কেবল মালতীর মূর্ত্তি স্ফূর্ত্ত দেখিতে লাগিল ও বলিতে লাগিল—

পশ্যামি তামিতঃ পুরতশ্চ পশ্চাদ
অন্তর্বহিঃ পরিত এব বিবর্ত্তমানাম্।
উদ্বুদ্ধমুগ্ধকনকাব্জনিভং বহন্তীম্
আসক্তমিয়াপবর্ত্তিতদৃষ্টিবক্ত্রম॥ (মাঃ মাঃ ১।৪৩)

'আমি সেই ফুল্লকনককমলমুখীকে মৎপ্রতি কটাক্ষ করিতে করিতে আমার অগ্রে, পশ্চাতে, অন্তরে, বাহিরে—সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে দেখিতেছি'।

জয়দেবের মাধবও এইরূপ একদিন বলিয়াছিল—

'দৃশ্যসে পুরতো গতাগতমেব মে বিদধাসি।' কিন্তু সে কথা পূর্ব্বরাগাবসরে উক্ত হয় নাই; হইয়াছিল প্রথম মিলনান্তে।

আবার কখনও মাধব বলিতেছে,—'আমার হৃদয় জ্বলিয়া যাইতেছে; কেবল সেই প্রিয়তমার ঐকান্তিক ধ্যান করিয়াই কোনরূপে বাঁচিয়া আছি'। এই কথারই যেন প্রতিধ্বনি করিয়াছেন জয়দেব—নায়িকার পক্ষে—

'সা বিরহে তব দীনা
মাধব মনসিজবিশিখভয়াদিব ভাবনয়া ত্বয়ি লীনা।'

(গীত. ৪।২)

আবার—

'তব কিতব বিধায়ামন্দকন্দর্পচিন্তাং
রসজলধিনিমগ্না ধ্যানলগ্না মৃগাক্ষী ॥' (গীত, ৬।১০)

এইরূপে কবি ভবভূতি, নায়িকার নিকট প্রেমের প্রতিদান না পাইয়াও যে নায়কের প্রেম বর্দ্ধিত হইতে পারে, তাহা দেখাইয়াছেন। আয়েসার প্রতি ওসমানের প্রেম এবং জগৎ সিংহের প্রতি আয়েসার প্রেম, প্রতিদানের অসদ্ভাবেও যে কত দূর প্রসার লাভ করিতে পারিয়াছিল, তাহা 'দুর্গেশ-নন্দিনী' ও 'নবাবনন্দিনী'র পাঠকমাত্রেই উপলব্ধি করিয়াছেন। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে' উদাসীনা শুধু নয়, বিরুদ্ধা অপ্রাপ্তযৌবনা নায়িকার উপর একাঙ্গ প্রেমে (কামে ?) প্রেমিক (কামুক ?) নায়ক যে অত্যাচার করিয়াছে, তাহা প্রেমচর্চ্চায় স্থান পাইতে পারে কি না, বিশেষ চিন্তার বিষয়। সে চিন্তা বর্ত্তমানে ত্যাগ করিলাম।

• •

কেহ কেহ বলিতে পারেন, একাঙ্গ প্রেম একটা অদ্ভুত জিনিষ। ইহা যে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর নহে, তাহা অবিসংবাদিত; কিন্তু তাই বলিয়া প্রেম বিচার করিয়া সংঘটিত হয় না। 'স্নেহশ্চ নিমিত্তসব্যপেক্ষশ্চ ইতি বিপ্রতিষিদ্ধমেতৎ' (মাঃ মাঃ ১ম অঙ্ক)—স্নেহ চিত্তের আদ্রতা, তাহা বাহ্য উপাধির অপেক্ষা রাখে বলিলে অসামঞ্জস্য হয়। সূর্য্য-দর্শনে পদ্মের বিকাশের ন্যায়, চন্দ্রোদয়ে চন্দ্রকান্তমণির দ্রবতার ন্যায় প্রিয়-দর্শনে চিত্তের যে দ্রবতা, তাহা কিছুরই অপেক্ষা রাখে না। মহারাজ সংবরণ পুরুষপ্রবর হইয়াও সূর্য্য-কন্যা তপতীর জন্য উন্মত্ত হইয়াছিলেন। ঋষিকুমার পুণ্ডরীক, বিদ্যাধরবালা মহাশ্বেতাকে সকৃৎ দর্শন করিয়াই এরূপ উন্মত্ত হইয়াছিলেন যে, অত্যল্প সময়ও বিরহযন্ত্রণা সহ্য করিতে পারেন নাই। এ সকল স্বাভাবিক নিয়মে ঘটিয়া থাকে; কোন শাস্ত্রীয় বিধান কি সামাজিক নিয়মের অপেক্ষা রাখে না। আর সেই সত্য স্বভাবের দিকে লক্ষ্য করিয়াই কোন কোন কবি নাট্যশাস্ত্রের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া, 'অগ্রে পুরুষানুরাগ বর্ণনা করিয়া বসিয়াছেন। তাহাতে হয়ত নায়কের উপর দুর্ব্বলতা দোষ আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু পড়িলে কি হয়? কবির মন নিজ আদর্শ নিজ কাব্যে পরিস্ফুট করিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়। তাই দেখি, ভবভূতির নায়ক সর্ব্বত্র প্রেমপ্রাণ এবং নায়িকা বহু পরিমাণে সংযতা। ভবভূতির মালতী-চরিত্রে কতটা সংযম আছে তাহা ক্রমশঃ দেখাইতেছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, লোকমুখেই কেবল শুনা গিয়াছিল, মালতীর বিরহোৎকণ্ঠা সঞ্জাত হইয়াছে; কিন্তু তাহা অত্যন্ত গুপ্ত ছিল। কামন্দকীর মুখেই কবি বলাইতেছেন—'অত্যুদার-প্রকৃতির্মালতী নাম'। সত্যই মালতী একটি অসাধারণ বালা। এরূপ গাম্ভীর্য্যময়ী প্রকৃতি সচরাচর দর্শন-পথে পতিত হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র এই গাম্ভীর্য্য দিয়া তদীয় আয়েসা-চরিত্র চিত্রিত করিয়াছিলেন। ভবভূতির সীতা-চরিত্রেও এই গাম্ভীর্য্য বিদ্যমান। কবি ভবভূতি নারী-চরিত্রের উপর অগাধ শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ নারী-চরিত্র এরূপে দেখাইয়াছেন। নায়িকার হৃদয়ে গাঢ় অনুরাগ ঢালিয়া দিয়াও, কবি সংযম দ্বারা তাহা প্রকাশ করিতে দেন নাই। মালতীর হৃদয়ে মাধবাভিমুখী প্রীতি ধ্রুব জন্মিয়াছিল; কিন্তু চরমাবস্থায়ও মালতী তাহা কাহাকেও সম্পূর্ণ জানিতে দেয় নাই; তাহা বিবাহের পূর্ব্বক্ষণেও কেহ ঠিক মত জানিতে পারিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কামন্দকী নানা কূট-কৌশলে মালতীকে মাধবসহ সংমিলিত করিয়া দিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু মালতী একদিনের জন্যও কাহাকেও অনুরোধ করে নাই যে, কেহ তাহাকে মাধবসহ মিলিত করিয়া দেয়। সহচরী লবঙ্গিকা বিবিধ বাকাচ্ছটায় মালতীর মদনাবস্থা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছে। সে বলিয়াছে—'মালতী কলাক্রীড়া ত্যাগ করিয়া কেবল করতলে গণ্ড স্থাপন করিয়া দিবস যাপন করিতেছে। মৃদু, শীতল ও সুগন্ধ সমীর-সংস্পর্শ তাহার ক্লেশকর বোধ হইতেছে। মাধবকে দেখিয়া অবধি সে অত্যন্ত ম্লান হইয়াছে। বল্লভসমাগমচিন্তা-মাত্রেই স্বেদসিক্ত হইতেছে। চন্দ্রকিরণ-স্পর্শে শীতলচন্দ্রকান্তমণিময় হার ধারণ করিয়া, কর্পূরচন্দনাদি-শীতলরসসিক্তকদলীদলে শয়ান থাকিয়া এবং সহচরিগণদ্বারা যথোচিত সেবিতা হইয়াও রাত্রি জাগিয়া কাটাইতেছে। দেহ নিয়ত কণ্টকিত হইতেছে; পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা হইতেছে; দেখিয়া সখীরা নিরাশ হইতেছে'। (৩য় অঙ্ক)

এই সব কথাই জয়দেবের নিকট পুনরাবৃত্তি পায় নাই কি?

আবার কামন্দকী-মুখে শুনিতেছি—

নিকামং ক্ষামাঙ্গী সরসকদলীগর্ভসুভগা
কলাশেষা মূর্ত্তিঃ শশিন ইব নেত্রোৎসবকরী।
অবস্থামাপন্না মদনদহনোদ্দাহবিধুরাম্
ইয়ং ন কল্যাণী রময়তি মনঃ কম্পয়তি চ॥ (২য় অঙ্ক, ৩য় শ্লোক)

পরিপুষ্ট কদলীসদৃশ সুন্দর দেহ কলাবশেষ চন্দ্রের ন্যায় ক্ষীণ হইয়াছে। মদনানলে দগ্ধ হইয়া মালতীর এই দশা। দেখিলে আনন্দও হয়, ভয়ও হয়।

আবার শুনিয়াছি, মালতীকে মাধবাকাঙ্ক্ষিণী করিতে লবঙ্গিকার যুক্তি—'তা এথ পিঅসহি সলাহণিজ্জং উল্লহ-মণোরহফলং জীঅলোকস্সজং গুরুআণুরাঅসরিসো মহাভাঅ-বল্লহসমাঅমোত্তি এত্তিঅং জাণীমো'; অর্থাৎ মাধবদর্শনে তোমার এই দারুণ অবস্থা; সখি, বেশী জানি না; তবে এই মাত্র বলিতেছি যে, যদি ভালবাসার অনুরূপ প্রিয়তম লাভ হয় তবেই জীবনের সার্থকতা।

কামন্দকীও এই ভাবে মালতীকে মাধব-মিলনে উদ্যত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। (৬ষ্ঠ অঙ্ক, ১৫ শ্লোক)

ভবভূতির সখীর চাতুর্য্য, বৈষ্ণব-কবিগণের রাধাসহচরীদের মধ্যে ষোলকলায় পূর্ণ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। বিদ্যাপতির—

'বড় পুণ্যে রসবতি মিলে রসবন্ত।'
... ...
'সুপুরুখ ঐছন নাহি জগমাঝ॥
... ...
সকল পুরুষ নারী নহে গুণবন্ত॥
জীবন চাহি যৌবন বড় রঙ্গ।
তবে যৌবন যব, সুপুরুখ সঙ্গ॥'

ভবভূতির বাণীর প্রতিধ্বনি বলিয়া সংশয় হওয়া বিচিত্র নহে।

বিদ্যাপতির রাধা 'অপযশভীত' হইলেও তাহাকে আর অভিসারে দেরী করিতে দেখি নাই। কিন্তু, ভবভূতির মালতী তদপেক্ষা অধিক সংযতা। মাধবের রূপে হৃতচিত্তা হইয়াও এবং মাধবেতর ব্যক্তির সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ পিতার অভিপ্রেত শুনিয়াও মালতী গোপনে মাধবকে আত্মসমর্পণ করিতে যায় নাই। প্রতিভা-সুন্দরীর মত বিদুষীও পিতার মত অবহেলা করিয়াছিল। ইমোজেন (Imogen) পিতার (Cymbeline) অমতে পোস্থুমাস্-(Posthumus)-এর হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। কবি বাইরণের দস্যুতনয়া হেইডী পিতার অজ্ঞাতে অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির হস্তে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিল। শকুন্তলা সর্ব্বজ্ঞ পিতার পরোক্ষে আত্মদান করিতেও সাহসিনী হইয়াছিল। কিন্তু, বঙ্কিমের আয়েসা পিতার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া পিতার অপমান করিতে চায় নাই; আর চায় নাই ভবভূতির মালতী। মাধব পিতার অনভিপ্রেত শুনিয়া মালতী বলিল—'হা হদম্হি সমুপত্থিদাসণিবজ্জপড়ণা মন্দভাইণী, (২য় অঙ্ক)—হায়, সমুপস্থিত বিপদ্‌বজ্রপাতে মন্দভাগিনী আমি হত হইলাম; আমার জীবন ব্যর্থ হইল। 'নিব্বূঢ়ং অ ণিক্করুণদাএ তাদস্‌স কাবালি-অণুণং। পরিণিট্‌ঠিদো দেব্বহদঅস্‌স দালুণসমারম্ভপরিণামো (৪র্থ অঙ্ক, পৃ ১০৫)—পিতা নির্দ্দয় হইয়া আমার উপর কাপালিকের কার্য্য করিলেন। পাপ দৈবের নিদারুণ কার্য্য সম্পূর্ণ হইল।

এইরূপে মালতী অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে। মাধব সুন্দর ও সদ্বংশজাত; মালতী তাহাকে হৃদয় দিয়া ভাল বাসিয়াছে; তাহাকে না পাইলে মালতীর কষ্টের সীমা থাকিবে না। কষ্টের সীমা থাকিবে না, হয়ত বা জীবন-সংশয় হইবে, কিন্তু তথাপি সংযম ত্যাগ করা যাইবে না। 'অহং এব্ব বারং বারং বিলোঅঅন্তী পলাঅন্তপড়িট্‌ঠাবিদধীরত্তণাবট্‌ঠম্ভেণ অন্তণো হিঅএণ দূরং বিলাঅন্তলজ্জত্তেণ ভুবিরণঅলহুআ এথ অবরদ্ধম্হি' (২য় অঙ্ক)—আমিই ধীরতা ত্যাগ করিয়াছি; আমিই লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়াছি; তাহাকে বার বার দেখিয়া দোষ করিয়াছি। দোষ করিয়াছি বটে, কিন্তু অপরাধ আর বাড়াইতে পারি না। নিজ জীবন সুখী করিতে পিতার মনে কষ্ট দিতে পারি না; কুলের মর্য্যাদা হানি করিয়া পিতার মাথা হেট করিতে ইচ্ছা করি না।

ব্যাপারটি দাঁড়াইল ঠিক শ্রীরামচন্দ্রের সীতা-পরিত্যাগের ন্যায়। 'প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়া সীতা রামস্যাসীন্মহাত্মনঃ'। প্রাণাধিক প্রিয়া শুধু নয়, অকলঙ্ক-চরিত্রা সীতাকে ত্যাগ করিতে হইল। কেন? বংশ-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ধৈর্য্যশীল রামচন্দ্র আত্মোৎসর্গ করিলেন। সীতা পরিত্যাগ ব্যাপার যে রামচন্দ্রের পক্ষে মৃত্যু অপেক্ষা ভীষণতর হইয়াছিল, তাহা অগস্ত্য-পত্নী লোপামুদ্রার কথায় প্রকাশ পায়।

'অনির্ভিন্নো গভীরত্বাৎ অন্তর্গূঢ়ঘনব্যথঃ।
পুটপাকপ্রতীকাশো রামস্য করুণো রসঃ॥'
(উত্তর, ৩য় অঙ্ক, ১ম শ্লোক)

পুটপাকের ন্যায় রামের বিরহ-বেদনা বাহিরে অপ্রকাশ থাকিলেও অন্তরে হৃদয়কে ভস্মসাৎ করিয়াছিল।

'যথা তিরশ্চীনমলাতশল্যং
পত্যুপ্তমন্তঃ, সবিষশ্চ দংশঃ।
তথৈব তীব্রো হৃদি শোকশঙ্কু—
র্মর্ম্মাণি কৃন্তন্নপি কিং ন সোঢ়ঃ॥'
(উত্তর, ৩য় অঙ্ক, ৩য় শ্লোক)

উত্তপ্ত লৌহশলাকা হৃদয়ে বিদ্ধ হইলে যে যন্ত্রণা হয়, কিংবা বিষধর কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে যে যাতনা হয়, সেরূপ যাতনা রামচন্দ্রের হৃদয়কে ছিন্নভিন্ন করিলেও, পরম ধৈর্য্য সহকারে রামচন্দ্র সে দারুণ বিরহশোক সহ্য করিয়াছেন। কেন? কেবল কুল-মর্য্যাদা অব্যাহত রাখিবার জন্য।

মালতীও নিজ জীবন সুখময় করিবার জন্য কুলে জলাঞ্জলি দিতে পারিবে না।

জ্বলতু গগনে রাত্রৌ রাত্রাবখণ্ডকলঃ শশী।
দহতু মদনঃ কিং বা মৃত্যোঃ পরেণ বিধাস্যতঃ॥
মম তু দয়িতঃ শ্লাঘ্যস্তাতো জনন্যমলান্বয়া।
কুলমমলিনং, ন ত্বেবায়ং জনো ন চ জীবিতম্॥

(মাঃ মাঃ, ২য় অঙ্ক, ২য় শ্লোক)

পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে বিরহীর দেহে অগ্নিবৃষ্টি হয়; মদনদাহনে বিরহিণীর মরণাধিক যন্ত্রণা হয়। হোক। জীবন যাউক। জীবনে প্রয়োজন নাই; কারণ মাধবরহিত জীবন মালতীর পক্ষে অসম্ভব। প্রাণপ্রিয়ের আশা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া কোন প্রেমিকই জীবনধারণ করিতে পারে না। তবে মাধবকেই স্বেচ্ছায় গ্রহণ কর না কেন? না, তাও অসম্ভব। মালতী অমল কুলে কলঙ্ক লেপন করিতে পারিবে না; সদ্বংশজা জননী ও শ্রদ্ধাস্পদ পিতার অপমান কোন মতে হইতে দিবে না। সে মাধবকেও চায় না; যা'ক জীবন।

মালতীর এইরূপ মনোভাব। প্রকৃত সৎকুলাভিমানবতী আত্মসম্মানজ্ঞানবতী সতীর ভাব। এইরূপ আত্মসম্মানজ্ঞান নারীর চরিত্রে কয় জন কবি দেখাইয়াছেন? রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ সত্যই বলিয়াছেন—'প্রেমের বর্ণনায়, বিশুদ্ধ প্রেমের বর্ণনায় যে, অশ্লীলতার কোনই প্রয়োজন হয় না, তাহা ভবভূতি এই নাটকে (মালতীমাধবে) অতি দক্ষতার সহিত প্রমাণ করিয়াছেন।' (শ্রীকণ্ঠ, পৃঃ ২৩৭)।

অনেকে বলিবেন—ইহা ঐকান্তিক ভালবাসা নহে; কুল, শীল, মান, মর্য্যাদার ধারণা যতক্ষণ বিলুপ্ত না হয়, যতক্ষণ নায়িকা না বলিতে পারে—

'জাতি জীবন ধন কালা।' (চণ্ডীদাস)

ততক্ষণ সে-ভালবাসার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে বলা যায় না। মহাকবি সেক্সপীয়র সর্ব্বস্বপণ প্রেমের দারুণ চিত্র 'রোমিও জুলিয়েটে' চিত্রিত করিয়াছেন। সেই প্রেম আজ জগতে 'love divine' বলিয়া যে বর্ণিত ও চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে কাহারও আপত্তি টিকিতেছে না। বৈষ্ণবগণের রাধাচরিত্রে এই জাতীয় 'পিরীতি'ই প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস তদীয় চিরপ্রখ্যাত জগদ্বিশ্রুত শকুন্তলানাটকে এই জাতীয় প্রেমের প্রশ্রয় দিলেন না। শকুন্তলা দুষ্যন্তচরণে চিত্তোৎসর্গ করিয়া ফেলিয়াছিল; কিন্তু দেহ-সমর্পণে ইতস্ততঃ করিয়াছিল; তাহার মধ্যে আত্মসম্মান কতকটা প্রকাশ পাইয়াছিল; কিন্তু গুপ্ত প্রতিজ্ঞায় যে আত্মমান ও পিতৃমান রক্ষিত হয় না, তাহা বুঝিবার মত ধৈর্য্য কামদগ্ধা নবীনা শকুন্তলা দেখাইতে পারে নাই। কবি শকুন্তলার ততটুকু দুর্ব্বলতাও সহ্য করিলেন না; দারুণ শাস্তি সেই প্রিয় দুষ্যন্তের হাত দিয়াই দেওয়াইলেন; দেখাইলেন—স্বৈরাচার যত সামান্যই হ'ক না কেন, তাহা অশুভাবহ সুতরাং অমার্জ্জনীয়। আয়েসা জগৎসিংহের রূপে গুণে বিমুগ্ধা হইয়াও তাঁহাকে চিত্তসমর্পণ করিলেও, তাঁহাকে 'স্বামী' বলিয়া স্বীকার করিলেও, আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, কুলমর্য্যাদা বজায় রাখিবার জন্য, নিজের অতুল জীবনকে ব্যর্থ করিয়া দিল। বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ নারীচরিত্রের অন্যতমা নবাবনন্দিনী আয়েসার চরিত্র অকলঙ্ক, অনিন্দ্যসুন্দর। এমনই তেজস্বিনী নারীচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন মহাকবি স্কট (Scott)। 'উডষ্টক' (Woodstock) নামক উপন্যাসে বর্ণিত এলিস্ লি (Alice Lee) আশৈশবসঞ্জাত ও পরিপুষ্ট প্রেমে পূর্ণ হইয়াও পিতার অমতে, কুলের বিরুদ্ধে প্রিয় মার্কহাম এভারাড্‌কে (Markham Everard) আত্মদান করে নাই। 'More he can not have, and will not ask, until some happy turn shall reconcile these public differences and my father be once more reconciled to him.' হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা এবং প্রীতি নিঃশেষে দান করিয়াও এবং সম্রাটপুত্রের প্রেমপূর্ণ প্রার্থনা সগর্ব্বে প্রত্যাখ্যান করিয়া এভারার্ডের জন্যই আপনাকে উৎসর্গীকৃত করিয়া রাখিলেও, এলিস মার্কহামকেও অধিক প্রশ্রয় দেয় নাই। সে তেজস্বিনী নারী জানে, সংসারে সর্ব্ববিষয়ে সমদর্শিতা না থাকিলে, সংযম না থাকিলে, বংশমর্য্যাদা ও গুরুজনভক্তি না থাকিলে এবং শুদ্ধ আত্মসুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি একান্ত পক্ষপাত দেখাইলে, তাহা মানুষের কেবল দুর্ব্বলতা নয়, মহা অকল্যাণ। তাদৃশ উন্মত্ত ভাব, 'সমস্ত বিশ্বনীতিকে আপনার প্রতিকূল করিয়া তোলে; অল্পদিনের মধ্যেই দুর্ভর হইয়া উঠে, সকলের বিরুদ্ধে আপনাকে আপনি সে আর বহন করিয়া উঠিতে পারে না।' 'যে অন্ধ প্রেমসম্ভোগ আমাদিগকে 'স্বাধিকারপ্রমত্ত' করে, তাহা ভর্ত্তৃশাপের দ্বারা খণ্ডিত, ঋষিশাপের দ্বারা প্রতিহত ও দেবরোষের দ্বারা ভস্মসাৎ হইয়া থাকে।'

'স্বপ্নবাসবদত্তা'য় বাসবদত্তার এবং 'অভিজ্ঞানশকুন্তলে' শকুন্তলার দুঃখে, সেক্সপীয়রের 'রোমিও জুলিয়েটে'র অকাল নির্ব্বাণে, বাইরনের হেইডির পতিশোকে এবং বৈষ্ণবীয় রাধার দীর্ঘ দুর্দ্দশায়, উন্মত্ত প্রেমের দারুণ পরিণাম প্রকটিত হইয়াছে।

আর, 'যে আত্মসংবৃত প্রেম সমস্ত সংসারের অনুকূল, যাহা আপনার চারিদিকের ছোট এবং বড়, আত্মীয় এবং পর, কাহাকেও ভোলে না, যাহা প্রিয়জনকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া বিশ্বপরিধির মধ্যে নিজে মঙ্গলমাধুর্য্য বিকীর্ণ করে, তাহার ধ্রুবত্বে দেবে মানবে কেহই আঘাত করে না' (রবীন্দ্রনাথ)। মহাকবি ভবভূতি স্বীয় কাব্যে সেই সর্ব্বতোভদ্র প্রেমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। জগতের লেখকদের সম্মুখে শুধু নয়, সাধারণের সম্মুখে মঙ্গলময় আদর্শ নারীচিত্র স্থাপন করিয়াছেন।

"ধর্ম্ম" সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষিগণের কথা

—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

পূর্ব্বানুবৃত্তি

স্যার রাধাকৃষ্ণন্ ও ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের ধর্ম্ম-বিষয়ক দুইটি বক্তৃতা অবলম্বন করিয়া এই প্রবন্ধটির আরম্ভ হইয়াছে।

ভারতীয় ঋষিগন জীবের "ধর্ম্ম" সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহা কত পরিষ্কার ও মানুষের পক্ষে তাহা কত প্রয়োজনীয় এবং বর্ত্তমান কালে ভারতীয় ঋষিগণের ভাষা বিলুপ্ত হওয়ার ফলে পণ্ডিতগণ ঐ সমস্ত কথা কত অপরিষ্কার করিয়া তুলিয়াছেন এবং তাহাতে ঐ প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি কত নিষ্প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়, তাহা দেখানই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সংস্কৃত ভাষায় 'ধর্ম্ম' এবং 'ধর্ম' এই দুইটি শব্দ আছে। বর্ণগত অর্থানুসারে ঐ দুইটি শব্দে কি বুঝায়, তাহা আমরা প্রথমতঃ পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিয়াছি। তাহার পর ঐ দুইটি শব্দের অর্থের সহিত যে বৈশেষিক ও পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন-প্রোক্ত সংজ্ঞার সামঞ্জস্য আছে, তাহা দেখাইব।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের যাহা যাহা বক্তব্য, তাহা বলা শেষ হইলে, স্যর রাধাকৃষ্ণন্ ও ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত শ্রেণীর পণ্ডিতগণ ভারতীয় ঋষিগণের মূল কথা সম্বন্ধে কিরূপ অজ্ঞ এবং তাঁহারা অযথা জগৎকে কিরূপ প্রতারিত করিতেছেন, তাহা পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন।

ইহা ব্যতীত জগতের অগণিত মনুষ্যশ্রেণী কেন যে ক্রমশঃ দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর, অসন্তুষ্ট হইতে অসন্তুষ্টতর, অশান্তিময় হইতে অধিকতর অশান্তিময়, অসুস্থ হইতে অধিকতর অসুস্থ হইয়া পড়িতেছেন, তাহাও বুঝা যাইবে।

বর্ণগত অর্থানুসারে 'ধর্ম্ম' বলিতে বুঝায় সেই কার্য্য অথবা সেই চাল-চলন, যে-কার্য্যে অথবা চাল-চলনে জীবের উপস্থ, বহ্নি এবং স্পর্শ-শক্তি অটুট থাকে। এক কথায়, যাহা মানুষের করা উচিত, তাহার নাম "ধর্ম্ম"। অবশ্য কোন্ উদ্দেশ্যে ও কি প্রণালীতে কার্য্য করিলে 'ধর্ম্ম'সঙ্গত কার্য্য করা হয়, তাহা এখনও বলা হয় নাই।

'ধর্ম' বলিতে বুঝায় সেই কার্য্য অথবা সেই চাল-চলন, যাহা জীব তাহার উপস্থ, তেজ এবং স্পর্শ-শক্তি বশতঃ অবলম্বন করিয়া থাকে। এক কথায়, মানুষ যাহা সাধারণতঃ করিয়া থাকে, তাহাই তাহার 'ধর্ম'। যথা—চোরের ধর্ম, সাধুর ধর্ম, ইত্যাদি।

'ধর্ম্ম' পদটির উপরোক্ত সংজ্ঞা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, প্রথমতঃ, উপস্থ, বহ্নি এবং স্পর্শ-শক্তি কাহাকে বলে এবং দ্বিতীয়তঃ, উপস্থ, বহ্নি এবং স্পর্শ শক্তি অটুট রাখিবার প্রয়োজনীয়তা কি, তাহা বুঝিতে হইবে।

সংস্কৃত ভাষায় 'উপ-স্থ' এবং 'অপ-স্থ', 'উপ-স্থান' ও 'অপ-স্থান' বলিতে কি বুঝায়, তাহা গত সংখ্যায় বিবৃত করা হইয়াছে। তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, শরীরের যাহা কিছু কাটিয়া ফেলিলে মানুষ পরমুখাপেক্ষী না হইয়া স্বাধীনভাবে দৃষ্টি-শক্তি, ঘ্রাণ-শক্তি, শ্রবণ শক্তি, বাক্‌শক্তি, স্পর্শ-শক্তি ও চলচ্ছক্তি বজায় রাখিতে পারে, তাহার নাম 'উপ-স্থ' এবং যাহা কাটিলে ঐ ছয়টি শক্তির কোন শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, তাহার নাম 'অপ-স্থ'। এক কথায়, মানুষের শরীরের ব্যোম, বায়ু, অম্বু, বহ্নি এবং মেদ তাহার অপ-স্থ এবং ইহা ব্যতীত তাহার শরীরে আর যাহা কিছু আছে, তাহা তাহার উপ-স্থ।

আরও দেখা গিয়াছে যে, মানুষের নিজ শরীর ব্যতীত তাহার নিকটবর্ত্তী বায়ুমণ্ডলকে এবং যে-সমস্ত চরাচর জীবের সংসর্গে মানুষ বস-বাস করিয়া থাকে, সেই সমস্ত চরাচর জীবকেও উপ-স্থ বলা যাইতে পারে।

উপ-স্থ প্রসঙ্গে উপসংহারে দেখান হইয়াছে যে, জীবের উপ-স্থ বস্তুগুলির শক্তি অটুট রাখিবার উপযোগী কার্য্য করিলে জীব তাহার নীরোগতা ও কার্য্যক্ষমতার বৃদ্ধি সাধন করিতে পারে।

মানুষের শরীরের বহ্নি কাহাকে বলে, তাহা এখনও দেখান হয় নাই। বহ্নি অটুট রাখিবার কি প্রয়োজনীয়তা, তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে মানুষের সাধারণতঃ কি কি প্রবৃত্তির উদয় হয় এবং কেন মানুষের জীবন অবিমিশ্র হাস্যময় না হইয়া হাসি-কান্না-মিশ্রিত হইয়া থাকে, তাহার আলোচনা আরম্ভ করা হইয়াছে। ঐ আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে, যে-প্রবৃত্তি-সমূহ বশতঃ মানুষের জীবন হাসি-কান্না-মিশ্রিত হইয়া থাকে, সেই প্রবৃত্তি-সমূহকে সাধারণতঃ আটটি কথায় প্রকাশ করা যাইতে পারে। যথা—

(১) ভূমি-প্রকৃতি,
(২) আপ প্রকৃতি,
(৩) অনল-প্রকৃতি,
(৪) বায়ু-প্রকৃতি,
(৫) আকাশ-প্রকৃতি,
(৬) মনঃ-প্রকৃতি,
(৭) বুদ্ধি-প্রকৃতি,
(৮) অহঙ্কার-প্রকৃতি।

যে-প্রকৃতিতে মানুষ অবিমিশ্র হাস্যময় হইতে পারে, সেই প্রকৃতির সন্ধান-প্রয়াসী না হইয়া কেন মানুষ ঐ আটটি কু-প্রকৃতির দাস হইয়া পড়ে, ইহাই আমাদের বর্ত্তমানে আলোচ্য।

কেন মানুষ ঐ আটটি কু-প্রকৃতির দাস হয়, তাহা বুঝিতে পারিলে মানুষের 'বহ্নি' অটুট রাখিবার কি প্রয়োজনীয়তা, তাহা বুঝা যাইবে।

বহ্নি ও স্পর্শ-শক্তি অটুট রাখিবার প্রয়োজনীয়তা

কোন্ প্রকৃতিতে মানুষ অবিমিশ্র হাস্যময় হইতে পারে, তাহা বুঝিতে হইলে মানুষের সৃষ্টি এবং চলা-ফেরা কোন্ কোন্ দ্রব্য হইতে কি প্রণালীতে উদ্ভূত হয়, তাহার অন্ততঃ একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা থাকা প্রয়োজন।

ঋষিদিগের কথানুসারে সমস্ত চরাচর জীব একটি "অখণ্ড মণ্ডলাকার"* দ্বারা ব্যাপ্ত।

* অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

"অখণ্ড মণ্ডল" বলিতে কি বুঝায় এবং তাহার "আ-কার"ই বা কি, ইহা পরিষ্কার ভাবে উপলব্ধি না করিতে পারিলে মানুষের সৃষ্টি এবং চলা-ফেরা কোন্ কোন্ দ্রব্য হইতে কি প্রণালীতে সাধিত হয়, তাহা বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয় না এবং যে-সমস্ত কু-প্রকৃতিবশতঃ মানুষের জীবন হাসি-কান্নামিশ্রিত হইয়া থাকে, সেই সমস্ত কু-প্রবৃত্তির হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় না।

"অখণ্ড মণ্ডল" এবং তাহার "আ-কার" বলিতে কি বুঝায়, তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে, প্রথমতঃ জগতের মূল কারণ কি, তাহা জানিতে হইবে।

ভারতীয় ঋষিদিগের কথানুসারে জগতের মূল কারণ "ব্যোম"। "ব্যোমের" দুইটি অবস্থা আছে; একটিকে "অশরীরী" অবস্থা এবং অপরটিকে "ভূত" অবস্থা বলা যাইতে পারে। দুইটি অবস্থাই বায়বীয়। "ব্যোম" অশরীরী অবস্থায় 'ক্রিয়া'হীন এবং সূক্ষ্মতম, আর "ভূত" অবস্থায় 'ক্রিয়া'শীল এবং স্পর্শযোগ্য। অশরীরী অবস্থাতেও ব্যোমকে স্পর্শ করা যায় বটে, কিন্তু অতীব সূক্ষ্মতাবশতঃ ঐ অবস্থায় ব্যোমকে স্পর্শ করা সর্ব্বাপেক্ষা সুনিপুণ সাধনাসাপেক্ষ।

ব্যোমের দ্বিবিধ অবস্থাই একমাত্র জিহ্বার অথবা শরীরাভ্যন্তরস্থ মেদের স্পর্শযোগ্য। তাহা অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইতে পারে না, এমন কি শরীরের মেদ ব্যতীত অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত ও চর্ম্ম প্রভৃতি অন্য কোন উপাদানের স্পর্শযোগ্য পর্য্যন্ত হইতে পারে না।

শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ুর সমতা সাধন করিয়া শব্দ-বিশেষের উচ্চারণসহকারে "উদান"-বায়ুর অনুধাবন করিতে পারিলে, ব্যোমের অশরীরী অবস্থা জিহ্বার মেদ-ভাগদ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়। জিহ্বার মেদ-ভাগদ্বারা ব্যোমের অশরীরী অবস্থা প্রত্যক্ষ করা অথবা স্পর্শ করার **কার্য্যকে** সংস্কৃত ভাষায় "**ব্রহ্ম**" বলা হইয়াছে।

শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ুর সমতা সাধন করিয়া শব্দ-বিশেষের উচ্চারণসহকারে "ব্যান"-বায়ুর অনুধাবন করিতে পারিলে, ব্যোমের "ভূত" অবস্থা জিহ্বার মেদ-ভাগদ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়। জিহ্বার মেদ-ভাগদ্বারা ব্যোমের "ভূত" অবস্থা প্রত্যক্ষ করা অথবা স্পর্শ করার কার্য্যকে সংস্কৃত ভাষায় "ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করার কার্য্য" বলা হইয়াছে। যে বহ্নি বশতঃ

ব্যোমের "অশরীরী" অবস্থা হইতে "ভূত" অবস্থা পরিগৃহীত হয়, সেই ঋদ্ধিকে সংস্কৃত ভাষায় "ঈশ্বর" নাম দেওয়া হইয়াছে।

কি উপায়ে শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ুর সমতা সাধন করিতে হয় এবং "উদান"-বায়ু ও "ব্যান"-বায়ু কাহাকে বলে, তাহা জানিতে হইলে সমগ্র আত্ম-তত্ত্ব অর্থাৎ শরীরগঠন-তত্ত্ব (Anatomy) এবং শরীরবিধান-তত্ত্ব (Physiology) জানিবার প্রয়োজন হয়। ভারতীয় ঋষিগণ আত্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভাবে যে গ্রন্থ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম "শ্রীমদ্ভাগবত"। বর্ত্তমানে প্রকৃত সংস্কৃত ভাষার বিকৃতির ফলে ঐ গ্রন্থ বিকৃতার্থে কতকগুলি ভাবের কথামাত্র বলিয়া প্রচারিত হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবত ছাড়া বেদ, তন্ত্র, উপনিষদ্, মীমাংসা, দর্শন, পুরাণ, উপপুরাণ এবং সংহিতাতেও আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় কথা আছে। ঐ সমস্ত কথা প্রায়শঃ আত্ম-তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় পৃথক্ পৃথক্ অংশের জ্ঞান ও উপলব্ধি লাভ করিবার উপায়-বিষয়ক। সমস্ত চর এবং অচর জীবের আত্ম-তত্ত্ব অর্থাৎ Anatomy এবং Physiology, শ্রীমদ্ভাগবতে যে-রূপ সম্পূর্ণ-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহার প্রত্যেক কথাটি পরীক্ষা করিয়া কিরূপ ভাবে প্রত্যক্ষ করিতে হয়, তাহা যেমন বিশদ-ভাবে বেদে দেখান হইয়াছে, তাহা অন্য কোন ভাষার কোন গ্রন্থে আমি অনুসন্ধান করিয়াও খুঁজিয়া পাই নাই। ভবিষ্যতের কার্য্য সম্বন্ধে কোন কথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে হইলে যে-স্বাস্থ্যের প্রয়োজন হয়, অতীত জীবনের কু-জ্ঞান এবং কু-কার্য্যের ফলে আমার সে স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং তাহা এখনও রক্ষা করিতে পারিতেছি না। নতুবা আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারিতাম যে, আমিই শ্রীমদ্ভাগবত ও বেদাদির ব্যাখ্যা করিয়া জগতের সমক্ষে আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করিব। ঐ কার্য্য এত বিস্তৃত এবং সময়-সাপেক্ষ যে, বর্ত্তমান কালের সাধারণ পরমায়ু এবং আমার স্বীয় স্বাস্থ্যের দিকে নজর করিলে, আমার চেষ্টায় কতদূর কি হইয়া উঠিবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ুর সমতা সাধন করিতে হইলে অথবা "উদান"-বায়ু ও "ব্যান"-বায়ুর কার্য্য বুঝিতে হইলে, আত্ম-তত্ত্ব-বিষয়ক যে যে কথা জানিবার প্রয়োজন হয়, তাহা এই প্রবন্ধে সম্পূর্ণ-ভাবে বলা সম্ভব নহে। এখানে কেবল তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

গলাটি যেখানে স্কন্ধের সহিত মিলিত হইয়াছে, অর্থাৎ যেখানে গলার বাহিরের দিকে গলবন্ধনীর অস্থি (collar bone) রহিয়াছে, সেইখানে লক্ষ্য করিলে উপলব্ধি করা যাইবে যে, গলার ভিতরের দিকেও একখানি স্থিতি-স্থাপকতা-সম্পন্ন সূক্ষ্ম অস্থি রহিয়াছে। একখানি কোশা ও কুশী খাড়া করিয়া মিলিত করিলে তাহার অগ্রভাগের যেরূপ চিত্র হয়, ঐ সূক্ষ্ম অস্থিটি সেইরূপ অবয়ব-বিশিষ্ট। ঐ সূক্ষ্ম অস্থিটির দক্ষিণে ও বামে দুইটি ছিদ্র আছে এবং তাহার পশ্চাতে ঘাড়ের মধ্য ভাগ এবং সম্মুখে জিহ্বা মিলিত হইয়াছে। জিহ্বার সম্মুখে রহিয়াছে স্বর-নালী এবং তাহা মিলিত হইয়াছে দুইটি স্তনের অপরাংশে যে দুই খণ্ড মেদের টুকরা রহিয়াছে (পূর্ব্ব বঙ্গের চলিত কথায় তাহাকে 'ধলীপোক' বলা হয়), তাহার সহিত।

ঐ সূক্ষ্ম অস্থিটির দক্ষিণে ও বামে যে দুইটি ছিদ্র আছে, তাহা মিলিত হইয়াছে দুইটি মেদ-নির্ম্মিত নালীর সহিত এবং ঐ নালী দুইটি নাভি-প্রদেশে যকৃতের সহিত মিলিত হইয়া পরিশেষে পাকস্থলীর সহিত মিলিত হইয়াছে। আমরা যে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করি, তাহা ঐ দুইটি নালীর সাহায্যে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে।

টাকরার উপরিস্থিত মস্তিষ্কের মধ্যে অবিরত বিবিধ রসের উদ্ভব হইতেছে এবং ঐ রস ঘাড়ের মধ্য দিয়া ঐ সূক্ষ্ম অস্থির উপর নিপতিত হইতেছে। ইহা ব্যতীত জিহ্বার অগ্রভাগ এবং টাকরা হইতেও রস নির্গত হইয়া ঐ সূক্ষ্ম অস্থিটির উপর নিপতিত হইতেছে। তাহার ফলে ঐ সূক্ষ্ম অস্থিটির পশ্চাৎ ভাগ প্রতিনিয়ত নিম্নদিকে গতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

মেরুদণ্ডের 'ক্রিয়া' এবং দুইখানি পায়ের ক্রিয়াবশতঃ পাকস্থলী প্রতিনিয়ত উত্তপ্ত হইতেছে এবং ঐ উত্তাপ খাদ্য-নালী দুইটির সাহায্যে উপরোক্ত গলবন্ধনীর সূক্ষ্ম অস্থিতে সঞ্চারিত হইতেছে, তাহার ফলে এই সূক্ষ্ম অস্থিটির মধ্যভাগ উপরের দিকে গতিবিশিষ্ট হইতেছে।

মেরুদণ্ডের 'ক্রিয়া' এবং দুইখানি পায়ের ক্রিয়াবশতঃ পাকস্থলীতে যে উত্তাপের উদ্ভব হয়, তাহা নাভিপ্রদেশস্থ যকৃতেও সঞ্চারিত হইতেছে এবং যকৃতের গতির সৃষ্টি হইতেছে।

যকৃতের গতির ফলে সমগ্র শরীরের মধ্যে তাপ সঞ্চারিত হয় এবং ঐ তাপ স্তনপ্রদেশের মেদখণ্ড দুইটিকে উপরের দিকে ধাবমান করিতেছে এবং তাহাতে স্বরনালী চালিত হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বাও উপরের দিকে পরিচালিত হইতেছে। ইহার ফলে গলবন্ধনীর ঐ সূক্ষ্ম অস্থিটির সম্মুখভাগ উপরের দিকে গতিবিশিষ্ট হইতেছে।

মস্তিষ্ক, জিহ্বা এবং যকৃতের কার্য্য যথাযথভাবে পরিচালিত হইলে ঐ সূক্ষ্ম অস্থিটির পশ্চাৎ ভাগ প্রতিনিয়ত নিম্নগতিবিশিষ্ট এবং সম্মুখভাগ উপরের দিকে গতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে। নতুবা তাহার উপরোক্ত দুইটি ভাগের গতিতে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। যখন ঐ সূক্ষ্ম অস্থিটির উপরোক্ত দুইটি ভাগ শৃঙ্খলিত ভাবে গতিবিশিষ্ট থাকে, তখন শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ুর সমতা সাধিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে এবং তখন জিহ্বা ও টাকরার মধ্যভাগে যে বায়ুস্পর্শ পাওয়া যায়, তাহার নাম "ব্যান"-বায়ু। শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ু সমতা-বিশিষ্ট হইলে টাকরা ও মাথার খুলির মধ্যে যে বায়ুর স্পর্শ পাওয়া যায় তাহার নাম "উদান"-বায়ু। মানুষের বায়ু সাধারণতঃ অল্লাধিক অসমতা-প্রাপ্ত থাকে। উহার সমতা সাধন করিবার উপায় অতীব বিস্তৃত। তাহা ঋক্, সাম এবং যজুঃ এই তিনটি বেদে অতীব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবৃত হইয়াছে।

বেদোক্ত উপায়ে শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ুর সমতা সাধন করিয়া ব্যোমের অশরীরী এবং ভূত অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে, ব্যোমই যে জগতের মূল কারণ, তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়।

বর্ণ হইতে পদের অর্থ কি করিয়া স্থির করিতে হয়, তাহা জানা থাকিলে, সংস্কৃত ভাষায় "হল্" বলিতে প্রকৃত পক্ষে কি বুঝায়, তাহা জানা যায় এবং তখন, ভারতীয় ঋষিগণ যে ব্যোমকেই জগতের আদি কারণ বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায়। এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, ইংরাজী 'ইথার' এবং 'ব্যোম' একেবারেই একার্থক নহে। যাঁহারা ইথারকে ব্যোমের প্রতিশব্দ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা প্রায়শঃ সংস্কৃত ভাষায় ব্যোমের অর্থ কি, তাহা যথাযথ ভাবে পরিজ্ঞাত নহেন। যাঁহারা ব্যোমকে জড় পদার্থ মনে করেন, তাঁহারাও ভ্রান্ত।

জিহ্বার মেদ-ভাগদ্বারা ব্যোমের অশরীরী অবস্থা স্পর্শ-করার কার্য্যকে যে সংস্কৃত ভাষায় "ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে, তাহা বেদান্ত-দর্শন যথাযথ অর্থে পড়িতে পারিলে জানিতে পারা যায়। প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা এবং সূত্রের অর্থ স্থির করিবার পদ্ধতি জানা থাকিলে, বেদান্ত-দর্শন বুঝিবার জন্য কোন ভাষ্যের প্রয়োজন হয় না। মূল বেদান্ত-দর্শনের যাহা বক্তব্য, তাহা অন্য কোন ভাষায়, এমন কি সংস্কৃত ভাষাতেও অন্য কোন কথায় সম্পূর্ণভাবে যথাযথরূপে ব্যক্ত করা যায় কি না, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। বেদান্ত-দর্শনের যে সমস্ত ভাষ্য প্রচলিত আছে, তাহার একখানিতেও মূল সূত্রের আসল কথা পরিস্ফুট হয় নাই। শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-দর্শনের যে ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা প্রায়শঃ মূল সূত্রের বিরুদ্ধ কথায় পরিপূর্ণ এবং তাহা পড়িয়া বেদান্ত-দর্শনের আসল বক্তব্য কি, তাহা মোটেই বুঝিতে পারা যায় না। ভারতে ঋষির জ্ঞান-বিজ্ঞান কালক্রমে যে কতদূর অবহেলিত হইয়াছে, ঐ ভাষ্য তাহার পরিচায়ক এবং উহা ভারতবাসীর পক্ষে কলঙ্কজনক।

একদিন বহু ভারতবাসী যে "ব্রহ্ম"কে প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন, তাহা "ব্রাহ্মণ" শব্দটির দিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ না করিতে পারিলে মানুষ ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হইতে পারিত না। ঋক্ বেদের অভ্যাসসমূহে অভ্যস্ত হইয়া বেদান্ত-দর্শনের বক্তব্য পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে এখনও ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু সম্পূর্ণ শঙ্করভাষ্য অধ্যয়ন করিলেও "ব্রহ্ম" প্রত্যক্ষ করা ত দূরের কথা, তাহা যে কি বস্তু, তাহা পর্য্যন্ত কেহ ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। অথচ ঐ শঙ্কর-ভাষ্যকে আজকালকার তথা-কথিত পণ্ডিতগণ মূল বেদান্ত-সূত্রের প্রকৃত ভাষ্য বলিয়া মনে করেন। ইহা কি কলঙ্কজনক পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক নহে?

যে বহ্নিবশতঃ ব্যোমের "অশরীরী" অবস্থা হইতে "ভূত" অবস্থা পরিগৃহীত হয়, সেই বহ্নিকে যে সংস্কৃত ভাষায় "ঈশ্বর" নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহা পাতঞ্জল-দর্শন যথাযথ অর্থে পড়িতে পারিলে বুঝিতে পারা যায়। অনেকে মনে করেন যে, ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। ঐ ধারণা যে সত্য নহে, তদ্বিষয়ে পাতঞ্জল-দর্শন এবং তিনটি বেদ পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে, নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারা যায়। ঈশ্বরকে কি করিয়া প্রত্যক্ষ করিতে হইবে, তাহা বিবৃত হইয়াছে ঋক্ বেদে।

যাহা প্রত্যক্ষ করা যায় না, তাহা ভারতীয় ঋষিগণ বিশ্বাস করেন নাই এবং তাহা কাহাকেও বিশ্বাস করিবার জন্ম তাঁহারা উপদেশ দেন নাই। তাঁহাদের মতে প্রমাণের উপায় চারিটি (প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ) বটে, কিন্তু জ্ঞানের উপায় মাত্র একটি, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ এবং সিদ্ধির উপায়ও মাত্র একটি অর্থাৎ কর্ম্ম। আমাদের এই উক্তি যে সত্য, তাহা গৌতম-সূত্র এবং বাক্যপদীয় প্রথম কাণ্ডের ৩০ শ্লোক হইতে ৩৯ শ্লোক পর্য্যন্ত পড়িলে বুঝিতে পারা যায়। পরবর্ত্তী ভাষ্যকারগণ ঋষিদিগের কথা যথাযথ-ভাবে না বুঝিতে পারিয়া নানাবিধ বিরুদ্ধ কথা ঋষিদিগের কথা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

বর্ত্তমান কালের তথাকথিত পণ্ডিতগণ ঐ সমস্ত ভাষ্য টীয়াপাখীর মত মুখস্থ করিয়া এবং তাহা উদ্ধৃত করিয়া জনসমাজকে অন্ধকারে নিপতিত করিতেছেন।

বর্ত্তমান কালের তথাকথিত বৈজ্ঞানিকগণ মনে করিয়া থাকেন যে, যাহা তাঁহাদিগের অনুবীক্ষণ এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় না, তাহা প্রত্যক্ষের অযোগ্য এবং তাহা বিজ্ঞানের বিষয় নহে। এই হিসাবে "ব্যোম", "ব্রহ্ম" এবং "ঈশ্বর"ও হয়ত তাঁহাদের মতে বিজ্ঞানের বিষয় হইবে না। কিন্তু ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। সারা শরীরের মধ্যে যে মেদ রহিয়াছে, মাথার খুলি হইতে যে প্রতিনিয়ত রস সঞ্চারিত হইয়া টাকরার উপর নিপতিত হইতেছে, যকৃতের দ্বারা উত্তাপ সঞ্চারিত হইয়া যে স্তন-প্রদেশের মেদখণ্ডকে চালু করিতেছে এবং তাহার ফলে যে, জিহ্বা কথা কহিতে পারিতেছে—ইত্যাদি অনেক ব্যাপার কোন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা দেখা যায় না, অথচ ঐ সমস্ত ব্যাপার যে ঘটিতেছে, তাহা অস্বীকার করাও চলে না। কাজেই অনুবীক্ষণ এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা কোন বস্তু দেখিতে না পাওয়া গেলেই যে, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার অথবা বিশ্বাস করিবার অযোগ্য এবং বিজ্ঞানের বহির্ভূত, ইহা মনে করা যুক্তি-সঙ্গত হইতে পারে না।

কোন স্থানে 'অশরীরী' অবস্থার ব্যোম একটু অধিক মাত্রায় সঞ্চিত হইলেই তাহা 'ক্রিয়া'শীল হয় এবং তখন 'ভূত' অবস্থার ব্যোমের উদ্ভব হইয়া থাকে। এই 'ভূত' অবস্থার ব্যোম যখন আরও অধিক মাত্রায় সঞ্চিত হয়, তখন উহা প্রবাহমান হইয়া থাকে। 'ভূত' অবস্থার ব্যোম যখন প্রবাহমান হয়, তখন তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় বায়ু বলা হইয়া থাকে এবং তাহাও ব্যোমেরই একটি 'ভূত' অবস্থা। মৌলিক অর্থাৎ অবিমিশ্র বিশুদ্ধ বায়ুর কোন শীতল অথবা উষ্ণ স্পর্শ থাকে না এবং তাহার সঞ্চরণেও কোন তীব্রতা থাকে না। তাহার অস্তিত্ব কেবলমাত্র মৃদু সঞ্চরণের দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী বায়ুমণ্ডলে মৌলিক অথবা অবিমিশ্র বিশুদ্ধ বায়ুর অস্তিত্ব নাই। টাকরার উপরিভাগে মস্তিষ্কের মধ্যে ব্রহ্মের উপলব্ধি করিতে পারিলে, 'উদান'-বায়ুকে নিয়ন্ত্রিত করিবার নিপুণতা লাভ করা সম্ভব হয় এবং তখন ঐ মস্তিষ্কের মধ্যে অবিমিশ্র বিশুদ্ধ বায়ু উদ্ভূত করিবার ক্ষমতা অর্জ্জিত হয়। অবিমিশ্র বিশুদ্ধ বায়ুর উদ্ভব করিবার ক্ষমতা লাভ করিতে পারিলে, তাহা যে কি বস্তু, তাহা উপলব্ধি করাও সম্ভব হয়। স্বীয় শরীরের মধ্যে অবিমিশ্র বিশুদ্ধ বায়ুর উদ্ভব করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে পারিলে, বায়ুমণ্ডলের যে স্থানে অবিমিশ্র বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চয় (storage) রহিয়াছে, সেইস্থানে গমনাগমন করা সম্ভব হইতে পারে। বায়ু-সঞ্চরণে তীব্রতা উপস্থিত হইলে তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় "অনিল", "মরুৎ" প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে।

কোন স্থানে অবিমিশ্র বিশুদ্ধ বায়ু অধিক মাত্রায় সঞ্চিত হইতে থাকিলে, তাহা ক্রমশঃ শীতল এবং উষ্ণ স্পর্শযুক্ত হইতে থাকে। এই শীতলতা এবং উষ্ণ স্পর্শে কোন তীব্রতা থাকে না। অবিমিশ্র বিশুদ্ধ বায়ু যখন এতাদৃশ শীতল স্পর্শযুক্ত হয়, তখন তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় "অম্বু" বলা হইয়া থাকে; আর উহা যখন উষ্ণ স্পর্শযুক্ত হয়, তখন তাহাকে "বহ্নি" বলা হইয়া থাকে। সাধারণ পণ্ডিতগণের ধারণা "অম্বু" শব্দের অর্থ "জল" এবং "বহ্নি" শব্দের অর্থ "আগুন"। কিন্তু ইহা সত্য নহে। অম্বু হইতে জলের এবং বহ্নি হইতে আগুনের উদ্ভব হয় বটে, কিন্তু "অম্বু" শব্দের অর্থ যে "জল", অথবা "বহ্নি" শব্দের অর্থ যে "আগুন", তাহা কোন ঋষি-প্রণীত ব্যাকরণ অথবা অভিধানের দ্বারা প্রতিপন্ন করা যায় না। পরন্তু পাণিনি এবং নিরুক্ত যথাযথ অর্থে অধ্যয়ন করিতে পারিলে আমাদের কথার সার্থকতা উপলব্ধি করা যাইবে। "অম্বু" এবং "বহ্নি" মূলতঃ ব্যোমেরই দুইটি বিভিন্ন 'ভূত' অবস্থা; তাহা বায়বীয় আকারে স্পর্শযোগ্য হইয়া থাকে এবং তাহাতে

শীতলতা ও উষ্ণতা থাকে বটে, কিন্তু ঐ শীতলতায় এবং উষ্ণতায় কিঞ্চিন্মাত্র তীব্রতা থাকে না।

পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী বায়ুমণ্ডলে এতাদৃশ অবিমিশ্র বিশুদ্ধ "অম্বু" ও "বহ্নি" পরিলক্ষিত হয় না।

টাকরার উপরিভাগে মস্তিষ্কের মধ্যে ব্রহ্মের উপলব্ধি করিয়া উদান-বায়ুকে নিয়ন্ত্রিত করিবার নিপুণতা লাভ করিতে পারিলে, ঐ মস্তিষ্কের মধ্যে অবিমিশ্র বিশুদ্ধ অম্বু এবং বহ্নি উদ্ভব করিবার ক্ষমতা অর্জ্জিত হয়। অবিমিশ্র বিশুদ্ধ অম্বু এবং বহ্নি উদ্ভূত করিবার ক্ষমতা লাভ করিতে পারিলে, তাহা যে কি বস্তু, তাহা উপলব্ধি করাও সম্ভব হয়। স্বীয় শরীরের মধ্যে অবিমিশ্র বিশুদ্ধ অম্বু ও বহ্নি উদ্ভূত করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে পারিলে, বায়ু-মণ্ডলের যে-স্থানে অবিমিশ্র বিশুদ্ধ অম্বু ও বহ্নির সঞ্চয় (storage) রহিয়াছে, সেই স্থানে গমনাগমন করা সম্ভব হইতে পারে।

অম্বুর শীতলতায় তীব্রতা উপস্থিত হইলে তাহাকে সংস্কৃত "অপ", "জল", এবং "বহ্নি"র উষ্ণতায় তীব্রতা উপস্থিত হইলে তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় "অগ্নি", "তেজ" প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে

ভূত অবস্থায় ব্যোম হইতে যখন বায়ু, অম্বু এবং বহ্নি নামক তিনটি অপর ভূত অবস্থার উদ্ভব হয় এবং যখন তাহা কোন স্থানে অধিক সময় সঞ্চিত হইতে থাকে, তখন তাহার মিশ্রণ আরম্ভ হয়। বহ্নির উষ্ণতার ফলে উহা সর্ব্বদা ঊর্দ্ধ-গামী হইয়া থাকে এবং অম্বুর শীতলতার ফলে তাহা নিম্নগামী হয়। বায়ুর সঞ্চরণের ফলে ঊর্দ্ধগামী "বহ্নি" এবং নিম্নগামী "অম্বু" মিলিত হয় এবং তাহা চক্রাকার ধারণ করে। ঐ মিলিত বহ্নি এবং অম্বুর চক্রাকারকে সংস্কৃত ভাষায় "মণ্ডল" বলা হইয়া থাকে। অম্বুর নিম্নগামিতা এবং বহ্নির ঊর্দ্ধগামি-তার ফলে উহাদের মিলন সর্ব্বদা অভেদ্য হইয়া পড়ে। যাহা অভেদ্য তাহাকে "অখণ্ড"ও বলা যাইতে পারে। বায়ু, অম্বু এবং বহ্নির এই "অখণ্ড মণ্ডলে"র অপর নাম বায়বীয় আকারের "পরমাণু"।

পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী বায়ু-মণ্ডলে সাধারণতঃ ঐ অবিমিশ্র বিশুদ্ধ পরমাণুর উপলব্ধি করা যায় না। টাকরার উপরি-ভাগে মস্তিষ্কের মধ্যে ব্রহ্মের উপলব্ধি করিয়া উদান-বায়ুকে নিয়ন্ত্রিত করিবার নিপুণতা লাভ করিতে পারিলে, ঐ মস্তিষ্কের মধ্যে অবিমিশ্র বিশুদ্ধ "অখণ্ড মণ্ডলে"র অথবা পরমাণুর উদ্ভব করিবার ক্ষমতা অর্জ্জিত হয়। অবিমিশ্র বিশুদ্ধ "অখণ্ড মণ্ডলের" অথবা পরমাণুর উদ্ভব করিবার ক্ষমতা লাভ করিতে পারিলে, তাহা যে কি বস্তু, তাহা উপলব্ধি করা অথবা প্রত্যক্ষ করাও সম্ভব হয়।

কোন স্থানে বায়ু, অম্বু এবং বহ্নির এই অবিমিশ্র বিশুদ্ধ "অখণ্ড মণ্ডল" অর্থাৎ বায়বীয় আকারে পরমাণু অধিক মাত্রায় সঞ্চিত হইতে থাকিলে, তাহার বৃদ্ধি অথবা কার্য্য আরম্ভ হয়। মিশ্রিত বস্তুর বৃদ্ধি অথবা কার্য্যকে সংস্কৃত ভাষায় "আ-কার" নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। মিশ্রিত বস্তুর বৃদ্ধি অথবা কার্য্যকে যে সংস্কৃত ভাষায় "আ-কার" নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে, তাহা পাণিনি অথবা নিরুক্তের প্রথম অধ্যায়ের সূত্রাংশ যথাযথ অর্থে পড়িতে পারিলে বুঝিতে পারা যায়।

বায়ু, অম্বু এবং বহ্নির অবিমিশ্র বিশুদ্ধ অখণ্ড মণ্ডলের অর্থাৎ বায়বীয় আকারের পরমাণুর আকার (অর্থাৎ বৃদ্ধি) আরম্ভ হইলে, ঐ অবিমিশ্র বিশুদ্ধ অখণ্ড মণ্ডলে (অর্থাৎ প্রত্যেক বায়বীয় আকারের পরমাণুতে) কখনও বা অম্বুর বৃদ্ধি সাধিত হয়, আবার কখনও বা বহ্নির বৃদ্ধি সাধিত হয়। যখন ঐ অবিমিশ্র বিশুদ্ধ অখণ্ড মণ্ডলে (অর্থাৎ প্রত্যেক বায়বীয় আকারের পরমাণুতে) অম্বুর বৃদ্ধি সাধিত হয়, তখন তাহা রস অথবা জল-বিন্দুর অথবা অপের রূপ পরিগ্রহ করে। আর যখন তাহাতে বহ্নির বৃদ্ধি সাধিত হয়, তখন তাহা তেজ অথবা অগ্নি-কণার রূপ পরিগ্রহ করে। অবিমিশ্র বিশুদ্ধ "অখণ্ড মণ্ডলের" (অর্থাৎ বায়বীয় আকারের পর-মাণুর) আকার (অর্থাৎ বৃদ্ধি) বশতঃ যে অবিমিশ্র বিশুদ্ধ অপ ও তেজঃকণার উদ্ভব হয়, তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় "অণু" বলা হইয়া থাকে।

এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, পরমাণু সর্ব্বদা বায়বীয় আকারের হইয়া থাকে এবং অণু হয় জলবিন্দুর, নতুবা অগ্নি-কণার রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকে। পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী বায়ু-মণ্ডলে সাধারণতঃ অবিমিশ্র বিশুদ্ধ অণুর উপলব্ধি করা যায় না। টাকরার উপরিভাগে, মস্তিষ্কের মধ্যে ব্রহ্মের উপলব্ধি করিয়া উদান-বায়ুকে নিয়ন্ত্রিত করিবার নিপুণতা লাভ করিতে পারিলে, ঐ মস্তিষ্কের মধ্যে অবিমিশ্র বিশুদ্ধ অণু উদ্ভব করিবার

ক্ষমতা অর্জ্জিত হয়। অবিমিশ্র বিশুদ্ধ অণুর উদ্ভব করিবার ক্ষমতা লাভ করিতে পারিলে তাহা যে কি বস্তু, তাহা উপলব্ধি করা অথবা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়।

কোন স্থানে অম্বু ও বহ্নির অণুসমূহ অধিক মাত্রায় সঞ্চিত হইতে থাকিলে তাহা হইতে রস ও তেজের উদ্ভব হইতে থাকে এবং ঐ রস ও তেজ হইতে ক্রমশঃ মেদের উদ্ভব হয়। মেদে সাধারণতঃ রস ও তেজ সমান মাত্রায় বর্ত্তমান থাকে।

অম্বু, বহ্নি এবং মেদের মিলনে অস্থির উদ্ভব হয়। এইরূপে অম্বু, বহ্নি, মেদ এবং অস্থির মিলনে মজ্জার উৎপত্তি; অম্বু, বহ্নি, মেদ, অস্থি এবং মজ্জার মিলনে বসার উৎপত্তি; অম্বু, বহ্নি, মেদ, অস্থি, মজ্জা এবং বসার মিলনে মাংসের উৎপত্তি; অম্বু, বহ্নি, মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা এবং মাংসের মিলনে রক্তের উৎপত্তি; অম্বু, বহ্নি, মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস এবং রক্তের মিলনে ত্বকের উৎপত্তি; অম্বু, বহ্নি, মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত এবং ত্বকের মিলনে রোমকূপের উৎপত্তি হইয়া থাকে। রোমকূপের উৎপত্তি হইলে পূরা মানুষটির গঠন সম্পাদিত হইয়া থাকে। কাযেই দেখা যাইতেছে, পূরা মানুষটির উৎপত্তির মূলে রহিয়াছে অণু এবং তাহার মূলে রহিয়াছে পরমাণু এবং তাহার মূলে রহিয়াছে অম্বু ও বহ্নি। অম্বু ও বহ্নি মিলিত হইয়া যে পরমাণুর উদ্ভব ও রক্ষা সম্ভব করিতে পারে, তাহার মূলে রহিয়াছে ঐ অম্বু ও বহ্নি এবং উভয়ের স্পর্শশক্তি; এবং পরমাণুসমূহ হইতে যে-অণুসমূহের গঠন ও রক্ষা সম্ভব হয়, তাহারও মূলে রহিয়াছে ঐ অম্বু ও বহ্নি এবং তাহাদের স্পর্শশক্তি।

অণু হইতে যে মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত এবং ত্বক ও রোমকূপের গঠন ও রক্ষা সম্ভব হইতেছে, তাহার মূলেও রহিয়াছে ঐ অম্বু ও বহ্নি এবং উভয়ের স্পর্শশক্তি। সমস্ত উপাদানগুলির মিলনে যে জীবের গঠন ও চাল-চলন সাধিত হইতেছে, তাহার মূলেও রহিয়াছে ঐ অম্বু ও বহ্নি এবং তাহাদের স্পর্শশক্তি। প্রত্যেক অণুর মধ্যে অম্বু ও বহ্নি রহিয়াছে বলিয়া জীবের গঠনে যে যে অণু আছে, তাহার অম্বুভাগ সর্ব্বদা নিম্নগামী এবং বহ্নিভাগ সর্ব্বদা ঊর্দ্ধগামী এবং তাহারই ফলে বিভিন্ন অণুগুলি বিচ্ছিন্ন না হইয়া পরস্পর সংযুক্ত থাকে এবং জীবের অবয়বের অস্তিত্ব সাধন করে।

কাযেই বলা যাইতে পারে যে, অম্বু ও বহ্নি এবং তাহাদের স্পর্শশক্তি লইয়াই মানুষের অস্তিত্ব এবং চাল-চলন সাধিত হইয়া থাকে।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে অম্বু ও বহ্নি এবং তাহাদের স্পর্শশক্তি লইয়াই যে মানুষের অস্তিত্ব এবং তাহার চাল-চলন, ইহা বুঝা গেল বটে, কিন্তু অম্বু ও স্পর্শশক্তি অটুট রাখা বলিতে কি বুঝায় এবং তাহা রাখিবার কি প্রয়োজনীয়তা, তাহা কিছুই বুঝা গেল না। বহ্নি ও স্পর্শশক্তি অটুট রাখা বলিতে কি বুঝায় এবং তাহার কি প্রয়োজনীয়তা, তাহা স্থির করিতে হইলে মানুষের আটটি কুপ্রবৃত্তির কেন উদয় হয়, তাহা জানিতে হইবে। মানুষের আটটি কুপ্রবৃত্তির কেন উদয় হয়, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে মানুষের জীবন অবিমিশ্র হাস্যময় না হইয়া কেন হাসি-কান্নায় মিশ্রিত হইয়া থাকে, ইহা বুঝা যাইবে।

কি উপায়ে বায়ুর সমতা সাধিত হইয়া থাকে, তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে, গলবন্ধনীর অস্থির অপর পার্শ্বস্থ যে সূক্ষ্ম অস্থিটির কথা আমরা বিবৃত করিয়াছি, ঐ অস্থিটির প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ অস্থিটির সহিত মানুষের দুইখানি হস্ত, দুইখানি পা, তাহার জিহ্বা, দুইটি কর্ণ, দুইটি চক্ষু এবং দুইটি নাসারন্ধ্র সন্নিবিষ্ট। ইহাও দেখা যাইবে যে, ঐ অস্থিটিতে শীতলতা অথবা উষ্ণতার তীব্রতা না থাকিলে মানুষ নিজ সামর্থ্য সম্বন্ধে অভিমান-বিশিষ্ট হয় না, পরন্তু তাহার সামর্থ্য কতটুকু, তাহা যথাযথ-ভাবে স্থির করিতে সমর্থ হয়। আবার, অন্যদিকে দেখা যাইবে যে, মানুষ যখন স্বীয় সামর্থ্য সম্বন্ধে অভিমানগ্রস্ত হইয়া থাকে, তখন ঐ অস্থিটি তীব্রভাবে উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। আরও দেখা যাইবে যে, ঐ অস্থিটিকে আমরা অস্থি বলিয়া অভিহিত করিতেছি বটে, কিন্তু উহা বস্তুতঃ অস্থি নহে, উহা সম্পূর্ণভাবে মেদ-নির্ম্মিত এবং মানুষ যখন অভিমানগ্রস্ত হয়, তখন কেবল গলবন্ধনীর অপরপার্শ্বস্থ ঐ চক্রাকার মেদখণ্ডখানিই যে তীব্র ভাবে উষ্ণ হয়, তাহা নহে, মানুষের সমগ্র মেদভাগ উষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হইবে। কাযেই বলা যাইতে পারে যে, মানুষের মেদভাগে উষ্ণতার তীব্রতা না থাকিলে, তাহার স্বীয় সামর্থ্য যথাযথভাবে নিরূপণ করিবার ক্ষমতা অর্জ্জিত হয়, আর ঐ মেদভাগে উষ্ণতার তীব্রতা

ঘটিলে মানুষ অভিমানী হইয়া পড়ে। সংস্কৃত ভাষায় স্বীয় সামর্থ্য যথাযথভাবে নিরূপণ করিবার নাম 'অহঙ্কৃতি' আর অভিমানগ্রস্ত হইবার নাম 'অহঙ্কার'। 'অহঙ্কৃতি' মানুষকে উন্নতির দিকে লইয়া যায়, আর 'অহঙ্কার' মানুষের পাতিত্য ঘটায়।

মানুষ কেন কখনও বা যাবতীয় তথ্যগুলি যথাযথভাবে বুঝিতে পারে, আবার কেন কখনও সে যাহা বুঝে, তাহা ভ্রান্তিপরিপূর্ণ হইয়া থাকে, ইহা স্থির করিবার উদ্দেশ্যে সাধনা আরম্ভ করিলে দেখা যাইবে যে, মানুষের শরীরাভ্যন্তরীণ অস্থি-সমন্বয়ের উষ্ণতায় কোন তীব্রতা না থাকিলে তথ্যগুলি বুঝিতে কোন ভ্রান্তির উদ্ভব হয় না, আর ঐ অস্থিসমন্বয়ের তীব্রতা ঘটিলে সে এক একটি তথ্যকে যথাযথভাবে বিচার না করিয়া তাহার সংস্কারকে আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করে। কাযেই বলা যাইতে পারে যে, অস্থি-সমন্বয়ের যথাযথ উষ্ণতায় মানুষের প্রকৃত বুদ্ধির উদ্ভব হইয়া থাকে, আর উহার উষ্ণতার তীব্রতায় মানুষ কুবুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া পড়ে।

কেন কোন কোন সময়ে মানুষ স্থিরমনা হইতে পারে, আবার কখনও কখনও কেন বা তাহার চাঞ্চল্যের উদ্ভব হয়, তাহা পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, মানুষের মজ্জা-সমন্বয়ের উষ্ণতায় তীব্রতা না থাকিলে তাহার মনের স্থিরতা সাধিত হয়, আর যখন ঐ মজ্জা-সমন্বয়ে উষ্ণতার তীব্রতা উপস্থিত হয়, তখন আর সে কোন বিষয়ে নিবিষ্টমনা হইতে পারে না। কাযেই বলিতে হইবে, মজ্জাসমন্বয়ের যথাযথ উষ্ণতায় মানুষ নিবিষ্টমনা হইয়া থাকে, আর তাহার উষ্ণতার তীব্রতায় মনের চাঞ্চল্যের উদ্ভব হয়।

কেন সময়ে সময়ে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে মানুষ যথেষ্ট বিচার করিতে আরম্ভ করে, আবার কখনও কখনও কিছু বিচার না করিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিলে দেখা যাইবে যে, মানুষের বসা-সমন্বয়ে উষ্ণতার তীব্রতা ঘটিলে তাহার বিচার করিবার প্রবৃত্তি নষ্ট হইয়া যায়; এবং বিচার করিবার প্রবৃত্তি নষ্ট হইয়া গেলে অযৌক্তিক ভাবে কোন কোন বিষয় তাহার ভাল লাগে, আবার কখনও কখনও সেই বিষয়ই তাহার বিরক্তিকর হইয়া পড়ে। কোন্ বিষয় মঙ্গলপ্রদ অথবা কোন্ বিষয় অমঙ্গলপ্রদ, তাহার বিচারের যখন সে প্রবৃত্ত হয়, তখন দেখা যাইবে যে, তাহার বসা-সমন্বয়ে কোনও উষ্ণতার তীব্রতা নাই। কাযেই বলা যাইতে পারে যে, বসা-সমন্বয়ের উষ্ণতার তীব্রতাবশতঃ মানুষের "আকাশ-প্রকৃতি"র উদ্ভব হইয়া থাকে।

যাঁহারা অবিচারিত সিদ্ধান্তের উপর আস্থাসম্পন্ন অথবা যাঁহারা সংস্কারকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহাদের মাংস-সমন্বয়ে উষ্ণতার তীব্রতা রহিয়াছে; আর যাঁহারা প্রচলিত প্রত্যেক সংস্কারটিকে পরীক্ষা করিবার প্রবৃত্তি-সম্পন্ন হন, তাঁহাদিগের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহাদের মাংস-সমন্বয়ের উষ্ণতার কোন তীব্রতা নাই। কাযেই মানুষের মাংস-সমন্বয়ের উষ্ণতার তীব্রতাবশতঃ তাহার "বায়ু-প্রকৃতি"র উদ্ভব হইয়া থাকে, ইহা বলা যাইতে পারে।

কখনও কখনও মানুষ যাহা পায়, তাহাতেই তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে, আবার কখনও কখনও সে যাহা কিছু লাভ করুক না কেন, কিছুতেই তৃপ্তি অনুভব করিতে পারে না। কেন এতাদৃশ অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহার পর্য্যালোচনা আরম্ভ করিলে দেখা যাইবে যে, যখন মানুষ কিছুতেই তৃপ্তি পায় না, তখন তাহার রক্ত তীব্র ভাবে উষ্ণ হইয়াছে, আর যখন রক্তের উষ্ণতায় কোন তীব্রতা থাকে না, তখন সে যাহা পায় তাহাতেই সন্তুষ্টি লাভ করে। কাযেই, রক্তের উষ্ণতা-বশতঃ মানুষের "অনল-প্রকৃতি"র উদ্ভব হয়, ইহা বলা যাইতে পারে।

সময় সময় মানুষ আত্মনিন্দা শুনিলে, নিন্দাকারী তাহার স্বীয় ত্রুটি দেখিবার সহায়তা করিতেছেন, তাহা বুঝিয়া তাহাকে পরম বন্ধু মনে করে; আবার, কখনও কখনও মানুষ আত্ম-নিন্দা শুনিলে কষ্ট অনুভব করিয়া থাকে বটে, কিন্তু নিন্দাকারীকে উপেক্ষার চক্ষেই দেখিয়া থাকে। আবার, কখনও কখনও আত্ম-নিন্দা শুনিলে নিন্দাকারীকে জব্দ করিবার পাশবিক প্রবৃত্তিতে মানুষ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। কেন এইরূপ হয়, তাহা অনুভব করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, স্বীয় শরীরে ত্বকের উষ্ণতায় তীব্রতার তারতম্য-বশতঃ ঐরূপ বিভিন্ন ভাবের উদ্ভব হয়। কাযেই বলা যাইতে পারে যে, ত্বকের উষ্ণতার তীব্রতা-বশতঃ মানুষের "আপ-প্রকৃতি"।

মানুষ যখন কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্যে উন্মত্ত হয়, তখন তাহার শরীরের কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় ও রোমকূপের মধ্য দিয়া আগুন ছুটিতেছে। কাযেই বলা যাইতে পারে যে, রোমকূপে উষ্ণতার তীব্রতা-বশতঃ মানুষের "ভূমি-প্রকৃতি"র উদ্ভব হইয়া থাকে।

মানুষ কেন অহঙ্কারী, কুবুদ্ধি-সম্পন্ন, বিক্ষিপ্তমনা এবং আকাশ, বায়ু, অনল, আপ ও ভূমি-প্রকৃতিসম্পন্ন হয়, তাহার আলোচনায় দেখা যাইতেছে যে, তাহার মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত, ত্বক্ ও রোমকূপে তীব্র উষ্ণতার উদ্ভব হইলে সে কু-প্রবৃত্তির আধার হইয়া পড়ে এবং ইহারই ফলে তাহার জীবন অবিমিশ্র হাস্যময় না হইয়া হাসিকান্না-মিশ্রিত হইয়া থাকে।

কাযেই বলিতে হইবে যে, মানুষের কু-প্রবৃত্তির অথবা অমঙ্গলের কারণ তাহার শরীরে উষ্ণতার তীব্রতা। তাহার শরীরের উষ্ণতা যে বহ্নি হইতে সাধিত হইয়া থাকে, তাহা আগেই দেখান হইয়াছে। সুতরাং মানুষের বহ্নি যথাযথ অটুট থাকিলে তাহার জীবন মঙ্গলময় অথবা অবিমিশ্র হাস্যময় হইবে, ইহা বলা যাইতে পারে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, কি উপায়ে মানুষের পক্ষে তাহার শরীরের বহ্নি অটুট রাখা সম্ভব হইতে পারে।

মানুষের শরীরের মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত, ত্বক্ ও রোমকূপে যাহাতে উষ্ণতার তীব্রতা উদ্ভূত না হয়, তাহা করিতে হইলে, প্রথমতঃ, তাহার শরীরের মধ্যে কোথায় কোথায় ঐ মেদ ও অস্থি প্রভৃতির সমন্বয় রহিয়াছে, তাহা অনুভব করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, কোথা হইতে তাহার ঐ মেদ, অস্থি প্রভৃতিতে বহ্নির প্রভাব ঘটিতেছে, তাহা বুঝিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, কি উপায়ে ঐ বহ্নির তীব্রতা সংযত করা যায়, তাহা জানিতে হইবে।

ধারান্তরে এই সম্বন্ধে আলোচনা করিব। [ক্রমশঃ

প্রাণ

—পৃথ্বীসিং নাহার

স্বষ্টির প্রথম যুগে এ মহীমণ্ডল
প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড-তপ্ত জলন্ত অঙ্গার,
কভু বা তুষারাহত কম্পিত বিকল,
অন্ধ মত্ততার ছিল বীভৎস বিকার।

তাহারি অন্তরে রহি' হে জগদীশ্বর!
কত লক্ষ যুগ ধরি' সহিলা যে ক্লেশ,—
ভূতের তাণ্ডব নৃত্য ভীম ভয়ঙ্কর,
নিশ্চেতনতার রুদ্ধ সংঘর্ষ অশেষ।

অদৃশ্য অদ্ভুত তব দিব্য পরাক্রম
স্থির লক্ষ্যে পলে পলে করি' নিয়ন্ত্রণ
সংক্ষুব্ধ বস্তুর পিণ্ড দুর্দ্ধর্ষ বিষম,
শান্তিমাঝে প্রতিষ্ঠিত করিল ভুবন।

আনন্দ-সঙ্গীত-ধ্বনি উঠিল গগনে,
জাগিল প্রথম প্রাণ নবীন স্বপনে।

[সম্পাদকদ্বয়ের সম্মতিক্রমে শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক লিখিত

মহাকালের প্রভাব, তাণ্ডব নৃত্য এবং পণ্ডিত জওহরলালের লক্ষ্ণৌ-অভিভাষণ

লক্ষ্ণৌ-কংগ্রেসে পণ্ডিত জওহরলাল সভাপতিরূপে যে-অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম আমাদের পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই সম্ভবতঃ অল্পাধিক অবগত হইয়াছেন। এক ষ্টেটস্‌ম্যান ছাড়া দৈনিক সংবাদ-পত্রসমূহের সম্পাদকগণ তৎসম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পড়িলে মনে হয় যে, জওহরলালজীর অভিভাষণ একটা কিছু অভূতপূর্ব্ব রকমের আশ্চর্য্যজনক 'রাজনৈতিকতা'র পরিচয় প্রদান করিয়াছে। আমাদের কিন্তু ঐ বক্তৃতা পড়িতে পড়িতে ভারতীয় ঋষিদিগের ভাষায় "মহাকালের প্রভাব" এবং "তাণ্ডব নৃত্য" বলিয়া যে কয়টী কথা আছে, তাহা মনে পড়িয়াছে।

"মহাকাল" সম্বন্ধে বিবৃত হইয়াছে যজুর্ব্বেদে এবং তাহার "তাণ্ডব-নৃত্য" কি, তাহা সূত্রাকারে লেখা রহিয়াছে অথর্ব্ববেদে এবং উহা শ্লোকাকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে বিশ্ব সার এবং কালীকুলসর্ব্বস্ব নামক তন্ত্রে। ইহা ছাড়া আরও অনেক গ্রন্থে "মহাকালের খেলা" সম্বন্ধে অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমাদের মনে হয়, যজুর্ব্বেদ এবং অথর্ব্ববেদে ঐ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা না জানা থাকিলে মহাকালের তাণ্ডব নৃত্য কি, তাহা যথাযথ ভাবে বুঝা যায় না।

"শ্যামা"র যে-চিত্র বর্ত্তমান কালের হিন্দুগণ ঈশ্বর-বোধে পূজা করিয়া থাকেন, তাহা প্রকৃত পক্ষে সর্ব্ব-পরিব্যাপ্ত কাল-প্রভাবে মানুষের কি কি অবস্থা হয়, তাহার চিত্র। কিন্তু ঐ চিত্রসমূহ কিরূপে যথাযথ ভাবে অধ্যয়ন করিতে হয়, তাহা বর্ত্তমান সময়ে মানুষ বিস্মৃত হইয়াছে। ফলে কেহ বলিতেছেন যে, ঐ চিত্র এবং তাহার পূজা অসভ্যতার পরিচায়ক এবং কেহ বলিতেছেন, উহা সভ্যতার আদিম অবস্থার পরিচায়ক এবং কেহ কেহ উহা যে কি তাহা বুঝিতে না পারিয়া কোশাকুশী, ফুল, বিল্ব-পত্র প্রভৃতি লইয়া উহার পূজায় নিযুক্ত হইয়া থাকেন। যদি কখনও মানুষ আবার শ্যামার চিত্রকে যথাযথ ভাবে অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, ঐ একটী চিত্রের সাহায্যে কাল (time) এবং স্থান (space) কাহাকে বলে এবং তাহার প্রভাব কি কি, তাহা এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রের সমগ্র মূল সূত্রগুলি বুদ্ধি-যোগ্য করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া উহাতে গতিশীল কার্য্যগুলির (dynamical actions) নক্‌সা কি করিয়া অঙ্কিত করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে জ্ঞানের পরিচয় রহিয়াছে। এই খানে মনে রাখিতে হইবে যে, বর্ত্তমান কালের ইঞ্জিনিয়ারগণ গতিশীল কার্য্যগুলির নক্‌সা কি করিয়া অঙ্কিত করিতে হয়, তাহা অদ্যাবধি পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই।

বর্ত্তমান কালের তথাকথিত পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন বটে যে, সময় সময় মহাপ্রলয় উপস্থিত হয় এবং সৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়া যায় এবং ঈশ্বর মানুষকে তাহার পাপ-পুণ্যের জন্য শাস্তি ও পুরস্কার দিয়া থাকেন। ঐ মতবাদ যে ঋষিদিগের মূল কোন্ কথা হইতে পাওয়া যাইতে পারে, তাহা আমরা খুঁজিয়া পাই নাই। আমরা বেদ এবং ঋষিদিগের অন্যান্য গ্রন্থ হইতে যাহা বুঝিতে পারিয়াছি, তদনুসারে বলিতে হয় যে, ঈশ্বরের সৃষ্টির পরিবর্ত্তন অহরহ হইতেছে বটে, কিন্তু তাহা কখনও সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয় না এবং ঈশ্বর কাহাকেও পাপ-পুণ্য প্রদান করেন না। চন্দ্র ও সূর্য্যের অস্তিত্ববশতঃ পৃথিবীর প্রকৃতির যে পরিবর্ত্তন হয়,

এবং ঐ পরিবর্ত্তন বশতঃ জীবের প্রকৃতি-পরিবর্ত্তনের যে যে কারণের উদ্ভব হয়, তাহার নাম "কাল"।

পৃথিবী যখন চন্দ্র ও সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা কম দূরত্ব (radius) লইয়া পরিভ্রমণ করিতে থাকে, তখন কাল অথবা সময় পৃথিবীর সমস্ত চরাচর জীবের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়া থাকে; তখন মানুষ প্রায়শঃ অত্যন্ত বুদ্ধিমান্, জ্ঞানী এবং প্রকৃত কর্ম্মী হইয়া থাকে। তাহার ফলে প্রায়শঃ মানুষের জীবনে তখন কোন কান্নার কারণ থাকে না এবং মানুষের জীবন প্রায়শঃ অবিমিশ্র হাস্যময় হইয়া থাকে। ইহার অব্যবহিত পরে পৃথিবী যখন চন্দ্র ও সূর্য্য হইতে ক্রমশঃ অধিকতর দূরত্ব লইয়া পরিভ্রমণ করিতে থাকে, তখন কালও ক্রমশঃ পৃথিবীর সমস্ত চরাচর জীবের পক্ষে অনিষ্টকারী হইতে আরম্ভ করে। তখন মানুষ প্রথম প্রথম তাহার পূর্ব্ব বুদ্ধি, জ্ঞান এবং কর্ম্মশক্তি বশতঃ কালের অনিষ্টকারী প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় এবং একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে না।

পৃথিবী যখন চন্দ্র ও সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দূরত্ব লইয়া পরিভ্রমণ করিতে থাকে, তখন কাল পৃথিবীর সমস্ত চরাচর জীবের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্টকারী হইয়া পড়ে। তখন মানুষ ক্রমশঃ তাহার পূর্ব্ববুদ্ধি, জ্ঞান এবং কর্ম্মশক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া পড়ে এবং তাহার জীবন প্রায়শঃ কান্নাময় হইয়া থাকে। ইহারই নাম **মহাকালের তাণ্ডবনৃত্য**। ইহার পর আবার যখন পৃথিবী ক্রমশঃ চন্দ্র ও সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতে আরম্ভ করে, তখন আবার কাল পৃথিবীর সমস্ত চরাচর জীবের পক্ষে ক্রমশঃ মঙ্গলপ্রদ হইতে আরম্ভ করে। কিন্তু তখন মানুষ তাহার অজ্ঞানতাবশতঃ গরলকে অমৃত মনে করে এবং অমৃতকে গরল মনে করে। তাহার ফলে, তখন মানুষের ভাগ্যাকাশে কান্নাই থাকিয়া যায়। ইহারই নাম **মানুষের তাণ্ডবনৃত্য।** এই সময় মানুষ যদি প্রকৃত বুদ্ধি, জ্ঞান এবং কর্ম্মের আশ্রয় লইয়া সতর্ক হইতে পারে, তাহা হইলে অনায়াসেই আবার তাহার হাসির দিন উপস্থিত হয়। নতুবা মানুষে মানুষে দ্বেষ, দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ এবং রক্তপাত অনিবার্য্য হইয়া পড়ে এবং ঐ রক্তপাতসহকারে শ্মশানভূমির উপর আবার মানুষের সুখের দিন উপস্থিত হয়। এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, পৃথিবী যখন চন্দ্র ও সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হয়, তখন জীবের পক্ষে ভাল সময়ের উদয় হইবেই। তখন যদি মানুষ সুবুদ্ধি লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে মনুষ্যজাতি হাসিতে হাসিতে বিনা দ্বন্দ্বে ও রক্তপাতে সু-কালের ফলভাগী হইতে পারে। আর তখন যদি মানুষ সুবুদ্ধি অর্জ্জন করিবার চেষ্টা না করিয়া অভিমানভরে মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব-কলহে প্রবৃত্ত হয়, তখন রক্তপাত অনিবার্য্য হইয়া পড়ে এবং বহু রক্তপাতের পর মানুষ আবার সু-কালের ফলভোগী হয়।

আমাদের মনে হয়, পৃথিবী আবার ক্রমশঃই চন্দ্র ও সূর্য্যের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী হইতেছেন। চন্দ্র ও সূর্য্য হইতে পৃথিবী দূরে যাইতেছেন অথবা নিকটবর্ত্তী হইতেছেন, তাহা বুঝা কষ্টসাধ্য হইলেও অসাধ্য নহে।

ধ্রুব-নক্ষত্র হইতে যে-তেজরশ্মি নির্গত হয়, তাহার সহিত স্বীয় ললাটকে সমসূত্রে রক্ষা করিতে পারিলে এবং ঐ রেখার সহিত শুক্র ও বৃহস্পতির রেখার কোণ (angle) বর্দ্ধিত হইতেছে অথবা কমিয়া যাইতেছে, তাহা পরীক্ষা করিলে পৃথিবী চন্দ্র ও সূর্য্য হইতে দূরে যাইতেছে অথবা নিকটবর্ত্তী হইতেছে, তাহা বুঝা যায়।

এক্ষণে সু-কালের উদয় হইতেছে বটে, কিন্তু মানুষের সুবুদ্ধি, প্রকৃত জ্ঞান এবং প্রকৃত কর্ম্মশক্তির উদয় হইতেছে না এবং মানুষ গরলকে অমৃত এবং অমৃতকে গরল মনে করিতেছে। তাই চারিদিকে ক্রমশঃই অধিকতর মাত্রায় দ্বেষ, দ্বন্দ্ব ও কলহের উদ্ভব হইতেছে। এক কথায় এখন আর কালের তাণ্ডব নৃত্য নাই। এখন আরম্ভ হইয়াছে মানুষের তাণ্ডব নৃত্য। জওহরলালজী যে-নেতাটীর কথা স্মরণ করিয়া ভক্তিভরে গদগদ হইয়াছেন, ঐ নেতাটী ভারতের ভাগ্যাকাশের তাণ্ডব নৃত্যের নেতা এবং জওহরলালজী ও তাঁহার অন্যান্য সহকর্ম্মী, কেহ বা প্রত্যক্ষভাবে এবং কেহ বা পরোক্ষ ভাবে ঐ তাণ্ডব নৃত্যের নেতার অনুচর মাত্র। আধুনিক কুজ্ঞানবশতঃ মানুষ প্রায়শঃ গরলকে অমৃত ও অমৃতকে গরল মনে করিয়া থাকে এবং তাই আজ মানুষ তাণ্ডব নৃত্যের নেতাকে "মহাত্মা" আখ্যা দিয়া বসিয়াছে। আপনারা আমাদের "ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহার পূরণের উপায়"-শীর্ষক প্রবন্ধ পড়িয়া দেখুন। উহা চিন্তা করিয়া পড়িলে দেখিতে পাইবেন যে, কি করিয়া ভারতবাসী কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া, কাহারও রক্তপাত না করিয়া,

কাহারও সহিত দ্বন্দ্ব-কলহে প্রবৃত্ত না হইয়া সকলকে প্রাণের ভিতর টানিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে নিজ দেশের শাসন-ভার অথবা প্রকৃত স্বরাজ পাইতে পারে, তাহার প্রয়োগ-যোগ্য উপায় বিবৃত হইয়াছে। উহাতে কেবল যে স্বরাজ লাভ করিবার উপায় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নহে; কি করিয়া ভারতীয় শিক্ষিত যুবকগণ ব্যর্থ জীবনের নৈরাশ্য বশতঃ তিল তিল মৃত্যুর হাত হইতে অনতিবিলম্বে রক্ষা পাইবেন, তাহার চিন্তাও ঐ প্রবন্ধে আছে। তাহা ছাড়া ভারতবর্ষের অগণিত শ্রমজীবিগণ যে অনশনে ও অর্দ্ধাশনে ক্লেশ ভোগ করিতেছে, তাহা হইতেই বা তাহাদিগকে অদূর-ভবিষ্যতে কি করিয়া রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহার নির্দ্দেশও ঐ প্রবন্ধে দেখা যাইবে। শুধু যে ভারতবর্ষের কথাই ঐ প্রবন্ধে আছে তাহা নহে। ভারতবাসী কি করিয়া ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশের জনসাধারণের জীবিকার্জ্জনের সহায়তা করিয়া তাহাদের সহিত প্রকৃত সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে এবং সমগ্র মানব-সমাজের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইতে পারে, তাহার চিন্তাও ঐ প্রবন্ধে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে

অন্যদিকে চাহিয়া দেখুন, ভারতের আধুনিক তাণ্ডব নৃত্যের নেতা তথাকথিত মহাত্মাটী আমাদিগকে যাহা শিখাইতেছেন, তাহাতে কেবল মানুষের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইতে হয়, জেলে গিয়া মাতা, পিতা ও স্ত্রী-পুত্রদিগকে পথে বসাইতে হয় এবং দাঁড়াইয়া থাকিয়া প্রহার খাইতে হয়। যদি কেহ মাতৃক্রোড়ের অপরিণতবয়স্ক শিশুগণের দর দর প্রবাহিত বিগলিত রক্তময় গাত্র দেখিয়া থাকেন এবং তাহাদের মুখ-নিঃসৃত "বন্দেমাতরম্", "মহাত্মাজীকী জয়" ধ্বনি শুনিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, ঐ মহাত্মাটী কি অমানুষিক, তাহা নিশ্চয়ই তাঁহাদের চিন্তায় উদয় হইয়াছে। আমরা আজকাল অমৃতকে গরল মনে করি এবং গরলকে অমৃত মনে করি বলিয়া যাহারা নিজ বিদ্যা-বুদ্ধি অনুযায়ী দেশের অধিকাংশ লোকের সুখ-শান্তি বিধান করিবার চেষ্টা করে, তাহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া থাকি। অথচ যিনি ঐ অবস্থার উদ্ভব করিতেছেন এবং যিনি আমাদের যুবকদিগকে জেলে যাইবার পরামর্শ দিয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় করিয়া তুলিয়াছেন এবং পরোক্ষভাবে অসংখ্য পরিবারকে দুর্দ্দশার চরমে উপনীত করিয়াছেন, তাঁহাকে "মহাত্মা" বলিয়া মাথায় করিয়া নাচিতেছি।

সর্ব্বদা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের নিজেদের কোন ভ্রান্তি না থাকিলে ঋষি-রচিত ভারতবর্ষে—আমাদের বুকের ধন, ভবিষ্যতের আশার স্থল, ঐ সুন্দর সুন্দর যুবকগুলি আজ কর্ম্মাভাবে আত্মহত্যা করিতে বসিত না। প্রতিদিন দেখিতেছি, চোখের সম্মুখে তাহারা আত্মহত্যা করিতেছে, কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া আসিয়া যখন জিজ্ঞাসা করে যে, "তবে আমরা কি করিব?" তাহার কোন উত্তর আমরা দিতে পারি না; অথচ আমরা নিজদিগকে জ্ঞানী, সুচতুর, কার্য্যক্ষম নেতা বলিয়া মনে করিয়া থাকি। ইহা কি ধিক্কারের বিষয় নহে?

আপনারা চাহিয়া দেখুন, ঐ মহাত্মাটী বরাবর যাহা বলিয়া আসিতেছেন, তাহাতে আমাদের ধ্বংসের পথ পরিষ্কার হয় বটে, কিন্তু কি করিয়া আমাদিগের যুবকগণের অথবা শ্রমজীবি-গণের অন্ন-সংস্থান হইবে, কি করিয়া আমাদের শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি হইবে, তাহার কোন সন্ধান ঐ মহাত্মার কোন কথায় পাওয়া যাইবে না। তাঁহার কাছে গিয়া ঐ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করুন, উত্তর পাইবেন যে, স্বাধীনতা অথবা স্বরাজ লাভ করিতে না পারিলে যুবকগণের অন্ন-সংস্থান হইবে না। তাহার পর, জিজ্ঞাসা করুন যে, স্বাধীনতা অথবা স্বরাজ কি করিয়া লাভ হইবে, তখন দেখিতে পাইবেন যে, ঐ মহাত্মাটীর মুখে কোন যুক্তিপূর্ণ উত্তর নাই। তাহার পর জিজ্ঞাসা করুন যে, যদি স্বাধীনতা পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের যুবকগণের ও শ্রমজীবিগণের অন্ন-সংস্থানের জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, তখন দেখিতে পাইবেন যে, মহাত্মাটীর মস্তিষ্ক ঐ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ফাঁপা (hollow) এবং তিনি বলিবেন যে, তাহা স্থির করা তাঁহার কার্য্য নহে, উহা বিশেষজ্ঞগণের কার্য্য। প্রয়োজন হইলে আমরা প্রমাণিত করিতে পারিব যে, ঐ তথাকথিত সত্যাগ্রহী মহাত্মাটী একটী প্রতারণা এবং দম্ভের প্রতিমূর্ত্তি। দেশবাসী যতদিন এই শ্রেণীর মহাত্মাসমূহকে যথাযথ ভাবে না চিনিতে পারিবে, ততদিন তাহাদিগের জীবন অশান্তিময় হইতে অধিকতর অশান্তিময় হইতে থাকিবে।

পণ্ডিত জওহরলাল যে কিরূপ অদূরদর্শী এবং অপরিণত জ্ঞানের চাঞ্চল্যযুক্ত, তাঁহার কথাগুলি যে কিরূপ অসংলগ্ন প্রলাপ, তাহা আমরা আমাদের ফাল্গুন সংখ্যায় "ভারতবর্ষের অবস্থা ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পণ্ডিত জওহরলালের মতবাদ"-শীর্ষক নিবন্ধে দেখাইয়াছি। এই শ্রেণীর মানুষের পক্ষে যে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় মহাসভার সভাপতি হওয়া সম্ভব হয়, তাহাও বর্ত্তমান তাণ্ডব নৃত্যের নেতা ঐ মহাত্মাজীর খেলা। আমাদের বিশ্বাস, কোন বুদ্ধিমান্ লোক ঐ পণ্ডিত জওহরলালের লক্ষ্ণৌয়ের অভিভাষণ পড়িয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিবেন না। অধিকন্তু দেশীয় লোকের জ্ঞান-বুদ্ধি কোন্ অবস্থায় উপনীত হইলে ঐ জাতীয় লোক দেশের নেতা বলিয়া গণ্য হইতে পারেন এবং দেশীয় সংবাদ-পত্রের সম্পাদকগণ তাহার সমর্থক হইতে পারেন, তাহা ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়।

পণ্ডিত জওহরলালের বক্তৃতা মুখ্যতঃ চারিটী অংশে বিভক্ত; যথা:—

(১) পণ্ডিতের নীতিবাদ;

(২) ভারতীয় কংগ্রেসের সাময়িক ইতিহাস;

(৩) ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে বর্ত্তমান জগতের রাজনৈতিক ইতিহাস;

(৪) ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ কার্য্যনির্দ্দেশ।

ইহা ব্যতীত ঐ বক্তৃতায় বর্ত্তমান নেতার প্রতি গদগদ ভাবের অভিব্যক্তি আছে। বক্তৃতাটীতে অনেক কথাই আছে বটে এবং তাহা পাঠ করিতে ২॥০ ঘণ্টা সময় লাগিয়াছে, তাহাও প্রচারিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সমগ্র বক্তৃতাতে ভারতের যে সমস্যা প্রত্যেক ভারতবাসীকে অধুনা ঘিরিয়া বসিয়া আছে, তৎসম্বন্ধে কোন কথাই নাই। মধ্যবিত্তগণের উন্নতি সাধন করিতে হইবে, শ্রমজীবিগণের উন্নতি সাধন করিতে হইবে - এই ভাবের অনেক কথাই ঐ বক্তৃতায় নানা স্থানে প্রকট হইয়াছে বটে, কিন্তু কি খাইয়া, কোন্ কর্ম্ম করিয়া শিক্ষিত যুবক অথবা মধ্যবিত্তগণ এবং শ্রমজীবিগণ বাঁচিয়া থাকিবে এবং কি পদ্ধতি অবলম্বন করিলে তাহাদের উন্নতি সাধন করা সম্ভব হইবে, তৎসম্বন্ধে একটী কথাও সমগ্র বক্তৃতায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পণ্ডিত পণ্ডিতটীর মতে একমাত্র সোসিয়ালিজ্‌মে জগতের ও ভারতবর্ষের সমস্যার মীমাংসা হওয়া সম্ভব এবং তাহা যাহাতে কংগ্রেস দ্বারা পরিগৃহীত হয়, তৎসম্বন্ধে তিনি ওকালতী করিয়াছেন। অথচ কি করিয়া যে ঐ সোসিয়ালিজ্‌ম জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা সম্ভব হইতে পারে, তাহার কোন কথাই তিনি বলিতে পারেন নাই। পণ্ডিত পণ্ডিতটী কি জানেন না যে, তিনি যে-সোসিয়ালিজ্‌মের প্রচারের কথা বলিতেছেন, তাহা তাঁহার কথা শুনিয়া যিনি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে যাইবেন, তাঁহাকেই গবর্ণমেণ্ট বন্দী করিতে বাধ্য হইবেন? ফলে তাঁহার সোসিয়ালিজ্‌ম প্রচারিত হইবে না এবং লাভের মধ্যে হইবে—কতকগুলি নিরীহ ব্যক্তি এবং তাঁহাদের সংসার বিপন্ন হইয়া পড়িবে। যাহা প্রয়োগযোগ্য নহে, তাহা বলিয়া তিনি অনেক কিছু বলিলেন, ইহা তিনি মনে করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহাতে ভারতবাসীর কোন্ লাভ হইবে?

ইহার পর যদি গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে আরম্ভ করেন যে, জনসাধারণ যে অনশন ও অর্দ্ধাশন-গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার উদ্ধারকল্পে গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু ঐ মহাত্মা ও পণ্ডিতশ্রেণীর লোকের হৈ-চৈএর জন্য তাঁহারা কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, তখন কি অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে তাহা জওহরলালজী এবং তাঁহার নেতাটী ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?

গবর্ণমেণ্ট যে বাস্তবিক পক্ষে জনসাধারণের দুরবস্থা দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধির অল্পতা-বশতঃ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না, তাহা অস্বীকার করা যায় কি? তাহার পর তাণ্ডব নৃত্যের ঐ নেতাটীর হৈ-চৈ কিসে বন্ধ হইবে, কয়েক বৎসর হইতে তাহার দিকে যে গবর্ণ-মেণ্টের অপেক্ষাকৃত অধিক মনোযোগী হইতে হইয়াছে, তাহাতে যে অর্থব্যয়ও বাড়িয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে যে জন-সাধারণের দুরবস্থা-মোচনের কার্য্যে বাধ্য হইয়া অবহেলা ঘটিতেছে, তাহা অস্বীকার করা যায় কি? এই সত্যকথাগুলি যদি গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণকে বুঝাইবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে কি জনসাধারণের পক্ষে তাহা বুঝিয়া উঠা অসম্ভব হইবে? তখন কি ঐ মহাত্মা, জওহরলাল এবং তাঁহাদের দলের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ক্ষিপ্ত হইবার আশঙ্কা ঘটিবে না? এখনই যে ভারতের জনসাধারণমধ্যে কেহ কেহ কংগ্রেসের নাম শুনিলে ঘৃণা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা কর্ণে তুলা দিয়া রাখিলে শুনিতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু তাহা-

য় বাস্তব সত্য। ঐ মহাত্মা এবং তাঁহার দলবল তাঁহাদের সোসিয়ালিজ্‌ম লইয়া যদি আর বেশী দূর অগ্রসর হন, তাহা হইলে যে জনসাধারণের হস্তে তাঁহাদের প্রহার খাইবার আশঙ্কা পর্য্যন্ত আছে, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন কি?

পণ্ডিত জওহরলাল তাঁহার বক্তৃতায় প্রচার করিয়াছেন যে, রুশিয়ায় সোসিয়ালিজ্‌মের ফলে রুশীয়গণ সর্ব্বসুখের অধিকারী হইতে পারিয়াছেন। ইহা তাঁহার অল্প বুদ্ধির পরিচয়। যদি রুশীয়গণ সর্ব্বসুখের অধিকারীই হইতে পারিত, তাহা হইলে তাহাদের দেশের অবস্থা রয়টারের সংবাদদাতাকে পর্য্যন্ত ঘুণাক্ষরে জানিতে দেয় না কেন এবং বারংবার কেবল গঠনমূলক প্ল্যানগুলির পরিবর্ত্তন সাধন করিতেছেই বা কেন? যদি তাহারা সর্ব্বসুখের অধিকারীই হইতে পারিত তাহা হইলে তাহারা অন্যান্য জাতির নিকট ঋণ করিতে বাধ্য হইতেছে কেন এবং এখনও তাহাদের দেশে অন্যান্য দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের আমদানী হয় কেন? এখনও তাহারা কোন দ্রব্য রপ্তানী করিতে পারে না কেন? আমাদের কি বুঝিতে হইবে যে, কি হইলে একটী দেশ অথবা একটী জাতি সর্ব্বসুখের আধিকারী হয়, তাহার ধারণা পর্য্যন্ত পণ্ডিতটীর নাই, অথচ তাণ্ডব নৃত্যের নায়কের কারসাজীর ফলে, তিনি ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় মহাসভার সভাপতি-পদ পাইয়া, সমগ্র ভারতবাসীকে হাস্যাস্পদ ও অপমানিত করিতেছেন?

রুশীয়গণ বর্ত্তমান সময়ে কোন্ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহার বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ রবার্ট বাইরণের প্রবন্ধগুলিতে পাওয়া যাইবে। ঐ প্রবন্ধগুলি বিলাতী টাইমস্ পত্রিকার বর্ত্তমান সনের ১৯শে মার্চ্চ হইতে প্রকাশিত হইতেছে। তাহা পড়িলে দেখা যাইবে যে, রুশীয়গণ পর্য্যন্ত জওহরলালের কথিত মুড়ি-মুড়কী এক করিবার সোসিয়ালিজ্‌ম রক্ষা করিতে পারে নাই অল্প কয়েক বৎসর যাইতে না যাইতে [illegible]রা তাহাদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ প্রবর্ত্তিত করিতে বাধ্য হইয়াছে।

জওহরলালজী তাঁহার অভিভাষণে যে নীতিবাদের প্রচার করিয়াছেন তাহা অদ্ভুত এবং তাহাতে অপরিণতবুদ্ধিসম্ভূত চাঞ্চল্যের পরিচয় আছে।

কংগ্রেসের সাময়িক ইতিহাস বর্ণনায় একদেশদর্শিতার পরিচয় আছে।

ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে বর্ত্তমান জগতের রাজনৈতিক ইতিহাসের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি যে যে বড় বড় কথা বলিয়াছেন তাহা শুনিলে আপাত-ভাবে মনে হয় বটে যে, তিনি একজন গভীর চিন্তাশীল রাজনৈতিক, কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া পড়িলেই দেখা যাইবে যে, উহার মধ্যে কোন চিন্তাশীলতার পরিচয় নাই। উহাতে বরং রাজনীতি এবং অর্থনীতি সম্বন্ধে স্কুল-বালকের বিদ্যার পরিচয়ই আছে।

ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য কি তৎসম্বন্ধে কথার পর কথা তাঁহার বক্তৃতায় পাওয়া যাইবে বটে, কিন্তু তাহার কোনটী হইতে কোন কার্য্যের প্রয়োগযোগ্য নির্দ্দেশ পাওয়া যাইবে না। প্রয়োজন হইলে আমরা বারান্তরে জওহরলালজীর বক্তৃতা বিশ্লেষণ করিয়া আমাদের উক্তির সত্যতা পাঠকবর্গকে দেখাইব।

এইখানে একটী প্রশ্ন হইতে পারে যে, যখন পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান নেতৃবর্গ তাঁহাদের আন্দোলনের দ্বারা কার্য্যতঃ দেশের কোন উপকার সাধন করেন নাই, পরন্তু অপকারই সাধন করিয়াছেন, তখন দেশের জনসাধারণ তাঁহাদিগকে মান্য করে কেন?

ইহার উত্তরে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, দেশের জনসাধারণ প্রায়শঃ এই নেতৃবর্গকে অথবা তাঁহাদের আন্দোলনকে কোন দিন মান্য করে নাই এবং এখনও করে না। ভারতবর্ষের জনসমষ্টির মধ্যে যে শতকরা একজন বর্ত্তমান কংগ্রেসের আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নহে, তাহা আমরা গত মাঘ মাসে প্রকাশিত বঙ্গশ্রীর "ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমস্যা এবং তাহার পূরণের উপায়"-শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায়ই সাধারণতঃ বর্ত্তমান কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনকে মান্য করিয়া থাকেন।

তাহার কারণ ঐ পাশ্চাত্ত্য কুশিক্ষা। ইহাঁদিগের বিশ্বাস স্বাধীনতা না হইলে দেশের আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে না এবং জীবন ও বিত্ত-ত্যাগ ও ক্লেশ-সহিষ্ণুতা ব্যতীত স্বাধীনতালাভ হইবে না। এই কারণে ইহাঁরা মনে করেন যে, যাঁহারা কারাবরণ করেন অথবা দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন ত্যাগ করেন, তাঁহারা আমাদের সম্মানার্হ।

আমাদের স্বায়ত্ত-শাসন না হইলে যে, দেশের আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে না, তাহা অনেকাংশে সত্য বটে,

কিন্তু ইংরেজকে তাড়াইয়া দিয়া স্বাধীনতা লাভ করিতে না পারিলে আমাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে না এই কথা আদৌ সত্য নহে, তাহাও আমরা "ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা এবং তাহা পূরণের উপায়"-শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি।

জগতের ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইলে দেখা যাইবে যে, যখন কোন জাতি নিজ দেশের শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার উপযোগী জ্ঞান হারাইয়া বসে, তখনই তাহা পরাধীন হইয়া পড়ে। যে-জাতির নিজ দেশের শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার উপযোগী জ্ঞান থাকে, সেই জাতির পরাধীনতার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যাইবে না। কোন জাতি কেবল-মাত্র মারামারি-কাটাকাটি করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্তও ইতিহাসে পাওয়া যাইবে না। বিচার করিয়া দেখিলে আরও দেখা যাইবে, যখন একটী জাতি প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত হয় এবং নিজ দেশের শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়া দেশীয় শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য কি করিয়া প্রকৃত-ভাবে উন্নত করিতে হয়, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারে, তখন ঐ জাতি যদি কোন মারামারি-কাটাকাটি না-ও করে, তাহা হইলে তাহাকে কেহ পরাধীন রাখিতে সমর্থ হয় না।

কাযেই যাঁহারা মনে করেন যে, দেশের স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে মারামারি-কাটাকাটি করা অথবা কারাবরণ প্রভৃতি ক্লেশ সহ্য করা একান্ত প্রয়োজনীয়, তাঁহারা ভ্রান্ত। প্রত্যক্ষভাবে দেশের কাহারও কোন উপকার সাধন না করিয়া যাঁহারা স্বীয় বুদ্ধির ত্রুটীবশতঃ ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নিকট দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা পোষণ করিবার অথবা তাঁহাদিগকে সম্মান দেখাইবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ আছে কি? এতাদৃশ লোককে যদি সম্মান করিতে হয়, তাহা হইলে যে আত্মহত্যা করে, তাহাকেও সম্মান করিতে হয় না কি?

ভারতবাসিগণকে আগত দুর্দ্দৈব হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, বর্ত্তমান নেতৃবর্গ যাহাতে হয় তাঁহাদের মনোভাব পরিবর্ত্তন করিতে অথবা কংগ্রেস পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

বেদ ও মহাভারতের সম্বন্ধ এবং একটী মহামহোপাধ্যায় উপাধিধারী পণ্ডিতের সংস্কৃত ভাষাজ্ঞানের দৃষ্টান্ত

চৈত্র মাসের ভারতবর্ষে প্রকাশিত "গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত কিনা"-শীর্ষক একটী প্রবন্ধ আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। ঐ প্রবন্ধটীর লেখক হরিদাস সিদ্ধান্ত-বাগীশ নামক একটী পণ্ডিত(?)। গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তিনি মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করিতে পারিয়াছেন।

লেখকের ভাষানুসারে ঐ প্রবন্ধটী "বাদী ও প্রতিবাদীর উক্তি-প্রত্যুক্তিচ্ছলে" লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

এই প্রবন্ধের যে যে উক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) মহাভারতের অন্যান্য স্থানে যেজাতীয় অপাণিনীয় (আর্য) প্রয়োগ আছে, গীতাতেও সেইরূপ সেই সমস্ত দোষ আছে।

(২) পুরাণ-রচয়িতা বেদব্যাস চিরকালই সাপের গল্প ও ব্যাঙের গল্প প্রভৃতিই লিখিয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি কেবল পুরাণই রচনা করিয়া যান নাই। তিনি অধ্যাত্মবিষয়ের চরম গ্রন্থ বেদান্তদর্শন এবং পাতঞ্জল-ভাষ্য প্রভৃতিও লিখিয়া গিয়াছেন।

(৩) ভীষ্ম-পর্ব্বের প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে, "সম্ভাষ্য প্রহর্ত্তব্যং ন বিশ্বস্তে ন বিহ্বলে" অর্থাৎ আমরা বলিয়া কহিয়া বিপক্ষের উপর প্রহার করিব এবং কোন পক্ষ বিশ্বস্ত বা বিহ্বল থাকিলে তাহার উপর প্রহার করিব না।

(৪) জাভা দ্বীপের মহাভারতে না কি "ভগবদ্গীতা" নাই। তাহার কারণ জাভা দ্বীপবাসীরা প্রথমে

হিন্দু ছিল, মধ্যে বৌদ্ধ হইয়াছিল, পরে মুসলমান হইয়াছে। * * * যখন বৌদ্ধ এবং মুসলমান হইয়াছিল সম্ভবতঃ তখন তাহাদের মহাভারত হইতে গীতা এবং ঐরূপ ঈশ্বরের মূর্ত্তিবোধক অংশগুলি নিষ্কাশিত হইয়াছিল। ভগবদ্‌গীতার বক্তা কৃষ্ণ আপনাকে বহু স্থানে ঈশ্বর বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

আমাদের মতে এই সিদ্ধান্তবাগীশটী সংস্কৃত জানেন না এবং তাঁহার পক্ষে মহাভারতের কোন যথাযথ ব্যাখা করা সম্ভব নহে। তিনি মহাভারতের যে ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাহা কোন আত্মসম্মানযুক্ত ভারতীয়ের পাঠ করা উচিত নহে। আমরা কেন এই মত পোষণ করি, তাহা তাঁহার উপরোক্ত চারিটী উক্তির সমালোচনাপ্রসঙ্গে যাহা বলা হইবে তাহাতে প্রস্ফুট হইবে।

মহামহোপাধ্যায়ের প্রথমোক্ত উক্তিটী হইতে বুঝিতে হয় যে, তিনি পাণিনি জানেন এবং মহাভারতে যে যে অংশ "পাণিনীয়" (অবশ্য জল-গণ্ডুষের মত পানীয় কি না তাহা আমরা জানি না), তাহা যে পাণিনীয়, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন এবং মহাভারতের ও গীতার কোন কোন অংশ অপাণিনীয় বলিয়া তাঁহার নজরে পড়িয়াছে।

এই উক্তির প্রত্যুত্তরে আমরা মহামহোপাধ্যায়টীকে নিম্নলিখিত প্রশ্ন কয়টী জিজ্ঞাসা করিতে চাই :—

(১) মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়, অর্জ্জুন প্রভৃতি যে যে পদ মানুষের নামবাচক পদ বলিয়া সাধারণতঃ ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে, তাহা যে মানুষের নামবাচক তাহা তিনি পাণিনির কোন সূত্রদ্বারা প্রতিপন্ন করিতে পারেন কি? যদি তিনি তাহা না পারেন, তাহা হইলে তিনি পাণিনি জানেন না এবং মহাভারতের ব্যাখ্যা করিবার অনধিকারী, তাহা স্বীকার করিয়া মহাভারত সম্পাদনের কার্য্য হইতে বিরত হইবেন কি?

(২) মহাভারত ও গীতার কোন্ কোন্ অংশ "অপাণিনীয়" এবং কেন তাহা তিনি অপাণিনীয় মনে করেন, তাহার যুক্তি তিনি লোকসমক্ষে প্রচার করিবেন কি? খুব সম্ভব তাঁহার বেদাঙ্গ পড়া নাই। যদি বেদাঙ্গ তাঁহার পড়া থাকিত, তাহা হইলে তিনি জানিতে পারিতেন যে যিনি পাণিনি-বিরোধী ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহাকে ঋষি অথবা মুনি বলা যায় না। এই হিসাবে "মহাভারতে ও গীতায় অপাণিনীয় ভাষা আছে" ইহা বলিলে উহার প্রণেতা ব্যাসদেব ঋষি অথবা মুনি নহেন, পরোক্ষ ভাবে ইহা বলা হয়। ব্যাসদেব মুনি অথবা ঋষি নহেন, ইহা কোন সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ বলিতে পারেন কি?

মহামহোপাধ্যায়টীর দ্বিতীয় উক্তি অনুসারে বুঝিতে হয় যে, পুরাণে সাপের গল্প ও ব্যাঙের গল্প আছে এবং পাতঞ্জলের ব্যাস-ভাষ্য ব্যাসদেব রচিত।

আমরা তাঁহাকে এইস্থানে জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে তিনি কোন্ পুরাণে সাপের গল্প এবং ব্যাঙের গল্প পাইয়াছেন? পুরাণের যে যে স্থানে সাপের গল্প ও ব্যাঙের গল্প লেখা রহিয়াছে বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছে, ঐ ঐ স্থান যে তিনি যথাযথ অর্থে বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহা পাণিনির সূত্রের দ্বারা প্রমাণিত করিতে পারিবেন কি? যদি তাহা না পারেন, তাহা হইলে তিনি স্বীকার করিবেন কি যে, তিনি সংস্কৃত বুঝিতে পারেন না এবং অযথা ব্যাসদেবের নিন্দা করিতেছেন?

"ব্যাস-ভাষ্য" বলিতে যে ব্যাসের লিখিত ভাষ্য এইরূপ অর্থ হইতে পারে, তাহা তিনি পাণিনির কোন্ সূত্রের দ্বারা প্রমাণ করিতে পারিবেন কি? যদি তাহা তিনি না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলা যায় না কি?

বেদান্ত-দর্শনকে তিনি অধ্যাত্মবিষয়ে চরম গ্রন্থ বলিয়াছেন। বেদান্ত-দর্শনকে অধ্যাত্মবিষয়ে চরম গ্রন্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে হইলে, প্রথমতঃ আত্মা বলিতে কি বুঝায়, দ্বিতীয়তঃ অধ্যাত্ম বলিতে কি বুঝায় এবং তৃতীয়তঃ অধ্যাত্ম সম্বন্ধে কি কি বিষয় আছে জানিতে হয়। তাহার পর জানিতে হয়, বেদান্তে কি কি আছে। তাহার পর দেখাইতে হয় যে, অধ্যাত্ম সম্বন্ধে যে যে বিষয় আছে, তাহার মধ্যে যেটী চরম তাহা বেদান্ত-দর্শনে পাওয়া যায়।

আমরা যদি বলি যে, সিদ্ধান্তবাগীশ মহামহোপাধ্যায়টী শাস্ত্র বিষয়ে একটী প্রতারক, তিনি না জানেন সংস্কৃত, না

জানেন কোন অধ্যাত্ম বিষয়, না জানেন বেদান্ত, তাহা হইলে তাঁহাকে উপরোক্তভাবে তাঁহার উক্তিটী প্রতিপন্ন করিতে হয় না কি? তিনি তাহা পারিবেন কি?

তাঁহার তৃতীয় উক্তি অনুসারে "সমাভাষ্য প্রহর্ত্তবাং ন বিশ্বস্তে ন বিহ্বলে"—এই বাক্যটীর অর্থ আমরা বলিয়া কহিয়া বিপক্ষের উপর প্রহার করিব—ইত্যাদি।

"সমাভাষ্য" এই পদটীর অর্থ যে "বলিয়া কহিয়া" তাহা মহামহোপাধ্যায় কোন ঋষির ব্যাকরণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন কি? "প্রহর্ত্তবাং" পদটীর অর্থ যে "প্রহার করিব" হইতে পারে, ইহা বোধ হয় সিদ্ধান্তবাগীশী ব্যাকরণ ছাড়া অন্য কোন ব্যাকরণদ্বারা প্রতিপন্ন হইতে পারে না এবং ইহা হইতে বুঝিতে হয় যে সিদ্ধান্তবাগীশ প্রচলিত সংস্কৃত পর্য্যন্ত জানেন না এবং তিনি যে মহামহোপাধ্যায় উপাধিটী অর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন, তাহা সংস্কৃত ভাষা অথবা শাস্ত্রের কোন বিদ্যাদ্বারা নহে।

তাঁহার চতুর্থ উক্তিটী অদ্ভুত। তিনি যাহা বলিতেছেন তাহা হইতে বুঝিতে হয় যে, গীতায় পুতুলকে ঈশ্বরবোধে পূজার সমর্থন করা হইয়াছে বলিয়া জাভাবাসিগণ যখন বৌদ্ধ ও মুসলমান হইয়াছিল, তখন তাহারা তাহাদের মহাভারত হইতে গীতার অংশ পরিত্যাগ করিয়াছিল। আরও বুঝিতে হয় যে, "কৃষ্ণ" শব্দটী একটি মানুষের নামবাচক শব্দ।

আমরা মহামহোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করি যে, গীতার কোন্ কোন্ শ্লোকে পুতুলকে ঈশ্বরবোধে পূজার সমর্থন ব্যাসদেব করিয়াছেন, তাহা তিনি পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিবেন কি?

"কৃষ্ণ" পদটি যে মানুষের নামবাচক, তাহাও তিনি পাণিনির কোন সূত্রের দ্বারা প্রমাণিত করিতে পারিবেন কি?

গীতায় পুতুলকে ঈশ্বরবোধে পূজা যে সমর্থিত হইয়াছে, অথবা "কৃষ্ণ" যে মানুষের নামবাচক শব্দ, তাহা গীতা ও পাণিনি যথাযথ অর্থে জানা থাকিলে কখনও বলা যায় না। যে পণ্ডিতগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন, তাঁহারা ঋষিদিগের ভাষা জানেন না, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

ব্যাসদেব কুত্রাপি পুতুলকে ঈশ্বরবোধে পূজা করিবার সমর্থন করেন নাই। পরন্তু গীতার ৭ম অধ্যায়ের ২৪শ শ্লোকে* এবং ৯ম অধ্যায়ের ২৩শ শ্লোকে* অব্যক্তকে ব্যক্ত বলিয়া মনে করিলে এবং পূজা করিলে বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দেওয়া হয় এবং ঐ পূজা অবিধিযুক্ত হইয়া থাকে, এই মর্ম্মের কথা আছে। দেব বলিতে কি বুঝায় এবং দেবতার বিবিধ মূর্ত্তি যে কি বস্তু, তাহা অতি বিশদভাবে বেদে এবং তন্ত্রে বুঝান হইয়াছে।

সিদ্ধান্তবাগীশ-শ্রেণীর পণ্ডিতগণ সংস্কৃত জানেন না বলিয়া "দেবতা" ও "পূজা" কি জিনিষ তাহা বুঝিতে পারেন না এবং জনসাধারণকেও বুঝাইতে পারেন না। তাহার ফলে তাঁহারা ভণ্ডামি করিয়া ঋষিগণকে হাস্যাস্পদ করিয়াছেন এবং ঐ পাপের ফলে ভারতের এই অবনতি সংঘটিত হইয়াছে।

সিদ্ধান্তবাগীশ-শ্রেণীর পণ্ডিতসমূহের কৃতকার্য্যের ফলে বেদ, মহাভারত, রামায়ণ ও ভাগবত, পুরাণ, দর্শন, উপনিষদ্ প্রভৃতি ঋষিদিগের সমগ্র অমূল্য গ্রন্থ অদ্ভুত অর্থে প্রচারিত হইতেছে এবং ঐরূপ অর্থে প্রচারিত হইতেছে বলিয়াই বিদেশীয়গণ বেদকে চাষার গান অথবা মানবের আদিম সভ্যতার গ্রন্থ, মহাভারত এবং রামায়ণকে মাইথোলজি (mythology) বলিতে সমর্থ হইতেছেন। এই পণ্ডিত সমূহের অজ্ঞতার ফলেই দর্শন ও উপনিষদ্ একটি কাল্পনিক অধ্যাত্মবাদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ভারতীয় ঋষির যে অমূল্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ছিল তাহার কোন নিদর্শন এখন আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এত বড় মহাপাপ করিয়া এই সিদ্ধান্তবাগীশ-শ্রেণীর পণ্ডিতগণের মস্তিষ্ক এমনই পক্ষাঘাতগ্রস্ত (paralysed) হইয়াছে যে, তাঁহারা কি বলেন তাহা জানেন না এবং ঋষিদিগের বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তাকে আক্রমণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। এই পণ্ডিতগণ যে নিজদিগকে "ব্রাহ্মণ" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, ঐ নামও যে ঋষিদিগের দেওয়া তাহা বিস্মৃত হন। প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইতে হইলে যে ব্রহ্মকে বাস্তবভাবে জানিতে হয় তাহা তাঁহাদের স্মৃতিপথে জাগরূক থাকিবার কোন নিদর্শন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

---

* অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম॥

ঋষিদিগের কথানুসারে যে বিপ্র ব্রহ্মকে বাস্তবভাবে না জানিয়া কেবল যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া আছেন বলিয়া ব্রাহ্মণের [illegible] করিয়া থাকেন তিনি "পশু"*।

যে বিপ্র বাপী, কূপ এবং তড়াগের ব্যবহার শঙ্কাহীন করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন না এবং উহাদের ব্যবহার বাধা প্রদান করিয়া থাকেন, সেই বিপ্র "ম্লেচ্ছ"†।

যে বিপ্র ক্রিয়াহীন, মূর্খ ও স্বীয় কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ এবং সমস্ত প্রাণীর প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়া থাকেন সেই বিপ্র "চণ্ডাল"‡।

অথচ এই সিদ্ধান্তবাগীশ-শ্রেণীর পণ্ডিতগণই ব্রহ্মকে বাস্তব ভাবে না জানিয়া ব্রাহ্মণ্যের গর্ব্ব করিয়া থাকেন, জাতি-বিশেষ কোন কূপের জল ব্যবহার করিলে তাহা নষ্ট হইয়াছে, এই অজুহাতে তাহাদিগকে ঐ কূপ-ব্যবহারে বাধা প্রদান করেন। মানুষকে অস্পৃশ্য নামে অভিহিত করিয়া তাহারা যেন পশু হইতেও অধম, এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

যে পণ্ডিতগণ ঐ জাতীয় ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে শাস্ত্রানুসারে পশু, ম্লেচ্ছ এবং চণ্ডাল বলিতে হইবে।

আমাদের সমাজ তাঁহাদিগকে যথাযথ নামে অভিহিত করিতে সঙ্কুচিত হয় বলিয়াই আজ আমাদের এই অবস্থা হইয়া পড়িয়াছে।

ঋষির নিন্দাকারী এই পণ্ডিতটী সংস্কৃত ভাষা জানেন না, মহাভারত যে কি জিনিষ তাহা পর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত নহেন, অথচ মহাভারতের ব্যাখ্যাকার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন। আমাদের সমাজও অবিচারিত চিত্তে তাঁহার প্রণীত ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতেছেন। সাধারণ বুদ্ধির সহায়তায় একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, ব্যাসদেব-প্রণীত মহাভারত কখনও মিথ্যা কথার ভাণ্ডার অথবা 'মাইথোলজি' হইতে পারে না।

---

* ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণগর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥
(অত্রিসংহিতা, ৩৭২শ শ্লোক)

† বাপীকূপতড়াগানামারামস্য সরঃসু চ।
নিঃশঙ্কং রোধকশ্চৈব স বিপ্রো ম্লেচ্ছ উচ্যতে॥
(অত্রিসংহিতা, ৩৭৩শ শ্লোক)

‡ ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চণ্ডাল উচ্যতে॥
(অত্রিসংহিতা, ৩৭০শ শ্লোক)

যে গ্রন্থ মিথ্যা কথার ভাণ্ডার, তাহা মানুষ পুরুষানুক্রমে বহন করে না। তাহার একটীর বেশী দুইটী সংস্করণ (edition) পর্য্যন্ত হয় না। যে ঋষিগণ মিথ্যা কথাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘৃণার্হ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারা নিজেরাই মিথ্যা কথা সাজাইয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহা যুক্তিযুক্ত ভাবে বলা যায় না। অথচ এই পণ্ডিতগণ যে ভাবে মহাভারতের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহাতে তাহাকে মিথ্যা কথার ভাণ্ডার অথবা 'মাইথোলজি' না বলিয়া উপায় নাই। কাযেই বুঝিতে হইবে যে এই পণ্ডিতগণ মহাভারত যথাযথ অর্থে বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা যে, মহাভারত যথাযথ অর্থে বুঝিতে পারেন না এবং সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে তাহাকে প্রচার করিতেছেন, তাহা প্রকৃত সংস্কৃত জানিয়া মহাভারত অধ্যয়ন করিতে পারিলে অতি সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। আমাদের ঋষিদিগের গ্রন্থরাশি যে কোন্ শ্রেণীর জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ এবং তাহাদের পরস্পরের কি সম্বন্ধ, তাহা জানা থাকিলে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাভারতের যে ব্যাখ্যা প্রচার করিতেছেন, তাহা কতদূর কলঙ্কজনক, ইহা বুঝা যাইবে।

ঋষিদিগের গ্রন্থরাশি যে কোন্ শ্রেণীর জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যে কি সম্বন্ধ, তাহা জানিতে হইলে প্রথমতঃ বেদ কি তাহা বুঝিতে হইবে। বেদ কি তাহা বুঝিতে হইলে, পরমাণু ও অণু কি জিনিষ এবং কি উপায়ে তাহাদের উদ্ভব হয়, তাহা জানিতে হইবে।

প্রকৃতিতে কি উপায়ে পরমাণুর গঠন সাধিত হয়, পরমাণু হইতে কি পদ্ধতিতে অণুর উদ্ভব হয় এবং প্রত্যেক জীব যে অণুরাশির সমাবেশের ফল, সেই অণুরাশি বিচ্ছিন্ন না হইয়া কি উপায়ে, কেন সংশ্লিষ্ট থাকে, তাহা আমরা এই সংখ্যায় প্রকাশিত "ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষিগণের কথা"-শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, "ব্যোম" জগতের মূল কারণ এবং ব্যোমের অশরীরী এবং ভূত অবস্থা নামক দুইটী অবস্থা আছে। অশরীরী অবস্থার ব্যোম হইতে ভূত অবস্থার ব্যোমের উদ্ভব হইয়া থাকে এবং ভূত অবস্থার ব্যোমের উদ্ভব হইলে, ভূত অবস্থার বায়ু, অম্বু এবং বহ্নির উদ্ভব হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে ক্রমশঃ পরমাণু, অণু, মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত, চর্ম্ম এবং রোমকূপের

উদ্ভব হইয়া থাকে। রোমকূপ পর্য্যন্ত উদ্ভূত হইলে একটী সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন মানুষের সৃষ্টি হয়।

ঐ প্রবন্ধে আরও দেখা গিয়াছে যে, মানুষের জীবন যাহাতে সুখ-দুঃখে মিশ্রিত না হইয়া অবিমিশ্র সুখময় হয়, তাহা করিতে হইলে, প্রথমতঃ জগতের মূল কারণ যে অশরীরী ব্যোম তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ, তাহা হইতে কি পদ্ধতিতে ভূত অবস্থার ব্যোম, বায়ু, অম্বু এবং বহ্নির উদ্ভব হইতেছে, তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ ভূত অবস্থার ব্যোম, বায়ু, অম্বু এবং বহ্নি হইতে কি পদ্ধতিতে মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত, চর্ম্ম ও রোমকূপের উদ্ভব হইতেছে, তাহাও জানিতে হইবে। এই তিনটী তথ্য জানিবার জন্য ঋষিগণ প্রথমতঃ রোমকূপ, চর্ম্ম, রক্ত, মাংস, বসা, মজ্জা, অস্থি এবং মেদবশতঃ, দ্বিতীয়তঃ বায়ুমণ্ডলবশতঃ, শরীরাভ্যন্তরে কি কি অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহার উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করেন। এই উপলব্ধি লাভ করিবার জন্য তাঁহারা বিশেষ ভাবে জিহ্বা এবং টাকরার সাহায্যে শব্দ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা যে ভাবে জিহ্বা ও টাকরার সাহায্যে শব্দ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন, সেই ভাবে উহা ব্যবহার করিতে পারিলে, রোমকূপ ও চর্ম্মাদি-বশতঃ এবং বায়ুমণ্ডলের কার্য্যবশতঃ শরীরাভ্যন্তরে কোথায় কি অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহা তন্ন-তন্ন করিয়া উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

রোমকূপ ও চর্ম্মাদিবশতঃ শরীরাভ্যন্তরে কোথায় কি অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহা জানিবার জন্য তাঁহারা জিহ্বা ও টাকরার সহায়তায় যে-শব্দযোজনা বিশেষ ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা "সাম-বেদ" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আর বায়ুমণ্ডলবশতঃ শরীরাভ্যন্তরে কোথায় কি অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহা জানিবার জন্য তাঁহারা জিহ্বা ও টাকরার সাহায্যে যে-শব্দযোজনা বিশেষ ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা "যজুর্ব্বেদ" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। রোমকূপ ও চর্ম্মাদি এবং বায়ুমণ্ডলবশতঃ শরীরাভ্যন্তরে কোথায় কি অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহা পরিজ্ঞাত হইবার পর মস্তিষ্ক, হৃদ্দেশ এবং জননেন্দ্রিয়ভাগস্থ শরীরের মধ্যে পরস্পরের কি সম্বন্ধ এবং কেন শরীরের বিভিন্ন পরিবর্ত্তন ও কার্য্য, তাহা তাঁহারা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করেন। এই উপলব্ধি লাভ করিবার জন্যও তাঁহারা জিহ্বা ও টাকরার সহায়তায় শব্দ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। যে-শব্দযোজনা বিশেষ ভাবে ব্যবহার করিয়া শরীরের বিভিন্ন প্রদেশের পরস্পরের সম্বন্ধ এবং কেন শরীরের বিভিন্ন পরিবর্ত্তন ও কার্য্য হয়, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছিলেন, সেই শব্দযোজনা তাঁহারা "ঋক্ বেদে" লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কাযেই দেখা যাইতেছে যে, ঋক্, সাম এবং যজুঃ এই তিনটী বেদে যে-শব্দযোজনা দেখা যায়, তাহা অভ্যাস করিবার বস্তু। ঐ শব্দযোজনার এতাদৃশ অভ্যাস করার নাম আ-গম অভ্যাস। ঐ আ-গম অভ্যাস না হইলে মানুষের ধর্ম্ম যে কি বস্তু, তাহা বিন্দুমাত্রও বুঝা যায় না*।

ঋক্, সাম, যজুঃ এই তিনটী বেদের আ-গম অভ্যাসের ফলে তাঁহারা যে যে তথ্য অবগত হইয়াছিলেন, তাহা "অথর্ব্ব-বেদ" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ঋক্, সাম, যজুঃ এই তিনটী বেদ ঋষিদিগের কর্ম্ম-ভাণ্ডারের উৎস। অথর্ব্ব-বেদ তাঁহাদের জ্ঞান-ভাণ্ডারের উৎস।

অথর্ব্ব-বেদকে ভিত্তি করিয়া বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তক রচিত হইয়াছে।

ঋক্, সাম, যজু-র অভ্যাসগুলি শরীরের বিভিন্ন অবস্থায় জ্ঞান-বিজ্ঞানলাভের বিভিন্ন উদ্দেশ্যে কিরূপ ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে বিভিন্ন উপনিষদে।

ঋক্, সাম, যজু-র অভ্যাসগুলি আয়ত্ত করিয়া ঋষিগণ শরীরগঠন (Anatomy) ও শরীরবিধান-তত্ত্ব (Physiology) সম্বন্ধে যে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহার সূত্রগুলি প্রথমতঃ, অথর্ব্ব-বেদে সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার পর আবার উহা বিস্তৃত ভাবে সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যোগসূত্রে এবং শ্লোকাকারে উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন ভাগবতে। ভাগবতে যে শরীরগঠন (Anatomy) ও শরীরবিধান-তত্ত্ব (Physiology) ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা উদাহরণ দ্বারা পরিষ্কার করিয়াছেন মহাভারতে। মহাভারতে কোন কাল্পনিক কথা নাই। সমগ্র গ্রন্থখানি যথাযথ ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা

---

* ন চাগমাদৃতে ধর্ম্মস্তর্কেণ ব্যবতিষ্ঠতে।
ঋষীণামপি যজ্জ্ঞানং তদপ্যাগমহেতুকম্॥
বাক্যপদীয়—প্রথম কাণ্ড—৩০শ শ্লোক।

যাইবে, উহা জীবের শরীরগঠন-তত্ত্ব ও শরীরবিধান-তত্ত্ব বিষয়ক কথায় পরিপূর্ণ। মানুষ যখন অধঃপতিত হয়, তখনই বা তাহার শরীর, মন ও বুদ্ধি কি অবস্থা পরিগ্রহ করে, আর মানুষ যখন উন্নতিকামী হয়, তখনই বা তাহার শরীর, মন ও বুদ্ধি কি অবস্থা পরিগ্রহ করে, তাহার বর্ণনাই ঐ গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ঋক্, সাম, যজুঃর অভ্যাসগুলি আয়ত্ত করিয়া শরীরের কোন্ কোন্ অংশের কোন্ কোন্ কার্য্যবশতঃ জীবের শব্দের উৎপত্তি হয়, তাহাঁও ঋষিগণ যথাযথ ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছিলেন। শব্দ-বিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল সূত্রও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে অথর্ব্ব-বেদে এবং ঐ মূল সূত্রগুলি বিস্তৃতভাবে সূত্রাকারে লিখিত হইয়াছে পাণিনিতে এবং তাহা শ্লোকাকারে ঋষিগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন বাক্যপদীয় নামক গ্রন্থে।

ঋক্, সাম, যজুঃর অভ্যাসের ফলেই জীব কেন চর ও অচর হইয়া বিভিন্নকার্য্যশক্তিসম্পন্ন ও বিভিন্নগুণবান্ হয়, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছিলেন এবং জীবের ধর্ম-বিষয়ক মূল তথ্যগুলিকে অথর্ব্ব-বেদে সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জীবের ধর্ম-বিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞান সমূহ বিস্তৃত ভাবে সূত্রাকারে লিখিত হইয়াছে পূর্ব্ব-মীমাংসা-দর্শনে এবং তাহা আরও বিস্তৃত ভাবে দৃষ্টান্তের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে আঠারখানি মহাপুরাণে। এই মহাপুরাণেও কোন কাল্পনিক কথা নাই। ইহার প্রত্যেকখানি অতীব প্রয়োজনীয় কথায় পরিপূর্ণ; তাহা হইতে মানব-জাতির বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায়।

মূল তিনটী বেদের অভ্যাসের ফলেই জীবের অবিমিশ্র সুখময় হইতে হইলে কি করা কর্ত্তব্য, তাহাও তাঁহারা পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছিলেন এবং জীবের কর্ত্তব্য অথবা ধর্ম্ম-বিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল তথ্যগুলি অথর্ব্ব-বেদে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ঐ তথ্যগুলি বিস্তৃত ভাবে সূত্রাকারে লিখিত হইয়াছে বৈশেষিক-দর্শনে এবং তাহা শ্লোকাকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, মন্বাদি বিংশ সংহিতায়।

সামের অভ্যাসের ফলে, কেন বিবিধ বস্তু বিভিন্ন রকমের শব্দ, বর্ণ, রূপ, এবং রসযুক্ত হইয়া থাকে তাহা তাঁহারা পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছিলেন। ঐ সম্বন্ধীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্থাৎ রসায়ন ও পদার্থ-বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলিও সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে অথর্ব্ব-বেদে এবং তাহা বিস্তৃত ভাবে সূত্রাকারে লিখিত হইয়াছে সাংখ্য-দর্শনে। ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে নিরুক্ত নামক গ্রন্থে।

যজুঃর অভ্যাসের ফলে, বায়ুমণ্ডলের কোথায় কি আছে এবং কেন তাহা বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকে, তাহাও ঋষিরা পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছিলেন। বায়ুমণ্ডলের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ফলে জ্যোতিষ্কমণ্ডল-সম্বন্ধীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান তাঁহারা অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। এই জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তৃত ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে উপপুরাণে।

ঋকের অভ্যাসের ফলে, জগতের মূল কারণ যে অশরীরী ব্যোম, তাহা কি করিয়া উপলব্ধি করিতে হয়, তাহাও তাঁহারা পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছিলেন এবং তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে ব্রহ্মসূত্রে। তাহা শ্লোকাকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণে এবং দৃষ্টান্তদ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে রামায়ণে।

ঋক্, সাম, যজুঃর প্রধান প্রধান অভ্যাসগুলি যাহাতে সর্ব্বদা স্মৃতিপথে জাগ্রত থাকে, তাহার জন্য তাঁহারা বিবিধ তন্ত্রের রচনা করিয়াছিলেন এবং যে-সমস্ত চিত্রগুলি আজকাল ঈশ্বরবোধে পূজিত হয়, সেই চিত্রগুলির পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্যসমূহ কার্য্য-কারণ ভাবের সামঞ্জস্যযুক্ত কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য ন্যায়-দর্শন রচনা করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া চিকিৎসা ও অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধীয় বিভিন্ন সূত্র-গ্রন্থও তাঁহাদের দ্বারা রচিত হইয়াছিল।

মোটের উপর, জ্ঞান-বিজ্ঞানভাণ্ডারে মানুষের যাহা যাহা পরিজ্ঞাত হইবার প্রয়োজন, তৎসম্বন্ধে তাঁহারা কিছুই অসম্পূর্ণ রাখিয়া যান নাই।

ঋষিদিগের বেদাদি গ্রন্থের পরস্পরের সম্বন্ধ বিষয়ে উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, তাঁহাদিগের কোন গ্রন্থেই পরস্পরের মধ্যে কোন বিরোধিতা থাকা সম্ভব নহে এবং একখানি অপর খানির পূরক-রূপে সমগ্র গ্রন্থরাশি মানব-জাতির পূর্ণ জ্ঞান-সঙ্কলনের সহায়তা করিতেছে। ঐ গ্রন্থরাশির এক একখানি যে পৃথক্ পৃথক্ সময়ে রচিত হইয়াছে, তাহাও মনে করা যায় না। বরং, তাহারা যে একই

সময়ে রচিত হইয়াছিল, ইহা মনে করিতে হয়। বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণের মধ্যে যাঁহারা বিভিন্ন গ্রন্থের রচনাকাল বিভিন্ন বলিয়া স্থির করিতেছেন, তাঁহারা বস্তুতঃ ঐ গ্রন্থসমূহের প্রকৃত প্রতিপাদ্য বিষয় বুঝিতে পারেন না এবং তাহারই ফলে প্রাচীন ইতিহাসের নামে ইহাঁদের দ্বারা যাহা রচিত হইতেছে, তাহা হাস্যকর।

বর্ত্তমান পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষা জানেন না বলিয়া ঐ গ্রন্থসমূহের আসল তথ্যগুলি আজ বিস্মৃতির গর্ভে লুক্কায়িত। মহাকালের তাণ্ডব নৃত্যে এইরূপ ঘটিতে পারে, ইহা মনে করিয়া অভিমানশূন্য পণ্ডিতগণ মানবসমাজের ক্ষমার্হ বটে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সিদ্ধান্তবাগীশ-শ্রেণীর দম্ভযুক্ত এবং ঋষিদিগের উপর কোনরূপ দোষারোপ করিয়া থাকেন, তাঁহারা কি কখনও উপেক্ষণীয় হইতে পারেন?

যাঁহারা পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া এই সিদ্ধান্তবাগীশকে মহামহোপাধ্যায় বানাইয়াছেন এবং তাঁহার প্রণীত বিভ্রান্তিকর গ্রন্থগুলি প্রচারিত হইবার সহায়তা করিতেছেন, আমরা তাঁহাদিগকে এখনও সতর্ক হইতে অনুরোধ করি।

আমরা সিদ্ধান্তবাগীশকেই সতর্ক হইতে বলিতাম, কিন্তু যে জাতীয় মস্তিষ্ক হইলে আমাদের কথা উপলব্ধিযোগ্য হয়, সেই জাতীয় মস্তিষ্ক তাঁহার থাকিলে তিনি ঋষিদিগের উপর দোষারোপ করিতে পারিতেন না, ইহা আমাদের বিশ্বাস।

সাহিত্যিকের দায়িত্ব ও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কিছুদিন পূর্ব্বে আশুতোষ-কলেজ-সংশ্লিষ্ট বাঙ্গালা সাহিত্য-সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসবে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমরা পাঠকদিগকে গত সংখ্যায় জানাইয়াছি। ঐ বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটী উক্তি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য :—

(১) আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে খুব নিন্দাবাদ না হওয়াই ভাল;

(২) এইভাবে লেখা উচিত বা এইভাবে লেখা উচিত নহে, একথা বলিলে বিশেষ কিছু লাভ হয় না;

(৩) যাহার যে-রকম শিক্ষা, যাহার যে-রকম শক্তি, যাহার যে-রকম রুচি, তিনি তাহারই অনুপাতে সাহিত্য গড়িয়া তুলেন।

শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়ের উপরোক্ত উক্তিগুলি সমীচীন কি না, তাহা বিচার করিতে হইলে, সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি, তাহা স্থির করিতে হইবে।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে যদি বলা হয় যে, "মুখ্যতঃ লোকশিক্ষার জন্য সাহিত্য", তাহা হইলে বোধ হয় 'জাত-সাহিত্যিক' ব্যতীত অন্য কেহ তাহাতে আপত্তি করিবেন না।

'জাত-সাহিত্যিক'গণ মনে করিয়া থাকেন যে, সাহিত্য উপভোগের জন্য। উপভোগের জন্য সাহিত্য, এই কথা বলিলেই যে লোকশিক্ষার জন্য সাহিত্য, ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া হইল, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। কিরূপ ভাবে উপভোগ করিতে হয়, তাহা শিক্ষা না করিলে প্রকৃত উপভোগ করা সম্ভব হয় কি?

মানুষকে সাধারণতঃ একক ভাবে এবং মনুষ্যসঙ্ঘের সভ্যভাবে জীবন যাপন করিতে হয় এবং তাহার যাহা কিছু শিক্ষা, তাহা ঐ দ্বিবিধ জীবনযাপনের জন্য। মানুষের শিক্ষণীয় অনেক কিছু আছে এবং তাহা লইয়া মতভেদও আছে। অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয় লইয়া যতই মতভেদ থাক না কেন, যাহাতে মানুষ তাহার কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, এবং মাৎসর্য্যের প্রবৃত্তিসমূহ সংযত করিতে পারে, তাহা যে, তাহার শিক্ষা করিতে হইবে, এই সম্বন্ধে কোন মতভেদ থাকিতে পারে না। কাম-ক্রোধাদি রিপুর একটীও বৃদ্ধি পাইলে একদিকে যেমন মানুষের স্বীয় স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ভাবে বজায় রাখা সম্ভব হয় না, সেইরূপ আবার ঐ রিপুসমূহের বশবর্ত্তী হইয়া যাহাদের সহিত চলাফেরা করিতে হয়, তাহাদের সহিত যথারীতি ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। কারণ কামাদি রিপুর বশবর্ত্তী হইলে কর্ম্ম-জীবনে সাফল্য লাভ করার আশাও

সুদূরপরাহত হইয়া যায়। ইহারই জন্ম শিশুগণ যাহাতে বাল্যকাল হইতে কামাদি রিপু-পরবশ কোন অসৎ সঙ্গীর সহিত মিশিতে না পারে, তদ্বিষয়ে অভিভাবকগণকে সতর্ক হইতে হয়। কামাদি রিপু-পরবশ অসৎ সঙ্গীর সহিত মিলিত হইলে যদি যুবকগণের বিপথগামী হইবার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে যে-সমস্ত পুস্তকে কামাদি রিপুর উত্তেজক আখ্যায়িকা থাকে, তাহা অধ্যয়ন করিলেও যুবকগণের বিপথগামী হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হয়, ইহা যুক্তিসঙ্গতভাবে বলা যাইতে পারে। কাযেই যে-কোন লেখকের যে-কোন সাহিত্য-পুস্তক মনুষ্য-সমাজ অবিচারিত চিত্তে গ্রহণ করিবে, এই মতবাদ অনুমোদন-যোগ্য হইতে পারে না।

আমাদের এই ভারতবর্ষে একদিন ছিল, যখন কোন কার কামাদি রিপুর উত্তেজক কোন আখ্যায়িকা লিখিলে জনসমাজের ঘৃণার্হ হইতেন। যাহা পড়িলে কোন রিপুর উত্তেজনা সম্ভব, এমন কোন সাহিত্য কোন ঋষি অথবা তাঁহাদের সমসাময়িক কোন গ্রন্থকার লেখেন নাই। সুন্দর ও সুখ-স্পর্শ বস্তুর বর্ণনা প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাতে কোনরূপ উত্তেজনা আসে না। তখনকার আখ্যায়িকাগুলি এমনই ভাবে রচিত হইত যে, কোন আখ্যায়িকায় কোনরূপ সমাজ-বিরুদ্ধ চালচলনের চিত্র থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে ঐ চিত্রেই তাহার কুফল প্রদর্শিত হইত। তখন মানুষের অবস্থাও সর্ব্বতোভাবে লোভনীয় ছিল। বহুদিন হইতে এ প্রথা ভঙ্গ করা হইয়াছে। এমন কি কবি কালিদাসও এই প্রথা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন নাই। ফলে আজ ভারতবর্ষ পরাধীন এবং ভারতবাসিগণ অন্নাভাবে ক্লিষ্ট। আমাদের মনে হয়, এখন সতর্ক হইবার সময় আসিয়াছে।

শরৎ বাবুকে আমরা বলি যে, আজ আমরা বিপথগামী এবং কোন্‌টী গরল ও কোন্‌টী অমৃত,তাহা বুঝিতে পারি না। তাই যে-সমস্ত পুস্তকে অবৈধ কামাদি রিপুর উত্তেজক চিত্র থাকে, তাহাও আমাদের কাছে আদর লাভ করে এবং তাহাও আমাদিগের যুবকগণ পাঠ করিলে আমরা তাহাতে বাধা প্রদান করি না। ফল যাহা হয়, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। বিনা কারণে কোন কার্য্য হয় না। মানুষের ব্যক্তিগত, সংসারগত এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে এখন যে প্রায়শঃ খ-শান্তি দেখা যায় না, তাহা কি অকারণ? অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, তাহার বহু কারণ আছে এবং তাহার প্রত্যেকটীর জন্ম আমরা নিজেরাই দায়ী এবং তন্মধ্যে ঐ কামাদি রিপুর উত্তেজনামূলক সাহিত্য একটী অন্যতম বড় কারণ। মানুষের শরীর-তত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে, পাতিত্যের মাত্রা অত্যধিক না হইলে কোন রমণীর অথবা পুরুষের ইন্দ্রিয় একাধিক পুরুষের অথবা রমণীর ভোগ-লালসায় মত্ত হয় না। যে রমণী অথবা পুরুষ একবার একাধিক পুরুষ অথবা রমণীর ভোগ-লালসায় মত্ত হয়, তাহার শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য কখনও সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না এবং সে কখনও দীর্ঘ-জীবী হয় না। ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, যেদিন হইতে পুরুষ একসঙ্গে একাধিক রমণী উপভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং রমণী একাধিক পুরুষের আকাঙ্ক্ষা করিতে অসঙ্কুচিতা হইয়াছে, সেইদিন হইতে মানব-জাতির পরমায়ু ক্ষয় হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং সেই দিন হইতে আর মানব-সমাজে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মস্তিষ্ক এবং অটুট স্বাস্থ্যসম্পন্ন মানুষ জন্মগ্রহণ করেন নাই। অধুনা তথাকথিত সভ্যসমাজে পুরুষ ও রমণী প্রায়শঃ অবাধে একাধিক রমণী ও পুরুষের উপাসনায় রত হইয়াছেন এবং তাহারই ফলে মানুষ দুর্দ্দশার চরম অবস্থায় উপনীত হওয়া সত্ত্বেও আজ একটী মানুষও দেখা যাইতেছে না, যিনি আমাদিগকে মানবের আগত দুর্দ্দৈব হইতে রক্ষা পাইবার নির্দ্দেশ প্রদান করিতে পারেন। পরন্তু জগতের সর্ব্বত্রই অশান্তি, অন্নাভাব এবং অস্বাস্থ্যের বিভীষিকা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। মানুষের মস্তিষ্ক-শক্তির যে অত্যন্ত অবনতি হইয়াছে, ইহা কি তাহার পরিচয় নহে?

যে রমণী একবার ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় উন্মত্ত হইয়া একাধিক পুরুষের ভোগ-লালসালিপ্সু হইয়া পড়ে, সেই রমণীর ইন্দ্রিয় স্বভাববশতঃ নিস্তেজ না হওয়া পর্য্যন্ত আবার কায়মনোবাক্যে একই পুরুষের সেবাদাসী হইয়াছে, তাহা বাস্তব জগতে দেখা যাইবে না। যদি কেহ বলেন যে, তিনি এতাদৃশ রমণী দেখিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আত্ম-প্রতারক বলিতে হইবে এবং বুঝিতে হইবে যে, তিনি রমণীর অন্তঃকরণ পরীক্ষা কি করিয়া করিতে হয়, তাহা জানেন না। আমাদিগের এই কথা মহাপুরুষদিগের রচিত শরীর-তত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বেরই প্রতিধ্বনি। খুব সম্ভব, শরৎ বাবু তাহা

জানেন না। তাই তাঁহার সুললিত ভাষায় যে চিত্রগুলি রচিত হইয়াছে, তাহাতে প্রায়শঃ পতিতা নারীকে আদর্শ রমণী ভাবে চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

তাঁহার রচিত চিত্রের ফলে মোট কত যুবকের যে সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে, তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না, তবে দুই একটী যুবক যে ঐ জন্যই বিপথগামী হইয়াছে, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

আজ মানুষ গরলকে অমৃত মনে করে এবং অমৃতকে গরল মনে করে বলিয়া শরৎ বাবুর মত সাহিত্যিকও সমাজে আদর লাভ করে, ইহা বলিতে হইবে। হয় ত শরৎ বাবুর উপাসক কত যুবক আমাদের এই কথায় ক্ষিপ্ত হইবেন। তাঁহারা ক্ষিপ্ত হইলেও তাঁহাদেরই বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া আমরা সত্যের খাতিরে ঐ কয়টী কথা না বলিয়া পারিলাম না।

আপনারা ভাবিয়া দেখুন, তিনি সমাজের বুকে বসিয়া নিজেও যথেচ্ছাচার করিতেছেন, আবার এমন উক্তি করিতেছেন,যাহাতে ঐ যথেচ্ছাচার সমাজে সকলে অবাধে চালায়। এই ধৃষ্টতা কি মার্জ্জনীয়? শরৎবাবু জানিয়া রাখুন যে, আমরা মোহের তমসায় আচ্ছন্ন রহিয়াছি, তাই তাঁহাদের মত কু-সাহিত্যিকও সমাজে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু কালের ভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে। মানুষ দুর্দ্দশার চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। তাই প্রতি ঘরে ঘরে অন্নাভাব, কর্ম্মাভাব, স্বাস্থ্যের অভাব ও শান্তির অভাবের জন্য হাহাকার উঠিয়াছে। জগদম্বার সৃষ্টির নিয়মানুসারে অদূরভবিষ্যতে প্রতিক্রিয়া অনিবার্য্য। প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইলেই মানুষ আবার আধুনিক সাহিত্য-সম্রাটদিগকে যথাযথভাবে চিনিতে পারিবে এবং তাঁহাদের কীর্ত্তি তাসের ঘরের মত ভাঙ্গিয়া পড়িয়া নিশ্চিহ্ন হইবে। আমরা তাঁহাদিগকে এখনও সাবধান হইতে বলি।

বর্ণবিন্যাস, ভাষা-তত্ত্ব ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কিরূপ বর্ণবিন্যাস অর্থাৎ বানান সঠিক এবং তাহা কি হইলে বেঠিক হয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহার নিরূপণে তৎপর হইয়াছেন। আমাদের মনে হয়, প্রকৃত ভাষা-তত্ত্ব লুপ্ত হওয়ার ফলে একটা অযৌক্তিক ও ভূয়া ভাষা-তত্ত্ব জগতে স্থান পাইয়াছে এবং তাহারই ফলে বানান-সমস্যা লইয়া একটা পাণ্ডিত্যের অভিনয় চলিতেছে। আমাদের এই কথা যে যুক্তিসঙ্গত, তাহা প্রতিপন্ন করিতে হইলে, প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, প্রকৃত ভাষা-তত্ত্বের দায়িত্ব কি।

আমরা যে বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ব্যাকরণ ও সাহিত্যাদি অধ্যয়ন করিয়া থাকি, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য অপরের রচিত গ্রন্থাদি যাহাতে যথাযথ অর্থে বুঝিতে পারা যায়,তাহার কৌশল নির্দ্ধারণ করা। প্রকৃতিবশতঃ মানুষ ও অন্যান্য জীবের মুখ হইতে যখন যে শব্দ নির্গত হয়, তাহা সাধারণতঃ একটা কোন না কোন বিশেষ উদ্দেশ্য বশতঃ। পার্লিয়ামেণ্টে অথবা বর্ত্তমান সভ্য মানুষগুলির কমিটিতে যে সমস্ত কথাবার্ত্তার আদান-প্রদান হয়, সেগুলিতে দ্ব্যর্থক শব্দ ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু মানুষ তাহাদের বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত অথবা স্ব স্ব পরিবারস্থ পরিজনদিগের সহিত প্রকৃতিবশতঃ যে-সমস্ত কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে, তাহাতে কোন দ্ব্যর্থ থাকে না। সভ্য মানুষগুলির কথা অনেক সময়ে ঠিক ঠিক বুঝা যায় না বটে, কিন্তু বালক যখন খাদ্যের জন্য কাঁদিয়া উঠে, তাহা মা যথাযথ ভাবে বুঝিতে পারেন এবং মা যখন বালককে শিক্ষাদানার্থ ক্রুদ্ধা হইয়া তিরস্কার করেন, তাহাও বালক সঠিকভাবে বুঝিতে পারে। বালকের কথায় ও মায়ের কথায় কোন দ্ব্যর্থ থাকে না। এইরূপভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, কতকগুলি শিক্ষিত(?) মানুষ ব্যতীত অপর কাহারও কথাবার্ত্তায় দ্ব্যর্থ থাকে না এবং এই শিক্ষিত(?) মনুষ্যগণও স্বীয় সন্তান-সন্ততির সহিত কথাবার্ত্তায় প্রায়শঃ দ্ব্যর্থযুক্ত ভাষা ব্যবহার করেন না। যখন মানুষ বক্তার কথা কোন্ অর্থটীতে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা ঠিক ঠিক ভাবে নিরূপণ করিতে পারে, তখন সে ভাষা বুঝিবার বিদ্যা অর্জ্জন করিতে পারিয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। কাযেই বলিতে হইবে যে, বক্তার কথা কোন্ অর্থটীতে ব্যবহৃত

হইয়াছে, তাহা ঠিক ঠিক নিরূপণ করা প্রকৃত ভাষাতত্ত্বের একটী উদ্দেশ্য এবং যে ভাষা-তত্ত্বে তাহা নিরূপণ করা সম্ভব হয় না, তাহাকে প্রকৃত ভাষা-তত্ত্ব বলা যায় না। কোন্ তত্ত্বের দ্বারা ঐ বিদ্যা নির্ণীত হইতে পারে, তাহা আমরা বঙ্গশ্রীতে অনেকবার আলোচনা করিয়াছি। কাযেই এক্ষণে আর তাহার পুনরুক্তি করিব না।

মানুষ ও অন্যান্য জীব প্রকৃতিবশতঃ পরস্পরের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা চালায়, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, পরস্পর পরস্পরের ভাষা স্বভাবতঃ ঠিক ঠিক বুঝিতে পারে। একজন ইংরাজ একজন বাঙ্গালীর ভাষা বুঝিতে পারে না বটে, কিন্তু একজন অশিক্ষিত বাঙ্গালী অপর একজন অশিক্ষিত বাঙ্গালীর ভাষা স্বভাবতঃই বুঝিতে পারে। সেইরূপ আবার একজন অশিক্ষিত ইংরাজ অপর একজন অশিক্ষিত ইংরাজের ভাষা, একজন অশিক্ষিত উৎকল-দেশীয় লোক অপর একজন অশিক্ষিত উৎকল দেশীয় লোকের ভাষা স্বভাবতঃই বুঝিয়া লয়।

পশু-পক্ষীদিগের চালচলন পর্য্যালোচনা করিলেও দেখা যাইবে যে, বাঙ্গালা দেশীয় গরু বিলাতী গরুর ভাষা অথবা বাঙ্গালা দেশের ভাল্লুকের ভাষা বুঝে না বটে, কিন্তু বাঙ্গালা দেশীয় গরু সকল পরস্পরের ভাষা ঠিকই বুঝিতে পারে, বিলাত দেশীয় গরুও পরস্পরের ভাষা বুঝিতে পারে। কাযেই বলা যাইতে পারে যে, এক এক প্রদেশস্থ মানুষ ও এক এক শ্রেণীর জীবের ভাষা পরস্পরের বোধগম্য করিবার জন্য কোন বিদ্যা-শিক্ষার প্রয়োজন হয় না এবং ঐ বোধ-শক্তি স্ব স্ব স্বভাব হইতেই মানুষ ও অন্যান্য জীব লাভ করিয়া থাকে। এই সমস্ত প্রাদেশিক ভাষাকেই সংস্কৃত ভাষায় প্রাকৃত ভাষা বলা হইয়াছে। এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, কোন বিদ্যা-শিক্ষা না করিয়াও এক এক প্রদেশস্থ মানুষ এবং এক এক শ্রেণীর জীব স্বভাবতঃ তাহাদের পরস্পরের ভাষা বুঝিতে পারে এবং কথাবার্ত্তার আদান-প্রদান করিতে পারে বটে, কিন্তু এক প্রদেশস্থ মানুষ যদি অপর প্রদেশস্থ মানুষের ভাষা অথবা অপর কোন জীবের ভাষা বুঝিতে চাহে, তাহা হইলে বিদ্যা-শিক্ষার প্রয়োজন হয়। ইহার জন্যও প্রকৃত ভাষা-তত্ত্বের প্রয়োজন। যে ভাষা-তত্ত্বের সহায়তায় এক প্রদেশস্থ মানুষের পক্ষে অপর প্রদেশস্থ মানুষের ভাষা অথবা অপর জীবের ভাষা বুঝা যায় না, তাহাকেও যুক্তিসঙ্গত ভাবে প্রকৃত ভাষা-তত্ত্ব বলা চলে না। ঋষিগণ এক একটী প্রদেশের এক একটী জীবের প্রাকৃত ভাষা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বিভিন্ন জীবের ভাষার বিভিন্নতা তাহাদের বিভিন্ন গঠন (anatomy) ও বিভিন্ন বিধান (physiology) বশতঃ হইয়া থাকে। বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষার বিশ্লেষণ করিয়া, ঋষিগণ ইহাও দেখাইয়াছেন যে, বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষার পরস্পরের মধ্যে যে বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে, তাহা কাল ও স্থানবশতঃ।

মানুষের স্বাভাবিক ভাষা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, একই কথা মানুষ কখনও হ্রস্ব করিয়া, কখনও দীর্ঘ করিয়া উচ্চারণ করিতেছে এবং স্বভাবতঃ তাহা পরস্পরের বোধগম্য হইতেছে। মানুষ যখন বলে যে, "আপনি কি আমাকে ডাকিয়াছেন?" তখন "কি" শব্দটী অতি সুমধুর স্বরে হ্রস্বভাবে বক্তার মুখ হইতে উচ্চারিত হয় এবং তখন শ্রোতা বুঝিয়া লন যে, বক্তা বিনীত ভাবে তাঁহাকে একটী প্রশ্ন করিতেছেন। আবার মানুষ যখন বলে যে, "কী, আপনার এতদূর স্পর্দ্ধা?" তখন "কী" শব্দটী অতি কর্কশ স্বরে দীর্ঘভাবে বক্তার মুখ হইতে উচ্চারিত হয় এবং তখন শ্রোতা বুঝিয়া লন যে, বক্তা ক্রুদ্ধ ভাবে তাঁহাকে তিরস্কার করিতেছেন। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, "ক"-এর সহিত হ্রস্ব ই-কারের সংযোগে যেরূপ "কি" গঠিত করিলে মানুষের বোধগম্য হইতে পারে, সেইরূপ "ক"-এর সহিত দীর্ঘ ঈ-কারের সংযোগে "কী" গঠিত করিলেও মানুষের বোধগম্য হইতে পারে। দুইটী বানানের কোন বানানটীকেই ভ্রমাত্মক বলা যাইতে পারে না। বানানের পার্থক্যবশতঃ কেবল অর্থের পার্থক্য হইয়া যায়। এইরূপভাবে এক একটী পদ যে-কোন বর্ণ-যোজনার দ্বারাই গঠিত হউক না কেন, তাহাকে যুক্তি অনুসারে ভ্রমাত্মক বলা চলে না। বর্ণ-যোজনার বিভিন্নতানুসারে একই পদের উচ্চারণে বিভিন্নতা হইয়া থাকে এবং তদনুসারে অর্থেও বিভিন্নতা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এক একটী প্রদেশের এক একটী প্রাকৃত ভাষায় ঐ প্রদেশের মানুষ কোনরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত না হইলেও বানানের পার্থক্য-বশতঃ অর্থের যে পার্থক্য সংঘটিত হয়, তাহা কথোপকথন-কালে বুঝিয়া লইতে পারে। কাযেই দেখা যাইতেছে

যে, এই বানানটি ভুল, আর ঐ বানানটি নির্ভুল ইত্যাদি কথা যে আমাদের পণ্ডিতগণ তুলিয়াছেন, তাহার মূলে কোন যুক্তি নাই এবং বানান সম্বন্ধে যদি কোন সমস্যা থাকে, তাহা বিভিন্ন বানানে একই পদের কি কি বিভিন্ন অর্থ হয়, তাহার নির্দ্ধারণ-কার্য্যে।

একই পদ বিভিন্ন বানানে যে যে বিভিন্ন অর্থযুক্ত হয়, তাহা শ্রোতা কোন শিক্ষায় শিক্ষিত না হইলেও কথোপকথন-কালে স্বভাবতঃই বুঝিতে পারেন বটে, কিন্তু যথাযথ শিক্ষা না থাকিলে লিখিবার সময় যথোপযুক্ত অর্থে সঠিক ভাবে পদ-বিন্যাস করা সম্ভব নহে। কোন্ অর্থে কোন্ পদের কিরূপ বিন্যাস হইবে, তাহা স্থির করাও প্রকৃত ভাষা-তত্ত্বের অন্যতম উদ্দেশ্য। যে ভাষা-তত্ত্বের সহায়তায় কোন্ অর্থে কোন্ পদের কিরূপ বিন্যাস হইবে, তাহা স্থির করা যায় না, তাহাকে যুক্তিসঙ্গত ভাবে প্রকৃত ভাষা-তত্ত্ব বলা যায় না।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃত ভাষা-তত্ত্বের উদ্দেশ্য তিনটী, যথা :—

(১) বক্তার কথা কোন্ অর্থটীতে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা ঠিক ঠিক ভাবে নিরূপণ করিবার কৌশল নির্দ্ধারণ করা;

(২) এক প্রদেশস্থ মানুষ যাহাতে অন্য প্রদেশের মানুষের ভাষা এবং পশু-পক্ষী প্রভৃতি জীবের ভাষা বুঝিতে পারে, তাহার কৌশল নির্দ্ধারণ করা;

(৩) পদের বিভিন্ন বর্ণবিন্যাসানুসারে যে অর্থের বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে, তাহা নিরূপণ করিবার কৌশল নির্দ্ধারণ করা।

ইহা ছাড়া আরও দেখা গিয়াছে যে, প্রকৃত ভাষা-তত্ত্ব জানিতে হইলে নিম্নলিখিত তিনটী বিজ্ঞানের প্রয়োজন হয় :—

(১) মানুষ এবং অন্যান্য চরজীবের জিহ্বায় শব্দের উদ্ভব হয় কেন তাহার জ্ঞান, অর্থাৎ (ক) শব্দ-বিজ্ঞান, (খ) সম্পূর্ণ ও নির্ভুল শরীর গঠন বিজ্ঞান (Anatomy) এবং (গ) সম্পূর্ণ ও নির্ভুল শরীর-বিধান বিজ্ঞান (Physiolgy);

(২) কাল-বিজ্ঞান (Science of Time);

(৩) স্থান-বিজ্ঞান (Science of Space)।

এক্ষণে দেখা যাউক, বর্ত্তমান ভাষা-তত্ত্ব কতখানি সাফল্য লাভ করিয়াছে এবং তাহাকে প্রকৃত ভাষা-তত্ত্ব বলা যায় কি না।

বর্ত্তমান ভাষা-তত্ত্বের সাহায্যে ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মান প্রভৃতি কোন ভাষায় বক্তার কথা কোন্ অর্থটীতে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা ঠিক ঠিক নিরূপণ করা যায় না। তাহা যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে একই আইনের ধারার বিভিন্ন অর্থ করা ব্যবহারজীবীদিগের পক্ষে সম্ভব হইত না। এক সেক্সপীয়রের গ্রন্থাবলীর বিভিন্ন অংশের যে কত বিভিন্ন রকমের অর্থ করা সম্ভব হয়, তাহা কে অবিদিত আছেন? সেক্সপীয়র যে একার্থে ছাড়া বিভিন্নার্থে তাঁহার বক্তব্যসমূহ ব্যক্ত করেন নাই, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। যে ভাষা-তত্ত্বের দ্বারা বক্তার বক্তব্য সঠিক ভাবে নিরূপণ করিতে না পারিয়া কোন্ অর্থে বক্তা কথা কহিয়াছেন, তাহা অনুমান করিবার জন্য অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতে হয়, তাহা কি অদ্ভুত রকমের ভাষা-তত্ত্ব নহে?

পশু-পক্ষী প্রভৃতি অন্য জীবের ভাষা বুঝা ত' দূরের কথা, বর্ত্তমান ভাষা-তত্ত্বের সহায়তায় এক প্রদেশের মানুষের পক্ষে অন্য প্রদেশের মানুষের ভাষা পর্য্যন্ত বুঝা সম্ভব হয় না।

পদের বিভিন্ন বর্ণ-বিন্যাসানুসারে যে তাহার অর্থের কিরূপ বিভিন্নতা ঘটে, তাহা বুঝা ত' দূরের কথা, বর্ত্তমান ভাষাতত্ত্ব-বিদগণ, পদের বিভিন্ন বর্ণ-বিন্যাসানুসারে যে তাহার অর্থের বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে, তাহা পর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত নহেন। তাহা পরিজ্ঞাত নহেন বলিয়াই তাঁহারা বানান-সমস্যার পূরণ করিতে উদ্যত হন এবং এ বানান ভুল, ও বানান ঠিক ইত্যাদি হৈ-চৈ আরম্ভ করেন।

ইহাঁদের না আছে সম্পূর্ণ শব্দ-বিজ্ঞান, না আছে সম্পূর্ণ ও নির্ভুল শরীর-গঠন বিজ্ঞান এবং শরীর-বিধান বিজ্ঞান। কাল-বিজ্ঞান ও স্থান-বিজ্ঞান যে কি বস্তু এবং কাল ও স্থানবশতঃ মানুষের ভাষার যে কি পরিবর্ত্তন হয়, তাহা ইহাঁরা ঘুণাক্ষরেও আজ পর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই।

ইহাঁদের কোন আসল বিজ্ঞান নাই, অথচ ইহাঁরা বৈজ্ঞানিকের অভিনয় করিতে চাহেন। তাহার ফলে ইহাঁরা বৈঠক করিয়া একই কথার বিভিন্ন মনগড়া অর্থ স্থির

করিতেছেন এবং নূতন নূতন অভিধানের উদ্ভব হইতেছে। শব্দ যে অসংখ্য এবং আভিধানিক অর্থের দ্বারা শব্দার্থ ঠিক করিতে হইলে যে ভাষাজ্ঞান কখনও সম্পূর্ণ হইতে পারে না এবং তাহাতে যে মানুষে মানুষে মত-দ্বৈধ থাকিয়াই যাইবে, তাহা বুঝিবার সামর্থ্য ইঁহাদের নাই

এক প্রদেশের মানুষের পক্ষে অপর প্রদেশের মানুষের ভাষা কি করিয়া বুঝিয়া উঠা সম্ভব, তাহা ইঁহারা পরিজ্ঞাত নহেন বলিয়া সমস্ত প্রদেশের ও সমস্ত জগতের মানুষের ভাষা ইঁহারা এক করিতে চাহেন। ইঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, দুইটী প্রদেশের মানুষের ভাষা সর্ব্বতোভাবে এক হওয়া ত' দূরের কথা, একটী মানুষের ভাষাই তাহার সারা জীবনে প্রাকৃতিক কারণবশতঃ এক থাকে না।

এখন যদি বলি যে,বর্ত্তমান কালের ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ কতকগুলি বিকৃত মস্তিষ্কের দাম্ভিক মানুষ, তাহা হইলে কি তাহা অসঙ্গত হইবে ?

অন্যদিকে ভারতীয় ঋষির "অথর্ব্ব-বেদ" পড়িয়া দেখুন, তাহাতে শব্দ-বিজ্ঞান, শরীর-গঠন বিজ্ঞান, শরীর-বিধান বিজ্ঞান, কাল-বিজ্ঞান এবং স্থান-বিজ্ঞানের সমস্ত মূল সূত্রই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। "যোগ-সূত্র" পড়িয়া দেখুন। তাহাতে জীবিতাবস্থার শরীর-গঠন বিজ্ঞান ও শরীর-বিধান বিজ্ঞান কিরূপ ভাবে নির্দ্ধারিত করিতে হয়, তাহা যেমন লিপিবদ্ধ আছে, সেইরূপ আবার শরীরের গঠন ও বিধানানুসারে ভাষার কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তাহাও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। "পাণিনি" পড়িয়া দেখুন। তাহাতে সম্পূর্ণ শব্দ-বিজ্ঞান অতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। পাণিনি যথাযথ অর্থে বুঝিতে পারিলে ভাষাতত্ত্বের তিনটী উদ্দেশ্যই সফল হয়। একদিকে যেমন বক্তার কোন্ কথা কোন্ অর্থটীতে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা ঠিক ঠিক ভাবে নিরূপণ করা যায়, অন্যদিকে সেইরূপ বর্ণ-বিন্যাসের বিভিন্নতানুসারে পদের অর্থের কিরূপ বিভিন্নতা হয়, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। পাণিনির মর্ম্ম যথাযথভাবে অবগত হইতে পারিলে একদিকে যেমন বিভিন্ন প্রদেশের এবং সারা জগতের প্রাকৃত ভাষাগুলি যথাযথভাবে বুঝিতে পারা যায়, অন্যদিকে সেইরূপ পশু-পক্ষী প্রভৃতির ভাষাও বুঝা সম্ভব হয়। হয়ত কেহ কেহ মনে করিতেছেন যে,আমরা ঠাকুরমার গল্প বলিতেছি। ভবিষ্যৎ দেখাইবে যে, আমরা যাহা বলিতেছি তাহা ঠাকুরমার গল্প নহে; উহা বাস্তব সত্য। লেখকের স্বাস্থ্যে কুলাইবে কি না, অথবা তাহার পক্ষে নিরুদ্বিগ্নচিত্তে আরও চার পাঁচ বৎসর বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হইবে কি না, অথবা সে তাহার অভীষ্ট সম্পন্ন করিতে পারিবে কি না, তাহা দৃঢ়তার সহিত বলা যায় না বটে, কিন্তু কালের যে ভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে জগদম্বার কৃপায় কেহ না কেহ যে আগামী চার পাঁচ বৎসরের মধ্যে অথর্ব্ববেদ, যোগদর্শন, পাণিনি এবং বাক্যপদীয় সঠিক অর্থে প্রচার করিবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তখন মানুষ বুঝিবে যে, ভারতীয় ঋষি কি বস্তু ছিলেন এবং ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান কোন্ স্তরের। তখন আমাদের কথার সত্যতা নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হইবে

বর্ত্তমান কালের ভাষাতত্ত্ববিদ্ নামধারী বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষগুলি জগতের যত অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন, বোধ হয় আর কেহ তাহা করে নাই।

ইঁহারাই জগতের বিবিধ-বিষয়ক ইতিহাসকে বিকৃত করিয়া মানুষকে অন্ধকারে নিমগ্ন করিয়াছেন। গ্যালিলিও ও নিউটন যে বিজ্ঞানের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহা হয়ত মানুষের প্রকৃত হিতকারী বিজ্ঞানে পরিণত হইতে পারিত। কিন্তু ভাষাতত্ত্ববিদ্ নামধারী বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষগুলির কাল্পনিক সুমধুর কথার ফলে উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকগণ বিপথগামী হইয়া অভিমানগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সেই কারণেই তাঁহারা আর বিজ্ঞানের কোন প্রকৃত প্রগতি সাধন করিতে পারেন নাই। তাই গ্যালিলিও ও নিউটনের মত মনীষাসম্পন্ন সাধু ব্যক্তিগণের সাধনা আজ কুজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে এবং তাহা মানুষের কত অনিষ্ট সাধন করিতেছে, তাহা মানুষ বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না।

এই বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষগুলির কৃতকার্য্যের ফলে প্রকৃত শিক্ষা (education) ও আক্ষরিকতা (literacy) কাহাকে বলে, তাহা পর্য্যন্ত মানুষ এখন আর বুঝিতে পারে না। তাই যে শিক্ষা ও আক্ষরিকতা যথাযথ হইলে মানুষের পক্ষে দেবতুল্য হওয়া সম্ভব, তাহা বিশেষ সাবধানতার সহিত অর্জ্জন করিবার চেষ্টা করিয়াও অধুনা জগতের সর্ব্বত্র যুবকগণ প্রকৃত কার্য্যক্ষমতা পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে না। তাহারা বস্তুত পক্ষে শ্রমজীবীদিগের সহিত তুলনাতেও অক্ষম হইয়া পড়ে। ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রমজীবীদিগের মধ্যে যে কুণ্ঠা দেখা

যায়, আধুনিক শিক্ষিত মানুষের মধ্যে প্রায়শঃ সে কুণ্ঠা দেখা যায় না। স্ত্রীলোকের সহিত চালচলনে শ্রমজীবীদিগের মধ্যে যে সঙ্কোচ ও ন্যায়ানুগতা পরিলক্ষিত হয়, শিক্ষিত মানুষের মধ্যে এখন তাহা দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। স্ব স্ব পরিবারস্থ পরিজনের প্রতি শ্রমজীবিগণের যে দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, এখন আর সেই দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় প্রায়শঃ শিক্ষিত লোকের মধ্যে পাওয়া যায় না। শ্রমজীবিগণের পরস্পরের মধ্যে যে সখ্য ও আন্তরিকতার দৃষ্টান্ত সুলভ, শিক্ষিত মানুষগুলির মধ্যে এখন প্রায়শঃ তাহা দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। পাঁচটী শিক্ষিত মানুষ দ্বন্দ্ব-কলহহীন হইয়া আন্তরিক মিলনে মিলিত হইতে পারিয়াছেন, এখন আর এমন দৃষ্টান্ত প্রায়শঃ পাওয়া যাইবে না। শ্রমজীবিগণের মধ্যে যে স্বাস্থ্য ও পরমায়ু কিছুদিন আগেও দেখা যাইত, তাহা শিক্ষিত মানুষের মধ্যে প্রায়শঃ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শ্রমজীবিগণের যে উপার্জ্জন-ক্ষমতা আছে, শিক্ষিত মানুষের মধ্যে সে উপার্জ্জন-ক্ষমতা প্রায়শঃ দেখা যাইবে না।

পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা বড় বড় চাকুরীয়া, তাঁহারা হয়ত আমাদের এই কথায় হাস্য সংবরণ করিতে পারিবেন না। সর্ব্বত্র গবর্ণমেণ্টের যে যন্ত্র চলিতেছে, তাহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে অনেক টাকা রোজগার করা যায়, তাহা সত্য, কিন্তু তাহা কি কোন বিশেষ কার্য্যক্ষমতা অথবা উপার্জ্জনক্ষমতার পরিচায়ক? কোন প্রকৃত কার্য্যক্ষমতা অর্জ্জন না করিলে কি গবর্ণমেণ্টের চাকুরী পাওয়া যায় না? গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন চাকুরীয়াগণের যদি প্রকৃত কার্য্যক্ষমতাই থাকিত, এবং তাঁহারা যদি তাঁহাদের দায়িত্ব যথাযথ ভাবে নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে জগদ্ব্যাপী অশান্তি, মানুষের অন্নাভাব প্রভৃতির উদ্ভব হইতে পারিত কি? স্ব স্ব চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া লোকের মনোরঞ্জন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে হইলে কয়জন গবর্ণমেণ্টের চাকুরীয়া শ্রমজীবীদিগের মত উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা কেহ ভাবিয়া দেখিবেন কি?

ভাষা-তত্ত্ববিদ্ নামধারী বিকৃত মস্তিষ্কের এই মানুষগুলি শব্দ-বিজ্ঞান জানেন না বলিয়া প্রাকৃত ভাষার সহিত ভাষা-তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ভাষার কি প্রভেদ, তাহা বুঝিতে পারেন না। ইঁহারা বর্ত্তমান সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন, ইংরাজী ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মান প্রভৃতি ভাষাকে ভাষা-তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ইঁহাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, যে-ভাষা ভাষাতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার পদ ও বাক্যের অর্থ করিবার জন্য কোন অভিধান প্রয়োজন হয় না। প্রকৃত ভাষাতত্ত্বে এমন কৌশল আছে যে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই প্রত্যেক পদের এবং প্রত্যেক বাক্যের কি অর্থ, তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। ভাষাতত্ত্ব জানা থাকিলে বৈঠক করিয়া কোন্ পদের কি অর্থ হইবে, তাহা (অর্থাৎ, conventional meaning) স্থির করিতে হয় না। শব্দ-বিজ্ঞানের জ্ঞানবশতঃ প্রকৃত ভাষা-তত্ত্ববিদ্ সমস্ত ভাষার সমস্ত পদের যথাযথ অর্থ কোন অভিধানের বিনা সহায়তায় বুঝিতে সক্ষম হন। বর্ত্তমান জগতে যে কয়টী ভাষা প্রচলিত আছে, তাহাদের কোনটী প্রকৃত ভাষাতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে এবং তাহাদের কোনটীকে প্রকৃত প্রাকৃত ভাষাও বলা যায় না। ভাষাতত্ত্ববিদ্ নামধারী বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষগুলির কৃতকার্য্যের ফলে প্রত্যেক দেশে শিক্ষিত লোকের ভাষা বলিয়া যাহা প্রচলিত আছে, তাহা কিম্ভূত-কিমাকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই শিক্ষিত মানুষের মধ্যে এত চাতুরী, মিথ্যা কথা ও প্রবঞ্চনার বৃদ্ধি ঘটিতেছে।

প্রকৃত ভাষাতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ভাষা তিন রকমের বেশী হইতে পারে না। কেন তিন রকমের বেশী হইতে পারে না, তাহা লিখিতে হইলে অনেকখানি লিখিতে হইবে। এ প্রবন্ধে তাহা সম্ভব নহে।

ঐ তিন রকমের ভাষা প্রাচীন জগতে শিক্ষিত লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ঐ তিনটী ভাষার নাম হইয়াছিল সংস্কৃত, হিব্রু এবং আরবী। ঐ তিনটী ভাষা মানুষ ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে।

বর্ত্তমান কালের ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন যে, প্রাচীন কালে লিখন-প্রণালী ছিল না। "ব্রাহ্মী" অক্ষর বলিয়া একটা শব্দ তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন। কোথা হইতে তাঁহারা এই শব্দটী পাইয়াছেন, আমরা তাহা পরিজ্ঞাত নহি। প্রকৃত সংস্কৃতে "ব্রাহ্মী অক্ষর" বলিয়া কোন শব্দ হইতে পারে না। উহা দুষ্ট শব্দ। "দেবনাগর" শব্দটীর অর্থ যদি তাঁহারা যথাযথ ভাবে বুঝিতে পারিতেন, তাহা হইলে উপলব্ধি করিতে পারিতেন যে, ঐ শব্দটীর মধ্যেই লিখন-প্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত, তাহার বৈজ্ঞানিক তথ্য লিখিত

রহিয়াছে। ইহা ছাড়া অথর্ব্ব বেদ, পাণিনি ও বাক্যপদীয় যথাযথ অর্থে পড়িতে পারিলে দেখা যাইবে যে, লিখন-প্রণালী সম্বন্ধে যে-সমস্ত বিজ্ঞানসঙ্গত কথা ভারতীয় ঋষিগণ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তৎ সমতুল্য কোন কথা অদ্যাবধি কোন বর্ত্তমান বিজ্ঞানে আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহাঁরা কোন পুস্তক না পড়িয়া, এমন কি সংস্কৃত ভাষায় কি কি পুস্তক আছে, তাহার নাম পর্য্যন্ত অবগত হইবার চেষ্টা না করিয়া সংস্কৃত ভাষায় ইহা ছিল না, উহা ছিল না বলিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। ইহা অপেক্ষা প্রতারণার ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার অধিকতর পরিচয় আর কিছু হইতে পারে কি?

ইহাঁরা হয়ত বলিবেন যে, অথর্ব্ব বেদ ও পাণিনি তাঁহারা পড়িয়াছেন। প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে তাহাতে ভাষাতত্ত্বের কোন কথা পাওয়া যায় না। কিন্তু ঐ প্রচলিত ব্যাখ্যা যে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না, তাহা কি একটু সাধারণ বুদ্ধি দ্বারা চিন্তা করিলে বুঝা যায় না? প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে ঐ গ্রন্থগুলি যে রূপ অসার হইয়া পড়ে, সেগুলি যদি বাস্তবিক পক্ষে অত অসারই হইত, তাহা হইলে স্মরণাতীত কাল হইতে মানুষ তাহা বহন করিয়া আসিত কি? অসার পুস্তকের একাধিক সংস্করণ হয় কি? তাহার পর, যে ভারতীয় ঋষিগণের কার্য্যকলাপের ফলে ভারতে অনন্যসাধারণ আর্থিক স্বাধীনতা সাধিত হইয়াছিল, সেই ভারতীয় ঋষিগণের মুখ হইতে ঐ শ্রেণীর অসার কথা নির্গত হওয়া সম্ভব কি? ইহা হইতে কি বুঝিতে হইবে না যে, বর্ত্তমান ভাষাতত্ত্ববিদ্গণ সাধারণ বুদ্ধি (common sense) বিবর্জ্জিত?

উপসংহারে আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণকে বানান-সমস্যা লইয়া হৈ-চৈ হইতে বিরত হইবার জন্য এবং বহু ব্যয়সাপেক্ষ ভাষাতত্ত্ব বিভাগটী উঠাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। এখনও যদি তাঁহারা সুপরামর্শ শুনিয়া তদনুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের সম্মান বজায় রাখিবার সম্ভাবনা থাকিবে

কংগ্রেসের বিষয়-নির্ব্বাচনী সভার কার্য্যাবলী

মিঃ বুলাভাই দেশাই তাঁহার একটী বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, ভারতীয় কৃষকদিগের দারিদ্র্য, ঋণ এবং বেকার অবস্থার মূল কারণ প্রাচীন ধরণের প্রজা-সত্ত্ব ও কর-স্থাপন বিধি। প্রাচীন ধরণের এই প্রজাসত্ত্ব ও কর-স্থাপন বিধি আর তাহার সঙ্গে ইংরাজের শোষণ অপসারিত করিতে পারিলেই তাঁহার মতে কৃষকদিগের দুঃখ দূর হইবে। অবশ্য প্রজা-সত্ত্ব অথবা কর-স্থাপনের বিধি কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা তিনি বলেন নাই।

আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, প্রজাগণকে যদি বিনা করেও কায়েমী সত্ত্বে জমী ভোগ-দখল করিতে দেওয়া হয়, আর সেই জমী হইতে যদি প্রচুর ফসল না হয়, তাহা হইলে কি প্রজাগণ তাহা চাষবাস করিয়া নিজ নিজ অভাব পূরণ করিতে পারিবে?

যতদিন জমী হইতে প্রচুর ফসল পাওয়া যাইত, ততদিন প্রজার কোন ঋণ হইয়াছিল কি এবং তাহাদের মুখে তাহাদের সত্ত্ব অথবা খাজনার হার সম্বন্ধে কোন বিরক্তি-প্রকাশক কথা শুনা যাইত কি?

একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই কি বুঝা যায় না যে, যত গোলমাল প্রতি বিঘার জমীর ফসল কমিয়াছে বলিয়া? যতদিন ঐ ফসলের হার বৃদ্ধি করা সম্ভব না হইবে, ততদিন কৃষকগণকে আর কোন উপায়ে শান্ত করা যাইবে না। মস্তিষ্কশক্তিকে একটু ব্যবহার করিয়া আসল ব্যাধি নির্ণয় করিতে না পারিলে কেবল ঝগড়াঝাটি এবং রেশারেশির উদ্ভব হইবে ছাড়া আর কোন ফলোদয় হইবে কি?

মিঃ দেশাই এর মতে ভারতবর্ষে কৃষিজাত এবং শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা যদি চারিগুণ অথবা পাঁচগুণও বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে তাহা উৎপন্ন করা মোটেই কষ্টসাধ্য নহে।

কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপত্তি লাভজনকভাবে চারিগুণ বৃদ্ধি করা কিরূপ ভাবে সম্ভব, তাহা মিঃ দেশাই দেশবাসীকে জানাইয়া দিবেন কি? যদি চার পাঁচগুণ কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন করাই সম্ভব হয়, তাহা হইলে এখন যাহা উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা কৃষক লাভবান্ হইতে পারে না কেন? যাহাদের জিহ্বায়

লাগাম নাই, সেই সব পণ্ডিতদের কাছে হার স্বীকার করা ছাড়া আর কোন উপায় আছে কি?

মদনমোহন মালব্য বড় দুঃখের সহিত বলিয়াছেন যে, পঞ্চাশ বৎসর আগে বাধ্যতামূলক শিক্ষা, কৃষকগণের শিক্ষা এবং ব্যাঙ্কের প্রসার প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে কংগ্রেসে আলোচনা হইত। কিন্তু এখন আর তাহা হয় না; এখন কেবল স্বাধীনতার নিশান উড়াইবার জন্যই সকলে ব্যস্ত।

আমরা অবশ্য স্বাধীনতার নিশান উড়াইবার পক্ষপাতী নহি। কিন্তু তাই বলিয়া মালব্যজীর কথায়ও সায় দেওয়া যায় না। যদি বাধ্যতামূলক শিক্ষা অথবা কৃষকগণের শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলেই দেশের দুর্দ্দশার মোচন হয়, তাহা হইলে যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষিত হইয়া বাহির হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এত হাহাকার কেন? ব্যাঙ্কের প্রসার করিতে পারিলেই যদি আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে দেশীয় মহাজনদিগের মধ্যে দুরবস্থার উদ্ভব হয় কেন? আর যে-সব ব্যাঙ্কগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশ নষ্টই বা হইল কেন? যেগুলি এখনও আছে, তাহাদেরই বা শ্রীবৃদ্ধি নাই কেন?

আমরা মালব্যজীকে বলি যে, বর্ত্তমান সময়ে দেশ যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে আর ভাসা-ভাসা কথা কহিলে চলিবে না, একটু ডুব দিয়া তলাইয়া দেখিতে হইবে।

'উদার কৃষ্টি' এবং অধ্যক্ষ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ

সম্প্রতি অধ্যাপক-সম্মেলনে অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। ঐ বক্তৃতাটীতে অনেক চিন্তার কথা আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্যে যে এতাদৃশ চিন্তাশীল অধ্যক্ষ এখনও বিদ্যমান আছেন, তাহা আমাদের জানা ছিল না।

অধ্যক্ষ ঘোষ মহাশয় শিক্ষকদিগের ত্রুটী ও দায়িত্ব সম্বন্ধে যে-সমস্ত কথা প্রচার করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেকের প্রণিধানযোগ্য।

তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বুঝিতে হয় যে, ছাত্রগণ যাহাতে অন্ন-সংস্থান করিতে পারে, তদুপযোগী শিক্ষাও যেমন প্রয়োজন, সেইরূপ আবার তাহারা যাহাতে 'উদার কৃষ্টি' (liberal culture) লাভ করিতে পারে, তদ্বিষয়েও লক্ষ্য রাখা বিধেয়। আজকাল শিক্ষায় যে 'উদার কৃষ্টি'র দিকে লক্ষ্য রাখা হয় না, তাহার জন্য শিক্ষক ও ছাত্রগণ সমান ভাবে দায়ী—ইহা অধ্যক্ষ ঘোষের অভিমত।

'কৃষ্টি' অথবা 'উদার কৃষ্টি' বলিতে অধ্যক্ষ ঘোষ মহাশয় কি বুঝিয়া থাকেন, আমরা তাহা পরিজ্ঞাত নহি। 'কৃষ্টি'র কোন 'উদারতা' আছে, ইহা স্বীকার করিয়া লইলে তাহার অনুদারতার কথাও মনে উপস্থিত হয়। 'অনুদার কৃষ্টি' বলিয়া কোন কথা হইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে।

'কৃষ্টি' বলিতে কি বুঝায়, তাহার যথাযথ ধারণা থাকিলে, আধুনিক শিক্ষা দ্বারা ছাত্রগণ যে তাহা লাভ করিতে পারে না, তজ্জন্য আমাদের মতে ছাত্রগণকে অথবা শিক্ষকগণকে দায়ী করা যায় না। তজ্জন্য যদি কাহারও উপর দায়িত্ব আরোপিত করিতে হয়, তাহা হইলে উহা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ও টেক্সট্-বুক কমিটির উপর।

প্রকৃত ভাষা-বিজ্ঞানানুসারে 'কৃষ্টি' বলিতে বুঝায় সেই কার্য্য অথবা সাধনা, যদ্দ্বারা প্রথমতঃ মানুষের প্রকৃতি কি বস্তু, দ্বিতীয়তঃ মানুষের প্রকৃতিতে কেন 'অশান্ত রাজসিকতা' অর্থাৎ দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার উদ্ভব হয়, তাহা জানিতে পারা যায় এবং তৃতীয়তঃ কি করিলে মনুষ্য-প্রকৃতির অশান্ত রাজসিকতার প্রশান্তি সাধন করা অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষাগুলিকে সংযত করা সম্ভব হয়, তাহা শিক্ষা করা যায়।

কাযেই কৃষ্টি লাভ করিবার উপযোগী শিক্ষা দান করিতে হইলে নিম্নলিখিত গ্রন্থ-সমূহের প্রয়োজন হয়:—

(১) প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার পুস্তক;

(২) প্রকৃতিবশতঃ মানুষের কেন দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা সমূহের উদ্ভব হয়, তৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার পুস্তক;

(৩) দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষাসমূহকে কি করিয়া সংযত করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার পুস্তক।

সমগ্র পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুসন্ধান করিলেও ঐ তিন শ্রেণীর পুস্তকের মধ্যে কোন শ্রেণীরই পুস্তক পাওয়া যাইবে না। উহা পাওয়া যাইবে একমাত্র সংস্কৃত ভাষায় এবং তাহা প্রণীত হইয়াছে ভারতীয় ঋষিগণের দ্বারা।

যতদিন পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় উহার সঙ্কলনে অবহিত না হন, ততদিন পর্য্যন্ত শিক্ষক ও ছাত্রদিগকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় কি?

ভারতীয় কৃষ্টি-সম্মেলন

সম্প্রতি ভারতীয় কৃষ্টি-সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ঐ সম্মেলনের যে যে বক্তৃতার সারাংশ সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ডক্টর ভাণ্ডারকর ও শ্রীযুক্ত বনমালী বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের বক্তৃতা উল্লেখযোগ্য।

এই ভারতীয় কৃষ্টি-সম্মেলনের বক্তৃতাগুলি পাঠ করিলে প্রায়শঃ হতাশ্বাস হইতে হয় এবং দুই একটী বক্তৃতা ছাড়া আর সমস্ত বক্তৃতা পড়িলে সম্মেলনটীকে পাশ্চাত্ত্য কৃষ্টি-সম্মেলন না বলিয়া ভারতীয় কৃষ্টি-সম্মেলন বলা হইল কেন, তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন জাগ্রত হয়। পরিণত বয়স ও পরিণত বুদ্ধি প্রাপ্ত না হইলে প্রায়শঃ গবেষণা করা সম্ভব হয় না। অথচ এই সম্মেলনে এমন অনেক বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছে, যাহা অপরিণত বয়স ও অপরিণত বুদ্ধির পরিচায়ক। পরিণামে যাহাতে কোন অপরিণত বয়স ও অপরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের গবেষণা এই জাতীয় সম্মেলনে স্থান না পায়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য আমরা কর্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করি। নতুবা ইহা মাত্র একটা তামাসায় পরিণত হইবে এবং ইহা দ্বারা ভারতবাসীর উপকার অপেক্ষা অপকার সাধিত হইবার সম্ভাবনা আছে।

ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের বক্তৃতা

ডক্টর শীলের বক্তৃতার নিম্নলিখিত কথা কয়টী উল্লেখ-যোগ্য :—

(১) কৃষ্টির সংজ্ঞাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, কৃষ্টি দর্শনও নহে, বিজ্ঞানও নহে। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক প্রভৃতি মানবীয় কর্ম্মতৎপরতার যে সমস্ত বিভিন্ন ভাগ আছে, তাহার বিজ্ঞান ও দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত জীবনের মূল্যের সহিত কৃষ্টি আপনা হইতেই সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে।

(Culture is neither Science nor Philosophy, but concerns itself with the values of life, founded on Science and Philosophy in the multifarious departments of human activity, social, economic and political.)

(পাঠক লক্ষ্য করিবেন, উপরের অনুবাদ অক্ষরে অক্ষরে করা হইয়াছে।)

(২) ভারতীয় কৃষ্টি জগতের কৃষ্টির একটী শাখা মাত্র। জগতের ইতিহাস এবং ক্রমোন্নতি হইতে ইহার মূল বিচ্ছিন্ন হইলে ইহার অস্তিত্ব ও বৃদ্ধি বজায় রাখা সম্ভব নহে।

ডক্টর শীলের কোন কথার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে হইলে আমরা সঙ্কোচ বোধ করি, কারণ তিনি আমাদের সকলের বরেণ্য। বর্ত্তমানে চারিদিকে আমাদিগের বিপদ যেরূপ জটিল হইয়া আসিতেছে, তাহাতে যাঁহারা আমাদের বরেণ্য, তাঁহারা যদি তাঁহাদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়া আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করিবার সময় সতর্কতা অবলম্বন না করেন, তাহা হইলে যাঁহারা নিজেদের অপরিণত অভিজ্ঞ-তার জন্য কর্ত্তব্যনির্দ্দেশ পাইবার আশায় সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদিগের মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের বিপথ-গামী হইবার আশঙ্কা আছে এবং তাহাতে সমগ্র সমাজ বিপন্ন হইতে পারে। ডক্টর শীলের বক্তৃতায় দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় আছে। কাযেই কর্ত্তব্যের খাতিরে আমরা তাহা পাঠকবর্গকে দেখাইয়া দিতে বাধ্য।

কৃষ্টির সংজ্ঞা কি তাহার আলোচনাপ্রসঙ্গে তাহা কোন্ কার্য্য, অথবা কোন্ দ্রব্য, অথবা কোন্ গুণ, তাহা না বলিয়া

যদি বলা হয় যে, তাহা দর্শনও নহে, বিজ্ঞানও নহে, কিন্তু তাহা মনুষ্য-জীবনের কর্ম্মতৎপরতার কোন বিভাগীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত জীবনের মূল্যের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহা হইলে কৃষ্টি বলিতে কি বুঝিতে হইবে, তাহা পরিষ্কার-ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায় কি ?

ইহা হইতে কি বুঝিতে হয় না যে, বক্তা তাঁহার শ্রোতা-দিগকে কৃষ্টির ধারণা সম্বন্ধে যেরূপ অন্ধকারে নিক্ষেপ করিয়াছেন, বিজ্ঞান ও দর্শনের ধারণা সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেছেন ?

কোন জীবনের মূল্যের সহিত কৃষ্টি যদি 'আপনা হইতেই সংশ্লিষ্ট হয়', তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান লাভ করিবার প্রয়োজন কি ? যাহা আপনা হইতে আসে, তাহা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিলেও আসিবে, চেষ্টা না করিলেও আসিবে।

ডক্টর শীলের কথার অর্থ যদি এইরূপ হয় যে, নিজ জীবনের কার্য্যে যিনি বিজ্ঞান ও দর্শন-জ্ঞানের যতটুকু উন্নতি সাধন করিতে পারেন, তাঁহার ততটুকু কৃষ্টি লাভ হইয়াছে বুঝিতে হইবে, তাহা হইলেও কি কৃষ্টির কোন পরিষ্কার সংজ্ঞা দেওয়া হইল, ইহা বলা যায় ? বিজ্ঞান ও দর্শনের জ্ঞান কতটুকু লাভ করা হইয়াছে, তাহা পরিমাপ করিবার উপায় কি, তৎসম্বন্ধে পরিষ্কার করিয়া বলিবার প্রয়োজন হয় না কি ?

যে-ভাষায় সংজ্ঞা প্রস্তুত করিলে তাহা শ্রোতাদিগের পক্ষে বুঝা কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য হয়, অথবা যে ভাবে কথা কহিলে তাহা বিভিন্ন বিভিন্ন রকমে ব্যাখ্যাত হইতে পারে, সেই ভাষায় অথবা সেই ভাবে কথা কওয়ার নাম হেঁয়ালির আশ্রয় লওয়া নহে কি ? তাদৃশ ভাষা অথবা তাদৃশ ভাবে কথা কওয়া কি শাস্ত্রবিষয়ক আলোচনায় পরোক্ষভাবে প্রতারণার পরিচায়ক নহে ?

"অমুক বড়লোক এত বিদ্বান এবং এত উচ্চদরের কথা বলিয়াছেন যে, তাঁহার কথা কাহারও পক্ষে বুঝা সম্ভব নহে" —এই ভাব অধুনা আমাদিগকে গ্রাস করিয়াছে বটে, কিন্তু চির দিন তাহা ছিল না। যেদিন হইতে এতাদৃশ ভাব সমাজকে আচ্ছন্ন করিয়া বসিয়াছে, সেইদিন হইতে আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পতন আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহার কথা বুঝিতে পারা যায় না, তিনি যদি বিদ্বান ও জ্ঞানী হন, তাহা হইলে যাহারা পাগল, তাহাদিগকেও বিদ্বান ও জ্ঞানী আখ্যাত করা হইবে না কেন ? যে কথা মানুষের পক্ষে বুঝা অসাধ্য, তাহা লোক-সমাজে প্রকাশ করিবার কি প্রয়োজন আছে ?

দুরূহ কথা যাহাতে সহজবোধ্য হয়, তাহা করাই কি বিদ্বানের কর্ত্তব্য নহে ? আর সহজ কথা দুরূহ করিয়া তুলিলে কি প্রকৃত পণ্ডিতের কর্ত্তব্যের বিরুদ্ধ কার্য্য করা হয় না ?

"কৃষ্টি" শব্দের সংজ্ঞা ত' এত দুরূহ নহে। বক্তা যখন যে ভাবাপন্ন হইলে তাহার মুখ হইতে বিভিন্ন শব্দ নির্গত হয়, সেই ভাব কি করিয়া নির্দ্ধারণ করিতে হয়, তাহা স্থির করিবার যে-পদ্ধতি ভারতীয় ঋষিগণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তদনুসারে

বলিতে বুঝায় সেই কার্য্য অথবা সাধনা, যদ্দ্বারা মনুষ্য-প্রকৃতিতে কি উপায়ে অশান্ত রাজসিকতার সৃষ্টি হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায় এবং অশান্ত রাজসিকতা প্রশান্ত করা যায়।

বাস্তব জগতের দিকে চাহিলে দেখা যাইবে যে, মানুষ যত কিছু ক্লেশ ভোগ করে, তাহার প্রধান কারণ তাহার প্রবৃত্তির অথবা আকাঙ্ক্ষার মাত্রাধিক্য। যখন যে কার্য্য অথবা দ্রব্য তাহার ভাল লাগে, তাহা যে কতখানি করিলে অথবা পাইলে তাহার সন্তুষ্টি হয়, তাহা সে বুঝিতে পারে না। প্রবৃত্তির অথবা আকাঙ্ক্ষার মাত্রাধিক্যের নাম "অশান্ত রাজসিকতা"। আর তাহার 'সংযততা'র নাম "প্রশান্ত "রাজসিকতা।"

ঋষিগণের উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসারে ল্যাটিন "কালটুরা" শব্দটিরও ঠিক ঐ একই অর্থের উদ্ভব হয়।

কৃষ্টি লাভ করিতে হইলে দর্শন ও বিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু দর্শন ও বিজ্ঞান পড়িলেই কৃষ্টি লাভ করা হইল, ইহা বলা চলে না। দর্শন ও বিজ্ঞানের সহস্র সহস্র পৃষ্ঠা উল্টাইয়াও যদি মানুষ হিংস্র পশুর মত হিংসা-পরায়ণ অথবা কামোন্মত্ত থাকিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে কৃষ্টিযুক্ত (cultured) বলা যায় কি ?

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, ডক্টর শীলের অপর উক্তিটীও যুক্তিযুক্ত নহে। ভারতীয় কৃষ্টি যে জগতের কৃষ্টির একটী শাখা, তাহা কোন দেশের কোন প্রাচীন গ্রন্থ হইতে তিনি প্রমাণ

করিতে পারেন কি ? জগতে যত কিছু প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে ভারতীয় বেদ, তন্ত্র, উপনিষদ, দর্শন, পুরাণ, সংহিতা যে কবে রচিত হইয়াছিল, তাহা এখনও কেহ সঠিক ভাবে নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

এই কয়খানি গ্রন্থ ছাড়া আর যে-সমস্ত প্রাচীন পুস্তক পাওয়া যায়, তাহার সমস্তই গত আড়াই হাজার বৎসরের মধ্যে রচিত বলিয়া প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। কোরাণ ও ওল্ড টেষ্টামেণ্ট যে কোন্ দেশে কাহার দ্বারা রচিত হইয়াছিল, তাহা এখনও কেহ স্থির করিতে পারেন নাই। মুসলমান ও খ্রীষ্টানদিগের ধারণা যে ঐ দুইখানি ধর্ম্মগ্রন্থের রচয়িতা স্বয়ং ঈশ্বর।

ভারতীয় কৃষ্টি যদি জগতের কৃষ্টির একটী শাখা হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ভারতবর্ষে যখন বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি সাধিত হইতেছিল, তখন জগতের অন্যান্য দেশেও তাহার চর্চ্চা ছিল। জগতের অন্যান্য দেশের উন্নতি যদি ভারতবর্ষের সমসাময়িক হয়, তাহা হইলে অন্য কোন দেশে বেদাদির মত প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া যায় না কেন ?

আমাদের বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত "বেদ ও মহাভারতের সম্বন্ধ" ইত্যাদি শীর্ষক সন্দর্ভে ভারতীয় ঋষিদিগের জ্ঞান-বিজ্ঞান যে কত সম্পূর্ণ এবং উচ্চাঙ্গের ছিল, তাহা দেখান হইয়াছে। ঐ সমস্ত গ্রন্থ যথাযথ অর্থে পড়িতে পারিলে জানা যাইবে যে, ভারতীয় ঋষি চিরদিন জগতের শিক্ষকতাই করিয়াছেন। তাঁহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান অপর কাহারও নিকট হইতে ধার করিয়া লওয়া হয় নাই এবং তাহা কাহারও অনুকরণেও প্রস্তুত হয় নাই। যেদিন হইতে ভারতবাসী তাঁহাদের ঋষির প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্মৃত হইয়াছেন, সেইদিন হইতে তাঁহাদের পতন আরম্ভ হইয়াছে এবং সেই দিন হইতে তাঁহারা অপরের অনুকরণপ্রিয় হইয়াছেন। যতদিন ভারতীয় ঋষির জ্ঞান-বিজ্ঞান জাজ্বল্যমান ছিল, ততদিন জগতের অপর সমস্ত দেশের মানুষও সমুন্নত ছিলেন। ভারতীয় ঋষির জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেশের মানুষও অবনত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা কোন দিন সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সন্ধান পান নাই। ইয়োরোপীয়দিগের বর্ত্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখাটী যে কত ভ্রান্তি-পরিপূর্ণ, তাহা আমরা এই 'বঙ্গশ্রী'তে বহুবার প্রমাণিত করিয়াছি এবং আমাদের মনে হয় যে, জনসাধারণও তাহা অচিরে বুঝিতে পারিবেন।

কাযেই ভারতীয় কৃষ্টিকে জগতের কৃষ্টির একটী শাখা বলা যায় না

ভারতীয় কৃষ্টি জগতের কৃষ্টির একটী শাখা কি না, তৎসম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে, একদিকে যেমন জগতের অন্যান্য দেশের সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থ তন্ন-তন্নভাবে অধ্যয়ন করিবার প্রয়োজন হয়, অন্যদিকে সেইরূপ আবার ভারতীয় ঋষির বেদাদি গ্রন্থও তন্ন-তন্ন করিয়া অধ্যয়ন করিতে হয়। ভারতীয় ঋষির বেদাদি মূল গ্রন্থের মধ্যে কি আছে, তাহা জানিবার সুযোগ ডক্টর শীলের হইয়াছে কি ? বেদাদি মূল গ্রন্থে কি আছে, তাহা যদি তাঁহার বিন্দুমাত্রও জানা থাকিত, তাহা হইলে তিনি কখনও ঐ জাতীয় উক্তি করিতে পারিতেন না। ইহা কি দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতার পরিচয় নহে ? ইহার পর বলিতে ইচ্ছা করে যে, "বল মা তারা দাঁড়াই কোথা" ?

ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের বক্তৃতা

ডক্টর দাশগুপ্তের এই বক্তৃতাটী মোটামুটি প্রশংসার যোগ্য, কারণ তাহাতে আত্ম-সম্মানজ্ঞানের পরিচয় আছে। বৈদিক যুগে ভারত যে কত উন্নত ছিল, তাহার একটী চিত্র অঙ্কিত করিবার চেষ্টা তিনি করিয়াছেন। ভারতীয় ঋষির বেদাদি গ্রন্থের মূলাংশ যদি তাঁহার যথাযথ ভাবে জানা থাকিত, তাহা হইলে ঐ চিত্র আরও পরিস্ফুট হইত এবং তাহা হইলে মহেঞ্জোদাড়োর নিদর্শন ও লিপি দেখাইয়া ভারতীয়গণের যে গৃহ-নির্ম্মাণ প্রণালী ও লিখন-প্রণালী জানা ছিল, তাহা প্রমাণিত করিতে হইত না। অথর্ব্ববেদ, নিরুক্ত এবং বিবিধ সংহিতা হইতেই তিনি প্রমাণিত করিতে পারিতেন যে, ভারতীয় ঋষিগণের স্বাস্থ্য ও আরামপ্রদ গৃহ-নির্ম্মাণ-প্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞান বর্ত্তমান এঞ্জিয়ানিয়ারদিগের তুলনায় অনেক বেশী ছিল এবং দেখাইয়া দিতে পারিতেন যে, বর্ত্তমান কালে যে যে গৃহ-নির্ম্মাণ প্রণালী প্রচলিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটী অস্বাস্থ্যকর এবং অদূরদর্শিতার পরিচায়ক।

অথর্ব্ববেদ, যোগসূত্র ও পাণিনি যথাযথ অর্থে জানা

থাকিলে তিনি দেখাইতে পারিতেন যে, সংস্কৃতে দেবনাগর অক্ষর বলিয়া যে লিখন-প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহা ঋষিগণ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন এবং তত্তুল্য বৈজ্ঞানিক লিখন-প্রণালী প্রাচীন হিব্রু ও প্রাচীন আরবী ছাড়া আর কোন ভাষায় নাই। ইহা ছাড়া আরও দেখাইতে পারিতেন যে, প্রাচীন হিব্রু এবং প্রাচীন আরবীর লিখন-প্রণালীও ভারতীয় ঋষিগণই প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

এই বক্তৃতায়ও ডক্টর দাশগুপ্ত একটী শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা কহিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বৈদিক যুগেও শব-ব্যবচ্ছেদ প্রথা ছিল। এই কথা মোটেই সত্য নহে। তিনি ভারতীয় ঋষির কোন কথা হইতে তাঁহার কথার সত্যতা প্রমাণ করিতে পারেন কি? আমরা তাঁহাকে ঐ জাতীয় অসত্য কথা হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করি। শব-ব্যবচ্ছেদের দ্বারা যে জীবিত মানুষের শরীর-গঠন বিদ্যা ও শরীর-বিধান বিদ্যা যথাযথ ভাবে জানা যায় না, তাহা আমরা এই 'বঙ্গশ্রী'তে অনেকবার অনেক প্রসঙ্গে প্রমাণিত করিয়াছি। ভারতীয় ঋষিগণ ঐ ভ্রান্ত পন্থা কোন দিন অবলম্বন করেন নাই। তাঁহারা কি পদ্ধতিতে জীবের শরীর-গঠন (Anatomy) ও শরীর-বিধান (Physiology) পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন, তাহা আমাদের এই সংখ্যায় প্রকাশিত "বেদ ও মহাভারতের সম্বন্ধ" ইত্যাদি শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলে জানা যাইবে।

ডক্টর দাশগুপ্ত তাঁহার বক্তৃতায় আরও বলিয়াছেন যে, বৌদ্ধ বিশ্বকোষ, উদ্ভিজ্জবিদ্যা বেদাঙ্গ ও জ্যোতিষ-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা তাঁহাদের আছে।

মানুষের প্রকৃত হিতসাধনার্থে গ্রন্থ-প্রচারের প্রয়োজন এবং কোন গ্রন্থ প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানমূলক না হইলে তাহা মানুষের যথেষ্ট অপকার সাধন করিতে পারে—এই দুইটী সত্য মানিয়া লইলে, যতদিন পর্য্যন্ত প্রকৃত সংস্কৃত ভাষার উদ্ধার না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সংস্কৃত ভাষার কোন গ্রন্থ প্রচারিত হওয়া উচিত নহে। প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা যে মানুষ বিস্মৃত হইয়াছে এবং তাহারই ফলে যে ভারতীয় ঋষিদিগের বেদাদি গ্রন্থ বিকৃতার্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা আমরা ইতি-পূর্ব্বে অনেক প্রসঙ্গে প্রমাণিত করিয়াছি। প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা নষ্ট হওয়া অবধি যে যে গ্রন্থ পরবর্ত্তী সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত হইয়াছে তাহা ভারতবর্ষের অপকার সাধন করিয়াছে এবং তাহারই ফলে আজ ভারতবাসী পরাধীন এবং অপরের নিকট হইতে বিকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান ধার করিয়া আনিতে বাধ্য হইতেছে। কোন বুদ্ধিমান্ ও দেশহিতৈষী লোকের আর তাহা করা সঙ্গত কি?

ডক্টর ভাণ্ডারকরের বক্তৃতা

এই বক্তৃতায় অনেক বড় বড় কথা আছে বটে, কিন্তু তাহা প্রায়শঃ অসংলগ্ন। ডক্টর ভাণ্ডারকরের লিখিত এক এক-খানি পুস্তকে স্থানে স্থানে যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আছে, তাহা স্মরণ করিলে এই বক্তৃতাটী তাঁহার নিজস্ব কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হয়। আমরা ইহার সমালোচনা করিব না।

শ্রীযুক্ত বনমালী বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের বক্তৃতা

বেদান্ততীর্থ মহাশয় বলিয়াছেন যে,

(১) আমাদিগকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতামতের উপর নির্ভর না করিয়া নিজদিগকেই **গভীর ভাবে বেদের অনুশীলন** করিতে হইবে।

বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের কথা অতীব সমীচীন। **বেদের অনুশীলন** অর্থাৎ আগম অভ্যাস যখন দেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িবে, তখন যে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবার সারা জগৎকে অধিকার করিয়া বসিবার সম্ভাবনা ঘটিবে, তাহা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে বলা যাইতে পারে। বেদের অভ্যাস পরি-ত্যক্ত হইয়া যেদিন হইতে মানুষ বেদ-বাদরত হইয়াছিল, সেই দিন হইতে জগতের পতন আরম্ভ হইয়াছে এবং ক্রমশঃ সারা জগতে অন্নাভাব পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছে। ব্যাসদেব অতি পরিষ্কার ভাষায় গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪২, ৪৩ এবং ৪৪ শ্লোকে মানুষ যাহাতে বেদ-বাদরত না হয় তাহার উপদেশ দিয়াছেন। অথচ মানুষ এখন আর বেদাভ্যাসে প্রবৃত্ত না হইয়া বেদ-বাদ লইয়াই ব্যস্ত থাকে। এমন কি সায়নাচার্য্য পর্য্যন্ত ভাষ্য রচনা করিয়া মানুষের বেদ-বাদচর্চ্চার সহায়তা করিয়াছেন। মানুষ এখন আর বেদাভ্যাস করে না বলিয়া প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে না এবং তাহার ফলে বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য গ্রন্থও যথাযথ ভাবে বুঝা

মানুষের পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। কবে দেশের লোক বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের কথা শুনিবে?

অন্যান্য বক্তৃতাসমূহ প্রায়শঃ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা ক্ষেত্রে বালকোচিত এবং অধিকাংশই সাহেবদিগের শেখান টীয়াপাখীর বুলির মত। একজন বলিতেছেন যে, বর্ত্তমানে যে সমস্ত ঋগ্বেদের সংস্করণ আছে, তাহার কোনটীতে সঠিক ভাবে পদগুলির ব্যবচ্ছেদ নাই। কি হইলে বেদান্তর্গত পদব্যবচ্ছেদ সঠিক হয়, তাহা জানা থাকিলে এবং তাঁহাদের মত পণ্ডিতগণ বেদের যে সমস্ত সংস্করণ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা বুঝিবার ক্ষমতা থাকিলে, আ-গমাভাস না করিয়া কাহারও বেদের নূতন সংস্করণ প্রস্তুত করিবার প্রবৃত্তি হইতে পারে না।

আর একটী পণ্ডিত বলিতেছেন যে, সংস্কৃত পুঁথিসমূহের কোন্ খানির কি প্রতিপাদ্য, তাহা স্থির করিয়া একটী বিষয়-সূচী প্রস্তুত করিতে হইবে বর্ত্তমান সময়ে সংস্কৃত গ্রন্থের যে সমস্ত সূচী আছে, তাহা কতদূর বিভ্রান্তিকর, তাহা ইহাঁরা জানেন না। প্রকৃত সংস্কৃত ভাষাবিস্মৃতির ফলে প্রাচীন কোন্ গ্রন্থের কি বক্তব্য, তাহা ইহাঁরা প্রায়শঃ বুঝিতে পারেন না। ফলে ইহাঁরা ব্যাকরণের গ্রন্থকে কখনও বেদান্তের গ্রন্থ, কখনও নাটকের গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। বেদান্তের কত 'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে' যে ইহাঁরা চাপাইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। গ্রন্থসূচী প্রস্তুত করিবার কল্পনা ইয়োরোপীয়-গণের নিকট হইতে কর্জ্জ করা। ইহাঁরা জানেন না যে, ইয়োরোপীয়গণের জ্ঞান-বিজ্ঞান বিশৃঙ্খলাময়।

যাহা আপাতদৃষ্টিতে বিশৃঙ্খল, তাহার মধ্যে কি শৃঙ্খলা আছে, তাহা নির্ণয় করা এবং তাহা যথাসম্ভব সংক্ষেপে ব্যক্ত করা শৃঙ্খলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। প্রকৃত পক্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিশৃঙ্খলা প্রাপ্ত হইলে যাহা প্রকৃত পক্ষে শৃঙ্খলিত এবং সংক্ষিপ্ত, তাহা যেন সম্বন্ধহীন এবং বহু বলিয়া প্রতিভাত হয়। কাযেই বিশৃঙ্খল জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থরাশি স্মরণ রাখিবার জন্য যে সূচীর প্রয়োজন হয়, শৃঙ্খলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থরাশি স্মরণ রাখিবার জন্য সেই সূচীর প্রয়োজন হয় না। দেশের কোন প্রকৃত হিতকর কার্য্য করিতে হইলে, ইহাঁদিগকে আগে সংস্কৃত ভাষা জানিয়া ঋষিদিগের গ্রন্থসমূহে কি আছে, তাহা যথাযথ ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে হইবে। তখন ইহাঁরা আমাদের কথার সার্থকতা বুঝিতে পারিবেন।

সংবাদ ও মন্তব্য

বিদায়, উইলিংডন

গত ৮ই এপ্রিল ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বিদায়কালীন শেষ বক্তৃতায় লর্ড উইলিংডন ভারতের সুখ-সমৃদ্ধির উল্লেখ করিয়াছেন।

লর্ড উইলিংডন পাঁচ বৎসরকাল ভারতের বড়লাট ছিলেন; কার্য্যকাল শেষ হওয়ায় তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আমরা ভারতবাসী, অতিথিকে সম্মান করিবার শিক্ষাই আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট হইতে লাভ করিয়া থাকি। যে অতিথি পাঁচ বৎসর ভারতের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া সম্প্রতি ভারত ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিতে আমাদের শিক্ষা ও সংস্কারে বাধা দেয়। কিন্তু বিদায়ের পূর্ব্বে লর্ড উইলিংডন যে শেষ বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা ক্ষুব্ধ হইয়াছি, এ কথা না বলিয়া পারিলাম না। ভারতবর্ষ-ব্যাপী অশান্তির পরিবর্ত্তে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, দেশব্যাপী অর্থকৃচ্ছ্রতা দূরীভূত হইয়া সাচ্ছল্য দেখা দিয়াছে, তাঁহার কার্য্যকাল-মধ্যে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থারও প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে বলিয়া তিনি যে আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেছেন, মূলতঃ আমরা তাহার কোনই কারণ দেখিতে পাইতেছি না। বেকার-সমস্যা গত পাঁচ বৎসরে যেরূপ ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে, ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল সাহেব কি সে সংবাদ রাখেন নাই? ব্যবসা-বাণিজ্যের বাজারে মন্দা বাড়িয়াছে কি কমিয়াছে, তাহার প্রকৃত সংবাদ কি বড়লাট সাহেবকে কেহ শুনায় নাই? কঠোর আইন প্রয়োগে কংগ্রেসের আন্দোলন প্রশমিত করা হইয়াছে সত্য; কিন্তু আন্দোলন-হীনতাই কি শান্তির লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে? ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অগণিত মূক কৃষক ও কৃষিজীবী যে অন্নের অভাবে, বস্ত্রের অভাবে, অনশনে, অর্দ্ধাশনে অবিরল ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন

করিতেছে, ভারতের সর্ব্বময় কর্ত্তার কর্ণকুহরে সে করুণ ক্রন্দনধ্বনি একটি মুহূর্ত্তের জন্যও কি প্রবেশ করে নাই? লর্ড উইলিংডন শান্তি-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা যে করিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; কিন্তু জনসাধারণের অবস্থার প্রকৃত সংবাদ না রাখিয়া, জনসাধারণের সহিত সম্পর্কশূন্য হইয়া, জনসাধারণের জন্য কাজ করিতে চেষ্টা করিলে, কখনই তাহা জনসাধারণের পক্ষে সুফলপ্রসূ হইতে পারে না এবং সেই জন্যই কার্য্যকালের সূচনায় লর্ড উইলিংডন যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা অধিকদূর অগ্রসর না হইতে পারিয়া ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে, দুঃখের কথা হইলেও ইহা সত্য কথা। জনসাধারণের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া, তাহাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া, তাহাদের কার্য্যে হাত দিলে কখনই তাহা নিষ্ফল হইত না এবং যে লর্ড লিংলিথগোর হাতে তিনি ভারত-পরিচালন-ভার ন্যস্ত করিয়া যাইতেছেন, কার্য্য করিবার পক্ষে তাঁহার পথ অনেকখানি সুগম করিয়া দিয়া যাইতে পারিতেন। লর্ড উইলিংডন যে-সুযোগ হেলায় হারাইয়াছেন, আশা করি, লর্ড লিংলিথগো সেই ভুলেরই পুনরাভিনয় করিবেন না।

একা লর্ড উইলিংডনকেই বা দোষ দিব কি করিয়া? আমাদের দেশীয় নেতাগণও সহরে বসবাস করিয়া—বড় জোড় পাত্রমিত্র সমভিব্যবহারে জেলার বড় সহরগুলি পরিভ্রমণ করিয়া পল্লীবাসী কৃষক ও কৃষিজীবীদের হিত চেষ্টা করিয়া যশ অর্জ্জন করিতে ব্যগ্র হইয়া পড়েন। কোন কোন সংবাদপত্রের কল্যাণে অথবা অনুগৃহীত সংবাদ-পত্রের প্রচারকার্য্যের ফলে সাময়িক যশলাভও হয়ত কাহারও কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে জনসাধারণের কল্যাণকর কোন কার্য্য হয় না, তাহার যশও কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। কোন মতেই তাঁহারা যে দীর্ঘকাল ধরিয়া জনসাধারণের নিকট যশস্বী থাকিতে পারেন না, তাহার মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, তাঁহাদের যশসৌধের ভিত্তি বা বনিয়াদেই দোষ থাকিয়া গিয়াছে। জনসাধারণের কল্যাণকর কিছু করিবার ইচ্ছা অনেকেরই হয়; কিন্তু তাহাদের অবস্থা আমূল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিবার মত বুদ্ধি-বিবেচনা, শিক্ষা-দীক্ষা না থাকিলে কল্যাণ করা যায় না। জনসাধারণের জন্য আজ পর্য্যন্ত যত আন্দোলন হইয়াছে, প্রায় সবগুলিই যে ব্যর্থতায় পরিণত, তাহাদের মূল কারণই ইহাই।

স্বাগত, লিংলিথগো

ভারতবর্ষের বড়লাট লর্ড লিংলিথগো গত ২৭শে মার্চ্চ তারিখে লণ্ডনের জাতীয় কৃষি-সমিতির এক সভায় বলিয়াছেন, তাঁহার পাঁচ বৎসরের কার্য্যকালমধ্যে ভারতীয় কৃষকগণের পক্ষে মঙ্গলজনক কোন কাজ করিতে পারিলে তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করিবেন।

ভারতবর্ষের অগণিত কৃষক সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে নবীন বড়লাট সাহেবকে আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি এবং তিনি যে ভারতের কৃষকগণের হিতচেষ্টা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু তাঁহার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হইয়াও একটি কথা না বলিয়া পারিতেছি না। কৃষকের মঙ্গল কিরূপে করিতে হয়, কৃষি কিরূপ উন্নত ও লাভজনক হইলে কৃষকের মঙ্গল হইতে পারে, লর্ড লিংলিথগো যে-দেশের অধিবাসী, সে-দেশে সে-জ্ঞানের কোন পরিচয় আজ পর্য্যন্ত প্রকাশ পাইয়াছে কি?

"জন্মসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত না করিতে পারিলে ভারতবর্ষের কোন সমস্যার পূরণ হওয়া সম্ভব নহে"—এই কথা লিংলিথগো-কমিশনের রিপোর্টে স্থান পাইয়াছে। ঐ কথা যে সত্য নহে, তাহা আমরা 'বঙ্গশ্রী'র ১৩৪২ সনের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত "জনসংখ্যা, জন্মনিরোধ ও মানুষের অবস্থা" এবং পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত "লক্ষ্ণৌয়ে ভারতীয় জনসংখ্যা সম্মেলন ও বিশেষজ্ঞগণের কীর্ত্তি"-শীর্ষক প্রবন্ধে প্রমাণিত করিয়াছি। কাযেই ভারতীয় কৃষকের কোন প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে হইলে নবীন বড়লাটের পূর্ব্বসংস্কার কিছু কিছু পরিত্যাগ করিতে হইবে, ইহা আমরা বলিতে বাধ্য।

স্যার জন এণ্ডারসন

বাঙ্গালার লাট স্যর জন এণ্ডারসন এপ্রিলের প্রথম ভাগে মেয়ো হাসপাতালের নূতন শাখা উদ্বোধন ও সেণ্ট জন অ্যাম্বুলেন্স অ্যাসোসিয়েসনে ইণ্ডিয়ান রেডক্রশ সোসাইটির কার্য্যক্রম সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়াছেন।

বাঙ্গালার গবর্ণর স্যার জন এণ্ডারসন গত মাসে কয়েকটি স্থানে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়াছেন। আমরা তাঁহার বক্তৃতা-গুলি প্রথমাবধি আগ্রহসহকারে পাঠ করিয়া থাকি। পূর্ব্বে

স্যার জন এণ্ডারসনের বক্তৃতাগুলি কেবল কথার মালা না হইয়া কাজের কথায় পূর্ণ থাকিত। তাঁহার বক্তৃতাগুলি পাঠ করিলে বুঝা যাইত যে, তিনি প্রকৃত কর্ম্মপদ্ধতির অনুসন্ধান করিতেছেন এবং কর্ম্মপদ্ধতি পাইলে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার বাসনা তাঁহার বক্তৃতায় পরিস্ফুট থাকিত; বাঙ্গালা দেশের শ্রীহীনতা, তাহার অমূল্য কৃষি ও শিল্পসম্পদের দুরবস্থা স্যার জনকে বিচলিত করিয়াছে এবং তিনি সেই গত শ্রী ও সম্পদের পুনরুদ্ধারে যত্নবান হইবেন, এই আশা ও আকাঙ্ক্ষাই লোকের মনে জাগরিত হইত। প্রদেশের শাসন ও পালনভার যাঁহার উপরে ন্যস্ত, তাঁহার নিকট হইতে লোকে ইহাই কামনা করিয়া থাকে। শক্তিমান ব্যক্তি ফাঁকা কথায় বিনি-সূতার হার গাঁথেন না, তাঁহার রচনায়, বক্তৃতায় শক্তির ও কর্ম্মপ্রচেষ্টারই সন্ধান লোকে পাইয়া থাকে। স্যার জন এণ্ডারসন বাঙ্গালার শাসন-ভার লইয়া আসিয়া প্রথম প্রথম যে আশার বাণী শুনাইতেন, তাঁহাতে দেশের লোক আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু স্যার জন এণ্ডারসনের বক্তৃতায় আর সেই জনসাধারণের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা এবং কর্ম্মপ্রাণতার স্পন্দন অনুভূত হয় না দেখিয়া আমরা হতাশ হইয়াছি। আমাদের শঙ্কা হইতেছে, আমাদের দেশের বর্ত্তমান আবহাওয়া (শুধু আমাদের দেশের কেন, সমস্ত জগতেরই বর্ত্তমান আবহাওয়া এখন এক) তাঁহাকেও পাইয়া বসিয়াছে এবং তিনিও আমাদের দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের মত কথার মালা গাঁথিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িতেছেন। কলিকাতার মেয়ো-হাসপাতালের একটি নূতন বিভাগ উদ্বোধনপ্রসঙ্গে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে হাসপাতালটির ক্রমোন্নতির ইতিহাস বিবৃত করিতে তিনি উল্লাস প্রকাশ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু দেশের মধ্যে ক্রমাগত রোগবৃদ্ধি-নিবারণের জন্য কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে রোগ-ভোগের জন্য ধনে-প্রাণে বিপন্ন ও বিপর্য্যস্ত হইয়া লোককে হাসপাতালের আশ্রয় গ্রহণ করিতে না হয়, তাহার কোন কথাই প্রদেশের সর্ব্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির বক্তৃতায় প্রকাশ পায় নাই। ইহা যে পরিতাপের বিষয়, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ আছে কি?

কলিকাতা কর্পোরেশন

২৬শে মার্চ্চ কর্পোরেশনের নির্ব্বাচন-পর্ব্ব শেষ হইয়াছে। কংগ্রেস-ইলেকসন বোর্ড কর্ত্তৃক মনোনীত ৩৯ জন নির্ব্বাচন-প্রার্থীর ১৩ জন পরাজিত হইয়াছেন।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সদস্য-নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু কংগ্রেসপক্ষ হইতে কর্পোরেশনের সদস্য-নির্ব্বাচনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যাহাতে কংগ্রেস-পক্ষীয় ব্যক্তিগণই নির্ব্বাচনে জয়লাভ করিয়া কর্পোরেশনে কংগ্রেসের প্রাধান্য রক্ষিত হয়, তজ্জন্য যথারীতি প্রোপাগ্যাণ্ডা বা প্রচারকার্য্য পরিচালিতও করিয়াছিলেন। তাহা সত্ত্বেও এবারকার নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় হইয়াছে এবং সেই পরাজয়ের প্রথম ফল আস্বাদিত হইয়াছে অল্ডারম্যান-ইলেকসানে। নিয়ম এই যে, কর্পোরেশনের ৮৭ জন কাউন্সিলার নির্বাচিত হইয়া ৫ জন অল্ডারম্যান বাহির হইতে নির্ব্বাচন করিয়া আনিয়া পূর্ণ সদস্যসংখ্যা ৯২ জন করিবেন। কংগ্রেসপক্ষ হইতে ৫ জন লোককে খাড়া করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু ৫ জনের মধ্যে মাত্র একজন অল্ডারম্যান হইতে পারিয়াছেন। তিনিও কংগ্রেসপক্ষের বলিয়া জয়যুক্ত হইতে পারিয়াছেন, অথবা অন্য কোন কারণে তাঁহার কর্পোরেশনে প্রবেশলাভ সম্ভব হইয়াছে, সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতেও পারে।

১৯২৪ সালে কংগ্রেস কর্পোরেশনের প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। তখন হইতে সময়ে এবং অসময়ে, সুসময়ে এবং দুঃসময়ে, সুবিধায় এবং অসুবিধায়, একক অথবা দলবদ্ধ হইয়া ক্রমাগত বড় বড় আশার বাণী সহরবাসীকে কংগ্রেস শুনাইয়া আসিয়াছেন। কর্পোরেশন হাতে লইয়া কংগ্রেস সহরের ও সহরবাসীর প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিলেও কার্য্যতঃ যে সহরের ও সহরবাসীর কাণাকড়ির কল্যাণও হয় নাই, তাহা সহরবাসী ভালরূপই জানেন। সহরবাসীর স্কন্ধ হইতে বিরাট করভার খর্ব্ব হয় নাই; সহরের স্বাস্থ্য উন্নত না হইয়া অবনত হইয়াছে—রোগ ও ভোগ দুই-ই বৃদ্ধি পাইয়াছে; সহরের পানীয় জলের দোষ ও অভাব, দুই-ই বর্ত্তমান রহিয়াছে; জল-নিকাশের ব্যবস্থা সংস্কৃত হয় নাই; তথাপি যদি কংগ্রেস সহরবাসীর কল্যাণকর কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া লোকের নিকট আদর প্রত্যাশা করেন, এবং সেই দাবী শুনিয়া লোকে যদি বক্রহাসি হাসে, তাহা হইলে লোকের দোষ দেওয়া যায় কি? আজ যে কলিকাতা কর্পোরেশনে কংগ্রেসের প্রাধান্য লুপ্ত হইয়াছে, ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই।

কারণ, কংগ্রেস যতদিন-না প্রকৃত কর্ম্মপন্থা বাহির করিয়া কর্ম্ম করিতে পারিবেন এবং কেবল কথার কথা কহিতে থাকিবেন, ততদিন লোকের শ্রদ্ধা অটুট রাখিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না।

সরকারের নীতি

মাদ্রাজের আইন-সচিব স্যার কে. ভি. রেড্ডী ইলোরের ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, সরকারের নীতি হইতে ইহা বুঝা যাইবে যে, মাদ্রাজের কোন স্থানই যেন ইলেকট্রিসিটি হইতে বঞ্চিত না হয়।

সরকার যাহা করেন, তাহা সাধারণের মঙ্গলের জন্যই করেন: কিন্তু জনসাধারণের ভাগ্যদোষে ভাল মন্দ হইয়া দাঁড়ায়। ইলেকট্রিসিটির প্রচলন লোকের মঙ্গলের জন্যই হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু বিদ্যুৎ-ব্যবহারের ফল ভাল হইয়াছে না মন্দ হইয়াছে? ইংরাজী শিক্ষা, ইয়োরোপীয় সভ্যতার অনুকরণের ফলে ভারতের যেরূপ 'উপকার' হইতেছে, ইলেকট্রিসিটি ব্যবহারেও তদ্রূপ 'উপকার' হইতেছে, ইহা বলিলে কি বিশেষ অন্যায় হইবে?

লাভবান্ কৃষি

গত ২৮এ মার্চ্চ আসাম ব্যবস্থাপক সভায় গবাদি পশু-পালন বিষয়ক এক প্রস্তাব আলোচনা-প্রসঙ্গে জনৈক ইউরোপীয় সদস্য বলিয়াছেন, শিল্পোন্নতির দ্বারা বেকার-সমস্যা সমাধানের আর সম্ভাবনা নাই; কৃষি ও গবাদি পশু-পালন ব্যবস্থায় ঐ সমস্যার আংশিক সমাধান হইতে পারে।

লাভবান্ কৃষির দ্বারা বেকার-সমস্যার আংশিক নয়—সম্পূর্ণ সমাধান হইতে পারে, ইহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় বটে; কিন্তু বর্ত্তমানে কৃষির যে অবস্থা ও ব্যবস্থা, তাহা দ্বারা বেকার-সমস্যা ত দূরের কথা, কৃষিজীবীদিগেরই অন্ন-সমস্যার সমাধান সম্ভব হইতেছে না। জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিতে না পারিলে কৃষি লাভজনক হইবে না এবং তাহা না হইলে বেকারদিগের কর্ম্মপ্রাপ্তিরও সম্ভাবনা দেখা যাইবে না। সমস্ত প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণ যখন এই বিষয়ে প্রকৃত মনোযোগ দিবেন, তখন হয় ত কিছু কাজ হইতে পারিবে।

অনাহারের তাড়না

২৭এ মার্চ্চ তারিখে রাওয়ালপিণ্ডি হইতে সংবাদ আসিয়াছে, একটি লোক তাহার তিনটি যুবতী কন্যাসহ অনাহারের তাড়নায় আত্মহত্যা করিয়াছে।

এই শ্রেণীর ঘটনা এই একটিই নহে; পরন্তু এইরূপ ঘটনা নিত্যই ঘটিতেছে। কতকগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশ পায়, কতকগুলির খবর আমরা পাই না। অন্ন-সমস্যা দিনের পর দিন যেরূপ জটিলতর হইয়া উঠিতেছে; তাহাতে অভুক্ত নরনারী উপায়ান্তর না পাইয়া মৃত্যুবরণ করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইবার চেষ্টা করিবেই। দেশের সরকার, রাজনীতিক, কংগ্রেস-পাণ্ডাগণ এই সকল 'ক্ষুদ্র' ও 'তুচ্ছ' বিষয়ের প্রতি অবহিত হইবেন কবে?

শিক্ষা

পেশোয়ার ফ্রণ্টিয়ার হাই স্কুলের জনৈক ছাত্র ক্লাশ-প্রমোসন না পাইয়া, হেড মাষ্টার ও সেকেণ্ড মাষ্টারকে ছুরিকাঘাত করিয়াছে, এই মর্ম্মে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রচলিত শিক্ষা বলিতে আমরা কি বুঝি?—Literacy. ভাষা শিক্ষা করিতে পারিলেই যে-শিক্ষায় শিক্ষিত বলিয়া ছাপ পাইবার অধিকার জন্মে, যে-শিক্ষার সহিত চরিত্রগঠনের কোন সম্পর্ক নাই, সদসৎ প্রবৃত্তির সহিত যে-শিক্ষা নিঃসম্পর্ক, সে-শিক্ষা ছাত্রদিগকে দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিলে বিস্ময়ের কোনই কারণ থাকে না। এই ত শিক্ষা! কিন্তু এমনই মোহ সেই শিক্ষার যে, তাহাতে ব্যর্থকাম হইলে লঘুগুরু-জ্ঞানহীন হইয়া শিক্ষককে শিক্ষা দিতেও বাধে না।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা

আমেদাবাদের ২রা এপ্রিলের সংবাদ, রায়চাঁদ নামে জনৈক হিন্দু গৃহস্থের গৃহে ডাকাত পড়িলে তিনজন মুসলমান প্রতিবেশী রায়চাঁদের সাহায্যার্থ আসিয়া ডাকাতের গুলিতে প্রাণ দিয়াছে।

ভারতবর্ষ হিন্দুরও দেশ, মুসলমানেরও দেশ। ভারতবর্ষে হিন্দু যে অন্ন গ্রহণ করে, মুসলমানও সেই অন্ন গ্রহণ করে; যে পানীয় হিন্দু পান করে, সেই পানীয় মুসলমানেরও পেয়; একই আকাশতলে, একই বায়ু সেবন করিয়া হিন্দু-মুসলমান চিরদিন সম্প্রীতির সহিত ভারতে বাস করিয়াছে। আজকাল রাজনৈতিক দলপতিগণের চেষ্টায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতির যে অভাব দেখা যাইতেছে, আজও তাহার বিষময় প্রভাব সর্ব্বত্র ছড়ায় নাই। কিন্তু যে গতিতে রাজনৈতিক জ্ঞানের(?) (political consciousness) প্রসার হইতেছে, তাহাতে দেশ এ বিষ হইতে আর বেশীদিন রক্ষা পাইবে না। যাঁহারা এ দেশের অতীতের সামাজিক সংগঠনের সংবাদ জানেন, তাঁহারাই জানেন যে, হিন্দু-মুসলমান এদেশে গ্রাম-

সম্পর্কে আত্মীয়-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়াই চিরদিন বাস করিত। সেই সংগঠন এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইলেও কখনও কখনও যে দুই একটি ঘটনা অতীতকে স্মরণ করাইয়া দেয় না, তাহা নহে। উপরে যে সংবাদটি দেওয়া হইল, তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, বিপন্ন হিন্দু রায়চাঁদের বিপদে সাহায্য করিতে মুসলমান প্রতিবেশীত্রয় দ্বিধা করে নাই। রায়চাঁদ হিন্দু হউক, অথবা আর যাহাই হউক, তাহার প্রতিবেশীরা তাহার বিপদে সাহায্য করিতে বাধ্য, অতীত ভারতের সামাজিক সংগঠনের ইহাই ছিল অন্যতম নীতি। সে সংগঠন কেন নষ্ট হইল, ইহা কি ভাবিবার কথা নহে?

লণ্ডনের বেকার সংখ্যা

ষ্টেটসম্যানে প্রকাশিত সংবাদ:—লণ্ডনের ২৩এ মার্চ্চ তারিখ পর্য্যন্ত বেকারের সংখ্যা—১৮,৮১,৫৩১; তন্মধ্যে ১৫,৬০,৫৭৪ জন সম্পূর্ণ বেকার; ২,৩৫,৬৮০ জন সাময়িক বেকার ও ৮৫,৬৭৭ জন আংশিক বেকার।

আমরা—ভারতবাসীরা কথায় কথায় বিলাতের নজীর উদ্ধৃত করি এবং বিলাত যে শিক্ষায় ও শিল্পে উন্নতির তুঙ্গশৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছে, আমরা সেই শিক্ষা ও শিল্প-কার্য্য পদ্ধতি প্রভৃতি 'গোগ্রাসে' গিলিতেছি। বিলাতের বেকার-সমস্যার স্ফীততর তালিকা দেখিয়া কি বিলাতের অনুকরণ-কারীদের চৈতন্য হইবে?

আমেরিকার বেকার

ষ্টেট্‌সম্যানে প্রকাশিত সংবাদ:—গত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে আমেরিকার বেকারসংখ্যা ছিল ৯৮,৪৮০০০।

শিল্পোন্নতিতে আমেরিকা ইংলণ্ডকে বহুদূর অতিক্রম করিয়াছে ইহা সকলেই জানেন। বোধ হয় সেই জন্যই বেকার-সংখ্যায়ও আমেরিকা ইংলণ্ডকে ছুয়ো দিয়া ছাড়িয়াছে। বর্ত্তমানে সেই দেশ তত উন্নত (?), সেই দেশে ধনবানের (?) সংখ্যা তত বেশী, সেই দেশের অবস্থা তত ভাল (?), যে দেশের লোক কাজ পায় না, অন্ন পায় না। আমরাও সেই হিসাবে উন্নত (?) হইতেছি না কি?

মহাত্মা গান্ধী ও শান্তি

রোমাঁ রোলাঁ পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে এক পত্রে লিখিয়াছেন যে, জেনেভায় আগামী সেপ্টেম্বর মাসে নিখিল বিশ্বশান্তি বৈঠকের অধিবেশন হইবে। মহাত্মা গান্ধী ও জওহরলালজীকে ঐ অধিবেশনে যোগ দিবার জন্য রোলাঁ মহাশয় অনুরোধ করিয়াছেন।

ইউরোপের মহাযুদ্ধের পর হইতে ইউরোপের সর্ব্বত্র শান্তি-বৈঠকের অধিবেশন ঘন ঘন বসিতেছে। ঐ সকল অধিবেশনের ফলে পৃথিবীতে শান্তি কতখানি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। যে জিনিষটার যত অভাব, সেইটা লইয়া আন্দোলন করাই বর্ত্তমান কালের রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রোমাঁ রোলাঁ মহাশয় যে দুই ব্যক্তিকে শান্তি-বৈঠকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, শান্তি-স্থাপনায় তাঁহাদের কৃতিত্ব কতখানি তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। মহাত্মা গান্ধী শান্তিকামী, ইহা তিনি বারবার বলিয়া থাকেন, কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার আগমনাবধি যত অশান্তি দেখা গিয়াছে, তেমন আর কখনও দেখা যায় নাই। কোন প্রতিষ্ঠানে ভেদ-বিভেদ, কলহ বর্ত্তমান থাকিলে সেই প্রতিষ্ঠানে শান্তি বিরাজিত হইয়াছে, এমন কথা বাতুলেও বলিবে না। কংগ্রেস এ দেশের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান, কিন্তু এই সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠানে আজ যত ভেদ-কলহ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহারই ফলে কংগ্রেস আজ দেশের জন-সাধারণের সহিত বিচ্ছিন্নসম্পর্ক মুষ্টিমেয় ধনিক ও বিলাত-ফেরতের রাজনীতি-চর্চ্চার আখড়ায় পরিণত হইয়াছে। পণ্ডিত জওহরলালের কথা না তোলাই ভাল। তিনি ত কল্কি অবতারের ভূমিকা অভিনয় করিতে চলিয়াছেন। দেশে যেটুকু শান্তিও (যে বিন্দুমাত্র) আছে, জওহরলালজীর সমাজ-তন্ত্রবাদ চলিলে সেটুকুও দেশ ছাড়িয়া পালাইবে।

রোমাঁ রোলাঁ মহাশয়ের লোক-নির্ব্বাচনের ক্ষমতা তথা-কথিত শান্তি-বৈঠকেরই যোগ্য হইয়াছে।

সংবাদ

শিক্ষা

কার্য্য

গত ২৮শে মার্চ্চ নিউ দিল্লীতে লেডী আরুইন কলেজে লেডি উইলিংডন একটা নূতন বিভাগের উদ্বোধন করিয়াছেন। এই বিভাগে ছাত্রীগণকে গার্হস্থ্য শিক্ষা দেওয়া হইবে।

শিশু-শিক্ষা বিষয়ে বিলাতে শিক্ষাপ্রাপ্তা শ্রীমতী মৃণ্ময়ী রায়ের পরিচালনায় গত ২৯শে মার্চ্চ কলিকাতা একটি নার্সারি-স্কুলের উদ্বোধন হইয়াছে।

২রা এপ্রিলের খবর: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক বাংলা ভাষার বানান-সমস্যা ও বিজ্ঞান ইত্যাদির পরিভাষা সম্পর্কে সংস্কার-কার্য্য অগ্রসর হইতেছে।

সাহিত্য ও বিজ্ঞান-বিষয়ক গবেষণার্থ বঙ্গীয় সরকার কর্ত্তৃক মাসিক ৭৫৲ টাকা হারে তিনটী স্কলারশিপ দেওয়া হইবে।

জেপুরের রাজা অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

বাঙ্গালার লাট স্যর ইউ. এন. ব্রহ্মচারীকে এসিয়াটিক সোসাইটির গবেষণা-পুরস্কার স্যর উইলিয়ম জোন্‌স্ মেড্যাল দিয়াছেন।

বক্তৃতা ও আলোচনা

গত ২৮শে মার্চ্চ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন-বক্তৃতায় ভাইস-চ্যান্সেলর ও প্রো-চ্যান্সেলর দুই জনেই শিক্ষিতদের মধ্যে বেকার সমস্যার উল্লেখ করেন।

ত্রিবাঙ্কুর সরকারের শিক্ষা-বিবরণীতে প্রকাশ, নারী-শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটিয়াছে; ১৯৩৪-৩৫ সনে ২লক্ষ ৬৯ হাজার ৪ শত ৪৭টী বালিকা স্কুলে শিক্ষালাভ করিতেছে, সহ-শিক্ষারও যথেষ্ট প্রচলন দেখা যায়।

হুগলী জিলার ১৯৩৪-৩৫ সনের মিউনিসিপ্যালিটির বিবরণী হইতে বুঝা যায়, ঐ জিলার প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় যেখানে গত বৎসর ২৫২৬২৲ টাকা ছিল, এই বৎসরে সেখানে ২৭৬৯৪৲ টাকা হইয়াছে।

গত ৩০শে মার্চ্চ ভিজাগাপত্তমের এক অভ্যর্থনা-সভায় স্যর রাধাকৃষ্ণন বলিয়াছেন—বাস্তব জীবনের সহিত সম্পর্ক না থাকিলে তাহাকে সত্যকার দর্শন বলা চলে না।

মাদ্রাজের ক্রিম্যাসন হলে স্যর রাধাকৃষ্ণনের বক্তৃতা: রাজনৈতিক সম্পর্ক তিক্ত হইলেও ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে ভাব ও আদর্শগত মিলন সম্ভব হইতে পারে।

আগামী জুলাই মাসে কেম্ব্রিজে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের যে পঞ্চবার্ষিক অনুষ্ঠান হইবে, তাহাতে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ভারতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত পাঠ্য পুস্তক নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত, এই প্রস্তাব ভারতীয় প্রতিনিধি কর্ত্তৃক আনীত হইবে।

কৃষি

কার্য্য

ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ হইতে প্রাপ্ত অর্থ-সহায়তায় মহীশূর কৃষিবিভাগ উদ্ভিদের পোকাবিষয়ে কার্য্যকরী গবেষণা করিয়াছেন।

বেজওয়াদার ৪ঠা তারিখের খবর: কৃষ্ণা জিলার কলেক্টর মার্চ্চ কিস্তির খাজনা দিবার সময় ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়াছেন।

রেওয়ার মহারাজ তাঁহার রাজ্যের কৃষিজীবীদের সহায়তাকল্পে রাজস্ব অনেকাংশে হ্রাস করিয়াছেন।

কুমিল্লার ৬ই এপ্রিলের খবর: ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে গ্রামউন্নয়ন কার্য্যসভার উদ্যোগে রায়তের অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্যমূলক উন্নতিকর কর্ম্মপ্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে।

বক্তৃতা ও আলোচনা

বিহারে শর্করা-শিল্পের কৃষি-বিষয়ক উন্নতির জন্য প্রাদেশিক সরকার এক ত্রিবর্ষ পরিকল্পনা করিয়াছেন।

মাদ্রাজ সরকার কর্ত্তৃক কৃষকঋণ অনুসন্ধান সমিতির রিপোর্ট গৃহীত হইয়াছে। রিপোর্টে বলা হইয়াছে, ভারতের জমীর উর্ব্বরাশক্তি অত্যন্ত কম হইয়া পড়িয়াছে; আধুনিক কৃষিবিজ্ঞান অনুযায়ী উন্নতির ব্যবস্থা সরকার হইতে করা হইতেছে।

মাদ্রাজ কাউন্সিলে কৃষিপণ্যের মূল্যহ্রাসের অনুপাতে কৃষকেরা খাজনা মকুফ দাবী করিতে পারিবে—এই মর্ম্মে যে-বিল গৃহীত হইয়াছিল (Madras Estates Land Amendment Bill), তাহা বড়লাট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে।

আদর্শ সংসার

বাড়ীর অন্তঃপুরে একবার যাওয়া যাক।

এদেশের গ্রামের সায়াহ্ন। মধ্য বিত্ত একটি ভারতীয় পরিবারের অনাড়ম্বর শোবার ও বসবার ঘরটি আমাদের দৃশ্য। সমস্ত পরিবার সেখানে একত্র হয়েছে। চা পরিবেশন করা চলেছে।

একটি টিপয়ের ওপর কাঠের ট্রেতে চা তৈয়ারীর সমস্ত সাজসরঞ্জাম সাজান। চীনে মাটির পাত্রটি হয়ত একেবারে সরেস নয়। পেয়ালা ও ডিসগুলি হয়ত সব এক ছাঁচের নয়। হয়ত পেয়ালার চেয়ে চামচ সংখ্যায় কম, কিন্তু এসবে কিছু আসে যায় না। আসল যা জিনিষ সেই চা'টি চমৎকার! সকলের আনন্দোজ্জ্বল মুখগুলি দেখিলেই এবং তাদের খোস গল্পগুলি শুনলেই সে কথা বুঝতে আর দেরী হয় না।

দেখলেই জানা যায় যে, এই পরিবারটি বেশ বিচার করে ভাল দেখে চা ব্যবহার করে, সযত্নে চা তৈরী করে এবং প্রাত্যহিক সায়াহ্নের এই চায়ের অনুষ্ঠান ঠিক প্রায় ধর্ম্মাচরণের মতই আগ্রহ নিয়ে পালন করে।

কথায় বলে,—'যে যার ঘর নিজেই গড়ে'। আমরা লোকের মুখে অনেক সময় আদর্শ সংসারের কথা শুনি। কিন্তু আজকালকার দিনে, প্রাত্যহিক জীবনে চায়ের উপযুক্ত মর্য্যাদা যে সংসার না দেয়, তাকে কিছুতেই আদর্শ বলা যায় না। ধরুন, কোন 'আদর্শ' সংসারে কোন বন্ধুজন এসে চা পেলেন না। তিনি সে বাড়ীর লোকজনকে কি মনে করবেন? অতিথি-বিমুখ? না, তিনি শুধু জানবেন যে সে সংসারে সামাজিকতার ভিত্তি স্বরূপ, জীবনের একটি সহজ আনন্দের অভাব আছে—সে আনন্দ চা-পানের।

শুধু নিজেদের জন্যে নয়, আমাদের বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের জন্যেও যে সংসার আমরা গড়ে তুলি,—যে সংসারে তারা এসে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, তাকেই আদর্শ সংসার বলা যায়। বন্ধুবান্ধবদের সংসর্গ চায়ের মত এত সহজে আর কিছুতেই আনন্দময় করে তুলতে পারে না। খাওয়া মাত্র মন প্রসন্ন হয়ে উঠে, আমাদের মুখ খুলে যায়। ইচ্ছামত যখন খুসী নিজেদের তৃপ্তি ও পরকে আনন্দ দেবার জন্যে চায়ের আয়োজন, যেখানে সদাই প্রস্তুত না থাকে, তাকে আদর্শ গৃহ বলা যায় না।

শ্রীদীনেশচন্দ্র গুহ কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস লিমিটেড, ৯০নং লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

৪র্থ বর্ষ, ১ম খণ্ড—৫ম সংখ্যা]

বিষয়-সূচী

[জ্যৈষ্ঠ—১৩৪৩

'চিত্রাপিতারম্ভমিবাবতস্থে'

শিল্পী : শ্রীপ্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়।

জ্যৈষ্ঠ- ১৩৪৩

চতুর্থ বর্ষ, ১ম খণ্ড—৫ম সংখ্যা

ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়

—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

পূর্ব্বানুবৃত্তি

ভারতবাসীর কোন্ অপরাধের ফলে ঋষি-রচিত ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সকল শ্রেণীর ও সমস্ত স্তরের লোকের মধ্যে হাহাকার উঠিয়াছে এবং কি করিলে আবার স্বস্তির নিশ্বাস আসিতে পারে, তাহা নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে।

ইহার প্রথম ভাগে মানুষের জীবন কেন অবিমিশ্র সুখময় না হইয়া সুখ ও দুঃখে মিশ্রিত হয়, তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে মানুষ বলিতে কি বুঝায়, তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। ঐ সন্দর্ভ সমাপ্ত হইবার আগেই গত কার্ত্তিক সংখ্যা হইতে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমস্যা কি কি, তাহা দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছি।

আমাদের বিচারানুসারে বর্ত্তমান ভারতের যত কিছু সমস্যা আছে, তাহা চারিটী কথায় বিবৃত করা যাইতে পারে। তাহাদের নাম :—

(১) কৃষক, তাঁতী, যুগী, কুম্ভকার এবং কর্ম্মকার প্রভৃতি শ্রমজীবিগণের অন্নাভাব ;

(২) শিক্ষিত যুবক ও শ্রমজীবিগণের বেকারাবস্থা এবং অসন্তুষ্টি ;

উকিল, ব্যারিষ্টার প্রভৃতি আইন-ব্যবসায়ী, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী এবং বণিকগণের পরমুখাপেক্ষিতা, অর্থকৃচ্ছ্রতা এবং অসন্তুষ্টি ;

(৪) সমস্ত অধিবাসীর স্বাস্থ্যহীনতা, অকালমৃত্যু, অসন্তুষ্টি এবং পরমুখাপেক্ষিতা।

ইহা ছাড়া অপর যে কোন সমস্যার কথা মনে জাগ্রত হইবে, তাহা বিচার করিলে দেখা যাইবে, উহা এই চারিটী সমস্যারই অন্তর্ভুক্ত। কোনটী উহার কারণ, কোনটী উহার পরিণতি।

উপরোক্ত সমস্যা চারিটীর কারণ প্রধানতঃ তেরটী। তাহাদের নাম :—*

(১) জমীর উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস ;

(২) পণ্যদ্রব্যের মূল্যের সাদৃশ্যের অভাব (want of parity) ;

(৩) কৃষি প্রভৃতি জীবিকার্জ্জনের চারিটী পন্থাতেই যাহাতে ন্যূনকল্পে গরীবানাভাবে পরিবার প্রতিপালিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থার অভাব।

(৪) উপরোক্ত চারিটী পন্থাতেই যাহাতে শ্রমজীবিগণের পারিশ্রমিকের সাদৃশ্য থাকে, তাহার ব্যবস্থার অভাব।

(৫) প্রকৃত বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে কি না, তাহার পরীক্ষা দ্বারা যাহাতে শ্রমজীবী (manual workers) ও বিভিন্ন পরিচালকগণের (officers and subordinate officers) পদগৌরবের তারতম্য স্থিরীকৃত হয়, তাহার ব্যবস্থার অভাব ;

(৬) বুদ্ধির উৎকর্ষের তারতম্যানুসারে যাহাতে মানুষের উপার্জ্জনের তারতম্য হয়, তদনুরূপ ব্যবস্থার অভাব ;

(৭) জীবিকার্জ্জনের চারিটী পন্থাতেই যাহাতে সর্ব্বোচ্চ (maximum) উপার্জ্জন একরূপ হয়, তাহার ব্যবস্থার অভাব ;

(৮) সম্পূর্ণ ও নির্ভুল শরীরগঠন-বিদ্যার (Anatomy) অভাব ;

(৯) সম্পূর্ণ ও নির্ভুল শরীরবিধান-বিদ্যার (Physiology) অভাব ;

(১০) সম্পূর্ণ ও নির্ভুল পদার্থবিদ্যার (Physics) অভাব ;

(১১) সম্পূর্ণ ও নির্ভুল রসায়নের (Chemistry) অভাব;

(১২) জল ও বায়ু যাহাতে অস্বাস্থ্যকর না হয়, তদনুরূপ ব্যবস্থার অভাব;

(১৩) শিক্ষাপদ্ধতি যেরূপ হইলে ছাত্রগণ স্ব স্ব বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিয়া স্বাবলম্বী হইতে পারেন, সেই শিক্ষাপদ্ধতির অভাব।

কোন্ কোন্ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে দেশবাসীর প্রত্যেকের আবার সুসময় উপভোগ করা সম্ভব হইতে পারে, তাহার আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে, নিম্নলিখিত দ্বাবিংশতি ব্যবস্থা ভারতবর্ষের সমস্যা পূরণের উপায়:—

(১) জমীর স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া যাহাতে কোনরূপ সার ব্যবহার না করিলেও প্রতি বিঘা জমী হইতে অন্ততঃ ১২ মণ ধান অথবা গম অথবা তন্মূল্যের অপর কোন শস্যের উৎপাদন হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা;

(২) যে জমীর স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তি প্রতি বিঘায় ৪ মণ ধান অথবা গম অথবা তন্মূল্যেরও কম, সেই জমী যাহাতে কোন কৃষক চাষ না করেন এবং তাহার উৎপাদিকা-শক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তদনুরূপ ব্যবস্থা;

(৩) নদীগুলি যাহাতে এত গভীর হয় যে, বর্ষাকালে বৃষ্টির পরিমাণ যতই বেশী হউক না কেন, তাহার দুই তীর প্লাবিত হইবার কোন সম্ভাবনা যাহাতে না থাকে, তাহার ব্যবস্থা;

(৪) বিভিন্ন খাদ্যশস্য, শিল্পজাত ব্যবহার্য্য জিনিষ এবং গৃহনির্ম্মাণের উপকরণের বিভিন্ন মূল্যের মধ্যে যাহাতে সাদৃশ্য (parity) থাকে, তাহার ব্যবস্থা;

(৫) সাংসারিক জীবিকানির্ব্বাহের খরচা ও পারিশ্রমিকের মধ্যে যাহাতে সাদৃশ্য (parity) থাকে, তাহার ব্যবস্থা;

(৬) পরিশ্রমজাত দ্রব্যের মূল্যের তারতম্যানুসারে যাহাতে পারিশ্রমিকের তারতম্য স্থির করা হয়, তদনুরূপ ব্যবস্থা;

(৭) যাহাতে ১৮ বৎসরের মধ্যে বালকগণের দশটী ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি কার্য্যক্ষম হয় এবং ঐ বয়সে যাহাতে তাহারা উপার্জ্জনক্ষম হয়, তদনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা;

(৮) কোন্ খাদ্য, পানীয়, বায়ু, বাসস্থান, এবং ব্যবহার্য্য বস্তু স্বাস্থ্যপ্রদ অথবা অস্বাস্থ্যপ্রদ, তাহা যাহাতে বালকগণ ১৮ বৎসরের মধ্যে পরিজ্ঞাত হইতে পারে এবং যাহাতে তাহাদের পরমায়ুবৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য থাকে, তদনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা;

(৯) জীবিকার্জ্জনের জন্য দেশের মধ্যে কোথায় কত লোকের উপযোগী কি ব্যবস্থা আছে এবং ঐ ঐ ব্যবস্থানুসারে কি কি শিক্ষা করিলে জীবিকার্জ্জন করা সম্ভব হয়, তাহা যাহাতে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক বালক জানিতে পারে, তদনুরূপ ব্যবস্থা;

(১০) যাহা যাহা শিক্ষা করিলে জীবিকার্জ্জন করা সম্ভব হয়, তাহা যাহাতে প্রাপ্তবয়স্ক বালকগণ ইচ্ছানুরূপ শিক্ষা করিতে পারে, তদনুরূপ ব্যবস্থা;

(১১) যে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক বালক উচ্চশিক্ষা অর্থাৎ বিজ্ঞানশিক্ষাপ্রার্থী হইবে, তাহাদের হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় উচ্চশিক্ষার উপযোগী হইয়াছে কি না এবং মন ও বুদ্ধি ভবিষ্যতে তদনুরূপ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিবে কি না, তাহার পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং যাহাতে অনুত্তীর্ণ বালকগণ উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ লাভ না করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা;

(১২) কোন বস্তুবিষয়ক বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইলে ঐ বস্তুর কত রকম পরীক্ষা কিরূপ ভাবে করিতে হয় এবং নিজেকেই বা কিরূপ ভাবে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা যাহাতে উচ্চশিক্ষার্থী যুবকগণ শিক্ষা করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা;

(১৩) বস্তুর কত রকম পরীক্ষা কিরূপ ভাবে করিতে হয়, অথবা নিজের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি কিরূপ ভাবে গঠিত করিতে হয়, তাহা না শিখিয়া যাহাতে কেহ উচ্চশিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হইতে না পারেন, তাহার ব্যবস্থা;

(১৪) উচ্চশিক্ষিত না হইয়া যাহাতে কেহ পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করিতে, অথবা শিক্ষকতা করিতে, অথবা চিকিৎসা ও আইন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে, অথবা ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে, অথবা বিচার ও শাসন-বিভাগে প্রবেশ লাভ করিতে না পারেন, তাহার ব্যবস্থা ;

(১৫) দেশের জলবায়ু যাহাতে কোনরূপে বিকৃত না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ;

(১৬) শ্রমজীবিগণ যাহাতে ১৮ বৎসর বয়সে উপার্জ্জন করিবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা ;

(১৭) দেশের মধ্যে যাহাতে মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৩০ জনের বেশী শিল্প, বাণিজ্য, ওকালতী, ডাক্তারী প্রভৃতি ব্যবসায়, শিক্ষকতা ও সরকারী চাকুরীর উপর নির্ভরশীল না হয়, তাহার ব্যবস্থা এবং যাহাতে কৃষি লাভবান্ হয়, তাহার ব্যবস্থা ; *

(১৮) বালকগণের যাহাতে ১৮ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে বিবাহ হয়, তাহার ব্যবস্থা ;

(১৯) প্রকৃত ভাবে বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন যাঁহারা না করিতে পারেন, তাঁহারা যাহাতে হস্তপদাদির শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা অথবা শ্রমজীবী হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তাহার ব্যবস্থা ;

(২০) যাঁহারা প্রকৃত ভাবে বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিতে না পারেন, তাঁহারা যাহাতে মস্তিষ্কজীবী না হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা ;

(২১) কোন প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোক যাহাতে স্বামী ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের সহিত অথবা কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ যাহাতে স্বীয় স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীলোকের সহিত অবাধে মেলামেশা না করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা ;

(২২) প্রত্যেক স্ত্রীলোক যাহাতে সংসারের কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং কোন উপার্জ্জনের কার্য্যে প্রবৃত্ত না হন, তাহার ব্যবস্থা।

কি করিলে ঐ দ্বাবিংশতি ব্যবস্থা দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে তাহার বিচারপ্রসঙ্গে দেখা গিয়াছে যে, ঐ দ্বাবিংশতি ব্যবস্থা দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে, প্রথমতঃ, প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেসের গঠন সাধন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে ; দ্বিতীয়তঃ, অসহযোগ আইন ও স্বাধীনতা আন্দোলন পরিত্যাগ করিতে হইবে ; তৃতীয়তঃ, ইংরাজ-বিদ্বেষ বর্জ্জন করিতে হইবে ; চতুর্থতঃ, প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেসের সভ্যগণ যাহাতে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল-সমূহের সভ্য হইতে পারেন এবং গভর্ণমেণ্টের বিচার ও শাসন-বিভাগে প্রবিষ্ট হইতে পারেন তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

ঐ বিচারপ্রসঙ্গে আরও দেখা গিয়াছে যে, প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেসের গঠন সাধন করিতে হইলে, যাহাতে দেশবাসীর মধ্যে সর্ব্বতোভাবে একতা স্থাপিত হয়, মুখ্যতঃ তাহার চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন। যতদিন পর্য্যন্ত দেশবাসীর মধ্যে আংশিক ভাবেও অসহযোগ অথবা আইন-অমান্য অথবা ইংরাজ-বিদ্বেষ অথবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিবার স্পৃহা থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত বাস্তব একতা স্থাপিত হওয়া সম্ভব নহে এবং ততদিন পর্য্যন্ত প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেসের উদ্ভব হওয়াও অসম্ভব থাকিয়া যাইবে। অসহযোগ অথবা আইন-অমান্য অথবা ইংরাজ-বিদ্বেষ অথবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিবার স্পৃহা পোষণ করিলে যে, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে গভর্ণমেণ্টের সহিত দ্বন্দ্ব করা হয়, তাহাও আমরা দেখাইয়াছি। দেশবাসী গভর্ণমেণ্টের সহিত দ্বন্দ্ব করিবে আর গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে দুর্ব্বল করিবার চেষ্টা না করিয়া সম্পূর্ণভাবে চুপচাপ করিয়া থাকিবে, বাস্তবক্ষেত্রে তাহা হয় না। কাযেই অসহযোগ অথবা আইন-অমান্য আন্দোলন প্রভৃতি চালাইতে গেলে দেশবাসিগণের মধ্যে দলাদলির উদ্ভব হওয়া এবং প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেসের গঠনের আশা সুদূরপরাহত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যাঁহারা মুখে স্বাধীনতার ও একতার কথা কহিয়া থাকেন এবং কার্য্যতঃ অসহযোগ ও আইন-অমান্যের আন্দোলন প্রভৃতি চালাইয়া থাকেন, তাঁহারা আত্ম-প্রতারক এবং তাঁহারা কতকগুলি পাশ্চাত্ত্য বুলি টীয়াপাখীর মত আওড়াইয়া আমাদের যুবকবৃন্দকে বিপথগামী করিয়া তুলিয়াছেন এবং দেশবাসিগণের ভবিষ্যৎ ক্রমশঃই অধিকতর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। দেশবাসিগণকে বুঝিতে হইবে যে, গোড়ায়

পাথরের বাটী' নির্ম্মাণ করা কখনও সম্ভব হয় না এবং বর্ত্তমান নেতৃবর্গ যাহাতে স্ব স্ব মনোভাব পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেস গঠন করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত না হইয়া প্রাদেশিক অথবা কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে প্রবিষ্ট হইলে অথবা কোন গঠনমূলক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিলে বিশেষ কোন ফলোদয় হইবে না। যে দ্বাবিংশতি ব্যবস্থা দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইলে দেশের প্রত্যেকের অন্নাভাব প্রভৃতি দূরীভূত হওয়া সম্ভব, তাহার দাবী মিলিত জনসাধারণের পক্ষ হইতে উত্থাপিত না হইলে কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করা সম্ভব হইবে না।

পরন্তু মিলিত না হইতে পারিলে কাউন্সিলে যে কোন প্রস্তাবই উত্থাপিত করা যায় না কেন, বিরুদ্ধবাদিগণের দ্বারা তাহা নাকচ হইবার আশঙ্কা থাকিয়া যাইবে।

অন্য দিকে, দেশের জনসাধারণ যদি একবার বুঝিতে পারে যে, কংগ্রেস তাহাদের প্রত্যেকের অন্নাভাব প্রভৃতি দূর করিবার প্রকৃত চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা হইলে জনসাধারণের মধ্যে প্রকৃত মিলন হওয়া অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ হইয়া দাঁড়াইবে এবং মিলিত জনসাধারণের পক্ষ হইতে জনসাধারণের বাস্তব হিতকর যে-সমস্ত প্রস্তাব উত্থাপিত হইবে, তাহার বিরোধিতা করা প্রত্যেকের পক্ষে চিন্তার যোগ্য হইয়া পড়িবে।

বর্ত্তমান কংগ্রেসের যে শাখা প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেসের গঠন করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত না হইয়া আগামী কাউন্সিলে প্রবেশ লাভ করিবার উদ্যোগী হইয়াছেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। দেশবাসিগণের মধ্যে যাঁহারা তাঁহাদিগের সহায়তা করিবেন, তাঁহারা প্রতারিত হইবেন। আমরা তাঁহাদিগকে সতর্ক হইতে অনুরোধ করিতেছি।

যাঁহারা মনে করেন যে, দেশের মধ্যে কয়েকটী শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারিলেই দেশের সমস্ত সমস্যার সমাধান হইতে পারে, তাঁহাদের চিন্তায়ও অদূরদর্শিতার পরিচয় আছে। যতদিন পর্য্যন্ত প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা সাধন করিবার এবং কাউন্সিল প্রভৃতি গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠান-সমূহে প্রবিষ্ট হইয়া উপরোক্ত দ্বাবিংশতি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা, দেশের জনসাধারণের মধ্যে জাগ্রত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সমগ্র জনসাধারণের অন্নাভাব দূরীভূত হওয়া সম্ভব নহে।

দেশের সমগ্র জনসাধারণের অন্নাভাব দূরীভূত করিবার ব্যবস্থা সাধিত না হওয়া পর্য্যন্ত ব্যাপক ভাবে কোন লাভজনক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হওয়া বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভব নহে। ক্রেতাগণের অবস্থা ভাল না হইলে যে, বণিক্‌গণের বাণিজ্য আশানুরূপ লাভজনক হইতে পারে না, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। জগতের সর্ব্বত্র ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমশঃ কেন অবনতি-প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলেই আমাদের কথার সার্থকতা উপলব্ধি করা যাইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জগতের সর্ব্বত্রই শিল্প ও বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলি যে প্রায়শঃ গত কয়েক বৎসর হইতে ক্রমশঃ অবনতি-প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা তাহাদের 'ব্যালান্স-শিট' পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। অথচ যে শিল্প ও বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলি টলটলায়মান, কি উপায়ে তাহাদের উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহার উল্লেখযোগ্য কোন চিন্তা না করিয়া অর্থনৈতিক জগতের ধুরন্ধরগণ ঐ ঐ শ্রেণীর শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে জনসাধারণকে নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার পরামর্শ প্রদান করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না।

দেশের ভবিষ্যতের কথা যে দিক্ দিয়াই চিন্তা করা যাউক, তাহাতেই দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমান সমস্যাগুলির সমাধান করিয়া দেশের সমগ্র জনসাধারণের অন্ন, বস্ত্র, সন্তুষ্টি, স্বাস্থ্য, স্বাবলম্বন, দীর্ঘ যৌবন ও দীর্ঘায়ু ব্যবস্থা করিতে হইলে, প্রথমতঃ, প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস-গঠন সাধন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, অসহযোগ, আইন-অমান্য ও স্বাধীনতা আন্দোলন সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, ইংরাজ-বিদ্বেষ বর্জ্জন করিতে হইবে এবং চতুর্থতঃ, প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেসের সভ্যগণ যাহাতে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল-সমূহের সভ্য হইতে পারেন এবং গভর্ণমেণ্টের বিচার ও শাসন-বিভাগে প্রবিষ্ট হইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে প্রকৃত ন্যাসন্যাল কংগ্রেসে পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে, তাহার গঠনকার্য্য নিম্নলিখিত নীতি-মূলক হওয়া একান্ত বিধেয়:—

(১) জনসাধারণের বিবিধবিষয়ক দুরবস্থার সংবাদ সংগ্রহ করা এবং তাহা যাহাতে গভর্ণমেণ্টের বিবেচনাযোগ্য হয়, তাহার চেষ্টা করা ;

(২) জনসাধারণের প্রতি গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের অনাচারের সংবাদ সংগ্রহ করা এবং গভর্ণমেণ্ট যাহাতে তাহার প্রতিবিধান করেন, তাহার চেষ্টা করা ;

(৩) কি কি কারণে জনসাধারণের দুরবস্থার উদ্ভব হইতেছে, তাহার গবেষণা করা এবং ঐ গবেষণামূলক তথ্যগুলির প্রতি গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করা ;

(৪) কি করিলে জনসাধারণের দুরবস্থা আমূলভাবে দূরীভূত হইতে পারে, তাহার গবেষণা করা এবং ঐ তথ্যগুলির প্রতি গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করা ;

(৫) যাহা যাহা করিলে জনসাধারণের দুরবস্থা আমূলভাবে দূরীভূত হইতে পারে, তাহা যতদিন পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্টের দ্বারা পরিগৃহীত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কি করিলে জনসাধারণের দুরবস্থা সাময়িক ভাবে উপশমিত হইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করা এবং তৎসম্বন্ধে জনসাধারণকে উপদেশ দেওয়া ;

(৬) দেশের সর্ব্বসাধারণ যাহাতে নিজ নিজ অবস্থা যথাযথভাবে বুঝিতে পারেন, তদ্বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করা এবং তাহার প্রচার করা ;

(৭) শিক্ষা, সাহিত্য, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও গভর্ণমেণ্টের পরিচালনা কিরূপ হইলে সর্ব্বসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় তাহা প্রকৃত হিতকর হইতে পারে, তাহার গবেষণা করা এবং তদ্বিষয়ক গ্রন্থ প্রচার করা ;

(৮) জনসাধারণের প্রকৃত হিতকর শিক্ষা-বিজ্ঞান, সাহিত্য-বিজ্ঞান, কৃষি-বিজ্ঞান, শিল্প-বিজ্ঞান, বাণিজ্য-বিজ্ঞান, রাষ্ট্রপরিচালনা-বিজ্ঞান প্রভৃতিতে যাহাতে বুদ্ধিমান্ লোক শিক্ষিত হইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করা এবং যাঁহারা ঐ ঐ প্রকৃত লোকহিতকর বিজ্ঞানে শিক্ষিত হইবেন, তাঁহারা যাহাতে গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রিত্ব প্রভৃতি প্রধান প্রধান দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করা ;

(৯) বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের নির্ব্বাচন-প্রণালীতে মানুষে মানুষে ডিমোক্রেসির নামে যে সমস্ত দ্বন্দ্ব-কলহ এবং বিদ্বেষের উদ্ভব হইতেছে, তাহা যাহাতে না হইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করা এবং তদনুরূপ কার্য্য করা ;

(১০) প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ যাহাতে প্রত্যেক প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল্ সমূহের সভ্যপদ লাভ করিতে পারেন, তাহার উপায় উদ্ভাবন করা এবং তদনুরূপ কার্য্য করা ;

(১১) জনসাধারণের প্রকৃত হিতকর শিক্ষা-বিজ্ঞান, সাহিত্য-বিজ্ঞান, কৃষি-বিজ্ঞান, শিল্প-বিজ্ঞান, বাণিজ্য-বিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রপরিচালনা-বিজ্ঞান প্রভৃতিতে যাঁহারা যথার্থভাবে শিক্ষিত হন নাই, তাঁহারা যাহাতে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সমূহের সভ্য অথবা মন্ত্রী অথবা গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত না হইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করা ;

(১২) প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল্ কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণের মধ্যে যাঁহারা জনসাধারণের প্রকৃত হিতকর শিক্ষা-বিজ্ঞান প্রভৃতিতে যথার্থভাবে শিক্ষিত, তাঁহারা যাহাতে গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রিত্ব লাভ করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করা ;

(১৩) যাঁহারা প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিলসমূহের সভ্য এবং মন্ত্রী হইবেন, তাঁহারা যাহাতে একযোগে জনসাধারণের দুরবস্থার আন্দোলনকর ব্যবস্থাসমূহ প্রবর্ত্তিত করিবার আয়োজন করেন, তাহার চেষ্টা করা ;

(১৪) যাঁহারা প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিলসমূহের সভ্য এবং মন্ত্রী হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে অথবা জনসাধারণের মধ্যে যে সমস্ত আত্ম-বিচ্ছেদকর প্রস্তাবের সম্ভাবনা উত্থিত হইবে, সেগুলি যাহাতে

আপোষে মীমাংসিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা ;

(১৫) যাহাতে ইংরাজ প্রভৃতি বিদেশীয়গণের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষের উদ্ভবকর মনোবৃত্তি জনসাধারণের মধ্যে উত্থিত না হইতে পারে, অথবা লোকহিতকর ব্যবস্থাগুলি প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, তাহার আয়োজন করা ;

(১৬) যাহাতে ইংরাজ প্রভৃতি বিদেশীয়গণের জীবনযাত্রায় ভারতীয়গণের দ্বারা যথাসম্ভব সহায়তা সাধিত হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা ;

(১৭) যাহাতে গভর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যের সহিত সংঘর্ষের উদ্ভব হইতে পারে, তাহা যথাসম্ভব বর্জ্জন করা ;

(১৮) যথার্থ লোকহিতকর গভর্ণমেণ্টের পরিচালনা করিতে হইলে গভর্ণমেণ্টের পক্ষেই যে এই শ্রেণীর জাতীয় মহাসম্মেলন একান্ত প্রয়োজন, তাহা ক্রমশঃ গভর্ণমেণ্টের পরিচালকদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া এবং তাঁহারা যাহাতে জাতীয় মহাসম্মেলনের ব্যয়সঙ্কুলনার্থ অর্থ সাহায্য করিতে সম্মত হন, তাহার চেষ্টা করা ;

(১৯) দেশের মধ্যে অপরাপর যে সমস্ত সাধারণ হিতকর প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান আছে,সেগুলি যাহাতে কংগ্রেসের সহিত মিলিত হয়, তাহার চেষ্টা করা।

ইহা ছাড়া প্রকৃত জাতীয় সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাকার্য্যে নিম্নলিখিত সত্যসমূহ স্মরণ রাখিতে হইবে :—

(১) কংগ্রেসের সংগঠন যাহাতে গ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে প্রত্যেক গ্রামে, ইউনিয়ন-বোর্ডে, মহকুমায় এবং জিলায় কংগ্রেসের শাখা স্থাপন করিবার প্রয়োজন হইবে ;

(২) কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও কর্ম্মতালিকা সফল করিবার জন্য যাহা যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহার দায়িত্বভার যাহাতে স্থানে স্থানে এক এক জন যথোপযুক্ত বিদ্যা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির উপর অর্পিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে ;

(৩) যাহাতে কর্ম্মকারের কার্য্য কুম্ভকারের হস্তে, অথবা কুম্ভকারের কার্য্য কর্ম্মকারের হস্তে অর্পিত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে :

(৪) নির্লোভ ও সত্যপরায়ণ লোক যাহাতে কংগ্রেসের দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মভার প্রাপ্ত হন, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে যাঁহারা স্ব স্ব পরিবারের জীবিকার্জ্জনের জন্য বৃত্তিহীন অথবা যাঁহারা স্ব স্ব বৃত্তিদ্বারা নিজ পরিবারের ভরণপোষণোপযোগী যথেষ্ট উপার্জ্জনে অক্ষম, তাঁহারা যাহাতে কংগ্রেসের কোন দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার প্রাপ্ত না হন, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে। যাঁহারা নিজ পরিবারের ভরণপোষণে অক্ষম, তাঁহাদের হাতে জনসাধারণের কার্য্য অর্পিত হইলে অনাচার প্রবিষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকিবে ;

(৫) যাঁহারা নিজ পরিবারের ভরণপোষণে অক্ষম, তাঁহাদের হাতে কংগ্রেসের কোন কার্য্যভার অর্পণ করিতে হইলে, তাঁহারা যাহাতে নিজ পরিবারের ভরণপোষণ করিবার উপযোগী বেতন পাইতে পারেন, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইতে হইবে।

প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল্ কংগ্রেসের গ্রাম্য ও ইউনিয়ন বোর্ড শাখাসমূহের নির্ব্বাচন ও গঠনপ্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত এবং তাহাদের কার্য্য ও দায়িত্ব কি হইলে মূল উদ্দেশ্য সুগঠিত হইতে পারে, তাহা বঙ্গশ্রীর চৈত্র-সংখ্যায় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

মহকুমা, জিলা ও প্রাদেশিক শাখাসমূহের এবং কেন্দ্রীয় সভার কি কি কার্য্য ও দায়িত্ব হওয়া উচিত, তাহা গত সংখ্যায় সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইয়াছে।

ইহার পর মহকুমা-শাখা প্রভৃতির গঠন ও কার্য্য-প্রণালী বিস্তৃতভাবে আলোচ্য।

প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেসের মহকুমা-শাখাসমূহের সংগঠন ও দায়িত্ব

যে যে দায়িত্ব মহকুমা-শাখাগুলির হস্তে ন্যস্ত হওয়া উচিত তাহা গত সংখ্যায় দেখান হইয়াছে। তাহাদের নাম :

কোথাও শীকারের আলাপ হইলেই বিজ্ঞের মত মতামত জাহির করিতে ছাড়িতাম না, অর্থাৎ সোরগোল খুব, কাজে "অষ্টরম্ভা"। তখন পর্য্যন্ত বন্দুক ছোঁড়াই হয় নাই। অনেক বাঘ গল্পের দাপটে মুখেই মরিতে লাগিল।

তখন সবে সি. আই. সি. রেলের নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে, সমস্ত মালপত্র চালাইয়ের বড়গোছ কণ্ট্রাক্ট পাওয়া গেল। সেই সময় খ্যাতনামা শীকারী বাবু বিজয়কুমার সেন, ডেপুটী কলেক্টর সি. আই. সি-র "ল্যাণ্ড একুইজিসনের" কার্য্য করিতেছেন। বিজয় দা আমাদের বড় স্নেহ করিতেন এবং শীকারে প্রায়ই তাঁহার সঙ্গে ঘুরিতাম। একদিন বিল আদায় করিতে টোরী যাইতে হইল, টাকার বড় প্রয়োজন; প্রায়ই এইরূপ যাইতে হইত। সাহেব বলিলেন, কেসিয়ার লাতেহার ট্রেজারী হইতে টাকা আনিতে গিয়াছেন; আগামী কল্য সন্ধ্যায় ফিরিবেন। তবে যদি আমি নিজের কারে তাঁহাকে লইয়া আসি, তবে সেই দিনই টাকা পাইতে পারি। গরজ বড় বালাই! লাতেহার গিয়া ক্যাস শুদ্ধ কেসিয়ারকে লইয়া সন্ধ্যায় রওনা হওয়া গেল। আমরা পিছনের সিটে, ড্রাইভার ছিল এক শিখ ছোকরা এবং তাহার পাশে বন্দুকধারী এক পলিশ গার্ড (বাকি গার্ড পরের দিন আসিবে)। ক্যাসচেষ্টের চাপে পিছনে আমাদের স্থাণুবৎ অচল অবস্থা, নড়িবার বা পাশ ফিরিবার উপায় নাই। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, তখনও গাড়ীর আলো জ্বালা হয় নাই। হঠাৎ ড্রাইভার মহা চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে সিপাহিপুঙ্গবের "রোকো, রোকো" রবে মেদিনী কম্পান্বিত-কলেবরা। পিছন হইতে আবছায়া দেখিলাম একটা প্রকাণ্ড জানোয়ার, বোধ হইল গরু, রাস্তায় শুইয়া আছে, এবং গাড়ী ধীরে ধীরে গিয়া তাহার উপর চড়িয়া পড়িল। পরমুহূর্ত্তেই গাড়ী কাৎ হইয়া, রাস্তার ধারে ধরাশয্যা লইল, আমরা উঁকি মারিয়া দেখিলাম এক প্রকাণ্ড বাঘ গাড়ীর নীচ হইতে বাহির হইয়া পুচ্ছ তুলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় মারিতেছে। ভাগ্যে কোনও পক্ষেই আঘাত লাগে নাই। কোনও রূপে, কারণ গাড়ী তখনও কাৎ—গাড়ী হইতে বাহির হইয়া সিপাহিকে প্রশ্ন করা গেল "সের্‌কো গোলি নেহি চালায়া কাহে?" অনেকবার ঢোঁক গিলিবার পর তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল এবং বলিল, "ডাকু চোর, বদমাসকো সাথ লড় সকতে হেঁ, জবরদস্ত সের পর গোলি চালানেকো 'ট্রেনিং' নেহি মিলা"। হায়রে ট্রেনিং! আর হায়রে, ট্রেনিংদাতা, কি ট্রেনিংই দিয়াছ! কোনও রূপে লোকজন সংগ্রহের পর গাড়ী সোজা করিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হওয়া গেল। ইঞ্জিনীয়ার সাহেব শুনিয়া মন্তব্য করিলেন, "Mr. Banerjee, you should always carry a gun." সেই রাত্রেই মোটা টাকা লইয়া দুর্গম পাহাড় ও জঙ্গলের রাস্তায় ৬০ মাইল পথ, রাঁচী প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। পরদিন কার্য্যসূত্রে জেলার মালিক, ডেপুটী কমিশনার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। বেশ রসান দিয়া, এডভেঞ্চারের গল্প করিলাম, শুনিয়া বলিলেন, "Have a gun with you." ইহার পর রাইফেলের হুকুম-নামার জন্ত দরখাস্ত দাখিল করিতে বিলম্ব হইল না।

বন্ধুদের মত অনুরূপ হইলেও আমি দেখি, আমার বরাৎ পাহাড়চাপা। বড় আশা—রাইফেল খরিদ মাত্রেই বড় বড় বাঘ মারিয়া একটা কেষ্ট-বিষ্টুর মধ্যে গণ্য হইয়া পড়িব। সাধে পড়িল বাদ। পরদিনই সহরে গোলযোগের সূত্রপাত হওয়ায় ৪০০।৫০০ শত বন্দুকের লাইসেন্সের দরখাস্ত পড়িল। কত রায় সাহেব, রায় বাহাদুর ইত্যাদির দরখাস্ত পত্রপাঠ না মঞ্জুর হইতে লাগিল, লাইসেন্সের হুকুম একজনেরও মিলিল না, শুধু আমার দরখাস্ত সাহেবের কাছে আটক পড়িয়া আছে। মনে মনে বলিলাম, "এরেই বলে বরাৎ।" কিন্তু প্রায় এক মাস পরে হুকুম মিলিল, দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়াছে; সাত দিনের মধ্যে বন্দুক আসিয়া পৌঁছিল।

ঝালদার জমিদার প্রকৃত পক্ষে একজন উচ্চদরের শিকারী। বন্দুক আসামাত্র ঝালদা ছুটিলাম। জমিদার সাহেব অনেক উপদেশ দিলেন। এবং নির্দ্দেশ দিলেন যে, যতদিন অন্ততঃ ২০০ শত গজ দূর হইতে ১০টার মধ্যে ১০ বার bull's eye hit করিতে না পারি, যেন শীকারে প্রবৃত্ত না হই। শুনা ছিল, এক গানের ওস্তাদের সাকরেদেরা বৎসরের পর বৎসর শুধু সা, রে, গা, মা করিয়া গলা ফাটাইত, তবু গান গাহিবার হুকুম-নামা পাইত না, সেই সা-রে-গা-মা, মা-গা-রে-সা। কেহ যদি আপন মনে গুন গুন করিয়াও গান গাহিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গেই গলাধাক্কা। আমারও অবস্থা তদ্রূপ হইল, ২০০ গজ দূর হইতে ১০টার মধ্যে ১০টা bull's eye হইল জপমালা। গুলির আন্ধ হইতে [illegible]

সরকারী পক্ষ হইতে রাইফেলের গুলি খরিদ হইলেই তদারক হয়। সব্‌ ইনস্পেক্টর বেচারা হয়রাণ হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "এত গুলি করেন কি?" উত্তরে বলিলাম, "গুলির ভক্ষণই সব চেয়ে প্রশস্ত ব্যবহার নয় কি?" তিনি খুব হাসিলেন। এ 'গুলি' সে 'গুলি' নয় তাই রক্ষা, নহিলে হয়ত আবগারী বিভাগের বড় সাহেব হইয়া পড়িতাম। ১০টায় ১০টা যেদিন হইল, সে কি আনন্দ! এই ১০টায় ১০টা "ষণ্ডের চক্ষু", শীকারে যে কতখানি প্রতিষ্ঠা ও সাফল্য আনে, তাহা পরে বুঝিয়াছি।

বিজয় দা ও আমি একসঙ্গে রাঁচী ছাড়িয়া টোরী গেলাম: তিনি সেখানে "বোস্‌" করিতে বসিলেন আমি গেলাম ডাল-টনগঞ্জে নিজের ধান্দায়, রাত্রে ফিরিয়া একত্রে থাকা যাইবে। একা ফিরিতেছি, সঙ্গে বন্দুক বোঝাই করা আছে, আজ একবার মিষ্টার "ষ্ট্রাইপস্‌"কে পাইলে হয়। বেশ মনে আছে, টোরী হইতে তখন মাইল ১০ দূরে একটা উৎরাই নামিবার কালে বিপরীত চড়াইয়ের মাঝামাঝি একটা উজ্জ্বল আলোক দেখিলাম; গরুর গাড়ীর আলো মনে করিয়া সজোরে "ভেঁপু" বাজাইলাম, অর্থাৎ জানান হইল মোটর আসিতেছে, "বগল্‌" যাও। যে স্থানে গাড়ী দেখিয়াছিলাম, সেখানে আসিয়া দেখি কিছুই নাই, একটু আশ্চর্য্য হইলাম, এই জঙ্গলে গাড়ীটা কি উবিয়া গেল? খুব আস্তেই চলিয়াছি, এমন সময় দেখি একটা ছোট হায়না রাস্তা পার হইয়া একটা ঝোপের পাশ দিয়া যাইতেছে। হায়না—ক্ষতি কি? প্রথম শীকারে এত বাছ-বিচার চলে না। বন্দুক উঠাইয়াই আওয়াজ, সঙ্গে সঙ্গে বেচারী বিনা বাক্যব্যয়ে ভবলীলা সাঙ্গ করিল। সাফল্য-গর্ব্বে ছুটিয়া শীকার উঠাইতে গেলাম, বন্দুক গাড়ীতেই পড়িয়া রহিল। গিয়া দেখি হায়না নহে। আশার অৰ্দ্ধেক ফল। দেড় হাত লম্বা ডোরাদার রয়েল বেঙ্গলের বাবা লোগ। ওঃ সে কি উৎকট, দারুণ, প্রাণঘাতী আনন্দ! যাহার হইয়াছে তিনিই বুঝিবেন। ল্যাজে ধরিয়া আনিয়া গাড়ীতে ফেলিয়া উৰ্দ্ধশ্বাসে দৌড়, একেবারে টোরী বাঙ্গলোয় হাজির। "বিজয় দা দেখুন কি মেরে এনেছি।" অতি আগ্রহে দাদা ছুটিয়া আসিলেন, শীকার দেখিয়া একেবারে গুম্‌! এ কি! তাঁরও হিংসে হইল না কি? মূর্খ, আনাড়ি আমি, বুঝি নাই, তাঁর মনে তখন কি ভাব হইতেছিল এবং তিনি আমায় কত স্নেহ করেন! তারপর যা গালাগাল, "হতভাগা, রাস্‌কেল", ইত্যাদি ইত্যাদি বিশেষণের ছড়াছড়ির সঙ্গে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "রাত্রে বাঘিনীর মুখের সামনে থেকে তার বাচ্ছা মেরে এনেছ?" "পুনর্জ্জন্ম" কথাটা অনেকবারই উল্লেখ করিলেন, "বরাৎ জোর", "ভাগ্য সুপ্রসন্ন"—কিছুই বাদ দিলেন না। শুনিলাম, মরিবার পূর্ব্বে শীকার একটু "টু" শব্দ করিতে সক্ষম হইলে আমায় সে অবস্থায় রক্ষা করা না কি সৃষ্টিকর্ত্তারও অসাধ্য ছিল। "দেখো বাঘিনী কি কাণ্ড করে।" হইলও তাই, দিনে দুপুরে গাড়ী চলা পর্য্যন্ত ব্যাঘ্রের দাপটে বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। সুখের বিষয় মাত্র ৭ দিন। অষ্টম দিনে বিজয় দা ও আমি গিয়া তাহার এক killএর উপর মাচা বাঁধিয়া বসিলাম। তখনও বেলা আছে, হঠাৎ দেখি আমাদের দিকে পিছন করিয়া প্রকাণ্ড বাঘ দুই ঝোপের মাঝে সোজা চলিয়া যাইতেছে। এ কি! বিজয় দা চুপ চাপ কেন? এখনই যে অদৃশ্য হইবে! "মারুন, শীঘ্র মারুন" বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিলাম। বাঘও তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া মাচার দিকে চাহিল। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক গর্জ্জিয়া উঠিল; বাঘ আছড়াইয়া মাটিতে পড়িল, দুইবার উঠিতে চেষ্টা করিল, দুইবার পদচতুষ্টয় সঞ্চালন করিল, তারপর সব স্থির। আনাড়ি শীকারী আমি অনেক পরামর্শ ও শিক্ষা লাভ করিয়া বাঘ লইয়া ফিরিলাম। সেই হইতে 'ভূত' আর স্কন্ধ হইতে নামে নাই।

একবার কয়েকটি বন্ধুর জন্য শীকারের বন্দোবস্ত করিতে হয়। পালামৌ জেলার অন্তর্গত এক স্থানে "ক্যাম্প" পড়িল। কুমার সাহেবের জঙ্গলে শীকার হইবে। তাঁহার পুত্রেরাও দলে যোগদান করিলেন। শীকারের আয়োজন খুব ভাল রকমই হইল। দলে একটি ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি বড় লম্বা লম্বা গল্প চালাইতে লাগিলেন; সব সময় তাঁর কথা বিশ্বাস করা দুরূহ হইয়া পড়ে। "নাগালের বাইরে, মাচায় বসে লোকে তাড়িয়ে আনা পশুকে বধ, একেই আপনারা শীকার বলেন? আমরা এমন শীকার করি না।" সর্ব্বনাশ! এযে একেবারে বজ্রাঘাতের ব্যবস্থা! দেখাই যাক্‌, শেষ পর্য্যন্ত জল কতদূর গড়ায়। ভদ্রলোক পড়িলেন আমারই ভাগে, অর্থাৎ স্থির হইল, তিনি আমার সহিত মাচায় বসিবেন। "বীট" (তাড়ান) আরম্ভ হইল, কিন্তু মাচায় বসিয়াও মুখের

মারিতং জগৎ-এর বিরাম নাই, বরং কথার দাপটে জানওয়ার যে সেদিকে ঘেঁসিবে না—বেশ বুঝিতেছিলাম। দু'চার বার মৃদু অনুযোগও করিলাম, ফল হইল না। এমন সময় দূরের মাচায় গুলি ছুটিল। এক মিনিট পরেই পাশের মাচা হইতেও ফায়ার হইল; সঙ্গে সঙ্গে সামনে ব্যাঘ্রগর্জ্জন। একটি শুষ্ক নালার ভিতর দিয়া বাঘ গা-ঢাকা দিয়া সরিবার মতলবে ছিল, হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজে আর আত্মগোপন করিতে পারিল না; আমাদের মাচা হইতে ৪০ গজ তফাতে নালা হইতে লাফাইয়া বাহির হইল। অতিথি নারায়ণ, সুতরাং অতিথিরই প্রথম চান্স—ভদ্রলোকটিকে ইঙ্গিতে বলিলাম, মারুন। প্রতি মুহূর্ত্তে "বিট্" আগাইয়া আসিতেছে, এর পর গুলি করা সমীচীন হইবে না। ভদ্রলোক যেন সম্মোহিত হইয়া চাহিয়া আছেন। হাত পা নাড়ার ক্ষমতাও নাই, তা গুলি করিবেন কি? বাঘ পালায়, আর এটিকেট রাখা চলে না, বন্দুক উঠাইলাম, এতক্ষণে তাঁর শক্তি ফিরিল, দুহাতে আমাকে বেষ্টন করিয়া প্রায় কাঁদিয়া বলিলেন, "আপনি করেন কি? ওযে সত্যিকারের বাঘ"। "রাখে কৃষ্ণ মারে কে"? বাঘ পলাইল। আমি হাসিব, কাঁদিব বা অতিথি-নারায়ণকেই গুলি করিব ভাবিয়া পাইলাম না। পরে জানিলাম, চিড়িয়াখানার খাঁচায় আবদ্ধ বাঘ ছাড়া এই তাঁর প্রথম সত্যিকারের ব্যাঘ্র দর্শন। কল্পনার প্রাবল্যে ভদ্রলোক মুখে বাঘ মারিতে ভালবাসেন। মায়া হইল, আর বিশেষ কিছু বলিলাম না। তিনি কিন্তু লজ্জায় জরুরী কার্য্যের অজুহাতে সেই দিনই দল হইতে সরিয়া পড়িলেন। এই লেখা যদি তাঁর চোখে পড়ে, তবে তাঁহাকে মানিতে হইবে, যতটা সম্ভব তাঁর মান বজায় রাখিয়াছি।

অতিথির গল্পটা হয় ত না বলিলেও চলিত; কিন্তু এইরূপ প্রবৃত্তিসম্পন্ন লোকের সঙ্গ—অন্য সময়ে অর্থাৎ বৈঠকখানায় বা ড্রয়িং-রুমে—যতই লোভনীয় হোক, শীকারের সময় যে কাম্য নয় বরং ত্যাজ্য, তাহা না বলিলে শীকারের যুদ্ধ-পর্ব্বের প্রধান কথাই বাদ পড়িয়া যাইবে, সেই জন্যই বলা বাহুল্য বিবেচনা করিলাম না।

ঐ অঞ্চলের আর একটি শীকারের গল্প বোধ হয় সুখপাঠ্য হইবে। এক বড় জমিদারের একজন বেতনভোগী শীকারী ছিল। প্রত্যহ প্রাতে তাহাকে গণনা করিয়া 'কারট্রিজ' দেওয়া হইত এবং সে জঙ্গলে ঘুরিয়া ছোট হরিণ, পক্ষী ইত্যাদি শীকার করিয়া আনিত। রাজা-উজিরের কথাই স্বতন্ত্র; প্রত্যহ মৃগয়ালব্ধ মাংস আহার করা চাই। যে কয়টি "কারট্রিজ" ফাঁকা যাইত, তাহার দাম শীকারীটির বেতন হইতে কাটিয়া লওয়া হইত। একদিন শীকারী বৈকালের দিকে দামোদরের ধারে (দামোদরের উৎপত্তি-স্থানের সন্নিকটে এবং তথায় দামোদর "দেওনদ" নামে অভিহিত) একটি ব্যাঘ্রের "মারি" হইয়াছে সন্ধান পাইল। মারি—মারী বা মহামারী নহে। বাঘ গৃহপালিত কোন পশু হত্যা করিলে, হত পশুকে 'মারি' বলে। মারি হইয়াছে বলিলে ইহাই বুঝিতে হয় যে, বাঘ পশুটিকে বধ করিয়াছে। বধ করিলে ভক্ষণ করিতে হয়। সুতরাং অনুমান করা হয় যে, বাঘ তাহার শীকারলব্ধ জীবকে ইচ্ছামত—ক্ষুধা অনুযায়ী ভক্ষণ করিতেছে। তখনও সেই শিকারীর কাছে ২টি কারট্রিজ আছে। একটি Ball (গুলি) এবং একটি ৪নং ছর্‌রা। শীকারী লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া নিকটস্থ গাছে উঠিয়া বসিল, আশা নেহাৎ পক্ষে একটা panther মারিয়া লইয়া যাইবে ও সকলকে আশ্চর্য্য করিয়া দিবে। ৫টার সময় 'মারি'র উপর আসিলেন প্রকাণ্ড "দক্ষিণা রায়"—পাকা ১০॥০ ফিট মাপের। শীকারী 'মরিয়া হইয়া' গুলি চালাইল, ব্যাঘ্র মাত্র তাহার দিকে একবার চাহিল, দন্তপংক্তি বিকশিত করিয়া হাঁক্ করিয়া আওয়াজ করিল, যেন বলিতে চাহে, "ভয়ে গাছে চড়িয়াছ বাপু, চুপ-চাপ বসিয়া থাক, এমন আওয়াজ কর ত ভাল হইবে না।" বাঘের গুলি লাগে নাই। বাঘ নিশ্চয়ই বহুকালের অভুক্ত, কারণ পুনরায় সে ভোজনে মন দিল। এদিকে শীকারী পড়িল বিপদে, বাঘ সারারাত্র আহারে ব্যস্ত থাকিবে, দারুণ শীতে, সারারাত্রি নদীর ধারে গাছের উপর তাহার প্রাণটা টিঁকিবে কি? প্রথমে সে চেঁচামেচি করিয়া বাঘ তাড়াইবার চেষ্টা করিল; সে যত জোরে চীৎকার করে বাঘ তার বহু গুণ বেশী জোরে হুঙ্কার ছাড়ে। এদিকে প্রায় অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। শীকারী বাঘকে তাড়াইবার জন্য বেকুবের মত তার শেষ সম্বল ৪ নম্বরের ছর্‌রা দাগিল, আশা ছিল, সামান্য আহত হইয়া বাঘ ভয়ে পলাইবে। উল্টা বুঝিলি রাম। ঘোর হুঙ্কার ছাড়িয়া বাঘ

মারিল শীকারীকে গাছ হইতে ফল পাড়ার মত টানিয়া নামাইতে।

রাত্রি ১১টায় ডাক-বাঙ্গলায় লেপমুড়ি দিয়া সুখে নিদ্রামগ্ন, এমন সময় "লালের" দল (বড় জমিদারের পুত্রেরা সব "লাল" নামে অভিহিত হন) আসিয়া সোরগোল করিয়া ঘুম ভাঙ্গাইল। এক রাখাল (যে শীকারীকে বাঘের মারির সন্ধান দিয়াছিল) শীকারীর দুরবস্থার সংবাদ 'ভেজ' দিয়াছে; সুতরাং শীকারী বেচারার কি হইল, তখনই দেখিতে যাইতে হইবে। তখন অনেক পোড় খাইয়াছি, অন্ধকারে হয়ত-আহত ব্যাঘ্রের পিছনে যাইতে প্রস্তুত নহি—জানাইলাম। তাঁহারা ৯টা বন্দুকের দুটি করিয়া আঠারটি নল এবং আমার রাইফেলের ৫টি গুলির দোহাই দিলেন; আমার এক কথা, আলো না হইলে "কভি নেহি জায়েঙ্গে"। অতি প্রত্যুষে "অকুস্থলে" যাওয়া গেল। রাস্তায় মোটর ছাড়িয়া প্রায় মাইল খানেক যাইবার পর রাখাল দূরে এক নাতিবৃহৎ বৃক্ষ নির্দ্দেশ করিল। দেখা গেল—বৃক্ষের উপরে শীকারী নিজেকে পাগড়ী দ্বারা এক ডালে বেষ্টন করিয়া অর্দ্ধমৃত অবস্থায় আছে। পরীক্ষা করিলাম, বায়ু আমাদের অনুকূল। ছোট, ছোট কাঁটা ঝোপ ইতস্ততঃ রহিয়াছে, মাঝে মাঝে কয়েকটি গাছও আছে, জমি প্রস্তরময়। ঝোপের আড়ালে যতদূর সম্ভব প্রচ্ছন্ন অবস্থায় অতি সাবধানে অগ্রসর হওয়া গেল। তখনও গাছের তলা দেখা যায় না। লালেরা বীরদর্পে অগ্রসর হইতে প্রস্তুত। আমার কিন্তু মনে হইল, শীকারী ইঙ্গিতে আমাদিগকে আর অগ্রসর হইতে নিষেধ করিতেছে। তখন প্রায় ৬০ গজ দূরে, সেইখানেই সকলকে গা-ঢাকা দিয়া অপেক্ষা করিতে বাধ্য করিলাম। হঠাৎ ভীষণ ব্যাঘ্রগর্জ্জন কাণে আসিল ও দেখা গেল, প্রকাণ্ড বাঘ লাফাইয়া শীকারীকে ধরিতে চেষ্টা করিতেছে। Council of War হইয়া গেল। পুনরায় লম্ফের সঙ্গেই মারিতে হইবে। সবাই প্রস্তুত হইয়া দণ্ডায়মান। পুনরায় হুঙ্কার ও লম্ফের সঙ্গে সঙ্গেই ১০টি বন্দুক গর্জ্জিয়া উঠিল। লম্ফের মধ্যপথে অতবড় প্রকাণ্ড বাঘ পিছন দিকে "ডিগবাজী" খাইয়া মাটিতে পড়িয়া গড়াইতে গড়াইতে গিয়া এক পাথরে আটক খাইল, তারপর সব স্থির, এক সঙ্গে ১০টি গুলির মার হজম করা সম্ভব নহে। [illegible] মৃত ব্যাঘ্রের নিকট যাওয়া গেল। পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, আশ্চর্য্য, মাত্র একটি গুলি স্কন্ধ ও মস্তকের সন্ধিস্থলে লাগিয়াছে, আর সব ফাঁক। "বড় লাল" পরীক্ষা করিয়া স্থির করিলেন—rifle shoot. এইবার বেচারী শিকারীর উদ্ধারের জন্য রাখালকে গাছে উঠান হইল, তাহার নিজে নামিবার অবস্থা নাই। রাখাল নামিয়া আসিয়া বলিল, "হাম্ নেহি স্থাকে গা" (আমি পারিব না)। ধমক, চড়-চাপড় খাইয়া কাঁদিয়া বলিল, "হুজুর হাম মেহথর নেহি, ময়লা, পিসাব সে ভরা হুয়া, উসকো উতারে কইসে?" ভাগ্যে কাছে নদী ছিল, তাই রক্ষা। আশ্রয়-বৃক্ষের সর্ব্বোচ্চ ডালে চড়িয়াও যদি ব্যাঘ্রের লম্ফ হইতে, মাত্র কয়েক হাতের জন্য রক্ষা পাওয়া যায় ও সারা রাত্র এই বিভীষিকা সমানে চলে, তবে অনেকের অবস্থাই এইরূপ হয়। এই ব্যাপার হইতে ৪নং ছবিতে আহত বাঘের কোপের পরিমাপের একটা ধারণা করা যায়। সারা রাত তাহার রাগ পড়ে নাই, এমন কি দিনের আলো হওয়া পর্যন্ত সে আস্ফালন চালাইয়াছে। মাঝে মাঝে আহার্য্য গিলিয়াছে ও শিকারীকে মারিয়া নূতন আহার্য্যের চেষ্টা সমানে করিয়াছে।

অনেকে মনে করেন, ভল্লুকের বড় কঠিন প্রাণ, অনেক গুলি হজম করিয়া তবে মরে। এটা ভুল ধারণা। প্রকাণ্ড ঋক্ষ মাত্র একটি গুলিতে ভূমি চুম্বন করিয়াছে আর উঠে নাই, ইহা অনেক বারই দেখা গিয়াছে। গুলি লাগার স্থানের উপর নির্ভর করে। প্রথম গুলি vital spotএ না লাগিলে তারপর উপর্য্যুপরি গুলির বিশেষ ফল তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি হয় না। আমার মনে হয়; প্রথম আঘাতের পর shock-(আঘাত)-এর অনুভূতি লোপ পায়, কাজেই আহত পশু তারপর অনেকক্ষণ যুঝিতে পারে, যতক্ষণ রক্তক্ষয়ে দুর্ব্বল না হয়, বা হৃদয়, ফুস্ফুস্ বা মস্তিষ্কে গুলি লাগায় মৃত্যু না ঘটে। ডোরাদার বাঘ অপেক্ষা, চিতাবাঘের যুঝিবার শক্তি (tenacity) অধিক, আবার তাহা অপেক্ষা ভালুককে আরও বেশী সহিষ্ণু (tenacious) বলা যায়। বড়বাঘ আহত হইয়া অতি ভয়ঙ্কর হয় বটে, কিন্তু তার দাপট অধিক কাল স্থায়ী হয় না, শীঘ্রই shock-এর ফলে নির্জ্জীব হইয়া পড়ে। চিতাবাঘ ও ভালুক যতক্ষণ পর্য্যন্ত না মরণ-মার-প্রাপ্ত (vitally hit) হয়, তার ভীষণতা (ferocity) সমানে বজায় থাকে।

রলের পুল-নির্ম্মাণে সিমেন্টের গোলযোগ হওয়ায় ইঞ্জিনিয়ার নিজে যাইয়া সারজমিন তদারক করিবেন, ারকে (অধীন লেখক) উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ ান। সমস্ত দিন কাজে ব্যস্ত থাকিয়া সন্ধ্যার ঠিক একটি ছোট ডাকবাঙ্গলায় ফিরিলাম, তখনও কাপড় নাই। চৌকিদার ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "হুজুর ভেড় ়ক) মারিয়ে গা ?" বিনা বাক্যব্যয়ে বন্দুক ও হাতে যে 'কারট্রিজ' উঠিল, লইয়া তাহার পিছনে ছুটিয়া হইলাম। ডাকবাঙ্গলার "হাতা", তার পরই বোর্ডের রাস্তা, তার ওপারে উঁচু জমি, একটি শুষ্ক ার পরই কয়েক খানি টিনের চালা, সেখানে গ্রাম্য তার পর জঙ্গল; ডাকবাঙ্গলা হইতে হাট জ মাত্র হইবে। রাস্তা পার হইয়াই দেখি একটি ভালুক একটা চালার নীচ হইতে বাহির হইতেছে। করিলাম, বিকট চীৎকার করিয়া ভালুক পড়িল, কিন্তু ৎ উঠিয়া charge করিল তিন পায়ে, সামনের একটি র্ণ হইয়া গিয়াছে। যখন নালার ধারে আসিল, পুনরায় করিলাম। ভালুক সশব্দে নালার ভিতর পড়িল। া দেখিতে গেলাম, দেখি—ভালুক আঁচড়াইয়া নালার উঠিতেছে, মস্তক লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলাম, হইল "ক্লিক", চেম্বার খালি, গুলি নাই। তখন , পিছনে চাহিয়া দেখি—ভালুকও তাড়া করিয়াছে, তিন পায়ে বলিয়া তত জোরে আসিতে পারিতেছে না। ch-এ একটি গুলি ভরিয়া পুনরায় মারিলাম, ভালুক উপর আছড়াইয়া পড়িল, কিন্তু পর মুহূর্ত্তে উঠিয়া আসিতে লাগিল। আমি ছুটিয়া গিয়া ডাকবাঙ্গলার য় উঠিলাম, হাতে আর একটি গুলি। যখন ভালুক হাত দূরে, শেষ গুলি মস্তকে করিলাম, ভালুকের যবনিকা পড়িল। প্রথম গুলি, সামনের পায়ে সহিত সন্ধিস্থানে, দ্বিতীয় গুলি ঘাড়ের ঠিক নীচে ঘেঁসিয়া গিয়াছে। তৃতীয় গুলি পেটে লাগায় দিকের পেট ফাটিয়া নাড়ী বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি charge করিতে ক্ষান্ত হয় নাই। পরে জানা It was a killer" (নরঘাতক)। ঐ গ্রামের টি লোককে পূর্ব্বে জখম বা হত্যা করিয়াছে।

আজ কাল রাত্রে মোটর-গাড়ীর spot light লইয়া শীকারের অত্যন্ত প্রচলন হইয়াছে। ঐ রূপ শীকার বন্ধ করিবার জন্য এক পক্ষ হইতে একটা আন্দোলনও চলিতেছে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত, আমার বিশ্বাস, ঐরূপ শীকার অবাধে চলিতেছে। শীকারবহুল স্থানে রাত্রে ধীরে ধীরে গাড়ী চালান হয় ও একজন spot light লইয়া চারিপাশে ঘুরাইয়া দেখিতে থাকেন। অপর শীকারীরা প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন। আশে পাশে কোনও জন্তুর উপর আলো পড়িলেই তাহার চক্ষু জ্বলিয়া উঠে ও গাড়ী বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার উপর আলোকসম্পাৎ সর্ব্বক্ষণ বজায় রাখা হয়। কাছে হইলে জন্তুটিকে বেশ দেখা যায় এবং গাড়ী হইতেই গুলি করা হয়; দূরে হইলে গাড়ী যতদূর সম্ভব নিকটে লইয়া গিয়া পরে সুবিধামত গুলি করা চলে। জন্তুর চোখের উজ্জ্বলতা ও বর্ণের পার্থক্যে কোন্ জাতীয় জন্তু বোঝা যায় এবং হরিণ ইত্যাদি হইলে অনেক শীকারী মোটর হইতে নামিয়া অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া নিকটস্থ হইয়া গুলি করেন।

রবিখন্দের সময় রাস্তার ধারের ক্ষেত কিংবা তাহার আশে পাশে এইরূপে যথেষ্ট হরিণ মারা পড়িয়া থাকে। ইদানীং এইরূপ শীকারের এত চলন হইয়াছে যে, দলে দলে শীকারী রাত্রির পর রাত্রি নিয়মিতভাবে ঘুরিয়া বেড়ান এবং শীকার অপেক্ষা বেশীর ভাগই পশুদের অযথা আহত করিয়া বা তাড়া দিয়া অত্যন্ত shy করিয়া দিয়াছেন, ফলে অনেক ঘোরাঘুরি না করিলে আর জানওয়ার পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে এই ভাবে যথেষ্ট পরিমাণে শীকার পাওয়া যাইত। হরিণ বা ব্যাঘ্রজাতীয় পশু আলো দেখিয়া একরূপ সম্মোহিত হইয়া পড়ে। আলো দেখাইয়া বহুদূরস্থিত হরিণকে ক্রমশঃ নিকটে আনা যায়; কিন্তু ভালুক ও বন্যশূকর আলো দেখিলেই বেশীর ভাগ ছুটিয়া পলাইতে চেষ্টা করে। এইরূপ শীকারে বড় বা মাত্র গুটি দুই মারা পড়িতে দেখিয়াছি। একটি সম্প্রতি বাবু তারক মল্লিক হাজারিবাগ হইতে মারিয়া আনিয়াছেন দ্বিতীয়টিও হাজারিবাগের নিকট মিঃ ওয়েকফিল্ড মারেন, সেটি Albino ছিল। চিতা, সাম্বর spotted deer চিনকারা, নীলগাই, ভালুক, বন্যশূকর এরূপে অনেক মারা যায়। এইরূপ শীকারের কোন স্থিরতা নাই। সমস্ত রাত্রি

ঘুরিয়া হয়ত কিছুই মিলিল না; আবার কোনও দিন হয়ত এত শীকার হইল যে, গাড়ীতে স্থান সঙ্কুলান হয় না। Spot light লইয়া শীকার, ছোটনাগপুর অঞ্চলে বহুকাল হইতে চলিত। "দিরিঘাটী" শীকারের উন্নত সংস্করণ বলা চলে। বারান্তরে "দিরিঘাটী" সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

একদিন কয়েকটি বন্ধুর উপরোধ এড়াইতে না পারিয়া রাত্রে বাধ্য হইয়া শীকারে যাইতে হইল। হাজারিবাগ হইতে বরহি হইয়া চৌপারাণ ও পরে চাতরা রোড ধরিয়া প্রায় চাতরার নিকট গিয়াও কিছু পাওয়া গেল না। ঠিক চাতরায় প্রবেশ করিবার মুখে ডাকবাঙ্গলার সামনের মাঠে ৫টি চিন্‌কারা চরিতেছে লক্ষ্য করা গেল। বন্দুক লইয়া গা ঢাকা দিয়া একটি নালার মধ্যে লুকাইয়া গুলি চালান আরম্ভ হইল। এক, দুই, তিনটি হরিণ ধরাশায়ী হইল, বাকী দুটি ছুটাছুটি আরম্ভ করিল; একটির উপর spot light সমানে ঘুরিতেছে। গুড়ুম করিয়া বন্দুকের আওয়াজ হওয়া মাত্র হরিণ মাটিতে পড়িল, কিন্তু অপরটি অন্ধকারে ছুটিয়া নালার নিকট দিয়া যাইতেছিল, আওয়াজ হইবামাত্র ভয় পাইয়া এক লম্ফে আসিয়া পড়িল বন্দুকধারী শীকারীর উপর; ফলে শীকারী, হরিণ, বন্দুক সব নালার মধ্যে "কুমড়ো গড়াগড়ি"। সৌভাগ্যের বিষয় হরিণ নীচে ও শীকারী উপরে। শত্রুর মুখে আদি ও অকৃত্রিম ছাই দিয়া এই ১৪ ষ্টোন বোঝার চাপে বেচারা হরিণ শুধু বিরাট চীৎকার ছাড়া আর বিশেষ কিছু করিবার সুযোগ পায় নাই। সোরগোলে গাড়ীর অপর সকলে আসিয়া পড়িলেন, তখন হরিণকে ঠাসিয়া ধরা হইয়াছে। সঙ্গে একজন মুসলমান ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি বাক্যব্যয় না করিয়া চটপট তাহাকে "হালাল" করিয়া ফেলিলেন। ৫টির মধ্যে ৫টিই মরিল। বন্ধুরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। এই ভাবে শীকারের সাফল্য মোটরচালক ও spot light-এর পরিচালক, এই উভয়ের কৃতিত্ব ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে।

বর্ষার ঠিক পূর্ব্বেই জঙ্গলে সব জল শুকাইয়া যায়। মাত্র দু' এক স্থানে ঝরণায় সামান্য জল থাকে। জীবমাত্রেই জল পান না করিয়া থাকিতে পারে না। ঐ সময়ে জলের উপর মাচা বাঁধিয়া রাত্রে অনেকে শীকার করেন। সব জন্তুই শীকারের জলে আসিতে বাধ্য হয়। প্রথম দিন মাচা লক্ষ্য করিতে পারিলে, জলে নামিতে পশুরা ভীত হয়, কিন্তু ধৈর্য্য ধরিয়া নিয়মিতভাবে ২।৩ দিন বসিলে যথেচ্ছা শীকার সুনিশ্চিত। অবশ্য সাবধান হইতে হইবে যে, পাঁচ সাত মাইলের মধ্যে আর কোথাও যেন জল না মেলে। যদি কাছাকাছি অন্য ঝরণা থাকে, ভারী প্রস্তরাদি দিয়া জল একেবারে এমন ভাবে ঢাকিয়া দিতে হয়, যাহাতে তাহারা পান করিতে না পারে।

কলিকাতা হইতে কর্ম্মসূত্রে এক ইংরাজ বন্ধু হাজারিবাগ যান। কাজকর্ম্ম শেষ হইবার পর ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, একটি বড় শিং শুদ্ধ সাম্বর মারিয়া দিলে পরদিন তিনি তাহার চামড়া, মাথা এবং কিছু মাংস কলিকাতা লইয়া যাইতে পারিলে কৃতার্থ হইবেন। তথাস্তু। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই উপর জঙ্গলের মধ্যে এক মাচায় গিয়া বসা হইল। একটি ডুমুর গাছে বাঁধা হইয়াছিল এবং গাছ তখন ভরা। প্রথমেই আসিল এক ভালুক, জলপানের পর সে গাছে উঠিবে রসাল ডুমুর খাইতে, এদিকে আমরা গাছের উপর জমকাইয়া বসিয়া আছি। গাছের নীচে জুতা খুলিয়া উঠিয়াছিলাম। তার প্রথম আক্রোশ পড়িল জুতার উপর। কিছু দূর সরিয়া যায়, আবার গোঁ গোঁ করিতে করিতে ফিরিয়া আসে ও জুতাজোড়া (প্রায় নূতনই ছিল) লইয়া টানাটানি করে। একপাটি মুখে করিয়া চলিয়া গিয়া দূরে ফেলিয়া আসিল, অপরটি আমারই চোখের সামনে ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিল। যদিও সম্বর ছাড়া অপর কিছু মারা সেদিন নিষিদ্ধ বলিয়া নিজেই ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, কিন্তু এই বর্ব্বর ভালুকের দুর্ব্বিনীত ব্যবহার অসহ্য হইল। দুই চারিবার ভয় দেখাইয়া তাড়াইবার জন্য তাহার উপর টর্চ্চের আলো দিলাম। ফল হইল না, বরং বাড়াবাড়ি উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। শেষ দুইটি গুলি খাইয়া বেচারা, "কৃষ্ণের জীব" "কৃষ্ণপ্রাপ্ত" হইয়া নিজেও শান্তি পাইল, আমাদেরও শান্তি দিল। বন্দুকের আওয়াজ, আহত ভালুকের চীৎকার, আমাদের অল্পবিস্তর সোরগোল ও পরে জলের ধারে পড়িয়া থাকা ভালুকের মৃতদেহ অপর জানোয়ারদের সন্ত্রস্ত করিল। গা ঢাকা দিয়া দূরে দূরে ডাকিতে লাগিল, জলের কাছে ঘেঁসিল না। ভোর হইল, সাম্বর মারার আশায় নিরাশ হইয়া মাচা হইতে নামিয়া পড়িলাম। তিন মাইল দূর গ্রাম হইতে

—আর মা, জান, আবার আজ ওরা ফ্রেডারিক স্তাওাসকে নিয়ে এমনি ক্ষেপাচ্ছিল। তুমি ত' জান তাকে?

—হাঁ, জানে সে তাকে। সেই কুঞ্চিত-কেশ সুশ্রী ছেলেটির পানে তাকিয়ে তার নিজের মন কতদিন যে ব্যথায় ভারী হ'য়ে উঠেছে! ছেলেটির মাকেও সে জানত; সেই অবিবেচক যে কোথায় গেল!

—ছেলেগুলো তাকে ভারী বিরক্ত করছিল মা। তারা আবার তাকে তার মার সম্বন্ধে কি-সব বলেছে, সে তো শেষে রেগে কাঁই হয়ে সব্বাইকে মারতে ছুটল। আর ছেলেগুলো হো-হো করে' হাসতে লাগল।

—সত্যি?

কথাটি বলতে তার গলার স্বর কেঁপে উঠল, কেমন এক অদ্ভুত রকমের দৃষ্টিতে সে তার ছেলের মুখের পানে নিষ্পলক ভাবে তাকিয়ে রইল।

—আচ্ছা, আমাদের সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতে পারে না, না মা? ঐ ছেলেগুলো সব্বাইকে কিছু না কিছু বলে ক্ষেপায়, কিন্তু কেউ কখনো তোমার সম্বন্ধে কিছু বলে না।—ছেলে গর্ব্বভরে বলে।

হঠাৎ সে বসে পড়ে তার ছেলের পাশে নতজানু হয়ে এবং তার মাথাটিকে রাখে ছেলের ছোট্ট কাঁধখানির উপর।

এ ধরণের আদর ছেলের অভ্যস্ত আছে, সে নিজের বাহু দু'খানি দিয়ে মায়ের গলাটি জড়িয়ে ধরে। চিরদিনই বড় ভাব এই মা ও ছেলের!

মা শেষে ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করে নেয়।

—তুমি কোথাও বেরুচ্ছ না কি মা?

—না।—উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের কোটটি... সে বলে,—না, বাবা, আমি বেরুই নি।

আগাগোড়া সে একেবারে সাদা হ'য়ে... সুপুষ্ট অধর দুটি দৃঢ়-সংবদ্ধ, এবং নিশ্বাস... উঠেছে। কিন্তু, যুদ্ধের অবসান হ'য়ে গেছে... হয়েছে—হাঁ, চিরদিনের জন্য জয়ী হ'য়েছে সে।

আশ্চর্য্য! কেমন করে' একটা মুহূর্ত্তের ... পেরেছিল যে, ঐ ছেলেটির সঙ্গে চিরদিন ... চোখো-চোখি তাকাতে পারার সৌভাগ্যটুকুই যে ... চরম কাম্য! কেমন করে' ভুললে যে, ঐ মুখ ... একটু ভর্ৎসনার বাণী সহ্য করবার ক্ষমতা যে ... নেই!

—তবে তো বেশ হয়েছে! মনে আছে ... আমাদের সেই বরফের রাণীর গল্প বল... কিন্তু মস্ত বড় বলে শুনতে শুনতে আমরা ... আজ মা সেটা শেষ করবে তো? বয় ... জন্যে হাঁ করে বসে আছে। তোমার মুখে ... শোনবার সময় সারাদিনে আর আমরা পাই...

পরিত্যক্ত কোটটি ততক্ষণে একটি ... ফেলা হয়েছে, এখন টুপীটিকেও তাড়াতা... হ'ল। একান্ত নির্ভরশীল ছেলের হাতখা... হাতের মধ্যে চেপে ধরলে।

সুন্দর তার মুখে-চোখে একটা পরি... ছড়িয়ে দিয়ে সে বললে, তবে আয় তোর... বলে! *

* Johanna Van Woude লিখিত হল্যান্ড...

ব্রাহ্মণ

একদিন বহু ভারতবাসী যে "ব্রহ্ম"কে প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন, তাহা "ব্রাহ্মণ" শব্দটির দিকে ... না করিতে পারিলে মানুষ ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হইতে পারিত না। ঋক্ বেদের অভ্যাসসমূহে অভ্যস্ত হইয়া ... পারিলে এখনও ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করা যায়।... ... ...
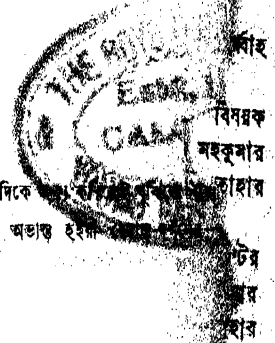
—শ্রীভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[১]

...র সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে, আমার শীকারের (experiences) প্রকাশ করা উচিত; তাহাতে বিশেষতঃ যাঁহারা সবেমাত্র এই সর্ব্বনাশী-নেশার ...ছেন, তাঁহাদের যথেষ্ট সাহায্য হওয়া সম্ভব। ... দ্রব্যবিশেষ গলাধঃকরণ করিবার ব্যবস্থা ...ন্ত সংক্ষিপ্ত সংস্করণ "গেলা"ও অসম্ভব। উপর এইরূপ অত্যাচারের ব্যবস্থা হয়, তাঁহাকে ...থবা "চেষ্টা মাত্র করা" ছাড়া উপায়ান্তর ... অসহযোগের ফলে পাল্টা অসহযোগের ভয় ...সে বন্ধুহীন অবস্থা স্বতঃই সত্যযুগের ...নে গমনের ব্যবস্থা আছে, তাহার আতঙ্ক ... হেতু "চেষ্টা করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। ...হোদয়েরা কৃপা করিয়া তাঁহাদের কাগজে ...বিমুখ হইলে "সাপও মরে, লাঠিও অটুট

...ছেলেখেলা"র বিষয় নহে। সত্যই "প্রাণ ...য়া থাকিতে হয়। Survival of the ...কাশের ফলে মানুষের, হিংস্র ও অনিষ্টকারী যুদ্ধঘোষণা, শীকার নামে চিরকাল চলিয়া ...ও বুদ্ধি, পশুশক্তিকে পরাজিত রাখিয়াছে, ...পশুরাই পৃথিবীতে রাজত্ব করিত।

...না প্রায়ই ঘটে; আমার মনে হয় তার প্রথম, শীকারের কতকগুলি যে সাধারণ ...পালন না করা; তাহারও আবার ... এক—অজ্ঞতা, দুই—"হামবড়াই" ... শীকারী, সমস্ত অবস্থা সামলাইয়া ... দ্বিতীয় কারণ 'আপৎকাল যখন moment-এ nerve fail করা। ... বলা চলে, যাঁহার যে-কোনও অবস্থায় ... না, অর্থাৎ যিনি কেবল স্নায়ুর জোরে nerves-এর ধার ধারেন না। তৃতীয় কারণ, লক্ষ্যভেদে অক্ষমতা। লক্ষ্য করিলাম বুকে, গুলি লাগিল পশ্চাৎ-ভাগে, এরূপ অবস্থায় সামান্য-আহত পশু প্রায়ই দুর্ঘটনার সৃষ্টি করিয়া থাকে।

হয় ত অনেকেই 'থাপচুরিয়াস্' হইয়া প্রশ্ন করিবেন, "বাপু হে, শীকার সম্বন্ধে উপদেশ দিবার তোমার কি অধিকার? শীকার সম্বন্ধে তুমি জান কি?" উত্তরে বলিতে হয়, "As regards my qualifications I beg to state যে advice gratis দিবার প্রলোভন সংবরণ কেহই করেন না এবং তাহাতে অল্প-বিস্তর অধিকার সকলের আছে; বিশেষজ্ঞ হইতেই হইবে এমন কোনও নজীর নাই। আজ প্রায় ১৬।১৭ বৎসর শীকারের আশায় বহু গম্য ও অগম্য স্থানে ঘুরিয়াছি, বহু খ্যাতনামা শীকারীর, ডাক্তইনের মতে অধুনালুপ্ত appendage বিশেষে তৈল-মর্দ্দনের ফলে হাতে কড়া পড়াইয়া ফেলিয়াছি, খানকয়েক নূতন মোটর ঐ নেশার পিছনে ধ্বংস করা গিয়াছে; বরাৎক্রমে দুটা দশটা মারাত্মক পশুও এই পাষণ্ডের হস্তে নিহত হইয়াছে এবং আজ পর্য্যন্ত (সাহেবী কায়দায় কাষ্ঠ ছুঁইয়া লিখিলাম) কোনওরূপ দুর্ঘটনার কারণ হই নাই, অধিকন্তু ইদানীং শীকার-পার্টিতে বিশেষজ্ঞরূপে নিমন্ত্রণও পাওয়া যাইতেছে, অতএব উপদেষ্টার আসন গ্রহণ হাস্যজনক হইলেও বোধ হয় মার্জ্জনীয় হইবে।

প্রথমেই কি প্রকারে শীকারের ভূত গরীবের স্কন্ধে সওয়ার হইল, তাহার ইতিহাস একটু বলা দরকার। যস্য কন্যা বিবাহিতা অর্থাৎ কি-না শ্বশুর মহাশয় শীকারী, তাঁহার পশ্চাতে তাঁহার বন্দুক কাঁধে বহিয়া অনেক খাকবেদী করিয়াছি, কিন্তু শীকার দেখা ছাড়া শীকার করিবার সুযোগ পাওয়া যায় নাই। তারপর যখন রাঁচীতে গিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিলাম, তখনও শীকারের দলে নিমন্ত্রণ হইত, সঙ্গে গিয়া ক্যাম্পে থাকিতাম, মাচায় বসিতাম, লব্ধপ্রতিষ্ঠ শীকারীদের কৌশল ও সফলতা দেখিয়া যথাযোগ্য তারিফ দিতাম,

(১) প্রত্যেক মহকুমার জনসাধারণের বিবিধবিষয়ক দুরবস্থার সংবাদ যাহাতে গবর্ণমেণ্টের মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষগণের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তাহার ব্যবস্থা করা ;

(২) প্রত্যেক মহকুমার জনসাধারণের প্রতি গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের অনাচারের সংবাদ যাহাতে মহকুমা-কর্ত্তৃপক্ষগণের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তাহার ব্যবস্থা করা ;

(৩) কি কি কারণে মহকুমার জনসাধারণের দুরবস্থার উদ্ভব হইতেছে, তাহার গবেষণা করা ;

(৪) কি করিলে জনসাধারণের দুরবস্থা আমূলভাবে দূরীভূত হইতে পারে, তাহার গবেষণা করা ;

(৫) যাহা করিলে প্রত্যেক মহকুমার জনসাধারণের দুরবস্থা সাময়িকভাবে উপশমিত হইতে পারে, তাহার উপদেশ দেওয়া ;

(৬) প্রত্যেক মহকুমার জনসাধারণ যাহাতে নিজ নিজ অবস্থা যথাযথভাবে বুঝিতে পারেন, তাহা যে সমস্ত গ্রন্থে বিবৃত হইবে, সেগুলির প্রচার করা ;

(৭) প্রকৃত সাহিত্য, শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য এবং রাষ্ট্র-পরিচালনা-বিজ্ঞান প্রত্যেক মহকুমার বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ যাহাতে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা ;

(৮) প্রত্যেক মহকুমার মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত লোক-হিতকর বিজ্ঞানাদিতে শিক্ষিত হইবেন, তাঁহারা যাহাতে গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রিত্ব প্রভৃতি প্রধান প্রধান দায়িত্বপূর্ণ পদ পাইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করা ;

(৯) প্রত্যেক মহকুমার লোক্যাল বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি নির্ব্বাচনের বর্ত্তমান পদ্ধতির ফলে যে সমস্ত দ্বন্দ্ব-কলহ এবং বিদ্বেষের উদ্ভব জনসাধারণের মধ্য হইতে পারে, তাহা যাহাতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা ;

(১০) প্রত্যেক মহকুমার জনসাধারণের মধ্যে আত্ম-বিচ্ছেদকর যে-সমস্ত ঘটনার উদ্ভব হইবে, তাহা যাহাতে আপোষে মীমাংসিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা ;

(১১) প্রত্যেক মহকুমার জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে ইংরাজ প্রভৃতি বিদেশীয়গণের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষকর মনোবৃত্তি জাগ্রত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা ;

(১২) প্রত্যেক মহকুমার মধ্যে অপরাপর যে-সমস্ত সাধারণ হিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহ বিদ্যমান আছে, সেগুলি যাহাতে কংগ্রেসের সহিত মিলিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা ।

একটু অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, উপরোক্ত দায়িত্বসমূহ চারিটী শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা :—

(১) মহকুমার গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণের সহায়তামূলক ;

(২) জনসাধারণের দুরবস্থার কারণ ও তাহার প্রতি-ষেধক উপায়-সমূহের গবেষণামূলক ;

(৩) জনসাধারণের মধ্যে কংগ্রেসের প্রয়োজনীয়তা প্রচার ও তাহাদের শিক্ষামূলক ;

(৪) প্রাদেশিক কাউন্সিল, ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটী প্রভৃতির নির্ব্বাচন মূলক ।

এই চারি শ্রেণীর দায়িত্বকে সংক্ষেপতঃ নিম্নলিখিত ভাবে অভিহিত করা যাইতে পারে, যথা :—

(১) গভর্ণমেণ্ট-সহায়ক ;

(২) গবেষণা-বিষয়ক ;

(৩) শিক্ষা ও প্রচার-বিষয়ক ;

(৪) নির্ব্বাচন-বিষয়ক ।

মহকুমা-শাখাসমূহে প্রধানতঃ তিনটী বিভাগ থাকিবে, যথা :—

(১) সাধারণ বিভাগ ;

(২) কার্য্য-নির্ব্বাহক বিভাগ ;

(৩) মহকুমা-সহর বিভাগ ।

কার্য্য-নির্ব্বাহক বিভাগে পাঁচটী কমিটী রাখিতে হইবে,

(১) গভর্ণমেণ্ট-সহায়ক কমিটী ;

(২) গবেষণা-বিষয়ক কমিটী ;

(৩) শিক্ষা ও প্রচার-বিষয়ক কমিটী ;

(৪) নির্ব্বাচন-বিষয়ক কমিটী ;

(৫) বিবিধ-বিষয়ক কমিটী ।

গভর্ণমেণ্ট-সহায়ক কমিটী নিম্নলিখিত কর্ত্তব্যসমূহ নির্ব্বাহ করিবেন :—

(১) প্রত্যেক মহকুমার জনসাধারণের বিবিধ বিষয়ক দুরবস্থার সংবাদ যাহাতে গভর্ণমেণ্টের মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষগণের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তাহার ব্যবস্থা করা ;

(২) প্রত্যেক মহকুমার জনসাধারণের প্রতি গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের অনাচারের সংবাদ যাহাতে মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষগণের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তাহার ব্যবস্থা করা ।

গবেষণা-বিষয়ক কমিটী নিম্নলিখিত কর্ত্তব্যসমূহ প্রতি-পালন করিবেন :—

(১) কি কি কারণে মহকুমার জনসাধারণের দুরবস্থার উদ্ভব হইতেছে, তাহার গবেষণা করা ;

(২) কি করিলে জনসাধারণের দুরবস্থা আমূলভাবে দূরীভূত হইতে পারে, তাহার গবেষণা করা।

শিক্ষা ও প্রচার-বিষয়ক কমিটীর কর্ত্তব্য :—

(১) যাহা করিলে প্রত্যেক মহকুমার জনসাধারণের দুরবস্থা সাময়িকভাবে উপশমিত হইতে পারে, তাহার উপদেশ দেওয়া ;

(২) প্রত্যেক মহকুমার জনসাধারণ যাহাতে নিজ নিজ অবস্থা যথাযথভাবে বুঝিতে পারেন, তাহা যে সমস্ত গ্রন্থে বিবৃত হইবে, সেগুলির প্রচার করা ;

(৩) প্রকৃত সাহিত্য, শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য এবং রাষ্ট্র-পরিচালনাবিজ্ঞান প্রত্যেক মহকুমার বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ যাহাতে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা ;

(৪) প্রত্যেক মহকুমার জন-সাধারণের মধ্যে যাহাতে ইংরাজ প্রভৃতি বিদেশীয়গণের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষকর মনোবৃত্তি জাগ্রত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা ;

(৫) প্রত্যেক মহকুমার মধ্যে অপরাপর যে-সমস্ত সাধারণ হিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহ বিদ্যমান আছে, সেগুলি যাহাতে কংগ্রেসের সহিত মিলিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা।

নির্ব্বাচন-বিষয়ক কমিটীর কর্ত্তব্য :—

(১) প্রত্যেক মহকুমার মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত লোক-হিতকর বিজ্ঞানাদিতে শিক্ষিত হইবেন, তাঁহারা যাহাতে গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রিত্ব প্রভৃতি প্রধান প্রধান দায়িত্বপূর্ণ পদ পাইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করা ;

(২) প্রত্যেক মহকুমার লোক্যাল বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি নির্ব্বাচনের বর্ত্তমান পদ্ধতির ফলে যে সমস্ত দ্বন্দ্ব-কলহ এবং বিদ্বেষের উদ্ভব জনসাধারণের মধ্যে হইতে পারে, তাহা যাহাতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা ;

(৩) প্রত্যেক মহকুমার জন-সাধারণের মধ্যে আত্ম-বিচ্ছেদকর যে-সমস্ত ঘটনার উদ্ভব হইবে, তাহা যাহাতে আপোষে মীমাংসিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা।

বিবিধ-বিষয়ক কমিটীর কর্ত্তব্য :—

(১) জিলা-শাখা, ইউনিয়ন বোর্ড-শাখা এবং গ্রাম্য-শাখা সমূহের সহিত ও জনসাধারণের সহিত চিঠিপত্র আদান প্রদান করা এবং তাহার রেকর্ড রক্ষা করা ;

(২) বিভিন্ন কমিটীর বিভিন্ন কর্ত্তব্য সম্বন্ধীয় চিঠিপত্রাদি ঐ ঐ কমিটীর কর্ম্মকর্ত্তার হস্তে প্রদান করা ;

(৩) যাবতীয় অধিবেশনের কার্য্যাবলীর মন্তব্য রক্ষা করা ;

(৪) মহকুমা-সহর বিভাগের পরিদর্শন করা, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

মহকুমা-সহর বিভাগের কর্ত্তব্য ও কার্য্যনির্ব্বাহ প্রণালী গ্রাম্য-শাখা সমূহের বিধানে নিষ্পন্ন হইবে। গ্রাম্য-শাখা সমূহের যে সমস্ত কার্য্য ইউনিয়ন-বোর্ড শাখাসমূহের দ্বারা নির্ব্বাহ হইবে— মহকুমা-সহর বিভাগের সেই সমস্ত কার্য্য মহকুমা-শাখাসমূহ নিষ্পন্ন করিবেন।

মহকুমা-শাখাসমূহের সাধারণ বিভাগের কর্ত্তব্য থাকিবে দুইটী, যথা :—

(১) কার্য্য-নির্ব্বাহক বিভাগের কর্ম্মিগণের মনোনয়ন করা ;

(২) কার্য্য-নির্ব্বাহক বিভাগের কর্ম্মিগণ তাঁহাদের কার্য্য যথাযথ পালন করিতেছেন কি না, তাহার পরীক্ষা করা।

সাধারণ সভা ও তাহার সভাপতির হস্তে সাধারণ বিভাগের কর্ত্তব্যনির্ব্বাহের প্রধান দায়িত্ব ন্যস্ত থাকিবে।

কার্য্য-নির্ব্বাহক বিভাগের কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিবার প্রধান দায়িত্ব থাকিবে তাহার সভাপতির ও বিভিন্ন কমিটীর হস্তে।

মহকুমা-সহর বিভাগের প্রধান কর্ত্তব্যভার থাকিবে ঐ বিভাগীয় কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা ও তাহার সভাপতির হস্তে।

প্রত্যেক মহকুমা-শাখার অন্তর্গত যে কয়টী ইউনিয়ন-বোর্ড শাখা থাকিবে, সেই শাখাগুলির এবং মহকুমা সহর বিভাগের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ মিলিত হইয়া, মহকুমা-শাখার সাধারণ বিভাগ গঠন করিবেন এবং তাঁহারা তাঁহাদিগের সভাপতি নির্ব্বাচন করিবেন। যাঁহারা সভাপতির পদপ্রার্থী হইবেন, তাঁহাদের সংগঠন-পরিচালনার, শিক্ষা-বিজ্ঞানের, কৃষি-বিজ্ঞানের, শিল্প-বিজ্ঞানের ও বাণিজ্য-বিজ্ঞানের বিদ্যা থাকা একান্ত প্রয়োজন। যাঁহাকে একবার সভাপতিপদে বরণ করা যাইবে, তাঁহার কোন কার্য্যে অসাফল্য না ঘটিলে, অথবা তিনি স্বয়ং কার্য্য পরিত্যাগ না করিলে তাঁহাকে পরিবর্ত্তন করা নিয়মবিরুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

কার্য্য-নির্ব্বাহক বিভাগের বিভিন্ন কমিটীর সভ্যগণ যাহাতে প্রয়োজনীয় কার্য্যদক্ষতা-সম্পন্ন হন, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। [ক্রমশঃ

আধুনিক বিজ্ঞান

—কাউণ্ট লিও টলষ্টয়

য়ুরোপের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা রুষ দেশের সমাজে এই কুসংস্কার অধিক বদ্ধমূল যে, মানবজাতির কল্যাণের জন্য প্রকৃত ধর্ম্মমূলক ও নৈতিক জ্ঞান বিস্তারের কোন প্রয়োজন নাই, পরীক্ষার দ্বারা যে বিজ্ঞানের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করা (experimental science) হয়, সেই বিজ্ঞানের পঠন ও পাঠনের উপরেই মানবজাতির কল্যাণ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে ও তাহাতেই মানুষের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণভাবে পরিপূরিত হয়। কার্পেণ্টার* বর্ত্তমান বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, আমার বিবেচনায় রুষ দেশের এই কুসংস্কারসম্পন্ন সমাজের পক্ষে তাহা বিশেষ ভাবে উপযোগী।

এই প্রকার ভীষণ কুসংস্কার ধর্ম্মমূলক কুসংস্কারের মতই মানুষের নৈতিক জীবনের উপরে অনিষ্টজনক প্রভাব বিস্তার করে, তাহা সহজেই বুঝা যায় ; কাজেই যাঁহারা পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান ও তাহার কার্য্যপন্থা বিশেষ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করেন, তাঁহাদিগের সেই চিন্তাধারা সাধারণ্যে প্রকাশ করা আমাদের সমাজের পক্ষে বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয়।

কার্পেণ্টার দেখাইয়াছেন, বর্ত্তমান জ্যোতিষশাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র, জীবতত্ত্ব কিংবা সমাজতত্ত্ব, কোন কিছু হইতেই আমরা বাস্তব তথ্য-সম্পর্কীয় প্রকৃত জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারি না। এই সমস্ত বিজ্ঞানশাস্ত্র যে-সকল সত্য আবিষ্কার করিয়াছে, সত্য হিসাবে তাহাদিগের মূল্য খুব বেশী নহে ; তাহাদিগের দ্বারা কোন কিছু সম্বন্ধে কিছু সাধারণ ভাবে বলা হইয়াছে মাত্র। এই সমস্ত সাধারণ উক্তিকে সত্য সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তবে, যে পর্য্যন্ত আমরা কোন কিছু সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকি, অথবা যতদিন পর্য্যন্ত সমস্ত দিকে আমরা লক্ষ্য করিতে না পারি, ততদিন পর্য্যন্ত এই সাধারণ উক্তিগুলির মূল্যও সত্য সিদ্ধান্তের মূল্যের অনুরূপ মনে হয়। তাহা ছাড়া সময় ও স্থানের দিক্ হইতে এত দূরে অবস্থিত বিষয় সম্বন্ধে আমরা এই সকল সত্য আবিষ্কার করি যে, প্রকৃত ঘটনা ও এই সমস্ত আবিষ্কৃত সত্যের মধ্যে যে কোন সামঞ্জস্য নাই, তাহাও আমরা লক্ষ্য করিতে পারি না। অধিকন্তু কার্পেণ্টার ইহাও দেখাইয়াছেন যে, সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য বিজ্ঞান যে পন্থার অনুসরণ করে, তাহাও প্রকৃত পন্থা নহে—ভুয়া পন্থা। যে সমস্ত বিষয়ের সহিত আমরা অধিক সংশ্লিষ্ট, যে সমস্ত বিষয় আমাদের অধিক প্রয়োজনীয়, বিজ্ঞান অন্য আর একটা দূরের জিনিষের সাহায্যে আমাদিগকে সেই সমস্ত বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করে। সুতরাং তাহাতে ঈপ্সিত ফললাভ হয় না। তাঁহার মতে প্রত্যেক বিজ্ঞানই আলোচ্য তথ্যসমূহকে নিম্নস্তরে আনিয়া সেগুলিকে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা পাইয়াছে।

ফলে প্রত্যেক বিজ্ঞানকেই সংকীর্ণতম গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করা হইয়াছে। নীতিশাস্ত্রকে প্রয়োজন হিসাবে ও বংশানুক্রমে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাসম্পর্কীয় ব্যাপারে পরিণত করা হইয়াছে ; রাজনীতিকে সর্ব্বপ্রকার দয়া-দাক্ষিণ্য-বিচার, বুদ্ধি-ভালবাসা, একতার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি প্রভৃতি বর্জ্জিত করিয়া স্বার্থপরতা-বুদ্ধিরূপ সর্ব্বনিম্ন স্তরের ধারণায় পর্য্যবসিত করা হইয়াছে। জীবতত্ত্ব মানুষ, জীবজন্তু ও বৃক্ষের মধ্য হইতে ব্যক্তিত্বের শক্তি লুপ্ত করিয়া দিয়াছে। এই বিজ্ঞান তাহাদিগের মধ্য হইতে স্বাতন্ত্র্য ভাবকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে—ইহার নির্দ্ধারণানুসারে মানুষ, জীবজন্তু, বৃক্ষাদি কতকগুলি রাসায়নিক, কোষাত্মক ও জৈবনিক সম্বন্ধের পরিণতি—পদার্থগুলি অনুপরমাণুর সংমিশ্রণের জের। রাসায়নিক সংসক্তি ও পদার্থসংশ্লিষ্ট বিস্ময়কর ঘটনাবলীকে "অ্যাটমে" পরিণত করা হইয়াছে, আবার সেই "অ্যাটম" সমূহকে (সৌরমণ্ডলকেও) গতিবিজ্ঞানের আইনকানুনে পর্য্যবসিত করা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, উচ্চ স্তরের কোন সমস্যাকে নিম্নস্তরের কোন সমস্যায় পরিণত করিতে পারিলেই উচ্চস্তরের সমস্যার সমাধান করা হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এইভাবে কোন সমস্যারই কখন সমাধান করা যায় না। ইহাতে এই

* এড্‌ওয়ার্ড কার্পেণ্টার লিখিত 'বর্ত্তমান বিজ্ঞান ও তাহার সমালোচনা' (Modern Science : a Criticism) অভিহিত পুস্তকের ভূমিকা হিসাবে এই প্রবন্ধ ১৮৯৮ সালে লিখিত হয়।

লাভ হয় যে, বিজ্ঞান নিম্ন হইতে নিম্নতর স্তরে যাইতে যাইতে ক্রমে এমন স্থানে গিয়া উপনীত হয় যে, সে স্থান তাহার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত—সে স্থানের সহিত তাহার কোনই সম্পর্ক নাই; আর অতি প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়িয়া দিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প প্রয়োজনীয় বিষয় লইয়াই তখন তাহাকে মাথা ঘামাইতে হয়। ফলে তাহার নিকট যাহা অত্যন্ত দরকারী—যে সমস্ত সমস্যার সমাধান করা তাহার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাহাকে বাধ্য হইয়া সেই গুলির কোন প্রকার সমাধান না করিয়াই সরিয়া দাঁড়াইতে হয়।

একজন লোক তাহার নিকটস্থিত কোন দ্রব্যের ব্যবহারাদি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে চায়; কিন্তু সে যদি সেই দ্রব্যের সন্নিকটে না গিয়া—তাহাকে সর্ব্বদিক হইতে সম্যক্ পরীক্ষা না করিয়া—তাহাতে কোন প্রকার হস্তার্পণ না করিয়া—ক্রমেই একটু একটু করিয়া তাহা হইতে দূরে সরিয়া যায়—তারপর সে এমন স্থানে গিয়া উপস্থিত হয়, যেখান হইতে আর সেই দ্রব্যের বর্ণের বৈশিষ্ট্য কিংবা উপরিভাগের অসমতা কিছুই লক্ষ্য করা যায় না—সেখান হইতে সে শুধু সেই দ্রব্যের মোটামুটি একটা আকার দেখিতে পায়; এই অবস্থায়ও সে যদি সেই স্থান হইতে সেই দ্রব্যের একটা বিশেষ বিবরণ লিখিতে সঙ্কল্প করে, সে যদি মনে করে, সেই দ্রব্য সম্বন্ধে সেখান হইতেই তাহার সম্যক্ জ্ঞান অর্জ্জিত হইয়াছে, তাহা হইলে তাহা যেমন আত্মপ্রতারণা—আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও অনেকটা সেই রকম। কার্পেণ্টারের সমালোচনায় এই আত্মপ্রতারণাই আংশিকভাবে দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তিনি প্রথমে দেখাইয়াছেন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হইতে আমরা যে জ্ঞান অর্জ্জন করি, তাহাতে প্রকৃত তথ্য সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিতে পারি না। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন, বিজ্ঞান উচ্চস্তরের কোন সত্যকে নিম্নস্তরের কোন সত্যে পর্য্যবসিত করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাপারটাকে যে বুঝাইতে প্রয়াস পায়, তাহা ভ্রমাত্মক, তাহাতে কখনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না—হইতে পারে না।

পরীক্ষা-মূলক বিজ্ঞান সত্য-সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য যে পন্থার অনুসরণ করে, সেই পন্থার দ্বারা মনুষ্য-জীবনের বিশেষ গুরুতর সমস্যার সমাধান হয় কি না হয়, পূর্ব্বাহ্নে তাহা স্থির করা হয় না; এবং মানুষের অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ও শাশ্বত দাবীর নিকট এই বিজ্ঞানের কার্য্যাদি এমন সামঞ্জস্যহীন বলিয়া প্রতীয়মান হয় যে, তাহাতে লোকে আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া থাকিতে পারে না।

মানুষকে বাঁচিতেই হইবে। কিন্তু বাঁচিতে হইলে তাহাকে জানিতে হইবে কি ভাবে বাঁচা যায়। ভাল হউক মন্দ হউক, সকল লোকেরই সব সময় এই জ্ঞান ছিল এবং এই জ্ঞানানুসারেই তাহারা জীবন ধারণ করিয়াছে—তাহারা উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। কি ভাবে মানুষের জীবন ধারণ করা উচিত—সোলোন, মোজেস ও কনফিউসাসের সময় হইতেই ইহা বিজ্ঞান - শুধু বিজ্ঞানই বলি কেন, বিজ্ঞানের সারবস্তু বলিয়া সর্ব্বদা বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু কেবল আমাদের সময়েই দেখিতে পাই, কি ভাবে জীবন ধারণ করিতে হয়, যে-বিজ্ঞান আমাদিগকে তাহা বলিয়া দেয় তাহাকে আর বিজ্ঞান আখ্যা প্রদান করা হয় না। আজকাল গণিত-বিজ্ঞান হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজ-বিজ্ঞান পর্য্যন্ত পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানকেই কেবল প্রকৃত বিজ্ঞান বলা হয়।

ফলে একটা অদ্ভুত ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হইয়াছে। সাধারণ বুদ্ধিতে মানুষ যে রকম ভাবে চিন্তা করে, সেই সনাতন ভাবে এখনও সহজ বুদ্ধিসম্পন্ন শ্রমিক মনে করে যে, যে-মানুষ অধ্যয়নে জীবন যাপন করে—সে তাহার আহারের ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবে, সে তাহার জন্যই চিন্তা করিতেছে—মানুষের যাহা জানা দরকার, সে তাহাই অধ্যয়ন করিতে চেষ্টা করিতেছে এবং সে আশা করে, তাহার ও অন্যান্য সাধারণ লোকের কল্যাণ যে-সমস্ত প্রশ্নের উপরে নির্ভর করে, বিজ্ঞান তাহার জন্য সেই সমস্ত প্রশ্নেরই সমাধান করিবে। সে আশা করে, কি ভাবে তাহার জীবন ধারণ করা উচিত—কি ভাবে তাহার পরিবারবর্গের সহিত, তাহার প্রতিবেশীর সহিত ও অন্যান্য লোকের সহিত ব্যবহার করা উচিত—কি ভাবে তাহার রিপু দমন করা উচিত, তাহার কি বিশ্বাস করা উচিত—কি বিশ্বাস করা উচিত না ও অন্যান্য অনেক কিছু বিজ্ঞান তাহাকে বলিয়া দিবে। কিন্তু আমাদের বিজ্ঞান কি তাহাকে এই সমস্ত কিছু বলিয়া দেয়?

বিজ্ঞান জয়োল্লাস সহকারে তাহাকে জানাইতেছে—সূর্য্য পৃথিবী হইতে কত কোটী মাইল দূরে অবস্থিত—কি হারে

আলো যায়, আলো প্রতি সেকেণ্ডে ইথারে কত কোটী বার কম্পনের সৃষ্টি করে—শব্দ বাতাসকে কি ভাবে কাঁপাইয়া তোলে—ছায়াপথের রাসায়নিক উপাদান কি—"হিলিয়াম" কি—সরীসৃপবিশেষের মল—হাতের কোন্ কোন্ বিন্দুতে বিদ্যুৎ সংগৃহীত হয়—রঞ্জন রশ্মি ও এই রকম অন্যান্য বিষয়ের সম্বন্ধেও বিজ্ঞান আলোচনা করে।

কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের কথা: আমি এই সমস্ত কিছুই চাই না—আমি জানিতে চাই কি ভাবে বাঁচিতে হয়।

বিজ্ঞান তাহার উত্তরে বলে, তুমি কি চাও না চাও তাহাতে কি আসিয়া যায়? তুমি যাহা চাহিতেছ, তাহা তো সমাজ-বিজ্ঞানের কথা। সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কীয় প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পূর্ব্বে আমাদিগকে প্রাণীতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, শরীরতত্ত্ব ও সাধারণভাবে জীবতত্ত্ব সম্পর্কীয় বহু তত্ত্বের সমাধান করিতে হইবে। আবার সেই সমস্ত সমস্যার সমাধান করিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমে পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রের বহু প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে; আর সেই সঙ্গে সঙ্গে অতি ক্ষুদ্র অণুর আকার সম্বন্ধেও আমাদের একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রয়োজন। অতি লঘু পৃথ্বীর কি ভাবে শক্তি স্থানান্তরিত করে, তাহাও আমাদিগের জানিবার বিষয়। এক সম্প্রদায়ের লোক—বিশেষতঃ যাহারা অন্যের স্কন্ধের উপরে বসিয়া রহিয়াছে, কাজেই যাহাদিগের পক্ষে অপেক্ষা করা অসুবিধাজনক নহে,—তাহারা বিজ্ঞানের এই ধরণের উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া কবে এই সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইবে, সেই ক্ষণের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে; কিন্তু বহু লোক—সমগ্র মনুষ্য জাতি—বিশেষতঃ যাহাদিগের স্কন্ধে উপবেশন করিয়া এই ধরণের বৈজ্ঞানিকরা বিজ্ঞানের আলোচনার কাজে ব্যাপৃত রহিয়াছে, তাহারা এই ধরণের উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারে না, তাহারা স্বভাবতঃ বিমূঢ় অবস্থায় জিজ্ঞাসা করে—কবে এই সমস্ত কাজ হইবে? আমরা তো আর অপেক্ষা করিতে পারি না। তোমরা নিজেরাই বলিতেছ, কয়েক পুরুষ পরে তোমরা এই সমস্ত আবিষ্কার করিবে, কিন্তু আমরা আজ এই মুহূর্ত্তে বাঁচিয়া আছি—কাল মরিয়া যাইব; যতক্ষণ আমরা বাঁচিয়া আছি, আমরা জানিতে চাই কি ভাবে বাঁচিতে হয়। কাজেই আমাদিগকে তাহাই শিখাইয়া দেও, আর কিছু চাই না।

তাহাদিগের এই কথার উত্তরে বিজ্ঞান চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠে, উহারা কি বোকা—কত বড় অশিক্ষিত! উহারা জানে না বিজ্ঞান বিজ্ঞানেরই জন্য—বিজ্ঞান ব্যবহারের বস্তু নহে। যাহা নিজে আসিয়া বিজ্ঞানের নিকট হাজির হয়, বিজ্ঞান শুধু তাহাই অধ্যয়ন করে—কি কি বিষয় অধ্যয়ন করিতে হইবে, বিজ্ঞান তাহা নির্ব্বাচন করিতে পারে না—বিজ্ঞান সমস্ত বিষয়েরই আলোচনা করে; ইহাই বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য। আর বৈজ্ঞানিকদিগের সত্য সত্যই ধারণা যে, যাহা অধিক প্রয়োজনীয়—যাহা বিশেষ দরকারী—তাহা বাদ দিয়া সামান্য সামান্য ব্যাপার লইয়া ব্যাপৃত থাকা তাহাদিগের নিজেদের স্বভাবের বৈশিষ্ট্য নহে, ইহা বিজ্ঞানেরই বৈশিষ্ট্য। সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের কিন্তু বিশ্বাস, এই বৈশিষ্ট্য বিজ্ঞানের নহে—যে সকল লোক সামান্য সামান্য ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত থাকিতে চায়—যাহারা এই সমস্ত সামান্য ব্যাপারের উপরেই অধিক জোর দিতে চায়, এই বৈশিষ্ট্য তাহাদিগের নিজেদের স্বভাবের।

বৈজ্ঞানিকরা বলেন, বিজ্ঞান প্রত্যেক বিষয়ের আলোচনা করে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে "প্রত্যেক বিষয়" বলিলে অনেক কিছু বুঝায়, ইহার দ্বারা অগণিত বিষয়কে বুঝায়। একই সময়ে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করা অসম্ভব।

একটী লণ্ঠন যে রকম সমস্ত দিক্ আলোকিত করিতে পারে না—যে যে স্থানে ইহা স্থাপিত করা হয়—যে দিকে কোন লোক ইহাকে লইয়া যায়, সেই স্থান ও সেই দিক্ যেমন লণ্ঠনের দ্বারা আলোকিত হয়; সেই প্রকার বিজ্ঞানও সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিতে পারে না; শুধু যে-বিষয়ের দিকে ইহার মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়, বিজ্ঞান শুধু সেই বিষয়েরই আলোচনা করে—অন্য বিষয়ের নহে। লণ্ঠনের অতি নিকটতম স্থান যেমন খুব বেশী রকম আলোকিত হয়, ইহা হইতে যত দূরে যাওয়া যায়, ততই দূরের বস্তু কম আলোকিত হইতে থাকে, তারপর এমন স্থানে উপনীত হওয়া যায়, যেখানে লণ্ঠনের আলো আর পৌঁছে না—সুতরাং সেখানকার বস্তুতে আর লণ্ঠনের আলোকসম্পাত হয় না।

মানুষের সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এই কথাই বলা যাইতে পারে। যাঁহারা গবেষণাকার্য্যে লিপ্ত, তাঁহারা যাহা অধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন, বিজ্ঞান তাহাই

চিরকাল বিশেষ মনোযোগ সহকারে পর্য্যালোচনা করিয়াছে ও করিতেছে; আবার তাঁহারা যাহা তত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন না, বিজ্ঞান তাহা আর তেমন মনোযোগের সহিত আলোচনা করে না। ফলে অগণিত বস্তুই বিজ্ঞান কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত—উপেক্ষিত হয়। যাঁহারা বিজ্ঞানের চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য ও সার্থকতার দিক্ হইতে বিচার-বিবেচনা করিয়া একটা বিষয় প্রয়োজনীয়- অপ্রয়োজনীয় কিম্বা অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় বলিয়া স্থির করেন, অর্থাৎ তাঁহারা তাঁহাদিগের নিজেদের ধর্ম্মানুসারে একটা বিষয়ের গুরুত্ব নির্দ্ধারণ করেন। কিন্তু আজকালের বৈজ্ঞানিকরা কোন প্রকার ধর্ম্মকেই স্বীকার করেন না। ফলে কোন্ বিষয় প্রয়োজনীয়, কোন্ বিষয় অপ্রয়োজনীয়, কিম্বা অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয়, তাহা স্থির করিবার তাঁহাদিগের কোন মানদণ্ডই নাই; তাই জগতের অগণিত বিষয়ের মধ্যে বহু বিষয়ই তাঁহাদের গবেষণার বাহিরে পড়িয়া থাকে; সেই জন্যই এই সকল বৈজ্ঞানিকরা তাঁহাদিগের নিজেদের জন্য একটা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বিজ্ঞান বিজ্ঞানের জন্য অর্থাৎ বিজ্ঞান মানুষের যাহা দরকার তাহার আলোচনা করে না—সে সমস্ত বিষয়েরই আলোচনা করে। প্রকৃত প্রস্তাবে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান সমষ্টিগত ভাবে বিষয়গুলির আলোচনা না করিয়া তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখে। অর্থাৎ, মানুষের প্রয়োজনীয়তা ও অপ্রয়োজনীয়তা অনুসারে বিজ্ঞান কোন বিষয়ে বেশী বা কম মনোযোগ দেয় না; যাহা কাছে আসে, সে অবিচারিত-চিত্তে তাহারই আলোচনা করে। অবশ্য বিজ্ঞানের একটা শ্রেণীবিভাগ আছে, কিন্তু সেই শ্রেণীবিভাগ আলোচ্য বিষয়ের নির্ব্বাচন নিয়ন্ত্রিত করে না। বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য লোকের মধ্যে যে পক্ষপাতিত্ব সমানভাবে পরিদৃষ্ট হয়, তাহার উপরেই এই নির্ব্বাচন নির্ভর করে। কাজেই বৈজ্ঞানিকরা প্রত্যেক বিষয়ের আলোচনা করেন বলিয়া যে মনে করেন ও প্রচার করেন, বাস্তবিক পক্ষে তাহা ঠিক নহে। তাঁহারা প্রত্যেক বিষয়ের আলোচনা করেন না। যাহা অধিক লাভজনক ও আলোচনার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ, তাঁহারা তাহার আলোচনায়ই আত্মনিয়োগ করেন। বৈজ্ঞানিকরা যে সকল উচ্চশ্রেণীর লোকের সহিত সংশ্লিষ্ট, যাহাতে তাহাদিগের কল্যাণ পরিবর্দ্ধিত হয়, এমন বিষয়ের আলোচনা অধিক লাভজনক এবং যে সমস্ত বিষয় জীবনীশক্তিবিহীন তাহার আলোচনা করা অধিকতর সহজ; কাজে কাজেই বহু বৈজ্ঞানিক এক্ষণে শুধু পুস্তক, প্রস্তর ও অচেতন পদার্থের আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেন।

তাহাদিগের এই আলোচনা—এই গবেষণাই আজকাল প্রকৃত বিজ্ঞান বলিয়া বিবেচিত হয়; কাজেই আমাদের যুগে মানুষ কি ভাবে অধিক সুখী—অধিক দয়ার্দ্রচিত্ত হইতে পারে, তাহার অনুধাবন ও গবেষণাকে আর প্রকৃত বিজ্ঞান আখ্যা প্রদান করা হয় না। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকেরা কোন বিষয় সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, বহু পুস্তক হইতে তাহা একত্র সংগ্রহ ও নকল করা—একটা কাচের গ্লাস হইতে অম্ল আর একটা কাচের গ্লাসে জল কিম্বা মদের মত তরল পদার্থ ঢালিয়া দেওয়া—অতি সূক্ষ্ম বস্তুকে নিপুণতা সহকারে আরও সূক্ষ্মতম বস্তুতে পরিণত করা—জীবাণুর চর্চ্চা করা—ভেক ও কুকুরগুলিকে খণ্ড খণ্ড করা, রঞ্জনরশ্মির ও সংখ্যাসমূহের থিওরী, নক্ষত্রনিচয়ের রাসায়নিক উপাদান প্রভৃতি সম্পর্কীয় গবেষণা করা প্রভৃতিকে এক্ষণে প্রকৃত বিজ্ঞান বলা হয়। এই বিজ্ঞানই এক্ষণে বিশেষ ভাবে আত্মপ্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে। যে বিজ্ঞানের লক্ষ্য মানুষকে সুখী—দয়ালু করা, সেই নৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম্মমূলক বিজ্ঞান আজকাল অ-বিজ্ঞান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তাহাদিগকে ধর্ম্মপ্রচারক, দার্শনিক, আইনজ্ঞ ও অর্থনীতিবিদ-দিগের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। উঁহারা বৈজ্ঞানিক সন্ধানের ভাণ করিয়া—প্রধানতঃ দেখাইয়া দিতেছেন যে, বর্ত্তমান সমাজের (যে-সমাজের সুবিধাগুলি শুধু তাঁহারাই পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করিতেছেন) অস্তিত্ব থাকা যে শুধু উচিত, তাহা নহে, সর্ব্বপ্রযত্নে ইহাকে রক্ষা করিতেই হইবে। ধর্ম্মতত্ত্ব ও ব্যবহার শাস্ত্রের কথা কিছু না বলিয়াও বলা যাইতে পারে, এই শ্রেণীর বিজ্ঞানের মধ্যে খুব বেশী উন্নত যে অর্থনীতি শাস্ত্র, সেই অর্থনীতিশাস্ত্রও এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য।

আজকাল যে অর্থনীতি খুব প্রচলিত (কার্ল মার্কসের অর্থনীতি), সেই অর্থনীতি পর্য্যন্ত বর্ত্তমান জীবনপ্রণালীকে এমন ভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছে যে, যে রকম হওয়া উচিত, ইহা যেন ঠিক সেই রকমই রহিয়াছে; তাই এই অর্থনীতি যে শুধু মানুষকে ইহার কোন প্রকার পরিবর্ত্তন সংসাধন করিতে

উপদেশ দেয় না, তাহা নহে ; ইহা যাহা বলে তাহা যদি কার্য্যে পরিণত করা হইলে মানুষের জীবন আরও শোচনীয় হইয়া পড়ে। কি ভাবে মানুষের জীবন ধারণ করা কর্ত্তব্য, এই বিজ্ঞান সেই সম্বন্ধে কিছুই বলে না—একেবারে নির্ব্বাক।

মানুষের কাজ যতই নিম্নস্তরে নামে, ততই তাহা আদর্শ হইতে দূরে সরিয়া পড়ে ; ততই আত্মম্ভরিতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বর্ত্তমান বিজ্ঞান ইহাই করিতেছে ; সমসাময়িক লোকেরা কখনও প্রকৃত বিজ্ঞানের আদর করিতে পারেন না। তাঁহারা বরং সাধারণতঃ ইহাকে নানাভাবে নিপীড়িত করেন। আর ইহা করাই স্বাভাবিক। প্রকৃত বিজ্ঞান মানুষকে তাহার ভুল দেখাইয়া দিয়া তাহাকে একটা অনভ্যস্ত নূতন জীবন প্রণালীর অনুসরণ করিতে বলে। সমাজের যাঁহারা দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, তাঁহাদিগের নিকট প্রকৃত বিজ্ঞানের এই দুই দফা কাজের কোন দফাই প্রীতিপ্রদ হয় না।

সমাজ-পরিচালনার ভার যাঁহাদিগের হস্তে ন্যস্ত, বর্ত্তমান বিজ্ঞান তাঁহাদিগের রুচি ও আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে তো যায়ই না—অধিকন্তু ইহা সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদিগের রুচি ও দাবী পূরণ করে। ইহা নিরর্থক কৌতূহল চরিতার্থ করে ও মানুষের আশ্চর্য্যভাব বর্দ্ধিত করিয়া তাহাদিগকে সুখবৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেয়। যাহা প্রকৃত মহৎ—তাহা সর্ব্বদাই শান্ত, শিষ্ট ও অজ্ঞের অলক্ষিতভাবে অবস্থান করে, কিন্তু বর্ত্তমান বিজ্ঞান আত্মপ্রশংসায় পঞ্চমুখ—কি ভাবে যে সে আপনাকে চারিদিকে জাহির করিবে, তাহা লইয়াই সে ব্যস্ত।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের ধারণা, পূর্ব্বে যে সমস্ত পন্থার অনুসরণ করা হইত তাহা সমস্তই ভ্রমাত্মক—পূর্ব্বে যাহা বিজ্ঞান বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহার কোনই মূল্য নাই ; ইহা নিছক প্রতারণা—বিরাট একটা ভুল। তাঁহারা বলেন, আমরা যে পন্থার অনুসরণ করিতেছি তাহাই খাঁটী সত্য—আমাদের বিজ্ঞানই প্রকৃত বিজ্ঞান—অন্য সমস্তই ভুয়া। তাই সহস্র সহস্র বৎসরে যাহা সম্ভব হয় নাই, আমাদের বিজ্ঞান এক শতাব্দীর মধ্যে সে সাফল্য লাভ করিয়াছে। ভবিষ্যতে ইহা এইভাবে পথাতিক্রম করিয়া আমাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান করিবে ও সকল মানুষকে সুখী করিবে। জগতের সমস্ত কাজের মধ্যে আমাদের বিজ্ঞানের কাজই বিশেষ উল্লেখযোগ্য—আর আমরা—বৈজ্ঞানিকরাই জগতের বিশেষ প্রয়োজনীয় ও আবশ্যক লোক।

শিক্ষিত সম্প্রদায় বৈজ্ঞানিকদিগের এই উক্তি সমর্থন করে ; তাহারাও তাহাদিগের স্বরেই স্বর মিলাইয়া বলে, তাহা তো বটেই। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু বর্ত্তমান বিজ্ঞান তাহার সমগ্র জ্ঞান-ভাণ্ডার লইয়া এমন নিম্নস্তরে অবস্থান করিতেছে যে, পূর্ব্বে কখনও কোন জাতির মধ্যে বিজ্ঞান এমন স্থানে অবস্থান করে নাই। মানুষ কিসে দয়ালু ও সুখী হইতে পারে, বিজ্ঞানের যে অংশের সেই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য ; সেই অংশ সমাজের বর্ত্তমান দোষ-দুষ্ট পরিস্থিতির সমর্থনে ব্যস্ত। আর অপরাংশ নিরর্থক কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে।

এই নিন্দাদ্যোতক কথায় কেহ কেহ হয়তো ক্রোধভরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিবে, কি এত বড় কথা! নিরর্থক কৌতূহল! বাষ্প, বিদ্যুৎ টেলিফোন ও অন্যান্য যন্ত্র সম্পর্কে বিজ্ঞান যাহা করিয়াছে তাহা কি তবে কিছুই না? বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বরং কিছু না-ই বলিলাম, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা যাহা করিয়াছে, তাহার দিকে একবার লক্ষ্য করিয়া দেখ। এই বিজ্ঞানবলে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করিয়া তাহাকে নিজের কাজে নিয়োগ করিয়াছে।

বৈজ্ঞানিকের এই কথার উত্তরে সহজ-বুদ্ধি-সম্পন্ন লোক বলিবে, প্রকৃতিকে যে জয় করা হইয়াছে, তাহার ফল তো কিছুদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত কলকারখানায়ই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে—এই জয়ের ফলেই কলকারখানায় শ্রমিকের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছে, তাহাতে মানুষ খুন করিবার অস্ত্রাদি তৈয়ারী হইয়াছে, তাহা ছাড়া এই জন্যই মানুষের বিলাসিতা ও অসাধুতা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। কাজেই মানুষ যে প্রকৃতিকে জয় করিয়াছে, তাহাতে মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বর্দ্ধিত হয় নাই, বরং ইহাতে মানুষের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় হইয়াছে।

আমাদের সমাজের মত যদি সমাজের ব্যবস্থা খারাপ থাকে—অল্প-সংখ্যক লোকের যদি বহুলোকের উপরে ক্ষমতা থাকে ও তাহারা তাহাদিগকে নির্য্যাতিত করে, তাহা হইলে প্রকৃতিকে জয় করিলে তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল তাহার দ্বারা এই ক্ষমতা ও অত্যাচারকে বর্দ্ধিত করা এবং প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাই করা হইতেছে।

মানুষের কি রকম ভাবে জীবন যাপন করা উচিত, যে বিজ্ঞানের তাহা পর্য্যালোচনা করা লক্ষ্য নহে—যে বস্তু যে ভাবে রহিয়াছে, যে বিজ্ঞান শুধু তাহাকে সেই ভাবে পর্য্যালোচনা

করে, সুতরাং যে বিজ্ঞান মনুষ্যসমাজ যেখানে যে ভাবেই থাকুক না কেন, সে দিকে কোন প্রকার দৃকপাত না করিয়া প্রধানতঃ অচেতন পদার্থের গবেষণাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করে, সেই বিজ্ঞান প্রকৃতিকে যতই জয় করুক না কেন, তাহার দ্বারা মানুষের অবস্থার কোনই উন্নতি সংসাধিত হইতে পারে না।

ইহার পরেই বিজ্ঞানের সমর্থকরা বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিবেন, চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্বন্ধেও কি এই উক্তি প্রযুজ্য? এই বিজ্ঞান লোকসমাজের যে কত উপকার করিতেছে তাহা ভুলিলে চলিবে না। বীজাণুর সাহায্যে যে টীকার ব্যবস্থা হইয়াছে—অস্ত্র-চিকিৎসকরা যে প্রকার অস্ত্রোপচার করেন তাহা কি বিস্ময়োৎপাদন করে না? টিকার সাহায্যে আমরা ব্যাধির আক্রমণ রোধ করিতে পারি, লোককে নিরাময় করিতে পারি—আমরা রোগীকে কোন প্রকার যন্ত্রণা না দিয়াও তাহার অস্ত্রোপচার করিতে পারি—মানুষের শরীরের অভ্যন্তর কাটিয়া তাহা বাহির করিতে ও পরিষ্কার করিতে পারি; এমন কি, আমরা এই চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাহায্যে কুঁজো লোককে সরল পর্য্যন্ত করিতে পারি। বিজ্ঞানের এই সমর্থকরা বোধ হয় মনে করেন, রুষ দেশের যে শিশুরা ডিপথেরিয়া ভিন্ন স্বাভাবিক ভাবেই শতকরা ৫০ জন (স্বজন-পরিত্যক্ত শিশুদিগের হাসপাতালে শতকরা ৮০ জন) মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাদিগের মধ্যে একজন শিশুকে ডিপথেরিয়া রোগ হইতে আরোগ্য করিতে পারিলেই লোকে বিজ্ঞানের উপকারিতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিহান হইবে।

কুখাদ্য, অত্যধিক ও অনিষ্টজনক শ্রম, খারাপ বাসস্থান, অপর্য্যাপ্ত পরিধেয় বস্ত্রাদি ও অভাব অনাটনের জন্য আমাদের জীবনের অবস্থা এমন যে, শুধু শিশু কেন, অধিকাংশ লোকই যতদিন বাঁচিয়া থাকা উচিত, তাহার অর্দ্ধেক দিন জীবন ধারণ করিবার পূর্ব্বেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্যাপার যে রকম, তাহাতে শিশুরোগ, যক্ষা, উপদংশ ও অত্যধিক মাদকতায় লোকের মৃত্যুহার ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। তাহা ছাড়া মানুষের শ্রম করিবার শক্তির বহু পরিমাণ যুদ্ধের জন্য ব্যয় করা হইতেছে; প্রত্যেক দশ বৎসর হইতে বিশ বৎসরের মধ্যে যুদ্ধে কোটী কোটী লোক মারা যায়। বিজ্ঞান প্রকৃত নৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম্মমূলক উপদেশ না দিয়া একদিকে সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা সমর্থন করিতেছে ও অন্য দিকে বাজে জিনিস লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে; তাহার ফলেই এই সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। তাহা না হইলে এই সমস্ত অহিত ব্যাপার আপনা হইতেই কোথায় উধাও হইয়া যাইত। অথচ বিজ্ঞান যে আমাদের কত মহোপকার করিতেছে, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আমাদিগকে বলা হয়, হাজারের মধ্যে একজনকে সে রোগমুক্ত করে। আমরা কিন্তু জানি বিজ্ঞান যদি তাহার যথাকর্ত্তব্য নিষ্পাদন করিত, তাহা হইলে লোক মোটে অসুস্থই হইত না। বিজ্ঞান অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে যে মনোযোগ দেয় ও তাহার জন্য যে পরিশ্রম স্বীকার করে, তাহার অতি সামান্য অংশও যদি সে নৈতিক, সামাজিক, ধর্ম্মমূলক ও স্বাস্থ্যসম্পর্কীয় জ্ঞান-বিতরণে ব্যয় করিত, তাহা হইলে সে যে ডিপথেরিয়া, পেটের আভ্যন্তরীণ অসুখ, বিকলাঙ্গ ভাব প্রভৃতি সাময়িক ভাবে আরোগ্য করিয়া গর্ব্বে স্ফীত হয়, সেই সমস্ত ব্যাধির শতাংশের একাংশও হইত না। তাহা ছাড়া এই যে সাময়িক ভাবে ব্যাধির আরোগ্য করা হয়, তাহাও হাসপাতালেই অধিকাংশ করা হয়। যাহাদিগের প্রয়োজন, তাহাদিগের সকলের পক্ষে আবার হাসপাতালের এই সুখপ্রদ চিকিৎসার ব্যয় বহন করা খুবই দুরূহ।

যদি কেহ ভাল রকম জমি চাষ না করিয়া, অনিয়মে কতকগুলি খারাপ বীজ বপন করে; তারপর সে যদি কতকগুলি শস্য মাড়াইয়া সেই সব শস্যের ভাঙ্গা শীষের যত্ন করিয়া লোকের নিকট তাহার ভাঙ্গা শীষ ভাল করিবার নৈপুণ্য ও কৃষি-বিজ্ঞানের পরিচয় দিতে প্রয়াস পায়, তাহা হইলে তাহার কাজ যে রকম—এই বৈজ্ঞানিকদিগের কাজও সেই রকম।

আমাদের বিজ্ঞানকে প্রকৃত বিজ্ঞান হইতে হইলে, লোকের ক্ষতিকারক না হইয়া প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানকে লোকের প্রয়োজনীয় হইতে হইলে, তাহাকে সর্ব্বাগ্রে পরীক্ষামূলক কার্য্যপন্থা পরিহার করিতে হইবে। এই কর্ম্মপন্থার জন্য যে বস্তু যে ভাবে আছে, তাহাকে সেইভাবে পর্য্যালোচনা করাই বিজ্ঞানের শুধু কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। কাজেই তাহাকে এই পন্থা বর্জ্জন করিতে হইবে। তারপর 'বিজ্ঞান' শব্দের যে একমাত্র যুক্তিসঙ্গত কার্য্যকরী অর্থ হয়, তাহাই তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। এই অর্থ অনুসারে বিজ্ঞানের কর্ত্তব্য মানুষের কি ভাবে জীবন যাপন করা উচিত তাহা তাহাকে দেখাইয়া দেওয়া; এখানেই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা। মানুষের কি ভাবে জীবনযাপন করা উচিত, সেই জ্ঞানের সহায়কভাবে যতটুকু দরকার, বিজ্ঞান ততটুকু পর্য্যন্ত শুধু বস্তু যে ভাবে, আছে সেইভাবে তাহাকে পর্য্যালোচনা করিতে পারে। ইহার বেশী সে পারে না।

কার্পেণ্টার তাঁহার এই প্রবন্ধে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের অনুসৃত নীতির এই ব্যর্থতারও অন্য প্রকার পন্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

[অনুবাদক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

"ধর্ম্ম" সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষিগণের কথা

—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

পূর্ব্বানুবৃত্তি

এই প্রবন্ধটী আপাতদৃষ্টিতে অনেক নূতন কথায় পরিপূর্ণ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহাতে কোন নূতন কথা নাই। ইহার প্রত্যেক কথাটী অতীব পুরাতন এবং উহা যে পুরাতন, তাহা বেদ, বেদাঙ্গ ও বেদান্তাদি ঋষিগণ-প্রণীত গ্রন্থ হইতে দেখান যাইতে পারে। প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা বিকৃত হওয়ার ফলে বহুদিন হইতে ঋষি-প্রণীত ঐ সমস্ত গ্রন্থ কার্য্যকারণ ভাবশূন্য অযোগ্য অর্থে প্রচারিত হইতেছে। তাই, এখন আর ঐ সমস্ত গ্রন্থ হইতে "ব্রহ্ম", "ঈশ্বর" প্রভৃতি বলিতে বাস্তবিক পক্ষে কি বুঝায়, কি উপায়ে তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষ করা যায়, বাস্তব জীবনে তাঁহা-দিগকে প্রত্যক্ষ করিবার প্রয়োজনীয়তা কি, ইত্যাদি তথ্য জানা যায় না। পরন্তু "ব্রহ্ম", "ঈশ্বর" প্রভৃতি কথা এখন কেবল কথার কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঋষি প্রণীত গ্রন্থ বিকৃত অর্থে প্রচারিত হইতেছে বলিয়া, কি করিয়া পরমাণুর হয়, পরমাণু হইতে অণুর উদ্ভব কি উপায়ে হইয়া থাকে, অণুগুলি বিচ্ছিন্ন না হইয়া কি উপায়ে পরস্পর সম্বন্ধ-বিশিষ্ট থাকে, ইত্যাদি তথ্য এখন আর ঐ সমস্ত গ্রন্থে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এমন কি উহাদিগকে "চাষার গান", "মানবীয় সভ্যতার আদিম সৃষ্টি", "পৌরাণিক গল্প", "মিথ্যাকথার ভাণ্ডার", "মাইথলজী" এবংবিধ আখ্যায় আখ্যাত করা হইতেছে।

কি উপায়ে বাস্তব জগতে পরমাণুর উদ্ভব হয়, পরমাণু হইতে অণুর উদ্ভব হইবার পদ্ধতি কি, কেন পরমাণু এবং অণুসমূহ বিচ্ছিন্ন না হইয়া কি উপায়ে একত্র সম্মিলিত থাকে এবং জীবের চলাফেরা প্রভৃতি জীবত্ব রক্ষা করিবার সহায় সাধন করে, এবংবিধ তথ্য যে বৈজ্ঞানিকগণেরও পরমাদরের বস্তু, তাহা বলাই বাহুল্য। এই তথ্যসমূহ বর্ত্তমান পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমাদের এই প্রবন্ধে ঐ সমস্ত তথ্য পাওয়া যাইবে। কাযেই আমরা অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণকে ইহা একটু ধৈর্য্যসহকারে অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করি।

ইহাতে এতাবৎ নিম্নলিখিত বিষয়ের আলোচনা ও তাহার সত্যতা প্রমাণ করা হইয়াছে :—

(১) বর্ণগত অর্থানুসারে "ধর্ম্ম" বলিতে বুঝায় সেই কার্য্য অথবা সেই চালচলন, যে কার্য্যে অথবা চালচলনে জীবের উপস্থ, বহ্নি এবং স্পর্শশক্তি অটুট থাকে। এক কথায়, যাহা মানুষের করা উচিত, তাহার নাম "ধর্ম্ম ;

(২) "ধর্ম্ম" বলিতে বুঝায় সেই কার্য্য অথবা সেই চাল-চলন, যাহা জীব তাহার উপস্থ, তেজ এবং স্পর্শ-শক্তি বশতঃ অবলম্বন করিয়া থাকে। এক কথায় মানুষ যাহা সাধারণতঃ করিয়া থাকে, তাহাই তাহার "ধর্ম্ম"। যথা চোরের ধর্ম্ম, সাধুর ধর্ম্ম ইত্যাদি ;

(৩) শরীরের যাহা কিছু কাটিয়া ফেলিলে মানুষ পর-মুখাপেক্ষী না হইয়া স্বাধীনভাবে দৃষ্টিশক্তি, ঘ্রাণ-শক্তি, শ্রবণ-শক্তি, বাক্-শক্তি, স্পর্শ-শক্তি ও চলচ্ছক্তি বজায় রাখিতে পারে, তাহার নাম উপ-স্থ এবং যাহা কাটিয়া ফেলিলে ঐ ছয়টি শক্তির কোন শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, তাহার নাম অপ-স্থ ;

(৪) জীবের উপ-স্থ বস্তুগুলির শক্তি অটুট রাখিবার উপযোগী কার্য্য করিলে জীব তাহার নীরোগতা ও কার্য্যক্ষমতার বৃদ্ধি সাধন করিতে পারে।

(৫) জীব ও জগতের মূল কারণ ব্যোম। ব্যোমের দুইটী অবস্থা আছে। একটীর নাম "অশরীরী" অবস্থা এবং অপরটীর নাম "ভূত" অবস্থা ;

(৬) "অশরীরী-ব্যোম" হইতে "ভূত-ব্যোমের" উদ্ভব হয় এবং "ভূত-ব্যোম" হইতে ক্রমশঃ বায়ু, অম্বু এবং বহ্নি, পরমাণু, অণু, মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত, ত্বক্ এবং রোমকূপের উদ্ভব হইয়া থাকে ;

(৭) অবিমিশ্র বিশুদ্ধ বায়ুতে যখন শীতল স্পর্শের উদ্ভব হয়, অথচ ঐ স্পর্শে শীতলতার কোন তীব্রতা থাকে না, তখন তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় "অম্বু" বলা হয়। "অম্বু"র শীতলতায় তীব্রতা উপস্থিত হইলে অন্যান্য গুণানুসারে তাহাকে "আপ", "জল" ইত্যাদি বলা হইয়া থাকে ;

(৮) অবিমিশ্র বিশুদ্ধ বায়ুতে যখন উষ্ণ স্পর্শের উদ্ভব হয়, অথচ ঐ স্পর্শে উষ্ণতার কোন তীব্রতা থাকে না, তখন তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় "বহ্নি" বলা হয়। "বহ্নি"র উষ্ণতায় তীব্রতা উপস্থিত হইলে অন্যান্য গুণানুসারে তাহাকে "অগ্নি", "তেজ" প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে ;

(৯) আমাদের নিকটবর্ত্তী বায়ুমণ্ডলে প্রকৃত বিশুদ্ধ বায়ু, অথবা বিশুদ্ধ অম্বু, অথবা বিশুদ্ধ বহ্নি অবি-মিশ্রভাবে পরিলক্ষিত হয় না। নীলাকাশের নিকটে যে বায়ুমণ্ডল আছে, তাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু, বিশুদ্ধ অম্বু এবং বিশুদ্ধ বহ্নির বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে ;

(১০) জীব তাহার শরীরের মধ্যে যে বায়ু, অম্বু এবং বহ্নি সাধারণতঃ পোষণ করিয়া থাকে, তাহা বিশুদ্ধ নহে। তাহা বিশুদ্ধ নহে বলিয়াই জীব প্রতিনিয়ত নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার যন্ত্রণা

ভোগ করে এবং ঐ বায়ু, অম্বু এবং বহ্নির অবিশুদ্ধতার মাত্রানুসারে জীবের শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার মাত্রার তারতম্য হয় ;

(১১) শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ু, অম্বু এবং বহ্নির বিশুদ্ধতা সাধন করিতে পারিলে শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা এবং ব্যাধিযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হওয়া যায় ;

(১২) বায়ু, অম্বু এবং বহ্নির মূল কারণ অশরীরী ব্যোমকে প্রত্যক্ষ অথবা স্পর্শ করিতে পারিলে, শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ু, অম্বু এবং বহ্নির বিশুদ্ধতা সাধন করিবার ক্ষমতা লাভ করা যায়। শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ুর সমতা সাধন করিয়া ঋক্-বেদোক্ত শব্দবিশেষের উচ্চারণ সহকারে "উদান" বায়ুর অনুধাবন করিতে পারিলে, ব্যোমের অশরীরী অবস্থা জিহ্বার মেদভাগ দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়। জিহ্বার মেদভাগ দ্বারা ব্যোমের অশরীরী অবস্থা প্রত্যক্ষ করা অথবা স্পর্শ করার কার্য্যকে সংস্কৃত ভাষায় "ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে "বায়ুর সমতা-সাধন" ও "উদান বায়ু" কাহাকে বলে, তাহার আলোচনা গত সংখ্যায় করা হইয়াছে ;

(১৩) ভূত-অবস্থার ব্যোমকে প্রত্যক্ষ অর্থাৎ স্পর্শ করিতে না পারিলে উদান বায়ুর অনুধাবন করা যায় না এবং উদান বায়ুর অনুধাবন করিতে না পারিলে ব্যোমের অশরীরী অবস্থা স্পর্শ করা অর্থাৎ "ব্রহ্ম" সাক্ষাৎ করা সম্ভব হয় না।

(১৪) শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ুর সমতা সাধন করিয়া ঋক্-বেদোক্ত শব্দবিশেষের উচ্চারণ সহকারে "ব্যান" বায়ুর অনুধাবন করিতে পারিলে, ব্যোমের "ভূত" অবস্থা জিহ্বার মেদভাগ দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়। জিহ্বার মেদভাগ দ্বারা ব্যোমের "ভূত" অবস্থা প্রত্যক্ষ করা অর্থাৎ স্পর্শ করার কার্য্যকে সংস্কৃত ভাষায় "ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করার কার্য্য" বলা হইয়াছে। যে বিশুদ্ধ বহ্নি বশতঃ ব্যোমের "অশরীরী" অবস্থা হইতে "ভূত" অবস্থা পরিগৃহীত হয়, সেই বিশুদ্ধ "বহ্নি"কে সংস্কৃত ভাষায় "ঈশ্বর" নাম দেওয়া হইয়াছে ;

(১৫) উপরোক্ত একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ দফার সত্যগুলি উপলব্ধি করিতে পারিলে বুঝা যায় যে, বিশুদ্ধ বহ্নি কি বস্তু এবং তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে **ঈশ্বর প্রত্যক্ষ** করা যায় এবং ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে **ব্রহ্মের সাক্ষাৎ** লাভ করা যাইতে পারে এবং ব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিলে শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ু, অম্বু এবং বহ্নির বিশুদ্ধতা সাধন করা সম্ভব হয়। শরীরাভ্যন্তরে বায়ু, অম্বু এবং বহ্নির বিশুদ্ধতা সাধন করিবার ক্ষমতা লাভ করিলে, মানুষের পক্ষে তাহার শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা এবং ব্যাধিযন্ত্রণা হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হওয়া সম্ভব হয়। কাযেই এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, বিশুদ্ধ "বহ্নি" কি বস্তু, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে এবং শরীরাভ্যন্তরে তাহা অটুট রাখিতে পারিলে মানুষের পক্ষে তাহার শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা এবং ব্যাধিযন্ত্রণা হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হওয়া সম্ভব হয় ;

(১৬) মানুষ তাহার কতকগুলি কু-প্রকৃতিবশতঃ তাহার শরীরাভ্যন্তরে যে "বহ্নি" আছে, ঐ "বহ্নি"র বিশুদ্ধতা উপলব্ধি করিতে পারে না এবং তাহারই জন্য মানুষের জীবন অবিমিশ্র সুখময় না হইয়া সুখ-দুঃখমিশ্রিত হইয়া থাকে। মানুষের কু-প্রকৃতির সংখ্যা সাধারণতঃ আটটী, যথা :— (১) অহঙ্কার, (২) কু-বুদ্ধি, (৩) বিক্ষিপ্ত মন, (৪) আকাশ, (৫) বায়ু, (৬) অনল, (৭) আপ ও (৮) ভূমি ;

(১৭) শরীরাভ্যন্তরস্থ "বহ্নি"র বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে হইলে মানুষকে উপরোক্ত আটটী প্রকৃতির হাত হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় অনুসন্ধান করিতে হইবে ;

(১৮) মানুষের কেন ঐ আটটী কু-প্রকৃতির উদ্ভব হয়, তাহার অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে যে, মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত, ত্বক্, ও রোমকূপে উষ্ণতার আধিক্যবশতঃ যথাক্রমে মানুষ অহঙ্কারী, কুবুদ্ধি-সম্পন্ন, বিক্ষিপ্তমনা এবং আকাশ, বায়ু, অনল, আপ ও ভূমি-প্রকৃতিসম্পন্ন হয়।

(১৯) উপরোক্ত অষ্টাদশদফা হইতে বলা যাইতে পারে যে, যাহাতে মানুষের শরীরের মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত, ত্বক, ও রোমকূপে উষ্ণতার আধিক্য না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে, মানুষ তাহার প্রধান আটটী কু-প্রকৃতি হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

কি উপায়ে মেদাদির উষ্ণতার আধিক্য প্রতিহত করা যায়, তাহা পরবর্ত্তী আলোচনার বিষয়। লেখকের শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ ঐ আলোচনা বর্ত্তমান সংখ্যায় লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হইল না। তাহার জন্য পাঠকগণের নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। [ক্রমশঃ

জিপ্‌সি-ভাষায় ভারতীয় প্রভাব

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

ইউরোপে বাস করিলে জিপ্‌সি(Gipsy)দের কথা প্রায়ই শুনা বা পড়া যায়। পথে ঘাটে মধ্যে মধ্যে এই অদ্ভুত নরনারীর সাক্ষাৎও মিলে। ভারতে "ইরাণী" নামে খ্যাত জাতির মত ইউরোপের জিপ্‌সিরাও সর্ব্বদা স্থান হইতে স্থানান্তরে তাঁবু ফেলিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, ছোটখাট ব্যবসা করে; তাহারা লোকের কাছে চোর, ঠক প্রভৃতি নামে পরিচিত। জিপ্‌সি-মেয়েরা লোকের হাত দেখিয়া ভবিষ্যদ্‌-বাণী করিতে পারে বলিয়াও ইউরোপের লোকের বিশ্বাস। জিপ্‌সিরা যে 'অ-ইউরোপীয়' জাতি তাহাতে সন্দেহ নাই, তাহাদের আকৃতি-প্রকৃতি, আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ সবই ইউরোপীয় হইতে বিভিন্ন। কোথা হইতে যে জিপ্‌সিরা সারা ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িল তাহা এখনও ঠিক নির্ণীত হয় নাই, তবে ইহারা যে প্রাচ্যজাতীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। ভাষায় মানুষের জাতি ধরা পড়ে; জিপ্‌সিরা ইউরোপের যে অঞ্চলে বসবাস করে, সেখানকার অনেক কথা তাহাদের ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু এ-ছাড়া ইউরোপের সব দেশের জিপ্‌সিদের মধ্যে প্রচলিত বহু শব্দ সম্পূর্ণ তাহাদেরই নিজস্ব। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই শব্দগুলির সঙ্গে ভারতীয় শব্দের অতি নিকট সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। হামবুর্গ ইউনিভার্সিটির ভারতীয় বিভাগের এক জন তরুণ পণ্ডিত সম্প্রতি বার্লিন ইউনিভার্সিটিতে সহকারী অধ্যাপকের পদ পাইয়াছেন; ইনি প্রায় দেড় বৎসর ভারতে ছিলেন এবং প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষায় বিশেষজ্ঞ; ইঁহার হিন্দি-গুজরাটিরও বেশ জ্ঞান আছে। ইনি বলিলেন যে, ইঁহার একজন জার্ম্মান বন্ধু অনেক দিন জিপ্‌সিদের সংসর্গ করিয়াছিলেন ও তাঁহার মুখে কিছু জিপ্‌সি কথা শুনিয়া ইঁহার মনে হইল যেন গুজরাটি শুনিতেছেন। ১৮৮৬ সালে ভিয়েনাতে ইণ্টারন্যাশনাল ওরিয়েণ্টাল কংগ্রেসের অধিবেশনে C. G. Leland নামক এক জন ইংরাজ এই মর্ম্মে একটি প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন—লণ্ডনে একটা ময়লা রঙের লোকের জিপ্‌সিছাঁচের চোখ দেখিয়া তিনি তাহাকে জিপ্‌সি ভাষায় প্রশ্ন করেন। লোকটি তাঁহার কথা বুঝিল ও উত্তর দিল যে, সে ইংলণ্ডের জিপ্‌সি নয়, তাহার বাড়ী কলিকাতায় ও সে লণ্ডনে কারি-পাউডার বেচিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে। Leland তাহাকে জিপ্‌সি ভাষায় আরও প্রশ্ন করিলেন, সে বলিল সবই বুঝিয়াছে কিন্তু সাহেবের ভাষা ভাল হিন্দুস্তানী নয়! অবশেষে লোকটি স্বীকার করিল যে, তাহার জন্ম ভারতীয় জিপ্‌সিকুলে। এখানে দেখি যে ভারতীয় জিপ্‌সি-কুলে জাত কলিকাতার হিন্দুস্তানীভাষী লোকও ইংলণ্ডীয় জিপ্‌সি ভাষাকে প্রায় হিন্দুস্তানীই মনে করিয়াছিল। অনেক পণ্ডিতের মত যে জিপ্‌সিরা ভারত হইতে ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইউরোপের জিপ্‌সিরা নিজেদের "রোম" "রোমেঙ্গো" প্রভৃতি নামে অভিহিত করে; কেহ কেহ বলেন, প্রাচীন ভারতীয় "ডোম" নামক নীচ জাতির (প্রাকৃত ভাষায় "ডোম্ব") সঙ্গে এই "রোম" নামের সম্বন্ধ আছে। কৌতূহল বশতঃ একখানি জিপ্‌সি-অভিধান ঘাঁটিলাম (Rudolf von Sowa প্রণীত, ১৮৯৮ সালে লাইপ্‌জিকে ছাপা ও স্বনামখ্যাত "জার্ম্মান-প্রাচ্য-সমিতি" হইতে প্রকাশিত)। এই অভিধানের বহু শব্দ দেখিলাম তৎক্ষণাৎ ভারতীয় বলিয়া ধরা পড়ে, নীচে ইহার একটি অকারাদি তালিকা দিলাম। ইহাতে ভারতীয় ভাষার সঙ্গে ইউরোপীয় জিপ্‌সি ভাষার সম্বন্ধ স্পষ্ট বুঝা যাইবে। অভিধানখানি পশ্চিম-জার্ম্মাণীর জিপ্‌সিদের কথ্যভাষায় ব্যবহৃত শব্দের; হয়ত অপেক্ষাকৃত আরও পূর্ব্ব-ইউরোপীয় দেশবাসী জিপ্‌সিদের ভাষায় আরও বেশী ভারতীয় প্রভাব পাওয়া যাইতে পারে, দুঃখের বিষয় সেরূপ শব্দ এখনও কেহ সংগ্রহ করেন নাই। নীচের শব্দগুলির মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য খৃষ্টীয় ক্রুশের জিপসি প্রতিশব্দ=ক্রুশুল (সংস্কৃত ত্রিশূল)। তালিকায় কেবল মূল শব্দগুলিই দিলাম, ইহার মধ্যে বহু শব্দ হইতে নিষ্পন্ন সমার্থক ও সমধ্বনি অনেক জিপ্‌সি শব্দ আছে।

জিপ্‌সি শব্দ	অর্থ
অংগার্	কয়লা, সংস্কৃত অঙ্গার।

জিপ্‌সি শব্দ	অর্থ
অনাব	আনয়ন করা, আনা। (জিপ্‌সি ক্রিয়া-বাচক শব্দান্তের আব হিন্দি-গুজরাটি শব্দান্তেও মিলে)।
অন্দ্রে	ভিতরে, অন্তরে, অন্দরে।
ইজেরো	হাজার ?
উচো	উচু, উচ্চ।
ওথটো	আট, অষ্ট।
কই	কই, কোথায়।
কতের্, কোতের্	কোথায়, (সং) কুত্র।
কন্	কান, কর্ণ।
কন	এখন, এইমাত্র, (সং) ক্ষণ ?
কন্দেলো	মনোযোগী } কান দেওয়া ?
কন্ধাল	মনোযোগ দেওয়া } কান দেওয়া ?
কন্দেপেন্	মনোযোগী } কান দেওয়া ?
কমাব	ইচ্ছা করা, ভালবাসা, (সং) কাময়তে।
কশট্	কাঠ, কাষ্ঠ।
কালো	কাল (কৃষ্ণ)।
কিনাব	কেনা।
কেরাব	করা।
কের্মো	কৃমি।
কেশ-	রেশম, (সং) কেশ ?
কোন্	কে ? কোনটি ? হিন্দি কোন্।
খিল্	মাখন, (সং) ক্ষীর ?
খেলাব	খেলা করা।
গাব-	গ্রাম, হিন্দি গাঁব।
গিনাব	গোনা, হিন্দি গিন্‌না।
গিলি	গান, (সং) গীতি ?
গিবাব	গান করা, (সং)√(গৈ) ?
গুরুমনি	গরু ?
গুশটো	আঙ্গুল, (সং) অঙ্গুষ্ঠ ?
চচো	সত্য ?
চন্	চন্দ্র।
চম্	চর্ম্ম।
চরাব	(গরু) চরান।

জিপ্‌সি শব্দ	অর্থ
চার্	চার্ (মশলা)।
চিকেন্	চর্বি, (সং) চিক্কণ ?
চীব্	জিহ্বা, জিভ্।
চুরি	ছুরি।
চুমেপেন্	চুমা।
চুমেবাব	চুমা খাওয়া।
চোর্	চোর।
চোরেপন্ ১	চৌর্য্য।
ছম্	কাশি, (সং) শ্বাস ?
ছিন্দো	শীলমোহর, (সং) চিহ্ন, প্রাকৃত চিন্ধ।
ছুর্দো	ছোট, (সং) ক্ষুদ্র।
জজেমেন্২	জমিয়া যাওয়া ?
জনাব	জানা।
জঙ্গেলো	জাগ্রত ?
জঙ্গেবাব	জাগিয়া উঠা।
জাব	যাওয়া।
জিদো	জীবিত।
জিপেন্	জীবন।
জুব্‌লি	স্ত্রীলোক, বালিকা, (সং) যুবতী।
জেনো	মানুষ, জন।
জেক্	এক } এখানে জ=য়।
জোব্	ও, সে } এখানে জ=য়।
জোর্	জোর।
জোরেলো	জোরাল, (বলবান্)।
ডার্, ডরাব	ভয় (ডর), ভয় দেখান।
তু	তুই, হিন্দি তু।
তুমে	তোমাকে।
তুমারো	তোমার।
ততো, তেপেন্ ততেবাব	তপ্ত, তাত, তাপ দেওয়া।
তত্ত	বাপ, (সং) তাত।

১। শব্দান্তের "পন্" (বা "পেন্") = গুজরাটি ও হিন্দি পন্ = বাংলা পনা = সং ত্ব = বৈদিক ত্বন।

২। 'জ'এর উচ্চারণ ইংরেজি z এর মত।

জিপ্‌সি শব্দ	অর্থ
তিরো	তোমার, হিন্দি তেরা।
তেল	নীচে, তলে।
তর্নো, তর্নেপেন্‌	তরুণ, তরুণত্ব।
ত্রাশ, ত্রশাব	ত্রাস (ভয়), ভয় দেখান।
ত্রিন্‌	তিন।
ত্রুশ, ত্রুশ্‌লো	তৃষ্ণা (তৃষা), তৃষ্ণার্ত্ত।
ত্রুশুল্‌	ক্রুশ।
থুদ্‌	দুধ।
থুলো	মোটা, (সং) স্থূল।
থোবাব	ধোয়া।
দন্ত্‌	দাঁত, দন্ত।
দাদ্‌	বাপ, (দাদা, দাদু), (সং) তাত।
দাব	দেওয়া।
দিকাব	দেখা।
দিবেস্‌	দিবস, দিন।
দুই	দুই।
দুক্‌	দুঃখ, বেদনা।
দুম্‌	পিঠ, হিন্দি দুম্‌।
দূর্‌, দূরো	দূর, দূরবর্ত্তী।
দেশ	দশ।
দেবেল্‌	দেবতা, ঈশ্বর, (ইং) devil।
দোষ্‌	দোষ, ক্ষতি, অভাব।
দ্রাক্‌	আঙ্গুর, (সং) দ্রাক্ষা।
নক্‌	নাক।
নঙ্গো	নগ্ন, হিন্দি নঙ্গা।
নাশাব	নাশ হওয়া।
নেবো	নব, নূতন।
পঞ্চ্‌	পাঁচ।
পশ্‌	পাশে, পার্শ্ব।
পত্রিন্‌	পাতা, পত্র।
পানি	জল, হিন্দি পানি।
পাপু	পিতামহ, গুজরাটি বাপু (বাপ্র)।
পিরেনি (নি)	প্রিয়া, বিবাহের কন্যা।
পিরেনো (নো)	বিবাহের বর।

জিপ্‌সি শব্দ	অর্থ
পিয়াব	পান করা, (সং) পিব।
পুর্দো, ফুরো	পুরাতন (?)
পেকাব	রাঁধা, (সং) √পচ্‌, হিন্দি পাকানা।
পেরাব	পড়িয়া যাওয়া।
পোশোম্‌	পশম।
ফক্‌	পাখা, পক্ষ।
ফন্দাব	বাঁধা।
ফুচাব	জিজ্ঞাসা করা, হিন্দি পুছ্‌না, (সং) √প্রচ্ছ্‌।
ফুর্দাব	ফুঁ দেওয়া ?
ফেন্‌	ভগ্নী, হিন্দি বহিন্‌, গুজরাটি বেন্‌।
বক্‌রো	ভেড়া, হিন্দি বক্‌রি।
বঙ্গো	বাঁকা, খোঁড়া, (সং) ভগ্ন, ভঙ্গ।
বন্দুক্‌	বন্দুক।
বাড়ো, বাড়েবাব	বড়, বাড়া।
বাল্‌	চুল, হিন্দি ও (সং) বাল।
বর্‌	বার (দুবার, তিনবার)।
বিকিনাব, বিকেবাব	বিকি (কিনা) বিক্রয় করা।
বিয়াভ্‌	বিবাহ।
বিবধ্‌ত্‌	বিপদ্‌ ?
বিবি	মাসী, খুড়ী, পিসি।
বিসরাব	ভুলিয়া যাওয়া, (সং) √বি-স্মৃ।
বীশ্‌	কুড়ি, বিশ।
বের্শ	বর্ষ, বৎসর।
বেশাব	বাস করা, বসা।
বৃষিন্‌	বৃষ্টি।
বুৎ	অনেক, হিন্দি বহুৎ।
বইনো	অহঙ্কারী, (সং) বিজ্ঞ ?
বোখ্‌	ক্ষুধা, হিন্দি ভুখ্‌।
ভাব	হওয়া, (সং) √ভূ
ভুষ্ট্‌	ঠোঁট, (সং) ওষ্ঠ ?
ম	নিষেধার্থক অব্যয়, (সং) মা।
মচ্‌লিন্‌	মাছি।
মতো, মত্তো, মদো	মত্ত, মাতাল।
মঙ্গাব	ভিক্ষা করা, হিন্দি মাংগনা।

জিপ্‌সি শব্দ	অর্থ
মনুশ্‌	মানুষ।
মকাব	মাখান।
মকেপেন্‌	তেল, চর্ব্বি, (সং) ম্রক্ষণ, প্রাকৃত মক্‌খন, বাংলা মাখন।
মরাব	মারা।
মরো, অমারো, মারো	আমাদের।
মম	মা।
মস্‌	মাংস।
মাচ্ছিন্‌	স্ত্রীমক্ষিকা।
মাচো	মাছ।
মারো	রুটি (Griersonএর মতে এই শব্দটি বিহারী ডোমদের 'মণ্ড' বা 'মার্‌রা' (=গম) শব্দ হইতে উদ্ভূত)।
মিশটো	ভাল, ঠিক, (সং) মিষ্ট ?
মীরো	আমার, হিন্দি মেরা।
মুই	মুখ ?
মুক্‌লো	খোলা, (সং) মুক্ত ?
মুত্‌র্‌	মূত্র।
মেরাব	মরা।
মোম্‌	মোম।
মোল্‌	মূল্যবান্‌।
রই	রাজা, বড়লোক (রায়)।
রকাব	রক্ষা করা।
রৎ	রক্ত।
রতি	রাত্রি।
রাণি	বড় লোকের স্ত্রী।
রুক্‌	গাছ, বৃক্ষ, প্রাকৃত রুক্‌খ।
রুপ	রূপা, রৌপ্য।

জিপ্‌সি শব্দ	অর্থ
রোবাব	কাঁদা, হিন্দি রোওনা।
লজ্‌	লজ্জা, লাজ।
লাব্‌	পাওয়া, লাভ করা।
লোকেস্‌	ধীর, হাল্‌কা, (সং) লঘু ?
লোন্‌	লবন।
লোলো	লাল।
হডাব	সরান, হটান, ধাক্কা দেওয়া।
হোম্‌	হওয়া, হিন্দি হোনা ?
শিং	শৃঙ্গ, শিং।
শিনেক্‌	সিংহ ?
শীল্‌, শীল্‌দো	ঠাণ্ডা, বরফ, (সং) শীত, শীতল।
শুকো, শুকেবাব	শুষ্ক, শুকান।
শুনাব	শুনা।
শোরো	মাথা, শির।
ষ্টার্‌	চারি, ৪।
সানো	ছোট, উড়িয়া সান।
সাপ্‌	সাপ।
সিকেরাব	শিক্ষা করা, শিক্ষা দেওয়া } সং√শিক্ষ
সিকেলো	শিক্ষিত, পণ্ডিত।
সিক্‌	চটপট, (সং) শীঘ্র ?
সীবাব	সেলাই করা, (সং)√ সিব্‌।
সুঙ্গাব	শুঁকা।
সুব্‌	ছুঁচ, সূচী।
সের্‌দাব	ছেঁড়া ?
সোনেকই	সোনা, স্বর্ণ।
সোব্‌, সোবাব	ঘুম, ঘুমান, (সং)√ স্বপ্‌।
সুমুন্‌	স্বপ্ন দেখা।
সেই	যদি, (সং) স্যাৎ, প্রাকৃত সিয়া।

শিল্পশাস্ত্র ও প্রাচীন মন্দির

—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

ভারতবর্ষের নানাস্থানে ও ভারতের হিন্দু উপনিবেশ কম্বোজ, চম্পা ও যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশে আমরা প্রাচীন যুগের হিন্দু স্থাপত্যের যে সব নমুনা পাই, তার মধ্যে রাজপ্রাসাদ বা সাধারণ বাস্তুর কোন ধ্বংসাবশেষ নাই। অনেক স্থানেই নগরের প্রাকার, বহির্বাটীর তোরণ, অলিন্দ প্রভৃতির অস্তিত্ব আছে, কিন্তু সেই নগরের প্রাচীরের মধ্যে হয়ত যেখানে রাজপুরী, রাজার অমাত্য ও বিশিষ্ট প্রজাবর্গের আবাসস্থল ছিল, সে সব স্থান এখন শূন্য, অথচ তার মধ্যে মন্দির ও অন্যান্য দেবাধিষ্ঠানগুলির অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বর্তমান রয়েছে। এর থেকে অনুমান হয় যে, সে যুগে গৃহ, সে গৃহ রাজপ্রাসাদই হোক বা সাধারণ প্রজার আবাসস্থলই হোক—কাষ্ঠ বা এমন কোন উপাদানে রচিত হ'ত, যার জন্য তা দীর্ঘকাল স্থায়ী হ'ত না। এই কারণে প্রাচীন বাস্তুশিল্পের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় শুধু পুঁথিপত্রে।

গ্রীকদূত মেগাস্থেনিস ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, সে গ্রন্থে অশোকের রাজপ্রাসাদের বর্ণনা আছে। এই রাজপ্রাসাদ পাটলিপুত্রে অবস্থিত ছিল—তার সৌন্দর্য্য পারস্যের রাজপ্রাসাদের চেয়ে কোন অংশে ন্যূন ছিল না। এই রাজপ্রাসাদ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথম ভাগেও বর্তমান ছিল, কারণ চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এ প্রাসাদ স্বচক্ষে দর্শন করেছিলেন। এর কিছুকাল পরেই এই রাজপ্রাসাদ খুব সম্ভব ভস্মীভূত হয়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগে হিউয়ান-সাং তার সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। এই বৈদেশিক লেখকদের কথা যদি সত্য হয়, তা হলে মানতে হবে যে, অশোকের রাজপ্রাসাদও এমন উপাদানে নির্ম্মিত হয়েছিল, যা স্থায়ী নয়।

কিন্তু প্রাচীন যুগের মন্দিরের পরিচয় আমরা শুধু যে পুঁথিপত্রেই পাই তা নয়। সে যুগের বহু মন্দির বা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে পুঁথিপত্রে মন্দিরের যে রচনাকৌশল উল্লিখিত হয়েছে ও তার নানা অংশের পরিমাপ দেওয়া হয়েছে, তার সত্যতা বিচার করতে পারি। ভারতের প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রের এখনও সম্পূর্ণ উদ্ধার সাধন করা হয় নি।
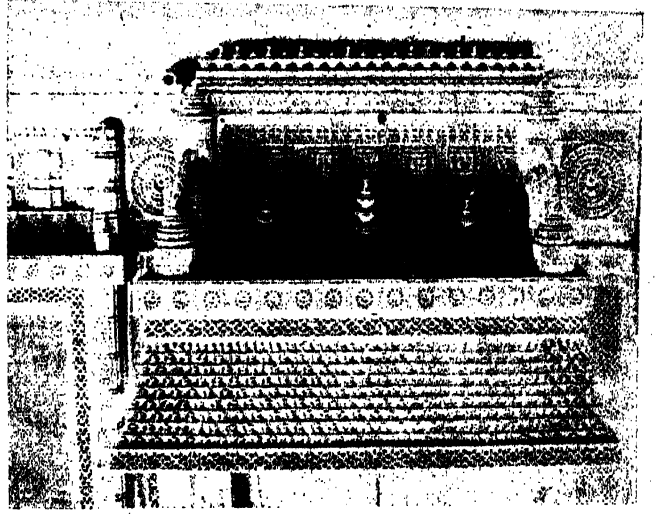
প্রাচীন মন্দির: সূক্ষ্ম শিল্প।

১৮৩৫ সালে রামরাজ তাঁর Architecture of the Hindus নামক গ্রন্থে সর্ব্বপ্রথম কতকগুলি শিল্পশাস্ত্রের পরিচয় দেন, স্থানীয় স্থপতিদের সাহায্যে দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলির রচনা-পদ্ধতিও বিচার করেন। তারপর মনোমোহন গাঙ্গুলী, ফার্গুসন সাহেব প্রভৃতি কয়েকজন পণ্ডিত ভারতবর্ষের নানা প্রাচীন মন্দির ও তাদের রচনাকৌশল আলোচনা করেছেন। কিন্তু প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রের পুঁথিপত্রের সাহায্য অনেকেই গ্রহণ করেন নি, অথচ এই সব শিল্পশাস্ত্র থেকেই আমরা প্রাচীন স্থাপত্যের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পেতে পারি।

ত্রিবান্দ্রামের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী

শিল্পশাস্ত্রের কতকগুলি পুঁথি প্রকাশ করেন ও অধ্যাপক প্রসন্নকুমার আচার্য্য সে সব শাস্ত্র আলোচনা করে তার পারিভাষিক শব্দ সমূহের সঠিক অর্থ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন।

কিছু দিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার বসু এ বিষয়ে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন—সে গ্রন্থের নাম—Canons of Orissan Architecture. তিনি উড়িষ্যার নানাস্থানে শিল্পীদের নিকট হ'তে শিল্পশাস্ত্রের যে সব পুঁথি সংগ্রহ করেন, এ গ্রন্থে সেই সব পুঁথি আলোচিত হয়েছে ও মন্দিরের নানা অংশের পরিমাপ দেওয়া হয়েছে। নির্ম্মল বাবু বুঝতে পেরেছিলেন যে, প্রাচীন বিদ্যা ভারতবর্ষ থেকে সম্পূর্ণ লোপ পায় নি, নানা শিল্পী সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুসন্ধান করলে সে বিদ্যার কিছু খোঁজ এখনও পাওয়া যেতে পারে। সেই উদ্দেশ্যে তিনি উড়িষ্যার নানা শিল্পী সম্প্রদায়ের নিকট অনুসন্ধান করে এবং শিল্পীদের সাধ্যসাধনা করে কতকগুলি পুঁথি উদ্ধার করেন ও নানা পারিভাষিক শব্দের যে সব অর্থ তাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, সে সব অর্থ সংগ্রহ করেন।

নির্ম্মল বাবুর প্রকাশিত গ্রন্থে যে শিল্পশাস্ত্র আলোচিত হয়েছে, তার ভাষা প্রথমে উড়িয়া বলে মনে হওয়া সম্ভবপর। এ পুঁথিতে উড়িয়া টীকাটিপ্পনী আছে বটে, কিন্তু মূলগ্রন্থ ছিল সংস্কৃত ভাষায়। সে সংস্কৃত ভাষা উড়িয়া শিল্পীর হাতে এরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়েছে যে, তাকে আর সংস্কৃত

হিন্দু মন্দির : কম্বোজ।

বলে চেনা সম্ভব নয়। উদাহরণ দিলেই তা স্পষ্ট বোঝা যাবে—

বিপ্রস চতুভুমি। ক্ষেত্রিয় তিতি স্মৃত।
বৈশ্য দ্বয়ামাশয়ঃ। শূদ্রসকা প্রকৃতিতা।

এই শ্লোকের ভাষা উড়িয়াও নয়, সংস্কৃতও নয়। অর্ব্বাচীন শিল্পীর হাতে সংস্কৃত শ্লোক এই রূপ নিয়েছে। এর মূল সংস্কৃত রূপ ছিল—

বিপ্রস্য চতুর্ভূমিঃ ক্ষত্রিয়স্য ত্রয়ীস্মৃতা।
বৈশ্যস্য দ্বয়মাশ্রয়ঃ শূদ্রস্যৈকা প্রকীর্ত্তিতা॥

এ গ্রন্থের সংস্কৃত ভাষা এভাবে পরিবর্ত্তিত হলেও তার অর্থগ্রহণে কোন কষ্ট হয় না।

নানা অধ্যায়ের ভণিতায় গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়—'ইতি নৈমিষারণ্যে ভুবনপ্রদীপে বিসিক্রমা মুনিসংবাদে প্রসাদলক্ষণ।' আমার বিশ্বাস এই ভুবনপ্রদীপ ছিল নানা বিষয়ের সংগ্রহ-গ্রন্থ—যাকে বলা যেতে পারে Encyclopædia. এই জাতীয় সংগ্রহ-গ্রন্থের নমুনা সংস্কৃত ভাষায় আরও আছে। এই ভুবনপ্রদীপের যে অধ্যায়ে স্থাপত্য শিল্পের বর্ণনা ছিল, তারই নাম হচ্ছে "প্রাসাদলক্ষণ"; সেই অধ্যায়ের পুঁথিই উড়িয়া টীকাসহ গ্রন্থকার উদ্ধার করেছেন।

এই ভুবনপ্রদীপ যে উড়িষ্যাদেশেই রচিত হয়েছিল ও সে গ্রন্থে উড়িষ্যাদেশের মন্দির ব্যতীত অন্য মন্দিরের কথা নাই, একথা মনে করবার কোন কারণ নাই। এ গ্রন্থে নানা-জাতীয় মন্দিরের নির্ম্মাণ; কৌশল বর্ণিত হয়েছে সে সব মন্দির ভারতবর্ষের বহু প্রদেশেই পাওয়া যায়। সুতরাং আমার মনে হয় যে, এ গ্রন্থের মূল ছিল সংস্কৃত শিল্পগ্রন্থের মধ্যে অন্যতম, তার পুঁথি উড়িষ্যাদেশে আবিষ্কৃত হলেও তার প্রচার ও প্রচলন প্রাচীনকালে অন্যত্রও ছিল।

ভুবনপ্রদীপে চার শ্রেণীর মন্দির বর্ণিত হয়েছে। এই চার শ্রেণী হচ্ছে—রেখ, ভদ্র, খাখরা ও গৌড়ী। গৌড়ীয় রীতি খুব সম্ভব বাংলা দেশের বিশেষত্ব, কারণ এই রীতিতে নির্ম্মিত মন্দির বাংলা দেশেই বেশী পাওয়া যায়, উড়িষ্যা ও অন্যান্য প্রদেশে কচিৎ দেখা যায়। রেখ ও ভদ্র রীতিতে নির্ম্মিত মন্দির উড়িষ্যা প্রদেশে ও অন্যত্র সুলভ। এ দুই শ্রেণীর মন্দিরের ভিত্তি চতুরস্র (square), খাখরা মন্দিরের ভিত্তি হচ্ছে আয়ত (rectangular)। প্রত্যেক মন্দির চার অংশে বিভক্ত—পিষ্ট, বাড়, গণ্ডী ও মস্তক। পিষ্ট বা pedestal অনেক প্রকারের হ'তে পারে—পদ্ম, সিংহ, ভদ্র, বেড়ি, সুথির, খুর, কুম্ভ, পরিজাজ্য ও কূর্ম্ম। নানা মন্দিরের পিষ্ট ও অন্যান্য অংশের সমস্ত পরিমাপ উড়িষ্যা ও দাক্ষিণাত্যের শিল্পীরা এখনো জানে, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ নির্ম্মল বাবুর বই থেকে পাওয়া যাবে।

প্রাচীন মন্দিরের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, বৃহৎ শিখরবিশিষ্ট মন্দির রচনা সুরু হয় খৃষ্টীয় অষ্টম-নবম শতক থেকে আর এই জাতীয় মন্দির নির্ম্মাণ চলে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক পর্য্যন্ত। এই যুগেই ভুবনেশ্বর, পুরী, কোনার্ক, কাঞ্চী, খজুরাহো, আবু, শত্রুঞ্জয় প্রভৃতি স্থানের প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলি নির্ম্মিত হয়। এই যুগে শুধু যে ভারতবর্ষেই এই বিপুল নির্ম্মাণ-প্রচেষ্টা চলে তা নয়, ভারতের উপনিবেশ চম্পার মন্দির, কম্বোজের এঙ্কোরভাট ও বায়ন, যবদ্বীপে বোরোবোদর ও প্রাম্বানামের শিবমন্দির প্রভৃতিও এই যুগে নির্ম্মিত হয়। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে ও তৎপূর্ব্বে আমরা যে সব
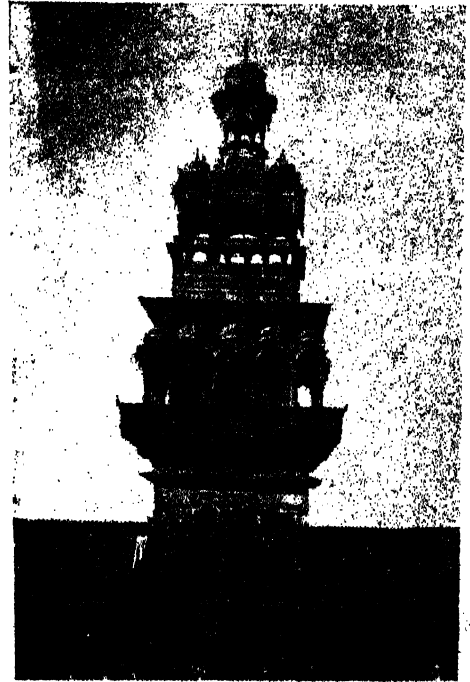
মন্দির-শিল্পে অভিনব পদ্ধতি।

মন্দির পাই, তার বেশীই হচ্ছে গুহা-মন্দির না হয় শৈলমন্দির —যেমন অজন্তা, ইলোরা, মহাবলীপুরের রথ ইত্যাদি। এই যুগে ভারতবর্ষের বাইরে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাবে আফগানিস্থানে বামিয়েন প্রদেশে, মধ্য-এসিয়ার নানাস্থানে, চীন দেশের নানাস্থানে—তুন্-হোয়াং ও যুন-কাং প্রভৃতি অঞ্চলে যে সব মন্দির নির্ম্মিত হয়, তা' প্রায় সমস্তই গুহা-মন্দির। এ সব মন্দিরের রচনায় নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে তোরণ, স্তম্ভ প্রভৃতিতে, ভাস্কর্য্যে ও প্রাচীর-চিত্রে।

মধ্যযুগের শিখর বিশিষ্ট মন্দিরগুলির রচনায় নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে তা'দের বিরাট পরিকল্পনায়, স্থাপত্যে ও বহির্ভাগের কারু শিল্পে ও ভাস্কর্য্যে। এই সব মন্দির শিখর-রচনার প্রণালী অনুসারে তিন ভাগে বিভক্ত—নাগর, বেসর ও দ্রাবিড়। নাগরের প্রচলন ছিল বিশেষতঃ উত্তর-ভারতে, বেসরের প্রচলন পশ্চিম-ভারতে, দাক্ষিণাত্য ও মহীশূরে ও দ্রাবিড় রীতির প্রচলন ছিল—মাদ্রাজ প্রদেশে ও সিংহলে। এই শ্রেণীবিভাগ যে সঠিক, তা মনে করবার কারণ নেই, কারণ প্রাদেশিক-প্রভাবে বহু স্থানে যে নূতন রূপ নিয়েছিল, তার পরিচয় আমরা নানা গ্রন্থে ও প্রবন্ধে পাই। এই সব প্রাদেশিক প্রভাবের ইতিহাস সংগ্রহ ও প্রাচীন শিল্পশাস্ত্র নানাদেশের পুঁথিশালা থেকে উদ্ধার না করলে প্রাচীন ভারতের কারুশিল্পের ইতিহাস সম্পূর্ণ ভাবে অঙ্কিত হ'তে পারে না।

অগ্নিমুখী

—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

তাহারা ছুটিয়া চলে, অগ্নিমুখী পতঙ্গ তাহারা,
ক্ষুদ্র প্রাণ, ততোধিক ক্ষুদ্র তার আশা;
তবু দেখি নিত্য দিন তাহাদেরই করে আকর্ষণ
অগ্নিশিখা মেলি বহু বাহু,
নিবৃত্তি করিতে ক্ষুধা, সর্ব্বভুক তাই তার নাম।
অগ্নির মিটে না ক্ষুধা, জ্বলে অগ্নি আরো চতুর্গুণ,
পতঙ্গ পতঙ্গ মাত্র - ধ্বংসে তার কিবা আসে যায়?

আমরা পতঙ্গ নহি, বুদ্ধিজীবী মানব-সন্তান।
পতঙ্গ পুড়িয়া মরে, বিড়ম্বনা দেখে হাসি পায়,
ঊর্দ্ধে হাসে অন্তর্জন আপনার সৃষ্টি মহিমায়।
দুর্ভাগা সন্তান তার জেনে শুনে নিত্য ছুটিতেছে,
কামনা-বহ্নির শিখা সস্নেহে করিছে আকর্ষণ,
জানে মৃত্যু অনিবার্য্য—তবু লুব্ধ চিত্ত যে বিদ্রোহী,
ঝাঁপ দেয় অহঙ্কারে এরই নাম মানব-প্রকৃতি।

মানব-প্রকৃতি জানি'—জানি' তার দুর্ব্বলতা কোথা,
কেমনে মানব-মনে তৃষ্ণা জাগে 'পুষ্পে কীট সম';
কিবা তার প্রয়োজন, কোন্ পাপে পতন তাহার,
—সমস্ত জানিয়া যারা তপস্যায় সমাহিত মন,
দিব্য দৃষ্টি লভি' নরে শুনাইল সাবধান বাণী;
তারা আজ যোগভ্রষ্ট, অসমাপ্ত সাধনার শাপে
কেবল ঘুরিয়া মরে আপনার ছায়ার পিছনে।

তাই আজ হেরিতেছি আশ্রমের পবিত্র বেষ্টনী
খসিয়া পড়িছে ধীরে জরাজীর্ণ প্রাচীর সমান।
সম্মুখ হইতে আসে "প্রগতি"র প্রবল প্রবাহ
সহজাত ধর্ম্মবোধ ভেসে যায় নিশ্চিহ্ন হইয়া;
নিয়ম-নিষ্ঠার বাণী স্তব্ধ হয় কল-কোলাহলে।
এ তরঙ্গ কে রোধিবে? হেন সাধ্য যদি কারো থাকে;
সে আচরি' সত্যধর্ম্ম অন্যেরে শিখাবে সুনিশ্চয়;
ভোগের নৈবেদ্য আনি সাজাইয়া পূজার থালায়
যাহারা করিতে চায় সর্ব্বগ্রাসী কামাগ্নি-সাধনা,
আপনার ধ্বংসপথে তারা আনে বহুর বিনাশ।

মন্দিরের উপরিভাগের ভাস্কর্য্য ।
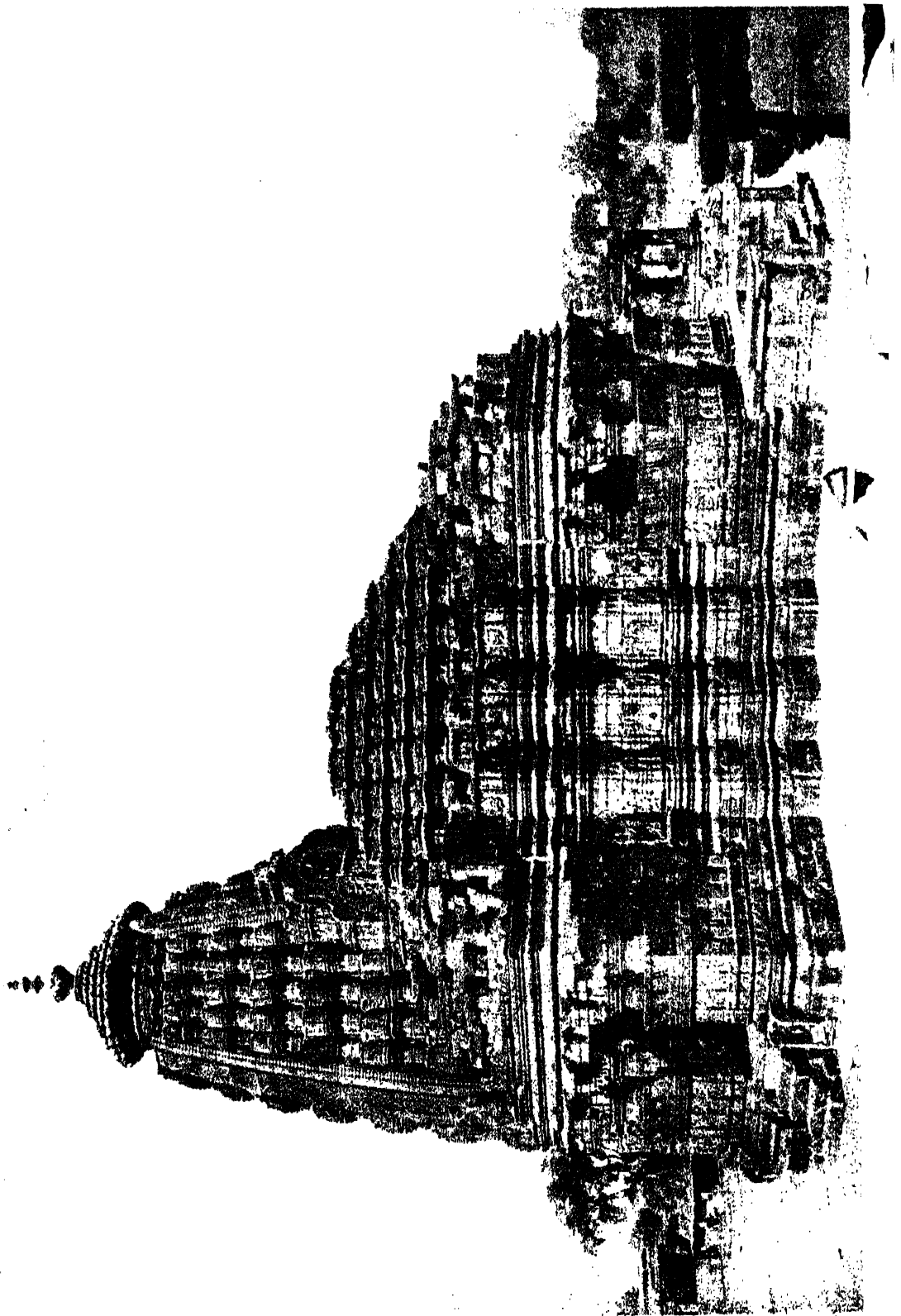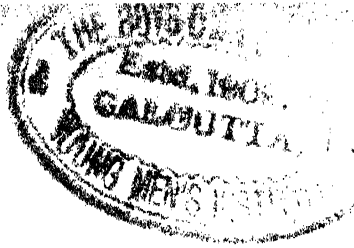
মিনতি-উদ্ধার

—শ্রীঅমলা দেবী

মিনতি চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া টেবিলের উপর দুই হাতের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া রহিল, জবাব দিল না। রমেন ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া কাছে আসিল; মিনতির পিঠে হাত দিয়া কহিল, "খুব ব্যথা হচ্ছে মিনু? ডাক্তার ডাকব?"

মিনতি মুখ তুলিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "আমার? না—"

রমেন কহিল, "তবে?"

—"প্রিয়তমের—"

রমেন তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া চেয়ারে আসিয়া বসিল।

মিনতি কহিল, "আমার হৃদয়-দেবতার—"

নীরস কণ্ঠে রমেন জিজ্ঞাসা করিল, "কে বললে?"

—"প্রিয়তমের পিতা—"

—"শুধু কলিক? কেন, নিউমোনিয়াও তো হতে পারে। ন' দিনের দিন crisis, হার্টফেল, নাভিশ্বাস, গলা ঘড়ঘড়—পটল!"

—"ষাট! বালাই! ও কথা ব'ল না" বলিয়া মিনতি কবিতার খাতাটা টানিয়া লইয়া কি লিখিতে লাগিল।

রমেন কহিল, "ও কি হচ্ছে?"

—"কবিতা লিখছি—"

—"ওরে বাবা! তুমি যে কথায় কথায় কবিতা লিখতে আরম্ভ করলে!"

—"চুপ! হৃদয়োচ্ছ্বাস কবিতায় আত্মপ্রকাশ করছে, গোলমাল ক'র না—" রমেন নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে মিনতি কহিল, "শোন দিকি, কেমন হয়েছে—"

"সুদূর বিদেশে প্রিয়াহীন বিছানায়

(রমেনের দিকে তাকাইয়া বলিল, আমি কাছে নেই কি না?)

প্রিয়তম মোর ভুগিছে কলিক পেনে,
হিয়া মোর তার কাছে ছুটে যেতে চায়,
হেথা গজানন রাখিছে আমারে টেনে—
বলিতেছে গজু টিকিটি নাড়িয়া
হায়! কেন হলনি ক' নিমোনিয়া।"

রাগত স্বরে রমেন কহিল, "গজাননের দায় পড়েছে টেনে রাখতে—"

মিনতি কহিল "দায় পড়েনি? সত্যি বলছ? তবে কেন এখানে ছুটে এসেচ? কেন এত কষ্ট করে এখানে পড়ে আছ?" চেয়ার হইতে উঠিয়া আসিয়া রমেনের পাশে দাঁড়াইল এবং তাহার চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া কহিল, "বল না গো—" রমেনের টিকিতে হাত দিয়া কহিল, "কেন এত বড় টিকি রেখেছ? কেন গজানন নাম ধরেছ?"

সহসা দরজা হইতে নকড়ির মা ডাক দিল, "দিদিমণি!" চমকিয়া উঠিয়া মিনতি মুখ ফিরাইয়া কহিল, "কেন রে নকড়ির মা!" মিনতি একটু খানি সরিয়া দাঁড়াইল এবং গজানন তাড়াতাড়ি কবিতার খাতাখানা টানিয়া লইল।

নকড়ির মা কহিল, "খাবার নিয়ে এসেছি।"

—"এখানে রেখে যা।" তারপর টেবিলের উপর দুই হাত দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া মিনতি রমেনকে কহিল, "দেখুন মাষ্টার মশাই, এখানটা কিছুতেই বুঝতে পারছি না—"

রমেন উত্তর দিল, "এটা আর বুঝতে পারছ না? এত করে বুঝিয়ে দিচ্ছি; মুস্কিল! আচ্ছা আবার শোন—"

নকড়ির মা এক গ্লাস জল ও এক থালা খাবার টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া ইহাদের দিকে একবার তাকাইল; কিন্তু মাষ্টার ও ছাত্রী বোধ করি কোন সুগভীর তত্ত্বের আলোচনায় নিমগ্ন, পৃথিবীর কোন বস্তুর প্রতি তাহাদের বিন্দুমাত্র লক্ষ্য নাই।

রমেন বলিতে লাগিল, "Marginal utility is the utility of the final unit, বুঝতে পারছ?"

মিনতি দুই ভুরু কুঁচকাইয়া ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, "না, বেশ clear হচ্ছে না তো?"

নকড়ির মা চলিয়া গেল। রমেন কহিল, clear হচ্ছে না? তবে শোন, marginal utility অর্থাৎ কি না, (স্বর নামাইয়া) মাগী গেছে?"

মিনতি কহিল, "দাঁড়াও দেখি" বলিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া দরজার কাছে আসিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া কহিল, "গেছে।"

রমেন কহিল, "মাগী বোধ হয় সব দেখেছে—"

মিনতি বেপরোয়া ভাবে কহিল, "দেখেছে তো কি? আমরা তো পড়ছিলাম," বলিয়া মুচকিয়া হাসিল। তারপর প্লেটটা রমেনের সামনে রাখিয়া কহিল, "খাও।"

—"তুমি খাবে না?"

—"আমি সকালে কখনও কিছু খাই দেখেছ?"

—"তবে এ ব্যবস্থা কি আমারই জন্যে?"

—"আজ্ঞে হাঁ হুজুর! আপনারই জন্যে। আপনি একাহারী ব্রহ্মচারী কি না, তাই দাদামশাই আপনার জন্য বরাদ্দ করেছেন, দিনে আলোচাল ও কাঁচকলা-সেদ্ধ আর রাত্রে পোয়াখানেক দুধ। দিন কয়েক ঐ বরাদ্দমত খাওয়া-দাওয়া করলে আপনার দেহখানি দেহযষ্টি হয়ে দাঁড়াবে। তখন মা বলবেন, এই হতভাগীর জন্যে ছেলেটী তাঁর আধখানি হয়ে গেছে—"

খাইতে খাইতে রমেন কহিল, "মা ভাববেন, ছেলে আমার বৌমার জন্য তপস্যা করতে করতে শীর্ণ হয়ে গেছে, যেমন গৌরী করেছিলেন মহাদেবের জন্য তপস্যা—"

মিনতি উত্তর দিল, "মহাদেবের জন্য গৌরী চিরদিন তপস্যা করে এসেছেন, কিন্তু গৌরীর জন্য মহাদেবের তপস্যায় বাংলাদেশে তুমিই pioneer," বলিয়া স্নিগ্ধ নয়নে তাহার দিকে তাকাইল।

এদিকে নকড়ির মা নীচে আসিয়া রঘুর কাছে গালে হাত দিয়া কহিল, "ছিঃ ছিঃ এ কি কাণ্ড! দিদিমণি সোমত্ত বয়সের মেয়ে, ছোকরা একটা মাষ্টারের গায়ে হাত দিয়ে ন্যাকাপড়া করছে; এমন তো কখন দেখিনি মা।"

রঘু ধমক দিয়া কহিল, "তুই কি করে দেখবি মাগী! একি তোদের ছোটলোকদের ন্যাকাপড়া, পেরথম ভাগ, দ্বুতীও ভাগ? আমাদের ভদ্রনোকদের কালেজের ন্যাকাপড়া এমনিই"—বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

নকড়ির মা মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, "ছোটনোক! কি আমার ভদ্রনোক্ রে! নাপতে কোথাকার!"

সেদিন অপরাহ্নে স্বামী জ্ঞানানন্দ ও সদানন্দ বাবু এক সঙ্গে হাজির হইলেন। স্বামীজীর বয়স পঞ্চাশ পার হইয়াছে; বেঁটে, মোটা দেহ, তামাটে রং; মুখে আবক্ষলম্বিত দাড়ি, ভারতবর্ষের ম্যাপের মত সূচ্যগ্র মাথায় বড় বড় চুলগুলি মেয়েদের মত ঝুটি করিয়া বাঁধা; পরিধানে গেরুয়া রংএর ধুতি, পাঞ্জাবী এবং পায়ে গেরুয়া রংএর ক্যাম্বিসের জুতা।

রঘু বাহিরে আসিয়া যুক্তহস্তে নিবেদন করিল, "বাবু তো বাড়ীতে নাই হুজুর! বেড়াতে গেছেন।"

সদানন্দ বাবু কহিলেন, "বেড়াতে গেছেন? কোথায়?"

—"হুজুর! এই রাস্তা ধরে, উদিকে"—বলিয়া হাত বাড়াইয়া দিক নির্ণয় করিল।

—"আর কে কে গেছে?"

—"হুজুর! মাষ্টার বাবু আর দিদিমণি—"

সদানন্দ বাবু স্বামীজীর সহিত দৃষ্টি-বিনিময় করিলেন।

রঘু বলিতে লাগিল, "আগে তো বাবু একাই যেতেন হুজুর! মাষ্টার বাবু আসার পর থেকে দিদিমণি শুদ্ধ যাচ্ছে, মাষ্টার বাবু বলেন যে ওতে দিদিমণির শরীর ভাল হবে।"

সদানন্দ বাবু কহিলেন, "তোমাদের বাবু কিছু বলেন না?"

ঘাড় নাড়িয়া রঘু জবাব দিল, "আজ্ঞে না—মাষ্টার বাবুর কথা তো বাবুর কাছে বেদবাক্যি কি না—" তারপর বাহিরের দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিল "ঐ যে বাবু আসছেন"—বলিয়া প্রস্থান করিল।

যোগেন্দ্র বাবু, রমেন ও মিনতি আসিয়া পৌঁছিল। যোগেন্দ্র বাবু ভূমিষ্ঠ হইয়া স্বামীজীকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু মিনতি নতমুখে ও রমেন বেপরোয়া ভাবে ঘরের মধ্যে ঢুকিবার উপক্রম করিতেই সদানন্দ বাবু কঠোর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "শোন।"—তাহারা থমকিয়া দাঁড়াইল।

সদানন্দ বাবু মিনতিকে কহিলেন, "এদিকে এস মা! স্বামীজীকে প্রণাম কর।" মিনতি লজ্জিত মুখে আসিয়া স্বামীজীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। স্বামীজী সস্নেহ বাহু-বেষ্টনে তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মিনতি হাত ছাড়াইয়া লইয়া পার্শ্বে নতমুখে দাঁড়াইল।

সদানন্দ বাবু বলিতে লাগিলেন, "দেবদ্বিজে ভক্তি করতে শিখতে হয় মা! শুধু লেখাপড়া শিখলেই হয় না—" রমেনের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "তুমি খাড়া দাঁড়িয়ে রৈলে যে হে, তোমার কি মাথা নোয়াবার যো নেই না কি?" রমেন ঘাড়

ধরিল। ধরিতেই রঘুনন্দন মুখ হাঁ করিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল। এবং লোকটাকে দেখিয়া 'বাবা রে' বলিয়া চীৎকার করিবার উপক্রম করিল, কিন্তু লোকটা রিভলভারের নলটা তাহার হাঁ-করা মুখ-গহ্বরের কিনারায় রাখিতেই—একেবারে নির্ব্বাক্—শুধু দুই চোখ দিয়া হু হু করিয়া জল পড়িতে লাগিল। লোকটা অঙ্গুলির ইঙ্গিতে আলমারিটার পশ্চাৎ দেখাইয়া কহিল, "ঐখানে ঢোক্, শব্দ করেছিস কি নড়েছিস তো"—বলিয়া ঘোড়াটা টিপিবার উপক্রম করিল।

রঘুনন্দন আবার চীৎকার করিতে গেল, "উরে মা—"

আবার ধমক আসিল "চুপ!" রঘুনন্দন নিঃশব্দে উঠিয়া লোকটার আদেশমত অতি কষ্টে আলমারিটার পিছনে ঢুকিল। লোকটা পাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

আর একজন যোগেন্দ্রবাবুর বিছানায় বসিয়া যোগেন্দ্র বাবুকে ঠেলিতে লাগিল। এবং বাকী দুইজনের একজন দাঁড়াইল মাথার দিকে এবং আর একজন পায়ের দিকে। বার দুই নাড়িতেই এবং ডাক দিতেই যোগেন্দ্র বাবু চোখ মেলিয়া চাহিয়াই—"কি! কি! কে তুমি—কে তোমরা?" বলিয়া চীৎকার করিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু লোকটা তাঁহাকে জোর করিয়া শোয়াইয়া দিয়া কহিল, "ব্যস্ত হবেন না। শুয়ে থাকুন। আপনার আবার হার্ট-এর দোষ আছে, ফেল করতে পারে—"

যোগেন্দ্রবাবু তাহার হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে কহিলেন, "করুক আমার হার্ট ফেল, ছেড়ে দাও।" তারপর, "চুরি করতে এসেছে, চোর! চোর! রঘু!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেই লোকটা তাঁহার মুখে হাত চাপা দিয়া রুষ্ট মৃদু কণ্ঠে কহিল, "চুপ, করে থাকুন, চ্যাঁচাবেন না, নইলে," বলিতেই আর একজন লোক সামনে আসিয়া দাঁড়াইল; তাহার হাতে একটা চকচকে ছোরা।

যোগেন্দ্রবাবু তাহার দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, এবং দুই হাতে পাশের লোকটার হাত ধরিয়া কহিলেন, "দোহাই বাবা, মের না,—কিছু নাই, নেহাৎ গরীব—"

লোকটা মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, "আজ্ঞে সে আমরা জানি। দয়া করে ভাল ছেলের মত সিন্দুকের চাবিটা বের করুন দিকি, নইলে অন্য পন্থা দেখতে হবে।"

যোগেন্দ্রবাবু চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "পন্থা! আবার কি পন্থা?"

—"আজ্ঞে, হরেক রকমের; দু একটার সঙ্গে পরিচয় হলেই 'মোহমুদ্গর' আওড়াতে আরম্ভ করবেন—"

যোগেন্দ্রবাবু সজোরে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "না, বাবা, না—পন্থা-টন্থা দেখিয়ে আর কাজ নেই; বুড়ো মানুষ, তোমাদের বাবার বয়সী।"

—"আজ্ঞে সেই জন্যেই তো আবদার করতে এসেছি—"

যে লোকটা আগাইয়া আসিয়াছিল, সে হাঁকিয়া কহিল, "বুড়টাকে ওঠাও তো হে, বুজরুকী বের করছি—" বলিয়া ছোরাটা বাগাইয়া ধরিল।

বৃদ্ধ হাউ মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "ওরে বাবা রে—মেরে ফেললে রে—"

সহসা সেই কক্ষে গজানন প্রবেশ করিয়া যে লোকটা মাথার দিকে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে মারিল এক ঘুসি, লোকটা ছটকাইয়া অন্য লোকটার ঘাড়ে পড়িল। সেই লোকটা ছোরা উঠাইতেই গজানন অপূর্ব্ব কৌশলে তাহার হাত হইতে ছোরা কাড়িয়া লইল এবং তাহাকে এমন প্রচণ্ড এক চপেটাঘাত করিল যে, সে উল্টাইয়া পড়িল; ইতিমধ্যে অন্য লোকটা আসিয়া গজাননের উপরে পড়িল এবং যে লোকটা বসিয়াছিল সেও আসিয়া যোগ দিল, কিন্তু গজানন একাকী অভিমন্যুর মত অমিতবিক্রমে তাহাদের সহিত লড়িতে লাগিল। জলের কুঁজাসমেত টেবিল পড়িল, ঝন ঝন করিয়া আলমারির কাঁচ ভাঙিয়া পড়িল, আলমারীর পশ্চাৎ দিকের একখানা কাঠ মড় মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং সেই সঙ্গে কাঠ-চাপা-পড়া রঘুনন্দন একটীমাত্র কোঁক করিয়া চুপ করিল, ল্যাম্পটা উল্টাইয়া পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল, এবং গাঢ় অন্ধকারে যোগেন্দ্রবাবুর নিমেষহীন চক্ষের সম্মুখে যেন মহাপ্রলয় নামিয়া আসিল। তাঁহার মনে হইল, যাহা দেখিতেছেন, সব মিথ্যা—চোর নয়, ভূমিকম্পে পৃথিবী দুলিতেছে, বাড়ীটা দুলিতেছে, সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইতেছে, ইহার পরই তাঁহাকে এবং বাড়ীর সকলকে লইয়া সমস্ত বাড়ীটা কাৎ হইয়া পড়িবে। তিনি একবার উঠিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

চৈতন্য লাভ করিয়া যোগেন্দ্রবাবু দেখিলেন, কক্ষে আলো জ্বলিতেছে; তাঁহার মাথার কাছে বসিয়া মিনতি পাখা করিতেছে; পায়ের কাছে বসিয়া ভৃত্য রঘুনন্দন। মাথার দিকে গজানন দাঁড়াইয়া ছিল, যোগেন্দ্রবাবু তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি চোখ মেলিয়া চাহিতেই রঘুনন্দন কাঁদিয়া উঠিল; যোগেন্দ্রবাবুর দুই পা দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল, "আর একটুকু হলেই কি হ'ত গো বাবু..." যে বিপদ ঘাড়ের উপর পড়িব-পড়িব করিয়া ভাগ্যক্রমে পাশ কাটাইয়া গিয়াছে,ভৃত্যের ইঙ্গিতে তাহা স্মরণ করিয়া যোগেন্দ্রবাবুরও চোখ হইতে জল পড়িতে লাগিল। মিনতির কোলের উপর হাত রাখিয়া তিনি কহিলেন, "সব ভাল ত দিদি ?"

মিনতি ঘাড় নাড়িল।

যোগেন্দ্রবাবু মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গজানন কই ?"

মিনতি তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া চাহিতেই গজানন সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

যোগেন্দ্রবাবু তাহার দিকে তাকাইয়া বিছানার পাশে হাত দিয়া কহিলেন, "এইখানে বস।"

গজানন বসিল।

যোগেন্দ্রবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "তুমি আজ আমাদের সবাইকে রক্ষা করেছ গজানন। তোমার ঋণ আমরা কেউ শোধ করতে পারব না। তুমি না থাকলে আমাদের আজ কি যে হ'ত !" বলিতেই যোগেন্দ্রবাবুর সমস্ত দেহ থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

গজানন বিনীত, মৃদু কণ্ঠে কহিল, "প্রত্যুপকারের আশায় কিছু করি নি, আমার যা কর্ত্তব্য তাই করেছি।"

যোগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তুমি মানুষ—মানুষের মত কথা বলছ, কিন্তু আমরা কৃতজ্ঞ না হয়ে যে থাকতে পারছি না বাবা।" বলিয়া গজাননের হাতটী টানিয়া লইয়া তাহাতে হাত বুলাইতে লাগিলেন এবং হঠাৎ কিসের স্পর্শে চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "তোমার হাতে রক্ত না কি ? মিনু দেখ তো দিদি ?"

মিনু পাখাটা ফেলিয়া দিয়া গজাননের হাতটা টানিয়া দেখিয়া বিবর্ণ মুখে কহিল, "তাই ত অনেকখানি কেটে গেছে দেখছি—"

"তাই না কি—তা' হলে ত—" বলিতে বলিতে যোগেন্দ্রবাবু উঠিয়া বসিতে গেলেন।

গজানন কহিল, "না—না—আপনি উঠবেন না—একটুখানি কেটে গেছে, ও আমি ঠিক করে নেব অখন—"

যোগেন্দ্রবাবু ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "অখন নয় এখনই—যাও ত দিদি, ভাল করে ধুয়ে ওষুধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দাও গিয়ে; না হলে ভারী ভুগতে হবে; যাও যাও, বাবা! দেরী ক'র না।"

মিনতির ঘরে রমেন একটী চেয়ারে বসিয়া; মিনতি সামনে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া রমেনের হাতটী ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিতেছে, রমেন সতৃষ্ণ নয়নে মিনতির চঞ্চল, সুন্দর আঙুলগুলির দিকে তাকাইয়া আছে।

মিনতি মুখ তুলিয়া কহিল, "ওরা কেটে দিলে, না নিজেই কেটেছ ?"

রমেন হাসিয়া কহিল, "নিজেই কেটেছি—"

মিনতি ছলছল চক্ষে কহিল, "বেশ করেছ; কতদিন ভোগাবে কে জানে ?" তারপর রমেনের কোলে মুখ লুকাইয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "যে কষ্ট আমার জন্যে করছ, আমি কি তার যোগ্য ?"

রমেন প্রত্যুত্তরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

পরদিন সকালে সদানন্দবাবু আসিয়া হাজির হইলেন। রঘু খবর দিল যে, বাবু আজ আর নামিতে পারেন নাই, উপরে শুইয়া আছেন।

সদানন্দবাবু কহিলেন, "এত বেলাতেও শুয়ে আছেন ? শরীর খারাপ না কি ? চল দেখি গে।"

যোগেন্দ্রবাবু চুপচাপ শুইয়াছিলেন; সদানন্দবাবু কক্ষে প্রবেশ করিলেও উঠিলেন না, শুধু কহিলেন, "এস সদানন্দ, বস।"

সদানন্দবাবু আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "ব্যাপার কিহে, আবার ব্লাড-প্রেসার বাড়ল নাকি ?"

যোগেন্দ্রবাবু ঘাড় নাড়িয়া 'হাঁ' কি 'না' জানাইলেন, বুঝা গেল না।

সদানন্দবাবু কহিলেন, "স্বামীজীকে খবর দিয়েছ ?"

যোগেন্দ্রবাবু মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, "আর স্বামীজী! কাল যা বিপদ গেছে—"

সদানন্দ উৎকণ্ঠিত স্বরে কহিলেন, "কি, কি হে?"

—"উঃ ভারী বিপদ! ডাকাত পড়েছিল—"

—"ডাকাত? সহরের মধ্যে ডাকাত! কথনও শুনিনি ত! কিছু নিয়ে গেছে না কি?"

যোগেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "কিছু নিয়ে যেতে পারে নি, তবে গজানন না থাকলে—"

—"গজানন! ঐ মাষ্টারটা ত?"

—"হ্যাঁ। ও না থাকলে কাল সবাইকে সাবড়ে দিয়ে যেত। বেচারী নিজে কাল খুব জখম হয়েছে—"

—"কি হয়েছে?"

—"হাতের কতকটা খুব কেটে গেছে। এমন ছেলে আজকাল দেখা যায় না, সদানন্দ!"

সদানন্দবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, বুঝতে পেরেছি; ডাকাত-ফাকাত ঐ বেটার কারসাজী। ঐ ডেকে নিয়ে এসেছে। ঐ জন্মেই ও তোমার বাড়ী ঢুকেছিল। ভেবেছিল, রাত দুপুরে চুপচাপ কাজ সারবে; এখন জানতে পেরেছ কি না, তাই নিজে নিজেই জখম হয়ে দেখাচ্ছে, নিজে কত সাধু।"

যোগেন্দ্রবাবু প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "ছিঃ ছিঃ ও কথা ব'ল না সদানন্দ!"

—"ঠিক কথাই বলছি; তুমি ভাল মানুষ, কিছু বোঝ না। পুলিশে খবর দিয়ে দাও, পুলিশ আসুক; দাও বেটাকে ঠেকিয়ে: চাবুকের চোটে সুড়সুড় করে সব স্বীকার করবে।"

—"এতখানি নেমকহারামী করতে পারব না সদানন্দ! আমি নিজের চোখে দেখেছি, কি ও করেছে—নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে একা যুঝেছে;" (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) "কি শক্তি ওর দেহে! একা চার পাঁচজন লোককে কাবু করে দিলে, আশ্চর্য্য! একটা মানুষের মত মানুষ! যেমন শিক্ষিত! তেমনি শক্তিমান!"

—"তুমি একটা বিপ্লবী ডাকাতের পাল্লায় পড়েছ যোগেন্দ্র! ভারী বিপদে পড়বে। এখনও ভালয় ভালয় পুলিশে খবর দিয়ে ধরিয়ে দাও—"

—"পারব না" (ঘাড় নাড়িয়া) "না—না—কিছুতেই না"

—"পুলিশে খবর দেবে না? গজানন চুলোয় যাক, কিন্তু সরকারী চাকরে হিসেবে ত তোমার পুলিশে খবর দেওয়া উচিত? গজাননকে ধরবে না ছেড়ে দেবে তা' তারা বুঝবে।"

—"আমার যখন কিছু চুরি যায় নি, তখন পুলিশে খবর দিয়ে কি হবে?"

—"নেই বা কিছু গেল! তবু পুলিশে খবর দেওয়া উচিত। সত্যিই যদি ডাকাত হয়, ত' তারা কি আর চেষ্টা করবে না ভেবেছ? চারজন এসেছিল এবার চল্লিশ জন আসবে। গজাননের চৌদ্দপুরুষ এলেও ঠেকাতে পারবে না।"

যোগেন্দ্রবাবু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কহিলেন, "এখান থেকে পালিয়ে গেলে হয় না?"

সদানন্দবাবু কহিলেন, "কোথায়?"

—"কলকাতায়, এখানে আমার মনও টি'কছে না শরীরও ত নিত্যি খারাপ হচ্ছে।"

—"পাগল না কি! এত টাকা খরচ করে বাড়ী কিনে পালাবে কি রকম? কিচ্ছু ভয় নেই, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আর এ বাড়ীতে যদি মন না টি'কে, সহরে কি আর বাড়ী নেই যে, দেশ ছেড়ে পালাতে হবে?"

সেইদিন অপরাহ্ণ। যোগেন্দ্রবাবু নীচের ঘরে বসিয়া ছিলেন, এমন সময়ে রঘু আসিয়া খবর দিল যে, পুলিশের ইনস্পেক্টর সাহেব ও দারোগাবাবু দেখা করিতে আসিয়াছেন।

যোগেন্দ্রবাবু মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, "এই দেখ কি কাণ্ড! কি মুস্কিলে ফেলেছে সদানন্দ! যা, ডেকে নিয়ে আয়।"

ইন্‌স্পেক্টর নীরেনবাবু ও দারোগা যতীনবাবু খাঁকী রংএর পুলিশের পোষাক পরিয়া হাজির হইলেন।

যোগেন্দ্রবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া "আসুন, আসুন—নমস্কার, বসুন" বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। আগন্তুকদ্বয় নমস্কার করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

নীরেনবাবু কহিলেন, "সদানন্দবাবু, আমাদের খবর দিয়েছেন যে, আপনার বাড়ীতে কাল না কি কতকগুলো ভদ্রলোকের ছেলে ডাকাতী করতে এসেছিল?"

যোগেন্দ্রবাবু উত্তর দিলেন, "কতকগুলো লোক এসেছিল বটে; তবে তারা ভদ্রলোকের ছেলে কি না তা কি করে জানব?"

—"চেহারা দেখে কি মনে হয়েছিল?"

—"সকলের মুখই তো প্রায় ঢাকা ছিল, কি করে চিনব বলুন? তা' ছাড়া ভাল করে তাকিয়ে দেখবার মত মনের অবস্থাও ছিল না।"

"আপনার বাড়ীতে গজানন নামের কোন ছোক্‌রা আছে?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"ডাকুন তো তাকে, একবার দেখি—"

—"কেন বলুন ত?"

—"সদানন্দ বাবু বলেন, আপনি না কি তাকেই সন্দেহ করেন? সেই না কি—"

যোগেন্দ্রবাবু প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, "সদানন্দ মিথ্যা-বাদী; আমি সন্দেহ করব তাকে? সেই তো কাল আমা-দের রক্ষা করেছে মশায়; সে না থাকলে এ বাড়ীর একটী লোকও বাঁচত না।"

নীরেনবাবু কহিলেন, "তা' ভাল, তবু একবার ডাকুন।"

অনতিবিলম্বে গজানন আসিয়া কাছে দাঁড়াইল।

নীরেনবাবু প্রশ্ন করিলেন, "আপনার নাম গজানন গাঙ্গুলী?"

গজানন উত্তর দিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"বসুন, আপনার সঙ্গে কথা আছে।"

গজানন একটা চেয়ার টানিয়া বসিল।

নীরেনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখানে কি করেন?"

—"মাষ্টারী।"

—"কলকাতা থেকে এখানে মাষ্টারী করতে এলেন, সারা কলকাতা সহরে মাষ্টারী জুটল না?"

—"তাই তো দেখলুম; চেষ্টায় বিফল হয়েই এখানে এসেছি, হাওয়া খেতে আসিনি—"

"এখানে যে মাষ্টারী পাওয়া যাবে, জানলে কি করে?"

—"খবরের কাগজ দেখে,—কাগজে বিজ্ঞাপন বেরিয়ে-ছিল—"

—"ওঃ তাই না কি?" যোগেন্দ্রবাবুর দিকে তাকাইয়া, "বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন বুঝি?"

যোগেন্দ্রবাবু ঘাড় নাড়িলেন। গজাননের দিকে চাহিয়া নীরবে প্রশ্ন করিলেন, "কাল যারা এসেছিল, তাদের কাউকে চিনতে পেরেছিলেন?"

গজানন হাসিয়া কহিল, "তারা কি আমার বন্ধু যে, চিনতে পারব? আপনার প্রশ্ন অদ্ভুত।"

নীরেন বাবু কহিলেন, "কি করব বলুন? আজকালকার ছেলেদের ত বিশ্বেস নেই। আপনি যে একজন রিভল্যু-সনারি নন্ তার প্রমাণ কি? আচ্ছা, আপনি এখন যেতে পারেন।" তার পর গজাননের ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাতের দিকে চাহিয়া বিস্মিতভাবে কহিলেন, "আপনার হাতে কি?"

যোগেন্দ্রবাবু কহিলেন, "ডাকাতদের কীর্তি—ওর বন্ধু কি না, একটু প্রীতি-চিহ্ন রেখে গেছে—"

নীরেন বাবু কহিলেন "তাই না কি?" ডাকাতদের সঙ্গে আপনি তা' হলে রীতিমত ফাইট করেছেন?"

যোগেন্দ্রবাবু কহিলেন, "তাইত বলছি মশায়, ও না থাকলে আমরা কাল কেউ বাঁচতাম না। ও একা তাদের সঙ্গে যুঝেছে। কোথায় ওর প্রশংসা করা উচিত, তা না, ঐ ডাকাত ডেকে নিয়ে এসেছে, ও একজন রিভল্যুসনারি; যেমন সদানন্দ, তেমনি আপনারা—"

—"আমরা তা বলতে চাইনে অবশ্য, তবে সদানন্দ বাবুই তো আমাদের এ সব বললেন কি না! আপনার যদি এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ না থাকে, তবে আর কথা কি—"

যোগেন্দ্রবাবু উত্তেজিত ভাবে কহিলেন, "আমার কোন সন্দেহ নেই, বরং ওকে আমি আমার ছেলের মত বিশ্বাস করি। আপনাদের প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ, দয়া করে এ সম্বন্ধে আর আন্দোলন করবেন না"—তার পর বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, "সদানন্দ আচ্ছা লোক!"

—"ও লোকটী যে আচ্ছা, তা' আজ জানলেন না কি? ওর সঙ্গে আলাপ হ'ল কি করে?"

—"ছেলেবেলার বন্ধু, এক সঙ্গে স্কুলে পড়তুম, অনেকদিন অবধি দেখা হয় নি, তারপর, আমি যেখান হতে রিটায়ার করি, সেখানে ও একটা জমিদারির ম্যানেজার ছিল। সেখানে আমাদের শুকিয়ে-যাওয়া বন্ধুত্ব আবার নূতন করে গজিয়ে

বেশ ভদ্রলোকের মত, ধুতি ও পাঞ্জাবী, পায়ে পেটেণ্ট লেদারের চক্‌চকে গ্রীসিয়ান স্লিপার।

যোগেন্দ্রবাবু কহিলেন, "এই যে আসুন, নীরেনবাবু! আপনার কথাই ভাবছিলুম—"

নীরেনবাবু কহিলেন, "সত্যি না কি! তা' হলে কিছু বেকায়দায় পড়েছেন বুঝতে হবে।"

যোগেন্দ্রবাবু কহিলেন, "ও কথা বলবেন না নীরেনবাবু, আপনি আমার যে উপকার করেছেন, আপনার কথা সারাজীবন ভাবব।"

—"তা' ভাবুন, কিন্তু আপনার খবর কি?"

—"সদানন্দ আর স্বামীজী ও বেলায় এসেছিল, সাফ জবাব দিয়েছি।"

—"ভাল করেন নি—"

"কেন? কোন ক্ষতি করতে পারে না কি?"

—"ক্ষতি করতে পারে নিশ্চয়। তবে আমি পিছনে আছি জানলে সাহস করবে না। তা' যাক সম্বন্ধ ত ভেঙ্গে দিলেন, কিন্তু কোথায় বে দেবেন?"

যোগেন্দ্রবাবু কহিলেন,—"তাই ত ভাবছি। কোথায় যে এ বয়সে আবার খুঁজতে বেরোই! একটী ছেলে হাতে ছিল, আমার মেয়ে ঠিক করে গিয়েছিল। তা' সেটীকে ত জবাব দিয়ে এসেছি—জবাব কেন, অপমান করে এসেছি। সেখানে হবার কোন আশা নেই।"—বলিয়া ঘাড় নাড়িলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "আপনার জানা কোন ছেলে নেই?"

নীরেনবাবু চিন্তিত ভাবে কহিলেন, "আমার জানা ছেলে—" কিছু ক্ষণ কি ভাবিয়া কহিলেন, "কেন আপনার বাড়ীতেই ত একটী ছেলে আছে! ওর সঙ্গে চলবে না?"

যোগেন্দ্রবাবু কহিলেন, "কে—কে?"

—"কেন? গজাননবাবু? বেশ ছেলে ত? শিক্ষিত—শক্তিমান—"

"কে,—মাষ্টার? ওর কথা ভেবেছি, কিন্তু ও ত বিয়ে করবে না—"

নীরেনবাবু বিস্মিতভাবে কহিলেন, "বিয়ে করবে না! কেন?"

—"ওর গুরুদেবের নিষেধ আছে।"

—"গুরুদেব!"

—"সে আবার সাংঘাতিক গুরুদেব, চণ্ডানন্দ না—কি—নাম।"

—"গুরুদেব রেখে দিন আপনি, সে আমি দেখে নেব। আপনি দেবেন ওর সঙ্গে?"

—"তা' আপত্তি কি? ছেলেটী তো ভালই—"

—"তবে ডাকুন ওকে, ঠিক করে দিচ্ছি আমি—" গজাননের ডাক পড়িল। গজানন আসিতেই নীরেনবাবু কহিলেন, "আসুন, গজাননবাবু, বসুন, আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।" গজানন বসিল।

নীরেনবাবু কহিলেন, "দেখুন গজাননবাবু, আমি পুলিশের লোক, যা' যা' জিজ্ঞাসা করব, সত্যি জবাব দেবেন, কোন কথা গোপন করবেন না।"

গজানন বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "এত ভণিতার প্রয়োজন কি—বলুন ত?"

নীরেনবাবু কহিলেন, "প্রয়োজন আছে। আপনার বাড়ী কোথায়?"

—"কলকাতায়—"

—"আপনার কে কে আছেন?"

—"মা আছেন—"

—"আর কেউ নেই?"

—"না।"

যোগেন্দ্রবাবু কহিলেন, "তা' ভাল। অল্প আয়েই চলে যাবে।"

নীরেনবাবু পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "লেখা-পড়া কতদূর করেছেন?"

যোগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "ও ত এম-এ পাশ।"

গজানন কহিল, "এম-এ, পি-এইচ-ডি।"

যোগেন্দ্রবাবু বিস্মিত ভাবে কহিলেন, "তুমি ডক্টরেট পেয়েছে না কি?"

গজানন বিনীত ভাবে কহিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

যোগেন্দ্রবাবু কহিলেন, "আমাকে বলনি ত?"

গজানন কহিল, "আপনি ডক্টরেট চাননি ত?"

যোগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তবু বলা উচিত ছিল।"

নীরেনবাবু প্রশ্ন করিলেন, "চাকরী-বাকরীর চেষ্টা করছেন, না লোকের বাড়ীতে মাষ্টারী করে জীবন কাটাবেন?"

—"চাকরীর চেষ্টা করছি। আশা আছে, একটা খবর পেয়েছি।"

যোগেন্দ্রবাবু উৎকণ্ঠিত ভাবে কহিলেন, "কোথায় হে?"

গজানন কহিল, "প্রেসিডেন্সী কলেজে—"

যোগেন্দ্রবাবু কহিলেন, "ও, সে ত গবর্ণমেণ্টের চাকরী!"

গজানন কহিল—"প্রভিন্সিয়াল সার্ভিশ।"

যোগেন্দ্রবাবু নীরেনবাবুর দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "আশা আছে—বলছ না?"

নীরেন বাবু কহিলেন, "তাই ত বলছেন।" গজাননের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "কি করে জানলেন, আশা আছে?"

গজানন—"এখানে আসবার আগে খবর নিয়ে এসেছিলাম—"

যোগেন্দ্র—"তবে যে আমাকে বলেছিলে, চাকরী পাবার আশা নেই, এখানেই বরাবর থাকবে?"

গজানন নত মুখে চুপ করিয়া থাকিল।

যোগেন্দ্রবাবু ক্ষোভের সহিত কহিলেন, "তা' হলে তুমিও মিথ্যা কথা বল? তা' হলে গুরুদেব, টুরুদেবও মিথ্যে!"

গজানন প্রবল প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "মিথ্যে কি রকম?"

নীরেনবাবু কহিলেন, "চুপ করুন, যোগেন্দ্রবাবু, আমি জিজ্ঞাসা করছি।" তার পর গজাননকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার গুরুদেবের নাম কি?"

গজানন—"শ্রীশ্রীমৎ প্রচণ্ডানন্দ স্বামী।"

যোগেন্দ্রবাবু নীরেনবাবুর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "দেখেছেন কাণ্ড! বলে, প্রচণ্ডানন্দ!"

নীরেনবাবু একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কোথায় থাকেন?"

গজানন—"নীলগিরি পর্ব্বতের গুহায়—"

—"বাঙ্গালী?"

—"না—উড়িষ্যাবাসী—"

—"অর্থাৎ উড়ে। মশায়, বাঙ্গালীর ছেলে হয়ে শেষে উড়ের কাছে মাথা মুড়িয়েছেন!"

—"মশায়! সাধু লোকদের কি আর, উড়ে বাঙ্গালী ভেদ আছে?"

—"নেই বুঝি? এ ডিপার্টমেণ্টেও তবে Bengal for all?—তা' ভাল—"

যোগেন্দ্র বাবু কহিলেন, "গুরুদেবের না কি বিয়ে করতে নিষেধ।"

নীরেন বাবু কহিলেন, "তাই না কি মশায়?"

গজানন কহিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

নীরেন বাবু কহিলেন, "আপত্তি কিসের? শিষ্যরা বিয়ে করলেই ত' ভাল; তা' হ'লে ভক্তিমতী শিষ্যা পাবেন। শিষ্যের ভক্তিতে যদিও বা ভাঁটা পড়ে, শিষ্যার ভক্তিতে চির-দিন জোয়ার চলবে। তা' ছাড়া ব্যবসাও একেবারে বংশানু-ক্রমে কায়েম হ'য়ে থাকবে।"

গজানন বিরক্ত হইয়া কহিল, "আমার গুরুদেব ব্যবসাদার নন্!"

নীরেন বাবু কহিলেন, "নন্ না কি? তা' ভাল।"—বলিয়া মুচকি হাসিয়া কহিলেন, "দেখুন মশায়, গুরুদেব-ফুরুদেব বুঝিনে। আপনাকে বিয়ে করতে হবে।"

গজানন আঁৎকাইয়া উঠিয়া কহিল, "আমার অপরাধ!"

নীরেন বাবু কহিলেন, "দাঁড়ান, বলতে দিন—বিয়ে করতে হবে, যোগেন্দ্র বাবুর নাতনী, আপনার ছাত্রী মিনতিকে।"

গজানন বিস্মিত ভাবে কহিল, "সে যে আমার ছাত্রী আমার—"

নীরেন বাবু ধমক দিয়া কহিলেন, "ছাত্রী বিয়ে করা চলে মশায়! নজীর আছে।"

গজানন কহিল, "আমার মত চালচুলোহীন মাষ্টারের সঙ্গে উনি বে দেবেন?"

নীরেন বাবু বলিলেন, "দেবেন। এখানে বিয়ে করলে তোমার চাল-চুলো দুই-ই হবে, তার উপর তুমি যদি প্রফে-সারী পাও ত সোণায় সোহাগা—"

যোগেন্দ্র বাবু সমর্থনসূচক ঘাড় নাড়িলেন।

গজানন বিস্মিত ভাবে যোগেন্দ্র বাবুর দিকে চাহিয়া কহিল, "একটা প্রফেসারের সঙ্গে মিনতির মত মেয়ের বিয়ে দেবেন আপনি?"

যোগেন্দ্র বাবু কহিলেন, "কেন, প্রফেসারী কি তুচ্ছ না কি? বরং ওর মত honest and respectable চাকরী আর নেই।"

নীরেন বাবু কহিলেন, "তোমাকে এত ভাবতে হবে না, তুমি বিয়ে করবে কি না বল?"

গজানন ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "মাপ করবেন আমাকে, গুরুদেবের নিষেধ—"

যোগেন্দ্র বাবু কহিলেন, "দেখলেন, আমি বলেছিলুম ত।"

নীরেন বাবু কহিলেন, "দেখুন, গজানন বাবু, আমি চাই আপনি যোগেন বাবুর নাতনীকে বিয়ে করেন। আর আমি যখন চাই, তখন আপনার বিয়ে দেবই, যে কোন প্রকারে হ'ক। কাজেই, ভালয় ভালয় মত দিন, নইলে বিপদে পড়তে হবে।"

গজানন চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "বিপদ!"

নীরেন বাবু কহিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, বিপদ, মহাবিপদ—সেদিনকার ডাকাতীর কথা আমরা ডাইরীতে লিখে নিয়েছি; সেই ব্যাপারে আপনাকে বিপ্লবী বলে জেলে ঢুকিয়ে দেব; আর যদি বিয়ে করেন, তা' হ'লে উল্টে নেমন্তন্ন খাওয়াব। 'তা' ছাড়া— (স্বর নামাইয়া) কেন এই বয়স থেকে টিকি-টুকি রেখে চেহারাটা বদখৎ করছেন? মাছ-মাংস ছেড়ে মানব-জীবন বৃথা নষ্ট করছেন? ধর্ম্ম করবার ইচ্ছে? তারও সময় আছে। আপনি একজন brilliant ছেলে, বে-থা করে সংসার-ধর্ম্ম পালন করুন, কাজ-কর্ম্ম করুন, তাতে সমাজের মঙ্গল হবে। তা' না এই বয়স থেকে ন্যাংটা সন্ন্যাসী সেজে হৈ-হৈ! ও সব মতলব ছেড়ে দিন, বুঝলেন?"

গজানন নিরুত্তর।

নীরেন বাবু প্রশ্ন করিলেন, "কি বলছেন? হ্যাঁ, না না?"

গজানন কহিল, "দেখুন, আমাকে একবার কলকাতা যেতে দিন; একটু বুঝে আসি গে, চাকরীর খবরটাও নিয়ে আসি গে—"

নীরেন বাবু কহিলেন, "অর্থাৎ পিঠটান্ দেবার মতলব—উহুঁ—তা হবে না। কলকাতা যেতে হলে বিয়ে করে যেতে হবে।"

গজানন—"সে কি মশায়! ভেবে দেখবারও সময় দেবেন না?"

নীরেন বাবু ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, 'না'।

গজানন কহিল, "যদি চাকরী না পাই?"

যোগেন্দ্রবাবু কহিলেন, "নেই বা পেলে চাকরী! আমার যা আছে, দেখে শুনে রাখতে পারলে তোমাদের কোন কষ্ট হবে না। তা' ছাড়া চাকরী তুমি পাবে, আমি বলছি—"

নীরেনবাবু কহিলেন, "কলকাতা যাবার মতলব ছাড়ুন; বিয়ে করবার জন্য প্রস্তুত হন, দু এক দিনের মধ্যেই। তা' ছাড়া আপনি ইচ্ছে করলেও কোথাও যেতে পারবেন না। সি. আই. ডি. লাগিয়ে দেব।"

গজানন ভীতভাবে কহিল, "বলেন কি মশায়?"

নীরেনবাবু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, কহিলেন, "এবং দরকার হলে হাতে পায়ে শেকল বেঁধে ঘরে চাবি দিয়ে রেখে দেব, বুঝলেন।"

—"আপনারা সব পারেন মশায়।"

দিন দুই পরে। নীরেন বাবুর চেষ্টায় মিনতির সহিত রমেনের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কোন আড়ম্বর হয় নাই, বিশেষ কাহাকেও ডাকা হয় নাই; জন কয়েক পুলিশ অফিসার বিবাহ-সভায় উপস্থিত ছিলেন। নীরেন বাবু ও তাঁহার স্ত্রী আসিয়া সব ব্যবস্থা করিয়াছেন—বিবাহের আয়োজন করিয়াছেন, রান্না-বান্নার তদ্বির করিয়াছেন, বর-ক'নেকে সাজাইয়াছেন, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের আদর-আপ্যায়ন করিয়াছেন, ও বিবাহান্তে রমেন ও মিনতিকে বাসর-শয্যায় পাঠাইয়া দিয়া পুনরায় পরদিন প্রাতেই আসিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া বিদায় লইয়াছেন। যোগেন বাবুকে কিছুই করিতে হয় নাই।

সদানন্দ, স্বামীজী এবং তাঁহার শিষ্যবর্গ যে নিমন্ত্রিত হইয়াও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসেন নাই, তাহাও কি বলিয়া দিতে হইবে?

নূতন জগৎ

—শ্রীউপানন্দ উপাধ্যায়

আজ যে ভূখণ্ডের কথা সংক্ষেপে বলিতেছি, উহা পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইউরোপের শ্বেতাঙ্গ জাতিদিগের দৃষ্টিগোচর হয়। এই ভূখণ্ডকে 'নূতন জগৎ' বলা হইয়া থাকে। এখনও ইহার গঠন শেষ হয় নাই। ইহার মধ্যে বহু ভূভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলিকে মানুষ এখনও আয়ত্তাধীনে আনিতে পারে নাই।

বাহামা দ্বীপপুঞ্জে কলম্বস পদার্পণ করিবার পর তিনশত পঁচিশ বছর উত্তীর্ণ হইয়াছে। এত অল্পকালের মধ্যে ঐশ্বর্য্য এবং শক্তি লাভ করিয়া মার্কিণবাসীরা এরূপ উন্নত হইয়াছে যে, আমাদের এই প্রাচীন ভূখণ্ডের অধিবাসিগণ বিস্ময়ান্বিত হইয়া তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে। কলম্বসের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্ব্বক এই নবাবিষ্কৃত জগতে ইউরোপীয়গণই প্রথম প্রবেশ করে। সম্পূর্ণ অপরিচিত নূতন ভূখণ্ডে প্রবেশ করিবার আগ্রহাতিশয্য এবং অদম্য উৎসাহ লইয়া তাঁহারা আসিলেন বটে, কিন্তু নানা হিংস্র বন্য জন্তু, অজ্ঞাত এবং অদ্ভুত প্রাণী, প্রকাণ্ড বিষধর সর্প ও দুর্দ্দান্ত বন্য মানব জাতি তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। কত নরখাদক মানবের সম্মুখীন হইয়া তাঁহারা মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিলেন। সে সকল রোমাঞ্চকর কাহিনী ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। যাহা হউক, তাঁহারা কাপুরুষের মত পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। জীবনে বহুবার বিপন্ন হইলেও তাঁহারা কোনদিনই তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। তাঁহারা নবজাগ্রত বীর্য্যে বলবান জাতি এবং আদর্শে অনুপ্রাণিত বলিয়া একে একে সর্ব্বপ্রকার বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিতে সক্ষম হইলেন।

ধীরে ধীরে হিংস্র বন্যজন্তু হইতে আরম্ভ করিয়া দুর্দ্দান্ত নরখাদক মানবদিগকে ধ্বংস করিয়া আপনাদিগের সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং বৈশিষ্ট্য লইয়া তাঁহারা নূতন জগৎবাসী হইলেন। তাঁহারা যে শক্তিমান একথা বোধ হয় অস্বীকার করা চলে না। তাঁহাদের দুঃসাহস, শৌর্য্য, বীর্য্য এবং অনুসন্ধিৎসা অনুকরণীয়।

অনেকে মনে করেন, আমাদের দেশের লোক সাধারণতঃ দুর্ব্বল মনোভাবাপন্ন। তাই ইহারা কখনও অজ্ঞাত দেশের অনুসন্ধানে বাহির হয় নাই এবং অত্যন্ত কুসংস্কারের উত্তাপে জাতীয় জীবনের ধারাকে শুষ্ক করিয়াছে; যে জাতি কূপমণ্ডূকের মত গৃহে থাকিতে সর্ব্বদা ভালবাসে, তাহার ভবিষ্যৎ কোন দিন উজ্জ্বল হয় না, কাজেই আমরা যে দুর্দ্দশাপন্ন হইব, তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক; ইউরোপের অধিবাসীরা বিরাট জলোচ্ছ্বাসের মত পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছে বলিয়া আজ তাহারা নিখিল বিশ্বের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছে। কিন্তু এ ধারণা ভুল। একথা মনে রাখিতে হইবে যে, পাশ্চাত্ত্য জাতিরা পেটের ভাতের জন্যই দেশ-বিদেশে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে এবং আমাদের দেশে কোনদিন অন্নের অভাব ছিল না।

ইতিহাসে আমরা উক্ত ভূখণ্ডের দুই দিকের পরিচয় পাই। একদিকে টিউটনিক, প্রোটেষ্টাণ্ট ও উত্তর-আমেরিকা, অপর দিকে মধ্য এবং দক্ষিণ, লাটিন এবং ক্যাথলিক আমেরিকা। উত্তর-আমেরিকায় ইউরোপীয়দিগের দ্রুত বিস্তৃতি যতই ঘটিতে থাকিল, ততই আদিম অধিবাসীরা নিশ্চিহ্ন হইয়া পড়িল। যে মার্কিণ যুক্তরাজ্য এবং কানাডার কথা ইতিহাসে পড়া যায়, তাহা উত্তরে গঠিত হইয়াছে।

দুই শতাব্দীর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি, যখন মধ্য এবং দক্ষিণ-আমেরিকার অধিকাংশ ভূভাগ স্পেনের কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিল, তখন অধিবাসীদিগের মধ্যে কোনরূপ ধ্বংসের করাল ছায়া দেখিতে পাওয়া গেল না। উহারা মাত্র স্পেনের

অনুজীবী হইল। এতদঞ্চলে স্পেনবাসীরা স্বর্ণ এবং অন্যান্য ঐশ্বর্য্যের অনুসন্ধানেই আসে। তাহারা ভূকর্ষণের নিমিত্ত আসে নাই এবং আদিম আধিবাসীদিগকে পৃথিবী হইতে চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত করিবার উদ্দেশ্যও তাহাদের ছিল না। এ কারণে এই দিকে আমরা আদিম অধিবাসীদিগকে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করিতে দেখিতে পাই।

মধ্য এবং দক্ষিণ-আমেরিকায় বিভিন্ন জাতির রক্ত-সংমিশ্রণে সঙ্কর জাতির উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের কেহই খাঁটি ইউরোপীয়ান বা ইণ্ডিয়ান নহে। সঙ্কর জাতিগুলির নামকরণ হইয়াছে মেক্সিকান, পেরুভিয়ান, চিলিয়ান ইত্যাদি দক্ষিণ-আমেরিকার ভিতর বহু দুর্গম প্রদেশে আছে সেখানে শ্বেতাঙ্গ বিজেতাগণ আজও প্রবেশ করিতে পারেন নাই। আদিম অধিবাসীদিগকে রেড ইণ্ডিয়ান বলা হইয়া থাকে।

ইউরোপীয় অভিযানের ফলে প্রায় সর্ব্বত্র আদিম ইণ্ডিয়ানগণের চারিত্রিক অধঃপতন দেখা যায়। তাহারা অতিরিক্ত মদ্য পানে অভ্যস্ত এবং রোগাক্রান্ত হওয়ায় ক্রমেই লঘিষ্ঠ-সংখ্যক হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইউরোপীয়গণের ইতিহাসে লেখা আছে, এখনও তাহারা 'শিক্ষিত' হইতে পারে নাই বলিয়াই এমন হইয়াছে। তাঁহাদের মতে লাটিন-আমেরিকার দেশগুলির শৈশবাবস্থা উত্তীর্ণ হয় নাই মাত্র এক শতাব্দী হইল ইহাদের ক্রম-বর্দ্ধন চলিতেছে ভবিষ্যৎ কতদূর উন্নত হইবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

প্রচলিত ইতিহাসের এই পাঠ বিভ্রান্ত মত। আমাদের মতে আদিম ইণ্ডিয়ানদের দশাও ভারতীয়গণের মতই, বড়-লোকের ছেলের অবস্থা। পৃথিবীতে একদিন সর্ব্বত্র যে বৈদিক সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহারই সহস্র খণ্ড ভগ্নাংশ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বর্ত্তমান পৃথিবীর আদিম জাতিদের মধ্যে বিকৃতাবস্থায় পাওয়া যায়।

মেক্সিকো : মুসাব্বর জাতীয় বৃক্ষ

মেক্সিকোর পার্ব্বত্যদেশ হইতে টেক্সাসের সমতল ভূমিকে বিভক্ত করিয়া যে দিকে রায়ো গ্রাঁদের স্রোত বিস্তৃতভাবে বহিতেছে, সে দিক ধরিয়া, যেখানে কারিবিয়ান সমুদ্রকে প্রশান্ত মহাসাগর হইতে বিচ্ছিন্নপূর্ব্বক সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্যভূমির নিম্নদেশ অবস্থিত, সেই পর্য্যন্ত এবং যাহাকে আমরা দক্ষিণ-আমেরিকা বলি, সেই বিস্তৃত অরণ্য-অটবীসঙ্কুল মহাদেশ ধরিয়া দুর্গ অন্তরীপের যেখানে মেঘাচ্ছন্ন পর্ব্বতমালা-সুশোভিত 'ল্যাণ্ড অব ফায়ার' দ্বীপ শেষ হইয়াছে, তদবধি সীমাভুক্ত নব্বই লক্ষ বর্গমাইল ব্যাপী ধরিত্রীর পৃষ্ঠদেশকে ল্যাটিন-আমেরিকা বলা যায়। উত্তরায়নান্ত বৃত্ত হইতে দূরে ৩০° অক্ষাংশে ল্যাটিন-আমেরিকার আরম্ভ হইয়াছে এবং দক্ষিণে বিষুবরেখা হইতে দূরত্বে পঞ্চান্ন সামন্তর সরল রেখা পার হইয়া কিয়দংশ প্রসারিত গ্রীষ্মমণ্ডল সংক্রান্ত ভূভাগ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। উক্ত মহাদেশের সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত অংশ গ্রীষ্মমণ্ডলমধ্যে অবস্থিত এবং ব্রাজিলের বিখ্যাত বন্দর রায়ো ডি জেনিরোর ঠিক দক্ষিণ হইতে মকরক্রান্তি সূচিত হয়।

উত্তর এবং দক্ষিণ-আমেরিকার আক্রমণকারী শ্বেতাঙ্গগণ দেখিলেন, বিচ্ছিন্ন ভাবে অধ্যুষিত মহাদেশ, নতুবা তাঁহাদিগের পক্ষে দেশজয় অসম্ভব হইত। ইণ্ডিয়ান জাতিসমূহ কবে এশিয়া হইতে এখানে আসিয়া বাস করিতেছে, অথবা সৃষ্টির আদিম যুগ হইতে এখানে বর্দ্ধিত বা লালিত-পালিত হইতেছে, তৎসম্বন্ধে বর্ত্তমান ইতিহাস কিছু লেখে না।

তবে অনেকে মনে করেন, তাহারা পূর্ব্ব-এশিয়া হইতে আসিয়াছিল, কেন না পূর্ব্ব-এশিয়ার অধিবাসীদিগের সাদৃশ্য ইহাদের মধ্যে বর্ত্তমান আছে। তাহারা হয়তো ইউরোপ এবং এশিয়ার মধ্যে অতি দূরবর্ত্তী উত্তরে যে ভূ-সেতু আছে, তাহার উপর দিয়া এখানে আসিতে পারে, অথবা এলিউসিয়ান দ্বীপগুলির পথ ধরিয়া পার হইয়াও আসিয়া থাকিতে পারে।

এইখানে প্রচলিত ইতিহাসের ভ্রান্তি ধরা পড়ে।

পরবর্ত্তী কালে আজটেক এবং ইন্‌কা সভ্যতা এই ভূখণ্ডের কিয়দংশে বিস্তৃত হইয়াছিল। আধুনিক ইতিহাসে লেখা হয়, তাহারা 'অসভ্য' ছিল না এবং তাহাদের শিক্ষাপ্রণালী, আচার-অনুষ্ঠান পদ্ধতি এবং শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য ছিল, কিন্তু ধর্ম্মানুষ্ঠানের ক্রিয়াকাণ্ড-পদ্ধতিতে বর্ব্বরতা এবং নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাওয়া যায়। বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর-নির্ম্মিত মন্দিরের বেদীমূলে তাহারা পশু এবং নর বলি দিত। সেই বলি দেবতার প্রসাদ বলিয়া ভক্ষণ করিত। তাহাদের শাসনে যথেষ্ট যথেচ্ছাচারিতা ছিল তাহাদের স্বর্ণ এবং রৌপ্যের কারুকার্য্য-খচিত মন্দির প্রাসাদ দেখিয়া বিজেতাগণ বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন।

এই যে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট গুণ ও দোষের সংমিশ্রণ ইহা কি করিয়া একই জাতিতে সম্ভব হইল, আধুনিক ইতিহাস তাহা বিশ্লেষণ করে নাই।

বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ লিখেন, আজটেকদের ন্যায় ইন্‌কারা অতি প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী হইয়া আশ্চর্য্যরূপ কলাকুশলতার পরিচয় দিয়া গিয়াছে। ইহারা সূর্য্যোপাসক এবং আপনাদিগকে সূর্য্যপুত্র বলিত। পেরু এবং বলিভিয়ার টিহুয়ানাকু ও অন্যান্য প্রদেশে তাহাদের সভ্যতার যে সব নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা মনোমুগ্ধকর এবং অপূর্ব্ব। অতীব সঙ্কীর্ণ গিরিপথের উপর দিয়া তাহারা পর্ব্বতশ্রেণীর উপর বৃহৎ বৃহৎ রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ভূমিতে উন্নত ধরণের জলসেচনের ব্যবস্থা করিতে তাহারা জানিত এবং কৃষি সম্বন্ধে তাহাদের বিশেষ বুৎপত্তি ছিল। ইন্‌কাদিগকে প্রজারা অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিত। এরূপ শ্রদ্ধা আর কোন শাসকেরা লাভ করেন নাই। আজও তাহাদের মহত্ত্বের ক্ষীণস্মৃতিগুলি ইণ্ডিয়ানদের অন্তরে জাগরূক রহিয়াছে। তথাপি ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ লিখিতেছেন, আদিম ইণ্ডিয়ানরা আজও 'সুশিক্ষিত' হয় নাই, অর্থাৎ কি না ইউরোপের শিক্ষা পায় নাই।

১৫১৩ খৃষ্টাব্দে ভাস্কো নানেজ্ দ্য বালবোয়া নামক প্রথম ইউরোপীয়ান এই ভূখণ্ডে পদার্পণ করেন। চারি বৎসর পরে ১৫১৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে জুকাটানে জনৈক স্পেন-দেশীয় নাবিকের আবির্ভাব হয়। এক বৎসর পরে কিউবা হইতে মেক্সিকোর দিকে কর্টেজ জলযাত্রা করেন, আজটেক-শাসনকর্ত্তাদের বিরুদ্ধে মেক্সিকোর অধীন প্রজাপুঞ্জকে বিদ্রোহী করিয়া তুলেন এবং ১৫১৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর মঙ্গলবার যে সহরে প্রবেশ করেন, তাহাই এখন মেক্সিকো নগরী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আজটেকদিগের সুবিপুল ঐশ্বর্য্য দেখিয়া স্পানিয়ার্ডগণ উৎফুল্ল হইয়া তাহা হস্তগত করিতে থাকে।

যদিও রাজকোষ হ্রদের ভিতর নিক্ষিপ্ত হওয়ায় নষ্ট হইয়া যায়, তথাপি স্পানিয়ার্ডগণ হতাশ হয় নাই। তাহারা ক্রমাগত দেশ জয় করিতে লাগিল। মেক্সিকো 'নূতন স্পেনে' পরিণত হইল।

পিজারো প্রথম বিপদসঙ্কুল জলযাত্রা করিয়া ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার অজ্ঞাত এবং ভীষণ সঙ্কটময় পশ্চিম উপকূলে আসিয়া উপনীত হইলেন।

ব্লাস্কো অন্তরীপের উত্তর দিকে টামবেজে আসিয়াই তাঁহাকে নিরস্ত হইতে হইয়াছিল। তৎপরে স্পেনে গিয়া তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত রাজসভায় জ্ঞাত করিয়া বলিলেন—"আমি স্বর্ণভূমি এল ডোরেডো আবিষ্কার করিয়াছি।" সমগ্র স্পেন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। পেরু জয় করিবার জন্য পিজারো রাজদরবার হইতে ক্ষমতাপত্র পাইলেন। স্বীয় প্রতিভা, ধৈর্য্য, পরিশ্রম এবং শৌর্য্যবলে তিনি সর্ব্বপ্রকার বাধা-বিপত্তিকে প্রতিহত পূর্ব্বক পেরু জয় করিলেন, ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয়বার এই ভূখণ্ডে পদার্পণ করেন। তাঁহার সহিত মাত্র ১৮৩ জন অনুচর এবং ২৭টী অশ্ব ছিল। দুই বৎসরের মধ্যে আন্দেজের বৃহৎ প্রাকৃতিক দুর্গ এবং কুজকোর ইন্‌কারাজের রাজধানী 'সূর্য্যনগর' অধিকার করিলেন। এইরূপে দক্ষিণ-আমেরিকায় প্রকাণ্ড উপনিবেশিক স্পেন সাম্রাজ্য গঠিত হইল। পিজারো কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত পেরুভিয় সহর লিমার শেষভাগে দক্ষিণ-আমেরিকার স্পেনীয়

গবর্ণমেণ্টের কেন্দ্র এবং রাজপ্রতিনিধির আসন স্থাপিত হইল।

ইদানীন্তন ইতিহাসে লেখা হয়, কর্টেজ কর্তৃক মেক্সিকো এবং পিজারো কর্তৃক পেরুজয়ের ন্যায় অপূর্ব্ব বীরত্বব্যঞ্জক ও আশ্চর্য্যজনক কাহিনী বিরল। ল্যাটিন-আমেরিকার আধুনিক ইতিহাস জানিতে হইলে এই সব বৃত্তান্ত পড়া উচিত। এ সম্বন্ধে প্রেস্কটের দুই খানা গ্রন্থ আছে 'দি কন্‌কোয়েসট্ অব মেক্সিকো' এবং 'দি কন্‌কোয়েসট্ অব পেরু'। কিন্তু এই জয় যে সত্যকারের জয় নহে, সত্যকারের 'জয়' তরবারির সহায়তায় হয় না এবং একজনের 'পরাজয়ে' অপরে 'জয়ী' হয় না—ইহা বর্ত্তমান জগতের অপরিজ্ঞাত।

শুধু যে কর্টেজ এবং পিজারো বিজেতাগণের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য স্প্যানিশ বীর তাহা নহে। সেবাস্তিয়ান দ্য বেনাল কাজার এবং জাইমেনেস দ্য কুইসাদা পানামা এবং পেরুর মধ্যবর্ত্তী দেশ জয় করেন। ডাইগো দ্য আলমাগরো এবং পেড্রো দ্য ভালডিভিয়া চিলি অধিকার করেন। ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে বুয়েনস এয়ারেসে প্রথম স্প্যানিস উপনিবেশ পেড্রো দ্য মেনডোজা স্থাপন করেন। ইঁহারাও বীরাগ্রগণ্য বলা যাইতে পারে। এদিকে ব্রাজিল ও উপকূলবর্ত্তী প্রদেশগুলি পর্ত্তুগালের অধীন হয়। পর্ত্তুগীজ নাবিক ক্যাবরাল ১৫০০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে উক্তদেশ দেখিতে পাইয়া তাঁহার সম্রাটের নামে উহা অধিকার করেন।

১৫৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে কুড়ি বছরের মধ্যে আমেরিকার বিস্তৃত ভূখণ্ড মুষ্টিমেয় যোদ্ধা লইয়া স্প্যানিশ এবং পর্ত্তুগীজগণ দখল করেন। বিজেতাগণ মেক্সিকো, জুকাটান, হণ্ডুরস এবং আমেরিকার অন্যান্য প্রদেশে বহু বৃহৎ নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাইলেন। প্রাচীন মায়া-সভ্যতার নিদর্শন এগুলির মধ্যে আছে বলিয়া মনে হয়। প্রস্তর-নির্ম্মিত বৃহৎ অট্টালিকা-সমূহের স্তূপ প্রভূত পরিমাণে দেখা যায়। শ্বেতাঙ্গগণ যখন আমেরিকায় আসেন, তখন তাঁহারা কুত্রাপি লৌহ দেখিতে পান নাই। সুতরাং ইতিহাসে লেখা হয়, লৌহ এখানে অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু যাহারা 'সভ্যতা'র আর সকল পরিচয়ই দিতেছে, তাহারা লৌহ কি বস্তু, ইহা জানিত না, ইহাই অধিক বিশ্বাস্য, না, কোন বিশেষ কারণে লৌহের ব্যবহার তাহারা নিষিদ্ধ করিয়াছিল, ইহাই অধিক বিশ্বাসযোগ্য? সর্ব্বত্র প্রস্তরের প্রচলন দেখা যায়। যেসব প্রস্তরখোদিত আলঙ্কারিক সুন্দর চিত্রলিপি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, তাহা প্রাচীন ভূখণ্ডের অতি-প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থান মিসরের কুত্রাপি সেরূপ দৃষ্ট হয় না। অতএব এখানে ভাস্কর্য্য শিল্পের যে বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।

কিউবার রাজধানী হাভানা: (১) রাজপথ (২) কলম্বাস গির্জ্জা (৩) এক্সচেঞ্জ।

ইণ্ডিয়ানদের অধিকাংশই পূর্ব্বের মত এখনও সাদাসিধা ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। মারাকাইবো উপসাগরে, আমাজোন এবং অরিনোকো নদীতে জলের উপর উন্নত কাষ্ঠদণ্ড দ্বারা মাচা নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি বাসা বাঁধিয়া তাহারা বাস করে এবং শালতি করিয়া সেখানে যায়। তাহাদের উঠিবার সিঁড়ি হইতেছে খাঁজকাটা বৃক্ষকাণ্ড। উত্তর প্রদেশের ইণ্ডিয়ানদিগের সাধারণ অরণ্য-কুটীরগুলির চতুর্দ্দিক খোলা থাকে। সেগুলিকে তালজাতীয় বৃক্ষপত্রাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয় এবং মটকা হইতে ঐ আচ্ছাদন

ঢালু হইয়া ভূমি স্পর্শ করে। এরূপ কুটীরকে বাসোপযোগী বলা চলে না, বরং আশ্রয়-স্থান বলিলে ভুল হয় না। প্রান্তরের ইণ্ডিয়ান কুটীরগুলির কোনটী গোলাকার, আবার কোনটী ডিম্বাকার। কুটীরগুলির মটকা পর্ণ দ্বারা ছাওয়া থাকে এবং বাঁশের মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়।

ব্রাজিলের আদিম অধিবাসিগণ সাধারণতঃ উচ্চবংশাপন্ন। বেড়া-দেওয়া কুটীরে তাহারা বাস করে এবং কতকগুলি কুটীর একত্রে নির্ম্মাণ করিয়া শয্যা, রন্ধন প্রভৃতির জন্য এক একটী পৃথক কক্ষ রূপে নির্দ্দিষ্ট রাখে। কুটীরের আবরণ আয়ত্ত ভাবে রাখাই নিয়ম।

ব্রাজিলের কতকগুলি পর্ণকুটীরে উপবেশন ও শয়ন, উভয় কার্য্যোপযোগী কাষ্ঠাধার আছে। জাহাজের নাবিকদিগের দোদুল্যমান শয্যামঞ্চের অনুকরণে গায়েনার ইণ্ডিয়ানরা একরূপ মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়াছে। এরূপ মঞ্চ মহাদেশের সর্ব্বত্র ইণ্ডিয়ান কুটীরে প্রচলিত হইয়াছে। রাত্রিতে শীতার্ত্ত হইলে ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ানরা উহার নীচে অগ্নি প্রজ্বলিত পাত্র রাখিয়া আরামে নিদ্রা যায়। কতিপয় জেলার ইণ্ডিয়ানরা এখন ইউরোপীয়দিগের অনুকরণে 'উন্নত' অবস্থায় বসবাস করিতেছে। তাহারা তাহাদের সম্প্রদায়ের ভিতর 'শিক্ষিত' এবং অবস্থাপন্ন, কিন্তু প্রত্যেক ষ্টেট এবং প্রত্যেক প্রদেশের মধ্যে ইহাদের অবস্থার পার্থক্যও আছে। প্যারাগুয়ে অঞ্চলে ইণ্ডিয়ানদের সুগঠিত সমাজ-শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সেখানে নিজস্ব জমি ও বসতবাটী তাহাদের আছে।

ব্রাজিলে বহু অসভ্য অধিবাসী দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ইণ্ডিয়ানগণ নম্র এবং অতিথি-সেবাপরায়ণ, কিন্তু আমাজনের দূর অঞ্চলগুলিতে এখনও নরখাদক আদিম অধিবাসীর অভাব নাই।

যাহা হউক, স্পানিয়ার্ড এবং পর্ত্তুগীজদিগের রাজ্য এই ভূখণ্ডে স্থাপিত হইবার পর ইউরোপের অন্যান্য জাতির শ্যেনদৃষ্টি পতিত হয় এবং তজ্জন্য তাহাদের সহিত বিজেতা-গণের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল।

সেণ্টমালো হইতে ফরাসী দস্যুরা স্প্যানিশ জলতরীগুলিকে আক্রমণ করিতে লাগিল এবং ব্রাজিলে ফরাসী প্রোটেষ্টেণ্টরা উপনিবেশ স্থাপনের জন্য অতিমাত্র সচেষ্ট হইল। পর্ত্তুগীজ-প্রাধান্যকে খর্ব্ব করিবার উদ্দেশ্যে ওলন্দাজরা দীর্ঘকাল ধরিয়া সংঘর্ষ করিতে থাকে। দুঃসাহসী ইংরাজগণ প্রকাশ্যে বা গুপ্তভাবে রাজ্ঞী এলিজাবেথের সাহায্য লাভ করিয়া সমুদ্র উপকূলে লুক্কায়িত থাকিত এবং সুযোগ পাইলেই রত্নভাণ্ডার-পরিপূর্ণ স্প্যানিশ জলতরীগুলি করায়ত্ত করিত। ফ্রান্সিস ড্রেক পানামা যোজকের মধ্যে আসিয়া নমব্রে ডি দায়াস হস্তগত করেন এবং পানামা গমনোন্মুখ পেরুভিয় রৌপ্যবাহী অশ্বতর দলকে জঙ্গলের ভিতর হইতে হঠাৎ আক্রমণপূর্ব্বক সমস্ত রত্ন অপহরণ করিতে থাকেন। ম্যাগেলন প্রণালীর মধ্য দিয়া তিনি ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে জাহাজ লইয়া দেশাভিমুখে যাত্রা করেন এবং পেরু উপকূলের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়া যান। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে খণ্ড যুদ্ধ করিয়া ড্রেক সাহেব আবার স্প্যানিশ ইণ্ডিজকে প্রায় ধ্বংস করেন এবং কার্টাজেনা তাঁহার কবলিত হয়। তৎপরে জ্বর-প্রপীড়িত অরিনোকোর অঞ্চলগুলিতে র‍্যালে প্রভৃতি ইংরাজগণও উপনিবেশ-স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। অবশেষে গায়েনাতে ইংরাজ, ওলন্দাজ এবং ফরাসীদের উপনিবেশ স্থাপিত হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়া ওলন্দাজরা ব্রাজিল অধিকার করিবার জন্য যুদ্ধ করে। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে রায়ো ফ্রান্সের আক্রমণে প্রপীড়িত হয়।

সাধারণতঃ মেক্সিকো হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নপ্রদেশগুলি পর্য্যন্ত স্পানিয়ার্ড এবং পর্ত্তুগীজদিগের ঔপনিবেশিক রাজ্য স্থাপিত হইলেও ভীষণ অরণ্যসমাবৃত অঞ্চলগুলির উপর তাহারা হস্তক্ষেপ করিতে পারে নাই। এখনও সেখানে বন্য অধিবাসীরা বসবাস করে। তাহারা কাহারাও অধীনতা স্বীকার করে না, বা আইন-কানুন গ্রাহ্য করে না। স্প্যানিশ বা পর্ত্তুগীজদিগের মধ্যে কেহই কৃষ্ণকায় মানবগণের উপর জাতিগত বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন নহে, কিন্তু ইংরাজরা কৃষ্ণকায়দিগকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারেন নাই, এজন্য তাঁহারা যেখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন, সেখানে ইহাদের সহিত যতদূর সম্ভব সংস্রব বর্জ্জন করিয়া আসিতেছেন। স্পেনের ঔপনিবেশিক শাসনকর্ত্তারা তাঁহাদের সৈন্য-সহচর এবং স্প্যানিশ উপনিবেশ-বাসেচ্ছু লোকদিগকে বহু জমি বিলি-বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। এই সুযোগ লাভ করিয়া ইণ্ডিয়ানদিগের সহিত তাহারা একত্র বসবাস আরম্ভ করিল

এবং বহুক্ষেত্রে ইহাদের সহিত বিবাহাদি সংঘটিত হওয়ায় সঙ্কর বর্ণের সৃষ্টি হইল।

এমন কোন স্প্যানিশ ঔপনিবেশিক পরিবার দেখা যায় না, যাহার ভিতর ইণ্ডিয়ান রক্ত প্রবেশ করে নাই। যাহা হউক ল্যাটিন-আমেরিকায় ইউরোপীয়দিগের সহিত ইণ্ডিয়ানদের যে রক্তের সংমিশ্রণ হইয়াছে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

বর্ত্তমান মেক্সিকো জাতি স্প্যানিশ ইণ্ডিয়ান বলিয়া অভিহিত হয়। ব্রাজিলিয়ানরা পর্ত্তুগীজ-ইণ্ডিয়ান বটে, কিন্তু নিগ্রোরক্তের কিছু সংমিশ্রণ হইয়াছে। দাসবাহী ইংরাজ জাহাজে আফ্রিকা হইতে এখানে নিগ্রোদিগকে আনয়ন করা হয়। আর্জেণ্টাইন এবং উরুগায়ে বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতির রক্তের সহিত ইণ্ডিয়ানদিগের রক্ত মিশ্রিত হইয়াছে।

যদি সমস্ত দক্ষিণ-আমেরিকার ভিতর ঘুরিয়া বেড়ান যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, এমন বহু বিস্তৃত ভূখণ্ড আছে, যেখানে কোন মানুষের সাড়াশব্দ নাই। জনসংখ্যা ঠিক করিয়া বলা যায় না, তবে দক্ষিণ-আমেরিকায় অধুনা ৬ কোটি ৬০ লক্ষ লোক বাস করে। মেক্সিকো এবং সেণ্ট্রাল রিপাব্লিকগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া সমস্ত ল্যাটিন-আমেরিকায় বোধ হয় ৯ কোটি ৯০ লক্ষ লোক আছে। ল্যাটিন-আমেরিকার খাঁটি ইণ্ডিয়ান, নিগ্রো (ব্রাজিলে) মেসটিজো (ইউরোপীয়ান এবং ইণ্ডিয়ান সংমিশ্রিত) মুলাট্টো, এবং কোয়াড্রুন (ইউরোপীয় এবং নিগ্রো রক্ত মিশ্রিত) জাতি আছে। এতদ্ব্যতীত স্প্যানিশ এবং পর্ত্তুগীজ ঔপনিবেশিকগণ, আমেরিকায় দীর্ঘকাল ঔপনিবেশিক হইয়াছে, এরূপ বংশগুলির উত্তরাধিকারিগণ এবং ইটালী, জার্ম্মাণী, গ্রেটব্রিটেন ও স্পেন হইতে নবাগত সম্প্রদায়গুলিও রহিয়াছে। দুঃখের বিষয়, বহু আদিম অধিবাসীর বংশ ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইয়া আসিতেছে।
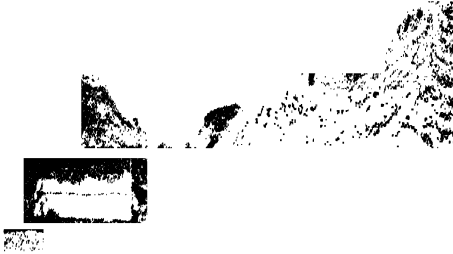
মনস্বী চার্লস ডারুইন ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে আর্জ্জেণ্টিনায় ছিলেন। ইণ্ডিয়ানদিগের উপর সে সময় যে অত্যাচার হইয়াছিল, তাহা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। খনির মধ্যে অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে এবং প্রভুদিগের অত্যাচারে বহু ইণ্ডিয়ান প্রাণ ত্যাগ করে। ডারুইনের বিবৃতি পড়িলে সকলের চোখে জল আসিবে।

এদেশে স্প্যানিশ ভাষাতেই সাধারণতঃ কথাবার্ত্তা চলে। পর্ত্তুগীজ ভাষারও অল্পবিস্তর প্রচলন আছে। এখানে বিভিন্ন রকমের ভাষায় ভাবের আদান-প্রদান হয় না। দক্ষিণ এবং মধ্য-আমেরিকায় নানা জাতি ও বিভাগ থাকিলেও একই ভাষা প্রচলিত থাকায় সকলের বোধ এবং উপলব্ধি এক ভাবে সাধিত হয়।

পানামা: (১) গ্রাম (২) কষ্টারিকার পথে গো-শকট।

আমেরিকার যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ-আফ্রিকা, উগাণ্ডা এবং বর্ত্তমান ভারতে যেরূপ বর্ণবিদ্বেষ আছে, ল্যাটিন-আমেরিকায় সেরূপ নাই। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ইণ্ডিয়ানগণ যে উৎপীড়ন ভোগ করিয়াছে, তাহাতে তাহারা নিজেদের সম্পর্কে একরূপ উদাসীন হইয়াছে। তাহারা কোন দিনই শ্বেতাঙ্গদিগের সহিত সাম্যের অধিকার পায় নাই।

দক্ষিণ-আমেরিকার প্রকৃত মুক্তিদাতা নেপোলিয়ান বোনাপার্টি। ১৮০০ এবং ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে যে সব জাতীয় বীর বিদেশীর কবল হইতে ল্যাটিন-আমেরিকাকে মুক্ত করিবার জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে এখানে বলিবার

সুযোগ পাইলাম না এবং সে বিরাট যুদ্ধের ইতিহাস বলাও এখানে নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

মেক্সিকোর ইতিহাসেও দেখা যায়, দীর্ঘকালব্যাপী সংক্ষোভ, আলোড়ন এবং উৎপাত। শাসননীতি ও শাসন প্রণালী-সংক্রান্ত ব্যাপার হইতে উদ্ভূত যুদ্ধ এবং বিপ্লব বহুকাল ধরিয়া চলিয়াছে। এখানকার রাজনৈতিক আকাশে বহুদিন ঘনঘটা থাকিবার পর সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ এজন্য আমাদের নিকট বিশেষ স্মরণীয়। তারপরও নানা বাধা-বিপত্তি এবং দুর্যোগ সময়ে সময়ে দেখা গিয়াছে। অবশেষে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে স্যান্টিয়াগো কনফারেন্সে আমেরিকার ষ্টেটগুলির মধ্যে যুদ্ধ-নিবারণার্থ সন্ধির প্রস্তাব উঠে। তদনুযায়ী ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে এই সন্ধিপত্রে যুক্তরাজ্য, ভেনিজুয়েলা, পানামা, উরুগায়, ইকুয়াডোর, চিলি, গুয়াটেমালা, নিকারাগুয়া, ব্রাজিল, কলম্বিয়া, কিউবা, প্যারাগুয়ে, ডমিনিকান রিপাব্লিক, হণ্ডুরাস, আর্জ্জেন্টিনা এবং হাইতি ষ্টেটগুলি স্বাক্ষর করিয়াছে।

মেক্সিকোর ৭৬৮০০০ বর্গমাইল বিস্তৃত প্রদেশগুলি যুক্তরাজ্যের কবলে পতিত হইয়াছে। গুয়াটেমালা, হণ্ডুরস, সালভ্যাডর, নিকারাগুয়া, কষ্টারিকা এবং পানামা লইয়া হণ্ডুরসের ব্রিটিশ উপনিবেশের সহিত যে মধ্য-মার্কিণ প্রজাতন্ত্র রাজ্যগুলি গঠিত হইয়াছে, তাহা ২১৫০০০ বর্গ মাইল। পানামাতে যে বৃহৎ খালটি আছে, তাহার উভয়পার্শ্ববর্ত্তী ছোট আকারের যে দীর্ঘ অপ্রশস্ত ভূখণ্ড আছে, তাহা আত্মরক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা এবং অন্যান্য কারণের অজুহাতে যুক্তরাজ্যের সম্পত্তি হইয়াছে। দক্ষিণ-আমেরিকার উত্তরদিকের ষ্টেটগুলির নাম দেখিতে পাই, যথাক্রমে কলম্বিয়া (৪৪০৮৪৬ বর্গ মাইল), ভেনিজুয়েলা (৩৯৮৫৯৪ বর্গ মাইল), ইকুয়াডর (২৭৬০০০ বর্গ মাইল) এবং তিনটি গায়েনা—বিটিশ, ওলন্দাজ এবং ফ্রেঞ্চ (১৭০,০০০ বর্গ মাইল)।

আনডিয়ান সাধারণতন্ত্রগুলির নাম যথাক্রমে এইরূপ—পেরু (৭২২,০০০ বর্গমাইল), বলিভিয়া (৫১৪,০০০ বর্গ মাইল) এবং চিলি (২৯০,০০০ বর্গ মাইল), ব্রাজিল (৩,২৯১,৪১৬ বর্গ মাইল)।

বৃহৎ দক্ষিণ সমতল ভূমির তিনটী প্রজাতন্ত্রের নাম হইতেছে প্যারাগুয়ে (১২০,০০০ বর্গ মাইল), উরুগায় (৭২,২১০ বর্গ মাইল) এবং আর্জ্জেন্টিনা (১,১৫৩,০০০ বর্গ মাইল)।

কলিমা এবং ক্রুজের মধ্যে যে সব প্রধান আগ্নেয়গিরি আছে, তন্মধ্যে ওরাইজাবা ও পোপোকাটেপটল উল্লেখযোগ্য। ইহাদের উচ্চতা প্রায় ১৮,০০০ ফিট। অধুনাতন কালের মধ্যে কতকগুলি গিরি হইতে অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছে। তাহারা ক্রিয়াশীল, কিন্তু পোপোকাটেপটল নিষ্ক্রিয় হইয়া রহিয়াছে। আণ্ডেজে পৃথিবীর বৃহত্তম আগ্নেয়গিরি আছে। আর্জ্জেন্টিনার দূর পশ্চিমপ্রান্তে একনকাগুয়া পৃথিবীর সুতুঙ্গ পর্ব্বতগুলির অন্যতম; তাহার উচ্চতা ২৩,০৮০ ফিট।

দুইধারে পর্ব্বতমালা, তন্মধ্যভাগ বিশালরূপে ভেদ করিয়া আমেরিকার ইঞ্জিনিয়ারগণ পানামা খাল কাটিয়াছেন। আটলান্টিক এবং প্রশান্ত মহাসাগরের সহিত ইহার সংযোগ ঘটিয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্ববৃহৎ নদীর রূপ দেখিতে হইলে এখানে আমাজনকে দেখিতে হইবে। প্রশান্ত সাগর কূলবর্ত্তী কলম্বিয়ার চোকো জেলাতে বৎসরের প্রত্যেক দিন সায়াহ্নে এবং সন্ধ্যায় বৃষ্টি হইয়া থাকে। কিন্তু গায়াকুইল উপসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া ভালপারাইসোর কিছু উত্তর পর্য্যন্ত পশ্চিম উপকূলে মোটেই বৃষ্টি হয় না। আণ্ডেজ পর্ব্বতমালার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য একমাত্র হিমালয় ভিন্ন পৃথিবীর আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

মেক্সিকোর বিভিন্ন অঞ্চলে ভুট্টা, গম, কফি, তুলা, প্রত্যেক রকমের ফল, কমলালেবু, জম্বীর, দ্রাক্ষা, আম্র, কদলী, পিয়ার প্রভৃতি পাওয়া যায় এবং প্রশস্ত নাভিবিশিষ্ট কমলালেবু অযত্নেও অজস্র ফলিয়া থাকে। মেক্সিকো এবং দক্ষিণ অঞ্চলবর্ত্তী বৃহৎ অরণ্যগুলিতে মেহগ্নি, আবলুস কাষ্ঠ, চন্দন কাষ্ঠ এবং গোলাপ গন্ধ বিশিষ্ট রক্ত বর্ণের কাষ্ঠ পাওয়া যায়। মেক্সিকোর প্রধান সম্পদ হইতেছে খনিজ পদার্থগুলি, যথা :- স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীসক, লৌহ প্রভৃতি—চারি শত বৎসর ধরিয়া ইহারই জন্য এ দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সংঘর্ষ হইয়াছে। তৈলখনিও যথেষ্ট আছে এবং অফুরন্ত পেট্রোলিয়াম এখানেই পাওয়া যায়। পৃথিবীর ভিতর যে অনুপাতে ইহা উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, তাহাতে পৃথিবীর শতকরা পঁচিশ ভাগের চাহিদা এখান হইতে মিটান হয়। রিপাব্লিকের রাজধানী মেক্সিকো সহরটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য-

কেন্দ্র। পুরাতন আজটেক সহরের অবস্থিতি-স্থলের উপর সাত হাজার ফিট উচ্চ স্থানে মালভূমিতেই এই সহর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তথায় প্রকাণ্ড যাদুঘর আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ সেখানে তাঁহাদের অনেক তথ্যের অনুসন্ধান পাইবেন। জুকাতানে বহু অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ আছে। তাহার মধ্যে আবার মায়া-সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ উন্নত ভাস্কর্যের পরিচয় রহিয়াছে। পশ্চিম উপকূলে মেক্সিকোর সুন্দর সুন্দর বন্দর সকলের চিত্তাকর্ষক হইবে। মেক্সিকো উপসাগরের কূলে যে সব বন্দর আছে, তাহা মোটেই ভাল নহে। কাষ্টারিকাতে উৎকৃষ্ট কফি পাওয়া যায় এবং প্রত্যেক বছর এখান হইতে ৮০ লক্ষ কাঁদি কলা বিদেশে রপ্তানী হয়। পৃথিবীর প্রভৃতি জানোয়ারের অভাব নাই। এক রকম পাখী আছে, সেগুলি মৌমাছি অপেক্ষা বড় নহে। নানাবর্ণের পাখীও অবশ্য আছে, কিন্তু আমাদের দেশের পাখীদের ন্যায় তাহাদের কূজনধ্বনি সুমিষ্ট নহে।

পূর্ব্বদিকের পার্ব্বত্য দেশে প্রচুরভাবে তুলার চাষ হয়। রাজধানী রায়ো ডি জেনিরো, সাণ্টোপলো এবং কফির জন্য বিখ্যাত বন্দর স্যাণ্টস—ইহারা সকলেই মকররাশির রেখার নিকট অবস্থিত। এদিকে জলবায়ু স্নিগ্ধ এবং সুখপ্রদ। এতদঞ্চল পৃথিবীর বৃহত্তম কফি-উৎপাদক স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ব্রাজিলের সহরগুলি আধুনিক। বিস্তৃত রাস্তা, বিজলী বাতি, ট্রামওয়ে এবং বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার

আদিম ইণ্ডিয়ান: (১) মোড়ল (২) পরিবার (৩) ধূমপান।

মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মেহগ্নির বৃক্ষ হণ্ডুরসেই দেখিতে পাওয়া যায়। আমজান নদীর ঊর্দ্ধতর প্রসরগুলিতে বন্য এবং নরখাদক মানব এখনও রহিয়াছে। সেদিকে তাহাদের ভয়ে মানুষ যায় না। পূর্ব্ব কলম্বিয়া এবং ইকুয়াডর, পূর্ব্বপেরুর খানিকটা অংশ, ব্রাজিলের বিস্তৃত ভূভাগ লইয়া যে প্রকাণ্ড অরণ্যাবৃত ভূভাগ রহিয়াছে, সেখানে মানুষ যাইত না, যদি রবারের চাহিদা না থাকিত। জীবন বিপন্ন করিয়াও পেটের দায়ে মানুষ সেখানে রবার সংগ্রহ করিতে যায়। জঙ্গলের ভিতর ভীষণ ব্যাঘ্র আছে। নূতন জগতের বিভিন্ন বর্ণ-চিহ্নিত গুলবাঘগুলি আমাদের দেশের সুন্দরবনের ব্যাঘ্র অপেক্ষাও দুর্দ্দান্ত এবং হিংস্র। বনবিড়ালও আছে। এখানে আটত্রিশ রকমের বানর দেখিতে পাওয়া যায়। সিংহ, টাপির, যাহা কিছু নিদর্শন সবই আছে, কিন্তু তাহাদের যে কোন একটী সহর হইতে দুই এক মাইল গমন করিলে ভীষণ এবং দুর্ভেদ্য অরণ্য দেখিতে পাওয়া যাইবে। কফি-চাষের কেন্দ্র স্যাণ্টোপলো পার্ব্বত্য উপত্যকার উপর উচ্চে অবস্থিত। স্যাণ্টোস বন্দরের সহিত তাহার যোগসূত্র আছে। পার্ব্বত্য রেলপথ দিয়া মালগাড়ীতে এই বন্দরে কফি আসে এবং এখান হইতে বিদেশে রপ্তানী হয়। আমজানের মুখে প্যারা অবস্থিত। এখানে জঙ্গল হইতে রবার আনীত হয়। রবার-ব্যবসায়ের কেন্দ্র বলিয়া ইহার প্রসিদ্ধি আছে।

ল্যাটিন-আমেরিকার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কর্ম্মকেন্দ্র বুয়েনস এয়ারেস। এই সহরের অধিবাসিগণ অত্যন্ত ধনী। তাঁহারা প্রায়ই ইউরোপ ভ্রমণে বহির্গত হন। প্যারিস

তাহাদের প্রিয় স্থান। ইঁহারা ফরাসী ফ্যাসান অনুকরণ-প্রিয়, ফরাসী গ্রন্থ পড়িতে অভ্যস্ত, ফরাসী আমোদ-প্রমোদের অনুরাগী, স্প্যানিশ এবং ফরাসী সাহিত্য ও আর্টের পক্ষপাতী। আর্জ্জেন্টিনা হইতে প্রচুর পরিমাণে মাংস, গম, তিসি এবং ভুট্টা বুয়েনস এয়ারেস বন্দর দিয়া ইউরোপে প্রেরিত হয়।

মধ্য চিলি পৃথিবীর অন্যতম মনোরম ভূমি। অধিবাসীরা উদ্যমশীল এবং পরিশ্রমী। এখানে প্রচুর নাইট্রেট ক্ষেত্র আছে। ভালপারাইসোর প্রায় ৩০ ডিগ্রী উত্তরে আব-হাওয়ার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং মরুভূমি আরম্ভ হইয়াছে। এন্টোফাগাষ্টা বন্দর হইতে চিলির নাইট্রেট অব সোডা এবং বলিভিয়া ও চিলির খনি হইতে উত্তোলিত তাম্র বিদেশে রপ্তানী হয়। ইকুইকুই বন্দর হইতে নাইট্রেট এবং আইওডিন পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রেরিত হয়। পশম ব্যবসায়ের জন্য চিলির পুন্টা আরেনাস বিখ্যাত।

সমস্ত অঞ্চলেই গমনাগমনের জন্য অশ্বতর ব্যবহৃত হয়। ইলামা বলিয়া একপ্রকার জন্তু আছে। ভারবাহী বলিয়া ইহারা গৃহপালিত হয়। উষ্ট্রের ন্যায় ইহাদের ককুদ আছে। তিন চারি বছর অন্তর ইহাদের গাত্র হইতে পশম ছাঁটিয়া লওয়া হয়। সেই পশমের ব্যবসা চলে।

চিলি বন্দর দিয়া লা পাজে যাইতে ৪৮ ঘণ্টা লাগে। আরিকা হইতে গমন করিলে কিছু কম সময় লাগে। ১২,৭০০ ফিট উচ্চে লা পাজ সহর অবস্থিত। পৃথিবীর মধ্যে এত উচ্চে আজও কোন সহর স্থাপিত হয় নাই। এই সহরে যাইবার সময় অনেক যাত্রী পার্ব্বত্যপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া থাকেন। সূর্য্যাস্তের পর লা পাজে অত্যন্ত শীত পড়ে। বলিভিয়ার পার্ব্বত্য অঞ্চলগুলির ভিতর টিন, তাম্র, রৌপ্য এবং অন্যান্য খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। পটোসাইয়ের রজত-পর্ব্বত বলিভিয়া প্রদেশের ভিতর। এখান হইতে টিন বিদেশে রপ্তানী হয়। কোকো, আলপাকা, পশম প্রভৃতি বলিভিয়ার অন্যতম সম্পদ। কোকো হইতেই কোকেনের উৎপত্তি।

তারপর ট্রেণে চাপিয়া উত্তর-পশ্চিম দিকে কিছুদুর গেলেই কুজকো সহর চোখে পড়িবে। ইহাই প্রাচীন ইনকা সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল এবং সূর্য্যনগর বলিয়া অভিহিত হইত। বর্ত্তমানে ইহা স্প্যানিশ সহর। ইহার অধিবাসীরা প্রধানতঃ ইণ্ডিয়ান। স্প্যানিয়ার্ডরা প্রাচীন সহরটী ধ্বংস করিলেও তাহার প্রস্তর-নির্ম্মিত দেওয়ালগুলি ভগ্ন করিতে পারে নাই। ইনকাদের কীর্ত্তি-স্তম্ভ এখান হইতে নিশ্চিহ্ন করা যে সাধ্যাতীত, তাহা স্প্যানিয়ার্ডরা বেশ বুঝিয়াছে।

পেরু উপকূলে গুয়ানো দ্বীপপুঞ্জ। পাথুরিয়া কয়লা, তাম্র, রৌপ্য এবং স্বর্ণখনি ও তৈলক্ষেত্র ইকুয়াডর সীমান্ত প্রদেশের ভিতর দৃষ্ট হয়। ইউরোপীয়রা জাভা হইতে এখন সিঙ্কোনা লইতেছে বলিয়া এখানকার সিঙ্কোনার কদর নাই। এই মহাদেশের সমস্ত সহর নির্ম্মাণেই যে উন্নত শিল্পকলার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

কলম্বিয়া বিস্তৃত সমতল ভূমি। বহু প্রকার দ্রব্য এখানে উৎপন্ন হয়, কিন্তু সংবাদ আদান-প্রদানের একটু অসুবিধা আছে। সর্ব্বোৎকৃষ্ট মৃদু উত্তেজক কফির জন্য ইহা বিখ্যাত। ম্যাগডালেনাতে প্রকাণ্ড তৈল-ক্ষেত্রগুলি কলম্বিয়ার ভবিষ্যতকে নূতন ভাবে গঠন করিতেছে। কলম্বিয়ার প্রতি বর্গ মাইলে তের জন করিয়া লোক বাস করে এবং ইকুয়াদরে দশজনেরও কম দেখা যায়, ব্রাজিলে দশজনও মিলে না। বেশীর ভাগই ইণ্ডিয়ান, তাহারা অত্যন্ত দরিদ্র।

ল্যাটিন-আমেরিকার ভবিষ্যৎ কিরূপ হইবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। ভূখণ্ডের বেশীর ভাগ প্রদেশই বন্য এবং আদিম অধিবাসীদিগের হস্তে রহিয়াছে এবং বহু অঞ্চলের আদ্যোপান্ত অনুসন্ধান এখনও হয় নাই। ব্রাজিল এত বৃহৎ যে, সমগ্র যুক্তরাজ্যকে স্থান দিয়াও স্পেন এবং পর্টুগালের জন্য স্থান সঙ্কুলান করা যায়।

অনেকে মনে করেন, ভবিষ্যতে ব্রাজিল তাহার প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য্য বশতঃ পৃথিবীর ভিতর বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিবে এবং ইউরোপ মহাদেশ হইতে বহুলোক গ্রাসাচ্ছদনের জন্য এখানে আসিবে। কিন্তু রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ঘটনার উপরই সমস্ত নির্ভর করিতেছে। কোন্‌টা কিরূপ অনুকূল বা প্রতিকূল হইবে, তাহা নির্দ্ধারিত না হওয়া পর্য্যন্ত এখানে কিছু করা যায় না।

ইউরোপীয়দিগের হিসাবে শিক্ষার অবস্থা উন্নতিজনক নহে। যে কয়টী বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তাহাতে ডাক্তারী, আইন, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষিসংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। নারী-

পুরুষের চিত্তবৃত্তি ক্রমেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে বলা যাইতে পারে। স্পেন দেশীয় আচার-পদ্ধতি অনুযায়ী মেয়েরা অন্তঃপুরচারিণী হইলেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। উন্নত ধরণের শিল্পকলা বা সাহিত্যের শিক্ষা দেওয়া হয় না বলিয়া যাহারা সঙ্গতিপন্ন, তাহারা কতক পরিমাণে তাহার শোচনীয় দুর্দ্দশার লাঘব করিতে একমাত্র পারে দক্ষিণ-আমেরিকা। কারণ এখানে প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার রহিয়াছে। একদিন প্রাচীন ভারতের সভ্যতা সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। আজ আমাদিগকে এই সব দেশের অনুকরণে আত্মোন্নতি করিতে হইবে,
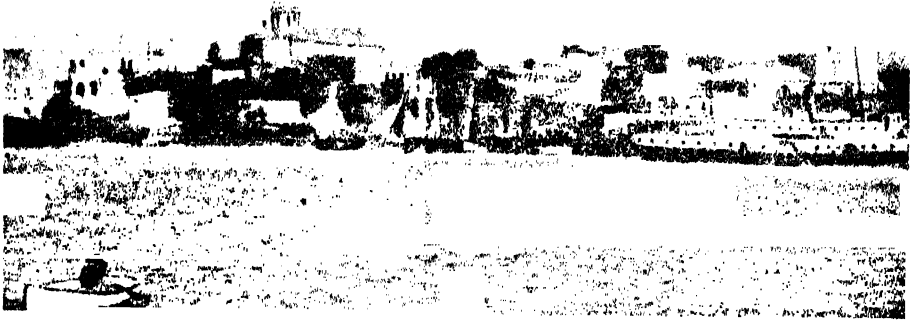
রোজারিয়ো সহর: (আরজেণ্টিনা) সম্মুখে পারানা নদী।

ফ্রান্সে এই সকল বিষয় অধ্যয়ন করিতে যায়। রাজনীতি-শিক্ষাভিলাষী ছাত্রগণ মার্কিন যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। দক্ষিণ-আমেরিকানরা সাধারণতঃ সঙ্গীতপ্রিয় এবং নৃত্যানুরাগী।

প্রাচীন ভূখণ্ডের সর্ব্বত্র যেরূপ অর্থনৈতিক সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে এবং বেকারসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, এই শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। যে শিক্ষা আমাদের উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে না, তাহা লাভ করিয়া আত্মম্ভরিতায় ঘরে বসিয়া থাকিলেও চলিবে না বা মসীজীবী হইয়া কালযাপন করিলেও সুখস্বাচ্ছন্দ্য পাইব না। আত্মোন্নতির জন্য এই সকল দেশের ইতিহাস জানা দরকার, কিন্তু অনুকরণ করিবার মত ইহাদের কিছু নাই, এ কথা ভুলিলেও চলিবে না।

বিজ্ঞানের বিষয়

·· বর্ত্তমান কালের তথাকথিত বৈজ্ঞানিকগণ মনে করিয়া থাকেন যে, যাহা উঁহাদিগের অনুবীক্ষণ এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় না, তাহা প্রত্যক্ষের অযোগ্য এবং তাহা বিজ্ঞানের বিষয় নহে। এই হিসাবে "ব্যোম", "ব্রহ্ম" এবং "ঈশ্বর"ও হয়ত তাঁহাদের মতে বিজ্ঞানের বিষয় হইবে না। কিন্তু ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। সারা শরীরের মধ্যে যে মেদ রহিয়াছে, মাথার খুলি হইতে যে প্রতিনিয়ত রস সঞ্চারিত হইয়া টাক্‌রার উপর নিপতিত হইতেছে, যকৃতের দ্বারা উত্তাপ সঞ্চারিত হইয়া যে স্তন-প্রদেশের মেদখণ্ডকে চালু করিতেছে এবং তাহার ফলে যে, জিহ্বা কথা কহিতে পারিতেছে—ইত্যাদি অনেক ব্যাপার কোন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা দেখা যায় না, অথচ ঐ সমস্ত ব্যাপার যে ঘটিতেছে, তাহা অস্বীকার করাও চলে না। কাজেই অনুবীক্ষণ এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা কোন বস্তু দেখিতে না পাওয়া গেলেই যে, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার অথবা বিশ্বাস করিবার অযোগ্য এবং বিজ্ঞানের বহির্ভূত, ইহা মনে করা যুক্তি-সঙ্গত হইতে পারে না।

মা

—শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল

চায়ের পেয়ালাটি স্বামীর হাতে দিতে, খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে স্বামী বললেন, মিঃ ভেরেনক্যাম্প আজ তোমার কথা বলছিলেন।

সান্ধ্য সূর্য্যের সোনালি রঙে সামনের ফুল-বাগিচাখানি হেসে উঠেছিল। শূন্যদৃষ্টিতে তারই ওপারে তাকিয়ে কতকটা অন্যমনস্কের মত স্ত্রী বললে, হাঁ। সে না কি এই সহরেই বাস করছে?

—অনেক দিন ধরেই সে এখানে আছে, তবে একেবারে সহরের ও-সীমানায়। মস্ত বড় কাজের মানুষ। প্রায়ই তাকে দেখি সভা সমিতিতে। আজই সব-প্রথম শুনলুম যে, সেও স্ত্রীসল্যাণ্ডের লোক, আর তোমাদের পরস্পরের চেনাও ছিল।

—হ্যাঁ, আমাদের গ্রামের কাছাকাছি একটি গ্রামে ওর বাপ ধর্ম্মযাজকের কাজ করতেন। বিয়ে করেছে দেখলে?

—না, বিয়ে করে নি। এখনো সে রীতিমত একজন যুবা, বেশ বুদ্ধিমান্ আর খুব আমোদে লোকটি। অনেকে বলে, সে না কি একদিন অধ্যাপক হয়ে বসবে।

—আমার চেয়ে ও দু'বছরের বড়—তারপর স্ত্রী যেন আপনার মনেই বললে—বত্রিশ বছর ওর বয়স হবে!

—খুব সম্ভব। যাক্, এখন তা' হলে আসি, আমার আবার একবার বেরুতে হবে—

… … …

'আবার একবার আমায় বেরুতে হবে!' স্ত্রীদের কাছে সাধারণতঃ কতখানি মর্ম্মবেদনার কথা এটা! কিন্তু তার পক্ষে এখন এসবগুলো গা সহা হয়ে এসেছে। ছোট-খাটো ছুতো ধরে' সে আর এখন স্বামীকে বাড়ীতে ধরে' রাখবার চেষ্টা করে না, স্বামীর নির্লিপ্ততায় আর সে কাঁদতে বসে না, নিজেকে ধিক্কার দিয়ে আর সে তাঁর ভালবাসাকে ফিরে পাবার চেষ্টা করে না, কারণ অনেক দিন আগেই জেনেছে যে স্বামী তাকে ভালবাসেন নি কোন দিনই। … হ্যাঁ মনের অশান্তিটাও ক্রমে মানুষের সয়ে' যায় বৈ কি!

ছেলেদের পরিষ্কার পোষাকগুলি সে আল্না থেকে টেনে নিয়ে তিনটি থাকে সাজিয়ে রাখে; চোখে কিন্তু তখনো তার সেই চিন্তাচ্ছন্নতা—যা দেখে স্পষ্টই বলা যায় যে, তার চিন্তাধারা বহু-বহু দূরে ছুটে চলেছে। চোখের সামনে তার ভেসে উঠেছে তার প্রথম-যৌবনের সুস্নিগ্ধ দিনগুলি, যখন ঐ লোকটি—দেশসুদ্ধ লোকে এখন যাকে মিঃ রবার্ট ভেরেনক্যাম্প বলে' শ্রদ্ধায় মাথা নত করছে—সেই ছিল অতি সাধারণ আনাড়ি একটা গ্রাম্য ছেলে, আর রব নামেই ছিল তার পরিচয়। তখন ঐ ছেলেটি ছিল তার প্রণয়-প্রার্থী—অসাধারণ অধ্যবসায় নিয়ে সে তার অনুগ্রহ ভিক্ষা করত। মেয়েটি তার রকম-সকম দেখে না হেসে থাকতে পারত না—সে ছিল এত উদ্দাম, এত বড় আনাড়ি, আর এত বড় গোঁয়ার! তার মত সহরবাসিনী তরুণী এমন একজন বন্ধুও তার ছিল না যে, রবের ভিতর এতটুকু আকর্ষণও খুঁজে পেয়েছিল. সে নিজে অবশ্য রবকে পছন্দ করত, কিন্তু তাকে তার প্রেমিকের আসন দিতে কোন দিনই সে রাজি হয় নি। তবে, বয়স তখন তার মোটে পনেরো। পঞ্চদশী একটি কিশোরী মেয়ের পক্ষে হৃদয় বিনিময় না করার ভিতর কি যে রহস্য থাকতে পারে, তা কে বলবে?

মোট কথা, রব তার পিছু পিছু নাছোড়বান্দার ন্যায় ঘুরে বেড়ালেও সে কিন্তু তার সেই একান্ত অনুরাগটুকুকে তার হৃদয় পর্য্যন্ত পৌঁছুতে দেয় নি।

তার পর রব চলে' গেল ইউনিভার্সিটীতে। তার বাবা বদলী হয়ে গেল অন্যত্র। এদিকে মেয়েটির জীবন-ধারা বয়ে' চলল নাচের আসর আর রকমারি পার্টির হাসি-আনন্দের ভিতর দিয়ে। অবশেষে কুড়ি বছর বয়সে সে বিয়ে করলে। অন্য মেয়েদের মতই তারও বুকে জেগেছিল প্রেমের রঙীন স্বপ্ন, তবে সেটা টিঁকেছিল শুধু বিবাহের শুভদিনটির আগে ও পরে মাত্র কিছু কালের জন্যই। তারপর একদিন যখন সে স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে চোখ রগড়ে তার আশে পাশে তাকালে, তখন নিজের অবস্থাটুকু

বুঝতে তার দেরী হ'ল না; সে পুরোপুরি উপলব্ধি করলে, —নিষ্ঠুর ভাগ্য-দেবতা কোথায় তাকে টেনে এনে ফেলেছে, আর কি-ধরণের মানুষটিকে সে বরণ করেছে তার সন্তানদের পিতার আসনে।

আজ দশ বৎসর বিয়ে হয়েছে তার। সুদীর্ঘ এই দশ বৎসর ধরে' সে ঢেকে রেখেছে তার সব দুঃখ—সব বেদনাকে তার হাসির অন্তরালে, এই দশ বৎসর ধরে' একটি অকপট হৃদয়ের স্নেহচ্ছায়ার তলে নিজেকে বিলীন করে' দেবার তৃষ্ণায় তার অন্তরাত্মা গুমরে উঠেছে।

রবের সঙ্গে তার পরিচয়ের দিনগুলি তার চিন্তাধারায় ভেসে ওঠে। মনে পড়ে সেই তাদের গ্রামখানি; কতকাল সেখানে সে যায় নি, অথচ সেখানে যাবার জন্য মাঝে মাঝে কি একান্ত কামনাই না জেগে উঠে তার মনে! কি মাধুর্য্যে ভরা সেই মেঠো পথগুলি, সেই ছায়া-নিবিড় গ্রামের রাস্তা, যেখানে সে তার কিশোরী বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াত, আর রব থাক'ত তার আশে-পাশে। এখনো যে তার চোখের সামনে ভাসছে সেই বিলের জল আর তার উপরের সেই ফুটন্ত পদ্মফুলগুলি! এখনো মনে পড়ছে, সেই সবুজ ময়দানের উপর বেড়াবার সময় গরুগুলো হঠাৎ তাকে তাড়া করে এসে পড়লে কতখানি উৎসাহ নিয়ে রব তাদের দূরে তাড়িয়ে দিত; মনে পড়ছে সেই কাঁটাগাছের ঝোপগুলো, যেখান থেকে রব তার জন্য পাকা ফলগুলি আহরণ করে' দিত,—সেই খালের জলের উপরকার জমে'-যাওয়া মসৃণ বরফের রাশি, যার উপর তারা দুজনে স্কেটিং করত, এবং পাছে ঠাণ্ডা বাতাস মুখে-চোখে লেগে তার এতটুকু কষ্ট হয়, রব তাই তাকে বরাবর আড়াল করে' রাখত তীক্ষ্ণ বাতাসের ঝাপ্টা থেকে। সেই রব—সহৃদয়তায় ভরা সেই রব!

কি করুণদৃষ্টিতেই সে যে চেয়ে থাকত তার মুখের পানে! সে-দৃষ্টিতে তার হতাশ প্রণয়ের সবটুকু বেদনা যেন ফুটে উঠত। বিনিময়ে সে তাকে দিয়েছিল শুধু অবহেলার হাসি; সে কথা স্মরণ করতেও আজ কষ্ট হয়। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে কতদিন সে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করেছে— "ঐ রবকে গ্রহণ করাই তার ভাল ছিল না কি? না এখনো যে-কথা মনে হয়, তার সম্বন্ধেও তাকে এমনি করে' বারম্বার ভাবতে হ'ত, আমায় বিবাহ করেছে শুধু আমার টাকার জন্যেই ত! না—না ছিঃ—রবের সম্বন্ধেও ওকথা!

কিন্তু···নাঃ, এমনি করে' ভাবনায় ডুবে থাকবার সময় তার একেবারেই নেই। চাকররা ছেলেদের স্নানের জল নিয়ে এসেছে। তিনটি ক্ষুদে প্রাণীতে মিলে তার চারদিকে লাফালাফি সুরু করে দিয়েছে। এখন তাকে ঐ সব দুষ্টুদের পাক্‌ড়াও করে, পোষাক ছাড়িয়ে, স্নান করিয়ে দিয়ে তবে বিছানায় শুইয়ে দিতে হবে। সে যে মা—স্নেহময়ী কর্ত্তব্য-পরায়ণা মা যে!

মনের পর্দ্দা থেকে অতীত মুছে গেল। শিশুদের চঞ্চল হাসি দেখে মা'ও হাসে। তাদের প্রাণখোলা খেলা দেখতে দেখতে মায়ের চোখ দুটি উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। তিন জোড়া কচি বাহু তার কণ্ঠে জড়িয়ে ওঠে; চুম্বনে চুম্বনে সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এই তো সুখ—হাঁ, বহু বর্ষ ধরে' এই সুখটুকুই ত সে অর্জ্জন করেছে।

শীতকাল।

বিশাল সহরের বরফে ঢাকা পথগুলির উপর সূর্য্যকিরণ ঝক্ ঝক্ করছে। স্লেজ গাড়ীগুলি সশব্দে বরফের উপর দিয়ে পিছলে চলেছে। তারই মাঝে মাঝে চলেছে ছোট-বড় অজস্র রকমারি গাড়ী; লোমের পোষাক-পরা চাপরাশ-আঁটা গাড়োয়ান-সমেত ধনীদের যান থেকে আরম্ভ করে' মাল-বাহী শ্লথ গাড়ীগুলি, কিছুই বাদ নেই। চারিদিকে হাস্যময় কলগুঞ্জন! গোলাপ ফুলের মত মুখ আর দামী পোষাকও যে কত চোখে পড়ছে তার ইয়ত্তা নেই।

বইয়ের দোকানের জানালাগুলিতে চক্‌চকে বইগুলি সাজান। খেলানার দোকানগুলির আলমারিতে রকমারি রঙের জলুস্ খেলছে। বড়দিন এল বলে! চারিদিকে আনন্দ এবং ভাবী সুখের ছোঁয়াচ লেগে গেছে।

স্বামীর হাত ধরে সে পথ চলেছে। পাতলা দেহখানির অপূর্ব্ব সজীবতা আর বর্ণ-সুষমায় উত্তর-হল্যাণ্ডের বিশিষ্টতা ধরা পড়ছে। সারা দেহটি ঘিরে এক লীলায়িত সৌন্দর্য্য। কত-না পুরুষের সস্মিত দৃষ্টি সেই সৌন্দর্য্যের উপর স্তব্ধ হ'য়ে থামছে; কত-না লোক টুপি খুলে তাদের সম্মান দেখাচ্ছে,

অবশ্য সেটা শুধু যে তাদের উচ্চ পদমর্য্যাদার জন্য নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য।

কোন এক জায়গায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করে তারা বাড়ী ফিরছে।

স্বামী জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি একা বাড়ী ফিরতে পারবে কি? আমি তা হলে একটু কাজ সেরে যেতুম এই পাড়ায়, অবশ্য তুমি যদি কিছু মনে না কর।

—তা বেশ তো

সেই সময় সামনের লোকেদের ভিড়ের মাথার উপর দিয়ে তার নজরে পড়ল, শ্মশ্রু ঘেরা সুন্দর একটি মুখ; বোঝা গেল, লোকটি তারই দিকে এগিয়ে আসছে। অজ্ঞাতেই তার চোখ চুটি সেই মুখের উপর স্থির হয়ে রইল, পরে লোকটির চোখে চোখ পড়তেই সে নির্লিপ্ততার ভঙ্গীতে চোখ সরিয়ে নিলে। রঙ্গিনীদের কথা ছেড়ে দিলেও, সুন্দরী মেয়েদের সাধারণতঃ পথ চলতে চলতে এমনি করে অনেকবার চোখ ফিরিয়ে নিতে দেখা যায়। শেষে কিন্তু যখন অচেনা লোকটি আরও কাছে এসে পড়েছে এবং সে বুঝতে পারছে যে লোকটি তার মাথার টুপিটা তুলতে সুরু করেছে, তখনই আবার সে আর এক মুহূর্তের জন্য তার পানে চোখ ফেরালে।

লোকটির চাহনি সোজা তার হৃদয় পর্য্যন্ত স্পর্শ করেছে। এখনও চোখে সেই একই সকরুণ দৃষ্টি—সে দৃষ্টি সে আজও তার মন থেকে মুছে ফেলতে পারে নি যে! এই দীর্ঘকায় সুপুরুষটিই হচ্ছেন রবার্ট ভরেনক্যাম্প। আজ তাকে দেখে সেই আনাড়ি পাড়াগেঁয়ে রব কে বলবে!

তার নারী-হৃদয় খুব দ্রুত স্পন্দিত হতে সুরু করেছে। বিগত দিনের সেই প্রণয়াবেগ-মাখা দৃষ্টির স্মৃতিটুকু মনের মাঝে ভেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার গাল চুখানিতে একটা সুগভীর লজ্জারুণ রেখা ফুটে উঠল। এবং সেই স্মৃতিই তাকে বলে দিলে যে, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের মধ্যে এতগুলো বৎসরের ব্যবধান থাকলেও আজ আবার তার দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে রবের মনে সেই পুরানো বাসনার শিখা নূতন করে জ্বলে উঠেছে।

তার স্বামী বললেন,—ঐ তো ভরেনক্যাম্প, নয় কি?

—হ্যাঁ।

—আমষ্টারডামে ও কাজ পেয়েছে। আজ সকালে আমি কাগজে দেখেছি।

—তাই না কি?

—হ্যাঁ। আচ্ছা আমি এখন আসি।

প্রাণহীন শুষ্ক একটু বিদায়-সম্ভাষণের ভিতর দিয়ে তারা স্বামী-স্ত্রীতে ভিন্ন পথে পা বাড়াল। মেয়েটি পথ চলেছে যেন একটা স্বপ্নাচ্ছন্নতার ভিতর দিয়ে, আর সর্ব্বক্ষণ তার মনের চোখে ভাসছে সেই বহুদিন অ-দৃষ্ট সুপরিচিত মুখখানি। তার আশে পাশে শব্দায়মান রকমারি যানগুলো ছুটে চলেছে,—কিন্তু সে-সবের কোন কিছুই তার চোখে পড়ছে না, কাণেও যাচ্ছে না। এমনি গভীর চিন্তায় সে তন্ময়! তার হৃদয়ের মধ্যে যে উদ্দাম আবেগ-স্পন্দন চলেছে, তা যে সে নিজে সুস্পষ্ট অনুভব করছে। এবং সবিস্ময়ে নিজেকেই সে নিজে প্রশ্ন করছে, কেন? তবে কি সত্যিই তাকে সে কোনকালে ভালবাসত? না, তারি ঐ সুন্দর মুখই আজ তাকে মুগ্ধ করলে?

তা সে যা-ই হোক, নিজের কাছে এ-কথাটা অস্বীকার করবার তার উপায় নেই যে, এতদিনের পরে আবার ঐ রবের সঙ্গে তার দেখা হলে তার আনন্দের সীমা থাকবে না। যদি আবার চুজনে বসে তারা সেই বিগত দিনগুলির কথা—তাদের সেই গ্রাম এবং তাদের চুজনের পরিচিত বন্ধুদের কথা বলবার একটু অবসর পায়, কত আনন্দ না হবে! হায়, পুরানো পরিচিত কারও সাক্ষাৎ তার পক্ষে যে কত চুষ্প্রাপ্য জিনিষ, তা কে বুঝবে!

যখন সে প্রায় তার বাড়ীর কাছাকাছি এসে পড়েছে, হঠাৎ তার কাণে এল সুপরিচিত একটি কণ্ঠস্বর।

সে মুখ তুলে চাইলে। আবার তার গালচুটিতে রঙের ছোপ ধরে ওঠে এবং তাতে তার স্বভাব-সুষমা অনেকখানি বেড়ে ওঠে।

—কেমন আছ, রব?

আজ অন্য কোন নাম ধরে তাকে সে ডাকতে পারল না। চুজনের চুখানি করতল পরস্পর আবদ্ধ হ'ল বেশ গাঢ় ভাবে। ঐ বলিষ্ঠ হাতের ঘন-স্পর্শটুকু আজও জাগ্রত তার মনে।

—আজও কি তোমাকে আমি আল্‌রিকা বলে ডাকতে পারি?

—নিশ্চয়। মাথা নামিয়েই সে জবাব দেয়।

তৃপ্তিমাখা একটুখানি হাসির আড়ালে তার অনুভূতি-গুলিকে চাপা দিয়ে রব বলে,—একই সহরে আছি এক বছরেরও বেশী, কিন্তু দেখা হ'ল আমাদের মোটে আজ!

—তা সত্যই এটা একটু আশ্চর্য্য বৈ কি! তবে তুমি তোমার কাজকর্ম্ম নিয়ে ব্যস্ত থাক সহরের পশ্চিম সীমায়, আর আমি পড়ে থাকি পূবে আমার সংসারের ঝঞ্চাট নিয়ে।···সত্যি রব, আবার এতদিনের পর একজন ক্রিসিয়ানের দেখা পাওয়া যে কত সুখের!—হঠাৎ সে আবেগভরে বলে ওঠে তার হৃদয়ের অন্তরতম দেশ থেকে।

—তাতে আবার এখন আমি ক্রিসিয়ান ভাষায় কথা বল্‌তেও ভুলি নি!—রব হেসে বলে।

আল্‌রিকা আবার একবার বেশ সশব্দে হাসে। নিজের মনের কাছে নিজেকে সে দেখাতে চায়, যেন আজকের এই ব্যাপারটাতে অত্যন্ত সাধারণভাবে খুসী হওয়া ছাড়া তার মধ্যে কোন রকম আবেগের উষ্ণতা নেই। কিন্তু রব লক্ষ্য করেছে; লক্ষ্য করেছে তার হাতের কাঁপুনী, তার চির-দিনের সুস্পষ্ট সহজ কণ্ঠস্বরে হঠাৎ আজকের এই অহেতুক স্পন্দন। তাই, বহু বছর ধরে, যে রব তার অন্তরের ভিতর প্রেমকে বাদ দিয়ে শুধু উচ্চাকাঙ্ক্ষাকেই পোষণ করে এসেছে, আজ হঠাৎ সেই রবেরই বুকখানি এক পরমানন্দে ভরে উঠল, তার মনে হল, যেন সে আজও সেই তরুণ যুবা বই আর কিছুই নয় এবং কাম্য শুধু তার ঐ মেয়েটির প্রেম, আর কিছু না—কিছু না! সুতরাং একটু পরেই আল্‌রিকা যখন আবার তার আনত দৃষ্টিটুকু তার পানে তুলে ধরলে, তখন ঐ রবের চোখের গভীর বিষাদ-করুণ প্রণয়দৃষ্টিতে সে স্তব্ধ হয়ে গেল।

সে বলে,—খানিক আগে আমি তোমায় চিনতে পারি নি, তা জান? এমনি বদলে গেছ তুমি!

রব বলে,—বদলেছি ভালর দিকেই বোধ হয়। তা, বদল যত কিছুই হয়ে থাকি, অনুভূতি আমার চিরদিনই আছে।

পায়ের তলায় বরফের উপর তাকিয়ে সে নীরব হ'য়ে থাকে। হ্যাঁ, এখনো ঠিক তেমনিই আছে ঐ রব, তেমনি উদ্দাম, তেমনি মুখফোঁড়, আর তেমনি আনাড়ি। অথচ আজ তার ঐ গুণগুলিই যেন তাকে আকর্ষণ করছে!

রব বলে,—তুমি খুব বেশী বাইরে বেরোও না বোধ হয়?

—না, খুবই কম। খুব বেশী বেরোতে আমার ভালও লাগে না।

—কিন্তু স্কেটিং করতে ত তুমি বরাবর ভালবাসতে! তোমার স্বামী স্কেটিং-ক্লাবের সভ্য নন্?

—হ্যাঁ, তবে সেটা বেশীর ভাগ ছেলেদের জন্যেই!

—ও, তোমার ছেলে আছে বুঝি?—রব বলে ওঠে যেন কতকটা অপ্রস্তুত হ'য়ে।

মাথা না তুলেই সে জবাব দেয়,—হ্যাঁ, দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে।

চুপচাপ। শোনা যায় শুধু ঘণ্টার শব্দ—শোনা যায় ফিরিওয়ালাদের হাঁক-ডাক। কাছেই স্কুলের ছুটী হয়ে যাওয়ায় চঞ্চল ছেলেদের দল লাফাতে লাফাতে হোঁচট খেতে খেতে রাস্তা মুখর করে ছুটে চলে।

এরা দুটি প্রাণী কিন্তু নিঃশব্দে সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে থাকে,—দৃষ্টি তাদের মাটির পরে নিবদ্ধ।

—শুনলুম, তুমি না কি এ সহর ছেড়ে চলে যাচ্ছ! আলরিকা বলে।

—ঠিক নেই কিছু। এখনও আমার মন ঠিক করে উঠতে পারি নি।

—ও।

উভয়েই একটুখানি নীরব।

তারপর সে বলে,—তার মানে, তোমার উন্নতি হ'য়ে গেল।

—হ্যাঁ, তবে কেবল পয়সার দিক দিয়েই। প্রথমে আমি নেব না ভেবেছিলুম। কিন্তু এখনও আমি ঠিক করতে পারিনি আলরিকা।

কোন জবাব নেই।

—তুমি এতক্ষণও স্কেটিং এর মাঠে ছিলে বুঝি?

—হ্যাঁ। যদিও স্বামী আমার স্কেটিং করেন না।

—কিন্তু তুমি ত' কর।

—এ বছরে আমি মাত্র একবার কি দু'বার স্কেটিং করেছি।

—আজ রাত্রে তুমি ওখানে আসবে না না কি?—বিদায়ের আগে রব বললে তার হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে। জান ত আজ ওখানে একটা বড় রকমের উৎসবের আয়োজন হচ্ছে। ইলেক্‌ট্রিক আলো, চীনে-লণ্ঠন, আরও সব রকমারি চমকপ্রদ জিনিষ।

আল্‌রিকা তার মুখের পানে না তাকিয়েই স্তব্ধ হয়ে থাকে। ঐ দুটি চোখের আকুল আকুতি, ঐ সুপরিপুষ্ট হাতখানির ঘন স্পর্শের মুখর আবেদন—এদের অস্বীকার করবার ক্ষমতা যে তার একেবারেই নেই। ইতস্ততঃ করে সে জবাব দেয়,—তা তো আমি ঠিক জানি নে।

কিন্তু মুখে সে যাই বলুক, তার উত্তপ্ত কপোল দু'খানির চেহারা দেখেই এ কথা বুঝতে রবের বাকী থাকে না যে, আজ এতকাল পরে ঐ তার চির-ঈপ্সিত হৃদয়খানিতে একটু স্থান তার জন্য আছে।

—জান না? সত্যিই জান না তুমি?

তার পেলব হাতখানিকে মুক্তি না দিয়েই রব ঐ কথা বলল। পরে আরও দুঃসাহসের সুরে সে বললে,—আমি আশালতিকা ধরে রাখব আল্‌রিকা।

এবং এই কথাটি বলে মাথা নামিয়ে নমস্কার করে সে আপনার পথে চলে গেল।

* * *

বাড়ীতে তার মস্তবড় একখানি আয়নার সামনে সে দাঁড়িয়ে। আজ সারা দেহে তার এক অনির্ব্বচনীয় সজীবতা। এটুকু তার নিজের চোখেই ধরা পড়েছে। মনে হচ্ছে সে যেন আজ সম্পূর্ণ নূতন একটা জীবনের উন্মেষ তার চোখের সাম্‌নে দেখতে পাচ্ছে। ওঃ, এতদিন ধরে' কি-জীবনই না সে যাপন করে' এসেছে!—শুধুই স্বামীর বিশ্বস্ত এক পরিচারিকা, তাঁর ঘর-গৃহস্থালী আর তাঁর ছেলেমেয়েদের রক্ষয়িত্রী ছাড়া আর কিছুই তো সে নয়! না, পত্নীত্বের অধিকার—জীবন আর যৌবনের সবটুকু মধুরত্বকে পান করবার অধিকার সে পায় নি—কোন দিন পায় নি।

চোখের সামনের সেই যৌবন-পুষ্পিত কমনীয় তনুখানির পানে সে তাকিয়ে থাকে, আর কত কি যে ভাবে। আজকের রাত্রিটির আশায় সে কতখানিই না উন্মুখ হ'য়ে আছে! প্রথমটা সে একটু ইতস্ততঃ করেছিল বটে, কিন্তু ডিনারের সময় স্বামী যখন নিজেই যাবার কথা তুললেন,—তখন লোভটুকু সে সামলাতে পারলে না।

হ্যাঁ, সে চায়—চায় তো সে আনন্দ। কি দোষ আছে তাতে? দুজনে বসে' অল্প একটুখানি আলাপ, একটুখানি স্কেটিং। তারপর হয় তো স্বামীর বাহুলগ্না হ'য়ে বাড়ী ফেরার সময় রবকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে আসা, তাদের বাড়ীতে একদিন আসবার জন্য। কি দোষ তাতে? সে তো আর কিছু চায় না। চায় শুধু এই তার সঙ্গীহারা একঘেয়ে জীবনের মাঝে সামান্য একটুখানি কাব্যের সরসতা, তার ব্যথাতুর বুকের মাঝখানে এতটুকু একটু স্নেহের প্রলেপ, সামান্য একটুখানি আনন্দ বই আর কিছুই তো সে চায় না।

তার টুপীটি সে মাথায় বসিয়ে দিলে; ঐ সাদা পাখনা-আঁটা টুপীটিতে চমৎকার মানায় তাকে। তারপর যখন সে তার মখমলের লম্বা কোটটি গায়ের উপর চড়িয়ে নিয়ে আবার একবার আয়নার দিকে তাকাল, তখন নিজের সুকুমার চেহারাখানিই তার নিজের মনে কেমন যেন একটু আনন্দের আবেশ এনে দিল।

হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। ভিতরে ঢুকল, তার বড় ছেলে ক্রুথিয়ান্; এই ছেলেটিকে ঘিরে মায়ের আশা এবং গৌরবের অন্ত নেই।

—তুমি এখানে মা?

—হ্যাঁ বাবা।

মুহূর্ত্তকাল সে ছেলের মুখের পানে তাকিয়ে থাকে। কি ভাস্বর আর কি স্বচ্ছ ঐ তার প্রাণপ্রতিম ছেলের চোখ দুটি! ঐ সব-ভুলান মুখখানিতে যেন তার নিজের মুখেরই প্রতিবিম্ব পড়েছে।

—বরফের উপর খেলা করছিলি বুঝি রে?

—হ্যাঁ মা। কি যে মজা!

—সত্যি! তার মুখের গুণ্ঠনটুকু আঁটতে আঁটতে সে অন্যমনস্ক ভাবে বললে।

লোকজন পৌছিল ; মোটর সেখানে আছে, পদব্রজে পাহাড়ে-রাস্তায় গ্রামের দিকে অগ্রসর হওয়া গেল। বন্ধুবরকে এ-যাত্রায় ভালুকের চামড়ায় সন্তুষ্ট হইতে হইবে। .

অর্দ্ধেক পথ তখনও বাকি, একটি ছোট "টুংরি" (hillock) উঠা হইতেছে, এমন সময় সঙ্গের লোকেরা "সাম্বর সাম্বর" বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। চারিদিকে চোখ ঘুরাইয়া কিছু দেখিলাম না, কিন্তু তাহারা জোর করিয়া বলিল, পাহাড়ের উপর হইতে তিনটি "সাম্বর" নামিয়া আসিতেছে, তাহারা দেখিয়াছে এবং আমি যদি দৌড়াইয়া আগাইয়া যাই তবে যখন রাস্তা পার হইবে, "রামফলে" (rifle) মারা চলিবে। ("রামফল", পাঠক লক্ষ্য করিবেন লক্ষণ ফল নহে, রামফল। লক্ষণের ফল হইলে হাতে করিয়া নট্‌-নড়ন-চড়ন বলিয়া থাকিতেই হইত) হস্তে উর্দ্ধশ্বাসে পাহাড় বহিয়া উঠিতে আরম্ভ করিলাম। একটা বাঁক ঘুরিয়া রাস্তা উপরে উঠিয়াছে, সেই বাঁক পার না হইলে কোনই ফল হইবে না। হাঁপাইতে হাঁপাইতে যখন বাঁক পার হইলাম, তখন ৩০০ গজ দূরে প্রথম সাম্বর লাফাইয়া রাস্তা পার হইয়া গেল। পর মুহূর্ত্তেই দ্বিতীয়ও গেল, দুইটিই female (মাদী), তারপর প্রকাণ্ড শিংযুক্ত ঘোড়ার মত এক সাম্বর ছুটিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে রামফল গর্জ্জিয়া উঠিল, সাম্বর যেন একটু হোঁচট খাইল, তারপর একটি ঝোপের আড়ালে চলিয়া গেল। আবার দৌড়। সকলে আসিয়া পড়িল, গুলি লাগিয়াছে, রক্ত পড়িয়াছে। ইচ্ছা—রক্ত ধরিয়া তাহাকে বাহির করা, কিন্তু নগ্নপদে (ভালুক জুতা খাইয়াছে) সেই প্রস্তর ও কণ্টকাকীর্ণ স্থানে সাম্বরের পিছনে দৌড়ান বড় লোভনীয় বলিয়া মনে হইতেছিল না। কিন্তু উপায়ও নাই, যাইতেই হইবে। এমন সময় "উহে, উহে ঝাড়িমে" (ঐ, ঐ ঝোপে), বলিয়া একজন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া নিকটস্থ ঝোপ দেখাইয়া দিল। একটি সাম্বরের মাথার একটু অংশ ও কান দুইটি দেখা যাইতেছে, মাদী ছুটিয়া পলাইল ও আহতটি কোনও রকমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা করা মাত্র রামফল-বিনির্গত দ্বিতীয় গুলি তাহার মস্তক বিদ্ধ করিল। সাম্বর পড়িল ; জাতীয় ও বিজাতীয় জয়োল্লাসে মেদিনী কম্পান্বিতা, এমন সময় মাদী দুইটি ফিরিয়া আসিয়া মৃত সাম্বরটিকে শুঁকিতে লাগিল। নিকটে লোকজন গিয়া পড়ায় ছুটিয়া পলায়, আবার ফিরিয়া আসে। তাহাদের এইরূপ আচরণ ও রক্তের নদী দেখিয়া বড় একটা অনুশোচনা আসিল। অনুরূপ দু' একটি ঘটনার পর হরিণ আর নেহাৎ দায়ে না পড়িলে পারতপক্ষে মারিতে ইচ্ছা হয় না। বন্ধু সাহেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট মনে মাথা, চামড়া ও কিছু মাংস সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা রওনা হইলেন।

শীকারের সখ অনেকেরই দেখা যায় ; কিন্তু কার্য্যকালে অনেক সময় হাস্যজনক ব্যাপারের অবতারণাও হইয়া পড়ে। একবার কলিকাতা হইতে আগত কয়েকটি ভদ্রলোকের জন্য এক শীকারের বন্দোবস্ত হয়। শীকার করিবার তাঁহাদের নিদারুণ সখ। Beat হইল, কোনও শীকারই পাওয়া গেল না। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে অশ্বপৃষ্ঠে জঙ্গলের ভিতর বহুদূর যাইতে হইয়াছিল, এখন ফল না হওয়ায় রুক্ষ মেজাজে beat-এর কুলিদের উপর ধমক আরম্ভ হইল ; তাহারা শীকারীর উপর দোষারোপ করিয়া বলিল, প্রকাণ্ড "সোনা চিতা" তাহারা ঘেরিয়া আনিয়াছিল, মাচার সামনে দিয়া নিশ্চয় গিয়াছে ; মারা না পড়িলে তাহাদের দোষ কি ? জোর তদারক আরম্ভ হইল—কোথা দিয়া কেমন করিয়া "প্যান্থার" পলায়ন করিয়াছে। তখন অভ্যাগতের মধ্যে একজন স্বীকার করিলেন, তাঁহারই মাচার নীচে দিয়া অবাধে বাঘ পলাইয়াছে, আর তিনি ছাড়িয়া দিয়াছেন। কারণ দর্শাইলেন যে, তিনি না কি মারিবার জন্য বন্দুক তুলিয়াছিলেন, কিন্তু বাঘ এমন কাতর ভাবে প্রাণভিক্ষার্থে তাঁহার প্রতি মিনতিপূর্ণ দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া মাচার সামনে লুটাইয়া পড়ে যে, সহানুভূতিতে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছিল ; তিনি বন্দুক নামাইয়া লইতে বাধ্য হন ও তাহাকে ছাড়িয়া দেন। সে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নেত্রে প্রাণদাতাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া যায়। এই অতি বিস্ময়কর ও দুষ্পাচ্য গল্প শুনিয়া একজন বলিয়া ফেলিলেন, "A damned intelligent brute !"

একবার এক ভদ্রলোক আমার সহিত ভ্রমণে যান ;— ইচ্ছা, সঙ্গে থাকিলে শীকারের সুবিধা হইবে। পালকোট অঞ্চলে এক ডাকবাঙ্গলায় অবস্থান করা গেল ; পাহাড়ের নীচেই বাঙ্গলা এবং স্থানে স্থানে পাহাড়ের একদিক দেওয়ালের মত খাড়া উঠিয়াছে, পিছনের দিক দিয়া মাথায় পৌছান যায় ; খাড়াই প্রায় ২০।৩০ ফিট হইবে। ঐরূপ

খাড়া অংশকে "টাপু" বলে এবং সামনের দিক সুরক্ষিত হওয়ায় "মাচা" হিসাবে ব্যবহার করা হয়। খবর পাওয়া গেল bait (টোপ) বাঁধিয়া বসিলে পাহাড়ের তলায় 'প্যান্থার' পাওয়া যাইবার খুব সম্ভাবনা। তৎপরদিনই এক "বকরা" (ছাগ) সংগ্রহ হইল এবং "টাপু"র নীচে তাহাকে বাঁধিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই টাপুতে চড়িয়া বসা গেল। ভদ্রলোক যথেষ্ট মিনতিপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, যেন আমি কোনওরূপ বিঘ্নোৎপাদন, interfere না করি, শীকারের সমস্তটা যেন তিনিই করিতে পারেন, আমি এ ক্ষেত্রে মাত্র দর্শক। তথাস্তু, তবে একেবারে দর্শক না হইয়া একটা কাজ মিলিয়া গেল। ছাগ কিছুক্ষণ চীৎকারের পর শুইয়া পড়িয়া, নিশ্চিন্ত মনে রোমন্থনে মন দিল, যেন জঙ্গলের ধারে পাহাড়ের কোলে রাত্রিযাপনে সে অভ্যস্ত। না চেঁচাইলে 'প্যান্থার' আসা সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে; শীকারী যেরূপ ভাবে বন্দুক ধরিয়া বসিয়া আছেন, তাঁর নড়াচড়াও কষ্টকর ব্যাপার; কাজেই আমাকে মাঝে মাঝে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া ছাগবৎসকে তাহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে স্মরণ করাইয়া দিতে প্রয়াস করিতে হইতেছিল। চুপি চুপি শিকারী বলিলেন, "স্যার, পান্থার কোথায়"? মানুষ ঐরূপ কাঠের মূর্ত্তির মত কতক্ষণ থাকিতে পারে, আমি তাহারই গবেষণায় তখন বিভোর।

চক্ষের নিমেষে 'প্যান্থার' আসিয়া একটানে খুঁটার রজ্জু ছিঁড়িয়া ছাগল লইয়া অন্তর্দ্ধান হইল; বলিলাম, "প্যান্থার ত চলে গেল এখন চলুন আমরাও যাই।" তিনি সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, "মারব তার বাবর?" কি সর্ব্বনাশ, কারিবার ভিতরে ত উপস্থিত এ অধম ছাড়া আর কোনও জীবই দেখা যায় না, আমাকেই না বসাইয়া দেয়! তারপর দিন অনেক সাধাসাধনা চলিল, আবার সন্ধ্যায় বসিতে হইল। বুঝাইয়া দিলাম প্যান্থারের আগমনের পূর্ব্বেই ছাগ চঞ্চল হইয়া উঠে, তখনই প্রস্তুত হইতে হয় এবং লাফাইয়া পড়া মাত্র গুলি করা ছাড়া আর সুযোগ পাওয়া যায় না। বাঘ আসিল, সেদিন গুলিও চালাইলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গুলি খাইয়া ছাগল মরিল; বাঘ অক্ষত দেহে পলাইল। আমারও জিদ হইল ভদ্রলোককে দিয়া বাঘ মারাইতেই হইবে। পরদিন blank, বাঘ আসিল না; তৎপরদিন বাঘ ওৎ পাতিয়াছে পূর্ব্বেই দেখা গেল, কিন্তু বাঘ দেখিয়া উত্তেজনায় শিকারী কাঁপিতেছেন; কানের কাছে বলিলাম, "Steady—তাড়াতাড়ি করবার দরকার নাই।" যেমন বাঘ লাফাইয়া পড়িল, বলিলাম, "এইবার মারুন।" "দুম্" করিয়া বন্দুকের আওয়াজ ও সঙ্গে সঙ্গে বাঘ কাৎ, একেবারে "head shot." ভদ্রলোক পায়ের ধূলা লইয়া (আমি বয়সে তাঁর অপেক্ষা অনেক বড়) "গুরুজী" সম্বোধনে আপ্যায়িত করিলেন; সেই তাঁর প্রথম বাঘ শীকার। আজ তিনি একজন "কৃষ্ণ-বিষ্ণুর" মধ্যে, তবু এখনও "গুরুজী" বলিয়াই সম্মান করিয়া থাকেন; সেটা ভাগ্য বলিতে হইবে।

আজ এই পর্য্যন্ত।

বেকার-সমস্যা ও দেশনায়ক

... ... সর্ব্বদা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের নিজেদের কোন ভ্রান্তি না থাকিলে ঋষি-রচিত ভারতবর্ষে—আমাদের বুকের ধন, ভবিষ্যতের আশার স্থল, ঐ সুন্দর সুন্দর যুবকগুলি আজ কর্ম্মাভাবে আত্মহত্যা করিতে বসিত না। প্রতিদিন দেখিতেছি, চোখের সম্মুখে তাহারা আত্মহত্যা করিতেছে, কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া আসিয়া যখন জিজ্ঞাসা করে যে, "তবে আমরা কি করিব?" তাহার কোন উত্তর আমরা দিতে পারি না; অথচ আমরা নিজদিগকে জ্ঞানী, সুচতুর, কার্য্যক্ষম নেতা বলিয়া মনে করিয়া থাকি। ইহা কি ধিক্কারের বিষয় নহে? ... ...

প্রতিদ্বন্দ্বী

—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

নারী ও পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শাশ্বত। কিন্তু বহুলাংশে উহা ফল্গু নদীর মত অন্তঃপ্রবাহিনী বলিয়া আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। সাধারণতঃ নরনারীর মধ্যে প্রেমটাই চোখে পড়ে।

অপিচ বিবাহ-নামক সংস্কারটা উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতারই পূর্ণ বিকাশ। তাই কাব্য ও রোমান্সে দুইটি নরনারীকে বিবাহ-বন্ধনে বাঁধিয়া দিয়া লেখক লেখনী সম্বরণ করেন। অর্থাৎ, দুইটি যুদ্ধোদ্যত প্রতিদ্বন্দ্বীকে আখড়ায় ঢুকাইয়া দিয়া সরিয়া পড়েন। অতঃপর যে কেলেঙ্কারি আরম্ভ হইবে, তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিবার সাহস তাঁহার নাই।

নৃসিংহ বাবুর অন্তরে কাব্য বা রোমান্সের বাষ্পটুকু ছিল না বলিয়াই বোধ হয় তিনি এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের ফলাফল শেষ পর্যন্ত দেখিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাঁহার দুর্দ্দম সাহস ছিল এবং লোকে বলিত, তিনি একজন বড় বৈজ্ঞানিক। তিনি না কি Natural Selection নামক জৈব আইনকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিবার মৎলব করিয়াছিলেন। অসম্ভব নয়; আমরা যতদূর জানি, লোকটি অতিশয় ধূর্ত্ত ও ফন্দিবাজ।

কোন বৈজ্ঞানিক দুরভিসন্ধিবশতঃ নৃসিংহ বাবু এক ঝাঁক পায়রা ও একপাল খরগোস পুষিয়াছিলেন। উপরন্তু তাঁহার এক শ্যালীর পুত্র ও ভগিনীর কন্যাও তাঁহার গৃহে প্রতিপালিত হইত। ইহারা সকলেই অনাথ; নৃসিংহবাবু ছাড়া ইহাদের আর কেহ ছিল না।

নৃসিংহ বাবুরও ইহারা ছাড়া আর কেহ ছিল না। স্ত্রী বহুকাল পূর্ব্বে Survival of the Fittest নামক আইন শিরোধার্য্য করিয়া বিগত হইয়াছিলেন। সন্তানাদিও কস্মিন-কালে হয় নাই। সুতরাং তাঁহার সংসারে পারাবত, শশক, শ্যালীর পুত্র ও ভাগিনেয়ী ব্যতীত অন্য কেহ ছিল না। নৃসিংহ বাবু ছিলেন ইহাদের ভাগ্য-বিধাতা।

নৃসিংহ বাবুর বয়স ছাপ্পান্ন। তাঁহার মস্তকের মধ্যস্থলে একটি মাত্র কেশ ছিল; প্রাতঃকালে স্নান করিয়া তিনি সেটিকে চিরুণী দিয়া আঁচড়াইতেন, তারপর বুরুশ দিয়া মস্তকের উপর শোয়াইয়া দিতেন। অতঃপর এক বাটি গরম দুগ্ধ পান করিয়া তিনি ল্যাবরেটারিতে প্রবেশ করিতেন। বাড়ীতে থাকিয়া যাইত নীরেন ও মিলু। নৃসিংহবাবু অন্তর্হিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহারা ঝগড়া আরম্ভ করিত।

ঝগড়ার কোন হেতু ছিল না, নিতান্ত অকারণেই পরস্পরের ছুতা ধরিয়া ইহারা ঝগড়া করিত। নীরেন মিলু অপেক্ষা ছয় সাত বছরের বড়, কিন্তু সেজন্য তাহাদের বাধিত না। বছর আষ্টেক আগে যখন এই বাড়ীতে তাহাদের প্রথম দেখা সাক্ষাৎ হয়, তখনই এই কলহের সূত্রপাত হইয়াছিল। নবাগত নীরেন মিলুকে দেখিবামাত্র বলিয়াছিল,—এই ছুঁড়ি, তুই বুঝি এ বাড়ীর ঝি? আমার জুতো ভাল করে বুরুশ করে রেখে দে ত।

দশবর্ষীয়া মিলু কিছুক্ষণ ঘৃণাপূর্ণ চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল,—মামা একটা বাঁদর পুষবেন বলেছিলেন; তুমি বুঝি সেই বাঁদরটা!

আড়াল হইতে নৃসিংহবাবু এই কথোপকথন শুনিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং তদ্দণ্ডেই তাঁহার মনে একটা কুটিল অভিসন্ধি জাগিয়াছিল।

অতঃপর নীরেন ও মিলু একত্র বড় হইয়াছে; দু'জনেই এখন কলেজে পড়ে। কিন্তু তাহাদের বিরোধ কিছুমাত্র কমে নাই। চোখোচোখি হইলেই তাহারা ঝগড়া করে; এমন কি বেশীক্ষণ চোখোচোখি না হইলে দু'জনেরই মন ছটফট করিতে থাকে। তখন একজন আর একজনকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া সাড়ম্বরে কলহ আরম্ভ করিয়া দেয়।

তাহাদের মনোভাব লক্ষ্য করিয়া বাড়ীর ঝি অক্ষদা ছড়া কাটিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল—

"মরি কি ভাবের হুলোহুলি
না দেখলে প্রাণে মরি, দেখলে চুলোচুল!"

নৃসিংহবাবু অবশ্য বিজ্ঞানে মগ্ন আছেন; তাঁহার ভাব দেখিয়া মনে হয় না যে, তিনি এসব কিছু লক্ষ্য করেন।

পায়রা ও খরগোসের মত ইহারা দুজনেও যেন তাঁহার জীবন-যাত্রার আনুষঙ্গিক অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

নীরেন ও মিলুর কলহের ক্রমবিকাশ আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করা ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়। প্রথম কিছুদিন তাহারা নির্লজ্জভাবে মারামারি করিয়াছিল। একবার নীরেন মিলুর উরুতে ছুরির এক কোপ বসাইয়া দিয়াছিল, পরিবর্ত্তে মিলু নীরেনের হাত কামড়াইয়া রক্তারক্তি করিয়া দেয়; দুজনের দেহেই সে ক্ষতচিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে। কিন্তু যতই তাহাদের বয়স বাড়িতে লাগিল, যুদ্ধের রীতিতেও ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন দেখা দিল। এখন আর কেহ কাহাকেও দৈহিক আক্রমণ করে না; যুদ্ধের অস্ত্রগুলি অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম আকার ধারণ করিয়াছে। মানব-প্রগতির ইহাই ইতিহাস।

সেদিন সকালে নৃসিংহ বাবু তাঁহার একটি মাত্র কেশ যথারীতি প্রসাধন পূর্ব্বক ল্যাবরেটারিতে প্রস্থান করিবার পর, মিলু নীরেনের ঘরে গিয়া দেখিল, নীরেন তখনও ঘুমাইতেছে। মিলু কিয়ৎকাল চিন্তিত ভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। একটা খরগোস আনিয়া তাহার বিছানায় ছাড়িয়া দিবে? না, সেটা নূতন কিছু হইবে না, কারণ কিছু দিন পূর্ব্বে নীরেনই ঐ কার্য্যটি করিয়াছিল। তাহার অনুকরণ করিলে নীরেন খুসীই হইবে।

সহসা মাথায় কোনও বুদ্ধি গজাইল না। তখন মিলু নীরেনের নাকে একটি খড়কে কাঠি প্রবেশ করাইয়া দিয়া বলিল,—কুম্ভকর্ণ, ওঠ—আটটা বেজে গেছে। বলিয়া প্রস্থান করিল।

নীরেন ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, নিদ্রাকষায় নেত্রে দ্বারের দিকে চাহিয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল,—রাক্ষুসী—বলিয়াই একটু বেগে হাঁচিয়া ফেলিল।

মুখ-হাত ধুইয়া সে টেবিলের সম্মুখে বসিল এবং গভীর মনঃসংযোগে কি লিখিতে আরম্ভ করিল।

কয়েক মিনিট পরে মিলু আসিয়া জলখাবারের রেকাবি টেবিলের উপর রাখিতেই নীরেন অসম্পূর্ণ লেখাটা লুকাইয়া ফেলিল। মিলু কিন্তু এক নজরে লেখাটা দেখিয়া লইয়াছিল, বলিল,—কি লেখা হচ্ছিল? পদ্য? আ মরে যাই! কার নামে পদ্য লেখা হচ্ছে?

নীরেন বলিল, যার নামেই লিখি না—

মিলু ফস্ করিয়া কাগজখানা কাড়িয়া লইয়া পড়িল—

'একটি বালিকা—নামটি তার মিলু
মস্তকে তার নাই এক ফোঁটা ঘিলু—'

নীরেনের নাকে কাঠি দিয়া মিলু যে বিজয়গর্ব্ব অনুভব করিতেছিল তাহা লুপ্ত হইয়া গেল; সে দু' হাতে কাগজখানা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে ক্রোধ-অবরুদ্ধ স্বরে বলিল,—আচ্ছা, আমিও জানি। মাথায় ঘিলু আছে কি না দেখিয়ে দেব।

তখনকার মত বিজয়ী নীরেন দন্ত বাহির করিয়া হাসিল এবং পরম পরিতৃপ্তি সহকারে জলযোগ আরম্ভ করিল।

দু' জনেই যথাসময়ে কলেজে গেল; নীরেন যাইবার সময় মিলুর দিকে চাহিয়া একটু মুচকি হাসিয়া গেল। মিলু নিদ্রালু বিড়ালীর মত কেবল চক্ষু ঈষৎ সঙ্কুচিত করিল।

নীরেন বৈকালে কলেজ হইতে ফিরিয়া দেখিল তাহার টেবিলের উপর একটি ছয় পংক্তির কবিতা শোভা পাইতেছে।

একটি যুবক নামটি তাহার নীরু,
ক্যাবলার রাজা, চাষা, অসভ্য, ভীরু;
মহিলাগণের সম্মান নাহি জানে;
বুদ্ধি এবং শিক্ষার দোষ—মানে—;
মানুষ না হয়ে ভাল্লুক হত যদি
নাচ দেখিতাম আনন্দে নিরবধি।

নীরেন কবিতা পাঠ শেষ করিয়াছে, এমন সময় মিলু প্রবেশ করিয়া বলিল,—কেমন কবিতা?

নীরেন দাঁত কড়মড় করিয়া বলিল,—আমার ছন্দ চুরি করেছিস।

মিলু বিদ্রূপপূর্ণ ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল,—ইঃ—ওঁর ছন্দ! বাজার থেকে উনি কিনে এনেছেন!

নীরেন উত্তপ্ত স্বরে বলিল, তুই একটা চোর।

মিলু ততোধিক উত্তপ্ত স্বরে বলিল,—তুমি একটি ডাকাত।

নীরেন চেয়ারে বসিয়া বলিল,—তুই প্যাঁচা।

মিলু তাহার সম্মুখে আর একটা চেয়ারে বসিয়া বলিল,—তুমি হাঁড়িচাচা।

দুজনেরই রক্ত গরম হইয়া উঠিল।

—তুই ইঁদুর।

—তুমি টিকটিকি।

—তুই আরশোলা।

—তুমি গণ্ডার।

এই ভাবে কিছুক্ষণ চলিল। ক্রমে পশুপক্ষীর নাম ফুরাইয়া আসিতে লাগিল, তখন মিলু জিভ বাহির করিয়া নীরেনকে ভ্যাংচাইয়া দিল। নীরেন প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল, তারপর সেও দীর্ঘ জিহ্বা বাহির করিয়া দিল। বিরোধ এতটা চরমে অনেক দিন উঠে নাই।

এই সময় নৃসিংহ বাবু কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মিলু ও নীরেন চক্ষু দৃঢ়ভাবে বন্ধ এবং জিহ্বা নিষ্ক্রান্ত করিয়া মুখোমুখি বসিয়া আছে। তিনি ধূর্ত্ত বৈজ্ঞানিক, চট করিয়া ব্যাপারটা বুঝিয়া লইলেন। আনন্দে তাঁহার মস্তকের একটি মাত্র কেশ কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

তিনি হর্ষোৎফুল্লস্বরে ডাকিলেন, মিলু, নীরেন।

উভয়ে জিহ্বা সম্বরণ করিয়া চক্ষু মেলিল।

নৃসিংহ বাবু বলিলেন, বড় খুশী হয়েছি। তোমরাই আমার থিয়োরী প্রমাণ করতে পারবে। আমি তোমাদের দুজনের বিয়ে দেব—পরস্পরের সঙ্গে। হাঃ হাঃ হাঃ। তিনি প্রস্থান করিলেন।

মিলু ও নীরেন পরস্পরের দিকে চাহিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল। প্রস্তাবটা আকস্মিক বটে, কিন্তু সেজন্য কেহ বিস্মিত হইল না। নৃসিংহ বাবুর সকল কার্য্যই অপ্রত্যাশিত, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার কথা অমান্য করিবার কল্পনাও কখনো ইহাদের মাথায় আসে নাই। তিনি ইচ্ছামত পায়রা ও খরগোসের বিবাহ দিতেন, কেহ আপত্তি করে নাই, এক্ষেত্রেও আপত্তি করিল না। বরং সারাজীবন ধরিয়া দুজনে দুজনকে জ্বালাতন করিতে পাইবে, এই আনন্দেই আত্মহারা হইয়া পড়িল। উভয়েই এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল, এবার মজা টের পাবে।

... ...

ফুলশয্যার রাত্রে নীরেন খাটে বসিয়া পা দুলাইতেছিল, মিলু প্রবেশ করিতেই গম্ভীর স্বরে বলিল, আমি হচ্ছি তোমার স্বামী, শীগগির প্রণাম কর। বলিয়া নিজের পায়ের দিকে আঙুল নির্দ্দেশ করিল।

মিলু ভালমানুষের মত গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল; তার পর উঠিবার সময় নীরেনের পায়ে সজোরে চিমটি কাটিয়া দিল। নীরেন লাফাইয়া উঠিল, "উঃ"। তারপর দুই বাহু বাড়াইয়া পলায়ন পরা মিলুকে চাপিয়া ধরিয়া গাঢ়স্বরে বলিল, তবে রে—

দুজনের দাম্পত্যজীবন আরম্ভ হইয়া গেল।

আশা করিতেছি, ইহাদের দাম্পত্যজীবন অন্যান্য সাধারণ দাম্পত্যজীবন হইতে পৃথক হইবে না। কারণ নারী ও পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রকট বা প্রচ্ছন্ন যাহাই হোক—সার্ব্বজনীন; মিলু ও নীরেন সাধারণ পাঁচজনের মতই ঝগড়া করিয়া, ভালবাসিয়া, পরস্পরকে জয় করিবার চেষ্টা করিয়া জৈব ধর্ম্ম পালন করিবে।

আমরা অবশ্য বিবাহ দিয়াই সরিয়া পড়িলাম।

স্বাধীনতা

"...জগতের ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইলে দেখা যাইবে যে, যখন কোন জাতি নিজ দেশের শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার উপযোগী জ্ঞান হারাইয়া বসে, তখনই তাহা পরাধীন হইয়া পড়ে। যে-জাতির নিজ দেশের শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার উপযোগী জ্ঞান থাকে, সেই জাতির পরাধীনতার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যাইবে না। কোন জাতি কেবল-মাত্র মারামারি-কাটাকাটি করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্তও ইতিহাসে পাওয়া যাইবে না। বিচার করিয়া দেখিলে আরও দেখা যাইবে, যখন একটা জাতি প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত হয় এবং নিজ দেশের শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়া দেশীয় শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য কি করিয়া প্রকৃত-ভাবে উন্নত করিতে হয়, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারে, তখন ঐ জাতি যদি কোন মারামারি-কাটাকাটি না-ও করে, তাহা হইলে তাহাকে কেহ পরাধীন রাখিতে সমর্থ হয় না।..."

অর্থ ও ঐশ্বর্য্য

—শ্রীঅনাথগোপাল সেন

বর্ত্তমান অর্থনীতিকগণের মতে জগতের প্রধান সমস্যা কৃষি ও শিল্প-সম্পদ সৃষ্টি করা নহে, উহা বিক্রয় করা। এক দিকে এ কথা যেমন তাঁহারা বলেন না যে, নিখিল মানবের অভাব আজ সম্পূর্ণরূপে পূরণ হইয়া গিয়াছে—মানুষের ভোগের জন্য আর অধিক পণ্যসম্পদ প্রস্তুতের প্রয়োজন নাই, তেমনি অন্যদিকে এ কথাও তাঁহারা বলেন না যে, বিশ্বের সকল নৈসর্গিক সম্পদ আহরণ ও সৃষ্টির কাজ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের মতে সমস্যা হইতেছে এই যে, যতটুকু আয়োজন করা হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ বা ভোগ করিবার শক্তি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের নাই। একদিকে কলকারখানা, শিল্পী ও মজুর অলস হইয়া বসিয়া আছে, পণ্যদ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও তাহা বিক্রয় হইতেছে না; অন্যদিকে অধিকাংশ মানবের অধিকাংশ অভাব অপূর্ণই থাকিয়া যাইতেছে। তাই আমাদের মনে আজ স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন জাগিতে পারে,—অর্থের অভাব হইতেই যখন ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই বিপদ্‌গ্রস্ত ও বর্ত্তমান সমস্যার উৎপত্তি এবং ইচ্ছা করিলেই যখন কর্ত্তৃপক্ষ অর্থের পরিমাণ বাড়াইতে ও কমাইতে পারেন, তখন অতিরিক্ত অর্থসৃষ্টি করিয়া এই ক্রয়শক্তি মানুষের হাতে দিতে কি বাধা আছে? অর্থশাস্ত্রের পক্ষ হইতে সেই প্রশ্নের জবাব বর্ত্তমান প্রবন্ধে দিতে চেষ্টা করিব।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, সত্যই কি অতিরিক্ত অর্থ ইচ্ছা করিলেই আমরা সৃষ্টি করিতে পারি? হাঁ, পারি। কি প্রকারে বলিতেছি। বর্ত্তমান সময়ে অর্থ বলিতে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রচলিত ধাতব মুদ্রা বা নোটই শুধু বুঝায় না—মানুষের যে টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে, চেক্ দ্বারা আমরা যাহা ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহাকেও বুঝায়। ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থ যখন ধাতব মুদ্রা বা নোট ভিন্ন অন্য কোন জিনিষ নহে, তখন উহাকে পৃথক্ করিয়া আমরা কেন দেখিব, এই প্রশ্নও আমাদের মনে আসিতে পারে। ইহার সহজ উত্তর এই যে, আমরা ব্যাঙ্কের টাকার বিনিময়ে চেক্ দ্বারা যখন আমাদের দেনা-পাওনা মিটাই, তখন একটি চেক্ই দশ হাত ঘুরিয়া দশটি পাওনাদারের দাবী মিটাইতে সক্ষম হয় এবং মধ্যস্থ নয়টি ব্যক্তির ব্যাঙ্ক-গচ্ছিত অর্থের কোনরূপ ব্যবহার করিবার প্রয়োজনই হয় না। এইরূপ ক্ষেত্রে চেক টাকার কাজই সম্পন্ন করে বলিয়া ইহাকে অর্থরূপেই স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন ইহার আর একটি কারণ আছে। ব্যাঙ্কের সহিত যাঁহার অনেকদিনের কারবার কিংবা ব্যবসায়-জগতে যাঁহার সুনাম ও মর্য্যাদা আছে, এমন ব্যক্তিকে প্রয়োজন হইলে ব্যাঙ্ক অনেক সময় শুধু বিশ্বাসের উপর কিংবা কারখানা ও তাহার উৎপন্ন পণ্য বন্ধক রাখিয়া কিংবা অন্য কোনরূপ নির্ভরযোগ্য জামিন লইয়া টাকা ধার দিয়া থাকে। ইহাকে ইংরাজীতে Credit বলা হয়। যে ব্যাঙ্ক টাকা ধার দিতেছে, সেই ব্যাঙ্কের নিজের যদিও এই টাকা নহে এবং যে ব্যক্তি টাকাটা লইতেছে, তাহারও ইহা নহে, তথাপি ব্যাঙ্কে অপরের গচ্ছিত অব্যবহৃত অর্থ হইতেই ইহার সৃষ্টি। সেই জন্যই ব্যাঙ্ক-ডিপোজিট ও ক্রেডিট উভয়েই অর্থের স্বগোত্র। এই ধার বা ক্রেডিট আধুনিক ব্যাঙ্ক ইচ্ছামত হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে পারে। কারণ কাহাকে কত টাকা ধার দেওয়া হইবে ইহা ব্যাঙ্কেরই সম্পূর্ণ বিবেচনাধীন; এবং ব্যাঙ্ক ঋণ-দানের পরিমাণ নিজেদের নিরাপত্তার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সর্ব্বদাই বাড়াইতেছে ও কমাইতেছে।

তার পর ব্যাঙ্ক-নোটের কথা ধরা যাক। নোট-প্রচলনের অধিকার প্রত্যেক দেশের শুধু কেন্দ্রীয় (Central) ব্যাঙ্কের উপরই ন্যস্ত আছে। সঞ্চিত স্বর্ণ-তহবিলের অনুপাতে নোট-সংখ্যার পরিমাণ আইনতঃ নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও সেই নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে নোটের সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি পাইতে পারে। এমন কি, বিশেষ প্রয়োজনের সময় নির্দ্দিষ্ট হারের অতিরিক্ত নোট কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অনেক ক্ষেত্রে চালাইয়া থাকেন। বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের সময় স্বর্ণমান পরিত্যক্ত হওয়ায়, স্বর্ণ তহবিলের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া নোটসৃষ্টির প্রয়োজন ঘুচিয়া গিয়াছিল। ১৯৩১ সালের পর অধিকাংশ দেশ

কর্ত্তৃক বর্ত্তমানে পুনঃ পরিত্যক্ত হওয়ায় আবার সেই অবস্থারই উদ্ভব হইয়াছে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, দেশের কেন্দ্রীয় ও অন্যান্য ব্যাঙ্ক নোটের ও ঋণদানের পরিমাণ ইচ্ছা করিলে বৃদ্ধি করিতে এবং এই উপায়ে নূতন অর্থের বা ক্রয়শক্তির সৃষ্টি করিতে পারে।

এখন মূল প্রশ্নে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাক। যদি ভোজ্যও প্রচুর হয় এবং ভোক্তারও অভাব না থাকে এবং যদি কেবল অর্থের অভাবেই মানুষ তাহার অভাব পূরণ করিতে না পারে, তখন উল্লিখিত উপায়ে নূতন অর্থ সৃষ্টি করিয়া বর্ত্তমান অবস্থা-সঙ্কট দূর করিতে কি বাধা আছে? ইহার জবাবের জন্য আমাদিগকে বর্ত্তমান অর্থশাস্ত্রের একটি কুহেলিকাচ্ছন্ন কূটতত্ত্বের অনুসন্ধানে বাহির হইতে হইবে। ইংরেজীতে ইহাকে Quantity Theory of Money বলা হয়। আমরা বাঙ্গালায় ইহার নামাকরণ করিতে পারি—টাকার সংখ্যাতত্ত্ব।

এই তত্ত্বের সার কথা এই যে, জিনিষের মূল্য প্রধানতঃ নির্ভর করিতেছে দেশ-বিদেশের পণ্য ও অর্থের মোট সমষ্টির উপর। কোন দেশের জিনিষের মূল্য নিরূপণ করিতে হইলে, আমাদিগকে সংগ্রহ করিতে হইবে, একদিকে সেই দেশের বিক্রয় ও হস্তান্তরযোগ্য পণ্যের মোট পরিমাণ বা সংখ্যা—অন্যদিকে অর্থের মোট সমষ্টি। যদি জিনিষের সংখ্যা এক শত ও টাকার সংখ্যা দুই শত হয়, তাহা হইলে গড়পরতা প্রত্যেকটি জিনিষের মূল্য দুই টাকা হইবে। কিন্তু যদি জিনিষের সংখ্যা সমান থাকিয়া টাকার সংখ্যা কমিয়া একশত বা বাড়িয়া তিন শত হয়, তাহা হইলে প্রত্যেকটি জিনিষের মূল্য যথাক্রমে এক টাকা ও তিন টাকা হইবে। পক্ষান্তরে টাকার সংখ্যা সমান থাকিয়া জিনিষের সংখ্যা কমিলে বা বাড়িলেও জিনিষের মূল্য এই ভাবেই বাড়িবে বা কমিবে। মানুষের অভাব-মোচনের জন্যই অর্থের প্রয়োজন—সঞ্চয়ের জন্য নহে। সুতরাং যাবতীয় অর্থ যাবতীয় ভোগসামগ্রী সংগ্রহের জন্যই ব্যয়িত হইবে, এই ধারণাই এই নীতির মূলে কাজ করিতেছে।

তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইয়া যদি টাকার পরিমাণ দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বা চতুর্গুণ বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে পণ্যের মূল্যই শুধু ঐ হারে বৃদ্ধি পাইবে; কিন্তু লোকের সুখ-স্বচ্ছন্দতা বাড়িবে না। কারণ অতিরিক্ত সমস্ত টাকাটাই অতিরিক্ত মূল্য দিতে নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকা দ্বারা পরিবার-প্রতিপালনের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছিল, তাহার আয় দেড়শত টাকা হইলেও তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিবে না। প্রত্যেকটি জিনিষের জন্য সে শুধু তিন গুণ মূল্যই দিবে—কিন্তু একটি অতিরিক্ত ভোগ-সামগ্রী তাহার ভাগ্যে জুটিবে না। ইহাই হইল সনাতনপন্থী পণ্ডিতদের মত।

কিন্তু এই মত নব্যতন্ত্রীরা স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন, নূতন অর্থ সৃষ্টি করিলে পণ্যের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবে; আর পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে উহার মূল্য চড়িতে পারিবে না। পণ্যের মূল্য যদি চড়িতে না পায়, তাহা হইলে অধিকসংখ্যক পণ্য মানুষের ভোগে লাগিবে এবং দেশের সম্পদ ও মানুষের সুখ-স্বচ্ছন্দতা বাড়িবে।

এই দুই পরস্পর-বিরোধী মতের মধ্যে সত্য কোথায় তাহাই এখন দেখা যাক। প্রত্যেক দেশে একদল লোক অর্থ ব্যয় করিয়া পণ্য-সম্পদ সৃষ্টি করে উহা বিক্রয় করিবার জন্য; আর একদল লোক অর্থদ্বারা উহা ক্রয় করে ভোগ করিবে বলিয়া। অর্থের এক প্রয়োজন, মানুষের নিত্য-ব্যবহার্য্য জীবনধারণোপযোগী পণ্যোৎপাদনের ভূমি, যন্ত্রপাতি ও কলকারখানার জন্য; দ্বিতীয় প্রয়োজন, ঐ সব ভূমি ও কলকারখানাজাত পণ্য-সামগ্রী ক্রয় করিবার জন্য। প্রথমোক্ত জিনিষগুলিকে মূলধন বা Capital Goods বলা হয়। শেষোক্ত জিনিষগুলিকে ভোগবস্তু বা Consumers Goods বলা হয়। অতিরিক্ত অর্থসৃষ্টির সঙ্গে ভোগের জিনিষের মূল্য সেই অবস্থাতেই বাড়িয়া চলিতে পারে, যে-অবস্থায় অতিরিক্ত অর্থসমষ্টি নূতন পণ্য সৃষ্টির কাজে না লাগিয়া শুধু পণ্যভোক্তাদের কাজে লাগিয়া থাকে। এইরূপ অবস্থা আবার তখনই ঘটা সম্ভব, যখন দেশের সকল কল-কারখানাই পুরাদমে পণ্যোৎপাদন করিয়া চলিয়াছে, কোন শিল্পী, শ্রমিক বা কৃষক বসিয়া নাই। সেই অবস্থায় যে অতিরিক্ত অর্থের সৃষ্টি হয়, নূতন শিল্পী বা পণ্য-নির্ম্মাণের কাজে তাহা ব্যয়িত হইবার প্রয়োজন হয় না বলিয়া, ঐ টাকার সবটাই পণ্য-ক্রেতাদের হাতে যাইয়া পড়ে এবং সেই

অবস্থাতেই অর্থের সমষ্টি দ্বিগুণ বা তিনগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিলে জিনিষের মূল্যও দ্বিগুণ বা তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

কিন্তু যদি দেশের পণ্যোৎপাদক কলকারখানাগুলি অর্থের অভাবে পুরা দমে কাজ করিতে না পারে, কিংবা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অর্থাভাব-বশতঃ নূতন কলকারখানার সৃষ্টি সম্ভব না হয়, তাহা হইলে ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ সুবিবেচনার সহিত হিসাব করিয়া এই অতিরিক্ত অর্থ এই সব ব্যবসায়ীকে ধার দিলে, দেশে নূতন পণ্য-সম্পদ সৃষ্টি হইতে পারে এবং এই অর্থ পণ্য-ভোগীদের হাতে না পড়িয়া শিল্পীদের হাতে পড়ায় জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি না পাইয়া দেশের প্রকৃত সম্পদ বাড়িতে পায়। উপরোক্ত অবস্থায় জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে না, যুক্তির দিক দিয়া এইরূপ মনে হইলেও, কার্য্যতঃ কিন্তু ঠিক তাহা ঘটিতে পারে না। কি প্রকারে তাহা আর একটু খোলসা করিয়া বলিতেছি।

অতিরিক্ত টাকার কোন অংশই যদি ব্যাঙ্ক ক্রেতাগণকে ধার না দিয়া তার সমস্তটাই কলকারখানার মালিকগণকে ধার দেয়, তাহা হইলেও মজুরী ইত্যাদি বাবদ এই টাকার খানিকটা পণ্য-ভোগীদের হাতে যাইয়া পড়িবে এবং অবশিষ্ট টাকা নূতন পণ্য-সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত হইলেও, নূতন জিনিষ তৈয়ী হইয়া বিক্রয়ের জন্য বাজারে আসিতে স্বভাবতঃই কিছু বিলম্ব ঘটিবে। নূতন পণ্যের সৃষ্টি হইতে কিছু সময় লাগিবে, অথচ ইতিমধ্যে কিছু টাকা নূতন কল-কারখানার মারফতে পণ্য-ভোগীদের হাতে আসিয়া যাইবে। ফলে নূতন টাকার সবটাই পণ্যোৎপাদকগণকে ধার দেওয়া সত্ত্বেও জিনিষের মূল্য খানিকটা চড়িয়া যাইবে। তবে এ কথাও ঠিক যে, যদি ব্যাঙ্ক অনির্দ্দিষ্ট কাল এই অতিরিক্ত অর্থ সৃষ্টি করিয়া না চলে, তাহা হইলে কিছু দিন পরে নূতন পণ্যসম্ভার যখন বাজারে উপস্থিত হইবে, তখন জিনিষের মূল্য স্বাভাবিক নিয়মে পুনরায় হ্রাস পাইতে থাকিবে।

দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্। জিনিষের ও টাকার উভয়ের সমষ্টি একশত হইলে প্রত্যেক জিনিষের মূল্য হইবে এক টাকা। কিন্তু যদি নোট বা ক্রেডিট সাহায্যে আরও একশত টাকা সৃষ্টি করা যায় এবং তাহার পঞ্চাশটি নূতন পণ্যোৎপাদনের জন্য মূলধনরূপে ব্যয়িত হয় এবং অপর পঞ্চাশটি মজুরী ইত্যাদি দিবার জন্য ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত নূতন পণ্য সৃষ্টি হইয়া বাজারে না আসিতেছে, সেই পর্য্যন্ত অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইবে: জিনিষের সমষ্টি এক শত, টাকার সমষ্টি দেড়শত, জিনিষের মূল্য দেড় টাকা। কিন্তু যখন অতিরিক্ত পঞ্চাশ টাকা মূলধনের সাহায্যে আরও পঞ্চাশটি জিনিষ যথাকালে বাজারে উপস্থিত হইবে, তখন অবস্থা হইবে এইরূপ: জিনিষের সমষ্টি দেড়শত, টাকার সমষ্টি দেড়শত এবং জিনিষের মূল্য এক টাকা। অর্থের অনুপাতে পণ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে পুনরায় মূল্যের হ্রাস ঘটিবে। তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বর্ত্তমান দুনিয়ার যখন নূতন সম্পদ সৃষ্টির আয়োজন এবং প্রয়োজন রহিয়াছে, তখন নূতন অর্থ বা ক্রয়-শক্তি সৃষ্টি করিলে জিনিষের মূল্য শুধু না বাড়িয়া জিনিষের সংখ্যা ও কাট্‌তি উভয়ই বাড়িতে পারে। ইহাই ত' সর্ব্বজন বাঞ্ছিত লক্ষ্য।

কিন্তু উল্লিখিত লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে এই অর্থ-প্রসারণ নীতি (Policy of Inflation) অতিশয় সাবধানতার সহিত নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। প্রথমতঃ, ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ-গণকে দেখিতে হইবে যে, অতিরিক্ত অর্থ ধার দিবার সময় উহা কল-কারখানার মালিকগণ পায় এবং উহা কতকগুলি ষ্টক্ ও শেয়ার-স্পেকুলেটারের হাতে গিয়া না পড়ে। তৎপর নূতন নোট ও ক্রেডিটের পরিমাণ আস্তে আস্তে হ্রাস করিয়া আনিয়া এমন ভাবে তাহা বন্ধ করিতে হইবে, যাহাতে অতিরিক্ত অর্থ দ্বারা নূতন অতিরিক্ত জিনিষের মূল্যই শুধু পোষাইয়া যায়। তাহা হইলে ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি সাধিত হইবে, অধিকতর পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা হইবে; অথচ জিনিষের মূল্য সাময়িক ভাবে কিছুটা বাড়িলেও মোটামুটি স্থিরই থাকিবে। সম্প্রসারণ-নীতির যাঁহারা পক্ষপাতী, অর্থকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া যাঁহারা বর্ত্তমান আর্থিক দুর্গতি ও ব্যবসায়-মন্দা দূর করিতে চান, সেই সব নব্যপন্থী পণ্ডিতদের ইহাই অভিমত।

কিন্তু সনাতন-পন্থীরা অজানা পথে নামিতে এত সহজে রাজী নন। তাঁহারা বলেন, বিক্রয়যোগ্য জিনিষের সংখ্যা নিরূপণ করা, চলতি টাকার সমষ্টির নির্দ্দেশ করা, উহার গতিশীলতা (velocity of circulation) নির্দ্ধারণ করা এতই দুরূহ ব্যাপার যে, এই সব তথ্য ঠিক মত পরিজ্ঞাত

হইয়া ইহাদিগকে আয়ত্তাধীনে রাখিয়া সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডে মাপিয়া অর্থের সম্প্রসারণ-নীতি প্রয়োগ করা একপ্রকার অসম্ভব। নূতন অর্থ সৃষ্টি দ্বারা নূতন পণ্য তৈয়ার করা ও বিক্রয় করা, কাহারও ইচ্ছাধীন হইতে পারে না। কেবল অর্থ সৃষ্টি দ্বারাই জগতে নূতন ব্যবসায়-বাণিজ্যের পত্তন সম্ভব নয়। ইহার মূলে মানুষের কর্ম্মশক্তি ও যোগ্যতা, পারিপার্শ্বিক অবস্থার আনুকূল্য, প্রয়োজনের তাগিদ ও আরও কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম অদৃশ্য থাকিয়া কাজ করিতেছে। ব্যবসায়-বাণিজ্য ও মানুষের কাজ-কর্ম্মের জন্য কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তাহা ঐ সব অদৃশ্য অবস্থা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া স্বতঃস্ফূর্ত্ত নিয়মে এতকাল নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও নিয়ন্ত্রিত হইবে। জোর করিয়া কাঁঠাল পাকাইবার চেষ্টা করা বৃথা।

অর্থ-সম্প্রসারণ নীতি ইচ্ছামত প্রয়োগ করিয়া অভিপ্রেত ফল পাইবার পথে যে যে অন্তরায় বা বিঘ্ন আছে, তৎসম্বন্ধে এখানে আরও বিশদভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। প্রথমতঃ, আমরা কোন দেশের বিক্রয় বা হস্তান্তরযোগ্য পণ্যের মোট সংখ্যা নিরূপণ করিব কিরূপে? এখানে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পণ্য বলিতে মানুষের যে বিদ্যা, বুদ্ধি ও শ্রমকে অর্থদ্বারা ক্রয় করিতে হয়, তাহাকেও বুঝিতে হইবে। মানুষের ভোগের জন্য যে-সব কৃষি বা শিল্পজাত পণ্য তৈরি হইয়া প্রত্যহ বাজারে বিক্রয়ের জন্য আসে, তাহার তালিকা প্রস্তুত করা হয়ত তেমন কঠিন নহে। কোন দেশে কত লোক ব্যবসায়ে বা চাকুরিতে নিজেদের জ্ঞান ও শ্রম বিক্রয় করিতেছে, তাহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করাও হয় ত দুঃসাধ্য নহে। কারণ আধুনিক কালে প্রত্যেক প্রগতিশীল দেশের কর্ত্তৃপক্ষই এই সব তথ্য সংগ্রহ করেন। কিন্তু মুস্কিল হইয়াছে এই যে, জমি বা কারখানা হইতে নিত্য নূতন যে সব পণ্যসম্ভার বাজারে বিক্রয়ের জন্য আসে, উহাই একমাত্র বিক্রয়যোগ্য পণ্য নহে। বহু জিনিষ একাধিকবার হস্তান্তরিত হইতেছে। যেমন নূতন জিনিষ সব বিক্রয়ের জন্য আসিতেছে, তেমনি তাহার সাথে সাথে অসংখ্য পুরাতন দ্রব্যও হাত বদলাইতেছে। তারপর, ভূমি হইতে উৎপন্ন বা কারখানায় প্রস্তুত জিনিষই যে শুধু বিক্রয় হইতেছে, তাহাও নহে। যে ভূমি বা কারখানা হইতে পণ্য-সম্পদ আসে, সেই ভূমি ও কারখানা পর্য্যন্ত হস্তান্তর হইতেছে, কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ারের বেচাকেনা অবিরত চলিতেছে। টাকার সংখ্যাতত্ত্ব-বিচারে এই সব পুরাতন জিনিষ (secondhand goods) ও মূলধনের হস্তান্তর ধর্ত্তব্য নহে। এই সব বেচাকেনাকে হিসাবের বহির্ভূত রাখিয়া বিক্রয়যোগ্য পণ্য ও শ্রমের সংখ্যা নিরূপণ করা যাইবে কি উপায়ে?

এখানেই সমস্যার শেষ নহে। টাকার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করিয়া জিনিষের মূল্যকে আয়ত্তাধীনে রাখিতে হইলে দেশের মোট টাকার পরিমাণও ত জানা আবশ্যক। তাহাই বা জানা যাইবে কি প্রকারে?

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, ক্রেডিট্ বাজারে ক্রয়শক্তি সৃষ্টি করিয়া অর্থের কাজ করে বলিয়া ইহাকে বর্ত্তমান কালে অর্থের সামিল গণ্য করা হয়। এক্ষণে সমস্যা এই, এই নিরাকার পদার্থটির পরিমাপ করা যাইবে কি উপায়ে? আর্থিক ও ব্যবসায়-জগতের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দেশের ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের নিকট গচ্ছিত টাকার অনুপাতে গ্রাহকগণকে কি পরিমাণ টাকা ধার দিবে, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা নাই। প্রত্যেক স্বাধীন দেশেই একটি করিয়া সরকারী বা আধা-সরকারী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আছে। সেই ব্যাঙ্কের সহিত যোগ রাখিয়া দেশের অন্যান্য প্রধান যৌথব্যাঙ্কগুলিকে কাজ করিতে হয়। দেশের স্বর্ণ বা রৌপ্য-তহবিল এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেই সঞ্চিত থাকে। এই তহবিলের অবস্থার দিকে নজর রাখিয়া ঋণদানের পরিমাণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রিত করে। অন্যান্য যৌথব্যাঙ্কগুলির স্বর্ণ-তহবিলের একটা বড় অংশও ঐ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেই জমা থাকে। অবশিষ্ট মুদ্রা ও নোট গ্রাহকগণের দৈনন্দিন প্রয়োজনের দাবী মিটাইবার জন্য সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি নিজের কাছে রাখিয়া থাকে। আধুনিক ব্যাঙ্ক সকল কোন্ নীতি অনুসরণ করিয়া ঋণদানের পরিমাণ নিজেদের ইচ্ছামত বাড়াইয়া ও কমাইয়া থাকে, তাহার বিস্তৃত আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এখানে আমাদের শুধু ইহাই জানিয়া রাখিলে চলিবে যে, ব্যাঙ্ক কাহাকে কোন্ প্রয়োজনে কত টাকা ধার দিয়া নূতন ক্রয়শক্তি সৃষ্টি করিতেছে, তাহা নির্ণয় করা অত্যন্ত দুরূহ। তাহা হইলে মোটের উপর অবস্থা এই দাঁড়াইতেছে যে, বিক্রয়যোগ্য জিনিষ ও শ্রমের পরিমাণ নির্দ্দেশ করা যেমন সুকঠিন, তাহা ক্রয়

করিবার যোগ্য অর্থের পরিমাণ নির্ণয় করাও সেইরূপই সুকঠিন।

দুরূহতার এখানেই পরিসমাপ্তি নহে। তর্কস্থলে ইহা যদি মানিয়াও লওয়া যায় যে, কোন দেশের মোট টাকার পরিমাণ নির্ণয় করা অসম্ভব নহে, তাহা হইলেও আমাদিগকে আর একটি সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। একটি টাকা এক দিনে একটিমাত্র বেচাকেনার কাজ করিয়াই যেমন ক্ষান্ত হইতে পারে, আবার তেমনি সেই টাকাই একদিনে দশহাত ঘুরিয়া দশটি কাজ সম্পন্ন করিতে পারে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে একটি টাকা দশটি টাকার কাজ করিতেছে; আবার দশটি টাকা দশদিনেও কোন কাজ না করিয়াই প্রভুর পকেটের মর্য্যাদা বর্দ্ধন করিতেছে। সুতরাং দেশের মোট টাকার সমষ্টি জানিতে পারিলেই শুধু চলিবে না; সেই টাকা কি পরিমাণ বেগে বেচাকেনার হাটে ছুটিয়া চলিয়াছে (যাহাকে ইংরাজীতে velocity of circulation বলে) তাহাও আমাদিগকে জানিতে হইবে। কিন্তু ইহাও মোটেই সহজ-সাধ্য ব্যাপার নহে।

তবে কি কোন দেশের টাকার পরিমাণ বা উহা কিরূপ তৎপরতার সহিত কাজ করিতেছে, তাহা নির্ণয় করিবার কোনই উপায় নাই? টাকার সংখ্যা ও গতিবেগ নিরূপণ করা কঠিন হইলেও তাহার একটা মোটামুটি ধারণা করা একেবারে অসম্ভব নহে। আজকাল লেন-দেন প্রধানতঃ ব্যাঙ্কের মারফতে চেক্‌দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। যে সব সাধারণ বেচাকেনার কাজ আমরা মুদ্রা বা নোট সাহায্যে প্রত্যহ সম্পন্ন করি, সেই টাকাও চেকের সাহায্যে ব্যাঙ্ক হইতেই তুলিয়া আনা হয়। অতি সামান্য টাকাই আজকাল ব্যবসায়ী বা গৃহস্থ নিজের কাছে রাখে। সেইজন্য কি পরিমাণ টাকার প্রত্যহ আদান-প্রদান চলিয়াছে, ব্যাঙ্কের হিসাব দৃষ্টে তাহা অনুমান করা অনেকটা সহজ। অবশ্য ইহাতেও একটু অন্তরায় আছে। প্রথমতঃ, ব্যাঙ্কগুলি যে হিসাব রাখে, তাহাতে একই ব্যাঙ্কের বিভিন্ন আমানতকারীর মধ্যে টাকার যে আদান-প্রদান হয়, তাহার পৃথক্ হিসাব দেখান হয় না। রাম ও শ্যামের টাকা যদি এক ব্যাঙ্কে গচ্ছিত থাকে এবং রাম যদি শ্যামকে কোন টাকা ঐ ব্যাঙ্কের চেক্ দ্বারা প্রদান করে, আর শ্যাম সেই চেক্ তাহার ব্যাঙ্কে জমা দেয়, তাহা হইলে সেই চেকের টাকা রাম ও শ্যামের হিসাবে শুধু জমা খরচ হয়—ব্যাঙ্কের গচ্ছিত টাকার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না বলিয়া ইহার পৃথক্ হিসাব রাখার প্রয়োজন হয় না। সেই কারণে একই ব্যাঙ্ক মারফতে কত টাকার আদান-প্রদান হয়, তাহা জানিবার বা ধরিবার উপায় থাকে না। অথচ কার্য্যতঃ এইরূপ ক্ষেত্রেও জিনিষের বা শ্রমের মূল্য দেওয়া ঠিক মতই অর্থদ্বারা সম্পন্ন হইতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ, ব্যাঙ্কের সাহায্যে যে অর্থের লেন-দেন হয়, তাহার সমস্তই মানুষের ভোগের জন্য প্রস্তুত পণ্যসম্ভারের মূল্য কিংবা মানুষের শ্রমের মজুরি নাও হইতে পারে। ষ্টক্, শেয়ার, জমিজমা ক্রয়বিক্রয়ের জন্যও ব্যাঙ্কের টাকা সমভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অর্থশাস্ত্রের যে তত্ত্ব আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য, তাহা হইতেছে টাকার সংখ্যা-নিয়ন্ত্রণ দ্বারা কি প্রকারে মানুষের ভোগের জন্য সৃষ্ট পণ্য সম্ভারের মূল্য ও মানুষের শ্রমের মজুরি নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া যায়। সুতরাং এই বিচারের মধ্যে ষ্টক্, শেয়ার, জমিজমার হস্তান্তর বা তাহার মূল্য আসিতে পারে না, ইহা পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি। এত সব মূলধন হস্তান্তরের ব্যাপারে ব্যাঙ্কের যে পরিমাণ টাকা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাকে আমাদের হিসাবের বাহিরে রাখিতে হইবে। কিন্তু উহা জানা যাইবে কি উপায়ে? কারণ, কত টাকা কার হিসাবে জমা বা খরচ হইতেছে, তাহারই হিসাব ব্যাঙ্ক রাখিয়া থাকে; কিন্তু কোন্ প্রয়োজনে উহার ব্যবহার হইতেছে তাহার হিসাব রাখা ত ব্যাঙ্কের কাজ নয়। তবে যে সব দেশে ব্যাঙ্ক-প্রথা বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে (যেমন ইংলণ্ডে), সেই সব দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও তদসংশ্লিষ্ট বড় বড় ব্যাঙ্ক ষ্টক্, শেয়ার ইত্যাদি মূলধন জাতীয় লেনদেনের কাজকর্ম্মই সাধারণতঃ বেশীর ভাগ করিয়া থাকে। মফঃস্বলের ব্যাঙ্কগুলিতে যে লেন দেন হয়, তাহার অধিকাংশই পণ্যের মূল্য বা শ্রমের মজুরি দিবার জন্য। এই ভাবে একটা মোটামুটি হিসাব করা যাইতে পারে।

মোটামুটি ধারণা করিবার আরও একটি উপায় আছে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের অবস্থার উপরও টাকার গতিশীলতা অনেকটা নির্ভর করে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের অবস্থা যখন ঊর্দ্ধগামী, তখন সকল শ্রেণীর মানুষকেই অধিকতর উদার হইতে দেখা যায়। নানাবিধ পণ্য প্রস্তুত করিয়া দেশের সম্পদ

গড়িয়া তুলিবার ভার যাহারা লইয়াছে, তাহারা যখন অপেক্ষাকৃত নির্ভয়ে অর্থব্যয় করিয়া নিজেদের ব্যবসায় ও কারবার সম্প্রসারণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহাদের নিয়োজিত শিল্পী ও শ্রমিক সকলেই সেই অর্থের ফলভাগী হইবার সুযোগ লাভ করে এবং মানুষের ব্যয়-বিমুখতা অনেকটা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে ব্যবসায়-বাণিজ্যের গতি অধোগামী হইলেই একটা ভীতি ও নিরাশার সঞ্চার হয় এবং সেই সন্ত্রাসের ফলে চারিদিকে এইরূপ ব্যয়সঙ্কোচ আরম্ভ হয় যে, তখন অর্থের ব্যবহার অত্যন্ত হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। যে অর্থ একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পঞ্চাশ হাত ঘুরিয়া পঞ্চাশটি কার্য্য সম্পন্ন করিতেছিল, তাহা হয়ত একই ব্যক্তির হাতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। ইহার ফল ব্যবসায়-বাণিজ্যের পক্ষে আরও ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়ায়---বর্ত্তমান বিশ্বব্যাপী দুঃসময়ে হইয়াছেও তাই।

অধিক নোট বা ক্রেডিট সৃষ্টি দ্বারা অর্থের পরিমাণ হঠাৎ অত্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া দিলেও টাকার গতিবেগ অতিশয় বাড়িয়া যাইবে। অর্থের সংখ্যাতত্ত্ব আলোচনার প্রারম্ভেই অর্থের সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত জিনিষের মূল্য কি প্রকারে বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ অর্থের মূল্য কি প্রকারে হ্রাস পায় তাহার আলোচনা আমরা করিয়াছি। সেই কারণে যদি কোন দেশের কর্ত্তৃপক্ষ অকস্মাৎ অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দেন, তাহা হইলে যেখানে দু'টাকায় এক মণ চাল পাওয়া যাইতেছিল, সেখানে এক মণ চালের জন্য তিন টাকা বা ততোধিক টাকার প্রয়োজন হইবে। যখন এই ভাবে জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি পাইবার লক্ষণ দেখা যায়, তখন স্বভাবতঃ মানুষের ইহাই আকাঙ্ক্ষা হয় যে, মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইবার পূর্ব্বেই পণ্যদ্রব্য যথাসম্ভব কিনিয়া রাখা। যতই বিলম্ব করা যাইবে, ততই জিনিষের মূল্য চড়িবে ও সঞ্চিত অর্থের মূল্য হ্রাস পাইবে, এই স্বাভাবিক আশঙ্কা মানুষকে তাড়াতাড়ি অর্থব্যয়ে প্ররোচিত করে। এইরূপ সময়েই অর্থ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গতিবেগ লাভ করে। ঠিক ইহার বিপরীত অবস্থা হয় যখন অর্থের পরিমাণ কর্ত্তৃপক্ষ সঙ্কুচিত করিয়া ফেলেন। অর্থের পরিমাণ কমিলেই তাহার ক্রয়শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে ও জিনিষের মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে এই ধারণা কাজ করিতে সুরু করিবে যে, যতই অর্থ ধরিয়া রাখা যাইবে, ততই ইহার মূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং স্বল্প মূল্যে অধিক পরিমাণ জিনিষ ক্রয় করিবার সুযোগ লাভ করা যাইবে। এইরূপ অবস্থায় অর্থের গতিবেগ স্বভাবতঃই অত্যন্ত হ্রাস পায়। উপরোক্ত অবস্থা হইতে আমরা তাহা হইলে ইহা মানিয়া লইতে পারি যে, জিনিষের মূল্য একবার বাড়িতে সুরু করিলেই আরও বাড়িবার আশঙ্কায় মানুষ পণ্য সংগ্রহ করিবার আগ্রহে অধিকতর অর্থ ব্যয় করিবে এবং টাকার গতিশীলতা বাড়িয়া যাইবে। পক্ষান্তরে জিনিষের মূল্য কমিতে থাকিলে আরও কমিবার আশায় মানুষ অর্থ ব্যয় করিতে যথাসম্ভব বিরত হইবে এবং অর্থের গতিশীলতা হ্রাস পাইবে। এই জন্যই কোন কারণে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সাধারণ অবস্থা একবার খারাপ হইয়া জিনিষের মূল্য হ্রাস পাইতে সুরু করিলে সেই অবস্থা ক্রমশঃই অধিকতর মন্দের দিকে যাইতে থাকে। ১৯২৯ সালের পর পৃথিবীব্যাপী যে ব্যবসায়-মন্দা সুরু হইয়াছে এবং যাহা কিছুতেই ঘুচিতে চাহিতেছে না, তাহার মূলেও আংশিক ভাবে এই নীতি কাজ করিতেছে।

এই জন্যই নব্যপন্থীরা মনে করেন যে, অতিরিক্ত নোট ও ক্রেডিট সৃষ্টি দ্বারা অর্থের পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়া জিনিষের মূল্য ও মানুষের ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি করা অত্যন্ত আবশ্যক। বিগত মহাযুদ্ধের সময় স্বর্ণমান পরিত্যাগ ও অত্যধিক নোট প্রচলন করার ফলে জিনিষের মূল্য শুধু বৃদ্ধি পায় নাই, ব্যবসায়-বাণিজ্যও অসম্ভব প্রসারতা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধাবসানে অতিরিক্ত নোটগুলি বাতিল করিয়া দিয়া সর্ব্ব দেশে সনাতন নিয়মে পুনঃ স্বর্ণমান প্রচলন করায় বর্ত্তমান অর্থকৃচ্ছ্রতা হইতে বিশ্বব্যাপী এই ব্যবসায়-মন্দা ও দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে।

এই সম্পর্কে ধীরপন্থীরা যে সব অন্তরায়ের অবতারণা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ সত্য থাকিলেও একথা বলা যাইতে পারে যে, বিভিন্ন ব্যাঙ্কের হিসাব দৃষ্টে ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের সাধারণ অবস্থা হইতে বিক্রয়যোগ্য জিনিষের সংখ্যা, অর্থের পরিমাণ ও তাহার গতিবেগ মোটামুটি অনুমান করিয়া লইয়া অর্থ-সম্প্রসারণ নীতি অনুসরণ করা একান্ত অসম্ভব নহে। অতিরিক্ত অর্থই অবশ্য অতিরিক্ত সম্পদ নহে; কিন্তু অতিরিক্ত অর্থ হইতে অতিরিক্ত সম্পদ সৃষ্টি করা সম্ভব, যদি ধীর স্থির ভাবে অতি-

সাবধানতার সহিত এই অর্থ-সম্প্রসারণ নীতি প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু তাহা না করিয়া অধিকতর মূল্য হ্রাস নিবারণ করিবার জন্য সৃষ্ট সম্পদকে মানুষ আজ নিজ হাতে ধ্বংস করিতেছে। বাংলায় পাটচাষ নিরোধ, আমেরিকায় গম ও তুলা স্বেচ্ছায় অগ্নিসংযোগে ধ্বংস ও সর্ব্বক্ষেত্রে পণ্যোৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ ইহার প্রমাণ। অর্থ না বাড়াইয়া পণ্য কমান, ইহাও সংখ্যাতত্ত্বেরই প্রয়োগ, তবে বিপরীত প্রয়োগ—ব্যবসায়ীদের ক্ষুদ্র স্বার্থ-প্রণোদিত আত্মঘাতী প্রয়োগ। যে সময়ে পৃথিবীর একটা বিরাট অংশ "অন্নাভাবে ক্ষীণ, বস্ত্রাভাবে শীর্ণ, দিন দিন আয়ুক্ষীণ" অবস্থায় দিন কাটাইতেছে, সেই সময়ে অধিক মূল্যের আশায় পণ্য-সম্পদ নিরোধ ও স্বহস্তে তাহা বিনাশ করাকে আত্মঘাতী নীতি ভিন্ন আর কি বলা যাইবে? দুর্গত মানবগোষ্ঠীর কিঞ্চিৎ দুঃখ লাঘবের জন্য তাহা দান করিবার পর্য্যন্ত উপায় নাই; কারণ তাহা হইলে জিনিষের মূল্য আরো হ্রাস পাইবে!

আমাদের মনোজগতে ছায়া আজ কায়ার স্থান অধিকার করিয়াছে, অর্থ আজ সম্পদকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অর্থরূপ দালালটিকে আমরা যতদিন পর্য্যন্ত বাদ দিয়া চলিতে না পারিতেছি, যতদিন পর্য্যন্ত আধুনিক যুগের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পণ্যের বিনিময়ে পণ্য আদান-প্রদানের রীতি (barter) প্রবর্ত্তন করিতে না পারিতেছি, ততদিন মুখের গ্রাস ধ্বংস করিয়া পণ্য-মূল্য স্থির রাখা অপেক্ষা অর্থ সৃষ্টি করিয়া মূল্য স্থির রাখা কি অধিকতর বুদ্ধিমানের কাজ নয়? কিন্তু উহা ত' শুধু কোন দেশবিশেষের পক্ষে সম্ভব নহে; তজ্জন্য চাই বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্মিলিত সহযোগিতা ও পরামর্শ। অন্যথা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নীতি অনুসৃত হইলে এক দেশে পণ্যের মূল্য চড়িবে, অন্য দেশে পণ্যের মূল্য কমিবে এবং অনর্থ আরো বাড়িয়াই যাইবে। কিন্তু অপ্রিয় হইলেও এই সত্যকে আজ আমাদের অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মানুষ আজ নিজেকে বড় মনে করিলেও মনে বড় হইতে পারে নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর অবাধ বাণিজ্য-নীতি অনুসরণ করিয়া পৃথিবীব্যাপী যে বিশাল আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা আজ বিংশ শতাব্দীর রক্ষণশীলতার চাপে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিতে বসিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ও অর্থনীতি আজ ঘোরতর জাতীয়তাবাদী হইয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য জাতি নিজেদের পণ্য বিদেশে চালান করিবেন, কিন্তু অন্য দেশের পণ্য নিজেদের দেশে প্রবেশ করিতে দিবেন না—ইহাই আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-নীতির "নয়া রূপ"। এইরূপ জিনিষকেই বোধ হয় নৈয়ায়িকেরা "সোণার পিত্তলের কলসী" আখ্যা দিয়া থাকিবেন। কতকগুলি দুর্ব্বল ও পরাধীন জাতির উপর জোর করিয়া এই নীতি পরিচালনা করা সম্ভব হইলেও স্বাধীন ও শক্তিমান জাতিদের মধ্যে এই নীতি চলিবে কি করিয়া? তাই ইহা বলা সম্ভবতঃ অত্যুক্তি হইবে না যে, পৃথিবীর আজ বড় সমস্যা তথাকথিত উচ্চ জাতিসমূহের নীচ মনোবৃত্তির সমস্যা।

পাশ্চাত্য অর্থনীতি

পাশ্চাত্য জাতিগণ প্রধানতঃ তাঁহাদের দুইটী ভ্রমের জন্য জগতের অন্ন-সমস্যাকে ঘোরাল করিয়া তুলিয়াছেন।

কি করিয়া কৃষিকার্য্যকে লাভবান্ করিতে হয়, তাহা তাঁহারা জানেন না, অথচ তাঁহারা তাঁহাদের কৃষি-বিজ্ঞানকে বিশ্বাস করিয়া থাকেন এবং ঐ বিজ্ঞান জগতের সর্ব্বত্র চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহা তাঁহাদের প্রথম ভ্রম। অনেকে মনে করেন, ফ্রান্স, স্পেন, মার্কিন ও রুশিয়া প্রভৃতি দেশে কৃষি লাভবান্ হইয়াছে, কিন্তু ঐ ঐ দেশের কৃষির অবস্থা গম্ভীর ভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ দেশগুলির কোনটিতেই কৃষিকার্য্য ব্যাপকভাবে লাভজনক হয় নাই।

পাশ্চাত্য জাতিগণের বিশ্বাস যে, শিল্প ও বাণিজ্য দ্বারা যত লোকের জীবিকা নির্ব্বাহ করা সম্ভব, কৃষি দ্বারা তত লোকের জীবিকা নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভব নহে। ইহা তাঁহাদের দ্বিতীয় ভ্রম।

এসিয়ার নদীপথে

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটী এসিয়ার বড় বড় নদীপথগুলির অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য মিঃ জোসেফ রকের নেতৃত্বে যে দলটি প্রেরণ করেন, তাহাদের লিখিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত হইল :—

চীনদেশের উত্তর-পশ্চিম ইউনান প্রদেশে ও দক্ষিণ-পূর্ব্বে তিব্বতের ভাক্সং পার্ব্বত্য অঞ্চলে যে দৃশ্যাবলী দেখা যায়, সারা পৃথিবীতে উহার তুলনা কোথায় মিলিবে?

চীনদেশের বিরাট নদীগুলির আশে-পাশে যে সকল পর্ব্বতমালা বিদ্যমান, সেগুলি আরোহণ করিবার সৌভাগ্য অনেকেরই ঘটে নাই। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, বহু প্রাচীন কালে এই অঞ্চল সমগ্র মধ্য-এসিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমদিগ্‌ব্যাপী এক বিরাট মালভূমির অন্তর্গত ছিল। ঐ উচ্চ মালভূমির বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া কালে কালে বড় বড় নদী বাহিয়া চলিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি নদী পৃথিবীর বৃহৎ নদীগুলির অন্যতম।

স্যালউইন : এই সর্পিল পার্ব্বত্য নদী তিব্বতের মধ্য দিয়া আসিয়া বর্ম্মা-শ্যাম সীমান্ত অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছে।

এই নদীগুলি আদিম যুগের মালভূমিকে শুধু যে এক বিশাল পর্ব্বতময় অঞ্চলে পরিণত করিয়াছে তাহা নয়, বড় বড় গভীর উপত্যকা ও অন্ধকারময় পাষাণমণ্ডিত নদীখাতেরও সৃষ্টি করিয়াছে। এমন অনেক নদীখাত আছে, যাহার মধ্যে মানুষে কোন দিন প্রবেশ করে নাই।

বিশ হাজার ফুট পর্ব্বতমালার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া স্যালউইন, মেকং ও ইয়াংসি নদী সমুদ্রে গিয়া পড়িতেছে। এই নদীগুলি পশ্চিম চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব তিব্বতে প্রায় সমান্তরাল ভাবে বহিয়া যাইতেছে এবং এক স্থানে পরস্পরের ৪৮ মাইল মাত্র ব্যবধানে আসিলেও ইহাদের পরস্পরের মোহানা পরস্পর হইতে হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত।

যখন আমরা আমেরিকা হইতে যাত্রা করি, তখন এই অদ্ভুত নদীখাতগুলির ফটো তুলিয়া আনিব, ইহাই ছিল আমার ইউনান অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য।

এই তিনটি নদীই তিব্বতের মালভূমি হইতে বহির্গত বটে, কিন্তু ইহাদের উৎপত্তিস্থান এখনও অজ্ঞাত। স্যালউইন তিব্বত দিয়া বহিয়া আসিয়া বর্ম্মা-শ্যাম সীমান্ত অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছে এবং মৌলমিনের নিকট ভারতমহাসাগরে পড়িতেছে। মেকং নদী অনেকদূর পর্য্যন্ত স্যালউইনের সহিত সমান্তরাল ভাবে চলিয়া আসিয়া পশ্চিমমুখী হইয়া ব্রহ্ম, শ্যাম ও ইন্দো-চীনের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে এবং সাইগনের নিকট দক্ষিণ-চীনসমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছে।

ইহাদের মধ্যে বৃহত্তম নদী ইয়াংসি কিছুদূর পর্য্যন্ত মেকং নদীর সহিত সমান্তরালভাবে বহিয়া আসিয়া হঠাৎ বাঁকিয়া উত্তরাভিমুখী হইয়াছে এবং সেই স্থান হইতে পুনরায় দক্ষিণ-মুখে ফিরিয়া আসিতে একটা খুব ভড়িপটির সৃষ্টি করিয়া ও দৈর্ঘ্য আরও কয়েকশত মাইল বাড়াইয়া অবশেষে উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া সাংহাইয়ের নিকট প্রশান্তমহাসাগরে পড়িতেছে।

ইয়াংসি নদীর বিষয় এখনও বেশী কিছু জানা যায় নাই। মোহানা হইতে ইহা প্রায় ১৫০০ মাইল পর্য্যন্ত নৌ চলাচলের উপযুক্ত, তার পরেও সুইফু পর্য্যন্ত ছোট নৌকায় যাওয়া যায়। আরও ছোট নৌকায় তারপর পূর্ব্ব-ইউনান প্রদেশের মাচাং পর্য্যন্ত যাওয়া চলে। এই নদী সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৩০০০ মাইল লম্বা এবং ইহার বহু অংশ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

ইচাং প্রদেশে ইয়াংসি নদী পর্ব্বত কাটিয়া যেখানে নিজের রাস্তা করিয়া লইয়াছে, আমেরিকান ভ্রমণকারীদের কৃপায় তাহা এখন বিশ্ববিখ্যাত। কিন্তু ইচাং নদীখাত অপেক্ষাও লিকিয়াং প্রদেশে ইয়াংসি যে খাত নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহা আরও অদ্ভুত। এই ভীম নদীখাতে পূর্ব্বে মিঃ বেকো ও ডাঃ হ্যাণ্ডলম্যাজেটি ছাড়া অন্য কোন ইউরোপীয় ভ্রমণকারী কখনও পদার্পণ করেন নাই। বর্ত্তমান লেখক (জোসেফ রক্‌, ইয়াংসি অভিযানের দলপতি) পূর্ব্ববর্ত্তী ভ্রমণকারীদের দ্বারা অতিক্রান্ত স্থান ছাড়াইয়া আরও উত্তরে গিয়াছিলেন।

এখানে ইয়াংসি নদী দুইধারে যে পাহাড়ের মধ্য দিয়া বহিতেছে, তাহার উপর ক্যাক্‌টাস ছাড়া অন্য কোনও গাছ পালা নাই। ক্যাক্‌টাস (ফণিমনসা জাতীয় গাছ) আমেরিকার গাছ, কিন্তু ইউনান প্রদেশের সর্ব্বত্র প্রচুর জন্মায়।

যেখানে দুইটি নদী সমান্তরালভাবে চলিয়াছে, সেখানে তাহাদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে যে উত্তুঙ্গ পর্ব্বত-মালা, তাহার তুষারাবৃত শিখররাজির সৌন্দর্য্য গভীর নদী-খাতের গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে মিলিত হইয়া এমন একটি দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা পৃথিবীতে নিতান্ত বিরল। স্যালউইন ও মেকং নদীর মধ্যে অবস্থিত কাকেরপু পর্ব্বতমালা ও তাহার ২২০০০ ফুট উচ্চ মিয়েটজিমু শৃঙ্গের দৃশ্য সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম।

এই পর্ব্বতমালার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া ও রহস্যাবৃত নদীখাতগুলির ফটো লইবার উদ্দেশ্যে আমি অক্টোবর মাসে নাশী গ্রাম হইতে (লিকিয়াং পর্ব্বতের পাদমূলে অবস্থিত) বহির্গত হইয়া উত্তরমুখে যাত্রা সুরু করি।

আমার সঙ্গে ১৫ জন কুলী ও অশ্বতর ইত্যাদি ছিল। বর্ষাকাল তখনও শেষ হয় নাই। পথ-ঘাট কর্দ্দমাক্ত, নদী খরস্রোতা। অশ্বতরের পৃষ্ঠে আমি তিন মাসের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য বোঝাই করিয়া লইলাম। প্রথমদিন বেশী দূর যাইতে না যাইতে এমন বৃষ্টি আসিল যে, টোকে নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম পর্য্যন্ত পৌছিয়া আমাদের তাঁবু ফেলিতে হইল।

আমি গ্রামের একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে রাত্রি যাপন করিলাম। রাত্রিতে ঘুম হইল না। যেমন মশা, তেমনি উকুন। চীনা কুলীরা দিব্য আরামে ঘুমাইতেছিল। পরদিন আমরা লিকিয়াং পর্ব্বতের ১০০০০ ফুট উচ্চ একটি শাখা অতিক্রম করিলাম। এখানে জঙ্গল একটু বেশী ঘন। শোনা গেল এই পথে ডাকাতের উপদ্রব খুব বেশী।

বেলা দুপুরের সময় আমরা শিকু গ্রামে পৌছিলাম। সেদিন সেখানে হাটবার, শিকু গ্রামের মধ্য দিয়া একটি মাত্র রাস্তা চলিয়া গিয়াছে এবং হাটবার বলিয়া রাস্তাটি স্ত্রী, পুরুষ, অশ্ব, অশ্বতর প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। চারিধারের পার্ব্বত্য গ্রামগুলি হইতে নাশী, লিসু ও লোলো জাতীয় লোকেরা তরিতরকারী, শূকর, ডিম ইত্যাদি বেচিতে আনিয়াছে।

এই গ্রামের রাস্তার ধারে পাথর কাটিয়া একটি অভিনয়ের স্থান তৈয়ারী করা হইয়াছে। যে ঐ স্থানটি তৈয়ারী করিবার জন্য টাকা দিয়াছে, তাহার নাম ও সে কত টাকা দিয়াছে, তাহা একপার্শ্বে একটি প্রস্তরফলকে খোদিত আছে।

ইউনান প্রদেশের রাস্তাগুলি যতই খারাপ হউক, চলিবার সময় তত কষ্ট হয় না, কিন্তু কষ্টের সুরু হয় তখনই, যখন কোন লোকালয়ে প্রবেশ করা যায়। দস্যুসঙ্কুল পার্ব্বত্য-স্থানে লোকালয় হইতে দূরে শৈলপাদমূলে অরণ্যের প্রান্তে রাত্রি-যাপন বিদেশী ভ্রমণকারীর পক্ষে আদৌ নিরাপদ নহে, কিন্তু গ্রামে ঢুকিলেই জঞ্জাল, ধুলা, মাছি, উকুন, চতুর্ক কড়া ধোঁয়া ও গোলমালের দরুণ যে কষ্ট উপস্থিত হয়, দস্যুর হাতে পড়াও তদপেক্ষা বাঞ্ছনীয়। চীনা গ্রামের সহিত যাঁহাদের পরিচয় নাই, তাঁহাদের এ উক্তির তাৎপর্য্য বুঝিতে বিলম্ব হইবে।

তবুও মনে রাখিতে হইবে যে, আমি শিকু গ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র ও পরিষ্কার স্থানে আশ্রয় পাইয়াছিলাম, অর্থাৎ স্থানীয় মন্দিরে, বুদ্ধমূর্ত্তি যে গৃহে অবস্থিত, সেই গৃহেরই এক পার্শ্বে।

আমার ঘরের পাশেই আস্তাবল, সেখানে মন্দিরের পুরোহিতের অনেকগুলি অশ্ব ও অশ্বতর বাঁধা। উঠানে এত কাদা যে, জুতা পায়ে দিয়া হাঁটিলে জুতার চামড়ার উপর

ইউনান: মণি-মন্দির। বড় বড় পাথরে 'মণিপদ্মে হুঁ' মন্ত্র লিখিত।

এক পুরু কর্দ্দমের প্রলেপ লাগিয়া যায়। এক পাশে কয়েকটি গ্রাম্য কুকুর বিনা কারণে ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিতেছে। ইয়াংসি নদীর বামতীরের পাহাড়ের উপর দিয়া রাস্তা।

পল্লীগ্রামগুলি খুব শান্ত, নদীর দুধারে উচ্চ পর্ব্বতশিখরে ঘন মেঘপুঞ্জ খেলা করিতেছে। পথের ধারে একটা খাড়া উত্তুঙ্গ পাহাড়ের চূড়ায় একটা বৌদ্ধ মন্দির। একটা গ্রামে কেহ মারা গিয়াছে, আত্মীয়-স্বজন শোক প্রকাশ করিতেছে, বাড়ীর উঠানের বেড়ার গায়ে সারি সারি বাঁশের চটা ও কাগজের তৈয়ারী মানুষের মূর্ত্তি, সিডান চেয়ার, বাড়ী, নৌকা, কাগজের ঘোড়া ইত্যাদি। জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, এগুলি মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হইয়াছে, পরজগতে ইহারা তাহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিবে।

নদীর ধার দিয়া যে পথ, তার দুই ধারে খুব ঘন জঙ্গল, তবে বড় গাছের চেয়ে ছোট গাছপালা, ঝোপঝাপই বেশী। এক এক জায়গায় দুই দিক্ হইতে জঙ্গল আসিয়া পথকে চাপিয়া ধরিয়াছে। প্রত্যেক গাছের ডালপালায় অসংখ্য মাকড়সার জাল, বড় বড় হলদে রংয়ের মাকড়সা জালের কেন্দ্রস্থানে ওৎ পাতিয়া শিকারের আশায় বসিয়া আছে।

নদীর এক দিক্ খুব উঁচু বেলে পাথরের পাহাড়—ঠিক যেন কেহ পাথরের দেওয়াল গাঁথিয়া রাখিয়াছে, মনে হয়। পাথরের গায়ে জলের দাগ দেখিয়া বুঝা গেল, বর্ষাকালে অনেকদূর পর্য্যন্ত জল ওঠে।

পথের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। চীন দেশে রাস্তার কখনও সংস্কার করা হয় না। মানুষ পায়ে হাঁটিয়া কোন ক্রমে হয়ত চলিতে পারে, কিন্তু এসব পথে যানবাহন চলাচল একরূপ অসম্ভব। একটি মন্দিরে আট দশ বৎসরের একটি ক্ষুদ্র বালক একমাত্র সেবাইত। সে মন্দিরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া আমাদের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল, হয়ত সে তাহার আট বৎসরের জীবনে কোন ইউরোপীয়কে কখনও দেখে নাই।

পাঁচ দিনের দিন আমরা চু-তি-য়েন্ নামক ক্ষুদ্র গ্রামে পৌঁছিলাম—পথে লিকিয়াং হইতে চু-তি-য়েন্ পর্য্যন্ত ভীষণ অন্ধকারময় বনভূমি, বড় বড় বার্চ্চ ও পপ্‌লার, একদিকে বহু নিম্নে খরস্রোতা ইয়াংসি, অন্যদিকে দুরারোহ পর্ব্বত-প্রাচীর। অশ্বতরের পদস্খলন হইলেই ইয়াংসি অভিযানের ছুটি!

চু-তি-য়েন্ গ্রামে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি নামিল। আশ্রয়স্থান খুঁজিতে খুঁজিতে একটা ছোট নালার ধারে একটি পাথরের ঘর পাওয়া গেল। ঢুকিয়া দেখি সেটা গ্রামের স্কুল-ঘর। একটিমাত্র চীনা বালক বড় বড় চীনা হরফে বোধ হয়—হস্তলিপি অভ্যাস করিতেছে। কিন্তু কোন গুরু-মহাশয়কে দেখিলাম না। লেখাপড়ার প্রতি ছাত্রটির মনোযোগের প্রশংসা না করিয়া উপায় কি?

সেখানেই আশ্রয় লইলাম। বৃষ্টি থামিলে অধ্যবসায়ী ছাত্রটি বিদায় লইল। আমরা ঘরের মেঝেতে বিছানা পাতিলাম। বাতাস চলাচলের কোন অভাব নাই ঘরে, তবে সে বাতাস জানালা দিয়া আসিতেছে না—আসিতেছে মাথার

উপরের ছাদ দিয়া। মেঘ-ভরা আকাশে দু' একটা যা' নক্ষত্র উঠিয়াছিল, তাহাও চোখ উপরের দিকে তুলিয়া দেখিলে বেশ দেখা যায়। গ্রামের লোকের স্কুলের প্রতি যে খুব দৃষ্টি আছে, ঘরের অবস্থা দেখিয়া মনে হইল না।

সন্ধ্যার বাতাসটি অদ্ভুত ধরণের আরামদায়ক, অবশ্য ইহাও দেখিতে হইবে যে, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে স্থানটীর উচ্চতা ৯০০০ ফুট। বৃষ্টি থামিয়া গেল; আকাশে এখন বেশ নক্ষত্র উঠিয়াছে, আমরা পথের কষ্ট ভুলিয়া গেলাম।

পাশেই দুইঘর চীনা পরিবার থাকে, তারা আমাদের জল ও কাঠ সরবরাহ করিয়া দিল। তারা এখন তাদের প্রাপ্য অর্থের অংশ লইয়া নিজেদের মধ্যে ঝগড়া সুরু করিয়া দিল—আমরা যতক্ষণ সেখানে ছিলাম, তাদের ঝগড়া থামে নাই।

কাংপু: নাশি লামা।

ইয়াংসি ও মেকং নদীর মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বত-মালার পাইন ও ঝাউ গাছের অরণ্যের ভিতর দিয়া আমরা চলিলাম। আরও কিছু দূরে গিয়া লিটিশিং পর্ব্বতশ্রেণী, এই পর্ব্বতের উপর দিয়া যে পথ, সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে তাহার উচ্চতা ১১০০০ হাজার ফুট।

বড় বড় গাছের নীচে ঘন বেত-বন, মাঝে মাঝে সমতল-ভূমিতে জেন্‌সিয়ান্ ফুল ফুটিয়াছে। পর্ব্বতের হাওয়া যেন নূতন জীবনের সঞ্চার করিয়াছে আমাদের মধ্যে, কি সুন্দর পাখীর ডাক চারিদিকে! এসিয়ার এই সব অঞ্চলে লোক কেন যে বেড়াইতে আসে না, তা'-ই ভাবি। রেল নাই, মোটর নাই, হোটেলওয়ালাদের উৎপাত নাই, বর্ত্তমান সভ্যতার সর্ব্বপ্রকার চিহ্ন হইতে বহুদূরে মধ্য-এসিয়ার এই অরণ্য ও পর্ব্বতের নিস্তব্ধতা ও গাম্ভীর্যের মধ্যে প্রাচীন চৈনিক জাতির প্রাণশক্তি যেন কোথায় লুকাইয়া আছে,—আজও যে শক্তি অমর, শত বিপদ্-বিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়াও যাহা চীনদেশ ও চীনা জাতিকে অটুট রাখিয়া আসিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও রাখিবে।

বৈকালের দিকে আমরা উই-সি গ্রামে পৌছিলাম। সেখানে চারশত ঘর লোকের বাস। মেকং নদীর একটি ক্ষুদ্র শাখার তীরে গ্রামটি অবস্থিত। গ্রামের চারিদিকে উঁচু মৃন্ময় প্রাচীর, তার তিনদিকে তিনটি প্রবেশ-দ্বার। শুনিলাম এই প্রাচীর বহুকাল পূর্ব্বের তৈয়ারী, দস্যুভয় হইতে নগরের অধিবাসিগণের ধনসম্পত্তি নিরাপদ করিবার উদ্দেশ্যে ইহা গঠিত।

উই-সি গ্রামে একটি ডাকঘর আছে। আমার পত্র ও পার্শেল সেখান হইতে ওয়াশিংটন ডি-সি'তে পাঠাইতে কত ডাকটিকিট লাগিবে, পোষ্ট-মাষ্টার তাহার হিসাব করিতে বসিল এবং ঘণ্টাখানেক ধরিয়া হিসাবের পরে আমাকে জানাইল অত ডাকটিকিট উই-সি ডাকঘরে নাই। আমি বলিলাম, যতগুলা টিকিট পাওয়া যায়, আঁটিয়া পার্শেল পাঠাইয়া দাও।

চীনদেশের ডাক-ব্যবস্থার সম্বন্ধে একটু বলিতে চাই যে, আমার পত্র ও পার্শেল ঠিক সময়ে ওয়াশিংটনে পৌছিয়াছিল।

উই-সি পরিত্যাগ করিয়া দশ মাইল হাঁটিবার পরে কা-কাটাং গ্রামে পৌঁছিলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, রাত্রির আশ্রয়-স্থান খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। গ্রামের বাড়ীগুলিতে কাদার দেওয়াল, পাতায় ছাওয়া। জানালার বালাই নাই। কোনগুলি গোহাল কি মানুষ-বাসের উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত, তা' চেহারা দেখিয়া নির্ণয় করা শক্ত।

অবশেষে একটা পাহাড়ের ধারে একটি ক্ষুদ্র মন্দির

দেখিয়া ভাবিলাম, সেখানেই আশ্রয় লইব। মন্দিরের মধ্যে ঢুকিয়া মনে হইল, এখানে বহুকাল মানুষ প্রবেশ করে নাই, মাকড়সার জালে মন্দিরের অভ্যন্তর-ভাগ আচ্ছন্ন। ঘরের সর্ব্বত্র জঞ্জাল।

শীঘ্রই কারণ আবিষ্কার করা গেল। আলো জ্বালিয়া দেখি ঘরের এক পাশে একটা গালার তৈয়ারী শবাধার, তার মধ্যে একটি মৃতদেহ রক্ষিত আছে।

শোনা গেল, এক বৎসর পূর্ব্বে লোকটির মৃত্যু হয় এবং তার পর হইতে তাহার শব এই মন্দিরে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে, কারণ সমাধিস্থ করিবার শুভদিন এক বৎসরের মধ্যে পাওয়া যায় নাই। নক্ষত্রের ঠিকমত যোগাযোগ ঘটিতেছে না।

বলা বাহুল্য, মন্দির পরিত্যাগ করিয়া বাহিরের মুক্ত বায়ুতে আসিতে আমাদের মুহূর্ত্ত কালও বিলম্ব হইল না।

এত সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে এ সব জায়গায় কত অসুখ-বিসুখ মানুষের কেন যে হয়! আমাদের আসিবার নাম শুনিয়া দলে দলে রোগী আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে ও চিকিৎসিত হইতে আসিল। তাহাদের দেখিয়া কষ্ট হয়, কাহারও শরীরে ক্ষত, গোড়ায় উপযুক্ত ঔষধ না পড়াতে পচিয়া উঠিয়াছে, কাহারও দন্তশূল, কাহারও পেটের পীড়া—আবার কয়েকটি যক্ষ্মারোগীও তাদের মধ্যে আছে। এ দেশের প্রায় সকলেরই গলায় ছোট বড় গলগণ্ড। অনেকের চোখের অসুখ, বহুদিন ধরিয়া চিকিৎসা না হওয়ার দরুণ তাহারা প্রায় অন্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

আমাদের নিকট এসব রোগের ঔষধ কোথায়? আমরা ডাক্তার নই, বা সঙ্গে চলন্ত দাওয়াইখানা লইয়াও বেড়াইতেছি না। কিন্তু এ কথা তাহারা শোনে না, তাহাদের বিশ্বাস এক দাগ বিলাতী ঔষধ গলাধঃকরণ করিলেই যতদিনের পুরাতন দুরারোগ্য রোগই হউক না কেন, ঠিক সারিয়া যাইবে। বেচারীদের সরল বিশ্বাস ও অসহায় অবস্থা আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিল বটে, কিন্তু আমরা সমানই অসহায় এ বিষয়ে। কি করিবার ক্ষমতা আছে আমাদের?

পরদিন আমরা আর একটি গ্রামে পৌঁছিলাম। এ অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য ভুট্টা। গ্রামের আশে পাশের মাঠে, পাহাড়ের ধারে ভুট্টার চাষ খুব।

গ্রামের মণ্ডলের বাড়ী হইতে আমাদের জলযোগের নিমন্ত্রণ আসিল। আমার ক্যামেরা দেখিয়া মণ্ডল তাহার ফটো তুলিবার আগ্রহ প্রকাশ করাতে আমি রাজী হইলাম। সে তখনই তাহার স্ত্রীদিগকে ভাল পোষাক আনিতে বলিল। তার পর ময়লা পোষাকের উপর একটা জমকালো রেশমী আলখাল্লা পরিয়া ভদ্রলোক গম্ভীরমুখে ফটো তোলাইবার জন্য বসিল—যেন সে নিজেই চীন সম্রাট্! ইয়েচি নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে আমরা সতাই এক রাজার বাড়ীতে অতিথি হইলাম। এই রাজার নাম লি—রাজা লি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

ইয়াংসি নদীর উপরে সিলিকিয়াং-এ দড়ির ঝোলা।
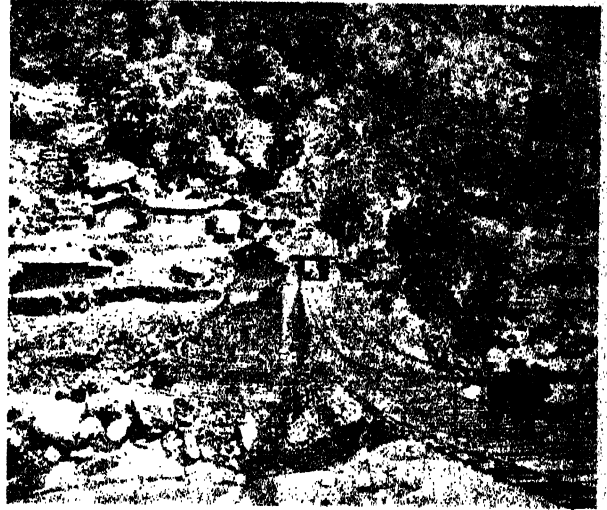
১৯০৫ সালে স্যালউইন ও মেকং নদীর মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্য অঞ্চলে নূতন গাছপালার সন্ধান করিতে ইংলণ্ড হইতে একটি বৈজ্ঞানিক অভিযান প্রেরিত হয়—প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত ডাঃ জর্জ্জ ফরেষ্ট ছিলেন ইহার নায়ক।

ডাঃ ফরেষ্ট কি কারণে তিব্বতী লামাদের বিরাগভাজন হন এবং তাহারা দলবদ্ধ হইয়া অভিযানকারীদের আক্রমণ করে ও ফাদার ডুবারনার্ড নামক জনৈক ফরাসী পাদ্রি ও আরও কয়েকটি নাশি লামা ও কুলীকে হত্যা করে। দিনের পর দিন ধরিয়া তাহারা ডাঃ ফরেষ্টকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছিল

এবং সে সময়ে ধরা পড়িলে ডাঃ ফয়েষ্টের মুণ্ড আটুংজি মঠের সিংহদ্বার অলঙ্কৃত করিত—সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজা লির বন্ধুত্ব ও করুণায় সে যাত্রা ডাঃ ফরেষ্ট বাঁচিয়া যান। রাজা লি এমন এক দুর্গম স্থানে তাঁহাকে লুকাইয়া রাখেন যে, লামার দল কোন সন্ধান করিতে না পারিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া ফিরিয়া যায়।

আটুংজি মঠ।

রাজা লি এখন বৃদ্ধ, অত্যন্ত লাজুক, কিন্তু তাঁর চালচলন, এমন কি বসিবার ধরণটি পর্য্যন্ত আভিজাত্য-মণ্ডিত। তাঁর পূর্ব্বপুরুষেরা বহুকাল ধরিয়া এই পর্ব্বত ও অরণ্যে নাশি ও অন্যান্ত জাতির উপর রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন—ইরাবতী নদীর তীর পর্য্যন্ত এক সময়ে এই রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এমন কি উত্তর-পশ্চিম চীন সীমান্তের দুর্দ্ধর্ষ কুটজু পার্ব্বত্য জাতি পর্য্যন্ত রাজা লিকে রাজস্ব দেয়।

ইয়েচি ছাড়াইয়া জঙ্গলের পথে ১০।১২ দিন যাইবার পরে স্যালউইন নদী পাওয়া যায়। রাজা লির সহায়তায় আমরা ১৩ জন কুলী সংগ্রহ করিয়া দুর্গম জঙ্গলের পথে স্যালউইন নদীর তীরভূমি লক্ষ্য করিয়া যাত্রা করিলাম। ভীষণ দুর্গম জঙ্গল, বন্য চেরী, রোডোডেনড্রন বৃক্ষে পূর্ণ, বড় বড় মৌমাছির চাক ডালে ডালে দুলিতেছে—দেখিয়া মনে হইল, ইউরোপীয় ত' দূরের কথা, কোন উপকূল-বাসী সভ্য চীনা লোকও কখনও এ অরণ্যের ধারণা পর্য্যন্ত করিতে পারিবে না।

স্যালউইন নদীর তীরে পৌছিয়া আমরা বাহাং ফরাসী মিশনে আশ্রয় লইলাম। ফাদার আঁদ্রে বর্ত্তমানে মিশনের অধ্যক্ষ। তাঁহার মধুর আপ্যায়নে ও আতিথেয়তায় আমাদের পথকষ্ট দূর হইল। ফাদার আঁদ্রে সন্ধ্যাবেলা আমাদের কাছে ১৯০৫ সালের লামা-বিদ্রোহের কাহিনী বর্ণনা করিলেন। এই মিশন-বাড়ীর প্রত্যেক মানুষটিকে তখন উন্মত্ত লামারা হত্যা করে, কেবল ফাদার জেনষ্টিয়ার নামে একজন পাদ্রী রাতারাতি পলাইয়া দূর জঙ্গলের মধ্যে পার্ব্বত্য লিসু জাতিদের গুহার মধ্যে আশ্রয় লওয়াতে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন।

ফাদার আঁদ্রে অবশ্য সে সময় এখানে ছিলেন না, তাঁর বয়স বেশী নয়—কয়েক বৎসর হইল এখানে আসিয়াছেন। বিগত মহাযুদ্ধের সময় ফাদার আঁদ্রে ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধ শেষ হইলে সংসারের উপর বিরক্ত হইয়া এই দুর্গম অরণ্য অঞ্চলে স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসন গ্রহণ করিয়াছেন। এ বড় দুঃখের জীবন, মে হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত সমস্ত পার্ব্বত্য গিরিবর্ত্ম তুষারে ঢাকিয়া যায়, বহির্জগৎ হইতে কোন চিঠিপত্র আসে না—তদুপরি আছে প্রতিমুহূর্ত্তেই—বিশ্বাসঘাতক অসভ্য জাতিদের দ্বারা আক্রমণের আশঙ্কা। দুইবার তারা এই মিশন-বাড়ী পুড়াইয়া দিয়াছে—কি করিয়া, কি উদ্দেশ্যে মানুষে এমন স্থানে বাস করে—তরুণ ফাদার আঁদ্রের মনের দুঃখ কি, কে তাহা বলিবে?

মীরা

—শ্রীসুরুচিবালা রায়

[৩৫]

বারান্দা ঘেরাও করা ফুলগাছের টবগুলি বেলফুলের সাদা কুঁড়িতে ভরিয়া উঠিয়াছে, দুপুরে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, তাহারই ফোঁটা ফোঁটা জল এখনও পাতাগুলির আগায়, কুঁড়ির গায়ে নোলকের মুক্তার মত দুলিতেছে; টবগুলির পাশেই ছোট একটী টেবিলে রং, কাগজ, তুলি লইয়া মীরা ছবি আঁকিতে বসিয়াছে, এ বিদ্যা মীরার নূতন আয়ত্ত, ছেলেবেলা স্কুলে ড্রয়িং করিয়া হাত কিছু তৈয়ারীই ছিল। এখন রং ও তুলির সাহায্যে মীরার হাতে যাহা তৈরী হইয়া দাঁড়ায়, চিত্র-প্রদর্শনীতে দিবার যোগ্য না হোক, নিতান্ত মন্দও কিছু হয় না।

মা আসিয়া পাণ-জরদা লইয়া একটা ইজিচেয়ারে বসিলেন। মীরা মুখ তুলিয়া একবার তাকাইয়া আবার কাজে মন দিল, —কি করছিস মীরু? তোর সেই ছবি? না বাপু, এ ছবি তোর ভাল হচ্ছে না।

মীরা মুখ তুলিয়া চাহিয়া কহিল,—কেন মা?

মা উঠিয়া ছবিখানার পানে তাকাইয়া কহিলেন, প্রথমে ত বেশ হচ্ছিল, তীর্থ দর্শন করে' যাত্রীরা ফিরে আসছে, নদী শান্ত সুন্দর, সব বেশ চমৎকার, নৌকাও বাড়ীর কাছে কাছে প্রায় এসে পড়েছে, দূরে ঘর দেখা যাচ্ছে, সবই ত বেশ, কিন্তু আকাশ কালো করে হঠাৎ কেন ঐ ঝড় তুললি বাপু? নৌকা ওদের ডুবিয়ে দিবে না কি? ঐ মেয়েটীর মুখখানা কি রকম হয়েছে, ঘরে ওর ছেলেমেয়ে আছে না কি?

মীরা হাসিয়া কহিল, আছেই ত।

—তা হলে? না বাপু ডুবোস নি নৌকোটী, ঝড় উঠেছে, তা' উঠুক না, নৌকোটা দুলতে দুলতে ডুবতে ডুবতেও কোনমতে ঘাটে এসে পৌছুক।

—কত নৌকো-ডুবি ত' দিনরাত হচ্ছে মা, ভগবান কি ছোট ছেলেমেয়ে ঘরে আছে বলে কাউকে দয়া করেন?

—এদের ভগবান ত তুই।

মীরা হাসিতে লাগিল।

মা ইজিচেয়ারে শুইয়া পান খাইতে খাইতে আবার ডাকিলেন—মীরু!

—কি মা?

—ছেলেটার কাণ্ডকারখানা দেখেছিস একবার? পনেরো দিন হয়ে গেল, এখনো দেখা নেই, কোথায় গেছে, কি করছে কে জানে।

মীরা নীরবেই ছবি আঁকিতে লাগিল।

—মীরু!

—কি মা?

—রেখে দে তোর ছবি, চল কোথাও একটু ঘুরে-টুরে আসি, বড় গাড়ীটা বাড়ীতেই আছে, তিনি বেরিয়েছেন ছোটটা নিয়ে।

—কোথায় যাবে মা?

মা কুণ্ঠিত ভাবে একটুখানি হাসিয়া কহিলেন,—পানু এল কি না দেখে আসি চল।

মীরা ছবি হইতে মুখ না তুলিয়াই কহিল, মিছিমিছি যাবে না, পানু দা এলে কি আর এখানে আসত না?

মা একটু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, তোদের সব তাতেই যুক্তি দেখান বাপু, সব কিছুই একই নিয়মে সংসারে হ'তে হবে, তার কিছু মানে আছে?

মীরু নিরুত্তরেই বসিয়া নিজের কাজ করিতে লাগিল।

অপরাহ্নের আলো ক্রমে মিলাইয়া গিয়া, সন্ধ্যার গোধূলি লগ্নে ক্ষণিকের জন্য একবার একটু রঙ্গীন হইয়াই ক্ষয় হইয়া গেল,—কাছাকাছি প্রতিবেশীদের বাড়ী হইতে শঙ্খধ্বনি উঠিয়া সন্ধ্যার আকাশ মুখরিত হইয়া উঠিল। মা উঠিয়া সোজা হইয়া বসিয়া যুক্ত করে প্রণাম করিলেন।

অন্ধকারে দৃষ্টি আর চলে না, উঠিয়া সুইচটা টিপিয়া দিতেও ইচ্ছা করিতেছে না। মীরা কাগজের উপর হাত দুখানি রাখিয়াই স্থির হইয়া রহিল। সিঁড়িতে পায়ের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বারান্দায় আলো জ্বলিয়া উঠিল, উত্তরে সচমকে সবিস্ময়ে তাকাইয়া দেখিলেন—পানু। সুইচ হইতে হাতটি নামাইয়া

প্রশান্ত হাসিমুখে সেখানেই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, মা সোজা হইয়া বসিয়া সম্মুখে ডান হাতটী প্রসারিত করিয়া দিয়া কহিলেন,—আয় আয়।

পান্নু অগ্রসর হইয়া আসিয়া, তাহার চিরদিনের নিয়মানুসারে মায়ের কাছে সতরঞ্চিতে বসিয়া পড়িল।

—অনেকদিন বাঁচবে পান্নু দা, তোমারই কথা হচ্ছিল এতক্ষণ।

গলা প্রথমে একটু কাঁপিয়া উঠিতেই মীরা তাহার স্বাভাবিক শক্তি বলে নিজেকে সংযত করিয়া লইল।

—কোথায় ছিলি বাবা এত দিন? পাঁচ ছ দিন দেরী হবে বলে এত দেরী করতে হয়? এদিকে আমি ভেবে মরি!

—কেন এত ভাব মা? ভাববার কি আছে? পুরুষ মানুষ কি ঘরে বসে থাকে?

—আমি অভিশাপ দিই পান্নু, আসছে জন্মে তুই যেন মা হয়ে জন্মাস।

—কি রকম মা? জন্মেই কি দেখব ঘর আমার ছেলে মেয়েতে ভর্ত্তি?

তিন জনেই হাসিতে লাগিলেন।

—এ কি রে পান্নু, এটা কি?

হাঁটুর নীচে সদ্য ব্যাণ্ডেজমুক্ত একটা ক্ষত-চিহ্ন। মা সেটায় হাত দিয়াই চমকিয়া উঠিলেন। মার চমকের সঙ্গে সঙ্গেই মীরা চেয়ার ছাড়িয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

পান্নু পা সরাইয়া লইয়া হাসিয়া কহিল, ডাকাত ধরতে গেছলুম মা, তারই ক্ষুদ্র একটি চিহ্ন।

—ডা—কা—ত!

মায়ের কম্পিত কণ্ঠস্বর আপনি থামিয়া গেল।

মীরা ঝুঁকিয়া পড়িয়া ক্ষত-চিহ্নটীর পানে তাকাইয়া রহিল।

—কি রে মীরু, নীচে থেকে যে খুব কথা শুনতে পাচ্ছি, কে এসেছে, বিভা বুঝি? ওঃ পান্নু!

বিনয়বাবুর প্রফুল্ল স্বর পান্নুকে দেখিয়া মুহূর্ত্তে গম্ভীর হইয়া গেল। চারিদিকে একবার তাকাইয়া তিনি একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। ঘরের আবহাওয়া মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। মীরা কাছে সরিয়া আসিয়া পিতার কাঁধে হাত রাখিয়া কহিল—বাবা, আগে তুমি পোষাক ছেড়ে এক পেয়ালা চা খেয়ে আসবে চল।

পিতা কন্যার পিঠে হাত রাখিলেন।

—তার পর! পান্নু কোত্থেকে?

পান্নু সবিনয়ে উত্তর দিল, আজ্ঞে, রামকৃষ্ণ মিশন থেকে।

—ওঃ তোমাদের সেই শ্রীপুরের আড্ডা!

পান্নু চুপ করিয়া রহিল।

—শ্রীপুরের সেই ডাকাতির কি হল?

—পুলিশ তদন্ত করছে।

—দেশের লোক তোমাদের সন্দেহ করে, জান?

পান্নু সবিস্ময়ে তাকাইয়া কহিল,—আজ্ঞে আমাদের কেন? পুলিশকে খবর ত আমরাই দিয়েছিলুম, সাহায্যও আমরাই করেছি।

বিনয়বাবু উত্তরোত্তর উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিলেন, কহিলেন, নিজেদের পক্ষ টানতে হলে ও রকম করে বলা ছাড়া উপায় নেই, কিন্তু তোমাদের উপর সন্দেহের দৃষ্টি আছে দেশের লোকের, তোমাদের সেটা জানা ভাল।

—আজ্ঞে রামকৃষ্ণ মিশন চিরকালই নির্দ্দোষ, স্বয়ং জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট এবং গভর্ণর সাহেবও রামকৃষ্ণ মিশনকে শ্রদ্ধার চোখেই দেখেন।

বিনয়বাবু জোরে মেঝেতে পা ঠুকিয়া কহিলেন, আমি ম্যাজিষ্ট্রেট হলে ও সব আশ্রমগুলো ভস্ম করে দিয়ে যে সব এঁচোড়ে পাকা ছেলে ওতে যোগ দেয়, তাদের একদিনেই জেলে পাঠাতুম।

পান্নুর মুখ লাল হইয়া উঠিল, চকিতে একবার মায়ের মুখের পানে তাকাইয়া পান্নু দৃষ্টি নত করিয়া লইল। মা মনে মনে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিলেন; পান্নুর পিঠে হাত রাখিয়া ইঙ্গিতে তাহাকে চুপ করিতে বলিয়া নিজেই বলিলেন—কাকে কি বলছ ঠিক নেই, কাজ থেকে এসেছ ক্লান্ত হয়ে আছ, কাপড়-চোপড় ছেড়ে ঠাণ্ডা হয়ে এস-না।

—কাউকে কিছু বলবার আমার দরকার নেই, কিন্তু পান্নু তোমায় বলছি ওসব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে আবার আমাদের এখানে এসে পড়াশুনো করে মানুষ হও, তোমার বাবাও খুসী হবেন—আমরাও হব। আর তা যদি না পার, তোমাদের
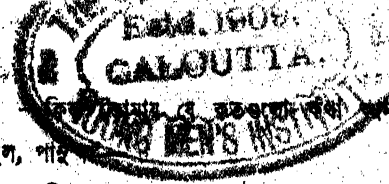
বাইরের বিপদ আমার ঘরে ডেকে এন না। আশ্রম-টাশ্রম না যদি ছাড়তে পার, আর তুমি এস না এ বাড়ীতে।

সমস্ত বারান্দাখানি বিনয়বাবুর গলার স্বরে কাঁপিয়া কাঁপিয়া নীরব হইয়া গেল। মীরা ধীরে ধীরে বাহির হইয়া ওপাশের একটা ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

বিনয় বাবু আরও কয়েক মিনিট স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

মা পানুকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন—পানু কোথায় তোর ব্যথা লেগেছে, বুঝতে পেরেছি, কিন্তু সত্যি, উনি তোদের মিশনকে নিন্দে করেন নি বাবা, রামকৃষ্ণ মিশনকে উনি মনে মনে ভক্তি করেন; আর কেউ না জানুক আমি ত তা জানি। তোর উপরে রাগ করেই এসব কথা বললেন, বেশি ভালবাসলেই রাগ বেশি হয়, তোর ভাল চান, তোকে ভালবাসেন—

পানু মুখ তুলিয়া কহিল, তা' আমি জানি মা, কিন্তু পড়াশুনো করে মানুষ হওয়া, তা আর আমার হবে না, আমি ত ওসব ছাড়তে পারব না মা, আর—

পানুর বাক্য বন্ধ হইয়া আসিতেছিল, মুহূর্ত্তকাল থামিয়া, নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া কহিল,– আর দেশের গরীব-দুঃখী চাষা-ভুষোর উন্নতি করার চেষ্টাকে যতদিন না খারাপ বুঝব, ততদিন আর আসব না মা, তুমি দুঃখ ক'র না মা, তুমি দুঃখ ক'র না। তা'ছাড়া, ভগবান জানেন, মা, আমাদের মনে কোন দুরভিসন্ধি নেই, সকল রকম অন্যায় কাজ, গোপন কাজকে আমরা ঘৃণা করি,—

পানু মাকে প্রণাম করিয়া সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। পশ্চাৎ হইতে মায়ের সজল-কণ্ঠ কাণে আসিয়া প্রবেশ করিল,—পানু, সুখী হ' বাবা সুখী হ', তুই ভাল থাক্, তোর ভাল হোক্, শুধু এই আমি চাই।

পানু সিঁড়ির কাছে পঁহুছিতেই পাশের একটা ঘর হইতে মীরা বাহির হইয়া আসিল, উভয়ে চক্ষু তুলিয়া উভয়ের পানে চাহিল, তাহার পর নীরবে পানু নামিতে আরম্ভ করিল। পশ্চাতে আসিয়া সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া মীরা কহিল,—চললে?

—চললুম।

—কিন্তু আমায় যে অতগুলো কথা আমার বলবার ছিল, পানু—

—কিন্তু আমার ত সময় নেই শুনবার।

—কোনদিন কি সময় হবে না?—

—বোধ হয়, না।

চক্ষুদুটি তুলিয়া গাঢ়স্বরে মীরা কহিল,—না?—আচ্ছা, তবে যাও।

নামিতে গিয়া পানু মুহূর্ত্তকাল স্থির হইয়া দাঁড়াইল, তাহার পর দ্রুত নামিয়া চলিয়া গেল।

মীরা আরও খানিকক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে পিতার কক্ষে গিয়া ঢুকিল। ছোকরা চাকরটি পিতার পোষাক ছাড়িতে সাহায্য করিতেছিল, তাহাকে সরাইয়া দিয়া, মীরা নিজেই পোষাক গুছাইয়া তুলিয়া রাখিতে লাগিল। এ' মীরারই প্রতিদিনের কাজ, ছোকরা চাকরটি তাহাকে সাহায্য করে মাত্র।

আহারাদির পর প্রতিদিনকার মত পিতাকে গান শুনাইয়া, পিতামাতা উভয়ে নিদ্রিত হইলে, মীরা ধীরে ধীরে বারান্দায় আসিয়া রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইল, কি তিথি সেদিন কে জানে, দূর দিগন্তে নিষ্প্রভ চাঁদখানি এখনই মিলাইয়া যাইতেছে।

ধীরে ধীরে মীরা, পানুর ঘরখানিতে গিয়া দাঁড়াইল, কতকাল পানু আসে না, থাকে না, তবুও ইহাকে পানুর ঘরই বলা হয়। ছোট একখানি পালঙ্কে শয্যাখানি তেমনই পাতা, টেবিলখানিতে পানুর শৈশবের পরিত্যক্ত জিনিষপত্র। সপ্তাহে সপ্তাহে বিছানার চাদর, বালিসের ওয়াড় ধোপার বাড়ী যায়, এবং আবার পাতা হয়, মা বলেন, "রোজই সব তৈরী থাকবে, আগেকার মত, পাগল ছেলে আমার, কোন দিন ইচ্ছে হবে এসে থাকবার, তখন সব ঠিক না থাকলে মনে দুঃখ পা'বে।"

মীরা আলো জ্বালিয়া চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল। একবার একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বিছানার চাদরখানি সোজা করিয়া দিল। বালিশ দুটি নাড়িয়া চাড়িয়া আবার ঠিক করিয়া দিল, টেবিলে সেই শতছিন্ন পুরাতন বহিগুলিতে ধূলা জমিয়াছিল, আলনার নীচের তাকে রাখা ঝাড়নখানি লইয়া বহিগুলি ঝাড়িয়া-মুছিয়া ঠিক করিয়া রাখিল, বহি-

গুলির পাতা খুলিতেই ছেঁড়া ছেড়া স্বপ্নের মত, অকস্মাৎ তখনকার দিনের কতকগুলি স্মৃতি মনের কোণে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। কোন পাতার কোন ছবি, কোন পাতার কোন কালীর চিহ্ন দেখিয়া দেখিয়া, অর্দ্ধমুদিত চোখে মীরা বই হাতে সেইখানেই দাঁড়াইয়া সেই সব দিনগুলির কথা পরিষ্কার করিয়া মনে করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কবে পানু কি ভাবে মাষ্টারকে ফাঁকী দিতে চেষ্টা করিয়াছিল, এবং পাকা গোয়েন্দার মত মীরা সকল কিছুই বুঝিতে পারিয়া মাষ্টারের কাছে সকল রহস্য প্রকাশ করিয়া দিয়াছিল! কবে পানু রাগ করিয়া বহির কোন্ মলাটে লিখিয়া রাখিয়াছিল, 'মীরার সঙ্গে জন্মের মত আড়ি।' মীরার চোখে সেটা ফেলিবার জন্য বহুক্ষণ হইতে বহুবিধ চেষ্টা করা সত্ত্বেও, মীরা যখন দেখিয়াও না দেখিবার ভান করিয়া ছিল, তখন কি ভাবে মীরার বহির উপর সে বহিখানি পানু রাখিয়া দিয়াছিল, এবং পরে কি কাজে পানু বাহিরে যাইতেই, মীরা দ্রুত হস্তে, বড় বড় অক্ষরে তাহার পাশে লিখিয়া রাখিয়াছিল, 'বয়ে গেল'। বহির মলিন পাতাগুলিতে কালীর চিহ্ন তেমনই উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে,—দিন যায়, পরিবর্ত্তন-প্রয়াসী মানুষের মন প্রতি-ক্ষণে ক্ষণেই পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু এই সকল অচল পদার্থগুলি পুরাতনের স্মৃতি বহন করিয়া, মানুষের বুকে অমর হইয়া থাকে।

নিঃশব্দে কাজ শেষ করিয়া, আলো নিভাইয়া, মীরা নিজ কক্ষে প্রবেশ করিল, নীচে পুরু গালিচার উপর বিছানা পাতিয়া মঙ্গলাদিদি অকাতরে ঘুমাইতেছে। কুঁজো হইতে ঢালিয়া, জলপান করিয়া মীরা পাখার গতি বাড়াইয়া দিল, এবং টেবিল হইতে একখানি বহি তুলিয়া ইজিচেয়ারে শুইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

রাত কত কে জানে! পাড়া নিঝুম হইয়া গিয়াছে, কাছাকাছি বাড়ীগুলির গ্রামোফোনের শব্দও আর শুনা যায় না। কেবলমাত্র, কোন্ এক দূরের রাস্তার মোড়ে, ক্লান্ত এক কুলপী বরফওয়ালা, সে রাত্রির মত তাহার শেষ ডাক ডাকিয়া, ঘুমন্ত পুরীতে শিহরণ জাগাইয়া চলিয়া যাইতেছে।

[৩৬]

গান শেষ করিয়া অর্গ্যান বন্ধ করিয়া চারু উঠিয়া দাঁড়াইল। দ্বারপ্রান্তে আসিয়া নীচের দিকে তাকাইয়া দেখিল, মায়ের পূজাগৃহের কাজ এখনও শেষ হয় নাই, মুহূর্ত্তকাল দাঁড়াইয়া ভাবিল, কি কাজ এখন তাহার বাকী আছে। আজকাল সব কাজেই তাহার ভুল হইয়া যায়, মা বকেন, দাদা রাগ করেন; মনটী যে কেন এ রকম অন্যমনস্ক হইয়া থাকে, পড়িতে ভাল লাগে না, কাজে সর্ব্বদাই বিশৃঙ্খলা, কি কথা যে দিন রাত তাহার মনে জাগিতে থাকে, সে কথা সে কাহার কাছে বলিবে, মন তাহার বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে, মনের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতে সে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পড়িয়াছে,—আর সে পারে না, আর তাহার ক্ষমতা নাই।

গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, হাতের উল্টাপিঠে চারু চোখ দুটি মুছিল, তাহার পর ঘরে ঘরে ঘুরিয়া দাদার বিছানা, নিজেদের বিছানা করিয়া নীচে দাদার টেবিল গুছাইতে চলিল। আজ দু'দিন টেবিল গোছান হয় নাই, দাদা আজ রাগ করিয়াছে।

অন্যমনস্ক ভাবে, এতক্ষণ যে গানটী গাহিতেছিল, তাহারই একটী পদ গুন গুন করিয়া গাহিতে গাহিতে চারুলতা সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল,—

তিমির দিগভরি, ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া,
বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া।

দাদার নীচের ঘরে ঢুকিয়া, সম্মুখে একটু অগ্রসর হইয়াই সহসা চমকিয়া চারু পশ্চাতে সরিয়া আসিল, খাটে শুইয়া আছে কে! দাদা ত নয়, কে তবে? অন্ধকার ঘরে, খালি তক্তপোষের উপরে কে এমন করিয়া শুইয়া আছে? কি একটা সন্দেহ মনে জাগিতেই চারু চকিতে বারান্দায় সরিয়া আসিল, বুকের ভিতর চারুর ঢিব ঢিব করিয়া, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস রক্ত-চলাচল যেন চারুর বন্ধ হইয়া আসিল। আবার ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া কম্পিত হস্তে সুইচটী টিপিয়া দিল,—যা ভাবিয়াছিল তাই, অন্ধকার ঘরে এমন অসময়ে তিনিই শুইয়া আছেন! কে জানে কি হইয়াছে! শরীর খারাপ হইয়াছে না কি? মুহূর্ত্তকাল নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, চারু খাটের পাশে সরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর রুদ্ধ কণ্ঠ স্বর পরিষ্কার করিয়া কহিল—এমন অসময়ে শুয়ে আছেন কেন? অসুখ করেছে?

মুখ ফিরাইয়া রক্তবর্ণ চক্ষু ছুটি বিস্ফারিত করিয়া, পান্নু অর্থহীন দৃষ্টিতে চারুর মুখের পানে তাকাইল, সম্মুখে আরও একটু সরিয়া আসিয়া, একটুখানি নত হইয়া চারু কহিল, কি হয়েছে? মাথা ধরেছে?

—না।

—তবে কি হয়েছে? কোত্থেকে এলেন হঠাৎ?

পান্নু উত্তর দিল না, হাত দু'খানি কপালের উপর রাখিয়া চক্ষু মুদিল।

—কি হয়েছে বলুন না।

—কিছু না।

—নিশ্চয় কিছু হয়েছে, তা' নইলে অমন করছেন কেন?

রুষ্ট ভাবে পান্নু উত্তর দিল, ইচ্ছে হয়েছে তাই; বিরক্ত ক'র না, যাও।

চারু ধীরে ধীরে দ্বারপ্রান্তে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইল, শুষ্ক ঠোঁট ছুটি শুষ্ক জিভখানিতে ভিজাইয়া লইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া কম্পান্বিত দেহে চারু দাঁড়াইয়া রহিল। এবং তাহার পর কি ভাবিয়া, ধীরে ধীরে রান্নাঘরের দিকে চলিল,—কল্পনায় মন কত কি ভাবে, কত কি আশা করে, বাস্তবে তাহা নিষ্ঠুর ভাবে ধ্বংস হইয়া যায়। চারুর চোখের কোণ ছুটি ভিজিয়া উঠিতেই, চারু সতর্কতার সহিত তাহা আঁচলে মুছিয়া লইল।

অর্দ্ধঘণ্টা কাটিয়া গেল, আবার চারুলতা শয্যাপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। সানুনয় কম্পিত কণ্ঠে ধীরে ধীরে ডাকিল, একটু উঠবেন? উঠুন না একটু।

—না।

একটু আহত হইয়া চারু কহিল, বিছানাটা পেতে দিই ভাল করে, আর একটু চা এনেছি, খান।

—কিছু দরকার নেই, যাও।

—থাক্ তবে বিছানা, পরেই করব'খন, কিন্তু লক্ষ্মিটী, একটি বার উঠুন, চা'টা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল,—

মুখ ফিরাইয়া, রক্তবর্ণ চক্ষুদুটির তীব্র দৃষ্টিতে চারুর অন্তর বাহির প্রায় দগ্ধ করিয়া দিয়া, পান্নালাল উঠিয়া বসিল, আবার একবার চারুর পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকাইয়া রহিল, তাহার পর শয্যা হইতে নামিয়া চটিজুতা ছুটিতে পা ঢুকাইয়া দিয়া, দ্রুতপদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

শান্তি নাই, পান্নুর কোথাও শান্তি নাই, অন্তরে বাহিরে পান্নুর এ কোন্ বিপ্লব মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে? পান্নুর আজ আশ্রয় কোথায়? নিজের প্রতি তীব্র অভিমানে পান্নু চিরদিন নিজের অন্তরকে শাণিত অস্ত্রে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া আসিতেছে। তাহার এই শোণিতাক্ত ক্ষত আর কাহারও চোখে পড়িয়া তাহাকে ক্ষণকালের জন্যও বেদনাতুর করিয়া তুলিয়াছে, এই কল্পনা পান্নুর মনে একটা উৎকট আনন্দের সৃষ্টি করিত এবং এই আনন্দই ছিল পান্নুর সকল কার্য্যাবলী ও জীবনের মেরুদণ্ড, আজ চারু তাহার চোখে মুখে বিশ্ব-প্রকৃতির দারুণ বুভুক্ষা লইয়া, তাহার এই বেদনাঘন আনন্দের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! সভয়ে পান্নুর সর্ব্বাঙ্গ বার বার শিহরিয়া উঠিতে লাগিল,—দৃষ্টিহারা উন্মাদের মত পান্নু পথে পথে ছুটিয়া চলিল। এ ছোটা তাহার শেষ হইল কোন্ একটা রুদ্ধদ্বার স্কোয়ারের বেড়ার কিনারায়, অবশ দেহে সেখানে ঘাসের উপরেই পান্নু এলাইয়া পড়িল। তাহার পর দুই চক্ষু গলিয়া তাহার জল পড়িতে লাগিল। তাহার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা—সকল আনন্দের উৎস যারা জীবনে আজ প্রথম তাহাকে নিজে হইতেই কি কথা বলিতে আসিয়াছিল, কে জানে, অভাগা সে, কঠোর ভাবে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিয়াছে! এ অসম্ভব কি করিয়া সম্ভব হইল?

*   *   *

নিদারুণ লজ্জা ও অপমানে স্তব্ধ হইয়া চারুলতা কিছুক্ষণ সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর নিজেকে প্রাণপণে সংবরণ করিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল, পেয়ালায় ধূমায়িত চা'য়ের পানে তাকাইয়া এইবার তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল, প্রাণের কতখানি আগ্রহ, যত্ন ও সেবার আকাঙ্ক্ষা মিশাইয়া সে এই চা তৈয়ারী করিয়াছিল, পান্নুর তাহা বুঝিবার ক্ষমতা নাই। ধীরে ধীরে নর্দ্দমার মুখে পেয়ালাটি কাত করিয়া চা ঢালিয়া ফেলিয়া চারু দ্বিতলে উঠিয়া গেল। প্রত্যাখানের অপমান এমন লজ্জাকর, এমন বেদনাদায়ক, চারু আগে তাহা জানিত না, ক্ষুদ্র শয্যাখানি তাহার চোখের জলে ভিজিয়া ভাসিয়া চলিল। রাত্রি গভীর হইল, মা ডাকিলেন; দাদা ভাত দিবার জন্য ডাকাডাকি করিয়া, নিজেই গিয়া রান্না-ঘরে দুমদাম করিয়া হাঁড়ি-কড়ার শব্দ করিয়া ভাত বাড়িতে লাগিল; চারু তবু উঠিল না। চারু মীরা নহে।

চতুর্দ্দিকে যে একটী সুদৃঢ় পাষাণদুর্গ প্রস্তুত করিয়া মীরা তাহার অন্তরের অন্তঃস্থিত কোমল ও রহস্যময় মনটীকে সংসারের নির্দ্দয় দৃষ্টি হইতে গোপন করিয়া, তাহাকে নিজেরই একান্ত আপনার করিয়া রাখিয়াছে,—চারুর সে ক্ষমতা নাই, তাই সংসারের নিষ্ঠুর বিচার হইতে চারু তাহার অনাবৃত মনটীকে রক্ষা করিতে পারে না। তাই মা সন্দেহাকুল দৃষ্টিতে বার বার কন্যার পানে তাকাইয়া তাকাইয়া রাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং সমস্ত বাড়ীময় একটা হৈ চৈ কাণ্ড করিয়া করিয়া দাদা অবশেষে শুইতে গেল। [ক্রমশঃ

পিণ্ডারিদিগের বিবরণ

—শ্রীপাঁচুগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়

[এদেশে যখন মুসলমানগণের শাসন-রবি অস্তগমনোন্মুখ এবং ইংরাজেরা যখন, ধীরে ধীরে ক্রমোন্নতির পথে হইতেছিলেন, সেই সময়ে জলপথে বোম্বেটিয়াদিগের এবং স্থলপথে পিণ্ডারিদিগের অত্যাচার দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছিল। এই দুইটি দুর্দ্দান্ত দস্যু-দলকে দমন করিতে ইংরাজকে যে কিরূপ কষ্ট স্বীকার করিতে তাহা বর্ণনা করা যায় না।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে পুরাতন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা হইতে পিণ্ডারিদিগের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা হইল। ইহা হইতে মোটামুটি জানা যাইতে পারে যে, তাহাদের কিরূপ অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল এবং তাহাদিগকে দমন করিতে কিরূপ ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল।]

[সমাচার দর্পণ—১০ এপ্রিল ১৮১৯ (২৯ চৈত্র ১২২৫)]

পিণ্ডারিরদের বিবরণ

পিণ্ডারিরদের লুট প্রভৃতি দৌরাত্ম্য মধ্যম হিন্দুস্থানীয় লোকেরদের নানাপ্রকার অনুভূত আছে কিন্তু বাঙ্গালি লোকেরা ইংগ্রণ্ডীয়েরদের পরাক্রম প্রযুক্ত অকুতোভয় হইয়া তাহারদের নামমাত্র শুনিয়াছেন অতএব তাহারদের কিঞ্চিৎ ২ বিবরণ আমরা জানাই।

এক শত বৎসরের পুর্ব্বে পিণ্ডারিরদের নাম হিন্দুস্থানে প্রথম শুনা গেল। তাহারা আওরঙ্গজেব বাদশাহের প্রধান সেনাপতি জুলফেকর খাঁয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল এবং পানিপত মোকামে মহাযুদ্ধেরকালে পোনের হাজার পিণ্ডারি সে যুদ্ধে ছিল। পিণ্ডারিরা প্রায় সকল মুসলমান, অনুমান তাহারা চল্লিশ হাজার লোক। তাহারদের বসতিস্থান নর্ম্মদা নদীর উত্তরে ভীলসা ও ভুপাল ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ দেশ। যে বৎসরে তাহারদের দেশে শস্যাদি অল্প জন্মে সেই বৎসরে তাহারা অন্য ২ দেশে গিয়া অধিক লুট করে। তাহারা সেনাপতিকে লবড়িয়া কহে; যে ব্যক্তি তাহারদের মধ্যে যুদ্ধে অতিসাহসিক হয়, সেই লবড়িয়া হয়। সেই লবড়িয়ারা যখন লুট করিতে যায় তখন তাহারদের আজ্ঞা ও পরাক্রমের পরিসীমা থাকে না কিন্তু যখন তাহারা সে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ঘরে থাকে তখন তাহারা প্রত্যেক জন আপন ২ ইচ্ছানুসারে চলে। যখন কোন ২ লবড়িয়া লুট করিতে ইচ্ছা করে তখন সে পিণ্ডারির সরদারেরদের নিকটে আপন উকীল পাঠায় তাহাতে তাহারা সকলে একত্র হইয়া যে দিগে ও যে পরগণায় লুট করিতে যাইতে হইবে তাহা স্থির করে, পরে ঐ লবড়িয়া তুরীধ্বনি করিয়া আপন লুটার্থে যাত্রা করে তৎক্ষণাৎ তৎপক্ষীয় লোকেরা সেই ধ্বনি শুনিয়া স্ব স্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিবিধ প্রকার অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়া সুশিক্ষিত ঘোটকারূঢ় হইয়া তৎপশ্চাৎ গমন করে। তাহারা আপনারদের ও ঘোড়ার [illegible] কারণ কেবল দুই তিন দিনের পাথেয় লয় এবং আপনারদের সহিত তাম্বু প্রভৃতি ভারি বস্তু লয় না, এই হেতুক তাহারা একদিনে বিশ পঁচিশ ক্রোশ চলে। তাহারদের মধ্যে ঘোড়া বড় প্রার্থনীয় যখন তাহারা কোন বিপক্ষের নিকটে থাকে তখন বিপক্ষেরদের ঘোড়া এইমত চুরি করে। তাহারদের বিপক্ষ পক্ষীয় চৌকিদার চৌকি দিতেছে তথাপি সেখানে তাহারদের একজন সর্পের মত মৃত্তিকাসংলগ্ন শরীর হইয়া ঘোড়ার নিকটে গিয়া ঘোড়ার দড়ি কাটিয়া দেয় এবং ঘোড়ার গলা ধরিয়া এমত থাকে যে ঘোড়ার পা ও তাহার পা মিলিত হয় ইহাতে অন্যে তকিতে পারে না পরে অল্পে ২ সেখান হইতে দূরে আসিবামাত্র ঘোড়ার উপরে আরোহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ পলায়। যখন তাহারদের উপরে কেহ আক্রমণ করিতে আইসে ও যদি তাহারা বুঝে যে আমরা অসমর্থ হইব তখনি তাহার দিগ্‌বিদিক্ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে একত্র কাহাকেও দেখা যায় না। পরে অন্য সময়ে ঐ লবড়িয়া তুরীধ্বনি করিবামাত্র তাহারা কোন দিগহইতে একত্র হয় তাহা জানা যায় না। কোন ২ সময়ে তাহারদের মধ্যে কোন লোকের দুই তিন দিন খোঁজ থাকে না কিন্তু কোন সময়ে কোথা হইতে আসিয়া আপনারদের দলে মিলে। যখন তাহারদের নিতান্ত বিপদ উপস্থিত হয় তখন তাহারা বিন্ধ্যাচলের গুহা আশ্রয় করিয়া থাকে, যে বিন্ধ্যাচল অগস্ত্য মুনির কীর্ত্তি পতাকার স্থান।

"তাহারা আপন ২ ঘোড়ার বিষয়ে সর্ব্বদা তদারক করে এবং উত্তম ২ আহারের দ্রব্য ঘোড়াকে খাওয়ায় কিন্তু বিপদ সময়ে যেমন আপনারদের দশা তেমনি ঘোড়ার দশা হয়। তাহারা দিনে ঘোড়ার সাজ খুলিয়া রাখে কিন্তু রাত্রিতে যখন শয়ন করে তখন আপন ২ ঘোড়া আপন ২ কাছে রাখে ও তাহার জিন হাতে রাখিয়া নিদ্রা যায় যদি কোন সঙ্কট উপস্থিত হয় তখনি ঐ ঘোড়ার উপরে চড়িয়া এক নিমেষে চক্ষুর অগোচর হয় পিণ্ডারিরদের ঘোড়ার শীঘ্রগামিত্ব প্রযুক্ত তাহারদের রক্ষা যতক্ষণ ঘোড়া তাহারদের সঙ্গে থাকে ততক্ষণ তাহারা নির্ভয়। তাহারদের মধ্যে যদি কাহারো ঘোড়া হারায় তবে সে তাহার অতি লজ্জাকর ও তাহাকে কেহই পিণ্ডারির মধ্যে গণনা করে না ও তাহার বংশের ঐ এক প্রধান অখ্যাতি হইয়া থাকে।"

"পিণ্ডারিরা অতিশয় সাহসিক ও আপনারদের সেনাপতির এমন বশীভূত যে সেনাপতি তাহারদিগকে যেখানে লইয়া যায় সেখানেই যায় আপনারদের মরণ ভয়ও করে না এবং নিত্য পরিশ্রম করাতে তাহারদের শরীর অতিশক্ত যে পরিশ্রমে সামান্য লোক মরে তাহাতে তাহারদের ভ্রূক্ষেপও নাই। কোন ২ সময়ে তাহারা নানা সুখ সম্পত্তি ভোগ করে কখন ২ তাহারা দুঃখ সমুদ্রে ভাসে তথাপি তাহারা সাহস ত্যাগ করে না। তাহাদের সাহস ইহাতে জানা যায় যে তাহারা আপন ঘর হইতে এত দূর দেশে গমন করে ও লবড়িয়ার অনুগামিদেরকে বিধান রাখিয়া বিপক্ষ সৈন্যেরদের মধ্যে ২ দিয়া পাঁচ ছয় শত

ক্রোশ গমন করিয়া লুটের উদ্দেশ্য স্থানে গিয়া আপনারদের অভিলাষ পূর্ণ করে।"

[সমাচারদর্পণ—১৭ এপ্রিল ১৮১৯ (৬ বৈশাখ ১২২৬)]

"পিণ্ডারিরা যখন বিপক্ষভয়ে পলায়ন করে তখন তাহারদের আহার করণের অবকাশ ও আহারের দ্রব্যের অভাবপ্রযুক্ত পলাইবার সময়ে পথের উভয় পার্শ্বে উৎপন্ন ধান্যাদি শস্য লইয়া হাতে রগড়াইয়া যাইতে ২ খায়। যদ্যপি জল কোথাও পাওয়া যায় তবে ঘোড়া সমেত জলের মধ্যে গিয়া আপনারা তৃপ্ত হয় ও ঘোড়াকে তৃপ্ত করে কিন্তু পলাইয়া বিপক্ষভয় হইতে উত্তীর্ণ হইবামাত্র সম্মুখে যে গ্রাম ও নগর পায় তাহাতে আপনারদের সম্পূর্ণ স্বভাব প্রকাশ করে তাহাতে স্বপক্ষ বিপক্ষ বিবেচনা করে না। তাহারা যে গ্রাম হইতে যায় সেই গ্রামে গৃহাদির ধূম এবং স্ত্রীলোকেরদের হাহাকার ও রোদন ও পুরুষের কোঁকান এই ২ চিহ্ন রাখিয়া যায়। যদি তাহারা দশ বৎসর পর্য্যন্ত নির্ভয়ে নির্ব্বিঘ্নে আপনারদের ব্যবসায় হিন্দুস্থানে চালাইতে পারিত তবে এই হিন্দুস্থানের মধ্যে প্রায় সমভূমি হইত।

কেহ ২ ভাবে যে তাহারা সকল দেশের সন্ধান রাখে কিন্তু সে নহে যেহেতুক তাহারা পথে যাইতে ২ যে লোক পায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সকল ঠিকানা করে। ১৮১৬ সালে যখন বক্সু পিণ্ডারি নর্ম্মদা নদী পার হইল তখন তাহাদের ইচ্ছা ছিল যে, কৃষ্ণা ও গোদাবরী এই উভয় নদীর মধ্যবর্ত্তী নিজামের দেশ লুট করে কিন্তু পথে একজন ফকীরের সহিত সাক্ষাৎ হইল ও তাহার প্রমুখাৎ শুনিল যে জিলা গণ্টুরে অল্প সৈন্য ও অনেক সম্পত্তি আছে। ইহা শুনিয়া নিজামের দেশে না গিয়া জিলা গণ্টুরের উপরে আক্রমণ করিল এবং বাঙ্গালার অন্তঃপাতী মেদিনীপুর পর্য্যন্ত সাড়ে তিন শত ক্রোশ আসিয়া লুট করিল।

এবং সাধারণ লুটহইতে ঐ সন্ধানদাযী ফকীরকে পোনের শত টাকা দিল। ঐ ফকীর সেই টাকা লইয়া আপনারদের তীর্থস্থানে গিয়া বাস করিতেছে। ঐ সময়ে তাহারা লুটিয়া অসংখ্যক সম্পত্তি একত্র করিল ও অশেষ দৌরাত্ম্য করিল তাহারদের ফিরিয়া যাইবার সময়ে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সৈন্যের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহারদের সেই লুটিত সম্পত্তির হ্রাস হইল ও হারদের বলও অনেক ন্যূন হইল।

তাহারদের মধ্যে যে আঘাতী হয় তখনি তাহাকে ঘোড়ার উপরে চড়াইয়া য়া যায়, কিন্তু অতিশয় উপদ্রব উপস্থিত হইলে যেখানে সেখানে তাহাকে ফেলিয়া আপনারা পলায়। কোন গ্রামে পঁহুছিলে পর যে ব্যক্তি যাহা লুট করিতে পারে সে তাহারি অসাধারণ ও তাহারা যে গৃহস্থের বাটী লুট করিতে যায় সে যদি আপন ন্যস্ত টাকার সন্ধান না কহে তবে যেমন ঘোড়ার মুখে তোপড়া করিয়া বান্ধে সেইমত তাহার মুখে কাপড়ের তোপড়া করিয়া বান্ধিয়া তাহাতে ভস্ম রাখে এবং ঐ ব্যক্তিকে পশ্চাদ্ভাগে মারে তাহাতে সে দৌড়িলে নিশ্বাস প্রশ্বাসদ্বারা ঐ ভস্ম তাহার নাকে মুখে প্রবিষ্ট হইয়া যে অতি ব্যামোহ পায় এইং রূপ দুঃখ দিয়া তাহার স্থানে সম্পত্তি বাহির করিয়া লয়। এবং তাহারা নগরের বাহিরে ঘোড়া রাখিয়া নগরের মধ্যে লুট করিতে যায় সেই ঘোড়া যাহারা রক্ষা করে তাহারা ঐ লুটের তৃতীয়াংশ পায়।

গত দুই তিন বৎসর হইল সকল পিণ্ডারিরদের মধ্যে বক্সু পিণ্ডারি প্রধান ছিল, তাহার বয়ঃক্রম পঁয়ত্রিশ বৎসর মাত্র ও সে অতি সুদৃশ্য ও তাহার যেমন সাহস তদনুসারিণী তাহার বিদ্যা ছিল সে বাল্যক্রীড়া ঘোড়ার উপরে করিয়াছিল। যখন ইংগ্রণ্ডীয়েরদের হইতে পিণ্ডারিরদের বড় বিপৎ উপস্থিত হইল তখন সকল পিণ্ডারির সৈন্যেরা তাহার প্রতি এমন স্নেহ রাখিত যে অতিবিপৎ সময়ে আপনারা অনাহারে মরিয়াও অনেক কষ্টেতে আহার সঙ্গতি করিয়া বক্সুকে খাওয়াইত যখন গণ্টুর লুট করিয়া বক্সু ফিরিয়া যাইতেছিল তখন ভাটিয়া নামে আর এক পিণ্ডারি আপন সৈন্য সমেত তাহার সহিত মিলিল কিন্তু রাত্রিতে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য তাহারদের উপরে আক্রমণ করিল তাহারা সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল পরে বক্সু আপন তুরীধ্বনি করিল তাহাতে তাহার সকল সৈন্য সঙ্কেত স্থানে একত্র হইল কিন্তু ভাটিয়ার সৈন্য প্রায় মারা পড়িল। ইত্যবসরে বক্সু আপন বুদ্ধি প্রভাবে আপন সৈন্য লইয়া ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যের মধ্য দিয়া পলাইয়া আপন দেশে নির্ব্বিঘ্নে পঁহুছিল। গণ্টুরের লুটেতে বক্সুর সিফাহীরা প্রতিজন দুই হাজার টাকা করিয়া পাইল।

এই প্রকার মধ্যম হিন্দুস্থানীয় লোকেরদের অনেক দিন পর্য্যন্ত দুঃখ হইতেছিল, দুই বৎসর হইল শ্রীশ্রীযুত অনেক আয়োজন করিয়া সেই দুষ্ট পিণ্ডারিরূপ ব্যাঘ্রের মুখ হইতে হিন্দুস্থানকে উদ্ধার করিয়াছেন। সম্প্রতি মধ্যম হিন্দুস্থানে নির্ভয়ে নানাপ্রকার বাণিজ্য বৃদ্ধি হইতেছে ও কৃষিকর্ম্ম চলিতেছে ও পূর্ব্বে যেখানে পিণ্ডারির ভয়প্রযুক্ত লোক যাতায়াত করিতে পারিত না এখন সেখানে অনায়াসে নির্ভয়ে লোকেরা গমনাগমন করিতেছে। এখন সেই পিণ্ডারিসমূহ আপনং প্রাণ হারাইয়াছে। যেমন ভারি কাষ্ঠাদিতে চাপা তৃণ সেই কাষ্ঠ উঠাইলে পুনর্ব্বার অঙ্কুরিত হয় তেমনি মধ্যম হিন্দুস্থানে উত্তরোত্তর অঙ্কুরিত হইতেছে।"

[উপরি উল্লিখিত বিবরণটি হইতে পিণ্ডারিদিগের বিষয় প্রায় মোটামুটি সবই জানা গেল। এইবার তাহাদিগের অত্যাচারের কাহিনী এবং ইংরাজগণ কর্ত্তৃক তাহাদের পরাজয়ের বিবরণ সংবাদপত্রে কিরূপে প্রকাশিত হইত তাহা আমি "সমাচারদর্পণের" পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত করিলাম।]

[১৭ জুলাই ১৮১৯। ৩ শ্রাবণ ১২২৬]

পশ্চিম দেশের সমাচার

"নর্ম্মদা নদীর নিকটস্থ দেশের পত্রের দ্বারা ইহা জানা গিয়াছে যে সে দেশে পূর্ব্ব কাল হইতে এখন যে বৈলক্ষণ্য হইয়াছে সে অত্যাশ্চার্য্য। যখন ইংগ্রণ্ডীয়েরা প্রথম সেখানে গেলেন তখন পিণ্ডারিরদের ভয়ে তাহারা আপনং ছাউনির বাহির হইতে পারিতেন না এবং সেখানকার ক্ষুদ্র ২ গ্রামস্থ প্রজারাও পিণ্ডারিরদের ভয়ে গ্রামের নিকট ভূমিতে যাইতে পারিত না যেহেতুক তাহারা গ্রামের মধ্যে কোন স্থানে উচ্চ কাষ্ঠ পুঁতিয়া রাখিয়াছিল তাহার উপরে চড়িয়া তাহারা চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত যখন পিণ্ডারিরদের সন্ধান পাইত তখনি কৃষিকর্ম্ম ছাড়িয়া গ্রামের মধ্যে পলাইত মাঠে কদাচ থাকিত না। সংপ্রতি ঐ প্রজারা অকুতোভয় হইয়া যাহার যেখানে ইচ্ছা সে সেখানে কৃষ্যাদি করিয়া আপনং পরিজনের ভরণপোষণ করিতেছে এবং কাহারো ধন সঞ্চয় হইলে তাহারা মৃত্তিকার নীচে পোঁতে না এবং তাহারদের স্ত্রী

ব্যাপারিরা এখন নির্ভাবনাতে বাহিরে গমনাগমন করিতেছে। তথাপি সে দেশের দুষ্ট সঙ্গী অথচ কৃতঘ্ন লোকেরা আপন স্বভাব পরিত্যাগ করে নাই যেহেতুক তাহারা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের নিকটে কোন আহারীয় দ্রব্য বিক্রয় করে না তাহারদের মধ্যে এক জন প্রধান প্রজা মানসিংহ নামে ; তাহার এত খাদ্য সঞ্চিত আছে যে তাহার দ্বারা ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যের অনেক দিনের খরচ চলিতে পারে সে তাহার কিঞ্চিৎও বিক্রয় করে না।"

[২৭ নবেম্বর ১৮১৯। ১৩ অগ্রহায়ণ ১২২৬]

গত পিণ্ডারিরদের যুদ্ধের লুট

"পিণ্ডারিরদের সহিত গত যুদ্ধে কেবল সাত হাজার টাকা মাত্র পাওয়া গিয়াছে সেও কেবল ক্ষুদ্র২ ঘোড়া ও গরু বিক্রয় দ্বারা। এবং ছাউনিতে আরং যে ধন ছিল তাহা যে সৈন্যেরা লুট করিয়াছিল তাহারাই তাহা বাঁটিয়া লইয়াছে অবশিষ্ট এই মাত্র পাওয়া গিয়াছে। এই টাকা যদি সৈন্যের মধ্যে বাঁটিয়া দেওয়া যাইত তবে প্রতিজন আট২ আনা করিয়াও পাইত না। তৎকালে সৈন্যের মধ্যে এক সিপাহী কহিয়াছিল যে পিণ্ডারিরদের পশ্চাতে২ দৌড়িতে আমাদের যে পায়ের জুতা ক্ষয় হইয়াছে এই লুটে তাহার মূল্যও আদায় হইল না।"

[২৯ জানুয়ারি ১৮২০। ১৭ মাঘ ১২২৬]

পিণ্ডারি

"দক্ষিণ দেশ হইতে সমাচার আসিয়াছে যে শেখ দৌলা নামে একজন পিণ্ডারিরদের সরদার কতকগুলি ঘোড়সওয়ার সঙ্গে লইয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের খাদ্যসামগ্রী প্রভৃতি কতক জিনিস লুঠ করিয়া লইয়াছে।"

[২৯শে এপ্রিল, ১৮২০। ১৮ই বৈশাখ, ১২২৭]

পিণ্ডারি

"শেখ দুল্লা নামে মহাদুরন্ত পিণ্ডারি পূর্ব্বে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের নিকট হইতে পলাইয়াছিল। সংপ্রতি তাহার সমাচার পাওয়া গেল যে সেই দুষ্ট পিণ্ডারি পুনর্ব্বার দেখা দিয়াছে এবং তাহাকে ধরিবার কারণ ইংগ্লণ্ডীয়েরা দুই শত ঘোড়সোয়ার ও পাঁচ শত সিপাহী পাঠাইয়াছিলেন, পরে এক স্থানে রাত্রিযোগে সেই পিণ্ডারিরদের সহিত যুদ্ধ হওয়াতে পিণ্ডারিরা পরাস্ত হইলে শেখদুল্লা আর তাহার সঙ্গে তিন জন পলাইয়াছে তাহারদের সাত জন খুন হইয়াছে তিন জন আঘাতী হইয়াছে এবং পাঁচ পুরুষ ও দুই বালক ও দুই স্ত্রী ও ষোল ঘোড়া এবং তাহারদের আর আর অনেক সম্পত্তি ইংগ্লণ্ডীয়েরা ধরিয়া আনিয়াছেন। ঐ শেখ দুল্লার সহিত যে সকল সৈন্য মিলিয়াছিল তাহারাও ডাকাইত ছিল, ঐ সরদার শেখদুল্লার সহিত মিলিয়া মধ্যে ২ ডাকাইতি করিতেছিল কিন্তু শেষে তাহার প্রতিফল পাইয়া পলাইল।"

[২৭শে মে ১৮২০। ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২২৭]

শেখ দুল্লা পিণ্ডারি

"শেখ দুল্লার বিষয় এই শুনা গেল যে সে একাকী এক চাকর তাহার সঙ্গে বস্ত্রহীন ও অস্ত্রহীন হইয়া পলাইতেছে। ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত যুদ্ধের শেষ বিবরণ এই। যখন সে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য হইতে ছত্রিশ ক্রোশ দূর ছিল তখন তাহার সন্ধান পাওয়া গেল এবং ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি তাহার লোকদিগকে ধন দিয়া তাহারদের দ্বারা তাহার স্থির সন্ধান পাইলেন ও অকস্মাৎ তাহার উপরে আক্রমণ করিলেন। শেখ দুল্লা ও তাহার চাকরেরা দুর্গম স্থানে ছিল ও ভাবিয়াছিল যে কেহ এথানে আসিতে পারিবে না এবং আপনারদের বাসস্থানের চতুর্দ্দিকে চৌকী রাখিয়াছিল কিন্তু দৈবাৎ এক স্থানে চৌকী ছিল না সেই পথ দিয়া ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য প্রবেশ করিল। শেখ দুল্লা ও তাহার অধীন লোকেরা আপনারদের অস্ত্র শস্ত্র খাদ্য প্রভৃতি সকল ফেলিয়া পলাইল এবং শেখ দুল্লা আপন গলার কবচ পর্য্যন্ত ছাড়িয়া গেল। সে স্থানে বড় জঙ্গল ছিল তৎপ্রযুক্ত কেহই ধরা পড়িল না।

শেখ দুল্লার পক্ষের বার লোক খুন হইল ও অনেক লোক আঘাতী হইল। এবং তাহার পোষ্য পুত্র সাত বৎসর বয়স্ক বালক অনাঘাতী এক ঘরে পাওয়া গেল।......সে বালক এখন ইংগ্লণ্ডীয়েরদের পোষ্য পুত্র হইয়াছে। সে বালক যে সাহেবের হস্তে পড়িয়াছে তিনি কহেন যে এই বালক অতি সুন্দর ও সুশিক্ষিত ও জ্ঞানবান্।

আসীরগড় হইতে সমাচার আসিয়াছে যে শেখ দুল্লা আপনি করনল আড্রুস সাহেবের হস্তে সমর্পিত হইতে বাসনা করিয়া যাইতেছিল ইতিমধ্যে পথে তাহার এক আত্মীয় লোক তাহাকে বারণ করিয়া কহিল যে তুমি যাইবামাত্র ইংগ্লণ্ডীয়েরা তোমাকে ফাঁসি দিবেক। তাহা শুনিয়া শেখ দুল্লা কহিল যে কি ফাঁসি দিবে, কি ফাঁসি দিবে, এই কথা বার বার কহিতে ২ ফিরিয়া গেল।"

[১৭ জুন ১৮২০। ৫ আষাঢ় ১২২৭]

পিণ্ডারির সরদার চিতু

"কাপ্তান ওয়াটসন সাহেব যখন নর্ম্মদা নদী তীরে সসৈন্যে ছিলেন তখন তিনি পিণ্ডারিরদের সরদার চিতুকে এমন বেষ্টন করিয়াছিলেন যে তাহ, সে আর কোন উপায় না পাইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। কাপ্তান সাহেবের হরকরা আসিয়া যখন তাঁহাকে চিতুর বিষয় সন্ধান বলিল তখন তিনি সৈন্য লইয়া তাহাকে ধরিবার কারণ গেলেন এবং ঐ সরদার যে কান্টাপুরের বনে আছে ইহা নিশ্চয় জানিয়া সেই স্থানে গেলেন এবং অগম্য বনে গিয়া দেখিলেন যে সেখানে সে ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে কেবল কতক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাত্র পড়িয়া আছে। পরে তাহারা পরিচ্ছদ ও কিরিচ ও ঘোড়া ইত্যাদি লইয়া তাহার পুত্র মহম্মদ পন্নাকে ও যুদ্ধলব্ধ পিণ্ডারিরদিগকে দেখাইলে তাহারা কহিল যে এই সকল চিতুর বটে। পরে কাপ্তান সাহেব তাহার ঘোড়া ও অঙ্গুরি ও কতক কাগজ পত্রাদি লইয়া তাহার পুত্র মহম্মদ পন্নার সহিত শ্রীযুক্ত সর জন মালকম সাহেবের নিকট পাঠাইলেন এবং তাহার কিরিচ শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের নিকট পাঠাইলেন।"

[৫ ডিসেম্বর ১৮১৮। ২১ অগ্রহায়ণ ১২২৫]

"... ... ... পিণ্ডারিদের নাশহেতুক রাজপুতানাতে লোকেরা এখন ক্রমে ২ সুখানুভব করিতেছে এবং এক বৎসরের পূর্ব্বে যে দেশ নিঃশব্দ ছিল সে দেশে স্থানে ২ সম্প্রতি মনুষ্য ও গৃহ ও লাঙ্গল ও গরু ও স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি সকল দেখা যাইতেছে এবং যে২ স্থানে গৃহমাত্র ছিল সেখানে ক্রমে ক্রমে লোক সঞ্চার হইতেছে। পিণ্ডারিরদের কেবল এক বৎসরের ঔদ্ধত্যতে সে দেশের এমত দুরবস্থা হইয়াছিল সে নয় কিন্তু তাহারা ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিবৎসর আসিয়া সে দেশে এমত দৌরাত্ম্য করিত।"

[৬ মার্চ্চ ১৮১৯। ২৪ ফাল্গুন ১২২৫]

রাজপুতানা

"আগরা হইতে আগত ৬ ফেব্রুয়ারি তারিখের পত্রে এই জানা গেল যে মথুরা ও আগরা হইতে আজমের প্রভৃতি রাজপুতানা দেশের লোকেরা নির্ভয়রূপে গমনাগমন করিতেছে, যেমন কলিকাতা হইতে মুরশেদাবাদ পর্য্যন্ত লোকেরা গমনাগমন করে। পূর্ব্বকালে পথ এমত নির্ভয় ছিল না যেহেতুক তখন পিণ্ডারি প্রভৃতির দৌরাত্ম্যপ্রযুক্ত পথ বড় সভয় ছিল। ... ..."

... ...

ইহার পর আর বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

ঈশানচন্দ্র

—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

উপক্রমণিকা

ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ কবি গ্রে লিখিয়াছেন,

"Full many a gem of purest ray serene
The dark unfathom'd caves of ocean bear;
Full many a flower is born to blush unseen,
And waste its sweetness on the desert air."

"অতল জলধি-গর্ভে গাঢ়-নীল-জলে
দীপ্তিমান্ চুনী পান্না মণি কত জলে!
দুরন্ত মরুভূ-মাঝে ফুল্ল ফুল-কুল,
বিস্তারি সুগন্ধ হয় বিচ্যুত-মুকুল!"

কালসমুদ্রের অতল গর্ভে সাহিত্যের কত উজ্জ্বল রত্ন সাধারণের অদৃশ্য হইয়া আছে। অরসিক পাঠক সমাজের অবহেলা ও অনাদরের মধ্যে কত প্রতিভা-প্রসূন সৌরভ বিস্তার করিয়া অকালে ঝরিয়া পড়িয়াছে!

ঈশানচন্দ্রের ন্যায় শক্তিশালী কবির কাব্যালোচনা করিতে গেলে স্বতঃই এই কথা স্মরণপথে উদিত হয়। আমাদের বেশ মনে পড়ে, 'অশ্রুকণার' কবি গিরীন্দ্রমোহিনীর স্বর্গারোহণের কয়েক মাস পূর্ব্বে একদিন তাঁহার সহিত বাঙ্গালা কাব্যের আলোচনা করিতেছিলাম, তিনি অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন যে, আজিকালিকার পাঠকগণ রঙ্গলাল, ঈশানচন্দ্র প্রভৃতি কবির রচনার সহিত পরিচয় স্থাপন করেন না, কিন্তু পরিচয় স্থাপন করিলে তাঁহারা যথার্থ কাব্যামৃতরসাস্বাদ লাভ করিতে পারিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন, তিনি ঈশানচন্দ্রের কাব্যের অত্যন্ত গুণপক্ষপাতিনী ছিলেন এবং আধুনিক পাঠকগণ কেন যে তাঁহার কাব্য পাঠ করেন না তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না। অবশ্য ইহার একটি কারণ এই যে, ঈশানচন্দ্রের কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে বোধ হয় পুনর্মুদ্রিত "যোগেশ" ব্যতীত সমস্ত গ্রন্থই এখন দুষ্প্রাপ্য। কবির স্বর্গারোহণের পর "যোগেশ"এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল ১৩১০ বঙ্গাব্দে। পঁচিশ বৎসরেও তাহার পুনর্মুদ্রণের কারণ ঘটে নাই। কিন্তু, এদেশে কাব্যের আদর এইরূপই। য়ুরোপ হইতে প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করিয়া আনিলে বাঙ্গালী পাঠকগণ হয়ত তাহার প্রতি অনুগ্রহ-দৃষ্টি পাতিত করিতে পারেন, নতুবা নহে।

সাধারণ পাঠকের নিকট ঈশানচন্দ্রের কাব্যগ্রন্থাবলী আজ অনাদৃত হইলেও, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক সাহিত্যাচার্য্যের নিকট তাঁহার নাম অপরিচিত থাকিলেও, বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন প্রভৃতি কাব্যরসিকগণ ঈশানচন্দ্রের

কবি ঈশানচন্দ্র।

কবি-প্রতিভার অতি উচ্চ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। অকালে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ না করিলে যে তিনি বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যকে অধিকতর সমৃদ্ধিশালী করিয়া যাইতে পারিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। অপরিণত বয়সের রচনাতেও তিনি যে কল্পনাশক্তির, যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। আমরা তাঁহার কাব্যপাঠে যে প্রচুর

আনন্দ লাভ করিয়াছি, বর্ত্তমান আলোচনা যদি কোনও পাঠকের কৌতূহল উদ্রেক করিয়া তাঁহাকে তাঁহার কাব্যপাঠে উন্মুখ করে তাহা হইলে আমাদের শ্রম সার্থক হইবে।

জন্ম ও বংশপরিচয়

সন ১২৬২ সালে ৩রা চৈত্র, শুক্রবার, কলিকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠে, খিদিরপুরে, কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুজ ঈশানচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। কিন্তু, তাঁহার জননী আনন্দময়ী রাজবলহাটের গুলিটা-গ্রামনিবাসী রাজচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর একমাত্র সন্তান ছিলেন বলিয়া সকলেই রাজচন্দ্রের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতেছিলেন। রাজচন্দ্র মোক্তারী করিতেন এবং খিদিরপুরে তাঁহার একটি সামান্য আবাসভবন ছিল। রাজবলহাটে তাঁহার কিছু জমি ও কয়েক ঘর যজমানও ছিল। তিনি ধনী না হইলেও সদাশয় ও নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং

কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জননী আনন্দময়ী দেবী।

কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি কবিতা-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে তিনি বৎসর বৎসর দুর্গোৎসব করিতেন।

কৈলাসচন্দ্রের পৈতৃক ভবন ছিল উত্তরপাড়ায়। কয়েক বৎসর হইল কবিবর হেমচন্দ্রের অনুরাগীদিগের উদ্যোগে এই ভবনের সম্মুখে একটি স্মৃতিশিলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ঈশানচন্দ্র তাঁহার জনক-জননীর কনিষ্ঠ সন্তান এবং উভয়েরই অত্যন্ত আদরের ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতাভগ্নীদের নাম :

(১) হেমচন্দ্র—'বৃত্রসংহার'এর মহাকবি ও হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠাপন্ন উকীলরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

(২) পূর্ণচন্দ্র—এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন, পরে কাশীধামে স্বাধীন ভাবে চিকিৎসাকার্য্যে রত হইয়াছিলেন।

(৩) যোগেন্দ্রচন্দ্র—অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

(৪) বসন্তকালী—অল্পবয়সে বিধবা হইয়া পিতৃগৃহে আসেন।

(৫) নৃত্যকালী—ইনিও অল্পবয়সে বিধবা হন এবং পিতৃগৃহে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন।

শিক্ষা

ঈশানচন্দ্র অপেক্ষা হেমচন্দ্র ১৭ বৎসরের বড় ছিলেন। হাইকোর্টে কর্ম্মক্ষেত্রে এবং সাহিত্যজগতেও হেমচন্দ্র এত দ্রুত গতিতে উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন যে ঈশানচন্দ্রের জ্ঞানোদয় হইবার পরে তাঁহাকে সংসারের দারিদ্র্য-দুঃখ অনুভব করিতে হয় নাই। যে দারিদ্র্যের পাঠশালায় তাঁহার অগ্রজ হেমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র তাঁহাদের জীবন গঠিত করিয়াছিলেন, ঈশানচন্দ্রকে সেখানে জীবন গঠিত করিতে হয় নাই। তিনি তাঁহার জননী ও অগ্রজগণের স্নেহ অত্যধিক মাত্রায় উপভোগ করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ তাঁহার ১২।১৩ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ ঘটিলে, এই স্নেহের মাত্রা অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ফলে বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকাদি পাঠে তিনি অমনোযোগী হইয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত কলেজ সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে এবং হিন্দু স্কুলে কিছুকাল পাঠ করিয়াছিলেন বটে, এবং তাঁহার "যোগেশ" কাব্যের 'উৎসর্গ' পাঠে ইহাও প্রতীত হয় বটে যে শেষোক্ত বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক হরলাল রায় মহাশয়ের উপদেশে তিনি যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি বিশ্ববিদ্যা-

লয়ের কোন উপাধিলাভের যোগ্যতা অর্জন করিতে পারেন নাই।

কিন্তু, অন্যবিধ উপায়ে তিনি উচ্চতম শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অগ্রজ হেমচন্দ্র অহোরাত্র নানাবিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিতেন, এমন কি আহারকালেও তিনি পুস্তক উন্মুক্ত করিয়া পাঠ করিতে করিতে ভোজন করিতেন। তাঁহার বৈঠকখানায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণের সহিত তিনি অধীত গ্রন্থাদির আলোচনা করিতেন। এই সকল আলোচনা—দর্শন, ইতিহাস, কাব্য ও সাহিত্যের সমালোচনা—ঈশানচন্দ্র উদ্‌গ্রীব হইয়া শ্রবণ করিতেন এবং সমালোচিত গ্রন্থগুলি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিতেন। এইরূপে তিনি সে যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষিগণের সহিত সমান ভাবে মিশিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

বিবাহ

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে, কি সমাজে, কি সাহিত্যজগতে, হেমচন্দ্রের অতুলনীয় প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ হইয়াছিল। তিনি তখন 'অবকাশরঞ্জিনী'র কবির ভাষায়,

> "বারের উজ্জ্বল রবি
> বঙ্গদর্শনের কবি"

এবং সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধার আধার। সুতরাং যে উত্তরপাড়ার এক দরিদ্রবংশে হেমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই উত্তরপাড়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জমীদারবংশ তাঁহার সহিত কুটুম্বিতা সংস্থাপনে অগ্রসর হইবেন ইহাতে আশ্চর্য্য কি? উত্তরপাড়ার স্বনামধন্য জমীদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অন্যতম ভ্রাতা বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,—যাঁহার উৎসাহে ও প্রচেষ্টায় উত্তরপাড়ায় বালিকাবিদ্যালয়, হিতকরী সভা, পোষ্ট অফিস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যিনি ৩৩ বৎসর কাল উত্তরপাড়া মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য, সেক্রেটারী, প্রথম বে-সরকারী ভারতীয় ভাইস্ চেয়ারম্যান্ ও চেয়ারম্যান্-পদ অলঙ্কৃত করিয়া স্বীয় গ্রামের অশেষ উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন,—তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা কুসুমকুমারীকে হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দ্রের সহিত বিবাহ দিতে উৎসুক হইলেন। পরলোকগত বিচারপতি স্যার প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হেমচন্দ্রের বিশিষ্ট বন্ধু ও হাইকোর্টের উকীল খ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হেমচন্দ্রের নিকট এই বিবাহের প্রস্তাব করেন এবং তিনি উহার অনুমোদন করেন। বিজয়কৃষ্ণের এক পুত্রের সহিত সেকালের প্রসিদ্ধ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের কন্যার, আর এক পুত্রের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের কন্যা নীলাব্জকুমারীর এবং অপর এক পুত্রের সহিত স্যার প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার বিবাহ হয়।

ঈশানচন্দ্র ভ্রাতৃগৃহে যেরূপ সাহিত্যচর্চ্চার সুযোগ পাইয়াছিলেন, শ্বশুরালয়েও সেইরূপ পাইয়াছিলেন, কারণ

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (তরুণ বয়সে)।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের অসীম সাহিত্যানুরাগ ছিল। সে সাহিত্যানুরাগের নিদর্শন উত্তরপাড়া লাইব্রেরী—যেখানে কত দেশীয় ও বিদেশীয় গবেষণাকারী তাঁহাদের গবেষণায় সাহায্য লাভ করিয়াছেন। আর একটী নিদর্শন ছিল উত্তরপাড়া হিতকরী সভা—যেখানে কত দেশীয় ও বিদেশীয় বিবুধমণ্ডলী নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন।

কুসুমকুমারীর গর্ভে ঈশানচন্দ্রের ৫টী পুত্র ও ২টী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে তিনজন পুত্র শ্রীযুক্ত বিমানচন্দ্র, শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ও নির্ম্মলচন্দ্র এখন বর্ত্তমান আছেন।

কবিতা-রচনায় আনন্দ। 'এডুকেশন গেজেট' ও 'বান্ধব'

তাঁহার অগ্রজ কবিবর হেমচন্দ্রের উজ্জ্বল আদর্শ সর্ব্বদা মানসনয়নের সম্মুখে থাকায় ঈশানচন্দ্র বাল্যকাল হইতে কবিতা-রচনার চেষ্টা করিতেন। তিনি তাঁহার প্রথম কাব্য-গ্রন্থ "চিত্তমুকুরে"র বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন, "কবিতা-রচনায় গ্রন্থকারের আশৈশব আমোদ; বাল্যাবস্থা হইতেই বনের ফুল, জলের ঢেউ, আকাশের দামিনী ইত্যাদি বস্তু দেখিয়া গ্রন্থ-

ঈশানচন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কারের হৃদয় নাচিয়া উঠিত এবং অবসর পাইলেই সেই হৃদয় উচ্ছ্বাসগুলি, সুধু তাহাই কেন স্নেহ, আশা, নৈরাশ্য, ক্ষোভ ও ভয় প্রভৃতি হৃদয়ের কোমল প্রবৃত্তিগুলি, কবিতায় প্রকটিত করিয়া নিজেই আমোদ অনুভব করিত।"

প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেটে' হেমচন্দ্রের ভারতসঙ্গীত প্রভৃতি বহু কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। ঈশানচন্দ্র ও তাঁহার প্রথম কবিতাগুলি 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশিত করেন। পরে বঙ্গের কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের "বান্ধব" পত্রের সহিত তাঁহার সংযোগ ঘটে। কালীপ্রসন্ন ঈশানচন্দ্রের কবিতার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। নিম্নোদ্ধৃত পত্র দুইখানি হইতে পাঠকগণ এই অনুরাগের পরিচয় পাইবেন :—

[১]

ঢাকা
বান্ধব কার্য্যালয়
২০ জুলাই ১৮৭৬

প্রিয় ঈশানবাবু!

যদি অপাত্রে অনুগ্রহ করিয়া পরিক্লান্ত হন, তবে আমায় আর স্মরণ করিবেন না; আর যদি এই অহেতুকী শ্রদ্ধাই আপনার প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি হয়, তবে আশা করিতে পারি চিরদিনই এইরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন।

আপনার 'অকাল কোকিল' আমার নিকট রহিয়াছে। আপনাকে বলা বাহুল্য যে আপনার লেখায় কেমন একটু তান আছে, তাহা আমি বড় ভালবাসি। আপনি একবার কোন ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন পূর্ব্বক বান্ধবে একটি দীর্ঘ কবিতা দিবেন। ঐরূপ কবিতা না হইলে আপনার সমুচিত বিকাশ হইবে না। অকাল কোকিলের মত আরও দুটি কবিতা আমি উপহার পাইয়াছি। তন্মধ্যে একটি জঘন্য আর একটি উৎকৃষ্ট, কিন্তু আপনার অকাল কোকিলের নিকট হীনপ্রভ হইবে। যখন মুদ্রিত করি, তখন দুইটিই একসঙ্গে মুদ্রিত করিব কি না ভাবিতেছি।

আপনি যে কয়টি নূতন গ্রাহকের নাম দিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট বান্ধব পাঠান হইয়াছে। আপনার শারীরিক মঙ্গল লিখিয়া সুখী করিবেন।

একান্ত আপনার
শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ।

[২]

প্রিয় ঈশানবাবু!

আপনার পত্র পাইয়া পরম আপ্যায়িত হইলাম। পত্রমধ্যে * * মূল্যের যে টিকিট ছিল, তাহা বান্ধব আফিসে জমা করিয়া দিয়াছে।

আপনি শিবজীর বিষয় আপাততঃ লিখিবেন না। সকলেই শিবজীর নাম গাহিয়া থাকেন; সুতরাং শিবজীর নামে নূতনত্ব থাকিবে না। যদি আমার পরামর্শ গ্রহণ করেন, তবে পৃথুরাজের সৈন্যপতি বীরচূড়ামণি সমরশায়ীকে অবলম্বন করিয়া সুদীর্ঘ একটি কবিতা লিখুন; দুই তিনবারে প্রকাশ করিব। সমরশায়ীর বিষয় টড্ সাহেবের রাজস্থানে সবিস্তার পাইবেন। অথবা আমার বলা অধিকন্তু, কারণ এ সকল কথা আমা অপেক্ষা আপনারা অবশ্যই অধিক জানেন। সমরশায়ী স্বদেশের হিতকামনায় যোগতম সমরব্রত উদ্যাপন করিয়া কাগুরার নদীর তটে সমরশয্যায় শয়ান হন। যদি আপনি লিখেন, তবে এই একটি কবিতাতেই যশস্বী হইবেন; পৃথুরাজের অজিনীর সহিত

সমরশায়ীর প্রেম, সমরশায়ীর স্বদেশ-বাৎসল্য, উগ্রতেজঃ, রণনৈপুণ্য ইত্যাদি কথা ঐতিহাসিকের লেখনীতেই কবিতায় কমনীয় কান্তি লাভ করিয়াছে; কবির তুলিকায় উহা কিরূপ চিত্রিত হইবে তাহা স্মরণ করিতেই আমার হৃদয় উল্লসিত হইয়া উঠে।

বান্ধবের প্রতি আপনার এবং সাহিত্যসমাজের যে স্নেহদৃষ্টি রহিয়াছে, ইহা আমার আশার অতীত। ভরসা করি, এ অনুগ্রহের স্রোতে শীঘ্রই ভাটা লাগিবে না।

আমি আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে লিখি না সে লজ্জায়, শিষ্টাচারের অনুরোধে রোজ মিথ্যা বলা যায় না। আর "ভাল আছি" বলিয়া লিখিতেও আমার অধিকার নাই। এই তিন চারি মাস যাবৎ আমি বড়ই কাহিল আছি, আজ এইটুকু কালি এইটুকু এই অবস্থা।

আপনি কেমন আছেন, লিখিয়া সুখী করিবেন। কোন দিন আপনি যখন সুকবি বলিয়া বঙ্গসমাজে সমাদৃত হইবেন, যশের ঢক্কা একদিনে বাজে না,—তখন বিলুপ্তনামা বান্ধবকে স্মরণ হইবে কি?

এবান্ত আপনার

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ।

কালীপ্রসন্ন ঘোষের পত্রে উল্লিখিত 'অকাল কোকিল' ও 'সমরসাহীর বিদায়' শীর্ষক কবিতাগুলি ঈশানচন্দ্রের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চিত্তমুকুরে' সন্নিবিষ্ট হয়। আমরা এক্ষণে সেই কাব্যগ্রন্থখানির পরিচয় দিব।

চিত্তমুকুর

"চিত্তমুকুর" 'পদ্য গ্রন্থ' খানি কলিকাতা ৪৪ নং বেনিয়াটোলা লেনে রায় যন্ত্রে আশুতোষ ঘোষাল কর্তৃক মুদ্রিত হইয়া ১২৮৫ সালে প্রকাশিত হয়। উহাতে গ্রন্থকারের নামের উল্লেখ ছিল না। কিন্তু উৎসর্গ-পত্রে লেখক আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। উৎসর্গ-পত্রটি এইরূপ:—

"পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্রজ মহাশয়!

আর্য্য! সংসারে যদি কাহাকেও দেবতুল্য ভাবিয়া থাকি তবে সে আপনি—যদি সদ্গুণের পক্ষপাতী হইয়া কাহাকেও অবনত হৃদয়ে পূজা করিতে ইচ্ছা থাকে সেও আপনি—উন্নত প্রকৃতি দেখিয়া যদি কাহারো পদাবনত হইতে ইচ্ছা হইয়া থাকে সেও আপনি। প্রথমত, অগ্রজ বলিয়া চিত্তমুকুর আপনারই অর্চ্চনার উপকরণ; দ্বিতীয়ত, যে মহাত্মা এত সদ্গুণ বিভূষিত তিনিও উপাস্য। ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে চিত্তমুকুর আপনাকেই অর্পণ করিলাম; কনিষ্ঠ বলিয়া আমার প্রতি যেরূপ স্নেহদৃষ্টি আছে চিত্তমুকুরের প্রতি সেই স্নেহদৃষ্টি থাকিলে আর একটি নূতন সুখে সুখী হইব।"

আপনার স্নেহের

শ্রী:—

তরুণবয়স্ক গ্রন্থকার তাঁহার এই প্রথম উদ্যম লোকসমাজে প্রকাশ করিতে স্বভাবতঃই সঙ্কোচ অনুভব করিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি তাঁহার কবিবন্ধু 'পলাশীর যুদ্ধে'র কবি নবীনচন্দ্রের পরামর্শ গ্রহণ করেন। নবীনচন্দ্র তাঁহাকে লিখেন:—

ঈশানচন্দ্রের তৃতীয় ভ্রাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরী—সমুদ্রতীর।

১৮ই আগষ্ট ১৮৭৮।

প্রিয় ঈশান,

বঙ্গদেশে গ্রন্থকারের অভাব থাকুক আর না থাকুক, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সমালোচকের অভাব নাই। বঙ্গদর্শনের ভূতপূর্ব্ব ক্ষণজন্মা সম্পাদক হইতে ঐ "আড্ডা বিহারিণী পত্রিকা"র সম্পাদক পর্য্যন্ত সকলেই সমালোচক। অতএব তুমি যদি তোমার কবিতাগুলি প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়া থাক, তবে প্রকাশের পূর্ব্বে আমার কি অন্য কাহারো মত জানিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ তোমার কবিতাগুলিতে "যুক্তাক্ষর ট ঠ ড ঢ ণ র ব ইত্যাদি অক্ষরের অধিক প্রণয়" আছে কি না আমার স্মরণ নাই। যে

ছিন মাত্র একজন সমালোচক অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে "সুকবিজনোচিত রচনাতে এরূপ প্রণয় অমার্জ্জনীয়।" এমত অবস্থায় তোমার কবিতা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়া কেন আমি তীব্র কটাক্ষভাজন হইতে যাইব?

তবে একটা কথা বোধ হয় বলিতে পারি। তোমার যে সকল কবিতা আমি তোমার মুখে শুনিয়াছি—যুক্তাক্ষর থাকিলেও তাহাদের কবিত্বে এবং লালিত্যে আমি মোহিত হইয়াছিলাম। আমার বোধ হইয়াছিল যেন কবিতা স্রোতের ন্যায় বহিয়া গিয়াছে, কোন স্থানে কষ্ট-কল্পনার চিহ্ন নাই, বরং স্মরণ হয়, স্থানে স্থানে কবিত্ব-শক্তির সুন্দর বিকাশ দেখিয়াছিলাম। বড় সুখের

নৃত্যকালী ও বসন্তকালী (ঈশানচন্দ্রের ভগিনী-দ্বয়)।

হইত যদি তোমার সুললিত আবৃত্তি-শক্তি এ কবিতার সঙ্গে প্রকাশ করিতে পারিতে।

তোমার বন্ধুতাভিলাষী

নবীন।

"চিত্তমুকুর" গ্রন্থখানি ১৪৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। উহাতে নিম্নলিখিত কবিতাগুলি মুদ্রিত হইয়াছিল—

(১) কলঙ্কী জয়চন্দ্র ; (২) চিতাশয্যা ; (৩) অভাগিনী ; (৪) উদাসীন ; (৫) নলিনী আত্তিকা ; (৬) কে গাহিল ; (৭) দুঃখিনী রমণী ; (৮) সুন্দরের গৌতা ; (৯) অকস্মাৎ সে তারাটি ডুবিল কোথায় ; (১০) সুন্দর হইয়ে কেন হইল চপল ; (১১) আশা তৃষ্ণা প্রাণেশ্বরী কর বিসর্জ্জন ; (১২) অকাল কোকিল ; (১৩) হৃদয়ে হৃদয়ে যদি সম্ভবে উত্তর ; (১৪) সময়সাহীর বিদায় ; (১৫) প্রেমপ্রপাত ; (১৬) সায়াহ্ন চিন্তা ; (১৭) একখানি চিত্র-পট দর্শনে ; (১৮) নির্ম্মীর্ষ বিলাপ ; (১৯) স্বপ্ন প্রতিমা ; (২০) হিতকরী সভার সাম্বৎসরিক সম্মিলন উপলক্ষে ; (২১) পুষ্পমালা উপহার পাইয়া ; (২২) আমি ত উন্মাদ নই, উন্মাদ জগৎ ; (২৩) কুলীন কামিনী।

ঈশানচন্দ্রের প্রথম রচনাগুলিতে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের রচনাভঙ্গীর সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। অবশ্য তাঁহার সকল রচনাতেই তাঁহার নিজস্ব বিশেষত্ব আছে। উপরিধৃত তালিকা হইতে প্রতীত হইবে যে ঐতিহাসিক, দেশভক্তি-মূলক, সামাজিক ও প্রেম-বিষয়ক নানাবিধ কবিতা তিনি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রেমের কবিতাগুলির কতকগুলি পরকীয়া প্রেমাত্মিকা হইলেও আন্তরিকতা ও মাধুর্য্যে অতুলনীয়া। এমন কি, উহা পাঠ করিলে মনে হয়, উহা কবির সত্যকারের অভিজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন এবং তাঁহার জীবনের সহিত উহার যোগ আছে। বোধ হয়, এই জন্যই তরুণ গ্রন্থকার সাবধানতা অবলম্বন করিয়া (১১) ও (১৩) সংখ্যক কবিতার পাদটীকায় লিখিয়াছিলেন, "গ্রন্থমধ্যে এরূপ যে দুই একটি কবিতা আছে গ্রন্থকারের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। অন্মদীয় জীবনের ঘটনার সহিত সম্পর্ক থাকিতে পারে।"

'সায়াহ্ন চিন্তা'য় একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন,—

"সাহিত্য বিলুপ্ত-প্রায় তথাপি এখানে
ছিন্ন বস্ত্র বিমণ্ডিত তালের পাতায়,
যে কবিত্ব যে পাণ্ডিত্য পড়ে অযতনে,
(ই)উরোপে নাহিক তাহা রয়েল ফর্ম্মায়।
তাপস বাল্মীকি বসি পর্ণের কুটীরে,
যে কবিত্ব স্রোত হায় করেছে সৃজন,
আভনের উচ্চতর প্রাসাদ শিখরে
হয় নাই—হইবে না কভু সে কূজন।"

এইরূপ অনেক স্থলেই কবি স্বদেশের গৌরবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছেন।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ উল্লিখিত "অকাল কোকিল" শীর্ষক কবিতা সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। পাঠকগণ হয়ত অনেকেই অবগত আছেন যে, হেমচন্দ্রই মহাকবি মাইকেল মধুসূদনকে তাঁহার 'স্বর্গারোহণ' বিষয়ক কবিতায়:

"অকাল কোকিল মরুস্থল তরু,
অসীম দেশের যাত্রি।"

বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু 'অকাল-কোকিল' আখ্যাটি হেমচন্দ্রের নিজের উপরেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কারণ স্বাধীন দেশে জন্ম গ্রহণ করিলে তাঁহার প্রতিভা যেরূপ স্ফূর্তি পাইত, তিনি যে কালে যে দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রতিভা সেরূপ স্ফূর্তি পায় নাই। তিনি যথার্থই বলিয়াছেন—

"ভয়ে ভয়ে লিখি, কি লিখিব আর
নহিলে শুনিতে এ বীণা-ঝঙ্কার।"

তাই যখন মধুসূদনের তিরোধানে হেমচন্দ্র কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন—

"সাহিত্য-কুসুমে প্রমত্ত মধুপ
বঙ্গের উজ্জ্বল রবি,
তোমার অভাবে দেশ অন্ধকার
শ্রীমধুসূদন কবি।"

তখন বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন:—

"কিন্তু 'বঙ্গকবি-সিংহাসন' শূন্য হয় নাই। • এ দুঃখসাগরে সেইটি বাঙ্গালীর সৌভাগ্য-নক্ষত্র। মধুসূদনের ভেরী নীরব হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের বীণা অক্ষয় হউক। বঙ্গকবির সিংহাসনে যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি অনন্ত ধামে যাত্রা করিয়াছেন, কিন্তু হেমচন্দ্র থাকিতে বঙ্গমাতার ক্রোড় সুকবিশূন্য বলিয়া আমরা কখন রোদন করিব না।"

ঈশানচন্দ্রও নগরের প্রান্তভাগে যে অকাল কোকিল মধুর ঝঙ্কার তুলিতেছিল, 'ভারত সঙ্গীতে'র সেই মহাকবিকে উদ্দেশ করিয়া 'অকাল কোকিল' শীর্ষক কবিতা লিখিয়াছিলেন। আমরা এই কবিতাটি সমগ্র উদ্ধার করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিতেছি না:—

(১)

কে বলে নাহিক আর বঙ্গের ভবনে
মধুর নিনাদী পিক, নীরব সে ধ্বনি
কাঁদাইয়া গৌড়জনে শ্রীমধুসূদনে
হরিল ভুবন-ত্রাস শমন যখনি।
নগরের প্রান্তভাগে উন্নত বদনে
অই যে উল্লাসে পিক মধুর ঝঙ্কারে,
"ভারত সঙ্গীত" গান দুন্দুভির তানে
"আর ঘুমাও না" বলি জাগায় সবারে।

(২)

কাব্য-বিটপীর শাখে বসিয়া বিরলে
মরি কি মধুর স্বরে সুললিত গায়।
কখন আনন্দ ভরে, কভু অশ্রুজলে
ঢালিয়া সঙ্গীত-স্রোত জগত ভাসায়,
অকাল কোকিল আহা অযত্ন লালিত,
সুবর্ণ পিঞ্জরে বদ্ধ ব্রিটিশ-প্রাঙ্গণে,
সভয়ে মনের ত্রাস না হয় স্ফুরিত
না পারে ভ্রমিতে সুখে সাহিত্য-কাননে।

বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

(৩)

আজ যদি সেই দিন হ'ত সে কানন
বেদব্যাস কালিদাস বাল্মীকি যেথানে
অবাধে গাহিল গান পূরিয়া গগন,
হিমাদ্রি কুমারী জুড়ি পূরিল নিক্বণে।
কিম্বা সেক্সপীর যথা বিমোহন স্বরে
ছুটাইল সঙ্গীতের তরঙ্গ প্রবল,
বাইরণ মিল্‌টন্ যথা স্বাধীন অন্তরে
গাহিল ললিত স্বরে সঙ্গীত অমল,

(৪)

সে বসন্ত হ'ত যদি, হ'ত সে কানন,
সে সুখ তটিনী যদি রহিত হেথায়,
চরণ শৃঙ্খল যদি হইত মোচন
বুঝিতাম অই পাখী কি মধুর গায়।
অন্তরে মরম দুখ পরাণে যাতনা
পরের প্রসাদ ভোজী অনার্য্য ভবনে,
ফুটালে ফুটে না ত্রাসে মনের বাসনা
তুষিবে সবার মন সঙ্গীতে কেমনে!

কবিপত্নী কুসুমকুমারী (বার্দ্ধক্যে বৈধব্যাবস্থায়)।

(৫)

একবার খুলে দাও চরণ শৃঙ্খল
সাজাও তেমতি করে বঙ্গের ভবন,
ফুটাও তেমতি করে জাহ্নবীর জল
সেই রবি শশী শূন্যে করুক ভ্রমণ।
শান্তির নিকুঞ্জ করি সন্তোষ লতায়
সরস বসন্তে ডাক করিয়া যতন,
তুলিয়া প্রমোদ কলি গাঁথিয়া মালায়
উল্লাস চন্দন তায় করিয়া লেপন—

(৬)

নিকুঞ্জের চারি ধারে দোলাও যতনে,
শুনিবে তখন পাখি কি মধুর স্বরে
গাহি সুললিত গান হতাশ শ্রবণে
ঢালিয়া পীযুষধারায় তুষিবে অন্তরে।
হায়রে সে সাধ পূর্ণ হবে কি কখন।
সরস বসন্তে কভু এ বঙ্গ ভিতরে
মাতারে আমার মন—মাতারে ভুবন
গাহিবে কি পিক আর বিমোহন স্বরে!

(৭)

হবে না সে সাধ পূর্ণ, শুনিব না আর
পরাণ মাতান গীত কোকিলের ৭
গাও তুমি পিকবর তোমারি ঝঙ্কার
শুনিব আনন্দ ভরে উল্লাস অন্তরে
নীরব এ বঙ্গে আজ তব কুহুস্বরে
হাসিব কাঁদিব কিম্বা মাতিব হরষে,
জাগে যদি আর্য্যাবর্ত্ত— তোমারি ঝঙ্কারে
সিন্ধু হতে ব্রহ্মপুত্র জাগিবে উল্লাসে।

(৮)

হৃদয়ের তুষানল নয়নের জলে
নিবায়ে আনন্দ মনে গাহ একবার,
দুখী বঙ্গবাসী প্রাণে গীত রস ঢেলে
শুষ্ক হৃদয়েতে কর সুধার সঞ্চার।
বন্দী যথা রুদ্ধ বাসে নির্ব্বান্ধব পুরে
সুদূর কোকিল কণ্ঠে জুড়ায় যাতনা,
তেমতি এ বঙ্গবাসী তব সুধাস্বরে
ভুলিবে ঈষৎ ভাবে দাসত্ব যাতনা।

যখন হেমচন্দ্রের প্রতিভাসূর্য্য মধ্যগগনে অবস্থিত, নবীনচন্দ্রের প্রতিভাপ্রদীপ্ত রচনাবলীতে বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্য সমৃদ্ধ হইতেছে, বিহারীলাল গীতিকবিতার ক্ষেত্রে নূতন সুর শুনাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তখন বিংশতিবর্ষীয় যুবক কবি ঈশানচন্দ্র তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করিয়া সুকবি নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন', যাহা উহার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রের সময় হইতে সমালোচনায় নির্ভীকতা ও নিরপেক্ষতার খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, ঈশানচন্দ্রের এই কাব্যখানির দীর্ঘ সমালোচনা করিয়া তাঁহাকে সুকবি বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিল। 'বঙ্গদর্শন' এক্ষণে অতীব দুষ্প্রাপ্য, সেই জন্য এবং ঈশানচন্দ্রের কাব্য সম্বন্ধে আমাদের অভিমত অপেক্ষা 'বঙ্গদর্শনে'র অভিমত অনেকগুণে অধিকতর মূল্যবান্ এই বিবেচনায়, আমরা নিম্নে 'বঙ্গদর্শন'-এর সমালোচনাটি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।—

বঙ্গদর্শনে "চিত্তমুকুর"-এর সমালোচনা

"একবার একজন আয়র্লণ্ড-দেশীয় সহিত ইংরেজি কাব্য সম্বন্ধে আমাদের কথা হইতেছিল। ইংরেজি শিক্ষাগুণে আমরা তাঁহার সাক্ষাতে ইংরেজি কবিত্বের প্রশংসা করি। প্রশংসা তাঁহার অসহ্য হইল। তিনি ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "সে কি কথা! ইংলণ্ড চিরসুখী, কখন কাঁদে নাই, ইংলণ্ডে কবিত্ব কি রূপে সম্ভব?"

কথাটি কতদূর সত্য তাহা জানি না, তবে এই বলিতে পারা যায় যে, যে-ব্যক্তি নিত্য অন্নধ্বংস করিয়া নিদ্রা গিয়াছে, এবং নিদ্রাভঙ্গে কেবল পান চিবাইয়াছে, যে শোক তাপ কিছুই জানে না; বা বুঝে না, কাব্য প্রণয়নে তাহার অধিকার হয় না, প্রয়োজনও জন্মে না। প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া যে লিখিতে যায়, কাব্যে সে অনধিকারী। প্রয়োজন বিবেচনায় যে কাঁদিতে বসে, সে ভাল কাঁদিতে পারে না। যে একান্ত অন্তরের জ্বালায় কাঁদে কেবল তাহারই চক্ষের জলে লোকে "আহা" বলে।

বোধ হয় চিত্ত-মুকুরলেখকের অন্তরে জ্বালা আছে। তিনি সেই জ্বালায় কাঁদিয়াছেন। অধিকাংশ কবিতাগুলি তাঁহার আন্তরিক ক্রন্দন। "কবিতা লিখেছি কত মনের বেদনে।" যাহাই তিনি লিখিতে গিয়াছেন, তাহাতেই যে তাঁহার চক্ষে জল আসিয়াছে। সকল অবস্থাই তিনি দুঃখের চক্ষে দেখিয়াছেন, সকল অবস্থাতেই তিনি আপনার মর্ম্মবেদনা মিশাইয়াছেন। একস্থানে ভাটের ন্যায় স্তুতিপাঠ করিতে গিয়াও সেই মনবেদনা কতক দেখাইয়াছেন।

দুই চারিটি কবিতা হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলে একথা প্রতিপন্ন হইবে।

'উদাসীন' নামক কবিতা হইতে উদ্ধৃত :—

"কিন্তু হায় এ পামর নির্ম্মম হৃদয়,
করুণা পরশে আর দ্রবিবার নয়।
পাষাণে বেঁধেছি প্রাণ পাষাণ রহিব,
এই তরুতলে বসি একাকী কাঁদিব।
হইবে গভীর নিশি দূরে ঝিঁ ঝিঁ রব,
আঁধারে ডুবিবে বিশ্ব জগত নীরব।
এই শুষ্ক তৃণদলে করিয়ে শয়ন;
খুলিয়ে প্রাণের দ্বার করিব রোদন।"

'সলিল প্রতিমা' হইতে উদ্ধৃত :—

"কত সাধ কত আশা, কত প্রেম ভালবাসা,
প্রাণেশ্বর নিরন্তর রেখেছি অন্তরে,
বারেক তোমার যত্নে দেখাবার তরে,
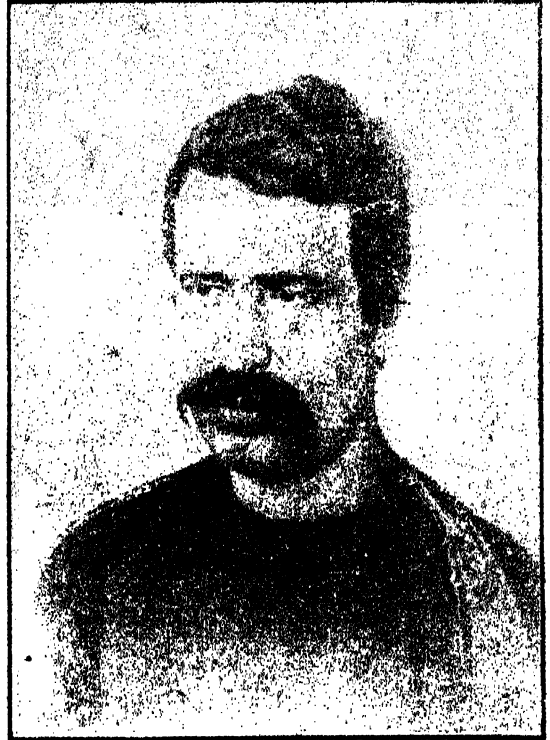
ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সি-আই-ই (তরুণ বয়সে)।

সুচিকন পুষ্প হার, গাঁথিয়াছি কতবার,
দোলাইতে তব গলে কতই যতনে।
কবিতা লিখেছি কত মনের বেদনে।

* * *

এতই বেদনা যদি, কেন দূরে নিরবধি,
এস কাছে প্রাণেশ্বর কাঁদি দুই জনে
মুছাইব অশ্রুজল অঞ্চল বসনে
ধন নাই—দুখ তাই, ধনে প্রয়োজন নাই,

উভয়ে পরম সুখে স্বপ্ন তরুতলে,
পূরিল যুগল আঁখি পুনঃ অশ্রুজলে।"

'দুঃখিনী রমণী' হইতে উদ্ধৃত :—

ইচ্ছা করে ছুটে যাই কানন-মাঝারে
পড়িয়া তরুর তলে কাঁদি একাকিনী।
এ দুঃখ কহিব কারে নির্ম্মম সংসারে,
কে বুঝিবে—কে শুনিবে—আমার কাহিনী।

*   *   *

ভাসাইয়া দেহ মোরে জাহ্নবীর নীরে,
এ মুখ দেখিয়া কেন পাইবে বেদন।
শুষ্ক পল্লবের মত যাইব ভাসিয়া,
প্রবল তরঙ্গ-স্রোতে সাগরের জলে।
এ ভগ্ন জীবন-তরি যাইবে ডুবিয়া,
দহিতে হবে না আর নিরাশা-অনলে।

*   *   *

শরবিদ্ধ বিহঙ্গিনী মর্ম্মবেদনায়,
অস্থির যখন পড়ি লতার বিতানে।
কে বুঝে কে দেখে তার তীব্র যন্ত্রণায়,
লুটায় সাপটি পক্ষ একাকী কাননে।

...   .

হেন চিত্রকর যদি থাকিত ভুবনে
হৃদয়ের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিতে পারিত,
আশা তৃষ্ণা সুখ দুঃখ মনের বেদনে,
তুলিকায় চিত্রপটে হইত অঙ্কিত।
দগ্ধ হৃদয়ের ছবি তুলিয়া তোমারে
দেখাতেম সহোদরে যাতনা আমার,
দেখিতে জ্বলিছে চিতা হৃদয়-মাঝারে,
আশা সুখ পরিবর্ত্তে দেখিতে অঙ্গার।"

'কুলীন কামিনী' হইতে উদ্ধৃত :—

"কি দুখে তটিনি! তুমি-হেন শুষ্ক বেশে
করুণ সঙ্গীত তুলি, শৈলময় দেশে?
ললিত লহরী হায়,
বিষাদে মিশায়ে যায়,
সরস যৌবন মরি বিশুষ্ক এমন
কোন্ দুঃখে বল মরি এতেক বেদন?

হায় জানিতাম আমি অনন্ত সংসারে
একা অভাগিনী শুধু পাষাণে বিহরে,
শুষ্ক শুধু এই প্রাণ,
গায় বিষাদের গান,
লুকায়ে মরম জ্বালা কাঁদি নিরজনে।
একা অনাথিনী আমি অখিল ভুবনে।

তুমিও যে তটিনী রে আমারই মতন,
পাষাণে চাপিয়া বক্ষ কর সন্তরণ,
নির্দ্দয়ের পদতলে,
লুটাই নয়ন জলে,
নিঠুর গিরির পদে তুমি অভাগিনী!
লুটাইছ তরঙ্গিণি দিবস যামিনী।"

এইরূপ করুণ রসের অবতারণা যে কেবল শিক্ষার গুণে বা যত্নের বলে হইয়াছে, এমত বোধ হয় না। হইয়াছে কবির নিজের গুণে। ভাবের মধ্যে শোক তাঁহার মনে বিশেষ প্রবল বলিয়া বোধ হয়। এই জন্য করুণ রসে তাঁহার এত অধিকার দেখা যায়। অন্য রসে যে তিনি সম্পূর্ণ বঞ্চিত এমত বলি না, তবে যে সকল রস তাঁহার চিত্ত স্পর্শও করে না সে সকল রস উদ্দীপন করিবার নিমিত্ত তিনি দুই এক স্থানে সময় নষ্ট করিয়াছেন, বোধ হয় তাহা কেবল অনুরোধে। কেন না লেখক আপনিই স্বীকার করিয়াছেন যে মধ্যে মধ্যে তিনি কাব্যের ফরমাইস লইয়া থাকেন। কিন্তু ফরমাইস বা চেষ্টা উভয়ই কবির পক্ষে কুপথ। যিনি তাহা অবলম্বন করিয়াছেন তিনিই নিষ্ফল হইয়াছেন। "কাব্য কি?" যাঁহারা জানেন না, তাঁহারাই কাব্য লিখিতে চেষ্টা পান, বা লিখিবার নিমিত্ত অন্যকে অনুরোধ করেন। যে রস মনে যখন আসে নাই, সে রস অনুরোধে বা চেষ্টায় কিরূপে বর্ণিত হইবে? বোধ হয় তাঁহারা বলিবেন অনুভব দ্বারা। সত্য, মনে কোন ভাবের উদ্দীপন হইলে তাহার দুই একটি কার্য্যকেলি অনুভব করা যাইতে পারে। কিন্তু যে স্থলে ভাব কি রস কিছুই নাই সে স্থলে কে তাহার ক্রিয়া অনুভব করাইবে? যে স্থলে মেঘ নাই, সে স্থলে কে বৃষ্টি বর্ষণ করিবে? যদি তুমি জল ছিটাইয়া বল, এই বৃষ্টি হইল, দুই একটি বালক ভিন্ন কে তোমার কথা বিশ্বাস করিবে? ইদানীং বাঙ্গালার অধিকাংশ কাব্যলেখক যে কবি নহেন তাহার কারণ এই। অনেকে জল ছিটাইয়া বলেন, বৃষ্টি করিলাম; ভাব বা রস কিছুই তাঁহাদের নাই, কেবল অনুভবের উপায় তাঁহাদের নির্ভর।

যে কখন স্বচক্ষে পর্ব্বত কি সমুদ্র দেখে নাই, সে তাহা কি অনুভব করিবে? অন্যের মুখে যাহা শুনিয়াছে বা অন্যের গ্রন্থে যাহা পাঠ করিয়াছে তাহাই লিখিবে! চর্ব্বণে যাহার রস গিয়াছে তাহাই আবার পুনশ্চর্ব্বিত করিবে। পর্ব্বতে কি সমুদ্রে কাব্যরস নাই। তাহা কেবল দর্শকের অন্তরে থাকে। পর্ব্বত কি সমুদ্র দেখিলে চিত্তের যে চাঞ্চল্য জন্মে তাহাই কাব্যরস। যে পর্ব্বত বা সমুদ্র দেখিল না কেবল অন্যের মুখে শুনিল, সে এ চাঞ্চল্য কোথা পাইবে, অনুভবে তাহা সম্ভবে না। কাজেই অনুরোধে কাব্যের সৃষ্টি হইতে পারে না।

সমুদ্র কি পর্ব্বত দেখিলেও অনেকের চিত্তে কোন চাঞ্চল্য জন্মে না এই জন্য সকলে কবি হইতে পারে না। যাঁহার চক্ষে পর্ব্বত কেবল প্রস্তর-স্তূপ, সমুদ্র কেবল জলরাশি, কাব্যে তাঁহার অনধিকার, তিনি অন্য ব্যবসা করুন। সমুদ্র কি পর্ব্বত দেখিলে কবিদের চিত্ত একরূপ চঞ্চল হয় না; ভিন্ন কবির ভিন্নরূপ হয়। এই জন্য কবি নানা প্রকার, কাব্যও নানা প্রকার। সমুদ্র ও পর্ব্বতের কথা উদাহরণস্বরূপ আমরা উল্লেখ করিলাম। সমুদ্র ও পর্ব্বতের কথা যাহা বলা গেল, বাহ্যবস্তুমাত্রেরই কথা সেইরূপ বলা যাইতে পারে। সঙ্গীত বা শব্দ সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে।

মূল কথা, ফরমাইসে কাব্য হয় না। চিত্তের চাঞ্চল্য না জন্মিলে কাব্য জন্মে না। চিত্তের কোন বেগ নাই, অথচ আমাদের কবিরা কাব্য প্রণয়ন করেন। কেহ বা অন্যের বেগ গ্রহণ করিয়া লেখেন; অর্থাৎ অন্য কবি আপন চিত্তের বেগে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই তাঁহারা অনুকরণ করেন। অনুকরণ অন্য বিষয়ে যাহাই হউক কাব্য সম্বন্ধে দোষের। অথচ অধিকাংশ কবি কিছু না কিছু নকল করেন। চিত্তমুকুরের লেখক দুই একটি ভাব বোধ হয় অন্য কবি হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। পুনরের দৌত্য নামক কবিতার এক স্থলে লিখিত হইয়াছে—

"আঘাতি অনল ছটা কন্দরে কন্দরে,
ভ্রমে যথা ক্ষণপ্রভা পর্ব্বত প্রদেশে,"

এই ভাব হেমবাবুর বিদ্যুৎ হইতে নীত। হেমবাবুর বিদ্যুৎ দেখুন—

"কিম্বা গিরিশৃঙ্গ-রাজি
মধ্যে যথা তেজে সাজি
ক্ষণপ্রভা খেলে রঙ্গে করি ঘোর ঘটা
খেলে রঙ্গে ভীমভঙ্গি,
শিখর শিখর লঙ্ঘি,
শৈলে শৈলে আঘাতিয়া জ্বল তীক্ষ্ণ ছটা।"

এই অনুকরণটি নিতান্ত দোষের নয়।

আর এক স্থানে (২৬ পৃষ্ঠা) আমাদের গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

"এস তবে শশধর নামিয়া ভূতলে,
লিখে দিই তব অঙ্গে দুইটী চরণ
হেরিলে তোমার পানে, পড়িবে নয়নে তার
প্রাণের লুকান কথা, বুঝিবে যেমন।"

ইংরেজি কবি মুর এই ভাবটি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

Sweet moon! if like Crotona's sage,
By any spell my hand could dare
To make thy disc its ample page,
And write my thoughts my wishes there;

How many a friend whose careless eye
Now wanders o'er that starry sky,
Should smile upon thy orb to meet
The recollection kind and sweet,
The reveries of fond regret,
The promise never to forget,
And all my heart and soul would send
To many a dear loved distant friend.

ইহা ভিন্ন অন্য দুই এক স্থলেও অনুকরণ আছে।

অনেক প্রধান প্রধান কবিরা অনুকরণ করিয়া গিয়াছেন। অনুকরণ নিমিত্ত বিশেষ দোষ দিই না। তবে এই বলি যে, এই গ্রন্থকারের ক্ষমতা আছে, ইনি দোষটি বর্জ্জন করিলে করিতে পারেন।

যে সকল কবিতা উদ্ধৃত করা গিয়াছে, তাহা করুণ রস বিশিষ্ট। অন্যদিকে চিত্ত-মুকুরলেখকের কিরূপ ক্ষমতা আছে তাহা দেখাইবার নিমিত্ত আর দুই তিনটি অংশ উদ্ধৃত করা গেল।

গ্রন্থের প্রারম্ভে রাজপুতকুলকলঙ্ক জয়চন্দ্রের মানসিক ভাবব্যঞ্জক একটি চিত্র আছে, তাহার এক স্থান বড় সুন্দর। স্বীয় দুষ্কৃতিচিন্তামগ্ন জয়চন্দ্র গভীর রাত্রে একাকী উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা—

"ত্যজিল সুদীর্ঘ শ্বাস চাহি শূন্যপানে,
নিবাবার তরে যেন গগনের আলো;
ভাবিল আলোকরাশি পশিয়া পরাণে,
অদৃষ্ট ভাবনাগুলি করিছে উজ্জ্বল।

মুদিল নয়ন পুনঃ আবরিয়া কর,
কিন্তু হৃদয়েতে যাহা হয়েছে অঙ্কিত
মুদিলে নয়ন কেন হইবে অন্তর!
বরং উজ্জ্বলতর হবে অনুভূত।"

সমরসাহী-বিদায় হইতে

মধুর সায়াহ্নে, প্রমোদ উদ্যানে
সরসী-সলিলে, সঙ্গিনীর সনে,
সুবর্ণ তরীতে, হরষিত চিতে,
কিশোরের আজি পুষ্প বিহরে।

হৃদয়ের হর্ষ বিকাশে বয়ানে,
চারু মৃদু হাসি ফুটিছে বদনে,
কুঞ্চিত কপোলে, যৌবন উথলে,
রজতের দাঁড় শোভিছে করে।
মত্ত হংসরাজ, গ্রীবা উচ্চ করি,
আসিছে সাঁতারি, পরশিতে তরী,
তরী বহি যায়, ধরিতে না পায়,
উঠে হাস্য-ধ্বনি, রমণী-মণ্ডলে।

এই সমরসাহী-বিদায় সুকবির রচনা, ইহা সমুদয় উদ্ধৃত করিবার মানস ছিল, কিন্তু স্থানাভাব।

স্থানান্তরে—

নিবিড় তরুর তলে শ্যাম দূর্ব্বাদলে
পড়িয়া শীতল ছায়া শান্তি-স্বরূপিণী,
বৃন্তে বৃন্তে ফুলগুলি, আনন্দে পড়েছে ঢলি,
অদূরে উঠিছে ধীরে মানবের ধ্বনি,
বোধ হইল যেন আজ নবীন ধরণী।

দেখিনু শিশির-বিন্দু গোলাপের দলে
কিরণে উজ্জ্বল হয়ে ঢল ঢল করে,
গোলাপ পড়িল হেলে, শিশির পড়িল ঝুলে
দেখিতে দেখিতে বিন্দু খসিয়া পড়িল,
শূন্য বৃন্তে চারু পুষ্প নাচিয়া উঠিল।

'চিত্ত-মুকুর' পাঠ করিয়া আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, লেখক সুকবি। এক্ষণে তাঁহার যে সকল দোষ আছে তাহা সামান্য; বোধ হয়, পরে তাহা কিছুই থাকিবে না। এই পুস্তক গ্রন্থকারের প্রথম উদ্যম। তিনি যে প্রথম উদ্যমেই অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার সাধারণের উৎসাহের পাত্র।"

কৃষ্টি

কৃষ্টি বলিতে বুঝায় সেই কার্য্য অথবা সাধনা, যদ্দ্বারা মনুষ্য-প্রকৃতিতে কি উপায়ে অশান্ত রাজসিকতার সৃষ্টি হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায় এবং অশান্ত রাজসিকতা প্রশান্ত করা যায়।

প্লাবন

—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বৃষ্টি! বৃষ্টি! বৃষ্টি!

কয়দিন হইতে অবিরল বৃষ্টির ধারা নামিতেছে, একটিবারের তরেও বিরাম নাই। আকাশ যেন সর্ব্বস্ব নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া দেউলিয়া হইবার সঙ্কল্প করিয়াছে। দিন ও রাত্রির মধ্যে একটিবার পাঁচ মিনিটের জন্যও ধারাবর্ষণ ক্ষান্ত হয় নাই। সহরের রাস্তার উপর এক-কোমর জল, কোন বাড়ীর একতলার একটি ঘরও বাসযোগ্য নাই। অনেক বাড়ীঘর পড়িয়া গিয়াছে, ভাসিয়া গিয়াছে, নদীর জলস্রোত তাহাদেরই ভগ্নাংশ বহিয়া অবিরাম ছুটিয়া চলিতেছে।

ইন্দুর বাঙলোখানিও জলে ভাসিতেছে, ঘরের ভিতরে এখনও জল ঢুকে নাই বটে, তবে দেরীও বিশেষ নাই। আজ রাত্রি নাগাদ এ বাঙলো অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িবে। উঠানে ফুলগাছ, লতাপাতা জলে ডুবিয়া আছে, কেবল দীর্ঘ দেবদারু-গুলি এখনও গর্ব্বভরে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। নদীর দিকে বেড়ার ধারে দুইটা প্রাচীন কাঁঠাল গাছ ফলভারে ষষ্টিবুড়ী হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল; আজ সকালে তাহাদেরও পতন হইয়াছে, একটি নাচিতে নাচিতে নদীর বুকে পড়িয়া ভাসিয়া কোন্ দূর দেশে চলিয়া গিয়াছে, অপরটি একটু একটু করিয়া নামিতে আরম্ভ করিয়াছে, আর খানিক পরে সেও নদীর বুকে গিয়া পৌঁছিবে এবং প্রেমিকা গোমতী তাহাকে বুকে ধরিয়া উল্লাসে শত বাহু বিস্তার করিয়া ছুটিয়া চলিয়া যাইবে। আউট্-হাউস্‌টা ধ্বসিয়া জলশায়ী হইয়াছে, দরোয়ান তাহার পুঁজি-পাটা, লোটাকম্বল, তুলসীদাসী রামায়ণ হইতে খড়ম জোড়া, সমস্ত লইয়া সাহেবের অফিস-কামরায় আস্তানা গাড়িয়াছে; প্যান্ট্রির ভিতরে এক-বুক জল; বেয়ারা, বাবুর্চ্চি, মশালচী দরোয়ানের সঙ্গী হইয়াছে। দরোয়ান নিষ্ঠাবান্—গোঁড়া হিন্দু, আর তিন ব্যক্তি মুসলমান, তবে গোঁড়া নয়—কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে কেহ কোনদিন অন্য জাতির ছোঁয়া জল খায় নাই ও এক ঘরে বসবাস করে নাই। আজ তাহারা আপিস-ঘরে ছাতু ও মুরগীর আণ্ডার সংমিশ্রণ ঘটাইয়াও বেশ আছে।

ইন্দু সেই সকালে শয্যাগৃহের জানালায় আসিয়া বসিয়াছে, সমস্ত দিনের ভিতর আসন ত্যাগ করে নাই বলিলেও চলে। কর্ত্তব্যপরায়ণ বেয়ারা, বাবুর্চ্চি কয়েকবার মেম-সাহেবের খবরদারী করিতে আসিয়াছিল, তিরস্কৃত হইয়া প্রস্থান করিয়াছে, আর আসিতে সাহস করিতেছে না।

জানালা খোলা,—যতদূর দৃষ্টি চলে, জল আর জল। পৃথিবী দেখা যায় না, জলে ডুবিয়া আছে; আকাশ দেখা যায় না, আকাশ হইতে কেবলই জল নামিতেছে। যে জানালাটায় মুখ রাখিয়া সে বসিয়া আছে, তাহার নীচেও জল। হাতটি অল্প একটু ঝুলাইলেই জল স্পর্শ করিতে পারা যায়। জল যদি আর একটু বৃদ্ধি পায়, তবে এই ঘরও জলে ভাসিবে। ইন্দু যেন সোৎসাহে, সোল্লাসে, সাগ্রহে সেই ক্ষণটির প্রতীক্ষা করিয়া আছে। ঘন ঘন হাত বাড়াইয়া দেখিতেছে, আর কত বাকী? জল আর কতটুকু উঠিলেই এই জানালা দিয়া [illegible] ঢুকিয়া পড়ে! সে যেন সেই বিশ্বধ্বংসী প্রাবনের [illegible] সংবর্দ্ধনা করিবার জন্যই ঘরের সমস্ত দরজা-জানালা খুলিয়া দিয়া বসিয়া আছে।

করগেটেড সীটে তৈরী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চাল স্রোতে পড়িয়া ছুটিতেছে। কোন হতভাগাকে নিরাশ্রয় করিয়াই যে তাহারা উন্মত্তের মত পৈশাচিক উল্লাসে ছুটিতেছে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। চালে আবদ্ধ কাষ্ঠখণ্ডগুলা বন্ধনমুক্ত হইয়া আগে আগে ছুটিতেছে—নক্ষত্রবেগে ছোটা কাহাকে বলে, নদীর উত্তাল স্রোতে এই ধাবমান কাষ্ঠখণ্ডগুলিকে না দেখিলে তাহা বুঝা যায় না।

কতকগুলি গরু-মহিষ প্রাণপণে বিরুদ্ধতা করিতে করিতেও ছুটিতেছে; হাঁড়ী-কলসী, পিতলের ঘড়া, ঝুড়ি, মাদুর, সতরঞ্চি—গৃহের আসবাব-পত্রও ছুটিতেছে। আবার এক পাল গরু-মহিষ! একখানা খড়ের চালাঘর তাহার বাঁশের খুঁটি, বাঁশের কড়ি-বরগা, কঞ্চির বেড়া, ঝাঁপ সমেত চক্ষুর পলক ফেলিতে না ফেলিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

একটি মানুষের মৃতদেহ—বোধ হয় পুরুষের দেহ—উপুড় হইয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া গেল; আর একটা, আরও একটা, এটি নারী-দেহ, সম্পূর্ণ উলঙ্গ, দেহটি ফুলিয়া ঢোল হইয়া উঠিয়াছে, চিৎ হইয়া ভাসিতে ভাসিতে জানালার নিকট দিয়াই চলিয়া গেল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, দূরে আর দৃষ্টি চলে না; নেহাৎ জানালার নিকট দিয়া যাহা যায়, তাহাই দেখা যাইতেছে। একটা মহিষের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার পিঠের উপর শুইয়া পড়িয়া একটি জীবন্ত বালক তারস্বরে চীৎকার করিতেছে। তাহার চীৎকারে ভয় পাইয়া মহিষটি আর্ত্তনাদ করিবার চেষ্টা করিতেছে বটে, কিন্তু সে অবসর তাহার মিলিতেছে না, স্রোতোবেগ নিঃশ্বাসটুকু ফেলিবার অবসরও দিতেছে না। ইন্দু তাড়াতাড়ি আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, ভাবিল, বেয়ারা-বাবুর্চ্চিদের ডাকিয়া ছেলেটাকে উদ্ধার করিতে বলে, কিন্তু উদ্ধার-চেষ্টা যে কিরূপ অসম্ভব, তাহা বুঝিতে পারিয়া আবার চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল। যে দুর্দ্দান্ত স্রোতোবেগে দুরন্ত মহিষ তৃণখণ্ডের মত ভাসিয়া চলিয়াছে, মানুষ সে স্রোতের মুখে চূর্ণ হইয়া যাইবে!

সন্ধ্যা আসন্ন বুঝিয়া বেয়ারা আলো জ্বালিয়া আনিয়া টিপয়ের উপর রাখিয়া দিল। বাবুর্চ্চি সঙ্গে আসিয়াছিল, বিনীতকণ্ঠে কহিল, মেমসাব, খানাকা কুছ—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সে চুপ করিল।

কিন্তু কোন উত্তর আসিল না দেখিয়া আর একবার সাহসে ভর করিয়া কহিল, মেমসাব, খানাকা—

—নেহি মাংতা।

প্রভুভক্ত বেচারী পুনরপি আবেদন জানাইতে ইন্দু বিরক্ত ভাবে কহিল, হিঁয়া কোই মেমসাব নেহি হ্যায়, যাও।

বাবুর্চ্চি চলিয়া গেল; বেয়ারাটাকে ইন্দু স্নেহ করিত; তাহার বালবাচ্চার জন্ত নানা সময়ে নানা দ্রব্য দিত; মাঝে মাঝে তাহারা কে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করিত; সময়ে সময়ে দু একটা টাকাও তাহাদের জন্ত দিত। সে ডাকিল, মা—

ইন্দু মুখ ফিরাইয়া চাহিল।

বেয়ারা যাহা বলিল তাহা এই—আজ কিছু খানা হয় নাই, ঘরে নাই-ও কিছু, বাজার, হাট, দোকান পসারা সব ত ভাসিয়া গিয়াছে, শুধু একটি লোকের বাড়ী হইতে কয়েকটা ডিম সে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে, তাহাই সম্বল। মা আজ্ঞা করিলে তাহারই আমলেট্ বা পোচ বানাইয়া দিতে পারে।

ইন্দু স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, আমার খেতে ইচ্ছে নেই।

বেয়ারা বলিল, বড় সাহেবের চাপরাসীর সঙ্গে তাহার পথে দেখা হইয়াছিল, তাহারই কাছে সে খবর পাইয়াছে, আমাদের সাহেব আজ রাত্রির মধ্যেই গন্তব্য স্থানে নিরাপদে পৌঁছিবেন।

কথাগুলা গুছাইয়া বলিয়া চতুর লোকটি এই ভাবে উপসংহার করিল যে, তবে, মা, আপনি খাইবেন না কেন?

হায়, সে বেচারা যাহা ভাবিয়াছে, তাহা যদি সত্য হইত, তবে নারীর পক্ষে সে কত-না সুখের, কত-না তৃপ্তির উপবাস বলিয়া বিবেচিত হইত! যে নারী তেমন উপবাস করে, তাহার মত সৌভাগ্যবতী কে?

বেয়ারা ভরসা পাইয়া আবার বলিল, সাহেবের ফিরিতে পাঁচ সাতদিন দেরী হইতে পারে, ততদিন কি আপনি খাইবেন না মা?

ইন্দু বিরক্ত ভাবে কহিল, তুমি যাও এখান থেকে।

বেয়ারা চলিয়া গেল।

তখন গাঢ় অন্ধকার নামিয়াছে, বৃষ্টির ঝুপ-ঝুপ শব্দই শুধু শুনা যাইতেছে, চোখে আর কিছুই দেখা যায় না। ঘরের আলোটা না থাকিলেই ভাল হইত, কিন্তু উঠিয়া গিয়া নিবাইবার বা কমাইয়া দিবার ইচ্ছাও হইল না। ইন্দু আগের মতই বহিঃপ্রকৃতির পানে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

বেয়ারা আবার আসিয়া ডাকিল, মা—

ইন্দু পরুষকণ্ঠে কহিল, নেহি মাংতা, চলা যাও।

বেয়ারা ভয়ে ভয়ে জানাইল, বড় সাহেবের কেরাণীবাবু দেখা করিতে আসিয়াছেন।

—কাহে?

—আমাকে বলেন নাই।

ইন্দুর মনে হইল, মফঃস্বলের কোন খবর ঐ লোকটা আনিয়াছে, তাহাই জানাইতে চায়।

বলিল, পুছো ক্যা মাংতা?

বেয়ারা চলিয়া গেল এবং ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্ববৎ শুদ্ধ ভাষায় নিবেদন করিল, বড় সাহেব পাঠাইয়াছেন।

বড় সাহেব অর্থে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট। ইন্দু অনুমান করিল, নিশ্চয়ই মফঃস্বলের খবর। মনের অন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুসন্ধান করিয়াও সেই সংবাদের জন্য অনুমাত্র কৌতূহলের সন্ধান সে পাইল না।

বলিল, বোল দেও, আজ ভেট্ নেহি হোগা।

বেয়ারা চলিয়া গেল।

পাছে আবার ফিরিয়া আসে, আবার বিরক্ত করে, ইন্দু জানালা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া প্রবেশ-দ্বারের পর্দ্দাটা টানিয়া দিয়া আবার সেইখানে গিয়া বসিল। পর্দ্দা ঠেলিয়া না ডাকিলে, কেহই ঢুকিবে না জানিয়া সে কতকটা আশ্বস্তি বোধ করিল।

দিগন্ত-আচ্ছাদিত গাঢ় অন্ধকারের পানে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার বাল্য, কৈশোর, যৌবনকালের রমণীয় চিত্রগুলি একটির পর একটি মনের চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। প্রত্যেকটি সুন্দর, কিন্তু প্রত্যেকটি চোখে জল আনিয়া দেয়। যে চিন্তা সুখের, তাহাই আবার দুঃখের হয় কেন? যে দৃশ্য দেখিতে এত সুন্দর লাগিতেছে, তাহাই আবার চোখের জলে ভাসায় কেন? না, সে চোখের জল ফেলিবে না। কেনই বা ফেলিবে?

তাহার মা'কে সে সুখী করিয়াছে এবং সুখী হইবে বলিয়াই জীবনের সঙ্গী সে নিজে বাছিয়া লইয়াছে। বাপ-মা এই নির্ব্বাচনে সুখী, সুতরাং তাঁহাদের দায় ও দেনা সে শোধ করিয়াছে তাঁহাদের মনোমত কার্য্য করিয়া; আর, নিজে? কি যায় আসে। একটা নারী-জীবন বৈ ত' নয়! এমন কত শত শত নারীজীবনই ত বৃথায় যাইতেছে, বিফলে যাইতেছে, একটা বাড়িলে বা একটা কমিলে কাহার কি আসে যায়!

কিন্তু তবু কেন, মন এমন সব তত্ত্ব-কথায় সান্ত্বনা পায় না! কেন মা'র উপর তীব্র কঠোর অভিমানে মন ভরিয়া যায়, চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হয়! কিন্তু কাঁদিবারও উপায় নাই; কাঁদিয়া দুঃখের ভার লাঘব করিবে সে উপায়ও যে তাহার নাই! তাহার যে দুঃখ তাহা অন্তরের ভিতরে বাসা বাঁধিয়া উইপোকার মত ভিতরটা কুরিয়া কুরিয়া খাইলেও তাহার কাঁদিবার উপায় নাই। যে দুঃসহ বেদনায় তাহার হৃদয় ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে, কেই বা তাহার পরিমাপ বুঝিবে, আর কেই বা তাহার দুঃখে সান্ত্বনা দিবে?

আজ একটিবার যদি তাহার স্নেহময় পিতার দেখা পাইত! তিনিও যে তাহারই মত সুখী নহেন, মনে মনে সে তাহা বুঝে; তাই আজ সকল দুঃখ অবসানের সময়ে একবার যদি তাঁহার দেখা পাইত! একবার তাঁহার গলা ধরিয়া কাঁদিতে পাইত! তাহাতেই বা কি সান্ত্বনা সে পাইত?—কিছু না, কিছু না! পৃথিবীতে তাহার কোন সান্ত্বনা নাই।

তবুও, তবুও ইচ্ছা করে একবার প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া লইতে। হিন্দুর মেয়ের আজন্মের সংস্কারের উচ্চ প্রাচীর ভেদ করিয়া একবার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করে। ভারতের নারীত্বের মহোচ্চ আদর্শ যদি ক্ষুণ্ণ হয়, হোক, তবু একবার স্বামী ছাড়া আর এক জনের উদ্দেশে প্রাণের অফুরন্ত কামনা ও বাসনার অসংযত রশ্মিগুলিকে ছুটাইয়া দিতে সাধ হয়! আজ শুধু তাহারই উদ্দেশে বলিতে ইচ্ছা করে, যে-ভুলের প্রাসাদ রচিত হইয়াছিল, তাহা ভাঙিতে আরম্ভ করিয়াছে, নিঃশেষ হইতে আর বড় দেরী নাই।

বাহিরে বৃষ্টির তেজ বৃদ্ধি পাইতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে গোমতীর গর্জ্জনও বাড়িতেছিল। মনে হইল, জলের ঢেউগুলি জানালায় আসিয়া আছাড় খাইতেছে। ইন্দু উঠিয়া দাঁড়াইয়া জানালায় মুখ রাখিয়া দেখিল, জল জানালার খুব কাছেই উঠিয়াছে, আর একটু পরেই ঘরেও জল ঢুকিয়া পড়িবে।

তারপর, সে উল্লাস অথবা অবসাদ, হর্ষ কিংবা বিষাদ, আনন্দ না আশঙ্কা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া ইন্দু একবার সমস্ত ঘরটা দেখিয়া লইয়া যেখানে বসিয়াছিল, আবার সেইখানেই আসিয়া বসিল।

মুহূর্ত্তের জন্য মনে হইল, ঐ বন্যার জল যদি ঘরে আসিয়া ঢোকে, যদি সমস্ত ভাঙিয়া চুরিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে?

তাহা হইলে, কিছুক্ষণ পূর্ব্বেকার কথাটি তাহার মনে জাগিয়া উঠিল, ভাবিল, মন্দ কি! স্রোতে স্রোতে ভাসিয়া চলিবে।

কোথায়, কতদূরে, কে জানে! কোন দিন কূল পাইবে কি না তাই বা কে জানে! না-ও যদি পায়, তাহাতেই বা কি?

কেবল একবার যদি⋯না, চিন্তার উদয় হইবামাত্র সে তাহা মনের গোপন কোণেই দমন করিয়া ফেলিল। যাহা অসম্ভব, একান্তই অসম্ভব, তাহাকে মনোমধ্যে স্থান দিয়া ভাঙ্গা-গড়া করার মত বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে? মানুষের কত সাধ, কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, কত বাসনাই ত' হৃদয়মধ্যে উত্থিত হইয়া জলবুদ্বুদের মত বিলীন হইয়া যায়, তাহার জীবনের এই শেষ কামনাটিরও না হয় সেই ভাগ্যই ঘটিল, তাহাতেই বা কি! এই কামনা—যাহাকে সে স্পষ্ট করিয়া চিন্তা করিতেও পারিতেছে না, যে সুপ্রিয় বাসনাটির কণ্ঠরোধ করিয়া হত্যা করিবার প্রবল আগ্রহ সত্ত্বেও মমতাবশে তাহাকে বিনষ্ট করিতে পারিতেছে না, মাতার বক্ষঃলগ্ন ক্ষুদ্র শিশুটির মত জড়াইয়া রহিয়াছে, মরণকালে যদি সেটি অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অতি সন্তর্পণে বসতি করিয়াই থাকে, এবং তাহার সহিত সহমরণেই যায়, তাহা হইলে কোন্ প্রাণেই বা ইন্দু তাহাকে নিরাশ করিতে পারে? করিবেই বা কি করিয়া? না, সে তাহা করিবে না। কোন্ দেশের কোন্ এক প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী নারী এক কালভুজঙ্গকে বুকের উপর ধরিয়া হাসিমুখে মৃত্যু বরণ করিয়াছিল, সেও সেই অতিপ্রিয় অতি অবাধ্য বাসনাটিকে বুকের ভিতরে পুষিয়াই চলিয়া যাইবে এবং অন্তিমকালে মৃত্যুদাতার নিকট এই কামনাই করিবে, তাহার জীবনের সঙ্গে যেন সেই বাসনারও অবসান হয়, সেই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহাকে যেন সেই বিষধর বাসনার সুখসঙ্গচ্যুত হইতে না হয়। বিধাতার নিকট ইহাই তাহার অন্তিম প্রার্থনা।

বিধাতা কে, কেমন তাঁহার রূপ, কিছুই সে জানে না; কাহারও করুণ প্রার্থনায় তিনি কর্ণপাত করেন কি না এবং মানুষের শেষ অভিলাষ পূর্ণ হয় কি না তাহাও সে জানে না; কিন্তু সেই অজানা অদেখা বিধাতার কাছে যদি তাহার কিছু বলিবার থাকে, কিছু চাহিবার থাকে, তাহা ঐ। তিনি কি তাহার সে কামনা পূর্ণ করিবেন না?

লোকে বলে, ভগবান্। ভগবান্ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই রক্ষা ও পালন করেন এবং সংহার-কর্ত্তা তিনিই। তিনি সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বত্র বিরাজমান, তাঁহার কর্ণে নারীর ক্ষুদ্র কামনাটি কি পৌছিবে না? লোকে বলে, তাঁহাকে যদি কেহ মনঃপ্রাণ ভরিয়া ডাকিতে পারে, কেহ যদি অবিচলিত বিশ্বাসে তাহার নিকট কোন প্রার্থনা করে, তিনি তাহা অপূর্ণ রাখিতে পারেন না, সেই জন্তই লোকে বলে, ভক্তের ভগবান্, ভক্তবৎসল ভগবান্!

জানালা দিয়া দেখা যাইতেছে, প্রচণ্ড জলরাশি ভীমগর্জ্জনে জানালার চৌকাঠ স্পর্শ করিয়া ছুটিতেছে, প্রাচীরগাত্রে আঘাতোৎক্ষিপ্ত জল-কণাসমূহ যেন অঙ্গস্পৃষ্টও হইতেছে, বাড়ীটা যেন থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, নড়িয়া উঠিতেছে, এই সময়, এই সময়—ইহার পরে হয়ত সে সময় আর আসিবে না, এই সময় কেহ যদি তাহাকে বলিয়া দিত, কেমন করিয়া তাঁহাকে ডাকিতে হয়, কোন্ ভাষায় তাঁহার নিকট আবেদন জানাইতে হয়, কেমন করিয়া অটল বিশ্বাসভরে যাচ্ঞা করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার কোন দুঃখ থাকিত না। কিন্তু কে এমন আছে, কে বলিয়া দিবে, কে তাহাকে শিখাইবে? তাহার নিকটে বা দূরে কে এমন বন্ধু আছে যে শেষ দিনে শেষ মন্ত্রটিতে তাহাকে দীক্ষা দিবে? ঐ উত্তুঙ্গ উন্মত্ত জলরাশি আর তাহারই ভীম নির্ঘোষ ছাড়া আর ত কাহাকেও সে দেখিতে পাইতেছে না; তার কিছুই সে পাইতেছে না। তবে কি ঐ ক্ষিপ্ত বারিস্রোতই তাহাকে বন্ধুর আলিঙ্গন দিতে আসিতেছে?

আসুক, প্লাবনের রূপ ধরিয়া মৃত্যু তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করুক। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার সময় সে শুধু বলিয়া যাইবে, যেখানে, যত দূরে যে অবস্থাতেই থাক না কেন, তাহার চিরদিনের, চিরজীবনের সঙ্গী যেন জানিতে পারে, মৃত্যুকালে ইন্দু তাহাকে চাহিতে চাহিতেই শেষ নিশ্বাসটি ফেলিয়াছে। ভগবান, কখনু কোন পাপ সে করে নাই, কাহারও অনিষ্ট করে নাই, স্বেচ্ছায় কাহারও মনঃকষ্টের কারণ হয় নাই, শেষ কালের এই বাসনার ফলে যদি তাহার অনন্ত নরকও হয়, অম্লান বদনে সে তাহা সহ্য করিবে, শুধু তুমি, ভগবান্, শুধু তুমি, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বান্তর্যামী, শুধু তুমি তাহাকে ক্ষমা করিও। জীবনের শেষ দিন, শেষ মুহূর্ত্ত বলিয়াই প্রাণের কামনা সে নিজের কাছে ব্যক্ত করিতে পারিয়াছে, অন্য কোন সময় হইলে নিজের কাছেও সে তাহা বলিতে পারিত না।

পর্দ্দার বাহির হইতে শব্দ আসিল—শেষ সাথ!

ঘৃণায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ রি-রি করিয়া উঠিল, ইন্দু সাড়া দিল না।

পুনরায় আহ্বান আসিল, মায়িজি!

ইন্দু পর্দ্দার এ পাশে দাঁড়াইয়া বলিল, কেয়া মাংতা?

—হুজুর, বড়া সাব আয়া!

—ম্যাজিষ্ট্রেট সাব?

—জী!

মনে হইল সাহেব প্রণয়ের সংবাদ দিতে আসিয়াছেন, সে সংবাদের জন্য তাহার কৌতূহল নাই বলিয়া বিদায় করিয়া দেওয়া যাক; কিন্তু কি ভাবিয়া বলিল, হাম আভি আঁতে হেঁ!

সাহেব বলিলেন, আপনাকে এই মুহূর্ত্তে এই বাড়ী পরিত্যাগ করিতে হইবে।

—কেন?

সাহেব বিস্ময়াতিশয্যে দশ সেকেণ্ড কথা বলিতেও পারিলেন না, তার পর বলিলেন, বাড়ীটার অবস্থা আপনি দেখেন নাই, বুঝি? আর পাঁচ ছয় ইঞ্চি জল বাড়িলেই—

তাঁহার বক্তব্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই ইন্দু বলিল, কথার মাঝে কথা বলিতেছি, মাপ করিবেন। দেখিয়াছি।

—তবে যে জিজ্ঞাসা করিলেন বাড়ী ছাড়িতে হইবে কেন?

—বাড়ী ছাড়িয়া যাইবার কোন কারণ দেখি না।

—আপনি আমাকে অবাক করিলেন! এ বাড়ী কাল সকাল পর্য্যন্ত থাকিবে বলিয়া আমার মনে হয় না।

—নাই বা থাকিল!

সাহেব ক্ষণকাল নীরবভাবে বিস্ময়ে এই দুঃসাহসিনী নারীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন; পরে মৃদু হাসিয়া শুষ্ককণ্ঠে কহিলেন, আপনার স্বামীকে এই দুর্য্যোগে দূরে পাঠাইতে হইয়াছে, আপনি কি সেই জন্য আমার উপরে ক্ষুব্ধ হইয়াছেন? আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন, কোন সরকারী কর্ম্মচারীই সদরে নাই, আমি ছাড়া! আমিও থাকিতাম না, কেবল সহরের গুরুতর দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়াই আমাকে থাকিতে হইয়াছে। জানি না, এত বড় সহর আর তার অগণিত অধিবাসীদিগকে রক্ষা করা সম্ভব হইবে কি না—একমাত্র ভগবান্‌ই জানেন, কি হইবে, কিন্তু আমি ত' কোন উপায়ই দেখিতেছি না।

ইন্দু বলিল, আপনি আমার বাচালতা ক্ষমা করিবেন। আমাকে আপনি কোথায় যাইতে বলিতেছেন?

—আমার বাসায়। সৌভাগ্যক্রমে আমার বাসাটি উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত। আজিকার বিষম রাত্রিটা সেখানে নিরাপদে থাকিতে পারিবেন, তার পর কাল যাহা হয় ব্যবস্থা করা যাইবে। বলিয়া সাহেব মাথা নীচু করিয়া আবার বলিলেন, আমার স্ত্রী ভারতবর্ষে নাই, কিছুদিন হইল স্বগৃহে গিয়াছেন; তিনি এখানে থাকিলে অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই আপনাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেন। আমি নানা কাজের ভিড়ে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম, তাই এতক্ষণ পর্য্যন্ত সময় করিয়া আসিতে পারি নাই বলিয়াই দুঃখিত।

—ধন্যবাদ! আপনার দুঃখিত হইবার কারণ নাই; কারণ, আগে আসিলেও আমি যাইতাম না, এখনও—

সে কি, আপনি যাইবেন না?

—না।

—কেন?

—আপনি সজ্জন ও দয়ালু বলিয়াই কথাগুলা বলিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া দোষ লইবেন না। সাহেব, আপনি কি সহরের সমস্ত নারীকে আপনার বাসায় লইয়া যাইতে পারিবেন?

—তাহা কি সম্ভব হইতে পারে?—অসম্ভব।

—তাহা আমিও জানি। যে ব্যবস্থা সকলের জন্য করিতে পারিবেন না, একজনের জন্য তাহা না করাই ভাল।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন, তাহারা পাড়াগেঁয়ে লোক, পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী, এরূপ বিপদ্ তাহাদের অপরিচিত নয়, বরং তাহারা সম্পূর্ণ অভ্যস্ত; তাহারা এরূপ বিপদের সঙ্গে লড়াই করিতে জানে।

—আমিও জানি।

—এ আপনি কি বলিতেছেন? আমি ত আপনাকে ছাড়িয়া যাইব না।

—আবার ধন্যবাদ। কিন্তু আমার যাহাই হউক, এইখানেই আমি থাকিব।

—তার মানে—নিশ্চিত মৃত্যু!

ইন্দু হাসিয়া বলিল, নিশ্চিত কি-না বলা যায় না, জল না বাড়িতেও পারে ; কমিতেও পারে।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, সে দুরাশা। পাহাড় হইতে বিপুল বেগে ঢল্ নামিতেছে, সংবাদ পাইয়াছি। বৃষ্টির প্রখরতাও দেখিতেছেন, জল কমিবার আশা নাই। জল বাড়িবে এবং রাত্রির মধ্যে এই গৃহেরও পতন হইবে। আপনি চলিয়া আসুন।

ইন্দু করযোড়ে বলিল, আমাকে মাপ করুন।

সাহেব দেখিলেন, মহা বিপদ্। এই অল্পবয়স্কা, ক্ষীণ-কায়া নারীটির কথা-বলার ও চাহনীর ভঙ্গীতে সাহেব ইহাও বুঝিতেছিলেন, ইহার কথার নড় চড় হইবার নয়। ইহার কণ্ঠ মৃদু কিন্তু দৃঢ়তাব্যঞ্জক ; দৃষ্টি সলজ্জ অথচ তেজঃপূর্ণ। স্বভাবকোমলা বঙ্গনারীর মধ্যে যাহা কখনও দেখা যায়, সেই তেজঃপূর্ণ নির্ভীকতা, সাহেব তাহা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলেন ; মনে মনে তাঁহার নেটিব সহকারীর অদৃষ্টের প্রশংসা করিলেন। তার পর, বলিলেন, দেখুন, আপনি আমার বাসায় না যান, কোন বাঙ্গালী পরিবারের মধ্যে যাইতে চান্, তাই চলুন।

ইন্দু নিঃশব্দে ঘাড় নাড়িল।

—তাও না ! আপনি আমাকে এরূপ দারুণ বিপদে ফেলিবেন না, আমি সকাতরে নিবেদন করিতেছি। আজ সন্ধ্যার দিকে কতগুলি গৃহের পতন যে হইয়াছে, কতলোক যে মরিয়াছে, স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে, এখন পর্য্যন্ত সংখ্যা গণনা করাই যায় নাই।

ইন্দু মৃদু-হাস্যে কহিল, তাহাদের বাঁচাইতে পারেন নাই ত ?

সাহেব কাতর স্বরে বলিলেন, না। বাঁচাইতে গিয়া অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। কলিকাতার রামকৃষ্ণ মঠের নাম জানেন ত ? তাহারা সেবাকার্য্য করিতে আসিয়াছিল, তাহাদের কয়েক জনের কোন সংবাদই পাওয়া যাইতেছে না, বোধ হয় কতকগুলি সন্ন্যাসী মরিয়াছে। আমার এক বিশিষ্ট বন্ধু মিঃ ডানকান, সুন্দরবনে চাষ করেন, তিনি তাঁহার এক বাঙ্গালী সহকারীকে লইয়া আজই সেবাকার্য্য করিতে আসিয়া-ছিলেন, এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাঁহার সেই বাঙ্গালী সহকারীটি—

একটা বিরাট শব্দে বাড়ীটা কাঁপিয়া উঠিল।

বেহারা আসিয়া সভয়ে কহিল, খানা-কামরার ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

সাহেব সেই দিকে ছুটিতেছিলেন, ইন্দু পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল। বলিল, ডানকান সাহেব ? সুন্দরবনে চাষ করেন ?

—হাঁ, আপনি কি তাঁহাকে চিনেন ? আহা, বৃদ্ধ তাঁহার বাঙ্গালী সহকারীটির জন্য কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন।

—সাহেব, দয়া করিয়া বলিতে পারেন, সেই সহকারীটির নাম কি ?

—আমি তাহার নাম জানি, ডানকান তাহাকে আমার কাছে লইয়া আসিয়াছিল, ফাইন ইয়ং ম্যান, চমৎকার স্বাস্থ্য —সে আবার এম্-এ, বি-এল্ উকিল। বেকার বসিয়া থাকিয়া মাথা খারাপ হইয়া নন্-কো-অপারেশন করিতে গিয়া কিছুদিন জেলে ছিল, স্বাস্থ্যটা একটু খারাপ দেখাইলেও খুব বলিষ্ঠ দেহ।

ইন্দু কাঁপিতেছিল। বাহিরের সেই বন্যার বজ্র নির্ঘোষও তাহার কাণে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, ঘর, চৌকী, সাজ, সরঞ্জাম, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার চোখে সবই বিলুপ্ত হইয়াছিল। তাহার কান্না পাইতেছিল কিংবা উল্লাসে চীৎকার করিতে ইচ্ছা হইতেছিল তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল না। শুধু নামটা তখনও জানা হয় নাই, সেইটা জানিতে পারিলেই তাহারও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়া যায় ! নামটা—নামটা ; কিন্তু কণ্ঠ-স্বরও যে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কণ্ঠে স্বর নাই যে জিজ্ঞাসা করে, অথচ এখনই জানিতে না পারিলে হয় ত আর জানাই হইবে না। ইন্দু নতজানু হইয়া সাহেবের পা ধরিলেও কি সাহেব তাহার প্রশ্নটা বুঝিতে পারিবেন না ? তা যদি না পারেন, তবে তিনি কিসের ম্যাজিষ্ট্রেট, কিসের জেলার শাসন কর্ত্তা, শাসনকর্ত্তা ! অতি কষ্টে প্রশ্নটা ঠোঁটের উপর আসিয়া কাঁপিতে লাগিল—নামটা আপনি—

—হ্যাঁ জানি, আমি মনে করিয়া বলিতেছি, এক মিনিট কোন্ ঘরটা পড়িল দেখিয়া আসি।

—কোন দরকার নাই। আপনি তাহার নাম বলুন।

—সু—সু—সুবি—সুবি—মোল, হইতে পারে। এক মিনিট, আমি আসিতেছি।

সাহেব বাহির হইয়া গেলেন, ইন্দু দেওয়ালটা ধরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু দেওয়ালও যে কাঁপে !

সাহেব ফিরিয়া আসিলেন, বলিলেন, আর একটি মিনিটও নয়, চলুন।

ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, তাঁহার কি হইয়াছিল বলিতে পারেন?

—হ্যাঁ। একজনদের ঘর পড়িয়া গেছে, তাহাদের একমাত্র ছেলেটি বন্যায় ভাসিয়া যাইতেছিল, তাহাকে উদ্ধার করিতে ছোকরা জলে ঝাঁপ দেয়, আর উঠে নাই।

ইন্দু পাষাণে পরিণত হইয়া গেল।

—ডানকান বড়ই আঘাত পাইয়াছেন। ছেলেটি কলিকাতার ছেলে, বেশ শিক্ষিত ছেলে। ডানকানের কাছে চাষকর্ম্ম শিখিতেছিল, কুমিল্লায় প্লাবনের কথা শুনিয়া ডানকানের হাতে পায়ে ধরিয়া টানিয়া আনিল, সেবাকার্য্য করিবার জন্য। বিশ নৌকা চাল-ডাল অনেক জিনিষ তাহারা তাহাদের গোলাবাড়ী হইতে আনিয়াছিল। ডানকান আসিতে চায় নাই, ছোকরা না কি তাহাকে বলিয়াছিল, কুমিল্লায় না গেলে সে বাঁচিবে না।—খুব বাঁচিল! হতভাগ্য নিজেই মরিল!

—আর একটি কথা।

—বলুন। কিন্তু আপনি ও-রকম করিতেছেন কেন? আমি বুঝিতেছি, আপনি ভীত হইয়াছেন, হইবারই কথা! আপনার মত সাহসী মেয়ে আমি দেখি নাই। কিন্তু আর দেরী করা নয়, চলুন।

ইন্দু কথা কহিতে পারিতেছিল না, গলায় যেন পাথর জমা হইয়াছে। অতি কষ্টে প্রাণপণ শক্তিতে কণ্ঠে ভাষা আনিয়া বলিল, একটি কথা।

সাহেব বলিলেন, বলুন।

—কতক্ষণ আগে ঐ ঘটনা ঘটিয়াছে?

—ঘণ্টা দুই হইবে।

ইন্দু খোলা জানালা দিয়া নদীটার পানে চাহিয়া বলিল, এই গোমতীতে?

সাহেব সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিলেন।

ইন্দু বলিল, এই গোমতী-নদীতেই তিনি—সুবিমল—তিনি ভাসিয়া গিয়াছেন ত?

—হ্যাঁ।

সে জলোচ্ছ্বাসের পানে চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সাহেব বলিলেন, আপনি যদি এখনও যাইতে রাজী না হন, আপনাকে আমি জোর করিয়া লইয়া যাইব। পাগলের প্রতি বলপ্রয়োগ নিন্দনীয় নয়, আপনার স্বামীও তাহা স্বীকার করিবেন।

ইন্দু আস্তে আস্তে সরিয়া গিয়া জানালায় দাঁড়াইল; বলিল, সাহেব আপনি যান, আমার নমস্কার গ্রহণ করুন, আমি এইখানেই থাকিব।

এই সময়ে আবার একটা ভীষণ শব্দ হইল। সাহেব চীৎকার করিলেন, বেহারা! দরোয়ান! বয়! বাবুর্চি! মশালচী! মেস্তর!—কাহারও সাড়া নাই। বুঝিলেন, চাকরী গেলে চাকরী হইতে পারে, প্রাণ গেলে প্রাণ ফিরে না বুঝিয়া তাহারা সরিয়া পড়িয়াছে। তবুও সাহেব বাহিরে ছুটিলেন। এবার ইন্দুর পার্শ্বের কামরাটি পড়িয়াছে।

সাহেব বাহির হইয়া যাইতেছে, ইন্দু ঘরের দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া দিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে নদীর ধারের জানালাসুদ্ধ দেওয়ালটা ধ্বসিয়া পড়িয়া ঘরে উন্মত্ত জলস্রোত তাণ্ডব তুলিয়া ঢুকিয়া পড়িল।

[শেষ

ভারতবর্ষের প্রকৃতি

... ... অনেকে মনে করেন যে, প্রকৃতিদেবী ভারতবর্ষের উপর পক্ষপাতিত্ব করিয়া এই দেশটিকে প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ করিয়াছেন এবং ভারতবাসীরও কোন উন্নত কৃষি-বিজ্ঞানাদি অথবা তৎসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা ছিল না। এই কথাও সত্য নহে। প্রকৃতির নিয়মের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, প্রকৃতিদেবী যাহা দিয়া থাকেন, তাহা সাধারণতঃ জঙ্গল এবং তাহাতে অনেক সম্পদ্ থাকে বটে, কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ব্যবস্থা দ্বারা তাহার উন্নতি সাধন করিতে না পারিলে মানুষের পক্ষে তাহা ব্যবহারযোগ্য হয় না। ... ...

জার্ম্মাণীর কয়েকটী স্থান

—শ্রীসুধা সেন

[১] ক্যলন্

ইউরোপের মধ্যে বেলজিয়াম অপেক্ষাকৃত অধিক উষর। বেলজিয়াম রাজ্যের রিক্ত ও নগ্ন দৃশ্যাবলী দেখবার পর জার্ম্মাণীর সীমানাতে প্রবেশ করবামাত্র প্রথমেই সেখানকার প্রকৃতির শ্যামল রূপ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পথের দুধারে পরিষ্কার আবাদী জমি। ছোট ছোট টালি-ছাওয়া ঘরগুলি দেখে বিহার অঞ্চলের কথা মনে পড়ে। এখানে ওখানে কত কৃষক কাজ করছে। গ্রাম্য কৃষক রমণীরা মাথায় রঙীন রুমাল বেঁধে কেহ শস্য কাটতে ব্যস্ত, কেহ বা সেগুলি সংগ্রহ করছে, আবার কেহ কেহ সংগৃহীত শস্য ঠেলাগাড়ীতে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। দূরে—পাহাড়ের কোলে সবুজ মখমলের আসনের মত বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র; মাঝে মাঝে ঝরণার স্রোত বয়ে যাচ্ছে। গ্রাম্য গৃহস্থেরা নিজের বাড়ীতে ফুলের বাগান করে কি শোভা যে বর্দ্ধন করেছে, দেখলে দুই চক্ষু জুড়িয়ে যায়। এই গ্রাম্যপথের সঙ্গে আমাদের দেশের গ্রাম্যপথের অনেক পার্থক্য। এখানে গ্রামের মেঠো পথ বড় চোখে পড়ে না, সবই পিচ-ঢালা অথবা ইট-গাঁথা রাজপথ। ক্ষেতের মধ্যে পরিষ্কার রাজপথে কত মোটর হু হু শব্দে ছুটে যাচ্ছিল। [illegible] [illegible] এ পথ পরিষ্কার হতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালাদেশের মাটীর পথের সঙ্গে তুলনায় এ কুৎসিত। দেশের মেঠো পথের গরুর গাড়ীর কোমল করুণ ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দের মধুর স্মৃতিতে সমগ্র ইউরোপের শোভা ও সৌন্দর্য্য যেন সেদিন ম্লান হয়ে পড়েছিল।

রেলপথের দুধারে নানা রকম দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা দ্বিপ্রহরে জার্ম্মাণী প্রদেশের ক্যলন্ (Cologne) সহরে উপস্থিত হলাম। ষ্টেশনের খুবই নিকটবর্ত্তী কলনার হোটেলে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হল। এখানে ঘরের ভাড়া বড় অধিক মনে হল, জার্ম্মাণ মুদ্রা প্রতি মার্ক আমাদের একটী টাকার সমান। শুনলাম গত মহাযুদ্ধের পর জার্ম্মাণী খুব ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়াতে এখন সমস্ত জিনিষের উপরই বেশীদরে শুল্ক বসিয়ে অর্থ-সমাগমের পথ দেখছে। হোটেলে আহারাদির ব্যবস্থা ভালই ছিল; অবশ্য বিলাতী মতে।

ক্যলন্ (Cologne): ষ্টীমার ঘাট; রেলষ্টেশন।

ক্যলন্ জার্ম্মাণীর শ্রেষ্ঠ সহরগুলির অন্যতম। গুণানুসারে জার্ম্মাণীর সহরগুলির মধ্যে বোধ হয় তৃতীয় স্থান অধিকার করে। স্থানটী বিখ্যাত রাইন নদীর তীরবর্ত্তী বলে শিল্প ও বাণিজ্যের একটী প্রধান কেন্দ্র। সহরের আধুনিক অবয়বের মধ্যেও সর্ব্বত্রই পুরাতন ঐতিহাসিক নানা ঘটনা ও কার্য্যাবলীর স্মৃতি জড়িত আছে; কথিত আছে, পঞ্চাশ খৃষ্টাব্দে

সম্রাট্ ক্লোডিয়াস্ তাঁর সম্রাজ্ঞী এগ্রিপিনার মনোরঞ্জনার্থে রোমক নাগরিকদের বসবাসের জন্য এই নগরী স্থাপন করে তার নামকরণ করেন "কলোনিয়া এগ্রিপেন্‌সিস্।" পরে ঐ নাম স্বল্লাকারে পরিবর্ত্তিত হয়ে প্রথমে "কলোনিয়া" এবং শেষে বর্ত্তমান "ক্যাল্‌ন্"-এ রূপান্তরিত হয়েছে।

ক্যাল্‌নের ক্যাথিড্রালটীর বাহিরের কারুকার্য্য চমৎকার। সমগ্র জার্ম্মাণীতে এই গির্জ্জাটী গথিক কলানৈপুণ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে পরিগণিত। ভিতরের উপাসনা-গৃহটীর ভিত্তি ১২৪৮শ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়, কিন্তু উপযুক্ত অর্থাভাবে ও অন্যান্য অসুবিধার জন্য অনেক দিন পর্য্যন্ত এর নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয়নি। ১৩২২শ খৃষ্টাব্দে উপাসনার বেদী নির্ম্মিত হয়ে

ক্যাল্‌ন্ঃ সাধারণ দৃশ্য, ক্যাথিড্রালের উপাসনা-গৃহ ; ক্যাথিড্রাল।

ছিল এবং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ প্রায় ছয় শত ত্রিশ বৎসর পরে সমস্ত কাজ শেষ হয়।

বর্ত্তমানে এই উপাসনা-মন্দিরে দুই সহস্র উপাসকের বসবার আসন আছে ; চতুর্ব্বিংশতি সহস্র লোক দাঁড়িয়ে উপাসনায় যোগ দিতে পারে। প্রায় সাত শত বৎসরের পুরাতন রঙীন কাঁচের জানালায় এখনও রংএর কি উজ্জ্বলতা! গৃহটীর ভিতরে একশত চারটী স্তম্ভ আছে এবং প্রাচীরের গাত্রে সাতশত আটাত্তরটি সাধুর মূর্ত্তি খোদিত। গির্জ্জার চূড়ায় উঠবার সোপানশ্রেণীতে পাঁচ শত আঠারটী ধাপ আছে। অনেক প্রধান পুরোহিতের মৃতদেহও এখানে প্রোথিত করা হয়েছে। ঈশার মাতৃমূর্ত্তির একখানি তৈলচিত্র এবং ঈশার দেহাবশিষ্ট কবরস্থ করবার দৃশ্যটি প্রস্তরের উপরে খোদিত আছে।

ক্যাথিড্রালের ধনাগারটীও দেখবার মত। এই গির্জ্জার যত ধনসম্পৎ সবই এখানে রক্ষিত।

অন্যান্য সহরের মত ব্যাঙ্ক, মহাসভাগৃহ, শাসনকর্ত্তাদের অফিস, সবাক চিত্রগৃহ, ক্যাল্‌নে সবই বর্ত্তমান।

এই সবের মধ্যে পুরাতন রোমক দুর্গের চিহ্ন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় এখানে ওখানে দেখা যায়। সমগ্র সহরটিতে আধুনিকতার সঙ্গে প্রাচীন ইতিহাসের একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক সুস্পষ্ট। এ যুগের কোন কোন লোক নিজেদের বাসগৃহগুলি দুর্গের অনুকরণে নির্ম্মিত করেছেন দেখলাম। ক্যাল্‌ন্ বিশ্ব-বিদ্যালয়টি আয়তনে মন্দ নয়। সহরের নূতন অংশের গৃহস্থদের বাড়ীগুলি বাংলোর ছাঁচে প্রস্তুত ; সঙ্গে উন্মুক্ত জমিও আছে। এখানে সহরের কোলাহল কম। প্রশস্ত প্রান্তরের ধারে জনসাধারণের ক্রীড়াভূমি দেখা যায়। সন্তরণের উপযোগী জলাশয়ও একটি আছে। প্রাতঃকালে পুরুষেরা সন্তরণ করে, বৈকালে নারীরা। নানাপ্রকার খেলাধূলার ব্যবস্থাও আছে। অদূরে একটি দর্শকদের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। গত যুদ্ধের পর এই অঞ্চলের বেকার লোক দিয়ে এ স্থানটি পরিষ্কার করিয়ে সুন্দর করা হয়েছে। তারাও কিছু উপার্জ্জন করে উপকৃত হ'ল, জনসাধারণেরও কত সুবিধা।

ক্যাল্‌নেই বিখ্যাত 'ও-ক্যাল্‌নের (Eaudecologne,

water of cologne) কারখানা। মাটির নীচে একটি প্রশস্ত কক্ষে কারখানা অবস্থিত। প্রবেশদ্বারের কাছ থেকেই 'ওডিকলনে'র সুগন্ধে মস্তিষ্ক ও মন স্নিগ্ধ হয়। কক্ষটীতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাঠের পিপাতে স্পিরিটের সঙ্গে সুগন্ধি ফুলের তেল নয় মাস মিশিয়ে রাখা হয়। তার কতকাংশ যখন ঘন হয়ে পাত্রের নীচে জমে যায়, তখন উপরের অংশ সাবধানে পৃথক্ করে অন্য পাত্রে তুলে রাখা হয়। এদেশবাসী বলে যে, এই ঘন অংশ বাতরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ও-ডি-কলোন প্রস্তুত হলে দেখতে স্বচ্ছ জলের মত হয়। তখন সেই জল নানা মাপের কাঁচের শিশিতে ভরে, ছাপ লাগিয়ে বিক্রয়ের যোগ্য করা হয়। একেবারে শীলমোহর করবার আগে রাসায়নিক ও বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষা করে দেখেন যে,

দক্ষিণ প্রদেশ থেকে, বিশেষতঃ ইটালী থেকে সুগন্ধি ফুলের তেল আনা হয়।

ক্যাল্‌নে বেড়াবার সময় যে জার্ম্মাণ বন্ধুটির ও তাঁর সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে পরিচয় লাভ করেছিলাম, হয়ত ভবিষ্যতে আর কখনও তাঁদের সঙ্গে দেখা হবে না, কিন্তু তাঁদের সহৃদয়তার কথা আজও মনকে আনন্দ দেয়

[২] রাইনল্যাণ্ড

ক্যাল্‌নে বেড়াবার পরে ফ্রাঙ্কফুর্টে (Frankfurt) যাবার কথা হওয়াতে স্থির করা গেল যে, জলপথে যেতে হবে। তা' হলে বিখ্যাত রাইন নদীর সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যাবে।

ক্যাল্‌নে একদিন কাটিয়ে পরদিন প্রাতরাশের পর ষ্টীমার-

মাইন্‌ৎস্ (Mainz)।

কব্‌লেন্‌ৎস্ (Coblenz) : কাইজার উইলহেল্‌মের প্রতিমূর্ত্তি।
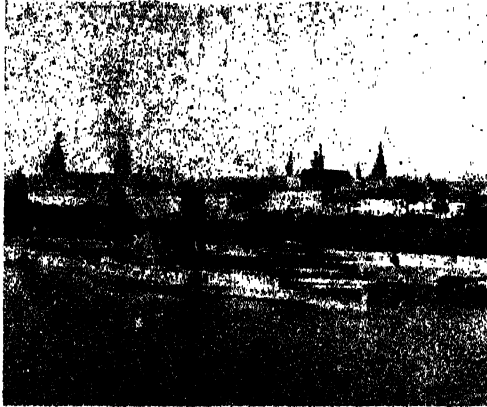
প্রত্যেক শিশির জল সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হয়েছে কি না। বিভিন্ন প্রদেশের নানা রকম কারখানা আজকাল এই ও-ডি-কলোনের অনুকরণে সুগন্ধি বারি প্রস্তুত করবার চেষ্টা করছে এবং অনেক দেশে সম্পূর্ণ ভাবে ও-ডি-কলোন জাল করবার দরুণ লোক ধরা পড়েছে বলেও শোনা গেছে।

কারখানাটি ১৭০৯ সালে স্থাপিত। তখন থেকে আজ পর্য্যন্ত এদের ব্যবসায় কত উন্নতি হয়েছে তাও একটি নক্সা করে বোঝান আছে। পুরাতন দিনের ব্যবহৃত রঙীন কাচের শিশিগুলিও রাখা আছে। এই কারখানায় সাধারণতঃ একশত পঁচিশজন লোক কাজ করে, বেশী কাজের ভার পড়লে লোক বাড়িয়ে আড়াইশত জন করা হয়। ইউরোপের

ঘাটে গেলাম। ষ্টীমার দাঁড়িয়ে ছিল, যাত্রীর দল মালপত্র নিয়ে সুস্থির হয়ে বসলে ষ্টীমারখানি ছেড়ে দিল।

আমরা নদীর স্রোতের উজান বেয়ে মোহানার বিপরীতাভিমুখেই চললাম। শুনলাম একেবারে ফ্রাঙ্কফুর্ট পর্য্যন্ত ষ্টীমার যায় না, মাইন্‌ৎস্ (Mainz) নামক স্থানে নেমে রেলপথে যেতে হয়।

ক্যাল্‌নের তীর ছাড়িয়ে আমরা অগ্রসর হলাম।

পূর্ব্বেই বলেছি, ক্যাল্‌নে রোমক নাগরিকদের একটী উপনিবেশ ছিল; এখনও চারিধারে তার স্মৃতিস্বরূপ দুর্গের ভগ্নাবশেষ চোখে পড়ে। ষ্টীমার থেকেও ক্যাল্‌নের বিখ্যাত ক্যাথিড্রালের চূড়াসমেত অট্টালিকাটী দেখা গেল। নদীর

অপর তীরেও ক্যল্‌ন্ সহর বিস্তৃত, দুটী সেতু দিয়ে দুই তীরের মধ্যে গতিবিধি রক্ষিত। একটী সেতুর উপর রেলপথ বিস্তৃত। দুই তীরে সবুজ ক্ষেতের মধ্যে গ্রামগুলি দেখতে ভাল লাগছিল। রাইন নদীর জল স্বচ্ছ। নদীটি বেশ চওড়া।

কিছুদূর গিয়ে একধারে গাছপালাবিশিষ্ট সুদৃশ্য বাগান-ঘেরা অষ্টাদশ শতাব্দার একটী দুর্গ দেখা গেল।

ক্যল্‌ন্ থেকে বন্ (Bonn) পর্য্যন্ত প্রাকৃতিক দৃশ্যকে এদেশবাসী হল্যাণ্ডদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে তুলনা করে; প্রায় একই রকম। আমরা বন্ সহরের তীরে এসে থামলাম। কয়েকজন যাত্রী নেমে গেলেন, আবার নূতন যাত্রী কয়েকজন এলেন।

সকলের কাছেই শুনলাম রাইনল্যাণ্ডে এই বন্ সহরটীই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর সহর। এখানে ক্যল্‌নের মত কোলাহল নেই। এদেশের একটী প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় এখানে প্রতিষ্ঠিত আছে। পাশ্চাত্য প্রদেশের বিখ্যাত বাদক ও সঙ্গীতবিশারদ বিঠোফেন (Beethoven) এখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বসতবাটী এখনও আছে।

ক্রমশঃ আমরা বন্ সহরের অপর পারে সাতটী পাহাড়ের শ্রেণী দেখতে পেলাম। এখানকার দৃশ্য বাস্তবিকই চমৎকার। ঘন গাছপালায় সমস্ত পাহাড় সবুজ হয়ে আছে—পশমের ছাঁটা ফুলের আসনের মত সবুজ শস্যক্ষেত্র; তার মাঝে মাঝে পাহাড়ের উপরে পায়ে চলার সরু ও আঁকা-বাঁকা পথ দেখা যায়। পাহাড়গুলির সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম "ওকলবার্গ" (Oelberg)। এখানে ভ্রাম্যমাণ পথিকদের থাকবার জন্য কয়েকটী হোটেল আছে। নদীর তীরে এই পাহাড়ের উপর হোটেলবাসের সময় চারিধারে কি চমৎকার শোভাই না দেখা যায়। শেষ পাহাড়টীর কোলে "হনেফ" (Hounef) নামে একটী সহর সমস্ত পাহাড়ের গায়ে বিস্তৃত—নদীর এত নিকটে অথচ পাহাড়ের আবেষ্টনের ভিতর বলে এ স্থানটী খুব স্বাস্থ্যকর। পাহাড়ের উপরে যক্ষ্মারোগীদের একটী স্বাস্থ্যনিবাস আছে।

অপর পারে "রোডারবার্গ" (Rodderberg) নামে পাহাড়ের কোলে "মেলেম" (Meblem) নামক একটী হোটেল দেখা গেল। আরও খানিক উত্তরে "গডেস্‌বার্গ" (Godesberg) পাহাড়ে গডেস্‌বার্গ দুর্গ অবস্থিত। এখন কেবল তার ভগ্নাবশেষ আছে। ১২১০ সালে ক্যল্‌নের প্রধান পুরোহিতের দল এটী উপাসনাগৃহ হিসাবে নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন; তার পর দুর্গ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ১৫৯৩ সাল থেকে দুর্গটী অল্প-বিস্তর ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে থাকে এবং শেষে ১৭৯৪ সালে একেবারেই ভূমিসাৎ হয়ে যায়। আরও খানিকদূর অগ্রসর হয়ে পাহাড়ের উপরে একটী গাছের

রোলাণ্ডসেক্ (Rolandseck) তোরণদ্বার।

তোরণদ্বার চোখে পড়ে। এই পাহাড়ের নীচে নদীর ধারে অনেক হোটেল আছে। শোনা যায়, বহুদিন পূর্ব্বে ঐ তোরণদ্বারের নিকট একটী আগ্নেয়গিরি ছিল। এ স্থানটির নাম "রোলাণ্ডসেক্" (Rolandseck)।

পাহাড়ের ধারে নদী কত বিভিন্ন পথে ঘুরে গিয়েছে; প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় মনোহর। পর্ব্বতপ্রধান স্থান হ'লেও কোনও স্থানেই নদীর উদ্দামভাব চোখে পড়ে না। ধীর শান্ত গতিতে নদী বয়ে চলেছে—দুই তীরের ভূমিই খুব উর্ব্বরা। সমস্তদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল ব'লে নদীপথে বেড়াবার কোন অসুবিধা হয়নি।

মধ্যাহ্ন-ভোজন ষ্টীমারেই সমাধা করা হ'ল। নদীতে এদেশবাসীরা ছোট নৌকার দাঁড় টেনে চলেছে দেখলাম। অধিকাংশ লোকেই শরীরের অর্দ্ধাংশ অনাবৃত অবস্থায় রেখেছে দেখে আশ্চর্য্য বোধ করলাম। দুই তীরে রেল-পথ; অনবরত ট্রেন যাচ্ছিল, মোটরের পথও বিস্তৃত। একটি পাহাড়ের উপর "হ্যামারষ্টিন" (Hammerstein) দুর্গের ভগ্ন প্রাচীর দেখলাম। ১১০৫ সালে জার্ম্মাণ সম্রাট্ চতুর্থ হেন্‌রী এই দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

পাহাড়ের শ্রেণী অতিক্রম করে দুই তীরের সমতলভূমিতে ছোট ছোট সহর ও গ্রাম দেখতে দেখতে অগ্রসর হলাম। নদীবক্ষে মধ্যে মধ্যে বালুর চড়া দেখা যায়। এই রকম একটী প্রশস্ত চড়ার নাম "মিডারওয়ার্থ" দ্বীপ (Isle of Miderworth)। এটী খুব উর্ব্বরা ভূমি ও এখানে লোকের বসতি আছে। এইভাবে "কবলেন্‌ৎস্" (Koblenz) নামক স্থান পর্য্যন্ত যাওয়া হ'ল। এখানে 'মোসেল' নদী রাইন নদীতে মিশেছে। দুই নদীর সঙ্গমস্থলের নিকটে প্রকাণ্ড অশ্বোপরি (অবশ্য প্রস্তরের) কাইজার উইলহেল্‌মের এক প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত।

কবলেন্‌ৎসে ষ্টীমার তীরস্থ হলে যাত্রীরা কেহ নামলেন, কেহ বা উঠলেন। তার পরই বৃষ্টি নামল মুষলধারে। নদীর বক্ষে ষ্টীমারে বসে এ রকম বৃষ্টিভোগ বহুদিন হয়নি। মাঝে মাঝে আকাশে মেঘের ফাঁকে রুদ্রতালে ডমরু বাজানর শব্দও হচ্ছিল। ষ্টীমারখানির প্রকোষ্ঠ সংখ্যায় কমই ছিল, তার উপর বৃষ্টিভয়ে ভীত যাত্রীর দল তার ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। আমরা বারান্দাতেই ক্যান্‌ভাসের পর্দ্দার আড়ালে বৃষ্টির অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষা করতে লাগলাম।

জলের ধারার সঙ্গে কুয়াশা মিশে বাইরের দৃশ্যকে ম্লান করে দিল। সেও এক বিচিত্র রূপ। নদীর প্রশান্ত মূর্ত্তি অল্প পরিমাণে চঞ্চল হয়ে উঠল। তারই মাঝে ষ্টীমারখানি মন্থর গতিতে অগ্রসর হল। একটু পরেই বৃষ্টি থেমে গেল। ক্ষণেকের জন্য যেন জলের ও বাতাসের আস্ফালনে সকলকে মাতিয়ে দিয়ে গেল।

অদূরে একটী চড়ার উপরে মন্দিরের মত কি দেখা গেল। কাছে পৌছে দেখলাম একটী দুর্গ। শুনলাম একাদশ শতাব্দীতে অনেকগুলি চূড়াবিশিষ্ট এই দুর্গটী নির্ম্মাণ করা হয়েছিল, সেটি এখন কাষ্টমস্ অফিস হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বীঙ্গেন (Bingen) সহরে ষ্টীমার থামল, এখানেও একটী দুর্গ আছে, তার নাম "বুর্গ ক্লপ" (Burg klopp)। সেখানে চতুর্থ হেন্‌রী তাঁর পুত্রের হস্তে বন্দী ছিলেন। অপরপারে জার্ম্মাণীর বিখ্যাত সহর "রুডেশহাইম্" (Rudesheim)।

ক্রমশঃ সন্ধ্যার আঁধারে চারিধার ঢেকে এল। গম্ভীর অন্ধকারে প্রাকৃতিক দৃশ্য আর পরিস্ফুট হয় না। বীঙ্গেন ছাড়িয়ে আসবার পর থেকেই নদীতে অনেক ছোট ছোট দ্বীপ দেখা গেল। সান্ধ্য-ভোজনের আহ্বান এল, আমরা ভোজনাগারে না গিয়ে বারান্দাতে অল্প কিছু আনিয়ে আহারের পর্ব্ব শেষ করলাম।

দিনের আলোর সঙ্গে মনের যে কি যোগ! অন্ধকার দেখলেই অবসাদ আসে, ক্লান্তির ভারে দুই চক্ষু বন্ধ হয়ে যায়। তাই সকলেই গন্তব্য স্থানে পৌছবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলাম।

ক্রমশঃ "ভিস্‌বাডেন" (Wiesbaden) পৌছুলাম। অধিকাংশ যাত্রীই এখানে নেমে গেলেন। তার অল্প পরেই দুটী সেতুর তলা দিয়ে "মাইন্‌ৎসে" (Mainz) এসে ষ্টীমারের গতি বন্ধ হল। তখন রাত্রি সাড়ে নয়টা। এই সহরের নিকটে "মেইন" (Maine) নদী রাইন নদীতে মিশেছে।

ষ্টীমার-ঘাটে নেমে মালপত্র নিয়ে ট্যাক্সি করে ষ্টেশনে এলাম। রেলপথে এক ঘণ্টার ভিতরেই ফ্রাঙ্কফুর্টে পৌছে গেলাম। ফ্রাঙ্কফুর্টে বিশেষ কিছুই দ্রষ্টব্য নেই বলে আমরা পরদিনই বার্লিনে চলে গেলাম।

[৩] পট্‌স্‌ড্যাম্

বার্লিনে গিয়ে পট্‌স্‌ড্যামের সম্পদ্ না দেখে ফিরে আসা হবে না, এই কথা ভেবেই আমরা অপর কয়েকজন যাত্রীর সঙ্গ নিয়ে একদিন দ্বিপ্রহরে পট্‌স্‌ড্যামের উদ্দেশে রওনা হলাম।

বার্লিনের কোলাহল ও জনতাপূর্ণ রাজপথ ছাড়িয়ে বাসে করে বাইরের পল্লীতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। নিকটস্থ ওয়ানসি হ্রদের (Wansee lake) ধারে নামতে হ'ল।

এখানকার দৃশ্য ভারী চমৎকার, দুপাশের গাছের ডাল নেমে এসে জলের ভিতর নত হয়ে যে তোরণদ্বারের সৃষ্টি করেছে, আমরাও সেই পথে গিয়ে ছোট মোটরনৌকায় উঠলাম। আকাশ সারাদিনই মেঘাচ্ছন্ন ছিল, বৃষ্টিও পড়ছিল।

নৌকাখানির বারান্দাতে আমাদের স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। খানিক পরে নৌকা ছাড়ল, মধ্যাহ্ন-ভোজনেরও ঘণ্টা বাজল। ছোট্ট জলযানেও যাত্রীদের কোনই অসুবিধা নেই।

প্রকৃতপক্ষে আমরা নদীপথেই যাচ্ছিলাম, নদীর নাম হ্যাভাল (Haval), কিন্তু মধ্যে মধ্যে বালির চড়া পড়ে নদীকে ঘিরে ফেলছে বলে এদেশবাসী একে হ্রদই বলে।

অদূরে "পীকক্" (Peacock) দ্বীপের বাগানের মধ্যে সম্রাজ্ঞী লুই-এর দুর্গ দেখা গেল। এর একধারে পিটার পলস্-এর গীর্জ্জা ও অপরধারে হাইল্যাণ্ডস্ গীর্জ্জা। খানিক পরেই দূর থেকে জার্ম্মাণ সম্রাটের মর্ম্মর-প্রাসাদ (Marmor Palais) দেখা গেল। এটি ১৭৮৬ সালে নির্ম্মিত হয় এবং এখানে ক্রাউন প্রিন্স থাকতেন। হ্রদের বামতীরে ঘন গাছের শ্রেণীতে ঢাকা স্থানটি ভারী চমৎকার। ক্রমশঃ গ্লীয়েনউইক সেতুর (Glienwicke Bridge) নিকটে উপস্থিত হলাম; অদূরেই বেবলস্‌বার্গের (Bablesberg) দুর্গ, এখানে না কি সম্রাট্ প্রথম উইলহেলম্ ও তাঁর সম্রাজ্ঞী অগাষ্টার অনেক সম্পত্তি আছে। সেতুর কাছেই নৌকা থেকে নেমে আবার বাসে উঠে প্রাসাদের উদ্দেশে রওনা হ'লাম।

পটস্‌ড্যাম সহরটী খুব জনবহুল ব'লে মনে হল না। সহরটী পাহাড় ও নদীর কোলে অবস্থিত, দেখায় ছবির মত। 'ফ্রেডারিক দি গ্রেট' এই সহরটী নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন এবং এখানকার যা' কিছু বর্ত্তমানে দ্রষ্টব্য সব তাঁরই রাজত্বকালীন।

নানা পথ ঘুরে এখানকার বিখ্যাত সাঁসুসি (Sansouci) প্রাসাদের সম্মুখে নামতে হল। তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল। কোনও প্রকারে প্রাসাদের কক্ষে প্রবেশ করে বৃষ্টির ধারা থেকে রক্ষা পেলাম।

প্রাশিয়ার সম্রাট্ 'ফ্রেডারিক দি গ্রেটে'র নিজের অভিরুচিতে এবং পরামর্শমত "নবেল্‌সড্রর্ফ" (Knobelsdorff) নামক এক বিখ্যাত স্থপতি এই প্রাসাদটি ১৭৪৫-৪৭ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করেন। ফ্রেডারিক এখানে প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল বাস করে গিয়েছেন এবং শেষে ১৭৮৬ সালে এখানেই প্রাণ ত্যাগ করেন। শেষে এটী চতুর্থ উইলহেলমের বাসস্থান হয়; তিনি এখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

প্রবেশের দর্শনী দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে প্রত্যেক যাত্রীকে আপন আপন জুতার উপর এক অপরূপ কম্বলের জুতা পায়ে পরতে হ'ল। প্রাসাদ-কক্ষের কাঠের জমির মসৃণতা নষ্ট হবার ভয়ে এই ব্যবস্থা। আমরাও সেই বৃহদাকারের জুতা পরে প্রাসাদ দেখতে গেলাম।

এই প্রাসাদটী একেবারে অনুপম না হলেও পৃথিবীর অতি অল্পসংখ্যক প্রাসাদের সঙ্গেই এর উপমা দেওয়া চলে। বিস্তৃত বাগানের ভিতর এই রাজপ্রাসাদ; বাগানে কয়েকটী সু-উচ্চ ফোয়ারা আছে। বাগান থেকে চত্বরে চত্বরে মর্ম্মর প্রস্তরের সোপান-শ্রেণী উঠেছে প্রাসাদ পর্য্যন্ত।

ভলটেয়ারের (Voltaire) কক্ষে তাঁর হস্তলিখিত একখানা পত্র পড়লাম।

প্রত্যেক কক্ষের মেঝে কি সুন্দর ও মসৃণ, তাতে কোনও রকম দাগ দিতে বা আঁচড় কাটতে বাস্তবিকই মায়া হয়।

চতুর্থ উইলহেলমের কক্ষ, ডিম্বাকৃতি ভোজন-গৃহ, অভ্যর্থনা-গৃহ ও সঙ্গীত-কক্ষ দেখে আমরা সম্রাট্ ফ্রেডারিক যে গৃহে দেহত্যাগ করেন, সেখানে এলাম। প্রত্যেকটী কক্ষে সুন্দর সুন্দর আসবাবপত্রই বা কত, আর প্রাচীরগাত্রে কারুকার্য্যই বা কি!

আমরা মর্ম্মর-কক্ষ দিয়ে গ্রন্থাগারে এলাম। এখানে দুই সহস্র সুন্দর বই আছে, সঙ্গে সঙ্গে কত সুন্দর তৈলচিত্রও দেখলাম। সম্রাটের নিভৃত পাঠাগারে তাঁর ব্যবহৃত লেখনের সরঞ্জাম, আরাম-কেদারা সবই রয়েছে।

শেষে গেলাম বাগানে। ফুল-ফলের গাছে ভরা সুদৃশ্য বাগান, কত জলের উৎস রয়েছে, জল প্রায় ষাট ফুট ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে। এই বাগানে সম্রাটের এগারটি "গ্রে হাউণ্ড" কুকুরের সমাধি আছে। এই সমাধি-ক্ষেত্রের নিকটেই ১৭৪৬ সালে সম্রাট্ নিজে একটি সমাধি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; তাঁর ইচ্ছা ছিল সেখানেই তাঁকে কবরস্থ করা হয়, কিন্তু দ্বিতীয় উইলহেলম্ গ্যারিসন্ গীর্জ্জায় তাঁর দেহাবশিষ্ট প্রোথিত করেন।

বাগানের সব দিকই শোভাময় ; ঠিক প্রাসাদ থেকেই ধাপে ধাপে সোপানশ্রেণী নেমে গিয়েছে, অর্দ্ধপথে নেমে প্রাসাদটি দেখতে ভারী ভাল লাগে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও এখানে কাইজারের বসতি ছিল বলে এখনও এত পরিচ্ছন্ন ও শোভন করে রাখা হয়েছে।

বৃষ্টির গতি কমলে একটু একটু ভিজতে ভিজতে আমরা অগ্রসর হলাম। পথেই ঐতিহাসিক স্মৃতি জড়ান একটি ভগ্ন "উইণ্ড-মিল্" (windmill) দেখলাম। প্রবাদ আছে যে, তার শব্দে বিরক্ত হয়ে সম্রাট্ সেটী বিনষ্ট করতে আদেশ দেন, এবং দরিদ্র মালিককে তার পরিবর্ত্তে কিছু অর্থ সাহায্য করতেও চেয়েছিলেন। কিন্তু দরিদ্র মালিক সম্রাটের অর্থ ও অনুরোধ উপেক্ষা করে, সম্পত্তি ত্যাগ করতে অসম্মত হয়। শেষ পর্য্যন্ত সম্রাট্ এটী বিনষ্ট করতে পারেন নি।

বাগানের বাইরে আবার বাসে চড়তে হল। খানিক চলবার পরে ডাহিনে ওরানজেরিস্ (Orangeries) প্রাসাদ পড়ল। ১৮৫৬ সালে চতুর্থ উইলহেলম্ এটী নির্ম্মাণ করান। তাঁর একটী প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তি এখানে আছে। বিদেশী অতিথিদের অতিথিশালা হিসাবে এই প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। এই প্রাসাদের একটী কক্ষ বিখ্যাত চিত্রকর র‍্যাফেলের নামে নামাঙ্কিত, সেখানে তাঁর অঙ্কিত আটচল্লিশটী তৈলচিত্র আছে।

ক্রমশঃ নিউপ্যালেস্ বা নূতন প্রাসাদের নিকট এলাম। এই প্রাসাদ পর্য্যন্ত সাঁস্যুঁসির উদ্যান বিস্তৃত, এইটাই সম্রাটের প্রধান প্রাসাদ ছিল। সাঁস্যুঁসিকে "উদ্যানবাটী" বলা যেতে পারে। কাইজার উইলহেলম্ অধিকাংশ সময় এখানেই থাকতেন। ১৭৬৩-৬৯ সালে "ফ্রেডারিক দি গ্রেট" এটী নির্ম্মাণ করান এবং নিজেদের রাজ্যের সমস্ত সম্পদের সাক্ষ্য দেবার উদ্দেশ্যেই যেন এ প্রাসাদকে যতদূর সম্ভব সমৃদ্ধিসম্পন্ন করে সাজিয়েছিলেন। এখানে দুইশত কক্ষ ও বড় বড় সভাগৃহ আছে। চারিশত দর্শকের আসনবিশিষ্ট একটী নাট্যগৃহও আছে। প্রধান প্রাসাদ ব্যতীত সভাসদদের বাসোপযোগী দুটী প্রাসাদও দেখা যায়।

প্রাসাদটী দেখবার জন্ত নামলাম এবং দর্শনী দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে আবার সেই কম্বলের জুতা পরতে হল, তার পর সারবন্দী হয়ে প্রথমেই প্রবেশ করলাম বিখ্যাত কড়িঘরে (shell room)। এই কক্ষের সমস্ত প্রাচীরগাত্রে, স্তম্ভে ও ছাদের নিম্নপৃষ্ঠে নানা রংএর, নানা আপের ঝিনুক, শাঁখ, কড়ি প্রভৃতি বসিয়ে বিচিত্র কারুকার্য্য করা হয়েছে। চুনী, পান্না, মুক্তার জ্যোতিতে ঘরখানি ঝলমল করছিল ; যে সব সম্পদের ছোট্ট একটি কণার দাম দিতে সাধারণ মানুষকে কত ভাবতে হয়, এ দেশের সম্রাট্ সে সব রত্নের বৃহৎ বৃহৎ খণ্ড প্রোথিত করে আপনার কক্ষখানিকে সাজিয়েছিলেন। ছাদের নীচের দিকে সামুদ্রিক জন্তুর মূর্ত্তি পাথরে খোদিত ; আর তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঝিনুক দিয়ে চিত্রিত করা। এ কক্ষে রাত্রিতে আলো জ্বালা হলে না-জানি কি শোভাই হয়।

একের পর এক অভ্যর্থনা-গৃহ, মর্ম্মর-কক্ষ, সঙ্গীত-কক্ষ সব দেখে উপরে নাট্যগৃহে গেলাম। লাল মখমলের আসনগুলি খুব আরামপ্রদ।

নীচে এসে কাইজারের বাসকক্ষগুলি দেখা হল। প্রত্যেক কক্ষের বিভিন্ন নক্সা, বিভিন্ন কারুকার্য্য। কোনও কোনও গৃহের প্রাচীরগাত্রে রূপার পাত বসিয়ে সুন্দর কাজ করা হয়েছে। স্তব্ধ হয়ে শুধু শিল্প-সৌন্দর্য্য দেখলাম। আমাদের দেশের মোগল সম্রাটেরা নবাবী করে গিয়েছেন, ইতিহাস সেই কথাই বলে। কিন্তু কাইজারের ঐশ্বর্য্য সেই নবাবী আমলের কথাই মনে পড়িয়ে দেয়। ভাবতে লাগলাম এত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে যাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছে, এখন রাজ্য থেকে নির্ব্বাসনে গিয়ে তাঁর মনের অবস্থা কিরূপ। আজ ঘুমন্ত পুরীর মত এ প্রাসাদ স্তব্ধ ও মৌন, অথচ এখানেই একদিন কত আড়ম্বরে রাজন্তবর্গপরিবেষ্টিত হয়ে সম্রাট্ বিশ্বের ত্রাস উৎপাদন করে গিয়েছেন। সবই যেন ভাগ্যের কঠোর পরিহাস!

পট্‌স্‌ড্যাম্ বেড়াবার পর আবার হ্রদের তীরে এসে নৌকাযোগে বার্লিনে ফিরে এলাম।

বাঙ্গালীর ছেলে

—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী

সেই সব সূর্য্যালোকের দেশ, যেখানে মাঠের পর মাঠে শ্যামল তৃণের অনন্ত প্রসার, যেখানে মাথার উপর আকাশ গাঢ় নীল, বিচিত্র বর্ণের পাখী ও তরুলতা, যেখানে নিস্তব্ধ দুপুরে চারিদিক্ ঝিম্ ঝিম্ করে, প্রকৃতি যেন ঘুমিয়ে পড়ে, কেবল অশ্রান্ত সমুদ্র-গর্জ্জন আর তটভূমির নারিকেল পল্লবের মর্ম্মর, আর সারা দিনমান গাছের ছায়া কাঁপে মাটীর উপর—সেই সব দ্বীপময় দেশ তোমার জন্য যুগযুগান্ত কাল অপেক্ষা করে আছে; যাও, ঘরের মায়া ছেড়ে, নিজ দেশের ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করে বৃহৎ ভারতের অফুরন্ত ঐশ্বর্য্যের সন্ধানে—সম্মুখে অনন্ত সম্ভাবনা, অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ!

রোদ্দুরের দিকে চেয়ে চেয়ে কেন জানিনে, বার বার ঘুরে ফিরে, এই কথাগুলোই মনে পড়ছিল,…লেখকের নামটা মনে নেই, কোথায় কবে পড়েছিলাম, তা'ও ভুলে গিয়েছি, কেবল ভাবটাই মনে রয়ে গিয়েছে, হয়ত কথাগুলোর মধ্যে একটা দুঃসাধ্য আশার বাণী ছিল, যাতে বর্ত্তমানের বিশ্রী রুক্ষতা দুর্ল্লভ সম্ভাবনার মোহে স্নিগ্ধ হয়ে আসে, ক্ষণকালের জন্যে নিজেকে ভুলে থাকার অবকাশ মেলে।

সে সময়টা কলকাতার পথে পথেই প্রায় কাটছিল ভাগ্যের সন্ধানে। সোনার হরিণ কোনদিনই নাগালের মধ্যে এল না, তবু যত্নের ত্রুটি ছিল না। আশাহীন আশার ঘোরে দিনের পর দিন আজ দু' বছর ধরে এই মায়ামৃগ শিকারের ব্যর্থ চেষ্টা চলছে। এই দু' বছরে জীবন যেন অনেকখানি এগিয়ে গেছে। মনে হয় কত জিনিষেরই আসল রূপ জানতাম না, কত ভুল ধারণা নিয়েই এতদিন কাটিয়েছি। কত বাজে, মিথ্যা কথাই না ইস্কুল-কলেজে শেখানো হয়, জীবনে কোনদিনই দরকার হয় না যাদের, চাই কি, সে শিক্ষার উল্টো রকমই ঠেকে সংসারের চেহারাটা। মফঃস্বলের কলেজ থেকে বেরিয়েই কলকাতায় চলে আসি, আর তার পর থেকেই চলছে ভাগ্যের সঙ্গে এই tug of war. মনে আছে, প্রথম প্রথম কি কষ্টই গিয়েছে, শহরের কিছুই চিনি না, একটা লোকের সঙ্গেও আলাপ নেই, মাত্র চার টাকা তের আনা সম্বল পকেটে, আর এই বিরাট সহর কলিকাতা,—কিন্তু সে দিন কেটে গেছে। পাড়াগাঁয়ের ছেলে আমরা, যে কোন অবস্থায়ই হ'ক, মানিয়ে নিতে বেশী দিন লাগে না। সে দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত, পুরো দুটো বছর এমনই ত কেটেছে—পয়সা রোজগারের নানা ফিকিরে কত বিচিত্র লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, কত অদ্ভুত ব্যাপারই দেখলাম!

সকাল থেকেই মনটা ভাল ছিল না, তার উপর পথে আসতে যা' দেখলাম, সমস্ত অন্তরটা একেবারে বিষিয়ে গেল। আমার ভারী আশ্চর্য্য লাগে, মানুষ মানুষের উপর এতটা নিষ্ঠুর হয় কি করে—আমারই মত রক্তমাংসের মানুষ, অথচ, …বেশ মোটাসোটা একজন বাবু একটা ছেলের উপর মহা তম্বিতাম্বি করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন হিন্দিতে, সঙ্গে একটা পাহারাওয়ালা; ছেলেটা বাঙালী, চেহারা দেখলে সত্যিই মায়া হয়, এম্‌নি কাহিল, কতদিন যেন খায়নি, যেন ধুঁকছে। তার অপরাধ, রাস্তার ধারে বাড়ীর পাঁচীল, তারি গায়ে খানকতক বই সাজান, আর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল ছেলেটা, বইগুলো বিক্রী করবে, এই আশায়। বাবু বলছেন—"হঠাও"; ছেলেটা হাত যোড় করে অতি মৃদু আপত্তি জানিয়ে মিনতি করছে; বাবু তারও জোরে হাঁক দিচ্ছেন—'আবি হঠাও'।—হিন্দুস্থানী পাহারাওয়ালা এবার তার জাতীয় গালি উচ্চারণ করলে,… কাঁহেকো, সঙ্গে সঙ্গে এক চড়! ছেলেটা পড়ে গেল; উঠে বইগুলো কোন রকমে গুছিয়ে নিয়ে একবার সেই বাবুটির দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল—যাবার সময় দেখলাম তার নাকের নীচে, ঠোঁটের উপরটায় টকটকে লাল দাগ! একটা কথাও বলিনি, বলবার কি-ই বা ছিল? একফোঁটা চোখের জলও পড়েনি, কারও দুঃখে আর চোখের জল আসে না,… সেখান থেকে চলে এলাম।

মানুষ মানুষকে বাঁচতে দেবে না। যারা দুঃখের, অভাবের পুড়িয়ে সোনা করার শক্তির জয় গান করে, ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলে প্রচার করে, সেই সব তত্ত্বজ্ঞানীর সম্বন্ধেও কিছু

বলতে চাইনে, যেমন চাইনে ওই হিন্দুস্থানী পাহারাওয়ালাটার সম্বন্ধে। ও ওর ঐ হৃদয়হীন, বুদ্ধিহীন পশুত্বের জন্যেই সরকারের কাছ থেকে মাইনে পায়। কাণ্ডজ্ঞানহীন ওরাই ত শাসন-যন্ত্র চালিয়ে রেখেছে; কিন্তু ঐ বাবুটি? তিনি ত বাঙালী, ক্ষতি ত তাঁর কিছুই হ'ত না—কিংবা হয়ত আমারই ভুল, বাইরের খোলসটা খুলে ফেললে সব মানুষের আসল চেহারা একই! কাউকে কিছু বলবার নেই।

তুমি এই সুন্দর ভুবনে এই মহৎ মানব-জন্ম পেয়েছ, দিনান্তে যখন ক্ষুধার জ্বালায় রাস্তার কলের জলে পেট ভরাতে হয়, তখন কি, তোমার এই দেশে জন্মের জন্য কৃতজ্ঞতায় সমস্ত অন্তর উদ্বেল হয়ে ওঠে না? একটা জাতকে জাত মরতে বসেছে, এই শ্মশানভূমিতে শবলুব্ধ গৃধ্র-গৃধিনীর উল্লাসের আর অন্ত নেই, তবু বাঙালীর ছেলের মুখে কথা নেই, প্রাণে উৎসাহ নেই, মনে ভাগ্যজয় করার তেজ নেই—কিন্তু এ সবখানিই কি তার আত্মকৃত অপরাধ, তার নিজের অক্ষমতার ফল? আর কারো কি কোন হাত নেই এতে? অথবা এসব চিন্তাই বৃথা, উত্তপ্ত মস্তিষ্কের উদ্ভট কল্পনা?

স্থানটি বেশ ছায়াঘেরা; কতকগুলো বিলিতী গাছের নীচে বাগানের এক কোণের একটা বেঞ্চিতে বসে আছি। এমনি আবোল-তাবোল কত কথাই মনে আসছে, বাইরে কি ভীষণ রোদ্দুর, কলকাতার ইট-পাথরের বাড়ী আর পীচ-ঢালা রাস্তা থেকে যেন আগুনের তাপ উঠছে, হাওয়া নেই একদম, মাঝে মাঝে এক-আধ ঝলক যা' বইছে, গায় যেন ফোস্কা পড়ে, এমনি গরম! জ্যৈষ্ঠ-মধ্যাহ্নে নীল নির্মেঘ আকাশে যেন প্রলয়ঙ্কর বহ্নি-উৎসব চলেছে, সেদিকে চাওয়া যায় না, চোখ ঝলসে যায়,—যেন সাপের জিভের মত, লক্লকে, তীক্ষ্ণ তলোয়ারের ধারের মত শাণিত রোদ্দুর! বাগানের চার-ধারের কেয়ারী-করা গাছগুলোর কেমন এক রকম হতচ্ছাড়া রোদপোড়া চেহারা! পুকুরের জলের উপর সূর্য্যের আলো পড়ে যেন জ্বলছে! একটা প্রকাণ্ড মাছ 'গুড়ুম্' করে ল্যাজের ঝাপ্টায় জল ছিটকে আবার তলিয়ে গেল—চারিপাশে রাস্তায় ট্রাম-বাসের ঘড়ঘড়ানি, লোকজনের হৈ-চৈ, সবশুদ্ধ মিলে মাথার ভিতর কেমন এক অস্বস্তিকর গুলতানি পাকিয়ে তুলছে—কোন আপিসের বাড়ীর আলসার উপর ঘাড় বাঁকিয়ে বসে একটা কাক।

কতক্ষণ যে বসে আছি, তার ঠিক নেই, এক ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা ...পেটের দায়ে নিত্য এই উঞ্ছবৃত্তি—শরীরের প্রতি রক্তকণা চীৎকার করে বলছে—না, না, না, শরীরে, মনে, কোথাও যেন আর এতটুকু জোর পাচ্ছি না—কেমন একটা ভারী, অবসাদ-ভরা জড়তা ধীরে ধীরে সমস্ত দেহ-মন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, হাত-পা নাড়তে পাচ্ছি না, হাত-পাগুলো যেন আমার নয়, আর কারো! কাল দুপুরের সেই আড়াই পয়সার মুড়ি—আজ দুপুর গড়িয়ে যায়—আর কতক্ষণ চলে? একেবারে নিঃসম্বল অথচ কি উপায় হবে, তা' ভাবতেও পারি না—পেটের ভিতর যেন আগুন জ্বলছে, নাড়ীগুলোর মধ্যে পেরেক ফুটিয়ে থেকে থেকে কে যেন মোচড় দিচ্ছে; সর্ব্বশরীর অবশ হয়ে আসছে! সময় কি কাটতেই চায় না? পোষ্টাপিসের ঘড়িটায় সবে বারটা বাজল—এই ভাবে ঠায় একঠাই বসে থাকতে আর ভাল লাগছে না, কিন্তু যাই বা কোথায়? থাকতাম একটা মেসে, শুধু রাতটুকুর জন্যে, টো টো করে ঘুরে ঘুরেই ত কাটে সারাদিন,—ভোজন জুটল ত যথা-তথা! কিন্তু কাল রাত্তিরে বাসায় ফিরতেই ম্যানেজার বাবু বিস্তর ভণিতার পর অত্যন্ত মোলায়েম সুরে আরম্ভ করে শেষে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছেন—শোনাতে অবশ্যই তিনি পারেন এবং শেষবারের মত জানিয়েও দিয়েছেন, এ ভাবে লোকসান তিনি আর দিতে পারবেন না, ভাল কথায় কাজ না হলে শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে অপমান করতে বাধ্য হতে হবে, ইত্যাদি। না, অপমান আর তাঁকে করতে দিই নি, রাত্তিরটা থেকে, ভোর না হতেই বেরিয়ে পড়েছি।

খানিকক্ষণ আগে একজন মাড়োয়ারী ফেরিওয়ালা তার কাপড়ের গাঁট নামিয়ে আমার বেঞ্চিটাতে এসে বসেছিল, কখন যে সে সটান হয়ে শুয়ে পড়েছে আর অল্প অল্প করে শিয়রের দিকে ঠেলা দিচ্ছে, লোকটা বেশ ত! আবার এক একবার মিটমিট করে চেয়ে দেখ্ছে! একটু সরে বসলাম, লোকটাও পুঁটলিসমেত এগিয়ে এল, একবার ডেকে বললাম, লোকটা সাড়াই দিলে না, দিব্যি নাক ডাকাতে সুরু করল। কি আপদ্—কিন্তু এ নিয়ে বচসা করার মত উৎসাহও আমার ছিল না, শেষে নিতান্ত কায়ক্লেশেও যখন আর বসা চলল না, উঠে পড়লাম; ফিরে দেখি, লোকটা এবার সমস্ত বেঞ্চিখানা জুড়ে বেশ আরাম করে গা মেলে দিয়ে শুয়েছে।

বড় বড় চার পাঁচ তলা বাড়ীগুলো সব আপিস। কত দেশ থেকে কত লোক এসে কাজ করে এই সব বাড়ীতে বসে, তাদের মাথার উপর ইলেক্‌ট্রিক পাখা ঘোরে, টেবিলের উপর গাদা গাদা কাগজ-পত্তর, মোটা মোটা বাঁধান খাতা, অত কি লেখে? কত কাজ না জানি, কত লাখ লাখ টাকার কারবার অথচ জানে না, ওরা কেউ জানে না, কাল থেকে আমি না খেয়ে আছি—ঐখানে ঐ পাখার নীচে একবারটি আমায় বসতে দেয় না? খানিকক্ষণ জিরিয়ে নেব। বাড়ীগুলোর চার পাশে বার বার করে ঘুরি, যেন কোন যাদু আছে ঐ সব বাড়ীর—ওরই মধ্যে একখানা টুল, আঃ, জীবন ধন্য হয়ে যায়।

সামনের রাস্তা ধরে বরাবর চলেছি—কোথায় জানি না, যে দিকে দু'চক্ষু যায়, একটু মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই—মনে হচ্ছে এমনি যদি চলি চিরকাল, দিনের পর দিন, সকাল থেকে সন্ধ্যে, লোকালয় ছাড়িয়ে বন-জঙ্গল পেরিয়ে কেবলি চলি! চলার উদ্দেশ্য নেই, যাত্রার শেষ নেই, পথও যেন আর শেষ না হয়! মাথার উপর মধ্যদিনের কড়া রোদ্দুর, পায়ের তলায় মাটী আগুনের মত তেতে উঠেছে, চটির গোড়ালিটা কোন্ কালে ক্ষয়ে গিয়েছে, আর মেরামত করা হয় নি, কিন্তু কোন অনুভূতিই যেন আজ আর আমার নেই, মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করছে, কোন কিছুই গুছিয়ে ভাবতে পারছি না, সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। যত চেষ্টা করি ততই আরও এলো-মেলো হয়ে আসে, অসংলগ্ন চিন্তার টুকরা বারংবার আবর্ত্তিত হতে থাকে মনে—ম্যাটিল্‌ডা, রাজার মেয়ে ম্যাটিল্‌ডা, কোথায় নিবাস তার, কি যে হ'ল তার জীবনে, ম্যাটিল্‌ডা, রাজার মেয়ে ম্যাটিল্‌ডা।

ঘ্যাঁ—চ—

চমকে ফিরে চেয়ে দেখি একখানা মোটর গাড়ী একেবারে ঘাড়ের উপর এসে পড়েছিল আর কি! সাহেব তার গাড়ী নিজেই চালিয়ে আসছিল, আমার দিকে চেয়ে মুচকে মুচকে হাসছে, সমস্ত অবস্থাটা ভাল করে বুঝবার আগেই লাফিয়ে অন্য ফুটপাথে উঠে পড়লাম,—সায়েব একটু হেসে বললে—"বি মোর কেয়ারফুল, বাবু"—তার পর গাড়ী হাঁকিয়ে চলে গেল। দেখলাম, বড় গির্জ্জাটার সামনে এসে পড়েছি, আশ্চর্য্য, এতক্ষণে মাত্র এইটুকু এসেছি, চারিদিকে গাছে গাছে নতুন পাতা গজিয়েছে, পথের পাশে মাঠে ঘাসগুলো রোদের তাপে ফ্যাকাশে, বিবর্ণ—এ দিক্‌টা নির্জ্জন, তবু, কি জানি, এখনি হয়ত লোক জমায়েৎ হবে, তার পর—না, একবার এদিক্ ওদিক্ চেয়েই সামনেই যে গলিটা পেলাম, ঢুকে পড়লাম—

দুর্ব্বলতা আর ক্লান্তি, পা যেন আর ওঠে না, অতি কষ্টে যেন গুণে গুণে পা ফেলা, সব মাটী মাড়িয়ে চলা—মাথার মধ্যে সমগ্র চৈতন্য আচ্ছন্ন করে কেবল একটা শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে—ঘ্যা-চ—দেশ দেশান্তর পার হয়ে, নদী নালা পাহাড় পর্ব্বত ডিঙিয়ে, সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত করে' পথের দু' ধারের বাড়ীগুলোর উপর দিয়ে যেন ঐ শব্দটা আসছে, ক্রমাগত আসছে, অতি মৃদু থেকে স্পষ্ট, স্পষ্টতর হয়ে আবার ক্ষীণ, ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে, আবার আসছে, কিছুতেই শেষ হচ্ছে না, মনে হচ্ছে আর যেন মাথা ঠিক রাখতে পারব না। এইবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাব!

এ কি এ কোথায় এসেছি—? বড় বড় অক্ষরে মোটর-ফলকের উপর লেখা—এম্. এন্. রয়, আঃ! এ বেলার মত নির্ভাবনা—কি আশ্চর্য্য, এই কথাটা এতক্ষণ মনে পড়ে নি! গেলে নিশ্চয়ই না খাইয়ে ছাড়বে না—বাঁচা গেল—তার পর? সে ভাবনা করা মূর্খতা—বর্ত্তমান, আজ শুধু এই ক্ষণটিই জগতে একমাত্র বাস্তব, বাকি মিথ্যা, কল্পনা…এক পা দু'পা করে ভিতরে ঢুকতেই দেউড়ির দরোয়ান বেরিয়ে এল …এঁ্যা? মেম-সাব নেহি, দার্জ্জিলিং গিয়া…সেই মুহূর্ত্তের জন্য বুকের স্পন্দন যেন বন্ধ হয়ে গেল, পায়ের তলার মাটী যেন যথেষ্ট কঠিন নয়…ফিরলাম। নাঃ, ফের তার কাছে গিয়ে জিগোস্ করলাম, কেউ নেই—লোকটা আমার রকম-সকম দেখে হকচকিয়ে গিয়েছিল বোধ হয়—বললে, নেহি নেহি, ছোটা মেমসাব ত হ্যায়ই…আপ যাইয়ে…একটা বেয়ারা ডেকে দিলে, এক টুকরা কাগজে নিজের নামটা লিখে দিয়ে ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসলাম…যাবার আগে বেয়ারা পাখাটা খুলে দিয়ে গেল…আঃ, পাখার হাওয়া নয় ত, মায়ের কোল, শরীর জুড়িয়ে যায়…বাস্তবিক এই ত জীবন, এমনি ছ' মহলা বাড়ী, এমনি জীবনযাত্রার উপকরণ…পথের দু' ধারে রূপকথার রাজ-অট্টালিকার মত প্রকাণ্ড বাড়ীগুলোর পাশ দিয়ে যাবার সময় কতবার মনে মনে আশ্চর্য্য হয়ে ভেবেছি, যে সব ভাগ্যবান্ এই সকল বাড়ীতে বাস করে, না জানি তারা কি

রকম, কত সুখী! অপরূপ আনন্দময় জীবন···লোকায়ত জীবনযাত্রার যে খণ্ড-বিচ্ছিন্ন ছবি চোখে পড়ে,এই সব জায়গায় মনে মোহ ধরে তাতে। অরূপণ কল্পনায় পৌঁছি গিয়ে রূপ-কথার রাজ্যে—যেখানে সোনার গাছে হীরা ফলে, মণি-মুক্তার প্রদীপ জ্বলে এবং রাজকন্যার গলায় দোলে গজমতীর মালা আর চোখে নাচে আলো, কখন আসবে রাজপুত্তুর পক্ষীরাজে চড়ে। মা ভালবাসে, বাপ আদর করে, সাত ভাই চম্পা আর বোন পারুলের দেশ।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠবার সময় এতক্ষণে নিজের দিকে নজর পড়ল···যেমন হয়েছে নিজের চেহারার ছিরি, তেমনি হয়েছে জামা-কাপড়ের দশা! পায়ের চটি যোড়া নামে জুতো, ধুলো আটকায় না, পায়ের সবটাই প্রায় বেরিয়ে থাকে, সার্টের হাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে আর গুটোতে গুটোতে কনুই-এর উপর পর্য্যন্ত এসে পৌঁছেছে, কাঁধের উপরটা ফেঁসে গেছে, পরণের কাপড়ের অবস্থা তদ্রূপ, যথেষ্ট পরিষ্কারও নয়; মাথার চুলে কতদিন যে তেল পড়েনি, তার ঠিক নেই; চারিদিক্‌কার এই মহার্ঘ্য, সুন্দর আসবাব-উপকরণের মধ্যে নিজের এই অতি দীন-মলিন বেশে মনটা সত্যিই বড় ছোট হয়ে যায়, নিরুপায় অক্ষমতার গ্লানিতে জীবনে ধিক্কার আসে।

তে-তালার ঘরের দরজায় পর্দ্দা টাঙান, ঠেলে ঢুকে পড়ব কি না ইতস্ততঃ করছি, ভিতর থেকে ডাক এল—এস না ভিতরে যতীশ—

ছোট মেজদাদের এ বাড়ীর বধূ। ইতিপূর্ব্বে আর যে কবার এসেছি এঁর দেখা পেয়েছি কচিৎ এবং কথাবার্ত্তা হয়েছে যৎসামান্য—সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামবার সময় কোন ঘর থেকে বেরিয়ে হঠাৎ মুখোমুখী দেখা, লৌকিক কুশল প্রশ্ন···এই পর্য্যন্ত—অবশ্যই এঁরা পর্দ্দানসীন নন্, বরঞ্চ একেবারে পর্দ্দা-ফাঁক, আগাগোড়াই সমস্ত বিলিতী ধরণ, সারা বাড়ীখানার মধ্যে এক শরীর ছাড়া আর কিছুই বোধ হয় এদেশের নয়। আমি এসেছি নিজের কাজে, এঁরা বড় লোক—একটা সম্পর্কও আছে কোথাও কিছু সুবিধে হয় যদি, এই আশায়—তাঁর কর্ত্তা-গিন্নির কাছে···কিন্তু আজ একেবারে সামনা-সামনি তে-তালার ঘরে—আশ্চর্য্য হবারই কথা···তিনি তখন একটা টেবিলের সামনে বসে কি লিখছেন, আমাকে একটা কৌচ দেখিয়ে একটু হেসে বললেন, একটু বস, যাহ্ এই চিঠিটা শেষ করে নি, পাঁচ মিনিট!

ঘরটা হাল ফ্যাসানে সাজানো, আধুনিকতার কোন উপকরণেরই ত্রুটি নাই···ওদিক্‌কার দেয়ালে দরজার দু'পাশে দুটো বড় আয়না, আয়নায় তাঁর ছায়া পড়েছে পিছন দিক্‌টা। একরাশ ভিজা চুল পিঠের উপর ছেড়ে দেওয়া, তার নীচে দিয়ে ঘুরিয়ে আঁচল মাথার উপর টানা, বার বার পড়ে যাচ্ছে—লেখার ফাঁকে ফাঁকে বার বার মাথায় তুলে দিচ্ছেন··· মেয়েটী সুন্দরী; যেমন রং তেমনি গড়ন···বাঙ্গালী মেয়ের পক্ষে একটু বেশী ঢ্যাঙ্গা, চলার সময় একটা অদ্ভুত ঢঙে সমস্ত শরীরটা ঝাঁকানি দিয়ে দুলে দুলে ওঠে, কথা বলার সময় ঘাড়টা হেলাবার একটা বিশেষ ধরণ আছে, যখন কারু মুখের দিকে চান্, টানা টানা ডাগর চোখের সবখানি মেলে দিয়ে চান্, সে চোখের চাহনাতে একটা অতল স্বচ্ছতা, অপরূপ তরলতা। চিঠি লেখা শেষ হল, গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত একবার পড়ে, সন্তর্পণে ভাঁজ করে' খামের মধ্যে পুরে, খামের উপর ঠিকানা লিখে আর একবার পড়া হল, তার পর টেবিলের ঢাকনিটা টেনে দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন—"এক মিনিট—"

ক' মিনিট কাটল, ঠিক জানি না, তবে বেশী নয়; ঘরের মাঝখানে একটা উঁচু গদি আঁটা ছোট খাট। তারই এক কোণে বসে পড়ে মিসেস্ রায় বললেন—তার পর? এমন অসময়ে যে?—কেন যে এমন অসময়ে তার স্পষ্ট উত্তর দেওয়া সহজ ছিল না, শুধু বললাম,—এই যাচ্ছিলাম এদিক্ দিয়ে, অমনি একবার—

—না, না, সে ত ভাল কথা। মা ত নেই, তিনি দার্জ্জিলিং গেছেন।

তাই ত মুস্কিল, এসে এমন্ অপ্রস্তুতে পড়েছি—

—কেন, মা না থাকলে কি আসতে নেই? সম্পর্ক কি শুধু মার সঙ্গেই···

নিতান্ত অপ্রতিভ হয়ে গেলাম, মুখের উপর এ কথার কি জবাব দেব? বলতে অবশ্যই পারতাম, সম্পর্ক সকলের সঙ্গে, কিন্তু যে সু-উচ্চ লোকে আপনার অধিষ্ঠান, সেখানে প্রবেশের স্পর্দ্ধা কই আমার? সম্পর্ক পাতাবার জায়গা কোথায়? কিছু না বলে চুপ করেই গেলাম।

কিছুক্ষণ এ-কথা সে-কথার পর চুপচাপ, আর যেন কথা খুঁজে মেলে না।—এক সময় তিনি বললেন—তুমি শ্যামনগরের উদের চেন?···কোথায় শ্যামনগর, আর কারাই বা সেখানকার উরা, কিছুই জানতাম না, কস্মিন্ কালে শুনেছি বলেও মনে পড়ে না, বললাম—নাম শুনেছি, তবে সাক্ষাৎ পরিচয় নেই··· কিছুক্ষণ ধরে তাঁদের কথাই চলল···কথাবার্ত্তার ফাঁকে ফাঁকে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলাম—সময় চলে যায় যে।—পেটের ভিতর থেকে থেকে কে যে যাঁতা পিষছে, মাঝে মাঝে সর্ব্বাঙ্গ বেয়ে ঠাণ্ডা হাওয়ার মত কি একটা শির্ শির্ করে উঠছে—সামনে একজন যে বসে আছে, তার সঙ্গে যে আমি কি কথা বলাবলি করছি, তার কথায় জবাব দেওয়া দরকার, সব যেন মাঝে মাঝে ভুলে যাচ্ছি···চোখের সামনে নানা খাবার জিনিষের মনোহর মূর্ত্তি ভেসে উঠছে, মুহূর্ত্তের জন্যে চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয় অন্তরের উৎফুল্লতায়, মনে মনে অত্যন্ত লজ্জা পাই, মিসেস্ রায়ের মুখের দিকে চাই—ভাগ্যিস্ মানুষের মনের কথা অন্য লোকে জানতে পারে না। তিনি তখন বলছিলেন, বাস্তবিক, তোমার একটা কিছু হলে বেশ হয়···কি কথার প্রসঙ্গে একথা, তা খেয়াল নেই···অন্তরের নিরুদ্ধ উত্তাপ যেন ফেটে বার হতে চায়, যেখানে অন্নের চিন্তা চমৎকার, একমুঠো মুখের ভাত যেখানে জোটে না—একটা কিছু হওয়া ত সেখানে হাতে স্বর্গ পাওয়া।

একথা কাকে বোঝাব···কিন্তু আর কতক্ষণ এমনি চলবে? এখনি হয়ত উঠে পড়তে হবে···শেষে বলেই ফেললাম, বৌদিদি একটু জল আনাতে···মুখের কথা শেষ হল না—তাঁর সুন্দর মুখ অপ্রতিভ-লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল—বার বার বলতে লাগলেন—ছি ছি, কি আমার আক্কেল, এই রোদ্দুরে এলে, কোথায় আমিই ছি ছি···।

শুধু জল নয়, জল খাবার—খাবারের রেকাবিটা নিজের হাতে, পিছনে পিছনে বেয়ারা। একহাত পিরিচের উপর গেলাস—গেলাসে চৌকোনা বরফের কুচি, অন্য হাতে একটা সোডার বোতল···খাবারগুলোর দিকে চেয়ে চোখ আর ফেরাতে পারিনে, দিশি, বিলিতী নানা রকমের, কি নধর, পরিস্ফুট চেহারা···হাত বাড়িয়ে তুলে নিতে গিয়েই মনে পড়ল, জল খেতে চেয়েছি, গপ্ গপ্ করে আগেভাগে খাবারগুলো গিলতে গেলে দৃশ্যটা হয়ত অশোভন হবে, হা অদৃষ্ট, এমন মুস্কিলেও মানুষে পড়ে? রেকাবিটা দেখিয়ে বললাম—আবার এসব কেন আনতে গেলেন—ঠাণ্ডা জলই ত···

—তা হোক, তুমি খাও,···উঁহু, ওসব শুনছিনে,

—তাইত,···কিন্তু আগে কি খাই বলুন, জল না খাবার?

—কেন খাবার, আচ্ছা প্রথমে একটু জল খেয়ে নাও···

খেতে খেতে এক সময় জিগ্যেস্ করলাম,···আচ্ছা বৌদিদি, আপনি বি-এ পাশ, না? অজ্ঞাতে অত্যন্ত ব্যথার স্থানে হাত দিইছি, বৌদিদির মুখখানা মলিন হয়ে গেল; নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, পাশ আর করতে পারলাম কই?

—কেন?

—কেন, ফোর্থ ইয়ারে উঠেই ত বিয়ে হয়ে গেল—তার পরে কি ভাবে আর পড়াশোনা হয়? আমার আর সব ভাই বোন, কেউই এম্-এর কম নয়, আমিই কেবল মুখ্যু হয়ে রইলাম, বিলেত যাব, কত কি, সবই ত হল···"

সমস্ত মুখখানা তাঁর কাল হয়ে গেল—কি আশ্চর্য্য এই মানুষের মন! কখন আর কিসে যে সে দুঃখ পায়, তার কি কোনই ঠিকানা নেই! এম্-এ পাশ আমি যখন এক মুঠো ভাতের কাছে পৃথিবীর অন্য সব কিছুকে তুচ্ছ যৎসামান্য জ্ঞান করছি, মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা, যুগ-যুগান্তরের অভিজ্ঞতা-লব্ধ সভ্যতাকে নিরর্থক, মিথ্যা বলে মনে হয়েছে, তখন এই অতুল রাজ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থেকেও এই মেয়েটি তার বি-এ পাশ না করার দুঃখে মনে শান্তি পাচ্ছে না! যার সামান্যতম স্বার্থ পূরণ করার জন্যে বাড়ীর দাসী-চাকর থেকে মায় খোদকর্ত্তা পর্য্যন্ত সর্ব্বদা শশব্যস্ত, পৃথিবীতে অভাব যার কোন বস্তুরই নেই, মুখের কথা না ফুরোতে যার ইচ্ছা পূর্ণ হয়, তারও জীবনে দুঃখের অবকাশ আছে! জীবনটা কি রহস্যময়! ভাবনা-স্রোতে বাধা পড়ল,—ও কি খাচ্ছ না যে বড়, হাত গুটিয়ে বসে রইলে কেন? উঁহু, সে হচ্ছে না, ফেলা চলবে না,—"

অন্যমনস্ক হয়ে কখন যে হাত বন্ধ হয়ে গেছে, খেয়ালই নেই, কিন্তু সত্যিই আর খেতে পারছিলাম না, অত খিদেয় কি এত মিষ্টি খাবার খাওয়া যায়—কিন্তু শোনে কে?—বেশ, একটু জল খেয়ে খাও, না, কোন ওজর আপত্তি শুনতে চাইনে, আচ্ছা, আমি হাতে করে দিচ্ছি, খাও,—

বৌদিদি, বৌদিদি, কি বলছ তুমি! তুমি কি জান না যে আমার জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা, সেখানে তোমার হাতের দেওয়া খাবার মিষ্টতর মনে করার, তোমার অনুরোধে খাবার নষ্ট আগ্রহ আবার ফিরে পাওয়ার মত মনের সূক্ষ্ম বিলাসিতার অবকাশ কই জীবনে? প্রাণ-ধারণের পক্ষে অপরিহার্য্য অংশ-টুকুই যেখানে দুর্লভ, রমণীর প্রভাব সেখানে কতটুকু?

কিন্তু এ মেয়েটি করে কি? সত্যিই আমার থাওয়া-রেকাবি থেকে খাব্যর নিয়ে হাতে তুলে দিলে, "নাও, খাও।" এরও পরে না বলার মত নিষ্ঠুর হৃদয় আমার ছিল না, গলায় একটা শক্ত ডেলা আটকে গেল, চোখ ছাপিয়ে জল এল—অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিজের দুর্ব্বলতা গোপন করলাম দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করে করে বাইরে যতই রুক্ষ কঠিন হয়ে উঠছিলাম, ভিতরে ভিতরে যে তেমনি দুর্ব্বল হয়ে পড়ছিলাম, আজ অতর্কিতে এমন ভাবে প্রকাশ না পেলে কি আমিই তার সন্ধান জানতাম।

আরও খানিকক্ষণ পরে বিদায় নিলাম। বৌদিদি নীচে পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে এলেন, চলে আসার সময় বললেন, এস মাঝে মাঝে, কেন যে আস না?

তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

আকস্মিক প্রণাম পেয়ে বৌদিদির মুখ লাল হয়ে উঠল। চেয়ে দেখলাম, সে মুখে বি-এ পাশ না করার গ্লানি আর এতটুকুও অবশিষ্ট নেই।

বাইরে আকাশ-বাতাসের চেহারা যেন বদলে গেছে—রোদ্দুর গায় লাগে না। বাতাসে ভেসে চলেছি যেন—কোথায় জানি না—কি হবে এর পরে, তাও জানি না, তবু মনে হল, আমি সুখী।

মর্ম্মবাণী

—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

এ ভগ্ন কুটীরে আজি জাতির জীবন-শিখা
কাঁপিতেছে ধীরে ধীরে,
উদগ্র বাতাসে বন্ধু নিভিয়া যাবে কি তাহা?
নিশীথের আঁখিনীরে।
এ জাতির আত্মাসনে অভাগা জননী কাঁদে,
চকিতে চপলা হাসে,
সঘনে বরষা নামে, দাদুরী ডাকিছে শোন,
গগনে মেঘেরা ভাসে।
দুর্য্যোগ দুয়ারে তব এসেছে ঝঞ্ঝার সাথে,
নিভিতে দিও না শিখা,
তোমরা রয়েছ শুধু দীনতার ধূলা মাখি—
জানি না ললাট-লিখা।
সুদূর অতীত যুগে ঋষিদের মন্ত্র জপি' তোমরা লভিলে শিব,
জাতির দেউল রচি' প্রতিমা বসালে তাহে।
পূজার জ্বালিয়া দীপ,
স্বপ্নকের বোধিমূলে শক্তি-সাধনার ফুল দেবতার পায়ে দিলে,
সাধনা সুন্দর হেরি আনন্দ-সাগরে প্রভু তোমাদের বুকে নিলে।
অতীত-সঙ্গীত আমি স্মরণের পাদপীঠে অকারণে গাহি নাই,
অতীত গৌরবগাথা ধিক্কৃত লাঞ্ছিত আজি
কেহ তাহা বুঝে নাই।
পূর্ব্ব-পুরুষের দেওয়া সাধনার জপমালা তোমরা ছিঁড়েছ সবে,
পাবক-বিহীন রহে এ বিরাট যজ্ঞশালা, সাধনা কেমনে হবে?
গৈরিক বসন পরি' ধনীর ভাণ্ডার শুষি' যারা সাজে ভগবান,
গড়েছে তাহারা বন্ধ কথার বাঁধন দিয়া এ জাতির অপমান।
তাদের পরাণে জাগে কামনা-কাঞ্চন-কাম।
থাকিত তাদের যদি,
তিলেক শকতি তবে উঠিত না হাহারব,
হ'ত না দেশের ক্ষতি।
তাদেরই ইন্দ্রজালে লুপ্ত আছে সব-কিছু মহাভারতের বুকে,
তোমরা উঠ গো সবে অমন করিয়া আর
থেক না ক' অধোমুখে।
জাতির জীবন-শিখা নিভিতে দিও না কেহ,
শ্মশান হবে যে দেশ,
দুয়ার ভাঙিয়া যায়, করালী নাচিয়া ফিরে,
উড়ায়ে আলুল কেশ।
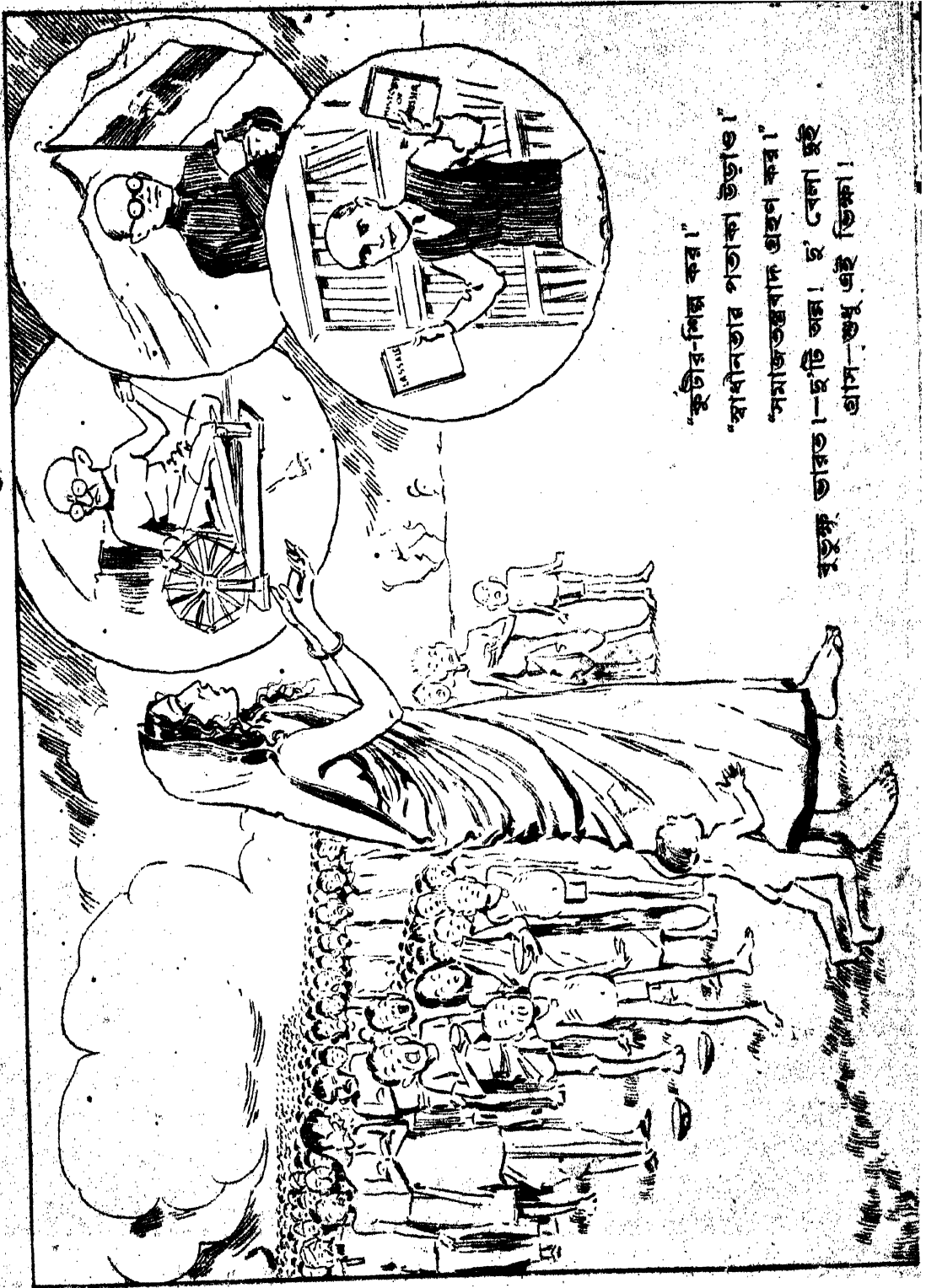
LASSALLE
"কুটীর-শিল্প কর।"
"স্বাধীনতার পতাকা উড়াও।"
"সমাজতন্ত্রবাদ গ্রহণ কর।"
বুভুক্ষু ভারত।—দু'টি অন্ন! দু' বেলা দুই
গ্রাস—শুধু এই ভিক্ষা!

[সম্পাদকদ্বয়ের সম্মতিক্রমে শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক লিখিত]

দেশের অবস্থা ও আমাদের কথা

কি হইলে দেশের অবস্থা ভাল হয়, তৎপ্রসঙ্গে আমরা বঙ্গশ্রী'তে অনেক আলোচনা করিয়াছি। তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, যখন দেশের অধিকাংশ মানুষের অন্নবস্ত্রাদির অভাব, পরমুখাপেক্ষিতা, অসন্তুষ্টি, অস্বাস্থ্য, অকালবার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যু দূরীভূত হয়, তখন দেশের অবস্থা ভাল হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যখন যে-দেশে মানুষের অবস্থায় অন্নবস্ত্রাদির অভাব, পরমুখাপেক্ষিতা প্রভৃতি তিরোহিত হয়, তখন সেই দেশের গৃহপালিত পশু, খেচর পক্ষী এবং জলচর মৎস্যাদিও সুলভ হয় এবং তাহারাও সুস্থ এবং সবল হইয়া থাকে, ইহা প্রাকৃতিক সত্য। শুধু যে চর-জীবগুলি সুলভ, সুস্থ এবং সবল হইয়া থাকে তাহা নহে, বৃক্ষ, লতা-গুল্ম প্রভৃতি উদ্ভিদ অর্থাৎ অচর জীবগুলিও দেখিতে সুন্দর, রসাল এবং অধিকতর ফলবান্ হয়।

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের মানুষের অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, অন্নবস্ত্রাদির অভাবযুক্ত মানুষের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। শুধু যে অন্নবস্ত্রের অভাবযুক্ত মানুষের সংখ্যাই বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা নহে, তৎসঙ্গে, যেমন পরমুখাপেক্ষী মানুষের সংখ্যা বাড়িতেছে, সেইরূপ আবার অসন্তুষ্ট, অসুস্থ, অকালবৃদ্ধ এবং অকালমৃত্যুমুখী মানুষের সংখ্যাও ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে প্রতি বৎসর বাড়িয়া চলিতেছে। যতই অতীতের দিকে পিছাইয়া যাওয়া যায়, ততই দেখা যাইবে যে, অন্নবস্ত্রাদির অভাব, পরমুখাপেক্ষিতা, অসন্তুষ্টি, অস্বাস্থ্য, অকালবার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যু আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম ছিল। ইহা ছাড়া গৃহপালিত পশু, খেচর পক্ষী, জলচর মৎস্য এবং বৃক্ষ, লতা-গুল্মাদির অবস্থাও ভাল ছিল। কাজেই বলিতে হইবে যে, ভারতবর্ষের মানুষের অবস্থা যেমন উত্তরোত্তর আশঙ্কাপ্রদ হইয়া দাঁড়াইতেছে, সেইরূপ তাহার গৃহপালিত পশু, খেচর পক্ষী, জলচর মৎস্য এবং বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। অতীতের সহিত মিলাইয়া বর্ত্তমানের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে, যে-শ্রেণীর ক্রমিক অবনতি পরিদৃষ্ট হইবে, তাহা আর সামান্য কয়েক বৎসর অপ্রতিহত থাকিলে আমাদের ভারতবর্ষের অবস্থা যে কোথায় যাইয়া দাঁড়াইবে, তাহা ভাবিতেও শিহরিয়া উঠিতে হয়।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যখন বৎসরের পর বৎসর ভারতবাসী ও ভারতবর্ষের এতাদৃশ ক্রমিক অবনতি ঘটিতেছে, তখন গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের বিভিন্ন য়্যাডমিনিষ্ট্রেসন-রিপোর্টে ব্রিটিশ রাজত্বে ভারতবর্ষের উন্নতি হইতেছে, ইহা লিখিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। শুধু যে গভর্ণমেণ্টই তাঁহাদের রিপোর্টে ভারতবর্ষের ও ভারতবাসীর ক্রমিক উন্নতির কথা লিখিয়া থাকেন, তাহা নহে, আমাদের দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, দার্শনিক, সমাজনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ এবং সংবাদপত্রওয়ালাগণও প্রায়শঃ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঐ একই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা মনে করেন যে, ষ্টীম এঞ্জিন, এরোপ্লেন, মোটর গাড়ী, বেতারবার্ত্তা, বৈদ্যুতিক আলো ও পাখা, সিনেমা, টেলিফোন, ছাপান পুস্তক, স্কুল-কলেজ প্রভৃতি যখন এত সুলভ হইয়া পড়িতেছে, তখন নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর উন্নতি হইয়েছে। কিন্তু ইঁহারা বিস্মৃত হন যে, মানুষ যাহা কিছু চায়, তাহা তাহার অন্ন-বস্ত্রের স্বচ্ছলতা, স্বাবলম্বন, সন্তুষ্টি, স্বাস্থ্য, দীর্ঘ যৌবন এবং দীর্ঘ জীবনের জন্য। হইতে পারে যে, ষ্টীম এঞ্জিন প্রভৃতি বড় অদ্ভুত জিনিষ এবং তাহাতে অনেক উন্নত মস্তিষ্কের পরিচয় আছে।

কিন্তু ঐ ষ্টীম-এঞ্জিন প্রভৃতির উন্নতি ও বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি দেখা যায়, জনসাধারণের অন্নবস্ত্রাদির অভাব, পরমুখাপেক্ষিতা, অসন্তুষ্টি, অস্বাস্থ্য, অকালবার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যু উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা হইলে কি যুক্তিসঙ্গত ভাবে বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষের ও ভারতবাসীর উন্নতি হইতেছে? যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, দার্শনিক, সমাজনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ এবং সংবাদপত্রওয়ালাসমূহের সাধারণ বিচারশক্তিতে এতাদৃশ অভাব পরিলক্ষিত হয়, তাঁহাদিগকে দায়িত্বজ্ঞানহীন দাম্ভিক (irresponsible humbugs) বলা যায় না কি? এবং তাঁহারা কি জনসাধারণের সমালোচনাযোগ্য নহেন?

ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সত্যের খাতিরে আমরা এই সব বিশেষজ্ঞগণের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে বাধ্য হইতেছি। আমাদের মতে দেশের মধ্যে যদি একজনও প্রকৃত রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক অথবা দার্শনিক অথবা সমাজ-নৈতিক অথবা সংবাদপত্রসেবী থাকিতেন, তাহা হইলে সোণার ভারত এবং তাহার জনসাধারণ এতাদৃশ শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইতে পারিত না, পরন্তু একটু না একটু উন্নতির দিকে পরিবর্ত্তন দেখা যাইত। যদি ভারতে প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞ অথবা অর্থনীতিজ্ঞ অথবা দার্শনিক অথবা সমাজ-নীতিজ্ঞ অথবা দায়িত্বজ্ঞানযুক্ত সংবাদপত্রসেবী একজনও থাকিতেন, তাহা হইলে আমাদের কৃষক, তাঁতী, যুগী, কুম্ভকার, কর্ম্মকার প্রভৃতি অন্নাভাবগ্রস্ত হইতে পারিত না; আমাদের শিক্ষিত যুবকদিগের বেকার হইতে হইত না; আমাদের উকিল, ব্যারিষ্টার প্রভৃতি আইন-ব্যবসায়ী, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী এবং বণিকগণের পরমুখাপেক্ষী হইয়া অর্থাভাব ভোগ করিতে হইত না এবং সমগ্র অধিবাসী স্বাস্থ্যহীন ও অকাল-বৃদ্ধ হইয়া অকালে মৃত্যুমুখী হইতে পারিত না। ভদ্রতার খাতিরে কোন তিক্ত সমালোচনা না করিয়া জনসাধারণের পক্ষে এতাদৃশ রাজনীতিজ্ঞ, অর্থনীতিজ্ঞ, দার্শনিক, সমাজনীতিজ্ঞ এবং সংবাদপত্রসেবিগণকে হয়ত উপেক্ষার চোখে দেখাই পরামর্শযোগ্য হইত, কিন্তু দেশে প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞ প্রভৃতির উদ্ভব না হইলে, দেশের উন্নতি হওয়া সম্ভব নহে এবং জনসাধারণের পক্ষে রাজনীতির অথবা অর্থনীতির অথবা দর্শনের অথবা সমাজনীতির অথবা সংবাদপত্র-পরিচালনার জ্ঞানলাভ করা সহজসাধ্য নহে। কাজেই বর্ত্তমান তথাকথিত রাজনৈতিক প্রভৃতির যাহাতে স্ব স্ব ভ্রম দেখিবার প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়, তাহার চেষ্টা জনসাধারণকেই করিতে হইবে; নতুবা আমাদের রক্ষা নাই। তথাকথিত রাজনৈতিক প্রভৃতির যাহাতে স্ব স্ব ভ্রম দেখিবার প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়, তাহা করিতে হইলে যে, বর্ত্তমানে পাশ্চাত্ত্য জগতে রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন এবং সমাজনীতি এবং সংবাদ-পত্র পরিচালনা-বিজ্ঞান বলিয়া যাহা চলিতেছে, তাহা যে ভ্রমে পরিপূর্ণ, তাহা যাহাতে তাঁহারা বুঝিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। যদি তাহা ভ্রমে পরিপূর্ণই না হইত, তাহা হইলে পাশ্চাত্ত্য জগতের জনসাধারণের মধ্যে অন্নবস্ত্রের অভাব, পরমুখাপেক্ষিতা, অসন্তুষ্টি, অস্বাস্থ্য, অকালবার্দ্ধক্য এবং অকাল-মৃত্যু উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইত না।

পাশ্চাত্ত্য জগতের প্রত্যেক দেশে যে অন্নবস্ত্রের অভাব, পরমুখাপেক্ষিতা প্রভৃতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা আমরা 'বঙ্গশ্রী'তে বহুবার বহু প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি। ঐ ঐ দেশে অন্নাভাব না থাকিলে, ঐ ঐ দেশের লোক স্বদেশ ও স্বজন ছাড়িয়া চিরবিদেশী হইত না এবং আমাদের এই বিপন্ন দেশে ব্যবসা ও বাণিজ্যের অজুহাতে অন্ন-সংস্থানের চেষ্টায় ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়াইত না। টলষ্টয়, হেন্‌রী জর্জ্জ প্রভৃতি সত্যবাদী ও বিচারশীল গ্রন্থকারদিগের লিখিত বর্ণনা পড়িলে জানা যাইবে যে, ঐ ঐ দেশে যাঁহারা ধনকুবের, তাঁহাদের সংখ্যা অতীব মুষ্টিমেয়। অধিকাংশ দেশেই ধনকুবেরের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ২ জনও নহে। প্রায় সমস্ত দেশেই শতকরা নব্বই জন লোক ভারতবর্ষের দরিদ্র লোকের অপেক্ষাও অধিকতর দরিদ্র এবং তাহাদের দারিদ্র্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। অথচ আমাদের বই-পড়া পণ্ডিতগণ প্রকৃত অবস্থা বিচার করিতে না পারিয়া এবং লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী কয়েকটী সহর ঘুরিয়া আসিয়া মনে করেন যে, পাশ্চাত্ত্য দেশের জনসাধারণ ভারতবর্ষ অপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী।

পাশ্চাত্ত্য জগতের প্রত্যেক দেশের জনসাধারণ যে চাকুরী-জীবী হইয়া উত্তরোত্তর অধিকতর পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতেছে, তাহাও সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আমাদের দেশের কৃষকগণকে এখনও পর্য্যন্ত স্বাধীনজীবী বলা যাইতে পারে। আমেরিকা, রুশিয়া প্রভৃতি যে সমস্ত দেশে বর্ত্তমান

intensive cultivation প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই সমস্ত দেশেও একদিন কৃষক সম্প্রদায় স্বাধীনজীবী ছিল। কিন্তু যে দিন হইতে ঐ ঐ দেশে intensive cultivation প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছে, সেই দিন হইতে কৃষকগণকে চাকুরীজীবী হইয়া পড়িতে হইয়াছে। ঐ ঐ দেশে শুধু যে কৃষকগণই পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছে তাহা নহে, অন্যান্য শ্রমজীবী সম্প্রদায়ও চাকুরীজীবী হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছে। আমাদের দেশে এখনও যেরূপ কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, কুম্ভকার, যুগী, তাঁতী প্রভৃতি কুটীর-শিল্পিগণকে স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে দেখা যায়, পাশ্চাত্ত্য জগতের প্রত্যেক দেশের শিল্পের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ ঐ দেশেও একদিন একমাত্র কুটীর-শিল্পই বিদ্যমান ছিল এবং ঐ কুটীর-শিল্পিগণের অধিকাংশই স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করিত।

কিন্তু যে দিন হইতে যে দেশে যত অধিক মাত্রায় যন্ত্রশিল্প প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তত চাকুরীজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং পাইতেছে। তাহার ফলে ঐ ঐ দেশে জনসাধারণের মধ্যে ক্রমশঃই বেকারের সংখ্যা, অসুস্থের সংখ্যা এবং অসন্তুষ্টের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। কাজেই বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান intensive cultivation ও scientific industry এবং trade-এর ফলে আপাতদৃষ্টিতে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধনকুবেরের উদ্ভব হইয়াছে বটে, কিন্তু জনসাধারণের পক্ষে উহা জগতের কোথায়ও সুফলপ্রদ হয় নাই। অথচ আমাদের দেশের ধুরন্ধরগণের মধ্যে যাঁহারা না ভাবিয়া, না বিচার করিয়া intensive cultviation, scientific industry এবং trade-এর বুলি আওড়াইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আমরা বর্ত্তমান কালে "মহাত্মা", "ঋষি", "আচার্য্যদেব" এবং "বিশেষজ্ঞ" প্রভৃতি সম্মানজনক আখ্যায় আখ্যাত করিয়া মাথায় তুলিয়া নাচিয়া থাকি।

অসন্তুষ্ট লোকের সংখ্যাও যে পাশ্চাত্ত্য জগতের প্রত্যেক দেশে বাড়িয়া গিয়াছে, তাহার পরিচয় ঐ ঐ দেশের দলাদলি ও যুদ্ধ-স্পৃহা পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যাইবে। যুদ্ধে মানুষের জীবন বিসর্জ্জন করিতে হয়, ইহা জানিয়াও যখন মানুষ যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, যাঁহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা স্ব স্ব জীবনযাত্রার কোন না কোন বিষয়ে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। নিজ জীবনযাত্রায় সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট থাকিলে কেহ কি তাহার মমতা পরিত্যাগ করিতে পারে?

পাশ্চাত্ত্য জগতের প্রত্যেক দেশে জনসাধারণের মধ্যে অস্বাস্থ্য এবং অকালমৃত্যু যে বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাও ঐ ঐ দেশের কয়েক বৎসরের সেন্‌সাস্-রিপোর্টগুলি পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। আমরা এই সম্বন্ধে "বঙ্গশ্রী"তে আগেই আলোচনা করিয়াছি।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, পাশ্চাত্ত্য জগতের জনসাধারণের মধ্যেও অন্নবস্ত্রাদির অভাব, পরমুখাপেক্ষিতা, অসন্তুষ্টি, অস্বাস্থ্য, অকালবার্দ্ধক্য, এবং অকালমৃত্যু উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। এক কথায় পাশ্চাত্ত্য জগতের এবং সেই সেই দেশের মানুষের অবস্থাও ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর অবস্থার মত অথবা ততোধিক শঙ্কাপ্রদ হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহা আমাদের আকাঙ্ক্ষণীয় হইতে পারে না। অথচ আমাদের দেশে যাঁহারা "মহাত্মা","কবিসম্রাট","আচার্য্য-দেব" এবং "বিশেষজ্ঞ" বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা আমাদিগকে অহরহ যাহা শুনাইতেছেন, তাহা হইতে বুঝিতে হয় যে, পাশ্চাত্ত্য জাতিগুলির অবস্থা আমাদের অবস্থা অপেক্ষা ভাল এবং তাহাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ব্যবস্থা অনুকরণযোগ্য। ইহা কি তাঁহাদের অদূরদর্শিতার পরিচয় নহে? জনসাধারণের পক্ষে ইহা কি পরিতাপের বিষয় নহে?

একবার যদি দেশের জনসাধারণ বুঝিতে পারে যে, তাহারা পাশ্চাত্ত্য যে যে শাস্ত্রের পণ্ডিতগণের পূজা করিয়া থাকে, সেই সেই শাস্ত্রে মানুষের উন্নতি কি উপায়ে হইবে, তাহার কোন সন্ধান নাই—পরন্তু তাহার ব্যবস্থা প্রতিপালিত হইলে মানুষের অবনতি অবশ্যম্ভাবী, তাহা হইলে মানুষ প্রকৃত শাস্ত্রের অনুসন্ধান-প্রয়াসী হইবে এবং তখন স্বভাবের নিয়মবলে আবার প্রকৃত শাস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যাইবে, ইহা আমাদের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসে আমরা দেশপূজ্য লোকগণের ভ্রম কোথায়, তাহা দেখাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছি। আমাদের আশা যে, যাঁহারা প্রকৃত দেশপ্রেমিক এবং জনসাধারণের হিতকামী, তাঁহারা আত্মনিন্দা শুনিয়াই ক্ষুব্ধ না হইয়া যে যে বিষয় সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে নিন্দা করা হইতেছে, তাহাতে বাস্তবিক পক্ষে নিন্দনীয় কিছু আছে কি না, তাহার বিচার করিতে চেষ্টা

করিবেন এবং তখন তাঁহারা ক্ষুব্ধ না হইয়া, আমাদিগকে নিন্দাকারী বলিয়া ঘৃণা না করিয়া আমাদের উদ্দেশ্যের সার্থকতা বুঝিতে পারিবেন।

আমাদের মতে কি উপায়ে দেশের জনসাধারণের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে, তাহা আমরা "ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়"-শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা করিতেছি।

তাহাতে দেখা যাইবে যে, জনসাধারণের প্রকৃত হিতসাধন করিতে হইলে, দেশের মধ্যে দ্বাবিংশতি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে এবং ঐ দ্বাবিংশতি ব্যবস্থার মধ্যে যাহাতে দেশের জমীর **স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি** বৃদ্ধি পায়, তাহার ব্যবস্থা সর্ব্ব প্রথম। দেশের মধ্যে যতগুলি নদী ও খাল আছে, মৃত্তিকার বালুকাস্তর পর্য্যন্ত তাহার সংস্কার সাধন করিতে পারিলে, জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির বৃদ্ধি সাধন করা সম্ভব হইতে পারে।

উপরোক্ত ভাবে দেশের সর্ব্বত্র নদী ও খালগুলির সংস্কার-সাধনের কার্য্য আরম্ভ হইলে, বেকার যুবকগণ ও শ্রমজীবীবৃন্দ অস্থায়ীভাবে কর্ম্ম-নিয়োগ পাইতে পারিবে এবং এই সংস্কার-কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে, দেশের কৃষিকার্য্যের এতাদৃশ উন্নতি করা সম্ভব হইবে যে, তখন দেশের মধ্যে কুটীর-শিল্প প্রবর্ত্তিত হইলে, যন্ত্রশিল্পও তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইবে না। কৃষিকার্য্য প্রকৃতপক্ষে লাভজনক হইলে, তখন লাভজনক শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব হইবে।

কাযেই বর্ত্তমান অবস্থায় বেকার-সমস্যা সমাধান করিবার একমাত্র উপায়—দেশের মধ্যে যতগুলি নদী ও খাল আছে, মৃত্তিকার বালুকাস্তর পর্য্যন্ত তাহার সংস্কার সাধন করিবার চেষ্টা করা এবং দেশবাসীর অন্নাভাব, পরমুখাপেক্ষিতা, অসন্তুষ্টি, অস্বাস্থ্য, অকাল-বার্দ্ধক্য এবং অকাল-মৃত্যু দূর করিবার উপায়—উপরোক্ত দ্বাবিংশতি ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা। তাহার চেষ্টা না করিয়া intensive cultivation, scientific trade and industry ও spread of education ইত্যাদি কথা টীয়াপাখীর মত আওড়াইলে বিপন্ন ও বিভ্রান্ত জনসাধারণের নিকট হইতে আত্ম-বিজ্ঞাপনের কৌশল দ্বারা জীবিতাবস্থায় "মহাত্মা," "কবিসম্রাট," "আচার্য্যদেব" ও "বিশেষজ্ঞ" প্রভৃতি আখ্যা লাভ করা সম্ভব হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে দেশের প্রকৃত কোন ফলোদয় হইবে না এবং অদূর-ভবিষ্যতে ঐ "মহাত্মা," "কবিসম্রাট", "আচার্য্যদেব" ও "বিশেষজ্ঞ" আখ্যাপ্রাপ্ত মানুষগণ জনসাধারণের শ্রদ্ধাযোগ্য স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

লর্ড লিনলিথগোর প্রথম অভিভাষণ এবং ভারতীয় কৃষক ও কৃষিকার্য্যের অবস্থা

গত ১৮ই এপ্রিল তারিখে ভারতের নূতন বড়লাট তাঁহার নিউ-দিল্লী ভবনের পাঠগৃহ হইতে বেতার মার্ফৎ ভারত-বাসীর উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রথম বাণী ঘোষণা করেন।

প্রথম, তিনি ভারতবাসীর রাজভক্তির প্রশংসা জানাইয়া বড়লাটের দায়িত্বসমূহের মধ্যে ভারতবর্ষের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষাকে প্রধান হিসাবে উল্লেখ করিয়া বলেন,—"রাষ্ট্রের পক্ষে চরম অনিষ্টকর বস্তু অন্তর্ব্বিবাদ। নিঃশঙ্কচিত্তে এবং কাহারও অনুগ্রহ, প্রীতি কি বিদ্বেষ গ্রাহ্য না করিয়া আমাকে এই শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব এবং অপরাপর দায়িত্ব পালন করিতে হইবে।"

অতঃপর, রাজকীয় কৃষি-কমিশন সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে তাঁহার ভারতবর্ষের আগমন উল্লেখপূর্ব্বক তিনি ভারতীয় রাজকীয় নৌশক্তি, ভারতীয় সৈন্যদল এবং বিমানশক্তির উদ্দেশ্যে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

তৎপরে, ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের প্রশংসা করিয়া এবং সিভিল সার্ভিস সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়া তিনি জিলার রাজকর্ম্মচারীদের উদ্দেশ্যে বলেন :—"গ্রামবাসী ও সরকারের মধ্যে আপনারাই যোগসূত্র; ভারতের চাষীরা সাহায্য, সান্ত্বনা এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্দেশের জন্য আপনাদেরই মুখের দিকে চাহিয়া আছে।"

অনন্তর, এ বিষয়ে জিলা-কর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্যপরতার প্রশংসা করেন। তাঁহাদের আফিসের কাজে ব্যস্ত থাকিতে হয় বলিয়া গ্রামবাসীদের সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপনের অবসর হয় না—এ সংবাদ তাঁহার অজ্ঞাত নহে, ইহাও জানান এবং যাহাতে

তাঁহারা ভবিষ্যতে আফিসের কাজ অপেক্ষা 'টুরে'র কাজ বেশী করিতে পারেন—ইহার ব্যবস্থা করিবেন, উল্লেখ করেন।

—"কিন্তু যত বাধাবিঘ্নই হউক না কেন, আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, আপনাদের অধীন গ্রামসমূহকে বুঝিবার চেষ্টা করুন।—আফিসে কলম পেষা অপেক্ষা তাঁবু লইয়া ঘুরিয়া বেড়ানোর এখন বিশেষ প্রয়োজন।"

অন্যান্য সরকারী চাকুরিয়াদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন—নিশ্চয়ই তাঁহারাও তাঁহার নিজেরই ন্যায় ইচ্ছা করেন যে, আগামী সংস্কৃত শাসনকালেও ভারতবাসীর অবস্থার উন্নতিকল্পে সরকারী চিরাচরিত কার্য্যসমূহ যেন অব্যাহতই থাকে।

অতঃপর তাঁহাদের চাকুরী-জীবনের দায়িত্ব ও বিঘ্নসমূহের সম্পর্কে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া তিনি বলেন যে, সকল সম্প্রদায়কেই তিনি সমান চক্ষে দেখিবেন; নিরপেক্ষতা তাঁহার স্বাভাবিক গুণ। তাঁহার পারিবারিক জীবনের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, "আমার পাঁচটী পুত্র-কন্যাদের মধ্যে একজন অপরজন অপেক্ষা আমার প্রিয় নহে।"

আগামী শাসন-সংস্কারের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার উল্লেখ করিয়া তিনি এ সম্বন্ধে তাঁহার যথাসাধ্য করিবেন জানান। রাজনীতিক দলের নায়কগণের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন—তাঁহাদের স্বার্থহানিকর উক্তি তাঁহার মুখে নায়কগণ কখনও পাইবেন না।

"আমার মতে" তিনি বলেন, "সরকারের বিরুদ্ধতা ও স্বপক্ষতা, দুইয়েরই প্রকৃষ্ট স্থান হইতেছে আইনসভা গুলি।"

"প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্রকে সার্থক করিতে হইলে,—(বিশেষ করিয়া প্রথম দিকে) ভোটদাতা জনসাধারণের সত্যকার মত আমার জানা দরকার এবং দেশের সকল রাজনৈতিক দলের নেতাগণের সহিত যথাসম্ভব ভাবের আদান-প্রদান দরকার। যদি এক দলের নেতাকে আমি কর্ত্তব্যব্যপদেশে ডাকিয়া পাঠাই, তাহাতে অপর দলের নেতৃবৃন্দ যেন মনে না করেন, আমি সেই বিশেষ দলের নেতাকে পক্ষপাতিত্ব দেখাইতেছি।"

অতঃপর তিনি দেশে প্রজাতন্ত্র-গঠনের পক্ষে সংবাদপত্রের দায়িত্বের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তাঁহার পক্ষ হইতে যথাসাধ্য তাঁহাদের দায়িত্বনির্ব্বাহের সাহায্য করিবেন।

তাঁহার বক্তৃতার একটী হিন্দুস্থানী অনুবাদ অতঃপর বেতারে পাঠ করা হয়।

লর্ড লিনলিথগো কৃষক ও কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে যে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাহা আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন। তাঁহার এই বাণীতে কৃষিকার্য্য ও কৃষকের প্রতি সমবেদনার পরিচয় আছে। ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীকে বর্ত্তমান বিপদ হইতে রক্ষা করিতে হইলে, ঐ কৃষক ও কৃষিকার্য্যের ব্যবস্থার প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ প্রদান করিতে হইবে, ইহা আমাদেরও অভিমত। আমাদের নূতন বড়লাট তাঁহার প্রথম বাণীতে উহার আভাস প্রদান করিয়াছেন, ইহা ভাবিতেও আমরা আনন্দানুভব করিতেছি। কিন্তু লর্ড লিনলিথগোকে মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি কৃষক ও কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে এতাবৎ যাদৃশ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন, তদনুসারে কার্য্য করিলে, তাঁহার দ্বারা ভারতবর্ষের কৃষক ও কৃষির কোন প্রকৃত উন্নতি সাধন করা সম্ভব হইবে না। তাঁহার অতীত অভিজ্ঞতানুসারে তিনি ভারতীয় কৃষি-সম্বন্ধীয় রয়াল কমিশনের রিপোর্টের নবম পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে—

"The question has been much argued whether the soils of India are to-day undergoing a progressive decline in fertility. Such experimental data as are at our disposal suggest the view, that, in an overwhelming proportion of lands in India, a balance has been established and no further deterioration is likely to take place under existing cnnditions of cultivation."—

এই উক্তি হইতে বুঝিতে হয় যে, তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা হইতে তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, ভারতের অধিকাংশ জমীর উর্ব্বরাশক্তি, যতদূর পর্য্যন্ত কমিবার, তাহা তখনই কমিয়া গিয়াছিল। তাহার পর আর ঐ উর্ব্বরাশক্তি কমিবার কোন আশঙ্কা ছিল না, ইহা তাঁহার মনে হইয়াছিল।

কিন্তু ঐ আশা সফল হয় নাই। **Estimate of Area and Yield of Principal Crops in India**

(1934-35) নামক গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতবর্ষে যে জমীসমূহে গমের চাষ হয়, তাহা হইতে গড়ে প্রতি একরে—

১৯২৯—৩০ সালে	৮১২ পাউণ্ড
১৯৩০—৩১ "	৬৯৩ "
১৯৩১—৩২ "	৬৪৮ "
১৯৩২—৩৩ "	৬৮৪ "
১৯৩৩—৩৪ "	৬১৭ "
১৯৩৪—৩৫ "	৬২৯ "

ফসল উৎপন্ন হইয়াছে।

যে জমীসমূহে ধান্য-চাষ করা হয়, তাহাতে গড়ে প্রতি একরে—

১৯২৯—৩০ সালে	৮৭০ পাউণ্ড
১৯৩০—৩১ "	৮৮২ "
১৯৩১—৩২ "	৮৮৩ "
১৯৩২—৩৩ "	৮৫০ "
১৯৩৩—৩৪ "	৮৪১ "
১৯৩৪—৩৫ "	৮৩২ "

ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে।

বাঙ্গালা দেশে যে জমীসমূহে ধান্য চাষ করা হয়, তাহা হইতে গড়ে প্রতি একরে ১৯২৯—৩০ সালে ১০১৪ পাউণ্ড ধান্য পাওয়া গিয়াছিল, আর ১৯৩৪—৩৫ সালে প্রতি একরে ৮৯৪ পাউণ্ড মাত্র পাওয়া গিয়াছে।

উপরোক্ত 'এষ্টিমেট' অনুসারে বলিতে হয় যে, ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই, জমীর উর্ব্বরাশক্তি প্রতি বৎসর কিছু না কিছু কমিয়া আসিতেছে। কৃষিযোগ্য জমীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মোট উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ খুব বেশী পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই বটে, কিন্তু প্রতি বিঘায় উৎপন্ন শস্যের হার অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। যাঁহারা ব্যক্তিগত ভাবে স্ব স্ব জমী হইতে কত শস্য উৎপন্ন হয়, তাহার বিশ্বাসযোগ্য বাৎসরিক হিসাব রক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ঐ হিসাব পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, স্থানে স্থানে সরকারী রিপোর্ট অনুসারে জমীর উর্ব্বরাশক্তি যতটুকু কমিয়া যাইতেছে বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, উর্ব্বরাশক্তির বাস্তব অবনতি তদপেক্ষাও বেশী এবং এতাদৃশ সরকারী রিপোর্ট সঙ্কলনের কার্য্যভার যাঁহাদের উপর অর্পিত হয়, তাঁহারা সর্ব্বদা নির্ভরযোগ্য নহেন।

অতএব বলা যাইতে পারে যে, লর্ড লিনলিথগো ১৯২৮ সালে রয়াল কমিশনের রিপোর্ট লিখিবার সময় তাঁহার মনে মনে যে আশা পোষণ করিয়াছিলেন, সেই আশা ফলবতী হয় নাই। কাজেই তাঁহাকে তাঁহার এতাবৎ অভিজ্ঞতাকে অবিশ্বাস করিয়া তাহার পুনঃপরীক্ষায় অবহিত হইতে হইবে।

তিনি যে বাস্তবিকপক্ষে ভারতীয় কৃষকের ব্যথার ব্যথী, তাহা কার্য্যতঃ প্রতিপন্ন করিতে হইলে, কৃষিকার্য্য যাহাতে কৃষকের পক্ষে লাভবান্ হয়, সর্ব্বপ্রথমে তদ্বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করিতে হইবে।

উপরোক্ত রয়াল কমিশনের রিপোর্টে কৃষি-সম্বন্ধীয় তাঁহার যে অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি আছে, তাহা বর্ত্তমান intensive cultivation বিষয়ক। তাঁহাকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বর্ত্তমান intensive cultivation জগতের যে যে স্থানে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে কৃষক সম্প্রদায়ের কোন প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয় নাই এবং সেই সেই স্থানে বেকার সমস্যা ও অসন্তুষ্টি মুখব্যাদান করিয়া বসিয়াছে। কাজেই ভারতবর্ষে intensive cultivation প্রবর্ত্তিত করিবার ব্যবস্থা করিলে, তাহাতে তাঁহার গভর্ণমেন্টের পক্ষে কার্য্যতৎপরতার পরিচয় দেওয়া হইবে বটে, কিন্তু তাহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের অথবা ভারতবাসীর কোন বাস্তব উপকার সাধন করা হইবে না। কেন যে intensive cultivation দ্বারা কৃষক সম্প্রদায়ের অথবা কৃষিকার্য্যের কোন বাস্তব উপকার সাধন করা সম্ভব হয় না, তাহা আমরা এই বঙ্গশ্রীতে বহু সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছি। * প্রয়োজন হইলে আমরা আবার তাহার আলোচনা করিব।

Intensive cultivationএর বিধি অনুসারে কৃষিকার্য্য করিতে হইলে, কৃষিকার্য্যে যে পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হয়, তাহা কোন দেশের কোন কৃষক সম্প্রদায়ের নাই এবং থাকা সম্ভব নহে। তাহার ফলে কৃষিকার্য্য ধনিক সম্প্রদায়ের হস্তে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে হস্তান্তরিত হওয়া অনিবার্য্য হইয়া পড়ে এবং কৃষক সম্প্রদায়কে চাকুরীজীবী হইয়া পড়িতে বাধ্য হইতে হয়। এইরূপে, intensive cultivation প্রবর্ত্তিত হইলে একে ত' স্বাধীনজীবী কৃষক সম্প্রদায় নির্ম্মূল হইয়া পড়ে, তাহার পর আবার ঐ জাতীয় কৃষিকার্য্যে সারাদি (manures) ব্যবহারের জন্য যে অতিরিক্ত খরচ হয়, তাহা

* ১৩৪১ সনের ফাল্গুন সংখ্যায় সম্পাদকীয় বিভাগে প্রকাশিত "অতীত ও বর্ত্তমান ভারতের কৃষি"; ১৩৪২ সনের অগ্রহায়ণ ও চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত "ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়" প্রবন্ধ এবং ফাল্গুন সংখ্যায় সম্পাদকীয় বিভাগে প্রকাশিত "কৃষকদিগের অবস্থা ও তৎসম্বন্ধে আনন্দ-বাজার" দ্রষ্টব্য।

ফসলের পরিমাণের দ্বারা কখনও পূরণ করা সম্ভব হয় না। ফলে কৃষিকার্য্য লোকসানজনক হওয়া অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। মার্কিন দেশে যে সমস্ত কৃষিকার্য্যের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, কার্য্যতঃ সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠান হাবু-ডুবু খাইতেছে। তাহাদের Balance Sheet পর্য্যালোচনা করিলে আমাদের কথার সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে। কাযেই আমরা লর্ড লিন্‌লিথগোকে intensive cultivation-এর পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

কৃষিকার্য্য যাহাতে কৃষকের পক্ষে লাভবান্ হয়, তাহা করিতে হইলে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কোনরূপ সার (manure) ব্যবহার না করিলেও জমীতে যে উর্ব্বরাশক্তি পরিলক্ষিত হয়, তাহার নাম **জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি**। কি করিলে কৃষিকার্য্য কৃষকের পক্ষে লাভবান্ হইতে পারে, তাহা স্থির করিতে হইলে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক কৃষক বৎসরে যতখানি জমী চাষ আবাদ করিতে পারে, তাহার পরিমাণ সীমাবদ্ধ। ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ কৃষকও বৎসরে ১০ বিঘার অধিক জমী কর্ষণ করিতে পারে না। অথচ প্রত্যেক কৃষকের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে ন্যূনপক্ষে একটা খরচার প্রয়োজন হয়। কাযেই, কৃষক যে-পরিমাণ জমী চাষ-আবাদ করিতে সমর্থ, তাহা হইতে তাহার সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহোপযোগী শস্য উৎপন্ন না হইলে, তাহার পক্ষে জীবন ধারণ করা কষ্টকর হইয়া পড়ে। অতএব কৃষিকার্য্য কৃষকের পক্ষে যাহাতে লাভবান্ হয়, তাহা করিতে হইলে জমীর একটা সর্ব্বনিম্ন (minimum) স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি (natural firtility) রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে।

কি ব্যবস্থা করিলে জমীর সর্ব্বনিম্ন স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি (minimum natural firtility) রক্ষা করা সম্ভব হয়, তাহার বিস্তৃত আলোচনা আমরা ইতিপূর্ব্বে বঙ্গশ্রীতে করিয়াছি। এখানে আবার তাহা উদ্ধৃত করিতে হইলে প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে। কাযেই তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না।

ভারতবর্ষে যে একদিন ঐ ব্যবস্থা ছিল এবং তাহারই জন্য ভারতবর্ষ সমৃদ্ধিশালী হইতে পারিয়াছিল এবং ঐ সমৃদ্ধির জন্যই যে প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক বিদেশীয় জাতিগণ ভারতবর্ষের সহিত সখ্য ও বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন, তাহাও আমরা বঙ্গশ্রীতে দেখাইয়াছি। যে ব্যবস্থা একদিন ছিল, তাহা পুনরায় প্রবর্ত্তিত করা কখনও কষ্টসাধ্য হইতে পারে না। কোন্ ব্যবস্থায় ভারত সমৃদ্ধিশালী হইয়া জগতের প্রত্যেক জাতির লোভনীয় হইতে পারিয়াছিল, তাহা জানিতে চেষ্টা করিয়া, ঐ ব্যবস্থা যাহাতে পুনরায় প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার উদ্যোগ লর্ড লিন্‌লিথগো করিবেন, ইহা আমরা আশা করি।

লর্ড লিন্‌লিথগোকে মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি ভারতবর্ষের—শুধু ভারতবর্ষের কেন, জগতের অতীব সঙ্কটকালে এই দেশের পরিচালনা-ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বটে যে, নূতন শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত করা একটা সঙ্কটের কার্য্য। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ফলে ভারতীয়গণ যে-অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে ইংরাজগণ যে-কোন শাসনবিধি প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করুন না কেন, তদ্বিরুদ্ধে তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় একটা হৈ-চৈ উদ্ভব করিবার চেষ্টা করিবেন বটে, কিন্তু এই হৈ-চৈ অন্তসারশূন্য, কারণ ঐ হৈ-চৈ-এর কর্ত্তাগণ অন্তঃসারশূন্য। কাযেই নূতন শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিতে তাঁহার কোনরূপ বেগ পাইতে হইবে, এইরূপ আশঙ্কা করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

ভারতের আসল সঙ্কট, তাহার ঐ জমীগুলির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি লইয়া। একদিন ছিল, যখন ভারতবর্ষে ভারতবাসীরা প্রয়োজনের অন্ততঃ বিশগুণ শস্য উৎপাদন করিতে পারিত। তাই ভারতবর্ষে অন্নের অভাব হয় নাই।

ভারতবাসী ঘুমাইয়া থাকিয়াও আহার সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে এবং জগতের অন্যান্য জাতির পক্ষে ভারতবর্ষ হইতে অন্নের সংস্থান করা সম্ভব হইয়াছে। ভারতবাসী ঘুমাইয়া রহিয়াছে বলিয়া বহু সহস্র বৎসর হইতে তাহার জমীগুলি শুষ্ক হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ভারতবাসী তাহা বুঝিতে পারে নাই। পঞ্চাশ বৎসর আগেও ভারতবাসীর মোট প্রয়োজনীয় শস্যের প্রায় দ্বিগুণ ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইত। আজ যে, জমীর প্রতি বিঘায় কিঞ্চিদূর্দ্ধ তিন মণ ফসল ফলিতেছে, পঁয়ত্রিশ বৎসর আগেও ঐ জমী হইতে গড়ে ৭ মণের উপর ফসল পাওয়া যাইত এবং ৭০ বৎসর আগে উহা গড়ে ১২ মণ ফসল প্রদান করিত। গভর্ণমেণ্টের বিবরণসমূহ হইতেই আমাদের এই উক্তি প্রমাণিত হইবে। গত তিন বৎসর হইতে প্রতি বিঘায় ফসলের পরিমাণ যেরূপ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে এখন আর উদ্বৃত্ত হওয়া দূরের কথা, ভারতবর্ষে ভারতবাসীর প্রয়োজনীয় শস্যও উৎপন্ন হইতেছে না। তাই এখন আর বৈদেশিক কোন জাতির ভারতীয় বাণিজ্য লাভজনক হইতেছে না।

আমাদের উপরোক্ত সমস্ত কথাই বঙ্গশ্রীতে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। যে দ্রুতগতিতে ভারতীয় জমীর উর্ব্বরাশক্তি কমিয়া যাইতেছে, তাহা অনতিবিলম্বে অবরুদ্ধ করিতে না পারিলে, এই দেশে অদূরভবিষ্যতে মানুষ মানুষের

হইতে উন্মত্ত হইবে, ইহা আশঙ্কা করিবার কারণ আছে। লর্ড লিনলিথগো রাজপ্রতিনিধিরূপে এ দেশের যে সমস্ত মানুষের সাক্ষাৎ পাইবেন, তাহাদের মস্তিষ্ক প্রায়শঃ বাতব্যাধিযুক্ত (paralysed) হইয়াছে। তিনি অনেক রাজনৈতিক নেতা ও বিশেষজ্ঞের দেখা পাইবেন। ঐ মানুষগুলির কথার কোন মূল্য আছে ইহা মনে করিয়া তিনি যদি তাহা শুনিবার জন্ম কালক্ষেপ করেন, তাহা হইলে তাঁহার কার্য্যকাল নিষ্ফল হইবার আশঙ্কা আছে। ঐ মানুষগুলি ভারতের উজ্জ্বল রত্নগুলিকে বিভ্রান্ত করিয়াছে, তাহাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় করিয়াছে এবং তাঁহাকেও বিভ্রান্ত করিবে। আমরা তাঁহাকে মুসলমান সম্প্রদায় ও তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায়ের কথায় সংস্রবহিত হইতে পরামর্শ প্রদান করিতেছি। তাঁহাদের মধ্যে এখনও যে জাতীয় ভারতীয় মস্তিষ্কের পরিচয় পাওয়া যাইবে, তাহা ঐ রাজনৈতিক নেতা ও বিশেষজ্ঞদিগের দলে পাওয়া যাইবে না। কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী রক্ষা পাইতে পারে, তাহার সংবাদ হয়ত স্বভাববশে ঐ মুসলমান ও তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায়ের মুখ হইতে নিঃসৃত হইলেও হইতে পারে। তাহারা রক্ষা পাইলে সমগ্র ভারতবাসী ও ভারতবর্ষ রক্ষা পাইবে। লর্ড লিনলিথগো সংবাদ লইলে জানিতে পারিবেন যে, ভারতবর্ষে আংশিক পরিমাণে ভারতীয় এবং অধিকাংশ পরিমাণে পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন যে কয়টী মধ্যবয়স্ক লোক বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনসমূহে নেতৃত্ব করিয়াছেন এবং করিতেছেন, তাঁহারা প্রায়শঃ ভারতীয় জনসাধারণ বস্তুতঃ কি জিনিষ, তাহা আদৌ পরিজ্ঞাত নহেন এবং তাঁহারা প্রকৃত জনসাধারণের অবজ্ঞাত। পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন বই-পড়া এই মধ্যবয়স্ক লোকগুলি যাহা বলিতেছেন, আমরা তাহার বিরুদ্ধে লর্ড লিনলিথগোকে সতর্কতা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করি।

তিনি তাঁহার অভিভাষণে আর যে যে কথা কহিয়াছেন, তাঁহার কার্য্য তদনুযায়ী হইলে ভারতবর্ষে সুপ্রভাতের উদয় হইতেছে ইহা মনে করিতে হইবে।

নিমেয়ার রিপোর্ট, তাহার সহিত জনসাধারণের সম্পর্ক এবং তৎসম্বন্ধে আনন্দবাজার ও অমৃতবাজার পত্রিকা

ভারত গবর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায় নূতন শাসনতন্ত্র কোন্ সময়ে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে এবং নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইলে ভারত গবর্ণমেণ্ট এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের আর্থিক বিলি-ব্যবস্থা কিরূপ হইবে—এই দুই বিষয় নির্দ্ধারণের জন্ম স্যর অটো নিমেয়ারের অধীনে একটী তদন্ত বসিয়াছিল।

গত ১লা মে তারিখে ঐ তদন্তের রিপোর্ট দাখিল হইয়াছে। অটো নিমেয়ার বলিয়াছেনঃ—"বিলাতী গবর্ণমেণ্ট পার্লিয়ামেণ্টের নিকট ভারত-শাসন আইনের তৃতীয় অধ্যায় (এই অধ্যায়ে প্রাদেশিক শাসন-সংস্কার বর্ণিত হইয়াছে) এক বৎসরের মধ্যে প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করিতে পারেন।"

প্রদেশগুলিকে তিনি তিন ভাবে সাহায্যদানের প্রস্তাব করিয়াছেনঃ—(১) নগদ টাকা দিয়া; (২) কিছু ঋণ মকুব করিয়া; (৩) বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যাকে পাটশুল্কের আয় আরও শতকরা ১২॥০ টাকা দিয়া।

বিভিন্ন প্রদেশকে বার্ষিক মোট এই পরিমাণ সাহায্যদানের প্রস্তাব হইয়াছে। বাঙ্গালা ৭৫ লক্ষ; বিহার ২৫ লক্ষ; মধ্য প্রদেশ ১৫ লক্ষ; আসাম ৪৫ লক্ষ; উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ১ কোটি ১০ লক্ষ; উড়িষ্যা ৫০ লক্ষ; সিন্ধু ১ কোটি ৫ লক্ষ; এবং যুক্ত প্রদেশ ২৫ লক্ষ।

অটো নিমেয়ার বলিয়াছেনঃ—"কেন্দ্রের আর্থিক অবস্থা যাহাতে দৃঢ় থাকে, সদাসর্ব্বদাই তাহা মনে রাখিয়া প্রস্তাবগুলি করা হইয়াছে।"

প্রদেশসমূহকে আর্থিক সহায্য করার প্রধান উপায় আয়কর রাজস্বের বণ্টন। সুতরাং যে সারচার্জ্জ বলবৎ আছে, তাহা বহাল থাকা উচিত।

রেলওয়েসমূহের আর্থিক অবস্থা ভাল না হইলে প্রদেশগুলির আর্থিক সাহায্য পাইতে দেরী হইতে পারে। রেলসমূহের আয়বৃদ্ধি ও ব্যয়সঙ্কোচ একটী গুরুতর বিষয়।

আয়কর-জাত রাজস্ব প্রদেশগুলির মধ্যে এই হারে বণ্টিত হইবে :—

মাদ্রাজ—	শতকরা	১৫৲
বোম্বাই—	"	২০৲
বাঙ্গালা—	"	২০৲
যুক্তপ্রদেশ—	"	১৫৲
পাঞ্জাব—	"	৮৲
বিহার—	"	১০৲
মধ্যপ্রদেশ—	"	৫৲
আসাম—	"	২৲
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত—	"	১৲
উড়িষ্যা—	"	২৲
সিন্ধু—	"	২৲

প্রদেশগুলির লোকসংখ্যা এবং করদাতারা প্রকৃত প্রস্তাবে কোন্ প্রদেশের অধিবাসী ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া এই হার নির্দ্দেশ করা উচিত।

স্যর অটো সুপারিশ করিতেছেন যে, ১৯৩৬-৩৭ সালের পাটশুল্কজাত আনুমানিক আয় ৩ কোটী ৮০ লক্ষ টাকা ধরিয়া ভারত-শাসন আইনের ১৪০(২) ধারা অনুসারে পূর্ব্বের হার (পাট-উৎপাদনকারী প্রদেশগুলিকে পাটশুল্কের শতকরা ৫০ ভাগ দেওয়া হয়) বাড়াইয়া শতকরা ৬২॥০ টাকা করা হউক।

ইহার ফলে বাঙ্গালা ৪২ লক্ষ টাকা, বিহার ২॥ লক্ষ টাকা, আসাম ২।০ লক্ষ টাকা এবং উড়িষ্যা ১।০ লক্ষ টাকা পাইবে।

এই রিপোর্ট সম্পর্কে মতামত ভারত-সচিবকে এক মাসের মধ্যে জ্ঞাপন করিতে হইবে।

আনন্দবাজার পত্রিকার মতে "নূতন শাসনতন্ত্র যে বাঙ্গালা দেশের পক্ষে অভিশাপস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা এই রিপোর্ট হইতে বুঝা যায়।"

অমৃতবাজার পত্রিকার মতে স্যার অটো নিমেয়ার বঙ্গদেশের উপর ঘোর অবিচার করিয়াছেন ("gross injustice has been done to Bengal")।

দেশের অনেক খ্যাত ও অখ্যাতনামা ব্যক্তিগণ এই রিপোর্ট সম্বন্ধে অনেক রকমের অনেক মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন। ঐ মন্তব্যগুলি পড়িলে মনে হয় যে, স্যার অটো নিমেয়ার ভারতের জনসাধারণের সম্পর্কিত একটা কিছু প্রকাণ্ড ব্যাপারের দায়িত্বভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং কাহারও কাহার অভিমতানুসারে তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য একেবারেই প্রতিপালন করিতে পারেন নাই। আর, কাহারও মতে ঐ দায়িত্ব আংশিক ভাবে সুচারু রকমে সাধিত হইয়াছে, আর এক দলের অভিমতানুসারে স্যার অটো নিমেয়ার যাহা করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের অচিরে স্বর্গলাভ করিবার আশা আছে।

আমরা কিন্তু এখনও বুঝিতে পারি নাই যে, স্যার অটো নিমেয়ারের হাতে ভারতের জনসাধারণের সম্পর্কিত এমন কি ব্যাপার ছিল, যাহার জন্য দেশের হোমরা-চোমরা সকলের সুনিদ্রার এত ব্যাঘাত ঘটিয়াছে।

নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইলে ভারত-গভর্ণমেণ্ট এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহের আর্থিক বিলি-ব্যবস্থা কিরূপ হইবে, তাহার নির্দ্ধারণ করা ছিল নিমেয়ার কমিটির অন্যতম উদ্দেশ্য।

গভর্ণমেণ্টসমূহের আর্থিক স্বচ্ছলতা বিদ্যমান থাকিলে তাঁহাদের পক্ষে প্রজার হিতকারী অনুষ্ঠানসমূহে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হয়, নতুবা তদ্বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে হয় এবং সময়ে সময়ে অতিরিক্ত কর ধার্য্য করিবারও প্রয়োজন হইয়া থাকে।

কাযেই আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে বটে যে, ভারত গভর্ণমেণ্ট এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহের আর্থিক বিলি-ব্যবস্থার সহিত জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার কিছু সম্বন্ধ আছে, কিন্তু বর্ত্তমানে গভর্ণমেণ্টসমূহ কার্য্যতঃ যে নিয়ম-কানুনানুসারে পরিচালিত হইয়া থাকে, তাহাতে গভর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থার সহিত যে জনসাধারণের কোন বাস্তব সম্বন্ধ আছে, তাহা মনে করিবার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

গভর্ণমেণ্টসমূহের বাজেটগুলি পুর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহাদিগের আর্থিক স্বচ্ছলতা বিদ্যমান থাকিলেও জনসাধারণের কোন হিতকর অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই, এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে; আবার আর্থিক অস্বচ্ছলতা থাকিলেও জনসাধারণের হিতকর অনুষ্ঠানের নামে ঋণ করিয়াও অনেক টাকা খরচ করা হইয়াছে।

[স্ব]চ্ছল অবস্থায় প্রজার উপর অতিরিক্ত কর ধার্য্য হইয়াছে, [ই]হাও যেমন দেখা যাইবে, আবার অস্বচ্ছল অবস্থায় প্রজার [উপ]র কোনরূপ অতিরিক্ত কর ধার্য্য না করিয়াও গভর্ণমেণ্টের [প]রিচালনে কিঞ্চিন্মাত্র বিশৃঙ্খল উপস্থিত হয় নাই, তাহার [দৃষ্ট]ান্তও বিরল নহে।

কাযেই গভর্ণমেণ্টসমূহের বাজেটগুলি পর্য্যালোচনা করিলে [ত]াহাদের সহিত জনসাধারণের হিতকর অনুষ্ঠান সকলের যে [কো]ন বাস্তব সম্বন্ধ আছে, তাহা মনে করা যায় না। অবশ্য [ব]াজেটে ঘাটতি থাকিলে, গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ সেই অজুহাতে সময় সময় সাধারণের হিতকর অনুষ্ঠানের দাবী প্রতিরুদ্ধ করিয়া থাকেন। যখন পরিষ্কার দেখা যায় যে, [ব]াজেটে উদ্‌বৃত্তি থাকিলেও প্রয়োজন হইলে সাধারণের দাবী প্রতিহত করিবার অন্যান্য অজুহাত খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তখন গভর্ণমেণ্টের ঘাটতি ও উদ্‌বৃত্তির সঙ্গে জনসাধারণের কোন বাস্তব সম্বন্ধ আছে, তাহা মনে করা যায় কি?

গভর্ণমেণ্টসমূহের বাজেটের ঘাটতি ও উদ্‌বৃত্তির হিসাব-প্রণালী পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, উহাও ঠিক ঠিক ভাবে তাঁহাদের আর্থিক অবস্থার পরিমাপক কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার যুক্তি আছে। বর্ত্তমান পাশ্চাত্ত্য জগত হইতে যে double entry system নামক বৈজ্ঞানিক হিসাব-প্রণালী আমদানী হইয়াছে, তাহার সাহায্যে যেমন ২।৪ লক্ষ টাকা দেনা থাকিলেও আপাতদৃষ্টিতে নিজেকে ২।৪ লক্ষ টাকার মালিক বলিয়া প্রমাণিত করা যায়—আবার সেইরূপ ২।৪ লক্ষ টাকার মালিককেও ইচ্ছা হইলে ২।৪ লক্ষ টাকার দেনাদার বলিয়া দেখান যায়। কাযেই গভর্ণমেণ্টসমূহের বাজেটের হিসাবে যে উদ্‌বৃত্তি ও ঘাটতি দেখা যায়, তাহার সার্থকতা যে কতখানি, তাহাও বিচারযোগ্য।

তাহার পর, বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টসমূহের আর্থিক অস্বচ্ছলতা যে কি করিয়া হইতে পারে, তাহাও আমাদের বুদ্ধির অগম্য। বর্ত্তমান জগতে ধাতু ও কাগজ হইতে টাকা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। যখন পরিষ্কার দেখা যায় যে, এখনও টাকা প্রস্তুত করিবার উপযোগী কোন ধাতুর এবং যে-সমস্ত উপাদানে কাগজ নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তাহার কোন অভাব জগতে উপস্থিত হয় নাই, তখন যে, গভর্ণমেণ্টসমূহের পক্ষে দেশের ব্যবহারোপোযোগী অর্থের কোন অস্বচ্ছলতা হইতে পারে না, ইহা খুব সম্ভব সামান্য একটু বিচার করিলেই বুঝা যাইবে।

অতএব যুক্তি অনুসরণ করিলে বলিতে হইবে যে, বাজেটের ঘাটতি, উদ্‌বৃত্তি, গভর্ণমেণ্টের অর্থের স্বচ্ছলতা, অস্বচ্ছলতা প্রভৃতি যে সমস্ত শব্দ (expression) গভর্ণমেণ্টের অর্থ-নীতিজ্ঞগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাদের কোন বাস্তব মূল্য নাই এবং উহা লইয়া জনসাধারণের মাথা ঘামাইবারও কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তথাপি যে আমাদের পূজ্যপাদ হোমরা-চোমরাগণ উহা লইয়া এত হৈ-চৈ করিয়া থাকেন, তাহা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ঘূর্ণীর আবর্ত্তনের ফল। যাঁহারা এতাদৃশ ব্যাপারে হৈ-চৈ করিতে উদ্যত হইয়া থাকেন, তাঁহারা যে কতখানি গভীর অর্থনীতিজ্ঞ, তাহা তাঁহাদের হৈ-চৈ হইতে বুঝিতে হইবে। আমাদের মনে হয়, গভর্ণমেণ্টের অর্থনীতিজ্ঞগণ দেশীয় খ্যাতনামা উপরোক্ত অর্থনীতিজ্ঞগণের জ্ঞানের গভীরতা কিঞ্চিৎপরিমাণে বুঝিতে পারেন বলিয়াই তাঁহারা সময় সময় তাঁহাদিগকে উপভোগের সামগ্রী করিয়া থাকেন।

পরিতাপের বিষয় এই যে, খ্যাতিপ্রয়াসী স্কুল-বালকসদৃশ দেশীয় এই অর্থনীতিজ্ঞগণ যে উপহাসাস্পদ, তাহা পর্য্যন্ত তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। অথচ তাঁহাদের কথা গভর্ণমেণ্ট শুনিলেন না বলিয়া তাঁহারা খেদ করিয়া থাকেন।

নিমেয়ার রিপোর্টের সহিত জনসাধারণের বাস্তব কোন সম্পর্ক নাই বটে, কিন্তু তাহা লইয়া যে হৈ-চৈ উঠিয়াছে, তাহাতে জনসাধারণের যথেষ্ট অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে। কারণ, ঐ হৈ-চৈ-এর ফলে প্রদেশে প্রদেশে রেষারেষি চলিতে থাকিবে এবং তাহাতে কার্য্যতঃ (divide & rule policy) ভেদনীতির সহায়তা সাধন করা হইবে। আমাদের দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন সংবাদপত্রের কর্ণধারসমূহ ও commercial mag-nateগণ কবে দয়া করিয়া এই সাদা কথাটুকু তাঁহাদের মস্তিষ্কের মধ্যে গ্রহণ করিবেন?

এই সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টকে আমাদের দুই চারিটী কথা শুনাইতে ইচ্ছা হয়। তাঁহাদের গভীর রাজনীতি-জ্ঞান আপাত-দৃষ্টিতে প্রশংসার যোগ্য বটে, কিন্তু ঐ রাজনৈতিক কৌশল আর বেশী দিন সুফলপ্রদ হইবে কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ আছে। কতদিন পর্য্যন্ত ভারতের জমীতে

প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইত এবং হইবে এবং ঐ শস্য উদ্বৃত্ত হইত এবং হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত ধাতু ও কাগজের সহায়তায় যে মুদ্রা প্রস্তুত হইত ও হইবে, তদ্দ্বারা অনেক কিছু করা যাইত ও যাইবে বটে, কিন্তু যে দিন ঐ উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ প্রয়োজনীয় শস্যের পরিমাণ হইতে কমিয়া যাইবে, সেইদিন হইতে গভর্ণমেন্টের বর্ত্তমান নীতিই যে গভর্ণমেন্টকে বিপন্ন করিয়া তুলিবে, তাহা একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। ভারতের জমীগুলি দ্রুত গতিতে যে রূপ শুষ্ক হইয়া উঠিতেছে, সেই বিষয়ে অবহিত না হইলে, আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে গভর্ণমেন্টের বর্ত্তমান নীতি আংশিকভাবে তাহার কালস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে, ইহা আশঙ্কা করিবার কারণ আছে এবং তাহা ভাবিতেও আমাদের শিহরিয়া উঠিতে হয়। পদ-গৌরব-সমাদৃত গভর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারিগণের মধ্যে এমন কয়জন আছেন, যাঁহারা জনসাধারণের কথায় বিবেচনা-যোগ্য কিছু থাকিতে পারে বলিয়া মনে করিতে পারেন? আমরা গভর্ণমেন্টকে এখনও সতর্ক হইতে অনুরোধ করি।

"নূতন শাসনতন্ত্র যে বাঙ্গালাদেশের পক্ষে অভিশাপ স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে এবং তাহা যে নিমেয়ারের রিপোর্ট হইতে বুঝা যায়"—আনন্দবাজারের এই উক্তিটী তাহার সম্পাদক-বর্গ প্রমাণিত করিতে পারিবেন কি? যে কথা যুক্তি এবং বাস্তব ঘটনা দ্বারা প্রমাণ করা যায় না এবং যাহা বলিলে পরস্পরের মধ্যে কেবল তিক্ত মনোভাবের উদ্ভব হওয়া ছাড়া আর কোন ফলোদয় হয় না, তাহা বলিয়া লাভ কি? এই জাতীয় উক্তির দ্বারা দেশের উপকার অপেক্ষা অধিকতর অপকার সাধন করা হয় না কি? আনন্দবাজারের পরিচালকবর্গকে মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহারা ভগবৎকৃপায় এখন বাঙ্গালা দেশে দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। যদি তাঁহারা বিবেচনাপূর্ণ উক্তি দ্বারা ঐ দায়িত্ব-পূর্ণ কার্য্যভারের উপযোগী বলিয়া নিজদিগকে প্রতিপন্ন করিতে না পারেন, তাহা হইলে অচিরে ভগবানের নিয়মানুসারে জনসাধারণের কাছে অশ্রদ্ধেয় হইবার আশঙ্কা আছে। আমরা এখনও তাঁহাদিগকে চিন্তাশীল সম্পাদক নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করি।

বাঙ্গালার অন্যতম জনপ্রিয় সংবাদপত্র অমৃতবাজার পত্রিকার উক্তিটী আরও অদ্ভুত। তাঁহারা সরাসরি বলিয়া বসিলেন যে, 'gross injustice has been done to Bengal', অর্থাৎ, বাঙ্গালার উপর অত্যন্ত অবিচার করা হইয়াছে। যদি স্যার অটো নিমেয়ারের স্থানে ঐ উক্তিটীর লেখককে ঐ কমিটির সভাপতিত্ব প্রদান করা হইত, তাহা হইলে তিনি সব দিক্ বজায় রাখিয়া, কি বণ্টনবিধিতে স্যার অটো নিমেয়ার অপেক্ষা অধিক বিচারশীলতার দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিতেন, তাহা জন-সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিবেন কি? একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়া রেষারেষির ভাবের উদ্ভব করিলে জনসাধারণের কোন হিত-সাধন করা হয় কি? এই বিপদের সময়, সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলি লিখিবার ভার যাহাতে বিচারশীল স্থিরমস্তিষ্ক লোকের হাতে অর্পিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য আমরা অমৃতবাজার পত্রিকার পরিচালকবর্গকে অনুরোধ করিতেছি।

জনসাধারণের অবস্থা ও দেশীয় সংবাদপত্রের দায়িত্বজ্ঞান

দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রতিদিন নিত্য নূতন দুঃখ-দুর্দ্দশার সংবাদ আসিতেছে। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলী, কাটোয়া, বর্দ্ধমান, কালনা, হাতিয়া, নোয়াখালী—পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্য বাঙ্গালার সর্ব্বত্র হইতে বুভুক্ষু কৃষকের আর্ত্তনাদ শুনা যাইতেছে। দলে দলে কৃষক পল্লী-অঞ্চল ছাড়িয়া সহরে অর্থ-সাহায্যের জন্য আসিতেছে। চব্বিশ-পরগণার নূরগ্রাম হইতে প্রাপ্ত একটী সংবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

> ...চারিদিকে দুর্ভিক্ষের ভীষণ হাহাকার উঠিয়াছে। কেহ কেহ ২।১ দিন উপবাস ও অনাহারে থাকিয়া শাকসজী সিদ্ধ করিয়া খাইয়া কোন-রূপে জীবন রক্ষা করিতেছে। কেহ বা গ্রামস্থ অবস্থাপন্ন ব্যক্তির হইতে ভাতের ফেন কাড়াকাড়ি করিয়া আনিয়া প্রাণ বাঁচাইতেছে।

অধিকাংশ লোক ক্ষুধার তাড়নায় ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইয়াও এক মুষ্টি অন্নের সংস্থান করিতে পারিতেছে না…

খুলনা হইতে প্রাপ্ত সংবাদের একাংশ :—

অন্নাভাবে কেহ কেহ একদিন ও দুইদিন অন্তর অন্তর খাইতেছে এবং কেহ কেহ তেঁতুল-পাতা ও কলার থোড় সিদ্ধ করিয়া খাইয়া জীবন বাঁচাইতেছে। স্ত্রীলোকেরা বস্ত্রাভাবে ঘরের বাহির হইতে পারিতেছে না। ছেঁড়া কাঁথা, ন্যাকড়া ইত্যাদি পরিয়া লজ্জা নিবারণ করিতেছে।…

এখনও স্ত্রী-পুত্র-কন্যা বিক্রয় করিয়া আহার্য্য-সংগ্রহের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু এই অবস্থা অধিক দিন চলিলে (এবং চলিবে যে, ইহাও নিঃসন্দেহে বুঝা যাইতেছে) সে সংবাদ পাইতেও বিলম্ব হইবে না।

এই বিপদের সম্যক্ উপলব্ধি আমাদের হয় নাই। হইলে তাহা প্রকাশ পাইত। আমাদের সম্মুখে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত দেশীয়-পরিচালিত সর্ব্বপ্রধান দুইখানি দৈনিক পত্রিকার এক মাসের কাগজ রহিয়াছে। এই একমাস কালের মধ্যে ইহাদের সম্পাদকীয় স্তম্ভে যে-সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সকল রচনার বিষয়ভাগ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পাঠ করিয়াও, পাঠক দেশব্যাপী এই দুর্দ্দশা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র চিন্তাযোগ্য কথা পাইবেন না, বরং সেগুলিতে এমন বহু কথার পরিচয় আছে, যাহাতে সত্যই দেশের কোথাও কোন দুর্দ্দশা আছে কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে।

প্রথম, আনন্দবাজার পত্রিকা। ১লা বৈশাখ হইতে ৩১শে বৈশাখ পর্য্যন্ত এই পত্রিকায় এই সকল প্রবন্ধ সম্পাদকীয় স্তম্ভ অলঙ্কৃত করিয়াছে :—

১। জহরলাল ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ; বর্ষারম্ভে ;
২। জহরলালের অভিযান ; আবিসিনিয়ার যুদ্ধ ও ভারত ;
৩। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস ; উইলিংডনের বাগ্মিতার উৎস ;
৪। কংগ্রেস ও কৃষক সমস্যা ; দেশীয় পতন ;
৫। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস ; ছাত্র ও শিক্ষক ;
৬। বড়লাট বদল ; কুটীরশিল্প ;
৭। বড়লাটের বেতার বক্তৃতা ; বলডুইনের আপশোষ ;
৮। অপ্রিয় সত্য ; রাষ্ট্র-বীরদের বিতর্ক ;
৯। স্বদেশী ও বেকার সমস্যা ; দুর্ভিক্ষে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট ;
১০। পাট কমিটি ও বাঙ্গালীর স্বার্থ ; বাঙ্গালার ইউনিয়ন বোর্ড ;
১১। আবিসিনিয়ার মৃত্যুপণ ; বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পাঠ্য ;
১২। ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রিকের অধিকার ; পুণার দাঙ্গা ;
১৩। জিন্নার দৌত্য ; বার্নার্ড শ'র সভ্যতা ;
১৪। রাজবন্দী প্রসঙ্গ ; কংগ্রেসের লক্ষ্য ;
১৫। কারাসংস্কার, বিলাতে ও ভারতে ; ভূমধ্যসাগরের ঝটিকা ;
১৬। ভ্রান্ত ধারণার কারণ কি ; আর কতদিন ;
১৭। কাজীর বিচার ;
১৮। ভবিষ্যতের আভাস ; বিদ্যালয়ে সৈন্য ;
১৯। আবিসিনিয়ার পতন ; সরকারী চাকুরীতে সাম্প্রদায়িকতা ;
২০। নোয়াখালিতে দুর্ভিক্ষ ; আসামের দুর্দ্দশা ;
২১। সাম্রাজ্যবাদের জয় ;
২২। বিদ্যুৎ তদন্ত কমিটির ফল ; শিক্ষাসংস্কার ;
২৩। সুভাষ দিবস ; সনাতন নীতি ;
২৪। সুযোগ কোথায় ? ডাঃ আম্বেদকারের প্রেত তাণ্ডব ;
২৫। পরলোকে ডাঃ আনসারি ; নূতন সাম্রাজ্যের পত্তন ;
২৬। রাষ্ট্রিকের অধিকার ; জিন্নার নূতন কীর্ত্তি ;
২৭। নূতন সমস্যা ; দুর্ভিক্ষপীড়িত বাঙ্গলা।

ইহার মধ্যে মাঝে মাঝে 'দুর্ভিক্ষ', 'দুর্দ্দশা', 'বেকার' ইত্যাদির উল্লেখ অবশ্য আছে। কিন্তু পাঠক ভুল করিবেন না, কথাগুলি থাকিলেও ঐ প্রসঙ্গে কোন একটী ধারণা-যোগ্য চিন্তার আভাস এই প্রবন্ধসম্ভারের মধ্যে চেষ্টা করিলেও পাওয়া যাইবে না। দুর্ভিক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের সকল কিছুরই মূল কারণ ইহাঁদের মতে একটী। (মত বলিলে ভুল হয়, কেন না এখন আর ইহা এই পত্রিকাগুলির মত নহে, ইহা অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছে)। সেই একটী কারণ হইতেছে বিদেশী সরকার। দুর্ভিক্ষ হইয়াছে ? সরকারী সাহায্য প্রচুর নহে বলিয়া এমনটী ঘটিতে পারিয়াছে—নহিলে ঘটিত না। বেকার-সমস্যা বাড়িয়া চলিতেছে ? সরকার কর্ত্তৃক শিক্ষার সংস্কার যথাযথ হইতেছে না—সকলের মূলে ঐ এক কারণ।

কিন্তু যে সকল দেশে সরকার বিদেশী নহে, সেই দেশগুলিতেও এই সব সমস্যার একটী না একটী যে অস্পষ্ট কিংবা স্পষ্ট ভাবে দেখা যাইতেছে—তাহার হেতুনির্দ্দেশ করিবে কে ?

গত ১০ই বৈশাখ তারিখে "স্বদেশী ও বেকার সমস্যা" শীর্ষে আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় স্তম্ভে মামুলী যুক্তির ঝুড়ি উজাড় করিয়া পরিশেষে বলা হইয়াছে :—"নূতন নূতন কল-কারখানার প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি ব্যতীত বেকার সমস্যার সমাধান বা নব নব কর্ম্মসৃষ্টি হইতে পারে না।"

আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সমস্ত পন্থাই তো সভ্য (?) দেশসমূহে পরীক্ষিত হইয়া গিয়াছে, তবু সেই সকল দেশ হইতে বেকার-তালিকার সংখ্যা স্ফীত হইতে স্ফীততর হইবার সংবাদ পাওয়া যায় কেন?

এবং এ প্রশ্নও কি স্বতঃই মনে হয় না যে, আমাদের দেশে যে-সব কল-কারখানা এ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে (তাহাদের সংখ্যাও কম নহে), তাহার ফলে বেকার সমস্যার কি পরিমাণ সমাধান হইয়াছে? উপরন্তু এই সকল কল-কারখানার অধিকাংশেরই অবস্থা কেন উত্তরোত্তর খারাপ হইতেছে?

আনন্দবাজারের পরিচালক ও সম্পাদকবর্গের নিকট আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ: কেবল ইংরাজীতে ছাপা পুস্তকে ব্যতীত যে-জাতীয় কথার আর কোথাও সন্ধান মিলে না, সেই জাতীয় কথা বলিয়া দেশবাসীকে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টায় তাঁহারা বিরত হউন। 'আবিসিনিয়া', 'বার্ণার্ড শ'র সভ্যতা' ইত্যাদি সমস্যা সমাধানের বর্ত্তমানে বিশেষ প্রয়োজন নাই। এমন কি 'রাষ্ট্রিকের অধিকার' লইয়াও মাথা ঘমাইবার অবসর এখন নাই। এখন আমাদের একমাত্র প্রয়োজন অন্নের ও বস্ত্রের। এই সামান্য দুইটী সমস্যার সমাধান বর্ত্তমানে অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই দুইটী সমস্যার সমাধান সাঙ্গ করিয়া, তাঁহারা 'ভূমধ্যসাগরের ঝটিকা' ও 'সাম্রাজ্যবাদের' গুরুতর দুর্নীতি-দমনে অগ্রসর হইতে পারেন।

আমরা জানি, এই শ্রেণীর কথা তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তির (ইহাকেই কি intellectualism বলা হয়?) মূলে আড্ডা গাড়িয়াছে। প্রতিদিন বিলাতী পত্রিকাসমূহে এই সকল কথাই আলোচিত হইতেছে। হয়ত ইহাঁদের মত এই যে, সেই সকল কথার বাঙ্গালা অনুবাদ (তাহাও সকল সময়ে শুদ্ধ নহে) যদি বাঙ্গালী দোকানদার এবং স্ত্রীলোকে নাই পাঠ করিল, তবে তাহাদের জীবনে বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি?

আমরা শুধু বুঝি না, যাঁহারা রাষ্ট্রিক পরাধীনতার বিরুদ্ধে এইরূপ খড়্গ-হস্ত, তাঁহারা কেন এই মানসিক পরাধীনতা—এই পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্বাসরোধকারী বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চাহেন না?

আমাদের মতে ভারতবর্ষের পরাধীনতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারণ আমাদের এই নির্ব্বিচারে অনুকরণপ্রিয়তা। এবং যতদিন নিজেদের চোখ দিয়া নিজেদের সমস্তাসমূহ আমরা নিজেরা না দেখিতে শিখিব, ততদিন আমাদের কোন প্রকার মুক্তি নাই।

এই দেশে যে আজ দুঃখ-দুর্দ্দশার বন্যাস্রোত বহিয়া চলিয়াছে, ইহার কারণ একদিনে সঞ্চিত হয় নাই। বহুদিন ধরিয়া ধীরে ধীরে একটীর পর একটী করিয়া এই দুঃখ-দুর্দ্দশার মূল কারণসমূহ সঞ্চিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে বৃটিশ রাজত্বের সূচনার বহুপূর্ব্ব হইতে ইহার আরম্ভ।

কিন্তু সেই অতিদূর পশ্চাতে দৃষ্টি ফিরাইবার সময় আজ নহে। আজ আগত দুর্দ্দৈব সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে সচেতন না হইলে মৃত্যু ব্যতীত আমাদের আর গতি নাই।

গত ভাদ্র সংখ্যায় 'স্যর জন এণ্ডারসন ও ভারতবর্ষ' শীর্ষক সম্পাদকীয় সন্দর্ভে আমরা লিখিয়াছিলাম:—'আমাদের মনে হয়, সারা ভারতবর্ষের ২৭ কোটি কৃষক বিদ্রোহোন্মুখ হইয়াছে। প্রকাশ্যতঃ এখনও তাহারা বিদ্রোহ করে নাই তাহা সত্য, কিন্তু বিদ্রোহের সমস্ত পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে।'

দেশব্যাপী এই অন্নকষ্ট তাহার পূর্ব্বলক্ষণ।

আমরা উক্ত রচনাতে দেখাইয়াছিলাম যে, বর্ত্তমানে দেশের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় কার্য্য কৃষকের অন্ন-সংস্থান এবং এই অন্নসংস্থানের একমাত্র উপায় জমীর উর্ব্বরতা-সাধনের চেষ্টা। যে পদ্ধতিতে ঐ চেষ্টা সফল হইতে পারে, পাশ্চাত্ত্যের কৃষিবিজ্ঞানে তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে না। পাওয়া গেলে পাশ্চাত্ত্য জাতির অন্নকষ্ট ঘুচিত।

কেন জমীর উর্ব্বরাশক্তি কমিয়া যাইতেছে, জমীর উর্ব্বরা-শক্তি কাহাকে বলে, জমীর উর্ব্বরাশক্তি লাভের উপায় এবং এই সমস্ত বিষয়ে আধুনিক কৃষিবিজ্ঞানের জ্ঞান যে কিরূপ অন্তঃসারহীন, তাহা গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় আলোচিত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠককে আমরা ঐ সংখ্যায় প্রকাশিত "ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়" প্রবন্ধ পড়িতে অনুরোধ করি।

আনন্দবাজারের সম্পাদকবৃন্দের পক্ষে এই সকল কথা নির্ব্বিচারে মানিয়া লওয়া কঠিন, কেন না ইহা বিলাতী পুস্তকের আমদানী নহে। এবং বিলাতী পুস্তকে যাহা পাওয়া যায় না, তাহাকে 'অথরিটি'-সূচক কোন মূল্য তাঁহারা দিবেন, এমন শিক্ষা (?) তাঁহারা পান নাই।

বিলাতী পত্র-পত্রিকা মার্ফৎ সংবাদ আসিতেছে, আমেরিকার কৃষির সম্যক্ উন্নতি সাধিত হইয়াছে, কৃষিযোগ্য জমী বিস্তর বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং উৎপন্ন শস্যের মোট পরিমাণ বহু বাড়িয়াছে। এই সকল কথার প্রত্যেকটী সত্য; আমরাও তাহা বিশ্বাস করি। কিন্তু ঐ বিলাতী পত্র-পত্রিকার মার্ফৎই প্রতিদিন আরও সংবাদ আসিতেছে যে, আমেরিকার জন-সাধারণের অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতেছে। এবং অনুসন্ধান করিলে ইহাও জানা যাইবে যে, আমেরিকার কৃষক জনসাধারণ আজ পরমুখাপেক্ষী, তাহাদের অধিকাংশই আজ চাকুরীজীবী।

আনন্দবাজারের সম্পাদকবৃন্দ এই দুই সংবাদের কার্য্যকারণ বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন কি যে, হিসাবে কোথায় গোঁজামিল আছে? তাঁহারা সন্ধান লইলে জানিতে পারিবেন যে, সেখানে উৎপন্ন শস্যের মোট পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও বিঘাপ্রতি জমীর উৎপাদন-হার অতি মাত্রায় হ্রাস পাইয়াছে। ইহাই কি তাঁহাদের মতে উন্নত কৃষিবিজ্ঞানের পরিচায়ক?

যে-দেশের লোক সেদিনও নগ্ন হইয়া, কাঁচা মাংস খাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছে, সে-দেশে যে আজও কোনও বিজ্ঞানের অ-আ-ক-খ পাঠ শেষ হয় নাই, তাহা কি প্রমাণ করিয়া দেখাইতে হইবে? মাত্র পাঁচ ছয় শত বৎসর জাতীয় জীবনের পক্ষে শৈশবকাল। আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে জাতিহিসাবে যাহারা শিশু, সেই শিশুদের 'হাঁটি-হাঁটি পা-পা' কেও আমরা আজ সমর্থ, পরিণতবয়স্ক মানবের চলাফেরা বলিয়া ভ্রম করিতেছি।

এবং তাহারই জন্য আজ এই সোনার দেশে দিকে দিকে হাহাকার উঠিয়াছে। ইহা কি কেবল রাষ্ট্রিক পরাধীনতার জন্য? রাষ্ট্রিক শৃঙ্খল তো বাহিরের বস্তু। যেদিন আমরা আমাদের মানসিক পরাধীনতা এবং অন্তরের শৃঙ্খল সম্পর্কে সচেতন হইব, সেই দিনই রাষ্ট্রিক শৃঙ্খলের অবসান ঘটিবে।

এই অতি সহজ কথাটী আনন্দবাজার প্রমুখ দেশের পত্রিকাসমূহের সম্পাদকমণ্ডলী এবং শিক্ষিত (?) সাধারণ বুঝিতে পারিবেন কি? অন্তরের যে শৃঙ্খল তাঁহাদিগকে প্রতিপদে স্বাধীন হইবার পথে বাধা প্রদান করিতেছে, সেই শৃঙ্খল হইতে দেশের অশিক্ষিত (?) জনসাধারণ আজও মুক্ত আছে। পাছে দেশব্যাপী নিরক্ষরতা দূরীকরণের চেষ্টায় তাহারাও এই শৃঙ্খলে বন্দী হয়, আমাদের আশঙ্কা সেইখানে।

দেশের এই চরম দুর্দ্দিনে কতকগুলি ধার-করা বুলি আওড়াইয়া দেশবাসীর দুর্দ্দশাকে তাঁহারা যেন আরও ঘনীভূত না করেন; তাঁহারা বুঝুন, পথ রোধ করিয়া পথ দেখাইবার ভান করিবার সময় আর নাই।

অমৃতবাজারের স্বাধীনতালাভের নীতি

গত চৈত্র সংখ্যায় 'দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও সংবাদ পত্রের দায়িত্ব' শীর্ষে আমরা লিখিয়াছিলাম, সংবাদপত্রের বহু উল্লেখ-যোগ্য দায়িত্বের মধ্যে কয়েকটী এই:—(১) যে যে ঘটনায় জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি অথবা অবনতি ঘটিতে পারে, সেই সব ঘটনা যথাসম্ভব যথাযথভাবে প্রচারিত করা; (২) দেশে যাহা যাহা ঘটিতেছে, তাহা জনসাধারণের হিতকর কিংবা অহিতকর, তাহা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া; (৩) দেশের মধ্যে জনসাধারণের অহিতকর কিছু ঘটিয়াছে, ইহা নজরে পড়িলে, তাহার কারণ নির্দ্ধারণ করিয়া ঐ কারণ জন-সাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া; (৪) জনসাধারণের অহিতকর যাহা যাহা দেখা যায়, কি করিলে তাহার উপশম হইতে পারে এবং ক্রমশঃ জনসাধারণের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে, তাহা জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া; (৫) দেশের জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে বিদ্বেষের অথবা দলাদলির উদ্ভব না হয়, অথচ কে দেশের হিতসাধন করিতেছেন, অথবা কে অহিত সাধন করিতেছেন, তাহা যাহাতে জনসাধারণ জানিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করা; ইত্যাদি।

সংবাদপত্রের দায়িত্ব বিষয়ে আমাদের এই ধারণা সম্বন্ধে জনসাধারণের কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। সংবাদ-পত্রের পরিচালকবর্গও, আশা করি, আমাদের এই উক্তি-সমূহের সমর্থন করিবেন। কার্য্যতঃ কিন্তু দেখিতে পাই, দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্রই এই আদর্শ মানিয়া চলেন না।

আমরা উপরে আনন্দবাজারের একমাস কালের সম্পাদকীয় হিসাবে লিখিত সন্দর্ভের শিরোনামার উল্লেখ করিয়াছি। আমাদের সম্মুখে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র ফাইল রহিয়াছে, এখানেও সেই একই কথার পুনরুক্তি—সেই আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্র-সমস্যার সমাধান-প্রচেষ্টা, সেই চর্ব্বিত চর্ব্বণ, বিলাতী বুলির আবৃত্তি—সমস্তই এক।

ইহাঁদের এই সব রচনা পড়িয়া আমাদের কেবলই মনে হয়, কোন উত্তপ্তমস্তিষ্ক ব্যক্তি কল্পিত শত্রুর সহিত অবিরাম যুদ্ধ করিয়া যাইতেছে, যে-শত্রুর প্রতি অদৃশ্য তরবারি ঘন ঘন সঞ্চালিত হইতেছে, সে-শত্রু নিকটে দূরে কোথাও নাই, কিন্তু তাহারই সহিত যুদ্ধ করিয়া এই ব্যক্তি ঘর্ম্মাক্তকলেবর। এদিকে নিজের অন্নসংস্থান নাই, কটিদেশ-বিলম্বিত বস্ত্রখণ্ড শত জীর্ণ, কিন্তু সেদিকেও ভ্রুক্ষেপ নাই।

আমাদের এই মন্তব্য পড়িয়া হয়ত অমৃতবাজার পত্রিকার পরিচালকগণ বিরক্ত হইবেন, কিন্তু তাঁহারা যদি সত্য-স্বীকারে পরাঙ্মুখ না হন, তবে আমাদের সহিত তাঁহারা একমত হইতে বাধ্য।

দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা তাঁহাদের যে কোনও একটী দিনের সম্পাদকীয় লইয়া আলোচনা করিব। গত ২৫শে এপ্রিল তারিখের পত্রিকাতে দেখিতেছি, 'Move for Unity (একতার আন্দোলন)' শীর্ষে একটী নাতিদীর্ঘ রচনা সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত হইয়াছে। মোটামুটি ভাবে ইহাতে বলা হইয়াছে যে, দেশের মধ্যে সর্ব্বদল সম্মেলন হয় ভালই, কিন্তু না হইলেও কংগ্রেসের পক্ষে একাকী পথ চলা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। তাঁহাদের স্বলিখিত প্যারাগ্রাফটী আমরা উঠাইয়া দিতেছি :

'It will be in our opinion not only unreasonable but unpatriotic for non-congressmen to demand as a price of their co-operation that the Congress should lower its ideal or abandon its creed. There can not be any levelling down. No body can deny that the ideology of the Congress is more advanced than that of any other political body in India. And the value of the advanced ideology is unquestionable for political freedom. The Congress therefore neither can nor should agree to surrender even a part of it, even, if by persisting in it, it has to plough a lonely furrow in the land. If in these circumstances, it is insisted on by those, whose alliance is desired by the Congress, that there should be a compromise by the Congress of its principles, hope for such unity will have to be given up in the interest of the country'.

আমরা ইহার মোটামুটি বাঙ্গালা ভাব পূর্ব্বেই দিয়াছি। নিষ্প্রয়োজন বলিয়া ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ করিলাম না; কেন না আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই সকল কথা এক ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী ব্যতীত আর কেহ বুঝিতে পারিবেন না। আমাদের এমন সন্দেহও হয় যে, কোন ইংরাজ (যদিও ইহা ইংরাজীতে লিখিত) এই সকল কথা পড়িয়া তাহার সম্পূর্ণ অর্থ বুঝিতে পারিবেন না।

আমাদের নিকট এই সকল কথা হেঁয়ালির মত লাগে। কেন না কংগ্রেস বলিতে আমরা মোটা বুদ্ধিতে এই বুঝি যে, কংগ্রেস দলনির্ব্বিশেষে সকল ভারতবাসীর মিলনক্ষেত্র। কিন্তু ইহাঁদের এই কথায় স্পষ্টতঃ বলা হইয়াছে যে, কংগ্রেসের দেশ ও দেশবাসী হইতে বিচ্ছিন্ন এবং বিভিন্ন একটী সত্তা আছে। ইহাঁদের কথায় মনে হয় যে, কংগ্রেস বুঝি কোন উপকথার দানব বিশেষ, তাহার সহিত দেশবাসীর সম্পর্ক—যে করিয়াই হউক, তাহাকে প্রতিদিন কয়েক শত নরমুণ্ড চিবাইতে দিতে হইবে, নহিলে কংগ্রেস-মূর্ত্তি ক্রুদ্ধ হইবেন, ক্রুদ্ধ হইয়া সংহার মূর্ত্তি ধরিবেন, এবং আমাদিগের ধনপ্রাণ সমূলে বিনষ্ট করিবেন।

আমরা কিন্তু কংগ্রেসের এই মূর্ত্তির পূজারী নহি। কংগ্রেস আমাদের নিকট বরাভয়দায়িনী মাতৃমূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছেন—তাঁহার ক্রোড়ে কোটি কোটি বুভুক্ষু নিরন্ন জনসাধারণের ক্ষুধার্ত্ত মানবশিশুকে তিনি আগুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহাদের দুঃখে সে-মূর্ত্তির অশ্রু সজল, কে তাহার সন্তান, কে নয়, ইহা নির্দ্ধারণ করিবার স্পর্দ্ধা কি সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং রাজনীতিক পাণ্ডাদের?

কংগ্রেসের এই মাতৃমূর্ত্তিকে দানব বলিয়া জানিব কেন? কংগ্রেস কাহারও নিজস্ব নহে, উহা সমস্ত ভারতবাসীর মিলনক্ষেত্র। যদি দেশের কোন শ্রেণীর লোকের কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়া অসম্ভব হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, কংগ্রেসের পাণ্ডাদের দোষ, সেখানে তাঁহারা অনাচার ও দুর্নীতির সৃষ্টি করিয়াছেন।

আমরা "ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়" শীর্ষক ক্রমশঃপ্রকাশ্য প্রবন্ধের গত মাঘ সংখ্যায় কংগ্রেসের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, এই অনাচার ও দুর্নীতির মূলে কি। এবং ইহাও দেখিয়াছি যে, বর্ত্তমানে কংগ্রেস ভারতবর্ষের মোট লোকসংখ্যার এক শত ভাগের এক ভাগ অপেক্ষাও অনধিক লোকের খেয়াল চরিতার্থ করিবার স্থানে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এবং সেই জন্ম 'ভারতীয় কংগ্রেস' এই নামটী অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে।

আমাদের মতে বর্ত্তমান কর্ম্মপদ্ধতিতে আর কিছুদিন কংগ্রেসের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হইলে, কংগ্রেসের অপমৃত্যু ঘটিবে। সুতরাং অনতিবিলম্বে কংগ্রেসের কর্ম্মোদ্দেশ্যের এবং কর্ম্মতালিকার ভ্রান্তি দূর করা কর্ত্তব্য।

দলনির্ব্বিশেষে যে মিলন-সভা পরিচালিত হওয়া উচিত, তাহাতে দেশের একটী মাত্র অধিবাসীরও স্বার্থবিরুদ্ধ কোন কর্ম্মোদ্দেশ্যের ইঙ্গিত পর্য্যন্ত থাকা উচিত নহে। ঐ একটী মাত্র ইঙ্গিতে শত-সহস্র বিরুদ্ধ পক্ষের উদ্ভব হয় এবং দেশবাসীর মধ্যে কুৎসিত দলাদলির সৃষ্টি করে।

আজ আমরা কংগ্রেসকে যে সঙ্কীর্ণ প্রাচীরের মধ্যে বহু বাধানিষেধ,বহুতর চুক্তি ও স্বীকারনামার ক্ষুদ্রতম গণ্ডীর মধ্যে উপস্থিত করিয়াছি, সেখানে মানুষ সহজে নিশ্বাস ত্যাগ করিতে পারে না। সেখানে যাইতে হইলে সাধারণ মানুষকে মুখোস পরিয়া যাইতে হয়, পূর্ণ স্বাধীনতার মন্ত্র-জপে দীক্ষা লইতে হয় এবং এ মন্ত্রের কি অর্থ, এ মন্ত্রে কি পরমার্থ সাধিত হইবে—সে প্রশ্ন ভুলিয়া এই মন্ত্র জপ করিতে হয়—

সেই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে ত্রিশ কোটি বুভুক্ষু কৃষকের স্থান কোথায়?

তথাপি কি আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, বর্ত্তমান কংগ্রেস দেশের জনসাধারণের জন্যই কাজ করিতে চায়? আজ যে সমাজতন্ত্রবাদের ধূয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যেও দেশবাসীর এক সম্প্রদায়কে অপর সম্প্রদায়ের সহিত ভেদ ঘটাইবার বুদ্ধি কটু হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি এবং আবার বলিতেছি যে, "স্বাধীনতা","সমাজতন্ত্রবাদ" সমস্তই ধার-করা বুলি। এই সকল কথার মধ্যে বিলাতী বই-পড়া বিদ্যার পরিচয় থাকিতে পারে, কিন্তু দেশ ও দেশবাসীর অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া নিজেদের বুদ্ধি অনুযায়ী বিধিব্যবস্থার ইঙ্গিত মাত্র নাই।

আমাদের বিশ্বাস, যদি সমগ্র ভারতবাসীর, তথা মনুষ্য-সমাজের আর্থিক দুরবস্থা দূর করা কংগ্রেসের কর্ম্মোদ্দেশ্য হয়, তবেই—কেবল মাত্র তবেই,কংগ্রেস সমগ্র ভারতবাসীর মিলন-ক্ষেত্র হইতে পারে, নচেৎ নয়; এবং যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের স্থায়ী ও অস্থায়ী বাসিন্দাদের একটী মূষিক কি পিপীলিকার পর্য্যন্ত কংগ্রেসের প্রবেশপথে কোন অন্তরায় থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত কংগ্রেস নামমাত্র কংগ্রেস থাকিবে। অবশ্য এমন কখনও সম্ভব হইবে না যে, আবালবৃদ্ধ সকলেই কংগ্রেস-সেবক হইবেন, কিন্তু তাই বলিয়া ইচ্ছা করিয়া কংগ্রেস হইতে কাহারও কংগ্রেস-প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করা কেবল ভুল নহে, পাপ। যাহাতে যে-কেহ ইচ্ছা করিলে কংগ্রেসের হইয়া অন্ততঃ তৃণকুটাটি সরাইয়াও কাজ করিতে পারেন, কংগ্রেসের কর্ম্মতালিকা এইরূপ হওয়া প্রয়োজন।

এইরূপ কংগ্রেসকেই প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেস আখ্যা দেওয়া যায়। এইরূপ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, প্রধানতঃ নিম্নলিখিত দুইটী ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন :—

(১) যাহাতে ভারতীয় জনসাধারণের প্রত্যেকের আর্থিক অসচ্ছলতা, অসন্তুষ্টি, পরমুখাপেক্ষিতা, অশান্তি, অস্বাস্থ্য এবং অকালমৃত্যুর সম্ভাবনা কমিয়া যায়, তদনুরূপ কর্ম্মপদ্ধতির উদ্ভাবন ;

(২) যাহাতে ইংরাজ জনসাধারণের প্রকৃত স্বার্থের কোন অনিষ্ট ঘটিতে পারে, তাহার কার্য্য, চিন্তা ও বাক্যের ঐকান্তিক বর্জ্জন।

কি উপায়ে ইহা সম্ভব, তাহা "ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়" শীর্ষক প্রবন্ধে গত কয়েক মাসে আমরা দেখাইয়াছি।

অমৃতবাজারের সম্পাদকবর্গের পক্ষে এই শ্রেণীর কথা বর্ত্তমানে অগ্রাহ্য বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু তাঁহারা সামান্য চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ইহা ব্যতীত আর কোনও পদ্ধতিই বর্ত্তমানে কার্য্যকরী হইতে পারে না।

কংগ্রেসের 'ideology' (অক্সফোর্ড ডিক্সনারিতে ইহার অর্থ দেওয়া আছে visionary speculation) যত উন্নতই হউক না কেন, এবং বর্ত্তমান কংগ্রেস-পাণ্ডাগণের পক্ষে যতই

মনে হউক না কেন যে, সেই উচ্চাদর্শের কোনরূপ অবনতি সাধন (lower) অথবা সমতা-সাধন (levelling down) একেবারেই অসম্ভব, মোটের উপর ঐ 'ইডিয়োলজি' 'ইডিয়োগ্রাফ' (ideograph : চীনা অক্ষরের কিম্ভূত কিমাকার রেখাবিন্যাস) মাত্র ; এবং হয় ত উহা গ্রীকদের idiotes- (যাহা হইতে ইংরাজি idiot হইয়াছে)-এরই সমপর্য্যায়-ভুক্ত। কংগ্রেসের 'ইডিয়োলজি' বলিতে অমৃতবাজার কি বুঝিয়াছেন, আমরা অবশ্য তাহা সম্পূর্ণ বুঝি নাই। সম্ভবতঃ কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জনের লক্ষ্যকেই অমৃতবাজার গালভরা কথা দিয়া পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারি না যে, দেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার অ-মিলনের অবসান না ঘটিলে 'স্বাধীনতা' অর্জ্জন করা সম্ভব কি করিয়া। অমৃতবাজারের সম্পাদকবৃন্দ কি আমাদিগকে তাহা বুঝাইয়া দিবেন ?

আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, অদূরভবিষ্যতে এমন দিন আসিতেছে, যেদিন ইংরাজীনবিশদের এই সব জারিজুরি ভাঙ্গিবে। যাঁহারা চক্ষু থাকিতে অন্ধ, তাঁহারাই কেবল ঈশান কোণে মেঘ দেখিয়াও আগামী ঝটিকা সম্বন্ধে সতর্ক হন্ না।

আমরা তাঁহাদিগকে এখনও সতর্ক হইবার জন্য পরামর্শ দিতেছি। দেশে যে দুঃখ-দুর্দ্দশার অগণিত সর্প আজ মাথা নাড়া দিয়া উঠিয়াছে, তাহদের লইয়া খেলা করা চলে কি ?

দেশের ভাগ্য, ভাগ্যবিধাতা কংগ্রেস ও কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল

লক্ষ্ণৌ-কংগ্রেসের পর মাসাধিক কাল অতিবাহিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে ওয়ার্দ্ধার বৈঠকে দেশের ভাগ্যবিধাতা-গণের মতানৈক্য ব্যতীত কংগ্রেসের পক্ষ হইতে দেশবাসীকে বিশেষ কোন সংবাদ দিবার নাই। এই মতানৈক্যও অপ্রত্যাশিত নহে। বর্ত্তমান কংগ্রেসের প্রকৃতির মধ্যেই অনৈক্যের বীজ রহিয়া গিয়াছে, এ কথা আমরা বহুবার উল্লেখ করিয়াছি।

গত ১৩৪১ সনের অগ্রহায়ণ সংখ্যা হইতে 'বঙ্গশ্রী'র সম্পাদকীয় বিভাগে মূলতঃ দেশের কথার আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। ঐ সংখ্যায় "দেশের কথার আলোচনায় বিপত্তি ও আমাদের লক্ষ্য" শীর্ষক রচনায় আমরা আভাস দিয়াছিলাম যে, বর্ত্তমানে দেশের কথা বলিতে অনেক বিপদ। দেশের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ এত প্রকট যে, এখন দেশের কথা বলিতে গেলেই কোন না কোন দলের অপ্রিয় হইতে হয়।

আমরা ঐ সংখ্যায় লিখিয়াছিলাম, জাতীয়তার প্রধান উপকরণ মিলন, 'ভারতবাসী জাতি' শব্দ সার্থক করিতে হইলে, সমস্ত ভারতবাসীর পরস্পর পরস্পরের মিলনের চেষ্টা অপরিহার্য্য। অতঃপর আমরা দেশের মধ্যে দেশবাসীর মিলনাভাবের স্বরূপ বিচার করিয়া জানাইয়াছিলাম যে, সমস্ত লোককে মিলিত করিয়া একটা জাতিগঠনের চিন্তায় ও কর্ম্মে এমন কিছু থাকার প্রয়োজন, যাহাতে কোন দেশবাসী কোনরূপে আহত না হন।

আমাদের আলোচনা পূর্ব্বাপর যাঁহারা পাঠ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা বড় অভিযোগ এই যে, ইহার গঠন ও প্রকৃতির মধ্যেই এই মিলনের বাধাদানকারী অনৈক্যের হেতু লুক্কায়িত রহিয়াছে।

সুতরাং ওয়ার্দ্ধা বৈঠকে দেশের ভাগ্যবিধাতাগণের মধ্যে মতানৈক্যের সংবাদ আমাদের নিকট অপ্রত্যাশিত নহে। পক্ষান্তরে এমন আশঙ্কা আমরা বরাবরই করিয়া আসিয়াছি এবং আজও করিতেছি যে, যতদিন পর্য্যন্ত না কংগ্রেস দেশের স্থায়ী ও অস্থায়ী বাসিন্দাদের সকলের পক্ষে আচরণীয় এবং প্রয়োগযোগ্য কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত কংগ্রেস কেবল কলহের এবং দলাদলির মাত্রা বৃদ্ধি করিবে, দেশের কোন প্রকার উপকার কংগ্রেস দ্বারা সাধিত হইবে না।

কংগ্রেস সম্পর্কে সত্যভাষণের নীতি হইতে আমরা এ যাবৎ কর্ত্তব্যবোধে কংগ্রেসের কার্য্যকলাপের যে সমালোচনা করিয়া আসিয়াছি, তাহার মূলে দেশের মঙ্গলচিন্তা ব্যতীত অপর কিছুই নাই, নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রই ইহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন।

কংগ্রেসকে সমালোচনা না করিয়া নীরব থাকা হয়ত' বিষয়বুদ্ধির পরিচায়ক হইত। কিন্তু আমরা তাহা পারি নাই। প্রত্যহ চোখের উপর দেখিতেছি, ভারতের সমস্যা ভয়াবহ মূর্ত্তিতে প্রকট হইয়া উঠিতেছে। দেখিতেছি, উদ্দীপ্ত-বদন, কৃতবিদ্য যুবকগণ চাকুরীর অন্বেষণে দ্বারে দ্বারে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া ফিরিতেছে; দেখিতেছি, মধ্যবয়স্ক ব্যবহার-জীবী ও চিকিৎসা-ব্যবসায়িগণ চিন্তাজর্জ্জরিত মুখে মক্কেল ও রোগীর বিফল প্রতীক্ষায় প্রহর গণনা করিতেছেন এবং দেখিতেছি, উদার আকাশের নীচে জননী বসুন্ধরার বুকে অনাবৃত চরণ নিক্ষেপ করিয়া গ্রামের কৃষক অকালবার্দ্ধক্য বরণ করিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে।

দেশের এই মূর্ত্তি দেখিয়া এমন কোন্ দেশবাসী আছেন, যিনি কেবল অপ্রিয়ভাষণের আশঙ্কায় সত্য কথা বলিবেন না?

দেশের নায়কগণের কার্য্যকলাপকে তাই বারে বারে আমাদিগকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে হইতেছে যে, ঐ সকল কার্য্যকলাপের মধ্যে দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দ্দশা উপলব্ধির বিন্দুমাত্র পরিচয় নাই। আছে কেবল আত্মপ্রতারণা ও আত্মম্ভরিতা।

আমরা গত সংখ্যায় জওহরলালের লক্ষ্ণৌ-অভিভাষণ প্রসঙ্গে অনেক কথা বলিয়াছি; তৎপূর্ব্বে ফাল্গুন সংখ্যাতেও জওহরলালের মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, জওহরলালের ভাষণসমূহ কেবলই কয়েকটী শ্রুতিমধুর বাক্যের সমাবেশ মাত্র; তাহাদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের কোন সামঞ্জস্য নাই। বর্ত্তমান সংখ্যায় পুনরায় আমাদিগকে সেই আলোচনা করিতে হইতেছে বলিয়া আমরা দুঃখিত; কিন্তু যখন দেখিতেছি, দেশীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহের একটীতেও দেশ ও দেশবাসীর স্বার্থের দিকে চাহিয়া কোন আলোচনা নাই, কেবল আছে লোকবিশেষে এবং দলবিশেষে স্তুতি ও নিন্দা, তখন জনসাধারণের পক্ষ হইতে এই দলবদ্ধ দেশপ্রেমের অভিনয়ের বিরুদ্ধে, যত ক্ষীণই হউক, প্রতিবাদের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই আছে, ইহাই আমাদের দৃঢ় ধারণা।

লক্ষ্ণৌ-কংগ্রেসের পর হইতে সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য এবং জওহরলালের গতিবিধি দ্বারা আমরা যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়া দেখিব।

প্রথম বিভাগ: কার্য্য; দ্বিতীয় বিভাগ: বক্তৃতা ও রচনা।

অবশ্য বলাই বাহুল্য, কার্য্য বিভাগে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন কিছুরই পরিচয় নাই। নিখিল ভারতের জাতীয় মহাসভার সভাপতি এই সময়ের মধ্যে কয়েকটী প্রাদেশিক কংগ্রেস সভার বরাবর কিছু ইস্তাহার বিলি করিয়া জানাইয়াছেন যে, কংগ্রেসের গঠনবিধিতে অমুক অমুক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। এবং অতঃপর কংগ্রেসের প্রাদেশিক শাখা সমূহের এই এই কার্য্য করা উচিত। পণ্ডিত জওহরলালের দ্বিতীয় কার্য্য (ঠিক কার্য্য নহে, কার্য্যের সঙ্কল্প বলা যায়) দলনির্ব্বিশেষে দেশের জনসাধারণের রাষ্ট্রিক অধিকার রক্ষার্থে একটী সমিতির গঠন।

ইহা ছাড়া কংগ্রেস হইতে সরকারের অনুকরণে একটী ইনফর্ম্মেশন-বুরো সৃষ্টির পরিকল্পনা করা হইয়াছে এবং বিদেশে প্রচারকার্য্যের কথাও উঠিয়াছে। ইতোমধ্যে সরকারী কর্ম্মচারীদের মত জওহরলালের একটী টুর-প্রোগ্রামের কথাও উঠিয়াছে।

জওহরলালের এই সকল কাজের নমুনা দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, বৃথাই তিনি ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ করেন নাই। তাঁহার সকল কাজের মধ্যেই ইংলণ্ডীয় কেতা-দুরস্ত ভাব বিদ্যমান। হয় ত ইহা প্রশংসনীয়।

অবশ্য একথা আমরা জানি যে, এই অত্যল্পকাল মধ্যেই একটা অসাধারণ কিছু করা জওহরলালজীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু তাহা সম্ভব না হইলেও, এমন কোন কার্য্যের সূচনাই আমরা তাঁহার কার্য্যকলাপ হইতে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেছি না, যাহা শেষ অবধি দেশের হিত-সাধন করিতে পারে।

জওহরলালের বক্তৃতা ও রচনাকে আমরা দ্বিতীয় বিভাগ বলিয়াছি।

এই সকল হইতে আমরা জওহরলালজীর বিশ্বাস ও মতের যে পরিচয় পাইয়াছি, নিম্নে সংক্ষেপে তাহা বিবৃত হইল।

জওহরলালজীর প্রথম বিশ্বাস:

লক্ষ্ণৌ-কংগ্রেস দেশে একটা কিছু অভূতপূর্ব্ব সংঘটন (তাঁহার কথায় 'landmark'), কেন না ইহাতে মূলনীতি-সমূহের আলোচনা হইয়াছে;

দ্বিতীয় বিশ্বাস:

সমাজতন্ত্রবাদ দেশের সর্ব্বরোগহর মহৌষধ, দেশবাসী এই

কথাটী বুঝিলেই দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশা কর্পূরের মত উবিয়া যাইবে ;

তৃতীয় বিশ্বাস :

দেশপ্রেমের চরম কষ্টিপাথর পূর্ণ স্বাধীনতার সমর্থন ;

চতুর্থ বিশ্বাস :

মহাত্মা গান্ধী জগতে শান্তিরাজ্যের বাণী দান করিয়াছেন, তাঁহার এই বাণী যীশুখৃষ্টের Sermon on the Mountকেও হার মানাইবার মত ;

পঞ্চম বিশ্বাস :

কংগ্রেসে সকল লোকের প্রবেশাধিকার সম্ভব নহে, সুতরাং অন্য কোন প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া দেশবাসী জনসাধারণের কতকগুলি অভিযোগের কারণ দূর করিতে হয় ;

ষষ্ঠ বিশ্বাস :

কৃষকের দুরবস্থা বাড়িতেছে এবং বেকার সমস্যার রূপ মারাত্মক, এবং এ বিষয়ে কংগ্রেসের কর্ত্তব্য আছে ;

সপ্তম বিশ্বাস :

আগামী আইন-সংস্কারটা কিংবা সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারা এমন একটা বিশেষ কিছু ব্যাপার নহে, যাহার জন্য মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন আছে ;

অষ্টম বিশ্বাস :

বিদেশে প্রচারকার্য্যের প্রয়োজনীয়তা আছে।

যাঁহারা পূর্ব্বাপর "বঙ্গশ্রী" পাঠ করিতেছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট জওহরলালজীর এই সকল বিশ্বাসের ফাঁকি অতি সহজেই ধরা পড়িবে ; কেন না এই সকল প্রশ্নেরই আলোচনা অল্পাধিক প্রতি সংখ্যাতেই করা হইয়াছে, সুতরাং আমাদের পক্ষ হইতে নূতন করিয়া এই সকল অপরিপক্ক মতবাদের কোন প্রতিবাদ প্রয়োজন বলিয়া আমরা মনে করি না। আমরা এখানে কেবল দেখাইব যে, জওহরলালজীর নিজের নিকটই তাঁহার মতবাদ সম্পূর্ণ ভাবে সুপরিস্ফুট নহে।

তাঁহার প্রথম বিশ্বাস যে, লক্ষ্ণৌ-কংগ্রেস একটা 'মহামারী ব্যাপার' হইয়াছে। এমন বিশ্বাস তাঁহার হইতে পারে। কিন্তু দেশবাসী তাঁহার সে-বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে কি পাইয়াছে ? আজ ৫১ বৎসর ধরিয়া দেশে একটার পর একটী কংগ্রেসের অধিবেশন হইতেছে, দেশনেতাগণের হিসাবে ইহার প্রত্যেক পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশন অপেক্ষা পরবর্ত্তী অধিবেশনটা অধিকতর সফল এবং প্রত্যেকটী অধিবেশনই জাতির জীবনে না কি যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। (আমরা এ সম্পর্কে একটুও অত্যুক্তি করিতেছি না ; পাঠক ইচ্ছা করিলে এই ৫১ বৎসরের কংগ্রেস অধিবেশনসমূহের উপর দেশনায়কগণের মতবাদ পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন)। কিন্তু আমরা প্রশ্ন করি, সেই যুগান্তরের ফলেই কি দেশে আজ অস্বাস্থ্য, অশান্তি, পরমুখাপেক্ষিতা এবং অকালমৃত্যু বাড়িয়া গিয়াছে ? এদিকে বাস্তব ঘটনা কি ? এই কংগ্রেস ও কংগ্রেসের অধিবেশনের সহিত জাতির জীবনের কতটুকু সম্পর্ক সাধিত হইয়াছে ? মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের 'ডিবেটিং ক্লাব' ব্যতীত বর্ত্তমান কংগ্রেসকে আমরা আর কি সম্মানযোগ্য আখ্যা দিতে পারি ? হইতে পারে, এই সকল কংগ্রেসে জোর গলায় ব্রিটিশ শাসনের তীব্র নিন্দা করা হইয়াছে ; হইতে পারে, এই সকল কংগ্রেস হইতে গৃহীত প্রস্তাবের ফলে দেশের শত সহস্র যুবক দেশের 'স্বাধীনতা' অর্জ্জনের প্রেরণা পাইয়া দলে দলে নিজেদের স্বাধীনতা হারাইয়াছে এবং আজ তাহারা কারাগারের অন্তরালে প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন গণনা করিতেছে ; হইতে পারে, এই কংগ্রেসের ফলেই দেশের কত মুকুলিত পুষ্পের মত সুন্দরস্বভাব কিশোর অকালে শুখাইয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু এই কংগ্রেস দেশের জনসাধারণের এক তিল উপকার সাধন করিতে পারিয়াছে কি ? আমরা জানি, উত্তরে অনেকে বলিবেন, "কেন, এই যে পোলিটিকাল কন্‌সাসনেস (political consciousness)—?" কিন্তু এই সকল ইংরাজী কথার ফুলঝুরি দেখিয়া ও শুনিয়া পেটের ক্ষুধা মিটে কই ? দেশের ক্ষুৎকাতর, মৃতপ্রায় নিরন্ন জনসাধারণের জন্য এই কংগ্রেসে আজ পর্য্যন্ত এমন কি হইয়াছে, যাহাতে এই কংগ্রেসকে আমরা দেশের সত্যকার ব্যথার ব্যথী বলিতে পারি ?

এমন 'ল্যাণ্ডমার্ক' লইয়া আমরা আর কতদিন কাটাইতে পারিব ?

কিন্তু জওহরলালজীর বিশ্বাস যে, সমাজতন্ত্রবাদ দেশের সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইলেই দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশার অবসান ঘটিবে। রুশিয়ার ইতিহাস পড়িয়া ও রুশিয়া ঘুরিয়া আসিয়া তাঁহার এই বিশ্বাস হইয়াছে। রুশীয়গণ যে প্রকৃত পক্ষে কি

অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছে, তাহার সামান্ত আভাস গত সংখ্যায় প্রকাশিত "মহাকালের প্রভাব, তাণ্ডবনৃত্য এবং পণ্ডিত জওহরলালের লক্ষ্ণৌ-অভিভাষণ" শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধের ৫৯৩ পৃষ্ঠায় দেখান হইয়াছে। সুতরাং জওহরলালের এই বিশ্বাস ধোপে টিকিবে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না। আমরা তাঁহাকে প্রশ্ন করি, তিনি তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত বিশ্বাস দেশবাসীর স্কন্ধে চাপাইতে গিয়া কি ভুল করিতেছেন, তাহা কি তাঁহার দৃষ্টিতে পড়িতেছে না? এই সমাজতন্ত্রবাদের ধূয়া তুলিয়াই তো শতধাবিচ্ছিন্ন কংগ্রেসকে তিনি আরও খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিবার সূচনা করিয়াছেন। বোম্বাই বণিক সমিতি যে তাঁহাকে মানপত্র দিতে পারিল না, ইহার মধ্যে কি তিনি কোন কিছুরই ইঙ্গিত পান নাই? যদি তাহা তিনি না পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে কি আমরা তাঁহাকে নির্ব্বোধ বলিয়া ভাবিতে পারি না?

সুতরাং তাঁহার এই সর্ব্বরোগহর মহৌষধ সম্বন্ধে দেশবাসীর মধ্যে যথেষ্ট সন্দেহ আছে বলিয়াই মনে হয়। ত তিনি হাতুড়ে ডাক্তারের মত দেশকে এই ঔষধ গিলাইবা চেষ্টা করিবেন?

তাঁহার মতে দেশপ্রেমের চরম কষ্টিপাথর—কংগ্রেসের পূ স্বাধীনতা মন্ত্রের সমর্থন।

দেশ স্বাধীন হইলেই যে দেশের কৃষকশ্রেণীর দুঃখ হইবে না, একথা তিনি নিজে গত ... তারিখে নাগপুরে বুটিবোরি গ্রামের ৫০০০ কৃষকের সম্মুখে স্বীকার করিয়াছে এই কৃষকেরাই দেশের শতকরা ৯৭জন; সাধের 'স্বাধীনতা'য় যদি তাহাদেরই সুখশান্তি না হইল, তবে 'স্বাধীনতা'র জন্য এই মাথাব্যথা কেন? আমাদের মনে হয়, জওহরলালজী নিজেই বুঝেন না, তিনি নিজে কি বলেন; কোন সময়ে তিনি বলিতেছেন, স্বাধীনতা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, নহিলে সুখশান্তি কিছুই আসিবে না; কোন সময়ে বলিতেছেন, স্বাধীনতা হইলেও সুখশান্তি হইবে না। এই আবোল-তাবোল কি ভারতের জাতীয় মহাসভার সভাপতির মুখে সাজে? দেশবাসী কি এই আবোল-তাবোল বুলি শুনিবার জন্যই তাঁহাকে জাতীয় মহাসভার সভাপতিত্বে বরণ করিয়াছেন?

প্রকৃত স্বাধীনতা বলিতে কি বুঝায় তাহা বোধ করি "বঙ্গশ্রী"র পাঠকগণকে আমরা বুঝাইতে পারিয়াছি। স্বাধীনতার বুলি আওড়াইয়া হৈ-চৈ তুলিলে যে দেশের উপকার অপেক্ষা অপকার অধিক করা হয়, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে বহুবার প্রমাণ করিয়াছি।

মহাত্মা গান্ধী যে শান্তিরাজ্যের বাণী আনয়ন করিয়াছেন, এবং তাহা যে যীশুখৃষ্টের Sermon on the Mount অপেক্ষাও মূল্যবান্ এমন কথা জওহরলালজী বিশ্বাস করিতে পারেন, কেন না, তিনি দুই দুইবার কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট পদ লাভ করিতে পারিয়াছেন; কিন্তু দেশবাসী কি এই উক্তি বিশ্বাস করিতে পারিবে? বস্তুতঃ কি দেখা যায়? দেখা যাইতেছে যে, মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের ফলে দেশে অশান্তির মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছে। একথা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? এবং কেবল অশান্তি নহে, দেশের সর্ব্বত্র মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের ফলে দলাদলি বৃদ্ধি পাইয়াছে। কত প্রকার দলের যে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহার প্রথম আন্দোলন দেশে সহযোগী এবং অসহযোগী দলের সৃষ্টি করে। সেই দলাদলির তীব্রতা আজও মিটে নাই; অসহযোগীরা সহযোগীর প্রতি অস্পৃশ্য জাতির মত আচরণ করিয়াছে, আজও করিতে চায়; সহযোগীরা যে দেশের শত্রু, এমন একটা মতবাদ দেশে চলিয়া গিয়াছে। এ মতবাদ কি যুক্তিসহ? অসহযোগ আন্দোলনের পর যত দি যাইতেছে, তত মহাত্মা গান্ধী নূতন নূতন দলের জন্মদাতা

ফলেও দেশে বহু দলের সৃষ্টি হইয়াছে। শুধু কি তাই আমাদের তো মনে হয়, আজ যে দেশের সর্ব্বত্র এই হাহাকার উঠিয়াছে, তাহার মূলেও গান্ধী-আন্দোলন। গান্ধীজী তাঁহার 'অহিংস অসহযোগ', 'আইন অমান্য' প্রভৃতির দুর্ব্বোধ্য ঘোর-পাঁচ দিয়া জাতীয় কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্যকে দৃষ্টিবহির্ভূত ন করিয়া দিলে, দেশে এই পঙ্কিল আবহাওয়ার সৃষ্টি হইত না এবং কংগ্রেস এতদিন গঠনমূলক কার্য্যনীতিতে মনোনিবেশ করিতে পারিতেন। আমরা অবশ্য এমন কথা বলিব না যে মহাত্মা গান্ধী জানিয়া শুনিয়াই এইরূপ করিতেছেন; কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে যখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, এইরূপ ঘটিতেছে, তখন মহাত্মা গান্ধীর কি কর্ত্তব্য, তাহাও কি দেশবাসীকে বলিয়া দিতে হইবে?

জওহরলালজী কি ইহাকেই Sermon on the Mount

এর নবরূপ বলিবেন ? আমরা ভাবিতেছি, কথার আতসবাজীর মোহে লোকে কি অনর্থের সাধনই না করে। এমন কোন্ খৃষ্টান আছেন, যিনি মহাত্মা গান্ধীর চেলার মুখে এই কথা শুনিয়া না ক্ষিপ্ত হইবেন ? ইহাও কি শান্তিকামী মহাত্মা গান্ধী সমর্থন করেন ? আমরা অবশ্য জানি যে, তিনি আত্মজীবনী লিখিয়াছেন (যদিও শাস্ত্রানুযায়ী আত্মপ্রচার সর্ব্বথা পরিত্যজ্য) এবং ইহাও শুনিয়াছি যে, জওহরলালজী গত লক্ষ্ণৌ-কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহা মহাত্মাজী স্বয়ং দেখিয়া দিয়াছিলেন এবং সে-অভিভাষণ মহাত্মাজীর স্বীয় প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। তদুপরি এই যীশুখৃষ্টের সহিত তুলনা!—জওহরলালের এই রচনাটীও কি মহাত্মাজী দেখিয়া দিয়াছিলেন ? আমাদের শাস্ত্রে আছে, আত্মপ্রশংসা-শ্রবণ আত্মহত্যারই নামান্তর। শেষ-জীবনে মহাত্মাজীর কি আত্মঘাতী হইবার ইচ্ছা জাগিয়াছে ? মহাত্মা গান্ধীর যদি কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান থাকিত, তবে তাঁহার এই চেলাটীকে তিনি থামাইতে চেষ্টা করিতেন। আর কিছুদিন কথা কহিলে যে, জওহরলাল আরও কত কি বলিবেন, আমরা তাহা ভাবিতেও পারি না। আমাদের দুঃখ এই যে, এমন ব্যক্তিকেও দেশের লোক নেতা হিসাবে মানিয়া থাকেন।

তাঁহার পঞ্চম বিশ্বাস, কংগ্রেসে সকল লোকের প্রবেশাধিকার নাই, সুতরাং দলনির্ব্বিশেষে অন্য কোন প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া কতকগুলি অভিযোগের কারণ দূর করা দরকার।

তিনি গত ১১ই মে তারিখে সুভাষ-দিবসে এলাহাবাদে যে বক্তৃতা দান করেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি— 'ইউরোপের দেশগুলিতে নাগরিক অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলিয়া মনে করা হয়। ইউরোপীয়গণের বদ্ধমূল ধারণা এই যে, এই নাগরিক অধিকার তাঁহাদের অবিসংবাদিত অধিকার। এই অধিকার রক্ষার জন্য তাঁহারা যুগে যুগে লড়াই করিয়া আসিতেছেন এবং অকাতরে সহস্র সহস্র লোক জীবন বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই… …' ইত্যাদি।

—এমন যে নাগরিক অধিকার যাহার মূল্য সাক্ষাৎ এমন কি ইউরোপীয়গণ পর্য্যন্ত এমন ভাবে স্বীকার করিয়াছেন, তাহারই জন্য আমরা দেশের সকলে মিলিয়া লড়িব না ?—জওহরলালজীর যুক্তি বোধ করি এই হইবে। তাঁহার আত্মজীবনী হইতে এখানে একটী ক্ষুদ্র বাক্য তুলিয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করি।

"All my predilections (apart from the political plane) are in favour of England and the English people, and if I have become what is called an uncompromising opponent of British rule in India, it is almost in spite of myself."

অর্থাৎ, ইংলণ্ড ও ইংরাজের প্রতি আমার পক্ষপাতিত্ব (রাজনৈতিক কথা বাদ দিলে) আছে ; এবং ভারতে ইংরাজ শাসনের এমন তীব্র বিরুদ্ধতা যে আমি করি, তাহা আমার প্রকৃতির বিরুদ্ধে।"

তাঁহার এই নির্ভীক 'সত্য'ভাষণের কি আমরা প্রশংসা করিব ? এখন আমাদের প্রশ্ন এই যে, নিজেকে এমন করিয়া চিনিবার পর জওহরলালের পক্ষে ভারতের জাতীয় মহাসভার কর্ণধারত্ব গ্রহণ করা উচিত কি না ? তিনি যে-দেশের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লইয়াছেন, সেই দেশবাসী কাহারও পক্ষে কিন্তু ইহা সম্ভব নহে। তাঁহাদের যে-কাহারও আত্ম-মর্য্যাদাজ্ঞান জওহরলালের বর্ত্তমান কার্য্য-কলাপের পথে প্রতিবন্ধক হইত। এই উক্তিকে কটু মনে হইতে পারে, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, জওহরলাল নিজে এ কথা স্বীকার করিবেন। অবশ্য তিনি বলিতেছেন যে, ভারতে বৃটিশ শাসনের তিনি পক্ষপাতী নহেন ; কিন্তু নিজেকে তিনি এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন কি ? চেষ্টা করিলেও তাহা তিনি পারিবেন কি।

শাসন বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা বাহিরের বস্তু নহে। মনে যাহার দাসত্বের ছাপ নাই, বাহিরে সে দাস হইলেও, মনে সে মুক্ত। জওহরলাল নিজে যে-দেশের কৃষ্টির নিকট দাসখৎ লিখিয়া দিয়াছেন, যে-দেশের লোক তাঁহাকে 'ইংলিশম্যান' বলিয়া 'গালি' দিতেছে—সে-দেশের কার্য্যকলাপের প্রকৃত রূপ দেখিবার সামর্থ্য তাঁহার কই ? তাহা হইলে কি তিনি বুঝিতে পারেন না যে, যতদিন কংগ্রেসে একজনেরও প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ থাকিবে, ততদিন কংগ্রেস হইতে সত্যকার কোন কাজ হইতে পারে না ? বৃটিশ বুলি 'স্বাধীনতা'ই তাঁহাকে এই সহজ কথাটী বুঝিতে দিতেছে না, কোন দিন দিবেও না।

কিন্তু দেশবাসী শিক্ষিত(?) জনসাধারণের কি ইহাতেও চৈতন্য হইবে না?

জওহরলালের ষষ্ঠ বিশ্বাস: কংগ্রেস হইতে দুঃস্থ কৃষক ও বেকারদের জন্য একটা কিছু করা দরকার।

এ বিষয়ে তাঁহার ধারণা কিরূপ অস্পষ্ট, কত অপরিণত, তাহা আমরা ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত "ভারতবর্ষের অবস্থা ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পণ্ডিত জওহরলালের মতবাদ"-শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে প্রমাণিত করিয়াছি (২৮১-২৮৫ পৃষ্ঠা)। জওহরলালের মত এই যে, যৌথ-চাষবাসের ব্যবস্থা হইলে দেশের কৃষি-সমস্যার সমাধান হইতে পারে। এই যৌথ-চাষবাস যে প্রকৃতপক্ষে কৃষকের বাঁচিবার উপায় নহে, মরণের অস্ত্র এবং ইহা যে জওহরলালজীর বহু সাধের সমাজতন্ত্রবাদেরই মূলে কুঠারাঘাত করিবে—এই সামান্য কথাও জওহরলালজী বুঝিতে পারেন না।

আমাদের মতে এমন ধোঁয়া-ধোঁয়া ভাব ও ধারণা লইয়া বর্ত্তমান জগতের কাব্য ও সাহিত্যরচনা চলিতে পারে, কিন্তু কোটি কোটি বুভুক্ষু নরনারীর জীবন-মরণ সমস্যার সমাধান করা যায় না। সে সমস্যার সমাধান করিতে হইলে দারিদ্র্যের তীব্রতা কি তাহা বুঝিতে হয়। অন্ততঃ এক দিনের জন্যও পয়সার অভাবে না খাইতে পাওয়ার যন্ত্রণা ভোগ করিলে, অন্ততঃ একরাত্রির জন্যও শয়নাভাবে কঠিন শীতে মৃত্তিকা-শয্যায় পড়িয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হইলে (সখ করিয়া নহে, বাধ্য হইয়া) এই সমস্যার রূপ চোখে পড়ে। বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়া আসিয়া, আই-সি-এস হইয়া,—আজীবন জেলে পচিয়া মরিলেও এই সমস্যা চোখে পড়ে না। জারকরসের মত দারিদ্র্যের দ্বারা তিল তিল করিয়া দেশসেবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়—

কেহ যেন মনে না করেন, আমরা ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিবার নিমিত্তই এই সব কথা কহিতেছি। দারিদ্র্য কি বস্তু, তাহা যে ধনীর সন্তান কিছুতে বুঝিতে পারে না,—আমাদের বক্তব্য কেবল এই, এবং সেই দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ না হইলে দেশপ্রেম আকাশ হইতে দৈববাণীর মত লাভ করা যায় না, আমরা কেবল এই কথা বলিতে চাই।

জওহরলালজী নিজেকে বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারিবেন, দরিদ্রের ঘরের সেই অপার্থিব দেশপ্রেম তাঁহার আছে, কি না। যে দেশপ্রেম তাঁহার পিতৃদেবের ছিল, যে দেশপ্রেম তাঁহার পিতৃসখা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ছিল—সে দেশপ্রেম তিনি কোথায় পাইবেন? সে দেশপ্রেম সহজাত নহে, সে দেশপ্রেমকে অর্জ্জন করিতে হয়।

জওহরলালজীর সপ্তম বিশ্বাস: আগামী আইন-সংস্কারটা এবং সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোয়ারা এমন বিশেষ কিছু ব্যাপার নহে, যাহার জন্য মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন আছে।

স্বীকার করিলাম, এ বিষয়ে মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু যদি কেহ আমার মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া খাইতে চায়, তবু কি আমি মাথা ঘামাইব না, বলিয়া বসিয়া থাকিব? জওহরলালজী নিশ্চয়ই তেমন কথা বলিবেন না?

সমগ্র জয়েণ্ট কমিটির রিপোর্টের কি দোষ-ত্রুটি, জওহরলালজী কোথাও তাহার আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে নাই। গত ১৩৪১ সনের পৌষ সংখ্যায় ও পরবর্ত্তী সংখ্যায় আমরা সম্পাদকীয় হিসাবে ঐ রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছিলাম। উহাতে ঐ রিপোর্টে যে শাসনকার্য্যের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিবৃতির অভাব আছে এবং প্রকৃত রাষ্ট্রপরিচালনা-কার্য্যের মূলনীতির বিরুদ্ধতাও ঐ রিপোর্টে আছে—তাহা দেখান হইয়াছিল। বৃটিশ জাতি মনে প্রাণে যে পার্লিয়ামেণ্টারি শাসন-পদ্ধতির সার্থকতায় বিশ্বাস করেন, সেই পদ্ধতি এদেশে বর্ত্তমানে কেন চালান সম্ভব নহে—তাহাও উল্লিখিত হইয়াছিল। সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারা বিষয়ে আলোচনাও তাহাতে ছিল। আমরা পাঠকগণকে সেই প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি এবং জওহরলালজীকে জিজ্ঞাসা করি যে, এই শাসন-সংস্কার যদি এমনই তুচ্ছ ব্যাপার, তবে সভাসমিতিতে নির্ব্বাচন ব্যাপার লইয়া, নির্ব্বাচন-প্রার্থীর দোষ-গুণ লইয়া বিচার করিতে তিনি যান কেন? কেন তাঁহার মুখ দিয়া এরূপ কথা বাহির হয় যে, কংগ্রেস-টিকিট না লইয়া যে নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইবে, তাহাকে যেন কেহ ভোট না দেয়? যে শাসন-সংস্কারেই তাঁহার বিশ্বাস নাই, সেই শাসন-সংস্কার সংক্রান্ত সকল বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার উদাসীন থাকা কর্ত্তব্য। দেশবাসী যদি জিজ্ঞাসা করে যে, কংগ্রেস-টিকিট লইয়া এতদিন যাহারা কাউন্সিলে গিয়া

গলাবাজি করিল—তাহাদের কোন্ কাজটা দেশের উপকারে লাগিয়াছে? তবে জওহরলালজী কি উত্তর দিবেন? এবং যদি দেশবাসী কংগ্রেসকে এই বলিয়া অভিযুক্ত করে যে, শূন্যগর্ভ কংগ্রেসী চালবাজীর জন্যই আজ দেশব্যাপী এই আইন-শৃঙ্খলার প্রবর্তন, তাহাতে কি জওহরলালজী আপত্তি করিবেন? তিনি নিজেও তো সেদিন এলাহাবাদে বক্তৃতা দিয়া বলিয়াছেন,—'যে সময়ে তাঁহারা (অর্থাৎ বৃটিশ জাতি) সবুট পায়ের দ্বারা আমাদের বুক চাপিয়া এবং হাত দ্বারা আমাদের ঘাড় আঁকড়িয়া ধরিয়া আছেন, সেই সময়ে সহযোগিতার কোন কথাই উঠিতে পারে না।' এই কথা কি বৃটিশরা স্বপক্ষে বলিতে পারেন না? কংগ্রেস হইতে আমরা তাঁহাদিগকে বলি নাই কি? সুতরাং বৃটিশ জাতির এই আত্মরক্ষার চেষ্টায় দোষ কি থাকিতে পারে? আজও যে জওহরলাল 'বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অস্তাচলযাত্রা'র ইঙ্গিত করিতে ছাড়িতেছেন না—ইহাতে কি বৃটিশ জাতি আনন্দে আত্মহারা হইবেন, না, স্বতঃই তাঁহাদের মনে প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি জাগ্রত হইবে? এবং সেই প্রবৃত্তির ফলে দেশময় যদি একদিন রক্তগঙ্গা বহিয়া যায়, তাহাতেও কি জওহরলালজী নিজের এই দায়িত্বহীন আচরণে অনুতপ্ত হইবেন না?

যে বক্তৃতার কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন, "ভারতের জনসাধারণকে যদি নাগরিকের অবাধ অধিকার ভোগ করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা এত বেশী শক্তিশালী হইয়া উঠিবে যে, হয়ত তাহারা বিদেশীর অধীনতা পাশ ছিঁড়িয়া ফেলিবে।" এই আশঙ্কা কি বৃটিশ জাতির পক্ষে একান্তই অন্যায় ও অমূলক?

আমরা কেবল বুঝি না যে, এই মিথ্যা আস্ফালন দেখাইয়া বৃটিশ জাতিকে উত্যক্ত করিয়া দেশের কি উপকার সাধন করা হইতেছে? অথচ স্পষ্টই দেখিতেছি, ইহাতে দেশবাসীর সমূহ অনিষ্ট হইতেছে। কংগ্রেসী পাণ্ডাগণ কি ইহা বুঝিতে পারেন না? আজ যদি দেশের বুভুক্ষু জনসাধারণ কংগ্রেসী পাণ্ডাগণকে বলে যে, তোমাদের জন্যই আমাদের আজ মুখের অন্ন যাইতে বসিয়াছে, তবে কি কংগ্রেসী তক্তায় বসিয়া এই সকল দেশনায়কের একবারও বিবেক দংশন হইবে না?

অকারণ শত্রুতাসাধন কংগ্রেসের একটী ব্যাধির মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। এই সেদিনও আবিসিনিয়ার প্রতি সহানুভূতির অভিনয় করিয়া কংগ্রেস ইতালীকে বিরক্ত করিয়াছে। ইহাতে না আছে আবিসিনিয়ার হিত, না আছে আমাদের হিত। আছে কেবল আমাদের অসংযত আত্মাভিমানের প্রকাশ।

এমন করিয়া কংগ্রেস আর কতদিন দেশসেবার নামে দেশের সর্বনাশ সাধন করিবেন?

জওহরলালজীর অষ্টম বিশ্বাস: বিদেশে প্রচারকার্য্য সম্বন্ধে।

আমরা জানি না, কংগ্রেস এই প্রচারকার্য্য করিয়া কি লাভবান্ হইবে। নিজেদের লজ্জা পাড়ায় রটাইবার দুর্বুদ্ধি ইহাকেই বলে। ঘর না সামলাইয়া আমরা বাহিরে ছুটাছুটি করিবার পক্ষপাতী নহি। ইহাতে অপর দেশবাসীর হাস্য ও অনুকম্পা ব্যতীত আমরা আর কি উদ্রেক করিতে পারি?

বর্তমান আলোচনায় আমরা দেখাইতে চাহিয়াছি যে, জওহরলাল প্রমুখ দায়িত্বহীন দেশনেতাদের পরিকল্পিত কর্ম্মপদ্ধতি অনুসৃত হইলে কংগ্রেস দেশ ও দেশবাসীর কোন উপকারে লাগিবে না। যে কর্ম্মপদ্ধতিতে দেশের সত্যকার কাজ হইবে, আমরা তাহা আলোচনা না করিয়া এই সমালোচনা করিলে আমাদের দোষ ছিল। কিন্তু সত্যকার কর্ম্মপদ্ধতি সম্পর্কে আমরা গত কয়েক সংখ্যায় "ভারতবর্ষের বর্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়"-শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা করিতেছি। আমাদের নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধিমত সেই কর্ম্মপদ্ধতিতে আমরা কোন ত্রুটি দেখিতে পাই নাই। নিরপেক্ষ পাঠককে আমরা ঐ কর্ম্মপদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

আমাদের বিশ্বাস, এখনও যদি আমরা বাজে কথায় আলোচনা না করিয়া সত্যকার কাজ আরম্ভ করি, তবে, আমাদের জীবনকালেই দেশের সুখসমৃদ্ধি পুনরায় ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু বর্তমান দেশনেতাগণের কার্য্যকলাপ আরও কিছুদিন চলিলে দেশ যে অবনতির কোন্ পাতালগর্ভে নিমজ্জিত হইবে, তাহা আমরা ভাবিতেও ভয় পাই।

আর কত দিন দেশের বুকে বসিয়া এই শূন্যগর্ভ দম্ভের আস্ফালন দেশবাসী নীরবে সহ্য করিবে? দেশপ্রেমিক মাত্রেরই ইহা চিন্তা করিবার বিষয়।

দেশের ভাগ্য লইয়া এই নিদারুণ পরিহাস কি উপেক্ষা করা চলে?

বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও আনন্দবাজার পত্রিকা

নিখিল বঙ্গ বিপ্লবী-বিরোধী সভা হইতে বাঙ্গালার বেকার-সমস্যা সমাধানকল্পে কয়েকটী প্রস্তাব সরকারের নিকট প্রেরিত হয়। ইউরোপীয় বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান সমূহ বাঙ্গালী যুবকদিগকে অধিক সংখ্যায় কর্ম্মে নিয়োগ করিলে বেকার-সমস্যার সমাধান-সহায়তা হয়, ইহাই এই প্রস্তাবের বক্তব্য ছিল। সরকার বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সকে এই সকল প্রস্তাব প্রেরণ করেন। বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স তদুত্তরে যাহা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কথা এই :—

(১) বাঙ্গালীর ছেলে বাড়ী কিংবা বিদ্যালয়ে কোথাও, ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতে হইলে যে-সকল গুণ অত্যাবশ্যক, তাহার শিক্ষা পায় না; সুতরাং সুযোগ-সুবিধা নাই বলিয়াই যে বাঙ্গালী ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে পারিতেছে না, তাহা বলা চলে না;

(২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কমার্স' বিভাগের ছাত্র-বৃন্দ যাহাতে যথার্থ শিক্ষা পায়, এই চেম্বারের সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাহা করা হইতেছে; বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কাজকে ভাল বলিতেই হইবে;

(৩) কিন্তু চেম্বারের মতে ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে হইলে চরিত্রের যে দৃঢ়তা, কার্য্য-প্রবৃত্তি এবং আত্মপ্রত্যয় প্রয়োজন, পরীক্ষায় পাশের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই;

(৪) কলিকাতা ইউনিভারসিটি কমিশন ১৯১৯ সনে বাঙ্গালীর কেরাণীগিরির ঝোঁকের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন; আজও সে-অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় নাই;

(৫) কোনও সুফলের আশা করিলে এ দেশের সমাজ-ব্যবস্থার এবং লোকের নজর বদলানোর প্রয়োজন।

বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের এই উত্তর যথোপযুক্ত হয় নাই কি? আশা করি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ চেম্বারের এই উত্তরের মধ্যে খুসী হইবার যথেষ্ট কারণ পাইবেন। বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স যে তাঁহাদের ব্যবসায়-শিক্ষার বন্দোবস্তের তারিফ করিয়াছেন, ইহা কর্ত্তৃপক্ষের নিশ্চয়ই মুখরোচক হইবে?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাগ্য ভাল যে, তাঁহাদের সকল কাজের প্রারম্ভেই তাঁহারা 'তারিফ' ও 'বাহবা' লাভ করেন। কিন্তু সেই কাজ একটু অগ্রসর হইলেই, সকলেই আবার সেই কাজের বিরুদ্ধ সমালোচনা আরম্ভ করেন কেন? কেন এইরূপ হয়, ইহা কি শুধুই বিশ্ববিদ্যালয়ের শত্রুপক্ষের দুরভিসন্ধিমূলক ষড়যন্ত্র, না, ইহার পিছনে আর কিছু কারণ আছে—বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষকে আমরা এই কথা চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এ পর্য্যন্ত আইন, চিকিৎসা, ফলিত বিজ্ঞান, চীনা ও তিব্বতী ভাষাশিক্ষা ইত্যাদি যত প্রকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সকল প্রকার ব্যবস্থারই প্রথমে প্রশংসা ও পরে কিছু দিন যাইতে না যাইতেই নিন্দালাভ ঘটিয়াছে—কর্ত্তৃপক্ষ কি ইহা অস্বীকার করিবেন? যদি না করেন, তবে তাঁহাদিগকে আমরা অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন ব্যবসায়-বাণিজ্যশিক্ষার এই প্রকার 'বুজরুকী'র মধ্যে যাইবার পূর্ব্বে একবার চারিদিকের অবস্থা ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করেন। চারিদিকে (কেবল এই দেশে নয়, পৃথিবীর সর্ব্বত্র) হাহাকার উঠিয়াছে; যে-দেশে ব্যবসায়-শিক্ষার প্রকৃষ্ট নমুনা পাওয়া যায় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস, তাহাদের দেশেও এই একই অবস্থা। কোন্ দেশে এমন কোন্ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান আছে, যেখানে এখন নিযুক্ত লোকের সংখ্যা হ্রাস করা হইতেছে না?

এই অবস্থায় নূতন করিয়া ব্যবসায়-শিক্ষার অভিনয় করা কি বুদ্ধিমানের কার্য্য?

আমরা এ পর্য্যন্ত শিক্ষা সম্বন্ধে * যে সকল বিভিন্ন আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে বুঝা যাইবে যে, শিক্ষা প্রকৃত

---

* অনুসন্ধিৎসু পাঠককে আমরা "বঙ্গশ্রী"র সম্পাদকীয় বিভাগে প্রকাশিত নিম্নলিখিত প্রবন্ধসমূহ পাঠ করিতে অনুরোধ করি :—

১৩৪১ সনের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত 'শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষণীয় বিষয় এবং শিক্ষার ক্রম', 'শিক্ষণীয় বিষয়নির্ব্বাচনের ও শিক্ষাপদ্ধতির বিচারবিধি', 'ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শিক্ষার অবস্থা', 'ভারতের শিক্ষার ক্রমিক অবনতির

হইলে, যে-কোন শিক্ষিত ব্যক্তি যে-কোন কার্য্যে সফল হইতে পারেন। এবং যদি দেশে সেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, তবেই আমাদের বর্ত্তমান সর্ব্বপ্রকার সমস্যার সমাধান হইতে পারে, তৎপূর্ব্বে নয়। বর্ত্তমানে দেশে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহার সর্ব্বস্থানে ছিদ্র; জোড়াতালি দিয়া সে ব্যবস্থার সংস্কার-সাধন সম্ভব নহে। কি প্রকারে এই সংস্কার সম্ভব, আমরা "বঙ্গশ্রী"র পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় তাহার আলোচনা করিয়াছি।

'আনন্দবাজার পত্রিকা' দেখিতেছি, বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের এই উক্তিতে রাগিয়া-মাগিয়া খুন হইয়াছেন; তাঁহাদের মতে চেম্বারের পত্রে যে বাঙ্গালী চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে, তাহার জন্ম দায়ী বাঙ্গালীর পরাধীনতা। ২৭শে বৈশাখ তারিখের সম্পাদকীয় স্তম্ভে তাঁহারা লিখিতেছেন— "শ্বেতাঙ্গ বণিক সমিতি বাঙ্গালী চরিত্র লইয়া শ্লেষ-বিদ্রূপ করিয়াছেন। দৃঢ় সঙ্কল্প, আত্মনির্ভরতা প্রভৃতি গুণ বাঙ্গালী চরিত্রে যদি যথেষ্ট পরিমাণে না থাকে, তবে সে জন্ম তাহার পরাধীনতাই কি প্রধানতঃ দায়ী নহে? পৌণে দুই শত বৎসর ইংরাজের শাসনে থাকিয়া বাঙ্গালী চরিত্রে যদি এই সব দৌর্ব্বল্য আসিয়া থাকে, তবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু আছে কি? আমরা নিশ্চিত রূপে বলিতে পারি, বাঙ্গালা যদি পরাধীনতার গ্লানি হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন ভাবে চিন্তা ও কার্য্য করিবার সুযোগ পায়, তবে তাহার চরিত্রে দৃঢ় সঙ্কল্প, আত্মনির্ভরতা প্রভৃতি গুণও আসিবে।"

এই সকল কথা কি নিতান্ত সস্তায় দেশপ্রেমিক হইবার কথা নহে? এমন করিয়া পরের স্কন্ধে দোষ চাপাইয়া নিজে-দের দোষ আমরা কি ঢাকিয়া রাখিতে পারিব? বৃটিশ শাসনের অব্যবহিত পূর্ব্বে দেশের যে-অবস্থা ছিল, আনন্দ-বাজার পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী কি সেই অবস্থাকে ভাল বলিবেন? তথাকথিত স্বাধীন দেশবাসীর চরিত্রে বর্ত্তমানে যে-সকল ভাব পরিস্ফুট দেখিতে পাই, আনন্দবাজার পত্রিকা কি সেই সকল ভাব দেশবাসীর চরিত্রে দেখিতে পাইলে খুসী হইবেন? আমাদের চরিত্রে ইংরাজজাতিসুলভ কতকগুলি গুণ নাই বলিলে আমরা যে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠি, ইহাকেই কি আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় মণ্ডলী "পরাধীনতার গ্লানি হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন ভাবে চিন্তা ও কার্য্য" বলিবেন?

কি জন্য আমাদের অবনতি ঘটিয়াছে এবং বর্ত্তমানে আমরা যাঁহাদিগকে উন্নত বলিতেছি, সেই উন্নতির প্রকৃত স্বরূপ কি, সত্যকার উন্নতি কাহাকে বলে এবং কি করিয়া আমরা সেই উন্নতি সাধন করিতে পারি, এই সকল বিষয় লইয়া আমরা "বঙ্গশ্রী"র প্রতি সংখ্যাতেই আলোচনা করিতেছি।

আমাদের মতে যে-জাতীয় উন্নতির জন্য "এ দেশের সমাজ-ব্যবস্থার এবং লোকের নজর বদলানোর প্রয়োজন", সেই জাতীয় উন্নতিকে আমরা যত পরিহার করিয়া চলি, ততই মঙ্গল।

দেশবাসীকে এই কথা বুঝানো ব্যতীত সংবাদপত্রসেবীর বর্ত্তমানে আর বড় কর্ত্তব্য নাই। সিনেমা ও ইংরাজী বইয়ের সাহায্যে যে-জাতীয় শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি-সভ্যতা, উন্নতিতে দেশবাসীকে অভ্যস্ত করিবার চেষ্টা হইতেছে, সেই জাতীয় শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি, সভ্যতা ও উন্নতির সর্ব্বনাশা মোহ হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করা সংবাদপত্রের এখন একমাত্র কর্ত্তব্য হওয়া উচিত।

দেশের সংবাদপত্র মাত্রকেই আমরা এই বিষয়ে অবহিত হইতে বলি।

দায়িত্ব ও কারণ', 'শিক্ষাব্যবস্থার মূল সূত্র, প্রয়োজন ও উপায়'; ঐ সনের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত 'শিক্ষাবিভাগের পরিচালনা ও বেতনভোগী ভাইস্-চ্যান্সেলার'; ১৩৪২ সনের ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত 'বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগের নূতন পরিকল্পনা', ঐ সনের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত 'বঙ্গীয় শিক্ষা-পরিকল্পনা, বাঙ্গালী জনসাধারণের দাবী এবং ইংরেজের কর্ত্তব্য', 'জন-সাধারণের শিক্ষা সম্বন্ধীয় যাচ্ঞা এবং তাঁহাদের কার্য্যবিধি', 'শিক্ষা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য এবং তৎসম্বন্ধীয় কার্য্যসূত্র', 'শিক্ষা-পরিকল্পনা সম্বন্ধে এডুকেশন লীগের ও দেশীয় সংবাদপত্র গুলির সমালোচনা'; ১৩৪২ সনের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত 'শিক্ষার প্রকার ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্চ্যান্সেলার', 'শিক্ষা সম্বন্ধে বর্ত্তমান আন্দোলন ও কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস্চ্যান্সেলার' এবং ১৩৪২ সনের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্ত্তন-উৎসবে ভাইস্চ্যান্সেলার শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা।'

সংবাদ ও মন্তব্য

সরকারের কৃষিবিজ্ঞান ও কাণ্ডজ্ঞান

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এক সংবাদে জানাইয়াছেন যে, বর্ত্তমান বৎসর হইতে বাঙ্গালার ইউনিয়ন-বোর্ডসমূহের অধীনে ৪৫০টি জোতে সরকারের তত্ত্বাবধানে কৃষিকার্য্য সুরু হইয়াছে। ভারত সরকারের পল্লীউন্নয়নকল্পে প্রদত্ত সাহায্য পাইয়া এই সকল ইউনিয়ন-বোর্ড এই কাজ আরম্ভ করিয়াছে। প্রায় ২৫ বিঘা জমী লইয়া এক একটী জোত গঠিত হইয়াছে। ৭৫ জন কৃষিবিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারী এই সকল অঞ্চলে কার্য্য করিবেন। এক এক জন কর্ম্মচারীর অধীনে নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী জোতের কার্য্য পরিচালিত হইবে। ইহা ছাড়া সরকারের পক্ষ হইতে জিলাসমূহে কৃষির উন্নতি-বিধায়ক অপরাপর কার্য্যও সূচিত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট বীজের জন্যও চেষ্টা চলিতেছে।

সরকার যে দেশের মধ্যে কৃষির উন্নতির জন্য সত্যই সচেষ্ট, সরকারের একাধিক কার্য্যে আমরা ইহার প্রমাণ পাইয়াছি ও পাইতেছি। এতদিন ধরিয়া সরকার যে সব চেষ্টা করিতেছেন, তাহার মোট হিসাব করিলে যে অর্থব্যয় হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহার সঙ্গে তুলনায় কত কম পরিমাণে দেশে কৃষির উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে—তাহা সরকার দেখিয়াছেন কি? এবং এই উন্নতি যে কেন হইতেছে না, সে প্রশ্ন কি সরকারের মনে উদিত হয় নাই? সংসাধিত উন্নতির মূল্য অপেক্ষা সেই উন্নতিবিধানের যে ব্যয়, তাহার তুলনা কি ভয়াবহ নহে? সরকারের অনুসৃত কৃষিবিজ্ঞানকে এই ত্রুটির জন্য কি দায়ী করিতে হইবে না? আমাদিগকে কি মনে করিতে হইবে যে, কংগ্রেসের মতই সরকারেরও কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান লোপ পাইয়াছে?

নূতন বড়লাট ও পুরাতন কৃষি-ব্যবস্থা

গত ২২শে এপ্রিল ভারতের নূতন বড়লাট নিউদিল্লীতে বলিয়াছেন:—'কৃষির উন্নতিসাধন বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া নহে, কৃষির উন্নতিসাধন আমার উদ্দেশ্য।

গত ২৭শে এপ্রিল নূতন বড়লাট ও বাঙ্গালার লাটের মধ্যে টেলিগ্রামের আদান-প্রদান হইয়াছে। বড়লাট জানান:—৭ বৎসর পূর্ব্বে রয়াল কৃষি কমিশন কর্ত্তৃক যে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল, (বাঙ্গালায়) তদনুযায়ী একটী কেন্দ্রীয় পাট সমিতি স্থাপিত হইতেছে জানিয়া আমি আনন্দিত হইলাম। আমার বিশ্বাস, এই কমিটি হইতে শীঘ্রই পাট সম্বন্ধে দুইটী বিষয়ে গবেষণা করা হইবে (১) পাটকে নূতন নূতন কাজে লাগাইবার চেষ্টা (২) পাটের বর্ত্তমান চাষ-ব্যবস্থার ও পাট প্রস্তুত করিবার পন্থার উন্নতিসাধন।

আমরা বড়লাটের এই সকল সাধু ইচ্ছা ও কার্য্যের নিঃসঙ্কোচে প্রশংসা করিতে পারিতাম, যদি জানিতাম যে, এই সকল কাজে কৃষির কোন প্রকার উন্নতির সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, যতদিন না আমরা ভারতের জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি পুনরায় ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা আরম্ভ করিব, ততদিন কৃষির উন্নতিও সাধিত হইবে না, দেশবাসীরও দুঃখ ঘুচিবে না। বড়লাট মহোদয়কে আমরা সেই চেষ্টা করিতে অনুরোধ জানাই। বিলাতী পন্থায় এদেশের কৃষির উন্নতি করিবার চেষ্টা যে কত বিফল, তাহা তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীদের কার্য্যকলাপ হইতে বুঝিতে পারিবেন। এ প্রকার চেষ্টা তো তাঁহারাও করিয়াছিলেন।

সাবাস কংগ্রেস

গত ২৩শে এপ্রিল তারিখে ব্যবস্থা-পরিষদের কংগ্রেস দলের প্রধান শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তি এক বিবৃতি দিয়াছেন—

"পরিষদে এবার কংগ্রেস তেইশটীর মধ্যে উনিশটি বিষয়ে জয়লাভ করিয়াছে।"

সাবাস! এমন যুদ্ধজয়ের কাহিনী মারাথন কি থার্ম্মো-পলির পর আমরা আর শুনি নাই। এতগুলি যুদ্ধজয়ের পর নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ হইতে দুঃখ-দুর্দ্দশার শেষ চিহ্নটী পর্য্যন্ত অদৃশ্য হইবে?

দেশ ও দেশবাসী লইয়া এমন প্রহসনের কোন অভিনয় ইতিহাসে আর পাওয়া যাইবে কি?

নিরক্ষরতা ও শিক্ষা

গত ৯ই এপ্রিল তারিখে উত্তরপাড়া কলেজের এক সভায় ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন:—

"চীন দেশে যেরূপ কলেজের গ্রাজুয়েটরা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, আমাদের দেশেও সেইরূপ হওয়া উচিত।"

আমরা মুখুজ্যে মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, যদি দেশের প্রতিটী লোক 'ডক্টরেট' লাভ করে, তাহা হইলে কি দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশা বাড়িবে না কমিবে? তিনি ও তাঁহার সগোষ্ঠীরা কি আমাদের জনসাধারণের রাম, শ্যাম, যদু, কছিমুদ্দি, হরিয়া অপেক্ষা সুখী? আমরা জানি, তাঁহারা বলিবেন যে, তাঁহাদের যে অসন্তুষ্টি, উহাকে সাহেবরা 'divine discontent' আখ্যা দিয়াছে।

কিন্তু তাহাতেই কি সকল কথা চাপা পড়িয়া যায়? নিরক্ষর ভারতবাসী যে অক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন ভারতবাসী অপেক্ষা আজও অধিক 'শিক্ষিত',এ কথা বলিলে কি মুখুজ্যে মহাশয়ের নিকট তাহা হেঁয়ালির মত লাগিবে?

ভাষার রাষ্ট্রত্ব

গত ২৪শে এপ্রিল নাগপুরে ভারতীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী ইহার সভাপতি ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী বক্তৃতা আরম্ভ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে জহরলাল সভায় আসিয়া উপস্থিত হন। মহাত্মা গান্ধী তখন আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ান এবং সমবেত দর্শককেও দাঁড়াইতে অনুরোধ করেন।

গান্ধীজী হিন্দীর পক্ষে রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী বিষয়ে বক্তৃতায় বলেন:—'হিন্দুস্থানী অতি অবশ্যই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবে।' তিনি ঐ বক্তৃতায় সাহিত্যে কামপ্রবৃত্তির অত্যধিক আলোচনা ও যে সাহিত্য-রচনায় দলাদলির সৃষ্টি হয়, তাহার বিপক্ষে ক্ষোভ জানাইয়া বলেন, "আমার ক্ষমতা থাকিলে এই সকল রচনা বন্ধ করিতাম।"

রাষ্ট্রভাষা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য এই চেষ্টা যে কত নিরর্থক, তাহা আমরা গত ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত "রাষ্ট্রভাষা ও শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, ডি-লিট" শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিব না। বিশেষতঃ, এই অধিবেশনের কার্য্যাবলীকে আমরা গম্ভীর ভাবে (seriously) গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। গান্ধীজী তাঁহার বক্তৃতায় কোন যুক্তি দেখাইবার প্রয়োজন মনে করেন নাই। জওহরলালকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তিনি হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা কি কেবলই হাস্যরস, না ইহার মধ্যে করুণ রসেরও পরিচয় আছে? দলাদলির সাহিত্য-রচনা অপেক্ষা দলাদলির রচনা কি অধিকতর অনিষ্টজনক নহে—ইহাও আমরা মহাত্মা গান্ধীকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

দুর্ভিক্ষ ও দুর্ভিক্ষের 'কোড'

দেশে প্রকৃত দুর্ভিক্ষ হইয়াছে কি না, ইহা বিচার করিবার জন্য বাঙ্গালা দেশের সরকার যে সকল কেন্দ্র খুলিয়াছেন, সেই সকল কেন্দ্রে প্রায় এক লক্ষ লোক কাজ করিতেছে, এই সংবাদ এসোসিয়েটেড প্রেস মারফৎ জানা গিয়াছে।

সরকারের হিসাব মত যতদিন পর্য্যন্ত না কোন অঞ্চলের শতকরা পঞ্চাশ জন লোক অন্ততঃ পর পর দুই মাস সরকারের দেওয়া সাহায্যে জীবন অতিবাহিত করিবে, ততদিন সে অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হয় নাই, ধরিতে হইবে। সরকারী হিসাবে এই অবস্থার আবার তিন প্রকার স্তরবিভাগ আছে। প্রথম, অন্নকষ্ট হইয়াছে কি না, তাহার সংবাদ সংগ্রহ; দ্বিতীয়, অন্নকষ্ট; তৃতীয়, দুর্ভিক্ষ।

ইহা ছাড়া এই সংক্রান্ত আরও জ্ঞাতব্য তথ্য 'Famine Code'এ লিখিত আছে। মুস্কিল এই যে, যখন 'কোড' লিখিত হয়, তখন দুর্ভিক্ষগ্রস্ত লোকের অবস্থা বাস্তবক্ষেত্রে দেখিয়া 'কোড' নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখন, যখন 'কোড' নির্ম্মিত হইয়া গিয়াছে, তখন 'কোড' অনুযায়ী দুর্ভিক্ষকে নিয়ন্ত্রিত হইতে হইবে, নহিলে তাহাকে দুর্ভিক্ষ বলিয়া স্বীকার করা হইবে না। যে বিষয় একবার আমাদের ছাপা হরফে স্থান পাইয়া গিয়াছে, সে বিষয় লইয়া এমন মুস্কিল বাধাই স্বাভাবিক। আমরা প্রশ্ন করি, 'Prevention is better than cure', এই সত্যটী যে সরকার হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদের কার্য্যে কবে উপলব্ধি করা যাইবে?

রবিবাবুর গান ও দুঃখ-দুর্দ্দশা

গত ৩০শে এপ্রিল তারিখে শ্রীনিকেতনে ১০ খানা নূতন তাঁত বসাইবার উপলক্ষে এক সভা হয়। এই সভায় কবি রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনের কর্ম্মীবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া বক্তৃতায় বলেন:—

"সঙ্গীত একদিন তাহাদের আনন্দের উৎস ছিল, আপনারা কি তাহা পুনরায় তাহাদের প্রিয় করিয়া তুলিতে পারেন না? তাহা হইলে গ্রামবাসী দরিদ্রজনগণ আপনাদের নির্দ্দিষ্ট পথ অনুসরণ করিয়া তাহাদের ভাগ্যোন্নতি করিবার জন্য জীবনসংগ্রামে সকল প্রকার দুঃখ জয় করিতে পারিবে।"

আমরা জানিতাম, পেটের ভাত জুটিলে এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার দুঃখ ঘুচিলে, লোকে তবে আনন্দের গান গাহিতে পারে; এখন দেখিতেছি, কবির মত এই যে, আনন্দের গান গাহিলে তবেই জীবনসংগ্রামে দুঃখকে জয় করা যায়।

আমাদের কিন্তু একটু ধোঁকা লাগিতেছে, রবীন্দ্রনাথের গানের বন্যায় তো আজ বাঙ্গালা দেশ হাবুডুবু খাইতেছে, কিন্তু এদেশের দুঃখ ঘুচিল কই? রবীন্দ্রনাথের এই সকল গানের উৎস স্বরূপ যে "বিশ্বভারতী", তাহারই দুঃখ ঘুচিয়াছে কি?

স্যর রাধাকৃষ্ণণের বাণী

গত ২৭শে এপ্রিল তারিখে মাদ্রাজে এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে স্যর রাধাকৃষ্ণণ বলিয়াছেন:—

"আমাদের দেশের ন্যায় পৃথিবীর অন্য কোন দেশেই ধনবৈষম্য এত অধিক তীব্র নহে। একদিকে মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যবানের হস্তে ঐশ্বর্য্যের বিস্ময়কর সমাবেশ, অপর দিকে দেশব্যাপী ক্ষুধার আর্ত্তনাদ; ইহা একমাত্র এ দেশেই দেখা যায়।"

স্যর রাধাকৃষ্ণণের কথা হইতে বুঝিতে হয় যে, ইয়োরোপে এবং মার্কিন দেশে বুভুক্ষুর আর্ত্তনাদ নাই এবং ধনিক ও দরিদ্র সম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য নাই।

এই সমস্ত দেশে যদি বুভুক্ষুর আর্ত্তনাদই না থাকিত, তাহা হইলে এত 'ডোল' দিবার ঘটা শুনা যায় কেন? ধনিক ও দরিদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য না থাকিত, তাহা হইলে Socialist Labur Party প্রভৃতির উদ্ভব হয় কেন?

দেখা যাইতেছে, স্যর রাধাকৃষ্ণন কেবল 'ধর্ম্মবিজ্ঞান' নহে, 'ধনবিজ্ঞানে'ও সুপণ্ডিত! তাঁহার 'ধর্ম্ম-বিজ্ঞান' সম্পর্কে জ্ঞানের পরিচয় আমরা "ভারতীয় ঋষিগণের ধর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধে দিতেছি; 'ধনবিজ্ঞান' সম্পর্কে তাঁহার উক্তির মূল্য যে কি, তাহাও প্রয়োজন হইলে আমরা প্রতিপন্ন করিব।

আমরা স্যার রাধাকৃষ্ণনকে আর একটু মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা করিয়া পড়াশুনা করিতে অনুরোধ করি।

এই জাতীয় পণ্ডিত যে ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্যের বিশেষজ্ঞ হিসাবে পাশ্চাত্ত্য জাতি কর্ত্তৃক সমাদৃত হন, ইহাতে ভারতবাসী মাত্রেরই লজ্জিত হইবার কথা; কারণ এত অল্পজ্ঞান-সম্পন্ন লোকের আত্মসম্মান বজায় রাখা সম্ভব হইতে পারে না। ইনি ভারতীয় "ধর্ম্ম" সম্বন্ধে ইউরোপীয়গণকে যাহা শুনাইয়া আসিবেন, তাহাতে ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় উভয়েরই অনিষ্ট সাধিত হইবে, কারণ ভারতীয় "ধর্ম্ম" সম্পর্কে কোন প্রকৃত ধারণা ইহাঁর নাই। ফলে ইহাঁর হস্তে একদিকে যেমন ভারতীয় ঋষিগণের অপমান সাধিত হইবে, অন্য দিকে তেমনই ইয়োরোপীয়গণ ভারতীয় "ধর্ম্ম" সম্বন্ধে কতকগুলি ভুল ধারণা অর্জ্জন করিবেন।

দেখা যাইতেছে যে, বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহাঁর নিয়োগ লইয়া ভারতবর্ষের প্রত্যেক পত্রিকায় আনন্দের তরঙ্গ উঠিয়াছে। ইংরাজী বুলি ব্যতীত যাঁহাদের আর কোনও সম্বল নাই এবং ইউরোপীয় লিখিত পুস্তকাদির মালমশলা সংগ্রহ করিয়া [illegible] শাস্ত্র [illegible] যে সুপণ্ডিতের দল দেশ ছা[illegible] সেই শ্রেণীর পণ্ডিতকে জনসাধারণ কবে চিনিতে পারিবেন?

এই শ্রেণীর পণ্ডিতকে আমরা সতর্ক হইতে বলি।

ডক্টর সুনীতিকুমার ও বাঙ্গালা ভাষা

"বঙ্গশ্রী"র পাঠকসমাজে সুপরিচিত ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, ডি লিট মহাশয়ের সম্প্রতিকার দুইটী উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

(১) ভারতবাসীরা সহজে রোমান অক্ষর গ্রহণ করিতে চাহিবে না; সুতরাং আমি সমস্ত ভারতবাসীর জন্য দেবনাগরী বর্ণমালা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত এবং ঐ বর্ণমালা সংশোধনের পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিয়া আনন্দিত।

(২) অনেকের ধারণা (ভারতে) হিন্দুস্থানী ভাষীর সংখ্যাই বেশী। এই ধারণা অমূলক। যাহারা হিন্দী জানে, তাহাদের সংখ্যা ধরিলে ভারতে হিন্দীর স্থানই প্রথম। কিন্তু হিন্দী ঘরে ব্যবহার করে অনেক কম লোকে।

আমরা ডক্টর চাটুয্যে মহাশয়ের এই উক্তির জন্য তাঁহাকে সানন্দ ধন্যবাদ জানাইতেছি। সত্যকার পাণ্ডিত্যের লক্ষণ, নিজের দোষ কেহ দেখাইয়া দিলে, সে সম্বন্ধে সচেতন হওয়া এবং যথাসম্ভব সেই দোষ সংশোধনা করা। কিন্তু, "বর্ণমালার সংস্কার করিতে হইলে উহার ক্রমবিবর্ত্তন, সরলতা এবং সৌন্দর্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া করিতে হইবে"—ইহাই যদি ডক্টর চাটুয্যের মত হয়, তবে আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, 'সৌন্দর্য্য' বিচার করিবার মাপকাঠি কি? উল্কী পরা, নথ ও নোলক পরার মধ্যে কেহ সৌন্দর্য্য দেখেন, কেহ বব-করা কেশদাম দেখিয়া মুগ্ধ হন। সুতরাং সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিচার করার মূল্য কি? 'সরলতা' সম্পর্কেও কি ঐ একই কথা বলা যায় না? এবং 'ক্রমবিবর্ত্তনে'র প্রকৃত ইতিহাস কি অদ্যাবধি জানা গিয়াছে?

ডক্টর চাটুয্যেকে গত ১৩৪২ সনের কার্ত্তিক সংখ্যা "বঙ্গশ্রী"তে প্রকাশিত "সংস্কৃত ও বাঙ্গলা অক্ষর এবং ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়" ও ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত "রাষ্ট্রভাষা ও শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, ডি-লিট" শীর্ষে প্রবন্ধ সম্পর্কে অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

শোক-সংবাদ

পরলোকগত ডাঃ আন্‌সারি

গত ১০ই মে বিশিষ্ট চিকিৎসক ও নেতা ডাঃ এম. এ. আন্‌সারি মুসৌরী হইতে দিল্লী ফিরিবার পথে ট্রেনের মধ্যে মারা গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৫৬ হইয়াছিল।

১৮৮০ সনে গাজীপুরে তাঁহার জন্ম। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে বি-এ পাশ করিয়া গিয়া তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯০৫ সালে চিকিৎসা শাস্ত্রের উপাধি লাভ করেন। অতঃপর ১০ বৎসর ইউরোপে বাস করিয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৯১২-১৩ খৃষ্টাব্দে বল্কান যুদ্ধের সময় তিনি তুরস্ক গিয়াছিলেন। ১৯১৭-১৮ সনে ভারতে হোমরুল আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯২০

সালে মুস্লিম লীগের সভাপতি ও ১৯২২ সালে গয়ায় খিলাফৎ সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। ১৯২৭ সালে মাদ্রাজ কংগ্রেসের এবং ১৯২৮ সালে কলিকাতায় সর্ব্বদল সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে তাঁহার কারাদণ্ড হয়। ১৯৩৩ সালে তাঁহার উদ্যোগে পার্লামেণ্টারি বোর্ড গঠিত হয়। ১৯৩৫ সালের এপ্রিল মাসে তিনি রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

ডাঃ আন্‌সারির কার্য্যকাল যদিও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, তাঁহার জীবনের গঠনকাল ঊনবিংশ শতাব্দীতে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে দেশের যে অবস্থা ছিল, আজ সে অবস্থা নাই। ইংরাজী শিক্ষার প্রথম যুগে ভারতবর্ষের যে ইতিবৃত্ত পাই, তাহা ইংরাজী শিক্ষা সূত্রপাতের পূর্ব্বের যুগ অপেক্ষা অনেকাংশে ভাল। সেই যুগের শেষ ফল হিসাবে আজও আমরা এখানে ওখানে যে ৭০।৮০ বৎসরের ভারতীয় দেখি, তাঁহারা বর্ত্তমান যুগের ভারতীয় অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। ডাঃ আন্‌সারিকে আমরা সেই যুগের লোক বলিব। তাঁহার জীবনে যে সকল কার্য্যের পরিচয় পাই, তাহাতে তাঁহার কার্য্যশক্তি সম্যক্ পরিস্ফুট।

মাত্র ৫৬ বৎসর বয়সে যখন ইঁহাদের ন্যায় কর্ম্মবীরের মৃত্যু হয়, তখন দেশের সত্যকার দুঃখ-দুর্দ্দশার রূপ আমাদের চোখের সম্মুখে আরও বেশী ফুটিয়া উঠে। ইঁহার মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হইল, তাহার পূরণ সহজে হইবে না।

পরলোকগত স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গত ১লা জ্যৈষ্ঠ রাত্রিতে স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৮২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

২৪ পরগণার ভাবলা নামক স্থানে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে মধ্যবিত্ত ঘরে তাঁহার জন্ম। মাত্র ৭ বৎসর বয়সে পিতাকে হারাইয়া আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের সাহায্যে তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষা করিতে হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া তিনি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে প্রবিষ্ট হন। সেখান হইতে তিনি উপাধি না লইয়াই বাহির হন।

প্রথমে ঠিকাদারী কার্য্যে সাফল্য অর্জ্জন করিয়া তিনি স্বীয় সামর্থ্য দেখাইয়া মার্টিন কোম্পানীর সহিত সংশ্লিষ্ট হন।

অতঃপর তাঁহার জীবনের পরিচয় সকল বাঙ্গালীরই সুপরিজ্ঞাত।

১৯০১ সালে স্যর রাজেন্দ্রনাথ প্রথমবার বিলাত গমন করেন। ১৯১১ সালে কলিকাতার শেরিফ হন। ১৯১২ সালে দিল্লীর করোনেশন দরবারে তাঁহাকে সরকার হইতে কে. সি. আই. ই উপাধি দেওয়া হয়। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয় বার বিলাত গমন করেন। ১৯১৮-১৯ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কমিশন ও ১৯২০-২১ সনে রেলওয়ে কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে হাওড়া ব্রিজ-কমিটির প্রেসিডেণ্ট; ১৯১৬ সালে ভারতীয় কয়লা তদন্ত কমিটি ও ভারতীয় কারেন্সি কমিশনের সদস্য হইয়াছিলেন। তিনি মিউজিয়ম ট্রাষ্টি বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন এণ্ড হাইজীনের পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কলিকাতা শাখার গভর্ণর ছিলেন।

১৯২২ সনে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন।

স্যর রাজেন্দ্রের মৃত্যুতে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি না করিয়া বলা যায়—'একটী দিক্‌পাল চলিয়া গেলেন।'

ব্যবসায়-বাণিজ্যে বাঙ্গালীর স্বাভাবিক মেধা নাই এবং সুযোগ-সুবিধার অভাবেই বাঙ্গালী ব্যবসায়-বাণিজ্যক্ষেত্রে উন্নতিলাভ করিতে পারে না—এই দুই প্রচলিত উক্তির প্রতিবাদ স্যর রাজেন্দ্রনাথ।

কি বিশেষ গুণের জন্য স্যর রাজেন্দ্রনাথ জীবনে উন্নতি লাভ করেন, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝার সময় আজ নহে, আমরা আজ কেবল এই ভাবিয়া বিস্মিত হইতেছি যে, যতগুলি গুণ তাঁহার ছিল, কদাচিৎ তাহার একটীরও তিনি অপব্যবহার করিয়াছেন। বর্ত্তমানে দেখি, আমাদের দেশে যাঁহারা একটু নাম করেন, তাঁহাদের আত্মজীবনী লিখিবার ঝোঁক চাপিয়া যায়; স্যর রাজেন্দ্রনাথ জীবনে যে স্থান অর্জ্জন করিয়াছিলেন, সে স্থানে বসিয়া তাঁহার পক্ষে আত্মজীবনী রচনা খুবই স্বাভাবিক হইত। কিন্তু এমনই তাঁহার ক্ষমতা যে, অতি সহজে তিনি এই মোহের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন।

এ জীবনে যাহা করা হয়, তাহা দিয়াই মানুষ সাধারণতঃ মানুষকে বিচার করিয়া থাকে, কিন্তু যাহা করা হয় নাই, মানুষের চরিত্রের অনেক অংশ তাহার মধ্যেও লুক্কায়িত থাকে।

স্যর রাজেন্দ্র কর্ম্মবীর ছিলেন, সুতরাং দেশের লোকের নিকট কর্ম্মই তাঁহার প্রকৃষ্ট পরিচয়। কর্ম্মী ব্যক্তিদের জীবনী আলোচনা করিলে দেখি,—একদিকে তাঁহারা যেমন কর্ম্মও করিয়াছেন, অপকর্ম্মও অন্য দিকে কম নহে। স্যর রাজেন্দ্র এই দোষ হইতে একেবারে মুক্ত ছিলেন।

স্বাভাবিক সংযম তাঁহার ব্যক্তিত্বকে জীবিতকালে চিরকাল অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল; মৃত্যুর পরেও তাঁহার সেই সংযমের জন্যই আমরা তাঁহাকে অধিকতর মহৎ বলিয়া স্মরণ করিতেছি।

শ্রীদীনেশচন্দ্র গুহ কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস লিমিটেড, ৯০নং লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
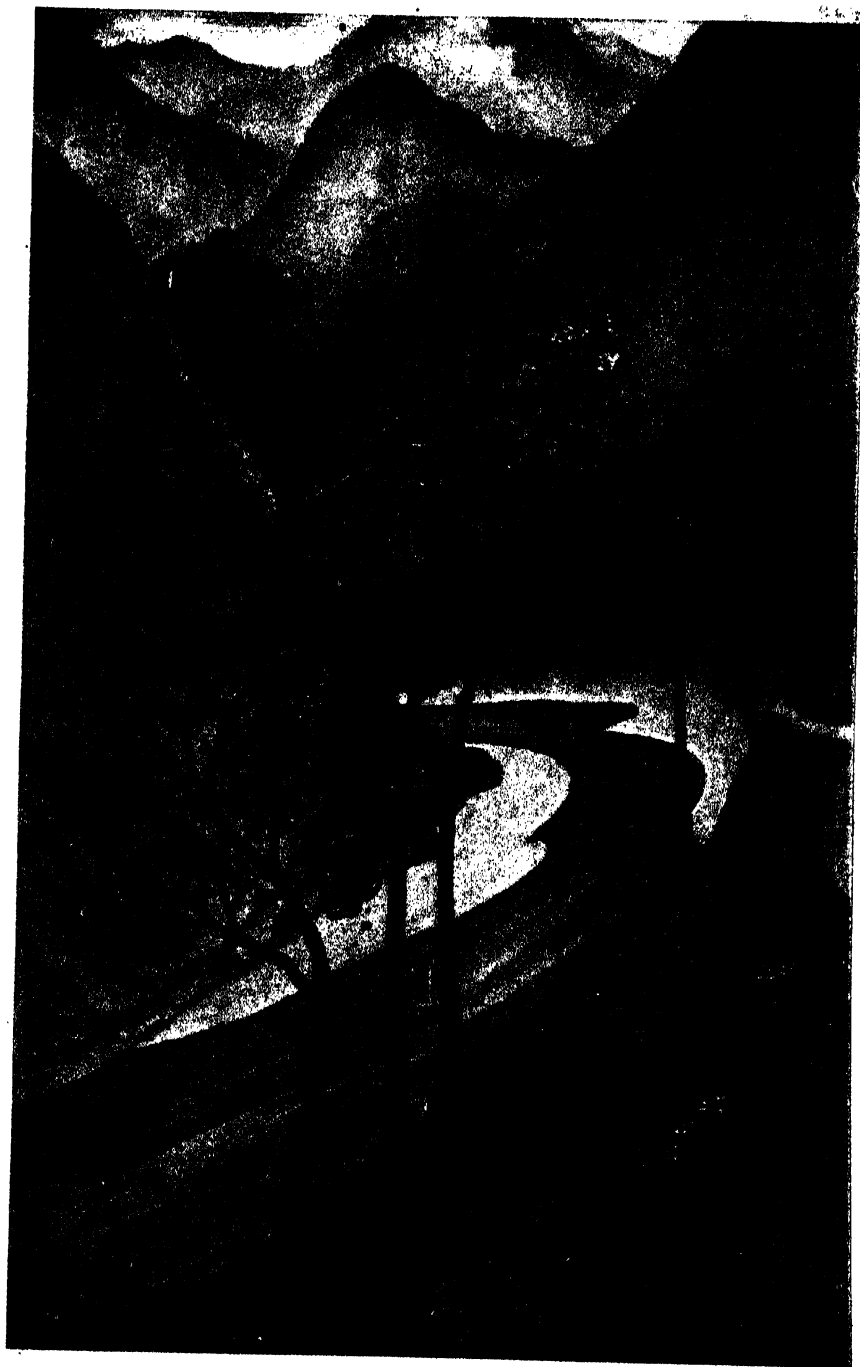
ব্যবস্থা করিতে হইবে, তখন হৃদয়ে কোন আশা পোষণ না করিয়া, নিজেকে লুক্কায়িত রাখিয়া কেবল মাত্র কর্ত্তব্যবোধে দেশের চিন্তায় ও কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়েন। ইহাই দেশ-প্রেমের তৃতীয় রূপ। ইহাকে প্রচলিত ভাষায় সাত্ত্বিক দেশ-প্রেম বলিতে হইবে।

যে একবার সাত্ত্বিক দেশপ্রেমের আস্বাদ পায়, তাহার হৃদয়ে অহরহঃ কর্ত্তব্যচিন্তা চলিতে থাকে এবং সে এক অনির্ব্বচনীয় জ্বালা অনুভব করিতে আরম্ভ করে। সে জ্বালায় যন্ত্রণা নাই, আত্ম-প্রচারের লিপ্সা নাই, তাহাতে অপরের লাভা-লাভের হিসাব আছে বটে, কিন্তু স্বকীয় লাভালাভের কোন হিসাব থাকে না। সে জ্বালায় সহবেদনার অনুভূতি আছে বটে, কিন্তু তাহাতে লোকপ্রিয়তার আকাঙ্ক্ষায় মনোরম কথার অভিব্যক্তি নাই। সাত্ত্বিক দেশপ্রেমিক সকলের বেদনার ভাব হৃদয়ে স্থান দিয়া সর্ব্বস্পর্শী হইতে চাহেন বটে, কিন্তু কেহ তাঁহার চিন্তা লইয়া ব্যাপৃত হইতেছেন বুঝিতে পারিলে মর্ম্মাহত হইয়া পড়েন। আত্ম-প্রচারকে তিনি আত্ম-হত্যা মনে করেন। তাঁহার লেখনী হইতে আত্মজীবনী (auto-biography) বাহির হইতে পারে না। পাঠকদিগের মধ্যে কেহ যদি বেদ ও পুরাণাদি গ্রন্থের রচয়িতা পরমারাধ্য ব্যাসদেবের চরিত্র উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে সাত্ত্বিক দেশপ্রেমিকের দৃষ্টান্তের সন্ধান পাইবেন।

পাশ্চাত্ত্য জগতের শিল্প ও বাণিজ্যের এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ইতিহাস যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা অনেক রাজসিক দেশপ্রেমিকের সন্ধান পাইবেন। বিংশ শতাব্দীর রাজসিক দেশপ্রেমিকগণের মধ্যে আত্ম-প্রচারের লিপ্সা জাগ্রত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে পাশ্চাত্ত্য দেশে যে সমস্ত রাজসিক দেশপ্রেমিক ছিলেন, তাঁহারা প্রায়শঃ আত্ম-প্রচারে সঙ্কোচ অনুভব করিতেন। যে যে বিরাট পুরুষ ইংলণ্ড, জার্ম্মানী ও মার্কিণ দেশের প্রকৃত উন্নতির বীজ বপন করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায়শঃ আত্মজীবনী (auto-biography) লিখিতে প্রবৃত্ত হন নাই এবং তাঁহারা যে, কোনরূপ আত্মপ্রশংসা প্রচার করিতে কুণ্ঠানুভব করিতেন, তাহার সাক্ষ্য আছে।

পাঠকদিগের চোখের সম্মুখে এবং মাথার মধ্যে যতগুলি দেশপ্রেমিকের কথা জাগ্রত আছে, তাঁহাদের অধিকাংশই তামসিক দেশপ্রেমিক। কাজেই তামসিক দেশ-প্রেমিকের দৃষ্টান্তের সন্ধান পাইতে তাঁহাদিগকে কোনরূপ ক্লেশভোগ করিতে হইবে না।

আমাদের মতে, আমাদের ভারতবর্ষে গত আট হাজার বৎসরের মধ্যে কেবল মাত্র দুইটি সাত্ত্বিক দেশপ্রেমিকের পরিচয় পাওয়া যায়। একজন বুদ্ধদেব এবং অপরজন চৈতন্যদেব। ইহা ছাড়া এই দেশে বহুদিন আর কোন সাত্ত্বিক দেশপ্রেমিকের উদ্ভব হয় নাই। এই আট হাজার বৎসরের মধ্যে বহির্জ্জগতেও কেবলমাত্র দুইজন সাত্ত্বিক দেশ-প্রেমিকের সন্ধান পাওয়া যাইবে—একজন খৃষ্টদেব এবং অপরজন নবী মহম্মদ। এই চারিজনের কেহই আত্ম-জীবনী (autobiography) লিখিয়া যান নাই। যিনি তাঁহাদিগের কথা যথাযথভাবে বুঝিতে পারিবেন, তিনি তাঁহাদের ঐ কথা হইতেই তাঁহাদিগের জীবনী যথাযথভাবে বুঝিয়া লইতে পারিবেন। তাঁহাদিগের শিষ্যগণ এখন আর প্রায়শঃ কেহ তাঁহাদের কথা যথাযথভাবে বুঝিতে পারেন না। তাই তাঁহাদের জীবনী সম্বন্ধে বিবিধ মতবাদ প্রচারিত হইতেছে।

এই আট হাজার বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশে অনেক রাজসিক দেশপ্রেমিক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এখনও অনেকে জীবিত আছেন। তাঁহাদের কার্য্যের ফলেই আমরা এখনও সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হই নাই, নতুবা আমাদের অস্তিত্বও দেখা যাইত না।

আমাদিগকে ধ্বংস করিতেছেন আত্মপ্রচারকামী ও আত্মজীবনী-(autobiography)-রচয়িতা তামসিক দেশ-প্রেমিকগণ। আমাদিগের যুবকবৃন্দকে ইঁহারাই প্রতারিত করিয়াছেন ও করিতেছেন। যুবকগণ কি এখনও সতর্কতা অবলম্বন করিবেন না?

উপরে যে চারিটি সমস্যার কথা বলা হইয়াছে, ঐ সমস্যাসমূহের কারণ তেরটি :—

(১) জমীর উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস;

(২) পণ্যদ্রব্যের মূল্যের সাদৃশ্যের অভাব (want of parity);

(৩) কৃষি প্রভৃতি জীবিকার্জ্জনের চারিটি পন্থাতেই

যাহাতে ন্যূনকল্পে গরীবানাভাবে পরিবার প্রতিপালিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থার অভাব ;

(৪) উপরোক্ত চারিটি পন্থাতেই যাহাতে শ্রমজীবিগণের পারিশ্রমিকের সাদৃশ্য থাকে, তাহার ব্যবস্থার অভাব ;

(৫) প্রকৃত বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে কি না, তাহার পরীক্ষা দ্বারা যাহাতে শ্রমজীবী (manual workers) ও বিভিন্ন পরিচালকগণের (officers and subordinate officers) পদগৌরবের তারতম্য স্থিরীকৃত হয়, তাহার ব্যবস্থার অভাব ;

(৬) বুদ্ধির উৎকর্ষের তারতম্যানুসারে যাহাতে মানুষের উপার্জ্জনের তারতম্য হয়, তদনুরূপ ব্যবস্থার অভাব ;

(৭) জীবিকার্জ্জনের চারিটি পন্থাতেই যাহাতে সর্ব্বোচ্চ (maximum) উপার্জ্জন একরূপ হয়, তাহার ব্যবস্থার অভাব ;

(৮) সম্পূর্ণ ও নির্ভুল শরীরগঠন-বিদ্যার (Anatomy) অভাব ;

(৯) সম্পূর্ণ ও নির্ভুল শরীরবিধান-বিদ্যার (Physiology) অভাব ;

(১০) সম্পূর্ণ ও নির্ভুল পদার্থবিদ্যার (Physics) অভাব ;

(১১) সম্পূর্ণ ও নির্ভুল রসায়নের (Chemistry) অভাব ;

(১২) জল ও বায়ু যাহাতে অস্বাস্থ্যকর না হয়, তদনুরূপ ব্যবস্থার অভাব ;

(১৩) শিক্ষাপদ্ধতি যেরূপ হইলে ছাত্রগণ স্ব স্ব বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিয়া স্বাবলম্বী হইতে পারেন, সেই শিক্ষাপদ্ধতির অভাব।

এই তেরটি কারণেই যে সমস্যা চারিটির উদ্ভব হইয়াছে, তাহা বঙ্গশ্রীর ১৩৪১ সনের কার্ত্তিক সংখ্যায় ৪৮৭-৪৯১ পৃষ্ঠায় প্রমাণিত হইয়াছে।

আমাদের এই সমস্যা চারিটির হাত এড়াইতে হইলে দেশের মধ্যে যাহাতে নিম্নলিখিত দ্বাবিংশতি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে :—

(১) জমীর স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া যাহাতে কোনরূপ সার ব্যবহার না করিলেও প্রতি বিঘা জমী হইতে অন্ততঃ ১২ মণ ধান অথবা গম অথবা তম্মূল্যের অপর কোন শস্যের উৎপাদন হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ;

(২) যে জমীর স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তি প্রতি বিঘায় ৪ মণ ধান অথবা গম অথবা তম্মূল্যেরও কম, সেই জমী যাহাতে কোন কৃষক চাষ না করেন এবং তাহার উৎপাদিকা-শক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তদনুরূপ ব্যবস্থা ;

(৩) নদীগুলি যাহাতে এত গভীর হয় যে, বর্ষাকালে বৃষ্টির পরিমাণ যতই বেশী হউক না কেন, তাহার দুই তীর প্লাবিত হইবার কোন সম্ভাবনা যাহাতে না থাকে, তাহার ব্যবস্থা ;

(৪) বিভিন্ন খাদ্যশস্য, শিল্পজাত ব্যবহার্য্য জিনিষ এবং গৃহনির্ম্মাণের উপকরণের বিভিন্ন মূল্যের মধ্যে যাহাতে সাদৃশ্য (parity) থাকে, তাহার ব্যবস্থা ;

(৫) সাংসারিক জীবিকানির্ব্বাহের খরচা ও পারিশ্রমিকের মধ্যে যাহাতে সাদৃশ্য (parity) থাকে, তাহার ব্যবস্থা ;

(৬) পরিশ্রমজাত দ্রব্যের মূল্যের তারতম্যানুসারে যাহাতে পারিশ্রমিকের তারতম্য স্থির করা হয়, তদনুরূপ ব্যবস্থা ;

(৭) যাহাতে ১৮ বৎসরের মধ্যে বালকগণের দশটি ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি কার্য্যক্ষম হয় এবং ঐ বয়সে যাহাতে তাহারা উপার্জ্জনক্ষম হয়, তদনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা ;

(৮) কোন্ খাদ্য, পানীয়, বায়ু, বাসস্থান এবং ব্যবহার্য্য বস্তু স্বাস্থ্যপ্রদ অথবা অস্বাস্থ্যপ্রদ, তাহা যাহাতে বালকগণ ১৮ বৎসরের মধ্যে পরিজ্ঞাত হইতে পারে এবং যাহাতে তাহাদের পরমায়ুবৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য থাকে, তদনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা ;

(৯) জীবিকার্জ্জনের জন্য দেশের মধ্যে কোথায় কত লোকের উপযোগী কি ব্যবস্থা আছে এবং ঐ ঐ

ব্যবস্থানুসারে কি কি শিক্ষা করিলে জীবিকার্জ্জন করা সম্ভব হয়, তাহা যাহাতে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক বালক জানিতে পারে, তদনুরূপ ব্যবস্থা ;

(১০) যাহা যাহা শিক্ষা করিলে জীবিকার্জ্জন করা সম্ভব হয়, তাহা যাহাতে প্রাপ্তবয়স্ক বালকগণ ইচ্ছানুরূপ শিক্ষা করিতে পারে, তদনুরূপ ব্যবস্থা ;

(১১) যে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক বালক উচ্চশিক্ষা অর্থাৎ, বিজ্ঞানশিক্ষাপ্রার্থী হইবে, তাহাদের হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় উচ্চশিক্ষার উপযোগী হইয়াছে কি না এবং মন ও বুদ্ধি ভবিষ্যতে তদনুরূপ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিবে কি না, তাহার পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং যাহাতে অনুত্তীর্ণ বালকগণ উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ লাভ না করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ;

(১২) কোন বস্তুবিষয়ক বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইলে ঐ বস্তুর কত রকম পরীক্ষা কিরূপ ভাবে করিতে হয় এবং নিজেকেই বা কিরূপ ভাবে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা যাহাতে উচ্চশিক্ষার্থী যুবকগণ শিক্ষা করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ;

(১৩) বস্তুর কত রকম পরীক্ষা কিরূপ ভাবে করিতে হয়, অথবা নিজের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি কিরূপ ভাবে গঠিত করিতে হয়, তাহা না শিখিয়া যাহাতে কেহ উচ্চশিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হইতে না পারেন, তাহার ব্যবস্থা ;

(১৪) উচ্চশিক্ষিত না হইয়া যাহাতে কেহ পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করিতে, অথবা শিক্ষকতা করিতে, অথবা চিকিৎসা ও আইনব্যবসায় অবলম্বন করিতে, অথবা ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে, অথবা বিচার ও শাসন-বিভাগে প্রবেশ লাভ করিতে না পারেন, তাহার ব্যবস্থা ;

(১৫) দেশের জলবায়ু যাহাতে কোনরূপে বিকৃত না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ;

(১৬) শ্রমজীবিগণ যাহাতে ১৮ বৎসর বয়সে উপার্জ্জন করিবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা ;

(১৭) দেশের মধ্যে যাহাতে মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৩০ জনের বেশী শিল্প, বাণিজ্য, ওকালতী, ডাক্তারী প্রভৃতি ব্যবসায়, শিক্ষকতা ও সরকারী চাকুরীর উপর নির্ভরশীল না হয়, তাহার ব্যবস্থা এবং যাহাতে কৃষি লাভবান্ হয়, তাহার ব্যবস্থা ;

(১৮) বালকগণের যাহাতে ১৮ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে বিবাহ হয়, তাহার ব্যবস্থা ;

(১৯) প্রকৃত ভাবে বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন যাঁহারা না করিতে পারেন, তাঁহারা যাহাতে হস্তপদাদির শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা অথবা শ্রমজীবী হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তাহার ব্যবস্থা ;

(২০) যাঁহারা প্রকৃত ভাবে বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিতে না পারেন, তাঁহারা যাহাতে মস্তিষ্কজীবী না হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা :

(২১) কোন প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীলোক যাহাতে স্বামী ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের সহিত অথবা কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ যাহাতে স্বীয় স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীলোকের সহিত অবাধে মেলামেশা না করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা ;

(২২) প্রত্যেক স্ত্রীলোক যাহাতে সংসারের কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং কোন উপার্জ্জনের কার্য্যে প্রবৃত্ত না হন, তাহার ব্যবস্থা।

উপরোক্ত দ্বাবিংশতি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে যে, আমাদের সর্ব্ববিধ সমস্যার হাত এড়ান সম্ভব হয়, তাহা বঙ্গশ্রীর ১৩৪২ সালের অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের সংখ্যায় প্রমাণিত হইয়াছে।

দেশের মধ্যে চারিদিকে যেরূপ দলাদলি এবং মাতামাতির আধিক্য দেখা যাইতেছে, তাহাতে এতদবস্থায় উপরোক্ত দ্বাবিংশতি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে—

প্রথমতঃ, প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসনাল কংগ্রেসের গঠন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, অসহযোগ, আইন-অমান্য এবং স্বাধীনতা-আন্দোলন সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে ;

তৃতীয়তঃ, ইংরাজবিদ্বেষ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিতে হইবে ;

চতুর্থতঃ, প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসনাল কংগ্রেসের সভ্যগণ যাহাতে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল প্রভৃতির সভ্য হইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে;

পঞ্চমতঃ, প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসনাল কংগ্রেসের সভ্যসমূহ যাহাতে গভর্ণমেণ্টের বিচার ও শাসন-বিভাগে প্রবিষ্ট হইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

কি হইলে বর্ত্তমান কংগ্রেস, 'প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসনাল কংগ্রেস' নামের যোগ্য হইতে পারে, তাহা আমরা বঙ্গশ্রীর ১৩৪২ সনের চৈত্র সংখ্যার ৩১৭ পৃষ্ঠা হইতে ৩২০ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছি।

প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসনাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা সাধন করিতে হইলে যে, অসহযোগ, আইন-অমান্য, স্বাধীনতা-আন্দোলন এবং ইংরাজবিদ্বেষ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা বঙ্গশ্রীর ১৩৪২ সনের চৈত্র সংখ্যার ৩১৮ পৃষ্ঠা হইতে ৩২২ পৃষ্ঠায় প্রমাণিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান কংগ্রেস যে কেন 'প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসনাল কংগ্রেস' নামের যোগ্য নহে এবং 'প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসনাল কংগ্রেসের' প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে যে, অতি অনায়াসে আমাদের স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করা সম্ভব হয়, তাহা আমরা বঙ্গশ্রীর ১৩৪২ সনের মাঘ সংখ্যার ৩ পৃষ্ঠা হইতে ১৩ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছি।

প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসনাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে যে, আমাদের জাতীয় মুক্তি লাভ করা, অথবা আমাদের সমস্যা চারিটির হাত এড়ান সম্ভব নহে, তাহা বঙ্গশ্রীর গত সংখ্যার ৬২১ পৃষ্ঠা হইতে ৬২২ পৃষ্ঠায় দেখান হইয়াছে।

প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসনাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা সাধন করিতে হইলে, তাহার গঠনকার্য্যে নিম্নলিখিত ঊনবিংশতি নীতি অবলম্বিত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় :—

(১) জনসাধারণের বিবিধবিষয়ক দুরবস্থার সংবাদ সংগ্রহ করা এবং তাহা যাহাতে গভর্ণমেণ্টের বিবেচনাযোগ্য হয়, তাহার চেষ্টা করা;

(২) জনসাধারণের প্রতি গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের অনাচারের সংবাদ সংগ্রহ করা এবং গভর্ণমেণ্ট যাহাতে তাহার প্রতিবিধান করেন, তাহার চেষ্টা করা;

(৩) কি কি কারণে জনসাধারণের দুরবস্থার উদ্ভব হইতেছে, তাহার গবেষণা করা এবং ঐ গবেষণামূলক তথ্যগুলির প্রতি গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করা;

(৪) কি করিলে জনসাধারণের দুরবস্থা আমূলভাবে দূরীভূত হইতে পারে, তাহার গবেষণা করা এবং ঐ তথ্যগুলির প্রতি গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করা;

(৫) যাহা যাহা করিলে জনসাধারণের দুরবস্থা আমূলভাবে দূরীভূত হইতে পারে, তাহা যতদিন পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্টের দ্বারা পরিগৃহীত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কি করিলে জনসাধারণের দুরবস্থা সাময়িক ভাবে উপশমিত হইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করা এবং তৎসম্বন্ধে জনসাধারণকে উপদেশ দেওয়া;

(৬) দেশের সর্ব্বসাধারণ যাহাতে নিজ নিজ অবস্থা যথাযথভাবে বুঝিতে পারেন, তদ্বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করা এবং তাহার প্রচার করা;

(৭) শিক্ষা, সাহিত্য, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও গভর্ণমেণ্টের পরিচালনা কিরূপ হইলে, সর্ব্বসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় তাহা প্রকৃত হিতকর হইতে পারে, তাহার গবেষণা করা এবং তদ্বিষয়ক গ্রন্থ প্রচার করা;

(৮) জনসাধারণের প্রকৃত হিতকর শিক্ষা-বিজ্ঞান, সাহিত্য-বিজ্ঞান, কৃষি-বিজ্ঞান, শিল্প-বিজ্ঞান, বাণিজ্য-বিজ্ঞান, রাষ্ট্রপরিচালনা-বিজ্ঞান প্রভৃতিতে যাহাতে বুদ্ধিমান্ লোক শিক্ষিত হইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করা এবং যাঁহারা ঐ সকল প্রকৃত লোকহিতকর বিজ্ঞানে শিক্ষিত হইবেন, তাঁহারা যাহাতে গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রিত্ব প্রভৃতি প্রধান প্রধান দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করা;

(৯) বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের নির্ব্বাচন-প্রণালীতে মানুষে মানুষে ডিমোক্রেসির নামে যে সমস্ত দ্বন্দ্ব-কলহ এবং বিদ্বেষের উদ্ভব হইতেছে, তাহা যাহাতে না হইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করা এবং তদনুরূপ কার্য্য করা ;

(১০) প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসনাল কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ যাহাতে প্রত্যেক প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল-সমূহের সভ্যপদ লাভ করিতে পারেন, তাহার উপায় উদ্ভাবন করা এবং তদনুরূপ কার্য্য করা ;

(১১) জনসাধারণের প্রকৃত হিতকর শিক্ষা-বিজ্ঞান, সাহিত্য-বিজ্ঞান, কৃষি-বিজ্ঞান, শিল্প-বিজ্ঞান, বাণিজ্য-বিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রপরিচালনা-বিজ্ঞান প্রভৃতিতে যাঁহারা যথার্থভাবে শিক্ষিত হন নাই, তাঁহারা যাহাতে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল-সমূহের সভ্য, অথবা মন্ত্রী, অথবা গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত না হইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করা ;

(১২) প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসনাল কংগ্রেসের প্রতিনিধি-গণের মধ্যে যাঁহারা জনসাধারণের প্রকৃত হিতকর শিক্ষা-বিজ্ঞান প্রভৃতিতে যথার্থভাবে শিক্ষিত, তাঁহারা যাহাতে গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রিত্ব লাভ করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করা ;

(১৩) যাঁহারা প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিলসমূহের সভ্য এবং মন্ত্রী হইবেন, তাঁহারা যাহাতে একযোগে জনসাধারণের দুরবস্থার অপনোদনকর ব্যবস্থাসমূহ প্রবর্ত্তিত করিবার আয়োজন করেন, তাহার চেষ্টা করা ;

(১৪) যাঁহারা প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিলসমূহের সভ্য এবং মন্ত্রী হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে অথবা জনসাধারণের মধ্যে যে সমস্ত আত্ম-বিচ্ছেদকর প্রস্তাবের সম্ভাবনা উত্থিত হইবে, সেগুলি যাহাতে আপোষে মীমাংসিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা ;

(১৫) যাহাতে ইংরাজ প্রভৃতি বিদেশীয়গণের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষের উদ্ভবকর মনোবৃত্তি জনসাধারণের মধ্যে উত্থিত না হইতে পারে, অথবা লোকহিতকর ব্যবস্থাগুলি প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, তাহার আয়োজন করা ;

(১৬) যাহাতে ইংরাজ প্রভৃতি বিদেশীয়গণের জীবনযাত্রায় ভারতীয়গণের দ্বারা যথাসম্ভব সহায়তা সাধিত হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা ;

(১৭) যাহাতে গভর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যের সহিত সংঘর্ষের উদ্ভব হইতে পারে, তাহা যথাসম্ভব বর্জ্জন করা ;

(১৮) যথার্থ লোকহিতকর গভর্ণমেণ্টের পরিচালনা করিতে হইলে গভর্ণমেণ্টের পক্ষেই যে এই শ্রেণীর জাতীয় মহাসম্মেলন একান্ত প্রয়োজন, তাহা ক্রমশঃ গভর্ণমেণ্টের পরিচালকদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া এবং তাঁহারা যাহাতে জাতীয় মহাসম্মেলনের ব্যয়সঙ্কুলনার্থ অর্থসাহায্য করিতে সম্মত হন, তাহার চেষ্টা করা ;

(১৯) দেশের মধ্যে অপরাপর যে সমস্ত সাধারণ হিতকর প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান আছে, সেগুলি যাহাতে কংগ্রেসের সহিত মিলিত হয়, তাহার চেষ্টা করা।

উপরোক্ত ঊনবিংশতি নীতি অবলম্বিত হইলে যে, কংগ্রেসের জনপ্রিয় হওয়া অবশ্যম্ভাবী, তাহা আমরা বঙ্গশ্রীর ১৩৪২ সনের চৈত্র সংখ্যার ৩১৯ ও ৩২০ পৃষ্ঠায় প্রমাণ করিয়াছি।

প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসনাল কংগ্রেসের গঠন কার্য্যে যাঁহারা ব্রতী হইবেন, তাঁহাদিগকে উপরোক্ত ঊনবিংশতি মূল নীতি ব্যতীত নিম্নলিখিত পাঁচটি সত্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে :—

(১) কংগ্রেসের সংগঠন যাহাতে গ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে প্রত্যেক গ্রামে, ইউনিয়ন-বোর্ডে, মহকুমায় এবং জিলায় কংগ্রেসের শাখা স্থাপন করিবার প্রয়োজন হইবে ;

(২) কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও কর্ম্মতালিকা সফল করিবার জন্য যাহা যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহার দায়িত্বভার যাহাতে স্থানে স্থানে এক এক জন যথোপযুক্ত বিদ্যা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির উপর অর্পিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে ;

(৩) যাহাতে কর্ম্মকারের কার্য্য কুম্ভকারের হস্তে, অথবা কুম্ভকারের কার্য্য কর্ম্মকারের হস্তে অর্পিত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে ;

(৪) নির্লোভ ও সত্যপরায়ণ লোক যাহাতে কংগ্রেসের দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মভার প্রাপ্ত হন, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে যাঁহারা স্ব স্ব পরিবারের জীবিকার্জ্জনের জন্য বৃত্তিহীন অথবা যাঁহারা স্ব স্ব বৃত্তি দ্বারা নিজ পরিবারের ভরণপোষণোপযোগী যথেষ্ট উপার্জ্জনে অক্ষম, তাঁহারা যাহাতে কংগ্রেসের কোন দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার প্রাপ্ত না হন, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে। যাঁহারা নিজ পরিবারের ভরণপোষণে অক্ষম, তাঁহাদের হাতে জনসাধারণের কার্য্য অর্পিত হইলে অনাচার প্রবিষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকিবে ;

(৫) যাঁহারা নিজ পরিবারের ভরণপোষণে অক্ষম, তাঁহাদের হাতে কংগ্রেসের কোন কার্য্যভার অর্পণ করিতে হইলে, তাঁহারা যাহাতে নিজ পরিবারের ভরণপোষণ করিবার উপযোগী বেতন পাইতে পারেন, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইতে হইবে।

কেন যে, উপরোক্ত পাঁচটী সত্য স্মরণ রাখা একান্ত প্রয়োজনীয় তাহাও ইতিপূর্ব্বে দেখান হইয়াছে।

প্রকৃত ইণ্ডিয়ান ন্যাসনাল কংগ্রেসের উনবিংশতি মূলনীতি, কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে, বিভিন্ন শাখার গঠন ও দায়িত্ববণ্টনে কিরূপ নীতি অবলম্বিত হওয়া উচিত, তাহা বঙ্গশ্রীর ১৩৪৩ সনের বৈশাখ সংখ্যার ৪৭০ পৃষ্ঠা হইতে ৪৭৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত অংশে আলোচিত হইয়াছে।

গ্রাম্য শাখার, ইউনিয়নবোর্ড-শাখার মহকুমা-শাখার গঠন ও দায়িত্ব কিরূপ হওয়া উচিত, তাহাও ঐ সংখ্যাতেই দেখান হইয়াছে।

এক্ষণে জিলা-শাখা, প্রাদেশিক-শাখা ও কেন্দ্রীয় সভার গঠন ও দায়িত্ব কিরূপ হওয়া উচিত তাহার আলোচনা করিতে হইবে।

এই প্রবন্ধ যাঁহারা আদ্যোপান্ত পড়িতেছেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, আমরা খেঁকী কুকুরের মত প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে জগতের প্রায় সমস্ত নেতৃবর্গের কোন না কোন কার্য্য আক্রমণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, আমরা বিবিধ নেতৃবর্গের **কার্য্যের** বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতেছি বটে, কিন্তু কাহাকেও ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করি নাই এবং যখনই যাঁহার কোন কার্য্যকে অসঙ্গত বলিয়া মন্তব্য করিতেছি, উহা কেন যে অসঙ্গত, তাহা যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছি।

আপাতদৃষ্টিতে আমাদের এবংবিধ আক্রমণ ব্যাধিবিশেষ বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু সামান্য চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, জগতে জাতিনির্ব্বিশেষে জনসাধারণের সকলেই যখন অন্ন-বস্ত্রাদির অভাবে, অসন্তুষ্টিতে, পরমুখাপেক্ষিতায়, অস্বাস্থ্যে, অকাল-বার্দ্ধক্যে এবং অল্পায়ুতে অল্পাধিক জর্জ্জরিত, তখন প্রত্যেক নেতৃবর্গের চিন্তায় ও কার্য্যে কোন না কোন ত্রুটী নিশ্চয়ই রহিয়াছে। একটি নেতারও চিন্তা ও কার্য্য সর্ব্বতোভাবে যথাযথ হইলে, অন্ততঃ একটি দেশেও, অধিকাংশ মানুষের মধ্যে অন্ন-বস্ত্রের প্রাচুর্য্য, সন্তুষ্টি, স্বাবলম্বন, স্বাস্থ্য, দীর্ঘ যৌবন এবং দীর্ঘায়ুর সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি দেখা যাইবে। কিন্তু, বাস্তবক্ষেত্রে তাহা কোন দেশে প্রায়শঃ কাহারও মধ্যে দেখা যায় না। কাযেই এই প্রবন্ধের লেখক নেতৃবর্গের তুলনায় অতীব অকিঞ্চিৎকর এবং নগণ্য হইলেও, হয়ত তাহার কথায় চিন্তার খাদ্য থাকিলেও থাকিতে পারে,ইহা বিবেচনা করিয়া আমাদের পাঠকবর্গ ও যাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতেছি, তাঁহারা লেখককে ক্ষমা করুন, এই প্রার্থনা জানাইতেছি।

মানুষকে আক্রমণ করা যে কি হৃদয়ঘাতী জ্বালাকর, তাহা ভুক্তভোগী না হইলে বুঝা সম্ভব নহে। একদিকে ঐ জ্বালা, আর একদিকে মূক জনসাধারণের আপামর অন্নবস্ত্রহীনতা, অসন্তুষ্টি, পরমুখাপেক্ষিতা, অস্বাস্থ্য, অকাল-বার্দ্ধক্য এবং অল্পায়ুর দৃশ্য। একদিকে শতকরা একজন লোকের নেতারূপে আত্মপ্রচারের জন্য বৃথা আস্ফালন, অন্য দিকে তাঁহাদের কৃতকার্য্যের ফলে শতকরা বাকী নিরানব্বই জন লোকের দুঃখ-দুর্দ্দশা। এই দুঃখ-দুর্দ্দশার গতি যে কোন্ দিকে চলিতেছে এবং তাহার পরিণতি যে কত ভীষণ, তাহাও আমরা মোহমুগ্ধ হইয়া বুঝিতে পারিতেছি না—ইহা লেখকের বিশ্বাস। তাই হৃদযন্ত্রের সঙ্গে বুঝা-পড়া করিতে হইবে ইহা অনুমান করিয়াও এই তিক্তকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়া-

ছিল এবং সর্ব্বনিয়ন্তার অনুমোদিত হইলে আরও কিছুদিন চালাইতে হইবে।

একটা কিছুকে সত্য বলিয়া মনে হইলে, প্রাণ তাহা বারবার দেখিবার জন্য ব্যাকুল হয় এবং যাহা দেখা যায়, তাহা সঙ্গিগণকে শুনাইবার ও বুঝাইবার জন্য আগ্রহ উপস্থিত হয়। সেই সময় সেই সত্যের দৃশ্যে এবং তাহা যথাযথ ভাবে শুনাইবার ও বুঝাইবার জন্য মানুষ এত বিভোর থাকে যে, তখন আর কিছু তাহার কাম্য থাকে না। আমাদের বোধ হয় ইহা একটা প্রাকৃতিক নিয়ম। সর্ব্বনিয়ন্তার বিধি অনুসারে পাঠকবর্গের নিকট হইতে আমাদের কিছু চাহিবার নাই। তথাপি হয়ত তাঁহাদিগকে আমাদের হৃদয়ের জ্বালা যথাযথ ভাবে বুঝাইতে পারিতেছি না বলিয়া তাঁহাদিগের বিরক্তির কারণ হইতেছি, এই বোধে আবার তাঁহাদিগের নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। তাঁহারা কি আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন না ?

যখন বাস্তবক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতবর্ষ রাষ্ট্রভাবে (politically) পরাধীন হইলেও তাহার ইতিহাসে, অন্নের জন্য তাহার সন্তানবৃন্দের অন্য কোন দেশের উপর নির্ভরশীলতার পরিচয় নাই—অথচ জগতে আর একটি দেশও নাই, যে-দেশের লোক অপর কোন দেশের উপর কোনরূপে নির্ভরশীল না হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তখন "ফলেন বৃক্ষঃ পরিচীয়তে"—এই নীতি অনুসারে ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে কি বুঝিতে হয় না যে এই হতভাগ্য ভারতবর্ষে যে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সংগঠন একদিন ছিল, তাহা স্বাধীনতার আস্ফালনকারী অন্য কোন দেশে কোনদিন ছিল না এবং এখনও নাই ?

তাহার পর, ভারতের বেদ, দর্শন, পুরাণ ও সংহিতাদি গ্রন্থের দিকে তাকাইলে যখন পরিলক্ষিত হয় যে, ঐ গ্রন্থগুলি যত প্রাচীন, তত প্রাচীন কোন গ্রন্থ অন্য কোন দেশে কোন জাতির মধ্যে পাওয়া যায় না, তখন কি মনে করিতে হয় না যে, ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংগঠন যত প্রাচীন, বিশ্বাসযোগ্য এবং দৃঢ়মূল, তত প্রাচীন, বিশ্বাসযোগ্য অথবা দৃঢ়মূল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংগঠনের উদ্ভব আর কোন দেশে হয় নাই ?

ইহার পর যখন দেখা যায় যে, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ ঐ বেদ, দর্শন, পুরাণ ও সংহিতাদি গ্রন্থের যে ব্যাখ্যা দিতেছেন, তাহাতে কোন বাস্তব চিন্তাযোগ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংগঠনবিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায় না, তখন কি বুঝিতে হয় না যে, ঐ পণ্ডিতগণ ঐ বেদাদি গ্রন্থের ভাষা অর্থাৎ প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা যথাযথ ভাবে বুঝিতে পারেন না এবং তাঁহারা অযথা আস্ফালন করিতেছেন ?

ইহার পর যখন দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ ভারতীয় ঋষির বেদ, দর্শন ও পুরাণাদি গ্রন্থ যে ভাবে ব্যাখ্যা করিতেন এবং মানুষের চালচলনের জন্য মানুষকে যে ভাবে উপদেশ দিতেন, এই ভারতবর্ষের মানুষ একদিন প্রায়শঃ তাহা মান্য করিত এবং তদনুসারে চলাফেরা করিত এবং ঐ পণ্ডিতগণকে মান্য করিত এবং তাহাদের উপদেশানুসারে চলাফেরা করিত বলিয়াই ভারতের মানুষের মধ্যে দলাদলির উদ্ভব হইয়াছিল এবং ভারতবাসী ক্রমশঃ রাষ্ট্রীয় ভাবে পরাধীন হইয়াছিল, তখন কি যুক্তিসঙ্গত ভাবে বলিতে হয় না যে, এই পণ্ডিতগণ ভারতীয় ঋষিগণকে এবং তাঁহাদের সংগঠনকে কার্য্যতঃ হত্যা করিয়াছেন এবং তাঁহারা এক সঙ্গে দেবঘাতক, ঋষিঘাতক এবং নরঘাতকের কার্য্য চালাইয়াছেন ?

ইহার পর যখন বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বর্ত্তমান জগতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আস্ফালনকারী কোন্ দেশের কোন জনসাধারণ* প্রায়শঃ অন্নবস্ত্রের অপ্রাচুর্য্য, অসন্তুষ্টি, পরমুখাপেক্ষিতা, অস্বাস্থ্য, অকাল-বার্দ্ধক্য এবং অল্পায়ুর হাত এড়াইতে পারে নাই, অধিকন্তু প্রত্যেক দেশেই জনসাধারণের মধ্যে উপরোক্ত অন্নবস্ত্রের অপ্রাচুর্য্যাদি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন কি বুঝিতে হয় না যে, ঐ স্বাধীনতার আস্ফালনকারী দেশগুলির মানুষ, মানুষ হিসাবে ভাল হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাদের স্বাধীনতার আস্ফালন সম্পূর্ণ বৃথা এবং তাহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংগঠনের বিদ্যা সম্পূর্ণ অসার ?

ইহার পর যখন দেখা যায় যে, আমাদের দেশের মহাত্মা, কবিসম্রাট্, আচার্য্য ও বিশেষজ্ঞ প্রভৃতি আখ্যাত নেতৃবর্গ আমাদের ঋষিগণের ভাষা কি ছিল, তাহা যথাযথ ভাবে বুঝিতে বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়া, ভারতীয় ঋষিগণের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংগঠন-বিদ্যা কি ছিল, তাহার কোন অনুসন্ধান না করিয়া

* Common people, who form mostly 99% of the total population of every country.

সরাসরি বলিয়া যাইতেছেন যে, আমাদের ইহা ছিল না অথবা উহা ছিল'না, তখন কি বুঝিতে হয় না যে, ইহাঁরা দায়িত্বজ্ঞান-হীন পক্ষিবিশেষ এবং ইহাঁরা আমাদিগের যুবকবৃন্দকে বিপথ-চালিত করিয়া মনুষ্যজাতির মধ্যে নিত্য নিত্য নূতন টীয়া-পাখীর সৃষ্টি করিতেছেন ?

ইহার পর যখন দেখা যায় যে, যে intensive cultivation, যে trade and commerce, যে industry, যে political organisation অন্যান্য দেশে জনসাধারণের মধ্যে নিত্য নূতন নূতন দলের সৃষ্টি সাধন করিয়া তাঁহাদিগকে বিদ্বেষবহ্নিতে প্রজ্বলিত করিতেছে এবং তাহাদের আর্থিক, মানসিক ও শারীরিক অবস্থা উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিতেছে, অথচ আমাদের নেতৃবর্গ ঐ intensive cultivation, ঐ trade and commerce, ঐ industry, political organisation-এর অনুকরণ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন, তখন কি বুঝিতে হয় না যে, আমাদের দেশের মস্তিষ্কগুলি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়াছে ?

উপরোক্ত কথাগুলি বিবেচনা করিয়াও কি পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন না যে, কি জ্বালায় আমাদের লেখনী চলিতেছে এবং তাহা বুঝিয়া আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন না ?

জিলা-শাখার সংগঠন ও দায়িত্ব

যে যে দায়িত্ব জিলাশাখাসমূহের হস্তে ন্যস্ত হওয়া উচিত, তাহা বঙ্গশ্রীর বৈশাখ সংখ্যায় দেখান হইয়াছে। তাহাদের নাম :—

(১) জনসাধারণের দুরবস্থার সংবাদ যাহাতে গবর্ণমেন্টের জিলা-কর্ত্তৃপক্ষগণের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তাহার চেষ্টা করা ;

(২) জনসাধারণের প্রতি গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারিগণের অনাচারের সংবাদ যাহাতে জিলা-কর্ত্তৃপক্ষগণের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তাহার ব্যবস্থা ;

(৩) কি কি কারণে প্রত্যেক জিলার জনসাধারণের দুরবস্থার উদ্ভব হইতেছে, তাহার গবেষণা করা ;

(৪) কি কি করিলে জনসাধারণের দুরবস্থা আমূলভাবে দূরীভূত হইতে পারে, তাহার গবেষণা করা ;

(৫) যাহা যাহা করিলে প্রত্যেক জিলার জনসাধারণের দুরবস্থা সাময়িক ভাবে উপশমিত হইতে পারে, তাহার উপদেশ দেওয়া ;

(৬) প্রত্যেক জিলার জনসাধারণ যাহাতে নিজ নিজ অবস্থা বুঝিতে পারেন, তাহা যে সমস্ত গ্রন্থে বিবৃত হইবে, তাহার প্রচার করা ;

(৭) প্রকৃত শিক্ষা, সাহিত্য, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য এবং রাষ্ট্র-পরিচালনাবিজ্ঞান প্রত্যেক জিলার বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ যাহাতে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা ;

(৮) প্রত্যেক জিলার মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত লোকহিতকর বিজ্ঞানাদিতে শিক্ষিত হইবেন, তাঁহারা যাহাতে গবর্ণমেন্টের মন্ত্রিত্ব প্রভৃতি প্রধান প্রধান দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করা ;

(৯) প্রত্যেক জিলার ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড, লোক্যাল-বোর্ড, ইউনিয়ন-বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি নির্ব্বাচনের বর্ত্তমান পদ্ধতির ফলে জনসাধারণের মধ্যে যে সমস্ত দ্বন্দ্ব-কলহ এবং বিদ্বেষের উদ্ভব হয়, তাহা যাহাতে না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা ;

(১০) কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ যাহাতে প্রত্যেক প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সমূহের সভ্যপদ লাভ করিতে পারেন ও ঐ জিলাস্থিত, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, লোক্যাল-বোর্ড প্রভৃতির সভ্যপদ লাভ করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা ;

(১১) প্রত্যেক জিলার ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড প্রভৃতির যাঁহারা সভ্য হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে এবং জনসাধারণের মধ্যে যে সমস্ত আত্মবিচ্ছেদকর ঘটনার সম্ভাবনা উত্থিত হইবে, তাহা যাহাতে আপোষে মীমাংসিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা ;

(১২) যাহাতে জিলার মধ্যে ইংরাজ প্রভৃতি বিদেশীয়গণের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষকর মনোবৃত্তি জনসাধারণের মধ্যে জাগ্রত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা ;

(১৩) প্রত্যেক জিলার মধ্যে অপরাপর যে-সমস্ত সাধারণের হিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহ বিদ্যমান আছে,

সেগুলি যাহাতে কংগ্রেসের সহিত মিলিত হয়, তাহার চেষ্টা করা।

উপরোক্ত দায়িত্বসমূহ বিশ্লেষণ করিয়া অধ্যয়ন করিলে দেখা যাইবে যে, উহা মূলতঃ চারি শ্রেণীর :—

(১) মহকুমার গভর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারিগণের সহায়তামূলক ;
(২) জনসাধারণের দুরবস্থার কারণ ও তাহার প্রতিষেধক উপায়-সমূহের গবেষণামূলক ;
(৩) জনসাধারণের মধ্যে কংগ্রেসের প্রয়োজনীয়তা প্রচার ও তাহাদের শিক্ষামূলক ;
(৪) প্রাদেশিক কাউন্সিল, ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড, ইউনিয়ন-বোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটী প্রভৃতির নির্ব্বাচন-মূলক।

আরও দেখা যাইবে যে, জিলা-শাখাসমূহের দায়িত্ব সাধারণতঃ জিলার মধ্যে যাহা যাহা ঘটিতেছে, তাহার বিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রাদেশিক শাখাসমূহকে তৎসম্বন্ধে পরিজ্ঞাত রাখা এবং প্রাদেশিক শাখাসমূহের উপদেশ জিলার মধ্যে অন্যান্য শাখার সাহায্যে প্রচার করা ও তাহা কার্য্যে পরিণত করা। জিলার মধ্যস্থিত মহকুমা-শাখা প্রভৃতি অন্যান্য শাখার দায়িত্বের সহিত জিলা-শাখার দায়িত্বের প্রধান পার্থক্য, প্রাদেশিক কাউন্সিলে সভ্য-নির্ব্বাচন লইয়া। কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ যাহাতে প্রত্যেক প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভ্যপদ লাভ করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিবার প্রধান দায়িত্ব জিলা-শাখার হস্তে ন্যস্ত থাকিবে।

জিলা-কমিটির চারি শ্রেণীর দায়িত্বকে সংক্ষেপতঃ নিম্ন-লিখিত ভাবে অভিহিত করা যাইতে পারে, যথা :—

(১) গভর্ণমেণ্টের সহায়ক ;
(২) গবেষণা-বিষয়ক ;
(৩) শিক্ষা ও প্রচার-বিষয়ক ;
(৪) নির্ব্বাচন-বিষয়ক।

জিলা-শাখাসমূহে প্রধানতঃ তিনটি বিভাগ থাকিবে, যথা :—

(১) সাধারণ বিভাগ ;
(২) কার্য্য-নির্ব্বাহক বিভাগ ;
(৩) জিলা-সহর বিভাগ।

জিলা-সহরের আয়তন এবং লোকসংখ্যানুসারে জিলা-সহরকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে এবং স সহরকে একটি মহকুমা-শাখার মত পরিগণিত করিয়া উহাকে কয়েকটি ইউনিয়ন-বোর্ড এবং গ্রাম্য শাখায় পরিণত করিতে হইবে। উহার কার্য্য মহকুমা, ইউনিয়ন-বোর্ডশাখা এবং গ্রাম্য শাখার কার্য্যের ন্যায় পরিচালিত হইবে।

জিলা-শাখাসমূহের কার্য্য-নির্ব্বাহক বিভাগে পাঁচটি কমিটী রাখিতে হইবে, যথা :—

(১) গভর্ণমেণ্ট-সহায়ক কমিটী ;
(২) গবেষণা-বিষয়ক কমিটী ;
(৩) শিক্ষা ও প্রচার-বিষয়ক কমিটী ;
(৪) নির্ব্বাচন-বিষয়ক কমিটী ;
(৫) বিবিধ-বিষয়ক কমিটী।

গভর্ণমেণ্ট-সহায়ক কমিটী নিম্নলিখিত কর্ত্তব্যসমূহ নির্ব্বাহ করিবেন :—

(১) প্রত্যেক জিলার জনসাধারণের বিবিধ-বিষয়ক দুরবস্থার সংবাদ যাহাতে গভর্ণমেণ্টের জিলার কর্ত্তৃপক্ষগণের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তাহার ব্যবস্থা করা ;
(২) প্রত্যেক জিলার জনসাধারণের প্রতি গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের অনাচারের সংবাদ যাহাতে মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষগণের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তাহার ব্যবস্থা করা।

গবেষণা-বিষয়ক কমিটী নিম্নলিখিত কর্ত্তব্যসমূহ প্রতি-পালন করিবেন :—

(১) কি কি কারণে জিলার জনসাধারণের দুরবস্থার উদ্ভব হইতেছে, তাহার গবেষণা করা ;
(২) কি করিলে জনসাধারণের দুরবস্থা আমূলভাবে দূরীভূত হইতে পারে, তাহার গবেষণা করা।

শিক্ষা ও প্রচার-বিষয়ক কমিটীর কর্ত্তব্য :—

(২) যাহা করিলে প্রত্যেক জিলার জনসাধারণের দুরবস্থা সাময়িকভাবে উপশমিত হইতে পারে, তাহার উপদেশ দেওয়া ;
(২) প্রত্যেক জিলার জনসাধারণ যাহাতে নিজ নিজ

অবস্থা যথাযথভাবে বুঝিতে পারেন, তাহা যে সমস্ত গ্রন্থে বিবৃত হইবে, সেগুলির প্রচার করা ;

(৩) প্রকৃত সাহিত্য, শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য এবং রাষ্ট্র-পরিচালনাবিজ্ঞান প্রত্যেক জিলার বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ যাহাতে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা ;

(৪) প্রত্যেক জিলার জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে ইংরাজ প্রভৃতি বিদেশীয়গণের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষকর মনোবৃত্তি জাগ্রত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা ;

(৫) প্রত্যেক জিলার মধ্যে অপরাপর যে-সমস্ত সাধারণ হিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহ বিদ্যমান আছে, সেগুলি যাহাতে কংগ্রেসের সহিত মিলিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা।

নির্ব্বাচন-বিষয়ক কমিটীর কর্ত্তব্য :—

(১) প্রত্যেক জিলার মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত লোকহিতকর বিজ্ঞানাদিতে শিক্ষিত হইবেন, তাঁহারা যাহাতে গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রিত্ব প্রভৃতি প্রধান প্রধান দায়িত্বপূর্ণ পদ পাইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করা ;

(২) প্রত্যেক জিলার ডিষ্ট্রিক্ট, লোকাল ও ইউনিয়ন-বোর্ড প্রভৃতি নির্ব্বাচনের বর্ত্তমান পদ্ধতির ফলে যে সমস্ত দ্বন্দ্ব-কলহ এবং বিদ্বেষের উদ্ভব জনসাধারণের মধ্যে হইতে পারে, তাহা যাহাতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা ;

(৩) প্রত্যেক জিলার জনসাধারণের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদকর যে-সমস্ত ঘটনার উদ্ভব হইবে, তাহা যাহাতে আপোষে মীমাংসিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা ;

(৪) কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ যাহাতে প্রত্যেক প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিলসমূহের সভ্যপদ লাভ করিতে পারেন ও ঐ জিলাস্থিত ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড, লোক্যাল-বোর্ড প্রভৃতির সভ্যপদ লাভ করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা ;

বিবিধ-বিষয়ক কমিটীর কর্ত্তব্য :—

(১) জিলা-শাখা, ইউনিয়ন-বোর্ড-শাখা এবং গ্রাম্য-শাখা সমূহের সহিত ও জনসাধারণের সহিত চিঠিপত্র আদান-প্রদান করা এবং তাহার রেকর্ড রক্ষা করা ;

(২) বিভিন্ন কমিটীর বিভিন্ন-কর্ত্তব্যসম্বন্ধীয় চিঠিপত্রাদি ঐ ঐ কমিটীর কর্ম্মকর্ত্তার হস্তে প্রদান করা ;

(৩) যাবতীয় অধিবেশনের কার্য্যাবলীর মন্তব্য রক্ষা করা ;

(৪) মহকুমা-সহর বিভাগের পরিদর্শন করা, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

জিলা-শাখাসমূহের সাধারণ-বিভাগের কর্ত্তব্য থাকিবে দুইটি, যথা :—

(১) কার্য্য-নির্ব্বাহক বিভাগের কর্ম্মিগণের মনোনয়ন করা ;

(২) কার্য্য-নির্ব্বাহক বিভাগের কর্ম্মিগণ তাঁহাদের কার্য্য যথাযথ পালন করিতেছেন কি না, তাহার পরীক্ষা করা।

সাধারণ সভা ও তাহার সভাপতির হস্তে সাধারণ বিভাগের কর্ত্তব্যনির্ব্বাহের প্রধান দায়িত্ব ন্যস্ত থাকিবে।

কার্য্য-নির্ব্বাহক বিভাগের কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিবার প্রধান দায়িত্ব থাকিবে তাহার সভাপতির ও বিভিন্ন কমিটীর হস্তে।

জিলা-সহর বিভাগের প্রধান কর্ত্তব্যভার থাকিবে ঐ বিভাগীয় কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ও তাহার সভাপতির হস্তে।

প্রত্যেক জিলা-শাখার অন্তর্গত যে কয়টি মহকুমা-শাখা থাকিবে, সেই শাখাগুলির এবং জিলা-সহর বিভাগের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ মিলিত হইয়া, জিলা-শাখার সাধারণ বিভাগ গঠন করিবেন এবং তাঁহারা তাঁহাদিগের সভাপতি নির্ব্বাচন করিবেন। যাঁহারা সভাপতির পদপ্রার্থী হইবেন, তাঁহাদের সংগঠন-পরিচালনার, শিক্ষা-বিজ্ঞানের, কৃষি-বিজ্ঞানের, শিল্প-বিজ্ঞানের ও বাণিজ্য-বিজ্ঞানের বিদ্যা থাকা একান্ত প্রয়োজন। যাঁহাকে একবার সভাপতিপদে বরণ করা যাইবে, তাঁহার কোন কার্য্যে অসাফল্য না ঘটিলে, অথবা তিনি স্বয়ং কার্য্য পরিত্যাগ না করিলে, তাঁহাকে পরিবর্ত্তন করা নিয়মবিরুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

কার্য্য-নির্ব্বাহক বিভাগের বিভিন্ন কমিটীর সভ্যগণ যাহাতে প্রয়োজনীয় কার্য্যদক্ষতা-সম্পন্ন হন, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

[ক্রমশঃ

জোড়াদীঘির চৌধুরী-পরিবার

—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

একটি অধ্যায়ে লেখক তাঁহার উপন্যাসের পরিচয় দিতে বলিয়াছেন :—"পাঠক, তোমাদিগকে একটু ইতিহাস শুনাইব। বাংলা দেশের সেই সময়কার ইতিহাস, যাহাকে আমি বলি সত্যযুগ, তোমরা বলিবে স্বর্ণযুগ (স্বর্ণই তো সত্য, কি বল পাঠিকা ?)—খৃষ্টীয় ১৭৯৩ হইতে ১৮২৫ অব্দের মধ্যবর্ত্তী কাল ! তোমরা শুনিয়া বলিবে অন্ধকার যুগ ; আমি বলিব হাঁ, কষ্টিপাথরের মত কালো, যাহার উপরে বর্ত্তমান যুগটার যাচাই অবশ্যম্ভাবী ! তোমরা সে যুগের কথা শুনিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিবে, কর ; বিদেশীর রচিত ইতিহাসে স্বদেশের কথা পড়িলে এমনটি-ই হয়। আর আমি বলিব এ সেই যুগ, যাহার আদর্শ আমার হৃৎকমলের নিভৃতে পুনরাবির্ভাবের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে ; এ সেই যুগ, যাহাকে আমরা স্বেচ্ছায়, অবজ্ঞায়, মোহাচ্ছন্ন ঘৃণায় ভাঙ্গিয়াছি আর ভাঙ্গিয়াছি, আর আজ তাহারই শ্মশানে বসিয়া রুশিয়ার স্বপ্ন দেখিতেছি, সোভিয়েট স্বর্ণযুগের এবং ... ... !"

ভূমিকা

সকল মানুষেরই পূর্ব্বপুরুষ মনু।

তবে আবার মানুষের মধ্যে ছোট-বড়, প্রাচীন-অর্ব্বাচীনের প্রশ্ন ওঠে কেন ? প্রশ্ন যখন উঠিয়াছে, ভাবিবার কিছু আছে নিঃসন্দেহ। মানুষে মানুষে মূলতঃ ছোট-বড় আগে-পিছে নাই, কিন্তু বস্তুত নানা প্রকার ভেদ সর্ব্বত্র দেখিতেছি। সে ভেদ ব্যক্তির, না বংশের ?

ব্যক্তির প্রবাহ ঝরণার মত, মানচিত্রে তাহার কোনো উল্লেখ নাই। এই ঝরণা যখন গভীর হয়, উদার হয়, সে হয় নদী, মানচিত্রে তাহার দাগ পড়ে। নিঃসঙ্গ ব্যক্তি যখন বংশের বিশালতা পায়, ইতিহাসে সে দাগ টানিতে সুরু করে। সব ঝরণা নদীরূপ পায় না, সব ব্যক্তি বংশ পাকাইয়া ওঠে না। সব নদী সমুদ্রে গিয়া পৌঁছায় না ; ইতিহাসের চরম উদ্দেশ্যকে ধরিতে পারে এমন বংশ কয়টা আছে !

ঝরণা প্রকৃতির অনেক বাধা লঙ্ঘন করিয়া তবেই নদী। বংশ-প্রতিষ্ঠাতেও বহু বিপত্তি। তাহার লড়াই স্বয়ং মহাকালের সঙ্গে। ধরিত্রীর পত্রে মহাকাল একমাত্র লেখক, সেখানে আর কেহ যে দাগা বুলাইবে, ইহা তাহার অসহ্য। কিন্তু, বংশ-প্রতিষ্ঠার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ধরিত্রীর পৃষ্ঠায় চিহ্ন রাখিয়া যাওয়া। বহু বংশের বিচিত্র এই চিহ্নকেই আমরা বলি ইতিহাস। ইতিহাস বনাম মহাকাল, ইহাই বিশ্বের বিরাট বিধান।

ব্যক্তির সঙ্গে মহাকালের কোনো দ্বন্দ্ব নাই, বোধ করি সম্বন্ধও নাই। সে এতই বড় যে মানুষের দিকে দৃকপাত করে না। আবার মানুষ এতই ছোট যে, মহাকালকে গ্রাহ্য করে না। যত তাহার জিঘাংসা বংশের সহিত। সত্য কথা বলিতে কি, মহাকালের খাতায় মানুষের জমা-খরচ নাই। মানুষ হাজারে হাজারে জন্মিতেছে, হাজারে হাজারে মরিতেছে। কিন্তু, একটি বংশ-প্রতিষ্ঠা হয় কতশত বৎসরে, তাহার পতন হইলে আর ওঠে না ! মানুষ আশ্রয়ের জন্য একখানা চালা তোলে, ঝড়ে সকালে ফেলিয়া দেয়, বিকালে আবার তাহা ওঠে। অট্টালিকা পড়িলে কবে তাহা উঠিয়াছে ! ব্যক্তির বসতি বানে ভাসে, জলে ডোবে, ঝড়ে ভাঙে, আগুনে পোড়ে। কিন্তু তাহার ধ্বংস কত ক্ষণের জন্য ! যে ধ্বংস ক্ষণিক, তাহা বোধ করি ধ্বংসই নয়। ধ্বংসের লীলা দেখিতে হইলে প্রাচীন কোনো বংশের আবাস-স্থলে যাইতে হয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় প্রাণীর কঙ্কালের মত অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপ পড়িয়াছে, তবু তাহার বিশালতায় মনে সম্ভ্রমের উদ্রেক করে। ভবিষ্যতের কাছে এই সম্ভ্রমের দাবী প্রাচীন বংশের। বর্ত্তমানের মানদণ্ডে মাপিয়া ইহাকে বুঝিতে পারিবে না, ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক পদার্থ। মনোযোগ দিয়া ইহাকে দেখ, সম্ভ্রমে মাথা আপনি নত হইয়া আসিবে,—ইহার অতিকায়িক বিপুলতায়, শক্তির সুলভ প্রাচুর্য্যে, অনাবশ্যক উদারতার আতিশয্যে। মানব-মনের মানসচিত্রের ইহা বিশাল হিমালয় ; হিমালয়ের মত ইহা মৃত

এবং শীতল ; অতীতের সমগ্র পাঠপীঠ জুড়িয়া ইহার প্রতিষ্ঠা এবং ভবিষ্যতের আকাশে ইহার মাথা ঠেকিয়াছে ; এবং জীবনের সমস্ত কামনার ইহা চরম আশ্রয়।

পূর্ব্বকথা

[১]

একটি বংশের পতন ও উত্থানের কাহিনীর মত চিত্তাকর্ষক অল্প জিনিষই আছে। পূর্ণ প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে গৌরব থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে আকর্ষণ তেমন বেশি নহে। কারণ সুখ ও সম্পদ্ মানব-জীবনে স্বাতন্ত্র্যের হানি করে। সকল বংশের সম্পদের কাহিনীই অল্পবিস্তর এক রকম। দুঃখে ও চেষ্টাতেই মানুষের জীবনের স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য।

জোড়া-দীঘির চৌধুরীদের পূর্ব্বপুরুষের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় বল্লালসেনের সময়। তারপর কয়েক শত বৎসর এই সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব। পুনরায় সম্রাট্ আকবরের সময় হইতে ইহাদের ইতিহাস পাওয়া যায়। আমরা একখানি পুস্তক হইতে চৌধুরীদের পরিচয় তুলিয়া দিলাম।

নীলকণ্ঠ ওঝা মোগল সম্রাট্ আকবরের সভাপণ্ডিত এবং হিন্দু দায়ভাগের বিচারক ছিলেন। ব্যাকরণ, স্মৃতি, বেদ, ষড়্ দর্শন, জ্যোতিষ ও তন্ত্রে ওঝা একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার ধর্ম্মশাস্ত্রে এত অধিকার যে, ইনি একজন তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। হরিবাটী গ্রাম দান করিয়া আকবর ওঝাকে পারইডিজিতে স্থাপন করেন। তারপর অতিথিসেবার্থে হুলিখালি গ্রাম, জিয়াসিন্ধ, মাদা, সিন্দুর-কুসুম্বী, কালিগাঁও, তেগাছি প্রভৃতি পরগণা এবং অনেক ব্রহ্মোত্তর ভূমি ওঝাকে আকবর দেন। এই বৃহৎ ভূসম্পত্তি লাভের পর নীলকণ্ঠ পারইডিজিতে ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ ও দেবালয় নির্ম্মাণ এবং সংস্কৃত বিদ্যালয় ও অতিথিশালা স্থাপন করেন। জলাশয় খনন করিয়াও জলকষ্ট নিবারণ করেন। ইহার পর তিনি পরলোক গমন করেন। আগরা হইতে নীল প্রস্তর আকবর ওঝাকে দেন, তাহা আজিও হরিবাটী দেবালয়ের সম্মুখে স্থাপিত আছে।

রামহরি ও গঙ্গাহরি নীলকণ্ঠ হইতে অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ। যে সময় ইঁহারা পারইডিজিতে বাস করেন, সে সময় বড়ল নদীর নিকট চাঁপলিয়ায় একটি ফৌজদারি আদালত ছিল। দিল্লীর সম্রাটের অনুগ্রহে গঙ্গাহরি সেই ফৌজদারি আদালতের প্রধান কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত হন। বড়ল নদীর তীরে জোড়া দীঘি ; চাঁপলিয়া জোড়াদীঘির অতি নিকট। চাঁপলিয়া থাকা সময় গঙ্গাহরি জোড়াদীঘির মজুমদার-বংশীয় একটি কন্যাকে বিবাহ করেন। গঙ্গাহরির শ্বশুরের পুত্র-সন্তান ছিল না। সুতরাং শ্বশুরের যাবতীয় সম্পত্তি তিনি প্রাপ্ত হন। কিন্তু, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নী সন্তানগণ সহ পারই ডিজির বাটীতে যান। রামহরি কনিষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গাহরির সন্তানগণকে পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বেদখল করেন। সুতরাং গঙ্গাহরির বিধবা পত্নী সন্তানগণ সহ জোড়াদীঘিতে ফিরিয়া আসিয়া পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া রহিলেন ; এ দিকে পারইডিজিতে রামহরি পৈতৃক সম্পত্তির ষোল আনার অধিকারী হইয়া বসিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই রামহরি এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিলেন। এমন সময়ে নাটোর রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। যে সময়ে রঘুনন্দন মুরশিদাবাদে আধিপত্য বিস্তার করেন এবং বিস্তৃতিলাভের জন্য সচেষ্ট ছিলেন, সেই সময়ে রঘুনন্দন রামহরির যাবতীয় সম্পত্তির প্রতি লোভ করেন। ইহা কথিত আছে যে, রামহরির নিকট হইতে রঘুনন্দন যাবতীয় সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া পারইডিজি, হুলিখালি ও হরিবাটি এই তিন গ্রাম ছাড়িয়া দেন।

[২]

এদিকে গঙ্গাহরির বিধবা পত্নী সন্তানগণ সহ জোড়াদীঘি গ্রামে বাস করিতেছিলেন। গঙ্গাহরির অধস্তন সন্তানগণ লইয়াই জোড়াদীঘির চৌধুরীবংশ। গঙ্গাহরির পুত্র রূপনারায়ণ। রূপনারায়ণের পুত্র উদয়নারায়ণ, তাহার পুত্র দর্পনারায়ণ। রূপনারায়ণ পর্য্যন্ত চৌধুরীবংশের অবস্থা ভাল ছিল না। উদয়নারায়ণ হইতেই জমিদারি-বৃদ্ধির সূত্রপাত হয়। একদা বড়ল দিয়া নাটোরের রাণী ভবানী বহুতর নৌকা ও লোকজনসহ জোড়াদীঘির নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। ঝড় বৃষ্টি নিবন্ধন নৌকা আদি জোড়াদীঘির ঘাটে লাগাইয়া রাণী বিশ্রাম করিতেছিলেন। সে দিবস দ্বাদশীর পারণ। রূপনারায়ণও ঘাটে উপস্থিত। রাণী ব্রাহ্মণ দেখিয়া দ্বাদশীর পারণ জন্য ফলমূলাদির প্রয়াস করিলেন। রূপনারায়ণ যত্ন করিয়া রাণীকে নিজ বাটীতে লইয়া গেলেন এবং দ্বাদশীর

পারণ তদপর হবিষ্যান্নাদি সহ আহার অতি ভক্তির সহিত সম্পন্ন করাইলেন। রাণী রূপনারায়ণের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া কিছু জমিদারি দিতে চাহিলেন। রূপনারায়ণের আকাঙ্ক্ষা সামান্য ছিল। জোড়াদীঘির উত্তরে যে বিল আছে, সেই বিল এবং বাড়ীর নিকটবর্ত্তী যে কয়েক ঘর শূদ্রের বসতি আছে, তাহা তাঁহার অধিকারে ছিল না। তিনি তাহাই যাচ্ঞা করিলেন। রাণীও সন্তুষ্ট হইয়া তাহা দিয়া যান। সেই হইতে সেই স্থানের নাম এখনও চক-ভবানী বলিয়া চলিয়া আসিতেছে।”

ইহার পর হইতে চৌধুরীদের দ্রুত উন্নতি আরম্ভ হয়। যে সময় নাটোরের রাজ-সাধক রামকৃষ্ণের অনবধানতা ও কর্ম্মচারীদের বিশ্বাসঘাতকতায় অর্দ্ধবঙ্গব্যাপী বৃহৎ নাটোর রাজ্য ছিন্ন সতীদেহের মত খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতেছিল, যে সময় বাংলার অধিকাংশ বর্ত্তমান জমিদারের পূর্ব্বপুরুষ নাটোর-রাজের কাছারী হইতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে সহজে প্রবেশ করিবার খিড়কি-দ্বার আবিষ্কার করিতেছিলেন, সেই সময়ে উদয়নারায়ণও পাবনার অন্তর্গত নাটোরের একটা বৃহৎ জমিদারী নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করিয়া চৌধুরীবংশের লক্ষ্মীর পাকা বনিয়াদ স্থাপন করিলেন।

[৩]

ইহাই ইতিহাস। বিশ্বাস করিতে হয় কর, কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে বলি না। ইতিহাসের সেতু সত্য এবং মিথ্যা, অনুমান এবং প্রমাণ, কল্পনা এবং বাস্তব এই দুই স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান। বুঝিতে পারিলেও মিথ্যাকে বাদ দিবার উপায় নাই। যে স্ত্রীর সঙ্গে বনে না, তাহাকে লইয়াও যেমন ঘর করিতে হয়, যাহাকে জানিতেছ মিথ্যা, তাহাকেও সহ্য করিতে হইবে। আজ যে তুচ্ছ সামগ্রীকে উপেক্ষা করিতেছ, আগামী কল্য সে শোধ লইবে। আজ যাহার স্থান গো-শালাতেও নহে, কাল সে জ্ঞানের সিংহাসনে বসিবে। ইহাই ইতিহাসের উপাদান। গতকল্যকার তাম্রমুদ্রা আজিকার স্বর্ণমুদ্রার অপেক্ষা মূল্যবান্। ইতিহাসের জল-দেবতা লৌহ কুঠার দিয়া ঐতিহাসিককে সন্তুষ্ট করেন।

আরংজের বাদশাহ কর্ম্মচারীদের বিশ্বাস করিতেন না, কিন্তু তাহাদের দিয়া কাজ চালাইয়া লইতেন। ইতিহাসের তথ্যকে বিশ্বাস করিও না, যতক্ষণ কাজ চলে তাহাই যথেষ্ট। যাহাকে শিলালিপি মনে করিয়া বিরাট গ্রন্থ লিখিলে, হয় তো তাহার দ্বিতীয় সংস্করণে দেখা যাইবে, উহা শিলালিপি নয়, মশলা বাঁটিবার পাথর। যে-তারিখটাকে প্রাচীনতম মনে হইতেছে, তন্মধ্যে কয়টা অঙ্ক কীটের কারচুপিতে কে জানে! ইতিহাসের পট্টবস্ত্র সত্য-মিথ্যা, কল্পনা-বাস্তব, অনুমান-প্রমাণের টানা-পোড়েনে রচিত। ইহাকে লইয়া বেশি টানা-টানি করিও না, যতক্ষণ চলে, ব্যবহার করিয়া যাও।

বাংলার জমিদারদের উদ্ভবের ইতিহাস লইয়া গবেষণা না করাই শ্রেয়। আধুনিক জমিদারদের অধিকাংশের গোড়া-পত্তন মুসলমান রাজত্বের শেষে ও কোম্পানীর রাজত্বের প্রারম্ভের অরাজকতার গোধূলিলগ্নে। সে সময় ইহাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা কেহ চুরি করিয়াছে, কেহ ডাকাতি করিয়াছে, কেহ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, কেহ কৃতঘ্নতা করিয়াছে, সকলেই নিরীহ প্রতিবেশীকে জোর করিয়া ঠেলিয়া কোণঠাসা করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া বসিয়াছে। সাংসারিক উন্নতির মইখানার নীচের কয়েকটা ধাপ জঘন্য পঙ্কিল, একদিন সকলকেই সেখানে বিচরণ করিতে হইয়াছে। তারপর উঁচুতে উঠিয়া হাত পা ধুইয়া সকলে সম্ভ্রান্ত হইয়াছেন। তখন সকলে মিলিয়া একযোগে সেই কলঙ্কময় প্রাচীন দলিলখানাকে সাংসারিক রাজসূয় যজ্ঞে আহুতি দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। কেহ কেহ ইহাতেও নিঃসন্দেহ না হইয়া মুদ্রা-বিনিময়ে নূতন করিয়া ইতিহাস রচনা করাইয়া লইয়াছেন। বিনিময়ের যুগ বিগত হয় নাই, কেবল তাহা রূপ পরিবর্ত্তন করিয়াছে। হে করুণাময়ী বিস্মৃতি, তুমি তোমার অজ্ঞতার তিরস্করণী নিক্ষেপ করিয়া আজিকার রাজা-মহারাজাদিগকে সেই কলঙ্কের স্মৃতি হইতে রক্ষা করিয়াছ।

আমি এ পট উত্তোলন করিব না, সে ইচ্ছা নাই, এবং সে শক্তিও বোধ করি নাই। কেবল ইহার একপ্রান্ত ঈষৎ উত্তোলন করিয়া একবার ক্ষণকালের জন্য সেই যুগের দুই একটা আভাস দিতে চেষ্টা করিব। আমার কাহিনীর নায়ক-পরিবারের ইতিহাস বাংলার সমস্ত জমিদারদের ইতিহাসের স্বরূপ।

[৪]

জোড়াদীঘির চৌধুরীদের পূর্ব্বপুরুষ ডাকাতি করিত। এ বৃত্তি বন্ধ হইবার এক করুণ ইতিহাস আছে। রাজসাহী

ও পাবনা জেলার মধ্যে অতি বিস্তৃত এক বিল আছে, লোকে ইহাকে চলনবিল বলে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বর্ষাকালে এই বিল সমুদ্রের ভীষণতা প্রাপ্ত হইত, এখন বিল শুকাইয়া গিয়াছে, তবু তাহা অতিক্রম করিতে একদিনের বেশি সময় লাগে। এই বিস্তৃত জলাকার ভূখণ্ড দিয়া দুইটি নদী গিয়াছে, আত্রাই ও বড়ল। বিল অতিক্রম করিয়া দুই নদী এক হইয়া যমুনায় গিয়া পড়িয়াছে।

বিল প্রকৃতির অরাজকতা। মাটি ও জল পুরাণের গজ-কচ্ছপের মত এখানে পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া পড়িয়া আছে। বর্ষাকালে জলের সীমা মাটি গ্রাস করিয়া ফেলে, গ্রীষ্মকালে মাটির রেখা জলকে শোষণ করিতে থাকে, বারমাস ইহাদের অনিয়ত চাঞ্চল্য। এই জলময় ভূখণ্ড হইতে বিশ্বকর্ম্মা পৃথিবী গড়িয়াছে, তারপর ইহাকে ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে। ইহা পৃথিবীর উপাদান, কিন্তু পৃথিবীর নিয়ম এখানে নাই। তাই বলিতেছিলাম, প্রকৃতির অরাজকতা বিল। না খাটে এখানে ডাঙার নিয়ম, না খাটে জলের, ইহা প্রকৃতির প্রত্যন্ত প্রদেশ। এখানে বিনা মেঘে ঝড় ওঠে, বিনা ঝড়ে নৌকা ডোবে। দিনের বেলা অন্ধকার হইতে বাধা নাই, আবার রাত্রিকাল শত শত আলোর শিখায় উজ্জ্বল। মাটি ও জল দুইই বিশ্বাসঘাতক, পরস্পরকে তাহারা বিশ্বাস করে না, অজ্ঞেরও বিশ্বাস ভঙ্গ করে। শক্ত মাটি আপাদমস্তক গ্রাস করে, ঘোলা জলে থই পাওয়া যায় না। স্রোতহীন জলের মোড় ফিরিতেই তীব্র স্রোতের টান ; এক রাত্রির মধ্যে কোথা হইতে প্রলয়ের বন্যা আসিয়া পাকা ফসল নাশ করিয়া চলিয়া যায়। কালো জল, ঘোলা জল, শাদা জল ; দৃঢ় মাটি, নরম মাটি, কাদামাটী। জল এখানে বোবা, মাটি এখানে অন্ধ। একজন শুনিতে পায় না, একজন দেখিতে পায় না। দুই জনই ভীষণ।

প্রকৃতির এই অরাজকতা মানুষের আদিম বর্ব্বরতাকে টানিয়া বাহির করে। বিলের মানুষকে বিশ্বাস করিও না। যাহারা বিলে যাতায়াত করে, তাহারাও ক্রমে ভীষণ হইয়া ওঠে। প্রকৃতি ও মানুষ এখানে সহকর্ম্মী। নিরীহ যাত্রীকে মানুষের বর্ব্বরতা তাড়া করিয়া মারে, প্রকৃতির বর্ব্বরতা তাহাকে পলায়নের পথে বাধা দেয়। মানুষ সুযোগ খোঁজে, প্রকৃতি রাত্রি আনিয়া দেয়। তাড়া করিবার জন্য মানুষ পাল তুলিয়া দেয়, প্রকৃতি তাহা ফুৎকারে ফুলাইয়া তোলে। মানুষ নৌকা লইয়া বসে, প্রকৃতি জলে স্রোত সঞ্চার করে। মানুষ খুন করে, প্রকৃতি অগাধজলতলে সে মৃতদেহ লুকাইয়া রাখিয়া দেয়। মানুষ ও প্রকৃতি জগাই মাধাইএর মত এখানে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া বাস করিতেছে।

[৫]

এই চলনবিলে রাজসাহী পাবনা অঞ্চলের বহু লোকে ডাকাতি ব্যবসা করিত। তার মধ্যে বহু জমিদারবংশের পূর্ব্বপুরুষ ছিল। তাহাদের দশটা ব্যবসায়ের মধ্যে ইহাও একটা ব্যবসায়, একমাত্র ব্যবসায় নয়।

ডাকাতের ভয়ে রাত্রে কেহ চলনবিলের মধ্য দিয়া যাইত না। দিনের বেলাতেও একাকী যাওয়া নিরাপদ ছিল না। বিলের পূর্ব্ব প্রান্তে সারারাত্রি নৌকা আসিয়া জমিত, ভোর বেলা দশ বিশখানা একত্র হইলে বিল অতিক্রম করিত। কিন্তু, ডাকাতদের প্রতাপ এতই বাড়িয়া উঠিল যে, তাহারা বিলের প্রান্তে গিয়াও লুটপাট করিতে দ্বিধা করিত না।

এক এক ডাকাতের সর্দ্দারের অধীনে বিশ পঁচিশখানা নৌকা থাকিত। ছিপ নৌকা, ডিঙি নৌকা, বড় বড় বজরা। কাহারো দলে একশ, দুইশ, তিনশ নৌকা। বন্দুক, বর্শা, লাঠি, শড়কি, বল্লম, এমন কি তীর-ধনুক পর্য্যন্ত ছিল। ঢাল-তলোয়ার ডাঙাতে লড়াই করিবার জন্যই বেশি ব্যবহার হইত। আমাদের চৌধুরীর অধীনে প্রায় আড়াইশ লোক ছিল, পঁচিশ খানা নৌকা। ডাকাতি করিয়া সে ন্যূনকল্পে দু'তিন হাজার নৌকা ডুবাইয়া দিয়াছে, বহুহাজার টাকা নগদ ও দ্রব্যমূল্যে পাইয়াছে, খুন-জখমও কোন্ না দু' তিনশত করিয়াছে।

তখন কার্ত্তিক মাস। এই সময়টাতেই ডাকাতির মরসুম। পূজার পরে শীতের প্রারম্ভে লোকজনের চলাচল বেশি হয়, ডাকাতদেরও সুযোগ আসে। চৌধুরীর বড় আদরের কন্যা পূজার পূর্ব্বে বাপের বাড়ী আসিতে পারে নাই। কন্যা সংবাদ পাঠাইল, পূজার পর আসিবে। চৌধুরী রাগ করিয়া খবর দিল, আসিবার প্রয়োজন নাই। কন্যা উত্তর পাইয়া স্বামীসহ বাপের বাড়ী যাত্রার দিন স্থির করিল। চৌধুরী প্রত্যুত্তর না পাইয়া বুঝিল কন্যা-জামাতা সশরীরে উত্তর

আনিবে। চৌধুরী কন্যা-জামাতার আদর-অভ্যর্থনার ব্যবস্থার জন্য ব্যবসায়ক্ষেত্রে যাত্রা করিল।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় বিলের পূর্ব্বপ্রান্তের গ্রামের ঘাটে কয়খানি নৌকা আসিয়া লাগিল। একখানা বজরা, তিন খানা পান্‌সী। রাত্রে বিল পাড়ি দেওয়া উচিত নয় মনে করিয়া আরোহীরা সেখানে নিশাযাপন স্থির করিল। আলো নিভাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িবার আগে একজন মাঝি অপরকে উদ্দেশ করিয়া বলিল,—রহিম একটু সজাগ থাকিস্।

রহিম বলিল—এখানে সে সব ভয় নাই, আল্লার নাম কর ভাই।

অন্ধকার রাত্রে চারখানা নৌকার আরোহীরা ঘুমাইয়া পড়িল।

গভীর রাত্রে কিছু দূরে কয়েকখানা ছিপনৌকা দেখা গেল। আরোহী অনেক, কথাবার্ত্তা অস্পষ্ট। মাঝে মাঝে দু'চারটা কথা বুঝা যাইতেছিল।

অতটা সাহস ভাল নয়, একেবারে গাঁয়ের ঘাটে গিয়ে।

আর একজন বলিল, কিন্তু মাল ভাল ছিল রে।

পূর্ব্বের কণ্ঠ বলিল, তবে এক কাজ কর সাঁতরে গিয়ে বজরাখানার কাছি কেটে দে, সোঁতে ভেসে আসুক।"

কি বলেন কর্ত্তা?

কর্ত্তা ভিতর হইতে গম্ভীর স্বরে বলিলেন—তাই কর।

তখন একজন লোক অন্ধকারে সাঁতার দিয়া চলিল, ক্ষিপ্র হাতে বজরার কাছি কাটিয়া দিল, বজরা ঘাট হইতে ভাসিয়া ছিপনৌকাগুলির মধ্যে আসিয়া পড়িল।

বজরার আরোহীরা তখনও নিদ্রিত। একজন ডাকাত কুড়ুলের আঘাতে বজরার তলায় ছিদ্র করিতে লাগিল। সেই শব্দে মাঝিদের মধ্যে একজন জাগিয়া উঠিয়া ডাকিল—রহিম। অধিক কথা সে বলিতে পারিল না। পিছন হইতে উদ্যত তলোয়ারের ঘায়ে তাহার ছিন্নমুণ্ড ঝপ করিয়া জলে পড়িল। খণ্ডিত দেহটা ধপ করিয়া বজরার পাটাতনের উপরে পড়িয়া গেল। অপর একজনের তলোয়ারের ঘায়ে ঘুমন্ত রহিম আর জাগিবার সুযোগ পাইল না।

বজরার ভিতরে আরোহীরা তখনো নিদ্রিত। তখন কর্ত্তা একজন অনুচরকে বলিল—তুই হাতিয়ার নিয়ে আমার সঙ্গে আয়। তাহার নিজের হাতে তলোয়ার। দুই জন নীরবে বজরায় উঠিল, দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। অন্ধকারে অনুমান হইল, আরোহী মাত্র দুই জন, একটি রমণী, একটি পুরুষ। বজরার অবস্থা দেখিয়া মনে হইল আরোহীরা ধনী। কর্ত্তার মন খুসি হইয়া উঠিল। সে আর অধিক বিলম্ব অনুচিত মনে করিয়া ক্ষিপ্র অসির আঘাতে সুপ্ত পুরুষের কণ্ঠ ছিন্ন করিয়া ফেলিল। মেয়েটিকে কি করা যায় ভাবিতেছে, ইতিমধ্যে রমণী বোধ করি রক্তেরই সিক্তস্পর্শে নিমেষের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়া হাতের কাছে রক্ষিত দীপটি জ্বালিয়া ফেলিল। সেই দীপালোকে দেখিতে পাইল পাশেই ছিন্নকণ্ঠ স্বামী, আর সম্মুখে রক্তাক্ত তলোয়ার হাতে তাহার পিতা। সেই রক্তপ্রতিফলিত দীপালোকে পিতাপুত্রী নিমেষের জন্য নিষ্পলক নেত্রে দুইজনকে দেখিল। নিমেষান্তে কন্যা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিল না। চৌধুরী টলিতে টলিতে বাহিরে আসিল, তাহার অসাড় দেহ শিলাখণ্ডের মত সশব্দে নদীর জলে পড়িয়া গেল।

নদীর যে স্থানে এই কাণ্ডটা ঘটিয়াছিল, আজও তাহা মেয়ে-জামায়ের দহ নামে পরিচিত। আর যে-ঘাট হইতে বজরার কাছি কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সে ঘাটকে লোকে কাছিকাটা বলে।

আজ আর সেখানে ডাকাতের ভয় নাই। বিল শুকাইয়া গিয়াছে, দু' তীরে বড় বড় গ্রাম বসিয়াছে, হাট লাগিয়াছে; রাতের বেলা নিঃশব্দ নৌকা নির্ভয়ে চলিয়া যায়। অন্য কোন ভয় নাই, কেবল মেয়ে-জামায়ের দহের কাছে বহু পূর্ব্বেকার এই করুণ ঘটনা স্মরণ করিয়া তাহারা শিহরিয়া ওঠে।

[৬]

এই নিদারুণ ঘটনার পর হইতে চৌধুরীরা ডাকাতি ব্যবসায় ছাড়িয়া দিল। তখন হইতে তাহাদের মন জমিদারীর উপরে পড়িল। প্রথমে তাহারা জোড়াদীঘির বাড়ী-ঘরের উন্নতি আরম্ভ করিল। চৌধুরীবংশের ইতিহাসে এই যুগটাকে ইট-পাথরের যুগ বলা চলে।

জোড়াদীঘির সদর রাস্তা হইতে পথিকের চোখে আম-বাগানের উপর দিয়া চৌধুরীদের চারতলা অট্টালিকা চোখে পড়ে। কৌতূহলী পথিক অগ্রসর হইলে দেখিতে পায় প্রায়

দশ বিঘা জমির উপরে চৌধুরীদের চকমিলান প্রকাণ্ড প্রাসাদ। বলা বাহুল্য, এত বিরাট বাড়ী একদিনে তৈয়ারী হয় নাই। এ বাড়ীর ইতিহাস প্রকারান্তরে চৌধুরীদেরই ইতিহাস। শামুকের খোলটা যেমন তাহার পক্ষে অবান্তর নয়, আবরণ; মানুষের পক্ষেও তেমনি তাহার বাড়ী-ঘর। উহা তাহার বর্ত্তমানের সঙ্গী এবং অতীতের সাক্ষী।

মানুষ যে পরকালে বিশ্বাস করে, অট্টালিকাই তাহার প্রমাণ। শুধু বিশ্বাস নয়, সে পরকালকে ভয় করে। কালের মত প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে সে পিরামিডের মত শক্তিমান্ মল্লকে দাঁড় করাইয়াছে। হস্তিনাপথের বিশাল প্রান্তর ব্যাপিয়া সাত সাতটা দিল্লীর ধ্বংসস্তূপ মহাকালের রাজপথের পার্শ্বে ধূলিমলিন অধ্বশিলাখণ্ডের মত পড়িয়া আছে। মানুষ ঐ টুকুই পারে। জীবনকে চিরস্থায়ী করিবে এমন শক্তি তাহার নাই, কোন রকমে জীবনের স্মৃতিটাকে বাঁচাইয়া রাখিতে সে চেষ্টা করে।

জোড়াদীঘির বিশাল প্রাসাদপুরী চৌধুরীদের ইতিহাসের স্বরূপ। ইহা চৌধুরীদের উন্নতির সঙ্গে গড়িয়া উঠিয়াছে, আবার ইহার ধ্বংসস্তূপের সোপান বহিয়াই চৌধুরী পুরলক্ষ্মী বহুকাল পরে এই বাড়ী ত্যাগ করিয়াছেন। ইহার প্রাচীনতম অংশ ধ্বংসপ্রায়; কারণ তাহা ছিল মাটি ও কাঁচা ইটের ব্যাপার। চৌধুরীরা তখন সামান্য জোতদার মাত্র। বাড়ীর এই অংশটা এখন লতাপাতা, আবর্জ্জনা ও বিস্মৃতির তলে বিলুপ্ত। দুঃখের দিনের ইতিহাস মানুষ মাঝে মাঝে মনে করে, হয় তো তাহাতে আনন্দও পায়, কিন্তু নগণ্যতার ইতিহাস সকলেই ঢাকিয়া রাখিতে চায়।

এই প্রাসাদপুরীর নবীনতম অংশটার ইতিহাসে কোন নূতনত্ব নাই, কারণ সে দেশে কোম্পানীর কাগজের মসৃণ পথ বাহিয়া যাওয়া চলে। এই দুই কালের মধ্যবর্ত্তী পূর্ব্বে যে অংশটা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বৈচিত্র্য আছে। সে প্রাসাদে চৌধুরীদের বহু কাল কাটিয়াছে,এখন তাহার কাহিনী কৌতূহলীর কাজে লাগিবে।

তখন চৌধুরীদের রক্তে কিছু গড়িয়া তুলিবার অনির্দ্দিষ্ট একটা আকুতি ছিল, কিন্তু গড়িবার মত উপকরণের সামর্থ্য ছিল না। তাহারা একটা বড় বংশ গড়িয়া তুলিল, আর গড়িয়া তুলিল সেই বংশের দৃঢ় প্রতিষ্ঠার জন্য এই প্রাসাদের ভিত্তি।

রাজশাহীর কিছু পূর্ব্বে চারঘাটের নিকটে পদ্মা নদীতে বড়ল নদের মুখ। বড়ল পদ্মা হইতে বাহির হইয়া জোড়াদীঘির তল দিয়া রাজশাহী ও পাবনা জেলার অধিকাংশ অতিক্রম করিয়া গোয়ালন্দের কিছু উজানে যমুনা নদীতে পড়িয়াছে। যখনকার কথা বলিতেছি, তখন যমুনা নদী বর্ত্তমান স্থানে ছিল না, খুব সম্ভব বড়ল আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া একেবারে পদ্মায় পড়িত। এখন বড়ল সামান্য একটা শুষ্ক নদী, বর্ষার সময়ে জল থাকে, অন্য সময়ে শুষ্ক বা স্বল্প জল। রেনেল সাহেবের অঙ্কিত মানচিত্রে দেখা যাইবে, উহা গভীর নীল বর্ণে চিত্রিত। এখন উহাতে যাহা কিছু নীলিমা তাহা কচুরীপানার প্রাচুর্য্যে। চৌধুরীদের উন্নতির সময়ে পদ্মার পরে এত বড় নদী আর এ অঞ্চলে ছিল না। ব্যবসায়-বাণিজ্য ছাড়া এ নদীপথের-একটা রাজনৈতিক দায়িত্বও ছিল। মুর্শিদাবাদ হইতে ঢাকার মধ্যে এই নদীর পথটাই হ্রস্বতম। নবাবী ফৌজ বড়লের তীর দিয়া যাতায়াত করিত; নবাবী পল্টনের বড় বড় বজরা এই পথেই মুর্শিদাবাদ হইতে ঢাকা যাইত।

এই পথে বড় বড় চূণের নৌকা, ইট-পাথরের নৌকা যাইত। জোড়াদীঘির ঘাটে যাহারা রাত্রি যাপন করিত, পরদিন তাঁহাদিগকে কেহ আর দেখিতে পাইত না; ইট. কাঠ, পাথর চৌধুরীদের দালানের কাজে লাগিত। শেষে জোড়াদীঘির দুর্নাম রটিয়া গেল। রাত্রে সে ঘাটে আর কাহারও নৌকা ভিড়িত না। চৌধুরীরাও রাত্রের যবনিকা সরাইয়া দিনের আলোতে দুঃসাহসী রূপে দেখা দিল। তাহারা চূণ-সুরকীর দাম করিত, জিনিষ বাড়ীতে আনিয়া মালিককে খেদাইয়া দিত। শেষে এমন হইল, জোড়াদীঘিতে কেহ জিনিষ বেচিবার জন্যও নৌকা লাগাইত না। অগত্যা চৌধুরীরা নৌকা লইয়া নৌকা আক্রমণ করিত। জিনিষপত্র মাঝিমাল্লা শুদ্ধ নৌকা ডাঙায় টানিয়া তুলিত। একবার কয়েকখানা নৌকা ধরা পড়িল, মাঝিমাল্লাও অনেক ছিল। জিনিষপত্র কাড়িয়া লওয়াতে তাহাদের দুঃখিত দেখিয়া চৌধুরীরা তাহাদিগের রাজমিস্ত্রীর কাজ করিতে লাগাইয়া দিল। চৌধুরীবাড়ীর সে দালানটাকে লোকে আজও "বেগারের দালান" বলে। বড় বড় ভূমিকম্পে চৌধুরীবাড়ীর সকল দালান ধ্ব-

ফাটিয়াছে, কিন্তু বিস্ময়ের এই যে, বেগারের দালানে একটিও ফাটল ধরে নাই।

অবশেষে চৌধুরীদের অত্যাচারে বড়ল নদীতে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হইল। তারপরে মুর্শিদাবাদের গুরুত্ব কমিয়া গেল, ক্রমে রাজধানী কলিকাতায় সরিয়া গেল; এবং বড়ল নদীও শুকাইয়া আসিতে লাগিল।

কিন্তু, ইতিহাসের ও ভূগোলের এই কয়েকটা বড় বড় পট-পরিবর্ত্তনের মধ্যে চৌধুরীদের অট্টালিকা একতলা হইতে চারতলায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল; তাহাদের ইতিহাসের ইট-পাথরের যুগ শেষ হইয়া স্বর্ণ-রৌপ্যের পর্ব্ব আরম্ভ হইল।

[৭]

এখন যেখানে নাটোর সহর, তিন শত বৎসর পূর্ব্বে সেখানে প্রকাণ্ড বিল ছিল। খৃঃ সপ্তদশ শতকের শেষে নাটোর বংশের আদিপুরুষ রঘুনন্দন এখানে তাঁহার বিস্তৃত রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার জমিদারীকে রাজ্য বলাতে দোষ নাই, কারণ তৎকালে বাংলাদেশের প্রায় অর্দ্ধ-ভাগ নাটোরের রাজাদের অধীনে ছিল। এখানে রাজধানী স্থাপনের কারণ কি জানি না। তবে বোধ করি, উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গেই নাটোরের জমিদারি অধিক ছিল, কাজেই উত্তর-বঙ্গের কোন্ একটা স্থানে রাজত্বের ভারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার আবশ্যক হইয়াছিল। বিশেষ এই বিলের মধ্যে বাহির হইতে আক্রমণের আশঙ্কা কম ছিল। বিলের মধ্যে অপেক্ষাকৃত একটা উচ্চভূখণ্ডে প্রাসাদ নির্ম্মিত হইল, তাহাকে বেষ্টন করিয়া তিনটি গভীর পরিখা কাটা হইল। এই পরিখাত্রয় অতিক্রম করিবার একটি মাত্র পথ, তাহার দুই দিকে কামান সজ্জিত। পরিখার চারিদিকে রাজবাড়ী ঘিরিয়া সহর গড়িয়া উঠিল; কর্ম্মচারী, সৈন্য, দোকানদার ও ব্যবসায়ী লোক। নাটোরের সৈন্যশক্তি তখন নবাবের আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল। ভূষণার দুর্দ্দান্ত সীতারামকে পরাজিত করিয়াছিল, নাটোরের দেওয়ান দয়ারাম রায়। পরবর্ত্তী কালে বর্গীর উৎপাতে সমস্ত বঙ্গদেশ যখন উদ্ভ্রান্ত, নাটোর রাজ্য তখন নিরাপদ, স্বয়ং আলিবর্দ্দী পরিজনবর্গকে নিরাপদে রাখিবার জন্য নাটোর রাজ্যের এক স্থানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

আজ সে নাটোর নাই। কিন্তু, নাটোরের দোষ কি! বোধ করি, সে বাংলা দেশও নাই। নাটোরের রাজারা এখন সামান্য জমিদার; নাটোরের প্রাসাদ ম্লান; পুরাতন পরিখা-ত্রয়ের মধ্যে একটা মাত্র আছে, তাহার প্রশ্বাসিত বিষবাষ্প ঘরে ঘরে ব্যাধি বিস্তার করিয়া ফেরে। দু'একটা কামান আজ মৃত অজাগরশিশুর মত পরিখার ধারে পড়িয়া আছে।

আমাদের পরিচিত এক ব্যক্তি বলিত, নরক দেখি নাই, কিন্তু নাটোর দেখিয়াছি। বোধ করি তাহার এ উক্তি মিথ্যা নয়। ব্যাধি, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, কদাচার, অত্যাচারে নাটোরের বায়ুমণ্ডল ম্লান। যে যুগটা বাংলা দেশের অন্যত্র হইতে অপসারিত, তাহারই খানিকটা অন্ধকার যেন এখানকার সূর্য্যালোককে মলিন করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু, নরকেও সৌন্দর্য্য আছে, কেবল দেখিবার চোখ নাই। নাটোরেও সৌন্দর্য্য আছে, সৌন্দর্য্য না থাকুক, ইতিহাসের চিহ্ন আছে; বিগত যুগের চিহ্ন, স্বাধীন যুগের চিহ্ন, দুঃখদিনের দীর্ঘ গোধূলি আলোয় স্বর্ণায়িত হইয়া যখন চোখে পড়ে, তাহার অপেক্ষা অধিক সুন্দর আর কি আছে! রাজপ্রাসাদের ভগ্নস্তূপের ধারে, পরিখার অনধিগম্য কোনও কোণে পুরাতন যুগের এক আধটা স্খলিত লগ্ন হয়তো পড়িয়া থাকিলে থাকিতে পারে, কিছুই অসম্ভব নহে!

নাটোর হইতে ছয় ক্রোশ পূবে জোড়াদীঘি গ্রাম। জোড়াদীঘির উত্তরে একটা বিল, অপর তিন দিকে বড়ল নদী ঘিরিয়া থাকিয়া ইহাকে শত্রুর আক্রমণের অতীত করিয়া রাখিয়াছে। আমরা যে যুগের কথা বলিতে যাইতেছি, সে কালে লোকে বাসস্থানের নিরাপত্তার দিকেই প্রথমে মনোযোগ দিত।

জোড়াদীঘি অতি প্রাচীন গ্রাম। কথিত আছে, রাজা শ্যামলবর্ম্মা এখানে কয়েক ঘর বৈদিক ব্রাহ্মণকে বাস করাইয়াছিলেন। কিন্তু, গ্রামের প্রকৃত উন্নতি চৌধুরীর আবির্ভাবের সময় হইতে, সে প্রায় চারিশত বৎসরের কথা।

চারি শত বৎসরের মধ্যে এই অঞ্চলের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। হয়তো নদী খানিকটা শুকাইয়াছে, বিলের মধ্যে মানুষের বসতি হইয়াছে, এই মাত্র। হাজার বছরের মধ্যেও কোনো পরিবর্ত্তন হয় নাই। বিস্তৃত বিলের ধারে মাঠের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলে আজ যাহা দেখা যায়, বোধ করি

হাজার বছর পূর্ব্বেও তাহাই দৃষ্ট হইত। দূরে একটা রাখাল, এক পাল গোরু; বিলের জলে পদ্ম, জলের ধারে বক; সম্মুখে একটা বটগাছ, বটগাছে এক ঝাঁক পাখী; আকাশে মেঘ, দিগন্তে কুহেলিকা, আর সারা মাঠ ভরিয়া শরবন, বেনা বন, চোরকাঁটা আর শ্যামল তৃণ।

ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন, সাড়ে পাঁচ হাজার বছর পূর্ব্বে না কি এই অঞ্চল দিয়া ব্রহ্মপুত্র নদী প্রবাহিত হইত। তাঁহারা মাটির তলায় কর্দ্দমস্তরে তাহার অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছেন। কিন্তু, আমাদের সে কথা কেমন মনে লাগে না। ঐ যে রাখাল আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখা-না-দেখার প্রান্তে কাঁপিতেছে, কোনো দিন সে যে এখানে ছিল না, তাহা আমরা ভাবিতে পারি না। আমরা এক বড় বংশের উত্থান-পতনের কাহিনী বর্ণনা করিতে যাইতেছি। বংশের উত্থান-পতন আছে, সভ্যতার সৃষ্টি ধ্বংস আছে, কিন্তু নিছক মানুষটা ঐ রাখালের মধ্যে চিরকাল বিরাজ করিতেছে। কিম্বা সত্যই হয়তো একদিন মানুষ ছিল না। মানুষ অনন্তকালের ধারণা প্রকৃতির অনন্তকাল নয়। মানুষ সান্ত্বনার জন্য নিজের ক্ষুদ্র স্মৃতির মানদণ্ডের অনুপাতে একটা অনন্ত কালের সৃষ্টি করিয়াছে। তাহার খ্যাতি, স্মৃতি, সভ্যতাকে যখন সে অনন্তকালব্যাপী মনে করে, তখন সে কাল প্রকৃতির নয়, মানুষের সৃষ্ট অনন্ত কাল। একদিন আসিবে, যখন তাহার সৃষ্ট অনন্ত সমাপ্ত হইয়া যাইবে, তখন অপরিমেয় তুষারস্তূপের তলে ঐ রাখাল-বালকের অস্থি আর প্রবলপ্রতাপান্বিত চৌধুরীবংশের অস্থি একত্র সমাহিত হইয়া যাইবে। তখনো নিঃসপত্ন প্রকৃতির অনন্তকাল অধীর তর্জ্জনী স্থাপন করিয়া এই মাঠের মধ্যে মানবহীন নির্জ্জনতায় নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবে।

[ক্রমশঃ

তাহাদের ক'র আশীর্ব্বাদ

—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

যারা আজ ভুলে গেছে ঋষিদের মহা-মন্ত্র, কুশিক্ষায় মাতি'—
সংসারে দিয়াছে তুলি শ্মশানের চিতাবক্ষে; কলঙ্কের স্রোতে
ভেসে যায় প্রতিদিন; এ জাতির ভাগ্যাকাশে চির-অমারাতি
যাহাদের অত্যাচারে ঘনাইয়া আসে আজি; নানা দিক্ হ'তে
কুড়ায়ে নিয়াছে যারা নিখিলের অভিশাপ; মোহিনী মায়ায়
আঁখিবাণে বিদ্ধ করি প্রেমের পথিক-হৃদি অতি সংগোপনে,
রঙ্গ করে রঙ্গময়ী, সমাজ-বাঁধন ভাঙি ছুটিয়া পালায়
আলেয়ার পিছু পিছু; আপনারে শ্রেষ্ঠ ভাবে গর্ব্বোদ্ধত মনে,
বিপ্লবের গান গাহি' আনন্দেতে পাশ্চাত্যের অবিদ্যা লভিয়া
কলুষিত করে দেশ; হে ঈশ্বর! তাহাদের তুমি কর ক্ষমা,
তুমি জান, ভারতেরে গড়িয়াছে আর্য্যনারী যে শক্তি সঁপিয়া
সৃষ্টির প্রথম প্রাতে, সে শক্তি নাহি ক' আজ। নাহি সেই রমা,
গার্গী-খনা-লীলাবতী-সতী-সাবিত্রীর জ্যোতি এ দেশের মাঝে;
কৃত্রিম কদর্য্য-পন্থা করিতেছে অন্বেষণ অধুনা যাহারা,
স্বজনের বক্ষে হানে শাণিত ছুরিকা তীক্ষ্ণ, শেলসম বাজে
যাহাদের উগ্রবাক্য, যাদের নিঃশ্বাসে সিন্ধু শুকায়ে সাহারা
মরুভূ হইয়া যায়; যাদের জীবন-গতি অতীব অদ্ভুত,
চাহে না গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম, চাহে না জননীরূপে দাঁড়াইতে দেশে,
সন্তানে পীযূষ দিয়া, অর্দ্ধনগ্ন তনু হ'তে রূপের বিদ্যুৎ
তরুণ নয়নপানে নিক্ষেপ করিছে নিত্য উর্ব্বশীর বেশে।
সন্তানক সম নহে স্নিগ্ধ শ্যামছায়াতল চির সুশোভিত,
হৃদে নাহি স্বর্গদ্যুতি, কমল আননে আর নাহি মাধুরিমা,
কলা-কেলি নৃত্যরত্য,—বিলাস-ভবনে যারা হয়ে' উপনীত
আত্মদান করিতেছে, যুগের সাহিত্যে শুনি যাদের মহিমা,
হে ঈশ্বর, তাহাদের ক্ষমা ক'র; স্বার্থ-মগ্না আধুনিকা সবে;
কহিবে উন্মাদ আমি মর্ম্মদাহী কথাগুলি লাগিবে না ভাল,
তবুও শুনাতে চাই আমার প্রাণের কথা বজ্র-ভীম রবে;
তোমারে জানাতে চাই হে ঈশ্বর! ভারতের বক্ষে তুমি জ্বালো,
অতীতের স্বর্গদীপ জাতির জীবনমাঝে। তুলসী-তলায়
আজো যারা দেয় ঝারি কমলাকল্যাণীরূপা শির নত করি'
তোমার চরণতলে, আজো যারা ব্রত করি' পাষাণ গলায়
ভক্তির সলিল ঢালি, যাহারা রয়েছে আজো হয়ে শতনরী
জননীর কণ্ঠদেশে, হে ঈশ্বর! তাহাদের কর আশীর্ব্বাদ;
তাহাদের গর্ভ হ'তে সাঙ্গোপাঙ্গ সনে এস করি কম্বুনাদ।

শিক্ষাবিস্তারে নব অভিব্যক্তিবাদ

[ডারউইনের থিয়োরি অব ইভল্যুসনের অনুপ্রেরণায় অঙ্কিত]

হাতেখড়ি

ফার্স্ট বুক

কলেজ

ডিগ্রীলাভ
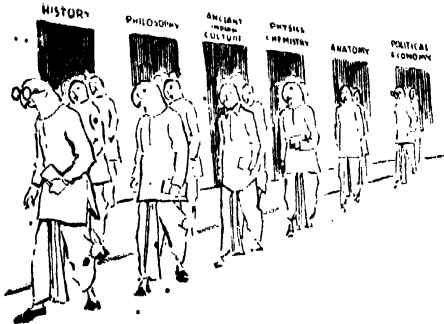
[শিল্পী—শ্রীপ্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি সত্যেন্দ্রনাথ

১৮৮২—১৯২২

-শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বাঙ্গালা কাব্যের ক্ষেত্রে এ যুগের যে কয়জন কবি চিরকালের জন্য স্মরণীয় হইবার দাবী করিতে পারেন, সত্যেন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই তাঁহাদের এক জন। চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে এই আষাঢ় মাসেই সত্যেন্দ্রনাথ পরলোকগমন করেন। ইহারই মধ্যে তাঁহার স্মৃতি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। এই প্রবন্ধ তাঁহার বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতির তর্পণোদ্দেশ্যে লিখিত ; ইহার মধ্যে কেহ সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার সম্পূর্ণ পরিচয়ের প্রত্যাশা করিবেন না।

[১]

রবীন্দ্র-যুগের কবিগণের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছেন। এই লোকপ্রিয়তার অন্যতম কারণ তাঁহার বিচিত্র ছন্দোঝঙ্কার। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যে শ্রেণীর ভাবুকতার সাক্ষাৎ পাই, সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় তাহা নাই। কিন্তু, তাঁহার কবিতার কোমল শব্দ-মাধুর্য্য, কল্পনার লঘুলীলা ও ছন্দের নৃত্যবিলাস অতি মনোরম।

চিত্র, সঙ্গীত ও ভাবুকতা এই তিনটি কবিত্বের পক্ষে পরম প্রয়োজনীয় উপাদান। কিন্তু বিষয় ও কবিপ্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য অনুসারে এই তিনের পরিমাণে তারতম্য ঘটে। কোনও লেখা চিত্রপ্রধান, কোনটি সঙ্গীতপ্রধান, আবার কোনটি বা ভাবপ্রধান হইয়া পড়ে।

সত্যেন্দ্রনাথের রচনা চিত্র ও সঙ্গীতপ্রধান। ভাবাত্মক রচনায় তিনি প্রায়ই সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই।

[২]

ছন্দ-সম্রাট্ আখ্যা লাভ করিলেও সত্যেন্দ্রনাথের কবিত্ব কেবলমাত্র ছন্দের উপরই নির্ভর করে না। তিনি সুনিপুণ চিত্রকর। ভাষা-চিত্রে এরূপ নৈপুণ্য সচরাচর দেখা যায় না।

'তুলির লিখনে'—অপ্সরী 'বিদ্যুৎপর্ণা' বলিতেছে—

"মেঘের ও পিঠে শুয়ে
ধরণীরে দেখি নুয়ে।"

দুইটি ছত্রে কি অপরূপ একটি চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে! মেঘের বিছানায় শুইয়া সুন্দরী অপ্সরী নতমুখে ধরণীর পানে চাহিয়া দেখিতেছে,--এই ছবিখানি মুহূর্ত্তের মধ্যেই মনকে মুগ্ধ করিয়া ফেলে।

আবার 'চিত্রশরৎ' কবিতায়

"হাওয়ার তালে বৃষ্টিধারা সাঁওতালী নাচ নাচতে নামে
আব্ছায়াতে মূর্ত্তি ধরে হাওয়ায় হেলে' ডাইনে বামে ;
... .
দিঘির জলে কোন্ পোটো আজ আঁশ ফেলে কী নক্সা দেখে,
শোল্-পোনাদের তরুণ পিঠে আল্পনা সে যাচ্ছে এঁকে!"

ছত্র কয়টিতে শরৎকালীন বর্ষাদৃশ্য অপরূপ সৌন্দর্য্যে আঁকা হইয়াছে। "ভাদ্রশ্রী", "চিত্রশরৎ", "সিঙ্গলে সূর্য্যোদয়", "পুষ্পের নিবেদন" প্রভৃতি কবিতা মনের পাতায় যে ছবি আঁকিয়া যায়, তাহা কখনও মুছিবার নহে।

[৩]

বিস্ময়-বোধই কবিতার উৎস এবং এই বিস্ময়রস সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে সুপ্রচুর। শিশুর মত কৌতূহলী মন লইয়া তিনি জগতের পানে চাহিয়াছেন, এবং যাহা কিছু তাঁহার চোখে পড়িয়াছে, তাহাতেই মুগ্ধ হইয়াছেন। কবিমনের ইহা একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী। অপূর্ব্ব আনন্দে তিনি 'চরকার ঘর্ঘর' শব্দে কান পাতিয়াছেন, 'পিয়ানোর টুংটাং' শুনিয়া মস্গুল্ হইয়াছেন, শীতের ভোরে 'তাতারসির গান' গাহিয়াছেন, আবার পাল্কীবেহারার সাথে দূরের পথে বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিয়াছেন। সংসারের প্রত্যেক খুঁটিনাটি জিনিষের মধ্যে চিত্র-সৌন্দর্য্যের ও গীতি-মাধুর্য্যের সন্ধান তাঁহাকে আনন্দদান করিয়াছে।

শিল্পী মাত্রেরই চোখে মাখানো থাকে বিস্ময়ের অঞ্জন। কেহ মানবমনের রহস্যে, কেহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে, কেহ অতীন্দ্রিয়ের ধ্যানে, কেহ বা অলৌকিক কল্পনায় এই বিস্ময় প্রকাশ করেন। সত্যেন্দ্রনাথ সহজ সৌন্দর্য্যের ভক্ত, সরল কল্পনার কবি। শিশুর রূপ-চপল মন লইয়া উৎসুক দৃষ্টিতে তিনি মাঠে ঘাটে, পাহাড়ে বনে, পথে-অপথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন ; গভীর চিন্তায় বা গুরু সমস্যায় মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতে চাহেন নাই। তাঁহার ভাষায়ও শিশুর প্রগল্ভ কোমল কলকাকলীর মাধুর্য্য। আপন মনের আনন্দে তিনি কথার পর কথা সাজাইয়া গিয়াছেন, হিসাব করিয়া তাহাকে কঠিন বাঁধনে বাঁধিয়া ফেলেন নাই।

[৪]

এই শিশু-মনই তাঁহাকে টানিয়া লইয়াছে রূপকথার স্বপ্নরাজ্যে। বিচিত্র অপার্থিব রহস্য তাঁহাকে মায়ামন্ত্রে আকৃষ্ট করিয়াছে। "সবুজপরী", "নীলপরী", "লালপরী", "জর্দ্দাপরী", "বিদ্যুৎপর্ণা" প্রভৃতি পরীর দল তাঁহাকে পথ ভুলাইয়া কোন্ সুদূর চির-জ্যোৎস্নার দেশে লইয়া গিয়াছে। এই অলৌকিকের মোহ ইয়েট্স্ ও ওয়াল্টার ডি-লা-মেয়ারের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সম্ভবতঃ ইয়েট্সের সহিত সত্যেন্দ্রনাথের কতকটা মানসিক সাধর্ম্ম্য আছে। ইয়েট্স্ যেমন প্রাচীন কেল্টিক গাথা ও কাহিনীর অনুরাগী, সত্যেন্দ্রনাথও তেমনি বাংলার ব্রত-পুরাণ-রূপকথার পরম ভক্ত।

ব্রত ও রূপকথার প্রভাব যে তাঁহার মনের উপর কতখানি, তাহা অনেক কবিতাতেই বুঝা যায়। "কুহু ও কেকার" অন্তর্গত 'দার্জ্জিলিঙে' কবিতায় –

"হঠাৎ এলো কুজ্ঝটিকা হাওয়ায় চড়িয়া
ঘুম-পাহাড়ের বুড়ী দিল মন্ত্র পড়িয়া"

ছত্র দুইটিতে অপূর্ব্ব রহস্য-কুহেলিকা ঘনাইয়া আসিয়াছে।

আবার "বিদায়-আরতি"র 'দূরের পাল্লা'য়

"হাড়-বেরুনো খেজুরগুলো
ডাইনি যেন ঝামর-চুলো
নাচতেছিল সন্ধ্যাগমে,
লোক দেখে কি থমকে গেল?
জমজমাটে জাঁকিয়ে ক্রমে
রাত্রি এল, রাত্রি এল।"

এখানে খেজুর গাছের সহিত ঝামরচুলো ডাইনির উপমায় একদিকে যেমন চিত্রটি সুপরিস্ফুট হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি অজানা দেশে সন্ধ্যা-সমাগম, মাঝিদের মনে উদ্বেগমিশ্রিত আশঙ্কা, চারিদিকে একটা কি-রকম কি রকম ভাব,—সমস্ত মিলিয়া একটি অদ্ভুত 'atmosphere' ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ব্রত-কথায় পাই, পুণ্যবতীর স্পর্শে আবদ্ধ নৌকা আবার জলে ভাসে। 'দূরের পাল্লায়' ও 'কিশোরী'তে-এই কাহিনীর সুস্পষ্ট প্রভাব পড়িয়াছে।

"আটকেছে যেই ডিঙা, চাইছে সে পণ" (দূরের পাল্লা)

"ওই সদাগরের বোঝাই ডিঙা
ফিঙার মত' চল্‌ত উড়ে'
তার পরশলোভে আজকে সে হায়
দাঁড়িয়ে আছে ঘাটটি জুড়ে'।
অরাজকের পাগলা হাতী
পথে পথে ফিরছে মাতি'
তারে দেখ্‌তে পেলেই করবে রাণী
শুঁড়ে তুলে' তুল্‌বে মুড়ে'
ওগো তারি লাগি বাজছে বাঁশী
পরাণ ব্যেপে, ভুবন জুড়ে'।" (কিশোরী)

[৫]

সমসাময়িক ঘটনাপ্রগতির প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের সাগ্রহ দৃষ্টি ছিল, কিন্তু তাহা লইয়া রচিত কবিতায় তিনি সর্ব্বত্র সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। যেখানে তিনি পলাতক শিশুর মত প্রকৃতির ও কল্পনার রাজ্যে বাঁশী বাজাইয়া ফিরিয়াছেন, সেইখানেই তিনি প্রকৃত কবি।

বঙ্গভূমির বন্দনায় অনেক স্থলে তিনি স্বদেশের গৌরবগান গাহিয়াছেন; কিন্তু সেগুলি প্রায়শঃ অতীত কীর্ত্তি-কথার একত্র উল্লেখ মাত্র। যে সব স্থানে তিনি বাংলার প্রাকৃতিক চিত্র আঁকিয়াছেন, সেই সব স্থানেই তাঁহার রচনা কবিত্ব-মণ্ডিত হইয়াছে।

'ফরিয়াদ', 'বড়দিনে', 'আখেরী' প্রভৃতি কবিতায় দেশের বর্ত্তমান দুর্গতির জন্য তাঁহার আন্তরিক বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু, এই সব কবিতার অনেক স্থল নানা ঐতিহাসিক ব্যাপারের উল্লেখে ভারাক্রান্ত এবং দেশী-বিদেশী শব্দসম্ভারে সমাচ্ছন্ন।

[৬]

ইতিহাসের তিনি ছিলেন অনুরাগী পাঠক। তাঁহার অসমাপ্ত উপন্যাস "ডঙ্কানিশান" এই অনুরাগের নিদর্শন। "দিল্লীনামা" ঐতিহাসিকস্মৃতি-মণ্ডিত একটি সুন্দর কবিতা। হিন্দু-মুসলমান-ইংরাজ যুগের বহু তথ্যসমাকুল হইলেও কবি-অনুভূতির প্রদীপ্ত স্পর্শে ইহা প্রাণময় হইয়াছে। অসংখ্য বীরের কামনার রাণী দিল্লী সংখ্যাহীন রাজ্যলিপ্সুর মৃত্যু নিষ্করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়াছে।

"হাজার হাজার বীরের রুধিরে
আঁকিয়াছ ভালে রক্তটীকা,
গড় কেল্লার কঙ্কাল জালে
সাজিয়াছ আজ তুমি কালিকা।"

দিল্লীর গৌরব আজ অস্তমিতপ্রায়। কীর্ত্তিরাজির ধ্বংসাবশেষ তাহার পদতলে লুটাইতেছে।

"কত অতিকায় কামনার কায়া
কঙ্কালসার পড়িয়া আছে
অতীত জীবের শিলাপঞ্জর
পাষাণী গো, তোর পায়ের কাছে!"

*

"সরযূ" আর একটি সুন্দর ঐতিহাসিক কবিতা। ইহার দীর্ঘপ্রবাহিত ছত্রধারায়, মিলনের ব্যবধানে স্মৃতিভারাক্রান্ত মনের বেদনা ধীরে ধীরে জমিয়া উঠিয়াছে।

"বিস্মরণের ভস্মমাঝে কি গান তুমি গাইছ উদাস-মনে,
রঘুকুলের হে রাজলক্ষ্মী! হে সরযূ! স্বর্ণ স্রোতস্বতী!
দুঃখদিনেও ললাটে তোমার অঙ্কিত যে ইন্দ্রাণী লক্ষণে,
হে সুন্দরী! অনিন্দিতা! অঙ্গে তোমার চন্দ্রমালার জ্যোতি!
সন্ন্যাসিনীর বেশে রাণী, কি কথা হায় জপ্‌ছ নিরজনে,
কোন্ অতীতের সঙ্গীতে মন তরঙ্গিয়া চল্‌ছ শ্লথগতি?"

... ...

[৭]

মানব-মনের মহিমার প্রতি তাঁহার অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা ও সত্যের প্রতি নিষ্ঠা তাঁহার রচনায় সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইয়াছে। দেশের রাষ্ট্রনৈতিক জাগরণ, হিন্দুসমাজে নারীর প্রতি অবিচার, অর্থহীন জাতিভেদ, সর্ব্বজাতির সাম্য প্রভৃতি তাঁহার অনেক কবিতার ভাবগত উপাদান।

দেশ-বিদেশের মহামানবগণের প্রতি তিনি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। "বুদ্ধপূর্ণিমা" একটি মনোরম কবিতা। উহার ছন্দের ধীর-

ললিত গতি মাধুর্য্যকে বহুল-পরিমাণে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। "গান্ধিজী" এবং "বিদ্যাসাগর" লোকপ্রিয় ; কিন্তু ঐ কবিতাদ্বয় স্থানে স্থানে গদ্যময় হইয়া পড়িয়াছে।

[৮]

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সত্যেন্দ্রনাথ ব্রত ও রূপকথার অনুরাগী ছিলেন। শুধু তাহাই নহে ; পৌরাণিক কাহিনীর প্রতিও তাঁহার আকর্ষণ ছিল। শেষজীবনে তিনি অনেক পৌরাণিক গল্প নূতন করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কবিতা হিসাবে সবগুলি সার্থক না হইলেও, নূতন প্রচেষ্টা হিসাবে এগুলি লক্ষ্য করিবার বস্তু। "ভীমজননী", "স্কন্ধধাত্রী", "গিরিরাণী", "কন্যাধু" প্রভৃতি এই শ্রেণীর কবিতা।

"পাখীর ডাকা ঘুমিয়ে গেল, ঝিঁঝিঁর ডাকা ঝিমিয়ে জাগে,
ডালপালাতে অন্ধকারের অন্ধ হাওয়ার উছট লাগে" (ভীম-জননী)।

রাত্রির বনভূমি তাহার তিমিরপুঞ্জ ও নিস্তব্ধতা লইয়া ছত্র দুইটিতে সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আবার,

"আকাশ জুড়ে' বিপুল-বপু উড়ল পাহাড় ক্রোর
ধরার উপগ্রহের মালা উল্কা হেন ঘোর !
অন্ধ ক'রে সূর্য্য ওড়ে বিন্ধ্য বহুমান।
ধবলগিরির ধবলিমায় চন্দ্রমা সে ম্লান ;
তীর-বেগে ধায় ক্রৌঞ্চপাহাড় ক্রৌঞ্চকুলের সাথ
নীলগিরি নীলকান্তমণির নির্ম্মিত ঠিক চাঁদ ;
উদয়-গিরি, অস্ত-গিরি উড়ল একত্তর
মাল্যবান্ আর মলয়-গিরি ছায় নভ-চত্বর ;
চন্দ্রশেখর-সঙ্গে মহা মহেন্দ্র পর্ব্বত—
লোমকূপে লাখ ঋষি নিয়ে উড়ল যুগপৎ !
সবার আগে চলল বেগে শৈল যুবরাজ
মৈনাক মোর- -ফেলতে মুছে শৈলকুলের লাজ !"
(গিরিরাণী)

পাহাড়দের যুদ্ধবর্ণনার এই চিত্র, গল্প বলিবার সহজ সরস ভঙ্গী ও ঘটনার উপযোগী ছন্দের দ্রুতগতি ও শব্দ-চয়নের কৌশল কবির অসাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক।

[৯]

অনুবাদ-নৈপুণ্যের জন্য সত্যেন্দ্রনাথ চিরদিন স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। 'তীর্থসলিল' ও 'তীর্থরেণু' বঙ্গসাহিত্যের মূল্যবান্ সম্পদ্। তাঁহার অনুবাদ মূলানুগত, অথচ সরস, আড়ষ্টতাবিহীন। বেদ, পুরাণ, ইতিহাস এবং দেশী ও বিদেশী সাহিত্যে তাঁহার অধিকার ছিল অসাধারণ। সর্ব্বস্থল হইতেই তিনি কবিতার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। সকল তীর্থের সলিল ও রেণু লইয়া 'তীর্থ-সলিল' ও 'তীর্থ-রেণু' রচিত।

'মৃত্যুরূপা মাতা' তাঁহার নিপুণতার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ইহা স্বামী বিবেকানন্দের একটি ইংরাজী কবিতার বঙ্গানুবাদ। সত্যেন্দ্রনাথের ভাষা সাধারণতঃ কোমল প্রকৃতির। কিন্তু, এই অনুবাদ-কবিতায় তিনি মূলের গাম্ভীর্য্য ও মহিমা চমৎকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

"The stars are all blotted out, clouds are covering
clouds"

"নিঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ"

পংক্তির পর পংক্তি পাশাপাশি রাখিয়া পড়িলে কবির অসাধারণ শক্তি প্রাণে প্রাণে অনুভব করা যায়।

[১০]

হাস্যরসেও তাঁহার অধিকার ছিল। 'হসন্তিকা' তাহার প্রমাণ। দ্বিজেন্দ্রলাল ও রজনীকান্তের পর এমন অনাবিল হাস্যরস আর কাহারও কবিতায় দেখা গিয়াছে কিনা সন্দেহ। 'জবান্ পঁচিশী' কবিতায় পঁচিশটি ভাষার শব্দ মিশাইয়া কবি অদ্ভুত হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন।

শব্দ-চিত্রণ ও ছন্দোগ্রহণে সুনিপুণ এই কবিকে বাঙ্গালী কখনও ভুলিতে পারিবে না। তাঁহার রচনার দোষ-ত্রুটি যতই থাকুক, স্বপ্নময় কবি-কল্পনায় তিনি আমাদের মন অধিকার করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার ভাষা মধুর, কোমল, নমনীয়। নানাদিক্ হইতে শব্দসম্ভার আহরণ করিয়া তিনি বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। দু' এক স্থলে ভাষার অমিতপ্রয়োগ ভাবকে আচ্ছন্ন ও আড়ষ্ট করিয়াছে ; আবার কোথাও বা শব্দের দীপ্তিতে রচনা সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

তাঁহার গৌরবের বিষয় এই যে, তিনি স্বীয় প্রকৃতির অনুবর্ত্তী হইয়াই চলিয়াছেন ; বড় কবির মোহে পড়িয়া কখনও স্বাতন্ত্র্য হারান নাই। সত্যেন্দ্র-নাথের কাব্য অপরূপ চিত্রশালা, মোহন স্বপ্নলোক। সেখানে প্রবেশ করিলেই মুগ্ধ হইতে হইবে। জ্যোৎস্না-বিহ্বল চকোরের গানে, ঝর্ণার কলহাস্যে, সিন্ধুর তাণ্ডব-নৃত্যে মুগ্ধ হইয়া মন চলিতে থাকিবে মায়াপুরীর পথে পথে। ধ্যান-তন্ময় হইয়া হয় ত কোথাও বসিতে পাইব না, কিন্তু লঘু মেঘে পা ফেলিয়া দ্রুত সঞ্চারে অগ্রসর হইতে হইবে ; এবং চারিদিক্ ঘিরিয়া ঘনাইয়া আসিবে স্বপ্নের অপরূপ বর্ণবিচার।
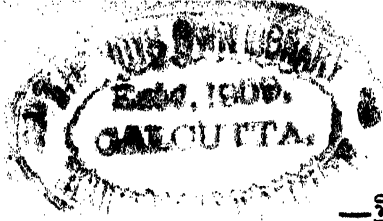
রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্বাধ্যায়

—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়

এই প্রবন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ আলোচিত হইয়াছে : (১) রাজধর্ম্মের প্রবর্ত্তক দণ্ডনীতি (২) রাজশক্তির আবর্ত্তন-সূত্র (৩) রাজা ও প্রজা (থিওক্র্যাসীর দ্বৈতরূপ) (৪) দণ্ড ও ব্যবহার (৫) দণ্ড চিরন্তন (৬) রাজধর্ম্মে যুগনির্দ্দেশ (৭) রাজ-দণ্ড অবিভাজ্য (৮) রাজানুশাসন পর্ব্বে ব্যষ্টি ও গোষ্ঠীর ধর্ম্ম। ভারতীয় রাজ-ধর্ম্মানুশাসনের বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত দেওয়া এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ; প্রসঙ্গতঃ পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান শাস্ত্রেরও উল্লেখ স্থানে স্থানে করা হইয়াছে।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ৫৯তম অধ্যায়ে রাজা ও রাজত্ব-সৃষ্টি সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা প্রদান করা হইয়াছে :—

রাজধর্ম্মের প্রবর্ত্তক দণ্ডনীতি

সর্ব্বপ্রথমে পৃথিবীতে রাজ্য, রাজা, দণ্ড বা দণ্ডার্হ ব্যক্তি কিছুই ছিল না, মনুষ্যগণ একমাত্র ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক পরস্পরকে রক্ষা করিত। মানবগণ এইরূপে কিছু কাল যাপন করিয়া পরিশেষে পরস্পরের রক্ষণাবেক্ষণ নিতান্ত কষ্টকর বোধ করিতে লাগিল। এই সময় মোহ তাহাদিগের মনোমন্দিরে প্রবিষ্ট হইল। মোহের আবির্ভাব বশতঃ ক্রমশঃ জ্ঞান ও ধর্ম্মের লোপ হইতে লাগিল এবং মানবগণ ক্রমে লোভপরতন্ত্র, পরধনগ্রহণতৎপর, কামপরায়ণ, বিষয়াসক্ত ও কার্য্যাকার্য্য-বিবেকশূন্য হইয়া উঠিল। অগম্যাগমন, বাচ্যাবাচ্য, ভক্ষ্যাভক্ষ্য ও দোষাদোষের বিচার কিছুমাত্র রহিল না। নরলোক এইরূপ কুমার্গগামী হইলে বেদ বিনষ্ট ও ধর্ম্ম এককালে বিলুপ্ত হইয়া গেল...

তখন দেবগণ নিতান্ত শঙ্কিতচিত্তে লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন, ভগবান পদ্মযোনি তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া ত্রিবর্গ (ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম) সংস্থাপন ও লোকের উপকার-সাধনের নিমিত্ত প্রথমতঃ বাক্যের সারস্বরূপ **নীতিশাস্ত্র** উদ্ভাবন করিলেন। এই শাস্ত্রে নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শনপূর্ব্বক দণ্ডপ্রভাবে লোক রক্ষা করিবার পদ্ধতি প্রণীত হইয়াছিল, অতএব ইহার নাম হইল **দণ্ডনীতি**।

ভগবান্ পদ্মযোনিপ্রণীত এই নীতি কালে কালে সংক্ষিপ্ত এবং নবব্যাখ্যা-সহযোগে সঞ্জীবিত হইয়া চলিয়াছে ; কিন্তু ইহা রাজধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, রাজ্য বা রাজার প্রয়োজনে ইহার লাভায় হইতে পারে না।

রাজশক্তির আবর্ত্তন-সূত্র

ভগবান পদ্মযোনির উদ্ভাবিত নীতিশাস্ত্র লোকব্যবহারের জন্য সংক্ষিপ্ত হওয়ার পর দেবগণ ভগবান্ নারায়ণের সমীপস্থ হইয়া কহিলেন—ভগবন্, এক্ষণে আজ্ঞা করুন, মনুষ্যদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ হইবে।

তখন ভগবান্ বিষ্ণু কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বিরজা নামে এক মানস পুত্রের সৃষ্টি করিলেন।

দৈবক্রমে ইঁহারই পৃথিবীর প্রথম রাজা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু বিষয়বাসনাশূন্য সন্ন্যাস ধর্ম্মে অনুরক্ত হওয়ায় রাজধর্ম্মে তাঁহার যোগ্যতা ছিল না। সুতরাং রাজ-সৃষ্টি সম্বন্ধে ভগবান্ নারায়ণের মানসসৃষ্টি সপ্ত পুরুষ অতিক্রম করিয়া পৃথুতে আসিয়া সার্থক হইল।

সপ্তপুরুষ-আশ্রিত এই বিবর্ত্তনে রাজানুশাসন ধর্ম্মে 'থিওক্র্যাসী'র বিজয়বার্ত্তাই ঘোষিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সম্ভবতঃ রাজব্যবহার ও রাজশক্তির একটি অর্দ্ধ-ঐতিহাসিক আবর্ত্তনসূত্রেরও ইহাতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। বিষয়বাসনাশূন্য সন্ন্যাসও নহে, অতিবল প্রভাবে ইন্দ্রিয়পরবশতা বা অধর্ম্মাচরণও নহে, রাজধর্ম্মের যে শাশ্বত ব্যাখ্যা নীতিশাস্ত্রে ব্যক্ত রহিয়াছে, বুদ্ধিবলে তাহাকে সঞ্জীবিত করিয়া দণ্ড পরিগ্রহ করাই তাহার যোগ্য ব্যবহার।

রাজা ও প্রজা (থিওক্র্যাসীর দ্বৈতরূপ)

শান্তিপর্ব্বের ৬৭তম অধ্যায়ে ভগবান্ মনুর রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে প্রজাবৃন্দের সহিত রাজসম্পর্কের এই উপাখ্যান প্রদান করা হইয়াছে :—

পূর্ব্বকালে পৃথিবী ভূপতিবিহীন হওয়ায় প্রজাসকল পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ঐ সময় কতকগুলি ধর্ম্মপরায়ণ লোক একত্র সমবেত হইয়া এই

নিয়ম করিলেন যে, যে-ব্যক্তি নিষ্ঠুরভাষী, উগ্র-স্বভাব, পর-দারাভিমর্ষী ও পরস্বাপহারক হইবে, আমরা তাদৃশ লোক সকলকে পরিত্যাগ করিব। প্রজাগণ সকল বর্ণের বিশ্বাসের নিমিত্ত এই রূপ নিয়ম নির্দ্ধারণপূর্ব্বক কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া, পরিশেষে নিতান্ত অসুখী চিত্তে লোক-পিতামহ ব্রহ্মার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন—ভগবন্, আমরা রাজার অভাবে বিনষ্ট হইতেছি, অতএব আপনি আমাদিগকে একজন রাজা প্রদান করুন, আমরা সকলে তাঁহাকে পূজা করিব এবং তিনিও আমাদিগকে প্রতিপালন করিবেন।

পিতামহ ব্রহ্মা প্রজাগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনুকে তাহাদের প্রতিপালনের আদেশ করিলেন। মনু উহা স্বীকার না করিয়া কহিলেন, আমি পাপানুষ্ঠানে নিতান্ত ভীত হইয়া থাকি। রাজ্যশাসন, বিশেষতঃ মিথ্যাপরায়ণ মনুষ্যগণকে স্বধর্ম্মে সংস্থাপন অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার···

তখন প্রজাগণ মনুকে কহিলেন, প্রভো, ভীত হইবেন না, পাপ আপনাকে স্পর্শ করিবে না। আমরা আপনার কোষবর্দ্ধনের নিমিত্ত পশু ও সুবর্ণের পঞ্চাশ ভাগ ও ধান্যের দশম ভাগ প্রদান করিব। বিবাদ, দ্যূতক্রীড়া ও শুল্কপ্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে আপনি পণস্বরূপ রক্ষিত সামগ্রী প্রাপ্ত হইবেন। আর যাহারা অস্ত্র-শস্ত্র প্রয়োগ ও বাহনারোহণে প্রধান হইবে, তাহারা, দেবগণ যেমন ইন্দ্রের অনুগমন করেন, তদ্রূপ আপনার অনুগমন করিবে, তাহা হইলেই আপনি মহাবল, পরাক্রান্ত ও প্রবলপ্রতাপ হইয়া কুবেরের ন্যায় পরম সুখে আমাদিগকে প্রতিপালন করিতে পারিবেন। আর আমরা আপনার পরাক্রমে রক্ষিত হইয়া যে যে ধর্মের অনুষ্ঠান করিব, আপনি তাহার চতুর্থাংশভাগী হইবেন···

সুতরাং একদিক হইতে যেমন নৃপতিকে প্রজাপুঞ্জের পুরোধাস্বরূপ, নীতিশাস্ত্রবারিধির তরঙ্গ গণিয়া চলিতে হইবে, অন্যদিক হইতে তেমনই প্রজাপুঞ্জের বুদ্ধি ও শক্তিই নৃপতিকে পুরোধা করিয়া, সেই দৈবানুক্রমে উদ্ভাবিত, শাশ্বতপ্রাণ নীতি শাস্ত্রের ব্যাবহারিক সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া চলিবে, ইহাই হিন্দু থিওক্র্যাসীর দ্বৈতরূপ কল্পনা।

দণ্ড ও ব্যবহার

নীতিশাস্ত্রের প্রধান আলোচ্য দণ্ডনীতি, কারণ ইহার প্রভাবেই জনসমাজে নীতি ও ধর্ম্মের প্রচার সম্ভব হইয়াছে।

মহাভারতের রাজানুশাসন পর্ব্বাধ্যায়ের ১২১শ অধ্যায়ে দণ্ড ও ব্যবহার সম্বন্ধে প্রাক্তন সূত্রাবলীর উল্লেখ করা হইয়াছে :—

ইহলোকে যাহা দ্বারা সমুদয় বশবর্ত্তী হয়, তাহার নাম 'দণ্ড' এবং যাহাতে ধর্ম্মের লোপ না হইয়া প্রত্যুত তাহার প্রচার হইয়া থাকে, তাহাকেই 'ব্যবহার' কহে।

যদি ইহলোকে দণ্ডের প্রাদুর্ভাব না থাকিত, তাহা হইলে সকলেই পরস্পরকে নিপীড়িত করিত। প্রজাগণ প্রতিদিন দণ্ড দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াই নরপতিকে সমুন্নত করে, অতএব দণ্ডই রাজ্যের প্রধান অঙ্গ এবং কারণ। যে অন্ন হইতে প্রজাগণ প্রাণধারণ করিয়া থাকে, 'যজ্ঞ' হইতে তাহার উদ্ভব, জনসমাজের পক্ষ হইতে 'ব্রাহ্মণ' তাহার 'হোতা', কিন্তু দণ্ডই 'ক্ষত্রিয়'মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করে। পক্ষান্তরে 'ব্যবহার' অর্থী ও প্রত্যর্থীর দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং অর্থী ও প্রত্যর্থীর মধ্যে একজনের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস উৎপাদনপূর্ব্বক তাহাকে জয়শালী করিয়া দেয়।

অর্থী ও প্রত্যর্থীর মধ্যে একের প্রতি বিশ্বাস করিয়া অন্যকে যে দণ্ড প্রদত্ত হইয়া থাকে, সেই দণ্ড প্রদানের অধিকার ভূপাল-নিষ্ঠ, সুতরাং ভূপালগণের উহা অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

যদিও আপনার বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া লোকের প্রতি দণ্ড বিধান করা যায়, তথাপি ব্যবহার যে দণ্ডের মূল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্যবহার বেদমূলক, যাহা বৈদিকসিদ্ধান্তসমুত্থিত, তাহাই বহুগুণসম্পন্ন ধর্ম্ম। মনস্বীরা এই ধর্ম্মানুসারে অর্থী ও প্রত্যর্থীর মধ্যে একজনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অন্যকে দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। দুষ্টনিগ্রহের জন্যই দণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে, সুতরাং স্বেচ্ছাচারী না হইয়া ন্যায় অন্যায় অবধারণপূর্ব্বক দণ্ডবিধান করা কর্ত্তব্য।

বৈবস্বত মনু ভূমণ্ডলে দণ্ড প্রচারিত করিয়াছেন, ঐ দণ্ড তদবধি প্রজারক্ষণে নিযুক্ত রহিয়াছে···

দণ্ড চিরন্তন

সুতরাং বলা যাইতে পারে, নৃপতি দণ্ডের উপলক্ষ্য স্বরূপ, এবং তাহার ব্যবহারের মাত্র অধিকারী। মহাভারতে দণ্ডের যে উগ্ররূপ কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা নরলোকের সাধ্য নহে, দণ্ডই প্রহরণসমূহের আকার পরিগ্রহ করিয়া কাহাকেও

ছিন্ন, কাহাকেও ভিন্ন, কাহাকেও নিপীড়িত, কাহাকেও বিদারিত, কাহাকেও বিপাটিত, কাহাকেও বা ঘাতিত করিতেছে; সৃষ্টি ও সংহারকর্ত্তা, সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা এবং নীতি ও বাক্য, সম্পদ্ ও বিদ্যা, স্ত্রী ও ধাত্রী নামে অভিহিত স্থিতিশক্তি-নিয়ন্তা ভগবান্ বিষ্ণু একাত্ম হইলেও ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ-পুণ্য, সত্য-মিথ্যা, হিংসা-অহিংসা বা জীবন ও মৃত্যুর মধ্য দিয়া জীবলোকে যে বহুধাবিভক্ত ক্রীড়া চলিতেছে, তাহার প্রত্যেকটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দণ্ডায়মান; এই জীবনপ্রবাহের মধ্যে ব্যবহারশাস্ত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নৃপতিকে ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্যই পূর্ণ দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে, নরলোকে তাহাই সার্ব্বভৌম।

পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানশাস্ত্রে, রাজদণ্ডের যে সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করা হইয়াছে, তাহার অজস্র রূপকল্পনা হইলেও, কোনও সুনির্দ্দিষ্ট আশ্রয় নাই, উহা বৈজ্ঞানিক তর্কের উপলক্ষ্য স্বরূপ;—জনসাধারণের শক্তিই রাজাসনে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নানা আবর্ত্তনের মধ্য দিয়া সার্ব্বভৌমিকতা দাবী করিয়া চলিয়াছে, ধর্ম্মকে রক্ষা করার মত তাহাকে প্রবর্ত্তন ও বহন করিবার অধিকারও তাহার।

কিন্তু ত্রিলোকের জীবনপ্রবাহ মন্থন করিয়া যে নীতিশাস্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে, ভারতীয় রাজধর্ম্মানুশাসনে তাহা প্রাক্তন এবং শাশ্বত, রাষ্ট্রনেতৃবর্গের সমস্ত জরাক্রান্ত প্রয়াস উপেক্ষা করিয়া, তাহা কালে কালে অপরিবর্ত্তনীয়। তাহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া লোকচক্ষুর গোচরে আনা যাইতে পারে, অথবা টিপ্পনী দ্বারা তাহাকে লোক-ব্যবহারের যোগ্য করিয়া লওয়া সম্ভব, কিন্তু তর্ক করিয়া তাহার সূত্র পরিবর্ত্তন বা বর্ত্তমান জীবন-প্রবাহে তাহার রূপায়ন দুরূহ বলিয়া তাহাকে বর্জ্জন করার অধিকার কাহারও নাই। কারণ যে ধর্ম্ম পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে, তাহার মধ্য হইতে ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য বা সত্য-মিথ্যাকে আমরা ব্যবহারের কুঠারে খণ্ডিত করিয়া বুঝিতে পারি এবং এই ব্যাখ্যার বৈচিত্র্যে জীবলোকের রীতি ও ইতিহাস ক্ষণকালের জন্য প্রভাবান্বিত হইতে পারে, কিন্তু চিরন্তনের ভূমিতে নীতি ও ধর্ম্মকে নূতন করিয়া প্রবর্ত্তন করিবার যোগ্যতা তাহার থাকিতে পারে না।

রাজধর্ম্মে যুগনির্দ্দেশ

অবশ্য ইহা সত্ত্বেও নরলোকে অবিরত নব নব যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে। শান্তিপর্ব্বের ৬৯তম অধ্যায়ে যুগপরিবর্ত্তনের সূত্র আয়ত্ত করার চেষ্টা হইয়াছে :—

কাল রাজার কারণ, কি রাজা কালের কারণ, এ বিষয়ে তোমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ করিবার প্রয়োজন নাই, রাজাই কালের কারণ।

রাজা যখন দণ্ডনীতি অনুসারে সুচারুরূপে রাজ্য পালন করেন, তখনই সত্যযুগ নামে শ্রেষ্ঠকাল উপস্থিত হয়। ঐ কালে বিন্দুমাত্র অধর্ম্ম সঞ্চার হয় না। সকল বর্ণেরই অন্তঃকরণ ধর্ম্মবিষয়ে আসক্ত থাকে। প্রজাগণ অলব্ধ বস্তু লাভ ও লব্ধ বস্তু পরিবর্দ্ধন করে। বৈদিক কর্ম্ম সমুদয় দোষশূন্য হয়, ঋতু সকল নিরাময় ও সুখাবহ হইয়া উঠে। মানবগণের স্বর, বর্ণ ও মন নির্ম্মল হয়। ব্যাধিসমূহ তিরোহিত হইয়া যায়। প্রজাগণ দীর্ঘায়ু হয় ও পরম সুখে কালযাপন করে। বিধবা স্ত্রী ও কৃপণ পুরুষ কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। পৃথিবী কৃষ্ট না হইয়াও শস্যোৎপাদন করে, ওষধি, ত্বক্, পত্র ও ফলসমূহ তেজঃসম্পন্ন হইয়া উঠে। অধর্ম্ম এককালে তিরোহিত ও ধর্ম্ম সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়। সত্য যুগে এইরূপে ধর্ম্মেরই প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

যখন রাজা চতুষ্পাদ দণ্ডনীতির তিন পাদ গ্রহণ করিয়া রাজ্য পালন করেন, সেই কালকে ত্রেতা যুগ কহে। পাপের এক পাদ মাত্র সঞ্চারিত হয়। তখন পৃথিবী কৃষ্ট না হইলে প্রচুর পরিমাণ শস্য উৎপাদনে সমর্থ হয় না।

যখন রাজা দণ্ডনীতির অর্দ্ধাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করেন, সেই কালকে দ্বাপর যুগ কহে। দ্বাপর যুগে অধর্ম্মের দুই পাদ ভূমণ্ডলে সঞ্চারিত হয়। তখন পৃথিবী কৃষ্ট হইয়া সত্য যুগে অকৃষ্টাবস্থায় যে ফল উৎপাদিত করিত, তাহার অর্দ্ধেক ফল উৎপাদন করে।

যে সময় নরপতি একেবারে দণ্ডনীতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রজাগণকে বিবিধ প্রকারে কষ্টপ্রদান করেন, সেই কালকে কলি যুগ কহে। কলি যুগে সকলেই প্রায় অধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হয়। ধর্ম্মানুষ্ঠান তিরোহিতপ্রায় হইয়া যায়। সকল বর্ণেরই স্বধর্ম্মত্যাগে প্রবৃত্তি জন্মে। শূদ্রেরা ভিক্ষাবৃত্তি এবং ব্রাহ্মণেরা দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। সমুদয় লোকই মঙ্গলহীন ও সর্ব্বত্র বর্ণসঙ্কর প্রাদুর্ভূত হয়। বৈদিক কার্য্যসকল অপরিশুদ্ধ ও ঋতু সমুদয় ক্লেশকর ও রোগজনক

হইয়া উঠে। মনুষ্যগণের স্বর, বর্ণ ও মনোবৃত্তির হ্রাস হইয়া যায়। নানা প্রকার ব্যাধি ও অকালমৃত্যু জীবগণকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। রমণীগণ বিধবা ও প্রজাগণ নৃশংস হইতে থাকে। নিরূপিত সময়ে বৃষ্টিপাত ও শস্যোৎপত্তি হয় না ও সমুদয় বন ক্ষীণ হইয়া যায়—

রাজদণ্ড অবিভাজ্য

ইহাতে মানব-সভ্যতার কোনও ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনসূত্রের ইঙ্গিত করা হইয়াছে, এই কষ্টকল্পনা না করিয়া বলা যাইতে পারে, ইহাতে দণ্ডনীতির যুগান্তরকারী প্রভাবই কীর্ত্তিত হইয়াছে।

—রাজা এই পৃথিবীর ক্ষাত্র শক্তিকে সংযত করিয়া প্রজাগণের প্রতি সদাজাগ্রত ত্রিকালবিহারী দণ্ডের স্থিতি-রূপের অনুবর্ত্তন করিয়া চলিয়াছেন, এই দণ্ড অবিভাজ্য, প্রজাবৃন্দের সহিত তাহাদের প্রতিভূস্বরূপ রাজাও তাহাকেই আয়ত্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু যেহেতু ইহলোকে রাজাই দণ্ডের উদাহরণ স্বরূপ, সেই হেতু নীতির বৈলক্ষণ্যে যাহাতে যুগপ্রবাহ বিচলিত না হইয়া উঠে, তজ্জন্য তাঁহাকে চতুষ্পাদ দণ্ডকেই সুদৃঢ় বলে ধারণ করিতে হইবে, কারণ প্রজাবৃন্দের নিকট হইতে দণ্ডের অধিকার তিনি প্রাপ্ত হন নাই, তাহাদের সহিত উহা ভাগ করিয়া লওয়ার প্রয়োজন বা অধিকারও তাঁহার নাই।

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রনীতি বহু তর্ক পার হইয়া রাজ-ব্যবহারের সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছে জনসমাজের স্বনির্ব্বাচিত প্রয়োজনের দাবী দ্বারা, এই দাবীর অনুকূলতায় 'ষ্টেট'কে বারে বারে শ্রেণীগত আদর্শের তাড়নায় নূতন করিয়া গড়িবার জন্য তাহার আগ্রহ এবং সেই জন্য বারে বারে জনসমাজের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির আহ্বান করা হইয়াছে রাজসভার প্রাঙ্গণে, রাষ্ট্র-শক্তির ব্যবহারনিয়ন্ত্রণের দাবী করিয়া। এই স্বনিয়ন্ত্রণ-প্রচেষ্টায় যখন যাহা বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, তাহা 'ষ্টেট-ইভল্যুশনে'র ইতিহাস বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া এই ব্যবহার-সূত্রও জনসাধারণের দৈনন্দিন প্রয়োজনের চাপে, এবং কখনও বা তাহাকে উপেক্ষা করিয়া রাজশক্তির মূঢ়তায় কালে কালে পরিবর্জ্জিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে এবং তাহার তর্কে প্রমাণিত হইয়াছে, 'ইভল্যুশন' বা সভ্যতার বিবর্ত্তনই মুখ্যতঃ এই ব্যবহারের স্রষ্টা ও সৃষ্টি। সুতরাং সন্দেহ নাই ইহার সহিত দণ্ডনীতিও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

এই আদর্শ হইতে বিচার করিতে গেলে, ব্যষ্টি ও সমষ্টির যে অধিকারের দাবীর উপরে পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রনীতি শাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাও ষ্টেটেরই সৃষ্টি এবং ষ্টেটই আবার তাহা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় চিন্তাধারা এই ব্যাখ্যা স্বীকার না করিয়া মানব-ইতিহাসের প্রেক্ষাভূমিতে শাশ্বত কালের নীতিসূত্র সম্পাদনে ব্যাপৃত হইয়াছিল; তাহার দাবী এই যে, ব্যবহারের উৎস স্বরূপ যে বেদ কালে কালে আদৃত হইয়া চলিয়াছে, তাহাও রাজা, প্রজা এবং তাহাদের ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া সেই চিরন্তন নীতিসূত্রকেই আয়ত্ত করিবার জন্য কালপ্রবাহে ধাবমান রহিয়াছে।

রাজানুশাসন পর্ব্বে ব্যষ্টি ও গোষ্ঠীর ধর্ম্ম

শান্তিপর্ব্বের ১২৩শ অধ্যায়ে ব্যষ্টির ধর্ম্মে ত্রিবর্গ সংস্থাপনের স্বরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে :—

পুরুষেরা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া ধর্ম্মার্থকাম নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে এককালে ঐ তিনেরই অনুশীলন করিতে পারে। উহাকে ত্রিবর্গের সংশ্লিষ্ট ভাব কহে। অর্থ ধর্ম্মমূলক, কাম অর্থমূলক এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ সংকল্পমূলক, আর সংকল্প বিষয়মূলক। বিষয় সমুদয় আহারসিদ্ধির উপযোগিতা সম্পাদন করিয়া থাকে, উহারাই ত্রিবর্গের মূল।

ত্রিবর্গ হইতে নিবৃত্তিই মোক্ষ। লোকে শরীররক্ষার্থ ও ধর্ম্মের নিমিত্ত অর্থের এবং ইন্দ্রিয়বর্গের প্রীতিসম্পাদানার্থ কামের সেবা করিয়া থাকে, ঐ তিন বর্গই রজঃপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হয়। উহাদিগকে এককালে মন হইতে পরিত্যাগ না করিয়া, অনাসক্ত চিত্তে উহাদের অনুশীলন করা আবশ্যক। ত্রিবর্গের অনুশীলন করিতে করিতেই মোক্ষলাভের ইচ্ছা হইয়া থাকে।

ধর্ম্ম হইতেই অর্থ এবং অর্থ হইতেই ধর্ম্ম উৎপন্ন। অজ্ঞানান্ধ মনুষ্যেরা কদাচ ঐরূপে ধর্ম্মার্থের ফললাভে সমর্থ হয় না। ফলাভিসন্ধি ধর্ম্মের মলস্বরূপ, ফলভোগবিমুখতা অর্থের মলস্বরূপ এবং প্রমোদপরাঙ্মুখতা কামের মলস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যখন ত্রিবর্গ ঐ সকল মল

হইতে বিমুক্ত হয়, তখন উহাদের ব্রহ্মানন্দরূপ ফল প্রদান করিবার ক্ষমতা জন্মে···

রাজধর্ম্মানুশাসনে, যে-ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কেবল কামের অনুশীলন করিয়া থাকে, তাহার প্রতি দণ্ড বিধান করা নৃপতির প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কারণ তাহা না হইলে ধর্ম্মার্থনাশক নষ্ট বুদ্ধির প্রভাবে গৃহস্থিত সর্পের ন্যায় জনসমাজের নীতি ও ধর্ম্মকে তাহারা কলুষিত করিয়া তুলিবে।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে ব্যষ্টির পক্ষ হইতে ধর্ম্মাচরণের এই ত্রিবর্গ-সূত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মানবগোষ্ঠীর কর্ম্ম ও ব্যবহারকে বাঁধিয়া দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছিল; রাজধর্ম্ম তাহারও দণ্ডমুণ্ডের প্রতিভূস্বরূপ।

শান্তিপর্ব্বের ৬০-৬১তম অধ্যায়ে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে :—

চতুর্ব্বর্ণের পুরোধা ব্রাহ্মণ, তাহার ধর্ম্ম ইন্দ্রিয়দমন ও **বেদাধ্যয়ন**; পৃথিবীর ধর্ম্ম-রক্ষার ভার ব্রাহ্মণের উপর এবং যে হেতু ধর্ম্মই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে, সেই জন্য প্রজারক্ষার ভারও মূলতঃ ব্রাহ্মণেরই। কিন্তু কামিনী-গণ যেরূপ পতির অবর্ত্তমানে দেবরকে পতিত্বে বরণ করে, তদ্রূপ পৃথিবী ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পালিত না হওয়াতেই ক্ষত্রিয়কে পতিত্বে বরণ করিয়াছে। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম **প্রজাপালন**, ধনদান, যজ্ঞানুষ্ঠান এবং অধ্যয়ন। বৈশ্যের ধর্ম্ম সদুপায় অবলম্বনপূর্ব্বক **ধনসঞ্চয়**, পুত্রনির্ব্বিশেষে পশুপালন এবং দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠান; এবং শূদ্রের ধর্ম্ম যত্নপূর্ব্বক ত্রিবর্ণের পরিচর্য্যা।

চতুর্ব্বিধ আশ্রমের মধ্য দিয়া, চতুর্ব্বর্ণ ধর্ম্মাচরণোদ্দেশে যে প্রয়াস, তাহার মধ্যে যাহাতে সংঘাত সৃষ্টি না হয়, সেই জন্য তাহাদের লৌকিক ব্যবহারের সূত্রনির্দ্দেশেরও প্রয়োজন রহিয়াছে। মোটের উপর বলা যাইতে পারে, "ক্রোধ পরিত্যাগ, সত্যবাক্য প্রয়োগ, সম্যক্‌রূপে ধনবিভাগ, ক্ষমা, স্বীয় পত্নীতে পুত্রোৎপাদন, পবিত্রতা, অহিংসা, সরলতা ও ভৃত্যের ভরণপোষণ, এই নয়টি সর্ব্ববর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম"। ক্ষত্রিয়গণের ও প্রতিভূস্বরূপ রাজার উপর তাহা নিয়ন্ত্রণের ভার। রাজধর্ম্মের সম্যক্ উপলব্ধির জন্য ইহার উল্লেখ প্রয়োজন।

অনন্ত সৌন্দর্য্য

শ্রীপৃথ্বীসিং নাহার

সৌন্দর্য্য-পীযুষ-পায়ী মনোবাসী কবি!
পরমা লাবণ্যময়ী প্রকৃতির মুখে,
মধুর মিলনরাগে, বিরহের দুখে,
নানারূপ ছন্দোময় দেখিতেছ ছবি।
হৃদয়-দর্পণে ধরা পড়িয়াছে সবি
মহাসুন্দরের লীলা কল্পনা-ময়ূখে—
মনাতীত? জানিয়াছে তাহারে কভু কে
অসীম অরূপাকাশ শুভ্র-শশী-রবি।

রসরাজ-রসলিখা ভুবনে ভুবনে
পরিব্যাপ্ত চিরানন্দে; চিত্তের উপর
পড়ে তারি প্রতিবিম্ব কীর্ণাবগুণ্ঠনে।
ছাড়ায়ে ইন্দ্রিয়গ্রাম পাই তাঁরে যবে
আত্মময় এক যিনি বিশ্বরূপেশ্বর
অনন্ত-সৌন্দর্য্য-দ্বার খুলে যায় তবে।

বার্দ্ধক্যের দৈন্য

—শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

জন্ম-মৃত্যুর সাগরদোলায় সৃষ্টির অসীম রহস্য এই মানব-জীবন,— শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্যের উত্থান-পতনের তরঙ্গে তরঙ্গে কখনও ভাসিয়া উঠে, কখনও বিলীন হয়। মুকুলিত শৈশবে যাহা ছিল কেবল কলি, কৈশোরে তাহাই প্রস্ফুট পুষ্প, তারপর আসে শোভা ও সৌন্দর্য্যে ভাস্বর যৌবন, সেই যৌবন প্রৌঢ়ত্বের সুঠাম গাম্ভীর্য্যে স্নিগ্ধ পরিণতি লাভ করে। সর্ব্বশেষে ম্লানায়মান বার্দ্ধক্যের সন্ধ্যা। এই সন্ধ্যার বাতায়নে যখন প্রভাত-জীবনের কলকোলাহল ভাসিয়া আসে, মনে পড়ে নিজের প্রভাত, মৃত্যু যখন জীবনের খেলা দেখিয়া ঈর্ষ্যান্বিত হয়, জীবন যখন মৃত্যুকে সম্মুখে দেখিয়াও উপেক্ষা করে, তখনকার সেই রহস্যময় অনির্ব্বচনীয় ক্ষণটি লেখক এই কাহিনীতে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

রাত তখন প্রায় দু'টো। কিন্তু সমস্ত বাড়ীময় চঞ্চলতা ছড়িয়ে রয়েছে। গেটের সামনে খান পাঁচেক ঝকঝকে মোটার-কার। বড় বড় ডাক্তার এসেছেন ··· ··· কেউ ছুটছে ওষুধ আনতে, কেউ আনছে গরম জল ··· ··· সবাই ব্যস্ত, চঞ্চল।

সুষমার প্রসব-বেদনা উঠেছে। বড়লোকের বাড়ী, তাই যা কিছু প্রয়োজন—আয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশী। বড় ডাক্তার, বিখ্যাত ধাত্রী থেকে কিছুরই অভাব নেই। সুষমার পিতা চঞ্চল-পদে বৈঠকখানায় পায়চারী করছেন, মাঝে মাঝে উপরে গিয়ে প্রসূতির খবর আনছেন। প্রসূতির ঠাকু'মা হাতের কাছে শাঁখটা রেখে বুকের উপর হাত তুলে বোধ হয় ইষ্ট-মন্ত্র জপ করছেন—সেকেলে মানুষ তিনি, তাই তাঁর ঈশ্বরে ভক্তি-শ্রদ্ধা কিছু বেশী। সুষমার মায়ের মুখেও উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠেছে। চাকরদের ছোটাছুটিতে, গৃহস্বামীর অকারণ চীৎকারে, প্রসূতির আর্ত্তনাদে সমস্ত বাড়ীটা মুখর হ'য়ে রয়েছে, মনেই হয় না যে, রাত হ'য়েছে অতটা।

তেতলার উপরে ছোট একটি ঘর ··· আলো নেই। জানলা বন্ধ, তাই হাওয়ার চলাচলও রুদ্ধ। সেখানে পড়ে রয়েছে বাড়ীর বৃদ্ধা ঝি। বয়েস হয়েছে তার অনেক, মাঝে মাঝে অকারণেই জ্বর হয় ··· আর বার্দ্ধক্যের দরুণ অল্পতেই সে হ'য়ে পড়ে কাবু ··· সামান্য দুর্ব্বলতাতেই সে হারিয়ে ফেলে তার চলবার শক্তি।

সুষমাকে ছেলেবেলা থেকেই সে মানুষ করেছে শুধু সুষমাকে কেন, সুষমার মা'র জন্মাবার আগে থেকেই সে কায করে আসছে তার দিদিমার কাছে। কত আদরের তার সুষমা! বৃদ্ধা তার হৃদয়ের ভালবাসার পাত্রটি উজাড় করে', উপুড় করে ঢেলে দিয়েছে সুষমার উপর। সেই সুষমাই আজ হ'তে চলল 'মা'! তার যে আজ আনন্দ রাখবার জায়গা নেই। আজ তার কত কায করবার কথা, কত ছুটোছুটি করবার কথা ··· কিন্তু আজই কি না তার জ্বর হ'ল, আজই কি না সে চলচ্ছক্তি ফেলল হারিয়ে! বিধাতার প্রতি মন তার বিমুখ হ'য়ে উঠল। সে জন্যে বিধাতাকে অভিশাপ দিতে সে ছাড়ল না। কিন্তু না না ··· প্রসূতি যাতে বেশী কষ্ট না পায়, যাতে নির্ব্বিঘ্নে সন্তানের জন্ম হয়, সে জন্যেও সে কায়মনোবাক্যে বিধাতার কাছে প্রার্থনা করল।

হরি-নামের মালাটা ঘোরাতে ঘোরাতে সে সামনের অন্ধকার-মাখা দেওয়ালটার দিকে চেয়ে রইল। অতীতের স্বপ্নময় সমুদ্র সন্তরণ করে' কল্পনার তরী তার এসে থামল এক উপকূলে ··· সে রাতটাও অনেকটা এমনি। এই রকমই এক অন্ধকার রাতে সমস্ত বাড়ীটা মুখর হ'য়ে উঠল ··· সুষমার মা'র জন্ম। দেহে তখন তার ছিল ঢের বেশী শক্তি, হাড় ক'খানা ছিল ঢের বেশী কর্ম্মঠ। নিজেই শাঁখ বাজিয়ে, চেঁচিয়ে, কেঁদে, নবজাত শিশুকে কোলে করে', তার নাড়ী নিজের হাতে কেটে, গরম জলে ঠাণ্ডাজলে স্নান করিয়ে সে শুইয়ে দিল।

সেই মেয়ে—সুষমার মা, উঠল বড় হ'য়ে। বৃদ্ধাই তাকে কোলে-পিঠে করে' মানুষ করে' তুলল। সে সমস্ত কত খুঁটিনাটি কথা। কিন্তু আশ্চর্য্য ··· লোকে বলে সে বুড়ী হ'য়ে গিয়েছে, তার না কি কিছুই মনে থাকে না।

—কিন্তু কৈ, সে সমস্ত ঘটনার একটি ছোট অংশও ত সে ভোলে নি!

তারপর সে মেয়ে যখন তের-চোদ্দ বছরের হ'ল … একদিন কত আলো, কত বাজনার সঙ্গে … কত হাসি, কত অশ্রুর অন্তরালে এক প্রিয়দর্শন যুবক তাকে নিয়ে গেল। মেয়ের সঙ্গে বৃদ্ধাকেও যেতে হ'ল তার শ্বশুর-বাড়ী।

তার কাছেই বৃদ্ধা রয়ে গেল।

সংসার যেমন চলে তেমনিই চলতে লাগল। পরের পর দুটি মৃত-পুত্র প্রসব করে' সুষমার মার দেহ পড়ল ভেঙ্গে, মন হ'ল অবসন্ন। তারপর আবার জানা গেল ভাবী শিশুর আগমনীর বার্ত্তা। বৃদ্ধা হ'য়ে উঠল চঞ্চল… প্রসূতির গলা উঠল মাতুলীতে ভরে। আপত্তি সে করতে দিত না।

সে আজ প্রায় আঠার বছর আগেকার কথা…নির্ব্বিঘ্নে সুষমার হ'ল জন্ম। যদিও তখন বার্দ্ধক্য এসে ধীরে ধীরে তার শরীরের উপর আধিপত্য করতে সুরু করে দিয়েছিল, তবুও তার দেহে যেটুকু সামর্থ্য ছিল, তা-ই যথেষ্ট।

"ওঃ বাবা…"

কে ওই চীৎকার করে উঠল? বোধ হয় সুষমাই হ'বে। চিন্তাসূত্র তার ছিন্ন হয়ে গেল, মন উঠল ব্যাকুল হ'য়ে। আজ যদি তার দেহে থাকত সেই শক্তি, দেহ যদি আজ তার হ'ত জরামুক্ত…

বৃদ্ধার নিজের ছেলে নেই, স্বামী নেই, সংসার নেই। কিন্তু তার জন্যে তার বিশেষ দুঃখও নেই। সেই কবে…ভাল করে' ছাই মনেও পড়ে না, একটা লাল চেলি পরে কার সঙ্গে যে তার বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তার সিঁদুর গিয়েছিল মুছে, শাঁখা ফেলতে হয়েছিল ভেঙ্গে।… বৃদ্ধা ভাবে, এরাই ত' তার ছেলে-মেয়ে, নাতি নাৎনি…এই ত তার সংসার।

সুষমাকে বৃদ্ধা বুকে চেপে ধরত, আদর করত…আবার মাঝে মাঝে মুখ ভার করে বলত, "আর কি আমার হাড়ে জোর আছে গো? এবার সুষীর বিয়েটা হ'লেই চলে যাব কাশী-বৃন্দাবন। শুধু ত' সবাইকার কম্মই করলাম…নিজের পরকালটা এবার গুছিয়ে নিই।"

সুষমার মা কিছু বলতেন না। তিনি জানতেন বৃদ্ধার ওই উক্তির মর্ম্মার্থ। কতবার সে ও কথা বলেছে, কিন্তু কাযে হয় নি কিছুই।

সত্যি, হ'লও তাই। খুব ধুম-ধাম করে সুষমার বিয়ে হ'য়ে গেল। সুষমার সঙ্গে তাকেও যেতে হ'ল তার শ্বশুর-বাড়ী। সে বলল, "আমার কি আর উদ্ধার আছে গো! এদের জ্বালায় আমার যে আজ কোথাও নড়বার জো নেই। তা না থাক্…এরাই আমার সব যে।"

এই সংসারের সূক্ষ্ম জালে সে পড়ে গিয়েছে আটকা, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার এর ভিতর দৃঢ়ভাবে হ'য়ে গেছে আবদ্ধ…যদিও তার নিজের সংসার নেই, যদিও নেই তার নিজের সন্তান।

পর পর কয়েক মাস জ্বরে ভোগায় শরীর তার একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। আজকাল প্রায়ই সে বসে থাকে চুপটি করে, আর হরি-নামের মালাটা ঘুরোয়। সে ভাবে আজকাল কেউ আর তাকে প্রাধান্য দেয় না, সবাই বুঝি তার সত্তাকে বিস্মৃত হ'য়েছে। কোনও কায-কর্ম্মে আজকাল তার আর ডাক পড়ে না .. বুকটা তার ব্যথায় ওঠে টন্‌টন্ করে', চোখ দিয়ে অকারণেই ঝরে পড়ে জল।

কেউ তাকে অবহেলা করলে সে উঠে কেঁদে, কেউ তাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিলে তার ইচ্ছে করে' একেবারে মরে যেতে। কারুর দেওয়া কৃপার অন্ন সে চায় না—সে চায় কার্য করতে, কিন্তু পারে না।

বাড়ীতে আজ হাজার গোলমাল। কেউ তাই আজ বৃদ্ধার কাছে আসতে পারে নি। সন্ধ্যেবেলায় চাকরটা এসে তাকে এক বাটী সাবু দিয়ে গিয়েছে … কিন্তু সে তা স্পর্শও করে নি! …

কিন্তু ও কিসের গোলমাল … আরে, শাঁখ বাজছে যে! সে আর স্থির থাকতে পারল না। জোর করে সমস্ত দুর্ব্বলতা, সমস্ত যন্ত্রণাকে সরিয়ে দিয়ে দারুণ উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। সুষমা, সুষমা … তার সুষমার কি না সন্তান জন্মালো, আর সে কি না চুপচাপ থাকবে শুয়ে!

অন্ধকারের ভিতর ধীরে ধীরে সে এগিয়ে চলল। সিঁড়ির কাছটায় এসে একটু দাঁড়িয়ে আবার চলতে লাগল।

নীচে তখন মহা হৈ চৈ ··· শাঁখ বাজছে, সবাই ছুটোছুটি করছে। কে একজন চেঁচিয়ে উঠল "ছেলে হয়েছে" বলে।

বৃদ্ধা আর নিজেকে চেপে রাখতে পারল না। যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি নেবে এল। আঁতুড়-ঘরের পিছন দিককার অন্ধকার দালানটার কাছে এসে রুদ্ধনিঃশ্বাসে সে ধীরে ধীরে একটা খড়খড়ি তুলে দেখতে লাগল। ওমা ··· আঁতুড় ঘর আলো করে' যেন একটা পদ্ম ফুটে উঠেছে।

বৃদ্ধার ইচ্ছে করতে লাগল ছুটে গিয়ে শিশুকে বুকে চেপে ধরে। কিন্তু কৈ ··· তার নামও কেউ করছে না, আজ এই আনন্দের দিনে। দারুণ অভিমান তার গলাটাকে যেন চেপে ধরল ··· চোখ দিয়ে তার ঝর ঝর করে' নেমে এল অশ্রুর বন্যা। তবুও প্রাণভরে সে আশীর্ব্বাদ করতে লাগল প্রসূতি ও শিশুকে, প্রাণভরে সে প্রার্থনা করতে লাগল তাদের দীর্ঘজীবনের জন্যে।

সবাই তখন ব্যস্ত। কেউ জানল না তার ব্যথার ইতিহাস, কেউ অনুভব করল না তার বার্দ্ধক্যের দৈন্য। রোগক্লিষ্ট দেহ তার উত্তেজনায় এতক্ষণ খাড়া হ'য়ে ছিল, দ্বিগুণ অবসাদ এখন তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। সে আর দাঁড়াতে পারল না। সেই অন্ধকারময় বারান্দার উপর আঁচলটা বিছিয়ে সে শুয়ে পড়ল। চোখ দিয়ে তার নেবে এল অশ্রুর বন্যা।

পল্লী-বন্দনা

—শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস

পল্লী-মায়ের শ্রীচরণের বন্দনা-গান গাহি'
কাটুক্ আমার কাটুক্ জীবন-বেলা;
রাখাল-ছেলের সাথে সাথে বনে বনে ফিরি
হ'ক অবসান আমার দিনের খেলা।
ষড়-ঋতুর উৎসবেতে পরাণ আমার মাতি
থাকে যদি থাকুক্ সকল ভুলে;
যাই শোনায়ে পল্লী-মায়ে আমার প্রাণের গীতি
এমনি করে নিতুই পরাণ খুলে।
পল্লী-পথের কাঁটাগুলি কুড়িয়ে ফেলে যাই
যাই নিকায়ে ছায়া-তরুর তলে;
রাখাল-গলে যাই পরায়ে ফোটাফুলের মালা
ভিজিয়ে তায় আমার আঁখি-জলে।

হয় যদি প্রাণ হ'ক অবসান পল্লী-মায়ের কোলে
নাই বা চিনুক্ আমায় ধরাবাসী;
আমার ফুলে পূজা যদি নেয় জননী মোর
অর্ঘ-কুসুম হ'বে না ত বাসি।
বেদনা মোর গুঞ্জরিবে কুঞ্জে অলি-দলে
বিহগ-কণ্ঠে অমর হ'বে ভাষা;
ছন্দ আমার রইবে বেঁচে কিশলয়ের নাচে
ধন্য হ'ব, পূর্ণ হ'বে আশা।
সত্যকারের ভালবাসা প্রাণে যদি মোর
একটু খানি থাকে পল্লী-তরে;
বিশ্ব-জোড়া খ্যাতি আমার নাই বা থাকুক গো
ওরাই আমায় রাখবে অমর ক'রে।

বিচিত্র জগৎ

ভারত-সমুদ্রের একটি দ্বীপ

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিচিত্র পৃথিবীর বিচিত্রতর ইতিহাসের 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা'র মধ্যে কত জাতি, কত সভ্যতা সমুদ্রবক্ষে জলবুদ্বুদের মত ভাসিয়া উঠিয়াছে, আবার অদৃশ্য হইয়াছে। এ জাতির সহিত সে জাতির, এ সভ্যতার সহিত সে সভ্যতার—সমগ্র মানবেতিহাস যুগ যুগ ধরিয়া কি ইহারই ঠাসবুনানির আল্পনা আঁকিয়া চলিতেছে? ভারত-সমুদ্রের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে ইংরাজ ও ফরাসী ইত্যাদি জাতির ঐতিহ্যে এবং দুর্দ্ধর্ষ বোম্বেটে ও নিগ্রো ক্রীতদাসের বর্ণসঙ্করে রচিত ক্ষুদ্রতর একটি জাতি—ক্রিয়োল; তাহাদের ছেলেরা পর্য্যন্ত অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ধার্ম্মিক, দয়ালু ও সরল, কিন্তু মেয়েদের মধ্যে বিলাসিতার প্রাদুর্ভাব খুব বেশী, অবস্থার অতিরিক্ত তাহারা সাজপোষাক করে, ফরাসী গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করে, সুবাসিত সিগারেটের ধূমপান করে, অথচ কদাচিৎ শ্লীলতা ও শোভনতার সীমা অতিক্রম করে,—এই অর্দ্ধ-সভ্য, অর্দ্ধ-বন্য জাতির একটি কৌতুহলোদ্দীপক পরিচয় এই রচনায় পাওয়া যাইবে।

ভারত মহাসমুদ্রের কয়েকটি দ্বীপের প্রাকৃতিক দৃশ্য অত্যন্ত চমৎকার। কিন্তু সাধারণ জাহাজের চলাচলের পথ হইতে অনেক দূরে অবস্থিত বলিয়া অনেকেই সেগুলি সম্বন্ধে কোন খবর রাখেন না। যে দু' একখানা ইংরাজি ভ্রমণ-সংক্রান্ত পত্রিকাতে মাঝে মাঝে ইহাদের কথা পাওয়া যায়, তাহাদের সংখ্যাও বেশী নয়। সম্প্রতি 'ব্লু পিটার' পত্রিকায় মিঃ ডেনিস পামার এ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

"সমুদ্রের ঢেউ প্রস্তরময় বেলাভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িতেছে।

সমুদ্রের জল হইতেই বিশাল গ্রানাইটের পর্ব্বত আকাশ-পানে ঠেলিয়া উঠিয়া রাত্রির অন্ধকারে মিলাইয়া গিয়াছে। সমুদ্রতীরের কঠিন পাষাণ ভেদ করিয়া একটি মাত্র নারিকেল গাছ কি করিয়া বর্দ্ধিত হইল, কোথা হইতে রস সংগ্রহ করিল, তাহার ইতিহাস সে-ই জানে।

এই সব দ্বীপে প্রাচীন জাতির প্রেতাত্মারা বাস করে না। কোন প্রাচীন দিনের সভ্যতার অস্তিত্ব খুঁজিয়া এখানে পাওয়া যাইবে না। ইহাদের ইতিহাস বড় জোর সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পৌছিতে পারে। সে ইতিহাসের নায়ক-নায়িকা রাজা-রাণী বা রাজপুত্র নহেন, তাহারা প্রায়ই সামুদ্রিক দস্যু,

সেচিলিস : মাহি উপকূলের এক অংশ।

এখানে তাহাদের একটা বড় ঘাঁটি ছিল এবং তাহারা লুঠতরাজ, গালাগালি, জুয়াখেলা, হত্যা, মদ্যপান প্রভৃতিতে সর্ব্বদা মত্ত থাকিত।

সুতরাং বুঝা যাইতেছে, এই সকল দ্বীপের প্রাচীন ইতিহাস দুর্দ্ধর্ষ বোম্বেটেদের ইতিহাস মাত্র। জগতে চিরকাল

কিছুই স্থায়ী নয়, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ফরাসীরা আসিয়া বোম্বেটেদের ধ্বংস করিল। পরে তাহারাও চলিয়া গেল, আসিল ইংরাজ। ইরাজদের সঙ্গে নিগ্রো ক্রীতদাস আমদানি হইল, পূর্ণ শান্তি স্থাপিত হইল। একথা স্বীকার করিতেই হইবে স্থানীয় ক্রিয়োল অধিবাসীরা খুব সুখেই আছে। ভারত সমুদ্রের ঢেউ ও ঝড় দ্বীপের প্রাচীন অপ্রীতিকর স্মৃতি বেমালুম ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়াছে। এখন আছে কেবল সমুদ্রজলের ও পচা নারিকেল-খোলার গন্ধ।

পর্ব্বতের মাথায় নারিকেল গাছের মধ্যে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, দৈত্যের হাতের লণ্ঠনের আলোর মত। নীচে পুকুরের জলের মত স্থির সমুদ্র জ্যোৎস্নায় চিক্ চিক্ করিতেছে। বন্দরের সম্মুখে প্রবালময় তটভূমি যেন হিংস্র দন্তপাটি বিকশিত করিয়া আছে, দন্তপংক্তির ফাঁকে ফাঁকে ফেণ-চিহ্ন।

মাহি: নারিকুলকুঞ্জের ছায়ায় ক্রিয়োল কুটির।

পাহাড়ে একটি অপেক্ষাকৃত সমতল স্থানে আমি শুইয়া সমুদ্র দেখিতেছিলাম, প্রবালময় তটভূমিতে জ্যোৎস্নার খেলা দেখিতেছিলাম, পোতাশ্রয়ের বাহিরের সমুদ্র কয়েকটি ক্রিয়োল জেলে-ডিঙ্গির মাছ ধরা দেখিতেছিলাম।

মাহি বন্দরে আজ আমার শেষ-রজনী। তাই অনেক পুরাতন দিনের কথা শুইয়া শুইয়া ভাবিতেছিলাম। প্রথম যেদিন আসিলাম, সেদিনের কথা বেশ মনে পড়ে। ইউরোপ হইতে ডাক-ষ্টীমারের নিম্নতম শ্রেণীতে মহাকষ্ট ভোগ করিয়া আসিতে আসিতে দূর হইতে মাহি বন্দরের নারিকেল শ্রেণী ও নীল পর্ব্বতমালা চোখে পড়িতেই পথের কষ্ট ভুলিয়া গেলাম। ডেকে দাঁড়াইয়া দেখিলাম—প্রদোষের অস্পষ্ট অন্ধকারে ত্রিভুজাকৃতি সিলুয়েটে আঁকা ছবির মতই সিলুয়েট দ্বীপটি কি সুন্দর ও রহস্যময় দেখিতে!

তারপর কতকবার আমি সিলুয়েট দ্বীপের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়াছি, সব সময়েই তাহাকে সুন্দর ও রহস্যময় বলিয়া মনে হইয়াছে। কখনও দ্বীপের সীমারেখা অস্পষ্ট ও ছায়াময়, কখনও তাহার প্রান্তভাগ দিগন্তরেখার সহিত এক হইয়া গিয়াছে, কখনও সূর্য্যালোকে তাহাকে এত স্পষ্ট দেখিয়াছি যে, তীর-বর্ত্তী নারিকেল বনানীর প্রতিটি শাখা যেন গণনা করিতে পারি।

আমাদের ষ্টীমার প্রবালশৈলের ভয়ে দ্বীপ হইতে বহু দূরে মুক্ত সমুদ্রের বক্ষ দিয়া চলিতেছিল, কিন্তু তবুও আমরা লক্ষ্য করিতেছিলাম, শুভ্র বালুময় বেলা ও প্রান্তবর্ত্তী শ্যামল নারিকেল-কুঞ্জ। সিলুয়েট দ্বীপে নামিয়াই বাস স্থানের সন্ধান করিলাম।

একটি ক্রিয়োল ভদ্রলোকের বাংলো ভাড়া পাওয়া গেল। স্ত্রী ও দুটি মেয়ে লইয়া পাশেই নিজেদের বাড়ীতে তিনি থাকেন। মেয়ে দুটি দেখিতে বেশ সুন্দরী। তাঁহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী বড় অদ্ভুত, তাঁহারা ঠিক সামোয়া দ্বীপের অর্দ্ধ-সভ্য, অর্দ্ধ-বন্য জাতির মত বাস করেন।

মেয়ে দুটির বয়স হইয়াছে। কিন্তু তাহারা এত স্বাধীন, এত মুক্ত যে, প্রশান্ত সাগরের দ্বীপে মেয়েকে নায়িকা করিয়া যে-সব ফিল্ম তোলা হয়, তাহার মধ্যেও নায়িকাকে এত মুক্ত ও স্বাধীন দেখা যায় কি না সন্দেহ। তাহারা জ্যোৎস্নালোকে হয় তো প্রবাল-বাঁধ ছাড়াইয়া দূরের দ্বীপে নৌকা করিয়া বেড়াইতে যাইতেছে, নয় তো বালুতটে চুপচাপ বসিয়া গান গাহিতেছে কিংবা মাছ ধরিতেছে, নয় তো পাহাড়ের উপর,

চড়িয়া বসিয়া আছে। তাহারা কোথায় কখন থাকিবে কেহ বলিতে পারে না।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহারা বা তাহাদের বাপ-মা পোর্ট ভিক্টোরিয়াতে বড় একটা যায় না। বোধ হয়, সহরের আকর্ষণ প্রকৃতির লীলাভূমি সিলুয়েট দ্বীপ হইতে তাহাদের লইয়া যাইতে পারে না। এই বন্য জীবনই তাহারা ভালবাসে, দেখিলাম ইহাতেই তাহারা সুখী।

পোর্ট ভিক্টোরিয়াতে যেদিন প্রথম যাই, সে দিনের কথাও স্পষ্ট মনে আছে।

এখানকার এই সব দ্বীপের রাজধানী পোর্ট ভিক্টোরিয়া।

এক হাজার মাইলের মধ্যে ইহাই একমাত্র সহর ও আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্র। এখানকার অধিবাসীরা ভাবে পোর্ট ভিক্টোরিয়ার মত সহর পৃথিবীতে বোধ হয় বেশী নাই। এখানে সিনেমা আছে, নাচঘর আছে, ব্যাঙ্ক আছে, হোটেল আছে, হরেক রকম জিনিসে সাজানো মনিহারী দোকান পর্য্যন্ত আছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থাও নিতান্ত মন্দ নয়।

পোর্ট ভিক্টোরিয়া কিন্তু উগ্র ধরণের সহর নয়। এত আধুনিক জিনিসের সমাবেশ হওয়া সত্ত্বেও পোর্ট ভিক্টোরিয়া তাহার বন্য প্রকৃতিকে ঢাকিতে পারে নাই। সহরের যে কোন বড় রাস্তা গিয়া উচ্চ গ্রানাইট পর্ব্বতের পাদদেশে পৌছিয়াছে ব্যাঙ্কের পিছনে, সিনেমা-হলের পিছনে, পর্ব্বত নীল আকাশে মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, ঘন হরিৎ বর্ণ তাদের বনানী-সমাকীর্ণ সানুদেশ।

পাহাড়ের ঢালুতে, সমতল ভূমিতে, সহরের রাস্তার সাথে ছোট পার্কে বড় বড় রুটীফলের গাছ, নারিকেল গাছ, কলা গাছ। নানা ধরণের অপরিচিত সুগন্ধ বাতাস। সহরের দোকানগুলির মালিক প্রায়ই চীনা, নয় ভারতীয়।

মঁসিও মিকেল যাহাকে হোটেল নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, আমি পোর্ট ভিক্টোরিয়ার রাস্তা বাহিয়া সেই কাঠের জীর্ণ বাড়ীটির অভিমুখে যাইতেছিলাম। আমার চারিধারে যেন রূপকথার দৃশ্য। সাদা ড্রিলের পোষাক পরিয়া হৃষ্টপুষ্ট ফরাসী পোদ্দার চলিয়াছে, ক্রিয়োল মেয়েরা পরস্পরের হাতে হাত দিয়া হাসিতে হাসিতে ও সুবাসিত সিগারেটের ধূমপান করিতে করিতে চলিয়াছে।

অনেকে রাস্তার ধারে দোকানে বসিয়া 'বাকা' পান করিতেছে। 'বাকা' একপ্রকার সুরা, আখের রস হইতে প্রস্তুত হয়। 'বাকা' পান করিয়া অনেকে মাতলামি জুড়িয়া দিয়াছে, কেহ বা হল্লা সুরু করিয়াছে, সম্ভবতঃ এখানে পুলিশের উৎপাত নাই।

ইহাদের মধ্যে অনেক ক্রিয়োল মেয়েও আছে, তাহারা নিজেদের মধ্যে মৃদুস্বরে কথা বলিতেছে বা গান করিতেছে

মাহি: ক্রিয়োল-পরিবার; ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ ক্রীতদাস ছিল।

বা হাসিতেছে। শ্লীলতা ও শোভনতার সীমা অতিক্রম করিতে ক্রিয়োল মেয়েদের ক্বচিৎ দেখিয়াছি।

তবে একথা স্বীকার করি যে, এই মেয়েদের মধ্যে বিলাসিতার প্রাদুর্ভাব কিছু বেশী। প্রায় সকলকেই দেখিয়াছি অবস্থার অতিরিক্ত সাজপোষাক করে, দামী ফরাসী গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করে। পয়সা ইহারা রাখিতে জানে না, যে-কোন প্রকারে উড়াইয়া দিতে পারিলেই যেন বাঁচে।

আমার শাদা চুণকাম-করা হোটেলের ঘরে মসিঁও মিকেলের সঙ্গে বসিয়া আমি নৈশভোজন সমাপ্ত করিলাম। ভোজনের প্রধান উপকরণ নানারকম সামুদ্রিক মাছ, দিশী ধরণে রান্না করা। ধরণটা ইটালী ও ফরাসী ধরণের মাঝা-

মাঝি। নমুনা হিসাবে কিছু 'বাকা' পান করিয়াও দেখিলাম। আমার সম্মুখের মুক্ত বাতায়নপথে আমি দূরের ক্যাথলিক গির্জ্জা ও তাহার দেওয়ালের গায়ের বোগেনভিলিয়া গাছের দিকে চাহিয়া ছিলাম।

মসিঁও মিকেল বলিতেছেন, দেখুন মিঃ পামার, এসব দ্বীপে খুব বেশী লোক আসে না। কিন্তু যারা আসে, তারা থেকেই যায়। এ জায়গার একটা মোহিনী শক্তি আছে। আপনি যদি চিরকাল পোর্ট ভিক্টোরিয়াতে থাকতে না চান, তবে খুব বেশীদিন এখানে থাকবেন না।

আমি বলিলাম, আপনি কতদিন এখানে আছেন?

সেচিলিস: নারিকেলের শুকনা পাতার বাড়ী।

দেখিলাম, আমার সঙ্গী একটু অতিরিক্ত মাত্রায় বকিতে ভালবাসেন। আমার কথার বিশেষ কোন উত্তর না দিয়া তিনি নিজের মনেই বলিয়া যাইতে লাগিলেন—আমি নানা জায়গায় বেড়িয়েছি মশায়। কত বড় বড় সহরে গিয়েছি, বম্বে, মোম্বাসা। তবে ইউরোপে কখনও যাইনি, যাবার ইচ্ছে আছে বটে। আমার এক বাল্যবন্ধু লণ্ডনে থাকেন। তিনি সাইকেল বিক্রী করেন, লোক ভারী ভাল। নামটা ভুলে গেলাম। তবে একদিন না একদিন তাঁর সঙ্গে আপনার আলাপ হবেই। আমার সে বন্ধুকে সবাই জানে।

মসিঁও মিকেল বলিয়াই চলিলেন। দ্বীপ সম্বন্ধে নানা কথা, তাঁহার স্ত্রীর দুর্ব্যবহার, প্রাসলিনের বিখ্যাত জোড়া নারিকেল, সমুদ্রে ঝড়ের গল্প ইত্যাদি। প্রথম আমলের ফরাসী ঔপনিবেশিকরা এখানে বড় বড় নারিকেল বাগান তৈরী করিয়াছিলেন, এখন সেই সব বাগান নানা টুকরায় ভাগ হইয়া যাইতেছে। কারণ এখানে নেপোলিয়নের আমলের উত্তরাধিকার-আইন প্রচলিত। উক্ত আইন অনুসারে পরিবারের প্রত্যেকেই সম্পত্তির অংশ পায়। এই সব কথাও মসিঁও মিকেলের মুখে শুনিলাম।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া ঘুম হইল না। সারারাত্রি ধরিয়া সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জ্জন শুনিলাম, বড় বড় ঢেউ প্রবালময় তটভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িতেছে, তাহারই শব্দ। তীরের নারিকেল বৃক্ষের শাখাপ্রশাখার মধ্যে নৈশ-বায়ুর চলাচলের শব্দ। যে রাস্তার ধারে আমার হোটেল, সেই রাস্তারই শেষে সমুদ্রবেলা। সমুদ্রের তীরে নারিকেল গাছের বন, সহরের রাস্তার ধারেও। এ যেন ষ্টীভেনসনের লেখা উপন্যাসের রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। পোর্ট ভিক্টোরিয়াতে হাওয়ার অভাব নাই।

পূর্ব্ব-বাণিজ্য বায়ু কোন সময়েই এ দ্বীপকে পরিত্যাগ করে না। ইহা বাহিরের নারিকেল শাখাকে দোলা দিয়া ক্ষান্ত নহে, পর্ব্বতের উচ্চ শিখরে গিয়া বাধিতেছে। আমি যে বাড়ীতে রাত্রিতে শুইয়া আছি, মনে হইতেছে বাড়ীটি যেন উড়াইয়া লইয়া সমুদ্রের মধ্যে ফেলিয়া দিবে। দরজা-জানালা খুলিয়া রাখিবার উপায় নাই। ঘরের মধ্যে দেওয়ালের গায়ের জামা-কাপড় উড়াইয়া লইয়া যাইবে।

বাহিরে নানাপ্রকারের নৈশ শব্দ। সমুদ্রকূলে তাল ও রাখিয়া অনন্তের সঙ্গীত গাহিতেছে। উড়ন্ত কীটপতঙ্গের গুঞ্জনধ্বনি, পাখীর কাকলী, বন্দরের স্থির জলের ওপারের গ্রানাইটের তটভূমিতে সমুদ্রজলের এক প্রকার চাপা আর্ত্তনাদের মত শব্দ।

বোধ হয় ঘুমাইয়াছিলাম, কারণ হঠাৎ শিঙাধ্বনিতে ঘুম ভাঙিয়া গেল।

তাড়াতাড়িতে বিছানায় উঠিয়া বসিলাম। নিশীথ রাত্রে এরূপ বিকট শিঙাধ্বনির অর্থ কি? কোথাও ডাকাতের

পড়িল, না প্রাচীনকালের বোম্বেটের দল রাত্রির অন্ধকারে এরূপ ভৌতিক শিঙা বাজায় ?

শুনিলাম তা নয়। ক্রিয়োল জেলেডিঙির দল বন্দরের বাহিরের সমুদ্র হইতে মাছ ধরিয়া ফিরিয়া আসিলে এ ধরণের শিঙাধ্বনি করে। ইহা এখানকার একটি প্রাচীন প্রথা। জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিলাম, জেলেডিঙির গলুইয়ে একজন লোক নীল ইজের পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কোমরের উপর হইতে তাহার শরীর অনাবৃত। জ্যোৎস্নার আলো তাহার কফি রংয়ের সুগঠিত দেহে পড়ায় তাহাকে সমুদ্রের দেবতার মত দেখাইতেছে

এ দেশের নৌকার নাম 'পিরোগ'। অনেকটা ভেনিসের গণ্ডোলার মত দেখিতে। অগভীর সমুদ্রে সেগুলি নিঃশব্দে দ্রুতগতিতে যাইতে মজবুত। খুব লম্বা একটা মাস্তুলে বড় পাল লাগানো থাকে। মাছ-ধরা ও জিনিষপত্র বহনের কাজে এখানে 'পিরোগ জাতীয় নৌকার যথেষ্ট ব্যবহার আছে। অন্য ধরণের নৌকা যে নাই, তাহা নয়। অনেক ধনী ইউরোপীয় ব্যবসাদার বা নারিকেল-বাগানের মালিক 'ইয়াট' বা 'বার্ক' জাতীয় জলযান আমদানী করিয়াছেন। অনেক মোটর-বোটও আছে।

মাহি: 'পিরোগ'-এ (জেলে-ডিঙ্গিবিশেষ) করিয়া জেলেরা মাছ ধরিয়া ফিরিতেছে।

শিঙাধ্বনিতে সেই যে আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল, আর ঘুম আসিল না।

উঠিয়া বাহিরে বারান্দায় গিয়া বসিলাম।

রাত্রির জ্যোৎস্না মিলাইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র হইতে ঘন কুয়াসা আসিয়া উচ্চ পর্ব্বতশিখর হইতে পোর্ট ভিক্টোরিয়ার হোটেল-বাড়ী, কফিখানা, মনিহারী দোকান, নারিকেল বন সব ধীরে ধীরে ঢাকিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। আকাশে দু' দশটা তারা, তাহাও দেখা য কি যায় না।

আমার মনে হইল এত চমৎকার দৃশ্য আমি আর কখনো দেখি নাই। স্বপ্নাভিভূতের মত সমুদ্রবেলায় শিলাখণ্ডে গিয়া বসিয়া বালুর উপর কাঁকড়াদের খেলা দেখিতে লাগিলাম। অসংখ্য লাল কাঁকড়া, প্রথমে মনে হইবে, যেন চেপ্টা লাল রঙের কি ফল বুঝি সমুদ্রতীর বিছাইয়া পড়িয়া আছে, মানুষের পায়ের শব্দ পাইলেই তাহারা গর্ত্তের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে, এজন্য খুব সন্তর্পণে পা ফেলিয়া উহাদের নিকটবর্ত্তী হইতে হয়।

আমি সেখানে অনেকক্ষণ থাকার পরে কয়েকটি ক্রিয়োল স্ত্রীলোক সমুদ্রজলে নামিয়া মাছ ধরিতে লাগিল। গলাজলে নামিয়া সারবন্দী দাঁড়াইয়া ইহারা ছিপের সাহায্যে মাছ ধরে। আধ ঘণ্টার মধ্যে অনেকগুলি মাছ পাইল। প্রত্যেকেরই পিঠে একটা ছোট ঝুড়ি বাঁধা ছিল। ঝুড়িটা পূর্ণ হইতে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় লাগিল। রোজই না কি তাহারা এভাবে মাছ ধরে।

ক্রিয়োল জেলেরা সহর হইতে দূরে পাহাড়ের নীচে ছোট ছোট কুটীরে বাস করে। তাহারা খুবই গরীব, তাহাদের ঘরে আসবাবপত্র অতীব বিরল, মাত্র একটি করিয়া টেবিল ও একখানা করিয়া শুইবার খাট। কিন্তু তাহারা অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ধার্ম্মিক, দয়ালু ও খুব সরল। তাহারা ভাঙা ফরাসীতে কথা বলে এবং শনিবার রাত্রে প্রায় সকলেই কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় 'বাকা' পান করিয়া থাকে।

পোর্ট ভিক্টোরিয়াতে চীনাদের যে বড় দোকান আছে, সেখানে 'বাকা' বিক্রয় হয়, এক বোতলের দাম দুই সেণ্ট মাত্র। 'বাকা' অত্যন্ত ঝাঁঝালো জিনিস, গলা দিয়া যতদূর নামে, মনে হয় যেন পুড়িয়া গেল এবং তখনি গান করিবার

ইচ্ছা হঠাৎ জাগিয়া উঠে। শনিবার রাত্রে সহরের সকলেই 'বাকা' পান করিয়া আমোদ করে।

কিছুদিন এখানে থাকিবার পরে আমি সহর হইতে দূরে নির্জ্জনে একটা বাংলো খুঁজিতে লাগিলাম। কিন্তু কেহই সঠিক সন্ধান দিতে পারিল না। একদিন জন্‌সন্ নামে জনৈক স্থানীয় ইংরাজ অধিবাসীর সহিত আলাপ হইল। তাহাকে বাংলোর কথা জিজ্ঞাসা করিতে খুব সুন্দর ও সস্তা একটা বাংলোর সন্ধান পাইলাম।

প্রাসলিন: জোড়া নারিকেল (coco de mer)

জন্‌সন্ চমৎকার লোক। একদিন রাস্তায় হঠাৎ আমার কাঁধ ধরিয়া বলিল, তোমার নাম সেদিন ক্লাবে শুনলাম বটে। এখানে বেড়াতে এসেছ! বেশ বেশ থাক। চমৎকার জায়গা। মাছ ধরার সখ আছে? তা হ'লে একদিন এস না আমার বাড়ীতে। দুজনে মাছ ধরা যাবে। এই ভাবেই জন্‌সনের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ।

একদিন আমি আমার নূতন বাংলোয় বসিয়া আছি, জন্‌সন্ তাহার নৌকা আনিয়া হাজির। এখনই মাছ ধরিতে যাইতে হইবে। আমি প্রস্তাব করিলাম সঙ্গে সঙ্গে প্রাস্‌লিন দ্বীপের জোড়া নারিকেল যে গাছে ফলে, সে গাছও দেখিয়া আসিতে হইবে।

আমরা নৌকা ছাড়িয়া দিলাম। সিলুয়েট দ্বীপ ও মাহি পাশাপাশি অবস্থিত—ইহাদের তীরভূমির দৃশ্য ধীরে ধীরে আমাদের সম্মুখে বিস্তৃত হইল। চারিধারেই গ্রানাইটের পাহাড়, পাহাড়ের সাম্নুদেশ সবুজ নারিকেল বনে আবৃত, মাঝে মাঝে সমুদ্রের সরু খাড়ি দ্বীপের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে, তাহার উপরে পাহাড় ঝুঁকিয়া আছে, পাহাড় ও সমুদ্রের মধ্যে সেখানে চক্‌চকে সাদা বালুময় বেলাভূমি। পাহাড়ের উপরে নারিকেল বন।

প্রবাল-বাঁধের বাহিরের সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গ-সঙ্কুল। বিশাল ঢেউ আসিয়া সজোরে প্রবাল-শৈলে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। ভিতরের সমুদ্র কিন্তু নদীজলের মত শান্ত, স্থির।

নিকটেই একটা ছোট দ্বীপে জন্‌সন্ একখানা চমৎকার বাংলোতে বাস করে। একটা অনুচ্চ পাহাড়ের উপর বাংলোটা তৈরী, সামনে ধূ ধূ করিতেছে সুবিস্তীর্ণ ভারত-মহাসাগর, এক পাশে ঘন নারিকেল বন। একজন ক্রিয়োল ভৃত্য ছাড়া জন্‌সনের বাংলোতে আর কেউ থাকে না। সে এই নির্জ্জন জীবনই ভালবাসে দেখিলাম। রাত্রে বাংলোর বারান্দাতে বসিয়া জন্‌সন্ আমাকে নিজের ইতিহাস বলিয়া গেল।

হতাশ প্রেমের কাহিনী। আর সে সভ্য জগতে ফিরিতে চায় না। এখানে বেশ আছে। এই জীবনই ভাল। এরূপ গল্প সারাজীবন অনেকের মুখে শুনিয়াছি। তবু প্রাসলিন দ্বীপের গ্রানাইট পাহাড়ের মাথার উপর উদিত চন্দ্র, সম্মুখের জ্যোৎস্নালোকিত সমুদ্রজল, ও নারিকেল কুঞ্জের মধ্যে বসিয়া শুনিতে শুনিতে এ সব কাহিনী চিরনূতন ও চির রহস্যময় বলিয়া বোধ হইল।

হরিগুরুর আখড়া
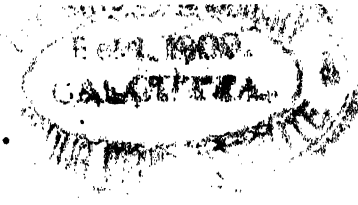
—শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

মাত্র আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বের কথা, তখনও বাঙ্গালার শ্রী-সমৃদ্ধি একেবারে লোপ পায় নাই, তখনও নদীমাতৃক এই বাঙ্গালা দেশের নদী-খাল-বিলের বুক একেবারে শুখাইয়া যায় নাই, নদীর বুকে তখনও বড় বড় বজ্‌রা ভাসিত, বাঙ্গালা দেশের কমলবনের শ্রী-সৌন্দর্য্য তখনও একেবারে অদৃশ্য হয় নাই ; বাঙ্গালার অভিজাত বংশের মর্য্যাদা তখনও শেষরাত্রির দীপশিখার মত জ্বলিতেছে ; বিজলী বাতি, মোটরকার ও ড্রইং রুমের কৌচ-সেটি-সোফার বিসদৃশ বিলাস-সজ্জায় তখনও বাঙ্গালার আভিজাত্য ঢাকা পড়ে নাই, তখনও এখানে ওখানে রায়-বাড়ী, শিকদার-বাড়ীর জমিদার বংশে দুই একটি মানুষ জন্মাইত। সেই আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বেকার স্তিমিতপ্রায় গৌরবের একটি চিত্র এই কাহিনীতে পাওয়া যাইবে—অথচ ইহা হতাশ প্রেমের গল্প।

সে আজকালের কথা নয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কথা—প্রায় আড়াই শত বৎসর হইল। পূর্ব্ব-বঙ্গের একটি ক্ষুদ্র পল্লী : নাম মাজবাড়ী। কিন্তু পল্লী ক্ষুদ্র হইলে কি হইবে, এ কাল আর সে কালে অনেক তফাৎ। ছোট্ট পল্লী, কিন্তু কোথাও একটু জঙ্গল নাই—এত ম্যালেরিয়া নাই, মানুষের পেটভরা প্লীহা নাই। গ্রামের পূর্ব্বদিকে বিল, বিলের ধারে একটি আশ্রম—লোকে বলে "হরিগুরুর আখড়া"। আখড়ার পূর্ব্বদিকে যতদূর চোখ যায়, কেবল বিল—অজস্র পদ্ম ফুটিয়া আছে, ঘরে বসিয়াই ভ্রমরের গুণ-গুণানি শুনা যায়। আখড়ার প্রথম অবস্থার কথা বলিতেছি—তখনও দেশ-বিদেশ জুড়িয়া তার খ্যাতি বিস্তৃত হইয়া পড়ে নাই।

গ্রীষ্ম কাল, সন্ধ্যা হয় হয়। সারা গ্রামখানি নানা প্রকার পাখীর ডাকে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিম গগনের শেষ রশ্মিটুকু আখড়ার মণ্ডপ-ঘরের মাথার উপরে যাই যাই করিতেছে। আখড়ার সম্মুখের ঘরের বারান্দায় একটি খাঁচায় একটি ঝুঁট-শালিখ—পাখীটি অনেক দিনের, পোষ মানিয়া গিয়াছে। একটি বাইশ তেইশ বৎসরের যুবতী খাঁচায় নাড়া দিয়া পড়াইতেছে, 'কৃষ্ণকথা বল, কৃষ্ণকথা বল মন—কৃষ্ণ ভজিলে পরিত্রাণ—কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম—।' পাখী সঙ্গে সঙ্গে দিব্য বলিয়া যাইতেছিল। যুবতীর অঙ্গে গেরুয়া, গলায় মালা, কপালে তিলক-কাটা, মুখে চোখে একটা পবিত্রতার ছাপ। এতক্ষণে সন্ধ্যা প্রায় হইয়া আসিয়াছে, তরল অন্ধকার চারিদিক ভরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় কে যেন এক জন ভিতর হইতে মৃদু মৃদু গাহিতে গাহিতে যুবতীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

> "সই কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম ?
> কানের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো
> আকুল করিল মোর প্রাণ।"

—নে তোর গান রাখ সরলা, রাত দিন তোর মুখে—সই কেবা শুনাইল, লেগেই আছে। ভাল লাগে না ভাই!

সরলা বলিল—ভাল লাগে না ? সত্যি বলছিস্ মালতী ? তবে সেদিন গোপীনাথের সামনে এই গান গেয়ে গেয়েই সকলে চোখের জল ফেলেছিলি কেন শুনি ?

—তা আর চোখে জল আসবে না, রাধার সে কি অবস্থা, কি সে অনুরাগ! গোপীবল্লভকে সামনে রেখে এমনি সব গানই যে একেবারে কানের ভিতর দিয়ে মরমেই পশে!

—সত্যই ভাই, ও গান আমিও ভুলতে পারিনে—গোপীবল্লভকে সামনে রেখেই কি, আর গোপীবল্লভকে আড়ালে রেখেই কি, যখনই গাই তখনই যেন অনুরাগে বুক ভরে ওঠে। সেদিন দেখিস নাই, এই গান শুনে ঠাকুর কেঁদে কেমন আকুল হ'য়েছিলেন।

সরলা আবার গাহিতে লাগিল—

> "না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো,
> বদন ছাড়িতে নাহি পারে,
> জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
> কেমনে পাইব সই তারে ?"

ইতিমধ্যে ভিতর হইতে খড়মের শব্দ হইতে লাগিল, কে যেন এই দিকেই আসিতেছে। মালতী বলিল, ঠাকুর আসছেন

–চল যাই সরলা। মুহূর্তমধ্যেই যিনি তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহাকে দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। দীর্ঘ, বলিষ্ঠ দেহ; অত্যুজ্জ্বল গৌরবর্ণ, শ্বেত শ্মশ্রু, কৌপীন পরা গায়ে নামাবলী জড়ান। ইনিই ঠাকুর, লোকে বলে 'হরি গুরু"। আগে কি নাম ছিল, কোথায় থাকিতেন, কি করিতেন, জানিবার দরকার হয় না, লোকে শুধু বলে, "হরি গুরু"—মনে মনে জানে, সিদ্ধপুরুষ। আশে পাশের গাঁয়ের লোক ঠাকুরকে ভয়ও করে, ভক্তিও করে। কত জনে কত কথা বলে। কেহ বলে, পূর্ণিমা রাত্রে যখন সারা বিল জ্যোৎস্নায় ভাসিয়া উঠে, ঠাকুর তখন সকলের আড়ালে খড়ম পায়ে দিয়া ভাদ্র মাসের ভরা বিলের উপর দিয়া হাটিয়া বেড়ান, আর গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতে থাকেন। কেহ বলে, গভীর রাত্রে মদাপুরের হাট করিয়া আসিবার সময় দেখে হরিগুরু চন্দনা নদীর উপর দিয়া হাটিয়া ওপারের গ্রামগুলার দিকে যাইতেছেন। তাঁহার গানের শব্দ পর্য্যন্ত সে শুনিতে পাইয়াছে। এমনি আরও কত কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

ঠাকুর বলিলেন—তোরা এখন এখানে কি করছিস্ মা? ভিতরে যা, গোপীনাথের আরতির সময় হলো যে।

সরলা ও মালতী ভিতরে চলিয়া গেল। হরিগুরুর মনটা আজ কিছু চঞ্চল। নিত্যকার মত বিলের দিকের বারান্দায় আজও ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন বটে, কিন্তু কিছুই যেন আগেকার মত আর হইতেছিল না। বারে বারে পথের দিকে চাহিতেছিলেন, যেন কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। অন্ধকার বেশ জমাট বাঁধিয়া আসিয়াছে। ভিতরে গোপীনাথের আরতির যোগাড় প্রায় হইয়া আসিল। ঠাকুর আরও চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। দূরে অন্ধকারে যেন কাহার ছায়া চোখে পড়ে! ঠাকুর তাকাইয়া রহিলেন। ছায়া আগাইয়া আসিতে লাগিল—দেখা গেল একটি স্ত্রীলোক, ঠাকুরের মুখে চোখে আনন্দের উচ্ছ্বাস ভাসিয়া উঠিল। যে আসিয়াছিল—ঠাকুরের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে সে লাগিল। ঠাকুর সস্নেহে তাহাকে তুলিয়া বলিলেন—কাঁদছিস কেন মা, আর তোর কোন ভয় নাই। কিন্তু এতক্ষণ ছিলি কোথায় বল তো? আমি যে তোরই অপেক্ষায় পথ চেয়ে ছিলাম।

মেয়েটি এবার মুখ খুলিল—সারাদিন ওধারের ঐ আমবাগানের মধ্যে লুকিয়ে ছিলাম, পাছে আবার তারা ঠিক পায়। আপনি যাদের পাঠিয়েছিলেন, তারা আমাকে উদ্ধার করেছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত লেঠেলদের লাঠির চোটে টিকতে পারে নি। আমি ছাড়া পেয়েই পালিয়েছিলাম।

মেয়েটির বয়স সতেরো আঠারো। সুন্দরী, শুধু সুন্দরী বলিলে ভুল হয়, অপরূপ সুন্দরী!

—কিন্তু তোমাকে নিয়ে এখন কি করব মা—সেই হচ্ছে কথা! সুবর্ণপুরের শিকদারদের ঘরের মেয়ে তুমি, কোথায় রাজরাণীর মত থাকবে!—কিন্তু কপালটা তো তুমি ভাল করে আস নি মা। শিকদার-বংশ আর রায়-বংশ, দুই জমিদার-বাড়ীই আজ শ্মশান, তা না হলে মমিনপুরের বাবুরা ফৌজ পাঠায় তোমার উপরে অত্যাচার করতে? যাক, ছোট রায় বোধ হয় বাড়ী নাই মা, না? আর পুরুষ মানুষের মধ্যে রায়-বংশে সেই বুঝি একমাত্র অবশিষ্ট?

মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

—তোমাকে যদি বাড়ী রেখে আসি, আবার হয় তো তারা ফৌজ পাঠাবে। সে সুযোগ পেয়েছে কি না! এ সময় যদি ছোট রায় বাড়ী থাকত—তা সে তো এখনও তিন চার মাস বাড়ী ফিরবে না, এত বড় যে একটা ব্যাপার হয়ে গেল একটা সংবাদও পেল না। কিন্তু তুমি কি আমার আশ্রমেই থাকতে চাও?

—হাঁ,—যতদিন ছোট রায় বাড়ী না আসেন।

ঠাকুর মৌন হইয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে বলিলেন—কিন্তু এখানকার আখড়ার নিয়ম কি জান তো মা? এখানে ঢুকতে হলে—সে স্ত্রী হোক, পুরুষ হোক, তার সমস্ত দেহ, মন, প্রাণ গোপীনাথের পায়ে সমর্পণ করে দিয়ে ঢুকতে হবে। সংসারের কোন আত্মীয়-বন্ধুর উপর সে আর কোন দাবীই রাখতে পারবে না। পারবে মা?

কতক্ষণ নিস্তব্ধতায় কাটিয়া গেল—কাহারও মুখে কোন কথা নাই। যাহার সম্মুখে অনন্ত ভবিষ্যৎ, অনন্ত সুখের নীড়, যে কল্পনায় এতদিন ধরিয়া স্বর্গ রচনা করিয়াছে, সহসা সে ইহার কি উত্তর দিবে? তাহার কচি বুক কান্নায় ভরিয়া উঠিতেছিল।

—তা ছাড়া কি সত্যি, আর অন্য পথ নাই ?

—আর তো পথ দেখতে পাই না মা!

—বেশ তাই হোক আখড়ায়ই থাকব!”

ঠাকুর আর কিছু বলিলেন না। এমন সময় সরলা দরজার গোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। ঠাকুর বলিলেন—কে, সরলা? এই দিকে আয় তো মা! এই মেয়েটিকে নিয়ে যা; এ আজকের মত তোর অতিথি।

সরলা কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তোমার নাম কি ভাই ?

—তরলিকা।

—বেশ মিষ্টি নাম তো ভাই। এস আমার সঙ্গে এস।

—বাবা, আরতির সময় হ'ল।

ঠাকুর বলিলেন—যাচ্ছি মা।

... ...

একক্রোশ দক্ষিণে সুবর্ণপুর। নামের মহিমা গ্রামে অনেকখানি ছিল, সে কালের বড় সমৃদ্ধ গ্রাম। শিকদার আর রায়, দুই জমিদার বংশ—বহুদিনের বনিয়াদী ঘর। দুই বংশের যেমন অসীম প্রতাপ, আবার তেমনি প্রীতির ভাবও ছিল খুব। তাই ইহাদের নামে এ অঞ্চলের লোকের মনে ভয় আর বিস্ময় জাগাইত, তা জমিদারীর ভিতরেই হউক আর বাহিরেই হউক। চন্দনা নদীর বুকের উপর দিয়া যত নৌকা ভাসিয়া যাইত, সকলেরই নজরানা দিয়া যাইতে হইত সুবর্ণ পুরে, কেউ বাদ যাইত না, এমন কি মমিনপুরের বাবুরাও না। কিন্তু এই মাত্র মাস দুই আগে সুবর্ণপুরের বড় সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। ওলাউঠায় কত যে লোক মরিয়াছে, তার ইয়ত্তা নাই। সঙ্গে সঙ্গে জমিদার বাড়ীরও সর্ব্বনাশ হইয়াছে—রায়-বাড়ীর দুই একজন মেয়ে অবশিষ্ট আছেন. আর আছেন মাণিক রায়, কিন্তু এ নাম বড় কেউ জানে না—ছোট রায় নামেই সকলে তাঁহাকে চিনে। আজ তিন মাস হইল তিনি গিয়াছেন নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া নূতন করিয়া জমিদারীর পরোয়ানা আনিতে।

শিকদার-বাড়ীর বাঁচিয়া ছিল এক তরলিকা আর দুই

তরলিকা ছোট রায়ের বাগ্‌দত্তা; নানা কারণে এতদিন বিবাহ হইয়া উঠে নাই। কথা ছিল, ছোট রায় নবাবের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলেই হইবে।

চার পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে চন্দনা নদীর ভাটিতে মমিনপুর। মমিনপুরের দুর্ব্বৃত্ত জমিদারেরা সারা অঞ্চলের লোকের মনে ত্রাসের সঞ্চার করিত, তাহাদের অত্যাচার, অনাচারের সীমা ছিল না। কিন্তু তবু সুবর্ণপুরের আশে পাশের লোক নিশ্চিন্ত ছিল—রায় আর শিকদারদের প্রতাপে ইহাদের মাথা হেট্ট করিয়াই এখান দিয়া চলিতে হইত। আজ আর সে ভয় নাই—শিকদার-বংশ প্রায় নির্ব্বংশ, রায়-বংশের ছোট রায় বিদেশে। দুই বাড়ীতে দুই চারি জন করিয়া আমলা চাকর আছে আর সারা বাড়ী খাঁ খাঁ করিতেছে। তাহা না হইলে নারায়ণ শিকদারের কন্যা—ছোট রায়ের বাগ্‌দত্তা তরলিকাকে ধরিয়া লইতে মমিনপুরের জমিদার ফৌজ পাঠায়!

ছোট রায়ের কাছে লোক ছুটিয়াছে খবর লইয়া, কিন্তু কতদিনে বা সে লোক মুর্শিদাবাদে পৌছিবে আর কতদিনে বা ছোট রায় গ্রামে ফিরিয়া আসিবে কেহ জানে না।

গ্রামের লোক পথ চাহিয়া আছে।

এক মাস গেল, দুই মাস গেল, তবু ছোট রায় গ্রামে ফিরিলেন না। অবশেষে আষাঢ়ের শেষে চন্দনা বাহিয়া ছোট রায়ের বজরা আসিয়া ঘাটে ভিড়িল। গ্রাম ভাঙ্গিয়া লোক আসিয়া ঘাটে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। বজরা ভিড়িল, মাঝিরা নোঙর ফেলিল, কিন্তু কাহারও মুখে একটি কথা নাই। ছোট রায় বজরা হইতে নামিলেন, এমন মূর্ত্তি কেহ তাঁহার কখনও দেখে নাই—দুই চোখ জবাফুলের মত লাল, মাথার চুল রুক্ষ। কাহারও সহিত কথা কহিলেন না, কাহাকেও সম্ভাষণ করিলেন না। গ্রামের লোক ভয়ে সরিয়া দাঁড়াইল, কেহ কিছু বলিতে সাহস করিল না। রায় সোজা হাঁটিয়া চলিলেন, সামনেই শিকদার-বাড়ীর দোতালা বৈঠক। বৈঠকের সামনে আসিয়া এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিলেন। পাশে যাহারা ছিল, তাহাদের নিকট কি যেন জিজ্ঞাসা করিতে চাহিলেন, কিন্তু কথা ফুটিল না—দুই এক ফোঁটা জল চোখের কোন বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল কি? আবার চলিলেন। রায়-বাড়ীর দালানের ছাদ নজরে পড়িল। পা আর যেন চলিতে চাহে না! প্রাঙ্গণের সম্মুখে ঢুকিতেই ভিতর হইতে বহু পুরাতন

চাকর সনাতন আসিয়া ছোট রায়কে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। ছোট রায় আর পারিলেন না, যে ক্রন্দনের বেগ এতক্ষণ ধরিয়া বহু কষ্টে সংযত করিয়া রাখিয়া ছিলেন, এখন তাহা শতধারে ফাটিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িল। কড়া মেজাজী দুর্দ্দান্ত সাহসী ছোট রায় যে এমন শিশুর মত কাঁদিতে পারে, তাহা বুঝি গ্রামের লোকে বিশ্বাসই করিত না। কাহারও চক্ষু আর শুষ্ক রহিল না, এই তরুণ যুবককে তাহারা সৎপ্রকৃতির জন্য অন্তর দিয়া শ্রদ্ধা করিত।

ক্রমে শোক কাটিল। ছোট রায় একে একে সকল খবর লইলেন, তরলিকার কথা আগেই শুনিয়াছিলেন। কয়দিন কাটিয়া গেল।

... ...

শ্রাবণের সন্ধ্যা; হরিগুরুর আশ্রমের ভজন-গানে সারা গ্রাম মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। ঠাকুরের আজ আরতিতে মন নাই, সদর দরজার সম্মুখে আসিয়া যখন দাঁড়াইলেন, ঠিক মুখোমুখি একজনের সহিত দেখা হইয়া গেল। যাঁহার সহিত দেখা হইল, তিনি ছোট রায়।

ছোট রায় বলিলেন—আমাকে হয়ত আপনি চিনেন না, আমি মাণিক রায়,—সকলে ছোট রায় বলে।

ঠাকুর বলিলেন—হাঁ, চিনি ত।

—আপনার সঙ্গে আমার অনেক দরকারী কথা আছে, সেই জন্যই এসেছি।

—তা বুঝেছি, এস, আমার সঙ্গে ভিতরে এস। মাণিক রায় ঠাকুরের পিছনে পিছনে ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

ভিতরে আট নয়খানা ছোট ছোট খড়ের ঘর, অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—উঠানে দুই চারি হাত অন্তর বেল ফুলের ঝাড়। পূর্ব্বদিকের ঘরখানি অন্যান্য ঘরগুলির তুলনায় অনেক বড়, এখানি মণ্ডপ। এই ঘর হইতেই আরতির গান ভাসিয়া আসিতেছিল। ঠাকুর যে ঘরে ছোট রায়কে লইয়া ঢুকিলেন সেটি ঠাকুরের শয়ন-ঘর। মাটিতে অল্পপরিসর একটি বিছানা। একখানা খেজুরের পাটির উপরে খান দুই কম্বল পাতা। দুই জনে আসিয়া বিছানায় বসিলেন। ঘরের এক পাশে একটি মাটির প্রদীপ জ্বলিতেছিল।

ছোট রায় বলিলেন—এইবার শুনুন।

—হাঁ, বল।

—বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন, আর আপনি ত সবই জানেন। আমি নারায়ণ শিকদারের কন্যাকে নিতে এসেছি।

—তরলিকাকে?

—আজ্ঞে হাঁ।

—কিন্তু নিয়ে গিয়ে তার কি ব্যবস্থা করবে শুনি?

—তার মানে?

—তার মানে—তরলিকাকে নরপশুরা জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল শুনেছ ত? আমি লোক দিয়ে তাকে উদ্ধার করে আখড়ায় রেখেছি। তোমাদের সমাজ এখন তাকে গ্রহণ করবে ত?

—সে আমি বুঝব।

—কিন্তু একা তুমি বুঝলেই চলবে না, আমিও কিছু কিছু বুঝতে চাই।

—বেশ, আপনি হয়ত জানেন, সে আমার বাগ্‌দত্তা। যদি সমাজ তাকে গ্রহণ না করে, আমি করব।

—তোমার কথা শুনে সন্তুষ্ট হ'লাম, ছোট রায়ের উপযুক্ত কথাই বটে। কিন্তু একটা কথা, তরলিকা এখন যেতে সম্মত হ'লে হয়।

—সে সম্মত হবে না কেন?

—আমাদের আখড়ার একটা নিয়ম আছে, যে এখানে ঢুকবে, সে স্ত্রী হোক পুরুষ হোক, তার সংসারের সকল বন্ধন ত্যাগ করে এখানে ঢুকতে হবে। গোপীনাথকে সমস্ত দেহ, মন, প্রাণ একেবারে সমর্পণ করে দিতে হবে। তরলিকাকেও তো সেই প্রতিজ্ঞাই করতে হয়েছে। সে কি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে?

শুনিয়া ছোট রায় নিস্তব্ধ হইয়া গেলেন। ঠাকুর ঘরের বাহিরে গেলেন। ছোট রায় ভাবিতেই লাগিলেন।

দ্বারের পাশে একটু শব্দ হইল, চাহিয়া দেখিলেন তরলিকা। তরলিকা আসিয়া ছোট রায়ের কাছে মাটিতে বসিল, কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল—সব খবর ভাল তো?

ছোট রায় শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিলেন—ভাল? হাঁ ভাল বই কি! কিন্তু আমি কেন এসেছি জান তো?

—আমাকে নিতে, নয়?

—হাঁ, চল ঘাটে আমার নৌকা লাগান আছে, ঠাকুরের

কাছে বিদায় নিয়ে এস ! ও কি তরলিকা, তোমার চোখে জল, কাঁদছ কেন ?

—কাঁদছি আমার জন্যে নয়, আমার জীবনটা না হয় একভাবে কেটে যাবে। কিন্তু আমার জন্যে আপনি সারা জীবন কষ্ট করে মরবেন, এ আমি কেমন করে সইব ? সে দিন যখন প্রতিজ্ঞা করে আখড়ায় ঢুকেছিলাম, নিজের কথাই কেবল চিন্তা করেছিলাম, তোমার কথা তো ভাবি নি। আমার হাত-পা যে বাঁধা পড়েছে, আমি যে গোপীনাথকে সব সমর্পণ করে দিয়ে আখড়ায় ঢুকেছি। আখড়ার নিয়ম এই—ঠাকুর আমায় প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছেন।

—সব শুনেছি। কিন্তু কোন্ অধিকার আছে ঠাকুরের, তোমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়ে তোমার সারা জীবনটাকে করে দেবার

-আপনার পায়ে পড়ি, ঠাকুরের সম্বন্ধে যেন বেশী কিছু আর বলবেন না। আপনি তাঁকে চেনেন না—যদি কখনও বুঝতে পারেন তবে দেখবেন—সাধারণ মানুষে আর তাঁতে অনেক তফাৎ।

—হয় তো হবে, কিন্তু আমি তোমাকে জোর করে নিয়ে যাব তরলিকা। তুমি যদি না যাও, আমি কি নিয়ে সংসারে থাকব ভেবেছ কি ? সারা রায়বাড়ী আজ শূন্য, কেউ নাই, আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব কেউ নাই। শোকে দুঃখে সারা অন্তর একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল। কিন্তু যখন শুনলাম তুমি আছ, তখন মনে হলো, না, এখনও আমার সব যায় নাই, এখনও এমন একজন এই সংসারে আছে, যে আমার সুখ দুঃখ তার প্রাণ দিয়ে অনুভব করে তার ফলাফলের ভাগী হবে। তাই বড় আশা করেই তোমার কাছে ছুটে এসেছি। আমায় এমন করে ফিরিও না !

তরলিকা মুখে আঁচল গুঁজিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিল ; মুখ তুলিয়া বলিল—জীবন দিয়েও যদি তোমায় একটু সুখী করতে পারতাম—তবু এ অভাগীর একটু সান্ত্বনা থাকত। কিন্তু আমি যে অপারগ, কোন উপায় নাই !

মাণিক রায় আর কথা বলিতে পারিলেন না। কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল। বাহির হইতে ঠাকুর ডাকিলেন—ছোট রায় বাইরে এস। মাণিক রায় বাহিরে আসিলেন। ঠাকুর বলিলেন—চল গোপীনাথকে প্রণাম করে আসি।

ছোট কাঠের সিংহাসন, তার উপরে গোপীনাথ।

ছোট্ট পাথরের মূর্ত্তি। ঠাকুর প্রণাম করিলেন। যন্ত্রচালিতের মত ছোট রায়ও প্রণাম করিলেন। তখনও ভজনগান চলিতেছিল, সুরে মন ভুলাইয়া কোন্ দূর অতীতের পারে লইয়া যায়—প্রাণ কাঁদাইয়া তোলে। গোপীনাথের সম্মুখে বসিয়া যুবতী বৃদ্ধা মিলিয়া পোনেরো ষোল জন স্ত্রীলোক। কেহ কেহ গাহিতেছে,—কেহ গাহিতে গাহিতে কাঁদিতেছে—

ছোট রায় জিজ্ঞাসা করিলেন—এঁরা কাঁদছেন কেন ? ঠাকুর মৃদু হাসিলেন, বলিলেন—তা তুমি হয়তো বুঝবে না ছোট রায়! বুঝবার মত মনের অবস্থাও তোমার নয়, আর সে শিক্ষাও তুমি কোন দিন পাও নি। যদি বলি এরা সত্যি করেই ভগবানকে পাবার জন্যেই কাঁদে, তুমি কি খুব বেশী আশ্চর্য্য হবে মাণিক রায় ?

—বুঝি না ; তবে এই আখ্ড়াকে কেও কেও ভালও বলে, আবার কেউ কেউ নেড়া-নেড়ীর দল বলে উপহাসও করে।

—করে না কি ? বেশ শুনে সুখী হলাম। তুমিও আজ থেকে বোধ হয় তাই বলবে ?

—আপনি ছোট রায়কে চেনেন নি—সে নীচ নয়।

ঠাকুর হাসিলেন, বলিলেন—ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আমি যেন তোমাকে চিনতেই পারি।

উভয়ে দরজা পর্য্যন্ত আসিলেন, ছোট রায় বিদায় লইয়া রাত্রের অন্ধকারে মিশিয়া গেলেন।

বিপদের পর সাধারণতঃ চারিদিক হইতে আত্মীয়-স্বজন ভিড় করিয়া আসে। নিকটে, দূরে নানাবিধ আত্মীয়ের আগমনে বাড়ী আবার প্রায় ভরিয়া গিয়াছে। বাহিরে আবার সেপাহী-বরকন্দাজে সরগরম হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু হইলে কি হইবে—ছোট রায়ের মনে সুখ নাই। নিরিবিলিতে বরং এক প্রকার ছিল ভাল, এই কোলাহল হৈচৈ-এর মাঝে তাঁহার মন যেন হাঁপাইয়া উঠে। এত লোকজন—এর মাঝেও সে যেন একা—বড় একা! রাত্রে সমস্ত গ্রাম সুষুপ্তির কোলে ঢলিয়া পড়ে, কিন্তু ছোট রায়ের চোখে নিদ্রা নাই, সারারাত্রি এপাশ ওপাশ করিয়া কাটিয়া যায়।

গত জীবনের কত কি অসম্ভব কল্পনার ছবি ভাবিতে ভাবিতে মন আবসন্ন হইয়া পড়ে। চারিদিক হইতে যেন একটা ব্যর্থতা, শূন্যতা হৃদয়কে চাপিয়া ধরে। এ সংসার কিসের জন্য—কাহার জন্য? কখনও উঠিয়া ছাদে পাদচারণা করিয়া বেড়ান, নৈশ বায়ু উত্তপ্ত মস্তিষ্কে স্নেহের প্রলেপ বুলাইয়া দিয়া যায়। আজকাল আর সন্ধ্যা হইলে ঘরে মন টিকে না। রোজ আসিয়া চন্দনার ধারে দাঁড়ান। রতন ও ভজন মাঝি আসিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়, ভজন ভয়ে ভয়ে বলে, - হুজুর, আজ নূতন বজরাখানা নিলে হয় না? রায় একটু ঝাঁঝাঁলো সুরেই উত্তর দেন- না। অগত্যা তাহারা ছোট ডিঙ্গিখানাই খুলিয়া আনে।

অতি ছোট একখানা ডিঙ্গি—মাঝখানে একটু মাত্র চাটাই দিয়া ঘেরা ছই। শ্রাবণের চন্দনা কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে, এপার হইতে ওপারের ব্যবধান বড় সোজা নয়, স্রোতের দিকে চাহিলে ভয় করে। তারই মাঝে ডিঙ্গি সন্ধ্যার অন্ধকারে উজান বাহিয়া চলে, ভজন হাল ধরে, রতন দাঁড় টানে। নৌকা চলিতেই থাকে, নূতন চরের বাঁকের কাছে যখন আসিয়া পৌছায়, ছোট রায় ডাকিয়া বলেন—ভজন সবুর কর—থামা নৌকা, ঐ ওপারের খালের মুখের দিকে নে।

—খালের মুখে! ও যে মাছডাঙ্গার খাল—ওর পরে পদ্মবুড়ীর বিল!

—হাঁ জানি, কিন্তু এত বয়স হ'ল এখনও তোর ভয় ভাঙ্গল না, ভজন?

ভজন বলে—ভয়? ভয় করি নে হুজুর, আপনার বাপ মায়ের আশীর্ব্বাদে। কিন্তু এ জায়গাটা বড় ভাল না হুজুর, তাই বললাম।

মাছডাঙ্গার খাল,. তার পরেই পদ্মবুড়ীর বিল। মাঝ-জায়গাটুকুর মাহাত্ম্য বড় কম নয়। রাত্রে পারতপক্ষে এ অঞ্চলের লোক কেহ এ দিকটা মাড়ায় না। একে তো শ্মশান,—তারপরে নানা জনরব প্লাবিত হইয়া লোকের কাণে কাণে ফেরে। রাত্রে আলেয়া ছুটাছুটি করে, বিলের মাঝে হিজলগাছে কুঁড়া পাখী সারা রাত্রি ধরিয়া প্রহরে প্রহরে কোঁ কোঁ করিতে থাকে। বিশেষ করিয়া রাত্রিতে কত অশরীরী প্রাণী না কি লোকচক্ষুর গোচরে অগোচরে ঘুরিয়া বেড়ায়। কত দিন কত জন দেখিয়াছে, কত জন ভয় পাইয়াছে—এমনি স্থান! নৌকা তবুও মাছডাঙ্গার খালের ভিতর দিয়াই আগাইয়া চলিল। আলেয়া ছুটাছুটি করে, কুঁড়া ডাকিতে থাকে, অশরীরী কেহ আশে পাশে আলাপ জমাইতে আসে কি না, ছোট রায়ের তাহার কোন খেয়ালই থাকে না।

পদ্মবুড়ীর বিল—এত গভীর বিল এ দিকে আর নাই। মাঝখানে টলটলে কাল জল, চার পাশ দিয়া গভীর পদ্মবন। পশ্চিমের পাড়ে হরিগুরুর আশ্রম, আর পূর্ব্ব পাড়ে মাছডাঙ্গার শ্মশান—মাঝখানের ব্যবধান প্রায় আধ ক্রোশ।

ছোট রায়ের ডিঙ্গি খাল ছাড়াইয়া বিলে আসিয়া ঢুকিল; রায় বলিলেন—ভজন, সোজা চালাও।

—হুজুর কি আখড়ায় যেতে চান? তা ঘুরে গাঁয়ের ধার দিয়ে গেলে হ'ত না?

—না, আখড়ায় কেন? চল না, বিলের মাঝে একটু ঘুরে আসি। রতন আর ভজন কিছুই ঠিক পায় না—এ আবার কি খেয়াল! চন্দনা নদীর প্রশস্ত বক্ষ ফেলিয়া রাখিয়া কে কবে এই পানাদল ঘেরা বিলে বেড়াইতে আসিয়া থাকে!

কিন্তু নৌকা না লইয়া তো উপায় নাই, সুতরাং নৌকা বাহিয়া চলে। সামনেই পদ্ম-বন। আর তো নৌকা চলে না, পদ্ম-বনে, ধাপদলে নৌকা আটকাইয়া যায়। রায় বলেন আর একটু—অল্প একটু চল ভজন। ভজন ও রতন চেষ্টা করে যতটুকু চলে। শেষে যখন নৌকা স্থির হইয়া দাঁড়ায় আর চলে না—ছোট রায় উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া আখড়ার দিকে তাকাইয়া থাকেন। এই ত এতটুকু মাত্র ব্যবধান! তখনও আশ্রমের ভজন-গান চলিতেছে—ছোট রায়ের কাণে স্পষ্ট করিয়া তার প্রত্যেকটি কথা—প্রতিটি সুরের ঝঙ্কার বাজিয়া উঠে। এরই মাঝে তরলিকার স্বরও যে মিশিয়া আছে! এই বুঝি বুঝা যায়—এই যায় না! তাই ত, তরলিকাই ত—এই ত আগে আগে গাহিয়া চলিয়াছে—

"বঁধু তুমি যে আমার প্রাণ!"

সারা মন-প্রাণ দেহ ছাড়িয়া, স্থান-কাল ভুলিয়া উন্মত্তের মত ছুটিয়া যাইতে চাহে। এই ত এত কাছে—অথচ এত দূরে! দুঃখে নিরাশায় আপনার বুক চাপড়াইয়া ভাঙ্গিতে ইচ্ছা করে, বুকের ভিতরে বাষ্প জমিয়া সারা বুক-

খানা চৌচির করিয়া ফাটাইয়া দিতে চাহে। রাত্রি বাড়িয়া চলে, আখড়ায় ভজন শেষ হয়, রায় তবুও পাথরের মূর্ত্তির মতই দাঁড়াইয়াই থাকেন। ভজন বলে—হুজুর, এবার ফেরা যাক। "ফেরো!" নৌকা আবার সেই পদ্মবুড়ীর বিল পাড়ি দিয়া, মাছডাঙ্গার খাল বাহিয়া চন্দনার বুকের উপর দিয়া ফিরিতে থাকে। রায় এবার যেন একেবারে এলাইয়া পড়েন। ঘাটে আসিলে ভজন ডাকে—হুজুর!

মাণিক রায় আস্তে আস্তে নৌকা হইতে নামিয়া বাড়ীর দিকে চলিতে থাকেন। এমনি করিয়া দিন কাটে।

সংসারে নিজের কোন আকর্ষণ নাই, কিন্তু তবুও ত তাহার বোঝা না বহিলে চলে না, জমিদারী তদারক করা দরকার। কিন্তু ছোট রায়ের এ সব ভাল লাগে না। ইদানীং তাঁহার এক মাতুল আসিয়া চেষ্টা করিতেছেন, যাহাতে ছোট রায়ের বিবাহ হয়। মেয়ে একেবারে ঠিকঠাক, কেবল রায়ের সম্মতি হইলেই হয়। কথা শুনিয়া ছোট রায় এমন হাসি হাসেন যে, মামা দমিয়া যান। এ কয়মাস কেহ ছোট রায়কে একদিনের তরেও অন্য কোথাও যাইতে দেখে নাই, কেবল সন্ধ্যা বেলায় চন্দনার ধারে গিয়া দাঁড়ান, তার পরে নৌকায় ছুটোছুটি আরম্ভ হয়। রোজ এমনি চলে, কোন-দিন এর ব্যতিক্রম নাই।

সেদিন সন্ধ্যা তখনও হয় নাই, উঁচু গাছগুলার মাথায় তখনও শেষ আলোটুকু ঝিক্‌মিক্ করিতেছে; এমনি সময় ছোট রায় আসিয়া চন্দনার ধারে দাঁড়াইলেন। আকাশ পরিষ্কার বটে, কিন্তু দক্ষিণের দিকে একখানা মেঘ বড় জমাট ভাবে সাজিতেছিল, জোর বাতাস চলিতেছে। ঘাটের উপরে একটি প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ। তাহারই শিকড়ের সঙ্গে রসি দিয়া বাঁধা একখানি পান্‌সী ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করিতেছে। ছোট্ট পানসীখানি বড় সুন্দর। ছোট রায় নিজের মনোমত করিয়া নৌকাখানি গড়াইয়াছিলেন। কত সাধের স্বপ্নই না এই পানসী গড়িবার সময় মনে জাগিত! মুর্শিদাবাদ হইতে ফিরিয়া আসিলেই বিবাহ হইবে। তারপর বর্ষাকাল যাইবে। আসিবে শরৎ কাল, চন্দনার দুই ধার দিয়া কাশের গুচ্ছ ফুটিয়া উঠিবে, উপরে ক্ষুদ্র মেঘ, নীচে তাহারই প্রতি-চ্ছবি। বর্ষার বেগ কমিলেও চন্দনার স্রোত থাকিবে যথেষ্টই, এক দিনেই হয় ত মথুরাপুর পর্য্যন্ত ভাটাইয়া যাইতে পারিবে। সঙ্গে মাঝি-মাল্লা বেশী থাকিবে না—বড় জোর জন তিনেক। আর ভিতরে শুধু সে আর তরলিকা! মথুরাপুরের দেউলের চারিপাশ দিয়া তখন মেলা বসিয়া গিয়াছে, কত দোকানপাট আসিয়াছে। তাহারা মেলা দেখিবে, বাছিয়া বাছিয়া মনোমত দ্রব্যাদি কিনিবে। তারপর ধীরে ধীরে দুই তিন দিন ধরিয়া না হয় উজাইয়া ঘাটে আসিয়া ভিড়িবে। দুই চারি দিন একটু আমোদ করিগে এমনই বা কি ক্ষতি হইবে;—আমলা-গোমস্তারাই তো সকল কাজ দেখিয়া শুনিয়া করিতে পারিবে। ভজন আসিয়া ডাকে—"হুজুর!" ছোটরায় চমকিয়া উঠেন। কল্পনার পুষ্পরথ হইতে হঠাৎ একেবারে ইট-কাঠের বাস্তবতায় ফিরিয়া আসেন।

এতক্ষণে যে মেঘখানি দক্ষিণ দিকে সাজিতেছিল, সেটা মাথার উপরে অনেকটা আগাইয়া আসিয়াছে। বাতাসের বেগ আরও বাড়িয়াছে, চন্দনা উন্মত্তের মত সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

আজ রতন আসে নাই, ভজন একলা।

—রতন কোথায় ভজন?

—সে ছেলেমানুষ, এই বাতাসে কিছুতেই সাহস করে এল না!

—যাক্, না এসে ভালই করেছে। ছেলেমানুষ! আর এই তো কদিন আগে ওর বিয়ে হয়েছে, না?

—হাঁ, কিন্তু আকাশের অবস্থা সত্যি করেই হুজুর আজকে ভাল না।

—তাই তো, নৌকাখানা শীগগির তা হলে নিয়ে এস ভজন, দক্ষিণে বাতাসে নৌকা দিব্যি চলবে আজ।

ভজন আর কি বলিবে, নৌকা খুলিয়াই আনে।

অনুকূল বাতাসে নৌকা চন্দনার ঢেউ ভাঙ্গিয়া বেগে ছুটিতে থাকে। ভজন হাল ধরিয়া সব সময় ঢেউয়ের তাল সাম-লাইয়া উঠিতে পারে না—দুর্ব্বল হাত কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে।

ছোট রায় বলেন—ভজন তুই ছাড়, আমার কাছে হাল দে। ভজনের আত্ম-মর্য্যাদায় আঘাত লাগে, সাত পুরুষের মাঝি তাহারা!

—না ভজন তুই সর্, তুই বুড়োমানুষ, তাল সামলাতে পারবি কেন? সামনে গিয়ে দাঁড়টা ধর।

ভজন হাল ছাড়িয়া দেয়, ছোট রায় দৃঢ় হস্তে হাল চাপিয়া ধরে, নৌকা শোলার নৌকার মত নাচিতে নাচিতে, দোল খাইতে খাইতে চলে। ছোট রায়ের বুকের ভিতরও যেন নৃত্য করিয়া উঠে—বাঃ! দিব্যি চলিয়াছে তো! কে বলে বিপদ? বিপদের মাঝে এমন আনন্দ কে কবে অনুভব করিয়াছে?

গাছডাঙ্গার খালের মুখে আসিয়া নিত্যকারের মত আজিও নৌকা ভিড়িল। ভজন বলিল—এ যে একেবারে ঝড় উঠে এল হুজুর—আজ ফেরা যাক্!

নৌকা খালের মাঝে ঠেলিয়া দিতে দিতে রায় উত্তর করে—তোর জীবনের মায়া এখনও কাটল না ভজন, সংসারের এত বড় বাঁধনেই বাঁধা পড়েছিস্!

—আর হুজুর সংসারের মায়া! বৃদ্ধ আর কথা বলিতে পারে না, দুই চক্ষু ছাপাইয়া জল আসে। এই তো সেদিন ওলাউঠায় তার একমাত্র উপযুক্ত সন্তান সকল মায়া-মমতা কাটাইয়া বিদায় লইয়াছে—তবু মায়া!

আকাশে প্রলয় কাণ্ড চলিতেছে—ওপারের গাছগুলা ঝড়ের দাপটে মাথা ঠুকিয়া মরিতেছে।

বিদ্যুতের ঝিলিক দাগ কাটিয়া একেবারে সারা দেহের ভিতরে যেন প্রবেশ করে।

নৌকা আসিয়া পদ্মবুড়ীর বিলে প্রবেশ করিল। ভজন আর একটা কথাও কহিল না, লগি দিয়া গভীর জলে নৌকা ঠেলিয়া দিল। বিলের বুকের উপর দিয়া ওপারের পদ্ম-বনের ধারে গিয়া নৌকা লাগিল। ঐ ত আশ্রম। হাঁ, ভজন-গান আজও চলিতেছে; শুনিতে পাওয়া যায়—তবে বাতাসের শব্দে বড় অস্পষ্ট! রায় আজও উৎকর্ণ হইয়া রহিল। সারা মন-প্রাণ দিয়া সে তাহার প্রতিটি কথা ও সুর, আপনার প্রাণের মাঝে অনুভব করিতে চাহে। ছোট রায় তন্ময়, বাহিরের পৃথিবীর কোথায় কি হইতেছে, কে তাহার খবর রাখে? হাতের মুষ্টি শিথিল হইয়া গেল, হাল খসিয়া পড়িল।

বাতাস—কি সে বাতাস—সারা বিলের তলা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি—শোঁ শোঁ বোঁ বোঁ শব্দে সারা পৃথিবী একেবারে ভরিয়া গেল। তাহারই মাঝে হয়ত সেই গভীর শব্দ ভেদ করিয়া দুই একটি করুণ আর্ত্তনাদ ভাসিয়া উঠিয়াছিল; হয়ত দুই একবার সেই ভীষণ জলোচ্ছ্বাস ভেদ করিয়া উঠিবার ক্ষীণ চেষ্টা কেহ করিয়াছিল। কিন্তু কেহ তাহা দেখেও নাই, বলিতেও পারে না।

আকাশে আর মেঘ নাই—ঝড় থামিয়া গিয়াছে। সারা প্রকৃতি যেন গভীর নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া গিয়াছে। আকাশের কোণে একখানি চাঁদ আড় হইয়া দেখা দিয়াছে, তাহারই অস্ফুট আলোকে সারা পদ্ম-বন হাসিয়া উঠিয়াছে।

মাঝখানের কতকগুলি পদ্মনাল ভাঙ্গিয়া জলে ডুবিয়া গিয়াছে, তাহারই নীচে তখন দুইটি প্রাণী অত্যন্ত শ্রান্তিভরে নিদ্রা যাইতেছিল। ঐ ত আশ্রম, কিন্তু সেখানে আর কোন সাড়া শব্দ নাই—নিশুতির কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। এই তো এত কাছে—অথচ এত দূরে! রাত্রি প্রভাত হইল—দুই চারিদিন কাটিয়া গেল, রায় ফিরিল না।—লোকে বলিল ছোট রায় মনের দুঃখে বিরাগী হইয়াছে।

... ...

কত দিন চলিয়া গিয়াছে—রায়-বাড়ী আর শিকদার-বাড়ী বলিলে সুবর্ণপুরের লোকে এখনও দুইটি ইটের স্তূপ দেখাইয়া দেয়।

চন্দনার আর সে দিন নাই—মরিয়া শুকাইয়া গিয়াছে। পদ্মবুড়ীর বিলে কদাচিৎ পদ্ম ফুটে। সারা বিল কচুরিপানায় ছাইয়া ফেলিয়াছে। "হরিগুরুর আশ্রম" আজিও আছে। পচা খড়ের ঘর খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে। ভিতরে ঢুকিলে দুই একজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বৈরাগী-বৈষ্ণবী এধারে ওধারে পড়িয়া আছে দেখা যায়। কিন্তু সারা গ্রামখানি বৈরাগী বৈষ্ণবীতে ছাইয়া ফেলিয়াছে। কোথায় গিয়াছে আজ হরিগুরুর সে আদর্শ! লোকে বলে নেড়া-নেড়ীর দল।

থিয়েটার সংস্কার

—শ্রীসুরাজমোহন দত্ত চৌধুরী

থিয়েটার এ দেশের নিজস্ব নহে—যাত্রাগান, কথকতা, পাঁচালিই এ দেশের, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালার নিজস্ব। এই সকলের সাহায্যে আমাদের দেশে চিরকাল জনসাধারণকে একাধারে শিক্ষা ও আনন্দ দেওয়া চলিয়াছে। অক্ষম হস্তে পড়িয়া এবং দেশের রুচির কুৎসিত পরিবর্ত্তন হওয়ায় এখন আর যাত্রা, কথকতা, পাঁচালির আদর নাই। রুচি-পরিবর্ত্তনের ফলেই দেশে থিয়েটারের আমদানী। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালা দেশে এই বিদেশী থিয়েটারের একটি দেশীয় রূপ গড়িয়া উঠিয়াছিল; সেই সময়ে সত্যকার নাট্যকারও কয়েকজন জন্মাইয়াছিলেন। দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে সে যুগের অবসান ঘটিয়াছে। এখন যে যুগ আসিয়াছে, সে-যুগে টকি-সিনেমার প্রাধান্য; এই প্রভাবে দেশের থিয়েটারগুলির দুর্দ্দশার সীমা নাই। লেখক এই প্রবন্ধে সেই দুর্দ্দশা দূর করিবার কথা তুলিয়াছেন।

বর্ত্তমান প্রসঙ্গে থিয়েটার শব্দটি ইহার আদি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, অর্থাৎ ইহাতে চিত্রাভিনয় (photo-drama) না বুঝাইয়া নাট্যাভিনয় বুঝিতে হইবে। আজকাল ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে, চিত্রাভিনয়ের প্রতিযোগিতায় থিয়েটারগুলির কণ্ঠশ্বাস উপস্থিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দুশ্চিকিৎস্য রোগে অনেক চিকিৎসক কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া যেমন নানারূপ উদ্ভট ও অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় রোগীর মৃত্যু আসন্নতর করিয়া তুলেন, থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষও তদ্রূপ বহুবিধ হাস্যজনক ও ভ্রমাত্মক পন্থা অবলম্বন করিয়া অচিন্তনীয় দ্রুত গতিতে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। আমি গত বার বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন সহরের থিয়েটার ও চিত্রাভিনয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছি এবং ইউরোপ ও আমেরিকার রঙ্গালয়গুলিরও কিঞ্চিৎ সংবাদ লইতেছি। আমার সামান্য অভিজ্ঞতার ফলে যে ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহাই এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইল।

বার বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, লাহোর ও রেঙ্গুনের থিয়েটারগুলি খুবই জনপ্রিয় ছিল। তখন এই কয়েকটি প্রধান নগরে ও অন্যান্য কতিপয় ক্ষুদ্রতর সহরে চিত্রাভিনয়ের ব্যবস্থাও ছিল। কিন্তু তৎকালে অবস্থা তুলনা করিলে কেহ কল্পনাও করিতে পারিত না যে, চিত্রাভিনয় কোনদিন থিয়েটারের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে। চিত্রাভিনয়-প্রদর্শকদিগের মধ্যে দুই একটি দেশীয় ব্যবসায়ী অগ্রগণ্য ছিলেন। প্রায় প্রত্যেক জনপূর্ণ সহরে তাঁহাদের প্রত্যেকের কয়েকটি করিয়া চিত্রশালা ছিল। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি প্রধান নগর ব্যতীত অন্যান্য স্থানের চিত্র-প্রদর্শনীর ব্যবসায় অত্যন্ত ক্ষতিজনক ছিল। হেড-অফিসের লাভ হইতে ব্রাঞ্চ-অফিসগুলির ক্ষতিপূরণ করা হইত। ফিল্ম সাধারণতঃ আমেরিকা ও ইউরোপ হইতে আসিত। মাঝে মাঝে যে দুই একটি দেশীয় ফিল্ম-কোম্পানীর পরীক্ষামূলক কার্য্য (experiment) চলিতেছিল, তাহারা নানারূপ অভাব ও অক্ষমতার জন্য বুদ্‌বুদের মত উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বিলীন হইতেছিল। তখন তিন শ্রেণীর লোক চিত্রাভিনয় দর্শন করিত। প্রথমতঃ বিদেশীয়গণ, দ্বিতীয়তঃ দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, তৃতীয়তঃ স্বল্পসংখ্যক অশিক্ষিত শ্রমজীবী। থিয়েটার অপেক্ষা চিত্রশালায় কয়েকটি বিশেষ সুবিধা ছিল। অধিকাংশ চিত্রের প্রদর্শিত বিষয় বিশ্ববিখ্যাত লেখকগণের রচিত, বিশেষজ্ঞ কর্ত্তৃক প্রযোজিত, 'ষ্টার' (Star) অভিনেতা ও অভিনেত্রী কর্ত্তৃক অভিনীত এবং বিশেষজ্ঞ (expert) ফটোগ্রাফার কর্ত্তৃক আধুনিক বিজ্ঞানসম্মতভাবে গৃহীত হইত। সুতরাং আমাদের থিয়েটারের সহিত বিদেশীয় ফিল্মের অনেক পার্থক্য ছিল। চিত্রশালায় থিয়েটারের মত ভিড় ও গোলমাল হইত না। শিক্ষিত লোক এই সমস্ত কারণে চিত্রশালা অধিকতর পছন্দ করিতেন। ইহা ছাড়া চিত্রশালার দর্শনী অনেক কম বলিয়া এবং ইহা হরেক রকমের ছবি, হাসি, তামাসা ও বৈদেশিক ভাবভঙ্গীতে পরিপূর্ণ থাকিত বলিয়া এক শ্রেণীর লোক ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ হইলেও বায়স্কোপ দেখিতে যাইতেন।

চিত্রাভিনয় যখন এইরূপ ধীরে ধীরে অথচ অবিচল গতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল, তখন থিয়েটারগুলি "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি" বলিয়া স্বীয় আসনে উপবিষ্ট

ছিল। আমার মতে থিয়েটারের পতনের প্রথম কারণ তাহার রক্ষণশীলতা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে না পারা। পোনের কি কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে থিয়েটারে যে-শ্রেণীর অভিনয় হইত, বর্ত্তমানে তদপেক্ষা উন্নত শ্রেণীর অভিনয় হয় বলিয়া মনে করি না। এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষ শিল্প, বাণিজ্য ও শিক্ষায় যেরূপ পশ্চিমের অনুকরণ করিতে পারিয়াছে, অভিনয়ে সে অনুপাতে 'অগ্রসর' হইতে পারে নাই। এই সঙ্গে লোকের রুচিরও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বোধ হয় থিয়েটারের অধঃপতনের দ্বিতীয় কারণ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আমোদ-প্রমোদের উপর ট্যাক্সের (**amusement tax**) প্রবর্ত্তন। জনসাধারণ পূর্ব্ব হইতেই থিয়েটারের উপর আস্থাহীন হইয়া আসিতেছিলেন, ইহার উপর যখন দর্শনীর রেট বাড়িয়া গেল, তখন তাঁহারা থিয়েটার পরিহারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং থিয়েটারের নেশা কাটাইবার জন্যে বায়স্কোপ ধরিলেন। থিয়েটারের অধঃপতনের শেষ ও সর্ব্বপ্রধান কারণ সবাক্ চিত্রের প্রচলন। সবাক্ চিত্রের শব্দই থিয়েটারের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিল। এত-দিন থিয়েটারের সর্ব্বপ্রধান আকর্ষণ ছিল শব্দ, যখন নূতন চিত্র সেই শব্দও হরণ করিয়া লইল, তখনি প্রাচীন, স্থবির থিয়েটারের যে অন্তিম দশা উপস্থিত, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারিলেন। দেশীয় সবাক্ চিত্র জন্মগ্রহণ করিয়াই সকলের অতি প্রিয় হইয়া উঠিল এবং বিদেশীয় চিত্রের প্রভাব বহুল-পরিমাণে হ্রাস হইল। আজকাল দেশীয় ফিল্ম ও চিত্রাভিনয়ের রাজত্ব চলিতেছে। বর্ত্তমানে থিয়েটার আত্মরক্ষার্থে সর্ব্বতো-ভাবে চিত্রাভিনয়ের অনুকরণ করিতেছে। কিন্তু এই চেষ্টা মৃত্যুশরাহত পেশীর আক্ষেপ মাত্র। ভেক যেরূপ মৃত্তিকার কথা ভাবিতে ভাবিতে মৃত্তিকার বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে, থিয়েটার-গুলিও যে এইরূপ অনুকরণ করিতে করিতে আসল বায়স্কোপে পরিণত হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে?

এখন দেখা যাক্, থিয়েটারের পুনরুত্থান সম্ভবপর কি না। ইহা কঠিন হইলেও অসম্ভব নহে। প্রথমে দেখিতে হইবে থিয়েটারের আদর্শ কি। মিলের প্রস্তুত বস্ত্র ও তাঁতের তৈয়ারী কাপড়ের উদ্দেশ্য এক হইলেও যেমন আদর্শ এক নহে, ফোটো ও হস্তাঙ্কিত চিত্রের উদ্দেশ্য এক হইলেও যেমন আদর্শ এক নহে, থিয়েটার ও বায়স্কোপের উদ্দেশ্য এক হইলেও ঠিক সেই কারণেই আদর্শ এক নহে। উভয়ই লোকরঞ্জন করে, কিন্তু বিভিন্ন উপায়ে। সাহিত্য করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়, চিত্রাভিনয় ঘটনাবহুল উপন্যাস—থিয়েটার ভাবপ্রধান নাটক, চিত্রাভিনয় একটি মিষ্ট গল্পগাথা—থিয়েটার একটি মধুর সঙ্গীত। থিয়েটার ভাব দ্বারা বাস্তব-ঘটনা প্রকাশ করে, বায়স্কোপ বাস্তব দ্বারা ভাব প্রকাশ করে। থিয়েটারের উন্নতি করিতে হইলে থিয়েটারের সহিত বায়স্কোপের যেখানে পার্থক্য—অর্থাৎ থিয়েটারের যাহা বিশিষ্টতা, তাহাই বিকশিত করিতে হইবে। এই উন্নতি অন্ধ অনুকরণ দ্বারা কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না।

উন্নতির প্রথম উপায় নাটক সংস্কার। প্রচলিত নাটক-সমূহ কলা ও কবিত্ব উভয় বিষয়েই অত্যন্ত নিম্নস্তরের। ইহারা বড় জোর একটা সাময়িক উত্তেজনা দান করে, অন্তঃকরণের কোন সূক্ষ্মবৃত্তিকে বিচলিত বা অনুপ্রাণিত করিতে পারে না। আদর্শ নাটক কোন নবাবিষ্কৃত রসভাব প্রকাশ করিবে বা কোন চিরন্তন রসভাব নূতনরূপে প্রদর্শন করিবে এবং তাহা এরূপ কলা-কৌশল সহকারে প্রদর্শিত হইবে, যেন দর্শক সহজে সত্যানুভূতির আনন্দ লাভ করিতে পারে। ইহা কৌতূহলোদ্দীপক হইয়া মানব-জীবনের রহস্য ও সমস্যাসমূহ প্রকাশ ও সমাধান করিবে এবং সেই সমস্ত সমস্যা বর্ত্তমান দেশ, কাল ও পাত্রের সহিত সংশ্রবযুক্ত থাকিবে। কেবল আদি, বীর, করুণ, হাস্য ইত্যাদি রসের চিরপরিচিত অংশগুলি দেখাইলে চলিবে না, ইহার অজ্ঞাত ও অখ্যাত ভাগও প্রত্যক্ষ করাইতে হইবে। ইঙ্গিতে অতি অল্প কথায় চরিত্র অঙ্কিত করিতে হইবে এবং সমস্ত চরিত্র একত্র হইয়া একটি সম্পূর্ণ ভাব প্রস্ফুটিত করিবে।

দ্বিতীয় উপায় অভিনয় ও অভিনেতা সংস্কার। অভিনয় স্থানবিশেষে স্বাভাবিক ও আলঙ্কারিক উভয় প্রকারের হইতে পারে। অভিনেতার ব্যক্তিত্বের উপর থিয়েটারের সাফল্য অনেকটা নির্ভর করে। থিয়েটারের অভিনেতা বায়স্কোপের অভিনেতার মত অত্যাশ্চর্য্য কিছু সাধন করিতে পারে না, কিন্তু তদপেক্ষা অধিকতর অনুপ্রাণিত করিতে পারে। কিন্তু অভিনেতা স্বয়ং নাটকীয় ভাবে অনুপ্রাণিত না হইয়া অন্যকে অনুপ্রাণিত করিতে পারে না। সুতরাং অভিনেতার স্বীয় চরিত্র গঠন সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। অভিনেতার দেহ, মন, বাক্য

ও হাবভাব নাটকীয় চরিত্রের অনুরূপ হওয়া চাই এবং তদপেক্ষাও তাহার নটবিদ্যা, কাব্যজ্ঞান ও প্রকাশশক্তি থাকা চাই। ইহার একটির অভাব হইলেও অভিনয়ের অঙ্গহানি ঘটিবে। তাহাকে প্রচলিত পন্থা পরিত্যাগ করিয়া স্কুলের ছাত্রের মত কঠোর নিয়মবলীর মধ্যে থাকিয়া কোন আদর্শ নাট্য-বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইতে হইবে। থিয়েটারে নাটকের প্রত্যেক চরিত্র অভিনয়ের জন্য অন্ততঃ দুইজন করিয়া অভিনেতা থাকার প্রয়োজন, কারণ তাহা হইলে তাহারা অভিনয়ে নিজ নিজ বিশেষত্ব দান করিয়া দর্শকের আনন্দ ও কৌতূহল উদ্রেক করিতে পারে।

তৃতীয় উপায় সঙ্গীত সংস্কার। বায়স্কোপ অপেক্ষা থিয়েটারই সঙ্গীতের অধিকতর উপযুক্ত ক্ষেত্র। কারণ সঙ্গীতে এমন কোন কোন বিষয় আছে, যাহা বায়স্কোপে ঠিক প্রয়োজন মত প্রকাশ করা যায় না। বর্ত্তমানে আমাদের দেশীয় সঙ্গীত বলিয়া যাহা চলিতেছে, তাহা দেশীয়ও নহে, বিদেশীয়ও নহে। এ সঙ্গীতের বহু দোষ; তন্মধ্যে প্রধান দোষ, বাদ্য ও সঙ্গীতের মধ্যে সুরের অসম্মিলন। সঙ্গীত বাদ্যের ও বাদ্য সঙ্গীতের প্রকাশক হইবে। এক কালে আমাদের দেশীয় সঙ্গীত অন্যান্য বহু কলা-বিদ্যা অপেক্ষা অগ্রগামী ছিল। বর্ত্তমানে সঙ্গীতের অবস্থা দেখিয়া সে কথা মনে করিবার উপায় নাই।

চতুর্থ প্রয়োজন—নৃত্য সংস্কার। চিত্রকর যেরূপ আলেখ্য দ্বারা দৃশ্য-জগতের ভাব প্রকাশ করে, নৃত্যও সেইরূপ মানুষের মনের ভাব প্রকাশ করে। থিয়েটার সঙ্গীতের মত, নৃত্যেরও সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ক্ষেত্র; সুতরাং নাট্যাভিনয়ে নৃত্যের উন্নতি ও বিশিষ্টতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

পঞ্চম প্রয়োজন—পোষাক-পরিচ্ছদ। ইহা অভিনেতা ও দৃশ্য বস্তুর সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করে। বায়স্কোপে পরিচ্ছদের বর্ণ উত্তমরূপে প্রতিফলিত হয় না বলিয়া থিয়েটারের পোষাক-পরিচ্ছদ দর্শকের দৃষ্টি অধিকতর আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়।

ষষ্ঠ প্রয়োজন—দৃশ্য-চিত্র সংস্কার। হস্তাঙ্কিত চিত্রের সহিত ফোটোর যে প্রভেদ, দৃশ্য-চিত্রের সহিত চিত্রাভিনয়ের দৃশ্যেরও সেইরূপ প্রভেদ। একটিতে ভাব ও অন্যটিতে প্রকৃত বস্তু প্রদর্শিত হয়। দৃশ্য-চিত্রে মানুষ যত art-এর পরিচয় দিতে পারে, চিত্রাভিনয়ের দৃশ্যে তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের দেশীয় চিত্রের মত, দেশীয় দৃশ্যচিত্রও অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর। অবিলম্বে ইহার সংশোধন প্রয়োজন।

সপ্তম প্রয়োজন—বর্ণ সংস্কার। বর্ণসমূহ আমাদের মনে এক একটি বিশেষ ভাব আনয়ন করে। লাল, নীল, পীত, শ্বেত প্রভৃতি বর্ণের আলোক মানব-নেত্রে পড়িয়া তাহাকে সুখ, দুঃখ, প্রেম, বিরহ প্রভৃতি ভাবের সূক্ষ্ম আভাস দেয়। নৃত্য, গীত ও অভিনয় সময়ে বিভিন্ন বর্ণের আলোকপাতে অভিনেতা সহজে স্বীয় ভাব প্রকাশ করিতে পারে ও দর্শকগণ তদ্ভাবাক্রান্ত হইয়া পড়ে। আলোকের এই রূপবর্ণবৈশিষ্ট্য একমাত্র থিয়েটারে প্রদর্শন করা সম্ভবপর—বায়স্কোপে নহে।

অষ্টম প্রয়োজন—গন্ধ-প্রবাহ প্রচলন। বর্ণের মত গন্ধও মানব-মনে বিভিন্ন প্রকার রসানুভবের সাহায্য করে। বিভিন্ন গন্ধের বিভিন্ন প্রকার প্রভাব। বিবিধ পুষ্পগন্ধ, শস্য-মঞ্জরীর গন্ধ, মুকুল ও ফলের গন্ধ—বায়ুর সাহায্যে প্রয়োজনীয় স্থানে প্রবাহিত করা যায়।

এতদ্ভিন্ন রঙ্গালয়, অভিনয়ের সময়, সভ্যজনোচিত নীতি ও নিয়মাবলী প্রভৃতির দিকে যথোপযুক্ত দৃষ্টি রাখিয়া একটি স্বাস্থ্যপূর্ণ ও আনন্দকর আবহাওয়া সৃষ্টির প্রয়োজন। দর্শক যেন থিয়েটারে আসিয়া শরীর ও মন উভয়ই পরিতৃপ্ত করিতে পারে।

আশা করি, আমাদের দেশের থিয়েটারের বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষ এই সকল সংস্কার-সাধনে যত্নবান্ হইবেন। এই সকল সংস্কার ব্যয়সাপেক্ষ; কিন্তু এই কল্পে ব্যয় করিলে অধিকতর আয়ের সম্ভাবনা আছে। থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই সকল সংস্কারে যে-ব্যয় করিবেন, অনুপাতে তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে তাঁহাদের আয় হইবে। এখনও দেশবাসী থিয়েটারকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করে নাই, কিন্তু আর বেশী দিন গতানুগতিক ভাবে থিয়েটার চলিলে দেশের লোক একেবারে থিয়েটার দেখা বাদ দিতে পারে, ইহা ভাবিয়াও কি থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই সংস্কারে অগ্রসর হইবেন না?

আর দুটি কথা

—শ্রীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়

পাশ্চাত্যের সমগ্র চিকিৎসা-বিজ্ঞান কি করিয়া রোগ আরোগ্য হইতে পারে, তাহারই উপায় আবিষ্কারে ব্যস্ত। সুস্থ মানুষ কেন অসুস্থ হয়, ইহার সংবাদ সে বিজ্ঞানে পাওয়া যায় না; যাহা পাওয়া যায়, তদনুযায়ী কাজ করিলে অসুস্থতা কমে, এমন কথা জোর করিয়া বলা চলে না। বর্ত্তমান জীবন-যাপনের চারিদিকে এমন অবস্থার জটিলতা সংঘটিত হইতেছে এবং সভ্যতাগ্রস্ত সহরের জল-হাওয়া দিন দিন এমনই দূষিত হইয়া উঠিতেছে যে, এখানে মানুষের সুস্থ থাকাই আশ্চর্য্য। অথচ এই মূল ব্যাধির প্রতীকার না করিয়া আমরা কেবল ব্যাধির উপসর্গগুলি লইয়া মাথা ঘামাইতেছি। বর্ত্তমান লেখক নিজে যক্ষ্মারোগী, অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সে তাঁহাকে এই ব্যাধির কবলে পড়িতে হইয়াছে। যাঁহারা "বঙ্গশ্রী"তে প্রকাশিত "বুকের একটি ব্যাধি" শীর্ষে তাঁহার প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, এই ব্যাধির কবলে পড়িয়াও তিনি ভাঙ্গিয়া পড়েন নাই। ইঁহার প্রবন্ধগুলির সেই হিসাবে বিশেষ একটি মূল্য আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তিনি যক্ষ্মাক্রান্তদের মধ্যে যাঁহারা কিছু সুস্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের উপকারের জন্য সমাজ হইতে কি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, তাহার আলোচনা করিয়াছেন। দেশবাসীর দৃষ্টি এ দিকে পড়া দরকার।

সম্প্রতি আমার "বুকের একটি ব্যাধি" শীর্ষক প্রবন্ধগুলি এই মাসিকের পাতায় সমাপ্ত হয়েছে। আমি আমার ষষ্ঠ প্রবন্ধটির (চৈত্র সংখ্যায়

যাদবপুর হাসপাতাল: মেন বিল্ডিং।

প্রকাশিত) শেষের দিকে আমেরিকা এবং ইংলণ্ডের ন্যাশনাল টিউবারকুলোসিস্ অ্যাসোসিয়েসানগুলি কি ভাবে কাজ করছে সে সম্বন্ধে বলেছিলাম এবং আর একটু লিখেছিলাম: "যক্ষ্মা-নিবারণের প্রচেষ্টা এবং যক্ষ্মাগ্রস্তদের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা ইত্যাদি ইত্যাদি ছাড়া যক্ষ্মা-সংক্রান্ত কাজের এদের আর একটি দিক্ হচ্ছে—সুস্থ রোগীদের জন্য এমন কিছু ব্যবস্থা করা, যাতে না কি তারা তাদের সুস্থতাটাকে বজায় রাখতে পারে—মুক্ত এবং বিশুদ্ধ বায়ুতে বাস ক'রে, অপেক্ষাকৃত হালকা কাজ ক'রে এবং চিকিৎসকদের সংস্পর্শে থেকে। প্রত্যেক দেশের ন্যাশনাল টিউবারকুলোসিস অ্যাসোসিয়েসান এ বিষয় নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাচ্ছে। মাথা ঘামানোর প্রয়োজন এই জন্যই যে, একজন যক্ষ্মারোগী তার আগেকার কার্য্যক্ষমতা যখন ফিরে পায় না, তাকে যখন নিজের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বহু সাবধানতা অবলম্বন ক'রে এবং বহু নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়, তখন সুস্থ লোকের মত যে কোন কাজের উপযুক্ত হওয়া তার পক্ষে কখনই সম্ভব হয় না। অথচ তাকে আপন জীবিকা অর্জ্জন করতেই হবে। অনেক সময়ে তার পক্ষে তার পূর্ব্বের কাজে ফিরে যাওয়া সম্ভব হয় না এবং যে কাজের সে উপযুক্ত, অনেক সময়েই তেমন একটি কাজ নিজের জন্য সংগ্রহ করা অতি কঠিন হয়ে পড়ে তার পক্ষে। নানা দুশ্চিন্তা এবং অবস্থাগতিকে নানা অনিয়মের ভেতর দিয়ে শরীরের উপর নানা অত্যাচারের ফলে আবার তার শরীর ভেঙে পড়ে এবং রোগ আবার আত্মপ্রকাশ করে। এই সব সমস্যার সমাধান করবার জন্য ওরা উদ্যোগী হয়ে উঠেছে—কোন্ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় তা ভাবছে। সমস্ত যক্ষ্মা-প্রতিষ্ঠানের ষ্টাফের ভিতরে সুস্থ রোগীদের ঢোকান হচ্ছে, গ'ড়ে তোলা হচ্ছে "After care colony"—উপযুক্ত অবস্থার ভিতরে রেখে সেখানে নানা রকম কাজের ব্যবস্থা করবার চেষ্টা চলেছে—সুস্থ রোগীদের জন্যে।"

বস্তুতঃ এই After care colonyর প্রয়োজনীয়তা এক কথায় বলে শেষ করবার নয়। স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসাকে যদি সম্পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত করতে হয়, তা হলে প্রত্যেক স্যানাটোরিয়াম এবং যক্ষ্মাসমিতির কর্ত্তৃপক্ষের After care colony স্থাপন সম্বন্ধে মনোযোগী হয়ে উঠতেই হবে। স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসা সমাপ্ত করে বাইরের জগতে ফিরে যাওয়া মাত্র রোগ যদি আবার সাথে সাথেই পড়ল বেড়ে, তবে স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসার সার্থকতা হল কি কিছু? দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে After care colony সম্বন্ধে এখন বিশেষ কিছুই আন্দোলন উপস্থিত হয় নাই। প্রত্যেক যক্ষ্মা-সমিতি এবং স্যানাটোরিয়ামের কর্ত্তৃপক্ষের ও দেশের প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির দৃষ্টি আমি একান্তভাবে আকর্ষণ করছি এদিকে।

আমি আমার ৫ম প্রবন্ধটিতে (ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত) বলেছি যে, স্যানাটোরিয়াম থেকে বেরুবার পরে (সুস্থ অবস্থায়—অর্থাৎ ডাক্তারেরা যখন রোগকে "arrested" অথবা "much improved" বলে দেন) প্রথম

দুটি বছর রোগীর বড়ই বিপদের কাল। এমন কি কখন কখন চার পাঁচ বছর অবধিই ;—বুকের অবস্থানুসারে। সাবধানমত তো অবিশ্যি সকলেরই সারা জীবনই থাকতে হবে।

(৩) হাঁসপাতাল বা স্যানাটোরিয়ামের কাছে কলোনি স্থাপিত হওয়া নানা দিক থেকে সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। স্বাবলম্বী হবার পক্ষে এতে কলোনির কত সুবিধা হবে, তা বলছি।

যাদবপুর হাসপাতাল : (১) বাগানে রোগীরা কাজ করিতেছে (২) নার্সদের কোয়ার্টার।

এখন স্যানাটোরিয়াম থেকে বেরিয়েই রোগী যদি অন্ততঃ গোটা দুই বছর একটি After care colonyতে কাটাতে পারেন, তবে তাঁর অবস্থা অনেক দিক থেকেই নিরাপদ হতে পারে—অন্ততঃ খানিকটাও।

একটি After care colonyর চিত্র হবে এই রকম :

(১) স্যানাটোরিয়াম হাঁসপাতালে সমস্ত নিয়ম-কানুনই যতখানি কড়া, কলোনির নিয়ম-কানুন অপেক্ষাকৃত কম কড়া হবে এবং কলোনির আবহাওয়াকে অনেকটা আপন বাড়ীঘরের আবহাওয়ার কাছাকাছি নিয়ে যেতে হবে। যে কোন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কলোনিতে ইচ্ছামত রোগীর কাছে এসে মাঝে মাঝে থাকতে পারবেন এবং রোগীকে এই কলোনিতে অবস্থানকালীন আস্তে আস্তে সইয়ে সইয়ে বাইরের সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করতে হবে নিজেকে।

(২) কলোনিতে একজন Resident Medical Officer থাকবেন এবং অল্প-স্বল্প ওষুধপত্রও রাখা হবে। তিনি মাঝে মাঝে রোগীদের বুক পরীক্ষা করবেন এবং রোগীদের বিশ্রাম এবং পরিশ্রমের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। কলোনি যদি হাসপাতাল অথবা স্যানাটোরিয়ামের বেশ কাছে হয়, তবে কলোনিতে স্বতন্ত্র ডাক্তারের প্রয়োজন হবে না ; নিকটবর্ত্তী স্যানাটোরিয়ামের বা হাসপাতালের ডাক্তারের সাহায্য পেলেই রোগীদের চলবে।

(ক) কলোনির রোগীরা একটি দোকান খুলবেন। এই দোকানে প্রথমতঃ থাকবে ষ্টেশনারী জিনিষ—হরেক রকমের ; যা' না কি স্যানাটোরিয়ামের পেসেণ্টদের সচরাচর ব্যবহার করবার দরকার হয়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ, দোকানে কিছু কিছু ফলমূলও থাকবে—যা না কি স্যানাটোরিয়ামের পেসেণ্টদের সর্ব্বদাই লাগছে। তৃতীয়তঃ রাখতে হবে কতগুলি পেটেণ্ট ওষুধপত্র এবং সব রকম ইঞ্জেকশানের ওষুধ। স্যানাটোরিয়ামের রোগীরা এগুলি কলোনির দোকান থেকে কিনে কলোনিকে সাহায্য করবেন। স্যানাটোরিয়ামের রান্নাঘরকে কলোনির রোগীরা হাত করতে পারলে সেখানে একটা মুদী বিভাগও খোলা চলবে।

এডিনবরা : সাউথফিল্ড স্যানাটোরিয়াম কলোনি।

(খ) কলোনি ক্রমে জায়গা বাড়ানর সাথে সাথে (প্রথমেই অনেকটা জমি পাওয়া গেলে ত কথাই নেই) তরিতরকারির ক্ষেত করবে। সমস্ত রকম তরিতরকারি কলোনি স্যানাটোরিয়ামকে সাপ্লাই করবে।

(গ) স্যানাটোরিয়ামকে দুধ সরবরাহ করবার ভারও থাকবে কলোনির হাতে।

(ঘ) স্যানাটোরিয়ামে রোগী ছাড়া ষ্টাফেও লোকসংখ্যা কম থাকে না। তাঁরাও সর্ব্ব বিষয়ে কলোনিকে patronize করবেন।

(৪) কলোনিতে রোগীদের স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং রুচি অনুযায়ী নানা রকম কাজের ব্যবস্থা থাকবে—যেমন তাঁতের কাজ, দরজীর কাজ, ছাপাখানা, বাগিচার কাজ, মুরগীর চাষ, চামড়ার কাজ, ফটোগ্রাফী, পশমী জিনিষ বুনান ইত্যাদি ইত্যাদি। আরও অসংখ্য arts and craftsএর নাম করা যেতে পারে—নিজেদের স্বাস্থ্য এবং আনন্দ বজায় রেখে রোগীরা যেগুলি কলোনিতে চালাতে পারেন।

(৫) যাঁরা কলোনির কাজের ভিতরে খুব বেশী না যেতে চাইবেন, এমন কোন রোগী টাকা দিয়ে কলোনিতে থাকবার স্থান পাবেন।

(৬) কলোনিতে থেকে সম্ভব অথবা সুবিধাজনক হলে কোন রোগী বাইরের চাকুরিও করতে পারবেন—অথবা অন্য কোন ব্যবসায়। তবে দুটি একটি ব্যতিক্রম ছাড়া—নিতান্ত অবস্থাবিশেষে—কোন রোগীকেই চিরস্থায়ী ভাবে কলোনিতে রাখা হবে না। সাধারণভাবে এক বছর থেকে পাঁচ বছর অবধি কলোনিতে কোন রোগী থাকতে পারেন—প্রয়োজনানুযায়ী। অর্থাৎ মুখ্যতঃ পালা করে করে এক এক দল রোগীকে সাহায্য করবার উদ্দেশ্যেই কলোনির থাকবে। তবে কলোনি যদি প্রচুর জায়গা-জমি পায়, অথবা নিজেদের চেষ্টায় পরে করে ফেলতে পারে এবং তার অন্যান্য অবস্থাও যদি অনুকূল হয়, তবে স্থায়ী বাসিন্দা ভাবেও দু'চারজন রোগী কলোনিতে থাকলে ক্ষতি হবে না।
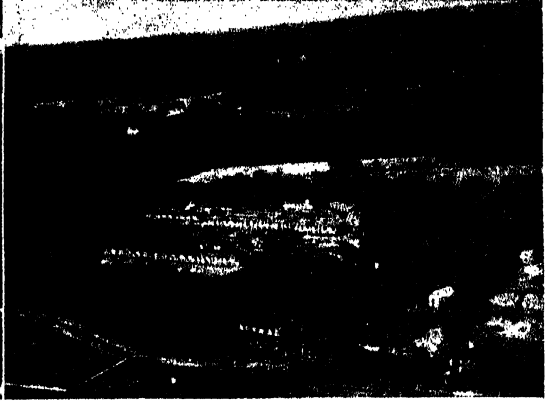
সারে (ইংলণ্ড) বারো হিল ট্রেনিং কলোনি: (১) ওয়ার্কশপে রোগীদের কাজ (২) সাধারণ দৃশ্য

(৭) কলোনিকে কোন মতেই হাঁসপাতালে পরিণত করা হবে না। কোন রোগীর ব্যাধি পুনরায় যদি কোন কারণে রীতিমত সক্রিয় হয়ে ওঠে, তবে তাঁকে হাঁসপাতালে বা স্যানাটোরিয়ামে অবিলম্বে চলে যেতে হবে। বাইরের কোন রোগীও—যিনি অনেকটা কর্ম্মক্ষম নন, অথবা যাঁর শরীরে ব্যাধির নানা উপসর্গ রয়েছে এবং যাঁকে নিয়মিত স্যানাটো-রিয়াম-চিকিৎসাধীন থাকতে হবে, তিনি কলোনিতে ঢুকতে পাবেন না।

(৮) অতিরিক্ত স্বার্থপর কোন রোগীর জায়গা কলোনিতে হবে না। যাঁরা কলোনির নিয়ম-কানুন মানতে পারবেন না অথবা পরস্পরের প্রতি গভীর সহানুভূতিসম্পন্ন হতে পারবেন না, তাঁদের সম্বন্ধে এই কথা বলা যেতে পারে যে, তাঁরা কলোনিতে থাকবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। টাকা-পয়সার দিক দিয়ে হ'ক অথবা অন্য যে কোন কাজের

সারে (ইংলণ্ড): বারোহিল ট্রেনিং কলোনি। রোগীরা বাগানে কাজ করিতেছে।

ভিতরে হ'ক ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে কলোনির সমগ্র স্বার্থকে বড় করে দেখতে হবে প্রত্যেকের।

আরও দু'চারটি পয়েন্টের উল্লেখ হয় তো করা যেতে পারে; কিন্তু আপাততঃ এতেই কলোনি সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা যাবে।

কলোনির পক্ষে প্রথমেই উত্তম রূপে স্বাবলম্বী হ'য়ে ওঠা সহজ হবে না; বিশেষতঃ কটেজ অথবা ঘরবাড়ী এবং অন্যান্য নানাবিধ আসবাব-পত্রের জন্য প্রথমেই যে টাকার দরকার, তার পরিমাণ একেবারে কম হবে না। কলোনির সর্ব্ববিধ উন্নতি, আয়তন বৃদ্ধি এবং সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যে ভবিষ্যতেও হবে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। কাজেই এমন প্রতিষ্ঠানের জন্যে দেশের সহৃদয় জনসাধারণের অকৃপণ সাহায্য সর্ব্বতোভাবে আশা করতে হবে।

কিছুদিন আগে ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে বাংলার টিউবারকুলোসিস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ছাত্রসম্প্রদায়ের একটি সভা হ'য়ে গিয়েছে—সভাপতি ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। এই দুরন্ত ব্যাধি সমগ্র ছাত্র-সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যকে কি ভাবে জর্জ্জরিত ক'রে তুলেছে, এর প্রতিকার কেমন করে হতে পারে, এসব বুঝিয়ে বলে ডাঃ বিধানচন্দ্র এই আবেদন জানিয়েছিলেন যে, সমস্ত কলকাতা সহরে যত ছাত্র আছেন, তাঁদের প্রত্যেকে যদি বছরে মাত্র আট আনা পয়সা দিয়ে টিউবারকুলোসিস অ্যাসোসিয়েসানকে সাহায্য করেন, তা হলে আরও ছয় সাতটি ক্লিনিক কলকাতা সহরের উপরে স্থাপন করা টিউবারকুলোসিস্ অ্যাসোসিয়েসানের পক্ষে সম্ভব হতে পারে।

After care colonyর জন্যে কর্ম্মী এবং উৎসাহী যাঁরা থাকবেন, তাঁরা কলোনির জন্যেও সবার কাছে আবেদন করবেন এই ভাবে। দশ জনের প্রত্যেকের কাছ থেকে পাওয়া যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য একত্র হ'য়ে যে শক্তি ধারণ ক'রতে পারে, তার দ্বারা অতি বৃহৎ কার্য্যই হয় সুসম্পন্ন। অথচ যাঁরা সাহায্য করেন, তাঁদের একেবারে গায়েও লাগে না—বছরে অতি সামান্য কয়েক আনা পয়সা। এর ভিতরে বৃহৎ দানের সম্ভাবনাও যে একেবারে না থাকবে, তা নয়। তবে কলোনির অধিবাসীদের সর্বদাই লক্ষ্য রাখতে হবে—নিজেদের শ্রমের দ্বারা তাঁরা যে সব জিনিষ উৎপাদন করবেন (তার বিক্রয়ের জন্যে নিকটবর্ত্তী সহরে থাকবে তাঁদের "মার্কেট"), অথবা তাঁরা অন্যান্য নানা প্রকার যে সব কর্ম্ম এবং ব্যবসায় কলোনিতে প্রচলিত করবেন, এ সব থেকে উপার্জ্জন ক্রমেই তাঁদের বৃদ্ধি করবার চেষ্টা করতে হবে এবং কেবলই বাহিরের সাহায্যের দিকে না তাকিয়ে নিজেদের কাজ দ্বারা নিজেদের অবস্থা ক্রমে তুলতে হবে স্বচ্ছল করে।

দক্ষিণ-ভারতের মদনপল্লী স্যানাটোরিয়ামে একটি কলোনি স্থাপিত হ'য়েছে। ঐ স্যানাটোরিয়ামের ১৯৩৩-৩৪ সালের বার্ষিক বিবরণীতে দেখলাম, ন' জন রোগী ওখানে র'য়েছেন। (বর্ত্তমানে নিশ্চয়ই হয় তো আরো দু' চার জনও যোগ দিয়েছেন।) দু' জন রোগী না কি একেবারে নিজেদের পরিবারই নিয়ে এসেছেন। কোথাও পড়েছিলাম, না কি কারুর মুখে শুনেছিলাম, ঠিক মনে নেই, ভাওয়ালী স্যানাটোরিয়ামের কাছেও না কি টি. বি. পেসেন্টদের একটি কলোনি সুরু হ'য়েছে। তবে এটির কথা ঠিক মত জানি না আমি কিছুই। আমি যখন যাদবপুর হাঁসপাতালে ছিলাম (বৈশাখে প্রকাশিত আমার "বুকের একটি ব্যাধি"র শেষ খণ্ডে আমি যাদবপুরে আছি—এই কথা আছে, কিন্তু আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধটি আমি লিখছি যাদবপুর হাঁসপাতাল থেকে বেরিয়ে মাস চারেক পরে)—জানতে পেরেছিলাম, জনৈক ভদ্রলোক হাজারিবাগের কাছে ৫০।৬০ বিঘা জমি দান করছেন যাদবপুর হাঁসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষের হাতে—Ex-patientদের একটি কলোনির জন্যে। এটি নিয়ে কথাবার্ত্তা কতদূর কি এগিয়েছে না এগিয়েছে, আপাততঃ ঠিক বলতে পারছি না।

পরিশেষে, বাংলা দেশে টিউবারকুলোসিস্ সংক্রান্ত কাজে যাঁরা যে কোন ভাবে লিপ্ত রয়েছেন, তাঁদের কাছে এই আবেদন জানিয়ে আমি আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটির উপসংহার করছি, তাঁরা কি বাংলা দেশে একটি After care colony স্থাপন করা বিষয়ে চিন্তা করবেন? টিউবারকুলোসিস সংক্রান্ত কাজে মাদ্রাজ, বোম্বাই, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশ যত আগে মাথা ঢুকিয়েছে—বাংলা এসেছে তার বহু পরে; যদিও বাংলার সমস্যা অন্যান্য প্রদেশের চাইতে বেশী ছাড়া এক তিলও কম নয়।

প্রকৃত শাস্ত্রের সন্ধান

... ... একবার যদি দেশের জনসাধারণ বুঝিতে পারে যে, তাহারা পাশ্চাত্ত্য যে যে শাস্ত্রের পণ্ডিতগণের পূজা করিয়া থাকে, সেই সেই শাস্ত্রে মানুষের উন্নতি কি উপায়ে হইবে, তাহার কোন সন্ধান নাই—পরন্তু তাহার ব্যবস্থা প্রতিপালিত হইলে মানুষের অবনতি অবশ্যম্ভাবী, তাহা হইলে মানুষ প্রকৃত শাস্ত্রের অনুসন্ধান-প্রয়াসী হইবে এবং তখন স্বভাবের নিয়মবলে আবার প্রকৃত শাস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যাইবে, ইহা আমাদের বিশ্বাস। ... ...

বিষ-কন্যা

—শ্রীঊর্ষাপ্রভা সেন

মানুষ অদৃষ্ট লইয়া জন্মায়—না, নিজে নিজের কিংবা অপরে মানুষের অদৃষ্ট সৃষ্টি করে? এই প্রশ্ন চিরকাল চিন্তাশীল মানুষকে বিড়ম্বিত করিয়াছে। হয়তো অদৃষ্ট বলিয়া কিছু আছে, কিন্তু যাহা একজনের পক্ষে অদৃষ্ট তাহাই অপরের পক্ষে 'দৃষ্ট' হইতে পারে। আজ মানুষ যে কাজ করিতেছে, কাল কিংবা আগামী মাসে তাহার কি ফল ফলিবে, ইহা সাধারণ মানুষেরও বুদ্ধির গোচর। সুতরাং অসামান্য বুদ্ধিতে আগামী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কি ঘটিবে, ইহা ধরা পড়া খুব আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু ইহা সত্য হইলেও আমরা নিজে এবং আমাদের চারিপাশের লোকজন যে প্রতিমুহূর্ত্তেই নিজেদের অদৃষ্ট রচনা করিয়া চলিয়াছি—ইহাকেও অসত্য বলা চলে না। নির্দোষ একটি শিশু জন্মাইল গৃহস্থের ঘরে; কোষ্ঠীবিচারে প্রমাণিত হইল সে বিষ-কন্যা, কিন্তু স্বভাব তাহার অমৃতময়। শেষ অবধি কি স্বভাব না কোষ্ঠীবিচার জয়ী হইবে? লেখিকা বর্ত্তমান গল্পে ইহারই একটি দিক্ অতি করুণ করিয়া ফুটাইতে পারিয়াছেন।

[১]

জ্যোতিষীর কোষ্ঠীবিচার হইয়া গিয়াছিল। নাসাপ্রান্ত হইতে চশমা খুলিয়া কাপড়ে ঘষিয়া, পুনরায় তাহা স্বস্থানে স্থাপন করিয়া বলিলেন "কন্যাটির জন্মপত্রিকা যা দেখলাম তা শুভ নয়, এটি বিষ-কন্যা। বিষ-কন্যা যে গৃহে জন্মগ্রহণ করে, তথায় গুরুজন-বিয়োগ, বন্ধু-বিয়োগ, গৃহ-বিচ্ছেদ, ধননাশ প্রভৃতি অমঙ্গল ঘটে। আর বধূরূপে যে গৃহে যায়, সেখানেও তাই হয়। কিন্তু পিতৃ ও শ্বশুরকুলের অমঙ্গল করলেও, কন্যাটি স্বামীর নিকট অমৃতময়ী হয়ে থাকে।"

গৃহের সকলে নির্ব্বাক্; অন্তরালে চাবি-চুড়ীর শব্দও কমিয়া গেল।

গৃহকর্ত্তা হরেন্দ্র কনিষ্ঠ পুত্র সুধীন্দ্রকে বলিলেন, "নৃপেন্দ্র এসেছে কি না, তাকে ডাক।" কণ্ঠস্বর নিম্ন করিয়া জ্যোতিষীকে বলিলেন, "দেখুন, কোষ্ঠীর ফলাফল নৃপেন্দ্রকে সবই বলবেন, কেবল কন্যাটি যে স্বামীর নিকট অমৃতময়ী হবে, এই কথাটি গোপন করবেন, বুঝলেন না?"

নৃপেন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিয়া একবার সকলের প্রতি চাহিয়া গম্ভীর ও অপ্রসন্নমুখে টেবিলের নিকট দাঁড়াইল। জ্যোতিষী কোষ্ঠিফল বিবৃত করিয়া বলিলেন, "নৃপেন্দ্র সবই ত শুনলে, এখন সকলকে নষ্ট করা যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে আর আমরা কি বলব?"

সুধীন্দ্র, নগেন্দ্র, ব্রজেন্দ্র তিন ভাই সাগ্রহ দৃষ্টিতে নৃপেন্দ্রের প্রতি চাহিল, নিরুত্তর নৃপেন্দ্র ভ্রূ কুঞ্চিত করিল।

জ্যোতিষী পুনর্ব্বার বলিলেন, "এই মেয়েটিই এমন কি ভাল যে তোমার জেদ হয়েছে, একেই বিয়ে করবে? বাংলাদেশে আর কি শিক্ষিতা মেয়ে নেই? তোমাদের এই সংসার পিতৃ-মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রীতির জন্য নদীয়া জেলায় প্রসিদ্ধ; এই শান্তি-পূর্ণ সংসার উচ্ছন্ন করা কি তোমার কর্ত্তব্য? গৃহের শান্তি রাখবার জন্য মানুষ কত ক্ষতি, কত ক্লেশ স্বীকার করে, আর তুমি এই সামান্য ত্যাগ স্বীকার করতে পারবে না? তোমার বুড়ো বাপ-মার জন্যও ত' তোমার এ ইচ্ছা দমন করা উচিত।"

নৃপেন্দ্র সমভাবেই নিরুত্তর রহিল। কিছুক্ষণ পরে হরেন্দ্র হতাশভাবে বলিলেন, "আমি স্নান করতে চললাম, ললাট-লিখন কে খণ্ডাবে!"

হরেন্দ্র চলিয়া গেলে নৃপেন্দ্র বলিল, "দেখুন এ সব বুজ-রুকিতে আমার কোন দিন বিশ্বাস নেই। মানুষ নিজের কর্ম্মফলই ভোগ করে, এজন্য অন্যে দায়ী নয়। এ মেয়েটির জন্মের পর তার বাপ মারা গেলেন বলে কি সেই দায়ী? এ মেয়ে না হলে কি তিনি অমর হয়ে থাকতেন?"

জ্যোতিষী বলিলেন, "তবে সব জেনেও কি তুমি ঐ কন্যাই বিবাহ করবে? তোমার বাবা এতদিন ভুগেও কোন রকমে বেঁচে আছেন, কিন্তু এই বিবাহের ফলে তিনি কি বাঁচবেন মনে কর?"

নৃপেন্দ্র এতক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া বলিল, "এ কথায় হাসব কি কাঁদব বুঝতে পারছি না। এ মেয়েকে যে আমি বিয়ে করবই তা বলি নি। এ বিয়েতে আপনাদের আপত্তি থাকলে আমি নয় বিয়ে করব না। বাবার অসুখ আছে, তিনি

মৃত্যু হয়েছেন, চিরদিন বেঁচে থাকবেন এরূপ আশা নিশ্চয়ই করা যায় না। অবশ্য আমার বিয়ের পর তাঁর মৃত্যু হলে আপনারা কন্যার অদৃষ্টই বলবেন তা জানি। কিন্তু এ বিয়ে না হলে কি তিনি চিরকাল বেঁচে থাকবেন ?"

জ্যোতিষী বলিলেন,"বাবা, দুষ্ট সরস্বতী তোমাতে অধিষ্ঠান হয়েছেন, তোমাকে বুঝান বৃথা। তবুও বলি এ মেয়েটির রাশি-নক্ষত্র বড়ই মন্দ, ফলে কন্যাটি বিষকন্যা হয়েছে। বিষ-কন্যা যে গৃহে থাকে তা উচ্ছন্ন না হয়ে যায় না।"

"আমার যা বলবার ছিল সবই বলেছি।" বলিয়া নৃপেন্দ্র ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

[২]

মঙ্গলশঙ্খ ও হুলুধ্বনির মধ্যে ফুলশয্যার স্ত্রী-আচার হইবার পর নবদম্পতি নির্জ্জন হইলে, নৃপেন্দ্র বধূর প্রতি চাহিল। দীর্ঘ ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া নববধূ বসিয়াছিল, নৃপেন্দ্র মৃদুস্বরে বলিল "বাসন্তি, তোমার সঙ্গে নূতন সম্পর্ক হল, সেজন্য কি আলাপও নূতন করে আরম্ভ করতে হবে ?"

বিবাহের সূচনা হইতে পরিবারে যে অশান্তির সূচনা হইয়াছিল, এখনও তাহার সমাপ্তি হয় নাই। বিবাহের সকল কাজই মাতা ও ভ্রাতৃবধূগণ গম্ভীর ও অপ্রসন্ন ভাবে করিয়াছেন। বধূবরণেও সময়ে চেষ্টা করিয়া প্রফুল্ল হইলেও তাহা বুঝিতে নৃপেন্দ্রের বিলম্ব হয় নাই। আশীর্ব্বাদের সময় পিতা গম্ভীর মুখে আশীর্ব্বাদমাত্র করিয়াই চলিয়া গিয়াছিলেন, বধূর মুখ দেখেন নাই বা প্রণাম লন নাই। মাতা ও অন্যান্য সকলের অসন্তোষ ঢাকিবার চেষ্টা এত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে, নববধূ পর্য্যন্ত তাহা বুঝিয়া বিস্ময় ও বেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। ঘোমটার ভিতর হইতে তাহা লক্ষ্য করিয়া নৃপেন্দ্র ব্যথিত ও চিন্তিত হইতেছিল। সে কি বাসন্তীকে অবজ্ঞা ও অসুখী করিবার জন্য লইয়া আসিল!

স্বামীর সম্ভাষণে, ব্যথাভরা চোখ তুলিয়া বলিল, "বুঝতে পারছিনে কেন আমার মন এত খারাপ লাগছে ? তুমি কি সকলের অমতে আমাকে বিয়ে করেছ এবং তাই বুঝি ওঁরা খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন ?"

নৃপেন্দ্র জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, "না খুব অসন্তুষ্ট হন নি, তবে কি না—"

কিছুক্ষণ থামিয়া আবার বলিল, "এখন আমার মনে হচ্ছে বাসন্তি, তোমাকে বিয়ে করা আমার অন্যায় হয়েছে, বোধহয় তোমাকে আমি সুখী করতে পারব না, হয় ত আমার সঙ্গে চিরজীবন তোমাকে দুঃখেই কাটাতে হবে।"

নৃপেন্দ্র একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

বাসন্তী বলিল, "সেজন্য আমার ভয়ের কোন কারণ নেই। তোমার সঙ্গে দুঃখই যে আমার সুখ। কিন্তু এসব কথা বলছ কেন, কি হয়েছে বল না ?"

নৃপেন্দ্র বলিল, "সে কথা না শোনাই ভাল বাসন্তি, শুনলে তোমার কষ্ট হবে।"

বাসন্তীর কৌতূহল বাড়িয়া উঠিল, বলিল, "এমনই কি কথা ? বল, বলতেই হবে।"

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নৃপেন্দ্র ধীরে ধীরে বাসন্তীর কোষ্ঠীফল খুলিয়া বলিল। বাসন্তী শিহরিয়া বিবর্ণমুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

বহুক্ষণ পরে নৃপেন্দ্র বলিল, "বাসন্তি, আমার একটা অনুরোধ তোমাকে আজ প্রথম দিনই জানাব, বল রাখবে ?"

অস্ফুটস্বরে বাসন্তী বলিল, "রাখব।"

নৃপেন্দ্র বলিল, "আমার বাবা, মা, আত্মীয়-স্বজন বিষকন্যা বলে হয় তো তোমাকে অনাদর করবেন, কিন্তু তাতে তুমি ক্ষুণ্ণ হয়ো না। তোমার প্রতি তাঁদের ব্যক্তিগত কোন বিদ্বেষ তো নেই ; তবে মানুষের চিরকালের সংস্কার কোথা যাবে ? তুমি তাঁদের ভালবেসো, ভক্তি ক'রো। বল পারবে ?"

বাসন্তী চোখ মুছিয়া বলিল, "কেন পারব না ? তোমার ভালবাসা পেলে জগতের সব দুঃখ আমি সহ্য করতে পারব। কিন্তু মানুষের মন ত' সমান থাকে না, শেষে যদি তুমিও আমাকে বিষকন্যা বলে—" কিশোরীর চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

সযত্নে চোখের জল মুছাইয়া নৃপেন্দ্র বলিল, "তোমার সংসারে এনে আমি তোমাকে অবজ্ঞা করব, আমাকে এত হীন মনে করলে ? না বাসন্তি, আমি নীচ নই। আমার ভালবাসায় যদি তুমি সুখী হতে পার, তবে তোমাকে সুখী করবার জন্য আমি কিছুতেই কুণ্ঠিত হব না।"

[৩]

কিছুদিন কাটিয়া গিয়াছে। শাশুড়ী ঠাকুরাণী বারান্দায় দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, "বৌমা ও বৌমা, আবার হেঁসেলে গিয়েছ? তুমি কথা শোন না কেন বাছা, তুমি যদি রাঁধবে, তবে বামুনের মেয়ে কি করতে আছে।"

রাঁধুনী রান্নাঘরের মধ্য হইতে বলিয়া উঠিল, "আমি সতর বার করে বললাম যে বাছা তুমি যাও, কাল তোমার মাথা ধরেছিল, মা বকবেন, তা বৌমা কিছুতেই শুনলে না মা, আমি কি করব? আমি বাছা ভাল মাছের ঝোল রাঁধতে পারি, হাঁড়িকাবাব পারি নে

বাসন্তী রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল, চিন্ময়ী অমনি বলিয়া উঠিলেন, "এই ত চোখ-মুখ রাঙ্গা হয়ে উঠেছে! ও সুধীন, তোর জন্যই বৌমা রাঁধতে যায়। শেষে একটা অসুখ-বিসুখ করে বসবে!"

সুধীন্দ্র পড়া বন্ধ করিয়া ঘরের মধ্য হইতে বলিল, "মা, নামটাই শুধু আমার, কিন্তু খাবার বেলায় ত শুধু আমিই খাইনে। তোমার নগু, নিপুও হাঁড়িকাবাব চেটে চেটে খায়! তবে মাথা ধরার ওষুদ আমি দিতে পারি বৌদিকে!"

চিন্ময়ী বলিলেন, "ওষুদ তোকে দিতে হবে না। বৌমা সাত দিনের মধ্যে আর হেঁসেলে যেতে পারবে না, তা বলে রাখলেম। এখন কাজের কথা শোন্, কুমারশঙ্কর বাবুর মকদ্দমার কাগজপত্র নগু তোর কাছে দিয়েছে, সেগুলো চাচ্ছে, বের করে দে।"

বাসন্তী বলিল, "মা, আমি বলি কি মকদ্দমার আর দরকার নেই, সে বাড়ীটা খুড়োমশায়ই নিন।"

চিন্ময়ী বলিলেন, "নগু বললে, তা হবে না। সে বাড়ী তোমার মার নামে ছিল, তোমার খুড়োর তাতে কোন অধিকার নেই। নিপুরও তাই মত। বুড়ো মিন্সে, পরের জিনিষে এত লোভ কেন, একটু শিক্ষা হোক।"

বাসন্তী আর কিছু না বলিয়া হাত ধুইয়া উপরে যাইবার জন্য সিঁড়িতে উঠিতেছে, আঁচলে টান পড়ায় ফিরিয়া দেখিল বামুন ঠাকরুণ। ঠাকরুণ করুণস্বরে বলিলেন, "বৌমা, কাল সূর্য্যগ্রহণ, সবাই গঙ্গায় নাইতে যাচ্ছে, মা কিছুতেই আমাকে যেতে দেবেন না, বলছেন বৌমার কষ্ট হবে। তা বৌমা একটা দিন বই ত নয়! তোমার কি খুব কষ্ট হবে?"

সহাস্যে বামুন ঠাকরুণকে আশ্বাসিত করিয়া বাসন্তী উপরে চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে শুনিল—

মেজ-বৌ করুণাকে চিন্ময়ী বলিতেছেন, "এত বেলা হ'ল উনি এখনও এলেন না, সেই রাতদুপুরে গেছেন, রাত্রে কলেরা রোগী, ভাল মনে নিচ্ছে না। আহা, বিধবার একমাত্র ছেলে! আমি এইবার স্নান করতে যাই, তুমি ছেলেপিলেদের খাওয়ার তদারক কর। উনি এলে আগে জলখাবার খান কি স্নান করুন, সে সব সেজ বৌ দেখবে।" চিন্ময়ী চলিয়া গেলেন।

শাশুড়ী ঠাকুরাণী অদৃশ্য হইলে করুণা বড়-বৌ বিমলাকে ডাকিয়া বলিল, "শুনলে দিদি, শুধু সেজ-বৌ, সেজ-বৌ! কেন, আমরা কি শ্বশুর ঠাকুরকে জলখাবার দিতে পারি নে! ও মন্ত্র জানে দিদি, মন্ত্রে সকলকে এত শীগ্‌গির ভুলিয়েছে! সকলে ভুলুক আমি ভুলছি নে, যত গুণবতীই হোন, উনি বিষকন্যা,—তা আমার মনে আছে।"

বিমলা কোটা তরকারী জল হইতে থালায় তুলিয়া বলিল, "সেটা মনে রাখা কি ভাল করুণা? ওর গুণ, ওর সেবা-শুশ্রূষা, কাজকর্ম্ম, কিছুতে কি খুঁত আছে? এত যে লেখাপড়া জানে, তবু সকলের সঙ্গে সমানভাবে মেশে, তা ছাড়া—"

এমন সময় সুধীন্দ্র দৌড়িয়া আসিয়া শুষ্ক মুখে বলিল, "মা কোথায়?"

বিমলা ও করুণা চমকিত হইয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, "কেন ঠাকুরপো, কি হয়েছে?"

সুধীন্দ্র হতাশভাবে বলিল, "পাল্কী করে বাবাকে নিয়ে এসেছে, বাবার কলেরা হয়েছে!"

নিমেষের মধ্যে সমস্ত বাড়ী নিস্তব্ধ হইয়া গেল। এক বৎসরের মধ্যে নব বধূর ভাগ্য ফলিতে দেখিয়া সকলে ভয়ে স্তম্ভিত হইল।

হরেন্দ্রের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল। আবার বমি করিলেন। সাবধানে তাঁহাকে শোয়াইয়া বাসন্তী বমন-পাত্র লইয়া উঠিতেই চিন্ময়ী তীব্রস্বরে বলিলেন, "থাক বৌমা, ওসব আমি করব, সুধীন করবে। তুমি এখানে এলে কেন?"

যে বিরাগ চাপা পড়িয়া গিয়াছিল, মেজবধূ করুণার অন্তর ভিন্ন যাহার চিহ্নমাত্র ছিল না, অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় তাহা

জলিয়া উঠিল। শাশুড়ীর কঠিন দৃষ্টির সম্মুখে সঙ্কুচিতা বাসন্তী মুখ নীচু করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

চিন্ময়ী অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "রাক্ষসী!"

বাসন্তীর কাণে বজ্রধ্বনি হইতেও ভীষণ ভাবে কথাটা প্রবেশ করিল। নীরবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া কাঁদিবার জন্য সে আপনার ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার ভাগ্য! হায়, সত্যই তাহার ভাগ্য এত ভয়ানক! কিছুতেই তাহা রোধ হইবে না! জ্যোতিষের কথাই ফলিবে! ভয়ে, দুঃখে সঙ্কোচে সে মাটীর সহিত মিশিয়া যাইতে চাহিল।

কতক্ষণ চলিয়া গেল সে জ্ঞান তাহার ছিল না। পদশব্দে বুঝিল নৃপেন্দ্র নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

বাসন্তীর লুণ্ঠিত মাথা দুই হাতে তুলিয়া নৃপেন্দ্র বলিল, "এখানে কেন বাসন্তি, মা বকেছেন বলে বাবার কাছ থেকে চলে আসা কি তোমার উচিত হয়েছে? মার মনের অবস্থা কি রকম তা কি বুঝতে পারছ না? বাবা তোমাকে ডাকছেন যাও।"

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ভগ্নস্বরে বাসন্তী বলিল, "মার কথায় আমি রাগ করি নি, আমি কি করে ওঁদের কাছে মুখ দেখাব? আমার অদৃষ্টই—"

নৃপেন্দ্র বলিল, "তোমার যে এত কুসংস্কার তা তো জানতাম না। বাবা কলেরা রোগী দেখে ডিসইনফেক্টেড না হয়েই সেখানে খাবার খান, তাতেই হয়েছে। ওসব কথা মনেও এনো না, বাবা তোমাকে ডাকছেন যাও। আমি নিশি ডাক্তারকে ডাকতে যাচ্ছি।"

মন হইতে সকল গ্লানি দূর করিয়া বাসন্তী শ্বশুরের নিকট গিয়া তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

হরেন্দ্র সস্নেহ দৃষ্টিতে বধূর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "বৌমা আমার লক্ষ্মী, গিন্নি, বৌমাকে দায়ী ভেব না। জন্ম-মৃত্যু সব ঈশ্বরের ইচ্ছা, এতে কারও হাত নেই। আমি বুড়ো হয়েছি, মরবার বয়স হয়েছে, সময় হয়েছে তাই যাচ্ছি। মন থেকে সন্দেহ দূর করে আমার মাকে টেনে নিও গিন্নি, তাতেই ভগবান্ মঙ্গল করবেন।" বাসন্তীর মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "সাবিত্রীসমান হও মা, তোমার বুড়ো শাশুড়ী থাকলেন, ছোট মেয়ের মত তাঁর আবদার সহ্য ক'রো। রোগে শোকে যখন তিনি কটু কথা বলবেন, মেয়ের কথা বলে সে সব মনে রেখ না।"

নিশি ডাক্তার নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "হাতটা একবার দেখি।"

হরেন্দ্র বলিলেন, "কে, নিশি? কি চিকিৎসা করতে এসেছ? আজীবন ডাক্তারি করে কাটালাম, তোমাদের চিকিৎসার দৌড় জানি। বৃথা চেষ্টা। বেঁচে বর্ত্তে থেকে সুখী হও বাবা। নিপুণ, এত ডাক্তার রয়েছে, খাওয়া দাওয়ার সময় নিশিকে কেন টেনে আনলে? এদিকে এস তোমায় আশীর্ব্বাদ করি, আর হয়তো সময় পাব না।"

[৪]

পিতার মৃত্যুর পর তিন বৎসর চলিয়া গিয়াছে।

কালীঘাটের একটি বাড়ীর সুসজ্জিত এক ঘরে নগেন্দ্র ও সুধীন্দ্র বসিয়া কথা বলিতেছিল। নগেন্দ্র আলিপুরে ওকালতী করে।

নগেন্দ্র বলিল, "আমার অবস্থা তো দেখছই, উকীলদের উপরেই যা, ভিতরে কিছু নেই। যা পাই বাড়ী-ভাড়া আর শোবার ঘরের দাম দিতেই সব ফুরিয়ে যায়।"

সুধীন্দ্র কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "কিন্তু মেজ দাদা, এ একটা মস্ত সুযোগ। তুমি আর সেজদাদা সংসারের সব ভার নিয়েছ, ফিরে এসে আমিও নেব। এখন কৃষ্ণনগরে ডিসপেনসারী খুললে কি হবে, চার পাঁচ বছরের আগে কিছুই হবে না। গভর্ণমেণ্ট থেকে একটা ষ্টাইপেণ্ড পাওয়া যাচ্ছে, আর এক হাজার টাকা হলেই আমার বিলাত যাওয়া হয়।"

সিগারেটে লম্বা টান দিয়া নগেন্দ্র বলিল, "তুমি একেবারে ফুইসেন্সের মত কথা বলছ। সংসারের এখন এই অবস্থা, বড়দাদাও চলে গেলেন, মাধুরীর বিয়ের চিন্তায় আমাদের ঘুম নেই। এখন তোমার বিলাত যাওয়ার ধুম পড়ল! যাও, কৃষ্ণনগরে ডিসপেনসারী খুলে ব'স গে।"

সুধীন্দ্র সঙ্কোচ দূর করিয়া বলিল, "সেদিনও তো তুমি ব্যাঙ্কে দু' হাজার টাকা জমা দিয়েছ, আমি ধার চাচ্ছি মেজ দাদা, তিন বছরের মধ্যে তোমাকে টাকা দিয়ে দেব।"

নগেন্দ্র বলিল, "খুব অল্প সময় তো! সব সন্ধানই যখন তুমি রাখ, তখন এটাও তোমার রাখা উচিত ছিল যে, ও

টাকাটা আমার নয়। বছর দুই আগে তোমার বৌদিদির কাছে ওটা ধার নিয়েছিলাম, ওটা তাঁর স্ত্রী-ধন।"

সুধীন্দ্র উত্তর দিল না, বৌদিদির এ স্ত্রী-ধন হঠাৎ কোথা হইতে আসিল তাহাও সে বুঝিল না।

নগেন্দ্র আর একটা সিগারেট ধরাইয়া বলিল, "হুজুগে মেতে চলা কিছু নয়। তুমি তো পাশই ঠিক করে রেখেছ, যদি ফেল হও?"

এবারও সুধীন্দ্র নিরুত্তর। কিছুপরে নগেন্দ্র আবার বলিল, "নৃপেন্দ্রকেও তো বলেছিলে, সে বুঝি চিঠির উত্তর দেয় নি? সে দিক না টাকাটা। সে মুন্সেফ, বাঁধা ৩০০৲ আয়, মাসে ১০০৲ তোমাকে দিতে পারে না?"

সুধীন্দ্র বলিল, "মেজদাদা, তুমি চিরদিনই স্বার্থপর তা জানতাম, কিন্তু এতদূর নীচ তা জানতাম না! তুমি দুধের দাম আর বাড়ীভাড়া দিতে পার না, অথচ বছরে তোমার দু হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা হয়! সেজদাদার তিনশো টাকা কিসে খরচ হয়, তা তুমি জান না? বাবা আর বড়দাদা মারা যাওয়ার পর তুমি বুদ্ধিমানের মত সরে পড়েছ। এত বড় সংসার, সেজদাদা তিনশো টাকায় কি করে চালায়, তা তুমি জান না, কিন্তু আমি জানি। মাধুরীর বিয়ের কথা বলছ, তাতে তুমি যা দেবে তাও আমি জানি।"

নগেন্দ্র সুচতুর উকীল, না রাগিয়া বলিল, "ছেলেমানুষের মত ঝগড়া ক'রো না। তোমার বৌদিদির সঙ্গে দেখা করেছ? এখানে যে খাবে তা বল গে।"

সুধীন্দ্র আর কথা বলিল না, চলিয়া গেল। তখনই করুণা ঘরে ঢুকিল, বলিল, "কত রাগ, যেন নবাব! চলে গেল, যাক, তোমার এত সাধাসাধির দরকার ছিল কি?"

নগেন্দ্র একটু থামিয়া বলিল, "ভাবছি টাকাটা দিলেই হ'ত।"

করুণা বলিল, "দেও না গো! আমি বাপের বাড়ী নিয়ে যাবার জন্য টাকা জমাই নি। মরলেও সঙ্গে যাবে না। ও তোমারই থাকবে।"

উকীলের তীক্ষ্ণবুদ্ধি কেবল স্ত্রীর নিকটেই পরাস্ত হয়। অবশ্য সকল উকীলের কথা জানিবার সুযোগ আমার হয় নাই। তাঁহাদের অভিজ্ঞতার কথা জানিলে হয় তো গল্প লিখিতে আমার সুবিধা হইত।

[৫]

রবিবার। দুপুরবেলা। নৃপেন্দ্র খাটের উপর শুইয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিল। বাসন্তী খোকাকে ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে বলিল, "ছুটি নেবার কি হ'ল, দেরী করছ কেন?"

নৃপেন্দ্র বলিল, "ছুটি নেব কি না তাই ভাবছি। মাকে এ সময় একা রেখে তোমাকে নিয়ে দূরে যাওয়া কি উচিত হবে? তুমিও ভেবে দেখ।"

বাসন্তী বলিল, "তাই ভেবেই এতদিন আমি যেতে চাই নি, কিন্তু—"

নৃপেন্দ্র বলিল, "সব বুঝি, তুমি যে চিরদিন এ ভাবে কষ্ট পাবে তাও জানি। কিন্তু মার কথা সহ্য করতেই হবে। কঠোর বলেই কি কর্ত্তব্য ত্যাগ করতে হবে?"

বাসন্তী বলিল, "সে জন্য নয়। আমার ভাগ্যেই এ সংসারের সর্ব্বনাশ হ'ল। আমার সর্ব্বদা মনে হয়, আর একটা ভয়ানক কিছু হবে। তাই আমি কয়েকদিন একটু অন্যত্র যেতে চাই।"

নৃপেন্দ্র ব্যথিত ভাবে বলিল, "ভাগ্য? তা যদি বল তবে সকলেরই একটা ভাগ্য আছে স্বীকার করতে হবে। যার ভাগ্যে যে সময় মৃত্যু আছে তা কে খণ্ডাবে? এ জন্য যদি কারও দোষ থাকে, তা সেই ভাগ্যবিধাতার। তুমি কি করবে?"

বাসন্তী নীরবে খোকাকে থাবড়াইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে নৃপেন্দ্র বলিল, "তারপর যদি তোমাকে কিছুদিন অন্যত্র পাঠাই, তবে মা আর বৌদিদিকে দুটি ভাত রেঁধে দেবে কে?'

বাসন্তীর চক্ষু সজল হইল, বলিল, "মা তো আমার রান্না খান না, আমার ছোঁয়া—"

বেদনায় জর্জ্জরিত হইয়া নৃপেন্দ্র বলিল, "খান না? ত তো আমি জানি না।" নৃপেন্দ্র দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

ঠিক এই সময় চিন্ময়ীর গৃহে তাঁহার কন্যা হিমকণ মার সহিত কথা কহিতেছিল। মায়ের অবস্থা দেখিয় নৃপেন্দ্র হিমকণাকে শ্বশুরালয় হইতে আনিয়াছে।

হিমকণা বলিল, "দাদাদের আর সুধীনকে যদি বাঁচাতে চাও, তবে এখনও ও বৌকে ছাড়াও। একটা স্বস্ত্যয়ন করাও, দাদার আবার বিয়ে দাও।"

চিন্ময়ী নিরাশার সহিত বলিলেন, "সেই যদি কথা শুনবে, তবে এ সর্ব্বনাশ হবে কেন? এখন কি ছেলেপিলের মা বৌকে ত্যাগ করবে?"

হিমকণা বলিল, "করবে মা, করবে। অল্প বয়সে পুরুষেরা ও রকম অনেক কথা বলে। দাদার মনেও এখন খুব অনুতাপ হয়েছে, তা মুখ দেখলেই বোঝা যায়।"

সুতরাং নবদ্বীপ হইতে প্রাচীন কুলপুরোহিত আসিয়াছিল। অমঙ্গল দূর করার জন্য স্বস্ত্যয়ন হইয়া গিয়াছে। চিন্ময়ী, হিমকণা ও পুরোহিতের একটা গোপন পরামর্শের পর গুরুর আদেশে হিমকণা নৃপেন্দ্রকে ডাকিয়া আনিল।

নৃপেন্দ্র আসিলে গুরু বলিলেন, "এস বাবা, দীর্ঘজীবী হও। সুধীন বাবা কোথায়?"

নৃপেন্দ্র বলিল, "সে কলে ঘুর্ণি গেছে। আমাকে ডেকেছেন কেন? আপিসের বেলা হয়েছে।"

গুরু বলিলেন, "বাবা, যা হয়েছে তার তো কোন্ উপায় নেই, কিন্তু যা আছে তা তো রক্ষা করতে হবে, কি বল?"

নৃপেন্দ্র বলিল, "নিশ্চয়ই।"

পুরোহিত বলিলেন, "তোমাদের এই ধনে জনে পূর্ণ রাজার মত সংসার, কার দৃষ্টিতে এমন ছারেখারে গেল সবই তো জান। তাই বলছি বাবা যাতে ভাল হয় তাই কর, মাকে আর কষ্ট দিও না।"

নৃপেন্দ্র বলিল, "আমাকে কি করতে বলেন?"

পুরোহিত বলিলেন, "বৌমাটিকে ত্যাগ কর। তুমি পুরুষ মানুষ, তোমার—"

নৃপেন্দ্র বলিল, "হাঁ বুঝলাম, আমি পুরুষ, স্ত্রীর অভাব আমার হবে না। কিন্তু নিরপরাধা স্ত্রীকে ত্যাগ করব, তার কি উপায় হবে?"

পুরোহিত বলিলেন, "উপায়ের কর্ত্তা ভগবান। তুমি কি তাঁকে ভিখারিণী করবে? বৌমাকে স্বতন্ত্র রেখে তাঁর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে দাও, যেন তার কোন কষ্ট না হয়।"

নৃপেন্দ্র কঠিন স্বরে বলিল, "তারপর? তাকে অসহায় দেখে কেউ যদি তার প্রতি অত্যাচার করে, তবে সে পাপের অংশ কি আপনি নেবেন? মা, তোমার কাছেই বাবা মরবার সময় ওকে দিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু মা, একদিনও কি তুমি ওকে স্নেহ করেছ? তোমাদের একটু স্নেহ পাবার জন্য ও দাসীর মত তোমাদের সেবা করেছে, তোমাদের সন্তুষ্ট করবার জন্য নিজের শরীর মনের দিকে ও চায় নি, কিন্তু মা, সে সবের পরিবর্ত্তে ওকে কি দিয়েছ? দিয়েছ শুধু মর্ম্মান্তিক কষ্ট আর অপমান। আজ পুরুত ডেকে তাড়াবার বন্দোবস্ত করছ! কিন্তু ও-ও রক্ত মাংসে গড়া মানুষ, আর সহ্যেরও একটা সীমা আছে!"

পুরোহিত মধুর স্বরে বলিলেন, "অত গরম হয়ো না বাবা।"

গর্জ্জন করিয়া নৃপেন্দ্র বলিল, "খবর্দ্দার! ফের যদি ও কথা বলবে, তবে ঘাড় ধরে বাড়ীর থেকে বার করে দেব।"

সকলে স্তব্ধ, নির্ব্বাক্। মহামান্য প্রাচীন কুলপুরোহিতের অপমান দেখিয়া কাহারও মুখে কথা সরিল না। অতি বুদ্ধিমতী হিমকণা কম্পিত বক্ষে পাশের ঘরে লুকাইয়া রহিল।

সশব্দ পদক্ষেপে নীচে নামিয়া নৃপেন্দ্র না খাইয়া আফিসে চলিয়া গেল। তাহার ভীষণ মুখশ্রী দেখিয়া সকলে সভয়ে সরিয়া গেল।

অধীর হইয়া চিন্ময়ী কাঁদিতে লাগিলেন। বধূর জন্য ছেলেকেও যে তিনি জন্মের মত হারাইতে বসিয়াছেন, তাহা বুঝিতে আর বাকী থাকিল না।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ফিরিয়া আসিয়া নৃপেন্দ্র সোজা মায়ের ঘরে গেল। পদশব্দে চিন্ময়ী চাহিয়া দেখিলেন। সমস্ত দিনের অনাহার ও উত্তেজনায় নৃপেন্দ্র সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। চুল অবিন্যস্ত, চক্ষু রক্তবর্ণ।

নৃপেন্দ্র স্থিরভাবে বলিল, "মা, ওকে ত্যাগ না করলে তোমাদের অমঙ্গল দূর হবে না, বুঝেছ। কিন্তু ও বেঁচে থাকতে তো আমি ওকে ত্যাগ করতে পারব না। তাই এই বিষ এনেছি, ওকে দাও, সহজেই তোমার অমঙ্গল দূর হবে। এত সহজ উপায় থাকতে পুরুত ডাকবার দরকার ছিল না।"

চিন্ময়ী আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া বলিলেন, "বাবা"—

নৃপেন্দ্র তেমনই স্থির ভাবে বলিল, "বিশ্বাস হ'লো না মা? সত্যিই ও বিষ, ওকে তোমার সামনে খেতে দাও, পাঁচ মিনিটের মধ্যে ও মরবে।"

চিন্ময়ীর চোখের জল শুকাইয়া গেল, বাক্যহারা হইয়া বসিয়া রহিলেন।

নৃপেন্দ্র ডাকিল, "বাসন্তি!"

নিজের ঘর হইতে বাসন্তী ম্লানমুখে ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইল। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া নৃপেন্দ্র বলিল, "বাসন্তি, তোমার জন্য বিষ এনেছি। তুমি এসে অবধি আমাদের সংসারে মঙ্গল নেই। এই বিষ খেয়ে তুমি আমাদের সংসার থেকে চলে যাও।"

বাসন্তী কয়েক মুহূর্ত্ত বিবর্ণ মুখে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর নৃপেন্দ্রর প্রসারিত হাত হইতে বিষের মোড়ক তুলিয়া লইল এবং সেই মুহূর্ত্তেই তাহা অকম্পিত হস্তে মুখে ঢালিয়া দিল।

চিন্ময়ী পাথর হইয়া গিয়াছিলেন। হঠাৎ উঠিয়া পাগলের মত চাকর-বাকর ও ছেলেদের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

সুধীন্দ্র সবে মাত্র 'কল' হইতে ফিরিয়া কাপড়-জামা ছাড়িতেছিল, চীৎকার শুনিয়া ছুটিয়া উপরে গিয়া দেখিল, বাসন্তী মাটীতে শুইয়া ছটফট করিতেছে, আর নৃপেন্দ্র কোলের উপর তাহার মাথা রাখিয়া এক দৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে।

সুধীন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া বলিল, "এ কি দাদা, এ কি করলে? বৌদিদি, বৌদিদি!"

নৃপেন্দ্র বিকৃতস্বরে বলিল, "ডাকিসনে ভাই, অনেক কষ্ট পেয়েছে, একটু শান্তিতে যেতে দে।"

বাসন্তীর তখনও জ্ঞান ছিল। স্বামীর পর এ সংসারে কেবল এই দেবরটিই তাহাকে স্নেহ করিয়াছে। অতি অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "ঠা—কুর—পো" কথা শেষ হইল না, চক্ষুতারা ঊর্দ্ধে উঠিল।

বাসন্তীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া নৃপেন্দ্র বলিল, "আমার ওপর রাগ ক'রো না বাসন্তি!"

বাসন্তী কি বলিতে চাহিল, পারিল না। সব শেষ হইয়া গেল!

চিন্ময়ী আছড়াইয়া পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল।

বর্ষায় নটরাজ

—শ্রীদীনেশচন্দ্র দাশ

ধ্যান-মৌন তপস্বীর তপোভঙ্গ হ'ল আজ বহুদিন পর,
বর্ষণের মত্ততায় রুদ্রসুরে আত্মভোলা জেগেছে শঙ্কর
দুরন্ত উল্লাসে যেন। পিঙ্গল জটার জালে নভের নীলিমা
মসীম্লান হয়ে আসে—লুপ্তপ্রায় হ'ল দিক্-দিগন্তের সীমা!
বিদ্যুতের অগ্নিসর্প ক্ষণে ক্ষণে ফণা হানে জটাভার হ'তে
ধরিত্রীর অন্তরাত্মা মুহুর্মুহু ত্রস্তে কাঁপে। এ-বিশ্বজগতে
শুনি যেন ভয়ার্ত্তের আর্ত্তসুর। নৃত্য করে মত্ত নটরাজ—
বজ্রের বহ্নিতে তার প্রলয়ের ত্রি-নয়ন জ্বলে ওঠে আজ,
ক্ষিপ্ত প্রতি পদাঘাতে দুলিতেছে আরণ্যক ঋষি বনস্পতি,
মেঘে লুপ্ত চূর্ণপ্রায় গ্রহে গ্রহে মুহ্যমান প্রাত্যহিক গতি!
মহাকাল নৃত্য করে—মেঘ-ডম্বরুর ধ্বনি, ঘন শিঙ্গারবে
দিগন্ত শব্দায়মান। আমূর্চ্ছিত পৃথিবীর ভীতি-কলরবে

শঙ্কিত উমার চক্ষে অবিশ্রান্ত ঝর ঝর ঝরে অশ্রুধারা,
তিলার্দ্ধ ভ্রূক্ষেপ নাই, তাণ্ডবের নটরাজ নাচে আত্মহারা!

শক্তির রূপান্তর

—শ্রীনীলরতন কর

সৌর কিরণের অসহনীয় আতপ্ততা, ঝটিকার প্রবল আবর্ত, মেঘের গম্ভীর গর্জ্জন, বিদ্যুতের চমকপ্রদ শিহরণ, বিক্ষুব্ধ সাগরের তরঙ্গসংঘাত, নদীর খরধার স্রোত, নির্ঝরের অবিশ্রান্ত প্রবাহ মানুষের মনে জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতে প্রকৃতির বিপুল শক্তিভাণ্ডারের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই শক্তি প্রকাশ পায় তাপে, আলোকে, বস্তুর চাঞ্চল্যে, বিদ্যুতে, চুম্বকে, শব্দে। এই প্রবন্ধে বর্ত্তমান জগতে মানুষের সেই প্রাকৃতিক শক্তিকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার চেষ্টার ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে।

নিখিল-বিশ্বের জড় ও শক্তির স্বরূপ-সন্ধানে মানুষের মন চির-কৌতুহলী। প্রাগৈতিহাসিক অতীতের গুহাবাসী আদি-মানব এবং আধুনিক সভ্য-সমাজের সংস্কৃতিশীল মানুষ, উভয়েই শক্তির রহস্য-উদ্ঘাটনে উৎসুক এবং তাহার নব নব প্রয়োগে কৌশলী।

জাগতিক অভিজ্ঞতার উদীয়মান আলোকে বিকাশোন্মুখ শিশু-মন ও নিরীক্ষাপরীক্ষার প্রখর দীপ্তিতে পরিণত বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধি, উভয়েরই কাছে শক্তির লীলা বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়াছে। পরিদৃশ্যমান প্রকৃতির বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মানুষকে শক্তির অস্তিত্বের বিষয়ে সজাগ করিয়া তুলিয়াছে।

শক্তি অর্থে বুঝায় কোন পদ্ধতির (system) কর্ম্ম করিবার সামর্থ্য। বৈজ্ঞানিকগণ কর্ম্ম (work) এবং শক্তিকে (energy) একই অঙ্কের সঙ্কেত দ্বারা প্রকাশ করেন।

বলপ্রয়োগ (force) দ্বারা কোন বাধা অতিক্রম করাকে কর্ম্ম বলে।

কোন দ্রব্যকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিতে হইলে শক্তি ব্যয় করা প্রয়োজন। এই উত্তোলনপথে প্রধান বাধা পৃথিবীর আকর্ষণ। কোন বস্তুকে পৃথিবী যতটা জোরে আকর্ষণ করে, তাহাকে সাধারণ ভাষায় সেই বস্তুটির ওজন বলে। দ্রব্যটির ওজন যদি চার পাউণ্ড হয় এবং উত্তোলনের উচ্চতা যদি পাঁচ ফুট হয়, তবে কর্ম্ম বা শক্তির পরিমাণ হইবে বিশ ফুট-পাউণ্ড। কোন কর্ম্ম খুব দ্রুততালে নিষ্পন্ন হইতে পারে, আবার ধীরে ধীরেও সমাধা হইতে পারে। যে-হারে কর্ম্ম সাধিত হয়, তাহার অপর নাম ক্ষমতা (power)। ওয়াট্ অশ্বক্ষমতা দ্বারা তাঁহার এঞ্জিনের কার্য্যকারিতা (efficiency) পরিমাপ

অগ্নিস্রাবী গিরি: কিলওইয়া (Kilauea): হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ। আগ্নেয়গিরি-গবেষণা-সমিতি (Volcano Reserch Assocition) হইতে এই গিরিপ্রসূত উত্তাপকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা চলিতেছে।

করিয়াছিলেন। অবশ্য সত্য সত্যই কোন অশ্বের ক্ষমতা অনুযায়ী এ বিষয় নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই। একটা কাল্পনিক পরিমাপ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, ৫৫০ পাউণ্ড ভার এক সেকেণ্ডের মধ্যে এক ফুট উঁচুতে তুলিতে যতটা ক্ষমতার দরকার, তাহাকে এক অশ্বক্ষমতা (horse power) বলা হইবে। শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর ভাবে আলোচনা সুরু হইয়াছে উনবিংশ শতকে। হেল্‌মহোলৎজ, জুল, হির্ণ প্রমুখ মনীষিবৃন্দ এ বিষয়ে গবেষণা ও পরীক্ষাকার্য্যের সূচনা করেন। ১৮৪২ অব্দে মায়ার শক্তির মূল তত্ত্বগুলি ভালভাবে বিধিবদ্ধ করেন। ইহাঁদের পর্য্যবেক্ষণ ও চর্চ্চার ফলে কর্ম্ম এবং শক্তির রূপান্তর

তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ এই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন্ যে, তাপশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মে পরিবর্ত্তিত

লর্ড কেলভিন (১৮২৪—১৯০৭)।

করিলে যতটা কর্ম্ম পাওয়া যাইবে, সেই পরিমাণ কর্ম্মকে রূপান্তরিত করিয়া পূর্ব্বপরিমিত তাপ পাওয়া সম্ভব। কতটা কর্ম্ম হইতে কতটা শক্তি পাওয়া যাইবে, জুল্ সর্ব্বপ্রথম সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ করেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, ৭৭২ ফুট-পাউণ্ড কর্ম্ম করিলে এক বি. টি. ইউ তাপ পাওয়া যায়। এক পাউণ্ড জলের তাপমাত্রা এক ফারেনহাইট ডিগ্রী বাড়াইতে যতটা তাপের প্রয়োজন, তাহাকে বলে এক ব্রিটিশ থার্ম্মাল ইউনিট বা এক বি. টি. ইউ। জুলের পরবর্ত্তী কালে অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণ অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম পরিমাপ করিয়া দেখিয়াছেন যে, এক বি. টি. ইউ তাপ উৎপাদনের জন্য ৭৭৮ ফুট-পাউণ্ড কর্ম্ম করা আবশ্যক। যখন জুল কর্ম্ম ও শক্তির রূপান্তর বিষয়ে পরীক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময় জার্ম্মানীর হেলম্‌হোলৎজ এবং ইংলণ্ডের ওয়াটারষ্টোন, র‍্যাঙ্কিন ও ম্যাক্সওয়েল শক্তিতত্ত্ব বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তাঁহাদের গবেষণার ফলে এই সত্য প্রকাশিত হইল যে, জগতের জড়রাশির ন্যায়, বিশ্বের শক্তিসমষ্টিও অব্যয় এবং অবিনাশী। ১৮২৪ অব্দে কার্‌ণো তাপপ্রবাহ ও জলপ্রবাহ বিষয়ে তুলনা করিয়া দেখাইলেন যে, জল যেমন উচ্চ স্থান হইতে নিম্ন স্থানে প্রবাহিত হইয়া যান্ত্রিক কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতে পারে, তাপশক্তিও সেইরূপ উচ্চমাত্রা হইতে নিম্নমাত্রায় প্রবাহিত হইয়া কর্ম্মসাধনে সমর্থ। তিনি বলিলেন—বাষ্প, বায়ু, গ্যাস অথবা তরল পদার্থ, যে-কোন বস্তুই হউক না কেন, তাপশক্তি হইতে কর্ম্ম করিবার সময় কোথাও না কোথাও মাত্রাবৈষম্য ঘটা দরকার। মাত্রার বৈষম্য ব্যতিরেকে কোন কর্ম্মই নিষ্পন্ন করা সম্ভব নয়। কার্‌ণোর চিন্তাধারা অবলম্বন করিয়া লর্ড কেল্‌ভিন তাপমাত্রার চরম মানদণ্ড পরিকল্পনা করেন। জুলের আবিষ্কারকে ভিত্তি করিয়া ক্লাউজিয়াস ও কেল্‌ভিন্ শক্তিতত্ত্বের এই দ্বিতীয় নিয়মের প্রতিষ্ঠা করেন যে, তাপশক্তি নিম্ন তাপমাত্রা হইতে উচ্চ তাপমাত্রায় গমনে অক্ষম। তাঁহারা বলিলেন, তাপশক্তি উচ্চমাত্রা হইতে নিম্ন মাত্রায় প্রবাহিত হইয়া যে কর্ম্মের সামর্থ্য হারাইয়া ফেলিতেছে, তাহাকে আর পুনরুজ্জীবিত করিবার আশা নাই। এ ঘটনাটি একেবারে বিপর্য্যাসের অযোগ্য (irreversible)।

সমগ্র বিশ্বের তাপমাত্রা ক্রমশঃ একাকার হইবার চেষ্টা করিতেছে, কাজেই হয়ত এমন একদিন আসিবে, যখন শক্তি সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় অবস্থা প্রাপ্ত হইবে।
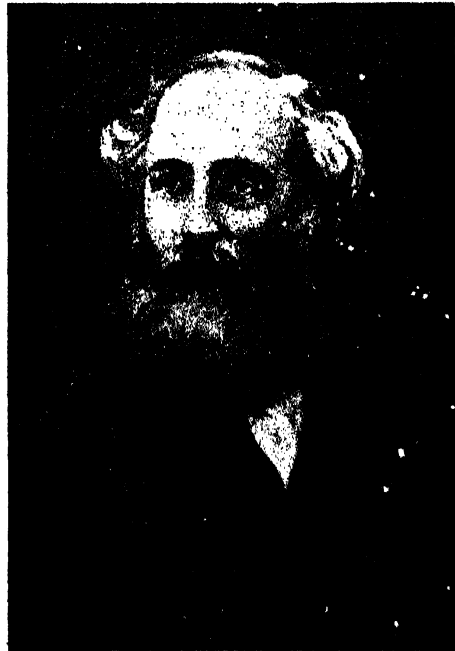
জেম্‌স্ ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (১৮৩১—১৮৭৯)। (বৈদ্যুতিক তরঙ্গের আবিষ্কর্ত্তা)।

এডিংটন বলেন যে—পদার্থ বিজ্ঞানের পক্ষ হইতে, অতীত কালের সঙ্গে ভবিষ্যৎ কালের প্রভেদ দেখাইবার একমাত্র মূলসূত্র এই বিপর্য্যাসের অযোগ্য ঘটনা।

[২]

জুলের পূর্ব্বে রামফোর্ড (১৭৯৮) তাপ সম্পর্কে কতকগুলি প্রাথমিক পরীক্ষা করেন। একদা তিনি মিউনিকের

কাউণ্ট রামফোর্ড (১৭৫৩—১৮১৪)। (Law of the Conservation of Energyর প্রতিষ্ঠাতা)।

আয়ুধশালায় পিতলের কামান প্রস্তুত বিষয়ে তদারক করিতেছিলেন। সেখানে পিতলের মধ্যে ছিদ্র করিবার সময় যে সব ধাতুর টুকরো বাহিরে আসিতেছিল, সেগুলি অনুভবে অত্যন্ত গরম ঠেকিল। তখনই তাঁহার মনে প্রশ্ন উঠিল—'ঘর্ষণজনিত এই যে তাপ সৃষ্টি হইতেছে, ইহার কি কোনো সীমা আছে ?' এই ভাবিয়া তিনি নানারূপ পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। শেষে প্রমাণ করিলেন যে, ঘর্ষণ দ্বারা যত ইচ্ছা তাপশক্তি উৎপাদন করা যায় এবং তাপশক্তি এক প্রকার চঞ্চলতা ব্যতীত আর কিছু নয়। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত পরবর্ত্তী বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা বৈজ্ঞানিক জগতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, কোন বস্তুর উষ্ণতার মূল কারণ তাহার আণবিক চঞ্চলতা। এই সিদ্ধান্ত হইতে আর এক নূতন মন্তব্য করা চলে। তাপশক্তিই যদি অণুর চাঞ্চল্যের কারণ হয়,তাহা হইলে কোন বস্তুর আণবিক চাঞ্চল্য একেবারে বন্ধ হইলে, তাহা হইতে সমস্ত উত্তাপও চলিয়া যাইবে। ইহা হইতে তাপমাত্রার চরম মানদণ্ড নির্ণীত হইল। সেন্টিগ্রেডের হিসাবে এই চরম মানদণ্ডের নিম্ন সীমা বরফ জমিবার তাপমাত্রার ২৭৩° ডিগ্রী নীচে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক বীক্ষণাগারে পরীক্ষা দ্বারা তাপমাত্রার নিম্নতম প্রান্তের খুব কাছাকাছি, এমন কি চরম শূন্যের প্রায় এক ডিগ্রী উপর পর্য্যন্ত পৌছান সম্ভব হইয়াছে। এই অবস্থায় সর্ব্বপ্রকার গ্যাসই কঠিনতা লাভ করে। বিশ্বের তাপমাত্রার নিম্নতম প্রান্ত—২৭৩° সেন্টিগ্রেড এবং তাহার উর্দ্ধতন প্রান্ত নক্ষত্রমণ্ডলীর অভ্যন্তরভাগের উষ্ণতা—লক্ষ লক্ষ সেন্টিগ্রেড। ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন নক্ষত্রাদির উষ্ণতার তুলনায় পৃথিবীর তাপমাত্রা চরম শূন্যের খুবই নিকটবর্ত্তী। কোন কোন নক্ষত্রের অভ্যন্তর-ভাগ এতই উত্তপ্ত যে, সেখানে জীবের আবাসভূমি বা স্বর্গরাজ্য কল্পনা করা ত দূরের কথা, পরমাণুদের পর্য্যন্ত ইলেকট্রনের বলয়বিহীন হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়।

[৩]

বস্তুর আণবিক চাঞ্চল্যের মাত্রাভেদে কঠিন, তরল ও বায়বীয় অবস্থার সৃষ্টি। গ্যাস অথবা তরল পদার্থের অণুরা

আইনষ্টাইন (১৮৭৯—×)।

যে সর্ব্বদা চঞ্চলভাবে ছোটাছুটি করিতেছে,ব্রাউনের আন্দোলন তাহার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ। ব্যাপারটি এই—১৮২৭ অব্দে

ব্রাউন নামে এক ইংরাজ উদ্ভিদবিদ্—জলের উপর ভাসমান কতকগুলি, পরাগরেণু, অনুবীক্ষণ সাহায্যে পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখিলেন যে, সেগুলি নিরন্তর চঞ্চল হইয়া বেড়াইতেছে। বহুকাল ধরিয়া তাঁহার এই আবিষ্কারের দিকে কাহারও তেমন লক্ষ্য পড়ে নাই। অনেকে ভাবিয়াছিল, বুঝি বা তাপমাত্রার পার্থক্যের জন্য, কিংবা কোনো উপায়ে বাহির হইতে নাড়া পাওয়ার জন্য এই আন্দোলন ঘটিতেছে। হ্বিনের (১৮৬৩), দেলসাক্স্ (১৮৭৭) এবং কারবোনেলি অনুমান করিলেন যে,

রবার্ট অ্যাণ্ড, মিলিক্যান (১৮৬৮—x) ১৯২৩ সনে পদার্থ বিদ্যায় নোবেল প্রাইজ লাভ করেন। (ইলেকট্রন বাদের প্রথম প্রবর্ত্তক)।

এই লক্ষণটি আণবিক সংঘর্ষের ফল। বোদোজুস্কি (১৮৮১) বায়ুমধ্যস্থ ধূলি ও ধূমকণায় ব্রাউনের আন্দোলন নিরীক্ষণ করিয়া ভাবিলেন—লক্ষণটিতে যেন গ্যাসের চাঞ্চল্যবাদের (kinetic theory of gases) আভাস পাওয়া যাইতেছে। তাঁহার পর গোয়ে একই রূপ অনুমান করিলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে আইনষ্টাইনের তথ্যমূলক গবেষণা হইবার পুর্ব্বে (১৯০৫) কোনরূপ পরিমাণগত পরীক্ষা হয় নাই। তাঁহার মনে হইল, তরল অথবা বায়বীয় পদার্থের আণবিক চাঞ্চল্যেই ঘটনাটির সৃষ্টি। ভাসমান বস্তুকণাগুলি জল অথবা গ্যাসের অণু দ্বারা আঘাত পাইতেছে। অণুগুলি চারিদিকে ছোটাছুটি করিবার সময় নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ লাগাতে তাহাদের অধিকাংশ ধাক্কাই পরস্পরের বিপরীত আঘাতে কাটাকুটি হইয়া যায়; কিন্তু সময়ে সময়ে একদিকে যতটা লাগে, অপর দিকে ততটা না লাগায় অবশিষ্ট গুলি ভাসমান কণার গায়ে ধাক্কা দেয়। যেন কতকগুলি অদৃশ্য ছেলে রেণুর পুসিং-বল লইয়া খেলা করিতেছে। তাহাদের সেই চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইয়েছে ব্রাউনের আন্দোলন রূপে। ভাসমান বস্তুকণার গড় চাঞ্চল্যশক্তি এবং সেই তাপমাত্রায় অবস্থিত গ্যাসের অণুর গড় চাঞ্চল্যশক্তি এক, এইরূপ অনুমান করিয়া আইনষ্টাইন অঙ্ক কসিয়া বাহির করিলেন, একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রেণুরা মোটের উপর কতটা ছুটিতে পারিবে। তিনি হিসাব করিয়া যে গাণিতিক সমীকরণ খাড়া করিলেন, তাহার হাতে হাতে প্রমাণ পাওয়া গেল পের্‍াঁর পরীক্ষায় (১৯০৯)। দ্য-ব্রগলিও এই লইয়া প্যারি নগরীতে পর্য্যবেক্ষণ আরম্ভ করিলেন।

তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধাতব রেণু লইয়া গ্যাসের মধ্যে তাহাদের আন্দোলন দেখিলেন। তাহা ছাড়া আরো একটি পরীক্ষা করিলেন; তামাকের ধোঁয়া-ভরা কাচের বাক্সে বিদ্যুত সঞ্চার করার পর সেই ধূমগাত্রে যে সকল বিন্দু বিন্দু জল সঞ্চিত হয়, তাহাদের গতিবিধি নিরূপণ করিলেন। ১৯১৩ অব্দে নর্ডল্যাণ্ড পের্‍াঁর পরীক্ষাদি আরো ভালভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। তিনি এই বীক্ষণকার্য্যে পারদের কলয়ডিয়াল দ্রব ব্যবহার করিলেন। তাঁহার যন্ত্রাদির সাথে ব্রাউনের আন্দোলনের আলোকচিত্র লইবার ব্যবস্থা করিলেন। মিলিক্যান এবং ফেলত্সের (১৯১৪) গ্যাসের মধ্যে তৈলকণা ভাসাইয়া তাহার সাহায্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিমাপকার্য্য করিয়াছেন। ১৯১৫ অব্দে ষ্টক্‌হলমের ওয়েষ্টগ্রেণ মহাশয়, কলয়ডিয়াল স্বর্ণ, রৌপ্য, সেলিনিয়াম ধাতুকণা এবং হীরকচূর্ণ লইয়া এ প্রসঙ্গে গবেষণা করিয়াছেন। এই সকল বীক্ষণের ফলে দেখা গিয়াছে যে, শূন্য সেন্টিগ্রেড ডিগ্রী উষ্ণতায় এবং বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক চাপে (অর্থাৎ ৭৬০ মিলিমিটর পারদের স্তরের যে চাপ) ২২.৪ লিটর আয়তনের গ্যাস অণু সংখ্যা ৬.০৬×১০^{২৩}। গ্যাসের বা কাইনেটিক থিওরী অনুযায়ী গণনার সাথে বহু-পরীক্ষিত

তথ্যের কোনরূপ পার্থক্য না থাকাতে আণবিক চাঞ্চল্যের সিদ্ধান্তটি সর্ব্ববাদিসম্মতক্রমে বৈজ্ঞানিক সমাজে গৃহীত হইয়াছে।

[৪]

শক্তি দুই ভাবে অবস্থান করে—চঞ্চল (kinetic) এবং স্থাণু (potential)। পদ্ধতি অথবা বস্তুর অবস্থা কিংবা অবস্থানের পরিবর্ত্তনে যে শক্তির প্রকাশ হয়, তাহাকে চঞ্চল শক্তি এবং অবস্থিতির গুণে যে শক্তি সঞ্চিত থাকে, তাহাকে স্থাণু শক্তি বলে। এই স্থাণু ও চঞ্চল শক্তির সমষ্টি তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি। কোন বিশেষ উপায়ের সাহায্যে পারিপার্শ্বিক স্থান হইতে শক্তি অর্জ্জন কিংবা বিকিরণ করা যাইতে পারে। এই অর্জ্জন ও বিকিরণের পরিমাণ কত, তাহা সহজেই হিসাব করা যায়, কিন্তু বস্তুর মোট শক্তির পরিমাণ গণনা করা এতদিন মানুষের বুদ্ধির সম্পূর্ণ অগোচর ছিল। আইনষ্টাইন এ বিষয়ে এক নূতন কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, শক্তির ব্যয় অথবা অর্জ্জনের সাথে সাথে দ্রব্যের বস্তু-পরিমাণেরও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। শক্তি ও বস্তুপরিমাণ একই পদার্থের বিভিন্ন পরিমাপ; অর্থাৎ শক্তির অবিনাশিতা, জড়ের অবিনাশিতার ভিন্নরূপ ব্যাখ্যামাত্র। কিন্তু, বস্তুপরিমাণের এই হ্রাস-বৃদ্ধি এতই সামান্য যে, সূক্ষ্ম তুলাদণ্ড দ্বারাও সে বিষয় নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। যদি এক গ্রাম্ বস্তুকে সম্পূর্ণ রূপে শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়, তবে ৯×১০২০ আর্গ্ শক্তি পাওয়া যাবে। এক ফুট-পাউণ্ড ১·৩৫৬×১০৭ আর্গ্ শক্তির সমান। একটা সহজ উদাহরণ দিলে বিষয়টির পরিমাপ সম্বন্ধে অনুমান করা যাইতে পারে। সূর্য্য হইতে প্রতি মিনিটে যতটা তেজঃশক্তি বিকীর্ণ হইতেছে, বস্তুপরিমাণ অনুসারে হিসাব করিলে তাহার পরিমাপ দাঁড়ায় ২৫০,০০০,০০০ টন। অথবা, যদি বলা যায়, সূর্য্য প্রতি মিনিটে পৃথিবীর প্রতি বর্গমাইল ক্ষেত্রের উপর ১২৫৫০ আউন্স শক্তি ঢালিতেছে, তাহা হইলে কোনরূপ ভুল বিবরণ দেওয়া হইবে না।

[৫]

ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণার ফলে যে অভিনব বিজ্ঞানবিদ্যার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহার নাম থারমোডিনামিক্স্ বা তাপশক্তির রূপান্তরতত্ত্ব। ইঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ভিত্তির উপর আরো বহুবিধ সিদ্ধান্ত গড়িয়া উঠিয়াছে। ভেন্ট হফ্ এবং জে. উইলার্ড গিব্স বিষমাকার বস্তুসমূহের সাম্যাবস্থা সম্পর্কে (equilibrium of heterogeneous substances) শক্তিতত্ত্বের দিক্ থেকে আলোচনা করিয়াছেন। থারমোডিনামিক্ সিস্টেম বা শক্তিপ্রবাহের পদ্ধতি বলিতে তেজঃশক্তি অথবা বিদ্যুৎ কিংবা চৌম্বক ক্ষেত্র বুঝায়। কিন্তু সাধারণতঃ এই পদ্ধতিকে বস্তুর সহিত বিজড়িত করিয়া দেখা

সূর্য্যের উত্তাপ সঞ্চয় করিবার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র-কৌশল : মিশরের কায়রো সহরে এবং টেক্সাসে এই ভাবে সূর্য্য হইতে উত্তাপ সংগ্রহ করিয়া এঞ্জিন চালান হইতেছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সমগ্র ইউরোপের প্রয়োজনে আজ যে বিভিন্ন প্রকারে রূপান্তরিত 'শক্তি'র কাজ চলিতেছে, মিশরের প্রান্তরব্যাপী উদারসূর্য্যকিরণের শতকরা আশী ভাগ হইতে তাহার সমস্তখানি আসিতে পারে।

হয়। এই বস্তুকে সমাকার (homogeneous) ও বিষমাকার (heterogeneous) নামে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। যে বস্তুর গুণ ও লক্ষণগুলি সর্ব্বাংশে একরূপ এবং যাহার এক অংশের লক্ষণের সাথে অপর অংশের লক্ষণ ধীরে ধীরে পার্থক্য লাভ করিতেছে, কিংবা যাহার মধ্যে সাধারণ দৃষ্টিতে কোনরূপ বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্র বা অংশ দেখা যায় না, তাহাকে সমাকার পদ্ধতি বলে। বিষমাকার বস্তু বা পদ্ধতি এরূপ কতকগুলি বিভিন্ন সমাকার পদ্ধতির সমবায়, যাহার মধ্যে সাধারণ দৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রসমূহ দেখা যায়। যদি কোন পদ্ধতি এরূপভাবে অবস্থান করে যে, পরিবেষ্টনীর অবস্থার সামান্যমাত্র সাময়িক পরিবর্ত্তনে তাহার অবস্থা ধীরে অথবা দ্রুত গতিতে পূর্ব্বরূপে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে বুঝিতে

হইবে যে, পদ্ধতিটি সাম্যাবস্থা লাভ করিয়াছে। নানাদিক্ দিয়া এই গবেষণার ধারা বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে। হরস্ট্মান্, হাবার্, নার্ণষ্ট্ ও তাঁহাদের শিষ্যবৃন্দের গবেষণার দান শক্তিরূপান্ত-রতত্ত্বের অমূল্য সম্পদ্।

থারমোডিনামিক্সের বিভিন্ন ধারায় চিন্তার ফলে ব্যাবহারিক শিল্পজগতে অশেষবিধ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। লোকে শক্তির অযথা অপব্যয় নিরূপণ করিতে ও নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিরূপ অবস্থায় কতখানি শক্তি ব্যয় করা আবশ্যক, এই বিদ্যার প্রয়োগে সে সম্বন্ধে নির্দ্ধারণ করা
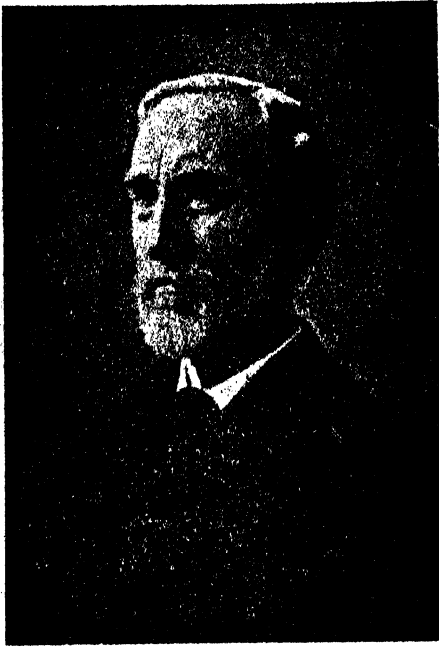
উইলার্ড গিব্স্ (১৮৩৯-১৯০৩)। (Chemical Energetics-এর প্রতিষ্ঠাতা)।

যায়। ইহার সাহায্যে জানা যায়, ইন্ধনকে কি ভাবে ব্যবহার করিলে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ শক্তিকে কাজে লাগান যাইবে। টার্বাইন অথবা রিফ্রিজেরেটর্ হইতে কতখানি কার্য্যকারিতা পাওয়া যাইবে, রাসায়নিক সামগ্রীর প্রস্তুতকালে কি উপায়ে অনাবশ্যক বস্তুগুলিকে অপসারিত করা যাইবে, কতখানি চাপ এবং তাপ প্রয়োগ করিতে হইবে, কিংবা রাসায়নিক বিশ্লেষণে কিরূপে পার্শ্ববর্ত্তী প্রক্রিয়াগুলিকে নিবৃত্ত করা যাইবে অথবা সেই বিশ্লেষণকার্য্যে কতটা ভুলের সম্ভাবনা থাকিবে, এ সমস্ত বিষয়েই থারমোডিনামিকস্-এর নিয়মদ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়।

বর্ত্তমানে সর্ব্বপ্রকার ব্যাবহারিক শিল্পে, বিশেষতঃ রাসায়নিক পণ্যশিল্পে থারমোডিনামিক্সের জ্ঞান অনিবার্য্য প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

[৬]

প্রকৃতির রাজ্যে নানাভাবে শক্তির রূপান্তর চলিতেছে। অতীতের কোন এক যুগে গাছ সূর্য্যের কাছ হইতে শক্তি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। পাতালপুরীতে কতকাল অজ্ঞাতবাস করিয়া তাহার শরীর পাষাণের মত কঠিন হইয়া গিয়াছে। সে যে এক কালে ধরণীর অঙ্গে শ্যামল শোভা সঞ্চার করিত, এখনকার কালিমাময় রূপ দেখিয়া সে বিষয়ে কল্পনা করা দুঃসাধ্য। কিন্তু, যে শক্তি সে অতি সংগোপনে লোক-চক্ষুর অন্তরালে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাকে মানুষ ব্যবহারে লাগাইতেছে নানাভাবে। কয়লা হইতে কতশত রাসায়নিক দ্রব্য, বস্ত্র-অনুরঞ্জনের সামগ্রী, সুগন্ধি বস্তু, রোগের প্রতিষেধক তৈয়ারী হইতেছে। কিন্তু, সে কথা যাক। সাধারণতঃ কয়লা ব্যবহারে লাগে তাপশক্তির উৎপাদনে। ইন্ধন পোড়াইলে তাপশক্তি উৎপন্ন হয়। বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলিতে গেলে দগ্ধ করা বা পোড়ানর অর্থ, ইন্ধনস্থিত কার্‌বনের সাথে অক্‌সিজেনের রাসায়নিক প্রক্রিয়া। যখন একটি বস্তুর সাথে আর একটি বস্তু রাসায়নিক বন্ধনে মিলিত হইতে যায়, তখন তাহারা বাহির হইতে তাপশক্তি নিজেদের মধ্যে টানিয়া লয়, অথবা নিজেদের ভিতরের শক্তি তাপের আকারে বিকিরণ করে। এই তাপ শোষণ ও বিকিরণের প্রক্রিয়াকে যথাক্রমে এন্‌ডোথার্মিক্ ও এক্‌সোথার্মিক্ প্রক্রিয়া বলে। যেমন কয়লা, কাঠ বা গ্যাস পোড়াইয়া তাপের সৃষ্টি হইতেছে, প্রাণিদেহে ভুক্তদ্রব্যের সঙ্গেও অক্‌সিজেনের সেইরূপ রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে তাপশক্তি প্রকাশিত হইতেছে। বাহিরের জ্বালানি বস্তু হউক বা দেহমধ্যস্থ খাদ্যদ্রব্যই হউক, অক্‌সিজেনের সাথে সেই একই প্রক্রিয়া চলিতেছে, পরিণামে পাওয়া যাইতেছে খানিকটা কার্‌বন্-ডাইঅক্‌সাইড আর খানিকটা উত্তাপ। কিন্তু, কতটা কার্‌বন পোড়াইয়া কতটা তাপ পাওয়া যাইবে, তাহা একেবারে ধরাবাঁধা। এক পাউণ্ড কার্‌বন দগ্ধ

করিলে ১৪,৫৪৪ বি. টি. ইউ তাপ উৎপন্ন হয়। ইন্ধন পোড়াইলে অক্‌সিজেনের সাথে শুধু যে কারবনের মিলন ঘটিবে এমন কোন কথা নাই, তাহার সঙ্গে হাইড্রোজেন অথবা অক্‌সিজেনের সংযোগযোগ্য অপর কোন বস্তু থাকিলে তাহারও দহন-ক্রিয়া চলিবে। কাঠ, কয়লা অথবা পেট্রল ব্যতীত কৃত্রিম উপায়ে নানারূপ কঠিন, তরল ও বায়বীয় ইন্ধন পাওয়া যায়। ইন্ধন পোড়াইয়া যে তাপশক্তির উদ্ভব হয়, তাহাকে ষ্টিম্ এঞ্জিন, গ্যাস্ এঞ্জিন বা অয়েল্ এঞ্জিনের সাহায্যে যান্ত্রিক কর্ম্মে রূপান্তরিত করা হয়। টারবাইন-সাহায্যে জলপ্রবাহের শক্তিকে বা বাষ্পীয় শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত করা যায়। যান্ত্রিক শক্তির দ্বারা ডায়নামো যন্ত্র আবর্ত্তন করিলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। আবার, বিদ্যুৎ-শক্তিকে নানা ভাবে প্রবাহিত করিয়া চুম্বক, তাপ, আলো অথবা শব্দ পাওয়া যাইতে পারে। বৈদ্যুতিক ব্যাটারী বা বিদ্যুৎ রাসায়নিক সেলে বিদ্যুৎ ও রাসায়নিক শক্তির পরস্পর রূপান্তর ঘটে। ফটো-গ্রাফিক প্লেটে আলো বা তেজঃশক্তি রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সাধন করে। ফটো-বৈদ্যুতিক সেলে আলোকশক্তি বিদ্যুতে পরিণত হয়। বৈদ্যুত চৌম্বক শক্তি—টেলিগ্রাফ, টেলিফোন বা বেতার যন্ত্রের সাহায্যে শব্দে রূপান্তরিত হয়। মানুষ একটা শক্তিকে অপর শক্তিতে রূপান্তরিত করিবার কৌশল জানিয়া তাহার প্রয়োজন এবং আনন্দের দ্রব্যসম্ভারের শ্রীবৃদ্ধি করিতেছে। বিমানযান, বেতারবার্ত্তা, সবাক্ চিত্র অথবা টেলিভিসন, আধুনিক সভ্যতার যাহা কিছু উপকরণ হউক না কেন, তাহার মূলে রহিয়াছে শক্তির রূপান্তর-তত্ত্ব।
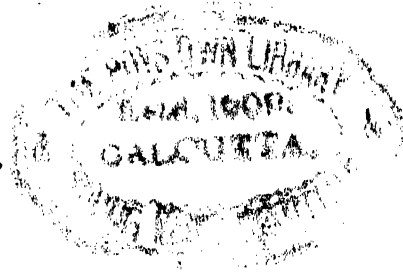
সাগরের শাস্তি

—শ্রীভূধরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কল্পনার দীর্ঘ বাহু না পারে ধরিতে
কোন্ সে অতীত-যুগে হ'য়েছিলে তুমি
হে বারীশ, ক্ষুদ্র টিট্টিভীর ক্ষুদ্রতর
অণ্ড গুটিকত, গর্ব্বস্ফীত তরঙ্গের
হিংস্র আস্ফালনে। ভেবেছিলে মনে ক্ষীণ
বিহগের আর্ত্তি চলোর্ম্মিগর্জ্জনে যাবে
ডুবে, পাইবে নিস্তার কর্ম্মফল থেকে।

যেই অনুপাতে দম্ভী, ধর শক্তি তুমি
দীনদ্বিজ হ'তে, সেইমতে দণ্ডভোগ
করিবে নিয়ত যুগযুগান্তর ব্যাপি'।

হতশ্রী ক'রেছে তোমা সুরদল মিলি;
সীতানাথ সেতুর বন্ধনে কিণাঙ্কিত
তব দেহ; পক্ষিপক্ষ পোতপক্ষ রূপে
দীর্ণদেহ করিতেছে নিত্য হে তোমারে।

ক্ষুদ্র যে দৃপ্তের চক্ষে সেই বলবান্।
তাহারই রক্ষার ভার নেন ভগবান্॥

ইটালীর নব-জন্ম

—শ্রীকাত্যায়ন বসাক

ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডি, কাভোরের স্বপ্নের ইটালী এবং মুসোলিনীর ইটালী—দুইই এক, কিন্তু দু'য়ে কি পার্থক্য! সেদিন ইউরোপের মধ্যে ইটালী ছিল নির্য্যাতিত, পরপদানত দুর্ব্বল ; আজ সেই ইটালী নিজে নির্য্যাতনকারী, অপরকে দমন করিতে তাহার উৎসাহ ও উল্লাসের সীমা নাই। ইটালীর সমরবাহিনী আজ সমগ্র ইউরোপের ঈর্ষা ও আশঙ্কার কারণ, শক্তির সু-উচ্চ শীর্ষে দাঁড়াইয়া কর্ম্মকার-তনয় মুসোলিনী আজ ইউরোপকে মুষ্টি দেখাইয়া শাসাইতেছেন। একদিকে এই ক্ষমতাদৃপ্ত মুসোলিনী, অপর দিকে শান্ত সমাহিত গ্যারিবল্ডি ও ম্যাট্‌সিনি,—মাত্র এক শতাব্দী কালের মধ্যে দৃশ্যের কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন! বর্ত্তমান রচনায় এই পরিবর্ত্তনের ঐতিহাসিক চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

আজ যখন সভ্য ইটালীর লক্ষ লক্ষ সৈন্য আফ্রিকার গিরি-মরু অতিক্রম করিয়া অসভ্য আবিসিনীয়দের জয় করিয়াছে, বর্ত্তমান-সভ্যতালোকবিহীন, [সুতরাং(?)] অন্ধকার মহাদেশের (dark continent) প্রাচীনতম স্বাধীন জাতিদিগকে পরাধীনতার গৌরবমাল্যে ভূষিত করিয়া বর্ত্তমান শিক্ষায়, দীক্ষায় ও জ্ঞানে উন্নত করিতে চাহিতেছে - ঠিক তখন, সেই ইটালীরই স্বাধীন হইবার ইতিহাস আলোচনা করিতে চাই। ইতিহাসের তথ্য চির সত্য, তাহাকে লোপও করা যায় না, মুছিয়াও ফেলা যায় না। সে সর্ব্বকালের জন্য শাশ্বতবাণী বক্ষে ধারণ করিয়া আছে ; অনাগত কালের সে মহাশিক্ষক।

মুসোলিনী-শাসিত ইটালী হয় তো আজ ভুলিয়া গিয়াছে—ইথিয়োপিয়ানরা আজ যে বিদেশী শাসনকে ঘৃণা করিতেছে, বিদেশীর প্রভাব হইতে মাতৃভূমিকে মুক্ত রাখিবার জন্য যাহারা সর্ব্বস্ব পণ করিয়া তাহাকে বাধা দিয়াছে,—মাত্র এক শতাব্দী আগে ইটালীও এমনই করিয়া একদিন বিদেশীকে ঘৃণা করিয়াছিল, বিদেশী শাসন হইতে দেশকে মুক্ত করিতে সেও ঠিক এমনি করিয়াই সর্ব্বস্ব পণ করিয়া লড়িয়াছিল। যে ইটালী বর্ত্তমান প্রধান বিশ্ব-শক্তি-পঞ্চকের একজন, যে আজ অতি নিশ্চিন্তে জাতিসঙ্ঘকে নির্ভয়ে 'ডোন্ট-কেয়ার' করিতেছে, মাত্র সত্তর বৎসর আগে সেই ইটালী ছিল পরপদানত, বিদেশী শাসিত, বিচ্ছিন্ন, বিখণ্ডিত। না ছিল তাহার রাষ্ট্রিক একতা, প্রবল সৈন্যসংখ্যা, না ছিল তাহার আর্থিক সচ্ছলতা। মেটারনিকের (Maternich) ভাষায় সে ছিল শুধু ভৌগোলিক একটি অভিব্যক্তি (a geographical expression)।

নেপোলিয়ানের পতনের পর ঊনবিংশ শতকের প্রথম পাদে ভিয়েনা-কংগ্রেস (১৮১৫) ইটালীকে দশটি খণ্ডে বিখণ্ডিত করিয়া নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লয়। অষ্ট্রিয়া তাহার নিজের অধীনে বা তাহার রাজপরিবারের কুটুম্বদের অধীনে রাখে বেশীর ভাগ : উত্তরে লম্বারডি, ভিনিসিয়া, তাহার নিজের খাসমহলে ; টাসকানী, মোডেনা, পারমা এবং লুকা তাহার রাজ-আত্মীয়দের অধীনে। দক্ষিণে সমগ্র ইটালীর প্রায় অর্দ্ধাংশ—নেপ্‌লস্ এবং সিসিলি দ্বীপ যায় ফরাসী রাজগোষ্ঠী বুরবনদের আত্মীয়ের হাতে। উত্তর-পশ্চিম কোণের পিডমণ্ট এবং মেডিটারেনিয়ান সাগরবক্ষে সারডিনিয়া দ্বীপটি এবং মধ্য-ইটালীর রোমাগনা, আমব্রিয়া, রোম প্রভৃতি স্থান ইটালীর শাসকের হাতে ; সারডিনিয়া এবং পিডমণ্ট—পিডমণ্টের রাজার অধীন—যিনি সাধারণতঃ সারডিনিয়ায় রাজা নামে অভিহিত এবং রোম প্রভৃতি স্থান ধর্ম্মগুরু পোপের হাতে থাকে। ১৮১৫-১৮৫৬ পর্য্যন্ত ইটালীতে ইটালীর অধিকার ছিল এই।

তখনকার ইটালীর শাসকশ্রেণী কেবল মাত্র বিদেশীই ছিল না—তাহারা ছিল প্রাগবৈপ্লবিকমনোবৃত্তিসম্পন্ন এবং বিদেশীর সম্পূর্ণ অনাত্মীয়তা তাহাদের মধ্যে বর্ত্তমান ছিল। দেশের জনমতের কোন ধার তাহারা ধারিত না—নিজের ইষ্ট এবং স্বার্থই ছিল তাহাদের কাম্য। রাষ্ট্র-ব্যবস্থার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ছিল শুধু তাহাদেরই হাতে—রাজ্যকে তাহারা মনে করিত নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, রাষ্ট্রজনকে তাহার নিজস্ব গোলাম। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই ছিল ইটালীর রাজনৈতিক অবস্থা।

কিন্তু, ইটালীর স্বাধীন হইবার ইচ্ছাকে ভিয়েনা-কংগ্রেসের দানব-বুভুক্ষা কিছুতেই হজম করিতে পারিল না। প্রশস্ত

এবং সহজ পন্থা অবশ্য রুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু, ইটালীর মুক্তির ঝরণা সেই পর্ব্বত-বাঁধের গোপন কন্দরে কন্দরে প্রবাহিত হইয়া মহা-মিলনের সাগরতীরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সমগ্র দেশের ভিতর অসংখ্য গোপন-সমিতি, গুপ্ত-সংখ্য স্থাপিত হইয়া গেল—যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র ইটালীর মুক্তি এবং তাহার রাষ্ট্রিক, আর্থিক এবং নৈতিক একতা। এই সকল সংঘের মিলিত নাম ছিল 'কারবোনারী' এবং এই 'কারবোনারী'ই সর্ব্বপ্রথম ইটালীর মুক্তিপথ প্রদর্শন করে।

১৮২০ সালের স্পেন-বিদ্রোহের সুযোগ লইয়া ইটালীর নেপ্‌লসে প্রথম কারবোনারী-আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে। বিদ্রোহীরা তথাকার রাজা ফারডিনাণ্ডকে শাসনবিধি সংস্কার করায় এবং ছোটখাট আরো দুই একটা সুবিধা আদায় করে। কিন্তু তাহাদের এই ফল বেশী দিন টিকিল না—অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার, স্বেচ্ছাতন্ত্রের প্রতিমূর্ত্তি মেটারনিক ষাট হাজার সৈন্য লইয়া নেপ্‌লসের এই বিদ্রোহ দমন করেন এবং পূর্ব্ব রাজাকে তাঁহার পূর্ব্ব গৌরবে সমাসীন করেন। দক্ষিণের অশান্তি প্রশমিত না হইতেই পিডমণ্টেও অনুরূপ আন্দোলন আরম্ভ হয়, রাজা সিংহাসন ত্যাগ করেন—তাঁহার ভাই রাজা হন এবং অষ্ট্রিয়ার সৈন্য আসিয়া দেশে শান্তি স্থাপন করে। ইহার পর দশ বৎসরের মত ইটালী স্থির হয়।

১৮৩০-এর দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লব বা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জুলাই-বিদ্রোহ ইটালীর প্রাণে নব-আশার আলোকপাত করে। পারমা, মোডেনা এবং পোপের এলাকায় রোমাগণা প্রভৃতি স্থানে অশান্তি প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করে। এই বারও অষ্ট্রিয়ার বিপুল সৈন্য আসিয়া ইটালীর শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। ১৮৩০-৩১ সালের বিদ্রোহ মধ্য-ইটালীতেই সীমাবদ্ধ ছিল।

বারে বারে অষ্ট্রিয়ার বিরোধিতায় ইটালীতে অষ্ট্রিয়া-বিরোধী মনোভাব ভয়ানক আকার ধারণ করে। ইটালী হইতে অষ্ট্রিয়াকে তাড়ানই তখন নেতৃবৃন্দের প্রধান চিন্তনীয় বিষয় হয়। 'ভাগো অষ্ট্রিয়া—Death to the Germans' এই শব্দই হয় মুক্তি-উপাসকদের প্রথম মন্ত্র। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সর্ব্বদলই একমত হয়, কিন্তু গোল তাহার পরের ব্যাপার লইয়া। ইহার পরে ইটালীর রাষ্ট্রের কি রূপ হইবে, এই লইয়া মুক্তি-কামীদের মধ্যে তিনটি দলের সৃষ্টি হইল। এক দল চাহিল বিভিন্ন স্বরাষ্ট্রের সংমিলিত বৈঠক (federal confederation), দ্বিতীয় দলের ইচ্ছা ছিল সারডিনিয়ার রাজার অধীনে সমগ্র ইটালীর পারলিয়ামেণ্টারী শাসনপ্রণালী ; আর তৃতীয় দলের, যুবক-ইটালীর (Young Italy) মত হইল সমগ্র ইটালীতে প্রজাতন্ত্র-স্থাপন। যদিও দ্বিতীয় দলের লোকই কম ছিল, শেষ পর্য্যন্ত তাহারাই হইল জয়ী।

১৮৩০-এর বিদ্রোহের পর হইতে ১৮৪৮-এর তৃতীয় ফরাসী বিপ্লব পর্য্যন্ত ইটালীর অবস্থা ছিল সাংঘাতিক। শাসকশ্রেণীর খামখেয়ালী অত্যাচারে দেশের কাহারও স্বস্তি বা শান্তি ছিল না। তৃতীয় ফরাসী বিপ্লবের সফলতা ইটালীর বুকে নূতন বল প্রদান করিল। সে পুনরায় তাহার ভাগ্য পরীক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। ইটালীর সর্ব্বাঙ্গে এই বার বিদ্রোহাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। ফারডিনাণ্ড নেপ্‌লসে এবং সিসিলিতে শাসনবিধি পরিবর্ত্তন করিলেন ; পিডমণ্ট, টাসকানী এবং পোপের এলাকাভুক্ত সকল স্থানেই জনসঙ্ঘ পারলিয়ামেণ্টারী বিধান চাহিল এবং তাহা প্রচলিত হইল। ইহার পরে মেটারনিকের পতনের সংবাদ যখন ইটালীতে পৌঁছিল, তখন ইটালীর রাষ্ট্র-আন্দোলনে একটা নবীন উৎসাহের সাড়া পড়িয়া গেল এবং আন্দোলনের গতিও অন্য ধারায় প্রবাহিত হইল। সারডিনিয়ার রাজা হইলেন এই নূতন অভিযানের পথ-প্রদর্শক। ভেনিসে সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হইল, মোডেনা এবং পারমার শাসকগণ পলাইয়া বাঁচিলেন। মনে হইল ইটালীতে অষ্ট্রিয়ার প্রভাব চিরতিরোহিত হইল। সারডিনিয়ার রাজা চার্লস্ অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে মুক্তি-সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন।

ওদিকে রোমে, 'যুবা ইটালীর' প্রধান ঋত্বিক্ মাৎসিনির (Mazzini) নেতৃত্বে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইল এবং মাৎসিনি হইলেন তাহার প্রথম প্রেসিডেণ্ট। পোপ পলাইয়া অন্যত্র আশ্রয় লইলেন।

সারডিনিয়ার রাজা প্রথম প্রথম তাঁহার মুক্তি-সমরে সাফল্য লাভ করিলেও পরে অষ্ট্রিয়ার কাছে হারিতে আরম্ভ করিলেন। নোভারাতে ভয়ানক ভাবে পরাস্ত হইয়া পুত্র ভিক্টর এমান্নুয়েলকে সিংহাসন দিয়া তিনি রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। অষ্ট্রিয়া আবার ইটালীতে প্রবল হইল। মাৎসিনি রোম ছাড়িয়া পলাইলেন—পোপ পুনর্ব্বার তাঁহার আসন পাইলেন; সিসিলি ও নেপল্‌স্ ফারডিনাণ্ডের করায়ত্ত হইল ;

অন্যান্য স্থানের শাসনকর্ত্তারাও তাঁহাদের স্থানে আবার বসিলেন। সারডিনিয়ার নূতন রাজা অষ্ট্রিয়ার সহিত সন্ধি করিলেন—তাঁহার পিতার প্রবর্ত্তিত শাসনপ্রণালীর কোন প্রকার পরিবর্ত্তন করিলেন না। বৎসরের শেষে ইটালী আবার তাহার পূর্ব্বের স্থানে ফিরিয়া গেল।

যদিও ইটালী এইবার অষ্ট্রিয়ার নিকট পরাস্ত হইল, যদিও সে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে পারিল না—তবুও এই বিদ্রোহ পরবর্ত্তী কালে অনেক সুফল দিয়াছিল। এই যুদ্ধে সমস্ত ইটালী এক হইয়া, জাতীয় বৈরীর সম্মুখীন হইতে শিখিল—ক্ষুদ্র স্বার্থ ছাড়িয়া ইটালীর বৃহত্তর কল্যাণের জন্য তাহারা প্রাণ দিতে শিখিল। ১৮৪৮-এর বিপ্লব ইটালীকে অসম্ভব নৈতিক শক্তি প্রদান করিয়াছিল। এখন হইতে সারডিনিয়ার শাসনপ্রণালী সমগ্র ইটালীর কাম্য হইল, সারডিনিয়ার রাজাকে তাহার ত্রাণকর্ত্তা, মুক্তিদাতা বলিয়া সে গ্রহণ করিল।

রাজা ভিক্টর এমানুয়েল অষ্ট্রিয়ার সহিত মিত্রতা করিলেন এবং নিজ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ উন্নতিতে মনোযোগ প্রদান করিলেন। ১৮৫২ সালে তিনি কাউণ্ট কাভোর নামে এক জন ইটালীয়ানকে তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন এবং সেই দিন হইতেই ইটালীর রাষ্ট্রনীতির ধারা পরিবর্ত্তিত হইল। ইটালীর মুক্তি অগ্রসর হইয়া আসিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর যে দুইজন কূটনীতি-ধুরন্ধর বিশ্বকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করিয়াছিলেন, যাঁহারা নানা প্রতিকূল ঘটনা-স্রোতের মুখেও আপনাদের কূটনীতিকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের একজন ইটালীর এই কাভোর, অন্য-জন জার্ম্মানীর বিস্‌মার্ক। বিস্‌মার্ক-বিহীন জার্ম্মান সাম্রাজ্য যেমন স্বপ্নের বস্তু ছিল, কাভোর-বিহীন ইটালীর স্বাধীনতা এবং একতাও তেমন অবাস্তব আদর্শমাত্রই থাকিত। জগতে কাভোরের তুলনা চলে শুধু বিস্‌মার্কের সাথে, বিস্‌মার্কের কতকটা তুলনা চলে কাভোরের সাথে।

কাভোর-নীতির মূলমন্ত্র ছিল অষ্ট্রিয়ার কবল হইতে ইটালীর মুক্তি এবং সারডিনিয়ার সিংহাসনের অধীনে তাহার শাসন-ব্যবস্থা। তিনি দেখিলেন যে, বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতির সাহায্য ব্যতিরেকে কেবল মাত্র ইটালীর শক্তি দিয়া এই কাম্য ফল লাভ করা যাইবে না। সুতরাং সর্ব্বপ্রথম তিনি বিদেশীয় রাষ্ট্রের সহিত মৈত্রী এবং বন্ধুত্ব করিতে মনোযোগ দিলেন।

১৮৫৩ সালের ক্রিমিয়ান যুদ্ধ তাঁহাকে এই সুযোগ দিল। তিনি পনের হাজার ইটালীয় সৈন্য লইয়া বন্ধুভাবে ইংরাজ এবং ফরাসীর সহিত রাশিয়ার বিরুদ্ধে যোগ দিলেন। পূর্ব্ব-ইউরোপের ব্যাপারে ইটালীর কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না, শুধু স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাভোর এই কূটনীতির চাল দিলেন এবং তাহার ফলও শীঘ্রই পাইলেন—প্যারীর শান্তি-বৈঠকে, ইটালীর ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম ইউরোপের রাষ্ট্রচক্রে তিনি আসন পাইলেন, আর পাইলেন ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডকে মিত্ররূপে—যাহা না হইলে তাঁহার নীতি কখনো সফল হইত না। ইটালীর স্বাধীনতায় ফরাসী সম্রাটের দান অপরিসীম।

ইহার পর হইতে কাভোর মন প্রাণ দিয়া কি ভাবে অষ্ট্রিয়াকে তাড়ান যায়, তাহার উপায় ভাবিতে লাগিলেন। সম্রাট্ তৃতীয় নেপোলিয়ন যখন ১৮৫৮ সালে প্লমবিয়ারের (Plombieres) স্বাস্থ্যনিবাসে হাওয়া বদলাইতেছিলেন, কাভোর অতি গোপনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং চুক্তি করেন যে, সারডিনিয়া অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে এবং ফরাসী সরকার তাহাতে সাহায্য করিবেন; তাহার প্রতি-দান-স্বরূপ সম্রাট্ ফ্রান্স ও ইটালীর সীমান্ত-স্থান দুইটি পাইবে। পরের বৎসরই কাভোর অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, নেপোলিয়নও পূর্ব্বকথামত তাঁহাকে সাহায্য করেন। এই যুদ্ধে সারডিনিয়া এমন কৃতিত্ব প্রদর্শন করে এবং সফলতা অর্জ্জন করে যে, ফরাসী সম্রাট্ চিন্তিত হইয়া যুদ্ধের মধ্যপথে অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধবিরতি চুক্তি করেন, কাভোর নেপোলিয়নের ব্যবহারে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন এবং অষ্ট্রিয়ার সহিত শান্তি স্থাপন করিতে বাধ্য হন। জুরিকে (Zurich) তাঁহাদের মধ্যে সন্ধি হয় এবং সারডিনিয়া লমবারডি প্রদেশ প্রাপ্ত হয়, কাভোর মনের দুঃখে আগেই পদত্যাগ করেন, কিন্তু এই যুদ্ধের ফল এইখানেই সীমাবদ্ধ রহিল না। মধ্য-ইটালীর টাসকানী, মোডেনা, পারমা, রোমাগনা প্রভৃতি স্থান হইতে এই যুদ্ধের সময় তথাকার শাসকগণ জনতা-কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিল এবং যুদ্ধান্তে এই সকল প্রদেশ ভোট দিয়া সার-ডিনিয়ার সহিত মিলিতে চাহিল। জুরিক-সন্ধির একটি ধারা অনুযায়ী ইটালীর প্রত্যেক রাজ্যকেই এই অধিকার দেওয়া

হইয়াছিল যে, তাহারা ইচ্ছা করিলে, ভোটাধিক্যে যে কোন রাজ্যের সহিত যুক্ত করিতে বা বিচ্ছিন্ন হইতে পারিবে। রাজা এমানুয়েল পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত সেভয় ও নিজ প্রদেশ দুইটি ভোটে নেপোলিয়নকে দিবার ব্যবস্থা করিলেন এবং তিনি নিজে মধ্য-ইটালীর রাজ্যসকল লাভ করিলেন। এই ভাবে ১৮৬০ সালে ভিক্টর আল্পস পর্ব্বত হইতে পোপের এলাকা পর্য্যন্ত ভিনিসিয়া, সেভয় ও নিস্ ব্যতীত সকল প্রদেশের কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হইলেন। প্রায় অর্দ্ধ-ইটালীর রাষ্ট্রীয় একতা সংগঠিত হইল।

ঠিক এই বৎসরই সিসিলি ও নেপল্‌স্ সারডিনিয়ার সহিত মিলিত হইল। এই মিলন-যজ্ঞে স্বাধীনতার অগ্রদূত, সর্ব্বদেশপূজ্য গ্যারিবল্ডি ইটালীর আত্মনিয়ন্ত্রণ ইতিহাসে ধ্রুব-নক্ষত্রের মত চিরকাল বিরাজ করিবেন। মাত্র এক হাজার অনুচর লইয়া গ্যারিবল্ডি যাহা ইটালীকে দিয়াছেন, মুসোলিনী বর্ত্তমান যুদ্ধনিপুণ লক্ষ লক্ষ সৈন্য লইয়াও তাহা আর দিতে পারিবে কি না সন্দেহ। গ্যারিবল্ডি এক হাজার অনুচর সাহায্যে ইটালীকে নব্বই লক্ষ নূতন প্রজা দিয়াছেন। ১৮৬০ সালে সিসিলি দ্বীপে বিদ্রোহ উপস্থিত হয় এবং বিদ্রোহীরা গ্যারিবল্ডির সাহায্য প্রার্থনা করে, তিনি এক সহস্র ভক্ত অনুচর (red shirt) লইয়া সিসিলিতে উপস্থিত হন। কাভোর এবং এমানুয়েল গোপনে তাঁহাকে উৎসাহিত এবং সাহায্য করিতে থাকেন। গ্যারিবল্ডি সিসিলিতে আসিয়া প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র লইয়া তাহা দমন করেন এবং সাগর পার হইয়া নেপল্‌স্ পর্য্যন্ত অধিকার করেন। গ্যারিবল্ডির এই অভিযান-কাহিনী রোমাঞ্চকর উপন্যাসের মত বিচিত্র ও অদ্ভুত। গ্যারিবল্ডির এই সফলতা দেখিয়া রাজা এমানুয়েল উপর হইতে সৈন্য লইয়া পোপ-শাসিত আমব্রিয়া, প্রভৃতি স্থান দখল করেন এবং নেপল্‌সে উপস্থিত হন। গ্যারিবল্ডি সমস্ত রাজার হাতে ছাড়িয়া দিয়া, পুরস্কার স্বরূপ মাত্র একবস্তা শস্যবীজ লইয়া সাগরবক্ষে তাঁহার নিজের ঘরে চলিয়া যান।

ইতিমধ্যে বিজিত স্থানসমূহে সাধারণ ভোটের ব্যবস্থা হয় এবং ভোটে সিসিলি, নেপল্‌স্, আমব্রিয়া প্রভৃতি সকল স্থান সারডিনিয়ার সহিত যুক্ত হয়। এই রূপে উত্তরে ভিনিসিয়া এবং মধ্যস্থানে রোম ব্যতীত ইটালীর সকল প্রদেশ এক রাজার শাসনে মিলিত হয়।

ভিনিসিয়া এবং রোম সারডিনিয়া সরকারের অধীনে আসিতে কিছুদিন বিলম্ব হয়। এই দুইটি প্রদেশের জন্য ইটালীকে বেশীর ভাগ বাহিরের ঘটনার উপর নির্ভর করিতে হয় এবং বিস্‌মার্কের সাম্রাজ্যলিপ্সা তাহাকে এই বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করে।

১৮৬৬ সালে বিস্‌মার্ক জার্ম্মাণীকে বিদেশী-মুক্ত করিতে ইটালীর প্রধান-মন্ত্রী কাভোরের সাহায্য চান। কথা হয়, প্রাসিয়া যত শীঘ্র সম্ভব অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ করিবে। আর ইটালীও তখন তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে—পুরস্কার স্বরূপ ইটালী অষ্ট্রিয়া-শাসিত ভিনিসিয়া প্রদেশ পাইবে কাভোর সম্মত হয় এবং সাত সপ্তাহের যুদ্ধে প্রাসিয়াকে সাহায্য করে। ইটালীর যুদ্ধে যোগদানের জন্যই সাডোয়াতে প্রাসিয়া অষ্ট্রিয়াকে হারাইতে সমর্থ হয়।

যুদ্ধশেষে শান্তি-চুক্তিতে ইটালী ভিনিসিয়া প্রদেশ লাভ করে। ১৮৬৬ সালে আল্পস্ পর্ব্বতের মূল হইতে মেডিটারেনিয়ান্ সাগরের সিসিলি পর্য্যন্ত—শুধু রোম বাদে সারডিনিয়ার একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তৃতি লাভ করে। এই সময়ে রাজধানী পিডমণ্ট হইতে উঠিয়া মিলানে আসে। সারডিনিয়ার রাজা এখন ইটালীর রাজা।

যে বিস্‌মার্ক ১৮৬৬ সনে ইটালীকে ভিনিসিয়া প্রদান করেন, তিনিই আবার চার বৎসর পরে তাহাকে রোম নগরী অধিকার করিতে সাহায্য করেন। ১৮৪৮-এর বিপ্লবের পর হইতে অষ্ট্রিয়ার বদলে ফরাসী সৈন্য পোপের রাজ্য রক্ষা করিতেছিল। সুতরাং সারডিনিয়ার পক্ষে রোম অধিকার করা অসম্ভব ছিল। কিন্তু ১৮৭০ সালের ফরাসী-প্রাসিয়ান যুদ্ধে সম্রাট্ নেপোলিয়ান রোম হইতে সমস্ত ফরাসী সৈন্য উঠাইয়া লন এবং ভিক্টর এমানুয়েল তৎক্ষণাৎ তাঁহার সৈন্য-সহায়তায় রোম অধিকার করেন।

ইটালীর স্বদেশ-প্রেমিকদের বহু দিনের স্বপ্ন—ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রোম—সিজারের রোম—এই ভাবে আবার ইটালীর হাতে আসে। এই বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা যাঁহার উৎসাহ ছিল বেশী, আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল—যিনি সকলের চেয়ে বেশী স্বপ্ন দেখিতেন রোমকে, সেই কাভোর কিন্তু ইটালীর এই বিজয়-অভিযান দেখিতে পান নাই। কিছুদিন আগে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। রোমে প্রবেশ করিয়াই ভিক্টর এমানুয়েল

নিজকে সমগ্র ইটালীর রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। আর সেই দিনই ইটালীর বর্ত্তমান জন্ম হয়।

ইহার 'পর হইতে বিশ্ব-যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইটালীর ইতিহাসে তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নাই। সে তাহার নূতন রাজত্ব লইয়াই বেশীর ভাগ ব্যস্ত থাকে—তাহার আর্থিক উন্নয়ন, ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধা, লোক-শিক্ষা, স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা, অস্ত্র-বৃদ্ধি, সৈন্য-সংগঠন—এই সকল ব্যাপার লইয়াই তাহাকে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। কিন্তু, রোম অধিকারের পর হইতে তাহার যে সাম্রাজ্যলিপ্সা জাগে, তাহাই উনবিংশ শতকের শেষের দিকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে আফ্রিকার বন্য জাতির উপর। আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলে সে উপনিবেশ স্থাপন করে এবং যে ইথিয়োপিয়ান্ আজ ইটালীর নিকট পরাজিত, ইহাদের হাতেই আদোয়াতে একবার ভীষণ ভাবে ইটালী পরাস্ত হয় (১৮৯৬)। তারপর আসিল বিশ্বব্যাপী প্রথম সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধ; ইহাতে ইটালী মিত্রপক্ষে যোগ দেয় এবং আড্রিয়াটিক সাগরের উপকূলের ইটালী-ভাষাভাষী স্থানসমূহ ও জার্ম্মান উপনিবেশের মাথায় হাত বুলাইয়া আফ্রিকাতে আরো কিছু সুবিধা করে। রোম-অধিকারের পর হইতেই পোপের সহিত রাজার যে বিরোধ বাধে, তাহা মিটে মহাযুদ্ধের পর ১৯২২ কি ২৩ সালে।

এই ১৯২২ সালেই সাম্যবাদীদের রক্তে কর্দ্দম-পিচ্ছিল রোমের রাজপথের উপর দাঁড়াইয়া কর্ম্মকার-তনয় মুসোলিনী সমস্ত জগতের রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করেন। তখন আবিষ্কার হয় এই ভয়াবহ ফ্যাসিজম্—সুপ্ত সাম্রাজ্যবাদ—যাহার ফলে হয় ত একদিন ইটালীকে আমরা প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্যের সমপর্য্যায়ে সমাসীন দেখিব, হয় ত বা দেখিব ইটালী মহাসাগরের অতল তলে ডুবিয়া গিয়াছে।

জগন্নাথের দূত

—শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

অম্বরে ঘন দুন্দুভি বাজে কার মহাবন্দনা,
বিশ্বের মন দোলায়ে গোপনে আসে ও রে কোন্‌জনা?
শত অশরীরী দেব-আবাহন চলে যায় পাশ দিয়া,
কাহার তনুর মদির গন্ধে ওঠে ধরা নন্দিয়া।
হাঁক দেয় কে রে সৃজনের বুক চিরে?
কাহার এ ডাক?—জগন্নাথের দূত আসে তবে কি রে!

ভূর্ভুব হতে স্বর্গ ব্যাপিয়া জেগেছে উদ্দীপনা,
চেতনের বুকে প্রকৃতির মন হয়ে ওঠে উন্মনা।
কাল-হিন্দোলা দোলে ঘন ঘন চঞ্চল চেয়ে রই,
যুগসন্ধির পথে শুনি কা'র চরণছন্দ ওই।
নবীন সৃষ্টি হবে কি রে তবে সুরু?
জগন্নাথের দূত আসে বুঝি—প্রাণ করে দুরু দুরু।

ভোরের সূর্য্য রাঙ্গা হয়ে ওঠে যুগের বেদনা বহি',
দিক্‌বালা দল নিদ নাহি চোখে অন্তর দহি' দহি'।
গ্রহতারাদল প্রহর গুণিয়া কাঁদিছে ঘূর্ণীপাকে,
মাটীর মহীর যাতনা বহিয়া কেঁদে কেঁদে কারে ডাকে।
সে রোদনে বুঝি অসীমে পড়িল টান,
জগন্নাথের দূত আসে—ওই পিছনে পরিত্রাণ।

তাই লোকে লোকে উঠিয়াছে কি রে আলোক-উন্মাদনা,
সৃজনের দ্বারে প্রলয়ের তাই ওঠে কি রে বন্দনা।
সুন্দর ঘিরে তাই বুঝি চলে ভীষণের কোলাহল,
মৃন্ময়ী-মহী কেঁপে কেঁপে তাই হ'ল বুঝি চঞ্চল।
ঝঞ্ঝার গানে উঠে বন্দনা-ধ্বনি,
জগন্নাথের দূত আসে—ওই শঙ্খের গরজনি।

ওই দোলে ওই সৃজনের দোল মরণের দোল দোলে,
লেগেছে দ্বন্দ্ব মলয় বাতাসে প্রলয় ঝঞ্ঝারোলে।
ফাগুন মিশেছে আগুনের সাথে বাঁশীর সঙ্গে ভেরী,
আয় দাঁড়া তোরা আবির্ভাবের আর বুঝি নাই দেরী।
ভেদি' হাহাকার চূর্ণি পাহাড়-ত্রাসে,
জগন্নাথের দূত বুঝি আজ—ওই আসে—ওই আসে।

ধর্ম্মের গ্লানি মর্ম্মের দাহে আকাশ হইল ভারী,
বাতাস ভরেছে রোষের গুমোটে অপমানে দেবতারি।
তাই শিব আজি ক্ষেপিয়াছে বুঝি তাণ্ডব হবে সুরু,
নবীন সৃজনে অজানার টানে হিয়া করে দুরু দুরু।
বিশ্বের মনে কাঁপে পথ বারে বার,
জগন্নাথের দূত আসে—ওই খোলে রে সিংহ-দ্বার।

চতুষ্পাঠী

ইতিহাসের একপাতা

ঃ ইউরোপের জাগরণের মূলে প্রাচ্যের প্রেরণা

—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

ইউরোপের সভ্যতার যে বাহ্যিক ঝুটা জৌলুষে আমাদের সকলের চোখে ধাঁধা লাগিয়াছে এবং সমস্ত দোষ সত্ত্বেও সে সভ্যতার ভিতরকার যে অক্লান্ত, অদম্য মানসিক উৎসাহ ও তারুণ্য আমাদের বর্ত্তমান অধঃপতনের দিনে সত্যকার প্রশংসা দাবী করিতে পারে—তাহার সূচনা কত সম্প্রতি হইয়াছে ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইহা যে সূচনা মাত্র এবং আজও যে ইউরোপ সভ্যতার অভিযান-পথে কেবল নবাগত—ইতিহাস হইতে সেই কাহিনীর কিয়দংশ বর্ত্তমান রচনায় লিখিত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতেও দেখতে পাই, ইউরোপে অন্ধকার-যুগ চলেছে। গ্রীস ও রোমের মানসিক উৎকর্ষ বর্ব্বরতার মধ্যে লুপ্ত, প্রাচ্য জাতিদের কাছ থেকে জ্ঞানের যে বর্ত্তিকা তারা ধার করে নিয়েছিল, তা জ্বালিয়ে রাখবার শক্তি, অবসর ও উৎসাহের অভাবে সমস্ত ইউরোপ গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে ফিরছে।

দ্বাদশ শতাব্দী থেকে সেই অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ইউরোপেই কেমন করে অকস্মাৎ আলোর স্ফুলিঙ্গ দেখা দিলে, সেই স্ফুলিঙ্গ ক্রমশঃ কেমন করে উজ্জ্বল শিখা হয়ে উঠে সমস্ত দেশ আলোকিত করে তুললে, তার কাহিনীই এখানে বলব।

ইউরোপের এই জাগরণের মূলে একটি নয়, অনেক গুলি জটিল, পরস্পরের সঙ্গে জড়িত কারণ আছে। এ ক্ষেত্রে প্রাচ্য সভ্যতার সংস্পর্শ থেকে কম সাহায্য সে পায়নি। ধর্ম্ম-যুদ্ধ ক্রুজেডের অভিযানগুলি সুরু হবার পরেই দেখা যায়, ইউরোপের পরিবর্ত্তন সুরু হয়ে গেছে।

যুদ্ধের দিক দিয়ে দেখতে গেলে ক্রুজেডগুলি ইউরোপের শোচনীয় পরাজয়-কাহিনী ছাড়া আর কিছু নয়। ধর্ম্মের নামে ক্ষেপিয়ে যে বিশাল জনতাকে এই অভিযানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তাদের না ছিল সৈনিকদের উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র, না শিক্ষা। এই বিশৃঙ্খল জনতাকে ছারখার করে দিতে তাই শত্রুপক্ষের বিশেষ কিছু বেগ পেতে হয় নি। যুদ্ধে জয়লাভ না করলেও, ক্রুজেডে গিয়ে যারা প্রাণ নিয়ে ফিরেছিল, তারা অনেক বেশী মূল্যবান্ জিনিষ লাভ করে দেশে ফিরেছিল। বাইরের জগতের সঙ্গে সংস্পর্শে তাদের সঙ্কীর্ণ মনের আকাশ শুধু যে বিস্তৃত হয়েছিল তা নয়, বিজেতাদের উন্নততর সভ্যতা থেকে তারা শিখেও এসেছিল অনেক কিছু।

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রেরণা ইউরোপে ইতিপূর্ব্বে দেশব্যাপী অশান্তির মাঝে ক্ষীণ হয়ে এসেছিল, সে প্রেরণার নূতন করে সঞ্জীবন দেখা গেল ক্রুজেডগুলির পর। নগরগুলি ক্রমশঃ নিরাপদ হয়ে উঠল, সাধারণের স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা উন্নত হল। পাত্রীদের ভিতর বিদ্যার চর্চ্চা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের মধ্যেও তা ছড়িয়ে পড়তে দেরী হল না। পূর্ব্বে যেখানে সামন্ত-রাজ্যের প্রতাপ ছিল অপ্রতিহত, সেখানে স্বাধীন বা অর্দ্ধ-স্বাধীন কয়েকটি নগরের উত্থান এ সময়কার একটি উল্লেযোগ্য বিশেষত্ব। ভেনিস, ফ্লোরেন্স, জেনোয়া, লিসবন, প্যারি, ব্রুজেস, লণ্ডন, অ্যাণ্টওয়ার্প, হামবুর্গ, নভগরড প্রভৃতি নগর এই সময়েই বিখ্যাত হয়ে ওঠে। বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসাবেই এই নগরগুলির প্রতিপত্তি এত বেশী হয়ে দাঁড়ায়। ব্যবসার খাতিরে নানা দেশের অসংখ্য লোকের এই সমস্ত নগরে আনাগোনা সুরু হয় এবং বহু বিভিন্ন দেশের মানুষের সেই সংস্পর্শ ও সংঘর্ষ থেকেই বুঝি মানুষের চিন্তা নূতন পথে প্রবাহিত হবার প্রথম প্রেরণা পায়।

রাজা আর পুরোহিতের প্রাধান্য ইউরোপ নির্ব্বিবাদে এতদিন মেনে এসেছে, কোন প্রশ্ন তুলবার কথা মনেও হয় নি। ধর্ম্মদ্রোহী অপবাদ দিয়ে যাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার পুরোহিতেরা করে এসেছে, তাদের হয়ে একটি কথা বলবার সাহস কারুর হয় নি। কিন্তু ধীরে ধীরে সে অবস্থা বদলে গেল। পুরোহিত আর রাজার শাসনকে প্রকৃতিস্থ

নিয়মের মত অমোঘ বলে মেনে নেওয়া আর সম্ভব হ'ল না।

ইতিমধ্যে গ্রীসের মানসিক উৎকর্ষ যাঁর মধ্যে চরম বিকাশ লাভ করেছিল, সেই অ্যারিষ্টটলের রচনা আরবীয়দের হাত ঘুরে ইউরোপে আবার এসে পৌঁছেছে। আরবীয় বিজেতারা সমর-অভিযানে বেরিয়ে সুদূর প্রাচ্যদেশ থেকে যে দর্শন ও বিজ্ঞানের তত্ত্ব সংগ্রহ করে এনেছিলেন, তার পরিচয়ও ইউরোপ লাভ করেছে। এ সময়ে ইউরোপের মানসিক নিদ্রাভঙ্গের ব্যাপারে ইহুদীদের দানও কম নয়। ক্রীশ্চান

উইলিয়ম ক্যাক্সটন (১৪২০–১৪৯১)

ধর্ম্মের অন্ধ গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তারা ছিল মূর্ত্ত প্রতিবাদ। ক্রীশ্চান ধর্ম্মের সমস্ত উক্তিই যে অভ্রান্ত নয়, ইহুদীদের অস্তিত্বই যেন তার সাক্ষ্য। ক্রীশ্চান ধর্ম্মের সব কিছুই যদি প্রশ্নাতীত হ'ত, তা হলে এ ধর্ম্মে বিশ্বাস না করার দরুণ ইহুদীরা অনেক দিন আগেই নিপাত যেত, এই কথাই সেদিন ইউরোপের মনে উঁকি দিয়েছে।

অন্ধ গোঁড়ামি থেকে একদিকে যেমন ইউরোপ এই ভাবে ধীরে ধীরে মুক্ত হয়ে ধর্ম্ম সম্বন্ধে সংস্কারমুক্ত মনে ভাববার সুযোগ পেয়েছে, আর একদিকে সৃষ্টির রহস্য সম্বন্ধে তার কৌতুহল ও অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হয়েছে 'অ্যালকেমিষ্ট'দের দৃষ্টান্তে।

'অ্যালকেমি' রসায়নের একেবারে গোড়ার স্তর,—যাদু-বিদ্যা ও ভোজবাজী থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের পর্য্যায়ে যখন তা ওঠেনি। 'অ্যালকেমি'ও যে প্রতীচ্যের হাতে প্রাচ্যের দান, নামটির মধ্যেই তার পরিচয় নির্ভুলভাবে দেওয়া আছে। আরবেরা প্রধানতঃ ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশের কাছে এ বিদ্যা আরও অন্যান্য বিদ্যার সঙ্গে লাভ করে ইউরোপকে তার দীক্ষা দিয়েছে।

শুধু দর্শন আর রসায়নের গোড়ার কথাই সেদিন ইউরোপ প্রাচ্যের কাছে শেখেনি, বর্ত্তমান সভ্যতার অপরিহার্য্য একটি অত্যন্ত মূল্যবান্ জিনিষ তার কাছে পেয়েছে। সে জিনিষটি আর কিছু নয়, কাগজ। শুনতে সামান্য হলেও এ জিনিষটির মূল্য যে কত, একটু ভাবলেই বোঝা যাবে। সমস্ত পাশ্চাত্য সভ্যতার বনেদ কাগজের উপর দাঁড়িয়ে আছে বললে অনেক দিক্ দিয়েই সত্য কথা বলা হয়।

যতদূর জানা যায়, কাগজ প্রস্তুতের কৌশল প্রথম আবিষ্কার ও আরম্ভ করে চীন দেশ। প্রাচীন মিশরে 'পেপিরাস' বলে যে জিনিষটি কাগজের কাজে লাগান হ'ত, তার মশলা ছিল আলাদা। জলা-জায়গায় উৎপন্ন এক রকম শরের ডাঁটা থেকে তা তৈরী হ'ত। পেপিরাসের প্রচলন অবশ্য মিশরে সুদূর অতীত থেকে চলে আসছে। চার হাজার বছর আগেকার রাজ-সমাধির মধ্যেও লিখন-সমেত পেপিরাস পাওয়া গেছে। চীনদেশে রেশমী কাপড়ের অব্যবহার্য্য অংশ থেকে কাগজ-প্রস্তুত-প্রণালী আবিষ্কৃত হয় খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর বোধ হয় আগে। সে বিদ্যা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরবীয়েরা দৈবাৎ অর্জ্জন করার সুযোগ পায়। ৭৫১ খৃষ্টাব্দে সমরখন্দের আরবীয় মুসলমানেরা চীনাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। চীনাদের আক্রমণ সফল হয় নি। কয়েকজনকে আরবদের হাতে বন্দী রেখেই তাদের পলায়ন করতে হয়। সেই বন্দী চীনাদের মধ্যে ছিল কাগজ প্রস্তুতের একজন গুণী কারিগর। আরবদের মধ্যে কাগজের প্রচলন তার পর থেকেই দেখা যায়। স্পেনে মূরদের আধিপত্য যখন ক্রীশ্চানের পুনরাক্রমণে লোপ পায়, সেই সময়েই ইউরোপ এ বিদ্যার প্রথম পরিচয় লাভ করে। স্পেনীয়দের হাতে কাগজ-প্রস্তুত-কৌশলের কিন্তু অবনতি হয় ধীরে ধীরে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে ইটালীতেই প্রথম সত্যকার ভাল কাগজের নমুনা

দেখা যায়, কিন্তু কাগজকে সুলভ ও উৎকৃষ্ট করার কৃতিত্ব জার্ম্মাণীরই প্রাপ্য।

কাগজ থেকে মুদ্রাযন্ত্র খুব বেশী দূরের কথা নয়। চীন দেশ থেকে এই যন্ত্রটির রহস্যও ইউরোপে এসে পৌছায়। কাগজ ও মুদ্রাযন্ত্রের মিলনের লগ্নেই বর্ত্তমান পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার জন্ম বলতে পারা যায়। বিজ্ঞান ও বিদ্যার প্রসার যেখানে ক্ষীণ মন্থর ধারায় জটিল ও বাধাবিড়ম্বিত পথে কোন মতে অগ্রসর হচ্ছিল, সেখানে প্লাবন দেখা দিলে অকস্মাৎ। বাইরের ভৌগোলিক রাজ্যের চেয়ে মানুষের মনের রাজ্য মূল্যবান্ হয়ে উঠল অনেক বেশী, কলম সত্যই তরবারির চেয়ে শক্তিমান্ হয়ে উঠল।

মানুষ কত মূল্যবান্ কথা কতদিন ভেবেছে, সে ভাবনা শূন্যতায় হারিয়ে গেছে অধিকাংশই। মানুষের কত সৃষ্টি, কত কীর্ত্তি, কত সাধনা কাল নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। মুদ্রাযন্ত্র আর কাগজ সেই সর্ব্বগ্রাসী কালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে। যে বিদ্যা কয়জনের মধ্যে মাত্র আবদ্ধ থাকত, তা ছড়িয়ে পড়ল অসংখ্যের মাঝে। আগেকার দিনে হাতে লেখা এক একটি পুঁথি অত্যন্ত আদরের জিনিষ ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য দু'একজন পণ্ডিত ছাড়া আর কেউ পেত না। সে বই রঙচঙে হ'ত যথেষ্ট, তাতে কারুকাজের পরিচয়ও থাকত অনেক, কিন্তু ভাষার দিক দিয়ে তা দুর্ব্বোধ্য ছিল বললেই হয়। সাধারণ লোকের সেখানে দন্তস্ফুট করার সাধ্য ছিল না।

মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন ও কাগজ সুলভ হওয়ার পর সাধারণের বোধগম্য সহজ দেশী ভাষায় বই লেখা সুরু হ'ল। কোন বিদ্যাই আর জনকয়েক ভাগ্যবানের একচেটিয়া রহস্যময় বস্তু হয়ে রইল না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারা অসংখ্য উৎসাহী মনের অবদান পেয়ে পরিপুষ্ট ও বেগবান্ হয়ে উঠল।

আরবদের মারফৎ প্রাচ্য থেকে ইউরোপ সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে অনুপ্রেরণা পেয়েছে, এতক্ষণ সাধারণতঃ তারই পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এবার তাতারদের কথা ধরা যাক।

তাতারদের আজ অত্যন্ত অগৌরবের দিন চলেছে। যে মোঙ্গল-বাহিনীর ঘোড়ার ক্ষুর একদিন ইউরোপের পিঠ ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে, আজ তাদের বংশধরদের নিজেদের অস্তিত্বটুকু বজায় রাখাই দায়। মোঙ্গোলিয়ার উপর জাপান, চীন, রুশিয়া সবাই আজ ভাগ বসাবার জন্য ব্যাকুল। বন্যার মত যে-জাত একদিন দুঃসহ বেগে সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে, সরোবরের মত আজ তাদের সকলে ঘিরে ধরে ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ করে আনছে।

কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপকে এই তাতাররাই আমূল নাড়া দিয়ে তার জাগরণ সহজ ও দ্রুত করে দিয়েছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ায় চেঙ্গিস্ খাঁর দুর্দ্ধর্ষ বাহিনী দক্ষিণ রুশিয়ায় কিয়েফ পর্য্যন্ত দখল করে যে দিগ্বিজয়ের সূচনা করে যায়, তা সমাপ্ত হয় চেঙ্গিস খাঁর উত্তরাধিকারী ওগদাই খাঁ-এর অভিযানে। ইউরোপের লোক ওগদাই খাঁকে বাধা দিতে গিয়েই প্রথম বারুদ ও কামানের সাক্ষাৎ লাভ করে। সমস্ত রুশিয়াকে পদানত করে ওগদাই খাঁর সৈন্যবাহিনী

মার্কো পোলো বর্ণিত তাতার-অভিযান।

পোলাণ্ড ছারখার করে দেয়; জার্ম্মান ও পোল সৈন্য একত্র হয়ে ওগদাই খাঁকে বাধা দিতে গিয়ে বন্যার সামনে খড়ের কুটোর মত ভেসে যায়।

তাতারদের এই অভিযানই ইউরোপের ভৌগোলিক কল্পনাকে বিস্তৃত করে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, তাতারদের আধিপত্যের দিনেই ইউরোপের সঙ্গে এসিয়ার ঘনিষ্ঠ পরিচয় সহজ হয়ে আসে। এতদিন পর্য্যন্ত ক্রীশ্চান ও ইসলাম ধর্ম্মের বিরোধের ফলে যে ব্যবধানের প্রাচীর দুই জগতের মাঝখানে খাড়া হয়েছিল, বিস্তৃত তাতার সাম্রাজ্যে তা প্রথম লোপ পায়। ইউরোপ থেকে এসিয়ার আনাগোনার পথ প্রশস্ত ও সুগম হয়ে ওঠে।

কুবলাই খাঁ ওগদাই-এর পর প্রথম চীনের রাজপ্রতিনিধি, ও পরে সম্রাট্ হয়ে ওঠেন। কারাকোরামে তাঁর রাজসভা

তখনকার সভ্য জগতের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। রোমের পোপের ক্রীশ্চান প্রতিনিধি, ভারতের বৌদ্ধ শ্রমণ, ইতালি, ফ্রান্স ও

মার্কো পোলো (১২৫৪-১৩২৪)

চীনের গুণী শিল্পী, ভারতীয় জ্যোতিষী ও পারসীক গণিততত্ত্ববিদের একত্র সমাবেশ তাঁর রাজসভাতেই প্রথম দেখা যায়।

তাতারদের অসভ্য বর্ব্বর যোদ্ধা বলেই অনেকে জানেন, কিন্তু চেঙ্গিস খাঁ-এর সামান্য যে পরিচয় ইতিহাস থেকে পাওয়া যায়, কুবলাই খাঁ-এর রাজসভার যেটুকু অস্পষ্ট চিত্র কালের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে, তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারণাই গড়ে ওঠে। বিদ্যা, শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগের যথেষ্ট পরিচয় সেখানে আছে। ইউরোপের ইতিহাসে আলেকজাণ্ডার বা শার্লেমানকে যে রকম চড়া রঙ দিয়ে চিত্রিত করা হয়েছে, কুবলাই ও চেঙ্গিস খাঁ তা থেকে বঞ্চিত। কিন্তু বহু বিজ্ঞাপিত না হলেও আধুনিক ঐতিহাসিকেরা এই দুই প্রতাপান্বিত বর্ব্বর নৃপতির মূল্য ক্রমশঃ বুঝতে শিখেছেন।

ইউরোপের ইতিহাসের উপর এই ক্ষণস্থায়ী তাতার রাজত্বের প্রভাব অসীম। গৌণভাবেও ইউরোপের অগ্রগতিতে তাতারদের আধিপত্য বিশেষ সাহায্য করে গেছে।

কুবলাই খাঁ-এর সময়ে তাতার জাতির ধর্ম্ম বলতে সুস্পষ্ট কিছু ছিল না। শুমানবাদ নামে আদিম প্যাগান ধর্ম্মের অনুরূপ কয়েকটি বিশ্বাস তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তাদের দিগ্বিজয়ের পর ক্রীশ্চান, মুসলমান ও বৌদ্ধ সবাই তাদের দীক্ষা দেবার জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠে। ক্রীশ্চান জগৎ থেকে যে সমস্ত প্রতিনিধি সে সময়ে এই উদ্দেশ্যে কারাকোরামে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে পোলো-পরিবার বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। পোলোরা দুই ভাই ও তাঁদের একজনের একটি ছেলে ১২৭২ খৃষ্টাব্দে চীনে গিয়ে পৌছান। এই ছেলেটির নাম মার্কো পোলো। ইউরোপ সকৃতজ্ঞ চিত্তে আজও এ নাম স্মরণ করে।

মার্কো পোলো তারপর আরও একবার ইউরোপ থেকে চীনে গিয়েছিলেন, প্রাচ্য দেশের নানা স্থানেও তিনি ঘুরেছিলেন। তাঁর সে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে অসাধারণ সাড়া পড়ে যায়। পাশ্চাত্য জগতের কৌতুহল ইতিপূর্ব্বে এমন ভাবে আর কিছুতে জাগ্রত হয় নি। তার কল্পনাকে এমন ভাবে উত্তেজিত আর কিছুতে করেনি।

ক্রিষ্টফার কলম্বাস (১৪৫১-১৫০৬)

দুই শতাব্দী বাদেও তার অসীম প্রভাবের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হতে হয়। জেনোয়ার এক নাবিকের হাতে ভাগ্যের দুর্জ্ঞেয় নির্দ্দেশে মার্কো পোলোর এই কাহিনীটি কেমন করে এসে পড়েছিল। কাজের অবসরে দীপের মৃদু আলোয় কতদিন ধরে কতবার সে এই বইখানি পড়েছে, তার সঠিক হিসাব অবশ্য জানবার উপায় নাই; কিন্তু ইউরোপের ভাগ্য যে আবিষ্কারের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে, তার প্রথম ইঙ্গিত ও প্রেরণা এই বইটিই যে সেই নাবিককে দিয়েছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

দুই শত বছরের ওপার থেকে স্থলপথের এক পর্য্যটকের আশীর্ব্বাদ ও উৎসাহবাণী সমুদ্রের এক নাবিকের কাণে এসে পৌঁছে সেদিনকার পৃথিবীর সীমাকে কল্পনারও বাইরে প্রসারিত করেছিল।

এই নাবিকের নাম ক্রিষ্টোফার কলম্বস। মার্কো পোলোর ভ্রমণ-কাহিনীতে ক্যাথে (উত্তর-চীন), ক্যামবুলাকের (পিকিং) এবং অন্যান্য স্থানের রোমাঞ্চকর বিবরণ পড়তে পড়তেই কলম্বাসের মনে নূতন এক সঙ্কল্প জেগে ওঠে। পৃথিবী যে গোলাকার, খ্রীশ্চান শাস্ত্রের মতের বিরুদ্ধেও সে কথা তখন সাধারণ লোকে বিশ্বাস করতে শিখেছে। পশ্চিম দিক্ দিয়ে ঘুরে পূর্ব্বদিকের এই রহস্যময় চীনে যাবার সম্ভাবনা কলম্বাসের কল্পনাকে অধিকার করে বসে। এই চিন্তা তাঁর কি রকম ধ্যান-জ্ঞান হয়ে উঠেছিল, মার্কো পোলোর বইখানি তাঁকে এ বিষয়ে কতটা প্রেরণা দিয়েছে, স্পেনের সেভিল নগরের একটি পাঠাগারে গেলে তার নির্ভুল পরিচয় পাওয়া যাবে। মার্কো পোলোর ভ্রমণ-কাহিনীর একটি বহু পুরাতন কপি সেখানে সযত্নে রক্ষিত আছে। সে বইএর পাতাগুলির ধারে আর সাদা জায়গা নেই। সমস্ত কলম্বাসের লিখনে ভরা।

অনেক বার ব্যর্থ ও ভগ্নমনোরথ হয়ে, অনেক জায়গায়, বাধা পেয়ে অপমানিত হয়ে, কলম্বাস শেষ পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্কল্পকে কাজে পরিণত করবার সুযোগ পান।

সে সুযোগ পেয়ে কলম্বাস তারপর কি করেছিলেন, আমরা সবাই জানি। যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি জীবন পণ করে বেরিয়েছিলেন, তা অবশ্য সিদ্ধ হয়নি, ক্যাথের রহস্য-উপকূলে পদার্পণ করবার সৌভাগ্য তিনি পান নি।

কিন্তু পৃথিবীতে অনেক নিষ্ফল চেষ্টার দান যে সফলতার চেয়ে কম নয়, কলম্বাসের ব্যর্থ অভিযান তারই অপূর্ব্ব প্রমাণ।

কলম্বাসের সাগর-অভিযান সমস্ত ইউরোপের পরবর্ত্তী ইতিহাসের রূপক হিসাবে ধরা যেতে পারে। সঙ্কীর্ণ, অন্ধকার, অর্দ্ধ-বর্ব্বরতার জগৎ থেকে ইউরোপ অদম্য প্রাণশক্তির জোরে অসীম দুঃসাহসে বাইরের বিস্তৃত অকূল সমুদ্রে বেরিয়ে পড়েছে, পথে অনেক কিছু সে পেয়েছে, গতি-বেগ এখনও তার অশান্ত।

কিন্তু তবু 'ক্যাথে'র উপকূলে পৌঁছান তার দরকার, প্রাচ্যের রহস্যময় পরম সম্পদ্ যেখানে আছে।

সাহিত্য

ব্যুৎপত্তির দিকে লক্ষ্য করিলে সাহিত্য বলিতে বুঝিতে হয় সেই বস্তু, যাহা মানুষের নিকট হইতে প্রকাশ পায় তখন, যখন মানুষ তাহার "নিত্যসঙ্গী"র ক্রিয়ার প্রভাবান্বিত হয়। অথবা মানুষের যাহা "নিত্যসঙ্গী," তাহার ক্রিয়া মানুষের অভ্যন্তরে প্রকট (Predominant) হইলে মানুষের যে অবস্থা হয়, সেই অবস্থায় মানুষ যাহা প্রকাশ করে, তাহার নাম সাহিত্য।

'নিত্যসঙ্গী' বলিতে বুঝিতে হয় সেই বস্তু, যাহা মানুষের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে থাকে।

৮ তখন ক্রীশ

অকাল বর্ষা

—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূধর-বুকে তুষার গলি পড়ে
ঋতুর ভূষা শিথিল মদালসে
পিয়াল-বনে ভ্রমর ঘুরে মরে
কুসুম যত পড়েছে খসে খসে।
উদাস বায়ু বিষাদে শ্লথ-গতি
সঙ্গে মধু-মাধব সমারোহ
গগনে জ্বলে তপন দিনপতি
হরিণী আঁখি পলাশে নাহি মোহ।

মুরছে চূত-মুকুল অবসাদে
কোকিল কল-কাকলি হল মৃদু
কীচক-বনে কানন-বধূ কাঁদে
চাঁপার বুকে ফুরায়ে আসে সীধু।
সোণার বীণা বাজায়ে কল-ভাষে
কিন্নরীরা গাহে না প্রেম-গীতি
বঁধুরে হাসি বাঁধে না বাহুপাশে
বিরাগ মানে পীরিতি-রতি-রীতি।

গহন ঘন নিভৃত গিরি-গেহে
মালতী লতা বিতান-তলে বসি
ধূর্জ্জটিরো ক্লান্তি আসে দেহে
বিবশ ম্লান-কিরণ ভাল-শশী।
স্তিমিত আজি অথির আঁখি-তারা
পার্ব্বতীরে খুঁজে না ফিরে ফিরে—
মদন পুন হল কি তনুহারা
কাঁদে কি রতি অলক ছিঁড়ে ছিঁড়ে?

অদূরে বসি আলসে আনমনে
উমার মুখে হাসিটি ম্রিয়মাণ
নয়নে আসে সলিল অকারণে
নিরাশে কাটে উদাস দিনমান।
হরের বাহু-বাঁধন আজি শ্লথ
শ্রান্ত আঁখি জ্বলে না অনুরাগে—
ঝরিছে মধু-মালতী শত শত
উমার বুকে ব্যথার মত লাগে।

হায় গো আজি এমন হল কেন
শুকালো কেন ফুল্ল মধুমাস?
রবির চোখে অনল ঝরে যেন
ধরণী ত্যজে তুহিন তনু-বাস।

গগন-বীণে সারঙ শুধু বাজে
রুদ্র তালে, গমকে কাঁপে দিশা
নির্ঝরিণী সাজিল শিলা-সাজে
শীর্ণ-ধারা মিটে না মৃগ-তৃষা।

সহসা এ কি! হৃদয় দুরু দুরু,
পুলক জাগে হরষে তনু-ময়,
চমকে শিখী শুনিয়া গুরু গুরু—
ঈশান কোণে অকাল মেঘোদয়!
শিহরি নীপ মুকুল উঠে ফুটে
বকুল-বনে সুবাস মোহ-মোহ
অকালে আজি গৌরী-গিরি-কূটে
বরষা-ঋতু নবীন সমারোহ।

হরষে হর-ডমরু উঠে বাজি
দ্রিমিকি দ্রিমি দ্রিমিকি দ্রিমি দ্রিমি।
ময়ূর নাচে কলাপসাজে সাজি
নূপুর বাজে রিণিকি রিণি রিণি!
শম্ভু তুলি আবেশভরা আঁখি
চাহিয়া রহে উমার মুখ পানে
উমার আঁখি অমিয়-সুধা মাখি
হরের পানে সরম-দিঠি হানে।

বিতান-তলে নামিল জল-ধারা
শীতল বায়ে কাঁপিল জটাজাল
উমারে ধরি রভসে মাতোয়ারা
হৃদয়ে টানি লইল মহাকাল।
দেবীর আঁখি নিমীল রসাবেশে
ভাবিতে কথা মরমে মানে লাজ—
আবার যেন নবীন বর-বেশে
গিরীশ-গৃহে আইল নটরাজ!

অকালে মধু-ঋতুর আগমনে
ফুটিয়াছিল যে-ফুল হিয়ামাঝে
আজিকে যদি নিদাঘ-জ্বালা সনে
মুরছি পড়ে শিথিল শ্লথ সাজে—
সহসা তবে বাদল বরিষণে
আবার তারে জাগাও উমাপতি
শিথিল হিয়া জাগুক শিহরণে
মদন সাথে আসুক ফিরে রতি।

চার্বাকবাদ

—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু

ভারতীয় দর্শনসমূহের প্রচলিত ব্যাখ্যা যে ভ্রমাত্মক এবং সংস্কৃত ভাষা যে বর্ত্তমানে বিকৃত, ইহা "বঙ্গশ্রী"তে একাধিক প্রবন্ধে প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং, প্রচলিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী কোন আলোচনা নির্ভরযোগ্য নহে। ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে কোন আলোচনা বিদেশী সমালোচকের উক্তিসমূহের পুনরাবৃত্তি ব্যতীত সম্ভব—বর্ত্তমানে কোন আলোচনা পড়িয়া এমন ধারণা হয় না। এই প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার সঙ্গে আমাদের দেশের সুধীবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করি—এমন করিয়া নিজকে আর কতদিন পরের চোখে দেখিয়া আমরা তৃপ্ত হইব?

ভূমিকা

ভারতীয় দার্শনিকগণের মধ্যে চার্বাক ও অন্যান্য জড়বাদিগণের স্থান যে কত উচ্চে, তাহা সাধারণতঃ অনেকেই ভাবিয়া দেখেন না। গোঁড়া হিন্দুমাত্রেই চার্বাকের নামে শিহরিয়া উঠেন এবং যাঁহারা দার্শনিক আলোচনার ব্যপদেশে জড়বাদের সহিত পরিচিত, তাঁহাদের কাছে নাস্তিক বলিয়া চার্বাক অস্পৃশ্যের সহিত সমপর্য্যায়ভুক্ত। খুব অল্পসংখ্যক দর্শন-পিপাসুই চার্বাকের যুক্তিতর্কের আদর করিয়া থাকেন। ঐহিক তত্ত্ব হইতে আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে আমরা বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত; সুতরাং চার্বাক-দর্শনের প্রতি এই অবজ্ঞার ভাব আমাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক; কিন্তু জ্ঞানের রাজ্যে বৈষম্যের স্থান নাই, চিন্তাশীলতার আদর সব বিষয়েই সমান হওয়া উচিত। চার্বাকের মত যাহাই হউক, তাঁহার বিচার-নৈপুণ্য ও যুক্তির নিন্দা করা চলে না। বরং তাঁহার অপূর্ব ধীশক্তির জন্য, অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য, মধ্যে মধ্যে আত্মদ্রষ্টা ঋষিদের সহিত তাঁহাকে সমান আসন দিতে ইচ্ছা হয়। আমার মনে হয়, জড়বাদের আবির্ভাব না হইলে ভারতীয় দর্শনের পরিণতি অন্যরূপ হইত; জড়বাদীরাই প্রথমে দার্শনিক জগতে স্বাধীন চিন্তার সূত্রপাত করে, যখন বৈদিক দর্শন মাত্র একটি মতবাদে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, তখন তাহারাই বৈদিক মতকে যুক্তি-মীমাংসার দিকে লইয়া যাইবার পথ প্রস্তুত করে। মানুষের মন যখন সংশয় ও অন্ধবিশ্বাসে পূর্ণ, তখন তাহারাই স্বাধীন চিন্তার আলোকশিখা তুলিয়া ধরে।

সামগানমুখরিত পঞ্চনদের তটে একদিন যে উৎসাহের আগুন জ্বলিয়াছিল, ধীরে ধীরে তাহা নির্বাপিত হইয়া আসিল। প্রাণহীন ক্রিয়াকলাপের প্রতি অনেকে আগ্রহহীন, আস্থাহীন ও বিরক্ত হইয়া পড়িল। কেবল তাহাই নহে, অনার্য্য প্রভাবের বশে একদল প্রশ্ন উত্থাপন করিল যে, যজ্ঞের প্রয়োজন কি, ক্রিয়াকাণ্ডের মূলে কোনও ভিত্তি আছে কি না, ইত্যাদি। ক্রমে যুক্তি-তর্কের সাহায্যে বৈদিক মতের বিপক্ষে এক দল নাস্তিক গড়িয়া উঠিল। তাহারাই ভারতের প্রথম আর্য্য জড়বাদী এবং খুব সম্ভব বৃহস্পতিই তাহাদের আদি নেতা। এই বৃহস্পতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিবার উপায় নাই। বার্হস্পত্য-সূত্র নামে এক গ্রন্থ পাওয়া যায় এবং তাহাতে অগ্নিহোত্র ও বেদপাঠের নিন্দাও[১] আছে বটে, কিন্তু উহা যে জড়বাদী বৃহস্পতির রচিত, তাহা সকলে স্বীকার করিতে চান না। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও বৃহস্পতির অনেক মত আছে এবং তাহার এক স্থানে দেখিতে পাই যে, তিনি বেদকে শাস্ত্র বলিয়া বিবেচনা করেন না, কিন্তু বার্ত্তা (অর্থকরী বিদ্যা) ও দণ্ডনীতিকে শাস্ত্ররূপে গণ্য করিয়াছেন।[২] মহাভারতেও[৩] দ্রৌপদীর মুখ হইতে বৃহস্পতির অনেক নীতি উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া মাধবাচার্য্যও সর্বদর্শনসংগ্রহে[৪] কতকগুলি বৃহস্পতির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সাধারণতঃ মানুষের মন ভোগলোলুপ। কাজেই দলে দলে লোক জড়বাদের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বেদপন্থিগণ বৈদিক ধর্মকে রক্ষা করিবার জন্য যুক্তি-তর্কের আশ্রয়ে আসিলেন। জড়বাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল এবং তাহারই ফলস্বরূপ মীমাংসাদর্শনের বীজ ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু, জড়বাদীরা যে স্বাধীন চিন্তার বীজ ছড়াইলেন, তাহা আদৌ নষ্ট হইল না। বেদপন্থীদিগের মধ্যে যাঁহাদের মনে তাহার প্রভাব পড়িয়াছিল, তাঁহারা তাহার সাহায্যে যে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন,

---

(১) অধ্যায় ১ম, সূত্র ১২শ। (২) অধ্যায় ২য়, সূত্র ৩য় (অধিকরণ ১ম)। (৩) বনপর্ব, অধ্যায় ৩২শ। (৪) চার্বাকমত।

তাহা অন্যান্য আস্তিকদর্শনের মধ্যে গ্রথিত রহিয়া গেল। অপর পক্ষে কেবলমাত্র স্বাধীন চিন্তাকেই অবলম্বন করিয়া যে নাস্তিক সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি দর্শন তাহারই অন্তর্ভুক্ত।

চার্বাক শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে সুনির্দ্ধারিতভাবে কিছু বলা যায় না; তবে এ বিষয়ে দুইটি মত আছে। কেহ বলেন, উহা চর্ব্ব ধাতু হইতে নিষ্পন্ন এবং চার্বাকগণ কেবল উদরসর্বস্ব ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে ঐরূপ বলা হইত। অপর মতে "চারু বাক্" এই দুইটি শব্দ হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। কারণ, প্রকৃত না হউক, চার্বাকের উপদেশ যে অন্ততঃ আপাত-মধুর তাহাতে সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য, ইহা কেবল চার্বাকের বিপক্ষ দলের মত। চার্বাকগণ নিশ্চয়ই ঐভাবে স্বনামের ব্যাখ্যা করিয়া নিজেদের হেয় করেন নাই। এতদ্ব্যতীত চার্বাকগণ "লোকায়ত" নামেও পরিচিত ছিলেন। কিন্তু, লোকায়ত যে চার্বাকেরই অপর একটি আখ্যা, এরূপ ধারণা করিবার কোনও কারণ নাই। "লোকায়ত" নামটি খুব ব্যাপক হওয়াই স্বাভাবিক। সম্ভবতঃ উহা জড়বাদনির্বিশেষে ব্যবহৃত হইত। চার্বাক সম্প্রদায় "ধূর্ত্ত ও সুশিক্ষিত" এই দুই শাখায় বিভক্ত ছিল। ধূর্ত্ত হইতে সুশিক্ষিত চার্বাকের প্রভেদ এই যে, তাঁহারা দেহের অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন; কিন্তু দেহধ্বংসের সঙ্গেই তাহারও নাশ হইত।

চার্বাক-দর্শনের প্রবর্ত্তক

চার্বাক-মতের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহা বৈদিক ক্রিয়া-কলাপের একেবারেই বিরোধী। অতএব এই মতের প্রবর্ত্তক, হয়ত বৈদিক মার্গে আস্থাহীন কোনও ত্রৈবর্ণিক, অথবা বৈদিকধর্মে অনধিকারী কোনও শূদ্র বা অনার্য্য ছিলেন। এ বিষয়ে বলা চলে যে, সাধারণতঃ যে সকল আর্য্যমনীষী বা ঋষি কর্মকাণ্ডে বীতশ্রদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা ব্রহ্মকাণ্ড অবলম্বন করিয়াছিলেন; বহু দেবতায় যাঁহাদের শ্রদ্ধা ছিল না, তাঁহারা এক ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন। কিন্তু কেহই বেদের বিরোধী ছিলেন না—কেহই সৃষ্টির অন্তরালে সৎ-তত্ত্বের অস্তিত্ব উড়াইয়া দেন নাই। অতএব চার্বাকদর্শনের প্রবর্ত্তক নিশ্চয়ই কোনও ত্রৈবর্ণিক ছিলেন না। তিনি শূদ্রও ছিলেন না। কারণ, এই দর্শনে যে চিন্তাশীলতা, যে গভীর পাণ্ডিত্য, যে প্রবল যুক্তিতর্কের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা তৎকালীন শূদ্রের পক্ষে অসম্ভব। শূদ্র তখন সমাজের অধঃস্থলে, অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত। তাহাকে মানসিক রাজ্যে কোনও স্থান, এমন কি বিদ্যাচর্চায় অধিকারটুকুও দেওয়া হইত না। রামায়ণে[৫] প্রমাণ পাওয়া যায় যে, শূদ্র তপস্যাতেও অনধিকারী ছিল। অতএব চার্বাককে অনার্য্য দর্শন বলিয়া সিদ্ধান্ত করাই সমীচীন। 'চার্বাক' শব্দটিও অনার্য্য বলিয়া প্রতীত হয়। সম্ভবতঃ এই দর্শনের প্রবর্ত্তক দ্রাবিড় ছিলেন। কারণ একদিকে যেমন এই দ্রাবিড় জাতির শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা ছিল, অপরদিকে তেমনি তাহারা আর্য্যধর্ম্মের প্রবল বিরোধী ছিল। এ সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ এই যে, প্রাচীন শাস্ত্রে আমরা জানিতে পারি, রাক্ষস বা অনার্য্যগণই আর্য্যগণের যজ্ঞে নানা-প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত করিত। অতএব কেবলমাত্র যজ্ঞ পণ্ড করিয়াই সন্তুষ্ট না থাকিয়া, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে যুক্তি-তর্কের দ্বারাও আর্য্যদিগকে পরাস্ত করিয়া স্বমতে আনি-বার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা নেহাৎ অসঙ্গত নয়। মহা-ভারতে[৬]ও চার্বাককে ব্রাহ্মণবেশী রাক্ষস বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই রাক্ষস বা অনার্য্যেরা যে ভারতের প্রাচীন অধিবাসী দ্রাবিড় জাতি, তাহাতেও কোনও সন্দেহ নাই। এই দ্রাবিড়জাতি যে ভোগবিলাসী ছিল এবং আর্য্যগণের মত অধ্যাত্মবাদী ছিল না, তাহারও প্রমাণ আছে। জড়বাদী জাতি ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রাখে বলিয়া জড়-জগতে বেশী উন্নতিলাভ করিতে পারে। দ্রাবিড় জাতিও জাগতিক বিষয়ে কিরূপ উন্নতি করিয়াছিল, তাহা রামায়ণে রাবণের ঐশ্বর্য্য ও লঙ্কার বর্ণনা হইতে, ময়দানবের স্থাপত্য-নৈপুণ্য হইতে এবং অধুনা-আবিষ্কৃত হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর নিদর্শন হইতে জানিতে পারা যায়। অবশেষে দ্রাবিড়-সভ্যতা লোপের সঙ্গে সঙ্গে চার্বাকদর্শন ও চার্বাকপন্থীরাও লুপ্ত হইয়া-ছিল। জড়বাদ আর্য্যজাতির অবদান হইলে, আর্য্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির স্থায়িত্বলাভের সহিত তাহাও স্থায়ী হইত। দ্রাবিড়গণ কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতির যতই উন্নতি করুক না, ভাষা ও সাহিত্যে তাহারা কিছুই করিতে পারে নাই। সেইজন্য আমরা চার্বাকদর্শনের প্রাচীন পুঁথি বা দ্রাবিড়দের লিখিত প্রমাণ পাইতেছি না। অতএব চার্বাকশব্দের উৎ-

৫। উত্তরকাণ্ড, সর্গ ৮৩ম—৮৯ম। ৬। শান্তিপর্ব, অঃ ৩৮শ, ৩৯শ।

পত্তি সম্বন্ধে ইহাও বলা চলে যে, চর্বক নামে কোনও অনার্য্য দার্শনিক ছিলেন এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত দর্শন ও তাঁহার অনুগামিগণ ভবিষ্যতে চার্বাক নাম পাইয়াছিল। আর্য্যগণের মধ্যেও যে চার্বাক-মতাবলম্বীর অভাব ছিল তাহা নহে, তবে এই দর্শনের যিনি প্রবর্ত্তক, সম্ভবতঃ তিনি আর্য্য ছিলেন না, ইহাই বক্তব্য। প্রতিপাদ্য বিষয় অনুসারেই সে দর্শনের নাম হইবে এমন কোনও নিয়ম প্রাচীন ভারতে ছিল না। সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা ও বৈশেষিক দর্শনকে যথাক্রমে কাপিল, পাতঞ্জল, জৈমিনীয় ও কাণাদ দর্শন বলা হয় দেখিয়া মনে হয় যে, প্রবর্ত্তকের নামেও দর্শন অভিহিত হইত।

চার্বাকদর্শনের তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ

ভারতের অন্যান্য প্রাচীন শাস্ত্র সম্বন্ধে যাহা ঘটিয়াছে, চার্বাকদর্শনেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। চার্বাক-সম্প্রদায়ের লিখিত কোনও গ্রন্থই আজ পাওয়া যায় না। অবশ্য প্রাচীনতা ছাড়া গ্রন্থলোপের অন্য কারণও আছে। চার্বাক সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু জানিতে পারি, তাহা অতি সামান্য। মহাভারত, পুরাণ ও অনেক দার্শনিক গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে ঐ মতের সংক্ষিপ্ত উল্লেখমাত্র আছে। তাহা ছাড়া ন্যায়মঞ্জরী, তর্করহস্যদীপিকা ও সর্বদর্শনসংগ্রহ প্রভৃতি আধুনিক গ্রন্থেও চার্বাকের মতবাদ জানিতে পারা যায়। কিন্তু, ঐ সকল গ্রন্থ সাধারণতঃ বিরুদ্ধ-মতাবলম্বিগণের। কাজেই উহাতে যে চার্বাক-মত অনেকখানি বিকৃত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। নাস্তিকবাদের প্রতি স্বাভাবিক ঘৃণাবশতও অনেক স্থলে চার্বাকদর্শনের প্রতি সুবিচার করা হয় নাই। যাহা হউক, চার্বাকদর্শন সম্বন্ধে বেশী কিছু জানিতে না পারিলেও ভিন্ন শাস্ত্রের বহুসংখ্যক গ্রন্থে তাহার উল্লেখ দেখিয়া বোধ হয় যে, উহা সমস্ত দেশেই বিশেষ ভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং লোকের মনে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কৌটিল্যও লোকায়তদর্শনকে আন্বীক্ষকীর মধ্যে স্থান দিয়াছেন। এখানে কথা উঠিতে পারে যে, বৃহস্পতি যখন আন্বীক্ষকীকে গণনা করেন নাই, তখন লোকায়তকেও অস্বীকারই করিয়াছেন। অতএব তিনি জড়বাদী হইতে পারেন না। এ বিষয়ে বলা চলে যে, জড়বাদ প্রায় বার্ত্তার মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া তিনি স্বতন্ত্রভাবে লোকায়ত-বিদ্যার নামোল্লেখ করেন নাই। আর সাংখ্যযোগ তাঁহার বিরুদ্ধমত বলিয়া একেবারেই আন্বীক্ষকীকে অস্বীকার করিয়াছেন। মোটের উপর লোকায়ত কৌটিল্যের মতে আন্বীক্ষকী, বৃহস্পতির মতে নয়।

দার্শনিক-চিন্তার উদ্ভব

ভারতবর্ষের দার্শনিক আলোচনার উদ্ভব হইয়াছে প্রবল সুখস্পৃহা ও দুঃখকে উচ্ছেদ করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা হইতে। ইহাদের যে কোনও একটিকে প্রধান ভাবে অবলম্বন করিয়া সত্য অন্বেষণের ইচ্ছা বাড়িয়া উঠিয়াছে। সুখৈকসর্ব্বস্ব চার্বাক যদিও দুঃখ সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া কোনও উদ্বেগ প্রকাশ করেন নাই, তথাপি দুঃখ-দূরীকরণও গৌণভাবে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু চার্বাকের বিশেষত্ব এই যে, তিনি সুখকে নিত্য ও অনিত্য এই দুই প্রকার দেখেন নাই। আস্তিক দার্শনিকগণ অনিত্য ঐহিক সুখের অভিলাষ না করিয়া অতীন্দ্রিয় লোকের আনন্দ বা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির অনুসন্ধানে নিরত ছিলেন। কিন্তু প্রত্যক্ষবাদী চার্বাক ইন্দ্রিয়ের অনধিগম্য কোনও অনির্ব্বচনীয় আনন্দ বা সাময়িক দুঃখনিবৃত্তির অতিরিক্ত একান্ত দুঃখোচ্ছেদ সম্বন্ধে কোনও মতবাদই সহ্য করিতে পারেন নাই। সুখের সঙ্গে দুঃখ মিশ্রিত থাকায় অন্যান্য দর্শনে সুখকে দুঃখের তুল্য বলিয়াই গণ্য করা হইয়াছে, কিন্তু চার্বাক দুঃখমিশ্রিত সুখকে উপেক্ষা করেন নাই। তাঁহার মতে, আঁশ ও কাঁটা ফেলিয়া দিয়া লোকে যেমন মৎস্য আহার করিয়া থাকে, তুষ হইতে পৃথক্ করিয়া যেমন চাল গ্রহণ করে, তেমনই দুঃখের মধ্য হইতে যতদূর সম্ভব সুখকেই ভোগ করিতে হইবে। তাহা না হইলে জগতে সুখের আশাই থাকিত না। সকলেই হরিণের ভয়ে শস্যরোপণ করিতে অথবা অতিথির আশঙ্কায় রন্ধন করিতে বিরত হইত। *

ঈশ্বর

চার্বাকের মতে প্রত্যক্ষই বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ। অতএব তাঁহারা যে ঈশ্বর মানেন না, তাহা বলা বাহুল্য। সাংখ্য যেরূপ ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার মূলে প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া একটা সামঞ্জস্য রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে, চার্বাকদর্শনে সেরূপ প্রকৃতি বা তৎসদৃশ কোনও তত্ত্বের স্থান নাই।

* সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ (বি. ও. আর্. আই. সংস্করণ), পৃঃ ৪, পংক্তি ৩২-৩২।

তাঁহারা বলেন যে, পার্থিব রাজাই একমাত্র পরমেশ্বর; অন্য কেহ নহেন। ৭

স্বভাব

চার্বাকের মতে সৃষ্টিরহস্যের মূলে আছে স্বভাব। স্বভাব বা স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যের বশে সমস্তই ঘটিতেছে। ধর্ম বা অধর্মের জন্য সুখ বা দুঃখ হয় না; কিন্তু মনুষ্য স্বভাবতঃই সুখী বা দুঃখী। ৮ এই স্বভাব সাংখ্যের প্রকৃতি হইতে একেবারে বিরুদ্ধ। ইহা কোনও দ্রব্য নহে, একটি আপেক্ষিক গুণ। কারণ কোনও বস্তু হইতে যাহা, যাহার বৈলক্ষণ্য, তাহাই তাহার স্বভাব। এই স্বভাব নিত্যও নয়; কারণ তাহা হইলে বৈচিত্র্যের উপলব্ধি হইতে পারে না। অনেক ব্যক্তিতে কোনও বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইলেও তাহাকে কেবল জাতিগত বলা চলে না। প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্র স্বভাব আছে এবং তাহা আছে বলিয়াই প্রত্যেক ব্যক্তিতে বিভিন্ন কার্যের সম্ভব হয়।

আত্মা

দেহ হইতে পৃথক্ আত্মার বিষয়ে প্রমাণ না থাকায় চার্বাকের কাছে দেহই আত্মা। তাহা ছাড়া "আমি স্থূল", "আমি কৃশ", "আমি তরুণ" ইত্যাদি বাক্যে 'আমি'-পদ দেহকেই নির্দ্দেশ করে। তবে যে "আমি দেহ" না বলিয়া "আমার দেহ" বলা হয়, তাহা "রাহুর শির" ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় ঔপচারিক প্রয়োগ। যদিও চার্বাকমতে প্রধানতঃ দেহই আত্মা, তথাপি সম্প্রদায়ভেদে বিভিন্ন ধারণা প্রচলিত ছিল। ৯ "তে হ প্রাণাঃ (ইন্দ্রিয়) প্রজাপতিং সমেত্য ব্রূয়ুঃ" (সেই ইন্দ্রিয়গণ প্রজাপতির কাছে যাইয়া বলিল)—এই শ্রুতি অনুসারে এবং ইন্দ্রিয়ের অভাবে শরীর চালনা অসম্ভব বলিয়া একদল চার্বাক মনে করেন যে, ইন্দ্রিয়ই আত্মা। এ বিষয়ে আরও প্রমাণ, "আমি অন্ধ", আমি বধির" ইত্যাদি বাক্যে 'আমি'-পদের দ্বারা চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ই সূচিত হইয়া থাকে—অপর কোনও পদার্থ অন্ধ বা বধির হয় না। অন্য চার্বাক বলেন যে, শ্রুতিতে যখন আছে "অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ" এবং প্রাণের অভাবে ইন্দ্রিয়ক্রিয়াও বন্ধ থাকে, তখন প্রাণই আত্মা। এই বিষয়ে যুক্তি এই যে, "আমি ক্ষুধার্ত্ত", "আমি তৃষ্ণার্ত্ত" ইত্যাদি বাক্যে প্রাণেরই ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রতীত হয়। আর এক সম্প্রদায়ের মতে, মনের আত্মত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতি থাকায় এবং সুষুপ্তিকালে মনের অভাবে ইন্দ্রিয়াদিরও অভাব উপলব্ধ হয় বলিয়া মনই আত্মা। তাহা ছাড়া, "আমি নিশ্চয়াপন্ন," "আমি সংশয়ারূঢ়" ইত্যাদি বাক্যে "আমি" অন্য কেহ নয়—উহা মনই। কারণ নিশ্চয় বা সংশয় মনের পক্ষেই সম্ভবপর।

চৈতন্য

আত্মা না থাকিলেও জড়দেহে কিরূপে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়, তাহা চার্বাকগণ সুন্দর দৃষ্টান্তের দ্বারা সুমীমাংসা করিয়াছেন। মদের উপকরণগুলির মধ্যে যেরূপ পৃথক্ ভাবে মাদকতা থাকে না, অথচ তাহারা মিলিত হইলেই মদের সৃষ্টি হয়, সেইরূপ চারি ভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুৎ) যখন সংহত হইয়া দেহাকারে পরিণত হয়, তখন সেই সমষ্টি হইতেই দেহের মধ্যে চৈতন্যের আবির্ভাব হয়। মৃত্যুতে ভূতচতুষ্টয় বিচ্ছিন্ন হয় বলিয়া তখন আর চৈতন্য থাকে না। অথবা পান, সুপারি, চূণ, খদির ইত্যাদির মিশ্রণে যেরূপ লাল রঙের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ চারি ভূতের সম্মেলনেও চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয়। ১০

বন্ধ-মোক্ষ

চার্বাকের মতে যদি আত্মাই না থাকে, তাহা হইলে তাহার বন্ধ-মোক্ষ বলিয়াও কিছু থাকিতে পারে না। মুক্তি জ্ঞানলভ্য কোনও অবস্থা-বিশেষ নয়। দেহই যখন আত্মা, তখন দেহের নাশ মুক্তি। ১১ এইরূপ দেহের জন্যই বন্ধ অন্যান্য দর্শনে প্রসিদ্ধ পুরুষার্থতাও চার্বাকের চোখে কাল্পনিক বস্তু। পুরুষার্থতা পুরুষেরই বৈশিষ্ট্য, নারী ও পুরুষ উভয়ের তাহা হইতে পারে না, পুরুষের ইন্দ্রিয়সুখই তাহার বিশেষত্ব—ইহা ছাড়া সমস্তই নরনারীর পক্ষে সমান। কাজেই চার্বাকের মতে তাহাই পুরুষার্থ। ১২ মীমাংসকগণ যে স্বর্গকে পুরুষার্থ

---

৭ লোকসিদ্ধো ভবেদ্রাজা পরেশো নাপরঃ স্মৃতঃ (সর্বদর্শন সংগ্রহ।)।

৮ সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ, শ্লঃ ৩, ৪। ৯ বেদান্তসার—সদানন্দ।

(১০) সর্বদর্শন-সংগ্রহ—(বি-ও আর, আই. সংস্করণ) পৃঃ ৭, পংক্তি ৬০-৬৩। সর্বসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ প্রকরণ, ২য়, শ্লোক ৭ম।

(১১) সর্বদর্শন-সংগ্রহ (উক্ত সংস্করণ) পৃঃ ৭, পংক্তি ৫৯।

(১২) " " " ৬, " ৫৬।

বলে তাহারও অস্তিত্ব নাই।[১৩] শাস্ত্রে এবং জনসাধারণের মধ্যে যে স্বর্গের প্রবাদ আছে, তাহা ঐহিক সুখেরই চরম আস্বাদন। এইরূপ নরকও কাল্পনিক।

জন্মান্তর

চার্বাক যে জন্মান্তর স্বীকার করেন না তাহা বলাই বাহুল্য; কেবল যে প্রত্যক্ষের বিষয় নয় বলিয়াই তাহা অসিদ্ধ, তাহা নহে। দেহের অতিরিক্ত আত্মার অভাবেও আত্মার জন্মান্তর অসঙ্গত হয়। আর, ভৌতিক দেহের যে পূর্ব্বজন্ম থাকিতে পারে না, তাহা আস্তিক দার্শনিকগণেরও অনুমোদিত যে দেহ ভস্মীভূত হইয়াছে, তাহার পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনাই নাই। আর, দেহ হইতে নির্গত হইয়া আত্মা নামে কোনও পদার্থ লোকান্তরে গমন করে বলিয়া মনে হয় না। কেননা সে ত আর প্রিয়জনের টানে ফিরিয়া আসে না।[১৪]

(১৩) সর্বসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ, প্রকরণ ২য়, শ্লোক ৮-১০।

(১৪) সর্বদর্শন-সংগ্রহ (উক্ত সংস্করণ), পৃঃ ১৪, পংক্তি ১২৩-১২৫

বেদনিন্দা

চার্বাক বলেন যে—ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও নিশাচর বেদ রচনা করিয়াছেন এবং বেদ ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপ নির্বুদ্ধি বা নিশ্চেষ্ট লোকের জীবিকার উপায়-স্বরূপ। তাঁহারা শ্রাদ্ধ তর্পণের প্রয়োজনও খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রাদ্ধ করিলে যদি মৃত প্রাণীর তৃপ্তি হয়, তাহা হইলে তৈলদানে নির্বাণ প্রদীপেরও শিখা-বৃদ্ধি হওয়া উচিত। যাত্রীদের কোনও পাথেয়েরও প্রয়োজন থাকে না; কারণ গৃহস্থগণ তাহাদের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিলেই তাহাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইতে পারে। পৃথিবীতে পিণ্ড দিলে যদি স্বর্গগত ব্যক্তি তৃপ্ত হয়, তাহা হইলে প্রাসাদশিখরে অবস্থিত ব্যক্তির জন্যও ভূতলে খাদ্য দেওয়া চলে।[১৫]

(১৫) সর্বদর্শন-সংগ্রহ (উক্ত সংস্করণ) পৃঃ ১৩ পংক্তি ১১২-১১৩
১৪ " ১২৮-১২৯
১৩ " ১১৬-১২১
১৪ " ১২৬-১২৭

শ্লোকগুলি এই ভাবে পড়াই বাঞ্ছনীয়।

স্বাধীনতা

—শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

নিরুদ্দেশ যে-দেশের না হয় ঠিকানা,
অনন্ত সম্মুখ ছাড়া পথ আর নাই যা'র জানা,—
বিহ্বল মত্ততা আনে তাহারি স্বপন;
তারি লাগি চলিয়াছে মহা-অন্বেষণ
মহা-কোলাহলে আর ব্যগ্র কৌতূহলে!
উন্মাদের মতন সকলে
লক্ষ্যহারা ছুটে তাই চলে
নিরুদ্দেশ কল্পলোক পানে।

অর্থহীন উন্মাদক ইঙ্গিতে আহ্বানে
যেতে শুধু হয়
দূর হ'তে দূরে,
অশেষ পথের শেষে বারে বারে
দুরাশার মৃগতৃষ্ণিকায়।

অবশেষে কোনো এক ধূসর সন্ধ্যায়
শ্রান্তির তিক্ততা নামে সর্ব্ব দেহ-মনে,
ক্রন্দনের ধারা নামে নিদ্রালু নয়নে,
উৎসাহের সে-উৎস ফুরায়;
কিছুতেই কেহ আর চলিতে না চায়
অবসন্ন জীর্ণ ভাঙ্গা রথ;
শেষ হয় যথা তথা অফুরন্ত পথ।

বিজ্ঞান জগৎ

—শ্রীসুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী

পরমাণুরহস্য (নিউট্রিনো) : বৈজ্ঞানিক গণ্ডী (টেলিটেক্টর) : কৃত্রিম ভূমিকম্প : চশমার নূতন ধরণ : দরিদ্রের প্রতি অত্যাচার-নিবারণে বিজ্ঞান : ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের বিদেশে সম্মান : নিরাপদ বৈদ্যুতিক পাখা : ষ্টিম-চালিত মোটর সাইকেল।

পরমাণু-রহস্য : নিউট্রিনো

কোন স্বাভাবিক ঘটনাকে অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য করা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, কিন্তু বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের গতি বিপরীত দিকেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সাধারণ লোকের পক্ষে বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার ক্রমশঃ দুর্ব্বোধ্য ও জটিল হইয়া পড়িতেছে। পদার্থবিজ্ঞান পর্য্যবসিত হইয়াছে গণিতে এবং রসায়ন হইয়াছে পদার্থবিজ্ঞানে। অঙ্কশাস্ত্রের ধোপে না টি'কিলে কোন আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানবিদ্ কিছু মানিয়া লইতে রাজি নহেন, কিন্তু আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান বুঝিতে হইলে যেরূপ জটিল ও দুরূহ অঙ্কশাস্ত্রের প্রয়োগ প্রয়োজন হয়, তাহা মুষ্টিমেয় বিশেষজ্ঞ ছাড়া অপর কাহারও পক্ষে বোধগম্য করা কেবলমাত্র সুকঠিন নহে, অসম্ভব।

পুরাতনপন্থী পদার্থবিজ্ঞান অনুসারে আমরা বহির্জ্জগতের যাহা কিছুর অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করিতে পারি, তাহা দুইটি পর্য্যায়ে বিভক্ত — দ্রব্য (matter) ও শক্তি (energy)। প্রত্যক্ষভাবে অনুভবযোগ্য সকল জিনিষকে আমরা দ্রব্য বলিয়া থাকি এবং ইহা সাধারণতঃ দুই বা ততোধিক ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমাদের গোচরীভূত হয়। এই হিসাবে ইট, কাঠ, মাটি, পাথর প্রভৃতি দ্রব্য। আলো, তাপ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি ইহাদের মত প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা যায় না। আলো, তাপ প্রভৃতির অস্তিত্ব বুঝিতে হইলে পরোক্ষভাবে ইহাদের ক্রিয়া হইতে বুঝিতে হয়। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, আলোর অস্তিত্ব দৃষ্টি-নিরপেক্ষ এবং আমরা আলো দেখিতে পাই না। যখন কোন বস্তুর উপর আলো পড়ে, তখন তাহা হইতে প্রতিফলিত এবং বিচ্ছুরিত আলো আমাদের চক্ষুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বস্তুটির অস্তিত্ব জানাইয়া দেয়। অন্ধকার ঘরে কোন ছিদ্রপথে আলো আসিলে ধূম বা ধূলা না থাকিলে আলোর পথ বুঝিতে পারা যায় না, অর্থাৎ যতক্ষণ না আলোর ক্রিয়া হইতেছে ততক্ষণ তাহা বুঝিবার কোন উপায় নাই।

দ্রব্য ও শক্তির পার্থক্য উপলব্ধি করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু উহাদের কোন সুনির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। সাধারণতঃ বলা হয় যে, যাহার ভার আছে, তাহা দ্রব্য এবং শক্তির কোন ভার নাই। আপাত-দৃষ্টিতে ইহা ঠিক বলিয়া বোধ হইলেও আইনষ্টাইন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের মতে শক্তিরও ভার আছে এবং তাহার পরীক্ষামূলক প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। আধুনিক মত অনুসারে শক্তি ও দ্রব্য দুই বিভিন্ন বস্তু নহে, একই মূলপদার্থের বিভিন্ন রূপমাত্র। পুরাতন মত অনুসারে দ্রব্য ও শক্তি দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু।

রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তি দ্রব্য ও শক্তি সম্বন্ধে দুইটি নিয়ম (law)— দ্রব্যের অবিনশ্বরতা (conservation of mass or indestructibility of matter) ও শক্তির অনপচয়ত্ব (conservation of energy)। প্রথমটির অর্থ এই যে, আমরা দ্রব্যের সৃষ্টি বা লয় করিতে পারি না, কেবল রাসায়নিক সংযোগ-বিয়োগের ফলে অণু পরমাণুর বিন্যাস পরিবর্ত্তন করিতে পারি। দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে শক্তির পরিমাণ বাড়ান বা কমান সম্ভব নয় ; একটি রূপ (form) হইতে শক্তি অন্যরূপে পরিবর্ত্তন করা যায় মাত্র। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যখন বিদ্যুৎ হইতে তাপ, আলো ও গতির সৃষ্টি করা হয়, তখন তাপশক্তি, আলোর শক্তি ও গতিশক্তির মোট পরিমাণ বিদ্যুতের শক্তির সমান হইবে। দ্রব্যের ন্যায় শক্তিরও সৃষ্টি বা লয় অসম্ভব। এক সময়ে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল যে, এই দুইটি নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নাই বা হইতে পারে না, কিন্তু জড়ের গঠন সম্বন্ধে আধুনিক গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে যে, সাধারণতঃ এই নিয়মগুলি ঠিক হইলেও পরমাণুর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এই নিয়মের সত্যতা রক্ষিত হয় না। শক্তির অনপচয়ত্বের নিয়ম সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণের কিঞ্চিৎ দৌর্ব্বল্য আছে এবং ফলে নিয়মটিকে বাঁচাইবার জন্য নিউট্রিনোর (neutrino) উদ্ভাবনা হইয়াছে।

নিউট্রিনো সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে জড়ের গঠন-সম্পর্কিত বর্ত্তমান মতবাদ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। কোন জড়পদার্থকে ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করিলে এমন অবস্থায় উপনীত হওয়া যাইতে পারে যে, আরও ক্ষুদ্রতর অংশে ভাঙ্গিলে পদার্থটির ধর্ম্ম পূর্ব্বের ন্যায় থাকে না ; এই ক্ষুদ্রতম অংশ (যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন পদার্থের ধর্ম্ম অপরিবর্ত্তিত থাকে) জড়-

পদার্থের অণু (molecule)। একই দ্রব্যের বিভিন্ন অণু একই ধর্ম্মবিশিষ্ট, কিন্তু বিভিন্ন দ্রব্যের অণুর ধর্ম্ম বিভিন্ন। অণু জড়পদার্থের শেষ অবস্থা নহে —অণু কয়েকটি পরমাণুর সমাবেশ। রাসায়নিক সংযোগ পরমাণুগুলির মধ্যেই হইয়া থাকে। পরমাণুকেও ভাঙ্গা সম্ভব হইয়াছে এবং দেখা গিয়াছে যে, ইহা সম-পরিমাণ পজিটিভ (positive) ও নেগেটিভ (negative) বিদ্যুতাবেশ ব্যতীত আর কিছু নহে। পরমাণুর গঠন অনেকাংশে সৌর-মণ্ডলের ন্যায়। সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে যেরূপ গ্রহ পরিভ্রমণ করে, সেইরূপ একটি পজিটিভ বিদ্যুতাবিষ্ট কেন্দ্রকের (nucleus) চতুর্দ্দিকে পরমাণুর প্রকৃতি হিসাবে, বিভিন্ন সংখ্যক ইলেকট্রন (electron) ঘূর্ণিত হয়। কেন্দ্রকটি সাধারণতঃ কয়েকটি প্রোটন (proton) ও ইলেকট্রনের সমষ্টি। একটি প্রোটন একটি পজিট্রন (positron) ও একটি নিউট্রন (neutron) দ্বারা গঠিত। সকল প্রকার দ্রব্যেরই চরম অংশ নিউট্রন, পজিট্রন ও ইলেক্‌ট্রন। ইহাদের মধ্যে নিউট্রন বিদ্যুতাবিষ্ট নহে এবং ইলেক্‌ট্রন ও পজিট্রন যথাক্রমে নেগেটিভ ও পজিটিভ বিদ্যুতাবিষ্ট। ইলেক্‌ট্রন ও পজিট্রনের বিদ্যুতাবেশ বিপরীতধর্ম্মী, কিন্তু পরিমাণে সমান। কোন পরমাণু হইতে সহজে পজিট্রন পাওয়া যায় না, সাধারণতঃ ইলেক্‌ট্রন ও কেন্দ্রক পাওয়া যায়। ইলেক্‌ট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা ও বিন্যাস অনুসারে বিভিন্ন দ্রব্য গঠিত হয়।

য়ুরেনিয়াম (uranium), রেডিয়াম (radium), থোরিয়াম (thorium) প্রভৃতি কয়েকটি 'ভারী' ধাতু স্বতঃই ভাঙ্গিয়া গিয়া অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা ও 'স্থায়ী' (stable) পদার্থে পরিণত হইতেছে। এই প্রকার দ্রব্যকে তেজো-বিকিরক (radioactive) দ্রব্য বলা হয়। তেজোবিকিরণের কারণ ঠিক ভাবে নির্ণীত হয় নাই; বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন যে, এই জাতীয় পরমাণুর কেন্দ্রকে বহুসংখ্যক প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রন থাকায় শক্তি-সাম্যের অভাব ঘটে এবং পরমাণুগুলি কিছু পরিমাণ শক্তি ও কণিকা ত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত স্থায়ী অবস্থায় যাইবার চেষ্টা করে।

কোন পরমাণুর কেন্দ্রক ভাঙ্গিবার সময় আলফা (alpha), বিটা (beta) বা গামা (gamma) রশ্মি বিকীর্ণ হয়। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বৈজ্ঞানিক বেকরেল (Becquerel) যখন এই রশ্মিগুলি আবিষ্কার করেন, তখন ইহার প্রকৃতি কিরূপ বুঝিতে না পারিয়া, গ্রীক বর্ণমালার প্রথম তিনটি অক্ষর দ্বারা তিনি ইহাদের নামকরণ করেন। বর্ত্তমানে জানা গিয়াছে যে, ইহাদের মধ্যে আলফা ও বিটা-রশ্মি প্রকৃত প্রস্তাবে রশ্মি নহে; প্রথমটি পজিটিভ বিদ্যুতাবিষ্ট হিলিয়াম-(helium)-কেন্দ্রক এবং দ্বিতীয়টি ইলেক্‌ট্রন। সুতরাং আলফা-রশ্মি ও বিটা-রশ্মি না বলিয়া আলফা কণা ও বিটা-কণা বলাই সঙ্গততর। গামা-রশ্মি ও রঞ্জন-রশ্মি একই পদার্থ, কেবলমাত্র গামা-রশ্মির তরঙ্গান্তর (wavelength) অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র।

যদি একটি পাত্রে সামান্য একটু রেডিয়াম রাখা যায় এবং যদি একই সময়ে তাহা হইতে তিন প্রকার রশ্মি বিকীর্ণ হয়, তবে পাত্রটিকে শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রে (magnetic field) রাখিলে তিন প্রকার রশ্মি পৃথক্ করা যায়। ১নং চিত্রে আলফা-কণা ও বিটা-কণা বিপরীত দিকে বাঁকিয়া গিয়াছে, কারণ আলফা-কণা ও বিটা-কণার বিদ্যুতাবেশ বিপরীত; গামা-রশ্মি কোনদিনই বাঁকিয়া যায় না, কারণ গামা-রশ্মি বিদ্যুতাবিষ্ট নহে। আলফা-কণা অপেক্ষা বিটা-কণা বহুগুণ হাল্‌কা, সুতরাং বিটা-কণা অধিক বাঁকিয়া যায়। কোন তেজোবিকিরক পদার্থ হইতে একই সময়ে তিন প্রকার রশ্মি বিকীর্ণ হয় না, পৃথক্ ভাবে আলফা বা বিটা-কণা নির্গত হয়—তবে গামা-রশ্মি যে কোন ক্ষেত্রেই বিকীর্ণ হইতে পারে।

রেডিয়াম ধাতু ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে অবশেষে সীসায় পরিণত হয়। এই পরিবর্ত্তনের সামান্য একটু অংশ, কিরূপে রেডিয়াম A রেডিয়াম D'য়ে পরিণত হয়, তাহার ক্রম ও পদ্ধতি ২নং চিত্রে দেখান হইয়াছে। রেডিয়াম A একটি আলফা-কণা ত্যাগ করিয়া রেডিয়াম B'য়ে পরিণত হইতেছে; রেডিয়াম B একটি বিটা-কণা অর্থাৎ ইলেক্‌ট্রন ত্যাগ করিয়া পরিণত হইতেছে রেডিয়াম C'য়ে। রেডিয়াম C'র ভাঙ্গনে একটু বিশেষত্ব আছে; ইহার শতকরা প্রায় ৯৯ ভাগ বিটা কণা ত্যাগ করিয়া হয় রেডিয়াম C এবং বাকী
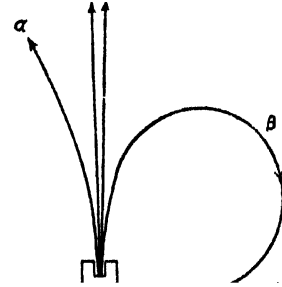
চৌম্বক ক্ষেত্রে আলফা, বিটা ও গামা রশ্মির আচরণ: বামে আলফা-কণা ও দক্ষিণে বিটা-কণার পথ; মধ্যে গামা রশ্মি। [১]

প্রায় একভাগ আলফা-কণা ত্যাগ করিয়া রেডিয়াম C'য়ে পরিণত হয়। রেডিয়ম C' ও C' যথাক্রমে আলফা ও বিটা-কণা ত্যাগ করিয়া রেডিয়াম D'য়ে পরিণত হয়।

কোন বিশিষ্ট মূলপদার্থের প্রত্যেক পরমাণু একই ভাবে গঠিত, প্রত্যেকটির ইলেক্‌ট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যা ও বিন্যাস একই প্রকার এবং প্রত্যেক পরমাণু নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ শক্তির আধার। সুতরাং যখন কোন পদার্থের কেন্দ্রক আলফা-কণা ত্যাগ করিয়া নূতন পদার্থে পরিণত হয়, তখন যে নূতন পদার্থের সৃষ্টি হয় এবং বিটা-কণা ত্যাগ করিলে যাহা সৃষ্ট হয়, তাহা দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ। ইহা ব্যতীত আরও মনে রাখিতে হইবে যে, আলফা-কণা ও বিটা-কণার শক্তি বিভিন্ন, সুতরাং আলফা-কণা অথবা বিটা-কণা ত্যাগ করিলে শক্তিক্ষয়ের পরিমাণও বিভিন্ন হইবে। আলফা-কণা ও বিটা-কণার ভার ও বেগ হইতে শক্তির পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব, কাজেই শক্তির অনপচয়ত্ব নিয়মটি যদি নির্ভুল বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে কোন

পরমাণুর কেন্দ্রকের ও তাহা ভাঙ্গিয়া যে নূতন কেন্দ্রক সৃষ্ট হয়, এই দুইটির শক্তির অন্তর (difference) নির্গত আলফা বা বিটা-কণার শক্তির সমান ; যদি কোন বিশেষ ক্ষেত্রে এই দুইটি সমান না হয় তাহা হইলে বাকী শক্তি গামা-রশ্মি রূপে দেখা যায়।

পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, আলফা-কণা নির্গমনের সময় এই নিয়ম খাটে, কিন্তু বিটা-কণা নির্গমনের সময় ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, যখন কোন কেন্দ্রক মাত্র বিটা-কণা ত্যাগ করিয়া অন্য কেন্দ্রকে পরিণত হয়, তখন নির্গত বিটা-কণার প্রত্যেকটির শক্তির পরিমাণ একই হওয়া উচিত, অবশ্য যদি গামা-রশ্মির উদ্ভব না হয়। রেডিয়াম B যখন রেডিয়াম C'য়ে পরিণত হয়, তখন কেবলমাত্র বিটা-কণা নির্গত হয়, সুতরাং প্রত্যেকটি বিটা-কণার শক্তির পরিমাণ অভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক ; কিন্তু ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে এলিস (Ellis) পরীক্ষা দ্বারা বিপরীত ফলই পাইলেন। এলিসের পরীক্ষা মূলতঃ ১ম চিত্রে প্রদর্শিত পদ্ধতির অনুরূপ। প্রত্যেক বিটা-কণার শক্তির পরিমাণ সমান হইলে সকলটি সমভাবেই বাঁকিয়া যাইবে, কিন্তু বিটা-কণাগুলি একটি ফটো তুলিবার প্লেটের উপর পড়িতে দিয়া দেখা গেল যে, তাহা ঘটে না, প্লেটের এক স্থানে না পড়িয়া বিটা-কণা বিভিন্ন স্থানে পড়ে।
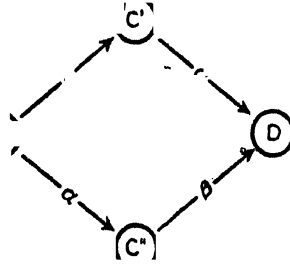
এলিসের পরীক্ষা হইতে দুইটি মাত্র সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে—হয় শক্তির অনপচয়ত্ব নিয়মটি নির্ভুল নহে, অথবা বিটা-কণার সহিত অন্য কোন রশ্মি বা কণিকা নির্গত হয়, যাহার অস্তিত্ব উপযুক্ত পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করা যায় না। শক্তির অনপচয়ত্ব নিয়মটির সত্যতা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের কিঞ্চিৎ ভয়মিশ্রিত ভক্তি থাকায় তাঁহারা সহজে ইহাকে ত্যাগ করিতে রাজি নহেন, কাজেই দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি মানিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জোমারফেল্ডের (Sommerfeld) প্রখ্যাত শিষ্য পাউলি (Pauli) এই সম্বন্ধে নূতন মতবাদ প্রচার করেন এবং এই অদৃশ্য কণিকার নামকরণ করিলেন 'নিউট্রিনো' (neutrino)। ইহা নিশ্চিত যে, 'নিউট্রিনো' বিদ্যুতাবিষ্ট নহে, কারণ বিদ্যুতাবিষ্ট হইলে চৌম্বক ক্ষেত্রে তাহার পথ বাঁকিয়া যাইত এবং তাহার অস্তিত্ব এতদিনে সহজেই ধরা পড়িত। পাউলি প্রচার করিলেন যে, ইহা যে কেবলমাত্র অনাবিষ্ট তাহা নহে, স্থির অবস্থায় ইহার ভার কিছুই নাই এবং বেগ-বৃদ্ধি হইলে বেগের সহিত ইহার ভার শূন্য হইতে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। বর্তমান মতবাদ অনুসারে সকল জিনিসের ভার তাহার বেগের উপর নির্ভর করে, সুতরাং নিউট্রিনোর অস্তিত্ব মানিয়া লওয়া আপাততঃ খুব কঠিন নহে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মুশকিলের কথা এই যে, আজ পর্য্যন্ত নিউট্রিনো পৃথক্ করা যায় নাই। ইতালীয় বৈজ্ঞানিক ফের্মি (Fermi) পাউলির মতবাদের গণিতসম্মত রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত আধুনিক মতবাদগুলি বাঁচাইয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার সহিত পরীক্ষামূলক ঘটনার মিল নাই। সুতরাং বর্তমানে নিউট্রিনো-মতবাদের আদর যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে। মার্কিন বৈজ্ঞানিক বেনব্রিজের (Bainbridge) মতে নিউট্রিনোর সাহায্যব্যতিরেকে কয়েকটি আইসোবারের[১] অস্তিত্ব সম্ভব নহে।

দুইজন জার্মান বৈজ্ঞানিক বেক ও জিটের (Beck and Gitte) মতে বিটা-কণার সহিত পজিট্রন নির্গত হয়। দিরাক্ (Dirac) দেখাইয়াছেন যে, শক্তি রূপান্তরিত হইয়া একই সময় একটি ইলেকট্রন ও একটি পজিট্রন সৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু পজিট্রন তৎক্ষণাৎ কেন্দ্রক কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া তাহার সহিত যুক্ত হয় এবং ফলে কেবল-মাত্র ইলেকট্রন বা বিটা-কণার নির্গমন হয় বলিয়া বোধ হয়।

-α- আলফা-কণানির্গম
-β- বিটা-কণানির্গম। [২]

নিউট্রিনো সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আজ পর্য্যন্ত পৌছান যায় নাই। শক্তির অনপচয়ত্বের সার্ব্বজনীন সত্যতা সম্বন্ধেও বৈজ্ঞানিকগণ সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন। সংখ্যা গণিত Statistical Mechanics) হিসাবে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম গড়পড়তা হিসাবে সত্য বটে, কিন্তু বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখিতে গেলে সত্য না হইতেও পারে। শক্তির অনপচয়ত্ব সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে সত্য, কিন্তু পরমাণুর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ইহার ব্যতিক্রম হওয়া স্বাভাবিক বলিয়া অনেকেই মত প্রকাশ করিতেছেন।

বৈজ্ঞানিক গণ্ডী

মার্কিন মুল্লুকের তথাকথিত সভ্যতা যে পরিমাণে বাড়িতেছে, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, গুমখুন প্রভৃতিও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইতেছে। পিস্তল দেখাইয়া ঘর হইতে লোক ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহার বা তাহার আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে মুক্তিপণ আদায় করা আমেরিকায় প্রায় আর্টের কোঠায় পৌঁছাইয়া গিয়াছে এবং এরূপ ঘটনা সেখানে প্রাত্যহিক হইয়া

১। Isobar (Iso = সমান, Bar = ভার ; সমভার)— সমভার অথচ ভিন্ন ধর্ম্মবিশিষ্ট মূলপদার্থ।

দাঁড়াইয়াছে। লিণ্ডবার্গের শিশুপুত্রের ন্যায় শোচনীয় পরিণাম সেখানে বহু লোকেরই ঘটিয়াছে। সুতরাং সেখানে সাধারণ ও বদমায়েস লোকের মধ্যে বুদ্ধির যুদ্ধ লাগিয়াই আছে।

কোন বদমায়েস্ লোক গৃহে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই যাহাতে গৃহস্থ তাহার আগমন-সংবাদ পান এবং সাবধান হইতে পারেন, তাহার জন্য 'টেলিটেক্টর' (Teletector) নামক একপ্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং বহু গৃহে এবং মিউজিয়াম, ব্যাঙ্ক প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইতেছে।

এই যন্ত্রে বেতার তত্ত্বের সাহায্য লইয়া দরজা, জানালা প্রভৃতি যেখান হইতে অনধিকার প্রবেশ করা সম্ভব, তাহার চতুর্দ্দিকে অদৃশ্য রশ্মির গণ্ডী রচনা করা হয়। এই অদৃশ্য রশ্মিরেখা কোনরূপে বিচ্ছিন্ন হইলেই তৎক্ষণাৎ ঘণ্টা বাজিয়া উঠে এবং সকলকে সতর্ক করিয়া দেয়। এই রশ্মি কোন প্রকারে ক্ষতিকর নহে এবং ইচ্ছামত বন্ধ করা যাইতে পারে।

কৃত্রিম ভূমিকম্প

কৃত্রিম ভূমিকম্পের সাহায্যে জমির কত নীচে পাথরের স্তর আছে, তাহা ঠিক ভাবে নির্ণয় করিতে বৈজ্ঞানিকগণ সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। জমির কত নীচে পাথর আছে, তাহা গৃহ, সেতু ও রাস্তা নির্ম্মাণ করিবার জন্য জানা প্রয়োজন হয়।

ডাইনামাইট বা অন্য কোন বিস্ফোরক দ্বারা শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি করা হয়। এই শব্দতরঙ্গ মাটি ও পাথরের মধ্য দিয়া বিভিন্ন বেগে প্রসারিত হয়; মাটির মধ্যে এই তরঙ্গের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১,০০০ হইতে ৬,০০০ ফুট এবং পাথরের মধ্যে ইহার বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১৬,০০০ হইতে ২০,০০০ ফুট।

যে স্থানে বিস্ফোরণ করা হয়, তাহার কিছু দূরে কয়েকটি নির্দ্দেশক (detector) থাকে। বৈদ্যুতিক তার দ্বারা বিস্ফোরণের কেন্দ্র ও নির্দ্দেশকগুলির সহিত একটি ভূকম্পন-নির্দ্দেশক যুক্ত করা থাকে। যে সময় বিস্ফোরণ হয়, তাহা ঐ যন্ত্রে চিহ্নিত হইয়া যায়। শব্দতরঙ্গ কেবলমাত্র মাটি ভেদ করিয়া এবং মাটি ও পাথর ভেদ করিয়া নির্দ্দেশককে আঘাত করে এবং শব্দতরঙ্গ বিভিন্ন স্তর ভেদ করিয়া আসিতে কত সময় লাগে, তাহা যন্ত্র দ্বারা পরিমাণ করা যায়। এই শব্দের বেগ ও সময়ের পরিমাণ হইতে জমির কত নীচে পাথর আছে ঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়।

(ক) বিস্ফোরণ, (খ) ভূকম্পন-নির্দ্দেশক যন্ত্র, (গ) বৈদ্যুতিক তার, (চ) জমি, (ছ) নির্দ্দেশক (জ) মাটি, (ঝ) মাটির মধ্য দিয়া মন্থরগতি শব্দতরঙ্গ, (ট) জমি হইতে পাথরের স্তরের দূরত্ব।

চশমার নূতন ধরণ

যে সমস্ত চশমা-পরা লোককে অধিকাংশ সময় শুইয়া কাটাইতে হয়, তাঁহাদের পক্ষে বই পড়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য সংপ্রতি বিলাতে এক প্রকার নূতন ধরণের চশমা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে প্রতিফলক প্রিজ্‌ম্ (reflecting prism) সাহায্যে এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, দৃষ্টিরেখা চক্ষুর সহিত সমতল না হইয়া লম্বভাবে থাকে, অর্থাৎ দাঁড়াইয়া থাকিলে এই চশমার সাহায্যে মেঝের জিনিস দেখা যাইবে, কিন্তু সামনের জিনিস দেখা যাইবে না। এই প্রকার চশমায় রোগীদের পড়িবার সাহায্য হইবে।
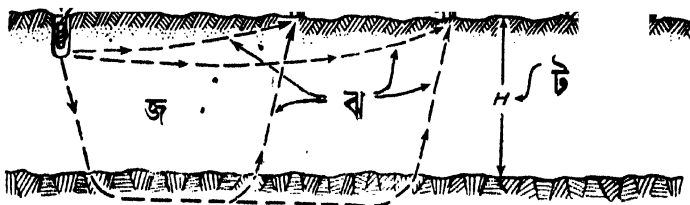
দরিদ্রের প্রতি অত্যাচার-নিবারণে বিজ্ঞান

বিলাতের বৈজ্ঞানিক কর্ম্মিসংঘ (Association of Scientific Workers) গত ২০শে মে তারিখে একটি সভা আহ্বান করেন।

সভায় বিজ্ঞানের অপব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় এবং বৈজ্ঞানিকদের সমবেত চেষ্টায় যাহাতে দরিদ্রের প্রতি অত্যাচার নিবারণ করা যায় এবং তাহাদের অবস্থার উন্নতিবিধান করা যায়, তাহার জন্য সকল প্রকার বৈজ্ঞানিকদের সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। সভার অধিবেশন হয় লণ্ডনের য়ুনিভার্সিটি কলেজে। বিজ্ঞানের সকল শাখার প্রতিনিধিই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

নূতন ধরণের চশমার ব্যবহার-বিধি।

মহাকাশ-রশ্মি (cosmic ray) সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপক ব্ল্যাকেট (Blackett) বলেন যে, বৈজ্ঞানিকদের চেষ্টায় জাতীয় সম্পদ্ বৃদ্ধি পায়। যদি মনে করা যায় যে, জাতীয় সম্পদ্ শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি করা সম্ভব, তাহা হইলে দেখিতে হইবে এই বর্দ্ধিত সম্পদ্ কাহাদের ভাগে

আসে? অধ্যাপক ব্ল্যাকেট প্রমাণ করেন যে, বিলাতের ধন-সম্পদ্ অত্যন্ত বিসদৃশভাবে বিভক্ত এবং জাতীয় সম্পদ্-বৃদ্ধির অধিকাংশ অপেক্ষাকৃত বড় লোকদের ভোগে আসে।

নিরাপদ বৈদ্যুতিক পাখা।

যাহাদের বাৎসরিক আয় ১ লক্ষ পাউণ্ড, তাহারা প্রতি বৎসরে প্রায় ১০ হাজার পাউণ্ড আয় বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু যাহাদের আয় বৎসরে মাত্র একশত পাউণ্ড, তাহাদের আয়বৃদ্ধি বৎসরে ১০ পাউণ্ডের বেশী হইতে পারে না। অধ্যাপক ব্ল্যাকেট আরও বলেন যে, বৈজ্ঞানিকদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, যাহারা বৎসরে গড়ে মাত্র ১৪০ পাউণ্ড আয় করে, তাহাদের আয়-বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা। কি কি উপায় অবলম্বন করিলে ধনবৈষম্যের অবসান করা যায়, সে সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার সময় আসিয়াছে বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করেন।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্রূণতত্ত্ববিদ্ ডক্টর নিডহাম (Dr. Needham) দেখান যে, ব্রিটিশ সরকার বিজ্ঞানের জন্য নিম্নলিখিতভাবে খরচ করেন:—

চিকিৎসা-বিষয়ক গবেষণা	১,৪০,০০০ পাউণ্ড
শিল্প-বিষয়ক গবেষণা	৪,৪০,০০০ পাউণ্ড
সামরিক গবেষণা	২৭,৫০,০০০ পাউণ্ড

সামরিক গবেষণার ২৭॥ লক্ষ পাউণ্ডের মধ্যে কেবলমাত্র মারণ-গ্যাস সম্বন্ধে গবেষণার জন্য ১॥ লক্ষ পাউণ্ড খরচ করা হয়। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, লোকের প্রাণরক্ষার কার্য্যের জন্য খরচ করা হয় মাত্র ১ লক্ষ ৪০ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ প্রাণিরক্ষা অপেক্ষা প্রাণিহরণ করা বেশী প্রয়োজনীয়। মানুষের সুখ-সম্পদ্ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা না করিয়া বিজ্ঞান প্রয়োগ করা হইতেছে অভিনব ও ভয়াবহ মারণাস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে।

পদার্থবিদ্ ডক্টর বার্ণাল (Dr. Bernal) বলেন যে, বর্ত্তমান জ্ঞানের প্রয়োগ কিরূপ হইতেছে, তাহা দেখা বৈজ্ঞানিকের কর্ত্তব্য। তিনি বলেন যে, বিলাতের শতকরা ৭০ হইতে ৮০ ভাগ লোকের স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হয় না, তাহাদের অধিকাংশ যে-সকল রোগে মারা যায়, সেগুলি অনায়াসেই নিবারণ করা সম্ভব। তাঁহার মতে সাধারণ লোকের আয়ু অনায়াসেই ১০ হইতে ১৫ বৎসর বাড়ান যাইতে পারে। দেশের রাজনৈতিকগণ যাহাতে এই সম্বন্ধে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করেন এবং সেই শিক্ষা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারেন, সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

প্রাণিতত্ত্ববিদ্ ডক্টর ম্যারাক খাদ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে সরকারের ঔদাসীন্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং বলেন যে, বিলাতে শিশুদের মধ্যে শতকরা ২০ হইতে ২৫ ভাগ যথোপযুক্ত খাদ্য পায় না।

ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের বিদেশে সম্মান

সংপ্রতি লক্ষ্ণৌ-বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ্‌বিদ্যার অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত বীরবল সাহনী সুবিখ্যাত বিজ্ঞান-পরিষদ্ রয়াল সোসাইটির সভ্য (F. R. S.) নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইঁহার পূর্ব্বে আরও চারজন ভারতীয় রয়াল সোসাইটির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—মাদ্রাজের রামানুজম্ প্রথম, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু দ্বিতীয়, অধ্যাপক রমণ তৃতীয় ও অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা চতুর্থ।

নিরাপদ বৈদ্যুতিক পাখা

ধাতুনির্ম্মিত সাধারণ বৈদ্যুতিক পাখা অনেক সময় আকস্মিক দুর্ঘটনার কারণ হইয়া থাকে। চারিদিকে তারের বেষ্টনী দেওয়া সত্ত্বেও ঐ প্রকার পাখা সকল সময়ে নিরাপদ নহে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য শক্ত ও স্থিতিস্থাপক রবারনির্ম্মিত এক প্রকার পাখার উদ্ভব হইয়াছে। ইহাতে হাত লাগিলে কাটিয়া যাইবার কোন সম্ভাবনা নাই, সুতরাং ইহাতে কোন প্রকার আবেষ্টনীর প্রয়োজন হয় না। তাহা ছাড়া এই পাখার ব্লেডগুলি এরূপভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে যে, ইহাতে কোনরূপ শব্দ হয় না।

ষ্টিম-চালিত মোটর-সাইকেল

পুরাতন মোটর-সাইকেলের অংশ লইয়া জনৈক আমেরিকান একটি ষ্টিম-চালিত মোটর-সাইকেল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহাতে কোনরূপ গিয়ার নাই। ইহা ঘণ্টায় ১ হইতে ৫০ মাইল পর্য্যন্ত যে কোন ভাবে চালান যায়। এঞ্জিনটিতে ২টি সিলিণ্ডার আছে। বয়লারটি ৫০০ পাউণ্ড চাপ সহ্য করিতে পারে, যদিও সাধারণতঃ ২৫০ পাউণ্ডের অধিক চাপ ব্যবহার করা হয় না। এঞ্জিন ঠাণ্ডা হইয়া গেলে চালাইবার জন্য পুনরায় ষ্টিম করিতে মাত্র ২০ মিনিট সময় লাগে। বয়লারটিতে পেট্রল জ্বালাইয়া ষ্টিম তৈয়ারী করা হয়। পেট্রলের পরিবর্ত্তে কেরোসিন তৈলও ব্যবহার করা চলিতে পারে। ষ্টিম-চালিত হওয়া সত্ত্বেও ইহাতে বিশেষ শব্দ হয় না।

ষ্টিমচালিত মোটর-সাইকেল।

শান্তি-প্রচেষ্টায় স্বাধীনতাবাদ

—রেজাউল করীম

প্রত্যেক দিনের সংবাদ-পত্র, আবার আসন্ন একটি মহাযুদ্ধের সংবাদ বহন করিয়া আনিতেছে। জার্ম্মানী, ইটালী ও জাপান একরকমতঃই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত এবং তলে তলে ইউরোপের সকল জাতিই অল্পাধিক প্রস্তুত। এতদিন ধরিয়া ইউরোপে শান্তি-বৈঠক, নিরস্ত্রীকরণ-বৈঠক ইত্যাকার যতগুলি বৈঠক হইয়াছে, সমস্তই কি ব্যর্থ হইল? জাতিতে জাতিতে হিংসাদ্বেষ দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। এক জাতি অপর জাতিকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না, ফলে, চারিদিকে অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা শুনা যাইতেছে। আমরা "পরাধীন" জাতি, "স্বাধীন" জাতিদের এই ভয়াবহ সমরোন্মাদনা হইতে আমাদের কি কিছুই শিক্ষা করিবার নাই? আমাদের মতে—স্বাধীনতার বর্ত্তমান নীতি জগতে যতদিন প্রবল থাকিবে, ততদিন প্রকৃত শান্তি কোথাও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ঐ নীতি প্রত্যেক শান্তি-প্রচেষ্টার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। জগতের সর্ব্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে স্বাধীনতার এই নীতি পরিহার করিতে হইবে—নতুবা কেবলমাত্র যুদ্ধ-বিরতিতে প্রকৃত শান্তি সূচিত হইতে পারে না। জগতের সহস্র সহস্র বৎসরের ইতিহাস এই কথাই ঘোষণা করিতেছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে মহাযুদ্ধের পরে স্বাধীনতার এই নীতি ইউরোপকে কি পঙ্কিল আবর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহাই আলোচিত হইয়াছে।

বিগত মহাসমরের অবসানের পর কিছু দিনের জন্য সাময়িক ভাবে জগতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই শান্তিকে বলবৎ রাখিবার জন্য একে অপরের সহিত নানা প্রকার চুক্তি ও সর্ত্তের দ্বারা আবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু, কোথাও শান্তির 'আবহাওয়া' সৃষ্ট হয় নাই; বরং চুক্তিতে আবদ্ধ প্রত্যেক দেশেই যুযুৎসু মনোবৃত্তি (war mentality) প্রবল হইয়া আছে। হঠাৎ যে কোথাও যুদ্ধ হইতেছে না, তাহা যুদ্ধের প্রতি বিতৃষ্ণা বা বিরাগ-ভাবের জন্য নয়—কেবল সুযোগের অভাবপ্রযুক্ত। সুযোগের অপেক্ষা মাত্র এবং উপযুক্ত সময়ে সুযোগ উপস্থিত হইলেই, সকলেই যে মার্-মার্ কাট্-কাট্ রবে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়াই উহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িবে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এ স্থলে একটা কথা স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হয়—মহাযুদ্ধ ত শেষ হইয়াছে, আজ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে। কিন্তু, কোথাও শান্তির মনোভাব কেন প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না? ইহার যথার্থ উত্তর জানিতে হইলে যুদ্ধবিরতির সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রকাশ্য ও গুপ্তভাবে যে সকল ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গিয়াছে এবং যে জঘন্য মনোবৃত্তি লইয়া শান্তির কথা আলোচিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। নতুবা এ সম্বন্ধে বেশী কিছু জ্ঞাত হওয়া যাইবে না। অথচ, এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অসুবিধা এই যে, গুপ্ত বিষয়গুলি জানিবার কোন উপায় নাই। তথাপি প্রতিকূল ও অনুকূল আলোচনা হইতে যতটা জানা গিয়াছে, আমরা তাহারই কিয়দংশ পাঠকবর্গকে উপহার দিব।

১৯১৪ সালের ২৮শে জুলাই মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং প্রায় চারি বৎসর কাল তুমুল যুদ্ধের পর ১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর এই মহাসমর স্থগিত হয়—কারণ ঐ তারিখে জার্ম্মানী অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সাময়িকভাবে সন্ধি করিতে প্রস্তুত হয় এবং তাহার পর যুদ্ধ প্রায় থামিয়া যায়। যুদ্ধের শেষের দিকে যুদ্ধনিরত অনেক জাতি শান্তির জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল, যুদ্ধ যথেষ্ট হইয়াছে, আর যুদ্ধ চাই না, এখন চাই শান্তি। কিন্তু, উক্ত ১১ই নভেম্বরের পূর্ব্বে শান্তিপ্রতিষ্ঠার বাস্তব নিদর্শন কেহই দেখাইতে পারে নাই। তাহার পর হইতে যুদ্ধ বিরত হইল—পুর্ণোদ্যমে যুদ্ধ চালাইবার প্রবৃত্তি কাহারও রহিল না। সুতরাং এক্ষণে সকলের ভাবনা হইল যুদ্ধনিরত জাতির মধ্যে কি প্রকারে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এই শান্তির প্রকৃতি কিরূপ হইবে—যাহারা শান্তি চাহিতেছিল, শান্তির জন্য উন্মত্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিল, তাহাদের সরলতা, সততা, নিঃস্বার্থপরতা ও মানবহিতৈষণার প্রবৃত্তির উপর এই সমস্যার সমাধান সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছিল।

কিন্তু, শান্তির জন্য একদল ব্যাকুলভাবে উদ্গ্রীব হইলেও যুদ্ধবিজয়ী জাতিদের প্রাণ হইতে জিগীষাবৃত্তি একেবারেই বিদূরিত হয় নাই। সাম্রাজ্য-লালসার জন্য যুযুৎসুবৃত্তি ঘোষিত হয়,

তাহা পূর্ণভাবে তৃপ্ত হইল না বলিয়া মনোমধ্যে যুদ্ধমনোবৃত্তি প্রবলভাবে বিদ্যমান রহিল। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা আরও বাড়িয়া গেল। বিজয়ী জাতি নব নব রাজ্যলাভের রঙ্গীণ নেশায় বিভোর হইয়া গেল। এইরূপ মনোবৃত্তির ব্যক্তিগণকে মধ্যস্থ করিলে শান্তি-বৈঠকের যে দুর্দ্দশা হওয়া উচিত, মহাসমরের পর শান্তি-প্রচেষ্টার সময় তাহাই হইল। নামমাত্র শান্তি হইল, অপরাধীর দণ্ডের ব্যবস্থা হইল, বিজেতাগণের পুরস্কারের অঙ্কে কিছু সাম্রাজ্য উঠিল—কিন্তু কোথাও শান্তির আবহাওয়া সৃষ্ট হইল না। মনোবৃত্তির যখন পরিবর্ত্তন হয় নাই, শান্তির আবহাওয়া যখন সৃষ্ট হয় নাই, তখন শান্তির জন্য কথাবার্ত্তা চালান ও আদান-প্রদান, লাভালাভের বিষয় আলোচনা করা ইত্যাদি যাহাই হউক না কেন, তাহার মূলে প্রচণ্ডভাবে কার্য্য করিতেছিল সেই যুযুৎসু মনোবৃত্তি। যে গুপ্ত সন্ধি ও গোপন চুক্তির কারণে এত বড় একটা মহাসমর সম্ভব হইল, এই শান্তি-বৈঠকে শান্তির বিষয় আলোচনা করিবার সময়ও সেই জঘন্য নীতিরই আশ্রয় লইতে হইল। গোপন সন্ধিকে বাস্তবে পরিণত করিতে গিয়াই মহাসমর আরম্ভ হয়। উহার বিরতির সময় সেই গোপন সন্ধি ও চুক্তিনামাই প্রবল হইয়া ভবিষ্যতের জন্য নূতন আকারে মহাসমরের পথ উন্মুক্ত করিয়া রাখিল। সাম্রাজ্যবাদ-নীতি রহিলই, তা' ছাড়া রহিল এই গোপন সন্ধি ও চুক্তি অর্থাৎ যুদ্ধের আদি কারণ নিবারিত হইল না, তৎসত্ত্বেও শান্তি-প্রতিষ্ঠার কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। ইহাতে যে প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না তাহা বলাই বাহুল্য। তাই মহাসমরের অবসানের পর ১৯১৮-১৯২০ সালের মধ্যে বিজয়ী জাতিগণ যে মনোবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিলেন, তাহা কতকটা যুদ্ধ-ঘোষণার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের মত—এত লোক-ক্ষয়কর যুদ্ধ সত্ত্বেও ইউরোপের কিছুই শিক্ষা হইল না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মহাসমরের আর একটা প্রধান কারণ গোপন চুক্তি—সমরের মধ্যেও পরেও এই গোপন চুক্তির আশ্রয় লওয়া হইল। যুদ্ধ তখন প্রবল উদ্যমে চলিতেছে—সেই সময় গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে এই ভাবে একটা গোপন চুক্তি হয় যে, যদি ভবিষ্যতে শান্তি ও মীমাংসা হয়, তবে একে অপরকে নূতন রাজ্যপ্রাপ্তি বিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিবে—রাশিয়া পাইবে কনস্ট্যানটিনোপল ও সমুদয় পোলাণ্ড, ফরাসী পাইবে আলসাস লোরেন এবং সে রাইন নদীর তীরবর্ত্তী জার্ম্মান প্রদেশের উপর কর্তৃত্ব করিবে, আর ব্রিটেন পাইবে জার্ম্মানীর সমুদয় উপনিবেশগুলি। যুদ্ধারম্ভের কিছুদিন পরেই এইরূপ চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। সেই সময় এই ত্রিশক্তির মিত্রতাকে দৃঢ় ও সবল করিয়া রাখিবার প্রয়োজন হইতেই এইরূপ প্রলোভনপূর্ণ চুক্তি-পত্র প্রস্তুত হয়—যেন একত্র ও সংঘবদ্ধভাবে মধ্য-ইউরোপের শক্তিকে কেহ ধ্বংস করিতে না পারে এবং যেন কেহ জার্ম্মানীর কোন প্রলোভনে লুব্ধ হইয়া হঠাৎ যুদ্ধ হইতে সরিয়া না দাঁড়ায়। তারপর যখন ইতালী ও রুমানিয়াকে সেই সমরে নামান হইল, তখন তাহাদিগকেও অনেক আশ্বাসপ্রদ প্রতিশ্রুতি ও প্রলোভন দেওয়া হইয়াছিল। তৎপর ১৯১৬ সালে মিত্রপক্ষীয় শক্তিরা একত্র মিলিত হইয়া আর একটা গোপন চুক্তি প্রস্তুত করিলেন। তাহাতে তুর্কি-সাম্রাজ্যকে ভবিষ্যতে কি ভাবে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লইবেন, তাহারই বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। এই গোপন চুক্তিপত্রে ইহাই স্থির হইল:—রাশিয়া কনস্ট্যানটিনোপল ত পাইবেই, তা' ছাড়া মধ্য ও উত্তর-আরমেনিয়া এবং কৃষ্ণ সাগরের নিকটবর্ত্তী দ্বীপসমূহ তাহাকে দিতে হইবে। ফরাসীকে দিতে হইবে আরমেনিয়ার দক্ষিণ, সাইলেসিয়া প্রদেশ এবং সিরিয়ার উপকূলবর্ত্তী দেশসমূহ। তা' ছাড়া আলেপ্পো, দামাস্‌কাস্, মোজাল প্রভৃতি 'মূল্যবান্' স্থানগুলি তাহাকে দিতে হইবে, তাহার প্রভাবাধীন স্থান-ভাবে (sphere of influence); আর, গ্রেট ব্রিটেন পাইবে মেসোপটেমিয়ার উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং ফরাসীর প্রভাবান্বিত প্রদেশের দক্ষিণস্থ সমুদয় অঞ্চলের উপর সংরক্ষণ ভার (protectorate)। ইটালীকে গোপনে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল যে, লাভের অংশ হইতে সেও বঞ্চিত হইবে না। আনাটোলিয়ার দক্ষিণস্থ অর্দ্ধেক প্রদেশ, তৎসহ কয়েকটি প্রধান প্রধান নগর, যথা:—আদিলিয়া, কোনিয়া এবং স্মার্ণা এইগুলি সে পাইবে। কিন্তু পরে এই যুদ্ধে গ্রীস্ যোগ দেওয়াতে তাহাকেও গোপনে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, স্মার্ণা তাহাকে দেওয়া হইবে। জাপানকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, সেই অঞ্চলের জার্ম্মানীর উপনিবেশ কিয়াচাও এবং বিষুবরেখার উত্তরে প্রশান্ত মহাসাগরের জার্ম্মান-অধিকৃত দ্বীপগুলি সে পাইবে। এইভাবে গোপন

চুক্তিতে আবদ্ধ জাতিগণ মহাসমরের অবসানের পর শান্তি-বৈঠকের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই শান্তি-বৈঠকে যে স্বাধীন আলোচনার পর কোন সিদ্ধান্ত হইতে পারিবে, না, বরং পূর্ব্বের গোপন চুক্তি অনুসারেই যে, সকল বিষয় মীমাংসিত হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

বিজয়ী শক্তিদের মধ্যে যে, এই সকল গোপন চুক্তি হইয়াছিল, তাহা বহুদিন পর্য্যন্ত প্রকাশ পায় নাই। এমন কি যুদ্ধাবসানে যখন চিরস্থায়ী শান্তি-প্রতিষ্ঠার কথা উঠে, তখন অপরাপর জাতিদের কেহই এ সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গ অবগত ছিল না। তাই তাঁহারা সরল হৃদয়ে শান্তির কথাবার্ত্তা আলোচনা করিতেছিল। এই আলোচনার সময় একদিকে ছিল সাম্রাজ্যবাদী চালিয়াৎগণ, তাহারা তাহাদের পূর্ব্বেকার প্রতিশ্রুতিকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রত্যেক সুযোগের সুবিধাগ্রহণে সদাই রত। আর, অন্যদিকে সরলবিশ্বাসী শান্তিপ্রয়াসী ব্যক্তিগণ, তাহারা স্বাধীন আলোচনা দ্বারা একটা সুসঙ্গত মীমাংসায় উপনীত হইবার জন্য সদাই প্রস্তুত। ইহারা সাম্রাজ্যবাদীদের চালবাজী ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারে নাই। আমাদের মনে হয়, প্রেসিডেণ্ট উইলসনও উহাদের এই চাল ও ধাপ্পাবাজী বুঝিতে পারেন নাই। তাই তিনি কতকটা স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া শান্তি-প্রতিষ্ঠার কার্য্যে অগ্রসর হইলেন। তিনি একদিকে যেমন মহাসমরের জন্য জার্ম্মানীকে দোষ দিলেন, অপর দিকে মিত্রশক্তিকে বলিলেন, কাহাকেও বিধ্বস্ত করা হইবে না। বিশেষতঃ, জার্ম্মানীকে ধ্বংস করিতে পাইবে না দণ্ডমূলক ব্যবস্থা, ক্ষতিপূরণের দাবী এসব তিনি অগ্রাহ্য করিলেন। তিনি আরও ঘোষণা করিলেন যে, কাহারও সাম্রাজ্যের অঙ্গচ্ছেদ করা হইবে না, অথবা অর্থনৈতিক লীগ প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরাজিত জাতির নিকট হইতে স্বেচ্ছামত অর্থ আদায় করিতে দেওয়া হইবে না। কিন্তু, সাম্রাজ্যবাদিগণ চালের উপর চাল মারিয়া উইলসনের সাধু উদ্দেশ্যকে পণ্ড করিয়া দিল। কি ভাবে তাহা সম্ভব হইল, এক্ষণে আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

[২]

যুদ্ধ যখন পূর্ণোদ্যমেই চলিতেছিল এবং হারজিতের কথা কেহই নিশ্চয় করিয়া অবগত ছিল না, ঠিক সেই সময় নানা কারণ দেখাইয়া আমেরিকা ইহাতে যোগদান করে। কিন্তু, যোগদান করিলেও এবং মিত্রপক্ষের শক্তি দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইলেও জার্ম্মানী সহজে পরাজিত হইল না। জার্ম্মানী সকলকে ঘোল খাওয়াইল, তবেই পরাজয় স্বীকার করিল। এদিকে যুযুধান জাতিদের প্রত্যেক দেশেই নানা ভাবে অন্তর্ব্বিপ্লব দেখা দিল, তাই সেই সব দেশের সরকার যুদ্ধবিরতির জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু, কে ইহার জন্য প্রথম প্রস্তাব করিবে, ইহাই হইল প্রধান সমস্যার বিষয়। আমেরিকা মিত্রপক্ষে যোগদান করিলেও জার্ম্মানী তাহাকে বিশ্বাস করিত—তাই কতকটা আমেরিকার প্রস্তাবে, বিশেষতঃ প্রেসিডেণ্ট উইলসনের বিখ্যাত চৌদ্দ দফার আশ্বাসে জার্ম্মানী অস্ত্র ত্যাগ করিয়া চিরস্থায়ী সন্ধি করিতে সম্মত হইল।

১৯১৮ সালের ৮ই জানুয়ারী প্রেসিডেণ্ট উইলসন এক ঘোষণা-পত্র দ্বারা চৌদ্দ দফা প্রচার করিলেন। তিনি আরও ঘোষণা করিলেন যে, ইহাই মিত্রশক্তির যুদ্ধের উদ্দেশ্য। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে এই দফাগুলি প্রতিষ্ঠিত হইলেই মিত্রশক্তির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। সংক্ষেপে আমরা সেইগুলি বিবৃত করিতেছি :—

(১) এখন হইতে সর্ব্বদাই শান্তির জন্য সরল মনে খোলাখুলি ভাবে চুক্তি বা সন্ধির কথাবার্ত্তা কহিতে হইবে। প্রত্যেক বিষয় খোলাখুলিভাবে আলোচনা করিতে হইবে এবং ভবিষ্যতে কোনওরূপ গোপন চুক্তি, কূটনীতি, গুপ্তসন্ধি ইত্যাদি কেহই করিতে পাইবে না।

(২) স্ব স্ব দেশের টেরিটোরিয়াল সীমানার বাহিরে উদার সমুদ্রের প্রত্যেক অঞ্চলকে কি শান্তির সময়, কি যুদ্ধের সময়, সকল অবস্থাতেই এবং সর্ব্বদাই জাহাজ চালাইবার জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে। সেই সব সমুদ্রপথ কেবল মাত্র আন্তর্জ্জাতিক কার্য্যের জন্য বন্ধ হইতে পারিবে।

(৩) যতদূর সম্ভব সর্ব্বপ্রকার অর্থনৈতিক বাধা দূর করিতে হইবে।

(৪) প্রত্যেক দেশকে জাতীয় যুদ্ধাস্ত্র হ্রাস করিবার জন্য যথোপযুক্ত গ্যারাণ্টি দিতে হইবে।

(৫) উপনিবেশের উপর দাবী সম্বন্ধে নিরপেক্ষ ও সুবিচার-সঙ্গত মীমাংসা করিতে হইবে এবং তথাকার

অধিবাসীদের স্বার্থরক্ষার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্বত্বাধিকারের দাবী মিটাইবার সময় উপনিবেশের আদিম অধিবাসীদের স্বার্থ সমভাবে বিবেচিত হইবে।

(৬) রুশিয়ার অধীন সমুদয় পররাজ্য ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং বিজিত শক্তিগুলির সাহায্যে সেইগুলিকে স্বায়ত্ত-শাসন দিবার পূর্ণ সুযোগ দিতে হইবে।

(৭) বেলজিয়াম হইতে সম্পূর্ণভাবে বৈদেশিক সকল অধিকার উঠাইয়া লইতে হইবে এবং তাহার পূর্ণ কর্তৃত্বের একটুও লাঘব করা হইবে না।

(৮) জার্ম্মানীর অধিকৃত ফরাসীর সমুদয় প্রদেশ ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং ১৮৭১ সালে ফরাসীর উপর যে অবিচার করা হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার প্রতিকার করিতে হইবে।

(৯) জাতীয়তার ভিত্তির উপর ইটালীর সীমান্ত-প্রদেশগুলি পুনর্গঠিত করিতে হইবে।

(১০) অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর অধিবাসীদিগকে স্বায়ত্ত-শাসন লাভের পূর্ণ সুযোগ দিতে হইবে।

(১১) রুমানিয়া, সার্ভিয়া, মন্টিনিগ্রোর অধিকার ছাড়িয়া দিতে হইবে। সার্ভিয়াকে সমুদ্র-পথের রাস্তা দিতে হইবে, কতকগুলি বলকান রাজ্যকে আন্তর্জ্জাতিক নীতির ভিত্তির উপর নূতনভাবে, অথচ তাহাদের সুবিধা অনুযায়ী পুনর্গঠিত করিতে হইবে এবং ইহাদের মধ্যে মিত্রতার সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে হইবে।

(১২) তুর্কি-সাম্রাজ্যের আদিম তুর্কি অঞ্চলকে পূর্ণ আধিপত্য দিতে হইবে এবং অ-তুর্কি প্রদেশগুলিকে স্বায়ত্ত-শাসন দিবার সুযোগ দিতে হইবে। দার্দ্দেনেলিস্‌কে সকল জাতির জাহাজের জন্য মুক্ত করিয়া দিতে হইবে।

(১৩) পোলভাষী জাতিদিগকে লইয়া একটা স্বাধীন পোলিশ রাজ্য গঠন করিতে হইবে এবং তাহাকে সমুদ্র-পথের রাস্তা দিতে হইবে।

(১৪) ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাজ্যগুলির মধ্যে সদ্ভাব রাখিবার জন্য একটা আন্তর্জ্জাতিক সমিতি স্থাপিত করিতে হইবে, প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাহাদের রাজ্যের সীমানা নির্দ্ধারিত করিবার নিমিত্ত এবং কাহারও মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাহা আপোষে মিটাইবার জন্য সেই সমিতির দ্বারা কতকগুলি কভেনান্ট বা চুক্তি প্রস্তুত করিতে হইবে।

ইহাই হইল উইলসন সাহেবের বিশ্ববিখ্যাত চৌদ্দ দফা।

এই দফাগুলিকে বিজিত জাতিগুলি পরম আদরে গ্রহণ করিল। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইল, সকলেই এই অনুসারে কার্য্য করিয়া বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সহায়তা করিবে। পরাজিত জার্ম্মানী এই চৌদ্দ দফার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর সাময়িকভাবে অস্ত্র ত্যাগ করে এবং তদনুসারে সন্ধি স্থাপিত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহাযুদ্ধের সময়ই প্রত্যেক দেশেই অন্তর্ব্বিপ্লব ধূমায়িত হইতেছিল—অস্ত্রত্যাগের পর জার্ম্মানীতে তাহা প্রবলাকার ধারণ করে, সুতরাং একবার অস্ত্র ত্যাগ করিয়া জার্ম্মানী আর সশস্ত্র হইতে পারিল না। সুযোগ বুঝিয়া মিত্রপক্ষ তাহার উপর চাপিয়া বসিল। উইলসনের চৌদ্দ দফার মূল নীতিকে মিত্রপক্ষ বিশেষতঃ ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইটালী অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে পারে নাই সুতরাং যখন তাহারা দেখিল যে, প্রবল জার্ম্মানী অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছে, তখন চৌদ্দ দফার একটা আদর্শও তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিল না। তাহারা জার্ম্মানীকে দণ্ড দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। চৌদ্দ দফার কথা তুলিয়া মিঃ উইলসন যে শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন, যে মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন চাহিয়াছিলেন, তাহা বিজয়ী জাতির দম্ভপূর্ণ আস্ফালনে ফুৎকারে উড়িয়া গেল। বরং উল্টা ফল ফলিল—পরাজিত জার্ম্মানীকে দমন করিবার জন্য মিত্রপক্ষীয় জাতিনিচয় তথাকথিত শান্তি-বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য প্যারিস্ অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

[৬]

কোনও বৈঠকে যখন শান্তির কথা আলোচিত হয়, সে সময় যদি কাহারও মনে লাভালাভের কথা, প্রতিশোধের কথা এবং দণ্ডের ব্যবস্থার কথা জাগে, দুর্ব্বলকে বা পরাজিতকে দমন করিবার কথা এবং তাহার নিকট সুযোগ বুঝিয়া নিঃশেষে নিঙাড়িয়া নিঙাড়িয়া যতদূর সম্ভব ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া লইবার কথা কাহারও মনোমধ্যে উদিত হয়, তখন সে বৈঠকের নাম আর যাহাই হউক না কেন, তাহাকে

কোনও মতে শান্তি-বৈঠক বলা যাইতে পারে না। তাই যখন মহাসমরবিজয়ী জাতিদের ধুরন্ধর নেতারা শান্তির জন্য প্যারিসের দিকে ধাবিত হইলেন, তখন তাঁহাদের কাহারও অন্তর হইতে যুযুৎসু মনোবৃত্তি একেবারেই বিদূরিত হয় নাই। যে জার্ম্মানী তাঁহাদের এতদূর সর্ব্বনাশ সাধন করিল, বিশ্বময় মহাসন্ত্রাস সৃষ্টি করিল, তাহাকে সমুচিত দণ্ড দিতে হইবে, তাহার সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য কাড়িয়া লইতে হইবে, তাহার নিকট হইতে প্রচুর ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া লইতে হইবে, তাহার সকল ক্ষমতা হ্রাস করিয়া তাহার বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে—ইত্যাকার বিষয় হইল তাঁহাদের মূল আলোচ্য বিষয়। তাঁহারা ভাবিলেন, এই যুদ্ধে জার্ম্মানী যদি জয়ী হইত, সে কি তাঁহাদিগকে সায়েস্তা না করিয়া ছাড়িত? তাঁহাদিগকে কোনওরূপ সুবিধা দিতে সম্মত হইত? আজ যখন মিত্রপক্ষীয়রা জয়ী হইয়াছেন, তখন কেন তাঁহারা জার্ম্মানীকে কোনরূপ সুবিধা দিতে যাইবেন? ধ্বংস কর জার্ম্মানীকে—কাড়িয়া লও উহার অস্ত্রশস্ত্র, এই হইল তাঁহাদের হুমকী। ফ্রান্সের ক্লেমেনসোঁ, ইটালীর ওরলান্ডো জার্ম্মানীর জন্য চরম দণ্ডের ব্যবস্থা করিতে উপদেশ দিলেন।

ইংলণ্ডের মন্ত্রীবর লয়েড জর্জ্জের অভিমত, জার্ম্মান-সম্রাট কাইজারকে ফাঁসীকাঠে ঝুলাইয়া দাও এবং জার্ম্মানীর নিকট হইতে তাহার সর্ব্বশেষ মুদ্রাটি পর্য্যন্ত কাড়িয়া লও। আমেরিকার অনেকে, এমন কি দুইজন ভূতপূর্ব্ব সভাপতি (রুজভেল্ট ও টাফট) অভিমত দিলেন, মুক্ত সভায় বসিয়া কোনও রূপ আপোষ-পরামর্শ দ্বারা জার্ম্মানীর সমস্যার মীমাংসা হইবে না, বিচারালয়ে অভিযুক্ত করিয়া তাহাকে দণ্ড পাইতে হইবে। ইহাদের মধ্যে কেবলমাত্র উইলসন জার্ম্মানীকে চরম দণ্ড দিবার বা একেবারে ধ্বংস করিবার বিরোধী ছিলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন, শান্তি-বৈঠক একটা ভীমরুলের চাক—আর ক্ষিপ্ত ভীমরুলগণ বিপর্য্যস্ত জার্ম্মানীকে ক্ষতবিক্ষত করিবার জন্য চারিদিকে উড়িয়া বেড়াইতেছে।

১৯১৯ সালে প্যারিসে শান্তিসভার অধিবেশন হয়। তাহাতে বিজেতা ও বিজিত অনেকেই যোগদান করেন, কিন্তু কোন্ কোন্ ভিত্তিতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহার একটা খসড়া রচনা করিবার জন্য যে সাময়িক বৈঠক হয়, তাহাতে বিজিত জাতি স্থান পায় নাই। বিজয়ী জাতিদের অধিকাংশের মতে ইহাই স্থির হইল, যাবৎ দিগ্বিজয়িগণ সন্ধির একটা মুসাবিদা না করিতে পারেন, তাবৎ শত্রুপক্ষীয় অর্থাৎ বিজিত জাতির কাহাকেও এই বৈঠকে আসন দেওয়া হইবে না। অর্থাৎ, কি ভাবে শান্তি হইবে, শত্রুদিগকে কি কি দেওয়া হইবে না হইবে, এই সকল বিষয় তাঁহারাই পূর্ব্ব হইতে ঠিক করিয়া লইবেন, তারপর একটা তথাকথিত বৈঠকে বিজিতদিগকে ডাকিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্ত শুনাইয়া দিবেন—"তোমাদের সম্বন্ধে আমরা সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে এই ব্যবস্থা করিলাম, মানিতে হয় ভাল, নতুবা সরিয়া পড়, আমরাই তাহার ব্যবস্থা করিব।" সুতরাং, উইলসন সাহেব তাঁহার চৌদ্দ দফায় যে স্বাধীন আলোচনা দ্বারা কোনও বিষয় সিদ্ধান্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা ফুৎকারে উড়িয়া গেল।

১৯১৯ সালের ১৮ই জানুয়ারী প্যারিস-কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সভাপতি উইলসন যে চির-অভিশপ্ত গুপ্ত সমিতি, গোপন চুক্তিনামা ইত্যাদির বিরোধিতা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারই উপস্থিতির কালে তাহাকেই প্রধান অস্ত্র রূপে অবলম্বন করা হইল। সভার কার্য্যধারাগুলি জাঁকজমকের সহিত কিন্তু 'যেন তেন প্রকারেণ' সম্পন্ন হইয়া গেল। কারণ কাহারও মনে বিন্দুমাত্র সরলতা ও পবিত্রভাব ছিল না, নিখিল বিশ্বের কল্যাণকামনাও কাহারও আদর্শ ছিল না। প্রকাশ্য সভা খুবই কম হইয়াছিল, অধিকাংশ আলোচ্য বিষয়ের মীমাংসার ভার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কমিটি অথবা গুপ্ত সমিতির উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। যে সকল বিষয়ে সমুদয় মিত্রপক্ষের প্রতিনিধিদের পূর্ণ সম্মতি ছিল এবং যাহা গ্রহণ করিতে ও করাইতে তাঁহারা একমত হইয়াছিলেন, কেবল সেইগুলি একাধিক হইয়াছিল ও পরাজিত জাতিদিগকে তাহার ফলাফল শুনাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কয়েক মাস ধরিয়া লয়েড জর্জ্জ, ক্লেমেনসোঁ, ওরলাণ্ডো ও উইলসন, এই চারি ধুরন্ধরা প্যারিস-কংগ্রেসের প্রধান বিষয়গুলি আলোচনা করিয়া একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং তাহারই শেষ সমর্থনের জন্য কংগ্রেসের একটি পূর্ণ অধিবেশনে হয় এবং বলা বাহুল্য, তাহা একরূপ বিনা বাধায় গৃহীত হইল।

অষ্ট্রিয়ার অস্ত্রত্যাগের পূর্ব্বেই সভাপতি উইলসন তাঁহার চৌদ্দ দফার দোহাই দিয়া জর্ম্মানীকে অস্ত্র ত্যাগ করাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহারই উপর নির্ভর করিয়া যখন সে

তালি কাড়িয়া, তথন কেহই প্রতিশ্রুতি-রক্ষার প্রতি সজাগ ছিলেন না, বরং বাগে পাইয়া সকলেই জার্মানীকে বধ করিতে উদ্যত হইল। তাই প্যারিস-কংগ্রেসের কোনও বৈঠকেই মিত্রপক্ষ চৌদ্দ দফাকে ভিত্তি করিয়া কোনও বিষয়ই আলোচনা করিতে দিলেন না। তুড়ি দিয়া উইলসনের সব আদর্শ উড়াইয়া দিলেন। বেচারা উইলসন! তিনি আর কি করিবেন—অবশেষে নাচার হইয়া তাঁহাদের কথামত শান্ত শিশুটির মত চলিতে লাগিলেন। এই ভীমরুলের চাকে চৌদ্দ দফার প্রথম তের পয়েন্ট টিকিবে না বুঝিয়া তিনি আর সে সম্বন্ধে কোনরূপ উচ্চবাচ্য করিলেন না। অবশেষে শেষ পর্য্যন্ত একটা জাতিসংঘ স্থাপন করাকেই তাঁহার জীবনের ব্রত বলিয়া মনে করিলেন। বড় বড় শক্তিধর জাতিদিগের নিকট এই জাতিসংঘ স্থাপন করিবার সহায়তা পাইব, এই প্রতিশ্রুতিতে তিনি অবশিষ্ট তের পয়েন্টের গুরুত্ব কমাইয়া দিতে সম্মত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, যদি জাতিসংঘ স্থাপিত হয়, তবে অবশিষ্ট তের পয়েন্ট পরে কাহারও দ্বারা গৃহীত করাইয়া লইতে বেগ পাইতে হইবে না। আর শক্তিধর জাতিগুলি ভাবিল, হউক না কেন জাতিসংঘ, সেখানে ত আমরাই প্রভুত্ব করিব—সেখানে তের পয়েন্টের এক পয়েন্টও গ্রহণ করিব না।

এই জাতিসংঘের মোহে উইলসন সব হারাইলেন। তিনি তের পয়েন্ট পরিত্যাগ করিলেন, ধরিয়া রাখিলেন শেষ পয়েন্ট, আর তাঁহারা শেষ পয়েন্টটি স্বীকার করিলেন, কিন্তু উড়াইয়া দিলেন মূল্যবান্ তেরটি পয়েন্ট।

প্রথম পয়েন্ট, যথা—খোলাখুলিভাবে আলোচনা করিয়া সব বিষয় সিদ্ধান্ত করিতে হইবে—এই নীতি মহাসমরের পর প্রথম শান্তি-বৈঠকে স্বীকৃত হইল না, তাহা আমরা দেখিলাম। দ্বিতীয় পয়েন্ট, সমুদ্র-পথের স্বাধীনতা—ইহা ইংলণ্ডের বাধায় টিকিল না, কেবল মাত্র কথাবার্ত্তা দ্বারা ইংরাজ ইহাকে উড়াইয়া দিল। এই ভাবে একে একে তেরটি পয়েন্ট বিজয়ী জাতিদের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বেমালুম হজম হইয়া গেল। উইলসন সাহেব মিত্রপক্ষের হাতের খেলার সামগ্রী হইয়া পড়িলেন। না হইল জার্ম্মানীর প্রতি সুবিচার, না হইল বিজিত জাতিদের প্রতি একটুও ন্যায়াচরণ ও কোমল ব্যবহার। লভ্যাংশ যাহা, তাহা সবই পাইল বিজয়ী জাতি। পূর্ণমাত্রায় জার্ম্মানীর উপর প্রতিশোধ লওয়া হইল।—তাহার উপর অর্থনৈতিক দায়িত্বের সকল ভার চাপান হইল—তাহার রণতরীগুলির কর্ত্তৃত্বভার কাড়িয়া লওয়া হইল। তাহার কতক দেশ লইল ফরাসী, তাহার বৈদেশিক উপনিবেশ লইল ইংরাজ ও জাপান।

এই ভাবে জার্ম্মানীর সমস্যা সমাধান করিয়া মিত্রপক্ষীয় শক্তিচতুষ্টয় তাহাকে তাহাই গ্রহণ করিতে বলিল। কিন্তু, জার্ম্মানীর প্রতিনিধি কাউণ্ট ব্রকডার্ফ রাণ্টজা বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে জানাইলেন, ইহা ত চৌদ্দ দফার বিপরীত—জার্ম্মানী চৌদ্দ দফার আশ্বাসেই অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছিল। সুতরাং এইরূপ আমূল পরিবর্ত্তিত ব্যবস্থা জার্ম্মানী গ্রহণ করিতে পারে না।—চৌদ্দ দফার অমর্য্যাদা করাতে সমগ্র জার্ম্মানীতে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল। কিন্তু, জার্ম্মানী তথন হতোদ্যম ও হতবল হইয়া পড়িয়াছে, মিত্রপক্ষের ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিলেও তাহা সরাসরি পরিত্যাগ করিতে পারিল না। বহু চিন্তা ও বাদানুবাদের পর অবশেষে নিরুপায় হইয়া শেষ দিনে জার্ম্মানীর জাতীয় সমিতি মিত্রপক্ষের ব্যবস্থা বিনা সর্ত্তে গ্রহণ করিতে ভোট দিল (১৯১৯ সাল ২৩শে জুন)।

[৪]

অতঃপর জার্ম্মানীর সহিত এই সন্ধিপত্রকে আরও পাকাপাকি করিয়া লইবার জন্য এবং অন্যান্য পরাজিত জাতির শক্তি আরও হ্রাস করিবার জন্য, বিশ্ব-শান্তির নামে ভার্সাই সন্ধি হয়। যে তারিখে ভার্সাই সন্ধির জন্য প্রথম সভা হয়, সেদিন ইউরোপের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে; কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই দিনই অষ্ট্রিয়ার আর্কডিউক নিহত হন। ১৯১৯ সালের সেই ২৩শে জুন যে একত্রিশটি জাতি জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহারা, (জার্ম্মানীর সম্রাট্ নহে) তাহাদের জাতীয় সমিতির প্রতিনিধির দ্বারা ভার্সাই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত করাইয়া লয়। যুদ্ধের পঞ্চবার্ষিক দিনে বিশ্ব-সমর সম্পূর্ণভাবে শান্ত হয়—সেই সঙ্গে জার্ম্মানীর হোহেনজোলার্ণ রাজবংশের যবনিকাপাত হয়।

নানা কারণে ভার্সাই সন্ধি ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইবে। ইহা ইউরোপের মানচিত্র

সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল। ইহার প্রভাবে জার্ম্মানী একেবারেই নগণ্য হইয়া পড়িল। আর্থিক হিসাবে, ভৌগোলিক ও সামরিক অবস্থার দিক্ দিয়া জার্ম্মানীতে এমন এক অদ্ভুত আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইল, যাহার প্রকৃত মীমাংসা এখনও এই হিট্লারী যুগেও হয় নাই। সন্ধির সর্ত্তানুসারে জার্ম্মানী, আলসাস্ ও লোরেন্ প্রদেশদ্বয় ফ্রান্সকে ছাড়িয়া দিল; ইউপেন ও মামেডি এই অঞ্চলদ্বয় বেলজিয়ামকে দিল —লিথুনিয়াকে দিল মেমেল। পোসেন ও পশ্চিম প্রাশিয়ার অনেক অঞ্চল পোলাণ্ডকে দিতে হইল। তা' ছাড়া পোলাণ্ড যাহাতে বাল্টিকের দিকে সমুদ্রপথ পায়, সেইজন্য ডানজিগকে একটি স্বাধীন আন্তর্জ্জাতিক নগর বলিয়া স্বীকার করিতে হইল। গণ-ভোট লইয়া ডেনমার্ককেও কিছু ছাড়িয়া দিতে হইল। এতদ্ব্যতীত পনর বৎসর যাবৎ জার্ম্মানী, ফ্রান্সকে তাহার দেশলুণ্ঠনের অধিকার দিল—(under economic exploitation of France)। সার প্রদেশকে একটা আন্তর্জাতিক কমিশনের উপর ছাড়িয়া দিতে হইল। পূর্ণ পনর বৎসর পর উহা গণ-ভোটদ্বারা আবার জার্ম্মানীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। জার্ম্মানীর বাহিরে তাহার সমুদয় উপনিবেশ তাহার হস্তচ্যুত হইল।

এইখানে জার্ম্মানীর প্রতি দণ্ডমূলক ব্যবস্থার পরিসমাপ্তি হইল না—তাহার সামরিকশক্তি হ্রাসের ব্যবস্থাও হইল। তাহার অফুরন্ত সৈন্যসংখ্যা কমাইয়া মাত্র এক লক্ষ করা হইল (সামরিক কর্ম্মচারী সহ)। জার্ম্মানীকে স্বীকার করিতে হইল, সে দেশের মধ্যে বাধ্যতামূলক সমর-শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিবে না। পশ্চিম সীমান্তে রাইন্ নদীর তীরে তাহার সমুদয় দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইল সে কোনও রূপ যুদ্ধসরঞ্জাম প্রস্তুত করিতে, অথবা আমদানী-রপ্তানি করিতে পাইবে না। তাহার নৌশক্তি মাত্র ছয়টি যুদ্ধ-জাহাজে পরিণত করা হইল। যুদ্ধের জন্য নৌ ও বিমানঘাটি প্রস্তুত করিবার অধিকার তাহাকে দেওয়া হইল না। কিয়েল খালটি সব জাতির জন্য উন্মুক্ত করিয়া রাখিতে হইল। বাল্টিকের নিকট কোথাও সে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে পাইবে না। বিজয়ী জাতির প্রতিহিংসার অনল আরও প্রসারিত হইল—তাঁহারা জার্ম্মানীকে বাধ্য করিলেন, সম্রাট্ কাইজারকে আন্তর্জাতিক উচ্চ-বিচারালয়ে বিচারার্থ মিত্রপক্ষীয়ের হাতে সমর্পণ করিবার জন্য। কাইজার তখন ডাচ সরকারের অধীনে বাস করিতে-ছিলেন। ডাচ সরকার তাঁহাকে মিত্রপক্ষের হাতে প্রত্যর্পণ করিতে অসম্মত হওয়ায় হতভাগ্য কাইজারের আর বিচার হইল না।

ভার্সাই সন্ধির সর্ত্তানুসারে মিত্রপক্ষ জার্ম্মানীকে যে অর্থ-নৈতিক চাপ দিলেন, তাহা জার্ম্মানীকে এক প্রকার বিধ্বস্ত করিয়া দিল। তাহাকে জোর করিয়া স্বীকার করিতে হইল যে-যুদ্ধের সমস্ত দায়িত্বই তাহার—সুতরাং যুদ্ধের প্রায় সমুদয় ক্ষতিপূরণ তাহার নিকট আদায় করিবার ব্যবস্থা হইল। যুদ্ধের সময়কার অসামরিক সমুদয় ক্ষতির ভার তাহার উপর চাপাইয়া দেওয়া হইল। প্রথম কিস্তিতে তাহাকে দিতে হইল পাঁচ বিলিয়ান স্বর্ণমুদ্রা—পরবর্ত্তী কিস্তির পরিমাণের ভার আন্তর্জ্জাতিক ক্ষতিপূরণ কমিশনের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইল। তাহাকে আরও নানা বিষয়ে ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকৃত হইতে হইল। তাহাকে বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলি পুনঃ নির্ম্মাণ করিয়া দিতে স্বীকার করিতে হইল। বেলজিয়াম ও ইটালীকে তাহার কয়লার খনির অংশ ছাড়িয়া দিতে হইল। ১৯২১সালে ক্ষতিপূরণের ঠিক পরিমাপ স্থির হইল—জার্ম্মানীর নিকট ৫৩ বিলিয়ান্ স্বর্ণমুদ্রা আদায় করিতে হইবে। আরও স্থির হইল, যাবৎ সে এই ক্ষতিপূরণ দিতে না পারে, তাবৎ রাইন্ অঞ্চলের অনেক দেশ মিত্রপক্ষের সৈন্যের অধীনে থাকিবে—জার্ম্মানীকে তাহার সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে।

মহাসমরের পর শান্তি-প্রতিষ্ঠার নামে বিজয়ী মিত্রপক্ষ এইভাবে পরাজিত জার্ম্মানীকে দমন করিতে উদ্যত হইল। পরাজিতকে ক্ষমা করিয়া একটা ন্যায়সঙ্গত মীমাংসা করিতে পারিলেন না—কেননা শান্তির সময়ও ভবিষ্যতের জন্য যুদ্ধের বাসনা তাঁহাদের অন্তর হইতে একেবারে বিদূরিত হয় নাই। জার্ম্মানীর সাম্রাজ্যের অঙ্গচ্ছেদ করা হইল—তাহাকে দরিদ্র করিয়া দেওয়া হইল – মিত্রপক্ষের বাহুতলে তাহাকে চিরকাল রাখিয়া দিবার ব্যবস্থা হইল। এই হইল বিশ্বশান্তি।

ঠিক এই ভাবেই অষ্ট্রিয়াকে দমন করা হইল। তাহার সহিত স্বতন্ত্র সন্ধি করিয়া তাহার সুবৃহৎ সাম্রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেওয়া হইল। তাহার অধীন অনেক প্রদেশকে স্বাধীন করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু, অবশিষ্ট রাজ্যটুকুকে

তাহার বিধ্বস্ত করিয়া দেওয়া হইল এবং সমুদ্রপথ তাহার এরূপভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, যেন সে আর কোনও দিন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে না পারে। তাহার সৈন্যসংখ্যাকে কমাইয়া মাত্র ত্রিশ সহস্রে পরিণত করা হইল- জার্ম্মানীর ন্যায় তাহার নিকটও গুরুতর ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা হইল। যে সমুদয় অঞ্চল সে বলকান্ যুদ্ধে পাইয়াছিল, তাহার সমুদয় অংশ কাড়িয়া লওয়া হইল—তাহার সৈন্যসংখ্যাও একেবারে কমাইয়া দেওয়া হইল।

তারপর আসিল তুরস্কের পালা। এ পর্য্যন্ত মীমাংসা করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। কারণ, কাহারও স্বার্থের সহিত সাম্রাজ্যবাদের বিশেষ সংঘর্ষ বাধে নাই। কিন্তু, তুরস্কের বেলায় সাম্রাজ্যবাদের গুপ্তলালসা আবার প্রত্যেকের মনে জাগিয়া উঠিল। যে কারণে এতাবৎ ইউরোপের কোন শক্তি একেবারেই তুরস্ককে গ্রাস করিতে পারে নাই—বরং সে স্বাধীন ভাবেই বাঁচিয়া থা'ক—এই ছিল সকলের মনোবৃত্তি—এক্ষণে সেই কারণই তুরস্ককে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিল। তুরস্ক-রাজ্যের ভাগবাঁটোয়ারার সময় নানা সমস্যা আসিয়া দেখা দিল। সিরিয়ার উপর ফ্রান্স ও গ্রেটবিটেন উভয়েরই লোভ ছিল। এসিয়ামাইনরের উপর গ্রাস্ ও ইটালীর লোভ ছিল—কাহারও কাহারও দৃষ্টি ইজিয়ান সাগরের দ্বীপপুঞ্জ ও আলবেনিয়ার উপর ছিল। মহাসমরের অবসানের পর আবার সেই সব ধূমায়িত বাসনা হঠাৎ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কোন শক্তি তুরস্ক সাম্রাজ্যের কোন মূল্যবান্ প্রদেশ হস্তগত করিয়া অপর হইতে শক্তিশালী হইয়া পড়িবে, ইহা কাহারও সহ্য হইল না—এই ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যাপার লইয়া বিভিন্ন শক্তির মধ্যে মন-কষাকষি হইতে লাগিল - বহু বৈঠক—বহু বাদাবাদি– রাগারাগি –চিঠিপত্রের আদানপ্রদান প্রভৃতি পর্ব্বের অভিনয়ের পর অবশেষে তুরস্কের সুলতান ও মিত্রপক্ষীয় জাতিগণের সহিত সেভার্সে একটা সন্ধি হইল (১০ই আগষ্ট, ১৯২০)।

ভার্সাই সন্ধি যেমন জার্ম্মানীর সর্ব্বনাশ করিল, এই সেভার্স সন্ধিও সেইরূপ তুরস্ককে বিধ্বস্ত করিয়া দিল। তুরস্কের সহিত সন্ধির সর্ত্ত স্থির হইবার পূর্ব্বেই একদিকে ইংলণ্ড, ফরাসী ও ইটালির মধ্যে এবং অন্যদিকে ইটালি ও গ্রীসের মধ্যে একটা গোপন চুক্তি হইয়া গেল। তদনুসারে আরব রাজ্যগুলিকে তুরস্কের কর্ত্তৃত্ব হইতে বিচ্যুত করিয়া দেওয়া হইল এবং সেগুলিকে ব্রিটিশের কর্ত্তৃত্বাধীনে সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা দেওয়া হইল। আন্তর্জ্জাতিক দায়িত্বে আরমেনিয়াতে একটা স্বাধীন প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। প্যালেস্টাইন, মেসোপটেমিয়া, জর্ডান নদের অপর পার্শ্বস্থ দেশসমূহ ও সিরিয়া—এইগুলি তুরস্কের হস্তচ্যুত হইল এবং বিভিন্ন শক্তির অধীনে 'ম্যানডেটারি'তে পরিণত করা হইল। প্রথম তিনটি ব্রিটিশের অধীনে এবং সিরিয়াটি ফরাসীর অধীনে। সাইলেসিয়া ফরাসীর প্রভাবাধীন অঞ্চল বলিয়া ঘোষিত হইল এবং দক্ষিণ-আনাটোলিয়া ইটালীর প্রভাবাধীন হইল। স্মার্ণা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী সমুদ্রতীরস্থ প্রদেশগুলি এবং থ্রেস্, আড্রিয়ানোপল, গ্যালিপলি উপদ্বীপ—এই-গুলি গ্রীসকে দেওয়া হইল। দার্দ্দেনেলিস্ ও বস্ফরাস্কে আন্তর্জাতিক অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করা হইল। এই সব মূল্যবান্ ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান কাড়িয়া লইবার পর বিরাট তুরস্ক-সাম্রাজ্যের যাহা অবশিষ্ট রহিল, তাহাই দেওয়া হইল তুরস্ককে। তুরস্কের এই সঙ্কীর্ণ রাজ্যটি প্রধানতঃ এশিয়া মাইনরের এক ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ রহিল। বিগত শত বৎসর ধরিয়া সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপ সকল সময় যে রব তুলিয়া-ছিল, তুরস্ককে ইউরোপ হইতে বিতাড়িত কর—তাহা এত-দিনে পূর্ণ হইতে চলিল। বস্তুতঃ, এই সন্ধি প্রতাপে তুরস্কের প্রভাব একেবারেই কমাইয়া দিল। মিত্রপক্ষ তুরস্ক-রাজ্যের সীমা হ্রাস করিয়াই ক্ষান্ত থাকিলেন না, তাঁহারা তাহার সার্ব্বভৌম স্বাধীনতাও বহুলাংশে কাটছাঁট করিয়া দিলেন তাহার উপর অজস্র ঋণের বোঝা চাপান হইল—তাহার রাজস্বনীতি, শুল্কনীতি, ঋণ-নীতি, কারেন্সি পলিসি ও অপরাপর অর্থনৈতিক ব্যাপারের উপর হস্তক্ষেপ করিবার প্রভূত ক্ষমতা মিত্রশক্তি নিজেদের জন্য সংরক্ষিত করিয়া রাখিলেন। এই সব হীনতা তুরস্কের সুলতান স্বীকার করিলেও, তুরস্কের নব্য যুবকদল তাহা স্বীকার করিল না—তাহারা কি ভাবে মোস্তফা কামালের প্রেরণায় এই সব অধীনতার নাগ-পাশ হইতে মুক্ত হইয়া তুরস্কের জন্য পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিল, তাহা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

কালস্রোতে

মীরা

—শ্রীসুরুচিবালা রায়

এ-বাড়ীর ও-বাড়ীর আশপাশ দিয়া আঁকা-বাঁকা সরু পথ, দু' পাশে বেড়ার গায়ে লতান গাছে ঝিঙে, করলা বা আর কিছু ঝুলিতেছে। অন্য-মনস্ক ভাবে এদিক-ওদিক তাকাইয়া…পানু হাঁটিয়া চলিল।……গলায় গামছা, পরিধানে অতি মলিন বস্ত্রখণ্ডের টুক্‌রা, দুইজন মুসলমান কৃষক মাঠে চলিয়াছে, কাঁধের উপর খাড়াভাবে তুলিয়া ধরা কোদাল এবং দা।…'এই পঞ্চাশ বছর বয়স হ'ল; বার বছর বয়সে বাবা হাতে লাঙ্গল তুলে দিয়ে স্বর্গবাসী হয়েছিলেন, আর দিয়ে গিয়েছিলেন খড়ের একটা ভাঙ্গা চালা, তারপর অবস্থা যা' কিছু করেছি, সে ত' আমার এই লাঙ্গলেরই জোরে, দাদাবাবু। এই হাত আর লাঙ্গলের সম্পর্ক আজ অবধি একদিনের তরেও ঘুচাইনি, এই লাঙ্গলই আমার লক্ষ্মী…।' পাঠক লক্ষ্য করিবেন, উপন্যাসের নায়ক এইবার তাহার জন্মভূমিতে ফিরিয়াছে। 'এই তাহার জন্মভূমি। এই তাহার নিজের দেশ, বাঙ্গালার ক্ষুদ্র একটি গণ্ডগ্রাম। এই অধঃপতিত দেশের পানে…।' উপন্যাসের বর্ত্তমান অধ্যায়ে নায়ক আত্মচিন্তার অবসর পাইয়াছে।

[৩৭]

পরদিন সকালে পিতার নিকট হইতে ঊষার বিবাহ-সংবাদের তার পাইয়া পানু দেশে রওয়ানা হইয়া গেল। তাহার সমগ্র মন-প্রাণ তখন কলিকাতা পরিত্যাগের কামনাই করিতেছিল।

কন্যার বিবাহের আনন্দে অন্য কোন দিকে মন দিবার অবসর আর নিমাইয়ের ছিল না, নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় তাই পানু এবারে কিছু দীর্ঘকালই বাড়ীতে রহিয়া গেল। এক ধারের একটি ক্ষুদ্র নির্জ্জন কক্ষ আপনার জন্য নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া দিনরাত পানু সেইখানেই আপনার সহস্র ভাবনার স্রোতে ডুবিয়া থাকিত।

ভাবিবার কারণও ছিল অনেক। বহুকাল পরে, বলিতে গেলে বয়স্ক হইবার পর, এই-ই প্রথম কিছু দীর্ঘকাল তাহার স্বগ্রামে বাস। এইবারেই সে ভাল করিয়া দেখিল, বুঝিল এবং দারুণ একটি ঘৃণা তাহার সমস্ত মনকে দিবারাত্র পীড়িত করিয়া তুলিতে লাগিল। গ্রামটির প্রতি ঘরে একটি করিয়া দল, প্রত্যেক ঘরে একটি করিয়া সমাজ, কে কাহার ক্ষতি করিবে, সর্ব্বনাশ করিবে এবং কে কাহার উপর প্রতিশোধ তুলিবে, এই প্রধান এবং মহৎ ভাবনায় নিজের কোন ক্ষতিই দলপতিগণ গ্রাহ্য করেন না। তাহাদেরই যে পাঁচ ছয় ঘর জ্ঞাতি এই গ্রামেই আছেন, পরস্পরের প্রতি তাঁহাদের কি ভয়ানক বিদ্বেষের ভাব, ঊষার বিবাহের সময়, পানু স্বচক্ষে এবার তাহা দেখিয়াছে। পুরুষানুক্রমে উত্তরোত্তর যাহা বাড়িয়াই চলিয়াছে, কি উপায়ে যে তাহা বিদূরিত করা যাইতে পারে, অনেক ভাবিয়াও পানু তাহার কোন উপায়ই নির্দ্ধারণ করিতে পারিল না।

তাহার জ্ঞাতি-কাকা পরেশবাবুর সহিত তাহাদের বহির্ব্বাটীর দিকে সকল কিছুই বিভিন্ন হইলেও, দুই বাড়ীরই অন্দরের মাঝখানে কোন প্রকার বেড়া দেওয়া বা অন্য কোন রকম সীমানার চিহ্ন কিছু ছিল না। প্রকাণ্ড একটি উঠান উভয় বাড়ীর মাঝখানে থাকিয়া দুই দিকেরই সীমানা রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। কয়দিন ধরিয়াই পানু লক্ষ্য করিয়া দেখিল, তাহাদের ঝি বা চাকর যখনই যে-কেহ উঠান ঝাঁট দিতে যায়, ঠিক সমান ভাগে অর্দ্ধেকটা বাকী রাখিয়া আসে। বিস্মিত হইয়া পানু কারণ জিজ্ঞাসা করাতে দাঁতে জিভ কাটিয়া উত্তর দিয়াছিল, সর্ব্বনাশ, দাদাবাবু, তা হলে কি আর মা ঠাকরুণের কাছে আমাদের রক্ষে আছে? কেন, ওদের বাড়ীর ঝি নেই? ওদের দিক্‌টা ওরা দিক না।

ও বাড়ীর ঝি-চাকর থাকিলেও, বড়গিন্নীর উপর মেজ-গিন্নী এক চাল চালিয়া, এই উঠানখানি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্যই প্রকাশ করিতেন। রান্নাঘরটা তাঁহার একটু আড়াআড়ি ভাবে থাকাতে, উঠানে জঞ্জাল দুই চারিদিন জমাইয়া রাখিলেও সহজে সেটা তাঁহার চোখে পড়িত না এবং এই জন্যই প্রতিদিনই উঠানটির পানে একবার বা দুইবার গোপনে কটাক্ষে তাকাইয়া গেলেও, তাঁহার ভাগটুকু পরিষ্কার করিবার কোন আগ্রহ তাঁহার দেখা যাইত না। কিন্তু, ইহাতে অসুবিধা হইত এ বাড়ীরই বেশি। ইহাঁদের রান্নাঘর এবং আর দুই চারিটি ঘরের দ্বারের একেবারে মুখোমুখী ছিল

উঠানটি। ও বাড়ীর তরকারী কোটার জঞ্জাল বা আরও অনেক কিছুই উঠানটির ও পাশে স্তূপীকৃত হইয়া জমিয়া থাকাতে, উঠিতে বসিতে, নড়িতে চড়িতে, সকল সময়ই চোখে তাহাদের ঐ জঞ্জাল ফুটিতে থাকিত। ইহাতে দিনে হাজার বার বড়গিন্নী অসন্তোষ প্রকাশ করিলেও, মেজগিন্নীর ইহাতে ধৈর্য্যের সীমা ছিল না। তথাপি ও বাড়ীর কাহারও কাহারও হাতে পক্ষাঘাত হইয়াছে বলিয়া যেদিন বড়গিন্নী মন্তব্য প্রকাশ করিতেন, সেদিন ও বাড়ীর রান্নাঘরের উনুনগুলির যত ছাই, উঠানখানির পাশে স্তূপীকৃত ভাবে বাড়িয়া উঠিত।

মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া এবং মাকে এ বিষয়ে কিছু না বলিয়া, ও বাড়ী গিয়া মেজকাকাকে অনুযোগ করিতে তিনি হাসিয়া কহিলেন, যতদিন আমি বা তোর মা না মরছি পান্নু, ততদিন এ হবেই, বাবা।

দুঃখিত হইয়া পান্নু কহিল—এ ভয়ঙ্কর অন্যায় আপনাদের, কাকীমা, বাইরে ত দেখছি, এটা ওটা নিয়ে দু' বাড়ীর বাড়ী আর আদালতে দৌড়াদৌড়ি নিত্যকার কর্ম্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে, ভিতরে সামান্য একটা উঠনের মাটি-ময়লা নিয়েও যদি আপনারা ভাগাভাগি করেন, লজ্জার তা' হলে আর সীমা থাকে না যে—

কাকীমা কহিলেন,—লজ্জাও ঠিক, আর অন্যায়ও সত্যিই পান্নু, কিন্তু সব সময় খালি ন্যায় নিয়ে থাকলে, অনেক দিকেই খালি অপমানিত হতে হয় যে। প্রথম প্রথম এ রকম ছিল না পান্নু, তোর মায়ের ঝি ঝাঁটকাট বড় একটা দিতই না, আমিই দেওয়াতুম আর সবটাই দেওয়াতুম; এতে মনে আমার কিছু ছিল না। মাঝে হঠাৎ একবার আমার সৌরভী ঝিটা অসুখ হ'য়ে প'ড়ে থাকাতে, দিন দুই আমার আর ঝাঁট দেওয়ান হয় নি, তোর মা কিন্তু কি যে ভেবে নিলেন তিনিই জানেন, তার পরেই দেখতে পেলুম, তাঁর ঝি ঐ অর্দ্ধেকখানিই খালি ঝাঁট দিয়ে গেল। একদিন দুদিন লক্ষ্য করলুম, বললুম না কিছু, কিন্তু তাঁর ভাগাভাগির কারণ বুঝে নিলুম। তা' আমিও এক বড় জমিদারেরই মেয়ে পান্নু, জানিস্ ত' বাবা, জেদাজেদি যে কি করে করতে হয়, আমিও তা' ভাল করেই জানি। সেই থেকেই এ রকম চলছে, আর চলবেও বাপু, তবে তোদের ঘর-সংসারের বেলা তখন যদি তোরা অন্য ব্যবস্থা করতে পারিস্, ত' বলা যায় না, কিন্তু এখন হবে না।

পান্নালাল ম্লান ভাবে কহিল,—তা কাকীমা, মাঝখানে আপনারা ত' একটা বেড়াও দিয়ে নিতে পারেন—

হাসিয়া কাকীমা কহিলেন, তাও হয় না পান্নু, আমি ত দেবই না, কেন না আমার অসুবিধে কিছুই হয় না। তোর মাও দেবেন না, দিলে তাঁর হার হবে মনে করে।

পান্নু অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল, দুঃখ তাহার ক্রমে বিস্ময়ে রূপান্তরিত হইতেছিল।

কাকীমা আবার হাসিয়া কহিলেন, একটা দিকই তোর চোখ পড়েছে, আর একদিক্ বুঝি দেখিস্ নি পান্নু? উঠনটাই দেখেছিস্, পুকুরটা দেখিস্ নি?

—না কাকীমা, সেটার আবার কি হ'ল?

—আয়, দেখবি আয়।

কাকীমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া পান্নু পুকুরপাড়ে দাঁড়াইল। কোন্ অতীত কালের দেওয়া, প্রকাণ্ড একটা পুষ্করিণী পুরুষানুক্রমে পাঁচ সরিকে ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। প্রত্যেকেরই গৃহের সম্মুখে বাঁধান ঘাট, ছাড়া, পুকুরটির অঙ্গসৌষ্ঠব এখন আর কিছুই ছিল না। মাস কয়েক হইতে পুকুরটিতে জার্ম্মানী-পানা ক্রমেই বিস্তৃত হইতে হইতে সম্প্রতি জল প্রায় ঢাকা পড়িবারই উপক্রম হইয়াছে। মিলিত পরামর্শে সেটির সম্বন্ধে কোনও ব্যবস্থাই না করিয়া, গৃহিণীরা আধ মাইল দূরের সরকারী পুকুর হইতে পানীয় জল আনাইবার কষ্টটুকু স্বীকার করিয়া এবং প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অসুবিধাটুকু লক্ষ্য করিয়া আরাম উপভোগ করিতেছেন।

দেখিয়া পান্নুর বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

ঊষার বিবাহের গোলমাল কাটিয়া গেলে একদিন পান্নু পিতার নিকটে পুকুরটি সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করিয়া, কাকাদের সহিত পরামর্শ করিয়া, একটা-ব্যবস্থা করিয়া লইলে ভাল হয়, বলিল। সুরেন্দ্রনাথও মনে মনে পুত্রের নিকট লজ্জিত হইয়া, শীঘ্রই ইহার কোন একটা ব্যবস্থা করিয়া দিবেন এরূপ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ নির্ম্মলা আসিয়া সেখানে যে ভাবে ঝঙ্কার দিয়া পড়িলেন, তাহাতে পিতা-পুত্রের কথা আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিল না, ক্ষুব্ধচিত্তে পান্নু নিজের ঘরটিতে ফিরিয়া গিয়া নীরবেই অপমান-জ্বালা সহিয়া লইল।

ইহার প্রায় দিন চারেক পরে একদিন সকাল বেলা পানু কাকীমার ওখান হইতে বাড়ী ফিরিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। পুকুরটির ভিতর আবার একটি বেড়া দিয়া, আপনাদের অংশকে তাহার মা নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বর্দ্ধমান জার্ম্মানী-পানা হইতে অতি দক্ষতার সহিত বাঁচাইয়া আনিতেছেন। পুকুরের ওপারের ঘাটে দাঁড়াইয়া তাহার এক জ্ঞাতি-কাকা এ বাড়ীর বড়গিন্নীর কাজ লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের স্বরে যে কথাটি বলিলেন, এবং যে ভাবে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি-উত্তর দিয়া বড়গিন্নী তাঁহার মনের বিষ ঢালিয়া দিলেন, তাহাতে লজ্জা, ঘৃণা এবং অপমানে সেই মুহূর্ত্তে পানু বাড়ী ছাড়িয়া আবার পথে বাহির হইয়া পড়িল।

এ বাড়ীর ও বাড়ীর আশ-পাশ দিয়া, আঁকা-বাঁকা সরু পথ; দু'পাশে বেড়ার গায়ে লতান গাছে ঝিঙে, করল্লা বা আর কিছু ঝুলিতেছে, কোথাও পথের পাশে বাঁধান ঘাটে কাপড় রাখিয়া, পল্লীর অশান্ত বালক-বালিকার দল ঘণ্টার পর ঘণ্টা অক্লেশে সাঁতার কাটিয়া জলখেলা করিতেছে,—অন্যমনস্ক ভাবে এদিকে ওদিকে তাকাইয়া বুকের উপর আড়াআড়ি হাত দু'খানি রাখিয়া পানু হাটিয়া চলিল। ঘোষপাড়া, বামুনপাড়া ছাড়িয়া গোয়ালাপাড়ার একপাশে সুবিস্তীর্ণ মাঠটির এক ধারে কতকগুলি গরু চরিতেছিল—অন্যমনস্ক ভাবে সে দিকে তাকাইয়া চলিল।

পল্লীর সংস্রব হইতে দূরে লোকবিরল জায়গাটি সুন্দর! মেঠো পথ ধরিয়া কদাচিৎ দুই চারিজন লোক গ্রামান্তরে যাইতেছে। পানু নদীর পাড়ের দিকে একটা গাছ-তলায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। শীতকালের মধ্যাহ্ন-রৌদ্র পিঠের উপর স্নেহপরশ বুলাইয়া দিতেছিল, দুই হাতের পাতায় মাথা রাখিয়া, উদাস নয়নে নদীর স্রোতের পানে চাহিয়া চাহিয়া পানু এলোমেলো কত কিছু ভাবিয়া চলিল। গ্রামের উপর তাহার একটা বিতৃষ্ণ ভাব আসিয়া পড়িয়াছে। এই তাহার দেশ, এই তাহার জন্মভূমি! এত বেশি গলদ, এত ভয়ঙ্কর অন্যায় এই গ্রামটির প্রতিদিনের ইতিহাসে সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকিতেছে যে, কোনও মতে কোনও দিকে ইহাকে মুক্ত করিবার আশ্বাস পানু পাইল না। পুরুষদের মধ্যে দলাদলি-হিংসাবিদ্বেষের ঘোরতর চাপে গ্রামখানি হীনতা-দীনতার চরম সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহার পর গ্রামের মাতৃজাতিরও যে কি ভয়ঙ্কর অধঃপতন, তাহা ভাবিয়া পানু স্তম্ভিত হইয়া রহিল। গ্রামের আশ্রয়স্থল জমিদার-গৃহে তাহার নিজের মায়েরই অন্তরে বাহিরে যে বিষ অহর্নিশ উদগীর্ণ হইয়া তাহাদের বংশটিকে বিষের জ্বালায় কালো করিয়া তুলিতেছে, তাহার তুলনা কোথায়?

এই তাহার জন্মভূমি! এই তাহার নিজের দেশ, বাঙ্গালার ক্ষুদ্র একটি গণ্ডগ্রাম। এই অধঃপতিত দেশের পানে পশ্চাৎ ফিরিয়া পানু সমুদয় বাংলাটিকে বড় করিয়া তুলিবার বড় আয়োজন করিতেছে! দুঃখে বিষাদে পানুর মুখে ম্লান হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। ভিতরে গলদ রাখিয়া বাহিরে উন্নতির ব্যর্থ প্রয়াস যুগ-যুগান্তেও কখনো সফল হইবে না। হতাশার বেদনায় পানুর দেহ-মন অবশ হইয়া আসিল।

মাথার উপর রৌদ্র ক্রমে বাড়িয়া উঠিতেছিল, ক্ষুৎ-পিপাসায় দেহে একটা অবসাদ ও শ্রান্তির ভাব আনিয়া দিলেও পানুর গৃহে ফিরিবার কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না। তেমনই নিস্পন্দ ভাবেই সে গাছতলায় পড়িয়া রহিল। পথে চলিতে চলিতে সহসা পথ হারাইয়া ফেলিলে বিপন্ন পথিকের যে অবস্থা হয়, পানুরও যেন তাহাই হইয়াছে। সম্মুখে তাহার বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র, কোন্ কর্ম্মে কি ভাবে হাত দিয়া, কোন্ কর্ত্তব্য আগে সম্পাদন করিয়া কবে সে তাহার অভীপ্সিত স্থানে পৌঁছিতে পারিবে?

বিপরীত দিক্ হইতে একটি গানের সুর ক্রমেই মাঠের পথে অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল। অন্যমনস্কভাবে সেদিকে কাণ রাখিয়া পানু স্থির হইয়া রহিল। সুর ক্রমে আরও কাছে আসিলে গানের পদও কিছু কিছু কাণে আসিতে লাগিল। ঘাড় ফিরাইয়া পানু সেদিকে তাকাইল, গলায় গামছা, পরিধানে অতি মলিন বস্ত্রখণ্ডের টুক্‌রা, দুই জন মুসলমান কৃষক মাঠে চলিয়াছে, কাঁধের উপর খাড়াভাবে তুলিয়া ধরা কোদাল এবং দা; পানু দূর হইতে তাহাদের সতেজ পাদক্ষেপ, সুদৃঢ় দেহাকৃতির পানে চাহিয়া রহিল। নদীর কিনারায় শায়িত পানুকে তাহারা লক্ষ্য করে নাই, হাসিয়া রহস্য করিয়া গাহিতে গাহিতে উভয়ে তাহার পাশ দিয়া চলিতে লাগিল। পানু এবারে মনোযোগী হইয়া গানের পদগুলি শুনিতে লাগিল—

(বাবার) মত শ্বশুর হবে,
শাউড়ী হবে মা জননী,
(আর) ছোড়দার মত বর যদি পাই
তবেই আমি বিয়ে করি,—

নিতান্ত গ্রাম্য ভাবে চাষার কন্যার মর্ম্ম-আবেদন! গানের পদগুলি ভাবিতে ভাবিতে পান্নুর মনটাও হাল্কা হইয়া আসিল। বেলাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুৎপিপাসাও বৃদ্ধি পাইয়া চলিতেছিল, কিন্তু বাড়ী ফিরিতে ইচ্ছা হইল না। অসময়ে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিবার জন্য বিমাতার মেজকন্যা আশা সহসা যে ভাবে তীব্রস্বরে ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছিল, ভাত লইয়া কেহ বসিয়া থাকিতে পারিবে না বলিয়া, সে কথা মনে হইতেই বাড়ীর প্রতি মনটা বিমুখ হইয়া উঠিল।

সম্মুখে অবিরাম গতিতে নদী বহিয়া চলিয়াছে। মাঝে মাঝে যাত্রী-বোঝাই দু'একটা বজরা, কখন বা প্রকাণ্ড দুই চারিটি কিস্তি-নৌকা স্তূপীকৃত পাটে বা ধান্যে বোঝাই হইয়া, ধীর মন্থর গতিতে কলিকাতার পথে যাত্রা করিয়াছে, একটি সুসজ্জিত পান্‌সীতে হারমোনিয়ম ও বাঁশীর সঙ্গে থিয়েটারের গান ও হাস্যকোলাহলে নদীটি কাঁপাইয়া, একদল তরুণ বরযাত্রী দেখা দিল। ভিতরের ক্ষুদ্র জানালাখানির ফাঁক দিয়া, একটি অশ্রুমুখী তরুণীর স্নিগ্ধ দুটি চক্ষু অবগুণ্ঠনের তলা দিয়া ফুটিয়া উঠিল, পান্‌সীখানির একপাশে মহাসমারোহে যে আনন্দ-উৎসব চলিয়াছে, মেয়েটির পিতৃগৃহত্যাগের শোক তাহাতে কিছুমাত্র কমিতেছে না।

—এ কে! দাদাবাবু যে!

আহ্বান শুনিয়া সচমকে পান্নু ফিরিয়া চাহিল, আনন্দিত হইয়া কহিল—কে? রঘুদা' না কি? এস, এস, বস একটু, কোথা যাচ্ছ এই অসময়ে?

আগন্তুক সেখানে বসিয়া হাসিয়া কহিল, চাষার আবার সময় অসময় কি দাদা? সেই ছোট বেলা থেকে, রোদে বিষ্টিতে মাঠে খেটে খেটে এই সব বুড়ো হাড় এখন পেকে ঝুনো হয়ে গেছে, সময় অসময় বলে আমাদের কিছু নেই দাদা, বসে বসে আরাম করলে কি আমাদের চলে?

পান্নু মুগ্ধ হইয়া এই বৃদ্ধ চাষার লোহার মত হাত-পায়ের দিকে তাকাইয়া ছিল, হাসিয়া কহিল, তা' বটে, কিন্তু সে ত আগের কথা রঘুদা, তোমার ত আর সে অবস্থা নেই এখন, শুনেছি, গোটা দুই তিন বড় বড় তালুক নীলামে কিনে রেখেছ, তুমি তার অন্যে কি এখন সমান? এখন তুমি লোক রাখবে তার লোক খাটাবে।

চক্ষু দুটি উজ্জ্বল করিয়া রঘু কহিল, না দাদাবাবু, ও কথা ব'ল না, বসে বসে লোক খাটাবে ভদ্দরলোকেরা, আমরা চাষালোক, চিরকালই চাষা, তালুক, জমিদারী থাকলেই বা কি, আর না থাকলেই বা কি! দেখ দাদাবাবু, এই পঞ্চাশের উপর বয়স হ'ল, বার বছর বয়সে বাবা হাতে লাঙ্গল তুলে দিয়ে স্বর্গবাসী হয়েছিলেন, আর দিয়ে গিয়েছিলেন খড়ের একটা ভাঙ্গা চালা, তারপর অবস্থা যা' কিছু করেছি, সে ত আমার এই লাঙ্গলেরই জোরে, দাদাবাবু! এই হাত আর এই লাঙ্গলের সম্পর্ক আজ অবধি একদিনের তরেও ঘুচাই নি, এই লাঙ্গলই আমার লক্ষ্মী, আজ অবস্থা ভাল হয়েছে বলে এই লাঙ্গল যদি আমি ছাড়ি, লক্ষ্মী আমায় ছেড়ে যাবে, সেই সাহস নেই দাদা, খেটে খেতে আমাদের ত অপমান নেই, আমি যে রঘু চাষা।

কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ রঘু হাসিয়া কহিল, তা আমায় ত অসময় বলছিলে, এই বেলা দুপুরে তুমিই বা কেন, গাঁয়ের বাইরে এই মাঠটায় শুয়ে আছ? বেড়াতে বেরিয়েছিলে, বুঝি? স্নান-খাওয়া যে হয়নি সে ত চোখেই দেখতে পাচ্ছি। এত বেলায় এখানে বসে কেন?

—বেড়াতে বেড়াতে এ দিক্‌টায় এসে ভারী ভাল লাগল রঘুদা, এই নদী মাঠ সব দেখছি শুয়ে শুয়ে, এখনি ফিরব ভাবছি।

রঘু হাসিল, পাড়াগেঁয়ে চাষা, নদীর জল বা শূন্য মাঠের দিকে চাহিয়া দেখিবার মত কি সৌন্দর্য্য আছে সে বুঝিতে পারে না, হাসিয়া কহিল, তা, না নেয়ে খেয়ে দেখা কেন দাদা, বাড়ীতে মা-ঠাকরুণরা সব ভাববেন না?

পান্নু মৃদু একটু হাসিল মাত্র। পুত্রের সঙ্গে মা'তার সদ্ভাবের কথা গ্রামের সকলেরই কিছু কিছু জানা ছিল; কতক ঝি-চাকরের মুখে মুখে শুনিয়া শুনিয়া এবং বাকীটা কল্পনার মুখরোচক ভাবে বাড়াইয়া। খানিকক্ষণ নত মস্তকে কি ভাবিয়া লইয়া রঘু কহিল,—দু'পুরের সূর্য্যিও মাথার পাশে হেলে পড়ছে যে, ওঠ এবারে, পাশেই আমার বাড়ী, অমনি একবার একটু দাঁড়িয়ে পায়ের ধূলা দিয়ে যাবে চল।

সঙ্কুচিত ভাবে পান্নু বলিয়া উঠিল, আজ নয় রঘু দা', আর একদিন যাব তোমার বাড়ী। এবারে বাড়ীর পথেই চলি।

হাসিয়া রঘু কহিল, চল। চল, আমার বাড়ী হয়েই বাড়ী ফির, দেরী হবে না। ভয় নেই দাদা, আমরাই না হয় চাষা ভূত, তা তোমার সঙ্গেও কথা বলবার লোক বাড়ীতে একজন আছে, চল না দেখবে।

উৎসুক ভাবে পান্নু রঘুর পানে চাহিলে, রঘু কহিল, আমার ছোটছেলেটিকে ডাক্তারী পড়াচ্ছি ভাই, গাঁয়ে ডাক্তারের বড্ড কষ্ট, ও বছর হরি গোয়ালার ছোটছেলেটা তিনটি দিন কলেরায় কষ্ট পেয়ে মারা গেল, তোমাদের জমিদারী কাছারীর ঐ নিতাই ডাক্তারকে একবারের জন্যও হতভাগার বাড়ীতে যেতে দিলেন না, বাপ্-মায়ের চোখের সামনে ছেলেটা ছটফটিয়ে মরল, গাঁয়ের গোপাল কবিরাজও তখন গাঁয়ে ছিল না, মেয়ের বাড়ী গেছল বেড়াতে, এক ফোঁটা ওষুধ পড়ল না ছেলেটার পেটে।

—ডাক্তারকে যেতে দিলেন না কে? বাবা?

রঘুর কাণে কথাটা ঢুকিল না। স্বজাতি ও স্বগোত্রের অপমান ও বেদনার তীব্র আঘাত হঠাৎ স্মরণ করিয়া অন্তরে তাহার বেদনার সৃষ্টি হইয়াছিল, সে মৌন, ব্যথিত ভাবে নদীর জলে বহু দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

অসহিষ্ণু হইয়া পান্নু কহিল, কে যেতে দিলেন না রঘু দা, বাবা?

—তাঁর দোষ নেই দাদা। তিনি তখন মহালে বেরিয়েছিলেন, কর্ত্রীঠাকরুণ অনুমতি দিলেন না, এর দিন দুই আগে হরির বৌ কি কথা নিয়ে তাঁর সঙ্গে রাগারাগি করে এসেছিল, তারপর খাজনাও ওদের বাকী পড়েছিল অনেক, তিনি শোধ তুললেন।

তীব্র কঠোর দৃষ্টিতে চাহিয়া পান্নু কহিল, বিশ্বাস হচ্ছে না রঘু দা, হাজার হলেও তিনিও ত মা।

—বিশ্বাস না হবারই কথা দাদা, তবে শুনেছি, রোগের অতটা বাড়াবাড়ি তিনি জানতেন না।

লজ্জায় দুঃখে পান্নুর মুখ পাণ্ডুর হইয়া উঠিল এবং দুই হাঁটুর ভিতর মাথা গুঁজিয়া সে নীরবে বসিয়া রহিল।

রঘু কহিল, সেইদিনই মরার খাটে হাত দিয়া পণ করেছিলুম দাদা, ডাক্তারের দুঃখ আমার স্বজাত গাঁয়ের দুঃখী গরীব কাঙ্গালের মধ্য হ'তে দূর করব, সে আজ বছর পাঁচেকের কথা। ছোট ছেলেটা বনগাঁয়ে মাসীর বাড়ী থেকে পড়ত, সেখান থেকে তাকে কলকাতায় নিয়ে গেলাম, আমার দোকানঘরেই থাকে খায়, আর সেখান থেকেই কলেজে যায়।

সবিস্ময়ে পান্নু কহিল, তাই না কি? আমি জানিনে ত।

হাসিয়া রঘু কহিল, তা' জানবে কি করে, ছোটলোকের ছেলে, থাকেও সেই ভাবেই, ওরা কি তোমাদের সঙ্গে মিশবার যুগ্যি?

দুঃখিত হইয়া পান্নু কহিল, ওসব কথা বললে কষ্ট হয়, রঘু দা।

হাসিয়া রঘু কহিল, তা' বেশ ত, আলাপ করবে চল না, মায়ের অসুখের খবর পেয়ে এসেছিল, আবার দিন দুই পরেই চলে যাবে।

রঘুর সঙ্গে পান্নু উঠিয়া দাঁড়াইল।

প্রাসাদ নয়, দালান নয়, টিনের চালা দেওয়া ছোট বড় অনেকগুলি ঘর, চারিদিকে আম-কাঁঠাল তরি-তরকারীর বাগান, সদরে অন্দরে দুইটি পুকুর, বাড়ীখানি যেন গৃহকর্ত্তার সচ্ছলতার সহস্র প্রমাণ ধরিয়া হাসিতেছে।

রঘুর স্ত্রী ও ছেলেরা আসিয়া যতদূর সম্ভব তফাতে থাকিয়া ভূলুণ্ঠিতভাবে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। কুণ্ঠিত পান্নু বিপদগ্রস্ত ভাবে চুপ করিয়া মাদুরে বসিয়া পড়িল। পুত্রদের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া মৃদুহাস্যে রঘু কহিল, জেতে গোয়ালা আমরা, চাড়াল মুচির মত তোমাদের অস্পৃশ্য নই ত' দাদা, গরম গরম চারটি ভাত খেতে আপত্তি আছে কি তোমার?

পান্নু মৃদু কণ্ঠে কহিল, চাড়াল মুচি হলেও খেতাম রঘু দা। দাও, বল ভাত দিতে, খাব।

পিতার আদেশে রঘুর জ্যেষ্ঠপুত্র চাটাই বোনা স্থগিত রাখিয়া, উঠানের কোণা হইতে জালটা কাঁধে তুলিয়া লইয়া সদরের পুকুরে মাছ ধরিতে চলিল এবং মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই বড় একটা রুইমাছ ধরিয়া ফিরিয়া আসিল। পান্নুর ক্লান্ত চোখ দুটি সহসা মাছটির উপর পড়িয়া বিস্মিত হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া হাসিয়া রঘু কহিল,—আমার লক্ষীর দয়ায় দিন এখন স্বচ্ছন্দেই চলছে দাদা, পুকুরের মাছ, ঘরের দুধ, ছেলেপিলেদের পেট ভরেই দিতে পারছি, আমার এই

লাঙ্গল লক্ষ্মী আমার ছেলেদের হাতেও অক্ষয় হয়েই থাক্; এই কথাই ওদের বলি।

পানু গম্ভীর স্বরে কহিল, তুমি সুখী রঘু দা, সহরের লোক সুখের অভিনয় করে নিজেকে এবং অন্য সকলকে ঠকায়, কিন্তু সত্যি সুখী তুমি আর তোমার মত আর যারা সবাই—

রঘু আনন্দিত হইয়া কহিল, এই পাঁচ ছ বছর চলছে দাদা, একটু নুন আর কাপড় ছাড়া কিছুই কিনতে হয় না, পানের বরজ একটা কিনেছি, তেজপাতার চাষও করিয়েছি, চিরটা কাল খেটে খেটেই ত চললাম, এখন একটু আরামে থাকতে ইচ্ছে করে বলিয়া রঘু একটু হাসিল।

আহারাদির পর দু'পুরটা এখানেই কাটাইয়া সন্ধ্যার পর রঘু স্বহস্তে লণ্ঠনের আলোতে পথ দেখাইয়া পানুর সঙ্গে জমিদার-বাড়ীতে অগ্রসর হইল, চলিতে চলিতে পানু কহিল, রঘু দা তোমার মত সুখী, এমন স্বাবলম্বী গাঁয়ে ক'জন আর আছে জানি না, তোমাকেই একটা কথা বলি, দেখলুম এক নুন আর কাপড় ছাড়া আর কোন জিনিষ সংসারে তোমার কিনতে হয় না। কাপড়টাও নিজেই ঘরে বুনে নাও না, তা' হলে ত কাপড়ও আর কিনতে হয় না, নুনের কথাটা অবিশ্যি বলব না, তবে আইনে না আটকালে ও জিনিষটাও ঘরেই করা চলত।

রঘু আগ্রহে পানুর দিকে তাকাইলে পানু তাঁতের কথা রঘুকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিল এবং চলিতে চলিতে সেই-খানেই ঠিক হইয়া গেল রঘু আপাততঃ দুটি তাঁত এবং গোটা কয়েক চরকা কিনিয়া কাজ আরম্ভ করিবে। ইহা বেশ লাভজনক একটি ব্যবসায় শুনিয়া রঘু পরম উৎসাহিত হইয়া উঠিল। তবে পানুকেই সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইবে, অনুরোধ করিলে, পানু আনন্দেই স্বীকৃত হইল।

গৃহে পঁহুছিয়া ভোজপুরী দরোয়ানের এলাকা পার হইয়া অন্দরে পঁহুছিলে শয়নগৃহের দ্বারপ্রান্ত হইতে নির্ম্মলা তাহাকে দেখিয়াই মুখ বিকৃত করিয়া গৃহে ঢুকিয়া পড়িলেন। আশা সম্মুখে আসিয়া তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের স্বরে, সারাদিন মেজকাকীমার ওখানে সে কি করিতেছিল জানিতে চাহিল। এই মেয়েটিও মায়ের সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞাতিশত্রুহিসাবে মেজকাকীমার সঙ্গে বিরোধ সুরু করিয়া দিয়াছে। পানু বিস্মিত হইয়া ভগিনীর মুখের পানে ক্ষণকাল তাকাইয়া রহিল, মেয়েটি সুন্দরী বটে, কিন্তু মুখে চোখে কি কঠিন কুৎসিত কুটিলতার ছাপ! সহোদরা হইলেও উহার সঙ্গে ইহার কি অদ্ভুত পার্থক্য! হাত মুখ নাড়িয়া আবার কিছু বলিবার উপক্রম করিতেই পানু সহসা ভগিনীর দুই বাহু ধরিয়া সবেগে বার দুই ঝাঁকুনি দিয়া খানিকটা দূরে সরাইয়া দিয়া নির্ব্বিকার ভাবে দ্বিতলে নিজের কক্ষে চলিয়া গেল।

ইহার পর আশার ফুলিয়া ফুলিয়া উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে এবং মাতার কণ্ঠের প্রলয়-ধ্বনিতে বাড়ীশুদ্ধ সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু অন্দরের একটি কক্ষে পুত্রের এবং বহির্ব্বাটীর বৈঠকখানা গৃহের একটি চেয়ারে তাম্বুল-চর্ব্বণে নিবিষ্ট পুত্রের পিতার কোনওরূপ ভাববৈলক্ষণ্য অন্ততঃ বাহিরে প্রকাশ পাইল না।

দিন দুই গৃহে কি ভাবে যে পানুর কাটিল তাহা জানিলেন একমাত্র তাহার অন্তর্য্যামী। অন্য সময় হইলে এই গৃহত্যাগ করিয়া যাইতে পানু মুহূর্ত্তকালও বিলম্ব করিত না, কিন্তু রঘুর নিকট হইতে তাঁত বসাইবার টাকা কয়টি আদায়ের জন্যই সকল কষ্ট, সকল অপমান আপনার সুদৃঢ় সহনশক্তির বর্ম্মে ঠেকাইয়া পানু অগ্রাহ্য করিয়া চলিল।

দিন দুই পরে রওয়ানা হইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে পানু বৈঠক-খানায় পিতার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

প্রণত পুত্রের মাথায় পিতা নীরবে মুদিত নেত্রে আপনার জরাজীর্ণ কম্পিত হস্ত দু'খানি রাখিলেন। মাথা তুলিয়া পিতার মুদিত নেত্রের পানে তাকাইয়া পুত্রের শুষ্ক চক্ষুও সহসা জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, চক্ষু মেলিয়া পিতা কহিলেন, —শরীর ক্রমে অথর্ব্ব হয়ে আসছে, অসুখ-বিসুখ হলে খবর দেব, এস, তুমিই জ্যেষ্ঠপুত্র, মুখাগ্নির অধিকার তোমারই আগে।

নত মস্তকে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভারাক্রান্ত চিত্তে পানু বাহির হইয়া আসিল। পিতাও সঙ্গে সঙ্গে দ্বারপ্রান্ত পর্য্যন্ত আসিলেন, পানু ক্ষুব্ধচিত্তে আরও মুহূর্ত্তকাল নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর গাড়ীতে গিয়া উঠিল। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে পানু আবার পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল, পিতা তখনও সেইভাবেই দাঁড়াইয়া তাহার পানে তাকাইয়া আছেন। রৌদ্র নিবারণের জন্য হাতখানি মাথার এক পাশে একটু উঁচু করিয়া ধরিয়া সম্মুখে একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া পানুর পানেই তাকাইয়া আছেন।

পিতার মৌন স্নেহের সুগভীর পরিচয়ে পানুর চক্ষু দুটি আবার জলে ভরিয়া উঠিল। [ক্রমশঃ

"ধর্ম্ম" সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষিগণের কথা

—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

এই প্রবন্ধে এ যাবৎ যে সকল কথা বলা হইয়াছে তাহা আমরা গত সংখ্যায় বিবৃত করিয়াছি। পাঠকদিগকে তাহা পুনরায় স্মরণ করিতে হইবে।

যাঁহারা ব্যক্তিগত ভাবে স্ব স্ব জীবনের সাফল্য কামনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে এই প্রবন্ধ অতীব প্রয়োজনীয়। আমাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্যক্তিগত জীবনে সর্ব্বসাধারণের সুখী হইতে হইলে, যেমন রাষ্ট্রগত সংগঠনের প্রয়োজন, সেইরূপ ব্যক্তিগত সংগঠনেরও প্রয়োজন আছে। রাষ্ট্রগত সংগঠন যতই সুচারু এবং সুচিন্তিত হউক না কেন, ব্যক্তিগত জীবন সুসংগঠিত না হইলে স্বকীয় জীবনে সুখলাভ করা সম্ভব হয় না। অবশ্য ইহা সত্য বটে যে, রাষ্ট্রগত সুসংগঠন না থাকিলে, ব্যক্তিগত জীবন সর্ব্বতোভাবে সুসংগঠিত হইলেও মানুষ স্ব স্ব প্রয়োজনীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে পারে না; কিন্তু ইহাও সত্য যে, দেশের মধ্যে সুসংগঠিত ব্যক্তিগত জীবনসম্পন্ন মানুষের উদ্ভব হইতে আরম্ভ করিলে, দেশের রাষ্ট্রগত সুসংগঠন সহজসাধ্য হইয়া পড়ে। কাযেই বলা যাইতে পারে যে, কোন দেশে মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত সুসংগঠনের প্রবৃত্তি জাগ্রত হইতে আরম্ভ করিলে, ঐ দেশের রাষ্ট্রগত বিশৃঙ্খলা অদূর ভবিষ্যতে তিরোহিত হইবার আশা করা যায়। কি করিয়া মানুষের বক্তিগত জীবন কার্য্যতঃ সুসংগঠিত করা যাইতে পারে, তাহার চিন্তা এই প্রবন্ধে দেখা যাইবে। কাযেই ইহা অনুসন্ধিৎসু পাঠকদিগের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

ইহা ছাড়া এই প্রবন্ধে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, অ্যানাটমী এবং ফিজিওলজী সম্বন্ধে এমন অনেক কথা পাওয়া যাইবে, যাহার সন্ধান ঐ সকল বিষয়ের পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকগণ এখনও পর্য্যন্ত পান নাই। এই বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি আমাদের ভারতীয় ঋষির কোন্ গ্রন্থে আছে এবং ইহা আমাদের বর্ত্তমান সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ কিরূপ বিকৃতার্থে ব্যাখ্যা করিয়া প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি অসার করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা আমরা এই প্রবন্ধের শেষাংশে দেখাইব। এই প্রবন্ধ পাঠ করিলে আমরা কাহার সন্তান এবং কোন্ বিদ্যার অধিকারী হইয়া কি বিভ্রান্তিকর কুজ্ঞানকে জ্ঞান-বিজ্ঞান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি তাহা বুঝা যাইবে।

আমরা এ যাবৎ শুনিয়া আসিয়াছি যে, ভারতে একটা প্রকাণ্ড জ্ঞান-বিজ্ঞান বিদ্যমান ছিল। অথচ সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান যে কোথায় আছে, তাহার সন্ধান আমাদের জানা নাই। ঐ প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা আমাদের দেবোপম ভারতীয় ঋষির কোন্ কোন্ গ্রন্থে আছে, তাহা জানা নাই বলিয়াই, আমরা একটা কল্পিত তথাকথিত "অধ্যাত্মবিদ্যা"কে ভারতীয় ঋষির জ্ঞান-বিজ্ঞান বলিয়া প্রচার করিতেছি। ঐ কল্পিত অধ্যাত্মবিদ্যা মানুষের কোন সাংসারিক প্রয়োজনে লাগে না এবং তদ্দ্বারা মানুষকে বিভ্রান্ত করা হইতেছে এবং সোনার ভারত উত্তরোত্তর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে বসিয়াছে। আমাদের ভারতীয় ঋষির কোন্ গ্রন্থে কোন্ বিদ্যার কথা আছে, তাহার পরিচয় এই প্রবন্ধে পাওয়া যাইবে। কাযেই একটু কষ্ট হইলেও আমরা পাঠকদিগকে ধৈর্য্যসহকারে এই প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

ইহাতে এযাবৎ নিম্নলিখিত বিষয়ের আলোচনা ও তাহার সত্যতা প্রমাণিত করা হইয়াছে :—

(১) বর্ণগত অর্থানুসারে "ধর্ম্ম" বলিতে বুঝায় সেই কার্য্য অথবা সেই চালচলন, যে কার্য্যে অথবা চালচলনে জীবের উপস্থ, বহ্নি এবং স্পর্শশক্তি অটুট থাকে। এক কথায়, যাহা মানুষের করা উচিত, তাহার নাম "ধর্ম্ম";

(২) "ধর্ম" বলিতে বুঝায় সেই কার্য্য অথবা সেই চালচলন, যাহা জীব তাহার উপস্থ, তেজ এবং স্পর্শশক্তিবশতঃ অবলম্বন করিয়া থাকে। এক কথায় মানুষ যাহা সাধারণতঃ করিয়া থাকে, তাহাই তাহার "ধর্ম"। যথা—চোরের ধর্ম, সাধুর ধর্ম ইত্যাদি;

(৩) শরীরের যাহা কিছু কাটিয়া ফেলিলে মানুষ পরমুখাপেক্ষী না হইয়া স্বাধীনভাবে দৃষ্টিশক্তি, ঘ্রাণ-শক্তি, শ্রবণ-শক্তি, বাক্-শক্তি, স্পর্শ-শক্তি ও চলচ্ছক্তি বজায় রাখিতে পারে, তাহার নাম উপ-স্থ এবং যাহা

কাটিয়া ফেলিলে ঐ ছয়টি শক্তির কোন শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, তাহার নাম অপ-স্থ ;

(৫) জীবের উপ-স্থ বস্তুগুলির শক্তি অটুট রাখিবার উপযোগী কার্য্য করিয়া জীব তাহার নীরোগতা ও কার্য্যক্ষমতার বৃদ্ধি সাধন করিতে পারে।

(৬) জীব ও জগতের মূল কারণ ব্যোম। ব্যোমের দুইটি অবস্থা আছে। একটির নাম "অশরীরী" অবস্থা এবং অপরটির নাম "ভূত" অবস্থা ;

(৬) "অশরীরী-ব্যোম" হইতে "ভূত-ব্যোমের" উদ্ভব হয় এবং "ভূত-ব্যোম" হইতে ক্রমশঃ বায়ু, অম্বু এবং বহ্নি, পরমাণু, অণু, মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত, ত্বক্ এবং রোমকূপের উদ্ভব হইয়া থাকে ;

(৭) অবিমিশ্র বিশুদ্ধ বায়ুতে যখন শীতল স্পর্শের উদ্ভব হয়, অথচ ঐ স্পর্শে শীতলতার কোন তীব্রতা থাকে না, তখন তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় "অম্বু" বলা হয়। "অম্বু"র শীতলতায় তীব্রতা উপস্থিত হইলে অন্যান্য গুণানুসারে তাহাকে "আপ", "জল" ইত্যাদি বলা হইয়া থাকে ;

(৮) অবিমিশ্র বিশুদ্ধ বায়ুতে যখন উষ্ণ স্পর্শের উদ্ভব হয়, অথচ ঐ স্পর্শে উষ্ণতার কোন তীব্রতা থাকে না, তখন তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় "বহ্নি" বলা হয়। "বহ্নি"র উষ্ণতায় তীব্রতা উপস্থিত হইলে অন্যান্য গুণানুসারে তাহাকে "অগ্নি", "তেজ" প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে ;

(৯) আমাদের নিকটবর্ত্তী বায়ুমণ্ডলে প্রকৃত বিশুদ্ধ বায়ু, অথবা বিশুদ্ধ অম্বু, অথবা বিশুদ্ধ বহ্নি অবিমিশ্রভাবে পরিলক্ষিত হয় না। নীলাকাশের নিকটে যে বায়ুমণ্ডল আছে, তাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু, বিশুদ্ধ অম্বু এবং বিশুদ্ধ বহ্নির বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে ;

(১০) জীব তাহার শরীরের মধ্যে যে বায়ু, অম্বু এবং বহ্নি সাধারণতঃ পোষণ করিয়া থাকে, তাহা বিশুদ্ধ নহে। তাহা বিশুদ্ধ নহে বলিয়াই জীব প্রতিনিয়ত নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার যন্ত্রণা ভোগ করে এবং ঐ বায়ু, অম্বু এবং বহ্নির অবিশুদ্ধতার মাত্রানুসারে জীবের শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার মাত্রার তারতম্য হয় ;

(১১) শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ু, অম্বু এবং বহ্নির বিশুদ্ধতা সাধন করিতে পারিলে শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা এবং ব্যাধিযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হওয়া যায় ;

(১২) বায়ু, অম্বু এবং বহ্নির মূল কারণ অশরীরী ব্যোমকে প্রত্যক্ষ অর্থাৎ স্পর্শ করিতে পারিলে, শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ু, অম্বু এবং বহ্নির বিশুদ্ধতা সাধন করিবার ক্ষমতা লাভ করা যায়। শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ুর সমতা সাধন করিয়া ঋগ্‌বেদোক্ত শব্দবিশেষের উচ্চারণ সহকারে "উদান"-বায়ুর অনুধাবন করিতে পারিলে, ব্যোমের অশরীরী অবস্থা জিহ্বার মেদভাগ দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়। জিহ্বার মেদভাগ দ্বারা ব্যোমের অশরীরী অবস্থা প্রত্যক্ষ করা অর্থাৎ স্পর্শ করার কার্য্যকে সংস্কৃত ভাষায় "ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে "বায়ুর সমতাসাধন" ও "উদান বায়ু" কাহাকে বলে, তাহার আলোচনা গত বৈশাখ সংখ্যায় করা হইয়াছে ;

(১৩) ভূত-অবস্থার ব্যোমকে প্রত্যক্ষ অর্থাৎ স্পর্শ করিতে না পারিলে উদান-বায়ুর অনুধাবন করা যায় না এবং উদান-বায়ুর অনুধাবন করিতে না পারিলে ব্যোমের অশরীরী অবস্থা স্পর্শ করা যায় না। অর্থাৎ "ব্রহ্ম" সাক্ষাৎ করা সম্ভব হয় না।

(১৪) শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ুর সমতা সাধন করিয়া ঋগ্‌বেদোক্ত শব্দবিশেষের উচ্চারণসহকারে "ব্যান"-বায়ুর অনুধাবন করিতে পারিলে, ব্যোমের "ভূত" অবস্থা জিহ্বার মেদভাগ দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়। জিহ্বার মেদভাগ দ্বারা ব্যোমের "ভূত" অবস্থা প্রত্যক্ষ করা অর্থাৎ স্পর্শ করার কার্য্যকে সংস্কৃত ভাষায় "ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করার কার্য্য" বলা হইয়াছে। যে বিশুদ্ধ বহ্নিবশতঃ ব্যোমের "অশরীরী" অবস্থা হইতে "ভূত" অবস্থা পরিগৃহীত হয়, সেই বিশুদ্ধ "বহ্নি"কে সংস্কৃত ভাষায় "ঈশ্বর" নাম দেওয়া হইয়াছে ;

(১৫) উপরোক্ত একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ দফার সত্যগুলি উপলব্ধি করিতে পারিলে বুঝা যায় যে, বিশুদ্ধ বহ্নি কি বস্তু এবং তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে **ঈশ্বর প্রত্যক্ষ** করা যায় এবং ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে **ব্রহ্মের সাক্ষাৎ** লাভ করা যাইতে পারে এবং ব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিলে শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ু, অম্বু এবং বহ্নির বিশুদ্ধতা সাধন করা সম্ভব হয়। শরীরাভ্যন্তরে বায়ু, অম্বু এবং বহ্নির বিশুদ্ধতা সাধন করিবার ক্ষমতা-লাভ করিলে, মানুষের পক্ষে তাহার শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা ও ব্যাধিযন্ত্রণা হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হওয়া সম্ভব হয়। কাযেই এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, বিশুদ্ধ "বহ্নি" কি বস্তু, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে এবং শরীরাভ্যন্তরে তাহা অটুট রাখিতে পারিলে, মানুষের পক্ষে তাহার শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা এবং ব্যাধিযন্ত্রণা হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হওয়া সম্ভব হয় ;

(১৬) মানুষ তাহার কতকগুলি কু-প্রকৃতিবশতঃ তাহার শরীরাভ্যন্তরে যে "বহ্নি" আছে, ঐ "বহ্নি"র বিশুদ্ধতা উপলব্ধি করিতে পারে না এবং তাহারই জন্য মানুষের জীবন অবিমিশ্র সুখময় না হইয়া সুখ-দুঃখমিশ্রিত হইয়া থাকে। মানুষের কু-প্রকৃতির সংখ্যা সাধারণতঃ আটটি, যথা :—(১) অহঙ্কার, (২) কু-বুদ্ধি, (৩) বিক্ষিপ্ত মন, (৪) আকাশ, (৫) বায়ু, (৬) অনল, (৭) আপ ও (৮) ভূমি ;

(১৭) শরীরাভ্যন্তরস্থ "বহ্নি"র বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে হইলে মানুষকে উপরোক্ত আটটি প্রকৃতির হাত হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় অনুসন্ধান করিতে হইবে ;

(১৮) মানুষের কেন ঐ আটটি কু-প্রকৃতির উদ্ভব হয়, তাহার অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে যে, মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত, ত্বক্ ও রোমকূপে উষ্ণতার আধিক্যবশতঃ যথাক্রমে মানুষ অহঙ্কারী, কুবুদ্ধি-সম্পন্ন, বিক্ষিপ্তমনাঃ এবং আকাশ, বায়ু, অনল, আপ ও ভূমি-প্রকৃতিসম্পন্ন হয়;

(১৯) উপরোক্ত অষ্টাদশ দফা হইতে বলা যাইতে পারে যে, যাহাতে মানুষের শরীরের মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত, ত্বক্ ও রোমকূপে উষ্ণতার আধিক্য না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে, মানুষ তাহার প্রধান আটটি কু-প্রকৃতি হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

কি উপায়ে মেদাদির উষ্ণতার আধিক্য প্রতিহত করা যায়, তাহাই পরবর্ত্তী আলোচনার বিষয়।

স্পর্শ-শক্তি কাহাকে বলে এবং তাহা অটুট রাখিবার প্রয়োজনীয়তা

গত বৈশাখ সংখ্যায় যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, যাহাতে মানুষের শরীরের মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত, ত্বক্ ও রোমকূপের উষ্ণতার আধিক্য না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে, মানুষ তাহার প্রধান আটটি কু-প্রকৃতি (অর্থাৎ অহঙ্কার, কুবুদ্ধি, বিক্ষিপ্ত মন, আকাশ, বায়ু, অনল, আপ ও ভূমি-প্রকৃতি)* হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

মানুষের শরীরের মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত, ত্বক্ ও রোমকূপে যাহাতে উষ্ণতার আধিক্য না হয়, তাহা করিতে হইলে, প্রথমতঃ তাহার শরীরের মধ্যে কোথায় কোথায় ঐ মেদ, অস্থি প্রভৃতির সমুচ্চয় (সমাবেশ বা assembly) রহিয়াছে, তাহা অনুভব করিতে হইবে ;

দ্বিতীয়তঃ কোথা হইতে তাহার ঐ মেদ, অস্থি প্রভৃতি উষ্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে তাহা বুঝিতে হইবে ;

তৃতীয়তঃ কি উপায়ে ঐ উষ্ণতার আধিক্য সংযত করা যায়, তাহা জানিতে হইবে।

মানুষের শরীরের মধ্যে কোথায় তাহার মেদ, অস্থি প্রভৃতির সমুচ্চয় (assembly) রহিয়াছে, তাহা অনুভব করিতে হইলে, মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত, চর্ম্ম ও রোমকূপ কাহাকে বলে, তাহা ঠিকভাবে বুঝিতে হইবে।

শরীরের বাহিরের দিকে তাকাইলে চর্ম্ম ও রোমকূপ কি বস্তু তাহা বুঝা যায় বটে, কিন্তু মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস ও রক্ত যে কি জিনিষ এবং জীবিত অবস্থায় শরীরাভ্যন্তরে ঐ সমস্ত বস্তু কিরূপ দেখায়, তাহা কিছুই বুঝা যায় না। অনেকে মনে করেন যে, পিচকারী (syringe) দ্বারা আধুনিক ডাক্তারগণ পরীক্ষার্থ যে রক্ত বাহির করিয়া থাকেন, তাহাই ঠিক ঠিক শরীরাভ্যন্তরস্থ রক্ত। কিন্তু, ইহা মনে করা সমীচীন নহে। রক্ত যখন শরীরাভ্যন্তরে থাকে, তখন তাহা যে পরিমাণ বহিঃস্থিত বায়ুর সহিত যে ভাবে মিশ্রিত থাকে, ঐ রক্ত পিচকারী (syringe) দ্বারা বাহির করিয়া লইলে তদপেক্ষা অধিকতর পরিমাণের বহিঃস্থিত বায়ুর সহিত বিভিন্ন রকমে মিশ্রিত হইয়া পড়ে। বহিঃস্থিত বায়ুর মিশ্রণের পরিমাণের ও ভাবের তারতম্যে যে শরীরাভ্যন্তরস্থ দ্রব্যসমূহের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, তাহা একটু চিন্তার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। মাতৃগর্ভস্থ শিশুসন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র তাহার গায়ের রং পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে পশু পক্ষী প্রভৃতি প্রত্যেক প্রাণীর শাবকগণ মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পর বহিঃস্থিত বায়ুর সহিত মিলিত হইবামাত্র ঘণ্টায় ঘণ্টায় বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। যে কোন কাঁচা ফলের রস অথবা ডাঁটার রস বাহির করিয়া কোন পাত্রে রাখিলে দেখা যাইবে যে, তাহাও বহিঃস্থিত বায়ুর সহিত মিশ্রণের ফলে প্রতিমুহূর্ত্তে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। কাযেই আধুনিক ডাক্তারগণ যে মনে করিয়া থাকেন, যে, পিচকারী (syringe) দ্বারা শরীরাভ্যন্তরস্থ রক্ত বাহির করিয়া পরীক্ষা করিলে, ঠিক ঠিক ভাবে শরীরাভ্যন্তরস্থ রক্তের পরীক্ষা করা হয়, ইহা তাঁহাদের ভ্রম। ঐরূপভাবে রক্ত, মূত্র প্রভৃতি পরীক্ষা করা তাঁহাদের accepted theory হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের accepted theory এইরূপ নির্ব্বুদ্ধিতা-মূলক হইয়াছে বলিয়াই এখন আর মানুষকে সর্ব্বতোভাবে প্রায়শঃ সুস্থ থাকিতে দেখা যায় না এবং ৫০ বৎসর হইতে না হইতেই অধিকাংশ মানুষ মৃত্যুর কবলে পতিত হয়। শরীরাভ্যন্তরস্থ রক্তাদি শরীরমধ্য হইতে নির্গত হইলেই তাহা

* মানুষের আকাশ, বায়ু, অনল, আপ ও ভূমি-প্রকৃতি কাহাকে বলে, তাহা বঙ্গশ্রীর বৈশাখ সংখ্যার এই প্রবন্ধে বিশদভাবে বলা হইয়াছে।

বহিঃস্থিত বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে এবং অন্য রূপ পরিগ্রহ করে। কারণ, বহিঃস্থিত বায়ুতে সর্ব্বদাই নানাবিধ বিভিন্ন বস্তু বর্ত্তমান থাকে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ খালি পাত্র (vacuum flask or syringe) নামক যে সমস্ত বস্তুর আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে অন্য কোন বস্তু না থাকিলেও তাহা বায়ুতে পরিপূর্ণ থাকে। কেহ কেহ মনে করেন যে, উহাতে বায়ু পর্য্যন্ত থাকে না। যাঁহারা ঐরূপ মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। প্রত্যেক বস্তু যে পরমাণুর সমষ্টি, তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রত্যেক বস্তু যদি কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি হয়, তাহা হইলে দুইটি পরমাণুর মধ্যে যতই অপরিসর হউক, একটু না একটু intermolecular space থাকিবেই থাকিবে এবং intermolecular space থাকিলেই তাহার মধ্য দিয়া বায়ুও প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে। এই তথ্য বিবেচনা করিলে বলা যাইতে পারে যে, বায়ুহীন স্থান থাকিতে পারে না এবং বায়ুশূন্য পাত্র হইতে পারে না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে কেহ কেহ যে তদ্বিরুদ্ধ অভিমত পোষণ করিয়া থাকেন, তাহার কারণ তাঁহাদের বায়ু-সম্বন্ধীয় জ্ঞান অতীব ভ্রান্ত এবং অসম্পূর্ণ। যজুর্ব্বেদ যথাযথ অর্থে অধ্যয়ন করিতে পারিলে বায়ু-সম্বন্ধীয় পূর্ণজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় এবং তখন আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের বায়ু-সম্বন্ধীয় জ্ঞান যে কত ভ্রান্ত এবং অসম্পূর্ণ তাহা বুঝিতে পারা যায়। এমন কি, চরক-সংহিতার "বাতব্যাধির" চিকিৎসা-অধ্যায় অধ্যয়ন করিলে বায়ু-সম্বন্ধীয় যে পরিমাণ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়, তাহা সমগ্র আধুনিক বিজ্ঞান পড়িলেও পারা যায় না।

কাযেই শরীরাভ্যন্তরস্থ মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস ও রক্ত দেখিতে কিরূপ দেখায় এবং তাহার গুণাগুণ কি, তাহা ঠিকভাবে বুঝিতে হইলে, উহা শরীরাভ্যন্তরেই বুঝিতে হইবে। চর্ম্ম ও রোমকূপ দেখিতে কিরূপ দেখায়, তাহা বাহির হইতে আংশিকভাবে বুঝা যায় বটে কিন্তু ঐ চর্ম্ম ও রোমকূপ কতখানি মোটা (thick) এবং উহার গুণাগুণ কি, তাহা বাহির হইতে ঠিক ভাবে বুঝিতে পারা যায় না। চর্ম্ম ও রোমকূপের গুণাগুণ সঠিকভাবে বুঝিতে হইলে তাহাও শরীরাভ্যন্তরে বুঝিতে হইবে।

শরীরাভ্যন্তরে এই মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত, চর্ম্ম এবং রোমকূপ কি করিয়া যথাযথভাবে অনুভব করা এবং তাহাদের গুণাগুণ বুঝিতে পারা সম্ভব হইতে পারে, তাহাই হইবে আমাদের প্রথম জিজ্ঞাস্য।

শরীরের অন্য কোথাও মেদ, অস্থি প্রভৃতি উপরোক্ত উপাদান কয়টি দেখিতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু মুখের অভ্যন্তরে উহা সমস্তই দেখিতে পাওয়া যায়। জিহ্বা দেখিলে মেদ কি বস্তু, তাহা আংশিক ভাবে অনুভব করিতে পারা যায়, কারণ জিহ্বার প্রধান উপাদান মেদ। দন্ত দেখিলে অস্থি কি বস্তু, তাহা আংশিক ভাবে বুঝিতে পারা যায়, কারণ দন্তের প্রধান উপাদানকে অস্থি বলা হইয়া থাকে। ঠোঁট দুই খানি দেখিলে মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত, চর্ম্ম ও রোমকূপ কি বস্তু, তাহা বুঝিতে পারা যায়, কারণ ঠোঁটের মধ্যে ঐ ছয়টি বস্তুই রহিয়াছে। ঠোঁটের মধ্যে ঐ ছয়টি বস্তুই রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা এমন মিশ্রিত রহিয়াছে যে, ঠোঁটের কোথায় মজ্জা, কোথায় বসা, কোথায় মাংস, কোথায় রক্ত, কতখানি চর্ম্ম এবং কোথা হইতে রোমকূপ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কাযেই ঠোঁট দেখিয়া ঐ ছয়টি বস্তুকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া অনুভব করা একটি সমস্যার ব্যাপার। ঠোঁট দেখিয়া ঐ ছয়টি বস্তুকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অনুভব করিতে হইলে শব্দের অথবা মন্ত্রের সাহায্য লইতে হইবে।

ঠোঁট দু'খানির অগ্রভাগ (section, অর্থাৎ হাঁ করিলে ঠোঁটের যে অংশ দেখিতে পাওয়া যায়) পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তাহার মুখমধ্যস্থিত অংশ রক্ত বর্ণের, আর উপরিভাগস্থ অংশ চামড়ার রংএর এবং ভিতর ও বাহিরের মধ্যস্থিত অংশের আর তিনটি পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ দেখা যাইবে। কাযেই ঠোঁটের মধ্যে যখন পাঁচটি বিভিন্ন বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, তখন তাহাতে পাঁচটি বিভিন্ন বস্তু আছে, ইহা বুঝিতে হইবে। ঠোঁটের মধ্যে যে পাঁচটি বিভিন্ন বস্তু আছে, তাহা 'প', 'ফ', 'ব', 'ভ', 'ম' এই পাঁচটি বিভিন্ন শব্দের বিভিন্ন স্পর্শ হইতে ঠিক ভাবে বুঝিতে পারা যায়। একটি ঠোঁটের উপর আর একটি ঠোঁট লাগাইয়া তাহা যাহাতে কোনরূপে কুঞ্চিত না হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য করিয়া স্বাভাবিক ভাবে 'ম' উচ্চারণ করিলে যে স্পর্শ পাওয়া যায়, তাহা মজ্জার স্পর্শ, ঐরূপ ভাবে ঠোঁটের উপর ঠোঁট লাগাইয়া

স্বাভাবিক ভাবে 'ভ' উচ্চারণ করিলে যে স্পর্শ পাওয়া যায়, তাহা বসার স্পর্শ; 'ব' উচ্চারণ করিলে যে স্পর্শ পাওয়া যায়, তাহা মাংসের স্পর্শ; 'ফ' উচ্চারণ করিলে যে স্পর্শ পাওয়া যায়, তাহা রক্তের স্পর্শ; 'প' উচ্চারণ করিলে যে স্পর্শ পাওয়া যায়, তাহা চর্ম্মের স্পর্শ। আপাতদৃষ্টিতে এইরূপ ভাবে মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত এবং চর্ম্মের স্পর্শ পাওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু পাঠকগণের মধ্যে কেহ যদি কায়মনোবাক্যে সামান্য কয়েক দিন এই স্পর্শ অনুভব করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি আমাদের কথার সত্যতা আংশিক ভাবে স্বীকার করিবেন। একবার মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত এবং চর্ম্মের স্পর্শ অনুভব করিতে পারিলে, তখন রোমকূপ কোথা হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা অনুভব করাও সহজসাধ্য হইয়া থাকে। এইরূপ ভাবে মুখমধ্যস্থিত জিহ্বা, দন্ত এবং ঠোঁটের সহায়তায় মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত, চর্ম্ম এবং রোমকূপ কি বস্তু, তাহা দেখিতে ও স্পর্শ করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু ঐ ঐ বস্তু শরীরের মধ্যে কোথায় কোথায় আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না

শরীরের মধ্যে কোথায় কোথায় মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত, চর্ম্ম এবং রোমকূপ আছে, তাহার অনুধাবন করিতে হইলে, প্রথমতঃ স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক জীবের শরীর অসংখ্য পরমাণু ও অণুর সমষ্টি এবং বায়ু, অম্বু এবং বহ্নির কার্য্যবশতঃ ঐ পরমাণু ও অণু বিচ্ছিন্ন না হইয়া সর্ব্বদা সংশ্লিষ্ট থাকে বলিয়া জীবের শরীর বিদ্যমান রহিয়াছে;

দ্বিতীয়তঃ স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সমগুণবিশিষ্ট অণু সর্ব্বদা একস্থানে মিলিত থাকিতে চাহে এবং উহা যে বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন রূপের হইয়া থাকে, তাহা উহাদের উপর বায়ুর বিভিন্ন কার্য্যবশতঃ।

সমগুণবিশিষ্ট অণু সর্ব্বদা একস্থানে মিলিত থাকিতে চাহে বলিয়া মেদ মেদের সহিত মিলিত থাকে; অস্থি অস্থির সহিত মিলিত থাকে; মজ্জা মজ্জার সহিত মিলিত থাকে; বসা বসার সহিত মিলিত থাকে; মাংস মাংসের সহিত মিলিত থাকে; রক্ত, রক্তের সহিত মিলিত থাকে; এবং চর্ম্ম, চর্ম্মের সহিত মিলিত থাকে।

চর্ম্ম যে চর্ম্মের সহিত মিলিত থাকে, তাহা যে কোন জীবিত জীবের দিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

কোন জীবের শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, চর্ম্ম শরীরের উপরিভাগে রহিয়াছে এবং তাহা শরীরের মধ্যে আর কোথাও দেখা যাইবে না। সেইরূপ কেবল মাত্র চর্ম্ম এবং মাংসের মধ্যেই রক্ত দেখা যাইবে এবং তাহা চর্ম্ম এবং মাংস ছাড়া অস্থির মধ্যে কুত্রাপি দেখা যাইবে না। শরীরের সমস্ত মাংস, বসা (চর্ব্বি), মজ্জা, অস্থি এবং মেদ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সংশ্লিষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে এবং মাংসসমুচ্চয়ের মধ্যে বসা পাওয়া যাইবে না, অথবা বসা-সমুচ্চয়ের মধ্যেও মাংস পাওয়া যাইবে না।

কাযেই বলা যাইতে পারে যে, জিহ্বাতে যে মেদ আছে, তাহার স্পর্শানুভব করিয়া ঐ স্পর্শের আধিক্য সাধন করিতে পারিলে, শরীরের মধ্যে কোথায় কোথায় মেদ আছে, তাহা অনুভব করিতে পারা যায়।

সেইরূপ দন্তে যে অস্থি আছে, তাহার স্পর্শানুভব করিয়া ঐ স্পর্শের আধিক্য সাধন করিতে পারিলে, শরীরের মধ্যে কোথায় কোথায় অস্থি আছে,তাহা অনুভব করিতে পারা যায়। ঠোঁটে যে মজ্জা, বসা, রক্ত ও চর্ম্ম আছে, তাহার পৃথক্ পৃথক্ স্পর্শাভনুব করিয়া ঐ স্পর্শের আধিক্য সাধন করিতে পারিলে শরীরের মধ্যে কোথায় কোথায় মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত ও চর্ম্ম আছে, তাহা অনুভব করিতে পারা যায়।

মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত ও চর্ম্মের উপরোক্ত স্পর্শের আধিক্য সাধন করিবার উপায় কি, তাহাই হইবে ইহার পরবর্ত্তী জিজ্ঞাস্য।

ভারতীয় ঋষিদিগের মতে উপরোক্ত স্পর্শের আধিক্য সাধন করিবার একমাত্র উপায়, শব্দের অর্থাৎ মন্ত্রের সহায়তা লওয়া।

যাঁহারা "অকার", "ইকার", "উকার" প্রভৃতি স্বরবর্ণের এবং "ক", "খ", "গ", প্রভৃতি ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণের পার্থক্য কি,তাহা অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে 'সবর্ণ' সমূহের* উচ্চারণের উৎপত্তি-স্থান এক বটে কিন্তু প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণের গতির দিক্ (direction of motion), গতির বেগ (velocity of motion) এবং পরিণতির স্থান (point where the

* তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্। পাণিনি, ১ম অ; ১ম পাদ; ৯ম সূত্র।

motion ends) বিভিন্ন। ইহা হইতে বুদ্ধিমান্‌গণ অনুমান করিতে পারিবেন যে, যথাযথ ভাবে বর্ণ-সংযোজনা করিতে পারিলে এবং তাহার নাদ(অর্থাৎ উচ্চারণ) যথাযথ হইলে এবং ঐ নাদ্ব শরীরের কোন্ কোন্ স্থান স্পর্শ করিতেছে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে, শরীরের মধ্যে কোথায় কি আছে, তাহা বুঝিতে পারা সম্ভব হইতে পারে।

মুখের মধ্যে জিহ্বায় যে মেদ আছে এবং দন্তে যে অস্থি আছে,উহা কি করিয়া স্পর্শ করিতে হয় এবং স্পর্শের আধিক্য কি করিয়া সাধন করিতে হয়, তাহা ঋগ্বেদে বর্ণিত হইয়াছে।

ঠোঁটের মধ্যে যে মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত ও চর্ম্ম আছে, উহা ঠিক ঠিক ভাবে কি করিয়া স্পর্শ করিতে হয় এবং ঐ স্পর্শের আধিক্য কি করিয়া সাধন করিতে হয়, তাহা সামবেদে বর্ণিত হইয়াছে।

এখন আর কোন পণ্ডিত(?) ঋক্ ও সাম অধ্যয়ন করিয়া উহার মধ্যে উপরোক্ত তথ্যসমূহের সন্ধান পান না। তাহার কারণ, তাঁহারা সংস্কৃত ভাষা-তত্ত্ব বিস্মৃত হইয়াছেন এবং এখন আর ঋষিদিগের কোন গ্রন্থ যথাযথ অর্থে বুঝিতে পারেন না।

ঋষিদিগের কথানুসারে প্রত্যেক চর-জীবের মৌলিক ভাব তিনটি। ঐ তিনটি ভাবের বৈদিক নাম "অ", "ই" এবং "উ"-ভাব। উহাদের দার্শনিক নাম—"ব্রহ্ম-ভাব", "চিৎ-কলা-ভাব" এবং "জগৎ-ভাব"। উহাদের পৌরাণিক (অর্থাৎ লৌকিক) নাম—"সৎ-স্বাভাব", "আৎ-মাভাব" এবং "শরীর-ভাব"। মৌলিক ঐ তিনটি ভাবের প্রত্যেকটির আবার তিন তিনটি করিয়া ভাব আছে, যথা,—সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ।

চর-জীবের মৌলিক তিনটি ভাবের সহিত পরবর্ত্তী তিনটি ভাবের সমন্বয়ে নয়টি ভাব উদ্ভূত হইয়া থাকে। এই নয়টি ভাব হইতে জীবের নব-দ্বারের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং ঐ নয়টি ভাবের সংমিশ্রণে ও বি-মিশ্রণে জীব বহুবিধ-ভাবের হইয়া পড়ে।

জীবের যেরূপ মৌলিক তিনটি ভাব আছে, ভাষারও সেইরূপ মৌলিক তিনটি ভাব আছে এবং তাহাও পরবর্ত্তী ভাব-সমূহের সংমিশ্রণে ও বিমিশ্রণে বহুবিধ-ভাবের হইয়া থাকে। ভাষার মৌলিক তিনটি ভাবের বৈদিক নাম অ, ই এবং উ-ভাব। তাহাদের দার্শনিক নাম ব্রহ্ম-ভাব, আত্মা-ভাব এবং জগৎ-ভাব, অথবা নিঃ-উক্ত-ভাব, অথবা লৌকিক-ভাব।

অথর্ব্ব-বেদের ৬ষ্ঠ, ৭ম এবং ৮ম ভাগ যথাযথ অর্থে অধ্যয়ন করিতে পারিলে ভাষার উপরোক্ত তিনটি ভাব সম্বন্ধে সমস্ত প্রয়োজনীয় মৌলিক জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। বাক্য-পদীয়-প্রণেতা তাঁহার গ্রন্থের তিনটি কাণ্ডে ভাষার ঐ তিনটি ভাব বিস্তৃত ভাবে বুঝাইয়াছেন। ইহা ছাড়া নিরুক্তে, কল্প-সূত্রে এবং অষ্টাধ্যায়ী পাণিনিতেও তৎসম্বন্ধে সমস্ত প্রয়োজনীয় কথা বিভিন্ন দিক্ হইতে বুঝান হইয়াছে।

চারিখানি বেদ, উপনিষদ্, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, বেদাঙ্গ (পাণিনিসমেত) এবং উত্তর-মীমাংসা ভাষার উপরোক্ত ব্রহ্ম-ভাবে লিখিত।

যে সমস্ত গ্রন্থ ভাষার উপরোক্ত ব্রহ্মভাবে লিখিত, তাহা বুঝিতে হইলে নাদবিভাগ কি করিয়া করিতে হয়, ধ্বনি নিত্যার্থক অথবা বৃত্তি-প্রকাশক অথবা বর্ণনা-প্রকাশক, তাহা কি করিয়া বুঝিতে হয়, ধ্বনির মধ্যে কোন্টুকু উপাত্মক এবং কোন্টুকু আদানাত্মক, তাহা কি করিয়া বিশ্লেষণ করিতে হয়, ধ্বনির আদানাত্মক ভাগ হইতে কি করিয়া অর্থসংগ্রহ করিতে হয়— এবংবিধ জ্ঞান লাভ করিবার প্রয়োজন হয়। এখন আর কেহ উপরোক্ত জ্ঞান লাভ করেন না বলিয়া কাহারও পক্ষে বেদাদি যে সমস্ত গ্রন্থ ভাষার ব্রহ্ম-ভাবে লিখিত, তাহা যথাযথ ভাবে বুঝা সম্ভব হয় না।

আধুনিক পণ্ডিতগণ ভাষার ব্রহ্ম-ভাব কি তাহা বুঝিতে পারেন না বলিয়া ঐ সমস্ত গ্রন্থের লৌকিক-ভাবে অর্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার ফলে ঐ সমস্ত গ্রন্থের পাঠ প্রায়শঃ পুলিশ-অফিসের (police office) স্থানে পোলাইস্-অফ্-ফাইসের (police-of-fice) মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং তাহার অর্থ চাষার গান ও ঠাকুরমার গল্প হইয়া পড়িয়াছে।

ভাষার ব্রহ্ম-ভাব না বুঝিতে পারিলে তাহার আত্ম-ভাব কি তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না এবং ভাষার আত্ম-ভাব কি তাহা না জানিলে উহার লৌকিক-ভাবও যথাযথ ভাবে বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয় না। এইরূপ ভাবে ভাষার ব্রহ্ম-ভাবের বিস্মৃতির ফলে যে সমস্ত গ্রন্থ লৌকিক-ভাবে শ্লোকাকারে অথবা আত্ম-ভাবে সূত্রাকারে লিখিত, তাহা পর্যন্ত বিকৃতার্থে

প্রচারিত হইতেছে এবং ভারতীয় ঋষির ধর্ম্ম ও কর্ম্মের গ্রন্থগুলি পরোক্ষভাবে তদ্‌বিশ্বাসী মানুষকে বিধর্মপথে ও কুকর্মে নিযুক্ত করিতেছে এবং ভারতীয় মানুষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে বসিয়াছে। শঙ্কর, কুমারিল, সায়ণ ও আর্য্যভট্ট প্রভৃতি যে সমস্ত পণ্ডিত আজ ভারতীয় ঋষির ধর্ম্মবিশ্বাসী মানুষের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহারাই আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন। ভারতীয় ঋষির ধর্ম্ম ও কর্ম্মের গ্রন্থ যথাযথ অর্থে প্রচারিত থাকিলে মানুষ তাহাতে এত সত্যের সন্ধান পাইত যে, জগতে অন্য কোন ধর্ম্মের অথবা কর্ম্ম-পন্থীর উদ্ভব হইত না। যতদিন পর্য্যন্ত ভারতীয় ঋষির মানব-ধর্ম্ম ও কর্ম্ম যথাযথ অর্থে প্রচারিত ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত জগতে সমস্ত মানুষ একধর্ম্মী এবং এক কর্ম্মপন্থী ছিল এবং বৌদ্ধ অথবা খৃষ্টান অথবা মুসলমান অথবা নাস্তিকবাদীর উদ্ভব হয় নাই এবং ততদিন পর্য্যন্ত মানুষ কোন দুঃখ-কষ্ট উল্লেখযোগ্য ভাবে ভোগ করে নাই।

লাপ্লাস, উইলিয়ম স্মিথ, স্যার গিকি অথবা ডারউইনের শিষ্যগণ হয় ত আমাদের কথা বিশ্বাস করিতে পারিবেন না, কিন্তু জগতের প্রারম্ভ যে অনির্দ্দিষ্ট কাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং সভ্যতার উত্থান ও পতন যে প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে এবং বর্ত্তমান জগতে মানুষ যে পতিত হইয়াছে, তাহা কার্য্য-কারণ ভাব বিচার করিলে অস্বীকার করা যায় না। শঙ্কর, কুমারিল, সায়ণ এবং আর্য্যভট্ট-প্রমুখ পণ্ডিতগণই যে মনুষ্য-জাতির বর্ত্তমান সর্ব্বনাশের কারণ, তাহা বর্ত্তমান তথাকথিত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ এক্ষণে স্বীকার করিবেন না বটে, কিন্তু আমাদের মনে হয়, অদূরভবিষ্যতে তাহা অনেকেই বুঝিতে পারিবেন।

মুখের মধ্যে মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত ও চর্ম্মের স্পর্শ কি করিয়া যথাযথ ভাবে অনুভব করিতে হয় এবং সেই স্পর্শের আধিক্যই বা কি করিয়া সাধন করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে ঋক্ ও সামবেদে যে সমস্ত কথা আছে, তাহা আমরাও এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিতে পারিব না।

একে ত' ঋষিগণ বেদের অভ্যাস ছাড়া তৎসম্বন্ধে বাদানুবাদ করিতে নিষেধ করিয়াছেন,* তাহার পর আবার যে সমস্ত মন্ত্র ব্যবহার করিলে স্পর্শাধিক্য সাধিত হইতে পারে, সেই সমস্ত মন্ত্র যাঁহারা শ্রদ্ধাশীল এবং কর্ম্মরত নহেন, তাঁহাদিগের নিকট প্রকাশ করাও পরামর্শবিরুদ্ধ। ঐ সমস্ত ব্যবহারে কোনরূপ ভ্রম উপস্থিত হইলে শরীরের যে অংশের সহিত যে অংশের স্পর্শ মানুষের ব্যাধির উৎপাদক, সেই সেই অংশের স্পর্শ সংঘটিত হইতে পারে।

মোটের উপর দেখা যাইতেছে যে, ঋক্ ও সামবেদের মন্ত্রের সাহায্যে মুখের মধ্যে কোথায় মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত, চর্ম্ম ও রোমকূপ আছে তাহার স্পর্শ যথাযথ ভাবে অনুভব করিতে পারা যায় এবং ঐ স্পর্শের আধিক্য সাধন করিয়া শরীরের মধ্যে কোথায় কোথায় মেদাদি উপরোক্ত বস্তু কয়টি আছে, তাহাও অনুধাবন করা যায়।

ঋক্ ও সামের সাহায্যে উপরোক্ত ভাবে স্পর্শের আধিক্য সাধন করিতে পারিলে, ঋকের সাহায্যেই বুঝিতে পারা যায় যে, শরীরের মধ্যে ব্যোম, বায়ু, অম্বু ও বহ্নি রহিয়াছে এবং ঐ ব্যোম, বায়ু, অম্বু ও বহ্নি মিশ্রিত হইয়া "ব্রহ্ম"-রূপে মেদাদির উষ্ণতা ও শীতলতা সাধন করিতেছে। ইহা ছাড়া ঐ ঋকের সাহায্যে আরও বুঝিতে পারা যায় যে, শরীরের মধ্যে মেদাদির অস্তিত্ব ও বহিঃস্থিত বায়ুমণ্ডল-বশতঃ, শরীরাভ্যন্তরস্থ ব্যোম, বায়ু, অম্বু ও বহ্নির মিশ্রিত ব্যোম-রূপ প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং মেদাদির গুণাগুণও সর্ব্বদা বিভিন্ন রকমের হইতেছে। ঋক্ ও সামের সাহায্যে উপরোক্ত স্পর্শের আধিক্য সাধন করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে পারিলে, শরীরাভ্যন্তরস্থ ব্যোম, বায়ু, অম্বু এবং বহ্নি যাহাতে মেদাদির মধ্যে অত্যধিক উষ্ণতার সঞ্চার করিতে না পারে, তাহার সামর্থ্য ঋক্, সাম এবং যজুর সাহায্যে অর্জ্জন করা সম্ভব হয়

কাযেই বলা যাইতে পারে যে, স্পর্শশক্তি অটুট থাকিলে শরীরস্থ মেদাদি যাহাতে অত্যধিক উষ্ণ না হয়, তাহা করিবার সামর্থ্য অর্জ্জিত হয় এবং শরীরস্থ মেদাদির উষ্ণতা যাহাতে অত্যধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হয়, তাহা করিতে পারিলে মানুষ তাহার আটটি কু-প্রকৃতির হাত এড়াইতে পারে এবং তখন মানুষের অবিমিশ্র সুখ ভোগ করিবার সম্ভাবনা হয়।

[ক্রমশঃ

* যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥৪২
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥৪৩
গীতা : ২য় অধ্যায়

অন্তঃপুর

বর্ত্তমান বঙ্গনারী ও সমাজ

—শ্রীতপতী দেবী

পুরুষ এবং স্ত্রীর আভ্যন্তরীণ ধর্ম্ম, গুণ ও কর্ম্মের বিশ্লেষণ করিলে উভয়ের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়, তাহাতে বুঝা যায় একটি অপরটির পূরক, একটি যে-কার্য্য আরম্ভ করেন, অপরটি তাহা শেষ করেন ; সন্তান-জননের আরম্ভ পুরুষ হইতে, শেষ স্ত্রী হইতে। মানুষের জীবন ধারণের জন্য যত কিছু কর্ম্ম করিতে হয়, তাহার প্রত্যেক কর্ম্ম কতকাংশ পুরুষোচিত-গুণসম্ভূত শক্তির সহিত সমঞ্জসীভূত এবং কতকাংশ স্ত্রীজনোচিত-গুণসম্ভূত শক্তির সহিত সমঞ্জসীভূত। দুই জনের কর্ম্মশক্তি লইয়াই একটা পুরা মানুষের কর্ম্মশক্তি। দুই জন সমধর্ম্ম অথবা সমগুণ অথবা সম কর্ম্ম-শক্তিবিশিষ্ট নহে। দুই জনকে সমান করিতে যাওয়া তাহাদের আভ্যন্তরীণ ধর্ম্মের অসমঞ্জসীভূত এবং তাহাতে জীবন-যাত্রায় বিশৃঙ্খলা সুনিশ্চিত। ইউরোপীয় সভ্যতা এই কথাটি না বুঝিতে পারিয়া, ক্রমাগত ভুল করিয়া চলিয়াছে। আমরাও সেই ভুল অনুকরণ করিতেছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে লেখিকা এ দেশের নারীজাতির সেই অনুকরণের প্রবৃত্তি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন।

প্রগতিপন্থী একদল লোক বলেন, বর্ত্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নরনারীর অবাধ স্বাধীনতা থাকিলে তবে মানবজাতির প্রকৃত উন্নতি হওয়া সম্ভব হইবে। তাঁহারা তাঁহাদের মত-সমর্থনের জন্য এইরূপ বলেন যে, কোন বিষয়ে ভুল হইবে বলিয়া যদি সেই বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতে আমরা বিরত থাকি, তাহা হইলে জ্ঞানের অগ্রগতি থামিয়া যায়। তাঁহাদের কথার পিছনে যুক্তি এইরূপ :—মানুষ ক্রমাগত ভুল করিতে করিতেই একদিন সত্যকে লাভ করে, ভুল হইবার আশঙ্কায় যদি সে কোন কাজ করিতে উৎসাহিত না হয়, তাহা হইলে তাহার সত্যলাভে বিঘ্ন ঘটে। প্রগতিপন্থী দলের এই উক্তি কি সত্য ?

আমরা সাধারণ লোক। সাধারণ লোকের বিচারবুদ্ধি এত প্রখর নহে যে, সকল কথার যথার্থ তাৎপর্য্যটি বুঝিয়া সেই অনুসারে নিজের কার্য্যধারা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। 'মানুষমাত্রেই প্রাণী' এই কথাটি আমরা বিশ্বাস করি, কিন্তু হঠাৎ বিশ্বাস করিতে বাধে যে, 'প্রাণী মাত্রেই মানুষ'। সাধারণ লোকের মধ্যে বিচারের ভ্রান্তি এত সহজেই ঘটিয়া থাকে।

*

মনে হয়, "ভুলের পথে চলিয়া মানুষ সত্যলাভ করিতে পারে"—প্রগতিপন্থীদের এই কথাটি সহজেই পরিবর্ত্তিত হইয়া দাঁড়ায়—"সত্যলাভ হইলে ভুলের পথে চলা প্রয়োজন, অর্থাৎ সত্য লাভ করিবার জন্য ভুলের পথটি আমাদিগকে বাছিয়া লইতেই হইবে।" প্রগতিপন্থী দল সাধারণ লোকের মধ্যে এই ভ্রান্তিমূলক ধারণাটি সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন।

ফলে আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যেও এরূপ ধারণা জন্মিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, আমরা এতকাল যে সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে আছি, তাহা হইতে মুক্ত হইয়া আমরা যদি বর্ত্তমান কালের ব্যবস্থাহীনতার মধ্যে গিয়া পড়িতে পারি, তাহা হইলে আমাদের উন্নতি অনিবার্য্যরূপে ঘটিয়া যাইবে।

ব্যবস্থাহীনতার মধ্যে পড়িয়া নানা ভাবে প্রতারিত হইয়া নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া, নানা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, আমরা যে ভবিষ্যতে আবার একটা স্বরচিত ব্যবস্থার মধ্যে নিজেকে উত্তীর্ণ করিতে পারিব এ কথা কি সত্য ? য়ুরোপ ইহাই করিতেছে। সে দেশের মেয়েরা পুরুষের সহিত বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়াছে। মেয়েরা ইহাতে সুখী হয় নাই, কিন্তু এই সুখহীনতা হইতেই হয় ত তাহারা একটা পথ আবিষ্কার করিতে পারিবে এবং তাহার পরও হয়ত সে পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নূতন নূতন ভুলের পথ বাহিয়া আবার তাহারা আর এক অবস্থায় গিয়া পৌঁছিবে। এরূপ তাহারা করিতে পারে, কারণ তাহাদের পক্ষে ইহা প্রয়োজনীয়। তাহারা এখনও তাহাদের সমাজকে একটা ধরাবাঁধা কাঠামোর মধ্যে ফেলিতে পারে নাই। তাহাদের সমস্তই এখনও পর্য্যন্ত পরীক্ষামূলক (experimental)।

কিন্তু আমাদের পক্ষেও কি ইউরোপের নারীদের পন্থা

বলম্বন করিয়া সামাজিক অব্যবস্থার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়া নুমোদনযোগ্য হইবে ?

এরূপ করিবার পূর্ব্বে অবশ্যই দেখিতে হইবে যে, ইহা মাদের পক্ষে প্রকৃতই প্রয়োজন হইয়াছে কি না। দেখিতে ইবে, ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা এরূপ করিতেছি ক না।

'সামাজিক অব্যবস্থা' কথাটি অস্পষ্ট হইয়াছে; ইহা লিতে আমি কি বুঝি তাহা বলা আবশ্যক। আমাদের দশে এবং প্রত্যেক দেশেই সেই সেই দেশের আবহাওয়া বং চরিত্র অনুসারে এক একটি সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। বশেষ করিয়া আমাদের দেশে যে সমাজ-ব্যবস্থা এতদিন ধরিয়া লিয়া আসিয়াছে, তাহার আরম্ভ অতি প্রাচীন। প্রাচীন ইলেও একই বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা চিরদিন চলিয়া আসে নাই, নানারূপ অবস্থা-বিপর্য্যয়ে তাহার নানারূপ পরিবর্ত্তন হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু, এই নানারূপ পরিবর্ত্তনের মধ্যেও তাহার আদর্শের কখনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। আদর্শ স্থির রাখিয়া সাময়িক প্রয়োজন অনুসারে বাহিরের দিক্ হইতে পরিবর্ত্তন সাধন করা হইয়াছে মাত্র।

*

আধুনিক পাঠিকা বলিবেন, আমি কৌশল করিয়া প্রাচীনের জয়গান গাহিতেছি। তাহা ঠিক নহে।

আমার রচনা শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরিয়া পড়িলে তিনি বুঝিবেন যে, আমিও আধুনিক-পন্থী, প্রাচীনপন্থী নহি। কিন্তু, তাহা প্রমাণ করিবার পূর্ব্বে দুই একটি অবান্তর কথা বলিয়া লইব। আমাদের এখন সামাজিক বা অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সকল বিষয়ই সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন কি করিয়া কোন রকমে বাঁচিয়া থাকা যায়, এই সমস্যার চেয়ে গুরুতর সমস্যা আর কি আছে ? আমরা কলেজে পড়িব কি গৃহে পড়িব, বা আমিষ খাইব কি নিরামিষ খাইব, এ প্রশ্নের উত্তর দিয়া জীবন-মরণ সমস্যা সমাধান করা যাইবে না এই বৃহত্তর সমস্যা সমাধানের ভার পুরুষে গ্রহণ করিয়াছে, আমরা ইতিমধ্যে বর্ত্তমান সময়ের সঙ্গে নিজেদিগকে কিছুটা খাপ খাওয়াইয়া লইবার চেষ্টা করিব। বর্ত্তমান কালে বাঁচিয়া থাকিয়া বর্ত্তমান কালকে ক্রমাগত অশ্রদ্ধা করিলে চলে না। এ যুগে এরোপ্লেন চলে, প্রয়োজন হইলে এরোপ্লেনেও উঠিব, কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে এরোপ্লেনে চড়াই যেন আমাদের জীবনের একমাত্র আদর্শ হইয়া না দাঁড়ায়। এরোপ্লেন মানবজাতির উপকার বেশি করিবে কি ক্ষতি বেশি করিবে—দেশের যাঁহারা চিন্তাশীল মনীষী তাঁহারা ইহা লইয়া চিন্তা করুন। পূর্ব্বে আমরা এরোপ্লেনকে অস্পৃশ্যও মনে করি না, আবার ইহা লইয়া উচ্ছ্বসিত ভাবে মাতামাতি করিবারও হেতু দেখি না—যেমন ইউরোপের মেয়েরা করিতেছে। এগুলি গৌণ সমস্যা, মুখ্য হইতেছে, কি করিয়া বাঁচিয়া থাকা যায়, সেই কথা। আমরা কি খুব জোর করিয়া বলিতে পারিব যে, ইউরোপ সেই বাঁচিবার চাবিকাঠিটি খুঁজিয়া পাইয়াছে ? ইউরোপের এক একটা আবিষ্কার মানুষের জীবনের লক্ষ্যকে আড়াল করিয়া দিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু তাহাদের নিকট সময়ে অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া দেখা দিতেছে এবং তাহার উন্মত্ত হাওয়া এদেশেও আসিয়া পৌঁছিতেছে।

প্রাচীনপন্থী বলিবেন, মেয়েরা উচ্চশিক্ষা লাভ যেন না করে, তাহারা যেন ঘর-সংসার ফেলিয়া চাকরি না করে, তাহারা যেন পুরুষের মত পথে বাহির না হয়, ইত্যাদি। উগ্র প্রগতিপন্থী বলিবেন, পুরুষে এবং নারীতে কোন ভেদ নাই, অতএব পুরুষ যাহা করিবে, নারীও তাহা করিবে। এই সাম্যবাদ প্রচার এবং প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই নারীদের দলে দলে অফিসে ফ্যাক্টরিতে পুরুষের অনুরূপ কাজ করিতে হইবে—ইত্যাদি। মধ্যপন্থী বলিবেন, গৃহ-সংসার নারীর আদর্শ, কিন্তু বর্ত্তমানে বাধ্য হইয়া ব্যক্তিগত প্রয়োজন-বোধে নারীকে চাকারও করিতে হইতেছে, ইহাও ভুলিতে পারি না। কিন্তু, ইহা নিতান্ত ব্যক্তিগত সমস্যা; ইহার জন্য বাহিরের কাহারও উপদেশের অপেক্ষা করিতে হইবে না। যখন দেশের এরূপ অবস্থা হইবে যে, নারীকে আর ব্যক্তিগত ভাবে অন্ন-সংস্থানের জন্য পুরুষের মত চাকরি করিবার প্রয়োজন হইবে না, তখনই আমাদের আদর্শে পৌঁছিবার পথ প্রশস্ততর হইবে।

সুতরাং ইউরোপের অনুকরণে আমরা অফিসে এবং ফ্যাক্টরিতে প্রবেশ করিয়া পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করাকেই জীবনের লক্ষ্য বলিয়া মনে করিব না। এরূপ করা যদি নারী-জীবনের আদর্শ হইত, তাহা হইলে এদেশে উহা পূর্ব্ব হইতেই

থাকিত বলিলে কথাটি অযৌক্তিক শুনাইবে কি? আমাদের সমাজ প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে নানা ভুলভ্রান্তির পথ অতিক্রম করিয়াই একটি আদর্শ অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছিল। সেই অবস্থার স্রষ্টা আমাদের কল্যাণকামী মুনি-ঋষিগণ কদাপি নারীর পক্ষে পুরুষোচিত কাজ অনুমোদন করিয়া যান নাই। অন্য কোন দেশে ইহা অনুমোদিত হইতে পারে না। ইউরোপ আজ যাহা করিতেছে তাহা নূতনত্বের মোহে তাহারা যে মুহূর্ত্তে নিজের ভুল বুঝিতে পারিবে সেই মুহূর্ত্তে তাহারা

"বিলাতে মেয়েরা যাহা আয় করিতেছে, তাহার অধিকাংশ ব্যয় করিয়া বিলাসিতার এবং প্রসাধনের দ্রব্যাদি কিনিতেছে, কারণ স্বামী-লাভের আশা মনে মনে আছে।" উপরে কৃত্রিম ভ্রূ-চিত্রণ রূপ এই প্রসাধন-লিপ্সার একটি অত্যদ্ভুত দিক্ দেখান হইয়াছে। ইহা কি উল্কি পরা অপেক্ষা ভদ্র রীতি?

ভুল সংশোধনের ক্ষমতাও নিজের মধ্যে অনুভব করিবে। কিন্তু, আমাদের পক্ষে তাহার প্রয়োজনীয়তা নাই। অনেকে বলেন, ক্ষমতা নাই। কিন্তু, যে-ক্ষমতার দ্বারা মানুষ দেউলিয়া হইয়াও আবার পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইতে চায়, তাহাকে কি ক্ষমতা বলিব?

*

ইউরোপেও পুরুষোচিত কাজ নারীর পক্ষে অনুমোদিত নহে, তাহা তাহারা ইতিমধ্যেই প্রকাশ করিতেছে।

সেদিন একখানা ইংরেজি পত্রিকায় এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পড়িয়া বুঝিতে পারিলাম, দেশভেদে নারীর দৈনন্দিন জীবনে যত বৈচিত্র্যই থাকুক, মানুষের অন্তরে শেষ পর্য্যন্ত যে আদর্শটি খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তাহা প্রায় সকল দেশেই এক। নারীই যে গৃহের শ্রী এবং নারীকে কেন্দ্র করিয়াই যে সংসার গড়িয়া উঠে, একথা শেষ পর্য্যন্ত সকলকেই মানিতে হইবে। প্রত্যেকটি পরিবার সমাজদেহের এক একটি অঙ্গ। পরিবারের কেন্দ্রে নারী। এই নারী কেন্দ্রচ্যুত হইলে সমাজদেহ বিকৃত হয়, তখন আধুনিকতা বা অন্য কোন নামে আর তাহাকে অনুমোদন করা চলে না।

ফ্যাক্টরিতে মেয়েদের কাজ করা বিষয়ে এই পত্রিকাটি বলিতেছেন,—

The situation is perplexing, because the last thing the average factory-girl wants to do is to continue working all her life. At the back of her mind is always the thought of a possible husband.

অর্থাৎ আজীবন কাজ করিবে অথচ সেই সঙ্গে স্বামী লাভের আশাও তাহার মন হইতে যাইবে না। কিন্তু ইহাতে আর একটি গুরুতর সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। মেয়েরা অপেক্ষাকৃত কম মজুরিতে পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর ধৈর্য্যের সহিত কাজ করিতে পারে বলিয়া ফ্যাক্টরির স্বত্বাধিকারিগণ মেয়ে-মজুর নিযুক্ত করাই বেশি পছন্দ করিতেছেন। এদিকে মেয়েদেরও আন্তরিক ইচ্ছা, এই ভাবে দারিদ্র্য ঘুচাইয়া শেষ পর্য্যন্ত বিবাহ করিবে। কিন্তু, এই ইচ্ছা তাহাদের যত প্রবল এবং ব্যাপক হইতেছে, বিবাহের সম্ভাবনাও তাহাদের ততই দূরে সরিয়া যাইতেছে। ইহার কারণ এই যে, মেয়েদের ফ্যাক্টরিতে কাজ করার জন্য পুরুষ বেকার হইয়া পড়িতেছে এবং বেকার অবস্থায় বিবাহ করিতে সাহস পাইতেছে না। মেয়েরা যাহা আয় করিতেছে, তাহার অধিকাংশ খরচ করিয়া বিলাসিতার এবং প্রসাধনের দ্রব্যাদি কিনিতেছে, কারণ স্বামী লাভের আশা যখন মনে মনে আছে, তখন চেহারার চাকচিক্য বজায় রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। চাকরিলব্ধ টাকা দিয়া নূতন পোষাক কিনিতেছে, মুখে মাখিবার রং কিনিতেছে, কিন্তু যাহাকে সে বিবাহ করিবে, সে দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে বিবাহের কল্পনাও করিতে পারিতেছে না।

মেয়েরা ফ্যাক্টরিতে না ঢুকিলে এই ভয়াবহ অবস্থার উদ্ভব হইত না। তাহা হইলে পুরুষের দারিদ্র্য ঘুচিত এবং যে মেয়েরা ফ্যাক্টরিতে ঢুকিয়া বিবাহের স্বপ্ন দেখিতেছে, তাহাদের বিনা আয়াসে বিবাহ হইতে পারিত এবং সম্ভবতঃ তাহাতে তাহারা অধিকতর সুখশান্তিও উপভোগ করিতে পারিত।

সুতরাং বিবাহ তাহার হইতেছে না। ফ্যাক্টরির বিধিবদ্ধ কাজে মনে বিতৃষ্ণা আসে, সুখের আশা ধীরে ধীরে চলিয়া যায়, রূঢ় বাস্তব চোখের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠে, জীবন নীরস বলিয়া বোধ হয়। একটা নির্দ্দিষ্ট বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গেলেই যখন সে বুঝিতে আরম্ভ করে যে, বিবাহের সম্ভাবনা তাহার ক্রমশই দূরে চলিয়া যাইতেছে, তখন ফ্যাক্টরি তাহার কাছে কারাগার-স্বরূপ মনে হয়। দিনের পর দিন একই কাজের পুনরাবৃত্তি আর তাহার ভাল লাগে না। মানুষের জীবনে ইহার চেয়ে ভয়ঙ্কর অবস্থা আর হইতে পারে না। কিন্তু, ইউরোপের সমাজে যেন একটা বিপর্য্যয়কারী অবিধি প্রবেশ করিয়া তাহার সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে প্রলয় ঘটাইয়া তুলিতেছে। একটা ভ্রান্তি হইতে অতি সহজেই তাহারা আর একটা ভ্রান্তির মধ্যে ছুটিয়া যাইতেছে। ফ্যাক্টরির মেয়ে মজুরদের মধ্যকার এই নৈরাশ্য তাহাদিগকে উত্তেজনা-পূর্ণ কাজে প্রলুব্ধ করিতেছে। যে কাজে উগ্র মোহ আছে, গুরুতর উত্তেজনা আছে, হৃদয়ের সঙ্গে মারাত্মক সম্বন্ধ আছে তাহাই এখন তাহাদিগকে একটা আপাতমধুর আবর্ত্তের মধ্যে ধীরে ধীরে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

আধুনিক সিনেমা এই মোহজাল বিস্তার করিয়াছে। সিনেমার চেয়ে মারাত্মক প্রলোভন বর্ত্তমানে আর কিছু নাই। ইহা বিশেষ করিয়া মেয়েদের জীবনের ধারা একেবারে বদলাইয়া দিয়াছে। মনে হইতেছে ইউরোপের সমাজ সিনেমার হাতে এরূপ গুরুতররূপে আঘাতপ্রাপ্ত হইবে যে, তাহার ধাক্কা সামলাইতে তাহার বহুযুগ কাটিয়া যাইবে।

এই পত্রিকা লিখিতেছেন,—

The pictures have undoubtedly helped to unsettle this generation; the films depict all sorts of deliciously thrilling experiences befalling typists and working girls—things that could never happen at home—and the woman always sees herself in the heroine's shoes.

বর্ত্তমান যুগের মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিতে সিনেমা সাহায্য করিয়াছে বলিলে অল্প বলা হয়, কারণ বর্ত্তমানে ইহা অপেক্ষা প্রবলতর শক্তি আর দ্বিতীয় কিছুই নাই। সিনেমায় সামান্য দাসী নিশ্চিত ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে প্রতিনিয়ত নায়িকার পদে উত্তীর্ণ হইতেছে, দরিদ্র মেয়ে ধনীর কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে ধনী গৃহিণীতে পরিণত হইতেছে, ইহাই ত দরিদ্রের মনে স্বপ্ন এবং মায়াজাল বিস্তার করিয়া দেয়। দরিদ্র মেয়ে-মজুরের জীবনে এ দৃশ্য অপেক্ষা অধিকতর উপভোগ্য এবং উত্তেজক কি থাকিতে পারে? প্লটের অনিবার্য্য বিধানে ভিখারী রাজরাণী হইতে পারে, দরিদ্র মেয়েও ত অন্তরে অন্তরে এই রাজরাণী হইবার বাসনাই আজীবন পোষণ করে! দরিদ্রের নেতা সাজিয়া যাহারা সভায় দরিদ্রের পক্ষ লইয়া বক্তৃতা দেয়, তাহাদের অভাব-অভিযোগ আলোচনা করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করে, তাহাদিগকে যেমন সাধারণে তাহাদের ত্রাণকর্ত্তারূপে পূজা করে—এই সিনেমাকেও মেয়ে-মজুরেরা তেমনি তাহাদের ত্রাণকর্ত্তারূপে মান্য করিতেছে। সিনেমা তাহাদের অন্তরের গূঢ় বাসনাকে যেন ভাষা দিয়াছে। এরূপ মধুর ভাবে, এরূপ প্রবল ভাবে তাহাদের বাসনা আর কোথায়ও রূপ ধরিয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে না।

ইহা গেল গল্পের প্লটের কথা। কিন্তু, সাধারণ মেয়ে গল্পের নায়িকা এবং অভিনেত্রীকে পৃথক্ করিয়া দেখিতে পারে না। সে মনে করে সিনেমা-অভিনেত্রীর জীবনও গল্পে বর্ণিত নায়িকার মতই সুখের। সে এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মনে প্রাণে আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, কবে সেও নীরস ফ্যাক্টরির কাজ ছাড়িয়া দিয়া সিনেমার নায়িকা হইতে পারিবে। শত শত দরিদ্র মেয়ে এইরূপে গৃহের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া, নিশ্চিন্ত জীবনধারার রসহীন, বৈচিত্র্যহীন দুঃখ এড়াইবার আশায় অজানিত, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। তাহার পর তাহাদের কি হইতেছে, মরীচিকা তাহাদের হাতে কতখানি সত্যবস্তু তুলিয়া দিতেছে, তাহার কাহিনী কেহ জানে না।

*

ইকনমিক-সমস্যা নামক একটি অতি কৃত্রিম সমস্যা পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহারই ফলে যাহার ঘরে টাকা মজুত আছে, সেও ইকনমিক-সমস্যায় ভুগিতেছে,

যাহার চাষ করিবার জমি আছে সেও ইকনমিক-সমস্যায় ভুগিতেছে এবং যে নিঃস্ব সেও ইকনমিক সমস্যায় ভুগিতেছে। উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতির সামঞ্জস্যহীনতাই ইহার মূল কারণ। কিন্তু, মূল কারণ যাহাই হউক, ইউরোপের যাহা সমস্যা, তাহা তৎক্ষণাৎ আমেরিকার সমস্যা হইতেছে এবং
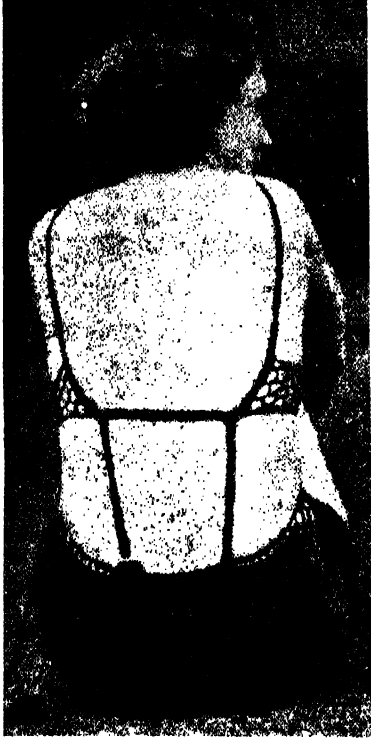
"ইউরোপের কোন্ মেয়ে কখন জলে এণ্ডিওরান্স-সাঁতার অভ্যাস করিয়াছিল জানি না, কিন্তু দেখিতেছি, ভারতবর্ষের মেয়েরা হাত-পা বাঁধা অবস্থায় এণ্ডিওরান্স-সাঁতার অভ্যাস করিতেছে।" এই সাঁতার কাটিবার জন্য বিলাতে আধুনিকারা যাহা পরিধান করেন—উপরে তাহার চিত্র দেওয়া হইল। ইউরোপের এই 'কষ্টাম' কি বর্ব্বরতা ও সভ্যতার মধ্যকার ব্যবধান ঘুচাইতে পারিবে না?

আমেরিকার যাহা সমস্যা, তাহা এশিয়ার সমস্যারূপে দেখা দিতেছে। আবিসিনিয়ার ভূতপূর্ব্ব রাজা এবং তিব্বতের দালাইলামার মধ্যে সমস্যাগত কোন পার্থক্য নাই। পৃথিবীময় এই বৈচিত্র্যহীনতার অভিযান চলিতেছে। যন্ত্র করিয়া বা মারিয়া পিটিয়া সব একাকার করিয়া দেওয়াই বর্ত্তমান সভ্যতার একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংলণ্ডের কোন মেয়ে যদি এরোপ্লেনে আটলান্টিক সাগর পার হয়, তৎক্ষণাৎ সংবাদ পাওয়া যাইবে, আমেরিকার মেয়ে এরোপ্লেনে প্রশান্ত মহাসাগর পার হইতেছে, জাপানের মেয়ে এরোপ্লেনে কলিফোর্ণিয়া গিয়াছে এবং ভারতবর্ষের মেয়ে এরোপ্লেনে অষ্ট্রেলিয়া যাইবার জন্য শিক্ষা লইতেছে। ইউরোপের কোন্ মেয়ে কখন জলে এণ্ডিওরান্স-সাঁতার অভ্যাস করিয়াছিল জানি না, কিন্তু দেখিতেছি ভারতবর্ষের মেয়েরা হাত-পা বাঁধা অবস্থায় এণ্ডিওরান্স সাঁতার অভ্যাস করিতেছে। এ যুগে নিজ নিজ জাতির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা এতই দুরূহ!

সুতরাং সিনেমার শিক্ষা যে আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যেও প্রচলিত হইবে ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। দুঃখের বিষয়, ইউরোপের ফ্যাশন এদেশে আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। সেই জন্য আমরা ইহাও দেখিব যে, ইউরোপে ইতিমধ্যেই মেয়েদের এই অতি-স্বাধীনতা-ভোগ লইয়া যে অনুতাপ আরম্ভ হইয়াছে এবং "send the women back home" বলিয়া যে আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহার ফলে সেখানকার মেয়েদের মধ্যে শীঘ্রই শৃঙ্খলা স্থাপিত হইবে—কিন্তু আমাদের দেশে তখন তাহাদের পরিত্যক্ত ফ্যাশন অতি উগ্ররূপে সমাজের স্তরে স্তরে সঞ্চারিত হইয়া আমাদের সংহতিকে ভস্মের মত শিথিল করিতেছে।

স্বকীয়তা নষ্ট হইলেই চরিত্র নষ্ট হইল। আমাদের জাতিগত চরিত্র ইতিমধ্যেই নষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু, তবু সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হইতে নিবৃত্ত হইলে চলিবে না। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া আমরা যদি শিক্ষার নামে একমাত্র ধ্বংসের শিক্ষাই লাভ করি, তাহা হইলে আর আত্মরক্ষার চিন্তা করিয়া লাভ কি? মানুষের মধ্যে আত্মরক্ষার যে সহজাত প্রবৃত্তি আছে, তাহাকে নিষ্পেষিত করা যায় না বটে, কিন্তু লোভে পড়িয়া যখন লোকে বাহিরের বস্তু অতিরিক্ত মাত্রায় আত্মসাৎ করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠে, তখন লোকে স্বাস্থ্যের উপরেই অত্যাচার করিতে থাকে। মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও ইহা সত্য। দৈহিক স্বাস্থ্যের ন্যায় মানসিক স্বাস্থ্যও নষ্ট হইয়া গেলে তখন আর আত্মরক্ষার ক্ষমতা থাকে না। অন্ততঃ আমাদের দেশের মেয়েদের দিক্ হইতে বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ কথার সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

*

সকল দেশেরই সমাজ একটা নিজস্ব রীতিতে গড়িয়া উঠে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার যে পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, তাহাই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক, অন্যদেশের অনুকরণে জোর করিয়া পরিবর্ত্তন ঘটাইতে গেলে তাহার কোন স্থায়ী ফল হয় না, পক্ষান্তরে ক্ষতির মাত্রাই অধিক হয়। আমাদের দেশের সমাজ যে ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে,তাহাতে নারীর একটি বিশেষ রূপ দেশের লোকের মনে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। গার্গী, মৈত্রেয়ী, ঘোষা প্রভৃতি আধুনিক যুগের প্রবর্ত্তয়িতা হিসাবে প্রথম স্থান লাভ করিবেন। তাহারও পূর্ব্বের সীতা-সাবিত্রীর আদর্শ; ইহা প্রাচীন বা আধুনিক নহে, সর্ব্বকালের আদর্শ। ভারতীয় নারী বলিতে ইঁহাদেরই রূপ দেশের মনে জাগে। ভারতীয় নারীর এই রূপ এণ্ডিওরান্স সাঁতার কাটা বা হাই-হীল জুতা পরিয়া পথে চুরুট টানিতে টানিতে যাওয়া রূপের সঙ্গে মেলে না। ইউরোপীয় মেয়েকে যখন খাটো চুলে মুখে রং মাখিয়া চুরুট টানিতে টানিতে পথ চলিতে দেখি, তখন তাহাতে মন খুসীও হয় না, পীড়িতও হয় না, সে সম্বন্ধে মন অনেকটা উদাসীন থাকে। কিন্তু কোন ভারতীয় নারীকে এরূপ অবস্থায় দেখিলে হৃদয়ে আঘাত লাগা স্বাভাবিক। পুরুষেরা বলেন, মনে হয় আধুনিক সভ্যতা-রূপ পশুর হাতে দেবী-মূর্ত্তি কলঙ্কিত হইতেছে। যাহারা পথে বাহির হইতে বাধ্য, তাহারা জুতা পরিতেও বাধ্য, কিন্তু হাই-হীল জুতা কেন? অবগুণ্ঠন ব্যবহার করিয়া পথে চলা মুস্কিল, কিন্তু মুখে রং মাখাইয়া চলিবার কি দরকার? আত্মরক্ষা বা স্বাস্থ্যচর্চ্চার জন্য প্রয়োজন হইলে সাঁতার শেখা চলিতে পারে, কিন্তু হাত-পা বদ্ধ অবস্থায় দর্শক জুটাইয়া এণ্ডিওরান্স সাঁতার দেখাইবার প্রয়োজন কি? যাহারা এরূপ করিতেছে সমাজের সঙ্গে তাহাদের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। এইরূপ একটি অসামাজিক দল ধীরে ধীরে বাংলা দেশে গড়িয়া উঠিতেছে। আমাদের দেশের মেয়েদের পক্ষে যে তাহাদের কার্য্যপদ্ধতি এবং উদাহরণ কতখানি অনিষ্টকর তাহা বুঝিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। ক্রমে ক্রমে স্কুল-কলেজের মেয়েরা এইদল পুষ্ট করিতেছে, কিন্তু ইহাতে না আছে কোন উপকার, না আছে কোন মহত্ব। শত শত কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে দৌড়-ঝাঁপের প্রতিযোগিতা করিয়া পুরস্কার লাভ করা, ইহা নিতান্তই অনুকরণমূলক ফ্যাশন। আজ যদি ইউরোপ প্রচার করে যে মেয়েদের পক্ষে এরূপ প্রতিযোগিতা আর চলিবে না, তখনই এদেশেও উহা বন্ধ হইয়া যাইবে। মেয়েদের দেহ-সৌষ্ঠব বাজারে দেখাইয়া বাহবা লাভ করার রীতি আমাদের নিজস্ব সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে নাই। জনৈক বিজ্ঞ-ব্যক্তির ভাষায় বলি—

"Any movement for the uplift of Indian womanhood will certainly fail, if it does not begin with, and end in, promoting the national ideals of Indian womanhood as embodied in the history and literature of ancient India."

অর্থাৎ আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে বা ইতিহাসে ভারতীয় নারীর যে আদর্শ বর্ণিত হইয়াছে, ভারতীয় নারীর উন্নতির জন্য যে কোন আন্দোলনই করা হউক না কেন, সুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত সেই আদর্শকেই লক্ষ্য ধরিয়া চলিতে হইবে। ইহা না করিলে ব্যর্থতা অনিবার্য্য। এই কথাটি স্বীকার করিয়া লইলে অনুকরণমূলক প্রচেষ্টাকে আদৌ প্রশংসা করা চলিবে না।

নূতন করিয়া সৃষ্টির ক্ষমতা যখন চলিয়া যায়, তখন কেবলই পরের অনুকরণ না করিয়া নিজের যাহা আছে, তাহা প্রাণপণে রক্ষা করিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য। ইহার মধ্যে লজ্জার নাই। ইউরোপের মেয়েরা সিনেমার অভিনয় করে, অতএব আমরাও সিনেমার অভিনয় করিব বলিয়া একদল মেয়ের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। সিনেমা ইউরোপের সমাজ চূর্ণ করিতেছে, সুতরাং ইহাতে আমাদের সমাজের কি দুর্দ্দশা হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সিনেমার শক্তি ঠিক আগুনের মত। সমাজের অনিষ্ট করিবার পক্ষেও ইহার চেয়ে প্রবল শক্তি আর নাই। ইউরোপের মেয়েরা এই আগুনে উন্মত্তবৎ ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। যে দেশের লোক স্বাধীনতা ভোগ করিতে অভ্যস্ত, সে দেশের লোকেরাই সিনেমার সমাজ-বিধ্বংসী ক্ষমতার পরিচয় লাভ করিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিতেছে। সুতরাং আমরা যদি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া আমাদের মেয়েদের সিনেমা-অভিনয়কে নিতান্ত খেলা মনে করিয়া পূর্ব্ব হইতে সতর্ক না হই, তাহা হইলে অচিরেই আমাদের আর্ত্তনাদে বাংলা দেশের আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিবে।

*

বাংলা দেশে আর একটি অনিষ্টকর রীতি প্রচলিত হইতেছে, ইহা মেয়েদের নৃত্য। নর্ত্তকী মেয়েরা অসামাজিক হইতে বাধ্য। নারীদেহের ভঙ্গিবৈচিত্র্য পুরুষ চিরকালই দেখিতে ভালবাসে, কিন্তু সে জন্য সমাজে চিরদিনই সমাজের বাহিরের একদল মেয়ে নর্ত্তকীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া পুরুষের লালসার ইন্ধন যোগাইয়া আসিয়াছে। আপন আপন মাতা বা ভগিনীর নৃত্যরত দেহসৌষ্ঠব জনসাধারণের সঙ্গে টিকিট কিনিয়া দেখা বা উপভোগ করার মধ্যে কতখানি মানসিক উন্নতির চিহ্ন বা চিত্ত-প্রকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য। ঘরে ঘরে মেয়েদের মধ্যে নৃত্যের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। যে কোন সভা বা জলসায় আজকাল কতকগুলি মেয়ের নাচ এবং গান না দিলে সভা বা জলসা কিছুতেই জমে না।

ইহা যে কতবড় জাতীয় অধঃপতনের চিহ্ন তাহা কেহ ভাবিয়া দেখিতেছেন না। যাঁহারা ইহার বিরোধী তাঁহাদের প্রতিবাদের কণ্ঠ অত্যন্ত ক্ষীণ, অথবা তাঁহাদের প্রতিবাদের ভাষা এরূপ অশ্লীল যে, নৃত্য খারাপ কি তাহার প্রতিবাদ খারাপ, ইহা অনেক সময় বুঝিতে পারা যায় না। ভদ্রঘরের মেয়েদের নৃত্যের বিরুদ্ধে কোন সফল প্রতিবাদ আজ পর্য্যন্ত শুনি নাই। তাহার কারণ বোধ হয় ইহাই যে, দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশা লইয়া আন্তরিকভাবে চিন্তা করিবার মত লোক এদেশে বেশি নাই। দেশে নীতির আদর্শ অত্যন্ত নীচে নামিয়া গিয়াছে। এমন কি এদেশে যে সব সাপ্তাহিক, মাসিক বা দৈনিক কাগজ বাহির হয় তাহাদের অধিকাংশ নৃত্যরতা মেয়েদের ছবি ছাপিয়া প্রকারান্তরে নৃত্যকে অনুমোদন করিয়া থাকেন। যাহারা টিকিট কিনিয়া নৃত্য দেখিতে পারিল না, তাহারা দুই চারি পয়সা খরচ করিয়া এই সব কাগজ দেখিয়া খানিকটা তৃপ্তিলাভ করে।

অনেকে প্রশ্ন করিবেন, তবে কি স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা ভাল নহে? আমরা বলি, নিশ্চয়ই ভাল, কিন্তু শিক্ষা যেন "শিক্ষা" হয় এবং স্বাধীনতাও যেন স্ব-অধীনতা হয় এবং দুইটিই যেন, 'স্ত্রী'-জনোচিত হয়। সর্ব্বমত্যন্ত-গর্হিতম্, অর্থাৎ সকল প্রকার 'অতি' বা আতিশয্যকে চরম খারাপ বলিয়াই এদেশে ঘোষণা করা হইয়াছে। কোন দিকেই অবাধ প্রসার নাই, একটা জায়গায় আসিয়া সীমারেখা টানিতেই হয়। যুগে যুগে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যে সকল মহৎ বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন, এ যেন সেই সব বাণী বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, দ্বারে দ্বারে তাহা কাঁদিয়া ফিরিতেছে, কিন্তু তাহা শুনিবার কেহ নাই। সমাজ আছে কিন্তু তাহার চালক কেহ নাই, শিক্ষা আছে কিন্তু সে শিক্ষার চরিত্র নাই, রাজনীতি আছে কিন্তু প্রকৃত দেশসেবক নাই। এমনি করিয়া আমরা সকল দিকে, সকল বিষয়ে চালকহীন অবস্থায় আত্মম্ভরিতা এবং আত্মপ্রাধান্যের প্রাবল্যে দিশাহারা হইয়া পড়িতেছি।

আমি আমাদের সমাজের যে দিক্‌টি উদ্‌ঘাটিত করিলাম, তাহার বিপরীত একটা দিক্ আছে সে কথা আমি বিস্মৃত হই নাই। বরঞ্চ একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে সেই দিক্ সম্বন্ধেই আমার লেখায় সর্ব্বত্র ইঙ্গিত করিয়াছি। সেদিকে কেবল ষ্টাটিস্‌টিক্‌স্—দেশ স্ত্রীশিক্ষায় দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, মেয়েদের কনফারেন্স বসিতেছে, সকল ভারতের নারী একত্র মিলিয়া নানারূপ মন্তব্য পাস্ করিতেছেন। যে দেশে একশত বৎসর পূর্ব্বে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করা উচিত কি অনুচিত, তাহা লইয়া প্রবল আন্দোলন হইয়াছে, সেই দেশে এই অল্পদিনের মধ্যে মেয়েরা কন্‌ফারেন্স করিয়া ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা দিতেছেন এবং জন্ম-শাসন ভাল কি মন্দ সে সম্বন্ধে খোলাখুলি আন্দোলন করিতেছেন। বাংলাদেশের মেয়েরা সাঁতার-প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিতেছে, ফ্ল্যাট রেস, হার্ডল রেস, বাইসাইক্‌ল্ রেস, দৌড় প্রতিযোগিতা প্রভৃতিতে যোগ দিতেছে; কাগজে-কলমে উন্নতির স্পষ্ট এবং নিশ্চিত পরিচয় পাইয়া দেশের লোক খুসী হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু, ইহা সত্ত্বেও কি নারী সুখী হইতে পারিয়াছে? আমরা কি বলিতে পারি যে, আমাদের ঠাকুরমা কি তাঁহার মা অপেক্ষা আমরা সুখী?—সুতরাং বিশ্বাস করিতেই হয় যে, প্রত্যেক দেশের উপযুক্ত একটি মাত্রই পন্থা আছে এবং তাহা প্রাচীন হইলেও তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট [illegible]।

ঈশানচন্দ্র

—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

গত সংখ্যায় প্রকাশিত এই রচনার প্রথমাংশে ঈশানচন্দ্রের পরিচয় দিতে লেখক লিখিয়াছিলেন :—"সাধারণ পাঠকের নিকট ঈশানচন্দ্রের কাব্য-গ্রন্থাবলী আজ অনাদৃত হইলেও, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক সাহিত্যাচার্য্যের নিকট তাঁহার নাম অপরিচিত থাকিলেও, বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন প্রভৃতি-কাব্যরসিকগণ ঈশানচন্দ্রের কবি-প্রতিভার অতি উচ্চ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। অকালে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ না করিলে যে তিনি বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যকে অধিকতর সমৃদ্ধিশালী করিয়া যাইতে পারিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই…।"

"বাসন্তী"

বঙ্গীয় পাঠকসমাজের এবং সুবিজ্ঞ সমালোচকগণের নিকট "চিত্ত-মুকুর" যে অপূর্ব্ব সমাদর লাভ করিয়াছিল, তাহাতে তরুণ কবি যথেষ্ট উৎসাহিত হইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার কিরূপ অনুরাগী হইয়াছিলেন, পাঠকগণ পূর্ব্বেই তাহার আভাস পাইয়াছেন। "চিত্ত-মুকুর" প্রকাশের সময়ে ঈশানচন্দ্র আরও কয়েকজন গুণমুগ্ধ বন্ধু ও ভক্ত লাভ করিয়াছিলেন। অল্পকাল পূর্ব্বে হেমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা ও ঈশানচন্দ্রের পরম স্নেহের পাত্রী সুশীলা দেবীর সহিত পাইকপাড়া-নিবাসী রায় বাহাদুর গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিবাহ হইয়াছিল। ইনি সৈন্যসংক্রান্ত হিসাব-বিভাগে কাজ করিতেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের পরম অনুরাগী ছিলেন। সম্পর্কে জামাতা হইলেও প্রায় সমবয়স্ক বলিয়া ঈশানচন্দ্রের সহিত বিনোদবিহারীর অকৃত্রিম সৌহার্দ্য ও অন্তরঙ্গতা ঘটে। ঈশানচন্দ্র প্রিয় বয়স্যের ন্যায় তাঁহার নিকট স্বীয় হৃদয়দ্বার অসঙ্কোচে উন্মুক্ত করিয়া দিতেন। বিনোদবিহারীকে লিখিত ঈশানচন্দ্রের কয়েকখানি পত্র দেখিয়া আমরা উভয়ের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার পরিচয় পাই। বিনোদ-বিহারী শেষজীবনে কাশীধামে কালীমন্দির স্থাপন করিয়া সেইখানে বাস করিতেন। ঈশানচন্দ্রের আর একজন অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন হুগলী জিলার অন্তর্গত গরলগাছার প্রসিদ্ধ জমিদার দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। ইনি পরোপকারী, দানশীল, ধর্ম্মপ্রাণ ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ইনি স্বগ্রামে ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, পথনির্ম্মাণ, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যদ্বারা স্বীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। নিজ গ্রামে ও বারাণসীধামে শিবমন্দির স্থাপন করিয়াও ইনি ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ইনি খিদিরপুরে হেমচন্দ্রের আবাসভবনের নিকটেই কৃতনিবাস হইয়াছিলেন এবং শৈশব হইতেই ঈশানচন্দ্রের বন্ধু ছিলেন। 'বঙ্গদর্শনের' সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র সম্প্রতি-পরলোকগত জ্যোতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও ঈশানচন্দ্রের অন্যতম বন্ধু ছিলেন। জ্যোতিশচন্দ্রও তাঁহার

সুশীলা দেবী।

বংশের ধারানুসারে সাহিত্যের পরম অনুরাগী ও সেবক ছিলেন।

এই সকল সাহিত্যানুরাগী বন্ধুগণের সাহচর্য্যে ও উৎসাহ-বাক্যে ঈশানচন্দ্রের স্বাভাবিক কাব্যানুরাগ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি সঞ্জীবচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন', কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'বান্ধব' এবং যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের 'আর্য্যদর্শন' সুমধুর গীতি-কবিতা দ্বারা সমৃদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১২৮৭ সালে তাঁহার

কতকগুলি এবং কতকগুলি অপ্রকাশিত কবিতা একত্র করিয়া 'বাসন্তী' নামে প্রকাশিত হয়।

'চিত্ত-মুকুর'-এর ন্যায় 'বাসন্তী'তেও গ্রন্থকারের নাম মুদ্রিত হয় নাই। উহাতে প্রকাশক বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম মুদ্রিত ছিল। ৮০ নং মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীট, চোরবাগান চিকিৎসাতত্ত্ব যন্ত্রে ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা গ্রন্থখানি মুদ্রিত হয়।

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থখানি কবি তাঁহার "সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়" মহাশয়কে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ-পত্র পাঠে দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার কিরূপ প্রীতির সম্বন্ধ ছিল তাহা প্রতীত হয়।—

"ভাই দেবেন্দ্র!

জগৎ অনন্ত ও মনুষ্যও অনন্ত, এখানে বিদ্বান ও বুদ্ধিমানের অভাব নাই, ধনী ও যশস্বীর অভাব নাই, কিন্তু এই অনন্ত জনস্রোতের মধ্যে অকপট ও উদার চরিত্রের লোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। আশৈশব আমি তোমার প্রকৃতির সেই মাধুর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। আমার অনুরাগের চিহ্ন স্বরূপ বাসন্তীকে তোমায় উপহার দিলাম। আদর করিয়া গ্রহণ করিও—সুখী হইব।

তোমার স্নেহের
গ্রন্থকার।"

পাইকপাড়া ১০ই শ্রাবণ ১২৮৭ তারিখ সম্বলিত বিজ্ঞাপনে প্রকাশক বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—"গ্রন্থকারের যে সকল কবিতা ইতিপূর্ব্বে বঙ্গদর্শন, বান্ধব, ও আর্য্যদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেইগুলি ও কতকগুলি অপ্রকাশিত কবিতা সংগ্রহ করিয়া বাসন্তী প্রকাশ করিলাম। গ্রন্থকার সাধারণের নিকট নিতান্ত অপরিচিত না হইতেও পারেন। তাঁহার 'চিত্তমুকুর' ও পূর্ব্বোক্ত সাময়িক পত্রস্থ কবিতাগুলি বোধ হয় সাধারণের নিকট নিতান্ত অনাদর প্রাপ্ত হয় নাই। বসন্তকালে প্রকাশ করিবার মানস ছিল বলিয়া বাসন্তী নাম দেওয়া হয়, কিন্তু কার্য্যগতিকে বিলম্ব হইয়া পড়িল। বাসন্তীর দোষগুণ বিচারে আমার অধিকার নাই, সে ভার সুযোগ্য সমালোচক ও সহৃদয় পাঠকগণের উপর। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আমার নিতান্ত ভাল না লাগিলে আমি ইহা প্রকাশের জন্য এত আগ্রহ করিতাম না। "যোগ-জীবন" ও আরো দুই একটি কবিতা বাইরণকে অনুসরণ করিয়া লিখিত। যাহাকেই অনুসরণ করিয়া লেখা হউক বোধ হয় বাসন্তীর সকল কবিতাতেই নূতনত্ব ও মাধুর্য্য আছে। এক্ষণে সাধারণে যত্নসহকারে বাসন্তী পাঠ করিলেই যথেষ্ট পরিতৃপ্ত হইব।"

তরুণ প্রকাশক (সম্ভবতঃ তরুণ কবির অভিপ্রায়ানুসারে) কাব্যের নামকরণ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। আধুনিক পাঠকগণের বিবেচনায় নামকরণ সম্বন্ধে এরূপ কৈফিয়ৎ দিবার প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হইবে না। কিন্তু যে সময়ে কাব্যগ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়, সে সময়ে উহার প্রয়োজন ছিল। কেন, তাহাই বলিতেছি।

উৎকৃষ্ট কবিরা কাল্পনিক বিষয়কে এরূপভাবে বর্ণিত করেন যে, তাহা পাঠকগণের নিকট সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। কবি হেমচন্দ্র যখন হতাশ প্রেমের দুই একটি কবিতায় লিখিয়াছিলেন, "হারাইনু প্রমদায়, তৃষিত চাতক প্রায়, ধাইতে অমৃত আশে বুকে বজ্র বাজিল," কিংবা "কতবার প্রমদার মুখচন্দ্র হেরেছি"—তখন এমন পাঠকও ছিলেন, যাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, সত্য সত্যই হেমচন্দ্র প্রমদা নাম্নী কোনও রমণীর প্রেমলাভে নিরাশ হইয়া "হতাশের আক্ষেপ" লিখিয়াছিলেন। যখন প্রকাশ পাইয়াছিল, হেমচন্দ্রের এক শ্যালিকার নাম "প্রমদা", তখন কবিতাগুলি যে তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া লিখিত হইয়াছে, অনেকের এরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল। কিন্তু, আমরা হেমচন্দ্রের জীবনচরিতে দেখাইয়াছি যে, উক্ত নিরাশ প্রেমের কবিতাগুলি হেমচন্দ্রের জীবনের ঘটনামূলক, এ ধারণা একান্ত অমূলক ও ভিত্তিহীন। হেমচন্দ্রের শ্যালিকা প্রমদা দেবী হেমচন্দ্রের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা ছিলেন এবং সুরূপা ছিলেন না এবং তাঁহার উদ্দেশে হেমচন্দ্রের কবিতাগুলি লিখিত হয় নাই।

ঈশানচন্দ্রের 'চিত্তমুকুর' কাব্যেও কতকগুলি হতাশ প্রেমের কবিতা আছে। এই পরকীয়া প্রেমের নায়িকা কে, তৎসম্বন্ধে কাহারও কাহারও কৌতূহল উদ্রিক্ত হইয়াছিল। যদিও এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে মনে করিয়া ঈশানচন্দ্র কোনও কোনও কবিতার নিম্নদেশে পাদটীকায় লিখিয়া দিয়াছিলেন যে, উহার সহিত গ্রন্থকারের জীবনের ঘটনার কোন সম্পর্ক নাই, তথাপি কবির রচনার গুণে উহা সত্যঘটনা অবলম্বনে লিখিত বলিয়া কোন কোন পাঠকের মনে হইয়াছিল।

> "আবার সন্ন্যাসী হ'ব বাসন্তীর তরে,
> এ জীবনে এ সংসারে ফিরিব না আর,
> বাসন্তীর মূর্ত্তি গড়ে নিরজনে বক্ষে করে,
> গোপনে কাঁদিব মুখে চুম্বি অনিবার,
> এ জীবনে বাসন্তী ত হবে না আমার!"

প্রভৃতি পদে বাসন্তী নাম্নী এক বালিকার উল্লেখ আছে কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন, ঈশানচন্দ্রের কবিতাগুলি যথার্থই বাসন্তী নাম্নী কোনও বালিকার উদ্দেশে লিখিত। ঈশানচন্দ্রের এক শ্যালিকারও নাম ছিল বসন্তকুমারী। পাছে চিত্তমুকুরে প্রকাশিত পরকীয়া প্রেমাত্মিকা কবিতাগুলির সহিত পরিচিত আত্মীয় বন্ধুগণ তাঁহার শ্যালিকা বা অন্য কোনও বালিকার নাম জড়িত করেন সেই জন্য ঈশানচন্দ্র পাদটীকায় উক্তবিধ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং "বাসন্তী"র বিজ্ঞাপনেও এই নিষ্প্রয়োজন সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। যদি যথার্থই উহা কোনও গৃহস্থকন্যার বা গৃহস্থবধূর উদ্দেশে লিখিত হইত তাহা হইলে তাঁহার নাম দিয়া প্রকাশ্যে কবিতা লিখিয়া কোন শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি লোকসমাজে আপনাকে বা আপনার প্রেমাস্পদাকে লোকনিন্দার ভাগী করিতেন না।

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

'বাসন্তী' কাব্যগ্রন্থখানি ১৩২ পৃষ্ঠায় (ডিমাই অক্টেভো) সম্পূর্ণ। উহাতে নিম্নলিখিত কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়।—

(১) সাগর (২) উপহার (৩) তবু বুঝিল না মন (৪) বিবেক ও নৈরাশ (৫) অন্তিম বিদায় (৬) মহাশ্বেতা (৭) জীর্ণঘাট (৮) 'ভুলে যাও' না বলিলে ভুলিতাম তায় (৯) নিশীথ ধ্বনি (১০) এই কি উত্তর তার? (১১) মুমূর্ষু শয্যায় ভার্য্যা (১২) ফুরাইল আশা কিন্তু ফুরাল না প্রেম (১৩) সে ঘোর নিশিতে (১৪) এত কাঁদি তবু কেন প্রাণ না যুড়ায় রে (১৫) যোগজীবন (১৬) স্মৃতি কিম্বা হৃৎপিণ্ড কর উৎপাটন (১৭) সব ঠিক (১৮) সন্তান দর্শনে।

'সন্তান দর্শনে' কবিতাটি কবির জ্যেষ্ঠ পুত্র বিমানচন্দ্রের

জন্মোপলক্ষে রচিত। 'উপহার' নামক কবিতাটি বন্ধু কবি নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের উদ্দেশে লিখিত, অতি সুন্দর। কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

(১)

নবীন !

জানিতাম এ জগতে নাহি সে আলয়—
যথায় হৃদয় খুলে
কাঁদিলে করুণা মেলে
একের বেদনে যথা কাঁদে দুজনায়
হেন সুখময় স্থান ছিল না ধরায়।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

(২)

জানিতাম কর্ম্মক্ষেত্র প্রবৃত্ত সংসার ;
পরি ছদ্ম পরিচ্ছদ
সাধে নিজ মনোরথ
নয়নে সম্বন্ধ হেথা—বচনে প্রণয়
আত্মপর এ সংসারে স্বার্থ গণনায়।

(৩)

জানিতাম নরচিত্তে সকলি তরল,
স্নেহ মায়া অনুরাগ
অন্তরে করে না দাগ,
হাসি কান্না দুই ক্ষীণ জীবের অন্তরে ;
দেবত্বের মাদকতা ছিল না সংসারে।

(৪)

সকলি সীমান্ত হেথা—কিবা সুখ দুখ,
কাঁদিয়া না হয় সুখ
হেসেও মিটেনা ভুখ
প্রবৃত্তি পিঞ্জরে বাঁধা মানব-অন্তরে
আশা তৃষ্ণা পরিণায় জীবনে বিহরে।

(৫)

অভাগা জীবনে পুন জানিতাম হায়—
সকলি দুর্লভ তায়,
সবি সিক্ত নিরাশায়,
ভাই বন্ধু দারা সুত সবি নিরদয়—
অভাগা জীবনে কিছু নাহি বিনিময়।

(৬)

জানিলাম আজ এই কুটিল সংসারে—
সে সুখ এখনো রাজে
সে জীব এখনো আছে—
কাঁদিলে যাহার কাছে যুড়ায় হৃদয়—
সে দেবতা আছে আজো পাপের ধরায়।

(৭)

নবীন !

এস কাঁদি একবার পরাণ ভরিয়া,
গঙ্গা যমুনার মত
জীবনের দুখ যত
দেও সখে মিশাইয়া খুলিয়া হৃদয়
এস কাঁদি একবার ধরিয়া গলায়।

(৮)

সখে !

যে দুখে তোমার আজ ব্যাকুল জীবন
অভাগারো হৃদিতলে
সে দারুণ দাহ জ্বলে
সেই আশা—সেই তৃষ্ণা—সেই ব্যথা বুকে
নিঠুর সংসারে সেই ভ্রমিতেছি দুখে।

* * *

(১৪)

চল সখে দুজনায় ত্যজিয়া সংসার—
হেন কোন স্থানে যাই
যথা নরকুল নাই,
দেশাচার জাত-ধর্ম্ম নহেক যথায়
স্বভাবে স্বাধীন যথা মানব হৃদয়।

(১৫)

যথায় মানব-চিত্ত একি স্রোতাধীন ;
আশার যন্ত্রণা নাই
প্রেমের বিকার নাই,
সহস্র বাসনা যথা জাগে না অন্তরে
একি ভাবনায় চিত্ত আকুলিত করে।

১৬)

কি ভীষণ সহে এই মানুষের মন !
নিভৃত হৃদয় মাঝে
যে দারুণ ব্যথা বাজে
অস্ত্রাঘাত—ঝঞ্ঝাবাত তুচ্ছ তুলনায়
নীরবে লুকায়ে রাখে সেই যাতনায়।

(১৭)

নাহি জানি বিধাতার এ কোন বিধান !
নশ্বর এ দেহ বাসে
স্থাপেন কি অভিলাষে
এত সুকঠিন আত্মা, দগ্ধ শিখা যার—
কি জাগ্রতে, কি স্বপনে সদা জ্বলিবার।"

এই স্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে ঈশানচন্দ্র নবীনচন্দ্রের ন্যায় অত্যন্ত ভাবপ্রবণ ছিলেন এবং উভয়ের চরিত্রের সৌসাদৃশ্য-হেতু উভয়ের মধ্যে অকৃত্রিম প্রণয় সঞ্চারিত হইয়াছিল। নবীনচন্দ্রের 'অবকাশ রঞ্জিনী'র ন্যায় ঈশানচন্দ্রের 'বাসন্তী'র অধিকাংশ কবিতা প্রেমাত্মিকা। একবার সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবক ৺প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত নবীনচন্দ্রের কাব্য-সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন যে লালিত্য, মাধুর্য্য, আন্তরিকতা ও আবেগের জন্য তাঁহার মতে 'অবকাশ রঞ্জিনী' নবীনচন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য গ্রন্থ। বাস্তবিক, বৃহত্তর এবং প্রসিদ্ধতর কাব্যগুলি অপেক্ষা নবীনচন্দ্র এই গীতি-কবিতাগুলিতে অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ঈশানচন্দ্রের প্রীতিগীতিগুলি নবীনচন্দ্রের প্রীতিগীতিগুলি অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। সমগ্র কবিতাগুলির মধ্যে একটি বিষাদের সুর, একটি নৈরাশ্যের বেদনা, একটি অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার ব্যথা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। যে কোনও স্থান পাঠ করিলে ইহা উপলব্ধ হইবে।

(তবু বুঝিল না মন)—

তবু বুঝিল না মন !
শুধু চিত্ত ভেঙে গেল, শুধু প্রাণ দগ্ধ হ'ল,
আশার একটি বক্ষ হ'ল না পূরণ
তবু কেন তার আশা, তবু কেন ভালবাসা,
জাগ্রত নয়নে তবু কেন সে স্বপন !
হায় বুঝিল না মন !

এইরূপে যাবে দিন—
যাবে মাস যাবে বর্ষ, যাবে সুখ যাবে হর্ষ,

নবীনচন্দ্র সেন।

গিয়াছে হৃদয়—যাবে হতাশ জীবন ;
এমনি অতৃপ্ত বক্ষে, এমনি সজল চক্ষে,
অন্তিম শয্যায় শেষ মুদিব নয়ন !
তবু পাব না সে ধন।

(বিবেক ও নৈরাশ)—

যদিই বাসিল ভাল	যাতনা কি যাবে তায়	মিটিবে কি আশা ?
শুনি জলধর ধ্বনি	শৃঙ্খলিত চাতকের	মিটে কি পিপাসা ?
কুদ্র পিঞ্জরের পাখী	পিঞ্জরে রহিবে সদা	তুমি রবে কোথা ?
দীর্ঘশ্বাস হা হুতাশ	পশিবে না কাণে তার	তবে কেন বৃথা ?
শুধু ভালবাসা নিয়ে	কোন্ প্রেমিকের চিত	জুড়ায়েছে কবে ?
আশার জলধি হৃদে	বাসনায় আকুলিত	কিসে স্থির রবে ?

অধিকাংশ কবিতা পরকীয়া-প্রেমসম্বন্ধীয় হইলেও "বাসন্তী"তে অন্যান্য বিষয়ের যে সকল কবিতা আছে তাহাতেও তাঁহার কবিত্বনোচিত কল্পনাপ্রাচুর্য্য ও ছন্দোবৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ঈশানচন্দ্র তাঁহার অগ্রজের ন্যায় স্নেহপ্রবণ ছিলেন। "সন্তান-দর্শনে" শীর্ষক কবিতা তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিমানচন্দ্রের উদ্দেশে লিখিত—ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার শেষাংশ এইরূপ : —

না,—না,—এ জীবন নহে এতই অসার—
সুখ দুখ এ জীবনে, বাঁধা নিত্য চিত্ত সনে
আত্মার প্রসাদে জীবে সুখের সঞ্চার ;
সত্য মাত্র লক্ষ্য করি, লোভ দম্ভ পরিহরি,
প্রতারণা প্রবঞ্চনা কর পরিহার,
ধরিবে মোহিনী মূর্ত্তি নীরস সংসার।

থাকি কি না থাকি বৎস ! তোমার যৌবনে
জনকের এই ভিক্ষা, সত্য ধর্ম্ম কোরো শিক্ষা,
কাপট্য চাতুরী যেন রহে না রে মনে,
পাপের চরম তাহা, জীবের ঘৃণিত যাহা,
অনিষ্ট কিছুতে এত হয় না জীবনে,
বিষকুম্ভ পয়োমুখ হ'ওনা জীবনে।"

'মুমূর্ষু শয্যায় ভার্য্যা'-শীর্ষক কবিতাটি সম্ভবতঃ পত্নীর সঙ্কটাপন্ন রোগের সময় কল্পিত হইয়াছিল। কবিতাটীর আন্তরিকতা কৃত্রিমতালেশশূন্য :—

"বল প্রিয়ে বল প্রাণ কি সাধ অন্তরে !
পুরাইয়া শেষ বাঞ্ছা প্রেয়সী তোমার
সার্থক হউক দগ্ধ জীবন আমার।"

'চিত্তমুকুর'-এর আলোচনা-কালে আমরা দেখিয়াছি ঈশানচন্দ্রও তাঁহার অগ্রজ হেমচন্দ্রের ন্যায় স্বদেশের অতীত গৌরব-কাহিনী স্মরণ করিলে আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেন। 'বাসন্তী'তেও ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। 'জীর্ণ ঘাট'-শীর্ষক কবিতার একস্থানে কবি বলিতেছেন :—

শিখিয়াছি বিদেশীর সকল আচার,
শিখি নাই শুধু সেই উদ্দীপনা তার।
পেয়েছি জ্ঞানের বাতি পেয়েছি বাসনা,
পাই নাই শুধু সেই গভীর সাধনা।
নাহি চাহি রাজ্যপদ, নাহি চাহি ধন,
নাহি চাহি ছাই ভস্ম সভ্যতা এখন,
যা পেয়েছি যা শিখেছি যথেষ্ট আমার ;
দেখাইয়া দেও এবে পথ সাধনার।
তৃণের অধম হ'য়ে সুখের সংসারে
আর্য্যসুত বঙ্গবাসী ভ্রমিতে না পারে !!

না জানি কি ভাগ্য দোষে দুর্দ্দশা এমন
বঙ্গভাগ্যে শুভদিন ঘটেনি কখন,
স্বর্ণপ্রসূ চিরদিন, তবু ভিখারিণী
বহু পুত্রবতী, তবু পরের অধিনী।
রাজা রাজ্য ধন ছিল, মন্ত্রী বিচক্ষণ
শস্ত্র শাস্ত্র বুদ্ধিবল, ছিল বিলক্ষণ।
যাহে বিদেশীর আজ এতই প্রভাব
বাঙ্গালায় সে সকল ছিল না অভাব—
তবু কেন ইতিহাসে করি দরশন
বাঙ্গালীর নামে এত কলঙ্ক লেপন !
পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে অক্ষরে অক্ষরে
কাঁদে কেন গ্রন্থকার বাঙ্গালার তরে !
সপ্তদশ অশ্বারোহী শেষ বঙ্গেশ্বরে
শুনিয়াছি বিনা যুদ্ধে পরাভব করে।
সপ্তদশ শত সৈন্য যাহার দুয়ারে
আপনি কমলা বাঁধা ছিল যার ঘরে।
পলাল সে বিনা যুদ্ধে ত্যজি বসবাস
সে কথা কেমনে আজ করিব বিশ্বাস।
বোধ হয় অভাগার পারিষদ যত।
আছিল কৃতঘ্ন মিরজাফরের মত।
… … …
ইতিহাস ?—ছাই ভস্ম করি না বিশ্বাস
বিদেশীর কয়খানা সত্য ইতিহাস ?
নয়নেও দেখেনি যে বাঙ্গালা কখন
সেও বাঙ্গালীর মুণ্ড করেছে ভক্ষণ।
অধম মেকলে আসি দিন দুই তরে
নিন্দিয়াছে বাঙ্গালীরে অক্ষরে অক্ষরে।
সভ্য ইউরোপ যাহা করে আবিষ্কার
মূর্খ বাঙ্গালীর তাহা অত্যাজ্য বিচার।
সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের সুশিক্ষিতগণ
করিতেছে স্বজাতির কলঙ্ক কীর্ত্তন।
এ চ'তে বঙ্গের ভাগ্যে ঘুনিঠ কি আর
লিখিয়াছে একজন কবি বাঙ্গালার—
যদিও কলঙ্ক রাশি আছে তব গায়
তবু ভালবাসি আমি * * * তোমায়।

প্রকৃতি-বর্ণনাতেও তরুণ কবি যথেষ্ট কবিত্ব-শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। 'সাগর'-নামক কবিতার প্রারম্ভ-ভাগ অতি সুন্দর :—

"জলধি কি মনোহর আকৃতি তোমার!
অসীম অতল শুধু অনন্ত বিস্তার!
সীমা হ'তে সীমা শূন্যে সলিল কেবল,
বিরাম-বিশ্রাম নাই সতত চঞ্চল;
এত যে গম্ভীর মূর্ত্তি এত যে ভীষণ,
দেখিতে দেখিতে তবু জুড়ায় নয়ন।
রোগে শোকে দগ্ধ হ'লে মানুষের মন,
তোমার এ মূর্ত্তি যেন করে দরশন!
হেরিলে তরঙ্গময় হৃদয় তোমার।
শুনিলে অশ্রান্ত তব গম্ভীর ঝঙ্কার—
কি হেন যন্ত্রণা আছে মানুষের মনে;
বিস্মৃতিতে মগ্ন নাহি হয় সেই ক্ষণে!
কি ছার সংসার সুখ আশার উল্লাস!
কি ছার যশের লিপ্সা ধনের প্রয়াস!
কি ছার সে প্রণয়ের অসার ভাবনা?
কিবা ছার স্নেহ মায়া দেহীর কল্পনা!
যত সুখ তত দুখ সংসার মাঝায়,
নিরমল সুখ-সিন্ধু তোমার বেলায়।
এইখানে দাঁড়াইলে মানবের মন,
বিধির অনন্ত লীলা করে দরশন।
জীবনের কুহেলিকা হয় অপনীত,
ক্ষুদ্র মানবের হৃদি হয় প্রসারিত।
হিংসা দ্বেষ প্রতারণা শোক তাপ নাই।
মায়া মোহ আশা তৃষ্ণা প্রেমের বালাই।
নিষ্পাপ নিষ্কাম চিত্ত তুমি পারাবার!
স্বরগের ছায়া ভাসে হৃদয়ে তোমার।
দাঁড়াইলে কূলে তব, মানবের মন,
আত্ম-বিস্মৃতিতে যেন হয় নিমগন!"

"তবু বুঝিল না মন"-শীর্ষক কবিতাটি ১২৮৫ সালের পৌষ মাসে এবং "স্মৃতি কিম্বা হৃৎপিণ্ড কর উৎপাটন" কবিতাটি ১২৮৭ সালে আষাঢ় মাসে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে অন্য কয়েকটি কবিতা কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্পাদিত 'বান্ধবে' এবং যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'আর্য্যদর্শন' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

"বাসন্তী" পাঠকগণের নিকট সেকালে অল্প সমাদর লাভ করে নাই। শ্রীরামপুরের সদ্বিদ্বান্ জমিদার, পরে বাঙ্গালার শাসন-পরিষদের প্রথম ভারতীয় সদস্য রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী "বাসন্তীর" প্রকাশক ৺বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন :—

7th August, '80.

My dear Benode,

In thankfully acknowledging your kind present of "Basantee" I cannot help noting the kindly feelings that prompted you to do so. I am exceedingly sorry that I could

রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী।

not be present at the time you favoured us with a call. I really do not know how to make amends for it. I hope you will be pleased to overlook it.

I found your name associated with a *work of substantial merit*. I carefully read the book and read over again some of the better poems. Some of the poems I read when they appeared in Bengalee magazines. I called the author of the book a mad man for a better man than we had called poets mad men, I mean Shakespeare. Some of the poems are rather too too full

of love. However *it is a book which the appreciative public would not willingly let die.*

With sentiments of affection

I remain
Ever yours
Kisori Lal Goswami

বিনোদবিহারীকে লিখিত ঈশানচন্দ্রের যে ইংরাজী পত্রের মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল, উহা হইতে প্রতীত হয় যে "বাসন্তী"র রচয়িতাকে দেখিবার জন্য, তাঁহাকে পত্রাদি দ্বারা উৎসাহিত করিবার জন্য তাঁহার গুণমুগ্ধ পাঠকগণ কিরূপ উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন :—

খিদিরপুর
১১ই অগষ্ট ১৮৮০

প্রিয় বিনোদ,

তোমার পত্রের সহিত তোমার বন্ধুগণ-কর্ত্তৃক লিখিত তিন খানি পত্র এবং আমি সেদিন যে পত্রখানি তোমাকে দেখিতে পাঠাইয়াছিলাম তাহা হস্তগত হইল। আমার মনে হয়, তোমার এম্-এ বন্ধুটি আমার যতটুকু প্রাপ্য ততটুকু প্রশংসা করিয়াছেন, বোধ হয় আর সকলে উচ্চ প্রশংসা দ্বারা অযথা বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। তোমার বাঁকীপুরের বন্ধুটির অভিমত সুস্পষ্ট নহে। আমার মনে হয়, "চিত্তমুকুর"-সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান "বাসন্তী"র সহিত সংযুক্ত বিজ্ঞাপন-পৃষ্ঠা হইতে আহৃত হইয়াছে। তুমি পত্রের উত্তরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পার, তিনি পূর্ব্বে "চিত্তমুকুর"এর নাম শুনিয়াছিলেন কি না। তুমি দেবেন্দ্রকে বই দিয়াছ জানিতাম না বলিয়া আমি এক খণ্ড পাঠাইয়াছি। তোমাকে তিনি যে পত্র লিখিয়াছেন তৎপাঠে প্রতীত হয় যে এখনও তিনি আমাকে বিশেষ স্নেহ ও প্রীতির দৃষ্টিতে দেখেন। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মহত্ত্বের জন্যই এইরূপ করিয়া থাকেন। ... ... আমি চিরদিন তাঁহার মঙ্গল কামনা করিব।

সেদিন তোমাকে যেরূপ পত্র পাঠাইয়াছিলাম সেইরূপ আরও দুই তিনখানি পত্র পাইয়াছি। সেদিন আমার উদ্দেশে লিখিত একটি কবিতা পাইয়াছি। সকলগুলিই অপরিচিত পাঠকগণের নিকট হইতে। সেদিন আমার অফিসে একজন ভদ্রলোক "বাসন্তী"র গ্রন্থকারকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। সুতরাং তুমি দেখিতে পাইতেছ পাঠকসাধারণের নিকট 'বাসন্তী' অনাদৃত হইবে না। আমি মনে করিয়াছি সংবাদপত্রাদিতে উহার বিজ্ঞাপন দিব, কিন্তু সমস্ত খণ্ড পাইবার পর উহা করিলে কি ভাল হয় না?

আমি এখনও আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে এক খণ্ড উপহার দিতে পারি নাই। যখন এত বিলম্ব হইয়া গিয়াছে তখন বোধ হয় তাঁহাকে, যোগেন্দ্র ঘোষকে[১] ও উমাকালীকে[২] আর দিয়া কাজ নাই। তুমি কি বল?

"রাণী"দের উপহার দিবার জন্য যে কয় খণ্ড গ্রন্থের প্রয়োজন, তাহা আমার নিকট নাই। তোমার তাড়াতাড়ি করিবার প্রয়োজন নাই, ক্রমে ক্রমে দিলে চলিবে।

কেদার রায়ের ভাই বলিতেছিল তাঁহাদের দোকানে কয়েক খণ্ড কেন পাঠান হইতেছে না। তাহাদের কিছু অধিক-সংখ্যক পুস্তক পাঠাইয়া দিও, কারণ মফঃস্বলের এজেণ্টদিগের সহিত তাহাদের বিস্তৃত কারবার আছে।

কৃষ্ণদাস পালকে এখনও আমি একখণ্ড পাঠাইতে পারি নাই। আবার কয়েকখণ্ড বাঁধিয়া আসিলে পাঠাইব।

সেদিন প্রাণকৃষ্ণের সহিত দেখা করিতে তাহার দোকানে গিয়াছিলাম, কিন্তু সে সেখানে ছিল না। আমি তাহার লোকদের তাহাকে বলিতে বলিয়াছি যে যেন কাগজগুলি শীঘ্র প্রেসে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তাহাদিগকে তাগিদ দিবার জন্য দেবেন্দ্রকে অনুরোধ করিব।

বিমানের অবস্থা ভালও নহে, মন্দও নহে। আমি বেচারার জন্য কি করিব ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না। আগামী রবিবার কি করিয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিবার সুবিধা হইবে বুঝিতে পারিতেছি না। রবিবার গাড়ীতে শেয়ারে যাইবার লোক পাওয়া যায় না, আর আমার একলা একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া যাওয়া সহজ ব্যাপার নহে। আমার অবস্থা ত তুমি জান। এই অল্প বেতন হইতে সব করিতে হইবে—একটু জমি, একটি বাড়ী, ছেলেদের শিক্ষা,

১। বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতির অন্তরঙ্গ বন্ধু সুপণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। ইনি ধ্রুবদর্শনবাদী (Positivist) ছিলেন। হেমচন্দ্রের বাটীর অতি নিকটেই ইনি বাস করিতেন।

২। হেমচন্দ্রের বন্ধু খিদিরপুর নিবাসী উমাকালী মুখোপাধ্যায়, ইনি হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন।

পরিবারের ভরণপোষণ, ইত্যাদি ইত্যাদি। তোমাকে নিশ্চিত বলিতেছি যে তোমার সঙ্গে দেখা করা, তোমার সঙ্গে গল্প করা, তোমাকে ভালবাসা আমার যত আকাঙ্ক্ষিত, এত আর কাহারও নহে। কিন্তু, আমার দুরদৃষ্ট যে আমার সেরূপ অর্থবল নাই, তোমার বাড়ী এত দূরে। তুমি আমাকে এত ভালবাস যে, আমি তজ্জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ভাষা আমার অভিধানে খুঁজিয়া পাই না। আমি এ সকল ভাব অন্তরের মধ্যে গোপন রাখিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার হৃদয়বেগ এত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে যে, উহার কিঞ্চিৎ আভাস না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রিয় বিনোদ, যখন আমি 'বাসন্তী' প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করি, আমি ছাপাখানা হইতে জানিলাম যে, প্রায় একশত টাকা খরচ হইবে। ওঃ! তখন আমার মনে কি কষ্ট হইল যে, আমার 'বাসন্তী' কখনও প্রকাশিত হইবে না, কারণ আমার এত অর্থব্যয়ের ক্ষমতা ছিল না। প্রকাশিত করিবার কোন আশা নাই দেখিয়া সত্য সত্যই আমি একদিন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি অগ্নিসাৎ করিতে গিয়াছিলাম। অবশেষে দেবেন্দ্র ও তুমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উহার প্রকাশের ভার গ্রহণ করিলে। প্রিয় বিনোদ, আমার 'বাসন্তী'র রচনা ও প্রকাশের সহিত কত দীর্ঘশ্বাস, কত অশ্রু জড়িত আছে। তুমি উহাকে ভালবাসিয়া আমাকেও ভালবাসিয়াছ। আমার 'বাসন্তী'কে ভালবাসিলেই আমাকে ভালবাসা হইল। বাগাড়ম্বর-দ্বারা আমি আমার মনোভাব ব্যক্ত করিতে কখনও ভালবাসি না। পরে যথোপযুক্ত সময় ও সুযোগ পাইলে আমার আন্তরিক ভাব ব্যক্ত করিব। আমি বোধ হয় দীর্ঘ পত্র দ্বারা তোমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইয়াছি, সুতরাং আজি রাত্রিতে এইখানেই বিদায়। আমার মনে হয়, তুমি যদি তোমার অফিস হইতে এখানে সোজা চলিয়া আইস তাহা হইলে সহজেই উভয়ের সাক্ষাৎ হইতে পারে। প্রিয় বিনোদ, মধ্যে মধ্যে এইরূপ এসো। আশা করি, তুমি সুস্থ দেহে ও সুস্থ মনে আছ।

চিরদিন তোমার

হতভাগ্য ঈশান।

এই পত্র হইতে দেখা যায় 'বাসন্তী'-প্রকাশের পূর্ব্বেই ঈশানচন্দ্র সামান্য বেতনে কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি, এই সময়ে বোর্ড অব রেভিনিউ অফিসে অস্থায়ী ভাবে তিনি একটি কার্যে নিযুক্ত হন।

দোসর

—শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

যুগ যুগ ধরি বঞ্চিত যারা পায় নি ক' ভালবাসা,
নিরাশা-পঙ্কে ডুবিয়া মরিছে—মিটে নাই কোন আশা,
জীবনু যাদের স্নেহ-দয়াহারা, হৃদয় করিছে ধূ ধূ,
পেল না যাহারা কাহারো প্রাণের ক্ষণিক পরশ শুধু।

যারা কেঁদে যায় দর দর ধারে, সান্ত্বনা নাহি দুখে,
জগতের ঘৃণা-অভিশাপগুলি তুলে লয় নিজ বুকে,
হে মোর হৃদয়, আয় ছুটে আয়, আজ তাহাদের সাথে,
দীর্ঘ-পথের সাথী পাবি তুই জীবনের দুখ-রাতে।

বেদনার ঠাঁই খুঁজে পাবি হেথা—যাবে কলঙ্ক গ্লানি,
দুঃখীরা হ'বে দুখের দোসর—বক্ষে লইব টানি।
আছে যত ব্যথা, যত হাহাকার, দিবি' নিবি' সব কিছু
ব্যথিতের সাথে কাঁদিয়া চলিবি—চাহিবি না আর পিছু।
জীবন-বীণায় আজ গেয়ে চল্—সকল ব্যথার গান,
পার হবি ওরে দুস্তর-মরু পথ তোর অফুরাণ।

পুস্তক ও পত্রিকা

অতসী মামী—শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ডবল ক্রাউন, ষোল পেজী, ২৬৭ পৃষ্ঠা। অ্যান্টিক কাগজে ছাপা। মলাট ও বাঁধাই ভাল। মূল্য দুই টাকা।

ছোট গল্পের বই। বইখানিতে দশটি গল্প আছে: অতসী মামী, নেকী, বৃহত্তর-মহত্তর, শিপ্রার অপমৃত্যু, সর্পিল, পোড়াকপালী, আগন্তুক, মাটির সাকী, মহাসঙ্গম, আত্মহত্যার অধিকার। লেখক বলিয়া দিয়াছেন, 'রচনা-কাল অনুসারে গল্পগুলি সাজানো হয়েছে।' না বলিয়া দিলেও, যে-কোন মনোযোগী পাঠকের নিকট ইহা ধরা পড়িত; ইহার প্রথম চারিটি গল্পের সহিত শেষের পাঁচটি গল্পের পার্থক্য এত সুস্পষ্ট। মধ্যখানে 'সর্পিল' গল্পটি পরিণত ও অপরিণত শিল্পী-মনের মিলন। এই গল্পটির আরম্ভ ও বিকাশকে যে কোন শ্রেষ্ঠ গল্প-লেখকের রচনা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু শেষাংশ দুর্ব্বল। কিন্তু, তারপর একে একে শেষের পাঁচটি গল্প পড়িলে সাহিত্য-রসিক ব্যক্তির পক্ষে সন্দেহ থাকে না—মোটের উপর এই লেখকের মধ্যে যে-প্রতিভার পরিচয় রহিয়াছে, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে মাঝে মাঝে দুই চারিবার দেখা গেলেও অতি দুর্লভ।

শেষ গল্প, 'আত্মহত্যার অধিকার' বোধ করি বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে যতগুলি ভাল গল্প বাহির হইয়াছে, তাহাদের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারে। একটি দরিদ্র বাঙ্গালী পরিবারের বর্ষারাত্রির দুঃখকে বিষয়বস্তু করিয়া গল্পটি রচিত; কিন্তু শিল্পী-প্রতিভার নিশ্চিত নিদর্শন স্বরূপ গল্পটি লেখকের অজ্ঞাতসারেই সমগ্র বাংলা দেশের পটভূমিকাতে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে—যে-দেশের প্রত্যেকটি লোকের জীবনে দুর্য্যোগের রাত্রি ঘনাইয়া আসিয়াছে এবং তাহার ঘর ফুটো হইয়া জল পড়িতেছে। গল্প-লেখক বাংলা সাহিত্যে এবং "বঙ্গশ্রী"র পাঠকগোষ্ঠীর নিকট অপরিচিত নহেন। ইতিপূর্ব্বে "বঙ্গশ্রী"তে তাঁহার উপন্যাস ও কয়েকটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা এই লেখকের নিকট অনেক প্রত্যাশা করি, কিন্তু ভয় হয়, বর্ত্তমানে বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে যে বিষাক্ত পারিপার্শ্বিক সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার আবেষ্টনীতে পড়িয়া, পাছে লেখকের স্বাভাবিক শক্তি অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে। এ দেশে অনেক লেখক ইতিপূর্ব্বে এই জন্য অঙ্কুরে বিনষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু, বর্ত্তমান লেখকের অঙ্কুরাবস্থা কাটিয়া গিয়াছে—ইহাই ভরসা।

টাকার কথা—শ্রীঅনাথগোপাল সেন। মডার্ণ বুক এজেন্সি, ১০ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা। ডবলক্রাউন, ষোল পেজী, ১৩৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ছাপা, বাঁধাই উৎকৃষ্ট।

বাংলা সাহিত্যে অর্থনীতি-বিষয়ক পুস্তক নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। 'টাকার কথা' এই শ্রেণীর পুস্তক। ইহাতে 'রাজনীতি বনাম অর্থনীতি' 'স্বর্ণমান', 'ভারতে মুদ্রানীতি', 'আমাদের রেশিও সমস্যা', 'বর্ত্তমান অর্থসঙ্কট' 'দেশীয় শিল্পের অন্তরায়,' 'যে দেশে টাকা নাই'—এই কয়টি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেকটি প্রবন্ধই বিভিন্ন মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং চিন্তাশীল পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। লেখক বাংলা সাহিত্যে অপেক্ষাকৃত আগন্তুক হইলেও ইহারই মধ্যে তিনি তাঁহার রচনা দ্বারা চিন্তাশীল বলিয়া যশ অর্জ্জন করিয়াছেন।

আমরা প্রচলিত অর্থনীতির বিরোধী। এ সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট অভিমত 'ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়' প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। আলোচ্য পুস্তকের অধিকাংশ রচনাই প্রচলিত অর্থনীতি সম্পর্কিত। লেখক এই নীতির ভাল-মন্দ দুই দিক্‌ই আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান অর্থনীতির গণ্ডী অতিক্রম করিতে সমর্থ হন নাই। তাহা হইলেও পুস্তকে অনেক চিন্তার বিষয় আছে। এই শ্রেণীর পুস্তকের দরকার আছে। প্রচলিত অর্থনীতি লইয়া যত বেশী আলোচনা হইবে, ততই তাহার দোষত্রুটি ধরা পড়িবে। বিশেষতঃ, এই সকল রচনাতে যে শক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, সে শক্তি যেদিন গতানুগতিকতার পথ পরিহার করিয়া সত্যকার পথের সন্ধান পাইবে, সেদিন আমরা এই লেখকের নিকটই অনেক কথা শুনিবার আশা রাখি। আশা করি; আমাদের এই উক্তির ভাল দিক্‌টাই লেখক দেখিতে পাইবেন।

নানা কথা—শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত। প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস্, ৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা ডবল ক্রাউন, ষোল পেজী; ১২৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। সচিত্র; সুন্দর ছাপা ও বাঁধাই।

ভূমিকায় লেখা হইয়াছে:—'জাতীয় চরিত্র গোড়া হইতে দৃঢ় করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে এ দেশের ছেলেমেয়েরা কল্পনা; ধারণা,

সুকুমার বৃত্তিগুলির কৌতূহল-তর্পণের সঙ্গে বস্তুনিষ্ঠাও লাভ করে, স্বপ্নের চেয়ে সত্যের মহিমা কম আশ্চর্য্যকর নহে, তাহাও উপলব্ধি করিতে শিখে—কিন্তু সে সত্য কোন্ সত্য? বিদেশী বৈজ্ঞানিক যাহাকে সত্য বলিয়া ধরিয়াছেন, সেই সত্য কি? একটি সমগ্র জাতি বিদেশী-রচিত ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান আলোচনায় মাতিয়া এমন একটি অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, যাহাতে সত্য মিথ্যার বাছ-বিচার আর সম্ভব নহে। বর্ত্তমান পুস্তকে প্রাণী ও উদ্ভিদ, জড় জগৎ, গ্রহতারা ইত্যাদি উদ্ভিদ-বিদ্যা, পদার্থ-বিদ্যা সমস্ত বিষয়েরই আলোচনা করা হইয়াছে—এবং সে আলোচনা সুপাঠ্য ও সুনিপুণ। কিন্তু অণুপরমাণু লইয়া বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যে বিপদে পড়িয়া গিয়াছেন, যে বিপদ ক্রমাগত জটিল হইতে জটিলতর হইয়া পড়িতেছে—সে আলোচনা অপেক্ষা যদি আমরা আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষ-রচিত এমন পুস্তকের সন্ধান পাই, যাহাতে অণু পরমাণু ইত্যাদির নিঃশেষ পরিচয় রহিয়াছে, সেই পুস্তকের সন্ধানই জাতীয় চরিত্রগঠনে অধিকতর সহায়ক হইবে না কি?—এ প্রশ্ন আমরা আলোচ্য পুস্তকের লেখককেই জিজ্ঞাসা করি। তাঁহার পুস্তকে যে বিদ্যাবত্তার পরিচয় আছে, সেই বিদ্যাবত্তা কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে হইলে তাঁহাকে এ প্রশ্নের উত্তর দিয়া তবে কাজে নামিতে হইবে।

নিরালায়—প্রমথনাথ রায়। মডার্ণ পাব্লিশিং সিণ্ডিকেট, ১৬।১ শ্যামচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা। ডবল ক্রাউন, ষোলপেজী, ১১২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ছাপা-বাঁধাই মনোরম।

গল্পের বই। লেখককে আমরা উৎকৃষ্ট ইংরাজী প্রবন্ধকার হিসাবেই জানিয়াছিলাম। তাঁহার ইংরাজীলিখিত পুস্তক পড়িয়াছি। সে লেখার তারিফও করিয়াছি। তাই তাঁহাকে গল্প-লেখক হিসাবে জানিতে আমাদের বাধে। গল্প লিখিবার নহে। ভঙ্গী তাঁহার আছে। কিন্তু তাঁহার প্রতিভা গল্প-লেখার উপযোগী নহে। নিজের বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করিয়া তিনি অন্যত্র বিচরণ করিতে অভিলাষী হইলেন কেন?

পশ্চিম-প্রবাসী শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। দি নিউ বুক ষ্টল, ৯ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা। ডবল ক্রাউন, আট পেজী, ৩০০ শত পৃষ্ঠা। অসংখ্য চিত্র; ছাপা-বাঁধাই অত্যুৎকৃষ্ট।

লেখক "বঙ্গশ্রী"র পাঠকদের অপরিচিত নন; কেবল বঙ্গশ্রী কেন, বাংলা সকল সাময়িক পত্রিকারই পাঠকবর্গ লেখকের রচনার সহিত সুপরিচিত। এত অল্প দিনে তিনি বাংলার পাঠকগোষ্ঠীর মন হরণ করিয়াছেন যে, তাঁহার পুস্তক সমালোচনার অপেক্ষা রাখে বলিয়া মনে হয় না। আলোচ্য পুস্তকের বিষয়ভাগ—(১) এডেন (২) কায়রো (৩) মাল্টা (৪) প্যারী (৫) বের্লিন ও পটস্‌ডাম (৬) লণ্ডন (৭) কোবেনহাবন্ (৮) ষ্টকহলম্ (৯) হেলসিংকী (১০) হামবুর্গ (১১) হল্যাণ্ড (১২) বেলজিয়াম (১৩) লাক্সেমবুর্গ ও সুইজার্লাণ্ড (১৪) মিলানো (১৫) জেনোয়া (১৬) রোমা (১৭) বর্ত্তমান ইতালী (১৮) নাপোলী, পাম্পেয়াই ও ভিসুভিয়াস্ (১৯) বৃন্দিসি, আলেক্‌জান্দ্রিয়া ও পোর্ট সৈয়দ্। এই তালিকার পর এমন কোন্ উৎসুক পাঠক আছেন, যাঁহার মন বইখানি পড়িবার জন্য ব্যাকুল হইয়া না উঠিবে? আমরা ইতিপূর্ব্বে লেখকের যতগুলি বইয়ের পরিচয় দিয়াছি, সবগুলিই দেশবাসীর প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। এখানাও করিবে, নিশ্চয় করিয়াই ইহা বলা যায়। ভ্রমণ-কাহিনীকে লেখক উপন্যাসের মত মনোরম করিয়া তুলিয়াছেন।

কিন্তু ভূমিকায় যে তিনি লিখিয়াছেন, ইউরোপের নিকট আমাদের জানিবার ও শিখিবার অনেক কিছু আছে, তাহার উত্তরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, এই দুই শত বৎসর ইউরোপের নিকট হইতে আমরা তো নানা প্রকার পাঠ গ্রহণ করিলাম, তাহাতে কি আমাদের দুঃখ বাড়িয়াছে না কমিয়াছে?

অপলাধিকা—শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু। ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এক টাকা চার আনা। ডবল ক্রাউন, ষোল পেজী, ১৫১ পৃষ্ঠা। ছাপা-বাঁধাই ভাল।

সাধারণতঃ পুস্তকের দুই শ্রেণী—পাঠ্য ও অপাঠ্য। পাঠ্য পুস্তক বলিতে সমালোচকের ধারণা এই যে, যাহা পাঠ করিতে বসিয়া শেষ অবধি পড়া যায়, তাহাই পাঠ্য (ভাল এবং মন্দ পাঠ করিবার পরের কথা); এবং যাহা পাঠ করিতে বসিয়া কিছুতেই (হাজার চেষ্টা করিলেও) শেষ অবধি পড়িয়া উঠা যায় না, তাহাই অপাঠ্য। এই অপাঠ্য শ্রেণীর পুস্তক (বিশেষতঃ উপন্যাস ও গল্পের বই) বাংলা দেশে যত বাহির হইয়াছে ও হইতেছে, এত আর কোন দেশে হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আলোচ্য পুস্তকটি, সেই সংপ্রাধিক পুস্তকের আর একখানি। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রের কোন অধিষ্ঠাত্রী দেবী যদি থাকেন, (তিনি সরস্বতী নন, তাহা নিশ্চিত জানি)—আমরা তাঁহার নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা জানাই—তিনি তাঁহার এই সেবকদের সুমতি দিন্।

শ্রীজগন্নাথ বল্লভ নাটকম্—শ্রীশ্রীযুগল মিলন। রায়োপাধিকেন শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র শর্ম্মা সম্পাদিতমনুবাদিতঞ্চ। মূল্য এক টাকা মাত্র। শ্রীনির্ম্মলকুমার রায়, ৩ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বৈষ্ণবাচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীগৌরসুন্দর ভাগবত দর্শনাচার্য্য মহাশয় লিখিত ভূমিকা। ডবল ক্রাউন, ষোল পেজী, ১২৮ পৃষ্ঠা। ছাপা-বাঁধাই মন্দ নহে।

শ্রীল শ্রীরামানন্দ রায় প্রণীত জগন্নাথ বল্লভম্ নাটকের বঙ্গানুবাদ। ভক্ত বৈষ্ণব মাত্রেরই ইহা হৃদয় জয় করিবে।

সম্পাদকীয়

[সম্পাদকদ্বয়ের সম্মতিক্রমে শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক লিখিত]

বর্ণাশ্রম ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ : সমাজতান্ত্রিকতা, ধনিকতা ও আনন্দবাজার পত্রিকা : সম্মিলিত মুসলমান দল : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলা বানান-সমস্যা : কলিকাতার বর্ত্তমান অবস্থা ও স্যার হরিশঙ্কর পাল : বাঙ্গালা দেশ, বাঙ্গালা সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ : বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ, নেতৃবৃন্দ ও সরকার : সংবাদ ও মন্তব্য।

বর্ণাশ্রম ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ

গত বৈশাখ মাসের প্রথম ভাগে বর্ণাশ্রম-স্বরাজ্য-সঙ্ঘের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ঐ অধিবেশনের সভাপতি হইয়াছিলেন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ। সভাপতির অভিভাষণ অবলম্বন করিয়া আমাদের এই প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে।

ভারতীয় ঋষিগণের বেদ ও সংহিতানুসারে "বর্ণ বিভাগ" সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান কি উপায়ে লাভ করিতে হইত এবং "আশ্রম" বলিতে কি বুঝা যাইত, আর এখন ঐ বর্ণ-বিভাগ ও আশ্রম-সম্বন্ধীয় জ্ঞান কিরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা দেখান এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে এমন অনেক কথা বলিয়াছেন, যাহা ভারতীয় ঋষির বেদাদি গ্রন্থের বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁহার ঐ সকল কথা যে প্রকৃত ঋষির শাস্ত্রের বিরোধী, তাহা দেখাইতে বসিয়া, আমরা স্থানে স্থানে তাঁহার বিদ্যাবত্তার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে বাধ্য হইব। আমরা তাঁহার বিদ্যাবত্তার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে বাধ্য হইব বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন, আমরা তাঁহাকে যে-পরিমাণ বুদ্ধিমান্ বলিয়া মনে করি, তাহা বর্ত্তমান সময়ের তথাকথিত বাঙ্গালী পণ্ডিতগণের কাহারও তুলনায় অপেক্ষাকৃত অল্প শ্রদ্ধার যোগ্য। প্রকৃত পক্ষে, আমাদের মতে, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের মত বুদ্ধিমান্, চিন্তাশীল, দর্শনালোচনারত মানুষ বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালীদিগের মধ্যে অতীব বিরল। যে কেহ তাঁহার সম্পাদিত গ্রন্থসমূহ চিন্তাশীলতার সহিত অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনিই সম্ভবতঃ আমাদের সহিত একমত অবলম্বন করিবেন। সংস্কৃত ভাষাতত্ত্বের মৌলিকতা অনুসরণ করিয়া বিচার করিতে বসিলে, শঙ্করাচার্য্য, কুমারিল ভট্ট-প্রমুখ পণ্ডিতগণের প্রণীত যে কোন ভাষ্য সম্পূর্ণ দুষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে। সেই হিসাবে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের গ্রন্থসমূহেও দোষ আছে এবং তদ্দ্বারা ভারতীয় ঋষির মূল বক্তব্য অনুধাবন করা যায় না বটে, কিন্তু তিনি তাঁহার জ্ঞানসারেই হউক অথবা অজ্ঞাতসারেই হউক, রামানুজ, শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যসমূহের মূল গ্রন্থের মূল সূত্রের সামঞ্জস্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়া যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আমরা বর্ত্তমান সময়ের তথাকথিত আর কোন পণ্ডিতের কোন রচনায় দেখিতে পাই নাই। তাঁহার রচিত গ্রন্থ পাঠ করিবার সময় আমাদের মনে হইয়াছে, তিনি যে-শ্রদ্ধার সহিত ভাষ্য অধ্যয়ন করিয়াছেন, সেই শ্রদ্ধার সহিত মূল গ্রন্থের মূল সূত্র বিচার করিবার চেষ্টা তাঁহার মত বুদ্ধিমান্ লোকের থাকিলে জগতের মানুষ তাঁহার মুখ হইতেই বহুদিন আগেই শুনিতে পাইত যে, প্রসিদ্ধ ভাষ্যকারগণই আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন।

আমাদের পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই হয় ত শুনিয়াছেন যে, ভারতবাসী একদিন সভ্যতায় ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে জগতের মধ্যে খুব উচ্চস্থান লাভ করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু, ভারতবাসী যে কত উচ্চস্থান লাভ করিতে পারিয়াছিল, তাহা আমাদের মনে হয়, বর্ত্তমান সময়ে খুব অল্প লোকেরই ধারণা আছে। মানুষের উপর মানুষের আধিপত্য অর্জ্জিত হয় সাধারণতঃ দুই উপায়ে। এক, শারীরিক বল—অপর, জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব। একজন মানুষ যখন অপর একজন মানুষের অপেক্ষা অধিকতর শারীরিক বলে বলীয়ান্ হয়, তখন সবল মানুষের পক্ষে দুর্ব্বল মানুষের উপর আধিপত্য

লাভ করা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু ঐ আধিপত্য কখনও দীর্ঘস্থায়ী হয় না; কারণ সবল মানুষের শারীরিক সবলতা সহজেই হ্রাস প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু দুর্ব্বল মানুষ শারীরিক সবলতার আধিপত্যে কখনও সন্তুষ্ট হয় না। অন্য পক্ষে, প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব-নিবন্ধন মানুষ, অপর মানুষের নিকট যে শ্রদ্ধা লাভ করে, তাহাতে মানুষের মস্তক আপনা-হইতেই মানুষের পদতলে নত হইয়া পড়ে এবং তাহাতে মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধের উদয় হয়, সেই সম্বন্ধ সহজে বিচ্ছিন্ন হয় না। ফলে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব-নিবন্ধন যে আধিপত্য অর্জ্জিত হয়, তাহা সর্ব্বদা দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকে এবং যতদিন পর্য্যন্ত ঐ জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন আধিপত্যের উদ্ভব না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত উহার আধিপত্যের কোনরূপ অন্যথা ঘটে না। এক কথায়, শারীরিক বলের আধিপত্যে 'জোরাজোরী'র ব্যাপার আছে এবং তাহা যখন তখন নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। আর, জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব-নিবন্ধন যে আধিপত্য অর্জ্জিত হয়, তাহাতে উভয় পক্ষেরই প্রাণের টান উপস্থিত হয় এবং তাহা সহজে নষ্ট হইতে পারে না।

আমরা যদি বলি যে, জগতের সমস্ত প্রধান প্রধান দেশ চিরদিন বিদ্যমান ছিল এবং সারা জগতের সমস্ত দেশেই চিরদিন সভ্য ও অসভ্য মানুষ ছিল এবং ভারতবাসী একদিন তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব-নিবন্ধন সারা জগতের প্রত্যেক দেশের মানুষের প্রাণের উপর আধিপত্য অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিল, তাহা হইলে আমাদের পাঠকবর্গ কি তাহা বিশ্বাস করিতে পারিবেন? খুব সম্ভব, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাহা পারিবেন না, কারণ accepted theory অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমান কালের accepted theory অনুসারে মনে করিতে হয় যে একদিন জগতের প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান দেশ সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল এবং এখনকার সমস্ত সভ্য মানুষ একদিন কেবলমাত্র মধ্য-এসিয়ায় বাস করিত এবং আর সর্ব্বত্র কেবলমাত্র অসভ্য মানুষের বসবাস ছিল।

স্বভাব ও প্রকৃতি যে কি বস্তু এবং তাহাদের নিয়ম কি তাহা যথাযথ জানা থাকিলে, ঐ ঐ accepted theory যে কত ভ্রমাত্মক ও বালকোচিত, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। আমরা ঐ ঐ accepted theory-র ভ্রমাত্মকতা বঙ্গশ্রীর ১৩৪২ সনের আষাঢ় সংখ্যার ৬৬৮ হইতে ৬৭১ পৃষ্ঠায় প্রমাণিত করিয়াছি। প্রবন্ধের কলেবর অযথা বৃদ্ধি পাইতে পারে এই আশঙ্কায় উহার পুনরুল্লেখ করিব না।

ঐ accepted theory-সমূহ প্রধানতঃ ভূতত্ত্ববিদ্ (geologist), প্রত্নতত্ত্ববিদ্ (archaeologist), নৃতত্ত্ববিদ্ (anthropologist) এবং ভাষাতত্ত্ববিদ্ (philologist)-গণের মস্তিষ্ক হইতে প্রসূত হইয়াছে। বর্ত্তমান ভূতত্ত্ববিদ্যা, প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা, নৃতত্ত্ববিদ্যা এবং ভাষাতত্ত্ববিদ্যায় মানুষের কতক-গুলি ব্যবহার (practice) সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায় বটে, কিন্তু কেন যে মানুষ ঐ সমস্ত ব্যবহারের আশ্রয় লইয়া থাকে, তৎসম্বন্ধে কোন জ্ঞান লাভ করা যায় না। ঐ ঐ শাস্ত্রের কোন কোন পণ্ডিত, কেন যে মানুষ তাহার বিবিধ ব্যবহার অবলম্বন করে, তৎসম্বন্ধে এক একটা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সমস্ত ব্যাখ্যাই কেবল কতক-গুলি কাল্পনিক কথার মারপ্যাঁচ মাত্র। ঐ ব্যাখ্যাসমূহ একটু চিন্তা করিয়া পড়িলে দেখা যাইবে, তাহার কোনটির মূলে এমন কোন সত্য নাই, যাহা বাস্তব জগতে প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। মানুষের বিবিধ ব্যবহার সম্বন্ধে যে যে কথা ঐ ঐ তত্ত্ব-বিদ্যায় আছে, সেই কথাগুলি না থাকিলে ঐ তত্ত্ববিদ্যা চারিটিকে হাওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হাওয়ার অট্টালিকা বলা যাইত। মানুষের বিবিধ ব্যবহার-সম্বন্ধীয় কথা থাকা সত্ত্বেও ঐ বিদ্যা চারিটিকে যুক্তিসঙ্গত-ভাবে হাওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত না বলিয়া পারা যায় না। কাযেই যাঁহারা বর্ত্তমান ভূতত্ত্ববিদ্যার, অথবা প্রত্নতত্ত্ববিদ্যার, অথবা নৃতত্ত্ববিদ্যার, অথবা ভাষাতত্ত্ব-বিদ্যার accepted theory-তে কি বলা হইয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া জগতের অতীত ইতিহাস স্থির করিতে চাহেন, তাঁহারা অদুরদর্শী এবং চিন্তাশীলতা ও বিচারশক্তি-বিহীন, ইহা বুঝিতে হয়।

তাঁহাদের কথা বাদ দিলে, জগতের সমস্ত প্রধান প্রধান দেশ যে চিরদিন বিদ্যমান ছিল এবং সারা জগতে সমস্ত দেশেই যে চিরদিন সভ্য ও অসভ্য উভয়বিধ মানুষই ছিল এবং এই হতভাগ্য ভারতবাসী যে একদিন তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব-নিবন্ধন সারা জগতের প্রত্যেক দেশের মানুষের মন কাড়িয়া লইয়া তাহাদের প্রাণের উপর আধিপত্য করিতে পারিয়াছিল—তাহা বিশ্বাস না করিয়া পারা যায় না। ভারতবর্ষের এই আধিপত্যের মধ্যাহ্নক্ষণের কথা এক্ষণে দশ

হাজার বৎসরের আগেকার কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আর তাহার আধিপত্যের সন্ধ্যাক্ষণের কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে আট হাজার বৎসরের আগেকার কথা। গত আট হাজার বৎসর হইতে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ক্রমশঃ পতিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আট হাজার বৎসর আগে ভারতবর্ষ যখন উন্নত ছিল, তখন জগতের সর্ব্বত্র সমস্ত স্তরের মানুষের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে অন্নবস্ত্রের স্বাচ্ছন্দ্য, সন্তুষ্টি, স্বাবলম্বন, দীর্ঘ-যৌবন ও দীর্ঘপরমায়ু বিরাজিত ছিল। ভারতবর্ষে তখন প্রকৃত ব্রাহ্মণ, প্রকৃত ক্ষত্রিয়, প্রকৃত বৈশ্য এবং প্রকৃত শূদ্র বিদ্যমান ছিল। প্রকৃত ব্রাহ্মণ, প্রকৃত ক্ষত্রিয়, প্রকৃত বৈশ্য এবং প্রকৃত শূদ্র বলিতে কি বুঝায় তাহা এই সন্দর্ভে বলিতে গেলে ইহার কলেবর অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে। কাযেই তাহার আলোচনা আমরা এখানে করিব না। পাঠকগণকে শুধু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইতে হইলে জগতের ও জীবের মূল কারণ যে, কি বস্তু, তাহা নিজেদের মধ্যে ও প্রত্যেক চরাচর প্রাণীর মধ্যে কর্ম্মতঃ উপলব্ধি করিতে হয়। সারা পৃথিবীতে একজন প্রকৃত ব্রাহ্মণ থাকিলে তিনি এতগুলি মানুষকে প্রকৃত মানুষ করিয়া তুলিতে পারেন, যাহাতে সারা জগৎ সর্ব্বতোভাবে সুখের আগার হইয়া পড়ে এবং জগৎ ও জীবের মূল কারণ কি, তাহা ব্রাহ্মণের জানা থাকে বলিয়া জগৎ হইতে অন্নাভাব, পরমুখাপেক্ষিতা, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অস্বাস্থ্য এবং অকালমৃত্যু তিরোহিত হইয়া যায়।

প্রকৃত ক্ষত্রিয় হইতে হইলে মানুষের কাযকর্ম্মে কেন অশান্ত রাজসিকতার উদ্ভব হয় এবং কি করিয়া অশান্ত রাজসিকতাকে প্রশান্ত করিতে হয় তাহা কর্ম্মতঃ উপলব্ধি করিতে হয়। যদি কোন দেশে প্রকৃত ব্রাহ্মণের অভাব হয় অথচ প্রকৃত ক্ষত্রিয় বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে সেই দেশে অস্বাস্থ্য এবং অকালমৃত্যু থাকিতে পারে বটে, কিন্তু অন্নাভাব, পরমুখাপেক্ষিতা, অশান্তি এবং অসন্তুষ্টি থাকিতে পারে না।

প্রকৃত বৈশ্য হইতে হইলে প্রত্যেক মানুষ কেন স্বাবলম্বী না হইয়া পরমুখাপেক্ষী হয়, তাহা কর্ম্মতঃ উপলব্ধি করিতে হয়। যদি কোন দেশে প্রকৃত ব্রাহ্মণ এবং প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের অভাব হয়, অথচ প্রকৃত বৈশ্য বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে সেই দেশে অকালমৃত্যু, অস্বাস্থ্য, অসন্তুষ্টি এবং অশান্তি থাকিতে পারে বটে, কিন্তু পরমুখাপেক্ষিতা এবং অন্নাভাব থাকিতে পারে না।

প্রকৃত শূদ্র হইতে হইলে প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজনীয় অন্নবস্ত্রাদি কি করিয়া উৎপাদন করিতে হয়, তাহা কর্ম্মতঃ জানিতে হয়। যদি কোন দেশে প্রকৃত ব্রাহ্মণ, প্রকৃত ক্ষত্রিয় এবং প্রকৃত বৈশ্যের অভাব হয়, অথচ প্রকৃত শূদ্র বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে সেই দেশে অকালমৃত্যু, অস্বাস্থ্য, অসন্তুষ্টি, অশান্তি এবং পরমুখাপেক্ষিতা থাকিতে পারে বটে, কিন্তু কোন মানুষের অন্নাভাব থাকিতে পারে না।

চারি বর্ণের কর্ত্তব্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিলাম, তাহা বেদ, শ্রৌতসূত্র, গৃহসূত্র এবং সংহিতা হইতে প্রমাণিত হইতে পারে। সন্দর্ভের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে এই আশঙ্কায় ঐ প্রমাণগুলি উদ্ধৃত করিব না। যাঁহারা ইহার বিরুদ্ধ ধারণা পোষণ করেন, তাঁহারা প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা পরিজ্ঞাত নহেন এবং বেদ, সংহিতা, শ্রৌতসূত্র (বেদাঙ্গের) এবং গৃহসূত্রের (বেদাঙ্গের) সামঞ্জস্য চিন্তা করিয়া অধ্যয়ন করেন নাই, ইহা বুঝিতে হইবে।

যে ব্রাহ্মণ জগতে একটি মাত্র বিদ্যমান থাকিলে সারা জগতের প্রত্যেক মানুষের অকালমৃত্যু, অকালবার্দ্ধক্য, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, পরমুখাপেক্ষিতা এবং অন্নাভাব দূরীভূত হইতে পারে, সেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে আমাদের এই ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় বিদ্যমান ছিল। ইহা ছাড়া প্রকৃত ক্ষত্রিয়, প্রকৃত বৈশ্য, প্রকৃত শূদ্রও কোটি কোটি সংখ্যায় দেখা যাইত। শুধু ভারতবর্ষে কেন, মধ্য-ইয়োরোপ এবং আমেরিকাতেও দশ হাজার বৎসর আগে লক্ষ লক্ষ প্রকৃত ব্রাহ্মণ, কোটি কোটি প্রকৃত ক্ষত্রিয়, কোটি কোটি প্রকৃত বৈশ্য, কোটি কোটি প্রকৃত শূদ্র বিদ্যমান ছিল।

গত দশ হাজার বৎসর হইতে প্রকৃত ব্রাহ্মণ্যে বিকৃতি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু আট হাজার বৎসর আগেও ভারতবর্ষে, মধ্য-ইয়োরোপে ও আমেরিকায় অল্পাধিক সংখ্যায় সামান্য সামান্য পরিমাণে বিকৃত হইলেও অধিকাংশ পরিমাণে প্রকৃত ব্রাহ্মণ দেখা যাইত। ফলে, স্থানে স্থানে অকালমৃত্যু ও অকালবার্দ্ধক্যের উদ্ভব হইলেও তখনও জগতে সম্পূর্ণভাবে সমস্ত মানুষের মধ্যে অকালমৃত্যু, অকালবার্দ্ধক্য, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, পরমুখাপেক্ষিতা এবং অন্নাভাব দেখা যায় নাই।

গত আট হাজার বৎসর হইতে জগতে আর কুত্রাপি প্রকৃত ব্রাহ্মণের উদ্ভব হয় নাই। ফলে, সারা জগতে, সর্ব্বত্র অকাল-মৃত্যু এবং অকালবার্দ্ধক্য দেখা দিয়াছিল। কিন্তু, তখনও মানুষের মধ্যে শান্তি অর্থাৎ নিরুপদ্রবতা, সন্তুষ্টি, স্বাবলম্বন এবং অন্নবস্ত্রের স্বাচ্ছল্য বিদ্যমান ছিল, কারণ তখনও প্রকৃত ক্ষত্রিয়, প্রকৃত বৈশ্য এবং প্রকৃত শূদ্র দেখা যাইত।

গত ছয় হাজার বৎসর হইতে জগতে আর কুত্রাপি প্রকৃত ব্রাহ্মণ ও প্রকৃত ক্ষত্রিয়—এই উভয় বর্ণেরই উদ্ভব হয় নাই। ফলে, সারা জগতে, সর্ব্বত্র অকালমৃত্যু, অকালবার্দ্ধক্য, অশান্তি ও অসন্তুষ্টি দেখা দিয়াছিল। কিন্তু, তখনও মানুষের মধ্যে স্বাবলম্বন এবং অন্নবস্ত্রের স্বাচ্ছল্য বিদ্যমান ছিল, কারণ তখনও প্রকৃত বৈশ্য এবং প্রকৃত শূদ্র দেখা যাইত।

গত চারি হাজার বৎসর হইতে জগতে আর কুত্রাপি প্রকৃত ব্রাহ্মণ, প্রকৃত ক্ষত্রিয় এবং প্রকৃত বৈশ্যের উদ্ভব হয় নাই। ফলে, সারা জগতে, সর্ব্বত্র অকালমৃত্যু, অকাল-বার্দ্ধক্য, অশান্তি, অসন্তুষ্টি এবং পরমুখাপেক্ষিতা দেখা দিয়াছিল। চারি হাজার বৎসর আগে এত চাকুরী করিবার প্রবৃত্তি এবং তাহার বড়-ত্ব ও ছোট-ত্ব লইয়া অভিমান মানুষের মধ্যে ছিল না। ইহারই নাম "পরমুখাপেক্ষিতা"। জগতের মানুষ চারি হাজার বৎসর হইতে অকালমৃত্যু, অকালবার্দ্ধক্য, অশান্তি, অসন্তুষ্টি এবং পরমুখাপেক্ষিতায় বিধ্বস্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে বটে, কিন্তু গত ১৫০০ দেড় হাজার বৎসর আগেও মানুষের অন্নবস্ত্রের অভাব হয় নাই, কারণ তখনও প্রকৃত শূদ্রের উদ্ভব হইত।

গত ১৫০০ বৎসর আগেও মানুষের অন্নবস্ত্রের অভাব ছিল না বলিয়া কোন দেশের লোক আত্মীয়স্বজন ছাড়িয়া বিপৎ-সঙ্কুল পথে অন্য দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের অজুহাতে অন্ন-বস্ত্রের জন্য গমনাগমন করিতে বাধ্য হয় নাই। ইয়োরোপীয়-গণের মধ্যে তখন সর্ব্বপ্রথম অন্নাভাব উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া, তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথম "হা অন্ন" "হা অন্ন" করিয়া জগতের সর্ব্বত্র ছুটাছুটি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু, তখনও এশিয়াখণ্ডের মানুষের অন্নাভাব উপস্থিত হয় নাই এবং ভারতবর্ষে তখনও পরমুখাপেক্ষিতা দেখা যায় নাই, বরং এখানে অন্নবস্ত্রেরও প্রয়োজনাতিরিক্ত কিছু উৎপাদন (surplus) দেখা যাইত।

কিন্তু, এখন আর সে দিন নাই। জগতের সর্ব্বত্রই হাহা-কার উঠিয়াছে হাহাকার যে কতদূর ভয়সঙ্কুল তাহা, আমরা বঙ্গশ্রীর পাঠকবর্গকে বিবিধ সম্পর্কে দেখাইবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি। লিখিত ইতিহাস* কার্য্যকারণের সহিত বিচার করিয়া সঙ্গত ভাবে অধ্যয়ন করিলে আমরা জগতের গত দশ হাজার বৎসরের ইতিহাসের যে সংক্ষিপ্ত চিত্র পাঠক-বর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম, তাহার সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

আমরা এই সম্বন্ধে বঙ্গশ্রীতে বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছি, কাযেই এখানে আর তাহার পুনরুল্লেখ করিব না।

জগতের প্রাচীন ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য উপকরণ পাওয়া যায় ভারতীয় ঋষির প্রণীত মার্কণ্ডেয় ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে।

প্রথমতঃ, জগতের রূপ কি, তাহা এই দুইখানি পুরাণেই দেখান হইয়াছে এবং তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, মানুষের মাথা ও ঘাড় লইয়া যে অংশ বিদ্যমান আছে, তাহা গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্রমণ্ডিত জ্যোতিষ্কমণ্ডল-স্বরূপ। আর, স্কন্ধ হইতে পদদ্বয়ের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত যে অংশ বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা পৃথিবী-স্বরূপ।

* লিখিত ইতিহাস বলিলে বুঝিতে হইবে সেই ইতিহাস যাহা বর্ত্তমান সময়ে লিখিত হইতেছে। বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ আংশিক শৃঙ্খলিতভাবে খৃষ্ট জন্মাইবার ছয় শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে রাজনীতিক জগতে যে সমস্ত প্রধান প্রধান ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার ইতিহাস সঙ্কলন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই ইতিহাসে ভ্রম-প্রমাদ পরিলক্ষিত হয় বটে, কিন্তু ইতিহাসোক্ত ঘটনাগুলি প্রায়শঃ বিশ্বাসযোগ্য। রাজনীতিক ইতিহাস ছাড়া, ঐতিহাসিকগণ অর্থনীতি, সাহিত্য, শিক্ষা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় ইতিহাসও রচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা প্রায়শঃ অবিশ্বাস্য। খৃঃ পূঃ অঃ ৬০০ (600 B.C.) বৎসর আগেকার অর্থাৎ মিশর ও গ্রীক সভ্যতা সম্বন্ধে যে যে ইতিহাস বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণের দ্বারা লিখিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাসযোগ্য। যাঁহাদের বিন্দুমাত্র কালবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা আছে, তাঁহারা যুক্তির সহিত বিচার করিলে আমাদের সহিত একমত অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবেন। আমাদের মতে, যাঁহারা কষ্ট করিয়া মস্তের সাহায্যে বন-জঙ্গলে ঘুরিয়া এই অতীত ইতিহাসগুলি রচনা করিতেছেন, তাঁহারা মানবজাতির যে সাহায্য করিতেছেন তাহার কৃতজ্ঞতা ও পদোন্নতির (promotion) নিদর্শন-স্বরূপ মদের সঙ্গে "গুলি"র ব্যবস্থা করা উচিত অর্থাৎ বাগবাজারে তাঁহাদের জন্য একটা মিউজিয়ম্ যাহাতে প্রস্তুত হয়, তদুদ্দেশ্যে জনসাধারণের চাঁদা উঠান উচিত।

দ্বিতীয়তঃ, ঐ দুইখানি গ্রন্থে দেখান হইয়াছে যে, মানুষের শরীরের কোথাও বা গ্রীবাবন্ধনার মত একখানি মোটা গোল অস্থি রহিয়াছে, কোথাও বা পৃথক্ পৃথক্ ছোট ছোট অস্থি-সম্বলিত পাঁজরা রহিয়াছে, কোথাও বা অস্থিহীন কেবল-মাত্র মাংস-সম্বলিত পেট (abdomen) রহিয়াছে, ইত্যাদি।

তৃতীয়তঃ, কেন শরীরের বিভিন্ন স্থান ঐ রকমের বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে, তাহা দেখান হইয়াছে। তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, মস্তিষ্ক এবং শরীরের মধ্যস্থিত ব্যোম, বায়ু, অম্বু ও বহ্নির বিভিন্ন কার্য্যবশতঃ শরীরের বহিঃস্থিত মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত, চর্ম্ম ও রোমকূপের বিভিন্নতা সংগঠিত হয় এবং এই ত্রিবিধ বস্তুর বিভিন্ন-কার্য্য-বশতঃ মানুষের শরীরের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকে।

চতুর্থতঃ, শরীরের বিভিন্ন অংশ যেরূপ মস্তিষ্ক হইতে বিভিন্ন ব্যবধান-বশতঃ বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকে, সেইরূপ জ্যোতিষ্কমণ্ডল হইতে বিভিন্ন ব্যবধান-বশতঃ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন উৎপাদিকা শক্তি হইয়া থাকে এবং ঐ ঐ দেশের মনুষ্যাদি বিভিন্ন জীব, বিভিন্ন-ভাবাপন্ন ও বিভিন্ন শক্তি-সম্পন্ন, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই অংশে কোন্ দেশের লোক কিরূপ ভাবাপন্ন ও কিরূপ শক্তিসম্পন্ন হয়, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় দেখান হইয়াছে।

পঞ্চমতঃ, ঐ ঐ দেশের লোক যে বাস্তবিকপক্ষে ঐ ঐ ভাবাপন্ন এবং ঐ ঐ শক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে ঐ ঐ দেশের এক একটি বারহাজার বৎসরের ইতিহাস উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে। এইরূপে কোন কোন দেশের ২৪ হাজার বৎসরের ইতিহাস, কোন কোন দেশের ৩৬ হাজার বৎসরের ইতিহাস, ঐ দুইখানি গ্রন্থে পাওয়া যায়। ঋষিদিগের প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা আজ বিস্মৃতির গর্ভে লুক্কায়িত বলিয়া ঐ দুইখানি গ্রন্থ আজ কাল্পনিক দেবাসুরের যুদ্ধের বর্ণনায় পরিপূর্ণ বলিয়া প্রচারিত হইতেছে। আজ কেহ কেহ এই প্রবন্ধের লেখককে একটি 'গাঁজাখোর' বলিয়া মনে করিবেন, কিন্তু কেন যেন মনে হইতেছে যে, অদূরসম্মুখে এমন দিন রহিয়াছে, যখন আত্মসম্মানে বিভোর অথচ অভিমানহীন মানুষের আবার উদ্ভব হইবে এবং জগৎ দেখিতে পাইবে যে, আমাদের পরমারাধ্য ঋষিগণ কি চমৎকার ইতিহাস এবং তাহাতে কি চমৎকার জ্ঞান-বিজ্ঞান লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, আর—আমরা বানর, তাই মুক্তাহারের সম্মান রক্ষা করিতে পারি নাই।

মার্কণ্ডেয় ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের বক্তব্য-সম্বন্ধীয় আমাদের কেহ বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, গত দশ হাজার বৎসরের জগতের ইতিহাসের যে সংক্ষিপ্ত চিত্র আমরা ইহার পূর্ব্বে অঙ্কিত করিয়াছি, তাহা লিখিত ইতিহাসের ঘটনাগুলি কার্য্যকারণের সহিত সঙ্গতভাবে বিচার করিয়া দেখিলে অবি-শ্বাস করিবার উপায় নাই।

উহা হইতে বলিতে হইবে যে, সারা জগতের মনুষ্যজাতি একদিন নিজদিগকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণে বিভাগ করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উন্নতি সাধন করিয়া-ছিল এবং অকালমৃত্যু, অকালবার্দ্ধক্য, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, পরমুখাপেক্ষিতা এবং অন্নবস্ত্রাদির অভাব হইতে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা পাইয়াছিল। ইহা ছাড়া আরও বলিতে হইবে যে, বর্ত্তমান কালে যে জগতের প্রায় সর্ব্বত্র হাহাকার উঠিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিলোপ এবং তৎসঙ্গে মানুষের ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের বিকৃতি।

মনুষ্য-জাতির মধ্যে একমাত্র প্রকৃত শূদ্রই যদি বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে মানুষের মধ্যে অকালমৃত্যু, অকালবার্দ্ধক্য, অশান্তি, অসন্তুষ্টি এবং পরমুখাপেক্ষিতা থাকিতে পারিত বটে, কিন্তু মানুষের প্রয়োজনীয় অন্নবস্ত্রাদির অভাব থাকিতে পারিত না। যদি প্রকৃত শূদ্র ও প্রকৃত বৈশ্য থাকিত, তাহা হইলে মানুষের মধ্যে অকালমৃত্যু, অকালবার্দ্ধক্য, অশান্তি এবং অসন্তুষ্টি থাকিতে পারিত বটে, কিন্তু পরমুখাপেক্ষিতা ও অন্নবস্ত্রাদির অভাব থাকিতে পারিত না। যদি প্রকৃত শূদ্র, প্রকৃত বৈশ্য এবং প্রকৃত ক্ষত্রিয় থাকিত, তাহা হইলে মানুষের মধ্যে অকালমৃত্যু ও অকালবার্দ্ধক্য থাকিতে পারিত বটে, কিন্তু অশান্তি, অসন্তুষ্টি, পরমুখাপেক্ষিতা এবং অন্নবস্ত্রাদির অভাব থাকিতে পারিত না। যদি প্রকৃত শূদ্র, প্রকৃত বৈশ্য, প্রকৃত ক্ষত্রিয় এবং প্রকৃত ব্রাহ্মণ থাকিত, তাহা হইলে অকালমৃত্যু, অকালবার্দ্ধক্য, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, পরমুখাপেক্ষিতা এবং অন্নবস্ত্রাদির অভাব তিরোহিত হইত।

কিন্তু, যখন দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান জগতে প্রায় সর্ব্বত্র সমস্ত স্তরের মানুষের মধ্যে অকালমৃত্যু, অকালবার্দ্ধক্য,

অশান্তি, অসন্তুষ্টি, পরমুখাপেক্ষিতা এবং অন্নবস্ত্রাদির অভাব ঘটিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, যাহারা নিজদিগকে ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য অথবা শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ, অথবা প্রকৃত ক্ষত্রিয়, অথবা প্রকৃত বৈশ্য, অথবা প্রকৃত শূদ্র নহেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই বিকৃতি ঘটিয়াছে। এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, অন্য কোন বর্ণের উদ্ভব না হইলেও একমাত্র প্রকৃত শূদ্রের উদ্ভব হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃত বৈশ্যের উদ্ভব হইলেই তৎসঙ্গে প্রকৃত শূদ্রের উদ্ভব হইয়া থাকে। প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের উদ্ভব হইলেই তৎসঙ্গে প্রকৃত বৈশ্যের ও প্রকৃত শূদ্রের উদ্ভব হইয়া থাকে এবং প্রকৃত ব্রাহ্মণের উদ্ভব হইলেই তৎসঙ্গে প্রকৃত ক্ষত্রিয়, প্রকৃত বৈশ্য এবং প্রকৃত শূদ্রের উদ্ভব হইয়া থাকে। অতএব; আবার মনুষ্যজাতির মধ্যে যাহাতে প্রকৃত চারি বর্ণের উদ্ভব হয়, তাহা করিতে হইলে, যাহাতে প্রকৃত ব্রাহ্মণের উদ্ভব হয়, তাহা প্রথমতঃ করিতে হইবে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইবে যে, মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের উদ্ভব ও রক্ষা হয় কি করিয়া এবং চারি বর্ণের বিকৃতিই বা হয় কেন?

ইহার উত্তরে বর্ত্তমান কালের তথাকথিত পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন। ভগবান্ স্বয়ং মানুষকে চারিটি বর্ণে বিভাগ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণের ছেলে চিরদিনই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের ছেলে চিরদিনই ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের ছেলে চিরদিনই বৈশ্য এবং শূদ্রের ছেলে চিরদিনই শূদ্র হইয়া থাকে। ইহাই তথাকথিত পণ্ডিতগণের মধ্যে বেশীর ভাগের কথা।

তাঁহাদের অভিমতানুসারে বুঝিতে হয় যে, ব্রাহ্মণগণ ঠিক ব্রাহ্মণই আছেন এবং মানুষের মধ্যে যে অকালমৃত্যু, অকালবার্দ্ধক্য, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, পরমুখাপেক্ষিতা এবং অন্নবস্ত্রাদির অভাব তাহাও ঠিক। তবে, তাহার জন্য দায়ী ব্রাহ্মণ নহেন। তাঁহাদের মতানুসারে সমস্তই ভগবানের ইচ্ছায় হইয়া থাকে এবং মানুষের এই যে দুর্গতি তাহাও ভগবানের ইচ্ছায়ই হইতেছে। ইহা ছাড়া, তাঁহারা কাল এবং ব্রাহ্মণেতর আর ত্রিবর্ণকে দায়ী করিয়া থাকেন।

একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমান কালের তথাকথিত পণ্ডিতগণের উপরোক্ত যুক্তি অতীব অসার। "ভগবান্" বলিতে তাঁহারা কি বুঝেন, তাহা আমরা জানি না। ভারতীয় ঋষিগণের কথা অনুসরণ করিলে বলিতে হয় যে, এই জগতের ও জীবের সর্ব্বনিয়ন্তা "ব্রহ্ম"[১] এবং তাঁহার মূল উপাদান চারিটি। ব্রহ্মের কার্য্যবশতঃ জগৎ ও জীবের উদ্ভব, বৃদ্ধি ও রক্ষা সাধিত হইতেছে। সর্ব্বনিয়ন্তার কার্য্য এতই বিধিবদ্ধ এবং সুচারু যে, তদ্দ্বারা মানুষের কোন দুর্গতি সাধিত হইতে পারে না। মানুষ যে কষ্ট পায়, তাহার একমাত্র কারণ তাহার নিজ অজ্ঞানতাবশতঃ দুষ্কৃতি[২]।

ভারতীয় ঋষিগণের এই কথা যে অতি যুক্তিযুক্ত, তাহা যাঁহারা আত্মা এবং সত্ত্বা বলিতে কি বুঝায়, তাহা যথাযথভাবে বুঝিয়া লইয়া নিজ শরীরের মধ্যে অহরহঃ তাহার কিরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে, উহা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। সর্ব্বনিয়ন্তার ইচ্ছায় মানুষের বিনাশ সাধিত হইতে পারে, ইহা বিশ্বাস করিলে, তাঁহার 'দয়াময়' নামের সার্থকতা থাকে কি?

যাঁহারা মনে করেন যে, একমাত্র কালবশে মানুষ এই দুর্গতি ভোগ করিতেছে, তাঁহারা কাল-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, ইহা বুঝিতে হয়। শুক্ল ও কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ অভ্যাস করিয়া অথর্ব্ববেদের ১১শ, ১২শ এবং ১৩শ কাণ্ড যথাযথ অর্থে পড়িতে পারিলে "কাল" বলিতে কি বুঝায়, তাহা যথাযথভাবে ধারণা করা যাইবে এবং তখন উপলব্ধি করা যাইবে যে, জ্যোতিষ্কমণ্ডলের সহিত সম্বন্ধবশতঃ আমাদের আভ্যন্তরীণ সর্ব্বনিয়ন্তার কার্য্য অহরহঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাতেও কোন অনিয়ম অথবা পাগলামী নাই। কাল আমাদের পরিবর্ত্তনের অন্যতম নিয়ামক বটে এবং তাহাতে আমাদের আত্মার ও শরীরের যথাকালে অবসান হইতে থাকে বটে, কিন্তু তাহা কখনও আমাদের সত্ত্বার অর্থাৎ মূল উপাদানের (ব্যোম, বায়ু, অম্বু ও বহ্নির মিশ্রণে যাহা প্রথমতঃ উদ্ভূত

---

(১) "ব্রহ্ম" কাহাকে বলে, তাহার মূল উপাদান কি, তাহা কি করিয়া উপলব্ধি করিতে হয়, তাহা বঙ্গশ্রীতে প্রকাশিত 'ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষিগণের কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে বুঝান হইতেছে। আমরা তাহা পাঠকদিগকে পড়িতে অনুরোধ করি।

(২) নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥
গীতা, ৫ম অধ্যায়, ১৫শ শ্লোক

হয় তাহার) সংহারক নহে এবং তাহা কখনও আমাদের দুঃখপ্রদ নহে। আমরা সতর্ক থাকিলে আমাদের আত্মার ও শরীরের অকালমৃত্যুও সম্ভব নহে।

যাহাদের বিশ্বাস যে, এই জন্ম ছাড়া আগেকার জন্মের কর্ম্ম অথবা একটা কিছু অদৃষ্টবশতঃ আমাদের দুর্গতি অথবা সু-গতি হইয়া থাকে, তাঁহাদের ধারণা ভাষ্যকারদিগের কথার অনুরূপ বটে, কিন্তু ভারতীয় ঋষিদিগের কথার অনুরূপ নহে। বস্তুতঃ কি হয়, তাহা একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, পিতার নিকট হইতে অম্বু, মাতার নিকট হইতে বহ্নি এবং বায়ুমণ্ডল হইতে ব্যোম ও বায়ু লইয়া ভ্রূণের সত্ত্বার উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং ঐ সত্ত্বা হইতে তাহার উপাদানের তারতম্যানুসারে "আত্মা"র উৎপত্তি হয় ঐ সত্ত্বার উপাদান এবং তদনুযায়ী আত্মার কার্য্যের তারতম্যানুসারে "শরীরে"র উৎপত্তি হয়। মানুষ অহরহঃ যে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে, তদ্দ্বারা বায়ুমণ্ডলের তারতম্য প্রতিনিয়ত সাধিত হইতেছে বটে এবং মৃত্যুকালে যে বিষাক্ত বায়ু পরিত্যক্ত হয়, তাহা বায়ুমণ্ডলের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে বটে এবং তাহা জন্মকালে "সত্ত্বার" উৎপাদনের জন্যও গৃহীত হইতে পারে বটে এবং তদনুসারে বলা যাইতে পারে বটে যে, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম ভ্রূণের "সত্ত্বা"র অন্যতম নিয়ামক, কিন্তু ঐ পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মবশতঃ ভ্রূণের "সত্ত্বা"র উপাদানের যে সংগঠন হয়, তাহার পরিবর্ত্তন "আত্মা"র কার্য্যের দ্বারা এবং মাতাপিতার কার্য্যের দ্বারা অতি সহজেই সংসাধিত হইতে পারে।

সাম, যজুঃ এবং ঋক্ অভ্যাস করিয়া অথর্ব্ববেদের প্রথম দশ কাণ্ড যথাযথ অর্থে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে, বুঝা যাইবে যে, আমাদের যে দুর্গতি ও সু-গতি হইতেছে, তাহার প্রধান কারণ—(১) আমাদের "শরীরে"র মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত, চর্ম্ম এবং রোমকূপ নামক জড়াংশ ; (২) আমাদের নিকটবর্ত্তী বায়ুমণ্ডল ; (৩) শরীরের ঐ জড়াংশে দূরবর্ত্তী জ্যোতিষ্কমণ্ডলের সহিত নিকটবর্ত্তী বায়ুমণ্ডলের সম্বন্ধ অর্থাৎ কাল। বায়ুমণ্ডল যথাযথভাবে পরিজ্ঞাত হইয়া তাহার বিশুদ্ধি সাধন করিতে পারিলে, আর কোন বস্তু আমাদিগকে বিধ্বস্ত করিতে পারে না, ইহাই আমাদিগের ঋষিদের কথা।

অদৃষ্ট কোন বস্তু অথবা কার্য্য আমাদের শুভাশুভের নিয়ামক, ইহাও ভাষ্যকারদিগের কথা এবং তাহাও ভারতীয় ঋষিদিগের কোন মূল গ্রন্থে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। আমাদের মনে হয়, "অদৃষ্ট" আমাদের শুভাশুভের নিয়ামক, ইহা যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা পরোক্ষভাবে বলিয়া থাকেন যে, কেন আমার জীবনে শুভাশুভ হইবে, তাহার অনুসন্ধান তাঁহারা করিবেন না এবং অদৃষ্ট নামক কথাটির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গড্ডালিকাপ্রবাহে ভাসমান থাকিবেন। ঐরূপ করিলে আপাতভাবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা যায় বটে, কিন্তু জীবনে যে সমস্ত দুর্গতি উপস্থিত হয়, তাহার কোন প্রতিবিধান সাধিত হয় না।

যে সমস্ত ব্রাহ্মণ মনে করেন যে, তাঁহারা ব্রাহ্মণবিরুদ্ধ কার্য্য করিলেও তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব ঠিকই আছে এবং মানবজাতির মধ্যে যে এত হাহাকার উঠিয়াছে, তাহার জন্য দায়ী ব্রাহ্মণেতর অপর তিন বর্ণের অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্য, সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ আমাদের মতে নিতান্ত অজ্ঞ ও আত্ম-প্রতারক এবং অধিকন্তু তাঁহারা কাপুরুষ। সংসারে বিপন্ন হইলে সংসারের কর্ত্তাকে সর্ব্বপ্রথমে দায়ী করিতে হয় না কি ? নিজ দায়িত্ব কি, তাহা যদি সংসারের কর্ত্তার সম্পূর্ণভাবে জানা থাকে এবং তদনুসারে তিনি যদি তাঁহার কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করেন, তাহা হইলে সহকারিগণকে কর্ত্তব্যপথে পরিচালিত করা তাঁহার দায়িত্ব হয় না কি ? সহকারিগণ কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইলে সংসারের কর্ত্তাই তজ্জন্য দায়ী নহেন কি ? ঐ দায়িত্ব স্বীকার না করিয়া সহকারিগণের উপর দোষারোপ করা কি কাপুরুষতার পরিচায়ক নহে ?

উপরে যাহা দেখান হইল, তাহা হইতে বলা যাইতে পারে যে, ভগবানের ইচ্ছায়, অথবা কালবশতঃ, অথবা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মবশতঃ, অথবা অদৃষ্টবশতঃ, অথবা ব্রাহ্মণেতর অপর তিন বর্ণের অবাধ্যতাবশতঃ মনুষ্যসমাজের বর্ত্তমান অকালমৃত্যু, অকালবার্দ্ধক্য, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, পরমুখাপেক্ষিতা এবং অন্নবস্ত্রাদির অভাবের উদ্ভব হয় নাই। ইহা ছাড়া আরও বলা যাইতে পারে যে, আমাদের বর্ত্তমান দুর্গতির প্রধান কারণ—মানুষের ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের বিকৃতি এবং তজ্জন্য প্রধানতঃ দায়ী ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের উদ্ভব ও রক্ষা হয় কি করিয়া এবং ঐ

তাহার বিকৃতি হয় কেন—ইহাই হইবে আমাদের পরবর্ত্তী আলোচনার বিষয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আধুনিক তথাকথিত পণ্ডিতগণ মনে করিয়া থাকেন যে, ভগবান্ স্বয়ং মানুষকে চারিবর্ণে বিভাগ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণের ছেলে চিরকালই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের ছেলে চিরকালই ক্ষত্রিয়, ইত্যাদি।

যখন একাধিক সংহিতায় দেখা যায় যে, কর্ত্তব্যবিরুদ্ধ কার্য্য করিলে বিপ্রকে পর্য্যন্ত পশু, চণ্ডাল ও ম্লেচ্ছ * মনে করিতে হয়, তখন কেহ কর্ত্তব্যবিরুদ্ধ কার্য্য করিলেও সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র বলিয়া পরিগণিত থাকিবে, ইহা মনে করা অসার। কাযেই, বর্ত্তমান কালে যে অবিচারিত-ভাবে মানুষকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করা হইতেছে, তাহা ভারতীয় ঋষির অনুমোদিত নহে—ইহা বলিতেই হইবে।

সর্ব্বনিয়ন্তা সমস্ত জীবের সৃষ্টি ও রক্ষা সাধন করিতেছেন এবং তাঁহার কার্য্যবশতঃ মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের উদ্ভব হয়, তাহা খুব সত্য, কিন্তু পরবর্ত্তী জীবনে কে ব্রাহ্মণ, কে ক্ষত্রিয়, কে বৈশ্য এবং কে শূদ্র হইবার উপযুক্ত, তাহা শিশুদিগকে পরীক্ষা করিয়া বাছিয়া লইবার কার্য্য মানুষের। তাহা বাছিয়া লইতে না পারিলে কর্ম্মকারের হস্তে কুম্ভকারের কার্য্য এবং কুম্ভকারের হস্তে কর্ম্মকারের কার্য্য অর্পিত হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হয় এবং তাহাতে সমাজে বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হওয়া অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। কাযেই, পরবর্ত্তী জীবনে কাহার্ পক্ষে ব্রাহ্মণোচিত শিক্ষা লাভ করিয়া ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য পালন করা সম্ভব হইতে পারে, কাহার্ পক্ষে ক্ষত্রিয়োচিত শিক্ষা লাভ করিয়া ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য পালন করা সম্ভব হইতে পারে, কাহার্ পক্ষে বৈশ্যোচিত শিক্ষা লাভ করিয়া বৈশ্যের কর্ত্তব্য পালন করা সম্ভব হইতে পারে, কাহার্ পক্ষে শূদ্রোচিত শিক্ষা লাভ করিয়া শূদ্রের কর্ত্তব্য পালন করা সম্ভব হইতে পারে, উহা শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র কি করিলে নির্দ্ধারিত হইতে পারে, তাহার চিন্তা ভারতীয় ঋষিগণ করিয়াছেন।

অথর্ব্ববেদের ষষ্ঠ কাণ্ডের প্রথম অনুবাকের ১ম সূক্তের ১ম মন্ত্রটি যথাযথ অর্থে পড়িতে পারিলেই আমাদের কথার সার্থকতা বুঝা যাইবে। শিশুকাল হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত কোন্ অবস্থায় মানুষের জিহ্বা কিরূপ পরিচালিত হয় এবং জিহ্বা দেখিয়া মানুষের ব্যাধি, স্বভাব প্রভৃতি কিরূপ ভাবে নিরূপিত হইতে পারে, তাহা অথর্ব্ববেদের ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম এবং দশম কাণ্ডে দেখান হইয়াছে। তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহার প্রাণ, উদান, সমান, ব্যান ও অপান-বায়ু কার্য্য করিতে আরম্ভ করে বটে, কিন্তু সমস্ত শিশুর উদান-বায়ু ঠিক একরূপ কার্য্যশীল হয় না এবং প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর কার্য্যও ঠিক একরূপ হয় না। জন্মের দশম অথবা দ্বাদশ দিনে কাহারও বা ব্যান-বায়ু পদদেশ পর্য্যন্ত সম্যক্ কার্য্যশীল হয়, কাহারও বা উরুদেশ পর্য্যন্ত কার্য্যশীল হয়, কাহারও বা বাহুদেশ পর্য্যন্ত, কাহারও বা মুখদেশ পর্য্যন্ত কার্য্যশীল হইয়া থাকে। আরও দেখান হইয়াছে যে, যে-শিশুর জন্মের দশম অথবা দ্বাদশ দিনে উদান-বায়ুর তেজ বশতঃ ব্যান-বায়ু মুখ পর্য্যন্ত কার্য্যশীল হয়, সে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম "সত্ত্ব"সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং তাহার পক্ষে ভবিষ্যৎ জীবনে ব্রাহ্মণোচিত শিক্ষা লাভ করা ও কর্ত্তব্য পালন করা সম্ভব হইতে পারে। যাহার ব্যান-বায়ু বাহুদেশ পর্য্যন্ত কার্য্যশীল হয়, সে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট সত্ত্ব-সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং তাহার পক্ষে ভবিষ্যৎ জীবনে ক্ষত্রিয়োচিত শিক্ষা লাভ করা ও কর্ত্তব্য পালন করা সম্ভব হয়। যাহার ব্যান-বায়ু উরুদেশ পর্য্যন্ত কার্য্যশীল হয়, সে আরও নিকৃষ্টতর সত্ত্বসম্পন্ন হইয়া থাকে এবং তাহার পক্ষে ভবিষ্যৎ জীবনে বৈশ্যোচিত শিক্ষা লাভ করা ও কর্ত্তব্য পালন করা সম্ভব হয়। যাহার ব্যান-বায়ু কেবল-মাত্র পদদেশ পর্য্যন্ত কার্য্যশীল হয়, সে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতম সত্ত্ব-সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং তাহার পক্ষে ভবিষ্যৎ জীবনে শূদ্রোচিত শিক্ষা লাভ করা ও কর্ত্তব্য পালন করা সম্ভব হইয়া থাকে। শিশুর জিহ্বা ও শ্রোত্রের সঞ্চারণ দেখিয়া কি উপায়ে তাহার প্রাণ, উদান, সমান, ব্যান এবং অপান-

* ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥
(অত্রিসংহিতা, ৩৭২ম শ্লোক)

ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চণ্ডাল উচ্যতে॥
(অত্রিসংহিতা, ৩৭০ম শ্লোক)

বাপীকূপতড়াগানামারামস্য সরঃসু চ।
নিঃশঙ্কং রোধকশ্চৈব স বিপ্রো ম্লেচ্ছ উচ্যতে॥
(অত্রিসংহিতা, ৩৭৩ম শ্লোক

বায়ু কিরূপ কার্য্যশীল হইয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিতে হয়, তাহাও অথর্ব্ববেদের উপরোক্ত অংশে দেখান হইয়াছে।

এই জন্যই মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের ৩১শ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, কারণের সাক্ষিত্বসম্ভূত প্রকৃতি অর্থাৎ বালক-প্রকৃতি-বশতঃ বিকাশ কতদূর হইতে পারে, তাহা বুঝিবার জন্য মুখ, বাহু, উরু এবং পদের সাহায্যে কে ব্রাহ্মণ, কে ক্ষত্রিয়, কে বৈশ্য, কে শূদ্র, তাহা 'ব্যক্তি' পরীক্ষা করিয়া নির্দ্ধারণ করিতে হয়। *

জিহ্বার ও শ্রোত্রের সঞ্চারণ দেখিয়া শিশু কোন্ বর্ণোচিত শিক্ষা ও কর্ত্তব্যভার পাইবার উপযুক্ত, তাহা উপরোক্ত-ভাবে পরীক্ষা করার নাম শিশুর জাত-কর্ম্ম। তাহার কথাও মনু-সংহিতার ২য় অধ্যায়ের ২৭, ২৮, ২৯, ৩০শ শ্লোকে লিখিত রহিয়াছে। এ কয়টি শ্লোকের যে ব্যাখ্যা মেধাতিথি ও কুল্লুকভট্ট করিয়াছেন, তাহাও পাণিনি-সম্মত নহে। তাঁহাদের ব্যাখ্যার ফলে যে "জাত-কর্ম্ম" মানুষের বর্ণবিভাগের প্রথম সোপান, তাহা বর্ত্তমান সময়ে একটি কথার কথা মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা কি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের পক্ষে পরিতাপের বিষয় নহে ?

কাযেই দেখা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণের ছেলে হইলেই মানুষ ব্রাহ্মণ হইবে, অথবা ক্ষত্রিয়ের ছেলে হইলেই মানুষ ক্ষত্রিয় হইবে, এবংবিধ ব্যবস্থা ভারতীয় ঋষিগণের অনুমোদিত নহে। পরন্তু, ভবিষ্যৎ জীবনে কোন্ শিশুর ব্রাহ্মণ হইবার সম্ভাবনা, অথবা কাহার ক্ষত্রিয় হইবার সম্ভাবনা, তাহা যাহাতে বিশেষ সতর্কতার সহিত জন্মের অব্যবহিত পরেই নির্দ্ধারিত হয়, তাহার ব্যবস্থা ঋষিগণ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণের ছেলে হইলে মানুষ ব্রাহ্মণ হইবে, ক্ষত্রিয়ের ছেলে হইলেই মানুষ ক্ষত্রিয় হইবে, এই যে সংস্কার বর্ত্তমানকালে চলিতেছে, উহা যে শাস্ত্রসঙ্গত, তাহা পণ্ডিতগণ প্রায়শঃ অত্রি-সংহিতার ১৪০শ শ্লোক হইতে প্রমাণ করিয়া থাকেন। ঐ শ্লোকে আছে—

> জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
> বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং শ্রোত্রিয়স্ত্রিভিরেব চ॥

তথাকথিত পণ্ডিতগণের মতানুসারে এই শ্লোকস্থিত "জন্মনা" শব্দের অর্থ "ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম হইলে"। এই অর্থও পাণিনি-সম্মত নহে। পাণিনি অনুসারে 'জন্মন্' শব্দের অর্থ "শ্রোত্রের ব্যক্তিসম্ভূত যে স্পর্শ পাওয়া যায়, তদ্বশতঃ যে ব্যক্তি হইয়া থাকে সেই ব্যক্তি।" যথাযথ-ভাবে শব্দের অর্থ গ্রহণ করিলে এই শ্লোক হইতেও পূর্ব্বোক্ত জাত-কর্ম্মের কথাই আসে। কেহ অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি-সূত্রের দ্বারা যুক্তিসঙ্গত ভাবে আমাদের উপরোক্ত অর্থের অন্যথা প্রমাণিত করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

আমাদের কোন কোন পণ্ডিতের(?) মধ্যে এখনও সংস্কার রহিয়াছে যে, বেদের সময়, ব্রাহ্মণের ছেলে হইলেই মানুষ ব্রাহ্মণ হইবে, ক্ষত্রিয়ের ছেলে হইলেই মানুষ ক্ষত্রিয় হইবে, বৈশ্যের ছেলে হইলেই মানুষ বৈশ্য হইবে, শূদ্রের ছেলে হইলেই মানুষ শূদ্র হইবে, এতাদৃশ ব্যবস্থা ছিল না। এই পণ্ডিতগণ বেদের কোথায় এই ব্যবস্থার কথা লিখিত আছে, তাহা

---

* লোকানাস্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥
মনু, ১ম অধ্যায়, ৩১শ শ্লোক।

'লোক' শব্দের অর্থ—কারণের সাক্ষিত্বসম্ভূত প্রকৃতি :

'ল' শব্দের অর্থ—"কারণ", 'ও' শব্দের অর্থ "সাক্ষিত্ব", 'ক' শব্দের অর্থ "প্রকৃতি"।

পাণিনি অনুসারে ষষ্ঠ্যন্ত পদসমূহ—নিমিত্তার্থক।

যখন কোন জিনিষ ব্যক্ত হইলেও তাহা সম্পূর্ণ ব্যক্ত অর্থাৎ জগৎ রূপ গ্রহণ করে নাই, তখন তাহাকে 'লোক' বলা হইয়া থাকে।

বিবৃদ্ধ্যর্থং—বিবৃদ্+ধী+অর্থং—ইহার অর্থ—বিকাশ কতদূর হইতে পারে তাহা বুঝিবার জন্য।

নিরবর্ত্তয়ৎ—নিঃ (গন্ধের কার্য্য অর্থাৎ ব্যক্তি)+অবর্ত্ত্ (পরীক্ষা করিয়া) +অয়ৎ (নির্দ্ধারণ করিতে হয়)।

এই শ্লোকটির প্রচলিত যে অর্থ আছে, তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং তাহা অপ্রাসঙ্গিক ও কার্য্য-কারণের বাস্তব-ভাববিরুদ্ধ। ঐ অর্থ নিষ্পন্ন করিবার জন্য একে ত' দুইটি উহ্য পদের আরোপ করা হইয়াছে, তাহার পর আবার যে যে অর্থ ধরা হইয়াছে, তাহা বর্ণের অর্থের সহিত সমঞ্জস নহে। কাযেই ঐ অর্থ বিশ্বাসযোগ্য নহে। আধুনিক তথাকথিত পণ্ডিতগণের কথানুসারে ইহার অর্থ—

"পৃথিব্যাদি লোকসকলের সমৃদ্ধিকামনায় পরমেশ্বর আপনার মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণ সৃষ্টি করিলেন।"

কথাগুলি বাস্তব কার্য্য-কারণের সহিত সমঞ্জস কি না তাহা পাঠকগণ বিচার করুন।

খুঁজিয়া পান না এবং মনে করিয়া থাকেন যে, বেদের কোন কোন অংশ বর্ত্তমান সময়ে আর পাওয়া যায় না।

কোন কোন পণ্ডিত(?) মনে করেন যে, বেদের সময় উপরোক্ত ব্যবস্থা ছিল বটে, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে তাহার পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে।

আমরা বেদ হইতে যাহা বুঝিতে পারি, তদনুসারে বলিতে বাধ্য যে, বর্ণবিভাগের ব্যবস্থা সম্বন্ধে উপরে যে সংস্কারের কথা বলা হইল, তাহা খুবই ঠিক এবং উহাই যে বেদের ব্যবস্থা, তাহা এখনও বেদ এবং সংহিতা যথাযথ অর্থে পড়িতে পারিলে বুঝিতে পারা যায়। ঋষিগণ ঐ ব্যবস্থার কোন পরিবর্ত্তন সাধন করেন নাই। বেদের কোন অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ইহাও মনে করিবার কারণ নাই। প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা পণ্ডিতগণ বিস্মৃত হইয়াছেন বলিয়া, এখন আর কেহ ঋষি-প্রণীত কোন মূলগ্রন্থ যথাযথ অর্থে বুঝিতে পারেন না। তাই তাঁহারা অন্যথা মনে করিয়া থাকেন।

মোটের উপর, যে দিক্ দিয়াই দেখা যা'ক না কেন, যথাযথ-ভাবে শিশুর জাত-কর্ম্ম সম্পাদিত হইলে, উপযুক্ত লোকের হাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের দায়িত্ব ন্যস্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয় এবং তাহার ব্যবস্থা ভারতীয় ঋষিগণ করিয়াছিলেন এবং তাহা করিয়াছিলেন বলিয়াই ভারতবাসীর জ্ঞান-বিজ্ঞান এত উন্নত হইয়াছিল। আর, আজ তথাকথিত বৈদিক সমাজের নেতাগণই শাস্ত্রের দোহাই দিয়া শাস্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন বলিয়া আমাদের এত দুর্গতি।

ইহার পর বর্ণবিভাগ রক্ষা করিবার কি ব্যবস্থা ঋষিগণ করিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, আশ্রমের প্রবর্ত্তন হইয়াছিল বর্ণবিভাগ রক্ষা করিবার জন্য। বর্ত্তমান কালে প্রকৃত শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাই ছিল "আশ্রম" শব্দের প্রকৃত অর্থ। এখন আর পণ্ডিতগণ "আশ্রম" শব্দের প্রকৃত অর্থ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারেন না। "আশ্রম" সম্বন্ধীয় বিস্তৃত আলোচনা এ প্রবন্ধে করা সম্ভব নহে।

মানব-সমাজের দুর্গতি দূরীভূত করিতে হইলে, মানুষের বর্ণবিভাগ ও আশ্রম যে একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু তাই বলিয়া আধুনিক পণ্ডিতগণ যাহাকে বর্ণ ও আশ্রম বলিয়া থাকেন, তাহা ভারতীয় ঋষির বেদসম্মত নহে। কাযেই তাহা যে সম্পূর্ণ ভাবে অবজ্ঞেয়, ইহা যুক্তি-সঙ্গত ভাবে স্বীকার করিতেই হইবে।

এক্ষণে দেখা যাউক, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে কোন সারবান্ কথা আছে কি না।

সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে নিম্নলিখিত চারিটি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন :—

(১) "বর্ণাশ্রম-স্বরাজ্য"-সংঘের উদ্দেশ্য কি?

(২) সনাতন ধর্ম্ম কাহাকে বলে?

(৩) ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন বা সংস্কার সম্ভব অথবা অসম্ভব?

(৪) বর্ণাশ্রম-বিভাগের উদ্দেশ্য ও রূপ কি?

তাঁহার শ্রোতৃবর্গকে "নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি"—অর্থাৎ "তাত! কল্যাণকারী কেহই দুর্গতি পায় না", গীতার এই বাক্যটি স্মরণ করাইয়া তিনি তাঁহার অভিভাষণ সমাপ্ত করিয়াছেন। কল্যাণকারী যে কখনও দুর্গতি পায় না এবং দুর্গতির হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে যে কল্যাণকারী হইতে হয়, তাহা খুবই সত্য এবং আমরাও আমাদের পাঠকবর্গকে ঐ কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া কল্যাণ-কারী হইতে অনুরোধ করিতেছি

এই প্রসঙ্গে আমরা সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে, কল্যাণকারী দুর্গতি পায় না, ইহার সত্যতা সর্ব্বান্তঃ-করণে উপলব্ধি করিতে পারিলে, ইহাও কি স্বীকার করিতে হয় না যে, যে-মানুষ যখন দুর্গতি পাইতে আরম্ভ করে, তখন সে-ই অকল্যাণকারী হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হয়?

সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ই তাঁহার অভিভাষণের প্রথম ভাগে "বর্ণাশ্রম-স্বরাজ্য-সঙ্ঘের উদ্দেশ্য কি?"—প্রসঙ্গে বর্ত্তমান কালে মানুষ যে নানা রকমের দুর্গতি ভোগ করিতেছে, তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। আমাদের তথাকথিত ব্রাহ্মণ ও তথাকথিত পণ্ডিতগণ যে বিবিধ রকমের দুর্গতি ভোগ করিয়া থাকেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। অর্থকৃচ্ছ্রতা, পর মুখাপেক্ষিতা, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য এবং অকাল-মৃত্যুর হাত এড়াইতে পারিয়াছেন এমন একজন মানুষ ও তথাকথিত ব্রাহ্মণ এবং তথাকথিত পণ্ডিতগণের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এতাদৃশ অবস্থায় "নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি"—এই ভগবদ্বাক্যে সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ

মহাশয়ের বিশ্বাস থাকিলে, বর্ত্তমান কালের তথাকথিত ব্রাহ্মণ ও তথাকথিত পণ্ডিতগণ যে সমাজের অকল্যাণকারী হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা তিনি যুক্তিসঙ্গত ভাবে অস্বীকার করিতে পারিবেন কি?

"বর্ণাশ্রম-স্বরাজ্য-সঙ্ঘের উদ্দেশ্য কি"—প্রসঙ্গে সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় যে যে কথা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত সাতটি কথা উল্লেখযোগ্য—

(১) আমরা (অর্থাৎ বর্ণাশ্রমস্বরাজ্য-সঙ্ঘের সভ্যগণ) রক্ষণশীল পুরাতনের পক্ষপাতী।

(২) সাধারণ জনসমাজ পশুসুলভ স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিরোধী সংযমের কথা শুনিতে ভাল বাসে না, বরং অসন্তুষ্ট হয়।

(৩) জগতের কোন কার্য্যই যখন বিফল হয় না, তখন আমাদের কার্য্যই বা বিফল হইবে কেন? নিশ্চয়ই সময়ে ইহার ফল দৃষ্ট হইবে।

(৪) আমাদের দেশে শিক্ষা ছিল ধর্ম্মমূলক, আদর্শ ছিল তপোরত ঋষিসমাজ; লক্ষ্য ছিল আধ্যাত্মিক উন্নতি। সে শিক্ষার সহচর ছিল ত্যাগ ও কঠোর সংযম।

(৫) যজ্ঞাদি কার্য্যে হিন্দুরা গো-বধ করিত সত্য, কিন্তু তাহা কেবল শাস্ত্রবিধি অনুসারে ধর্ম্মাঙ্গ বলিয়াই করিত, কিন্তু রসনাতৃপ্তির জন্য করিত না।

(৬) দেশবাসী জনসাধারণ যদি শাস্ত্রানুশাসন মানিয়া সদাচার-রক্ষায় ব্রতী হন, তাহা হইলে দেশের এই দুর্দ্দিনেও অনায়াসে অর্থকৃচ্ছ্রতার একটা সমাধান করিতে পারেন।

(৭) দেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতসমাজ এখনও যথাসম্ভব ঐ সকল (অর্থাৎ বিদেশীয়) দ্রব্য বর্জ্জন করিয়া দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতেছেন।

ইহা ছাড়া তিনি বালিকা-বিবাহ-ব্যবস্থা, জাতিভেদ, বিধবা-বিবাহনিরোধ-প্রথা, অবরোধ-প্রথা এবং যুবক-যুবতীর অবাধ-মেলামেশা-নিরোধ-প্রথার বিরোধিগণের মতবাদের বিচারপ্রসঙ্গে অনেক কথা বলিয়াছেন। সমাজের এতাদৃশ ধ্বংসকর তথাকথিত প্রগতির সময়ে ঐ কথাগুলি সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় যেরূপ নির্ভীক যুক্তিপূর্ণ ভাবে বলিয়াছেন, তাহা শুনিলে কোন দূরদর্শী চিন্তাশীল লোক তাঁহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া পারে না। আমরা দূর হইতে তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক নমস্কার জানাইতেছি।

ভারতীয় শিক্ষার প্রভাবে ভারতের অবস্থা কি হইয়াছিল, তাহার বর্ণনায় তিনি বলিয়াছেন যে, শিক্ষার প্রভাবেই ভারতে একদিন এমন উজ্জ্বল জাতীয় ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল এবং শান্তিপূর্ণ, সুনিয়ন্ত্রিত এমন সুন্দর সমাজ-বন্ধন গড়িয়া উঠিয়াছিল, যাহার উজ্জ্বল আদর্শ ও উদার মহিমায় মুগ্ধ হইয়া কত বিদেশী বিজাতীয় লোক যে, ইহার শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়া ধন্য হইয়াছে, অতীতের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

এই বর্ণনাটি যে অতীব মনোরম, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কিন্তু, এখন আর ত' কেহ আমাদের মা-জননীর সেই স্নিগ্ধ চেহারা, সেই মাতৃবেশ, সেই শান্তিময় ক্রোড় মানস নেত্রে অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করেন না! সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় সত্য সত্যই কি সেই চেহারা, সেই বেশ, সেই ক্রোড় হৃদয়ে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন? আমাদের তৎসম্বন্ধে সন্দেহ হয়। আমাদের মার সেই—ই—সে—ই দিনকার চেহারা···আর আজিকার চেহারা···!

"সেই"-দিনকার চেহারা হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া লইয়া তাহার সহিত বর্ত্তমানের চেহারা তুলনা করিতে বসিলে অশ্রু সংবরণ করা যায় কি? মস্তিষ্কশক্তি অটুট রাখিতে প্রয়াস পাইতে হয় না কি? তখন বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতে পারে কি? হৃদয়ের স্পন্দন তখন নিভিয়া যাইতে চাহে না কি? লেখনী চালাইতে চক্ষুর জল মুছিতে হয় না কি? মুখ হইতে মা, মা, ধ্বনি স্বতঃই নিঃসৃত হয় না কি? নিজেদের অকৃতিত্বের কথা স্মরণ করিয়া মায়ের কাছে শক্তি যাচ্ঞা করিতে ইচ্ছা হয় না কি?

আমাদের যেন কেন মনে হইতেছে, সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের ঐ বর্ণনা তাঁহার হৃদয় হইতে উদ্ভূত হয় নাই। মার সে-ই চেহারা ভারতীয় ঋষির দেওয়া। আর, এই চেহারা যাঁহাদের দেওয়া, তাঁহাদেরই রক্ত সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় ও এই প্রবন্ধলেখকের মত লোকের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছে। ভারতীয় ঋষির সন্তান বলিয়া সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় হয়ত গৌরব অনুভব করিয়া থাকেন, কিন্তু যদি

প্রমাণিত হয় যে, যে-শাস্ত্র তাঁহারা ঋষির শাস্ত্র বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, সেই শাস্ত্র ঋষির শাস্ত্র নহে, পরন্তু আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ ভারতীয় ঋষির ভাষা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের শাস্ত্রের নামে যে-শাস্ত্র উপস্থিত করিয়াছেন, সেই শাস্ত্র ভারতীয় ঋষির মূল শাস্ত্র নষ্ট করিয়াছে এবং তাহারই ফলে আমাদের মধ্যে সর্ব্বত্র অকালমৃত্যু, অকালবার্দ্ধক্য, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, পরমুখাপেক্ষিতা এবং অন্নবস্ত্রাদির অভাব উপস্থিত হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি লজ্জানুভব করিবেন কি? আমরা তাহাই প্রমাণিত করিতে বসিয়াছি। এই প্রবন্ধের প্রথম ভাগে মানুষের "বর্ণবিভাগ" ও "জাতকর্ম্ম" সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে তাহা প্রমাণিত হয় নাই কি?

যথাযথ-ভাবে "জাতকর্ম্মে"র দ্বারা কে ব্রাহ্মণ হইবার উপযুক্ত, কে ক্ষত্রিয় হইবার উপযুক্ত, কে বৈশ্য হইবার উপযুক্ত, কে শূদ্র হইবার উপযুক্ত, তাহা স্থির করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারি বর্ণের বিভাগ ব্যবস্থিত হইলে, একই পিতার সন্তানের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি চারি জাতি থাকিতে পারে না কি? তখন জাতিভেদ-বশতঃ স্পৃশ্যতা এবং অস্পৃশ্যতার কথার উদ্ভব হয় কি? কর্ম্মকারের হস্তে কর্ম্মকারের কার্য্য এবং কুম্ভকারের হস্তে কুম্ভকারের কার্য্য অর্পিত হইলে, সমাজের সমস্ত কর্ত্তব্য যথাযথ-ভাবে সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয় না কি? এবং, তখন কে বড় এবং কে ছোট, তাহা লইয়া একটা মনোমালিন্য উপস্থিত হইতে পারে কি?

অন্য পক্ষে, কর্ম্মকারের হস্তে কুম্ভকারের কার্য্য এবং কুম্ভকারের হস্তে কর্ম্মকারের কার্য্য ন্যস্ত হইলে সমাজের কোন কর্ত্তব্য সুচারুভাবে নির্ব্বাহ করা সম্ভব হয় কি? এবং, তখন কে বড় এবং কে ছোট, ইহা লইয়া মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়া অস্বাভাবিক কি? বাস্তব জগতে এক পিতার সমস্ত সন্তান কয়টি কোথাও ঠিক ঠিক একই রকমের ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া থাকে কি? তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে এক ব্রাহ্মণ-পিতার সন্তান বলিয়াই সকলকে ব্রাহ্মণ বলিয়া আখ্যাত করা এবং সকলের উপর ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব ন্যস্ত করা যুক্তিসঙ্গত কি? মানুষকে অস্পৃশ্য মনে করা মনুষ্যোচিত দয়া-দাক্ষিণ্যের পরিচায়ক হইতে পারে কি?

ভারতীয় ঋষির উপর প্রকৃত শ্রদ্ধা থাকিলে, তাঁহারা যে মানবসমাজের কোনরূপ বিশৃঙ্খলাকর কোন ব্যবস্থার কথা বলিতে পারেন না—তাহা বিশ্বাস করা সম্ভব হইবে। আমরা সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়কে উপরোক্ত প্রশ্ন কয়টি অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। ঐ কয়টি প্রশ্ন ভাবিয়া দেখিলে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, ভারতীয় ঋষিগণ মানুষের বর্ণবিভাগের কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু বংশ-পরম্পরায় ব্রাহ্মণের ছেলে যথোপযুক্ত গুণ ও কর্ম্মশক্তিসম্পন্ন না হইলেও ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইবেন, এমন কথা তাঁহারা বলেন নাই। এই কথাটুকু বুঝিতে পারিয়াই বর্ত্তমানে তাঁহারা যাহাকে শাস্ত্র বলিয়া থাকেন, তাহা যে ঋষি-প্রণীত মূলশাস্ত্র নহে, পরন্তু তাহা যে পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণের স্বকপোল-কল্পিত কথা, তাহা তাঁহার মত বুদ্ধিমান্ লোকের উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হইবে না।

সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের যে বয়স এবং যে তাঁহার কার্য্যে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহার কোন কথার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে আমাদের সঙ্কোচ অনুভব করা উচিত—ইহা আমরা স্বীকার করি। একদিকে আমাদের এতাদৃশ মনোবৃত্তি, আর অন্যদিকে জনসাধারণের হৃদয়বিদারক অবস্থার দৃশ্য—এই দু'য়ের মধ্যে হাবুডুবু খাইতে খাইতে আমাদের লেখনী চলিতেছে। আশা করি, সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

অতীতে শিক্ষার প্রভাবে ভারতের যে উজ্জ্বল চিত্র, সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় তাঁহার শ্রোতৃবর্গের চোখের সম্মুখে অঙ্কিত করিয়াছেন, সেই চিত্র কেন এখন অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় ভাবিয়া দেখিবেন কি?

"নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি"—এই ভগবদ্বাক্যের সত্যতা স্বীকার করিলে, এখন যে তথাকথিত ব্রাহ্মণ ও তথাকথিত পণ্ডিতগণ সমাজের অকল্যাণকর হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা যেমন স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ অতীতের উজ্জ্বল চিত্র এখন কেন ম্লান হইয়া পড়িল, তাহা ভাবিতে বসিলে—ঐ কথারই সাক্ষ্য প্রদান করে না কি?

"বর্ণাশ্রম-স্বরাজ্য-সঙ্ঘের উদ্দেশ্য কি", তাহা বলিতে বসিয়া শ্রীযুক্ত সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় যে যে উল্লেখযোগ্য কথা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে প্রথম কথা—"আমরা রক্ষণশীল পুরাতনের পক্ষপাতী।"

যখন তিনি নিজেই মানুষের বর্ত্তমান দুর্গতির চিত্র অঙ্কিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং তাহা ছাড়া যখন দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান কালের তথাকথিত ব্রাহ্মণ ও তথাকথিত পণ্ডিত যে-"পুরাতন" অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন, সেই পুরাতনের ফলে তাঁহারা প্রত্যেকে অকালমৃত্যু, অকালবার্দ্ধক্য, অসন্তুষ্টি, অশান্তি, পরমুখাপেক্ষিতা এবং অন্নবস্ত্রাভাব ভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখনও কি "পুরাতন"কে যুক্তিসঙ্গত ভাবে "মারক" না বলিয়া "রক্ষণশীল" বলা যায়? এতাদৃশ অবস্থায় ঐ "পুরাতন" ঋষি-প্রণীত কি না, তাহা বিচার্য্য নহে কি?

আমরা অবশ্য বর্ত্তমান তথাকথিত প্রগতিরও পক্ষপাতী নহি, কারণ তাহারও প্রত্যেকটি বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমান জগতে যে হাহাকার উঠিয়াছে, তাহার মূলে কুবিজ্ঞান-সম্ভূত ঐ বর্ত্তমান প্রগতি রহিয়াছে। অতীত ইতিহাস বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, জগতে একমাত্র ঋষি-প্রণীত ব্যবস্থাতেই সমগ্র মানবসমাজের সর্ব্ববিধ দুঃখের হাত সম্পূর্ণভাবে এড়াইবার পন্থার নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। এখন যাহা ঋষি-প্রণীত ব্যবস্থা বলিয়া চলিতেছে, তাহা বস্তুতঃ ঋষি-প্রণীত নহে। আমাদিগকে দুঃখের হাত এড়াইতে হইলে প্রকৃত ঋষি-প্রণীত ব্যবস্থা কি ছিল, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের দ্বিতীয় কথা:—"সাধারণ জন-সমাজ পশু-সুলভ স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিরোধী সংযমের কথা শুনিতে ভাল বাসে না, বরং অসন্তুষ্ট হয়।"

আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব যে, যে-কথা সাধারণ জনসমাজ শুনিতে চায় না এবং শুনিতে চাহিতে পারে না, সেই কথা তাহাদিগকে শুনাইবার চেষ্টা করিয়া লাভ কি? তাহা শুনাইতে চেষ্টা করিলে সময়ের অপব্যবহার করা হয় না কি? তাহা কি বুদ্ধিমানের লক্ষণ?

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ২৬শ শ্লোক* লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, সাধারণ জনসমাজ যাহা শুনিতে চাহে না, তাহা তাহাদিগকে না শুনানই কর্ত্তব্য—ইহা ব্যাসদেবের উপদেশ। সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের মত বুদ্ধিমান্ মানুষ, ব্যাসদেব যাহা নিষেধ করিয়াছেন, তাহাতে লিপ্ত হন কেন?

তাহার পর যাহা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তদ্বিরুদ্ধে কার্য্য করা কাহারও পক্ষে সম্ভব কি? গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৩শ শ্লোক† পড়িলে দেখা যাইবে যে, এমন কি জ্ঞানবান্‌গণ পর্য্যন্ত স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন। স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারেই জীব চলিয়া থাকে, নিগ্রহ করিয়া কোন ফল হয় না—ইহা স্বয়ং ব্যাসদেবের কথা।

যাঁহারা বাস্তব জীবনে এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা এই সত্যের বিরুদ্ধে কোন অভিমত পোষণ করিতে পারিবেন না।

যে মানুষের পক্ষে যে-সংযম অভ্যাস করা সম্ভব নহে, যাহা ব্যাসদেবের পরামর্শবিরুদ্ধ এবং যাহা তথাকথিত পণ্ডিতগণ নিজেরাই পালন করিতে পারেন না, তাহার উপদেশ আমাদের পণ্ডিতগণ আমাদের জনসমাজকে দিতে চাহেন কেন? ইহাতে কি বুঝায় না যে, তথাকথিত পণ্ডিতগণই শাস্ত্র না জানিয়া, শাস্ত্র জানিবার ভান করিয়া, শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করিতেছেন?

সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের তৃতীয় কথা:—"জগতের কোন কার্য্যই যখন বিফল হয় না, তখন আমাদের কার্য্যই বা বিফল হইবে কেন?"

জগতের কোন কার্য্যই বিফল অর্থাৎ ফলশূন্য হয় না, তাহা সত্য, কিন্তু প্রত্যেক কার্য্যের কুফল এবং সুফল উভয়ই হইতে পারে না কি?

সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়, শিক্ষার প্রভাবে ভারতে এক দিন যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। সেই চিত্রের সহিত ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা তুলনা করিলে, মধ্যযুগে ভারতবর্ষে যে সমস্ত কার্য্য করা হইয়াছে এবং এখনও যাহা করা হইতেছে, তাহার কুফল পরিদৃষ্ট হয় না কি?

তজ্জন্য বর্ত্তমান শাস্ত্রী দায়ী নহেন কি?

আমরা এখনও তথাকথিত পণ্ডিতসমাজকে তাঁহাদের স্ব স্ব সন্তানসন্ততির মুখের দিকে চাহিয়া সতর্ক হইতে অনুরোধ করি। তাঁহারা আত্মপরীক্ষায় নিযুক্ত হইলে দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহারা প্রায়শঃ ব্যাস ও অন্যান্য ঋষির পরামর্শবিরুদ্ধ কার্য্য করিতেছেন এবং তাঁহাদের অনুসরণকারী জনসমাজকে

---

* ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং … … ।৩।২৬

—অজ্ঞানীদিগের বুদ্ধিতে ভ্রম উৎপন্ন করা উচিত নয়

† সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥ ৩।৩৩

দিয়া করাইতেছেন। তাই খৃষ্টান, মুসলমান, নাস্তিক প্রভৃতি যাঁহারা তাঁহাদের কথা শুনেন না, তাঁহারা যতটুকু ভাল আছেন, ততটুকু ভালও তাঁহারা এবং তাঁহাদের অনুচরগণ থাকিতে পারিতেছেন না। ইহাতেও কি চক্ষু ফুটিবে না?

অবশ্য খৃষ্টান, মুসলমান এবং তথাকথিত নাস্তিকগণও যে সর্ব্বতোভাবে ভাল নাই, তাহা পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন।

সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের চতুর্থ কথা :—"আমাদের দেশের শিক্ষা ছিল ধর্ম্মমূলক, আদর্শ ছিল তপোরত ঋষিসমাজ, লক্ষ্য ছিল আধ্যাত্মিক উন্নতি। সে শিক্ষার সহচর ছিল ত্যাগ ও কঠোর সংযম।"

তিনি এই কথাগুলি কোথা হইতে পাইলেন, তাহা আমরা জানি না। খুব সম্ভব, তিনি তাঁহার স্বীয় সংস্কার অথবা কোন ভাষ্যকারের কথা উদ্গিরণ করিয়াছেন। কোন ঋষি-রচিত গ্রন্থে তাঁহার উপরোক্ত কথার পোষকতা পাওয়া যাইবে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত এবং কি ভাবে কাহাকে শিক্ষিত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, তাহা অতি বিশদ ভাবে ঋষিগণ বেদাঙ্গের "পাণিনীয়া শিক্ষা", "আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে" এবং "আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে" লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য "সিদ্ধি", অর্থাৎ যখন যে-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হয়, কি করিলে তাহা সফল হইতে পারে, তাহা জানাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। আর, মানুষের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য থাকিবে ব্রহ্ম কি, অধ্যাত্ম কি, কর্ম্ম কি, অধিভূত কি, অধিদৈব কি এবং অধিযজ্ঞ কি, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া এবং তদনুসারে কার্য্য করিবার ক্ষমতা লাভ করিবার চেষ্টা করা। জীবনের উদ্দেশ্য-সম্বন্ধীয় এই জ্ঞাতব্যসমূহকে বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিতে হইলে বলিতে হয় যে, কোন্ উপাদান, গুণ এবং কর্ম্মবশতঃ চরাচর প্রত্যেক জীবের গঠন, রক্ষা ও বৃদ্ধি সাধিত হইতেছে, তাহা জানাই এবং তদনুসারে স্ব স্ব অকালবার্দ্ধিক্য ও অকাল-মৃত্যু যাহাতে প্রতিহত হয়, তাহা করাই ছিল জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। বাক্যপদীয়ের প্রথম কাণ্ডের ৩৬শ শ্লোক* এবং গীতার ৭ম অধ্যায়ের ২৯শ* এবং ৩০ শ্লোক† যথাযথ অর্থে বুঝিতে পারিলে, আমাদের কথার সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে। জীবনের উপরোক্ত উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে প্রথমতঃ, কর্ম কি, তাহা বুঝিতে হইবে এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম কি, তাহা বুঝিতে হইবে এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে; তৃতীয়তঃ, জ্ঞান ও বিজ্ঞান কি তাহা বুঝিতে হইবে এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে, চতুর্থতঃ, ধর্ম্ম‡ কি, তাহা বুঝিতে হইবে এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে এবং পঞ্চমতঃ, কর্ম্ম কি, তাহা জানিতে হইবে এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে। কর্ম্ম কি তাহা জানিতে পারিলে এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিলে সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব হয়, এই জন্যই ঋষিগণ বলিয়াছেন, "কর্ম্মাত্মা এব সিদ্ধয়ঃ"। উপরোক্ত পাঁচটি বিষয় জানিতে হইলে এবং সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে, সমগ্র বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ্, মীমাংসা, দর্শন, সংহিতা, পুরাণ এবং উপপুরাণ অধ্যয়ন করিবার এবং কর্মতঃ উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন হয়।§

যেরূপ ভাবে ঐ গ্রন্থগুলি লিখিত আছে, তাহাতে একবার প্রবেশ করিলে উহার প্রত্যেক খানি সাধারণ বালকের কাছে ডিটেকটিভ উপন্যাস যেরূপ মনোরম, সেইরূপ মনোরম হইয়া দাঁড়ায়। প্রতিদিন চার পাঁচ ঘণ্টাকাল অনন্যমনা হইয়া অধ্যয়ন করিলে বার হইতে চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে ঐ সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করা সম্ভব।

এখন আর কেহ ঋষিগণের ভাষা পরিজ্ঞাত নহেন, তাই এখন কেহ আর উহার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন না এবং

* প্রত্যক্ষমনুমানং চ ব্যতিক্রম্য ব্যবস্থিতাঃ।
রক্ষঃ-পিতৃ-পিশাচানাং কর্ম্মাত্মা এব সিদ্ধয়ঃ॥ ১।৩৬

* জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্॥ ৭।২৯

† সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ॥ ৭।৩০

‡ ধর্ম ও ধর্ম্ম, কর্ম ও কর্ম্ম ইত্যাদিতে কি পার্থক্য, তাহা গত চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত 'ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষিগণের কথা' প্রবন্ধের ৪৪০ ও ৪৪১ পৃষ্ঠায় বিশদ ভাবে লিখিত হইয়াছে।

§ বেদাদি গ্রন্থের কোন্ খানির কি বক্তব্য এবং তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ কি, তাহা বঙ্গশ্রীর গত চৈত্র সংখ্যার ৫৯৮ পৃষ্ঠা হইতে ৬০০ পৃষ্ঠায় 'বেদ ও মহাভারতের সম্বন্ধ এবং একটি মহামহোপাধ্যায় উপাধিকারী পণ্ডিতের সংস্কৃত-ভাষাজ্ঞানের দৃষ্টান্ত'-শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখা হইয়াছে। আমরা তাহা পাঠকদিগকে পড়িতে অনুরোধ করি।

কেহ ঐ সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়নও করেন না। ভাষা না জানা থাকায়, প্রত্যেকখানি গ্রন্থ এত রসহীন ও জটিল হইয়া পড়িয়াছে যে, কাহারও সমগ্র জীবনে দুই তিন খানি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া তাহা মনে রাখা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়কে আমরা তবু স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য জীবনের উদ্দেশ্য সফল করিবার সহায়ক বটে, কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং জীবনের উদ্দেশ্য এক কথা নহে। "উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে" দেওয়াই কি বর্ত্তমান পাণ্ডিত্যের লক্ষণ ?

আবার বলি, আমাদের মতে সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় বর্ত্তমান বাঙ্গালার সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ পণ্ডিত। হয় ত আমাদের এই মন্তব্যে কেহ কেহ অসন্তুষ্ট হইবেন, কিন্তু যুক্তি-সঙ্গতভাবে বিচার করিলে আমাদের সহিত একমত অবলম্বন করিতে প্রত্যেকে বাধ্য। বর্ত্তমান কালে বাঙ্গালায় এমন অনেক পণ্ডিত আছেন, যাঁহারা এ গ্রন্থে এক 'ঠোক্কর', ও গ্রন্থে আর এক 'ঠোক্কর' প্রদান করিয়া, অথচ কোন গ্রন্থ সম্পূর্ণভাবে চিন্তা করিয়া না পড়িয়া জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিতে পারেন যে, তাঁহারা অনেক গ্রন্থ পড়িয়াছেন এবং খুব বড় পণ্ডিত। আমরা যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে বলিতে হয় যে, এই মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ বেদান্ত-শাস্ত্র এবং উপনিষদ্ জানেন, তাহা যুক্তিসঙ্গতভাবে বলা যায় না বটে, কিন্তু তিনি যে বেদান্তের ও কয়েকখানি উপনিষদের শাঙ্করভাষ্য চিন্তা করিয়া পড়িয়াছেন এবং তিনি যে অসাধারণ বুদ্ধিমান্ (সংস্কারাপন্ন বুদ্ধিমান্ বটে, কিন্তু কু-বুদ্ধিমান্ নহেন), তাহা বলিতেই হইবে।

অথচ, উপরে যেরূপভাবে বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার কয়েকটি কথার অযৌক্তিকতা দেখান হইল, সেইরূপভাবে বিশ্লেষণ করিলে তাঁহার প্রত্যেক কথাটির ভ্রমাত্মকতা প্রমাণিত হইতে পারে।

প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আমরা এখানে তাহা করিব না। কাহারও আমাদের কথায় কোন সন্দেহ হইয়াছে বুঝিতে পারিলে ভবিষ্যতে আবার এই সম্বন্ধে লিখিব।

উপসংহারে আমরা বলিতে চাই যে, মানুষকে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি বর্ণে বিভক্ত করিয়া এবং যথাবিহিত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া ভারতীয় ঋষি একদিন মনুষ্য-সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ সুখ-সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহারই নাম ভারতীয় ঋষির "বর্ণ" ও "আশ্রম"। এখন আর সে বর্ণ ও আশ্রম কোথাও কার্য্যতঃ পরিদৃষ্ট হয় না। বর্ত্তমানকালে ভারতীয় তথাকথিত পণ্ডিতগণ যাহাকে হিন্দুর বর্ণাশ্রম বলিয়া থাকেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় ঋষির বর্ণ ও আশ্রম নহে, পরন্তু তাহা ভারতীয় ঋষির পরামর্শের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।

বর্ত্তমান হিন্দুর বর্ণাশ্রমই মানব-সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত ভারতীয় ঋষির বর্ণ ও আশ্রম মানব-সমাজে প্রবর্ত্তিত ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত সমস্ত মানুষের মধ্যে "মানবধর্ম্ম" বিদ্যমান ছিল এবং বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মের উদ্ভব হইতে পারে নাই। যেদিন হইতে মানব-সমাজে বর্ত্তমান হিন্দুর বর্ণাশ্রম স্থান পাইয়াছে, সেই দিন হইতে মানুষে মানুষে বিদ্বেষ, কলহ আরম্ভ হইয়াছে এবং ক্রমশঃ বৌদ্ধাদি ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়া, আমাদিগকে খণ্ডিত বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিয়াছে এবং আজ জগতের সর্ব্বত্র সমস্ত স্তরের মানুষের মধ্যে অকালমৃত্যু, অকালবার্দ্ধক্য, অসন্তুষ্টি, অশান্তি, পরমুখাপেক্ষিতা এবং অন্নবস্ত্রের অভাব দেখা দিয়াছে।

মানুষকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করিবার, অর্থাৎ প্রত্যেকে যাহাতে অকালমৃত্যু প্রভৃতি ছয়টির প্রত্যেকটি দুঃখের হাত এড়াইতে পারে, তাহার উপায় কি, তাহা জগতের আর কোন জাতি কোন দিন দেখাইতে পারে নাই। জগতে যে সমস্ত পণ্ডিত বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ আমাদের কথার অন্যথা প্রমাণিত করিতে সমর্থ হইবেন না। লেনিন, কার্ল মার্কস্, হেনরি জর্জ্জ এবং টলষ্টয় বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চিন্তাশীল ব্যক্তি। মানুষকে কি উপায়ে সর্ব্বতোভাবে সুখী করিতে পারা যায়, তাহার চিন্তা তাঁহারা করিয়াছেন বটে, কিন্তু উপায়ের সন্ধান পাওয়া ত' দূরের কথা, কি কি পাইলে মানুষ সর্ব্বতোভাবে সুখী হইয়াছে বুঝিতে হয়, তাহার সংজ্ঞা পর্য্যন্ত তাঁহারা স্থির করিতে পারেন নাই। অনেকে মুসোলিনী, হিটলার প্রভৃতি শারীরিক বলে বিশ্বাসী মানুষগুলিকে প্রকাণ্ড এক একটা মানুষ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু ভবিষ্যৎ ইতিহাস তাহার অন্যথা প্রমাণ করিবে বলিয়া আমাদের মনে হয়। আমাদের

মতে মুসোলিনী ও হিটলার প্রভৃতিকে চিন্তাশীল মানুষের মধ্যেই ধরা যায় না।

মানুষকে কি করিয়া সর্ব্বতোভাবে সুখী করিতে হয়, তাহা একমাত্র ভারতীয় ঋষিগণ কার্য্যতঃ দেখাইতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট বর্ণবিভাগ ও আশ্রমই ছিল মানুষকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করিবার প্রথম সোপান।

মানুষ আবার যাহাতে অকালমৃত্যু; অকালবার্দ্ধক্য, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, পরমুখাপেক্ষিতা এবং অন্নবস্ত্রাভাবের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে, তাহা করিতে হইলে, আবার সেই ঋষি-নির্দ্দিষ্ট বর্ণ-বিভাগ ও আশ্রম মনুষ্য-সমাজে প্রবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন হইবে বটে, কিন্তু এখন মানুষ যেরূপ অন্নবস্ত্রের অভাবে জর্জ্জরিত, তাহাতে যতদিন পর্য্যন্ত তাহাদের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের কোন উচ্চশিক্ষায় অভিনিবিষ্ট হওয়া সম্ভব নহে।

উচ্চশিক্ষা পাইতে ইচ্ছা হয় কি না, তাহা প্রত্যেকে স্ব স্ব বুকে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করুন। বুঝিতে পারিবেন যে, সকলেরই সে ইচ্ছা আছে। কিন্তু, অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, ভোর হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অনন্যমনা হইয়া কার্য্য করিলেও, অনেকের পক্ষেই পুত্রকন্যাকে দুই বেলা পেট ভরিয়া দুইটি খাওয়াইবার মত উপার্জ্জন করা সম্ভব হয় না।

যখন এতাদৃশ অবস্থা, তখন মানুষ উচ্চশিক্ষা লইবার সময় পাইবে কখন? আর, যাহাদের মস্তিষ্ককে সর্ব্বদা অন্ন-বস্ত্রাদির অভাবের চিন্তায় আচ্ছন্ন রাখিতে হয়, তাহাদের পক্ষে প্রকৃত উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করিবার চিন্তাশীলতা অর্জ্জন করা সম্ভব হইবে কি করিয়া?

কাযেই যতদিন পর্য্যন্ত দেশে মানুষের অন্নবস্ত্র-সংস্থানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত অন্য কোন বিষয়ের কথা বলিলে আত্ম-প্রচার (self-advertisement) করিবার সুবিধা হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে জনসাধারণের কোন উপকার সাধিত হইবে না।

কি করিলে দেশের মধ্যে অন্ন-বস্ত্রসংস্থানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে, আমরা "ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়"-শীর্ষক প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিতেছি।

মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় এবং তাঁহার সহচরবর্গকে আমরা অনুরোধ করিতে চাই যে, গীতার ২য় অধ্যায়ের ৬৪ম শ্লোক* এবং অত্রিসংহিতার ৩৪১শ শ্লোক† স্মরণ করিয়া, দেশের মধ্যে দ্বেষ ও ভেদের উদ্ভবকর কার্য্য হইতে বিরত হউন।

* রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥

† ভেদকারী ভবেচ্চৈব বহুপীড়াকরোঽপি বা।
হীনাতিরিক্তগাত্রো বা তমসাপনয়েত্তথা॥

সমাজ-তান্ত্রিকতা, ধনিকতা ও আনন্দ-বাজার পত্রিকা

কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট পণ্ডিত জওহরলাল ফতোয়া জারী করিয়াছেন যে, ভারতবাসিগণের সর্ব্ববিধ দুঃখের অবসান করিতে হইলে, "সোস্যালিজ্‌ম" গ্রহণ করিতেই হইবে। তাঁহার মতে উহাই একমাত্র অমোঘ ও অকৃত্রিম ঔষধ। ইহা ছাড়া তিনি আরও বলিয়াছেন যে, স্বাধীনতা লাভ না করিতে পারিলে দেশের কোন দুঃখেরই অবসান হইবে না। কাযেই জওহরলালজীর কথার মূল্য কতখানি, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমতঃ, কোন দেশে সমাজ-তন্ত্রবাদ গৃহীত হইলে সেই দেশবাসীর দুঃখের অবসান হইতে পারে কি না, দ্বিতীয়তঃ, সমাজ-তান্ত্রিকতা ভারতীয় কংগ্রেসের কার্য্যতালিকা-ভুক্ত হইলে ভারতবাসীর স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব কি না, তাহা বিচার করিতে হইবে।

কোন দেশে সমাজ-তন্ত্রবাদ গৃহীত হইলে, সেই দেশ-বাসীর দুঃখের অবসান হইতে পারে কি না, তাহার বিচার করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম সমাজ-তন্ত্রবাদের স্রষ্টাগণ সমাজ-তন্ত্রবাদ নামে কি কি কথা প্রচার করিয়া থাকেন, তাহা ভাল করিয়া জানিতে হইবে এবং বুঝিতে হইবে।

জগতে "সোস্যালিজ্‌ম" কথাটি ঠিক ঠিক কবে সর্ব্বপ্রথম

প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছে, তাহা কেহ ঠিক ভাবে বলিতে পারে না। ইহার পুস্তকগত ব্যবহার সর্ব্বপ্রথম সেণ্ট-সাইমনের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। সেণ্ট-সাইমনের জীবনকাল ছিল ইংরাজী ১৭৬০ হইতে ১৮২৫ সাল পর্য্যন্ত। কাজেই বলিতে হইবে, "সোস্যালিজ্‌ম" খুব প্রাচীন না হইলেও প্রায় দেড়শত বৎসর হইতে জগতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এই সোস্যালিজ্‌ম যাঁহারা প্রথম প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের গ্রন্থ পড়িলে দেখা যাইবে যে, কোন গভর্ণমেণ্ট যাহাতে কোন রাজা দ্বারা পরিচালিত না হইয়া সর্ব্বসাধারণের দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহা প্রচার করাই ছিল এই বাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

"সোস্যালিজ্‌ম" প্রচার করা যাঁহারা জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে Fourier, Robert Owen, Karl Marx, Kingsley, H. M. Hyndman, G. B. Shaw, H. G. Wells, J. Ramsay Macdonald, Sidney Webb, Lenin এবং Trotsky-র নাম সর্ব্বপ্রধান। মূল "সোস্যালিজ্‌ম"-বাদের সহিত Lenin এবং Trotsky-র কথা কতকাংশে বিভিন্ন হইয়া পড়ায় তাহা Bolshevism-বাদ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। Communism, Fascism, Nazism প্রভৃতি পরবর্ত্তী বাদসমূহও মূলতঃ "সোস্যালিজ্‌ম" হইতে উদ্ভূত। এই উক্তি যে যথাযথ, প্রয়োজন হইলে তাহা আমরা প্রমাণিত করিব।

এইখানে পাঠকদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ১৫০ বৎসরের মধ্যেই এক "সোস্যালিজ্‌ম" হইতে বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে এবং প্রত্যেক দলের পরস্পরের মধ্যে মত-পার্থক্য এবং তাহা লইয়া সর্ব্বদাই রেষারেষি হইয়া থাকে।

নির্ভুল এবং সুচিন্তিত কথায় মানুষে মানুষে মতবিরোধ থাকে না; আর যখন কথার মধ্যে ভ্রান্তি ও অদূরদর্শিতা থাকে, তখনই তাহা লইয়া মত-পার্থক্যের (difference of opinion) উদ্ভব হয়—এই সত্যকে যাঁহারা বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাঁহারা, "সোস্যালিজ্‌ম" হইতে যে-সমস্ত দলাদলির উদ্ভব হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিলেই, জনসাধারণের হিত-সাধন পক্ষে ইহার মূল্য কতখানি, তাহার কথঞ্চিৎ ধারণা করিতে পারিবেন।

এক্ষণে দেখা যাউক যে, "সোস্যালিজ্‌ম" নামে কি কি কথা প্রচারিত হইয়া থাকে।

সেণ্ট-সাইমন এবং রবার্ট ওয়েন প্রভৃতি যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য "সোস্যালিজ্‌ম"-বাদিগণের নাম ইহার আগে প্রকাশ করা হইয়াছে, তাঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই তাঁহাদের মতবাদ সম্বন্ধে একাধিক গ্রন্থ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ঐ সমস্ত গ্রন্থ বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রত্যেকখানি বাস্তবতার বিরোধী কথায় পরিপূর্ণ এবং একই "সোস্যালিজ্‌ম"-বাদের অনুচর দুইজন সর্ব্বতোভাবে একমত পোষণ করেন নাই। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে, পরবর্ত্তী গ্রন্থকার, পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারের মতবাদের পুষ্টি-সাধন (development) করিয়াছেন। তাহা কতকাংশে সত্য হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু যদি দেখা যায় যে, একজন আর একজনের মতবাদের পুষ্টিসাধন করিতে বসিয়া, ঐ মতবাদ হইতে বিভিন্ন মতবাদে পৌছিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা হইলে কি উহাঁদের ঐক্য নষ্ট হইয়া যায় না? এবং, তখন কি বলা যায় না যে, দুইজন সর্ব্বতোভাবে একমত পোষণ করেন নাই? তাহা হইলে কি বলা যায় না যে, "সোস্যালিজ্‌ম" একটা কথার কথা মাত্র এবং ঐ বাদের প্রধান প্রধান অনুচরগণের মধ্যে পর্য্যন্ত ঐক্য নাই?

"সোস্যালিজ্‌ম"-বাদিগণের উপরোক্ত মতানৈক্য বাদ দিয়া, "সোস্যলিজ্‌ম"-বাদ নামে কি কি কথা প্রচারিত হইয়া থাকে, তাহা সংক্ষেপতঃ বর্ণনা করিতে হইলে বলিতে হয় যে, সোস্যালিজ্‌মের তিনটি দিক্ আছে; প্রথম সমাজ-সম্বন্ধীয়, দ্বিতীয়টি অর্থনীতি-সম্বন্ধীয় এবং তৃতীয়টি রাজনীতি-সম্বন্ধীয়।

"সোস্যালিজ্‌ম"-বাদিগণের উদ্দেশ্য যে জনসাধারণকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মানুষের সমতার (human equality) উপর সমাজ বন্ধন করা "সোস্যালিজ্‌ম"-বাদিগণের সামাজিক উদ্দেশ্য।

যাহাতে কোন মানুষের ব্যক্তিগত (private and individual) কোনরূপ সম্পত্তি না থাকে এবং যিনি যাহা উপার্জ্জন করেন, তাহা যাহাতে একস্থানে সঞ্চিত হইয়া বিভিন্ন মানুষের প্রয়োজনানুসারে বণ্টিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা, "সোস্যালিজ্‌ম"-বাদিগণের অর্থনৈতিক (economic) উদ্দেশ্য।

প্লেটো ও টমাস্ মুরের যে রাজনীতিবাদ আছে এবং যাহাকে প্রধানতঃ ভিত্তি করিয়া জগতের বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট সমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা হইতে "সোস্তালিজ্‌ম্"-বাদিগণের রাজনীতি-সম্বন্ধীয় মতবাদের পার্থক্য যে কোথায়, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। মোটের উপর, যাহাতে কোন দেশে "রাজা" না থাকেন এবং দেশ সর্ব্ব-সাধারণের সভার দ্বারা পরিচালিত হয়, প্রধানতঃ তাহার ব্যবস্থা করাই "সোস্তালিজ্‌ম্"-বাদিগণের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য।

উপরোক্ত তিনটি উদ্দেশ্য যুক্তিসঙ্গত কি না এবং তাহা জনসাধারণের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব কি না, আমরা এক্ষণে তাহার বিচার করিব।

আমরা আগেই বলিয়াছি, জনসাধারণকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করা যে, সোস্তালিষ্ট্‌গণের প্রধান উদ্দেশ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কাযেই, আমাদিগকে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে, মানুষকে সর্ব্ববিধভাবে সুখী করিতে হইলে, যে সকল উপায় অবলম্বন করা উচিত, সোস্তালিষ্টগণ তাঁহাদের সমাজ, অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রনীতি-বন্ধনের কল্পনায় সেই সেই উপায় সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন কি না এবং দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে যে, যে সকল উপায় গ্রহণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা জনসাধারণকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করা যায় কি না।

এই খানে পাঠকদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যাহা প্রকৃতির নিয়মসম্মত, তাহা গ্রহণ করিলে মানুষ সুখী হইতে পারে, আর যাহা প্রকৃতিবিরুদ্ধ, তাহা গ্রহণ করিলে মানুষকে সংসারক্ষেত্রে সর্ব্বদা বিধ্বস্ত হইতে হয়। এই সার্ব্বভৌমিক সত্যটি প্রমাণ করিবার প্রয়োজন আমরা অনুভব করি না। তাহা করিতে বসিলে অযথা প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি পাইবে। আশা করি, পাঠকগণ স্বতঃই ইহা গ্রহণ করিবেন।

সংসারক্ষেত্রে জনসাধারণকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করা কাহারও নীতির উদ্দেশ্য হইলে, যুক্তিসঙ্গত ভাবে প্রথমতঃ, মানুষের কোন্ অবস্থাটিকে সুখের অবস্থা বলা যাইতে পারে, দ্বিতীয়তঃ, কি কি উপায় অবলম্বন করিলে জনসাধারণের পক্ষে ঐ সুখের অবস্থা অর্জ্জন করা সম্ভব, তাহা দেখা যে একান্ত প্রয়োজনীয়, ইহাও বুদ্ধিমান্ পাঠকগণ স্বীকার করিতে বাধ্য। এই দুইটি বিষয় বিশদভাবে বিচার করিয়া না লইয়া কোন নীতি প্রবর্ত্তন করিলে তাহাতে মানবহিতৈষী বলিয়া আত্ম-প্রচার করা সম্ভব হইতে পারে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ জনসাধারণের কোন হিতসাধন করা হয় না এবং এবংবিধ নীতিকে হাওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত ও বৃথা হৈ-চৈ বলা যাইতে পারে।

বড় বড় সোস্তালিষ্ট্‌গণের, এমন কি কার্ল্‌ মার্কস, লেনিন প্রভৃতির যাবতীয় গ্রন্থ মনোযোগসহকারে অধ্যয়ন করিলে দেখা যাইবে যে, জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ দূর করা যে তাঁহাদের উদ্দেশ্য, তাহা তাঁহাদের প্রত্যেক গ্রন্থেই ফুটিয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু কি উপায়ে জনসাধারণের বিবিধ অভাব-অভিযোগ দূর হইতে পারে, তাহার আলোচনা ত' দূরের কথা, মানুষের কোন্ অবস্থাকে জনসাধারণের অভাব-অভিযোগাতীত অবস্থা বলা যাইতে পারে, তাহার বিচার পর্য্যন্ত কোন সোস্তালিষ্টের কোন গ্রন্থে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। কার্ল মার্কস্ পর্য্যন্ত কতকগুলি গুরু-গম্ভীর (high sounding) কথা জগৎকে শুনাইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রধান বিচার্য্য (main issue) কি এবং ঐ প্রধান বিচার্য্যের (main issue) সহিত তাঁহার কথাগুলির সম্বন্ধ (relevancy) কি, তাহা কোথাও আলোচনা করেন নাই এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কার্ল মার্কসের কথায় চিন্তাশীলতার পরিচয় পাইবেন বটে, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থে কুত্রাপি প্রকৃত পক্ষে যাহাতে জনসাধারণের হিতসাধন করা সম্ভব হয়, তদুচিত সম্বন্ধবিশিষ্ট (relevant) কোন কথা খুঁজিয়া পাইবেন না।

কাযেই, সমগ্র "সোস্তালিজ্‌ম্"কে মানব-হিতৈষণার একটি অভিনয় (dramatic performance) বলা যাইতে পারে এবং বস্তুতঃ ইহা হাওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বৃথা হৈ-চৈ মাত্র।

সমাজ, অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রনীতি-সম্বন্ধীয় যে তিনটি উদ্দেশ্য অথবা প্রস্তাব সোস্তালিষ্ট্‌গণ জগতের সমক্ষে প্রচার করিতেছেন, উহা জনসাধারণের পক্ষে হিতকর কি না এবং উহা তাহাদের গ্রহণ করা সম্ভব কি না, তাহার বিচার করিতে হইলে ঐ প্রস্তাব তিনটি স্বভাবসম্মত কি না, প্রথমতঃ তাহার বিচার করিতে হইবে এবং পরে দেখিতে হইবে যে, উহা গ্রহণ করিলে জনসাধারণের পক্ষে কি হিত অথবা কি অহিত সাধিত হইতে পারে।

আগেই বলিয়াছি যে, সোস্তালিষ্ট্‌গণের সামাজিক প্রস্তাব – মানুষের সমতার উপর সমাজ গঠন করা।

"মানুষের সমতা"—ইহা কি একটি কাল্পনিক বস্তু নহে? বাস্তব জগতে ইহা কোথাও দেখা যায় কি? দুইটি মানুষ সর্ব্বতোভাবে সমান হয় কি? যে যে বিবিধ অঙ্গ লইয়া এক একটি মানুষের গঠন, সেই বিবিধ অঙ্গসমূহ সর্ব্বতোভাবে সমান হয় কি? পা আর মাথা সমান কি? হাত আর পা সমান কি? হাতের আঙ্গুল ও পায়ের আঙ্গুল সমান কি?

কাযেই, যুক্তিসঙ্গত ভাবে বলিতে পারা যায় যে, দুইটি মানুষের সর্ব্বতোভাবে সমান হওয়া প্রকৃতিসম্মত নহে।

অবশ্য, দুইটি মানুষের সর্ব্বতোভাবে সমান হওয়া প্রকৃতির নিয়মসম্মত নহে বটে, কিন্তু প্রত্যেক মানুষের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও প্রত্যেক অঙ্গের যেমন প্রয়োজন আছে, সেইরূপ দুইটি মানুষ সর্ব্বতোভাবে সমান না হইলেও সমাজ-গঠনে প্রত্যেক মানুষেরই প্রয়োজন আছে। ইহা ছাড়া, দুইটি মানুষ সর্ব্বতোভাবে সমান না হইলেও, সমস্ত মানুষের মধ্যে মৌলিক সমতা রহিয়াছে, কারণ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্যোম, বায়ু, অম্বু এবং বহ্নির প্রক্রিয়া রহিয়াছে; এবং প্রত্যেকের শরীরেই মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত, চর্ম্ম ও লোমকূপ রহিয়াছে*; এবং সকল মানুষের জন্ম, বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়তা, বার্দ্ধক্য এবং মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এই সমতায় হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, অথবা ভারতীয়, ইংরেজ, জার্ম্মাণ প্রভৃতির বিচার নাই। এই মৌলিক সমতা আছে বলিয়াই মানুষ যে মানুষকে ঘৃণা করে, তাহা প্রকৃতি-সম্মত নহে। কাযেই, দুইটি মানুষ সর্ব্বতোভাবে সমান না হইলেও, সমাজ-গঠনে প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজন আছে এবং কোন মানুষ বিধিসঙ্গত ভাবে অপর কোন মানুষের উপর কোনরূপ বিদ্বেষ অথবা ঘৃণা পোষণ করিতে পারে না।

আমাদের পাঠকগণের মধ্যে কেহ যদি মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায় যথাযথ অর্থে অধ্যয়ন করিতে পারেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, উপরোক্ত সত্যের উপর ভারতীয় ঋষি একদিন মানবসমাজ গঠিত করিয়া মানবধর্ম্মের রচনা করিয়াছিলেন। আজ তথাকথিত ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতগণের প্রকৃত শাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং নির্ব্বুদ্ধিতার ফলে ভারতীয় ঋষির সেই সমাজ-বন্ধন ও মানবধর্ম্ম নষ্ট হইয়া গিয়া বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট, মুসলমান প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে বটে, কিন্তু বৈদিক ঋষি-রচিত ভারতীয় সমাজের এখনও যে ধ্বংসাবশেষ আছে, একটু চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, ঐ সত্যের উপরই এই হতভাগ্য সমাজ রচিত হইয়াছিল।

উপরোক্ত সত্যকে উপেক্ষা করিয়া কোন শৃঙ্খলিত সমাজ গঠন করা সম্ভব নহে।

বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্ত্য দেশে এবং তাহাদের অনুকরণে আমাদের দেশে যে সমাজ গঠন করিবার চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে উপরোক্ত সত্যকে অবহেলা করিয়া ধনিকগণ দরিদ্র-দিগকে ঘৃণা করিয়া থাকেন, তথাকথিত শিক্ষিতগণ তথাকথিত অশিক্ষিতগণকে ঘৃণা করিয়া থাকেন, অফিসারগণ (officers) সব-অর্ডিনেট এবং কেরাণীগণকে (sub-ordinates and clerks) ঘৃণা করিয়া থাকেন। ফলে, সমাজের সর্ব্বত্রই রেষারেষি, দ্বন্দ্ব এবং কলহ উপস্থিত হইয়াছে এবং মূল সমস্যা সকলের নিকট উপেক্ষিত হইতেছে।

মধ্য-সময়ে ভারতবর্ষে এবং অন্যান্য দেশে উপরোক্ত সত্যকে অবহেলা করিয়া তথাকথিত উচ্চজাতির (ব্রাহ্মণ প্রভৃতি) মানুষগণ তথাকথিত নিম্নজাতির মানুষগণকে অস্পৃশ্য মনে করিয়া তাহাদিগকে ঘৃণা করিতেন, গোত্র ও বংশমর্য্যাদার অজুহাতে তথাকথিত উচ্চগোত্রীয়গণ তথাকথিত নিম্ন-গোত্রীয়গণকে উপেক্ষার চক্ষুতে দেখিতেন, জমীদারগণ প্রজাগণের প্রতি অসম্মানজনক ব্যবহার করিতেন। তাহার ফলে, সমাজ-বন্ধন শ্লথ হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে।

সোস্যালিষ্ট্‌গণ যে সকলকে সমান করিয়া মুড়ি-মুড়কী এক করিবার কথা বলিয়া থাকেন, তাহা কার্য্যতঃ সম্ভব নহে। তাঁহারা মনে করিতে পারেন যে, তাহা সম্ভব; কিন্তু তাঁহারাই যখন বলিতেছেন যে, একটা সোস্যালিষ্ট্-গভর্ণমেণ্ট রাখিতে হইবে এবং সকলের উপার্জ্জন একস্থানে সঞ্চিত করিয়া প্রত্যেকের প্রয়োজনানুসারে তাহা সকলের মধ্যে বণ্টন করিতে হইবে, তখনই যে তাঁহারা মানুষের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর কার্য্যের কথা বলিতেছেন এবং তাহাতে যে এক শ্রেণীর লোকের আদেশকর্ত্তা ও অপর শ্রেণীর লোকের আদেশ-পালনকারী হওয়া অবশ্যম্ভাবী, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন না। ইহার নাম কি আত্মপ্রতারণা নহে?

* এই সকল বিষয় "ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষিগণের কথা"-শীর্ষক প্রবন্ধে গত চৈত্র সংখ্যা হইতে আলোচিত হইতেছে।

মস্তিষ্ক যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে পরিচালনা করিয়া থাকে, সেইরূপ সমাজের মধ্যে যাঁহারা মস্তিষ্কবান্, তাঁহারাই অপেক্ষাকৃত অল্পবুদ্ধি মানুষগণ যাহাতে বিপন্ন না হন, তাহার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। সমাজের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত মস্তিষ্কবান্, তাঁহারা মানুষের পরস্পরের সম্বন্ধ-বিষয়ক উপরোক্ত সত্যকে উপলব্ধি করিয়া কাহাকেও ঘৃণা করেন না এবং কাহারও নিকট হইতে সম্মানের দাবী করেন না বটে, কিন্তু যাঁহারা অপেক্ষাকৃত অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন এবং যাঁহারা প্রকৃত মস্তিষ্কবান্ লোকের দ্বারা উপকৃত হইয়া থাকেন, তাঁহারা যদি কৃতজ্ঞতার ভাব পোষণ না করেন এবং উপকারকদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা না দেখান, তাহা হইলে সমাজের পুষ্টি সাধিত হওয়া কোন-ক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, সমাজে একজন আর একজনকে বড় বলিয়া মান্য করিতে বাধ্য হইলেও যিনি প্রকৃত-পক্ষে বড় তাঁহার পক্ষে কাহাকেও ছোট বলিয়া অবজ্ঞা করা সঙ্গত নহে।

কাযেই, সোস্থালিষ্টগণের সমাজ-বন্ধন-বিষয়ে সমতার কথাকে "সোনার পাথরের বাটী" বলা যাইতে পারে এবং তাহা অদূরদর্শিতা ও অল্প-বুদ্ধির পরিচায়ক।

সকলেই পরিজ্ঞাত আছেন যে, রুশীয়গণ লেনিনের "বল্‌শেভিজ্‌ম"-নীতি অবলম্বন করিয়া সমাজগঠনে উপরোক্ত সমতার নীতি প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই নীতি যে সফল হয় নাই, তাহা যাঁহারা রুশিয়ার বর্ত্তমান অবস্থা যথাযথভাবে পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহারা স্বীকার করিতে বাধ্য। সমাজ-গঠনে সোস্থালিষ্টগণের সমতার নীতি যে প্রয়োগোপযোগী নহে, তাহার উদাহরণ রুশিয়া।

যাহাতে মানুষের ব্যক্তিগত (private and individual) কোন রকম সম্পত্তি না থাকে এবং যিনি যাহা উপার্জ্জন করিবেন, তাহা যাহাতে একস্থানে সঞ্চিত হইয়া বিভিন্ন মানুষের প্রয়োজনানুসারে বণ্টিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা—সোস্থালিষ্টগণের অর্থনৈতিক প্রস্তাব, ইহা আমরা আগেই উল্লেখ করিয়াছি

দেশকে আর্থিক সম্পদে সম্পন্ন করিতে হইলে ধনের (wealth) একান্ত প্রয়োজন, তাহা বলাই বাহুল্য। কাযেই, দেশের প্রত্যেকে যাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ধন উপার্জ্জন করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা অপরিহার্য্য। দেশের প্রত্যেককে উপার্জ্জনশীল করিতে হইলে যে যতটুকু উপার্জ্জন করিতে পারিবে, তাহার ততটুকু লাভ যাহাতে হয়, তাহার ব্যবস্থাও অপরিহার্য্য। কারণ, দেশের সকলেই কোন সময়ে একরূপ উপার্জ্জনশীল হইতে পারে না। মানুষের মধ্যে বুদ্ধি ও উপার্জ্জন-ক্ষমতার ইতর-বিশেষ অবশ্যম্ভাবী। একজনের উপার্জ্জনের ক্ষমতানুসারে তাহার উপার্জ্জন হইবে হয়ত ২০০৲, অথচ প্রয়োজনানুসারে বণ্টনের হারে তাহার মিলিয়াছে মাত্র ৫০৲; আর একজনের উপার্জ্জনের ক্ষমতানুসারে তাহার উপার্জ্জন হইয়াছে হয় ত ১০০৲, অথচ প্রয়োজনানুসারে বণ্টনের হারে তাহার মিলিয়াছে ১৫০৲। এতাদৃশ অবস্থার উদ্ভব হইলে, যিনি বেশী উপার্জ্জনক্ষম, তিনি কেন তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তিকে বিরত করিবেন, আর যিনি কম উপার্জ্জনক্ষম, তিনিই বা কেন উপার্জ্জন-ক্ষমতা বাড়াইবার জন্য বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করিবেন—এবংবিধ প্রশ্ন স্ব স্ব মনের মধ্যে জাগ্রত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ফলে, সেই দেশের মানুষের অল্পবুদ্ধি হইয়া পড়া এবং তাহাদের জাতীয় আর্থিক অবস্থা হীন হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

অনেকে হয়ত মনে করেন যে, রুশিয়ার আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে। কিন্তু, বস্তুতঃ তাহা যে হয় নাই, তাহা আমরা বঙ্গশ্রীর গত বৈশাখ সংখ্যার ৫৯৩ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছি।

আমাদের উপরোক্ত যুক্তি অনুসরণ করিলে বুঝা যাইবে যে, মানুষ যাহাতে স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে উপার্জ্জন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা না করিয়া সকলের উপার্জ্জন একস্থানে সঞ্চিত করিলে এবং বিভিন্ন মানুষের প্রয়োজনানুসারে তাহার বণ্টনের ব্যবস্থা করিলে, কোন দেশের জাতীয় অবস্থার আর্থিক উন্নতি হইতে পারে না।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে মানুষ যাহাতে স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে উপার্জ্জন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ঐ সকল দেশের মধ্যে অসন্তুষ্টির ও অস্বচ্ছলতার উদ্ভব হয় কেন?

পাঠকবর্গ "ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়"-শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলে ইহার উত্তর পাইবেন। দেশে যতদিন জুয়া এবং চাকুরী-বাকুরী-প্রদানে পক্ষপাতিত্ব (nepotism) থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত মানুষের উপার্জ্জন-ক্ষমতানুসারে তাহার উপার্জ্জনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে না।

একদিন ছিল, যখন জগতের প্রত্যেক দেশে জুয়া ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত এবং সমস্ত দেশেই উহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু, এখন আর সে দিন নাই। প্রত্যেক দেশে এখন ঘোড়দৌড়ের মাঠে জুয়া, শেয়ার-মার্কেটে জুয়া, ব্যবসা-বাণিজ্যের বেচা-কেনায় জুয়া, এক্সচেঞ্জ-মার্কেটে জুয়া, আমদানীতে জুয়া, রপ্তানীতে জুয়া, আন্তর্জ্জাতিক (international) টাকা-পয়সার আদান-প্রদানে জুয়া। কোথায় যে জুয়া নাই, তাহা এখন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

জুয়ার অনেক দোষ। একে ত' কোন উপযুক্ততা (efficiency) অর্জ্জন না করিয়া হঠাৎ বড়-মানুষ হওয়া যায়, তাহার পর আবার অনুপযুক্ত লোকের হাতে টাকা পড়িলে, তাহার সদ্ব্যবহার কখনও হয় না এবং সমাজে নানারূপ অসৎ দৃষ্টান্তের উদ্ভব হইয়া থাকে।

এখন জগতের সর্ব্বত্রই চাকুরীর আদান-প্রদান ও উপযুক্ততার (efficiency) প্রতি সম্যক্ দৃষ্টি-পাত করা হয় হয় না। কখনও বা আত্মীয়-স্বজন বলিয়া, কখনও বা বন্ধু বলিয়া, কখনও বা সাম্য, মৈত্রী, ভেদনীতির পরিপুষ্টিসাধনার্থ চাকুরীক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত পক্ষপাতিত্ব ঘটিয়া থাকে।

কাজেই, মানুষ যাহাতে ক্ষমতানুসারে উপার্জ্জন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা, এখন আর কোথাও নাই—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তাহা থাকিলে "সোস্যালিজ্‌ম"বাদ আসিতে পারিত না।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সোস্যালিষ্ট্‌গণের অর্থ নৈতিক প্রস্তাবও সমীচীন নহে এবং তদ্দ্বারা কোন দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হওয়াও সম্ভব নহে।

সোস্যালিষ্ট্‌গণের রাষ্ট্রীয় প্রস্তাব বহুলাংশে আধুনিক ডিমোক্রেটিক গভর্ণমেন্ট-সমূহের বিধি-ব্যবস্থার অনুরূপ।

আধুনিক ডিমোক্রেটিক গভর্ণমেন্ট-সমূহের নির্ব্বাচন-প্রণালীতে যে জনসাধারণের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহের উদ্ভব হয় এবং তাহাতে যে অনেক অনুপযুক্ত লোকেরও গভর্ণমেন্ট-পরিচালনার ভার পাওয়া সম্ভব হয়, তাহা আমরা এই বঙ্গশ্রীতে বহুবার আলোচনা করিয়াছি। তাহা আমরা পাঠকবর্গকে পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

গভর্ণমেন্ট-পরিচালনা যে সাধারণতঃ বুদ্ধিমান্ লোকের কার্য্য তাহা সম্ভবতঃ আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই স্বীকার করিবেন। জনসাধারণের মধ্যে অধিকাংশ লোকই সাধারণতঃ কি উপায়ে স্ব স্ব জীবিকার্জ্জন করা সম্ভব হইতে পারে তাহা পর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত নহেন। যাঁহারা কি উপায়ে, ব্যক্তিগতভাবে স্ব স্ব হিত সাধিত হইতে পারে, তাহাই পরিজ্ঞাত নহেন, তাঁহাদের পক্ষে, কে সমষ্টিগতভাবে লোকহিতকর কার্য্য করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন তাহা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব কি? অথচ, আধুনিক ডিমোক্রেটিক গভর্ণমেন্টের বিধি অনুসারে জনসাধারণকে দেশের মধ্যে কে গভর্ণমেন্ট-পরিচালনার ক্ষমতাসম্পন্ন তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া নির্ব্বাচনের (election) সময় ভোট প্রদান করিতে হয়। ইহার ফলে, দেশের মধ্যে বিবিধ ভাবের উৎকোচ আদান-প্রদানের প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং গভর্ণমেন্ট-পরিচালনার কোন ক্ষমতা অর্জ্জন না করিয়া কেবলমাত্র ধনবান্ হইতে পারিলেই, মানুষের পক্ষে গভর্ণমেন্টের একজন সভ্য হওয়া সম্ভব হয়।

আমাদের মতে যখন মনুষ্যজাতির মধ্যে কোন উচ্চতম শ্রেণীর বুদ্ধিমান্ লোক বিদ্যমান থাকেন, তখন আধুনিক ডিমোক্রেটিক গভর্ণমেন্টের কোন প্রস্তাব উত্থাপিত হইতে পারে না। যখন উচ্চতম শ্রেণীর বুদ্ধিমান লোকের অভাব হয় তখন যে বুদ্ধি হইলে একজন মানুষের পক্ষে জনসাধারণকে সন্তুষ্টভাবে পরিচালিত করা সম্ভব হয়, তাহার অভাববশতঃ, সকল মানুষে মিলিয়া-মিশিয়া কার্য্য করিবার অজুহাতে, অপেক্ষাকৃত চতুর লোকগণ প্রকৃতপক্ষে দেশের পরিচালনার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তাহাতে কোন গভর্ণমেন্ট সুচারুভাবে পরিচালিত হইতে পারে কি না তাহা বর্ত্তমান জগতের প্রত্যেক দেশের গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে যেরূপ অসন্তুষ্টি এবং অভিযোগ দেখা যায় তাহা পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। অবশ্য, যখন দেশের মধ্যে প্রকৃত বুদ্ধিমান্ লোকের অভাব হয় তখন আধুনিক ডিমোক্রেটিক গভর্ণমেন্ট অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে এবং তাহা যদিও সর্ব্বতোভাবে জনসাধারণের দুঃখমোচন করিতে অক্ষম হইয়া থাকে, তথাপি তাহাকে মন্দের ভাল বলিতে হইবে।

উপরে যাহা বলা হইল তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, জনসাধারণের সর্ব্বতোভাবে দুঃখ মোচন করাই সোস্যালিষ্ট্‌গণের

উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু কি উপায়ে জনসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্য-পূর্ণ অবস্থা সম্ভাবিত হইতে পারে তাহা জানা ত' দূরের কথা) কি অবস্থা হইলে জনসাধারণের দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত হইয়াছে বুঝিতে হইবে তাহা পর্য্যন্ত, তাঁহারা অবগত নহেন।

ইহা ছাড়া, আরও দেখা যাইতেছে যে, সোস্যালিষ্ট্‌গণের সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক অথবা রাষ্ট্রনৈতিক কোন প্রস্তাবই প্রায়শঃ প্রয়োগযোগ্য নহে; পরন্তু প্রত্যেকটিই জনসাধারণের পক্ষে অনিষ্টজনক।

এতাদৃশ সোস্যালিজ্‌মের কথা জগতে স্থান পায় কেন—ইহাই হইবে পরবর্ত্তী জিজ্ঞাস্য।

ইহার উত্তরে আমরা বলিব যে, সোস্যালিজ্‌মের কথা জগতে স্থান পাইয়াছে নিম্নলিখিত পাঁচটী কারণে:—

(১) মনুষ্য-জাতির অন্ন-বস্ত্রের অভাব;

(২) জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির হ্রাসবশতঃ শ্রমজীবী ও মধ্যবিত্তগণের লাভবান্ জীবিকাপন্থার অভাব;

(৩) কুশিক্ষাবশতঃ দরিদ্রগণের প্রতি ধনিকগণের কুব্যবহার;

(৪) উপার্জ্জনক্ষমতার তারতম্যানুসারে মানুষের উপার্জ্জন করিবার ব্যবস্থার অভাব;

(৫) জুয়ার দ্বারা উপার্জ্জনের ব্যবস্থা এবং চাকুরীক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব।

যতদিন পর্য্যন্ত জগতে মানুষের জীবিকার্জ্জনে কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই, ততদিন পর্য্যন্ত জগতের ইতিহাসে সোস্যালিজ্‌মের কোন কথা শোনা যায় নাই। যত দিন পর্য্যন্ত জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বিদ্যমান ছিল, তত দিন পর্য্যন্ত কৃষি কৃষকের পক্ষে লাভবান্ ছিল এবং প্রত্যেক স্তরের লোকই অল্পাধিক ক্লেশ সহ্য করিয়াও জীবিকার্জ্জন করিতে পারিত। কিন্তু, এখন জগতের প্রত্যেক দেশেই সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা নব্বইজন অনশন ও অর্দ্ধাশনে ক্লেশ পাইতেছে। কাযেই মানুষ দিগ্‌বিদিগ্‌-জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছে এবং অন্তঃসারশূন্য এই সোস্যালিজ্‌মের মত সোনার পাথরের বাটী লইয়াও মানুষ নাচানাচি করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

কিন্তু, যে মানুষগুলি ইহার নেতৃত্ব লইয়াছেন যুক্তিসঙ্গত ভাবে তাঁহাদিগকে কোনক্রমেই দূরদর্শী ও বুদ্ধিমান বলা চলে না।

ভারতীয় কংগ্রেসের কর্ম্মতালিকায় "সোস্যালিজ্‌ম" স্থান পাইলে ভারতবাসীর পক্ষে স্বাধীনতা লাভ করার আশা যে সুদূরপরাহত হইয়া যায় তাহাও আমরা ইতিপূর্ব্বে বঙ্গশ্রীর পৃষ্ঠায় আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি।

এক্ষণে পাঠকগণ বিচার করুন যে, জওহরলালজী কোন্ শ্রেণীর অমোঘ ঔষধ দেশবাসীকে বাতলাইতেছেন এবং তিনিই বা কোন্ শ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞ।

খাঁটি দেশীয় অথবা খাঁটি বিলাতীয় সব সময়েই ভাল, কিন্তু দু'য়ের ভাবগত বর্ণসাঙ্কর্য্য কোন সময়েই কাহারও পক্ষে ভাল নহে, ইহা আমাদের প্রচলিত কথা।

ভারতের বর্ত্তমান ভাগ্যাকাশের সম্রাট্ এই জওহরলালজী নিজেই তাঁহার আত্মচরিতে স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার ভাব ইংলণ্ডদেশীয় না ভারতীয় তাহা তিনি নিজেই বুঝিতে পারেন না। এক সঙ্গে জনসাধারণের দুঃখ মোচনের কথা, স্বাধীনতার কথা, আর সোস্যালিজ্‌মের কথা বলা, আমাদের মতে, সম্পূর্ণভাবে অন্তসারশূন্য পাশ্চাত্য ভাবের নিকট আত্ম-বিক্রয় করিয়া দেশীয় মনুষ্যত্বের অভিনয় করা। ইহা কোন খাঁটি মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। ভাবগত বর্ণসাঙ্কর্য্য বশতঃই মানুষ এইরূপ করিয়া থাকে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমাদের বাঙ্গালার আনন্দবাজার পত্রিকা এই সোস্যালিজ্‌ম লইয়া খুব মাতামাতি আরম্ভ করিয়াছেন। অমৃতবাজার পত্রিকা জওহরলালজীর বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন বলিয়া সম্পাদকীয় স্তম্ভে তাহাকে অনেক বিদ্রূপ করা হইয়াছে। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকগণের যুক্তিজ্ঞান যে কত বালকোচিত তাহা ঐ প্রবন্ধে পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রয়োজন হইলে আমরা পাঠক-বর্গকে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইব।

২৮শে জ্যৈষ্ঠের আনন্দবাজার পত্রিকায় "কংগ্রেস্ সমাজতন্ত্রবাদ"-শীর্ষক যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পড়িলে মনে হয়, দেশের ধনিকগণের জন্যই ভারতে স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব হইতেছে না। যাহাদের টাকা-পয়সা আছে তাহাদিগকে "ধনিক" বলা হইয়া থাকে। ধনিক-দিগকে বাদ দিয়া স্বাধীনতা লাভ করিবার চেষ্টার অপর নাম টাকা-পয়সার সাহায্য না লইয়া স্বাধীনতার আন্দোলন করা

টাকা-পয়সার সাহায্য ব্যতীত স্বাধীনতার আন্দোলন কিরূপ ভাবে হইবে তাহার প্ল্যানটী আনন্দবাজারের সম্পাদকগণ তাঁহাদের পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিবেন কি ?

আমাদের জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় যে, 'আনন্দবাজার পত্রিকা কি সত্য সত্যই স্কুল-বালক এবং অপরিণামদর্শী স্ফীত-মস্তিষ্ক ব্যক্তিদের একটী আড্ডা হইয়া দাঁড়াইয়াছে ?

আনন্দবাজার পত্রিকার পরিচালকগণ দরিদ্র বাঙ্গালীগণকে সংবাদ পত্র পড়িতে অভ্যস্ত করিয়াছেন। এই হিসাবে তাঁহারা বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতা-ভাজন। কিন্তু, তাঁহারা প্রকৃত রাজনীতি এবং অর্থনীতি কাহাকে বলে তাহা না বুঝিতে পারিয়া যেরূপ-ভাবে ইংরাজ-বিদ্বেষ, অসহযোগ, স্বাধীনতা, আইন-অমান্য, সাম্প্রদায়িকতা এবং সমাজতন্ত্রবাদ প্রচার করিয়া আসিতেছেন তাহাই বাঙ্গালা দেশের দলাদলি, অশান্তি এবং যুবকদিগের বর্ত্তমান বেকার অবস্থার অন্যতম প্রধান কারণ।

যে পাঠকবর্গ তাঁহাদের মেরুদণ্ড-স্বরূপ তাঁহাদের অর্থ-কৃচ্ছ্রতা ও বেকার অবস্থা এবং যে বিজ্ঞাপন-দাতাগণ তাঁহাদের স্তম্ভ-স্বরূপ তাঁহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে লোকসান, এই শ্রেণীর সংবাদপত্রের দুর্নীতি-বশতঃই ঘটিয়া থাকে। প্রয়োজন হইলে আমরা দেশবাসীকে ইহা বিশদ ভাবে বুঝাইব। আমরা আনন্দবাজার পত্রিকাকে এখনও সতর্ক হইতে অনুরোধ করি।

তাঁহাদের ভ্রান্তি যদি তাঁহারা নিজেরা বুঝিয়া লইয়া তদনুযায়ী তাঁহাদের সম্পাদকীয় মন্তব্যের পরিবর্ত্তন সাধন করেন এবং বাঙ্গালী জনসাধারণের সর্ব্বনাশ সাধন হইতে বিরত হন তাহা হইলে ভগবানের নিয়মানুসারে তাঁহাদের প্রাধান্য বজায় থাকিবে, নতুবা তাঁহাদের পতন অনিবার্য্য। কংগ্রেস যে তাহার নেতৃবর্গের স্ফীত-মস্তিষ্কতা এবং অপরিণামদর্শিতার জন্য বর্ত্তমান সময়ে অসার হইয়া পড়িয়াছে, তাহা অস্বীকার করা অন্ধতার পরিচায়ক। বাঙ্গালী যে পত্রিকাকে এখনও এত আদর দেখাইতেছে, সেই পত্রিকার সম্পাদকগণ কেন এই অন্ধতার পরিচয় দেন ?

আনন্দবাজর পত্রিকা এখন যে প্রচার লাভ করিয়াছে, উহা যদি নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে বাঙ্গালী জনসাধারণের একটা অনিষ্ট ঘটিবে বলিয়া আমাদের মনে হয়। অথচ, আনন্দবাজার পত্রিকার পরিচালকগণ যেরূপ স্ফীত-মস্তিষ্ক হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে ভগবানের নিয়মানুসারে অদূর ভবিষ্যতে তাঁহাদের পতনের আশঙ্কা আছে। তাই আবার আমরা তাঁহাদিগকে সতর্ক হইতে অনুরোধ করি।

কলিকাতায় সম্মিলিত মুসলমান দল

গত ২৬শে মে কলিকাতায় "সম্মিলিত মুসলমান দল" নামে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। আগামী শাসন-সংস্কারে ব্যবস্থাপক-সভার নির্ব্বাচনে সভ্য-পদপ্রার্থী হওয়া এবং ব্যবস্থাপক-সভায় গিয়া শাসন-সংস্কারকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলাই এই দলের প্রধান কার্য্য হইবে।

এই দল গঠনের জন্য ২৪শে মে তারিখে ঢাকার নবাব বাহাদুরের রসা রোডস্থ বাটীতে একটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল।

এই দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলা হয় যে, বাঙ্গালার মুসলমানদের সহিত জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, সেই কারণে নূতন শাসন-সংস্কার গ্রহণ করিয়া যাহাতে এই প্রদেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই দল বাঙ্গালার সকল সম্প্রদায়ের সহিত হৃদ্যতা ও বাধ্য-বাধকতা বাড়াইবার জন্য চেষ্টা করিবে। দলের সভ্যগণকে একটি "ক্রীডে" স্বাক্ষর করিতে হইবে এবং এই বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে, তাঁহারা নূতন শাসন-সংস্কারে কাজ করিবেন, দলের নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিবেন এবং অধিকাংশের সিদ্ধান্ত স্বীকার করিবেন।

দলের তিনটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। (১) জেনারেল কমিটি, ইহাতে ২৪৫ জন সদস্য থাকিবেন ; (২) পরামর্শ কমিটি, ইহাতে ৬০ জন সভ্য থাকিবেন ; (৩) কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটি, ইহাতে ১৬ জন সভ্য থাকিবেন। অস্থায়ী ভাবে ইঁহারা কার্য্য-নির্ব্বাহক নিযুক্ত হইয়াছেন—সভাপতি—ঢাকার নবাব বাহাদুর, সহঃ সভাপতি—নবাব মসারফ হোসেন, সম্পাদক—মিঃ এইচ. এস্. সুরাবর্দ্দী সহঃ সম্পাদক—মিঃ কে নুরুদ্দীন, কোষাধ্যক্ষ—মিঃ হাসান ইস্পাহানী।

দলের উদ্দেশ্য :—

(ক) রায়ত ও শ্রমিকের অবস্থার উন্নতি-সাধন।

(খ) প্রজাস্বত্ব-বিষয়ক আইনের উন্নতি সাধন করা, যাহাতে প্রজা বর্গের সাধারণ অবস্থার উন্নতি হইতে পারে।

(গ) এই প্রদেশের শিক্ষাপদ্ধতির পুনঃসংস্কার এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন।

(ঘ) জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি।

(ঙ) কৃষির উন্নতিসাধন, জলনিকাশের বন্দোবস্ত এবং মরা নদী, খাল প্রভৃতির সংস্কার।

(চ) এই প্রদেশে শিল্পের উন্নতিসাধন।

(ছ) অর্থ, রাজনীতি ও সমাজের কল্যাণসাধন।

(জ) গ্রামের পুনঃসংস্কার ও কুটীর-শিল্পের উন্নতিসাধন।

সম্মিলিত মুসলমান দল 'সর্ব্বসম্মিলিত' হইবার চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া তাঁহারা ভারতীয় জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন। তাঁহারা যে কার্য্যতালিকা জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে ভারত আবার সুখের দিন দেখিবে, ইহা আশা করিতে পারা যায়। কিন্তু, তাঁহারা যেরূপ-ভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে ঐ কার্য্য-তালিকা প্রকৃত পক্ষে কার্য্যে পরিণত হওয়া সম্ভব কি?

রায়ত ও শ্রমিকদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইবে বলিলেই তাহা কার্য্যতঃ করা যায় না। একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, রায়ত ও শ্রমিকদিগের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে জমীদার, মহাজন এবং বণিক্‌দিগের এবং দেশের প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইবে। কোন এক শ্রেণীর লোককে বাদ দিয়া, অপর কোন শ্রেণীর লোকের স্থায়ী উন্নতি হওয়া সম্ভব নহে। ইহার সাক্ষী বর্ত্তমান বণিক্, উকিল, জমীদার প্রভৃতি। ইহাঁরা প্রত্যেকেই অপরের অবস্থাকে উপেক্ষা করিয়া এতাবৎ স্ব স্ব অবস্থার উন্নতি সাধন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কার্য্যতঃ সফল হন নাই।

সকল শ্রেণীর লোকের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইলে যে পরিবর্ত্তনের এবং যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তাহা সমগ্র ভারতবাসী সম্মিলিত না হইলে গবর্ণমেণ্টের দ্বারাও সংগৃহীত হওয়া সম্ভব নহে।

বিশেষতঃ, যতদিন পর্য্যন্ত নদীগুলির উৎপত্তি-স্থান হইতে তাহাদের সংস্কার সাধিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব নহে। যুক্তপ্রদেশের, অথবা বিহারের গঙ্গাকে উপেক্ষা করিয়া, শুধু বাঙ্গালার গঙ্গার সংস্কার সাধন করিলে উহা আবার অচিরে মজিয়া যাইবে এবং তাহাতে কোন ফলোদয় হইবে না।

কাযেই, কৃষকের প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে হইলে সারা ভারতবর্ষের মিলন অথবা সম্মিলিত ভারতীয় কংগ্রেস্ অপরিহার্য্য। তাহার, অর্থাৎ সম্মিলিত কংগ্রেস গঠন করিবার চেষ্টা না করিয়া, একটা শ্রুতিমধুর কার্য্য-তালিকা দেশের সম্মুখে উপস্থিত করিলে, নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বের সহায়তা সাধিত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে রায়তের কোন উপকার সাধিত হইবে না। পরন্তু, এখন রায়তগণ যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে এবং তাহাদের অবস্থা যে দিকে চলিয়াছে, তাহাতে যদি তাহারা বুঝিতে পারে যে, তাহাদিগকে 'বাবু'রা প্রতারিত করিতেছেন, তাহা হইলে এক সময়ে কিল-গুঁতা খাইবারও আশঙ্কা আছে।

যে-কার্য্যতালিকা রায়তদিগের সম্মুখে সম্মিলিত মুসলমান দল উপস্থাপিত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা আগামী নির্ব্বাচনে সাফল্য লাভ করা সম্ভব হইতে পারে বটে, কিন্তু ঐ কার্য্যতালিকা কার্য্যে পরিণত না হইলে পুনর্ব্বার রায়তদিগের সম্মুখীন হওয়া বিপজ্জনক হইবে।

কাযেই, আমরা এই নূতন দলকে একটু পরিণামদর্শিতার সহিত সতর্ক হইতে অনুরোধ করি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলা-বানান-সমস্যা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রস্তাবানুযায়ী বাঙ্গালা ভাষার বানান-সমস্যার সমাধানকল্পে প্রায় দুই শত বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপকের অভিমত সংগ্রহ করেন। সদস্যগণের মতৈক্য অনুসারে বানানের প্রত্যেক বিধি রচনা করিয়া একটি রিপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ছাপান হইয়াছে এবং ভাইস-চ্যান্সেলার স্বয়ং তাহার ভূমিকা লিখিয়া বলিয়াছেন—"বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত শব্দসমূহের মধ্যে যেগুলি সংস্কৃত ভাষা হইতে অপরিবর্ত্তিত-ভাবে আসিয়াছে, তাহাদের বানান প্রায় সুনির্দিষ্ট। অর্থাৎ, যেগুলি দেশজ বা অজ্ঞাতমূল, বিদেশাগত অথবা সংস্কৃত বা বিদেশী শব্দের অপভ্রংশ, তাহাদের বানানে বহু স্থলে বিভিন্নতা দেখা যায়। ইহার ফলে লেখক, পাঠক, শিক্ষক ও ছাত্র সকলকেই

কিছু কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। যদি সাধারণে সংকলিত নিয়মাবলী গ্রহণ করেন, তবেই অনেক বাংলা শব্দের বিভিন্ন রূপ অপসৃত হইবে এবং তাহার ফলে বাংলা ভাষা শিক্ষার পথ কিছু সুগম হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত ও অনুমোদিত পুস্তকাদিতে ভবিষ্যতে এই নিয়মাবলীসম্মত বানান গৃহীত হইবে।"

প্রকৃত ভাষাতত্ত্বের উদ্দেশ্য কি এবং বানান বিষয়ে তথা-কথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কি পন্থা অবলম্বন করা উচিত, তাহা আমরা বঙ্গশ্রীর গত বৈশাখ সংখ্যায় "বর্ণবিন্যাস, ভাষাতত্ত্ব ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়"-শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আমাদের পাঠকবর্গকে জানাইয়াছি।

আমাদের ন্যায় অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথায় কর্ণপাত করা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ যে কর্ত্তব্য মনে করেন না, তাহা তাঁহাদের কার্য্য হইতেই প্রমাণিত হইতেছে।

প্রকৃতির নিয়মানুসারে ভাষা কিরূপ-ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহা বররুচির "প্রাকৃত-প্রকাশ" যথাযথ অর্থে পড়া থাকিলে বুঝিতে পারা যায়।

বিভিন্ন ভাষাভাষীর ভাষা বুঝিতে হইলে, ভাষাতত্ত্ব জানা একান্ত প্রয়োজনীয়। ভাষাতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ভাষা তিনটি—সংস্কৃত, আরবী এবং হিব্রু। সংস্কৃত, আরবী এবং হিব্রু, এই তিনটি পদ একার্থক। "পাণিনি" যথাযথ অর্থে পড়িতে পারিলে প্রকৃত ভাষাতত্ত্ব জানা যায়।

বর্ত্তমানে যদি কোন প্রাপ্তবয়স্ক ও পরিণতবুদ্ধি ব্যক্তি নিজের ভ্রম বুঝিয়া "প্রাকৃত-প্রকাশ" এবং "পাণিনি"র বৈজ্ঞানিক অর্থ কি হইতে পারে, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হন, তাহা হইলে ভাষার প্রাকৃতিক গতি ও সংস্কৃত রূপ কি হওয়া উচিত, তাহা বুঝিয়া উঠা সম্ভব নহে।

শব্দের প্রাকৃতিক গতি ও সংস্কৃত রূপ কি হওয়া উচিত, তাহা না জানিয়া পদের বানান সম্বন্ধে কোন নিয়ম প্রণয়ন করিলে, কেন ঐ বানান এরূপ করা হইতেছে, তাহার কোন সঙ্গত যুক্তি দেওয়া যায় না। কোন পদের বানান কেন ঐ রূপ করা হইতেছে, তাহা যদি ছাত্রগণ জানিতে না পারে, তাহা হইলে ভাষা সম্বন্ধে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির স্ফুরণ হওয়া সম্ভব নহে। বুদ্ধি-বৃত্তির স্ফুরণই যে শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য তৎসম্বন্ধে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। প্রায়শঃ এই বুদ্ধি-বৃত্তির যথাযথ স্ফুরণ হইতেছে না বলিয়াই স্বভাবতঃ প্রতিভামণ্ডিত যুবকবৃন্দ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধিগুলি অর্জ্জন করিয়াও স্বাধীন জীবিকাক্ষেত্রে সাফল্যলাভ করিতে পারিতেছেন না।

কাযেই, শব্দের প্রাকৃতিক গতি ও সংস্কৃত রূপ কি হওয়া উচিত, তাহা স্থির না করিয়া বাংলা বানানের নিয়ম প্রস্তুত করাকে পরোক্ষভাবে ছাত্রগণের সর্ব্বনাশ সাধন করা বলা যাইতে পারে।

যাহাতে ভাষার প্রাকৃতিক গতি ও সংস্কৃত রূপ কি হওয়া উচিত, তাহা জানা যায়, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রথম কর্ত্তব্য ছিল এবং যতদিন পর্য্যন্ত তাহা বিশ্ববিদ্যালয় স্থির করিতে না পারেন, ততদিন বানানের নিয়ম লইয়া ঘাটাঘাটি না করাই সঙ্গত ছিল।

প্রাকৃতিক নিয়মবশতঃ যে ভাষাটি বঙ্কিম বাবুর হাতে গড়িয়া উঠিতেছিল এবং যাহার আগুশ্রাদ্ধ কবি-সম্রাট রবীন্দ্র-নাথ ও তাঁহার অনুচরগণের দ্বারা সাধিত হইয়াছে, তাহার সপিণ্ডীকরণে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান অপরিণতবয়স্ক ভাইস্-চ্যান্সেলার এবং তাঁহার অপরিণত-বুদ্ধিসম্পন্ন অনুচরবর্গ—ইহা আমাদের মত। আমরা কেন যে এই মত পোষণ করি, তাহা বঙ্গশ্রীতে বহু প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি এবং ভবিষ্যতে দেখাইব।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সমিতি বাংলার এবংবিধ বানান-সংস্কার সাধন করিয়াছেন, ঐ সমিতিতে শ্রীযুক্ত রাজ-শেখর বসু ও শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নাম না থাকিলে উহা ঠিক ঠিক বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের সাদৃশ্য রক্ষা করিতে পারিত।

আমরা এখনও শ্যামাপ্রসাদ বাবুকে সতর্ক হইতে অনুরোধ করি। জনসাধারণের প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য যে কত গুরু, তাহা আমরা বহু প্রসঙ্গে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। অপেক্ষাকৃত অধিক সতর্কতার সহিত কার্য্য না করিলে শ্যামাপ্রসাদ বাবুর পক্ষে যে ঐ দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করা সম্ভব নহে, তাহা কি শ্যামাপ্রসাদ বাবু অস্বীকার করিবেন? যথোপযুক্ত দায়িত্বজ্ঞান যে তাঁহার নাই, তাহা কি তাঁহার কন্‌ভোকেসন্-বক্তৃতা প্রসঙ্গে আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহাতে দেখান হয় নাই?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য যাহাতে সুচারুভাবে নির্ব্বাহ করা হয়, তদ্বিষয়ে আর একটু অধিকতর মনোযোগ প্রদান করা চ্যান্সেলার স্যার জন অ্যাণ্ডার্সনের পক্ষে সম্ভব নহে কি? শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার যে অভিজ্ঞতার পরিচয় আছে তাহা স্মরণ করিলে বুঝিতে হয় যে, তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য-সম্বন্ধে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় যে আমাদের জীবন্-কাঠি ও মরণ-কাঠি!

যুবকবৃন্দ, তোমরা আমাদের বাঙ্গালার ভাগ্যাকাশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, তোমরা স্বাধীনতা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বরাজ্য লইয়া মত্ত থাক, কিন্তু তোমরা যে প্রাণপণে খাটিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিগুলি অর্জ্জন করিয়াও কেন অর্থকৃচ্ছ্রতা, অসন্তুষ্টি, অশান্তি, অকালবার্দ্ধক্য এবং অকাল-মৃত্যু ভোগ করিয়া থাক, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিবে কি?

কলিকাতার বর্ত্তমান সমস্যা ও স্যার হরিশঙ্কর পাল

কলিকাতার বর্ত্তমান সমস্যা যে প্রধানতঃ তিনটি, তাহা ইতিপূর্ব্বে আমরা বঙ্গশ্রীর পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি।*

কলিকাতা সহর উত্তরোত্তর অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়িতেছে এবং যে হারে ইহার অস্বাস্থ্যের বৃদ্ধি এযাবৎ হইয়া আসিতেছে, ঐ হারে উহা চলিতে থাকিলে অদূরভবিষ্যতে, কলিকাতা মানুষের বাসের অযোগ্য হইয়া পড়িবার আশঙ্কা আছে। কি কারণে এত অস্বাস্থ্য বৃদ্ধি পাইতেছে, কেন প্রতি ঘরে ঘরে, কেহ না কেহ, কোন না কোন একটা অসুখে ভুগিতেছেন, তাহা নির্ণয় করা কলিকাতা সহরের প্রথম সমস্যা।

কলিকাতার ভূমি ও বাড়ীর মূল্য উত্তরোত্তর হ্রাস পাইতেছে এবং তাহার ফলে যিনি এক সময়ে দশ হাজার টাকার মালিক ছিলেন, তিনি এখন দরিদ্র হইয়া পড়িতেছেন। ইহা কলিকাতা সহরের দ্বিতীয় সমস্যা।

এতদিনে কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, অথচ ট্যাক্সের হার হ্রাস পাইতেছে না, অধিকন্তু বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা আছে। কি কারণে ট্যাক্স কমাইয়া দেওয়া সম্ভব হইতেছে না, ইহা কলিকাতা সহরের তৃতীয় সমস্যা।

এই তিনটি সমস্যা পূরণ করার দায়িত্ব কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউনসিলারগণের স্কন্ধে ন্যস্ত রহিয়াছে।

আপাতদৃষ্টিতে উপরোক্ত সমস্যা তিনটি যত সহজ বলিয়া মনে হয়, বস্তুতঃ উহা তত সহজ নহে।

সহরবাসীর পক্ষে যদি সহর স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী না হয়, অথবা সহরে ভূমি ও বাড়ী ক্রয় করিলে যদি ক্রমশঃ দরিদ্র হইয়া পড়িতে হয়, তাহা হইলে সহরে বাস করা এবং তাহার ভূ-সম্পত্তির মালিক হওয়া কি বিপজ্জনক হয় না? সহরে বাস এইরূপ বিপজ্জনক হওয়া সত্ত্বেও, যদি করদাতাগণের ট্যাক্স কমাইয়া দিবার চেষ্টা না করিয়া, আবার প্রতিনিয়ত নানা রকম অজুহাতে তাহাদের নিকট হইতে বিভিন্ন রকমের অতিরিক্ত ট্যাক্স আদায় করা হয়, তাহা হইলে কি বুঝিতে হয় না যে, কলিকাতা কর্পোরেশনে এমন কোন কাউনসিলার নাই, যিনি স্বীয় দায়িত্ব নির্ব্বাহ করিবার চেষ্টা করিতেছেন?

অনেকে হয় ত' ইহার প্রত্যুত্তরে বলিবেন যে, সহরবাসীর যতদূর সুযোগ-সুবিধা হওয়া সম্ভব, তাহার ব্যবস্থা কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউনসিলারগণ করিতেছেন।

ইহাই যদি কাউনসিলারগণের অভিমত হয়, তাহা হইলে কি সহরবাসিগণকে বুঝিতে হইবে না যে, কাউনসিলারগণের বিদ্যাবুদ্ধি ও স্ব স্ব দায়িত্বনির্ব্বাহে মনোযোগ বড়ই কম?

আমরা বঙ্গশ্রীর মারফৎ ক্রমশঃ দেখাইব যে, অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প খরচে কলিকাতা সহরকে অধিকতর স্বাস্থ্যসম্পন্ন করা যায় এবং কলিকাতার কর্পোরেশনের কাউনসিলারগণ প্রায়শঃ তাঁহাদের দায়িত্ব অবহেলা করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া আরও দেখাইব যে, কলিকাতার অস্বাস্থ্যের কারণ অসংখ্য হইলেও, তাহা সাধারণতঃ কাউনসিলারগণের মনোযোগ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করে না। কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউনসিলারগণ তাঁহাদের দায়িত্ব অবহেলা করিয়া থাকেন বলিয়াই উপযুক্ত

* ১৩৪২ সনের পৌষ সংখ্যায় "কলিকাতা কর্পোরেশনে মুসলমানদিগের চাকুরীর দাবী"-শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

অভিজ্ঞতা এবং সততা-রক্ষার পন্থা-সম্বন্ধীয় শিক্ষা অর্জ্জন না করিয়াও মানুষ কর্পোরেশনের সর্ব্বোচ্চ চাকুরীগুলি লাভ করিতে পারিতেছে।

কর্পোরেশনের কাউনসিলারগণ যে তাঁহাদের দায়িত্ব প্রায়শঃ অবহেলা করিয়া থাকেন, তাহা সহরবাসিগণ একটু অবহিত হইয়া চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। নির্ব্বাচনের সময় তাঁহাদের প্রত্যেককে যেরূপ গৃহে গৃহে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যাইত এবং তাঁহাদের মুখ হইতে যেরূপ বিবিধ প্রতিশ্রুতির বাণী অহরহঃ নির্গত হইতে শুনা যাইত, করদাতাগণ এখন আর তাঁহাদের সেইরূপ সাক্ষাৎলাভ পাইয়া থাকেন কি? এক্ষণে কাউনসিলারগণের সাক্ষাৎলাভ করিতে হইলে করদাতাগণকে প্রায়শঃ বিবিধ সুপারিশ সংগ্রহ করিতে হয় না কি?

কাউন্সিলারগণ যে প্রায়শঃ স্ব স্ব দায়িত্বনির্ব্বাহে অবহেলা করিতে কুণ্ঠিত নহেন, তাহা কর্পোরেশনের বর্ত্তমান মেয়র স্যার হরিশঙ্কর পাল যেরূপভাবে অসংখ্য সংবর্দ্ধনা-ভোজে যোগদান করিয়া সময়ক্ষেপ করিতেছেন, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। যখন প্রতিদিন কলিকাতা সহরের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিতেছে, যখন প্রতিদিন কলিকাতার ভূমি ও বাড়ীর মূল্যের হ্রাসবশতঃ সহরের ভূম্যধিকারিগণ দরিদ্র হইয়া পড়িতেছেন, যখন কর্পোরেশনের ব্যয়াধিক্য-বশতঃ প্রতিমুহূর্ত্তে করদাতাগণের কর বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা রহিয়াছে, তখন যাহাতে সহরের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, যাহাতে ভূমি ও বাড়ীর মূল্যের হ্রাসপ্রাপ্তি না হইতে পারে, যাহাতে করদাতাগণের ট্যাক্স বৃদ্ধি না পাইয়া কমিয়া যাইতে পারে, তাহার পন্থা কি হইতে পারে, মেয়র তাহার চিন্তায় ব্যাপৃত আছেন, এমন কোন প্রমাণ যদি না পাওয়া যায় এবং যদি দেখা যায় যে, প্রায় প্রতিদিনই একটা না একটা প্রীতি-ভোজে যোগদান করিতে তিনি ব্যস্ত রহিয়াছেন, তাহা হইলে কি বুঝিতে হয় না যে, মেয়র তাঁহার কর্ত্তব্যপালনে যতটুকু অবহিত, তদপেক্ষা "মেয়রত্ব" উপভোগে অধিকতর যত্নশীল? ইহা কি পরিতাপের বিষয় নহে? তথাকথিত 'সিমলা-গড্'গণ (Simla Gods) পান-ভোজনে ব্যাপৃত থাকেন বলিয়া দেশের প্রায় সমস্ত লোক তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ করেন না কি? যাহা লইয়া অপরকে বিদ্রূপ করা হয়, তাহা আমাদের নিজেদের করা সঙ্গত কি?

এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, স্যার হরিশঙ্কর পালের মত নিরীহ, পরিশ্রমী ও সৎপ্রকৃতির ভদ্রলোক কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলারগণের মধ্যে খুব বেশী পাওয়া যায় না। যিনি এতাদৃশ নিরীহ, পরিশ্রমী এবং সৎপ্রকৃতি, তিনিই যদি তাঁহার কর্ত্তব্য অবহেলা করিতে কুণ্ঠিত না হন, তাহা হইলে অপরাপর কাউন্সিলারগণের নিকট হইতে কি আশা করা যাইতে পারে?

স্যার হরিশঙ্কর পালকে মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি যে এতদিন ধরিয়া সদ্‌ভাবে কঠোর পরিশ্রমের সহিত কলিকাতা কর্পোরেশনের সেবা করিয়া আসিতেছেন, কলিকাতাবাসিগণ তাঁহাকে তাহার পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন। সকল দলের কাউন্সিলারগণ যে তাঁহাকে একবাক্যে মেয়র-পদে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন, তাহাই কলিকাতাবাসিগণের তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্ন।

তাঁহাকে আরও মনে রাখিতে হইবে যে, সহরবাসিগণের অতিশয় সঙ্কটকালে তিনি কর্পোরেশনের কর্ণধার হইতে পারিয়াছেন। যদি তিনি সতর্কতার সহিত কার্য্য করিয়া তাঁহার দায়িত্ব নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তাহা হইলে সহরবাসিগণ চিরদিন তাঁহার কার্য্যকলাপ মানসপটে অঙ্কিত রাখিবে এবং তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। আর, অন্যথায় তাঁহাকে অবজ্ঞেয় হইতে হইবে।

রাজনীতি এবং অর্থনীতি-সম্বন্ধীয় তাঁহার বক্তৃতাসমূহে ভূয়োদর্শিতা এবং দূরদর্শিতার চিহ্ন থাকা একান্ত বিধেয়। সম্প্রতি বেঙ্গল ন্যাসনাল চেম্বার অব কমার্শের সভাপতিরূপে তিনি সোস্যালিজ্‌ম-সম্বন্ধে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন এবং ঐ বক্তৃতায় ধনিকতা সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে চিন্তাশীলতার অভাবের চিহ্ন রহিয়াছে। বঙ্গশ্রীর এই সংখ্যায় "সমাজতান্ত্রিকতা, ধনিকতা ও আনন্দবাজার পত্রিকা"-শীর্ষক যে-সন্দর্ভ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পড়িলে দেখা যাইবে যে, স্কুলের কেতাবে যে সমস্ত কথা লেখা থাকে, তাহা প্রায়শঃ ভ্রমাত্মক। কোন বক্তৃতায় স্কুলের কেতাবের কথা প্রতিধ্বনিত হইলে, বক্তা স্কুল-বালকসদৃশ হইয়া পড়েন। আমরা তাঁহাকে আমাদের বন্ধু মনে করি বলিয়া

সতর্কতা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেছি। নতুবা, তিনি লোকসমাজে হাস্যাস্পদ হইয়া পড়িবেন।

স্যার হরিশঙ্কর কলিকাতার মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া আমরা আনন্দিত। তিনি আমাদের "বঙ্গশ্রী"র স্বত্বাধিকারী মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস লিমিটেডের অন্যতম ডিরেক্টর। তথাপি, আমরা তাঁহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে বাধ্য হইলাম; তাহার কারণ, যাঁহারা লোকহিতকর কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের সদসৎ কার্য্যগুলি লোকসমক্ষে প্রচার করা আমাদের অন্যতম মূলনীতি। আশা করি, স্যার হরিশঙ্কর আমাদের অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিয়া যথাযথ অর্থে আমাদের কথাগুলি গ্রহণ করিবেন এবং ভবিষ্যতে আবার যাহাতে তাঁহার কার্য্যের এতাদৃশ সমালোচনা না করিতে হয়, তাহার সহায়তা করিবেন।

বাঙ্গালা দেশ, বাঙ্গালা সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ

গত জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা মহম্মদী-পত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা পাঠ্য-বিচারপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি লেখা আলোচিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রতিবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত করিয়াছেন। এই প্রতিবাদের মূল বক্তব্য হইতেছে, সাহিত্য-বিচারে সাম্প্রদায়িক মাপকাঠির স্থান নাই। তিনি তাঁহার যুক্তি-সমর্থনার্থে মিল্টনের "প্যারাডাইস লষ্ট" ও সেক্সপীয়ারের "ম্যাকবেথ" হইতে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন।

সম্প্রতি দেশে সাম্প্রদায়িক সমস্যা এমন তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যে, ঐ সমস্যা লইয়া কোন আলোচনা করিতে ভয় হয়। যে-ক্ষতের ব্যথায় রোগী প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যু কামনা করেন, সেই ক্ষতে চিকিৎসক কি শুশ্রূষাকারীর হস্তক্ষেপও রোগীর পক্ষে ভীতিজনক। চিকিৎসক কি শুশ্রূষাকারীর মূল উদ্দেশ্য যে, তাঁহার পক্ষেই সুখকর, এ বোধ রোগীর তখন থাকে না, পাছে কেহ তাঁহার ক্ষতস্থানে ব্যথা দেয়, এই বোধই তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ পীড়িত করে। বর্ত্তমানে দেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যা এমনই একটি জীবন-মরণের দায় হইয়া উঠিয়াছে। ইহা লইয়া আলোচনা করিলেই মনে হয়, কোথা হইতে কোন্ রোগী মরণ-চীৎকার করিয়া উঠিবেন, শেষ অবধি আমাদের কথা শুনিবার ধৈর্য্যও তাঁহার থাকিবে না।

আমাদের মতে সাম্প্রদায়িক সমস্যা একটি কৃত্রিম সমস্যা। দেশের প্রকৃত সমস্যা অন্ন ও বস্ত্রের। সেই সমস্যার বোধ যাঁহাদের মধ্যে সামান্য মাত্রাতেও আসিয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে অপর কোন সমস্যার অনুভূতিও অস্বাভাবিক। অথচ দেখি, দেশের পত্র ও পত্রিকায় সাম্প্রদায়িক সমস্যা লইয়া সকলেই অতিমাত্রায় চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং সন্দেহ হয়, আমরা আমাদের প্রকৃত সমস্যার উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি কি না।

সাম্প্রদায়িক সমস্যার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে, একটি দিক্ সুপরিস্ফুট হয় যে, মুসলমানেরা প্রায় সকলেই ভাবিতেছেন, হিন্দুরা কয়েক শত বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত তাঁহাদের উপর অবিচার করিয়া আসিয়াছেন। ইহার কারণও আমরা বুঝিতে পারি। অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, কয়েক শত বৎসরের (কয়েক সহস্র বৎসর বলাই ঠিক) সামাজিক ব্যবস্থায় এমন একটি বিধি মানিয়া চলা হইয়াছে, যাহাতে মনুষ্য-সমাজে অধস্তন ও উপরিতন হিসাবে একটি অপ্রাকৃত শ্রেণীবিভাগ বিদ্যমান ছিল। কালের প্রভাবে এই উপরিতন শ্রেণীকে আজ অধস্তনের নিকট সম্পূর্ণ হিসাবনিকাশ দিতে হইবেই। রবীন্দ্রনাথই তাঁহার একটি কবিতায় লিখিয়াছিলেন—

> হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদেরে করেছ অপমান
> অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

কিন্তু, কাব্যে রবীন্দ্রনাথ যাহা উপলব্ধি না করিয়া সংস্কারবশে লিখিয়াছিলেন, বাস্তব জীবনে তাহার দায়িত্ব গ্রহণ করিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই। সে সামর্থ্য থাকিলে তাঁহার কাব্য অন্য রূপ গ্রহণ করিত, দেশের কোন সম্প্রদায়ের লোকই তাহাকে অন্তঃসারশূন্য ও অসার বলিতে পারিত না।

কিন্তু যে কথা বলিতেছিলাম: সাম্প্রদায়িক সমস্যার মূল কারণ বলিয়া ইতিহাস-পাঠে যাহা প্রমাণিত হয়, আমরা ইতিপূর্ব্বে তাহার আভাস দিয়াছি। (১৩৪১ সনের চৈত্র-সংখ্যা প্রকাশিত 'ভারতবর্ষের বর্ত্তমান-শিক্ষার অবস্থা'-শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ও ১৩৪২ সনের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় প্রক

তের 'বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়'-শীর্ষক প্রবন্ধের ৫৩২ ও ৫৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত "বর্ণাশ্রম ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ"-শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ঐ কারণ বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিকৃতিই পূর্ব্বে উল্লিখিত অপ্রাকৃত শ্রেণীবিভাগের মূলে; সুতরাং আমাদের মনে হয়, যতদিন পর্য্যন্ত আমরা প্রকৃত সমাজব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে না পারিব, ততদিন পর্য্যন্ত কোন না কোন রূপে সাম্প্রদায়িক সমস্যা আমাদিগকে পীড়িত করিতে থাকিবে। ইহার মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানের, কিংবা যে কোন প্রকারের সাম্প্রদায়িক সমস্যা মিটাইবার জন্য কোন জোড়াতালি দেওয়া চলিলেও, তাহাতে এই সমস্যার ছিদ্র অদৃশ্য হইবে না।

আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের মূল আলোচ্য কিন্তু সাম্প্রদায়িক সমস্যা নহে—আমাদের আলোচ্য রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ-পত্র। এই পত্রে রবীন্দ্রনাথ যে অংশে লিখিয়াছেন—

> "'হিজ হাইনেস' আগা খাঁয়ের বিবরণ জানি এবং সকলেই জানে। নরপূজা হিন্দুর লেখা গল্পে থাকলে নৈতিক অধঃপতন অনিবার্য্য হয়, কিন্তু মুসলমান সমাজের সর্ব্বাগ্রগণ্য রাষ্ট্রনায়কের ব্যবহারে থাকলে দোষ স্পর্শে না"।

—সেই কুৎসিত ইঙ্গিতের আলোচনা হইতেও আমরা বিরত থাকিতে পারিতাম; কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে, হিন্দুর লেখা গল্প ব্যতীতও নরপূজা হিন্দুর (না, ব্রাহ্মের?) প্রচলিত নীতিশাস্ত্রের একেবারেই বিরোধী নহে, এমন কি ঔপনিষদ হিন্দু ধর্ম্মের বর্ত্তমান আশ্রয়স্থল শান্তিনিকেতনেও ইহার প্রচলন আছে জানি এবং সর্ব্বাপেক্ষা মজার কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথ নিজেই সে পূজার পাত্রার্ঘ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন।

আগা খাঁর উল্লেখ করিয়া মুসলমান সমাজকে অকারণ আঘাত দিবার অমার্জ্জনীয় প্রবৃত্তিকে তিনি সংযত করিতে পারিতেন। আলোচ্য প্রতিবাদ-পত্রে ইহার প্রাসঙ্গিকতা মাত্র রবীন্দ্রনাথের আহত আত্মাভিমানকে প্রকাশ করিয়াছে এবং সাম্প্রদায়িক বিষ আরও বেশী ছড়াইবার সুযোগ দিয়াছে, ইহা ছাড়া আর কিছু করে নাই। অন্ততঃ, আত্মচিন্তা করিয়াও রবীন্দ্রনাথের এই বিষোদ্গারী কথা উচ্চারণ করা উচিত ছিল না।

কিন্তু, ইহাও আমাদের মূল আলোচ্য নহে, আমাদের মূল আলোচ্য এই প্রতিবাদ-পত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের বাঙ্গালা দেশ বিষয়ে দুইটি ইঙ্গিত :—

> (১) "আমার সম্বন্ধে এমন অপবাদ বাংলার মতো দেশেও সম্ভবপর হোতে পারে—এ আমি কল্পনাও করিনি।"
>
> (২) "কলি-যুগের কবির মাথায় হিন্দু-মুসলমান উভয় পক্ষই একই শ্রেণীর অপরাধ চাপিয়ে যদি তার অখ্যাতিকে দুর্ভর কোরে তোলেন তবে কি এই বাংলা দেশের পঙ্কিল মাটিকেই দায়ী করব?"

কথা ঘুরাইয়া বলিয়া একই কথার দশ রকম অর্থ করিবার সুযোগ দেওয়া এ যুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য এবং এদেশে সে সাহিত্যের যুগ-প্রবর্ত্তক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সেই রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেন, তাহার যে অন্ততঃ দুইটি অর্থ করাও সম্ভব, ইহা আমরা জানি। সুতরাং উপরের উদ্ধৃতাংশকে দেশ ও দেশবাসীর প্রতি ইঙ্গিত হিসাবে না লইয়া, অত্যন্ত গভীর সহানুভূতির ভাব হিসাবেও যে লওয়া যায়, এমন যুক্তি যদি কেহ দর্শান, তবে আমরা বিস্মিত হইব না। কিন্তু, মোটের উপর ঐ দুইটি উক্তিতে দেশ ও দেশবাসীর প্রতি যে মনোভাবের নিদর্শন আছে, এই অতিমাত্রায় সহনশীল বাঙ্গালা দেশ ব্যতীত রবীন্দ্রনাথকে তাহার জন্য আর কোন্ দেশবাসী ক্ষমা করিত?

রবীন্দ্রনাথের প্রথম উক্তিটি বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে হয়, বাংলা দেশের লোক অপবাদ ব্যতীত আর তাঁহাকে কিছুই দেয় নাই এবং এমন অপবাদ নাই, যাহা বাংলা দেশের লোক তাঁহাকে দেয় নাই, কিন্তু সেই বাংলা দেশের পক্ষেও বর্ত্তমান অপবাদের সম্ভাব্যতা রবীন্দ্রনাথের কল্পনার বাহিরের বস্তু। অপবাদটি হইতেছে—

> "কাব্যে আমি পৌত্তলিকতার প্রচার করেছি অথবা পাপ একবার সুরু করলে, সেটা একেবারে চূড়ান্ত করাই কর্ত্তব্য, এই নীতিটাকে 'মানুষের মনে বদ্ধমূল' করবার জন্য আমি বদ্ধপরিকর।"

অর্থাৎ, কাব্যে পৌত্তলিকতার (কোন কবির পক্ষে সম্পূর্ণরূপে পৌত্তলিকতা বর্জ্জন সম্ভব কি?) প্রচার রবীন্দ্রনাথ করেন নাই এবং পাপ একবার সুরু করিলে মানুষের আর মুক্তির উপায় নাই—এমন কথা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বলা অসম্ভব। আমরা জানি, (মহম্মদীয় সমালোচকবৃন্দ ক্ষমা করিবেন) শুধু এই দুটি কথা নয়, রবীন্দ্র-সাহিত্যের আদ্যোপান্ত সন্ধান করিলেও কচিৎ এমন কোন কথা পাওয়া যাইবে, যাহার

উপর ভিত্তি করিয়া বলা যাইতে পারে; রবীন্দ্রনাথ ইহা বলিয়াছেন, কেননা ঐ কথারই প্রতিবাদমূলক উক্তি যে, তাঁহার অপর কোন রচনাতে পাওয়া যাইবে না, এমন কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

পৌত্তলিকতা-প্রচার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় মত যাহাই হউক, দেখা যাইতেছে, অ-পৌত্তলিকেরা তাঁহার কাব্য হইতে পৌত্তলিকতার নজীর খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন এবং পৌত্তলিকেরাও চেষ্টা করিলে তাঁহাদের স্বপক্ষে এমন অনেক কথা রবীন্দ্র-সাহিত্য হইতে টানিয়া বাহির করিতে পারিবেন, যাহাতে রবীন্দ্রনাথের অপৌত্তলিকতার প্রমাণ আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, হয়, দেশের সাধারণ লোক রবীন্দ্র-সাহিত্য বুঝিতে পারে না, নয়, দেশের লোক ইচ্ছা করিয়াই রবীন্দ্র-সাহিত্যকে ভুল বুঝে।

এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, ইহার হেতু কি?

গত ১৩৪২ সনের শ্রাবণ-সংখ্যায় প্রকাশিত "ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়"-শীর্ষক প্রবন্ধে "সাহিত্য" সম্পর্কে আলোচনায় আমরা লিখিয়াছিলাম :—

যিনি তাঁহার আভ্যন্তরীণ কোন্ অঙ্গের সহিত তাঁহার কোন্ শব্দ কিরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট, তাহা অনুভব করিয়া কথঞ্চিৎ শব্দজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারই নাম 'কবি'। প্রকৃত কবির নিজ যোগ্যতায়, লেখায় এবং শব্দ ও বর্ণবিন্যাসে বৈশিষ্ট্য থাকে।

তাঁহার নিজ যোগ্যতার বৈশিষ্ট্য দুইটি, যথা :—

(১) প্রকাশিত শব্দের সহিত স্বীয় অন্তরঙ্গের সম্বন্ধের কায়িক অনুভূতি;

(২) যে শব্দ যে অর্থে প্রকাশিত হইবে, তাহার আংশিক জ্ঞান।

তাঁহার লেখা সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য। প্রকৃত কবি যে বস্তু অথবা অবস্থা বর্ণনা করেন, পাঠকের মনে ঐ বস্তুর অথবা অবস্থার যে অংশ বাহ্যিক জগতে প্রকাশিত, সেই অংশ সম্পূর্ণ ও ঠিক ভাবে অঙ্কিত হইলে, কেন ঐ বস্তুর অথবা অবস্থার প্রকাশ ঐরূপ হইল, তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন পাঠকের মনে স্বতঃই উদিত হয়। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে, ঐ বস্তুর অথবা অবস্থার যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা ঠিক এবং সম্পূর্ণ নহে এবং যিনি উহা বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি কবি আখ্যা পাইবার উপযুক্ত নহেন। ..

সাহিত্য-রচনার সহিত শব্দজ্ঞানের যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক, তাহাও ঐ প্রবন্ধে প্রমাণিত হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় যে সুস্পষ্টতা ও সহজবোধ্যতার অভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহাতে কি আমাদের ঐ কথাই সমর্থিত হয় না?

ইয়োরোপীয় সাহিত্যের দোষগুণ বিচার করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ একদিন বলিয়াছিলেন—এ সাহিত্যে খাদ্য দ্রব্য অপেক্ষা মাদক দ্রব্যের আধিক্য বেশী। তাহার হেতু-নির্দ্দেশ তিনি করেন নাই। আমাদের উপরের কথা বিচার করিলে, শব্দসাধনা ও সেই সাধনালব্ধ জ্ঞানের সহিত সাহিত্যের কি যোগাযোগ, তাহা বুঝা যাইবে। বর্ত্তমান ইয়োরোপের নিকট এই তথ্য একেবারে অজ্ঞাত। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা বর্ত্তমান ইয়োরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে এমন দৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি, যাহাতে ঐ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিধি অতিক্রম করিয়া কোন কথা বলিলেই, তাহা অবিশ্বাস্য ও অগ্রাহ্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু, তবু আমরা রবীন্দ্রনাথকে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি যে, ইয়োরোপীয় সাহিত্যে মাদক দ্রব্যের আতিশয্য কেন হয়?

প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে তিনি এ যাবৎ অনেক কথা বলিয়াছেন এমন কি "তপোবনের বাণী"ও প্রচার করিয়াছেন। প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে তাঁহার এই বাণী বিদেশীরা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া শুনা যায়। আমরা গত পৌষ-সংখ্যায় "রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবর্ষের প্রাচীনতা"-শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আলোচনায় দেখাইয়াছি যে, প্রাচীন ভারতের আদর্শ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞতা কিরূপ। ইউরোপীয় সাহিত্যের যে-মাদকতা সম্পর্কে তিনি নিজে আপত্তি করিয়াছেন, সেই মাদকতাই যে তাঁহার কার্য্যক্রমেও পরিস্ফুট হইয়াছে, ইহার আভাস আমরা সেই প্রবন্ধে দিয়াছি। কেবল কার্য্যক্রমে নহে, তাঁহার সাহিত্যেও সেই মাদকদ্রব্যেরই আতিশয্য; হয়তো তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পাতিয়া খাদ্যদ্রব্য কিছু বাহির করা যাইতে পারে, কিন্তু মাদকদ্রব্যের অতিমাত্রায় সংমিশ্রণে সেই যৎসামান্য খাদ্যদ্রব্যও উপকার অপেক্ষা অপকার করিয়াছে ও করিতেছে অধিক।

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ গদ্যে পদ্যে বাংলা দেশে প্লাবন বহাইয়া আসিতেছেন—তাহার ফল কি দাঁড়াইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ ভক্তদের গণ্ডী ও স্তুতিস্তাবকতার কুহেলি অতিক্রম করিয়া তাহা দেখিবার চেষ্টা করিলেই নিজে [illegible] পারিবেন। সহজাত কবচকুণ্ডলের মত যে-প্র[illegible] তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে-প্রতি[illegible]

ফল প্রসব করিত, তবে দেশের মূর্ত্তি আজ অন্য প্রকার হইত না কি ?

আজ যে, দেশবাসী সময়ে অসময়ে তাঁহার উদ্দেশে কটূক্তি প্রয়োগ করে, উহার কারণও তিনি ইহা হইতে অনুমান করিতে পারিবেন। দেশবাসী তাঁহার নিকট প্রত্যাশা করিয়াছিল অনেক কিছু—কিন্তু সে প্রত্যাশার সামান্য পূরণও তাঁহার দ্বারা হয় নাই। দেশবাসী হইতে চিরকাল বিচ্ছিন্ন থাকিয়া দেশের মাঠ-ঘাট, নদী-বিল বন-বাদাড়কে তিনি ছন্দে পূজা করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার সমগ্র সাহিত্যে দেশবাসীর প্রকৃত দুঃখে সমবেদনার পরিচয় নাই, বরং ব্যঙ্গ ও পরিহাস আছে। কোন পক্ষে কটূক্তি ইহারই প্রতিক্রিয়া, কোন পক্ষে কটূক্তি মাদক দ্রব্য গ্রহণের শেষ ফল। রবীন্দ্রনাথকে আমরা ইহা বুঝিতে অনুরোধ করি।

কথায় কথায় দেশবাসী তাঁহাকে হতাদর করিয়াছে—এ অভিমান তিনি প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহার কি যৌক্তিকতা আছে ? আমরা তো দেখি, বর্ত্তমান বাঙ্গালী জনতার উৎসাহের কেন্দ্র দুইটি—(১) রবীন্দ্রনাথ, (২) মোহনবাগান। মোহনবাগানের গৌরবরবি অস্তমিত হইয়াছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনিতে আজও বায়োস্কোপের ভিড় হইয়া থাকে। তবুও কি রবীন্দ্রনাথ খুসী নন ?

আমরা জানি, আমাদের এই কথা রবীন্দ্রনাথের তিক্ত বোধ হইতে পারে, কিন্তু তিক্ততাই ইহার একমাত্র গুণ নহে, ইহা রবীন্দ্রনাথ চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবেন।

তাঁহার "জীবনস্মৃতি"তে তিনি লিখিয়াছিলেন—

> "আমার অন্য কোন প্রবন্ধে আমি বলিয়াছি—রমেশ দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহসভার দ্বারের কাছে বঙ্কিমবাবু দাঁড়াইয়া ছিলেন। রমেশবাবু বঙ্কিমবাবুর গলায় মালা পরাইতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম। বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি সে মালা আমার গলায় দিয়া বলিলেন, "এ মালা ইঁহারই প্রাপ্য—"

বঙ্কিমচন্দ্রের সেই দানের মর্য্যাদা কি তিনি রক্ষা করিতে পারিয়াছেন ?

অথচ তিনি পারিতেন, বোধ করি আজও পারেন - যদি শৈশবে যে গায়ত্রী-মন্ত্রটার প্রতি তাঁহার খুব ঝোঁক পড়িয়াছিল বলিয়া লিখিয়াছেন—সেই গায়ত্রী-মন্ত্রটা সম্পর্কে তিনি নিজের পাঠ ("কথার মানে বোঝাটাই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় জিনিষ নয়") ভুলিতে পারেন।

বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ, নেতৃবৃন্দ ও সরকার

এই "সুজলা সুফলা মলয়জ-শীতলা" বাঙ্গালার আজ ভীষণ অবস্থা, চারিদিকে হাহাকার, সর্ব্বত্র অভাব-অভিযোগ, বুভুক্ষুর চীৎকার, দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের মর্ম্মস্পর্শী করুণ বিলাপ—যে দিকেই তাকান যায়, সেই দিকেই এই ধন-ধান্য-পুষ্পভরা বসুন্ধরায় শ্মশানের দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। প্রায়, গৃহে গৃহেই বিকট দৃশ্য, মর্ম্ম-বিদারক চীৎকার। দিনাজপুর, রংপুর, রাজসাহী, ময়মনসিং, ঢাকা, কোমিল্লা, নোয়াখালী, যশোহর, খুলনা, চব্বিশ-পরগণা, হুগলী, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ অর্থাৎ বাঙ্গালার প্রায় প্রত্যেক জিলা হইতেই প্রত্যহ মানুষের যে অবস্থার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহা অত্যন্ত ভয়াবহ। সর্ব্বত্রই দুর্ভিক্ষের করাল মূর্ত্তি—লোকের অনশন-ক্লিষ্ট, অস্থিচর্ম্মসার, জীর্ণশীর্ণ দেহ, অভাবের বৃশ্চিক জ্বালায় সকলের জীবন অতিষ্ঠ।

কিন্তু, দেশের যাঁহারা হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা, দেশের যাঁহারা নেতা, সমাজের যাঁহারা শীর্ষস্থানীয়, তাঁহারা কিন্তু এত বড় একটা জীবন-মৃত্যুসমস্যাতেও "কূটস্থ চৈতন্যের" মতই একেবারে নির্ব্বিকার। এই সম্বন্ধে তাঁহাদিগের যে কোন কর্ত্তব্য আছে, ইহাও যেন তাঁহারা মনে করেন না; অন্ততঃ তাঁহাদিগের কার্য্যকলাপে তাহাই প্রতীত হয়। তবে, মধ্যে মধ্যে বিজলী-চমকের মত তাঁহাদিগের পোঁ-ধরা দুই একখানা দৈনিক সংবাদ-পত্র এখানে সেখানে দুই একটা শুষ্কগর্ভ কথা বলিয়া "যত দোষ নন্দ ঘোষ" হিসাবে একমাত্র সরকারই যেন এই জন্য সম্পূর্ণ দায়ী, এই ভাব প্রকাশ করিয়া আপনাদের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম শেষ করিতেছেন।

এই সম্পর্কে সংবাদ-পত্রের কর্ত্তব্য যে কত বড়, কত বিরাট, কতদূর দায়িত্বপূর্ণ, আমরা বঙ্গশ্রীর গত চৈত্র-সংখ্যায়